

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত

ভাষ্যতরঙ্গ

সচিত্র মাসিকপত্র

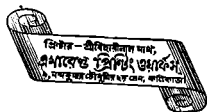
ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

১. গুরুদাসচন্দ্রোদ্যোগ এণ্ড সন্স—২০১ বর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা



অকালী, বিহব (বর্ষ)—ঈশ্বাওতোব তরকারী ...	১০০	কবি বনীচন্দ্র (সাহিত্য)—	
অক্সফোর্ড বেলে (কবিতা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক, বি-এ	১০১	কানবীর বিচারপতি তার ঈশ্বাওতোব তৌহী, কেট	
অমাব (বর্ষ)—ঈশ্বরানন্দী বেনী	১০২	কাপাল (কৃষি)—ঈশ্বরানন্দী লাহা ...	
অমর দিক (আশোচনা)—ঈশ্বরদয় স্টে	১০৩	কালিগাও ও তরকারি মাটের সাহী-চিহ্ন (সাহিত্য)—	
অমরকোশিট প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-পদার্থ (সাহিত্য)—		অধ্যাপক ঈশ্বরেন্দ্রনাথ তৌহী এম-এ ...	১০৪, ১০৫
ঈশ্বাওহুদ কবি, সাহিত্য-বিষয়ক		কুমারানন্দী (আশোচনা)—ঈশ্বরেন্দ্রনাথ বহু	১০৬
অভিভাব (সাহিত্য)—		কুমার (কবিতা)—ঈশ্বরদয়	১০৭
আমরোহাণাবার ঈশ্বরদয় তরকারি		কুমার (কবিতা)—ঈশ্বরানন্দী প্রমথ কট্টাচার্য ...	১০৮
অমরকোট (ইতিহাস)—		কৈশোর-কুমার (কবিতা)—ঈশ্বরানন্দী প্রমথ কট্টাচার্য...	১০৯
ঈশ্বাওহুদ বৈজ্ঞানিক-পদার্থ এম-এ ...		কালী সাইনুগুণ বৈজ্ঞানিক চিত্র (কবিতা)—	
অমরকোট সত্ত বৈজ্ঞানিক (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক বি-এ	১১০	ঈশ্বরানন্দী আশুত আশি বসিরাবাবী	১১১
আমরকোটিক বিধান (ব্যবহার-পত্র)—		কালী (বর্ষ)—ঈশ্বরানন্দী প্রমথ	১১২
ঈশ্বরানন্দী প্রমথ		কুমার (কবিতা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক বি-এ	১১৩
আমর টুয়া বর্ষ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক বহু		কুমার (বর্ষ)—ঈশ্বরানন্দী প্রমথ	১১৪
আশোচনা—ঈশ্বরেন্দ্রনাথ প্রমথ	১১৫, ১১৬, ১১৭	কুমার (কবিতা)—	
আশোচনা—সম্পাদক		ঈশ্বরকুমার প্রমথ বৈজ্ঞানিক-পদার্থ এম-এ, বি-এ	
আমরকোটের পরিবর্তন (বর্ষ-বিজ্ঞান)—		কুমার (উপকরণ)—	
অধ্যাপক ঈশ্বরানন্দী প্রমথ	১১৬	ঈশ্বরকৃষ্ণ টুয়াপ্রমথ	১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১
আমর (কবিতা)—ঈশ্বরেন্দ্রনাথ প্রমথ এম-এ	১১৭	টুয়াপ্রমথের সাহিত্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ কবি, সাহিত্য-বিষয়ক	১২১
আমর (কবিতা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ বি-এ	১২০	টুয়া (বর্ষ)—অধ্যাপক ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক কট্টাচার্য এম-এ	১২২
ইশ্বানন্দ (উপকরণ)—ঈশ্বরকুমার প্রমথ	১২১, ১২২	টুয়া (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক এম-এ	১২৩
উৎকল সাহিত্য (দৈনিক সাহিত্যসংগ্রহ)—		টুয়া (বর্ষ)—ঈশ্বরকুমার প্রমথ	১২৪
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ	১২৪, ১২৫	টুয়া ও টুয়া (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১২৫
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ		টুয়া-পত্রিকার	১২৬, ১২৭, ১২৮
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ		টুয়া (কবিতা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১২৭
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (আশোচনা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১২৭	টুয়া (কবিতা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১২৮
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১২৮	টুয়া (কবিতা)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১২৯
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১২৯	টুয়া (কবিতা)—	
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩০	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩০
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩১	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩১
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩২	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩২
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩৩	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩৩
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩৪	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩৪
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩৫	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩৫
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক	১৩৬	ঈশ্বরকৃষ্ণ মল্লিক প্রমথ	১৩৬
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমথ (বর্ষ)—			

কৃপ ৩৪ সেকিবিটার বিমানসদৌ কানান
কৃপ ৩৪ সেকিবিটার বিমানসদৌ কানান
৩ ইকি কানানের ইশাতের আন্দোলন
ইশাতের বর্ণ—ভাষার উপর বিভিন্ন শব্দ পোলাপাতের বন

ফৈব, ১০২৫

আবদীকতার বাসতি

সৌর-কমর

টাইবাইন

সেসিস সপ

কোক তৈরাতী করিবার উদ্যম

পাওয়ার হাউস

য়েস তৈরাতী করিবার

যান চালান দিবার প্রাতিষ্ঠান

ইশাতের কারখানা

বার বিদ্যুৎ

হান

এখন

ভাবনা

হাসি

চিন্তাবিকা

কাল

সলজী

অভিসিদ্ধে

চোখ টোপা

খাপিরা বাসিকাগ

মোটাক বহিরাগমন

চোখের উপর মৌমাছি

খাপি মোটাক

খোপের ভিতর মোটাক

খোপের মোটাক হইতে মৌমাছির বিতাড়ন

শুষ্কতার মধ্যে বসন্ত

শিশিরবাতন উপল

বরের চাকলা

বরের খাপ

ফতান

ফেটান

খোপের কল

শুকতার কর্ণপাতা

শুকতার কর্ণপাতা

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর পাকক

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর মৃত্যুশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দ, ১০২৩

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর বাসনা

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর বাসনা

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর মৃত্যুশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩ খ্রিষ্টিশাব্দীর

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

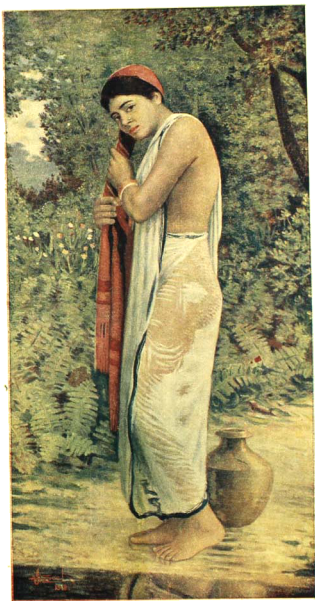
৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩

৩৩৩



সত্ত্ব স্নাতা

[শিল্পী—ঔদ্যোতেশচন্দ্র বসু]



পৌষ, ১৩২৮

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অষ্ট বর্ষ

[প্রথম সংখ্যা]

কর্ম-বিজ্ঞানের দুই ধারা •

[শ্রীকৃষ্ণশর্মা গোস্বামী এম-এ, বি-এল্]

যখন অগতে কোন নূতন পরিবর্তনের সূচনা হয়, তখন মানব বর্তমানের প্রতি অনাগত হইয়া, বর্তমানের যোগ উপলব্ধি করিয়া, উহার প্রতীকার-করে নূতন পদ্ধতি বা নূতন সভ্যতার অঙ্গগঠন করে। আবার যে যুগের মানব, তাহা যে একটা বিশিষ্ট পরিবর্তনের যুগ, তাহাতে বিমুখ্যে সন্দেহ নাই। চতুর্দিকেই নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন রীতিনীতির দিকে একটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র, সুবৈবের ভাণ্ডার, ভোগ-বিলাসের নীল-নিকেতন যুরোপ আজ মহাক্ষক-সময়ে অবতীর্ণ হইয়া বর্তমান সময়ে একটা ঘোর বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে,— বর্তমান সভ্যতার একটা পরিবর্তনের যুগ আনিয়া দিয়াছে। এই সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের একত্র সমাবেশ হওয়ায়, উভয়ের বিশেষণ আবর্তক হইয়াছে। এই সময় প্রাচীন ছাড়িয়া নবীনের অঙ্গগঠন আরম্ভ হইয়াছে। তাই নবীনের আঙ্গিনন করিবার পূর্বে প্রাচীনের সমালোচনা আবশ্যক

হইয়াছে। যে ভাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত-স্থিত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে দুহুর্ভমধ্যে ভাব-বিনিময়ের সহায়তা করিয়াছে; অসীম, অন্তঃস্পর্শ সমুদ্র দ্বারা আর্জা অবনত-মস্তকে পালন করিয়া, একদেশ হইতে দূরত্ব দেশান্তরে ভোগপকরণ বহিয়া লইয়া দাঁড়িতেছে;—হৃদয়-পর্বত, হৃদয় পণ্ডুল-অধ্যুষিত ভীষণ অরণ্যানী তুচ্ছ করিয়া যে ভাতি নিজে প্রকৃতি জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতা বিস্তৃত করিয়াছে;—তুবারাত্ত ভীষণ প্রদেশেও যে ভাতি জ্ঞানের প্রাণী জাতিতে উদ্ভাবিত—সেই পান্ডিত্য ভাতির মধ্যে মহত্বের উপর ভীষণ আক্রমণ দেখিলে বাতবিকই পান্ডিত্য সভ্যতার উপর সন্দেহ আনিয়া পড়ে। সভ্য বাটে, যে দেশে কেপলার, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রকৃতি দনীবিগণ অঙ্গগ্রহণ করিয়া স্বয়ং গণিতের গণনা অগভীর নির্যাতক প্রকৃতির গুঢ় রহস্যের আলোচনা করিয়াছেন, যে

দেশে স্থানীয়মানের স্তর সত্যাত্ম্যবোধী ব্যক্তি চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগপরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, যে দেশে স্ট্রিকেন, স্যাভিসন, মারকটীর স্তর বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির উপর রামধেনু পদ্ম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যে দেশে সকেটগন, স্ট্রেট, আফ্রিটেল, ডেকার্ট, ক্যাট, সেদেল প্রকৃতি পণ্ডিতগণ দর্শনের গভীর গবেষণা করিয়া গিয়াছেন,—সেই দেশের জ্ঞানে, সেই দেশের বিজ্ঞানে, সেই দেশের সভ্যতার আনন্দ যে অসিমান্যরূপে বৃদ্ধ হইবে তাহা আর বিচিৎ কি ? কিন্তু বিশ শতাব্দীর মধ্যকালে আর জগতে যে ভীষণ বজ্রের ব্যুটি করিয়াছে, যে ভীষণ তরঙ্গ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে সংসার-মাগের প্রত্যেক সাম্রাজ্যের কর্ণধার নিম্ন-নিম্ন গুরী রক্ষার বদল হইয়াছেন। তাই আর পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এতদিন পাশ্চাত্য জাতির বাহ্য দেখিয়াছি, তাহারই অন্ধকরণের চেষ্টা করিয়াছি; এতদিন প্রতীচ্যের যে কথা শুনিয়াছি, তাহাই বোধবাধ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছি; এতদিন যুরোপ যে জ্ঞান দিয়াছে তাহাই চরম বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি; - কিন্তু আর এই পণ্ডার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দেহের বীজ উপ হইয়াছে। বিনি শাস্তির আশ্রয় বলিয়া নোবেল প্রাইজের বস্ত্র মনোনীত হইতে বাইতেছিলেন, তাহার রক্ত-পিপাসা সেখা মস্তিষ্ক নিহরিয়া উঠে। আর নন্দন-কাননে আর্ন্তমানের ভৈরব নিবাস তুলিতেছি। তাই সেই নন্দন-কাননের ঐশ্বর্যের ও ভোগের—সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ ও ক্রমবিকাশ কিরূপে পাশ্চাত্য জগতে আত্মপ্রসার করিয়াছে এবং তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব।

জানি না কখন কি কখন কলংল আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সভ্য বটে, এই আবিষ্কারের পর হইতে জগতে একটা নূতন যুগের প্রবর্তনা হইয়াছিল; কিন্তু আশঙ্কা হইত বৃষ্টি এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুরোপীয় সভ্যতার ও সমাবে নৈতিক যুগেরও একটা ভীষণ পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে। মেক্সিকো ও পেরুর বিপুল ঐশ্বর্য, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার উর্বরতা যুরোপীয় জাতির বিলাস-বাদনা সঙ্গলগণে বর্ধিত করিয়াছে। প্রথমে স্পেন যে পথের প্রদর্শক হইয়াছিলেন, ক্রমে-ক্রমে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রকৃতি সেই পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আর তাহার

ফল যোগ্যতমের উৎকর্ষন নীতির (survival of the fittest) পোষকতা করিয়া আদিম Red Indian-জাতি স্থান-চ্যুত হইয়া গেল। হার কলংল, হার ভাকোভিগামা, তোমরা জগতে যে বহিষ্ঠা আনিয়াছিলে, তাহার পশ্চাতে যে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার সন্ধান লইয়াছিলে কি ? বুঝিয়াছিলে কি—“যে বিদ্রোহ রম্যে আঁধি, মরে নর তাহার পরশে” ? যে পুণ্ডের সৌরভে জগৎ মাতোরায়া করিয়াছিলে, সেই পুণ্ডের ভিতর যে কীটদংশনের অংশকা আছে, তাহা চিত্তা করিয়াছিলে কি ? তোমরা অন্ধকো যুরোপে যে ভোগ-বাদনার ব্যুটি করিয়াছিলে,—তাহার তুফা যে বড় প্রবল, সে তুফার যে সমুদ্র শোষণ করিতে বাসনা হয় ! যে আতঙ্ক-দুগ্ধিষ আনিয়াছিলে, ভোগোপকরণ তুণে পড়িয়া তাহা যে ভীষণ দাবাঘটিতে পরিণত হয় ! দেখিতে-দেখিতে Darwin, Huxly, Spencer প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ (survival of the fittest) যোগ্যতমের উৎকর্ষন, (struggle for existence) জীবন-সংগ্রাম, (Nature's selection : প্রাকৃতিক-নির্বাচন প্রকৃতি মতের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে যুরোপ মুগ্ধ হইয়া গেল—প্রকৃতি পূজার শব্দ-ধ্বনির ধ্বনিতে মগ্ন পাশ্চাত্য দেশ নিনাদিত হইল। “দুর্কলের পরাজয়” এই বব জগতে প্রচারিত হইয়া গেল। প্রকৃতি-পূজার আয়োজন করিতে বাইরা একবার কলো, ভলটোরার প্রকৃতি পূজকগণ যুরোপে যে অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহার তব এখনও বিস্তারিত হইয়াছে। আর আবার প্রকৃতি-পূজার ধ্বংস পড়িয়াছে বলিয়া মানুষকে প্রকৃতির সামিল করা হইয়াছে। দ্বা-বাদিগণ দুর্লভতার চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সবলের অধগমন আবার ঘোষিত হইতে বাইতেছে Ideal theoryর পরিপোষক বিখ্যাত জার্মান দার্শনিকের মতের বিপরীত ব্যাখ্যা জার্মানিতে আরম্ভ হইয়াছে। জার্মানির দার্শনিক কবি গেটে মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন, “Light, light, more light” “আলো—আলো, আরও আলো !” কিন্তু হার, আর জগৎপতির কবানের ধূমে জগৎ অন্ধকারের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতি-পূজার আয়োজন দেখিতে চাও—বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাও—ইংলণ্ডের নোবাথিনীর দিকে অবলোকন কর; ক্রুপ্পের বোথানার দিকে অগ্রসর হও; Krupp's Arms Factoryতে

বাও। ঐযর্থের বিপুলভায়ে, বিজয়ের বিপুল গৌরবে, ভোগের বিলাসটায় হরত মুগ্ধ হইয়া বাইবে; পাকাতা সভ্যতার চরণে শতবার নমস্কার করিবে; কিন্তু সমস্তের পশ্চাতে যে বীতংস ব্যাপার রহিয়াছে, এরূপের যে ভীষণ সৃষ্টি রহিয়াছে, ধর্মের যে বিরাট বণ্ণ সূচক রহিয়াছে, তাহাও একবার অধ্যয়ন করিও। Essen নগরে প্রবেশমাত্রই Krupp এর কারখানার ধ্বংসের যে ভৈরব বিনাদ তনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে বসে। তাই একজন জার্মান বলিয়াছিল “This is the place, where we make the stuff, with which to blow the world to pieces.” এই সেই স্থান, যেখানে আদম্য এমন তিনিশ প্রস্তত করিতেছি, যাহা সমস্ত পৃথিবী টুকরা-টুকরা করিয়া ছিন্নভিন্ন করিবে।

জার্মানিই না এত দিন পাকাতা সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত? জার্মানীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতাই না এতদিন পাকাতা জগতে আধঃপন্থি ছিল? কিন্তু যে সভ্যতার এই পরিণাম, যে সভ্যতার উদ্বর্তন ধর্মের দিকে, সেই সভ্যতার জগতের কি প্রকৃত উপকার হয়? যে সভ্যতার উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য ও ভোগ, সে সভ্যতার স্থায়িত্ব জগতে কতদিন বাহনীয় হয়? ইহা খুঁজি সত্য যে, ঐশ্বর্য নলিনীমলগত মনের ভ্রাস্র চক্রে। ঐশ্বর্য-মুগ্ধ প্রবেশের ভাষা জোইসাস একদিন সোণকে নিম্নের অতুল ঐশ্বর্য দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “সোণে, তুমি ত অনেক রান্না অনেক ঐশ্বর্য দেখিয়াছ, বল ত সর্বাংশেকা হুখী কে?” সোণে যে দুই-চারিজন ব্যক্তির নাম করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্রাট বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন তিনি পারস্যরাজ সাইরাস কর্তৃক পরাজিত হইয়া গলত চিতার নিকশিত হইতে বাইতে-ছিলেন, সেই দিন উক্তকণ্ঠে সোণের নাম উচ্চারণ করিয়া উচ্চার পাইয়াছিলেন, মধ্যম প্রবনী সপ্তদশবার ভারত লুণ্ঠন করিয়া যে রত্নরাশি আধরণ করিয়াছিলেন, যুগ্মর যবর সেই সমস্ত সপ্রে বাইতেছে না দেখিয়া, কি দর্শন ঘটনায়ে না পড়িয়াছিলেন! যথার্থ বেলগোলিয়ান বোনাগাট শেষ জীবনে কি যন্ত্রণাই না সহ করিয়াছিলেন! ভগবান কি উদ্দেশ্যে জগতে কি অভিনয় করেন, তাহা তিনিই জানেন। ধর্মরাধা প্রতিষ্ঠার বস্ত্র তিনি একবার কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করিয়াছিলেন; নিম্ন চক্রে অত্যাচারী বহুকুলের

ধ্বংস দেখিয়াছিলেন। জানি না এই মহাকুরুক্ষেত্রে আবার তিনি কি উদ্দেশ্য সাধিত করিবেন!

পাকাতা সভ্যতার যে চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, তাহার নৈতিক কারণ অসুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ বাস্তব কার্য অসম্ভব। পাকাতা দেশে সভ্যতা যেভাবে বিকৃতি লাভ করিয়াছে, পূর্বে ইহাতে তাহার আভাস দিয়াছি। এক্ষণে উহার মূল কারণ অসুসন্ধান করিতে গেলেই কর্ম-বিজ্ঞানের কথা আসিয়া পড়ে। কর্ম-বিজ্ঞানের দুই ধারা পাকাতাদেশে ও ভারতবর্ষে কিরূপ কার্য করিয়াছে, এবং সামাজিক নীতি নীতি, জাতীয় জীবন ও ধর্মের কিরূপ গঠন দিয়াছে, তাহাই সামান্য ভাবে আপনাদের নিকটে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিব।

পাকাতা জাতি কর্মবীর;—কর্ম যাত্রা তাহার চরমল্য পরিত, অসীম সমুদ্র, তুফানাত্ত ভীষণ প্রবেশ, ভীষণ ব্যাপন-মুগ্ধ অধ্যয়নী সুরুই জয় করিয়াছে। তাহাঙ্গিদের কর্মশৃঙ্গ দেখিলে সভ্য-সভ্যই মনোহৃত হইতে হয়। কর্মের প্রতি আগ্রহ ও আগন্তির অনলে শত শত বাধাবিহীনতীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেক কর্মের সাধনা করিতে দিয়া কতদিন অনাধারে অনিশ্চয় তাটাইয়াছে, বতগ্রকার দহিত্রাতকে বরণ করিয়াছে; এমন কি জীবন পরীত বিসর্জন দিয়া মস্ত্রের সাধন করিয়াছে। কিন্তু কর্মের প্রতি অতি আগন্তি—এই অসামান্য একাগ্রতা ভোগের প্রশ্রয় দান করিয়াছে। সভ্য বটে, “নহি কন্দিং কণমণি জাহু তিষ্ঠত্যকর্মকৃত্বং”—কণমাত্র কর্ম ব্যতিরেকে কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু ভারতবর্ষের কর্ম-বিজ্ঞান যুরোপের কর্ম-বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। পাকাতা দেশে কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বের অভিমান পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। কর্ম-মাত্রই কর্তৃত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মুক্তরাং কর্মের সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে কর্তারও সৌরভ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই কর্তা কর্মকে ভোগ না করিয়া ছাড়িয়া দিতে চাহে না। কর্তৃত্বাভিমানমূলক কর্ম তাহাদের নিকট অনেকটা প্রেমিক। কর্ম করিতে করিতে কর্তৃত্বকেই তাহার বড় করিয়া দেখে—জীবনটাকেই কর্মের সাধিল পণ্য করে। তাহার মনে করে “That all business is good”; কিন্তু কর্মের পশ্চাতে যে একটা সংঘত উক্ত আদর্শ রহিয়াছে, তাহা কখন দেখিতে ইচ্ছা করে না। কোন আদর্শের দিকে কর্ম

—It is not out of the mouths of kintled gun or the smothered rifle but out of the mouths of babes and sucklings that the strength is ordained which shall still the enemy and anger.”—Ruskin. এই সর্ববিধারী প্রেমের আশ্রয়ন পাইয়া কপিতাবস্তুর রাভা শাকাগিহ অনায়াসে পথের ভিখারী সাক্ষিরাহিলেন। ইগারই টানে চণ্ড অশোক হইয়া সমস্ত জীবন বহিরঃ ত্যাগের চক্কি করিয়াছিলেন। এই রসের রসিক হইয়া সমস্ত নানান বিপুল ঐর্ষ্যা ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়া কুলাবনের রঙে বেহ রাখিয়াছিলেন। এই প্রেমের ভক্ত এখনও তাঁহারা লক্ষ-লক্ষ মরনাচারী ক্রমের রাভা হইয়া রহিয়াছেন। আর এই ভীষণ সঙ্গোমের দিনে, কালের এই চৈতন্য নিনাদের মধ্যে, হিংসার এই প্রচণ্ড সূঁটির মধ্যে শান্তির উৎসের সন্ধান কি পাইব না—প্রেমের পুণকে - কদম মাতাইবার ভক্ত কেহ কি দেখা দিবে না? ভগবন্ কুনি না বলিয়াহ—

“বহা বদারি ধর্ম্মত মানির্ভবতি ভবতঃ ।

অনুখানঃ অধর্ম্মত উপাখ্যনঃ স্থলাবাস্হুঃ”

তবে একবার ঈশা, মুশা, তেভিড, ইব্রাহিম অথবা মহম্মদ রূপে আসিয়া শান্তির বার্তা ঘোষণা কর; অথবা ভক্ত, বৃদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রামোহনরূপে আবার প্রেমের স্তুতিতে ভগবৎ মাতাও। সংসারের আবর্জনা দূর করিয়া দাও, অহমিকা, ঐর্ষ্যা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের হানে বিনয়, মৈত্র, নিরুত্তি ও সন্ন্যাসের বহিরা প্রচার কর। চতুর্দিকেই ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। লক্ষ-লক্ষ পরিবার বিধবার ক্রন্দনে, শিশুর আর্জনে, বৃদ্ধের ধর্ম্মভর ব্যাঘাতের সুবিস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কত বৃগ-বৃগান্তরের শির, কত নগর, কত গরী, কত পথ, কত দেশ, কত গ্রাম্যর ধ্বংস হইয়াছে। কত পুণ্যভোটি: কলরিত হইয়াছে। কত সাধু পুরুষের স্তূতি ধূলিসাৎ হইয়াছে। ভগবন্, বাতকের জীবন লীলা, কামো-আমের বিকট বিশাল, শিষ্টের বর্জ্যতার পৈশাচিক ভাণ্ড, উচ্ছ্বল পতনের বীতংস আনন্দ, সূচ্য ও সংহারের ভয়াবহ দৃষ্ট, নরকের এই উৎসব, কত দিনে শেষ করিবে? এখন প্রেমের অর-পানে আবার ভগবৎ মাতাও। “মহানদেয় ভুখিয়া যাক, আবার তোরা মাহুৎ” হইবার বার্তা প্রচার কর “বস্ত্র বিস্ত চরচরত” এই নীতির ঘোষণা কর—ভদ্র

পবিজ হইয়া যাক। আবার এই সময়ানল হইতে পাকাতা সভ্যতা পরিভ্রুতি লাভ করুক। কর্ণবিজ্ঞানের বে ধারা ভারতে বে মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছে, তাহাই আবার সবত ভগবৎ প্রচারিত হউক। বিলাতের এক কবি বলিয়াছেন, “The East is East and the West is West. The twain shall never meet,” কিন্তু আমাদের কবি (বীরেন্দ্র) প্রচার করিয়াছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন অবশ্যই হইবে—কর্ণ-বিজ্ঞানের গদ্য ও বহুনার ধারা ভবিষ্যতে নতুন পুত প্রয়াগ-কোষ উন্মোচন করিবে। সেই বাস্তব আভাষ এই বৃদ্ধের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। গত বই লাহারী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহামতি Loyd George ‘War Aims’ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই যে অকৃত্রিম বিদ্ভাৎকাঙ্ক্ষা—এই যে ভোগ-বিশাস, এই যে স্বার্থাধান ও ভাণ্ডার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করা “These are blots on our civilisation of which every thinking individual would be ashamed. After all, war is a relic of barbarism.” তাই তিনি প্রকৃত-স্বার্থ ছাড়িয়া নিরুত্তি-স্বার্থের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, “We must see by some international organisation to limit the burden of armaments and diminish the probability of war” সেই দিন বোধ হয়, শত্রুই আসিবে, যখন প্রীতিচোর আশঙ্কি ও ভারতের সন্ন্যাস, প্রীতিচোর ভোগ ও ভারতের সংঘ, পশ্চিমের কর্ণকোলাহল ও পূর্বের শান্তির নদুর তরার একত্র হইয়া ভগবৎ এক নতুন যুগের প্রবর্তনা করিবে। আর সেই দিন আবার যেন ঐমহাদগবন্তের সুরে মুর মিলাইয়া বলিতে পারি,

“বাণী শুণাহু কখনে, শ্রবণৌ কথায়ান ।

হস্তৌ চ কর্ণশ্চ বনস্তব পানকোণৈঃ ।

সুপ্রাণি সন্তবঃ নিবাস ভগবৎপ্রণামে ।

দৃষ্টিঃ সত্য” ধর্ম্মনেহন্ত ভবৎ তনুনামঃ ।

হে ভগবন্, আমাদের বাণী যেন তোমারই গুণগান করে, কর্ণ যেন তোমারই কথার তুলি লাভ করে, হস্ত যেন তোমারই কর্ণে নিয়োজিত হয়, মন যেন তোমার পদ যুগলে সন্নিবিষ্ট হয়, মস্তক তোমার নিবাস এই ভগবৎ প্রণাম করিয়া সার্বকতা লাভ করে, আর দৃষ্টি যেন তোমার শরীর ভূত সাধুদিগের দর্শনে নিমুক্ত হয়। আর তোমার নাম কীর্তনের সময় যেন মনে হয়,—

“ত্বাদপি স্থনীচেন তত্তোয়ি বসিষ্ঠানা ।

অমানিনা যানবেন কীর্তনীঃ সদ্যঃ হরি ।

সে রাতে অরবিন্দ এখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সঘর নিশুভ, নিদ্রার নিম্নম। পথে পাগলাওমাথা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। হ্যা,—হু—একটা মাঠালু বা ঐ শ্রেণীর লোক কঠিন পানালয় বা ঐ প্রকার কোন স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। একটা পুন্নিশের হাতে পড়িল। তাহা দেখিয়া আর একজন ‘জানকীর দশা দেখে হাসে চুৰ্ছোৎসব’ ইত্যাদি গাহিতে-গাহিতে বথাসাধ্য বহিঃপথে পলায়ন করিতে লাগিল— তাহার অবস্থা কথকিত উন্নত।

দ্বারবান ছোট্ট সিং প্রভুর প্রতীক্ষার জাগিয়া থাকিয়া তখনও স্থর করিয়া তুলনীয়া পড়িতেছিল,—দ্বার পুন্নিশা দিগা সেলাম করিল। “সব কোই আছা হায়, না ছোট্ট সিং?” “ঐ, সব কোই আছা হায়। সেকেন, বড়া মাইকীকো তবিয়ে কুছ খারাপ বা।” “মার? কি হয়েছে?” “হ্যা এদীয়া কুছ নেই। শুনাখা কি বদনদ্রুখতাখা, অউর বোখারকা এইয়া মানুষ হোতাখা।” “ওঃ! কাষ্টিক, দেখে আর তো, মা পুনিয়ছেন কি না। দেখিল, বহি ঘুমিয়ে থাকেন, যেন আগাগু নু।”

কাষ্টিক খবর জানিতে চাহিয়া গেল। ছোট্ট সিংএর হারিকেন লঠনের সাহায্যে ততক্ষণে অরবিন্দ বৈঠকখানার পাশে নিজের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, হস্তিপদিকের একটা বড় জানালা পুন্নিশা ফেলিয়া সেইখানে গড়াইল। বাড়ীর এইদিকে বাগানের একটা অংশ আছে। জানালায় ধীরে-ধীরে সারবীণা কতকগুলি জুঁই ফুলের গাছ; একটা বিস্মিতি ফুল—বাগার নাম ব্যাখাশিয়া গ্রাভিকুলোজ— তাহারই একটা গাছ ছিল। বাতাসের একটা দমকার সঙ্গে খুব খানিকটা ঘন দৌতর ছুটয়া আসিয়া, বাতায়ন-সমীপ-বর্তী অংশ-স্রাব মতিফে দিগ্ধ প্রলেপমাখা শীতল হৃদ্য বুলাইয়া দিল। উত্তরীয়ে লগাটের বাম হৃদিয়া, সে হৃদীর্ষ নিখাস মোচনপূরক, বাহিরের অর্ধফুট অন্ধকার ঘেঁ

ছুটীকে জ্বাইয়া দিল। ছোট্ট সিং ইতাবলয়ের ঘরের অন্তান্ত দায়ন্তলা একে একে পুন্নিশা ফেলিল।

“মাতানু ঘুমছেন। দিঠানু বয়ে তেমন কিছু ভর নি। ছোট্টুর বৃদ্ধি দাখার বাড়ী ঢুকতে তর নয় নি।” তিনি খাবার আগলে বসে আছেন। “তুই আবার একবার বা; গিয়ে বলে আর,—আমি আজ আর বাবো না। ঐ জানলাটার কাছে আমার ভবর থেকে গালচেখানা এনে পেতে দিয়ে বা বেশি, আর আমি এইখানে শুয়ে ঘুমবো।”

কাষ্টিক অবাক হইয়া গিয়া বলিল, “বশা থাকেন নি।” “বশা তেমন নেই, বেশ বাতাল আসচে।” “নীচের ঘরে পোকা-মাকড় কি কোথা আছে, দানু, তপরে দানু। সেখান কি হাওয়ার আকাশ পড়চে? দিঠানু ব্যাগ করবে, কিছু ছুটী মুখে বেন গে।” “না, তুই গালচে-খানা পেতে দে।” “তবে ওলোর খে মকমলের গালচেটা নিয়ে আসি। ওতে হালিগুছু বুলো আছেন, সাত-অম্ব মোস দানু নি, ওতে ওয়ে কি ঘুম হবে?” “হবে— হবে। হা বলি তাই শেনু না। তোরা শুধু কথা-টালা।”

এই ভিরস্বারে ঘুমখানা গোঁজের মত করিয়া কাষ্টিক পাশের ঘর হইতে গাছিা লইয়া আসিল। গজগজ করিয়া বলিল, “কাষ্টিক বা বলেন, ভালর জন্তেই বলেন। পরমের কাল,—বিচে আছে,—রেতের বেলা বাসের নাম করতে নেই, উত্তরা সব বাগানে-বাগানে ঘুরচেন। মাতানু শুনলে কাষ্টিককে গুহ্বেন নি। কাষ্টিকে কি আঙ্কের চাকর?”

বিধান্য বিধানো ও আবস্তক বন্দোবস্ত হইয়া গেলে, উপরে খবর দিতে গিয়া অনেক দিনের ভূতা আবার সসঙ্কোচে কিরিয়া আসিল।—“দিঠানু আমার ‘গরে বৈকুন্ডে উঠলো। বরো বে তেনাকে তুই ভেকে দে’তো। খার না খার, সে আমি বুঝবো।”

তত্তা-বিগড়িত গভীর আলগভরে, হৃদিতনেত্র অরবিন্দ

ছাড়াছাড়া করিয়া উত্তর দিল, “বলগে বা, আমার খাবার কমতা নেই,—ভাতী ঘুম লেগে গ্যাছে। আর আমার আগাভন করতে আসিনু, আমি এখনি ঘুমিয়ে পড়বো।” “দি’ঠানু যে শোনে না বাবু, কতখানি কি? বহু যে লাট-স্রমে বধন ফিরে এলো, তখন থেকেই দামাধার শরীল-গতিক ভাল নেই, নেশা বেলে যেমনি টেলে পড়ে গুনার পাটিক তেমন করে টলছেলো। এত প্রেম কি ওই শরীলে নয়? তবে কি করেছে? আমার তো সবই সেখা আছে বাবু। বলি, কান্তিকে তো আর আছেকের নয়।” “আলোটা নিবিঘে দোঁতো কান্তিক।” “তা দিচ্ছি। আরি এই সামনের দামানে গুয়ে থাকচি। আলোও ঐখানেই রেখে দোব। জোরের বেলা তো ঘুম তাকবে—তা বত রাতেই শোও না কেনে। কান্তিকে আর তোমাদের না জানে কি?”

কান্তিক চানিয়া গেলে উপাধানর্দন মত্তক হুই বাছ মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া, অরবিষ উপুড় হইয়া পড়িল। সে যে ঘুমাইল, অথবা ডাণিয়া রহিল, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল না। কেবল কিছুকণ ধরিয়া বড় জ্ঞত শাস-প্রশাসের ধ্বনি স্রুত হইবার পর, তাহা ক্রমে থাঘিয়া আসিলেও, সে তাজির সমুদায় অবশিষ্ট কালটোতেই, মধ্যে-মধ্যে এক-একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ধেন একান্ত অসুখী কোন অপর্যায়ী প্রাণীর ভায় নিঃশব্দ লঘু চরণে সেই নিস্তব্ধ ঘরময় রাশি-রাশি যত্নবা ছড়াইয়া দিতে-দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ঘরের বাহিরে শুধরা অনেকদিনের পুরাতন ভূতা কান্তিকও ঘুম ডাণিয়া সে ধ্বনি শুনিতে পাইয়া, মনে-মনে ঐরাবচক্রে প্রব্র কহিয়াছে। এদর ঘর অনেক দিনের অব্যবহৃত,—এই বকম কাণ্ড ইহার মধ্যে যে ঘটা সম্ভব, এ তার তাহার মনে-মনে ঘটেই ছিল। তবে সে যে প্রকাশ করিয়া বলে নাই,—তা এসব কথা উগানের কাছে বলিয়া কি হইবে? বাহারা জলজাত—সেই গ্রামে বাহার নাম ধরিতে নাই,—স্তাণ্ডকেই যানিতে চাহে না, তাহারা আবার এই সব হাওয়া-বাতাস, অপসেবতার অজিবে বিশ্বাস করিবে? বা’ধোক, লোহার ছুরিখানা বিছানার তলার দিতে সে ভুল করে নাই,—এই বা মঙ্গল। সে তো আর ছোট্ট দিগের মত ছুদিনের লোক নয় যে, মনিষকে ধোঁহটা খুলিয়া দিরাই, মজা করিয়া চারপাইয়ে

চাপিয়া মাক ডাকাইবে! সে রাখে কান্তিক ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিগ না।

লকলবেলাতেই হুতিনখানা গাড়ি বোকাই করিয়া ছুতিন স্থান হইতে সুটুখ-সাকান আলিয়া পৌছিল। ঘোষরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেখান হইতে উক্ত-হোলে কায়া উঠিল; এবং বাহিরের ঘরে মাত্র-গণা আখীরের লগাধুতুতুচক পত্রিতাপ, প্রোবোধ এবং পরামর্শের মধ্যে, পিতৃব্যরোগ-কাতর অরবিল হেটুমে বারকতক উত্তরীর-প্রান্তে নেত্র মার্জনা করিয়া ফেলিয়া, বৈধ্যাবধনে চেতিত হইল। অল্প বাপের বড় আধরের সন্তান,—চিরদিনই সে পিতৃবৎসল। পিতার আদর ও শাসন সঙ্গত প্রভাভে সে চিরদিন মাঝার তুলিয়া লইয়াছে। সেই পিতাকে হারায়া তাহার চারিদিক সূত্র হইয়াছিল। সংসারের বড় কড়া এইবারে যে তাহার মাথার উপর উজ্জত হইয়া উঠিয়াছে, উচিত-অহুতিতের বিধা-বন্দে অন্তরাখা অতোভায় পূর্ণাবর্ত-বেগে পাক খাইয়-খাইয়া হাক’াইয়া উঠিতেছে,—ইহার পূর্বে এমন অবস্থা ঘটিতে পারে, এ ধারণাও যে তাহার ছিল না। ভাল-বন্দ-নিষিদ্ধারেই সে পিতৃ মাজা পাগল করিয়া গিয়াছে, সেখানে নিম্নের মাস-কর্তি বিস্ময়াজ লক্ষ্য করে নাই। সেনাপতিত্বের দায়িত্ব বড় বেশী,—তার চেয়ে সেনাপতির অধীন থাকিয়া সুখ-করা শতগুণে নিভাপ। তা, মুছের সেনাপতিত্বের অপেক্ষা সঙ্গারের সেনাপতিত্বের দায়িত্বও নেহাৎ কম নয়।

(৯)

ভাঁড়ার-ঘরে ওরগাণী সুটুখ-হেলেনের ভক্ত লগাধার দিতে বসিতে আসিয়া বেবিল, নানাবিধ ব্রা-সামগ্রীর মাফখানে একটা বড় ঝোড়ার করিয়া এক কোড়া বর্ধমানের সীতাতোপ প্রবৃত্তি রহিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই “দি’ঠান বরেন” বলিয়া কি একটা বলিবার মজা দার-লম্বীপস্থ কান্তিককে মেথিতে পাইয়া, ‘দি’ঠানে’ কি বলিলেন সে কথাটি তনিবার অপেক্ষা না বাবিসাই, ওরগাণী সেই ঘরে উপস্থিত একটা বালিকাকে মধ্যা রাধিয়া, বাহাতে কান্তিক শুনিতে পার এমনি উক্ত কর্তে বলিয়া উঠিল “জিজ্ঞেস কর তো, কাল-গুণ কত রাখে কিংগছিল?”

মেথটিকে আর বিজ্ঞাস্য করিতে হুইল না—কান্তিক

বকর্ষেই গুলিতে পাঠিয়া উত্তর দিল, “হাত, তা সে ঢের হয়েছিলুম বোমা, বাতারাটা-একটা হবেন বাধ করি।” “জিগেন্স কর তো টেপি, এ সব খাবার কোথা থেকে এলো?” প্রশ্ন তিনটাই মামী-বাওড়ী-দলগীরা ভাঙারের অধিকার-প্রাপ্ত্য কর্তী ঠাণ্ডাখণি কহিয়া উঠিলেন “কোথা থেকে খাবার আসবে বউ না! দেখতে না এমন বর্দ্ধবানের খাঁকা, মতিচূর, সীতেভোপ! গেল-বাতিরে অরু নিজে এ সব কিনে এনেছে।” কারিকুণ্ড এ কথার সম্পূর্ণ দায় দিয়া গেল, “হ্যাঁ মা, মামী-বাওড়ী বগেচে—বর্দ্ধবান না হলে এমন খাঁকা কি আর কোথাও চম্ভায়! ভগলপুরেও মল করে না, পেতে বরং ভালই; তবে রুগটি অমন দারুণ নয়—মনে আছে মামী-মা, বড়-বউয়ার বাপ হুলশবারে তবে খাঁকা দে’ছলো, একোখানি একো বায়কোসে করে—আর সে খাওয়ার—” “হ্যাঁ যে কারিকে, তোকে না আমি পাঠালুম চটে করে হু’খান চাঙ্গারি নিয়ে যেতে,—তুই এখানে এসে মজা করে খাওয়ার গল্প করছিল! দিন-দিন তুই হরিন কি?”

শরৎশস্যর এইরূপ আকস্মিক উদয়ে কার্তিকি ধমকিয়া গিয়া, অপ্রতিভের একশেষ হইয়া, আমতা-আমতা করিয়া উত্তর করিল, “আমি তাই তো নিয়ে—তাই তো—দি’খান, সেই নিতেই তো এইছিলুম। তা বউ মা গুজ্বিলেন এই খাঁকা-সীতেভোপের কথা। তাই বলি ভয়বতা দিয়েই একছুটে চলে যাই—” “কই চাঙ্গারি?” বলিয়া কার্তিকির বিপর মুখের দিকে চাহিতেই তাহার অবস্থা বুঝিয়া, “গল্প পেলো আর কিছু হুঁস থাকে না—” বলিতে-বলিতে বহুদূর মধ্যে পা দিয়াই, ভাত্ৰাভাষার অপ্রসন্ন মুখখানা চোখে পড়িল। মিষ্টায়ের বুদ্ধিটা যে ইহার দৃষ্টিকে আনন্দ বান করিতে পারে নাই, তাহা পলকের ভিতর বুঝিয়া লইয়া, তিনিও নিজের মুখে ইহার অহুকরণে গভীর করিয়া ফেলিয়া, প্রশ্ন করিলেন, “খাঁকা-সীতেভোপের কি হয়েছে বৌ?” বধু উত্তর না দিয়া ভদ্ম হইয়া পাড়াইয়া বহিল। মামী তাহার বদলে উত্তর দিলেন, “না, হয়নি কিছু। বউমা জিগেন্স করছিলেন, এ-সব কোথা থেকে এলো।” “বউমার যেমন ভ্রাকপনা। বর্দ্ধবানের খাবার ও কি কখন দেখেন নি, তাই জিগেন্স করতেন!”

মনমার এই টিপসিই হুতে জুড় বধু খাঁজিয়া কহিল, “দেখো না কেন, হু’খাখাবার দেখেছি। শুভ আবেশ্বে

যবে ভগবান ভদ্র মেননি। কে আমলে তাই জিগেন্স কর-ছিলুম।” “সেও শুভোখার ভ্রাকপনা। বেশ জানো যে বাবাই এনেছে। খাঁকা কাল বর্দ্ধবান গেছেলো—সে ছাড়া খাবার কে আনতে যাবে?” “খাবার দমর আবার সঙ্গে তো পরামর্শ করে নি। কেনন করে জানবো, কে কখন কোথায় যাবে। জিগেন্স করেছে, তাতে হয়েছে কি?”

“হবে খাবার কি? তবে ভ্রাকপানী বেবলে গা জালা করে। কেন, বর্দ্ধবানের খাবারও কি যবে আনতে দোষ আছে?” এই কথাটি বলা শেষ হওয়া নাহে শরৎশস্য চাঙ্গারি হু’খানা টানিয়া আনিয়া তাহা কার্তিকির হাতে তুলিয়া দিয়া—“নে কারিকেকে, পিঙ্গির করে আর, পিসে মশাই ওখানে রাগ করতেন হয় ত” বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। বহুদূর গভীর কলো চোখে তখন যে বিভ্রান্তের স্বপ্নের মত আলোর আভাস স্বপ্নকিতছিল, তাহা সে চাহিয়া দেখিয়াও গেল না। আর দেখিলেই বা কি হইত! এ রকম কথার ঠোঁক-মাংসমারি এ তো তাহাদের মধ্যে আকস্মিক নয়,—ইহা নিত্য। এই বধুটি যে দিন যবে আসে, সে দিন শরৎশস্য পেট-বাখার অছিলায় বিদ্যানার পড়িয়া ছিল,—শুভক্ষণে বধুর মুখ দেখে নাই, নুকে-কানে মধু চোখে গোপার চল দিয়া মধু-মাথা কথা গুলিবার-তনাইবার, গোপার ঢকে দেখিবার-মেখাইবার বনোবস্ত সে কিছুই করিতে চাহে নাই। কেহ সে কথা বলিতে আসিলে, কাঁদিয়া ভাষাইয়া বিরা বলিচ্ছিল, “পেটের খাবার আমি মরে গেলোম, —ও সব আবার ভাল লাগে না।” অনেকেই কান্নায় গলিয়া গিয়া “আহা বাছা রে, আঁককের দিনে একবার মাথাটি তুলে উঠে বসতে পারলে না;—মরে যাই!” ইত্যাদি বলিয়া সহানুভূতি মেখাইয়া ফিরিয়া গেল। কেহ পেটে গরম চোকরের পেক, কেহ টার্পিন তেল মাশিনের বাবুয়া করিয়া গেল। কেহ বা বলিল, “একটুই পিপাসামেন্ট বাইরে পাও দেখি, এখনি সরে যাবে। আবার টেবুর সে দিন অখনি হয়েছিল। মেখা-মস্তুর বদলে না পেতায় যাবে, কে যেন আকস্মে কলটুই ঢেকে দিলে।”

মা আনিয়া বিস্তর সাধিলেন,—একবারি মধু-মাখা আনিয়া হাতে দিয়া বলিলেন, “একেবারে নিরুপ উপোসী থাকলে বাবা আরও বাড়বে,—একটু খা।” খাটের তলার বাটটা ঠেলিয়া দিয়া, শরৎ পশু ফিরিয়া কাঁদিতে-কুঁদিতে

উত্তর করিল, “আমি পারোঁ না না।” মা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেলেন। এ কেমন অপরা বউ বয়ে আসিল? চৌকাট পার হইতে না হইতেই জনজাত সন্ধ্যা ঘেঁরে এমন হইয়া পড়িল। “মাকী, মাকী, প্রতিবেশিনী প্রৌড়াগণ এক-বাক্যেই এই মন্তব্যে সাহা মিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া শরৎ একা পড়িয়া আছে। পারের শব্দ শুনা গেল না;—বাটী একটু ছলিয়া উঠিল,—কে যেন আসিয়া কাছে বসিরাছে বুঝা গেল। কিসের যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কে অকস্মাৎ শরতের মুকের মধ্যে ভুড়ভুড় করিয়া উঠিল। কে? এমন করিয়া এমন সময় কে আসিল? উঃ! কে? ভয়ে সে প্রায় পর্যাক্ত করিতে পারিল না। যদি কোন অপরিস্ফুট বালিকা-কণ্ঠ প্রব্লে উত্তর দেয়? সে সহিতে পারিবে না,—সে সহিতে পারিবে না।—আর বার সুদী সে পারুক,—সে পারিবে না।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাউবার পর, সহুচিত্ত নুহু স্বরে, যে আসিয়া কাছে বসিয়াছিল, সে যেন বড় ভয়ে ভয়ে ভাকিল, “শরৎ!” “কে, দাখা?” ধূমধিরা শরৎশশী বিদ্যার উপর উঠিয়া বসিল। দুহুর্ন্তের সে মুক্তির আনন্দে দুর্দ্ধর প্রঃ-অভিমানের প্রচণ্ড ব্যাধি যেন কোথায় সরিয়া গেল। অরবিন্দ আবার তেমনই ধরেই বসিল, “এই, এমন করে কেন কষ্ট পাওন—ওঠ, উঠে যা’ না।”

আবার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ শয্যাশ্রমী হইল। অনেকক্ষণ কোন কথাই সে কহিল না। তারপর তাইয়ের পুনঃ-পুনঃ অহুসারে, অশ্রুধিত, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “যেলে আমি যেরে যাব। তোমরা জানো না, আমার ভয়ানক দয়া হচ্চে।”

অরবিন্দ পাশ্বে বসে কহিল “তা আমি জানি। কিন্তু খেলে এ যোগের কিছুই কম-বেশি হবে না। শরীরে তো তোমার কিছুই হয় নি।”

শরৎ তাইএর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, কঠোর স্বরে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, “তবে কি আমি তমু-তমু ভান করে পড়ে আছি—এই কথা তোমরা বলতে চাও?” “জানার নর—আমি।” “তাকে আমার লাভ?” “আপাততঃ একজনের মুখ দেখতে হবে না।” “তুমি কি তার ঘরে আমার সঙ্গে বসতে চাও?” “না” বলিয়া অরবিন্দ

একটুখানি হাসিল। সেই হাসিটুকুর সামান্য এতটুকু শব্দে, অকস্মাৎ বাক্যের ত্বণের মত কাটিয়া উঠিয়া, তুর্দ্ধন-শব্দে শরৎ কহিয়া উঠিল, “হাসও তুমি! দাখা, তুমি কি!” অরবিন্দ অক্ষণল নীরব রহিল; তার পর অত্যন্ত স্নান স্বরে উত্তর করিল, “আমি কি—তা’কি তুমি এতকণে ভিন্তে পারছি শরৎ? তবে আরও একটা কথা বলি, তুমি পারবি? কাল বাসর-ঘরে—” “কি? গান গেয়েছিলে?” “হ্যাঁ।” শরৎ অক্ষণল তত্ব হইয়া রহিল। তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, “তুমি যাও।” “হাই, কিন্তু তুমি খেতে আয়।” “শিগগির যাও বলছি—” “যাকি রে, তুমি আগে-ওঠ।” “কথা শুনে না? তবে আমিই যাই। তুমি বড় ভাই—তোমার পারের ধূলা নিচি,—কিন্তু তোমার মুখ দেখতে নেই।” বলিতে-বলিতে উচ্ছ্বসিত বেদনার, অভিমানের কাঁদিয়া উঠিয়া, সেই নির্মম, নিষ্ঠুর জ্যোতের কোণের ভিতর সে নিম্নের শতধারা-যৌত মুখখানা ভুলিল।

এই তো নন্দ-ভাষের প্রথম প্রণয়,—ইহার পরিণতি আর কেমন আশা করা যায়! সেবারে বধু যে বরদিন যত্নাঙ্গরে রহিল, সে বরদা দিনই তাহার বড় নন্দনের শরীরের অবস্থা ঘোটে ভাল রহিল না। পাঁচজনে নববধুকেই তাহার নন্দনের কাছে-বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে, গায়ে মাখায় হাত বুলাইতে বসিয়া-কহিয়া পাঠাইয়া দেয়। নন্দন তাহাকে গায়ে হাত দিতে তো ঘেঁরেই না,—পাখার বাতাস করিতে গেলে “শীত করিতেছে” বলিয়া গায়ে চানুর টানিয়া দেয়। বধু ছোঁয়া কি করিবে হির করিতে না পারিয়া নত মুখে বসিয়া থাকে। সেও ভাগ্যের মেয়ে—বৃদ্ধি তার বেশ ভীক। তাহার প্রতি এই নন্দনটি যে বেশ সঙ্কট নন, এটুকু সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে। নিম্নের অপরায় খুঁজিয়া পরে না। একদিন ছোট নন্দনকে একটুখানি আতায় দিয়া কেলিল। কে একজন তাহাকে শরতের কাছে বসিতে বলিতেই, সে জনান্তিকে উঠাকে বলিল “আমি থাকলে ঠাকুর-কি বিরক্ত হন যে,—আমি যাব কি?” উবার ইচ্ছা নয় যে, তাহার এই নতন সঙ্গীত তেমন করিয়া একটা স্নোমির ঘরে বসে হইয়া থাকে। তাই সে প্রতি সন্ধ্যাই ইহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সাতর্ঘ্যে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, সে তোমার বকে না কি?” বধু নত-নেত্রে নখ খুঁটিতে-খুঁটিতে দুহুস্বরে কহিল, “না তাই, কেমন না; কিন্তু

বোকা দাখ যে রাস করতেন। কেবলি-কেবলি উঠে যেতে বলেন।”

“তবে তুই যান্নো!” এই বলিয়া উষা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নিম্নের খেলাঘরে লইয়া আসিল। ইহার পর হইতে কেহ বধূকে শরতের সেবার কোন ভার দিতে আসিলে, সে বধূ পক্ষে ওকালতি করিয়া লবাব দিতে আরম্ভ করিল যে, “দিদি ওকে বকে—ও কি কল্পতে বাবে? ও বাবে না।”

বধূ ভাত হইয়া বলিল, “ও কি ভাই, ও রকম করে বলচ কেন? ভঁরা হরত রাস কর্শেন।”

“কে আবার রাস কর্শে,” বলিয়া নিঃশব্দ উষা অপ্রতিদত্ত অধিকারে নৃতন তাহার উপর লম্বল লইয়া বলিল। নববধূ সেই ছইতেই ছই নমসের প্রভেদ করিতে নিখিল।

একদিন দুয়োগ মত অরবিন্দ স্তমিত মুখে কাছে আসিয়া বলিল, “শরি ভাই, বউ কিছ এ সব কথা কখন কুলবে না।”

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, “কি সব কথা?”

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া অরবিন্দ করিল, “এই তুই—”

“বউ কুন্নি তোমার কাছে দাগিয়েছে?”

“লাগায়নি ঠিক,—হুংধ করে বলছিল, যে,—” কুন্নি হাতের সহিত শরৎ বাগা দিল, “বাগো বাবা,—বউএর সঙ্গে তোমার কি-কি কথাবার্তা হয়েছে, সে কথা শোনবার আমার মোটেই আগ্রহ নেই; তবে তুমি যখন এমি ঘণ্টা বউএর গল্‌ক হয়ে আমার কাছের কৈফিয়ত দিতে এসেছ, তখন আমারও জানানো উচিত যে, আমি তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবো, তার ভরসা তার কাছে অব্যবহি করিতে বাধ্য নই। আর ভাল না লাগবে, সে বেশ আমার কাছে আসে না।”

অরবিন্দ তাহার আরক মুখের দিকে চাহিয়া, দুই হাসিয়া করিল, “কেন বিচ্ছে এত হুংধ করছিল শরৎ?” “কি করবে—শরতের ঐ রোগ।” বলিয়া শরৎ চলিয়া যাইতেছিল; অরবিন্দ ডাকিয়া বলিল,—“ওনে বা?”

“কি ওন্‌বো হলো?” “অনর্থক সংসারে অশান্তি আনায় লাভ কি?” শরৎ তখন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “আমি যদি তোমাদের সংসারে অশান্তি আনছি এই হয়, তাহলে এখন তোমরা আমার বিহার করে হাও না।”

“তুই বড় একরোখা। তা বলচিলে। বলি, ও-বেচারা যোগ কি? ওকে অনেকাই না ধরে এনেচি?” “সেই কি আগনি যেতে এসেছিল?” “সে কথা হতে না, ও তো আর ভাতক তাড়ানি। বিহের করে যখন এনেছি তখন—” “তাকে বেশ করি নিকে করই এনেছিলে?” “তুই তারি উষ্টো-বোকা মাহুহ। তার কথা ছেড়েই দে না। যনে কর, সে কেউ ছিল না। সে সব যখন—”

“মা গো! তুমি মাহুহ, না কি!” এই বলিয়া শরৎ মুখে আঁচল শুঁকিয়া দিয়াও কান্না রোধ করিতে পারিল না; এবং কান্নার চোটে তাহার মুখ দিয়া অপর কোন ভৎসনাও বাহির হইতে পারিল না।

তা এ সব পুরানো কথা। এখন শরৎশশী ছেলেনিসের মা,—বহুদণ্ড সাত আট বৎসর বাড়িয়াছে—শরীর-মনের ভাল অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। কাল-প্রবাহেও সেই কৈশোর-শোকের অনেকখানি ভাসাইয়া লইয়াছিল। বিজীয়ার উপর বৈরভাব আর ততদূর নাই। তবে অশুভ দৃষ্টির ফলে ভরনের কেশ কাহারোও বেশ যে দেখিতে পারে, তা’ও নয়। মনোরমকে শরৎশশী আদর ও ভুলে নাই। তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সাধ এ বাড়ীতে তাহার মত আশ কাহারও নয়। যাহারও যে অদাশ ছিল না, সেও অনেকখানি এই ঘেরেরই লভ। (ক্রমশঃ)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[ত্রিঅনাথনাথ বসু]

(পূর্ণাহুতি)

প্রাতঃস্মরণীয় মেমপ্রকৃতি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। শিক্ষা-বিভাগে কার্যকালে শিশিরকুমারের সহিত হঠাৎ তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভূদেব বাবু স্বয়ং একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়াই তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের জ্ঞান বীজ্ঞিসম্পন্ন সুবন্ধে একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিলে, শিক্ষা-বিভাগের অনেক উন্নতি হইতে পারে, এই চিন্তা ভূদেববাবুর জুড়য়ে উৎকর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের নিকট তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। উভয়ের এই সাক্ষাতের কয়েক দিগদ পରେ, একদিন কঠিনক পত্রবাহক শিশিরকুমারের নিকট একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হয়। পত্র উন্মোচন করিয়া শিশিরকুমার দেখিলেন যে, ভূদেববাবু তাঁহাকে মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে মনন করিয়া, তাঁহার অভিনত ভাবিত্তে চাহিয়াছেন। ভূদেববাবু শিশিরকুমারের গ্রিকানা জানিতেন না; সেজন্য তিনি চুঁচুড়া হইতে লোক ন্যাকত বশোহরে পত্র পঠাইয়াছিলেন। পত্রবাহক অনেক অস্থলভান করিয়া শিশিরকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বিনা চেষ্টার বখন পঁচাত্তর টাকা বেতনের একটা চাকুরী ছুটিল, তখন তাহা ভগবানের প্রেরিত বনে করিয়া শিশিরকুমার চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারও গ্রিক এই সময়ে শিক্ষা-বিভাগের ভাইরেটের মহোদয় কর্তৃক মাসিক ৫০০ পঞ্চাশ টাকা বেতনে ঝাঁড়ুয়া স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অগ্রহতা নিবন্ধন তিনি বার্ষিক্য এই কার্য করিতে সমর্থ হন নাই, এক বৎসরের মধ্যেই তিনি কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার বখন শিক্ষা-বিভাগে পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত হন, তখন মিটার জেমস্ মনরো (Mr. James Munro) বর্নোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহযোগী ছিলেন মিটার জেমস্ ওকিনিলী। ইনি পরে মহানাত্ম হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কবিবর মণীনন্দ্র সেন মহাশয় “আমার জীবন” নামক গ্রন্থে মিটার মনরো ও মিটার ওকিনিলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“বেমদ ম্যাজিষ্ট্রেট, তেমনই জইটে—সোনার সোহাগের বোগ, অমলের সোহা পবন; ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাকে ধরিতে বলেন, জইটে তাঁহাকে খুন করেন। যুদ্ধরত পক্ষ-কঙ্কপের পতাক্রম বিঘটরাত্তর সহিতে পারে নাই। এই সম্বন্ধিত গম্বজ্ঞপের শক্তি একটা জেলা কিরূপে সহিবে? এই যুগল রূপের—একাত্তর হরিহরের শালনে ও অত্যাচারে বশোহর উপলভাযমান। ভল্লোলক পথান্ত অস্থির।” কিন্তু এ যেন সাহেবদরক শিশিরকুমার মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট ও জইটে তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তাঁহার শালন-সংক্রান্ত ব্যাপারে শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে জীবন বাতাবর্ত ও জলপ্রাবনে মক্কাব জ্বের নানা স্থানের জ্ঞান বশোহরেরও বিজ্ঞান ক্ষতি হইয়াছিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে রাত্তি বাট পরিষ্কার হয়, বস্তা-প্রদীপ্তিত বশোহরবাসিগণের জ্বের অবমান হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত মিটার মনরো সর্বদাই শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিতেন। এই জলপ্রাবনে কত লোক ব্রী-পুত্রীন ও গৃহপুত্র হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। গভর্নমেন্টের বেতন-ভোগী কর্মচারিগণ বেকাবে কার্য করিতেন। শিশিরকুমার বিনা বেতনে তদপেক্ষা অধিক আশ্রয় ও ব্যয়ের সহিত বীর জেলার উন্নতির জন্ত পরিশ্রম করিতেন। এইজন্যই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সহযোগী সকল বিবদেই তাঁহার

মতান্তর গ্রহণ করিতেন। পাছে দ্বিচার মন্থো ও দ্বিচার ভাবিনীশীর কোনরূপ নিদ্রা হয়, এই আশঙ্কায় শিশিরকুমার এখনই তাঁহারের সহিত কোন কার্যে লিপ্ত হইতেন, তখনই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, এবং কাণ্ডাটী বাহ্যতে হুতাশ্রুপে সম্পূর্ণ হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। শিশিরকুমারের হয়ে বস্ত্র-প্রদীপ্তিত বহু নরনারী সাধারণ প্রাপ্ত হইরাছিল। তাঁহার সকল কাণ্ডাই একটা বিশেষণ লক্ষিত হইত। এই ক্ষেত্রে পর মনোচক্রেয় সহিত শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ হইলে, নবীনচন্দ্র তাঁহাকে বিভ্রাণা করিয়াছিলেন, “ঝড়ের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?” প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, “নাঠে শুইয়াছিলাম।” নবীনচন্দ্র উল্লিখা অবাক্। তিনি বিভ্রাণা করিলেন, “এই খেয়াগ কেন হইল?” শিশিরকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন, “ঝড়ের বেগ (velocity) যাপ করিতে-ছিলাম।”

শিশিরকুমারের স্ত্রীর বুদ্ধিমান, বিবেচক ও কণ্ঠ স্বকণ্ঠে ঘোকার কোনও দারিদ্রপূর্ণ কার্যে স্থায়ী ভাবে নিবৃত্ত করিতে পারিলে সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ পাওয়া গাইতে পারে, এই ভাবিয়া দ্বিচার মন্থো তাঁহার কল্প একটা কাণ্ড অবলম্বন করিতেছিলেন। হঠাৎ এই সময়ে ইন্কদ্‌-ট্যান্ড বিভাগে দুইটা ডেপুটী কন্সটেবলের পদ পূত্র হয়। মন্থো শিশিরকুমারকে একটা ও তাঁহার বন্যপ্রাণ হেদওকুমারকে অন্যটা গ্রহণ করিবার মন্ত্র বিশেষ ভাবে অমুচোদন করিলে, দুই সহোদর ইন্কদ্‌-ট্যান্ড ডেপুটী কন্সটেবলের কাণ্ড গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

নিরন্তর বিধান লব্ধন করা মানবের অসাধ্য। সহোদর হীরালালের বিরাগজনিত নিরাক্ষণ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ প্রণীত হইতে-না-হইতে শিশিরকুমার ও তাঁহার স্ত্রী-ভগিনী-গণের জনসংকাশ পুনরায় কাল-সেব্যাত হইরাছিল। এই সময় তাঁহারের কোষ্ঠাশ্রয় বনতকুমার তাঁহারদিকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া যান। বাশা কাল হইতেই বনতকুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তিনি চরাচরোয় স্থানযোগে ভ্রমিতেছিলেন, একথা পাঠকবর্ণ অবগত আছেন। সুতরাং কয়েক দিন পূর্বে তিনি শিশিরকুমারের সহিত মন্থোনিবেশ পূর্বক কথা করিতে-কহিতে কাদির

সঙ্গে কাদ ফেলিলেন। পাছে শিশিরকুমার দেখিতে পান, সেজন্য কাদ ফেলিগাই বস্ত্র তাহা পদদ্বারা আবৃত করিলেন। শিশিরের মনে সন্দেহ হওয়ার, তিনি দাবার পা ধরিয়া বলিলেন, “তুমি পা সরাও, আমি কাদ দেখিব।” বস্ত্র পা সরাইতে সম্মত হইলেন না। শিশিরকুমার সম্মত হই, বুকিতে পারিলেন; তাঁহার শরীর বেন অবসর হইয়া পড়িল। বনতকুমার শিশিরকুমারকে তুমিরা বলিলেন, “তুমি দেখে কি ? ও রক্ত।” শিশিরকুমারের চক্ষু কাটরা অশ্রু ছুটতে লাগিল। হাঁহার পদপ্রাণে উপবেশন করিয়া তিনি বাসো মানব-ভাবনের কর্তব্য শিল্পা করিয়াছেন, হাঁহার মেহপ্রবণতার সকল স্রাভ-ভগিনী স্তম্ভ ছিলেন, সেই মেহের গোষ্ঠাশ্রয় সকলকে চিরদিনের মন্ত্র পরিভাগ করিয়া পরলোক গমন করিবেন, এই চিন্তায় শিশিরকুমারের জ্বর শাখিহীন হইয়া উঠিল। যে ভীষণ ব্রহ্মা শিশিরকুমারের অন্তস্তল স্তম্ভ করিতেছিল, তাহা তাঁহার বদনে প্রতিক্রান্ত ঘেঁরা বনতকুমার বলিয়াছিলেন, “আমি আগে আদিয়াছি, আগে যাযো। শিশির! আমার বেহের এত কষ্ট যে, আমার আর এ ধরৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি স্বজন্ম মনে অমুখিত কর। আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিহবে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।” বনতকুমারের শরীর দিন-দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। সুতরাং দিন তিনি শিশিরকুমারের অন্ধ মস্তক হুকা করিয়া শরম করিলেন, শিশিরের নহন-গুণ হইতে অবিরল অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় বনত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, “শিশির, ভাই, আমি চলিলাম। প্রকৃত মানুষ হইতে চেষ্টা কর। অকারণ মানসিক দুর্জলতা প্রকাশ করিয়া আর আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিও না, ভাই।” বনতকুমার নীরব হইলেন; সন্ধ্যা-সন্ধ্যা বোধ পরিবারের মধ্যে কল্পন বিলাপ ধ্বনি-উদ্ভিত হইল। বন-গানের একটা মক্কত বীর দীপ্তির পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল। এই সময়ে, মানব-সমাজের অজ্ঞাতে, দূর অরণ্য মধ্যে কতশত দেবভোগ্য সুস্থ মনুষ্যে বীর পরিমল বিতরণ করিয়া বৃন্ত্যুত হইতেছে; আবার কত-শত অর্দ্ধমৃত কলিকা মগ্নক বিলাইবার পূর্বেই অতালে

করিয়া পড়িতেছে, কে তাঁহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে ? ভগবান বসন্তকুমারের জন্মে যে সংগ্রহীত প্রাণন কতিয়া কর্ণধ্বনিত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ উদ্বেগ হইতে-না-হইতেই, দুইতাল কাল তাঁহাকে তাঁহার কর্ণ-জীবনের মধ্যাহ্নে করণ করিয়া লইল। বেশের দুর্ভাগ্য, তাই বসন্তকুমার মাত্র বক্রিণ বসন্ত বয়সে ইহাখান পরিভ্রাম্য করিলেন। দানার লোকান্তর গমনে শিশিরকুমার যেন অকুল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। যে জ্যোতাঃর বেশের ও সমাকের হিতকারিণী শক্তি তাঁহার জন্মে সঞ্চারিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহার অত্যাশ-মুক্তিতে শিশিরকুমার কিংবদন্তি হীনবল হইয়া পড়িলেন। উত্তরকালে সংসারে বীরের জ্ঞান কাণ্ড করিলেও, প্রথম-জীবনের সেই সাধন ও সেই স্মৃতি তিনি পুনঃ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার জন্মে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনে নির্বাপিত হয় নাই; তাবণের চিতার জ্বালা সে অগ্নি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার অন্তরালে ধূমায়মান ছিল। শিশিরকুমার তাঁহার ‘আমর নিমাই চারুতের’ বিচারে খণ্ড স্বর্গীয় জ্যোতঃপ্রভকে উৎসর্গ করিয়া গিথিয়াছিলেন,—“বহাদুর তাঁহার গহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ অগ্নি সদানই রাহাছে।” দানাকে তিনি দেবতার অধিক ভক্তি করিতেন। উল্ল উৎসর্গ পত্রেই তিনি গিথিয়াছেন,—“অত্যাশ ঐশ্বর্যবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে ঘোঁষিতে পারি না, সেখানে দানাকে ঘোঁষি।” এতদ্ব্যতীত অগ্রেও দুর্ভাগ্য; অথবা কেবল তৎপূর্বকুমারগণের অশ্রুত্মি ভাবতবর্ষেই লাগত হয়।

মৃত্যুর কিছুকালপূর্বে বসন্তকুমার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষাব্যবসায় একখানি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তিনি শিশিরকুমারকে আপনাদের অতিপ্রিয় ভ্রাতৃপন করিলে শিশির সর্বপ্রথমে একটি সুপ্রাণ্ড ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনশত টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার আনিলেন। তিনশত টাকার একটি গ্রেস্ পাওয়া কতদূর সম্ভব, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। শিশিরকুমারকে কিন্তু উল্ল টাকার মধ্যেই গ্রেস্ সংগ্রহ করিতে হইবে; প্রস্তাভ তিনি কলিকাতার নানাব্যানে অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর একটি পুণ্ডিত স্বাক্ষরে গ্রেস্ সংগৃহীত

হইল। গ্রেস্ টালাইতে হইলে, গ্রেস্‌ঘ্যাম, কম্পোজিটর প্রভৃতি আবশ্যক; কিন্তু পত্রীপ্রাণে এ সকল কার্যে অতিশয় ব্যক্তি তখন আশে পাওয়া যায় না। শিশিরকুমার কলিকাতার একটি ভাণ্ডারখানার গ্রেস্‌সংক্রান্ত ব্যবসায়ী কার্য লিখা করিলেন এবং গ্রেস্‌টি লইয়া তাঁর গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কালিকার বর্তমান রাজ্য ঐশ্বর্যমহেন্দ্ররজন চৌধুরী বাহাদুরের শিষ্য স্বর্গীয় রাজা ঐশ্বর্যমহেন্দ্ররজন বাহাদুর সর্বপ্রথমে পত্রীপ্রাণে গ্রেস্‌ লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পর শিশিরকুমার তাঁহাদের গ্রামে গ্রেস্‌ লইয়া যান। তাঁহার গ্রামবাগিন্ধ দলে দলে ভ্রাম্যমাণ। দেখিতে আসিতে লাগিল। বসন্তকুমার এই গ্রেস্‌ হইতে “অমৃত প্রবাহিনী” নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইত। নানা কারণে পত্রিকাখানির অতিশয় অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

জ্যোতঃপ্রভের বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর প্রথম শোকাবেগ কিংবদন্তিমাণে প্রশমিত হইলে, শিশিরকুমারের জন্মে পুনরাশ সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। তিনি ও তাঁহার মধ্যমাশ্রম হেমবীকুমার ইন্দুক-ট্যাক্স ডেপুটি কালেক্টরের কার্য করিতে-করিতে বুকিতে পারিয়াছিলেন যে, গভর্নমেন্টের কাগজের গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বেশের বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। উত্তর সাধনের কার্য পরিভ্রাম্য পূরক আপনাদিগের গ্রামে একখানি বাঙালী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া, মিটার মন্ডো ও মিটার ওকিনিরী নিকট আপনাদের অতিপ্রিয় ব্যক্তি করিলেন। বেশের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে গভর্নমেন্টের কার্যেরও নানা সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; অনেক সময় রাজকর্মচারিগণের দুর্নীতিব্যাঘ্রের কথাও গভর্নমেন্টের গোচর করিবার জন্য সংবাদপত্রে তীব্রভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এই সকল কথা জানিয়াও মিঃ মন্ডো শিশিরকুমারের উত্তম ও সদৃষ্টানে কোনও রূপ বাধা প্রদান করেন নাই। তিনি ও তাঁহার সহযোগী সংবাদপত্র পরিচালনে শিশিরকুমারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আশ্রয় এইখানেই বলিয়া রাখি, সংবাদপত্র পরিচালনের জন্য হেমবীকুমার ও শিশিরকুমার

ইন্সপেক্টর ডেপুটি কলেজের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। চাকুরীগত-প্রাণ বাগানীর পক্ষে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য স্বার্থভাগের কার্য বলিতে হইবে।

পূর্বাতন প্রেসটি গ্রিক করিয়া লইয়া .৮৯৯ খৃঃ অব্দ মার্চ মাস হইতে শিশিরকুমার একখানি বাগান-মাধ্যমিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 'বীর গ্রামের নামানুসারে পত্রিকাখানির নাম হইল "অমৃত বাগার পত্রিকা।" বৈষ্ণবকুমার, দুঃপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বহু, যশোবন্ত বিলাসুলেয় তৎকালীন দ্বিতীয় শিল্পক বাবু লগনধর ভট্ট ও শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ ভগিনীপতি ঐন্দ্রকিশোরীলাল সরকার পত্রিকার লেখক নিৰ্ব্বাচিত হইলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স হইলেও মতিশাল ও চাঁদোরে সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিশোরীবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিচক্ষণ উকিল। ইনি এখনও মধ্যে মধ্যে অমৃতবাগার পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। যশোবন্ত ঘরে ও পরিশ্রমে অমৃতবাগার পত্রিকা আদ্য এতদূর উন্নত, কিশোরীলাল তাঁহারের অন্ততম। শিশিরকুমার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতেন না। কিন্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে প্রস্তাবনাটা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালিক স্বাধীনগণী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইংরেজীই লিখিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে স্বল্পরূপে বাগান লিখিতে পারেন, তাহা কেহ ভাবিতেন না। পত্রিকার বাৎসরিক মূল্য পাঁচ টাকা ও ডাক-মাস্তুল তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইল। যশোবন্তে লোক মারফত কাগজ বিলি হইত, সুতরাং লেখনকার গ্রাহকগণকে ডাক মাস্তুলের তিন টাকা দিতে হইত না। আশা যে সময়ের কল্যাণ আশোচনা করিতেছি, বর্ধমানের তুলনায় তখন ছাপাখানার কার্য পরিচালনা যে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। শিশিরকুমারের স্বল্পভূমি অমৃতবাগার (পন্থা বাগা) হইতে কলিকাতা গ্রাম সাততর মাইল দূরে অবস্থিত। তখন কলিকাতায় আদিবার পথকল্প ছিল না। প্রেস সম্বন্ধীয় ব্যবসায়ীরা কলিকাতা হইতে সহবাস করিতে হইত। মধ্যে-মধ্যে অনুবিধায় পড়িত হইতেন বলিয়া শিশিরকুমার স্বয়ং গৃহে ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়া লইতেন। যশোবন্তে সকল সময় কাগজ পাওনা হইত না। কাগজের অভাব দূর

করিবার নিমিত্ত তিনি বীর গ্রামে পত্রিকার ভগ্ন কাগজ প্রস্তুত করিতে মনন করিয়াছিলেন। তৎকালে পন্থা ও তৎপার্বত্য গ্রামের মূলনামগণ কাগজ প্রস্তুত করিতে মানিত। শিশিরকুমার তাহারের "মিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া পত্রিকার ভগ্ন যন্ত্রে কাগজও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কাগজ ভাল হয় নাই।

এক সময় আমেরিকার কোন এক পত্রীর একটা ছাপাখানা হইতে "S" অক্ষরগুলি অপ্রদত্ত হইয়াছিল। এই ছুর সংবাদটি স্থানীয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"We are thorry to they, that our com-
pothing room wath entered latht night by
thome unknown thcoundrel, who thtrole
every "eth" in the ethtblithment, and
thucceded in making lith ethcape undetected,
the motive of the miththreant doubtlieth wath
revenge for thome thuppothed inthult."

"s" অক্ষরটির স্থলে "th" দিয়া প্রেসের কর্তৃপক্ষগণ সংবাদটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন। শিশিরকুমারের যদি কখনও কোন অক্ষরের অভাব হইত, তাহা হইলে তিনি কিরূপে সেই অভাব পূরণ করিতেন, আমরা তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইব। একবার একটা লোক প্রেসে কতকগুলি হাবিলা ছাপিতে দিয়াছিল। হাবিলার একদ্বানে ১০ ছয় আনা ছাপিতে হইবে, কিন্তু প্রেসের অক্ষরের সারের ভিতর ১০ এই অক্ষরটির অভাব দেখা গেল। শিশির এক অনুত উপায়ে হাবিলা ছাপা শেষ করিলেন। ১০ স্থলে "h" এই অক্ষরটি বিপরীত ভাবে বসাইয়া তাহার পূর্বে ইংরেজী পূর্ণস্বরের চিহ্ন দিয়া ১০ মূর্ত্ত করিয়াছিলেন। যখনই দেখা যাইত যে কোনও একটা অক্ষরের অভাব পড়িতো, তখনই তিনি লিখিত প্রবন্ধের যে অংশে সেই অক্ষরটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অংশটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিতেন। মধ্যে-মধ্যে তিনি অত্র অক্ষর সংগ্রহে কাটা-ছাঁটী প্রয়োজনীয় অক্ষর প্রস্তুত করিয়াও লইতেন।

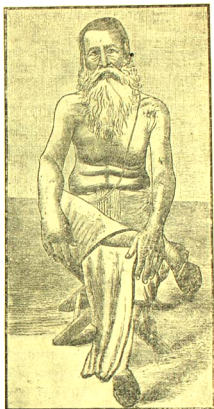
এইরূপে অমৃতবাগার পত্রিকা প্রকাশিত হইতে

লাগিল। ইহার চক্র শিশিরকুমারকে সকল কার্যেই পরিদর্শন করিতে হইত। প্রেমমান অমুপস্থিত, শিশির তাহার কার্য চালাইয়া লইলেন; কম্পোজিটর অমুপস্থিত, শিশির তাহার কার্যে বসিয়া গেলেন। শিশির যেদিন কম্পোজিটরের কার্যে বসিতেন, সেদিন তিনি একই সময়ে কম্পোজিটর ও সম্পাদকের কার্যে করিতেন। তিনি স্বস্তর কাগজে পত্রিকার চক্র প্রবন্ধ না দিখিয়া, মনে-মনে প্রবন্ধ রচনা করিতে-করিতে মুদ্রাক্ষর সাজাইবার দ্বারা অক্ষর বিভ্রাণ করিয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার বড় জুগ হইত না। এতদূর ক্ষমতা কল্পনামের মধ্যে সঞ্চিত হয়, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। ব্যাটিক্লেট মিটার মন্ড্রো ও তাঁহার সহযোগী মিটার ওকিনিচী সর্বদাই শিশিরকুমারকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। গুরুপুত্রের বিভ্রাণগুলি পত্রিকার প্রকাশ করিতে দিন্না-মিটার মন্ড্রো শিশিরকুমারের ঘণ্টে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিটার ওকিনিচী মশ কপি পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের তৎকালিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিটার জেড্জেস (Mr. Geddes) একবার মন্ড্রোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার চক্র ঘণ্টাহারে আগমন করিয়াছিলেন। একদিন মন্ড্রো, জেড্জেস ও ওকিনিচী কলবার্ভা করিতেছেন, এমন সময় শিশিরকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। মন্ড্রো শিশিরকুমারকে জেড্জেসের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন, “জেড্জেস, তোমাকে অনুতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে।” মিটার জেড্জেস সন্মত হইয়া স্বীয় বেলার প্রত্যাবর্তনপূর্বক পত্রিকার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাভাব বশতঃ পত্রিকার কার্য একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু নলডাঙ্গার সদস্যর রাজা ইন্দুকৃষ্ণ দেবরায় একশত টাকা সাহায্য দান করিয়া অনুতবাজার পত্রিকাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজার এই সাহায্য পাইয়া শিশিরকুমার যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। বাহা হউক, গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকার আর্থিক অবস্থানও দূর হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে এই সময় ইংলিশমান, হিন্দু প্যাট্রিষ্ট, ইণ্ডিয়ান মিরর ও সোমপ্রকাশ এই চারিখানি সংবাদপত্রেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানি ইংরাজদিগের ও শেষোক্ত তিনখানি বাঙ্গালীদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

হইত। বর্তমান সময়ে ভারত-শাসনের অধিকার লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগন্তু হিমচল আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু তখন এ চিন্তা তৎকালিক রাজনীতিজ্ঞ-দিগের দ্বারে উদিত হয় নাই। বিধাতার অলম্বনীর বিধানে আমরা বিদেশী রাজার অধীন; হুতরাং আমাদের গুতাগুত সমস্তই রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিয়া দেশবাসিগণ নীরব থাকিতেন। কোনও কারণে রাজ-কর্মচারিগণের হাতে নির্ণাতন ভোগ করিলে, তাহা সহ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। পূর্বোক্ত সংবাদপত্রগুলি যে প্রণালীতে পরিচালিত হইত, শিশিরকুমার অনুতবাজার পত্রিকা পরিচালনে সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। কথা-প্রসঙ্গে একদিন শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, “We are we and they are they.” অর্থাৎ তাহারা তাহাদিগের হুখ-বার্খের কথা ভাবিয়া থাকে, আমরা আমাদের হুখ-বার্খের কথা ভাবিয়া থাকি। আমরা, অর্থাৎ ভারতবাসীরা স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য বাধ্য করিতে চাই, বিদেশীয়গণের পক্ষে তাহা করা কখনও সম্ভব নয়। এই কথা সর্বদাই শিশিরকুমারের দ্বারে জাগরক হইত। অনুতবাজার পত্রিকার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিশিরকুমারের উক্ত চিন্তার আভাস স্পষ্টরূপে পরিগণিত হইত। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মিটার মন্ড্রো ও মিটার ওকিনিচী প্রথমে শিশিরকুমারকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাহারা পত্রিকা পরিচালনের অভিন্ন পন্থা লক্ষ্য করিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সাহেবদিগের পক্ষে বিরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু শিশিরকুমারের স্বদেশবাসিগণও তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন না। ইংরেজরাজ বাহা দিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ দহগ্রহ করিয়াই দিতেছেন,—তাহাতে যে আমাদের বিধাতৃ-দত্ত অধিকার আছে, ইহা শিশিরকুমারের সমকালবর্তিগণ ধারণা করিতে পারিতেন না। এইজন্য স্বদেশ-প্রেমিক সাধু রানডল্ফ লাক্টিয়র গ্রাম ব্যক্তিগণও অনুতবাজার পত্রিকাকে রাজস্ব-প্রচারক বলিয়া মনে করিতেন। দেশের দুর্বলী রাজনীতিজ্ঞগণ অনুতবাজার পাঠ করিয়া দ্বন্দ্বের পরম আনন্দ অহুভব করিতেন এবং সততই সম্পাদকের প্রশংসা করিতেন; কিন্তু দুগদনী, হুর্দলচেতা



• মহাত্মামোহন বহু



• হুদেব সুখোপাধ্যায়



• মহাত্মামোহন ঘোষ

ব্যক্তিগণ তাহা পাঠপূর্বক প্রকৃত মর্মগ্রহণে অশক্ত হইয়া
পত্রিকার সম্পাদককে একজন অবিনীত, অজ্ঞ, গ্রাম্য ব্যক্তি
বলিয়া তুগা ও উপহাস করিতেন।

কেশব ম্যাগিষ্ট্রেট দিটার মন্ড্রো ও তাঁহার সহযোগী
দিটার ওকিনিগী, এবং শিবিরকুমার এতদিন যে সত্যতা-
বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা এই সময়ে ছিন্ন হইয়াছিল।
মন্ড্রো ও ওকিনিগীর দ্বারা অত্যন্ত হুমকিপূর্ণ যে তাঁহার
বিপক্ষতাচরণ করিবে, একথা শিবিরকুমার যথেষ্ট তাবিত্তে
পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতবাজার
পত্রিকা দেশের মধ্যে একখানি অতি উজ্জ্বল সংবাদপত্র
বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিল। পত্রিকা পাঠ করিবার ক্ষমতা
দেশের সকল সম্প্রদায়ই উদগ্রীব হইয়া প্রাপ্তিতেন।



নবীনচন্দ্ৰ সেন



হৃদয় মোহনপাল ঘোষ

গভৰ্ণমেণ্টে পুৰস্কাৰপুৰুষৰূপে অনুত্তৰাজাৰ সজ্জিকৰ প্ৰবন্ধ-
গুলি পাঠ কৰিতেন; এবং ইংলেণ্ড-মন্ত্ৰসভায়মধ্যে পত্ৰিকা
ও শিশিৰকুমাৰেৰ কথা লইয়া আলোচন চলিত।
তাৎপৰ্য্যেৰ মনে এই বিশ্বাস জন্মিছিল যে, শিশিৰ ও
তাৎপৰ্য্যৰ সহোদৰৰূপে ভাৰতবৰ্ষে একটা ভীষণ বিপ্লৱোদয়ন

প্ৰজ্জ্বলিত কৰিবাব সম্ভৱপত্ৰিকৰ হইয়াছে। পত্ৰিকাৰ
ধ্বংস-সাধনেৰে সমস্ত উচ্চপদস্থ ৰাজকৰ্ম্মচাৰিগণ সুযোগেৰ
সন্ধান কৰিতে লাগিলেন। শিৱই দে সুযোগ উপস্থিত
হইল। বাস্তৱে আমবা দে ঘটনাৰ বিবৰণ লিপিবদ্ধ
কৰিব।

মোগল-সম্ৰাট আক্‌বৰ

[শ্ৰী ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আক্‌বৰ ও ৰাজপুত জাতি।

ৰাণা প্ৰতাপ; হৰ্দ্দীঘাটেৰ হুঁ; মিৰাৰেৰ পুনৰুদ্ধাৰ।

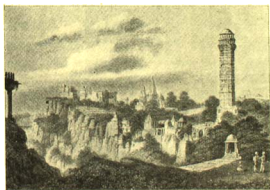
"There is not a pass in the Alpine Aravalli
that is not sanc tified by some deed of Pratap,
—brilliant victory, or oftener, more glorious
defeat"— Tod.

চিতোৰ-প্ৰদেশৰ 'পৰ ৰাজপুতানাৰ সেই মহা-ভূমিৰে যে
মহাপ্ৰাণ পুত্ৰচৰিত্ৰ ৰাজশি ভাৰতৰে প্ৰেত সম্ৰাটৰে সহায়-

সম্পদ, দৈৱতবল জুহু কৰিয়া একমাত্ৰ জয়ভূমিৰ অহ-
প্ৰাণনাৰ নিঃসঙ্গ গিৰিপুণ্ডৰে জায় একেধৰ দণ্ডায়মান
ছিলেন; অতুলনীয় ভাগ্য, ধৈৰ্য্য, সাহস, মহিচ্ছতাবলে
যিনি বীৰক্লে বীৰেন্দ্ৰ; বাহাৰ পবিত্ৰ পদাধি পৌৰবেৰ
বিকৃতিক্ৰমে লগাটে ধাৰণ কৰিবা মিহাৰ-ভূমি চিৰবহিমবী
—তাঁহাৰ অমৰ কাহিনী প্ৰবণে আলিঙ ৰাজপুত-ধ্বনীতে



ମହାରାଜା ଅଶ୍ୱିନୀ ମହା



ଚିତ୍ରୋତ୍ତର ଅକାଶର ଦୃଶ୍ୟ



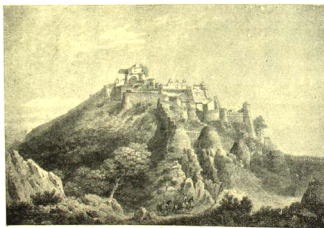
ମହାରାଜା (ଅକାଶୀର)



লক্ষ্মী আত্মদেব



কোহর



কমলখোঁষ বিহির্গ



রণভাঙ্গার অবস্থা



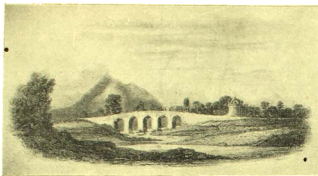
রণপুত্র বৈদিক

ধন-প্রবাহ বহে,—তাহার অনন্বিত হস্তক শ্রদ্ধায় অবনমিত হয় এবং তন্ত্রির বিদল অশ্রুতে চক্ষু সলসল হইয়া উঠে। আনন্দে-উৎসবে, বিবাসে-বিসর্বে আজিও সে পূণ্যগাথা মিলায়ের ঘরে ঘরে চারুদুখে গীত হয়,—আশাবরীর প্রতি গিরিকন্দর তাহার প্রতিধ্বনি করে। জয়ভূমির কলাপ-কামনার-নয়নগুলি যে-সকল অমূল্য জীবন-চরিত্র ইতিহাস কীর্তন করিয়াছে, বহুগুণ প্রতাপ-চরিত্র সে সকলের অগ্রগণ্য। যশোরের একান্ত অমরগণি কোণার এমন ওয়ালেস, পাওলী, গ্যারিবল্ডী, মালিনী কম্বিগার্ডেন, বঁহাঘের সকলের মিলন-মিশ্রণে প্রতাপের স্তার সর্বভাষায় সম্রাটের উত্তর হইতে গায়ে ?

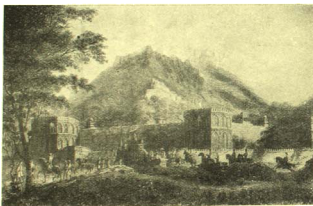
চিতোর-ধ্বংসের চারি বৎসর পরে (১৫৭২ খ্রি:) গোপুতা গিরিনগরে কুশাবাট উদয়সিংহের কলঙ্কিত-জীবনের অবসান

হইল। কাপুরুষ পিতা বীরপুত্র প্রতাপের পূজ্যপাতী ছিলেন না। তিনি দুহাকালে কনিষ্ঠ পুত্র জগন্মলকে উত্তরাধিকার প্রদান করিয়া গেলেন; কিন্তু এই অস্তায়-মির্জানে দিবার-প্রধানগণের মনোনিবেশ হইল না;—তাঁহারা কনিষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঘোড়কে রাজ্যভিত্তিক করিলেন।

প্রতাপ রাজহত ধরিলেন বটে, কিন্তু রাজ্য বলহীন, রাজকোষ অর্থশূন্য, দিবার করিগদগলিত পদবনের স্তাধ ঐন্দ্র;—রাজবাড়ার বুকুটখনি, বীরবেশ ধনি, অনন্ত-গৌরবশালিনী, অক্ষরকৌটিল্যশালিনী, সংগ্রাম-সমর্থ-বাহাদুর চিতোর—যোগল-কবলে। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না এই বীরবাহিত নগরীর পুনরুদ্ধার হয়, ততদিন রাণা-বংশে কেহ রাজবেশ পরিবেশ না—রাজপ্রাণায়ে বাস



উষসুর কথিতকা



হাছমীও দূর্ণ

করিবেন না ; ততদিন তাঁহাঙ্গিণের শয্যা—কুঁদিতল ;
 হোচন—সুখপাত্র ; ততদিন সকলে মাতৃবিয়োগের
 শোকচিহ্ন স্বাক্ষর করিবেন, আর রাজপুত্রের
 রণভঙ্গ বাহিনীর পুরোভাগে না বাজিয়া পশ্চাতে বাজিবে ।
 প্রতাপ রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন—বীরতীর্থ চিতোর
 বহদিন ঐতরিক্রে বাজিবে, ততদিন তাঁহার রাজ্যে আনন্দ-
 উৎসব নিবেদ ; ততদিন কেহ চল-চালন বা হেদ-পালন
 করিবে না ; মিবারের সমস্ত কৃষি-বাণিজ্য বন্ধ ; শত্রুর
 সোতনীর সমস্ত ড্রবা বিনষ্ট করিা, নিজ নিজ গৃহে আশ্রয়
 দিয়া প্রজাগণ পর্তে আসিয়া বাস করিবে । রাজাজ্ঞা
 লঙ্ঘন করিলে—প্রাণদণ্ড ! দেখিতে দেখিতে হুরমা জনপদ

অরণ্য হইল ; সমগ্র মিবার ভূভাগ ‘বে-চিরাগু’ বা ‘মিঙ্গাধীণ’
 হইয়া গেল !

স্বয়ং এই কঠোর ব্রত গ্রহণ এবং প্রজাগণকে তাহাতে
 দীক্ষিত করিয়া প্রতাপ মনে মনে সমুদ্রবন্দ হইলেন যে—
 জয়, পরাজয়, সুখ,—ভাগ্যে বাধাই ঘটুক, স্বাধার
 বংশধর মাতৃদ্রব্য কলংকিত করিা, জীবন থাকিতে যোগলের
 দাসত্ব করিবেন না ;—রাজপুত্রের বংশ-মান, ক্রান্তি-ধর্ম,
 স্বাধীনতা, ভূর্কের সমক্ষে বশি বিবেচন না । আর্যবস্ত্রীয়
 শিখরে শিখরে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত হইল ।
 মিশাহাভা রাজবারা শুনিল ;—আর শুনিবেন হিন্দুধানের
 একচ্ছত্র সম্রাট আশ্চর্য । দিগ্বিদ্যী আদিশাকু, মনে মনে



শৈব মন্দির—কনকনীর



সাগুন্ডা

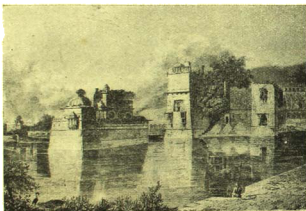
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ছলে বলে কোনে—বেক্রপে হউক, তাঁহার প্রতিষ্ঠাপহারী এই দুর্বার, দুর্ধ্বিনীত অরিকে নমন করিতে হইবে। লোমুপ সিংহের স্ত্রী তিনি 'আমিহ' অধেষণ করিতে লাগিলেন; তাহা যোগাইয়া দিলেন—মানসিংহ!

অমেশ-বসতি-স্রোহী যে-সকল রাজপুত-বৃগতি, প্রতিষ্ঠার প্রেরণার যোগলের বস্ততা-স্বীকার করিয়া সম্রাটের এসাদতোদারী হইয়াছিলেন, 'কনিম্বের কালিমা' নান্দিংহ তাঁহাদিগের অন্ততম। এই প্রবীণ, পরাক্রান্ত বীর যোগন-সম্রাটের প্রধান অন্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিতীর্ণ যোগন-সম্রাটের শাশন-সংরক্ষণে রাজপুতের বীরবাহুর ব্রহ্মবল ডে অপরিহার্য—যোগলের নব-প্রতিষ্ঠিত

সিংহাসনভার রাজপুতগণকে ভ্রুত না হইলে যে অচিরাত্ম দুর্লিখাৎ হইবে, প্রজ্ঞাচক্ষু সম্রাট তাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়া-ছিলেন। বাসনবর্ষ রাজপুত গারু করিয়া রাজনীতিবিশারদ আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, স্বাভি এবং বিশেষতঃ আত্মীয়-বন্ধনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সূচ্যত। এইরূপ করিয়া অধিকাংশস্থলেই তাহাকে অহুতাপের তিক্ত কল আবাদন করিতে হইয়াছে। মাহমু, আদম্, মীর্জাপণ, উল্বেগ্-সম্রাট, আটকা-খইলু, তাঁহার বৈদ্যজ্ঞের স্রাতা হকীম—সকলেই একবার না একবার তাঁহার রাজসুহৃটের উপর লোমুপ-পৃষ্ঠপাত করিয়াছেন; কিন্তু এই রাজপুতপ্রতি সৌভজবদ্ধ হইলে প্রাপণে দর্শ রক্ষা করে। তাঁহার পিতা হযায়ুৎ যখন বৃদ্ধবর্ণন কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, যুগ্মা-



উদয়পুর রাজ প্রাসাদ



জাতিদেব ও শহিনীর প্রাঙ্গণ

তাড়িত পত্ন প্রায় বনে মনে মকছুয়ে ছুটছুটি করিয়া-
ছিলেন, সে সময় সদস্য রাজপুতাই তাঁহার আশ্রয়লাভ;
রাজপুতের আশ্রয়েই আকবরের জন্ম; তাহার পর এ
জাতির বীর্থাবল তাঁহার অবিস্মৃত নহে। স্বতঃস্ফূর্ত্যে তাবী
কল্যাণ-কামনার সম্রাট সন্তবতঃ এই বীরজাতির সহিত
বৈবাহিক আদান-প্রদানে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া
হিন্দুধর্মে এক মহাজাতি গঠন করিবার উদ্যোগ করিয়া
পোষণ করিতেন। রাজপুতানার বে-সকল ভূগতি,
বাদশাহ্ এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইতেন, যোগল-দরবারে

উদাহরণের আদর ও উন্নতির সীমা থাকিত না। বাহাদুর
অপমদ্রুত করিবার দূর সম্ভাবনা থাকিত, সম্রাট তাঁহাদের
বিশেষভাবে ঐশ্বর্য করিতেন; কিন্তু যেখানে তাঁহার
প্রশোভন উপেক্ষিত হইত, কুটনীতিজ্ঞ সম্রাট 'বিবে বিদ্য ৩৩'
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাজপুতবলে, রাজপুত-বল কর
করিতে কুশ্লিষ্ট হইতেন না।

স্বল্পবর্ষী প্রতাপ ভারতগতির এই গুঢ় অভিসন্ধি
দৃশ্যদর্শন করিয়া ব্রূহিহাছিলেন যে, যোগল-সংস্পর্শে হিন্দু-
শোণিত কলুষিত হইয়া, রাজপুতকৃষ্টি নিঃশেষে বিলুপ্ত

হইবে, এবং সেইজন্যই তিনি যোগেশ্বর পদসেবী কৃপাধার-
গণকে নিরতিশয় বিবশ্কে দেখিতেন;—বিশেষতঃ হান্-
সিংহকে; কারণ এই কাছওয়ার-বংশই সর্বপ্রায়ে যোগেশ্বকে
কৃত্যদান করে। এই কঠোর স্বাভাবিকতার প্রতিফল
অতিরেই বলিল।

জুয়ারপুর-বিজয়ের পর রাধা হান্ যে পথে অধরে
কিরিত্তেছিলেন, তাঁহার অনুসরণেই কমলহরী গিরিগুহ।
বিহারপথে আসিতে আসিতে হান্ যেবিবাহের, সমস্ত
মেশ যেন এক বিস্তীর্ণ অশ্রু-স্রোত। ইতস্ততঃ বহুগুহের
জগদাশ্রয়, পথপ্রাণ—কটকাকীর্ণ, জনমানব-সম্পর্ক-বিহীন
এবং নিরাশ্রয়ই ওয়ায়। হান্ প্রকৃত পক্ষে অশ্রু-স্রোত
বিস্তার করিতেছেন। বিহারপথের কঠোর সত্বর অগ্র
করিয়া মহারাণা হান্সিংহের দ্বারে ভক্তির উল্লেখ
হইল এবং যুদ্ধের আশ্রয়স্থিত কলে তাঁহার দ্বারে
রাজ্যবিক্রেতা সন্ধান-প্রদানের বাদনা প্রাণিয়া উঠিল;—
হান্ বিহারপথের আশ্রয় স্থিত করিলেন। কিন্তু
তাঁহার পরিণাম হইল বিপরীত। রাজপুত-অভিযান-সংকল্পের
প্রাণপ্রাণেই গৃহস্থানীকে বহু সন্তান অতিবির সমুখে
ভোজনপাত্র দিয়া দিতে হয়। তাহা দূরে থাকুক, প্রতাপ
নিরংগুণের অধিগার ভোজনস্থলে উপস্থিত হইলেন না।
কোন্ অসমানে হান্সিংহ উদ্ভাসিত; তাহা পি শাস্ত্রমতে
বলিলেন,—“হায়া ঘটনা গিরাহে, তাহার আর প্রতীকার
নাই। মহারাণা যদি আমাকে অসমাজ্য দিয়া না দেন,
তবে কে দিবে?” প্রতাপ উত্তর পাঠাইলেন,—“যে রাজপুত
ভূমীকে ভগিনী-বিক্রয় করিয়াছেন, মহারাণা তাঁহার সহিত
একত্র ভোজন করিতে অসমর্থ।” পাত্র হইতে কয়েকটা
অন্ন তুলিয়া হান্সিংহ অসমর্থের সম্ভাব্য উত্তরে রাখিলেন;
ভারপর প্রতাপকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—“আমাদের
হীনতার আপনাই সম্ভাব্য বাড়িয়াছে; কিন্তু আশীর্বাদ
বিপদে বহু থাকাই যদি আপনায় অতিপ্রায় হয়, তাহাই
থাকুন;—এ রাধা হইতে অধিরে আপনায় বাস উঠিবে।”
সেই সময় প্রতাপ তাঁহার সমুখে আসিলেন। হান্ বলত
জন্মের জন্ম গর্ভিণী উঠিলেন,—“আপনার এই গর্ভ যদি
দুশার দলিত করিতে না পারি, তবে আমি হান্সিংহ
নহি।” প্রতাপ অবিলম্বে গর্ভিণীর সহিত উত্তর দিলেন,—
“হৃদয়ে আপনাকে রাখা পাইলে হৃদয়ই হইবে।” তৎপরে

পাত্র হইতে কোন রক্তপ্রায় রাজপুত বসিরা উঠিল,—
“তোমার ‘হৃদয়’ (পিতাকে অর্থাৎ আকবরকে) যেন সমস্ত
আনিত তুলিও না!”

এখিকে অগ্রগতি বশেষে না দিয়া একেবারে আত্মীয়ের
সম্রাটদ্বয়ে উপনীত হইলেন। চিতোর-বিজয়ী বীর তখন
জুয়ারটি ও বন্দোবস্তের বিরোধে শাসনে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু
হান্দের অতিশয় কার্য হইল না। চিতোর-দুর্গ অধিকার
করিয়া সম্রাট তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই; বিজয়
পলাইয়াছে, কেবল স্তম্ভপিতার লইয়া কি হু? অধর
চিতোর দ্বার করিয়া সম্রাটের দোরব প্রতীকী বাড়িয়াছে,
কিন্তু মহারাণা এখনও তাঁহার পদাশ্রয় হইল নাই। দাস্তিক
পন্থায় গর্ভস্থিতবিরে বসিরা আশ্রয় করিতেছে। বীর
বীরে রাধা হান্ তাঁহার অপমান-কাহিনী বলিতে বলিতে
মহারাণার দত্ত, উদ্ভট, যোগল বিবেক, সম্রাটকে উপেক্ষা,
এবং মহা-পণে স্বাধীনতার সত্বর বিবৃত করিয়া আহত
ভূমির জন্ম কেবল গরল উদ্ভীর্ণ করিতে লাগিলেন। সে
বিষ সম্রাটের বীজদাহ করিল। তাঁহার একটীমাত্র হস্তার
অসংখ্য বাহিনী সমবেত হইল, এবং যে অতুলীচালনে সমগ্র
ভারত শাসিত, সত্বর হয়, আহতগর্ভ ভারতগতি সেই অতুলী
হেলাইয়া তাঁহার হৃদয়-সৈন্যদলকে বিহারের পথ দেখাইয়া
দিলেন।

বিপুল গর্ভনে নদ বধা শতমুখে সিদ্ধলয়ে ধাবিত হয়,
তখনই কোলাহল তুলিয়া, দেশ দলিয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে
উচ্চাঙ্গে-উচ্চাঙ্গে মহোচ্চাঙ্গে যোগলবাহিনী অভিশপ্ত বিহার
অভিমুখে ছুটিল। রণে রাধা কিছু দূরীত, বলে দুর্বলী,
কোশে দুর্ভেদ, ভারতগতি সেই অস্বীকারী মহাত্মকল
বিহারী প্রতাপের প্রতিপক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তাঁহার
অস্বীকারী রাজপুত-সেনাপতি, কৃত, স্বর্গদত্ত, প্রতিশোধদুহ
হান্সিংহের উপর এই বিপুল অভিযানের নেতৃত্বভার
দিলেন। কর্ণে টুট বসেন, রাজপুতানার প্রচলিত
প্রাণ যে, সম্রাটপুত্র সন্যাসের উপর এই হৃদয়ের অধিনায়ক
পণিত হইরাছিল। কিন্তু ভারতের ভারী রাষ্ট্রব্যবস্থার বহল
তখন সাত বন্দর মাত!

বীরপ্রতিম প্রতাপ এই মহাবুদ্ধিবীরের সমাচার পাইয়া
বুঝিলেন যে, আগল সময়ে আশ্রয়স্থল ভিন্ন তাঁহার
গত্যন্তর নাই। রাধায়া বশেষ, বরাতি, বরাশের

সম্মান রাখা করিবার উপযুক্ত পাত্র, তাঁহার প্রায় সকলেই সভ্যতের স্বপক্ষ,— তাঁহার প্রতিফুলে দণ্ডায়মান। এমন কি মহারাণার স্যোদর শক্তিসিংহ ত্রাত্ত্রোহী, সহস্রবলে যোগল-বাহিনীর অগ্রদূত। এ সকলি একমাত্র প্রভুত্বকীর্ণ ভীল সৈন্য ভিন্ন আর কেহ তাঁহার মুখ চাহিবার নাই। আশ্চর্যজনক প্রতাপ তাহাতে অসুখাতি বিভাজিত হইলেন না। সম্রাটের ভক্ত হৃদয়ের অক্ষর গোঁড়, বেহের শোণিত-দান, বীরের বাহিত বৃত্তা, যদি হীনপ্রাণ কাহাকেও প্রলুদ্ধ না করে, তিনি যুগে সে অমর্যব লাভে ব্যক্তি হইবেন কেন ? নির্ভর—নিজ ভূমণ্ডল; ভয়সা—মৃত্যুনাশ মহামন্ত্র; প্রতাপ প্রাণবিসর্জনে হতসম্মত হইলেন।

কিন্তু রাজপুতানা তখনও একেবারে নির্দোষ, নির্দোষী হয় নাই। তখনও স্বাভাবিক্রিতি, সম্রাটের প্রতি অশ্রুত অমৃত্যুগ, প্রভুত্বকীর্ণ ও আশ্চর্য্যগোচর উচ্ছল দৃষ্টান্ত নিবাহের বোর অন্ধকারে প্রথর রশ্মিপাত করিতেছিল। মহারাণার এই মহাবিপদের দিনে ঐহায়া রণে, যুনে, সমরলীলায়, যুগলয়, সম্পদে-সমুদ্রে তাঁহার চিরমহার,—নিবাহের সেই সামন্তরাগণ হৃদয়বলসহ একে একে অলোচ্যোৎসেহ করিতে লাগিলেন। ভগ্নাশ্রয়, চন্দ্রাশ্রয়, রাঠোর, প্রমার, চৌলান, তাল—ঐহাদের পিতৃবংশগণ চিতোররক্ষার্থ অকাতরে শোণিতদান করিয়া বংশ-দান উচ্ছল করিয়া গিয়াছেন,— তাঁহার্য্য সকলে আসিয়া বীর-অবিশ্বাসে মহারাণার চরণবন্দনা করিলেন। অস্বাভাবিক সূত্রে সূত্রে প্রণয়ের বিধান—সংহারের ডমক ব্যাধি। উঠিল !

কিন্তু সকলের নিমিত্তবল বাবিশে সহস্রের অধিক হইল না। বিরাট যোগল-বাহিনীর নিকট ইহা নগণ্য। এই যুগ্মের বল লইয়া প্রতাপ গিরিসঙ্ঘিতে মানসিংহের প্রতীকা করিতে লাগিলেন। প্রতাপের পার্শ্বভাষ্যো প্রবেশ করিয়া ইহাই প্রধান পথ, এবং এই পথ লক্ষ্য করিয়াই মানসিংহ ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি দ্বিতীয় আদক বা হলদীঘাট সন্যাস ধমনীর গ্রামে ছাটনী করিয়াছেন।

স্বভাব-স্বরক্ষিত এই দুর্বল গিরিসঙ্ঘি পক্ষের হৃদয় পথ। অতি নদীর্ণ পথের উপর উত্তর পার্শ্বে উন্নত পর্বতপ্রাচীর অস্বাভাবিক উপেক্ষা করিয়া, দৃঢ়বক পাতিয়া সপক্ষে দণ্ডায়মান। সেই প্রাচীর-নিবয়ে প্রতাপ ভ্রাতৃত্ব-লক্ষ্য তীরলান ভীলসৈন্য স্থাপন

করিলেন। তাঁহার স্বয়মুখ-সেনা অধিত্যাক্রান্তি অধিকার করিয়া রহিল। নিবাহের বাধা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সমুচ্ছল রক্ত, গোরবে গঠিত, আশ্চর্য্যজন মহিমার মহিমাবিত্ত,—আজ এই স্থানে সমবেত হইয়াছে,— প্রভুত্বকীর মন্বিরে আশ্চর্য্যনি নিবাহ তত !

হলদীঘাটের সমুখে এক অগ্রসর ভূখণ্ডের উপর মানসিংহ যোগল ও রাজপুতসেনা সমাবেশ করিলেন। শ্রেণিতে শ্রেণিতে সারির পর সারি মিলা, কামান-সহায় অশ্ব-গজ-উষ্ট্রসমবিত্ত বাহিনী স্তম্ভজিত-স্বলম্বল দৃষ্টান্তসম্বল প্রতীকার হির। রণলক্ষ্য মানসিংহ বহুবিধ গুপ্তবিপদ আশঙ্কা করিয়া সহসা পর্বতপথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। প্রতাপ সম্মত করিলেন, যোগলকে তাঁহার পৈলমর্য্যোচর পথে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তিনি সহসা পর্বতের আগ্রসর পরিভাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ একেবারে পততরী গর্জনে, সহস্র কামান অনল ভস্মন করিল। তৎপরেই উত্তরপক্ষে হৃদয় সজব, কিন্তু সন্ত্রাট-বাহিনী অচলের স্তায় অটল হইলেও বৃহৎ সাগরবৎ নিবাহ-সেনার সংঘাত সহ করিতে পারিল না,—রণে ভগ্ন বিল। এই সময় নির্দোষ সৈন্যদল প্রাণ উপেক্ষা করিয়া ইসলামের মান রাখা না করিলে বোধ হয়, স্বয়মুখ-ইতিহাসে অস্ত্র কাহিনী লিখিত হইত। ইহাসেরই গোরবের দৃষ্টান্তে হৃতভল-বাহিনী পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ হইয়া যোৱতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আর্জুন, সিংহাস, বৃহৎ কামান-গর্জনে, অগ্রে অগ্রে কন্যাকার, রণভেদীর গভীর নিবাসে প্রভাতের সে শান্ত প্রান্তর অবিলম্বে পৈশাটিক লীলাভূমে পরিণত হইয়া গেল। ধূলায় ঘূমে প্রান্তর আচ্ছন্ন, দেশাশ্রয়-রণে স্বপক্ষ বিপক্ষ স্বয়মুখ সৈন্য বিভ্রান্ত করা হুত্ব। বদায়ুনি আদক-পাথে ঐ প্রসন্ন করিলেন। আদক উত্তর গিলেন,—“আপনি নির্দোষের তীর ছাড়িতে থাকুন। স্বপক্ষ হটক, বিপক্ষ হটক, স্বয়মুখ মরিলেই ইসলামের লক্ষ্য।” মাণার উপর হইতে স্বর্গাসেব নিঃশব্দে অধিবর্ষণ করিতেছেন; রণলক্ষ্য কামান হইতে লক্ষ্যে অগ্নি ছুটিতেছে; ওদৃশ্যে তপ্তবায়ু যেন শিরায় শিরায় অগ্নিসংকার করিতে লাগিল।

প্রিয়বাহন, লীলায় চৈতকে আয়োজন করিয়া প্রতাপ মহিমার নিবাহ হইলেন এবং অগ্রস্তুতিবিক্রমে অস্বাভাবিক-

দলদ্বারা মানসিংহকে অধেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন; কিন্তু মানসিংহ সে উগ্রভাবের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না, চুক্তির বাহনধা সূত্রান্ত রহিলেন। বিষয়ে মোগল বেখিল, দলপ্রত্যাপ সংশ্লিষ্ট বাহুকীর বিক্রমে শক্রসিদ্ধ হইলেন করিতেছেন। মহাশয় মার্কণ্ডেয় জ্ঞান তাঁহার অনিতোক্তোক্ত মূর্তি দেখিয়া মোগল প্রমাদ গণিল। অবিরত তরবারি লগালন করিয়া প্রত্যাপ অধিগতের ভায় অধিগতের ফিরিতেছেন। এবার আর মানসিংহের নিস্তার নাই। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যাপ স্তম্ভিত ভাবে নিশ্চয় করিলেন। মানসিংহের ততদৃষ্টবশতঃ সে বর্ষা লোহার হাওয়ার লাগিয়া ব্যর্থ হইল; কিন্তু প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বাতীশের 'চৈতন্য' শত্রুপৈত্র মনিত করিয়া বারগাদীনে মামের অভিযুক্ত ছুটিল এবং রণনিপুণ অথ অধিলে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, হতীর মতকে চরণ স্থাপন করিল; কিন্তু মানসিংহ, সম্মুখে পাইয়াও প্রত্যাপ নিহত করিতে পারিলেন না। তাঁহার উত্তম পতিত হইল—হস্তিকের উপর। বিহারপতি যিহীরা অস্ত্রাবাত করিতে না করিতে ঢালকাষীনে ভীত হইয়া লক্ষ্যভাগে তাঁহার আঘাত^১ ব্যর্থ করিয়া মানসিংহকে গাইয়া ছুটিল। প্রথম নিহতির কৃপার মানসিংহের বন্ধা পাইলেন।

এদিকে সেনাপতির সমূহ বিপদ-দর্শনে মোগলসেনা দলে দলে প্রত্যাপকে বেঁটন করিল; কিন্তু রণরঙ্গে প্রত্যাপ আত্ম আপনাই মাতিয়া তাঁহার প্রত্যেক সেনাকে বাতাইরাছেন। প্রভুর সক্ষমতাধারও দলে দলে ছুটিয়া আসিল। বৈরিনেপট প্রত্যাপ ভালবড় সিংহের জায় পুষিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকে নিহত-সৈন্যের শব শুণ্যকার হইয়া উঠিল। তথাপি বিরাম নাই। বিহারের রাজদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া দূরে বিকটে অসংখ্য অগ্নি অস্ত্রক্ষেপ করিতেছে। রাজ-অঙ্গে অস্ত্রশোণা হইতে গিহি-নিহতের জায় রক্তশোত ছুটতেছে। অশ্রিত রণরঙ্গ অবলম্বন শরীর, লীলাধের উপরে জুগ্মপনে জুগ্মের ন্যায় টুংগ করিতেছে। তথাপি বিরাম নাই। দূর হইতে রাজা মদার মারা রাও তাঁহা লক্ষ্য করিলেন। আশ্বাবানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার উৎসাহ, উচ্চদ্রব্য দারা মহোদয়ে মহাগায়ের লক্ষ্যকনি করিয়া ছুটিলেন এবং নিম্নে বিহারের রাজদ্বন্দ্ব লক্ষ্য আপনার মতকে দারণ করিলেন।

রাণা-ব্রহ্মে শত্রুট্টেদনা মারাকে বেঁটন করিল। অশ্বোদ্রাক, প্রভুতর বীর মহাধার করিয়া শত্রুপবহারী হইলেন।

মহাশয় মারার আশ্বাবানে হলুদীবাট হুজুর অবলম্বন হইল।^২ মহাশয় দেখিলেন, বিহার-বাহিনী বিলুপ্ত-প্রায়, বিহারগা আর নাই। তখন দিনদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যাপ একবার বিহার নগরে সেই শত্রুকীর রণরঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপরে গজীর দীর্ঘ-স্থান ফেলিয়া অস্ত্রোদ্ধ শ্রমকরের পানে যাবেক চাহিয়া রণরঙ্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিহার দ্রুপ্তি বাকাইয়া মোগল-বাহিনী শিবিরে ফিরিল। রাজপুতের পরাজয় হইল (জুন ১৫৭৩)। কিন্তু চারি শতাব্দী ধরিয়া এই পরাজয়ের গৌরব-সৌভাগ্য অগতঃ ভরিয়া রাজপুত-মহিমার বৈজয় হইয়া রহিয়াছে। যে পরাজয় বিজয়ের গর্ভে খসি করিয়া বিধিতের মতকে কীর্ষির অক্ষয়-স্মৃতি পরাইয়া দেয়, হলুদীবাটের পরাজয়,—সেই পরাজয়! পৃথিবীতে বহুবার জয়-পরাজয়,

১ হলুদীবাটের দূর ইতিহাসে 'গোপুতা' দূর নামেও পরিচিত। কবিভাষ্য ভ্রাম্য দান বলেন, দানসীর বৃত্তিকা হরিবর্ষ বলিয়া এই পরিচয়ের নাম হলুদীবাট। ইতিহাসিক বহাদুরী এই সময়ে আকবরের একজন ইমাম (Court Chaplain) ছিলেন; তিনি বয়ঃ এই বর্ষদুইতে মরন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত হলুদীবাট হুজুর বিরম বিলুপ্ত ও লক্ষ্যলক্ষ্য বিহারের দায়া। বহাদুরী লিখিয়াছেন, মারার অর্ধেক বাহিনী হলুদী শত্রু নামক তরৈক আশ্বাবানের নেতৃত্বাধীনে ছিল। ইহা একটা নূতন তথ্য,—যত কান ইতিহাসিকই ইহার উল্লেখ করেন নাই।

মুগলমান-ইতিহাসিকগণ প্রতাপসিংহকে 'রাণা কীক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সিংহাসনোত্তরণের পূর্বে বিহারের মহারাজা-মহারাজ 'কীক' বা 'হুকা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কারণে শিতা ইবরাহিমের জীবিতাবস্থায় প্রতাপ 'কীক' নামে পরিচিত ছিলেন। আকবর প্রতাপকে যে 'কীক' বলিতেন, ইহাই খুব সম্ভব, এবং এইখানে প্রতাপসিংহে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পরে, মুগলমান-ইতিহাসিকগণ কীক 'রাণা কীক' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। See Noer's *Emperor Akbar*, Translator's note, i, 245.

২ রাণা হলুদীবাট হুজুর বিলুপ্ত বিহারী পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার দিগদিশিত অষ্টকলি অধ্যয়ন করিবেন—H. Deveridge কর্তৃক অনূদিত বহাদুরী হলুদীবাট হুজুর বিহার—See von Noer's *Emperor Akbar*, i, 247-56; *Annals of Mewar*, Vol. i; *Akbarnama*, Vol. iii; *ঐদ্যোপন্যাস* বিজয়ী 'প্রতাপসিংহ'।

বহু ভাতির উত্থান-পতন হইয়াছে ; কিন্তু দিবারের আশ্রিত্য এই বীরত্বকাহিনী ইতিহাসে বিরল। তথাপি সমগ্র মোগল-মাত্রায়া মধ্যেই তাহা মাতিয়া উঠিল।

পরামিত রণস্থল হইতে প্রত্যুত্থ 'চৈতক' বিবাহময় প্রতাপকে লইয়া দক্ষিণ অভিমুখে ছুটিল। সম্রাটের জনৈক খ্রাসানী ও একজন মুলতানী সেনা দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া দিবারপতির অহুসরণ করিল। বুদ্ধবয়সের শ্রেষ্ঠ-মূর্তি যে হস্তচ্যুত হইয়া বাইতেছে, সে কথা এই দুই নির্লোভ সেনা বুঝিয়াছিল। বিজয়দুগ্ধ মানসিহ তাহা বুঝেন নাই ; এমন সম্রাট, তাঁহার বিস্তার সাধনা করিয়াছিলেন। অপরিসিত পুংস্বরের শোভে সেনাধর তীরবেগে অগ্র ছুটাইল ; কিন্তু যেখানে প্রভুর কল্যাণপাপেক্ষ, সেখানে বেগবলে চৈতকে পরামিত করা যায় : পবনবেগেরও ছঃসাধ্য। আশা যেন সে বুঝিয়াছে যে দিবারের আশ্রিত্য, শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার পূর্বে ; প্রভুচক্ষু বাহন আপনায় শাস্তি-ক্রান্তি, ক্ষতব্রণ, সর্বাঙ্গের রক্তধারা, সব ভুলিয়া প্রভুকে লইয়া গোপালের স্তায় এক গিরিনদী উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে কাহার অস্বাভ-চালিত ভ্রমের আঘাতে সেনাধর নিহত হইল। হত্যাকারী পলাতকের অহুসরণ করিল। 'হো মৌণা যোড়াকো আসোয়ার !'—সম্রাটের গুনিয়া প্রতাপ পক্ষাৎ কিরিলেন এবং কিছুকণ পরেই দেখিলেন—অহুস শক্তসিংহ তাঁহার চরণে !

সম্রাটের ঈর্ষার শক্তসিংহ মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু হৃদয়ীঘাতে প্রতাপের অমায়ত্বী বীরত্ব যেখিয়া তাঁহার বিঘ্নে, প্রভাব ও সৌখ্য-অল্পভাগে পরিণত হইল। দুইজন মোগল-সেনাকে ছোটের অহুসরণ করিতে দেখিয়া, তাহাদের হুস্তিসন্ধি বুঝিয়া, শক্ত মেবার-পতিকে রক্ষা করিবার অন্তিমপ্রায়ে অগ্রসর হ'ন।

অহুসকে আশ্রয়ন করিয়া দিবারপতির ছয় হইতে পরাময়ের তীক্ষ্ণ কণ্টক ফণিকের মত মিলাইয়া গেল ; কিন্তু ভ্রাতৃসম্মিলনে দিবারপতির ছয়বিগলিত আনন্দধারা তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ শোকাহুতে পরিণত হইল। মরণাত হইয়া মরণপ্রাণ চৈতক ভূপায়া প্রণয় করিয়াছে। প্রতাপ অধীর হইয়া উঠিলেন। সম্পদে-বিশেষ-সমসংঘ, শতরণ-সঙ্গী, সহস্র লগটে আগ্রহী চৈতক ! দিবারের দৃষ্টদোষ পুনরুত্থ হইতে পারে, কিন্তু চৈতক আর কিরিতে না।

শক্তসিংহ ভ্রাতাকে সাহায্য দিয়া, পলায়নের মত আপনায় অশ্রু অর্পণ করিলেন। যে স্থানে চৈতক দেহরক্ষা ক্রিয়াক্ষিপ্ত, সেইখানে 'চৈতক-কা-চা-বুজা' নামে তাহার সমাধিবেদী এখনও বিস্তারন রহিয়াছে।

ছোটকে পলায়নে সহায়তা করার মোগল-শিবিরে আর শক্তসিংহের স্থান হইল না। তিনিও ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। অবসর পাইয়া শক্ত আনন্দচিত্তে সমলবলে সম্রাটের-সামিধান চলিলেন।

অন্নদিন পরে মোগল-বাহিনী গিরিবন্ধে প্রবেশ করিয়া মনোহর পার্শ্বভাগের গোপুতা অধিকার করিয়া গেল। প্রতাপ পূর্ণ হইতেই ইহা অহুসরণ করিয়া সেখান শোভমুখ ও শক্তপুত্র করিয়া, ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মানসিংহ দৈবস্তের রস-সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে প্রতাপ পুনরায় দৈব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অভিনব বুদ্ধ-প্রণালীতে তাহাদিগকে বীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইহা আত্মনিক আক্রমণ-প্রণালী (Guerilla warfare) বলিয়া বিখ্যাত। পার্শ্বভাগ-প্রবেশ ব্যতীত এরূপ বুদ্ধের সুবিধা হয় না। অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া শত্রুর রস লুপ্তপাত ও ধ্বংসস্তব পৈন্যকর করিয়া পার্শ্বভাগ সেনা কোথায় অবস্থিত হইয়া যায়, তাহা সক্ষমক অহুসরণ করিতে পারে না। হৃদয়ীঘাতে প্রতাপ যদি পার্শ্বভাগ হইতে বাহির না হইয়া, এইরূপ বুদ্ধপ্রণা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ইতিহাসে হৃদয়ীঘাত-কাহিনী অনারুণ কীর্ণিত হইত।

এমিকে তীব্র বর্ষাসাগম হইল, তখন পার্শ্বভাগে মোগল-বাহিনীর পক্ষে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহারা দ্রবর্জী সমলভূমে আশ্রয় লইল। অবসর বুঝিয়া প্রতাপ উদয়পুর অঞ্চল অধিকার করিয়া গেলেন। দিবার-বাহিনী আবার রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। দিবার-প্রবেশের হৃদয় প্রাত পর্বাৎ চারপাশ-পাশীর ঘরে ঘরে সক্ষমকে উৎসাহিত করিয়া কিরিতে লাগিলেন। শৈলকন্মর প্রতি-ধ্বনিত করিয়া আবার দিবারের বিজয়-ধ্বনি ব্যক্তি ব্যক্তি লাগিল। সম্রাট সন্তোষে হর্ষা উঠিলেন। হৃদয়ীঘাটের সমরানন্দ নির্জাপিত হইলেও তাঁহার মনে বিঘ্নেবাকি নিবে নাই ; প্রতাপের অগ্রদ্বনিতে তাহা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, রাজধানীর দ্বীপে স্থানে

বিশ্রোহের সূচনা হইয়াছে। আকবর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিশ্রোহ-সম্বন্ধে নৈস্ত পাঠাইয়া বহু বিপুল আড়ম্বরে প্রতাপের বিরুদ্ধে বিবার যাত্রা করিলেন। ক্রুদ্ধ বাহ্যাত্মকিত্বতেই মিথ্যাপত্রিক কমা করিতে পারিলেন না—তাঁহার মহাপরোধে বশেষস্বরাগ! চিত্তোর-বিজয়ী জুগল ভাষিয়া পাইলেন না; যে নিমগ্ন, সোভবলহীন, গৃহধারা এক তুচ্ছ শত্রু ক্রুদ্ধে এমন চর্য্যের হইয় উঠিল। নিশ্চয়ই তাঁহার সেনাপতিগণ শিথিলপ্রবর। তিনি শুনিয়াছিলেন, মানসিঙ প্রতাপের উপর প্রথর ঈর্ষাবান হইলেও যোগল-সৈন্তকে বিবার লুটপাট করিতে সেনা নাই। সেইজন্য মানুষকে স্বখেই অগমান করিলেন। কিছুদিনের জন্য তাঁহার সম্রাট-সরবাধার ব্যার বন্ধ হইল।

ক্রমে বাহ্যাত্মক নৈস্ত কর্তৃক বিবার চারিদিকে অবস্থিত হইল। মিথ্যার অধিকরণ সামন্তস্বাক্ষরণ একে একে যোগলের করে আত্মদর্শন করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে অবলম্বন বসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি সূচপ্রতিভ মিথ্যাপতি আরাবল্লী-নিখরের উপরে দ্বিতীয় নিখরের দ্বার অটল। 'পতন্ত্য স্বপ্রাণী বীর শত্রুপদ অবলম্বন করিয়াছে, কক্ষ; সহস্র-সহস্র শত্রুসেনা আরাবল্লীর গিরিধারে সমবেত হইয়াছে, হটক; চূর্ণের পর চূর্ণ, যাক্ষাংশের পর যাক্ষাংশ শত্রুগণে যাইতেছে বাটক, তথাপি প্রতাপসিংহ অটল ও অটল। আত্মবিক্রম বা স্বদেশ-বিক্রম করিব না—বলিয়া প্রতাপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই টলিবে না। যোগলের প্রাধাত্ম স্বীকার করিলে স্বদেশ প্রত্যাগর্ত হইবে, চিরনাথের চিত্তে আর প্রবেশাধিকার মিলিবে, প্রতাপ তাহা চাহে না।'

ভিরত্বত মানসিঙের সৈন্তগণ পর্ত্তের কন্ডের-কন্ডের অবলম্বন করে—কাঁহারও সাফাং পার না; কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে 'আগোষা' আসিয়া পড়ে—যোগল-সৈন্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রসদ সূঁটা। বেন যাবৎকাল অগ্রহিত হইয়া যায়। এমনই খণ্ডবুদ্ধে বর্ষ কাটয়া আবার বর্ষ আসিয়া পড়িল। যোগল-সৈন্ত পর্ত্তত ত্যাগ করিয়া গেল। প্রতাপ কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া কলহীর চূর্ণে অবস্থান করিলেন এবং খাড়াই সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পার্সীরা হুঃসুঃ সীত ক্রমে শেখ হইয়া আসিল। কলহীর আক্রমণের দগ্ধ সম্রাট, শাহবাখ, খাঁর অবস্থান

সুতন সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। কলহীর অবস্থান হইল। প্রতাপের খাড়াই সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেল; তথাপি তিনি অবনত হইলেন না;—কঠোর সত্বে, অমাহুদী বিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধু নিরতিত সহিত কে বুঝিবে? একদিন চট্টাং একটা কামান কাটরা চূর্ণের ব্যতনানা পুড়িয়া গেল। তারপর যোগলের কোশে চূর্ণ-বাণীর পানীর দল বিধাত হইল। নিকপার প্রতাপ অবশেষে একদিন রাতিযোগে অবরোধকারীদিগের অজান্ত-সারে গুপ্তগণ দ্বারা চূর্ণ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কলহীর ত্যাগ করিয়া প্রতাপ চন্দ্র প্রবেশে ভীল-পানী চৌক্যর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিথ্যাপত্রিক দমন করিতে সম্রাট বতই বার্ষিক্য হইতে লাগিলেন, তাঁহার আক্রোশ ও উত্তম ততই বাড়িতে লাগিল; প্রতাপ বতই চূর্ণবাণীর হইতে লাগিলেন, তাঁহার সম্রা ততই দৃঢ়বদ্ধ হইল। চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত, নিষ্করণের পথ নাই, রাসদ বন্ধ; পতনবুদ্ধী সেনাপতিগণ তাঁহার শত্রুচাওরনে দৃঢ়গণ; যোগলের বিপুল অর্থ, অতুল লোকবল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরোদ্ধিত; তথাপি মিথ্যাপত্রিক ক্রোধে নাই। চৌক্য আক্রান্ত হইল, প্রতাপ এতদিনে নিরাশ্রয় হইলেন।

মিথ্যাপত্রিক সিংহাসন এখন ধরাডল; মুক্ত অধর রাজ-হস্ত; গৃহ—গিরিকন্ড; শয্যা—কঠিন ককরময় গিরি-ভূমি; আহোর—বনের দল, তৃণের বীজ হইতে প্রস্তুত হটি, অথবা মুগলান্দ্র মাংস। বজ্রপতি ভীলগণ তাঁহার দরতে সহায়, বিশ্রামে সেবক, বিপদে রক্ষক। রাজমহিষা এবং রাজসন্ততিগণকে ইহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতাপ তাঁহার একান্ত আশ্রিত সেনাদলসহ সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সাধনের অস্ত্র বনে-বনে শৈল-শৈল-বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। আপদ উপস্থিত হইলে ভীলগণ রাজপরিবার-বর্গকে কাঁপানে তুলিয়া লইয়া গুপ্তস্থানে নিরাপদে রক্ষা করিত। অনেক সময় সুখেই গ্রাম কেশিয়া, ক্ষুধার রোকেয়ায় নিশ্চিন্তস্থানসংগে হইয়া ভীল সহায় রাজ-মহিষীকে গুপ্ত গিরিকন্ডের লুকাইতে হইত। একদিন দৃঢ়-শত্রুসৈন্তের আক্রমণে পরিবার এইরূপ সুখের গ্রাম কেশিয়া পলায়ন করিতে হয়।

কুটবুদ্ধি যোগল-সেনাপতিগণ মিথ্যাপত্রিক পতিবিধি কোনদিকে নির্দ্ধার করিতে পারিতেন না। কলহিত

তিনি কোন দুরারোগ্য পরীক্ষাধর দেখা দিতেন। শত্রু-
সৈন্য আক্রমণের হইলে তীলগপত্র ও শিলাখণ্ড নিক্ষেপে
তাহাদিগকে বধাশাখা বধা দিত; প্রত্যপ ইতিমধ্যে
অস্ত্রধারি করিতেন। এমনই করিয়া দিন-দিন যোগল-
শোণিতে গিগিগম্ম রহিত হইতে লাগিল। এক সময়ে
করীন্দ্র প্রত্যপকে জালবদ্ধ করিবার জন্য উল্লাসে উৎফুল্ল
হইয়া উঠিলেন। বিহারপতি পলায়নপর; যোগলসৈন্য
বিজয়গর্বে তাঁহার অঙ্গসম্পর্ক করিতে-করিতে সহসা এক
নিগমবিহীন নিতিসম্মতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন
তাহাদের চৈতন্যহীন হইল, কিন্তু অতি বিলম্বে। করীন্দ্র
বা বৃক্ষলেন, বাহ্যকে তিনি বকী করিতে অগ্রসর, তাঁহারই
কূটকৌশলে তিনি সটপ্পে বকী। আবার যোগল-রকে
আত্মবলী মান করিলেন। যোগলসৈন্যের একজনও কিরিল
না। অত্যাচারী প্রতি শিলাখণ্ড প্রত্যপের এইরূপ শত-
শত বীরকীর্ত্তির দৃষ্ট সাক্ষীরূপে আজিও বিদ্যমান। কূট-
কৌশল-নিপুণ যোগল-সেনানায়কগণ বৃক্ষলেন, প্রত্যপ
অপেক্ষা দ্রুত বাহুকে বকী করা সহজসাধ্য। এইরূপে
আবার বর্ষা আসিল; যোগলসৈন্য পরীক্ষা ভাঙা করিল।
বিহারপতি স্থির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

এমনই করিয়া কত বর্ষা কাটিল। প্রতি বর্ষা যোগল-
সৈন্য পরীক্ষায় হইতে মানিবার ভায় ভাসিয়া যায়, আবার
বলভাগনে নব্যোপকরণের দ্রুত বৈলম্বে অজ্ঞেয় করিয়া
কেলে। সম্রাটেরও উদ্ভব কমিল না; বিহারপতির
জয়ও কমিল না; তাঁহার উচ্চ শিরও কমিল না।

কিন্তু আর বৃদ্ধি থাকে না। বৈধর্ম্যের যন্ত্র, সচিক্রতার
শিবর, বৃদ্ধি নিবৃত্তির কঠোর পরীক্ষার, হৃদৈব পীড়নে
ভাসিয়া যায়। ক্রম হইতে বাহ্যিক রাজভোগের অধিকারী,
বনের কলম্বু, তৃণবীজের অন্ন, অর্জমান করিয়া তাহার
জীবনধারণ করিতেছে; বস্ত্র তীলগপত্র তাহাদের সচর,
তাহারা রাজপরিচ্ছদের পরিবর্তে বনিন ছিন্ন চির পরিতেছে।
বাহ্যকে শত ধানী দেখা করিত, চন্দ্র-সূর্য্য বাহ্যকে কখন
দেখে নাই, সেই রাজকুলধর, পতিভ্রাতা সীতা-সাম্বিকীর ভায়
আজ শূন্য অরণ্যতলে, তৃণাসনে শায়িত—শত্রুসমূহ অনাহার
অনিদ্রা-পীড়িত। কঠোর দুর্ভোগের শেষ সীমা আর
কত দূর?

একদিন আর কোন খাদ্য সংগ্রহ হয় নাই। মহারাণী

মলভূগের শত্রু হইতে কয়েকখানি কুটি প্রস্তুত করিয়া
স্বাভাবিক সন্তানগণের সামগ্র-প্রদানিত হস্তে এক একখানি
করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন। তাহাও নিরাশ্রয় গ্রন্থ
হইল—অর্দ্ধখণ্ড এ বেলায়, অপরাধী সারাহের আহার।
রাজসন্তানগণ ক্ষুধিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে
লাগিল। সেই সময় বৃক্ষশাখা হইতে একটা বস্ত্র-বিড়াল
সহসা লাফাইয়া পড়িয়া রাজকন্তার ক্রোড় হইতে তাহার
অপরাহের আহার অর্দ্ধখণ্ড কুটি কাড়িয়া লইয়া গেল।
বালিকা সহসা উঠে-বসে কাঁদিয়া উঠিল।

বিহারের শত্রুকে তৃণখাদ্য শয়ন করিয়া আপনায়
চুষাই ও মিবারের দুর্দশা ভিত্তি করিতেছিলেন। সহসা
বালিকার হঠাৎ ক্রন্দন ক্রমে তাহার ভয়ঙ্কর ছলিয়া
উঠিল। দ্বিধা, দীর্ঘ, ভাবিত্তি, রমণীমূলক উজ্জ্বলিত অক্ষ-
রোধ করিবার নিমিত্ত হস্তে বস্ত্র শিশুরা বগিয়া উঠিলেন,
—“হতভাগ্য বিহারপতির দুঃখপাত্তি পূর্ণ হইয়াছে—আকুবর
শাহ্ তোমারই জয়!” তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন কন্ডাকে পরিত্যাগ
করিয়া পতিপররাগা রাজমহিষী পতিপার্শ্বে ছুটাই আসিলেন।
আপনি অকলে চক্ষু মুদ্রিতে মুদ্রিতে মহারাণাকে প্রিয়বাক্যে
সাম্বনা দিতে লাগিলেন; কিন্তু মহিষীর সাম্বনা, বিহার-
সর্দারগণের প্রবেশবাক্য, নিম্নের প্রতিজ্ঞা, চিরদগ্ধান ব্রত,
স্বাধীনতারক্ষার জন্য দুঃসহ ক্রোধবীকার—বালিকার
যোননে সব ভাসিয়া গেল। বাহ্যিক অপত্যসহের অপরা-
হের বোহমায়ার বিবর অবগত, তাঁহার পিতার এই কবিত্ত
দুর্দলতা বৃদ্ধিবেশ। মহারাণা রণে কমা প্রার্থনা করিয়া
আকুবর শাহ্-র নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন।

যোগল-সম্রাটের বিজয়োৎসব পড়িয়া গেল। রণে
কমা? যোগল-বাহিনী এখনই তাহা দিতে প্রস্তুত।
এই মহা ত্রণসমূহ-মখন যে গরল উঠিয়াছে—বে বিষ
তিনি উল্লীর্ণ করিতে পারিতেছেন না—তাহাকে
নিভা জর-জর করিতেছে, কোন মতে তাহা হইতে
জ্ঞান পাইলে তিনি বাচেন! সম্রাট সর্ব্বার্থে তাঁহার
সন্তানদ্বি বিকায়ের ক্রয়ার পুণ্ড্রাভ্যন্তে প্রত্যপের পত্র
দেখাইলেন। পুণ্ড্রাভ্যন্তের জয়র বাধিত হইল; কিন্তু
তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সম্রাটকে বলিলেন,
“বাহাগনা! প্রত্যপ আপনায় রাজ-দুঃখ পাইলেও কখন
সন্ধি করিবেন না। আমি তাহাকে উত্তমরূপে মানি। এ

পত্র তাঁহার কোন শত্রু লিখিয়াছে—ইহা ভাল। ভারতবর্ষ যদি অস্থমতি করেন, আমি বিহারপতিকে স্বহস্তে পত্র-লিখিয়া ইহার বাধাধা নিরূপণ করিতে পারি।” সম্রাট অস্থমতি দিলেন। স্বাক্ষর কর্ণেশ্বর হস্তে প্রতাপ যে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন, পুথিগ্রন্থ ভাণ্ডার অবিখ্যাস করেন নাই; কিন্তু প্রতাপকে পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য তাঁহাকে সন্ধিপ্রার্থনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা। পুথিগ্রন্থ হুকবি ছিলেন; উৎসাহের অসম-ভাষার তিনি লিখিলেন :—

“হিন্দুধর্মের এই মহানিশার সমস্ত রাজপুতানা মোহ-নিমন্ত্রণ আচ্ছন্ন; বিধর্ষিগণ রাজপুতের জাতিধর্মশত্রু লুপ্ত। লইতেছে, এ যের নৈরাস্ত-নিধিবে একমাত্র জাগ্রত-প্রহরী প্রতাপ।

“আর সকলে বধন-অবসন্নবাস, একমাত্র উদয়-কুমার ঘীরকরে অসিধারণ করিয়া রাজপুতের ধর্ম রক্ষা করিতে-ছেন। সেই অমিততেজ রাজপুত-স্বর্গের উপর সমগ্র ভারতের আশা-দৃষ্টি নিপতিত!

“চিরদিন সমান দায় না। বিপুল মাত্রাঙ্কের বিপনীতে আজ যিনি রাজপুতের জাতিবর্ধ পণের নায় ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন—এ বাণিজ্যে একদিন তাঁহাকে ঠিকিতে হইবে। জীবনের দিনও তাঁহার অক্লান্ত নহে; বধন সেই জ্বলি অসিবে, তখন প্রতাপ ভিন্ন কে আর রাজ-পুতানার উদয়-ক্ষেত্রে জাতীয়তা ও ধর্মের বীজ বপন করিবেন?”

বীর-কবির এই সত্যের পত্র এক আকৌহিনী সেনার কাণে করিল। প্রতাপ আবার ছুতার বিদ্যা উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু উপার কি? তাঁহার অর্থ নিঃশেষিত, নিভা রূপে যে লৈল কব হইয়াছে তাহা আর সংপূরিত হয় নাই। এরূপ অবস্থার অকূল বলশালী যোগল-সম্রাটের সহিত নিরুপ রণ-পরিচালনা করা সুখ। প্রতাপ স্থির করিলেন চিতোরের আশা ছাড়িয়া, অস্থমতি বিহারের দ্বারা কাটাওয়া, তাঁহার আশ্রিতগণের জন্য মরুপ্রান্তে সিদ্ধকূলে নব-বিহার স্থাপন করিয়া স্বয়ং চিরসন্মাদ ব্রতে দিনধারণ করিবেন। শুণ্ডচর দ্বারা রাজ্যের শুণ্ড সংবাদ প্রেরিত হইল। প্রতাপ বধেন ও বদেষবাদিগণের নিকট চির-বিহার লইবার জন্য আরাবলীর পাশকূলে, মরুকূলে শিবির-দখল কল্পিলেন।^{১০} বিহার-প্রধানগণ সকলে বিহার লইতে

আসিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে আসিলেন বিহারের প্রাচীন রাজমন্ত্রী ভান্সাহ।

মহাতাপ: সকলের নিকট মর্গভেদী-বাণ্যে বিহারপ্রবণ করিলেন, পলিতকেশ মন্ত্রী মহারাণার নিকট বীরপদে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—“বিহার-রাজগণের সেবা করিয়া আবার পূর্বপুরুষগণ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সে অর্থে পঞ্চাংশতি সহস্র সেনা স্বাক্ষরপ্রাপ্ত প্রতাপদিত হইবে। মহারাণার চরণে আবার ভিক্ষা, প্রভুবাংশের অর্থ, প্রভু-বাংশের গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধকে কৃতার্থ করুন।” এই উপায় বদামাতার সদগ্র শিবির প্রথমে তত্ত্বিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই বিহারেশ্বর ও ভান্সাহর ভ্রমণে গিরি মুখরিত হইয়া উঠিল। আজ হইতে বৃদ্ধ ভান্সাহ বিহারের উদ্ধার-কর্তা নামে অভিহিত হইলেন। বিহারপতির ভ্রূঙ্গাঙ্গপাশল জীবনপ্রোত ফিলিল!

অবিলম্বে কর্তব্য স্থির হইয়া গেল। ২৭—২৭—২৭! যোগলের সহিত কন্যাসূতা-২৭! অভিনব সাজ-সজ্জাম-সহ নৃতন বাহিনী প্রস্তুত হইল। প্রতাপের চরম কর্ণেশ্বর নিশ্চিত যোগল তাঁহার কিছুই ভাবিতে পারিল না।

বিহারের পার্শ্বপ্রাঙ্গণে বহু স্থানে বহু সেনানিবাস স্থাপিত করিয়া শাহ-বাঘ-বাঘ-সেইখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, নিশ্চিত-নিমন্ত্রণ নব-অভিব্যানে বিহার-বিজয়ের যত্ন দেখিতেছিলেন। প্রতাপ এতদিনে মরুপারে,—আর বাধা বিহার কে আছে? কিন্তু একদিন অকস্মাৎ তৃতীধর্মিতে যোগল-সেনাপতির মিত্রদ্রুপ সহই ছুটিয়া গেল। কিন্তু বধন আগিলেন, তখন আর আক্রমণে বাধা দিতে পারিলেন না। রাজপুত-অসিযুগে ছিন্নভিন্ন যোগল-সৈন্তের হস্তপদ যুগ করকার মত ধরাডল ছাইয়া ফেলিল। আলবদ্ব সিংহ, কন্যরুদ্ধ ঝা, মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রতাপের নববলোচ্ছত বিজয়-বাহিনী প্রবল বস্ত্রাভ ভায় বিহারস্থিত যোগল-সৈন্ত ছারবার করিতে করিতে ছুটিল। যোগল-অবিকৃত বিহার লণ্ডতও হইল। আজ চিতোরের প্রতিপোধের দিন উপস্থিত! তথায় অস্তায়-যুদ্ধে নিহত, জোহর-মদ নরনারীর অপরীরা আত্মগণক উত্তেজনার কণাঘাতে ছর্দিত রাজপুত-বাহিনীকে চালনা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলমীর প্রভূতি গিরি-দুর্গসকল পুনরাধিকৃত হইল। ঐশ্বর্যগর্ভিত বিজয়দৃশ

সামসিংহকে কথকিং শিক্ষাদানের নিমিত্ত প্রতাপ অম্বর আক্রমণ করিয়া, রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যস্থল মালপুরা লুট করাইলেন। দিবারের সৌভাগ্য হুণা পুনরুদ্ধার হইল; কিন্তু চিতোরের কিল্লিন না। দিবারপতির সন্ন্যাসী-বেশে পরিত্যক্ত হইল না!

উনয়পুরে পেনেশালা ব্রহ্মের পার্শ্বে প্রতাপ নবরাজ্য স্থাপন করিলেন; কিন্তু সে রাজধানী পৰ্ব্বভূমির-নির্মিত। এই সকল পৰ্ব্বভূমীরে সমস্ত রাজ্যভূমি, উৎসবাদি নির্মিত হইত। চিতোরহারা রাজসি এই পৰ্ব্বভূমীরে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। যৌবনের বল একদে বার্কোকা শিখিল হইয়া পিঠাছে। আক্রমণ এখন পক্ষতল প্রাণী সন্মুখ। যৌবনের সে উৎসাহ, উদ্ভম, দৃঢ়তা আর তাঁহার নাই। কিন্তু তথাপি মহারাণার উপর তাঁহার বিশেষভাবে অম্বুহায়ে বিদ্রুত হইয়া নাই। তবে এই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পক্ষময় প্রদেশে তাঁরকে ১০ বৎসর অবস্থিতি করিতে হয়; তাহার উপর সেনাপতিগণ, বিশেষতঃ রাজকুমার সন্দীপ দিবারের মকপ্রদেশে আর বৃথা রক্ত ক্ষর করিতে অনিচ্ছুক। এই সকল কারণে প্রতাপ জীবন-সন্ধ্যার শাঙ্কিভোগ করিতে সন্মত হইয়াছিলেন। দিবার-পতির মুক্তার পর তাঁহার মহান্ন প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্টবর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন।

কিন্তু সেই পূর্ণশক্তির অধিকারেরও রাজ্যের বিষয় নয়ন কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-তখন দূর চিতোর-দুর্গপানে ধাবিত হইত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি চিতোর-দ্বন্দ্রে অতিবৃত্ত ছিলেন। মিনে মিনে ক্রমে শেষ দিন সমুদিত হইলে, মুক্তাশয়্যাপার্শ্বে উপস্থিত সকলে দেখিলেন, মহারাণার স্বভাবত প্রকাশিত মুখ অশাণ্ড-ছায়াব্রিষ্ট। কারণ বিজ্ঞাপা করিলে রাজসি উত্তর দিলেন, “কুর্কের হস্তে দিবারভূমি পুনরর্পিত হইবে না, এ প্রতিজ্ঞা গুনিতে পাইলে আমি চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।” তারপর অন্তিমবাসের সঙ্গে বলিতে লাগিল,—“হায়, আশাঘাটা

চিতোরের উদ্ধার হইল না; আমার পুত্রও পারিবে না। আমি দিবারকে দেখিতেছি, আমার দেখাত্রে এই পেনেশালা-ভূতে বহু রাজ-প্রাণের উঠিবে! অম্বুহৃদ্রির স্বাধীনতা রক্ষাক্রমে যে দৃঢ়পন প্রয়োজন, আমার পুত্র অম্বর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। যে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য অকাতরে জলের মত, বেহের শোণিতপাত করিয়াছি, তাহা বিলাস-বিস্রমে ভাগিয়া গাইবে। তখন তোমরাও সেই অশাণ্ড দৃষ্টান্তের অনুদগুন করিয়া বিলাস-পক্ষে ভুবিবে।”

দিবার-প্রধানগণ প্রস্তুতি হইলে এই তবিস্তৃতবাণী শুনিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, যে, রাজ্যের চিরজীবনের পন প্রতিপালনের জন্য তাহার সন্মত প্রতিজ্ঞা রহিলেন। এই শান্তিপ্রদ আশ্বাসে রাজসি অন্তিম স্থান ত্যাগ করিয়া চিরনিদ্রায় অতিবৃত্ত হইলেন (১৫২৭)। চিতোররাজ্য চিরসন্ন্যাসীর আশা চিতোররাজ্যী গোকে চলিয়া গেল!

অধ্যাপক যদুনাথ সত্যি লিখিয়াছেন,—“ইতিহাসে শুধু শেষ দলটি দেখিয়া, লাও গোতরানের দিবার বতাইয়া বিচার করে না। চরিত্রের জন্য, শক্তির জন্য আভি-বিশেষ অম্বর হয়,—শক্তির ফলশ্রুতির জন্য নহে। বাহার কীর্তি, সেই জীবিত থাকে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

“উন্মের পথে গুনি কার বাণী—

‘ভয় নাই ভয়ে ভয় নাই,

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।”

রাজপুতরা অম্বর, কীর্তির জন্য অম্বর। তাহাদের মধ্যেই কাহিনী-ভারতের চিরকালের সন্মতি হইয়া রহিয়াছে। এই মধ্যেই দৃষ্টান্তে কোন রাজপুতই প্রতাপ-সিংহকে ছাড়াইতে পারেন নাই।”

• চুঁচুড়া ক্রেশম ডিম্বকী: ব্রহ্মের বিশেষ অবিলম্বে পঠিত।

সখী

(বক্তৃতাগুলির আধ্যাত্মিক-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারতত্ত্ব, এম-এ]

দ্বিতীয় শ্রেণী

এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীদিগের কথার আলোচনা করিব। এই শ্রেণীর ঘোটে তিনটি দৃষ্টান্ত বক্তৃতাগুলির আধ্যাত্মিক-বলিতে দৃষ্ট হয়। (১) 'জর্জেশনন্দিনী'তে অপরদ্বারা মান-সিংহের অন্ততঃ দ্বিধা উপলিখিত দেবীর সখী বিমলা, (২) 'কপালকুণ্ডলা'র সুব্রাহ্ম সেলিমের প্রাধান্য মহিষীর সখী লুৎফউরিসা, এবং (৩) 'রাজসিংহ'ে রাজকন্যা চকলকুমারীর সখী নির্মলকুমারী। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার ত্রিভাগিনী হইলেও, সাধার্মণ্য পটভূমিকা বা দ্বন্দ্ব নহেন; ইংরাজ ভ্রম-বংশজা এবং রাজমহিষী বা রাজকন্যার সহিত অনেকটা সমানভাবে বিশিষ্টে সমর্থ।

(.) 'জর্জেশনন্দিনী'তে বিমলা

'জর্জেশনন্দিনী'তে মানসিংহ-মহিষী উপলিখিতদেবীর সহিত বিমলার সখিত্বের ত্রিভাগিত চিত্র নাই, বিমলার পক্ষে এই সখিত্বের ব্যতিক্রম বর্ণনামাত্র আছে (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। বিমলা লিখিতেছেন :—'উর্ধ্বাশ্রয় গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব ? তিনি আমাকে সহচরিত্রি দাসী বলিয়া জানিতেন না ; আমাকে প্রাণাধিকা মনোদগত ভগিনীর স্তায় জানিতেন। ঠাণ্ডায়ই মনোরঞ্জনকর্মে মৃগাঙ্গিত লিখিয়া। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া দিখাইলেন।'

যাহা হউক, এক্ষেত্রে সামাজিক পদবীতে উপলিখিতদেবী প্রাধান্য ও বিমলা অপ্রাধান্য হইলেও, কাব্যবর্ণিত ব্যাপারে বিমলা প্রাধান্য, উপলিখিত অপ্রাধান্য; অর্থাৎ উপলিখিতদেবীর অপরদ্বারের সহিত প্রণয় ব্যাপারে বিমলা 'নারিকা-সহায়িনী' নহেন, বিমলার বীরেন্দ্রসিংহের সহিত গুপ্তপ্রণয়-নীলার উপলিখিতদেবী 'নারিকা-সহায়িনী' বীরেন্দ্রসিংহে অন্তঃপ্রণয় গুপ্ত-প্রণয় করিতে আগিয়া মানসিংহ-কর্তৃক কান্দাগারে আবদ্ধ হইলে, বিমলা উপলিখিতদেবীর শরণ লইলেন। "আমি কীমিয়া উপলিখিতদেবীর পদতলে পড়িলাম ; আশ্বস্ত্য সকল ব্যক্ত করিলাম। উপলিখিতদেবী আমার প্রাণরক্ষা

মহারাজের নিকট বহুবিধ করিলেন।" (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। এক্ষেত্রে সখিত্বের কাব্য এই পর্য্যন্ত।

(.) 'কপালকুণ্ডলা'র লুৎফউরিসা

'রাজপুত্রপতি মানসিংহের ভগিনী, সুব্রাহ্মের প্রাধান্য মহিষী ছিলেন। সুব্রাহ্ম লুৎফউরিসাকে তাঁহার প্রাধান্য সহচরী করিলেন। লুৎফউরিসা প্রকৃতবে বেগমের সখী, পরোক্ষে সুব্রাহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গিনী হইলেন।' (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। অতএব এক্ষেত্রে লুৎফউরিসা আগত-দৃষ্টিতে বেগমের সখী হইলেও, প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার প্রতি-যোগিনী। তথাপি 'লুৎফউরিসা আশ্বপ্রাণত-রক্ষার জন্য', আকবরের মৃত্যুর পরে বাহাতে সেলিমের পরিবর্তে বেগমের গর্ভজাত শত্রু সিংহাসন লাভ করে, তজ্জন্ত শত্রুজননীকে প্ররোচিত করিলেন এবং তাঁহার সহিত একান্তিসন্ধি হইয়া রাজনীতিক বৃত্তান্তে সোৎসাহে যোগ দিলেন। উভয়েরই গুণ উদ্বেগ, সেলিমের হৃদয়ের উপর মেহের-উরিসার ভবিষ্যৎ প্রভাব বাহাতে না ঘটে। 'বেগম সহচরীর অতিশ্রায় বৃদ্ধিলেন। হাসিয়া করিলেন, "তুবি আগ্রহ যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পানিগ্রহণ করিবে।" শুধু এই লোকে লুৎফউরিসা এ কথায় প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উরিসার স্ত্রী এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্বেগ' (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। যাহা হউক, এই রাজনীতিক বৃত্তান্তে সখিত্বের মনোরম চিত্রের আশা করা যায় না। ব্যাপারটিও অপ্রাধান্য। কেবল প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য এই প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিতে হইল।

(.) 'রাজসিংহ'ে নির্মলকুমারী

বক্তৃতাগুলির প্রথম আমলে লিখিত এই দুইখানি আধ্যাত্মিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীর তেমন স্থান্য আশ্রয় মিলিল না। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' 'রাজ-সিংহ' এই শ্রেণীর সখীর চিত্র অতি সুন্দর, অতি উজ্জল,

অতি মনোরম। বাস্তবিক, নির্মলকুমারী সখীকুলশিরো-
মণি। তাঁহার সখিদের চিত্র আখ্যানের অনেকটা স্থান
অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং এই চিত্রের আলোচনাও
বর্তমান প্রবন্ধের অনেক অংশ অধিকার করিবে। তবে
জ্ঞাপনা করি, এই মনোরম চিত্রের আলোচনা দীর্ঘ হইলেও
তাঁহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যভূতি বটবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদেই, ভবতঃস্তরের বীরসিংহ রাজার
কস্তার ভাষা, বহিমস্তরের বিক্রমসিংহ রাজার কস্তার 'এক
পাল' ('সম জন কি পনর জন') 'বুঝতী' 'সখীজন এবং
দানী', 'রঙ্গপ্রিয়া বহতা ও পরিচারিকা'র উল্লেখ আছে।
কিন্তু 'কামিনীর কমনীর কণ্ঠবাহারের ছাতিমান মধ্যমণি
যেমন সুন্দর', 'হেরনই এই সখীমালায় মধ্যে নির্মল-নারী
একজন বহতা' উজ্জলতন, 'চকলের সহোদরাধিকা অতি
দ্বিহবুদ্ধিশালিনী'।

এখন সূত্রে দেখা যায়, চকল যখন আগমনীর
বাগশাখের তলুখীলের উপর লাগি মারিবার অসম-
সাধনিক প্রস্তাব করিলেন, তখন একজন সখী বলিল,
"অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী!" একটু পরেই
বুঝা যায়, এ নিবেদ নির্মলের, কেন না পরেই স্পষ্ট নাম
নির্দেশ করিয়া বলা আছে, 'নির্মল-নারী এক বহতা আসিয়া
রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,
"অমন কথা আর বলিও না।" আবার যখন (২য় পরি-
চ্ছেদে) চকলকুমারী 'নির্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন,
"সখি নির্মল!...আনি কি কখন ভীতস্ত ভীরুজ্ঞেবের মুখে
এইরূপ—" নির্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন।'
এইরূপে রাজকুমারীকে নিবারণ করিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টায়ই
নির্মল ক্ষান্ত হইল না, সে উপবিতবুদ্ধি-বলে তলুখীর ওধানীর
মুখ বন্ধ করিবার ভক্ত তাহাকে বুঁব দিল ও বিশেষ করিয়া
বলিয়া দিল, "আরি বুড়ো, দেখিও, বাহা তনিলে, কাহারও
সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই
—এখনও উহার ঘেলে বয়ল।" (২য় পরিচ্ছেদ)। বুঝা

যে, নির্মল শুধু 'অতিদ্বিহবুদ্ধিশালিনী' নহে, রাজকুমারীর
'পরমা হিতৈষিণী'; বাহ্যতে রাজকুমারীর ভবিষ্যতে অস্তিত্ব না
হয়, তজ্জন্ত সর্বথা চেষ্টে। ইহা স্থচনামাত্র। আমরা পরে
দেখিব, নির্মল চকলের জন্য কতটা ত্যাগস্বীকার, কতটা
প্রাণপাত পরিশ্রম করিবে।

নির্মল গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে
জানেন, অথচ সে 'পরিহায়ে' 'নরপরিজ্ঞানে'ও অভিজ্ঞ।
(অগভীর-পায়ে সখীর লক্ষণ দৃষ্টব্য।) প্রথম পরিচ্ছেদে
যখন 'হাসির গোলা পড়িয়া গেল', কিন্তু রাজকুমারীর
আবির্ভাবে 'হাসির ঘূন কম পড়িয়া গেল', তখনও 'এক
সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না...বুঝতী হাসিতে হাসিতে
লুটাইয়া পড়িল।' অহুয়ানে বৃষ্টি, এই 'সুন্দরী' 'বুঝতী'
নির্মলকুমারী, কেননা 'মধুর সরল হাসি' ('তৃতীয় পরিচ্ছেদ')
তাঁহার শিষ্টবিশিষ্ট। ইহাও স্থচনামাত্র। আমরা এই তৃতীয়
পরিচ্ছেদে দেখিব, নির্মল কেননা পরিহাণ-রসিকা। সে
ভীরুজ্ঞেবকে বিবাহ করিতে চায় এই কথা লইয়া নন্দা
করিল, চকলের রাধাসিংহের প্রেত পূর্বস্বাগের আঁচ
পাইয়া তাঁহাকে 'জালাতন' করিতে লাগিল। অথচ সে
রাজকুমারীর মরসের মরনো, মরনের মরনী। যখন (২য়
পরিচ্ছেদে) চকল রাধাসিংহের 'চিত্র হাতে লইয়া অনেকক্ষণ
ধরিতা তহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন', তখন 'একজন
সখী তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল' (অহুয়ানে
বৃষ্টি এ নির্মলকুমারী); রাজকুমারী বলিলেন, "যেথ!
দেখিবার বোগ্য বটে।" নির্মলের মুখ চাহিয়াই রাজকুমারী
বলিলেন, "সখি নির্মল!...আমার সাথ কি মিটিবে না?"
ইহা হইতে বুঝা যায় নির্মলকে ছাড়ায় বাধা জানাইয়া
রাজকুমারীর জালা জুড়ায়। সে 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী
পার্শ্বচাঞ্চলি সখী'।

(তৃতীয় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে) বোগ্যপূরীর দেবী
চাকরাণী মতিওয়ারীরা ইঙ্গবেশে আসিয়া রাজকুমারীর সহিত
গোপনে কথাবার্তা করিতে চাহিলে রাজকুমারী বলিলেন,
'নির্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।' ইহা হইতেও
বুঝা য়ে, সে কতদূর বিশ্বাসপাণী, তাঁহার সহিত
রাজকুমারীর কতটা অন্তরঙ্গ ভাব।

চিত্রদলনের পর চিত্র-বিচারণ-কালে (৩য় পরিচ্ছেদে)
'একখানা কার ছবি' লুকাইয়া লুকাইয়া রাজকুমারীকে

* এই চকলমতির মতই চকলকুমারী নামকরণ। নির্মলকুমারী
ও 'হুর্দেপনকিনী'র যিন্দা অনেক কথা করিয়াছে বাহা সাধারণ
নাগকটিকে বিচার করিলে ঠিক বলিয়া সাধারণতঃ জানিবেন না,
অথচ উভয়েই চরিত্র কোণ একই কোণে পাই, এইটু বুঝিবার মত
কবি স্মার্য্যপূর্বক তাহাশিল্পের একই নাম রাখিয়াছেন।

‘পাচবার করিয়া’ দেখিতে দেখিয়া নির্ধল তাঁহাকে একটু ‘আগন্তন’ করিল। চকলকুমারী লজ্জার মনের কথা চাপিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শেষে রক্তপ্রস্রা অগতঃ ঘেঁষাই সখীর নিকট সব কথা বলিয়া ফেলিলেন। নির্ধল আবেগমত্তা নবগ্রন্থমথার কথা শুনিয়া বলিল, ‘বল কি রাক্ষসটোর? ছবি দেখিয়া কি এত হয়?’ আশ্রয় অবস্থায় অতটা বিস্মিত হই নাই, কেননা ‘বিরলে বলিয়া পড়তে গিয়া’ বিশাখা দেখালে আনি বৈক্য মহামনের এই বান্ধী আশ্রয়ের ‘কাণের তিতর দিয়া মরবে পশি’গাছে। যাহা হউক, এক্ষেত্রে নির্ধল বিশাখার স্তায় ছবি আঁকিয়া দেখাইলেন না বটে, কিন্তু ছবি দেখিয়া রাক্ষসটোর ক্রোধ ভাববোধ হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন। এই পূর্বসংসারের বৈধী আর প্রথম খণ্ডে কিছু নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু এইটুকু আছে, বাদশাহ রাক্ষসজাতীর পানিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দ্বিতীতে লইয়া বাইবার মন্ত্র সৈন্য পাঠাইতেছেন, বিক্রমসিংহের নিকট এই ‘রাষ্ট্রাঙ্গ’ (mandate) পৌঁছিলে সকলের ‘আনন্দের সীমা রহিল না’, কেবল ‘চকলকুমারীর সখীমন নিগানন’। (২য় খণ্ড, ৪ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। সাধারণভাবে সখীমনের কথা আছে, নির্ধলের স্বস্তর উল্লেখ নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইহার বিশদ বিবৃতি আছে, নির্ধলের সখিদের উচ্ছল চিত্র আছে। ‘নির্ধল দীয়ে দীয়ে রাক্ষসজাতীর কাছে গিয়া বলিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসজাতী একা বসিয়া কাদিতেছেন।...নির্ধল কাছে গিয়া বসিল, বলিল, ‘এখন উপায়?’ সে রাক্ষসজাতীকে দ্বিতী বাইতে, ‘পৃথিবীঘরী’ হইতে পরামর্শ দিল (‘বহিঃ আদিত’ ও পথে কিছু হইবে না’), তাহার পর ‘আর কোন পথে রাক্ষসজাতীর কিছু উপকার বাকি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।’ চকল দ্বিতীবাগীর স্বীকৃত না হইলে তাঁহার পিতার কি বিশদ হইবে নির্ধল তাহার উল্লেখ করিলে, চকল দ্বিতীবাগীর পর দ্বিতীয় পথে বিধ বাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন নির্ধল বলিল, ‘আর কি কোন উপায় নাই?’ চকল রাক্ষসিংহের আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিলেন, নির্ধল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিল এবং কনিষ্ঠীর বহুপতির দরদ লগ্ধায় স্তায় চকলকুমারীর রাক্ষসিংহের শরণ লগ্ধায় সম্মত সখীমনোচিত্ত পদ্ধিগণ করিল। নির্ধল নিজে কুমারী

স্বস্তী সাজিয়া গেল না, উত্তরের পরামর্শ হইল, গুহসেবকে দিয়া পত্র পাঠান। এই উপলক্ষে নির্ধল আবার ‘একটু পরিগণ করিল, “সে ত অনেক কাল আনি।” সকল কথা বলিতে চকলের সজ্জা করিবে বলিয়া নির্ধল গুহসেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার কায় হইল। পরিহাস-কালে, ‘নির্ধল হাসিল’ বটে, কিন্তু তাহার পর সে যখন উঠিয়া গেল, তখন ‘কাদিতে কাদিতে গেল’। (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। কুমারী গেল, নির্ধল কত সমবেদনাময়ী এবং রাক্ষসজাতীর সহিত তাহার কত একাত্মতা; উত্তরে একান্তিভক্তি হইয়া পরামর্শ করিল।

পর-পরিচ্ছেদে গুহসেব অনন্ত মিশ্র যখন বলিলেন, “রাণা রাক্ষসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?” তখন নির্ধল রাক্ষসজাতীর সজ্জানিবারণের মন্ত্র সে স্তায় লইল, তাহার পর ‘চকল ও নির্ধল দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল।’ এখানেও সেই একাত্মতা। ‘আমরা পরে দেখিব (৩য় খণ্ড, ৪ম পরিচ্ছেদ), পত্রের একটা ‘পুনরু’ ছিল সেটা নির্ধলের মুনীমানে, চকলকুমারীর লজ্জাকার মন্ত্র, তাহার চরিত্রের মর্যাদাকার মন্ত্র, ‘সখী এ স্তায় লইয়াছেন, ‘সলজ্জা নবযৌবনা’ নারিক। সংক্ষেপে এটুকু লিখিতে পারেন নাই।

যখন মোগলসৈন্য রাক্ষসজাতীকে লইতে আসিল, তখন ‘নির্ধলের মুখ শুকাইল।’ ক্রতবেগে সে চকলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, ‘কি হইবে সখী?’...রাক্ষসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমার লইয়া বাইবে—কি হইবে সখী?’ সখীর মন্ত্র এই উৎকর্ষ হইতে কুমারী, নির্ধলের বেহে কখন অস্তিত্ব। ‘রজনীতে নির্ধল আসিয়া গুহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুইজনে দুইজনকে বকে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল।’ সমবেদনাময়ী সখী শুধু কাদিয়াই ক্ষান্ত হইল না, রাক্ষসজাতীর সঙ্গে বাইতে চাহিল, তিনি কিছুই অস্বস্তি দিলেন না। ‘নির্ধল বলিল, “তুমি আশ্রয় লইয়া যাও, বা না যাও, আমি নিজের তোমার সঙ্গে বাইবে—কেহ রাখিতে পারিবে না।” দুইজনে কাদিয়া রাত্রি কাটাইল।’ (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। ইহার উপর উল্লী অনাবশ্যক। আশ্রয় পরে দেখিব, কিন্তু নির্ধল নিজ প্রতিজ্ঞা রাখিল।

৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে সখীঘরের কল বিলম্বিত।

‘নির্ধল অলঙ্কার পরাইল; চকল বলিল, “কুলের মালা পরাও দিবি—আমি চিত্রাঙ্গোষণে ঘাইতেছি।”’ এবং যখন প্রথমবার অলঙ্কার চকুলে ধরে পাঠাইয়া নির্ধল বলিল, “রত্নালঙ্কার পরাই দিবি, তুমি উত্তরপুরেশ্বরী হইতে বাইতেছ।”...নির্ধল...কাঁদিল। কিন্তু বলিল না। চকল তখন নির্ধলের পলা ধরিয়া কাঁদিল।’ এ যেন শঙ্করদাসের বিদায়পুত্র। চকল বলিল “নির্ধল! আর তোমার সেখিবে না।” নির্ধল কিন্তু বলিল, “আমার আবার সেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমার না সেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমার না যেখিলে আমার মরা হইবে না।”...নির্ধল... চকলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।’ আবার ৪ম খণ্ডে দেখিবে, কিভাবে নির্ধল তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিল। এই অটল সঙ্গম হইতে তাহার সখিদের গভীরতা বুঝা যায়। ‘তার পর একে একে সবীজনের কাছে, চকল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গড়গোল করিল।’ এই ত সেল সাধারণ সবীজনের কথা। আর নির্ধল? ‘চকল ত চলিয়া গেল।...কিন্তু নির্ধলের কান ত থাকে না। এক—এক—এক—সত গৌরভনের মধ্যে চকল অভাবে নির্ধল বড়ই একা। নির্ধল উচ্চ গৃহভূতীর উপর উল্লীয়া দেখিতে লাগিল...কতকণ নির্ধল চাহিয়া রহিল। চকু মালা করিতে লাগিল। তখন নির্ধল চকু বুজিয়া ছাদের উপর হইতে নামিল।...নির্ধল একাকিনী রাত্রিপূত্রী হইতে নিজস্বা হইল। পরে দুপথে, অগ্ন্যোতী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহারে অস্থিতিনী হইল।’ সে ‘অগ্ন্য ভলে কাঁপ’ দিল। (৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) তাহার সখীর প্রতি অস্থিতিক (devotion) অনুভূতি-প্রিয়তা অপেক্ষাও অধিক নহে কি ?

এই খণ্ডের ৪ম পরিচ্ছেদে পঞ্চমোদর অনভ্যাত্ত নির্ধল-কুমারী ‘পথের ধারে বৃক্ষের ছায়ার পড়িয়া আছে’ নালিক-লাল দেখিল; নির্ধল পরিচয় দিল; * রাজকুমারীর কাছে বাইতেছিল, সে কথাও জানাইল। তাহার পর, নালিক-লালের সহিত তাহার বৈতণ্য বোঝনা হইল, পাঠকবর্ষের

তাঁহা অবদিত নাই। এই বোঝনা পাঠক মহাশয়ের বড় ভাগের কারণ। কেননা সখীর কার্য (function) সম্বন্ধে (অবতরণিকা) আলোচনা-কালে (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃ: ২৬) বুঝাইয়াছি, সখীকে প্রেম পড়িতে নাই, ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। গিরিজারা স্বামী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন তাহার সখীর কার্য বুঝাইয়াছে। পঞ্চাশতের এক্ষেত্রে নির্ধলের এত নীচ, সখীর কার্য অসম্পূর্ণ থাকিতে, প্রেমের কাঁপে পা বেগুয়া অনেকের ভাল লাগিবে না। কিন্তু একটু তপাইয়া দেখিলে পাঠক মহাশয়ের হাগটা জল হইয়া যাইবে। গ্রন্থকার বুঝিয়াছিলেন, এই উপায় ভিন্ন নির্ধলকে নিরাপদে চকলের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায় না। তাই এই কৌশলটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল, এক্ষেত্রে সখীর গ্রহণ ও পরিণয় উভয় সখীর ভবিষ্যৎ পূর্নদিনের উপায়-স্বরূপ (means to an end); কবির চরম (ultimate) উদ্দেশ্য উভয় সখীর পূর্নদিন। জাহা আমরা ৪ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখিবে। নায়কের সহচরের সহিত নায়িকার সখীর বিবাহ হইল, (গিরিজারা-দিস্মৃতির ভুলনীর) অবতরণিকা (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃ: ২৬) এ ত অষ্টম বুঝাইয়াছি।

মাণিকলালের গৃহিণী হইয়া নির্ধল চকলকুমারী-সম্বন্ধে মাণিকলালের প্রবৃত্তি সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার পর (৪ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে) নির্ধল চকলকুমারীকে রাঙ্গ-লিগেহের অন্তঃপুরে দেখিতে আসিলেন। ‘অনেক দিনের পর নির্ধলকে দেখিয়া চকলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ধলকে বাইতে দিলেন না। নির্ধলের সুখ শুনিয়া চকলকুমারী আক্ষেপিতা হইলেন।’ চকল-কুমারী বলিল, “আমার সঙ্গে আমার একটা চেনা পোক নাই। আমি এ অবস্থার এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান তোমাকে দিলাইয়াছেন; তবে তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।” এই ত গেল এক পক্ষের কথা। ইহা হইতে বুঝা গেল, চকল-কুমারীর নির্ধলকুমারীর প্রতি কত গভীর প্রীতি, কত প্রাণের টান।

‘পঞ্চাশতের, নির্ধল চকলকুমারীর হৃৎ-শুনিয়া অত্যন্ত মর্ষাহত হইল।’ ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা গেল নির্ধলের সখীর লজ্জা সমবেশনা কত গভীর। কিন্তু চকলকুমারীর

* নির্ধল বলিল, “আমি ভগবতের রাজকুমারীর লালী।” এই ‘লালী’ শব্দ বিনয় (humility) প্রকাশ করিতেছে। সে সত্য-সত্যই হোয়াসি বা কবির দত্ত লালী অর্থাৎ চাকরানী নহে, ভগবৎকা উদ্দেশ্যের।

প্রত্যয় 'ভসিরা প্রথমে নির্মলের বোধ হইল বেন বৃক্স উপর পাছড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে লবে বামী পাই-
হাছে—'নূতন প্রণয়, নূতন হৃৎ, এসব ছাড়িয়া কি চেল-
কুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়?' নির্মলকুমারী হঠাৎ
সমত হইতে পারিল না। চেলকুমারীর চক্ষে একটু মল
আসিল; বলিল, "নির্মল, তুমি আমার মস্ত একা পদত্রে
রূপনগর হইতে লিখা আসিয়া মরিতে বলিয়াছিলে!
আর আর! আর তুমি স্বামী পাইয়াছ?" নির্মল অর্ধো-
বদন হইল। এই মস্তই বলিয়াছি, কাব্য-নাটকে সখীর
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, ব্যক্তিগত স্বত্ব-দুঃখের, পারিবারিক
জীবনের স্থান নাই, নারিকার স্বত্ব-দুঃখে সমবেদনানোদেই
তাহার সকল কার্য পর্যবসিত। নির্মল সেই বাহুল্য পথ
ছাড়িয়াই কাঁদে পড়িয়াছে। এক্ষণে তাহার জন্যে পতি-
প্রেম ও সখিগে তুমুল ধ্বং (conflict) উপস্থিত হইল।
স্বপ্নের বিষয়, অবশেষে পথিবী ছাড়ি হইল, তাহার সখীর
কার্য বজায় থাকিল, সে আবার 'বিদ্যাস-বিশ্রাম-কারিণী
সখী'র পথে বাহাল হইল। পর-পরিচ্ছেদেই তাহার
পরিচয় পাই।

সখীর কার্য্য পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রথম কার্য্য,
মোতিবীর নিকট চেলকুমারীর ভাগ্যসন্ধান করা।
চেলকুমারীর অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের মস্ত নির্মলের দাঙ্গা
উৎকর্ষ, সেই উৎকর্ষাবলতাই তাহার এই উদ্ভব। (৫ম
খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।)

মোতিবী গমিরা বলিলেন, 'যদি সমাপ্তা পৃথিবীপতির
মহিী আসিরা কখন তোমার সখীর পরিচর্যা করে, তখন
বিবাহ হইবে।' এই মোতিবী-গমনার স্বত্ব ধরিয়া বিম্বর-
কর জর্জবীর ঘটনা-পরম্পরায়, অর্থাৎ রোমাণ্টিক উপ-
করণের আবার নূতন করিয়া উৎপত্তি হইল। চেল-
কুমারীর নির্মলভাষিণের নির্মলকুমারী উমিপুরীকে চেল-
কুমারীর জানাহু সামার নিয়ন্ত্রণ করিতে দিল্লিতে বাহ-
শাহের রত্নস্থানে বাইতে, অসমসাহসিক কার্যের ভার
লইতে বাধ্য হইল। এই উপলক্ষে সখীঘরের একটু রক্তস
হইল (৪ষ্ঠ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। তাহার পর, নির্মল
কিন্নে স্বামীর সহিত গুপ্ত-পরামর্শ করিল, রত্নস্থানে
যোগপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, উমিপুরীকে পত্র দিল,
বাহশাহের কাছে ধরা পড়িয়া বন্দি হইল, মাণিকলালের

সহিত কোশলে পত্র-বিনিময় করিল, ইত্যাদি ঘটনার
বর্ণনার সুঁধি বাড়াইতে চাতি না। বুদ্ধ বাবিলে নির্মল
কোশলে উমিপুরীকে বন্দি করা ইরা রাজসিংহের অন্তঃ-
পুরে চেলকুমারীকে নিকট পৌছাইল দিলেন (৭ম খণ্ড,
৩য় পরিচ্ছেদ) ও 'আতোপার সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট
নিবেদন করিলেন।' (৮ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। কল-কথা,
নির্মল যে কার্যের ভার লইয়াছিলেন তাহা অদ্বুত সাধল ও
বুদ্ধিকোশলের প্রভাবে হ্রসিদ্ধ করিলেন। সখীর মস্ত
প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কঠিন কার্য্য উদ্ধার করা তাঁহার গভীর
সদ্বী-প্রীতির প্রবল নির্মল।

ইহার পর নির্মল একবার রাজকুমারীর অমুমতি লইয়া
তাঁহার কাছছাড়া হইলেন, শিবিরে গিয়া বাহশাহের একটা
বিশেষ উপকার করিলেন (৮ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)।
ইহার সহিত আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সংযোগ নাই।

উমিপুরী ঘারা জানাহু লাচান হইয়া গেলে অর্থাৎ
মোতিবীর ভবিষ্যৎবাণী সকল হইলে, উত্তর সখীতে মিলিত
মহাভাগার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে পরামর্শ হইল। 'কৈ, রাণা
ত কিছু বলেন না। চেলকুমারী কাদিতেছে যেমিয়া
নির্মল আসিরা কাছে বলিল। মনের কথা বুঝিল, নির্মল
বলিল, "মহাভাগাকে কেন কথটা দরং করিয়া দাও না?"
চেলের তাগাতে লজ্জা হইল, নির্মল অগত্যা তাঁহাকে
পিত্রাণের ঘাইতে পরামর্শ দিল। 'চেল কি উত্তর করিতে
দাইতেছিল। উত্তর সুখ দিরা ব্যতির হইল না—চেল
কাঁদিয়া কেছিল। নির্মলও কথটা বলিয়াই অপ্রতিভ
হইয়াছিল। চেল, চম্ভর, মল দুছিয়া, লজ্জা একটু
হাসিল। নির্মলও হাসিল। তখন নির্মল হাসিয়া বলিল'
ইত্যাদি। এইরূপ হাসি-কান্নার মধ্যে নির্মল আবার 'দুন্দী-
আনা' করিয়া পত্র লেখাইল, কোলাচিত্তে ম্পরামর্শ দিল;
সক্রে-সক্রে রক্তস ও একটু আঁটু চলিল। এইভাবে আবার
দুই সখীতে একাডিলকি হইয়া কার্য্য করিলেন। পরে
পত্রের উত্তর আসিলে উত্তরের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উভয়ে
চিত্তাকুল হইলেন। (৮ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ)।
নির্মলের এই সমবেদন-প্রকাশ ও পরামর্শদান সখীঘর
শেষ চিত্র।

তাহার পর, হুজিল-আশান হইল, রাণা রাজসিংহ
বিক্রম সোশাহির হস্ত হইতে তাঁহার কস্তা চেলকুমারীকে

ব্যাপার প্রণয় করিলেন। (৮ম খণ্ড, ১৫ম পরিচ্ছেদ।) কিন্তু ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় এ সব ব্যাপারের ভেতন ভুঙ্কব নাই, সুতরাং গ্রন্থকার সমাজ ইঙ্গিত দিয়াই শেষ করিয়াছেন, এবং সখীর প্রসঙ্গ আর একবারেই উত্থাপন করেন নাই। 'রাধারাণী'র শেষ পরিচ্ছেদে নারিকার বিবাহ কালে নারিকার সখী বদন্তকুমারী আসিলেন, আসিরা রাধারাণীর সহিত রঙ্গরঙ্গ করিলেন, ইত্যাদি ভাবেই বর্ণনা

ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় উপসংহারে আশা করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, প্রথম হইতে প্রারম্ভ শেষ পর্যন্ত নির্মলকুমারী যে ভাবে চকলকুমারীর 'বিশ্বাণ-বিশ্রাম-কারিণী' সখীর কাব্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা যান্ত্রিকই মনে হয়। সখীর এই চিত্র অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল। এরূপ অভাবমীর ঘটনা-পরম্পরায় সখীর বিকাশ প্রাচীন সাহিত্যে দ্রুপ্ত। ইহার মৌলিকতা স্বীকার করিতেই হইবে।

রাধারাণী

[ত্রিবেস্ত্রনাথ বসু]

(১)

জয় গগনে, জয় গগনে, জয় গগনে !

হরিপল-পদ্ম পীতম-প্রবাহিণী, পাবনী পূণ্যতরঙ্গে !

কলকল ভাবিণী, কলিমল নারিণী,

অমল তরল সুরবালা,

হর-শির-ভূষণ মালতীমালা !

পূণ্যে, ধন্যে, গিরিবর কস্তে,

অভয় চরণ চির-শরণ প্রণয়ে,—

পতিত প্রসরে !

মেদিনীহারে, মুক্তভাষারে,

মাধুরী ভাষে মৃদু কথারে—

তান-তরঙ্গিনী তরঙ্গ-চরিনী সাগরসঙ্গম রঙ্গে,

তারিণী—ভব-ভয় হরণ ভাসরে—

(জয় জয় মাকুণী গগনে !)

বাথাজি বিভোর হইয়া গাহিতে-গাহিতে বাসুম্বর বেলাভূমির বাক-বাক্যে বিরিতেছিল। একটা বাক্য ফিরাই সহসা পিছাইয়া আসিরা বলিল, "গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! এখনই যে বাড়িরে কেলিছেন ! নবাবের বেটি, শোবার আর দায়গা পাওনি ? 'ওগো—ও—কি বলে—গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! তে তুমি কো ? ঈঃ, অথোরে বুঝে ! ঈচো উমের কি না ? বয়স হ'লে ঘুন পাংলা হয় !"—বাথাজী ব্যক্তি কোন নবাবী জেলায়, তাই কথায় মাকে-মায়ে একটু-আধটু খোসবো পাওয়া যায়।

গঙ্গাসাগর-বাড়ীর পূর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্প সংখ্যক ঘাটী এখনও বেলাভূমি পরিত্যাগ করে নাই ; তাই বেলাভূমি অপেক্ষাকৃত নির্জন। সন্ধ্যার আগের অভিনায় তাহাকে নির্জনতর করিয়া তুলিয়াছে। সমুখে কেবল চপল মদুরাশির আকুল কোলাহল। পশ্চাতে—দূরে—কালগি-বিলিত বনানীর দর্শন—দূর—ভিঁচি-মুখরিত। মাথার উপর ক্ষণ-ক্ষণে নীচুগাখী মলচের পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালন শব্দ। চারিদিকে চাকলোর মাঝখানে সেই নীরব নিব্বর নাত্রী-প্রতিমা মেঘ-ছাত খণ্ড-বিদ্রুতের মত ওটুতুমি আলো করিয়া আছে ! বাথাজী সেই এলাহিতা স্বর্ণলতাকে দেখিয়া, ভাবিতে লাগিল, গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! ঠিক যেন রাধারাণীর মুষ্টি-খানি ! ক্রাম বিরহে স্বর্ণলতা গুঁকিরে গিয়ে' ধুলোয় লুটীছে ! মরি মরি !

গঙ্গায় ভেদন সারাণী ভাটা। কিন্তু সেই ক্রাম-বিরহিণী রাধারাণী যেখানে ধুলার অথবা বালিতে লুটীতেছিল, পূর্ণ জোয়ারে সে স্থান নিরাপদ নহে। বাথাজী অবিকতর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "বলি ওগো, ও যেহে ! ইয়াবাছা, তোমার ঘুম কি আর তাড়বে না ? গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! বলি, তোমার ব্যাপারখানা কি ? এই সাপ্তরে শীত, কন-কনে হাওয়া, আর তুমি এই খোলা মাঝগার এলো গারে পড়ে আছ ? ওগো, ও রাধারাণী ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ !

এখন বাবে যে—হর বা গঙ্গার আঁতে, নয় বাথের পাঁতে ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! এমন ঘুম তখন দেখিনি ! এ কি কোত না কি ? বাবাজীর মনে পড়িল, স্তম্ভিরাছিল কোন্ গৃহস্থ-বন্ধু বিদ্ভুতিকার আক্রান্ত হইয়াছে। ইহারও দেখিতেছি, সন্ধ্যার বেশ। তখন সে নিকটবর্তী হইয়া নৈকতশাসিনী রমণীকে সমাক্ষুণ পত্নীকা করিয়া বসিল—তারার মাসার খাপ নাই, ধমনীতে গতি নাই। কিন্তু তথাপি তাহাকে মৃত বলিয়া মনে হয় না। বাবাজী ভাবিতে লাগিল, সকলে যে বাজীর দল চলিয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্যে ইহার আখীর কেহ ছিল, ইহাকে মৃত মনে করিয়া বিলম্বন দিয়া গিয়াছে। জিশ বৎসর পূর্বে ঐক্কেত্রের পথে সে নিজেও একবার এমনই নির্দয়ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। রাখে ঘরি, মারে কে ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! সকলই কৃকের ইচ্ছা ! এখন কি করি ? আঃ, কোন্ আবাসী গ্রাম ধরে এমন পোণার প্রতিমা ভাসিয়ে দিয়ে গেল রে ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! এ মরে নাই। মরিলে এতক্ষণ কখন এমন টাটকা পাকিত না। কি করি ! হুঁড়র নিরে ঘাই। আঃ বাই দাউ, হরিনাম করি, আমার অস্ত ঋণমাধে কাল কি ? নবাবের বেটী যোগ করবার আর আশা পাও নি ? কিন্তু গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! কৃকের জীব—গোরচন্দ্র বলেছেন জীবের দয়া ! কিন্তু এর মুখ দেখে আমার মাথা হচ্ছে ! বোধ করি, আর অঙ্গে আমার কেউ ছিল ! কে আর ?—না হবে। নইলে, গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! আমি যাটা বৈরাগী, আমারই এত দরদ কেন ? আর আমার মত লজ্জাছাড়ার না না হলে, এ যেটারই বা এমন হালু হবে কেন ? গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! আর অঙ্গে কি বৃদ্ধি, এই অঙ্গেই হর ত আমি এর পেটে অঙ্গোচ্চি ? কিন্তু গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! আমার ত তিন কুড়ি পেরিয়েছে, আর একে দেখে মনে হচ্ছে এখনও ছগড়া পোরেনি। মা বড়, না, বাটা বড় ? গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! আমার অস্ত হিসেবে কাল কি ? ও—না, আমি—বেটা ! আর তোর সঙ্গে ঋণদা কি তাই ? গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! তবে কি উপযুক্ত বেটার কাল স্বপ্ন ? হুড়ো ছেলে আনু ? সেই হলোই যেটার ঠিক হয় ! ধর-মঙ্গার ফেলে মৃত্যে এলে সাঙ্গের ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! আমি

এখন করি কি ? যদি বাচাতে পারি ত—গোবিন্দ ! গোবিন্দ !

সমুখে জলরাশি বেদন অগাধ, অপার, বাবাজীর ভাবনাও আঁক তেমনই অন্তরীন। কিন্তু ভাবিয়ার আর সময় নাই। সন্ধ্যা ক্রমে বনাইয়া আসিতেছে। বাতাসের ঘোর বাড়িয়া উঠিয়াছে। দলপা সাগর-তরঙ্গিণীর প্রমত্ত সংঘাতে যেম ভৈরব গর্জন স্রুত হইল। ফেন-দীর্ঘ তরঙ্গ-দল কল্ কল্ করিয়া ছুটিল। আবার পন্দাতে—দূরে—অতি দূরে—বনাম্বরে যেম বিকট হুগারধ্বনি উঠিল। "গোবিন্দ ! গোবিন্দ !" —গাভারগণ কখনখানিতে নৈকত-শাসিনীকে আছাদিত করিয়া, বাহুপরি তুলিয়া লইয়া বাবাজী ছুটিতে লাগিল। সাগর সমীরণের ঐকতানবাহানে আগমুগ-তটভূমির উপর বাদিনীর ধ্বনিকা পড়িয়া গেল।

(২)

সিদ্ধ-নৈকত-শাসিনী রমণীকে সজীবিত করিয়া বাবাজী যে মৃতন নারকরণ করিয়াছে, আঘরা এখন হইতে তাহাকে সেই নামে অভিহিত করিব। রাগারগীকে আশ্রমে আনা অবধি আদ্যের বাবাজী একটু পাঁচো পড়িয়াছে। মধুর কৃকনার বাহ্যের নিষপদ অপেক্ষা তিক্ত বোধ হইত, তাহা এখন তাহার চিনির পানার জ্বার মিষ্ট বোধে পান করিতেছে ; আর ধাত্তেবরীর উগ্র গন্ধ হইতে তুলসীগন্ধের মৌরত তাহানিগের প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে। এ সকলই রাধারাণীর কৃপার।

যে প্রাচীন নগরীতে বাবাজীর আশ্রম, এক সময় তাহা বেশ সমীচীন ছিল। কিন্তু সোভাগ্য ভিন্নদিন সন্ধান থাকে না। একদিন মহামাত্রী আদিয়া তাহার সকল ঐ হরণ করিয়া লইল। কালে মহারণ্য জনারণো পরিণত হয় ; আবার বন আদিয়া কখন মনোব-স্তনন অধিকার করে। ধল লইয়া পৃথিবীর আদিম অধিবাসী বস্ত্রবৃক্ষের সহিত সভ্য মানবের নিরস্তর যুদ্ধ চলিতেছে—যে বস্তুত্ব জ্বর-বধল সুরিয়া লইতে পারে। আঘরা যে প্রাচীন সহরের কথা বলিতেছি, সেখানে পার্থক্য ইহার চান্দ্র প্রমাণ পাইবেন। দেখিবেন, কোথাও যুগ্ম আটালিকার বন্দগন্ধ তেন করিয়া অস্বতক সদর্পে মাথা তুলিয়াছে ; বিশাল-কাঠা ধররী অঙ্গার সর্পের জ্বার কাছাকে পাক-পাক

বেটন করিয়াছে; কাধকে নিকড়ে-নিকড়ে আঁঠুগুটে
বঁধিয়া মহাধাকস বট পত রসনার তাহার জগৎ-রক্ত
শোষণ করিতেছে। গম্বী জনশূন্য, হাবির বেবশুত;
কোনখানে—নিরাশ্রয় বিগ্রহ তুতলে গড়াগড়ি ঘাইতেছে!

• গোয়াল গাভীপুত্র, তড়াপ জলপুত্র—কর্মমপূর্ণ, ধূং উজান
সকল জলধাকীর্ণ। বাবলা, বাপ, ছাতিম প্রভৃতি বৃক্ষ
সকল ক্রমে-ক্রমে পখিঃপাখিঃ অধিকার করিয়াছে। বিবাল
হাট—নাও হইয়াছে। বদিকগণের কুটীতে কুটীতে শৃগাল,
কুক্কু ছুটাছুটি করিতেছে। আর অকপালিতা চুড়িতাকে
শ্রীমন্তা মেথিয়া ত গীতখী মনতাপে দীর্ঘ হইয়াছেন।

জন্মের সহিত গ্রামপলে সংশ্রব করিয়া এই প্রাচীন
সহর এখনও আশ্চর্য্যকর করিতেছে। ইহারই প্রান্ত-
বেশে তুলসীবনে বেড়া বাবাজীর আশ্রম-কুটীর। গ্রাম-
রাণী আনিবার পর তাহার পার্শ্বে আর একখানি কুটীর
উঠিয়াছে। সেখানি গ্রামাধ্যক্ষের মন্দির। কিন্তু প্রতিবেশী-
দিগের মধ্যে হঠাৎ দ্বিভুক্তি প্রবল হইয়া এই নির্দিষ্ট
মন্দিরেও গ্রামাধ্যক্ষিক এক। গ্রামিণী বাবাজী নিশ্চিন্তে
জিঙ্গার বাহির হইতে পারে না। কিন্তু মগরেও ত নিজার
নাই! তাই বলিতেছিলাম, বাবাজী এতটু পামচে
পড়িয়াছে। সহরে যে বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যায়,
আবাল-বৃদ্ধ-বগিনী বিস্মিত নেত্রে আবাক হইয়া গ্রামাধ্যক্ষের
অর্দ্ধাবরিত শূন্যপানে চাহিয়া থাকে। সজ্জার শুবতী
অবগুঠেন আরও টানিয়া দেয়। তথাপি নিরাজ্ঞ নিম্বর্ণ
স্বাধর দল পচাভাবন করিতেও ত্রুটি করে না। বাবাজীর
নিষ্ঠা-নিষ্ঠা এই বিষয়। কিন্তু আর কিছু বেনী। সহরের
প্রধান পথে বাবাজী পাথিতে-পাথিতে চলিতেছিল—

তখনগরে এসেছে এক রসিক ব্যাপারী।

রঙমহলে এসতি ভাট, ব্যাসাং রঙমারী।

রঙে ভাট জগৎ আলো,

কখন ধলো, কখন কালো,

ইচ্ছে যেমন, কণার তেমন রঙ, রঙমারি,

সে আপন রঙে রঙার বধন—

চিকণ হয় ভাট।

একজন উদ্ভট বুঝা ডাকিল, “ও রসিক ব্যাপারী, ও
রসিক ব্যাপারী! রঙমহলের পঞ্চাং বাথলে দাও না,
আমরাও একটু-আধটু রঙ মাখি। কাঙন বাস, একা একাই

হোলি খেলবে? আমাদের ছিটে-কোঁটা দাও!” বাবাজী
সম্মত হইয়া বলিল, “গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমি কাঙাল,
হোলি খেলবাই বোস্তর টেক বাবা! রঙ পাব কোথা?”

অপর এক বর্জর কবিল, “বাবাজী, কষ্টি-বল কয়লে
কবে? একদিন হটিছুট দাও।”

বাবাজী এই রঙ্গরঙ্গের উত্তর দিতে না দিতে রঙ্গস্থলে
এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল। স্পষ্টিত শুবকদল বিষয়ে
চাহিয়া দেখিল, বাবাজীর সঙ্গচারিণী সেই কুষ্টিতগদনা নারী
যেন মূর্ত্তিমতী মধ্যাহ্ন বীপ্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট জলিতেছে!
তাঁহার মুখে আর সজ্জার আবরণ নাই। চক্ষু নর—বেন
শিখায়। অকস্মাৎ রঙ্গরঙ্গের এই কুস্তম্বি হেথিয়া রঙ্গিকের
দল রঙ্গে তঙ্গ দিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

পঞ্চাৎ পরপারে বাবাজীর এক আখীরের গৃহ ছিল,
সেইখানে গিয়া ডাকিল, “তুলসী!”

“কে—বাবাজী?” বলিয়া এক ক্লমারী বহির্ঘার
খুলিয়া দিল। মগরিত-যৌবনা সেই ক্লমারীকে দেখিলে
মনে হয়, ইহার “তুলসীমগরী” নাম সার্থক। তুলসী বলিল,
“ভেতরে এল না, বাবাজী!”

“গোবিন্দ! গোবিন্দ! এখন বস্‌ব না, দিদি! ভোর
বাগ কোথা?”

“জিঙ্কেব গেছে।”

“গোবিন্দ, গোবিন্দ! ঐ গুণিকে হুথানা বর পড়ে
আছে দেখে এলাম, কার বলতে পারিস?”

“হমগুঁবাবুর। কেন গা?”

“গোবিন্দ, গোবিন্দ! আমরা এ-পারে উঠে আশ্বে
রে! ভাড়া দেবে বলতে পারিস?”

তুলসীর কোকুহলের আর সীমা রছিল না। বাবাজী
আপন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া, এ-পারে উঠিয়া আসিতেছে—
ভাড়া দিয়া বাস করিতে চায়—ইহার রহস্য কি? আবার
বলিতেছে—আমরা! বাবাজীর ত চিত্তকাল এক-বচনে
কাটিয়াছে। বাট বছরের পরে আবার বি-বচন কেন?

তবে—তাই না কি? এই বুড়া বয়সে কষ্টি-বল? তুলসীর
বিষাধরে চাপা হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু বাবাজীর
মনে কোন পাপ নাই। সে তুলসীর তাঁরবতাগুণি হইয়া

জিজ্ঞাসা করিল, “গোবিন্দ, গোবিন্দ! চূপকরে রইলি যে! ভাড়া দেবে না?”

“কেন দেবে না? ওনার ত ভাড়াই দেয়। কুনি খাও না।”

বাবাণী আশঙ্ক হইয়া বলিল, “গোবিন্দ, গোবিন্দ! কোন্‌খানে রে?” তুলসী এবার চুঠামি করিয়া বলিল, “কি কোন্‌খানে? গোবিন্দ, না, ঘর ঘর, সে?”

“গোবিন্দের তন্নান তুই পোড়ারমুখী কোথেকে দিবি? রমণীবাবুর ঘর কোথা বল?”

তুলসী বলিল, “ঐ যে পো, ঐ কোটা মেগা যাচ্ছে! আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাব?”

বাবাণী বলিল, “না! তুই ততক্ষণ রাধারাণীকে রাখ! আমি একাই যাব।”

তুলসীর মনে হইল বেন রহমতী একটু পরিত্রাণ হইয়া উঠিছে। বলিল, “রাধারাণী আবার কে, বাবাণী? কোন্‌ সন্ধানবন থেকে এসে তোমার ঘাড়ে চাপলেন?”

“গোবিন্দ! গোবিন্দ! সাগর থেকে লক্ষ্মী উঠেছেন, শুনেছিল ত? এ সেই লক্ষ্মী-প্রতিবেদ।”

তুলসী আবার হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ বাবাণী, সাগর থেকে, শুনি না কি, নাক-কাণ নিয়ে কেউ ফেরে না? শুন্তে পাই, সেধানকার ঠাণ্ডা হাওয়ার এখনি ঘর ঘর যে, নাক-কাণগুলো কচকচ করে খুঁড়িয়ে কেটে নিয়ে যায়।”

সরল ছদ্ম বাবাণী তুলসীর পরিচায়ের দিক দিয়াও গেল না। “নাক-কাণ নিয়ে ফেরে না? গোবিন্দ! গোবিন্দ! এগুলো তবে কি?” বলিয়া নাক-কাণ খোঁড়াইতে লাগিল।

তুলসী মধুর হসে উত্তরাঙ্গা করিয়া বলিল, “খাচ্ বাবাণী, সকাল বেলা আর নাক-কাণ মলার ঘরকর নেই! এখন তোমার রাধারাণী সেখাও।” অন্তরাণ হইতে এতটুকু অবগতনবতী স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিয়া বাবাণী তুলসীর কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল।

রাধারাণী গৃহভাঙরে আসিয়া অবগতন মোচন করিলে তুলসীর মনে হইল হঠাৎ বেন ভায়াসের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ হলপন্ন ছুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। তাহার বিষম-বিজ্ঞানতা দেখিয়া রাধারাণী মুহ-মুহ হাঙ্গিতে লাগিল। তুলসী ইত্যাদিরে ছুটিয়া দিয়া

ঘরের ভিতর হইতে থলনী বাহির করিয়া গাছিতে আরক্ত করিল—

বর্তারে দেখলে পরে নারীর মন হরে!

কিশোর নাপর কটাক্ষ-সর ম’বে সো কেমল করে।

এমন মন-মলানো মধুর হাসি শিশু শি কোথা, সই!

সাধ করে তোরা টুক-টুক মুখ বুজ করে রই;

চাঁদ বদনে ফাঁপ পেতেছ রাগেতে হলে নাপরে।

উৎপেছে চেটে মোর পরনে মোবনে রূপসাগরে।

তুলসী ঘুরিয়া-কিরিয়া, নাচিয়া, ডিবক ধরিয়া রাধারাণীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তারপর বলিল, “রাধারাণীর ভর হ’ক! আনরা, বইয়ের মেগে, অমনি পাইনি, কিছু ভিক্ষে চাই।”

“আচ্ছা, যদি কেউ ফাঁদে পড়ে, তাকেই তোমাকে বক্ষুশি দেব।”

“হরি বল! সে আমিও ফাঁদ পেতে বসে আছি, পারি ত ধরে নেব।”

‘তবে কি চাও বল?’

“আদরা বোইম, আর কি চাইব! রাধারাণীকেই চাই।”

“সেত ধান হয়ে গেছে।”

“ধরি বন্দ! সব ধান হয়ে গেছে? ছিটে-কেটা মৎল কিছু পড়ে নেই?”

“না। কার, মন, গ্রাণ সব একেবারে খোস-কবলার মিখে দিয়েছি।”

“তা নিদেই বা! এখন ত সে বেশখল!”

“টুক বেশখল! এই বেশ না তার মৎলের প্রমাণ আবার মাধার ওপর—বসিয়া রাধারাণী কলুশিয়ার সিঁধার সিন্দুর দেখাইল।

“কিন্তু সে ত আপনার মৎল ছেড়ে বেছে। যদি মহা-জন দেখে ধান দিতে ত মৎল ছাড়ত না।”

“মহাভন দেখেও দিয়েছিলো, আর ইচ্ছে করলেও তিনি মৎল ছাড়েন নি।”

“কোথার তিনি?”

“আপাততঃ নিরুদ্দেশ।”

“জব বুদ্ধি তাঁর আরও ইন্ডা-মৎল আছে? তাই তহারক করতে পেরেন?”

“না। তিনি যেমন আমার এক মালিক, আমিও তেমনই তাঁর খাদ্য-ভাণ্ডারের একমাত্র প্রজা।”

“তবে প্রজা বিদুল কেন?”

“সব। মনে করলাম খাঁটার পাখী, দিন কতক বনে-

বনে ঘুরে আসি না। সেই সময় আমার খাঁড়ী গলাগায়ে বাঁধাছিল। আমি তাঁর সঙ্গ নিম্ন।”

খাঁটার দোর খোলা গেলে কেমন করে?

“যিনি খাঁটার গুণেছিলেন, তিনিই খুলে দিলেন।”

“তবে আর কি, তিনি ত খ-ইচ্ছার ছেড়ে দিয়েছেন!”

“খ-ইচ্ছার নয়। বিদায় দেবার সময় তাঁর চোখের

জল যদি দেখতে, তা হলে দুঃখ। সাগরে গিয়ে গলায় লতখারা বেধে আমার কেবল সেই কথাই মনে হ’তে লাগল—তাঁর চোখে এমন লতখারা দেখে এগেছি!” বলিতে

বলিতে রাধারাণীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তারপর পরতের আকাশে আচ্ছাদিত কোথায় হতে একখানা উড়ো

যেব এসে ফৌটারকয়েক বিদ্যা গেল। সেই অক্ষয়িক চক্রে রাধারাণী দেখিল, তুলসীর যেমনভাড়া চোখদুটিও মলে

টল টল করিতেছে। রাধারাণী আর থাকিতে পারিল না।”

সহসা তুলসীর কঁঠলয় হইয়া ছুঁপাইয়া কাদিয়া উঠিল।

উভয়ের অঙ্গ বেন গঙ্গা-বনুয়ার তার ধারার ধারার দুকুবেরী

হইয়া বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রাধারাণী মুখ তুলিয়া

বলিল, “সই, সাধ করে ‘সই’ বলে ডেকেছিল! লোক

কুল দিয়ে, মিষ্ট দিয়ে ভালবাসার সম্পর্ক পাতায়, আমার

আজ চোখের জলে ‘সই’ গাভালাহ! এত দিন একলা

একলা হাঁপিয়ে বসেছিলাম, আজ তোকে পেয়ে মনের মাঝে

হুটো বীর্ণনিঃশ্বাস ছুঁফৌটা চোখের জল ফেলে নি। তারপর

হয় ত এই দেব দেখা।” সই, মেয়েদাণ্ডের এই যে

একটু চিমটি ফেটে মজা দেখা স্বভাব, তাঁর অত কাণ্ডাতেও

পেলোতে লাগাতে পারি নি। হাঃ, ভগবান! সত্যিই কি

আমার অশ্রুতে তাই করলেন! সাগরে গিয়ে কলেরা হ’ল।

কিছুকালের অন্তে, মনে হয়, মরেও ছিলাম। খাঁড়ী নড়া

মনে করে আমার অঙ্গুল পাখার ভাসিয়ে দিয়ে বেশে ফিরে

গেলেন। তারপর একদিকে হয় টানে, আর একদিকে

সাগর। মাথান থেকে বাবাণী কুড়িয়ে এনে দুখনকই

ফাঁকি দিলেন। সই, আমার কি হবে?”

তুলসী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, “তার ভাবনা কি,

সই! সে দেশ ত আর উবে যায় নি। আমি তোমার

সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের দুগল মিলন দেখে

আসব।”

“আমার বচাতে সে পণও বন্ধ। সেখান থেকে তিনি

তোমার চলে গেছেন। বাবাণী চিঠি লিখিয়েছিলেন,

অবধ আসে নি!”

“তা হলে মদনমোহন সত্যিই অসুস্থেন! এখন উপায়?”

“উপায় নড়ি আর কলসী, নর তুলসী! অন্তকালে

পারে ঠেস না।”

এই সময় বাবাণী আসিয়া বলিল, “গোবিন্দ, গোবিন্দ।

রমণীবাণু বড় মহাশয় লোক। সব রিক্তাক্ষ করে এলাম।

তুলসী, রাধারাণীকে সব মতুন হাঁড়ি কুড়ি, দুধ-দুধ এনে দে।

মেয়ে, আজ এইখানেই রাধাবারী কর! ওপার থেকে

আজই ঐপাঠ তুলে এনে তোমার হাতে পেলাপে পারো।

মেয়ে, তুমি কিন্তু বাছ! আমার সন্তা মা! যদি বল, বুড়ো

ছেলে। তা হ’ল হ’লই। কি বলিস, তুলসী? আমার

মা নর?” তুলসী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। বাবাণী বলিল,

“তবে? যে না বলে,—আজ্ঞেই মায়ের হাতের পায়ের ধাক্কা

দেখুক, আমার মা কি না! গোবিন্দ। গোবিন্দ। মা,

আজ বেলা হয়েছে, খালি পায়েগ ভোগ হাও! তুই একটু

পেলাপ পাস দিকিন্, তুলসী। গোলোকের রান্না কখন

থেকেছিল? পেবারে লক্ষী ঠাকুরের হাতে অমনি পায়ের

রান্না হয়!”

তুলসী হাসিয়া বলিল, “বাবাণী, গোলোকে বৃষ্টি তোমার

নেমন্তর হয়েছিল? তাই সেগানকার পায়ের খেয়ে

এসেছে।”

“বাই নি! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আচ্ছা, আর পারেন
শেখান পা।”

তুলসী কহিল “পোড়া কপাল! আমি ও হাদি-
গমলানির হাতে খেতে পেলাম কি হুণে!”

“গমলানী! গোবিন্দ! গোবিন্দ! তোর বত বড় মুখ,
তত বড় কথা। বাবুন না হলে গমলানীর হাতে অমন
পারেন ওংরাহ! বাবনী কি? গোবিন্দ! গোবিন্দ!
বাবনীর ওপর বাবনী! নইলে অমন মাগপো পড়তে
পারে? খেয়ে দেখি! এক এক চোক পারেন খাবি—
আর চোক কপালে উঠতে থাকবে।”

“তাহলে মাগপোর টুকরো মুখে তুলসীই একেবারে
অন্তর্ধানী করতে হবে।” বলিয়া তুলসী হাসিতে লাগিল।

“তুলে না, আবাবীর কথা তুলে! তুমি ওর কথা
তন না, মা।”

“না বাবা। তুমি শিশুগিরি ফিরে এসো ও পাগলীর
কথা কে শোনে, বাবা।”

বাবাজী সগর্বে বলিল, “ঐ শোন! যে দমজনার হর,
সে মিষ্ট কথা তুলেই পারেনের হাত বুকেতে পারে। জুই
পোড়ারদুই আবার মাতানিবে করিন? তোর মুখ যদি
আমি আর মেবিত—গোবিন্দ! গোবিন্দ! জুই যদি ববর
রাখিল, মাগপোর খবর কি জানিবি?” বলিয়া বাবাজী
রাগে গল্প গল্প করিতে করিতে বাটার বাহির হইল।
কিন্তু অনেক দূর হইতে “গোবিন্দ গোবিন্দ” শোনা গেল।
তুলসী ও রাধারাণী হাসিতে লাগিল। অবশেষে রাধারাণী
বলিল, “বাবাকে সত্যিই আমার পেটের ছেলের মত
মনে হয়।”

তুলসী বলিল, “তোমার জোর বরাং! না বিইয়ে
কানাইয়ের দা হয়, তুমি বাবার দা হয়েছ! কিন্তু মন-
মোহন নিতি নিতি ওর পায়ে মাগপো ধোপাতে কি
রাখি হুণে।”

রাধারাণী ঈর্ষ্য বিবর হইয়া বলিল, “যদি এ ভাড়া
কপাল ছোড়ে ত সে তার আমার।”

(৪)

রাধারাণী একাধিনী গৃহকর্ষ করিতেছিল। রমণী-
মোহন সহসা প্রাণেট হইয়া বলিলেন, “শোন, রাধারাণী!

আমি আর এ ভেটা চাপুতে পারছি না! আমার শরীর
তকিরে যাচ্ছে! তোমার দেখলে আমার বুকের ভেতর
দাঁট দাঁট করে নরকের আগুন জ্বলে ওঠে!”

রমণীমোহনের কথাগুলো যেন সত্য সত্যই সেই
নরকারের স্মৃতির মত ছিটকাইয়া দিয়া রাধারাণীর
সর্বাস্ব দগ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে
সহসা তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না,
ছবির মত নিচল দৃষ্টিতে রমণীমোহনের মুখ চাহিয়া
রহিল। রমণীমোহন আবার কহিতে লাগিলেন, “রাধা-
রাণি, আমি পাগল হয়েছি! দিন নেই, রাত নেই,
আমার এক চিন্তা কেবল—তুমি। ভোগে—তুমি, ঘুমিয়ে
—তুমি! আমার একমাত্র তুমি এ বাড়ীতে এসেছ, আমি
সারাদিন ঐ ছাতের ঘুলঘুলিতে চোখ পেতে মোটে গাড়িয়ে
থাকি, একবার তোমাকে দেখতে পাব বলে। নির্জনে
তোমাকে আমার মনের কথা বলব বলে কত দিন থেকে
এই হুযোগ খুঁজছি। আর বাবাজীকে তুলসীকে কৌল
করে গঠিয়ে দিয়েছি। তেঁহার আমার ছাতি শুকুড়ে,
আর আমি সেইতে পারছি না। তুমি আমাকে হরা কর।
চুপ করে আছ কেন? কথা কও। তোমার কথা
শেনেবার মতো আমি সারাদিন কাণ পেতে থাকি।”

ভয়ে বিহ্বলে একান্ত বিহ্বল হইয়া রাধারাণী বলিল,
“আপনি কি বলছেন! আশ্রয় দিয়েছেন, আপনি আমার
বাগ! আমি বড় অসঙ্গী, আপনি আমার দয়া করুন!
এখান থেকে চলে যান। বাড়ীতে কেউ নেই। শোকে
এমন দমব আপনার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে কি
বলবে?”

“কর মাথা কি বলে? কুবীরের সঙ্গে বাগ করে
কেউ বলে বাগ করতে পারে? এ গ্রাম আমার। আমার
সবাই চেনে। রমণীমোহনকে ভর করে না, এমন লোক
মাতবান গায়ের ভেতর নেই। শোন! তুমি আমার
সঙ্গে চল। আমি নৌকা ঠিক করে রেখেছি, তোমাকে
খুব সুখে-সুন্দরে রাখব।”

রমণীমোহনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, পৃষ্ঠপ্রতিজ্ঞা-বাহক মুখ
দেখিয়া রাধারাণী আপনাকে অতিশয় বিবর মনে করিল।
ভীতিচক্ৰ চক্রে চারিদিক চাহিয়া দেখিল, পলায়নের পথ
নাই। সহসা তাহার চক্রে মলমল ছুটিল। রোমন-

কলিত-বয়ে কলিল, “আপনি অত্যাশঙ্ক, আবারে কিরাস্র
অন্যায় পেরে অপমান করছেন ? আপনি আমার স্বামীর
সন্ধান করে তাঁর কাছে আমার পাঠিয়ে বেধেন বলে
প্রতিজ্ঞা করেছেন।” আমি আপনাকে বাপের মতন ভক্তি
করি। আমার স্বামীর সন্ধান করে দিল। আমি চির-
জীবন আপনার বান্দী হয়ে থাকব।” রোমনে নরনে অঙ্গ-
হাস বিকশিত ! অঙ্গধৌত হৃদয় মুখ শিশির-ধোয়া
গোলাপের মত চলল করিতেছে ! লজ্জার, উত্তেজনার,
অধরে, গন্তে গোলাপের উপর গোলাপ ফুটিয়াছে। পবন-
কুল চূর্ণ-কুন্তল উদ্ভাস্ত্র ভ্রমরের ছায় সেই গোলাপফুলের
উপর উড়িয়া পড়িয়া চুপন করিতেছে ! রমণীমোহন মুখ
লুহ্নে বেরে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, “কেন ? বান্দী হতে
হবে কেন ? আমি তোমার আদরে রাখব। কুমি ক্লেশ
পাবে বলে তোমার বলিনি। কুমি কার মুখ চেয়ে মিছে
আশায় বসে আছি ? তোমার স্বাক্ষরিত মুখে তোমার মরা
ধবর পেরে তোমার স্বামীও শোকে মারা গেছেন !”

মুহূর্ত্তে রাধারানীর মুখ প্রভাতের চাঁদের মত পাণ্ডে
হইয়া পেল। কিন্তু তৎকণ্য বিদ্বান-বহিকার ছায় মগ্ন
করিয়া অলিয়া উঠিয়া বলিল, “তোমার মিথ্যা কথা !”

কথাটা সত্যই মিথ্যা। রাধারানীকে সেবিয়া এবং
বাধ্যকীয় মুখে তাহার বিদ্রকর কাহিনী শুনিয়া রমণী-
মোহন প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন যে, তাহার স্বামীর সন্ধান
লোক নিহৃত্ত করিবেন। কিন্তু সে অলীক জোচ্। রাধা-
রানী পাছে তাহার হাতছাড়া হইয়া যায়, এই ভয় মিথ্যা
ভরসা দিয়া তাহাকে আটকাইয়াছেন। স্বামীর মৃত্যু
সংবাদ যে রাধারানী ঠিক বিশ্বাস করিবে, রমণীমোহন তাহা
মনে করেন নাই। তিনি আঁধারে ডিগ জুড়িতেছিলেন—
যেটা মাগে ! তথাপি প্রভুভারে বলিলেন, “কে বললে
মিথ্যা কথা ?”

“আমি বলছি !”

“কুমি ? কেমন করে জানলে ?”

‘সে কথা কুমি বুঝে না। তোমার ভনে দরকার
নেই। কুমি কি জান না যে, গাছ ততুলে ফুল আপনি
করে যায়।’

“তাই ত সেই বরা ফুলটা ফুটিয়ে নিতে চাই। রাধা-
রানি, কুমি আমার সঙ্গে চল। পূব হুয়ে থাকবে। এখানে

ঐ বাধ্যকীয় রাধুনী হয়ে আছি বৈ ত না ? আমি তোমার
বাড়ী দেব, গমনা দেব—”

“বান্দী ছাড়া পৃথিবীর ঐশ্বর্য আমি চাই নি।” কুমি
তাঁর সন্ধান করে যাবে বলেছিলে, আমি তোমার কাছে
আমি যে উপকার চাই নি। কুমি দুঃস্থ হও !”

রমণীমোহন ইজ্জার কথা বাগ্য প্রাপ্ত হইল। তাহার
মন ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বলিলেন, “বাগ্য ! শুশ্র-
ণীয়া কর্ত্তে বাধ্যকীয় বাড়ী এয়েছ, অত সতীপনা কেন ?
তোমার মত চের চের আমি দেখেছি। গোড়ার গোড়ার
অমন একটু কাঁপ, পাক, সীতা সাবিত্রীর কথা বলে।
তার পর অহলা, জ্যোতী, কৃতী, তারা, মন্দোদরীর
যোহাই পাড়ে। আর আশাও কেন ? বলে, এই কাছ
করে করে চুল পাকানাম ! ভাল করে বলছি, ভাল এয়েক
চলে এস, নইলে পোর করে নিয়ে যাব।”

রাধারানী বিস্মিত হইয়া বলিল, “কোর ! এ কি মাগের
মুহুর্ত্ত না কি ?”

“না। তার চেয়ে বেশী—রমণীমোহনের মুহুর্ত্ত।
আমাকে সবাই চেনে, তার করে। নইলে মিনে ডাকতি
করতে পারি ! আমি কোর করে নিয়ে গেলে কে তোমার
রাখবে ? কেন চোঁচায়ে কলেকারী করবে। ভাল
ভাল চল এস। এমন শোক এ ভগ্নাটে নেই, যে তোমার
আম রক্ষে করে।”

রাধারানীর মুখ সলসা অসৌকিক দর্প-বিতার প্রোচ্ছল
হইয়া উঠিল। বলিল, “বিনি চিরদিন রাখছেন, তিনি
রাখবেন।”

“ও তোমাদের ঐ একটা কথা আছে—ধর্ম। ধর্ম-
টর্গ কিছু নেই। কোর বার মুলুক তার ! আমি কত
গেরস্তর সর্জনশ করেছি ! কত নিরীহ লোককে পীড়ন
করেছি ! ধর্ম যদি থাকত, তাহলে এতদিন—”

কথাটা শেষ হইল না। রমণীমোহনের ভিতরটা
হঠাৎ বেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া একটু শিউ, শিউ, করিয়া
উঠিল। সে অমির অহুত্ব কোর করিয়া হাসিয়া
তাকাইয়া দিয়া রমণীমোহন বলিতে লাগিলেন, “কৈ কখন
ত সেল্গাম না, ধর্ম অধর্মের মাঝার বাঁক কেমনে। কত
দার্ষিক যে না খেতে পেরে মরছে, কৈ ধর্ম তাদের এক
মুঠো ভাত দিতে পারে না ? ধর্ম-টর্গ নেই। আজ যদি



পদ্ম-খাটে

(চিত্রের স্বাক্ষরিত—ঐযুক্ত কবানীন্দ্রনাথ গোস্বামী)

[দ্বিতীয়—ঐযুক্ত গোস্বামী]

তিনি তোমাকে বন্ধা করতে পারেন—তাহলে ধান্য, সত্যিই ধর্ম আছে। ধর্মের তরঙ্গ কোর না! তিনি কাউকে বন্ধা করেন না।”

“ধর্মের বিনি বড়—সেই” নারায়ণ আমাকে বন্ধা করবেন।”

“তিনি কোথায়, সতী ঠাকুর?”

রাধারাণী জববে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, “এইখানে, আমার কাছে পাশে—চাষিদিগকে।”

রমণীমোহন উভয় হস্ত করিয়া বলিলেন, “তিনি রাগ-লীলা করেন। বেরদিক ন’ন—রসগ্রাধ। তিনি রসভঙ্গ করবেন না, আমারই সহায় হবেন। নারায়ণ তোমার একদার ন’ন।”

“আমি অত্র নারায়ণ আনি না, আমার নারায়ণকেই আনি। তিনি আমার কাছে, দূর, সঙ্গ জাগরণ, সব সময়, মনের ভেতর জেগে রয়েছেন। তিনিই আমার বল, ভরসা, রক্ষক। সইলে কার ভরসার আমি ফুলের বো, বুড়ামাসের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম। তুমি যখন বলছিলে তিনি মারা গেছেন, কে আমাকে অন্তরে অন্তরে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—আমি বেঁচে আছি।”

রমণীমোহন অকৃত্রিম নরেন তাঁহার সমুখস্থ পুরাতন তেলোমারী প্রতিমা দেখিতেছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম প্রবণ তাহার ঋণ্য কর্তৃনিঃসৃত পদব্যত্যা সঙ্গল গুনিতে-ছিল। রাধারাণী নীরব হইলে বলিলেন, “ফুলের বো এখন ত জলে পড়ছে। ওলব বাড়ে কথা ছেড়ে ধাঁও! এখন আমাকে কি বল, বল।”

“তুমি পত্তর অঘব।”

“গোড়ায় অমন অনেক ফুলোপানা চকর ধরে।

কিন্তু গম্বা-গাটি পরে যেতপার বদে কেঁচো ধবে থাকে।

তুমি দেখছি সোখায় বাবে না। বেশ আমি পত্ত—পত্তর মতই তোমাকে নিয়ে ধাব।” বলিয়া রমণীমোহন অগ্রসর হইলেন।

করকণপ শিলাইয়া গিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে রাধারাণী বলিল, “সাবধান! আমার ছুরো না। তুমি দ্বারা মাপ নিয়ে খেলা করেছ, ভায়াত লাগকে বেঁটো না, যুদ্ধ বাবকে লাগিয়ে না।” রাধারাণীর মুষ্টি দেখিয়া রমণীমোহনের বীর্ঘ ব্যাঘ্রান-পুই বৃহৎ শরীর তাঁহার অজ্ঞাত-

সারে যেন একটু কুচিত-হইয়া পড়িল। রমণীমোহন দেখিলেন, রাধারাণীর কপালের শিরাসঙ্গল স্তীত হইয়া উঠিয়াছে। ষোড়শমাখা সেই তরল নীল চকুহইটতে যেন বজ্রারি অস্তিতেছে। নস্যারত্ব, ধন ধন কুচিত স্মৃতি হইতেছে। অস্তিত্ব গিরির দ্বার যুগী কানিতে লাগিল। রমণীমোহনের বিশাল বক্ষ ভিতরে ভিতরে একবার একটু মোড়ে গিল। কিন্তু আগনার দুর্গলতা আগনি উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, “এব বন করা বস্ত্রও আমি জানি।” কিন্তু তিনি পুনশ্চ অগ্রসর হইতে না হইতে নিম্নে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, লগ্না যেন একটা দুর্জয় তরঙ্গ আদিয়া তাঁহাকে তৃণাভিত করিল। তারপর অদ্ভুত করিলেন, কাহার পদতল তাঁহার ঐক্যবেশ লগ্নে নিলীভিত করিতেছে। চাষিয়া দেখিলেন, হুই রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চকু উজ্জ্বল হইতে ক্ষুধিতা বাধিনীর দ্বার তাঁহাকে নিরাশ্রয় করিতেছে। ঠিক সেই সময় বহির্দ্বারের শব্দ হইল, ‘গোবিন্দ! গোবিন্দ!’—রাধারাণী ভূতলে খুঁজিত হইয়া পড়িল।

(৫)

ভুলসী বলিল, “সই, তুমি বেঘন চন্দনী, তেমনি দিখিছই। ঐ দশপটে পুষ্কটীর গগর পা চাপুনি কি করে বল দিকি?”

“আর লজ্জা দিলেন, তাই! মনে গেল লজ্জায় মরে যাই! অন্যতে কি তখন আমি ছিলাম। আমার ভেতর তখন যেন দশটা পাগুলা হাতী ঢুকেছিল।”

কথা হইতেছিল ভুলসীঘের অসিনার বসিরা। রমণীমোহনের আত্মরিক অস্তাচ্যেয়ের পর, বাবাণী রাধারাণীকে লইয়া আগততঃ তাহাঘেরই ঘৃণে আস্রয় লইয়াছে।

ভুলসী রাধারাণীকে স্পর্শ করিয়া সবিম্বরে বলিল, “এই ত ফুলের মত গা। ফুলে মনে হয়, ফুলের দ্য সইবে না। দশটা পাগুলা হাতীর তর সইল কেনম করে? তন্তুতে পাই, মেয়ে পুরুষে লড়াই হয়—ফুলের বাণে। ও পাঠ কখন পড়ি নি, জানি নি। তবে একবালাঘের হাতে, তনেছি এই ছিল ঘোষণা অন্তর। যেহে যাহুৎ যে তোর বতন থিকী হয়ে শিখি চক্কে, তা জান্তাম না।”

রাধারানী হাসিয়া উত্তর দিল, “কেন ? ওর নিউজের বুকের কথা শোন নি ? আমি আমার খাচড়ীর মুখে গুনেছি সিংহবাহিনী একলাই ত সব অশ্বর মেয়েছিলেন। আহরা সবাই সেই সিংহবাহিনীর ভাত। মা বলেন, পুরুষমানুষ পর-নারীর নিকে কুচকে চাইলে তার বুকের বল কমে যায়। সই, মনের জোয়ই কাণ্ড তোর।”

তুলসী যাক মিথ্যে ভিজ্ঞাপা করিল, “তোর মার কথা ত একদিনও বলি নি ?”

“ও, তুমি বলছ ঝাঁর পেটে হয়েছিলাম ! তাঁকে ত জানিমে, তাই ! আমার খাচড়ীকেই মা বলে জানি। তাঁর মাই খেতে আমি মানুষ ! মা বলেছেন, আমি ঝাঁর পেটে হয়েছিলাম, তিনি আমার খুব ছোট বরষে মরে গেছেন। তিনি আমার খাচড়ীর ‘গলাভল’ ছিলেন। মরবার সময় ঐর হাতে আমাকে দিয়ে বান। তাই ত মা পলাশাগরে আমাকে মরা মনে করে কলে তেখে চলে আসবার সময় কঁদে বগেছিলেন—‘মা গো, পলাশগের কাছ থেকে তোমাকে পেয়েছিলাম, পলাশলকেই দিয়ে গেলাম।’ তাঁর কথা আমার কাণে শেল, কিন্তু তখন আমার এমন শক্তি নেই বে, তাঁকে ডেকে বলি, ‘আমি বেঁচে আছি।’ তারপর অজান হবে গেছলাম।”

রাধারানী চক্ষু মুছিতে লাগিল। তুলসী সেই করুণ স্মৃতি চাপা দিবার ভক্ত ভিজ্ঞাপা করিল, “তোর খাচড়ী বুঝি তোকে মানুষ করে ছেলের সঙ্গে বে দিলেন ?”

“সে, তাই, এক মজার কথা ! আমার বখন পাঁচ বছর বরষে, একদিন পাড়ার অনেককত ছেলে-মেয়ে মিলে আমরা ‘বউ বউ’ খেলছিলাম। তাতে উনি আমার বর হব-ছিলেন। খাচড়ী সেই বেখে বলেছিলেন, মেয়েমানুষের খেলার মাগাবলও মিথ্যা নহ। ওই ওর ক’নে, নইলে এত বেখে থাকতে ওরই সগার মামা মিলে কেন ? তারপর একদিন বিন-কাণ দেখিয়ে পুস্তক ভেকে আমাদের বে দিলেন। নিখোর বে সতি হল।”

“তোর খাচড়ীর বুঝি আর ছেলেপুলে নেই ?”

“না। তিনি মারের এক ছেলে আর আমিও এক মেয়ে।”

“তাহলে তিনি তোর কে হলেন গো ?”

“দুঃ পোড়ারুণী” বলিয়া রাধারানী তুলসীকে তাড়না

করিল। তুলসী হাসিয়া ভিজ্ঞাপা করিল, “বে হবার পর বহকে তোর লজ্জা ক’রু না ?”

“কিছু না ! আমি পাঁচ বছরের, তিনি দশ বছরের। লজ্জার মার কে মারে ? হুজনে ছুটেছুটি পুকেচুরি খেলা ক’রতাম ! কিন্তু তাঁকে জোরে আমি পারতাম না। তাইতে আমার হিঙ্গে হত। তারপর তিনি বত বড় হতে লাগলেন, তাঁর জোর ততই বাড়তে লাগল। হাতের ‘গুলিহুটো’ টিপে খেতাম বেন-নোয়া। তাহতাম, কি করে এত জোর হয় ? শুনলাম, যাগান করে। মনে করলাম, বুঝি কোন রকম যাগযাম ! খাচড়ীকে বললাম—‘মা, ওর বে যাগরামে এত জোর হয়েছে, আমারও সেই যাগযাম করে দাও-না।’ মা হেসে বললেন, ‘তুই ওর জোরে পারিস নি, বুঝি ? আচ্ছা, আমি তোর গায় খুব জোর করে দেব।’ মা সিঁড়ি ওঠা-নাবা করাতেন, বড়-বড় বড়া তোলাতেন, সঁটার কাটতাম, আরও কত কি ? আমাদের একটা দ্রুত গাই ছিল, সেটা রাগলে কেউ তাকে আঁটতে পারত না। আমি তার সিং ধরে রাখতাম। তার একটা বাছুর ছিল, তাকে তুলতাম। আমাদের গায়ে একটা বাগুদি ছিল, তার গায়ে ভারি জোর। কেউ তার সঙ্গে পারত না। ওর বখন বাইশ-তেইশ বছর বরষে, তখন ওর কাছে সে ধেরে বার। শুনে, মা আমাকে হেসে বললেন, ‘ও-হোঁড়া বাগুদি ছুঁয়েছে, না নাইলে তুই ওকে আমার ঘরে চুকতে দিস নি।’ ‘আমি ওর জোরে পারব কেন, মা ?’ ‘খুব পারবি’ বলে তিনি হেসে চলে গেলেন। তারপর উনি ‘বাড়ী এসে বললাম, ‘নোয়ে এস, নইলে দর চুকতে দেব না।’ তিনি হেসে বললেন, ‘তোমার ভারি দুঃ কি না।’ আমি বে লুকিয়ে লুকিয়ে গায় কত জোর করছি, তিনি ত তা জানতেন না।”

তুলসী মধা কোতুলনে ভিজ্ঞাপা করিল, “তারপর কি হল ?”

“আমি ঘরের কপাটহুটো তেলিয়ে দিয়ে ঐ হাতে চেপে গাড়ালাম। তিনি বললেন, ‘বিলু খুশে দাও, নইলে আমি জোরে তেললে ভেঙে বাবে।’

“ভালপত, তারপর ?”

“আমি বললাম, ‘বিলু দিই নি, কিন্তু গুলেও দেব না।’

তিনি একটা জান্না দিয়ে দেখলেন, তারপর দরজার

কাছে এসেই সম্বোধন করে এক ধাক্কা! কিন্তু দরজা একটুও ঝাঁক দুল না। অধোবদ্য দস্তা-দস্তি। শেষে মাঝে ডেকে বললে, 'মা, দরজা খুলে দিতে বল।' মা হেসে বললেন, 'ঐখানে হার মান, তবে খুলে দিতে বল।' কি আর করে! বললে, 'জাচ্ছা, মান্‌লার!' খাটুড়ী আবার বললেন, 'গাও ত, বউমা, দরজা খুলে! ছোঁড়া বাবুনের ছেলে, বাগদির সঙ্গে লড়াই করে মনে করে মস্ত বীর হয়েছে।' আর একদিন দ্বারা গুলে বেতে চেয়েছিল। মা বারণ করেছিলেন। খাটুড়ী খুলে বললে, 'আমি কথা দিয়েছি, একবার গিবে চট করে চলে আসব। তুই মাঝে কিছু বলিস নি।' আমি বললাম, 'আমি মায়ের কাছে মিছে কথা বলতে পারব না। তুই মাঝে একথা বল নি কেন?' সে বললে, 'মাঝে আমার বড় ভয় করে।' আমি বললাম 'সে যাই বল, আমি তোমাকে যেত দেব না।' বললে, 'আমি গেলে তুই আটকাতে পারিস।' আমিও তেমনি দোর করে বললাম—'যেতে না দিলে তুই যেতে পার? কৈ যাও দিকি', বলে হাত ধরলাম।"

"এত ছাড়িয়ে যেতে পারলে না?"

রাধারাণী সলজ্জ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল—না!

"এখন তবে হাতছাড়া করি কেন, সই?"

নিম্নে রাধারাণীর মুখ দেখাচ্ছ দ্বিগুন মত নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। বলিল, "অদৃষ্টের কের, সই! কিন্তু হাতছাড়া সে হয় নি, হবার নয়। ধনের আকৃতি নয় যে মুছে যাবে।"

"সই, তুই বড় ভালবাসিস, না?"

"কে জানে, সই, ভালবাসা কাকে বলে জানি নি।

শুনতে পাই, ভালবাসা—ভালবাসা—এ ওকে ভালবাসে—এমনি কত কথা। সে কথা সেও কখন আমার বলে নি, আমিও তাকে বলি নি। কিন্তু আমি মনে মনে বেশ করে ভেবে বেখেছি, সে আমি ভের নই—এক! এক ভালবাসা বলতে হয়, বল। জাচ্ছা, সই, তুই কখন কাউকে ভালবেসেছিস?"

তুলসী সলজ্জ হাসিয়া বলিল, "বেসেছি, সই! ও গোড়া কুচুটে বোঙ্গের হাতে কি এড়ান আছে, বোন্?"

রাধারাণী ঈষৎ ঈশু তার করিয়া কহিল, "সই, আমার

যোগেট সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তর তর করে দেখে নিচ্ছ, কিন্তু নিজের মনের বোহকাট ত খোঁচনি, তাই!" তুলসী গুলু গুলু গাহিল—'মনের কথা কইব কি, সই, কইতে মানা—'

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "তা হবে না, সই! কাকি দিলে চলে যাবে না। তোমার গুণ-বাড়ী কোথায়?"

"বৈকুণ্ঠপুরে। কিন্তু আমি সেখানে কখন যাই নি।"

"কেন? কেন?"

"গভীরের ভয়ে। আমার দামী সবাইকে ভালবাসে, আমাকেই কেবল বাসে না। এত ভাকি, এত শাদি, এত কাঁদি, তবু একবার আমার কাছে আসে না।" বলিতে বলিতে তুলসীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। রাধারাণী ব্যথিত হইয়া হিজিমা করিল, "তবু তুই তারে এত ভালবাসিস?"

"বাসব না! সে বৈ আমার আর কে আছে, বল?"

আমার মতন তার কত শত আছে, কিন্তু সে ছাড়া আমার ত আর কেউ নেই। যেদিন বাবা আমার তরে পার দামী করে দিলেন, চকিতের মত চার-চক্রে চাওয়াচারি হয়ে শুভদৃষ্টি হল, তখন থেকেই তাকে ভালবেসেছি। ভালবেসেছি কি হচ্ছে! তুই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখছিস কি? মনে করছিস, একবার দেখাতে এত হয়? সই, বার হয়, তার একবার দেখাতেই হয়, আর এতই হয়! তোমার যদি একবার তার ভূমি-ভোগানো বাঁশী শোনাতে পারতাম, তুই যদি একবার তার মন-মরানো হাসি দেখতিল, কুন্তিল, কেন এখন করে মনেছি!" তুলসীর চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া ধারা বহিতে লাগিল। রাধারাণী বলিল, "সে যদি তোকে নাই চায়, তবে তুই তার ভয়ে অত করে কেনে মরিস কেন? মনকে বোঝাতে পারিস নি?"

"ভালবাসার কাহাই যে হুখ, বোন্! মন বোঝে কৈ? তাকে যে চেয়েছে, সেই কৈসে কৈসে পথে কিরেছে। তবু মন বোঝে না। সে কি ছাড় আসে?"

"এবার বাহুকের দেখা পেলে ছাড়িস নি, আর করে হয়ে বাসিস।"

"পারি কৈ, সই? তোমার লুকাচুরি খেলা ছুঁয়েছে, আমার এখনও শেষ হয় নি। তাকে ধরি ধরি করি, ধরা দেয় না। আমি তার ভয়ে মনে মনে খুঁজি; কাহালিনী

হয়ে নগবে নগবে কিরি ; সরে সরে কখন মনে করি তারে
তুম্ব। কিন্তু তুম্বতে বের কৈ ? বনমুখের গড়ে তার
শ্রীমুখের দোরভ মনে পড়ে ! মাঠের পাশে চাই, সবুজ
ঘাসে তাকে মনে পড়িয়ে বের ! নীল আকাশে দেখি,
তারই বরণ ! অভিমান করে মনে করি, যে এত করে
কামার, আর তারে দেখি না, কিন্তু চোখ বুজে দেখি,
বৃক-জোড়া হয়ে বসে হাসছে ! তুম্বতে বের কৈ ?

“সত্যি, সই, তোলা যায় না ! তাকে ভাব না মনে
করি, কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে একটা একটা করে কত
কথাই মনে ওঠে, বুকের ভেতর বেন ঢেউ বেগুতে থাকে।
অন্তমনর হয়ে বাই, কিন্তু হাঁস হলেই দেখি তারই কথা
ভাবছি !”

“এই বোধ, সই ! তোলা যায় না। বখন প্রাণ বড়
অস্থির হয়, তার নাম করি।”

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, “হৃদয়ের দাগ কি ঘোলে যেতে,
সই ?”

“মনন কথা বোল না ! তার সব মধুর ! বাঁধি মধুর,
হাসি মধুর, নাম বড় মধুর ! বখন প্রাণ বড় অগ্নে, তার
নাম করি, প্রাণ নীতল হয় ! নামেই ত সে ধরা দিয়েছে।
নইলে কে তাকে জানত ? ছিষ্ট-সংসারে আছে কেবল
তার ভুবনমোহন নাম আর মদনমোহন রূপ !”

“আহ, তুইও সই আমার মতন অভাগিনী !”

“মনন কথা বুধে এন না ! আমি অভাগিনী ! আমি
ওঁর নাম নিয়েছি, আমার বত ভাগ্যবতী কে ?”

“কিন্তু আমার মত তোর আগাও ত কখন ! ওনি
তাকে ডাকলে সতল জালা জুড়ায়।”

“সে সত্যি ! চিতের আগুনে সব আগুন নেবে, কিন্তু
চিত্তে জ্বলতে থাকে ! কিন্তু সে অগ্নির কত সুখ, যদি
আমার মতন জন্মিত, তা হলে বৃত্তে পারতিল ! একবার
যদি তার সঙ্গে তোর ভাব হত, তা হলে জান্তিল,
তার ভাবও যেমন মিষ্ট, আড়িও তেমন মধুর ! তাই
কহিবি ?”

“আর নতন করে কার সঙ্গে ভাব করব, সই ! বার
সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে ভাব করেছি, সেই আমার সব।
আমি তাকে ছেড়ে আর কাউকে চাই নি।”

“সে সত্যি, বোন্ ! কিন্তু—”

রাধারাণী ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু কি ?
বৃত্তে বৃত্তে থাকলে কেন ?”

“ভাবছি, এতদিন হল, তোমার মদনমোহন ত একবার
উদ্দেশ করলেন না।”

“মহা নাহুদের কে বোঝে করে, সই !”

“তা ঠিক ! কিন্তু আমারও ত এত চিঠি লেখানিধি
করে তার ঠিকানা কর্তে পারলাম না।”

“চাকরীর অস্ত্রে তাকে ঠাইঠাই বুলি হতে হয়।
তারপর আমরা সামান্য লোক, আমাদের বোঝ-ববর
কে রাখে বল ! বেশ নেই, বাড়ী নেই যে উদ্দেশ পাবে !
যেখানে চাকরী, সেইখানেই বর।”

“তা যেন হল ! কিন্তু সই, একটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা
করি। তুমি গেরস্তর বউ এতদিন অহুদ্দেশ, তুমি কিরে
পেলে আর কি তোমার স্বাভাবী তোমাকে ঘরে নেবেন ?
আর কি তুমি তোমার মদনমোহনকে পাবে, আশা কর ?”
রাধারাণী বলিল, “সই ! থাকে তুমি কখন চোখে
দেখনি, তাকে তুমি পাবে, আশা কর ?”

“সে কি সই ! নইলে কিসের অস্ত্রে এই বৃকপোরা
ভেটো নিয়ে কেঁসে কেঁসে বুকে বেড়াচ্ছি।”

“তবেই বোধ, সই ! তোমার মনের মদনমোহনকে
এতদিন পাবে, তোমার আশা আছে। আর আমি বার
কাছে বসেছি, বার সঙ্গে হোসে কথা করেছি, থাকে ছুঁয়েছি,
হার স্পর্শে শিউরেছি, আমার সে মদনমোহনকে পাবার
আশা বিসর্জন দেব কেন ?”

“বোন্, আমার মদনমোহন ভুবন ভরে রয়েছে !
তোমার যে অহুদ্দেশ।”

“সই, যদি মহা পতি ফেটে, আমি জীৱন্ত বাণীকে
কিরিয়ে আনতে পারব না ? তা যদি না পাতি, তবে আমিই
বা কিসের অস্ত্রে এই বৃকপোরা ভেটো গুণে রেখেছি। ভয়
কি, সই, সেই হাতছাড়া হয়েছে, গলা ত আর হাতছাড়া
হয় নি !”

(৩)

“গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! এ আখ্যায় কি মায়ায় ঠেকালে
ঠাহুর ! আমার নামে কটি পেল, অপের মালা শিকর
তোলা রইল, কেবল রাধারাণী, রাধারাণী, যা আর বা।

এই বাৎসল্য! বোধ কহি, নন্দরাণীর এমনি হয়েছিল! গোবিন্দ! গোবিন্দ! একেই বলে বিকৃত্য! এই চক্ষে সন্সার চলছে! গোবিন্দ, গোবিন্দ! তা চল্লেই বা! তবে কি না—গোবিন্দ! গোবিন্দ!—এ বৈরাগীর কৃষ্ণেতে কেন, যা, তুমি? ও বাৎসল্যের হৃৎ আর হাই হৃৎ—সমান বন্ধন! গোবিন্দ! গোবিন্দ! তরত মূনি একটা হরিণ-ছানার মত মনেছিলেন। তবে কি পাকা খুঁটি আবার কাঁচাশয়! তা কাঁচাশয়—কাঁচাশয়! আমার খুঁটি আমি কাঁচিগেহি, বেশ করেছি! গোবিন্দ! গোবিন্দ!”

বাগবীর আত্ম ভিকার হাইতে মন সরিতেছে না। বসিরা বসিয়া সেই গলাগাগরের ঘটনা হইতে নানা কথা ভাবিতেছে।

এমিকে রাধারাণী তুলসীকে বলিতেছিল, “আজ আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। কিছুতেই ঘরে টেকে পায়ছি নি। মনে হচ্ছে কে ঘেন আমার গড়ি বেঁধে টানছে। ঠা’ সেই, আত্ম বাবার সঙ্গে ভিক্ষের হাই।”

তুলসী হাসিয়া বলিল, “তবে আর, ভাড়াভাড়ি একটা রসকলি কেটে’ দি’ আর আমার ভিক্ষের মূলিটা কাঁধে নে।”

“ঐঠী, সেই, পান্ন না। তাঁর পরবে আমি রাধারাণী, ভিক্ষের মূলি কাঁধে কর্ব কি হুংবে?”

“কেন লো? কৈলাসের সন্সার ত ভিখারীর সন্সার।”

“ভিখারীর সন্সার বটে, কিন্তু না সেখানেও রাজ-রাজেশ্বরী।”

তুলসী হাসিয়া বলিল, “বাবা, ভিক্ষের দাব না? আজ সেই আর আমি তোমার সঙ্গে গুণারে ভিক্ষের দাব।” বাবাণী তুলসীর মুখপানে খুব বড় করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে দাবে?”

“সাধে বলি, সাগরে শীতে নাক-কাণ কাটা দাব! এই ত তুমি কাপটা বেখে এগেছ। ভিক্ষের দাব আমি আর রাধারাণী।”

“গোবিন্দ! গোবিন্দ! রাধারাণী কেন? তোর বড় বড় মুখ তত কড় কথা? না আমার ভিক্ষের দাবে? গোবিন্দ! গোবিন্দ!—

বাবাণী জনেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া রাধারাণী

হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, “আজ আমার নিয়ে চল, বাবা! তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে।”

“গোবিন্দ! গোবিন্দ! তুমি ধুবো, সে ত ভাল কথা, মা! ঘরে থেকে থেকে মন কেমন করে কি না? তুলসী, তবে আর দিহি! ধন্যনৌটা দে।”

তিন জনে খেয়ার নৌকার পার চইতে হইতে বধন প্রায় এ পারের নিকটবর্তী হইয়াছে, তুলসী দেখিল, রাধারাণী তাহাকে ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তুলসীর ভয় হইল। রাধারাণী অহুহ হইয়াছে! ব্যাকুল কর্তে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে সেই?”

রাধারাণী কুলের বিকে অহুনি নির্দেশ করিয়া বলিল, “সই, সই,—ঐ।”

সই দেখিল, কুল এক পরম লক্ষ্যের সুখপূর্ব্ব গাড়াইয়া আছে! তুলসী পুনরায় রাধারাণীর মুখ চাহিল। তাহার আরক্ত মুখে অশ্রু-বিস্তাদিত সলজ্জ হাসি দেখিয়া আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তুলসী রাধারাণীর কাণে-কাণে জিজ্ঞাসা করিল, “ঐ—কি সই? ঐ মনমোহন?”

রাধারাণী তুলসীর হৃদে মাথা রাখিয়া মুখিতার প্রায় চক্ষু বুলিল।

মিলনটা পাঠকের মনোমত হইল না। একে ত অন্তর্কিত, তার উপর স্থান কাল কিছুইই খ্রী-হাঁস নাই। একটা কুল নাই, একটু মল্লর পবন নাই; কুসুম, কুসুম, কিছু নাই; একটু চাঁদের আলোর পর্য্যন্ত অভাব। কিন্তু তবু এই ছুইটা প্রাণী পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিয়া কাঁপিয়া অস্থির হইতেছে! যদি কেহ হারানিধি কিরিয়া পাইয়া থাক, যদি কেহ মৃত প্রাণাংশকে পুনর্জীবিত হইতে দেখিয়া থাক, বুঝিবে, এই পুনর্মিলিত মণ্ডিত-দুগের তখন কি তরঙ্গ খেলিতেছিল! সংসারে এরূপ অভাববীর সংঘটন বিরল নহে। বাস্তব ঘটনা অনেক সদর কবি-কল্পনা অপেক্ষা বিষমকর।

রাধারাণীর স্বামী বদলি হইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উৎকট আনন্দের বেগ স্বর্ধ্বিৎ প্রেমমিত হইলে তিনি গাড়ী করিয়া পরীকে গৃহে লইয়া বাইবার মত প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বিস্তর সাধা-সাধনাতেও বাবাণী তাঁহাদের সঙ্গে পেল না। তুলসী চোখ মুখিতে মুখিতে বলিল, সদয়ভাবে

স্বাক্ষর করিবে। কিন্তু বাবাভী কোন কথাই করিল না। গাড়ী ছাড়িল। বহুদূর বেগে যাত্রা, বাবাভী একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। হান অংশা হইলে তাহার অভিকৃত প্রাণ, মন, চৈতন্য বক্ষ-পঙ্কর ভেদ করিয়া সরল যেন 'কোথা যাও, মা' বলিয়া হা-হা করে চীৎকার করিয়া উঠিল! চুই করে সবলে বুক চাপিয়া ধরিয়া বাবাভী বলিল, "তুলনী রে, সাগর ছেঁচে

মাগিক এনেছিলো! বিকৃতমুখের বহু হয়ে গোবিন্দের গার অপরাধী হয়েছি। আমি আর আগ্রয়ে ফিরে যাব না। তোর বাপকে বিন্দু, সুন্দারন চললুম। গোবিন্দ! গোবিন্দ!" বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাবাভী পথ চলিতে আরম্ভ করিল।*

* সহায় হ.দা অসমবয়ে রচিত।

শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালী

[রায় বাহাদুর ত্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি.এ]

(১)

আমাদিগের ধারণা এই যে পশুদিগের মধ্যে কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রণালী নাই। তাহাদিগের প্রকৃতগত ধর্ম ও কর্ম নির্দিষ্ট; এবং সেই অনুসারে প্রকৃতিই তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদের পাঠ-শালা ও গুরুমহাশয় প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না, এবং শিক্ষাপ্রণালী লইয়া কোন বাগ্‌বিত্তও হয় না। কিন্তু বাস্তবিক এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমাদেরও পূর্বে সেই ধারণা ছিল; কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বল, বিচার ও উদ্ভিয়ার অনেক জেলায় বন-বাহাদুর ও জল পরিদর্শন করিয়া, এবং এ বিষয়ে খোঁজাখোঁজ অনুসন্ধান করিয়া যেটুকু বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, শৃগালদিগের মধ্যে একটা সুসংগত শিক্ষা-প্রণালী আছে, এবং তাহাদিগের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বহুদূর জানা গিয়াছে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত তাহাদের কতটুকু সাদৃশ্য, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেকে জানেন যে, শৃগালেরা পোষ মানেন না। তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ রকম একটা প্রেয় বাতর্য ও ব্যক্তিগত স্বাভাব্য আছে। বিকৃৎসার্য বিতোপদেশের পর শৃগালের মধুর কাহিনী আমরা অল্প কোন গ্রন্থে পাঠ্য করি নাই; কিন্তু বিকৃৎসার্য যুগের পর শৃগালদিগের মধ্যেও যে ক্রম-বিকাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধ দ্বারা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। পোষ্টকতক লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য।

শৃগালেরা বিখ্যাত দূর্ব। তাহাদিগের আত্মরক্ষার

কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে; তাহা আমাদিগের অগোচর। তাহার প্রত্যেক দল বাঁধিয়া লড়াই (civil wars) করে না। তাহাদিগের মধ্যে বীকাক্তক নাই; শিক্ষাক্তক আছে। তাহারাত্তী কিবা পুত্রসন্তানাদি লইয়া সচরাচর বাহির হয় না। অজ্ঞাত পশুদিগের মধ্যে অব-গোণ প্রথা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু শৃগালের মধ্যে আছে। তাহাদিগের লোকসংখ্যা ঐক্য, এ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের মনে কৌতূহল জাগিতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, মানব-লোকালয়ের সন্নিকটবর্তী মাঠ ও জঙ্গলই শৃগালের বাসস্থান। তাহারা জঙ্গলের হইতে বহু দূরে বাল করে না। যেখানে জীবপদের মধ্যে বন্য বৈদ্য, সেখানেই শৃগালের সংখ্যা বৈদ্য। তাহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান। পালকুড়ার নিকটবর্তী একটা মাঠে শৃগালের 'সেলাল' লইতে চোঁটা করিয়াছিলাম; তাহাতে জানা গেল,

৬ বর্গ মাইলের মধ্যে ৩৪০ শৃগালের বাস। অর্থাৎ প্রত্যেক তিন বিঘা জমির মধ্যে একটা শৃগাল বাস করে, গুণ্যে—

১২২০ স্ত্রী

১২২০ পুরুষ

এবং উভয়ের মধ্যে প্রায় চতুর্থাংশ বৃক ও দ্ব্যতী। শতকরা ২০ জন বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ ক্ষিপ্ত। আঁহালা ও বায়ুযোগ ছাড়া অল্প কোন ঘাঘি নাই। স্ত্রী সরিলে পুরুষ সহমরণে যায়, এবং পুরুষ সরিলে

স্রী তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করে। উহাদিগের আত্ম নির্দিষ্ট করা হুক্তম। শৃগাল-সমাজে compulsory education চিরস্বরসী কথ্য। এ সংক্ষে তাহারও মতভেদ নাই। যাহারা পণ্ডিত এবং স্বীয় মত প্রচার করিতে কৃতসমর্থ, তাহারাও সম্ভার সময় মাঠে আসিয়া একবার ডাকিয়া যায়। তাহাদিগের বুদ্ধি-প্রাণী দেখিয়া অস্তিত্ব পণ্ড, বিশেষতঃ কৃষ্ণমণ্ডলী খোঁজ প্রকাশ করে, এবং সেই ক্ষণে মাঠে শৃগালের ধ্বনি শুনিতেই লোক-সমূহের সারসংক্ষেপের Protest তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইয়া পড়ে।

মানব-বুদ্ধি মতিবৃদ্ধি। শৃগালদিগের বুদ্ধি লাম্বলগত। এই ক্ষণে তাহাদের লাম্বল অশেষকৃত হুল। তাহারা অস্তিত্ব গৃহপাণিত পণ্ডর ভ্রম লাম্বল-আশ্বাসন-পূর্বক তত্ত্ব-উদ্ধা প্রকৃতির অবতারণা করে না। তাহার কারণ, এ লাম্বল সম্পূর্ণ Rationalistic। লাম্বল দ্বারা তাহারা অনেক কথ্য সাধন করে। কর্কটের গর্ভে লাম্বল প্রবিষ্ট করিয়া তাহারা কর্কটকে হিরণ্যে আকর্ষণ করে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। লাম্বলগত বুদ্ধি-বলে তাহারা বৃক্ষ হইতে বক্ত-বক্ত কাঠাল কি করিয়া পাড়িয়া নর, তাহা আমরা বস্তুকে দেখিয়াছি। প্রথমতঃ, কতকগুলি শৃগাল পরস্পরের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া কাঠালগটিকে ভূমিতে পাড়িয়া ফেলে। তার পর একটি শৃগাল চিৎ হইয়া সেই কাঠাল গুলুভাবে কোলে ভড়াইয়া থাকে, এবং সে অস্ত্র একটি শৃগালের লাম্বল কামড়াইয়া ধরে। এই দ্বিতীয় শৃগালটি তৃতীয় একটি শৃগালের লাম্বল কামড়াইয়া ধরে। এইরূপে সারি-সারি অনেকগুলি শৃগাল পরস্পরের লাম্বলের সাহায্যে ভূপাণী শৃগাল ও তাহার কোড়র কাঠাল অব-লীলাক্রমে টানিয়া গর্ভে প্রিয়া পৌছে। এই অসাধারণ facultyর প্রতিভা অনেক প্রকার Resolutionএ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ক্রমে উল্লিখিত হইবে।

শৃগালের মত অস্ত্র কোন বৃহৎকার অস্ত্র গর্ভে বান করে না। একটা গর্ভ বৃদ্ধিরা দেখা গিয়াছিল যে, ইহাদিগের sanitary ব্যবস্থাও খুব ভাল। কখন-কখন ইহারা অস্থায়ী সম্পত্তি গর্ভে রাখিয়া, রাত্রিকালে বাহিরে আসিয়া গাফিয়া দেয়।

মানব-শৃগাল-সমাজের মধ্যে একজন করিয়া local

correspondent থাকে। তাহারা দিবাভাগে বাহিরে আসিয়া লোকসমূহের সমাচার লুকাড়িত ভাবে জানিয়া যায়, এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি গর্ভে আনিয়া সকলকে বলিয়া দেয়। শৃগালের প্রেমের ভয়ে স্বীয়কর বিবরের নিকট গর্ভ স্থাপন করে না; এবং এমন করিয়া গর্ভ নির্মাণ করে যে, তাহাতে কোন দ্বিভিত্তি হ্রাসের কল প্রবেশ করিতে পারে না।

শৃগাল সংঘে এইরূপ অনেক সংবাদ আনয় প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু বহুদূর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহাতে কেবল মাত্র বিনিরা বাবা উচিত যে, শৃগালের যদিও ধর্মার্থ মানে, সেটুকু কেবল রাষ্ট্র-চিত্তার্থ। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত তত্ত্ব-উদ্ধার দ্বারা। শৃগালের আচার utilitarianism এর মত দেখিতে।

(২) -

শৃগালের 'মাত্তিক' এ কথা বলিলে কোন অর্থ হয় না। মানবসমাজের মধ্যেও অনেক ঈশ্বর মানিতা থাকেন; কিন্তু সেটা কেবল তর্কের কিংবা পূর্ব-প্রচার খাতিরে। শৃগাল-মধ্যেও সে ব্রহ্ম অনেক মানে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। পাছে ঈশ্বর-ভক্ত হইলে জীব অক্ষয় হইয়া পড়ে, এই ক্ষণে ঈশ্বর সন্তকে কোন কথা তাহাদের শিক্ষার মধ্যে স্থান পায় নাই।

পূর্বে কতকগুলি বৃক্ষ শৃগাল ইহা লইয়া দহা গওগোল করিয়াছিল; কিন্তু বহু বর্ষাবাদী ঘোর তর্কের পর তাহার মিটমাট হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে যখন শৃগাল-সমাজে ধর্মের কথা উঠে, তখন কেহ-কেহ বলেন:—“কো ধর্ম?” অর্থাৎ ধর্ম কে? (What is the essence of reality)? এবং কেহ কেহ বলেন—“কি ধর্ম?” (What is the form of reality)? অর্থাৎ ধর্ম কি? বৈদী ভাগ শৃগালের মতে ধর্ম ভক্তপন্থা, অতএব স্রীমন্নিব। যদিও শ্রীমন্নিব, “এক এব ব্রহ্মং ধর্ম, নিধনে পাছরিত ধর্ম”, উহার অর্থ ‘পঞ্চভূত’। অর্থাৎ মন্নিব গণে পঞ্চভূত থাকে, এবং তাহারা সেহনুক আচার দ্বন্দ্ব হাড়ে না। এই পঞ্চ-ভূতের কথ্য শৃগালের ধর্ম (শৃগালধর্ম) বস্তু কথ্য। মানব-ধর্মের প্রতিপাত্ত বিবরণ পরমাখ্য, এবং উক্ত শ্রেণীর মতে তিনি পুণ্ডির মধ্য দিয়া অবতীর্ণ ও প্রসারিত হইয়া থাকেন। শৃগালের পরমাখ্য ও পুণ্ডি উভয়কেই শিক্ষা-প্রণালী হইতে

ধারিত করিয়া দিয়াছে। তাহারদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য
'আদর্শ শৃঙ্গাল হওয়া।'

আদর্শ শৃঙ্গাল কি? আদর্শ শৃঙ্গাল বস্তাবস্ত শৃঙ্গালই
ধাকিবে। শৃঙ্গাল ধাকিরাই তাহার মানসিক ঔৎকর্ষ্য লাভ
করিবে। সান্ত্বিত্য বিজ্ঞতা লাভ করিয়া শৃঙ্গাল-সমাজকে
পণ্ড সনাতনমধ্যে উন্নত করাই আদর্শ শৃঙ্গালের কাজ। রাষ্ট্র-
হিতই মুখ্য উদ্দেশ্য। সে রাষ্ট্র শৃঙ্গাল-সমাজ নইয়া। হইতে
পারে, অস্তর ভাবমত, যেমন পাতী প্রভৃতি, পীর রাষ্ট্র
অন্তর আদর্শগণের চূড়ান্ত দেখাইয়া চিরস্থায়ী হইয়াছে;
কিন্তু তাহা হইলেও, শৃঙ্গাল কখন পাতীর আচার-ব্যবহার
ও শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্মবীররূপে প্রখ্যাত
হইতে চাহে না। অর্ধ-সত্তর করাই রাষ্ট্র-হিতের অঙ্গুল;
সুতরাং শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য, বুদ্ধি ধরত করিয়া যেন
তেন প্রচারেণ অর্ধ-সত্তর। মানবসমাজে যেমন আদর্শ
জ্ঞান, আদর্শ উচ্চতা, আদর্শ সাহিত্যিক, আদর্শ বিচারক,
ও আদর্শ ন্যায় প্রভৃতি আছে, শৃঙ্গালদিগের মধ্যেও সেই
রকম আছে। তাহার শিক্ষারূপ কলের মধ্যে সনাতনের
উপযোগী নানাবিধ ব্যবস্থা-বিশারদ শৃঙ্গাল-জীব তৈয়ারি
করিয়া রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা অঙ্গুর রাখিতে বস্তাবস্ত। জ্ঞানবীর
উদ্দেশ্য, শৃঙ্গালের শরীর যেন শৃঙ্গাল ভাবেই স্থায় থাকে।
শৃঙ্গাল যেন বাহিঃপ্রাণ হইয়া পাতী কিংবা কুকুরের মত না
হইয়া যায়। একালে উদ্ভেদ্য বাহ্যে শৃঙ্গাল সনাতনের
আদর্শ-কালনের প্রাকৃতিক অর্থ আদালতে সত্য হইবে এবং
তবহুযায়ী স্বাধীন ও আচার-ব্যবহার অটুট থাকে।
সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ শৃঙ্গালের আদর্শ শৃঙ্গাল-সমাজের
সমুদ্রে দেখান। ধর্মের অবতার বলিলে 'শৃঙ্গাল ধর্মের
অবতারই' বুদ্ধিতে হইবে। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে,
শৃঙ্গালদিগের মতে 'অবতার' বলিয়া কিছু নাই। যদি কোন
ব্যাক্তি হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাক্ত-সমাজ সংগঠন করিতে
প্রয়াসী হয়, শৃঙ্গালদিগের মতে সে 'ব্যাক্তকুলসার'। 'কো
ধর্ম-পতী' শৃঙ্গালগণের মতে সে 'ব্যাক্তের' অবতার। এ
সময়ে মানব-সমাজেও Conservatism চূড়ান্ত হয়। হিন্দু-
দিগের 'অবতার' হিন্দু ভিন্ন কেহই মানে না; এমন কি,
হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাহা কেবল 'আদর্শ মনুষ্য'
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। সেই রকম অস্ত রাষ্ট্রের
অবতার হিন্দুগণের নিকট বিশ্বজনীন অবতার নহেন।

সকলেই ঈশ্বরের সার্বভৌমিকতা পীর রাষ্ট্রকুল করিতেই
বাস্ত। ঈশ্বরের অস্ত রাষ্ট্রের উত্তানে একটু হাওয়া বাইবারও
যো নাই।

একই ধর্ম যে কখনও ব্যাক্তরূপী, কখন শৃঙ্গালরূপী, এবং
কখনও পাতীরূপী হইতে পারে, তাহাও শৃঙ্গালদিগের
শিক্ষা-ভাষ্যের বহুত্ব। 'ধর্ম' কখনও বহুরূপী হইতে পারে
না। মনে করুন, সত্য কথা বলি ধর্ম; কিন্তু সকলে যদি
সত্য কথা কহে, তবে সংসার মুক্ত হইয়া যাওয়া সম্ভব।
কারণ, পাপ (সমাজের অধিত) করিয়া যদি কেহ তৎক্ষণাৎ
মুক্তকর্তে বীকার করে, তবে আইনকানুন, সমাজ ও বাহ্য-
বাগিমা প্রভৃতি বিফল হইয়া যায়। শৃঙ্গালদিগের মতে
প্রত্যেক রাষ্ট্র এক একটা রূপ, এবং প্রত্যেকের মনে করা
উচিত, সেই রূপের মধ্যেই ধর্মের সর্বসমীচীন বিকাশ সম্ভব।
সুতরাং এক সঙ্গে যদি অনেকগুলি রাষ্ট্র বর্তমান থাকে,
তবে দেখিতে হইবে যে, সম্পূর্ণ জালাক কে, অথবা কাহারের
বুদ্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অর্থ অদ্বাইতে পারে।
তাঁহার পরীক্ষা কর্ণে, পুথিতে নহে। পুথির উদ্দেশ্য
মুঠ পদার্থকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া অগুণ্ডন মাথাত্ত করা।
তবহুযায়ী কর্ণ, শিক্ষাপ্রণালীর উপযোগী নহে। ইহাতে
শরীর ও মন মাটি হইয়া যায়, এবং মুঠ পদার্থ যের
হইয়া পড়ে।

এবিধ নানাপ্রকার তর্কান্বিত পথ একটা মহাসমিতিতে
আলোচিত হইয়াছিল—

১। শিক্ষার বিষয় কি?

২। শিক্ষা প্রমাণ কিসে?

৩। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহার
জনবিকাশ সম্ভব?

শৃঙ্গালদিগের মতে, বাহা স্বভাবতঃ কেহ শিখিতে চাহে,
তাঁহারই ঔৎকর্ষ্য সাধন কিংবা অহুশীলনের নাম শিক্ষা।
বাহার ঔৎকর্ষ্য-সাধন কাহারও পক্ষে হইয়া গিয়াছে, সে বস্ত
শিক্ষার বিষয় নহে। মাতৃভক্তগান, এবং ভর পাইলে
চাঁকার প্রভৃতি কর্ণ অহুশীলনের বিষয় নহে; কারণ, ইহার
যথেষ্ট ঔৎকর্ষ্য-সাধন হইয়া গিয়াছে। কেহ স্বভাবতঃ মিথ্যা
কথা শিখিতে চাহিলে, তাহাকে মিথ্যা কথার বস্ত রকম
কৌশল আছে, শিখান উচিত; কিন্তু তাহা আশ্চর্য্য ও
রাষ্ট্রহিতেরই প্রমাণ। তাহাতে যদি রাষ্ট্রের অধিত হয়, এবং

আম্বরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে, তবে সত্য কথা শিখানও উচিত। একজন শীর্ণ ব্যক্তির যদি বিখ্যা কথ্য কহিলা আম্বরক্ষা প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাহাকে প্রত্যেকপলে মিথ্যা-তরীয়া সাহায্যে ভবনবী উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এবং তাহাতে যদি তাহার মনে কষ্ট হয়, তবে সে যথো-মধ্যে সকালে ও সন্ধ্যায় কিংবা রবিবারে অমৃত্যু প্রকাশ করিয়া মনের কষ্ট দূর করিতে পারে। আবার, বিখ্যা কথ্য কহিলা, কিংবা প্রবক্তা করিয়া যদি কাহারও আম্বরক্ষার পক্ষে, কিংবা রাষ্ট্রহিতের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, তবে তাহার সত্য কথা কহিতে অত্যন্ত কঠোর বর্ষা শিক্ষা-প্রণালী।

(৩)

আম্বরক্ষার গ্রন্থ হু অটল; কিন্তু শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে তাহার বিকাশ কি একারে হয়, এবং তাহার সহিত মানব-ধর্মের স্বতন্ত্র সাদৃশ্য, তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিব। আম্বরক্ষা ব্যক্তিগত ধর্ম। নিম্নের মন ও শরীর সুস্থ না থাকিলে, ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় অহিত উভয়ই আশিয়া পড়ে। অশিষ্ট রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য রক্ষা করিতে হইলে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আম্বরক্ষা করা সম্ভব, তাহাও শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত।

শৃগালদিগের প্রত্যেক উপনিবেশেই এক-একটা পাঠশালা আছে। সেগুলি গর্তের মধ্যে সুসজ্জিতভাবে সংস্থাপিত হয় বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। শৃগালদিগের পাঠশালা প্রায়ই ধলপটের নিকটবর্তী। এ হেন স্থানে কোন বৃক্ষের উপর যদি কেহ ডালের মধ্যে লুকাইয়া তাহাদের রীতিনীতি লক্ষ্য করিতে চাহেন, তবে দেখিবেন, তাহারা সকলেই বিজ্ঞান-কোশলসম্পন্ন। আম্বরক্ষার নানাবিধ ব্যায়াম, 'ড্রিল', এবং একস্পেরিমেন্ট শৃগাল-শিশুগণ বৈকালে গর্ত হইতে বাহিরে আশিয়া শিক্ষা করে। বাহ্যিক গৃহপালিত কুকুর ও বিড়াল-শিশুগণের রীতিনীতি লক্ষ্য করিরাছেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে একখণ্ড কাষ্ঠ কিংবা বস্ত্রখণ্ড লইয়া তাহারা অনেকখণ্ড ক্রীড়ার মত হয়। সেই পদার্থ লইয়া টানাটানি করে, এবং ক্ষেপে উদ্দীপ্ত হইয়া পরস্পরকে কামড়াইয়া দেয় ও অবশেষে সেই আঘাত পদার্থ ফেলিয়া দিয়া বুকুল হইতে সরিয়া পড়ে। কিন্তু শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে আম্বরক্ষা নাই। তাহারা

যাহা লইয়া চর্চ্চা করে তাহা সার, এবং তাহাদিগের পরিশ্রম বার্থ হয় না। তাহাদের সকল পরিশ্রমই সার (productive) এ বিধের শৃগালদিগের নিকট মানব-সমাজের অনেক শিখার বিষয় আছে। অনেক প্রাকৃতিকালে চুইক্রোশ হাটিকা লুণার উদ্ভেদ করেন; কিন্তু বাটতে অয়ের সংস্থান নাই। শৃগাল চুইক্রোশ হাটিলে মিশ্রত কিছু চুরি করিয়া আনে, কিংবা অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা লইয়া আসে। তাহারা 'চুইবনে'র মত খেলার মত হয়। কিন্তু চুরত সেই চুইবল কোন অপদার্থ শৃগাল-কলহের দ্বারা প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ সকলে তাহাকে চুইবলের দ্বারা পদাঘাত করিয়া নদীতে তাড়াইয়া দেয়। প্রত্যেক শৃগাল প্রতিদিন কতখানি পরিশ্রম করে, তাহা তাহার ধর্মকলম দ্বারা একটা কলে Metre-এর সহযোগে পরিমিত হয়, এবং সেই পরিশ্রমের ফল অনুযায়ী রাষ্ট্রহিত হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক শৃগালের value and wages নির্দিষ্ট হয়। ইহা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

শৃগাল-পাঠশালার গুরুদ্বন্দ্ব্যয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আম্বাদিগের দ্বারা তাহাদিগের 'ইনস্পেক্টর' গুরু কিংবা পণ্ডিত নাই। বৎসরের শেষে কোনও স্থানে খাত্তরবার (যেমন ইঙ্গ প্রভৃতি, কিংবা গৃহপালিত পক্ষী) প্রাচুর্য থাকিলে প্রত্যেক পাঠশালার শিষ্যবাহিনী ছাত্র (তাহারা ফাইন্সাল সার্টফিকেট পাইতে পারে) সেই স্থানে আশিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে, এবং তদনুসারে তাহাদিগের গুরুদ্বন্দ্ব্যয় আদৃত হইয়া থাকেন। শৃগালগণ মানব সমাজ হইতে এক বিধের শ্রেষ্ঠ। 'তাহাদিগের গুরুতত্ত্ব আছে। আম্বাদিগের মধ্যে অনেক বিধারী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাহারা পূর্নকালের পাঠশালার গুরু, কিংবা স্থলের 'মাস্টার', কিংবা কলহের প্রোফেসর হইতেও তিনিতেই পানেন না। কিন্তু শৃগাল-সমাজের গুরুদ্বন্দ্ব্যয় অভিন্ন ভক্তির পাত্র। আমরা যতক্ষণ দেখিরাছি যে, একজন শৃগাল একটা গুরুবিদ্রোহী ছাত্রকে কামড়াইয়া কত-বিকৃত করিয়াছিল। এই গুরুতত্ত্বের দ্বারা কারণ যে গুরু নিকট যে বুদ্ধি শিষণ প্রাপ্ত হয়, তাহা লিপক্ষণ লাভজনক (profitable)। কোন পাঠশালার গুরু কিংবা 'প্রোফেসর' অস্বাভাবিক সম্মানিত ও রাষ্ট্রদ্বারা বহু পালিত হইয়া থাকেন। আম্বাদিগের সমাজে

ছুর টাকা বেতনে একজন গুরুদ্বারের পাঠ্য বাহ্য, কিন্তু শৃগাল-সমাজে তাহা পাঠ্য বাহ্য না। (অবশ্য, শৃগাল-সমাজে টাকা প্রচলিত নাই, কিন্তু পরিভ্রমের অংশেতে শৃগাল নিষ্ঠারিত হইয়া বাহ্য প্রদত্ত হয়, তাহাকেই টাকা বলিতেছি) ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কাঁচি নামক স্থানের শৃগাল শিক্ষা-সমিতির বার্ষিক সম্মেলনের কালে যে সকল বিধান প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাকার শৃগাল-সমাজে অতিশয় বিখ্যাত প্রাপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রের আদালতে বিচারের সময় একটি সভাবাদী সাক্ষী পাঠ্য বাহ্য হইত না। ক্রমে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হইতে লাগিল। সমস্তগণ তত্ত্ব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, পাঠ্যগানের গুরুদ্বারগণ বিখ্যাত কথার কৌশলগুলি ছাত্র-গুলিকে ব্রীহিমত শিক্ষাইতেন, এবং তাহাদিগকে ভুলাইয়া পরমা উপার্জন করিতেন। বিখ্যাত কথার ও প্রবক্তার প্রভাবে ছাত্রগণও বেশ রোজগার করিত এবং তাহা রাষ্ট্রসিদ্ধার্থে অর্পণ করিত না, সুতরাং তাহারা গুরু-মহাশয়কে এক অংশ অক্ষুণ্ণভাবে ছাড়িয়া দিত। ইহার ফলে নিরীহ শৃগাল প্রজাতির খারাপ অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, অতিশয় মামলাই শৃগাল গুরুদ্বার নগোই বিখ্যাত প্রাপ্ত হইয়া বৈশি। ইহাতে সমস্তগণও প্রত্যেক গুরুদ্বারের মস্ত প্রথমতঃ ছাত্রগণ বাহ্য করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা শুধুকে দেখিয়াছি যে, সেই বৎসর অনেকগুলি রামকুণ্ডল কাঁচি এলাকার আসিয়া উপস্থিত। শান্তি-ব্রহ্মণ বিখ্যাতবাদী ছাত্রগণকে সেই রামকুণ্ডলের দ্বন্দ্ব দ্বিধা গুরুকুলকে বাগড়াইতে হইত। এইরূপ সাংঘিক আহারে এবং পরিভ্রমে, ছাত্র ও গুরুকুল উভয়েই উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। সেই অবধি গুরুকুলও সাংঘিকভাবে উদ্ধার হইয়া ছাত্রগণকে 'বেকের উপর' গুরু না করাইয়া ইজুরস প্রদত্ত করিতে হিতেন। আবাদিগণের মধ্যেও এই রকম একটা প্রথা গুরু করান হইতে পারে। অমূল্যমান করিয়া দেখিলে মানব-সমাজের বিজ্ঞানের অনেক ছাত্র বিখ্যাত কথা করিতে কুণ্ঠিত নহ, এবং কিসে 'কোয়েন্টন' পেপার' চুরি করা সম্ভব তাহারই অল্প টেট পত্রিকার ভিন্ন-মাল পূর্ণ হইতে মানবিক উপায় উদ্ভাবনা করে। এরূপ

Compulsory education হইলে ইহারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আবাদিগণের হতাশ হওয়া উচিত নহ। শৃগালগণের শিক্ষা-প্রণালী অমূল্যমান করিয়া এই সকল ছাত্রকে আবাদি মানবিক মঙ্গলজনক কর্ণে নিমুক্ত করিতে পারি যেমন—

(১) উত্তম বৃত্তি।

(২) গোসেবা।

(৩) পুষ্করীস্থ পল্লভাঙ্গার করা।

(৪) হুঁড়ি, মুড়কি ও বিকৃত প্রস্তুত করা।

(৫) এমন কি বিখ্যাতবাদী ছোট ছোট ছেলে-পুলেদের নাগরদোশার আয়োজন করাইয়া, তাহারই পূর্ণাঙ্গমান Energy বনে, সর্বগঠন ও খনি বাহির করিয়া দেয়া।

ইহাতে রাষ্ট্রের উপকার দর্শে এবং বিখ্যাত প্রবক্তা-পত্রায়ন শিক্ষিত শৃগালদের representative leaders হইয়া রাষ্ট্রের অধিত সাধনের পথ বন্ধ হয়।

(৬)

সকলের কৌতুকল জগিতে পারে যে শৃগালদের ভাষা কি? এবং সেই ভাষা রাষ্ট্র মধ্যে সকলে ব্যবহার করে কি না?

এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, যে শৃগালগণের মধ্যে বিবিধ ভাষা প্রচলিত।

১। সরব। objective.

২। নীরব। subjective.

সরব ভাষা তাহাদিগের প্রকৃতিগত—যেমন—কা—কা—কাহা—খ্যা খ্যা—হুতা হুতা— ইত্যাদি। ইহা শৃগালগণ বাহ্যক। এ ভাষার তাহার শিক্ষা গ্রহণ করে না কিন্তু শিক্ত হয়। ইহার অর্থ ভ্রমণ: প্রাক্ত। যে ভাষায় তাহার শিক্ষা গ্রহণ করে তাহা নীরব। অর্থাৎ—তাহার আদর্শ শৃগালগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নীরবে শিকলাত করে। তাহার কোন পুঁথি নাই ও বক্তৃতাও নাই। ইহাই তাহাদের মাতৃভাষা।

তবে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বিজ্ঞান লাভ করিয়া যদি কোন বৃদ্ধ শৃগাল কিছু হইয়া পড়ে, তবে সে 'হুতা হুতা' প্রকৃতি মানবিক শব্দে শৃগাল-সমাজকে আলা-

তম করিয়া যেন। শৃগাল-সমাজে ইহাদিগের আখ্যা 'সু' (Fool)। যদি কোন জীৱাণী অবাধ্য, কিংবা কোন শাবী জীৱ অবাধ্য হয়, তবে শান্তিধ্বস্তর তাগকে এই 'সু'এর নিকট সকলে ছাড়িয়া দেয়, এবং সে অচিরেই 'সু'এর ভাবগতিক দেখিয়া জানলাত করে। অর্থাৎ সরব ভাব, নীরব ভাব। মাতৃভাষার তর্জমা করিয়া তাহার সারমর্ম উপস্থাপিত করে।

মানব-সমাজে তাহার প্রেম অতি জটিল। মানব 'সরব' ভাষার শিকা লাভ করিতে পারে। নীরব ভাষা প্রাপ্যপণে বর্জন করিতে পারে। তাহার কারণ কি?

প্রথম কারণ। মানুষের কোন বিশেষ রস নাই। সকল আনন্দেরই এক একটা ধর্ম-বিশেষ আছে, ওদ্বারা তাহার পরিচিত। মানবধর্মের সহিত কথা বলা না হইলে কাহারও চিনিবার উপায় নাই। অতঃপর আত্মিক কোন রকম ভাবের উদ্বেগ হইলেই কথা বাহির হইয়া পড়ে। সেই খাঁটি ভাবটুকু যে কথায় মানব সহজে প্রকাশ করিতে পারে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা। কথা শুনিয়া আমরা মানবের জাতিবিচারে (ascertainment of species) করিতে সক্ষম। কথার উপস্থিতি কেন? মানবের মধ্যে কেবল এক জাতি নাই। বহুজাতি পদ-সমূহকে আনিয়া, যেটুকু নূতন, তাহা শিখিতে চায়, এবং তাহার সমীকরণে যত্নবান হয়। শৃগাল অজ্ঞাতাচারী পণ্ডর মানব ভাব কখন প্রেম করে না, কারণ ইহাতে বর্ণলঙ্ঘন উপায় হয়। (crossbreeding)।

দ্বিতীয় কারণ। মানবের মতে নীরব ভাষা কেবল প্রেম, ভক্তি, করুণা প্রভৃতির ভাষা। বিশেষতঃ ইহাতেই বন্ধন হয়। কিন্তু পাছে এ ধেম কথায় সৃষ্টি হইলে যশের উপস্থিতি হয় ও শৃগালও স্তম্ভ হয়, সেইজন্য সমাজ কোন বাহু ভাষা বিশেষ অবলম্বন করে নাই; কোন শৃগাল খাঁর প্রিয়তমকে পত্রি শিখিবার, কিংবা কোন ধন্যাত্মক লম্ব প্রেম বাক্য করিবার করুণা করে নাই।

শৃগালদিগের সহিত অজ্ঞ জাতির কথোপকথন কি করিয়া হয়?

তাৎক্ষণিক ব্যবহারে ও ভাবেই বুঝিয়া লয়। হিতোপদেশে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্বে বল্য গিয়াছে যে শৃগাল শিকা-প্রণালীর ভাষা

নীরব, কিন্তু সেই নীরব ভাষাতেই তাহার মনোরম তর্জমা করে, এবং কোন বিষয় তাহাদিগের স্তায়ী ভাবনের উপযোগী কি না, তাহা লক্ষ্যমত পরীক্ষা করিয়া লয়।

ইহার ইতিহাস খানিকটা জানা গিয়াছে। বায়ুদিগের কথা তরজমা করিয়া শৃগাল সমিতি জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহা তাহাদিগের উপযোগী নহে। বায়ুদিগের শাবী জীৱ মধ্যে যেমন কথা, ও বায়ুর যেমন চাট বাজারে ও মাঠে পক্ষ্মন, তাহাতে পক্ষ্মের মধ্যে বাস করা সুকটিন। খরগোষের ভাষাও তাহাদিগের উপযোগী নহে, কারণ খরগোষ অতিশয় ইঁদুর পরায়ণ ও নিরীহ জাতি।

কিন্তু ইহাও পূর্বে বল্য গিয়াছে যে, শৃগাল-সমাজ আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার নিমিত্ত অজ্ঞ ভাষা কিঞ্চিৎ শিখা করে। তাহার নাম 'ফেক্‌ভাষা'। অনেক 'ফেক্' ডাকিতে শুনিয়াছেন যোগ হয়, কিন্তু তাহার অর্থ সকলে বিদিত নহেন। সেটুকু আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যেটুকু জানা আমাদের পরিপাক হয়, সেটুকু মাতৃভাষায় (শৃগালের পক্ষে অবাধ্য নীরব ভাষা) বলেই হয়। যেটুকু পরিপাক হয় না, তাহা আয়ত্ত্বাধীন কালে ঘন ঘন উদ্গীর্ণিত হইতে থাকে এবং তাহা শুনিয়া অজ্ঞাত জাতি সাবধান হয়। একটা উদাহরণ লইলে হয়। আয়ত্ত্ব যদি কোন খাদ্য প্রত্যাহতঃ পরিপাক করিতে না পারে, তবে কিয়দিন সোজা কিংবা পেপসিন্ মাগায়ে পরিপাক করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে উপায়-প্রসূত হইয়া পড়ি, সেইটুকু ফেক্‌ভাষায় স্তায় তাহা দেখিয়া সমাজ সাবধান হইয়া পড়ে। অনেকের ধারণা যে বায়ুর পদ্মাব্যমী হইয়া শৃগাল 'ফেক্‌ভাষায়' আর্জিনাদ করে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। শৃগাল পদ্মাব্যমীকে চাহিয়া চলে, অন্ততঃ পদ্মাব্যমী ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করে। কেবল বায়ুর হিতার্থেই শৃগালবৃন্দ বায়ুর আবির্ভাব হইবার পূর্বে ভীতি প্রচার করিয়া থাকে। শৃগাল ফেক্‌ভাষায় স্বজাতির সহিত অজ্ঞাত জাতির তুলনা করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের আত্মোত্তীর্ণ কতক হইয়াছে, তাহাও অনাগ্রাসে বুঝিতে পারে।

ফেক্‌ভাষায় যে সকল বিষয় শৃগালদিগের চর্চ্চার যোগ্য তাহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মহাশয়দ্বিতীয়ে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

১। 'লজিক্' অর্থাৎ স্তায়-স্তায়।

- ২। ভূগোল-বৃত্তান্ত ও ইতিহাস।
- ৩। ঋতু-বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র।
- ৪। ভার্বেক্ল্যান্ডের অর্থোং পোষাকী ভাষা।

এগুলির অধ্যয়ন অপূর্ণ উপায়ের হইয়া থাকে।

- শৃগালদিগের মধ্যে ‘বৈকশেশ্যালির’ নামের একজন পণ্ডিত আছে; তাহার কুকক্ষেত্রের সমস্তের পরবর্তী জীব। সন্ধ্যাকালে তাহার স্বপ্নন বিচরণ করে, তখন তাহার দ্বিগের মুখগন্ধের হইতে একপ্রকার জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। সেই জ্যোতিঃ অশ্রুতম নাম

‘নোট’।

বহুতাবার ‘নোট’র কোন প্রতিশব্দ নাই।

পাঠশালার পণ্ডিতগণ সেই জ্যোতিঃের ‘নোট’ হইতে ফের-নাগিত্যের সার সংগ্রহ করেন। বৈকশেশ্যালির মুখ হইতে শৃগাল পণ্ডিতগণের মুখে সেই নোটগুলি সংগ্রহীত হইলে, তাহার ফল অচিরে লাভুলে গিয়া প্রকাশ পায়। এবং তাহার ফলে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়, বোধ হয় আপনাতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

লবিক্ মাখা ত ভ্রাম-শাশ্ব অতিশয় গভীর তব। তাহার প্রধান স্বত্র ইহাই :—

সকল পতাই মরণশীল

শৃগাল পতাবিশেষ

সুতরাং শৃগাল মরণশীল।

শৃগালেরা পূর্বে জানিত না যে, তাহাদিগের মরণ অবশ্যসাধী। ক্রমে উপরোক্ত স্বত্রের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে তাহাদিগের ধারণা দৃঢ় হইয়া সন্যাসের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। এবং সেই অবধি অনেকে শীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই স্বত্র হইতে অনেক স্বত্র বাহির করিয়া শৃগাল ছাত্রগণ ‘নোটের’ সার্থকতা প্রচার করিয়া থাকে। যথা

১। যদি ককণার ঈষদ্ব ব্যাক্তিভেদ, তবে অন্ততঃ একটা জীবকেও বাঁচাইতে। কিন্তু কোন জীবই বাঁচে না। সুতরাং ঈষদ্ব নাই।

২। যে সব বিষয় ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগে না, সেগুলি যাহারা শিখায় তাহার হস্তীমূৰ্খ। অধ্যাপকবৃন্দ যাহা শিখায়, সেগুলি কোন কাজে লাগে না। সুতরাং অধ্যাপকবৃন্দ হস্তীমূৰ্খ।

৩। যাহাদের লাভুল নাই, তাহাদের বুদ্ধি নাই; মানব-জাতির লাভুল নাই, সুতরাং তাহাদের বুদ্ধি নাই।

যদিও উপরোক্ত দুইগুলির মধ্যে অনেক fallacy আছে, কিন্তু শৃগাল জাতি ‘ব্যাকাশেশ্যালির’ নোটের সাহায্যে ভ্রাম-শাশ্বের মত অচিরেই বুদ্ধিমান হয়।

ভূগোল-বৃত্তান্তে শৃগালগণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। পৃথিবী গোলাকারিক না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহার ব্যর্থ নহে। শৃগালগণের ভূগোল-বৃত্তান্ত ভূগর্ভ লইয়া, এবং পীর বাসস্থানের এবং দেশের অবস্থা সমাকল্পণে নির্ণয় করাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশের বাহিরের অবস্থা লইয়া আশ্রয় আশ্রয়ান করি, অন্তরের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি না। শৃগালদিগের দৃষ্টি অন্তরের দিকে। জলের গতি কোন্ দিকে, ভূগর্ভে কতপ্রকার কীট জন্তুগ্ৰণ করিয়া মায়াবী ব্যাধিগণের ক্রিয়োগে, এবং স্বাস্থ্যের অবনতি কিসে, এ সকল বিষয়ের তথ্য শৃগাল-সমাজ জ্ঞাত। বিশেষতঃ কোন্ কোন্ স্থানে তাহাদিগের ভক্ষণ-যোগ্য শস্যাদি প্রচুর, তাহার তালিকা প্রত্যেক ছাত্রের নিকট থাকে।

অনেকের ধারণা যে, গোময় জন্তুদিগের ম্যালেরিয়া রোগের নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শৃগাল-জাতির মধ্যেও অনেকস্থলে ম্যালেরিয়া বেধা প্রচলিত। ম্যালেরিয়া (যখন আশ্রয়যোগ্য) নামক বহুস্থায়ী একটি শৃগাল ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইয়া বাসন-ঘরের (Treasury) চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। আশ্রয় দর্শ্যগ্ৰস্ত হইয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতাম। ক্রমে তাহার শ্রীল বুদ্ধি হওয়াতে একদিন অদভলী ভাষা বুকাইয়া দিল যে, দারিদ্র্যই ম্যালেরিয়া ও শ্রীল বহু হইয়া বাইবার কারণ।

দারিদ্র্য কেন হয়, এবং দেশের কোন্ স্থানে তাহা প্রবল, তাহা শৃগালেরা শিক্ষা করে। পৃথিবী লম্বীর ভাঙার, এবং সকল জন্তুরই খাদ্য প্রকৃতি দেবী ক্রমাগত যোগাইতেছেন। যদি কোথাও দারিদ্র্য ঘটে, তবে শৃগালেরা মনে করে সেই স্থানের অধিবাসী শৃগালের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটাইছে, কিংবা শিক্ষা-বিজ্ঞানের হয় নাই। সুতরাং তাহার হয় ত হাসপাতাল কিংবা পাঠশালা স্থাপন রোগের উপশম এবং শিক্ষা-বিবৃতির পথ খুলিয়া দেয়। তাহার প্রমাণ যে, সেই সকল স্থানে গৃহস্থের উত্তানে এবং গৃহেই কলম, এবং স্বত্র

পক্ষ, পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা তাহা শৃগালদিগের ভোগে লাগে। যদি লুপ্ত-হস্ত গৃহস্থ সে শৃগালকে অন্নদান করে, তবে সে হয়ত করুণ ভাবে কহে, “বহাশর, আমার বিচার motive দেখিয়া করিবেন, Intention দেখিয়া করিবেন না। শরীর-পালন ও শিক্ষা-প্রণালীর এত ব্যয় যে চূরি না করিলে উপায় নাই। এই argumentও যদি না মানেন, তবে স্বীতা পুলিশা যেমন যে, কর্তব্য আপনাদিগের অধিকার আছে, ফলে নাই। অতএব আপনাদের উদ্ভানের ফল ও গৃহ-পালিত বৃগী (বাহ্য আপনাদের শাস্ত্রে অভক্ষ্য) উভয়ই ভ্রা-শাস্ত্রানুসারে আমার গ্রাণ্য। টাকা দেখুন।”

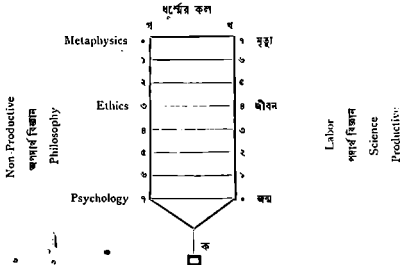
ইতিহাস ও Political economy শৃগালদিগের নিকট একই বিষয়। পরমা উপার্জন কোন্ দেশে ও কি একারে এবং কোন্ সময়ে শৃগাল জাতিদিগের মধ্যে হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত শৃগালজাতির পাঠ্য। প্রত্যহ তাহারা বৈদিক ও পৌরাণিক সময়ের কোন কথা ভানিতে চাহে না। গাভনির বাহ্যদের ভারতক্রমণের পর শৃগালজাতি কি একর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিংবা যুরোপে Elizabethan period-এর পর শৃগালগণ বিদেশীয় বাণিজ্যের ফলাফল মানব-জাতির হইতে কি একারে আহরণ করিয়াছিল, এই সকল প্রশ্নের বীনাসে তাহাদিগের পাঠশালায় হয়। ইহা স্বরণ রাখা উচিত যে, জীবগণের মধ্যে স্বাম্ভের উৎপত্তি হইলেই শৃগালদিগের লাভ। স্বাম্ভের কলে বাহ্য গীড়ার, তাহা মৃতদেহ।

এই মৃতদেহকে শৃগাল-সমাজ (capital) মূলধন বলিয়া গণ্য করে (dead labour)। এই মূলধন হইতে তাহারা মৃতদের দ্বারা নূতন মূলধনের সৃষ্টি করে। শৃগালজাতি ইতিহাস পাঠ করিয়া বিশেষ ভাবে দেখিগাছে যে, জীবের সম্বন্ধে এই মূলধন লইয়া, অর্থাৎ পরিষ্রমের কর্তব্যের ফল লইয়া; হস্তান্তর ভগবানকে অর্পণ করিবান্না তাহা শৃগালের ভক্ষ্য হয়। শৃগালেরা আত্মার অবস্থার অধিবেশন করে।

বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রই শৃগালদিগের প্রিয় বিষয়। ইহার অনেক আড্ডা পূর্বে দেখা হইয়াছে।

বুদ্ধিবলে শৃগালগণ একপ্রকার ফল সৃষ্টি করে; তাহার নাম “বর্ধকল”। সে ফল পূর্ব লবু, এবং দেখিতে তাহাদিগের লাবুদের মত। এত লবু যে তাহা বাতাসে নড়ে। এই ফল পূর্বে তাহাদের লাবুমেই ছিল। (লাবুই শৃগালের বুদ্ধিবল)। ক্রমে ক্রমবর্তন (Evolution)এ কৃৎসলী-শক্তির সাহায্যে তাহাদের মধ্যস্থ উন্নতি, কোন ঐতিহাসিক যুগে অনেক শৃগাল ফিল হইয়া পড়ে। সেই অবধি তাহারা বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রে বাহ্য একটা ফলে গড় করাইয়াছিল। ইহাই বর্ধকলের ইতিহাস।

কলটা অতিশয় জটিল। তবে যতটুকু এই প্রবন্ধের লক্ষ্য প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা সেই বর্ধকলের একটা প্রতিকৃতি নিম্নে দিলাম।



পরিভাষা।

ধর্ম—বাহ্যতে মুক্তা দর্শকে হয়।

মুক্তা—পরিশ্রমের (কর্ম) ফল, যাহা ভগবানে অদিত হওয়া শাস্ত্রসম্মত।

জীবন—স্বাভাবিকতার পরিশ্রম।

ঐশ্বর্য—আত্মা পূর্ণভাবে কর্মফল লইয়া যে পরিশ্রম আরম্ভ করে।

সার পরিশ্রম—Productive labour—বাহ্যতে মুক্তা সাদিত হইয়া পূনর্ভব হয়।

অসার পরিশ্রম—Unproductive labour—বাহ্যতে মুক্তি হয়।

পন্যার্থ—যাহা আমরা ইচ্ছাতঃ দেখিতে পাই। বধা, অঙ্গ, বাস্তব, চন্দ্র, বৃত্ত, সিগারেট, মাংস, মন্ত্র, মেটরিকার প্রভৃতি।

পরিশ্রম—বাহ্যতে শত্রুর, পন্যার্থের যোগে অঙ্গ-প্রাণ হইয়া মুক্তকালে পতিত হয়।

অপন্যার্থ—ধর্ম ও কর্মের বাহিরে বধা। বধা, শাস্ত্র, ভগবৎকৃতি, দেবদেবা, যৈশ্ব-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি।

বাতাস—জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় মত।

শৃগাল-বিজ্ঞানের মতে, জীবের পরিশ্রম (energy) তাহারের ভোগ্য বিবরে পরিণত হয়। অর্থাৎ জীবশক্তিই রূপান্তরে পরিণত হয়। যেমন (মানব-সমাঙ্গে) তুল্যর বীজ-বপন+পরিশ্রম=তুলা; তুলা+পরিশ্রম=হতা; হতা+পরিশ্রম=কাপড়। গরু+পরিশ্রম=দুগ্ধ; দুগ্ধ+পরিশ্রম=ঘৃত; ঘৃত+চাউল+পরিশ্রম=পোলাও।

একটা লোক কেবল নিম্নের পরিশ্রমে তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারে। অর্থাৎ তাহার পরিশ্রমজাত শক্তি সে নিজেই আহার করিয়া নির্দিষ্ট আয়ু বজায় রাখে। কিন্তু তাহার পরিশ্রমজাত ভোগ্য বস্তুর ভাগ যদি অন্য লোকের ভোগে অর্পিত হয়, এবং তাহার বিনিময়ে যদি সে অন্য লোকের পরিশ্রমজাত জীবন-ধারণোপযোগী অন্ত-প্রকার ভোগ্য বস্তু না পায়, তবে তাহার আত্মকর হয়।

সকলে একই পরিমাণে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তাহারও নির্দিষ্ট আয়ুর আর্দ্রক, তাহারও কেবল এক-চতুর্থাংশ শক্তি থাকে। কিন্তু অস্তের শক্তির (পরিশ্রমের)

ভাগ দাঁকি দিয়া লইতে পারিলে, তাহাদিগের আবহুজির একটা পথ হয়।

অস্তের শক্তি উপরোক্ত উপায়ে লাভ করিতে হইলে, এমন ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি করিতে হয়, বাহ্যতে সেই অন্ত লোক তাহাতে বেগতিক আরাম (luxury) পায়, এবং শীঘ্রই মুক্তাসুখে পতিত হয়।

মুক্তাসুখে পতিত হইলেই শৃগালদিগের লাভ।

মৃত্যুর অন্ত জীব বাহ্যতে শীঘ্র মরে, তাহার উপায় উদ্ধাবন করা এবং যশের উৎপত্তি করাই শৃগালদিগের জ্ঞান-ভব।

এ সম্বন্ধে বাহার হত বুদ্ধি, তাহার শৃগালত বৈশি। ইহা স্বাভাবিকতার্থে।

অবশ্য মানব-সমাঙ্গে আমরা উপরোক্ত বিজ্ঞান অমু-মোদন করিতে পারি না, কারণ লোকজন হইলেই তাগদের পরিশ্রমও অন্তর্ধান হয়; এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তির অপরের পরিশ্রম (ঠকাইরা) লাভ করিবার পথ বন্ধ হয়। স্বধন প্রাকৃতিক পন্যার্থের অনুকূলন হইয়া পড়ে, এবং পরিশ্রম সংযুক্ত করিবার পন্যার্থই থাকে না, কিংবা ভূমি অমুর্জরা হইয়া যায়, অনারুণি হয়, ইত্যাদি, তখন লোক-জন হয় ত মরকার হইতে পারে। কিন্তু শৃগালদিগের অপর জীবের মুক্তাই বাহনীয়; অতএব তাহারা বুদ্ধির শৃগাল সেই পথেই নির্ধারণ করে।

কি করিয়া নির্ধারণ হয়?

বুদ্ধির ওজন কিংবা পরিশ্রমের শৃগাল নির্ধারিত করিতে হইলে, বীর লাগুল ঐ ধর্মকালে ক অঙ্কিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দ্বিভায়ে বিভাজিত হইবে। লাগুলের স্পন্দনে (ইহার Vibration ইহারের স্পন্দনের অষ্টমাংশ) কল বাতাসে নড়িত থাকিবে। এবং তাহার কলে উদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়া পরীক্ষারী শৃগালের শৃগাল ধ অঙ্কিত পারদযুক্ত নলে Graduated Scaleএ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পারদ বত মুক্তার দিকে উঠিবে, ততই পরীক্ষারী শৃগাল বৈশি।

ইচ্ছা করিলে আনন্দও এই কল ব্যবহার করিতে পারি। কেবল লাগুলের পরিবর্তে মস্তক প্রতিষ্ঠিত করাইলেই হইল। মনে করুন, একজন ভিক্ষক (বৈষ্ণব কিম্বা ভাক্তার) তাহার বুদ্ধি ও পরিশ্রমের শৃগাল পরীক্ষা করিতে চাহেন। ধর্মকালে মাথা ঢুকাইয়া দিলে, তাহার Index যদি ৭ সংখ্যায়

ধাতার, তবে তাহার মূল্য নিম্নোক্ত Formula অনুসারে নির্ধারিত হইবে, যথা :—

$$\text{Value} = \text{Unit of Energy} \times (\text{Unit of Faculty})^2$$

মূল্য = পরিশ্রম কিংবা শক্তি $\times$ (মুহূ-সাধনের উপায়)²

$$= \text{আটআনা} \times ৭ \times ৭$$

$$= ২৪৫ টাকা (দৈনিক ভিত্তি) .$$

এখন দেখিতে হইবে যে, unit of energy একটা variable quantity—একটা মুটে-মজুরের দৈনিক পরিশ্রমের মূল্য বত, তাহাই আপাততঃ Wage-standard ধরা হইয়াছে। যদি ধর্মঘট করিয়া তাহারা ১ টালা করিয়া দেয়, তবে শক্তির মূল্য (unit) বাড়িয়া গেল। সুতরাং একজন ডাক্তার কিংবা অস্ত্র বুদ্ধিজীবীর মূল্যও বাড়িয়া যাইবে।

এখন গ অস্তিত্ব নলের দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন। যদি এই নলেও পায়দ উঠিয়া পড়ে,—তবে বুঝিতে হইবে যে, পরীক্ষারী লোকটার অপদার্থের ভাগ (খোঁজুকি)ও আছে। সকলেই পূর্ণ বুদ্ধিবান হয় না, এবং তাহার Graduated Scaleও দ্বিহ্ন করা ছড়। সুতরাং অপদার্থের ভাগ বিবেচন পূর্ক রাহির না করিলে, একটা জীবের খাট মূল্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া যেন। একটা বলকে ধর্মঘটলে ফেলিয়া দিলে, ষাঁত তাহার মূল্য নলে ১ পর্যন্ত উঠিবে। অতএব তাহার মজুর শকট আকর্ষণ করিবার পরিশ্রম, হাফ গাড়িওয়ান কিংবা মালিক বসিয়া যায়) ৪০ হিহ হইল। এ স্থলে গ চিহ্নিত নলে পায়দ উঠিবে না; কারণ, গন্ধর পক্ষে ধর্ম-শাস্ত্র নাই; কারণ, তাহার আখ্যা নাই। বাহ্যের আখ্যা আছে, তাহাদের একটা Subjective Idealism আছে; এবং Moral consciousness নামক কুপ্রকৃতি আছে, এবং মনোভাবও আছে। এই সব অপদার্থ faculty থাকিবার ক্ষমত মানব পণ্ডিগের জ্ঞান খাট বুদ্ধিজীবী হয় না। Subjective Worldএর (Parallelismএর কলে) তাহারা ফিটার আরজ করে।

সুতরাং গ চিহ্নিত নলের কল গ চিহ্নিত নলের কল হইতে বিরোধ করিতে হইবে। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, গার বত গ এর দিকে উন্নত, তত গ এর দিকে অবনতি। ইহা কেবল ক্ষমত-পক্ষেই বাহার ৭ নম্বরে স্থিতি সে খুব

পাকা লোক এবং মুক্তিভব তাগার কঠক। ৩ নম্বরে জীবের মূল্য

$$\text{মূল্য} = (৩-১) \times ৪০ \text{ আনা}$$

$$= ১২০ টাকা$$

সেই প্রকার ৫ নম্বরে জীবের মূল্য

$$= (৫-১) \times ৪০ \text{ আনা}$$

$$= ৪০ টাকা$$

আবার লক্ষ্য করুন।

যদি কোন মানবের নম্বর ৩ হয়, এবং পারসের দিকে ৪ নম্বরে গিয়া উঠে, সে এক নম্বরের অপদার্থ। সেই সকল ২২২ ওয়ালা (২-৪ = -৩) তিন নম্বরের অপদার্থ ইত্যাদি।

এ প্রকারের লোক (যাহাকে আমরা 'খারিজ' বলিয়া থাকি) শৃগাল-মন্ডলে দৃশ্য, এবং তাহাকে বিনামূল্যে (without wages) ঘোট বহিতে হয়।

এই ধর্মঘটের সার্থকতা বহুবিধ। ইহা দ্বারা আমরা পরিশ্রমজাত প্রবোহও মূল্য নির্ধারণ করি, এবং যে সকল বৃত্তি দ্বারা মুহূ সহজে সাহিত্য হয়, তাহাও মূল্য নির্ধারণ করিতে পারি।

কোন পুস্তক নলে কেহিয়া দিলে তাহার মূল্য তৎকণ্যৎ হুগা ধার। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, Realistic Novelগুলির মূল্য বেশী। সেইজন্য ছবি, টেবল, চেয়ার, কোচ, ধর্ম, পাউডার, কাচের খেলনা, প্রকৃতির মূল্য বেশী। অগ্নির সত্য হইতে প্রের মিথ্যার মূল্য বেশী।

এই কল দ্বারা Labour and Wages Problem খুব সহজ হইয়া গিয়াছে।

এই কলের সাহায্যে প্রণীত দ্বারা শৃগালের হৃদ্য কদিসা লয়। মৃত পরিশ্রমের নাম হৃদ্য। এবং সেই হৃদ্য একত্র হইলে যে পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহার আখ্যা Capital। হৃদ্য মতকে আসিয়া যমে। এইজন্য মন্তক ছিন্ন করার পরিতাপ Capital punishment। শূন্য O মূলধন (Capital) নামক পদার্থের Unit, এবং শূন্যের সংখ্যা বত হুদে বুদ্ধি পায়, ততই জীবেরও উন্নতি। প্রান্তঃ ইহাকে Multiplication of cells কহে। শূন্যের সংখ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার নাম Evolution.

ধর্মের কল দ্বারা আমরা অন্ততঃ ইহাই বুঝিতে পারি

যে, মরণ ও তাহার আত্মশুদ্ধি বৃত্তি ও পরার্থভুলিই জগতে একশ্রেণীর লোক দ্বাধাধন বিবেচনা করে। বাহ্যতে ঘন নাই, এবং বাহ্যকে আত্মতা ধর্ম বলিয়া থাকি, Labour-market এ তাহার স্থা কম। অসম্বুদ্ধির স্থা সঙ্গ্জন হইতে বেশী।

ভর্ৎসকুলের অর্থাৎ পোষাকী ভাব।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শৃগালদিগের ভাষাতত্ত্ব আদ্য-দিগের ঐহিক বিপত্তী। তাহাদিগের মতে ভাবের আত্মতন কমইয়া খুব ছোট করিয়া নইলে, কেবল ‘কা হইয়া’ কা? কা? কা? রূপে গাড়িয়া। তাহার অর্থ ‘কি হইল?’ (কি বসন?) এ সব কি? কি?। জগতে কোন প্রস্তর এ পর্যন্ত বিনাশে হয় নাই, ইহা শৃগালদিগের বিশ্বাস; সুতরাং তাহারা এক বসন Agnostic বসিলেও চলে। সংসারের অসারত্ব বুঝাইতে চলে তাহারা কেবল ছ—দল দীর্ঘ করিয়া সন্ধ্যার সময় লোকালয়ের নিকট কোন মাঠে বসে করে। সেই উদাস ধ্বনিত গুলুহুর মৃদু-ভার উপস্থিত হয়। কোন জীব বাজে বসিলে, শৃগালেরা তাহা ভুজ্জ করিয়া “কা” ধ্বনি প্রকাশ করে। তখন সে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়।

(৮)

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যদিও শৃগালদিগের নীচা-প্রণালী আত্মতা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত নহি, তবুও যতদূর জানা গিয়াছে, ইহার মধ্যে মানব-শিক্ষাপ্রণালীর সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। মানব-শিক্ষাপ্রণালীর এখনও সম্পূর্ণভাবে বিকাশ হয় নাই; তবে মানব এবং শৃগালের দ্বারা কোন বুদ্ধিজীবী পত্তর পার্থক্য এই যে, মানবের ধর্ম মারক বৃত্তি পত্তরক হইতে প্রেত। শৃগালেরা তাহা নীচকার না করিলেও, আত্মতা তাহা ব্যক্তিগত চৈতন্য হইতে বুদ্ধিতে পারি (Moral consciousness)। বাহ্যাদিগের Individualism এখনও ছুটিয়া উঠে নাই, তাহারা অনেক শৃগাল-ধর্মী, এবং ব্যক্তিগত অজ্ঞতার থাকার জাহারা শৃগাল হইতেও অধম। শৃগালদিগের চৈতন্য Collective এবং রাষ্ট্রবোধই তাহার চরম বুদ্ধি। রাষ্ট্রবোধে একতা আছে; কিন্তু তাহা অজ্ঞাত জীবের রাষ্ট্রবোধের প্রতিধ্বনি। অতএব শৃগালদিগের মধ্যে ভক্তি নামক কোন পদার্থ নাই। তাহাদিগের একতা কেবল রাষ্ট্রবোধে লইয়া।

এই ভক্তি পদার্থের ক্ষুর না হওয়াতে আমরা দেখিতে পাই যে, শৃগালগণ কিন্তু হইয়া পড়ে; এবং শ্রমজীবনে উপস্থিত হইয়া বিকট চীৎকার করে। সেই ধ্বনি অত্যন্ত বিষমপূর্ণ। তখন পিতা, মাতা, সখা, আত্মীয়স্বজনের ভাব কিছুই থাকে না। বোধ হয় তাহারা বুদ্ধিতে পাঠে, স্বার্থের জগতে আনন্দ নাই। Collective স্বার্থ ভনিত ভাল; কিন্তু সেই স্বার্থের ভাব আবার ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিবিম্বিত হইয়া রাষ্ট্রের মধ্যেও যত্নের উৎপত্তি হয়; এবং সক্তি অর্থ নামক শব্দ লইয়া, তখন সকলে কাড়াকাড়ি করে। জীবনের উদ্দেশ্য যে পরম আনন্দ, তাহা নিরানন্দে পরিণত হয়।

বহুধনপূর্ণ, পৌষমালা-সুশোভিত, জনাতীর্ণ বড়-বড় দেশ এবং মহানগরী এইরূপে প্রাচীনকালে ধর্মসমূহে পতিত হইয়া শৃগালের বাসস্থান হইয়াছিল। বহু তপস্করে গলিত শব্দ ও শোণিতের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, শৃগালের দল বোধ হয় এককালে বুদ্ধিহীন হইয়া, সন্ধ্যার বুদ্ধিই জ্ঞানের চরম। কিন্তু তবুও শৃগালের ক্রন্দনমোহে শুনিয়া বোধ হয়, তাহারা শ্রমানে গাড়িয়া তার-খের মানব-সমান্যক উপদেশ দিতেছে, “গাবধান! এ মহাভীতিময় পথে আসিতে হইলে, আত্মদের যেটুকু অভাব আছে, তাহা তোমরা পূরণ করিয়া এস। একটা কোন পদার্থবিশেষ আছে, যাহা নিখনের পরও সহস্রের দ্বারা অস্বর্তী হয়। যখন চক্ষু চিরদিনের জন্ত মুদ্রিত হয়, তখন সে সম্ভারপে তোমাকে লক্ষ্যে অন্ধে লইয়া কোন আত্মের স্থানে তোমাকে বন্ধ করে।”

যে সমাজের শিক্ষাপ্রণালীতে ধর্মের কথা নাই, এবং যে শিক্ষা ধর্মকে প্রকাশ না করিয়া গুহার মধ্যে তাহার তব রাখিয়া দেয়, তাহার ফল এই শ্রম-ভীতি। যেখানে ধর্মের মনির নাই, সেখানে ধর্মের চিহ্ন গুলুই প্রকাশ হয়। সেখানকার সঙ্গীত মরণ-সঙ্গীত, সেখানকার বিলাস ও হৃদয়হীন মঞ্চকালের তাত্ত্বিক নৃত্য।

আদর্শ মানব মানব-সমাজে বিরল। কিন্তু ভক্তিরূপে সিক্ত হইলে এই শ্রমানেই আদর্শ মানব ছুটিয়া উঠে। ভক্তির প্রভাকে পত্তরিত দূর হয় এবং অত্যন্ত পানী পূর্ণময় হইয়া পড়ে। পুস্তকের ঘেহ ও ভক্তি দেখিয়া অধম পিতা দেবত্ব লাভ; শিশুর ভক্তি পাইয়া গুরু আনন্দময়ের সন্ধান পায়; বহু ও আত্মীয়-স্বজনের ভক্তিও বলে পরিবার ও সমাজ

পঞ্চাশত্রে, ঐকমিক মত-সমষ্টি বিবিধ সহজ উপায়ে আচাৰিত ও শক্তিমূলক
কৰি জা স্বৰ্ণবাহি সম্ভলত। লাভ কৰি আছে।

[illegible]

বর্তমানে নবতর ভারতবর্ষে উপাশ্র, উপাশল ও বর্ধ-সম্ভাব্য, দ্বারা
 শ্রোণীতে বিস্তৃত হইলেও, অকথ্য অসিত-অনবীৰ্য্য দুঃকামস আছে যে
 তাহার মূল্যেই সাদৃশিত, অথ আলোচনাতেই তাহা লক্ষ্যের উপা-
 দ্য। হ্র। বিশেষতঃ, গরম অকথিত, গরম যৌগি মহাসে-মুগ্ধবিশ-
 লিঃ-স্ততঃ কল্পণার যে মঙ্গলময় মতবাধের অদ্বিতীয় কর্তব্য সর্ব-
 সম্ভাব্যের উপা দহি। অমূল্য বাহিত্যে, তাহাতেই তাহার সর্বতো-
 দ্য। প্রত্যাঃ বতঃ প্রত্যাঃ বতঃ প্রত্যাঃ বতঃ প্রত্যাঃ বতঃ প্রত্যাঃ বতঃ

[illegible]

পাক্কাটা বিবরণী ও তাহারে নিরূপিত এতদেবদ্বারা সহস্রা-
 ধন অনেক দিন হইতে বলিয়া আদিত্যকেন্দ্র, তরঙ্গার বস্তু আধুনিক,
 ও তরঙ্গার বস্তু বৈদ্যবিরোধী অসমর্থ ভাষার বস্তু। তরঙ্গার বস্তু আধা-
 ভাষার বস্তু হইক বা না হইক, মস্তিষ্ক তথ্যভাষার প্রকাশন হই। তবে
 কখনো কখনো কি আধুনিক, তাহার আলোচনা অসমর্থিক নহে।

যে শাস্ত্র ত্রি-মুখাধারে আখ্যান-বুদ্ধ-বিতারিত করণে সাধরে আত্মজিত
হইতেছে, বাহার সাহায্যে প্রতি পদে উদ্বেগাবিত হইয়া শাস্ত্র-সাধকে এক
একনিপত্য বিস্তার করিতেছে, বাহার সগীশ আত্মসিদ্ধান্তদানে স্বপক্ষ
আত্মসিদ্ধান্ত ভারতীয় পদোপদেশ, যৌগিক, জ্ঞানী—এবং বি, বহি-
সম্প্রদায় বাহার পদার্থের অনুপলব্ধি করিতেছেন,—এখানে হইতে
হইলে, যে শাস্ত্রের পুণ্যের সম্ভার সমাজ, রীতি, নীতি, বর্ণ, কর্ম ও
পরিণতি বর্ণনায় সময়ে বহুদায়ে সম্ভিত, পরিবর্তিত, পরিবাসিত ও
কালোচিত হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষ কাল কাল হইতে ভারতীয় বর্ণ-
বর্ণের অভিত, স্ত্রী ও পুরুষ আবেশ প্রভৃতি দান। নিম্নত বহিঃপ্রাণ,
ভাষ্য ও আবেশিত কাল প্রভৃতি ভারতবাসীর অঙ্গত কর্তব্য।

শাক্যতা বিবেচনাসম্বন্ধে অনেক মহাত্মা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐতিহাসিক ভাষ্যবাহীরাও বর্ণনাগ্ৰন্থি বিভাজিত অতিদূরত্ব বীতরস ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে শাক্যতা মহাপণ্ডিত বিভাজিত মহাত্মা উদ্ধৃতি মহোৎসবে নৃত্যী তত্ত্ব-শাস্ত্রের উপ নিপতিত হইয়া, প্রচলিত মতবোধে দুঃস্থার আনন্দ করিয়াছেন। যত আনন্দের সহিত বসিতে হইতেন, তাঁহার নৃত্যী-পূর্ণ তত্ত্বশাস্ত্রীয় বস্তুতা ও প্রবাহিত প্রচারে শাক্যতা শিক্ষার শিক্ষিত অনেক মহাত্মার পূর্ণ বিখ্যাপন-শাস্ত্রীয় গোলাচলান হইতেছে। কেহ বা তাঁহার বস্তুত্ব-পীঠ পীঠ বর শিক্ষিত করিয়া তত্ত্ব-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া করিতেছেন। যে তত্ত্ব-শাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্ব-শাস্ত্রের শিক্ষিত মহোৎসব দুঃস্থার বসিতা হুক্তিত করিতে, তাঁহার এক্ষণে পূর্ণতাবে কল্যাণিত বিরা তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়নে বসাবিবেশ করিয়াছেন। কলতঃ, বস্তুত্বান সময়ে তত্ত্ব-শাস্ত্রের একটা প্রশংসার বিন বেসুপ্তিত হইতাকে, তাঁরা সকলকেই পীঠার করিতে হইবে। তত্ত্বশাস্ত্র বর্ণ আন্য কল্যায় বর্ণ বসিতা আনন্দাল বেসু প্রশংসার করেন না। তবে তাঁহার আনন্দিক সময়ে পূর্ণ-ব্যাখ্যা যে পূর্ণতঃ বস্তুত্ব হইতাকে, তাঁরা সম্পূর্ণ-রূপে অনুভূত হই। তত্ত্ব-শাস্ত্র প্রাণীস কি আনন্দিক, তাঁহার বিচারে অত্যাধিক বেসু বস্তুত্ব করেন নাই। তাঁরা-বস্তুত্ব উক্ত-কার্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য অতিক্রম এই সামান্য প্রাণ।

তত্ত্বাব্ধের আধুনিকত্ব নব্য মস্তান্ধের

• स्थान ब्रह्मराज ।

পাশ্চাত্য বিচার শিক্ত অনেক মহাশয় বলিয়া থাকেন,—
তত্ত্ব-প্রাপ্তি অতি অল্পকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে
আমরা যে হেতুবাণ প্রদর্শন করি, সর্ব্বত্র তাহা উল্লিখিত
হইতেছে।

১। যদি তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক বর্ণনা পাঠান হয়, তাহা হইলে এাচীস
যেহে তাহার উত্তরে নাই তেম ৭

২। বৈদিক যুগের কথা ঘুে বাবুজী, যুগের পরবর্তী উপনিষৎ
দর্শন, স্মৃতি, গুরুগ বা ইতিহাসেও তত্ত্বের বাস্তব মাই।*

৩। বিখ্যাত ভোপকার অমরসিংহের রচিত অমরকোষ নামক অভিধান গ্রন্থে সকল শব্দের নামোৎপত্তি কথিত আছে, কিন্তু তন্ত্র-শব্দের নাম বর্ণিত নাই। যদি অমরসিংহের সময় তন্ত্র-শব্দের প্রচলিত বা বর্ণনাত্মক থাকিত, তাহা হইলে তন্ত্রোক্ত গ্রন্থে তন্ত্র-শব্দের নাম অবশ্য উল্লিখিত হইত।

২। পূজাশায় শঙ্করাচার্য্য ভাস্কর্য্য হইতে বৌদ্ধমত নিরাসনের
উক্ত পথঃ তদুপায় প্রচারিত করিগায়েন।

৪। বৈদেশিক গণ্যকরণ এইখানে বহুদিন ব্যর্থ অবস্থিতি করিয়া এসেছে। বৈদেশিক নগর, বীতি, বর্গ, পাত্র ও নগরী প্রভৃতি করিয়াছিলেন, তাহারা অকস্মাৎ হঠাৎ তৎপরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বহুদিন কাল হইতে তাহারা অকস্মাৎ হঠাৎ বহুদিন ব্যর্থ অবস্থিতি করিয়া এসেছে। বৈদেশিক নগর, বীতি, বর্গ, পাত্র ও নগরী প্রভৃতি করিয়াছিলেন, তাহারা অকস্মাৎ হঠাৎ তৎপরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বহুদিন কাল হইতে তাহারা অকস্মাৎ হঠাৎ বহুদিন ব্যর্থ অবস্থিতি করিয়া এসেছে।

৩। তত্ত্ব যে বর্ণমালা নির্দেশ-পদ্ধতি বা ভাষার বস্তু কথিত হয়, তাহাকে বর্ণাক্ষর বা বর্ণলিপি কথ্য হয়। ইহাযে বসিয়া মনে হয়। বর্ণলিপি প্রাচীন যুগে, আধুনিক। বঙ্গীয় বর্ণলিপির উদ্দেশ্য বর্ণিত তত্ত্ব পাঠ্য পদ্য আশ্রয়িত আধুনিক বর্ণমালা পরিচিত হয়।

৩২ প্রবন্ধ তাহা, তাহ, স্রীতি প্রকৃতির বিবেচনায় করিলে
অস্বাভাবিক হয় যে, ৩২ নম্বরোক্তভাবে বঙ্গভূমির আভ্যন্তরীণ। জন-
স্বাধীন উল্লিখিতের সহায়তা করিতেছে। যথা—

“মৌতেনেঃৎপাষিত। বিজ্ঞা যৈখিলৈ বিপুলীকৃত।।

କଟିଃ କଟିସହାରଂ ଶ୍ରେ ଶର୍ମସ୍ତେ ବିଜୟଃ ସତ୍ୟ ।" ଇତ୍ୟାଦି ।

নব্য সম্ভাব্যের কথিত তত্ত্ব-শাস্ত্রের আটনিব বিরোধী গ্রন্থবলম্ব
আংশিকসমূহ গ্রাণ উল্লিখিত হইল। 'তত্ত্ব-শাস্ত্র আটনি কি না' ইহার
এমণ কথিত হইল, আণ্য পান্দসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে
হইবে। বেশ বিম্ব, রাজ-বিম্ব, সম্বা বিম্ব ত সম্ভাব্যবি বিম্ব
আণ্য শাস্ত্র আটনি করি ব্হুত হইয়াছে। আণ্যশাস্ত্র নামে অষ্টাবিশি ব্হু
করকথাবি ব্হু ব্হু কাক সম্বা গ্রন্থিগ হইয়াছে, তাহারের অম্ব-অষ্টাব
অনেকাণে কাক-পঙ্কজের গতি। নামে আণ্য শাস্ত্র পাণ্ডিকম্ব
শাস্ত্র-সমূহ গোণে গণিত হইল, হুটল কালগতির উল্ল সাধ্য
এমণ করিতেহে। তাহার উপর পাণ্ডাক্ষ পতিতবয়ের আটনি
কিয়ার-পঙ্কজ ত পদবহার দায়। আণ্য-পান্দসমূহ নামে কাক-কথিত
হইয়া। আণ্ডিক সাজা আণ্ড করিয়াহে। অম্বব্হুগ শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব-
শাস্ত্রের গ্রাণিব ব্হু আণ্ড কাক ব্হুত। ত অম্ব-সম্বের কাণ
কাক সম্বা অম্বপান করিতে পঙ্কজ।

অতি দ্রুতের দ্রুতি বলিতে ইহাও—সত্যতা-বৃত্ত পাকতায়
পতিতগণ আপনাদের আনুহিক, পকাত্তে, ভারতবাসীর প্রাণিব
বীকার ভয়কে বিশ্ব লঙ্ঘার কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। সেজন্য
যদি প্রাণিব ব্যাপনে ও পৃথিবী শাস্যাবির অভিব্যব প্রতিপাদনে বহু
পরিচয় ইহাও সত্যতায় বহুত অচ্যুত-পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেও

তাঁহারা হুঁচিট করেন। তাঁহাদের বিভিন্ন চৰ্চ-বুদ্ধিজন্য পানিত অনিবাধ্য বিজ্ঞ-বিজ্ঞ বিকাশ, সমাজের বেষণায় কৃষ্ণের উদ্যোগ পলাতক পণ্ডিত, ইতিহাস-পণ্ডিত। অস্তিত্ব প্রকাশিতবীর অধ্যাপক-পুত্র উপকথার উদ্ভূত এবং প্রাচীন ভাষ্যভাষ্য উপাধের বস্যাভাষ্যপুত্র পাশ্চাত্য ভাষ্যভাষ্য পদ্যভাষ্যপুত্র হুঁচিট বলিয়া পণ্ডিতবীর হইতেছে। আখ্যে ভাষ্যভাষ্য, পণ্ডিত, পুত্রপাণি অধ্যাপক বীরপুত্র হইলেও, পাশ্চাত্য-আধ্যাত্ম নভ্য-পুত্র পিতৃকণ্য সমাজত হইয়া পাশ্চাত্যে অধ্যাপনাধি উপকথায় পণ্ডিত, বুদ্ধিত ও পণ্ডিতবীর বলিয়া কল্পিত হইতেছে। আখ্য-নভ্যত সেব্যভাষ্য অনাধ্য-পণ্ডিত ভাষ্যভাষ্য পণ্ডিত হইয়া নভ্যত (নভ্যভাষ্য) পাণ্ডে হুঁচিট কটাক্ষে বিবর্ত উপকথিত হইতেছেন। জনপুত্র আখ্য-পণ্ডিতবীর পুত্রত আখ্য পাশ্চাত্য নভ্যত-পণ্ডিত-পণ্ডে এতদ্ব্য বিজ্ঞের হইয়াছে যে, ভাষ্যভাষ্য বিজ্ঞে অধ্যাপ-পণ্ডিতক বস্যা-পুত্র-পিতৃ-বীরক কল্পিত, ভাষ্যভাষ্যের হুঁচিট-নিবাসে বস্যা-পুত্র পণ্ডিত-পুত্রক নিম্ন উক্তকর্তে বলিতেছি:—
সভ্যত-পুত্রপুত্র পাশ্চাত্য-পাণ্ডে আখ্য নভ্য-পুত্র পিতৃভাষ্য! আমাভের আপনায় বলিয়া অধ্যাপক কল্পিত কল্পিত নাই। বস্যা ইতস্তত: নভ্যভাষ্যের হুঁচিট, তাহা আমাভের পুত্রপুত্রবীরক পণ্ডিত-পণ্ডিত বস্যা-পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুত্র হইতে কতক বস্যাভাষ্য, কতক না বলিয়া, কতক বা ভিষ্য কল্পিত আখ্যভাষ্য। এইজন্য ভাষ্য-পণ্ডিত আমাভের পণ্ডিতা বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্য পাণ্ডিত্যের বস্যা পণ্ডিত উভ্যভাষ্যের প্রাচীনক আমোচিত হইলে, উভ্যভাষ্যের নভ্য পণ্ডিত পণ্ডিত সমাজের বস্যা-পুত্র পিতৃভাষ্যের হইয়া পণ্ডে

কি' প্রকারে তত্ত্বশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইতে পারে ?

তত্ত্বগত গ্রাটিন কি না? এতৎ সম্বন্ধে এতদ্ভাষ্যে কেহ আশা করিতে পারে না, যে, সম্যকতম বেদ-সত্য হইতে আশ্রয় করিয়া 'বৃত্তি-পুণ্যাদি' সমস্ত শাস্ত্র—“তত্ত্ব গ্রাটিন কি আত্মসিদ্ধ” এই কথা লম্বতঃ বলিয়া-
 যেন। ঐহায়া এই অবস্থায় সত্যি সত্যিই উক্ত ভগ্ন বর্ণন-কথনা
 করেন, ঐহায়াবিক অংশ হইতে হইবে। পঞ্চাশত্তে, বেদগ
 পঞ্চতি অবদতি হইলে তত্ত্ব-শাস্ত্র-গ্রাটিনও ভক্তত্ব তদা অশাসিত
 হয়। সত্যে, সত্যে তত্ত্বের নির্দেশ করিয়া অতীত বর্ণের অনুদয়
 করা গাইতে।

১ : তত্ত্বপাত্র-বাটী তত্ত্ব বা আশ্রয়িণী শব্দ কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত
হইয়াছে এবং কত হইলে, তত্ত্ব গ্রন্থের আবির্ভাব সময়ে তত্ত্ব-পাত্রের
বর্তমানতা ছিল :

২। ওস্তাদ-বাঈ তঁরাণি নামের স্ট্রটঃ উল্লেখ না থাকিলেও, ওস্তাদ-বাঈ বিটিত আডাল, নিয়ম ও মানসিহ, সাবহার ঘর্পনে জনম প্রভৃতি ওস্তাদের পরবর্তী বসিহ।

ওস্রোক্ত আচাৰ্য্যসি বহিতে, বাহা কেবল তত্ত্ব-শাস্ত্ৰের মূল সম্পত্তি,
তাছাড়াই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের নাম তথা—

(क) सञ्चालन बाधित होला ।



শরীরের প্রতি আবেগ লক্ষ্য করে না। কোনরূপে বিবিকলাসের “হাণ্ড” লওয়াই যেন তাহাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। আধাঘের পুষ্ণ ও কলেজের শারীরিক ব্যায়াম-চর্চা এতদূর ভ্রমের মধ্যে থাকে যে, শুল্ক হওয়া অবশ্যক। আধাঘেরের এ কথা জুলিয়ে চলিয়ে না যে, শিকারে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, শুধু মানসিক উৎসাহ লাভই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে-সঙ্গে বৈধিক উন্নতিও আবশ্যক।

আর এক কথা—আধাঘের বিবিকলাসের পটীকাগুলি এক-একটি ছাত্র-শেখর বস্ত্রবিশেষ। বৎসর বৎসর তত সেবারী ছাত্র পটীকার সম্বন্ধে যখন আধিকার করিতেছে; কিং হার! তাহাদের মধ্যে আধিকাংশই ভগ্নপাশা—জীবন-সংগ্রামের সঙ্গুপক্ক। অস্ত্রাস্ত্র সত্য সেনের সহিত তুলনা করিলে যেনো যার যে, স্নানোপ ও ইংরেজ ছাত্রেরা যখন বিবিকলাসের পরিচয় করেন, তখন তাহারা সবজীবন লাভ করিয়া, নূতন উচ্চতম সীমা সংগ্রামের জন্যে প্রবেশ করেন। আধাঘেরের ছাত্রদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের শরীর এক-একটি বাহি-বলি। এমন অবস্থা বাস্তবিকই পোচোয়। সমস্ত বিষয়ের পটীকা একসঙ্গে এক সময়ে গ্রহণ না করিয়া, উদ্যোগে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা উচিত; এবং যে ছাত্র একবার একটা বা দুইটি বিষয়ে অকৃতকাব্য হইবে, তাহাকে সুদূরার সমস্ত বিষয়ে পটীকা হিতে বাধ্য না করিয়া, কেবল এক-একটা বা দুইটি বিষয়ে পটীকা গ্রহণের অসুবিধি বেগুনা করণ। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সবখানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। বাস্তবিক হানে পুষ্ণ ও কলেজ স্থাপন, এবং সঙ্গুপক্কের বা শৈলশিখরে ছাত্রদের রক্ত বাহ্যাবিবাস স্থাপনের প্রত্যাবর্তন সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্গু হানে অবকাশের সময়ে, কিংবা পটীকার পর কিছুদিন অধ্যয়ন করিলে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক দ্বয়ের পুষ্ণ হইতে পারে। আধাঘেরের এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে। বর্তমানকালে ছাত্রদের mess-এ অবস্থান পদ্ধতিও তাহাধাঘের বাহ্যাবিবাসের অন্ততম কারণ। ছাত্র-বাসের আহার্য তাহাধাঘের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। বাহ্য উচ্চ ছাত্রবাসের প্রতি বর্ষব্যয়বোয় দুই পণ্ডিত হইয়াছে,—ইহা হুদের বিষয়।

ছাত্রদের বাহ্যাবিবাসের আর একটা কারণ, কলিকাতার ভায়রনকোলাসহপূর্ণ বৃহৎ নগরের অবিশেষ বায়ু সেদন। এ বিষয়ে কলিকাতা অশেষ বধ্যবাসের সহযোগিতা লাভ। সেখানে নির্মল বায়ু সেদনের সুবিধা ও আধাঘেরদের প্রাচুর্য সেবিত পাওয়া যায়। বাহ্যাবিবাসের আর দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ—প্রত্যাহ আহারের স্থাপন করিবামাত্রই বিভাগেরে ছুটাছুটি করিয়া সমন। ইহাতে পরিচাল্য কিয়ার বাহ্যাব বটে, তাহা সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় কারণ—৪১৬ বর্গ একর একই হানে অবস্থান থাকে ও “all-in”এর সমস্ত কিছু না থাকে। অতঃপরে ছাত্রদের রক্তের বাহিরে অবস্থান করিতে দেওয়া ও বিভাগেরে সন্ধ্যাবের ব্যবস্থা করা বিধেয়। সেদের বর্তমান বাহ্যাব অবস্থা, যালেসিয়ার প্রভৃতির বিস্তার—ছাত্রদের বাহ্যাব উপরন্ত প্রত্যাহ বিস্তার করিয়াছে। যালেসিয়ার শরীর ক্রিয়

বিপর্যয় হয়, তাহা উত্তরোত্তর ভিন্ন অংশে বৃদ্ধিতে পারিবে না। বৎসর বৎসর কত সমস্যা! যে মালোয়ারের কতক কলেজ পণ্ডিত হইতেছে, তাহার ইচ্ছা নাই। বাহ্যাব বাহিরে থাকে, তাহাও জীবনস্ত—আধাঘেরের যের বলা নাই, যতিকে শক্তি নাই, যেনে কৃষ্ণ নাই। কিন্তু এই বৈদেশিকের মধ্যে “Panama Canal Colony” প্রভৃতির উদাহরণ আধাঘেরের যেনে আহার লক্ষ্য করে। যালেসিয়ার প্রভৃতির উপায় সম্বন্ধে এখন অবশ্য পটীকা ও ব্যবস্থা চলিতেছে। পর্যবেক্ষিত এ বিষয়ে বহুমান হইয়াছেন। এখন সেদের জীবনোদ্যোগ—বাহ্যাব অন্তর্য প্রবেশ হইতেছেন—আধাঘেরের এদিকে পুষ্ণপাশ করা অবশ্যক।

ইংরাজীতে একটি অর্থ আছে—“Prevention is better than cure” যেরেরে উৎস অর্থোক্ত তাহার প্রভৃতিই অধিক স্পষ্ট-প্রু। এই ব্যক্তার পটীকা প্রবর্তন করিয়া যদি অনেক উপরি-নিশ্চিত উপায়-বিভাগেরে কাহা পরিণত করিতে দেখে হই, তাহা হইলে এই হস্তান্তর যেনে বাহ্য ও আনন্দ পুনর্বার সিঁচিয়া আসিলে, এরূপ আশা করা যায়।

রস-সাগর

শরীর কবি কৃষ্ণকান্ত তাহতী

[কবিত্বরূপ শ্রীপূর্ণক্সে সে কাহারও উত্তর-সাগর, বি-এ]

(পূর্ক সাহেব আর একবারের পর)

(৪০)

একদিন যখনকার দ্বিতীয়-চল সত্যার বলিয়া অনেক লোকের সঙ্গুপে বীর প্রসিদ্ধার বহায়ায় কৃষ্ণক্সের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতেছিলেন। কথার কথার ভিত্তি রস-সাগরের দিকে চাছিল। সহ্যত-বহনে কহিলেন, “বৈভাঙ্গীর সঙ্গে!” রস-সাগর বহায়ায় অধিকার বৃদ্ধিতে পারিয়া তৎকালীন এইভাবে এই সমস্ত পূর্ণ করিয়া কহিলেন :—

প্রত্যাহ। বহায়ায় কৃষ্ণক্সের দুই রূপী ছিলেন। প্রথমবার ঘর্টে শিবচন্দ্র, তৈরবন্দ্য, কলিকাতা, যালেসিয়ার ও উপাচন্দ্র, এবং দ্বিতীয়বার ঘর্টে পশুচন্দ্র অধ্যয়ন করেন। শিবচন্দ্র বৈভাঙ্গী শান্ত বস্ত্রাব, পশুচন্দ্র ও দৃশ্যভিত, শবুচন্দ্র সেইরূপ উচ্চত, শিবুচন্দ্রের ও শান্ত-জ্ঞান-বিশুদ্ধ ছিলেন। শিবচন্দ্র সাক্ষ্য বিব। যখন নবাব দীরকামির মুখেরে চূর্ণে শিতা ও মুক্তক বধ করিবার জন্য প্রবেশ যেন, তখন শিবচন্দ্র তাহাকে উত্তরেরে প্রাণ রক্তের সম্বন্ধে অনেক সৎ-সংসারশ্রী দিয়া তাহার যাকী সেবা ও প্রত্যাহ করিয়াছিলেন। একজন কৃষ্ণক্স শিবচন্দ্রেরই নামে সমস্ত বিষয় শিখিয়া দিবার সংকল্প করিয়া বাহ্যাব তাহার এক খাবি “বানপাত” ও পার্শ্বী তাহার একখাবি “তৎ-বিশ্ব নামা” দিছিলেন। তৎকালীন সমস্তই যেনোই তাহারে প্রভৃতির কাউলদের একজন সাহেব বেদের ও একজন দুলী আশিয়া হইতেই শ্রুতক ও সোহর

করিয়া বিয়া দান। ১১৭০ বঙ্গাব্দে (১১৮০ খৃষ্টাব্দে) ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই দুই খানি কাগজ লিখিত হয়। এই দানপত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রশ্যাম জ্যৈষ্ঠ পূজা পিণ্ডপত্রকেই সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া বিয়া করেন। অজ্ঞাত বীরা পুত্র ত শৌচদীপিককে সর্বস্বত্ব কেবল ৪০০০ (চারিশ হাজার) টাকা দ্বারা বার্ষিক কৃতি বিদ্যার ব্যবস্থাপন করিয়া বিদেশে।

এই দানপত্র লিখিয়া মহারাজ ১১৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা পিণ্ডপত্রের নামে সমস্ত প্রতীমানী রাজ-সম্বল আদির উল্লেখ করিতে পারিলেন। তৎকালে বেঙ্গলের কর্তৃক কালে এইজন যোগার নির্মাণ-বিষয়ে তাহার এখানে কর্তৃপতিব বেঙোন পরগণাধিপতি সিংহের অনুজ কন্যা ও কর্তৃক লিখ। তাৎকালিক প্রসঙ্গ ভবিষ্যৎ বিবরণে কৃষ্ণচন্দ্র হইলেন। পরগণাধিপতির মাতৃ-প্রাচীর সমস্ত বয়সের কৃষ্ণচন্দ্র জ্যৈষ্ঠপূজা পিণ্ডপত্রকে সম্বরণ করা করিতে পারিয়াছিলেন। পিণ্ডপত্র মহারাজে বিয়া পরগণাধিপতি সিংহ মহারাজকে বলিলেন “বেঙোন বারাহদুহ। আপনাব মাতৃশ্রদ্ধা গ্রীক বন্দন্যকর। বত।” তাহাতে সিংহ মহারাজ ইহা হস্তে করিয়া বিদীত ভাবে বলিলেন, “আমার মাতৃশ্রদ্ধা গ্রহণকর অগ্ণেকাও অধিক; কারণ বন্দন্যে বহা শিখের আদর হয় নাই।” কৃষ্ণচন্দ্র পরগণাধিপতিকে লষ্টে করিতে পলিলেন তেজী করিয়াও কৃষ্ণচন্দ্র হইতে পারেন নাই। তাহার উক্ত ও অবাধ্য পুত্র নতুংজ্ঞ মনে করিয়াছিলেন যে, পুণ্ডরুক সম্পত্তির এক অর্ধাংশ বেঙোনায় অর্জিয়া পাইবেন এবং অপর অর্ধাংশ তিনি বহা পাইবেন। এই উদ্দেশ্যে নতুংজ্ঞ রাজ-পুত্র-সমস্ত সারথী-সাক্ষের বিস্তার নানা প্রকার তেজী করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই দানপত্র লিখিয়া বিদ্যার পূর্বকই সমস্ত সম্পত্তির বর্ণনা পিণ্ডপত্রে এক খণ্ডে নতুংজ্ঞকে দেওয়া দিয়া করিয়াছিলেন, এবং নতুংজ্ঞও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে নতুংজ্ঞ এজিয়া করিলেন, “যে ভগ্নেই হউক, অর্ধেক রাজ্য নাই। ইহাতে বস্ত্রের দানব ভিষা পবীত-পতন।”

দানপত্র দেখা হইয়া বিজ্ঞানে, এবং তাহাতে বেঙ্গলের এক সাহেব দেখে ও স্থানীয় লোকের এবং বোম্বের সিবিজী হইয়াছে। এবং নতুংজ্ঞ জিজ্ঞাসার হইয়া বেঙোন পরগণাধিপতির পরগণায় হইলেন। তিনি তাহাকে অর্ধেকের বেঝাইলেন; কিন্তু তিনি এখন কি করেন, তাহা দিয়া করিতে পারিলেন না। এই সমস্ত কৃষ্ণচন্দ্র পরগণাধিপতিকে একখানি পত্র লেখেন। তাহার একখানে এইজন লিখিত ছিল “পুত্র অবাধ্য, বহবার অবাধ্য, এখন যা করেন শীঘ্রসম্মোদন।” কৃষ্ণচন্দ্রের বেঙোন কালীমাগার সিংহ, পরগণাধিপতিকে এসব ও বস্ত্রপত্র করিবার জন্য তাহার নিকট প্রত্যাহা বতাহাত করিতে লাগিলেন।

কিয়দিন পরে কালীমাগার বৃত্তিতে পারিলেন যে, পরগণাধিপতি তাহার সহিত কলট ব্যবহার করিতেছেন। তখন তিনি পরগণাধিপতির কলট ব্যবহার ও অজ্ঞাত বিদ্যার এবং লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। নতুংজ্ঞ পত্র-ব্যবহারে নিকট হইতে এই পত্রখানি লইয়া পরগণাধিপতির হস্তে অর্পণ করেন। পর-পাঠ-দ্বারা সিংহের প্রোচনদ প্রেরণিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিপক হইয়া উঠিলেন।

পরদিন বেঙ্গল কর্তৃকলমে উপস্থাপন করিবার জন্য তিনি তাহাকে বলিলেন, “নিবর্তন বিষয়কভাবে বিদ্যার অঙ্গ, কিন্তু নতুংজ্ঞ বিদ্যার ও কালীমাগার। পক্ষপাতী হইয়াই কৃষ্ণচন্দ্র জ্যৈষ্ঠ পুণ্ডরুক দ্বারা বিয়া অজ্ঞাত পুত্রবিপক্ষে বক্তিত করতে চাহে। কৃষ্ণচন্দ্র তাহা করেন। তখন তৎকালে বেঙ্গল পরগণাধিপতির কলট-হস্তে প্রেরণিত হইয়া নতুংজ্ঞেরই হাতে সমস্ত বিদ্যার আদেণ প্রদান করিলেন।

বেঙোন কালীমাগার এই বিষয়ের বিষ্ণু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তিনি পরগণাধিপতির নিকটে প্রত্যাহা বেঙোন ব্যতীতে করেন, সেইজনই করিতে পারিলেন। একদিন প্রাতঃকালে কালীমাগার পরগণাধিপতির বাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরগণাধিপতি তাহাকে বেশিখানায় ফোঁপে প্রেরণিত হইয়া তাহার অভ্যন্ত অর্থদান করােন। কালীমাগার বিজ্ঞাত পরগণাধিপতি ও লালিত হইয়া বিধ-বস্ত্রের কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে আসিয়া পরগণাধিপতির সমস্ত কথা তাহা বিজ্ঞান করিলেন। মহারাজ অনেক চিন্তা করিয়া দিয়া বলিলেন যে, বেঙ্গলের গ্রীক কোনও কোনও হস্তে করিতে পারিলেই আমার অস্তিত্ব পূর্ণ হইবে।

তৎকালে হলদী ও চন্দন-মণ্ডের রাজ্যের দ্বিপ-পত্রের নিকটে গতি উৎকৃষ্ট বহুলায় চুক্তি বিস্তারিত হইত। মহারাজ কালীমাগারকে বিয়া ভাল ভাল লুতা লুতা করিয়া একতরফা হস্তার দান প্রেরণ করাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কালীমাগার এই অমূল্য মুক্তাখণ্ডা লইয়া বেঙ্গলের বাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তৎকালে মাতৃ-সেবার্ণ বাটী হইতে বর্ণিত হইয়াছিলেন। কালীমাগার এই মুক্তাখণ্ডা পাইয়া দ্বিপ-পত্রের বেঙ্গে বেঙ্গল-পত্রী নিকটে উপস্থিত হইয়া উক্ত মুক্তার দান তাহাকে দেখাইলেন। তিনি দান দেখিয়া হইলেন বিজ্ঞান করিলেন, “ইহার মূল্য কত?” হস্তেই দ্বিপকার বিদীত-জ্ঞানে করিলেন “আপনি মূল্য লিখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন কেন? অল্পপ্রহ করিয়া একবার বলুন পত্রী যেমন, কতগুলি টাকা হয়।” তিনি তখন ইহা বলার পরিয়া ইহার অমূল্য দেখা দেখিতে পারিলেন। দ্বিপকার করিলেন, “আপনার জ্ঞান যেমন মনোহর, দান প্রেরণিত সেইজন মনোহর হইয়াছে।” তখন বেঙ্গল-পত্রী পুত্রজ্ঞার ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে হস্তেই দ্বিপকার কাহন্য, ইহার মূল্য অনেক টাকা। তবে আপনি বহা ইহা লইলে আপনি চরিত্র হাজার টাকা মূল্যে ইহা আপনাকে বিক্রয় করিতে পারি।” যে মাহেব বীর বিদ্যার-পরিচয় করিয়া বিধ তাহা করিলেন “আমার খানী এত টাকা বিক্রয় না। এমন আমার ভাগ্যে এই মুক্তার দান ক্রয় করা যতটা উচিত না।” মুক্তার দানার বেঙ্গল-পত্রী দ্বিপ বিক্রিত করিয়াছে, ইহা বৃত্তিতে পারিয়া বেঙোন কালীমাগার বিদীত-জ্ঞানে করিলেন “আপনি এই মূল্যে কতটুকু হইতে চান? করিলেন না।—আমি ইহা আপনাকে উপহার দিচ্ছি।—আমি দিচ্ছি।” তখন তিনি আপনাব পরিচয় প্রদান করিয়া করিলেন,—“আপনাব খানী পূর্ণকর বেঙোন বারাহদুহ, পরগণাধিপতি সিংহের আদেণিত

যাওয়া প্রভাবিত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ ক্ষতি করিতে উত্তম হইতামেন। এক্ষণে আপনাদি কৃপা ভিন্ন মহারাজের অল্প উপায় নাই।” (হেষ্টিংস পত্র) ইহা তথিগা ভাষ্যকে খাওয়ান করিলেন, এবং হেষ্টিংস সাহেব পুত্র অজ্ঞানত হইলেন ভাষ্যকে পরামোখ্যবোধে প্রভাবিত আশুপ্ত হইয়া বর্ষন কারিয়া মহারাজের আর্থনা-নিষ্কৃত নিমিত্ত বিশেষ অসুখের করিতে লাগিলেন। যেহেতু সাহিত্য লেখক অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া মহারাজের আর্থনা-পূরণ করিতে সমর্থ হইলেন। অবশিষ্টবিশেষ লবচন্দ্রের নামে লিখিত সন্দেহ পত্রটির জেনারেল বারোহুর্দা স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন। (ক)

সমস্ত—“বৈভাবী হইল।”

বিশেষ করি ওগো হেষ্টিংস-বহিঃ।
আমি এক মণিহার আলিয়ায়িত্ত বন হার
বিস্তর করিতে এই দুহুতার মালা।
ইহা অতি মূল্যবান্ হারি বৈদিক ভাষ্যবান্
যে কিনিতে পারে এই মহামূল্য হার।
তুমি হেষ্টিংসের সতী ভগবতী ভগবতী
হে- নিম্ন সাহেব খণ্ডে ভেল ভাষ্যবান্।
ইহার নৈতিক ভাষ্য না লব অধিক মূল্য
চামচ হাতের টাকা করিব গ্রহণ।
একবার দিন গলে যেহুত ভগবতী-সে
সোণার লহিত হোণ্ডে মোহনে মিলন।
তুমিগা হেষ্টিংস-বাহী করিলেন বন ভারি
এত টোকা না হেবেস সাহেব আহার।
দুহুহাতে একবার করিলেন মণিকার
নাহি লব মূল্য আমি,—ইহা উপহার।
টারগান্দা দুপখানি তুলিয়া তখন বনী
জালিলেন,—আমি বস্ত্র এই দুহুতলে।
ঈকালীপ্রসার কর ঈদুলপ্রসারের হার
কিবা মোতে দুহুহার ‘বৈভাবী হইল।’

(১০)

মহারাজ দ্বিতীয়-চন্দ্র ভগ-সাগ-ক্রে এর করিলেন—“ঈদুলপ্রসারিক,”
এবং বহিঃ মিলেন,—“ঐতিহাসিক ঘটন। অবলম্বন করিয়া ইহা আপনাকে
পূর্ণ করিতে হইবে।” তখন ভগ-সাগর, মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে
পারিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

প্রস্তাব। বন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পীর জ্যোতি পুত্র বিখ্যাতের
নামে লগত সম্পত্তির বাসপত্র দি-ব্যা নমুচন্দ্রকে কেবল বাহিক বৃত্ত

(ক) এই লম্বা-পুত্র সৎকে যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা
বর্ণিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হার মহোদয় কৃত “কিচীপ-বংশাবলি চিত্রিত”
হুতে সুদীর্ঘ বর্ণনা দান।

বন্দোবস্ত করিয়া যেন, তখন নমুচন্দ্র অর্থেক রাক্ষাস পাইবার অল্প
শিতার মধ্যেই ইহা বেচিয়া প্রদানোদিত্ত সাহেবের লগতাপার হইল।
ইহা জানিতে পারিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চিত্তিত ক নিপত্তার হইলেন,
এবং পরামোখ্যবোধে একবার পত্র বহুতে লিখিয়া ভাষ্যে এই
করেতী কথা সরিয়েলিত করিয়া দিলেন,—“তুমি অজ্ঞান, ইহাখার
অনাথ, যা করেন ঈদুলপ্রসারিক।”

সমস্ত—“ঈদুলপ্রসারিক।”

(পত্রাবোধিক সাংকেয় প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি)

ভীষণ অরণ্য-সম অরণ্য লংসার,
নমুচন্দ্র বৃষ্ণপত,—বাহিক নিগার।
তুমি সিংহ পতগরি তুমিই আমার পতি
তুমি কৃপা করিলেই পদর আনন্দ।
পুত্র হইল অবস্থা বরবার হইলো অসাধ্য
এ সময় যা করেন ‘ঈদুলপ্রসারিক।’

(১১)

দ্ব্যয়্য ঈদুলপ্রসার বহা ভগবান্ বৃদ্ধিমান্ ক বিদ্যাসুহৃৎ দিলেন।
তিনি ভগ-সাগরকে বিদ্যা মধ্যে যথো সমস্ত পূর্ণ করিয়া পদর
আনন্দ অসুখক কহিলেন। একদিন তিনি এর করিলেন,—“সেই নব-
বন-ভাষ্যে।” ভগ সাগর ভাষ্যের মধ্যে প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া
তৎকথ্য ইহার উত্তর প্রদান করিলেন।

[প্রস্তাব। ভগপত্নী নিবাহী কবির বর্ণনের বিভাগভার মহোদয়,
সহাব আলিখদি খাঁ, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও মোতা-
বাগোদিশিত মহারাজ নবকৃষ্ণের পদর ঈদুলপ্রসার দিলেন। ভাষ্য-
পত্নিত মহোদয়গণকে উত্তর-চিহ্নার খ্যাতি হইয়া নানা বন্যারের হার
ইহা শুভবান করিতে হইল। বিভাগভার মহোদয়কে তাহা করিতে
হইয়াছিল। একজন ভীষণের লগে বর্ণার যেনে মাঝেবে বিভাগ
অন্ততাপ করিয়া-তিনি এই রোক্তী রচনা করিয়াছিলেন। ভগ-সাগর
মহোদয়ের রচিত বাঙ্গালা কবিতাটি নিম্ন লিখিত পংক্তির প্রেক্ষায় অব্যর্থ
হইল :—

“আলিখদিবানবদ্বীপ নবদ্বীপেরদ্বারিক
তৎকথ্যবহুতপুত্রসমুৎসিহিত বিদ্যাভাষ্য।
সদীর্ঘ নবদ্বীপবহুতপুত্রসমুৎসিহিত বিদ্যাভাষ্য
তৎকথ্য পরাবর্ধক নবদ্বীপবহুতপুত্রসমুৎসিহিত বিদ্যাভাষ্য।”

উক্ত-সাগর : (ভূতীর-মাধ্যম) ১০১ মোতা।

সমস্ত—“সেই নব-বন-ভাষ্যে।”

তখন ভগ বলি ভেদে কহে বোর মণ।
“এব-এব ভাল বাস তুমি বিলম্বন।
নবদ্বীপ-আধিপতি ভগচন্দ্র মহাবতি
কি-বৃষ্ণতি না সইবে কীবা দিয়ার।

সমস্তা—“সীতার কষ্টিন গ্রাণ, রামের কোমল !”

(সীতা-হরণের পরেই রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে কুটীরে বেষ্টিতে না গাইয়া বিধব ব্যাধুল হইয়া উঠিলেন। তখন রাম “সীতা, সীতা” বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতে উত্তর না পাওয়ার চোবতরে দীর্ঘ কক্ষ কটিকা করিতেছেন।)

কোথায় কোথায় দীর্ঘ সেলে এ লব,।

এখনি উত্তর দাও,—ব্যাধুল রুহর !

এখনি আইন হেথা, ডাকিলে পাহাণ,

এই দিলে, এই কোথা হইলে অধ্বনি ?

সদুয়ার গন্ধবতী-বনে ঠাই ঠাই

দুর্ভিত্তি ছুই তাই,—ওষু দেখা নাই !

বুঝিলাম পরিচাল্য করিবে বলিরা,

গম্ভা মধ্যে গম্ভ বনে আক লুকাইয়া।

এখনো উত্তর নাই জনক-নৃপিনি !

বুঝি সুতোয়ার মত না আছে পাখী !

‘সর্বসঙ্গ’ নাক্য তব, ‘শেষে জড়ি’ তার

সব সঙ্গ হই তব, বুঝিলাম সার।

লক্ষ্মণ মোর শিতা,—বিজ্ঞা মোরে যবে

সক না কুন্তিতে পারি’ ঘরেছেন গ্রাণ !

ও রস-সাগর করে হইয়া বিলস,—

‘সীতা’ কষ্টিন গ্রাণ, রামের কোমল ! (ক)

(৪৪)

একদিন এক পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ হইতে কুলনগরে মহারাজ দ্বিতীয়-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রস-সাগর তখন রাজ-সভার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত পূর্বে হইতেই উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় ছিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন “রস-সাগর মহাশয় ! আপনি পরম বুদ্ধিমান্ পুত্রব।” ইহা শুনিয়া রস-সাগর কহিলেন, “সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে !” তখন উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহারকে এই সবকানী পূর্ব কর্তেই বলার তিনি এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন :—

(ক) এই কবিতামীর ভাব বিয়-নিষিদ্ধ রোকে বেধিত পাওরা
বার :—

বিতর বিতার বাহঃ কুল সীতে বতা ধঃ

বিরমতু পরিচাল্যঃ সঙ্গমা হ্রস্বসো যো।

ভবনি বপু তনুয়া হস্ত সর্গঃসহায়ঃ

অকস্মিৎবিন্দুগ্রাণবাহাঃকোমলঃ।

উদ্ভট-সামর্থ্যঃ (দ্বিতীয়-প্রবাহঃ) ১৮ স্রোতঃ।

সমস্তা—“সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে !”

উত্তর দবার তরে হর অবনত,

ক্রীদন ব্যথিতে করে ক্রীদন মিহত ;

হ্রস্ব পাণ্ডু স্পন্দোপ কবিরবার তরে,

‘সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে !’

(৪৫)

একদিন মহারাজ দ্বিতীয়-চন্দ্র রস-সাগরকে এই সবকানী পূরণ করিতে দিলেন :—“সে নারী ত নারী নয়, ষ্টিক নিশাচরী।” রস-সাগর মহাশয় মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এই সমস্তানী তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্তা—“সে নারী ত নারী নয়, ষ্টিক নিশাচরী।”

সে নারী পতির প্রতি বরা না ভাবিয়া

কেমন তাহার খনে রয়ে ভাষাইয়া ;

সে নারী পতির রূপি হানি’ বাক্য-বাণ

ক্ষিপ্ত করিয়া তাহা করে খান্ খান্ ;

সে নারী তমর কিংবা তমরার প্রতি

নাহি রাখে বরা মাদ্য কিংবা আর ঐতি ;

সে নারী চীৎকারে করি’ কাটায় সেনিনী,

সে নারী ভরতে পূব ভূগতির বনি ;

সে নারী সর্বত্র করে নাদিকা-কুকল,

সে নারী সর্বত্র করে অস্ত্রের বচন ;

সে নারী উন্নত রহে ধইয়া কলহ,

সে নারী বিবাদ-জিত্তা করে অধরহ ;

সে নারী শিতার গুহে করিয়া পদম

বার তার ঘরে করে শব্দন কোমল ;

এ রস সাগর করে,—সেবহ বিচারি’

‘সে নারী ত নারী নয়, ষ্টিক নিশাচরী !’

(৪৬)

একদিন রস-সাগরের শাস্তিপুর-নিবাসী এক বন্ধু তাঁহারকে এর কহিলেন, “হাটের জাদা হজু চার।” রস-সাগর তখনই তাঁহা পূরণ করিয়া বন্ধুকে পরম ঐকিত করিয়া দিলেন :—

সমস্তা—“হাটের জাদা হজু চার।”

উকীল খোজেন সন্ধ্যায়, কোকিল বসে বার,

অত্রবাদী গেলু’ নিত্য,—কোন্ দিব কে লজা পায়।

সাদু বোঁদে পদার্থ, লম্ফ খোজেন বেজারায়,

গোবদাসেতে বেসে বেসে, ‘হাটের জাদা হজু চার।’

(৪৭)

মহাত্মা গান্ধী-জ্যেষ্ঠের একজন ভ্রাতা ব্রজবানস (বাঁক) ও অজ্ঞাত
মাদক দ্রব্য সেবন করিত। সে ব্যক্তি একবিঘ্ন রাজ-সভার আশিষ্য
সেশার কোঁচের সহযোগিতায় কথার কোনও উত্তর দিতে পারেন নাই।
তখন সে পাঁজার বেনার অতিভূত ছিল। তখন মহাত্মা রস-নাথের
দিকে সহজ-মনে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন “হায় রে ব্রজবানস!
বড় ভোর জাতি।” রস-নাথের হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া
ছিলেন :—

সমস্ত—“হায় রে ব্রজবানস! বড় ভোর জাতি।”
আম্রোহে কিনিতে চায় নবাবের হাতী,
চাকর রাখিতে চায় নবাবের মাতি।
মাথার দিকেতে চায় নবাবের হাতি,
নম্বর বারিতে চায় বেগমের প্রতি।
বিবিধ বেলার খোঁকে এল দ্বর্গতি,
‘হায় রে ব্রজবানস! বড় ভোর জাতি!’

(৪৮)

একদিন মহাত্মা গান্ধী-জ্যেষ্ঠ সভার বসিমা রস-নাথের ও অজ্ঞাত
লোকের নিকটে মহাত্মা জ্যেষ্ঠের অবস্থার সহিত বীর অধঃসার
তুলনা করিয়া চুপে একপাশে করিতেছিলেন। তখন রস-নাথের
মহাত্মাকে কহিলেন “আপনার তখনকার বাজপেয়ী বুড়া বহানইই,
আপনার বাবতীর মূখ্যবৎ বড় আয়শাৎ করিয়া গিয়াছেন। ইহা
তিনিই মহাত্মা ধীর্ঘ-নিশাণ পতিতাস করিয়া কহিলেন “হায় রে
পিতৃব্য।” তখন রস-নাথের এই সমস্তা এইভাবে পূর্ণ করিয়া
ছিলেন :—

সমস্তা—“হায় রে পিতৃব্য।”
কি আর বসিধ বিখ্যাতর তবিতব্য,
ছান হুঁড়ে লংগে বার ওমকাত্র্যব্য।
বাবশাহী ব্রিগিন বত ছিল উপজ্যোবা,
আননের বন্যে এতঃ ‘হায় রে পিতৃব্য।’

(৪৯)

একদিন রাজ-মণ্ডার এর হইল “হায় হায় হায়।” রস-নাথের ইহা
এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্তা—“হায় হায় হায়।”
তনর কাননা করে পিতৃ-বন-হরি,
পাওড়ী কামনা করে জাখাই-বর করি।
বধূর কানবা মনে বতরকে পারি,
এ বড় আকর্ষী কথা ‘হায় হায় হায়।’

(৫০)

মহাত্মা গান্ধী-জ্যেষ্ঠ সাধু ও সন্ন্যাসী নইরাই কাল বাপন করিতেন।

বিষয় কর্তে তাঁহার কিছুমান আধা ছিল না। একথা তিনি কয়েকটা
সাধু লোকের সঙ্গে বসিয়া সম্ভাষণের অন্তিমভাও অপঘিততার সময়ে
কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, “তুমিই হইয়া হরি! হারাগাম
এইকাত্র।” রস-নাথের তৎকথাৎ ত্তিক্ত-ভরে এই সমস্তা পূর্ণ
করিয়া দিলেন :—

সমস্তা—“হারাগাম এইকাত্র।”

হার হার হারাগাম, বিজ কর্তে তুই,
পূর্ণ কথা নাহি মনে,—কি নান, কি গোত্র।
ভ্রমের পরমানন্দে ছিলার পতিত,
তুমিই হইয়া হরি! ‘হারাগাম এইকাত্র।’

কয়লায় খনি

[শ্রী ব্রহ্মচন্দ্র রায়চৌধুরী]

পাখুরিগা কয়লার ব্যবহার আশাবের বেগে ক্রমশঃই বিবৃতি লক্ষ
করিয়াছে ও কহিতেছে। ইহার অত্যাগে পাটের কল বন্ধ, ময়নার
কল বন্ধ ‘৬ মাসের পথ ৬ দিনে’ বহনকারী আশাবের আয়ের রেল-
পাড়ী বন্ধ। এখন কি সুতোর এতেক্ষক লোকের ভাত বন্ধ। তদু
লম্বর কেন, আশকাল গণীয়ায়ও ইহা বিশেষ ‘ভাবে এতদ
করিয়াছে। হুতরাং এক কথার বলিতে গেলে, কয়লার অত্যাগে
স্রাবাবের ‘ধাঁকি দিকার উঠে’।

কয়লার সহিত আশাবের এক বসিধ লম্বা। কিন্তু কয়লা ভিতরে
বা কোণার হয়, কি উপায়েই বা তাহা বনন করা হয়—তাহা যোগ হয়
খুঁ খুঁ আর লোকেরি জায়েন। এই কারণে পাখারগের অবগতির ক্ষয়
আদি এ সময়ে ছুই এক কথা বলিতে চাই।

কয়লা ভিতরে উপলব্ধ হয় তাহা জানিতে হইলে, একটু তুতবের
আলোচনা প্রকার; হুতরাং তুতবনিম্বণের সাধ্যা আশক্তক।
এই পৃথিবী পূর্বে ভিতর ছিল, এবং ভিতরই বা বর্তমান দৃষ্টিতে
পরিণত হইল, ইহার উপলব্ধি বা নিম্নে কি কি লক্ষ্য বর্তমান,
এই সমস্ত বিব্রি করা তাঁহাদের কাণে। বসিধ বিজা তুতব বিজার
একটি প্রশ্ন আর। হুতরাং এই যে পৃথিবীর অত্যন্তর হইতে
আবদা কয়লা, বর্ষ রৌণা, হীরক ইত্যাদি পাইতেছি, এই সবস্তর
জট আদরা প্রধানতঃ তুতবনিম্বণের নিকট বসি।

এই বিশ্বদীর্ঘ বাস্তবিকই এক আকর্ষা ব্যাপার। কোথা হইতে এই
বিষয়ের দৃষ্টি? কেমন করিয়া ইহা বর্তমান আকারে বাস্তব করিল?
এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নানা বুদ্বির নানা মত আছে। তবে আমরা যে সমস্ত
সোলমালের ভিতর থাকিব না; কারণ তুতবের আলোচনাই আশাবের
প্রধান উদ্দেশ্য নয়। হুতরাং আদরা এগুলিত হুতরাই অনুমান করিব।
তুতবনিম্বণের বসে পৃথিবী প্রথমে একটু পলিত প্রকৃতি ছিল।
তাঁহার পর ক্রমশঃ তাহার বহির্ভাগ ঝিলন হইয়া কঠিন দৃতিভার

পরিণত হইল। এই দুইরূপ উপরিভাগই আবারে বর্তমান বায়ুহীন। ইহার অত্যন্তর যে এখনও অস্তিত্ব পায়, তাহার বাসেই প্রমাণ আছে। যে কোন ধর্মি মধ্যে অবতরণ করিলেই স্থিতিতে পাতা যায় যে, বত নিয়ে বাওয়া যায়, তাগ তর্কই বৃষ্টি আত বহু। যেটাইটু তাগে এরূপ বলা বাইতে পারে যে, ভূখণ্ডের স্তোভক ৩০ ফিটে এক ত্রিভুজ করিয়া উতাপ বৃষ্টি আত হয়। যদি এই পত্রিকায়ে ক্রমশঃই বৃষ্টি আত হয়, তাহা হইলে ১০০০০ হাজার ফিট নিয়ে তাগ হল ভূতাইতে এবং আরও নিম্নের তাগ শিলা গলাইতে সক্ষম হইবে। ইহা বাতীত আরো-গির্মা, উল্ল প্রবণ ইত্যাদি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের প্রমাণ দেয়।

যেমন পৃথিবীর উপরিভাগ নীচল হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে পলিত ওড়ণিত খেঁদনকারী খাপণ্ড (mus) নীচল হইল। তাহা হইতে হল প্রস্তুত হইল এবং ক্রমশঃ তাহা বর্তমান আকারে ধারণ করিল। পৃথিবীর উপরিভাগ নীচল হওয়ার তাহা সমুচিত হইতে লাগিল; এবং তাহাতে উপরে বিলম্ব চাপ (Pressure) পড়িতে লাগিল। এই চাপের বাহা পূর্বেরে বৃত্তিকা সূপ বসে হইতে ও যান-যানে ভাঙিতে লাগিল। পৃথিবীর এই লগেচেন ত্রিধা এখনও চিত্রিতঃ; তবে পৃথিবীর কল যেমন বৃষ্টি পড়তেছে, ভূপৃষ্ঠও তত পুরু হইতেছে; এবং ইহার চিত্রেরে পলিতাংশ পূর্ণাঙ্গেকা অনেক সক্ষর-পড়িতে নীচল হইতেছে। ব্রততঃ ইহার সত্যচেন-ক্রিয়াত পূর্ণাঙ্গেকা অনেক কম। ইহা বাতাই প্রমাণ হয় যে, নীচল পলিতাঙ্গ প অনেকা পুরাতন পলিতাঙ্গ (rock) ভেদে এক প্রকরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে।

এইরূপে অনুৎপাতে, কলমারাসপাতে এবং সর্ব্বথা তাগ বিকীরণে পৃথিবী নীচল হইতে লাগিল; ভূপৃষ্ঠ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল এবং তাহাও অত্যন্তর পলিত বাতুসমূহ বীর-বীরে কামিত প্রাপ্ত হইল। কামিত হইতে শিলা নির্মিত হইল। পুতবদ্বিধ এই শিলা (rock) দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন,—

১। আগ্নেয় (Igneous).

২। জলজ (Aqueous).

১। আগ্নেয়।—

আগ্নেয় পর্ব্বতাকারী পলিত নিঃস্রাবের দ্বারা পলিত ওড়ণিত পিত্তল হইলে সেই শিলাকে আগ্নেয়শিলা (Igneous rock) বলে। ইহাদের কোন বিশেষ আকার থাকে না, কিংবা সাদা থাকে না (Not crystalline)। ইহা পৃথিবীর চাপে ভিতর হইতে পলিত অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া উঠে এবং তাহার পিত্তল হইয় কঠিন হয়।

২। জলজ।—

পূর্ব্বেরি বর্ণনাক্রমে, পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ বতই সমুচিত হয়, তাহার চাপে পুরাতন শিলাময়ক স্থানে-স্থানে ততই ভাঙিতে থাকে এবং তাহা বৃষ্টি-জল দ্বারা বৌত হইয়া বাতাসের সাহায্যে নবীত অগ্নিরা পড়ে এবং নবীত গঠিত পলিত হইয়। নব্য নবী সমুদ্রে

পতিত হয়, যে স্থানে তাহার প্রোতপতি ঘন হয় এবং বাত্যা ও কর্ভম পক্ষতর রূপে বিস্তৃত হইতে থাকে। এইরূপে ভরে-ভরে সম্বিত হইয়া বাত্যা ও কর্ভম রূপে উপরের চাপে কঠিন হইয়া উঠে এবং শিলার পতনত হয়। এই প্রকার শিলার বিভিন্ন ভাব থাকে এবং ইহা অগ্রেস্তো দ্বারা উপেক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে জলজ বা জল-বিভক্ত শিলা (aqueous or Stratified rock) বলে।

এই সমস্ত শিলার উপর-প্রান্তর ঘেষের বা অধি-পত্রের বা উদ্ভিদের ছাপ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই সমস্ত শিলা ভরে-ভরে সম্বিত হইবার সময়ে, ভাৎকালিক কোন উদ্ভিদের বা কীটজন্তর যেযাবলেন তাহার উপর পতিত হইয়াছে; এবং উপরের ভরের চাপে তাগ পড়িয়াছে (ইহাকে fossil বলে)। ব্রততঃ এই সমস্ত ছাপ দেখিয়া সেই শিলা কোন্ সময়ের, তাহা বলা বাইতে পারে। ইহা হইতেই স্তর-বিস্তৃত শিলা (Stratified rock) চারিত্র্যে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীর প্রমাণবাহ্যর সঙ্গীত প্রাণীর অস্তর ছিল না; তবে ক্রমে পৃথিবীর বহির্ভাগ বত উঠল হইতে লাগিল, ততই বৃকসভাবি ভাঙিতে লাগিল এবং বীরে বীরে প্রাণিময়পতের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

Stratified rock এর বিভাগ

4. Cretaceous—(বর্তমান জীবন)
3. Mesozoic—(বধ্য জীবন)
২. Palaeozoic—(পুরাতন জীবন)
1. Azoic—(জীবনের চিহ্ন নাই)

ইহাও আবার পুনর্বিভক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে Palaeozoicএর বিভাগই আবারের দরকার।

Palaeozoic—	Pérmian.
	Carboniferous (অসায়ক)
	Devonian.
	Silurian. (প্রথম বংশজাতী)
	Cambrian. (জীবের আবির্ভাব)

ইহাদের মধ্যে Carboniferousএর বিভাগ আবারে আবিস্কৃত; কারণ, ইহা হইতেই আমরা কয়লা প্রাপ্ত হই—

Carboniferous	3. Coal
	2. Millstone gri
	1. Carboniferous limestone

কলার উৎপত্তি:—

যেখানে যেখানে কয়লায় ভর আছে, পূর্ব্বেরি ঐ সকল স্থানে পতীর্ষ অবস্থা ছিল। ক্রমে ভূপত্রেরে পড়িতে ঐ সকল স্থান ভলে নিম্নর হয়; এবং ক্রমে বাত্যা ও বৃত্তিকা ভর তাহার উপর পড়িত হইতে থাকে। ঐ সমস্ত বাত্যা ও বৃত্তিকা এখন বাতুকামিলা (Sand-stone) ও শূণ্ণধরে (Shale) পড়িত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বৃকসভাবি পলিতা উপরের চাপে ও আভ্যন্তরীণ চাপে কঠিন হইয়াছে। ইহার

একটি বস্তু কখনও-কখনও কয়লায় উপর বৃক্ষশস্যের বা বৃক্ষের স্তর কোন কোনের জাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়লার সামান্যিক বিশেষণ দ্বারাও ইহার কতক অংশ পাওয়া যায়। বৃক্ষশস্যাদি কতদিন পড়িলে যে কয়লার পরিণত হয়, তাহা বলা কঠিন; তবে বহু বেশী দিন ধরিয়া পড়িলে, কয়লা ততই ভাল হইবে।

স্তর-বিশিষ্ট শিলার গঠন—Structure of Stratified rocks

পূর্বেরই বলিয়াছি যে, দুইভাঙ্গা বা ত্রাসুভাঙ্গা স্তর-স্তরে ভবিষ্য উপরে ঢাপে কঠিন হইয়া শিলার পরিণত হয়। যখন ইহার সঠিক হয়, তখন ইহাদের স্তর সবল থাকে; কিন্তু সত্যজাত দেখা যায় যে সবল নাই।

(বলিতে নিম্নলিখিত ভূত্বক-বিজ্ঞানের কতকগুলি কথা সর্বদাই ব্যবহৃত হয়)।

Dip এবং Strike :—

শিলাস্তর প্রায়ই সবল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা যে দিকে ঢাপ, সেই দিকেই নাল dip। ইহা সবলতমের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, সেই কোণের দ্বারা ইহার নাল বুঝা যায়। কিন্তু বলিতে dip কোণ দ্বারা বুঝা হয় না।

ক ব যদি শিলাস্তর হয় এবং ক গ যদি সবল দেখা হয়, তবে—



অর্থাৎ dip = 1 in 12 (১২ তে ১)

যে স্তর dip এর সহিত সবলকোণে অবস্থিত, তাহাই Strike, অর্থাৎ dip বহি উত্তর-দক্ষিণ হয়, তবে Strike পূর্ব-পশ্চিমে হইবে।

Out crop :—যেখানে শিলাস্তর আঙ্গি। ভূপৃষ্ঠের সহিত মিলিয়াছে সেই স্থানকে সেই স্থানের out crop বলে।

কয়লা-স্তরের বিঘ্ন—Disturbances in coal seam

Fault :—এখানে বলিয়াছি যে, যখন কয়লা বা শিলাস্তর ঢাপে, তখন সবল থাকে; কিন্তু পরে ভূপৃষ্ঠের ঢাপে ও ভূকম্পাদি উপস্থানে ভ্রষ্টতালি স্থানে-স্থানে বিপর্যাস ও ভ্রষ্ট হয়; এবং হয় ত একজায় উর্ধ্বে উৎকিষ্ট হয়, কিংবা নিম্নে নামিয়া যায়। কয়লা-স্তরে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Fault বলে। দুইটি স্তরের মধ্য কয়েক বর্গ হইতে কয়েক মাইল পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থর উর্ধ্বে উৎকিষ্ট হয়, তাহাকে up throw, এবং বাহা নিম্নে নামিয়া যায় তাহাকে down throw বলে।

Fault এর স্তর ভাঙার লক্ষণের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার নাম Hade। ইহা ষাট স্তর-বিন্দুর সাধারণ পাওয়া যায়। যখন কয়লা, আদি একসি কয়লার স্তর পার্শ্বাধিক; এবং বেশীমান, তাহাতে একটি Fault আছে; কিন্তু সেই fault down throw কি up throw, তাহা জানিতে না পারিলে, আদি সেই স্তরের কয়লা পাইব কি না, কিংবা অবশিষ্ট অর্থ নাই হইবে, তাহা বুঝা যাইবে না। Hade হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। কোন কোণ কোন কয়লাস্তরের স্তর ঝিকাইলে, fault যদি তাহার দিকে কুঁকিয়া আসে, অর্থাৎ কয়লাস্তর ও fault এর ভিতরের কোণ দুগুণকোণ হয়, এবং নিম্নে ঝিকাইলে Fault তাহার দিক হইতে দুই গুণ থাকে, অর্থাৎ কয়লাস্তর ও Fault এর ভিতরের কোণ তুলকোণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, যেখানে down throw হইয়াছে। Up throw নিম্নে ইহার বিপরীত।

Dyke :—পূর্বেরই বলা হইয়াছে যে, যখন কখনও নিম্ন হইতে আগ্নেয়-শিলা পগিত অবস্থার উৎপাদন তখন কয়লা উর্ধ্বে; এবং তাহার দিক ইহা কঠিন হয়। এ কয়লার স্তরের ভিতর শিলা উঠিলে ইহা উত্তর পার্শ্বের কয়লা কিছু দূর পর্যন্ত বহুত ও অপাণ্ডিত হইয়া যায়। ইহাকে dyke বলে। ইহা সাধারণ শিলা অনেকা দূর কঠিন। তেল অথবা ইহা কঠিন করা যায় না। ইহার ভিতর বিদ্য পথ করিতে যেমন Dynamite (ডিনামাইট) বিস্ফোটারিয়া তখন পথ ক হতে হয়। এইগুলি ব্যতীত কয়লাস্তরের আগ্নেয় অনেক বিঘ্ন আছে; কিন্তু অগ্রগতাবধিও যোবে সেগুলি বিদ্যমান নাই।

কয়লার বিশেষণ ও পার্শ্বক :—

সামান্যিক বিশেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, কয়লা বিভিন্ন একালের আছে, এবং তাহাদের গুণও বিভিন্ন। বৃক্ষশস্যাদি স্রব-পরিবর্তনের কয়লার উৎপত্তি; দস্ত্রাঃ পরিবর্তনের পরিবাপ অনুসারে কয়লার ভগ্নের পার্শ্বক হয়। যে কয়লা পরিবর্তনের শেষ সীমার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা। নিম্নে বিভিন্ন একতার কয়লার নাম, ও তাহাদের সামান্যিক বিশেষণ দ্বারা বাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া গেল।

অম্লার উৎপাদন অম্লানু ও বস্কাহাদান

১। Peat—(Carbon) (Hydrogen) (Oxygen & Nitrogen)
পতকরা ১০ ৬ ৩৪

ইহাই কয়লার প্রথম স্তর।

২। Lignite ১০ ১৬ ২৪
ইহা Peat এর ক্রমোত্তর। ইহার ২১ ভাগ, ষ্টিক কয়লা নয়। ইহার তাপগতি কম ও ইহাতে ভস্ম (ash) বেশী।

৩। Gas coal—ইহাতে উদ্ভাবন (Hydrogen) ভাগ বেশী; সেজন্য ইহা পান প্রভৃত্ত কবিতার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

C H O & N

Gas coal— ১০ ৬ ১০

৪। Bituminous Coal—ইহাই সর্বোত্তম আদায় ব্যবহার করিয়া থাকি। House coal, Steam coal, Caking coal সব ইহা হইতে হয়।

House coal—ইহার রং কাল এবং চকচকে। ইহা সহজেই জ্বলে এবং ইহার ভাগ বেশী ও ধূম (Smoke) ও তণ (ash) কম।

Steam coal—ইহার রং কাল, কিন্তু চকচকে নয়। ইহা (Dull black)।—ইহা House coalের জন্য অল্প মিশ্র যোগে না। ইহাতে ঘূষ কম কিন্তু ভাগ ঘূষ বেশী। ইহা ঘনিতার সময় পিঠাকার হয় না (do not cake)।

Caking Coal—কোক প্রভৃত্ত কবিতার জন্য এই কয়লা ব্যবহৃত হয়। ইহা শুঁড়া করিয়া একটি আবদ্ধ পাতে আলাদা হয়—এবং ইহা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পিঠাকার প্রায় হয় (cake together); এবং ইহার জ্বলিত ও বাষ্পের অংশ উড়িয়া যায়। যে সব কয়লা উড়িয়া যায়, তাহা হইতে Coal-tar, ammonia ইত্যাদি অনেক মিশ্রিত পদার্থ বাহিরে পাবে। সাধারণতঃ কোক প্রভৃত্ত করিতে হইলে, কয়লা আবদ্ধ পাতে না আলাদা বাহিরে একত্রেই সঞ্চিত করিয়া আলাদা সেওয়া হয়; এবং কিছুকাল পরে মল বিহীন নিভাইয়া সেওয়া হয়।

C H O & N

Bituminous— ১৫ ৫ ১০

৫। Anthracite—ইহাই কয়লা-প্রকারে সেরা পরিবর্তন এবং ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা। ভারতবর্ষে ট্রিক্‌ anthracite পাওয়া যায় না। কেবল হাউলিংএ একটি বহির্ভূত প্রকার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রকারে বনজ (thickness) কম হওয়ায় তাহাতে খসক বেশী পড়িলে বসিয়া, সেখানে কাছ হয় নাই। Anthracite এবং সেরা কাল এবং উৎকৃষ্ট। ইহা সহজে জ্বলে না এবং Bituminous coal অপেক্ষা ইহা শক্ত ও তরঙ্গপ্রবণ। ইহার উত্তাপ ঘূষ বেশী এবং ঘূষ একত্র নাই বগিনেই হয়।

C H O & N

Anthracite— ২৫ ২.৫ ২.৫

সাধারণিক বিবেচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়তঃ, যে কয়লায় কার্বনের (Carbon) ভাগ বড় বেশী, সেই কয়লা তত উৎকৃষ্ট; কারণ, তাহা হইতে বড় বেশী উত্তাপ পাওয়া যায়।

আমাদের এখানে অধিকাংশ কয়লা করিয়া ও রাসায়নিক হইতে পাওয়া যায়; এবং এখানকার মধ্যে পরিচিত কয়লা সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা ই, আই, আর—কোম্পানীর ঘনি। আর খেন্ড্রিসনের কয়লা পুনিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এখানকার বনিত পল্লীরা পুনিবীর সব ঘনি প্রকারে বেশী, সেই জন্যই ইহা এত উৎকৃষ্ট।

মুসলমান কবির বৈকণ-পদাবলী

[শ্রীমাকুল কবির সাহিত্য-বিবরণ] .

প্রাচীন কালে মুসলমান কবির বৈকণ-পদাবলী বা বাণ্যকবির কীল্য-বিষয়ক কবিতারূপে রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন আর নূতন কথা নহে। অনেকই জানেন, নবীরা—সেহেতুপরের কবিতার পরলোকগত বাণ্য রচয়িতাদের যমিক দশাশ্রমই সর্বপ্রথমে মুসলমান কবিরদের করতলি বৈকণের সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-সমাজের গোচরে করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এমিকে আদিত বহু পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া কাব্যানুশীলনের আদায় বর্ধন করিতে থাকি। আবার সংগৃহীত পদগুলি একত্র করিয়া যাকসাহীর হুসনিদ সাহিত্যিক দ্বন্দ্ববৎ শ্রীকুল ব্রহ্মবর সাধারণ দশাশ্রম করত বঙ্গের পূর্বে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া নেন। ইতোমধ্যে আমি আরও বহু পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকার পুণ্ডিত্য আবিস্মিত হইবেন, একমাত্র আমার প্রার্থনা প্রভু মুসলমান কবির সংখ্যা এখন পঞ্চাশেরও উপর উঠিয়াছে।

সম্রাট আরও অনেক নূতন ও পুরাতন কবির অনেক নূতন পদ আমার হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি পদ গত বৎসর 'বৃহৎ' 'ভায়তবর্ষ' ও 'চাকারি' তিষ্ঠিত ও সঞ্চিত' পরে প্রকাশিত হইয়াছে। আর আমার আরও কয়েকটি নূতন পদ এখানে প্রকাশ করিতেছি।

এই প্রকারে সেরা সর্বকণ ৫টি, শাবানের ১টি, বীর কল্লোয়ার ১টি, সেগ কবিরের ১টি, মনোহারের ১টি, আবাহারের ১টি, আদিত্যবীর ১টি, মোহাম্মদ হানিরের ১টি এবং আবাহারের ১টি—মোট ১০টি পদ প্রকাশিত হইল। এই সকল কবি নূতন নয়েন। কিন্তু তাঁহাদের পদগুলি সম্পূর্ণ নূতন বটে।

১০০০ সন্য সনে বা ১০০০ শকাব্দে লিখিত 'রাগমালা' নামক একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থের ভিতর এই সকল পদ পাওয়া গিয়াছে। বাহারি কবিরও প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করিয়াছেন, তাহারো বেশ আদরত আছেন যে, একবার প্রতিদিনের সাহিত্যে সেকারো কিছু সম্পূর্ণ নির্দল্লগে প্রচার করা বড়ই কঠিন। এই কারণে পদগুলি হাতে-হাতে অসংখ্যরূপে প্রচার গুলিগত হওয়ার পূর্বে লজ্জাবৎ রহিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের সংস্কারের ক্ষমতা কার্যকর নাই। একজন আদায় পদগুলি প্রাইই 'দশা সূত্র' তথা লিখিত' করিয়া প্রকাশ করিলাম।

যে দেশে বড়-বড় কবিরদেরই পরিচয় পাওয়া যায় না, সে দেশে এ সব সূত্র-সূত্র পদ-রচয়িতা কবিরদের পরিচয় কোথায় পাওয়া যাইবে?

ব্রহ্মবর বাণ্য 'মুসলমান বৈকণ কবি' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থটির মুদ্রিত ইহাওয়ে জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া কেবল এই কথা বলিয়া রাখি, ইহাও পূর্বে সত্য বটে তাহাওই কাব্য-কালনের কোমল ছিলেন। তাহাদের নবর সেহেতু কান্ হুহু অকৃত্যে মগ্নিতে দিগন্ত দিগন্তে; কিন্তু তাহাদের পরিত্যক্ত বীণা এত ঘনি পরে আমার

বিস্তৃত হইয়া উঠিয়া, দেশবাসীর আগে কি অকৃতপূর্ণ আবেশের সকার
করিতেছে !

নিম্নে গবেষণা উদ্ধৃত হইল :—

रा.प्र.—विष्णुजी ।

आत्म ब्रह्मेन्द्रात्मनस्तत्त्वमसि ।

যশুধাত্তে (অম্বে) দুই গোবিন্দ পাইলুম ৪ ৬ ।

কথা (১) হচ্ছে আইলা-বল বৈদ্য তত্ত্ব অনুযায়ী।

आणि हाचि निज कालावधीनी येथे ।

କଥା ହେଉ ଆଇନା ବନ୍ଦ କର୍ମେ ଶାନ୍ତା ବୁଲି ।

ସୁଧେଶ୍ୱର ମାଧୁକୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଳାସୀ ଗୀତି କୁଳ ।

मैत्रेय पर्व, अ० २८२ अ० १००० ।

ভাষা-বিশেষে অর্থ হয় শিলা ।

बमलु गिफ्त ।

নাগর জাএরে বাইরে মন্দিরে

ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ମିଷ୍ଟା ବ୍ରାହ୍ମା ନୃମିଷ୍ଟା ବିନାଶିଷ୍ଟା ବୀଜେ ବାହେ ଯେ । ୫ ।

ଅକ୍ଷୟ କୁନ୍ଦନିତ ଚକ୍ରପତି ମାଲେ । (୭)

দ্বিঃ কাকোদ্ধা কহে অগস্ত্য দিগা ।

সামন্ত্য বহুসনে বহুবহে (১১) দিগা ।

বানশী—বেলাবনী ।

অকি অগস্ত্য রূপে রমণী বন বনি ।

চলিতে দেখিল বলরামরমণী বনি বনি । দুঃ

কালমে রক্তিত নয়ন বনি বনল তালে

অবহা জোমল খিলল কনক বনে ।

ভয়ান না কর বনি বনি অতি মাতাখানি

কুচগিরি কলয় তরে ভারি না গড়িব দৌবনি ।

দুশরী চান্দ সুখি বচন বোলসি হাসি

অধিমা বরিষে জানি বৈষ্ণবে নরকে পুণ্য পশি ।

সেব করিবে ভগ্নে অহি (১২) ভগ্ন পায়বে জালে

কলতান দরিয়া সাধা জুড়িছে কলম বনে ।

“ ছুই—বেলাবার ।

নাচে কাহু দুনি দুনি (১৩) রমণী সমাধে ।

কুচু কুচু কাকে কলকিত থাকে । দুঃ

কিনি কিনি কিকিণী নগুর কি রিদি রিদি

তবু বণু পুহ পুহ গুহে রত থানী ।

দুবক কর্তীয়া । নাচে তথিঃ ভারিখা

ভিকিট রিদি ভিকিট বাল্যে ভাণাবর খেমা ।

কাকে উড়ে গারে (গড়ে) শপি কলকএ রাপি রাপি

থাকে উড়ে থাকে গড়ে সকে জাম থানী ।

হলসর নাট পুরে সাধুর এ নটবরে

ভর রসে তা বনি ভগ্নে মনোমরে ।

রাগ—আখির পরহ ।

আজু সেই কি দেখিগুঃ বপনে ।

বিবিত বিদল হরি বিলসি আশনে । দুঃ

সায়র সমঃ (সময়ে) মেনে আদিনি উকল ।

কলকিত কেল আতা চরক চকল ।

নখাবে লালিল রূপ আশি আচুবিহ ।

আখিতে হারাইগুঃ হরি পোকে বয়ে চিত ।

কি দেখিগুঃ কি হইল পলক অস্তর ।

ভলগল পাইবে পুনি কহে বহুবহ ।

কোড়া ।

লখন ন মার হুঃ লখন ন মাঃ ।

কৌবন চলিমা সেলে শিরা না বোলাএ ।

সব মারী জিহা লনে করে আনিখিত ।

আখার মনিরে জিহা কেনে যে খকিত ।

বকম বেবন গুঃ হুতাপে বহে জিহা হানি দ্বিঃ ।

হেরিতে শিরাঃ পুঃ আবি হেল খৌণ ।

আজু কাণ্ডা করি বিন বেগ বইয়া ।

না জরিগুঃ জিহা খোর কৌবন খেটীয়া ।

এখাওয়া করে বনি ভল গুঃ পয় ।

কবচতলে শিরা বেব শিরাঃ সপায় ।

এই বোর কপালে ছিল এগোনো ছাতি সেলে

সবী সেই খাব বহুহাতে ।

বহুগাতে এগবন চল চল সনাপন

ছাতি খেল দখা এগবনায়ে ।

রাবা মনু বীন-। খ জুদি বিনে পয়মায়

জুদি বিনে আখার জুলায়ন ।

শ্রীমানিমদ্বিনে করে ভল রাখে বহাগরে

কুঃ সাথে ছইব বরসন ।

কানড়া ।

নব পৌবনী বোর রূপ নিরাফতে

না রখে পরাশি । দুঃ

বহুনাঃ জলদেয় জাইতে সনদী চলিল নাখে

লায়ে মারী না বোলাই বহুহে (১৪) ।

আকলে চাকিরা কুঃ মনেক হইল হুঃ

কান্দি কান্দি আইগুঃ নিম্নায়ে ।

উকল বকল (১৫) বটি বামিতে নকট ততে

নাখিয়াছে এ চক্রাবতী ।

টিলেক হাতাই জাত জুড়াক ভায়ের গাও

কলনী ভরিয়া বিগু আশি ।

কহিত বহুঃ আখে মাখার সপন পাগে

রাবা (১৬) হুকাই গড়ে পানি ।

খাখার পানিএ সেটিন ভিজিল রে

কালা বুয়ে কে থিল আঙনি ।

জুদি নব পৌবনী কাঃ বস মোখিনী

ততে মেখি ঐকণ বানি ।

বোহাম্বর হামিমে করে এই না হুঃ গাঃ ময়ে

ভোর লানি তেজিগুঃ পানি ।

বামিগা ।

রে সাম বিসেস চাকুরি জোর (জোড়) ।

কণট না কর কৌঃ আ ।

(১১) বহুবহে—বহুবহঃ ; ভব হয় ।

(১২) অহি—ঐ ।

(১৩) দুনি দুনি—দুনি দুনি ।

(১৪) বহুহে—বহুহেঃ ; (১৫) উকল বিকল—উচ্চনীত ।

(১৬) রাবা—রাব ।

সাম্রাজ্য উপল। উত্তর-পশ্চিম দিকের সামরিক ক্ষমিত, অস্ত্রের
কনকনাদা' আয়তের আয়তনবে যেদিনে একপিত হইতে পারিল।
বিনা যেনে বস্ত্রপাত ভাঙিয়া নবীণ আটপাণ ইত্যদ্য: পলায়ন করিতে
পারিল। বহু সৈন্য হত হইল। কুয়ারবেগ, লাক্ষ্মণেন হত হইলেন।
তত্ত পোশিতের এখন প্রোতে সেই ভীষণ বনভূমি কখনো হইয়া
ভীষণতর হইল। যোগদগুণ পরাভিত হইল। হস্তাঘটতি দৈন্তগণ
লাহোরে প্রত্যাবনন করিল। এইরূপে শিগগণের সহিত যোগদগুণের
বিভীত যুদ্ধের অবসান হইল। অস্ত্রোৎস্রুত হইয়া হস্তাঘটিল জনপ
পরিভাগ করিলেন; পতঙ্গ অতিক্রম করিয়া কর্তব্যপূরে আদিয়া
অধিকৃত করিতে পারিলেন। হস্তাঘটিল করায় একটি বাদীন
সাম্রাজ্যশাসকের খাদ্য ভাঙার ভয়ে এখন হইয়া উঠিল। সেই
অতিক্রম সাধন উদ্দেশে তিনি প্রচুর সৈন্য ও নানাবিধ যুদ্ধসম্পদ
সংগ্রহ করিলেন এবং সুবিধাসহ যোগদগুণ আক্রমণের ব্যবস্থা
কুমিত্তে পারিলেন। যোগদগুণই উপস্থিত হইল। পাইকা খা নাথক
একজন পাঠান গুরু পায়িত প্রাত্য ছিলেন। ভাঙারের যোগে
অত্যন্ত বহুত্ব ছিল। একটি সাতাঙ করণে সে বহুত্ব ভীষণিতি
আশিষ্টাভ্যন্ত নই হইয়া যায়। এমন, কি উত্তরে-পশ্চিমের আশ-
বিনাশে উত্তর হইয়াছিলেন। গুরু তেওঁ পুত্র ভাবিতেন একটি
জেন পকী ছিল। সেই বিপর্যক খা নাথের আশে উড়িয়া
যাওয়ার তিনি উরা বিব্রণ করেন; সন্তানের অস্থিরে সন্ত
কিন্নারিয়া দিতে স্বীকৃত হন। ফলে, তিনি লাভিত ও প্রভুত
হইলেন। এই অশ্বদানের অভিযোগে লইবার ব সমার তিনি যোগদ-
গুণই সাম্রাজ্যের পরাধার হইলেন। সাম্রাজ্য তখন বিলীতে।

সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য গুরু কখনই অপরাজে হইয়া উঠিতেছেন। তিনি
সাম্রাজ্যের কটকবস্ত্র। পতঙ্গের প্রবল হইতে সেওরা অধিবাসকের
কর্ম; ভাঙাকে বহন না করিতে পারিলেন বিস্তারিত, বিস্তৃততার
সাম্রাজ্যের অবসান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তিনি ভাঙার বিস্তার
বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পতঙ্গের উত্তর পক্ষের একটি ভীষণ
সংগ্রহ হইল। যোগদগুণ তাহ দের প্রাণের পুনরুদ্ধার করিতে
প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিস্তারিত অবশেষে হর-
কোবিশের বিচীকতার ও তৎকর্তৃক পরিচালিত শিশুদৈন্তগণের
অতুলনীয় বীরের সেনা বৃহৎ হইয়া গুরু অশ্বদগুণই হইল। পূর্বে
সুইট যুদ্ধে যেওগ যোগদগুণ সেনাপতি নিহত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও
তাহাই হইল। পাইকা গুরু গুরু পায়িত ভাবারির দ্বারা
সমরশাধী হইলেন।

হস্তাঘটিলেই ভীষণ অশ্বদগুণ বাগ দিহের সহিত বৃহৎ করিতে
হইয়াছিল কিন্তু তিনি বৈ সমগ্র বীর বিদ্যাদী অস্ত্রের অস্ত্রের
যেলের অস্ত্রের করিয়াছিলেন। ভীষণের লক্ষ্যকালে তিনি তীর
আগ্রব অস্ত্রের পরিভাগ পূর্বেক শ্রিত শ্রিত বৃহৎ বহিত বৃহৎ পশত-
রাহি শোভিত কর্তব্যপূরে শান্তির ভীষণ বাগন করিতে পারিলেন।
কিন্তু সে বৃহৎ অশ্বদগুণ দ্বিগুণ হইল না। এই দ্বাবেই ১০২৪ খৃঃ
অশ্ব ভাঙার ভীষণীয়া সাক্ষ হইল। "হস্ত পায়িত হইল শেষ, অস্ত্রের
শব্দ"।

ভাঙার তিনি পাইকা ও পাইকা পুত্র ছিল। হস্ত পুত্র ভবনতর ভাঙার
ভীষণদগুণ বৃহৎ হওয়া তিনি তীর পুত্র হস্তাঘটকে তৎ নানাবীত
করেন।

চিত্র ও চিত্রকর

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

(১)

বিধবিন্যাস আশ্রয় ভাবনালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওস্তাদ ইশা
একবার বীর শিষ্টবস্ত্রের সহিত বিভিন্ন বেশ-প্রদেশের
স্থাপত্য শিল্প-কৌশলাদি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে-
বেড়াইতে গান্ধার্যায়ের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র পট্টা-প্রান্তে
অবস্থিত একটি বস্তু-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বস্তু-দ্বারটি
ক্ষুদ্র, অতি সাধারণ এবং প্রাচীন; বিশেষ-বস্তু-বস্তু
বসিলেও চলে। বিশেষে সাধারণ ইশা সাধে বস্তু-দ্বারের
ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভাঙার অশ্বদগুণের দৃষ্টি
একখানি সুকায়িত-প্রাণী আশেখোর উপর নিবৃত্ত হইল।

তিনি চক্ষু কিরাইতে পারিলেন না,—বিশ্বের অতিক্রম হইয়া
পড়িলেন; শিষ্যবস্ত্রাদিকে সন্ধান করিয়া বসিলেন—
"সেখ! সেখ!"

চিত্রখানির সমুদ্র-ভাগে শাখিত একটি বৃহৎ মৌলজী-
মুকুর চিত্র। ভাঙার এক হস্তে একখানি ধর্মগ্রন্থ, অস্ত্র
হস্তে একটি মুখের চিত্র। এই চিত্রখানিকে আদরে
ধরিয়া সে সমস্ত ভবন-মন্দির রাখিতে ব্যর্থ প্রয়াস
পাইতেছে। যেন তাহার আশা মিটিতেছে না—নৈরাত্তের
বস্ত্রাধ ভাঙার বৃহৎ কাটিতেছে। তাহার স্বপ্নের বহনমতল

ত চক্ষুধীর ভাব-বাক্যনা এইরূপ। আশেখানার পঞ্চাশগণে যুবকের চতুর্দিক রমণীয় চিত্রের অমূল্য একটা স্মরণীয় দৃশ্যের পূর্ণাবয়ব চিত্র। সে মনুসিংগে ঠেস দিয়া মুক্তে খুলিতেছে। তাঁহার এক হস্তে একটা নির্জলে দ্বীপ, অতঃপর হস্তে অবতর।

চিত্রখানির এক স্থান নির্দেশ করিয়া ইশা সাহেব বলিলেন—“এই স্থানে কাহার নাম লেখা ছিল বলিয়া মনে হইতেছে,—লক্ষ্মীতি কে তাহা তুলিয়া দিরাছে। চিত্রখানি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে অঙ্কিত।” একজন শিষ্য বিজ্ঞাসা করিল—“ওস্তাদজী, চিত্র-শিল্পী কে?”

চিত্তাক্লিষ্ট মুখে ইশা সাহেব বলিলেন, “হাঁ, আমি সেই কথাই জাবিতেছি। দেবীরা মনে হয়, বাদ্যপুলি চিত্রখানি আঁকিয়াছেন, বাজপেঠ রং ফলাইয়াছেন, নাইচু বিখ্যাত ইহাতে জীবন্ত ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন। মোট কথা, এই তিনজন প্রতিভাবান চিত্রকরের গুণগরিষের একত্র সমাবেশে বাহা হয়, আমাদের এই অজ্ঞাত চিত্রকর তাহাদের অপেক্ষাও প্রতিভাবান।”

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, —“চিত্রকরকে কোনও রকমেই পাইতেছি না। আমার ধারণা, এই প্রতিভাবান শিল্পী কাহারও নিকট অঙ্কন-বিজ্ঞা শিক্ষা করেন নাই। জীবনে তিনি এই চিত্রখানিই—সুখ এই একখানিমান চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঠিক এই ছবির মত আর একখানি ছবি তিনি নিশ্চয় আঁকিতে পারিবেন না। ইহা স্পষ্টিক ভাব-উদ্বেজনা ও প্রতিভা-উদ্বেগের ফল, সাধনার ফল নহে।”

আরও কিছুক্ষণ চিত্রখানি দেখিতে-দেখিতে হৃৎপ্রায় ওস্তাদ ইশা সাহেব উদ্ভাসের মত চাঁৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“চমৎকার! চমৎকার! একখানি নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য। একটা পবিত্র প্রেমের কাহিনী। চিত্র-করই নায়ক ও নাটককার!”

একজন শিষ্য বলিল—“ওস্তাদজী, আপনি কি রহস্য করছেন? বৃত্ত ব্যক্তি নিঃস্বের দৃষ্টি-চিত্র কি করে আঁকিবেন?”

দৃঢ়কণ্ঠে ইশা সাহেব বলিলেন,—“না—না, আমি ঠিকই বলছি। আমার লাবণ্য অন্তঃ। জীবিত ব্যক্তি কল্পনার দ্বীপ দৃষ্টি-বস্তু হুটীর তুল্য, এটা কি অসম্ভব? বস্তু

দৃশ্যের দৃষ্টি হইল, মৌলভী যুবকও মরিচ—অর্থাৎ সংসার ছাড়া সে বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন করিল। মৌলভীর পবিত্র ধর্মোদয় চিত্রে পরিপূর্ণ হইয়া যেন পরম্পরে তাহাদের অনন্ত যুগের সূচনা করিতেছে। আমরা এখন এই ব্যক্তিকে বুঝিয়া বাহির করিব।”

(২)

ওস্তাদ ইশা সাহেবের মস্তিষ্ক-প্রান্তে একজন বৃদ্ধ মৌলভী ‘সেমায়ে’ পড়িতে বসিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকট অসীম ভাবে দিয়া বলিলেন—“আপনি কি একবার মৌলভী সাহেবকে সংবাদ দিবেন? আমি তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রাপ্তি হইতে বাসনাহেব নিকট হ’তে আসছি।”

বাসনাহেব নাম শুনিয়া মৌলভী সাহেব বিচলিত হইলেন না, কিন্তু বিস্থিত হইলেন। তাঁহার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সাধনশীল বাদ্যসাহেব এমন কি আবৃত্তক! প্রকাশ্যে বলিলেন—“আমিই এই মস্তিষ্কের মৌলভী; আপনাকে কি আবৃত্তক বলুন।”

ভূমিকা করিয়া ওস্তাদ ইশা সাহেব বলিলেন—“আমার কৌতুহল নিবৃত্তি হইল আপনাদের সেমায়ে পড়ার বাধা দিয়া অগ্রাহ্য করছি। আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন।” মৌলভী সাহেব সংক্ষেপে বলিলেন—“আপনার অপরাধ কি, তা দেখতে পাচ্ছি না; এবং ব’লিই পেতুম্, তাও গ্রহণ করবার মত ক্ষমতা তো আমার নাই।”

ইশা সাহেব—“বারে সংসার বে চিত্রখানি রহিয়াছে, উজার চিত্রকর কে, যদি অগ্রহণ করে বলেন, আমি বিশেষ উপকৃত হই।”

মৌলভী—“ঐ চিত্রটি! হ্যাঁ—আপনি উপকৃত হন, বলেন কি! আমি নামটি বিস্তৃত হয়েছি।”

ইশা—“কি বলছেন আপনি! আপনি নামটি জানতেন, ভুলে যাচ্ছেন?”

“হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই বটে” সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া বৃদ্ধ মৌলভী পুনরায় ‘সেমায়ে’ বসিবার উপক্রম করিলেন।

মারুণ বনোভকে ইশা সাহেব বলিলেন—“আমি বাদ্যসাহেবের নামে আপনাকে একটা কথা বিজ্ঞাসা করছি।”

মন্তকোত্তোলন করিয়া বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব বলিলেন—“আদেশ করুন।”

সম্মিত হইয়া ইশা সাহেব বলিলেন—“আমি চিত্রখানি কিনিতে ইচ্ছা করি।”

মোলতী—“ইহা তো বিক্রয়ের বস্তু নহে।”

ইশা—“অন্ততঃ আমাকে বস্তু, আমি কি উপায়ে চিত্রকরের সাফাৎ পাব। আমি তাঁহাকে আমার আর্থিক ভক্তি ও প্রদ্বা জ্ঞাপন কর্বে। বাৎসরিক তাঁর বিবহ নিশ্চয় জানতে চাইবেন।”

“তা অসম্ভব। চিত্রকর আর নাই।” “তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।”

“ইশা—চিত্রকর মৃত।”

“চিত্রকর মৃত!” বীয়ে বীয়ে ইশা সাহেব বলিলেন—“কেহ তাঁহাকে জানি না,—বিশ্বভিত্তে প্রতিভা-স্বর্গ্যের অন্তর্নিহিত হইল। তুচ্ছ আমি! তুচ্ছ আমার গৌরব!”

কৌতুহলাকৃত হইয়া মোলতী সাহেব মিজাসা করিলেন—“আপনি কে?”

“জ্যোতি, আমি ইশা।”

বিখ্যাত স্থপতি-শিল্পী ওতাদ ইশার নাম শুনিয়া প্রজ্ঞা ও প্রীতিতে মোলতী সাহেবের বহনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ইশা সাহেব আশাবিত হইয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—“সাহেব আমাকে কি চিত্রখানি বেচিবেন না? চিত্রকরের নামটী মনে করিয়া বলিতে পারিবেন না?”

“অসম্ভব! আপনাকে বলিরাছি ত, চিত্রকরের সহিত পৃথিবীর কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি মৃত না হ’তও পাতের।”

“তবে তিনি বেঁচে আছেন। তাঁহার নামটী কি?” অধো হইয়া শিবামণ্ডলী মিজাসা করিল—“তাঁহার নামটী কি?”

“আমি আপনাদের বলিরাছি ত যে, সে হতভাগ্যের সহিত পৃথিবীর কোনও সম্বন্ধ নাই; সে কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহে। তাহাকে শান্তিতে মরিতে দিন।”

ইশা সাহেব বলিলেন—“তাতো হয় না সাহেব। খোঁসা বহন পৃথিবীতে এমন একটা প্রতিভা-বস্তু পাঠিয়েছেন, তখন তাঁর নিশ্চয় এটা প্রতিশ্রুতি নহে যে, শুধু সেই নিম্নে মজিয়া কোর হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর সকলেই তাঁহার ফল-ভোগের সমান অধিকারী। শুধু বস্তু, তিনি কোথায়

সুকিমে জাচ্ছেন—আমরা লোক-সমাজে তাঁকে বাহির করি! পৃথিবীর দৌরব-মাংসা তিনি বিতুষিত হেন।” মোলতী সাহেব বলিলেন—“আর যদি আমি কিছু না বলি?”

“যদি কিছু না বলেন, তা হ’লে—তা হ’লে বাধ্য হয়ে বাৎসরিক তাহা আমাকে সমস্ত বলতে হ’বে; তিনি বা’ হয় কখনে।”

অতি স্বাভাবিকভাবে মোলতী সাহেব বলিলেন—“মোহাই আপনায়! মোহাই খোদায়! খোদায় নামে বলছি, আপনি যখনই ছবিখানি নিয়ে যান; কিন্তু চিত্রকরকে শান্তিতে মরতে দিন। সে কোলাহলে যেতে চায় না। আমি তাঁকে আনুহ, ভালবাসুহ, আপদে-বিপদে সাহায্য দিহুহ। আপনি যাকে প্রতিভা বলছেন, আমি সেই হত-ভাগ্য নরপথকে পরভানের কবল থেকে মুক্ত করেছি। জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফলে এখন সে পৃথিবীটাকে তুচ্ছ জান করতে পেরেছে। মানুষের মনোমিলার গভী অতিক্রম করে সে এখন কিছুইর অঙ্গুর হ’য়েছে। মোহাই আপনায়—তাকে আর কিছু ডাকবেন না। সে যে অপার্থিব গৌরব-শাস্তের গোতে ধাবমান, তার কাছে পৃথিবীর স্ততি-গন্নিমা একান্ত তুচ্ছ। কেন তার প্রাণে পৃথিবীর অপমার্গ মোতের মোহে ছাপিয়ে তুলছেন! আপনি যদি জান্তেন যে, সংসারের সহিত সম্পর্ক রহিত করতে, ধন-জন-জীবন-যৌবন-বশঃ প্রভৃতির হাত হতে আত্মরক্ষা করতে তাকে মনের সঙ্গে কি ভীষণ বুদ্ধ করতে হয়েছে। খোদায় মোহাই, তাঁর প্রাণে আপনি সেই সমস্ত-বলি আর প্রজ্জ্বলিত করে তুলবেন না।”

বিস্মিত ইশা সাহেব বলিলেন—“এ যে অমরয়ের বলিমান!”

দ্বির গভীর কণ্ঠে মোলতী সাহেব বলিলেন—“না, এ অমরয়ের প্রকৃত সোপান।” ইশা সাহেব কৌশল করিয়া বলিলেন—“আপনি কেন ও কি অধিকারে চিত্রকরের পক্ষ নিয়ে এত কথা বলছেন! তিনি স্বয়ঃ এ বিষয়ে আলোচনা করুন না কেন।” “বাপ, মা, ভাই, বন্ধু যে অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে খোদায় নামে আমি তাঁর পক্ষ দর্শন করছি। দয়া করে আমার কথা রাখুন—আমার বিশ্বাস করুন।” অতি করুণ কণ্ঠে এই কথা বলিতে-বলিতে, বৃদ্ধ মোলতী মুখ আবৃত করিয়া, বীর-বহর গতিতে

হৃদয়ভরে গমন করিলেন। ইশা সাহেবের মুখ যেন শুক
হইয়া গেল; চোখের পাতা অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া উঠিল।
অশ্রুচরবর্ণকে সংক্ষেপে বলিলেন—“চল, আমরা এখন
যাই।”

ইশা সাহেবের একজন শিষ্য বলিয়া উঠিল—“ওতাদজী,
আপনার কি মনে হয় না যে, এই বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবের
দর্শিত চিত্তের বেশ সাদৃশ্য আছে?” ইশা সাহেব যেন কি
একটা অমৃতা মিথি কুড়াইয়া পাইলেন। তিনি চিন্তাশ্রিত
হইয়া ঠাড়াইয়া পড়িলেন। আর একজন শিষ্য জোর
গলায় বলিল—“সে তো নিশ্চয়! বৃদ্ধ মৌলভীর মুখ থেকে
চলিল বৎসর বয়স কমাইয়া দাও; তা’ হ’লেই দেখবে—
আমাদের ওতাদজী যে বলেছিলেন, ‘ছবিখানি চলিল বৎসর
আগে ঝাঁকা—চিত্রকরই নায়ক ও নাটককার’। তা
অন্ধরে-অন্ধরে সত্য। আমি বাকি রেখে বস্তুতে পারি, বৃদ্ধ
মৌলভী সাহেব ও চিত্রের মৌলভী-দ্ব্যক একই ব্যক্তি।”

“নিশ্চয়ই তাই!” গভীর স্বরে ইশা সাহেব বলিলেন—
‘নিশ্চয়ই তাই! উভয়ে একই ব্যক্তি। সাধু পুরুষ ঠিকই

বলেছেন, তাঁর পৌরবের কাছে আমরা বস্তু জুড়ে! এস,
আমরা যাই। তিনি আশ্রয় শাস্তিতে থানু।”

ইশা সাহেব কোনও ক্রমে দিবসত্রয় অতিবাহিত
করিলেন; আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায়
সেই ক্ষুদ্র মন্দিরে আগমন করিলেন।

দেখিলেন, বস্ত্রায়ত বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবের মৃতদেহ
তথায় শায়িত রহিয়াছে; এবং চারিজন মৌলভী কোয়াণ
শরীক পাঠ করিতেছেন।

হানুচাত চিত্রখানি ওটাইয়া তাঁহার পার্শ্বে রক্ষিত
হইয়াছে। ভক্তি ও প্রভার নিদর্শন স্বরূপ ইশা সাহেবের
চক্ৰ হইতে ছই কোঁড়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি শুধু
মুহু আর্দ্র-কণ্ঠে বলিলেন—“বনমূল বনেই শুকাইল!” *

* Two Glories নামক বিখ্যাত পেন্সিলেদ্বারা গম অঙ্কনদ্বয়ে।
—লেখক।

হোম-রুল

[ত্রিপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

(১)

গিগি বয়েন—ওগো বৃদ্ধির ঢেঁকি,
ছেলোটা যে আট বছরে প’ল,
ইতুলে দাঁও, হুক কর শাসন;
আদর দিলেই বাপের কাজ হ’ল।

(২)

নাটক লিখিছ আবার-মিত্রা ভুলে,
লোক-চরিত্রে লবল তোমার ছাই।
ছেলে যদি নাহুৎ কহুতে হয়,
আদর শাসন ছই-ই সমান চাই।

(৩)

দত্ত হাসি, গিগি ততই কষ্ট
যেজাৰ একদিন হঠাৎ গেল বৈকে,
বয়েন, “খোকা—খুব হ’লিয়ার কিস্ত।
শাসন হুক কয়েম এবার থেকে।”

(৪)

তুনে’ ছই একই নষ্ট হেসে’
বৃদ্ধাভূত দেখিবে বয়ে—“ইস্,
তোমার দেখে’ ভারি আমার ভয়।
আড়ি।—তোমার কঙ্কণ না আর কিস্।”

(৪)

মিষ্ট হাসি ভাসিয়ে দিলে পণ,
বুকের মাঝে কাগলেম বাছায় খঁয়ে ;
আবেগ-ভরা চুম্বন চুম্বায় ভারে
বিলম্ব ভাবি বাতিহাত ক'রে !

(৬)

শ্রিয়া এসে কেনেন ঘোড়ার ধর',
বলেন,—“হুঁ, বাবি গুস্তার দলে ।
কোথায় তোর শেলেট, পেলিল, বই ?—
আমায় বলেন, “শাসন একেই বলে !”

(৭)

বলেন,—“বাত্ত কেন ? সুদ-আসলে
‘বিশ্ববিদ্যা’ ক'বে ছেলে শাসন ! .
বেত্র দিয়ে ছায় গড়তো আগে,
হালের পাঠ্য ছেলে ক'ছে গেষণ !”

(৮)

কুড়ি ক'রে ভক্তি হল বাহু
গেরে ঘোড়ার দেহের বিভাগ্য,
নিক সে পাঠ্য চুম্ব আনিবনে,
হু'দিন, আহা, হু'দিন বই ত নয় !

পুরীর কথা

[শ্রীকৃষ্ণদাস সরকার এম.এ]

(২)

শ্রীমন্দির-প্রাক্ষেপে আরও যে কয়টি পুস্তকীয় মন্দির দেখা যায়, তাহার মধ্যে পাতালেখর, বিমর্শা, লক্ষ্মীদেবী ও ধর্মরাজ বা সূৰ্য্য-নারায়ণের মন্দির উল্লেখযোগ্য। আমরা হৃদয় মন্দিরের পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পাতালেখর মন্দিরে বরজার পার্শ্বে একখানি খোদিত লিপি আছে; কিন্তু হানটি বিশেষ অর্ধ, অন্ধকার ও হৃগন্ধ বাষ্পসমাজ্বর বলিয়া সেখানে অধিকক্ষণ ভিটান যায় না। হৃদী শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় লিপিটি পরীক্ষা করে! দেখিয়াছেন যে, ইহা তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালায় রচিত (in three different characters) এবং হান! অনন্য ভীমসেবের হাকহকালে খোদিত। ভূবনেশ্বরের মন্দিরে তেলগু ও উড়িয়া এই উত্তর ভাষার খোদিত লিপিমালা আমরা যুগ-ক্রম পাহাচো দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারও একটীতে অনিহক ভীমের নাম আছে। হান! অনন্যভীম ১১২২ খঃ অবঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অবঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন।

বিমলা দেবীর মন্দির প্রাচীন বটে কিন্তু ইহাতে সেরূপ কোনও কারুকার্য নাই। ইহা তান্ত্রিকগণের একটা তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। মন্ত পুথ্যের “বিমলা পুস্তকোত্তম” প্রকৃতি বচন হইতে মনে হয় যে, এ মূর্তিটিও নিত্যই অল্প দি.এর নহে। মন্ত পুথ্যে মোর্গা সন্ন্যাসগণের বংশাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ৪৮০ খৃঃ অবঃ মোর্গা বংশের অবলান হইয়াছিল; হুতরাং ত্রিলোক্যে দ্বিধ অধ্বান করেন যে, মন্ত পুথ্য সম্ভবতঃ ৫০০ খৃঃ অবঃ সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্বে হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে, বিমলা দেবীর উল্লেখ মন্ত পুথ্যে দেখা যাইত না। তান্ত্রিকেরা বিমলা দেবীকে ভগবাতেরই ‘শক্তি’ বলিয়া মনে করেন। লক্ষ্মী-মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর। দেওয়ালের খোল বা কুলদীতে তিনটি সুন্দর অনতিবৃহৎ শ্রী-মূর্তি রহিয়াছে। দেওয়াল হইতে উল্লসিত তাক বা ব্রাকটের উপর উপবিষ্ট পরাশরায়র সুন্দর মূর্তি। মন্তকো-

পরি হস্তি-কর-দ্বত চল-প্রাণী কলম। এ মূর্তি 'গজ লক্ষ্মী' নামে পরিচিত। শুভগায়ে ধৌতবা ব্রুক নাগ-নাগিনীর মূর্তি—নিম্নে হাতী-পুণ্ডে শাফল। তৈল খণ্ড-দ্বিত-ভগ্নর এবং লাকী ও বাহুভেদে বৌদ্ধ ভূপেও এইরূপ "জী মূর্তি" দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলি অনেক স্থলে দণ্ডায়মান অবস্থার পরিকল্পিত। প্রাচীন ভারত-বাসীরা হিন্দুধর্ম-ভাগী হইলেও একেবারে "লক্ষ্মীচাক্ষু" হইতেন না। জগন্নাথ-মন্দিরে কাক-কাক্ষ্যের অস্তাব নাই। মন্দিরের "বিমান" অংশটি আগাগোড়া সিমেন্টে দিয়া পলস্তারা করা। বিমানের গায়ে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তি। তাহার আর ২০ হাত নিম্নে বৃক্ষশাখা-ধারী হনুমান-মূর্তি। (১) দেখিলাম সুসিংহ, হরহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, শশানন প্রভৃতি আরও বহু পৌরাণিক মূর্তি হইয়াছে। একটা চিত্রে রামদত্তপ্রাণ হনু জানকী-দেবীকে প্রণাম করিতেছে। বামন ও বসাহ অবতারের মূর্তি দুইটি sculptor বা বর্জকীর শিল বৈশুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। কটিনেশের বর্জলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'হান'র মাণ, তাঁরা প্রভৃতি অলস্তার, এমন কি পরিচ্ছন্নর তাঁজভদিগে স্থান্যরূপে তথিত হইয়াছে। বামন-মূর্তির মস্তকে টোপেরর তার স্থ্যাল মস্তকাবরণ। মুখাবরণ স্থান্য—তবে মাটি বেন অধিক উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বসাহ-মূর্তি পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান। সাধারণ বিষ্ণু মূর্তির তার এ মূর্তিরও চারিটি হস্ত। ইহার সন্নিহিতে পশ্চিম দ্বারের একটি niche বা ফুলদ্বীপে সুসিংহ-মূর্তি—চতুর্ভুজ, গব্যাক্রমধারী, গলার ব্রহ্মাকমালা; দুই হস্তে ত্রিগণকপিশুর নাকী ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন। কেবল দেবদেবীর মূর্তি বেচিতে-দেখিতে চিত্রে মানব-ছবির পথি অভিযুক্তি দর্শনের মত স্বভাবতই ঔৎসুক্য প্রদায় থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে এ শ্রেণীর একটা চিত্র নিত্যন্ত ছন্দহীন ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এটি হিন্দু-সম্প্রদায় মাক্-মূর্তির চিত্র। মাতার কর্ণে স্নরহং কুণ্ডল; বাহ ও প্রকোষ্ঠে অলস্তার। পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তম্বর তাহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন; শিশুও

মাতার মুখের দিকে সহজ বদনে চাহিয়া বসিয়াছে। পুত্রী আগিয়া এ চিত্রটি না দেখিলে মন্দিরের কাক-কাক্ষ্য দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যার।

জগন্নাথের হইতে পুন্ড্রদেবের দ্বার দিয়া নাট-মন্দিরে এবং পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমানে যাওয়া যায়। নাট-মন্দিরটি—ভুবনেশ্বরের শিবরাম-দেবের নাট-মন্দিরেরই অতুলন। ভোগমণ্ডপের কক্ষ ফ্লোরাইট প্রস্তরে শোণিত মূর্তিগুলির কথা পূর্বেই বলিয়াছি; কিন্তু একবারমাত্র দেখিলে এগুলির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রূপে উপলব্ধ হয় না। ভোগমণ্ডপের পূর্বদিকের বাহ পার্শ্বে দোলবাড়ার চিত্র। দোলবার গোহার শিল ও কাগ্না প্রভৃতিও অপূর্ণ বৈশুণ্যের সহিত খোদিত হইয়াছে। ইহার পর ঐক্ককের গোষ্ঠীগল্য—কক্কা রাবাল-বাগলদিগের সহিত গজ-চরাইতেছেন। ঐক্কক বাঈ বসাইতেছেন, গোদন-গুলি উৎকর্ণ হইয়া তথিত। তাহার পর রামের রাজ্যভিষেক, এবং তৎপরে নৌবিহারের চিত্র। ভোগ-মণ্ডপের উত্তর দ্বারে সীতার বিবাহ, রামের সিংহাসনোত্তোলন, ইন্দ্র ও ঐরাবত প্রভৃতির চিত্র বড়ই সুন্দর। কন্নালী পণ্ডিত শুভাঙ্কলে বঁ (Gastave le Bon) মন্দিরের এ সকল চিত্রাদির বিবরণ বোধ হয় অবগত ছিলেন না; কারণ, মন্দিরে অহিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। তথিতাছি, ফটোগ্রাফ লওয়া সম্বন্ধেও অনেক রূপ আপত্তি ঘটে। Le Bon (সে বঁ) বলিয়াছেন, "জগন্নাথের মন্দির ভুবনেশ্বরের অনেক পরবর্তী; অত্বেদান, খ্রঃ ১২০০ অব্দে নির্মিত। খাটে বা ললিতকলার হিদাবে মোখতে গেলে ইহা এতই অপকৃষ্ট যে, ব্যববিকই ভুবনেশ্বরের বাস্তব প্রতিচ্ছবি (veritable caricature) বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চূড়া ও বিমান প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেরই অতুলনপূর্ণে নির্মিত বটে, কিন্তু প্রস্তরে খোদিত চিত্রগুলি অত্যন্ত খুল ও অসংযত স্বভাবের (grossieres)। পুণীতে যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিরও এই দশ। নন্দনার চিত্র দৃষ্টে সকলেই এ উকির বাগার্থ নির্ণয় করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া মন্দিরে বঁ নিম্ন পৃষ্ঠকে প্রকাশিত চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখিলাম, সব কটা ফটোই শুষ্ক-চাক্ষুর চিত্র হইতে গৃহীত। মন্দিরও তরুণী-বাহিত তরুণীর চিত্রটি দেখিলে কন্নালী পণ্ডিত অন্ততঃ সেক্ষর প্রশংসা না করিয়া

(১) ঐক্কক মনোমোহন বসোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তিচিত্র প্রঃ মন্দিরের এ অংশের বিবরণ বেশ বিস্তারিত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে।

থাকিতে পারিতেন না। তবে স্তম্ভা দ্বার, পেট ও ন কি কোনারকি হইতে আনীত। প্রথমবার ভাড়াভাড়ি সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া সেই পথেই কিরিয়া গিয়াছিল।—অল্প দূরত্ব গুলি বড় লক্ষ্য করি নাই। যেদিন, সন্ধ্যাবেলা চারিটি দরজা আছে—পূর্বে সিংহদ্বার, পশ্চিমে বজ্রদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার। চতুর্দিকে ছুটি এক-কোণিক আয়ত বেটনি (concentric rectangular enclosures)। বহিঃপ্রাচীর বৈদ্যুত ৩৩২ ফিট, ভিত্তি ৬৪০ ফিট, উচ্চতা ২০ হইতে ২৫ ফিটের মধ্যে। এই বহিঃ-প্রাচীরেই উপরিভাগে battlement বা শঙ্খবিনীত অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিনাশ, মন্দির-অভ্যন্তরস্থ মূর্তিমণ্ডপে অগ্নি। শাস্ত্রাঙ্গোচনা হইয়া থাকে। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শীলাবতী মাটকের মূর্তিমণ্ডপের নামকরণ বোধ হয় এই মূর্তিমণ্ডপেরই বিকৃতাকারে করিয়া থাকিবেন।

রান্না রান্নেস্ত্রাঙ্গাল মিত্র মহাশয়—পুরী প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিবার পর, যোদ্ধাশক্তি বিঘ্নক ধারণা ক্রমশঃই বহুদূর হইয়াছে। মূর্তির কখনও বা বৌদ্ধত্বের অস্বত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট, কখনও বা “জিহর” (বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য) জাপক চিহ্নের রূপান্তর—এইরূপ বিভিন্ন মতও বাক্য হইয়াছে। রক্ত-প্রানাইট-প্রস্তর-খোদিত এলোরা গুহার ভগ্নাংশ নামে খ্যাত অপর একটা দেবমূর্তির পরিচয় করানী পণ্ডিত Langlois (ল্যাংলোয়া) তাঁহার Monuments de L. Hindostan নামক গ্রন্থে দিয়াছেন যে; কিন্তু তাহার লিখিত উদ্ধৃত্য ভগ্নাংশ-মূর্তির কোনও সাদৃশ্য নাই। এ ভগ্নাংশ উনু হইয়া (Sur ses kalous) বসিয়া আছেন। হস্তের ভাঙ্গুর উপর বিস্তৃত। পার্শ্বে দক্ষকণ্ঠা অথবা বিজয়া নামে পরিচিত ছুটি স্ত্রী-মূর্তি। প্রবেশ-দ্বারের নিচে অপর দুইটি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; একটার নাম “হুদ”, অপরটির নাম “হুদ”। Langlois সাহেবের মতে হুদ—হুদ বেনে (Soudoudheneh) (২) (হুদ্য নহে ত) ? এবং হুদ—হুদ শব্দের অপভ্রংশ। বিশেষজ্ঞগণের মতে,

ইলোরার ভগ্নাংশসমূহ এখন জৈন কীর্তি বলিয়াই পরিচিত; হস্তরূপে এ ভগ্নাংশ যে বৌদ্ধদেবতা, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। (Burgess Eleura Rock temples, p. 73; and Fergusson and Burgess Cave Temples of India, p. 500) চীন দেশের প্যাটক কাগিয়ান-রচিত কো-কু-কী গ্রন্থে আশ্চর্য মনে খোদিত ও প্রাচীন পাটলী-পুস্ত্রে চারিচক্রবিনীত রথের করিয়া যে বিভিন্ন বৌদ্ধ মূর্তি সকল সঠিক বাগ্‌দার বর্ণনা পাওয়া যায়, তালাতে রথ-বাগ্‌দার যে বৌদ্ধ প্রকার অস্বত্বপূর্ণ মাত্র—একথা অনেকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। রান্না রান্নেস্ত্রাঙ্গালের মতে, হুদশর্ম-চক্র নামক বুদ্ধ শিবলিঙ্গবৎ প্রস্তরটি বৌদ্ধ ধর্মচক্রেরই প্রচ্ছন্ন মূর্তি। প্রস্তরটি উচ্চ প্রায় ৮-৯ গজ হইবে। রান্নেস্ত্রাঙ্গাল বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তরখণ্ডের শিখোভাসেই ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠাপিত হইত। চক্র-চিহ্ন কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দু: নির্ভর্য নহে। জৈন গুহাখোদিত ও প্রস্তর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু চক্রচিহ্ন বলিয়া নহে হুদশর্ম চক্রের পূজাই যে কেবল ভগ্নাংশ মন্দিরের বিশেষত্ব, এজন্য বিবেচনা করার কোনও কারণ নাই। “দাক্ষিণাত্যেও হুদশর্ম চক্র” জৈনধর্ম-বলিয়া “চক্র শেকরদন” নামে পুণ্ডক ভাবে পূজিত হইয়া থাকে। ঐদৃশ্য ভগ্নাংশী মহাশয় মাস্ত্রাঙ্গাল বর্ণনামতে কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার দক্ষিণ ভারতীয় দেব ও দেবী-মূর্তির পরিচয় (South-Indian Images of Gods and Goddesses) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শিল্পায় মতে, হুদশর্মের বৌদ্ধ হস্ত, ত্রিলোচ, উল্লাস হস্ত, অগ্নিশিখাবৎ বেশ এবং অগ্নির স্ত্রী উল্লাস বর্ণ। বিভিন্ন হস্তে চক্র, ধ্বজ, পরশ, তরবারি, তীর, ত্রিশূল, পাদ, অশ্বশৃঙ্গ, পদ্ম, বজ্র, চর্ম (চাল), বল, মূল্য, মূল্য, বর্ণা প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন। নৃত্যের ভঙ্গীতে নৃত্যরমান হুদশর্মের হুদশর্মিত ধাতব মূর্তি—ঘাতক hexagon বা ষট্‌কোণের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এই ষট্‌কোণের গায়েও অগ্নিশিখার চিহ্ন দেখা যায়। হস্তরূপে চক্রাকার অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে হুদশর্ম রৌ সকল শত্রু বিনাশ করিয়া থাকেন,—শিল্পীর এই পরিচয়না মূর্তি মাঝেই স্থির। লইতে বিলম্ব হয় না। দক্ষিণ ভারতে চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ বিশিষ্ট “শেকরদন” মূর্তিও দেখা গিয়া থাকে। এ শৈলীর মূর্তির সকল হস্তেই চক্রাঙ্গ থাকে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার মূর্তির মধ্যে

(২) Mons. Foucher L' Iconographie Budhique গ্রন্থে যে “হুদশর্ম” নামক মূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার লিখিতও ইহার বিশেষ কোণে দিল দেখা যায়।

কোনও একটীও যে উদ্ভিদা দেশের বৈকল্পগণের মধ্যে পরিচিত ছিল না, এ অস্থান সমস্ত বলিয়া মনে হয় না। রাজ্য ও উৎকলে এখনও বেশ মেধামিহিত ভাব রহিত। অজ্ঞানের 'বৈক্য' মিত্র থাকিতেও, কেবল শ্রীক্ষেত্রেই যে বোধ প্রাপ্য বলবৎ হইবে, ইহা হিন্দুগণের নিকট অস্বাভাবিক মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হিন্দু-মূর্তি-তত্ত্বে Anthropomorphism বা মানবীয়-রূপাদি আয়োগের হ্রাস্ত নিত্যর বিরল নহে। "অনার্দন" বিষ্ণু-মূর্তির হই পার্শ্বে যে দুইটি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বামনযং মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটা চক্র ও একটা গম্বীর Personified মূর্তি। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ বিনোদবিহারী কাব্যার্থ মচাপর হোমসিদ্ধান্ত-খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃতিত বিষ্ণুমূর্তি-পরিচয় গ্রন্থে যে সকল ন্যাক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই, "বক্ষিপে তু পদাদেবী তত্ব মধ্যা শ্লেচচনা" এবং "বাঘ-ভাগদন্তকর কার্ণো লম্বোদর স্বৰা, সর্মাভরণ সংস্কো বৃত্ত বিদ্যাসিতকর্ণঃ"। সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা শাস্ত্রমতেও নিতান্ত হিন্দু ধর্ম-বহির্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। অনার্দন-মূর্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাগাতে যে প্রকার Personification বা নরাকৃতি-পরিগ্রহণ হওয়া ত্রিশূলের সহিত সম্প্রদিত হইয়াও যে বাক্যস্বরের বর্তমান মূর্তিতে পর্যাবসিত হইতে পারে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রম-পরিবর্তনে চক্র ও ত্রিশূল নব-নামুদ-মূর্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই; এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কোন-কোন স্থানে কি প্রকার বৌদ্ধ-মন্দিরাদি অবস্থিত ছিল, তাহাও অজ্ঞাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। সত্যাহুপক্টিংস মানবী ডাঃ রামেন্দ্রনাথ ও এ কথা স্বীকার করিতে সূচী বোধ করেন নাই। ফার্দন পুরীতে যে চৈত্যা থাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও অস্থান বাস্তবীতার আর কিছুই নহে। অন্তর্গত এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা হইতে পারে যে, কোন-কোন স্থানে বৌদ্ধার্থ যেরূপ হিন্দুার্থে পরিণত হইয়াছিল, এখানেও হয় ও সেইরূপ হইয়া থাকিবে; তবে এ মতটা সমর্থনের জন্য এখনও প্রাচীন পুঁথি, লিলালিপি, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি অধিকতর সম্ভোগজনক বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আবশ্যকতা আছে;—সুতরাং করি, এ উক্তিতে সত্যের

অপলাপ ঘটিবে না। রাজ্য রাজেন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেব গুঃ ৪র্থ অঙ্কে নাগায়ণের অবতার রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পুরুষোত্তম মন্দির-বৈষ্ণবী মধ্য অবস্থিত। এখানে যাবৎ অগ্ন্যায়ের শক্তি রূপেই পরিচিত। এবং হিন্দুদেবী বলিয়াই স্বীকৃত—বিদ্যা হিন্দুগণতে গুঃ ৫০০ অঙ্কের পূর্বে হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে হিন্দুদিগা দেশের "বিজয় বৌদ্ধরূপের" প্রভৃতি পদ ও বৈষ্ণবতের সবল্যমবিক অস্থানিক পঞ্চম শতাব্দীর লোক হ্রো-পঞ্চমনের গোষ্ঠী কথার লিখিত

ইন্দ্রদ্বার বৌদ্ধ রাজ্য অগ্ন্যায়ের কর্তী।

মাধাবানী তবু বলায় ক্ষমির বৃত্তি(৩)।

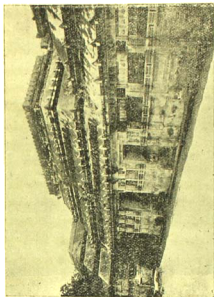
প্রভৃতি উক্তি যেরূপ বৌদ্ধ প্রবাদ বহন করিয়া আনিতেছে, সেইরূপ প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে বিমলাদেবী ও সুধর্শন চক্র চতুর্ভুজ পূজা এবং ইন্দ্রদ্বার কর্তৃক হিন্দু দেবতা মূর্তি স্থাপনার প্রবাদ-বিবৃদ্ধ মতেরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং আর অধিক প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, হিন্দু সাক্ষ্য-পরিপত্তী একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক মতবাদ নিশ্চিতরূপে আলোচ্য করা কতদূর ভয়জনক, তাহা পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন। উপস্থিত এ সম্বন্ধে open mind বা মন নিরপেক্ষভাবে উন্মুক্ত রাখিয়া, হুই প্রমাণ সংগ্রহ করাই সাধারণ বুদ্ধিতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রাজ্য রাজেন্দ্রনাথ প্রমুখকমে নিম্নগ্রন্থে (Antiquities of Orissa) লিখিয়াছেন যে, মানবীয় ধর্মায়োগজনিত (anthropomorphie) পূজা-পদ্ধতি চৈতন্যদেবের প্রভাবের অগ্ন্যায়-মন্দিরে প্রথম অস্থানত হয়। ইহার পূর্বে সাধারণ মানবের ভায়-অগ্ন্যায়-ভোজন, শয়ন, পূজার প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল না। চৈতন্যদেব ১০১১ অব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যগমন করিয়া ১৫০৪ খৃঃ অঃ তাহার ভিত্তিপ্রস্তর পণ্ডিত জীবনের শেষ অংশ পুরী ও ব্রহ্মাবানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (৪) (শ্রীকৃষ্ণ রাধা-*

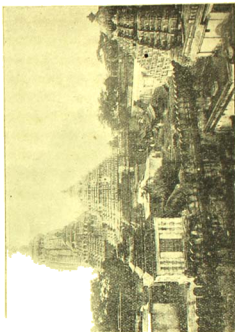
(৩) ৮ যোগেশ্বরের দেব প্রভৃতি "দাক্ষিণ্য" এই শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) ২৩ বৎসর পূর্বে করিয়া লিখিয়া।

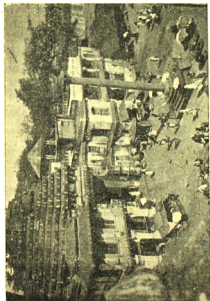
আর ১০ বৎসর বৈদ্য মীতিতে বাস।



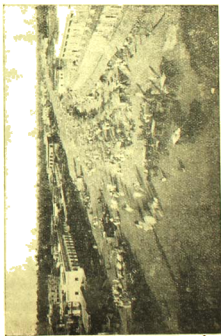
ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା



ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା



ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା



ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା



মন্দিরের প্রবেশ দ্বার



মন্দির-পাঠক মহাবীর মূর্তি

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড ১১৪ পৃ:।) তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রসেবের পদসাময়িক। প্রতাপরুদ্রসেব যে গীতগোবিন্দের গীতাদির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিলালিপিতেই প্রকাশ; সুতরাং চৈতন্যসেবের চেষ্টাতেই যে একুশ ব্যবস্থা হইয়াছিল, রাজা রাধেশ্বরলালের এ উক্তি কল্পনা মজি নহে। শ্রীমদগদ্য-সেবের রথযাত্রাকালে চৈতন্যসেব রথের আগে আগে

“যঃ কৌমার হরঃ স এববিবহত্তা এব চৈতন্যকপা

স্তোচোন্মিলিত দালতী স্বরভরঃ শ্রোতাঃ কদম্বলিলাঃ

প্রকৃতি পুঙ্গব-রসাম্বক পৌক পাঠ করিতে-করিতে
শ্রেনে বিকোর হইয়া নাচিতে-নাচিতে গমন করিতেন।
(অর্কনা ১৪শ বর্ষ: ৭ম সংখ্যা পৃ: ২৪৬।) পৃথীর মন্দিরে

তার মধ্যে ৪২ বৎসর গমনাগমন।

কহু বন্ধি কহু যৌক্ত কহু বৃন্দাবন।

অষ্টাদশ বৎসর রহিয়া নীলাচলে।

কৃষ্ণশ্রদ্ধে বাহ্যসুতে তাম্রাল লকলে।

১ ভৈরব চরিতাবৃত্ত।

চৈতন্যদেবের চিত্রের মধ্যে স্থানীয় পাণ্ডাগণ প্রস্তরের খোদিত পদচিহ্নদ্বারা দেখাইয়াছিল যেন আছে। বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালার 'নিমাইএর' নাম তাহার বেশ স্পষ্ট-ভাবেই উল্লেখ করিতেছিল। কিন্তু তখন আর তাহাদিগের স্থানীয় কাহিনী শুনিবার সময় ছিল না। ভগবতের মন্দিরে চৈতন্যদেবের আরাধ্য করেকটা চিত্র আছে। (৫) বাডের দক্ষিণ পার্শ্বের খোল বা কুলদ্বীপে গঙ্গেশ্বর মন্দিরটি যে দুইটি বেধিতে পাওয়া যায়, তাহা খ্রীষ্টাব্দেরই মূর্তি বলিয়া প্রকাশ। (Vide M. Ganguly's Orissa) মহাপুরুষগণ কালক্রমেতে যে সকল পরচিত্র রাখিয়া গান, তাহার তুলনায় এ সকল নবকল্পিত প্রতীকগুলি নিত্যই অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়।

এদিকে কথার-বার্তার মন্দির-দর্শন শেষ করিতে প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া বাসার (৬) প্রহর-দুয়ের পক্ষে মহাপ্রভুর অস্থায়ী চিত্র কোন কোন গা দেখাইয়া থাকে।

নিরীক্ষা আসিলাম। পথে চর্যাকার-বীথি। গ্রীক আরিয়ান (Arrian) বহুপূর্বে ভারতবাসীগণের বেবেত পাঠকরি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অভ্যাসি উদ্ভিগ্নায় নির্বিত হইতেছে।

গ্রামি ধাতার সময় টেপ। ঘোর বাক্য-দুহের পর স্থির হইল, অন্তই এখন হইতে বিদায় লইতে হইবে। মলপতি মহাশয় যেন একটি ভীষণ আয়েরমি—যেহে আরতনে ও উৎসাহের প্রবল আধিক্যে সৌন্দর্যট দৃষ্টিই দখা পড়িয়া যায়। অল্পকূল ঠাকুর Quick artist—তড়ি-বড়িতে অভ্যস্ত। প্রায় তিন কোরাটারের মধ্যে—মহাশ-ভোজন-যোগা চুড়ী নামাইয়া দিল। কৃ-চন্দ্র এ ছায়ামেয় ভিতর কিছুই থাইতে পারিলেন না; নারায় অল্প স্পর্শ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আগরতে তাজাতাড়ি জিনিস-পত্র গোছগাছ করিয়া আমরা সকলেই অবদানে সমাপীন হইলাম।

পূরীর কাহিনী এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

শ্রীযুক্ত মহারাজ সায় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দো বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত



কলিকাতা পলিটেকনিক্ বিদ্যালয়ে মাননীয় পর্ববার বাহাদুর

ভাবের অভিব্যক্তি

[কোন সস্ত্রাস্ত্র গৃহস্থমহিলার ভাবের অভিব্যক্তি]



স্বাভাবিক দুঃখ



অস্বাভাবিক



স্বাভাবিক



এ ডিঃ এস !



দুখটেশ।



অভেক



অবসাদ



৬৮৮ শ্রদ্ধাঙ্গ বন্দোপাধ্যায়

৩ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্যে আত্ম একটা আদর্শ দৃষ্টান্তে বঞ্চিত। হইল। বাল্যস্মৃতির বর্ণনায় যুগের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত সার গুরুদাস মহা-প্রদান করিলেন। বাল্যকালে মামবতার পূর্ণ আদর্শ যদি কোথাও থাকে, তবে তারা সার গুরুদাসে ছিল। বিদ্যারণ যদি দৃষ্টিমান দেখিতে চাই, তবে সার গুরুদাসকে দেখ। যদি যুক্তিতর্ক শিক্ষা করিতে চাই, জননীর আশীর্বাদ লাভ করিতে চাই, তবে সার গুরুদাসের চরিত্রের অধ্যয়ন কর। চেষ্টা ও কলহ আছে বলিয়া, দোষ-গুণে ভূষিত, অপূর্ণ মানব আগমের সম্মুখে প্রবেশ দিয়া থাকে। আদর্শ বলি, সার গুরুদাস নিতলত। বাল্যস্মৃতির প্রত্যেক জনহিতকর অঙ্গুলির সহিত সার গুরুদাসের কোন-না-কোন একবার সংস্পর্শ ছিল। সার গুরুদাস সংসারী মানব হইলেও, এ সংসারে তাঁহার শত্রু কেহ ছিল না। সন্দেহ বশবশতের এমন অকৃত্রিম প্রভা-ভক্তি সার গুরুদাসের মত অপর কোন বাল্যস্মৃতি অর্জন করিতে পরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্বদেশপ্রেমিকতার আর কেহ সার গুরুদাসের সমকক্ষ নহেন। স্বজাতির প্রতি মহত-বুদ্ধি সার গুরুদাসে যেমন ছিল, এমন আর কোন বাল্যস্মৃতিতে দেখি নাই। পান্ডিত্য উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও স্বার্থে এমন নিষ্ঠাবান বাল্যস্মৃতি বাল্যকালে আর কে আছে। বৃহৎ জাতিতে এক ভূদেব ছিলেন, আর বর্তমান যুগের সার গুরুদাস—বাল্যস্মৃতি এই দুইজন নবিক আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলে, বাল্যস্মৃতি হিন্দু চিন্তার আর কোন কারণ থাকে না; বাল্যস্মৃতির পুনরুৎপাদন তাহা হইলে অনিবার্য।

গত ১৬ই অক্টোবর, ১লা ডিসেম্বর, সেমবার রাত্রি আর সাড়ে দশটার সময় বাগবাগারে, গঙ্গাতীরে সার গুরুদাস দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে নারিকেলভাগা পরগণায় সার গুরুদাস জন্ম গ্রহণ করেন। অতি শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বিধবা ব্রাহ্মণ-কর্তা সমস্ত শিশু পুত্রটির লালন-পালন করিতে থাকেন।

সেই শিশুই আর আমাদের—সদয় বঙ্গদেশের—সার গুরুদাস—আদর্শ জননীর পুত্র আর বাল্যস্মৃতির আদর্শ।

চোরাং গুল হইতে এন্টাল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া সার গুরুদাস প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এ-এ, বি-এ, এম-এ ও বি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'ন এবং প্রত্যেক পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেন। পাঠক-পাঠিকা, গণ্যমান পুস্তকের অনুবাদ বর্ণনে পুস্তকবন্দগলা বিধবার আর্থিক নির্বাহক আনন্দের কল্পনা করুন!

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বহরমপুর কলেজের 'ন' শ্রেণীর প্রথম পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৭২ অব্দে তিনি বহরমপুর তাগা করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উকীলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'ন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। পর বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজিয়তী করিতে গেলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাক্তার গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন-গ্যোনেসের ছিলেন। ৯০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবামাত্র, অপর ভাষ্যবঙ্গীর হাইকোর্টের জজিয়তী লাভের পথে হস্তাক্ষর হইবেন না বলিয়া ডাক্তার গুরুদাস বেছায় পেনসন লইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। স্বদেশবাসীর প্রতি এমন সহানুভূতি, স্বজাতির প্রতি এমন স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত কমটা লোক দেখাইতে পারেন? জজিয়তী হইতে অবসর লইলেও, সার গুরুদাস কর্ম হইতে অবসর করেন নাই; গত অক্টোবর মাসে তাঁহার সাংবাদিক পুত্রের পূর্ব পর্যন্ত লালন-পালন এবং দেশহিতকর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যেই অবসর-ক্রমে তিনি বহু সদৃশ্যের প্রচারও করিয়া গিয়াছেন।



ଆମର କବି ହାକିମ

[ଶିଳ୍ପୀ—ଶ୍ରୀବିହାରୀ ମେହେର ।

হাফেজ

[ঐনরেঙ্গ দেব]

(২)

নিয়তিবিত কবিতাটি হাফেজের, পুস্ত-বিয়োগ-জনিত
মৰ্মাহ্বাস বলিষ্ঠা উল্লিখিত হয়—

একদা হুন্ হুন্ এক
হৃদয়ের রক্ত পান করি,
পেয়েছিল বক্ষে তার
কুস্ত এক গোলাপ মঞ্জরী !

কণ্ঠকে বিকৃত বক,
সহসা উল্লিখিত বক্তাব্যত,
রক্তাক্ত হৃদয় হ'ল,
শতধা বিক্লিপ্ত অকস্মাৎ ।

মধু-গোতে ভুগ্ন-প্রাণ
হয়েছিল উন্নতলে আকুল ;
পূর্ণীয়ায় আচণ্ডিতে
বৃত্তচ্যুত করিল-দুহুল !

রবিশশী দৃষ্টি হতে
হাবি-চক্রে আঁধি অন্তর্ধান
ধরায় অ'ধার গর্ভে
চিরতরে লভিছাছে স্থান !

আশার অশনি হানি
কবলেরে কয়ল কুর কীড়া,
বিবল করেছ ঘোরে
দিয়া প্রাণে নিদারুণ পীড়া !

জীবন করিয়া কৌণ
স্বখহীন বিধায় বরণ,

অস্তিত্বের অন্ধকারে
বুজু তরে করেছে হরণ !

শে বে গো নয়নবলি !
ধরিত্রের বুক-ভরা ধন !
স্বপ্নে আঁগিবে সদা
যতদিন বেহে হবে মন ।

আঁধি আর সেও নাই
হত' দার বুকে বস্ত্রাবৃত—
কাতর হাফেজ এক।
নীতবে করিছে অঙ্গপাত !

ইংরেজী সর্কবৃত্তান্তাভিধান হইতে জানিতে পায়া যায় যে, দামিগাতোর শাসনকর্তা সুলতান হামুদশাহ বাহমনি কর্তৃক কবির হাফেজ ভারতবর্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হামুদশাহ শির ও সারিতোর একান্ত অহুয়াদী ছিলেন। আরব ও পারস্যের বহু কবি তাঁহার স্তায়সভায় কবিতা আবৃত্তি করিয়া সহস্র-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক ও বহু উপহার প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই শুণ-প্রাণী সুলতানের নিকটে হাফেজ আপনার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুলতানের উজীর মীর ফজল উল্লাহ তাঁহাকে পাথরেরস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় প্রচুর দরবারে উপস্থিত হইবার বস্ত্র সান্নিধ্যকর অস্ত্রোপকরণ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। হাফেজ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভারত-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন। লাহোর উপস্থিত হইয়া হাফেজ তাঁহার এক পরিচিত বন্ধুর সাহায্যে পাইলেন এবং দ্বারাতে উক্ত বন্ধুটির স্বাস্থ্যকর অপহরণ করিগাছে। তদন্থা, হাফেজের নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল, তিনি সে সমুদয় বন্ধুকে

অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে কপর্দকশূন্য হইয়া অপরিচিত বিদেশে তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কয়েকদিন পরে পাহাড়ের দুইজন বিখ্যাত বণিক ঐ পথে যত্নে গিয়াছিলেন। তাঁহারা হাফেজের সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁহার এরূপ অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহার বদশে ফিরিবার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। হাফেজ তাঁহাদের সহিত পারস্তোপশাগরের বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দক্ষিণাভ্যাসের স্থলতানের প্রেরিত লাহাজ তাঁহার মন্ত্র সেখানে বহুদিন হইতে অপেক্ষা করিতেছে। তখন হাফেজ উক্ত লাহাজকে আরোহণ করিয়া পুনরায় ভারত যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সমুদ্রের আকৃতি এরূপ ভীষণ হইয়া উঠিল যে, হাফেজ তদধীন ভীত হইয়া দক্ষিণাভ্যাস গমনের সকল আশা পরিত্যাগ করিলেন; এবং সমুদ্র প্রকৃতির হইবার পর, সর্বপ্রথম বন্দরেই তিনি লাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। পরে লাহাজের একজন সহযোগীর দ্বারা উজীর মীর ফজল উল্লাহকে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন—

“ধরার ঐশ্বর্য আসে
অসহ স্রুতার ফাঁসে

সুদূরত্ব কোরো না বাপন ;

এক পত্রি স্রুতা লয়ে

দাও বেচে বিনিময়ে

দাক্ষিণ্যের ছত্র আঁবরণ।

রাজ-সুসূক্তের দান

বিগৃহেণে বশমান

লুপ্ত করে অনেকের বন ;

কিন্তু যেন গোভেদে তবু

যোগ্য নহে বন্ধু, কহু

অপবাদের হারান কীবন !

বাড়িতে গোভেদে যাত্রা,

হাফেজ সমুদ্র-যাত্রা

ভাবে নাই কঠিন ভেদন !

দণ্ড আশি তাই কোভেদ ;

শত সহস্রত গোভেদ—

কেহ যেন করে না এমন।

এই কবিতাটা প্রাপ্ত হইয়া মীর ফজল উল্লাহ স্থলতানকে ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং হাফেজের পথের বিয় প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্থলতান কবির এই আদিবার উত্তম ও চেষ্টার মন্ত্র মাসাফের ঘোরা মহদম কাশিমের দ্বারা তাঁহাকে আরও সহস্র স্বর্ণদ্রুতা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১০ ২ খৃঃ অব্দে মেবারীজ উদ্দীনের পুত্র শাহ্মুজা পিতাকে অন্ধ করিয়া স্বয়ং সিরাজের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই শাহ্মুজা হাফেজের অসাধারণ কবিশক্তির মন্ত্র হিংসাপরবশ হইয়া কবির বিরুদ্ধে নিজ ক্ষণে বিজাতীয় বিদেহ পোষণ করিতেন। একদা হাফেজের রচিত কোন একটা কবিতার ভবিষ্যতের প্রতি কবির অনাস্থা-প্রকাশ দেখিয়া, শাহ্মুজা সিরাজের প্রধান উম্মার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছিলেন। হাফেজ স্থলতানের এই দুঃশিক্ষিত কানিতে পারিয়া, উক্ত কবিতাটির সহিত—যেন উহা কোন খৃষ্টানের উক্তি, এই মর্মে—আরও ছই ছই নূতন কবিতা যোগ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং এই উপায়ে সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কবিতাটি ছিল এই :—

আজি এ দিবস নিশি,

হায়, যবে হইবে অতীত,—

সত্য যদি জানিতাম

কলা এক আসিবে নিশ্চিত ! ইত্যাদি

হাফেজ ইহার পুরোভাগে সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন—

প্রভাতে খুঁটান এক

পানানোমে হারারে সম্বিত,

ভুলিলাম, গাহিতেছে,

হুসনে মধুর সঙ্গীত !—

এই শাহ্মুজার মন্ত্রী খালা কীবানুদীন হাফেজের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। উক্তশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ খালা কীবানুদীন বহু অর্থব্যয়ে একটা বৃহৎ বিভাগাল স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং হাফেজকে উক্ত বিভাগালে ধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে, দেশভক্ত ও বিভাগালী সচিবের সহায়ত্ব ও বদান্ততার হাফেজ অশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়াছিলেন।

বাস্তাশার নবাব গিয়াসুদ্দীন পুরবী একবার হাফেজকে আদিবার মন্ত্র নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বহু প্রোত্বে

সবেও হাফেজ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তবে নবাবের অমুরোধে গিয়াহুদীনের রচিত একটি অসম্পূর্ণ কবিতা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত কবিতাটির সম্বন্ধে এই-রূপ একটি স্থলর গল্প আছে যে, নবাব গিয়াহুদীন-বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পর কঠিন চৰ্চায়েরে আক্রান্ত হন; এবং এই রোগে এতদূর সঙ্কটাপন্ন হন যে, চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার হারেমের 'গুল' 'সব্জী' ও 'লালা' নামী তিনজন স্ত্রীস্বামী পরিচারিকা অতি ধৈর্য সহিত নবাবের গুস্তাব্য করিতে ছিল। সেবাস্থগ্রেই নবাব সেবার আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং উক্ত পরিচারিকাদ্বয়কে তদীয় বেগমের গর্ভে অধিষ্ঠিত করিয়া, আশ্রয়িতভাবে পুত্রস্বত্ব ও সম্মানিত করিলেন। হারেমের অপরাপর স্ত্রীস্বামীগণ তাহাদের এই পরম সৌভাগ্য বর্ণনে ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাহাদিগকে "যুগালা" বা গোমল-কারিণী বেগম বলিয়া বিদ্রোপ করিতে লাগিল। তাহারা তিন-জনে এই ব্যাপার নবাবের কর্ণপোচ করিল। নবাব ইহা শুনিয়া নিরান্বিত কবিতার গ্রন্থ চরণটি মুখে-মুখে রচনা করিলেন:—

"গুল সব্জী লালার কথা শোন্ লো তবে সাকী।"

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি কবিতাটির পাদ-পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য তাঁহার সভা-কবিগণের এবং তৎকালীন দেশের অজ্ঞাত লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবিগণের উপর ভার হিলেন; কিন্তু কাহারও রচনাই তাঁহার মনোমত হইল না। তখন সকলে বলিয়া নবাবকে পরামর্শ দিল যে, পারস্যের সুবিখ্যাত কবি হাফেজের নিকটে উহা প্রেরিত হউক। তদনুসারে নবাব বহু উপঢৌকনের সহিত উক্ত কবিতাটি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য অমুরোধ করিয়া হাফেজকে এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। হাফেজ নবাবের ঐ এক ছত্র কবিতাটি এক রাত্রেই সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত কবিতাটিতে তিনি ভারতের তৎকালীন মুসলমান কবিগণের প্রতি কঠোর বিদ্রোপণ বর্ণন করিয়াছিলেন—

"গুল সব্জী লালার কথা শোন্ লো তবে সাকী।

তিন 'যুগালা'র সবেলবার যাচ্ছে বিবাস না কি ?

রাঙ্গবাগানের ঘবিন হাওয়া (১) নিত্য নিশি শেষে—

এই তিনটি স্থলের বৃক্ণে ঘুমিয়ে পড়ে হোসে।

তিনটি মাত্র শুরাপাত্র (২) সর্ক প্রানি হৈরে,
পেশাদার ঐ দালালগুলো বুঝেই ভেবে মরে। (৩)
হিন্দুস্তানের টিয়ার (৪) দাল মিছরি খেতে চায়।
কাসী দেশের শর্করা (৫) তাই বাংলা দেশে যায়;

কবির কাছে কতই পোষা বিশেষ বাওয়া কাজ,
চলো শিত একটি রাতের (৬) বছর পণে আজ।

'রাইজা কুলি' বলেন, হাফেজ ফেরাণের একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হুসেনান্নু মাত্তকী নামক জনৈক হাফেজ-ভক্ত কবির রচিত কতকগুলি সুস্ব-কৃত কবিতা হাফেজেরই রচনা বলিয়া অনেকের ভ্রান্তি উৎপাদন করিত। হাফেজের রচিত একটি কবিতার এক স্থানে আছে—

"হে রূপসী! দিরাঘের দৌন্দর্য্য-গরিমা—!

নাও যদি হাফেজের দিরায়ে হৃদয়

তব্বৎগোলের ওই ত্রুত তিল লাগি—

বুথরা সামারখন্দে দিবে সে নিস্তর—!"

'দৌন্দর্য্য' বলেন, ইরাক ও পারস্যের অধিপতি শাহ মনুরকে হত্যা করিয়া দিরাঘের তৈমুর লঙ্-বৎন পারস্য অধিকার করেন, তখন তিনি হাফেজকে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ দেন। হাফেজ বন্দী হইয়া তাঁহার সমুখে প্রানীত হইলে, তিনি হাফেজকে দ্রিচ্ছাসা করিয়াছিলেন যে, "ওহে কবি! যে সামারখান্দ ও বুথরা আবার লম্বা-দান ও আবাসভূমি, বাহার সমৃদ্ধির স্তম্ভ আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, তীক্ষ্ণ-আগি আগ্রে পৃথিবীর চতুর্দিক বিদীর্ণ করিয়া আসিয়াছি—কত দেশ, কত রাজ্য, কত নগর ধ্বংস করিয়াছি,

(১) নবাব গিয়াহুদীন।

(২) গুল, সব্জী, ও লালা।

(৩) গিয়াহুদীনের আততায়ী কবিগণ।

(৪) কবিতা।

(৫) কবিগণ (যারা সেবা বুঝিই) আওজার।

(৬) হাফেজের একরাত্রে রচিত কবিতাটি।

—আমার সেই বড় সাধের সামারথন্স ও বুথারা তুমি না কি তোমার কোন্ প্রেমদীপ পণ্ডের একটা কৃষ্ণ তিলের বিনিময়ে হান করিতে চাহিয়াছ ?” তুমি চুপন করিয়া রামকীর সন্মুখের সহিত কৃণীণাভে হাফেজ উত্তর দিয়াছিলেন, “হে মূল্যে—জামানিয়া ! এই অশ্ব-মাহাসিক দানের জন্তই যে আমি এই পথের কাশাল হাফেজ আপনার মত একজন ভূমনিবসিত মহাবীরের দর্শনরূপ অক্লুণ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছি !” তৈমুর লঙ্গ হাফেজের এই উক্তি শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শান্তির পরিবর্তে প্রচুর পুষ্কারময় মুক্তি দিয়াছিলেন। কথিত আছে, কোনও ইরানীপন্থায়ন সমসাময়িক কবি হাফেজের অনিষ্টকরে হুজতানের নিকট উক্ত কবিতাটি তাঁহার স্পর্শের নিদর্শনরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু হাফেজের উপস্থিত-মুখি ও সরস উত্তর তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

দীর্ঘকাল যেদি রং বলেন যে, ‘তাউরী’র বিরুদ্ধে অভিধান করিবার পূর্বে নাহির শাহ হাফেজের ‘সেওয়াগ’ হইতে তাঁহার সমস্ত দ্বন্দ্ব করিয়াছিলেন। পুস্তকের যে কোনও এক স্থানে খুলিয়া, প্রথম পৃষ্ঠার ৭তী ছত্র পরিত্যাগ করিয়া, তাহার পর বাহা লেখা আছে তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন—এই দ্বন্দ্ব করিয়া তিনি যে স্রোতী পাইয়াছিলেন, সেটি তাঁহার নিকট অতীব শুভলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি সেবার কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

সে স্রোতীটি এই—

“হাফেজ ! তোমার এই মধুর কবিতাবলি দিয়া ইরাক্ পায়ত আলি অবশেষে লয়েছ জিনিয়া ;
চল অগ্রসর হয়ে, এইবার জিনিয়ে “বোপাদ”
স্বর্গীর সঙ্গীত ঢালি ‘তাব্রিজের’ সিন্ধাইয়ে সাধ !”

হাফেজের আধ্যাত্মিক জীবন-পথে প্রবর্তন সম্বন্ধে একটা অনস্বীকার্য্য আছে যে, হাফেজ কবর-ক্ষেত্রে দীপ-দানের কার্য্য করিতেন। একদা সারাজে প্রতীপ-হস্তে হাফেজ সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শুভ্রবসন-পরিহিত, শ্বেতশস্ত্র ছইজন পবিত্র মূর্ত্তি বৃদ্ধ আরেফ্ (বোপী) ভাষায় মূর্ত্তিত মেয়ে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। তাঁহাদের মূখমণ্ডলে একটা স্বর্গীর দীপ্তি প্রতিভাত। এই ছই দেব-মূর্ত্তি দর্শনে

হাফেজের সমস্ত দেহ-মন কি এক অনমুদ্রতপূর্ণ, অনির্কটচরীর ভাবের আবেশে বিভোর হইয়া উঠিল। হাফেজের মনে হইল, যেন সেদিন ইরানের উপস্থিতিতে সমস্ত সমাধিক্ষেত্রে একটা নিবিড় পরিভ্রম। বিরাগ করিতেছে ! দেখিতে-দেখিতে যেন কি এক হিরণ্য দিবা স্নোতিভাঙে, কি এক সিন্ধোজ্ঞান অশ্লোকিক সৌন্দর্য্য-ধারার সমস্ত সমাধি-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; একটা অসহ্য বিপুল আনন্দপ্রবাহ যেন হাফেজের সমস্ত অস্তিত্ব ভাগাইয়া লইয়া গেল ! আশ্চর্য্য ! হাফেজ যেন কোনও ঐশী প্রেরণার অমুপ্রাপ্তি হইয়া, বীরে-বীরে দেই আরেফ্-স্বপ্নের পাশে উপবেশন করিলেন এবং নিবীণিত নরনে ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যান-যোগে তিনি সেদিন যে পদম সত্যের সন্ধান পাইলেন, যে অনন্তকালের, অনাদিযুগের, অনিত্য হৃদয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, সেই একান্ত প্রিহৃত্যের স্রষ্টা সেইদিন হইতে হাফেজ পাগল হইয়া উঠিলেন ! হাফেজের উৎকলিত হৃদয় সেদিন নবীন সুরে বিশ্বব্রহ্মকে বিম্বিত করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

“কৃতীরাহনে কুঙ্করানে বিকট কুহুবাশি—

দৌরভৌন—বুধা নিশি-দিন খুঁজিয়া না সেবা হাদি !

কাঁদ বুল বুল—কানিতে এলেছ, মোদনের এ যে ঠাই—

কিরে এগ বরে—খুঁজিছ বাহারে, সে জন বাহিরে নাই !”

হাফেজের অন্তরে-অন্তরে সেদিন যে নবোদযোজিত প্রেমের গভীর বন্ধার উঠিয়াছিল, জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই হৃদয়ানুগীত নব-নব ছন্দে, নব-নব ভাবে গাহিয়া গিয়াছেন ! কখনও বসন্তের মাকুত-হিম্মোলে উৎফুল্ল হইয়া মুগ্ধ কবি তাহাকে সন্ধান করিয়া বলিতেছেন—

যে বলয় ! বসন্তের মুহূল অনিল !

আলি তব বিকম্পিত মদন হিম্মোল

বহিয়া আনিছে যেন নিঃশ্বাস তাহার,

তাহারই হৃদয়ধানে হুবাগিত তুমি—

কখনও সন্ততুট গোলাপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ কবি তাঁহার প্রিয়ভ্রমের সন্নিহিত গোলাপের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

“ও গোলাপ ! এই রূপে এত অহংকার ?

আমার প্রিয়ার রূপে ও রূপ তো ছার !

কঠিন কটক মাংসে পরিপূর্ণ তুই—

আমার প্রিয়ার প্রেমে আনন্দ শুধুই !”

শায়র-কোয়ী স্নাত নিম্নে, শত-বিকলিত হুবাগিত

কুসুম-বিতানে বসিয়া কবি তাঁহার আরাধ্যা মানদ-
প্রতিমাকে বলিতেছেন—

“গো পিয়ারী ! জালি নাই কোন বীণ আছ
মোদের এ নিভৃত মিলন-কুন্ড মাথ !
জ্যোৎস্না ছড়ারে তব আঁখি-তারা কালে
সকল ভুবন মৌর করিয়াছে আলো ।
চাহে না স্তব্ধ-গন্ধ মকরম কেহ—
তোমার কুণ্ডলবাসে আমোদিত গেহ !”

এই একনিষ্ঠ সাধক কবি কখনও তাঁহার গরম
আকাজিক্তের সহিত যোগদাতা মিলনানন্দে বিহ্বল হইয়া
গরিয়াছেন—

“তোমার প্রতি আমার প্রেম
আমার বেহ মনের টান !
তোমার অগাধ ভালবাসায়
উজ্জ্বলিত আমার গান !
মাতৃগুণে দিক প্রাণে
তোমার প্রেমের শীতুবধারা,
সে প্রেম বাবে যে বিন, হবে
বেহ আমার জীবনধারা !”

কখনও বা বিরহে কাতর হইয়া বলিয়াছেন—

“মধু হুতু আশিরাজে কুটিরাছে স্তল ;
আমার চৌধিকে আল পাছে বুলবুল !
এখন লুকারে তুমি রয়েছ কোথায় ?
বলন্ত উৎসব-নিশি বুধা বলে যায় !
তোমার বিচ্ছেদে আছি হয়ে অচেতন,
তবুও কি বলে’ সখা, কঠিন এমন !”

কখনও বা হতাশ হইয়া বলিয়াছেন—সেখা এখন আর
মিলে না, তবে শোন—

“যদি কিছু ওই চাক চরণ তোমার
স্পর্শ করে হাফেজের কবর-মুক্তিকা
চুমিতে ও পদধূলি হইবে বাহির
সমাধি গহ্বর হতে মস্তক তাঁহার !”

কখনও বা অভিমান করিয়া বলিয়াছেন—

“(ওগো !) দাম্প্ণ্যে এস আঁচলখানি তব
রক্ত-রাঙা পথের কাণা হতে—

আদর্শে তুমি যে দিন আমার কাছে !

(কারণ) এই পথে সে তোমার আসার আশে
কথিরাক্ত ছিন্ন জীবন বসত

আমার মত নিতা পড়ে আছে !”

হাফেজের কবিতার অধিকাংশ উক্তিই রূপক । তাঁহার
নানাব্যানে সুরা, সুরাবাতা, সুরালহ, পানপাত্র, অগ্নি,
উপাসক, প্রতিমা, মন্দির, বসন্ত, নিকুঞ্জ, উদ্ভান, বুলবুল,
গোলাপ, ঈদরোজা, প্রভৃতি শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ
আছে । অধ্যাস্তবহিদ্গণ বলেন, এই সকল শব্দ কবির
স্বার্থ প্রয়োগ ! অর্থাৎ, সুরা অর্থে ভগবৎ প্রেম ; সুরাবাতা
কে ? না, শুক বা ধর্মোপদেশী ; সুরালহ অর্থে ভক্তবৃন্দের
মিলন-নিকেতন ; পানপাত্র হইতেছে প্রেমিকের হৃদয় ;
অগ্নি উপাসক হইল প্রেমোৎসাহী সাধক ; নিকুঞ্জ ও
উদ্ভান অর্থে প্রেমিক ও ভক্ত-দুগমী ; বুলবুল কে, না, যিনি
প্রেমতবধারী ; গোলাপ কি না পবিত্র আশ্রা—ইত্যাদি
সাধু অর্থ বুঝিতে হইবে ; যথা—

“উঠ, ওগো সুরাবাতা ! সুরাপাত্র বাও ;
মন-বেদনার শিরে ঢাল দত ধূলি ।

বাও যদি পানপাত্র মদ-করতল
তাজিবি এ ছন্দবেশ—বৈয়োগ্যের স্থলি !
নাহি চাহি বন্দ-মান, কিবা কাব তার ?
করক দুর্দাস মম বত জানী অনে !

সুরা বাও, সুরা বাও, আর কতদিন
গর্জ্বাধু দিবে ধূলি মলিন জীবনে !
আমার এ মত মন পায়ে বুকিবারে ;
ওগো হেখা নাহি কেহ মর্যদ এমন—
মাত্র নিত্য নিরঞ্জন চিত্ত স্থনী হয় ।

কিন্তু সে আমার চিত্ত করেছে হরণ !
গোলাপ বুলবুল আছে, কোন চিন্তা নাই ।

সুরাপানে হৃদে থাক, দিন কেটে যাবে ।

হাফেজ-অধীর কেন, বৈধাঘর ভাই—

পরিণামে একদিন আবা পূর্ণ হবে !”

আমাদের বেশে যেমন কৃত্তিবাস তাঁহার ভাস্কর্যেণ,
কান্দ্রিয়ার দাস তাঁহার মহাভারত, এবং বিভাগতি, চণ্ডীমাল,
জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি—তাঁহাদের পরাবলী-গুলির
শেষ চরণে স্ব-স্ব নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ
হাফেজও তাঁহার প্রত্যেক গদ্যের শেষে হুই পংক্তির

যথো কোথাও না কোথাও তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। সাদীর যুগ ও তৎপূর্ববর্তী কালে কবিতার যে কোনও স্থলে কবি তাঁহার নিজের নাম দিতে পারিতেন; কিন্তু হাফেজের ও তাঁহার পরবর্তী যুগে কবিতার সর্বশেষ অংশেই কবির নাম দেওয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে—যেমন পূর্বোক্ত কবিতাটিতে রহিয়াছে।

হাফেজের অসংখ্য প্রেমপূর্ণ কবিতার সম্বন্ধই যে শ্রীভগবানের উদ্দেশে রচিত, তাহা নহে;—তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর উদ্দেশেও বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। একদিন তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর কণ্ঠে অবরচিত একটা সঙ্গীত প্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

“ওই তব অপরূপ স্তম্ভমাত্রে সখি—

আপনারে লুকাবারে পারিতাম যদি—

প্রত্যেক নিঃশ্বাসে তব চাক ওঠ ছুটি

প্রেমানন্দে চুম্বিতাব প্রিয়ে নিরবধি!—”

প্রেমিকের ছব্বরের অন্তঃস্থলে নিত্য যে অসংখ্য বাসনা জাগ্রত হয়, হাফেজ হ-এক ছব্বের অল্পত কবিতা-সজ্জির পরিচয় দিয়া, তাহা স্পষ্টই, সম্পূর্ণ ও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। একুশা তিনি প্রিয়তমার আঙুল-লবিত, আলুণারিত, কৃষ্ণ কুন্তলভার নর্শনে মুগ্ধ জ্বরে বলিয়াছিলেন—

“তব কৃষ্ণ বেশপাশে চুম্বি

দিন বোর রাত হয়ে যার—

ওঠের বেঠেনী মাঝে পড়ি—

আত্মা নম প্রার্থনা হারায়!—”

প্রণয়িনীর প্রত্যেক রূপ-বর্ণনার সহিত হাফেজ একটা অপারিবার্য বোগ-নাশন করিয়া, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এ ভগবতের হইতে যেন নাই!—হাফেজের নিপুণ হতে বাসনার কেমিলোদ্ভাস, কামগন্ধমুগ্ধ ও গাঙ্গসাবর্জিত হইয়া উদ্ভঙ্গ ও পবিত্রতার মণ্ডিত ও মহিমাবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রদান কারণ এই যে, হাফেজ নিজে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র প্রেমই মাহুযকে স্বর্ণের পথে টানিয়া তুলিতে সমর্থ। একটা কবিতার তিনি তাঁহার প্রেরণীকে সযোজন করিয়া বলিয়াছেন—

“আরেক বা দরবেশের দ্বারা নাই প্রিয়ে!

দে বীণ নিহিত আছে প্রেমিক জ্বরে—

প্রেম বহে আনে প্রাণে ভাগের সম্বেশ,
পারে না আনিতে দ্বারা তত্ত-ময় বেশ!”

এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি ভগবানকে তাঁহার প্রণয়িনীর দাস ও বেহেস্তকে তাঁহার প্রেমের বিলাস-ক্ষেত্র বলিতে বিমুখ্যাজ ও সন্তোষ বা দ্বিধা বোধ করেন নাই—! ভগবতের সুভ-বৃৎ প্রত্যেক গোম্বেরের মধ্যে তিনি সেই পথম সুন্দরের সখা অমুভব করিতেন! প্রেমের ছায়ার অন্তরালে তিনি বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতেন! তাই বোধ হয় সেদিন এই ভাববিহীন কবি তাঁহার অমুভববর্ণকে সযোজন করিয়া বলিয়াছিলেন—

“আজি এ উৎসব-রাত আশিও না বীণ;

প্রেমদীপ চাক গতে উদিত চন্দ্রমা!

ছড়ায়ে না পুষ্পগন্ধ সুবাস অলৌক,

প্রিয়ার কৃত-গন্ধে আঘোষিত দিক!”

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা হযরত মহম্মদের প্রতি হাফেজের অগাধ ভক্তি ছিল। এই মহাপুরুষের উদ্দেশে তিনি অসংখ্য স্তব্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহারই একটা পাঠকগণের জন্ত নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া—

“সখার স্বপ্নে হ’তে সেই দ্বিখাণ্ড ভূত—

এসেছেন বিনি তাঁর সুগন্ধ-গজিকা দনে

সজীবনী ঐবধ বাহিয়া;

সখার দোস্তা আর যন্তের নিবর্জন

প্রতাপ ও গৌরবের স্মরণ কাহিনী বিনি

গিয়াছেন অগতে গাহিয়া,—

উৎসর্গ করেছি তাঁর চরণে পরাণ যোর

সুসংবাণ লাভ হেতু; কিন্তু গো লজ্জিত অতি—

হেন তুচ্ছ বস্ত তাঁরে দিয়া—!

বস্ত তুমি অগণীশ! অহুকুল ভাগ্যবশে

কৃপার দিবাছ করি বাসনার অহরূপ—

আমার সখার বস্ত কিয়া—!

বিপণের বস্তা বনি বর্ণ-মর্ত্য ছিন্ন করে

তথাপি রহিব আমি সখার উদ্দেশে বনি

আনাপথে নীরবে চাহিয়া—!

সখার চরণ স্পর্শে—ভাগ্যবান সেই দুলি

ওগো প্রাণসমীপ নরন অজ্ঞান হেতু—

আবারে তা বিবে কি আনিয়া ?

বে দূত ! স্বাগত তুমি ! দাগ অহুয়াগী জনে

সখার সাংখ্য বসত ; শুনিয়া চরণে তাঁর

দিব গ্রাণ হর্বে নিবেদিয়া !

হাফেজের গ্রাণবধে হ'ক শত্রু সমুত্ত

আমি ত' লক্ষিত নহি আবার সখার কাছে—

ভীত হব কিসের লাগিয়া ?”

সার্ভ উইলিয়াম জোনস Sir William Jones বলেন, হাফেজের রচনার বিশেষত্ব নুতাইবার ক্ষমতা তাঁহার কোনও একটা সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা বাছিয়া লইয়া উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা অত্যন্ত দুর্বল ব্যাপার ! তাঁহার এছের বে, কোনও আশে খুশির, যে কোনও একটা কবিতায় দুই-এক ছত্র দেখাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট কার্য। কারণ, অসংখ্য গ্রন্থ গোলাপ-জুজের মধ্যে কোনটি যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব কার্য।

পারস্ত-রনদগদের আঁটার-ব্যবহার ও বীতিনীতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক আছে ; তাহার নাম—“কিতাব-ই-কুলুহ্ম নানে”। বিবি নুইয়া ট্রাফট কঠেগো তাঁহার “পারস্তের গোলাপজুজ”—(Rose-garden of Persia) নামক পুস্তকে উক্ত কিতাব-ই-কুলুহ্ম-নানে হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পারস্তের মহিলাবৃন্দ নৃত্য-গীতাদি শ্রুত্বার-কলার শিক্ষাগত বাস্তবিক সাহিত্য-চর্চাও করিতেন। এবং তাঁহারা কাব্য-রসেরই সমধিক পক্ষপাতিনী ছিলেন। বিশেষতঃ, হাফেজের কবিতাবলী তাঁহারা সকলেই কর্তৃক করিয়া রাখিতেন। একটা কিছু ব্যতীত তাঁহাদের শিক্ষা করিতেই হইত ; এবং আর কিছু জ্ঞান আর নাই ক'হুন,—হাফেজের স্তিতি-কবিতা গোটা কয়েক তাঁহাদের কর্তৃক করিয়া রাখিতেই হইত ; নতুবা তাঁহাদের ভ্রমসময়ে খাতির হইত না।—আমিও ভারতবর্ষের নানা স্থানের প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকারা যে সকল গমল পাখিরা থাকেন, তাঁহার অবিকালই পারস্ত-কবি হাফেজের বিরচিত। কালের সর্বগ্রাসী রদনা আমিও হাফেজের অমর রচনাবলী বিস্মৃত করিতে পারি নাই। তাঁহার রচনার এই অমরত্ব সম্বন্ধে শক্তিশালী কবি বহুপুর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কিতাবের এক স্থানে আছে—

“লক্ষিত প্রেম চিত্ত তার

নুতাই নাই তার—

অমিত এ বিশেষ বোর

অমরত্ব হযেই প্রচার !”

এমার্সন (Emerson) সাহেব বলেন, তরানীতন জগতের কবিরদের মধ্যে হাফেজকে সর্বশ্রেষ্ঠ আশন দেওয়া যায়। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সহিত Pindar, Horace, Anacreon ও Burns-এর কিছু-কিছু মাত্র তুলনা দেওয়া হইতে পারে।

হাফেজের কবিতাগুলির প্রকৃত ভাব লইয়া পাশ্চাত্য-জগতে চিত্তকল দল চলিয়াছে। একদল গণ্ডিত বলেন, “উহা কেবল অভ্যাস ও ইম্প্রিভ-ভোগ প্রচার করিয়াছে।” অল্প দল বলেন, “উহা স্বর্গীয় রহস্যময় এবং অখায়া-তবে পরিপূর্ণ।” ঠিক এই বিবাদই হাফেজের কবিতাকালে পারস্তকেও দুই দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর পর, সিরাজের উম্মা সাহেব (যিনি হাফেজের কবিতাবলী অপবিত্র মনে করিতেন) তাঁহার শবদেহের উপর অন্তিম উপাশনা পর্যন্ত করিতে অসম্মত হইয়া-ছিলেন। এক দিকে হাফেজের অহুয়াগীরা তাঁহাকে পারস্তের বিখ্যাত কবর-ক্ষেত্রে সমাহিত করিতে উদ্ভত ; অন্যদিকে তাঁহার বিপক্ষীয়েরা হাফেজকে সাধারণ কবর-ভূমিতে পর্যন্ত স্থান দিতে প্রস্তুত নন,—উভয় দলে এমন ঘোর বিরোধ উপস্থিত! এখানে কি করা কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, হাফেজের রচনার যে-কোনও এক স্থান উন্মোচন করিয়া সেখা বাড়ুক, সেখানে কি নিষিদ্ধ হইয়াছে। হাফেজ অপবিত্র কি পবিত্র, তুচ্ছ কি অতুচ্ছ, অশুভ কি সুশুভ, তাহা হইতেই স্থির হইবে।—অতঃপর, তদনুসারে হাফেজের রচনার যে-কোনও এক স্থান উন্মুক্ত করিয়া সেখা হইল যে, সে স্থলেও কবি নিষিদ্ধাছেন—

“আমি আর হাফেজের শব্দার্থ হতে

চরণ তোমার, বন্ধু ! লইও না তুমি ;

যদিও সে ঘোর পাণে ছিল নিমগ্ন,

তবু কেনো, স্বর্ণপুটে গিয়াছে সে চলি !

গোলাপের ফুল হতে তেলে আসে এই—
 ত্রিবিবের স্তম্ভভিত্তি মুহুঃ সন্ধানিনী ;
 আমি আর দূরা আমি আমরা ছন্দন,
 প্রেমাস্পদ প্রেমময়ী প্রণয়ী সমান !
 হে ভিক্ষুক ! গর্ল কেন করিছ না আজ
 দিগন্ত-বিস্তৃত তব নব সাম্রাজ্যের ?
 শিরে ধার নীলধর হাম্রাস্ত্রভেদণ,
 পুশিত ক্রান্তল ধরা ধার সিংহাসন ;
 অনন্ত বলন্ত বার ঐশ্বর্য-মহিম,
 তার সম ভাগ্যবান আছে বল কেবা ?

পাপ যদি হয়ে থাকে—কমা যার নাই,
 তবু এই অভ্যাসে করিও না যুগা ;
 কে জানে কি অগন্ধিতে লিখেছে নিমতি—
 হুম্মিত হাক্কেলের অদৃষ্ট-বিধান !

এই রচনা পাঠ করিয়া হাক্কেলের অসংখ্য তুল্য বহুগুণ
 অধোগ্রাস করিয়া তাঁহার শব্দার্থের লইয়া চলিলেন ; এবং
 বিপক্ষপক্ষেরও সমবেত সম্ভ্রান্ত সঙ্কলন সকলেই কবর-ভূমি
 পূর্ণ্য এই মহাকাব্যের মৃতদেহের অঙ্গুসরণ করিলেন ।

হাক্কেলের মৃত্যুকালের কোনও সঠিক নির্দিষ্ট তারিখ
 পাওয়া যায় নাই । সকল গ্রন্থকারই বিভিন্ন তারিখের
 উল্লেখ করিয়াছেন । 'বিশ্বনেস' সাহেবের প্রস্তুত তারিখই
 বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়, কারণ, তিনি

হাক্কেলের লম্বা-পায়ে খোদিত প্রস্তর-শিপি হইতে তুলিয়া
 দিয়াছেন—১৩৬৮ খৃঃ অব্দে হাক্কেল ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ
 করিয়া গিয়াছেন । (Bicknell's selections ; pp. ২২৭)

শিরাজের উত্তর পূর্বে কোণে, সহর হইতে দুই মাইল
 দূরে মুল্লা নামক একটা কুহুমতর লম্বাকর্ণ কবর-ভূমিতে
 হাক্কেলের শব্দত রোপিত একটা সাইগ্রাস (৭) কৃষ্ণের
 তলদেশে মহাকাব্যের পাকভৌতিক দেহ লম্বাহিত হইয়াছে ।
 হাক্কেলের এই লম্বাখি ক্লেদকে কবিতা "হাক্কেলিয়া" নামে
 অভিহিত করেন । উহা এক্ষণে মুল্লামানগরের একটা
 তীর্থ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে । নানা স্থান হইতে বাজীরা উহা
 দর্শন করিতে আসেন ।

১৪৫২ খৃঃ অব্দে মুল্লামান আবুল কাশেম বাবরের
 উম্মীর মৌলানা মহম্মদ মোরাসাই হাক্কেলের কবরের উপর
 একটা মনোরম স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন । (৮)

(৭) ডিঃ হারিসবার্গ কৃষ্ণ বিশেষ-মুল্লামানগরের পোকখন্দ চিত্র ।

(৮) Leut. Col. H. Wilberforce Clarke R. E.

"The Life of Haik" অবলম্বনে গ্রন্থকর্তা এই গ্রন্থ রচিত ।
 ইনি ইংলণ্ডে আয়লওডের এনিমালটিক সোসাইটির ও বঙ্গদেশের
 এনিমালটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন । ইনি পার্স-সাহিত্যে হৃদগত ।
 "Persian Manuel" নামে ইংল্যান্ডে রচিত গ্রন্থ-ভাষ্য শিক্ষার
 উপযোগী একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা । ইনি সর্বপ্রথমে দেশ-স্বাধীন
 "বস্ত্রান" ও বিজ্ঞানীর "দেবোদ্যোগমালা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অমূল্য
 পাঠ্য গ্রন্থ মূল পাঠ্য হইতে অব্যাহত করিয়াছিলেন ।

স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র

[শ্রীমদরেন্দ্রনাথ রায়]

হৃৎ-হারিস্রোত দাবানলে দহিতে দহিতে যে কবি কাতরকণ্ঠে
 একদিন বাঙ্গালীকে বলিয়াছিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে—

তোমরা আমার চিত্তার দিবে মঠ ?

আজ যে আমি উপোস করি, না খেয়ে শুকিয়ে মরি,
 হাংকায় দিবানিশি খুঁধার করি ছটকট ;

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে, তোমরা আমার

চিত্তার দিবে মঠ ?

সেই কবি—ভাওয়ালের গৌরব সেই গোবিন্দচন্দ্র দাস
 মুকুন্দর পুত্রবীতে আর নাই । দুইশাব্দিক কাল গত হইল,
 মুকু। আশিরা তাঁহাকে সঙ্গারের সকল আশা—সকল
 যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছে । তাঁহার বিরোধে
 বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তিনি এখন জুড়াইয়া
 বাঁচিলেন ।

কবির ভাগ্যে হৃৎ-ভোগ এ দেশে অবন্ত নুতন ঘটনা
 নহে । মধুসূদন ও বেদেন্দ্রকে অনেক হৃৎ-কষ্টই সহিতে

হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের জীবন নিরবচ্ছিন্ন প্রাণেরই জীবন।—সে জীবন-ইতিহাসের মত জীবন-ইতিহাস বিতীর্ণ দেখিয়াছি বহিরা মনে পড়ে না। সে ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ছন্দ করুণ-রসে অভিভূত। মাইকেলের বিজ্ঞানায়ন ছিলেন,—বহাগালা বীজব্রহ্মোদয় ছিলেন; হেমচন্দ্রেরও সম্বন্ধসমূহ অস্বাভাবিক ছিলেন,—বিশারদ ছিলেন; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের চোখের জলের স্রোত সহস্রাধারে বরাবর বহিয়াছে—কেহ তাহা দুইহাওয়ার মত অগ্রসর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পূজা কবিবার মত বাঙ্গালী যখন বোলপুরে ছুটিয়াছে, রায়েন্দ্রবাণীকে পরিচয়-দানির যখন সোংসাথে লব্ধিলা করা হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র স্মারক মাকণ মংশনে অবস্থি—অভাবের অশেষ স্বেপে অবসর। মনে পড়ে, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার এক শ্রুতিমত কবি-ভ্রাতা দেশের অন্তর্য্যেক মাক্ষ-গণ্য ব্যক্তির নাম সহি করাইয়া ভাওগালের রাষ্ট্রমাতার নিকট এই আবেদন-পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন,—“মহোদয়, কবির গোবিন্দচন্দ্র দাদা, ভাওগালের কবি—পূর্ব্ববঙ্গের কবি—অনুনাটন বঙ্গ-সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। কিন্তু এই চির দরিদ্র কবির দারিদ্র্য এখন চরমে উপস্থিত। এ সদর তাঁহার বেশ-বাসীরা যদি তাঁহার জতি কৃপা-দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলে অক্ষতজ্ঞতা-পালে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস চিরদিনের মত কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের সহিত ভাওগাল-রাজবংশের কীর্ত্তি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত। তিনি ভাওগাল-রাজের প্রজা। শৈশব হইতে ভাওগাল-রাজবাটীতে, রাজ-অঙ্গে—রাজ-অগ্রহায়ে লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে যে পৌরবের আগমনে আন তিনি প্রতিষ্ঠিত, ভাওগাল-রাজই তাহার প্রধান কারণ। তজ্জন্ত কবি এবং কবির গুণমুদ্র বেশবাসিগণ ভাওগাল-রাজ-সমসারের নিকট ত্ততজ্ঞ। আমরা আ-নাথের এখন এই অল্পতোষ করি যে, যে কবি আপনার স্বামী-সেবতার সহিত—আপনার স্বপ্ন-কুলের সহিত চিরজীবন অর্জিত, সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাকা-নগরীতে একটি বাস-গৃহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিদগ্ধ হইতে রাখা করুন। তিনি বিক্রমপুরে এখন যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা অতিরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ভাওগালেও এখন বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন; সে সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। পাচ কি ছয় হাজার টাকা চইলেই তাঁহার উপযুক্ত একটি বাসগৃহ হইতে পারে। আপনার পক্ষে টাকা অতি সামান্য ব্যয় মাত্র, কিন্তু কবির পক্ষে টাকা ইচ্ছাকৃতের সংস্থান। আপনি অবগত আছেন যে, আপনার স্বর্ণগত স্বামী-সেবতা গোবিন্দ বাণীকে একখানি বাটী নির্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আমরা করি, এই নিমন্ত্রণ, বঙ্গ-সাহিত্যের কীর্ত্তিমান কবিকে আপনি একটি বাসোপ-যোগ্য গৃহ প্রদান করিয়া রাজ-বংশের পূর্ব্ব-গৌরব ও বসন্তজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। গোবিন্দ বাণী সেই গৃহ আপনার নামে, অথবা আপনার সঙ্গীর স্বামীর নামে নামকরণ করিয়া ত্ততজ্ঞতার সহিত আদরণ এই দান দরপ রাখিবেন, এবং সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার এই কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল থাকিবে। পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রাচীনতম রাজ-বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার ও দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। হিন্দু বিবাহের নিকট ত্ততজ্ঞা করি, এই সমবেত অহুতোষ কখনও উপেক্ষিত হইবে না।”

বলা বাহুল্য, এ সমবেত সাহসের অহুতোষ মরণ হয় নাই। দেশের ধনকুবেরগণের কর্ণধূমেরও উচ্চ ভেদ করিতে পারে নাই। ঐগোরা আবেদন-পত্রে নাম সহি করিয়া-ছিলেন, তাঁহাব্যেও ঐ কর্ণধূম হুড়ু গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি আর কোনও কর্তব্য করেন নাই তাই তখন ‘প্রবাসিনী’ পত্রিকায় শিথিয়াছিলাম—“গুণিতে পাট, আশাহের মনুষ্য ভয়িরাছে; আমরা মাইকেলের উদ্দেশে মাঝে মাঝে বিশাশের হুয়ে বলিয়া থাকি,—

“অথহে না অনাথরে, বঙ্গ-কবি-কুলেথরে,

ভিকৃৎকের বেশে মাতা বিরাহ বিহার।”

কিন্তু আজ যে আমরা দেশের আর এক কবিকে সেই ‘ভিকৃৎকের বেশেই বিহার’ দিতে বলিয়াছি, তাহার কি ? বলিতে নাই—কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র যখন ইচ্ছাকৃত হইতে বিদায় লইবেন, তখন বহু তাহার তাঁহার মত স্মৃতি-সভা করিব, শোকে কবিতা ছাপাইব, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশে তাঁহার খাতাও তৈয়ারী করিব। কিন্তু তাহাতে কি কবির পেট তরিতে ? স্মৃতি-রক্ষা তো ভবিষ্যতের কথা,—

উপস্থিত যে কবির প্রাণ যায়, তাহা রক্ষার উপায় কি ?
শেওত্র কি কেহই কিছু করিবেন না ? শেওত্র কি কাগরও
প্রাণ ভাঁধে না ?—বলা বহুলা, এ কোন আমাদের
অহংগে কোন নাকই হইতছিল। বাঙ্গাল দেশের এ কাঙ্গাল
কবিতাও তখন তাহা বুঝিয়াছিলেন;—বুঝিয়া নৈরাশ্রের
প্রকাশ কেনিয়াছিলেন। সে প্রাণ বড়ই মর্মান্তিক।—
সে প্রাণ তখন কাগরও কর্ণগোচর হয় নাই জানি;—
এখন একবার কাগ পাতিয়া সকলে তখন,—

“প্রাণের এ হাফাকার, কেহ তুলি না আর—
আর না শুনাতে চাই,— আর না শুনাতে চাই—
কিরে বাই, কিরে বাই !”

কবির সত্যই আর তাঁহার ‘প্রাণের-হাফাকার’
কাগরও নিকট প্রকাশ করেন নাই। অত্যাচার পত
বুদ্ধিক-দংশন-আলার অসিয়া অসিয়া নিতা জাণ হইয়াছেন,
তবু সে আশা কাহাকেও জানিতে যেন নাই। অভিমান
তাঁহার বড় বেশী ছিল। ‘গারিভোর মুক্ত গার্ক’ তিনি
ধরিত্রের আদর্শ ছিলেন। অত তেজ, অত অভিমান না
ধাকিলে আমরা গোবিন্দনাথকে যেমন কবিতা পাইয়াছিলাম,
ঠিক তেমনটি পাইতাম না সত্য; কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে
অতটা অত্যাচার উৎপীড়ন সহ করিতে হইত কি না সন্দেহ।
মোহাম্মদীকে তিনি আত্মীয়ই অন্তরের সহিত স্থগা
করিতেন।

তবু অর্ধের অভাব নহে, বিধাতার বিধান তিনি
কোনও স্নেহেই স্থগী হইতে পারেন নাই। দারিদ্র্য-দুঃখের
সঙ্গে-সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের বিরোধ-কথাও তাঁহাকে নিরন্তর
পুতপাকের ভ্রায় নষ্ট করিয়াছে। বাণী-সাধনার তিনি যখন
নতন ব্রতী, তখনই তিনি তাঁহার “সংসারের সার, মেহের
জীবন, জীবনের সর্বস্ব” গুলেন্দ্রীকে হারাইয়াছিলেন।
সেই সময়ই—“স্বধাবহ সোহাগ জীবনের ভাই, পৃথিবীতে
যেন বড় আর চুট নাই”—এমন যে তাঁহার সোহাগর,
তাঁহাকেও নিষ্ঠুর কাল হরণ করিয়াছিল। প্রায় সেই
সময়েই তাঁহার “শত-শত-ব্রহ্মদাণ্ড, চাক ইন্দীবর আঁকা”
তনয়াও তাঁহার নিতট হইতে চিত্রবিদ্যার প্রাণ করিয়াছিল।
একটি শোক সমিত হইতে না হইতে আর একটি শোক
তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক, এমন শোক-

দুঃখের জীবন আর কোনও কবির দেবিগাছি বলিয়া যেন
পড়ে না।

এত দুঃখ, এত দৈন্ত, তবু কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র একদিনের
অন্তও সাহসা-সাধনার শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। দৈন্ত-
দুঃখের দক-মারুতে কবিত্বের সাধারণতঃ শুকাইয়া যায়
বটে, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের তাহা না হইয়া বরং তাহার উটাই
হইয়াছিল। সাহিত্য সেবা তাঁহার যেন দুঃখে সুখ, শোকে
সাম্রা ছিল। যে সময় অন্ত লোক তাঁহার অবস্থা
দেখিয়া চক্কর মল ফেলিত, সে সময়ে তিনি সারবার সেবা
করিয়া মনের আগুন নিবাইতেন। তাঁহার কবিতাসকল
স্বপ্নের দান নহে,—তাঁহা রুদিনের ক্লমদেব-সংঘর্ষে উৎপন্ন।
দুঃখের বিষয়, এমন ওদ্বিগ্নী প্রতিভা অপূরণীয় রহিয়া
গেল। কলঙ্কের কণা, এমন অস্বাধার প্রতিভার আঘাত
গোরব বৃষ্টিতে পাড়িয়ান না।

রবীন্দ্রনাথের সমদামরিক ও পঞ্চাষষ্ঠী কবিগণের মধ্যে
যে কল্পন কবির স্মৃতি-কবিতার স্বাতন্ত্র্য সেবা যায়,
গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের অন্ততম। তবু তাহাই নহে, এ
মুগের স্মৃতি কবির মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ করি
খাটি বাঙ্গালার খাটি বাঙ্গালী কবি। তিনি ইংরাজী
ভাষার সহিত অপরিচিত ছিলেন। কালেই শৈলী-ভ্রান্তি
বা বাহরপ টেনিসনের ভাব-সম্পদ লইয়া তাঁহাকে কখনও
বাহির হইতে হয় নাই। তাঁহার প্রাণ বাহা বলিতে চাহিত,
তাঁহাই তিনি গারিতেন। রাখিরা-চাকিরা কিছু বলিতে
পারিতেন না—বলিতে জানিতেনও না। এজন্য তাঁহাকে
অনেক সময় অনেক লাহা-গল্লা ভোগ করিতে হইয়াছে,
কিন্তু তাহাতে তিনি ক্রক্ষেপ করিতেন না। যেন পড়ে,
প্রায় সাতাইশ বৎসর পূর্বে “নব্যভারত” সম্পাদক মহাশয়
তাঁহার “নব্যভারতে” লিখিয়াছিলেন,—“গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র
ব্যক্তি, তাহাতে পূর্ণ-বঙ্গবাসী, এজন্য একশ্রেণীর হিংসা-
পরায়ণ ব্যক্তি ক্রটি ধরিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাব্য-অঙ্গ হইতে
অবহৃত করিবার চেষ্টা আছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্রটি
ধরিয়া শুধে কেহ কথা বলিতে সাহসী হন না, কিন্তু দরিদ্র
গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা ঘুরাইতেছেন।
গোবিন্দচন্দ্র যনের কথা লেখেন,—প্রাণ খোলা, ভাব খোলা,
কোন বাধা তিনি মানেন না, উপদেশের কথা শুনে না।
এ বড় বিষয় দার। গোবিন্দচন্দ্রকে পরামর্শ উপদেশ দিয়া

মিরা ক্লান্ত হইরাছি; গোবিন্দচন্দ্র কিছুতেই আপন মনের কাহিনী বলিতে ছাড়িবেন না। জামরা গোবিন্দচন্দ্রের এই স্বভাবের কিন্তু বড়ই পক্ষপাতী। তিনি কাহারও কথার চলিতে চাহেন না। মূল কোটে, চাঁদ হাসে, পানী গাধ, সাগর গর্জন করে, কাহারও কথা মানে না। কবি সেই ভানে বহন তান মিলাইয়া ভগতের উগরে উঠেন, তখন তিনি কেন ভগতের কথা শুনিবেন? গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাব কবি।—“কথাগুলি অকৃত্রিম অভিব্যক্তি নহে। লোকে কি বলিবে, কি ভাবিবে, এ কথা ভাবিয়া ব্যস্তবিহই তিনি কবিতা লিখিতে বসিতেন না! মনে পড়ে, বেহলতার আশ্রয়ত্যা দেখিরা মেলতকালোক বহন তাহার ভরণান আরম্ভ করিয়াছিল, সেই উজ্জ্বলের মূখে কেহ বেহলতাকে ‘দেবী’, বেহ বা ‘ভগবতী’ বলিতে লাগিল, সেই সময় একমাত্র গোবিন্দচন্দ্রই বলিয়াছিলেন,—

“কলি কিরে হস্তভাঙ্গি কেরোদিনে পুড়ে,
নারীর মড়ক লাগাইলি বাগল! মল্লুক জুড়ে!
মনে যদি ভেদ ছিল তোর করি না তুই বিদ্র,
কে নি’ছিল কল্যাতার গলায় গানছা দিরা?
আর্গা-নারীর কার্য্য নয়, এ আশ্রয়ত্যা করা,
ইহকালের পরকালের নিশা-নয়ক-ভরা!

• • • • •
এ ত নয় সে জহর ব্রত, এ যে বিষম পাণ,
নিম্নিসিতে আশ্রয়ত্যা বিধির অভিশাপ!
লোকের হিতে বেশের হিতে সবশিখে গ্রাণ,
সে ত নয় যে আশ্রয়ত্যা, সে যে আশ্রয়ান।
আশ্রয়ান আর আশ্রয়ত্যা বর্ণ-নরক ভেদ,
বুঝিলি না তুই বোকা। যেহে, আই যে বড় বেধ।

• • • • •
বিদুর মেয়ে কেউ কি কখন এমন মরণ মরে?
চিরজুবারী রেজনারী পরের সেবা করে!
মকরীপেটী, মর্দাবোতী বরং ভাল ভায়া,
এমনতর মর্দানিতে নয় সে আশ্রয়ত্যা।
তাদের চেয়ে অধম তুই যে তাদের চেয়ে বীন,
হস্তভাঙ্গি, এঘনি করে মাখুনি কেরোদিন।” ইত্যাদি।

এ বেশ গৈরিক নিম্নের বত।—যে সময় বেশ শুদ্ধ লোক বেহলতার গুণ-পানে উজ্জ্বল, সেই সময় অমন ভাবে তাহার

কলা চা-না করা যে কত বড় সাহসের কার্য্য, তাহা বলা যায় না। তাই পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, কাগরও দুখ তাকাইয়া গোবিন্দচন্দ্র কখনও কিছু লিখিতেন না। তাঁহার ভাব-প্রোত বঁদন উজ্জ্বল হইত, তখন তিনি তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। কোথাও শুণ্ডারী ছাকানী বা অভ্যাচার উৎপীড়ন দেখিলে তিনি আত্ম উজ্জ্বল উজ্জ্বল;—তখন তাঁহার নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পাকিত না, নিজের বিপদের কথাও মনে হইত না। অভ্যচার উপশান্তির মত তাহার মনের মধ্যে তখন যে ভাব উদ্বেলিত হইত, তাহাই কবিতাকারে প্রকাশ পাইত। তাহার ‘মগের দুমুখ’ ঐ কবিতাই উজ্জ্বল উদাহরণ। মনে পরে আক তাহার—

“এই যে ভাগ্যলবানী,
নিভা অজ্ঞানে তাসি,
অবিচারে ব্যতিচারে তথ্যীকৃত হয়;
কে করে তাহার খোঁজ,
অহরেরা রোম রোজ,
কত যে কুলের বধু চুলে ঘরি সুর!
দিবাশোকে যিশ্রংহের,
গতির বীতিয়া বয়ে,
কোণের কাড়িয়া লয় কত কুলসর,
কত যে ঘননী বোন্;,
কাটিয়া বয়ের কোণ,
ছুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়। “ইত্যাদি—

নবীন কবিতারো বোধ করি এ কবিতা পড়িয়া নানিকা শিকার জুগিয়েন, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ‘বিশ্ব-সাহিত্য’ গড়িবার দিকে গোবিন্দচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজের মধ্যমে, নিজের বেশে, নিজের জীবন-বটনায় কবিতার বস্ত্র দেখিতে পাইতেন।—তাহা দেখিতে পাইতেন বলিয়াই আজ তাঁহার কবিতার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। দুর্জয়-পীড়ন দেখিলে তাঁহার গ্রাণ কিরণ কাঁদিত, পাঠক তাহা একবার দেখুন—

“ভাগরণ আমার অবি-মক্ষ, ভাগরণ আমার গ্রাণ,
আমি তার নির্ময়িত অধম সন্তান।

• • • • •

আহা তার নর নারী,
কেলে যে আঁখির বারি,
অবিচায়ে বাড়িচারে ধরে স্ত্রিমহাণ,
বার মাপ তের কান্দি, যিনে রেতে মে ডাকান্দি,
বুকে বিঁধে সধা মোর, শেণের সমান !

তাদের কলিঙ্গা ভাঙ্গা বাতনা-আগুন-হাঙ্গা,
শিগার শিগার জলে শিখা লেলিহান !

বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার ছুখ-নিশি হয় অবলান,
আগনি ধরিতা ছুরি, আকর্ষ লগরে পুত্রি,
কলিঙ্গা কাটিয়া দিই করি শতধান !” ইত্যাদি
—ইহা আত্মরিকতা ও সমবেদনায় উৎস ! দেশবাসীর
হৃৎ খণ্ড দেখিয়া এমন ভাবে রোদন করিতে আনন্দের
আর কোনও কবিকে দেখি নাই।

দেশান্ধবোধের কথা উঠিলে অনেক কবির নাম করা
হয় দেখিতে পাই, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের নাম কেহ করেন
না। অথচ তাঁহার ভ্রাতা বাতুলকণ্ঠ, 'স্বদেশপতঙ্গাণ,
দেশান্ধবোধে উদ্ধত সাধক বঙ্গদেশে অতি বিরল আছেন।
তাঁহার কবিতার জাতির যে সজীবন মহামন্ত্র কল্পত হইতেছে,
ভ্রাতার তুলনা বড় একটা দেখিতে পাই না। জাতীয়তার
গান অনেকেই তো পাইয়াছেন, কিন্তু এমন গান কেহ
তিনিয়াছেন কি ?—

আমরা হরিহর,

আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম,

যোক না বোমের সপ্ত ন্যাস,

আমরাই সদিয়া সিদ্ধ দেহু রামেশ্বর,

আমরা নাগা আমরা গারো,

কেহই ত পর নহি কারো,

ধর্মী বর্গী স্তম্ভা মাঠ আর পার্শী সওদাগর।

গতিচেষ্টা ফরাসভগো,

নামে কি বার ভাঙত ভাঙ্গা !

কেউ বা কাণো কেউ বা রাগা একই কলেশ্বর।

কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,

বক্ষ চক্ষ লগটি মস্ত,

একই মেহের বক্ষ মাসে আমরা পরস্পর।

আমরা হরিহর।

বাঁধা যে তাই বিভ্রম-শিলা,

ভুবল কোথায় সপ্ত ভিলা,

সাগর সৈতে তুলব এবার 'চাঁদর' 'মধুকর'।

দেখব মাতের গজ গিলা,

দেখব মাতের শক্তি-লীলা,

সাগর সৈতে তুলব এবার 'ঐশ্বর্যের টোপর'।

আরও পুঞ্জি মাতের চরণ, মাতের দিবেন বর !

আমরা হরিহর।

কঃ পদ আঁখি দিয়া,

রাম পুঞ্জিল লতা গিরা,

শকা কি রে, আমরা তো তাই তারি বংশধর !

আরও আমরা সবাই বুট,

পুঞ্জি মাতের চরণ ছুটি,

উপাড়িয়া বসি কোটি নেত্র মনোহর।

ছাপিত হুও হুও

আর বা লাগে দে সমস্ত,

আরও সবাই সেই রে মাতের পদ-পাতের পর ;

অনেক দিন মা পায়নি পুঞ্জা,

সাগর-পরা ভ্রামণ ভূষা,

ললিত চরণ মলিন মাতের রক্তে রাগা কর।

আরও পুঞ্জি মাতের চরণ মাতের দিবেন বর।”

—এইরূপ এক-আখটি নহে—বহু লগীতি তিনি রচিতা

দিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতার তিনি এইরূপ আগুন

ছুটিয়া গিয়াছেন—এইরূপ সুধাধারা ঢালিয়া দিয়াছেন।

বহিন বাবুর ভাবার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, যদি 'উজ্জৈঃমরে

রোদন, যদি আত্মরিক মর্মেতেদী কাতরোক্তি, যদি ভ্রমশূন্য

ভোমোর সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্লভা-প্রার্থিত কোষ বেশ-

বাৎসল্যের লক্ষণ হয় ;—তবে সেই বেশবাৎসল্যের সকল

লক্ষণ গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার বিকীর্ণ হইয়া আছে।’

সার্বক-জীবন 'গোবিন্দ দান' যে ভাবের ভূকান তুলিয়া-

ছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনার ইহা স্থান নহে—ইহা

অবসরও নহে। সমগ্রান্তরে তাহা আমরা করিব। আজ

তাঁহার বিরোধ-বেদনা অহতব করিয়া রোদন করিলাম

যাত্রা। বাও কবিবর! যে সংচিহ্নমানক শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গীত-মন্ডল-বীণা বর্ণনাকর্মের সমর্পণ করিয়াছিলেন, বাও, তাঁহার নিকট বাইরা শান্তি-স্থল সন্তোষ কর। তথায় শোক-সত্য-পারিতোষ্য নাই। বিবেকের বিব নাই। ভোমার পুণ্যত পূর্ণ; এখন বাও। আদ্য ভোমার কবি-ভ্রাতার ভাষার রোমন করিয়া বলি—

“নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্মী—গর্দোহিত শির,
কোন মধ্যমাজ নহে পূর্ণবীর,
নাহি প্রতিদ্বন্দ্বি ছবি।
তবু কীর, কীর,—জনমভূমি
সে এক দরিদ্র কবি।”

আন্তর্জাতিক বিধান

(International Law)

[শ্রীমত্যাগোপাল রুদ্র]

পৃথিবীর সভ্যরাজ্যগণ পরস্পরের প্রতি বৈষম্যচ্যেয় করা উচিত বিবেচনা করেন না। ঐতিহাসিকের দাবীতে কার্য কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে;—কি দক্ষি, কি বিগ্রহ সকল সময়েই তাঁহারা সেই নিয়মসমূহ পালন করিয়া থাকেন। সেই নিয়ম সমূহকেই আন্তর্জাতিক বিধান কহে। বর্তমান কালে সভ্যরাজ্যগণ বিবেচনা করেন, যেনন যুগ্মপদের রাজবিধান পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য, তেমনি আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে কার্য করা সকল নৃপতির একান্ত কর্তব্য। যে স্থলে কোন নিয়ম নাই, সেই স্থলেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই হেতু, বিবেকসম্পন্ন মানবজাতি যে প্রত্যেক বিষয়েই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই বাস্তবিক। ইহাতেই আন্তর্জাতিক বিধানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অসন্দেহ হইতেছে। যদি নৃপতিগণের কার্যসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিয়মাবলী না থাকিত, তাহা হইলে পদে-পদে বৃদ্ধ, অশান্তি ও অকারণ শোকের সংঘটিত হইত।

আধুনিক আন্তর্জাতিক বিধান ক্রিষ্টাব্দিক তিন শত বৎসর হইতে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইতেছে। অতি পুরাকালেও নৃপতিগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিধান বর্তমান ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে রোমের সাম্রাজ্য-স্থাপন-কাল পর্যন্ত আদ্য এক একালের আন্তর্জাতিক বিধান তথানীকন যুরোপীয় রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই।

যদি বিভিন্ন দেশীয় লোকগণ একই বংশসমূহ হইত, তাহা হইলেই তাহারা পরস্পরের সমান চক্ষা করিত, এবং নৃপতি-গণ বহুত্ব-স্থলে আবদ্ধ থাকিতেন। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, তৎকালে দৃশ্যগণের কোনরূপ অনিষ্ট করা হইত না। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও দৃশ্যগণ অবশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যুরোপে যুগ্মের জন্মের পর হইতে বহু শত বর্ষ ব্যাপিয়া এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, সমুদায় নৃপতিকে পরিচালনা করিবার জন্য একটা সর্বপ্রধান শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে; রোমের সম্রাটই সেই প্রধান শক্তি। তাঁহার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিধান নির্ধারিত হইত। তিনি যুরোপের সমুদায় নৃপতির ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। যখন তাঁহার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, এবং গোপের সম্মান ও ভয় প্রাপ্ত হইল, তখন যুরোপের রাজাদিগের মধ্যে আর কোন বন্ধনই রহিল না, আন্তর্জাতিক বিধান লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। রোমান সম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; সভ্যতার আলোক নির্মোচিত হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে দুষ্-বাগ্যের আর কোন নিয়ম পালন করা হইত না; বাণিজ্য-নিয়ম অতীব দুর্বল হইয়াছিল। সমুদ্র-পথে দুইবৃদ্ধি জলদস্যুর প্রাচুর্য বর্ধিত, ব্যবসায়িকগণ সবিশেষ কতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে এই বিশৃঙ্খলার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। হিউগোগোপাল নামক একজন খ্যাতনামা উভোপী পুরুষের উত্তম নৃপতিগণের ও সাধারণ

লোকের মতি পরিবর্তিত হইয়াছিল; এবং তাঁহার ফলে, সমুদ্রায় যুরোপ মহাদেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল। একজন লোকের প্রথমে সমুদ্র পৃথিবীর যে এতাদৃশ পরিবর্তন সংঘটিত হইল, ইহা অতীত আশ্চর্যের বিষয় নহেই।

১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে হম্ফ্রি বোশেইল গ্ল্যান প্রুট ভ্রমগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণতঃ ফিউগো গ্রোসাস্ম নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহার বেশাবলিগণ এই সময়ে স্বদেশের ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে স্পেনের সহিত বিঘ্ন সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই সমুদ্রায় যখন তিনি স্বত্বে প্রত্যক্ষ করেন। আন্তর্জাতিক বিধান লুপ্তপ্রায় হওয়ার বেদের যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহা তাঁহার সমাক্ষ অস্বস্তিক্ত হয়। অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যান ও আইনজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি-লাভ করেন। গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি সাতিশয় ধর্ম: অর্জন করেন। তাঁহার বহুবিবরণী প্রতিভা ছিল। তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, আইন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি কবিতা রচনা করিতেও পারিতেন। দেশের মধ্যে তৎকালে গৃহ-বিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে যোগদান করায়, ১৩৮ খৃষ্টাব্দ তিনি বন্দি হন এবং তাঁহার প্রতি বাবজীবন কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হয়। তাঁহার অসুস্থতায় পক্ষীর বৃদ্ধি-কৌশলে তিনি এই বিঘ্ন বিপন্ন হইতে মুক্তলাভ করেন। তাঁহাকে গোপনে একতী বাসে: মধ্যে বদ্ধ করিয়া কারাগৃহ হইতে বাহিরে আনা হয়;—লোকে বিবেচনা করিল, যেন তিনি তাঁহার বহুবর্ষের নিকট হইতে যে সমুদ্র পুস্তক পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন, সেই গুলিকে বাসে পরিপূর্ণ করিয়া বাহিরে লইয়া আসা হইতেছে। অনেক বিপদ-আপদের পর তিনি প্যারিসে উপস্থিত হন। তথায় তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যে কাটাইলেন। বাহা হউক, যে পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা তিনি সমুদ্র মানবজাতির উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার নাম De Jure Belli ac Pacis ডি জুরি বেলি এক পেসিস্। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি দারিদ্র্যে অতীব প্রলীভিত হন। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া তিনি যে মুদ্রা তৎকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পঞ্চমের টাকাও সম্পূর্ণ উঠে নাই। অতি সময়েই পুস্তকখানি বিশ্ববঙ্গমণীর দৃষ্টি

আকর্ষণ করিল; এই পুস্তক পাঠে চিত্তাঙ্গিল রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ-গণের মনোভাব পরিবর্তিত হইল; আন্তর্জাতিক বিধানের অভাবে পৃথিবীর যে অনিষ্ট হইতেছিল, তাহাযে তাঁহাদিগের লক্ষ্য হইল। বাহা হউক, গ্রোসাস্ম তৎকৃত পুস্তকে এই মত স্থাপন করিলেন যে, সকল রাষ্ট্রাই স্ব স্ব বিধানে স্বাধীন এবং সকল রাষ্ট্রাই স্বাধীন অধিকার আছে,—কেহ কাহারও অধীন নহে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তখনে ক্যালিয়ার যখন সন্ধি স্থাপিত হয়, তৎকালে প্রধান-প্রধান রাষ্ট্রশক্তি-সমূহ স্বীকার করেন যে, সমুদ্রায় যতন নৃপতিই গ্রোসাস্মের মত অমুদ্রায় চলিতে বাধ্য হইবেন। গ্রোসাস্মের প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বহুলখ্যাত চিত্তাঙ্গিল লেবক এতৎ সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভ্যাটেল, পক্ষেও, উল্লেখ্য প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অল্প দিন পূর্বে হম্ফ্রি, ব্রুনস্‌লি, হোয়েটন প্রভৃতি খ্যাতি-লাভ লেখকগণ আন্তর্জাতিক বিধান সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কাপানী পণ্ডিত লুইস টকহমি (৭) এ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; জাপান দেশও এই সমুদ্রায় আন্তর্জাতিক নিয়ম মানিয়া চলে।

স্বাধীন নৃপতিগণই আন্তর্জাতিক বিধানের বিধায়িত; তাঁহারা আন্তর্জাতিক বিধান পালন করিয়া থাকেন; এবং আন্তর্জাতিক বিধানে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই নিয়মাবলী নিদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? প্রথমতঃ, রাষ্ট্রা-সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পাদনের জন্য সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের স্বাধীন বস্কাবস্ত থাক। চাই। নতুবা আন্তর্জাতিক বিধানের অমুদ্রায়িত কার্যাবলী তাঁহারা কিল্পে সম্পাদন করিবেন এবং আন্তর্জাতিক বিধান হইতে উপকারই বা তাঁহারা কিল্পে প্রাপ্ত হইবেন? দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগের অধিকারে নিদিষ্ট রাষ্ট্রা থাক। আবস্তক। তৃতীয়তঃ, সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা থাক। প্রয়োজন। কতকগুলি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলেও, তৎসমুদ্রায় আন্তর্জাতিক বিধানের অধিকার আংশিক ভাবে লাভ করিয়াছে। আবার কয়েকটা রাষ্ট্রা আছে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বহিরাছে।

বাহা হউক, যে সমুদ্রায় রাষ্ট্রা যুরোপীয় সভ্যতা বিরামমান, সেই সকল রাষ্ট্রাই আন্তর্জাতিক বিধানের বিধায়িত। অবশ্য এতাদৃশ কোন রাষ্ট্রের নৃপতি ইচ্ছা

করিলে, প্রকৃত্তে তাঁহার অস্তিত্ব বিস্তারিত করিয়া, আন্তর্জাতিক বিধানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিদ্যুত করিতে পারেন। আবার অপর কোন রাজ্যও আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আসিতে পারে। এইরূপে কতিপয় সুরোপীয়-সভ্যতা-বর্জিত রাজ্যকে আন্তর্জাতিক বিধানের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পার্শ্বীয় সন্ধির দ্বারা প্রচুর করা হইয়াছে, যে তুর্কসম্রাট হুলতান সুরোপের আন্তর্জাতিক বিধানের অধিগত প্রভৃতি ভোগ করিতে পাইবেন। পরন্তু, চীন ও জাপানকেও এইরূপ আন্তর্জাতিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু চীন সব বিষয়ে সভ্য রাজ্যের ভাষা ব্যবহার করিতে পারে নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পিকিন নগরে অবস্থিত দূতগণের প্রতি চীন-রাজের ভীষণ আক্রমণই তাহার সন্দেহ। আন্তর্জাতিক বিধান রাজ্যসমূহ সব্বক্ষেত্রই নিয়মাবলী নির্দেশ করে; কোন ব্যক্তি-বিশেষের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। তবে যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর রাষ্ট্রিক লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সে যদি রাজ্যে কর্তৃত্ব আদিত না হইয়া নিজের ঘাড়ে কুঁকি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে সে আন্তর্জাতিক বিধানের গতির মধ্যে পড়ে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি জনসম্মত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও সে আন্তর্জাতিক বিধানের বিধায়িত হয়। যদি কোন রাজ্যের অংশবিশেষ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহচরিত করে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিধান তাহা লক্ষ্য করে না। কিন্তু যদি সেই বিবাদ-বিসংবাদে অস্ত্র রাজ্যসমূহে কতিপয় হয়, তাহা হইলেই সেই রাজ্যের অংশবিশেষ আন্তর্জাতিক বিধানের বিধায়িত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ঐ বৎসরের প্রথমে ইউনাইটেড্‌ স্টেটসের দক্ষিণ-সাতভা রাজ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছিল। ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর-সাত রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিল যে, ঐ সাতভা রাজ্যকে বল পূর্বক তাহাদিগের সহিত একত্র থাকিতে বাধ্য করিতে হইবে। এইরূপে ইউনাইটেড্‌ স্টেটসের দুই অংশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমেরিকা দৃষ্টিতে রাজ্য; এই হেতু আমেরিকার স্থল-যুদ্ধে অস্ত্রাভিযানের কোনরূপ কতি-বৃত্তি হয় না। কিন্তু এখন বলযুদ্ধ আরম্ভ হইল, এখন

অস্ত্রাভিযানের কতি হইতে লাগিল; বিশেষতঃ, ইংল্যান্ড অস্ত্রাভিযানের সহিত লাগিলেন। এই হেতু বৃটশ-রাজ ঐ বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌ ইচ্ছাতে আপত্তি উপস্থাপিত করিয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কোন-কোন স্থলে এতরূপ বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা অস্ত্র রাজ্যের কর্তব্য? বিদ্রোহকে যুদ্ধ নামের বলিয়া স্বীকার না করিলে, বিদ্রোহী-দলকে আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আনিতে পারা যায় না। এই ক্ষতই বাধা হইয়া অস্ত্র রাজ্য বিদ্রোহকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করে। তবে যদি অস্ত্র রাজ্য কোন-রূপে কতিপয় ন' হয়, তাহা হইলে এরূপ বিদ্রোহকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করা অস্ত্র রাজ্য বটে। কোন রাজ্য এইরূপ বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও, যে রাজ্যের প্রোগণ বিদ্রোহী হইবে, সে রাজ্যের রাজ্যও যে সেই বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিবে, তাহার কোন প্রত্যয় নাই; তিনি বিদ্রোহীগণকে কাহ্নক করিবেন, "ভুলি কাহ্নবেন, অথবা অস্ত্র প্রকারে শাস্তি দিবেন;— তাহাতে তাঁহার কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে, এরূপ স্থলে যদি অস্ত্র রাজ্য বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে বিদ্রোহীগণ আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আসিবে না; আন্তর্জাতিক বিধান অত্যাচারে তাহাদিগের বিচারও হইবে না। বিদ্রোহী রাজ্যের রাজ্যই বিদ্রোহী দলের তত কার্যের ক্ষত্র অস্ত্র রাজ্যের নিকট দায়ী হইবেন। এই হিসাবে যেখা বাইতেছে যে, অস্ত্র রাজ্য এরূপ স্থলে বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে, বিদ্রোহী রাজ্যের রাজ্যও কতক পক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। আর, কোন বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেই যে, বিদ্রোহীগণের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল, তাহা নহে।

আন্তর্জাতিক বিধান যারে যারে যেরূপে পরিপূর্ণ হইতেছে, এক্ষণে তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, হিউগো গ্রোসাস্‌ বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধানের রাজ্য বর্ণন করেন। প্রধান প্রধান রাজ্যের নৃপতিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া সকলের উপকার ও সুবিধার ক্ষত্র কতকগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট ও নিশ্চিন্দ করিয়াছেন এবং অস্ত্রাভিযানে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিতেছেন। ইচ্ছাতেই আন্তর্জাতিক বিধান ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণতা লাভ

করিতেছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ান যুদ্ধ শেষ হয়। প্যারিসের সেই মহাসভার যে সমুদয় মনঃপতির প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহারা অল্পকাল সযত্নে চাতিটি নিয়ম নির্ধারণ করেন। "অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুলস্তুডে নীড়িত ও আহত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য জেনেভা নগরে মিলিত সভার নিম্নোক্তা নির্ধারণ করা হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় যে সভা আহুত হইয়াছিল, তাহাতেও এই সমুদয় নিয়ম পর্যালোচিত হইয়াছিল। যুদ্ধ বাইতে স্ফোটন-ধর্মী গুলিসমূহ (explosive bullets) ব্যবহৃত না হয় তদ্বিষয়ে নিয়ম নির্দেশের মন্ত্র ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেন্টপিটার্সবার্গে অষ্ট মণ্ড রাষ্ট্রের রাজপ্রতিনিধি মিলিত হইয়াছিলেন। প্রাগুক্ত বিধান সমুদয় প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের বহু নৃপতির উত্তমের নির্ধারিত হওয়ায় সেগুলি এক্ষণে সার্বজনীন হইয়াছে এবং সকল নৃপতির দ্বারা পালিত হইয়াছে। হুজুরখাল সযত্নে যে সমুদয় নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, সেগুলিও সার্বজনীন হইয়াছে। হুজুরখাল সযত্নে পরে আলোচনা করা যাইবে। বাহা হটক, ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগসমিতি কর্তৃক যে সমুদয় নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, তদ্বারা সমুদয় পৃথিবীর বংশধরানন্দি উপকার সাধিত হইয়াছে। এই হেগ সমিতি আন্তর্জাতিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মিলিত হইয়াছিল। রুসিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের চেষ্টাতেই এই সমিতির উদ্ভব। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে দোকন্দারকারী ভীষণ সদরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তদুপরে তাঁহার জ্বরয়ে করণায় সক্ষম হয়। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করা প্রয়োজনীয়; তদ্বারা শোকহিতকর ব্রত অমুষ্ঠিত হইবে, বাহাতে পৃথিবীর শান্তি বিস্তার করে, তাহারই উপায় নিরূপিত হইবে এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্রমশঃ হ্রদিত বাহাতে নিবারণিত হয়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইবে। অগতঃ শান্তি স্থাপন ও গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র বিহারণই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাজপ্রতিনিধিগণের বিচার-বিতণ্ডার পরিণামে ইহাই দ্বিভীকৃত হইল যে, যুদ্ধ বাণ্যায় সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা, যুদ্ধ সযত্নে প্রয়োজনীয় নিয়মসমূহ নির্ধারিত করাই সমীচীন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজপ্রতিনিধিগণ হেগ নগরে সম্মিলিত হইলেন। বাহাতে বিনাযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা নিয়ম নির্ধারণ করিতে অগ্রসর

হইলেন। হুলস্তুডে ও অল্পকালের কুপ্রথাগত দূর করিতেও তাঁহারা সক্ষম হইলেন। এতদ্বার্তীত তাঁহারা তিনটি বিশেষ হিতকর বিধান নিষ্পন্ন করেন। প্রথমতঃ, যেসব চইতে গোলা নিক্ষেপ করা পাঁচ বৎসরের মাত্র নির্দিষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেসব গোলায় দ্বিগুণ পাল বিস্তৃত হয় এবং মৈত্রীগণ সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়, তাহাদৃশ গোলায় ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, যেসব ভাগ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিস্তৃত হইয়া শরীর ধ্বংস করে, তাহার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হয়। যে ছাব্বিগণী রাষ্ট্রের রাজপ্রতিনিধি সমিতিতে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ নগরে দ্বিতীয়বার যে সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও বহুসংখ্যক বিধিব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়। যখন কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ প্রস্তুত হন, তখন তিনি, আবশ্যক বোধ হইলে, শত্রুপক্ষ বার্তীত কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সাহায্যও প্রত্ন করিতে পারেন, এবং তাঁহার নিম্ন বিচারালয়ে এই জাহাজের বিচার হয়। কাঙ্ক্ষিতঃ সেই রাষ্ট্রা নিম্নকৃত কার্যের বিচারক নিজেই হন। এক্ষণে কেহে সকল হুলে ভায় বিচারের আশা করা যায় না। এই হেতু রুটসারাজ ও জার্মান নৃপতির পক্ষ হইতে এইরূপ কার্যের মন্ত্র একটা আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের কথা উত্থাপিত হয়; এবং এইরূপ প্রস্তাব হয় যে, এই বিচারালয়ে পঞ্চদশজন বিচারক থাকিবেন। যে সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ হেগ সমিতিতে মিলিত হইয়াছেন, সেই সকল নৃপতি কর্তৃক বিচারকগণ দ্বয় বৎসরের মাত্র নির্ধারিত হইবে। ১৯০৮—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যে নৌ-বাণ্যায় সর্বকার সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তদ্বারাও রাজগণের সবিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। বাহা হটক, এই সমুদয় আন্তর্জাতিক সমিতির দ্বারা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক বিধান বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে। এতদ্বার্তীত, প্রোসাসের আন্তর্জাতিক বিধান সযত্নে পুস্তক রচনার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহুসংখ্যক ক্ষমতাবান লেখক এতৎসম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎসমূহের দ্বারাও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৃপতিগণের জ্বর অগতঃ মঙ্গল সাধনের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং সেই সমুদয়ের

লেখকের অন্তিমতঃ আন্তর্জাতিক সমিতিসমূহে আলোচিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বিধান অমুসারে সকল রাজ্যেরই পৃথিবীর কোন-না-কোন অংশের উপর অধিকার রহিয়াছে। যে ভূখণ্ডের উপর রাজ্য স্থাপিত, সেই ভূখণ্ডই সমুদায় জলভাগ ও স্থলভাগ ঐ রাজ্যের রাজ্যের অধিকারভুক্ত। যে সকল নদী ও হ্রদ সম্পূর্ণ ভাবে কোন রাজ্যের হাঙ্গামায়ে অবস্থিত, সেগুলি ঐ রাজ্যেরই অধিকারভুক্ত। যদি একটা নদী বহু রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে যে অংশ যে রাজ্যে আছে, তাহার রাজ্য সেই অংশেরই অধিকারী। জলের ধার হইতে সমুদ্রের তিন মাইল পর্য্যন্ত স্থান সেই সমুদ্রের উপকূলবর্তী রাজ্যের অস্থভূক্ত বলিয়া গণ্য হয়। যে সমর এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, তৎকালে কামানের গোলা ও নাইলের বেলী ঘাইতে পারিত না বলিয়া এই নিয়ম হইয়াছে। যে সকল উপদ্বীপ ও প্রণালী ও নাইলের অধিক প্রশস্ত মণ্ডে, এবং বাহাদিগের উত্তর কূল একই রাজ্যে অবস্থিত, সেগুলিকে সেই রাজ্যের অস্থভূক্ত বিবেচনা করা হয়। বাহা হউক, পৃথিবীতে জল ও স্থল উভয়ই বিভিন্ন রাজ্যের অস্থভূক্ত হইতে পারে। কিন্তু আকাশের উপর কি কাহারও অধিকার আছে? এই প্রশ্ন বর্তমানকালে সমালোচিত হইতেছে। বালিগ্রকার বোম্বারনের উদ্ভব হওয়ার এই প্রশ্নের সীমাংসা হওয়াও বিশেষ আবশ্যিক। এই বিষয়ের সীমাংসার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে একটি আন্তর্জাতিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। যদি বহু রাজ্য একই নদীর উপর অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল রাজ্য ঐ নদীর সমুদায় অংশ ব্যবহার করিতে পারিবে কি না, এতদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। আন্তর্জাতিক বিধানের হল বলেন যে ঐ নদীর উপর সেই সকল রাজ্যের যে কোন অধিকারে অধিগাছে, মগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কোনও আন্তর্জাতিক সমিতিতেই এতাদৃশ অধিকারকে ভাষা অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বিজ্ঞতম ফোরেটন সাহেবের এই অভিমত যে, এরূপ স্থলে সেই সকল রাজ্যের কতক অধিকার রহিয়াছে। পূর্বকালে মদাগাস্কার ধর্মীর অধীশ্বর-গণ স্থবিশাল সমুদ্রকেও স্বীয় রাজ্যের অস্থভূক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভেনিসের রাজ্য এড্রিয়াটিক সাগরের

দাবী করিতেন; এবং বৃটিশ-রাজ ইংলিশ প্রণালী, উত্তর সাগর ও ফটলণ্ডের উত্তর সাগরের দাবী করিতেন। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমুদায় নৃপতি সমুদ্রের উপর প্রভু উপভোগ করিতেন এবং অজ্ঞাত রাজ্যের নিকট হইতে সেই-সেই সমুদ্রে বাতাগাতের জন্য গুফা আদায় করিতেন। আর তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে যে সকল জলমধ্য উপভব করিত, তাঁহারা তাহাদিগকে নমন করিতেন। যখন বোডল শতাব্দীতে স্পেনের রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের এবং পর্তুগালের রাজ্য ভারত মহাসাগরের ও এড্রিয়াটিক মহাসাগরের কতক অংশের দাবী করিলেন, তখন অনেকেরই ধারণা হইল যে, এতাদৃশ স্থবিশাল সমুদ্রের উপর প্রভুত্বের দাবী করা জ্ঞান-সম্বন্ধ নহে। এইরূপ দাবী মাত্র না করায় যখন বৃটিশগণের প্রতি স্প্যানিয়ার্গণ ক্ষুব্ধ হইল, তখন রাজ্যী এলিজাবেথ বোম্বা করিলেন যে, সমুদ্র ও আকাশের উপর সকলেরই সমান অধিকার আছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধানের প্রবর্তক গ্রোপাসও বলেন যে, বিশাল সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব বিস্তার সম্ভবে না। কিন্তু সমুদ্র শতাব্দীতে সঙ্কটক এই মত প্রচার করিলেন যে, সমুদ্রের বর্ণোপদ্রু অংশ তবীরবর্তী রাজ্যের অস্থভূক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা সেই রাজ্য নিরাশর হইবে কিরূপে? বাহা হউক, বর্তমানকালে নৃপতিগণ স্থবিশাল সমুদ্রের উপর আর কোন দাবী করেন না। তবে তিন মাইল বায়ু স্থানের উপর যে অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পূর্ণাঙ্গ নহে। কারণ এক্ষণে কামানের গোলা ও নাইল অপেক্ষা বেশী দূরে ঘাইতে পারে। এই হেতু সমুদ্রের তিন মাইল অপেক্ষা অধিকতর অংশ নৃপতিগণের অধিকারে থাকা আবশ্যিক।

এইস্থলে সুবেল বাল ও পানামা খাল সম্বন্ধে যে বিশেষ নিয়ম আছে, তাহার উল্লেখ করা বাইতেছে। সুবেল খালের সহিত সকল রাজ্যেরই দ্বার্ব বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এরূপ খাল এইটাই প্রথম। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে করালী-গণ এই খাল খনন করিয়াছিলেন। তুরস্কের মুলতানের সম্মতিক্রমে মিশরের খেদিব এই খাল খননে অহুমতি সেন। ইংরেজরাও ইহা খননের সমর অনেক 'শেয়ার' খরিদ করিয়াছিলেন। মুলতান বোখা বাইতেছে যে, বহু-রাজ্যের সহিতই ইহার বন্টি সম্পর্ক। বালিকা ও জলমধ্য ব্যপদেশে এই খাল দিয়া যাতায়াত করিবার প্রকৃত

প্রয়োজন আছে। এই চেতুঃঈশ্বর ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নির্যাবলী নিকিতি করার প্রয়োজন সকল নৃপতিই অঙ্গুভব করিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৪৪তী প্রধান রাজমন্ডলি এবং তুরস্ক, স্পেন ও হাঙ্গা এইরূপ নির্দেশ করিলেন যে, এই বাণেশী সকল সময়েই খোলা থাকিবে,— যুদ্ধের সময়ও বন্ধ করা হইবে না। এই খালের ভিতর অথবা ইহার প্রান্তদেশে হইতে তিন মাইলের মধ্যে সংগ্রামাদি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার সুব অববোধ করা বাইতে পারে না। ইখাদনি নৃপতির ভাষ্যসমূহ সেত বন্দর বা যুদ্ধের বন্দরে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় থাকিতে পারে না, অথবা এই খালে ও ইহার বন্দরসমূহে সৈন্য কিংবা যুদ্ধোপকরণ লইয়া বাইতে পারে না। যদি কোন নৃপতি এই খালে হঠকারিতা প্রকাশে উত্তত হন, তাহা হইলে মিসরের খেদিব অথবা তুরস্কের মুলতান তাহার প্রতিকারের উদ্ভব করিবেন। ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড্‌ স্টেটের মধ্যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে ইহা নিকিতি হইয়াছে যে, পানামা খালও সকল নৃপতি সমান ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। কি বাণিজ্যের জাহাজ, কি যুদ্ধের জাহাজ সমুদ্র মাগারই এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পাইবে।

প্রত্যেক নৃপতিরই তাঁহার সাম্রাজ্যিক ব্যক্তিগণের উপর অধিকার রহিয়াছে। তাহারাই যদি সেই নৃপতির প্রজা হয়, তাহা হইলে কোন কথাই নাই; আর যদি তাহারাই বৈদেশিক লোক হয়, তাহা হইলেও বাৎসকাল তাহার তাঁহার রাজ্যের মধ্যে থাকিবে তাঁৎকাল তাঁহার শাসনাধীন থাকিবে। যুরোপের সভ্যদেশ সমূহে, বা যে সব রাজ্যে যুরোপীয় সভ্যতা বিরাজমান, সেই সমুদয় দেশে, বিদেশীয়গণও ভ্রায় বিচারের আশা করিতে পারে। কিন্তু তুর্ক্য প্রভৃতি দেশে বিচার-প্রণালী ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, বিদেশীয়গণের পক্ষে অনেকস্থলে হুজিয়ারের আশা করা যায় না। এই যেহেতু তুর্ক্য, মিশর প্রভৃতি রাজ্যে বৈদেশিক বিচারক রাখিয়াছেন, তাঁহারাই বিদেশীয়গণের বিচার করিয়া থাকেন। জাপানেও এই নিয়ম ছিল; কিন্তু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনে এইরূপ বিচারালয় অস্থাপি রহিয়াছে। যাহা হউক, এইস্থলে স্বাভাবিক-প্রজার ও কৃত্রিম উপারে প্রজাব্যব প্রাপ্ত ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করা বাইতেছে। কিন্তু লোক

স্বাভাবিক প্রজা বলিয়া গণ্য হয়? এ বিষয়ে পৃথক দেশের পৃথক নিয়ম। ইহা জন্মভূমি অনুসারে নির্ধারিত হইবে, অথবা গোত্র দর্শনে স্থিরীকৃত হইবে, ইহাই প্রশ্ন। যদি একজন লোক ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার পিতামাতা কতালী দেশীয় হয়, তাহা হইলে সেই লোক ইংরেজ হইবে কি ফরাসী হইবে? যদি জন্মভূমি অনুসারে ইহা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে সেই লোক ইংরেজ; কিন্তু যদি গোত্রই এ বিষয়ের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ফরাসী। সকল দেশে এ বিষয়ে একই নিয়ম প্রচলিত নাই বলিয়া, একই লোককে পৃথক দেশের রাজ্যে নিম্ন প্রজা বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। ইংলণ্ডে ও ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌সে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, যদি বৈদেশিকগণের সম্ভাব্য-মস্ততি ঐ দুই দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারাই অন্তর্দেশীয় প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি ইংরেজ বা আমেরিকানদের সম্ভাব্য-মস্ততি অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও তাহারাই ইংরেজ বা আমেরিকান বলিয়া পরিচিত হইবে। এইরূপ ভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। এই স্বাভাবিক প্রজা বাস্তবিক অন্ত দেশের লোক কৃত্রিম উপারে প্রজাব্যব প্রাপ্ত হইতে পারে। ইংলণ্ডে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এতদ্বিধে একটা আইন করা হইয়াছে। এতদ্বারা ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে অন্ততঃ পাঁচবৎসর বাসের পর কোন বিদেশীয় লোক প্রজাব্যব প্রাপ্তির সার্টিফিকেট লইতে পারে। অন্তঃপর সে বৃটিশ প্রজা-রূপেই পরিচিত হয়। এই আইন অনুসারে ইংলণ্ডে নির্ধারিত হইয়াছে যে, যদি বৃটিশ প্রজা অন্ত দেশে যেছাড় প্রজাব্যব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে আর বৃটিশ প্রজারূপে গণ্য হইবে না। কোন দেশের জাহাজ যদি সমুদ্রের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সেই সমুদায় জাহাজের উপর সেই দেশের রাজার অধিকার বর্তমান থাকিবে। আর যদি কোন রাজ্যের জাহাজ কর্তৃক জলদস্যুর জাহাজ ধৃত হয়, তাহা হইলে সেই ধৃত জাহাজ ঐ রাজ্যের অধিকারে আসিবে। সভ্য রাজগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এইরূপ ভাবে সমুদ্রে মুঠন আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অতীব গর্হিত কার্য।

সপ্তদশ সভ্যরীতি প্রোচাস্য বহন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া-
ছিলেন, সেই সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক

বিধানমণ্ডল পণ্ডিতগণ বলিয়া কল্পিত হইল যে, সকল স্বাধীন রাষ্ট্রাই আন্তর্জাতিক বিধানের নিকট সমান,—সকল রাষ্ট্রই সমান অধিকার গ্রহণ করিবে। কিন্তু কখনও ঐশ্বর্য্যে অল্প তাহার পক্ষপাত তুল্য নয়। আন্তর্জাতিক বিধানের নিকট অতি পরাক্রমশালী বৃশাল রাজ্যের অধিপতিগণ যেমন হান, অতীত ক্ষত্রবাহী রাজ্যেরও তুল্য সমান। কিন্তু বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক ইতিহাস আশোচন্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্বকালে স্বাধীন রাজ্যসমূহের প্রকৃত সমতার কথা বলা হইত, বর্তমান সময়ে ঠিক প্রকৃত সমতা লক্ষিত হয় না। যদি আমরা প্রথমতঃ যুরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, গত শতাব্দীর আরম্ভে যে সমুদয় নৃপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ততকাল পরিমাণে প্রাধান্যের দাবী করিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র প্রাধান্য রামনতির চৌর্য্য ঐস রাজ্যটী গঠিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা ঐক্যে বিগদ-আগদে রক্ষাও করিয়াছেন। সেই সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, স্পেন এবং ইটালী— এই কয়টা রাজ্য মিত্রভাষণের রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যদিও নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের অবশেষে পরাস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের রাজ্য অত্যন্ত প্রধান রাজ্য বলিয়া তুল্য বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্স আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আইনে, তৎকালে ফ্রান্স ও উক্ত স্থান লাভ করে। বর্তমান কালে জাপানের অসহ্য শক্তির উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে আমেরিকার রাজ্যগুলির ঐক্য ও ইউনাইটেড স্টেটসের উন্নতি ও প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করা হইতেছে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া পরস্পর মিলিত হইল,—ফ্রান্স ও তাহাদিগের সহিত যোগদান করিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই সম্মিলিত রাজ্যসমূহ যোগদান করিল যে, তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং সকল কার্য্যই একমত হইয়া চলিবে। পরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়ানরা (৫) সংক্ষেপে প্রকাশ করিল, যে কোন—

রাজ্য যিকোনো প্রকারে, যুদ্ধের শাস্তিরক্ষা করে তৎক্ষণাত তাহারা তাহার দমন করিবে। আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে তাহাদিগের এই সংকল্প ভ্রান্তমূলক বলিয়া বোধ হয় না। ইংলণ্ড ও প্রুসিয়ান রাজ্যের সহিত যোগদান করিল না। সেই সময়ে ইংলণ্ড ক্যানিং বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী ছিলেন; তিনি সমস্ত রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎকালে ইংরেজগণ দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্য কর্তার বিশেষভাবে অর্থোপার্জন করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত রাজ্য সমূহের হস্তক্ষেপ ব্যাপারের দ্বারা ইংরেজ বণিকদিগের সমুদয় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহা হইলে তখন আমেরিকার দূত রূপে লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। কলিফোর্নিয়া-সমূহের হস্তক্ষেপ ব্যাপারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড স্টেটস একযোগে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন কি না, এতদ্বারা ক্যানিং আমেরিকার মিনিস্টারের সহিত পরামর্শ লেখালেখি করেন। সেই সময়ে মিনিস্টার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মিনিস্টার তাঁহাকে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞাপন করেন। এই বিষয় লইয়া মিনিস্টার তাঁহাকে যে মত ঘোষণা করিলেন, তাহাকেই মনুচা ডকট্রিন কহে। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইউনাইটেড স্টেটস যুরোপের দ্বারায় ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই এবং করিতে ইচ্ছাও করে না; এই হেতু তাহারাও আশা করিতেছে যে, যুরোপের রাজনৈতিক তাহাদিগের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সত্য তামসগণ আমেরিকা মহা-দেশের যে সমুদয় রাজ্য ইতিপূর্বেই অধিকার করিয়াছেন, সেই সব রাজ্যে আর কোন নৃপতি উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিবেন না ইহাও ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট গণ মিনিস্টার এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, এবং এইরূপে এই মনুচা ডকট্রিন বীর-বীরের পতিপুত্র লাভ করিয়াছে। আর ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকার অসহ্য রাজ্যের চালক রূপে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন।

(পূর্বে প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্তসার)

বাংলা পরিচ্ছেদ

মহিমের পরবন্ধ ছিল প্রেম। একসঙ্গে এ-এ পাশ করার পর প্রেম দিয়া মেত্রিকাল কলমে ভর্তি হইল; কিন্তু মহিম তাহার পুত্রতনু গুটি কলমেই টিকিয়া রহিল। প্রেমের ইচ্ছা, মহিমও ভাঙার হয়, কিন্তু মহিম তাহাতে কিছুতেই রাজী হইল না এবং বন্ধুর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাসা বদল করিল। প্রেমও দুঃখিতা দুঃখিতা তাহাকে বাহির করিল; এবং বন্ধুকে নিজের বাড়িতে আশ্রয়-বস্ত্র রাখিবার প্রস্তাব করিল। মহিম তাহাতেও রাজী হইল না।

ইহার বছর পাঁচ পরে প্রেম জীবিত পাঠিল, মহিম কেবার তার নামক একজন ব্রাহ্ম ভক্তলোকের কন্যা অচলায় প্রতি অধরিত হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। প্রেম বন্ধুকে এই বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার পর একদিন প্রেম মহিমের বাসায় আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার কন্যা বদরবাড়িতে দিয়া, কেবাববাসুর সঙ্গে মিলান করিল এবং তাহার কন্যা মহিমের প্রপত্নী অচলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কন্যা এসেছে প্রেমের নুবে কেবাববাসুর জানিতে পারিলেন, মহিমের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, সে অচলাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে তাহার প্রানের কুঁঠের পাঁচটা দিয়া রাখিলে। কেবাববাসু তখন ষাটবার হিন্দুসেন এবং কন্যা-সন্তান প্রেমের মনে-মনে অচলায় প্রতি আসক্ত দুঃখিতা এই নূতন পাত্রের প্রতিই তাহার লক্ষ্য স্থির করিলেন। এবং, পাত্রও কেবাববাসুর ইঙ্গিত পাইয়া তাহার বাড়ী ঘাভাভাত আরম্ভ করিল। কিন্তু অচলা নিজে মহিমের প্রতি অচলাই রহিল। এবং পিতার আর্থিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে অংশেই মহিমকেই বরণ করিল। মহিম অচলাকে মহীতা তাহার পত্নী-পুত্র পদন করিল এবং দুগাল নারী তাহার এক বালা-সঙ্গিনীকে দুঃখিতা অচলায় সাহচর্য্যে নিযুক্ত করিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতের ও মনের মিল হইল না। দুগাল তাহার পতিপুত্রের দ্বিগুণ পেলে দুই-একদিনের মধ্যে প্রেম তাহার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর সমিত সেবা করিবার অধিগার মহিমের বাড়িতে উপস্থিত হইল। সে সেখানে দুই একদিন বস করিতে না করিতে মহিমের মৃত্যু ওর দুঃখিতা হাই হইয়া পেল।

পার্বত্য লগালেই অচলা বাবার অসুখতি লইয়া প্রেমের সমভিযোগের বাপের বাড়ী করিয়া আসিল। কিন্তু পিতা-কর্তার এই অসুখত আচরণের বিরুদ্ধ ও লক্ষিত হইয়া উঠিলেন। এবং নিজের হনের ভাব প্রকাশ করিতে লিখিতও করিলেন না।

কেবাববাসু সংসারের সাধারণ বশ-কনের মত ঘোষে-শুনে মানুষ। ঘরের বিবাহে জামাই বাধাতে পাশ-করা হয়, অংশপূরণ হয়, এই কাননাই করিয়াছিলেন। মহিম ভাল ছেলে, সে এ-এ পাশ করিয়াছে, দেশে তাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করাকে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার ধন্যতা বন্ধ প্রেমের বধন একদিন তাহার বাড়ীর গাড়ী করিয়া আসিয়া একটা উল্টা রকমের ধবর দিয়া নিজেই জামাইগিরির উদ্দেশ্যের বাড়ী হইল, তখন উত্তর বন্ধুর মতো আর্থিক সঙ্গতির হিসাব করিয়া মহিমকে বরণান্ত করিতে। কেবাববাসুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালবাসার হৃদয়তন্ত্রের বড় একটা ধার ধারিত্বন না; তাহার বিশ্বাস ছিল, বেয়ে মানুষে বাবার কাছে গাড়ী পালকি চড়িয়া বস্ত্রাণ্ডায় পরিয়া প্রেম বন্ধনে থাকিতে পার, নারী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে। স্ত্রীত্যাগে যেহেতু স্থবী করাই যদি পিতার কর্তব্য হয়, ত, এত বড় অবাচিত স্ত্রীত্যাগ কোন মতেই যে হাত-ছাড়ি করা উচিত নয়, ইহা স্থির করিতে তাহাকে অত্যন্ত বেশি চিন্তা করিতে হয় -ই।

এমন কি, বড়লোক দামাভার কাছে কর্কষ বলিয়া বিবাহের পূর্বেই হাজার পাঁচেক টাকা লগণাও তিনি ঘোষের মনে করেন নাই। এবং বাড়ীটা বধন তাহারই থাকিবে, তখন পরিশোধের হস্তান্তরও তাহাকে বাতিবাত্ত করিয়া ভুলে নাই।

অথচ, হস্তান্তর ঘেরটা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল,— কিছুতেই বাগ বাসিল না। অতএব, শেষ পর্যন্ত সেই মহিমের হাতেই তাহাকে বেয়ে দিতে হইল বটে, কিন্তু, এই হৃদয়তার তাহার ঘোষের অবধি রহিল না। তা'ছাড়া, যে কথাটা এখন তাহাকে নিজের কাছে নিজে শীকার করিতে হইল, তাহা এই যে টাকটা এইবার কিরূপে সেওয়া

প্রয়োজন। কিন্তু বিনিময় প্রাপ্যপত্রের মধ্যে না থাকায়, এবং পরিপোষের রাস্তাটাও খুব স্থল্লেখ্য ও প্রাঞ্জল হইয়া চোখে না পড়ায়, ইহার চিন্তাটাকেও তিনি দৃষ্টির মধ্যে তেমন উচ্ছল করিয়া তুলিতে পারিলেন না। সুতরাং প্রমত্তা বৃদ্ধির মধ্যে উঠিল বটে, কিন্তু ইন্তরটা প্রায় তেমন কাপুলা হইয়াই রহিল।

অচলা শব্দে বাড়ী চলিয়া গেল। ইহার পরে সুরেশের আগ-বাওয়া, বনিউতা তেহার বাবু পছন্দ করিতেন না। বাড়ী নাই অত্যাধিক অধিকাংশ সময়ে দেখাও দিতেন না। কিন্তু, তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়া, ঘরের চর্চাব্যবহারে বৃদ্ধ অন্তরের মধ্যে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াই রহিলেন।

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু, হঠাৎ একদিন তিনি অত্যন্ত অসুখে পড়িয়া পেলেন। সুরেশ আসিয়া চিকিৎসা করিয়া এবং নিজে পুরাতন সেবা-বস্ত্র করিয়া তাঁহাকে আঁতরাইয়া করিয়া তুলিল। তিনি স্বঃ স্বঃের উল্লেখ করিলে, সে তাহা বন্ধুকে মৌতুক দিয়াছে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই অবধি এই বৃদ্ধটির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রতিদিন পতীর ও অত্যাধিক হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময়ে সময়ে কতায় বিকছে তাঁহার মনের মধ্যে অভিলাষের স্রাব উদ্ভব হইত, যে-উর্ধ্বাধা যেটো এমন রক্ত চিনিলা না, উপেক্ষা করিয়া তাগ করিয়া গেল, সে বেন একদিন ইহার শাস্তি ভোগ করে।

এই ব্যাপারে মহিন তাঁহার চক্ষের বিব হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কত। যে নারীধর্মে স্নানজলি দিয়া স্বামী-ভাগ্যের পতীর চরিত্র সর্বাঙ্গে বহিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া উঠিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এবং এই মহাপাপে যে ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে, সে বৎ বড় বড়ই দোষ, পিতার মনের ভাব যে তাহার বিকছে কিন্তু বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, ইহাও অসম্ভব কল্পা কল্পন নহে।

অতঃপক্ষে, পিতার প্রতি কতায় মর্মান্তিক পূর্ণে যেমনই থাক, যেদিন তিনি শুদ্ধমাত্র তাঁকার লোভেই বহিমকে বর্জন করিয়া সুরেশের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে বদ্ধপত্রিকর হইয়াছিলেন, এবং পতিশোধের কোন উপায় না থাকা লক্ষ্যে তাহার কাছে স্বঃ স্বঃ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে মাত্র বিন্যাসে কেশার বাবু অচলার চক্ষে অত্যন্ত নানিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশ্রুতা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল

কাল রাতে, যখন সে স্বর্গেরে গুণিতে পাইল, তিনি নিজের কতায় চিত্রিত সপক্ষে গোপনে দানীর মতামত গ্রহণ করিতেও সক্ষম বোধ করিলেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে অচলা আজ জীবনাকেও দেখিতে পাইল। তাহার সর্বাস্থা হোমাক্রান্ত হইয়া চোখে পড়িল, যে-সুহৃৎ সে স্বামীকে নিজের মুখে বলিয়াছে তাঁহাকে সে ভালবাসে না, সেই সুহৃৎই নানীর সর্বোত্তম মঙ্গলাও ভগ্ন সংসার হইতে তাহার স্তম্ভ বুদ্ধিয়া গেছে। তাই আজ সে স্বামীর কাছে ছোট, পিতার কাছে ছোট, নিজের পরিচালিকা কাছে ছোট, এমন কি সেই সুরেশের নত লোকের চক্ষেও আজ সে এত ছোট যে, তাহাকে লালসার সন্নিবিষ্ট কল্পনা কল্পনা তাহার পক্ষে আর চরিত্র নহে। কিন্তু সত্যই কি সে তাই? এমনি ছোট? এই ত, সেদিন সে তাহার ভাল-বাসাকেই সর্ব-স্বামী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে বলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; আজ ইহাওই মধ্যে সে কথা কি সত্যই ভুলিয়াছে? তাহাকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াও স্বামী আর তাহার কোন সংবাদ লইলেন না। এই উদ্ভাসিতের নিগূঢ় অপমান ও লালনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি বেন আগুন দিয়া গোড়াইতে লাগিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা হইয়াছে। তরুণ স্বর্বাঙ্গোৎকর্ষণে বোলা জানালার ভিতর দিয়া বরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে বীরে বীরে শব্দার উঠিয়া বলিয়া শিরস্তের জানালটা খুলিয়া দিয়া বাহিরের পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জন-প্রবাহের বিদ্রাম নাই। কেহ কখনে চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ বা প্রস্রাবের আলোক ও হাওয়ার মধ্যে শুণ্ড শুণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, এ সময়ে কেহই ত ঘরে বসিয়া নাই,—আর আমিই বা স্বার্থ কি এমন শুক্করত অপরাধ করিয়াছি, বাহাতে মুখ দেখাইতে পারি না,—আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! অপরাধ যদি কিছু করিয়াই থাকি ত সে তাঁর কাছে। সে বড় তিনিই দিবেন; কিন্তু নিবিচারে যে কেহ শাস্তি দিতে আসিবে, তাহাই মাথার পাতিয়া লইব ফিলের স্তম্ভ?

অচলা ভৎসনাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সমস্ত মানি বেন

কোষ করিয়া বাড়িয়া কেলিয়া গিয়া হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কোষার বাবু তাঁহার আশ্রম কোষার বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন ; একটীবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার সংবাদ-পত্রের পূর্বাংশ মনঃসংযোগ করিলেন।

খানিক পরেই বেহারা কেবলিতে গরম চায়ের তল এবং অস্ত্রান্ত সমগ্রাম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল, কোষার বাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া নিজের অস্ত্র এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া লইলেন, এবং বাটিটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার আরাম চৌকিতে কিরিয়া গিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

অচলা নতমুখে বসিয়া পিতার আচরণ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিল ; কিন্তু নিজে ব্যতীয়া আর তাঁহার চা তৈরি করিয়া দিতে, কিংবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, ইচ্ছাও করিল না।

কিন্তু এক ঘরের মধ্যে এমন করিয়া কাঠের স্তম্ভের মত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকারও অসম্ভব। এমন কি, এই ভাবে দীর্ঘকাল এক গৃহের মধ্যেও তাঁহার স্নিহিত বাস করা সম্ভবপর এবং উচিত কি না, এবং না হইলেই বা সে কি উপায় করিবে, এই ভট্টল সমস্তার কোথাও একটু নিরাশ্রয় বসিয়া যৌমাংসা করিয়া লইতে বধন সে উঠি-উঠি করিতেছিল, এমন সময়ে দুঃসহ বিষয়ে চাহিয়া দেখিল সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সে হাত তুলিয়া কোষার বাবুকে নমস্কার করিতে তিনি মুখ তুলিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া পুনশ্চ পড়ার মন দিলেন।

সুরেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চায়ের ব্রিন্দ-শুভা সরাইবার ভক্ত বেহারা ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে কহিল, “আমার ব্যাগটা কোথায় আছে, আমার গাড়ীতে জুলাই দাও। সে-ই স্বাক্ষর জিনিসগুলো পর্যায় তার মধ্যে আছে। যে-কি করো না, আমি এখুনি বাবো।”

‘বে আছে’ বলিয়া সে চলিয়া গেল আবার সমস্ত ককটো তুল হইয়া রহিল। খানিক পরে সুরেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল “মহিষের কোন খবর পাওয়া গেল?”

কোষার বাবু মুখ না তুলিয়াই শুধু বলিলেন, না।

সুরেশ কহিল, আশ্চর্য!

তারপরে আবার সমস্ত চুপ-চাপ। বেহারা কিরিয়া

আসিয়া জানাইল, ব্যাগ উদ্ধার গাড়ীতে তুলিয়া বেহারা হইয়াছে।

“আমি তা’হলে চলুম। মহিষের চিঠি এসে আমাকে একটু খবর পাঠাবেন,” বলিয়া সুরেশ উঠিবার উপক্রম করিতেই মহলা কোষার বাবু হাতের কাগজখানা মাটিতে কেলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি একটু অপেক্ষা কর, সুরেশ, আমি আসছি।” বলিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়াই চটুপুতায় চটপট শব্দ করিয়া একটু দ্রুত-বেগেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এতকণ অবধি অচলা অধোমুখেই ছিল। তিনি বাহির হইয়া গাইতেই বিমিত্ত সুরেশ অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টি অশ্রার দ্রুত, পীড়িত ও একান্ত বলিন হই চক্ষুর উপরে গিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাগার কি?”

অচলা মুখ আনত করিয়া শুধু মাথা নাড়িল।

সুরেশ বলিল, “আমি যে কত হুঃখিত, কত লজ্জিত হয়েছি, তা’ বলে জানাতে পারিনে।”

অচলা অধোমুখে দীর্ঘবে বসিয়া রহিল।

সে পুনশ্চ কহিল, “তোমার বাবা যে আমাকে এমন হীন, এতবড় পায়ও ভাবতে পারেন, এ আমি স্বপ্নও মনে করিনি।”

এ অভিযোগেরও অচলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি স্থির হইল বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল, “আমার এখুনি ইচ্ছে হচ্ছে যে এখুনি মহিষের কাছে গিয়ে গিয়ে তাকে—” কথাটা শেষ হইতে পাইল না, কোষার বাবু কিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার হাতে একখানা ছোট কাগজ। সেই খানা সুরেশের সমুখে টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়া কহিলেন, “গড়িমসি করে তোমার সেই টাকারটার একখানা রশিদ দেওয়া আর ঘটে উঠেনি। পাঠোধ্যায় টাকার ছাওনোট দিখেই দিলুম,—দুই বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়ীটা ত রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হতে পারবেই।”

সুরেশ শুভিতের তার কণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, “আমি ত আপনার কাছে ছাওনোট চাইনি কোষার বাবু!”

কোষার বাবু বলিলেন, “তুমি চাও নি মতি, কিন্তু

আমার ও সেওরা উচিত।' এতদিন যে দিইনি, সেই আমার ঘণ্টে অজায় হয়ে গেছে, স্নেহে, কামরুখানা তুমি পাচটে তুলে রাখো। বুড়া হয়েছি,—ঠাণ্ডা যদি মরে বাই, টাকটা নিয়ে একটা গোল হতে পারে।'

স্নেহে আবেগের সন্ধিত জবাব দিল,—‘কেদার বাবু, স্নেহে আর বাই করুক, সে টাকা নিয়ে কখনো কারো সঙ্গে গোল করে না। তা' ছাড়া, আগনি নিজেও বেশ জানেন এ টাকা আমি চাইনে,—এ আমি আমার বন্ধুকে মোকুব দিয়েছি।’

কেদার বাবু বলিলেন, ‘তা'হলে সে তোমার বন্ধুকেই দিয়ে, আমাকে নয়। আমি যা' নিয়েছি সে আমারই ধন।’

স্নেহে কহিল, ‘বেশ, আমার বন্ধুকেই দেবো,’ বলিয়া কামরুখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া ছই পা দিচ্ছাইয়া গিয়া অচলায় সমুখে ঠাণ্ডাইবামাত্রই কেদারবাবু অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে প্রজলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, ‘খবরদার, স্নেহে! কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ করেছি, কিন্তু, আমার ঘেরেকে আমার চোখের সামনে তুমি টাকা নিয়ে বাবে, সে আমার কিছুতেই শইবে না বলে মিথি।’ বলিয়া কানিতে কানিতে তাঁহার আরম্ভে কেদারবাবু করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা স্নেহে চমকিয়া কেদারবাবুর প্রতি নির্ণয়ে বৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি ভইরূপে বসিয়া পড়িলে সে তাহার বিবর্ণ মুখ অচলায় প্রতি ক্রিয়াইয়া দেখিল, সে এক মুহূর্ত্তে যেন পাখান হইয়া গেছে। প্রবল চেষ্টায় একবার স্নেহে কি একটা বলিতেও গেল; কিন্তু তাহার গুহ্ব কণ্ঠ হইতে একটা অস্বাভাবিক ধ্বনি উঠি কিছুই বাহির হইল না। আবার ক্রিয়া দেখিল কেদার বাবু ছই করতল মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভেদনি পড়িয়া আছেন। আর সে কোন কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু আড়ষ্টের মত আরও মিনিট খানেক গুহ্বভাবে থাকিয়া অবশেষে নিঃশব্দে গীরে গীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কত্না ও পিতা ঠিক তেমন একভাবে বসিয়া রহিলেন; এবং সেখানেই গীরে বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া কেবল একটা শূন্য বীজবতা বিস্তার করিতে লাগিল।

নীচে হ্রতেশের রবার-টারারের গাড়ীখানা যে ফটক পার হইয়া গেল, তাহা ঘোড়ার ঘুরের শব্দে বৃষ্টিতে পারা গেল, এবং পরক্ষণেই বেলায়া ঘরে ঢুকিয়া ভাকিল, বাবু!

কেদারবাবু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখণ্ড ছিন্ন কাপড়। আর কিছু বলিত হইল না, তিনি লাকাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘নিহে যা' বন্দি বাটা, নিহে যা' হুশ্ব খেকে! বেয়া বন্দি—’

হতবুদ্ধি বেহারাটা মনিবের কণ্ঠ দেখিয়া দ্রুতগদে পলায়ন করিতেই, তিনি কত্নার প্রতি অধি-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠের আরও একপদা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, ‘হাতান-আবা নজ্জার হ'ল আর কোনদিন কোন ছলে আমার বাড়ী ঢোকবার চেষ্টা করে, ত তাকে পুলিশে দেব—এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলুম অচলা!’

নিজের নাম শুনিয়া অচলা একান্ত পাণ্ডুর মুখখানি তাহার ঘীরে ঘীরে উঠীত করিয়া বাধিত মান চক্ষু ছুটি পিতার মুখের প্রতি নিঃশব্দে বেশিয়া চাহিয়া রহিল। পিতা কহিলেন, ‘টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে অন্ধ করা যায় না, পাখও যেন এ কথা মনে রাখে।’

কত্না তথাপি নিরন্তর হইয়াই রহিল; কিন্তু তাহার মনিন দৃষ্টি যে উত্তরোত্তর প্রথর হইয়া উঠিতে লাগিল, পিতার দৃষ্টিতে তাহা পড়িল না। তিনি তজ্জনী কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হাতনোট ছিঁড়ে ফেলে বাপকে ঘৃণা দেখা যায় না, এ কথা আমি তোকে বুঝিয়ে তবে ছাড়ব। এ বাড়ী আমি নিজে বিক্রী করে নিজেই গুণ পরিশোধ তেরে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো—আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না তা' বলে রাগ্দি।’

এতক্ষণ পরে অচলা কথা কহিল। প্রথমটা তাহা পাইল বটে, কিন্তু, পরের দ্বির অবিচলিত কণ্ঠে কহিল ‘গুণ পরিশোধ না কোরে বাড়ীটা আমার ভ্রাত্রে রেখে যাবে, এই কি আমি প্রত্যাশা করি বাবা? তুমি না করলেও ত এ কাজ আমাকেই করতে হোতো।’

কেদার বাবু অধিকতর উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, ‘তোমরা যা' করে এসেছ, শুধু তাইতেই ত আমি গুহ্বসম্মানে মুখ দেখাতে পারতিনে,—তা' তুমি জানো।’

অচলা ভেদনি শব্দ দৃঢ়ভাবে প্রত্যুত্তর দিল, ‘না, আমি

জানিলে। আমি এমন কিছু ঘনি করতুম বাবা, বার করে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তা' হলে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখতে পেতে না। সে দেশে আর বারই অজাণ থাক, ভূবে মরবার মত কলের অভাব ছিল না।" বলিতে বলিতেই কায়ার তাহার গলা ধরিয়া আসিল; করিল, "কাল থেকে যে অপমান আমাকে তুমি কোরচ, শুধু মিথো বলেই সহিতে পারিতি, নইলে—"

এইখানে তাহার একেবারে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর আঁচল ঢালিয়া ধরিয়া উজ্জ্বলিত ক্রন্দন কোনমতে সত্বন করিয়া ক্রতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেশারবাহু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিবার, আঘাত করিবার, শোক করিবার, অর্থব্যয় করার নিষিদ্ধ আচরণে সর্বপ্রকার গভীর বিধাবের কারণ একমাত্র তাঁহারই ঘটন্যে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু অপর পক্ষও যে অকস্মাৎ তাঁহারই আচরণকে অধিকতর গর্হিত বলিয়া মুখের উপর তির্যকার করিয়া তীব্র অভিমানের কাঁদিয়া চণিগ্না বাইতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। তাই অভিব্যক্তির ভ্রাস কিছুকণ পাড়াইয়া থাকিরা তিনি আত্মে আত্মে বসিয়া পড়িলেন, এবং দাখার হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যর্থতার বলিতে লাগিলেন,—এই নাও,—এ আবার এক কাণ্ড!

ইহার পরে আট দশ দিন পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অশ্রুধারীই দেখিলেন। অচলা কোনমতেই নিম্নের ঘর ছাড়িয়া বাতির হইল না, বাতীর চাকর দাসীর কাছেও সুব দেখানো তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া পাড়াইয়াছিল। বিপ্লব কর দিনের মত আশ্রয় সে পথের দিকে চাহিয়াই দিন কাটাইবার অস্ত্র খোলা জানালার আশিরা বসিয়াছিল।

শ্রুতির দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গেসঙ্গেই একটা হান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটির উপরে ধীরে ধীরে করিয়া পড়িতেছিল, এবং সেই দালিমের সন্নিহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সমস্ত অন্তরের গভীর তলদেশে অস্বস্তি করিয়া তাহার সমস্ত হন যেন এই সম্রাট বেলার মতই নিঃশব্দে অবসর হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু যে ঠিক কিছু দেখিতেছিল তাহাও নহে, অথচ, অভ্যাসমত

উপরে নীচে আশে পাশে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। এমনি একভাবে বসিয়া বেলা যখন আর বড় বাকি নাই, সংসা দেখিতে পাইল হুরেশের গাভী তাহার ঘরের বাটতে প্রবেশ করিতেছে। চক্ষের পলকে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং পুনিশ দেখিয়া চোর যেভাবে উদ্ভবনে পলায়ন করে, ঠিক তেমন করিয়া সে জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মিনিট কুড়ি পরে তাহার কান্দ দরবার বা পড়িল। এবং বাহির হইতে তাহার পিতা দিব্যবরে ডাক দিলেন, "না অচলা, মেয়ে আছে কি?"

কিন্তু সাজা না পাইয়া অধিকতর কোমল কর্তে কহিলেন, "বেলা গেছে বা ওঠো। হুরেশের পিসীমা তোমাকে নিতে এসেছেন, বহিষ না কি তারি পীড়িত।"

অচলা শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিয়া নীরবে ঘর পুসিয়া দিতেই হুরেশের পিসী-মা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অচলা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ে ধুলা নইয়া প্রণাম করিল।

কেশারবাহু সকলের পশ্চাতে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার একান্তে বসিয়া কস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের চলে আসার পরে থেকেই মথিদের ভারি অর। খুব সম্ভব হায়ে হিম'লেগে, দ্রুতিভ্রাস, পরিশ্রমে, নানা কারণে এই অসুখটি হয়েছে।" বলিয়া হুরেশের পিসীকে উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি ভেবে সারা হয়ে থাকি, এদের পাঠিয়ে দিবে পর্গাত সে একটা সম্বাদ দিলে না কেন। হুরেশে আসার বীর্ণজীবী হোক, সে গিয়ে বৃদ্ধি করে তাকে এখানে না এনে কেবলে কি যে হোতো তা' তপনানই জানেন!" বলিয়া সম্বোধ অসুখতাপে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

অচলা শিশু নতমুখে পাড়াইয়া সমস্ত শুনিয়া, কোন প্রশ্ন করিল না, কিছুমাত্র চাক্ষু্য প্রকাশ করিল না।

হুরেশের পিসীমা অচলার ব্যস্ত উপর তাঁহার ডান হাতখানি রাখিয়া শাব্দ বৃদ্ধ কর্তে বলিলেন, "ভয় নেই না, সে হু'মিমেই ভাল হবে যাবে।"

অচলা কোন কথা না কহিয়া তাঁহাকে আর একবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া আসিল। হইতে শুধু পায়ের

কান্ডফানি টানিয়া লইয়া ঘাইবার অল্প প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এই শৈতব্দের অপরায়, ঠাণ্ডার মধ্যে ভাতকে কিছুমান্ন পরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি পায়ে, অনত্যন্ত শীতল বাহিরে বাহিতে উত্তর দেখিয়া বৃষ্টি পড়ার ন্যূন বালিন্দ; কিন্তু পুরোবর্তী ওই বিধবার সম্মান প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাঁহার বাধা দিতে প্রস্তুতি হইল না। তিনি শুধু কেবল বলিলেন "চল না, আমিও সঙ্গে যাইছি," বলিয়া চট-জুতা পায়ে বিছাই সঞ্চলের অগ্রে নির্দিষ্ট বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহিমের প্রতি অলসার সঞ্চলের চেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, ব্রী হইয়াও সে একটা দিনের অল্পও স্বামীর হৃৎ-চুচিক্তার অংশ গ্রহণ করিতে পার না। এই লইয়া হ্রস্বেশও বহুব সহিত ঘোলেবেলা হইতে অনেক বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তপণের ধনের মত মহিম এই বস্ত্রটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এমনি একান্ত করিয়া আগুনহীরা ফিরাইয়াছে যে, তাহাকে হ্রস্বে হ্রস্বময় কাহারও সাহায্য করা দূরে থাকুক, কি যে তাঁহার অস্তাব, কোথায় যে তাঁহার বাধা, ইহাই কোনদিন কেহ তাঁহা করিতে পারে নাই।

হুতরাং বাড়ী এখন পুড়িয়া গেল, তখন সেই পিতৃ-পিতামহের ভয়ীকৃত গৃহস্থপূর্ণের প্রতি চাহিয়া মহিমের ন্যূন যে কি শেল বিঁধিল, তাহার ন্যূন দেখিয়া অচলা অনুমান করিতে পারিল না। সূপালের বৈধবোও স্বামীর প্রাণের পরিচালন করা তাহার তেমন অসাধ্য। যেদিন নিজের ন্যূন শুনাইয়া দিয়াছিল তাহাকে সে ভালবাসে না, সেদিন সে আখাতের গুরুত্ব সহজেও সে এমনি অন্ধকারেই ছিল। অথচ এতবড় নির্দোষও সে নহে যে, সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যেই স্বামীর নির্জিকার ঔষাদীকৃত বর্থাৎই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার মনের মধ্যে কোন সন্দেহই উঁকি মারিত না। তাই সেদিন ঠেগনের উপরে সে স্বামীর অবিচলিত শান্ত মুখের প্রতি বারবার চাহিয়া সমস্ত পথটা শুধু এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, সবিস্ময়ত ওই মিথ্যা মুখের অস্তরালে তাহার মুখের সত্যকার চেহারাটা না জানি কিরূপ!

আজ তাহার পিড়ার সংসারটাকে লম্বু এবং স্বাভাবিক ঘটনার আকার দিবার অল্প কেশরবাসু এখন প্রবল পলায় বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুই আশ্রয় হইয়া নাই, বরঞ্চ এতবড় দুর্ভাগ্যের পরে এমনিই কিছু একটা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন অচলার নিজের অস্তরে যে ভাব এক হৃদয়ের অস্তর আশ্রয়প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে অবিশ্রান্ত উৎকর্ষা বলাও সাজে না।

হুতরেশের রবায় ঠাণ্ডারের গাড়ী স্রুতবেগেই চলিয়াছিল। পিসিমা একদিকের ঘরলা টানিয়া নিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অচলা পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া ছিল। শুধু কেশরবাসু কাহারো কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়াও পথের বিকে শূন্য দৃষ্টি পাতিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন। হুতরেশের মত দয়াপু, বুদ্ধিমান, বিচলন ছেলে ভূতায়তে নাই; মহিমের এক-ভ্রমের আলার তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; যে বেশে মানুষ নাই, ডাক্তার-বৈদ্যা নাই, শুধু চোর ভাতাত আর শিরাল-কুতুরের বাস, সেই পাক্কাগারে পিয়া বাস করার শান্তি একদিন তাহাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে; এমনি সমস্ত সংসার অসংলগ্ন মন্থনা তিনি নিরন্তর এই দ্রুতি নির্জিকার মণ্ডির কর্তে নির্জিকারে ঢালিয়া চলিতে-ছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। কেশরবাসু স্বভাবতঃই সে একটা হৃদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ের গুঢ় আনন্দ কোন সংসারের শাসনই মানিতেছিল না। তাঁহারের পরম মিত্র হুতরেশের সহিত প্রকৃত্ত বিবাহ, একমাত্র কস্তার নিঃসঙ্গ বিবাহ এবং সর্বোপরি একান্ত কুৎসিত ও কথক সংসারের গোপন গুরুত্বের বিগত কয়েকদিন হইতে তাঁহার ন্যূন উপর তাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছিল; আজ পিসিমার অগ্রজাশিত আগমনে সেই ভারটা অকস্মাৎ অতীত হইয়া গিয়াছিল। মহিমের অংশের খবরটাকে তিনি মনের মধ্যে আমলই মেন নাই। যদি বা সে তামির মৈব দুর্জিকাকে ঠাণ্ডা লাগিয়া একটু অরুচ্যবোধ হইয়া থাকে, ত সে কিছুই নহে। পিসিমা দুই-তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবার আশা দিয়াছিলেন; হয় ত সে সমস্তও লাগিবে না, হয় ত কাল সকালেই লাগিয়া যাইবে। পিড়ার

সম্মুখে ইহাই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, হুশের স্বরঃ গিয়া তাহাকে আপনার বাড়ীতে ধুরিরা আনিয়াছে, এবং যে-কোন-দলে তাহার ঝাঁকে আনিবার লজ্জা নিজের শিগিরাকে পূর্ণ্য পুষ্টাইয়া দিয়াছে! কত-জামাতার মধ্যে যে কিছুকাল হইতে একটা মনোবালিশ চলিয়া আসিতেছিল, দাসীর মুখের এ তথ্যটি তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই। অতএব, সমস্তই যে সেই দাম্পত্য-কলহের ফল, আর এই সত্য পরিস্ফুট হওয়ার, এই অবিশ্রাম বহুনির মধ্যেও তাহার নিরতিশ্রয় আত্মনিয়ন্ত্রিত মনে হইতে লাগিল, ওখানে পৌছিয়া সেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও তব্ধ হৃৎকের মুখের পানে তিনি চাহিয়া দেখিবেন কি কুরিরা? কিন্তু তাহার কন্নার সর্বস্বের উপর একটা কঠিন নীরবতা স্থির হইয়া বিরাম করিতে লাগিল। অল্পবটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা সেও মনে মনে ধরিয়াছিল, শুধু বৃত্তিতে পারিতো-ছিল না হুশের তাহাকে ধরিত আশিষ্ট করিলে! স্বামীকে সে এটুকু চিনিয়াছিল।

সকাল হইয়া গেছে। রাত্তার গ্যাস জলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ী হুশেরের বাটার কটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গাড়ী-বারান্দার অনতিদূরে আসিয়া থামিল। কেসারবাবু গলা বাড়াইয়া দেখিয়া সধলা উদ্বিগ্ন স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “জু’খানা গাড়ী পাড়িয়ে কেন?” সঙ্গে সঙ্গে অচলায় চকিত দৃষ্টি পিছা তাহার উপরে পড়িল, এবং লষ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, হুশের একজন প্রবীণ ইংরাজকে সঙ্গমনে গাড়ীতে তুলিয়া নিতেছে, এবং আরও একজন সাবেকী-পোদাক-পরা বাঙ্গালী পাশে পাড়াইয়া আছে। ইংরাজ যে ডাক্তার, তাহা উভয়েই চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ইংরাজের গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় লাগিল। হুশের পাড়াইয়াই ছিল; কেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, “বহিষ কেমন আছে হুশের? অল্পবটা কি?”

হুশের কহিল, “ভাল আছে। আশুন।”

কেন্দ্রবাবু অবিকৃতর ব্যাকরণে বিভ্রাণা করিলেন, “অল্পবটা কি, তাই বল না তুমি?”

হুশের কহিল, “অল্পখের নাথ কবলে ত আশনি বৃষ্টি

পারবেন না কেন্দ্রবাবু। অর, বৃষ্টি একটু গড়ি বসেছে। কিন্তু আপনি নেমে আশুন, গুঁদের নামতে দিন।”

কেন্দ্রবাবু নামিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিলেন, “একটু গড়ি বসেছে, তার চিকিৎসা ত তুমি নিজেই কর্তে পার। আমি ছেলেনাথব নই হুশের, জু’খন ডাক্তার কেন? সাহেব ডাক্তারই বা কিদের লজ্জা?” বলিতে বলিতেই তাহার গলা কাঁপিয়া গেল।

হুশের নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া বলিল, “পিসিমা, অচলাকে ভেতরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি।”

অচলা কাঁধেও কোন প্রশ্ন করিল না। তাহার মুখের চেহারাও অন্ধকারে দেখা গেল না; নাহিত গিয়া পা’ধানের উপর তাহার পা যে টলিতে লাগিল, ইহাও কাহারও চোখে পড়িল না; সে বেহন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে নামিয়া শিগিরার পিছনে পিছনে বাটার ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে দ্বারের ভারি পর্দা সরাইয়া যখন সে রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন বহিষ বোধ করি তাহার বাটার সম্মুখেই কি সব বলিতেছিল। সেই লজ্জিত কণ্ঠের ছটা কথা কানে প্রবেশ করিবারাই জ্বর তাহার বৃত্তিতে বাকি রহিল না ইহা অর্ধরাত্রি প্রাপ্ত, এবং রোগ কতদূরে গিয়া পাড়াইয়াছে। মুহূর্তকালের লজ্জা সে মেঝের দ্বারে ভর দিয়া আপনাকে দূর করিয়া রাখিল।

যে ঘেরটি রোগীর শিয়রে বসিয়া বসক দিতেছিল, সে কিরিয়া চাহিল এবং বীর পক্ষে উঠিয়া আসিয়া অচলাকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া শোভা হইয়া পাড়াইল। ইহার বিধবার বেশ। চুলগুলি বাড় পূর্ণ্য ছোট কিরিয়া ছাঁটা; ইহার হুশের উপর সর্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য বেন নিবিড় হইয়া বিভ্রাণ করিতেছিল। জ্ঞান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে সূণ্য বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই; এখন মুখোমুখি স্থির হইয়া পাড়াইতেই জনকালের লজ্জা উভয়েই বেন তন্ত্বিত হইয়া রহিল;—একবার অচলায় সমস্ত মেঘ গুলিয়া নড়িয়া উঠিল; কি একটা বলিবার লজ্জা ওঁড়ারও কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ ছুটিয়া বাহির হইল না, এবং পরক্ষণেই তাহার সম্মুখীন মেঘ ছিল লতার লজ্জা সূণ্যের পদমূলে পড়িয়া গেল।

চেতনা পাইয়া অচলা চাঁচিয়া বেবিল, সে পিতার ফ্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া একটা কোচের উপর শুইয়া আছে। একজন দাসী গোলাপ-মলের পাতা হাতে তাহার চোখে-মুখে ছিটা দিতেছে, এবং পার্শ্বে ঠাড়াইয়া সুশ্রবণ একখানা হাত-পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে মরণ করিতে তাহার কিছুকণ লাগিল। কিন্তু মনে পড়িতেই অজ্ঞান মরিয়া গিয়া শশবাত্তে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই কোলাহল বাধা দিয়া কহিলেন, “একটু বিশ্রাম কর না, এখন উঠে কাজ নেই।”

অচলা মুহুর্তে বলিল, “না বাবা, আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি,” বলিয়া পুনরায় বসিবার চেষ্টা করিতে পিতা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া উৎপেয় সহিত বলিলেন, “এখন ওঠবার কোন আবশ্যক নেই অচলা, বরঞ্চ একটুখানি সুশ্রাব্য চেষ্টা কর।”

সুশ্রবণও অদৃষ্টে বোধ করি এই কথায়ই অনুমোদন করিল। অচলা নীরবে একবার তাহার সুশ্রবণে পানে চাঁচিয়া প্রভুত্বের কেবল পিতার হাতখানা টেগিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া ঠাড়াইয়া বলিল, “সুশ্রাব্যের দ্বন্দ্ব ত এখানে আমি নিবী—আমার কিছুই হয়নি—আমি ও-বয়ে থাকি।” বলিয়া প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ ঘাটীর ঘর-দ্বার সে বিস্তৃত হয় নাই; বোস্তির কণ্ঠ চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। প্রবেশ করিতেই মৃণাল চাঁচিয়া বেবিল, কহিল, “তুমি এসে একটুখানি বোসো সেজদি, আমি আড়িকটা সেয়ে নিইগে। বরফের টুপিটা গড়িয়ে না পড়ে যায়, একটু নম্বর বেখো।” বলিয়া সে অচলাকে নিম্নের দ্বারদ্বার বলাইয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কঠিন নিষোদ্রিয়া রোগ দারিতে সমর্থ লাগিবে। কিন্তু মহিম ধীরে ধীরে যে আরোগ্যের পথেই চলিয়াছিল, এতাদার আর তাহার ভয় নাই, এ কথা সকলের কাছেই প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সুশ্রবণ অর্থীন বাবা, চোখের উন্মাত্র দৃষ্টি সমস্তই শান্ত এবং স্বাভাবিক হইয়া আনিতেছিল।

দিন দশেক পরে একদিন অপরাহ্ন বেলায় মহিম শান্ত-ভাবে ঘুমাইতেছিল। এ বৎসর সর্বত্রই শীতটা একটু বেশি পড়িয়াছিল। তাহাতে এইমাত্র রাহিরে এক পদ্মলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; রোগীর খাটের সহিত একটা বড় তক্তপোষ জোড়া দিয়া বিছানা করা হইয়াছিল; ইহার উপরেই সকলে বেশ করিয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়া ছিল। সকলের চোখে-মুখেই একটা নিকরির তৃপ্তির প্রকাশ; শুধু পিদিমা গৃহকর্মে অস্ত্র নিমুক্ত, এবং কোলাহল তখনও বাড়ী হইতে আদিয়া দ্রুত পড়েন নাই।

সুশ্রবণের প্রতি চাঁচিয়া মৃণাল হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিল, “এইবার আমার ছাড়-পত্র মঞ্জুর করতে হুজুম হোন্ সুশ্রবণবাবু, আমি বেঁচে যাই। এই দারুণ শীতে আমার বুড়ী শাওড়ী হত ত বা নরই গেল।”

সুশ্রবণ কহিল, “এখনও কি তাঁর বেঁচে থাক। মরকার না কি? না, তাঁর মজ্ঞ আপনায় বাওয়া হবে না।” মৃণাল পলকের ভয়ে বাড়ি ছিটাইয়া বোধ করি বা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই চাপিয়া গেল; তাহার পরে সুশ্রবণের সুশ্রবণে পানে চাঁচিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “ওহু আপনিই নয় সুশ্রবণবাবু, এ প্রশ্ন পূর্বে আমিও অনেকবার করেছি। মনেও হয় এখন তাঁর বাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু মরণ-বাচনের দালিক যিনি, তাঁর ত সে বেখাল নেই, থাকলে হয় ত সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকেই বাহুব নিস্তার পেত।”

অচলা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মৃণালের কথা বোধ করি তাহার স্বামীর মৃত্যুর কথাটাই মনে করিয়া কহিল, “তার মানে, যিনি অর্থদায়ী তিনি জ্ঞানেন বাহুব শত দুঃখেও নিম্নের মৃত্যু চায় না।” মৃণালের সুশ্রবণের উপর একটা গোপন বেবনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, “না সেজদি, তা’ নয়। এমন সময় সত্যিই আসে, যখন বাহুবে বর্ষা হই মরণ কাখনা করে। সেদিন অনেক রাতে হঠাৎ তব্বা ভেঙে যেতে শাওড়ী ঠাকুরকে বিছানায় পেছন্ন না। তাকাতাড়ি বাইরে এসে দেখি, ঠাকুর-ঘরের দরজাটা একটু খোলা। চুপি চুপি গাশে এসে গাড়াডুন। দেখি, তিনি গাশ কাপড় ধরে ঠাকুরের কাছে কল-কোড়ে মৃত্যু ভিক্ষে চাইলেন। বললেন, ঠাকুর! যদি একটা দিনও কাহননে তোমার সেবা করে থাকি, ত আম আবার সজ্জা নিবারণ কর। আমি মুক্তি চাইনে, স্বর্গ চাইনে,

তুখু এই চাই, ঠাকুর, তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না—
আমি এ মুখ আর আমার খোয়ার কাছে বার করতে
পাঠাচিনে।” বলিতে বলিতেই সুগাল কহু কহু করিয়া
কানিতে লাগিল।

এই প্রার্থনার মধ্যে মাতৃ-রূপের স্তম্ভিত হৃৎকীর
বেদনা যে নিহিত ছিল, তাহা কাহারও অদৃষ্টব করিতে
অবশিষ্ট রহিল না। হৃৎকীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া
উঠিল। কাহারও সামান্য হৃৎকীর সে কাতর হইয়া পড়িত;
আজ এই সন্তানহারা বৃদ্ধা জননীর মর্মান্বিত হৃৎকীর
কাহিনীতে তাহার বুকের মধ্যে কড় বহিতে লাগিল। সে
খানিকক্ষণ তরুভাবে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুখ
তুলিয়া অকস্মাৎ উদ্ধৃগ্নিত কর্তে বলিয়া উঠিল, “আজ্ঞা যাও
মিদি, তোমার বড়ো শাওড়ীর সেবা করে কর্তব্য করবে,
আমি আর তোমাকে আটকে রাখিব না। এই হস্তভাগা
দেশের আলম বহি কিছু পৌরষ করবার থাকে, ত সে
তোমার মত মেয়ে যাহুবে। এখন জিনিদট বোধ করি আর
কোন বেশ সেখানে পারে না।” বলিয়া সে হিজাহ মুখে
একবার অচলায় প্রতি চাহিল। কিন্তু সে জনালের
বাহিরে একখণ্ড ধূসর বেগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া
নিঃশব্দে বলিয়া ছিল, বলিয়া তাহার কাছে হইতে কোন
শব্দ আসিল না।

কিন্তু সুগাল লজ্জা পাইয়া নির্ভর দিক হইতে
আলোচনাটাকে অস্ত্র পথে সরাইবার ভক্ত তাড়াতাড়ি ঘোর
করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “না, নেই বই কি! আপনি
সব দেশের ববর জানেন কি না। আজ্ঞা, সেজন্যর চেয়ে
আপনি বড় না ছোট?”

এই অল্পত প্রণে হরেশ নরাজে কহিল, কেন বলুন ত?
সুগাল বাধা দিয়া বলিল, “না, আমাকে আর আপনি
নয়। আমি মিদি হলেও এখন বরষে ছোট, তখন—
বেজনা? ন’না?—বলুন, বলুন, নীলগিরি বলুন কি?”

অচলা আকাশ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া এবার
তাঁহার দিকে চাহিল। অনেক দিন পূর্বে যেদিন এই
মেঝেট এমনি দ্রুত, এমনি অবশীলাক্রমে তাহার সহিত
‘সেজ’ সবুজ পাটাইয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে
পড়িল। কিন্তু, সুগালের চরিত্রের এই দিকটা হরেশের
জানা ছিল না বলিয়া সে এই আশ্চর্য্য রমণীর মুখের পানে

ডাকাইয়া সফোভুক হাজ্তে বলিল, “ন’না! ন’না! তোমার
সেজসার চেয়ে আমি প্রায় বেড় বহুরের ছোট।”

সুগাল কহিল, “তা’হলে ন’না, দয়া করে একটি লোক
টিক করে দিন যে আমাকে কাল সকালের গাড়ীতেই
রেখে আসবে।”

মাইবার অল্পমতি এইমাত্র হরেশ নিজে দিলেও সে যে
কাল সকালেই হাইতে উজ্জত হইবে, তাহা সে ভাবে নাই।
তাই কণকাল স্থির থাকিয়া ঈষৎ গভীর হইয়া বলিল,
“আর ছোট মিনও কি থাকতে পারবে না মিদি? তোমার
ওপর তার দিবে আমরা মহিমের জন্তে একবারে নিশ্চিত
হিসূব। এমন অহিনিশি সত্য, এমন গুহিবে সেবা করতে
আমি হাসপাতালেও কখনো কাউকে দেখেছি যেন মনে
হয় না। কি বল অচলা?”

প্রত্যুত্তরে অচলা তুখু মাথা নাড়িল।

সুগাল হরেশের চিত্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে
বলিল, “আপনি সে জন্তে একটুও ভাববেন না। যার
জিনিশ ভাবই হাত দিবে থাকি,—নইলে আমিও হয় ত
যেতে পারবুন না। আপনার মত মনে আছে, আমাদের কি
রকম ডাক্তারি চলে আসতে হয়েছিল। তাই, কোন
বন্দোবস্ত করাই আসা হয়নি। কাল আমাকে ছোট
দিন ন’না, আবার এখন হুহুন করবেন তখন চলে
আসব।”

হরেশ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, সহসা বলিয়া
বলিল, “আজ্ঞা, সুগাল, সেই অল্প পাড়াগাঁয়ে তুখু কেবল
একটা বড়ো শাওড়ীর সেবা করে, আর পূজা-আহিক
করে তোমার সমস্ত সময়টা কাটবে কি করে? আমি
তাই তুখু ভাবি।”

সুগালের মুখের উপর পুনরাব ধাখার চিহ্ন প্রকাশ
পাইল। কিন্তু সে হাসিয়া কহিল, “সময় কাটাবার
ভার ত আমার ওপর নেই ন’না। যিনি সময় সৃষ্টি
করেছেন, তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।”

হরেশ কহিল, “আজ্ঞা, সে বেন হোলো। কিন্তু
তোমার শাওড়ী ত বেশী দিন বাচবেন না, আর মহিমকেও
ডাক্তারের হুহুন মত ভাল হয়ে পড়িমের কোন একটা
স্বাস্থ্যকর সময়ে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হবে। তখন,
একলাটি সেখানে তুমি থাকবে কি করে?”

মৃণাল উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় একটু হাসিল। কহিল, “সে উনিই জানেন।”

অজ্ঞাতসারে সুরেশের মূখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মৃণাল কহিল, “ন’দা বুদ্ধি এসব মানেন না?”

“কি সব?”

“এই যেমন ভগবান—”

“না।”

“তবে বুদ্ধি আবারের অন্তে ওটা আপনার অবজ্ঞার দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে গেল ন’দা?”

সুরেশ এ প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ বিমনায় মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বাড়ি নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “না মৃণাল, তা’ নয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের তার তেমনি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপরে যিরে তারা যে বরক আমাসের চেয়ে জিতের পথেই চলে তা’ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এ সব আলোচনা থাক্ মিহি, হয় ত আবার প্রতি তোমার একটা গুণা হয়ে যাবে।”

মৃণাল তাকাতাড়ি হেঁট হইয়া সুরেশের ছুই পায়েয় ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, “আচ্ছা, থাক্।”

সুরেশ বিষয়ে অবাক্ হইয়া কহিল, “এটা আবার কি হ’ল মৃণাল?”

“কোনটা ন’দা?”

“কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই পায়েয় ধূলা নেওয়াটা।”

মৃণাল কহিল, “বড় ভাইয়ের পায়েয় ধূলা নিতে কি আবার দিন রূপ দেখতে হয় না কি?” বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া গেল।

“আচ্ছা বেরে ত!” বলিয়া সঙ্গেহ গায়ে সুরেশ অচলায় সুরেশের প্রতি চাহিতে গিয়া বিষয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত মূখ প্রাণ-আকাশের মত ঘন মেঘে বেন আচ্ছন্ন হইয়া গেছে এমনি বোধ হইল। কিন্তু বিশ্বেরে থাকা সামলিয়াই এ সময়ে কোন প্রকার প্রশ্নের আভাস হান্দিয়া দিবার পূর্বেই অচলা হতবুদ্ধি সুরেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিয়ার অতল অবকাশ দিয়া ঘরিত পথে মৃণালের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইখানে শুদ্ধ ভাবে বলিয়া সুরেশ কেবলি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কিসে কি হইল! মৃণালের প্রশ্নায় করার সঙ্গে ইহার কোন মত কিয়দা বেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা সে নির্ভর ভিতর হইতেই নিজের অস্থান করিতে নাগিল; কিন্তু এ যোগ কোথায়? কেন মৃণাল অকস্মাৎ তাহার পদখলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং পলক না কেলিতে কেনই বা অচলা গুরুত্ব বিবরণ মুখে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল! নিজের ব্যবহার ও কথাবার্তাগুলো সে আগাগোড়া বাহ্যিক ও ভয় করিয়া মরণ করিয়াও কিন্তু কোন স্থল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ, পাশাপাশি এত বড় ঘটনা ঘটনাও কিছু শুধু শুধু ঘটে নাই, তাহাও সে বুঝিল। সুরেশ তাহারই কোন অজ্ঞাত নিমিত্ত অচেনাই যে এই অনর্থক মূল, এ সংসার তাহার মনের মধ্যে কীটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু মৃণালকেও এ সময়ে কোন প্রকার প্রশ্ন করা অসম্ভব। রাজিতি সে এক রকম পাশ কাটাইয়া রহিল, এবং প্রত্যেকে এক সময়ে অচলাকে নিভৃত্তে পাইয়া কহিল, “তোমাকে একটা কথা মজাব দিতে হবে।”

অচলায় মূখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। প্রশ্নটা যে কি, সে তাহার অশোচন ছিল না। গত রাজির সেই তাহার অকৃত আচরণের এইবার কৈকিরূপে দিতে হইবে বুদ্ধিগা সে আরক্তমুখে মুদুর্কটে কহিল, “কি কথা?”

সুরেশ আস্ত আস্তে বলিল, “কাল মৃণাল হঠাৎ আমায় পায়েয় ধূলা নিয়ে উঠে গেল, তুমি মূখ তার করে রাখ করে চলে গেলে, সে কি তার শাওড়ীর ময়নের কথা বলেছিলুম বলে?”

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অচলা একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে খুসি হইয়া বলিল, “এ রকম প্রশ্ন কি তোমার তোলা উচিত ছিল? সে বেচারার শামী নেই, শাওড়ীর সূত্রে তার নিঃসংসার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি!”

সুরেশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, “আমার ভাবি অস্তায় হয়ে গেছে। কিন্তু, তিনি যে আর বেশি দিন বাঁচতে পারেন না, এ তো মৃণাল নিশ্চয় বোঝে। তা’ ছাড়া সে নিঃসংসার হবেই বা কেন?”

অচলা লজ্জা দিল, “এ কথা আমায় তাকে একবারও

বলিল। বরঞ্চ তুমিই তাকে নানা রকমে ভয় দেখালে, বেশে সে একলাউ থাকবে কেনন কোরে।”

হুশের অত্যন্ত অসহ্য হইয়া ভিজ্ঞান্য করিল, “তা’হলে সে বাবার পূর্বে আমার কি তাকে সাধন দেওয়া উচিত নয়? তার যে কোন ভয় নেই এ কথা কি তাকে—”

বলিতে বলিতেই অকস্মিক কক্ষণার তাহার কণ্ঠ সম্মল হইয়া আসিল।

অচলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। এই পতঙ্গ-কাতর সজ্জনর মুখের সংস্রব দ্বারা কাহিনী তাহার চক্ষুর নিমিষে মনে পড়িয়া গেল। বাড়ি বাড়িয়া বলিল, “না, তোমার সাধন দিতেও হবে না, ভয় দেখিয়েও কাজ নেই। এখন সে সময় আসবে তখন আমি চূপ করে থাকব না।”

হুশের আশ্চর্যবিশ্বত আবেগভরে অকস্মাত তাহার হাত-বানো সম্বন্ধে চাপিয়া বসিয়া অস্ফুট একটা মাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, “এই ত তোমার যোগ্য কথা! এই ত তোমার কাছে আমি চাই অচলা!” বলিয়া বেশিরাই, কিন্তু অপরিণীত লক্ষ্যের হাত ছাড়িয়া দিয়া উর্দ্ধবাসে পলায়ন করিল।

তা’হার যে উদ্ভ্রাম হুহুত পূর্বে পরাধিকার নির্ণয় আন্দলের মধ্যে লগ্ন লাভ করিয়াছিল, এই লক্ষিত পলায়নে তা’রা এক নিমিষেই কদম্ব কলুবিতে হইয়া সেবা দিল। অচলার মুকের রক্ত-বিভ্রবেগে প্রবাহিত হইয়া বিন্দু বিন্দু বাদে লম্বাট ভরিয়া উঠিল, এবং সর্বাঙ্গ বাৎসর্য শিহরিয়া উঠিয়া নিকটবর্তী একখানা চোরাগের উপর সে নিশ্চীনের মত বসিয়া পড়িল। কিছুকণে তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু পীড়িত বানীর শব্দায় গিয়া নিষেধ আপনটি গ্রহণ করিতে আর সন্দেহ সকলটা তা’হার কেনন যেন তর-ভর করিতে লাগিল।

বাই-বাই করিয়াও বাইতে মুগালের দিন দুই দেয়ি হইয়া গেল। মহিমের কাছে বিদায় লইতে গিয়া যেবিল আজ সে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত অসময়ে বুধাইয়া পড়িয়াছে। যে বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সে এই বিখ্যা-নিগ্রার হেতু নিশ্চিত অহমান করিয়াও চুপি-চুপি করিল, “ঠেকে আর জাগিয়ে কাজ নেই সে’দিকি” কি বল?” প্রভাতেরে অচলার ট্রোটের কোণে শুধু একটুখানি থাকা হাসি দেখা দিল। মুগাল মনে মনে বুঝিল এ হলনা সে ছাড়াও আরো একটা

নারীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। তা’হার বিরুদ্ধে মুগাল কস্তরের মধ্যে যে গোপন ঈর্ষার ভাব গোষণ করে, তা’হা সে মহিমের কাছে কোন দিন আভাস মাত্র না পাইয়াও জানিত। এই একান্ত অদুলক যেব তা’হাকে কাঁটার মত বিবিত। কিন্তু, ওখাপি অচলা যে নিষেধ হীনতা দিয়া আভিকার দিনেও ওই পীড়িত লোকটির পবিত্র দুর্জলতা-টুকুকে বিরক্ত করিয়া দেখিবে, তা’হা সে ভাবে নাই। হুহুত-কালের নিমিত্ত তা’হার মনটা আলা করিয়া উঠিল, কিন্তু তৎকণাৎ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইলা কানে কানে করিল, “তুমি ত সব জানো সেজন্যি, আমার হয়ে ঠিক কাছে জমা চেয়ে নিয়ো। বোলো, ভাল হয়ে আবার” যখন সেয়ে কিছুবেন, বৈঠে থাকি ত দেখা হবে।”

নীচে কোদারবানু বসিয়া ছিলেন। মুগাল প্রণাম করিয়া গাড়াইতেই তা’হার চোখের কোণে লল আসিয়া পড়িল। এই অল্পকালের মধ্যেই সকলের মত তিনিও এই বিধবা মেয়েটিকে অভিশয় ভাল বাসিয়াছিলেন। আবার হাতের অশ্রু মুছিয়া করিলেন, “না, তোমার কল্যাণেই মহিমকে আমার মনের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। বধনি ইচ্ছে হবে, বধনি একটু বেড়াবার সাধ হবে, তোমার এই বুড়ো ছেলোটিকে তুলো না বা। আমার বাড়ী তোমার জন্তে রাত্রি দিন খোলা থাকবে মুগাল।”

অচলা অদূরে চুপ করিয়া গাড়াইয়া ছিল; মুগাল তা’হাকে সেবায়া হাসি মুখে করিল, “বয়ের বাপের সাধা কি বাবা, ঠিক কিছু থেকে সেজন্যি’কে নিয়ে যাব! যে দিন সে’দিকি’র হাতে পৌছে যিয়েছি, সেইদিনই আমার কাজ চুকে গেছে।”

কোদারবানু মুখের ভাব একটু গভীর হইল, কিন্তু আর তিনি কিছু বলিলেন না।

জীবন বৃদ্ধগোছের কণ্ঠগায়ী ও একজন দাসী মুগালকে দেশে পৌছাইতে দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তা’হাদের সম্মলকে লইয়া ট্রেনের অভিমুখে যোড়ার গাড়ী ফটকের বাহির হইয়া গেলে, কোদারবানু কস্তরের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘখাস পড়িল। বীরে বীরে তথু বলিলেন, “অস্তু, অপূর্ব মেয়ে!” হুশের মনটাও বোধ করি এই ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সারি দিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, “আমি কখনো এমনটি আর দেখিনি কোদারবানু। এমন দিষ্ট কথাও কখনো শুনিনি,

এমন নিপুন কাজ-কৰ্মও কখনো দেখিনি। যে কাজ দাও, এমন অপূৰ্ণ বন্ধুতার সঙ্গে করে দেবে যে, মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চির কালটা আছে। অথচ, আশ্চর্য্য এই যে কোন দিন এসেব বাইরে পর্য্যন্ত যায় নি।”

কেদারবাবু ইহা শুনে বসিয়া জািলেও বিপর্য্য একাশ করিয়া কহিলেন, “বল কি হুশেন!”

হুশেন কহিল, “বধাই তাই। ওর পানে চেরে চেরে আমার মাকে মাকে মনে হোতো, এই যে ব্রহ্মজ্ঞানের সংস্কার বলে একটা প্রবাব আছে, কি জানি নতি) না কি।” বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পরকাল সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু চিন্তাভুক্ত হুখে কিছুক্ষণ দ্বিধভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, “তা সে ঘাই হোক, এ কথামিন দেখে দেখে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে, এ ঘেরে ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন। একে সারানীকন এমন দীর্ঘজীবিত করে রাখা শুধু পাপ নয় মহাপাপ। ও আমার ঘেরে হলে আমি কোন মতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতুম না।”

হুশেন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি করতেন?”

তুচ্ছ উল্লীও স্বরে বলিলেন, “আমি আমার বিবাহ নিতুম। ‘একটা বুড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যারা ওকে সন্ন্যাসিনী লাগিয়েছে, তারা ওর নিজ নয় শত্রু। শত্রুর কার্য্যকে আমি কোন মতেই ক্ষান্তনকৃত বলে স্বীকার করে নিতুম না।”

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “তা’-ছাড়া ওর স্বামী যাবহারটাই একবার মনে করে দেখ দিকি হুশেন। সে লোকটার দু-দুটো ব্রী গুত হতে পকান বছর বয়সে এখন এমন ঘেঘেঁকে বিবাহ করতে রাগী হোলো, তখন নিজের মুখ-সুখিবে ভিন্ন ব্রী তবিত্ততের দিকে পাশও কতটুকু দৃষ্টপাত করেছিল কল্পনা কর দেখি?”

হুশেনকে নিরন্তর দেখিয়া তুচ্ছ অধিকন্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “না হুশেন, আমি বিধবা-বিবাহের ভাল-মন্দ তর্ক তুলতিনে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত বিশ্বাসমাত্র টাংকার করে মলেও আমি মানবো না এই ব্যবহারই ভই দুখের মেটোর পক্ষে চরম শ্রেয়। ওর এমন একটুকু কিছু নেই, যার মুখ চেয়ে ও একটা দিন কাটাতে পারে। সমস্ত দীর্ঘমতা কি তোমরা খেলার

মিনিষ পেরেছ হুশেন, যে, ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধচর্য্য করে চৌকালেই সারা দুনিয়াটা ওর ভক্তে রাতারাতি হৃদে কবির তপোবন হয়ে উঠবে। ঘেরটার শুধু কাপড়-চোপড়ের পানে চাইলে আমার বুক যেন কেটে যেতে থাকে।”

হুশেন অব্যবও দিল না, দুখ তুলিয়াও চািল না; কিন্তু চোখের কোণে দেখিতে পাইল যে চৌকাতে তর দিয়া অচলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হত পাড়াইয়া ছিল—সেখানে আর সে নাই, কখন নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেছে।

মৃণাল চলিয়া গেলে, অচলা স্বপ্নই হুশেনের মুখের দিকে চাছিল দেখে তখনই তাহার মনে হয় সে বিমনা হইয়া আছে, এবং কিসের শোক যেন তাহাকে নিরন্তর শুক করিয়া ফেলিতেছে।

দিন দুই পরে একদিন অপরাহ্নে হুশেন নীচের বারান্দার এক ধারে চৌত্তের মধ্যে আস্তান কেদারটা টানিয়া লইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, পদশব্দে চাছিল দেখিল, তাহারই ভক্ত চা লইয়া অচলা নিজে আসিতেছে। একদল ঘটনা পূর্বে কোন দিন ঘটে নাই; তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া সোলা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —“বোঝার কই? আশ তুমি যে?”

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া একটা ছোট টিপার চেয়ারের পাশে টানিয়া আনিয়া চারের বাটি নামাইয়া রাখিল এবং আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

এই অভিনব আচরণে তাহাকে বিতীর্ণ প্রশ্ন করিতে আর হুশেনের সাহস হইল না। শুধু চারের পেরালাটা নীরবে হাতে তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ শুদ্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অচলা বৃদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞা হুশেনবাবু, আপনি কি বিধবা-বিবাহ কোন ক্ষেত্রেই ভাল বলে মনে করেন না?”

হুশেন চারের বাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, “করি। তার কারণ কুসংস্কার আজও আমার অন্তর্গত পর্য্যন্ত পৌছয় নি।”

অচলা চিন্তা করিবার নিমিত্তকে আর দুহুর্ন্ত অবসর না দিয়া বলিল, “তা’হলে মৃণালের মত ঘেরেকে বিবাহ করতে আপনায় ত লেশমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।”

স্বপ্নের চারের বাটী। হাতে করিয়া কাঠের মত বলিয়া বলিল, “এ কথার মানে ?”

অচলার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উত্তরনা প্রকাশ পাইল না। বেশ সহজ ভাবে বলিল, “আপনার কাছে আমি অলম্ব্য হই। তা’হাড়া আমি আপনার হিতা-কাম্বিনী। আপনার কাছে আমি হুহ, সহজ, সংসারী এবং স্বাভাবিক দেখতে চাই। একদিন আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আজ আমার একথা অস্বপ্নেরে আপনি কীকার করেন।”

এক নিঃশ্বাসে স্বপ্নের মত এতগুলি কথা বলিয়া অচলা বেন হাঁপাইতে লাগিল।

স্বপ্নের পাথরে-গড়া স্মৃতির মত অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বলিয়া থাকিয়া শেষে করিল, “এতে তুমি কি সত্যিই স্থনী হইবে ?”

অচলা করিল, হাঁ।

“সে সত্যী হইবে ?”

“তাই ত আমার বিশ্বাস।”

স্বপ্নের একটুখানি দূর হইয়া বলিল, “আমার বিশ্বাস তা’ নয়। বইরে পড়েছ ত সহরগণের দিনে কোন কোন সতী হাস্তে-হাস্তে পড়ে মরত। নৃপাল ভাসেরই জাত। এদের সুখের কথাই সমস্ত করানো ত চোর সুখের কথা, একটা-একটা করে হাস-পা কাটতে থাকলেও একে আর একবার বিয়ে করতে রাজী করানো যাবে না। এ অলম্ব্য সাধনের চেষ্টা করে মাঝে খেঁক আমাকে তার কাছে মাটি করে দিয়ে না অচলা। আনাকে সে মায়া বলে ডেকেছে, তার কাছে আমি এই স্বপ্নানটুইই বজার রাখতে চাই।”

যেথিত যেথিত অচলার সমস্ত মুখ জ্যোৎস্না কালো হইয়া উঠিল। স্বপ্নেশের কথা সেব হইতেই কর্তন মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিল, “সংসারে শুধু নৃপালই একমাত্র সতী নেই স্বপ্নেশবাহু। এমন সতীও আছে যারা মনে-মনেও একবার কাটকে খামিবে বরণ করলে সহস্র কোটি প্রোলাভনেও আর তাদের মরুকো বার না। এদের কথা আপনি ছাপার বইরে পড়তে না গেলেও সত্যি বলে বলেন রাখবেন স্বপ্নেশবাহু!” বলিয়া তন্ত্রিত, অভিভূত স্বপ্নেশের প্রতি লুকপাত মাত্র না করিয়াই এই গর্জিতা রমণী দুঃপদক্ষেপে থর হাফিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

একজনের উজ্জ্বলিত অকণ্ঠ প্রাণসংসার মধ্যে যে আর একজনের কত বড় সুকণ্ঠের আঘাত ও অগম্যন দুকাইয়া থাকিতে পারে, বসন্ত ও প্রোতা উভয়ের কেহই বোঝে করি তাহা মুহূর্ত্তকাল পূর্ণেরও জানিত না। স্বপ্নের হাতের বাটি হাতে লইয়া আড়ই হইয়া বলিয়া রহিল, এবং অচলা তাহার ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দ্বার কক্ষ করিয়া বাগিনে মুখ তুলিয়া মর্মান্বিত ক্রন্দনের চূর্ণিবার বেগ রোধ করিতে লাগিল; পাশেই মহিদের ঘর, পাছে বিস্ময়াৎ লম্বও তাহার কানে গিয়া পৌছে। বসন্তও, অস্বপ্নবাহী ভিন্ন সে কাহার ইতিহাস আর বিতীর্ষ ব্যক্তি জানিল না।

কিন্তু সে নিজে এই গভীর হৃদয়ের মধ্যে এক নূতন তথ্য লভ করিল। এই নারী-জীবনের সত্যিও যে কত বড় সম্পদ, এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আনয়ই প্রথম বেন তাহার চোখের সমুখে সম্পূর্ণ উল্কাটিত হইয়া দেখা দিল। সেদিন স্বপ্নেশের সাম্পর্কে পিতার সম্বন্ধ দৃষ্টিকে সে অস্ত্রের উপগ্রহ মনে করিয়া বৎসরোলাপ্তি জ্বল ও বাষ্পিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সেই ধর্ম্মহীন পরতীক্ষিত স্বপ্নেশকেই বধন সত্যিঘের পাদপদ্মে অধন করিয়া মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিল, তখন নিজের সত্যাকার হানটাও আর তাহার দৃষ্টির অগোচরে রহিল না।

আরও একটা জিনিষ। সম্প্রতি বাক্যের শক্তি যে কত বৃহৎ, আজ এ সত্যও সে প্রথম উপলব্ধি করিল। সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কার-মন নিষ্ঠাই যে সত্যিও, এ কথা তাহার অববিহিত ছিল না। শুধু বেহ বা শুধু মন কোমটাই যে একতাকী সম্পূর্ণ নয়, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত। তথাপি মন বধন তাহার বিচলিত হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসে না, জিজ্ঞাসা বধন এ কথা উচ্চরবে ঘোষণা করিতেও সঙ্কোচ মানে নাই, তখনও কিন্তু, কোনদিন তাহার আপনাকে ছোট বলিয়া মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজ বধন স্বপ্নেশের মুখের সম্প্রতি বাণী না জানিয়া তাহার নামের সঙ্গে অসতী শব্দটা বোপ করিয়া দিতে চাহিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তরাখা বেন এক সুক-কাটা বেদনার আর্তস্বরে চাঁৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাই বলিয়া নৃপালের প্রতি যে তাহার প্রভা ব্যক্তি তাহা নহে; কিন্তু এই সেয়েটির প্রসঙ্গে যে চৈতন্য আজ সে

লাত করিল ইহা সে জীবনে কখনো বিস্মৃত হইবে না, ইহা
‘আগনার কাছে আগনি বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

বাহিরে শিতার লাঠির আগরাল এবং শিহনে হুরেশের
দমনক সে ভনিতে পাইল। বৃষ্টি, তাহার মহিমকে
সেবিত্তে চলিয়াছেন। এবং অল্পকাল পরেই শিতার কণ্ঠধরে
উর্ধ্বাধি আছান ভনিয়া সে বেশ করিয়া ‘আঁলে চোখ মুখ
মুছিয়া দ্বার খুলিয়া ওখরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কেদারবাহু তাহার দ্বারের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া
উঠিলেন, “আম বাপার কি? চারটের সময় হুজুরা দেবার
কথা, ছটা বাজে বে! ও কি, চোখ মুখ অমন ভারি কেন?
মুখুখি সে না কি?”

অচলা উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।
যেথাক হুজুরা দেবার ব্যবস্থা হইবার পরে এই কাজটা
মুগাশই করিত। চাকরে চড়াইয়া দিত, সে আদ্যাক করিয়া
বধাদমরে নাড়াইয়া লইত। সে চলিয়া গেলে এ ভাড়াটা
অচলাই উপরেই পড়িয়াছিল। আর সে কথা তাহার মনেই
ছিল না। ছুটয়া গিয়া সেখিল আগুন বন্ধকর্ণ নিবিয়া গেছে
এবং সমস্তটা শুকাইয়া পুড়িয়া উঠিয়াছে।

বন্ধকর্ণ সেইখানে কাঠ হইয়া গড়াইয়া থাকিয়া যখন
সে কিরিয়া আসিল, তখন কেদারবাহু এ কথা ভনিয়া
অচলাকে কিছুই না বলিয়া শুধু হুরেশকে লক্ষ্য করিয়া
কঠিনভাবে বলিলেন, “তখন ত তোমাকে বলেছিলাম
হুরেশ, এখন একজন ভাল নর” না রাখলে মহিমকে
বাঁচাতে পারবে না। নিদের বেয়েকে কি আবার চেরে
তোমরা বেশি বোকা?”

হুরেশ নিরুত্তরে বলিয়া রহিল। কিন্তু মহিম যে এত-
দূর নিঃশব্দে স্ত্রীর লজ্জিত স্নান মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে
চাহিয়া ছিল, তাহা কেহই দেখে নাই। সে এখন বীরে বীরে
কহিল, “নসের হাতে আমার শুধু পর্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি
হবে না হুরেশ। তবে, ভঁকে সাহায্য করবার একজন
লোক দাও। কাল পরন্ত ছুটা রাত্রিই ভঁকে সারা রাত্রি
জাগতে হয়েছে। দিনের বেলায় একটু বিশ্রামের অবকাশ
না গেলে কলের মাল্লকে দিয়েও কাজ পাবে না তাই।”

কথাটা বর্ণে বর্ণে লতা না হইলেও বিখ্যাত নয়। হুরেশ
পূর্নি হইয়া মুখ তুলিল, কিন্তু কেদারবাহু নিজের দ্রুতবাক্যে
লক্ষ্য পাইয়া কোমল কিছু একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই
অচলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। “রাত্রে তাগুর অনেক
বার ইচ্ছা করিতে লাগিল, কয় দ্বারীর কাছে বস্তু অপরাধের
জন্ত কাঁদিয়া কমা তিকা চাহিয়া একবার ভিজাগা করে,
তাহার মত পাশিটাকে বাঁচাইবার জন্ত তাহার কি মাথা-
কাথা পড়িয়াছিল! কিন্তু নিদাক্ষ লক্ষ্য কোনমতেই এ
প্রশ্ন তাহার মূখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

হুরেশের একটা কাজ ছিল, প্রতিদিন অনেক রাত্রে
সে একবার করিয়া ঘরঘর ঘরে দুষ্কিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত
বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তবে ভইতে বাইত। মুগাল
থাকিতে সে প্রায় সারা রাত্রিই আনাগোনা করিত, এবং
তাহার আবস্তকও ছিল; কিন্তু কয় দিন হইতে দেখা গেল
সে সহজে আর ঘরে প্রবেশ করে না। প্রয়োজন হইলে
দাদী পাঠাইয়া খবর লয়, শুধু সন্ধ্যার প্রাকালে স্বপকালের
জন্ত একটওয়ার মাত্র নিজে আসিয়া সহায় গ্রহণ করে।
তাহার এই নতুন আচরণ সকলের অগ্রে অচলাই দৃষ্টি
আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য একটু দস্তব্য
প্রকাশ করায় তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই সে মৌন
হইয়াই ছিল; কিন্তু যে দিন মহিম নিজে ইহার উদ্দেশ্য করিল,
তখন তাহাকে বলিতেই হইল, আজকাল তিনি অধিকাংশ
সময় বাটীতেও থাকেন না এবং ইহার হেতু কি তাহাও সে
জানেন না। মহিম চুপ করিয়া গেল, কোন প্রকার মতামত
প্রকাশ করিল না।

পরদিন সকালে অচলা নিচে নামিতেছিল, হুরেশ বাধ
করি কি একটা কাজে এই সিঁড়ি গিয়াই উপরে উঠিতে
আসিতেছিল; মুখ তুলিয়া অচলাকে দেখিবারাই অন্তরিক্ত
সরিয়া গেল। সে যে সর্লগ্রকারে তাহাকেই পরিহার
করিয়া চলিতেছে, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয় মাত্র রহিল
না। একদিন হাধা সে সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল,
আজ তাহার সেই মনেই হুরেশের আচরণে বেদনার পীড়িত
হইয়া উঠিল।

(ক্রমাৎ)

সাময়িক

আবারও বেলে দারিদ্ৰ্য্য-সমস্তা বড়ই উন্নতর হইয়া উঠিতেছে, শিক্ষা-সমস্তা ততই উন্নতর—যেনে হইতেছে। গারামের ঘরে আর নাই, অৰ্ধশতী শিক্ষা তাহাদের একমাত্র পতি, সল্লেখ নাই। কিন্তু এত পর বৎসরের অভিজ্ঞতা-আধাধিকশিক্ষিত বালিয়া বিতরণে যে, বিদ্যা-বিভাগেরে এমন শিক্ষা বৃত্তকে যোগ্যতারে জীবন সম্ভারের সমাধান করিতে অসমর্থ। শুণু তাহাই নহে। খাস বিলাতী শিক্ষাও এ সময়ে সমান নিরুপায়। পাকিস্তান-শিক্ষিত যুবকগণ বেলে আদিয়া বেধেন যে, দেখার তাহাদের বোশা কাছাকাছে নাই। তবন; তাহাদের অপরিসীম অর্থ, ধন, অধ্যবসায়, অর্থব্যয়, সমস্তই নিরাপত্তা স্বত্বকার ও হস্তান্তর নিঃশেষে পথ্যবসিত হয়। এইজন্য শেখজনীয় যুবকসমূহ উপর এই বিদ্যা শিক্ষা আবার অজীব ভূর্ণশ্য। যে যুবকের উপর বইতেন্দ্রীয় রূপা সমর্থিক, তাহার জীবন সমগ্রসময়ে হ্রাসহ। কতক জনগণে দিন দিন ভয়ভয়। গৃহিণী যৌবনে ভয়ভয়, শতগ্রহি বহনে কতকজনগণ বেধের সম্ভাবনায়ে বাস্ত। সন্তানগণ জনাধারে বা অর্থগণে ভয়, ঐশ্বর্য্যপন্যাইন, অকালে মৃত্যুর অতীত। এ ছবি চারিদিকে চোখে পড়ে, কখন বিচার হয়; কিন্তু তাহারা প্রতিকার নহীন। এই যৌবনমুখিক জীবন-সম্ভার উপর আবার নিরাপত্তা পরিচাল—সম্ভাবনগণের মুখিকার বাস্ত। করিতে বিপর যুবকের প্রাণান্ত। কেবল না, উচ্চশিক্ষা গভীরে চাকরী হ্রাসগ, আর চাকরীই বাসালীর স্নেহকর জীবন-বস্তার একমাত্র সম্ভাব। তাই উচ্চশিক্ষার মূল্য অজীব সম্ভাব হইলেও, চাকরীর বাস্তার উদ্যোগে পরিপূর্ণ।

যাযি এই; কিন্তু বিধান কি? যোগ্যতমের উদ্ভব—এ কথা যুবই সভ্য; কিন্তু তাই বলিয়া আবে শা বা অননবর্ধের নিধান, নিরতিশয় কঠোর বিধান নহে কি? বাহাতে যৌবন যুবক সম্ভাবন কানে-প্রাণে সমস্ত রাশিয়া পুত্র-পরিবারের মূখ এক হুঁচকি অত্র দিতে পারে, ইহাই বর্তমানের জীবন-সম্ভাব; এবং যুবের বিধান, এই হুঁচকি সম্ভার যীমাংসা-কর আবারের জাতীয় চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সম্ভাবিত সন্তান বনাবস্ত কানোবস্তার-অধিপতি, সম্ভাবী কালেন শেখাভেদ-সহযোগে কলিকাতার উত্তর-বিভাগে ‘পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট’ নামক যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এই উক্ত শিক্ষাবস্তার অন্ততম কল। ইহার প্রথম লক্ষ্য,—বাহাতে শিক্ষার্থীগণ নিজ পরিবারবর্ষকে ভরাস্বস্ত না করিয়া আপনায় শিক্ষার ব্যয় আপনি বহন করিতে পারে; এমন কি, শিক্ষাকালে তাহার অর্জিত উৎকর্ষ অর্থ হইতে নিজ পরিবারবর্ষকে যোগ্যতা সাধনা করিতে সমর্থ হয়।

আপাততঃ এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত করেকটি বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে;—(১) বিবিকালার-নামিত মাস্ট্রি-ফিউলেশন বৃত্ত। কলি-

কাতার লক্ষ্য বিভাগের অপেক্ষা ইহার বেতন অল্প এবং ইহা প্রাথমিক শিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত। মাস্ট্রি-ফিউলেশন গরীকার উপযোগী শিক্ষা যাতীয় যালকগণকে অত্যন্ত অহুদ্যে। হুঁচকির কাথ (Carpentry), কাঠের কাথ (Wood-work), কাগজ কাটা (Paper-cutting), বুক্টি যোন (Basket-weaving), ত যুবক-মুষ্টি নির্মাণ (Clay-model) শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) কমাশিয়াল বিভাগ (Commercial department); এই বিভাগে স্টাইলগ, (Short-hand), টাইপিং (Typing) ত বুক-কিপিং (Book-keeping) শিক্ষা দেওয়া হয়। (৩) টেলারিং বিভাগ, (Tailoring)।

যুবকগণের হাতকণের স্থবিধার জন্য বিভাগের-প্রতি হাট-বাল আছে। যবেপরিহিতরী মহারাষ্ট্রা যৌবপ্রচেষ্টার বার্ষিক উত্তবে লগায় বর্ষবসেটের শুভ মুষ্টিপাত হইয়াছে। মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ বসেবর কাট মহোদয়, সন্তানগণে মেতি রোনাভেদে সহ এই অতিবহ বিভাগের পরি-বর্ধনে আদিয়া সবিধের শ্রীতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এতযাতীয় শিক্ষা বিতরণের কতক যি: হার্ণেল, অনায়েবল ডাঃ সল্লেখিকারী, অনায়েবল সার সামসুল হুদা, অনায়েবল যি: ভগার্ডনগার, মহারাষ্ট্রা বারাদেব বিনোদগুণ্যপতি, সার ড্যানিয়েল ফ্রান্সিস, শ্রীকৃষ্ণ মাধো রাত, ত বস্ত্রাভ বিমিষ্ট, সন্তানগণ মহোদয়গণ শ্রীকৃষ্ণ কামিন্যবাস্তা, অধিপতির এই সহযোগ অহুতান পরিবর্ধন করিয়া যে লক্ষ্য সম্ভাব একাধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যৌবন অহুতানের পক্ষে যৌবনের বিধান সম্ভাব নাই। মহাশয় হাইকোর্টে মানসীয় বিভাগপতি সার আভেতাথ যুগাধি, এবং যৌবন সম্ভাব যাকব সার ড্যানিয়েল ফ্রান্সিস এই বিভাগেরে হিতাকাঙ্ক্ষী এবং গুণগণক। যৌবনের হিতাহুতানে, যৌবনগত: শিক্ষাবিভাগকণে মহারাষ্ট্রা যৌবপ্রচেষ্টা মূক:শ। তাহার উপর বস্ত্রাভ বর্ষবসেট বস্ত্র-প্রদানগিত হইয়া এই বিভাগেরে নামিক শাড়ে গঠনিত টাকা সাহায্য করিতেছেন। ইহার হারিৎ যেনন বান্ধারী, তেযনি আশাশ্রয়।

সম্ভাবিত বাসালী গণের শিক্ষা-যোগ্যতার আর একটা যুগান্তেরে হুঁচকি দেখা গাইতেছে। বাসালী তাবা ত বাসালী সাহিত্যগত একটা যুব-সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছে। কলিকাতা বিবিকালার Indian Vernaculars অর্থগ কালেকের বৈশী তাহার এ-এ উপাধি-গরীকা-মান-পদ্ধতি গণ্যগিত করিতে উজ্জত হইয়াছেন। ইহার ফলে বাসালী কাথ ত বাসালী সাহিত্যে, বাসালীর জাতীয় জীবনে যে যুগান্ত উপস্থিত হইবে, তাহাতে আশায়ে বিশ্বদ্বারা সম্ভাব নাই। বিবিকালার একগণ যে উক্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা এখনও

বাণালী জনসংযোগ সমাচক্ষণে অবদান নহেন; অসুস্থ: এমন
একটি ক্ষুদ্রতর বিখ্যে সাধারণের দৃষ্টি সমাচক্ষণে আকৃষ্ট হয় নাই।
দুস্তরঃ বাণালী জালে ক্রিয়া নৃপতির এবং সাধারণের সহযোগে
আলোচনার প্রয়োজন বর্তীয়ে।

সত্ৰ ১৯১৮ জৰ্জৰ ২৮শে সেপ্টেম্বৰ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
সেনেট-সভাৰ একটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভাৰ সাৰ
স্বত্ব আন্তোৰে মুখোপাধ্যায় বংশানুভৱতৰ বৈদ্য ভাৱা
এক-এ পৰীক্ষা প্ৰাপ্তৰ পদ্ধতিৰ ওচৰলৈ কৰিবাৰ প্ৰস্তাৱ কৰি-
ছিলে। উক্ত অধিবেশনে প্ৰত্যেকটি আলোচিত এক সভাৰ
স্বীকৃত হয়। ১৯১৮ জৰ্জৰ ২৮শে আগষ্ট তাৰিখে সাৰ শ্ৰীকান্ত
আন্তোৰে মুখোপাধ্যায় বংশানুভৱতৰ এ স্মৃতি-
সেনেট-সভাৰ উপস্থাপন কৰিয়াছিল, তাৰাৰ সাৰ বৰ্ণ এই—
শ্ৰীকান্ত আৰি একটী সেনেট-সভাৰ প্ৰস্তাৱ কৰিয়াছিল। তাহাতে
বৈদ্য ভাৱাৰ উল্লেখৰ পৰে-পাৰ্ৱৰ্তীৰ লক্ষ কৰক প্ৰেৰিত হও
প্ৰস্তাৱ কৰিবাৰ প্ৰস্তাৱ দিল। গত ২৮শে জুন তাৰিখে সন্তোষ,
গাৰ্ভি ও তুসদাৰ্থক ভাৱা বিজ্ঞান সন্তোষ বোৰ্ড-সমূহৰ প্ৰসিদ্ধি
সভাৰ প্ৰত্যেকটি অনুমোদিত হইয়াছিল। এই প্ৰসিদ্ধি সভাৰ
মন্তব্য পৰে এককমিটিৰ কৰ্মী ও কৰ্মচালক কৰ্ত্তক অনুমোদিত
হয়। সন্তোষ দিগন্তেই উক্ত প্ৰস্তাৱ কাৰ্য্যে পৰিণত কৰিবাৰ লক্ষ
সেনেটৰে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিয়াছিল। বৰ্ত্তমান মেমোৰাণ্ডমে আদি
প্ৰথম-এ উপাধি পৰীক্ষাৰ বৈদ্য ভাৱাৰপৰে পৰীক্ষাৰ বিষয় সমূহৰ
অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবাৰ প্ৰস্তাৱ কৰিব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা
পৰীক্ষাৰ লক্ষ বৈদ্য বিজ্ঞান (intellectual discipline)
আন্তৰ্ক, ভাৱীৰ ভাৱাসমূহৰ সলোচনামূলক, বৈজ্ঞানিক,
ঐতিহাসিক ও কৃষ্ণানুভৱক আলোচনা কৰি তাৰাৰ কিছুবাৰ কথা
হইবে বা। আন্তৰ্ক এ স্মৃতি-সন্তোষৰ পৰাভাৱে পৰাভাৱ

অধোঃ প্রত্যাহাটি সংক্ষেপে এই—

এক এ টপাৰি সন্তোষ নিয়ন্ত্ৰণাৱলীৰ ৩০ মাৰ্গক পৰিচ্ছেদেৰে
 ছুতীৰ খাৰা পৰীক্ষাৰ বিষয়সমূহৰ বে তালিকা। শিশিবদ্ধ হইকালে,
 তাহাৰ স্তন্য দ্বাৰা লাটুৰেৰ পৰা (১৮) ইন্ডিয়ান আৰ্থিকদ্বাৰা
 কথা হুইটীৰ পাইয়া বেগৰ হটক। বিকীৰ্ত্ত, এই পৰিচ্ছেদেই, লা টন
 তাহাৰ শিশুৰ বিধা সন্তুৰে পদে নিৰ্দেশিত বিবৰ্ত্তি সন্নিবিষ্ট
 হইক, বলা—

ইতিহাস অর্থাভাস

পত্রীকার্ধিগণকে নিম্নলিখিত বিবরণমুখে পত্রীকা দিতে হইবে—

(ক) Board of Higher Studies in Indian Vernaculars মঙ্গল-মঙ্গল আত্মীয় ভাষায় যে ভাষিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহা হইতে পত্রিকার বহা এককী, ভাষা প্রকাশ্য আদিত্য দিবস বঙ্গ পত্রিকা করিয়া গাইবে।

(খ) উক্ত তালিকা হইতে গণ্যকৰ্মী আৰু একতী ভাৱতীৰ্ণ ভাণ্য subsidiary subject ৰূপে নিৰ্ধাৰিত কৰিবেন।

(৩) প্রকৃত, শালি, কামি ও পুতুল—এই চারটি ভাষার মধ্যে যে দুইটিই, পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত প্রধান ভাষা তাহার subsidiary subject এর উপর কোন প্রভাব আছে, সেই দুই ভাষার Elements পরীক্ষার্থীর পাঠ্য হইবে। [এই তালিকাটি পরিবর্তনশীল।]

(ঘ) উক্ত বোর্ড ইতো-এরিয়ান কিংবা ভাষা-বিজ্ঞানের ঐকণ কোন শাখার মূলতত্ত্ব পাঠ্যক্রমে নির্দেশ করিতে পারিবে।

(ক) চিহ্নিত বিষয়ে চারিখানি, (খ) চিহ্নিত বিষয়ে দুইখানি, এবং (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত বিষয় দুইটির প্রত্যেকটিতে একখানি করিয়া প্রশংসিত প্রাপ্ত হইবে।

[ইহার পর এতোক অংশে কি কি বিষয় থাকিবে, কি
এখানে কতকালের উত্তর লিখিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত
হইবে।]

কাজ আরম্ভের শেষকালে এই কথা বলিয়া তাঁহার বৈদ্যোতর্য
সেব করিয়াছেন যে, দেশীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাস্তবতা থাকিবেই,
পয়ত, আশাধী, উজ্জীৱ, বিদ্যো, উর্ধ্ব, স্তম্ভাশী, যাত্রাণি ও পুণ্ড্র
জাতিও থাকিবে পারে। এতলি দেশ উক্তর জাতেরও ভাষা। তা'হাও,
কালে স্তেপ্ত, জাতি, মালয়নাথ এবং কান্যকী ভাষা এই তালিকার
অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এমন কি, সিংহলী ভাষাও যদি এই তালিকার
অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে বলাইক, তবে বাস্তবিকও ঐক্যবিশিষ্টাণা একবারে
সম্পূর্ণ হইবে। তখন হইবে যদে।

প্রাচীন কালের এই অধ্যাপকগণ, যিনি ভারতীয় 'Boards of Higher Studies in Sanskrit, Pali, Arabic, Persian and Comparative Philology' সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই সমিতির ভারতীয় Executive Committee of the Council of Post-Graduate Teaching in Arts এবং এই সমিতির ভারতীয় কাউন্সিল এবং এই অধ্যাপকের অধ্যাপনা করেন। গুরু এই অধ্যাপক বিভিন্নভাবে উচ্চতর স্থানে, বিভিন্ন উচ্চতর স্থানে ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় অধ্যাপকগণ ১৯৩৫ সালের ভারতীয় অধ্যাপকগণের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

উক্ত শিক্ষার বাহুলা ভাষায় প্রবর্তন, কিংবা বাহুলা ভাষাতে উক্ত শিক্ষা, এমন কি, সাধারণ শিক্ষার কথা উল্লেখই আমেরিক আশ্রিত করিয়া থাকেন যে, বাহুলা ভাষায় উক্ত-শিক্ষা শ্রাব্য বলসহ কল্পনা ; তাহা, বাহুলা ভাষায় উক্ত-শিক্ষা লাভের উপযোগী হইবে এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকের একান্ত প্রত্যয় । এক্ষণে ত্রায় আওতোরের প্রস্তাব অনুসারে বাহুলা সাহিত্যে এই প্রথমিক ধরনের প্রথা বিবিধভাণ্ডারে প্রবর্তিত হইতে চলিলে, উহা কতদূর কলসের হইবে, এ বিষয়ে সোচ্চার হইলে সন্দেহ থাকিবার দায়িত্ব পড়ে । কিন্তু ত্রায় আওতোরের যে কাণ্ডে

হৃদয়গণ করেন, সে কাম তিনি স্বপ্নও অনুশূৰ্ণ বা অসম্ভব রাখিয়া ছাড়িয়া যেন না; শোভা না রাখিয়া তিনি কোন কামে হাতই যেন না। উপরিউক্ত যোগ্যতায় তিনি আরও যে একটি যোগ্যতাসময়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা/বার অবসরের বিরুদ্ধাচরণের আশ্রিত। এখন করিয়া রাখিয়াছেন। এই যোগ্যতায়ই আমরা দেখিতে পাইয়াছি, আন্ত বাহু বলিতেছেন, "I have long maintained the view that a subject so extensive in scope, so well-calculated to rouse intellectual curiosity may fittingly be included in the scheme for our highest Degree Examination. But this object can be successfully attained, only after the materials for study and investigation have been made easily accessible to teachers and students." অর্থাৎ অনেক দিন ধরিয়া আমরা মনে এই বিশ্বাস বহিরাগত যে, এক বৃহৎ ব্যাপার, এমন কৌতূহলজনক বিষয় আমাদের নৈরাজ্য পত্রিকার পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে, প্রায় শুধু উচ্চতর ইচ্ছাতে সহজে পাইতে পারেন, এমন উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। কেনন এই আবশ্যিকতার উল্লেখ করিয়াই আন্তবাহু কথ্য থাকেন নাই। তার মধ্যেই শ্রীমন্ত বীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত Typical selections in Bengali on a quite comprehensive scale" উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থসংগ্রহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও পরিণতির ইতিহাস এমন দৃষ্টরূপে প্রদেয় হইয়াছে যে, এতল চোখে ইত্যদূর্লভ আর কখনও হয় নাই। ভারতের ভিতরে ও বাহিরে গতিতগণ এই গ্রন্থগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আন্তবাহু ইউনিভার্সিটি কমিশনের সহিত রূপে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ কালে, মহাশয় পণ্ডিতগণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এইখানেই তিনি বিবৃত হন নাই। তিনি ভারতীয় অজ্ঞাত ভাষা সম্বন্ধেও ঐকম সঙ্গ-এই ভাষার মনোনিবেশ করিয়াছেন। এবং এই কারণে পরিমিতকরণ ১০০ হইতে ২০০ টাকা ব্যয় করিবার কল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি বিক্ৰিত হইলে ইউনিভার্সিটি হইতে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আন্তবাহুর উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে কার্যবাহিন্য প্রকাশের শ্রীমন্ত ডি. আর. ভাটরকর মহাশয় ভারতী, তার শ্রীমন্ত রাধাকৃষ্ণ গোপাল ভাটরকর। কে-সি-আই-ই, পিএইচ-ডি, এলএল-ডি মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে পুণ্য কান্ডন কলেজের প্রোফেসর ডাক্তার সি. ডি. গুপ্তি এন-এ, পিএইচ-ডি প্রাক্তন এবং "বেঙ্গলো" নামক আসানী কোম্পানীর রচয়িতা শ্রীমন্ত বেংকল খোবানী আসানী ভাষার এই গ্রন্থের সংগ্রহ-এই সকলসম্প্রদায় হইয়াছেন।

আন্তবাহু প্রাক্তন আন্তবাহুর প্রত্যয়ের ব্যক্তিগত পরিচয় বিবারণ চোকা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তবাহু যে চোকা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং অজ্ঞাত হই একটি প্রত্যয়ের এই। চোকার প্রত্যয় আন্তবাহু এবং উদ্দেশ্যের পরিচয়, চোকা ও উদ্ভব বর্ষ হইতেছেন না। শ্রীমন্ত ডি. আর. ভাটরকর নামক সূত্রপূর্ণ সিবিবিদ্যালয় প্রোফেসর ১৯৮০ অবধি ১৯৮১ সালে প্রোফেসর লেভন টাইমসের এডুকেশনাল সাপ্লিমেন্ট (The Times Educational Supplement) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেঙ্গলভারী প্রোফেসরগণের এই সূত্রপূর্ণের কিছু পরিচয় বিবারণেন। বেঙ্গলভারী প্রোফেসরগণের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীমন্ত সূত্রপূর্ণের চোকা/প্রাক্তন মহাশয় বাহাল। ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আন্তবাহু। এটিকে শ্রীমন্ত বঙ্গ-প্রথম তার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মহাশয় চোকা/প্রাক্তন-বিবর্তিত "শ্রীমন্ত-কীর্তন" নামক গ্রন্থের একটি সূত্রপূর্ণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থবাহি বাহাল ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

এই সকল দেখিয়া উদ্ভিগ্ন মনে হয় না কি, বাহাল ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বর্ষবাহন কালে একটি দুঃ-সম্মিত বহা মিলা অসম্পন্ন হইতেছে? বাহাল আর এমন একদিন বিদ্যাকে, যে দিন শিক্তিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষার পত্র লেখা, এমন কি, হৃদয়গণের বাহালীয় সাহিত্য বাহাল ভাষার কথাগণকন করা অসম্পন্নজনক বলিয়া মনে করিতেছেন। বাংলা ভাষার এবং বাংলা দেশের সেই দুর্দিনে বাহাল। ভবিষ্যতের সুখ চাহিয়া বাংলা ভাষাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দিলেন, উদ্ভিগ্নের আশা। এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিল। বাহাল ভাষা এখন আর অনাদৃত নহে। বাহাল ভাষা ও বাংলা সাহিত্য অতীত শিক্তিত সস্ত্রাঘ্যে আবৃত ও আলোচিত। বঙ্গবাহি আর ছই চারিদিকের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নের ভাষা অধিকার গ্রহণ করিতে হইতেছেন। এই সংবাদে কোন্ বাহালীয় কথার আনন্দে উদ্ভিগ্ন হইয়া না উদ্ভিগ্ন?

বাহাল ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যাবদে পরিণত করিবার জন্য শিক্তিত সস্ত্রাঘ্য, ভাষা বঙ্গবাহিনী কল্পণ আরও একশ করিতেছেন, তাহারও বিকিং পরিচয় বা দিলে, উদ্ভিগ্নের প্রতি অধিকার করা হয়। শ্রীমন্ত তার আন্তবাহুর দুঃখাপাণ্ডার মহাশয়ের প্রত্যয় সত্তর কার্যে পরিণত করার পক্ষে মহাশয়তা করিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীমন্ত অধিকার দুঃখাপাণ্ডার মহাশয় ১৫০০০ টাকা এবং মহাশয়তার শ্রীমন্ত বঙ্গপ্রথম নন্দী বাহালীর ১০০০০ টাকা ইত্যদূর্লভ ইত্যদু করিয়াছেন।

তার আন্তবাহুর প্রত্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে মতে, কিন্তু বড় লাট বাহালীর ভাষা ভারত প্রত্যয়ের এই প্রত্যয়ে অনুসন্ধান না করিলে প্রত্যয় কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা নাই। বলা

বাহুদ্য, আঁতবাহুর প্রত্যাহার বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। নব্বইশের বহি এই প্রস্তাবে অংশদেয়ন করিতে পীড়িত না হন, তবে সম্ভবতঃ, অর্থাভাব বশতঃই করিবেন না। বুদ্ধ উপলক্ষে নব্বইশের একম বিব্রত রহিয়াছেন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারের বিত্তের অর্থ ব্যক্তি হইতেছে। একম অবস্থার নব্বইশের যে একম বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে ব্যয়ক্ষেপ করিতে পীড়িত হইবেন, অথবা, প্রত্যাহার অংশদেয়ন করিলেও যে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবেন, একম আশা করা যায় না। সুতরাং আশাযের মনে হয়, ইহা বশবৎ যেনের কাজ, ইহাতে বশবৎ নব্বইশের অংশদা যেনবাহুরই সহুই বরল হইবে, তখন যেনবাহুরই এ ব্যাপারে মুক্ত হইতে অর্থ-সাহায্য করা কর্তব্য। প্রত্যাহার একম নব্বইশের অংশদেয়ন ও সম্ভবিতঃ প্রত্যাহার করিতেছে। এখন আশাযের একম ভাবে কাজ করিতে হইবে যে, নব্বইশের যেন বিদায় করিতে পারেন, এ ব্যাপারে অর্থভাব হইবে না। তাহা হইলে, অশা হয়, নব্বইশের পক্ষ হইতেও আশঙ্কিত কোন কারণ থাকিবে না। এ পক্ষেও হুলস্থল দেখা হইতেছে। মহারাজ নন্দী বাহাদুর এবং অংশদা মুখাপাখার মহাশয় পক্ষ অর্থদান করিয়াছেন, আশাযের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এখন যেনের লোক নিয়ন্ত্রণের কর্তব্য সাধন করুন।

পরিণেবে, আশায কি বলিয়া যে আঁতবাহুর বহুব্যয় করিব, তাহার ভাষা দুঃখি গাইতেছি না। আঁতবাহুর ভক্তও যেন অশায, তাহার নিম্নকর্তার তেজনি দ্বারা নাই। যে বাঙ্গালী সচিবতার উন্নতি বহু তিনি এম ত করিয়া পরিগ্রহ করিতেছেন, সেই বাঙ্গালী সাহিত্য

পেদিগণের মধ্যেই তাহার শত্রু সংখ্যা সর্বাংশে অধিক। এই নিম্নকর্তার বহুব্যয় খরচাই তাহার নিম্না প্রচার করিয়া আশাযের। আঁতবাহুর বহু ভাব কাহই করুন, এই লেখকের লোক আশা-নিম্না হইতে কিছুতেই নিরত হইবেন না। কিন্তু আশাযে আঁতবাহুরই মত নির্ভরতার ভিত্তি শীঘ্র কর্তব্য পালন করিয়া থাকিতেছেন। নিম্নকর্তা বাহাই বহু, বাহায়া বিজ্ঞ, বিতরণ, নিয়ন্ত্রণ,—বাহায়া দুঃখনী, যেনের এবং যেন-ভাবার প্রতি বাহাযের চরণে কিছুনা মন-বুদ্ধি আছে, তাহায়া নিম্নকর্তা বীজের করিতে বাহা হইবেন যে, এই মহায়া বাহা করিয়া থাকিতেছেন, তাহার কলে বাঙ্গালী ভাষা ও বাহায়া লাহিত্যের ঐ একেবারে করিয়া থাকিবে, এবং যেনবাহুর তাহার নিম্নকর্তা ভিত্তিও প্রত্যাহার আশায থাকিবে। কলিকাতা বিখ্যাতলাসে বাঙ্গালী ভাষার প্রবর্তন কাহার দাত অধিক পরিমাণে ছিল, বাঁকীপুরের বহীরা সাহিত্য। সচিবদের পর এই প্রকৃ উপাধিত হইয়াছিল এবং তাহার কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু তর্কের বিচারিত প্রায়ের বাহায়া চিরকাল যে ভাবে হইয়া আশাযেরে এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল; অর্থাৎ কোন চুক্তির বাহায়া' হয় নাই, এবং কোনকালে হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন সেই সকল পুরাতন কথা পুনরাবলম্বন অংশদেয়ন, নিম্নকর্তা, এবং নিম্নকর্তা; সেইরূপ আশায তাহার আলোচনার নিরত রহিয়াস। বাঙ্গালী ভাষার বর্তমানে সৌখ্য যে আঁতবাহুরই চেষ্টা। বহু, তাহা যেনের কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতএব নিম্নকর্তা হইয়া আশা-নিম্নকর্তা নিরত বাহুদ্য, এবং তাহার প্রত্যাহার তাহার প্রতিবাদ করিতে বাহুদ্য,—যহা আঁতবাহুর কিন্তু নিম্না প্রসঙ্গের অনেক উর্ধ্বে। নিম্নকর্তার নিম্না বা প্রত্যাহার প্রতিবাদ তাহারে স্পষ্ট করিতে পারিবে না।

স্বপ্ন-মিলন

[ত্রিঃমহুত গুণাচার্য]

(সংবাদ)

যনপ্রভা বহু, নন্দ, ভাষার প্রত্যাহার নিম্নকর্তা হইয়া লাহন, গল্পনা ভোগ করুক না কেন, তাহা সে পারে নাথিত না; কারণ, সে জানে যে, সে বাহুর নিম্নকর্তা করুনই অস্বাভাব্য নয়; তিনি তার যৌব-ভাগের বর্ধা বিচার করেন। বাহাতে তাহার যৌব সংশোধিত হয়, সে লজও তিনি বহুই চেষ্টা করিতেছেন। তবে যনপ্রভার অপরাধের বহু পূর্বেই ত বসিয়াছি যে, সে কাম-কর্মে বিশেষ পটু নয়; কারণ, বাস্তবিকতার দ্বারা সে শিক্ষা সে পায় নাই। তাহায়া

তাহাকে আশাযের বহু করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বৈব-হুর্জিপাক শিতকালে উক্ত তান হইতে পতিত হওয়ার যনপ্রভার দক্ষিণ হস্তও সেই অবধি অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়াছিল। সেজন্যও সে তার বহু ঠাকুরাণীর সেই মহানদের কাঁচা প্রথমালে সন্মান করিতে পারিত না। এই সব কারণেই বোধ হয় যেনের তাহার কর্তব্যক্ষমতার অপরাধের কথা তত ভক্ততরভাবে গ্রহণ করিতে পারিত না।

একদিন যনপ্রভা যানের বাট হইতে যান করিয়া যানের

কলসী ককে লইয়া গৃহে ফিরিতেছে,—ভাণ্ডার পুন্ডাতে বড়বড় দীয়াও আসিতেছে। এমন সময় প্রতিবেশিনী সম্বরদ্বা হেমবরদী নামী একতী বাসবিধবা কারক-কল্যা সানার্থ সেই সরোবরীর দিকে হাইতেছিল। পল্লীগ্রামের চির-প্রচলিত প্রথা অনুসারে হেমবরদী উদ্বিগ্নগকে দান করিয়া আসিতে দেখিয়া, এবং দেখা হইলে পরস্পর কথা না কথা নিতান্ত দোষাবহ এবং অসম্ভব ও অহঙ্কারের পরিচায়ক প্রানে, ঘনপ্রভার নিকট গিয়া বলিল, “কি ছোট-গিহি, আজকাল যে বড় সফল-সফল দান করা হয় দেখছি; শেখর-দাদা বাড়ী এলেছেন, বটে—তাই বৃষ্টি ভাড়াভাড়ি নেয়ে ঘুরে গিয়ে তাঁর ভক্ত চাষটি বেঁধে-বেড়ে দেবে? নইলে মাসীঠাকুরের সেতের ভক্ত এ আয়োজন ত নয়! এ হ'লো ইষ্টদেবের পুণ্যের আয়োজন—কি বল বড়-গিহি!”

“কি জানি বিবি, ঐর দেবতা তাঁকেই গ্রহণও” বলিয়া দীয়া এক পার্শ্বে দিয়া দাঁড়াইল।

তখন ঘনপ্রভা বলিল, “তা দেবতাই ত কটো ভাই! সে কথা ত আর মিছে নয়। তবে আমার সেটা বুঝতে পারি না, এই যা।”

“আচ্ছা ভাই, তবে এখন নেয়ে আসিগে,—আবার এখনি প্রসঙ্গ পেতে যাব, মাসীঠাকুর বলছেন। তখন দেখা হ'বে।” এই বলিয়া হেমবরদী দান করিতে গেল,—ঘনপ্রভা ও দীয়া গৃহে ফিরিল।

পরিমধ্যে দীয়া ঘনপ্রভাকে বলিল, “ঐ বেখেছ যহু দিদি, তোমার বড়-ঠাকুর মাঠ হ'তে বাড়ী যাচ্ছেন। উনি আমাদের ঐ আকের জমিতে ব'লে মজুরদের বাটীছিলেন—আমাদের পথে দাঁড়িয়ে কথা কইতে দেখে, বোধ হয় রোগে বাড়ী যাচ্ছেন। জানি না, আজ কপালে কি আছে। উনি ত জানই যে, পথে কারুর সঙ্গে কথা কওয়া দেখতে পাবেন না। আনি ভাই তখনই ঠক সেবেছিলাম,—দেখে একপাশে দ'রে দাঁড়িয়েছিলাম। চল ত এখন বাড়ী—দেখি, কার কপালে কি আছে। হরি হে, তোমার হরিমুট দেব—দেখো যেন আমাদের পক্ষে কিছু না খেতে হয়।”

“এঁা, বড়ঠাকুর দেখেছেন না কি? হী দিদি? এই যা, আর রক্ষা নাই। আজ একটা সুক্কেই উনি বাধাবেনই—তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ও হরি ছেড়ে হরির বাবা

মহাকালী এলেও বোধ কর্তে পারবেন না—এ আমি ব'লে রাখলাম—দিদি, তুমি দেখো। আমি যে ভাই টের দেখলাম কি না।” “না,—আজ ঠাকুরগো বাড়ীতে আছেন—আজ আর কিছু বলতে পারবেন না বোধ হয়।” “হী, তোমার ঠাকুর-পোকে ত তিনি বড়ই অপেক্ষা রেখে কথা কন কি না। আর তোমার ঠাকুরগোও বড় তাঁর দায়ের মুখে মুখ তুলে কথা কন—তাই আবার তাঁর ভয়ে উনি কিছু বলবেন না মনে করছে।”

এইরূপ কথা কহিতে-কহিতে ছই বা'য়ে আসিয়া বাড়ী পহঁছিল। ভিতর-বাটীতে পা দিতেই, চন্দ্রনাথের উগ্র কঠোর ভীষণ আওয়াজ তাহাদের কর্ণক, তেদ করিয়া দমদমভায়ে শ্রবেণপূর্ণক অন্তর কাঁপাইয়া তুলিল।

চন্দ্রনাথ শেখরকে বলিতেছেন, “শ্রদ্ধা শেখর, তুই কি বল ত?” “কেন দাদা, কি করলাম আমি?” “কি করলাম আমি?—বলি বউমা যে দিন-দিন কি রকম হ'চ্ছেন, সেটা কি একবার চেষ্টাও দেখা হয় না কি? এই আজ দান ক'রে আসতে-আসতে পথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যে বজ্রতাঁটা কচ্ছেন,—কই, চ' দেখি, একবার দেখে আর। ওঠ, ঈশগির ওঠ—একবার দেখগে যা—আমি ত অবাক হ'য়ে আকের ভূঁই হ'তে সেই তরঙ্গ দেখে ছুটে আসছি। তেমন অসহ্য করে বজ্রতা বোধ হয় কেহ কখন করতে পারে না। তুই একবার দেখবি চ'—বেরো ঘর থেকে।”

“কি বলছ দাদা! আমি ত তোমার কথাই কিছু বুঝতে পারছি না—কোথার কার সঙ্গে গর করছে?”

“ঐ আমতলার পথে দান ক'রে আসতে আসতে দিকদীরে হোমার সঙ্গে—আর কার সঙ্গে?—আগা যা—সবীটও ছুটেছে তেমনি—কোথাকার এক করুই বাঁড়ী—সর্বনাশী! আমার এই বয়সে নাকে-চোকে তেলক কাটে! যাব সাঝা বছরের কথা ক'টা উননহুদীরে মুখে।”

ঐক এই সময়ে ঘনপ্রভা ও দীয়া দীয়ে-দীয়ে বিড়কি-বার দিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল।

দীয়া বলিল, “ঐ দেখ। ঐ তুলে ত, উননহুদীরে মুখে কি পড়ছে?”

“তাই ত দিদি, ছুদি বা বললে, ভাই, ঐক ভাই হ'ল। চল ত, এখন দুর্গা ব'লে বাড়ী ঢুকি, তাহপর যা কপালে

আছে তাই হবে।" এই বশিরা উত্তরে ভিতর-বাড়ীতে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধিগকে দেখিয়া চক্ৰনাথ ত চটয়া গেল। বলিলেন, "ওগো, বটমাকে বল, ওর জল-খড়টা বাড়ীর বাহিরে ফেলে দিবে, পুনরায় ভূবদিয়ে জল নিয়ে আসুক। ঐ বেদাটাকে জল কীকে ক'রে ছুঁয়ে আগা হ'ল, তা বৃদ্ধি আমি দেখি নাই মনে করছে?"

"আজ্ঞা যদি বৈবাহ্য ছোঁরা ন'ড়েই থাকে, তা হ'লে কি আর সেই জল নিয়ে এসে ঠাকুরদের ভোগে দিতে পারে? এত কি পাগল? ঐ বউদিদি ত ছিল মলে, ওকেই আসে বিজ্ঞাপা কর না কেন—সে ছুঁয়েছে কি না।"

"ওরে পাণ্ডি, বৈবাহ্য!—তা নইলে কি ঐ একরত্তি মেয়ের এত বড় আশ্পর্ক, যে, আবাহের কি মারের কথা পোনে না!"

"ও কি কথা বাবা! তুমি যেন দিন দিন কি রকম হ'য়ে উঠছ! এই যেদিন তুমি সরি-শিরীকে বরণনবাই অপমানটা করলে। তিনি বা রামবা, কি তুসু, এমন কি রামদার মেয়ে হুঁই শুধু আর আবাহের বাড়ী আসে না। এটা কি তোমার বন্ধ ভাল কাজ করা হয়েছে? একটু গম্ভীর চালে চলতে হয়। ঐ যে ওরা ভিজে কাগড়ে উঠেনে ধাক্কিরে হইল—ওসের বোখটা কি হ'ল? মেয়েছেলেতে-মেয়েছেলেতে বেধা হলে, ও রকম কথাবার্তা হয়েই থাকে। আর ভাত্তে যদি বোখবাট হয় ত, সে না ও-বি'গে সাবধান করবেন—তোমার ওদম্ব বিয়ের নম্বর মেওরা কি কর্তব্য কাজ বাবা?"

বৃদ্ধিগতী বীরা ককব্ব কুন্ডটি গায়ামরে বন্ধ করিয়া কলসান্তর গ্রহণপূর্ব্বক ঘনপ্রস্তার পন্ডাং-পন্ডাং চলিল। ঘনপ্রস্তা বলিল; "বেখ দেখি তাই, কি বিভ্রমবোটেই পড়া গিচ্ছে। ওগু-ওগু এই রকম শাব্বি কি সহ হয়। আমি ত তাই ভূব কিছতেই সেব না—মিহিমিহি কেন বায়ে-বায়ের বাবা ভুববো বল ত। ছুঁলাম না কিছ না, আর ভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা নাই হয় কই, কিন্তু আমি কি কখনও ওকে ছুঁয়েছি, তাই আজ ছুঁতে দেখাব! আর এই পোড়া চুল হয়েছে বাথার এক রাশ—এ কি হাই আর এ বেলার ওকাবো?"

"না তাই, এখন হাজ্ঞে তখন ভূবা মিও—নইলে কেউ দেখে যদি বলে দেয়।"

"আমি লোকের কথাই ভরাই না, তাই! আমার সে বাণে কদম নয়।"

"তবে বা ইচ্ছে তাই কর" বলিয়া কালীগড়ের ঘাট হইতে বীরা এক বড়া জল লইয়া ককে তুলিল। ঘনপ্রস্তাও যে জলখড়টি বাটির জলগাছগুলার গোড়ার ঢোলিয়া দিয়া আদিয়াছিল, এখন শূন্য কলসী পূর্ণ করিয়া ককে লইয়া গুয়ে ফিরিল।

সেই দিন রাত্রে ঘনপ্রস্তা শেখরকে বলিল, "আজ ত তুমি নিজের কাশে শুন্নে, চোখেও দেখলে—আমি এখানে কি ভাবে দিন কাটাই। তবু তুমি বাড়ীতে আছ বলে শু তোমার খাতির করা হয়েছে; নইলে আরও কত হ'তো! তোমার ছুটি পায়ে ধরছি—আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল; নইলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি কখন কোন আবদারই তোমার কাছে করি নাই—আজ এ দাসীর কথাটা রাখবে না? বল। আরও এক কথা—প্রতাপনগর এখন যেতে আমার ইচ্ছে নাই—তাই বলি, দয়া করে আমার একেবারেই অন্নসিনের মত সত্যনাথায় নিয়ে চল।"

"বেখ, সহসা কোন কাজ করা ভাল নয়। তুমি নিশ্চিত থাক। আমি আজ হ'তে এক মাসের মধ্যেই যা' হ'ব, একটা বাথবা করবোই করবো।"

(৫)

ইতোমধ্যে একদিন শশিশেখর সত্যনাথ হইতে বাড়ী আসিয়া তুলিল যে, ঘনপ্রস্তা তাহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে বাপের বাড়ী গিয়াছে। তাহার মাতাভ্রাতৃস্বয়ং ঘনপ্রস্তাকে পাঠাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ঘনপ্রস্তা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত শেখর মনে-মনে ঘনপ্রস্তার উপর অসন্তোষ হইল; কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না। পরে তাহার পুত্র্য দ্বাধার ঘন সমস্ত কথাই শেখরকে বলিলেন, তখন শেখর মাতা বলিল—"তা, বেশ করেছেন, ভালই হয়েছে। না পাঠানো কি ভাল হ'ত?"

"হা বাবা, আমি তাই বলছিলাম যে, শেখর আমকাল-

কর ছেদেপিলেদের মত নয়। তার বৃত্তিও আছে। শুক্র-
জনে যা করেন তার ওপর কোনও বিচারই সে করে না।”

সেখিচে-সেখিভে একদিন দুইদিন করিয়া দশদিন
অতিবাহিত হইয়া গেল। চন্দ্রনাথের যা একটি স্ত্রীলোককে
ছোট বধূনাভাকে আনিবার জন্য প্রতাপনগর পাঠাইয়া
ছিলেন। যনপ্রভার পিতা মনোহরবাবু ভাগ্যকে বলিয়া
ছিলেন যে, “আমার নৈরকে আমি এখন সেখানে কিছুতে
পাঠাতে পারব না, বলগে। বিনা ঘোষে কেন আমার
বৈরকে শশিশেখরের যা ও লাগা যৎপরোনাস্তি বরণ্য দেখ,
তার একটা প্রতিকার শেষর না করলে আমি সেখানে
পাঠাব না—এই আমার শেষ কথা।”

স্ত্রীলোকটি আসিয়া গৃহস্থিকে ও চন্দ্রনাথের পুত্র
মহাশয়কে মনোহর বাবুর কথা সাপড়ারে বিবৃত করিল।
তিনিয়া উগ্গরা যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অসমানিত বোধ
করিলেন। চন্দ্রনাথ শশিশেখরকে এসংবাদ জ্ঞাপন করিলে
শশিশেখরও তাহার বসন্তমহাপ্রবৃত্তির প্রতি বড়ই বিরক্ত
হইল এবং যনপ্রভাকে আনিবার জন্য যন প্রতাপনগর
গমন করিল।

(৬)

প্রাতঃকালেই ট্রেন হইতে নামিয়া শশিশেখর বস্ত্রালয়ে
আসিয়া পৌঁছিল। বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই
শেখর বেধিল যে, যনপ্রভা তাহার কনিত ভাইটার নিমিত্ত
ঘরের দাড়া হইতে এক হস্তে একটা ক্ষুদ্র পেরারা
গাছের একটা শাখা ধরিয়া টানিয়া, অপর হস্তে বস্ত্র-
খণ্ডাভূত করেকটি পেরারা পাড়িয়া পার্শ্ব দ্রাভার হস্তে
প্রদান করিতেছে। যনপ্রভা সল্লা শশিশেখরকে বেধিয়া
একটুখানি বেন বস্ত্রমত বাইরা, নিজেই সাব্লাইয়া
সইয়া শেখরের বসিবার জন্য একখানি আসন আনিয়া
দিল; এবং তাঁহার দ্বারা ও বাটাই মকলের কুশলাদি
সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন করিয়া, পানপ্রসঙ্গানার্থে একটা
গুলপূর্ণ ভূসার আনিয়া দাবার রন্ধা করিল। ইতো-
যন্তে যনপ্রভার দ্রাভা অমিহ হস্ত পেরারা দাবার রাখিয়া
উর্ধ্বাঙ্গে ছুটয়া উপরে গিয়া, দাবার মাতাপিতা ছিলেন তথায়
শশিশেখরের আগমন-বার্তা পেল করিয়া দিল। আনাতার
আগমন তিনিয়া তাঁহাদের আর বৃত্তিতে বাকি রহিল না
যে, শেখর যনপ্রভাকে সইয়া বাইতে আসিয়াছে। কিন্তু

ভাগ্যকে না পাঠানর পক্ষে যেহু উত্তাবন করিতেও তাঁহাদের
ক্ষমতা বিলম্ব হইল না। শশিশেখরের বস্ত্রাভূষণ
তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোলের ছেদেটিকে সইয়া যোগদাবার
শরম করিলেন। মনোহরবাবু পার্শ্ব বসিয়া রহিলেন,—
যেন রোগীদের তত্ত্বাবধানরূপ।

এদিকে শশিশেখর যনপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বলি,
মাংনের যা যে দিন নিতে এলেন, সে দিন যাওয়া হয়
নি কেন?”

“কেন, আমি ত তার পরদিনই তোমাকে পত্র দিইছি,
সে পত্র কি পাওনি? আমি কি কন্থ বল। এতদূর
যে বাবা করবেন, তা আমি ভাবতে পারি নাই। তার পর,
আমি বাগেকে বললাম—জায়া, আমাকে পাঠিয়ে দেন,
আমি যাব। অনেক দিন আপনামিগকে যেখি নাই হ’লে
আমি এখানে আগবার জন্তই অল্পবৃত্তি বস্ত্রাই ওরূপ কথা
বলেশিলাম; নচেৎ সেখানে আমার কোন কষ্টই প্রকৃত পক্ষে
নাই।” তাতেও বাবা কিছুতেই পাঠাতে সন্নিহন নাই।
যেগে আবারে মাংমুর্জি! তখন আমি যে কল্পন ভাসার
বাব জলে সূত্রী’ অবতার পড়লাম, তা আমার অন্তরাআই
জানেন। তাইতেই আমি তোমার বিশেষ ক’রে আসতে
লিখেছিলাম। সে পত্র কি পাও নাই?”

“হঁ। পেয়েছি। আর বাড়ী হ’তে দাবার পত্রও পেয়েছি;
এবং সেই জন্তই তোমার শেষ কথা নিতে এলাম। তুমি
আমার সঙ্গে যাবে কি না।”

“নিশ্চয় যাব। তোমার সঙ্গে যাব না ত আমি কোথায়
থাকব? যে দিন হ’তে মাংনের যা ফিরে গেছে, সেই দিন
হ’তে যে আমি কি মন: কষ্টই কাটাছি, তা আমার
একমাত্র অন্তরাআই জানেন।”

শশিশেখর তখন একবার শতর-বস্ত্রদের সহিত বেগা
করিতে গেল। প্রথম আশীর্বাদ ও কুশল প্রদানর পর
শশিশেখর যীর আগমন কারণ ব্যক্ত করিল এবং তাহার
সহিত যনপ্রভাকে সেই দিনই পাঠাইতে অহরোধ
করিল। মনোহর বাবু প্রথমত: পত্নীর গীর্জা খোকার
গীর্জা ইত্যাদি হেহু বেগাইয়া যনপ্রভার সেদিন বস্ত্রালয়
যাত্রার অলম্ববতা ও অযৌক্তিকতা প্রতীপন করিতে
চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু শশিশেখরের তখন মনে
বিরক্তির আশ্রয় জলিতছিল। উত্তর পক্ষে অনেক

বাধাহীন হইল। মনোহরবাবুর কড়া চইরা এত লাহিনা ভোগ, বিভিন্ন ভাত ইঁপা—এমন তার কপালে লেখা না থাকার কথা মনোহর বাবুর পত্নী জামাতাকে বেশ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন না। তখন শেখর ভিজ্ঞান কবিল যে, তারা হইলে সমস্তি উভয়ই কি করিতে বলেন। তাহাতে মনোহর বাবু উত্তর দিলেন, বাহাতে আর কেউ কোন কথা উত্তর করিতে না বলিতে পারে, এক্ষণ কোন প্রতিবিধান করা—এক সেটা শিশু-শেখরের পুঙ্খ হইয়া থাক। তিন অর কিছুই নয়—সেইরূপ অভ্যাসও শরীর বস্ত্র প্রদান করিলেন। শিশুশেখর বলিল, “আপনারা শুভকর যা ইচ্ছা বলিতে পারেন। কিন্তু আমার জীবন থাকতে আমি ইচ্ছাও নিষেধ না-ভাট্টএর সঙ্গে পুঙ্খ হয়ে থাকতে পারব না। এতে আপনারা আপনারদের মেরে পাঠান আর না পাঠান।”

“আজ্ঞা, বেশ তবে তুমি যাও, আমি পাঠাব না।”

“বেশ,” বলিয়া শিশুশেখর ছীচে নামিয়া আসিল। মিড়িতে গাড়িইয়া যনপ্রভা তৎগত হাতা দিতা স্মারি কথোপকথন শুনিয়াছিল। এক্ষণে শিশুশেখর যনপ্রভাকে তববহাষ দেখিয়া বলিলেন, “আমি তবে চললাম—এই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা আসবে। তুমিও এখন তোমার যাবাপের কথা একাইতে পারবে না? তুমি থাক তবে—আমি যাই।” আর যদি পার আমার সঙ্গে চল—বাইরে গাড়ী গাড়িয়ে আছে। আমি আর কখনও অপেক্ষা করতে পারি না—এই শেষ সাক্ষাৎ।” বলিয়া দ্রুত-পদে শিশুশেখর বাটার বাহির হইল। তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাশয় দ্বারদেশে তববহাষ শেখরকে দেখিয়া এবং ইতঃপূর্বেই তাহার এক কস্তার মূখে সমস্ত শুনিয়া শেখরকে নিজের হাটীতে লইয়া গেলেন এবং কিছু খাবার না খাওয়াইয়া কিছুতেই বাইতে দিলেন না।

যখন শিশুশেখর গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে বাট-তলা ট্রেনে বাইবার অহমতি দিল, তখন রাস্তার দিকের দিকের লোকেরা হইতে একটি বালিকা বলিতেছে—“কোচম্যান কোচম্যান, গাড়ীও, গাড়ী হাঁকিও না—বিধি থাকে গাড়ীও।”

শেখর দেখিল—জানালার পার্শ্বে বসিয়া যনপ্রভা ক্রন্দন

করিতেছে “না, আমার! তুমি থাকলে কি আজ উনি আমার এমনি ক’রে দেখে যেতে পারতেন”—

করা শুনিয়া শেখর গাড়ী হইতে বৃথ বাড়াইয়া পুনরায় যনপ্রভাকে আহ্বান করিল। যনপ্রভা ভর হয়েই বলিল, “তুমি ইচ্ছা করেই অপেক্ষা কর—বাবা ডাক্তার-খানা গেলেই আমি যাব।”

কিন্তু শেখরও উত্তেজনা বশতঃই হোক কিংবা যনপ্রভার জড়িতোচ্ছারিত বাক্যকথন প্রবৃত্তিই হোক, তিনি বিশ্রীত অর্থাৎ যে তিনিই যেন বলিতেছে “বাবা ডাক্তার-খানার গেলে—এলেই যাব।”

এইরূপ অস্থান বশতঃ যনপ্রভার উপর বিরক্ত চটয়া শিশুশেখর কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। গাড়ী ট্রেন অভিমুখে চলিল।

(৮)

ট্রেনে পৌঁছিয়া শেখর তিনি যে ট্রেন আসিতে তখনও তিন ঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে—কারণ একটা পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ওরোটা রুমে একখানা ইন্ডি টোয়ার টানিয়া শেখর ভুটরা পড়িল এবং অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ শীঘ্রই তন্দ্রাভিকূত হইয়া পড়িল।

সে স্বপ্নে দেখিল যেন যনপ্রভা তাহার জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের সহায়তার হেতুে গিয়া শিশুশেখরের সেকা পাইয়াছে। কিন্তু শিশুশেখর বলিল, ‘না, আর আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না। ও অহরোধ আর আমার ক’রো না ঘন। নাও, তুমি, তোমার বাপের আদরে বেশ থাকবে, যাও।’

যনপ্রভা কাতরভাবে শিশুশেখরের পাদদুলে মাথা রাখিয়া বলিল—‘তোমার পাশে আমার স্থান চাই না—আমার যে চিরদিনকার কেনা স্থান ঐ চরণে দেখান হ’তে যে আমাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও নড়াতে পারবে না। তা ত তুমি জান—ও যে আমার কত অল্প জন্মাত্তের সাধনায় কলে লাভ করেছি—আবার যেন জন্মাত্তের ঐ ধানেই স্থান দিও।’

যনপ্রভার বেহলতা শিশুশেখরের পদমূলেই নিম্নলিখিতভাবে পড়িয়া গিয়াছিল। দেখিয়া নিকটবর্তী একটি রথশী দ্রুত আসিয়া যনপ্রভাকে পাশে ফিরাইয়া হাত ধরিয়া তুলিতে গিয়া দেখিল তাহার দেহ-পিঙ্গল হইতে প্রাণ বাহির

হইয়া গিয়াছে। শশিপেথর নিম্পলক নেত্রে সে বৃদ্ধ সেখিতছে।

হঠাৎ কি একটা শব্দে তারার বস্ত্র ডাঙিয়া গেল; সে তখন চক্ৰ চাহিয়া দেখিল, তারার বস্ত্র মিথ্যা নয়— বনপ্রভা তারার পায়দলে।

বনপ্রভার সঙ্গে আগত গ্রীলোকটী “প্রাণাই বাবু! এই পত্রখানা দেখুন” বলিয়া একখানি পত্র শশিপেথরের হাতে দিয়া বলিল “এখানি বড়বাবু আপনাকে দিয়াছেন। দিদিমণির কাজা বেধে, আর কি কির থাকতে পারেন? আপনিও চ’লে এলেন, তার পরেই বাবু ডাক্তারখানায় গেলেন। তখনই দিদিমণি বেহিমে এসে আপনার গাড়ী বা আপনারকে না দেখতে পেয়ে সকলকেই বলল আপনার কাছে বিয়ে আসতে। বাবু তরে বধন কেউ আসতে রহিল না। তখন দিদিমণি নদীর তলে ঝাঁপ দিতে গেলেন। বাটে বড়বাবু হান করে আসছিলেন। তিনি ঐ কাণ্ড দেখে ঠেকে নিব্বের বাড়ীতে ডেকে আনলেন। এনে গাড়ী পাখী খুঁজতে পাঠালেন। তা এই গা-খানি খুঁজে একখানা গাড়ী কি পাখী মিলল না। অবশেষে আমি এ সাতাইসু দিদিমণিকে হাঁটিয়েই নিয়ে এলাম।”

শশিপেথর তখন তাকাতাকি বনপ্রভাকে বসিবার ঘরে লইয়া গেল এবং অপরূপেই টেন আসিলে উত্তরে গাড়ীর একটি নির্জন কাছা দেখিয়া উঠিয়া পড়িল।

গাড়ী ছাড়িয়া মিলে শশিপেথর বিজ্ঞাপা করিল “যদি এখানে আমার না পেতে, তা হ’লে কি কর্তে? আবার কিরে যেতে ত?”

“হঁ, তা যেতাম। কিন্তু বাড়ীতে নয়, যেখানে গেলে মাহুপ আর কেঁরেনা, দেখানোই যেতুম।”

“হিঃ! এমন কথা ভাবতেও নেই। কিন্তু, তারি আকর্ষণ বাপার,—বস্ত্র যে এমন করে সকল হয়, তা আমি কখনও শুনি নাই, দেখিও নাই।”

বনপ্রভা আশ্চর্যতরে করিল, “বস্ত্র?—সে আবার কি? তুমি কখন বস্ত্র দেখলে।”

শশিপেথর বলিল, “আমি ক্রান্ত হয়ে ঠেগনের চোরের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় বস্ত্র দেখলাম যে, তুমি এনে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলছ ‘আমি ত তোমার সঙ্গে আসতেই চেয়েছিলাম। অল্প একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। তুমি তা না শুনে চলে এলে।’ এই কথার পরেই হঠাৎ আমার বস্ত্র ভেঙ্গে গেল; আমি চেয়ে দেখি তুমি আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছ। এ জতি আকর্ষণ। বস্ত্র যে এমন করে যায়, এ জ্ঞার দেখিনি।”

বনপ্রভা শশিপেথরের পদগুলি ধরল করিয়া বলিল, “আমার নারীজ্ঞান সকল কথার অন্তই তোমার বস্ত্র সকল হয়ে গেল।”

“কৈশোর-বৃন্দাবন”

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

বধু বৃন্দাবন বহুত আশ্রম নন্দ্যালের সঙ্গীতে;
সারা বিব-প্রাণের বস্ত্র বাজে মিলন-প্লবের তরীতে।
যাতাল বাবু বইছে বেগে,
গোনার স্বপন-বাসর ধোলে,
আছে নাথের দিলন-পঙ্খ চাহি’ ব্রহ্মের বসন্ত বিনীতি;
হবে বিব-প্রাণ বহু-বিহার বহু-অঙ্গে বিনীতি।

ওই চক্ৰ-তরুর অমৃত-রস উৎপলে ওঠে অধরে,
সদা ক্রামের পাগল বংশী বাজে, লক্ষ্য কে আশ্রম নগরে।
নীল বদনা খাইলো উল্লাস,
গাইছে স্রাব্য বন্দনা-গান,
যাতে কৃষ্ণ কমল-অঙ্গ পরে রক্ত-বস্ত্রে সুধনে;
প্রোমে ব্রহ্মের সারা অন্তর আঁধি পড়ছে হুটে মূলধনে।

ওরে যদিগীষের রঙ্গরসে রঙ্গরাজের বোললীলা ;
এই বর্ণ প্রাচীন-রঙ্গলে আঁধা আঁধা রে মন-প্রাণ মিলা ।
তমাণ-বনের কুন্দ-ফাঁকে,
আঁহুল হ'ল কোকিল ডাকে,
আয় কুহুম-কাগ-রঙীন-ঘোরে রঞ্জিতে মন-মনিরে ;
হোল ঘোহন-বাঁধীর রক্ত-হাথে সকল শূর আঁধা বন্ধি রে ।

আমি কালিনী প্রাণ আনন্দে চোর ছন্দে কোটী বন্দনে,
মধু গন্ধবহের অন্ধ ভরা মন্বনের চন্দনে ।
ব্রহ্মের মারী কুন্ত কাণে,
চন্দ্রে সারি গণের বাক্যে,
তার। ভক্তচুদি করতে সোনা স্পর্শমণির গুণ করে ;
সারা ইন্দ্রিয় তার অন্ধ আমি খুঁজতে ভ্রামহু করে ।
এল মত্ত শান্ত মিলন-গানে বিরহী-প্রাণ অর্জুনে,
নীল কাশ্মিনীর কয়ে ধারা অধরে ঘোর সর্জরে ।
পিয়াটী আজ আঁহুল প্রাণে,

চিত্ত উগাও বধূর পানে,
বন কুন্দমাকে খুঁজি বোলায় হুগুছে হোড়িল অস্তর ;
আমি কিরণীয়া গান ধোরে আর মন-স্তরীতে মত্তর ।
শত পূর্ণিমা হাত আঁহুল হ'লে কুইলো দুখন মন্দিরা ;
ওঠে রসের লচর উগলে গোপের অঙ্গন-প্রাণ-মন-দিরা ।
অপরসে আর গন্ধে পানে
মত্ত মধুর প্রেম তুকানে,
হোল চিত্তহারা পাগল রাধা কুন্ড-প্রাণ-মন্দিতে ;
দেহ আঁধা আমি অর্থা চাহে প্রাণ-কানারে বন্দিতে ।
প্রাণ কাহ্ন দিল চুপ, শিথিল ইন্দ্রিয়েরি বন্ধন,
গেল অঙ্গে প্রতি অঙ্গ 'মিশি' মর্তী হোল মন্বন ।
আঁধির ওটা দৃষ্টি দিয়া,
মগ হুই বৃগল দিয়া,
আমি বধুর মধুর বাঁধি বাধে কৃপাবানন্দী গো ;
হোল বিব-প্রাণানন্দ-রাধা রক্ত-প্রাণে বন্ধী গো ।

আলোচনা

[শ্রীবীহেন্দ্রনাথ ঘোষ]

চারি বৎসরব্যাপী যুগোপী বহাধুদে বসুদেবের গ্রন্থোৎসাহী জীব্যাদির
একটি অগণ্য বহিরাছে যে, অতির-তথ্যবাহুত এই সকল গ্রন্থের মধ্যে
অন্যতম বহিরাছে আশা করা যে বাইতবে । দুই চালাইবার ভর্যে
সকল গ্রন্থ হুদ-বলে সঙ্গুতীত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু সৈতম
এক- দুইয়ের কার্যে বিতুল অল্প লোক-বনের বাহ্যবাহে আসিলেও,
অনেক গ্রন্থের তপ্প অগণ্য বহিরাছে । এই চারি বৎসরে হুদে বিতুল
উভয় পক্ষকেই কোন সময়ে অগ্রসর এবং কোন সময়ে বা পশ্চাৎপদ
হইতে হইয়াছে । এইরূপ পশ্চাৎপদবর্তনের সময়, বা অগ্রবর্তন হই
হাড়া। চণিরা আদিবার সময়, হুদ সন্ধান বা রসপাণি পাছে পশ্চ-
হুদবর্ত হই। তাহারের-কার্যে সন্তে, এই আশঙ্কা, এই সকলগ্রন্থ লইয়া
আদিবার সুবিধা না থাকিলে, বহুতে কালে করিয়া আদিত হই ।
উভয় পক্ষকেই বার-বার এই ভাবে পশ্চাৎপদবর্তন করিতে হওয়াছে,
অনেক িমিস নষ্ট করিতে হইয়াছে । আবার অগ্রবর্তনের পূর্বে
পোষ্যবর্তনের কালে অনেক বহু সৈতমবর্তনের কারণ না লাগিয়া নষ্ট হইয়া
থায় । এবারকার হুদে আবার আরও একটি কারণে অনেক িমিস
নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; যখন, " আশ্রয়নের কালে অনেক সালবাহী
সালবাহী দুবিয়া বাওয়ার, অর্থাৎ " অগণ্য বহিরাছে । বহুতঃ

সামুদ্রের গ্রন্থোৎসাহী সব িমিসেই যে পুঁথিবীব্যাপী একটা অব্যাহত
বহিবে, তাহা বিচিত্র বহু ; এবং একত পক্ষে বহিরাছেও তাহাই ।

কিছু অল্পত িমিসের অগণ্য, বাধ্য ব্রবাই সামুদ্রের সর্বাগ্র
গ্রন্থোৎসাহী বহু । পুঁথিবীব্যাপী বাধ্যবর্তন বহিবে, হুদে বহু লোক
বহিরাছে, তাহার উপর আরও বহু লোক যে বাধ্যবর্তন বহিবে পায়ে,
তাহা বলা যায় না । এই বাধ্যবর্তনের আশঙ্কা অনেক িমিস পূর্ন হইতেই
অগ্রবর্ত হইতেছিল । সেই বহু িমিসপক্ষী বাধ্যবর্তন বহিরাছে এই
বাধ্যবর্তন বহু করিবার উপায় বহুতবে একত হইয়াছিলে । হুদে
পূর্ন হইলেও, ওয়া, ইটাইটেট িমিসে বহু বলা বা পশ্চাৎবর্ত
উৎসাহ হইত, একবে চাষের জমী বাড়াইয়া, বহুত অব্যাহত িমিস
আবাহ করিয়া, তাহার পরিবাহ অনেকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ।
অল্প িমিসে, অগণ্য পরিবাহ করিয়া, বেশের বহুত বাধ্যবর্ত পরিবাহ
হির করিয়া এবং আশ্রয়নী-রপাণীর একটা আশ্রয়নিক হিসাবে হির
করিয়া, বাধ্যবর্তনের বাধ্যবর্ত িমিসিত ও বহুত করা হইয়াছে । এ
িমিসে, আশ্রয়নের িমিসিত পশ্চাৎপদ চাষের জমি বাড়াইয়া বাধ্য-
বর্তন উৎসাহবর্তন বহু িমিসে ওয়া আরও হইয়াছে । এই ওয়া

উন্নতির সম্ভাবনা যেনা হাইতেছে না। যদ্য বর্ষাঋতু তেঁৱর বলে,
বীৰভূমি ও বঁকুড়া জেলায় কয়েক শত একর বাজ কৃষিতে চীনা
বাগানের চাষ প্রবর্তিত হইতাহে।

তেঁতার ত কোন দিকে কোন ঝটাই হইতেছে না। কিন্তু এই চোঁটা
 কত দিনে কলকাতা হইবে, তাহার কোনই স্থিতি নাই। এদিকে
 হীতৈশ্বৰ্য্যেই অম্বা এমন পোকাবীর হওয়া উচিত যে, শ্রম হইয়া
 ঐকচিত্ত না হইলে, অশ্রু-তব্ৰিতের অম্বা কাৰিগা শিৱিৱা উঠিছে
 য়ে। হুঁজ অকলস যাহা হইবার, ভালত হইয়াছে। তাহার উপর
 মধ্যাৰণতে বেশীতৰ্জি, এবাৰ ভারতের গুৰু সৰুল গ্ৰন্থেই অম্ব-মজ
 বন্দল অশেকা বাজ-কত কয় গড়িয়েছে। দকৰণে হাবিববন্দে
 চটীসের মণ হইতে ১০ টোকা ঠাঁইতায়ছে। ভৱসার মতো রেবুণের
 গাটল। হুঁজ কণ্ঠে পোৰা বনাণৰ রেবুণের বাহার পরিচয়ন করিয়া
 আনিয়াছেন। তনিতৈজি, তিনি সোণায়ে একরকম ব্যাধা করিয়া
 আনিয়াছেন। আর হুঁজ একটা গ্ৰন্থে ভৱণ করা হইলেই, সত্ৰবত:
 তিনি বাজ-অধ্যায়িৰ মূল্য বিধেয়। আমতা সেই আশার ই
 করিয়া বসিৱা তৱিৱিৱি।

বাস-হই-তিন্, কি বড় জোর চাণ্ডি বাস পূর্বেও বসন্তাধ্বনি
 আশোনির অতি প্রবল ভাবে চলিতেছিল; আর কিয় সখ চুপচাপ।
 বাসনা; বসন্তাধ্বনি কি বৃহৎ হইয়াছে? না,- বহু নাই। কাণ্ডের
 বাস কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বৃহৎ বেশীই আছে। পূর্বে
 পূর্বে কাণ্ডের বাস যখন ছিল, তখন আরও হইবার পর তাহা বাড়িত
 বাড়িত তখনও কি চাণ্ডিও বাড়িয়াছিল; এখন কিছু কমিয়াছে
 বটে, কিন্তু এখনও আর বিস্তার আছে। পূর্বে; আশোনির বহু হইবার
 কথা মনে। তবে আশোনির হঠাৎ বহু হইল কেন? ইহার কারণ
 নিতান্তই দুর্বোধ্য। কাণ্ডের বাস বাহা কিছু কমিয়াছে, তাহা যে
 বিলাত হইতে কাণ্ডও বেশী পরিমাণে আবেদানী হইতে আরও হইয়াছে
 বলিয়াই কল্পিবে, এমন কথা বলা যায় না। বৃহৎ বাসিয়াছে বটে, কিন্তু
 এখনও কমতার খাঁটা প্রতিভাত চলিতে আরম্ভ হয় নাই; মাহামের
 জগত এখনও মহিরাছে। বিশেষতঃ; বহুর এই দুলা-দ্রাব দুহু বহু
 হওয়ার ফলে ঘটে নাই। বৃহৎ বহু হইবার সংসার এতদেশ জঘাতিত
 হইবার পূর্ল হইতেই কাণ্ডের বাস কবিত্তে আরম্ভ হইয়াছিল।
 আমকের বোধ হয়, পর্যবেক্ষিত এই বাণ্যের হৃৎকণ কসাতেই এই প্রভ
 বল কমিয়াছে। এই সঙ্গে আরও বলে হইতেও, পর্যবেক্ষিত সেই
 হৃৎকণ করিবে, —এই আর কিছু দিন পূর্বে হৃৎকণ করিতেন।
 বহু।

পাথরপাথর খোঁজা, বাড়োবাড়ী বণিক-সভার পরামর্শের পর ছির
হইয়াছে, তিনমাস কাল বস্ত্র আদ্যবানী করা হইবে না, কিবা কোন
নুতন কট্টাইও করা হইবে না। যমুত বাংলার বাঘ নির্ভীকিত করিয়া
বেড়া হইয়াছে; জাহাঙ্গীর-কন-কৌরী হয়ে কের কাপড় কেনাবেচা

কিতে পারিবে না। এ আবার কি হইতে, তাহা ভাল বুলিবে না। মুখ-বিরাগের সংযোগ প্রোত্ৰিত হইবার অব্যবহিত পরে এই কাণ্ডটি ঘটাইবে। তিনবাল কাল কাণ্ডক অব্যবহী ন্য করিবার কারণ যখন প্রকাশ করা হয় নাই, তখন সবচেয়ে নিম্ন নিম্ন মনের গতি অনুসারে ইহার একটা কারণ বলিয়া করি। লইবার অনিবার্য। আশায়ের দ্বারা যেন হইতেছে, তাহাতে বিবেচনা করি, যত্ন সংঘর্ষ আত্মোৎসাহ চালাইবার এমনও ঘণ্টে প্রয়োজন ইচ্ছাযে। বিশেষতঃ, মুখ বন্ধ হইয়াছে; এইবার শির-বার্ণিকের উন্নতি লাগেব লম্বা আনিয়াছে। গর্ভবৈকট বোধ কারবারের দুখন লগ্নেই সংঘর্ষে যে সকল নির্যাস ধর্মিষা বিগ্রাহিসেন, মুখ শেষ হওয়ার, সেই সকল নির্যাস আর প্রোত্ৰিত হইয়াব সে কোন প্রোত্ৰিত বেলা ঘাইতেছে না। বোধ হয় স্মিতই গর্ভবৈকট বোধ সকল নির্যাস তুলিয়া দিবেব। আর আর মনের বোঝাই বোধ হয়, বিলাত হইতে বড় বড় কলকাতা আশ্রয়ী করিবার জন্য প্রার্থনাও পাঠয়া গাইবে। একই অবস্থায়, বিশ গণিত বা গণনা যত টাকার মূল্যবে বড়কৃত কলকাতারনা স্থাপনের পক্ষে আর বিশেষ কোন বাধা দিই থাকিবে না। আবার আভি-ভবিষ্যতে বাস্তবাসে অন্তঃ পাত্যত কাণ্ডের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাই। মুখ উপলক্ষে আশ্রয়ের এ শিখা লাভ হইয়াছে, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়। বেগুন অবস্থায় বসন্তকী মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল, বর্তমান অবস্থা তাহারপক্ষে কোন প্রসঙ্গ হীন নহে। পরন্তু, কলকাতারনা স্থাপনের পক্ষে এখনকার প্রতিস্থল অবস্থাসমূহ এখন কোন পরিমাণে অনুত্ৰিত-হইয়াছে। এমনও বার আছে বিশেষ্ট থাকি, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে আবার বাস্তবায়ন ঘটিলে, নির্যাসের বিশেষতঃ অকর্ণপাত-ভিন্ন অপর কাহাণ্ডে যে নী না বাধী করা চলিবে না।

কলকরখানার কথার আর একটা কথা যেন গড়িয়া গেল। সেদিন বি: এক, চি, আগকোঁপি ইতিহাস মিউজিয়মে বাঙ্গলার কুটীর-শিল্প লগ্নে একটা বস্তুতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের অথবা নুকাইনার লগ্ন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাঙ্গলার বাঙ্গলার বাণিজ্যের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, অন্তঃস্থ খসড়াই দেশ কয়েক বৎসরের পূর্ণ পর্য্যট, কুটীর-শিল্প বাজীত কলকারখানা বসবাসে অপরিজ্ঞাত ছিল। এদিকে বুঝায়ে কলকারখানা বাণিজ্য হইতে পারিল, সঙ্গে-সঙ্গে বসবাসের সহিত বুঝায়ে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল; অথচ, বাঙ্গলা যেনে কলকারখানা বাণিজ্য হইল না। হস্তপ্রা-কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজ হইয়া বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের অন্তঃস্থ কয়েক-কয়েক বিলুপ্ত হইল। তবে বি: আগকোঁপি কুটীর-শিল্পের লগ্নে একেবারে বাণ্য হ'ন নাই। কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও বাণিজ্য পাঠিতে গঠে, এবং কতকগুলি কুটীর-শিল্পের বাসোজো করিয়া বি: আগকোঁপি বাঙ্গলার কুটীর-শিল্প-লগ্ন-সম্বন্ধ হইয়াছে বিবৃত করেন; অথ (১) industrial arts এবং (২)

আত্মপূজা বলের যতই ইঙ্গা পড়িবে। আর ধনী ব্যাপিটালিষ্ট বুঝ হইতে কার্য করিয়া আনানের রক্তের বেটু হুৎ খাশিষ্ট আছে তাহাও যিগনেবে দেখেও করিয়া আনানিককে ওক করিয়া ফেলিবে।' একজন অধ্যাপক, শিল্প-বণিকমোর বেটু হুৎ হইয়াছে, তাহা যে বুঝাণীদানবের দ্বারা হইয়াছে, ইহা বিস্তার নহে।' নাট বাহাদুরের কথাগুলি খুব হুৎ হুৎ। অতি অল্প দিন পূর্বে পাটের সমস্ত অনেক লোকসেধি হইয়া গিয়াছে। তখন-লোক পাটের কলওলালা বুঝাণী বণিকবিশেষ উপর অনেক বোঝাঝোণ করা হইয়াছে যে, তাহারা চৌধুরীকে অস্ত্রায় কন্যার দ্বারা পাট কিনিয়া বুঝাণে খুব বেশী দামে পাটের দরিদ্র বিক্রয় করিয়া, অত্যধিক লাভ করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি তাহাদের অপরাধ? ষ্ট্রিক এইজন্য অবস্থায় আনান্য কি ষ্ট্রিক এইজন্য আচরণই করিতাম না? তখন কি সেটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত? না, সমস্ত ব্যক্তিকে কন্যার দ্বারা কিনিস কি-নিয়া বাহাদুরের বাহাদুরে চড়া দামে বিক্রয় করা বাহাদুরের মূল্যকে বসিয়া, বিক্রয়ের প্রদোষ বিচার? পাট আনানের বেগের বিষয় জিনিস। বুঝাণীদেয়া লাভ লভ্য তের নবী পার হইয়া এবেশে আনিয়া বহুদূর কল-কজা আনাইয়া এখানে দরিদ্র প্রস্তুত করিয়া দরিদ্র প্রসঙ্গ। দারুণ কঠোর তাহা হইলেই তাহারা অপরাধী। আর আনান্য নিজেই হইয়া দরিদ্রা থাকিয়া বলিতে থাকিবে, বুঝাণী বণিকেরা আনানের বিল ও আনানের বেড়া লইয়া আনানেরই হাতের বেড়া জালিয়া খুঁ বেটু লাভ করিতেছেন, ইহা তাহাদের বড় অজ্ঞ হ। এ বেগের তাহার বেশী পাট উৎপন্ন করে; তাই পাট সম্ভা। পাট বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহারা অস্ত্রের সংগ্রহ করিতে পারে না— তাহানিককে বাধ্য হইয়া পাট বিক্রয় করিতেই হইবে—যে দাম দিয়া তাহাদের তাহাদের দাম একেবারেই চলিবে না—তাই পাট সম্ভা। তাহারা এত বেশী পাট অস্ত্রায় কেন, বাহাতে পাটের দাম এত কমিয়া যায়? তাহারা দাম দরিদ্রা রাখিয়া বেশী দাম আবার করিয়া লয় না কেন? ইহা অস্ত্র বুঝাণীর বণিকবিশেষের অপরাধ নয়। তাহাদের পর, তাহারা বেশী দাম দিয়া পাটলাভ ত্রয় বিক্রয় করেন বলিয়াই চাহানিককে পাটের মূল্য বেশী দাম দিবে কেন? ইহা দাম হইতে পারে, দাম-বর্ধের পরিচালক হইতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের নীতি কখনই নয়। বুঝাণীদেয়া এ বেগে বান্ধিয়া করিতে আনিয়াছেন, দাম-লভ্য করিতে আসেন নাই। তাহা তাহারা করিবে কেন? সে মূল্য তাহানিককে কোন প্রকার অপরাধী করা চলে না।

নাট বাহাদুরের দুইখ বক্তব্য বহুবেশ ও তাহাদের শিল্প-বান্ধিয়া সমস্ত অনেক প্রকারের তাহাদের সমস্ত পাটের দাম। আনানের উপাধীক সমস্ত এবেশে অনেক কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে; হুৎ উপলক্ষে সেই সকল কলকারখানার কাণ্ড বেশ ভালরূপ চলিতেছে। পাট ও চালের কল পূর্বেই উন্মিষ্ট হইয়াছে। তাহা লব্ধ হুৎের পূর্ববর্তী বিষয়। হুৎ উপলক্ষে এই দুইটা বিনিয় আনন অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন ও রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দ্বিগুণ তিনগুণ পাটের কল উন্মিষ্ট হইবে। ১৯১০-১১-১২-১৩-১৪-১৫-১৬-১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০-১০০১-১০০২-১০০৩-১০০৪-১০০৫-১০০৬-১০০৭-১০০৮-১০০৯-১০১০-১০১১-১০১২-১০১৩-১০১৪-১০১৫-১০১৬-১০১৭-১০১৮-১০১৯-১০২০-১০২১-১০২২-১০২৩-১০২৪-১০২৫-১০২৬-১০২৭-১০২৮-১০২৯-১০৩০-১০৩১-১০৩২-১০৩৩-১০৩৪-১০৩৫-১০৩৬-১০৩৭-১০৩৮-১০৩৯-১০৪০-১০৪১-১০৪২-১০৪৩-১০৪৪-১০৪৫-১০৪৬-১০৪৭-১০৪৮-১০৪৯-১০৫০-১০৫১-১০৫২-১০৫৩-১০৫৪-১০৫৫-১০৫৬-১০৫৭-১০৫৮-১০৫৯-১০৬০-১০৬১-১০৬২-১০৬৩-১০৬৪-১০৬৫-১০৬৬-১০৬৭-১০৬৮-১০৬৯-১০৭০-১০৭১-১০৭২-১০৭৩-১০৭৪-১০৭৫-১০৭৬-১০৭৭-১০৭৮-১০৭৯-১০৮০-১০৮১-১০৮২-১০৮৩-১০৮৪-১০৮৫-১০৮৬-১০৮৭-১০৮৮-১০৮৯-১০৯০-১০৯১-১০৯২-১০৯৩-১০৯৪-১০৯৫-১০৯৬-১০৯৭-১০৯৮-১০৯৯-১১০০-১১০১-১১০২-১১০৩-১১০৪-১১০৫-১১০৬-১১০৭-১১০৮-১১০৯-১১১০-১১১১-১১১২-১১১৩-১১১৪-১১১৫-১১১৬-১১১৭-১১১৮-১১১৯-১১২০-১১২১-১১২২-১১২৩-১১২৪-১১২৫-১১২৬-১১২৭-১১২৮-১১২৯-১১৩০-১১৩১-১১৩২-১১৩৩-১১৩৪-১১৩৫-১১৩৬-১১৩৭-১১৩৮-১১৩৯-১১৪০-১১৪১-১১৪২-১১৪৩-১১৪৪-১১৪৫-১১৪৬-১১৪৭-১১৪৮-১১৪৯-১১৫০-১১৫১-১১৫২-১১৫৩-১১৫৪-১১৫৫-১১৫৬-১১৫৭-১১৫৮-১১৫৯-১১৬০-১১৬১-১১৬২-১১৬৩-১১৬৪-১১৬৫-১১৬৬-১১৬৭-১১৬৮-১১৬৯-১১৭০-১১৭১-১১৭২-১১৭৩-১১৭৪-১১৭৫-১১৭৬-১১৭৭-১১৭৮-১১৭৯-১১৮০-১১৮১-১১৮২-১১৮৩-১১৮৪-১১৮৫-১১৮৬-১১৮৭-১১৮৮-১১৮৯-১১৯০-১১৯১-১১৯২-১১৯৩-১১৯৪-১১৯৫-১১৯৬-১১৯৭-১১৯৮-১১৯৯-১২০০-১২০১-১২০২-১২০৩-১২০৪-১২০৫-১২০৬-১২০৭-১২০৮-১২০৯-১২১০-১২১১-১২১২-১২১৩-১২১৪-১২১৫-১২১৬-১২১৭-১২১৮-১২১৯-১২২০-১২২১-১২২২-১২২৩-১২২৪-১২২৫-১২২৬-১২২৭-১২২৮-১২২৯-১২৩০-১২৩১-১২৩২-১২৩৩-১২৩৪-১২৩৫-১২৩৬-১২৩৭-১২৩৮-১২৩৯-১২৪০-১২৪১-১২৪২-১২৪৩-১২৪৪-১২৪৫-১২৪৬-১২৪৭-১২৪৮-১২৪৯-১২৫০-১২৫১-১২৫২-১২৫৩-১২৫৪-১২৫৫-১২৫৬-১২৫৭-১২৫৮-১২৫৯-১২৬০-১২৬১-১২৬২-১২৬৩-১২৬৪-১২৬৫-১২৬৬-১২৬৭-১২৬৮-১২৬৯-১২৭০-১২৭১-১২৭২-১২৭৩-১২৭৪-১২৭৫-১২৭৬-১২৭৭-১২৭৮-১২৭৯-১২৮০-১২৮১-১২৮২-১২৮৩-১২৮৪-১২৮৫-১২৮৬-১২৮৭-১২৮৮-১২৮৯-১২৯০-১২৯১-১২৯২-১২৯৩-১২৯৪-১২৯৫-১২৯৬-১২৯৭-১২৯৮-১২৯৯-১৩০০-১৩০১-১৩০২-১৩০৩-১৩০৪-১৩০৫-১৩০৬-১৩০৭-১৩০৮-১৩০৯-১৩১০-১৩১১-১৩১২-১৩১৩-১৩১৪-১৩১৫-১৩১৬-১৩১৭-১৩১৮-১৩১৯-১৩২০-১৩২১-১৩২২-১৩২৩-১৩২৪-১৩২৫-১৩২৬-১৩২৭-১৩২৮-১৩২৯-১৩৩০-১৩৩১-১৩৩২-১৩৩৩-১৩৩৪-১৩৩৫-১৩৩৬-১৩৩৭-১৩৩৮-১৩৩৯-১৩৪০-১৩৪১-১৩৪২-১৩৪৩-১৩৪৪-১৩৪৫-১৩৪৬-১৩৪৭-১৩৪৮-১৩৪৯-১৩৫০-১৩৫১-১৩৫২-১৩৫৩-১৩৫৪-১৩৫৫-১৩৫৬-১৩৫৭-১৩৫৮-১৩৫৯-১৩৬০-১৩৬১-১৩৬২-১৩৬৩-১৩৬৪-১৩৬৫-১৩৬৬-১৩৬৭-১৩৬৮-১৩৬৯-১৩৭০-১৩৭১-১৩৭২-১৩৭৩-১৩৭৪-১৩৭৫-১৩৭৬-১৩৭৭-১৩৭৮-১৩৭৯-১৩৮০-১৩৮১-১৩৮২-১৩৮৩-১৩৮৪-১৩৮৫-১৩৮৬-১৩৮৭-১৩৮৮-১৩৮৯-১৩৯০-১৩৯১-১৩৯২-১৩৯৩-১৩৯৪-১৩৯৫-১৩৯৬-১৩৯৭-১৩৯৮-১৩৯৯-১৪০০-১৪০১-১৪০২-১৪০৩-১৪০৪-১৪০৫-১৪০৬-১৪০৭-১৪০৮-১৪০৯-১৪১০-১৪১১-১৪১২-১৪১৩-১৪১৪-১৪১৫-১৪১৬-১৪১৭-১৪১৮-১৪১৯-১৪২০-১৪২১-১৪২২-১৪২৩-১৪২৪-১৪২৫-১৪২৬-১৪২৭-১৪২৮-১৪২৯-১৪৩০-১৪৩১-১৪৩২-১৪৩৩-১৪৩৪-১৪৩৫-১৪৩৬-১৪৩৭-১৪৩৮-১৪৩৯-১৪৪০-১৪৪১-১৪৪২-১৪৪৩-১৪৪৪-১৪৪৫-১৪৪৬-১৪৪৭-১৪৪৮-১৪৪৯-১৪৫০-১৪৫১-১৪৫২-১৪৫৩-১৪৫৪-১৪৫৫-১৪৫৬-১৪৫৭-১৪৫৮-১৪৫৯-১৪৬০-১৪৬১-১৪৬২-১৪৬৩-১৪৬৪-১৪৬৫-১৪৬৬-১৪৬৭-১৪৬৮-১৪৬৯-১৪৭০-১৪৭১-১৪৭২-১৪৭৩-১৪৭৪-১৪৭৫-১৪৭৬

শোক-সংবাদ

এ দ্বায়ে আশাশ্রমকে আরও একটি শোকের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতে হইল। "ভারতবর্ষের" অন্ততম দেবক, প্রেসিডেন্সী কলেজের কোষাগার চুণীলাল মিত্র মহাশয় গত ২২শে অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যাকালে কলকাতা রোগে লোকাবস্থিত হইয়াছেন। "ভারতবর্ষের" জাহাজ কর্তৃক সঞ্চিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ আভ্যন্তরীণ বিষয়, প্রায় এক কি দেড় বৎসর পূর্বে তিনি

একখানি উপভাস লিখিয়া আশাশ্রমকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে ভাবে শেখ রাজিতে একটি পরিবারের কলহা রোগে আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও প্রায় ঠিক সেই ভাবে রোগাক্রান্ত হন। ইহা কি presentiment? আমরা শুনিলাম, চুণীলাল সবে জাহাজ পরীও এই কাল রোগে আক্রান্ত হন। এখনও তিনি জীবিতা আছেন; পরে কি হয় বলা যায় না।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী শৈলবালা গোস্বামী প্রণীত নূতন উপভাস "নন্দিতা" প্রকাশিত হইল: মূল্য ২ টাকা।

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ প্রণীত "পলী সংখ্যার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২ টাকা।

শ্রীমতী সম্পাদক শ্রীমতী বনিন্দা বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত ১- আনা সংস্করণের ৩০ সংখ্যক পুস্তক "ব্রহ্মসিঁ" প্রকাশিত হইল।

শ্রীমতী বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বনিন্দা" বাহির হইয়াছে। মূল্য ১০ পিকা মাত্র।

ডায় বিবেচনার অন্তিমীত শ্রীমতী বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বায়বিক-অভিমান" প্রকাশিত হইয়াছে: মূল্য ১ টাকা।

শ্রীমতী বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বায়বিক-অভিমান" বাহির হইল। মূল্য ১০ পিকা মাত্র।

শ্রীমতী বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ডিউপলিট উপভাস "বসন্তোপাধ্যায়" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা।

শ্রীমতী বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বসন্তোপাধ্যায়" বাহির হইল। মূল্য ১০ আনা।

বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বসন্তোপাধ্যায়" প্রকাশিত হইয়াছে: মূল্য ১ টাকা।

বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বসন্তোপাধ্যায়" প্রকাশিত হইয়াছে: মূল্য ১ টাকা।

শ্রীমতী বসন্তোপাধ্যায় প্রণীত "বসন্তোপাধ্যায়" প্রকাশিত হইয়াছে: মূল্য ১ টাকা।



ভারতবর্ষ



স্বর-সাধনা

[শিল্পী—শ্রী বৃক্‌ রামেশ্বর প্রসাদ]

Emerald Printing Works
SALOUTA



মাস, ১৩২৫

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অষ্ট বর্ষ

[দ্বিতীয় সংখ্যা]

শক্তি-পূজার উৎপত্তি ও প্রচার

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল]

শক্তি-পূজার উৎপত্তি বা আরম্ভ আমরা ইতঃপূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার বেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। চণ্ডীতে যে বিবরণ আছে, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই কন্মের দ্বিতীয় মহত্ত্বের কোন সময়ে, অর্থাৎ ১৩৫ কোটি বৎসর পূর্বে, মেঘদাম্রমে কবি মেঘদুঃস্বরণ ও সমাধিকে এই শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন, এবং শক্তি-পূজা করিতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশ অনুসারে, হুগু ও সমাধি সেই মেঘদাম্রম সঙ্গিতকর নদী-পুপিনে গিরা, দেবীর পূজা করিয়া অভিলষিত কল লাভ করেন। এ কন্মে ইহাই দেবীর প্রথম পূজা, এবং তাহা হইতেই দেবী পূজার আরম্ভ।

এই মেঘদুঃস্বরণ কবে? মূল চণ্ডীতে বা দেবী-ভাগবতে তাঁহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ত্রয়ৈববর্ষ-পুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড ৩২।৩৭) আছে যে, মেঘদুঃস্বরণ ত্রয়ৈববর্ষ পৌত্র, অচেতার পুত্র। স্বয়ং শক্তর তাঁহাকে দেবী-রহস্য শিখাইয়া-

ছিলেন। মেঘদুঃস্বরণ যখন আর কোন কথা কোন স্থানে পাওয়া যায় না। রাজা সুবর্ণ সম্বন্ধে চণ্ডীতে এই মাত্র পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয় মহত্ত্বের চৈতন্যেশ্বর রাজা ছিলেন। চণ্ডীর আরম্ভ এইরূপ :-

“সাবর্ণিঃ সূর্য্যভনরো যে মহুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ।

নিশামর তত্ত্বংগতিঃ বিস্তর্য্য গরতো মম ॥

মহামারাহুতাবেন বধা মহন্তরাধিপঃ।

ন বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিতনরো রবেঃ ॥

স্বারোচিষেহন্তরে পূর্ষঃ চৈতন্যংপদমুত্তমঃ।

স্বরথো নাম রাজাহুতুং সদন্তে কিতিমন্তলে ১” ০

• এই চণ্ডীর বস্তু হইতুমু পুত্র ত্রি-সংকল্প ত্রিকালেশ্বরী সতকর্ম্মদেবী। সুতরাং পুরাণ-মতে তিনি, অজীত কন্মে বাহ্যায় মহু হইয়াছিলেন, এবং এ কন্মে বাহ্যায় মহু হইয়াছিলেন, এবং বাহ্যায় মহু হইবেন, তাহা আদিতেন। পূর্ষ কন্মে যিনি অষ্টম মহু হইয়াছিলেন, এবং এ কন্মে যিনি অষ্টম মহু হইবেন, তাহা তিনি জাত ছিলেন। এ কন্মে অষ্টম মহু—সাবর্ণি। পুত্রের উদয় সমুদ্র-

এই স্বাভাবিক মনস্তর এই কালের দ্বিতীয় মনস্তর; সেই মনস্তরেই হুগল চৈতন্যবশে অধ্যগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রবর্তী রাক্ষা হইয়াছিলেন। তাঁহার পর তিনি সেবী-বয়ে পূর্ণ হইতে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া সাংঘর্ষি নামে খ্যাত হইয়াছেন, এবং আগামী অষ্টম মন্বন্তরে মনস্তরবিপ্লবিত হইবেন। চণ্ডী হইতে সুবর্ণের এইমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়। সেবী-ভাগবতেও হুগল সম্বন্ধে অল্প কিছু জানা যায় না। কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে হুগল সম্বন্ধে অল্প বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ অল্পসংখ্যক ব্রহ্মার পুত্র—অত্রি; অত্রি-পুত্র নিশাকর (চন্দ্র); নিশাকরের পুত্র বৃধ; বৃধের পুত্র চৈত্র; চৈত্রের পুত্র অতিব্রহ্ম, এবং অতিব্রহ্মের পুত্র হুগল। (প্রকৃতি খণ্ড ৪৮ ও ৬১ অধ্যায় ষষ্ঠ্য)। অতএব ব্রহ্ম চন্দ্রবংশীয় রাক্ষা। কিছু কথা হইতেছে যে, চন্দ্রবংশে অতি প্রসিদ্ধ বংশ। হুগল যদি চন্দ্রবংশীয় রাক্ষা হইতেন, তবে চণ্ডীতে তাঁহাকে চৈত্রবংশীয় বলা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। হুগল কোন দেশের রাজা ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে এই ভারতেরই কোন দেশের রাজা ছিলেন, তাহা তাঁহার রামান্বানের পর বেঙ্গল গুহির আশ্রমে গমন হইতে

করা সাংঘর্ষি (রাণার) পরে ইহার জন্ম হইবে—ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যান। কিন্তু চন্দ্রবর্তী হইতে চীক অল্পসংখ্যক মন্বন্তরে ঘর। তৎপুত্রস্বরে উক্ত প্রথম স্রোতের বিভিন্ন বর্ষ যাত্রা বিভিন্ন বীষের উদ্ভাব হইয়াছে। তাহা এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

উক্ত শ্লোক ম.যা "স বহু-বহু....." ইত্যাদি হইতে বহু হুগল, তিনি সাংঘর্ষি নামে অষ্টম মন্বন্তরে হইয়াছিলেন, তাহারই উপাখ্যান এখানে উক্ত হইয়াছে। এ কয়েকটি বহু বা সাংঘর্ষি মন্বন্তর অবিচার-কাল এখনও আইসে নাই। হইতে পারে, ইত্যংকুরে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে; তবে, পরে তাঁহার অবিচার আরম্ভ হইবে। এ মন্ত চণ্ডীর শেষে আসে :—

"এবং সেখা বহু লগা বহুবা; ক্রিয়াকর্মতঃ।

হুগাক্ষম সমাপ্যত সাংঘর্ষিগতিতঃ বহুঃ।

এ স্থলে তিনি পরে সাংঘর্ষি নামে মন্ব হইবেন, ইহাই উল্লিখিত আছে। অতএব উক্ত "বহুবা" অর্থে এই বহু হুগল, হুগল ইত্যংকুরে চণ্ডী হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন, পরে মন্ব হইবেন। অথবা ত্রিকালবদী কবি যাহা ভবিষ্যৎ তাহা অতীতের ভাষা বর্ণন করিতেছেন—হুগল এখনও চণ্ডী হইতে জন্ম লাভ করেন নাই।

বৃদ্ধা যার। কেন না তখন কোন গুহির আশ্রম পূর্ণা-কৃষি ভারতের বাহিরে কোথাও ছিল না।

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ অল্পসংখ্যক হুগলের রামধানী কোলা নামক নগরে ছিল (প্রঃ খঃ ৬২২)। হুগলের শত্রুগণ এই কোলা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। একমাত্র চণ্ডীতে হুগলের শত্রুগণকে "কোলা-বিধ্বংসিনঃ" বলা হইয়াছে (প্রঃ খঃ ৬২৩)। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ মতে, যে রাক্ষা হুগলকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার রামধানী কোলা ধ্বংস করিয়াছিল, তাঁহার নাম নন্দী। নন্দী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নন্দী ক্রবের পৌত্র উৎকলের পুত্র। এই উৎকল হইতেই বোধ হয় "উৎকল" দেশের নাম হইয়াছে। নন্দী সম্ভবতঃ এই উৎকল-দেশীয় রাজা ছিলেন। বর্তমান উড়িষ্যার কোন স্থানে তাঁহার রামধানী ছিল, এবং উৎকল দেশ হইতেই তিনি হুগলের রামধানী আক্রমণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বৈষ্ণব সমাধিরও কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। সমাধি কলিঙ্গ-দেশীয়—বিরাধের পৌত্র, এবং ক্রবিনের পুত্র। (প্রঃ খঃ ৬১১-৪-৬)। এই কলিঙ্গ বর্তমান উৎকল দেশ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-মতে, হুগল রাজা যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া, একাকী হস্তাক্ষা ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন পুন্স-ভক্তা নামক কোন নদীর নিবর্তে সমাধি নামক বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

"বদর্শ ভক্ত বৈষ্ণব পুন্সভক্তা নদীতটে।" (প্রঃ খঃ ৬২৬)

তাঁহার পর হুগল ও সমাধি উভয়ে বেঙ্গলাশ্রমে গমন করেন।

"বৈষ্ণব শার্ঘিঃ স্পৃগতিঃ লগান মেঘলাশ্রমঃ।

পুন্সঃ চক্রং পুণ্যক্ষেত্রক ভারতে ভগ্নাঃ" (ঐ ৬২৭)

হুগল তখন ভারত-মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এই মেঘলাশ্রম। সেই মেঘলাশ্রম মহা পুণ্যক্ষেত্র। অথবা তাহা পুন্সের ভার অত্যন্ত চক্র বা চূর্ণ ছিল। চণ্ডী হইতে জানা যায় যে, মেঘলাশ্রম অতি গহন, বা চূর্ণ বন-মধ্যে অবস্থিত ছিল। এবং পুন্সের তীর্থ বেঙ্গল ছাড়াই পূর্বভা-পরি অবস্থিত, এই মেঘলাশ্রমও সম্ভবতঃ সেইরূপ শৈলোপরি যার অরণ্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত ছিল।

এ ইতিমধ্যে শ্লোক "পুন্সঃ চক্রঃ" অর্থে অথবা পুন্সের ভার হুগল। পুন্সই যে সেই মেঘলাশ্রমের নাম এখনও হইতেপারে না। কেন

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই বিবরণ হইতে দৃষ্টা যায়, যে, যখন এই বিবরণ লিখিত হইয়াছিল, তখন শক্তিধর্ম ও শাক্ত ধর্মের বিশেষ প্রচার হইয়াছে। এবং এই শাক্ত-ধর্মের মূল চতীগ্রন্থের বিশেষ আদর ও প্রচার হইয়াছিল। এজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই অংশের বক্তা চতী-উক্ত পাত্রগণের বিবরণ এবং মেঘদাঁশ্রমের স্থান সম্বন্ধে দুই এক কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এই অংশ মূল পুরাণের অন্তর্গত হয়, তবে ত্রিকাশদর্শী যদি বেদবাস্য ইহার বক্তা। সুতরাং এ অংশ প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শাক্তগণ এ অংশ প্রামাণ্যরূপেই গ্রহণ করেন। আর যদি এ অংশ প্রকৃষ্ট হয়, তবে ইহা কোন অজ্ঞাত লেখকের স্বল্পগোষ্ঠ-কল্পিত বলিতে হইবে। সূর্য-সম্বাদি মন্ত্রোক্ত ঘটনা দ্বিতীয় মন্তব্যের। সে ঘটনার স্মৃতি থাকিতে পারে না। তবে যিনি ত্রিকাশদর্শী ব্ৰহ্ম, তিনি তাহা যোগবলে জানিতে পারেন, ইহা প্রচাযান, হিন্দুযাজ্ঞেই বিশ্বাস করেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই বিবরণ হইতে অস্থান করিতে পারা যায় যে, সূর্যের রাজধানী কোলা নগরীতে ছিল। সে কোলা নগরী কোথায়, তাহা এই পুরাণে উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তাহা এই বঙ্গদেশের পূর্ব-ভাগে অবস্থিত ছিল। উৎকল বা কলিঙ্গ হইতে কোন রাজা সশস্ত্রে আসিয়া সূর্যকে আক্রমণ করেন, এবং কোলা নগরী ধ্বংস করেন। যখন পশ্চিম দিক হইতে এই আক্রমণ হইয়াছিল, তখন অব্ধ সূর্য পূর্ব দিকেই পলাইয়া গিয়া-ছিলেন। সেই পলায়ন-পথেই পুন্ড্রভা নদী তটে সমাধির সহিত তাঁহার লাক্ষ্য হয়। এবং সমাধির সহিত সূর্য আবার পূর্ব দিকে যার অরণ্যাদি তেজ করিয়া গিয়া তবে মেঘদাঁশ্রমের আশ্রয়-স্থান গ্রাপ্ত হন। সুতরাং বর্তমান পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে এই মেঘদাঁশ্রম অবস্থিত ছিল, এবং তাহা যার অরণ্য-মধ্যে কোন শৈল-শিখরে সন্নিবেশিত ছিল, এইরূপ অস্থানই সম্বন্ধে সঙ্গত। ভারতের পূর্বভাগে, বঙ্গদেশের পূর্ব দিকে যে গিরিশ্রী আছে,

যা, তাহা ইহা চতীতে অঙ্গ একশ প্রদিক তাঁহার উল্লেখ থাকিত। যিগবতা উক্ত বিবরণ হইতে দৃষ্ট উৎকলে। বিটটরতী নগরতঃ বরদেবী রাজা ছিলেন (যাঁহঁর)। সেখান হইতে যাঁহঁর) অগায়েবনে রাজপুত্রাদি মতে অবস্থিত পুন্ড্রের সমন্বয় নহে।

তাহা হিমাচলের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্ত-সীমায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর বা বর্তমান আশ্রম, মণিপুর তাহা এবং বর্তমান চট্টলের পূর্ব দিয়া বরদেব ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত গিয়াছে। এই পূর্বভাগে মধ্য শক্তিধর্মের মতান্তরস্থান প্রধান তীর্থ কামরূপ অবস্থিত। এই পূর্বভাগে মধ্য বর্তমান চন্দ্রনাথতীর্থ অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উক্ত উপাখ্যান হইতে অবশ্য অনুমান করিতে পারি যে, এই পূর্বভাগ-প্রান্তের মধ্যে কোন স্থানে শাক্তদের এই মহাতীর্থ মেঘদাঁশ্রম অবস্থিত ছিল।

এই অনুমানের আরও এক কারণ আছে। শাক্ত-ধর্ম বাঙ্গালারই সম্পত্তি। বাঙ্গালা দেশেই ইহার প্রধান প্রচার, বাঙ্গালা দেশেই ইহার বিস্তার, বাঙ্গালাতেই ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি। শাক্ত-ধর্ম প্রধানতঃ বাঙ্গালীর ধর্ম। বাঙ্গালা হইতে তাহা বৌদ্ধগণ নেপালে, কান্টোরে, তিব্বতে, চীনে প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ক্ষেত্র প্রভৃতি উত্তরবঙ্গী মহাযান পন্থীর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তাহার প্রচার করেন। তান্ত্রিক চীনাচার প্রদিক, চীনের 'তান্ত্র' উপাদান প্রদিক। বাঙ্গালা হইতেই পশ্চিমে, বাফিগাতে—একরূপ ভারতের সর্বত্র শাক্ত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তন্ত্র মূল বাঙ্গালারই সম্পত্তি। বাঙ্গালাতেই তন্ত্রের স্মৃতি, বিস্তার ও প্রভাব। অর্থাৎ যেমন এককালে বৌদ্ধ-প্রধান ছিল, বাঙ্গালাও সেইরূপ এককালে তন্ত্র-প্রধান ছিল। বাঙ্গালা এখনও তন্ত্র-প্রধান। বাঙ্গালার অগ্রকরণে সমগ্র ভারতই এখন তন্ত্র প্রধান। পূজা, উপাসনা, ধর্ম-সাধনা সমুদায়ই এখন তন্ত্রমূলক। তন্ত্র এখন কলিতে সমগ্র ভারতের ধর্মের ভিত্তি। ঐশ্বর্য, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য বা সৌর সম্প্রদায়,—সকলেরই পূজা ও পদ্ধতি, সাধনাপ্রণালী তন্ত্রমূলক।

বাঙ্গালার এ গৌরব অসাধারণ। বাঙ্গালা হইতে কত-বার কত নূতন ধর্ম-মূল প্রস্তুত হইয়াছে, কত নূতন ধর্ম-চক্র প্রবর্তন হইয়াছে। প্রধান বাঙ্গালা হইতেই এই শক্তি-বাসের ও শাক্ত ধর্মের উৎপত্তি ও প্রচার; তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্মের উৎপত্তি ও প্রচার। কারণ বিহার দেশ বাঙ্গালারই অন্তর্গত ছিল। বৌদ্ধ গদাতেই বুদ্ধদেব সিদ্ধ হন—সেখান হইতেই তিনি প্রথম ধর্ম-চক্র প্রবর্তিত করেন। বিহার ও বাঙ্গালার রাজগুরু রাজাই বৌদ্ধ-

ধর্মের প্রচার হয়। তাহার পর মহা প্রভু চৈতন্যদেব অপূর্ণ বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেন। বর্তমান কালেও তাম্বা রাম-মোহন রায় বাঙ্গালারই প্রথম ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রচার করেন। অতএব বাঙ্গালা বর্তমানই ধর্ম বিকাশের মহাকেন্দ্রস্থান। বাঙ্গালার এ পৌরব অপূর্ণ, অধিহিত। বাহা ইউক, বাঙ্গালা বহন শাক্ত ধর্মের কেন্দ্রস্থান, তখন ইহা অসুস্থান করা ঘাইতে পারে যে, বাঙ্গালাতেই শক্তিবাদ বা শাক্ত-ধর্মের প্রথম প্রচার হয়। সেই প্রথম প্রচারের স্থান বেধগাম্রম। অতএব এ অসুস্থান অসম্ভব নহে যে, এই আশ্রম বাঙ্গালাতেই অবস্থিত ছিল।

আমরা এ স্থলে বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা হইতেই শক্তিবাদের উৎপত্তি ও প্রচার হইয়াছে। এ কথাই আপত্তি হইতে পারে। অতএব এ কথা আরও বিশদ রূপে বৃত্তিতে হইবে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যে বেধগণ্ডবি কর্তৃক শক্তিবাদ-ব্যাপার এবং সূর্য ও সর্দার কর্তৃক দেবীর প্রথম পূজা বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিচার্য কল্পে কথ্য। বলিয়াছি তাহার পর প্রায় ১০৫ কোটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমাদের এ পৃথিবীর নিরন্ত পরিবর্তন হইতেছে। পূর্বে যেখানে পর্কত ছিল, কয়েক যুগ পরে সেখানে সাগর হইয়াছে; আর যেখানে সাগর ছিল, সেখানে পর্কত হইয়াছে। সুতরাং এক কোটি বৎসর পূর্বে যেখানে বেধগ আম্রম ছিল, এখন যে তাহা সাগর-গর্ভে লীন হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি যে, যে ঋষি ত্রিকালদর্শী, তিনি যোগদ্বয়ে এই বেধগাম্রম পরে আবিষ্কার করিতে পারেন, ইহা বিচিত্র নহে। আত্মবান হিন্দুমাত্রেরই ইহা বিশ্বাস। মার্কণ্ডেয় ঋষি ত্রিকালদর্শী সপ্তকল্পদ্বীপী বলিয়া খ্যাত। তিনি যদি বিচার্য মনসে এই সূর্য-সর্দারের বিবরণ জানিতে পারেন, তবে সে সময়ে বেধগ-আশ্রম কোথায় ছিল, তাহাও অবশ্য তিনি জ্ঞাত ছিলেন। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে অবশ্য সে স্থানের বিবরণ দেওয়া নাই। কিন্তু কথিত আছে যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই বেধগাম্রমের স্থানেই নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে এই বর্তমান যুগের প্রারম্ভের কথা। এ বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

সে বাহা ইউক, এই বিচার্য মনসে হইতে আরম্ভ করিয়া এই মনসের পরে বাগের যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্তৃক এই দেবী-মাহাত্ম্যের পুনঃপ্রচার পর্যন্ত এই শাক্ত-

ধর্মের বিস্তার বিস্তার ছিল, তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। কালের তিমির গর্ভে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন ত্রিকালদর্শী ঋষি যোগদ্বয়ে সে তত্ত্ব জান লাভ করিয়া প্রচার না করিলে, আর তাহা আমাদের জানিবার কোনোই। আমরা এই যুগের প্রথমে মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্তৃক চণ্ডী-মাহাত্ম্যের প্রচার হইতেই শক্তিবাদের ও শক্তি-পূজার আরম্ভ, এই মাত্র জানিতে পারি। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ এবং তদন্তর্গত চণ্ডী মহাভারতের পরে রচিত, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে সময় হইতে এখনও পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালার যে শক্তি-পূজার উৎপত্তি ও প্রচারের কথা উক্ত হইয়াছে, সে অবশ্য এই সময়ের মধ্যেই হইবে।

কিন্তু বাঙ্গালাতেই যে শক্তি-পূজার প্রথম উৎপত্তি, তাহার প্রমাণ কি? আমরা দেবী-ভাগবত হইতে জানিতে পারি যে, শক্তি-পূজা প্রথমে সূর্যদর্শন রাজা কর্তৃক কোশলে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বিখ্যাতশক্তিকা দেবী কোশলে নু বভূব হ।

• • •
বেয়া পূজা ওবা গ্ৰীত্যা কোশলে নু প্রবর্তিতা।

• • •
বিখ্যাতা সা বভূবা থ দুর্গাদেবী ধরাতলে।

সর্বজ্ঞ ভারতে লোক সর্ব-বর্ণে নু সর্বপা।

[দেবী-ভাগবত ৩ তম, ২য় অধ্যায় ৩৯-৪০]

কিন্তু এ সম্বন্ধে কথা আছে। এই যে পূজা কোশলে প্রথম প্রবর্তিত হয়, তাহা দুর্গাদেবীর পূজা। দুর্গাপূজা প্রকরণেই তাহা উল্লিখিত। ইহা সেই আত্মশক্তির বিশেষ রূপের পূজা। চণ্ডীতে তাহার ইঙ্গিত আছে, নান্ন। চণ্ডীতে দেবীর চতিকা, কাদিকা, অগ্ন্যাত্রী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি রূপে আবির্ভাবের কথা আছে। মহাকালী, মহাগণ্ধী, মহাসরস্বতীর ইঙ্গিত আছে। দেবী ভবিষ্যতে দুর্গাপূজার বধ করিয়া ভবিষ্যতে দুর্গা নামে বিখ্যাত হইবেন, ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং কোশলে দুর্গা পূজার প্রথম প্রচার হইলেও, তাহা আত্মশক্তি পূজার প্রথম নহে। আরও এক কথা আছে। দেবী-ভাগবতে মহিষাসুর কোশলের রাজা ছিলেন, মহিষাসুর বধ হইলে সেবগন পঞ্চরূপে কোশলে রাজা করেন, আ কথাও উক্ত

হইয়াছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, যিনি দেবী-ভাগবতের এই অংশের রচনা, তিনি কোশলের লোক—কোশলপ্রিয় ছিলেন। অথবা ইহা এ কল্পের, এই মূলের কথা মাত্র।

দেবী-ভাগবত ব্যতীত একদৈবর্ষ-পুরাণেও শক্তি-পূজা ও শক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারের কথা আছে। তাহার দুই স্থানে যে বিবরণ আছে, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

পূজিতা হরধেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাদিনী।

যিতীয়ে রামচন্দ্রেন ভাবনত বহাদিনীঃ।

তৎ পক্ষাৎ ভক্তাভ্যাং মাতা ত্রিস্র শোকেনু পূজিতা।

(প্রঃ ৮, ১১১)১৪৫—৬)

অতএব এ কল্পে পুণ্ড্রবীতে মাহুদের দ্বারা দেবীর প্রথম পূজা এই সুরথের এবং সনাতন পূজা। তাহার পূর্বে দেবতাসাই দেবীপূজা করিয়াছিলেন। একদৈবর্ষ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

“প্রথমে পুজিতা মা চ কৃষ্ণেন পরমাখ্যনা।

বৃন্দাবনে চ হৃষ্টদৌ নোক্তোক্তে রামদণ্ডেন।

মধুকটভ ভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীঃসতঃ।

ত্রিপুরা প্রেতিভট্টেন তৃতীয়ে ত্রিপুরারিনাঃ।

ঐষ্ট্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপদক্ষ্যাসপঃ পুত্রা।

চতুর্থে পুজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতীঃ।

তথা দ্বিতীয়েঃ সিংহট্টেঃ দৌবন্দ দ্বিপুঙ্কটৈঃ।

পূজিতা সর্গবিধেযু বহুং সর্গতো দমা।

• • •

তেজঃ স্র সর্গদেবানাম আবিভূতা পুত্রা দুনে।

সর্গদেবাঃ সপ্তভট্টৈঃ শত্রাণি কুণ্ডলানি চ।

দুর্গাধর দৈত্যাক নিহতা দুর্গদাতরা।

দন্তঃ স্বরাজ্যং দেবেভ্যাং বরকং বহতিপিতম্।

কল্লাবরে পুজিতা মা সুরধেন মহাখ্যনা।

রাজা দেবদশিনেন সুপ্রধ্যাক সমিতটে।

রাধা কুবা পত্নীহায়ং বরং প্রাপ যৎকপিতম্।

মুক্তিং সাংপ্রাপ বৈশ্রকং সংপূজা চ সমিতটে।

(প্রঃ ৮, ৫৭ অধ্যায়, ২২—৩০ শ্লোক।)

ইহার অর্থ এই যে, পূর্বকালে মহিষাসুরদিগ্‌ বধ উপলক্ষে দেবভাগ্য-কর্তৃক দেবী পূজিতা হইয়াছিলেন। সুরথের

পূজা অল্প কল্পে অর্থাৎ এ কল্পে। সুরথের ও সনাতন দেবীপূজা এ কল্পের দ্বিতীয় মন্তব্যের হইয়াছিল, ইহাই সর্গবোধিসম্বৎ। এবং এ কল্পে তাহাই দ্বিতীয় প্রথম পূজা। দ্বাদশ ঈটক, দ্বিতীয় মন্তব্যের সুরথ ও সনাতন এই পূজার পরে, এই মন্তব্যের বর্ষমান মহাপ্রাণের প্রোক্ত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজা। অতএব আশ্রিত্য অস্ত্রান্ত কারণে যদি অনুমান করি যে, এই কলিমূলের প্রথমে মার্কণ্ডের চতুর্থ অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা দেশে প্রথম শক্তি-পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, অথবা বাঙ্গালা দেশই শক্তি-পূজার কেন্দ্র ছিল, তবে সে অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বাঙ্গালায় পূর্বে বৈদিক ধর্মের বিশেষ প্রচার ছিল না। সপ্তপত্তী (বা সাত শত বর্ষ) ব্রাহ্মণগণ এবং পরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এখন পশ্চিম হইতে বাঙ্গালায় আসেন, তখনই বোধ হয়, তাঁহারা বৈদিক ধর্ম প্রথমে বাঙ্গালায় লইয়া আসেন। তখন সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় তাত্ত্বিক শক্তিধর্মের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল; তাই তাঁহারা ক্রমে সেই ধর্ম-প্রভাবে বৈদিক ধর্ম তুচ্ছ হইল। তাহার পর বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়। কিন্তু তাহাতে শক্তিধর্মের লোপ হয় নাই; কেন না, তাঁহার প্রভাবে বৌদ্ধ-ধর্মও রূপান্তরিত হয়,—বৌদ্ধধর্ম মধ্যে মহাযানে শক্তিবাদ প্রবেশ করে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালায় বৈদিক-ধর্ম বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ অল্প বাঙ্গালায় রাক্ষাস আদিমূর বধন বৈদিক বক্ত করিব্যয় অতিপ্রায় করেন, তখন তিনি কনৌজ হইতে পক্ষ বেদান্ত ব্রাহ্মণ আনিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের বংশধরগণও বাঙ্গালায় তত্ত্বের ও শাক্তধর্মের প্রভাবে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাহার প্রভাবে তাঁহারা বৈদিক-ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

অতএব শাক্ত-ধর্ম প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সম্পত্তি। বাঙ্গালাতেই অসংখ্য তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া, শাক্ত ধর্মের বিশেষ বিলুপ্তি ও পরিণতি, এবং বিলুপ্তিও হইয়াছে বলিতে হইবে।

বাঙ্গালায় এখন এইরূপে তত্ত্ব দ্বারা শাক্ত ধর্মের বিস্তার হয়, এবং তত্ত্ব মার্কণ্ডের-চতুর্থী শক্তিবাদের মূল গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়, তখন এই চতুর্থী-উক্ত শক্তিবাদ ও শক্তি-

পূজা প্রচারের আদি স্থান নির্ণয়ের জন্য অবশ্য চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব করা অসম্ভব নহে। সেই আদি স্থান মেধাশ্রম অবশ্য শাক্ত-ধর্মের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। আমরা যেখান হই, ত্র্যম্বক-পূজাও মেধাশ্রমক—

“পুস্তকঃ হুতঃ পূর্ণাক্ষরিক ভারতে মতা।”

বলা হইয়াছে। ভারতের মধ্যে একমুখ প্রাধান পূর্ণাক্ষর কোথায়, শাক্ত পতিতগণের পক্ষে তাহার অসুদৃশ্য-চেষ্টা স্বাভাবিক। ত্র্যম্বক-পূর্ণাক্ষর সে সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। স্মৃত্যং তস্মৈ যে মেধাশ্রমের স্থান—সেই শক্তি পূজা ও দেবীর আবির্ভাবের প্রথম স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই, এবং সে স্থান নির্ণয় করিয়া তাহাকে মহাতীর্থক্ষেত্র রূপে পরিণত করা হয় নাই—ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু বলিয়াছি ত, তত্ত্ব অসংখ্য। অনেক তত্ত্বের শোণ হইয়াছে, অনেক তত্ত্বের সংগ্রহ মাত্র আছে, অনেক তত্ত্বের এখনও কোন সন্ধান হয় নাই, অথবা সন্ধানের কোন চেষ্টা হয় নাই। প্রচলিত তত্ত্ব ও সংগ্রহ মধ্যে মেধাশ্রমের কোন উল্লেখ নাই। এ জন্য কোন্ তত্ত্ব কোথায় এই মেধাশ্রমের বিবরণ আছে, তাহা পূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবিত্ব দ্বারা বৎসর পূর্বে জৈমিন্য বেদান্তিক স্বামী নামক এক সরাসরি বৈদ্যবোপে গ্রাণ্ড সৌরী-তত্ত্বের কামাখ্যা পটনের এক বটন অবলম্বনপূর্বক অসুদৃশ্য করিয়া, চট্টোপ চন্দ্রনাথতীর্থের অসুদৃশ্য দিগন্তেই মধ্যে এই মেধাশ্রম তীর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে স্থান গহন পর্বতশ্রেণীর অবস্থিত। তাহা অন্তরাপরিণাম ছিল। কিন্তু সে স্থানে পূর্বে যে মহাতীর্থ ছিল, তাহার চিহ্ন অস্পষ্ট বিস্তারিত আছে। উক্ত তত্ত্বোক্ত মেধা ও মার্কণ্ডেয় কবির আশ্রমের চিহ্নসকল সেখানে স্পষ্ট পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, পূর্বে সে স্থান এক মহাতীর্থ রূপে বিখ্যাত ছিল। সম্ভবতঃ দেবীভক্ত মহাবি মার্কণ্ডেয় যোগ-বলে এ স্থানে পূর্বে মেধাশ্রম ছিল, নির্ণয় করিয়া, এ স্থানেই নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। সে অবশ্য চতী-মাধায়া প্রচারের পরে—গ্রায় পাঁচ হাজার বৎসর মাত্র পূর্বে। সেই হইতে এ স্থান মহাতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভবিত হয়। কালব্যয়ে তাহা ত্র্যম্বক-পূর্ণাক্ষর বোধদানের দ্বারা অধিকৃত হয়। তখন এই তীর্থ বোধ-তীর্থ রূপে মনসের নিকট আবৃত হইত। পরে বোধ মনসের অধিকার

লাগার সঙ্গে-সঙ্গে সেই তীর্থস্থান বোধ অধিকারীতে পরিণত হইয়া তীর্থ-চিহ্ন সকল গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। তাই শাক্তগণ সে তীর্থের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শাক্ত-গণের নোভাগা যে, সেই মেধাশ্রম তীর্থ এই বাঙ্গালাতেই আবিষ্কৃত হইয়া শক্তি-পূজার কেন্দ্রস্থল বাঙ্গালার পূর্ব-গৌরব রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গীত্ব মাগাইয়া দিয়াছে। চট্টোপ ও তৎপরিণিত স্থানে ইতোমধ্যে সে তীর্থের বহুল প্রচার হইয়াছে। এই মেধাশ্রমের কিরূপে স্মরণের সামর্থ্য কী কোলা নগরী অবস্থিত ছিল, ইহা উক্ত তত্ত্বই উল্লিখিত আছে। গৌরী-তত্ত্বের এই বটন যদি প্রমাণ্য রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে ত্র্যম্বক-পূর্ণাক্ষর স্মরণ-সংখ্যার উপা-স্থান হইতে আমরা যে অসুদৃশ্য করিয়াছিলাম যে, স্মরণ বোধদানের দ্বারা ছিলেন, বাঙ্গালার মধ্যেই তাহার সামর্থ্য কী কোলা অবস্থিত ছিল, এবং তিনি উৎকলের কোন রাজ্য কর্তৃক পরাজিত হইয়া, বাঙ্গালার পূর্ণাঙ্গীত্ব অবস্থিত পর্বতমালামাধ্যমে মেধাশ্রমেই গমন করিয়াছিলেন,—তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শক্তি-ধর্ম-কেন্দ্র বাঙ্গালার মধ্যেই যে শক্তি-পূজার আদি উৎপত্তি-স্থান, ইহা হইতে তাহা স্বীকার করিতে পারা যায়। অতএব আমরা নিশ্চয় করিতে পারি যে, শাক্ত-ধর্মের ও শক্তি পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থান ও পাত্র—এই বাঙ্গালার। শাক্ত-ধর্মের ও শক্তি-পূজার প্রচার এই বাঙ্গালার হইতে। শাক্ত-ধর্মের মূল এবং তত্ত্ব শাস্ত্র প্রচারিত এই বাঙ্গালার হইতে। বাঙ্গালার শাক্ত-ধর্মের কেন্দ্র। ইহা বাঙ্গালার গৌরব—সমস্ত ভারতের গৌরব।

অনুনা শাক্ত-ধর্ম বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া সে গৌরবের স্থান হয় নাই। কোন্ ধর্ম বিস্তৃত হয় নাই? যে ধর্মই হউক না কেন, মূল তাহা বতই নির্মল থাকুক না কেন, সে ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও কতি অসুদৃশ্য, তাহাদের অসুদৃশ্য ধর্ম অবশ্যই বিস্তৃত হইবে। বৈদিক ধর্ম বল, বৌদ্ধ ধর্ম বল, ইহুদী ধর্ম বল, খ্রীষ্টান ধর্ম-বল, মহম্মদের ধর্ম বল, বৈকুণ্ঠ ধর্ম বল—কোন্ ধর্ম এই রূপে বিস্তৃত হয় নাই? ধর্মের এই বিস্তৃতি দূর করিবার জন্য কোথায় ব্যর্থতার চেষ্টা হয় নাই? এবং কোথায় সে চেষ্টার ফলে সে ধর্ম নানা সম্প্রদায় বিস্তৃত হয় নাই? ইহার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। শাক্ত-ধর্ম অনেক স্থলে

বিকৃত হইলেও, তাহার মূল নির্মল, পবিত্র, বেহনমত। শাক্ত-ধর্ম—নিভা, অপৌকষেধ, তোপ-মোক্ষপ্রদ, মুক্তিদায়ক। গম্য মূল উৎস কি নির্মল! গোস্বামী হইতে হঠাৎ পর্বাৎ পর্জন্ত-বাধিনীর বারি কি ঝিলল, কি সুনয়! কিন্তু গম্য বত সাগরান্তিমুখে গমন করিয়াছেন, বতই অস্ত্র নবী তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন, বতই গম্যমাতৃক যোনের অপবিত্রতা, মলিনতা! শিখ অঙ্গে এগন করিয়া, সে দেশকে

পবিত্র করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, ততই তিনি শঙ্কিল, মল্য-মর হইয়াছেন। কিন্তু তাৎপাতে তাঁহার সেই চিরপবিত্রতা কি নষ্ট হইয়াছে? বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন রুচির স্যাবক-পণের অপবিত্রতা, সত্যীকর্তা হেতু শাক্ত-ধর্ম আপাত-সূত্রিতে মলিন হইলেও, তাহার মূলের শ্রেষ্ঠত্ব কি নষ্ট হইয়াছে? আমরা কবে এই শাক্ত-ধর্মের শ্রোতা বৃত্তিতে চোঁটা করিব।

মা

[ত্রিচ্ছুরূপা দেবী]

(১০)

প্রাচীরে পূর্ণনিম্ন ব্রহ্মস্বায়ী বাণ দ্বায্যের বাড়ী দেখা দিলেন। বাড়ীর গাভিতে ছেলেমেয়ের কে-কে সঙ্গে আসিয়াছিল; আর আসিয়াছিল ব্রহ্মের দাণ। বাড়ীর মধ্যে থাকিয়া বহর পাইয়া, একটা ভাইবিক্রেতে দিয়া ব্রহ্ম নিজেই এই দাণটিকে আনাইয়া, নিজেই বহর মধ্যে তাঁগকে ডাকিয়া লইয়া গেল। দেখানে চুই ভাই-বোনে কি-কি কথা হইল। তাহার বানিক পরে দাণটি সুখানি পরম গভীর করিয়া বিজ্ঞানীতে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মও কানককর্ম দেখিতে কিরিয়া আসিল।

বড়-মোকের প্রাচ;—প্রাচের উপর বোড়ল, বুন, আরও সব অনেক কাণ্ডেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সব দেখা-তনা করিয়া, ভাপ-মদ্য মত্ততা প্রকাশ করিতে-করিতে, মুক্তি-পরামর্শের শ্রোতা প্রবাহিত করিয়া দিয়া, সঙ্গে-সঙ্গে বিনীতভাবে বুরিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে, সেই সব বহুমূল্য সংপরাধর্ষ-প্রাধ-কার্যে নিযুক্ত ভাষাতাকে উৎকেন করিয়া, এক সময়ে কাছাকাছি কেহ নাই দেখিয়া, স্বপ্ন-মহাশয় একটুখানি কাদিয়া, কেনবিরল মতকে বার-কতক হাত ব্লাইয়া, একটু ঘেন সলজ্জভাবে করিয়া কেবিলেন, “কিছু মনে করো না, অরবিন্দ,—আমি তোমার ভাল রকমেই চিনি। তবে কি না,—তবে কি না এটা সত্যের, আর আমার হস্তি মংসারী। এখানকার বা কর্তব্য, সেগুলো তো নিহন-মতন ঠিক-ঠিক করে যাওয়া চাই। তাই এমন অগ্রিম প্রসঙ্গটা ঠাণ্ডাৎ একটাবারের ভিত্তে তুলতে হলো বাবা। তা-তুমি সে ক্ষেত্রে হুংখিত হয়ে না; আমি

তোমার কিছু অবিবাস করে এ কথাটা তুলছি না। নেহাৎ বাপের প্রাণ কি না! সেইজন্তে তার মুখটা চেয়েই, আমার—মুহুর্তে পাছুতো তো?—নেহাৎ সেইটেরই ভিত্তে।” অরবিন্দ বিনীত বচনে তিজ্ঞান করিল, “কি আমেন কন্ডেন, বলুন?” “না—না, আমেন কিছু নয়। সেই তোমাদের বিয়ের সময়কার কথাটা। সেই সময় সকলেই আমার ছুটকীর বিয়ে এখানে দিতে মানা করেছিল কি না; আর তোমার বাড়ী ঠাকুরাণী—সেও তো শুনেইছ, কেঁধে-কেটে লম্বাখরা হয়ে পড়েছিল। বলে, সতীনে যেয়ে দেবার চেয়ে, যেয়ে গম্য তাসিয়ে দাও। যেয়েমাহুৎ কি না! তবের মনহাত কাপড়ে কাচা নেই,—বুড়ির হোড় তই পর্বাৎ! তা, আমি কাক কথা শুনিনি। সকলে একমিকে, আর আমি একমিকে। আমি বলি, মুহুর্ত বোপ যখন আমার কথা দিয়েছে, তখন সে কথার আর নড়চড় নেই,—সে সতীন্ পালা না থাকা এক কথা। ওয়া কেঁদে বলে কি জানো? যে, ‘ওগো, তাঁর অবর্তমানে ছেলে যদি সে কথা না মানে?’ তা, আমি তার কি লম্বাখটি দিয়েছিলাম, তা তবু? আমি বলেছিলাম যে, ‘কেন অত দাব্যডাঙো? সেও মুহুর্ত বোপেরই ছেলে! কথার বলে, বাপকা বোটা, সিপাখিকা খোড়া, কুছ বেছি তবু হি খোড়া খোড়া। দার বাপের বোটা হয়, তারা কি আর বাপের কথার নড়চড় হ’তে যের? অরবিন্দ যে ত্রীকে বাপের কথার ভাপ করতেন, তাঁর অবর্তমানেই কি আর তাঁকে কিরিয়ে নিয়ে যাই বাপের অপমান করতে পারেন। সে রকম ঔরসে

ওর জন্মই নয়।' তা বাবা, তোমার শ্যাক্তী ঠাকুরণ
হাজারই হোক,—বহুশ ঐ তো,—সেয়েমানুষ বই আর তো
কিছুই নয়। সে এমই মধ্যে অয়তল ছেড়ে ঘোর বিরে পড়ে
আছেন। বলছেন, 'ছুটকৌকে যদি সতীন্ নিয়ে বর কব্বে
হয়, তা' হলে যেহেতু কোন দিম না তোন দিম গলায় গড়ি
যেবে, কি 'বিড়কির পুত্রে গলায় কলসী বেঁধেই উল্বে,'
মায়ের প্রাণ! আর ঐটি ওর কোলের সন্তান কি না—বড়ই
আদরের—সে ত তুমি সব জানোই বাবা,—"

অরবিন্দ নত মুখে, শান্ত বরে উত্তর করিল, "আপনি
আমার কত কথা কেন বলছেন? আমার বাপের প্রতিজ্ঞা
আমার দ্বারা তবু হবার কোন সম্ভাবনা কি বোঝা গেছে?"

মোক্ষদাচরণ (অরবিন্দের শত্রু মহাপরটির উদ্বাহ
নাম) কিছু বেন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না—না, তা কি
বলছি, তা কি বলছি—সে ত আমি বরাবরই জানি,—আমার
আর সে যুক্তিতে হবে না বাবা! তবে ওরা সব সেরেমানুষ,
—সেয়েমানুষের ভাত,—ওদের কথা ধরে কে? আমি এক-
রকম বলছি এলো; আমার এই এমনি বাড়ী গিয়েই
ওদের বেশ করে বুঝিয়ে দেব 'খন যে, বোম্ভাই পত
হয়েছেন,—তা'বলে' তাঁর তত্ত্বলোকের সঙ্গে মত কথার তো
আর বৃত্তা হয়নি। তোমাদের এ-সব ছোট ভাবনা কেন?
ওহে চন্দ্র, যেখ যেখি, ছেলেগুলো সব গাড়ীতে গিয়ে
উঠেছে কি না, সড়কা-বেলা আমার এক বেটা মজেলের
আসবার কথা আছে। শালায় বেটার শালা আলিয়ে
মেরেছে যে,—তার ইচ্ছে যে, চকিব খড়্গেই আমি তার
কাগজ-পত্র নিয়ে বসে থাকি।—আচ্ছা এখন চলুন।"

মাতা-পুত্র কোন এক সময়ে নির্জনে সাক্ষাৎ ঘটিলে, যা
ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সম্বদ্ধ কর্তে প্রশ্ন করিলেন,
"ওখানে গিয়েছিলি?" পুত্র ইহার জবাব দিল, "হঁ।"
না বলিলেন, "সবাই ভাল আছে?" ছেলে কহিল, "হঁ।"
"খোকাটিকে দেখিলি?" "দেখেছি।" "কত বড়টি
হয়েছে?" "বড় হয়েছে।" "যেখুঁত কার মতটি হয়েছে
রে? তোর মত, না, আমার বোমায়ের মত?" "জানিনে।"
"আসতে চাইলে না?" "না।" "কিছু বয়ে জোকে?
কোলে এলো?" "উর্ধ্বঃ।"—"ওহে, একবার তাকে
সঙ্গে করে আনি। যে কেন রে,—একটাবার দাবার আমার
মুখানি দেখেছ? আমার সোনার চাঁদ রে!"

অরবিন্দকে গমনোদ্ভূত দেখিয়া, নিজের আকস্মিক
উন্মিত শোচোচ্ছ্বাস আপনাই দমন করিয়া লইতে গেলেন;
কিন্তু সেই অপরিস্রুত পৌষটীর কালমিক স্থবর মুখানি
দৃতিপথে উদ্ভিত হইবামাত্র, সংগা বরষাধিরা চোখের জল
ধরিয়া পড়িল; কীদ্বারা কেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! কি
পাখাণই আমি সেটে ধরেছিলাম। কাল কত করে ত্রৈণে
পাঠাশেন;—মনে কতলম, ও বোমায় তো পাওনি,—ছেলের
মুখ চোখে পড়ল, আর এমন করে বাক্ত্য পার্শে না।
পৃথিবীতে মানুষ ঐ মুখানির দিকে চেয়ে আর সবই ভুলে
যেতে পারে,—কেবল ঐ ধানিকে পারে না। তা, তোরা
তাও পারিস। কেনন লোকের ছেলে বাবা তুমি,—তোমার
কাছে আমার আশা করাই ভুল হয়েছিল।" না কীদ্বিতে
লাগিলেন; ছেলে নিরন্তরে চশিয়া গেল।

ব্রহ্মাণ্ডি সে রাতে নিজের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া
বেশিল, স্বামী শুইয়া আছেন। বেথিয়া সে ঈষৎ বিস্মিতা
হইল। শিশু-বিবাহের পর হইতে অরবিন্দ মায়ের কাছেই
শয়ন করিয়া থাকে। "আজ এ বরে যে?" এই প্রশ্ন
করিয়া সে কাছে আসিয়া ঝাড়াইল। অরবিন্দ সেওয়ারের
দিকে মুখ করিয়া ছিল; তেমনি থাকিয়াই জবাব দিল,
"চানদিকে গোলমাল।" "ওঃ, তাই জ্ঞে?" স্বরে ঈষৎ
ব্যঙ্গের আভাস ছিল। পরদিন বাট,—প্রকাণ্ড বাড়ীটা
আত্মীয়-কলরবে পরিপূর্ণ; অদভুততা ইহার মধ্যে কিছুই
ছিল না। তথাপি ব্রহ্মাণ্ডির মনে হইল, স্বামী নিজের শরীরের
বিশ্রাম লইবার অল্প আশ তাহার মস্তিষ্ক পবিত্র করিতে
আসেন নাই, অপর উদ্বেগ আছে। অস্তরের কোন বিধা-
দ্বন্দ্ব প্রশমন করণার্থ তাহার আজ একটুখানি নির্জন
স্থানের প্রয়োজন বোধাইছিল বলিয়াই, ঈষৎ এই ব্রহ্মাণ্ডির
পরামর্শের কথা মনে আসিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডি তীব্র
অভিমনে বুক ভরিয়া আসিল। কিন্তু মনের মধ্যে বাই
হোক, বস্তুভাটী করিবার ইচ্ছা ছিল না। শিশু বাড়ী
কিরিয়ার মুখে শুত সংবাদ কতক বিজ্ঞাপিত না করিয়া-
শান নাই। সেই আনন্দে মনের মধ্যে আজ উদারতার
হাওয়া বহিতেছিল। তাহাতেই ভাবিয়া দিয়া একটুখানি
বরচ করিয়া কেলিল। স্বামীর কলসলবার অদূরে, মুক্ত
বাতায়নের স্যোংরা-ধারার মজা বলিয়া গড়িয়া বলিল,
"কাল রাতে ফিরে কিছু খেলে-টোলে না, ওখানে বৃষ্টি

খেয়ে এসেছিলে?" "হ্যাঁ।" "সেইজন্মেই বৃদ্ধি অত রাত হ'লো,—এক বৃদ্ধিতে তো ঘুমের খেতে নেই।" "হ্যাঁ।" "আমাদের কিন্তু ভাবনা হচ্ছিল যে, ওর ত শরীর ভাল নেই না কি। পাওয়ার কথা তো কার্তিকেরা কিছু বলে না।"

"সে তো তোমার নত পাগল হয়নি।" "আমিই বা পাগল হবু কিসে?" "হরেন্দ্র বই কি।" "হ'তে পারে। তবে কি-কি লক্ষণ দেখতে পেল, সেটা শুনে পাইনে?" "আমার কি এখন সেখানে-সেখানে গেয়ে বেড়াবার সময়?"

"সেখানে-সেখানে নয়; তবে এখানে খেলো যো কি?"

"এখানেই বা আমার 'সেখানে-সেখানে'র সঙ্গে প্রভেদ কি?" ব্রহ্মাণী কিছুক্ষণ দ্বিধা অসন্তোষ ভাবে চুপ করিয়া থাকিল। তার পর চট্‌চট্‌ স্বামীর কর্ণধরের প্রাঙ্গণ দ্বাৰে মনে-মনে শুধু হইয়া উঠিল, সেও তেমনই সে-প্রজ্ঞাদিত সহজ হয়েই কথাব করিল, "তা একটুখানি আছে বই কি।"

"কি?" "আর তেঁনি দিন রাত একটার ঘাড়ী বিয়ে দায়া-রাত নিঃসর ঘরে পড়ে কৈঃবঃ।" "কৈঃবঃ?" "শব্দ।" "সেই অধিকার কর্তব্য হইতে নয়,—অনেক দুঃ হইতে অধিকৃত হয়ে আসিয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মাণী তখন গাফিলত। সে গাফিলত উঠিল, কর্ণধরে খেটে তাঁর মাথাইরা, স্পষ্ট হয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কাননি? কার্তিক তোমার দেহের গুণে কাল যে দাগরাট উপদেশবার বড়-বড় নিষেধের শব্দ শুনে, সে উপদেশটা কে গো? আমি তো আর চাখা নই যে কিছু বৃদ্ধি! মনের সমস্তটাই তোমার সে আত্ম পর্যাট ফুড়ে আছে। আমার এতটুকু একটু হান আছে তোমার?"

অরবিন্দ তখন বিদ্বান্নার উপর উঠিয়া বসিল। এ কথাব কোন প্রতিবাদ সে করিল না। শুধু এই কথাটি বিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার অধর করেচি কখনও?"

"বড় আর ভালবাসা ছই কি এক?" অরবিন্দ এ কথাব "কোনই জবাব দিল না। তখন ব্রহ্মাণী উঠিয়া স্বামীর সমুখে আসিয়া গাফিলত। সেই বিন্দু ভোক্তাভোগ্যের মধ্যে গাফিলত ইর্ষা-বিবর্ণ দুঃ অত্যন্ত পাত্তর হইয়া উঠিল। তাহার ছই চোখ নৃতন ইন্দ্রিয়ের ছুটির মত শুকিয়া উঠিল। সে কহিল, "অধর যে ঠিক কৈন দিন করেছ, সে কথা বলে আমার দিত পলি ধাবে,—তা" আমি বন্তে পাবো না।

কিন্তু তুমি থাকে বড় মনে করে করেছ, বস্তুর দ্বারা ঠিক তা থেকে আমি কোন বিনই পাই নি। আমার রাশি-রাশি বই, এসেল, গহনা, পাড়ী কিনে এনে দিয়েছ; রূপ করে কথা, বেহাং আমি না রাগালে বসেও নি। কিন্তু সেই কি সব? আমি কিছু বলে চাইনে,—অনেকবার তো বলেছি,—ওসব ছাই-পাঁপ,—তোমার ও শুধুনা আদর ওসব আমার চাইনে। ওসবে আমার এতটুকুও লাভ নেই। তুমি যখন আমার সতিা করে ভালবাসতে পার্কে না, তখন তুমি কেন আমার বিয়ে করেছিলে? মনের মধ্যে সমস্তক্ষণ আর একজনকে পান করে, বাহিরে এই যে একটা টেনে-এনে বহুকথা করা,—একি ছাননা নয়? এতে কি লাভ নেই?"

অরবিন্দ আবার শরনোত্তাপ করিয়া বীরে-বীরে কহিল, "আমি তো তোমার নিজ কোর্টশিপ করে বিয়ে করিনি রাশি! বাবরা চলনেই পুঁজে-খেতে চলনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তার ভজ্ঞে আর ভিরকাল পরে কৈঃ-কৈঃ কি করবে,—সে তো আর বসল হবে না! এখন নিজের বিদ্বান্নার গিরে বৃদ্ধির পড়ে,—অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ব্রহ্মাণী এ বৃদ্ধিতে টলিল না। সে তেমন গাফিলত গাফিলতই, গভীর বৈরাগ্যের হয়ে কহিয়া উঠিল, "আমার তুমি বাপের কথার বাধা হয়ে বিয়ে করেছ, তা আমি জানি। কোর্টশিপ করে তাকে বিয়ে করেছিলে, তাও না কেনেছি তাও না; কিন্তু বলো তুমি, এ রকম কর্তার তোমাদের কি অধিকার আছে? থাকে ভালবাসতে পার্কে না,—কখনও পার্কে না,—তাকে কেন চিরদিন এমন করে পুড়িয়ে মার্কীর ভজ্ঞে বস্তে নিয়ে এসে?"

"কি ছেলেনাহবী করণো রাশি! তোমার উপর এতটুকু অজ্ঞার হয় নি, তেবে দেখ। তুমি অনর্থক নিজের মনের হিংসার ঘনি আগে, সে ঘোষ তোমার।"

"সে ঘোষ আমার নয়। তুমি শুধু বাইরের কথা বলো; কিন্তু ভেতরে যে সেই তোমার সব। সেখানে আমি যে ভিথিরি—"

"রাশি, তুমি থাকলে। সেই একজনকে চিখারীর অধর করেও কি তোমরা তৃপ্ত হও নি? মনের থোটা চকিম বটী বিজ্ঞ! তারই বা কি আর্ঘ্য পেয়েছ, বলো দেখি?"

একবিধু মহাব্যবসায় এ মন থেকে কোন দিন করে পড়েছে কি ?”

“তুমি তার কি বুঝবে? এই যে কথাগুলো বলে, ওইগুলো যে তোমার বুকের হৃদয়ে মোহের রসে মাখা।”

“তবে নাচার!”

“আমি তো তোমার কিছু বলচিনি! এ যে হবেই! তুমি যে তাকে ভাগবেসেছিলে,—কেমন করে ভুলবে; কেমন করে আবার আর একজনকে ঠিক তেমনি করে ভাগ-বাসবে।—সে কি হয়?”

“আমি জানিনে রাণি। তুমি আমার শরীর পাখর হয়ে আসতে, আমি একটু রেহাই দাও—”

“বেশ তো, বুঝো না তুমি! এ তো আর বর্জমান থেকে আসা নয় যে—না! আমার কপাল মন্দ,—কার যোব দেখো?”

একটা দুহুর্ন্তদণ্ডে বিছানার পড়িয়া অরবিন্দের নাসিকা গন্ধিরা উঠিল। আর জানালার নিকটে বসিয়া, তাহারই দরদে দাঁধা চাষিয়া, চোখ মুছিতে-মুছিতে ব্রজরাণী মনে-মনে বলিতে লাগিল, “এর চেয়ে যদি সতীনে নিরেণ্ড করতুম, সেও তের ভাল হ’তো। সে না হয় দুখনে ঝগড়া হোল,—ওঁকেও হুকথা চমকাল। এতে বলবার, যোব দেবার কিছু নেই। অথচ এতে তার উপরও অস্ত্রার, আর আমার উপরও অস্ত্রার। কিন্তু তাই বলিই কি আর আমি তাকে আন্তে হিতে পারি? না, সেও পারি না। এর সবটাই যোব। না গো! সতীনের উপর নাহব কেন বেরে যের?”

(১১)

ভাগলপুরে অম্ম, এবং উক্ত প্রবেশিকা দ্বানী এতবাধিয়া কর্তৃক প্রতিপালিতা উষাকে ছোটবেলায় ‘কবুতরি’ বলিয়া ডাকা হইত। এখনও মা প্রভৃতি কেহ কেহ তাহার উপরি-উক্ত বিশেষণটিকে একেবারে ভাগ করিতে পারেন নাই। পরিচালন করিয়া মনস্বার অগছন্দসই ওই নামটির বহন-তখন ব্যবহার করিয়া তাহাকে কেপাইয়া ভোগ্য ব্রজরাণীর চিরদিনের আখ্যায়িক। “আর ভিত্তি, আর, আর, আর—” ইত্যাদি বীথবিশেষের প্রতি প্রবেশ্য লম্বোদর-পথটি ব্যবহার করিলেই, যুব রাত্রে করিয়া হয় উবা সেখান হইতে চলিয়া যাইত, না হয় “বা— বা, ছুটকি,

অত আর বাহ্যিকের স্বভাৱে হবে না।” এই বলিয়া এক দুর্গল কলহের চোঁটা উপস্থিত করিত। ব্রজরাণীর বাণের বাড়ীর যে কী তাহার সঙ্গে আশিরাছিল, সেই তাহাকে বাড়ীর কনিষ্ঠা কন্যা পূর্ণাচা এই নামটিতে সম্বোধন করে। নিরুপায়া উবা আশ্বর্যকর ইহাকেই প্রতিশব্দের বিরুদ্ধে প্রক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ব্রজরাণী অতি শীঘ্রই একদিন প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, ‘ছুটকি’ আর ‘কবুতরি’তে আসমান-মন্মন্ ফরশ। অগত্যা রাগে গম্ভিরাও উবা এই অজানাব্যহার তাহার প্রতি পাচনের দেওয়া অভিপাতকে কোন রকমে হুম্ব করিয়াই চলিত। আর কাছে নালিসে ফল ফলে নাই। বাবার কাছে নালিসে ফল ফলিয়াছিল; তবে ফলটা কিছু কটু। তিনি অতি শিওরিতেও বোঝাযি সহ করিতে পারিতেন না। বউমার এই অশিষ্টতা উপলক্ষ করিয়া সেই হেতু কৃশিকা-প্রমায়ী বধু জননীই নিম্নার ভাগিনী হওয়াতে, ব্রজরাণী বৎপরে-নান্তি জুড় হইয়া আশিয়া, তাঁড়ার হইতে একমুঠি চাল আশিয়া উঠানে ছড়াইতে-ছড়াইতে, আকাশের বিকে চাহিয়া কণ্ঠিত পান্নাবতের উদ্দেশে গলা ছাড়িয়া আরম্ভ করিল, “আর ভিত্তি, ভিত্তি, ভিত্তি—”

উবা ছুটয়া আশিয়া—“বোধি কেন? বলিয়া গর্জাইতেই, সগর্জনে উত্তর হইল, “তুই কি পারা না কি? তবে আর, ধান খাবি আর।”

সেই অবধি ‘কবুতরি’র ঝগড়া প্রায় মিটয়াছিল; অর্থাৎ আর কখন এ লইয়া হারিকোটা হয় নাই। আর আবার সেই নামে আখ্যায়িক ননমকে ডাকিয়া ব্রজরাণী কহিল, “কবুতরি। সতীনে পড়ার মত অধর্ম বেরে-নাহুয়ের আর কি আছে বল দেখি?”

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে ‘পুন্মুহুরি’ ঝগড়া অনেকখানি করিয়া গিয়া, গাঢ় প্রণয়ে এই ছুটি সমবয়স্কার চিত্ত পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। যা নিজে কোন সময় ভুলিয়া গিয়া ছোটবেলায় নাম ধরিয়া ফেলিলে, সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠে—“তোমরা কি ওই ছায়ের নাম চার-কাল ধরেই করবে!—উবা বলতেই বা কতক্ষণ লাগে বাবু।” কিন্তু ইহাকে প্রায় কিছু বলে না। সে যুব গভীর করিয়া জবাব দিল, “তাঁতো বটেই। বীথি-বিশ্বির দত্ত চক্ৰবর্তী-দণ্ডী সতীনের সঙ্গে লড়তে ছড়ে—অধর্ম না।”

ব্রহ্মাণ্ডীয় মুখের ভাব হাসির উপযুক্ত না থাকিলেও, এ কথাই সে হাসিয়া ফেলিল। হাসিটাই বলিল, “ঠিক তাই হে, ঠিক তাই! এ আবাণী দুটোর মতনই দিন-রাত মনের মধ্যে সতীনের সঙ্গে যে কপট চলেছে, সে তোরা তখনতে না পান্, আমার নিজের কাণ যে তাতে কালাপালা হয়ে গেল।—না ভাই, সত্যি বলছি তোকে,—সতীনের ওপরে বাঁধা দেবে দেখ, তাহলে মড় দেয়ের শত্রু আর এ পৃথিবীতে কেউ নেই। তাহলে তাই বেশ, কোন জালা-কষ্টটি পোরাতে হয় না।”

“হিংসে হচ্ছে না কি? বড় পছন্দ হয় তো মিরে নে? না?”

“বদলে নিস্ তো রাণী আছি।”

“ধাঃ!—পোড়ামুখীর মুখে আগুন জ্বলতে শুরু!”

“তা না হলে আর লাভটা কি হলো? ইংরেজিতে যে বলে from the frying pan to the fire, ভাঙনা খোঁজা থেকে আগুনে পড়া—তাই হবে না কি? কেন, লাবা কি মন্দ?”

“তুই বল!”

“বেশ মজা আর কি! আমি বলি, আর আমার সতীন এসে বরকরা করুক।”

“সতীনের হিংসের মরবি নি? যদি সত্যি-সত্যিই মরণ আসে, তাকে ঠেকাবি কেনম করে বউ-দি? সত্যি তাই, তা হলে কি করবি, বল না?”

“তা, সে তখন দেখা যাবে। তুই তাই এমন কথাগুলো বামকা বলিসনে—তন্মূলে যেম প্রাণ উড়ে যায়। কথার বলে ‘খোয়াবী ঘমকে দেওয়া যায়, তবু সতীনকে দেওয়া যায় না।’ সে আবি তে পারবে না,—ভুল হবেও আগুনে বেড়াব।”

উষা ঈশং শিহরিয়া, ব্রাহ্মণ্যার ঈর্ষা—বিকৃত মুখের বিকে চাহিল।—“নাগো! এমন কথা তোর মুখ থেকে বেরলো • কি করে? সত্যি কি সতীনের উপর অন্তই হিংসে হয়?” ব্রহ্মাণ্ডীয় সতীর তিরস্কারে সজ্জিত না হইয়া, সত্য মুখে মূলপাঠা কথিতা-পুস্তকের বাণ্যগঠিত কবিতাংশ আয়ত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—

“চির-সুখী মন

তবে কি কখন

যাবিত বেদন ঘূর্ণিতে পারে?

কি বাতনা বিবে, ঘূর্ণিতে সে কিলে,
কতু আশিবিবে যংশনি ধারে।”

উষা একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, শুধু ছোট করিয়া বলিল, “কে জানে তাই!”

ব্রহ্মণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, সে নিঃশ্বাসটা মনমা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও তপ্ত। এগার না হাসিটাই বলিল, “জান্নবিনি কেন, জানে সবাই! মনে করে দেখ দেখি,—ছোট্টা-কুর-ধামাই আর একজনকে নিয়ে হাসছে, কথা কইছে,—তোর ঘরের বাটের বিছানায় দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছে,—ঠাকুরজামাইকে মধ্যে-মধ্যে আদর করছে,—তোর—”

“ধাঃ—” বলিয়া এই অপরিগ্রহাধীনীর পৃষ্ঠে উষা একটা ছোটখাট কিল বসাইয়া দিল।

“কেন গো!—যারো কেন? ছবিখানা কেন লাগছিল? মন্দ না?”

উষা লজ্জা-কুণ্ঠিত সরল হাতে স্বীকার করিয়া লইল যে, ভাল লাগে নাই। তার পর অপরূপ নীরবে কি চিন্তা করিল, কিছু বিশ্বস্তের সঙ্গিত করিয়া উঠিল, “আজ্ঞে, একটা আমার বড় আকর্ষণ লাগে,—আমরা একটা সতীন সহিতে পারিনে; আর দেখাশোনার সোজসোজ অন্ত-অন্ত সতীন সহিত কি করে? তর্কোক্তি, শুধন কুলীন বাসুন-কারেতের ঘরে,—বিশেষ বাসুনের একশো, একশো-আট পর্বাণ্ড বিয়ে হতো। তা আমাদের ঘরেই তো তিনজন বাতুড়ী ছিলেন।”

ব্রহ্ম বলিল, “কি আর সহিতো? বাসের অন্তগুলি করে কিং, তাহলে তো ওটা বিয়ের হিসেবে ছিল না,—বাবলার লাগিল ছিল। বউকে ঘরেও আনতো না,—তা ঘরই বা তাহদের কোথার? নামা-ঘরেই ত মাথু। বছরে দু’একবার পাওনা আদার উপলক্ষে প্রত্যেক স্বস্তরবাড়ী পারের মুলার সঙ্গে খ্রী-বেচারিকে কুর্ভার করে আসতেন। একমুখে মাথা ফুড়ান,—কে কার হিংসে করে। চাক্ষুষ পর্বাণ্ড কখনও হয়ে ওঠে নি।”

“যারা দু’তিনজনে বরকরা করতো, তেমনও তো ছিল,—সবাই ত আর ‘একপতা’ নয়। এই যেমন আমাদের ঠাকুরমায়েরা।”

“তা, ভারাই যে খুব গলাগলি ক’রে বসে থাকত, ভারই বা প্রমাণ কি? ভারাই ওই বগী-বিকারী আশ্রম।”

এ খৃস্ট খ্রিস্টের কোন বিরুদ্ধ নতীর কামা না থাকায়, উবা অসত্য। হারি মানিয়া চুপ করিল। কিন্তু ত্রুতক সঠানে পাইয়া রাখিয়াছে,—সে এমন মুখশ্রীর আলোচনা এত অকস্মৎ তাগ করিতে পারে না। সপতীর তথ্য সে বেন মতিয়া উঠে। সামান্য অণুচুপ করিয়া থাকিয়া, বেন বিরুদ্ধ পক্ষের সূক্তি স্বপ্ন করিয়াই, সে নিজের সপতীরে অল্পপারতা প্রদর্শন করিবার কতই বলিল, “আবধমান কান থেকে খুঁজে দেখ, সতীন সইতে কেউ কোনদিন পারে নি : দ্রোপদী,—যার পাচ-পাঁচটা স্বামী, সে যেহেতু—অর্জুন যখন ত্রুতকে বিয়ে করে আনলেন,—তখন বউ ত্রুতে বরণভাণ : সামান্যে বসেনি। একটা দিনের মত দেখা হয়েছে কি, অমনি হিড়িম্বার সঙ্গে ছুটোপুটী লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন কি, ছদ্মনে চুলোচুলি হ’তে-হ’তে কটাকটু ছেলেগুলোয় মাথা পর্যায় খেয়ে বসলেন। তার পর হুমীতি-সুজতি, দেবদামী-শর্পিষ্ঠা কতই বলবে, পুঁথি বেড়ে যায়।”

উবা কহিল, “তা পুথানে ও-সব অনেক আছে। কৈকেয়ী সতীনটোও কাকুর চেয়ে কম নয়। কিন্তু ভারাই বরিষ বাবুর বইতে—”

“ভাই বা কি? সূর্য্যমুখী কি সতীনকে বড়ই ভাল-বেসেছিল? সতীনের ভয়েই তো ত্রুতলোকের মেয়ে দেশত্যাগী হ’লো!”

“কিন্তু সাগর-যৌ, নয়?” “নন্দাও সতীনের প্রেমে মগ্ন হইবে তিচ্ছই করে নি। কর্তব্য-বোধটা তার একটু বেশী মজার থাকায়, ভারই তাড়া খেয়ে যা কিছু করেছিল। ঐ যে ভারই মুখ দিয়ে লেখক বলিচ্ছেন ‘সতীন মরিগেই ভাল; কিন্তু—’ ঐ কিস্টটোই সে বেচারাকে সতীন-কাটা গলা থেকে নামতে ছাড়নি।” “থরে নিলুম। কিন্তু সাগর-যৌ? সে যে নিজে কোণাড় করে নিজের ঘরে ‘সতীনকে’ স্বামীর কোলে তুলে গিলে। ওহু কতটুকু ঘেরে সে তখন! তের-চৌদ্দ বছর বই তার বয়েস না। সাগর কত ভাল ভাই!”

“সংসারে ক’জন সাগর হতে পারে।” তাঁর অতগুলি নাহিকার মধ্যেও তো ঐ এঘটা সাগর। অমনট আর কই?”

“তা হলে তুমি সেই বালগেটা নয়নতারা?”
ত্রুতরাণী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—“হা! তা বই কি! কেন, আমি কি তেজ্জি কালো, না আমার গাত তেমন উঁচু?”

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[শ্রীঅন্যথা বহু]

পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় বশোহর দেশায় কোন মহৎস্বায় জটনক নৃত্যপীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক একটা প্রীলোকের লক্ষ্যনিষ্ঠার হানি সংঘে একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহৎস্বা ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম কিন্তু প্রকাশ করা হয় নাই। অস্টেট ম্যাজিষ্ট্রেট মিটার ওকিনিশীর বেহু ব্রার্ক বাবু ব্রাহ্মকুমার ডেপুটীর উক্ত কাহিনীটি অতি তীব্র ভাষায়, বিবৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অন্তত্বাধার পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পত্রিকা পাঠ করিয়া মিটার মনুরো প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা জানিবার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। “ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষসংগণের মত,” যে সংবাদপত্র এই মত প্রসব করিয়া থাকে, তাহার ধারণ-সাধনের মত বেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি ব্রাহ্মকুমারসংগণ যে সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এইবার তাহা প্রাপ্ত হইলেন। পত্রিকার নৃত্যপীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম অপ্রকাশ থাকিলেও, কিনাইবহের সবডিভিশনাল অফিসার রাইট সাহেবের দ্বারা, মিটার মনুরো অনুত্বাধার পত্রিকার পরিচালকসংগণের বিরুদ্ধে আদালতে এক বোঝান্দা কছু করাইলেন। প্রকৃত লেখক কে, তাহা স্থির করিতে না পারায়, শিশির-কুমারের সহিত তাহার পরিবর্তন সকলকেই আসামী করা হইয়াছিল। শেষে মতিলাল ও ত্রুতহার একজন

পুস্তকাত্মক বুদ্ধি দিয়া সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া মেসের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল। শিবিরকুমারই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মতিলাল ও তাঁহার পুস্তকভাণ্ডারের সহিত মশোহরের বহু উকিল, মোকদ্দম, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হুদুগে ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষকগণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। পত্রিকার প্রিন্টার চন্দ্রনাথ দাস ও বাবু রামকৃষ্ণ হিজ্জেক ও আগামী করা হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ বাবু নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর নিকট অসহায় করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হুদুগেীর ডেপুটীর বিরুদ্ধে পত্রিকার-বে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। এ সংবাদ ক্রমশঃই রাষ্ট্রে হইয়া পড়িল; শেষে গভর্নমেন্ট হানিতে পারিয়া রামকৃষ্ণকে আগামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপঞ্চে বিচাররূপে তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। মোকদ্দমা রুজুর পর, দেবরকুমার কলিকাতার আসিয়া উকিলদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের মোকদ্দমার বিচার-ভার মশোহরের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট মিটার ওকিনিজীর হস্ত হইতে অন্য কোনও এক বিচারপতির হস্তে প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে এক আবেদন করিয়াছিলেন।

মোকদ্দমাটা বেন শিবিরকুমার ও গভর্নমেন্টের মধ্যেই হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিটার হুদুগে তাঁহার সহযোগী মিটার ওকিনিজীর উপর বিচার-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ওকিনিজী একদিন শিবিরকুমারকে বলিয়াছিলেন, “শিবির, এবারে তোমাকে নিশ্চয়ই বেলে দিছি।” হাসিতে-হাসিতে শিবিরকুমার উত্তর করিলেন, “যেহা যাযে; কিন্তু তেই পারবেন না।” ওকিনিজী একদিন বেলে পরিদর্শনে গমন করিয়া জেলায়কে বলিয়াছিলেন “শিবিরকুমার ঘোষ ঈশ্বরই বেলে আসছেন, তাঁর জন্তে বেন একটা ব্যাটিক করে রাখা হু।” কোন-কোনও কর্মচারী খেয়ালের বশবর্তী হইয়া মধ্যে-মধ্যে যে অস্তায় কার্যের জট্টান করেন, অস্তায় অন্য গভর্নমেন্টেরই দূর্যাস হইয়া থাকে! শিবিরকুমারকে বেলেপেই হটক কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া বাধী পক্ষ হইতে বিশেষ তদ্বির করা হইয়াছিল।

যাহাদের উদ্দেশ্যে এই মোকদ্দমার স্থল, তাঁহারাওই যখন বিচার-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন শিবিরকুমারের কাঁচা-বাস অনিবার্য্য তাবিহা বশোহরবাদিন্দ উৎকলিত হইয়া-ছিলেন। শিবিরকুমারের দহিত ওকিনিজীর প্রগাঢ় বন্ধু ছিল; সেজন্য তিনি মতিলালকে দখটে ধেহ করিতেন। বিচারের সময় একদিন ওকিনিজী মতিলালকে বলিয়া-ছিলেন, “জুই রামকৃষ্ণের নাম কর না, তাহেলেই তোরা সব খালাস পাবি।” কিন্তু মতিলাল অচল, অটল। হেমন্ত-কুমার হাইকোর্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের বিচার-ভার দায়িত্ব-ভাণ্ডের উপর অপিত হইয়া-ছিল। ওকিনিজী আগামীগণকে বোঝা দাবাত-করিয়া শান্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় হাইকোর্টের আদেশ তারযোগে তাঁহার হস্তগত হয়। হাইকোর্টের আদেশ পাঠ করিয়া রাগে ওকিনিজী কাপিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিয়া উঠিলেন, “এ মেথিতেছি হেমন্তর কাজ। আচ্ছা, দেখি কে আগামীদের রক্ষা করে।”

দায়িত্ব-ভার মিটার লফোর্ডের উপর বিচার-ভার অর্পণ করা হইল খটে, কিন্তু তিনিও শিবিরকুমারের প্রতি সদয় ছিলেন না; কাএদ তাঁহার সহক্ষেও অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে মধ্যে তাঁর মন্তব্য প্রকাশিত হইত। এই সময় তিনি বিচার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার স্থলে মিটার লাইউইন্স (Mr. Lewis) দায়িত্ব-ভার নিযুক্ত হন। নির্দিষ্ট দিবসে মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়া তিনি শিবিরকুমারকে বলিলেন, “বাপীগণ আর প্রস্তুত নহে, সেজন্য মোকদ্দমা অন্য একদিন হইবে।” শিবিরকুমার সমস্তই বুদ্ধিতে পারিলেন। বিচারের পর লফোর্ড গোদানন করিয়া বিচার করিবেন, বাদীপক্ষের এইরূপ ইচ্ছা ছিল। কয়েকদাল মোকদ্দমা স্থগিত রহিল। মিটার লফোর্ড বিচার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। শিবির-কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু গভর্নমেন্টের উকিল বাবু দক্ষিণা-প্রদায় বহু তাঁহার বিপক্ষে এবং হুগুন্দি ব্যারিষ্টার বাবু মনো-মোহন ঘোষ তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার হওয়ার পর মনোমোহনের এই সর্বপ্রথম মোকদ্দমা। একজন কঠিন মোকদ্দমার মণ্ডিত হইলেও শিবিরকুমার বিশ্বাস্য বিচলিত হন নাই। অমৃত-বাজার পত্রিকা প্রচারিত হইবার কয়েক দিবস পরেই তাঁহার

সহধর্মী একটা পুস্তকখান রাখিয়া ইহাৎ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভগবানের লীলা ভগবদ্বদ্য করা মানবের সাধ্যাতীত। শিশিরকুমারের সাতনা-দশ সেই মাহুতীম শিওটিকেও ভগবান করেক দিন পরে শিশিরকুমারের দ্বয় অন্ধকার করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন। শিশির-কুমার স্বামী; সংসারের চিত্রা তাঁহার দ্বয় হইতে এক-রূপ দূর হইয়াছিল। মোকদ্দমার অস্ত তাঁহার আত্মীয়-বন্ধন, বন্ধুবর্গ ও বৈশ্বাসিগণ চিত্রিত হইলেও তিনি বিমু-মাত্র বিচলিত হন নাই। বালাকাল হইতেই ভগবানে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই, শিশির আপনাকে নির্দোষ জানিয়া, মোকদ্দমার তর লাভ করিবেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক হাজার টাকার জামিনে থালাপ ছিলেন। দ্বয়সময়ে আদালতে উপস্থিত না হইলে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং ওয়ারেন্ট বাহির হইবে, এককল কথা জামিনাও শিশির আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ব্যস্ত হইতেন না। মোক-দ্দমার সময় একদিন আদালতে থাইবার কথা জুগিয়া গিয়া, তিনি একটা সন্ধ্যা রতনা করিয়া, তাহাতে দ্বয় সংযোগ পূর্ণক আশাপ করিতেছিলেন। শিশির বাহ্যিকভাবে বোকাইতে-বোকাইতে গুন্-গুন্ স্বরে গান করিতেছেন, আর গানের এক-এক পদ খড়ি বাধা দেওয়াতে লিখিতেছেন। তাপা-ক্রমে আদালতে রওনা হইবার পূর্বেই গানটা শেষ হইয়া-ছিল; ত্রয়ো সেন দিন হয় ত তাঁহার আর আদালতে যাওয়া সম্ভবিত না; এবং সঙ্গে-সঙ্গে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইত। গানটা আদরা নিরে উচ্চুত করিয়া—

“আমি যেনেছি পিতা আমি তোমার সন্তান।

আমি যেনে শুনে বলে আছি আপন মনে কুতূহলে

আর কে আমারে পায়

সংসারেরি দ্বয় দূর করেছি।

এখন চরণ সেবি তোমার, গুণ গাই সার মনে।

যদি কেপেতে ধর, মারিবে মার,

আমার ত্যজে কতি কি!

ও বাপ্, যেন আমার কাছে

তোমার প্রেয়ার দিষ্টে লাগে।

যদি ক্রোধ করি চাও, আমার তর নাহি ধর,

আমি তোমারি সন্তান।

তোমার রাগে যাদা পদ্য চক্ষে

বহে যেখি প্রেমদাগত,

মারে সন্তানে মারে, সন্তান কাঁদে ছুঁকারে

আর বার কোলের ভিতরে।

ও বাপ্, এবে মারো, পরে দিবে শত চুবন বসনে।”

মিটার মনরো ইতোমধ্যে ক্রকনগরে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য বশোভয়ে আগমন করিয়া, আদালতে একথাখানিও পত্র দাখিল করেন। পত্রখানি শিশিরকুমার তাঁহাকে শিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, সেই পত্র হইতেই তাহা প্রকাশ্য করিবার জন্য মিটার মনরো বখেট চেষ্টা করিয়াছিলেন। নীলকর সাহেবও অজান্তে বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল; কিন্তু শিশির যে পত্রিকার সম্পাদক, তাহা সপ্রমাণ হইল না। পত্রমেম্বের পক্ষ হইতে মতি-লালকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স বিশ বর্ষের অধিক নহে। তিনি ইংরেজীতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধমক দিয়া, সেবে রাগাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এই মোকদ্দমার পূর্বে ছাপা-খানার ঘোষণা (declaration) দেওয়া হয় নাই বলিয়া শিশিরকুমার প্রজুডিকে একবার অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার সময় মতিলাল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুতাত চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। এই মোকদ্দমার সময় জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক কে?”

মতি। ইহার কেহ মালিক নাই, ইহা সাধারণের কাগজ।

জজ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি পূর্বে এক মোকদ্দমায়, নির আদালতে বলিয়াছ যে, চন্দ্রনারায়ণ মালিক; এখন বলিতেছ কেহই মালিক নহে। তোমার কোন কথা সত্য? আমি তোমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করিব।”

মতি। মিথ্যা লাক্ষ্য দিলে আপনি অভিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু আমি মিথ্যা লাক্ষ্য দিতেছি, আপনি কিরূপে জানিলেন?

জম। তুমি নিম্ন আদালতে এক কথা বলিয়াছ, এখানে আর এক কথা বলিতেছ। তোমার কোন কথাটা সত্য?

মতি। আমার দুই কথাই সত্য।

জম। তবে বড়ই ভাগ করিয়া বলিলেন, “কি রকম?”

মতি। “চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র যে দুইটা পৃথক জিনিস, এ কথা আপনি তুলিয়া বাইতেছেন কেন?” মতিলালের জবাব শুনিয়া জম সাহেব অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইলেন। তিনি পুনরায় মতিলালকে মিথ্যালা করিলেন, “অমৃতবাখার পত্রিকার সম্পাদক কে?”

মতিলাল। অমৃতবাখার পত্রিকা হাজি কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং কে যে তাহার সম্পাদক হইবেন, তাহা স্থিতিকৃত হয় নাই।

জম। যদি তাহাই হইবে, তবে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ভ্রাতৃলোকগণ শিশিরকুমারকে সম্পাদক বলিয়া মনে করেন কেন?

মতিলাল। তিনি একজন স্থলপেক বলিয়াই বোধ হয় সাধারণে তাঁহাকে পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া মনে করেন।

শিবিরকুমার স্থলপেক,—কথাটা জম সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও যে শিবিরকুমারের ভ্রাতৃ লেখক এদেশে আর নাই?”

জম সাহেবের ভাব যেমিরা মতিলাল হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “তাঁহার ভ্রাতৃ লেখক এ দেশে আর নাই, এ কথা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমার বোধ হয় যে, শিশির বাবু অনেক বোটা মাথিনার দিবিগিরান • অগেকা ভাল লিখিতে পারেন।”

নির্ভীক বৃদ্ধ মতিলালের এই উত্তর শুনিয়া আদালতে উপস্থিত সাহেব ও ভ্রাতৃলোকগণ ভস্মিত হইরাছিলেন। কোথো বিচারপতির যুগ্মাধি রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি কোথ সঞ্চরণ করিয়া পুনরায় মিথ্যালা করিলেন,—“এবমতী কে লিখিয়াছিল?”

মতিলাল। তা আমি জানি না।

জম। তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি স্বরণ করিয়া দেখ।

মতিলাল। কি স্বরণ করিব?

জম। তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে।

জম সাহেব খড়ি খুলিয়া বসিয়া বহিলেন। মতিলাল নীরব। পাঁচ মিনিট অস্ত্রে জম সাহেব মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে লিখিয়াছে বল।”

মতিলাল। আমি জানি না।

জম সাহেব রাগে টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই জান। তোমাকে বলিতেই হইবে।”

মতিলাল মুচ-মুচ হাসিতে-গদগদে বলিলেন, “আপনার মনস্তত্ত্বের গুণ আমি ত কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারি না।”

অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন শিশির ও তাঁহার সহোদর-পুত্রের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না, বিচারপতি তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ব্যাংকিয়ার মনোমোহন মতিলালের লাক্ষ্য প্রদানের চক্ৰবর্তী ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কন্ডমর্দন পুঙ্কব বলিয়াছিলেন,—“এ মতির ছুড়ি পাওয়া ভার।” বাহাদুরের একান্ত যত্ন ও উত্তোষে এই মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারা পূর্ণকায় হইতে না পারিয়া বকুই মনঃস্বর হইয়া ছিলেন। পত্রিকার প্রিণ্টার ও রামকৃষ্ণ বাবু বিনাম্রমে যথাক্রমে ছয় মাস ও এক বৎসর কারাগারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বাবু যে বীর নির্ভীকতার গুণই বিপদ-মাগে লভিত হইরাছিলেন, পাঠক তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ বাবু মুক্তাঙ্গীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটী লিখিয়া যখন অমৃতবাখার পত্রিকা অফিসে প্রেরণ করেন, শিবিরকুমার তখন ঘাষণা করেই ছিলেন। আদালত-প্রার্থী হইলে, রামকৃষ্ণ বাবু ভীত হইয়া, শিবিরকুমারকে তাঁহার ‘বাকরিত’ সেই প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করিতে অজরোপ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিবিরকুমার হয় ত বীর নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার গুণ সেই পাণ্ডুলিপি আদালতে দাখিল করিবেন। কিন্তু শিবিরকুমারের ক্ষম্যে এরূপ নীতির স্থান ছিল না। রামকৃষ্ণ বাবু যদি অঙ্কার করিয়া পক্ষের নিকট প্রবন্ধ-

লেখক বলিয়া আপনায় পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও বিপদ হইত না। শিশিরকুমার সেই একদমের দায়িত্ব বহী ত্যক্তই গ্রহণ করিতেন। প্রবন্ধটী নতিশাসনের নিকট ছিল। তিনি শিশিরকুমারের নির্দেশ-মত বাহা লোক-মারফত মাগরা হইতে বশোহরের প্রেরণ করেন। শিশিরকুমার বাড়ীতে না থাকা, তাঁহার খুশতাত চন্দ্রনাথগণের হস্তে প্রবন্ধটী পতিত হয়। চন্দ্র-নাথগণ যোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের অন্ত প্রবন্ধটী ওকিনিলাকে দিবার উপক্রম করেন। শিশির-কুমার তাহা জানিতে পারিয়া, খুশতাত মধ্যাংশের নিকট হইতে জোর করিয়া প্রবন্ধটা কাড়িয়া লইয়া, রাতকুকুবাথকে প্রদান করেন। আট মাস কাল যোকদ্দমা চনিয়াছিল। যোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইলেও শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ সর্বস্বান্ত হইয়া ধ্বংসলাভে অভিভূত হইয়াছিলেন। রাতকুকুবাথ কারাবাসের সময় জেলে বসিয়া হোমিও-পাথিক চিকিৎসা গ্রহণ অচাচন করিয়াছিলেন। মুক্তি-লাভের পর তিনি কণিকাভার একজন প্রতিদ্বান্দ্বান হোমিও-পাথিক চিকিৎসক হইয়া গৃহে-সঙ্কল্বে শেব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের যোকদ্দমার জ্বরভাতের সংবাদ ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। তাঁহার মুক্তিলাভে দেশবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। শিশিরকুমার এই যোকদ্দমার একরূপ সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই যোকদ্দমার পর হইতেই পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাঁহার আর্থিক অবস্থানলাভা ক্রম-পরিবর্তন দৃশ্য হইয়াছিল। অনুভবাত্মক পত্রিকার প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে যে বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, তাহা তৎকালিক অন্ত কোন সাংবাদপত্রে দেখা যাইত না। যবেদ-প্রেমিক সম্পাদকের দ্বারা যে যবেদ সেবার আকাঙ্ক্ষা লাগিয়া উঠিত, পত্রিকার প্রত্যেক পংক্তিতে তাহার অভিযুক্তি লক্ষিত হইত। ভারতবর্ষ যে আমাদের দেশ, জননী জন্মভূমি প্রতি যে আমাদের একটা কর্তব্য আছে, অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য না করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করা যে যবেদ-হিতবীর কর্তব্য, শিশিরকুমারই সর্বপ্রথমে ইহা দেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন। প্রকৃত রাজনীতিক আন্দোলন বাহাকে বলে, শিশিরকুমার যে

তাঁহার একজন প্রধান প্রবন্ধক ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুভবাত্মক পত্রিকার প্রবন্ধলেখকের কোনও অন্তরে কার্যের ভিত্তি সমালোচনা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হইতেন না। কণ্ঠস্বাধিপণের অন্তরে কার্যের প্রতিবাদ করিয়া শিশিরকুমার বীর পত্রিকার একমুখী বিদ্রোহকে প্রবন্ধ লিখিতেন যে, বাহাদুরগকে লক্ষ্য করিয়া তাহা লিখিত হইত, তাঁহারও তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে অনুভবাত্মক পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পাঠক! এই সময় বশোহরের নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং শিশিরকুমারকে কিরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়া বীর জীবন গঠন করিতে হইয়াছিল, আমরা তৎসময়ে এখানে দুই-একটা কথা উল্লেখ করিব। ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশে তখন মদিরা-সেবন-প্রথা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাহারা দুর্য্যাপান করিতেন না, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে অশিক্ষিত বা অল্পতর বলিয়া দৃঢ়া করিতেন। শিশিরকুমার এই অল্পতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অশেষ শ্রমের অধিকারী হইলেও, তিনি মদিরা স্পর্শ করিতেন না বলিয়া, বশোহরের ইংরেজীনিবাসগণ—বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুদেবক প্রভৃতি—তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিশিরকুমার ইহাতে বড়ই ভ্রমিত ছিলেন। এই সময়ে কবির নবীনচন্দ্র বশোহরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমরা তাঁহার “আমার-জীবন” নামক আত্ম-কাহিনী হইতে একটা ঘটনা উদ্ধৃত করিলাম; পাঠক তাহা হইতে বশোহরের নৈতিক অবস্থার কথা বৃথিতে পারিবেন। “একদিন ওভারসিয়ার দানার বাড়ী নিমন্ত্রণ। নৃত্য শিল্পের তরঙ্গ আশোষ উৎপাদিত পড়িতেছে। এমন সময় আর একজন পূর্ণবিভাগীর প্রত্ন—এ ডিপার্টমেন্টের বক্তাব্য—ঊৎসাহ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—‘বাবা! নাকী বসিয়া গিয়াছে।’ নৃত্যশিল্পী বামিয়া গেল। সকলেই বেথিলার* যে তিনি নাকী ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর কাঁদিয়া বলিতেছেন তাঁহার গ্রী-পুস্ত্রের কি উপায় হইবে। বঙ্গা বাহাদুর যে তিনি দুর্য্য-অন্ধকারে কিং অতিরিক্ত সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডিপার্টমেন্টের নামই D. P. W.—Department of Prostitute and Wine, কিছু

বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, 'তাঁহার' নাকী হারা-প্রবাহে সতেজ চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের দৃষ্টিও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটাইয়াছে, তাঁহার পরিবারবর্গের অনাব হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি ততক্ষণ সজ্ঞান ছিলেন, ততক্ষণ এক একবার—'বাবা! নাকী বসিয়া গিয়াছে'—বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাঁৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। আহার করিতে অনেক রাত্রি হইল। আমি ও ডাক্তারিয়ার দাদার কাছে গুইয়া রহিলাম। ইন্সপেক্টর দাশাও আমাদের সঙ্গে গুইলেন। অতি প্রত্যুষে কঁপাটে আবার শুনিয়া আমি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখি গামছা পরিহিত ইন্সপেক্টর দাশা। টিক বেন মড়া পোড়াইয়া আদিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ পৈতাধিক। অল্পতর করিয়া ধোয়া হইয়া দেখিলেন যে, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে বেরণ বস্ত্রহীন তাহে তৃতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, টিক সেই অবস্থায় একটা বড়ই অস্থানে পড়িয়া আছেন। বহু অধেষণে একবার গামছামাত্র পাইয়া অশ্রীপত-নিবারণী সভার হস্ত হইতে কোনও রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়া চলিয়া আদিয়াছেন। নিদ্রিত বন্ধু নওনী ধাত্রত হইয়া তাঁহার সেই মূর্তি দেখিলেন, আর একটা হাদির তুফান ছুটিল। আমাদের পার্শ্ব দখা হইতে তাঁহার সেই অশ্রীভিকর স্থানে কিরূপে যে নৈশ অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাও এক প্রকার বোমের ফল—মস্তিষ্কের সহিত মস্তিষ্কার বোম। সেই D. P. W. মহাশয় বলিলেন—'আমার নাকী উড়িয়া গিয়াছিল। তুমি বাবা! সন্ন্যাসী উড়িয়া গিয়াছিলে। আমার নাকী-হরণ; আর ভোমার বস্ত্র-হরণ।' এইরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়াও শিশিরকুমার আপনাকে নির্দোষ রাখিতে পারিয়াছিলেন। কেবল বশোহরের নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে তখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যুগ্মগণের কিরূপ ভীষণ পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য পরব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বোধিপ্রসাদ বসু কবিত্ববর্ণন মহাশয়ের মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—'বাণীনা আর্থে বেকাচার ও সংস্কার আর্থে সম্মোহপাটন, এই তাঁহার দুবিধা লইলেন। পূর্য্যপেক্ষ তৈজস কোটি সেবতার উজ্জ্বল করিতে বাইরা তাঁহার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সবচেয়েও সন্দিহান

হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহস্রশ প্রকার ভাষা কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহার কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। হুয়াশ্বন, গোমাংস ভক্ষণ, এবং ধবনীর প্রলেপ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার সমাজ-সংস্কারের পরাক্রান্ত বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও-কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে, পুণিবীতে যখন 'গোবাদক' জাতিরাই অপর সকল জাতির পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও 'গোবাদক' না হইলে তাহাদিগের উন্নতির আশা নাই।' এই অদ্ভুত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহার ত্রুটি করিতেন না। সকলে বলবৎ লইয়া গোমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক, কখন-কখন প্রতিবাদাদিগের গৃহে কৃত্য-বশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল অচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নিষিদ্ধ, তাহারই অমুচ্যন করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বশের) পরিচয় দিতেন।"

শিশিরকুমারের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহাকে অবশেষে সহিত তর্ক ও প্রভা করিতেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন, "বশোহরে লিখিত আমার বক্তৃতা-কবিতার ও গলাশির মুগ্ধে বাণীব্যবহারে জন্ত যে নিঃশাস ও মাতৃভূমির জন্ত অশ্রুসিদ্ধান্ত আছে, তাহা কথকিত শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ-প্রদর্শক।" বশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ ও শিক্ষকগণের সখা লাভের জন্য শিশিরকুমার এই নবীনচন্দ্রের শরণাগত হন। শিশিরকুমার একদিন নবীনচন্দ্রকে বলেন, "আমার শরীর এই, মন বাইলে আমি মরিয়া যাইব। তাই বাই না। আজ্ঞা একজন চোদনও মন আছে বাহা বাইতে জ্বাল, নেশা হয় না, বুক জ্বালা করে না?" তিনি যখন শুনিলেন যে "রোম লিকার" হুমিষ্ট ও দেশাত্মবোধ, তখন তিনি তাহাই এক বোতল আনাইলেন এবং একদিন নবীনচন্দ্রের বাসায় বসিয়া একটু মুখে দিয়া বলিলেন, "মবী, চল বাওরা হাক।" তাঁহার উত্তরে স্থানীয় বিভাগস্বরের প্রধান শিক্ষকের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে বেশ একটা আড্ডা জমিয়াছে। শিশিরকুমার সকলকে বলিলেন, "নবীনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি এখনই তাহার বাসায় যাব

হাওয়া আসিতেছি। বল, তোমরা আর আমাকে চুপা করিবে না।” বিভাগলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়—ছাত্রদের চিত্রে পঠন ঘাটার প্রধান কার্য—“ত্রাতো শিশির” বলিয়া খুব একটা বাধা দিলেন। তখন শিশিরকুমার ব্যতীত সমবেত সত্যমণ্ডলী হুয়া-হুনারী দেবার উন্নত হইয়া উঠিলেন। শিশিরকুমার স্বীয় লম্বা সর্দীতে সকলকে হুহু করিলেন।

বিষয় চিরদিনই বিপদের অঙ্গুসরণ করিয়া থাকে। মানবানির বোকদমার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শিশিরকুমার পুনরায় এক নূতন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে বেঞ্চপেই হটক রমন করিতে হইবে, তাঁহার পরিচালিত অনুভবায় পত্রিকা বিন্ধি করিতে হইবে,—ইহাই তদানীন্তন রামপুঙ্খবর্ণের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। প্রথম বোকদমার আর্থ-মনোরণ হইয়া তাঁহার শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে এক অভিযন অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় তে, ওয়েষ্টলাও এই সময়ে বংশধরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পুনঃ-পুনঃ তলব করা সত্ত্বেও শিশিরকুমার মানবানির বোকদমার সমর রামপুঙ্খ বিরুদ্ধে গিথিত প্রবন্ধটি আদালতে দাখিল না করিয়া সাক্ষ্য গোপন করার তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। মতিলালকে এ বোকদমারও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে পূর্বের ভ্রায় এবারও বিশেষভাবে জেরা ও শেবে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। শিশিরকুমার এবারও মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি কিশোরী-

বাবুও কলকাতার প্রসিদ্ধ উকীল বাবু ভাট্টাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এই বোকদমা পরিচালন করিয়াছিলেন।

স্বীয় গ্রামে বাহা তাল না থাকায়, শিশিরকুমারকে ইহার পর বাধা হইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। বর্তমানের ভ্রায় তখনও বংশধর ম্যাজিষ্ট্রেটার আধাসভুনি ছিল। পরিবারবর্গ ম্যাজিষ্ট্রেটার আক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া শিশিরকুমার ১৮৭১ খৃঃ অব্দের পঞ্চমাসে (সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে) সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন। যে জন্মভূমি অনুভবায়াকে তিনি বহু বর ও পরিগ্রহে একখানি আদর্শ পল্লী করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাহা পরিভ্রাণ করিবার সময় শিশিরকুমারের জন্ম বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কলিকাতায় আসিবার সময় পত্রিকার গুণ-পরিশোধ জন্ত ছাপাখানায় বাবতীর সন্ন্যাস দাশ্যহরের একজন গুপ্তদোষকে বিক্রয় করা হইয়াছিল। শিশিরকুমার রিক্তহস্ত, স্তব্ধতাঃ হ্রস্ব দিবার অসীকারে তাঁহাকে জটিল মহাভয়ের নিকট হইতে একশত টাকা গুণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মতিলাল খুদার অন্তর্গত পীলজহের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকতার কার্য করিয়া যেতন হইতে যে দুইশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সেমনারায় হস্তে অর্পণ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট নিকট টাকা সঙ্গে লইয়া শিশিরকুমার যুৎ পরিবারসহ কলিকাতায় আগমন করিয়া বটবাজারে ৫২নং বিহারায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দিল্

[ত্রিনিশিকান্ত সেন]

পক্ষর বাঁচিয়া থাকিতে ছোট ভাই মহারের সঙ্গে সচাবহার করে নাই; এমন কি, কখনো-কখনো লাঠাল্যাগিও করিয়াছে; কিন্তু হইলো কি হয়, সে মায়ের পেটের ভাই যে! তাহার পর আরো একটা কথা—মাত্র বাঁচিয়া থাকিয়া যদি শত্রুতাও করে, তাহাই বা মন্দ কি; যদিও গেলে যে সবই হুয়াইল, তখন আর তাহার উপর যাপ কিসের? হাতেম তাহার সেই বড় ভাইয়ের পুত্র।

ছেলেটার কি নহিবে! আর তার মায়েরই বা কি প্রশ্ন! বিধবা চইতে-না-হইতেই বা ছর-গাভ বহুরের? এই ছেলেটাকে রক্তশোষী বৌকের যত টান মারিয়া কেদিয়া দিয়া, কোথায় যে উণ্ডাও হইয়া চলিয়া গেল, কেহ জানিতও পারিল না। এই গিহুইল মাতৃ-পরিভ্রাণ শিশুটিকে দেখিলে পরের চোখেই জল আসে, তাহা—মহারের কাহা পাইবে বিভিন্ন কি? *

কিন্তু ছেলোটাকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেও যে পেট চলে না! বিষয় আশ্রয়, ভবিষ্যৎ, চাষ-বাগ নাই। সোণাপাড়ার চৌধুরীদের কাছারীতে তাহাকে কান করিতে হয়। এই ইঙ্গিতগুলি হইতে সে প্রায় তিন-চার দিনের পর, —মনে করিলেই যে বাড়ী-ঘরের সুখ সেবা ঘাইবে, এমন নহে। বিখ্যাত বসিয়া তাহার উপর মনিবের একটু নেক-নম্বরও আছে। কাজেই, বরোয়ানগিরি হইতে দূর করিয়া মুন্সিগিরি পর্যন্ত অনেক কাজেই তাহাকে রাখা দিতে হয়। ছুটি-ছাটা প্রায় বটিয়াই উঠে না। এবার ভাইয়ের সূতা উপলক্ষে অতি কষ্টে ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছিল। ছুটি হুয়াইয়াছে,—একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহ্বরে কৰ্ম্মবানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে হইল। হাতেম তাহার চাটী দিল্লীজানের কাছে রাখিল।

ভাই-পোয় প্রতি কাকীর টান থাকিলেই যে ভাতুর-পোর প্রতি কাকীর টান থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। স্বামী উপস্থিত থাকিতে যদিও দিল্লীজান কষ্টেহুটে হাতেমকে আদর-বর করিয়াছিল,—তাহার অস্বাস্থ্যে সে কিছুতেই সে ভাব বজায় রাখিতে পারিল না। যে ভাতুর তাহার স্বামীর সঙ্গে বিবাদ না করিয়া অলপের পরে নাই, হাতেমও তাহারই পুত্র। বিভীষিকা, ভাতুরের কীৰ্ত্তনায় যে স্বামী তাহাকে নিজের দিনের মতই দেখিত,—ভাতুরের কোত হইবার পর, ছেলোটাকে দৃঢ়গত হইয়া তাহাকে এমনই বাদ করিয়াছে যে, সে আর দিনের সুখের দিকে ফিরিয়াও তাহার না। একপ ক্ষেত্রে বাস্তবের মন কেমন করিয়া মরল ও গিড় ভাব ধারণ করিতে পারে? কিন্তু ভাই বলিয়া কি দিল্লীজান তেমন বাগের বেটী! এমন অলক্ষণে, অনামুখ্যে, মুগ্ধিত উৎপাতকেও সে ঘাড় হইতে বাড়িয়া ফেলিয়া দেয় নাই। আর কোনও বেয়ে হইলে, কখন-কালেও কি সে ইহার মূখপর্শন করিত?—ইস!

বাগের বাড়ী কাছেই। ছোট-ছোট ভাই-বোনরা সেখানে হইতে আসিয়া দিল্লীজানকে এবং দিল্লীজানের সংসারটিকে মতাইয়া রাখে। পাশে বাহার বাড়ী, সে গ্রামসম্পর্কে গহ্বরের নানা। হাট-বাগারের ব্যবস্থা এবং সলায়ের তথ্যের তার তাহার। তথ্যের সবচেয়ে বিশেষ কোনও আগতি না থাকিলেও, হাট-বাগারের সবচেয়ে দিল্লীর ঘোর আগতি দেখা দেল।—নানা এক পরসার সওয়া

আমিরা নগর পাঁচ পরসার দাবী করে! কাজেই অচিরে বাগারের তার হাতেমের বাড়ীতে পড়িল।

সে ছেলেনাথর সম্বন্ধ নাই, কিন্তু চাষার ছেলে বে। পেট হইতে পড়িয়াই চাষার ছেলেকে সংসারের অনেক কাজের আশ্রয়লা করিতে হয়। না করিলে লামকে হইবে ফিরণে?

প্রাথমিক পদ্মার উপরে; মাছ কিনিবার জন্য বাগারে না সেলেও চলে। ইঙ্গিতগুলির ব্যতিক্রম হইল,—পদ্মার ঘায়ে গিয়াই হাতেম মাছ কিনিয়া আনে; কিন্তু মাছের উত্তমাংশ তাহার ভাগ্যে জোটে না। দিনের বাগের বাড়ীর গোষ্ঠী বৃহৎ,—সেখানে নিত্য পক্ষে ব্যয়োজ্ঞান অংশ দিতে হয়। বাকী রহিল সিকি। ভাই-বোনরা আছে, দিদির সঙ্গে না থাকিলে তাহাদের পেট ভরে না। তাহাদের সুখ এমনি কতিও কোমল যে, মনে হয়, কাটা-বিহীন মাছও মুখি বা ছড়িয়া ঘাইবে! কাজেই, কাটা-সুখ মাছ তাহাদিগকে দেওয়া ঘাইতে পারে না। তাহারা পেটের মাছ, ডিম, এবং সুতার বি ঘাইতে-ঘাইতে পরস্পর মুখ চাওয়াচাও করিয়া হাসে—সেখ ভাই, সেখ, বেহুবার কাণ্ড। কান্ধা মেও কান্ধা, হুন্ডা মেও হুন্ডা, গাড়া মেও গাড়া,—কেমন মজা করিয়া যায়! আবারের দিকে একবার চাহিয়াও দেখে না।

বস্ততঃ, সলায়ে বাহার লক্ষণ চোটে ঘাইবার সম্ভাবনা, বিখ্যাত তাহার চামড়া প্রায় পাতলা করেন না;—চোট ঘাইবার উপদ্রুত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাতেম গাছের ফল-পাকড় পাড়িয়া আনিলেই, দিল্লী কাছে গিয়া হাতেমের কৌচড় হইতে নির্জিকার চিত্ত ভাল-ভাল রসাল, স্নডোল, পাক। ফলগুলি বাছিয়া তুলিয়া লয়। দিনের ভাই-বোনরা সেইগুলি ঘাইতে-ঘাইতে জিজ্ঞাসা করে, “ওরে ও হাতেম! তুই এমন কাটা, ডাঁপা, চুটিকে ফলগুলি কেমন করিয়া খাস?” হাতেম কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলে, “তোরা পাকা পড়া ফল বেধন করিয়া খাস।” প্রত-কারীরা অবাক হইয়া যায়।

দিনের বাগের চাষী বৃহৎ। বাগের লম্বা তাহাদের কান অধুন্নত। দিল্লী হাতে কয়ে দিয়া হাতেমকে সেই-খানে পাঠাইয়া দেয়; কান দেখা তো চাই! তা ছাড়া, হাত-পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে কুঁড়ে হইয়া ঘাইবে

বে! কাজেই, গহেরের পরম দেহের শিত বাপজানকে সাধাদিন মাঠে থাকিয়া থান কাটিতে, আঁটি বাধিতে, এবং আঁটি মাথার করিরা মনোবের উঠানে কেলিয়া আসিতে হয়। আঁটি অবস্ত ছোটই; কিন্তু তাহা হাতেমের কচি হাতের পক্ষে কিরণ ছোট, তাহা ধিনি বিশ্বভারবাহী তিনিই বলিতে পারেন, অস্ত্রের পক্ষে বুদ্ধিরা উঠা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, হাতেমের ইহাতে আগন্তি দেখা যায় না।

কাজের অবস্থানে পদ্মার ধারটিতে গিয়া বসিগেই চোচার কথা হাতেমের মনে হয়। দূরের পাশ-তোলা নৌকার দিকে চাখিয়া-চাখিয়া তাহার মনে হয়, ঐ—ঐ বুকি চোচার নৌকা! বেথ চোচার কি মহন! চাচা সে-বার তাহার অস্ত্রে কেনন তোকা, নয়া বাপড় কিনিয়া আনিয়াছিল! সেই বাপড় পরাইয়া সে তাহাকে কাঁধে করিয়া লক্ষীপুরের ঘাটে লইয়া গিয়াছিল। হাতেম ইটিয়া ঘাইতে চাহিলে বলিয়াছিল, “ওরে বাপজান, সে কি কাছের পথ যে তুই হাঁটো যাবার চাসু?” চাচা জাবিয়াছিল, ভাই-পোর পারে বুকি বাধা ধরিবে—ছেলেনাহব কি না! কি বুদ্ধি চোচার! বাহার বাড় এত বড়-বড় বোখা বহিতে পারে, তাহার পা বুকি অত নরম হইলে চল? পালের নৌকা নিকটবর্তী হয়, আবার দেখিতে-দেখিতে দূর হইতে দূরত্বের চলিয়া যায়, ঘাটে আসিয়া হিড়ে না। হাতেমের ক্ষুদ্র, কোমল, কচি দহনটি কাপাইয়া একটা বৃৎৎ দাঁড়শাল পুস্ত দিলাইয়া যায়।

কিন্তু গহেরের প্রাণটাও কি হাতেমের লজ কীদে না? দেহের বিনি-ভারের বকবের কল যে খোদার কারিগরি—কি মজার ভিম তাহা বুকিরা উঠিবার উপায় নাই। সেই কলটি গহেরের কাপে-কাপে দিনরাত ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া যে সব কথা কয়, তাহা শুনিতে কোন্‌ পাশও দ্বির হইয়া থাকিতে পারে? অনেকবার সে বাড়ী ঘরে দাইবার লজ চৌধুরী সাহেবের কাছে ছুটির আর্জি করিয়াছে,—মজ্ব একবারও হয় নাই। মাঝলা-মোকর্দমার কাজ বেধন বাড়িয়াছে, চুরি-ডাকাতিও তেননি। এমন সময়ে তাহার ভ্রাতৃ পুস্তাতন বিশ্বত ভূত্যের ছুটি মজ্ব কিরণে হইবে? কিন্তু এইরূপ একাদিক্রমে বধন তিন-চারি বৎসর পার হইয়া গেল, ওখন আর গহের দ্বির থাকিতে পারিল না। নিজেই চৌধুরী সাহেবের কাছে হাজির হইয়া, সেলাম জানাইয়া কহিল,

“আমার আর নোকরী পোষাইল না জনাব।” সাহেব হাসিয়া কারণ জানিতে চাহিলে, গহের নিবেদন করিল, গোলামেরও বাড়ীঘর আছে, তাড়া হুঁড়ে হইলেও সে বাড়ী—বাপদামার ভিটা, আর গরিবের লজ খুব খোপ-মুহৎ না হইলেও সে লজ, এবং ছাওখাল-পুত না থাকিলেও একটা ভাই-পো আছে, সে ছেলের বাড়ী। চৌধুরী-সাহেব কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু ছুটি মজ্ব হইল। বলিয়া গিলেন, “নাগে আসিতে পারিতেই ভাল, নিমেন, শ্রিয়াদের মাথার-মাথার আসিবে।”

(২)

বহুদিন পরে বেশে কিরিয়া গহের পদ্মার ধোলা অলের খেলা,—বেত-বাশ-উঁড়ল-গাছ-খেয়া বাড়ী,—বেশর, রূপোর চুড়ি, শৈল, গোট এবং চুয়রে ডুরে সাড়ী-পর্য্য জীটিক দেখিয়া খুসী হইল; কিন্তু ভাই-পোকে দেখিয়া খুসী হইতে পারিল না। একেবারে বোলা টিম্‌টিম্‌ করিতেছে—গার-পার কিছু নাই। সর্কাকের মধ্যে চোখে পড়ে শুধু এককোড়া বৃৎৎ নীল চক্ষু। কিন্তু সেমিকে চাহিলে চুৎৎ বাড়ি বই কবে না,—বুকের ভিতর খালি ছ ছ করিতে থাকে। গহের মেধাক্ষর বেরবার প্রেরণ করিতে লাগিল, “ওরে ভোর এ কি হাল! এ কি হাল!” হাতেমের কোন অবাধ নাই,—চোচার সুখের দিকে চাখিয়া সে কেবল কীদ বজ্রণ হাসি হাসে। কিন্তু গিলের অলহ বোখ হইতেছিল; একটু বোঁচা দিয়া কহিল, “এ তোমার মাছভাতের গুণ, বোখা, মাছভাতের গুণ।”

গহের জীর মেহের মিকে একটু কটাক করিতেই, সে চুপ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সেখানে গহেরের মাছ-ভাতের গুণের বৈলম্বণ ঘটবার বিশেষ কোন হেতু দেখা যাইতেছে না।

গহের খুব কিরাইয়া প্রশ্ন করিল, “কোন বেয়ার-টেমার নাই ক হাতেম?”

“না চাচা, বেয়ার আমার একদিনও হয় নাই।”

“তবে?”

হাতেম অবাধ না গিয়া, ছুই হাতে গহেরের কোমর বড়াইয়া, দ্বির হইয়া বহিল।

আউশ-খানের মোটা, মিঠি জাত, আশি পদ্মার তৈলাক্ত,

টটিকা ইলিশমাছের কোল তারা হইয়াছিল। বহুদিন পরে খুঁড়া-ভাইগো দুইজনে একশবে আহারে বসিল। তখন হাতেমের মুখের আগল খুলিয়া গিয়াছে। সে চাচার মুখে বিশেষের গর শুনিতে, এবং নিজের মুখে স্বপ্নের গর শুনাতে ব্যস্ত—আহারের সবচে একেবারেই উৎসাহীন। অবশেষে চাচার তপসিবে মাছের বাটিতে হাত দিতে গিয়া দেখিল, তাহার বরাক—বাড়া গোছা এতুতি কিছুই দেখা যাইতেছে না। সে অসীরা হইয়া চাঁৎকার করিয়া বসিল, “ও চাচি, চাচি, আমার মাছ?” কিন্তু গহের দেখিল, উতলা হওয়ার কারণ নাই, বাটা ভরপুর,—বড়-বড় পেটের মাছ, ডিম, ফুঁড়া এতুতি কিছুই অভাব নাই। কহিল, “খাও না বাপজান্ন, তুমি বত পার।” গহের মাথা নাড়িয়া কহিল, “ও মাছ তো আমার না চাচা!” গহের বিন্মিত হইয়া কহিল, “তোমার না তো কার তা হ’লে?”

দিলের দিল্ বেতের পাতার মত ধ্বংস করিয়া কাঁপিতেছিল, ভয়ে এবং রাগে। রাগ এই যে, কি চন্দ-বোর এই ছেলোটা! চিক্কা যে পাইতেছিল, ইহাই কি ঢের নহে? সে ভিক্ষার চাপ কাঁড়া, কি আঁকাড়া—তাহাই লইয়া নানিঙ্গ।—স্পর্ধা তো স্ব নহে! ভয় এই অন্য যে, বামী পাঁছে বা এই তুচ্ছ ব্যাপারটা লইয়া একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসে,—যেনম উহার বৃদ্ধি! কিছু তো বলা যায় না!

হাতেম কহিল, “এ সব মাছ আমি খাই না, চাচা!” ঘরকার আড়ালে থাকিয়া দিল্ মনে-মনে কহিল, “আমার হুতু খাও তুমি!” গহের সকৌতুকে হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি তা হ’লে কোন্ সব মাছ খাও হাতেম?”

হাতেমের মনে গোল নাই,—সে সরল ভাবে বলিতে লাগিল, “ক্যান, বাড়া, ফুল্কা, তার পরে—” দিল্ আর খৈখী ধরিয়া থাকিতে পারিল না; কাঁপের আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া ঠাঁত মুখ এবং পৈঁছা-শোভিত হাতেমের সৃষ্টি সহযোগে তীব্র শাসনের যে নীরব নমুনা দেখাইল, তাহাতে হাতেমের পেটের পাখরের মত নিশ্চল, শক্ত সীরাটি চমকিয়া কাঁপিয়া উঠার, সে একেবারে ধামিয়া চূপ করিয়া গেল। কিন্তু দিলের এই সতর্কতাপূর্ণ ইঙ্গিত চৌধুরীদের কাছারীর হুঁসিয়ার শৌক্যের নম্র এড়ায় নাই। সে দিলের বক্তৃতি-কৌমুদীর-ইবৎ বিকাশ দেখিয়াই, মনের

শংকর-তিবির অনেকখানি নান করিয়া ফেলিল; হাতেমের বক্তব্যের উপসংহার শুনিবার দ্রুত কিছুমাত্র আগ্রহ একাংশ করিল না; নিরতিশর মিশেবে আহার-কাঁচা সমাধা করিয়া উঠিল।

অশুভক্ষে গহের পদ্মার ধারে বসিয়া হাতেমের কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে-দিতে কহিল, “চাচি বোধ করি তোরে পাট ভইয়া দুই বেলো দুই হুঁতা ভাতও দেখ নাই রে হাতেম!” হাতেম হাসিয়া কহিল, “তা ক্যান্ সেবে না চাচা?” গহের কহিল, “না বে না, দেখ নাই,—দিলি তোরা এমুন বেগাল হু? যে তোরে এতুইকু ভাল মাছ পরান হইয়া সেবার গারে নাই, সে-বে তোরে পাট ভইয়া ভাত দেখ, সে তো আমি চোক্ষে দেখিও পেতর করি না রে।” হাতেম কহিল, “কিন্তু তাতে চাচির কোন বোঝ নাই। তার ভাই-বুড়া আইলা খরে; তার পর বাপের বাড়ী—” বলিতে-বলিতে হাতেম ধামিয়া গেল। তাহার মনে হইয়া-ছিল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হর ত ভাল করিল না। যে আশাটা সেই কাহ্ন! গহের তৎক্ষণাত্ বিজ্রপের স্বরে কহিল, “বাপের বাড়ীতেও বয়রাং হু? বৃষ্টি! বা:- বা:-—বেশ মৃগাক্ষেরখানা গুল্লে রে তোর চাচি!”

হাতেম কথা কহিতে পারিল না,—বোকার মত চাচার মুখের দিকে ক্যান্ ক্যান্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

গহের পুরা একমাসের ছুটি লইয়া আদিয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহের বেই কাটাইল না। তাহার বাড়ী হইতে রওনা হইবার প্রাকালে দিল্জান্ন দুঃখিত হইয়া কহিল, “আর দুইটা দিন।—” গহের গম্ভীর মুখে কহিল, “ঢের-ঢের দুইটা দিন হইয়া গেছে, আর ক্যান্?” কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া দিল্ কহিল, “হাতেমও বেই নাচুতিছে।” গহের গম্ভীর মুখেই কহিল, “ও, ও-ও বাবি।”

অভিমানিনী দিলের দিল্টা অভিমান-ভরে কাটরা পড়িবার মত হইল; কিন্তু সে কাঁদিল না,—অলপায়াসীন শুক্ল মেঘের মত অদগর আঁধার মুখে গাঁড়াইয়া রহিল।

(৩)

হাওয়ার-পরিবর্তনে এবং তার উপর গহেরের বেহে-বুত্ব করেক মাসের মধ্যেই হাতেমের চেহারা কিরিয়া গেল। গহের বৃষ্টি, চাচির অনাদর-অবরহই যে হাতেমের স্বাস্থ্য-

নানের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা এই কয় মাসে তাহার হাল কিরিয়া গেল কেন? কিন্তু দিলের বিকছে কোন কথা বিজ্ঞাপন করিলে, সে কিছুই বলে না। ইহার রহস্য কি?

কিছু দিন পরে ইনিস্থানি হইতে গহেরের নামে এক-খানি চিঠি আসিল। দিল্ স্বামীকে লিখিয়াছে, “টাকা-পয়সা দেও না, অন্যথায়, হেঁড়া নেকড়া পরিগ্রহ দিন কাটাইতেছি। তাহাতেও হুঃখ নাই; কিন্তু তোমার স্ত্রী আমি—আমার এই দুর্দশার কি তোমার মানের হানি হই-তেছে না? শুনা যদি হয়গা থাকে মনে কর, সমাজও ত ক'ম দেও নাই—আর কত দেবে?”

চিঠিখানি বখন কাছারীর সুন্দরী গহেরকে পড়িয়া শুনার, হাতেম তখন দেখিলেন। সে তখন চাটাকে কোন কথা বলিল না। সন্ধ্যাবেলা একেলা পাইয়া বিজ্ঞাপন করিল, “চাচা, তুমি বাড়ীতে টাকা-পয়সা দেও না, চিঠি পড়ও না?” গহের রাগিয়া উঠিয়া বলিল, “না। কিসির জন্তি দেব তুমি?” “কিসির জন্তি!”—হাতেম অবাক হইয়া চাচার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গহের উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, “বোকা আমরক কি না, তাই তুই অমন কথা কইল। সে তোরে মাইরা ফেলাইছিল না?” “মাইরা ফেলাইছিল!”—হাতেম বিল-বিল করিয়া হাসিতে লাগিল, —“মাইরা ফেলাইলে নাকুব আবার বাঁচে না কি?”

“না! বাঁচি ক্যান! আত্মা কুসুর বলবা যে,—কেহুন কইরা বুঝি তুই?”

“কিন্তু চাচির চিঠি তুমি চৈকে পানি আসে।”

“তা তোরে আসবি। ইচ্ছার কি তোরে আমি কলুর বলব কই। কিন্তু আমার চৈকে কি আসে জানিস? পানি না, হুঁড়ি—আগনের হুঁড়ি। ওর সব নটাই—আগা-গোড়া সব বানাইনা মিথ্যা। ভুগাইয়া টাকা দেবার চার। সেই টাকার ওর ভাইবুনির প্যাট ভরানি।—কি, এতদূর কথা!” গহেরের চোক দুটি বাবের চোখের মত জলিতে লাগিল।

গহেরের স্বাগতী একটু পড়িয়া আসিলে হাতেম কহিল, “আমার মনডার কর, চাচি এবার মরবি—না মাইরাই মরবি।” গহের উত্তেজিত হইয়া কহিল, “মরবি!—মরক, মরক,—এ আমা, এ মরক। মরলি, আমি নিঞা

সারেবের মরগার দিয়া নগর সোরা পাঁচ গোস্তা করতা দেব।” চাচার যেমনি নরদ, তেমনি গোসা।—হাতেম গভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল।

(৪)

হাতেম তাহার চাচার সঙ্গে প্রবাসে চলিয়া গেলে, দিল্ মনে করিয়াছিল, আপনটা আপনা হইতে বিদায় হইল, ভালই। সে তাহার ভ্রাতৃ মনের কোণে আর এতটুকু হুঃখও পোষণ করিবে না। পরের ছেসের ভ্রাতৃ আবার হুঃখ কিসের গা?

কিন্তু কিছুদিন হাইতে-না-পাইতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা চিন্-চিন্ করিতে লাগিল। আগন্তন হওয়ার অন্তরে-অন্তরে যে একটা অপূর্ণ, মধুর স্বপ্ন হুঃখ হইয়া থাকে, এতকাল সত্য-সত্যই সে রহস্ত তাহার অজ্ঞাত ছিল। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে কাছে আসিয়া, হাতেম তাহার বড়-বড় নীল চকু দুটি তুলিয়া চাচির মুখের দিকে ফাল্ ফাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত। কিম্বে পাইলে ত মাহবে বলে যে, কিম্বে পাইরাছে,—ভগে, কি আছে,—আমার খাইতে দাও। কিন্তু সে তাহা বলিত না; তথু কাছে আসিয়া ভয়ে-ভয়ে একটা ডাক দিত—“চাচি!” বাস, আর কিছু না। তার চাচি কি জান্ না কি দে, তথু ঐ ডাকট গুনিয়াই ঠিক করিবে—শেটে তাহার কিম্বের আগুন জলিয়াছে! রাগ হইত। কিন্তু আশা যেন দিলের সমস্ত প্রাণটি সেই সলকোচ ডাকটির ভ্রাতৃ কাণ পাতিয়া আছে; আর চোখ দুটি যেন হাতেমের সেই বেহ-পিপাস্ন কলশ দুট্টুইকুর ভ্রাতৃ ঢকল হইয়া রহিয়াছে।

ইতোমধ্যে দিলের ভাই-বোনরা এক বিভ্রাট ঘটাইল। গহের বাড়ী আসিবার কালে হাতেমের ভ্রাতৃ কয়েকটি কাচামিটে আশ আনিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটা ছিল পাকা। গাছ জমাইবার ভ্রাতৃ গহের নিজেই হাতেই তাহার আঁটি পুতিয়াছিল। বাড়ীতে এত যে আনের চারা, হতভাগা ছেলেদেরগুলি সে দিকে নজর দিল না; এক-টের কোণার যে কাঁটার বেড়ার মধ্যে সেই আঁটিটি পজা-ইয়াছে, সেইখানে গিয়া তাহার চারাটি নমুলে উপড়াইল। তারপর সেই আঁটি গাছে ঘরিয়া, বীজ বানাইয়া খেই-খেই বুতা! কেন না, এত আনোশ, এত গাফালাদি কিসের? সন্দেহ হওয়ার দিল্ খোঁজ লইয়া দেখিল, দুর্দশার! গহেরের

বড় সাধের, বিলের পুষ্টিময় হাঙ্গের সেই কাচামিটা গাছের কর্ণ ফটে। অল্প সময়ে দিল্ যে ভাই-বোনের একগুণ অস্তায় অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ করে নাই, এমন নহে। কিন্তু এবার হাতেসের সস্ত্র বধন তাহার মনটা অত্যন্ত খারাপ, সেই সময় এই ঘটনা ঘটায়, সে কোনমতেই তালটা সাধনাইয়া উঠিতে পারিল না,—তালটা সবলে এবং লশদে পড়িল তাহাদের পিঠে। কিন্তু ইলিশদাছের পেটির ভার মোলায়েম বস্ত্র স্তোভন করাই তাহাদের অভ্যাস, তাহার একগুণ কঠিন বস্ত্র কিরূপে নীরবে পরিণাক করিবে? তাহাদের মেহে বত না বামিল, তাহার ঠোঁটাই তাহার দশগুণ। তাহার পর আবার বাড়ী গিয়া লাগাইল। তাহাই লইয়া অবশেষে দিল্কে ভালদল কত কথা শুনিতে হইয়াছে।

হার বে হাতেস, হার! তোর মুখে যে একটু কথা ছিল না! কত গানি-মন্স, কত প্রহার তুই যে বুলায় মত গা হইতে কাড়িয়া ফেলিয়াছিল। তার পর মুহুর্ত হাইতে-না-হাইতে কোলের কাছে আসিয়া ডাকিয়াছিল—‘চাচি!’—দিল্ আত্ম লইয়া ভাবে, আমি যে তোর সেই ঘেঘের ডাক শুনিয়াও শুনি নাই,—এতদিনে এইরূপে তার শাস্তি আরম্ভ হইল। ওরে মাতৃদ্বারা, ঘেঘের কাণ্ডাল হাতেস! তোর সেই কাভরতা-ভরা, নীল, নির্মূল চক্ষু দুটি আমার মুখের ভিতর যে কিসের সন্ধান করিত, এত-দিন অন্ধ হইয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই; আল বুঝিয়াছি। তুই ঘরে কিরিয়া আর,—আমার বে সেহ রাবিবার আর ঠাই নাই! গহের ডোকে নিজের অভাৱ বুঝিতে ঘেহ নাই,—তাহার কর্তব্য সে করিয়াছে। আমার কর্তব্য আর আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চাই।

কিন্তু দিলের অন্তরের কামনা সবও হাতেস সোণা-পাড়া হইতে ফিরিল না। এ দিকে ভাই-বোনেরা অভি-ভাবকের শাসন এড়াইয়া, সরদ কলারির লোতে আবার একে-একে আসিয়া হাঙ্গির হইতে লাগিল। কিন্তু দিল্ তাহাতে কুই হইল না। ঐ রবাহতগণকে হুতরাং দিদির তাক্সিয়া ও বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া বখাছানে সরিয়া পড়িতে হইল।

বামীর প্রতি অসুখাগের অভাব দিলের কোন কালেই নাই,—ওহু মাকে-মাকে অভিমান আসিয়া তাহাকে

আড়াল করিয়া রাখে মাত্র। গহের বধন হাতেসকে লক্ষ্য করিয়া লইয়া যায়, তখনও এই কারণেই তাহার উপর দিলের গোণা হইয়াছিল। কিন্তু হাতেসের উপর ঘেঘের সন্ধান হওয়ায় সে বুঝিয়াছে, গহের কোন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদেশে লইয়া গেল। অমন বাপ-মা-হারা গো-বেচারিকে কি মাহুত ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? নিম্নের পূর্বকৃত আচরণ স্বরণ করিয়া এখন সে একেবারে মরমে মরিয়া হাইতে চায়। পোড়া চোখজটিও তার মাকে-মাকে ভরিয়া উঠে। লক্ষিত ও অলুতগু দিল্ তাই মনে-মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, গহের এবার ঘরে ফিরিলে, মোহ কদল করিয়া পাশে থরিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিবে।

কিন্তু তাহার বিরাগ ছিল, বামী আর কোন কর্তো-রতা করিবে না,—হাতেসকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াই, তাহার শেষ-চরম শাস্তি হইবে। কিন্তু দিল্ বধন আসা করিয়া-করিয়াও চিঠি পাইল না, পরচপতা অভাবে মহা কষ্টে পড়িল, তখন বুঝিল, বরাত বড় দল। অভিমান আসিয়া আবার তাহার দ্বার পূর্ণ করিয়া ফেলিল। বামীকে দ্বঃ-কষ্টের কথা না জানাইয়া, গয়নাগাতি খেঁচল, মিনিসপত্র ঝাঁপ দিয়া কারক্রেমে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু পাছে আত্মীয়স্বজন বা গাঁয়ের লোকের কাছে গৃহস্থের মাথা হেট হয়,—সে ভরটাও অল্প নহে। তাই, বিক্রম-আদি বাহা করিতে হয়, সেই প্রতিবেশী নানার সাহায্যে দ্বঃের লোকের কাছে গোপনেই হইয়া থাকে। কিন্তু এ সংগারে ঢাকঢাক, চাপাচাপি দিয়া যে কিছুই রাবিবার মো নাই, ঘরের চক্ষু যে অন্ধকারেও বুঝিয়া-ফিরাই নিগুঢ় ব্যাপারের খবর লইতে পারে, ইহা সে এ দাবং লক্ষ্যমাত্র করে নাই। অবশেষে একদিন ধল-মাখার একটা লোককে উঠানে আসিতে দেখিয়া, বিদ্রিত হইয়া দিক্সাস করিল, “এ কি!” লোকটা গাত বাহির করিয়া কহিল, “চাইল-ভাইল। তোমার বাপ—নুঙ্গি-সাংঘের বাড়ীর।” দিল্জানের মুখখানি কাদি হইয়া গেল। তাহার মনে হইল কিছুই আর গোপন নাই, ঘরের কথা বাহির হইতে-হইতে একেবারে বাপ-মায়ের কাণে গিয়া উঠিয়াছে! তাহার দিলের সম্বন্ধে এতদিন উপাসীন থাকিলেও, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না!—দয়া করিয়াছেন।

আর কেহ হইলে নিশ্চয়ই এই সমগ্র কৃত্যই হইত। কিন্তু দিল্লী এমনি অসহন্য করে যে, একেবারে পৌঁচি হইয়াছিল, “কে তাকে এসব দিতে কইছে?” মুন্সিয়ার গভেষের পাতি মুহুর্ন্তে ঠোঁটের আড়ালে মুখ লুকাইল। সে ঢোক গিলিয়া কহিল, “তা তো পুছ করি নাই।” বলিয়াই মাথা হইতে খলো নামাইবার উদ্ভোগ করিল। দিল্লী জুড়ি করিয়া কহিল, “ধবরদার! নামাইয়া না—এখানে নামাইল না বলছি।” মুন্সিয়ার হতভম্ব হইয়া কহিল, “কোথার তা আইশে নামাই?” দিল্লী বলিতে বাইতেছিল, এই আমার কপালের গুণের; কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল, “এখানে না,—এখানে না; যেখানে থিকা আইছিল সেইখানে—”

মুন্সিয়ার চলিয়া বাইতে উভয় হইলে, দিল্লী তাহাকে বলিয়া দিল, “এমটা কথা—বাগদানকে কইস যে, মাইয়া তার ফকিরের ঘরে পড়ে নাই, বার ঘরে পড়েছে, সে সোণ-পাতার চৌধুরীরের নোকর।”

ইহার পর সে আর দ্বাখীকে চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারে নাই।

(৫)

চিঠিখানা যে দিন সোণাপাড়ায় পঁছাচ্ছে, সেই দিন সন্ধ্যা-বেলা শিলের সবুজ খুড়া ভাইপোতে একটু বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। পরদিন দ্বিপ্রহরে হাতেমকে আহারের স্থানে উপস্থিত দেখা গেল না। ঐ সময় তাহার উপস্থিতি এক-রূপ অনিবার্য ব্যাপার বলিয়াই গণ্য ছিল। খেলা-খুলা বা বেগারের কাজ কিছুতেই তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিত না,—সব কেলিয়া রাখিয়া সে ছুটিয়া আসিত, এক সঙ্গে না থাকিলে যে চাচার পেট ভরে না।

ভাত বাড়িয়া লইয়া গরের বহুজন অপেক্ষা করিল; ভাত শুকাইয়া চাপ হইবার উপক্রম করিলে, সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; যেখানে-যেখানে হাতেমের থাকিবার সম্ভাবনা, সর্বত্র তাহার বৌদ্ধ লইল। যখন কোথাও উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তখন গরের তাবিয়া-চিহ্নিয়া এইরূপ বুঝিল যে, সে তাগিয়াছে—দেশে চাচির কাছে বাইবার প্রজ্ঞাই এখানে হইতে তাগিয়াছে। হাতেম যে চিঠি তুলিয়া চাচির লত বাত হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাবে ও কথার একাংশ। কিন্তু হাতেমের সবুজ দ্বি-

দিক্ষাত্তে উপনীত হইয়াও দে দ্বির হইতে পারিল না। কেন না, পথ যেমন দৌঁবে তেমনি বিপদসমূহ। তার পর পথ পার হইয়া যে আশ্রয়, তাহাও নিরাপদ নহে,—ইহাই গহেরের ধারণা। অতএব বাড়ী-ভাত, আর সাধের চাকরী কেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাত্ সে হাতেমের উদ্দেশে দেশের পথ করিল।

কিন্তু ছুটিয়াই কলিয়াও হাতেমের নাগাল পাইল না। দূর হইতে অনেককেই হাতেম বলিয়া মনে করিয়া তাহা-দের পিছনে-পিছনে সে অনেক ঘুরিল। আবার অনেকের কাছে হাতেমের কথা মিছামিছি করিয়াও বিজ্ঞিত হইল। তাহার প্রাণে যে যেখানে হাতেমের মতো বালক দেখিয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিল, গরের সেই-সেই স্থানে তাহার সন্ধান না করিয়া নিরন্তর হইল না। এইরূপে তিনদিনের পথে ছয় দিন কাটিয়া গেলে তাহার হুঁস হইল যে, এত দিনে হয় ত সে বাড়ী পৌঁছিয়াছে; অতএব পথে-পথে পুঁজিয়া বেড়ানো পণ্ডিত্রম নাজ।

মাঠে-মাঠে লোণা কলিয়াছে। কোথাও ধানের ডায়ে গাছ ছইয়া পড়িয়াছে, কোথাও গাড়াইয়া-গাড়াইয়া কাপিতেছে। গ্রামগ্রামে তাগবনের ধারে যে ক্ষেত, তাহাতে বাবুগণের মহোৎসবের মহা সমারোহ। সেখানে গান-বাজনা, বীরভা-ভুল্লাভাং রবের বিরাট নাই। এ সকলের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর গহেরের ছিল না,—সে আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এক ধারগার আসিলে, তাহার চরণের গতি স্থগিত হইল। সে যন্ত্রণার স্রাব উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, বান কাটিতে-কাটিতে কে গাথিতেছে,—

“আইল আইল আইল কিরা

ইধুরে দোয় মাখার কিরা।

যে সব হুংখ

দিছি তোমার

মনে প’লে

যদি কথার,

এবার আইলে রাখব রে প্রাণ,

বুকের মাঝে আঁচল দিরা।”

মুহুর্ন্তে দিল্লীজানের সেই শুভ, বিশ্বস্ত স্মৃতি, বাহা সে প্রবাসে আসিবার কালে দেখিয়া আসিয়াছিল, মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহাকে কিছুমান খাতির করিল না, তাড়াতাড়ি মন হইতে হৃৎপ্রের বস্তু খাতিয়া কেলিয়া

আগিয়া উঠিল, এবং হাতেমের কথা ভাবিতে-ভাবিতে দ্রুত-বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(৩)

সব বুঝাইয়াছে—বাধা দিয়া চালাইবার মত আর কিছু অবশিষ্ট নাই। কাল সারা দিন এবং আশিও বেলা তিন প্রহর অনাহারে কাটাইয়া, ফল, অবলম্বন ঘেঁষে দিল্ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,—অনাহারের চোটা করে নাই। গহের দ্বারস্থ হইলে যে দ্বার মেলে না, তাহা নহে; কিন্তু এ দীনতা সে প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে সক্ষম নহে। যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আর পরিত্যাগ করিবে না,—ইহাই তাহার লক্ষ্য। শ্যামী তাহার বিত্তপ হইল,—স্বী মণিল কি বাঁচিল খবর লইল না,—তাহার আবার আহারের দ্রুততা কেন? সে মরিবে, মরিবে—নিশ্চয় মরিবে।

বহুকণচূপ করিয়া গড়িয়া থাকিরা সে মনে করিল, কিন্তু যদি গহের আসিত, হাতেম আসিরা একবার চাচি বলিয়া ভাবিত, তাহা হইলে মরণ তাহার কোন দৃশ্যই থাকিত না। আসিবে না? চেষ্টা তো পাইয়াছে, আসিবার হইলে এতদিন নিশ্চয় আসিত। না—না আসিবে না,—তাহার আর তাহার মুখ দেখিবে না। এই শূন্য ঘরেই তাহার শূন্য প্রাণ শূন্য মিলাইবে।

অজ্ঞান-বিগলিত চক্ষু ছুটি মুদ্রিত করিয়া দিল্ কল্পনা করিতে লাগিল, যেন তাহার মূর্ত্তা হইয়াছে। মৃত্যুর পর খুঁড়া-ভাইপো দ্রুৎ মনে আসিরা তাহার ‘মড়াবুখ’ দেখিতেছে। গহের কোঁটার খুঁটে মূখ মুছিতেছে, আর হাতেম তাহার বুকের উপর পড়িয়া চাচি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার পর তাহার অস্ত্র কত দৃশ্য করিতে-করিতে তাহার তাহার পোর দিল। মাটির উপর মাটি, তাহার উপর মাটি চাপাইল। আর কথা শোনা যায় না। আগো নাই, বাতান নাই, গহের নাই, হাতেম নাই—নাই বসিতে কিছুই নাই, শুধু অন্ধকার—যেন জাহ্নবের বেধে ঢাকা অসংখ্য রক্ত কালকেউটের মত গর্ভের ভিতর ঢুকিয়া ভীড় পাড়াইয়া আছে। তার পাকে-পাকে ভয়ের বাস। বাশ্বে, পা ছুঁছুঁ করে বে। দিল্ ভীত হইয়া চোখ চাচিল। আলোর ত্রি দৃশ্যর মূখতয়া হাসির আভা, হাওয়ার কি মধুর প্রাণতয়া আনন্দের ঢেউ। তার

মধ্য দিগা ও কে আসিরা ঘরে গাঁড়াইল? গহের! দিল্ বাঁচিয়া আছে, না সত্য-সত্যই মরিয়া দ্রুত হইয়া তাহাকে দেখিতেছে—ইহা সে যেন প্রাণময় বুকেই পারিল না। তার পর দ্রুত ভাবিতে-না-ভাবিতেই, অজ্ঞান-ভাবে মুখ কিরাইতে গেল, কিন্তু পারিল না। গহেরের উৎসব-পীড়িত, কক্ষ, পূর্ণপূর্ণর সুশ্রব ছনি যেন তাহাকে ছোঁয় করিয়া ধরিয়া রাখিল। দিল্ স্তম্ভিত হইয়া গহেরকে দেখিল; তাহার পর তাহার পদাঙ্ক তাহার দিকে চাচিল—হাতেম নাই! প্রাণটা দ্রুৎদ্রুৎ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—কি অমূল্য ঘটনাছে না-হানি! স্মৃতি কটে দ্রুৎ, তিনবার ঢোক গিলিয়া দিল্ জিজ্ঞাসা করিল, ‘হাতেম! হাতেম! হাতেম কই?’

অনাহার, অনিদ্রা ও পঞ্চম তখন গহেরের পেটে ও মাথার আগুন আনিয়াছে—মেজাজ একেবারে কক্ষ। তাহার উপর যে লোক হাতেমের লক্ষ্য চর্চনার, এমন কি উপস্থিত নিকশেশেরও একমাত্র কারণ, তাহারই মুখে—‘হাতেম কই’ প্রশ্ন—গহেরের বেহে যেন বিন ছড়াইয়া দিল। সে ক্ষিপ্তপ্রাণ হইয়া কহিল, ‘হাতেম কই! হাতেম কই!—মরণ এককালে আগের চমির মতো উৎলাইয়া উঠল বে। ক্যান্, কিছুই তো আর বাকি রাইয়া ছাড়ো নাই—গতের হাড়ি তক চাবাইয়া খাবার দো করছিল। আবারও হাতেম কই! হাতেম কই! মনে কি ভাবছো তাই কও দেখ’।

হাতেমকে দৃশ্য দেওয়ার দৃশ্য দিলের অন্তরালে যেন একটা স্বাভাৱিকের স্মৃতি করিয়াছিল,—ইহার কথা তাহার কিছুতেই ভুলিয়া থাকিবার উপার নাই। এই বাধার উপর গহেরের কথার বিবাক ছুরির নিদারুণ, নিঃস্ব আঘাত তাহার অনাহার-নির্ণ, দুর্বল বেহের শব্দে বরফাত কড়া কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার-দিশাভাৱা চক্ষু ছুটি বক্ষ-মোকন করার ভাৱ ভিতরের উচ্চ অজ্ঞানতাকে অব্যবহিত, উজ্জলিত করিয়া দিল। শয্যার উপর বাহ দুইটির ভর রাখিয়া অতি কষ্টে আশ্রয় সংগ্রহ করিয়া দিল্ কহিল, ‘আমি কেন্দু কইরা তোমার বুকাইমু বে’ হাতেম—

দিলের মুখে আবার হাতেমের নাম শুনিয়া গহের অধীর হইয়া কহিল, ‘বুজ্ছি, বুজ্ছি—আর বুকাবার কাম নাই। এক কইয়াও মনটা খুঁচী হব নাই, পরাগতা তইয়া

ওঠে নাই। তার আলি মাথাডা কচমচ কইরা চাবাইয়া খাবার না পালি প্যাটটা ভরিবি কাখার! তার কন্ড্রিই ব্রিঙ্কার নালা মদুর্ধ্ব কইরা কাটবার লাগছে। হাতেম কই? হাতেম কই?—গালিরে গালি!—কর কি! শুন্নিও যে ডর করে।”

মাথার উপরকার খোমাতারা, যিনি চুপ করিয়া বসিয়া দিম-চুনিয়ার নাকী-নকতের খবর রাখেন, তিনি জানেন, হাতেমের মস্তে দিলের সত্ত্বানের বাধা কন্ড্রিরাছে কি না? তারি সম্বন্ধে বার-বার এই অজ্ঞার, অসঙ্গত কীর্তি আঘাত! আঘাতকারী আর কেহ নহে, তাহারই দরসের দয়াদী স্বামী!

একটা অবাক মর্দবিহারী শব্দ করিয়া দিল্ বিছানার উপর পড়িয়া গেল। তাহার অন্তরের উষ্মিত, অশান্ত বেদনা বাহির হইবার পথ না পাইয়া, এবল পীড়নে ক্ষয়প্রাপ্ত কীর্তি, কলিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু গহরের রোজ চড়িয়া গিয়াছিল। সে নিবৃত্ত হইতে পারিল না। উদ্ভতের ম্যার বিকট হাসি হালিয়া বলিতে লাগিল, “তাচ্ছব! তাচ্ছব! এ যে বাতের পোক সাপের চোখে সঁতার পানি। বরদ—বরদ—বরদের আশার আর বাটোলা নাই। লজ্জাও নাই সরমও নাই!—”

দিলের মরণপ্রায় অভিমান আঘাতের পর আঘাতে মরিয়া হইয়া, দিল্কে আগাইয়া দৃষ্ট করিয়া তুলিল। কীরে-বীরে মুখ তুলিয়া দিল্ করিল, “না ছর সরম আমার নাই, কিন্তু তোমার খুব আছে তো! ধারে বিয়া করছো, তোমার সেই ঘরের লক কি খার, কি পরে, খবর নেও না, মইল, কি বাটল ডাইকা মিগাও না। সোব-বাইট হাইরা-মালুসে করে। আর তা কনি পুখর মালুসে ডাইকা নেব, তারে বুকাইরা কর, মাগ করে। তারে ভাঙ্গা পাতিলের মতো টান হাইরা কেলাইরা দেব, তাতো মান্তাম না। তুমি আমারে কিছু বুকাইরা কইছিল। কি? কও নাই। এখন জবাই করা মরণপ্রায় মতো আমারে দাও দিয়া চুরবার আইছ! তোমার যদি সরম থাকে, তার ওপরে দরদও থাকে—আমার থাকবে না ক্যান, তাই স্বও দেখি, শুনি?” দিলের কণ্ঠ বদ্ব্যবাহার, সেহ রোমনোজ্বলে কলিত।

গহের চাছিল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া এতক্ষণ সে বেন

কিছুই দেখিতে পায় নাই। এইবার একে-একে সমুদ্র দৃষ্ট তাহার চোখে জুটিয়া উঠিতে লাগিল। কোটা পনের মত দিলের সেই ডরপুর হৃদয় সুখখানি শুখাইয়া ফেঁদে আকার পাইয়াছে, অব্যাহিত চোখের ধারা তাহাকে ধোত, ধবল ও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। তৈলহীন, রুদ্ধ চুলভলি উদ্যোগী ভ্রমরের মত তাহার উপর উড়িয়া-উড়িয়া গুরিয়া গুরিয়া বেড়াইতেছে। গহের বদন মলিন, ছিন্ন। আর গরনা—নাকের বেশর, কাণের মাকড়ি কোথায় গেল তাহার? ঘরেরই বা এ কি সর্বহারা জীর্ণ মূর্তি! গহেরের প্রাপটা তো আর সত্যসত্যই কুঠিন কঠোর নহে। দেখিতে দেখিতে আশ্ব-বিশৃত হইয়া সে ব্রিঙ্কাসা করিল, “ওরে এ কি! এ কি হাল!—এ সব কি হয়েছে, তরে ও দিল্?”

অক্ষর পর অক্ষর—গহেরের রেহ-নহাছ-কীর্তির মুহূর্ণশর্প দিলের প্রাণের শোক-দুঃখ, মান-অভিমান, প্রেম-প্রীতি, সব যেন গলিয়া-গলিয়া ঝলকে-ঝলকে বাহির হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ তাহার মুখ মিহা কোন কথা বাহির হইল না। তাহার পর করিল, “আমার কথা ছাইড়া দেও তুমি। ছুইড়ি পায় ধরি তোমার, হাতেমের কথা কও—কোথায় দে? পাছে আবার হুঃখু সেই, সেই তরে মুক্তি, তুমি তারে পেনাপাড়াই রাইখা আইছ?”

বলি বড় মিঠে—গহেরের মধুতে ভরা বলিয়া বোধ হয়, চোখের জল যে মোটে মানা মানে না! এ যেন সত্যই কেমন-কেমন বলিয়া বোধ হইতেছে। গহের অবাক হইয়া দিলের অলম্বা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দিল্ অধীর হইয়া করিল, “কথা কও না যে! হাতেম কই?”

গহের মনে মনে করিল, “তাই তো!” একান্তে করিল, “সে পলাইয়া আইছে, তোমার কাছে আসবে বইলা। ক্যাবল আসবে বইলা না, পাছে তুমি না থাইয়া মরো সেই ভরে।” গহেরের হৃদে ধাঁধে নামিয়াছে।

প্রিল্ কীদ্বারা ভাঙ্গাইতে লাগিল,—আহা রে বাপমান! এমন ঘেহের বাছ্যকও আমি কত না হুঃখু দিছি। গহেরকে বলিল, “কোথায় গেল? কোনো বিশপ-আপগ খটল না তো?”

“আম্মা জানে। বোধ করি, পথ হাটুয়াছে। আমি

চলান, তার উদ্দেশ্যে।" বলিয়া গহের পা বাড়াইল। চলিয়া-চলিয়া পা ছলিরাছে, কোমের বাধা ধরিতেছে, দুর্বল, অবসর বেহ চণ্ডিতে একাত্ত অনিচ্ছুক। তবু অবোধ আত্মিক মনের হৃদয় তাড়িল না করিলেই নয়।

দিল উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিল। সময়ে বলিল,

"মইরা থাথা যে। তালস যে করবা, কেমন কইরা করবা।"

হঠাৎ ঘুর হইতে লাগল, কল্প, ক্রিষ্ট কর্তের একটি ডাক আসিয়া উত্তরকে চকিত করিয়া দিল—“চাটি!—ও চাটি!”

কুন্দনন্দিনী

[প্রবেশনাথ বহু]

যে নিবিড়, তামসী নিগাহ হিংস্র-ব্যাতিঃ, প্রকাশন, গুহ কুন্দকণ্ঠি আঘাতের প্রথম দৃষ্টগণে পড়ে, তাহা তাহারই হৃদয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। কুন্দের জীবনে এ নিগাহনন্দনীর বাহিনী আর সুপ্রভাত হয় নাই; আলোক তাহারে ছুটিবার অবসর দেয় নাই। একবার এই ঘনাক্ষ-করে স্বপ্নের তরে উদ্যোগ দেখা দিরাছিল,—সে কেবল সেই তিমিরকে গাঢ়তম করিবার জন্য। কুন্দের জীবনাবসানে বহিঃক্ষেত্রে শিবিয়াছেন—‘অগরিমুট কুন্দ-কুন্দন শুকাইল।’

মাগধ ও হৃৎপিণ্ড মধ্যবর্তী একটা দেশ আছে,—মাগধবৃত্ত; লোক তাহারে স্বপ্নলোক বলিয়া থাকে। এই বিভিন্ন দ্বায়ে স্থান পরিমাণহীন, কাল অনির্দিষ্ট, পতি ও স্থিতি অনিশ্চিত। এ লোকে আলোক ও অন্ধকার, বাস্তব ও অবাস্তব, স্মৃতি ও কল্পনা, হাসি-অশ্রু, আশা-ভয়-বিষাদ একাধারে একাকারে বিরাটমান। হেথা সুদৃঢ় চক্ষু অদৃঢ় মর্শন-শক্তি-সম্পন্ন,—বৃদ্ধ নরনন্দ। এখানে মৃত সঞ্জীবিত,—জীবিত সমাপিত হয়; করতলকে শোচন-শোভন বল বলে,—কিন্তু কর-প্রসারণধারে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এখানকার অমৃত-প্রসবণে তৃষ্ণার তৃপ্তি হয় না, কামাঙ্কলে ক্ষুধা মেটে না। কুন্দনন্দিনী এই স্বপ্নলোকের জীব। বাস্তব সংসারে তাহার জীবন—স্বপ্নের জীবন।

বহিঃ প্রাচীরে প্রথম নীরবতার বালাজীবন সন্নিবেশ বর্ণনা করেন নাই; কিন্তু তাহা অসুখান, কণা কষ্টসাধ্য নহে। জননীর জীর্ণ গৃহে বাহ্যিক সমবয়স্ক। মদিনী চাঁপার সঙ্গে বেশা করে; কিন্তু বেশিতে-বেশিতে অস্তমদক হইয়া যায়। তাহারে নিজের লগনে মগ্ন হইয়া থাকে। তাহার

ফল পাড়িতে আসে। কুন্দ ছুটিয়া যায়, কিন্তু কিছুদূর ঘাইয়াই থমকিয়া দাঁড়ায় ও অবাক হইয়া থাককিয়গকে দেখিতে থাকে। মনে হয়, তাহার সে মৃত, বিহ্বল, বজ্র নীল চক্ষু গুটি ঘেন এ বাস্তব লগ্নতকে সর্বদাই বেখিয়ার, আনিবার, চিনিবার বার্ষ চেষ্টা করিতেছে। ভোরনপাত হইতে বিড়াল মাছ তুলিয়া লইলে, কুন্দ তরে অক্ষুণ্ণ হয়; মুখিক দেখিলে চমকিয়া উঠে; রাজিতে সহসা পেটের হুংকার শুনিলে ঘুর তাগিয়া কাঁপিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় ঘন আঁধারের ঘোর ঘনাইয়া আসে, কিল্লীরবে বিভ্রম জবন মুখরিত হইয়া উঠে, গৃহ-প্রাঙ্গণে অবর-রক্তিত ফুলগাছে ফুল ফুটে, কুন্দ তখন ভাবিতে থাকে, তাহার মা, ভাই, বোনের মুখগুলিও এমনি ফুলের মত কুটরা; থাকিত, তাহার। সব কোথায় করিয়া গেল! বুঝি এই আকাশে নক্ষত্র হইয়া আছে! মৃত আত্মীয়গণকে নক্ষত্র কল্পনা করিয়া কুন্দ চিনিতে চেষ্টা করিত, কোনটিকে।

এই কল্পনা বা ভাবপ্রবলতা কুন্দ-চরিত্রের প্রধান উপাদান—মূল ধাতু।

কুন্দ বৈশিষ্ট্যে মাতৃহীন। মাতার ঘরের শিক্ষার অভাবে তাহার সংসার-শিক্ষা হ্রস্পন্ন হয় নাই। তার উপর কুন্দের পিতা বেশ বিচক্ষণ ছিলেন না। মৃত্যু একে-একে তাহার জ্বর-রক্তগুলিকে হরণ করিয়া বারবার শিখাইয়াছে যে, জীবন অনিশ্চিত, হেথা ইচ্ছামত সকল কাজ সম্পন্ন করা যায় না। তাপাশ, কুন্দের বিরোধযোগ্য বরস হইলে তিনি ভাবিতেন, “কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব, কি লইয়া থাকিব?” “এ কথা তাহার মনে হইত না যে যে দিন তাহার ডাক পড়িলে, সে দিন কুন্দকে

কোথায় রাখিব' ঘাইবেন।" তাহাই হইল। একদিন অকস্মৎ তাঁহার ভ্রূক পড়িল।

সে দিন তারি কড়-বুড়ি। প্রকৃতি যেন কুন্দের ভাবী জীবন তাহাকে অভিন্ন করিয়া দেখাইতেছেন। ক্রমে বাহিরের কড় খামিল। বুকের জীবনে যে ভোগ-শোক-দৈন্তের কড় উঠিয়াছিল, তাহারও অবদান হইল। "কুন-নন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ জোড়ে লইয়া রহিলেন।" কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, ইহা নিভ্রা কি মহানিভ্রা। কিছুকাল বৃদ্ধিবার চেষ্টা করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া কুন শ্রম বেধিল, যেন তাহার জননী এক বিপুল আলোকমণ্ডলে আকৃত হইয়া তাহাকে নক্ষত্রগোকে লইয়া ঘাইবার ভ্রম দাখিয়াছেন। কিন্তু কুন ঘাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে মাতা বিবর হইয়া বলিলেন—"বাছা, ঘাইলে ভাল করিতে। তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ ও পাইবে। কিন্তু আমি তোমাকে হুইটী মহা-মুষ্টি দেখাইতেছি; যদি পায়, তবে ইহা বিগণকে বিবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।" তার পর গগন-পটে এক বিরা পুরুষ ও শ্রাবাসী নারী-মুষ্টি অঙ্কিত হইল। মাতা বলিলেন, "এই পুরুষের বেষকায় মুষ্টি দেখিয়া তুলিও না। ইনি তোমার পক্ষে মহা অনবলের কারণ। আর এই শ্রাবাসী নারীবোশে রাক্ষসী।"

ইতিমধ্যে নদীপথে কলিকাতা বাক্সী নগেন্দ্র দত্ত বড়ের ভ্রম ইহাদের জর্প তবনে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি মনু বুকের মুখে কুন্দের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়াছেন। নগেন্দ্র প্রাণে দ্বিগা বুকের সংকারের ব্যবস্থা করিলেন।

শ্রমদী কুন কি বাতুলে গঠিত, বন্ধিনেত্র প্রথমেই তাহার পরিচয় দিগছেন। পিতার শব্দেই দ্বানাত্তরিত হইলে, কুন কামিতে বলিল। চাপা তাহাকে সাধনা দিবার ভ্রম দাখিল। চাপা কুন্দের সমবয়সী ও সঙ্গিনী হইলেও, সে এই প্রত্যাক নৌকিক জগতের জীব। অশৌকিক যেমন তাহার চর্ম-চর্মের বহির্ভূত, তেমনি তাহার প্রত্যয়ের অতীত। চাপা দেখিল, "কুন কামিতেছে এবং এক-একবার প্রত্যাশাপরংব আকাশ-পানে চাহিয়া দেখিতেছে।" সে কৌতূহল-শ্রমুক বিভ্রালা করিল, "এক-শ'-বার আকাশ-পানে চাহিয়া কি দেখিতেছে?"

কুন অগোচরে উত্তর দিল, "আকাশ থেকে কাল মা আতিয়াহিতেন।"

কিন্তু কুন্দের কাছে বাহা প্রত্যাক সত্য, চাপার কাছে তাহা অবিবাস্য। চাপা বলিল, "হাঁ! মহা বাহুব না কি আবার আসিয়া থাকে!"

কুন শ্রম-বৃত্তান্ত সব বলিল। চাপা বিস্মিত হইল, কিন্তু তৎকণাৎ প্রশ্ন করিল, "সেই আকাশের গায় যে পুরুষ আর যে মহাবাহু দেখিয়াছিলে, তাদের চেন?"—অর্থাৎ তাহার্য বাস্তব জগতের শোক কি না।

কুন বলিল, "না, তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত কুন্দের পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।"

কুন্দের এখন রূপ দেখিবার চক্ হইয়াছে; আর সেই শ্রমদুট পুরুষ সে চক্কে আকৃষ্ট করিয়াছে।

বুকের সংকারের, পর, সত্যমুজ্জা, উপায়বিহীন। বালিকার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া, অন্তোপায় নগেন্দ্রনাথ যখন কুনকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া ঘাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং সেই কথা বিববার ভ্রম তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন, কুন আসিতে-আসিতে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া অকস্মৎ তন্ত্রিতের ভ্রম দাঁড়াইল। সেই শ্রম-দুট মুষ্টি, শ্রম-জগতের পুরুষ শরীরী হইয়া যে তাহার সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, কুন ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে বিশ্বযোগ্যত্ব-সোপানে বিশ্বদূর ভ্রম নগেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। তার পর চাপাকে অশুনি নির্দেশ দিয়া নগেন্দ্রকে দেখাইয়া করিল, "এই সেই।"

"এই কে?"

"কাল রাত্রে মা বাহাকে আকাশের গায় দেখাইয়া-ছিলেন।"

প্রথম কৌতূহল, তার উপর রূপের আকর্ষণ। নগেন্দ্রকে প্রত্যাক শ্রম কামিয়াই যে, কুন্দের মনে অস্বাভাব-সঙ্গার হইবে, তাহা বিচিৎ কি? নগেন্দ্র যখন তাহাকে বলিয়া-ছিলেন, "কুন, যোগ হয়, তুমি আমাকে কখন ভালবাসিতে না।" কুন এই ভ্রমই তখন উত্তর দিগাছিল, "বয়সের বাদি।"

নগেন্দ্র কুনকে লইয়া কলিকাতার গেলেন। সেখানে তাহাকে তাঁহার ভগিনী কমলবিন্দু নিকট রাখিয়া, কুন্দের আত্মীয়-বন্ধনের অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাহাকেও পাঠ্য দেয় না। যখনই কুনকে সত্য লইয়া নিতি

গোবিন্দপুরে বাসা করিলেন। বাসাকালে বিবৃত প্রায়
সপ্ত-কথা একবার কুন্দের শ্রবণ-পথে আসিল। “কিন্তু
নগেন্দ্রের কাকলা-পূর্ণ মূখ-কান্তি এবং লোক-বৎসল চরিত্র
মনে করিয়া, কুন্দ কিছুতেই বিবাহ করিল না যে, ইহা
হইতে তাহার অমিষ্ট হইবে। অথবা কেহ-কেহ এমন
পতঙ্গবৃত্ত যে, অগতঃ হিংস্রাশি দেখিয়াও ভয়না প্রদর্শিত হয়।”

সত্য! পতঙ্গ যে ঘোহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া অনলে
আত্মবিসর্জন করে, বাবের বংশী-ধ্বনি শুনিয়া মৃগ
যে ঘোহিনীতে অন্তিভূত হয়, যে ঘোহিনীতে আচ্ছন্ন
হইয়া কখনা অজ্ঞাতের গুহ, তপ্ত হস্তের সন্ধানে
ছুটতে থাকে, নগেন্দ্রের মূর্তি সেই ঘোহিনীতে কুন্দ-
নন্দিনীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আকর্ষণের ধর্ম
এই যে, কর্তা-কর্ম উভয়েরই উপর তাহা সমভাবে আপনার
প্রভাব বিস্তার করে। নগেন্দ্র যেমন কুন্দকে আকর্ষণ
করিয়াছিলেন, আপনিও তেমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।
কুন্দকে কিছুদিন দেখিবার পর, তিনি হরদেব ঘোষালকে
পত্র লিখিতেছেন,—

“এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না।
.....লেখাপড়ার তাহার বিধা বুদ্ধি। কিন্তু অত্র কোন
কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃৎ নীল হুইটী চক্ষু—চক্ষু হুইটী
শরতের মত সর্জলাই বহু ধূসে ডালিতেছে—সেই হুইটী
চক্ষু আমার-মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে,
কিছু বলে না।—আমি সে চক্ষু দেখিতে-দেখিতে, অন্তঃমন
হই, আর মুখাইতে পারি না। তুমি আমার মতি-দ্বৈধের
এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে। কিন্তু তোমার ঘনি সেই
হুইটী চক্ষুর সম্মুখে ধাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও
মতি-দ্বৈধের পরিচয় পাই। চক্ষু হুইটী যে করুণ, তাহা
আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার
এক বকম দেখিলাম না। আহার বোধ হয়, যেন এ
পৃথিবীর সে চোক নয়, এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল
করিয়া দেখে না, অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে
নিবৃত্ত আছে। কুন্দ যে নির্দোষ মূল্যহীন, তাহা নহে।
অনেকের তুলনায় তাহার সুধাবহর অপেক্ষাকৃত অগ্রাংশ-
সমী়া বোধ হয়; অগতঃ আমার বোধ হয়, এমন মূল্যহীন
কখনও দেখি নাই। যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু

কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া নগেন্দ্রের মনে যে তরঙ্গ
উঠিয়াছে, তাহা তিনি এখনও পশ্চাৎ কল্পিয়া বৃত্তিতে পারেন
নাই। স্থির বহু ধূসে “শরচ্ছত্রের কিরণ সম্পাত” (তুলনাটী
বহিঃচরিত্রেরই) সরোবর যেমন বৃত্তিতে পড়ে না, কিন্তু
তাহার অন্তরের অন্তঃস্থ পর্বাৎ যেমন সে আলোক-গুপ্তকে
নাচিয়া উঠে, নগেন্দ্রের অবস্থা এখন সেই মত। নগেন্দ্র
কুন্দকে বধাবধই বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এত পুখা-
পুখা বর্ণনা করাটাই সে মূলতঃ। বর্ণনা করিয়া নগেন্দ্রের
কিছুতেই আর তৃপ্তি চাইতেছে না।—“যেন চেষ্টা করি
গুপ্তসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার
সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য
পদার্থটী, তাহার সর্বাঙ্গীন শাস্ত্র ভাবব্যক্তি—“শরচ্ছত্রের
কিরণ-সম্পাতে বহু সরোবরের ভাবব্যক্তি” ইত্যাদি।

কুন্দ যে অপূর্ণ মূল্যহীন তাহা নহে, কিন্তু “লোক-মনো-
দোহিনী।”

হৃদ্যমুখী পত্রে লিখিলেন,—“একটা বাসিকা কুড়াইয়া
পাইয়া কি আমার তুলিলে?.....যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ
করিবার অতিপ্রায় করিয়া থাকে, তবে বল, আমি বরণভাণা
সাজাইতে বসি।” কথাগুলো এখনও পর্বাৎ ঠাট্টা-ভাষা
বটে, কিন্তু অনেক সময় যে হাসিতে-হাসিতে মাথা বাগা
করে! নগেন্দ্র বৃৎ হইয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্বাৎ লুভ হন
নাই।

ভার্গ্যার অহুত্যাধে নগেন্দ্র কুন্দকে গোবিন্দপুরে লইয়া
গেলেন। হৃদ্যমুখী তাহার আশ্রিত ভাষাচরণের সহিত
তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পরে কুন্দ
বিধবা হইল। কুন্দের বিবাহিত জীবনের এই তিন বৎসরের
ইতিহাস উপভাসে নাই। কিন্তু তাহা আমরা বেশ বৃত্তিতে
পারি। যনের পানীকে ধরিয়া আনিয়া শিল্পের পুঞ্জিলে,
সে যেমন তাহার সঙ্গীত জন্ত উত্তরা হইয়া লভ্য আকাশ-
পানে চাহিয়া থাকে, কুন্দের অবস্থা এখন তাই। ভাষা-
চরণের অনেক কাজ। বৃৎ লইয়া সমগ্রকণ করিবার
অবলম্ব তাহার নাই। সে দিনের বেলায় মূল-মাটার।
সন্ধ্যার পর বেবেজ নগের বৈঠকখানার রিকমার। এ
সকলের উপর আমার তাহার একটা পোষা বান্দরী ছিল।
একদা অবস্থার সে যে বধুর চিত্তাকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে
সে তাহাকে সত্যভাগ্য হইবে, তাহা সন্ধ্যা কড়া মনে না।

মনে হয়, কৃষ্ণ যেন গ্রামে কোন বিশেষের সঙ্গে যোগ করিতেছে। এখানে চাপাচাপ বাতাস-বরষার হিঙ্গাব ছাড়া আর কিছুই নিকাশ দিতে হয় না। অমূল্য যৌবনের যে কতটা ব্যর্থ-ব্যর্থ হইতেছে, কৃষ্ণের কাছে সে হিঙ্গাব লইবার কেষ্ট ছিল না। তারারচরণের সে বাঁহীটো মাঝে মাঝে তাহারক আঁচড়ায়-কানড়ায়, তিনি নারী-মাতির ব্যবহার সম্বন্ধে বহুক বিশেষ-ভাবে উপদেশ দেন। তারারচরণ পরীর সঙ্গে প্রেমাপাণ করিতেন মহালী রীতার নবর প্রী (Moral Reader no. 3) হইতে; আর রবিবার মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে তাহারক সিটিজেন অফ্‌ দি ওয়ার্ল্ড (Citizen of the World) বাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার প্রায়ই কৃষ্ণকে পাড় করাইয়া বক্তৃতার মহলা দিতেন। এইরূপে তারারচরণ একদিকে বক্তৃতার স্রোতে, অপরদিকে কৃষ্ণ আপনায় মনের স্রোতে ভাসিয়া বাইতে লাগিল। পরীর রাজ্যে কৃষ্ণ যখন ভাগিনা-ভাগিয়া স্বপ্ন দেখিত, তখন দেখিত, যুনের খোরে তারারচরণ হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া কোন বিম্বত-পাঠ বালকের বর্ণাধ্বনি করিতেছেন। কৃষ্ণ অতি কোমল, অতি ভীক, ভ্রমের লুভ দৃষ্টি তাহারক পীড়িত, ব্যথিত করে।

কৃষ্ণমন্দিরী "নবযৌবন সত্যের অপূর্ণ শোভা" তারারচরণ না দেখুন, কথিত বেবেস্ত্র দত্ত তাহা দেখিয়াছিল এবং দেখিয়া আর ভুলিতে পারে নাই। তাই বিধবা হইবার পর কৃষ্ণ যখন নগেশ্বরের অন্তঃপুরবাসিনী হইল, তাহারক দেখিবার কল্প হরিদাসী বৈকুণ্ঠী সাজিয়া দেবেস্ত্র দত্ত মাকে-মাঝে সেখানে আনাগোনা করিত।

কৃষ্ণ গোবিন্দপুরে নগেশ্ব দত্তের গৃহে আসা অবধি, প্রথম কিছুদিনের কাহিনী বহুমুখ হুপ্পট প্রকাশ করেন নাই। কৃষ্ণ গোবিন্দপুরে আসিয়াই "নগেশ্বরের বাড়ী দেখিয়া অধাক্‌ হইয়া গেল," তার পর স্ব্যামুখীর খাস-দাসী হীরায়ে দেখিয়া "তারার পরীর কটকটি এবং আপনমনস্ক স্বেনাক হইল," কৃষ্ণের স্বপ্ন-পুষ্ট অপরা মুষ্টি এই। ইহার অধিক কথা আর উপক্রমে নাই। কিন্তু না থাকিলেও, পাঠকের কাছে তাহা অজ্ঞাত থাকে না। আমরা প্রথম যে বাণিকাকে দেখিয়াছি, কখনও বীর, কখনও চকল,—কৃষ্ণ এখন আর ঠিক তেমনটাই নাই। পুশিত যৌবনে

ঈশং শক্তিত, প্রতি পক্ষপে আপনা-আপনি কুণ্ডিত। সে এখন কুটুখিনীদের মহলা থাকে; পদের মত—পাঁকে থাকে, পাঁক মাঝে না। কৃষ্ণের জীবন স্বতঃ, কাহারও সহিত মিশ যায় না। স্বরভাষিণী, স্বভাবতঃ-ভীক, সকলকে সম্বন্ধে করিতে অস্বস্তি বহুতী। একই অঙ্গমনা। নমন যেন নিরত কি অধেবণ করিতেছে। শ্রবণ যেন কোন দূর ব্যস্তিধনি তনিসার আকাজ্জার দত্ত উৎকর্ষ। পূর্ণ-দুই স্বপ্নের কথা কৃষ্ণের আর এখন মনে নাই। সে স্বপ্ন আর এক স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণের জ্বর সর্বদাই তাহারে বিভোর। এই স্বপ্নই তাহার জীবন—তাহার জীবনের অনন্ত অবলম্বন। এই প্রেম-স্বপ্ন হইতে কৃষ্ণের স্বতঃ অস্তিত্ব নাই।

হরিদাসী বৈকুণ্ঠী যখন তাহারক জিজ্ঞাসা করিল, "হীরাগা—তুমি কিছু কহিয়াস করিলে না?"

ভিখারিণীকেও করমাণ করিতে কৃষ্ণের মুখে বাধে। "সে তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া, একটু হাসিয়া,—সবী নয়, সন্নী নয়—এক বরজার কাণে কাণে বলিল, কীর্তন গাইতে বল না।"—এ গান যে বহুদিনের আর এক প্রেম-স্বপ্নের গান! এ গানে যে চিত্র-প্রেমের উজ্জ্বল, আশা-আকাজ্জা-ভর, চির-বিরহের বাধা, চোখের অলে কথায়-কথায় গাঁথা! ইহাতে যে পূর্ণ আশা-নিবেদন, অপূর্ণ মিলন, অতৃপ্তির মিঃখাস, আশার বিলাস, ভক্তের চিরান্তিলাব, প্রেমিক-প্রেমিকার জ্বরের ভাবা অক্ষর-অক্ষরে প্রকটিত! কৃষ্ণের মুখে প্রাণের কথা বলিবার ভাষা নাই—তাঁই, কৃষ্ণ বলিল, কীর্তন গাইতে বল না।

কৃষ্ণে স্ব্যামুখী কৃষ্ণকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। এই অপার্থিব কৃষ্ণের সৌরভে নগেশ্ব উগ্রভ্রমার হইয়া উঠিলেন। —"দিনব্যয় যথো ক্রমে ক্রমে নগেশ্বের সকল চরিত্র পরি-বর্তিত হইতে লাগিল। নির্বল আকাশে বেগ দেখা দিল। নিরাশ-কালের প্রয়োজ্যকালের মত অকস্মাৎ সে চরিত্র বোঝাত হইতে লাগিল। দেখিয়া স্ব্যামুখী গোপনে আপনায় অফলে চক্ষু মুদ্রিলেন" ও কমলমণিকে পত্র লিখিলেন—"একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার হৃদয় কেহ নাই। একবার এসো!"

কমলমণি আসিলেন। চিত্ত অনুধিণী, অজানিণী,

সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে কুম্মকে হানাত্তরিত করিতে হইবে। কথার কথার কুম্ম কুম্মকে বলিলেন, “যদি আমি তোমার ভালবাসি—আর তুমি আমার ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না—যাবে?”

কুম্ম বাড় নাড়িল—“ধাব না।” মনে-মনে বলিল, গেলে যে, নগেশ্বকে দেখিতে পাইব না। কুম্ম আর কিছুই চায় না, কেবল নগেশ্বকে দেখিতে চায়। দূর হইতে, অতি দূর হইতে, নক্সা যেমন অগাধ তদ-মিহু ভেব করিয়া পৃথিবীকে, দেখে তেমনি করিয়া দেখিতে চায়।—“সেই কুম্ম দ্বারবানির মধ্যে অপরিহিত প্রেম। প্রকাশের সক্তি নাই বলিয়া তাহা বিকৃত বায়ুর জায় সতত কুম্মের সে দ্বারে আঘাত করিত।” বাণা-কাণাবধি কুম্ম নগেশ্বকে ভালবাসিয়াছিল—কাঁধকে বলে নাই। নগেশ্বকে পাইবার বাসনা তাহার মনে ছিল না—কোন আশা স্বপ্ন করে নাই। আপনায় নৈরাশ্র আপনি সধ করিত। সেই গভীর নৈরাশ্রপূর্ণ হৃদয়ের গভীরতম অন্ধত্বপূর্ণ নক্সাজ্বালায় মত কুম্ম নগেশ্বের বৃষ্টি মুকাইয়া রাখিত। কুম্ম সরলা কুম্মের মনের কথা বুঝিলেন, বলিলেন, “তুমি ধাবাবাক্ষে বড় ভালবাসিস—না?”

কুম্ম কথার এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। কিন্তু যে উত্তর হৃদয়ের কথা হইতে মুখের, তাহা হইতেও স্পষ্টতর, কুম্ম সেই উত্তর দিল—চোখের মশে। হৃদয়ের কথা প্রত্যক্ষা করিতে পারে; চোখের লগ্ন মিছা বলে না।

কুম্ম বলিলেন, “বুঝছি—মরহাছ। মর, তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু মরে-মরে অনেকে মরে বেঁ?”

কুম্ম এ কথা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ভালবাসে বলিয়াই দোষী? কুম্মের বুক পঙ্ক থাকে, সে কি কুম্মের অপরাধ! নারীর পক্ষে পরকীয়া প্রেম যে দুর্নীতি, বিধবাকে যে পরপুরুষের ধ্যান করিতে নাই, কুম্ম সে কথা ঠিক বুঝিত না। এইমত তাহার চরিত্রে কোথাও আত্ম-শাসনের প্রয়াস বা আত্ময়ানি নাই। স্বভাব-দুহিতা কুম্মের স্বভাব-ভ্রমণ সরলতা। পরহঃখকাতরতা তাহার চরিত্রের অঙ্গকার। পরের লজ্জা, বিশেষ উপকারীর লজ্জা আত্মত্যাগ তাহার ধর্ম। কুম্ম কুম্মের বন্ধ হইতে মতক উত্তোলন করিয়া হির-মুষ্টি করিয়া রাখিল। কুম্মদমনি তাহার মনের সে নীরব প্রশ্ন বুঝিলেন, বলিলেন, “পোড়ারমুখী, চোখের

মাথা খেয়েছে? দেখিতে পাও না যে—” কুম্মের কথা শেব না হইতেই কুম্মের উত্তর মন্তক দ্বিগুণা কুম্মদমনির বক্ষের উপর পড়িল। সহসা উজ্জল আলোক ঠাড়িলে চক্ষু যেমন অন্ধকার দেখে, কুম্ম তেমনি অন্ধকার দেখিল। তার পর চুইলেন অনেককণ ধরিয়া কাঁদিল। অবশেষে কুম্ম বলিলেন, “আমার সঙ্গে চল। নহিলে মর। সোপার সংসার ছাড়বার গেল।”

কুম্ম বুঝিল। বুঝিল, চির-দুঃখিনীরা শ্রেষ্ঠ সম্পদ—প্রেমাস্পদকে চোখের-সেবা দেখা, তাহার ঝাণায় জীবনের একমাত্র আলো—হতাশা-সাগরের ত্রবতারা, আশাপূত্র ভালবাসার একমাত্র কৃষ্ণি। তাহাও বিসর্জন দিতে হইবে। কুম্ম অনেককণ ধরিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আপনাকে বুকাইল। তার পর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বলিয়া বলিল—“ধাব।”

কুম্ম যে কতখানি বিসর্জন দিতেছে,—আপনার হিতের লজ্জা নয়—কুম্ম তাহা বুঝে না,—পরের মঙ্গলের লজ্জা, নগেশ্বের হিতার্থ, স্বর্গামুখীর হিতার্থ, যে আত্মবলি দিতেছে, কুম্ম তাহা বুঝিলেন।

কিন্তু যদি জীবনের এই একমাত্র মুখ বিসর্জন দিয়া হানাত্তরে বাইতে হয়, তবে সোকাত্তরে বাইতেই বা ক্ষতি কি? অন্ধকার বাণীতেই একাধিনী বলিয়া কুম্ম সেই কথাই ভাবিতেছিল। তাহার উর্জর, উত্তপ্ত কল্লার কত কথাই উঠিতেছে। কুম্ম অন্ধকারে বলিয়া, আকাশ চাখিয়া ভাবিতেছে—“মাহু কি মরিয়া নক্সা হয়?” তবে যদি না কেন? কেমন করিয়া মরিব? মলে ডুবিয়া? ভালই ত! যদিও নক্সা হয়, তাহ’লে তাঁহাকে রোজ-রোজ দেখিতে পাব। কাকে? কাকে? মুখে বলতে পারিনে কেন?

সাধক যেমন ইষ্ট-দেবতার নাম অন্তরের অন্তরে গোপন করিয়া রাখে, প্রকাশ করিলে মহাপ্রভাবায়ের তাণ্ডী হয়, কুম্ম তেমনি তাহার ইষ্টদেবতার নাম হৃদয়ের নিভৃত বুলে গোপন করিয়া রাখে। কিন্তু আত্ম জীবন-মঙ্গলের সন্ধিস্থলে গাড়াইয়া কুম্ম আপনাকে আগনি প্রের করিতেছে—“নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেউ নেই—কেহ জনিতে পাবে না, একবার মুখে আনিব? কেহ নেই, মনের সাথে নাম করি।” অন্তিম সবরে মুখু যেমন ইষ্টনাম

ইবার ঢাক দেখিত। কিন্তু হীরা আনিত, নগেন্দ্রবাসু কুন্দের
অনু পাগল। কুন্দের গৃহত্যাগে দত্তের অমন হাতমুখ
বাঁকীথানা যেন বোম্বটা টানিয়া বলিয়া আছে। তাহার
উপর যেন একটা আগর বিপদের বিপদ ছায়া পড়িয়াছে।
নগেন্দ্রের জ্বরহাস্যে সজা লাগিয়াছে, হৃদয় ভুৎভুৎ,
এখন চাঁদ উঠিবার সময়। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র—কুন্দ। হীরা
সম্মত করিল, চাঁদকে কিছুদিন সুকাইয়া রাখিয়া সময়মত
সে আকাশে উন্নত করিবে। হীরা তাবিয়াছিল, কুন্দ
বোকা মেয়ে, সে তাহাকে দ্বন্দ্বই বশ করিতে পারিবে।
বাহু হবেন কুন্দের আত্মকাতারী, আর সে হবে কুন্দের
স্বকন্যাপর। এখন হৃদয় বাগাতে শীত শীত অস্ত বায়,
হীরা সেই চোঁদার দনিববাঁকী পেল। হল-দুতার কলহ
করিয়া নগেন্দ্রকে বলিল, সে বিদায় চাই। মা ঠাকুরাণীর
মুখের আগার আর কেহ টিকিতে পারিবে না। সে-দিন
তিনি বা-তা বলিয়া কুন্দ ঠাকুরাণীকে দূর করিয়া দিয়া-
ছেন। সজা আরও ঘোর হইল। নগেন্দ্র হৃদয়বৃত্তিকে
বলিলেন, তিনি কুন্দের মত গৃহত্যাগী হইবেন, তাহাকে
অপেক্ষা করিয়া সে-সে-সে মিচিবে। অন্তর্গামী হৃদয়
তাঁহার পাখ গড়াইয়া পড়িয়া বলিল, “আর একমাল থাক।
কুন্দকে না পাওয়া যায়, গৃহত্যাগ করিও।”

হীরা অনেক তাবিয়া এই চাপ চালাইয়াছিল। বাহুব
এমনি ভাবে। সাত চাপ চিহ্নিয়া ঠিক করে, মস্তকে
চাপায় রাখিয়া বোড়ের কিত্তিতে মাং করিবে। কিন্তু
কোথা হইতে বোড়ার আড়াই চাপ তাঁহার সর মতদব
লগতও করিয়া দেয়। তাৎপরি হইল। হীরা গৃহে কিছু-
দিন থাকিত-থাকিতে বোকা মেয়ে তাবিল, “এ আবার
কি হইল। আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম।
আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইতাম। এখন একবারও
দেখিতে পাই না।” ক্রমে ভিরকার, অপমান, সজা সব
ফুলিয়া, চাঁদ আগনি আদিয়া বরা দিল।

হৃদয়বৃত্তি বনে-বনে ছিন্ন করিয়াছিল, যদি কুন্দনন্দিনী
আসে, তাহাকে স্বামী-দান করিয়া, গৃহত্যাগ করিবেন।
কুন্দ কিরিয়া আসিলে তিনি স্বয়ং ঘটক হইয়া নগেন্দ্রের
সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

দানবক্রীডনে কখন-কখন এখন কট্টন সমস্তার উপর
হয়, বাহাতে ভিত্তরকার অগতঃ হাতঘটি এক দরজা বাক

হইয়া পড়ে। এই অতঃস্থান-আলোকের সম্মুখে তাহার
অভিনিহিত প্রকৃতি, প্রকৃতি, বল, বুদ্ধি, অতিশক্তি কিছুই
অপ্রকাশ থাকে না। এই সকল সমস্তই লোক-চরিত্র
পটীকার কট্ট-পাথর। এই পটীকার দানবের চরিত্রজনত
স্বাভাৱ লক্ষিত হয়। নগেন্দ্রের সহিত বিবাহ কুন্দনন্দিনীর
জীবন-সমস্ত।

কুন্দের যদি কিছুমাত্র সঙ্গার-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে
সে এ গরিবের কখনই সম্মত হইত না। একদিকে বিশ্বাসী
সুখার শেনিহানু জিহ্বা, আত্মকৃত্তির মত অনন্ত প্রকৃতির
উদাম উজ্জ্বল, অত্মিকে অতিমানে অনিচ্ছার আত্ম-বলি-
দান। এ পরিণামের পরিণাম কখন শুভপ্রদ হইতে পারে
না। কিন্তু পঙ্গরপালিতা, পরাধীন, চিরচুঃখিনী কুন্দ
চিরদিন গরুর ইচ্ছার চালিত। যেজ্ঞাচালিত হইয়া কুন্দ
ইহলীডনে কেবল একটীবার কাৰ্য্য করিয়াছিল, তাহা বিব-
পান। হৃদয়বৃত্তি তাবিণেন, কুন্দকে পাইয়া নগেন্দ্র হৃদয়
হইবেন; নগেন্দ্র তাবিণেন, কুন্দকে পাইয়া আমি হৃদয়
হইব; কুন্দ তাবিল, তাহার আত্মদানে হৃদয়বৃত্তি, নগেন্দ্র
উভয়েই তৃপ্ত হইবেন।

কুন্দের এ ভ্রান্তি অচিরেই তাকিয়া পেল। নগেন্দ্রের
বিবাহের পর-রাত্রেই হৃদয়বৃত্তি গৃহত্যাগ করিলেন, কিন্তু
তাঁহাকেও মাপাইয়া দিয়া গেলেন।

আহা-কাহিনীতে তখন বায়, আবহোদ্যনের একদিনের
মত রাবাকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। অত্যাগিনী কুন্দের একদিনের
স্বাভাব একদিন-অবগমন হইল। বহন্য বোহভকে নগেন্দ্র
দারুণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কুন্দ বাখিত হইল।
হৃদয়বৃত্তি তাহার মত এত করিয়াছে, আর সেই হৃদয়বৃত্তি
তাহার মত গৃহত্যাগিনী। কুন্দ তাবিল, আমি হৃদয় না
হইয়া মরিলে ভাল ছিল। কুন্দের মনে দৈর্ঘ্য ছিল না।
যে ভালবাসা তোদগলগল-বিহীন, কেবল আত্মদান করিয়া
তৃপ্ত, আত্ম দিবেদনের চরিতার্থতার হৃদয়, সে ভালবাসার
বিষের বিব স্পর্শ করে না। তাহার সরল, উদার হৃদয়
হৃদয়বৃত্তির হৃদয়ে গুলিয়া গেল। কুন্দ নগেন্দ্রকে এর
করিল, “কি করিলে আবার যেমন ছিল তেমন হয়?”

নগেন্দ্র তাবিলেন, এ এর অতঃস্থানের আত্মদান।
তাঁহার মনে বড় শুকতর বাসিল। বাহার মত তিনি
দর্প, বোকাগল, চরিত্র, আত্মদান এবং কি হৃদয়বৃত্তি

পূর্ণাঙ্গ হারাইয়াছেন, সেই বলিতেছে, কি করিলে বেমন ছিল আবার ভেদনি হয়। তিনি বিংক হইয়া ভিজ্ঞান করিলেন, “তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অহুতাপ হইয়াছে?”

কুম্ভ বুকাইয়া বলিল, “তাঁরা নহে। তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে স্থানী করিয়াছ তাঁরা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তা বলিতেছি না। আমি বলিতে-ছিলাম কি করিলে হৃৎসুখী কিরিয়া আসে।”

কুম্ভের মুখে হৃৎসুখীর নাম শুনিয়া নগেন্দ্র অলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “তোমারই ভ্রাতৃ হৃৎসুখী আমার জ্ঞাপ করিয়া গেল।”

এ কঠোর আঘাত কুম্ভ নীরবে সহ করিল। নগেন্দ্রের চক্ষু তখন অহুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, চটুকেট করিতেছে। কুম্ভের ঐ শাস্তভাব তাঁহার ভাল লাগিল না। কথার-কথার ভিজ্ঞান করিলেন, “তুমি কি আমার আর ভালবাস না?”

কুম্ভ বলিল, “হাসি বৈ কি।” “বাসি বৈ কি। এ যে বালক তুলান কথা।” “কুম্ভ, বোধ হয়, তুমি আমাকে কখন ভালবাসিতে না।”

“বরাবর বাসি” বলিয়া কুম্ভ ঘন ঘন বাতাস করিতে লাগিল।

বিবর অর্জুন করিলেই হয় না, রাগিতে জানা চাই। নগেন্দ্রের ঘন এখন অহুতাপে হু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি চাফিতেছেন সাবনা, বুঝিতেছেন—শাস্তি। হৃৎসুখী হইলে উষ্মলিত প্রেম-বারার, কথার নির্করে নগেন্দ্রকে নিবিক্ত করিয়া দিও করিয়া দিত। কিন্তু কুম্ভ কথা জানে না। নগেন্দ্র তাঁহা বুঝিলেন না, বলিলেন, “আমাকে হৃৎসুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় সুন্দার হার সহিবে কেন? হোতার শিকলই ভাল।”

কুম্ভ ক্রমে নগেন্দ্রের চক্ষুঃপূর্ণ হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র হরষবেগে শিখিলেন, “কুম্ভের মোহ নাই, মোহ আমারই, কিন্তু আমি আর তাঁহার মুখদর্শন সহ করিতে পারিতেছি না।” হাওরানের উপর বিবর-কর্ণ রমণ্যবেশের ভার দিয়া তিনি দৃষ্টতাপ করিলেন—যেন-যেন হৃৎসুখীকে বুজিবার ভ্রাতৃ। কুম্ভের সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্ণাঙ্গ করিলেন না।

সহায়সীল। সমস্তকি-কিটান। কামের জীবন চন্দ্র

হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র একখানা পত্র লিখিয়াও তাঁহার তত্ত্ব করেন না। হাওরানের নিকট মধ্যে-মধ্যে যে পত্র আসে, কুম্ভ সেগুলিকে লণঘণ্য করিয়াছে।

কুম্ভ রাতিদিন কাশে, রাতিদিন ভাবে, কেন এমন হইল। আমি কখন নগেন্দ্রকে পাইবার আশা করি নাই। ঠাঃ, কে আমাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। আমি কি ঘোষে সে চাঁদ হারাইলাম। আবার যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। তাহারই ভ্রাতৃ হৃৎসুখী, তাঁহার শরম হিত-কারিণী, পথের কান্দালিনী হইয়াছেন। কুম্ভ সন্মম করিল, মল্লিবে। কিন্তু এখন নয়। নগেন্দ্রকে আর একবার দেখিবে। আর হৃৎসুখী যদি কিরিয়া আসেন, তবে মল্লিবে। আর তাঁর হৃৎসুখের পথে কাঁটা হবে না। হার, ভ্রাতৃত্ব স্বপ্ন কিছুতেই ভাঙে না। হৃৎসুখ যন্ত্রণার দ্বন্দ্ব চটুকেট করিতে থাকে, তবু সাহসে প্রাণপণে হৃৎসুখকে বুকে আঁকড়িয়া ধরে।

ইতিমধ্যে হৃৎসুখীর নিখা। সূত্ৰা-সংবাস রটিল। কুম্ভ কামিল। কিন্তু নগেন্দ্র কিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার শ্রীণ অধরে হাসি দেখা দিল। তাঁর পর নগেন্দ্র কিরিলেন। আশ্বীর-শবন সফলকে সন্তপ্ত করিলেন। কেবল চির-হৃৎসুখী কুম্ভনন্দিনীর মলিত সাক্ষৎ করিলেন না। হৃৎসুখীক যাতনায় কুম্ভ পরিতাপ করিতে লাগিল, “কেন আমি দানী-দর্শন-লালসার প্রাণ রাখিয়াছিলাম। এখন আর কোন হৃৎসুখের আশার প্রাণ রাখি।”

নগেন্দ্র হৃৎসুখীর শরম-কক্ষে গেলেন—হৃৎসুখীর ভ্রাতৃ রোদন করিতে; কুম্ভ আপনায় শরম কক্ষে গেল—আপনার ভ্রাতৃ কাঁদিত। যে পরের ভ্রাতৃ কাঁদে, তাঁর রোদন বরং সহনীয়; যে আপনায় ভ্রাতৃ কাঁদে, তাঁর রোদন হৃৎসুখ। সে হৃৎসুখী বিরহ-রজনীর অন্তঃকালে যে কল্প, দ্বন্দ্বভেদী নটের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা শোক-চক্ষুর অগোচর। সে উপেক্ষিতার বাধা, আত্মল অক্ষয়; সে আশার নিরাশা, নিরাশার প্রতীক্ষা; সে বাসনার উত্তেজনা, লজ্জার অবসাদ; সে ব্যাভুল বুক-কাটা কাঁদা বুক চাপিয়া রাখা; সে পদ-শব্দে ভ্রাতৃ কাণ-পাতিয়া থাকা; দেখিয়াছিলেন কেবল অন্তর্গামী।

সদত রাত্তির পর প্রভাতে কুম্ভের একটু তত্ত্বা আসিল। তখন সে আবার ডায়ান হাতকে হৃৎসুখী দেখিল। সাতা

ভাষাকে লইবার যত্ন আদিয়াছেন। মিত্রাত্তবে কুন্দ সেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল—“এবার আমার যত্ন সকল হউক।”

দীয়া তখন কুন্দের পরিচয় করে। সে প্রত্যতে আসিয়া বুধিল, কুন্দ সাধা রাতি কাঁদিয়াছে। কথার সহায়ত্বিত্তি জানাইয়া চকুহা দীয়া কুন্দের সহ কথা জানিয়া লইল। কৃত্রিম সহায়ত্বিত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, “আমার মত যদি তোমাকে চুঃখ দহিতে হইত, তবে এতদিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।”

আত্মহত্যার নাম শুনিয়া কুন্দ চমকিয়া উঠিল। রাজিতে সে অনেকবার এই কথা জাবিয়াছে। জাবিল, এ কি বিধাতার সঙ্কট!

দীয়া আপনার দুঃখের কাহিনী, বলিয়া বলিল, “এই দেখ, আত্মহত্যা করিব বলিয়া আমি বিধি কিনিয়াছিলাম।” বলিয়া বিধি দেখাইল।

সেই সময়ে সহসা বস্ত্র গৃহে মঙ্গল শব্দরোল উঠিল। দীয়া ছুটিয়া দেখিতে গেল। কুন্দ একদিন বাস্তবসূচক বিব পান করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তখন ভাবিয়াছিল, বিধ কোথায় পাইবে, কে আনিয়া দিবে। সেই বিধ তাহার সমুখে। একি দৈব-প্রেরিত! কুন্দ বিধ পান করিল। প্রেরণের অমৃত সিদ্ধি যখনে অজাদিনী কুন্দের ভাগ্যে উঠিল কেবল হলাধল।

ইতিমধ্যে স্বর্গদূতী গৃহে কিরিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজনকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কমলের সঙ্গে তিনি কুন্দকে দেখিতে আসিলেন। কুন্দের অবস্থা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

নগেন্দ্র আসিলে কুন্দ দ্বিগবীরবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র পদপথ কর্তে প্রসন্ন করিলেন—“এ কি এ কুন্দ, তুমি কি ঘোবে ভাগ করিয়া বাইতেছ?”

কুন্দ কখন স্বাধীন কথার উত্তর করিত না। আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন মনে কথা কহিল, বলিল, “তুমি কি ঘোবে আমার ভাগ করিয়াছ?”

বাস্তবপূর্ণ নগেন্দ্র আর সত্যতা বালিকার কাছে নিকন্তর! কুন্দ বলিতে লাগিল, “কাল যদি তুমি আসিয়া, এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, কাল যদি তুমি একবার আমার নিকট এমনি করিয়া আসিতে তবে আমি

মরিতাম না। আমি অধর্মিন্যাত্র তোমার পাইরাছি, তোমার দেখিয়া আমার আশ্রয় তৃপ্তি হয় নাই।”

নগেন্দ্র মন্দপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, “কেন এমন কাণ্ড করিলে? আমাকে একবার ডাকিলে না কেন?”

পাছে অস্তিম-অভিমান-বেদনার চিত্তবৃত্তি স্বাধীন মনে থাকিয়া যায়, তাই কুন্দ দিবা হাঙ্গি হাসিয়া বলিল, “তাঁরা জাবিও না। বাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে তোমাকে দেখিয়া মরিব।…… আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।”

নগেন্দ্র তখন নীরবে বলিয়া সেই “মৃত্যুচ্ছাদা-মান মুখে দেখে প্রহসিতা দেখিতেছিলেন।” সে আশ্চর্য্যিত মুখে তিনি যে হাসি দেখিয়াছিলেন, প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার বলিতে লাগিল,—অস্তিম বাসের সঙ্গে ভীত বিয়ের ভীতস্তর আগার ছটকট করিতে-করিতে কুন্দ বলিতে লাগিল,—মৃত্যুচ্ছাদাচ্ছন্ন নয়নপথ হইতে চির-বাক্তিত্বের বীকীনপ্রায় “মুখমণ্ডল” দেখিতে-দেখিতে কুন্দ বলিতে লাগিল,—প্রিয়দর্শনের চিরসাপ শেষ দেখা দেখিতে-দেখিতে কুন্দ বলিতে লাগিল,—“আমার কথা কহিবার তুচ্ছা নিশ্বাস হইল না। আমি তোমাকে সেবতা বলিয়া জানিতাম, সাহস করিয়া মুখ ফুটরা কখন কথা কহি নাই। আমার সাব মিটিল না।” কিন্তু যার, “সবর হয়েছ নিকট এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে!” মননের অপ্রোচন হইতে সোণার স্বপন ক্রমে মিলাইয়া বাইতেছে! কীদ—কীদন্তর—ক্রমে শূন্য! অপরিসৃত কুন্দকণি কলিকা-যৌবনে বৃক্ষ-ভরা বহু লইয়া অকালে কালমাগবে করিয়া পড়িল! হাঃ, এখনও যে “অনিয়তন, সোণা-বস্ত্র, অনেক হয়েছে বাকি!” জ্যোৎস্না যেমন নীরবে আসিয়া নিঃশেষে চলিয়া যায়, পৃথিবীর উপর ভাপলেপটু কুন্দ রাখিয়া যায় না, তেমনই এই স্বপ্নভাবিনী, নিরতিলাসিনী নিরতিমানিনী যালিকা স্বপ্নের মত আসিয়া স্বপ্নের মত চলিয়া গেল। রহিল কেবল তাহার চিত্তস্বপ্নীর বৃত্তি! কীবিতে আত্মগোপন করিয়া মৃত্যুতে কুন্দ আপনাকে বরা দিয়া গেল। হৃৎ-স্বপ্ন ভাসিলেই জানা যায়।

সোবিশ্বপূরের অন্ধকার ভবন স্বর্গ্যালোকে আবার হাসিবে। কিন্তু এই একরাত্রির জ্যোৎস্নাই কুন্দ যে নির্মল, নিঃকলিত বিজ্ঞান করিয়া গেল, নিষ্ঠুর নগেন্দ্রনাথ, সেই চিরবিক্রান্ত, চিরস্বপ্নবীর যত্ন একটা কোন্ডের নিঃশ্বাস, এক বৈটী অশ্রুধন হাও।

উৎকল-সাহিত্য

[ত্রিদেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য, — ভাগ, ১০৫।

কেউর গ্রাম-বিত্তোহ—(৭) আমি মহামাণ্ডী-পুত্র বশীধরের মন্ত্রী—
এ কথা ভূঞা-সমাধে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। বশীধর আমার প্রতি
বুৎ বিদ্যাস। রাজকণ্ঠ-বিস্তার লগ্নে আমার পামর্য অস্বাদ হই না।
বশীধর এখন সেই প্রদেশে বেষ্টুল্য পুণ্ড। প্রতিদিন দ্বি-ত্রি-চার
হইতে মনে-মনে স্রীলোক শীক হাওয়াইয়া ত উদ্ভুলি-বিদ্যা বশীধকে
পুণ্ডা করিতে আসিতেছে। বশীধর পশ্চিম হস্তিরা মনে খোঁজ
করিয়া পুশারি দাখ্য পুণ্ডা করিয়া তাহারা আশা। দিক আসেন করে।
আমি অনেক দিনেরি করিয়া তাহাবিধকে নিবৃত্ত করি। বশীধর সহিত
আমার সান্নিধ্য কখনোই হয়। সময়ে-সময়ে বশীধর আমার ঘরে আসিয়া
পান পায়। সেইজন্য সোপানিগ ও মহাপণ্ড আমার উপর ভারি অসন্তোষ
এবং আমার আশ্রয়ালয়ে সংঘ-অনুদাননে তৎপর। কেবল বশীধর
জন্মে তাহারা এ পণ্ডিত কোনওরূপ অত্যাচার করিতে পারে নাই।
মন্ত-সত্যই একদিন বশীধর অনুপস্থিতি কালে তাহারা আসিয়া আমার
বিদ্যা করেন। সৌভাগ্যকর বশীধর সন্ধ্যা পাইয়া আমার উদ্ধার
করে। আমার পুত্রের চতুর্দিকে অবতরণি লগ্নে এইই নিবৃত্ত।
আমি কিন্তু তাহাদের উপর বিশেষ প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতাম। আমি যে
বশী, তাহারা সে বিষয় মুক্তিতে না পারিয়া ভয়ে-ভয়ে আমার আশ্রয়
প্রতিগমন করিতেছে।

রাজকোষ হইতে বনঃস্রাবি লুণ্ঠন করিয়া রাজ-পরিবারদিগকে
বন্দী করা ভূঞাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমাকে বন্দী করিয়া
পুনরায় বশীধরে নিবৃত্ত করিতে ব্যস্ত থাকায়, তাহারা একদিন-দে-বিষয়ে
সম্মোহিত করিতে পারে নাই। বর্তমান সে সময় উপস্থিত। রাজমাণ্ডী,
রাজকণ্ঠ ও অন্তর্ভুক্ত পরিজনদের দ্বারের দ্বিধি পর্বতস্থলে সান্নি-সান্নি
‘হুস্রিমা’ পুত্র নির্মিত হইতেছে। পূর্ণ হইতে পুণ্ডি প্রস্তুত করিয়া
না থাকিলে তাহারা মৃত হইয়া কোবার থাকিবেন। সে দিন আমার
একটি বৃদ্ধ লগ্নার আয়োজন হইয়াছে। ভূঞা-বন্দীরা লগ্না দর্শন,
একদা-বন্দী ভূঞা, বয়ঃ মহাপণ্ড ও পাইক-দলপতি সোপানিগ—
সকলেই উপস্থিত। বয়ঃ সোপানিগের পায় হির হইল, নির্মিত হির
প্রত্যেককে চার-পাঁচ সহস্র পাতাক তীর, ধনু, বন্দুক, তরবারি লইয়া
একযোগে সবার আশ্রয়ন করিয়া রাজমাণ্ডী লুণ্ঠন করিলে। লগ্ন
প্রায় প্রীক হইয়া গিয়াছে, কেবল বশীধর অনুপস্থিতি প্রদান করিলেই হয়।
কিন্তু মন্ত্রী পামর্য ব্যতীত বশীধর কিছুই করণ করিবেন? অবশেষে
বশীধর ভক্তিরা দক্ষল কথা বলিয়া বিজ্ঞান করিল, ‘আপনার
বত কি?’ আমি বশীধর জন্মে ভিত্তা করিয়া উত্তর করিলাম, ‘দিক্ত,

রামার ভাতারে ব্যাধ আছে তাহা জানিতে হইবে। কিন্তু রাজমাণ্ডী
যে দুই তিনজন বন্দুকধারী পদাধিক আছে, তাহারা একবার বন্দুক
হাতিলে ব্যাধদের ভিতরত লোক হস্তিরা হইবে। এদিকে আমার
সিংহদ্বারে যে কামান পাঠা আছে, তাহাতে একবারে পাঁচপাচ কোবার
উড়িয়া হইবে। ভূঞাদের বহি এত লোকই বিনষ্ট হয়, তবে কাহার
মৃত একজন পরিজন? তখন টাকার কি হইবে? টাকা বড় না
ইহারা বড়?’

মন্ত্রী এই মারমর্দ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিয়া উঠিল,
‘তারা হইলে কি আর কোন উপায় নাই?’

মন্ত্রী। এমন উপায় আছে তাহাতে কাহারও পায় লাড়ক পণ্ড
লাগিলে না, অথচ টাকা জানিতে-পারা যায়; কিন্তু তাহাতে চার-পাঁচ
দিন বিলম্ব হইবে।’

ভূঞাপণ্ড। বিলম্ব কেন? উপায় কি?

মন্ত্রী। উপায় বোঝা—ভিনাশাইট!

ভূঞাপণ্ড। বোঝা—ভিনাশাইট কি?

মন্ত্রী। যদিত্তেহি। আমার রাজমাণ্ডীর পক্ষাঘাতনে পর্বতে
লুকাতিত ব্যক্তিরা এক-একটি বোঝা কি ভিনাশাইট বেলিয়া দিব, আর
এক-এক বিহেত প্রাচীর আমি দ্বিলাপ হইয়া হইবে। এছাড়া
অগ্নি-ককাল পুঁজিরা পাঠা হইবে না। আমারে হুড়িটা বোঝার
বন্ধকার। একদল হইলে এই পর্বত উড়াইয়া দিতে পারা যায়।
সাধেরসে। কর্ণা মহারানী-পুত্রের অনিধিত নাই। তাহাকে ভিজ্ঞান
করিতে পার। কিন্তু কলিকাতা হির যে দক্ষল পাঠা যায় না।

হির হইল দেশ, লোক বাইরা কলিকাতা হইতে এক লত বোঝা
কিনিয়া আনিবে। মূল্য বক্ষণ এক হাজার টাকার প্রয়োজন।
সাধা-মূল্যে অর্থ-সাধা করিবার মত বড়-বড় প্রকার উপর আশ্রয়
প্রেরিত হইল। ‘পারওয়ান’ দ্বিধিবার মত দুই জন কর্মচারী নিযুক্ত
হইল। হাজার-হাজার আশ্রয়-পত্র লিখিত হইল। মন্ত্রের উপর
আমার আশ্রয় হইল—‘মহামাণ্ডী-পুত্র বশীধর’। এ কি সহস্র কার।
মন্ত্রী কার্যের তদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

কেউর। গড় রক্য করিতে সক্ষম হইতে সৈন্ত আদিবার কখন
কৈ, এখনও তাহারা আদিয়া উপস্থিত হইতাম না। আর কতদিন
ভূঞাদের ভুলানিয়া রাখিব? ব্যাধ হইক মহারাজকে এখানের সবার
বেতরা উড়িত। কিন্তু তিনি কোথায়? কিরূপে আনিব বা সাধার
বিধ? ইত্যাদি মাঝে মাঝে মনে-মনে আলোচনা করিয়া হির করিলাম,
সাধের দ্বিধা দ্বিধা কোলাহল সে আশ্রয়পত্র আকিসের ‘পারতের’।

সঙ্গে একমাত্র ভৃত্য। আর কোন কর্মচারী থাকেন নাই। আমি একাধারে সাহেবের শেখার, কেউটার পকেট হারকীর অভিযোগ ও সরকারী উকিল হইয়া আঁণ্ডা করিলাম। পুনরায় আমাকেই সাক্ষীর - এলাহার লিখিত কবিতা হইল।

কি কারণে কবীর ভক্ত বিহায়ে স্রাবজ হন, তাহার লিখিত লিখ্য নথিলি কবিত্তে মহাশয় আদিত্ত হইলেন। কবীরের সেরেস্তাবারের আশ্রয়ভিত্তিতে লিখিবার তার তাহার উপর আদিত্ত হন। আদিত্ত হইল হুজুর ভিত্তি। কবীর সে সময় কেউটার গুণ লোক লোক-না হইল। ভিত্তি। বিপৎ-কালে সাহায্যের ভক্ত বিহায়ে ভক্তবান, বাসনা, বিহায়ে ভক্ত হইল। পদ্য ভক্ত ও কবীরের ভক্ত কবীর-হইল। সকলে হইল, ভক্ত ও আদিত্ত কবীরের আদিত্তের ভক্তবান কবীর। ১০টা হইতে ভক্ত। পদ্য সাহায্যের পদ্য ভক্ত ও ভক্তের ভক্ত। ১০ কি ১২ ঘটিকার সময় মহাশয়ের দরবারে বাস্তুভূতের কাণ্ড কবীর। পদ্য। ভক্তবিত্তি কাণ্ড ভক্তবান উপর লোকের ভক্ত। বোকা ভক্তি কবীর ভক্ত হইল।

পহিবন প্রাতঃকালে সেরেস্তাবার বাবু এক তড়া লেখা কাগজ হস্তাহস্তানুসারে রাখিয়া, একটু পৰ্ব্বকরে আবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“আমেরাধার বাবু, গত রাত্রে আহাৰ তি নিদ্রায় কষিত সদৰ পাই বাই। সদন্ত ৩৩০১ লিপিডাছি।” তেবিলান, তাঁহার কথা লেখা। সত্য হাতি প্যাকবন বা কঠিনে সাত কৰ্ছ কাগজ হুই পুটে গেল। সন্তব বন। বহাধার বা আমোদগায়ন লড়িতে পাগল করিয়ান। দুৰ খেবো ধারন কঠিন। অর্থেচি কাটা পঠিয়া দেখোন, আর পাগল করান।

হা কপাল! এ কি? ইহাতে যে চাপকা হইতে আরম্ভ করিয়া রানার-
সহাকার্যতরং বহু উৎসাহেণ ও ঝালকানী উদ্ভূত হইয়াছে, ইতিহাস-
জুগলেশও বাধ পড়ত নাই। আন সময় নাই, ১টা বারিগা দিয়ায়ে।
১-২টা সময় রিপোর্ট বাকিল করিতে হইবে। মহারাজার শশক্তি শইয়া
সেইখানে বসিয়াই লিখিয়া—“বহুদীর বাতুলতা ও ভুল-সেবের স্বভাব
বশত অকারণ বিদ্রোহ ঘটাইয়াছে।” মহারাজা রিপোর্ট ভদ্রিহা স্বাক্ষর
করিয়া দিলেন।

বদ্যায়সে কদাচিৎ আশ্রয় হইলে, বিশেষ্ট পটভূমি হইল। সাহেব
সহোদর ক্রোধ-কম্পিত গণে বলিলেন—“এ জোয়ার লেগা, তাকি যাবে।
আমি তোমাকে মিস্তাই হলে বিব।” কি করিব, বর্ধমান অবস্থায়
ক্রোধ প্রবর্ণন বা কার্য ত্যাগ আশার উদ্ভিত বর। দীর্ঘবে সময় সহ
করিলাম।

বহাগাছার নির্বাহিতা অর্পণ করিতে বহু করার সাহেবের বহু রাগ আবার উপর পড়িত হইল। ঘাই হউক, বিচার-কালে সাক্ষীগণ জুকাণের অপরাধে বিশ্রোহ ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিল। সাহেব বহাগাছার উদ্বেজিত মাফসা আপত্তিঃ দেখা যেন না। হুগরিউউউউউ সাহেব মিছ পড় ত্যাগ করিয়া আদালতগণের সহিত ভটক বসিয়া করিসেন। আদালতগণে এক দিন থাকিয়া ধর্মী প্রতীতির বিচার শেষ করিয়া রায় প্রকাশ করিলেন। কষ্টের পরিচয়ের সহিত বহাগীর পাঁচ বৎসর কারাবাদ হইল। অজ্ঞাত আদালত। দুই কি তিন বৎসরের কারাবাদ প্রাপ্ত হইল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ବାଞ୍ଛାନୀର ଖାତ ।—(୧)

[ডাক্তার জীবনেন্দ্রনাথ বসু, এম-এম-এম]

হিন্দু বাঙ্গালীর বাজ কি, তাহা। এখনও বলা বড় শক। বাঙ্গালী এখন বহুতর। বাঙ্গালী যেমন বহু ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে শিখিয়াছে, তেমনই সহজেই সে বহু জাতীয় বাজ ধন্যধন্যকরণে পটু হইয়াছে। হিশ-গ্রিশ বঙ্গের পূর্বে বাঙ্গালীর বাজ ঘোড়ামুঠিগণে নির্দেশ করিতে পাওয়া গাইত; এখন তাহা করা কঠিন। এখন বাঙ্গালী প্রান্তরাণে সাহেবী খানা খায়, মধ্যাহ্ন-ভোজনে বিব্রণ "তোপ" মদ্য করে; সাত্যভোজনে বোম্বাইই পানীয় সত্ত বাজক। এখন কামে-কর্মে এক নমবে, একশাতে বোম্বাইই পোলাও, সাহেবী চপ-কাউন্টে ও হিন্দু সসেণ-বোতা গাভরগে একত্র বাবস্তত হয়। আয়তাকার, আয়ত ও প্রান্ত পোলাও এবং মাসে পোলাও, গুস্তক; কলিকাতায়, বিদ্যাকলসেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে যেমন বাঙ্গালীর

অক্লিষ্টতা ও স্থাবাসনা বুদ্ধি পাইতেছে, অপর দিকে, তেমনি ব্যস্তের খটা বুদ্ধি পাইতেছে। এ খটা অক্লিষ্ট বসবাসের ক্ষমতা নহে, ব্যস্ততারতির ক্ষমতা নহে, এ খটা বেবস্ততা, ত্রাণশ, লবাক বা ক্ষাতীর ত্বষ্টির ক্ষমতা নহে—এ খটা আত্মভিমান পরিচয়পোষণেরই ক্ষমতা। ব্যস্তত্বগো তৎকাল যে কালে বাড়িতেছে, ব্যস্তত্বগো বাল্যগো তৎকালে বৃদ্ধি হইতেছে—খাইতা অক্লেশের দ্বারাও কতদূরখটাই হইতেছে। কল কথ্য, —ব্যাসটাই ব্যস্তকে যে দিক খটাই বেধি, সেই দিকেই “অপমান” প্রকটত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালী মুসলমান জনগণের পাকিস্তানে আসার অধিকৃততা বা
বাংলায় এবং ভারতবিশ্বের পাকিস্তানে গাৰ্হাৰ্হি নিষেধ না থাকায়, মুসল-
মানবিশ্বের পাক-সম্মখে আলোচনা করিলাম না : এতদ্ব্যতীত, বিলাসী
ধনী হিন্দু বাঙ্গালীবিশ্বের কথাও এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না :

যে যেহু, খণ্ডাখাণ্ড, ভোজনের সময়, ভোজ্যের উপযোগিতা প্রকৃতি
কখনও তাঁহারিদের পদার্থ মধ্যে আছে না; খোলা ও রসনাভূতিই
তাঁহারিদের ভোজনের উদ্দেশ্য। নিত্যকাল হুণী-ব্রহ্মের মধ্যে থাকে
অত্যন্ত বিশেষ ভাবে পরিমিত হয়। তাঁহারিদের মধ্যে অনেকই
হুবেলা পেট ভরিয়া থাকিতে পার না। কেহ-কেহ বা সন্ধ্যাবে
বতবাই বায়, তৎপুত্রাই থাকিতে পার। একই লগ্ন, একই ভিত্তি,
একটা লজা, বা বস্ত্র শাকপত্র দ্বিত্ব হাতের অপর কোন বস্তু হয়
অনেকেরই ঘোটে না। অতএব, এই প্রকৃত মাত্র যথাবির হিন্দু
বাস্তবী ভ্রমোৎকর্ষের আধারের উপরেই বেশী লজা রাখা হইবে।
যাচ বিচার করিতে বাসিলে, শিত-খাণ্ড, পতিবীর খাণ্ড, রোষ্ট্রী খাণ্ড,
বুদ্ধের খাণ্ড প্রকৃতির বিভাগ আদিয়া পড়েই; পরন্তু তৎসঙ্গে যেসে
পুণ্ডরিকের খাণ্ড ও ব্রহ্মোৎকর্ষের খাণ্ড-বিভাগের কথাও আদিয়া
পড়ে। শিত-খাণ্ড প্রকৃতি এ প্রকারে দীর্ঘ বহির্ভূত—বাস্তবের
অন্ততঃ শিত-খাণ্ডের আশ্রয়িতা করিবার মানস রহিল। কিন্তু যথাবির
বাস্তবী খাণ্ড-বিভাগসকলে, ব্রী-পুণ্ডরিকের যে পার্শ্বক পরিমিত
হয়, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুর্দে যে নিম্নবই খাণ্ডক, বর্তমান কালে, আগিলে চাহুরী করিতে
যাচ হওয়ায়, বাস্তবী আহারের সময় ও উপায়ের বিলম্ব
ভারতবর্ষে ঘটাইবে। সাধারণতঃ, "বাস্তবী" (early breakfast বা
"বোটা হারিবি") বাস্তবী পুণ্ডরিকের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই বলিলেও
চলে। বর্তমান কালে কেহ-কেহ, অর্ধের অথলতা দেখু, অথবাখার
হুচ-পানের স্রাব, সন্ধ্যার স্রাব পান করিয়া ভোজনের পরম পরিভূতি
লাভ করিয়া থাকেন। হুণিবিশেষ, বিশিতে লজা করে, বাসি হুণেও
চা পান ও পান করণ অথবা চলিয়া থাকে। পুণ্ডরিকের মধ্যে
বাস্তবীভোগের প্রচলন না থাকিলেও ব্রীলোকদিগের মধ্যে উহার প্রচলন
অবিকাল হুগেই আছে—তবে পুণ্ডরিক বাসি-মুখে অতি প্রকৃতিই
চা পান করেন, ব্রহ্মীয়া বাস-আকিক সম্প্রদায় করিয়া হয় ত খাণ্ডেই
"বাস্তবীভোগ" গ্রহণ করেন। "বাস্তবীভোগের" কথা বাস বিল, বাস্তবী
এবং বাসার হুইট থাকে—একটা খাণ্ডে, অপরটি বাসিকালে;
বৈকালে (dinner) প্রলম্বণ করা সন্ধ্যার সহ হয় না। বাস হুটক,
বোটাট্ট হিগাবে বাস্তবী পুণ্ডরিকের বতক্রম আধার্য আছে, সেই
সকল আহার্যে তাদিকা এই:—

প্রাতঃ—চা-বিহুট, চা, হুণ, বোহনভোগ, বাসি (সেবাং টাটকা) কট্ট,
পুহোট্ট) বা বোহনের সিটাই, মিহির পান, ফোলা বা মুয়ের
ভাইল ভিন্নান, কলম্ব (সন্ধ্যাপোষা)।
দুহুহ—ভাত, ভাইল। সাধারণতঃ দুধের, কলাইয়ের বা ফোলায়,
সাধারণ একই খাণ্ড, সন্ধ্যাপোষা শাক ভরকারী, হুণ বা
হুণি, অথ।

বৈকালে—চা, চা-বিহুট, বোহনভোগ, হুটি-কট্ট, চিট্টা-হুণি, সন্ধ্যা-

ভাইল—ভাত (বা কট্ট), ভাইল-ভরকারী (বা কলাচি, বাস),
হুণি বা হুণি।

যে 'তাদিকা' দেখা গেল, তাহা যথাবির বাস্তবী পক্ষে
যেণ liberal বা যথেষ্ট বলিয়াই বলা হইতে পারে। কারণ, তাদিকার
বত দেখা গেল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই এক সময়ে সাধারণতঃ
যাচত হয় না—যথাবিশেষ ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃকই গ্রহণত হয় মাত্র।
এই লক্ষ্য দেখিতে তাদিকা হইতে আবার বাস্তবী ব্রীলোকের
অনেক মিলিলে বক্তিত থাকেন। হুণ তাঁহারের মধ্যে চলে না বলিলেই
হয়। কট্ট-পুট্রি আবারও কম এবং অত্যন্ত পুন। ভাত হুবেলা
ভাইল সব বিন ঘোটে না। ভিহ ও বাস বাস্তবী যেহের পক্ষে
অধিকাংশ হুগেই অথবা। বোহনের সিটাই অথবা তেল-ভাতা
লবণাক্ত খাণ্ডগুণিই তাঁহার্য বেশী পছন্দ করেন—কেহ-কেহ বা
ভবভাবে মুক্তি বা খে বাবহার করেন। হুবেলা পেট-ভরা ভাত, হুবেলা
খাণ্ড হুটক কিছু আর ও পুণ্ডরিক সেবার শেষে যে ভরকারী থাকে—
সন্ধ্যার এই ই পুণ্ডরিক যথ-বহীর ভোগ।

আহারের সহিত আহার্যের সম্বন্ধ।

যাচার সঙ্গে সামাজিক ও মানসিক বাস্য অতি বিন্ধিতাবে
সম্বন্ধ। পরীয়া খাণ্ডার্থই আহার্যের প্রয়োজন—আহার করিবার
অন্ত জীবনযাত্রার প্রয়োজন কর্তি দেখা যায়। যেভাবে আহার করা
যায়, মানসিক ক্রটি ও স্বর্গ কর্তাত ভয়দ্বারা হইয়া থাকে।
এ কথা যে শুধু বাস-কিধবই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নয়। প্যাণ্ডাত
ভিহিংসকপণ্ড ই হাতের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। বাসার ভিহাট্ট
সেবক, তাঁহারিদের পক্ষে বিভাহারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিনা
বিচারে, সোজের বসন্তই হইয়া কতকগুলো মাসে, ভিহ প্রকৃতি থাকিলে,
অথবা অতি ভোজন বা ভ্রমপাক আহার্য ভোজন করিলে, পরীরে ও
দনের হুটতার উদ্ভেদ হওয়া অবশ্যস্বারী। কল-মূল-কলাহাটী আধা-
খনিগ মানবের ভিহা-মগত যে অমল-বল কোমুগীয়া হুগীয়া
বিহায়েন, আল ভাহার তুলন্য অপর যেনে কোষার; একজন খনিগ-
যেখবাসী ভিহাট্ট ভিহিংসক, একদিকে সুকরের হুণি খোখাইয়া ও
অপরদিকে হুণক ফলের দিক অমূল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—
"ই পুট্রী বাসার উত্তর হইবে, ভিহি মুক্তি, মুক্তি, প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে
পুট্রেরই পরিচয় বিবেচন; বাসার উপরে ই মনোজ্ঞ কলমুগুটি
বাইবে, তাঁহার মুক্তি, মুক্তি, প্রকৃতি ও প্রকৃতি মনোজ্ঞ হইতে বাধ্য।"
ই কথাগুলি বর্ষে-বর্ষে সত্য না হইলেও, তাঁহার মধ্যে অতি হুণর লজা
বিহিত আছে। আহার্যের সঙ্গে যে শুধু মুক্তি-বৃত্তিরই বিন্ধিত সম্বন্ধ
আছে, তাহা নহে; আহার্যের উপরে বাস্য অত্যন্ত বেশী পরিমাণে
নির্ভর করে। বাস্যবিশেষ পক্ষে আশাশ, টাইকরত আর প্রকৃতি
সহজেই মনোজ্ঞ হইয়া পড়ে। মনোভাজী সিংহ বা বাস্য কিপ্রভার
সহিত বলসাধ্য কাণ্ড করিতে সমর্থ; কিন্তু তাহার্য দীর্ঘায়ু হয় না।
শাকভাজী হুণী মন্ত্রণমানে সমুদ্রবিন পরিপ্রবাসী কায় করিয়াও স্রাভ

হয় না; এবং হস্তী বীরাণু হয়। আসক্তোন্নীয়া কৃপ-কাণ, কৃপ শেখিবলস হয়, শাক-তোলীয়া দেববলস হয়। বর্তমান কালে বাঙ্গালী উত্তর-তোলী। আস্ত হীত্বিত্ত বাবহার না করিলেও, বঙ্গালী মাংসই মন্তাহারী। মন্ত হোমনে কিংব পরিষদে আস্ত-তোলনেরই কাণ হয়। বর্তমান কালের কণা হাতিয়া হিলে, কবেক বঙ্গের পূর্বে, বাঙ্গালী যখন ব-কৃতিয় এটটা বইকৃত হয় নাই, যখন পল্লীভাব বাঙ্গালার যেতারক এতাত আনিকার-বতপ বিরাঙ্গমান ছিল, তখন এতাতকেরই ক্ষেত্রে বাস-তোলন-তোলা হুতবী পাতী ও পুষ্টিপতিতে বাস ছিল। তখন কেহই কখন। অর্থাৎ বিনা মৃতপ-তোলে নয়। প্রথম করিতেন না, তখন বাসি ক্তকাতী বা পল বাস বা অতি কৃপকার দ্বারা কেহ বাইতেন না এবং তখন বাঙ্গারের নাং ও নিটার প্রথ কতায় এতাবার ছিল। তখন বেশে অসংখ্য, নাকোতিয়া ও তৎপহোব-শিকার নামে মন ও বেহেত বেশে করিবার প্রথ—এবেশে ছিল না। তাই তখন বেশে বীরাণু, বসি, হুত ও বীরাণু লোকেরও অস্তাব ছিল না। কিন্তু এখন বেশে ব্যাংকোব, ভাল ত্রিবিদের অস্তাব, ম্যালেরিয়া ব্যাংকো এবং শিকা-রাক্ষসী ঘরে-ঘরে। তাই আর বাঙ্গালী বর্কোতি, দুর্কণ, হোপ-প্রথ ও বহাঃ।

পাচার বাস বেহের মন্তক নির্দি করিতে পিয়া পান্ডাতা চিকিৎসকগ হুই-একটী অল্পা তথ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। সে তথ্যগুলি পরীক্ষামূলক। তাহারের মধ্যে মৃত পশুটি এই—যদি বর্জিতে হয়, তবে আনামিদের ব্যাংকোবের মধ্যে এমন একটী কৌবনী-শক্তি-বিশিষ্ট পদার্থ থাকে। বদ্যায় বেহেট হুত ও অল্পে থাকিতে পারে। কারণ, সকলেরই মনে ধারণা আছে যে, বাইলেই বেহের পুষ্টি ও বাস্য একত্র আসে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বহুশস্য ধরিয়া, বাসি অথচ উৎকৃষ্ট বঙ্গালী দ্বারা বাইলেও, ব্যতঃ পাত্তিরিক পুষ্টি বঙ্গার থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অল্পে-অল্পে বাস্য পুষ্টি হইতে থাকে। সেই বাস্য পুষ্টিতে deficiency disease (অর্থাৎ পাত্তিরিকের মধ্যে কৌবনী-শক্তি অস্তাবলিত ব্যাধি। কয়ে। বেরিবেরি, কাতি, পেলোয়া, রিকট্ট্‌স্‌ প্রভৃতি ই প্রাতীর ব্যাধি। যে কৌবনী-শক্তি অস্তাবে পুষ্টি বাস্য বাইয়াও ব্যাংকোব কত মন্তবণ হয় না, সে কৌবনী-শক্তিগ পদার্থকে ভাইটামিন (vitamine) বলা হইয়া থাকে। ই ভাইটামিন এক এবং অতিদীর্ঘ নহে—অর্থাৎ বেরি-বেরি ভাইটামিন ব্যতির ভাইটামিন হইতে বহুত, ব্যতির ভাইটামিন বেরিবেরি ও রিকট্ট্‌স্‌ ভাইটামিন হইতে বহুত। এই তথ্য আবিষ্কৃত হয় বেরিবেরি ব্যাংকোবের কারণমূলকান কালে। অদ্যেকই জানেন যে, কলে দাঙা চটল বাইলে বেরিবেরি হয়। কারণ, তৎকাল-মানে খুব ব্যতীত একটী খুব পাতলা অথচ বলিষ্ঠভাবে সঙ্গর আবরক থাকে। ই আবরকেই বেরিবেরি-বিষাক্ত ভাইটামিন থাকে। কলের সাহায্যে তৎপুষ্টিগোয়ে খুসারগ ই আবরকটিকে বহুত কয়ই অবিরের প্রেত।

এই কারণে, বাহারা কলে উৎকৃষ্টরূপে “দাঙা” চাল ব্যবহার করেন,

যে চোতের ব্যাং হইতে আনরক-বিশেষক টিটা দিয়ার, তদ্যায়ই বেরি-বেরি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ব্যাধি হইতে ভুক্তি থাকেন। এই তথ্যটি মগ্রাণ করিবার মন্ত এই পনীকটি করা হয়:—হুত পারাবতকে উৎকৃষ্টরূপে দাঙা চোতল অমবহত বাইতে হিলে, ই পারাবতটি অথমে কীপ, পরে পক্ষাবতপ্রস্ত ও পেবে মৃত্যুপ্রাপ্ত পতিত হয়; কিন্তু, যখন তাহার পক্ষাবত পক্ষ হইতে পারে নাই, সেই অবস্থায় যদি পারাবতটিকে উৎকৃষ্ট আঁটা বা উক্ত তৎকালে আনরক চুই বাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষাবত অতিরে পুষ্টি হইয়া যায়। অতএব, বেশে খুশা বেশে যে, উত্তর-পুষ্টি এবং পাত্তিরিক পরিপোষণ করিবার ক্ষমতা বাসে, ব্যত প্রথ্য এমন একটী কৌবনী-শক্তিগ পদার্থ থাকে। বদ্যায় বেহেট হুত রপিতে পারে যায়। এইরূপ আর একটী মৃত্যুত বিব। পূর্বে আবিষ্কার করিয়া বেশেপাত্তিরে বাইতে অনেক কালবিলম্ব ঘটত। সেই বীরাণু, দ্বারা কবেক বা মনবে বা হৈলে রমিত বা ওত ব্যত প্রথ্য ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। বীরাণু বসি বাসি ব্যত বাইলে, ঐশ বাস কত ব্যত বটে, পাত্তিরিক পরিপোষণও সম্ভবপর হয়, কিন্তু ব্যতি নামক রক্তপ্রাণকাতী এক প্রকারের ব্যাংকো বসিয়া থাকে। সেই হুতটি বিবাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, বর্তমান কালে বহুদূরগামী প্রত্যেক মাহেভের আন্তোহীকে টাইকা সেহু রস কতকটা ব্যতিতে দিতে হয়। কল কথা, আনরক যে ব্যতই থাকে না কেন, প্রত্যেক কতকটা টাইকা মাসে বা কলমূলের রস প্রথ কত ব্যাংকো পক্ষে একত্রই আবরক। কারণ প্রত্যেক টাইকা শাকপতী ও মাসে কিছু না কিছু পরিমাণে ব্যতি সিমারক ভাইটামিন থাকে। যে অপরিশোধিত মনবী বিম শিতকে মন্ত-হুত ব্যতি করিয়া, কতাবতই বিন্যাসী পাত্ত হুত বা কোন একটা “হুত” ব্যতগাহিতে আনরক কবেক, তাহার শিত পুষ্টিগ: ভই পুষ্টি হইলেও, রিকট্ট্‌স্‌ রোগে একেবারে এমন অস্ত:পাত্তরীন হয় যে, দ্যাস্ত ব্যাংকোই দাঙা গড়ে। অতএব এই দুই টাইকা কত সকলেরই অগ্র-পোশা—(১) চটলকে বেশি মাত্রিয়া ব্যতগা অমুচিত। (২) সকল ব্যত টাইকা বা হইলেও, প্রত্যাহই অস্ত: অবিকারগ ব্যত প্রথ্য টাইকা হুতগা চাই।

সামাজিক বিপর্যয় ও বাঙ্গালীর পাত্ত।

আম বাঙ্গালীর সামাজিক, সাংসারিক ও আর্থিক বিপর্যয় ঘটায় যে বিন্যাস, তাহার আহারেরও বিপর্যয় ঘটায়: তাই আম বাঙ্গালীর পাত্তা এত ব্যাপক।

তাবৎ বাঙ্গালীই যখন বঙ্গালী ছিল না, তখন বাঙ্গালীর মন্ত অবস্থা। তখন ম্যালেরিয়া ও শিকার বিভূষণ ছিল না; এবং ঘরে ঘর না থাকিলেও পাত্ত প্রচুর পরিমাণে ছিল। কলে, বেশে একমিকে বেশে ম্যালেরিয়া দেখা দিলে, সেই মন্ত অবস্থিকে বিশেষিতার আকাঙ্ক্ষাও বাঙ্গালীর কল অবিকার করিয়া বসিল। কয়েই, বাঙ্গালী চাটুয়ার মন্তাবে পক্ষপালের জায় বাহির হইতে গাশিল। পরীবার-কালীন, মন্ত বাস সেবন উৎকৃষ্ট তোলা কোলন এবং তৎকালীয় সময়ের কোলন

করা—এমন ছাড়াই বাঙ্গালী সহজে শিখায়নি হইল,—যদি, অল্পটুকু ও তেজস্বী থাকে বলিল :—এক কুখার সময় থাকে না বাইরা, আপিসে যুগ। পাইবার আশাও, অন্যথায় থাকেই অভ্যাগম করিল। বাঙ্গালী ভিতরকারেই এতদে সত্যকিছু বাকী, পূর্ণ কুখার উদ্ভব হইলে তবে যথাক্রমে জোমন করিত এবং জোমনকে বিক্রাস করিবার ব্যবস্থাও পাইত। এখন সবুজই উঠাইয়া গিয়াছে। এখন এতদে চা পান অথবা পূর্ণ উপবাস করিয়া বেলা ৮টা হইতে ১০ টার মধ্যে অল্পিক বা অর্ধসিদ্ধ আর জোমন করিয়া দুপুরে কেহ কেহ আপিসে চা বা বোকায়েন লবণা খিয়ার জোমন করিয়া, সত্যাকালে রান দেহে, খুঁপাশায়া ভাতর হইয়া বাঙ্গালী রায়ে ভাত বাইরা এগে বারগ করে। আপিসে বহিষ্ঠে বেগী হইবার ভয়ে, এতদে কালে আহার্যি অতীব ক্রত ভাবে সংস্কারিত হয়। সাভা-জোমনটি যেমন ভলপাক হয়, তেমনই শাস্ত্রিক অল্পপদক অস্বাদ্য পুত্রী হয়। চিকিৎসকবাহাঃই জানেন যে, অল্পপদক, কখনো উরকে পূর্ণ ভর্তি করিতে পাই : বিজ্ঞতাঃ, শাস্ত্রিক ভাবের সময় পরিপাক কাল হয় না : এবং কুজীকৃত, আহারের সময় ও পরিমাণ একটা বিশেষ বিষয়ের বশীভূত হওয়াই বাঙ্গালীর পক্ষে এই ভিতর বিরম প্রতিপালন করা অসম্ভব। যদি ধরা যায় যে, এতদে ৫টার চা পান করা হইল, তাহার সত্যে তিন ঘণ্টা পরে (১০ টার সময়ে) আর পুত্রী হইল, আর তাহার চারি ঘণ্টা পরে (বেলা ১০ কিংবা ১২টার সময়ে) সাভাক জলপান করা হইল, এবং তাহার হয় ঘণ্টা পরে। যদি ১০টা নাগাইৎ) সাবার আর পণ্য পুত্রী হইল,—তাহা হইলেই বেশ খুশা যায় যে, চরিত্রী ঘণ্টার মধ্যে, আহারের সময়ের লবণক বিভাগ করা হয় পাই। পরিপাক-হয় সর্বসংগে ত দৌলী হইলেও, তাহারও বহুতা অস্বাস্থ্য আছে। এই অস্বাস্থ্যর ফলে আত্ম অস্বাভাব্য বাঙ্গালীর হয়ে-যায় : এবং এই অস্বাভাব্যর ফলে আত্ম বাঙ্গালীর সাম্যায়িক বিপদ্য। সাংসারের ভয়, চাচুখীর ফলতা, এবং পয়-কোয়রের সত্যসাই এই সাম্যায়িক বিপদ্যের মূল।

বাঙ্গালীর সাম্যায়িক অস্বাস্থ্যকর বস্তুই বহিষ্ঠাঃ। দুঃখ-দৈবের বুদ্ধির অস্বাস্থ্যকর, বাঙ্গালীর একাঃগতিভাও সোণ পাইয়াছে। এখনো যেখানে উদার বোলসটি আছে, দেখানে একতর মনের সিলের সহিত একাঃগতিভা পাই—আত্মে শুষ্ক বুদ্ধিবাণের একাঃগতিভা। এই একাঃগতিভার সোণের সঙ্গে-সঙ্গে, পয়ে-পয়ে বিপাদ্যিভার উগ্রতি দেখা পাইতেছে। তাহার ফলে আত্ম একাঃগতিভার বস্তু জোমন করায় ভবা উগ্রতা পিয়াছে, এবং তৎপরিণতিঃ, বুদ্ধির যোগস্বত্ব, ব্রহ্ম-কৃত্ত্ব-ব্রহ্ম, ব্রহ্মায়োগস্বত্ব একতর সাম্যায়িক যোগস্বত্ব, অর্থেঃ রান, লোভী পাতক ও পরিপাকিকার দ্বারা বেধিত হইয়া আহার্য্য নানা যোগস্বত্ব ত ব্রহ্মাঃ হইয়া পড়িতেছি। সেই সঙ্গে, ইত্যনের যে art, কলার যে delicacy, তাহা এই বাঙ্গালায়েই চরমলীলা লাভ করিয়া, আত্ম সোণ পাইতে বসিয়াছে। আত্ম পুষ্টিলা ভাষা-আহার্য্য-কথা হইতে বহিত হইতেছেন, পুণ্য ভাবে জোম হইতে বহিত হইতেছে, পলীতে-পলীতে কাটা সাংসার বোকায়েন, বোকায়েন, দিগ্গিরের বোকায়েন একতর লকিত হইতেছে।

বাঙ্গালীর সাম্যায়িক বিপদ্যের অন্যতর প্রধান বস্তু—বুদ্ধিবাণের আহার্য্য ব্রহ্ম করা। বুদ্ধিবাণের মূল আত্মে বিপাদ্যিভা : বিপাদ্যিভার মূল অস্বাস্থ্যকর। সাংসারের বেশ দৃষ্টিভায়া বস্তু পাইলে সত্যাকটাকে জোম করিতে পারে,—এই জোমন, তাদ্রী বিন্দুকে ক্রমশঃ জোনের শিল্পিল শখে লইয়া গিয়াছে। জোম করিতে করিতে, এবং প্রতিবিলত জোনের উপকরণ হাতের কাছে পাইয়া, আর বাঙ্গালী অস্বাস্থ্য, ব্রহ্মাঃলাল, কীদরীম। একতর অস্বাস্থ্যর বুদ্ধিভার জোম হয়, জোনের সাম্যায়িক অস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে, বাঙ্গালীর উপবাস মূঢ়া হইতে থাকে। তাই ক্রমশঃ সাম্যায়ের পবিত্র পতী ব্রহ্মাঃলাল, আর সত্যাকটক নানা ব্রহ্ম অস্বাস্থ্য-বিপদ্যর পবিত্র হইতেছে। সাংসারের বেশ অস্বাস্থ্যকর ব্রহ্ম করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারিণের অন্য উপাঃলা, দিগ্গিরের এক তৌঃ একতর দিকে সাম্যায়িকের বুদ্ধি আত্মে পড়ে পাই।

এখন সাম্যায়িক অস্বাস্থ্যকর জোনের সত্য পাতরা যায় না। এসলকতা, অসমিতা ও উগ্রতার পরিচয় পয়ে-পয়ে। উগ্রাঃখলতা এবং সত্যায়ের শিষ্টাঃব্রহ্ম। এখন লক্ষ্য দিকেই সত্যের বিশাঃ করিয়া কান করিবার প্রবৃত্তি অতীব একতর। তাই আত্ম বাঙ্গালীর উগ্র "হুত্বের পেটে" পড়িত হইলেও, বাঙ্গালীর জোম তাদ্রিক ক্রমশঃই ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মতর হইতেছে। আর বোকায়েন পাক-করা মাস, ডিম ও একতর ভাবে সত্যায় উপকরণ করিয়া ভাঃ-কীদরীমই সত্য ও দিকের পণ্য ব্রহ্ম করিয়া গতিতেছে। আর পুষ্টিলাঃ অস্বাস্থ্য বোকায়েন বিজ্ঞার বিপাদ্যিভাঃকটক মিঃহেয়েন। আর এক-অর্থেঃ মূল করিয়া বিজ্ঞা অস্বাস্থ্যকর মূল্য বাকি ভাঃ ব্যতঃসংগে সত্যায় একতর হইতেছে। আর জিঃ-কর্মে পুণ্য লক্ষ্য সময়ে সাম্যায়ের বিঃহ-তাঃ দিকে লক্ষ্য হাঃয়েন না—যেমন-ভেদন উপাঃয়েন জোম একতর করিতে বিঃহা বোঝ করেন না। এই বিঃহা অস্বাস্থ্যকর ফলে বাঙ্গালী আত্ম এক দিকে যেমন লোভী হইতেছে, অন্য দিকে তেমনই অস্বাভাব্য জোম জোম করিতেছে। তাই আর "টাইকরতঃ কিতার" বা সত্যায়ের বিঃহা বসন্তে বস্তু-তবা।

বেশ হইতে আত্ম সো-সেবা উগ্রতা পিয়াছে—বাক্য হইতে পাতী পণ্ডয়ে পবিত্র হইয়াছে। আর তাই বেদে কলসার ব্রহ্ম, সোমকর্মে, কীদরীম, ব্রহ্ম-বুদ্ধি শিষ্ট, এবং পকাশ বসে বাঙ্গালী

০ লোকায়েন যে হাঃলা মাসে বিজীত হয়, তাহা কোন্ পণ্ডর মাস, বলা কটিল। তাহাতে হুত্বের মাসেও থাকিতে পারে। লক্ষ্য সময়ে যে কীদরীম পণ্ড হবম করিয়া বোকায়েন মাসঃপুত্রী হয়, তাহারেও অন্যর সত্যেই আছে। একতাই যে মূল্য করিয়া মাসে আনিয়া একতাই ব্রহ্ম করা হয়, এমনও বিঃহা হয় না। সাম্যায়ের যে কোনও পণ্ডর অস্বাস্থ্যকর কল্লাঃ ভীঃ ভাঃ সাম্যায়ের চরিত্রের সত্যায় চপ একতর হয়। অস্বাস্থ্যকর ফলে তাহাতে বুদ্ধিবশিত সাম্যায়ের পুণ্যায় শিষ্টাঃলাঃ ব্রহ্মায় বিঃহা ব্যতঃসংগে করা হয়। বাক্য সম্যকীয় দৃষ্ট ইন্সপেটর দ্বারা এ লক্ষ্য কতঃ রীতিমত সত্যায়িত হওয়া কটিল।

বৃষ্টি। আর বসন্ত দেখা নাই বলিয়া সেপে বসন্ত ঘোরের এমার বৃষ্টি, আর তাই বিলাতী বৃষ্টির প্রভাভ চাষিগণের! আর বাগানভাষে জীব সেহে মাসেরিয়ারি অতি-বিষ্টি!

সামাজিক বিশপাচের মধ্যে “হাস্তান”ও অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে পট্টা বাগানী নিত উদ্ব্যক্ত বকিত করিয়া বাহিরের টাট-সাক বসার ভাবিতে গিয়া করে। কয়েক সেপের পুষ্টি অখাণ্ড থাকে হইবার অবলম্ব পাও না। আমি সামাজিক বিশপাচের পুষ্টি আর বিশ্ব না—ভারত গুণ ই বিষ্টি লইয়াই বহু প্রভাভ রচনা করা গলে। আমার উদ্দেশ্য সামাজিক বিশপাচের ফলে বাগানী বায় সখ্যে ক্রিতি পরিবর্তন হইতাহে বা হইতে পারে, তৎসময়ে বাগানবের পুষ্টি অকরণ করা। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ তৎসময়ে যথেষ্ট অবহিত হইবেন।

একদে প্র হইতাহে এই—সেপে থাথা প্রচুর পরিমাণে বহিষ্কারে, অন্য কামরা ল্যাম্পোদু কেন? এই প্রচুর এক কবার সঙ্কটের যেত্যা তপ্পন। সেপে থাথা প্রচুর পরিমাণে আছে হটে, কিন্তু কত জনে থাথা লক্ষ্যে না-এই করিয়া উপযোগে পরিবার আর্থিক ও শারীরিক ক্ষমতা থাকে? থাথা থাকিলেও, নিকার অভাবে, তে-নু থাথা তি জায়ে ব্যবহার করা উচিত, তাহা অংশে জায়ে না। থাথা থাকিলেও, তাহাতে পল্লব-প্রাণের চেতন চাণিগাহে; এবং থাথা থাকিলেও, সেখানি আলোয়, বাতশক্তি কমেয়ার ভাণে বুজা, বসন্তের উৎকর্ষ বাণি বহুবেশে থাথা-ত। পল্লব বহুর পূর্বে, সেপে আলোয় থাকিলেও, বসন্তের এমন বিকট বৃষ্টি এতটা প্রকট হয় নাই। নিত্য চ্যপ-ব্রজিতা, নিত্য অভাব, নিত্য রোগ—এত নষ্টা প্রাণ ধাত কেনে করিয়া? পল্লব বহুর পূর্বে এ সেপে বলিষ্ঠ, বীর্যবান ও কর্তৃত্বশাল ব্যক্তিরা অভাব ছিল না; এখন তাহার অন্যতম অভাব হইয়াছে।

ব্যস্তিক, বাগানীর ভবিষ্যৎ বহা সতীল সম্ভা হইয়া বঁকাইয়াছে। এ সমস্তার সমাধান কোন একটা দিক দিয়া হইবে না। যিনি বাগানীর তত্ত্ব আভ্যন্তর দেখে থোথোই পদ্ধতিগণ নির্দেশ করিয়া দিবে, তিনি ই সমস্তার আর্থিক সমাধান করিবে বহা। যিনি সেপ হইতে হ্যামেলিয়া বৃক্ষ কঠিতে পারিবে, তিনিও আর্থিক সমাধানের বেশী কিছু কল্পিত পারিবে না। যিনি হাতীরা শিকার প্রবর্তন করিবে, তিনিও আর্থিক সমাধানের বেশী কিছু করিবে না। চল কথা, এক কালে এককালে বাগানীর শিকা, বাগানীর আহার, বাগানীর চিকিৎসা প্রভৃতি, বাগানীর সামাজিক অবস্থা, বাগানীর বৈদিক পরিপ্রভ প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে, বাগানীর জগৎব্যপ্ত পণ্য পরিবর্তন করিতে বা পারিলে, এ ভাবিত ভবিষ্যৎ বিস্তার আশা প্রব। ই সকল কথা করিতে হইলে, সেপের কর্মপ্রাণের বিলাতী চন্দ্রাধ সাহায্যে কাষ করিলে চলিবে না—সেপের লোককে উদ্ধ করিয়া, সেপের লোককেই সাহায্যে, সেপের কাষ করা হইতে হইবে।

যে সকলে কাষ হইবে, তাহা অন্তর্ধানী জানে। আমাদের

কাষ—ভবিষ্যতের দিকে পুষ্টিপাত করিয়া, সেপের লোককে সকল কথা প্রবাহিয়া ও জানাইয়া রাখা। এখন হইতে নৈমঃ-নৈমঃ ই সকল বিবর্তক আলোচনা করিলে, প্রব সেপের লোককে চন্দ্র পুষ্টিবে। তাই আর বাড়তিট এ বিবর্তক আলোচনা প্রবাহের আংশিক আলোচনা হইলেও, এবং এ বিবর্তিতে “চন্দ্র” না থাকিলেও এবং তৎসময়ে সাহায্যের সঙ্গে আহার পাইবার অনুশ্রুত হইলেও, সাহায্য বিবর্তক সাহায্য পাইয়া প্রবর্তক করিগাম।

অনু

বাগানীর প্রাথম পাত জাত। সেই তাত বাক্ত হইতে হয় এবং বাক্ত হই বসার দিচ্ছ হয়। প্রথমবারে চাষার পুষ্টি দিচ্ছ হওয়ার উহার চুপ বিস্তার হয়, এবং তৎসময়ে তৎসময়ের সমাধান সমাধান-ভবিষ্যৎ হয়। বিচারবারে তৎসময়ে দিচ্ছ করিয়া “কেন” নামক পদার্থের সঙ্গে তৎসময়ের সমাধান ও ক্রিয় পরিপ্রাণ যেতনার (starch) নামের নষ্ট করি। এবং বাগানী “কেনের নাম” চাউল বাইয়া থাকে, তাহারা তৎসময়ে তাইটামিনবৃত্ত পরম উপকারী আহারকটি হইতে বকিত হয়। বাগানী আতপ তৎসময়ে তাহারা উচ্চ তাইটামিন হইতেও বকিত হয় না এবং তাহাদের মধ্যে অনেকের যেতনার ও লবণ বেশী থাকে। এই প্রভাভের মধ্যে পুরোচিত ও বিবর্তক। অধিকার হইলেই প্রবর্তক। যে সকল বিলাতী স্বাধিক্ত বাগানী পুরোচিত, দিচ্ছ চাউল বেশ করিয়া লগাইয়া জোবন করেন, তুল দিগবে, তাহারা তৎসময়ে চাউল আলো কল হইতে বকিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য কতি বসন্তের সেপে সামাজ্য আভার প্রাণ করে না। তাককে বেশী “কলার” অনুচিত। তাত বস বস হইবে, তাত প্রবর্তক প্রবর্তক প্রবর্তক করা বাইবে। তাতকে প্রবর্তক প্রবর্তক করিলে তাহা বহুবেশে পরিপ্রাণ হয় না। তাতকে বস বৈশিষ্ট্য বহুবেশে প্রবর্তক প্রবর্তক করা বাইবে, তাহা তাত বহুবেশে পরিপ্রাণ হইবে। “কলার” তাতকে বেশী করিয়া কর্তব্য করার প্রবর্তক হয় না—কাবেই যে তাত পরিপ্রাণ হইতেও বহা হয়। বর্তমান কালে, বৃত্তে তৎসময়ে হওয়ার ও বৃত্তে হুঁদা হওয়ার, বৃত্তে জোবন করা সমাধান বহা। কিন্তু বহুবেশে পদ্ধতিগণের, বৃত্তীল আভ্যে “কলার” বলিয়া নির্দেশ করা আছে। এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাণ এই যে, তাতের অধিকারের প্রবর্তক প্রবর্তক (pancreatic juice) পটিত হয়। প্রবর্তকের বৃষ্টির সঙ্গে বহু পরম উপকারী। এই প্রভাভ, অনেক দলে বৈদিক পাঠ্য বহা যে, যে ব্যক্তি গুণ তাত পরিপ্রাণ হয় না, তাহাকে “বি-তাত” বাগানীয়ে তাহার সঙ্গে তাত সমাধান হইয়া উঠে। অন্তঃপ্রাণ তাত বহুবেশে এই বহুবেশে কথা সকলেরই যাবে রাখা প্রবর্তক।—

(১) কলে থাথা চাউল বাইতে দাই।

(২) সস হইলে, আতপ-তৎসময়ে বৃত্ত সাহায্যে ও সবেগ জোবন করাই পদম উপকারী। প্রত্যহ সস না হইলেও দ্যে দ্যে ইয়ল বাগানী ভাল।

(০) ভাত খুব পলাইয়া পাওয়া উচিত নহে। একোৰ তত্পূৰ-
কণা আতৰ অৰ্দ্ধত স্থিতি হইবে, ইহাৰ বাহীৰী:

চাউমকে সিদ্ধ কৰিবার উদ্দেশ্যে, উভাৰ অত্যন্ততম বেতনপাতের
বান্ধাওকে কাটাইয়া বেতন। সেগুলি কাটিকা যেনে, পরিপাক হই
সহজে একোৰ বান্ধাৰ মধ্যে স্থিতি ভাবে প্রতিষ্ট হইতে পারে এবং
পরিপাক কাটিকা স্থাপ্য ও সহজসাধ্য হয়। কিন্তু চাউমকে বহিৰত
বেষ্টী উত্থাপন হিলে, উভাৰ অত্যন্ততম বেতনপাতের বান্ধাও সিদ্ধ
কৰ্ম-বিহীন হওয়ায় সম্ভাবনা কম। এই ভাত খুঁটেৰ পোড়ো বা
কাটেৰ আগে সিদ্ধ হয়, কৰ্মসূত্ৰ বা টোকেৰ আগে সিদ্ধ হয় অথবা
সহজ-পাঠ্য। এবেশে পূৰ্ণসিদ্ধ ভাত (বাণি ভাত) বাহিৰাৰ এখা
আছে। সুতৰায়ে, ভৌতিকক, ইত্থন আৰু কৰ্মসূত্ৰকৰ্মে বাহিৰে
বাহ্য নাই; কিন্তু অত্যাধিকতম উভা কৰ্মসিদ্ধ সেয়া নহে। ভাত বাণি
হইলে উভাতে কৰ্ত্তব্যগতি আৰেৰে পট্ট হয়—সেই অৱগতি পাকস্থলীৰ
পরিপাককাৰী আৱৰণেৰে স্ফীত হুগল যিহে বৃদ্ধি ঘটায় না।
এবেশে বহুত ভাত ভালে খোঁচ কৰি। ভোজন কৰাৰত এখা সেয়া যায়।
ভাহাতে যৌগীৰ মানসিক উপভোগ মাতীত, অপর কোনও উপভোগ হয়
বলিয়া দেখা হয় না;—অৰ্থাৎ যৌগীৰ সেয়ে যে ভাহাৰ দ্বিত “একটা
কিছু” কথা হইল, অতএব সে যেনে-যেনে পুৰি হয়। এই মানসিক
সন্তোষে পরিপাকের পক্ষে কম উপকাৰী নহে। এবেশে উভাৰ
শুদ্ধতাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দ্বিত ভোজন মত চিঁড়ী (চিপিটক) ভক্ষণ কৰিবার
এখা আছে। উভাই অতীৰ লক্ষণক পায়; তদুপায় চিঁড়ী আত্ম
কৰ্ম। যেনে, যে এতিয়াৰ চিঁড়ী এমন্ত হয় তাহাতে উভা বহুই
স্থগতা হইল। পাক—উভাৰ বেতনপাতকি সহজ পাঠ্য doctrine
(ভেদনশীল)ে পরিবৰ্তিত হইল। বৰ্তমান সময় আবেৰিতায়
উভাৰ বিশেষ সহায়ক হইছে। উভাকে pulled rice বাণি
ভাহাৰ খুব ব্যৱহাৰ কৰিতেহেঁম। বহুত: সে চিঁড়ী অতীৰ
সহজপাঠ্য।

যৌগীক ভাবে বহিলে, ভাত অতীৰ সহজপাঠ্য ভাত। কিন্তু
ভায়ে বাহাৰ উভাকে অৱশ্যেপূৰ্ণ কৰি। ভোজন কৰি, তাহাতে
সেহেৰে পুষ্টিৰকাৰ্য্য অৰ্থক পরিপাৰে ভাত একত্ৰ আধাৰ না কৰিলে
সেই না; অৰ্থক বাহুসে পাকস্থলীৰ একটা ধাৰাবাহি আৱতন আছে।
সিদ্ধাই সেই আৱতনকে সহজাৰে বড়াইতে বাণিলে পৰ্বতী বহুগীৰ
উপৰে বেদন কাট যেনে, পাকস্থলীৰ পাকত তেজনি কাটিকা যায়।
হুগেৰে বিধাৰ এই বে, পৰ্বতী বহুগীৰ উভা-ভাহাৰ কাটিলে
বিশেষ কিছু পুৰিষ্ট হয় না যত; কিন্তু পাকস্থলীৰ বেদনে বহুইহু কাটে,
সেইবেশে তততত পৰিপাৰে পরিপাক ব্যস্তৰ আগে হয়। তদুপায়,
পাকস্থলীৰ সিদ্ধাঙ্গাৰে মনে উভাৰ সন্তোষে কৰ্ত্তব্য হুগল হয়; অৰ্থক
পাকস্থলীৰ এই সন্তোষ-কৰ্মতা পরিপাক কাটেৰে সহায়ক। অতএব
সেই এখা বাহিৰেই যে, যৌগীৰ ভাতকে “বিয়েল” কৰাৰ কৰ্মে,
পরিপাৰে অৱশ্যেগতি ভাত বাহিৰাৰ একোজন হয়, এবং অৱশ্যে
একত্ৰ অৱশ্যেগতি ভাত বাহিৰে পরিপাক-স্ফীত কৰ্মসূত্ৰ হুগল হইল।

যাক। পরিপাক-স্ফীত হুগল হইলেই “পেটের ভাত” পেটের মধ্যেই
পৰিষ্ট থাকে এবং ভাহাৰ কৰ্মে বাহাৰ কৰ্মেৰে পৰিষ্টকৰিত হয় ও
আহু (বাহু) পট্ট হয়। যিয়েৰ পৰি যিই সকল স্থিতি পৰ্য্য পট্ট
হওয়ায় কৰ্মে, “ভিঙ্গপেপুসি” বা অৰ ও অতীৰ বেগে পাক্যপাকি
হুগল বড়াইল। বাহ। এই ভাহেই, বৈধিক-অন-ভাহে, বিভা-
ইক-বহিৰ, অপর-অৱশ্যে বাহাৰী আৰু ভিঙ্গপেপুসি ও
বহুভুগেগী। আৰু বাহাৰীকে ভিঙ্গ কাৰ কৰিতেই
হইবে, তবে বাহাৰী আৱাৰ সলল ও বহু হইতে পাৰিবে।
বাহাৰীৰ এখা কৰ্ত্তব্য—ভীতিত বৈধিক পৰিষ্টে অৱত
হওয়া: ভীতিত বৈধিক পৰিষ্ট এখা-ওখাৰী পৰ্য্য একই “একতৰ বহু”কে
পৰিষ্ট কৰা অৱশ্যে বাহাৰ না। বিভা কৰ্ম, বহু ও পিণ্ড মাতীত
পৰিষ্ট এক আৰু ভোজন অৱশ্য কৰা কাহাৰে পক্ষে অৱশ্য কৰা
বলিয়া দেখা হয়। অৱ কৰিতে হইলে যেনে, ভাহা, বাহা,
অৱকৰ্ম, পৰিষ্টাৰিক বহুভাৰিগেৰে উভাৰে বিভৰ্ত কৰি, বাহা
কৰ্মসূত্ৰ অৱগতি। কৰা যায়। কৰ্ম কৰা, যে ভাহেই হইল, সবত
ভোজন কৰ্ত্তব্য বাণিলে, তবে পরিপাকের অৱশ্য ও ভাত থাকিবে।
পাঠকপক্ষে অৱ কৰ্মে ভাত বে, পাকস্থলী ও অৱ, এই বে বহুই যিয়েৰ
মধ্যে পরিপাক কাৰ্মে সংশ্লিষ্ট হয়, সেই বহুই বৈধিক-বহুৰ বহু এবং
পেটের সন্তোষেৰে কৰ্মতাৰ উপৰে ভাহাৰিগেৰে পরিপাক-কাৰ্ম-
কৰ্মতাৰে বিভৰ্ত কৰে। যে ভাহি অৱশ্যে, অৰ্থক বহুভাৰিগে
অৱগতি, ভাহাৰ পরিপাককৰ্ম অৰ্থক পরিপাৰে অৱগতিৰে কৰ্মে সেয়ে
একত্ৰিক অৰ্থক সংশ্লিষ্ট হইতে থাকে, তেনেই ভাহাৰ অৱগতিত
কৰ্মে পরিপাক যিয়েৰ পৰিষ্টাৰ অৱশ্যে। এই উভাৰে সন্তোষে,
অৰ্থক অৱশ্যে। তাই বহুভেদেই বে, বাহাৰীৰ পক্ষে
ভীতিত ভায়ে অৱগতি কৰা মাতীৰ এখাৰীৰ আধাৰ হইল।
বড়াইহাৰে। বিভাৰ হইতে ভীতিত বাহাৰ-ভাহাৰ এখাৰ না।
হইলে, তবে-তবে পৰিষ্টিক পরিপাৰে বাহাৰ অৱশ্যে না হইলে
অৱগতিৰে অৱশ্যে নাই। পরিপাক কৰ্মে, বাহাৰ পেটের উত্ততি
অৱগতি। = আৱাৰে বিভাৰ কৰ্ত্তব্য—বাহুভোজৰ অৱশ্য বিধাৰ
কৰা। তত্পূৰকৰ্মে বাহাৰ: ভাহাৰীৰ বহুভাৰ অৱশ্যে
বহুভেই হইবে, বহু ও ভাহাৰ তত্পূৰকৰ্মে বহুভাৰ হইতে পারে।
ভাহাৰ কৰ্ম বাহাৰ বহু কৰিতে হইবে; অৱশ্যে: অৱশ্যে কৰ্মে
একাৰে কৰ্মে উভাৰ কৰ্ম: হইবে। এই বহুৰ বহুভাৰ
কৰ্ম টাফ। পট্ট বাণি এখাৰ ভাহাৰ দ্বিত ভোজন কৰ্মে বাহাৰীকৰ্ম
বিভা: বাহিৰ হয়, তাহা বাণিলে সিংহিয়া উত্ততি হয়। ভাহাৰিগে
ভাহাৰে কৰ্ম অৱগতিই বাহাৰ কৰা বাহিৰে পারে। আৱাৰে
ভাহাৰ কৰ্ম—ভাত অৱশ্য কৰ্ম-পাঠ্য হওয়ায়, ভাহাৰিগে বা

০. ইহুত বাহু পুৰিষ্ট বাহু ভুত “বাহা ও পাকি” পুৰ্ণকৰ্মনি
সকলকেই পৰিষ্ট অৱশ্যে কৰি।

অন্ততঃ একবেলা তৎপরিবর্তে, আটা যথার্থ ব্যবহার করা। এ-
ছাটক গাটিন সিদ্ধ করিলে, তিন ছাটক ভাতের দাঁড়ায়; অর্থাৎ এ-
ছাটক গাটিন হইতে পুষ্টিমাত্র পরিবার ভ্রম সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য
সদ্যে দুই ছাটক ভ্রমেৎও যাহা সমুদান করাইতে আদ্য। বাধা হই-
যদি আটার মদ্য এক ছাটক ভ্রম করিতে ইচ্ছা করি, তবে তৎসঙ্গে
কঠকটা দূত ভোজন করিতে বাধা হই—যে গ্রাহ্যকৌর্য্য ভাত-
ভোজ্য সহানভাবে আছে, অথচ তাহার বেদ্য বাধাব্যবস্থা আদ্যে
নাই। কয়েই, এটা-মদ্য ভ্রমণ তিনটি সাত আদ্যে; অথবা
পুষ্টি বিশেষ, আটা গাটিন হইতে যুগ্ম পুষ্টি করি; যিহাভ্যে:
আটারমদ্য ভ্রমণ করিতে হইলেই তৎসঙ্গে দ্বিতিক দূতভোজন
হওয়া পুষ্টি সত্তা বর্জিত্য খার; এং ভূতীয়ত, আটা-মদ্য
সমুদান পরিবার ভ্রম উভয়ে বেশী হানের গ্রাহ্যজন হয় না। এই
সকল কারণে, প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে, অথবা একবেলা ভাতের পরিবর্তে,
আটা যথার্থ প্রচলন করা আবশ্যের উচিত। অথবা, যতবায় সময়ে
নিরাবিধি ও সাধারণ পুষ্টি কলিকাতাবাসী অনেকের পক্ষে
‘বিশ্ববাসী’ বা যে ভাবে ভাত খা: ভাঃ করাও সমীচীন। বিশ্ববাসী
আদ্য তৎসঙ্গেই ব্যবহার করেন। ই তৎসঙ্গে সতে, সমগ্রবাসে,
অন্ততঃ তিন একাত্তর টাইল মিশ্রিত করিয়া তাহাতেই দূত ও আদ্য
পাটো, প্রভৃতি একত্র সিদ্ধ করিয়া বিটুড়ি ভ্রমণ করেন। প্রথম-
প্রথম এইরূপ পরিবর্তন করিলে ভই হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশ:
সহ্যাই হইলে, ভই হইবার কোন কারণ নাই। যে সকল বাসিন্দী
পুষ্টিভ্রমে বহুবারে উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে বায়ু পরিবর্তন করিতে যান,
উভাতের পক্ষে আদ্যের ভ্রম দ্বিক অতীত প্রোৎসাহ। সেখানে
কিছুই অস্বাভাব্য সাহায্যে ত্রিত পুষ্টিক প্রাধাণ্য ভোজনে অত্যন্ত
উৎসাহী বৃত্তিমানের কথা। নতুন-নয় অর্থব্যয়ে, বহু ক্রম দীক্ষার
করিয়া কাটতে ৩৫ বাঙালী খাওয়া হয়—আর কিছুই হয় না।

ভক্তের পায়ঃ বাহ্যাত্মীর বিতীর প্রধান ষাট—ভাইস। কিন্তু বাহ্যাত্মী ভাইস তখন কহা অস্বচ্ছন্দকর্তব্য হইবে করেন না। অনেক দুঃস্থের বাস্তব সেবেরও চাকরিতা ভাইস পায় না। এবং বাস্তব পুরুষেরাও যে ভাইস ভজন করেন তাহাও যথেষ্ট নাই। একবার্তা বলে যেওটা করকে ভাইসের দাবা থাকে নাম, তাহারও নিম্নবংশ ভূমণবর্ণিত রূপ পড়িয়া থাকে। আনার হলে হু, ভাইসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ভাইস ব্যবহারের ন্যূনতার কারণ। প্রবীণ হু-বোধ্য রচনা কহা ভাইস বহিতে না পাইলেও, চান, ছোলা, মটর, কড়াই, চীনা বাধান প্রভৃতি রচনা বা ভাষা বাইরা অনেক হলে রচনা কহা ভাইসের উপকারিতা কিংবা পরিমাণে জ্ঞান করে। এতদেশের "হবিজ্ঞান" পথ উপাধারের আধাড়া। এই অজ্ঞই বিহারা হবিজ্ঞানী তাহারা বেশ দুঃস্থের। হবিজ্ঞানে ভাইস একটি প্রধান কাজ। অর্ধের অজ্ঞতার প্রভৃতি হটক বা পরিণাম পড়ির হ্রাসের হাটই হটক, বা হাটের হাটক বেশী স্তি থাকার মতই হটক বর্জনা কালে, তাহাদের আদর কম হইয়াছে। কিন্তু কিছুটা পূর্বে, প্রাককালে যীতিমত

এখা কোন কোন বৃক্ষ জোতের প্রান্তরে ভিজান কাঁচা দুগ্ধে
ডালি বাইবার এখা ছিল। তখন আমাবসের পুরুলকাঁচা ডালি তাজে,
ডাইলের বড়া, বড়ি, খোঁকা এতুতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন।
সক ডাফুলি, শিঙা, এতুতির আঘর লোণ পাইতেছে। এখন কেবল
কাচা জর্মে ডালি ও শাশর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আঘুর হয় না। এবং
সিঁচা ব্যবহারে, পুখুরের খেয়ে ডাইলের হোমিওপ্যাথিক কোলিও একথা
না। ডাইলের এই কথ বাহার নিত্যকাল হুশেবে কা। আমায়,
সীদ, কড়াই হুঁটি, বরখাই অংকের দুখে হতে না। ডালি শুকণে
মাসে শুকণেও কায হয়। এমন অবস্থায়, ডালি পরিবর্তন অত্যন্ত
হুশেবে বিষয়। আমায় মনে হয়, দত্ত হুশেবে দলব ও বংশসম্বল,
ডাইলের ব্যবহার করা অত্যন্তক হইয়া পড়িয়াছে।/কাঁচা দুগ্ধের
ডালি, বহুর, কুলফকাই ও যতুই চাহার পাত্য। বহুর ডাইলের
কতকটা ব্যাক শুণও আছে। এবং কাঁচা দুগ্ধের ডালে কাইটানীন
বিষয় পাওয়া যায়। বালকবালিকাক্রিয়কে লক্ষ্য হোকামের বিষ্টার
না বাওয়াইয়া, বায়াকাল হইতে “ডাল, কড়াই” কালো, হোয়া ভিজান,
দুগ্ধের ডালি ভিজান বাওয়াইতে পুষ্টিবিদ্যে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা
আছে। প্রবেশে বলা-ভাত, বাহারে ফোলের বহু কপ-পুষ্টির খাও
অনবহৃত বাইয়া বাগলীয়া বৈদিক পুষ্টি, যোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা,
বনসিক স্বর্ষি এতুতির হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষর বিবারণ
করিতেই হইবে। আঘি উপরে যে কথাগুলি বলিয়াছি বা পরে
গালা-বায়া বসিক, ভাহার মধ্যে অধিকাংশই পুষ্টিহীন বিদ্যে বায়ে,
এক অজ্ঞানসেই বসে-বসে করিতে সমর্থ হইবেন। বাঁহারা মাসে খান,
ভাহাংগিরে পক্ষে একগ তবির করিয়া ডালি শুকণের প্রয়োজনীয়তা
অজ। কাল করিয়া এবং নিম্নে মত বাহ বাইটে পাইলেও, ডালি
শুকণের তাল্পন আবহুততা হয় না। কিন্তু বিরাবিরাংগিরে পক্ষে
এক সাধারণ পুষ্টি, বিশেষতঃ পুষ্টিবিদ্যের, পক্ষে বেশি করিয়া ডালি
শুকণ করা একান্ত আবশ্যিক।

বাসানিধি তুতার বাত—বাহ। বাহ ত্রয়ঃই দুর্গা ও দুর্গত
হইয়া উঠিতেছে। তদ্ব্যতীত, বাহের জাতীয় অংশগতন হওয়ার, অনেক
হলে স্তম্ভপুত্র বাহের পরিভাষে নির্ভর্য ও সূত্রান্ত বাহ সেথা বাইতেছে।
টট্টকা বাহ বহু একটা পাণ্ডা বা বাওগাও আরো কতের পরিমিত
নাই। সর্বোপরি কট—আলকাল বাহ বাওগা, বাহে পদ্যবসিত
হইয়াছে বাহ—অর্থাৎ এককও বাহ ব্যতীত এই অধিসূচ্যতার দিলে
পুণ্য একটা ছোট মারও সবসের তাগো ঘোটে বা। লাহে পুত্রমি
রাশিবার উপার নাই। কিন্তু পদীদ্বয়ে পুত্রমিয়ার বাহবা থাকিলেও,
অন্যভাবে পুত্রমিয়ার বাহাবিকারী সহরবানী হওয়ার, অথবা বহ
বাহাবিকারী হওয়ার, পুত্রমিয়ারিও পরিভাষ ও সংকারীন অর্থহীন
আছে; কয়েই বসন্তের ভিতও নাই, বসন্তও নাই। এই ক্রমিক বসন্তের
বাহব বালাসামেশের পক্ষে একটা জটিল লবতা হইয়া ঝড়বিস্তেছে।
সর্বদেবী কবুর্ক সংকেতগণনা বোলাগ ইহার বিশেষ কোনও স্থিতি
হইয়াছে বা ইহাে বসিয়া বোঝ হইয়া।

একটু গল্পে সহজ হয়, আমরা যে বিবর্তী বস্তু দেখি না বা দেখা করি না, এ কথাই কি সংস্কৃত্যাক্রান্ত পারে ?

বেশের প্রচলনগণ, প্রতীক প্রবৃদ্ধগণ, বহু বীর-কর্মী মহাদেবগণ আজীবন বেশের চিত্তার নিমগ্ন রুচিয়াছেন। আত্মবাহ্যে রাষ্ট্রবৈতনিক অধিকারের সীমা বৃদ্ধির ক্ষমতা বা মূর্তির অধিকার লাভের ক্ষমতা কত সহজ কত পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ হস্ত কত বিঘাতন ভোগ করিতেছেন, তাহার শেষ নাই। হস্ত ও তাঁহারা, তাঁহাদের ইচ্ছার আদ্যবধি সঙ্গ বন্ধা, সঙ্গ অজ্ঞান, সঙ্গ সামাজিক ব্যাপি অস্তিত্ব মূলোৎপাটন হইবে, এই বিশ্বাসের দ্বন্দ্ববর্তী হইয়া, উহাই তাঁহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া দ্বিগুণ ভয় ভয় লইয়াছেন। কিন্তু জীবন ব্যাপি মূলোৎপাটন বাস্তবিক অসম্ভব, ব্যতিক্রমিত অসম্ভব বস্তু না বা উপদ্রবসমূহের আশ্রিত অধিকার প্রকাশিত থাকিলে, যে ব্যাপির মূলোৎপাটন সমস্ত পথান্ত হইয়াই প্রায় থাকিবে, কি না তাহাও তাবিবার বিষয়। পরোক্ষের সহকমে ব্যাপির হইয়া, যেসকল সুখসা আনন্দ প্রত্যক্ষক অবস্থোলাভ করিয়া আনন্দ কতটা সন্তোষভার পরিচয় দিতেছি, তাহা আছে তাবিবার দেখা কর্তব্য।

দেশের যেটি-বস্তু অনেক লোকই এখন বাস্তব শাসন পাইবার ক্ষমতা বস্তু হইয়াছেন। রাষ্ট্রবৈতনিক-জ্ঞানপুত্র আদ্যরা সমাজ লোক। বাস্তব-শাসন পাইলে আর দেশের দুঃখ-ব্যতিক্রম, অজ্ঞান-অভিযোগের কতটা অবসান হইবে, তাহা আমরা ঠিক জানি না। যদি ঘটনা লগ্না যায়, তাহা পাইলে আমাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না, তাহা হইলেও, বহু ভাষা সে অধিকার লাভের যোগ্যতা এক্ষণে আমাদের মধ্যে বেশিতে পাইতেছেন না, তাহা বহু অক্ষণেও সহজলভ্য নয়, তখন কি, উঃ, পাইবার চেষ্টার সঙ্গে, কেবল রাষ্ট্রের বোঝাই না দিয়া, উন্নতি লাভের অপর পথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক নহে ? রাষ্ট্রের সাধনা ব্যতীত উন্নতি লাভ করা সহজ-সাধ্য নহে, এ কথা সহস্রবার বীজ্য। তথাপি আজীবন হার-হার করিয়া চরুচিকিত্ত অসুখের মধ্যে অসুখা নিম্ন ক্ষমতাবী বৈদ্য ও সহস্র উপায় আমাদের পথ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কি বরজ্ঞান নহে ? স্বাস্থ্যকর্যের চক্রে আমরা বাহার অযোগ্য, তাহা পাইবার ক্ষমতা অতি-নিম্নতর চেষ্টা করিলেও, যে বিষয় আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্বন্ধে থাকিতে পারে না বা থাকিবার আশংক্যতা নাই, তাহার প্রসিদ্ধি লাভ তাঁহাদের বিকট হইতে পারে পাণ্ডা বাইতে পারে, সে কত সোজা পথ বলিয়া আশঙ্কিত করিয়া দেখাও কি অসম্ভব এক্ষণে কর্তব্য নহে ? আমাদের নিজের কোন ভার লইবার ক্ষমতা আমাদের নাই, এই ভাব দেখাইয়া তাঁহারা আমাদের শাসন করেন, তাঁহাদের কাছে বসন্ত-বসন্ত-অধিকার সঙ্গ পাইবার ক্ষমতা আমরা কোবর বিদ্যা লাগিয়াছি, অপর বিদ্যে ততক্ষণ আমাদের কত যোগ্যতা সাধনের অধিনে পাইবার নীচে উড়িয়া বাইতেছে, কত বৈদিক বস্তু বাইতে থাকিতে

কত যোগ্যতা, কত শক্তি আমাদের হেদার নাই হইয়া বাইতেছে। এখন সমস্ত সমস্ত মানুষ জীব-জন্তুর শক্তি, জল-বায়ুর শক্তি, বায়ু-বিদ্যুতের শক্তি নিজের সুখ-প্রসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়াই নিম্নতর নহে, —পুনরায় প্রকৃতির জ্ঞাতর হইতে আর কি লাভ নাই। নিজের কলমে লাভাইতে পারে। আর তাহার চিত্তার নিম্নতর, অতি ক্ষুদ্রতম সাধারণতঃ, এমন কি সহস্র ও শতাব্দের কল-মুদ্রণ হইতেও তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পর্যায় পর্যন্ত করিতে বিবর্তন নহেন। সেই সময়ে আমাদের ক্ষমতা-বৃদ্ধি কত শক্তি, কত সামর্থ্যের চাহিদা অপর হইয়া বাইতেছে, যে তাহার ইচ্ছা করিতেছেন ? আমাদের নিজের বৈদিক ও সামাজিক শক্তির সম্বন্ধ বিচারেরও সুযোগ নাই। আমরা প্রস্তুত আবার নীরে যত যে বিদ্যে এতাবৎ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছি, এখনও যদি সেই বস্তু আদ্য-পথ চাহিয়া থাকি, আমাদের অতিবৃদ্ধি বলায় তাবিবার ক্ষমতা যদি এখনও অপর বিদ্যের অগ্রগমন না করি, বাহা আমাদের, আমরা বাহ্যে, তাহাদেরই যদি আবার স্বাধীন করিয়া আমাদের করিতে না পারি,—জাতিবী মায়ের প্রেরণে বাহ অজ-কণা চাহিয়া, পরের উদ্ভিষ্ট জীব সমস্ত যোগ্যতায়িত না পারি,—তাহা হইলে এখনও বাহা আছে, তাহাও ক্ষুদ্র হইয়া, আমাদের শেষের দিন আরও বিকট হইয়া আসিলে, আমাদের রোগ অবিবাহিত হইয়া পড়াইলে—তাহাতে সম্বন্ধ করিবার নাই।

আমাদের বাহ্যলার দ্বারা এখনও যোগ্যতা লাভের পরিপূর্ণ থাকে, পাঠের ক্ষেত্রে এখনও সমস্ত সম্বন্ধের পাঠ চেষ্টার অত্যাশ পূর্ণ করিয়া বিবেচনায় বসিকলপের ধনাত্মক পূর্ণ করিতেছে : তথাপি আমরা ভীতি ভীতি হইয়া দ্রুত পাইতে পাই না, চাহিবার পড়াইবার স্থান নাই, পরশ বস্তু নাই। দেশে এখনও গতি আছে, কার্যের চাহ এখনও পূর্ণ হইতে সত হইতে পারে : মিহি সূতা প্রস্তুত করিবার শক্তি এখনও সুযোগ আছে, তাহার দ্বারা আমাদের সম্বন্ধ বিবারণ হইতে পারে, তথাপি আর বাহ্যলী বিশ্বাস হইতে বলিয়াছে। ক্ষেত্রেবিশিষ্ট শক্তি লাভ পূর্ণের তুলনায় এখন কত অধিক বাহ্য হইয়াছে, কত বার হইতেছে,—তথাপি এখনকার তথাকথিত শক্তিত্ব বৃদ্ধকের শিকার হইতে কোথাও কোথাও অতিভাববিশিষ্ট অস্থির হইতে দেখা যায়। পূত্র কস্তার বিবাহ দিতেই হয়, দেশে শক্তিত্বের লক্ষ্য বাড়িতেছে, তথাপি আশ শক্তিত্ব ও অশক্তিকৃত উভয় সম্প্রদায় বলিয়া বাইতে থাকে। যোগ্যতা-প্রাধান্যের মধ্যে বিবাহ-পথের আলো সম্বন্ধে বিবর্তন। দেশে শিকার-বিবাহের চেষ্টা ক্রমে বাড়িতেছে, বাসিতা ও পুত্রসন্তানের শিকার ক্ষমতা চাহিদা-বিশিষ্ট ক্রমশঃ সম্বন্ধে বহু লক্ষ্য দেখা বাইতেছে, ক্ষেত্রেবিশিষ্ট আশংক্য বিন বিন বাড়িয়া চাহিয়াছে। এইরূপ কত শত বস্তুর দিন দিন আমাদের শক্তিত্ব বাড়িয়া চাহিয়াছে। আমরা তাহার শক্তিতে বসিতে থাকিলেও, মূখ্য বলিতেছি তথাপি বস্তু না হইলে আর চাইল ডাউল সম্বন্ধ হইবার উপায় নাই, কাগজের সম্বন্ধে গুরুত্বমূল্য কথা আইন না করিলে বাস্তবিক বাস্তবসাধারণের

বিভিন্নর আদর্শ সত্যের না হইলে হেগেলিয়ানের প্রত্যুত যাব্দ হইবে না। সমাজের-এখন যা-বাপ নাই, সুতরাং যাহার বাহ্য ইচ্ছা তিনি তাহারই করিতেছেন। আর যেহেতু পথার কথাই এই পথের নহণ, এই আদর্শ কোনো যেক-এসে এবেশে মুক্ত, এই কথা বলিয়াই নির্দিষ্ট। কিন্তু এই সুত্রে যে অনিবার্য, সুতরাং তির যে এক পথ তাহাদের আশ্রয় করিবার নাই, সে কথা মনেও আইসে না।

এখন কথা হইতেছে, এই সকলের প্রতিফল-করে আমাদের কি কিছুই করিবার নাই? বরিতা লওয়া খাটক যে, বহানি বহু চাইবে না; বিশ্ববিজ্ঞানের শিক্ষার হাতি পরিচরিত বর্ননায় অধ্যায় সঙ্কলন নহ, ব্যবসায়ের যদি অসুখ হয় ত সে অসুখই থাকিবে; সমাজের না যাহা হইবে সূতন করিয়া আর হইবে না; সেহেতুই কেহাঙ্গিলে মুক্তিলাভ লওয়াই সুত্রে! কিন্তু এই সকলগুলিই এখন বহুপ্রকারে আমাদের অগ্রসর পথে আকর, ইহাদের সঙ্গে যাত্রায় করিতে-করিতেই এখন আমাদের চৌহদ্ভাগ হয়, তখন যে উপায়েই হউক প্রতিফল ত করিতেই হইবে। তাহা না পারিলে, কলকাতার কথা তির আর উপায় কি? আজ দুইটা যে দিক লইব- মনে করিয়া এতাবৎ ঘনিষ্ঠ হইয়াছি, যা সোজা দিক বলিয়া থাকে মনে করা যায়, সে দিকে বাতারা এখন আমাদের দিক ইচ্ছার অনবন নহ ঘনিষ্ঠাতি, তিক্তায় এখন সেরাজের নুতি তির আর কিছু লাভ নাই বুঝিয়াছি, তখন অপর দিক যদি কিছু থাকে তাহার অংশদান আশ্রয়ক। বৈধ ও লজ্জ উপায়ে নিজেদের ক্ষমতা-মত ত্যাগ করিতেই হইবে। স্বর্নবীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির এক দিক বেগিতে হইবে। অর্থাৎ বহুত্যাগবিধির পালাপালি না থিয়া, বহু-সকলের হাত হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য, হেল-য়েয়েব প্রকৃত শিক্ষার জন্য, পদ-প্রথা ও কেহাঙ্গিলে সুস্থির হাত হইতে নিষ্ঠুর লাভের জন্য,—এবং এই সকলের পরত যদি পুনরায় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের প্রয়োজন হয় তাহা পাইবার জন্যও, অন্য প্রকৃতি পথ খিঙে হইবে। অনেক সময়ে বহু প্রমত্ত ও পরিভ্রাণ পথের অপেক্ষা সাক্ষী অপরিভ্রাণ পদি পথ বরিতা স্তির পত্থা হইবে পৌঁছান যায়। বহু-বহু জাহাঙ্গ যে বাসে হাটতে পারে না, হোট প্যাসি অব্যাহালে তথায় হাটতে পারে। আমাদের এইবার সেই অঙ্গপ্রত্য যদি পথ বাহির করিতে হইবে, সেই হোট প্যাসির আলয় লইতে হইবে। জগত্বানের অধিনাপ্যতে আমাদের এ কৃত সঙ্ক করিতেই হইবে, নতঃ পত্থা হইবে পৌঁছিতে-এবংও বিলম্ব করিবে। চাই কি বহু জাহাঙ্গ হয় ত কোম দিনই সেখানে হাটতে পারিম না।

মাত্রির বার্থ, দেশের বার্থ, নিজের বার্থ বার্থ বার্থ করিবার এক ব্যক্তিগত অধীক ও সুত বার্থ বহল সূচিতে হইবে। বিমানিতা ও আদিক জ্ঞান বোধিতে হইবে। কেবল কি পতি, কতটুকু সামর্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহা বেগিতে হইবে। সাক্ষ্যার্থে বিবিশ্রয়ের সঙ্ক লক্ষ-পতি-নিয়োগ করিতে হইবে। সমস্যাের পথ অবলম্বন করিয়া হরিত্র কৃষক, কৃষাণ ও কৃষকীণের ক্ষমতাইহু বাহিতে আর না নষ্ট হইয়া হাটতে পারে, সাধারণে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকলের

জন যে কোন পার্বত্যায় প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে, যে কোন যাহা তাহা অবল হইলেও অপসারিত করিবার সঙ্ক বহুতন হইতে হইবে। এই সব হোট হোট বিষয়ে সমস্তইই আমাদের জাতীয় উন্নতি-সৌভেব হিতি পাপিত করিতে হইবে।

সেবার যাহালায় প্রাকৃতিক সম্পদের বেদন অভাব নাই, তেমনই দুর্ভিক্ষ, দল ও জন-বলয় এখানে এখনও অভাব হয় নাই। প্রতাপ ও সীতারামের বীরত্ব, অধীন ও প্রকৃষ্টের বৈজ্ঞানিক যোগিত্ব, স্বাধীনতা ও প্রেমপ্রদায়ের প্রতিভা, অপর্যায় অসুখলতা পাইলে সমুদ্র হইবার বত লল, মটি ও যাব্দ এখনও অভাব হয় নাই। কপতের যে কোন মনেবে যে কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট লাভ করিতে পারিবারে, বাসলার মোকেরও সে সন্তুষ্ট লাভের পূর্ণ বানী আছে,—ইহা একজন প্রমাণিত নহা। বাসলার মাটিতে নিউটন, জ্যোতস্ব, গার্লিন্ডিও, ক্রোয়ালিয় প্রভৃতির জায় বাসপুত্রের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। আমাদের দুইটুকু, তাই মাক আমাদের শক্তির অনেকটা বিনোদনের উপাধ্বন-মালি, চট্টের ফলে বৈদেশিক বণিক-দিশের সম্পদ-বৃদ্ধির সত্যতাের পটিল পক্ষপাটী টাকার বেতনের বিনিময়ে বিক্রীত।

প্রকৃতির সম্পদ এবং দেশের এই দুইকণ্ডই আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রধান উপাধ্বন। দেশে বনী আছে, তাহাদের বন কৃষির স্পৃহা আছে; দেশে প্রচুর পরিমাণে মাসের এখনও অভাব হয় নাই। বন-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার উপায় প্রচুরও অভাব নাই। এখন বেগিতে হইবে তবে কোম এ সকলের সমর্থ না হয়! দুর্ভিক্ষা বাহির করিতে হইবে বাহা কাছাট,—সকলের মধ্যে সমজলর ব্যবধান কটাই। তার-পর সেই বাহা সন্নাহিতে হইবে, যিহাদের অভাবের ইচ্ছা তাহাদের পথে গাঁড়াইগা থাকে তাহা সন্নাহিতে হইবে। বহুটা লক্ষ্য থিমাঙ্গ-বর্ধিত হইয়া অসুখ হইবার সঙ্ক করিয়া বাহা আমাদের চির মনের তাহার জেমে আবার মাটিই ইহা পরের ঘোরে ও প্রেমোত্তনের মনস্ত তিক্তকল ব্যবসায় বৃদ্ধি। কেমিগা, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের স হুত আমাদের দেশের সঙ্ক দুইকণ্ডের হাতে-কলমে দিশের মনস্ত দান করিয়া থিতে না পারি; কমেব প্রত্যব অনিবার্য হইলেও, যদি মাত্রির বাস্তবিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া অসলর হইতে না পারি; বন,—আমাদের যে শিক্ষার, যে বিভ্রাণ প্রত্যবে বাহুদ্রকে বিবেকের আবার তিরিা তুলে, পরত হইতে যেহেতু কমে লইয়া যায়—বিপাকোপসে শিক্ষা সন্তে যা তাহার বোধে জাতিগত শিক্ষার সেই দিক এখনও তার নিজেব লইতে না পারি; আমাদের মাক-জাতিগত বর্ননায় কালে উপযোগী শিক্ষার সহিত জ্ঞানলোক প্রবান করিয়া উন্নত করতে না পারি; আমাদের সামর্থ্য বেদনই হোক, আমাদের সেবার তার যদি আবস্থা নিজে লইতে না পারি; নিজের কুখুদ্রকে অন্তের ঠাইয়ের অপেক্ষা যদি আমাদের মনে করিতে না পারি,—তবে আমাদের আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। আর ইহা পাইলে যে তুতি লাভের সত্যদান, জানি না,—যাত্র-পালন রূপ অধিকার লাভের অভাবে তাহার কটাই ক্ষতি হইতে পারে।

খীকার কঠি, চিত্রাবত অধ্যাপকের সহিত নব উদ্ভবের সংঘর্ষে, প্রাচীরের সহিত নদীর সংঘর্ষে, চলিতের সহিত বসায়তের সংঘর্ষে এবং বাহ্যিক অনেক অসুবিধা, বিড়ম্বনা চোপ কতকটা অনবহা: িকৃত মনে হই ইংরেজ গ্রিক যে, এই অসুবিধা-বিড়ম্বনার পশ্চাতে অনেক অজ্ঞানগুণ প্রদীপ্ত, মানুষোচিত ব্যক্তি বস্তু অপেক্ষা করিতেছে।

আপাতের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সহায়তায় আর নিবেশে করিয়া এতদং কোন এককালে যদি রাজ্য সংস্থার চালনীতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে নিজ সম্পদ প্রাচীর সম্পদ বুদ্ধির ভক্ত অহরহণি দিতে পারিলে উপস্থিত হয় ত সুমিহের মস্ত একটু ত্রেণ হুচি পাইলেও, বস-মনেরই প্রসাধে কামনা কখন বিফল হইবে না। এত বিঘের বিঘাতীক দিকচৌতির প্রসাধে এখন যদি অনুপেচনায় কারণ ঘটয় থাকে, তাহা হইলে প্রাচীর দিকার আপাত-কটাক্ষীপ পথ পার হইতে চরণ একটু-আটটু কট-বিহ্বল হইলেও, দিকার বিতর্ক কখনও বিফল হইবে না। প্রীত্যোক্তের মধ্যে শিক্ষার বিভ্রান্তের মধ্যে তাহাদের মধ্যে অস্বাভাবিক সংখ্যা হয় ত এবং-প্রথম ব্যক্তিতেও পারে যদিও কেহ-কেহ সন্দেহ করিলেও, উপযোগী শিক্ষার দ্বারা দুই ভবিষ্যতে নিবর্তাই যে সকল প্রশ্ন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই নাই।

একশ শিক্ষার, জীবন-কাম্পের, সমাজের এই অপর পথে প্রবেশের দ্বারা একেবারে বেশ প্রশ্ন ও সহজ না হইবারই কথা। হুতরাং এই একশ-পথে যে সংগ্রামের সমাপ্তি সেই সংগ্রামে কী হইবার মস্ত উপস্থিত হইয়া অধিকার লাভের আশোদানেও যদি উপাধীন থাকিতে হয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের দর যদি সংক্ষেপ করিতে হয়, তাহা করিয়াও দেশের প্রবাদমণ্ড, সেতুপদ শিখিতমণ্ড ও ধনিমণ্ডের মধ্যে ট্রো প্রয়োগ করা কর্তব্য। তাহাদের উপস্থিই নবীন রাজ্যের জীবনের জিহ্বা স্থাপনের জায় অপেক্ষা করিতেছে। ইহার মস্ত চাই সাধন, চাই একাক্রান্ত, চাই চারিত্র্য, চাই উক্তম উপাধন, চাই নিষ্ঠা, চাই শিলা, আর চাই অসীম প্রাণবশ্য ও প্রতিজ্ঞা। এ কার্যের মস্ত দেশের বনকুয়েরকণে আপাতত: কিছু কার্য্যোগ প্রয়োজন। তাহাতে কষ্ট-কেষের পথ প্রশ্ন হইবে, অথচ অপর-ভবিষ্যতে সেই ধনিমণ্ডের অর্থ দ্রুত-আদান লাভ হইবে। দেশের কক্ষীপ যদি এখনও অপর নিবেশে প্রতি লাভ না করেন, তাহা হইলে বস রাজনৈতিক আন্দোলন করাই হোক না কেন, যেদন এতাবৎ বাসালার বহু বোঝা চারিত্র্যকে বই হইয়া থাকিতে, তেমনই বইতে থাকিরা আমাদের অভাব, অপাড়ি, ব্যক্তিরা দিতা বুদ্ধি করিবে। তাহাতে আমাদের পতন নিকর, আমাদের হুতু অব্যবহা।

“কথমে সূর্য-প্রহণ”

[শ্রীমদোদিশারী রায়]

পত অগ্রহাণ বসের ভারতবর্ষ পথে অধ্যাপক শ্রীমত তাম্রাণ মুখাপাণাথ এন-এ মর্শাল, “কথমে সূর্য-প্রহণ” নামক যে এবং শিখিয়ে, তৎপথকে নিয়ে কিত্তি আন্দোলন করিলার।

তিনি শিখিয়েছেন—“কথি যেমিলে, সূর্য অকতার দ্বারা আবৃত হইয়া গেল। এটিপন পথ বেধিতে না পাইয়া সূর্য মস্ত অবস্থায় করিতে পারিল। সেবার এই অকতার অশোভন করিয়া বহি হির করিলেন, এই অকতার বর্তমু নামক অকতার দ্বারা। তিনি আরও মনে করিলেন, অকর দ্বারাও (শিখি) কেলিতেছে।”

সাপচাচা ১০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তখন যেহে অর্থ মকলে গ্রিক বুদ্ধিতে পারিতেন না। শৌধ্যপিক মুখই বেহের অর্থ চুর্যো হইয়াছিল। হুতরাং এই বিজ্ঞানের উন্নতির পূর্বে, সাধনের আভার সাহায্যে বেশ বুদ্ধিতে সেলে, গ্রিক অর্থ চুর্যজন করা বাইবে না। বৈদিক কালের প্রথম ভালে বিজ্ঞানের বিদ্যে উন্নতির পরিচয় প্রদানে পাওয়া যায়। এখনকার উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা বুদ্ধিতে চোঁ। করিলে, তখনকার বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় পাইয়া মুহু হইতে হয়।

অনেক একশে যেহে কতের নামা-প্রকার অর্থ করিয়া বহিধিদের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। কিন্তু যেম আদি প্রঃ হুতরাং প্রতিবৈদিক মনের প্রাচুর্য অর্থ বহিরা এখনকার বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া তপক তাহিয়া বেহকে বুদ্ধিতে চোঁ। করিতে হইবে। তাহা হইলে অধ্যাপক মহাশয় বেধিতে পাইবেন, “অকর দ্বারাও শিখিয়া কেলিতেছে” এ কথা যদি লিখেন নাই। “একতার পুনিবাক্য প্রাস করিতেছে” যদিও “প্রাস” অর্থ দ্বারা দ্বারা, ১৮ বকের “সারী” মনের অর্থ তাহাই বুদ্ধিতে হইবে। সকলোই মনে রাখিবে, যেম তপকে বর্নিত।

অধ্যাপক মহাশয় বেহের যে বস উক্ত করিয়াছেন, তাহা অর্থ একশে বিচার করা থাকি। মনোমের পক্ষ বসনের ১০ সূক্তের ১০১০১০ বকের অর্থ অধ্যাপক মহাশয় শিখিয়েছেন—

যে সূর্য। তেমনোও বহন অকরবাক্য বর্তমু অকতার দ্বারা বিহ্ব (অর্থ্য আবৃত) করিয়াছিল, মকল প্রাণী পথজানপূত সূর্য মস্ত হইয়াছিল।

যে ইন্দ্র। অনন্তর বহন বর্তমু হইতে উপাধা, নিবে বর্তমান দ্বারা মকলকে বিধাসোক হইতে (তুবি ও মকরণ) দ্ব্য করিয়াছিল, ত্রত নষ্টকারী অকতার বং। আভাবিত সূর্যকে চুর্য বস দ্বারা অকি লাভ করিয়াছিলেন। ৬

যে অক। তাম্রাণ প্রকৃতর ভর দ্বারা প্রোৎসাহী (বর্তমু) এই অবহা-প্রাণ আভাকে নিবেশে প্রাস করে নাই। তুবি আভার নিবে হইতেহ। সত্যপ্রাণ (ইন্দ্র) ও রামা বসন বুদ্ধিতে আমাকে এইভাবে হকা করন। ৭

(যজ্ঞের) ত্রকা (অকি) হুতল মকল নিবেশ করিয়া পূজা করিয়া-ছিলেন। সেবদিকে বসতার ও (সোমদন) দিক্ষেপ দ্বারা তুই

করিয়াছিলেন; অতি শূণ্যের চক্রে (বা ভেতরে) বিখ্যাতোৎ হুগেন
করিয়াছিলেন ও পর্তুগু যাহা বহু করিয়াছিলেন ।

অনুগ্রহণীয় পর্তুগু অন্ধকার দ্বারা যে শূণ্যকে বিচ্ছ (বা আনুত)
করিয়াছিল, অত্রিগণ তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন; অত্বে কেহই সমর্থ
হয় নাই ।

শূণ্যগ্রহণ সময়ে প্রাপ্তিগণ পথ দেখিতে পার না, এত অন্ধকার হয়
না। পর্তুগু যে “অনুগ্রহণীয়” তাহাতে এই কক্ষের অর্ধ দ্বারা বুঝা
যায় না। অধ্যাপক মহাশয় হরত পর্তুগুকে পুরাণের রায় নামক অগ্রহ
নয়ে করিয়া থাকিবেন, তাই “অনুগ্রহণীয়” নির্দেশ্যেন। বাস্তবিক
পর্তুগুর বৈদিক অর্ধ হইত নহে। ব বর্গীয়—জা যৌথ পাঠ্য+হু (হু)
প্রায় ক) অর্থাৎ প্রেরিত বর্গীয় বী তৎ যে পায়। বর্গীয় বীতি অর্থাৎ
দুইয়ের রূপিত কে আমোচিত হয়? পৃথিবী এবং চন্দ্র। অতএব
ইহাতে উভয়েই পর্তুগু। পুরাণের দ্বারা কায় ইহারাই করে। এই
কক্ষের কবর দ্বারাই পর্তুগু পুরাণে রাহ বলিয়া অগ্রহ মধ্যে পণ্য
হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়ের একটা কক্ষের অর্ধও গ্রিক হয় নাই।
নবম কক্ষের অর্ধ দ্বারা তবু কি পরিচায়েন, তাহা বুঝা যায় না।

৮ রমেশ বাবুর অর্ধ—

যে শূণ্য! যখন অগ্রহ পর্তুগু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল;
নিঃস্বাস নিঃসরণ অপসর্গ হতমুষ্টি ব্যক্তি বেগে দৃষ্ট হয়, তৎকালে
তিনিমুখও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।

যে ইন্দ্র! যখন তুমি শূণ্যের অন্ধমুষ্টি পর্তুগুর সেই সকল দ্বারা
(অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অতি চাতিটা কক্ষের
দ্বারা কাণ্যবিখ্যাতক, অন্ধকার দ্বারা লম্বাচ্ছন্ন শূণ্যকে প্রকাশিত
করিলেন।

(শূণ্য বলিতেছেন) হে অত্রি! আমি তোমার আশ্রয়। মোহকালী
যেমন খুদ্বশস্ত: ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে প্রাণ না করে। তুমি
মিত্র ও সত্যপরাধন; তুমি ও রাজা বহুগ উভয়ে আমাকে রক্ষা
কর।

তখন সেই ব্যক্তি (অত্রি) শূণ্যকে উপদেশ দিয়া, প্রকৃতকালে
বর্ণন করিয়া এবং প্রোক্ত দ্বারা বৈশম্যকে পূর্ণা করিয়া, সত্যসত্যকে
অন্তর্যাক্ষ শূণ্যের চক্রে সন্ধানিত করিলেন; তিনি পর্তুগুর দ্বারা দূরে
অপসারিত করিলেন।

অগ্রহ পর্তুগু অন্ধকার দ্বারা শূণ্যকে আকৃত করিলে, অত্রি-
শূণ্যক অপসেপে তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অত্বে কেহই সমর্থ হয়
নাই।

৮ রমেশ বাবুর এই অর্ধও গ্রিক হয় নাই। ৪ম কক্ষের দ্বারা
অন্ধকারাচ্ছন্ন শূণ্যকে প্রকাশ করা অসম্ভব। শূণ্য অত্রি আশ্রয়—
ইহাও সমস্ত অর্ধ নহে। অত্রি অর্থাৎ পৃথিবীর আশ্রয় বলিলে গ্রিক
হইত। পর্তুগু অন্ধকার দ্বারা শূণ্যকে আকৃত করিলে, অত্রিশূণ্যক
কিভাবে তাহাকে মুক্ত করিলেন? নবম কক্ষের অর্ধ দ্বারা কবির চিত্তে
বস্তু যায় না। এই সমস্ত কক্ষের রমেশ বাবুর অর্ধও প্রত্যাশোভ্য নহে।

আমার অর্ধ—

যে শূণ্য! যখন পর্তুগু (চন্দ্র) ভরতর অন্ধকার দ্বারা তোমাকে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল (তখন) কি ইহাতেই শূণ্যের অন্ধ ব্যক্তির জায়
সমস্ত শূণ্যক মুক্ত লক্ষিত হইয়াছিল।

যখন ইন্দ্র আকাশে বিকৃত অন্ধমুষ্টি পর্তুগুর (চন্দ্রের) দ্বারা
পতিত হইয়াছিল (তখন) অত্রি অর্থাৎ সত্য পদমণ্ডল (পৃথিবী) পতি
দ্বারা, কাণ্যবিখ্যাতক অন্ধকারাচ্ছন্ন, শূণ্যক শূণ্যক অন্ধমুষ্টিত অর্থাৎ
প্রকাশ করিলেন।

যে অত্রি অর্থাৎ সত্য পদমণ্ডল (পৃথিবী) তোমার এই পৃষ্ঠদ্বাষক
সম্মান (অর্থাৎ চন্দ্র)। যেন আমাকে প্রাণ না করে। তুমি ও রাজা
বহুগ মিত্র এবং সত্যপরাধন, তোমরা এই বিকৃত তরকে পরিচাল
কর।

(পর্তুগু) পদমণ্ডল পর্তুগু দ্বারা শূণ্য শূণ্যকে প্রণ ও রূপনিমিত্ত
সত্য করিয়া যখন কক্ষের: বিপুলভাবে ত্রয়ে ত্রয়ে সংযোজিত হইল।
পৃথিবী শূণ্যের চক্রে অন্তরীকে হুগেন করিলেন, পর্তুগুর অন্তরীকর দ্বারা
(অন্ধকার) অপসারিত করিলেন।

যখন পর্তুগু (চন্দ্র) ভরতর অন্ধকার দ্বারা শূণ্যকে আচ্ছন্ন
করিয়াছিল, (তখন) অত্রিগণ তাহা কতক প্রকাশ করিয়াছিলেন।
অত্বে পারে নাই।

এই অর্ধইহাতে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠ্য দ্বারা—

(১) শূণ্যগ্রহণের সময় চন্দ্র শূণ্যের বিরোধিতা শূণ্যকে আকৃত
করে। এই “কিহে” অর্ধ শূণ্য ও পৃথিবীর সম্মান্যে শূণ্যের হইবে।

(২) পৃথিবী (অত্রি)—অং সত্য পদমণ্ডল (অর্থে) সত্য পদমণ্ডল।
অনেকের দ্বারা, পৃথিবীর পতি দ্বারা আশ্রয় প্রাপ্তিভেদে না। কিহ
এই কক্ষের দ্বারা প্রকাশিত হইলেই “পৃথিবী সত্য পদমণ্ডল”।
আরও প্রকাশ দ্বারা।

(৩) চন্দ্রগ্রহ শূণ্যকে পৃথিবী দ্বারা পতি দ্বারা, সত্য দ্বারা,
প্রকাশিত করে। অর্থাৎ পৃথিবীর পতি দ্বারাই আমরা গ্রহণের পতি
ও তুমি দেখিতে পাই।

(৪) চন্দ্র অত্রি অর্থাৎ পৃথিবীর সম্মান। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে
চন্দ্রের অগ্র ইহাও।

(৫) গ্রহণ সময় চন্দ্র দ্বারা শূণ্যক আকৃত হয়।

(৬) অত্রিগণ অর্থাৎ অত্রি তবু ও তৎপূরণ গ্রহণ পদমা করিয়া
মুক্তি। সময় বলিতে পারিভেদ, আর কেহ গ্রহণ পদমা করিতে
পারিভেদে না।

এবং অধ্যাপক মহাশয় বর্ণিতেন, কোমলে অর্থাৎ বৈদিককালে
জীবিত প্রাণী দ্বারা গ্রহণ হত্যা বর্ণিত হয় বলিতে পারেন না। অন্ধকার
অর্থাৎ কায় দ্বারা শূণ্য আকৃত হইয়া গ্রহণ হয়, ইহাই যখন করিলেন।
মধ্যে পৌরাতনিক যুগে পর্তুগু জীবিত অগ্রহে পরিণত হইয়াছে। এ
সব বিবরণ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া শূণ্যক লেখকগণ হত
প্রকাশ করিলে ভাল হয়। হিন্দু দ্বারা বিশাল এবং ছদ্মবর্ষা। অগ্রহ-

স্বাধীনতা বিপ্লব পরিপ্রভু করিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে, এবং কোন ধর্মের নীতি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহাই আশংকা। যেরূপ তথ্যের পানে বলিয়া দিই যাহা করা যায়, তিনি তাহাতে বৈজ্ঞানিক ভাৱ কিছুই পাইবেন না। অশিষ্ট, সেই ধর্মগ্রন্থের কথা করিলে, বেদের প্রতি—পত্রের প্রতি—বৈদিক কথিবিশেষ প্রতি—বেদের প্রতি যেরূপ অবিশ্বাস করা হইবে।

বঙ্গের শিক্ষা-সমস্যা ও তাহার প্রতীকার চিন্তা

(সাধারণ শিক্ষা)

[অধ্যাপক ঐযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গদেশে হুমুসাতের হুমুসাত সঞ্চিত হইতেছে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি, বিজ্ঞানসাহী, বঙ্গোত্তর লর্ড চেমসফোর্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনেষ্ট্র প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞান, স্থপতিত ন্যূনতম এক শিক্ষা-কমিশন স্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার উৎসর্গ, সাধনকার্যের ভার-পথরসেটের সমাধি ও কৃষি বহুপণের বহী সাবনীস তার হুদুহিস (The Hon'ble Sir Claude Hill) প্রোসেদিক পদসেউপসূত্রে নিচুট এক পত্র ঘেরণ করিয়াছেন। এই শিক্ষাবিজ্ঞান অসুতর হইলে ভারতের উন্নততর প্রোসেদিকসূত্রে প্রতি িলায় এক-একটি করিয়া উচ্চ-তৃবিবিদ্যালয় ও কলেজটি করিয়া বা-তৃবিবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কলিকাতা-প্রোসেদিক হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার, শিল্প ও বাণিজ্য সপক্ষে উচ্চ-শিক্ষার প্রোসেদিক করা সত্তবপণ কি না, তাহা বিবেচনা করিতেছেন। এখিক ভারত পদসেউট কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের শিক্ষা সহায়তা ও অসৎপাত্ত অসুতরসাধা করিবার এক স্তুতিস্তিত প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচুট প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রস্তাবটি যে সম্পূর্ণ সমাধানসাধনী হইয়াছে, এবং কথো পরিপন হইলে দেশের বাহ্যে কল্যাণ সাধন করিবে, তাহা নিশ্চয়পরিচরণে বলা হইতে পারে। সংবেদিকা পত্রিকার উদীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিবার সুবিধা অসৎপাত্তের সকল সহরে হইয়া উঠে না। কলেজেই ছাত্রপণ কলিকাতা সহরের নিকটে প্রাণবিত হয়। কলিকাতায় ছাত্র-সংখ্যা দিন-দিন এত বর্ধিত হইতেছে যে, তাহাদের বাস-সংস্থান বর্তমানে এক ঝটিল সমস্যার পরিণত হইয়াছে। ১১১১ পুঁঠা হইতে এ পর্যন্ত কলিকাতা সহরে ছাত্রাবাস নির্মাণের এক ভারত পদসেউট অসুতর পক্ষে (১০-১০০০) চালিশ লক্ষ টাকা ব্যয়-করিয়াছেন। হুতরাঃ ভারত-পদসেউট প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গ-বঙ্গে যে যে সং-কলেজ নাই, এইরূপ কলিগর স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অসৎ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজের প্রথম দুই বর্ষের পাঠ

সংস্থাপন করিবার বঙ্গোত্তর করিয়া, এই সমস্যার সীমাংসা করা যায় কি না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা বিবেচনা করুন।

প্রতি কিলোমিটার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বঙ্গ-বঙ্গের বিদ্যালয় দিন-দিন লোপ পাইতেছে। বেঙ্গের কোট-বর্ড সফলের বঙ্গোই ইংরেজী শিক্ষাভ্যন্তের আকাঙ্ক্ষা সমাধিক বাণিতে পতিত হইয়াছে। ইংরেজী ছাত্রাংসা, এবং এই 'বঙ্গ' আশ্বাসের সাধনর সীমাবি বিবেশ প্রাণবিতীর্ণ। হুতরাঃ এই আশ্বাস সাধনর জ্ঞান ভ্যন্তর বাসনা বাণবিতিক। তাই আশ্বাস বঙ্গদেশের প্রাণ-প্রাণ প্রাণ পত্নত স্থপরিচালিত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় বহিতে পাই। তার পর আশ্বাসের বেষণ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অসুতি কাগ্যকরী শিক্ষার প্রাণবিত্ত না থাকত, ইংরেজের উপকলিতা এবং প্রাণবিত্ততা। এ-কোই উপকলিত করিতে সৎপণ হন নাই। তাই কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য লাগলো বৃদ্ধক-সীমাবি সন্তো হইয়াছে। বঙ্গর সহরে-সহরে এবং গ্রামে গ্রামে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, বঙ্গর বৃদ্ধকরা দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের অসৎপ্রাণ অসুতৃষ্টি বৃদ্ধকপণ কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য অসুতি বিবেশ শিক্ষাভ্যন্ত করিয়া, সীমাবি তাহাদের অসৎপ্রাণ উন্নততর অসৎপ্রাণ আছে, বঙ্গর তাহারা দেখিতে পাইবে যে, সন্তোদের উপর তাহাদের যে কর্তৃত্ব বা সন্তো ছিল, তাহা দিন-দিন অসৎপ্রাণ হইয়া, কৃষিকরী, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকের হস্তে পতিত হইতেছে, তখন তাহাদের সন্তোদিতা অসৎপ্রাণ হইবে, তখন তাহাদের জ্ঞানবের উদীর্ণিত হইবে, তখন তাহারা সীমাবি-সংস্থানে প্রতি প্রাণবিত্ততা কাগ্যকরী শিক্ষার নিকটে প্রাণবিত্ত হইবে। সে সমস্যা সমাধনের অসৎপ্রাণ বিলম্ব নাই। সেই উপাধিসীম আশ্বাস-বেশ সম্প্রাণ ইতোমধ্যেই সমাধি-প্রাণ পতিত হইয়াছে। ভারত-পদসেউট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তুতি এখিক অসুতৃ হইয়াছে; অতএব, অসুতরি শিক্ষাক্ষেত্রে এক হুতরা উপকলিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিত বর্তমানে, কলিকাতা সহরে কলেজের ছাত্র সংখ্যা অসৎপ্রাণে বৃদ্ধি-প্রাণবিত্ত, ভারত-পদসেউট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুখ যে সমস্যা উপকলিত হইয়াছে, আত তাহা প্রাণবিত্ত সাধন করিতে হইবে। (১) কলিকাতার কলেজের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও ছাত্রাংসার উপকলিত সাধন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইতে পারে। (২) বর্তমানে নূতন কলেজ স্থাপন করিয়াও ইহার প্রতিবিধান সম্ভবপর হইতে পারে। (৩) উচ্চশিক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত রূপ সংস্থাপন করিয়াও এই সমস্যার সীমাংসা সাধনিত হইতে পারে। এখন কোন্ পথ অসৎপ্রাণ? কোন্ পথ অসৎপ্রাণ অসৎপ্রাণ? কোন্ পথ হুতর পক্ষে অসৎপ্রাণ বলা-পত্ন? কোন্ পথ বর্তমান অসৎপ্রাণ উপকলিত?

কলিকাতার কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি-করা সম্ভবপর; কিত বঙ্গ-বঙ্গের ছাত্রাংসার পক্ষে কলিকাতার অসৎপ্রাণ ব্যাধি। অসৎপ্রাণ অসৎপ্রাণ বঙ্গ-বঙ্গের কোট কোট সহরে তাহাদের 'কলিকাতা' সমাধি

বাল্য কভন। তাহাদের পুত্র, ভ্রাতা ও অন্তঃক আত্মীয় তাহাদের সঙ্গে
কানিয়া বিভাগের অধীন করে। কিন্তু যখন এদেশিকা পট্টকার
উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা কলেজে প্রবেশ করিতে চাহ, তখন অনেক
তাহাদের সম্বন্ধেই বাস্তবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া উঠে। কনি-
কাজার ভ্রাতৃ সহরে, উপযুক্ত ছাত্রাবাসে রাখিয়া পাঠাইতে হইলে, একটা
ছাত্রের ক্ষতি হইলে আর ১০-১২ টাকা ব্যয় করিতে হয়। আবারও পট্টকা
সেতের করতল হোক এইরূপ গুরু ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ?
সকলবলের সহরে কলেজের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ সমাপন করিবার
পূর্বাধি থাকিলে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক ছাত্র এতদূর বাড়াই হইতে
আসিয়াই অধ্যয়ন করিতে পারে। অনেক তাহাদের বিকট-আত্মীয়গণের
বাসার আশ্রয় অধরন করিতে পারে। হুতরা কলেজের আশ্রিত
শিক্ষা গ্রাহকের উৎকর্ষ কোনরূপ শিক্ষণের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইলে,
অনেক পট্টকা অর্থ বোধব্যী ছাত্রের অধ্যয়ন-পথ উন্মুক্ত হইবে।

যে সকল ছাত্র এদেশিকা পট্টকার উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ-
লাভ করে, তাহারা অপরিশুদ্ধ-বয়স যুক্ত। তাহাদের বয়স
সাধারণতঃ ১৮-২০ বৎসরের বেশী হয়। যে বয়সে যৌবনের প্রথম
উন্মেষ হইতে থাকে, যে বয়সে যুগ-ক্রম-ব্রহ্মতঃ সন্তোষ-লাভনা উদ্ভাবন
মুষ্টি ধারণ করে, যে বয়সে বিভ্রান্তি বিবেকনা-বুদ্ধি যৌবনের
উজ্জ্বলতা-বোধ আশ্রয় থাকে, যে বয়সে সবলতায় বিপদগ্রাস্ত
হইবার আশা পূর্ণ-পথে বিরাজিত, সেই বয়সে শিক্ষাক্ষেত্র প্রায়
পূর্ণ-প্রসারিত-মহুদ্র সহরে অভিত্যাক্ষরীণ অধ্যয়ন অবস্থায় যে শিক্ষণ
আনন্দজনক, তাহা সহজেই অনুসরণ। যুগকণ আত্মব্রহ্মতঃ প্রাপ্ত
সহরে পিতামাতার পাদপাশেই মরল পশির জীবন বাপন করিয়া হুতা-
বিলাস-পূর্ণ বয়সের যুক্ত হইতে, যুক্ত হইতে, যুক্ত হইতে, যুক্ত হইতে
অন্য-পথ-অধিকার লাভ করে। নান্যপ্রকার পোস্তনীর্ণ যুক্ত তাহাদের
বহনপথে পতিত হয়; অন্যোহাও নবীত প্রথা তাহাদের প্রতিমূলে অমৃত
বর্ষণ করে। বিলাসের আশ্রিত-মহুদ্র যৌবন মুষ্টি তাহাদের প্রাণ মন
অধিকার করিয়া বসে। কণটের প্রস্তরগাথন চাক্ষুসীমূলে সহরে-সহরে
তাহারা অস্তিত্ব হইয়া পড়ে। এইরূপে অনেক সময় নিম্নোক্ত যুক্ত
কৌশল-পথে মল্লকট হইয়া নীতি-নিবন্ধিত বর্গ-বিকল্প কার্যে হরকণ
করিতেও যথ্য যোগ করে না।

এই অস্বাভাবিক তাহাদের উপর সতর্ক অর্থ-সেতুর্গ বৃষ্টি হইয়া অতীব
প্রয়োজনীয়। কিন্তু অভিত্যাক্ষরীণ যুক্ত কোথায় কি করিতেছে,
কে তাহার যৌত রাখে? যেটা সহরে অভিত্যাক্ষরীণ যুক্তও বর্জনা
শিক্ষকের বৃষ্টিই অধীন থাকে। কিন্তু বয়সের বড়-বড় অধ্যাপক-
বর্গ অভিত্যাক্ষরীণ ছাত্রের কথা বড় ভাবেন না, অধ্যাপক-
সহর ও যৌবন তাহাদের বটিকা উঠে না। যেটা সহরে শিক্ষক
ও ছাত্রের মধ্যে যে ঐক্যের বন্ধন, সেতের আশ্রিত্য ও ভক্তি
আত্মপ্রত্য লক্ষিত হয়, বয়স সহরে অধ্যাপক ও ছাত্রের সেই বন্ধন
নিশিথ হইয়া যায়। যুক্ত তাহাদের সম্পর্কে মল্লকট বহন কর্তব্য হইতে
বিস্মৃত হইয়া যাবীন হইলে জীবন বাপন করে; বাহিরে বর্জনাভ্যাসের

মাত্রা যেন অস্বাভাবিক বিকল্প অসুপাত্ত হ্রাস পাইতে থাকে। ছাত্রগণ
যেটা সহরে শিক্ষকের বিকট বৈরাগ্য সহ্য-বৃত্তি-ব্রহ্মতঃ ব্যবহার, সেহ-
পূর্ণ উপবেশ, সাবর সম্ভাষণ, ও আহারে ব্যাপ্তি-বহন তাহারা প্রাপ্ত হয়,
বড় সহরে যে সকল বক্তিত হইয়া তাহারা বতনতঃ একই উচ্চ-মুখ
ও বেলাচ্যারী হইয়া উঠে, এবং অনেক সময় হুতুরের মাথা অনেক
অভার কথা করিয়া বসে। তাই বড় সহরের মন-নাতন, সে-
জ্ঞান-বৃত্ত অশেষক যেটা সহরের বিকট-উত্তল প্রকৃতির যৌবনা-যুগে
যুক্তগাথন প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। একই পরিণত
বয়সে বড় সহরে গেলে, তত্বত তত আশঙ্কা থাকে না। অতএব,
কলেজের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ সাধারণতঃ সকলবলে সমাপন
করিবার বশোত্ত হইতে পারে, তত্বত বেশি-হইতব্যী ব্যক্তিমা-সেই সতর্ক হইবেন,
একটি আশা করা যায়।

ছাত্রের পক্ষ হইতে বৈধিত্য গেলে, সকলবলে কলেজের প্রথম
দুই বৎসরের পাঠ সমাপন করা যেত পূর্বাধিকৃত ও কল্যাণকর,
শিক্ষা-কর্তৃ-পক্ষীয় ব্যক্তিগণের দিক হইতে বৈধিত্য গেলেও ইহা সেইরূপ
যুক্ত ও অস্বাভাবিক। সকলবলে সহরে যে ব্যক্তি শিক্ষার হৃদয়োবাস্ত
সম্ভরণ, কনিকাজার ভ্রাতৃ সহরে সেই ব্যক্তি উহা একরূপ অসম্ভব
ব্যাপার। তাহাদের ছাত্রাবাসের উপযুক্ত সংস্থান করা। বিলাসের
বাহিরে ছাত্রদের কাছের উপর সতর্ক বৃষ্টি রাখ এবং বৈতিক জীবন-
পথে কল্যাণের প্রকৃত সন্ধানতা করা, আরও কল্যাণে বা হুতর।
এখন আর এই, সহরবলের সহরে শিক্ষণ বসোবস্ত করা মনীচীন?
হুতরী ত্রাণ সহরা নৃতন কলেজ স্থাপন করা? না, হুতরী অতিথিত
ত্রাণ উচ্চ বিভাগের সহরে সংযোজন করা যেত?

কেহ-কেহ হয় ত বলিবেন যে, সকলবলে কলেজ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া
ব্রহ্মজিহ্বিত বড় বড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পক্ষে হুতরী অতিরিক্ত
সম যোজন্য করিয়া দিলে, আশ্রিত্যঃ অশেষকৃত অস্বাভাবিক পূর্ণিকার
অশেষকৃত হইতে পারে। এইরূপে বিভাগের অতিরিক্ত ত্রাণ পূর্ণিকার
ব্রহ্মজিহ্বিত হইবে বলিয়া মনে হয় না; অথবা, অতাব হইলেও,
অশেষকৃত অস্বাভাবিক তাহারা অস্বাভাবিক করা হইতে পারে।

তাহার পরবর্তীতে শিক্ষাবিভাগে শিক্ষকতা-যোগ্য বিবিধবিভাগের
উচ্চ উপবিধারী অনেক ব্যক্তি যাহার, গীহারা অধ্যাপনাক্ষেত্রে
অধ্যাপকবিশেষকে বৈধিত্য লাভ্য করিতে পারিবেন। অতঃপূর্ব বিভাগের
সহরে অতিরিক্ত হুতরী ত্রাণ যোজন্য করিলে, তাহাদের অধ্যাপনার ক্ষমতা
উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং বৈধিত্য হইবে যে,
তাহাদের গণপ্রাণ যেন কোনও আশে অশ্রুত্ব কলেজের অধ্যাপক
অশেষকৃত হইবে না হয়। এইরূপে অধ্যাপক ও শিক্ষক পদসমূহের
সাধ্যো যথেষ্ট উপযুক্ত হইবে। কলেজের লাইব্রেরী, কলেজের বিজ্ঞানা-
গার এবং কলেজের কমন রুম, বিভাগের শিক্ষকবর্গের ও উচ্চলম্বীর
ছাত্রগণের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে। বিভাগের শিক্ষা-প্রদায়ী,
বিভাগের শিক্ষকগণের অধ্যাপনা-কৌশল, বিভাগের শিক্ষক ও
ছাত্রের মধ্যে সেহ-ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রকৃতি হইতে, অশ্রাব্যতম যুক্ত-

গণের পক্ষে চিত্রণ শিক্ষাশ্রমণী সম্পূর্ণ উপযোগী, কলেজের অধ্যাপকবর্গ এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিবেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপনা-শ্রমণী উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপনা-শ্রমণীর সবতম সাহায্য, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান হুই প্রিন্সিপ্যাল শিক্ষা-শ্রমণীর অগ্রদূত হইলে, অধিক ভুলভাৱে তাহা করা বাইতে পারে; কারণ, কলেজের অধ্যাপক-বর্গকে যুগ্মকরণের চিন্তা, ভাব ও কাৰ্য্য অনেকটাই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর হস্তগতের অগ্রদূত। সুতরাং কলেজের অধ্যাপকবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষা-শ্রমণী কলেজের হস্তগতের উপযোগী কি না, তাহা তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন।

দুঃশ্রম, আবেশিকা বা জাপানের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, যুগ্মকরণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্থাপন করিয়া ১৯২০ বৎসর যতনে বিধিবিধানে প্রবেশপত্রের অধিকার পায়। তাহাযে বিদ্যালয়ের পঠীয়া বিধি আদ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা অনেক উচ্চ। আদ্যের বেশের কলেজের এখন হুই বর্ষে যে কাৰ্য্য হয়, তাহাযে বেশে বিদ্যালয়েই সেই শিক্ষা দিয়া হয়। সেই শিক্ষা-শ্রমণী কলেজের শিক্ষা-শ্রমণী হইতে বহুতর। যে বিজ্ঞান-সম্বন্ধ শিক্ষা-শ্রমণী অবলম্বন করিয়া এই সকল দ্রুতগতি দেখা দৃষ্টকাৰ্য্য হইয়াছে, সেই শিক্ষা-শ্রমণী অবলম্বন করিয়া, আদ্যের বেশের কলেজসমূহ, এখন হুই সেইভাবে অধ্যাপনা-কাৰ্য্য পরিচালিত করিলে হুইন সফলতর সম্ভবনা।

এই সকল কিছু বিদ্যা দেখিতে গেলে, কলেজের এখন হুই প্রিন্সিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগদান করিয়া বিশেষ দক্ষ হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থা কাৰ্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর কি না, তাহা তাৎবিধাৎ দেখা। নুতন হুইটি স্রাণ যোগদান করিলে, উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গতকর্ম ব্যতীত স্রাণ হইবে। হর বৎসরের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ বৎসরের যুগ্মকরণ এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবে। এইজন্য বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন-ভাষার যাত্রক ও যুগ্মকরণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষবর্গের কাৰ্য্য এত জটিল করিয়া তুলিবে যে, ইহার সুশীলসননা একজন সমস্তর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে,—স্থাপন ও সুশীলসন ব্যাখ্যাত করিবে। সুতরাং শাসন ও শিকার সৌকর্য্য-সাধনের ক্ষমতা বাহা হইয়া উচ্চ বিদ্যালয়কে দুইভাবে বিভক্ত করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থার এইজন্য ভাষাভেদ সম্ভব না হয়। অতএব আপাততঃ সকলক্ষেত্রে নুতন কলেজ স্থাপন করিলে বর্তমান শিক্ষাসমস্তার সহজ সীমালী হইতে পারে।

কিন্তু এই ভাষাভেদ আদ্যের অধিক দিন স্থিতি আশিষ্টে পারিবে না। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অতঃপক্ষেই সমস্তোপযোগী নুতন ব্যবস্থা। প্রয়োজন আদ্যের উপস্থিত হইবে। বর্তমান প্রাথমিক পঠীয়ার শিক্ষাদান ক্ষমতা হইয়া পড়িবে এবং শিক্ষার বিষয়ও নুতনো বা জাপানের প্রাথমিক পঠীয়ার অন্তর্গত নয়। আদ্যের বেশের প্রাথমিক পঠীয়ার উত্তীর্ণ হইয়া যুগ্মকরণে শিক্ষালাভ করে, তখন এক্ষুণি বিদ-

যিতালয়ের প্রবেশিকা পঠীয়ার উত্তীর্ণ যুগ্মকরণ তাহাযে অনেকাধিক উচ্চতর শিক্ষালাভ করে। সুতরাং আদ্যের বেশের প্রাথমিক পঠীয়া শাসন করিয়া বিশেষতঃ যুগ্মকরণের কোলভপ দেখাই হইয়া না; তাহাযে যুগ্মকরণ আদ্যের নুতন করিয়া যে স্থানের প্রাথমিক পঠীয়ার ক্ষমতা হইতে হয়।

দুঃশ্রমের শিক্ষা-ব্যবস্থা আদ্যের বেশের পক্ষে বহুটা উপযোগী, জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহা অনেকাধিক উচ্চতর উপযোগী। সুতরাং জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা আদ্যের বেশের ও অবস্থার উপযোগী করিয়া আদ্যের, বেশে হুই, এজন্য করিতে পারি। আদ্যের আদ্য, যাত্র ও উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট যাত্রের লগানের ভাৱ একটা অধিকতর যাত্রা-বাহিক যাত্রা যাত্রিতে পারে, তাহাযে বিদ্যান করিতে হইবে। শিক্ষা-বিভাগের প্রবেশের পূর্বে যাত্রা শিক্ষা-কালকে পনের বৎসরে পরিণত করিয়া উচ্চতর তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে—প্রাথমিক-শিক্ষা-বিভাগ, যাত্রা শিক্ষা-বিভাগ এবং জ্ঞান বা কলেজের শিক্ষা-বিভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা প্রবেশের অন্তে প্রাথমিক-বিভাগ (Elementary School) প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং সেখানে যাত্রক ৪০ বৎসরের প্রাথমিক প্রবেশ করিবে। যাত্রাযাত্রা আদ্য বিভাগের পাঠ করিয়াই শিক্ষা স্থাপন করিতে চাহে, তাহাযে যাত্রা সেখানে পূর্ণ আট বৎসর অব্যাহত করিতে হইবে। কিন্তু যাত্রাযাত্রা যাত্রা-বিভাগে প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাযে যাত্রাযাত্রা প্রাথমিক বিভাগে যাত্রা যাত্রা অব্যাহত পূর্ণ যাত্রা-বিভাগের প্রবেশাধিকার পায়, তাহাযে যাত্রাযাত্রা করিতে হইবে। যাত্রা বিভাগের পাঠ বৎসর অব্যাহত করিয়া সতের বৎসর যাত্রা যুগ্মকরণ প্রাথমিক পঠীয়া প্রদান করিবে। প্রাথমিক পঠীয়ার উত্তীর্ণ হইয়া সে কলেজে প্রবেশ করিবে, এবং সেখানে তিন বৎসর অব্যাহত করিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান উপাধি লাভ করিবে। এই উপাধি লাভের পর যুগ্মকরণ বিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের যাত্রাযাত্রা ও সৌকর্য্য তথ্যগোচর করিয়া উচ্চতর উপাধি লাভ করিবে। এইজন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীকে বিভাগের তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়া আদ্যের হইবে। আদ্য বা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে যাত্রা যাত্রা, যাত্রা শিক্ষা বিভাগে পাঠ বৎসর, জ্ঞান বা কলেজের শিক্ষা বিভাগে তিন বৎসর তাহাযে যাত্রাযাত্রা যাত্রাযাত্রা হইবে। হুইয়াং জ্ঞানের শিক্ষা জ্ঞান ১০ বৎসরে পরিণত হইবে। হুই বৎসর বহুতর প্রাথমিক আদ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে যাত্রা বৎসর যাত্রা শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে।

বর্তমান সময়ে বহুক্ষেত্রে যাত্রা ইংরেজী বিভাগের নামে যে সকল বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাযে ক্রমিকতর আদ্য বিদ্যালয় বলিয়া পরিণতি হইবে। এই সকল আদ্য বিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল অব্যাহতের পর, তত্ক্ষণাতঃ প্রাথমিক হইতে, ইংরেজী একটা যাত্রা-করণ পঠিত হইবে। পূর্বেই যাত্রা হইয়াছে যে, এই বিদ্যালয়ে ১০ বর্ষের পাঠ স্থাপন করিয়া যাত্রাযাত্রা যাত্রা বিভাগের সঙ্গতিব্রহ্মপীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যাত্রাযাত্রা আদ্য বিভাগে (যাত্রাযাত্রা কলেজ বা

নিয়ন্ত্রণের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের *। এদেশ করিতে চাহ, তাহারিকক আইনবর্ণ আছে আদ্য বিভাগেরেণে পত্রীকা প্রদান করিতে হইবে। বাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা পান পাসসিফিকেট (pass certificate) লইয়া অজ্ঞাত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এই বিভাগের ইংরেজী ভাষা প্রথমতঃ ইংরেজী বর্ণের রূপে গঠিত হইবে। যখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে, তখন ইচ্ছাকৃত (compulsory) আবৃত্ত-পাঠ্য করিতে হইবে। বর্তমানে যে সকল উচ্চ-প্রাথমিক ও মধ্য-মহালা বিভাগের যেখানে পাঠ্য গ্রন্থ, তাহাদের বস্তুর পরিচয়ের কোনও প্রয়োজন নাই হয় না। এই সকল বিভাগেরেণে সবে বর্তমান-সময়ের উচ্চ ইংরেজী বিভাগেরেণে কোনও যোগ না থাকায়, ইংরেজী শিক্ষালাভকৃত গ্রাম্যদের বিশেষ ক্ষতিসাধন হয়।

কৃষ-পুত্র প্রাথমিক মাধ্যম-বিভাগেরেণে প্রথম চারিটি শ্রাণ লইয়া নিম্ন-প্রাথমিক-বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; কারণ, এইরূপ বিভাগে বৈশ্বাসীরা পক্ষে শিক্ষা অনাধ্যায়গত করা কঠিন। বিশেষতঃ, যেরূপে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইলে, এইরূপ নিম্ন-প্রাথমিক-বিভাগেরেণে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা দৃষ্ট হইবে। এইরূপ বিভাগেরেণে সংখ্যা উন্নতি যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সংস্থান সম্ভার্যে সমাধা করিতে হইবে। তার পর কালক্রমে না করিয়া শিক্ষার দ্বিতীয় সর্বসাধারণের তিতর বস্তুর ক্রম স্থাপন করিয়া, প্রথমসেট প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবেন। অপরকর্তা, যেরূপে ইচ্ছা, প্রাথমিক বিভাগেরেণে চারি বৎসরের পাঠ্য বাধ্যতামূলক (compulsory) করিতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছাতে সমস্ত না থাকিয়া, বীর-বীরে শিক্ষা-বিস্তারেরেণে সবে-সবে মাধ্যম-বিভাগেরেণে আট বৎসরের পাঠ্য বাধ্যতামূলক করিলে বেশের একান্ত কল্যাণ লাভিত হইবে এবং ভারত পৃথিবীর অজ্ঞাত সুসভ্য ও সজ্জত জাতির সম্বন্ধে হইতে চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইবে।

মধ্য-বিভাগে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই উচ্চতর করিয়া, উচ্চক বর্তমান I. A. বা I. Sc.র প্রায় সমতুল্য করিতে হইবে। আদ্যেরেণে বেশের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বাহাতে পৃথিবীর অজ্ঞাত সুসভ্য বেশের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া অসুস্থ জ্ঞান লাভ করিয়া,

সর্বপ্রকারে তাহাদের সম্বন্ধে হইতে পারে, তাহারা বিদান করিতে হইবে। আর এই প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াই শিক্ষার্থী বাহাতে সমাধার সমস্ত-বিভাগে, যেতিয়া কলেজে ও ইন্ডিনিয়ারি কলেজে প্রবেশের উপযোগী হইতে পারে, তাহারা প্রবেশজন করিতে হইবে। সুতরাং I. A. বা I. Sc. পরীক্ষার আর কোনও প্রয়োজন থাকিবে না।

বর্তমান সময়ের উচ্চ-বিদ্যালয়গুলি এই প্রসঙ্গিত মধ্য-বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। উচ্চতর নিম্নের শ্রাণগুলি লইয়া প্রাথমিক বিভাগে গঠিত হইবে। এই প্রাথমিক বিভাগেরেণে প্রথম একজন মাত্র বেচ, দ্বিতীয় নিম্নত হইবেন। কিন্তু প্রথমতঃ তিনি মধ্য-বিদ্যালয়ের বেচ, দ্বিতীয়েরেণে অধীন থাকিবেন। বীর-বীরে নিম্ন-শ্রাণগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া বস্তুর আদ্য-বিদ্যালয়েরেণে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শুধু উপরে চারিটি শ্রাণ লইয়া, এবং তাহাদেরেণে সবে আর একটা উচ্চতর শ্রাণ যোগ্য করা যিহা, মধ্য-বিদ্যালয়েরেণে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই মধ্য-বিদ্যালয়েরেণে হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থী কলেজে প্রবেশ করিবে।

এখনকার কলেজগুলিতে সমস্তই অধ্যয়নকাল তিন বৎসর করিতে হইবে, এবং তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া এই সকল কলেজে হইতে শিক্ষার্থীগণ বি-এ বা তত্তুল্য উপবিদ্যালয়েরেণে প্রথম পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ কলেজেরেণে বর্তমান-সময়েরেণে প্রথম পরীক্ষার পাঁচ প্রশ্ন করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর বাহারা আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিতে চাহ, অপর উচ্চ বিদ্যায় প্রবেশা ও বৈদিক তত্ত্বাধীনতা করিতে চাহ, শুধু তাহারা ই বিদ্য-বিদ্যায় প্রবেশ করিবে।

পরিশিষ্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়েরেণে যেরূপ-লৌকিক্যেরেণে নিম্নে একটা যোগ্যতারেণে প্রদান হইল।

প্রথম-বাহারা সাধারণ শিক্ষা বিভাগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাহ, তাহারা আদ্য বিভাগেরেণে ১ম বৎসরের পাঠ্য সমাপন করিয়াই যেন মধ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স ১০ না হইয়া ১০ হইবে।

আদ্য-শিক্ষা-বিভাগ	মধ্য-শিক্ষা-বিভাগ	অধ্য বা কলেজ-বিভাগ	বিদ্যবিদ্যালয়-বিভাগ
১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২	১৩ ১৪ ১৫ ১৬	১৭ ১৮ ১৯
অধ্যয়নকাল ৮ বৎসর	১০ ১০	১৫ ১৫ ১৫ ১৫	১৭ ১৭ ১৭
	৮ বৎসর	৩ বৎসর	৩ বৎসর

* ভারত বহনসেটের কৃষিবিভাগ কৃষিবিভাগেরেণে স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপ শিল্প-বিভাগে যেরূপ শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা-বিভাগেরেণে প্রথম বৎসরেরেণে প্রথম বিভাগেরেণে প্রতিষ্ঠা করিবে তাহা আদ্য হয়।

নিম্নের এই অভিন্ন তত্ত্ব পৃথিবীর বিষয় অস্বীকার করিয়া গ্রাচীন বহুদল ব্যাখ্যানসমূহকে একেবারে উৎপাটন করিতে অসমর্থ হইল। সুতরাং ইহা নিম্নোক্তও আশ্চর্য বিষয় নহে যে, তৎকাল এই বহুদল আত্মাঙ্গল মনোভা অস্বস্তি বাল্যে প্রদীপিত হইলেও, অতি দীর্ঘকালীনে পাশ্চাত্য জগতে আপনায় প্রাচ্য আবিষ্কার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পর্যায় জ্যোতিষের আবিষ্কারেই পথ্যবেক্ষণ-মাপন—বর্ণকের চক্রে অগ্রাধার গতি-মাপনকে যে সমস্ত জ্যোতিষিক ঘটনা লক্ষিত হয়, তাহাটাই কঠকট। সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল সমাবেশ। স্তম্ভাক্ষ পথ্যবেক্ষণের নিম্নলিখিত উপর্য উপর্যজ্ঞানিক উপায়ে জ্যোতিষ মাপনের স্তম্ভ উপরিত নির্ভর করে। কিন্তু সুবীক্ষণ ও যন্ত্রকারণ আবিষ্কারের পূর্বে ইহা সম্ভবপর ছিল না। আমরা যেখানি, অতি প্রাচীন যুগেও ক’ বিশদভর জ্যোতিষিক তথ্য উদ্ধৃতিত হইয়াছিল। সুবীক্ষণ বা যন্ত্রকারণের সাহায্য ব্যতীত পথ্যবেক্ষণ-মাপন জ্যোতিষিক উপরিত টাইকোভারিহর প্রভৃতি চরম সীমার উপরীত হইল। যেতল পতাবীর শ্বেতাংশে টাইকোভারিহর চেনাযন্ত্রেবর্ণিত শ্বেতাংশের অক্ষকপার ও উৎসবে প্রকৃতিত বীণে একটা অতি মনোজ্ঞ বৈবাহার নির্ণয় করেন। তৎকাল তিনি খেল-বহু, ক্রিষ্ণ-বহু (mural quadrant) ক্রান্তি ভ্রমণকর্তা নৃতন বহু প্রকৃত ক্রান্তি পথ্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। বহুভ্রমণের নির্ণয়গত অনস্বর্ত্যসাধারণে, তিনি অনেক অভিন্নত ও মিল্লিগ তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যুগের পরমজ্ঞানি (greatest declination) প্রকৃতক অবদত হইয়াছিলেন; এবং আর সম্ভাষণ করেন যে, মক্ষ ও মুহুর্ততর কেন্দ্রের মারিক লখন (annual parallax) নাই; অর্থাৎ পরিভ্রমণের মারিকক্ষণে মাপ অনুভাষণ মক্ষেরও সহিত যে কোণ মাপন করে (angle subtended by the diameter of the Sun's orbit) তাহা অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং ইহাই নির্ভরিত হয় যে, বহুভ্রমণের বহুত অত্যধিক। যিনি প্রকৃত ও অগ্রগণ্য বহুত সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গোপমা আবিষ্কার নিম্নলিখিত তথ্য আবিষ্কার করেন। এইজন্য টাইকোভারিহর আশ্রয় অন্তর সাধারণ প্রতিভার বলে জ্যোতিষের অস্বস্তি উপরিত করেন এবং যেন মরীষার কণিক ক্ষুদ্র, অবদতরিত সম্বন্ধে বহু নৃতন ভাষার উদ্ভাবন করেন। কিন্তু জু-অনবদ্য সম্বন্ধে টাইকোভারিহর কোণাঙ্গলিকদের বহু অগ্রাধার করেন। তিনি উহার মুক্তি বহন করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তিনি ক্রিয়োগ করেন,—“যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব-মিকে আবর্তন করিতোহ, তবে উর্দ্ধ হইতে পৃথিত সৌর্য পতিময়িক পৃথিতে বেধা যায় না কেন?” ভ্রমণেও ইহার মধ্য বহুত “পূর্ব-আবর্তন”ের পরবর্তী জ্যোতিষগণ উহার জু-অনবদ্য বহন করিতে প্রাণী হইয়াছিলেন। জ্ঞান আর্গুমেন্টের নিত হইতেও নিখতেছেন,—“যদি পৃথিবী অগ্রন করিতোহ তবে পশ্চিমমুখ বিমানমার্গে উজ্জ্বল হইয়া ক্রিয়োগ বহু-ম্প্রাণে প্রত্যাপন করিতে পারে? আকাশ-

মধ্যমুহুর্তে কেবল পতিময়িকই পদম করিতে বেধা যায় না কেন? যদি বহু, পৃথিবী মক্ষ মক্ষ পতিতে চলিতোহ বালিগ এ সমস্ত সম্ভবপর হইতোহে। তাহা হইলে এক নিবে উহার ক্রিয়োগ একবার আবর্তন ঘটে?” বহুভ্রমণের ও বহুভ্রমণ উপরিত ই সমস্ত মুক্তি অগ্রন করিতো আশ্চর্যের মধ্যম বহন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা বহুভ্রমণ: বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। মধ্য বহুতর পরেও বহন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণ টাইকোভারিহর; কোণাঙ্গলিকদের জু-অনবদ্যের বিচারাণী হইয়াছিলেন, বহন প্রকৃত বোদ্ধ পতাবীরতেও পাশ্চাত্যদেশে কোষ কোম জ্যোতিষী এই ভর্তুকী সীমাংসা অবদর বক্রিগা বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন ভ্রমণের অতি প্রাচীন জ্যোতিষগণের মনে যে সম্বন্ধ উপরিত হইবে এবং প্রত্যক্ষ প্রাণের অভাবে তাহারা যে জু-অনবদ্য বীক্ষার করিতে মুক্তি হইবেন, ইহা যোগ হয় তেমন আশ্চর্যের কথা নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সহিত জু-বাহুর আবর্তন অতি পথ্য—ইহা তাহাদের ভ্রমণের মনে উচিত হয় নাই। টাইকোভারিহর আশ্রয় বহন বহু হইয়াছিল যে, বহুত পৃথিবী সহিত জু-বাহু এবং সৌরবহুও অগ্রন করিতোহে, প্রকৃত সৌর্য প্রকৃত নিবে পতিত হইবে। কিন্তু ইহার ব্যতী উক্ত আশ্রয় বহন হইল মাত্র, জু-অনবদ্য প্রকৃত হইল না। আশ্চর্যের মধ্যম বহুতর নিমিত্ত বহুভ্রমণ একটা অতি সুনির্ভরিত—এ বহুভ্রমণ-মুহুর্তের পতিত বহুভ্রমণ: কথ্য—“পৃথিবীর যদি আবর্তনই থাকিতো, তবে সম্ভ্রুতি বহু পড়ে না কেন? ঠিকাকার পৃথক-মারী ইহার উত্তর পারিয়াছেন—“পৃথিবীর আবর্তন হইলে উজ্জ্বল বহু পড়িতো কেন? কারণ উর্দ্ধে যায়, নিম্নে তাহা; বহুভ্রমণ ইহার অবস্থিতি অনুসারে উর্দ্ধাধ: প্রকৃত হইয়া থাকে।”

জ্যোতিষজ্ঞানের ক্ষেত্রে টাইকোভারিহর পর কোণাঙ্গলের আশ্রয় জ্যোতিষের অধিক উজ্জ্বল ব্যাখ্যাত্মক ইতিমধ্যে একটা প্রকৃত অনস্বর্তি, মধ্য নৃতন আবিষ্কারের মারিকক্ষণ বক্রিগা মুক্তি হইতোহে। টাইকোভারিহর পথ্যবেক্ষণে ব্যাধা পতিত যে অগ্রাধার ছিল, কোণাঙ্গলের অস্বস্তিগত প্রতিভা অনেকাংশে তাহার পূর্ণ করিতা হইতে পারিয়াছিল। বহুভ্রমণ: পথ্যবেক্ষণকর্তা টাইকোভারিহর কোণাঙ্গলের অবদর কোণ পাঠায়াছিল; কিন্তু পথ্যবেক্ষণ: ব্যতীত বহুভ্রমণের প্রকৃত কোণাঙ্গল জ্যোতিষের উপরিত শ্বেতা একটা নৃতন সুদক্ষ সূচনা করিয়া যেন। টাইকোভারিহর বীক্ষণমাপনী নিম্নলিখিত পথ্যবেক্ষণাবলীর সাহায্য লইয়া কোণাঙ্গল অগ্রমতের প্রকৃত পতি নির্ভর করিতে অগ্রগণ্য হইলেন। প্রকৃত পৃথিবীকে মিলল বক্রিগা অগ্রমতের পরিপাকিত পতিত নির্ভর-প্রাণীই পাঠায়াছিল; কিন্তু এইজন্য ব্যাধার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রমতের পতিত একটা সুদক্ষ বিষয় বেত্তা এক প্রকার অনস্বর্তি। প্রকৃত পূর্ণ পতাবীরতে ব্রহ্মদেশে প্রকৃত বিহু করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতের ব্রহ্মদেশের কক্ষ অগ্রনই মক্ষোপমা মধ্য ও মধ্যমত। প্রাচ্য হই মধ্য বহুতর ব্যাধ

কৰিয়া ত্ৰিভুজত দু নীচোক্ত বৃত্তৰ সাহায্যে ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ পতিৰ একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্ৰদান কৰিতে প্ৰৱৰ্ত্তন হইয়াছিল। টলেমিৰ সময় পৰ্যন্ত পণ্ডিত-জ্যোতিষৰ প্ৰধান উপক্ৰমই ছিল, কল্পকল্পি বৃত্তৰ কল্পনা কৰিয়া উদাহৰণ সৰ্বসাধাৰণ পৰিলক্ষিত ব্ৰহ্মপেনৰ পতিৰ একটা প্ৰকৃতি বা স্থূলকল্প বিবৰণ সিদ্ধিৰূপে কৰা। কিন্তু আন্যাত্মকই দেখাওৱাই যে, এইজন চোৱা নিতল হইতে বাহ্য। আৱণ, একে ত ইজন উপায়ে পতিৰ নিৰ্ণয় তেমন সম্বোধনাত্মক নিৰ্মূল হইত না; তাহাৰ উপৰি ঐ অসম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যাটো এখন ভুল হ'ল যে, উদাহৰণ জ্যোতিষৰ উন্নতি চোৱা কৰাৰ বাবে হইয়া পড়িল। ষ্ট্ৰিক এই সময়ে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰে কেপ্‌লারৰ আবিৰ্ভাব হয়। কেপ্‌লার টাইকোৰ পিতৃ প্ৰথম কৰিয়া, অধ্যাপকৰ হুগ্‌বাৰ পৰে ওঁহাৰ অধ্যাপকপদ লাভ পৰেপৰে উত্তৰাধিকাৰী হইলেন। কয়েক বৎসৰ এই সকল পৰেপৰাৰ সাহায্যে প্ৰাচীন নীচোক্ত বৃত্ত-পদ্ধতিৰ (epicyclical machinery) উপৰি বিস্তৰ কৰিয়া ব্ৰহ্মপেনৰ পতিবিষয়ে নূতন তথ্য উদ্ধাৰন কৰিতে অৱতৰ হইলেন, কিন্তু সকলকাল হইতে পাইলেন না। তবল তিনি, পৃথিবী যে নিতল, এই মতবাদটো গহিত্যল কৰিলেন; এৰা তৎপৰিষৰ্ণে, পৃথিবী প্ৰথম চতুৰ্ভুজিক প্ৰতিবেশে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। অৱন্ত কল্পনাটো বৈজ্ঞানিক নহে; ইয়াৰ বৰ্ণনাপূৰ্ণে ভাৱতে ও পান্ধাতা প্ৰাচ্যেৰ এইজন মন্তৰ প্ৰচলন ছিল। কিন্তু ইয়া এক সময়ে একেবাৰে সোণ পাইয়া যায়। পৰে বোধ পৰ্ত্তোৰ কোপাটনিকস ইয়াৰ পুনৰ্জাগৰণ কৰেন। কিন্তু তিনিও, ব্ৰহ্মপেনৰ বৃত্তপৰ্য্যে পতি—এই সিদ্ধান্তটো বীকাৰ কৰিয়া লইলেন; এৰা সেই মন্ত আপনাৰ নূতন বতৰাৰে উপযোগিতা সম্ভাৱন কৰিতে পাইলেন না। কেপ্‌লারই লক্ষ্যপ্ৰদ এই নূতন সিদ্ধান্তৰ ষ্ট্ৰিকনত প্ৰৱৰ্ত্তন ও প্ৰচলন কৰিয়া জ্যোতিষৰ সত্যো হুগ্‌বতৰ আৱন কৰিলেন। তিনি পৌৰষতলৈৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰকৃক হিচাপৰে স্থাপন কৰিলেন এৰা টাইকোৰ পৰ্য্যবেক্ষণপ্ৰকৃ কল্পসূত্ৰৰ বিশিষ্ট আলাচল্যৰ বাবে স্থিৰ কৰিলেন, ব্ৰহ্মপেনৰ কল্পা ষ্ট্ৰিক বৃত্তাভাৱ নহে, পৰন্ত ইই পাৰ্ণে চাপা অক্ষুৰীকেন্দ্ৰ (ellipses) ভাৱ এৰা ঐ অক্ষুৰীক (বৃত্তাকেন্দ্ৰ) ক্ষেত্ৰৰ ব্যাপহিত বিন্ধ্যৰেৰ একপাতে (one of the foci) প্ৰথম নিতলভাৱে পৰিহিত হইয়াছে। এইজনক পৰ্য্যবেক্ষণ হইতে কেপ্‌লার ওঁহাৰ মপৎ-প্ৰসিদ্ধ ভিতৰি সিদ্ধ সিদ্ধিৰূপ কৰেন—

(১) প্ৰথম চতুৰ্ভুজিক আৱৰ্ত্তনকাল প্ৰত্যেক ব্ৰহ্মসূত্ৰ-সমান সময়ত সমান-সমান কোণত অৱিত কৰে।

(২) প্ৰথম চতুৰ্ভুজিক প্ৰকল্পকট একটা অক্ষুৰীকেন্দ্ৰ ভাৱ, এৰা ঐ অক্ষুৰীক-ক্ষেত্ৰৰ ব্যাপহিত বিন্ধ্যৰেৰ একপাতে প্ৰথম নিতলভাৱে অৱিত।

(৩) ত্ৰয়ো পূৰ্ণ আৱৰ্ত্তন সময়ৰ বৰ্গকাল (square of the periodical time) কৰ্ত্তক সমানকাল সমান কালকাল সমানকাল

কেপ্‌লারৰ এই ভিতৰি সিদ্ধিৰূপে বৰ্ণন পণ্ডিত জ্যোতিষ একটা প্ৰাচ্য-বৰা পতীৰ মতো আৱিৰ্ভাব পড়িল; ব্ৰহ্মপেনৰ পতি ও অৱতৰন বিৰ্ণৰ অতিশয় সম্ভাৱনা হইয়া আছিল এৰা তাহাৰিষেৰ আৱিৰ্ভাব ও তিৰোৱাৰেৰ পূৰ্ণ-সম্ভাৱন কাল পণ্ডিতৰ সাহাৰণ অৱশ্যপতেৰ মতো আৱন্ত থাকিবা, কেপ্‌লারৰ অসম্পূৰ্ণ প্ৰতিভাৰ বিমন্ত-বোধনা কৰিতে লাগিল।

অপৰ নিচে, বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰে কেপ্‌লারৰ বিখ্যাত লভাৰ্ণ পেন্সিলিয়ে, পণ্ডিত-জ্যোতিষৰ ভিত্তিৰূপে যে স্থানকাল-কট আৱশ্যপণন কৰিয়া ছিল, তাহাৰ লগে-লগেৰে বৰ্ণনকিত হইলেন। ওঁহাৰই অৱন্ত ইংলণ্ডেৰ কলে বহাবিহিত্ত বৃত্তবীকণ ব্ৰহ্মৰ সাহাৰ্যে পৰ্য্যবেক্ষণ-লাপেক জ্যোতিষৰ বহু উন্নতি সাধিত হইল। অৱন্ত একেৰে ওঁহাৰ লক্ষ্যৰ আৱন্ত ছিল না। কিন্তু পেন্সিলিয়েৰ পৰ্য্যবেক্ষণগুলি কেপ্‌লারৰ সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞাত ছিল; এৰা ইয়াও কল আৱশ্যেৰ বিধৰ নহে যে, কেপ্‌লারৰ প্ৰকৃক-বিৰ্ণেৰে সিদ্ধিৰূপে পেন্সিলিয়ে একেবাৰে অৱগত ছিলেন না। এইকলে দুই ভিত্ৰ প্ৰাচ্যলীতে দুইটি বীকাৰ প্ৰভাৱে বিজ্ঞানৰ উন্নতি বেশ ক্ৰম হইতে লাগিল। কিন্তু সম্ভাৱনিক জ্যোতিৰ্গতপৰেৰ উপৰি পেন্সিলিয়েৰ প্ৰভাৱই অৱিক ছিল। এমন কি, বতৰিৰ বা নিউটন ওঁহাৰ অসম্পূৰ্ণ জ্ঞান-সৌৰেৰ তিত্তিত্তৰূপে পেন্সিলিয়েৰ সিদ্ধিৰূপক স্থাপন কৰিয়াছিল, ততৰিৰ পৰ্য্যক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰে ওঁহাৰিষেৰ উপযোগিতা সাধাৰণে বিকট অৱন্ত ভাৱে প্ৰতিপন্ন হয় নাই। বৰ্ত্তন্ত, কেপ্‌লার ও পেন্সিলিয়ে দুইটি বিত্তৰ পৰে আপন-আপন প্ৰতিভা বিৰোধিত কৰিয়াছিল। স্থাপিত বৃত্তবীকণ ব্ৰহ্মৰ সাহাৰ্যে ব্ৰহ্মপেনৰ পৰ্য্যবেক্ষণ বিধেৰ পেন্সিলিয়েই লক্ষ্যপ্ৰদা অৱিক কৃত্তিৰ দেখাইতে পাৰিয়াছিল। পেন্সিলিয়েৰ আৱিহিত্ত তথ্যগুলি লকলেই বোধগম্য ছিল; কাৰণ, একটা বৃত্তবীকণ ব্ৰহ্ম লইয়া পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিলেই, ওঁহাৰেৰ বিতৰ্কতা ও বিতুলতা সম্বন্ধে অৱশ্যপৰিচয় চৰম উত্তৰ পাতলা বাইত। পেন্সিলিয়েৰ পৰ্য্যবেক্ষণ-লাৰ্ণা অতি অল্পত ছিল। তেদে এককিকে অজ্ঞানত পৰ্য্যবেক্ষণেৰ শক্তি লইয়া তিনি মন্তৰূপ কৰিয়াছিল, সেইজন ওঁহাৰ ব্যাখ্যান-প্ৰাচ্যলীত নূতন ও ভৱকল্প ছিল। তিনিই পৰ্য্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষৰ ক্ৰমত উন্নতি-বিখ্যাত এৰা ওঁহাৰই পৰ্য্যবেক্ষণ-ভাৱ্যকৈ ভিত্তি কৰিয়া জ্যোতিষকল্পীৰ নিৰ্মূল বিবৰণ সিদ্ধিৰূপ হইতে পাৰিয়াছিল।

এইয়াৰ পণ্ডিত-জ্যোতিষে মাতাকৰ্ণণেৰ সিদ্ধিৰূপে প্ৰাচ্যলীত ও প্ৰচলিত হইল, উৰা উন্নতিৰ আৰ একটা সোণাৰে-উপহিত হইল। কেপ্‌লার পৰম ওঁহাৰ মপৎ-প্ৰসিদ্ধ বিবৰ ভিতৰি সিদ্ধিৰূপ কৰেন, তবল তিনি জ্যোতিষ এৰা বৃত্তিৰূপে পাৰিয়াছিল, মাতাকৰ্ণণেৰ সিদ্ধিৰূপ ওঁহাৰ আৱিৰ্ভাৱে ক্ষেত্ৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিয়াছিল; কাৰণ, বোটাটো মাতাকৰ্ণণেৰ ব্যাপাৰটো কেপ্‌লারৰ বহু পূৰ্ণে প্ৰচলিত ছিল। বৰ্ত্তন্ত, ইয়া অৱতৰন কৰা অৱগত হয় যে, প্ৰাচীন চিত্তাঞ্চল জ্যোতিৰ্গতপৰে

তিনি দ্বিতীয় যুগে বলিলেন, “যাহুজি, এই যে বিশাল ভবন দেখিতেছেন, ইহা এক কালে শিল্পের অপরূপ নিদর্শন ছিল। ইহার পরিকল্পনা দিল্লীর বাদশাহী মহালাকেও কারুকাঠামুগুণে পরাভূত করিয়াছিল; কিন্তু শক্তিময় কালের কঠোর শাসনে আজ ইহার সমস্ত বিস্তৃত বিস্তৃত স্থলগুলির মত করিয়া গিয়াছে। কেবল একটা বার্ষ প্রদর্শনকারী কক্ষই বৈরাগ্যের স্বাভাবিক এই প্রাঙ্গণের প্রতি ইষ্টকণ্ঠের সঙ্গিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।”

কাহিনী শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করায়, তিনি আমাকে প্রাঙ্গণ-দর্শন দিয়া একটা প্রস্থান চেষ্টা করিয়া গেলেন। তৎকালীণ-অধ্যাপক হনিত চন্দ্রশেখর বর্মণের গঠিত একটা সমাধি-পার্শ্বে বসিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

“দ্বিতীয় শত বৎসরেরও পূর্বে গেলিম শাহ এই বিহীন-সদন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আজ যে প্রাঙ্গণ দেখিতেছেন, তখন ইহা দীপোদ্ভাসিত নগরশাশুর ভায় শত চন্দ্র-মুদ্রা দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহার প্রতি কক্ষ কক্ষ অতুল্য বাদনা, কত বার্ষ প্রতীক, কত মধুর ছিল, কত সঙ্গম বেদনাস্রাব, কত সুখ-চাঞ্চল্য, কত বিরোধ, কত অশ্রু বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? শত যৌবন-কুহব-পেশাব, অগোচরসমস্ত রূপ-লাভ্যময়ী তরুণী ইহার শোভা বর্ধন করিত। আলোকবাহী চিরজ্যোতির্ময়ী উষার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র তখন আবেগময় সঙ্গীত-প্রবাহে যুবর হইয়া উঠিত এবং সঙ্গীত-সমাগমে শত দীপমালা ইমাকে আলোক-দীপোদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। প্রায় প্রত্যহ প্রদোষ সময়ে নবাব বিদ্রোহ ভয়ে উপস্থিত হইতেন। তখন অশ্রু উল্লাস-হিল্লোল যেন আতুল বায়ু-প্রবাহের মত প্রতি কক্ষ-দ্বারা ও বাতায়নে উৎফুল্লিত উঠিত। অপরূপ-বিন্যস্ত কঠোর স্থাপত্য শীতলহরী ও তাল-সহ মন্থিত হুগুনের নিম্ন কুহব-পঙ্ক-বিদ্য বায়ুতরঙ্গ কারাক্ষর করিয়া তুলিত। উজ্জ্বলময়ী গোমতী স্রুত বীণাবাদিনী হইয়া সে উৎসবে যোগদান করিত। এক বিরাট আনন্দ রূপী যেন জলে, ফুলে, গগনে, পথের সর্বত্রই কঙ্কত হইয়া উঠিত।

“হায়, সে কি দিনই গিয়াছে! কত সতীর সান্নিধ্য, কত মরণ, কত ঐশ্বর্য, অবাধ বিশাল-প্রবাহে ত্বণের ভায় ভাসিয়া গিয়াছে। ক্ষতিকারক কনিসোচ্ছল কত

তীব্র বিবাহী হুদরা, কত কোল আবেশের কটাক, কত লাভ, কত কলিত চরণ-ভঙ্গ, কত আবেগ, কত সঙ্গ-বিচ্ছিন্নিত মুগ্ধ প্রণয়-বাণী, কত বেদনা, কত বাদনা—আজ সকলই কোন্ অতীত মহিমাতেই সমাধিত।

“আজ বার্ষ সমাধি-সমীপে আমরা উপবেশন করিয়া আছি, এই গুলনোরার বেগমই ছিলেন নবাবের প্রিয়তমা। কৈশোরের কোন্ অজ্ঞাত নবীন প্রভাতে এই হুগু-বাদিনী আরাম-মন্ডলের সঙ্গ হুগু-প্রতিভা করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইতিহাসে তাহা অজ্ঞাত হইলেও সৌন্দর্য্য-সম্মানে সে নবাবের অঙ্গ সঙ্গ বেগমকে নিশ্চয় করিয়াছিল। রত্ন-পরিপূর্ণ হুগু-দাড়ির মত তাহার সৌন্দর্য্য যৌবনভারে বিকশিত ছিল। তাহার হৃদি ও অঙ্গ উভয়েই সর্বভাবে প্রেমিকের মুদ্রা দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সে যখন তাহার অঙ্গ-সঙ্গিত, কুহব-কোমল চরণ বিক্ষেপ করিত, তখন চারিদিকস্থ হুগু সৌন্দর্য্য যেন জীবনী-শক্তি লাভ করিত। প্রতি কথাটা, দৃষ্টিপাণ্ডী, মিলন-রাগিনী-কঙ্কত করিত। রূপ-বিসৃষ্ট নবাব তাহার নবজাগ্রত জন্মের সমস্ত কামনা, সমস্ত প্রেম অর্থাৎ তাহা এই তরুণীর পদপ্রান্তে উপহার দিতাছিলেন। তাহার দান ও ধারণার উপাত্ত মাত্র ছিল এই বেগমী, যাক্‌জাক্‌চাক্‌তা, স্বপ্নমগ্নাভিতা তরুণী। জীবনে যেন তাহার অঙ্গ কিছুই লাভ করিবার ছিল না। এই অজ্ঞাত-কুলশীলা হুগু-বীণা যেন তাহার জীবনে প্রেমী ও প্রেমণী ছিল।

উজ্জ্বলিত দিরাহী ও ললিত নৃত্যমৈশূর্য্য নবাবের দিনগুলি যোগ ও যন্ত্রের ভিত্তি দিয়া চাণিত করিতে লাগিল। রক্ত-লিপা, শাল, দণ্ড প্রভৃতি কোথায় ভাসিয়া গেল।

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। নিতান্তে সন্নয়র আশার মোহিনী তুলিকা দিয়া মানব যে বর্ণ-বৈচিত্র্যময়, অপ্রাপ্ত চিত্র অঙ্কিত করে, বাস্তব ঘটনার পাত-প্রতিপাতে তাহা ধূলিকণার ভায় পুণ্ডরাক্য বিনীত হইয়া যায় এবং যেমন অস্পষ্ট নিপুণ চিত্রকরের হাতে তাহার বিনিময়ে এক সম্পূর্ণ নবীন চিত্র পরিষ্কৃত চিত্র উঠে।

রক্তনী সেদিন জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। সমস্ত নীলাকাশ ভরিয়া হীরক বীণী নন্দনরাজি হুগু-উঠিয়াছিল। দিগ্‌চাঁদের আলো ও হুগু পথের প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা

বাধাতর্য্য আবেগ ভাগাইয়া তুলিতেছিল। মর্দর-মস্তিষ্ক অসিদ্ধোপরি প্যস্ত বশ-ম্রাত বহুশূল গালিচার উপরে নবাব অর্ধপারিত অবস্থায় ছিলেন এবং তত্ত্ব চাঁদের আলোক রূপকোটিতে রান করিয়া একটু দূরে গুলনেশ্বর বসিয়া ছিলেন। উভয়েই নির্বাক্। কি এক সূক্ষ্ম-বস্তু যেন উভয়কেই বিস্তার করিয়া তুলিয়াছিল।

সহসা সেই হুপ কোথাস্থালোক কলিত করিয়া দূরে বাঁশেরী বাজিয়া উঠিল। নবাব ও বেগম দুইজনেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। বাঁশের স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্বমে উঠিতে লাগিল। চম্রাণোক প্রাবিত করিয়া সেই অশ্রান্ত কণ্ঠ রাগিণী প্রাবহিত হইতে লাগিল। সে যেন এক বিহবীর তপ্ত আত্মা জ্বলন।

আবেশবিহীনময়ী মৌনা প্রকৃতি আদি উৎসবময়ী। চারিদিকে কি মলান্, কি বিরাট ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ! সুদ-পবন কলিত শ্রাবণ প্রান্তর চম্র ক্রমে সমুদ্রাসিত—দূরে উল্লাসময়ী গোমতী। প্রাণের সমস্ত আকুল আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন শরীরিণী হইয়া এই গোম্বা-পান-শালসার উদ্ভবী হইয়া আছে। সহসা এক কাহার ক্রমের বর্ষ মৌন প্রেমঘটিত আদি সুখরিত হইয়া উঠিল। কোথায় সে! কি তাহার কামনা! কোন্ মাগনার ধন আশ সে হারাইয়া ফেলিয়াছে! বহুকণ বাজিয়া হতশ্র বাঁশের স্বর দিশাহারা হইয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। বাঁশের গান শুনিতে শুনিতে নবাব নিদ্রামগ্ন হইলেন। সেদিনকার মত উৎসব সমাপ্ত হইল।

এতদে বাঁশী বাজিতে লাগিল। সন্ধ্যার রান ছায়া প্রমতি বাঁহিয়া আসিলে, রজনীর রহস্তের মত কখনো কখন হুত্রে, কখনো বা উচ্চম পবনের মত বাঁশী আকাশ ও ধরতী প্রাবিত করিতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে সকলেই সেই বাঁশীর সঙ্গীতের প্রতি উদাস হইয়া পড়িল। একমাত্র গুলনেশ্বর বেগম ব্যতীত সে সঙ্গীত আর কাহারও তিত আকর্ষণ করিতে পারিত না। বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিলে গুলনেশ্বর যেন সকলই ভুলিতেন। তাঁহার চরম যেন কি এক ভাবে অভিভূত হইয়া বাইত। কত কালের কোন্ দীপ্তোজ্জ্বল অতীতের মধিবন ছবি স্মৃতি-স্মৃত নিভৃত ক্রম-কোণে ছুটিয়া উঠিত। আশ্চর্য্য হইয়া প্রতি ইন্দ্রিয়

প্রমোহ-ভরস তখন তাঁহাকে বাঁহিতে পারিত না। কোন্ দীপ্তোজ্জ্বল সঙ্গীত মৌলিমার অন্তরালে যের্থানে সেই অজ্ঞাত অদৃষ্ট বাঁশীর স্বর শব্দী গুরুত হইতেছে, সেখানে ছুটিয়া বাইত।

সেদিন নবাব কোন গুরু রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে অস্থগত। সঙ্গীত-সুখর আসাধ যৌন। প্রাণমনঃপথ পূর্ণ-বীণক মধো সূক্ষ্মমনে গুলনেশ্বর একাকিনী বসিয়া ছিলেন। এমন মহবে গগনতল প্রাবিত করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সঙ্গীতঃ গুলনেশ্বর একপ্রতিতে বাঁশীর গান শুনিতে লাগিলেন। বাঁশী আর কত না কল্পন হুত্রে বাজিতে লাগিল। কে যেন তাহার তপ্ত চরমের প্রতি সঙ্গল কাহিনী বাঁশেরী রক্তে, দুটাইয়া তুলিতে লাগিল। এক নিদ্রণ পরিজ্ঞান বাঁশী অতীত বাস্তবের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্ব ছাইয়া ফেলিল। বাঁশীর স্বর ধীরে-ধীরে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। গুলনেশ্বর নিবিত্ত চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। সহসা বাঁশী নীরব হইয়া গেল। গুলনেশ্বর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, হুম কোথাস্থালোকে এক অনিন্দ্য-কান্তি দ্বক দণ্ডমান।

দৃষ্টমাজেই গুলনেশ্বর তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে তাঁহাদের প্রতিবেদী ছিল; শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তাঁহার পিতৃপুত্রে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অন্তর মধ্যে গত জীবনের শত স্মৃতি নিবেশমধ্যা স্মৃতিমতী হইয়া উঠিল।

দূর পার্শ্বের নির্বর শীতল কোন এক পার্শ্বতা গল্পী-হুত্রে বেবকস্তার স্রাব রূপাণবগামতী এক ক্ষুদ্রা বালিকা ও সলল হুহকার এক কৃৎস-ম্পতি। তাহাদের কোন অভাব ছিল না। মস্তিষ্কের হুত্রে স্বপ্ন ও স্বাক্ষর্য্য উছলিয়া পড়িত। কৃৎস ও তাহার শ্রবণমরণ্য পক্ষীর বস্ত্রে উৎপন্ন শব্দে ও অনায়াসসক কণ্ঠসুলে তাহাদের জীবিক। সম্বন্ধেই নির্বাক হইত। বিশাল, ঐশ্বর্য্য ও ভোগলিপ্সা তাহাদের নিকট চিত্র-অপরিচিত ছিল। তাহাদের অগত, তাহাদের স্বপ্ন-স্বপ্ন সেই পর্শ্বত-পরিবেষ্টিত তরুজ্জ্বাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গ্রাম-খানির মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

প্রতি প্রত্যতে প্রথম অক্ষণ আলোকে বিহঙ্গ-কলরবে আগরিত হইয়া অশত শান্তি ও অশ্রাব আশ্রয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের মিনগুলি সন্ধ্যার কাশো ছায়ায় নিশিরা বাইত।

যখন বহুদূর হইয়া উঠিত, তখন নিরন্তর অগভীর মুহূর্ত
বারিষাশিতে উপস্থিত উপলব্ধিও নিষ্কণে কঠিন। তাহার
কত না আনন্দ লাভ করিত। সন্ধ্যা সমাগমে প্রতি সূর্য-
প্রাক্তনে প্রজ্জ্বলিত অঁৎখণ্ডের পার্শ্ব বসিয়া তাহার কত
গল্প, কত কাহিনী শ্রবণ করিত; এবং তাগণের অবাধ
কল্পনা মধুর স্মৃতি বহন করিত। কোন দূর অতীতের অজ্ঞাত
রহস্যময় রাস্তা আশ্রয় লাভ করিত। আবার যখন নিশাচর
সময়ে শিথিল ওত্র চাঁদিনী মৈদ বন প্রকৃতিবৈক্য আলোক-
ছায়ার আদ্যম্পনে চিত্রিত। করত, তখন পল্লীবাণীগণ
মল-মলে মধুর সঙ্গীত-কণ্ঠে আনন্দ ও কুণ্ঠ বিলাইত।
ঐযনের প্রথম প্রভাতে যে সুখ, যে আনন্দ নিত্য মগ্ন
ছিল, এতদিনের বিলাস-ভরস্ব তাগণের একেবারে মুছিয়া
দিতে পারে নাই। নিকটে সুবর্ণ-রেখার স্তর মাঝে-মাঝে
মরহের নিভৃত প্রান্তে বিদ্যুৎ-স্মরণের স্তর তাগণ
কণ্ঠের সমস্ত সূচী উঠিত।

যৌর যৌর আপনাকে সংযত করিয়া উজ্জ্বলিত করে
ওলেনহার ম'রানকে জনক-জননীর কুলল বর্তী জিত্রাস।
করিলেন। নিষ্ঠুর পলাপান-বাবলারী ওলেনহারের অতুল
বেক-বাহিত বেক-সাংঘ্যে প্রসূত হইয়া লুপ্তাবের প্রাণাদ-কণ
পরিণোভনের নিমিত্ত অগ্নিরপ করিবার পর তাগণ
শিতামাতা শোক একান্ত অভিভূত হন। যখন অল্পসন্ধান ও
উচ্চাঙ্গের সমস্ত চোটা বর্ষ হইয়া গেল, তখন সকলই তাহার
জীবন সম্বন্ধে হতাশাস হইলেন। আর মরিয়া শিতকাল
হইতেই ওলেনহারের সহিত একত্র গালিত ও একই জনক-
জননীর স্নেহময় লালিত হইয়া, বয়োবৃদ্ধির সহিত
সংগোগনে যে আশা পোষণ করিতেছিল, তাহা মুকলিত
হইয়াই করিয়া গেল। যে দৃষ্ট এতদিন মুকলী, মুখময়ী
হইয়া নীর ও বীতসংসার সমস্ত সৌন্দর্য ও বিচিত্রতালীনা
ছিল, আকি যেন মগ্না সে আবার পরিণত হইল। বিপুল
পৃথিবীর এক প্রান্তে মুকলিত বয়সে জনকের অজ্ঞান স্নেহ ও
জননীর নিঃস্বার্থ প্রীতিহারা হ'রা সে নতুন করিয়া যে বেক
নীচ রচনা করিতেছিল, তাগণবেততার মুহু অঙ্গুলি সকালনে
নিবেশ তাহার অবগান হইয়া গেল।

কত মধুর প্রত্যন্ত তাগণ শিশুর-সিক মূলল হইয়া
আনিল, কত মৌন সন্ধ্যা তাগণ নীরব-সঙ্গীত গাহিয়া
চলিয়া গেল, কত পুরাতন বর্ষ অতীতে চলিয়া পড়িল, কত

মনীর বর্ষ তাহার বর্ণ-গন্ধ-গানে নিশি বিশেষ প্রসম্পর্ক
ও প্রাণ-হিংস্র আনন্দন করিল, কত বিরহের, কত
বাধার অবগান হইয়া গেল; তাখি এই দীর্ঘ-কৃতীয়ে যে
দুঃখ জঘাট বাধিয়াছিল, তাহার বিদ্যুৎ-অবগান হইল না।
অবিসংখ্যাত সুতের স্তর তাগণ যেন সকল পরিবর্তনের মধ্যে
এক তানে ব্যক্তিভে লাগিল।

বয়সের পর বয়স আদিয়া বাবধান সূত্রন করিতে
লাগিল। ক্ষুদ্র পল্লীর ভীতি-চকল ভাব বিগত হইয়া ক্রমশঃ
পূর্কের শাস্ত্র-মৌল অবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশী-
বর্ষ ওলেনহারের বেননা-বাখিত স্মৃতিকণা প্রসঙ্গলসে
উত্থাপন বাতীত আর কখন তুলিত না। এমন কি কাল-
মাগাছো বৃদ্ধ কুব-সম্পত্তিরও শোকাবেষে মনোভূত হইয়া
আসিল। কিন্তু প্রেবের তির-বিরহিনী শক্তি মরিষনের
নিকট ওলেনহারের স্মৃতি অজ্ঞান ও অক্ষর করিয়া রাখিল।
তিলে-তিলে সঙ্কিত, কত গৈরিক-প্রবাহবৎ অদীর্ঘ প্রেমমাশি
প্রতিদিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

যখন আয়োরবর্ষের বিকল অল্পসন্ধানের পরিসমাপ্তি
হইল, তখন মরিয়া মগ্না একবিষ্ণুওলেনহারের সুবৈশ্বক্যের
সংবাদ লইয়া আসিল। পূর্বেশ-প্রত্যাপ্ত কোন বণিকের
নিকট যে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ প্রসংগ করিয়াছিল।
কুব-সম্পত্তি এ সংবাদে একেবারে আত্মগরা হইয়া
পড়িলেন। প্রতি প্রভাতে যে সঙ্গীতিকা আশা সন্ধ্যার স্নান
হইয়া বাইত, বহুবর্ষ পরে অতীতের কোন বহুতময় অন্তরাল
হইতে সে শরীদী হইয়া বেগা দিল। মরিষনের যেন
বহু সাধনার ঘন আকি অকস্মাৎ মিশিয়া গেল। ওল-
নহারের শত স্মৃতি তাগণকে যেন সতত কণ্ঠে বিদ্ধ
করিত। দিবসের ধ্যান ও ধারণা ও নিশিবেদ স্বপ্ন ছিল
ওলেনহার। মরিষনের পরম বহু ও সাধনার বংশী, বাহা
প্রতি সারাহে উহার আকাশ ও মৌন বনবর্ষীকে উজ্জ্বল-
মুখর করিত, যেন চিরন্তন মুখ হইয়া গিয়াছিল। বহুদিন
পরে আকি আবার তাহার স্মরণলী ব্যাধিতে মুহু কম্পন
কোণাটী তুলিল। কিন্তু আকি যেন অজাহতে অতীতের
আনন্দ ও স্নেহের একান্ত অতাব ছিল। এ যেন ভগ
ভবের আকুল দীর্ঘবাদ। উজ্জ্বলিত শোকাঙ্গ যেন বাঁশীর
রক্ত-রক্তে শুষ্করিয়া উঠিতে লাগিল। শত চোটেতে আর
যেন নিভৃত নীরবে থাকিতে চাহে না। শোকের সন্নিধ্য।

দিয়া যে মাধুর্যময়ী প্রতিমা সে এত কাল ধরিয়া গঠন করিয়াছিল, বিচ্ছেদে বাগের প্রতি প্রেম শত ধারায় ভ্রাণ উজ্জল ও বেগময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংবাদ লাভে এ কি হইল! শত পরিবর্তনের মধ্যগত যে দ্বির ছিল, হৃৎকোষের হৃৎপ্রাণি দ্বাধাকে মুহূর্তেরও ক্ষণ স্বেদমান ও নিরাশ করিতে সমর্থ হন নাই, আলি এ কি লনাতীত অন্তর্বেদনার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল!

সংসা এ কোন্ মধুরময়ী অনন্ত প্রেম-রাগিণী ছন্দে ছন্দে বঙ্কত হইয়া উঠিল। উদ্রুক্ত আকাশ ও ধরণী পুনরিতা হইয়া সে গান গুলিতে লাগিল। সমস্ত হৃৎ-হৃৎ, সমস্ত বাগের বেন অবসান হইয়া গেল। কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! দিকে-দিকে কি অপূর্ণ শ্রী উদ্ভাসিতা হইয়া উঠিল! কি গার বাণী শুই! প্রেম ও পৃথিবীর নহে যে সর্কার ও পার্শ্বের হইবে! সে প্রেমে আত্ম-বিসর্জন নাই, তাহা যে প্রাণহীন—সে ত প্রেম নহে, আত্মহুৎবোধ।

সস্তানের প্রতি মমতা বৃদ্ধ ভূতকাল্পনিক তাহার দর্শন লাভের নিমিত্ত দিন-দিন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশেষে বসন্তের এক নির্মল প্রভাতে ভিরবেহরী পল্লী ও শত-স্মৃতি-বিছাড়িত কৃতীর পদাভে রাবিয়া তাঁহার মস্তিষ্কের সহিত বিশৃঙ্খলনে ব্যস্ত করিলেন। বিগত-বিস্মৃত, দুঃস্বপ্ন, বহুদূর পর্ত্তমালা ও খাপস-সকল গহন অরণ্যময়ী মধ্য দিয়া বহু আশ্রমে তাঁহার এই কুহুমিত, শত-শাবদ, নদ-নদী-বিশ্রোত ভ্রাতৃ-শত্রুতলে উপনীত হইলেন। মস্তিষ্কের একান্ত চেষ্টা ও বহু পরিচয়ের পর এই বিশ্রাম-ভবনের সন্ধান হইল। গুলনোরায়ের সহিত সাক্ষাতের সমস্ত পন্থাই বখন বিকল হইয়া গেল, তখন সহসা এক মাধবী হজলীতে মস্তিষ্ক প্রাশাদ-প্রাপ্তে নিচ্ছন গোমতীতীরে বৃক্ষতলে বসিয়া বাণশ্রী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

বাণীর সুর বাহ্য আটকশোর খুলনোরায়ের অভ্যন্তর প্রিয় ছিল এবং বাহ্য তাহাকে বহুবার সঙ্গীতগুণের চকল হস্ত-ক্রীড়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মস্তিষ্কের নিকট টানিয়া আনিয়াছে, তাহা যদি এই সুখীর্ণ বিরোধের অবসান করে, যদি উজ্জল প্রবেশ-ভরঙ্গের মধ্যে অতীত স্মৃতি আগাইয়া তুলে—যদি বা এই আশা তাহার মর্ম্মপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

তাঁহার সে সাধনা, সে অর্জনা সার্থক হইয়াছে। বাগের নর্থ-সংস্কারী, যৌবনয় মানস-বাহিনী আনন্দ-প্রতিমা,

কীমন সংক্রমে পরাগত চটগাও দ্বাধাকে সে প্রেমের সৈন্য বৈদীতে স্থাপিত করিয়াছিল, বাগের প্রতি তাহার প্রেম ভোগদিশা-বিধীন ছিল, আজ যে সে তাহার সন্মুখে বিদ্যমান। সাধকের যেমন সাধনার দন লোক-চকুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে, মস্তিষ্কেরও তেমনি অনন্ত প্রেমরাগি এক প্রেম-দেবতা ব্যতীত আর কেহই জানিত না। এমন কি তাঁহার এই প্রণয়-কঠিনী গুলনোরায়েরও অজ্ঞাত ছিল।

অন্য শাব-ঐদম্বা বিকশিত কুহুমের ভাষ হাত ও আনন্দে প্রহুৎসবী মূর্তি দেবিয়া মস্তিষ্কের তৃপ্তি নয়ন-বৃগল পরিতৃপ্তি লাভ করিল। স্বভাব-সরলা গুলনোরায় শিশুর ভাষ শত সস্তর গলে তত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। মস্তিষ্ক অস্বাভাব্যে সে সকলের উত্তর দিলেন। অবশেষে পর রাতিতে নবাবের অধুনা সইয়া ভনক-ভনকীয় দর্শনের কথা বলিয়া নবাবের প্রতি অনন্ত-প্রেম-পরায়ণা হর্বাচ্ছল কবরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু হায়! এই বহুবর্ষ পরে আনন্দ-মিলনই তাঁহার কাল-ব্রত হইল। গুলনোরায়ের কালকোণগলকে নবাব সেদিন প্রবেশ-মন্ডরে বিশ্রাম-ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অধিক রাতিতে কাঁধা বখন সমাপ্ত হইয়া গেল, তখন নবাবের চিত্ত প্রিয়তমা গুলের চকল আকুল হইয়া উঠিল। নবাবের বিচিত্র তরঙ্গী বখন উদ্ভাস-প্রাপ্তে ললিতা, তখন মস্তিষ্ক ও গুলনোরায় পম্পোর নিকট বিদায় লইতে-ছিলেন। গুলনোরায়ের গুলনোরায়ের মূর্তি নবাবের বিষয়-বিচ্ছলনে পরিচুত হইয়া উঠিল। ক্রিয়াকাল নিশ্চল থাকিবার পর বিনয়ের পরিবর্তে হুজীর রোমানল ও দারুণ প্রতিহিংসা-প্রভৃতি নবাবকে অধার করিয়া তুলিল। এতকাল ধরিয়া বাগের চরণ-তলে উদ্বেল কবরের সমস্ত কাদনা, প্রেম, অতুল ঐশ্বর্য, অতুল-মুখ্যোপ উপহার দিয়াছেন, সে আল অবিদ্যাসিনী! এই দ্বাধাবিনী এতকাল বর্ষিয়া তাঁহার কুটিল হাসি ও মিথ্যা বাণী দিয়া তাঁহার সন্ত লক্ষ্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তিলে-তিলে পানভ করিয়া তাঁহার বাহ্য কিছু মনের ও ব্যক্তির ছিল, সমস্তই অপরূপ করিয়াছে। তাঁহার অতুল রূপরাশি, মনোহর শ্রী ও প্রেমভাষানত বৃত্তি কি কুহুম-পান রচনা করিয়াছিল! বিধাতা সার সৌন্দর্যের আদরণে কি নয় বীভৎসতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে! সমস্তই মিথ্যা! সমস্তই মারা!

উক্ত নবাব দারুণ প্রতিশোধ বাসনা দেখে যত্ন-তত্ব, অমরতরুণশালিনী ও ততোচ্ছিন্ন পুত্র-চরিত্রা তরুণীর জীবন্ত-সম্বন্ধি কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। ঐতিহাসিক-জ্ঞান-বিবর্জিত নবাব মুর্শ্বেজের ক্ষত্র ও তাহার অথও প্রণয়ের একান্ত নির্ভরতা ও শিতর ভাব মরণভার কথা জাবিয়া দেখিলেন না। তাহার অবর্ণনে যে গীতচীনা বীণার স্রাব ভূমিতল আশ্রয় করিত, যে চিরদিনই তাহার হৃদয়ে ধ্বংসালিনী, হৃদয়ে বিধাদিনী ছিল, সেই শিঠী-স্ববকনন্য। ললনার উপর কি নির্ভর আশে প্রসন্ন হইল!

গুলশেরার জীবন-লীলা অবগানের পর প্রাসাদের উৎসব-তরঙ্গ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল। এই নৃশংস ঘটনা সকলের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। নবাব প্রায়ই অস্থগস্থিত থাকিতেন। তাহার মনেও একটা গভীর ক্রকচ্ছা পড়িত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন বিশ্রামভাবে আশিয়া নবাবের চন্দ্র-কিরণে উজ্জলিতা সোনালী-বকুবিহারে সাধ হইল। তরুণী নৃহ মধ্যর চনিয়াছে, এমন সময় বিতর্জন প্রান্তর প্রাবিত করিয়া ললনা বাগদী বান্ধিয়া উঠিল। ঘোংগালোকে নবাবের মনে অসুস্থ অতীত কাহিনী ও তাহার সহিত নৃহ বেদনা মায়িয়া উঠিতেছিল। বান্ধী বসারের সহিত তাহার সবত কবর-তরী বিপুল বেদনা-বলে স্বরত হইয়া উঠিল। স্মৃতির তাড়নে

ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নবাব-বংশীবাদনকারীকে গুত কবিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তে তাহার আজ্ঞা পালিত হইল। হতভাগা যন্ত্রিণ তরুণী-পরে নীত হইল।

নবাব যখন গুলশেরার দ্বিগত জীবন ও মরণ রজনীর আল্প কাহিনী অবগত হইলেন, তখন কুহরিত মর্ম্ম-বেদনায় শরহেতু ক্রোধের স্রাব স্টাইয়া রক্তিলেন। বিবেচ, অভিমান, রাজপন কোথায় ভাসিয়া ইগল। অবাধ, উত্তপ্ত অস্ত্রবারি অঘস্ত ধারার হতভাগিনী গুলশেরারের নিরুপক চরিত্রকে 'দুইতর' করিয়া তুলিতে লাগিল।

হায় সে রজনী! যন্ত্রিণ কেন তুমি আসিলে না। কেন এই কোথা-ভাঙিত বসন্তাগকে এ কাহিনী এমন করিয়া শুনাইসে না। হয় ত তাহা হইলে আর অসুতাপের প্রয়োজন হইত না; এবং একটা অগ্নান কুহবের ক্ষুদ্র জীবন-সন্ন্যাসের অকালে পরিণামাপ্তি হইত না। কোথায় তুমি গুল-কোথায় কেন মন্দে পরিপূর্ণ মহিয়ার প্রসুটিত রহিয়াছ! সেখানে বুকি প্রণয়ে অবস্থান নাই, নিশনে বিরহ নাই। অবস্ত হৃদ, অবস্ত প্রীতি বুকি নিতা সেখানে বহিয়া যায়! কেন পূণ্য-লগ্নে স্বর্গভূতা কুহব তুমি, ধর্ম্মবৎক হৃদয় উঠিয়াছিলে—নিবর্তির নিষ্ঠুর পরি-হাসে শুধু মধুর স্মৃতির অগ্নান পৌরষ রাখিয়া অকাল সন্ধ্যার করিয়া পড়িলে!

চা-তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীম্ভাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম.এ]

যে কলিকালের প্রায়স! তোমাকে নমস্কার করি। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আমাকে একবাক্যে 'সার' দিন, আমি বেপাল, চীন ও বোচোন দেশের পুঁথি প্রকৃতি হইতে প্রমীণ করিয়া দিই যে, তুমিই প্রায়সের বিবর্ত বা পরিণতি। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যদি এ কথাই সমর্থন না করেন, বা হঠ-করিতার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তবে স্মৃতির তাহার 'চা' এর সেবা করিয়াও যোর নিম্ভুহ্যায়—অথবা চিনি-হায়া; কারণ, চা-এর অপরূপ পদার্থে 'নিম্ভু' থাকিতে পারে না, চিনিই থাকে। হায়! আমার কথার আমিই প্রতি-

বাদী হইলাম (আজকালকার দিনের থীকই এই)! কারণ, কতকগুলো "নিরস তরুণী" প্রেরিত লোক আবার কুৎসিত 'হন চা' খাইয়া থাকেন।

বোচোন ও চীনে যখন হাজার এত প্রচলন, আর ঐ দুই দেশ যখন অতি প্রাচীন দেশ, (বোধ হয়, আর্জাণ বোচোনের নিকট হইতেই) আসিয়াছেন, তাই আর্জাণ-বাসিনগ বা হিম্মুহাণগ 'বোচা' নামে অভিহিত, তখন প্রমাণিতই হইল যে 'চা' এক অতি 'প্রাঐতিহাসিক' বস্তু। অতএব ঐতিহাসিক প্রমাণে স্বীকৃত হইল যে 'চা' পূর্বে

‘সোম’ রূপে পরিচিত ছিল। (১) তিব্বতের ‘মুনিং’ ঘরের কোন পুথিতে ইহার আরও স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’, আগাভক্ত বন্ধু রাণিয়ার, পবেশ্যাকারিগণ কি ‘কোঁদর বাঁধিয়া’ ইহার বিশদীকৃত করিবেন না? তাহার পর দেখুন, দার্শনিক হিসাবেও সোমরস যে ‘চা’ তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, evolution বা অভিযুক্তিধর্মের নিয়মামুসারে আর কোন ‘মুষ্টি-কারক পানীয়’ (অথচ দ্রব্যক নহে) সোমরসের স্থানীয় হইবে? পৃথিবীতে কোন জিনিসেরই একবারে ধ্বংস হয় না—সুখ দুঃখের হইয়া থাকে, দার্শনিকগণ তারতম্যের এই কথা বলিতেছেন। অতএব, যে ভাবে বোধগণ্য হইতে উত্তরবর্ষের কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ উৎস হইয়াছেন (প্রাচ্য-বিজ্ঞানমার্গবের মতে), সেই ভাবেই কালে সোমরস ‘চা’ রূপে পরিণত হইয়াছে। দার্শনিকগণের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—intuition (Bergson) দ্বারা সোমার কথা “বুকে হাত দিয়া বলা”। আচ্ছা, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, যে, সকলেই বুকে হাত দিয়া বস্তু দেখি, ‘চা’ ‘সোমরস’ কি না? সকলেই intuitively বলিয়া উঠিবেন (বিশেষজ্ঞা পান করিতে-করিতে) আঃ, কি আরাম! ইহাই তা আসল সোমরস! ভারতীয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, নয় বানর হইতে উদ্ভূত। সে বানরকেও ‘চা’ খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, সে বড়ই আরাম অশ্রুতব করিয়া থাকে। অতএব আর বলিবার ‘কো’ চা নাই যে, ‘চা’ অতি অর্জুচীন সামগ্রী।

(১) আর্যভট্টের মতে নব্বি চাড়া কোন কথা বলিবার না। বলিবার দেখুন—“According to Chinese legend, the virtues of tea were discovered by the Emperor Chinnung, 2737 B. C. to whom all agricultural and medicinal knowledge is traced” ইত্যাদি—তিনি আশ্চর্য্যবশিত হইল যে, কালে-কালেই বৈদিক যুগের ‘চা’ বাসোয় ব্যবহৃত হইত। তারতবর্ষ হইতে যে ‘চা’ উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ‘কণ’ ও ‘ত্বন’, ও ‘কু’ গৌরবে বর্ণনা হইতে বিনা—“A tradition exists in China that a knowledge of tea travelled eastward, to and in China, having been introduced 543 A. D. by Bodhi-dharma, an ascetic, who came from India on a missionary expedition”—Encyclopaedia Britannica, Vol. 26 (11th Ed.) pp. 476—481.

হাঃ, আর্যের ‘চা’ এর মণ্ডারী কুলিরা গিয়াছিল। (২) কই, দেশে তা সোমরসের জার ‘চা-বন্ধ’ অশ্রুত হইতেছে না? শুধু মূলাপাণিগণের ‘সোমরস’ ও ‘ব্রাহ্মরস’ বলে ও আশ্চর্য্যের ত্রিসংখ্যার উদ্ভব-বন্ধে চা একটা নিত্য ‘অস’ হইয়া আছে। পুনশ্চ, চায়ের আমরা আরও কোন স্ততি-পীতি ঘটনা করি নাই। আমুন, আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর ‘চা’ এর গুণ-কীর্তন করি।

সত্যগুণ সাধিকগুণ ছিল। অতএব সে গুণে সাধিকতার বৃদ্ধির লক্ষ সোমরস পান করা হইত। আমরা অতঃ সেই সত্যগুণের লোককেই বংশধর। এই কলিযুগে বা ‘চামলিক’ গুণে উচ্চ চা বাতীত কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? এ কথা কি কেহ অসম্মতি বাহির করিতে পারিবেন?

‘চা’ নামের উৎপত্তি কি কেহ trace করিয়াছেন? আখ্যায়িক্তে হিম্বি ভাবার ‘চা’ কে ‘চাধ’ বলা হয়। এখন আখ্যায়িক্তে আখ্যায়িক্তে আসিলেন, তখন সকলে সোমরস চাহিতে লাগিলেন। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই ‘চাধ’ ‘চাধ’ করিতে লাগিলেন। অননি সোমরস এই নাম লুপ্ত হইল, ‘চাধ’ নাম চলিতে লাগিল। অসমস্তার ব্যতিরেকে আমরা আরও ছোট করিয়া—‘চা’ করিয়া বেশিলাম।

আচ্ছা যে আমরা ‘চাকরি’ করিতেছি, ইহা কি? চা বাহারা করিত বা জমাইত, তাহারাই ছিল চাকর। সেই কর্তৃ চাকরি। চা-বাগানের চা-করণ কৃষ্ণের প্রায় জীবন-ধারণ করিয়া থাকে। সেই হইতে চাকরি কৃষ্ণ। ‘চা’ না হইলে বাহাদের জীবন ত্রিসংখ্যক বাঁচে না, প্রাচাত্তিক কর্তৃ বন্ধ হইয়া যায়, তাহাদের নিম্নক্কারামি চিরবিখ্যাত। বাহার দুই পান করা হয়, তাহাকেই হেনন করা হয়। চা-এর কি মহিমা? চায়ের কুলিগণ অগস্ত্যের মধ্যে অতি পুণ্ড্রিগা, আর চায়ের কুলিগণগণ একবারে বনকুবের। ‘চা’কে বাহারী বাজাইয়া রাখিবার, তাহার অগস্ত্যের শ্রেষ্ঠ কান্তি। আর কে অস্বীকার করিতে পারে যে, বাহারী ‘চা’কে বাহারি, তাহারাই ‘চা-বান’। হাঃ! এ হেন

(২) অথচ ভারতীয় ‘চা’ যে শ্রেষ্ঠ চা তাহার নব্বি লভন—“The finest teas are produced at high elevations in Darjeeling, Ceylon and in the plains of Assam.” Ibid. হাঃ! “আমরা দেশ” নামে এই কথাটা বার পড়িয়া থায়ে! বুক আরও ফুট হইল।

‘চা’কে যে ভাঙারগণ অপকাত্ত্রী বলিয়াছেন,—গবেষণায় ধরা পড়িয়াছে, তাঁহারাষ্ট বাঙালীতে তিন বোলা তিন-তিন পেয়াদা ‘চা’ উৎসব করিয়া থাকেন। ‘চা’এর একবার সেবক হইলে, আর এ চাকুরি ত্যাগ করা অসম্ভব,—একবারে জীবন-যৌবন সমর্পণ। অতঃপর যোগীশ্বরের ঘোর দর্ভাঙ্গা, ‘সে রসে বঞ্চিত, গোবিন্দ দাস।’

আজ এই ইনকুরেঞ্জার দিনে, চিরকাল যে সকল চিকিৎসক ‘চা’এর দুর্দাম রটাইয়াছেন, তাঁহারাষ্ট আবার জিব্ কাটিয়া বলিতেছেন, চা এই অমৃত পদম হিতকারী। বন-বন পিপাসার বোঝা গিয়াছে যে, চা পিপাসার শান্তি করে। মাসেতিমার বেশে, বলিতে কি সমগ্র বাঙ্গালীর বেশে (যাহ যে দেশে বাঙ্গালী গিয়াছেন সে দেশেও) চা-খোরগণ উঠা হইতে পরিভ্রাণ পান। চা বাঁচা সন্ধিতে উপকারী। শীতল চা উত্তাপময় উপকারী। চর্ভিকের দেশে আহার কনাইবারও ইহা একটা অমোঘ ঔষধ। অতএব এমন “সর্বব্যাপিগণসংহ” আর কি ছুনিয়ার আছে? তথাপি ‘চা’এর নিন্দা! নিশ্চয়ই যথেষ্ট কে বন্ধ করিবে?

‘চা’কে খ্রীষ্টান বলিব, কি মুসলিম বলিব,—ইহা লইয়া ঝটকা উঠিতে পারে। ‘চা’এর সর্বব্যাপিগণের কথা ভাবিলে, ব্রাহ্মের ভ্রাতা ও তৎসং বং নপুংসক লিঙ্গ বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়, এত ক্ষুদ্র শক্তিমানকে ক্রীষ তুলিব? আহার মনে হয়, ইহা তাত্ত্বিকী শক্তির ভ্রাতা একটা মধ্য-পুষ্টি। ইহা যে এক সর্বব্যাপিনী শক্তি, তাহার প্রমাণ কি পান নাই? একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলিতেছেন যে, পরিমাণ ও পানকাত্ত্রীগণের সংখ্যা হিসাবে অগণ্য বস্তু পানীয় বস্তু হয়, তাহাতে জলের পরেই চা এর স্থান (“Next to water, tea is the beverage most widely in use throughout the world as regards the number of its votaries as well as the total liquid quantity consumed”)। কুশলেন না হয়, জল নপুংসক লিঙ্গ, কলের বোলাতেও তাই। কোন উদ্ভিদমণী শক্তি উগাতে নাই, বসন্ত উদ্ভী গুণ আছে। (৩) চাও কিন্তু ঐ শক্তি রীতিমত বর্ধমান। অতএব প্রমাণে

‘চা’ই শ্রেষ্ঠ স্থান পাইল। সেই কারণেই দেখুন, কলিকাতার রাস্তার “যে দিকে কিয়াই রাখি, সে দিকে তোনরে ঘেঁষি।” চারিদিকেই চাের জীবন্ত রক্তাক্ত সৃষ্টি প্রকটিত। কত লোকে বাসায় প্রস্তুত পুষ্টি চা চাড়াইয়া বারগমারি হস্তিনে চা এর আশার চাতকের ভ্রাতা ছুটিতেছে। এটা যে Democratic age!

“চা” এই শব্দ হইতে কত গভীর তত্ত্ব স্ফুট হইতেছে। “চালাখ” কথার উৎপত্তির দিকে মনঃ করিয়াছেন কি? বাহারা লাখ লাখ পেয়াদা চা খাইয়াছেন তাহারাষ্ট চালাখ। বস্তুতঃ অধিক চা মা খাইলে চালাখ হইবার সম্ভাবনা অতি কম। মুসলমানী ও হিন্দুজানী “চাচা” শব্দের বীজ্য কি? শব্দতত্ত্বের গবেষণায় দেখা যাইবে যে, পূর্বে বালকগণ খড়ার নিকট আশ্রয় করিয়া (বাগ অপেক্ষা খড়ার নিকটেই আশ্রয় বেশী চলে) “চা” “চা” করিয়া জিন্ম করিত; সেই হইতে “চাচা” শব্দে স্ফুট হইল। এই ভাবে তৎকাল “চাচী” দিবার সময় বাস্তবকরণ “চা” “চা” (Tea) বলিয়া ইঙ্গ বঙ্গ ভাষায় কলরব করে। সেই হইতে তৎকাল “চাচী” হইয়াছে। “চা-মুতা” শব্দের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস “চা-মুতা” শ্রেণীর ত্রীলোকগণের নিকট হইতে পাইবার সম্ভাবনা আছে।

‘চা’এর উপর সত্য ও মিথ্যা কত গল্প রচিত হইয়াছে। সত্য ঘটনার প্রথমে একটা নমুনা দেই। তার পর মিথ্যা কথার অস্ত্র ত নভেল-নাটক আছেই। পশ্চিমে থাকিবার সময়ে সংবাদ-পত্রে এক অপূর্ণ ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। পাঠকগণ এইবার একটু গভীর হইয়া শ্রবণ করুন। বৃত্তান্তবোধের একটা সহায় এক সাহেব সতীক বাগ করিতেন। তাহার মেজাজটা সর্বদাই “পকম চড়িয়া” থাকিত। তিনি তাহার গুলদানী খেচারাক সময়ে-অসময়ে পূর্ব গালিগালাহ করিতে John Bull হইয়া উঠিতেন। এক দিন ‘চা’ দিবার সময়ে সামান্য কারণে সাহেব তাহাকে, যে নাম উচ্চারণে মূলদান “তোওবা, ‘তোওবা’ উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহারই “বাক্স” বা পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে মূলদান খানদানার আর খেঁচা টকিল না। সে অসময়ে পকেটে করিয়া রাখিল। পরদিন প্রভাতে সাহেবের চা পাইবার সময়ে, সে নিজের ক’লমত একটা জলীয় পদার্থ উক করিয়া তাহাতে চা, চুড় ও চিনি মিশাইয়া

(৩) এই সঙ্গে কুলদী—“Throwing cold water upon”।

কুলদী না করিলে কি পা ওতা প্রকাশ সম্বন্ধে?

ভারতবর্ষ



“বিদ্যাপটনা, লাক্ষ্মীভরণা, বিনত-দ্বন্দ্ব-বিজয়ী-নন্দনা—”

—৮ বিজ্ঞানপ্রদায়

শিল্পী—ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী]

[ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী অঙ্কন করিয়াছেন]

Emerald Printing Works
CALCUTTA.

‘ক্রী’তে করিয়া সাহেবের টেবিলে রাখিয়া আসিল। সাহে-
সহে নিজের পেটলা পুটলী লইয়া একবারে চম্পট দিল।
এদিকে সাহেব নিশ্চিতমনে “জা” কয়েক চামচ খাইয়াই
সেমিনের চাহ লবণস্বাদ আবিষ্কার করিলেন। তৎক্ষণাৎ
খানসামার ডলপ্ হইল। সাহেব জানিলেন যে, সে পদায়ন
করিয়াছে। তখন সাহেবের মাংস হইল, ‘জা’তে কোন
বিষাক্ত পদার্থ বিশদ হইয়াছে। সাহেব অবশিষ্ট ‘জা’
পুশিনের দ্বারা রাসায়নিক পরীক্ষার পাঠাইয়া দিয়া ‘উইণ’
লিখিতে বলিলেন। তাঁহার মনে হইল, মাথা পুতিতেছে।
কিছুক্ষণ পরেই খবর আসিল যে, রাসায়নিক পরীক্ষার ফির
হইয়াছে যে, ঐ পানীয়ে Uric Acid বা মূত্র সঞ্চীর অল্প
পাওয়া যাইতেছে; হস্তগত মূত্রের বিশ্রণ সূচ্য যাইতেছে।
সাহেব পুণ্য বনিব চেষ্টার অকৃতকার্য হইয়া বোকর্দ্দমার
হস্তপাত করিলেন। খানসামা ধরা পড়িল। বিচারালয়ে
খানসামা নিজের সোণ বাকার করিল ও সাহেবের শূকর-
পুত্র সন্ধান করার কথাও বলিয়া ফেলিল। বিচারক
উত্তর পক্ষের কথা শুনিয়া শেষে খানসামার সামান্য কিছু
জরিমানা করিলেন, এবং চারে দিখিলেন যে, “জামরা
রাসায়নিক পরীক্ষার অবগত হইলাম যে, জা-য়ে যে প্রস্তাব
বিশদ হইয়াছে, তাহা মহুৎ-মুৎ, অল্প কোন হীন মন্তব্য নহে,
এবং ইহাও জানা গেল যে, মহুৎ মূত্র কোনক্রমেই প্রাণ-
নাশক নহে; হস্তগত আসামীর দণ্ড গুরুতর হইতে পারে
না।” ইত্যাদি। এই প্রেরী বোকর্দ্দমার আর আশীল

নাই তাহিরা সাহেব তদু হস্তকে করাবাত করিতে
শাশিলেন।

এইবার কাননিক গল্প ও সাহিত্যে ‘জা’র প্রতিপত্তির
কথা বলিয়া এই ভূতিগান সাক করিব। ‘জা’র চাহ ও
বাণিজ্যের কথা ভারতবর্ষের পাঠকগণ পূর্বেই পড়িয়াছেন।
তখন-কাহিনীতে টেনে-টেনে “জা-পান করা দেশ”
ইত্যাদি না থাকিলে সরস হয় না। “জা-পাতি” বা “জা-এর
নিমন্ত্রণ যেমন আধুনিক গল্পের অঙ্গীভূত, তেমনি সামান্য
কারণে “মুখ ভাং করা” বচসা তর্ক করা বা “জা-এর
পেয়ালায় ঝড় তোলা” (tempest in the tea pot)
নাহক-নাহিকাগণের হতাশাবিহীন ব্যাপার। ‘জা’এর উপর
গল্প করিতে-করিতে কত প্রণয়ের পরিণতি (develop-
ment) নভেলে দেখিতে পাওয়া যায়। হার! জা না
থাকিলে “নৌকা-ডুবি”তে রমণ ও ফেমলিনীর মানসিক
বন্ধনের কে পরিচর পাইত? “নবীন সরাসী”র ‘সরাস’
যোগ সারাইতে “চিনি”র রসে পূর্ণ জা একরূপ প্রাণপতির
কাজ করিয়াছিল। “নবীন সরাসী” পড়িয়া চম্ মুহিলে
বেধিতে পাই তিনটি শক্তি—নবীন সরাসী—পুরুষ, চিনি—
প্রকৃতি, জা—প্রকৃতির ক্রিয়া। ইহাকেই বলে দার্শনিক
উপভাস! স্পষ্টতঃ বলধর বাবু—“এক পেয়ালা জা” তৈরি
করিয়াছেন। এইবার ‘জা’এর লোচে বঙ্গীর পাঠকবর্গ
তাঁহার স্বাধীন ব্যক্তির নিকটে কেবলি “জা জা” করিয়া
কলহ করিবে। সাহিত্যের ‘জা’র নোভাতই এমন!

গলগ্রহ

[শ্রীযতীশচন্দ্র বাগুচি]

স্বর্গাপূনার ভূতীর বনোবস্ত করিতে পারি নাই। চলিণ
টাকা বেতনের কেরানী,—যেই আবেদন-নিবেদন করিলে
হয় ত ঢাকহীটির মত ভাগ্য করিতে হইবে। বাহা
হউক, ঠাকুরদার শ্রদ্ধা, ঠাকুরদার বিবাহ ইত্যাদি নানা-
রকম গল্পের কাহিনী কালীপুতার পূর্বে আট দিন ভূতী
পাইলাম। সেই কাজেই বাবু-বিভানা মুন্ডে, মাঝার
চাশাইয়া শিলাদা অভিযুৎ হওনা হইলাম।

“কণা না কি মশাই?” “জানেনকি, ঠাকুরদার

যে!” “উঃ! কহুরের ভাতো মার কেন হই?” “আহা—হা,
ঠেলবেন না।” ইত্যাদি নানাবিধ লাক্কা-গল্পনা, অহুত-
অহুযোগ প্রবণ ও কখনের পর টিকিট ক্রয় অধ্যায় সমাপ্ত
হইল।

বলাবলে ট্রেন ছাড়িল। গাড়ী দাঁড়ানোর চাকারিয়া
গেলো, একটা পরিভ্রমণকে নিঃশেষ ছাড়িলাম। বাবু,
বাকী পাওয়া তাহা হইলে একরকম ঠিকই হইল। মহা
কলহে কলহে, হীরা-হীরা, হীরা-হীরা, হীরা-হীরা, হীরা-হীরা

করায় উদ্দেশ্যে গতে হস্ত প্রবিষ্ট করাইলাম। হরিবোল ! কোটা নাই। হুঁধীগবনের মত মধ্যাত্মিক রকম হাৰ্বে-বিবাস ধাড়াইয়া পেল।

পাশে একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। বর্ণ ধোর কৃষ্ণ; জ্বল ও কোটিরগত চক্ষু দুইটা সুদৃষ্টি-প্রাণ; অশ্রু-জল পূরিপাটী রূপে উৎপাটিত; অবিদ্যমান-সংস্কার তাত্পর্য চক্ষুণে দর্শনপত্ৰে বিস্তৃতবর্ণ। গাত্রে স্তূৰিমা ছিটের টানে কোট; ভদ্রপূর্ণ একখানি মোটা লুই।

পা-দুখানি বেকের উপর গুটাইয়া তুঁড় বারির করা আরম্ভলাভ মত বসিয়া ছিলেন। মস্তকে প্রকাণ্ড এক কাশো কন্দাটার ড'র মত করিয়া বাধা। বরস পকাশের কাছাকাছি।

পার্শ্বে একটা ৭/৮ বৎসরের বালক কন্দাটার এবং আলোরান জড়াইয়া একটা পুটলীর মত বসিয়া আছে। চক্ষু দুইটা তরুণ ও সশর। মুখখানি বেথিয়া বাধা হয়।

ভদ্রলোক চটু করিয়া আহার বিপন্ন অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। বিনাযাকাবারে পকেট হইতে প্রকাণ্ড এক ডিবা (ভাবর বলিলেও চলে) বারির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন; বলিলেন, “নিম্ন তুলে ছুটো।”

আমি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ বোধ করিলাম। তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামান্যইয়া লইয়া একটা পান তুলিয়া লইলাম। আকাশ-পাতাল-বাগ্মী বিয়টি এক হা করিয়া, তাহার মধ্যে দুইটা পান ফেলিয়া দিয়া, ভদ্রলোক নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। গাত্রে কাপড়খানি একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, “বেশ দীর্ঘ পড়ল।”

আমি। পড়ল হই কি! কার্তিক মাসও তো পড়েছে। ভহ। এই, এই ছোঁড়া! ব্যাপারখানি টেনে যে না। এহু, তুমিই ভরসা। (ভাল করিয়া উপবেশন) মশায়ের নাম?

আমি নাম বলিলাম।

“আমার নাম ঐতিহ্যগোবিন্দ পাল। মশায় ব্রাহ্মণ, একটু চরণ ধূলি—” আমি তারবারে আপত্তি করা সম্বোধ, জুতার উপর হাত বুলাইয়া বসে, কপালে এবং জিহবার পের হাত তৈরীয়া, ভগ্নগোবিন্দ বাবু বলিলেন, “হাজার হোক, ব্রাহ্মণ ত! আমি শূদ্র, চিরদিন চণ্ডালিত।

পায়ের ধলা দেবেন বট কি। তবে কি জানেন—আজকাল

আপনারদেরও যোগা-মটা পায়ের ধুলা মেলা ভার; আশ্চর্যেরও টেঙা ভালে, মাথা হেঁট হয় না। এই তো দেশের অবস্থা! হা—হা—হা—”

দেশের অবস্থা আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া পাল মহাপন্ন অট্টহাসি বুড়িয়া দিলেন। আমি নির্জঙ্ক!

“মহাপণের নিবাস?” নিবাস বলিলাম।

“আমার বাড়ী এই আড়ংখাটার কাছে। ইষ্টপান্থ থেকে বরাবর পূর্বদিকে চলে যাবেন। প্রকাণ্ড দালান। অধিষ্ঠিত প্রাচীন হরে গেছে। তা সম্বোধ বেশ বড় বাড়ী। আমার ঠাকুর একজন মহাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম, ছিল সে ৬৭৪৪৪৪ পাল। তদা পিতা ৮৮৮৮৮৮ পাল। তদা পিতা ৮৮৮৮৮৮ পাল। তদা—”

তলোর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ক্ষমতা আমি সেই ছেলের উপর স্থিতি পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার নামটা কি থোকা?” আমার দিকে একবার চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া বালক বলিল, “প্রদানবাস।”

“প্রদানবাস কি? পাল?”

বালকটা কাতর নরনে একবার আমার মুখের দিকে, পরবার ভগ্নগোবিন্দ বাবুর প্রতি চাহিয়া চোখ ফিরাইল। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “তা তো জানি না।”

বিস্মিত হইয়া আমি ভগ্নগোবিন্দ বাবুর প্রতি সূচী নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, সেই বালকের মত হাসি মুখ তাহার আর নাই। তীব্র ব্যথার মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। কোটিরগত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটা মল্ল হইয়াছে। ভগ্নগোবিন্দ বাবু ধীরে-ধীরে বলিলেন, “ও তো তা জানে না।”

আমি হস্তবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ভগ্নগোবিন্দ বাবু বলিলেন, “একটু বসুন। তামাকটা খেয়ে নিয়ে সব বলছি।”

তার পর তিনি তাঁনের একটা বৃণ্ড গোড়া বারির করিলেন। তাহার চাইদিকে দুই বিশাল গল্লর;—একদিকে তামাক, একদিকে টাকে। মধ্যে জামালা-ঢাকা একটা ক্ষুদ্র ঘুলালি, তাহাতে দিয়াল্লাই ইত্যাদি রহিয়াছে। কাষিসের বাগ হইতে ছোট ছোট ও কলিকাতা

ਦਾਨ-ਧਾਨ ਕਰ, ਛਾਤ-ਕੁਝੇਰਾਕੇ ਬਾਝਾ-ਬਾਝਾਨੇ ਸਿਰੇ ਭੇਠੇ
ਪੜ੍ਹੇ ਆਰ ਕਿ 1°

রামবল্লব বলিলেন, "তা তো বটেই।" এতটা ভাল রকম প্রারম্ভিক ট্রায়ালভিত্তিক করতে হবে বই কি। যে সে কথা মনে তো! কল্যাণ! এইটুকু মেয়ে, তার ভেতরে-ভেতরে এতো! পাপিহিণি, পুণ্ডারিকাণি।" রামবল্লব ঘন-ঘন হাঁকা টানিতে লাগিলেন। আত্মকণ্ঠে গোঁসাইখুড়ো কহিল, "তার কোনে যোগ নেই যেবতা! এতবারে ছেলেমানুষ দে। সব কাজের মূল্যধার হচ্ছে ঐ চটকো ডোঁড়া।" "হাঁ, হাঁ, —কারে পড়লে সবাই অমন বলে থাকে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ণন করিয়া উঠিলেন।

গোলাই খুড়া প্রারম্ভিক করিয়া সমাজে উল্লিখিত।
 গ্রামের সমস্ত ব্যাপার নির্বাহে চলিতে লাগিল। কেবল
 নগো-নগো সেই কল্যাণায়, যেহেতু বুকের কাতর নারী
 হইতে অশ্রুত অকথায়া তাহার হৃৎ-শঙ্ক-ক্লিষ্ট, স্নান সুখ-
 ব্রণ বিধোত করিয়া অকাতরে করিয়া বাইত। তেমনি
 পরলা ছিলাম যোগ কলিয়ার হু' দিতে দিতে বলিত, "বাই
 বল খুড়া, এটা কিন্তু বড় অজ্ঞান! হত সব বজ্ঞাত বেটারা
 ছুটে"—বরিত হতে অক্ষ হুইয়া গোলাই খুড়া তাহার মুখ
 চাপিয়া ধরিয়া হিরকর্ণে জনিতেন, আশে পাশে রামধন
 ডাড়াচার্যের বকুমের চটপট ধনি প্রতিগোচর হইতেছে
 কি না।

বহু-কবেক গভাঃ বাতীতে পড়িয়া থাকিয়া ভাবিনায়,
আর কেন ? সঙ্গারের মুখ ত ঘেঁষেই হইল। এখন
সঙ্গারের সমস্ত বেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া, রাগাকাত্তর
চরণ পরণ করিয়া শেখের দিনকরীটী শ্রীযবে কাটাইয়া
দিই। তাহারই কহিয়া।

সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ভাৰ্ণাশ, একবার বেঠোকে দেখিয়া আসি। খুশী পেলো। বাইরা দেখি—একটা ০৪ বৎসরের ছেলে কোলে তাকানি আমার জানাইবাড়ী পরিচয়িকার কান কবিতছে।

আমাকে দেখিয়া তারামণি কাঁদিয়া ফেলিল। সত্য কথা বলিতে কি, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে ক্রোধের পরিবর্তে অহুস্কার উদ্ভূত হইল। তাহাকে সমস্ত ভিক্ষাসা করিলাম।

অনেকজন কামিরা-কামিরা, শেষে শায় হইয়া সে বাহা

বলিল, তাগার সারমর্ম হইতেছে এই, যে, ফটিক তাগাকে লইয়া খুলনার আসে। এখানে তাহার একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকে। ফটিক একটা ছোট খাট খুঁইর দোকান খুলিয়াছিল। কিছু দিন পরে তাহারের একটা পুত্র-সন্তান হয়। বছরখানেক পুত্রই ওলাউঠা রোগে ফটিকের মৃত্যু হয়। অসুস্থতাপালনে দগ্ধ হইয়া, এবং জীবন-ধারণের অস্ত্র সন্তান না দেখিয়া, সে তিলকের স্বস্তর-বাড়ীতেই মাসী হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিচর তিলকের স্বাণ্ডীকে বলিতে, বা তাগার কথা তাগার গ্রামে জানাইতে সে তিলককে নিবেদন করিয়া দিরাছে। বেহপরবশ হইয়া তিলক তাহা দিবার এই অসুযোগে এ পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছে।

আমি মিস্ত্র হইয়া সমস্ত স্তমিলাম। অতঃপিনি!
চল যোবনের বৃহত্তর ভুলে আমি তুই সমাজ-পরিণাস্ত।
অর্থ, যে এই বাপায়ে প্রাধান্য আরণ, যে পিলাচ ভোঙ্ক
লাস্যার মায়ায় তিত তোর ভরা যোবনের, সরল মনের
সমুৎসে তুলিয়া ধরিয়াছিল, — সে ব্যক্তিও থাকিলে সমাজ হয়
তো আমি তাগকে বৃক তুলিয়া লইত।

হঠাৎ একদিন তায়ামবির বড় জ্বর আসিল। দ্বিতীয় দিন সে জ্ঞান হারাইল। তৃতীয় দিন নিশাবাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসুস্থতা-মদিন পাণ জীবন-প্রাণী পশম-নয়নান্তরালে নিবিয়া গেল। আপন জন কেহ দেখিল না, কেহ এক বিস্ম অক্ষ তাগ করিল না। সে মরিয়া বাচিল। নিমেষের ভুলে পথরঙার দ্বাৰাও জীবন মরণের বিধ গুলিল-সেচনে শান্তিলভ করিল বটে, কিন্তু হতভাগিনী তাহার পাণের কল হারিয়া গেল—একটী চারি বৎসরের শিশু।

বেমান ঠাকুরাণী বলিলেন, "এ কি গলগ্রহ জুটলো বাপু! কোথায় রাবি, কি করি! পাঁচজন ভাত-ফুটু তো আছে। তার পাঁচ কথা বলবে। কান নেই বাপু। তার চেয়ে পান্ডী সাহেবের হাতে দিয়ে এলো। সেই বা হর একটা বিলিবাযশু করবে'ন।"

সদস্য কথা প্রকাশ করিয়া আনি বলিলান, “সেটা কি ভাল হয়? নিজের স্বাধাতি, নিজের দেশের লোক, একজন বিদেশীর হাতে সঁপে দেব? তার পর সে তো ছেলোটাকে খুঁটান করবে?”

বেগান স্বভাব দিয়া উঠিলেন, "তা, আবার কি হবে ?

তারি আমার শুকবেব ছেলে হইবেন।—ছেলে বৃষ্টস হব না তো কি ?”

তা ঠিক্। এই পুষ্পশেলভ-দমর, নিশাপ শিশু আৰু তাহার অম্মদোষে পাণের অবতার। সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিতে বিম্ব। সকলে আৰু তাহাকে ঠৈলিয়া দূরে রাখিতে চায়। কেন? কি তাহার অপরাধ? কোন্ পাশে আৰু সে নীরশিত্ত হইয়া কুকুরের চোরেও দৃগা অবস্থার সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে? তাহার আপন সমাজের এই বিশাল বন্ধ থাকিতে, সে কি একজন বিদেশীয় সোলুপ আশ্রয়নের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চুটিবে! তাহার শাসনে তাহার পরমোক্তপুত পিতামাতা খানিত হইবে কি? পাণের শাসন কর, আপত্তি নাই। কিন্তু সে কোন্ অপরায় অপরাধ? সকল সমাজই কুলত্যাগিনীকে শাস্তি দেয়, তাহাকে দৃগা করে। কিন্তু তাহার সমাজকে তো কোন সমাজই তাহার ক্রোধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে না। তাহাকে আশ্রয় দেয়,—তাহাকে বাঁচিয়া থাকার অবসর এবং উন্নতি করিবার সুবিধা দেয়। কই, আমার সমাজ তো তাহা দেয় না। সে শুধু জুটী-ভঙ্গে শাসন করিতেই জানে,—কুকু টানিয়া লইতে জানে না; শাস্তি ও হুধ দিতে পারে না।

বৃদ্ধের নয়ন-গ্রাস্ত হইতে বিদু-বিদু জ্ঞানধারা স্রিয়া পড়িল। বহুশ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, “যেমনের শত নিবেধ সবও ছেলটাকে কোলে করিয়া আমি সেই দিন বাড়ী রওনা হইলাম। গ্রামে পৌছিভেই একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। পৌসাই খুড়ার সঙ্গে পথে দেখা হইল। চক্ষুর করতলে আবৃত করিয়া বুদ্ধ করিলেন, “ভদ্রা, সরে যা বাবা। ও বে—ও বে—ভদ্রা বে আমার” —খুড়া হা হা করিয়া কানিয়া উঠিলেন। আমি সরিয়া গেলাম।

সন্ধ্যাবেলা রামবহু তটোবাঁধা, স্ত্রীনাথ খোব, কেবল শুই প্রভৃতি গ্রামের মাতবরণ আমার বাটতে জ্বায়ে হইলেন। চণ্ডীমণ্ডলের ব্যাঘ্রান্নার লাটী পড়িয়া নিলাম। এক ছিলিম তামাক গোড়াইয়া, এমিক-ওমিক চাহিয়া শুই মহানর বলিয়া ফেলিলেন, “তা হলে বাঘটাকুর, আপনাই বগো। আপনাই হচ্চে যে পাগলের পুতবংশ।”

“তা, হ্যা—বলি না, খোবম্বাই বল না।”

“আহা, আপনাই বলুন না। না হর, শুই মশাই বল না কেন।”

“না—না, দাঘটাকুরই বগো।”

কিছুকাল এইরকম গণপোণ ভরার পর একটু কানিয়া, একটু নড়িয়া-চড়িয়া বলিয়া দাঘটাকুরই বলিলেন, “বেধ ভজগোবিন্দ, তুমি হুনামধক পোক্তের ছেলে। মহংবংশে জন্ম তোমার। নিজেও একজন মহানর পোক্ত। তোমার কি এইটে ভাল হচ্ছে।”

আমি বলিয়াছি করিলাম, “কোন্টা।”

রামবহু বলিলেন, “এই ছেলটাকে বাড়ীতে রাখা।”

আমি কহিলাম, “ভাতে হয়েছে কি! পাণ বা কয়েছে, ওর বাপ-মা। ও তো নিশাপ।”

রামবহু বলিলেন, নিশাপ হলো? এ্যা, অবাচ্ করলে যে তুমি! হুশ্চাতিই কুলটোর ছেলো নিশাপ হলো? বাপু হে! তিলির ছেলে, মোকান-পাট করে বাও, যিহের বৌড় বড় ঘোর “নাভাকর্ণ” পর্যন্ত,—তোমার এ পত্তিতি বাতিক কেন? ভিরকাল বেমে-পুংগে বলে অসছে কুলটার সমাজ সন্তাধা পরিত্যক্তা, আর তুমি গল্পপালের বেটা ভজাপাল বেরহাস হচ্ছে; বল কি নাও নিশাপ।”

আমি উত্তর করিলাম, “দাঘটাকুর! আমি ওর কোন পাণই দেখতে পাছি না। আমি বিবাচকে দেখছি, সমাজ এই অসহায়, নিরাশ্রয়, মীন শিশুটার উপর অত্যাচার করছে। আমি কোন্ গ্রামে ওকে এই রাক্ষস সমাজের নির্ধর অত্যাচারের কবলে ছেড়ে দিই?”

রামবহু করিলেন “বেধ বাপু, ও সব বক্তৃতে মধুর সা’র মলে গিরে কোতো! সোরা কথা হচ্ছে, ওকে বাড়ীতে রাখলে তোমাকে সমাজ ভাগ্য করতে হবে। এক, শুই গল্প-গ্রন্থটাকে বিসের করে দাও,—নহ, তোমার পিতৃ-পিতামহের সমাজ ভাগ্য কর।—কি বল?”

আমি একবার মণ্ডপ-বরের মধ্যে বৃষ্টি-নিষ্কপ করিলাম। দেখিলাম, বৃত্ত-প্রসীপের জ্ঞান আলোকে আমার নিজস্ব-পাণ্য রাখাকান্তের নিবিড়-কৃষ্ণ মুষ্টিবানি মুঁই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখকমলের প্রতি চাহিলাম। দেখিলাম, মলিত বিধবারের গ্রন্থে মনোমোহন কানি জাতিয়া উঠিয়াছে,—বড় মধুর। চন্দনচর্চিত বহন উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে,—বড় সুন্দর! দৈব-বিশ্বপিত নলিন-নয়ন-বুলালে

দ্বিত শান্ত্রী হুঁটা উঠিয়াছে,—বড় প্রীতিময়। সুক-করে প্রণাম করিয়া কিরিয়া পাড়াইয়া বলিলাম, “পারলাম না লাগিয়াছে! রাধাকান্ত তাকে আমার কোলে তুলে দিবেছেন।”

“সোজায় বাও, নিশাত বাও! রাধাকান্ত ঠর কানে কানে বলে গেছেন, ‘ওরে, ওই বেবুজের ছেসেটাকে কীখে তুলে নেই-বেই করে নাছ’। রসাতলী বাও, ভঙ্গগোবিন্দ শাল, তুমি রসাতলে বাও। চমকে যোবনা,—তখনই বলেছিলাম।”

একটা অসুস্থ কলরোল করিতে-করিতে সকলে বাহির হইয়া গেল। আমি একঘরে হইলাম।

সেইদিনই রাধাকান্তকে মাধব এবং তাঁহার প্রসাদ-দাসকে হুকু করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে রওনা হইলাম।

সেখানে প্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পুণ্ডার কল্প পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছি। কস্তা জামোতা, সমাক, দেশ পরিভাগ করিয়াছি। করিয়াছি সবই। কিন্তু রাধাকান্তের দান আজ আমার গলগ্রহ হইয়াছে। সকল ত্যাগী হইয়াও আজ আমি এই লোহার বাধনে সংসারে বাধা পড়িয়া রহিয়াছি। রাধাকান্ত হে! স্থান বাও প্রভু!”

অক্ষয়সরল বেয়ে বৃদ্ধ বালককে ফোড়ে টানিয়া লইলেন। আশ্চর্যবৃত্ত হইয়া আমি এই সর্বভাগী ভোগনাথ বৃদ্ধের চরণধূলি লইতে বাইতেছিলাম। বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “করেন কি? আপনি ব্রাহ্মণ বে!”

প্রণাম করি নাই বটে, কিন্তু তখনও আমি বুকিয়া উঠিতে পারি নাই,—সেই নিরপেক্ষ বিচারকের চক্রে কে ব্রাহ্মণ, কে শূত্র,—কে উচ্চ কে নীচ!

জমি-বিলির “উটবন্দী” প্রণালী

[শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার বি, এ]

সর্বপ্রথমে “উটবন্দী” অর্থ কি, তাহার আলোচনা করা বাউক। “আবাদ অধুনায়ে জমির কর নির্ধারণ” ‘উটবন্দী’ কথাটার অর্থ।

‘উটবন্দী’ প্রণালীর কথা ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের Bengal Tenancy Bill এ বকীরগতর্পমেণ্টের রিপোর্টে নিরূপিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

“ইহা একরূপ বাৎসরিক ভাড়াটিয়া প্রণালী। কখনও কখনও ইহা সাময়িক হইয়া থাকে। কবিত ভূমির কর নগদ টাকা দিতে হইয়া; কিন্তু ভূমির শতের গুণাবধারণ পূর্বক তাহা বিদ্যমান হইয়া থাকে। ভাড়াটিয়া প্রণালীর শতের গুণাবধারণ পূর্বক করগ্রহণের সহিত ইহার এ পর্যন্ত মিল আছে। কিন্তু ইহারের মধ্যে এই বিশিষ্ট বিভিন্নতা আছে যে, শেখোক্তাভিতে জমি বৎসর বৎসরে এক ব্যক্তির হস্ত হইতে অপর ব্যক্তির হস্তে যায় না, শেখোক্তাভিতে কিন্তু তাহা বাইতে পারে।”

(J. H. E. Garrette's Nadia Gazetteer.)

“কেবল দ্বারা বৎসরকালের কিবা এক বহুতর গৃহীত ভূমিতেই ‘উটবন্দী’ নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ

কৃষককে জমিদারের বৌধিক অধুনাতি লইতে, ওয়, এবং এক নির্দিষ্ট হারে কিছু জমি বন্ডোবস্ত করিয়া লইয়া চাষ করিতে হয়। বৃষক সেই ক্ষেত্রে শত উৎপন্ন হয় তখন ঐ জমির মাপ লওয়া হয় এবং উহার উপর কর ধার্য করা হয়।” (W. W. Hunter's Statistical Accounts, Nadia).

Rampini তাঁহার Tenancy Act এ বলিতেছেন, “উটবন্দী” রাইয়তীসনূহ অস্তত্বৃত্ত চুক্তি (implied contract) হইতে উৎপন্ন রাইয়তীর দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে জমিদারের বা তাঁহার গোমস্তার স্পষ্ট অধুনাতি না লইয়াই কৃষক জমি আবাদ করিতে থাকে এবং জমিদার তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না।

বাস্তবিক বলিতে গেলে, এইরূপ সৌক শয়ের ভূমিতে অনধিকার-প্রবেশকারী। কিন্তু যদি তাহাকে থাকিতে দিয়া ভূমি করণ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাইয়তীর চুক্তি ধার্য হইতে পারে, কিবা যদি কলের জন্ত তাহাকে আশ্রয়তে অতিশুক্ত করা হয়, তাহা হইলে রাইয়তী পরিহার্য তাহেই স্থাপিত হয়।

• • • যদি যে জমিদারের জমি কর্ষণ করিতে ইচ্ছা করে এবং জমিদার তাহাকে জমি বিলি করেন, তাহা হইলে তাহারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চুক্তি হয় এবং জুযামী প্রভা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

পুনরায় উক্ত হইতেই "কেবল কয় দাবী করণই জুযামী-প্রভা সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পর্যাপ্ত নহে। ইচ্ছাকে হাইরতী দানের প্রভাবের অধিক আর কিছুই বলা যায় না।"

• • • Tenancy Act এর ১৮০ ধারা বলিতেছে, "এই আইন থাকার পরে যে যে স্থানে 'উটবন্দী' প্রণালী বর্তমান, এমন স্থানে যদি কোনও প্রকার সেই প্রণালী অস্থগারে গৃহীত জমি থাকে, এবং সে জমি যদি সে সময়ের জন্য তাহাকে বিলি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে যদি উপস্থাপিত ১২ বৎসর ধরিয়া সে জমি না লাভ, তাহা হইলে সে এ জমি দখল করিবার ক্ষমতা পাইবে না এবং বতক্ষণ পর্যন্ত সে দখল করিবার অধিকার পাইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ঐ জমির জন্য জমিদার এবং তাহার মধ্যে চুক্তি কর প্রদান করিতে হইবে।"

হাইরতীর এই প্রণালী অস্থগারে শুধু কিংবা অন্য লগার সময় শেষ হইলে সে জমির অধ্বর্ষরতা বা অন্য কেহ না লগার বশতঃ পতিত থাকে বলিয়াই বোধ হয় "উটবন্দী" কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে। (Rampini)

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলার কলেক্টার বলেন, যে সকল কৃষক এইরূপ জমি গ্রহণ করে, তাহারা সেই জমি দ্বিতীয় বৎসরের কর্ষণ করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা ইচ্ছা করিলে সে জমিকে তিন বৎসর কাল রাখিতে পারে। প্রধানতঃ, এই প্রণালী অস্থগারে গৃহীত জমিদান এক হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কবিত হইতে পারে, এবং ঐ সময় ব্যাপিয়া পতিত থাকিতেও পারে। কৃষকসমূহ জমি দখলের কোনও অধিকার প্রাপ্ত হয় না এবং তাহারা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছাও করে না।"

Rampini পুনরায় বলিতেছেন "ইহা কেবলমাত্র এক বৎসরের ইচ্ছার বলিয়া প্রকার 'উটবন্দী' হাইরতী ভাগ্য করিবার পূর্বে জমিদারকে কোনও বিজ্ঞাপন দিতে হয় না।"

'উটবন্দী' প্রণালীর প্রধান বিশেষ লক্ষণসমূহ নিম্ন-লিখিত প্রকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পু্যে :—

(১) "উটবন্দী" হাইরতী অন্তর্ভুক্ত চুক্তি। (implied contract)। কৃষক প্রধানতঃ এক অসীদ্ধত হারে জুযামীর নিকট হইতে বৈধিক অস্থগতি পাইয়া থাকে।

(২) কেহ কেহ বলেন যে ক্ষেত্রের শক্তের গুণাবধারণ পূর্বক কয় দ্বিহীকৃত হয়।

(৩) এই প্রণালী অস্থগারে গৃহীত জমি কেবল মাত্র এক বৎসর অথবা এক বছর ভক্ত রাখা হইতে পারে। ইহা এক হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায় এবং তৎপরে পতিত থাকিতে পারে।

(৪) ধারাবাহিক ভাবে দ্বাদশ বৎসর জমি কর্ষণ না করিলে কৃষক সে জমি দখল করিবার ক্ষমতা পাইবে না। বলিতে গেলে ইহা প্রায় হয় না এবং কৃষককে যে কোনও সময়ে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যায়।

(৫) প্রকার জমি পতিতগণ কালে জমিদারকে কোনও বিজ্ঞাপন দিতে হয় না।

(ক) কাথাতঃ নদীয়ার কোন স্থানে প্রথমে একটা হার দ্বিহীকৃত হয় এবং শক্ত কাটা হইলে সেই হারে জমিদারকে নগদ টাকায় কয় দেওয়া হয়।

(খ) বখন কৃষক জমি কর্ষণ করিয়া থাকে, কেবল মাত্র তখনই তাহার জমিদারকে কয় দিতে হয় এবং জমি পতিত থাকিলে তাহাকে কয় দিতে হয় না।

কয় প্রদানের এইরূপ প্রণালী হইতেই 'উটবন্দী' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। জমি কবিত হইলে কৃষক 'উটরিয়াছে' বা 'উটা' এবং পতিত থাকিতে দেওয়া হইলে 'পতিত' বা 'পড়া' এই দুইটি কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। জমি কবিত হইলে সে কয় প্রদান করিয়া থাকে এবং পতিত হইলে করে না। এই নির্দিষ্টই 'উটবন্দী' কথাটির স্রষ্টা হইয়াছে।

এই প্রণালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যতন্তর আছে।

W. W. Hunter তাঁহার Gazetteer এ বলিতেছেন,—

"নদীয়া জেলার 'উটবন্দী' হাইরতীর বর্তমান সংখ্যা-বিধার কারণ তদ্রূপ কলেক্টার কর্তৃক নিরূপিত রূপে

নিম্নিষ্ট হইয়াছে,—১৮৬৪-৬৫ অঙ্গে তৃতিক এবং '১৮৬১-৬২ অঙ্গে মহামারীর নিমিত্ত অস্ত্রান্ত হারী রাইয়তী উগ্রিয়া বাওয়ার এই জেলার 'উটবন্দী' রাইয়তীর সংখ্যা অধিক।"

Garrette সাহেব তাঁহার Gazetteer এ লিখিতেছেন, "নদীরাই 'উটবন্দী' নামে জ্ঞাত রাইয়তীর উৎপত্তি স্থল। এই জেলা হইতেই রাইয়তী সন্নিহিত জেলাসমূহে বিস্তৃত হইয়াছে। নদীরা জেলার দ্বার কোথাও ইহা এত সাধারণ নহে। এই স্থানে কথিত ভূমির ৫ অংশ এই প্রণালী অমূল্যে প্রযুক্ত।"

কেহ কেহ বলেন নীলকর জমিদারেরা নীল চাষের সুবিধার জন্য ভাল ভাল জমি 'উটবন্দী' নিয়মে বিলি করিতে অনেক ভাল জমি 'উটবন্দী' জমা হইয়া যায়।

১৮৬১ অঙ্গে Montresor সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে এই প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন :—

"উটবন্দী রাইয়তী এই জেলাতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা নদীরা জেলার স্বকীয়। প্রায় সকল গ্রামেই প্রজাদিগের জমিদারী বাতীত কিছু জমি আছে। তালুকের পরিজাত স্বাধিকারীই ইহার প্রভু। আইনের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইবার নিমিত্ত পলায়িত প্রজাগণের জাত জমা এবং পলিমটি উৎপন্ন নব ভূমি ভাগ, সম্পত্তি কথিত বনভূমি বাহা বিনা ধম্মাতে কথিত এবং 'খাস খামার' হইতে এই সকল যে বলাবস্ত জমির সৃষ্টি হইয়াছে।

যে জমী স্বাধিকারী কর্তৃক স্বকীয় সংসারের জন্য রক্ষিত হয়, তাহাকে 'খাস খামার' বা 'লোকসানি জমি' বলে।

'ক্ষিত্রীণ বংশাবলী চরিত্ত্বৎ' লাহক একখানি মূল্যবান বাংলা পুস্তক হইতে 'উটবন্দী' নিয়ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ধর্মিও ১৭২০ অব্দের আইন ও চতুর্থ আইন অনুসারে জমিদারগণ তাঁহাদের প্রজাগণ কর্তৃক দখলীকৃত ভূমির জন্য তাহাদিগকে পাট্টা দিতে বাধ্য ছিলেন এবং তাহারা চাহিলে যদি জমিদার 'পাট্টা' না দেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিভাগস্বরে হস্ত দেওয়া হইবে, তাহাদিগও প্রথমে পাট্টা দান ও গ্রহণ প্রণালী নদীরা-জায়ে ইলাকার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল না। * * * * * অধিকাংশ রাইয়ত 'উটবন্দী' প্রণালী অনুসারেই ভূমি কর্ষণ, কথিত

এবং যদি তাহারা চিরকালের জন্য বন ভূমি রাখিতে চাহিত, তাহা হইলে তাহারা নায়েব কিম্বা গোমস্তাকে কিছু টাকা প্রদান করিত এবং তাহার নাম এবং তাহার জমার সংখ্যা তাহাদিগকে কত্ৰা হইত অথবা সে নায়েব বা গোমস্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত * পাট্টা লইত, * কিন্তু ইহা কখনও স্ত্রত হয় নাই যে এইরূপ কর্ষণকারী বা প্রতিনিধিপণ পাট্টা প্রদান করিবার অধিকারবৃত্ত।"

অতএব সেবা হইতেছে যে পূর্বে নদীরা জায়ে ইলাকার মধ্যে 'উটবন্দী' প্রণালী অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। মহাত্মা রাকেশ কৃষ্ণকান্তের সময়ে নদীরা-জায়ে ১৮৮১ উত্তর মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত, দক্ষিণে গঙ্গাধার পর্যন্ত পূর্বে মূল্যপূর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নদীর পশ্চিমে কুঁজপুর নামক এক বৃহৎ পরগণাও ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সময়ে এই জায়ে অস্তর্গত স্থানভাগ নদীরা, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বনোয় এবং বর্ধমান জেলার মধ্যে আছে। *

(অমরদামল)

আমরা জানি যে 'উটবন্দী' প্রণালী নদীরা, ২৪ পরগণা, বনোয়, খুলনা, মুর্শিদাবাদ এবং পাবনা জেলার বর্তমান। (Bengal Government's Report on the Bengal Tenancy Bill, 1894, VII cited by Rampini). এবং 'Garrett সাহেবের হস্তানুসারে 'উটবন্দী' নামে পরিচিত রাইয়তী নদীরা জেলার উৎপত্তি লাভ করিয়া তাহা হইতে সন্নিহিত জেলাসমূহে বিস্তৃত হইয়াছে।"

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 'উটবন্দী' প্রণালীর উৎপত্তি নদীরা জায়ে হইতেই এবং অস্ত্র কিছু হইতে নহে। নদীরা এবং তৎসন্নিহিত জেলাসমূহে যে সকল স্থানে 'উটবন্দী' প্রণালী অনুসারে পর্যন্ত বর্তমান, সে সকল পূর্বে নদীরা-জায়ে জমিদারী অস্তর্গত ছিল। এ স্থলে ইহা ঐতিহ্য যে যৈমেন-

- * অধিকার স্বাক্ষর ওঁরাণী পরগণা।
- পাট্টা হুজি আদি করি দস্তুরে দণ্ডা।
- জায়ে উত্তর নীচা মুর্শিদাবাদ।
- পশ্চিমে নীচা দক্ষিণে নীচা বার।
- দক্ষিণে নীচা দক্ষিণে নীচা বার।
- পূর্বে নীচা মূল্যপূর বড় দক্ষিণে নীচা বার।

(অমরদামল, ভারতবর্ষ)

নিম্নে এবং নদীঘাতে কোরফা প্রণালী বলিয়া একরূপ প্রণালী আছে। ইহার সহিত 'উটবন্দী' প্রণালীর কিছু সাদৃশ্য আছে।

'উটবন্দী' প্রণালী অহুগারে গৃহীত ভূমির মোট ক্ষেত্রফল (area) ঠিক নির্দেশ করা যায় না। প্রতি বৎসর ইহার তারতম্য হয়। আনুমানিক এই প্রণালী অহুগারে গৃহীত ভূমির পরিমাণ বর্ধিত হইতেছে কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

১৯১০ খৃঃ অব্দে Garrett সাহেব লিখিয়াছেন যে, কথিত ভূমির প্রায় ৩ অংশ এই প্রণালী অহুগারে গৃহীত। এক্ষণে এই প্রণালীর চল কি তাহা দেখা যাউক। ইহার একটা মঙ্গল ফল এই হইতেছে যে, ভূমিদারগণ অনিয়মিত খাজনা দিয়াই সুবিধা প্রাপ্ত হন। রাইরতকে পত্তনী জমা প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীতে অনেক বেশী কর দিতে হয়। সুতরাং এই আত্যাদিক করই রাইরতদিগের স্বপ্নগ্রস্ত হইয়া সর্বদা হওয়ার কারণ। অপর একটা ফল এই হইতেছে যে, রাইরত এই প্রণালী অহুগারে গৃহীত ভূমির ঐক্যবর্ধা সাধন করিতে চেষ্টা করে না। অর্থাৎ প্রণালী অহুগারে গৃহীত

হইলে সে একরূপ করে, কারণ সে জানে যে ভূমির ঐক্যবর্ধা সাধন করিলে সে নিজে লাভবান হইতে পারিবে। আর এক ভিনিসও লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত এবং তাহা এই :- ভূমিদার এবং 'উটবন্দী' রাইরতের সম্বন্ধ ভূমিদার এবং অন্তান্ত প্রজার সম্পর্কের দ্বারা বহিষ্ঠিত নহে। প্রথমোক্ত প্রজাদিগের নিমিত্ত ভূমিদার অতি অল্পই করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রণালীর অসুস্থ ফল একটা কথা বলা যাইতে পারে। রাইরত ভূমিদারকে যে উচ্চ কর প্রদান করে, ভূমি পতিত থাকিলে তাহার কিছু কিছু পূরণ হয় ; কিন্তু ভূমিগ্রাহক প্রত্যেক ভূমি পতিত থাকিলে বা না থাকিলেও প্রতি বৎসর কর দিতে হয়।)

অধিকাংশ সময় রাইরত 'উটবন্দী' অপেক্ষা জমা নির্দিষ্ট পছন্দ করিয়া থাকে।

৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নোক্ত প্রকল্পের দ্বারা জামিন ও চুক্তির কলেক্টর অধ্যক্ষ বিভিন্ন বিভাগীয় টংগে এই প্রকল্প পরিচালিত হইল। ইহুৎ সুশ্রেণীবদ্ধ সরকারি বি-এ ও ইন্টারমিডিয়েট স্কুলগুলোর প্রথম দিগিতে সাধারণ করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞান ।

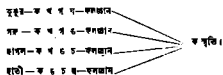
[অধ্যাপক শ্রীচাক্রান্ত সিংহ এম.এ]

চিন্তা

সামান্য জ্ঞান

"সামান্য জ্ঞানের" অর্থ।—আমি একটা কন্যা লেনু দেখিলাম। পরে একটা বাতাবি লেনু দেখিলাম। আবার একটা পাতি লেনু দেখিলাম। এতোকরই পৃথক-পৃথক 'কল জ্ঞান' লাভ হইল। এতোকরই স্বীতি মনোযোগে স্থান পাইল। কিন্তু মনোযোগে তাহার পৃথক-পৃথক থাকিতে পারে না। পৃথক-পৃথক লেনুর স্বীতি নিশিধা এক হইতেছে। এইরূপে বহু স্বীতির সমন্বয়েই একটা স্বীতির নাম "সামান্য-জ্ঞান"। কুকুর দেখিলাম, গরু দেখিলাম, ছাগল দেখিলাম, হাতী দেখিলাম, এতোকরই কলজ্ঞান হইল। এতোকরই স্বীতি মনোযোগে স্থান পাইল। এবং সকলগুলি নিশিধা

একটা স্বীতিতে পরিণত হইল। এইরূপ সম্মিলিত (১) স্বীতিকে—"জ্ঞান" নামে অভিহিত করিলাম। এইরূপ সম্মিলনকালে ব্যক্তিগত পর্য্যকোপলি অস্পষ্ট হইয়া যায়। বাহ্য সাধারণ, বাহ্য সকলেরই আছে, সেইটিই ব্যক্তিগত যায়।



‘ক’ পুনঃপুনঃ স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে; স্মৃত্যং পৌনঃ-
পুনঃ কেহু ক এহু স্মৃতি ক্রমশঃই স্পষ্ট এবং স্থায়ী হইতেছে;
অপরগুলি ক্রমশঃই মুছিয়া বাইতেছে। এখন বুদ্ধিগাম
‘ক’ বিশিষ্ট প্রাপ্তিমাতেই ভ্রম। ভ্রম বলিলে এখন
কুহুর বা গর বুদ্ধি না—অস্বাভাব্যেরই একটা ধারণা হয়।
কিন্তু এই সামান্য কথা হইতে সত্য জ্ঞানই জ্ঞান হইতেছে।
ভ্রম জ্ঞানব্যাচক শব্দ। যে জ্ঞান অবলম্বনে এই জ্ঞানব্যাচক
শব্দ সৃষ্ট, সেই জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান বলে।

সামান্য জ্ঞানের সৃষ্টি।—বাগকে কুহুর লইয়া খেলা
করে। প্রথমে সে যখন একটা কুহুর দেখে, তখন তাহার
সেই কুহুরই জ্ঞান হয়; কুহুরজ্ঞানের কোন জ্ঞান হয় না।
পরে যখন তাহার অভিজ্ঞতার প্রণীর বুদ্ধি হয়, যখন ধারণা-
শক্তি প্রবল হয়, তখন নানা প্রকারের কুহুর দেখে। এই-
রূপ অনেক কুহুর দেখিতে দেখিতে কোন একটা কুহুরের
জ্ঞান তাহার থাকে না; অথচ এক অভিনব জ্ঞানের সৃষ্টি
হয়, যে জ্ঞানের বলে সে সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট কুহুরেরও ধারণা
করিতে পারে। এইরূপ জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান বলে। এই
সামান্যজ্ঞানের সাহায্যে এক জাতীয় বহু বস্তুর ধারণা
সম্ভব হয়।

প্রথমে বাগকেট একটা কুহুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল—

- ১। ইহা দোড়িতে পারে
- ২। ইহার পা চারিটি
- ৩। ইহা ‘বেগ বেগ’ শব্দ করে
- ৪। ইহা প্রকাণ্ড
- ৫। ইহা পীতবর্ণের

আর একটা কুহুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল—

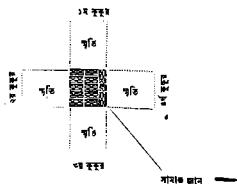
- ১। ইহা দোড়িতে পারে
- ২। ইহার পা চারিটি
- ৩। ইহা ‘বেগ বেগ’ শব্দ করে
- ৪। ইহা প্রকাণ্ড
- ৫। ইহা কৃষ্ণবর্ণের

এইবার বাগকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, তবে কি
সব কুহুর এক রকমের নয়? আবার আর একটা তাহার
লক্ষ্যপথে পতিত হইল; এবার সে দেখিল—

- ১। ইহা দোড়িতে পারে
- ২। ইহার পা চারিটি

- ৩। ইহা ‘বেগ বেগ’ শব্দ করে
- ৪। ইহা কুহুর
- ৫। ইহা খেতবর্ণের

• এইরূপ বহু কুহুর দেখিয়া বাগক বুদ্ধিতে পারিল,
কতকগুলি লক্ষণ সকল কুহুরেই আছে; আর কতক-
গুলি কোনটিতে আছে এবং কোনটিতে নাই। স্মৃত্যং
কতকগুলি লক্ষণ সাধারণ এবং কতকগুলি অসাধারণ।
বাগক অনেক কুহুর দেখিয়াছে; কিন্তু সকলেই সাধারণ
এবং অসাধারণ লক্ষণ মনে রাখা সম্ভব নহে; স্মৃত্যং কতক-
গুলি লক্ষণের বিস্মৃতি অনিবার্য। কিন্তু যাহারা বারংবার
স্মৃতিপটে আনীত হয়, তাহাদের বিস্মরণ অসম্ভব। যতবার
কুহুর দেখিতেছে, ততবারই সাধারণ লক্ষণগুলি স্মরণ-পথে
আসিতেছে। আর, অসাধারণ লক্ষণগুলি কখনও আসি-
তেছে, আবার কখনও আসিতেছে না। স্মৃত্যং সাধারণ
লক্ষণগুলিই বাগকের মনে থাকে এবং অসাধারণ লক্ষণগুলি
সে ভুলিয়া যায়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি অতি সামান্য;
কিন্তু এই সামান্য লক্ষণ হইতে সমস্ত কুহুরের বিধর আসরা
ধারণা করিতে পারি। ‘বেগ বেগ’ এই সামান্য লক্ষণ
বর্তমান, তাহাই কুহুর; আর যেখানে ইহার অভাব,
সেখানে কুহুরেরও অভাব। এই সামান্য লক্ষণ, কুহুর-
জ্ঞানি যাহার লক্ষণ।



সামান্য-জ্ঞান প্রেরণ।—“কুহুর” বলিতে তুমি কোন
একটা নির্দিষ্ট কুহুর বুঝিতেছ না—এই কুহুর বা সেই
কুহুর বুঝিতেছ না। বুঝিতেছ কোন সামান্য গুণবিশিষ্ট
একটা জ্ঞান। এই সামান্য-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তুমি
কতিপয় কুহুর পর্যবেক্ষণ করিলে; তাহাদের গুণগুলি

নির্ণয় করিলে (বিভ্রমণ) কোন গুণটি সকলের আছে, এবং কোনটি সকলের নাই বিচার করিলে, সাধারণ গুণ-গুলি অসাধারণ গুণ হইতে পৃথক ভাবে চিত্রা করিলে; মনে-মনে সাধারণ গুণগুলিকে একত্র করিয়া তাহাতে "কুহু" নাম আরোপ করিলে। অতএব সামান্ত-জ্ঞান লাভের এই কল্পটি মানসিক প্রক্রিয়া—

- ১। পর্যবেক্ষণ
- ২। বিশ্লেষণ
- ৩। বিচার
- ৪। অসাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া সাধারণ লক্ষণ চিহ্নন
- ৫। সাধারণ লক্ষণ একত্রীকরণ
- ৬। একত্রীকৃত লক্ষণের নামকরণ।

প্রত্যক্ষ বৃত্তি ও সামান্ত-জ্ঞানের সম্বন্ধ।—এই প্রকার সামান্ত-জ্ঞানকে ফলজ্ঞান বলা যায় না। ফলজ্ঞানে স্পর্শ-হুতি আবশ্যিক। এখানে কোনপ্রকার স্পর্শহুতি নাই। এরূপ জ্ঞানকে বৃত্ত বস্তুর বলিতে পারি না, কারণ বৃত্ত বস্তুর ফলজ্ঞানের প্রতিরূপিত নাত্র। সামান্ত-জ্ঞানের অধরূপ কোন বস্তুর সর্বাংগ বাহু ভগতে থাকিলেও তাহার ফলজ্ঞান সম্ভব নহে। অবশ্য বহু বৃত্তির সমবায়ে এই সামান্ত বৃত্তির উদ্ভব হইতেছে সত্য, কিন্তু এই সামান্ত বৃত্তি কোন একটীও বৃত্তির মত নহে। এই—“সামান্ত বৃত্তি” কোন বৃত্তিরই অবিকল প্রতিরূপিত নহে। ইহাকে কল্পনাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, কল্পনার উপকরণ আবশ্যিক। পৃথক ভাৱী নামনা বস্তুর ফলজ্ঞান হইতে

কল্পনার উপকরণ সংশ্লীষ্ট হয়। কিন্তু এক ভাৱী পৃথক বস্তুর ফলজ্ঞান হইতে সামান্ত-জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কল্পনা এবং সামান্ত-জ্ঞান এই দুইয়েরই উপকরণ ফলজ্ঞান সরবরাহ করিয়া থাকে—কিন্তু কল্পনার উপকরণের মধ্যে পার্থক্য প্রবল এবং সামান্ত-জ্ঞানের উপকরণের ভিতর সাদৃশ্যই অধিক।



সামান্ত-জ্ঞানের মূল ভিত্তি স্পর্শহুতি। স্পর্শহুতি হইতে ফলজ্ঞান, ফলজ্ঞান হইতে বৃত্তি এবং বৃত্তি হইতে সামান্ত-জ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে। সামান্ত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এক ভাৱীর অন্তর্গত বহু বস্তুর বৃত্তি প্রয়োজন; কিন্তু ফলজ্ঞান ব্যতীত বৃত্তি এবং স্পর্শহুতি ব্যতীত ফলজ্ঞান সম্ভব নহে। কোন একটী বস্তুর ফলজ্ঞান বা বৃত্তি সম্ভব; কিন্তু এক কালে এক ভাৱীর বহু বস্তুর জ্ঞানকে বৃত্তি বা ফলজ্ঞান বলা যায় না।

ফল	বৃত্তি	সামান্ত জ্ঞান
অবলম্বন—স্পর্শহুতি	অবলম্বন—স্পর্শহুতি	অবলম্বন—বৃত্তি
প্রত্যক্ষ	পারোক্ষ	অতিপারোক্ষ
উপস্থিত বস্তুর জ্ঞান	অনুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান	একভাৱীর বহুবস্তুর জ্ঞান
“বাস্তব”	“চিন্মায়া”	“চিৎ”

অস্পষ্ট সামান্ত জ্ঞানের হেতু।—বালক বেথিল, তাহার পিতার বেশ এবং মস্তক দীর্ঘ এবং ক্রক বর্ণ। বালক এখন তাহার শিকড়কে “বা” (বান) বলিতে শিখিয়াছে। বালক ঐ প্রকার বেশ এবং মস্তক বিশিষ্ট আর একটী লোক দেখিলেও তাহাকে “বা” বলিয়া থাকে। বালক তাহার বাড়ীতে অনেক লোকই দেখিতে পায়; এবং অনেক

লোকের মধ্যে বাগীর বেশ এবং মস্তক দীর্ঘ, তাহাকেই “বা” বলিয়া থাকে; এবং এরূপ বেশ এবং মস্তকবিশিষ্ট অপর লোক দেখিলেও “বা” বলিয়া হাত তুলিয়া তাহার কোলে বাইতে চাহে। বালকের হয় ত মনে-মনে হইতেছে যে, দীর্ঘ ক্রকবর্ণ বেশ মস্তকবিশিষ্ট মানুষকেই “বা”। বালকের পিতার আরও অনেক এমন গুণ আছে, বাহা অপরকে নাই; কিন্তু

বালক এখন নিত্য শিশু ; স্তত্রায় সেই গুণগুলি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার শক্তির অধিকারী সে এখনও হইতে পারে নাই। সেই ক্ষুদ্র বালকের ভ্রম হইতেছে। তবে বালকের সামান্য জ্ঞান লাভের হ্রেন দেখা দিরাছে। তাহার পরিবারস্থ বন্ধ লোকের মধ্যে সে এমন একটা লক্ষণ বাছিয়া লইতে পারিরাছে, যাহা তাহার পিতা বাতীত অপর কাহারও নাই। বাশকেন্দ্রা অপর প্রীণেককেও নিজের দা বলিয়া ভুল করিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু সে ভুল কথাটিং ঘটয়া থাকে। বালক তাহার মাতার প্রতি অধিক আস্থা ; স্তত্রায় তাহার মাতার বিষয় যত মনোযোগ পূর্বক প্রণিধান করিয়া থাকে, পিতার বিষয় তত করে না। অনেকই ভিন্নিক মস্ত বলিয়া থাকে। তাহার কারণ, মস্ত মলমস্ত, তিনিও অলমস্ত। তিনি মস্ত জাতীয় কি না দেখিতে হইলে, ভাল রূপে পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে, তিনি মস্ত মস্তের সাদৃশ্য অধিক, কি বৈসাদৃশ্য অধিক। কিন্তু সেসব পর্যবেক্ষণের সুযোগ অনেকেরই হইরা উঠে না। স্তত্রায় 'মলে বাস করাটা'ই মস্ত জাতীর সাধারণ গুণ বলিয়া মনে করিয়া লয়। আমরা পরমাকে গোল বলি, ডিহ গোল বলি, লেবু গোল এবং ছড়িও গোল বলিয়া থাকি। এখানে 'গোল' কথাটি বড়ই অসংকল্প ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে ; এবং অনেক স্থলেই আমরা এমন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। পরমা, ছড়ি, ডিহ, লেবু প্রভৃতিকে যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই ; তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বিসাদৃশ্য গুণাবলীর সম্যক বিশ্লেষণ করা হয় নাই ; অসাধারণ গুণ হইতে সাধারণ গুণগুলি বাছিয়া লওয়া হয় নাই এবং অবশেষে এই সাধারণ গুণের সমন্বয়ে 'গোল' বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। অতএব অসংকল্প ভাবাই এই অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের ফল। সামান্য জ্ঞান স্মৃতি-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; স্তত্রায় স্মৃতি-শক্তি দুর্বল হইলে কিংবা সময়ের ব্যবধান-ফেঁদু স্মৃতির লোপ হইলে সামান্য জ্ঞান অস্পষ্ট হইতে পারে না। অপরিমিত কল-জ্ঞান, অসম্যক পর্যবেক্ষণ, অসংকল্প ভাষা, সময়ের ব্যবধান, স্মৃতি-শক্তির অভাব ইত্যাদি অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের ফল।

সামান্য জ্ঞানের উপকারিতা।—সামান্য জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপরাপর মানসিক ক্রিয়ামিত্র স্মৃতি লাভ করিয়া

থাকে। সামান্য জ্ঞান মানা প্রকার মানসিক ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কলজ্ঞান, অবধান, বিশ্লেষণ, স্মৃতি-শক্তি, বিচার প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন। অতএব সামান্য জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিলে অপরাপর গুণের উৎকর্ষ সাধন হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কতপত বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছি ; কত পত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতেছি ; কিন্তু এই প্রত্যেক-টিকেই যদি পৃথক ভাবে আনন্দিকগত মনে রাখিতে হইত,—তাহা হইলে আমাদের মন একবারে অকর্ষণ হইয়া পড়িত, জ্ঞানের প্রকাশ বা বিস্তার সম্ভব হইত না। কিন্তু সামান্য জ্ঞান ভাবসমূহের মধ্যে শূন্য আনন্দন করিতেছে, ভাব-সমূহের শ্রেণীবিভাগ করিতেছে ; অসামান্য গুণি বাস দিয়া সামান্য গুণি গ্রহণ করিতেছে। অসামান্য গুণির বিশোধ-ফেঁদু স্মৃতির কাঁচা সহম হইতেছে ;—অন্ত ভাব গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইতেছে, জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে ; এক্ষে বহুকের চিন্তা সম্ভব হইতেছে। সামান্য জ্ঞান হইতে আমরা ভবিষ্যৎ এবং অতীতকে বর্তমানে চিন্তা করিতে পারি—জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের অনুমান করিতে পারি। সামান্য জ্ঞানের উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ জ্ঞানই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞান পৃথক-পৃথক বস্তু পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনার পর সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করে। সামান্য জ্ঞান বাতীত শ্রেণীবিভাগ বা নিয়ম-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

“বহুর বা এক করে ; বিভিজের করে বা সয় ;—
প্রভুতেরে করি” আনে নিম্ন ক্ষুদ্র তর্জুনীর বশ

—সেই প্রেম হ'তে মোরে গ্রিয়া
মেখে না বাকিত করি।”

অবগতি।

বালক ক্রীড়াবীল
কুসুর গুণপালিত পণ্ড
মেঘ হিংস্র ঘন নহে

এই বাক্য কয়টি নিয়মিত প্রকারে বিশ্লেষণ করা
যায়—

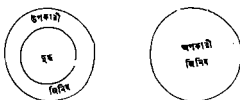
উপকারী একটি পদ	বালক	হয়	ঐচ্ছানন্দ	অপকারী একটি পদ
	কুহুর	হয়	গৃহপালিত পশু	
	মেঘ	নয়	হিংস্রক অন্ত	
	উদ্বেগ	সংবোধক	বিধেয়	

“যে পক্ষের উদ্দেশ্যে অপরটির অবস্থা কিংবা নিবেশ করা হয়, সেইটিকে উদ্বেগ বলে। এবং উদ্বেগের সহিত যে পক্ষটির অবস্থা কিংবা নিবেশ করা হয়, সেই পক্ষটিকে বিধেয় বলে। যে শব্দের দ্বারা উদ্বেগের সহিত বিধেয়ের অবস্থা কিংবা নিবেশ করা যায়, তাহাকে সংবোধক বলে।”

আমরা বধন বলি “কুহুর গৃহপালিত পশু,” তখন “কুহুর” এবং “গৃহপালিত পশু” এই দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ জান প্রকাশ করিল। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়াকে অবগতি বলে। বধন এই মানসিক সম্বন্ধ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তখন ইহাকে বাক্য বলে।

বাক্য	অবগতি
১। উদ্বেগ	১। { দুইটি প্রত্যয়
২। বিধেয়	২। {
৩। সংবোধক	৩। তাহাদের সম্বন্ধ
দুইটি প্রত্যয়ের স্বরূপতা (স্বরূপ সম্বন্ধ) বা বিরূপতা-জ্ঞানের নাম অবগতি।	

এখানে দুইটি স্তর দেখা আছে। এই রেখাধার তুলনা করিয়া আমি বীমাংসা করিলাম যে, ক খ অপেক্ষা ছোট।



“হৃদ বড়ই উপকারী” বধন আমার এইরূপ অবগতি হয়, তখন বেন আমি সমস্ত জিনিসকে দুই প্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কেলি। উপকারী জিনিস এবং অপকারী জিনিস। আমি হৃদকে উপকারী জিনিস এবং অপকারী জিনিসের

সহিত তুলনা করি, এবং পরে আমার এই বীমাংসা হয় যে, অপকারী জিনিস অপেক্ষা উপকারী জিনিসের সহিত ছোটের সাপেক্ষ অধিক। অতএব তুলনা এবং বীমাংসা এই দুইটি অবগতির প্রক্রিয়া।

ফলজ্ঞানে আমরা এক একটা বস্তুর প্রত্যেক জ্ঞান লাভ করি। ফলজ্ঞান হইতে বিশেষ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। সামান্যজ্ঞান হইতে একজাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞান হয়। সামান্য-জ্ঞান হইতে সাধারণ প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। দুইটি বিশেষ প্রত্যয়ের কিংবা দুইটি সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা একটা বিশেষ এবং একটা সাধারণ প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ অবগতির কার্য। অতএব ফলজ্ঞান এবং সামান্য-জ্ঞান হইতে অবগতির উপকরণ পাওয়া যায়।

অবগতি ব্যতীত ফলজ্ঞান অসম্ভব; কারণ, তুলনা এবং বীমাংসার পরিণামই ফলজ্ঞান, এবং তুলনা এবং বীমাংসারূপ প্রক্রিয়াকেই অবগতি বলে। যতদূর শব্দ তুলিয়া বলিলে “ফলজ্ঞানের বড়ি বাড়িতেছে”—তোমার ফলজ্ঞান হইল; কিন্তু অবগতি ব্যতীত ফলজ্ঞান অসম্ভব। বধন শব্দ তুলিলে, তখন বর্তমান শব্দটি অন্ত শব্দের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে, ইহা বড়ির শব্দের মত—অন্ত শব্দের মত নহে; আরও বুঝিলে যে, এই শব্দ তোমার পূর্বে প্রাপ্ত ফলজ্ঞানের বড়ির শব্দের মত। অতএব বীমাংসা করিলে যে, এটো ফলজ্ঞানের বড়ির শব্দ। অবগতি ব্যতীত সামান্য-জ্ঞানও অসম্ভব; কারণ তুলনা এবং বীমাংসা দ্বারাই সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত হয়। একজাতীয় বহু বস্তু পর্যবেক্ষণ করিতে হয়; পৃথক-পৃথক বস্তুর লক্ষণাবলী বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিভিন্ন (x) লক্ষণাবলির তুলনা করিয়া সাধারণ লক্ষণের বীমাংসা করিতে হয়। এক কথায় বলিতে হইলে, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতেই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি বর্তমান। লক্ষ্যেই একই মনের ক্রিয়া, আমরা কেবল চিন্তাধারা তাহাদিগকে পৃথক-পৃথক করিয়া ভাবি।

দুইটি প্রত্যয়ের সঞ্চয় নির্বাহ করা অবগতির কার্য ; হুতরাং প্রত্যয় অস্পষ্ট হইলে অবগতিও অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যয়গুলি সংখ্যায় বহু বেশী হইবে এবং বহু হ্রস্পষ্ট হইবে, অবগতিও তত প্রশাসনশূন্য হইবে। বালক-বালিকাযের প্রত্যয়গুলি তত স্পষ্ট নহে—সংখ্যাতেও কম ; সেইজন্য তাহাদের বিচারও দোষশূন্য হয় না। দুইটি প্রত্যয়ের সঞ্চয় নিক্ষেপ করিতে হইলে, কিংক সময়েই প্রয়োজন ; হুতরাং সময়েই অস্তাব হইলেও অবগতি তুল হইতে পারে ; প্রথম-বারে সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বারে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অন্তের কথাই অথবা আত্মা স্থাপন করিলেও অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অহুত্বের প্রাবল্য অনেক সময়ে বর্ধমান অবগতির অন্তরায় হইয়া থাকে। আমি বাহ্যকে প্রোণাণেপকা ভালবাসি, সে মন্য করিলেও ভাল বলিয়া যোব হয়। আমি বাহ্যকে অত্যন্ত দুগা করি, তাহার ভাল কাজও মন্য বলিয়া মনে হয়। পূর্বে হইতে কোন ব্যর্থতার বশবর্তী হইলে অবগতির ক্রিয়া নির্বোধ না হইতে পারে।



তোমাকে আর ১১টার সময় কলেজে বাইতে হইবে। তোমার বক্তৃতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি সময় ঠিক করিতে পারিতেছ না। কিছুক্ষণ পরে কাছারির বক্তির শেষ শুনিতে পাইলে। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার কর্তব্য বাঞ্জিল তাহা তোমার গণনা করা হইল না, কিন্তু তোমার মনে হইল ১১টা বাঞ্জিল। তাড়াতাড়ি আহোরাতি সংগঠন করিয়া কলেজে ছুটিলে। কলেজে প্রবেশ করিয়া বক্তির বিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে। প্রথমেই তোমার মিনিটের কাঁটাতে নজর পড়িল। দেখিলে উক্ত কাঁটাটি ৬৫র দাগে আছে। বাজীতে তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল ১১টা বাজিয়াছে—আবার এখন দেখিলে মিনিটের কাঁটাটি ৬৫র দাগে আছে। হুতরাং তোমার আর সন্দেহ থাকিল না ; ১১টা বাজিয়াছে—তোমার

এই অবগতি হইল। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলে, তোমার আদিবার এখনও সময় হয় নাই। তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রিয়াক্রিয়া আসিলে। পুনরায় বক্তির বিকে দৃষ্টিপাত করিলে। পূর্বে ছোট কাঁটাটির দিকে তাকাও নাই—এখন তাকাইলে। দেখিলে ১১টা নয়, মাত্র ১০টা বাজিয়াছে। বৃত্তিতে পারিলে, তোমার পূর্বে অবগতিতে তুল ছিল।

জীবনের প্রথম উদ্যেগ হইতেই বিচার-শক্তির বিকাশ হয়। যেখানে জ্ঞান, সেইখানে বিচার। বৈদ্যদুস্ত আনয়ন বাজীতে জ্ঞান থাকে না। তুলনা এবং মৌল্যসং বাজীতে বৈদ্যদুস্ত নিরূপিত হয় না। হুতরাং এখনই জ্ঞানের বিকাশ, তখনই বিচার-শক্তিরও বিকাশ। জীবনের প্রথম অবস্থায় ভাবার অস্তাব বলিয়া বিবেচনামূলকিতও অস্তাব মনে করা তুল। কথা করিতে পারিবার বহুপূর্বে বিচার করিবার ক্ষমতা আনিয়া থাকে। অবশ্য তাকা অবগতির প্রকাশক। ভাবার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে বিচারশক্তির উন্নতি অগ্রসরিত হয়। বালক প্রথমে ভাবে, পরে বলে। প্রথমে “কুকুর” জীবিয়া নয়, পরে বলে “কুকুল” ; তার পর হয় ত বলে “কুকুল পা” এবং অবশেষে “কুকুল পা আছে”। তাহা বিচার-শক্তির চিহ্ন হইলেও, এ চিহ্নকে সত্যমানে মনে করা উচিত নয়। বালকেরা অহুত্বপ্রিয় ; হুতরাং অহুত্বপ্রিয় করিয়া জ্ঞানীয় মত কথা বলিয়াও, উদ্যেগের বিচার-শক্তি জ্ঞানীয় মত নহে। বিচারশক্তির বতই উদ্যেগ হয়, জ্ঞানেরও ততই বিকাশ হয়। বাহ্য প্রথমে অস্পষ্ট, তাহা পরে হ্রস্পষ্ট হয়। মনে করা, মাকড়সা সন্ধ্যায় তোমার বিশেষ জ্ঞান নাই। তবে তুমি এই মাত্র জান যে—

১। ইহা একটা কদম্বী মৌব

২। ইহা জাল তৈয়ার করে (৭)

পরে এই অঙ্কটিকে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে, এবং ইহার সন্ধ্যায় আরও করেকাট বিদ্য অবগত হইলে—

৩। ইহার আটটা পা আছে

৪। ইহার শরীর ছই অংশে বিভক্ত

৫। ইহার পাশক নাই।

এইরূপে বতই তোমার অবগতির সংখ্যা বাড়িয়া

হইবে, ততই মাঝমাঝে সন্ধ্যা জ্ঞান পরিপূর্ণ হইবে।

স্মৃতি।

মন আমাদের নানাবিধ প্রত্যয়ের আধার। প্রত্যয়গুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। একটা অপরটির সহিত সহজেই মিশিত হয়। 'সম্পূর্ণ' 'অংশ' এবং 'বৃহৎ'—এই তিনটি প্রত্যয়। যাহার এই তিনটির জ্ঞান আছে, সেই ইচ্ছার মধ্যে সন্দেহ স্থাপনে সমর্থ হইবে। সে মনে করিতে পারিবে, 'অংশ' অঙ্গের 'সম্পূর্ণ' বৃহৎ। 'অংশ' এবং 'বৃহৎ' এই দুইটি প্রত্যয়ের ধারণা না করিয়া 'সম্পূর্ণ'র ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। মনে কর 'জননী' 'কন্যা' এবং 'ভালবাসা' এই তিনটি প্রত্যয়ের ত্রৈধার ধারণা আছে; হস্তায় এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে সন্দেহ স্থাপন করিবে তুমি একটা ব্যাকার সৃষ্টি করিতে পার; যথা—'জননী কন্যাকে ভালবাসেন'। কিন্তু জননী এবং কন্যা উভয়েকেই যদি ভালবাসার পাত্র করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে একটা নূতন 'উদ্দেশ্য' সৃষ্টিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে কর, এই নূতন উদ্দেশ্যটি 'মাহুৎ' কিংবা 'জানী মাহুৎ'। এখন তুমি বলিতে পার, 'জানী মাহুৎ জননী এবং কন্যাকে ভালবাসে'। এই নূতন উদ্দেশ্যটি পাইবার জন্য মাহুৎয়ের কথা কেন ভাবিলে—'জানী' কিংবা 'পরমা'র কথা কেন ভাবিলে না? 'জানী' কিংবা 'পরমা'কে উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, বর্তমান প্রত্যয়গুলির মধ্যে সন্দেহ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যয়ের মধ্যে সন্দেহ স্থাপন আমাদের সম্পূর্ণ চৈতন্যের নহে। সত্যের মধ্যস্থ অঙ্গের সত্যের প্রত্যয়গুলির মধ্যে সন্দেহ স্থাপন করিতে চাইলে, প্রত্যয়গুলির স্বাভাবিক সন্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রত্যয়গুলির মধ্যে সন্দেহ স্থাপনের ক্ষমতা থাকিলেও আমাদের অধিকার নাই। যদি ক্ষমতার অপব্যবহার কর, তবে সত্যের অপলাপ হইবে। প্রত্যয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে

হইবে, উদ্দেশ্যের ধারণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং স্পষ্ট হইবে, ততই তাহারের প্রকৃতিগত সন্দেহ নির্মূলে সন্দেহ হইবে। বর্তমান হইতে অতীতের এবং ভবিষ্যতের কথা জানিতে পারিবে। আমরা সকলেই জীবন-সংগ্রামে গিয়া। এই সংগ্রামে অরাজক করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যিক। যখন নূতন অবস্থার মধ্যে পতিত হই, তখন পুরাতন প্রথা (কাঁচকাঁচ) হইবে বলিয়া মনে করি না। পুরাতনকে পরিহারপূর্বক নূতনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর।

"ভাবিতেছে পুরাতন, গড়িছে নূতন,—
অগতির নীতি এই মহা বিবর্তন।"

মুগ্ধ প্রত্যয়সমূহকে উৎসর্গ করিয়া তাহার সাহায্যে নূতন অবস্থাতেও ভরসা দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। 'একদিকে পুরাতনের সাহায্যে নূতনের সমুদায় চরিতে চাইলে শক্তির আশ্রয় লইতে হইবে; এই শক্তির নাম বুদ্ধি। বুদ্ধিবলে নূতন প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় না; কিন্তু পুরাতন প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন জ্ঞানের বিকাশ হয়। সকল মাহুৎ ঘরে। যত মাহুৎ, অতএব বড় মরিবে। এখানে কোন প্রত্যয় নূতন নহে—কিন্তু বড় মজ্জিবে—এ জ্ঞানটি নূতন। অথবা, সত্য মরিয়াছে, বড় মজ্জিবে, সত্য মরিয়াছে—অতএব মাহুৎ অমর নয়। এখানেও পুরাতনের সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি হইল।

মাহুৎ সত্য জ্ঞানোন্মেষণে বসে। জ্ঞানের বসতি বিপুলিত হউক না কেন, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। বসতি জ্ঞানি না কেন, তৃপ্তি কিছুতেই হইবে না। হারা জ্ঞানি না, তাহা জানিতে চাই। হারার প্রত্যেক জ্ঞান অসম্ভব, তাহার অস্বীকৃত জ্ঞান লাভে সচেষ্ট। আমরা বর্তমানে আবদ্ধ থাকিতে পারি না,—বর্তমানকে ভেদ করিয়া অতীত এবং ভবিষ্যতে যাইতে চাই। প্রত্যয়ের সাহায্যে-পর্যায়ের বহনিকা সন্ধানিতে চাই। যে মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে জ্ঞাতপূর্বক সন্দেহ হইতে অজ্ঞাতপূর্বক সন্দেহ নিরূপিত হয়, তাহাকে বুদ্ধি বলে।

দার্জিলিং ও কালিম্পাং

[ত্রিপুরার উত্তর-চট্টোপাধ্যায়, বি-এল]

দার্জিলিং পূর্বে সিকিম-বিপত্তির অধিকৃত ভূমি ছিল। তথ্যরা এক সময়ে ইহা অধিকার করিবার প্রয়াসী হইয়া কতকাংশে সফলকাম হইয়াছিল। নেপালের সীমান্ত-প্রদেশ সহীরা ১৮১৪ অব্দে ইংরেজের সহিতও নেপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের ফলে, নেপাল সিকিম-রাজ্যের যে সকল ভূমি অধিকার করিয়াছিল, তাহা ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করে। ইংরেজ সেই সকল ভূমি সিকিম-রাজ্যকে প্রত্যর্পণ করেন; কিন্তু এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হয় যে, ইংরেজ সিকিম-রাজ্যের অধিবাসক স্বত্ব প্রাপ্ত করেন, এবং সিকিমের সহিত নেপালের বা অপর কাহারও কোনও বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই বিরোধের মীমাংসার ভার ইংরেজের উপর ন্যস্ত হইবে। কিছুকাল পরে নেপাল ও সিকিমে বিরোধ উপস্থিত হইলে লাট সাহেবের উপর তাহার বিচারের ভার অপিত হয়। তদনুসারে লাট সাহেব ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে (Lloyd) লয়েড সাহেবকে বিরোধের বিষয়ীভূত স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ের অঙ্গসম্বন্ধের মন্ত প্রেরণ করেন। ফ্রান্স ও গ্র্যান্ট সাহেব ত্রিকিণ্গ পর্য্যন্ত সিরাজিহিনে এবং পশ্চিমঘো দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। লয়েড সাহেব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রসাহী মালে দুইদিন ব্যতীত দার্জিলিং দেখিয়াছিলেন—তাহার পূর্বে কোনও যুরোপবাসী দার্জিলিং দর্শন করেন নাই। লয়েড এবং গ্র্যান্ট উভয়েই দার্জিলিং দেখিয়া দ্বিগ্ন করেন যে, বাহ্যের অঙ্গ, ব্যবসায়ের অঙ্গ, এবং নেপাল-ভূটানের দ্বারদেশে সামরিক উদ্দেশ্যে এই স্থান ইংরেজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং তাহাজ্ঞা উভয়েই অবশ্যই বড়লাট বেট্রি সাহেবকে এই স্থান অধিকারভুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেন। দুয়োপক্ষ শীঘ্রই উপস্থিত হইয়াছিল। কতকগুলি নেপালী লেপচা সিকিম-রাজ্যে সৌভাগ্য করিলে, লয়েড সাহেব তাহার অঙ্গসম্বন্ধের ভার গ্রহণ করেন এবং নেপালীগণকে স্বদেশে প্রত্যাপন করিতে বাধ্য করেন। তাহার পরেই ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে এক দলিল সম্পাদন করিয়া সিকিম-

রাজ ইংরেজ-রাজ্যকে বিনামূল্যে দার্জিলিং অর্পণ করিলেন। দলিলখানি অতি ক্ষুদ্র। তাহাতে লিখিত আছে যে, "লাট সাহেব দার্জিলিং পাণ্ডুড়ী পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন—কারণ উহা শীতপ্রধান; পূর্বঘোড়ের কণ্ঠ-চাকীরা অসুস্থ হইলে এই স্থানে আসিয়া বাহ্যামৃত করিতে পারিবেন। তজ্জন্ত লাট সাহেবের সহিত বন্ধুতা প্রবৃত্তি আমি সিকিম-বিপত্তি ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানিকে দার্জিলিং দান করিলাম।" রাজা কোনও মন্তব্য দাবী করেন নাই। তখন উহার মূল্যই বা কি ছিল? ওখানি ইংরেজ-রাজ্য স্বতঃ-প্রাপ্যমিত হইয়া প্রথমতঃ বাবিক ৩০০০ টাকা, পরে ৬০০০ টাকা রাজ্যকে দিয়া আসিতেছেন। ইংরেজাধিকারে আসিয়া দার্জিলিং-এর লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সমগ্র দার্জিলিং জেলার অধিবাসী সংখ্যা ১০০ জন ছিল—১২০১ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং জেলার অধিবাসীর সংখ্যা ২৪৯১১৭ হইয়াছিল, তদনুযায়ী কেবলমাত্র দার্জিলিং সহরেই ১৬২২৪ জন অধিবাসী ছিল।

দার্জিলিং-এর ভ্রূপ-সম্ভার অপূর্ণ ও অনন্ত-সাধারণ। যখন রৌদ্র হাসিতেছে, তখন কি স্থানীয় আকাশ, মহামহিমময় কাকসমষ্টির ভ্রূষারশ্মির সহিত কি মহান ভাব বিকশিত! দূরে-অদূরে গিরি-শ্রেণী-ভরসের কি মনোহর মীলভঙ্গী! গিরি-অঙ্গে বৃষৎ-বৃষৎ কত বৃক্ষ, কত লতা, কত বকমের, কত বর্ণের কুসুমরাগ! কি বিচিত্র কারুকার্যময় ভঙ্গ ও শৈবাগম! স্থানে-স্থানে কলনামিনী নিবহিত্বি চিত্র-শিতরতা।

কখনও বাহার উপরে রৌদ্র,—কিন্তু দূর গিরি-শ্রেণীর উপর মেঘাভকার—নিরদেশ হইতে লঘুপক্ষ মেঘরাশি ধীরে-ধীরে উঠিতেছে। কখনও বা বাহার উপর মেঘ,—দূরে রৌদ্র চক্চক করিতেছে। কখনও বা দূরে মেঘের ভিতর দিয়া সূর্য্য-রশ্মি পাণ্ডুড়ের উপর পড়িয়াছে—সে দৃশ্য বর্ণনা-তীত। রৌদ্র মেঘের ভিতর দিয়া প্রিগছে বলিয়া তাহার তীব্রতা নাই—অথচ মধুর মীলি আছে; কিন্তু কোম্পার

মত কোষল নহে—গেটা যেন পৃথিবীর সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। তাহা হইতে কিছু নুতন ও পূর্ণব—একটা দ্বারা-দ্বারা—একটা পূর্ণ-কুবনের মত দেখায়।

হুইটা গিরিশ্রেণীর মধ্যে যে গহ্বর তাহাতে শুষ্ক বেথ-রাশি গ্রন্থপু ফেন-পুস্ত্রের দ্বারা কখন-কখনও লগান থাকে। ইচ্ছা হয়, কাছে গিয়া একবার তাহাদের গারে হাত কুলাইয়া আসি। বেথিতে-বেথিতে তাহারা ঐষং ছুঁদিয়া উঠিতে থাকে—একটু-একটু করিয়া শিথিল-কলেবর মেঘরাশি ফুসাসা হইয়া উঠিতে থাকে। বায়ু যেন ঘন হইয়া, ঐষং কাল হইয়া উঠিতেছে। ‘অকলতা কুহুমরাশির উপর ফুসাসা আসিতেছে—তাহারা যেন হুশ্ট আছে—একটু অশষ্ট—আরও অশষ্ট—তাহাদের বেশ ছায়া-কায়া দেখাই-তেছে—তারপর একেবারে অশুষ্ট—আবার একটা ছায়ার মত—আবার একটু-একটু করিয়া ফুসাসার বজা সরিয়া গেলে তাহাদের বিকাশ হয়।

সম্মুখে গিরি-লগ্নী! কোনও গিরি হই কোণ, কেহ ঘন কোণ, কেহ বা কুড়ি কোণ দূরে,—গিরিশ্রেণীর অন্ত নাই। গিরি-ভরসের পর ভরস, আবার ভরস—আবার ভরস। গিরি-সমুদ্রের উপর রৌদ্র ঝলসিতেছে,—রৌদ্র-লোক কোথাও সবুজবর্ণ তরুরাশি, কোথাও মকমলের সিঁড়ির দ্বারা চা-বাগান, কোথাও রক্ত-রেখা জলপ্রপাত, কোথাও শুষ্ক পাথর, কোথাও বা বেত-বিন্দুমালা-সম কুটারশ্রেণী নরনকে চরিতার্থ করিতেছে। বেথিতে-বেথিতে ফুসাসা উঠিল,—ফুসাসা সব ঢাকিয়া ফেলিল,—যেন রঙ্গ-শাশুর কেহ বহনিকা ফেলিয়া দিল। সম্মুখে কেবল এক বলাভকার মহাসমুদ্র—পৃথিবী হইতে যেন সব বুদ্ধিরা গিয়াছে—এক নীরব বিরাট মহাপুঞ্জ। আবার যেন কে একজন চিত্র-শিল্পী তুলিকা লইয়া চিত্রপটে বাহুবল্লভ অশ্বলি-সকলনে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিতেছে—একপার্শ্বে রং ছুঁটিয়া উঠিতেছে—ক্রমে ক্রমে এধারে-ওধারে চারিধারে চিত্র বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আবার সেই পরিষ্কার—স্বর্বা-কর সমুদ্র—বিবিধ-রঙ্গ-সমলভূত গিরি-লগ্নী। সেই রৌদ্র-কর-সমুদ্রে মাঝে-মাঝে মেঘের ছায়া ক্রমবর্ধ হীনের মত রহিয়াছে,—কোথাও বা শুষ্ক বেথপু যেন পাথরের অঙ্গে অল ঢালিয়া গুসাইয়া রহিয়াছে।

মার্জিলিং হইতে যে সকল চিত্রভারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী

নয়নগোচর হয়, তন্মধ্যে কাকনজয়াই প্রধান। ইহা ২৮.১৬ ফিট উচ্চ। রবিকরে কাকনজয়া ও-তাহার নিকটস্থ গিরিশ্রেণী বড়ই সুন্দর দেখায়। সূর্য্য-কিরণ কোনও গিরি-সূত্রের লগাটে তিলকের দ্বারা বহন কর—কোনও পাথরের দ্বারাও ঠিক গোণালী পাড়ের মত ককমক করে—আবার কোথাও বা সমুদ্র পাথরের উপর গড়িয়া তাহাকে “রক্ত-গিরি স্মিট” করে। বহুকণ ধরিয়া দেখিবার তৃপ্ত হয় না;—নীচে মেঘ—পাশে মেঘ—এক-একবার মেঘ আসে—কতক ঢাকে, সব ঢাকে—আবার সরিয়া যায়—আবার আসে। হৃর্বাধারে ও হৃর্বাধারে কত বর্ণের নীলা প্রকাশিত হইতে থাকে। পাথরের সেই সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরাজের শিবোত্ত্বপ চিত্র-তুষাররাশি—আলো ও ছায়া-গঠিত স্ববর্ণ-কিরীট—সেই সৌন্দর্য্য বাহার কিরদংশ চক্ষু ধর্মন করে, কিরদংশ কল্পনা গড়িয়া তোলে—তাহা তৎক্ষণ দেখা যায়, তৎক্ষণই উপভোগ করা যায়। কিন্তু তাহা সঙ্গে করিয়া আনা যায় না—বাক্যেও প্রকাশ করা যায় না।

এত যে সুন্দর মার্জিলিং, তবু এখানে আসিয়া,—আমি নিজের বাড়ী আসিয়াছি—আবার যেন সহজে এ ভাবটী আইসে না। এটা ত একটা প্রকাণ্ড সহর—তাহাও সাহেবী সহর—বৃহৎ-বৃহৎ মোকান, বৃহৎ-বৃহৎ হোটেল, বৃহৎ বাজার, হুপ্রশস্ত পথ, প্রকাণ্ড বাটী, ডাঙা। দিক্‌স, ঘোড়া লইয়া সাহেবিস্তানারই জন্ত বিরচিত। মার্জিলিং ত সাহেব-মেয়ের একটা বিরাট বিলাস-ক্ষেত্র। বাঙ্গালী মনরানী বাগান এখানে বিস্তৃত করেন, তাহাদের অবিকলই নকল সাহেব-বের বাড়ি। একটা সহজ স্বচ্ছ দৃশ্য—নিজের কিনিব ভোগ করিবার সুখ—এখানে পাওয়া যায় না। চারিদিকে মানুষের সুখ দেখিলে মনে হয় যে, ইহাদের সহিত আবার কোনও সম্বন্ধ নাই—ঈশ্বর যেন কোনও অনধিকারী, অপর কাহারও দেশে আসিয়াছি।

মার্জিলিংএর মধ্যে বার্ট হিল আবার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। বার্ট হিলে যে যে দিবস দিরাছিলাম, সেই দিবসের ভারতী হইতে কিরদংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বার্ট হিলে বাইবার দ্বিতীয় ক্রমে উপরে উঠিত লাসিগাম। এই স্থানে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিরাটমান আছে—নয়নগোচর তাহা বিরচিত প্রাপ্ত হয় নাই। আমি একাকী এই

পাহাড় উঠিতেছি ;—স্বপ্নের বিকট চাঁৎকার এখানে নাই।
 শাব, কীরব নির্ভরতার বড়ই শক্তি অমৃত্যব করিলাম। কিছু
 উপরে উঠি। দেখ—সেই কুহুরের কবর ! তাগতে কি
 দেখ, কি কণা, কি প্রেম বিকলিত ! শাব্য মার্বল পাথরের
 ভিত—তাহার উপর সেই পাথরেরই স্তম্ভ ;—স্তম্ভটী সম্পূর্ণ
 হঠাতে পারে নাই—জীবনের অর্ধপথে প্রিয়জনকে হারাইলে
 যেমন তখনমোরখ হয়, তেমনই ভয় অবস্থার ;—সেই স্তম্ভের
 উপর স্তম্ভকে ভড়াইয়া মোচল গোলপের মালা—যেন
 প্রেম পত্নী প্রিয়জনের স্মৃতিকে ভড়াইয়া রাখিতেছে। কি
 সুন্দর ! কাহার স্মৃতি বৃক করিয়া গাঁড়াইয়া আছ স্তম্ভ !
 একটী কুহুরের—তাহার নাম ছিল জিম। কাহার বৃকের
 বাধা এই পাথরের উপর—এই উত্তম হিমশব্দের উপর
 জমতি বাঁধিয়া রাখিতেছে তাহার নিত্যের নাম পরাশ্রয় নাই।
 ‘আমার বিদ্যুৎ বহু ও লজী কুহুর জিম ২৬২সর বয়সে
 ১২০০ অংক আয়াকে চাড়িত’ চলিয়া গিয়াছে—আমি
 একজন করেটার,’ আচ্ছ, ভালবাসার কি হুণে—ভালবাসা
 কি সুন্দর ! শ্রাণ এখন ভালবাসিল, আর একটী কিছুই গল্প
 পাগল হইল তখন মনেবে দেহও আসিল। ভালবাসিলে
 শ্রাণ কোমল হইল—স্তম্ভ হইল—স্বপ্নকিনী ছুটিল।
 ভালবাসিলেই হইল,—তুমি মাতৃহৃৎ ভালবাস, যেহেতুকে
 ভালবাস আর কুহুরকে ভালবাস। আচ্ছ জিমের এই
 কুহুর, কুহুরসি কুহুর সমাধি-স্তম্ভের নিকট গাঁড়াইয়া মনে
 হইল—এই সমাধি-স্তম্ভও যাহা, আর পূর্ণবীর সৌন্দর্য শার
 ত্যমঙ্গলও তাহাই। মাতৃহৃৎ আর একটী কিছু ভাল-
 বাসিয়াছিল—তাগতে হারাইতেছে ; যাহার স্তম্ভ ৭৭ পাগল
 হয়, সে স্তম্ভের মত চলিয়া গিয়াছে ; যাহাকে নিষিদ্ধি
 চোখে-চোখে রাখিতে লাগ যায়—তাগতে আর কিলেকের
 ভরে দেখিতে পাইবে ন—স্বপ্নের অক্ষ চমকি বাঁধিয়া
 উঠিতেছে—স্বপ্নের বেধনা স্মৃতি-স্বপ্নের মত হুটিয়া উঠি-
 য়াছে। দিল্লীর বাতশার তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়জনকে
 হারাইয়া যে মনোবেধনা পাইয়াছিলেন—সেই মনোবেধনা
 পৃথিবীর সর্বত্র। তাহাৎমকে বিচিয়া বাবু বেতন
 হারাকার করে, এই কুহুর জিমের সমাধি-স্তম্ভ বিচিয়াও বাবু
 সেইসুপই হারাকার করিতেছে !

“আরও উপরে উঠিলাম—শিবরদেপে গিয়া কুহুর ভামশপ-
 খণ্ডের উপর বসিতি দেখিয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিপ্রায়ে

সরল, দীর্ঘ ভ্রমরাশি বাহু-বচনা করিয়া রাখিতে,—অসুস্থ
 বিধবাবলীর মধুর কাকলি ভাসিয়া আসিতেছে,—মাথার
 উপর নীলাকাশ-সমুদ্র—লঘুশব্দ, স্তম্ভ বেধ-বিধব কোথাও
 কোথাও মধুর ভাবে চলিয়াছে। চারিপ্রায়ে কীরব, নিত্যরস,
 কোণহেল-শব্দ। আমি একাকী। মনের মধ্যে ব্রিহা-
 ক্রিয়া জিমের সমাধির কথা ভাবিতে লাগিল। হায় রে
 মানব ! হুণে তুমি এত ভালবাস—হুণে লাভ করিবার
 অবসর কখনও তুমি পরিত্যাগ কর না। যেখানে যে হুণে
 পাওয়া যায়, সব সময়ে স্বেচ্ছা করিয়া তাহার মালা গলনা
 কর—আর আপনার জনকে তাহা দেখাও। মানবের,
 নিজে—কত হুণের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। উঠিয়া
 বসিলাম। বুকে সবুজবর্ণ গিরি-অঙ্গে রৌদ্র কক্ষক করিতেছে,
 —রৌদ্রের উপর কীর্ণ, শিথিল, বহু বেধ—বেধের ভিতর
 দিয়া প্রথের জ্যোৎস্নার মত হৃৎকালোক বড়ই সুন্দর দেখাইতে
 লাগিল। দেখিতে-দেখিতে সেই লঘু, বহু দেখাবলী
 কোথায় বাহুগে দিশাইয়া গেল—প্রোজল রৌদ্র হাসি-
 তেছে। আবার চুড়িত বেধরাশি হৃৎকিরণ অবরোধ
 করিল—গিরি-অঙ্গ ছায়ায় আবৃত। আবার কতক আলো,
 কতক ছায়া—আলো-ছায়ায় কত খেলাই হইতে লাগিল।
 কে নিশিধিন গেল, গেল, অন্তরীকে এই খেলা খেলাইতেছে ;
 —খেলায় অন্ত নাই, বিশ্রাম নাই, আলস্য নাই। তাবিত-
 তাবিত আবার শুইয়া পড়িলাম। স্তম্ভ-বেধ-খচিত নীলাকাশ
 দেখিতে-দেখিতে আঁধার স্মৃতি হইয়া আসিল,—পানীর
 কাকলি সুহু হইতে মুক্তর হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতে
 লাগিল,—বাবুয় শীতলতা কোমল হইতে কোমলতর হইয়া
 অঙ্গ-স্পর্শ করিতে লাগিল। আমি যেন সমগ্রে পৃথিবী হইতে
 বিচুত হইয়া পড়িয়াছি—সতল-সম্পর্শ-বিতীর্ণ একটী শ্রাণ
 অনন্ত কাল-সাগরে ভাসিতেছি। কোথা হঠাৎ আসিয়াছি,
 কোথায় আছি, কোথায় বাইব ? হৃৎকিরণ কক্ষ করিতেছি
 —পান-পূণ্যে, হুণে-স্বপ্নের তিলক বিশ্রাম নাই। কবে
 এ কর্ণস্বয় বেধের কর্ণের অবসান হইবে, মাথার বোঝা
 ফেলিয়া ছুঁ দণ্ড বিশ্রাম করিতে পারিব।

“সংসা হামির কলরোল কর্ণে প্রবেশ করিল। উঠিয়া
 দেখি, একমল সাহেব-বেশ আসিয়াছে। কোনও চিন্তা
 নাই, কোনও হুণে নাই, কোনও পোকের ছাড়া নাই—
 কেবল চাঁৎকার, প্রতি কথাতেই হাসির কলোণ ও তাহার

এতিহাসি, এতিহাসিই নৃতন নৃতন খেলা। এই দাপ্তর আশ্রমে এই চপলতা ও চাকলা আহার ভাল লাগিল না। আমি বীর-বীরে নামিদায়—নামিবার সময় আর একবার ত্রিবেদ সমাধি দেখিলাম—বীর-বীরে দায়ার আসিলাম।”

তারপর কালিম্পাং হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। তৎপক্ষে আমার ভাষায় :—

১৯১৬২০এ অক্টোবর বেলা ১১টার সময় ভাঙী আরোহণ দার্জিলিং হইতে কালিম্পাং যাত্রা করি। দার্জিলিং চৌরাস্তা (১০০২ ফিট উচ্চ) হইতে ক্রমে সন্ট-হিল রোড দিয়া—জলাপাহাড় রোড দিয়া—জলা-পাহাড়ে (১৪২০ ফিট উচ্চ) উপস্থিত হই। পথে দিবাণতিরা-রাজের মনোরম “সিবিবিলাস” নয়ন-পোত হই। তারপর পথে (১৪০৭ ফিট উচ্চ) আসিলাম। সেখান হইতে ক্রমশঃ নীচে নামিতে লাগিলাম। পথের দুই ধারে হিমালয়ের মনোরম দৌলদার,—উপরে সুন্দর আকাশ—দূরে কাকতালিকা—কখনও ঢেঁক পড়ে, কখনও পড়ে না। কোথাও আকাশ-স্পর্শী সুন্দর তরঙ্গানি—মহাযোগীর স্তায় সমাধিমাথ—কোথাও অবিরল পাইন-শ্রেণী—কত তরু, কত লতা, কত গুল্ম, কত শৈবাল, কত বর্গের কত সুসুন্দর। মাথার হস্ত-চিহ্ন কেবল সেই শীর্ণ ক্ষুদ্র পথ। মানবের হস্ত-রচনা সেখানে আর কিছুই নাই। সেই ক্ষুদ্র পথ বাহিয়া চলিয়াছি। পথের দুই পাশেই বিধগতির স্ব-হস্ত-রচনা। যে দিকেই তাকাই, আঁখির তিতর দিয়া যে রূপ-মহরী মরমে পশে, তাহাকে কথা দিয়া বাহিয়া বাহিবার হুম্বাস পাই না। “কি সুন্দর!” “কি সুন্দর!” প্রাণের মধ্যে কেবল এই দুইটা কথাই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। মাঝে-মাঝে সুন্দর নির্ভীক নরায়ণের প্রভাবকে সহসা চমকিত করিয়া দু উচ্চ অজানা প্রবেশ হইতে নিজের হৃৎ-কেন্দ্র-গত বেগপতাকে সোদাইয়া বিদ্যাহে। ক্রমে সম্মান-অঙ্ককার আকাশ-পাতাল ছাইয়া কেলি। এখানে সৌন্দর্যের আলোক অণুস্বাক্ষর ধীরে—সেই সৌন্দর্য-আলোকে ভাঙি গিয়াছে। নদীর কলধনি ক্রমে কর্ণ-পোত হইল। “তারে চোখে দেখিনি” কিন্তু তার বংশধর বৈশ কনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, জিতানদীর নিকট আসিয়াছি। জিতার কূলে এক বাগনার রাজ্য-খাপন করিলাম। সমস্ত বিন্যাসী ভাঙীর আলোকনে নিদ্রা

সময়েই আসিল। রাজিতে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনই জিতার কলধনি প্রতিপোত হইয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়াই বাগার আবুল আব্বাস কিছুতেই থাকিতে চাহে না—সেই জিতানদী দেখিতে সেলাম। দুই পার্শ্বে উচ্চ গিরিশিখর—মধ্যে উপত্যকার অরুণ-প্রশান্তি, বরষাভিনী, কলমাদিনী, তিতা চুটাইছে। জিতা এখানে বালিতা—অমৃত্যু-অমৃত্যু—শীর্ণকরা, চুটুলা—বড়ই—সুন্দর।

একটু বেলা হইলে পুনরায় ভাঙী আরোহণ করিলাম। প্রথমেই জিতার পুল পার হইলাম। এই পুলটা ৯ ফিট প্রশস্ত এবং ৩০০ ফিট দীর্ঘ। পুল পার হইয়া এবার ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। এবার বহুদিন পরে ধানের ক্ষেত, বাগের বাগান দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম—যাত্রা পূর্বে কখনও দেখি নাই—কলম—সেবুর বাগান।

আড়াই ঘণ্টা পরে দার্জিলিং হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী কালিম্পাং পৌছিলাম। কালিম্পাং অতি ক্ষুদ্র সহর। অল্প কয়েকটা রাস্তা, সামান্য কয়েকখানি ঘোশান, একটা কাছারী, এতদ্বির ধান, ডাকঘর, বাগার প্রভৃতি আছে। কাছারীতে বিচারপতি একজন গায়ে—তিনিই মার্জিষ্ট্রেট—তিনিই মুনসেফ। কিন্তু এখানে উকীল নামক জীবিত হুগুং জীবের ঐকান্তিক অভাব। হুগুং সাহেব বিচার-পতির নিত্য পরম গুরুদ্বার লাভের কোনও বিষ নাই। সিকিম এখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিকুতে বাইবার পথ এই কালিম্পাং এর বাজারের তিতর দিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান পণ্যপ্রবাহ পশম—যাযগারী মাড়োয়ারী। তারপর বাবদারের সোণার শিকলী কলিকাতা হইতে দার্জিলিং আসিয়াছে—দার্জিলিং হইতে কালিম্পাং আসিয়াছে—আবার কালিম্পাং হইতে তিকুতের মধ্যবর্তী গিয়াঙ্গী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে।

কালিম্পাং হুগুংসিদ্ধ শিশুগণের রোজায়েও ডাক্তার কে, প্রোগ্রাম এম-এ, সি-আই-ই বাস করেন। কালিম্পাং এর নানা স্থানে তাঁহার সাধু চোটা নামাচরণ কলবর্তী হইয়াছে। তিনি বহির্বিদ্রীষ্টানদিগের মত একটা আবাসভূমি রচনা করিয়া তাহাদের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সুন্দর হাসপাতাল ও সুন্দর বিদ্যালয় তাঁহার কীর্তিতত্ত্ব স্বরূপ হইয়া বহিয়াছে। এতদ্বির দরিদ্র পাঠাভিরাগণ

যাঃতে নানা শির-শিক্ষা করিতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ আগ্রহজন করিয়াছেন। কোনও স্থানে স্বত্বধরের কর্তৃক সযত্নে, কোনও স্থানে বহু-বয়স সযত্নে, কোনও স্থানে কর্পেট প্রস্তুত সযত্নে, কোনও স্থানে লেন্স প্রস্তুত সযত্নে সুন্দর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কার্পেটের রং এইখানেই প্রস্তুত হইতেছে। কালিঙ্গাঃ লেন্স ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে ৪০ আনা গজ হইতে ১২০ টাকা গজের লেন্স প্রস্তুত হইতেছে। এই-রূপ শির-শিক্ষা বাগাতে বাঙ্গলা দেশে গ্রামে-গ্রামে কুটীরে-কুটীরে বিস্তৃত হয়, ব্রহ্মা সাহেবের তাহাই ইচ্ছা। বাঙ্গালীর কি সে ইচ্ছা হইবে না ?

২৩৫ অক্টোবর—আজ কালীপূজা। বাজারে মোকান্দ-দারেরা দীপাবলী জ্বালাইয়াছিল। পাহাড়ের উপর আলোকমালা আকাশের ভাঙকর সমভাতির বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। বাজারে আনন্দ-উৎসব, জৌড়-কলহোল দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হইল।

২৭৭ অক্টোবর গ্রাতে দূরবীণ-মাদা দেখিতে গিয়া-ছিলাম। রাস্তাটিতে খুলি নাই। দেখানে পোছিয়া দেখি, চারিদিকেই মেঘ—দানী গিরি-বৃন্তের বেশ বরষা। চতুর্দিক কুয়াসাজর থাকার কোনও দিকেরই দৃষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কর্ণে জিস্তার কল্লোলের ভাৱ একটা শব্দ আসিতে লাগিল। হঠাৎ দক্ষিণ দিকের মেঘ সরিয়া বাওয়ার দেখিলাম—সেই গিরিপাদ-চারিটি শিখরাদি জিস্তা চিরিতা নদীর ভাৱ অধিকতর রহিয়াছে। উত্তর দিকে মধ্যে মধ্যে অরুভেনী তুয়ার-বল গিরিরাঙ্গি নরনগোর হইতে লাগিল। বীর-বীরে বাসার ফিরিতে লাগিলাম। এখানে যে ১২১৪ জন বাঙ্গালী আছেন, সকলেরই সহিত পরিচয় হইয়াছে। বাহার সহিত দেখা হয়, তিনিই বেন একটা আনন্দ অচূত করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালীর পরিচয় প্রীতি বোধ করেন। দার্জিলিং সাহেবিয়ানার যে একটা চক্ষু-বলসান আলা দেখিয়া আসিলাম, এখানে তাহা নাই। দুই পার্শ্বের রূপ-লাগরে নয়ন দাঁত কড়াইয়া, এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীগণের কথা বনে করিতে-করিতে বাণীর ফিরিলাম।

২৮৫ অক্টোবর সকালেই উঠিলাম। আজ কালিঙ্গাঃ

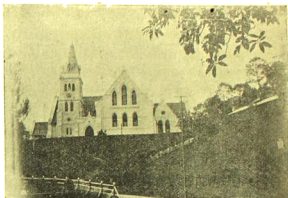
লাগিল। দার্জিলিংএর মত দৃষ্ট-প্রদান নহে—অথচ বেশ শীত আছে। চারি পার্শ্বের পাহাড়ের দৃষ্ট-গুলিও সুন্দর। আমার বাসার সমুখের পাহাড়গুলি ও তাহাদের মধ্যগামী নদীরেখা বড়ই সুন্দর। সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার। একটু উচ্চ স্থানে গিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কি সুন্দর! গিরিশ্রেষ্ঠীর মধ্যে যে গল্পর আছে,—তাহার মধ্যে গভীর গুহ মেঘরাশি সুস্থগু—বেন মেঘনদী চলিতে চলিতে পথ-প্রান্ত হইয়া গিরি-ভাটে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ভোর হইলে আবার চলিতে আরম্ভ করিবে। তুয়ার-মন্ডিত গিরিরাঙ্গি দেখা বাইতেছে; কিন্তু এখনও সূর্যোদয় হয় নাই,—তাহার স্নোভিহারা, বেন একটা ছাত্র-মাখান। পূর্বদিকের মেঘ কিন্তু বেশ জলকাল—বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। আজ বেন ওদিকে একটা কি মহোৎসব। একবার পূর্ব-দিকে তাকাইতেছি—একবার তুয়ার-গিরির দিকে ফিরিতেছি। হঠাৎ দেখি সন্ধ্যাক গিরির শিখর-বেশে সোণার তিলক অলমল করিয়া উঠিল। তার পর ক্রমে-ক্রমে অপর গিরিসকলের শিখর অমনি আলোক-তিলকে অলকিয়া উঠিল। আজ তাই-কোটার দিন। আবার মনে হইল, আজ উত্তরাবী উত্তার তাইসের কপালে কোটা দিলেন। উত্তার আনন্দ, তাইসের আনন্দ—আর সেই আনন্দ দ্বারা বহুভাষা প্রাণিত হইয়া উঠিল।

আজ শনিবার—কালিঙ্গাঃএর হাটবার। কিছুকাল পরে হাটে গিয়া দেখি হাটে একটাও লোক নাই। আজ “থেউপি”—ভাই-কোটার দিন। আজ দ্বাভাষা পুণ্যব্যা বিক্রয় করিবে, তাহাদের বাড়ীতে আনন্দোৎসব; আর দ্বাভাষা ক্রয় করিবে, তাহাদের বাড়ীতেও উৎসব;—কে হাটে আসিবে? এই একটা উৎসবের বন্ধনে দেখি, আমি কালিঙ্গাঃএর সহিত বাঁধা রহিয়াছি। মনে মনে সুখিলাম যে, কালিঙ্গাঃ আমার বাড়ী হইতে বত দূর হউক, এখানকার লোক আমারই প্রবেশকারী।

আজগ্রেতে বহু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় লইলাম—চারিদিকের প্রবাসান্তেও বিদায় লইতে চকুতে জল আসিল। দার্জিলিং রূপ এবং অর্ধের গৌরবে ও অধিকারে ভাল করিয়া কথা কহে না। তাহার রূপ নরন অলসিমা দেয় বটে,—কিন্তু তাহার স্বর আছে কি না, সে যেহে কহাকে বলে জানে কি না—তাহার পরিচয় কখনও পাই নাই। কিন্তু এই



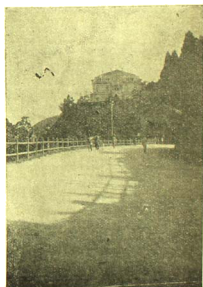
বাজার—দাউলিং:



সেন্ট কোদেক চার্চ—দাউলিং:



কাট'থোক—দাউলিং:



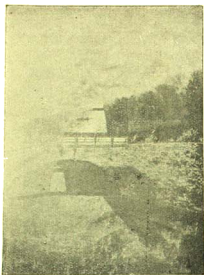
রাও—দাউলিং:

কুই হ'ল কালিম্পা ১২ ১৬টা বক্স বাছানী কোলে করিয়া, বাতু বেহে অতুল ঐখাণ্ডে মহিমাদিত হইয়া আমার কুতিপট উল্লগ করিয়া রাখিবে। গৌনে এগারটার সময় কালিম্পা এ ডাক্তী আরোহণ করিয়া একটার কিছু পরেই

কালিম্পা রোড হৈশনে পৌছিলাম। দুইটার সময় গাড়ী ছাড়িল। একখানি গ্রন্থর শ্রেণী, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও একখানি তৃতীয় শ্রেণীর—এই তিনখানি গাড়ী লইয়া টেন। গাড়ী চলিতে লাগিল—জিস্তার কলে কলে



ডিস্টোরিয়া পার্ক—বাহিলা:



কাথোয়া—বাহিলা:



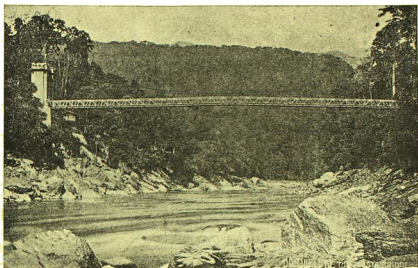
চৌধুরাট বাইপাস পথ—বাহিলা:



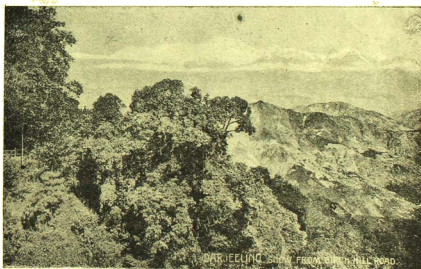
কুলা—বাহিলা:

—একেবারে নদীর গা দিরা। সেই নীর্ণকারা ক্ষুদ্র একটি বেথার মত চলিয়াছে। তাহারই অঙ্গস্পর্শ করিয়া বোতবিনীর হই পান্থেই প্রায় হই হাজার ফিট উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। সেই পাহাড় হিমায়ণের অপূর্ণ সৌন্দর্যের আবাসভূমি। সেই তপারণের মাকবান দিয়া দ্বিতা

একটি বেথার মত চলিয়াছে। তাহারই অঙ্গস্পর্শ করিয়া রেল-রাস্তায় রেল চলিয়াছে। রূপের ভাবে এটি বেন বিকল হইয়া পড়ে—নয়নের আর বেন বাসনা করিবার কিছুই নাই। উপরে হ্রদীল আকাশ,—সেই আকাশ



ত্রিঙ্গা সেতু- বাতিগিঃ



বার্ভিল হাইতে বৃক্ষের দৃশ্য

স্পর্শ করিয়া গিরিশ্রেণী,—সেই গিরিশ্রেণীর অঙ্গে বিধাতার
স্বয়ং-স্ফুটিত সৌন্দর্য্য-উজান,—সেই গিরি-পাদ-স্পর্শ করিয়া
কলগান করিতে করিতে ছুটিয়াছে সেই গিরি-বাদিকা।

ত্রিঙ্গা। রেল চলিয়াছে—চক্ষে সেই রূপভার—কর্ণে সেই
কলভান;—বুধরা জিতার বলগানের অস্ত নাই—তাহার
অশ্রান্ত স্রুতগতির অস্ত নাই,—পাশে পাশে ছুটিয়াছে—



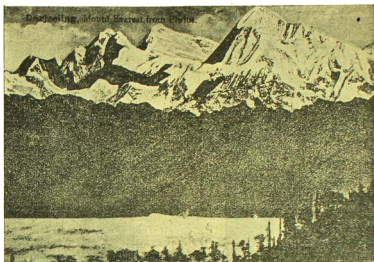
যাকার হইতে হিমা নদীর দৃশ্য



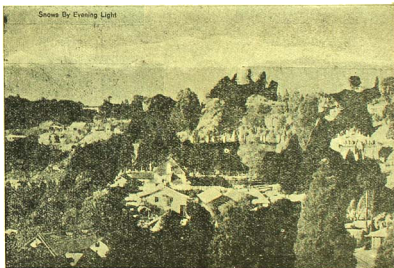
হিমা উপত্যকা

যেন কোথায় কোন উৎসবে যোগদান করিতে হইবে—
তত্ত্ব বাস্তব অনিন্দ-অশ্রীর চাইরা ছুটিয়াছে। রেলের বসিরা
এমন অবাধ অনন্ত রূপরাশি আর কখনও দেখি নাই—

কল্পনাও করি নাই। আকাশ অনন্ত, পিরিভ্রমী অনন্ত,
অরণ্য অনন্ত—ত্রিভুজের গীত ও গতিরও অন্ত নাই।
চারিদিকে অনন্ত—যাযাবনে সূর্য আদি। আমি সূর্য,



দুংট হইতে এভারেস্ট পর্বতের দৃশ্য



দক্ষিণাংশে তুংকোবের দৃশ্য

কিন্তু আমার স্বপ্ন-দুঃখে ক্ষুদ্র নহে—আমার আশা ক্ষুদ্র নহে—
আমার কল্পনা ক্ষুদ্র নহে। ভাবিতে-ভাবিতে লক্ষ্যের গোল—ইহা হির বৃত্তয়া লইলেন।
অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—ক্রমে নিলিঙড়ি পৌছিলাম।

পর দিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, বহু-বাক্যবোঝা পৃথিবী

ভাবের অভিব্যক্তি



দুঃখ নিশা



দুঃখ কাহা



অবশেষ (অশ্রু)



জীবন



স্বপ্নময়ী



দলোনিবেশ



●আকস্মিক



বিস্ময়

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর আধ্যাত্মিকাবলি

(ସଂଶୋଧନ)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার দাস, পাণ্ডাঘাট, চিচ্চানন্দ, এম এ]

‘ক’তবধে’র আশংকা-সংস্কার হিন্দী ইচ্ছা (স্বপ্না) দেবীর ‘পরমর্শ’-সমালোচনা-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই গীতার তথিনী হিন্দী মনুভূষণ দেবীর বাগ্মত্ব, ‘পাঠপুত্র’, ‘অন্তর্গতি’, ‘সফা-না’ ও ‘ভাবমণ্ড’ এই পাঁচখানি পুস্তক ‘সমালোচনা বা আলোচনার্থ’ উপহার পাইয়াছি। (মুদ্রক পাঠক হরত বলিয়েন, ‘জ্যোতিঃযোতা’ খানি হইলেই আর ভজন পুত্রিত) উক্ত ঘটনার সৌন্দর্য্য কাকতালীয়-রূপে ঘটিলে, এরূপ বিবেচনা হয় না। যাহা হউক, পাঁচ পাঁচখানি পুস্তকের বিস্তারিত ভাবে সমালোচনা করি, এমন সমর্থও নাই, এরূপ প্রবৃত্তিও নাই—কেন না সমালোচনা কহাই বর্তমান লেখকের পেশা নহে। ইহার কয়েকখানি পুস্তক অনেক যিগ পূর্বে প্রকাশিত এবং একাধিক পক্ষে সমালোচিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি বুজন করিয়া সমালোচনার তত প্রয়োজনও দেখি না। তবে এককতী হরত লখগুলি লক্ষ্যেই এ প্ৰকের অভিন্নত স্থানিতে উৎসাহ। যাহা হউক, যথাসম্ভি অসংবিত্ত সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শেষতক ‘ক’রতে পারি কি না জানি না।

‘বাণেশ্বর’ বিহার, ‘গোতপুত্র’ কুঠার ও ‘বনশক্তি’ বিহার সংরক্ষণ ইত্যাদি। হস্তা: বনপ্রকাশিত পুস্তকের ভাষা একদিন বিস্তারিত সমালোচনা বা কবিতাও কতি বাই। বিশেষতঃ, শাক দিয়া হস্তা লক্ষ্য করিতে গেলে, অর্থাৎ পাঁচবাশি মাধ্যমিকভাবেই বিস্তারিত সমালোচনা করিতে গেলে, প্রথম অতিরিক্ত হাণ্ড ও একত্রেই হইবে, তাহাতে পাঠ্য, সমালোচক ও লেখিকা তিন পক্ষেরই বৈধাভূতি ঘটিবে। অতএব পুস্তকবৎসি সম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করি।

পুস্তকটি লেখিকা বিস্তারিত সমালোচনা করিব। হস্তি কটাই ভাষায় প্রথমে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়া লই।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ

‘অশ্লিষ্ট’ লব্ধে অনেক কথা ‘বিশি’ ও ‘অশ্লিষ্ট’র সমালোচনা-
শ্রেণিতে স্থিতিযুক্তি, ‘পাশলা বোয়ার’ ‘ভর্তার উত্তরে’ ইহার গুণগত
কতিয়টি, আর সুবিশেষ্যের একোজন কি? এক কথায় তবু
এইটুকু বলিয়া রাখি, ‘অশ্লিষ্ট’ গ্রন্থকার সর্বোত্তম আশ্রয়িতা—
সুশিক্ষিত, হৃৎকিত, হৃৎকিত। আমাদের ন্যায়গত ইহার
বহুল-প্রকারে খণ্ডিত সমালোচনা বলা হইবে। সাধারণতঃ, গ্রন্থকার
আশ্রয়িতা লব্ধে ন্যায়গতের চরিত্রে একটা বা একটা দৃষ্টান্ত
থাকে, তাঁহার মধ্যে সত্যের চিত্রের জীবন ও লক্ষণের আশ্রয়
থাকে।

কোনও বৈশিষ্ট্যই হয়। পড়ে; কিন্তু এই আখ্যায়িকার প্রধান
অখ্যানের ন্যস্ত আদর্শ গুরু, এমন কি অগ্রগত আখ্যানের ন্যস্ত
উৎসাহ অস্বাভাবিক আখ্যায়িকার ন্যস্তের উল্লসিত উল্লসিত চরিত্র।

পোহ্যপুস্ত

‘শোভাপুত্র’ও ‘সখিকার’ আর একখানি উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা। ঘটনা-
সম্পর্কভাষ্যে রচয়িতা ও বৈচিত্র্যে, চরকসম্মত আকর্ষণীয় ঘটনার সমাবেশে,
কৌতুহলোদ্দীপক পটভূমি, রহস্যের কোণসে ও চিত্রায়িতবৈশিষ্ট্যে
একত্রী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা ইচ্ছাছেন। ‘শ্রী-বি-ভিন্ন’ এবং ‘পুত্রাংস’, মাহাত্ম্য,
সমৃদ্ধি-অধিক হালের সাক্ষ্যে বর্ণনা বেশ যথোক্ত হইয়াছে। ‘নারক
বিলাস’ ও ‘কংক’ নারায়ণ চরিত্রের রূপ, শিখা ভাষ্যকর্ত্তের রোম্যান্টিকতা,
রজনীনবোধে কণ্ঠস্বাধীনতা, তাহার পত্নী বহুবীর্যের মাতৃস্বভাবের বহুবীর্যের
সময় সখিকৃত্য, শান্তির আশ্রয় শান্ত মনস্ত-একত্রণ সজ্জিত, নিম্নোক্তের
স্বাধীনতা ও নীচাঙ্গতা, তাহার কল্পা শিবানীর তথ্যনির্ভর একত্রিত্য,
অন্তিমশিবানীর স্বাধীনতার সমাবেশে, যোগেযে বহুবীর্যের প্রকাশিত্য, শান্ত
চিত্রিত্য মায়া, সজ্জিতের শিতচিত্রিত্য, শোভাপুত্রের উচ্চাঙ্গতা ও
শেবে চিত্রিত্য-সমাবেশে, ইত্যাদি সমস্ত আশ্রয় স্বভাব হইয়াছে। ‘শান্তি ও
শিবানী’ এই দুইটি আশ্রয়বৎ চিত্রিত্যই এই পুত্রকের স্রোতসম্পদ।
যোগেযে যোগেযে প্রকৃষ্টের প্রতি আশ্রয়িত্য সমস্ত পুত্র সাধনাইচ্ছা
শেবা চিত্রিত্য কল্পিত্য প্রকৃষ্টের স্বভাব ও স্বভাবের সমস্ত স্বভাব কল্পিত্য-
স্রোত। রজনীনতা ও তাহার শিত্রিত্য নারায়ণের ‘বহুবীর্য’ স্রোত উচ্চাঙ্গ
একত্রিত্যের শিত্রিত্য ‘আশ্রয়বৎ’ স্রোত।

ବାମନଦାସ

‘বাসুদেবতা’ পায় করিভা তেমন আদম্ব পাই নাই, ইহা; প্রকৃতকর্তার
জ্ঞাতাজ আখ্যাতিকা অপেক্ষা নিরুট; শেব হুই এইখান তাঁহার প্রথম
হটন। ইহাতে ‘আদ্যমবধু’ অমুকগণের চিত্র অমুক বলে বিস্তারন;
কলক: ইহা প্রকৃতকর্তার শিক্ষানবিশি বা সকলবিশি অধিকার নির্দর্শন,
তদ্বিহতে সন্দেহ নাই। পুত্রকোর প্রথম যৌব, পশ্চিমপে নৃতন নৃতন
সোকেব আকর্ষিক আকর্ষিতা এবং তজ্জাত ঘটনাপ্রান্তের অতিষ্ঠিতপূর্ণ
পরিবর্তন। একগ ঘটনা দুই একটি হইলে চকচক হয়, কিন্তু বাস্তব
হইলে এককোকে তৎ আকর্ষিতা কথিরা ঝড়ায়। রাত্রি বায়েগে দুই দুইটি
বিশেষের ব্যাখ্যা প্রকৃতকর্তা করিয়া দেন বটে, সমবেগে একগ হুজুতি
দর্শকগে তাহাও বাটে; কিন্তু ইহাতে পে এই সামাজিক সমস্যা

আঁধার চরিত্রের বর্ণনা হইত (আর পাঠক-পাঠিকার চক্ষে এই দুঃখ-মিশ্র বড়ই বেখায়া) যেমানান প্রকৃত, এই কা' আপোষে। 'পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় নির্দেশে প্রতি বিরাটী কথাত্মকি কি হৃদয়, কি মধুর, কি আত্মরিক্তাপূর্ণ!

ঐতিহাসিক স্মৃতি-বর্ণনা ও বাস্তব-ঐতিহ্য সহিত মানব-ঐতিহ্য নিম্নত্ব কথোপকথন-কল্পনার প্রযুক্তি যে তথ্যই বোধাইয়াছেন, তাহাতে চরম বিশ্বাস ও আসিবে পরিপূর্ণ বহ। বিস্তা-পরিবর্তন-ইলা ঐতিহ্য মধ্য-বহু-রূপে তাহার বহির্ভূত ও অন্তর্ভূত বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা আমাদের সাহিত্যে একেবারে অভিনব না হইলেও মূল্যব। প্রযুক্তির তাহার প্রবাহ তাহার বর্ণিত ইয়াবতীর প্রবাহের মতই (এ সংঘর্ষ পরিচ্ছেদ) বৈচিত্র্যময়। তাহার মস্তব্যক্তির চিত্রাঙ্গুলতা ও সহবর্ততার পরিচায়ক। তবে এতদিকে হানে হানে বিচার প্রাক প্রকট হইত। বিজ্ঞান, ধর্ম, বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র, কৃষি, শিল্প, আইন, আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম, কিছুই যায় পড়ে নাই। এইটুকুই 'একো হি বোহো ভগ্নপ্রতিপাত'। উল্লিখিত বোহোটু George Lewes-এর পিতা ও সঙ্গিনী George Eliot প্রদানযায্যিষ্ঠ আধ্যাত্মিক-চরিত্রীয় বোলারও বেখা যায়, এই বড় মজির খাড়া কক্ বায় বটে, কিন্তু এটুকু না থাকিলেই বৈশিষ্ট্য হইত। ইহা স্বকীয়-পাঠক-প্রবাহ—এমন কি মূলভিত্ত পাতক-প্রবাহ হইত না কিংবা শীতলা! তবে প্রযুক্তি হইত এই প্রকল্পসম্বন্ধে পুস্তক-ঐতিহ্য দ্বৈত-বৈশিষ্ট্য বহিষ্ঠা বহে মনে হইলেন। হইতেও পারে; ব্যক্তিগত সমীকরণ (personal equation) ত একেবারে বর্জন করা যায় না, তা' সম্বোধিত বহই বিজ্ঞান ও মিশ্রলোকের মান কক্।

স্বাশাস্ত্র

'স্বাশাস্ত্র' ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক—ইংরেজীতে বলাকে Historical Romance বহে। মাঝে মাঝের পাঠকের কর্ণে ঐক মধ্যস্থতা হালিবে না, হয় তা মারিষ্ঠা ওস্তাদ নামে আধ্যাত্মিকের মাসকরণ হইলে স্যারগণের ঐতিহ্য হইত। বিশেষতঃ অন্তর বলিবে, এই বোধের সঙ্গে প্রাচীন ভাষার একটী বিদ্যুত কামিনী ভক্তিত্ত আলো, অন্তর এই নামের উপস্থাপিত। অতঃ। আদ্যা প্রকল্প-মিষ্ট বহি, দ্ব্যন্তঃ ইহার বহুটুকু ঐতিহ্যের 'স্বের সোপা', আর কতটুকু কল্পনার 'চামি রূপ', তাহা আমাদের কথিয়া বৈশিষ্ট্যের শক্তি নাই। এইরূপ একটা আদ্যা প্রযুক্তির মনেও হইয়াছিল, তাই তিনি কৃষিকার ক্রিয় কৈলিগ্ন বহিগ্নে; বহিগ্নপ্রভে এই আদ্যের 'আনন্দময়' প্রকৃতির বোলা কৈলিগ্ন বহিগ্নে। কক্: এই প্রকৃতির আধ্যাত্মিকের বিচারে বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ বাণালদাস বাণ্যোপাখ্যার অধিকাংশ, আমাদের মত অধিকাংশের হাতে এ ভাষা বেগের কিছুনা-বহ। তবে বহন ইহা 'আপুণে আত্যা সার', তখন 'বহা মিলুকোংগি তথা কয়েমি' এই শিথিলে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত।

আধ্যাত্মিকাবানি বৌদ্ধ-ভারতের একটুকু ঐতিহ্য বা ক্রিয়াকর্মী-

অনুশ্রবণে নিশিত। বৌদ্ধ ভারতের ঐতিহ্যে অনবদ্যে আধ্যাত্মিক-চরিত্র বহে হয় প্রবন শব্দ বোধাইয়াছেন—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন পাঠী মহাপর; তাহার 'কাকনামা' পুস্তক 'বহুবর্ণনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সন্ততি ইহা ওকলাস চট্টোপাখ্যার এও মনের আট আনা মতবোধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাধারণের ভূমি আকর্ষণ করিয়াছে। হালে আর একজন বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ বাণালদাস বাণ্যোপাখ্যার বৌদ্ধ-চরিত্র মস্তকে অনেকগুলি মধ্যপ্রাচ্য আধ্যাত্মিক হওয়া করিয়াছেন। দ্ব্যন্তঃ বর্জন প্রযুক্তি একেবারে নুতন গর আবিষ্কার করেন নাই। তবে তাহার বিশিষ্টতা এই যে, তিনি মস্তবোধের জীবনধারণের মনের চিত্র অধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কি ভদ্রগুরু ভদ্রানন্দকে রম্যকো অনবর্তী করিয়াছেন। ইহা পূর্ববর্তী আধ্যাত্মিকায়ন কয়েই করেন নাই। ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক-চরিত্র প্রযুক্তির এই প্রবন উদয়, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

আদ্যা ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক-চরিত্র প্রকল্পমীকতা (বিশেষতঃ এই প্রকল্পে ভাবের মধ্যস্থতার মনে) পুণী শীকার করি; কিন্তু, প্রবের বিচার, বহুগ্নে বোহো বা ক্রি-ঐতিহ্য বোহো আদ্যা 'ক্রিতিমত বোহোগ্নে' মনপ্রবণে তাপন পাই নাই; 'বিশ্বকৃষ্ণ' 'কৃষ্ণকায়ের উল', 'মহাবিশ্ব', 'মহাপ্রতি' প্রকৃতি আধুনিক বাণ্যো-ক্রিতিমতের স্যারগণ বহন-পাঠের চিত্রের মধ্যে যে আদ্যায়ন কক্ মন ও প্রবের মনের মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাহাতে আসন্ন যে ভূমি, যে আদ্য লাভ করি, প্রাচীন ঐতিহ্যের অদ্যায়ন ব'বাহনী ও পাঠ্যপ্রাচীর বর্ণনার আদ্যা সে ভূমি, সে আদ্য নাই না। অতঃ ইহার মস্ত লেখিকা বহী মনে, বর্তমান সম্বোধিতকই বহী। বহা হইক, বহায়া বোহোগ্ন ভালবাসেন, তাহাদের বৌদ্ধবহ-উদ্যেকের মস্ত বলিতে পারি যে, এই প্রকল্প বোহোগ্নের বহ উপকরণ সন্ততি আছে, ঘটনা-সম্বন্ধ ও চরিত্র-বৈচিত্র্যের বহ-মধ্যপ্রবণ আছে। তিন তিনটা মস্ত (mythology) ও চারি চারিটা পোকাবহ বাণ্যার (magic theme) আধ্যাত্মিকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আদ্যাবন (plot) পুণী বোহোগ্নে কক্ হইয়াছে। বৈশিষ্ট্যের মস্তমি ইতিহ্যের অদ্যেত প্রকৃতির ভদ্রগুরু ভাষা প্রকাশিত-বহণ ও তাহার ক্রিতিমতের প্রাকৃতিক, ওস্তাদ বৈশিষ্ট্যের মস্ত আদ্যায়ন ও পতিমস্তের স্যারগণের মস্ত আদ্য-হোয়া, বৈশিষ্ট্যের মস্তা দ্ব্যন্তিমতের বহুগ্নে পুণী প্রকৃতির পাণের মস্ত অদ্যায়ন বহন ও ওস্তাদ, তিনটুকু ইতিহ্যের বাহি পুণীর মস্তা, বৈশিষ্ট্যের মস্তকতা বহুগ্নের স্যারগণ কক্-পাঠ্যবহিষ্ঠা, বৌদ্ধায়ন মস্তমি পুণ্যমিত্রের প্রকৃত প্রবের পঠন-পাঠ্য-মস্তে পঠন হইতে বহুগ্নের মস্ত, অদ্যেতুক ইতিহ্য-মস্তে কলিগ্নায়ন মস্তমি বহুগ্নের পাণ্যকতা প্রকল্পমীকতা অধিতার মস্তাধ্যান এবং এই ইতিহ্যের মস্ত পঠন ভাষা অদ্যায়ন ও পুণ্যমিত্রের পরিচয়ে পোকাবহ হইয়া—ইতিহ্যের মস্ত চিত্রিতব্যবী-বাণ্যার ইহাতে বর্ণিত আছে। ইতিহ্যের অদ্যায়ন বহিষ্ঠা, ইতিহ্যের আদ্যপ্রকাশ, ওস্তাদ অদ্যায়ন, (কলিগ্নায়ন ইতিহ্যের বহুগ্নের পাঠ্য) ইতিহ্যের অদ্যায়ন-

বসিয়া 'সুখ্যে' বসতি নিকাশ' নদীয়ে 'জাব-গ্রাহী' জনাধিনঃ' বহুবে
সারিরা গইতে হইবে? 'কোমলতা', 'সম্বোধনা' এই দুইটি হলে
ভক্তভক্তানী গোব এবং 'সবক বেঙ্গলভেত' ও 'উৎসব পুশ-সদৃশ'
এই দুইটি হলে চলিত কবির বসলে অথবা সাহিত্য-প্রবণতা নিশাধঃ
('বহুশক্তি') 'নীলাভবীল নেত্র' বৃত্তি : কিন্তু 'নীলিনাভীল নেত্র'
(বহানিশা ৩০০ পৃঃ) কি পদার্থ? চক্রেপের স্থাপনা ত চক্রেপের
বৃত্তি-প্রাপ্য কবি-এসিদ্ধি, চক্রেপের ব্যাপ্যনা (বহানিশা ৩১৩
পৃঃ) কিন্তু বটল ?

সুর্কোই বসিয়াহি, উৎকৃষ্টে বসিয়ে খুঁত থাকিলে বড় ভই বহু,
তাই এই অমির এমন সুসিদ্ধিহি । প্রকর্তা বিদগ্ধে এই সুস্থ
সদ্যোচকত কবা করিবেন, এই প্রার্থনা ।

আত্মগোচর বিদ্য, পুস্তকগুলি গ্রন্থে বাসিকপরে প্রকাশিত হইয়া
পরে পুস্তকাকারে পুনঃপ্রতি হইয়াছে, কয়েকখানির প্রকাশিত সত্যের
হইয়াছে, একখানির ভূমিকাও দেখিলেন—ইহা 'সম্পাদিত হইয়া'
পুনঃপ্রতি হইল, তথাপি সত্যাকরস্বাধ ও ব্যাকরণের ভুল অত্র
মিলে । কয়েকটি নতুন বিলাস দ্বারা, ব্রীতিবত প্রদীপক বাসিল করা
আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধাও নহে । পরবর্তী সংস্করণে প্রকর্তাকে
এ পক্ষে বিশেষ সাধনাত্মক অবলম্বন করিতে অন্বিত উপদেশ
(advice gratis) দিয়া—(সদ্যোচক-প্রদীপ এই সুসিদ্ধিমানার
অধিকাংশ সাহিত্যক্ষেত্রে বিদিত আছে)—এই সুখী ও নীরস
সদ্যোচনা দেখ করিলেন ।

হিসাব-নিকাশ।

[প্রিয়ারবেশ]

জননি, তুমি বিশ্বাসতা, চাহ না আঁখি মেলে—
আমরা বত নিঃব, নীন-দুঃখী তব ছেলে !
নিকাশ ধরে দেখ না বাতা,
বুঝবে তবে মোদের বাধা ;
জননী হ'য়ে সন্তানেরে কতটা দিলে 'ঢেলে',
কাঙাল তব ছেলের কাছে কত বা তুমি পেলে !

তুমি যে রাজ-রাজেশ্বরী পাই নি তাহা ভুলে,
কিন্তু তব জন্ম সেই পাবান-রাজ-ভুলে !
ভিখারী বোঝা 'বিশ্ব' নাহা,
মোদের পিতা মহান্ নাহা,
ভুবন তিন করিয়া দান তোমারি পদ-ভুলে,
বিক্র বৈশে বসতি তাঁর অশান-চিত্তা-ভুলে ।

ভাগ্যেরেতে রত্ন-ধন পণনা নাহি হয়,
হু'হাতে যদি বিলাও তব হবে না তিল অয় ।
কৃপণ তুমি এদনি ধারা—
দাঁও না কিছু হুং-হুং ছাড়া,
হিনের শেষে পুত্র স্থলি পুত্র পড়ে' হয়,
—একটা দুই অর তব কর না অপচয় !

এমন ধরা শিশলে কোথা ? বুঝতে নারি মাতা !
—ওজন-ঘরে যে দান করে, সে নর কতু দাতা ।
আপন কড়া-ক্রান্তি মিল,
উত্থলে নাই প্রাপ্তি তিল,
বিন্দু বরি হর গো দিতে, অদ্বনি খোঁলে খাতা ;
কতই যেন হিলাবে গোল, কতই পাও বাধা !

মোদের তুমি হাও নি কিছু, মোরাই দিছি সব,
সেবার কালে হিসাব খুলে' তুমি নি অলসব,
এই যে তব স্বরূপ বাসি
—মুড় বাহে গিগাক-পানি,—
অরূপ তুমি কোথায় গেলে অরূপ অভিনব ?
মোদের হাতে রচিত তব বা' কিছু বৈতব ।

ছিল না বাড়ী, ছিল না ঘর, ছিল না দাস-দাসী ;
ছিল না কোনো কসন-ভূষা, রতন রাশি-রাশি ;
ভোলায় মত ভর্তা পে'লে,
হুইট মেয়ে, হুইট ছেলে ;
বাগের লাগি অলকাপুতী ; মর্ত্যে পে'লে কাশী ;
ঘনের রাজ্য হুবেব তব দয়ার অভিলাষী ।

আমরা বোকা ; লাগাবে দোকা গড়েছ তপ নানা,—

কখনো ভীমা তরুণী, কখনো চাঁদ-পানা ;

চুইটা নহে—বশটা হাত !

দোদের তব শূন্য পাত !

ভাতের লাগি দুরারে তব পেতেছে পতি থানা,

এনিতর করুণা তব আছে গো, আছে জানা !

সবার থাকে চুইটা চোখ,—তোমার দিছি তিন,

একটা ফুলে' চাইলে কি গো রইতো কেহ বীন ?

দোদের গড়া চরণ ছাঁটি ;

ধরতে গেলে পালাও ছুটি !

পরের ধনে পোদারীটা ফুলের তব জিন্

দোদের কাছে বাড়ছে না কি বহুত তব স্বপ্ন ?

অরুণা তুমি অরুণা হ'লে ; কতই হ'লো ঠাঠি ;

আমরা দিছি ; তাইতো, হেন জুখের দ্বন্দ্ব-পাট !

ইন্দু-আঁশি মেদিয়া চাও !

বিন্দু—ওগো, বিন্দু দাও !

বিন্দু দানে সিদ্ধ তব হ'বে না লুঠ-পাট,—

একটা কাণা-কড়ির দানে তাহুবে না এ হাট !

অনাথ

[শ্রীমুণালিনী দেবী]

ভায় বাপ-মায়ের দেওয়া নাম কি ছিল, তা জানি না। তবে সবাই তাকে "দুঃশী" বলিয়া ডাকিত। একরাশ কাশ চুলে ঘেরা কপালের নিচে ছুঁটা শান্ত সজল চক্কর দ্বির দৃষ্টি, আরও আমার মনে বাণ্য-কীবনের একটা কুরুণ স্মৃতি-কাহিনী বহন করিতেছে। আমি তখন চতুর্দশ বর্ষের বালক। ভায়গরে আর দীর্ঘ বাসন বৎসরের ঘটন'-স্রোত কীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আরও সে স্মৃতি স্নান হই নাই। কোমরে একটা তাগা, কঠে একটা মালুদী ও হাতে ছ'পাছি পিতলের সজ বালা—এই বেশে বেদিস প্রথম আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তার বাপের হাত ধরিয়া সে গাঁড়াইয়াছিল—কে জানিত অদৃষ্ট-দেবতা তাকে আমাদেরই একজন পরিজন করিয়া দিবে? কে জানিত আমাদেরই প্রাঙ্গণের তুলসী-তলে তার ক্ষুদ্র বকের শেখ নিশাপাশ অনন্তে মিলাইয়া যাইবে!

জাত ছিল ভায়া—নাগিত। বাপ-মায়ের এক ছেলে, একমাত্র আদরের ধন—সে ছাড়া তাদের আর কেউ ছিল না। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, যখন তার বৃদ্ধ বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া আনিল, তখন ভায়র ইতঃপার্শ্বে তার শুক কনয়ের সমত রস প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল; নবাপতা শুকীয় কীবন-ভাও করিয়া দিবার মত বড় বেশী কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু, যখন এই ক্ষুদ্র প্রাণটি

দেবতার আশীর্বাদের মত তাদের নিয়ানন গৃহ-কোণটীতে আনন্দ চকল দীপশিখার মত আসিয়া দেখা দিল—সেইদিন হইতে এই কিশোরীও তৃত্বিত কনয়ের সব আকাঙ্ক্ষা এই ক্ষুদ্র শিশুটীকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তারিত হইল। জুখে-ডাঙে চারিটা দীর্ঘ-বর্ষ অতীত হইয়া গেলে একটা সংস্কারের ঘন ছায়া গৃহের কন্যে কালিদা বেশিয়া দিতেছিল। কি একটা সংস্কারের ঘন-আলা তার বৃদ্ধ বয়সের অলস দিনগুলি ঘূর্ণিত করিয়া তুলিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরে কিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, গৃহকোণে শিশুপুত্রটিকে শোয়াইয়া, জননী তার কোথায় গিয়াছে। রান্নাবর, ভাতের, পুষ্টিবিশীর্ষ তীর এক-একে সব হারগা বুজিয়া, নাম ধরিয়া উঠে:ঘরের ডাকিয়া তার সড়া না পাইয়া, বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া যখন গাঁড়াইল, জোখে, যুগায় তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, বীতংল হইয়া গিয়াছে। শিয়ার-শিয়ার রক্ত-প্রবাহে একটা প্রেতি-হিংসার পাশব উল্লাস নাচিয়া উঠিল। যুগ্ম পুত্রের নিকে একবার সে চাছিল,—সন্ধ্যার তিমিত আলোকে সে নিশাপাশ মুখখানিতে একটা মুহূর্ত্তা ফুটরা উঠিয়াছিল। ব্যক্তিগত-ভয়া ভয়তের কাশাবল মধ্যে সে শুভ হাসির কতটুকু মূল্য, আর জায়া সে আঁধা পাইল না। শুধু অপদক নেত্রে তার নিকে চাহিয়া-চাহিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল;

ভারতের রাষ্ট্রের সেই আদর্শ অঙ্কনকে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, রাষ্ট্র তখন গভীর হইয়াছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে একটা গাঢ় অন্ধকার এক অমানিত বিপত্তির সম্ভাবনার সম্মুখে বাঁধা-ছিল। ঘুরে শৃংগলের উচ্চ চীৎকার ও কিল্লীর সঙ্কল্প ক্রন্দন নৈশবাহু বহন করিয়া আনিতেছিল। সমস্ত গভীর আবেগ স্থগিত শান্তির অঙ্গুলি-তলে শায়িত। ঘরে দ্বার ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। বাতায়ন-পার্শ্বে একটা প্রদীপের ক্ষীণ শিখা বাহিরের বায়ু-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তারই স্নান আলোকে সে দেখিল—পুস্তকে বন্ধে লুপ্তাঙ্গা জননী নিদ্রিত। যুগ্ম মায়ীর অনাবৃত অচেন মূখে তখনও বেন নির্মল বাৎসল্যের 'ফুট-উল্কা' বিলম্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু—না—স্বয়ং তার নিদ্রার ক্ষণে প্রতিহিংসার কোমল বক্ষি-শিখা আগাইয়া দিয়াছে। বিন্দু-কল্পিত হস্তে ঘরে সে বাঁশের ফাঁক হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা টানিয়া লইল। ঘরে শব্দার পাশে গিয়া তার তীক্ষ্ণ-কলক সেই হৃৎকোষে তরুণ-কণ্ঠে বসাইয়া দিয়া কিন্তু হস্তে পুস্তকে তুলিয়া লইল। একটা ভীত চকিত দৃষ্টি—একটা মর্ম্মকৌ আত্মনাদ,—ভারতের সব শেষ। একটা প্রতি-বাদের সময় না পাইয়া, একটা সম্মুখের ধনি না তুলিয়া রক্তনীর এই নিদ্রার পাণ অতিনয়ের মধ্যে হতভাগিনী অফালে প্রায় মৃত বাঁধা-পুত্র হইতে বিহার লইল।

মায়ীর ক্রন্দন যখন সেই মলিন-শব্দার আন্তরঙ্গ্যনি প্রাণিত হইয়া গেল,—রক্ত নর—সে বেন কানী, নিদ্রাঙ্গ প্রদীপ-শিখার স্নান আলোকে রক্তের সে ঘন কালিমা তখন নরকের বীতংসতা সৃষ্টি করিল। সমস্ত যুগ্মিক বেন সেই শোণিত-রাশির মধ্যে শৈশবাতিক উন্মাদে শিহরিয়া উঠিল। সে ভীষণ স্ত্রে তার বন কেনন হইয়া গেল—মাথা ঘুরিয়া উঠিল। নিস্তাভ্র পুস্তকে প্রাণপণে বন্ধে ঢাপিয়া ধরিয়া রক্তনীর সেই তরু অন্ধকারে পাগলের মত সে বাহির হইয়া গেল। তার মনে হইল পথঘাট আর কে বেন রক্তে লেপিয়া দিয়াছে। চক্ষের সমুখে এই রক্তের বিভীষিকা লইয়া চলিতে-চলিতে গানার শিখা উপস্থিত হইল। উচ্চ চীৎকারে সকলকে জাগাইয়া, আত্মবলে কহিয়া উঠিল, "আমি পুন করছি, আমার কানী মাও।"

আমার পিতা তখন সেই জেলার একজন হাকিম। পরদিবস জবানবন্দী লিখিয়া লইবার জন্য তাঁর সমুখে যখন তাকে উপস্থিত করিল—এই নিম্নরূপ হজা-কাহিনী অকল্পিত কণ্ঠে সে কহিয়া গেল। নরেন তার দ্বির উপাস-দৃষ্টি—যেন ভবিতব্যের অন্ধ-বনিকা স্তম্ভ করিয়া কেন্ এক অমানিত লোকের উদ্দেশে তার জ্যোতিঃহীন আঁখি ছুটা বেনমায়—পরিতাপে সম্মল হইয়া উঠিল। পাশে বসিয়া তার বালক-পুত্র সন্ত-মাতৃ-বিচ্ছেদের তীব্র বেনমায় মূক হইয়া রহিল। নিদ্রার নিয়তি আল তার ক্ষুদ্র জীবনের পৃষ্ঠায় কতখানি ক্ষতি আঁকিয়া দিল—কে তাকে বুঝাইয়া দিবে।

বুঝ কহিল "হুজুর! যথিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। আমি যে পাপ করেছি, হাজার অণুমুক্তিতেও তার প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। আর বাঁচিতেও আমার সাধ নাই। খ্রী-হত্যার নিদ্রার স্মৃতি জীবনের উপরে যে বিঘ ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার জ্বালা আমি বুঝ বরষে সইতে পারব না। তবে অস্তবের শৃঙ্গপথে এই অর্থাৎ বালককে একাকী কেনে মৃত্যুর কোলে দিয়েও আমি শাস্তি পাব না—এই আমার একমাত্র আবেগ।" বলিতে বলিতে তার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জয়াস্পন্দ-রোমাঞ্চিত কপোল বহিরাঃ দৃষ্টিবিলম্বিত দ্বারের অঙ্গ অধিয়া পড়িল।

বাতায়ন হইতে আবার বা এই শোচনীয় দৃষ্ট দেখিতে-ছিলেন। আধাকে ইলারার ডাকিয়া লইয়া বা বলিলেন, "প্রাণা বোঝারদের জন্য বড় দুঃখ হয়। হয় ত আল সার্বস্বিন ওদের খাওয়া হয়নি। বা, ডেকে এনে কিছু খেতে দে।" আমি দ্বিরা বুঝকে সেই কথা বলিলে সে অসম্মতি জানাইল। শুধু পুস্তকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বোঝাইল, বেন বলিল "আমার কিছু দরকার নাই— যদি খাইতে দেও ত ইহাকে কিছু দাও।" আমি তাকে তুলিয়া লইলাম। দ্বারের মত অঙ্গল হইয়া সে বসিয়া ছিল। তুলিয়া লইতে সে কাঁদিল না। বেন অসহ শোকে তার সকল ইন্দ্রিয় নিঃস্পন্দ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে লইয়া গিয়া তাকে খাইতে মিলান। কিছুই সে স্পর্শ করিল না। শুধু আমার দিকে যথা-ভর্যা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। খাওয়াইয়া দিতে সেলাম—সে মূক কিংবাহী লইল। অনেক চেষ্টায় কিছুমাত্র খাওয়াইতে না পারিয়া তার বাঁশের কাছে যখন

লইয়া সেলাম, আমার পিতার তখন অব্যবসায়ী লেখা হইয়া
দিয়াছে। বৃদ্ধ উত্তীর্ণা গীড়াইল। ছইজন পুলিশ কনষ্টেবল
আসিয়া তার স্বর্ণ হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল, কোমরে
একগাছি হুণ্ড বান্ধিয়া দিল। একজন শিকড়িকে কোলে
তুলিয়া লইল। বাইবার আগে বুকের চক্ষু আবার সমল
হইয়া উঠিল। অন্যের দিকে একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিয়া সে বিদায় হইল। সন্ধ্যার সেই স্নান আকাশপটলে
মাতৃহীন বালকের অচেনা চক্রে যে বেদনা স্ফুটাইয়াছিল,
শোক-রূপে বিরোধ ব্যাধার মতো কতখানি তার তীব্রতা,
কে তার পরিচাপ করিবে?

বিচারে বুকের কাঁপির হৃদয় হইয়া গেল। মাহবের
বিদান আজ বিধিনিষিদ্ধ হইবে অমোঘ হইয়া উঠিল।
পতিহত্যার পুত্র-বিচ্ছেদে কতখানি গুরু বেদনা, কেহ তা
বিবেচনা করিল না। মাহবের শাসন আজ মাহবের
দুর্জলতার কোনও প্রস্তর স্বীকার করিল না। মাহবের
আগে বৃদ্ধ কহিল “আমি সেই হাকিমের সঠিত একবার
বেশা করিতে চাই—এই আমার শেষ ভিক্ষা।” পুত্রকে
বন্ধে করিয়া আমার পিতার সমুখে বসন সে গীড়াইল—
শোকের নিষ্ঠুর আঘাতে তার কণ্ঠ ভাঙিয়া গিয়াছে। সেই
ভয়-কণ্ঠ হইতে মর্মরূপ ধন-জালা লইয়া শুধু একটা কীণ
স্বর বাহির হইয়া আসিল “অনাথকে দয়া করবেন।”

এত বড় একটা শোচনীয় বিরোধ-কাহিনী জীবনের
পাতার পোষিতের অকরে লিপিবদ্ধ করিয়া, সে আসিয়া
বসন আমাদের গৃহতলে গীড়াইল, সেই পিতৃ-মাতৃহীন
অনাথের মস্ত আমার মন মতবার তরিয়া গেল। ইচ্ছা
হইল তাকে বৃদ্ধে তুলিয়া লইয়া তার মাতৃহারা তুণিত ভবনে
সেহস্পর্শ বলাইয়া দিই; তার অস্বস্তিক কোমল কপোলে
একটু সমরু চুষনে মাতৃ-বিচ্ছেদ-বাথা ভুলাইয়া দিই।
এই চিন্তার চৌরক-শক্তি কি সেই বাল-দয় স্পর্শ করিল!
নীল উজ্জল চক্ষু ছুটী তুলিয়া আমার দিকে একবার
সে চাহিল ও ধীরে-ধীরে আমার পাশে আসিয়া গীড়াইল।
না তাকে বাধার পাইতে ডাকিলেন। সে আমার হাঁটু
জড়াইয়া বসিল—গেল না। তখন তার হাত ধরিয়া আমার
ঘরে লইয়া সেলাম। একটা ছোট টুলের উপরে তাকে
বসাইলাম ও নিজে তার সমুখে একখানি চেয়ারে বসিলাম।
না আসিয়া টেবিলের উপরে খাবার রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

তার বগলক বতকণ না চুগবের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া
গেল, সে স্থির হইয়া টুলের উপর বসিয়া রহিল।
তারপরে মাঝরা আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। “খাও”
বসিয়া তার মুখে খাবার দিতে সেলাম—হাত দিয়া সে
লয়ইয়া দিল। একটা বিবাদের পাত্রীরা তার স্বমহীর
মুখখানি বড় মন্দর বসিয়া মনে হইল। তাকে কোলে
তুলিয়া লইলাম। চক্ষু তার মলে তরিয়া গেল। কি এক
গভীর নির্ভরতার আমার বন্ধে মুখ লুকাইয়া ধীরে, সতর্পণে
সে কাদিতে লাগিল। সেই যৌক্তিকমান শৌচাচারের
ছেলেটিকে বন্ধে লইয়া আমার আভিভাষা কি সত্ত্বাতে
মরিয়া গেল,—অথবা কোন এক অস্বাভাবিক উচ্চলোকে
হইতে একটু মাতৃদয়নের মুক আশীর্বাদে তারা অমর হইয়া
রহিল—কে বলিবে!

কাদিতে-কাদিতে তার তপ্ত দেহ নিস্তার শান্তিধর
কোলে তুলিয়া পড়িল। কিছুকালের তত্ত্ব বিদ্যুতি আসিয়া
দেই বগলকত ধরণে বিদ্য প্রলেশ মাথাইয়া দিল। সেই
ঘরেই একটা ক্ষুদ্র তৌকিতে তাকে শোয়াইয়া দিলাম।
আবিধান কি করিয়া এই শোকাতুর প্রাণকে স্থগ্ন করিব—
কি করিয়া এই মাতৃহারা অমোঘ বালককে সাহস দিব।
দুর্দৈব আজ তার ক্ষুদ্র জীবনের উপরে যে নিম্নারুণ মৈত্রের
দুর্দৈব তার চাপাইয়া দিল, আজ প্রভাতের এই মাতৃহারা
কে তার ক্ষুদ্রিত অভাব মিটাইয়া দিবে—কে তার মেহ-
মহতা দিয়া এই ক্ষুদ্র কলিতিক স্ফুটাইয়া তুলিবে—অকালে
বৃত্তহাত হইতে বিবে না।

এইরূপে সেই অনাথ বালক আমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত
হইল। আমরাই সঠিত তার বসিতা বাড়িয়া গেল,—
আর কাহারও কাছে সে বাইত না। বাওয়ার সময়ে
আমাকেই তার কাছে বসিয়া থাকিতে হইত—না হইলে
সে খাইত না। আমি বিভাগে চলিয়া গেলে আমরাই
ক্ষুদ্র বরটিতে দেই ক্ষুদ্র টুলখানির উপর আমরাই অগে-
ন্য দে বসিয়া থাকিত। ফিরিয়া আসিলে সেই নির্জন
বরটিতে বসিয়া তার শান্ত মুখীতে একটা আনন্দের
দীপ্তি ভাসিয়া উঠিত, তার তকণ অধরের কোণে একটু
যেন মুহূর্তসি স্ফুটাই উঠিত,—সে হাশিতে কি গোপন-বেদনা
বহিয়া পড়িত।

সন্ধ্যার পরেই তাকে খাওয়াইয়া দিতাম। আমি আলো

আসিয়া পড়িতে বলিলে সে আমার টেবিলের পাশে সেই ক্ষুদ্র টুলে উঠিয়া বসিত; অনিমেষ ঢেকে আমার নিকটে চাহিয়া থাকিত। আমার গড়া হইত না। পুস্তকের দ্বারা পৃষ্ঠায় কাল-কাল অক্ষরের শ্রেণী আমার মনের দ্বারে কোনও অর্থ বহন করিত না। মন তখন সেই মাতৃহারা বাসকের মৌন প্রতিচ্ছায়া ধারণ করিয়া একটা অস্বস্তি-বেদনার নিষ্পন্ন হইয়া থাকিত। ক্রমে যুগে তার চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া গেলে আমারই বিছানার পাশে সেই ক্ষুদ্র চৌকীখানিতে তাকে শোয়াইয়া দিতাম। প্রতিদিন গভীর রাতে একটা অল্পক্ষণ চাঁৎকারে আমার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। তখনিতাম, সেই মাতৃহে-পাশছিন্ন বালক “মা, মা” বলিয়া করুণ কণ্ঠে কাদিতেছে। রজনীর শুভ্র অন্ধকারে সে ক্ষনি বহন কাদিয়া-কাপিয়া গৃহছানতলে প্রতিধ্বনিত হইত—মনে হইত যেন সেই মাতৃবিয়োগ-বিধুর বালকের আকুল ক্রন্দনে জননী তার কোন প্রেতলোক হইতে অপরীক্ষিত ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া তার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া গাড়াইয়াছে। কি বলিয়া তাকে সান্তনা দিব, কি করিয়া তার তৃপ্তি করিব হইতে এই আশান্বিত মাতৃস্মৃতি মুছিয়া দিব—তাণ্ডা ভাবিয়া না পাইয়া বৃক হইয়া থাকিতাম।

গভীর রাত্রির এই শান্তি ভঙ্গ করার ও দিবসে তার অস্বাভাবিক বোনতায় বাড়ীর লোকের তার প্রতি করুণার পরিবর্তে অনাযত্নের ভাব আসিয়া বেধা দিল। কত বড় ক্ষুণ্ণে আম বালকের কলকণ্ঠ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কতখানি বেদনার অসহ উত্তাপে তার মাতৃহারা করণ হইতে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস নৈশ অন্ধকারে বাহির হইয়া যায়, নসংসারের পার্শ্বপরতা তার কতটুকু আর বিদ্যাব নহবে।

বাড়ীর পাশে নবানী-আমলের একটা ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। তার ক্ষীর্ণ প্রাচীরগায়ে লতাভাঙ্গাদি দিয়া কাল তার নবর গতি-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। বিপ্রহরে সেই পুরাতন ফর্দাতলে গাড়াইয়া আমার মনে হইত ওই ভগ্ন ইষ্টকল্পে শতাব্দীর কত সুখ-দুঃখের অতীত কাহিনী প্রোথিত হইয়া আছে—মূলদান আভিজাত্যের কত সৌরভ তার মধ্যে আত্ম সমাধি। বড় বড় বিদগ্ধ-করা প্রোকাঠের শৈবালশিখর দেওয়ালগুলিতে একটা বিষাদের স্নানহারা অঘাট হইয়া থাকিত। বনশ্রিবিষ্ট আশ্রয়কের নিবিড় বৈটনের অন্তরালে থাকিয়া সেই কৃতসৌন্দর্য ভগ্ন

অট্টালিকার ক্ষীণতার মধ্যে সূর্য্যদা একটা সহজ শান্তি মুটিয়া থাকিত। বাড়ীতে বহন বিশেষ হইতে আত্মীয় স্বজন আসিত, পাঠের বিষ আশ্রয় করিয়া আমি প্রায়ই এই নির্জন গৃহীর নিতৃত শান্তির মধ্যে আশ্রয় হইতাম। একটা ভাঙ্গা ছত্রের ক্ষীণ তত্তা পাতিয়া বই লইয়া বসিয়া পড়িতাম।

একদিন সেইখানে বসিয়া ছিলাম। আকাশটা সে দিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তাই যেন সেই নিবিড় শান্তির স্নান ছায়া বিষাদের ভাঙ্গে, গাঢ়তার হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে অবিচ্ছিন্ন নিতৃততা। শুধু সেই বিষাদশিখর একটা দেওয়ালের ছিন্নমধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া করুণ আলাপনে কোন এক বিষাদ-কাহিনী গাহিতেছে। এমন সময়ে ঘরে মুগ্ধমান বিষাদেরই মত আসিয়া সে উপস্থিত হইল। নরনে কখনও তার বালকমূলক চাকগা দেখি নাই। কিন্তু তার স্নিগ্ধ নীলিমায় এমন একটা শান্ত-সৌন্দর্য্য মুটিয়া থাকিত, যে তাকে মনে-মনে ভাল না বাসিয়া পারিতাম না। শুদ্ধে শুদ্ধে কৃত্তিক বনকৃষ্ণ অলঙ্কার তার ক্ষুদ্র মুখখানিকে ঘিরিয়া ছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মলিন ছায়াভঙ্গে সে মুখখানিকে বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। বেহায়ে বসিলাম, “হুবা, আমার পাশে এসে বস”। সে বলিল। একান্ত অঙ্গুণ্ডেই মত সে আমার কথা তুলিত। আমি নিবিষ্টমনে বই পড়িতে লাগিলাম ও মাঝে-মাঝে আঁচ ঢাকে তার দিকে চাহিতেছিলাম। ঘুরে বেঘরান আকাশের গায়ে একটা চিল বুড়িয়া-বুড়িয়া উড়িতেছিল। ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁকের মধ্য দিয়া সে তাহাই একপ্রাণ মনে দেখিতেছিল। হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমানের স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, কই?”—আমি একটু বিমিত হইলাম। যারের কথা ত সে আমাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না—দিবসে কখনও সে “মা” বলিয়া ডাকিত না। তবে আজ সহসা এ প্রশ্ন কেন? তবে কি রজনীর শুভ্র অন্ধকারে যে মাতৃ-স্মৃতি তার বাল্যময়ে বেদনার উচ্ছ্বাস তুলিত—আজ কি এই বিষর প্রকৃতির মৌন ছায়া তার মানস নয়নের সম্মুখে সেই মাতৃস্মৃতি আশ্রয় দিয়াছে। বলিলাম—“মা যে তোমার বাড়ী গেছে।” অভিমানে ক্ষুদ্র অধর “স্মৃতিত করিয়া কহিল “আমি যার কাছে যাব—” আমি আমার করিয়া

কহিলাম “আমি যে তোমার মা, আমার বেলে কোথা যাবি?” বিগুন অভিমানে সে উত্তর করিল “না—তুমি মা নও—তুমি বাবু।” জীয়ার কোলে করে তুমি হারের কাছে নিয়ে চল।” তার ক্ষুদ্র হাতখানি বকের উপরে রাখিয়া কহিলাম, “এই দেখ, এইখানে তোমার মা সুকিরে আছে। এখানে বসে সে তোমার সব কথা শুনতে পাচ্ছে, তুমি কাঁদলে সে কাঁদে, তুমি হাসলে সে হাসে। লম্বীটি, তুমি আর তার মস্ত কৈশো না।” চক্ষে তার অশ্রু উৎসল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কাঁদিল না। কথাটিতে কতখানি শাখনার যিৎ আশা নিহিত ছিল, সে বেন তাঁহা বুঝিল। ঘরে তার অলক-শোভিত ক্ষুদ্র মাথাটা আমার বকের উপরে রাখিয়া মুহূর্তে সে কহিল “তুমি মা।” হই তিনটা তপ্ত অশ্রু আমার বসে স্পর্শ করিল।—সে কি ঘেহের—না বেনদার! হার হতভাগিনি, ধরিত্রীর বাঘাভরা বুকে যে রিক্ততার মধ্যে এই প্রিয় প্রাণটিকে রাখিয়া গিয়াছিল, তাই কি মিটাইবার ক্ষমতা মরণের অন্তরাল হইতে এই পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালকের দ্বারা অলঙ্কারিত হইতে দ্বয়ের সেহাধারা চালিয়া দিয়াছিল। আরও তাকে বকে চাপিয়া ধরিলাম, বুকিলাম, পুরুষের মধ্যে বাহা পুরুষ তার সবটুকুই পৌকব নয়—তার মধ্যে যে নারী আছে তার ব্যথা, তার ব্যাকুলতা, তার অবিকার ক্রম নয়; এই নারীরই দেহ, কোমলতা বিশ্বের উপরে বাহা কল্যাণ ফুৎকা। লইয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছে, পৌকব অপেক্ষা তার শক্তি; তার মর্যাদা বড় অল্প নয়।

সে দিন রজনীতে সে আর ‘মা মা’ বলিয়া কাদিল না। মধ্য-রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার তার বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সে উঠিয়া বসিয়াছে। আমি জাকিলাম —“হুবা!”—বাগ্ন কর্তে সে কহিয়া উঠিল “বাবু, মা!”—আমি বলিলাম “কেন?” সে মিনতি স্বরে বলিল, “তোমার কাছে যাব?”—বুঝিলাম কেন আজ আমার কাছে আসিবার ক্ষমতা তার এই ব্যাকুলতা। বলিলাম, “এস।” জানালার একটা উন্মুক্ত খড়খড়ির মধ্য দিয়া জোখবার রক্ত-বেধা আঙ্গুরা পড়িয়াছিল। তাইই অশ্রু আঙ্গুরা দেখিলাম, সে ডাড়াডাড়া নখিরা আমার শয্যার উঠিয়া বসিল। ঘরে তার মুখখানি আমার বকের পাশে রাখিয়া সে কহিল “মা”—পাশে তার এই অলঙ্কারিত মাথাখন

পাশের ঘর হইতে কেহ গুনিয়া ফেলে ও ইহাকে একটা পরিহাসের বিষয় করিয়া তোলে, এই ভাবিয়া আমি একটু লজ্জিত হইলাম। তার নাথার হাত রাখিয়া কহিলাম, “হুবা, এখন ঘুমাও; রাত্তিরে কথা বলতে নেই।” সে-চুপ করিল। কিন্তু সেই প্রাণজঙ্করে আমার মনে হইল—তার চক্ষু চুপ উন্মুক্ত হইয়া আছে। অতি সতর্পণে তার নিঃশ্বাস পড়িতেছিল—বেন কিসের একটা উৎকণ্ঠা তার ক্ষুদ্র বক্ষখানিকে ভায়াক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বুকিলাম আমার কাছে আসিয়া তার মাঝেবন্ধা নিটে নাই। তখন ঘরে তাকে বকে জড়াইয়া ধরিলাম ও তার হৃদয়ার গুণ্ডে একটা চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিয়া কহিলাম, “লম্বীটি, ঘুমাও,”—সে ঘুমাইয়া পড়িল। বকের কাছে সেই মিশ্রিত নীচ ভাবের ছোঁচটির দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, নীচ বগিরা বাক্স মানুষকে ঘৃণা করে, মানুষের ধর্মকে ভায়া জানেনা;—অবদার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাক্স পিছে পড়িয়া আছে, তুচ্ছ আশ্রয়তার বোহে বাক্স তাদের অবজ্ঞা করে, তারা ঘৃণা, তারা হুর্লগ—বাহিরের তারা ক্রীতদাস হইয়া আছে, অন্তরকে তারা চেনে নাই।

তার সহিত আমার এই ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে বাড়ীর শোকে একটা অরতির চক্ষে দেখিতেছিল;—বুঝিলাম, তাদের মধ্যে ইহা লইয়া গেলগনে একটা আলোচনা চলিতেছে। তথাপি সেই ক্ষুদ্র বালকের প্রতি আমার মমতার কিছুদূর ব্রণ হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। সেও তার ক্ষুদ্র দ্বয়ের বতখানি ভালবাসা, তার সবটুকু ব্যাকুলতা দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। দিবসে তার প্রতি কাতের ভিতরে আমারই স্মৃতির একটু অলুপ্রাণনা থাকিত বসিয়া বসে হইত। বৈকালে তাকে যে খাবার দেওয়া হইত, তার ভাল অংশটুকুই সে গোপনে আমার মস্ত লুকাইয়া রাখিত। বিছানার হইতে কিহিয়া আসিলে, সে আমার হাত ধরিয়া বসাইত ও তার বাহিত খাত আনিয়া আমার মুখে তুলিয়া দিত। একটা অহেতুকী কৃষ্ণিতে তার হৃদয় মুখখানি ভরিয়া বাইত।

একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিলাম, আমার ঘরের দরজার ভাণা দেওয়া—বহু জানালার একটা উন্মুক্ত খড়খড়ির মধ্যে কার হুঁচি বাগ্ন চাখনি হুটুটা আছে। আমাকে দেখিয়াই সে অভিযুক্ততা স্বরে কহিয়া উঠিল “খুলে দাও।”

“বই” বলিয়া ভিতরে ঢাৰী আনিতে গেলাম। তিনদিন, “গণপেভা ভাড়া বাড়ীতে” একটা উক্তার উপরে একাকী বসিয়া থাকায় মজা, আশু তার এই শক্তি। কিছু না বলিয়া তাগা খুলিয়া বসে ঢুকিলাম। “মা” বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে আমার হাঁটু ঘড়াইয়া ধরিল—তাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। দুই হাতে আমার চিবুক ধরিয়া মেহমাখা কণ্ঠে সে কহিল, “কাজ বে খাবার মেহ নি, তুমি কি খাবে?” বুঝিলাম তার বৈকালের খাবারও আজ কেহ খেয় নাই। ভিতরে গিয়া খাবার লইয়া আসিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই খাটল না। আমার হাত হইতে পাত কাড়িয়া লইয়া সে আমাকেই খাওয়াইতে লাগিল। তার সব বহু, সব দেবা আমাকে দিগাই সে তুণ—আমার তৃপ্তির কণাটিতেও সে ভাগ বলাইতে চাহে না। এই ক্ষুদ্র বালকের মনে এই চরিত্র মেহ-স্বভাব কে দিল? কে তার ক্ষুদ্র বক্ষধানির কাণার-কাণার ক্ষুদ্র ঢালিয়া আমার ভূমিত হৃদয়ের কাছে ধরিয়া দিল—কে আমার তা বলিয়া দিবে?

এইরূপে একটা স্বপ্ন-পক্ষে ছুটা নীচের এম্বি বাঁধিয়া লইয়া কাল তার নীলশক্তি পতিতে বসিয়া বাইতেছিল। এখন সময়ে একদিন আমার পিতার বংশির সংবাদ আসিল। বৈকালে জানানার ধারে বসিয়া আমি একখানি মাসিক পত্র পড়িতেছিলাম। বায়ান্নার উপরে বসিয়া আমার একখানা বই খুলিয়া সে ছবি দেখিতেছিল। কিছু দূরে বসিয়া আমার দিদি লেগাই করিতেছিল। হঠাৎ দিদি তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হুণী, আমাদের সঙ্গে কখনগরে যাবি?” বই হইতে চক্ষু না তুলিয়াই সে কহিল, “না।” “তবে এখানে থাকবি?” এবার সে চাহিল—বলিল, “না।” “তবে কোথা যাবি?” উর্কে অনন্ত নীলিমার দিকে তার নীল নয়ন ছুটা তুলিয়া, একটু বৃহৎ হাসিয়া সে কহিল, “ওইখানে।” দূরে আকাশের গারে একখানা মেঘ অন্তর্গামী সূর্যের বিদায় চুবনে আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারই সোহিত বর্ণনাগ তার মুখখানিতে পড়িয়া একটা অবশল ছায়া কে নীপ্ত করিয়া দিল। একটা অমানিত আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। দিদিরও মুখে একটা ভীত ভাব দেখিলাম। আমার দিকে একবার চাহিয়া, সে কথটা চাপা দিল—বলিল, “হুণী, তোমার মজা একটা ভাড়া ভৈরবী

কছে, চল, পরিয়ে দেব।” এই বলিয়া তার হাত ধরিয়া লইয়া গেল। সে দিন আর মাঠে খেলিতে গেলাম না। শুক হইয়া সেইখানেই বসিয়া ক্রীড়াম। ক্রমে পোকরা বসনে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। বিদায়ের মহাশক্তি ক্রান্ত গারে সান্তনা-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। কিন্তু আমার শক্তিত ছদর যে বিদায়-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার সে শ্রিত স্পর্শে তাহা অলপান্তিত হইল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মা আসিয়া বলিলেন “ভাড়া বাড়ীর হকিণের আমবাছটার অনেক গুটা পড়েছে; বা, হুণীকে নিয়ে কয়েকটা গেড়ে নিয়ে আয়।” তাকে লইয়া আমবাছতলার উল্লিখিত হইলাম। তখনও সূর্য্যায় অবগতিত ধরণীর সজল মুখখানি অরুণ চুবনে হাত্তোচ্চল হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতির ক্রম অকল ঘিরিয়া একটা বিদায়ের গাঢ় ছায়া সমাট বাধিয়াছিল। গাছে উঠিয়া আমি আম পাড়িতে লাগিলাম। নীচে সময়ে সে তাহা ফুড়াইতেছিল! আজ প্রভাতে তার ক্ষুদ্র মেহের নীলশক্তি পতিতহিতে কি আনি কেন, একটা অবশলের ছায়া বেলা করিতেছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি আশ্রুগুটিকা কেলিয়া দিয়া আমি ঘন পল্লবলণে বসিয়া তাকে দেখিতেছিলাম। একটা ভবিষ্য অকলাপের আশঙ্কা আমার ধবনীতে দ্রুতভালে স্পন্দন তুলিয়াছিল। একটা গুটি কিছু দূরে ভগ্ন ইষ্টক-তুণের পাশে দিয়া পড়িয়াছিল। সে তাহা ফুড়াইতে গেল। হঠাৎ “মা” বলিয়া চীৎকার করিয়া সে বসিয়া পড়িল। সে করুণ ধ্বনি আমার দ্রুতকপিত হৃদয়ে শেলের মত আসিয়া বাজিল। কিপ্রকারে বৃক শাখা ধরিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। ছুটিয়া গিয়া তার অবলুপ্তিত দেবখানি কোলে তুলিয়া লইলাম। আমার মুকের উপরে, তুণগুলি স্ক্রুতিত করিয়া সে ছটফট করিতে লাগিল। আমার দিকে বেদনায় পাণ্ডুর মুখখানি তুলিয়া স্ক্রুতিত কণ্ঠে সে কহিল “মা, চল বাড়ী গাই।” দ্রুতপদে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাক্যে ডাকিয়া বলিলাম “মা, হুণী আজ কেমন কছে।” সকলে ছুটিয়া আসিল। বায়ান্নার তাইই ক্ষুদ্র বিছানাখানি পাতিয়া তাকে শোয়াইলাম। বহুদায় সে অস্থির হইয়া পড়িল। সকলে বসিতে লাগিল মাগে স্বাভাবিকহাছে। মেহের কোনও অংশে মংশনের চিন্তা না দেখিয়া কি উপায় করিব তাহা পাইলাম না। একজন সন্ধ্যাবেলায় বৈক

আনিতে গেল। মুখ বিয়া তখন তার কোণা উঠিতেছিল।
 ব্রহ্মলোকে খুব বিদ্যাক সর্প তাকে দংশন করিয়াছে, নতুবা
 এত শীঘ্র এইরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় না।
 মহাপোদুখ সেই স্তম্ভিত শ্রির দেহবানির পাশে বসিয়া
 ডাকিলেন, “হুবা!” স্যোতিঃসীন আঁখিতারা ছুটি ভুলিয়া
 সে একবার চাৰিল,—আবার তখনই স্তম্ভিত করিয়া
 লইল;—আবার সে চিনিতে পারিল না। হার নিষ্ঠুর
 নিয়তি যে তার ক্ষুদ্র ছবয়ের সব ভালবাসা আমাকে অর্পণ
 করিয়া তার অভিশপ্ত ক্ষুদ্র জীবনের সবটুকু তৃপ্তি আহরণ
 করিত—আমাকে তার মাঝের আগুনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
 ভিখারীর মত যে তার মাকুসে-মুখা মিটাইত—ধর্মীর বক
 হইতে শেষ বিবার-কণে সে আমা আমাকে চিনিল না!

অস্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া তুলসীতলার
 তাকে লগ্না হইল। বৈত্র আসিবার পূর্বেই তার শেষ
 নিঃশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। আর সে তরুণ কণ্ঠ না
 বলিয়া ডাকিল না। আর সে নীল নবনে মেহের ঢালি ছুটি

না। উদার স্বর্ণরাগে যে কণিটি ছুটিয়াছিল—প্রভাত না
 হইতে বার কোমল পেলবে চোখের নিষ্ঠুর আঘাত লাগিয়া-
 ছিল, প্রভাতেরই আলো রক্তহাতে সে অকালে ধরিয়া
 পড়িল। হিন্দুর এই তুলসীতলে যুগ হইতে যুগান্তর কত
 প্রাণ অতীতের পথে ভীর্ণ যাত্রা করিয়াছে—জলতরা কত
 আঁখি কত অজ্ঞানিতপথ বজ্রকৌ এইখানে শোক অশ্রু
 উপধারে বিহার দিয়াছে—আল প্রভাতে, কুরাসার
 অবগুষ্ঠনতলে, এই তুলসীতলার একটা অভিশপ্ত ক্ষুদ্র
 জীবনের উপরে ভবিতব্য যে সূত্রার অন্ধ যবনিকা টানিয়া
 দিল, বিব-রসমকের এই বিরোপাত্ত দৃষ্টতা কাল তার নিত্য
 বিশ্বস্তির মধ্যে বহন করিবে না জানি, কিন্তু আল ও আবার
 মর্দ-বীণার নকল তর্রিতে এই স্মৃতি একটা করুণ হারে
 গাথা আছে—আল ও আবার নিদোষ-বস্ত্রে তার তরুণ কণ্ঠের
 হৃদয় মা-সংবাদন অতীতের একটা বিরোপ-বেদনাকে
 প্রবোণ করিয়া দেয়।

রামাশ্রম

[শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন মল্লিক-বি-এ]

[‘স্বর্গাশ্রম’ের অপর পারে, লক্ষ্মনকোণার নিকট এই হৃদয়
 পুত্রকাণার প্রতিষ্ঠিত। একেবারে পাহাড়ের ঢুকে। উত্তর-
 পশ্চিম প্রদেশের একজন হিন্দু জল তাঁহার গুরুদেবের
 নামে এই পুত্রকাণার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইছাতে
 মাঝারদের পাঠের অস্ত সন্তুষ্ট ও ইংরাজী অনেকগুলি পুস্তক
 আছে।]

স্বর্গাশ্রমের ভূমি বাগির ময়াল
 হয় হেতা বিশ্রামে,
 বাগলো মুখর ঘরনা বালা
 ‘মোনী বাবা’র আশ্রমে।
 সত্য এ কি ‘কৈদারনাথ’
 ভূখার ‘পরে পয়দুল,
 আকাশ দেউল নামিয়ে এনে
 করলে কে যে বড়মূল?
 কে মোটালে বাগির বীণা
 একতারাির সহতে
 ‘আটকা-তোপের’ ভাঙা ভাঙা কে
 দিলে ‘নাগা’র পংগতে।

পাহাড় চিরে পুত্রকাণার
 করলে হেতা তৈরি কে?
 কান্দীর পাড় বসিয়ে দিলে
 ঘনবাণীর গৈরিকে।

খাজা মাইনুদ্দিন মোহাম্মদ চিস্তি (১)

[ত্রিমোহনি আস্মত আলি নসিরাবাদী]

সত্যাবিশিষ্টতার মধ্যে সকলের অগ্রগণ্য খাজা মাইনুদ্দিন মোহাম্মদ চিস্তি সাহেব ভারতীয় তাপনহৃদয়ের শিরোমণি ছিলেন। তিনি নিখিঁদ্বান শরৎ ভগ্নগ্রহণ করেন এবং বোরশানে প্রতিষ্ঠাপিত হন। তাঁহার পিতা গিরাহুদ্দিন হাসান অত্যন্ত সম্ভাতির ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তি সাহেবের বয়স ছিল নয় বৎসর। পৈতৃক উত্তরাধিকার-স্বত্বে তিনি একতী বনশীর উদ্ভান এবং একতী ধাতা প্রাপ্ত হন।

তাঁহার আশ্রয়স্থানের অনতিদূরে ইব্রাহিম কঙ্কুজি নামক এক জন দক্ষ (উদ্ভাষক) ছিলেন। একদা খাজা সাহেব বৃক্ক জল সেচন করিবার সময় সেই জাবোমুক্ত বৃক্কপুত্র তাঁহার উত্তানে আসিয়া উপস্থিত হন। যখন খাজা সাহেবের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল, তখন তিনি সৌভাগ্য গিরা, সম্মানে তাঁহার হস্ত চুম্বন করতঃ, এক বৃক্কতলে বসাইয়া, একতী আশ্রয়ের গুহ্য তাঁহার সমুখে রাখিলেন। তিনি পৌর ব্রহ্মচার (ধনি) হইতে কাজাটার খোদা বাহির করিয়া চর্চন করতঃ তাত্তা খাজা সাহেবকে খাইতে দিলেন। ইহা ভক্ষণমাত্রই খাজা সাহেবের মনের কবচ খুলিয়া গেল,—অস্তুর বিদ্যা জ্যোতির্বিদ্য হইয়া উঠিল। এই ঘটনা হইতেই তিনি বিদ্য-বাগনা ছাড়িয়া মুক্ত হইয়া পড়িলেন; এবং সমস্ত ধন-সম্পদ দীন-দুঃখীমণ্ডিকে দান করিচ্ছদ্মনে বহির্গত হইলেন।

কতক দিন তিনি সমরকন্দ ও বোখারায় থাকিয়া কোরাণ শরীফ কঠোর করিবার পর বিভ্রান্তিকার মনোনিবেশ করিলেন। বিভ্রান্তিকার পর তিনি এতাক প্রদেশান্তিমুখে গমন করেন।

যখন তিনি নিশাপুর অঞ্চলের কস্‌বাবে হাক্কীতে উপস্থিত হন, তখন সেখ উপমাণ হাক্কী সাহেব সর্বাগ্রগণ্য মহাপুরুষ (পীর) ছিলেন। খাজা সাহেব তাঁহার নিকট

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আড়াই বৎসরকাল তপস্ব্যবাসে কাশ-বাগন করিয়া গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। (২)

খাজা সাহেব সেখ হাক্কী সাহেবের নিকট হইতে খোলাকত প্রাপ্ত হইয়া, বাগদাদান্তিমুখে গমন করিয়া কস্‌বাবে সাধ্বারে পহুছিলেন। জায়েল কস্‌বা বেঘন বনশীর ও পবিত্র ভূমি, তেমনি দীক্ষালভের উপযুক্ত স্থান। ইহা বাগদাদ হইতে ৭ দিবসের পথ দূরবর্তী হুদী পর্বতের তলদেশে অবস্থিত। ইহার জনবাস্য নানিষ্টতোকা। মহা জন-প্রাণের সময় হজরত নূহের নোকা এইখানে বন্ধা পাইয়াছিল। এই স্থানই সেখ বখিউদ্দিন আবদুল কাদের জিশানী (কঃ) সাহেবের পবিত্র ভ্রমস্থান। নজরদিন কোজা সাহেব যখন তথায় পদার্পণ করেন, তখন খাজা সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অস্ত সাধ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মর্দন লাভ না হওয়ার, সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ বাগদাদে উপস্থিত হইলেন। প্রাথমিক শরীফ সেখ আউহাউদ্দিন কেবরমারী সাহেব খাজা সাহেবের মর্দনে তাঁহার প্রতি একান্ত অস্বস্ত হইয়া পড়েন এবং

(২) সেখ উদ্‌গুণ হাক্কী সাহেব হাক্কী শরীফ রেখানির দ্বিত্ব ছিলেন। রেখানী সাহেব খাজা মোহম্মদ চিস্তির, খাজা মোহম্মদ চিস্তি সাহেব খাজা নাসিরুদ্দিন চিস্তির, খাজা নাসিরুদ্দিন সাহেব ইব্রাহিম চিস্তির, ইব্রাহিম চিস্তি সাহেব সাহেব খাজা নাসিরুদ্দিন আবু মোহাম্মদ চিস্তির, আবু মোহাম্মদ সাহেব খাজা নাসিরুদ্দিন আবু হাম চিস্তির, আবু হাম চিস্তি সাহেব খাজা ইলহাক শাবী এরশন বচিতি সাহেবের, ইলহাকশাবী সাহেব খাজা মোহাম্মদ-বীনওয়ালি সাহেবের, বীনওয়ালি সাহেব খাজা হাদিবায়ে বগরি সাহেবের, বগরি সাহেব খাজা হোজারকয়ে দুইইশী সাহেবের, দুইইশী সাহেব মোলতান ইব্রাহিম আবদুল সাহেবের, আবদুল সাহেব খাজা ফারেল আইরাম সাহেবের, আইরাম সাহেব খাজা হাদিব আইরামির মরহুমের, হাদিব সাহেব খাজা হাসান বদরী সাহেবের, হাসান বদরী সাহেব আবদুল মোমেনিণ ইব্রাহিম দুতাকিন বীর কেনরী হজরত আদী (৩ঃ) সাহেবের, এবং হজরত আদী সাহেব হজ্জে বকুল সাগ-আশা হো সালসের দ্বিত্ব ছিলেন।

তাহার শিষ্য গ্রন্থপূর্কক দীক্ষা লাভ করেন। পীর-শ্রেষ্ঠ সেখ সাহাবুদ্দিন সহরওয়াদিও প্রথমসংস্থায় খাজা সাহেবের সংসর্গে গভীর ভাবজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে খাজা সাহেব বাগদাদ হইতে হাম্বাননে আসিলেন। তিনি সেখ ইউসুফ হাম্বানী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তেত্রিগতিবুখে প্রস্থান করিলেন। সেখ খালসুদ্দিন তিরিহির পীর আব্দুসাইদ তিরিহি সাহেবকে প্রাপ্ত হইয়া খাজা সাহেব কিছুকাল তাহার সংসর্গে রহিয়া গেলেন। (৩)

সেখ কুতুবউদ্দিন গজ শরর খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী সাহেব হইতে বর্ণনা করেন, “খাজা মাইমুদ্দিন চিত্রিত সাহেব গ্রন্থ অবস্থায় একদল কঠোর উপবাসগত করিতেন যে, সাতদিবস রোজা রাখিয়া ৪ বেন্দুগল হইতে ৮ ঘন্টার একটী কষ্ট পানিতে ভিজাইয়া একতর করিতেন।”

নিজামুদ্দিন আউলিয়া বলেন যে, “খাজা মাইমুদ্দিন চিত্রিত সাহেবের পরিচানে সামান্য খেরকা ছিল, কোন দ্বান হিঁড়িয়া গেলে তাহা নিজ হাতেই খেগাই করিয়া লইতেন। বগলের দিকে ছিন্ন হইলে, যে কোনরূপ কাপড় পাইতেন, তদ্বারা ছিন্নাংশে তালি মিটেন।”

খাজা সাহেব যখন তেত্রিগ হইতে ইম্পাহানে উপস্থিত হন, তখন সেখ মোহাম্মদ ইম্পেহানী সাহেব তাহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময় খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী সাহেব ইম্পাহানে ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ ইম্পেহানীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন মনন করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন খাজা সাহেবের বর্ণন পাইলেন, তখন তিনি ইম্পেহানীর নিকট খুদ্বি হওয়ার সময় পরিভ্রামপূর্কক খাজা সাহেবের নিকট খুদ্বি হইলেন। খাজা সাহেব উক্ত খেরকা বখতিয়ার কাকী সাহেবকে দান করিলেন।

কুতুবউদ্দিন সাহেবের অন্তিম সময়ে তিনি সেই খেরকা করিমুদ্দিন গজ শরর সাহেবকে, করিমুদ্দিন সাহেব নিজামুদ্দিন

খুদ্বি আউলিয়া সাহেবকে ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া সাহেব নামিকখুদ্বি চেচাগ বেহেন্দী সাহেবকে দান করিয়াছিলেন।

খাজা সাহেব হাজকানে দুই বৎসর অবস্থান করিবার পর আন্তার্যাবে চলিয়া যান। তথায় সেখ নাসেরুদ্দিন আন্তার্যাবাদী সাহেবের সংসর্গে সম্মানিত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। তখন তাহার বয়স ১২৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইতেছিল। তিনি তারত্ব এবং বায়তিব যুগ্মানী—এই দুই তাপসগ্রন্থ হইতে দীক্ষিত ছিলেন। খাজা সাহেব কতকদিন তাহার সহবাসে থাকিয়া অনীয় ভাবজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি হারির দিকে প্রস্থান করেন। তাহার এমন অভ্যাগ ছিল যে, তিনি এক নির্দিষ্ট স্থানে বহুদিন অবস্থান করিতেন না। দিব্যাতপে ভ্রমণ করিতেন, এবং রাজিতে প্রায়ই খাজা আবদুল্লা আউলিয়ার মনোনীত স্থানে রাত্রি বাপন করিতেন। একজন দরবেশের অধিক সঙ্গী করিতেন না।

তিনি এশার নামাজের সময় যে অজু করিতেন, তাহাতেই সারানিশি উপাসনা-অধ্যয়ন করিয়া সেই অজু দ্বারা প্রাভাতিক উপাসনা শেষ করিতেন।

যখন হেরাত প্রদেশের চতুর্দিকে তাহার নাম রাষ্ট্র হইয়া গড়িল, তখন বহু শোক-সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। (খাজা সাহেব নিষ্ঠুরতাগ্রহ ছিলেন, জনমানসে তিনি ভাণ-বাগিতেন না।) তাই তিনি সবল গুহারের দিকে চলিয়া গেলেন।

তথায় একজন শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার নাম ছিল এশাদ-গার-মোহাম্মদ। তিনি অত্যন্ত বহুনিজাজি ও মন্দ প্রকৃতির শোক ছিলেন। তিনি রাজকি সম্প্রদায়ভুক্ত খাজা বশতঃ, পরগাহর (৫২) সাহেবের সঙ্গীবর্গকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; এমন কি, বাগদাদের আব্দুসকেব, উমর নাম থাকিত তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন; এমন কি, তাহাদের বিনাশ সাধনও প্রয়াস পাইতেন।

সহরতমিতে উক্ত শাসনকর্তার একটী রুমশীল উত্তান ছিল। তাহার মধ্যস্থলে অতি নির্মল একটা হাউস ছিল। খাজা সাহেব তাহার পার্শ্বে অবতরণ করিলেন এবং গোসল করিয়া অতিথির বোধাতালার নিকট ছ'রাকাত নামাজ পড়িয়া পবিত্র মহাপ্রার্থনা করিয়া পাঠে নিমগ্ন হইলেন।

(৩) সেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, “সেখ আব্দুসাইদ তিরিহি সাহেবের শ্রেষ্ঠতম পীর ছিলেন।” সেখ খালসুদ্দিন

আসিল। খাজা সাহেবের সহিত বেদবেশ ছিলেন, তিনি ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হজরত, উঠুন,—আমরা এ উজান হইতে বাহিরে চলিয়া যাই।” খাজা সাহেব তাঁহার বাগ্মূলতা মর্শনে মুহু হাসিয়া বসিলেন, “ধর্মি ভয় পাইয়া থাক, তবে ঐ বৃক্ষতলে গিয়া বসিয়া থাক।” দরবেশ ক্রত-পদে তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে বাগ্মনা-ধিপতি এরাব-গার-মোহাম্মদের পার্শ্চর্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া হাউসের পার্শ্বে গাশিতা বিছাইল। কিন্তু তাহার খাজা সাহেবের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া অবহেলার সহিত বসিল, “এখান হইতে উঠিয়া যাও।” তখন এরাব-গার-মোহাম্মদ ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খাজা সাহেবকে হাউসের পার্শ্বে দেখিয়া খীর ভূতাগণকে গর্জিয়া হুকুম করিলেন, “তোমরা এ দরবেশকে এখান হইতে উড়াও নাই কেন?” এতকুণে খাজা সাহেব মন্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টী নিক্ষেপ করিবা-নাত্ত তিনি ধরথর করিয়া কান্দিতে-কান্দিতে অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। ভূতাগণ তাঁহার শোচনীয় অবস্থা মর্শনে খাজা সাহেবের মনুষ্যে ভূ-নতমাহু হইয়া করবোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। খাজা সাহেব সেই বৃক্ষতলস্থ ভীক দরবেশকে ডাকিয়া করিলেন, “এই হাউস হইতে কিঞ্চিৎ পানি উঠাইয়া ‘বিসমিল্লা’ পড়িয়া ইহার নাকে মুখে ছিটাইয়া দাও।” দরবেশ তাহা করিবাযাত্রই বাগ্মনাধিপতির চৈতন্য লাভ হইল। তিনি খাজা সাহেবের চরণতলে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন, “হজরত, আমি সমস্ত পাপকর্মা হইতে বিহত হইয়া তোবাওগ্ৰহোল করিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।” খাজা সাহেব দয়াদরশ হইয়া তাঁহার মাথা উঠাইলেন, করিলেন, “হজরত রহুলের (ব?) বংশধরগণের মহাক্ষতের দাবি দিয়া তাঁহাদিগের পদাহুসরণ না করিলে তাহার কোন মূল্য নাই।” এই বলিয়া খাজা সাহেব ইমানগণের প্রশংসা আশ্রয় করিলেন। উজানধিপতি ও তাঁহার সঙ্গীর্ষ ইহা শ্রবণ করিতে-করিতে দুহু হইয়া গেলেন এবং ক্রন্দন করিতে-করিতে সকলই পূর্ষ-কৃত পাপ হইতে তোবা করিয়া প্রকৃত মূলদান হইলেন। তৎপর এরাব-গার-মোহাম্মদ হুইয়া কাত নানাজ আদায় করিয়া খাজা সাহেবের নিকট নীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি

করিলেন। কিন্তু খাজা সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, “তুমি হাফা অপার হইতে জুগ্ম বা বলপূর্ষক গ্রহণ করিহাছ, তাহা তাঁহার দানিকগণকে প্রত্যর্পণ কর। তাহা হইলে তোজকেস্নামতে কেহই তোমার অকল স্পর্শ করিতে পারিবে না।” এরাব-গার-মোহাম্মদ খাজা সাহেবের আদেশ পালন করিলেন। হাফা অবশিষ্ট রহিল, তাহাও মহিম্মদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। ইহা ভিন্ন আপন ক্রীতদাসগণকে মুক্তিদান করিলেন; এবং খীর মধ্যখণ্ডিক ও ভাণক দিয়া খাজা সাহেবের সঙ্গী হইয়া হোমার-দানদান পরিত্যক্ত মধ্যব্রাজী হইলেন।

বখন এরাব-গার-মোহাম্মদ সাহেব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন খাজা সাহেব হোমার-দানদান অকল তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বলবে চলিয়া গেলেন। তথায় শেখ আবদন বখরোবিয়া সাহেবের বাড়ীতে কতকদিন অবস্থান করিলেন।

সেই সময়ে মৌলানা মিরাজ্জিন হেফিম নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জিৎ-শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি খীর শিষ্যগণকে বলিতেন, মজাজ্জাত ও বুদ্ধিহীন লোকেমাই তজ্জিৎ-মুখে আনে। বল্প অকলের কোন একটা গ্রামে তাঁহার একটা মাত্রাণা ও একটা উজান ছিল। তথায় তিনি বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতেন।

সর্ব্বথা হুই-এক মুঠা জীর, কামান, চক্কে পাথর ও নিমকদান সঙ্গে রাখা খাজা সাহেবের অভ্যাগ ছিল। কমাটিং যদি লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে হয়, কিবা কোন কিছু শিকার করিয়া নিঃসন্মহে আহায করিতে হয়, সেই সময়ে তিনি একুণ করিতেন।

মৌলানা মিরাজ্জিন সাহেবের গ্রামে হঠাৎ খাজা সাহেব উপস্থিত হইলে, সেই দিন তিনি জীর দিয়া একটা কুলাম পাখী শিকার করিয়া কোন এক বৃক্ষ-নিম্নে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গীর্ষ বাসেমকে পাখিট কাবাব করিবার মজ্ঞ আদেশ প্রদান করিয়া তিনি ঘানদর হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই বৈজ্ঞানিক তথায় উপস্থিত হইয়া ঘানাবিষ্ট খাজা সাহেবকে দেখিতে পাইলেন। কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর, খাজা সাহেবের ঘানদর হইলে, তিনি তাঁহাকে

আসিয়া খাজা সাহেবের সমুখে স্থাপন করিল। খাজা সাহেব বিশিষ্টা বলিয়া ঐ কাবাবের কতকংশ পুথক করিয়া বৈজ্ঞানিকের সমুখে দিয়া, অপর অংশ নিজে লইলেন। বৈজ্ঞানিক কাবাব ভক্ষণ মাঝেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক মতিভা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে অপসারিত হইল। তাহাতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। খাজা সাহেব তাঁহার পবিত্র মূখের চর্কিত গ্রাণ মুছিত্ত বৈজ্ঞানিকের মুখে দেওয়া যাহা তাঁহার চৈতন্য-সর্গার হইল। সেই সময়ে তিনি তাঁহার সমুদ্র বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি পাণিতে নিক্ষেপ করিয়া, নিশ্বাসপন্থা খাজা সাহেবের নিকট তোবা করিয়া নীকা গ্রহণ করিলেন।

খাজা সাহেবের অসৌক্যিকতার কথা সেই অকালের চারিদিকে অন্তিমাজার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে সর্পন করিবার জন্য বহু শোক মল-মলে আগমন করিতে লাগিল। তাই খাজা সাহেব মোলানা মিরাউদ্দিন সাহেবকে শিক্ষা-নীকা দিবার জন্য বদিকা বিস্তৃত করিয়া গল্পী চলিয়া গেলেন। তথায় মিরাউদ্দিন আবুলমোহাম্মদ সাহেবের পীর তাপসপ্রবর আবদুল ওয়াহেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাহেবের আসিলেন। তৎপরে তিনি বিদ্রীতে আগমন করেন। এখানেও অত্যন্ত শোক-সমাগম হইতে লাগিল। তজ্জত তিনি আশ্রমীর শরীফের দিকে খাজা করিলেন। কারণ বহু জনতা তিনি আসিয়া পছন্দ করিতেন না। ৬৩ হিঃ ১-ই মহরম তিনি আশ্রমীরে উপস্থিত হইলেন।

দিয়ামতাবশরী হাসানদমস্কাহী একাশ জগৎ সওয়ার অত্যন্ত বার্ষিক ও বিনরী ছিলেন। স্থলতান কুতুবউদ্দিন এরাফ তাঁহাকে আশ্রমীরে বারগা করিয়াছিলেন। তিনি খাজা সাহেবকে সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও এলাম ডাউট্‌ ও দরবেশী শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান রাখিতেন। তাই খাজা সাহেবের সংসর্গে বাস করা বৎসরোত্তি সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি প্রায়ই খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। আশ্রমীরের অনেক বিখ্যাত খাজা সাহেবের পবিত্র শাস-প্রবাদের বরকতে সত্য সত্যতন ইন্সান ধর্মে নীকিত হইল। অপরন্তু, খাজা ইন্সান গ্রহণ করিল না, তাহারও খাজা সাহেবকে আত্মিক ভক্তি প্রদা করিতে লাগিল। ইহাতে অসংখ্য উপঢোকনাদি তাঁহার

দিল্লীর পাঠান সম্রাট আমমুদ্দিন আলুতমোশের রাজত্ব-কালে খাজা সাহেব খীর হুদ্রি কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী সাহেবকে দেখিবার জন্য হুইয়ার দিল্লীতে আসিয়া-ছিলেন। খিচীরবার তথা হইতে প্রত্যাপনম করিবার পর তিনি সংসারী হইলেন। তাহার বিবরণ এইরূপ—

সৈয়দ হোশাইন মাসহাদির চাচা সৈয়দ ওয়াজিহুদ্দিন মাসহাদী ওরফে—অসৎ সওয়ার আশ্রমীরে বারগা ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মতা অতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী ও পরম বার্ষিক ছিলেন। বারগা বরকত কতককে কোন এক সংস্রমাত পায়ে সর্পণ করিবার জন্য চিত্তিত থাকিতেন। এমনতাব্যহার এক রজনীতে তিনি হজরত ইব্রাহিম হামান জাফর সাহেবকে (বাং) অস্প্রে দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, “হে আমার প্রিয় পুত্র ওয়াজিহুদ্দিন, হজরত রসুলের (সঃ) ইহাই প্রীতি যে, তুমি এই বালিকাকে খাজা মাইমুদ্দিন চিত্রিত সহিত উদ্ভাব-সুত্রে আবদ্ধ কর। কারণ সে খোদাতাওয়ার অত্যন্ত প্রিয় এবং পারদগার সাহেবের বান্দানের (বংশের) একান্ত অনুসারী।”

সৈয়দ ওয়াজিহুদ্দিন খাজা সাহেবকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, “বৎন হজরত (সঃ) ও ইমাম শাহান সাহেবের প্রীতি, তখন ইহা আমাকে পালন করিতে হইবে; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।” তৎপরে হজরতের শরিয়ত বত খাজা সাহেব উক্ত বিন্দুী লগনাকে ভার্যাক্ষে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পর্তে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। খাজা সাহেব এ বিবাহের সাত বৎসর পরে ৬৩০ হিঃ ৬ই রজব পবিত্র আশ্রমীর শরীকে ইহনীলা সঘরণ করিয়া পবিত্র ধামে গমন করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ২৭ বৎসর।

তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতের সম্রাটগণ মতমতই তাঁহার পবিত্র মাজার শরীকে বরকত প্রাপ্তির আশায় উপঢোকন পাঠাইতেন। বিশেষতঃ সর্বজনপ্রিয় বেশ প্রসিদ্ধ সম্রাট জালাউদ্দিন মোহাম্মদ আজবর আপন রাজত্বকালে প্রতি বৎসরই পদব্রজে খাজা সাহেব ও হাসান মাসহাদী সাহেব উভয়ের মাজার জেয়ারত করিবার জন্য আশ্রমীর শরীফে যাইতেন। তিনি অত্যন্ত দকলের অপেক্ষা খাজা সাহেবের প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতেন।

নিখিয়াছেন যে, খাদ্য সাহেবের শীর শেখ উদ্দীন হাকীমী সাহেব সম্রাট সামুদ্দিন বোহলখান আলতামাশের রাজত্বকালে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার হৃদয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আদর আভাষণ করিতে তিলমাত্রও কুটী করিতেন না। তৎকালে খাদ্য সাহেবও আমীর শরীফে বাস করিতেন। এমনতাবস্থায় ভারতে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না। শেখ উদ্দীন হাকীমী সাহেব হইতে অনেক অশোকিত কাণ্ড প্রকাশ পাইত। নিম্নলিখিত বিবরণটিও তাহাদের অন্ততম।

খাদ্য সাহেব যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাঙ্গাল বাক্সা করেন, তখন হাকীমী সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণে বর্ণিত হন। ভ্রমণ করিতে-করিতে তিনি এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথাকার অধিবাসিগণ মগ—অধি-উপাসক। তাহারা এক সহস্র বৎসর হইতে একতীক্ষ্ণপ্রভাও অগ্নিকুণ্ড অনবরত প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া আসিতেছিল। সেই হকিত অগ্নিকুণ্ডে তাহারা প্রত্যহ ১০০ সাধারণ বোকাই করা কাঠ জ্বালাইত। হাকীমী সাহেব উক্ত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ তিনি যোদ্ধা রাখিতেন। সন্ধ্যার প্রোক্তালে খাদ্য সাহেব ফকরুদ্দিনকে এক তায়ের মত কুটী সংগ্রহ করিতে বলিলেন। সে কুটী তৈয়ার করিবার জন্য অধি-উপাসক মগবিধের নিকট গিয়া অগ্নি চাহিল। কিন্তু তাহার অগ্নি না দেখায়তে সে কিরিয়া গিয়া হাকীমী সাহেবের নিকটে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। হাকীমী সাহেব স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গিয়া দেখিলেন, মোক্তার নামক একজন মগ ৭ম বর্ষীয় একটা ছেলেকে কোলে লইয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, “এক অল্পলি পানি দিলে যে অগ্নি নির্ভাপিত হইতে পারে, তোমরা

কেন তাহার পূজা কর ? যিনি আগুনকে স্থলন করিয়াছেন, সেই পৃষ্ঠীকর্তা খোদাতালাহ অর্চনা কর।”

বৃদ্ধ উত্তর করিল, “আমাদের ধর্মে আগুনের শক্তিই সর্বাধিক প্রবল; হুতরাং কেন তাঁহাকে পূজা না করিব ?” হাকীমী সাহেব উত্তর করিলেন, “এতকাল হইতে তোমরা মরণ প্রাণে এই অগ্নিকে পূজা করিয়া আসিতেছ; দৃঢ় না হয় এমনতাবস্থায় তোমার হাত-পা অগ্নিতে স্থাপন করিতে পার কি ?”

বৃদ্ধ উত্তর করিল, “দৃঢ় করাই আগুনের বর্ষ; কাহার শক্তি তাহার নিকট যায় ?” এতদ্ভরণে হাকীমী সাহেব সুন্দের কোণ হইতে তাহার পুত্রকে কোশলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের বিকে ধাবিত হইলেন। তিনি “বিস্মিতা” বলিয়া কোরাণ শরীফের একটা আয়েত পাঠ করিতে-করিতে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

এই সংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়ায়, তিন-চারি হাজার মগ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে সমবেত হইয়া গোলবোপ আরম্ভ করিল। চারি ঘণ্টা পরে হাকীমী সাহেব অগ্নিকুণ্ড হইতে বালকসহ অক্ষত সেহে বাহির হইলেন। বালকের ও তাঁহার শরীরের কোন অংশ অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই।

তৎপর মগগণ মলে-মলে আসিয়া বালককে বিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সে তথায় কিরূপ অবস্থার ছিল। বালক বলিল, “তথায় আমি অত্যন্ত আনন্দ-আল্লাহে শেখ সাহেবের চরণতলে ফল-ফুলে শোভিত একটা অতি সুন্দর বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলাম।”

অধি-উপাসকগণ অবশেষে হাকীমী সাহেবের শরণাগত হইয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। তিনি মোক্তার নামক তুর্ককে আবদুল্লা ও তৎপুত্রকে ইব্রাহিম নাম দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই দুই-জন আউলিয়া মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

સામગ્રિકૌ

বকবিরের সময় দুই-ধর্মাবলম্বীবিগের মধ্যেও। তাঁরা
এই সময়ে আহোম-আনন্দে কয়েকদিন অভিযাত্রিত করেন।
আর আহোমের বেলা এই সময় সত্য-সমিতির মরুম
লাগে। যেমন করিয়া হউক, দুই-তিন গুণ সত্য-সমিতি
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হইয়া থাকে। এবারে আত্মীয়
মহা-সমিতির অধিবেশন দিল্লীতে হইয়া গেল; সেই
সময়ে-সময়ে আরও কয়েকটি সম্মেলনও দেখান হইয়াছে।
সুতরাং আহোমের বাঙ্গালারপরে বাক্যের দরবারী মাহুপ,
আহোমের অনেকই দিল্লীতে গিয়াছিলেন। কংগ্রেসের
প্রধান বাঙ্গালী পাণ্ডা হানদীর ঐক্যের হুস্ত্রমণ
বন্দোপাধ্যায় মহাপর কংগ্রেসের সম্পর্ক তাগ করিয়াছেন;
তাই তিনি দিল্লীতে গান নাই। প্রবেশ কথা বটে!

রাজধানী ব্রিটী এবার অধিকাংশ সভাসমিতির কেন্দ্রস্থল হইলেও আশাযের কলিকাতা একেবারে নীরব নহে। ভারত-রাজ-প্রতিনিধি মহোদয় ব্রিটীর রাজপাট কয়েক-দিনের জন্য কংগ্রেস-কনফারেন্স কোম্পানীর হস্তে স্তম্ভ করিয়া কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত রাজধানী এবার রাজ-প্রতিনিধিকে পাইয়া খুব আনন্দ-আনন্দ, খান-শিনা করিয়াছেন। সভা-সমিতির বিশেষ সভাবনা বড়দিনের কিছুকাল পূর্বেও ছিল না। অকস্মাত ঘাতকাতার মহারাণা বাহাদুর কলিকাতায় আগমন করিয়া এবারের কলিকাতার সভা-সমিতির আগর বেশ জম্কাইয়া লইয়াছিলেন। ঘোষাইয়ের মামনীর শ্রীকৃষ্ণ প্যাটেল মহাশয় বড়পাটের ব্যবস্থাপক সভায় বিদ্যুৎ আদর্শ বিবাহ আইন-সমত করিবার মত এক থিগ পেশ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভাতেই কয়েকজন মামনীর সমত এই বিলের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত বড়দিনের সবার ঘাতকাতার মহারাণা বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া এই বিলের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এখানে, সেখানে, নানাখানে সভা হইয়াছিল। অবশেষে কলিকাতার মহাধানে একটা দ্রাক্ষী (Monster) সভা হইয়াছিল, বাঙ্গলা ও বিহারের মহারাণা, রাজা ও সম্রাট

বাহিনীপত্র এই সভা আয়োজন করেন। গড়ের মাঠে কুড়িটি মঞ্চ হইতে বক্তৃতা হয়। বলিতে গেলে সৈনিক বক্তৃতার বান জাতিগ্রাছিল। এবার বিহারের মহাভারতমূল কলিকাতার সভা-সমিতির আগের মূল্য করিয়াছিলেন। ঐদুল পাটেল মহাশয়ের বিশেষ অনুষ্ঠে বার হয় হইবে; আমরা কিন্তু বড়দিনের মাগুনী সভা-সমিতির অধিবেশন হইতে বঞ্চিত হই নাই।

মাননীয় শ্রীমুক্ত প্যাটেল মহাশয়ের বিলের নাম—The Hindu Inter-marriage Validity Bill. অর্থাৎ এই বিলে হিন্দুভাতির মধ্যে অসম্বর্ণ বিবাহ ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কঠোর বিধান আছে। বঙ্গের কয়েক পূর্বে মাননীয় শ্রীমুক্ত লুপ্তজনাথ বসু মহাশয় এই ভাবে—টিক এই নম্বে—একটা বিল বঙ্গপাটের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেন। সে সময়ে বিশেষ প্রতিবাদ হওয়ার বিলখানি পরিত্যক্ত হয়। এখন আবার সেই রকমের বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে; এবং এবার সে সময়ের অপেক্ষা গুরুতর ভাবে প্রতিবাদ হইতেছে। হিন্দুভাতির মধ্যে এখন অসম্বর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই; বীহারী অসম্বর্ণ বিবাহ করেন, তাঁহারী এখন তিন-আইন অম্বলারে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ সিদ্ধ করিয়া লন। খোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁহাদের সহিত আদর্শ-প্রদান করেন না। শ্রীমুক্ত প্যাটেল মহাশয় হিন্দু পক্ষে এই তিন-আইনের আশ্রয় গ্রহণের বিরোধী,—তিনি এই অসম্বর্ণ বিবাহ হিন্দু-বিবাহ বলিয়া স্বীকার করাইতে চান। কিন্তু, এইটুকু স্বীকার করাইয়া কি লাভ হইবে? হিন্দুসমাজ অসম্বর্ণ-বিবাহকারীকে সমাজে লম্বে গ্রহণ করিবেন না, গ্রহণ করা বর্জনন কেহে অসম্ভব। তবে উত্তরাধিকারের কথা—তাহাও তিন আইন অম্বলারাই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং শ্রীমুক্ত প্যাটেল মহাশয় শুধু একটা নামের খোঁহাই দিবার জন্যই এই বিলখানি উপস্থিত করিয়াছেন। তিন-আইনে একটা বিধান আছে, যে, বীহারী বিবাহ করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, তাঁহারী হিন্দু, বা অন্ত কোন বর্ণ-সম্প্রদায়-ভুক্ত

নহেন। স্তত্রাঃ তাঁহার জাতির বাহিরে। এখন যদি ঐ লাহটা জুলিয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ বিবাহ-কারীরা কোন ধর্মাবলম্বী নহেন, এই কথাটা তাঁহাদের মা বলিতে হয়, তাহা হইলে বিবাহের পর তাঁহার ধর্মাবলম্বী থুদী সেই ধর্মাবলম্বী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিবে। ইচ্ছা হয় তাঁহার বিদ্ বপুন, তাহার হস্ত কে তাঁহাদিগকে কি বলিতে পারেন? তাহার পর, সমাজ এই অসবর্ণ-বিবাহকারীকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমাদের মনে হয়, তিন-আটন হইতে ধর্ম সম্বন্ধে declaration লাহটা জুলিয়া দিলে, এই বিপ্লব স্বপ্ন ও বিপ্লবকারী,—উভয় পক্ষেই বিশেষ কোন আপত্তি নাও হইতে পারে।

দিল্লীতে এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। বানমৌরী ঐশ্বর্য মনমোহন লাহরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভায়ানক দিল্লীতে দিল্লীতে পাচহাজার প্রতিনিধি ও পাঁচ হাজারের অধিক ধর্মক উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্তত্রাঃ অধিবেশন পূর্ব ভালই হইয়াছিল। কনগ্রেস উপলক্ষে আর যে-যে সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাদের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থান আমাদের নাই। আমরা শুধু একটা সম্মেলনের কথা বলিব। তাহার নাম ভারতীয় চিকিৎসক-গণের সম্মেলন। এটা সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন, আমাদের বানমৌরী ডাক্তার ঐশ্বর্য লাহরী মহাশয়। অতি উপযুক্ত ব্যক্তির উপরেই সম্মেলন পরিচালনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। লাহরী মহাশয় সরকার মহাশয় তাঁহার অভিব্যক্তি একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিজ্ঞা শিক্ষার ক্ষতি বর্ধিত হইতেছে; - সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম-প্রকৃতি শিক্ষার দিকে লোকের মন বর্ধিত আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার ফল স্বরূপ নানা স্থানে বিজ্ঞান, কলেজ প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষার ক্ষতি নানাস্থানে কলেজাদি প্রতিষ্ঠান চোঁতা তেমন লক্ষিত হইতেছে না বলিয়া লাহরী মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন। কথটা পূর্ব সত্য। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের কথায় বলা বাউক। আমাদের দেশে কলিকাতার একটা মেডিকেল কলেজ এত

দিন ছিল। পরলোকগত ডাক্তার আর, ডি, কর মহাশয়ের অধিষ্ঠিত অধ্যাপনা, বহু ও পরিচয়ের ফলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকগণের সাহচর্যে বেগবেগিয়া মেডিকেল কলেজ সেদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে এই দুইটা নাম কলেজ। আর দুটি ছিল তিনটা—কলিকাতার ক্যামেল মেডিকেল স্কুল, ঢাকার মেডিকেল স্কুল, আর ডাক্তার করের মেডিকেল স্কুল। তাহার মধ্যে ডাক্তার করের স্কুলটা কলেজে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতায় একটা এবং ঢাকায় একটা,—এই দুইটা স্কুল মাত্র বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি। আমরা দেখিয়াছি, এই চারিটা কলেজ ও স্কুল লত-লত ছাত্র প্রতি বৎসর প্রবেশার্থী হইয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন; স্থানান্তরে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে বিদ্যালয়-মনোরথ হইতে হয়। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয়, গ্রাম-গ্রামে যে প্রকার ম্যালেরিয়া, ওয়াটার প্রকোপ - তাহাতে অনেক রোগী যে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ পতিত হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবই যে ইহার কারণ, তাহা আর বলিতে হইবে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞা-শিক্ষার্থীর অভাব নাই, কিন্তু শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা নাই; এবং এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি নাই। স্বীকার করি, বহু-বহুর বহু-বহু করে কটা সহরে চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্থাপন বহু-বহু-বহু; কিন্তু এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না যে, বাঙ্গালা দেশে এই বহু-বহু-বহুর বহু-বহুর সাধারণ কাহারও নাই। বাঙ্গালা দেশের জীবনধারণের অবস্থা পূর্ণাঙ্গের নহিন হইলেও, তাঁহার দুই-চারিভাগে দিল্লী যে এই দেশ-হিতকর অস্থান স্থাপন করিতে পারেন না, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। তাহার পর দেশ-বিশেষী অনেক লোক, অনেক কোম্পানী এখানে ব্যবসার-বাণিজ্য করিয়া অতুল ধন সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। দেশ-হিতকর সংকল্পে যে তাঁহার ক্ষমতা হইবে, তাহা নহে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ ও বেগবেগিয়ার কলেজে অনেকেরই যথেষ্ট ধান করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা করিলে কি বাঙ্গালা দেশের মফসলে দুই-চারিটা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না? বেগ-

গেছিমার খুলটী কলেজে উন্নীত হইলে, ডাক্তার কর মহাশয় আর একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অস্ত্রাকর্ষী, পরহিতব্রত কর মহাশয়ের বিচিত্রা থাকিলে এ কার্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। এখন এমন কি কেহ নাই, যিনি বা বাহারা কলিকাতার বাহিরে দুই-চারিটী স্বাস্থ্যকর স্থানে চিকিৎসা-বিভাগের স্থাপনের ক্ষমতা অগ্রসর হন? বাগলা ভাষার সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা পুথিই যে কঠিন ব্যাপার, তাহা নহে। মফ-স্থলের বড়-বড় সহরে বৃহৎ হাসপাতাল আছে। সেই সকল হাসপাতালে ছাত্রগণ হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিতে পারেন; এবং মফসলে অনেক স্থানে বহু সুযোগ ও বহু ধনী চিকিৎসক আছেন; তাহার সমস্ত একটু আর্থতাগে করিয়া অনায়াসে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতে পারেন। সার নীলরতন সরকার মহাশয় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে দেশের মহত্বপূর্ণ সাধিত হইতে পারত।

বিশেষ কার্যোপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বে আমরা বোলপুরে শ্রীচুক্ত দার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমরা যে দিন বোলপুরে বাই, সেই দিন (৭ই পৌষ) শান্তিনিকেতনের সপ্তবিংশতি সাংসদিক উৎসব ছিল। আমরা এ সংবাদ জানিতাম না। বর্ডমান ষ্টেশনে আমরা এই সংবাদ জানিতে পারি। এই দিনে বোলপুর গমনের সময় না করিলে আমরা একটি অতি পরিষ্কৃত হৃদয় উৎসবের আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হইতাম। আমরা উৎসবের কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, অস্ত্রাক্ষ হানে এই-প্রকার উৎসবে যেমন অহুষ্ঠান হইয়া থাকে, বোলপুরেও তাহাই হইবে; অর্থাৎ বক্তৃতা হইবে, সমন্বয়যোগী দুই-চারিটী গান হইবে; তাহার পর কিঞ্চিৎ অলমোগাতে উৎসবের কার্য পরিসমাপ্ত হইবে। কিন্তু অপরাত্তকালে বোলপুর ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাদের জ্বদ দূর হইল। আমরা ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই দেখি, দিলীপিকার সারি রত ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বোলপুরের শান্তি-নিকেতন অভিমুখে ছুটিতেছে। তখন বুঝিলাম, এ শুধু সত্য নহে, বক্তৃতা নহে; মহর্ষিদের শান্তি-নিকেতনের বার্ষিক উৎসব, আমাদের দেশের আবহমানকাল-প্রচলিত, অথবা অনাদিত, ভাবে সম্পন্ন

হইবার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; এবং সেই ব্যবস্থা অল্পনাতেই উৎসব অহুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শান্তি-নিকেতনের সাংসদিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ তারিখে নিকেতনে একটি মেলা হয়।

আমরা এই শান্তি-নিকেতনের মেলা দেখিবার সৌভাগ্য দেখিন। অতিক্রান্তভাবে লাভ করিয়াছিলাম। যেখানাম, অনেক স্থান হইতে বহু লোকানব্ধার নানা প্রকারের লোকান দাখাইয়া বসিয়াছে। সংস্কৃত-মহাশয় নর-নারী, বালক-বালিকা অনেক দূর হইতে এই মেলা দেখিতে এবং নানা ভ্রম্য ক্রম-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। অনেকগুলি গো-বানে চড়িয়া গৃহস্থ মহিলারাও মেলা দেখিতে আসিয়াছেন। আমাদের দেশে আমরা বাল্যকালে এই রকম মেলা দেখিতে পাইতাম। এখনও মেলা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন লোক-সমাগম হয় না; কারণ, এখন আমরা অর্থাৎ ভ্রম্য-নামধারী ব্যক্তিগণ এ সকল মেলায় যোগদান করা ভয়ভা-বিকল্প মনে করি; অশিক্ষিত সাধারণ লোকেই এখন আমাদের দেশের মেলাগুলি ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু বীরভূম জেলার অন্তর্গত এই শান্তি-নিকেতনের মেলায় সেই পূর্বের ভাবই দেখিলাম; এবং আরও দেখিলাম মহর্ষিদের পরিবারের গাভারা এই শান্তি-নিকেতনের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তাহার সকলেই অসকোচে এই পল্লী-মেলায় আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মেলায় শুধু লোকানপাট আসিলেই হয় না, অস্ত্র প্রকার আনোদেরও আয়োজন করিতে হয়। শান্তি-নিকেতনে তাহারও অভাব দেখিলাম না। এক স্থানে প্রকাণ্ড এক সামিধানা খাটাইয়া তাহার মীচে বাজা-গান আদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাজাওয়ালায় কসবধ পালা গান করিতেছিল, আর শত শত নর-নারী সেই বাজা শুনিতেছিল। সার রথীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীচুক্ত রথীন্দ্রনাথ ও ভ্রাতৃতা শ্রীচুক্ত নগেন্দ্রনাথকে অগ্রণী করিয়াও আমরা সেই খাটার আসরে প্রবেশের পথ পাইলাম না। এক স্থানে দেখিলাম, বাড়িদেরা গানের আসর অখাইয়া বসিয়াছে; আর একদিকে কতকগুলি লোক লাগর-দোলায় দোল খাইতেছে। সকলেরই মুখে আনন্দের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীচুক্ত ভগদানন্দ রায়

মহাশয় বলিলেন যে, এবার বেশে ব্যাধির বড়ই প্রকোপ ; তাই এবার অধিক লোক-সমাগম হয় নাই,—অস্ত্রাত বৎসরের তুলনায় এবার দিকি লোকও আসে নাই। তা না আশ্চর্য,—বাহারা আশিরাছিল, তাহাদের আনন্দ-কোশল হল দেখিগাই আনন্দ পাতি লাভ করিয়াছিলাম।

আমরা মনে করিয়াছিলাম এই সেলা, এই ফেনা-বেচা, এই ব্যাক্তীগণেই হয় ত দোহার শেষ। তাহা নহে; রাজিতে অনেক টাকার হুন্দর-হুন্দর বাজী পোড়ান হইবে; এবং বাজী পোড়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত জন-সমারোহ কনিতোহে না। বাজী পোড়াইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে গুলিয়া আদর্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম বর্জন করিতে দেলাম। কিন্তু, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে জল জাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না; বিশেষতঃ একটু পরেই শান্তি-নিবেত্তনের উপাসনা-মন্দিরে শ্রীমুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিবেন। তাহাতেও ত যোগদান করা চাই। উপাসনার স্থানে বাইবার পূর্বেই আমরা আর এক মহোৎসব দেখিতে দেলাম। প্রকাণ্ড ভোজন-গৃহে দলে-দলে ভদ্রলোক—ব্রহ্ম-বিভাগ্যের ছাত্র ও শিক্ষকগণ, আগন্তুক ভদ্রলোকগণ আগারে বসিয়া গিয়াছেন,—বসিতে ইচ্ছা হইতেছে, প্রসাদ পাইতেছেন। সত্যই এ মহোৎসব দেখিবার মত। মনে হইল, সেংময়ী নাতা আম

"নিমন্ত্রণ করি যবে, এনেছেন এই মহোৎসবে
বিতরিতে প্রেম-অন্ন স্মৃতি মনে।"

আমরা বৎসময়ে শান্তি-নিবেত্তনের উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, এই উৎসবে যোগদান করিবার জল কলিকাতা ও অস্ত্রাত স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক ও তত্ত-মহিলা সমবেত হইয়াছেন। শ্রীমুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ব্রহ্ম-চর্যাশ্রমের ছাত্রগণ এই উপলক্ষে সার রবীন্দ্রনাথের রচিত তিনটী গান গাওয়া উৎসবের আনন্দ বঞ্চিত করিয়াছিলেন। নিয়ে সেই তিনটী গান উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রস্তোতন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

১

অল্পকালের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেইত তোমার আলো।
সকল স্বপ্ন-বিস্ময়ধমাক জাগ্রত যে ভালো,
সেইত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বন্ধ পেতে রয়েছে যেই পেছ,
সেইত তোমার পেছ।
সবর-ঘাতে অমর করে কুন্তলধীর রেখ,
সেইত তোমার বেহ।
সব সূর্য্যালে বাকি রয়ে অনূত যেই মান,
সেইত তোমার মান।
মৃত্যু আপন পায়ে ভরি বহিছে যেই গ্রাণ,
সেইত তোমার গ্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি,
সেইত তোমার ভূমি।
সবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
সেইত আমার তুমি।

২

সারা জীবন নিল আলো
হৃদ্য গ্রাহ্য চান,
তোমার আশীর্বাদ, যে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।
সেখের কলস তরে করে
প্রসাদ-বারি পড়ে যবে,
সকল ঘেঁষে প্রকৃত-বাহু
যুগার অবসাদ,—
তোমার আশীর্বাদ, যে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।
তুমি যে এই ধূলায় পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীল
অনুত্তর্য বাণী,—
তুমি যে আঁসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ছুবন দিকের দিকে

৭৬

তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ ।

৩

আকাশ ছুঁতে তুমিহু ঐ বাজে
তোমারি নান সফল তারার মাঝে ।
সে নামধানি মেঘে এল ছুঁয়ে,
কখন, আমার ললাট দিল ছুঁয়ে ;
শান্তি-ধারার, বেগন সেল ধুয়ে,
আগন আমার আগনি মোতে লাগে ।
মন মিলে হার আল এই নীরব রাতে
তারার তারা ঐ গগনের সাথে ।
এমনি করে আমার এ ক্রম
তোমার নামে হোকনা নামদহ,
জাঁধারে মোর তোমার আলোর জ্বর
গভীর হয়ে থাক জীবনের বাজে ।

উপাশনা শেষ হইলে আমরা বাবী-পোড়ান দেখিতে
গেলাম। তুমিনাম, বীরভূম অঞ্চলের কারিগরেরাই এই
উপলক্ষে বাবী সরবরাহ করিয়া থাকে,—কলিকাতা বা
অন্ত স্থান হইতে বাবী আনা হয় না ; সুতরাং আমরা মনে
করিয়াছিলাম, বিবাহ-আদি ব্যাপারে যে সফল মানুষী বাবী
পোড়ান হয়, তাহাই হইবে ; এই কনুকে শীতের মধ্যে
তথু কর্তৃত্বোগই হইবে। কিন্তু বাবী পোড়ান আরম্ভ হইলে
আমরা অবাক হইয়া গেলাম ; মকমলে, বিশেষতঃ বীরভূম
ঝোলা পল্লী-কারিগরেরা যে সমস্ত বাবী প্রস্তুত করিয়াছিল,
সে প্রকার বাবী মকমলে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায় ।
কিন্তু কে ইহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে ? এই
বোলপুর অঞ্চলের কারিগরেরা উৎসাহ পাইলে আরও কত
উন্নতি করিতে পারে। উৎসাহের অভাবে আমাদের
দেশের কত উৎকৃষ্ট শিল্প যে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে,
তাঁহার কথা কে ভাবে ? বোলপুরের এই মেলা দেখিয়া
একটা কথাই বার-বার আমাদের মনে হইয়াছিল। এই
মেলা উপলক্ষে যদি অমুচ্চাভূষণ এই মেলায় বা মেলায় এই
আশের কবি ও শিল্পকাজ ত্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন,
উৎকৃষ্ট ত্রব্যের প্রদর্শন, পণ্যের সেন এবং সদাগত কৃষক ও

শিল্পীদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করেন,
তাহা হইলে এই মেলায় আরোজন অধিকন্তর সার্থক হয় ।

শান্তি-মিত্রতনের মেলায় কথায় বলিলাম ; কিন্তু এই
স্থানের দ্বারা প্রধান বিষয়, সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্বন্ধে
এতকণ কিছুই বলা হয় নাই। আমরা অতি অল্প সময়ই
আশ্রমে ছিলাম ; তাহার পর, এই উৎসব উপলক্ষে
আশ্রমের ছুটি ছিল ; তাই আশ্রমের প্রধান বিষয়ই আমরা
দেখিবার সুযোগ পাইলাম না। কিন্তু বিজ্ঞানীদিগকে
দেখিলাম, অধ্যাপকগণকে দেখিলাম, আশ্রমের সুবন্দোবস্ত
দেখিলাম ; সুকৃতিতে পারিলাম, আমাদের কবি স্রষ্টা এই
আশ্রমে যে সাত্ত্বীয়া স্থাপন করিয়াছেন, এবং ঐকান্তিক
স্রষ্টা ও আশ্রমের সহিত যে সাত্ত্বীয়া শাসন-সংরক্ষণ করিতে-
ছেন, তাহা কবির সাত্ত্বীয়া আপেক্ষা অনেক উন্নত, অধিকতর
বাহীনী। সার ববীজনাথ এবং তাঁহার সহকারী মহেশ-
বর্মার সেহ-তালবাসায় মুদ্র হইয়া পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের
বালকেরা পর্য্যন্ত এখানে সুখে বাস করিতেছে ; মা বাপের
সেহ, ভালবাসা, বর তাহারা এখানে পাইয়াছে বলিয়াই, মা-
বাপ হইতে বহু দূরে এই প্রান্তরের মধ্যে তাহারা মনের
আদর্শে বাস করিতেছে। এই আশ্রমের লজ্জা যেখানে বাহা
প্রদোষন, তাহার কিছুই অভাব ও অধরা দেখিলাম না।
সার ববীজনাথ ও তাঁহার পুত্র জীবুজ ববীজনাথ এই
আশ্রমের উন্নতি-করে গ্রাম-মন উৎসর্গ করিয়াছেন।
আমাদের দেশের বাহারা পবিত্র শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী,
তাঁহাদের ক্ষমতাই একবার করিয়া এই আশ্রমে আদিয়া
শিক্ষাদান-প্রণালী ও শিক্ষাদান-ব্যবস্থা দেখিয়া যাওয়া
উচিত। আমার সঙ্গী প্রসিদ্ধ উপজ্ঞানিক জ্ঞানান শরৎচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় সমস্ত দেখিয়া (এই তাঁহার ও আমার প্রথম
শান্তি-মিত্রতন দর্শন) বলিলেন, ‘সবই ত দেখিলাম, কিন্তু
কি কৈ ?’ ববীজনাথ কতকগুলি গাছ দেখাইয়া বলিলেন,
‘এ সকল গাছ-তলাতেই শিক্ষা দেওয়া হয় ; শিক্ষার্থীরা নত-
পনে স্তম্ভিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে।
ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখা হইল না বলিলেই হয় ; যদি কখন
আবার দেখিবার মৌজাগ হয়, তাহা হইলে এই আশ্রমের
বিশেষ বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল। সর্ব্বদেবে
তাঁহারা একবারের লজ্জা আমাদেরকে আশ্রমদান করিয়া-

ছিলেন, তাহাদিগের আদর-আপ্যায়নে আমরা মহা স্নেহে, মহা আনন্দে এই আশ্রমে কয়েক বসন্তী অভিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

—

এবারের ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে উপাধি বিতরণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মস্তকে যথেষ্ট উপাধি বিচিত্র হয় নাই; কিন্তু যে ছই-চারিটা হইয়াছে, তাহার ভিত্তি আমরা সন্যাস গবর্ণমেন্টের আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। পর্যায়ে নাম করিতে হইবে আমাদের গৌরব-কেতন, সদাঙ্গন। ঐশ্বর্য্য প্রচুরতর রায় মহাশয়ের। তিনি এবার ‘সার’ হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য প্রচুরতর রায় মহাশয়ের রায় পুণ্ডরীকায় পণ্ডিত যে এতদিন ‘সার’ উপাধি লাভ করেন নাই, ইহাই আমাদের নিকট বিশ্বাসের বিষয় ছিল। এবার সেই ভ্রুটি সংশোধিত হওয়ার

আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। ডাক্তার রায় আদর্শ পুরুষ; তাহার এই সম্মানে আমরা বাঙ্গালীমাজেই সন্মানিত হইয়াছি। তাহার পরই বেথিয়াম, ঐশ্বর্য্য প্রভাকর মিত্র মহাশয় সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন। উপশ্রুত পিতার উপশ্রুত পুত্র, মনসী মিত্র মহাশয়ের সম্মানে সকলেই আনন্দিত হইবেন। আবার আর একটা নাম উল্লেখ করিব। পাবনার গবর্ণমেন্ট উকিল ঐশ্বর্য্য প্রসন্ননাথায় চৌধুরী মহাশয় এতকাল পরে রায় বাহাদুর হইলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের উকিল বলিয়াই এই উপাধি লাভ করিলেও, একজন শ্রীমৎ সাহিত্যিক, প্রসন্নবদ্বি ও আমাদের ‘ভারতবর্ষ’ের বিশিষ্ট লেখক বলিয়াই আমরা তাহার এই উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বাঙ্গালীর মধ্যে আর তাহার উপাধি লাভ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকেও অভিনন্দিত করিতেছি।

প্রেম

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

প্রেম নহে এ ধরার—সে বেব-বাহিত—
অদরার প্রিয়তম ভূর্ণিত অমিরা,
হসে বার চিত্তবানি হয় সজীবিত,
অনন্ত সৌন্দর্য্য নাথেক ভূবে বার হিরা।
এ নহে পরল কত কাম-বদিরার—
মিটে বাহে জ্বিতের লালসার সূতা;
এ যে ওগো, বিধাতার স্রেষ্ঠ উপহার,

মর্ত্য-নাথেক মূর্ত্তিমতী শান্তিময়ী সুখ।
কল্যাণী, আনন্দ-মধু অন্তরেতে বহি—
কোন সে বসন্ত-প্রাতে এসে বহুধার,—
আলো তাই বাতনার লক্ষ স্তম্ভ সহি
বাঁচিয়া রয়েছে ধরা সে পুণ্য-ধার।
সাধনা সার্থক করি মৃগ-মৃগ ধরি,
যে দেখি, রয়েছে জাগি চিত্ত-বেদি ‘পরি।



গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অগোচর সমস্ত কাহ্ন-কৰ্ণ, সমস্ত ঠাঠা-বসার মধ্যেও দিতৃত
 জ্বর-ভস্মে যে কথটা অসুস্থক আলো করিতেই লাগিল তাহা
 এই যে, সুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন
 কাহ্ন করিতেছে, তাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ
 নাই। যে উদ্ভাস ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে
 জন্মলাভ করিয়া বহিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আশ্রয় জীর্ণ
 আশ্রয়ের স্তার তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্য যাত্রা
 করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র ভিন্নভাৱ,
 সহস্র কটুক্তি করিয়া লাহুনা করিতে লাগিল; কিন্তু
 তথাপি এই বিদায়ের বেগনাকে আশ্রয় সে কোনরূপেই
 মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি মাকে
 মাকে বিকট ভরে সর্দার কটুক্তি করিয়া এ সংশয়ও
 উকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতগারে সেও সুরেশকে
 গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না! প্রতিবারই এ আশঙ্কাকে
 সে অসহ্য, অসুখক, বসিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে
 লাগিল; আপনাকে আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল,
 এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্বে সে গলাধ বড়ি থিরা মরিবে;
 তথাপি ছায়ার মত এক কথা যেন তাহার মনের পিছনে
 লাগিয়াই রহিল, ব্রুিতে-কিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে
 দেখিতে লাগিল। এবং বোধ করি বা, এই বিতীৰ্ণিকা
 হইতেই আশ্রয়লা করিতে সে হানাহারের সমরটুকু বাতীত
 দিব্য-বজ্রির একটুকু কাগ্ন স্বাবীর কাছ-ছাড়া হইতে সাহস
 করিল না। পাশের যে ঘরটা তাহার নিজের ব্যবহারের
 অস্ত নির্দিষ্ট ছিল, কমদিনের মধ্যে তাহার মধ্যে প্রবেশ
 করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না;—এমন করিয়াও কিছুদিন
 অভিযাহিত হইয়া গেল।

মহিম প্রায় আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শীতই অসল-
 পুরে চেয়ে বাইবার কথাবার্তা চলিতেছে। সেদিন সকাল-
 বেলা অচলা স্নেহের উপর বসিয়া একটা ছোট ঠোঙে
 স্বাবীর অস্ত্র হু গরম করিতেছিল, হু মুহূহু উথলিয়া

উঠিতেছে, কোমলিকে চাহিবার তাগত একটুকু অবসর
 নাই,—মহিম এতক্ষণ যে একদৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল
 ইহা সে ভানিত না—হঠাৎ স্বাবীর দীর্ঘবাস কানে বাইতেই
 সে হু হুলািয়া একটাবার মাত্র চাহিয়াই পুনরায় নিজের
 কাজে মন দিল।

মহিম কোন দিন বেশি কথা কহে না; কিন্তু আজ সে
 সহসা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড়
 দুঃখ ছাড়া কোন দিন কোন বড় মিলিল লাভ করা
 যায় না। আমার বাড়ীও আবার হবে, রোগও একদিন
 সারবে; কিন্তু এর থেকে যে অসুখ বস্ত্রী লাভ করণুম সে
 তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর
 বোধ হয় আমার একটা দিনও কাটবে না।

অচলা নিঃশব্দে গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে
 লাগিল, কোন উত্তর করিল না। মহিম একটু থামিয়া
 পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম
 করেনি, কিন্তু কি ভানি কেন, যখন জান হোতো তখন
 কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম। কেবলি মনে হোতো
 হরত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্ছে,—এদের দয়ার
 গুণ আমি কেমন কোরে এ জীহনে শোধ দেব। কিন্তু,
 ভগবানের হাতে-বঁধা এমনি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে
 কখনো মনে হয় না, এই সেবার যেন একদিন আমাকে
 শুধুতেই হবে! আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন
 তোমার নিমিত্তই গরম। বলিয়া মহিম একটুখানি
 হাসিল।

অচলা বাড়ি হেঁট করিয়া দুধ নাড়িতেই লাগিল, কোন
 কথা কহিল না।

মহিম বলিল, আর কত ঠাণ্ডা করবে, দাও ?

তবুও অচলা জ্বাব দিল না, তেমনি আধোমুখেই বসিয়া
 রহিল। প্রথমটা মহিম একটুখানি বিস্মিত হইল,
 কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল স্বাবীর কাছে অচলা চোপের

ভল গোপন করিবার চতুর্ভুজই অমন করিয়া একজায়ে
অবগোমুখে বসিয়া আছে।

কেন বে সুরেশ বড়-একটা আর আলো না, তাহার চেতু
নিচর করিয়া মহিম না বুকিলেও, কতকটা বে অসুস্থমান
করে নাই তাহা নহে। ইহাতে ক্ষোভ-মিশ্রিত একটা
আনন্দের ভাবই তাহার মনের মধ্যে ছিল। কারণ, অচলা
যে সতর্ক হইয়াছে, নির্জনে অশুশংসে দেখা হইতে না পার
এই ভয়েই সে যে বর ছাড়িয়া সহজে অন্তর্য বাইতে চাহে না,
ইহা সে মনে মনে অস্বস্তক করিল। আজ তাই সাতদিন
ধরিয়া মন বেন তাহার বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইয়া
কটিছিল। তাহার শব্দ আর কিছু দূরে একটা আত্মন-চৌকি
ছিল। সেদিন অনেক রাতি পর্যন্ত তাহার উপরে বসিয়া
অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল, এবং ক্লাস্তিবশতঃ
সেইখানেই অবশিষ্ট রাতটুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন
সকালে মহিমের ডাকে শব্দগতে উঠিয়া বসিল, এবং জানালা
খুলিয়া দিখা দেখিল বেলা হইয়া গেছে।

মহিম কি একটা কাগজ বলিতে গিয়া সংসা চূপ করিয়া
গেল, এবং হ্রীর আপোব-মন্তক ব্যতীত নিরীক্ষণ করিয়া
বিহবের পরে মিজপো করিল, তোমার নিষেধ পায়ের
কাপড় কি হোলো ?

অচলা ততোধিক বিদ্বেষে নিষেধ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
দেখিল, এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া দেখানা সে তাড়াতাড়ি নিষেধ
পায়ে অড়াইয়া শইরা উঠিয়া আসিয়াছে, দেখানা সুরেশের।
স্বাধীর প্রদত্ত তাহাকে বেন মারিল। লজ্জার, বাধার
তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু এবে কি করিয়া বটল
তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মরণ হইল,
গত রাতে তিনি ঘুমাইয়া গড়িলে সে নিষেধ শালাননা
পাট করিয়া তাহার পায়ের উপর চাপা দিয়া অকল মাত্র
পায়ে দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। ঘুমের মধ্যে বাত বাত
তাহার অন্তর্য ইত করিতেছিল মনে পড়ে, তাহার পরে
আগিয়া উঠিয়া ইহাই দেখিতেছে।

কিন্তু, হ্রীর একান্ত লজ্জিত রান ঘুমের পানে চাহিয়া
মহিম সম্মুখে সর্বোচ্চ হাসিল। কহিল, এতে আর লজ্জা
কি অচলা ? চাকরটাই হইত উটোপান্টা কোরে
তোমারটা তার পরে নিয়ে সাতটা এখানে রেখে গেছে। না
হয়, সুরেশ নিজেই হইত কাল বিকেল বেলা ফেলে গেছে।

রাতে চিন্তে না পেয়ে তুমি গায়ে দিয়েছ। বোঝাওকে
ডেকে বস্লে আনতে বলে দাও।

মিই, বলিয়া দেখানা হাতে করিয়া অচলা বাহির হইয়া
আসিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া বখন অবসরের মত
বসিয়া পড়িল, তখন বৃত্তিতে কিছুই আর তাহার অবশিষ্ট
ছিল না। অনেক রাতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ যে
নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং শীতের মধ্যে তাহাকে
ও-ভাবে নিশ্রিত দেখিয়া আপন্যার গাত্রবাণ্যনি দিয়া
ঘুমন্ত তাহাকে সম্মুখে সম্মুখে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে
চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহার আর শেখমাত্র সংশয় রহিল
না। সে চোখ বুজিয়া সেই আনন্দ সতৃক দৃষ্টি বেন স্পষ্ট
দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে
হইতে লাগিল, শুধু তাহাকেই দেখিবার মত, এবং ভাল
করিয়াই দেখিবার মত সে অমন করিয়া আসিয়াছে, এবং
হইত, প্রতিরাতেই আসিয়া থাকে, কেহ জানিতেও
পারে না।

এই কপাচারে তাহার লজ্জার পরিলীনা রহিল না;
এবং ইহাও সে স্তব্ধিত বলিয়া, গর্হিত বসিয়া, অন্তর্য
বলিয়া সহস্র প্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল; এবং
অভিযার প্রতি গৃহবানীর এই চৌক্যবৃত্তিতে সে কোনদিন
কমা করিবে না বলিয়া নিষেধ কাছে ব্যতীত প্রতিজ্ঞা
করিল; কিন্তু, তথ্যপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে
কোনমতেই সাহ্য দিতেছে না, ইহাও যে তাহার অগোচর
রহিল না; এবং কোণার কিসে যে তাহাকে এতদিন
উঠিতে-বসিতে বিধিত্তেছিল, তাহাও যে একবারে স্পষ্ট
হইয়া দেখা দিল।

কোমারবাবুর এক বাল্যবন্ধু মরুলপুর সহরে বাস
করেন; তাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল, মল-বাবু
ও প্রাকৃতিক দৃষ্টি এ স্থান অতি উৎকৃষ্ট। তাহার নিষেধ
বাসাও খুব বড়; অতএব মহিমের বসি আসাই হয়, ত, সে
সম্মুখে তাহার কাছেই থাকিতে পারে।

একদিন সকালে কোমারবাবু আসিয়া এই লম্বা জাপান
করিলেন; এবং বাথ বাস বখন শেষ হইয়াই আসিতেছে,
এবং পথের অন্ন-বস্ত্র রূপেও বখন সমস্ত করিতে মহিম সমর্থ,
তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার বাজা করা
কর্তব্য। স্বা। বয়সে তিনি নিজে একবার মরুলপুরে

সিয়াছিলেন, সে স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, মহা উল্লাসে সেই সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, ভগবতীশের স্ত্রী এখনো জীবিতা আছেন, তিনি আমার মত মহিষকে বধ করিবেন, এবং চাই কি, এই উপলক্ষে তাঁহারও আর একবার বেশটা দেখা হইয়া যাইবে। মহিষ চুপ করিয়া এই সকল শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। এই আগ্রহহীনতা শুধু অচলাই লক্ষ্য করিল। পিতা প্রহ্মান করিলে সে আত্মে আত্মে বিভ্রাণা করিল, কেন, অক্ষয়পুর ত বেশ বায়না, তোমার বেতে কি ইচ্ছে নেই?

মহিষ কহিল, তোমরা সকলে আমাকে বতটা হৃৎ-সল ভাবচ, ভতটা এখনো আমি হইনি। কোন দিন হ'ব কি না, তাও আমি আশা করিনে।

অচলা বলিল, সেই ক্ষেত্রেই ত ভক্তার তোমার চেহের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এসেই সমস্ত সেয়ে যাবে।

মহিষ বীরে বীরে ঘাড় নাড়িয়া অশ্রুশাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থার আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর ক'রে বর্ণে বেতেও ভরসা হয় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্জল, বড় অস্থির। তুমি কাছে না থাকলে হয়ত আমি বেশি দিন বাঁচুবা না। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠের বেন মলম উঠিল।

যে মুখ সুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের ক্ষুধ অত্যাধ ব্যস্ত করে না, তাহারই সুখের এই আকুল ভিক্ষা, ঠিক বেন সুখের মত আখাত করিয়া অচলার মনকে মত বেধ, মত কল্পনা, মত মাধুর্য্য এতদিন ফল হইয়া ছিল, সমস্তই এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেই আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু একটা করিয়া বলে, এই ভাবে চক্ষের গল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া পেল। মহিষ হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিহবের বাথার সেই উম্মুক্ত ঘরের দিকে নির্নিবেধে চাহিয়া থাকিয়া আবার বীরে বীরে উইয়া পড়িল।

আবার বেন উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন স্বামী-স্ত্রীর কেহই এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। পরদিন অচলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আলিয়া হাসিমুখে কহিল, ভগবতীশ বাব টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছেন, তাঁর বাবার

কাছেই আমারের মস্তে তিনি একটা ছোট বাড়ী ঠিক করেছেন।

মহিষ কপটা ঠিক মুখিতে না পারিয়া বলিল, তার মানে?

অচলা কহিল, বাবার বন্ধু বলে তোমাকেই না হয় তিনি বাড়ীতে বাসনা দিতে পারেন। কিন্তু হৃৎমনে দিয়ে ত তাঁর কাঁধে ভর করা যায় না। তাই কালই একটা বাসা ঠিক করবার মস্তে টেলিগ্রাম ক'রে বাবাকে চিঠি লিখে দিই। এই তার সবাব। বলিয়া সে হৃদে বামখানা বামীর বিছানার উপর ছুটিয়া দিল।

মহিষ হাতে লইয়া সেখানা আগাগোড়া পড়িয়া শুধু বলিল, আচ্ছা।

অচলা যে বেজার সঙ্গে বাইতে চাহে ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কলাকার আচরণ, বাহা আখিও তাহার কাছে তেমনি দুর্বোধ, তেমনি দুর্জয়, তাহাই মরণ করিয়া কোনরূপ অথবা চাকলা প্রকাশ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অচলার তরফ হইতে বাতায় উত্তোলন পূর্বা সাতায় চশিতে লাগিল। সেদিন হৃৎকবেণা সে এ বাটতে আসিয়া তাহার মিনিস-পত্র শুধাইতেছিল, সেদারবাসু ঘরের বাহিরে পাড়াইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার না গেলেই কি নয় না?

অচলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া বিভ্রাণা করিল, কেন বাবা?

সাতা ও চিকিৎসার দিক দিয়া তাহার সঙ্গে থাকটা যে ঠিক সমস্ত নয়, পিতা হইয়া কতকে এ কথা জানাইতে সেদারবাসু লক্ষ্য বোধ করিলেন। তাই তিনি মহিষের বর্তমান আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, বেশী দিন ত নয়। তা'ছাড়া, ভগবতীশের ওখানে তার কোন অনুবিধেই হোতো না। এই অল্পকালের মস্তে বেশি কতক-গুলো খরচ-পত্র করে—

আসল কথাটা অচলা বুঝিল না। সে পিতার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বলছিলেন কি?

“না না, মহিষ কিছুই বলেনি, শুধু আমি ভাবছি—”

“কিন্তু কিছু তোরা না বাবা, সে আমি সমস্ত ঠিক করে

সেই, বসিয়া অচলা পুনরায় তাহার কাজের মধ্যে যেনো-
নিবেশ করিল; এবং, পরদিনই সুকাইয়া তাহার চাকরী
এখন বিস্তারিত করিয়া নগর টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

কালক্রমে যথাক্রমে কাজের সঙ্গর ছিল, কিন্তু চরিত্রের
সিদ্ধি। সুবোধিত ডাক্তারের পক্ষে 'সুখপাই' নামের প্রথম
সম্প্রদায়ই দিন-দিন করিয়া দিলেন। সেই মতই সকলকে
মানিয়া লইতে হইল।

সেইরূপ দিন চই পূর্বে হইতেই অচলার সারা পানি
যেন হঠাৎকার ভাঙ্গিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই কলিকাতা
ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত স্থানীয়-বাস বাতীত
তাহাকে জীবনে কখনো অগ্রহ হইতে হয় নাই। আজিও
সে গণিতের মুখ দেখে নাই। সেখানে কত প্রাচীন কীর্তি,
কত বন-ভরণ পাহাড় পর্বত, কত মন-মনী মনপ্রপাত,
এমন কত কি আছে, তাহার গল্প শোকার মুখে শুনা হইত
নিজে ত্রেবিবার ভ্রমণ। কোনদিন তাহার যেন স্থান পায়
নাই। এইবার সেই সকল আকর্ষণ সে স্বতন্ত্র বোধে
চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে তাহার স্থানী ভর দেহ
কিছুটা পাইবে, একটী সেই সেখানে বসি, গৃহীত, সর্গ-
কার্যে স্থানীয় সাধাব্যকীর্তি। সেখানে মন-বাহু পাহারার
সেখানে জীবনযাত্রার পথ সহজ ও প্রশস্ত, তিনি ভাগ
হইলে, তত একদিন তাহার সেইখানেই তাহাদের বহু-
সংসার পাত্তা বসিবে, এবং অচির-অবিলম্বে যে সকল
অপরিসীম অভিধারা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাদের শ্রীর মুখও শি নিভাত
পরিচিতের মতই সে যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে
লাগিল। এমনি কত কি যে স্থানের স্বপ্ন দিবানিশি তাহার
মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার ইচ্ছা নাই।
আর সকল কথার মধ্যে স্থানী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর
স্বর্ণে বাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা নিশিরা যেন
তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একবারে মন্থর করিয়া তুলিল।
আর তাহার কাণেরও বিরুদ্ধে কোন কোঁত, কোন লাগিল
হইল না,—অন্তরের সমস্ত গানি দুইয়া দুইয়া গিয়া জ্বর
পদাঙ্কের মত নির্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিল। আজ
তাহার বড় সাধ হইতে লাগিল, বাইবার আগে একবার
স্বপ্নাককে দেখে, এবং সমস্ত বুক দিয়া তাগাক অড়াইয়া

হয়। আজ সুরেশের ভ্রম ও তাহার এগে কীর্তিতে লাগিল।
যে যে পদম বহু হইয়াও লজ্জার মধ্যেতে তাহাদের সেখা
নিত পাত্রে না, তাহার এই ভ্রমের গোপন বেদনাটি সে
আর যেন মনুষ্য করল, এমন বোধ করি কোন দিন
কর নাই। তাগারো কাছে সন্ধ্যাকরণে কথা চাহিয়া
বিনা মইবার আছে। কিন্তু অসুস্থদান করিয়া আনিল
তিনি তাগ হইতেই গুণে নাই।

বাইবার দিন সকল হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া
টপটিপ বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্রহ্ম-পদ
বাধা হইয়া হইয়াছে, কিছু কিছু ঠেগেও পাঠ্যনো হইয়াছে,
টিকিট পদার্থ কেনা হইয়া গেছে। অচলার ভ্রমও সেকণ্ড
ক্লাস টিকিট কেনার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু সে যোরতর
আশ্রিত তুলিয়া মহিমকে বসিয়াছিল, টাকা মিথো নটে
করবার সাধ থাকে ত কিন্তে বাও গে। আমি হুহ সবল,
তা'ছাড়া কত বড়-শোকার মেহেরো ইন্টার ক্লাসের দেহে-
গাড়িতে যাকে, আর আমি পাঠ্যনো? আমি সেড়া-ভাড়া
যেই কোনমতেই বাবো না।

সুতরাং সেইরূপ বাবুয়াই হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ চুটা দিন সুরেশের সেখা নাই। কিন্তু আজ
সকালে সুরেশের ভ্রম হই হোক, বা, অপর যে কোন কারণেই
হোক সে তাহার পড়িবার ঘরে ছিল। এই আনন্দময়ী
কক্ষে মধ্যে অচলা ঠিক যেন একটা বসন্তের দম্কা
বাতাসের মত গিরা প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে
আনন্দের আশ্রিত্য উপুচাইয়া পড়িতেছিল; বসিল, সুরেশ-
বাবু, এ জন্মে আমাদের আর মুখ দেখবেন না না কি?
এত বড় অপরাধটুকি করেছি বসন্ত ত?

সুরেশ চিঠি লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাদের
বাড়ী পড়িয়া গেলে আশে-পাশের গাছগুলার যে চেহারা
অচলা আসিবার দিন চক্রে দেখিয়া আসিয়াছিল, সুরেশের
এই মুখখানা এমনি করিয়াই তাহাদের স্বপ্ন বহাইয়া দিল
যে, সে যেন যেনশিহরিয়া উঠিল। বসন্তের হাওয়া কিরীয়া
গেল,—সে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব তুলিয়া কাছে
আসিয়া উর্ধ্ব কর্তে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অস্থ-
করেছে সুরেশবাবু? কৈ, আমাকে ত এ কথা কেউ বলেনি।

তথু পদকের নিমিত্তই সুরেশ মুখ তুলিয়াছিল।

করেনি, আমি ভাগ্যই আছি। বলিয়া সে বইখানার পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে পুনরায় কহিল, আমি ত তোমরা খাবে,—সমস্ত ষ্টিক হায়েচে? কতকাল হয় ত আর দেখা হবে না।

কিন্তু মিনিট-খানেক পরায় পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া হুশেন বিষয়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচেনার হুই চক্ষু আসে ভাদিতেছিল, চোখো-চোখি হইবামাত্রই বড় বড় অক্ষর ঘেঁটা টপ্ টপ্ করিয়া করিয়া পড়িল।

হুশেনের ধমনীতে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ উদ্ভূত হইয়া উঠিল, কিন্তু আশ সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া আপনাকে সংবর্ত করিয়া ঘূর্ণি অবনত করিল।

অচেনা অফলে অল্প সুস্থিরা গাড়বয়ে বলিয়া উঠিল, তোমার কথনো শরীর ভাল নেই, হুশেনবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

হুশেন মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

না, কেন? তোমার অন্তে—” কথাটা শেষ হইতে পাইল না। ঘরের বাহিরে হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবু আপনার চা—বসিতে বসিতে সে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। এবং পরক্ষণেই অচেনা অন্তরিকে মুখ কিয়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘটা। বানেক পরে সে তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলে মহিম জিজ্ঞাসা করিল, হুশেন ক’দিন থেকে তোমার গেছে জানো? গিনিমাকেও কিছু বলে দাওনি; সে কি আমরও আমার সঙ্গে দেখা করবে না না কি?

অচেনা আত্মজ্ঞাতে কহিল, আমি ত তিনি বাড়ীতেই আছেন।

মহিম কহিল, না। এইবার আমাকে কি বলে গেল সে সকালেই কোথায় বেড়িয়ে গেছে।

অচেনা চুপ করিয়া রহিল। স্বপ্নকাল পূর্বেই যে তাহার সহিত লাক্ষ্য বটয়াছিল, সে যে অতিশয় অসুস্থ, সে যে ছেলে-বেলার মত এবারও তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে,—তুমু কেবল এইটুকু ভ্রমভ্রতার ভ্রমও একবার তাহাকে আশ্বাসের ওখানে আনান করা উচিত,—আর তাহাকে ভয় নাই—লক্ষ্যটাকে সংশয়ের ঢকে দেখিয়া আর লক্ষ্য দিয়া না—তাঁহাঃ অন্তরের এই সকলের একটা কথাও জিজ্ঞা-
আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে স্বামীর মনের প্রতি

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্যায় পারিল না; নিঃশব্দে নিকন্তরে হাতের কাছে বে-কেন-একটা কামের মধ্যে আপনাকে নিমুক্ত করিয়া দিল।

ক্রমশঃ ঠেগনে বাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিল। নীচে কোয়ারবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল, এবং শিশীমা পূর্ণ-চন্দ্র প্রভৃতি লইয়া বাতিঘর হইয়া পড়িলেন। চাকরহারা জিনিষ-পত্র গাড়ীর মাথার তুলিয়া দিল;—তুমু মিনি গৃহস্থামী ভাগ্যবতী কোন উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। অথচ, এই লইয়া প্রকান্তে কেহ আলোচনা করিতেও সাহস করিল না,—বাগাঘাটা ভিতরে ভিতরে এমনিই যেন সকলকে কুপ্তি করিয়া তুলিয়াছিল।

কোয়ারবাবু কতকাল একটু নিরাশার পাইয়া মাথার হাত দিয়া বেহাঙ্গি কর্তে কহিলেন, মতীলক্ষ্মী হও না, মাংসের মত হও। বুড়ো-বরলে না বুকে অনেক দল কথা বলেচি যা, রাগ করিসনে। বলিয়া ভাড়াভাড়ি সরিয়া গেলেন।

মহিম গাড়ীতে উঠিতে গিয়া অচেনাকে একান্ত সুরহরে চুপি চুপি কহিল, সে মতীভাই আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। একটা কথা তাকে বলবার হতে আমি ছ’দিন পক্ষ চেষ্টে ছিলাম।

পিঠার বাকো তাহার চোখ দিয়া মল পড়িতেছিল, সে কেবল বাড়ি নাড়িয়া জানাইল, না।

ঘরের অন্তরালে শিশীমা গাঁড়াইয়া ছিলেন। অচেনা প্রপাচ্ ভক্তিহরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদখলি প্রদণ করিতেই তিনি গমগম কর্তে অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, হাতের নোয়া অক্ষর হোষ্ট, যা, স্বামীকে নীরোগ কোরে ঈগুণ্ডির কিরিয়ে এনে, এই প্রার্থনা করি।

এই আশার সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ শিশীমা! বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে গাড়ীতে গিয়া বসিল। কথাটা কোয়ারবাবুরও কানে গেল। তিনি নিম্নের অমার্জ্জনীয় সম্বোধনের লক্ষ্যের মরমে যেন মরিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া ঠেগন হইতে পশ্চিমের গাড়ী ছাড়িতে মিনিট-দশেক মাত্র বিলম্ব আছে। বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপি-টিপি বৃষ্টির আর বিস্তার নাই। লোকের পায়ে-পায়ে জলে-জলার সমস্ত প্রাচীনকর্ম করিয়া উঠিয়াছে,—বাকীরা

শিখল বাগাইয়া, ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে ঘোট-ঘাট লইয়া বাগগা খুঁজিয়া তিরিতেছে;—এমনি সময়ে অচলা বিবর্ণ মুখে চাহিয়া বেণিল প্রকাট একটা বাগ হাতে করিয়া হুত্রেণ আসিতেছে !

বিষয়ে, হুস্তিহায় কেনার বাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল; সে কাছে আসিতে-না-আসিতে তিনি চাঁৎকার করিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন, বাগার কি হুত্রেণ? তুমি কোথায় চলেচ ?

জবাবটা হুত্রেণ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুধু হাসিয়া বলিল, না :—তোমার উপদেশ এবং নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখুসু। আমি সকালবেলা তুমি জমন কোরে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত ধারাপ হয়ে গেছে ! চল, তোমাদের অভিধি হরেই দিন-কতক দেখি সাহসে পারি কি না ! বাস্তবিক বলচি ম——

বেশ্ ত, বেশ্ ত, হুত্রেণ ! তা'ছাড়া নূতন বাগগার আবাসেত্ত ওর সাহায্য হবে। বলিয়া মহিম পলকের দ্রুত একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উল্লসিত করিয়া দিল। অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন ? বাগার সাহায্য লইয়া মনে মনে এত উৎকর্ষা ভোগ করিয়াছ, আর সকালবেলা পর্যন্ত উল্লসে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘুণায়ে জানিতে দাও নাই কেন ? এই সুকাকুরি কি প্রয়োজন ছিল অচলা !

কিন্তু অচলা অন্তরিক্তে মুখ কিরাইয়া রহিল এবং হুত্রেণ ক্ষণকাল বিমূর্ছের মত থাকিয়া অকস্মাত্ত ভিতরের উত্তেজনা বাহিরে ঠেলিয়া আনিয়া অকারণ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, কিন্তু আর ত ঘেরি নেই। চল চল, গাড়ীতে উঠে তার পরে কথাবার্তা। চলুন কেনারবাবু। বলিয়া সে কেবল দাঁড়ানু-বাবুর দিকেই চোখ রাখিয়া সকলকে এক-প্রকার যেন ঠোঁটগা লইয়া চলিল।

কেনারবাবু বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা কহিলেন না। মহিমকে তাহার বাগগার বলাইয়া দিয়া অচলাকে মেরেদের গাড়ীতে তুলিয়া গেলেন। শুধু গাড়ী ছাড়িবার সময় হুত্রেণ হেঁট হইয়া যখন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মহিমের পার্শ্বে

আশা করি পাশে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। মেরেদের গাড়ীটা একটু দূরে চলে, মাঝে মাঝে থবর নিরো হুত্রেণ। এবং মহিমকে আর একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, পৌছেই থবর দিতে যেন ভুল হয় না—যেথা। আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকুব,—বলিয়া চোখের জল চাপিয়া আশ্রয় করিলেন। তাহার বিষম মগ্নির মুখ, ও বেরোই কঠোর বহুক্ষণ পর্যন্ত হই বহুক্ষণই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িলে ঠাণ্ডার ডয়ে মহিম কখন হুড়ি দিয়া অবিলম্বে গুইয়া পড়িল, কিন্তু হুত্রেণ সেইখানে এক-ভাবে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘেঁষিবার সেখানে লোক কেহ ছিল না, থাকিলে, যে-কেহ বলিতে পারিত, ওই দ্রুত চোখের দৃষ্টি আমি কোন হতেই ভাবাবিক নয়;—ভিতরের অতি-বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে না থাকিলে বাবুয়ের চোখ দিয়া কিছুতেই জমন কঠিন আলো হুটুয়া বাহির হয় না।

সুদীপ্যমান হোট-বড় প্রত্যেক ঠেসনেই ধরিতে ধরিতে মন্থর গতিতে অগ্নির হইতে লাগিল, এবং বাহিরে শুভি-শুভি বৃষ্টি সমভাবেই বহিতে লাগিল। একটা বড় ঠেসনে গাড়ী থামিবার উপক্রম করিলে মহিম তাহার আবরণের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, ভিড় ছিল না, একটু গুরে নিলে না কেন হুত্রেণ ? এমন সুবিধে ত ব্যাবার আশা করা যায় না।

হুত্রেণ চমকিয়া বলিল, হাঁ, এই যে গুই !

এই চমকটা এমনি অসঙ্গত ও অকস্মিক হুটুত সেখান-ইল যে, মহিম সন্নিহনে অবাক হইয়া রহিল। সে যেন তাহার অপোচরে কি একটা অপরূপ করিতেছিল, ধরা পড়ার ডয়েই এমন ত্রুট হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবটা মহিম অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

গাড়ী আসিয়া ঠেসনে থামিল।

হুত্রেণ আপনার অবস্থাটা অতুত্ব করিয়া একটুখানি ঘামির আঁতসে মুখখানা সরল করিয়া কহিল, আমি ভেবে-ছিলুম তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই এমনি চমকে উঠেছিলুম—

মহিম শুধু কহিল, হাঁ ; কিন্তু এই অনাবস্তক কৈকিয়ৎ—

হরেশ বলিল, তাঁর কিছু চাই কি না, একবার খবর নিতে পারলে—

“কিন্তু মল পড়চে না?”

“ও কিছুই নয়, আমি চুট করে দেখে আসছি” বলিয়া হরেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে বেয়ে-পাড়ার হুয়েণে আসিয়া দেখিল অচলা ইতিমধ্যে একটা সবদগী সঙ্গী পাইয়াছে, এবং তাহারই সহিত গল্প করিতেছে। সেই অগ্রে হরেশকে দেখিতে পাইয়া অচলার গা টিপিয়া দিয়া মুখ কিরিয়া বলিল। অচলা চাহিয়া দেখিতেই হরেশ কিছু চাই কি না, নিজ্ঞাসা করিল।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার মলে ভিজতে হবে না, বাও। বলিয়াই কিন্তু নিজে জানাশার কাছে উঠিয়া আসিয়া মুখকণ্ঠে কহিল, আমার মস্তে তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু বার মস্তে ভাবনা তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।

হরেশ কহিল, তা’ আছে; কিন্তু তোমার কিছু খাবার কিবা চা, কিবা শুধু একটু মল—

অচলা সহজে বলিল, না গো না, আমার কিছু চাই-বে। কিন্তু তুমি নিজে কি মলে তিলে অমুখ করতে চাও না কি?

হরেশ গলক মাত্র অচলার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু আনত করিল; কহিল, অনেকদিন থেকেই ত চাইচি, কিন্তু হতভাগের কাছে অমুখ পর্বাৎ বৈদ্যে চাহ না যে!

কথা তিনরা অচলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে হরেশ মুখ তুলিয়াই তাহা দেখিতে পায়, এই আশ্রয় সে কোনমতে ইলাকে একটা পরি-হাসের আকার দিতে কোর করিয়া হাসিয়া বলিল, আজ্ঞা, একবার চল না। তখন এমন খাটুনি খাটাবো যে—

কিন্তু কথাটাকে সে শেখ করিতে পারিল না। তাহার অদৃষ্ট লজ্জা এই ছন্দ-রহস্যের বাহ্য প্রকাশকে যেন অর্ধ-পথেই বিকার দিয়া খামাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার বঁটা বাজিল; হরেশ কি বলিবার মস্ত মুখ তুলিয়াও অবশেষে কিছুই না বলিয়াই চলিয়া যাইতে-ছিল, লজ্জা বাধা পাইয়া কিরিয়া দেখিল তাহার রূপারের একটা খুঁট অচলার হাতের দৃষ্টার মধ্যে। সে কিন্তু কিস্তি করিয়া অকস্মাৎ তর্জন করিয়া উঠিল, তোমাকে যে আমি

সঙ্গে যেতে ডেকেছি, এ কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে:কেন? কেন আমাকে এমন অপ্রীতিত করলে?

ঠিক এই কথাটাই হরেশ তখন হইতে সঙ্গ্রহাৎ তোলাপাড়া করিয়া অহুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল; তাই প্রত্যুত্তরে কেবল স্বকণ কণ্ঠে কহিল, আমি না বুঝে অপরাধ করে কেলেচি অচলা!

অচলা লেশমাত্র শব্দ না হইয়া তেমনি উত্তপ্ত হয়ে অব্যবহিল, না বুঝে বই কি! সকলের কাছে আমার তথু বাধা দৌট করবার মস্তেই তুমি ইচ্ছে করে বলেচি!

তেন চলিতে ছক করিয়াছিল; হরেশ আর কথা কহিবার অবকাশ পাইল না; অচলা তাহার পায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতেই সে নিরন্তরে প্রক প্রক বক্ষে ক্রতবেগে প্রস্থান করিল। সে কোনদিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিল বাটে, কিন্তু তাহাকে দৃষ্টি দ্বারা অহুশরূপ করিতে গিয়া আর এক-মনের জ্বল্মনন একেবারে ধামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অচলার লোমো চোখ পড়িয়া গেল, আর একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া যখন ঠিক তাহারের দিকেই চাহিয়া আছে। সে স্বহাসে কিরিয়া আসিয়া যখন উপবেশন করিল, সেই মেরেটি নিজ্ঞাসা করিল, উনিই তুমি আপনার বাবু?

অন্তমনঃ অচলা শুধু একটা হ’ মিয়াই আর একটা জানাশার বাহিরে গাছ-পালা মাঠ-মহদানের প্রতি স্মৃত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; যে গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সে হরেশের কাছে গিয়াছিল, কিরিয়া আসিগা তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার অবুত্তি মাত্র রহিল না।

আবার এঘরের পর এঘান, মহরের পর সঘর পার হইয়া যাইতে লাগিল, আবার তাহার মনের কোড়ে কাটায়া গিয়া মুখ নির্গদ ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল, আবার সে তাহার মন্বিনীর সহিত লজ্জা চিত্তে কথাবার্ত্তার যোগ দিতে পারিল; —যে লজ্জা ঘটাকরক মাত্র পূর্বে তাহাকে এতদূর পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে আর তাহার মনেও রহিল না।

একটা বড় ইঙ্গনে হরেশ খানসামার হাতে চা ও অন্ত্যস্ত খাণ্ডলায়ী উপস্থিত করিল। অচলা সেগুলি গ্রহণ করিয়া সহজে অহুশোচনের স্বরে কহিল, তোমাকে এত হাকান্য করতে কে বলে দিচ্ছে বলা? তোমার বন্ধুরাও

এ বিষয়ে হুশের কাধারা যে বলার অপেক্ষা রাখে না অচলা তাহা ভীল করিয়াই জানিত, তথাপি এই অব্যাহিত ঘট্টাইর পরিবর্তে সে এই দ্বিধা বোঁচাইকু না দিয়া বেন থাকিতে পারিল না।

হুশের মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া বাইতেছিল, অচলা ফিরিয়া ডাকিল। সেই চাপা হাসির আভাসটুকু তখনও তাহার গুঠাধরে লাগিয়া ছিল; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই অচলা সংগা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জার কুঠায় রাঙা হইয়া উঠিল। এই আকুল আভাইকু হুশের হই চকু দিয়া বেন আকর্ষণ পান করিয়া লইল।

অচলা স্বামীর সন্ধানের জন্যই হুশেরকে ফিরিয়া ডাকিয়াছিল। তাহার কোন প্রকার দ্বন্দ্ব বা অসুবিধা হইতেছে কি না, কিছু আবক্তক আছে কি না,—একবার আনিতে পারেন কি না, এই সকল একটা একটা করিয়া জানিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে এ সবকিছু আর একটা প্রশ্ন করিবারও তাহার সক্তি রহিল না। সে অসঙ্গত গাড়ীখোর সহিত শুধু বিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ত এলাহাবাদে গাড়ী বল করতে হবে? কত রাত্রে লেখানে পৌছবে জানেন? একবার জেনে এসে আমাকে বলে যেতে পারবেন?

আচ্ছা, বলিয়া হুশের একটু আশ্চর্য হইয়াই চলিয়া গেল।

অচলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সেই মেয়েটি তাহার ঘরসা ছাড়িয়া দূরে গিয়া বসিয়াছে। অচলা অন্তরের বিরক্তি সম্পূর্ণ গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনার ঘর বাড়ীতে বৃষ্টি কেউ ঢা-কটি থায় না?

মেয়েটি সবিনয়ে হাসিয়া বলিল, হায় হায়, ও দৌরাছা থেকে বৃষ্টি কোন বাড়ী নিজার পেয়েচে তাবেন? ও ত সবাই থায়।

অচলা কহিল, তবে যে বড় গুণার সরে বসলেন?

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলিল, না ভাই, গুণার নয়,—পুলকোতা ত সমস্তই থায়, তবে আমার স্বামী এ সব পছন্দ করেন না, আর—আমাদের ঘরে-বাহুরে ত—

একদিন এমনি একটা বাওয়া-হেঁয়ার ব্যাপার লইয়া মুণালের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল। সেদিনও সে যে কারণে নিজেকে শাসন করিতে পারে নাই, আজও সে তেমনি

একটা অস্বস্তিগার আত্ম-বিশ্বাস হইয়া গেল। এবং মেয়েটির কথাটা শেষ না হইতেই কক্ষস্থলে বলিয়া উঠিল, আপনারকে বিরক্ত করতে আমি চাইনে, আপনি সম্বন্ধে কিংবে এসে আপনার ব্যয়গার বহন; বলিয়া চক্ষুর নিমিত্তে চা এবং সমস্ত বাস্তবতা মানালা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, তাহার পরে একেবারে সম্পূর্ণ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বোধ করি সে ইহাই তাবিল এতক্ষণের এত আশাপ, এত কথাবার্তার যে বিন্দুমাত্র মধ্যমা রাখিল না, না জানি সে এ অশ্রু দেখিয়া আবার কি একটা করিয়া বসিবে।

কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি বামিলেও আকাশে বনবেশ উত্তরোত্তর জ্বালা হইয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি পুনরায় চাপিয়া জল আদিল। এই জলের মধ্যে মেয়েটি আবার নামিয়া বাইবে, সে তাহার উত্তোপ আরোজন করিতে লাগিল।

অচলা আর দ্বির থাকিতে না পারিয়া, একেবারে তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া দ্বিধা কর্তে কহিল, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অন্তঃস্থ লজ্জিত। আমাকে আপনি মাণ করুন।

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু সংসা উত্তর দিতে পারিল না। অচলা পুনরায় কহিল, আমার মন ব্যয়গ থাকলে কি যে করে ফেলি, তার কোন ঠিকানা থাকে না। স্বামী পীড়িত, তাঁকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে থাকি—ভাল হ'ল ভালই, না হলে ওই বিশেষে কি যে আমার হবে তা শুধু ভগবানই জানেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বিম্বিত হইয়া কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীকে যেখানে ত পীড়িত বলে মনে হয় না।

অচলা কহিল, আমার স্বামী এই গাড়ীতেই আছে, কিন্তু, আপনি তাঁকে দেখেন নি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।

মেয়েটি অধিকতর আশ্চর্য হইয়া চূপ করিয়া গেল।

এই বন্ধু তাহার স্বামী কি না জিজ্ঞাসা করার সে যে হ'ল বলিয়া যায় দিয়াছিল, এ কথা অচলার মনেই ছিল না, কিন্তু মেয়েটি তাহা বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু তাহার

বিশ্বকে অচলা সম্পূর্ণ অস্ত্র ভাবে গ্রহণ করিল। হুশেরে সখিত ভাণের আচরণ ও বাতাসাপাকে সে নিভের অন্তরে লজ্জা মিলা বিকৃত করিয়া সাগরপ হিন্দুনাগীর ঢাক ঠাণ্ডা কিস্তি বিন্দুশ দেখাইগাছে, তাহাই কল্পনা করিয়া লজ্জার বহিরাগেল। এবং একান্ত নিরর্থক জীবাবিহির বস্ত্রে বসিয়া কেলিল, আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্ম।

মেয়েটি তবুও মৌন রহিল যেমিতা অচলা সপত্ন্যেতে ভাণের হাতবাণি ছাড়িয়া মিলা করিল, আমাদের আচরণ-ব্যবহার আপনাদের সমস্ত বৃত্তে না পরলেই আমাদের অসুখ বসে ভাববেন না।

এইবার মেয়েটি হাসিল, কহিল, আমরা ত ভাবিনে, বরক আপনাদেরই যে-কোন কারণে হোক আমাদের থেকে দূরে থাকতে চান। কেমন কোরে জানুন? আমাদেরই ছুই একটি আত্মীয় আছেন বাহা আপনাদের সমাজের। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানুত পেয়েছি। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, সেই কারণটি কি?

মেয়েটি কহিল, সে আপনি নিশ্চয় জানেন। না জানেন ত সমাজের কাউকে জিজ্ঞেসা করে নেবেন। বলিয়া হাসিয়া এগলটা অক্ষাং চাপা দিয়া কহিল, আজ্ঞা, অত দূরে না গিয়ে আপনার স্বামীকে নিয়ে কেন আমাদের ওখানে আসছেন না!

“কোথায়, আমার?”

“হাণো! সেখানে কি দাঁড়ব থাকে! আমার উনি ঠিকেন্দারী কাঁজ করেন বলেই আমাকে মাঝে মাঝে আমার গিরে থাকতে হয়। আমি ডিহ্রীত কথা বলছি। শোন নবীর ওপর আমাদের ছোট একটি বাড়ী আছে, সেখানে দু’দিন থাকলে আপনার স্বামী ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন সেখানে? বলিয়া মেয়েটি অচলার হাত ছুটি নিষের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উত্তরের আশার ভাণের দৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এই অপরিচিতার ঔৎসুক্য ও আত্মিক আগ্রহ যেমিতা অচলা মুগ্ধ হইয়া গেল। কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীর ত অসুস্থতি চাই। তিনি না বললে ত যেতে পারি নে।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ইস, তাই বই কি!

আমরা সেবা করিতে দানী, বলে বখি সব ভাত্তাই দানী?

মনেও করবেন না। হুসুম বেবার বেবার আমরাই ত কর্তা। সে বেশ পছন্দ না হলে সেখা” ডিহ্রীতে চলে আসুন—এতটুকু চিন্তা করবেন না, এই আপনাকে আমি বলে দিলাম। অসুস্থতি নিতে হয়, আমি তাঁর নেব, আপনার কি গরজ? বলিয়া এটি স্বামী-সোভাগ্যবতী মেয়েটি ভাণের আনন্দের আতিশয্যে অচলকে বেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

আত্মা টেপন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে ভাণ টেপের মন-গতিতে বুঝা গেল। সে অচলার হাত ছুটি পুনরায় নিষের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগ ভরে বলিল, আমার সময় হ’ল আমি চলুলাম, কিন্তু আগনি ভেবে ভেবে মিথো মন খাড়াপ করতে পাবেন না, বলে বাড়ি। আপনার কোন ভর নেই, স্বামী আপনার পুখ ঈশ্বরের ভাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু কণা দিন, ফেরবার পথে একটীবার আমার ওখানে পারের দুলো দিয়ে যাবেন?

অচলা চোখের জল চাপিয়া বলিল, সে দিন যদি পাই, নিশ্চয় আপনারকে একবার দেখে যাবো।

মেয়েটি বলিল, পাবেন বৈ কি, নিশ্চয় পাবেন। আপনারকে আমি চিন্তে পেয়েছি। এই আমি বলে যাচ্ছি, আপনার এত বড় ভক্তি-ভালবাপাকে ভগবান কখনো বিদূষ করবেন না,—এমন হুতই পারে না!

অচলা জবাব দিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া একটা উজ্জ্বলিত বাণোদ্রাস সখরণ করিয়া লইল।

যুষ্টির মধ্যে গাড়ী আসিয়া প্রাটকর্ম ধামিল। মেয়েটির ছোট সেবার অন্তঃ ছিল, সে আসিয়া গাড়ীর হরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। অচলা ভাণের কানের কাছে মুখ আনিয়া ছুপি ছুপি কহিল, আপনার স্বামীর নাথ ত মুখে আসবেন না জানি, কিন্তু আপনার নিষের নামটি কি বলুন ত? বখি কখনো কিরে আমি, কি কোরে আপনার বোঁজ পাব?

মেয়েটি মুগ্ধ হাসিয়া কহিল, আমার নাম রাস্মী। ডিহ্রীতে এসে কোন বাঙালীর মেয়েকে জিজ্ঞেসা করলেই সে আমার সন্ধান বলে দেবে। কিন্তু হজনে একরে একবার এসো ভাই। আমার মাথার দিয়া হইল, আমি পথ চেয়ে থাক্‌বো! শোন নবীর উপরেই আমাদের বাড়ী। এই বলিয়া মেয়েটি ছুই হাত কোড় করিয়া হঠাৎ একটা নন্দহার করিয়াই ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেল।

বাস্তব নকট আবার ঘরে ঘরে ছাড়া করিল। এই মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু, অবিভ্রাম বারিগাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই চর্যোগের তাত্ত্বিক যেন শতগুণ ভাবন করিয়া তুলিয়াছে। জানালায় কাগের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি ঈড়িত হইয়া উঠিল, - তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল এই সুচিত্তেত অন্ধকার তাহার আদি-অন্ত যেন গ্রাস করিয়া দেলিয়াছে। আলোর স্মৃৎ, আনন্দের স্মৃৎ আর সে কখনো দেখিবে না, - ইহা হইতে এ জীবনে আর তাহার মুক্তি নাই! সন্দীবিদ্যে নির্জন কক্ষের মধ্যে সে একটা কোণের মধ্যে আসিয়া গায়ের কাপড়টা আগা-গোড়া টানিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল; এবং এইবার তাহার মনিত হই চক্ষু বাহিয়া বর বর করিয়া অন্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে এই চোখের জল, ঠিক কি যে তাহার এতবড় হৃৎ, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল, না, কিন্তু কান্নাকেও সে কোন মতে আরম্ভ করিতে পারিল না। অমনা তরঙ্গের দল সে তাহার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার পিতাকে মনে পড়িল, তাহার ছেলেকেলায় সন্দী-সাবীনের মনে পড়িল, গিনীমাকে মনে পড়িল, কৃপালকে মনে পড়িল, এইমাত্র যে নেয়েট রাকশী বসিয়া নিজের পরিচর দিয়া সেল তাহাকে মনে পড়িল, - বহু চাকরটা পধ্যত যেন তাহার চোখের উপর দিয়া বারবার আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শবলের নিকট হইতেই সে যেন অন্তের শোথ বিদায় লইয়া কোথায় কোন্ নির্দেশন বাজা করিয়াছে, বকের মধ্যে তাহার এমনি বাধা বাজিতে লাগিল।

এই ভাবে নিরন্তর অন্ধ বিলম্বন করিয়া গাড়ী বখন গরের ষ্টেশনে আসিয়া বাসিল, তখন বেরনাতুর স্বয়ং তাহার অনেক শব্দ হইয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল যদি কোন ক্রীলোক বাজী এই চর্যোগের রাজ্যেও তাহার কক্ষে সৈন্যবাণ গণার্পণ করে। ভিজিতে ভিজিতে কেহ কেহ নাহিয়া সেল, কেহ কেহ উঠিলও বটে, কিন্তু তাহার কামনার পরিচকটেও কেহ আসিল না। -

গাড়ী ছাড়িলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার বারগার কিরিয়া আসিল, এবং আগাধ-মতক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ববৎ শুইয়া পড়িতেই এবার কোন

অচিরমীর কারণে তাহার চর্যার্থ চিত্ত অকস্মাৎ জ্বরের করনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা নূতন নহে; যে দিন বাহু-পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, সেদিনও সে এমনি শ্রমই দেখিয়াছিল। আলোও সে তেমনি তাহার কথ বানীকে শ্রবণ করিয়া তাহারই বাহা ও দীর্ঘাঙ্ক কামনা করিয়া এক অপরিচিত স্থানের মধ্যে আনল ও সুখ-শান্তির জাল বুনিতে বুনিতে শিতার হইয়া সেল।

কখন এবং কতকাল যে সে ঘুণাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার শ্রবণ নাই। সহসা নিজের নাম কানে বাইবামাজই সে লক্ষম করিয়া উঠিয়া বসিয়া সেলি জ্বরের কাছে শ্রুতেশ দাঁড়াইয়া, এবং সেই খোলা দরজাও ভিতর দিয়া অন্ধল জল-বাতাস ভিতরে ঢুকিয়া প্রাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রুতেশ চীৎকার করিয়া কহিল, শীগৃগীর নেবে পড়, ও প্রাটিকর্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে। তোমার নিজের ব্যাগটা কোথায়?

অচলায় হই ঢকে খুম তখনও জড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল এলাগাথার ষ্টেশনে অন্ধলপুত্রের জন্ত গাড়ী বসল করিতে হইবে। সে ব্যাগটা দেখাইয়া দিয়া লম্বাভে নাহিয়া পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু এত জ্বরের মধ্যে তাঁকে নামাবে কি করে? এখানে গাড়ী-তাড়ি কিছু কি পাওয়া যায় না? নইলে অন্ধল যে বেড়ে যাবে শ্রুতেশ বাবু!

শ্রুতেশ কি যে লম্বা দিল জ্বলের শব্দে তাহা বুঝা সেল না। সে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হাতে অচলায় একটা হাত দুচুড়িতে ঢালিয়া ধরিয়া তমিকের প্রাটিকর্মের উদ্দেশে দ্রুতগমে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ষ্টেশনটা ছাড়ি-বার জন্ত প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারই একটা দীর্ঘাঙ্ক কাটকাল কামনার মধ্যে অচলাকে ষ্টেশিয়া দিয়া শ্রুতেশ ডাডাডাড়ি কহিল, তুমি দ্বির ঘরে যোগো, তাকে নামিয়ে আনিগে।

"তা'হলে আমার এই মোটা গায়ের কাপড়টা নিয়ে যাও, তাঁকে বেশ করে ঢেকে এনো" বসিয়া অচলা হাত বাড়াইয়া তাহার গাভবদ্রটা শ্রুতেশের গায়ের উপর কেলিয়া দিতেই সে দ্রুতগমে প্রস্থান করিল।

অন্ধকারে বতবুর দৃষ্টি বার অচলা সমুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গোঠের উপর দূরে দূরে ষ্টেশনের লঠন জলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যে সে আলোক

এমন অস্পষ্ট ও অকিংকর যে তাহার সাধাৰো কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জলে ভিজিয়া বাতীরা ছুটাছুটি করিতেছে, ফুলিরা খোট বহিয়া আনাগোনা করিতেছে, কর্ণচাতীরা ভিত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—কাল্পা হায়ার বত তাহা দেখা যায় নাই। ক্রমশঃ তাহাও বিলম্ব হইয়া আসিল, ট্রেনের ঘণ্টা ভীষ্মবে বাজিয়া উঠিল এবং যে ট্রেন হইতে অচলা এইমাত্র নামিয়া আসিয়াছে, ভীষণ অন্ধগতের স্তার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে তাহা আকাশ কল্মিত করিয়া প্রাটকৰ্ণ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এবং বতহুঁ শব্দে দায় এক অশুভ আত্মকার ব্যতীত সমুখে আর কোন বায়ধানই ছিল না।

আবার বতীর বা পড়িল। ইহা যে এ গাড়ীর ধস্ত অচলা তাহা বুলিল, কিন্তু তাহার উঠিলেন কি না, কোথায় উঠিলেন, ভিনিস-পত্র সমস্ত তোলা হইল, কিবা কিছু রহিয়া গেল, কিছুই জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিত্তিত হইয়া উঠিল।

একজন পিরাগা সৰ্কাফ কবলে ঢাকিয়া নীল লঠন

হাতে বেগে চলিয়াছিল; হুহুবে পাইয়া অচলা ডাকিয়া প্রশ্ন করিল সমস্ত প্যাসেঞ্জার উঠিয়াছে কি না। প্রথম শ্রেণীর কাম্ভা দেখিয়া লোকটা ধমকিয়া ঠাড়াইয়া কহিল, হ্যাঁ মেম্‌সায়েব। অচলা কতকটা হুহুির হইয়া সময় জিজ্ঞাসা করায়, লোকটা কহিল, নহু বাত্‌কে—

নর বাত্‌কে? অচলা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এলাহাবাদ পৌছিতে ত প্রায় শেষ-রাত্রি হইবার কথা! বাতুল হইয়া প্রশ্ন করিল, এলাহাবাদ—

কিন্তু লোকটা আর ঠাড়াইতে পারিতেছিল না। উপরে ছাদ ছিল না, তাই আকাশের তুটী ছাড়া গাড়ীর ছাদ হইতে বল ছিটকাইয়া তাহার চোখে-মুখে হুচের বত বিধিত-ছিল; সে হাতের আলোটা সববেগে নাড়িয়া দিয়া ‘বোগল-সরাই! বোগলসরাই!’ বলিয়া ক্রতবেগে প্রস্থান করিল। বাতী বাতাইয়া পড়ো ছাড়িয়া দিল। এমনি সময়ে স্মরণে তাহার সমুখ দিগা ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ভর নেই—আমি পাশের গাড়ীতেই আছি!

সহযোগী সাহিত্য

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

পরলোক-রহস্ত।

(The Edinburgh Review, April, 1918.)

ইংরেজ কবি বলিয়া গিয়াছেন, “Old order changeth, yielding place to new.” ইংরেজ ভাবুক বলিতেছেন, “History repeats itself.” অর্থাৎ কবি পুরাতনকে বিহার দিগা নূতনের অস্ত হান দিতেছেন; আর ভাবুক বলিতেছেন, ও সব কিছু নয়; বারো পূর্বাগর ঘটনা আসিতেছে, বরাবরই তাহাই ঘটবে। পৃথিবীতে নূতন কিছুই নাই (There is nothing new under the Sun.) এই দুই শ্রেণীর কথার মধ্যে কি কিছু সাংঘাত আছে?

তিনিতে পাই, যুরোপীয়নরা পরলোক যানেন না, পুনর্জন্ম যানেন নহা—ইহলোকই তাঁহাদের সর্ব্বা; যত্নের

সঙ্গে-সঙ্গে সকলই শেষ হয়। তার পর, শেষ বিচারের দিনে (Last Day of Judgment or Doomsday) কবর হইতে মৃতদের পুনরুত্থান, ঐ বেঙ্গপ্রতী আবার পুনরায় তাহাতে সংযোগ এবং ইংরেজের নিকট কৃত কণ্ঠের বিচার। স্বর্গের ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণ ও নরক আছে। বিচার-কলে হয় বর্ণবাস, না হয় নরক-বাস। পরলোক বা প্রেলোক সাধারণতঃ যুরোপীয়ের নিকট কৃষ্ণভার বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু ইহানীঃ যুরোপে, বিশেষতঃ আমেরিকায় পরলোক সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা চলিতেছে। সম্রাতি The Edinburgh Review নামক সাময়িক পত্র (April,

1918) Mr. A. Wyatt Tilby পরলোক-ব্রহ্মের সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিতেছেন, "The recent revival of interest in psychic questions, and more particularly in the possibility of communion with the dead is undoubtedly a direct outcome of the war." অর্থাৎ আধিক্য বাপারসমূহের প্রতি লোকের পুনরায় মনোবোধ প্রদান এবং বিশেষভাবে দূত আখ্যার সহিত সংযোগের সম্ভাবনার প্রতি লোকের বিশ্বাস, প্রত্যক্ষভাবে বুঝের ফল।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইত এবং পরলোকের অস্তিত্বে লোকের বিশ্বাস ছিল। যথোচ ত উহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এবং কবির সিদ্ধান্ত অনুসারে নূতন মত পুরাতনের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তার পর আবার এখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

যাহা কুসংস্কার বলিয়া বর্জিত হইয়াছিল, তাহা আবার এখন পুনর্জীবিত হইতেছে কেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে দিয়া লেখক বলিতেছেন,—লোকে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছিল, হঠাৎ বৃদ্ধ উপস্থিত হইল, আর "the world had changed. When the material universe that had seemed so safe and sufficient was subject to such convulsions, people turned naturally to the older spiritual conceptions for consolation, or at least for some explanation of these disasters." অর্থাৎ পৃথিবীটার অবস্থা হঠাৎ বদলাইয়া গেল। এই ক্ষণ-অধঃ বেশ নিরাপদ ও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। ইহাতে বহন করণ অক্ষম উপস্থিত হইল, ভগ্ন, লোকে সাহায্য লাভের জন্য, অন্ততঃ এই সকল বিপর্যয়ের একটা কৈবল্য লাভের জন্য বসাবস্তঃই তাহাদের সেই পুরাতন আধিক্য বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দীর্ঘায় কৌশল্য শান্তি না পাইয়া এবং নূতন কোন তত্ত্ব অবগত হইতে না পাইয়া, "Men and women, and more particularly those women who

had lost their men, looked elsewhere for sympathy. Many found it in spiritualism. Seances were organised, mediums brought messages from the dead," অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের পুরুষের মরিয়া গিয়াছে তাহারা অন্তরঙ্গ সহানুভূতির সন্ধান করিতে লাগিল। অনেকে আধিক্য চর্চার সাধনা লাভ করিল। মেন-মেরিঙ্কনের সাহায্যে মধ্যবস্ত্রী মৃতের সংবাদ আনিতে লাগিল।

কিন্তু এই ভূত-নামানোর বাপার কি সম্ভা এবং বিশ্বাসযোগ্য? লেখক নিজে যথোচ ইহা বিশ্বাস করেন না; কারণ, তিনি ইহার পরেই বলিতেছেন, "There are thousands of such mourners now, and their grief has created a sinister industry—it has raised up among us a host of seers who profess communication with the dead • • •

• • • For a few guineas one may purchase a glimpse into a pretended heaven, for a somewhat higher fee the trader in bereavement will undertake to disturb the dead and bring us their authentic messages." অর্থাৎ এখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের দুঃখ একটা অসং-ব্যবসারের সৃষ্টি করিয়াছে। আশ্রয়ের মধ্যে এখন একদল অতীন্দ্রিয়-বর্ণন শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা লোকান্তরিত আখ্যার সহিত আলাপ রাখিবার জ্ঞান করে; • • • • কয়েক পিনি ব্যয় করিলে যে কেহ অলৌকিক ধর্মের অত্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিবার অধিকার ক্রয় করিতে পারে; আর কিছু বেশী দী দিলে পরলোক-ব্যবসারীরা যতবাক্যিক নাড়াচাড়া দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দ্বারা আনিয়া দিতে পারে।

লেখক বলিতেছেন, কাব্যলিঙ্গ ধর্ম-সংক্রান্ত উপাখ্যান এবং বাইবেলে মৃত ব্যক্তির সহিত আলাপের সম্ভাবনা থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই বাপারটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর বিষয়—মানবের অমরত্ব-সনাক্তার অংশ মাত্র। আর, মানবের আত্মা যদিই অকীদ না হয়, তাহাপি

অতীতের একটা ভগ্ন আছে, যেখানে দেহত্ব, ভূত, প্রেত প্রভৃতি বাস করে। "But there can be no communion with the dead." কিন্তু মৃতের সহিত আলাপ করা অসম্ভব। "And it was largely on this question that Christianity first took its stand." অর্থাৎ প্রধানতঃ এই প্রশ্নটি অবলম্বন করিয়াই প্রথমে খৃষ্টীয় ধর্মের উদ্ভব হয়। ইহুদি লেখকগণ আত্মার অমরত্ব প্রারম্ভে স্বীকার করিতে নাই; বাহ্যিক করিতে, তাহাদের মধ্যেও ইতস্ততঃ ভাব ছিল। কিন্তু "The doctrine of human immortality.....was triumphantly affirmed by the early Christians." প্রথম আমাদের খৃষ্টানরা মানবাত্মার অমরত্ব-ওষ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিলেন। স্বয়ং খৃষ্ট নিজেই জীবদশায় ইহুদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তার পর তাহার পুনরুত্থান ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে।

লেখক মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবন লাভ; আত্মার সহিত দেহের পুনঃযোগের প্রভৃতির কথা, বাহ্যিক ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, বিশ্বাস করেন বলিয়া বোধ হয় না; তিনি বলিতেছেন, খৃষ্ট স্বহস্তে তিনটা মৃত ব্যক্তির জীবন দান করিয়াছিলেন; সেট পলও একজন সরা লোককে বাঁচাইয়াছিলেন; "Must we assume that each of these four had died again, before their evidence which should surely have proved convincing even to the sceptical, could be produced before these doubting crowds?" এই চাতিটা লোকের সাক্ষ্য অবিদ্যাসী লোকবিশেষের দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিত; আমরা কি মনে করিব যে ইহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিবার পূর্বেই ইহারা পুনরায় মরিয়া গিয়াছিল?

আবার, খৃষ্ট যখন ক্রুশে আবদ্ধ হন, তখন জেরুসালেমের সমস্ত কবর উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং মৃত মুনিকবির জীবিত হইয়া কবরের বাহিরে আসিয়া অপর জীবিত ব্যক্তিগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। "কিন্তু ইহাদের একজনেরও সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই। সেইজন্য লেখক প্রশ্ন করিতেছেন, "Are we, then to assume, what is not even hinted in the text, that

these also had all returned to their tombs?" আমরা কি সিদ্ধান্ত করিব যে, এই সকল লোক আবার তাহাদের কবরে ফিরিয়া গিয়াছিল? অথচ, ধর্মশাস্ত্রে এই ঘটনার আভাস মাত্র নাই।

The Old and the New Testamentsএ একরূপ মৃতের পুনরায় জীবিত হওয়ার, অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাদের কোন প্রমাণও নাই, বিবৃত বিবরণও নাই। "Had they been recorded, we should at least have known whether the soul retains its consciousness after its separation from the body." এই সকল বিবরণ সিদ্ধান্ত হইলে অন্ততঃ জানিতে পারিতাম, দেহের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পর আত্মার বোধ-শক্তি থাকে কি না।

"It would seem that the prevalent theory among the early Christians was that death entailed a simple suspension of consciousness, a dreamless sleep from which all men should be awakened when the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." এইরূপ অনুমান হয় যে, প্রথম-প্রথম খৃষ্টানদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যু আর কিছুই নয়—শেফল বোধ-শক্তির স্বপ্ন অবস্থা মাত্র—এক প্রকার স্বপ্নহীন নিদ্রা, যে নিদ্রা হইতে—যখন খৃষ্ট স্বয়ং স্বর্গ হইতে নামিয়া দেহত্বগণের সহিত স্বর্গে বিলাইয়া এবং ইহাদের তেরিফারির সহিত আত্মান করিবেন, তখন সকল লোকই জাগ্রত হইবে, এবং সর্বপ্রথমে খৃষ্টের মৃতদেহ উদ্ভূত হইবে।

কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লেখক দুই সহস্র বৎসর পূর্বকালের সরলবিশ্বাসী খৃষ্টানদের বিশ্বাসে সার্ব দিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি সম্ভ্রান্তচিত্তে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "If that were so, the dead would have nothing to reveal." তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, মৃত ব্যক্তিগণের কিছুই প্রকাশ করিবার থাকিবে না।

কিন্তু ইহাতে এখন আর লোকের তৃপ্তি ঘটিতে পারে না। বিজ্ঞান সর্বত্র উদ্ভাৱিত হইয়াছে। তাই লেখক এই বলিয়া পাঠকগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, "But this theory of a suspension of consciousness slowly faded and ultimately vanished."

• • • The theory was insensibly modified to suit the necessity of the case: in place of the dreamless sleep in which Christian and pagan alike awaited the final audit of their deeds and the apportionment of eternal bliss or punishment arose the theory of immediate judgment at the very hour of death, and the existence of a heaven and hell and purgatory as the present destiny of departed souls." কিন্তু এই বোধ-শক্তির স্রষ্টা-মূলক বিয়োৱীটা ক্রমশ: মলিন হইয়া গিয়া অবশেষে একেবারে অদৃশ হইয়াছে। • • • বিয়োৱীটা লোকের আভ্যন্তরে সংশোধিত হইয়া বর্তমান প্রয়োজনের অনুকূল আকার ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টান এবং নৃসিং ধর্ম্মে অধিশূন্য উত্তর পক্ষই যে স্বপ্রদীন নিরাবস্থায় তাহাদের কার্যাবলীর শ্রেষ্ঠ ফলাফল-বিকাশের এবং তাহারা ফলাফল অনুসারে অনন্ত স্বর্গ বা নরকও পাণ-খালনের প্রতীক্ষা করিত, তাহার বশে এই বিয়োৱী গৃহীত হইল যে, নৃত্যর সন্মুখেই আত্মার পাণ-পুণ্যের বিচার হইয়া যায় এবং আত্মা নরসেহাস্রের অবস্থিতি কালীন বীর কর্তৃত্বকে স্বর্গ বা নরকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এ বিয়োৱীর ওপ্ৰাঙ্গি হইল তাহার বর্ণনা করিয়া এবং বহু নবীর উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন, "But although the theory was modified from time to time the essential doctrine of the resurrection of the body and the immortality of the soul, which appeared incredible to so many who heard the preaching of the apostles, triumphed, nor has there been any greater or completer triumph of an idea in the whole history of the world."

.....The triumph was complete and absolute. To this day it remains the central fact of Christian belief, and it is equally accepted by the Mahomedan theology." কিন্তু যদিও এই বিয়োৱী সময়ে-সময়ে সংশোধিত হইয়াছে, তথাপি, দেহের পুনরুত্থান এবং আত্মার অমরতা সংক্রান্ত মূল মতবাদ, বাহ্য অনেক লোকের নিকট—বাহ্যারা খৃষ্টের শিষ্যগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল—বিশ্বাসের অবশ্যোপাধি প্রতীক্ষমান হইয়াছিল, জরাজীর্ণ করিয়াছিল; সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অপর কোন মতবাদ এত বেশী এবং এমন সম্পূর্ণভাবে জরাজীর্ণ করিতে পারে নাই। এই জরাজীর্ণ কেবল সম্পূর্ণ নহে, ইহা অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। আজ পর্য্যন্ত ইহা খৃষ্টানধর্ম্মের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব, এবং মুসলমানধর্ম্মের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ইহা সর্বোচ্চ আদ্যুরে গৃহীত হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও, লেখকের বিশ্বাস, অল্পবয়সে বাহ্যাবের মৃত্যু হয়, তাহারা পরলোকে অনন্ত জীবনের কাহনা করিয়া কালমিতিক তৃপ্তি ও সাধনা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু বাহ্যারা দীর্ঘকাল এই সংসার উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মরিবে, তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, ছেড়ে দে বা কেঁদে বাচি; অনন্ত জীবনের বাগাই আর কাজ নাই।

তার পর লেখক ছাঃঃ করিতেছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে স্পষ্টাক্ষরে মৃতের জবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারিত না হওয়ায় অনেক কতি হইতেছে; "the obscurity has led directly to spiritualism and its allied follies or rogueries." এই অস্পষ্টতা প্রত্যক্ষভাবে প্রেততত্ত্বের এবং তবৎসঙ্গিক সূর্য্যতা বা বজ্রাতির স্রষ্টা করিয়াছে।

মৃত্তে অনেক পোক মাক্সা বাগুয়ায়, তাঁহাদের আত্মিক-বলন শোকার্ত হইয়া প্রেততত্ত্বের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ লাভের চেষ্টা করিতেছেন; ইহাতে লেখক আতঙ্কিত হইয়াছেন। তবে তিনি আশা করেন, কালে পোক অপসোমিত হইলে spiritualism-এর প্রভাবও কমিয়া আসিবে।

মানবের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কোন সঙ্গতর পাইবার আশা নাই দেখিয়া, লেখক অল্প

পথার সন্ধান করিয়াছেন—“It is a road which starts from the purely material conception of modern biology. জীব-বিজ্ঞানের পূর্ণ পার্থিব ধারণা হইতে এই পথার আরম্ভ হইয়াছে।

ইহা হইতে জীবন-সংগ্রামের কথা আদিগা পড়িতেছে। কি মানুষ, কি পশু—উভর সম্ভাব্যের মধ্যেই জন্মের পরিমাণ বর্ধিত হইলেই সৰ্ব্ব-সৰ্ব্ব মৃত্যু-সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু (natural death) না হইলেও, মানুষ এবং পশুরা পরস্পর কাটাকাটি, হানাহানি করিয়া যাইবে; এবং এই জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উত্তরন (survival of the fittest) হইবে। বর্তমান মহাব্যুৎ “may be politically a struggle between democracy and militarism,” (রাজনৈতিক দিক্‌দেখে ইহা স্বাভাবিক ও ডেসোক্রেসীর মধ্যে বিবাদ বলিয়া উক্ত হইলেও) আসলে ইহার কারণ হচ্ছে, (“the fact that the rapidly increasing population of Germany sought a redistribution of the world’s soil at the expense of the stationary populations of France, while it was itself frightened at the (apparently) still more rapid increase of the rival Slavonic populations” (এইটুকু যে, জার্মানীর লোকসংখ্যা দ্রুতগতি বর্ধিত হইতে থাকায়, এবং ফ্রান্সের লোকসংখ্যার স্থান-বৃদ্ধি না হওয়ায়, জার্মানি ফরাসীর খাড়ে ঢাপিয়া পৃথিবীর ভূমির নতুন অধিকার ভোগা-ভোগি করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল; পরস্পর, জার্মানি অসহ্যমান করিতেছিল যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্লাভোনিক জাতি সকলের লোকসংখ্যা জার্মানীর লোকসংখ্যা অপেক্ষাও দ্রুতগতি বাড়িয়া যাইতেছে; ফলে, জার্মানীর নিজেরও উন্নয়ন হইবার আশা হ্রাসিয়াছিল।)

অতঃপর লেখক একতরু কথার অবতারণা করিয়াছেন, —science ও theologyর ক্ষেত্রে। “Theology presents us with conclusions; science insists on the investigation of origin.” ধর্ম-বিজ্ঞান আশ্বাসের কেবল বীমাশালা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চায়; কিন্তু বিজ্ঞান ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না;—বিজ্ঞান বলে, উৎপত্তি-জ্ঞানের অঙ্গীকরণ কর।—একবারে গোড়া ধরিয়া

চান। “Theology informs us whether the human soul is bound, science would prefer to investigate whence it comes as a preliminary.” মানুষ বহিরাব পথ তাহার আত্মা কোথায় যায়, ধর্ম-বিজ্ঞান আশ্বাসিতক কেবল তাহাই বলিয়া দেয়; বিজ্ঞান চাহে, আত্মা কোথা হইতে আসিল, আগে তাহারই অঙ্গীকরণ হউক, তার পর সে কোথায় যায় তাহার কথা পরে হইবে।

সর্বশেষে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “on the chance meeting of a man and a woman and all that it entails, must depend in the last resort the condition if not the existence of the spirit world.” খ্রী-পুরুষের দৈবাৎ মিলন ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলীর উপরই শ্রেষ্ঠ-মুহুর্তের অস্তিত্ব না হউক অবস্থার নির্ভর করিতেই আছে।

কেবল তাহাই নহে; “the doctrine of personal immortality as well as the current theories of the origin of the soul seem to depend upon it.” ব্যক্তিগত অমরত্ববাদ এবং আত্মার উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত পিয়োরীগুলিও তাহার উপর নির্ভর করে বলিয়া অনুমান হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা পতপক্ষীর বংশাধিকারের ধারার (heredity) কথা অনেকটা জানেন, কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানেন না। “yet, without this knowledge we cannot expect to investigate the problem of human origins with any success; nor until we have that knowledge can we demand or expect to add or substitute a strictly scientific proof to the religious doctrine of the immortality of the soul.” অর্থাৎ মানুষের বংশাধিকারের ধারা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, আশ্বাস মানবের উৎপত্তির সম্বন্ধে অঙ্গীকরণে কৃতকাৰ্য্য হইবার আশা করিতে পারি না; কিবা, বতকণ না আশ্বাসের এই জ্ঞান জন্মে, ততকণ আশ্বাস আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধর্ম-বিশ্বাসের উপর ঝটিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যোগ-বিয়োগের আশা বা দাবী করিতেও পারি না।

চট্টগ্রামের সাহিত্য •

[শ্রীআবুল করিম সাহিত্য-বিশারদ]

আনন্দের এই শৈশব-কিছুটিনী সাগরতীরে জন্মভূমি তুখু বৈশাদিক সৌন্দর্যের আধার নয়, তুখু কবিতা-বরষের আবাদ-ভূল নয়, ইহা চিরদিন কবিত্বেরও পরম রমণীয় নীলোদ্ভাবন—বঙ্গভাষীর প্রিয় বিহার-কানন। বঙ্গভাষায় যেই তুখু কোকিল-কুলের সুখ-নিষ্ঠা-স্বামী কাকনী প্রতিগোচর হয়, কিন্তু আমাদের জন্মভূমিতে বেন চিরবন্দিত বিরাটমান। বিলাজির অপর অঙ্গুষ্ঠে চট্টগ্রাম সুপ্রাচীন কাল হইতেই কলকর্ত্ত কবি-কোকিলের মধুর স্বরধারে সুশ্রুতি। মনে হয় বেন সে স্বরধার কখন ধামিবার নয়,—সে স্বর-লহরী বেন হুয়াইবার নয়। কালচক্রের আবর্তনে সেই শিকড়ল কবে কোন বঙ্গময় রাস্তা অধরিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধুস্রাবী সঙ্গীত-সুধ-না আজও বিহার-ভাপ-বৎ মানবের প্রতি-বিবরে প্রস্রিত হইয়া অমৃতভাষা বর্ণন করিতেছে। সে অমৃতের রসাস্বাদনে আমরা চিরদিন বিজোর—আজ সদন্ত বঙ্গদেশ প্রমত্ত!

‘সাগর-বিষ-বৃক্ষত যে কলে অমৃতোপমে।

কাব্যামৃত-রসাবাস: সঙ্গম: সুরনৈ: সহ ॥

বিধাতার অপর করুণায় এই মহাজনোক্তি আমাদের পক্ষে চিরলতা। অসংখ্য ভাপসের পরেও সংস্পর্শে আনন্দের মেল যেমন হয়, অসংখ্য কাব্যামৃতবর্ষী কবির বীণা-কন্ডারেও তেমনি ইহা সুশ্রুতি। মানবের পরম কামনার বঙ্গ কাব্যামৃত এবং সুজন-সঙ্গম দুইই যেখানে একত্রে মিলে, সে বেশ বরাভনে নিশ্চয়ই হয়!

চট্টগ্রামের নৈসর্গিক অবস্থা কবিত্ব-শক্তি সুরণের পক্ষে একান্ত অসুস্থ। এজন্য ইহা চিরদিনই অসংখ্য কবির প্রার্থিত। এ মেষবাসীর কাব্য-রস-পিপাসায় তীব্রতা

অত্যন্ত বিঘ্নোৎপাদক। তাঁহারা কেবল নিজেরাই মধুচ্ছ নিষ্ঠাণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, নানাধিবেশ হইতে মধু আহরণ করিয়া আনিয়াও তাঁহারা আপনাদের ভাঙার পূর্ণ করিয়াছেন। আধুনিক সাহিত্যের কথা বাহাই উক্ত, এজন্য এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য বহুদূর-প্রসারী। সে বিষয়ে সেরে অস্ত্র কোন বেশা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে কি না, সম্বোধ আছে। কেবল শিক্ষিত লোক নয়, এ দেশের অশিক্ষিত কৃষক-জমদ পর্বত কবি-প্রবণ। এ দেশের ‘সারিগানের’ নাম আনন্দে তনিয়াছেন। সেই ‘সারিগান’ এই কৃষক-জমদেরই ভাবের অভিযুক্তি। তাহার সরল জমদে কখন কি ভাবের চেউ উঠিয়া উঠাকে তরবারিত করিয়া তোলে, তাহার ইতিহাস আমাদের মত আর কোন দেশ কখন রক্ষা করে নাই। আনন্দের কবি নবীনচন্দ্র এ সকল গানের সরল সৌন্দর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি উহাদের সৌন্দর্য বিবেচন করিয়া বুঝাইতেন, আর আমরা অবাক হইয়া তাঁর হৃদয় সুখের দিকে চাখিয়া থাকিতাম। এদেশের সারিগানদের সুখ — প্রাণা গায়কদের সুখে যে সকল প্রাচীন গান অজ্ঞাপি প্রত হওয়া যায়, এদেশে যে সকল হৃদয়ও ভাটিয়াল গান আজও প্রচলিত আছে, তাহা সংগৃহীত হইলে দেশের নেকাদের কি একটা হৃদয় সুখ ছবি অঙ্কিত হইয়া যাইবে!

এক সময়ে চট্টগ্রামের পল্লীতে-পল্লীতে প্রাচীন ফুলট কাগজে লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিরাট স্রুতি। অধুনা তাহার অধিকাংশই অদ্বয়ে বা কাল প্রভাবে, অগ্নি বা কাটের উপদ্রবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও বাহ্য অবশিষ্ট আছে, তাহাও নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশের বা স্বভাতির বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-করে এখানে কি অস্ত্র ছই চারিজন কর্তৃক কোন চেষ্টা সুসঙ্গমনসমানে অজ্ঞাপি হয় নাই। একমাত্র এই বীন অজ্ঞানই আপনায় অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সহকৃত স্তম্ভ শক্তির যিনিরাণে একান্ত সহার-সমল-

• বিসত ১২ই শোম্ব হইতে তিন দিন চট্টগ্রামে ‘বঙ্গী’ মূলমান সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়। এই আয়োজনে অধ্যাপনা লখিতর লতাগতি ঈদুক আনন্দ কবির সাহিত্য-বিশারদ সাগর যে প্রতি হৃদয় অভিভাষণ পাঠ করেন, বিশেষ হৃদয় হওয়া তাহার সমস্ত। এজন্য কবির সাহিত্য-বিশারদ: ‘চট্টগ্রামের সাহিত্য’ ঈদুক জলে দাত প্রকাশিত হইল।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

হীন ভাবে আশ্রয় ২৫ বৎসর থাকত প্রাচীন সাহিত্যের রত্ন-রাজি-সংগ্ৰহে ব্যপৃত রহিয়াছে। তাঁহার গবেষণায় ফলে হিন্দু কবি ছাড়া এ পর্যন্ত শত শত মুসলমান কবির কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপনারা প্রথমশ্রী গৃহে সেখিয়েন, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই অবদানসমূহ বঙ্গ-পুণ্ড্র পরিয়া কালের নিখাতন সহ করিয়াও শুধু আমাদের হিতার্থ কেমন হীনহীন বেশে ও কতদূর স্তম্ভিতে আশ্রয় ও আশ্রয়ের কৃপা-কটাক্ষ তিস্ত করিতেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের বহু গ্রন্থ এখনও গ্রন্থের নিক্ত নিক্তে কলমে কাঁচাচোপে নিশ্চিষ্ট থাকিয়া কীটকুলের আহার ও হত্যাশয়ের আহুতি যোগাইতেছে। লুপ্তগ্রন্থ চট্টগ্রামে প্রাচীন কবির সংখ্যা কত, তাহা আশ্রয় নিন্দার করিয়া বলা হইতে পারে না। অতীত বেশে শিক্ষিত লোকের অসম্মান নাই এবং মাতৃভাষার সেবাস্তেও অনেকের অহুত্যাগ জন্মিয়াছে। আশা করা যায়, তাঁহাদের স্টোয়র আমাদের পূর্বপুরুষদের এই কীর্তিনিকেয় সমুদ্রারের একটা উপায় অবলম্বিত হইবে। আমার জীবন-স্বার্থ এখন ব্যয়ান্ত্র গগন পার হইয়া পশ্চিমদিকে বেদিয়া পড়িয়াছে। কালের কলহাত আনিয়া কখন এ জীবন-গ্রন্থী নিবাইয়া দেয়, জানি না। এ অবস্থায় আমার উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া আমার বজাতীয় দুক বহুদূর এ মহা গৌরবকর কার্যে আশ্রয়-নিয়োগ করুন। তাঁহারাই দেশের ও সমাজের একমাত্র ভবিষ্য ভরসার স্থল। এই সকল সাহিত্যোপকরণ সংগৃহীত হইলে একদিকে দেশের ও সমাজের সৌরভ শতগুণে বর্ধিত হইবে, অপর দিকে মাতৃ-ভাষার মহোপকার সাধিত হইবে।

বর্ষের আধুনিক সাহিত্য-গগন আমাদের নবীনচন্দ্রের প্রতিভার ভাষার আলোকে সমুদ্রাসিত। আর আমাদের আলাওলকে লইয়া শুধু চট্টগ্রাম নব, সবত্র বঙ্গদেশ সৌরভাষিত। কেবল এই দুইজনকে লইয়াই আমরা কীত বকে বঙ্গ-সাহিত্যের আশ্রয় গৌরবান হইতে পারি। ঐশ্বর্যমণি বর্ষ ও সত্যতার আমাদের চট্টগ্রামের আসন যেমন অতুল্যে প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্যমণি বঙ্গ-সাহিত্যেও চট্টগ্রাম তেমন চিরদিন সাহিত্য-ভুজের সমুদ্র সিংহাসনে অবস্থিত থাকিবার অবিকারী। বকের মূলস্থান সাহিত্যস্রোতে আমাদের আলাওল একজন্ম সরাষ্ট। তিনি হিন্দু

সাহিত্যেও অনেকের উপরে আসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার স্রাব পণ্ডিত ও কবি বর্ষীয় মুসলমান সমাজে কখন লক্ষ্যগ্রহণ করেন নাই; আর কখন করিবেন কি না, তাহাও জানি না। এই স্থান চাইতে ৮ মাইল উত্তরে ক্ষতেআবাদের নিকটবর্তী জগলপুর নামক গ্রামে আমাদের এই মহাকবির জন্ম। তিনি ক্ষতেআবাদের তৎকালীন অধিপতি মহলিস কুতুবের অমাত্য-তনয় ছিলেন। অতাপি এই মহলিসের দ্বিবি বর্ধমান। কোন কার্যোগলক্ষে তিনি রোসাবে (আজকালে) বাইতেছিলেন। পথে হাঙ্গামের হস্তে পতিত হইয়া তাঁহার শিতা সমিহ হন। তিনি কোন-রূপে প্রাণ লইয়া রোসাব-রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর মুলতান শাহ মুহা ঘটতি বিপ্লবে পড়িয়া তিনি রোসাবের কাগাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পঞ্চাশ দিন 'গর্তবাস সম' কারাগারে ভোগ করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি রোসাব-রাসের অমাত্য বাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুহা, মন্তর হোসেনদান, সৈয়দ মোহম্মদ খান, নবরাজ মহলিস প্রভৃতি নামের মহোদয়গণের স্ত্রী-লাভ করিয়া তাঁহাদেরই আশ্রয়ে তবীয় কাবাগুলি রচনা করেন। আপনারা বীনেস বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এবং এই বীনের লিখিত বিবিধ প্রবন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিবাসি সম্বন্ধে সকল কথা অবগত আছেন। হস্তগ্রন্থ এখানে তাঁহার পুনরুক্তি নিম্নোক্ত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই মহাকবি কোন্ স্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন, অতাপি তাহা জ্ঞানসৌচর হয় নাই। তাঁহার নামীয় এক স্মৃৎস্মৃৎ নীতি ও তৎপারিত মহলিস আশ্রয় ৫ই মহরের ১০ মাইল উত্তরে তবীয় কীর্তি যোগ্য করিতেছে। আলাওলের সম্মানন হিন্দু মুসলমান সকল সাহিত্যসেবীরই তীর্থ-ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। এ অংশ-পণ্ডিত সমাজে না জানিয়া যদি তিনি অস্ত কোন সমাজে লক্ষ্যপরিগ্রহ করিতেন, আশ্রয় তাঁহার সম্মানন সভ্য সভাই তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হইত। কিন্তু, হায়! ঘরের রত্ন না চিনিরা আশ্রয় আমাদের অনায়েবে বেলিয়া থাকিয়াছি।

কেবল আলাওল নহেন, এই দেশে আরও অনেক কবি আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মূল কবি বকের মুসলমান সমাজে আর লক্ষ্যগ্রহণ করেন নাই! একদল কবির মধ্যে মৌলত কবি, সৈয়দ মুলতান, মোহাম্মদ খান, মৌলত

উজ্জ্বল, সেখ করুণা, শৈব মর্ত্য জাতিতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মৌলভ কালি' গ্রন্থ আলোগলের সম্বন্ধে কবি। হোসাকরার লগ্ন উজ্জ্বল আশ্রয় খানের আশ্রয়ে তিনি 'লোর চন্দ্রানী সত্য মরন' নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বপ্নলগ্ন নামক গ্রন্থে লগ্নর উজ্জ্বলের প্রকাশ দীর্ঘ এই আশ্রয় কাব্যই অবিস্মরণীয়। মৌলভ কালি রাউজানের অন্তর্গত মুসলিম মূলভাবনায় লগ্নগ্রন্থ করেন। তাঁহার চিত্তের এখন ব্যক্তি বিচার কেহ নাই। তিনি আলোগলের ক্রিষ্ণ পূর্ববর্তী। গ্রন্থখানি সমাপ্ত না হইতেই তিনি পরলোকে গমন করেন। এতদ্ব্যতীত কবি আলোগল ইহার পোষাক রচনা করিয়া গেল।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশেষ আদর ও অনুষ্ঠান ছিল। তাহার ফলে এই দেশে তখন অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রবিদগণ পণ্ডিতের আবির্ভাব ও বহু সঙ্গীত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ 'রাগমালা' বা 'রাগমালা' নামে পরিচিত। তাহাতে রাগমালাসমূহ পরিচয়গত বর্ণিত আছে। প্রত্যেক রাগে পের এক বা ততোধিক সঙ্গীত প্রত্যেক রাগের নীচে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন কবির রচিত। রচয়িতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই মূলমান। সে সমস্ত মূলমান কবিই প্রাক্তন পদাবলী গ্রন্থের কবিরা গিয়াছেন। সে সমস্ত পদাবলীতে হিন্দু রাগতত্ত্বের প্রবেশ বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা এখন লক্ষ্য হইবে, কবির নাম উচ্চাঙ্গ দিলে ঐ সকল পদ যে মূলমান কবির লিখিত, তাহা বুঝা বড় কঠিন হয়।

হিন্দু সাহিত্যিকগণ এ সকল কবিকে 'মূলমান বৈকব কবি' আখ্যা দিয়াছেন। তাহার সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার আপনাতা করিবেন। আমার মতে তাঁহাদিগকে 'মূলমান বৈকব কবি' না বলিয়া 'বৈকব পদাবলী' লেখক মূলমান কবি' নাম দিলেই ঠিক হইত। আমার মনে হয়, বৈকব পদাবলীর অল্পম সৌন্দর্যই তাঁহাদিগকে উচ্চতর পদ রচনার প্রবৃত্তি করিয়াছিল, কেবল সাহিত্যসাধকের প্রতিবেশী তাঁহারা উচ্চতর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা কতকটা সখের বাতির হইলেও তাঁহারা উহাতে একেবারে বিভোর হইয়াছিলেন। এ ইস্যুয়ের মধ্যে তাঁহারা সত্য-সত্যই রাগতত্ত্বের ভক্ত হইয়াছিলেন, এমন

ধারণা আমি কল্পনার আশ্রিতে অক্ষম। রাগতত্ত্বের প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া প্রেম কবিতা রচনার সকল পিপাসাই নিটান যায়। এইমতও বোধ হয় তাঁহারা রাগতত্ত্বের প্রেমকে আদর্শ করিয়াছিলেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে আমি ইহা অসম্ভব বোধ করি। কিন্তু না। কেহ-কেহ বলেন, উপাত্তকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষকে রাগা কল্পনা করিয়াই তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। আর কেহ-কেহ বলেন, মনকে লক্ষ্য এবং মেহকে রাগা কল্পনা করিয়াই তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। তাহার কথা ঠিক, তাহার বিচার করিবার সক্তি আমার নাই। আমি এইমত বুঝি, উচ্চতর উচ্চতর উচ্চতাই কিছু-কিছু সত্য নিহিত আছে। তবে সকল কবিই যে দরবেশী ভাব-প্রণোদিত হইয়া উচ্চতর পদ রচনা করিয়াছিলেন, আমি এমন অসম্মান করিতে অক্ষম। কেহ-কেহ কেবল সাহিত্যসাধকের বশবর্তী হইয়াও উচ্চতর পদ লিখিয়াছিলেন, লক্ষ্য নাই। সত্যি চট্টগ্রামের মাইলভাটের মুসলিম কবির গোলাবী আহমদ উল্লাহ সাহেবের শিখনগলীর মধ্যে যে সকল কবির কবির আবির্ভাব দেখা যায়, তাঁহারাও রাগতত্ত্বের প্রেমোন্মত্ত কবিরা কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইত, প্রাক্তন পদাবলী-রচয়িতৃগণের মধ্যে অনেক উচ্চতর কবি আছেন। স্তম্ভ-ভুলনার তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু কবির সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।

বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্য-ভূমিতে চট্টগ্রাম বাহা কবিরাই, ইহা তাহার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র। বিদ্যুৎ বিবরণ প্রদানের স্থান ইহা নহে বলিয়া বাহা হইয়াই আমাকে লেখনী সবেদ করিতে হইল। মূলমান-বাগলার আর কোন দেশের সাহিত্য কবির এতগুলি কবির কবির আর কখনও উচিত হয় নাই। এই দেশের শৈল-কম্বল-লীল প্রায়শ্চলি চিরদিন সাহিত্য-সাধনার সহায়। সকলেই কিছু-না-কিছু ভূ-মণ্ডলটির অধিকারী বলিয়া এসেছে। কবির-সংগঠন আশঙ্কালঙ্কার মত পূর্বে এত কঠোর ছিল না। তাই সেখানে সাহিত্য-সাধনার এমন দক্ষা-কিনী-হারা প্রদর্শিত করা সম্ভব হইয়াছিল। 'এ দেশের প্রকৃতি তাঁহার অনিন্দ্য-স্বন্দর লীলা-বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়া চিরদিন মনুষ্য জন্মের ভাবতরঙ্গকে সচেতন রাখে' বলিয়াও এতদ

সাধনা সম্ভব হইয়াছিল। 'এই বেশ যেমন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-পুঁঠানের সৌভ্রাতৃ সম্মিলন-স্থল থাকিয়া আসিয়াছে, তেমন বঙ্গ সাহিত্যের যুগে-যুগে বকীর কবি ভারতীয় একাত্মান মধ্যে ধোঁহাচিত্রিত মতে নিজের কষ্টও মিলাইয়া আসিয়াছে।' কবির নবীনচন্দ্রের স্থানানুভূতা সম্মল করিয়া আমাদের মনেক হিন্দু সাহিত্যিক তাঁহার শোকসভার কে উক্তি করিয়াছিলেন, শশাঙ্কবাবুর মত এতলে আমিও তাহার কিয়ৎপন উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আবার এতদ্বিবৎক বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিতেছি :-

"এই ভূমি চিরকাল কবিত্বম্! সাধুসম ফকির পরমেশ্বরের সাধনভূমি! এই ভূমিই অতীতকালে নিজের মনোনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং জ্ঞান-পরিবার 'রসাত্মক', 'সহরে সন্ধ্যা' এবং 'পশ্চিমবিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল। * * * এই ভূমিই যোগেশ্বর-যুগে সন্তোষ, পারলীক, উর্দু ও বঙ্গভাষার এবং তাবের মহামিলন সংঘটনা করিয়া বঙ্গালীর সাহিত্য-ক্ষেত্র কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার ক্ষমতা কবির আত্মগলকে সমুদীপ্ত করিয়াছিল! এই ভূমিই পরিশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতা-আত্মপের সম্মিলন-স্থলে ভারতীয় এবং ইরোপীয় সাহিত্য, বর্ণনীতি এবং সমাজ-নীতির সম্বন্ধ-যুগে নিজে শৈল-নদী-সমুদ্রের প্রতিভার সমুদীপ্ত করিয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিল।" বঙ্গের সকল মুসলমান সাহিত্যসেবকই ধর্ম্ম এবং জাতীয়তাসমূহে আমাদের এক পরিবারভূক্ত। সে হিলাবে আমাদের এই কবিগণও তাঁহাদেরই, আমাদের এই সাহিত্যও তাঁহাদেরই। আপনাদিগ আমাদের পোষাবে নিম্নোক্ত সৌরভাধিত মনে করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ণপুঙ্খীয় উত্তরাধিকার-স্বয় বলবৎ রাখিবার ক্ষমতা দেখিতে হইলে আমরা নিজেকে পয়ম কৃতার্থ জ্ঞান করিব। সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের, আমাদের সমাজ ও সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসের একটা বিশেষ স্থর, বিশেষ বক্তব্য এবং বিশেষ সাধনীয় বিষয় আছে বলিয়া প্রত্যেকেই বারংবার পূর্বক একত্র মনে অগ্রসর হইন। সাহিত্য চিরকাল সাধনার জিনিষ। সাধনা ভিন্ন একে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। জাতীয়তা লাভ করার সাহিত্যই একমাত্র উপায়। জাতীয় ভাষা ও

আকাংক্ষাশ্রমক অলৌকিক। জাতীয় বা জাতুতাবার সাহিত্যই জাতীয় সম্মিলন এবং উন্নতির সর্বপ্রধান বেক্ত। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিক পন্থাশ্রমক জ্ঞানে তাহার সাধনা করাই সাহিত্যসেবিকগণের একমাত্র কর্তব্য।

আমাদের আধুনিক সাহিত্য সাধনা এই সবেমাত্র আরম্ভ হইলেও আমাদের বিরাট প্রাচীন সাহিত্য আছে। অনেককেই বোধ হয় জানেন না, কলিকাতার এবং মক্কাবলে মুসলমানদিগের পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানা আছে। এ সকল ছাপাখানা হইতে এ পর্যন্ত সম্ভব-সম্ভব বাংলা পুস্তক ছাপা হইয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিতাভিমানে বিশ-শতাব্দীর বাংলা মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত শোকেও তাহার খবর রাখেন কি না, সম্ভব। সেই সমস্ত পুস্তককেই আমরা 'বটতলার পুঁথি' নাম দিয়াছি। সেই 'বটতলার' সাহিত্যকেই প্রধান ভিত্তি করিয়া আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ বঙ্গ-সাহিত্যে অগ্রগতি যৌথ নির্মাণ করিয়া বন্দী হইয়াছেন। সেই 'বটতলার পুঁথি'র নাম শুনিয়া আমরা দুগায় মাসিক! ক্রুদ্ধিত করি!—তাৎহাতে ক্রুদ্ধিতপূর্ণ ও ক্রুদ্ধবের ছাত্র আছে করনা করিয়া আমরা আত্মকে শিখরিয়া উঠি! তার পর বদান্তি-প্রমোদ পদগম হইয়া অগ্রনামিক মূলে বহিতে থাকি, আমাদের জাতীয় সাহিত্য নাই! আমাদের যুগ-যুগান্তরের সেই মীরব সাহিত্য-সাধনা ইদৃশ্যের কীটী-পাখা বকে ধারণ করিয়া আক ও অবজাত ভাবে বটতলার পুঁথি রাখিয়াছে, আর যুগের পর যুগ ধরিয়া আমাদের ছাপা ও তাহিলের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের করণা ভিকার করিয়া আসিতেছে। একবার একটু প্রেমের চক্রে—একটু অহুয়াগ-রঞ্জিত মননে তৎপ্রতি সৃষ্টিপাত করিলেই আপনাদিগ বৃত্তিতে পারিবেন, আমাদের এই ছাপা ও অবজা কিছুতেই তাহার উচিত প্রাণ হইতে পারে না। ঐ সকল অবজাত পুস্তকের মধ্যে রচয়িতৃগণের কবিত্ব-শক্তি, শব্দ-যোজনায় গাঢ়িগাটা, ভাষার লাগিতা, বর্ণনার স্বাভাবিকতা ও তাবের যৌগিকতা দেখিলে কয়েক যুগপৎ বিষম ও আনন্দের সন্সার হইয়া থাকে। এই হতভাগা ও অকৃতজ্ঞ সমাজে না জন্মিয়া বহি তাঁহারা অপর কোন সমাজে জন্ম-পরিগ্রহ করিতেন, তাহা

আর তাঁহাদের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিত, সন্দেহ নাই। *

তান্না সিংহাছে, এ পর্যন্ত প্রাপ্তক 'বটতগার' মূলমন্ত্রান কবিত্ব ৮০২৪ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহার মধ্যে এখন কেবল ৪৪৫৬ খানি গ্রন্থ ছাপা হয় এবং বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি গ্রন্থের অস্তিত্ব নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৭২৫ খানি গ্রন্থ কবিত্বগণের উত্তরবংশীদের মধ্যে বিস্তারিতরূপে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি পুস্তকের প্রচার সরকারী আইনানুসারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে আমাদের ধর্ম্মদৃশ্য গ্রন্থই বৈধ। ঐ মূল গ্রন্থের ভাব-রাশি যদি নূতন ভাষায়-নূতন ছন্দে আমাদের বর্ণে-বর্ণে প্রবাহিত করা যায়, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত কলাগণ সাহিত্য হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সাহিত্য, আমাদের পূর্বপুরুষের অতুলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তির খিঁচ। সমাজ-দেখে প্রতিটি কতাইতে পারিলে তাহাতে নূতন উদ্দীপনা ও উদ্বোধনের স্ফূর্তি হইবে, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আমাদের সম্পূর্ণ নিষ্করের হইবে। বিজাতীয় ভাব এবং বিজাতীয় সাহিত্যে আমরা নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা কি হিন্দু আর কি হইয়াছি, তাহা চিনাইয়া বেগাই এখন আমাদের সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আপনাদের বির লক্ষ্যে সেই সাধনার অগ্রদূত হটন। খোদাতালা আপনাদের সহায় হইবেন।

মূলমন্ত্রান সাহিত্যের ভাষা ও গতি

আমাদের সাহিত্যের ভাষা কিন্তু হওয়া উচিত, সে বিষয়ে এখানে চুটী কথা বলা আবশ্যক। আপনাদের দেখিয়াছেন, আধুনিক সাহিত্যে নূতন ব্রতী হইলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা নূতন ব্রতী নহি। হিন্দু মত আমাদেরও সাহিত্যের একটা প্রবৃত্তি বনিয়া আছে। সেই বনিয়াদের উপরেই আমরা সাহিত্যের নূতন ধর্ম্ম নির্মাণ করিতে পারি। মূলমন্ত্রান সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্গভাষার যুগ-যুগে ভাষা সাংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান পঞ্চাদিকে বাইবেল, ততই আরবী-

* ২য় ভাগের আদর্শ পদ্য সিংখী নামের একটি গ্রন্থ

হইতে উক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত হইল।

পারসী শব্দ-বহুল ভাষা দেখিতে পাইবেন; আর বর্ত্তমান মধ্য-মিকে অঙ্গুর হইবেন, ততই আরবী-পারসী শব্দ কবিত্ব আর হিন্দু ভাষার মত ভাষা হইয়াছে দেখিবেন। আমাদের পূর্ণ সৃষ্টিগণ বৃদ্ধিলাভিলেন, আমাদের সাহিত্যে শুধু আমাদের জাতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, অস্ত্র জাতির মস্ত ও ভাষার দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে। বিজাতীয়ের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের এখন অনেক বেশী হইয়াছে। এই অবস্থার আমাদের সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বজাতি-বোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দেশ করা যেমন আমাদের আবশ্যক, পরকে বুঝানও আমাদের ক্রম আবশ্যক নহে। প্রধানতঃ, অজ্ঞতা-বশতঃ বুঝিতে না পারিয়াই যে বিজাতীয়েরা আমাদের পক্ষে মনী-বর্ণে চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার কথা নহে। মূলমন্ত্রানের বঙ্গভাষার জন্মপীঠ, মূলমন্ত্রানের বঙ্গ-নাংসে, মূলমন্ত্রানের অস্থি-বজ্জার বঙ্গভাষার যেহ গঠিত, মূলমন্ত্রানের আদর্শেই উৎসাহে তাহা লালিত, পালিত ও বর্ধিত। এ অবস্থারও বঙ্গভাষা জাতি ভাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিবে, সে ভয়ে আমাদের কি বিচলিত হওয়া উচিত? বঙ্গভাষার সঙ্গে আমাদের অগণিত শব্দ ও ভাব এবং অসীম প্রেতাব মিশ খাইয়া গিয়াছে। তৎসমুদয় বিছিন্ন করিতে গেলে তাহার লোম বাহিতে কণল শব্দ হইয়া পাইবে, কুঠরোগীর জায় তাহার যেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পাইবে। সুতরাং অস্ত্রের পক্ষে অবোধ্য বা হুস্তোধ্য নূতন মনোবির আমদানী করিয়া ভাষার অটপীতা সৃষ্টির প্রয়োজন কি? আমাদের বাঙ্গালার মনের ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দ পাইলে তাহা ভাগ করিয়া পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাইবে কেন, আমি বুঝিতে পারি না। অস্ত্র বেখানে বাঙ্গালার ঐক্য শব্দ নাই, সেখানে আমরা যে-কোন ভাষার শব্দ গ্রহণ করিতে পারি। (এখানে পরিভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই হইতেছে না)। আগেই বলিয়া আসিয়াছি, কবি আলাওল আমাদের মূলমন্ত্রান সাহিত্যের স্তম্ভ। ওরফে অক্ষরগণ ও অক্ষরগণ কতাই ভক্তমান শিল্পের সর্ব্বভোক্তা হইতে উঠিত। তাঁহার ভাষা আদর্শ করিয়া আমরা অন্যান্যসেই নূতন স্রোতে সাহিত্যের দ্বারা প্রবাহিত করিতে পারি। বাঙ্গালার

বর্তমান তাবা ব্যবহার করিয়াও আমাদের সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যে পরিণত করা অসম্ভব নহে। ভারতমণ্ডলে সম্পন্ন না হইলে শুধু স্বদেশমণ্ডলে কোন সাহিত্য জাতি-বিশেষের প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। তাবা তিরদিন ভাষের অঙ্গুপাখিনি, তাব ত্রিধ কেবল তাবার কোন জাতির প্রকৃত জাতিত্ব ভয়স্বয় করা বড়ই কঠিন। যদে হয় গারে নামাবলী ও কপালে ত্রিগুণক কেবল বৈকবতার বাহু চিহ্ন মাত্র; তাহাতে ভিতরের বৈকবতার পরিমাণ করা চলে না। ধর্মের পার্থক্যে দেশে এখন এত অশান্তি; তার উপর তাবারও যদি পার্থক্য ঘটে, তবে পরিণাম আমাদের বড়ই ভয়াবহ হইয়া উঠবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের লেখকগণ এই কথাটুকু মনে করিয়া সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হইলে দেশের পক্ষে প্রদম কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমি জানি, বঙ্গসাহিত্যে আমরা অনেক লাহুনা, অনেক অজ্ঞাতার, অনেক নির্ণায়িতন সহ করিয়াছি; আমাদের সে ব্যাধিও সহিষ্ণুতার নীচা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু উপার কি? খোদাতালা যখন গোপ-শোক দেন, তাহার

প্রতীকারের সমস্ত উপায় গ্রহণ করিয়াও তখন রিকল-কাল চই, তখন কি আমরা আত্মত্যাগ করিয়া সে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই, না খোদার নামে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকি? এখানেও সহিষ্ণুতাই আমাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। কুকুরে ধংশন করিলে কেবল প্রতিশোধ দ-বাসনার কুকুরকে প্রতিদংশন করে না, কিন্তু স্থিতিবিশ্বাস গোপনুতির চেষ্টাই করিয়া থাকে। বিভ্রান্তিরে ধংশনে তাহারে প্রতিদংশন না করিয়া আমাদের স্থিতিবিশ্বাস আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। সে চিকিৎসা হইতেছে এই সাহিত্য-সেবা। বিভ্রান্তিরো যখন বৃদ্ধিবে যে, আমরা সাহিত্যের সমর-ক্ষেত্রে তাহারের সমরক হইরাছি, তখন ভাগ্য। নিজেরাই আমানিগকে ভয় করিয়া গণিবে। দুর্বল তিরদিনই যথার অজ্ঞাতার ভোগ করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি পূর্বশায় লগাটে পাশার যে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখা দিয়াছে, তাহা অচিরে প্রসারিত হইয়া অন্দেরের এ অমানিশার গুচ্ছ অন্ধকার বিদূরিত করিবে। আপনারা খোদার নামে ধৈর্য ধরিয়া স্থির লক্ষ্যে সাধনা করিতে থাকুন।

আলোচনা

লংবাধপত্রাবিহিত লাহকারী ভারতবর্ষের লর্ড আইলিংটন (Right Hon'ble Lord Islington) লিপিত একটা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান দুঃসময়ী মহাপনরে ভারতবর্ষ হইতে কি সাহায্য পাওয়া দিয়াছে, তাহাই তাহাতে বিদগ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, ধন, জন, ও যুদ্ধের উপকরণ প্রদানতঃ এই তিন বিষয়েই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রপতির বহুই সাহায্য করিয়াছে।

(১) ধন।—১৯১৭ অব্দের প্রাথমিক মাসে ভারতীয় প্রেসিডেন্টের লম্বাভিতে ভারত বর্ষবর্ষেই যুদ্ধের ব্যয় বিধানে বৎসরেটা পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। বৎসরে ১৯১৭ অব্দের প্রথম war loan ব্যয় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯১৮ অব্দের দ্বিতীয় war loan ব্যয় ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড উল্লিখিত; বাকী ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড British war loan বিক্রয় করিয়া তোলা হইবে, আশা করা হইতে পারে। ১৯১৮ অব্দের নোবেম্বর মাসে ভারতীয় স্বাধীন্যক সভার প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, অতঃপর ভারতীয় সৈন্য-সংখ্যা ক্রমশঃ

বর্তমান মদরে সমর-বিভাগে মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভারতীয় সৈন্য আছে; ইহার উপর আরও দুই লক্ষ সৈন্য বাড়াইতে হইবে। হুতরাং তৎক্ষণে সেনা-বিকাশে ব্যয়ও তদনুসরণ বাড়িয়া বাইবে। সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পেন্সন খরচও প্রায় এক কোটি পাউণ্ড হইবে। ভারত বর্ষবর্ষেই এই লক্ষ ব্যয়ভার বহন করিয়াও টংলও, ইংলণ্ডের উপনিবেশ ও তাহার নিজস্বাধ্য লুইস বহু টাকার লণ্ডানিও রপ্তানি করিয়াছেন। ১৯১৭-১৮ অব্দে এই লক্ষ রপ্তানি প্রকারে আত্মসাহায্য মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা আত্মসাহায্য, শাস্ত্র, লক্ষা, যন্ত্রাদি এত বিদগ্ধ দেশেও অনেক সময় ভারতবর্ষ হইতে অর্থ সাহায্য প্রেরিত হয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রপতি এই বর্ষকালব্যাপী মহাপনরে দুঃসময়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাহারের প্রদত্ত অর্থসেবায় ও উল্লিখিত সৈন্যধন আর প্রত্যেক স্থানেই যুদ্ধে দিগ্ধ হইয়াছে। দূত ও বৃহৎ সর্গবিধ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত অর্থব্যয় ভোগ করিয়াও যুদ্ধব্যয় নিঃস্বার্থে

(motor launch), হেলিটাল জাহাজ, নাব্যধি বান ও বাহন এবং নব্র ও ব্রহ্ম প্রভৃতি পরিমাণে বান করিয়াছেন।

(২) জন।—১৯১৪ অব্দের ৪ঠা আগস্ট হইতে ১৯১৮ অব্দের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধার্থী ও ভারতীয় সৈন্য মোট ১১,১৬,৩২২ জন প্রেরিত হইয়াছে। তাহাদের ২৯,০০০ জন যুদ্ধে এবং বোম্বে দুর্য্য-যুদ্ধে পতিত হইয়াছে। ইহাধিগের মধ্যে ইংরেজ কর্ণ-সারী ২০০, সার্কসারী কর্ণসারী ১০০ এবং বাকী ২৮,০০০ জন সাধারণ সৈন্য। বলা বাহুল্য, ভারতীয় সৈন্যবলের সম্বন্ধেই যেগুলি যুদ্ধে যোগদান করিবার, কাহারোও জোর করিয়া সৈন্য-বলভূক্ত করা হইয়া নাই। যুদ্ধোত্তরে পূর্ণ প্রতি বৎসরে প্রায় ১০,০০০ ভারত-বাহী সৈন্য-বলভূক্ত হইত; কিন্তু যুদ্ধোত্তরে পর প্রতি মাসেই ইহা অনেকাংশে ভারতবাহী সৈন্যপ্রেরিত হইতেন।

১৯১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গলাট বহাভূক্তের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় সম্মেলন এক সভার আয়োজন হয়। তাহারে ভারতের অন-সামর্যের বহু প্রতিনিবি উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের মন্ত্র আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ও অধিক পরিমাণ উপকরণ সংগ্রহের প্রস্তাব এই সভার মধ্যে হয়। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা দশ লক্ষেরও উপর হইয়াছিল; তাহাশি গত বর্ষে আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের প্রস্তাব হইয়াছিল। সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারী, চিকিৎসা ও রসন বিভাগের বহু ভারতবাহী নিযুক্ত হইয়াছেন; এতদ্ব্যতীত দুগল ও মোসাপটেবিয়ার বেশীর ভাগবাহী ও কারিকর ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে।

নূরন সৈন্যবিশেষ শিক্ষা দানের নিমিত্ত বহু সাময়িক কর্ণসারী আনন্দক হওয়ায়, তাহার সংখ্যাক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ণ প্রতি মাসেই প্রায় ৪০ জন মাত্র অতিরিক্ত কর্ণসারী নিযুক্ত হইল; কিন্তু বর্তমানে এইরূপ কর্ণসারী সংখ্যা ৫০০ হইয়াছে।

Indian Defence Force মানে একদল সৈন্য গঠিত হইয়াছে। ভারতবাহী ও ইংলণ্ডের প্রমোডেব্রিট প্রমোডেব্রিট প্রমোডেব্রিট এই সৈন্য প্রেরিত হইতে বাধ্য করা হয়; কিন্তু ভারতীয় প্রমোডেব্রিট প্রমোডেব্রিট ইংলণ্ডে যোগদান করিতে পারে। ভারতের যে কোন স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে আনন্দক বহু ইংলণ্ডের সাহায্য লভ্য হইবে। এই বলে এক্ষণে ৪ হাজার সৈন্যকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে।

যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই দূগল, ইঞ্জিনিয়ার, প্যালেস্টাইন, বার্কোয়েল, সার্কোয়েল, মোসাপটেবিয়ার, পূর্ণ জাহাজ, গভিস জাহাজ, এডেন, চীন এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যবল যুদ্ধে মিত্র করিয়াছে। ইরানী প্যালেস্টাইন যুদ্ধে যে জয়লাভ হইয়াছে, ভারতীয় সেনাবল, বিশেষতঃ তাহাধিগের অধ্যোগেই সৈন্যবলই তাহারে যৌগে কৃত হইয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যবলের এইরূপ একনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও

যাযায়া করা হইয়াছে। ভারতীয় সামরিক কর্ণসারীবিশেষের বেতনের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এবং তাহাধিগের পেনসনবিশেষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধ কাণ্ডেবলতার মন্ত্র ভারতবাহী সৈন্যবিশেষের জাহাজী প্রদান করিবার ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

পূর্ণপ্রেরিত হির করিয়াছেন যে, এখন হইতে দ্বিতীয় সংখ্যক ভারত-বাহীকে দিল্লীতেই কলেজে উত্তরপ্রেরিত হইতে শিক্ষা দান করা হইবে; এবং তাহাধিগের মধ্যে বাহায়া কাণ্ডেব্রিট হইবে, তাহাধিগের King's Commission প্রদান করা হইবে। বলা বাহুল্য, ভারতবাহী সৈন্যবল যাহাতে লক্ষবিশেষের যুদ্ধার্থী সৈন্যবলের সম্বন্ধে হইতে পারে, তাহাধিগের পূর্ণপ্রেরিত যোগ্যতা প্রেরিত করিতেছেন।

(৩) উপকরণ।—এই তীব্র যুদ্ধকালে যদি ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ না পাওয়া যায়, তবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আশা অনেকটা কমিয়া যাইতে সম্ভব নাই। এই সম উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে ও যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিবার মন্ত্র ভারতবর্ষে একটা Munition Board গঠিত হইয়াছে। কেবল যুদ্ধের ক্ষতিই যে এই বোর্ডে গণিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাহাধিগের যাহাতে এই সম উপকরণ ও যুদ্ধার্থী যোগ্যতা-বাহী মন্ত্র ভারতবর্ষে পর-যুদ্ধার্থী হইয়া না থাকিতে হয়, তাহার উপায়ও ইহা বোর্ডে গণিত হইবে। এই বোর্ডে এক্ষণে প্রতিমাসে প্রায় ২০ লক্ষ পাউন্ড যুদ্ধার্থী যুদ্ধোপকরণ প্রেরিত ও সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাহাধিগ ও যুদ্ধার্থীমানে যে রেলপথ নির্মিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ভারতীয় যৌগ ও ইংলণ্ডে প্রেরিত এবং তাহার নির্মাণকারক অধিকাংশই ভারতীয় যুদ্ধার্থী। প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ, ২০০ ইঞ্জিন এবং ৫০০০ যুদ্ধ-পট ভারতবর্ষে হইতে যুদ্ধ স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। টাইট্রিস্ ও ইংলণ্ডে বহীতে যে সমস্ত যৌগ ও জাহাজ প্রেরিত হইতে, তাহা সমস্তই ভারতবর্ষে হইতে প্রেরিত হইয়াছে, এবং ভারতবাহী যাহাশি পরিচালিত হইতেছে।

মোসাপটেবিয়ার চাহ-আবাদের মন্ত্র যে সমস্ত কৃষিকার্যোপযোগী যন্ত্রাধিগ বাহ্যক হইতেছে, তাহাও প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে হইতে সংগ্রহিত হইয়াছে। মোসাপটেবিয়ার ও পূর্ণ আধিকার অধিকৃত সৈন্য-বিশেষ কাণ্ডের নিমিত্ত সহস্রাবিক মাইলব্যাপী টেম্প্রায়েন ভার ও তাহার পরিচালনের মন্ত্র কর্ণসারীমন্ত্র ভারতবর্ষে হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে। Trench বাহাধিগ করিবার মন্ত্র বাহিগ যন্ত্র প্রেরিত পরিমাণে ভারতবর্ষে হইতে প্রদান হইয়াছে। এক কলিকাতার কলকাতালাই মাসে ১ ডেসি ৫০ লক্ষ বাহিগ যন্ত্র পাঠাইয়াছেন। যুদ্ধার্থী বাহিগ যন্ত্র প্রেরিত করিবার মন্ত্র বহু পাউন্ড প্রেরিত হইয়াছে। সৈন্যবলের হুট জুতা, খোদার জিন প্রভৃতি প্রেরিত করিবার মন্ত্র যোগ্যতার চাহ্যক ভারতবর্ষে হইতে কম প্রদান হয় নাই। ১৯১৭ অব্দে ৫০ লক্ষ যন্ত্র হুট জুতার উপযুক্ত চাহ্যক ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল; ইহা ছাড়া প্রায় ৫০ লক্ষ পাউন্ড স্ট্রাসবার্ড ভারতবর্ষে হইতে

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

পত্নী ১২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় ইন্দুসুয়েন্সারোগে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি স্বনামধন্য ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মোট পুত্র। ইংলও হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষা আদিয়া ইনি ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ কলিকাতার বিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা-কার্য পরিচালন করিয়াছিলেন। সাধারণ্যে ইনি ডাক্তার কর সাহেব নামে পরিচিত। ইনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার উত্তরাংশে তাঁহার প্রসার ঘণ্টে ছিল। বেলগেছিয়া আলবার্ট ভিক্টর স্কুল, হাসপাতাল ও কলেজ তাঁহার অঙ্গর কীর্ষি। এই অনহিতকর অহুতানের সাক্ষ্যের মত তিনি ঘরে-ঘরে ভিক্ষা করিয়াছেন। ইহার উন্নতি-কল্পে তাঁহার অসুখা সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে কোন দিনই তিনি স্ক্রুতি হন নাই। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হইবে, ইহার স্বাধিকার ও উন্নতি-সাধনের মত তিনি কীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার দেশের ম্যালেরিয়া-প্রদীড়িত পরীতে-পরীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাব বেগুণে বহিয়াছে। কেবলমাত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও ঢাকার স্কুল হইতে প্রতি বৎসর বৃত্ত ছাত্র বাহির হয়, শুদ্ধায়া দেশের অভাব মোচন হইতে পারে না। তাই তাঁহার অস্বাঃ উৎসাহ ও ধৈর্য গালিত ও বর্জিত বিভাগর হইতে বৎসর-বৎসর বহু ছাত্র বাহির হইয়া দেশের ও দেশের উপকার সাধন করিতেছে। কিছুদিন পূর্বে সদাশয় গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভাগরী কলেজে পরিণত করিয়া দিয়া দেশের যে কতটা অভাব দূর করিয়াছেন, তাহা ভাবার ব্যক্ত করা যায় না। বিভাগর-প্রতিষ্ঠার সময়ে ডাক্তার কর-প্রমুখ স্বদেশ হিতবিগণের মুখা উদ্বেগ ছিল, অপনাদের চেষ্টার জাতীয় ভাষার চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। তাঁহার এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। পরে গবর্ণমেন্ট বহন স্থলী কলেজে পরিণত করিবার অহুমতি দিলেন, তখন ইংরেজী ভাষাতেই অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। তাঁহার পরই

ডাক্তার কর মহাশয় দেশীয় ভাষার চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষা দিবার মত একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। রাধাগোবিন্দ বাবু স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শৌর্য বর্জিত করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতার অনহিতকর অহুতানে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন কর্মবীর ছিলেন, তাহা নহে; তিনি একজন মানবীরও ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মত তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নীর দেহান্তর হইলে, তাঁহারই পৈতৃক বাস-ভবনে এই নিবেদন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি তাঁহার পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার মত এই দাতব্য চিকিৎসালয়কে “দুর্গাদাস আনোয়াগ-নিকেনন” নাম দিয়াছেন; এবং তাঁহার বড় সাধের অলংকার ভিক্টর কলেজের অহুতাপ্রণকে ইহার পরিচালন কার্যের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকৃত্য কীর্ষিকাহিনীর উত্তরণ করিয়া তাঁহার চরিত্র-বিস্মরণ করিতে হইবে না। উপর-দ্বন্দ্ব রাধাগোবিন্দ দেখিয়াছিলেন, প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে বাঙ্গালী জাতিটা ধ্বংসের নিকট অগ্রসর হইতেছে। সেই চিরবয়োগা জাতিতে হৃৎ ও বল করিবার মত তাঁহার যে বলবতী ইচ্ছা ছিল, তাহারই মত পুরোক্ত দুইটা অহুতান। এই দুই কীর্ষি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। গভীর বাঙ্গালদেশে তাঁহার প্রভাব-মুষ্টি স্থাপিত করুক আর নাই করুক,—তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন রাখুক আর নাই রাখুক, তিনি স্বয়ং যে অঙ্গর কীর্ষি রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরোজ্জ্বল থাকিবে। ছাত্র, ক্রম বাঙ্গালী তাঁহার রূপায় ব্যাধি-নিমুক্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে—শ্রদ্ধা-শ্রুতমানে তাঁহার স্মৃতির পূজা করিবে। বাঙ্গালী জাতির চরিত্র-গঠন-কল্পে তিনি যে সহায়তা করিয়া গেলেন, কাল তাহার প্রকৃত বিচারক হইবে। তাঁহার শোকাক্ত পরিবারবর্গকে আমরা আত্মিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক সংবাদ

৮ অজিতকুমার চক্রবর্তী

মূলধন, অজিতকুমার চক্রবর্তী আর ইংলণ্ডে নাই। ইনফ্লুয়েন্সারোগে অকালে ৩, বৎসর বয়সে অজিতকুমার হৃদাঘাত, বিধবা পত্নী ও শিশু সন্তানগণকে তেলিয়ার চেষ্টায় গেলেন। অজিতকুমার প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন। তিনি মর্যাদা দেবেন্দ্রনাথের একখানি বিদ্যুত জীবনচিত্রিত নিখিরাছেন; মহাত্মা, রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চিত্রিত নিখিয়ার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন; কিন্তু সে জীবন চিত্রিত আর নিখিয়ার বাইতে পারিলেন না। বাঁচিয়া থাকিলে অজিতকুমার প্রচুর বংশোদ্ভূত করিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃ একমিষ্ট সাহিত্য-সেবকের অকাল বিরোগ-বেদনা আমাদের বড়ই লাগিয়াছে। ভগবান তাঁহার শোক-সম্পন্ন আত্মীয়গণের মূলে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৮ রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

অমরা তুমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ইতিহাস-প্রথিত পাইকপাড়ার রাজবংশের রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাগাজুর গত ২৮শে ডিসেম্বর শনিবার সহসা প্রকাতভিত্তি হইয়াছেন। তিনি অল্প দিন হইল রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন; এই উপাধি ভোগ করিবার অবসর মা পাইয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। ১৮৮১ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুর দুইবৎসর তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তামানীজন Prince of Wales এর ভারত ভ্রমণকালে রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র যুবরাজের page এর কার্য করিয়াছিলেন। তিনি উইল করিয়া কাম্বির পুল তহবিলে একলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থ-দানগোত্র দুগুণী কলেজে পরিণত হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ঐতিহ্যবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

৮ রামদেব মুখোপাধ্যায়

তুমি! দুঃখিত হইলাম যে চুঁচুড়ার বর্ণীর ভূমিবে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বযোগ্য পৌত্র রামদেব মুখোপাধ্যায় গত ৩০শে নভেম্বর তারিখে ইনফ্লুয়েন্সারোগে অকালে (৩০ বৎসর) বয়সে মানবদীপা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ভূমিবে বাবুর ষোড়শ পুত্র বর্ণীর গোবিন্দদেবের দ্বিতীয় পুত্র। এম-এ পাশ করিয়া পাটনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে কার্ঘ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব ও পটুতা দেখানর জন্যে বেয়ার গভর্ণমেন্টে কর্তৃক Personal Assistant to the Cloth Controller এর কার্যে নিয়োজিত হন। ৮ গোবিন্দ বাবুও তৎপত্রীর সূত্রার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐহুত্ব মুহুন্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিশু পুত্র কল্যাণগণকে প্রাথমিক দেখে করে প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন। পিতামহাতার মৃত্যুকালে ৮ রামদেবের বয়স ষষ্ঠ বর্ষ ছিল; এবং পরীর সূত্রার পর ৮ গোবিন্দদেব বাবু এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ৮ রামদেব পিতৃ-প্রতিম খুলতাত এবং মাতৃদেবা খুড়িমাতার অকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে পুরনোক লক্ষ্যহিত অন্তরে শোণাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

৮ ডাক্তার আর, সি, নাগ

আমরা শোকসম্পন্ন চিত্তে এবার আরও একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা চিকিৎসকের মৃত্যু-সংবাদ পত্র করিতেছি। ডাক্তার আর, সি, নাগ নামের চট্টোয় দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আমেরিকার গিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান এন-ডি উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন। ইহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনা বাইত। বেঙলার হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করিয়া তিনি এদেশের যুবকগণের পক্ষে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা শিকার পথ মুদ্রণ এবং তাহাদের উপ-জীবিকার সঙ্গায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

ঐক্য-লীলাসূতম্

মহাশূণ্যে ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

এই পুস্তক পুস্তক-পরিচয় সূতম্ ঐক্য-লীলাসূতম্
বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

মহাশূণ্য গান্ধী

ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

মহাশূণ্য গান্ধী ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

মহাশূণ্য গান্ধী

ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

এখনি গান্ধী ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

পুস্তক-পরিচয় সূতম্ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

মহাশূণ্য গান্ধী

ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

মহাশূণ্য গান্ধী

ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

ঐক্য-লীলাসূতম্-বিশ্বনাথ ঐক্য-লীলাসূতম্, হুলা
স্বপ্নসূতম্।

কথা সরিৎসাগর

হেতুকের

ঈশ্বরপ্রভাব রায় এম্বিট, মূল্য নয় টাকা ।

যেহেতু যেহেতু শ্রীমান কুলদ্বারজ চন্দ্র অনেকগুলি কবি লিখিয়া ফেলিলেন । তাঁহার 'পুত্রাণের পর' 'বেশেখের বেতাস পক্ষ-বংশতি' 'জ্যেষ্ঠের বক্রিণ সিংহাসন' 'অবিন হুত' প্রভৃতি বহুটি আবার লাল করিয়াছে । ক্রিকেট-ক্ষেত্রে শ্রীমানের যে ক্রীড়া ও দক্ষতা বেগিয়া আবার কত সংখ্য গ্রন্থসমূহ করিয়াছি, এখন আবার পিতৃ-সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সেই ক্রীড়া ও দক্ষতা বেগিয়া আসিয়া তাঁহার ততোধিক গ্রন্থসমূহ করিতেছি; তাঁহার 'কথা সরিৎসাগর' তাঁহার পূর্ব ধর্ম; অল্পই বাকি আছে ।

সবিত্তাধনা

ঈশ্বরীন্দ্রপ্রভাব সর্বাধিকারী এম্বিট, মূল্য এক টাকা ।

'শ্রীমান সুনীতপ্রভাব সত্যসায়ী 'সর্বাধিকারী' । তিনি উপজাল সেধেন, কবিতা সেধেন, গান সেধেন, কুলদ্বারী পুস্তক সেধেন, কীর্তনী, জনন, নীতিপুস্তক, বিবাহের কবিতা, চন্দ্র কাব্য, কাব্য, বঙ্গ ও ইংরাজী গ্রন্থকর্তা সেধেন; বাঁকী ছিল নাটক, তাহার লিখিয়া ফেলিয়াছেন । এই 'সবিত্তাধনা'ই সেই নাটক । এখানি কলিকাতার রক্তককে অভিনীতও হইয়াছে, হুতাং নাটক সেখান সার্থক হইয়াছে । এই নাটকখানি আর কিছুই নহে—আমাদের বেশ-প্রচলিত ইচ্ছা-পূরণের পর । সেই পর অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে । যোরালা নাম গুনিয়া কিত লবের কথাটা বরা বার না । লকণেই ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়েন ।

সাহিত্য-সংবাদ

ঈশ্বর বীনপ্রভাব রায় কৃত 'সৈনিকের কাণ্ডাকাল' বাহির হইয়াছে মূল্য ৫/- ।

ঈশ্বর বরীন্দ্রনাথ বসু এম্বিট সচিত্র "গ্রেবজীবনী" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১/- ।

সরিসায় সম্পাদিত রক্ত পিয়ারিস্, নিরিঞ্চার এম এম "পুত্র সন্নীতিকা" প্রকাশিত হইয়াছে । মূল্য হাক হেনদী বীণাই পাঁচলিকা, কাণ্ডোজর সমিতি একটাকা ।

সিদ্ধান্তপ্রভাব সর্বাধিকারী এম্বিট, মূল্য সাত টাকা ।

এখানি পঞ্চপুস্তক;—ছোট পনের সহস্র বর্ণে, একটা খায়াখিক পত্র । পুস্তকীর কবিতার ঈশ্বর বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথায় এই পনের মটের মূল খায়াট লেখক যথায়কে দান করিয়াছিলেন । পাক্সা আর্টস্টের মট, তাহার পর সৌত্রিক-সংখ্যের স্তারও লইয়াছিলেন নিগুণ শিল্পী; পল্লভি যে লিখিয়াছে, তাহার না বলিলেও চলে । রক্তের চহিহ অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার অধঃপতনের কাহিনী বখাবৎ হইয়াছে; বহুত আশাশের মনে রক্ত, কলসজার গোণাপাণির বড়ীয়া কুণ্ডলা সামগ্র্য একটু ইঙ্গিতে সার্থি। বিশেষই হইত; তাহারও রক্তের অধঃপতনের ইতিহাসের অঙ্কখানি হইত না । বিদ্যুৎ ও শিশির অতি সুন্দর চুটরাহে । বইখানি লিখিয়া আদার আনন্দিত হইয়াছি ।

বৃক্ষের বচন

ঈশ্বরপ্রভাব রায় এম্বিট, মূল্য এক টাকা ।

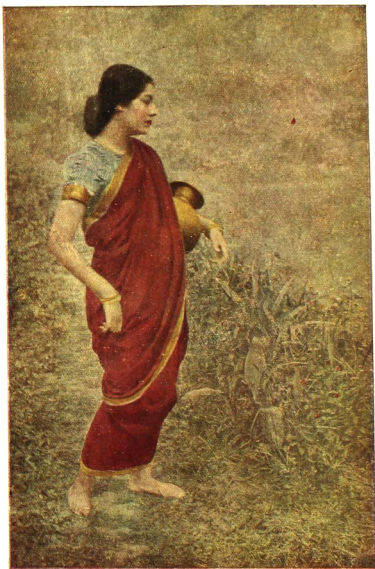
'বিত্তাবা' পত্র যথ্যবিন হইতে 'বৃক্ষের বচন' প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে । যে বৃক্ষ প্রথমে এই 'বচন' আরম্ভ করেন, তাঁহারও আদার লালি, আর আর যে বৃক্ষ সেই 'বচন' চোমাইতেছেন ও সম্পাদন করিলেন, তিনিও আদারের প্রভাব বহু । এই বচনগুলি 'বিত্তাবা'র পারকরণ পরম আশ্রয়ে পাঠ করিয়া থাকেন । সম্পাদক বৃক্ষ ঈশ্বর বোলেপ্র বাবু এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করার আশঙ্কা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি । আশঙ্কাল স্ত্রী-বস্ত্রার বড়ই অভাব হইয়াছে । এ সংগ্রহ এই বচনগুলি বড়ই কাজে লাগিবে ।

ঈশ্বর সুনীতপ্রভাব সর্বাধিকারী এম্বিট 'সৈনিকের কাণ্ডাকাল' প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৫/- ।

ঈশ্বর হরিদ্রাবন গোণাপাণার এম্বিট, আটখানা-সংখ্যের ৩০ সংখ্যক এই 'পত্রবনের দান' প্রকাশিত হইল ।

ঈশ্বর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্বিট 'সুনীতি' বাহির হইয়াছে ১১/- ভাকবার ১/- ।





“কলসী লয়ে ঠাণ্ডে

পান সে বীকা”

—ইবীন্দ্রনাথ

ঈশ্বর আর্ধ্যহুয়ার তৌহী-দ্বীত আলোকচিত্র হইতে]

[ঈশ্বরহুয়ার তৌহী অমুখিতি অমুখিতি]



কাল্কুন, ১৩২৫

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শষ্ঠ অর্ধ

[তৃতীয় সংখ্যা]

নব পরমাণুবাদ

[অধ্যাপক শ্রীশ্রীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ]

পরমাণু বিশ্বের সূক্ষ্মতম অণুগণ্যমান। সূতরাং পরমাণুবাদ
যে অড়বাদ হইবে, তাহা অতীব সহজবোধ্য। আমাদের
জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।
এই উত্তর দর্শনেই অড় রূপেই পরমাণুর ব্যাখ্যা দেখা যায়।
পাশ্চাত্য পরমাণুবাদেও অড় রূপেই পরমাণুর ব্যাখ্যা।
এই প্রকারে পরমাণু অড়ত্ব রূপেই প্রোচা ও পাশ্চাত্য
উত্তর অণুতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অড় রূপে পরমাণুর
ব্যাখ্যা এতকাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একরূপ বদ্ধমূল হইয়া
গিয়াছে যে, এক্ষণে পরমাণু সম্বন্ধে অত্র কোনরূপ সন্ধান
আবিষ্কারকে বোধ প্রদান করিতে চাহিলে, আমরা যে তাহা
সন্নিহিত চাহিব না,— বরঞ্চ উপেক্ষা করিতেই উদ্ভত হইব,
তাহা কিছুই বিচিন্তা নহে। আমরা কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে
নূতন সন্ধান প্রদান করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের
সেই সন্ধান পূর্বেই উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া, বিচার
পূর্বক যেন উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়, ইহাই আমাদের
একান্ত প্রার্থনা।

প্রথমেই আমরা বায়ুপূরণ হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত
করিতেছি :—

“তানুগ্রকৃতি মং হৃদয়ধিতাত্ত্বমব্যয়ম্।

অমুংপাতঃ পরং ধাম পরমাণুপরেপদম্।

অক্ষয়জ্ঞানানুভূত অবিস্মৃতিমানসৌ।

প্রাচুর্যবতিরোক্তাবঃ ত্বিত্তিশাল্যমুগ্রহঃ।

বিধিরৈক্যমৌপমাঃ পরমাণুহেবরঃ ৪”

—বায়ুপূরণ, ১০১ অধ্যায়।

“তদ্ব্যবো গ্রহুতিমান্, হৃদয়, অক্ষয়, অমুংপাত,
অতর্ক্য, অমূর্ত অথচ স্মৃতিমান্, পরমাণুরূপ, অবিষ্টানাম্যক,
পরমধান পরমেবর বিরাজমান, তিনি প্রাকৃত্যব, তিরোক্তাব,
স্থিতিবিধি ধরাদির মূল আশ্রয়, অথচ সর্ববিধ সৃষ্টির দ্বারা
অনৌপমা।”

এস্থলে পরমাণুর অড়ত্বের সহিত ঈশ্বর-চৈতন্যের পং-
নিয়মেই আশ্রয়্য চোটার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।
জ্ঞান ও বৈশেষিক মতে পরমাণু বিশ্বের উপাদান-কাথ্য,

আর ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা। ইহাতে পরমাণু স্বতন্ত্র ভাব ভগ্নে পরিণত হওয়াতেই বৈতবাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বৈতবাস স্বীকার করিতে গেলে, ঈশ্বরকে খর্ব করিতে হয় বলিয়াই, অবৈতবাসের পক্ষ হইতে পরমাণুতে চৈতন্যের আরোপ করতঃ, উপাধান-ভাৱণকেই নিমিত্ত-কারণে পরিণত করা হইয়াছে। উক্ত বর্ণনাধর পরমাণু ও ঈশ্বরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধের স্পষ্ট প্রদর্শন পূর্বক সান্নিধ্য বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপেই লক্ষ্যবিত্ত।

বাসুপুত্রাণেরই অস্ত্র একটা ব্যাক্যেও স্পষ্টভাবেই পরমাণুর সন্ধিত পরমেশ্বরের অন্তর তাৎসব্যক হইয়াছে; যথা :—

“ঈশ্বরঃ পরমাণুভাবগ্রাহমনীবিগাযুঃ”

“ঈশ্বর পরমাণুরূপ বলিয়া মনোবিদগণের ভাবের দ্বাৰাই মাত্র গ্রাহ্য।”

ঈশ্বরের এই পরমাণুরূপ যে কেবল পুণ্যের উজ্জ্বলতাই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নহে; এতদুপায়ে বিহীন এক নামও “পরমাণুরূপ” হইয়াছে। এইরূপে ভাবাতে পর্যন্ত যে পরমাণুর ঈশ্বরত্ব-ধারণার দৃষ্টান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই আশ্চর্য্য দেখিতে পাইতেছি। কেবল তাহাই নহে। পরমাণুর ঈশ্বরত্ব-ধারণার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহাও আমরা এখানেই দেখিতে পাই। পরমাণু ঈশ্বরের অল্প রূপে স্বীকৃত হইয়াই ঈশ্বরত্বে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। এই প্রকারে ঈশ্বরের সহিত অসামান্যতাব হইতেই মূঢ় পরমাণুখান চৈতন্য-পরমাণু-বাসে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরমাণুখানের বৈতবাসের সহিত এখানেই অবৈতবাসের সমন্বয় বটিয়াছে।

পুণ্যে ধাৰ্য্য সিদ্ধান্ত রূপে প্রকাশিত, উপনিষদে তাহারই সূক্তি, বিবিধ দৃষ্টান্ত সহকারে শুদ্ধশিষ্টসংযমকুলে প্রদর্শিত। এতলে আমরা সেই বিচিত্র দৃষ্টান্ত পরম্পরার হুইট দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব :—

“ভ্রূগ্ৰোধকলমত আবেবেতীমঃ ভগবতীতি তিষ্ঠতি ভিন্নঃ ভগবতীতি কিম্ব পত্নীত্যা ইবেমাবান। ভগব ইত্যাসা-মনৈক্যাঃ তিষ্ঠতি ভিন্না ভগব ইতি কিম্ব পত্নীতী ন কিঞ্চ ভগব ইতি। ১ ওঃ হোবাচ যঃ বৈ সৌভেদগনিধানঃ ন নিতালয়স এতত্ত বৈ সৌভেদগোহনির এবং মহান্ ভ্রূগ্ৰোধকীতি। প্রচ্ছংস সৌভেতি ন ব এবেমনিমিত্তাখ্যা-

মিৎ-সৌভেদ-স আখ্য তবমসি বেত্তকেত্তো ইতি ভূঃ এবং যঃ ভগবান্ বিভাগ্যবিত্তি তথা সৌভেতি হোবাচ। ইতি স্বামিনঃ ২।”

“শেবগ্ৰেভেতদ্বকৎসংযমাখ্য না প্রাতঃকপাসীদখ্য ইতি সমুত্তা চকার তং হোবাচ যদোবালবণমুৎসংযমাখ্য-তদাহরেতি তদ্ব্যবসুতনবিবেহ। ১ যথা বিদীন মেধাশী-ভাতাদ্যাচ্যোমেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদ্যাচ্যোমেতি কথমিতি লবণমিত্যাদ্যাচ্যোমেতি কথমিতি লবণমিত্যতি-প্রাতঃকপাখ্য ইতি তদ তথাচকার তদ্বৎ সংবর্ততে তং হোবাচ্যেৎ যাব কিম সংসোম্য ন নিতালসং-জ্ঞেব কিলেতি। স-চ জ্যোহগনিমিত্তাখ্যামিৎ-সর্গং তৎ-সত্যঃ স আখ্য তবমসি বেত্তকেত্তো ইতি ২। জ্যোহগ-সত্যঃ ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

“ইহা হইতে ভ্রূগ্ৰোধকণ আধরণ করা।” (শিষ্ট বলিতেছে) “ভগবন্! এই ভ্রূগ্ৰোধকল।” “ইহাকে ভগ্ন কর।” “ভগবন্! ভগ্ন করা হইয়াছে।” “ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?” “হে ভগবন্! এই সূত্র বীজসকল।” “ইহাদের একটিকে ভগ্ন কর।” “ভগবন্! ভগ্ন করা হইয়াছে।” “ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?” “ভগবন্! কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।” তাহাকে (শুক) বলিলেন, “হে সোম্য! যে অণুরূপকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছ না—এই অণুরূপেরই (বিশাকরণে) এই প্রকাত ভ্রূগ্ৰোধকণ বর্তমান রহিয়াছে। হে সোম্য! ইহা বিশ্বাস কর যে, সেই অণুই এই (বৃক্ষ)। এই সমস্ত বিষই অগ্নিমান্বক, উহাই সত্য। উহাই আখ্য। হে ভেত্তকেত্তো! উহাই ভূমি।” (শুক এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, শিষ্ট বলিলেন) “হে ভগবন্! পুনর্বার আমাকে বিশেষভাবে বলুন।” (শুক বলিলেন) “হে সোম্য! তাহাই করিতেছি।”

“এই লবণ জলে রাখিয়া প্রাতঃকালে আহার নিকট আনিও।” সে তাহাই করিল। তাহাকে শুক বলিলেন, “ওহে! রাত্রিতে লবণ জলে রাখিয়াছিলে, তাহা আনয়ন কর।” তাহা সে হাতের দ্বারা বৃজিয়া পাইল না; যেহেতু তাহা জলে বিশীল হইয়া গিয়াছে। (শুক বলিলেন) “ইহার উপর হইতে আচমন করিয়া কিরূপ দাব পাওয়া যায় দেখ।” শিষ্ট বলিলেন, “লবণের স্ফাব।” “ইহার

মধ্য হইতে আচমন করিয়া যেন বহিষ্কৃত হইয়া যায়। "লবণাধার।" "তল হইতে আচমন করিয়া যেন ক্রিয়ণ যায়।" "লবণাধার।" ইহা পান করতঃ আবার নিকট আসিও।" সেই শিবা তাহাই করিল, ইহা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। তাহাকে শুক বলিলেন, "হে সৌম্য। ইহাতেই সমস্ত বিস্তারন আছে। কিন্তু তাহা নিরীকণ করিতে পারিতেছ না।" "এই যে অণু তাহাই সেই সমস্ত। সমস্ত বিবী এই অণুরূপ। উহাই সত্য, উহাই আখ্যা। ভূমিও, যে যেতাকতো! উহাই।"

এখানে বিশ্বের মূল অণুরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অণু যে চৈতন্যরূপ, জড়রূপ নহে, তাহাও ছান্দোগ্যোপনিষদেরই অপর স্থলে স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত দেখা যায়। এখানে আবার তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অন্নমতিভং ত্রেখা বিধীয়েত ততঃ যঃ স্থবিতো বাতুত্ত্বং পৃথীযঃ তবতি যো মধ্যমত্ত্বাসং যোহপিঠঃ সূত্রঃ। ১ আপোপীঠা মেধা বিধীয়েত তাসাং যঃ স্থবিতো বাতুত্ত্বমুত্রং তবতি যো মধ্যমত্ত্বোহিতঃ যোহপিঠঃ স গ্রাণঃ। ২ তেজোহপিতং ত্রেখা বিধীয়েত ততঃ যঃ স্থবিতো বাতুত্ত্বমহি তবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোহপিঠঃ সা বাক্। ৩ অন্নমঃ হি সৌম্য মনঃ আপোমঃ গ্রাণতেজোহবিধীয়াসিতি ত্বয় এব না তপবাদিগ্রাপরাধিতি ত্বা সোমোতি হোবাচ। ৪ ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।"

"ত্বক্ অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়। বাহ্য মূলঃপুরুষ বস্ত তাহা মূল হয়; বাহ্য মধ্যম প্রকারের বস্ত তাহা মাংস হয়; আর বাহ্য সূক্ষ্মতম বস্ত তাহা মন হয়। পীঠ বল তিন প্রকারে পরিণত হয়,—ইহার মূলঃপুরুষ সূত্র হয়; মধ্যমাংশ রক্ত হয়; আর সূক্ষ্মতমাংশ গ্রাণ হয়। ত্বক্ তেজঃ পদার্থ তিন প্রকারে পরিণত হয়,—মূলঃপুরুষ অহি; মধ্যমাংশ মজ্জা ও সূক্ষ্মতমাংশ বাক্ রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য। মন অন্নমঃ, গ্রাণ মনঃময় ও বাক্ তেজোময়।" "হে ভগবন্! পুনর্বার আনন্দে বলুন।" "হে সৌম্য! তাহাই করিব।"

এই বর্ণনা হইতে সমস্ত মূল রূপের মূল অবলম্বন স্বল্পরূপেই যে পরমাণু বর্তমান এবং এই পরমাণু যে চৈতন্যময়, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

পাক্তাভ্যাসে পরমাণু আপেক্ষিক স্বয়ং-পদার্থ

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম "Electron" বা "তড়িতাণু"। এই তড়িতাণু সকল শক্তির আধার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পরমাণু সকল এই সকল তড়িতাণু দ্বারা গঠিত। পাক্তাভ্যাসে এতৎ দ্বারা এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—"Each atom has proved to be remarkable collection of electrons, a colossal reservoir of energy." The Evolution of Mind, by MacCabe, p. 14.

"প্রত্যেক পরমাণুতেই স্পষ্ট লক্ষিত তড়িতাণুগুলি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটাই শক্তির বিপুল আধার।"

পরমাণু যে শক্তির আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহার সেই শক্তি যে তড়িৎ হইতেই প্রাপ্ত, তাহা স্পষ্টই বৃক্ষিতে পাওয়া যায়। কারণ, তড়িৎ নিজেই যে শক্তি পদার্থ, তাহা সকলেরই স্বীকৃত। তড়িৎের কার্যের দ্বারাই পরমাণু সকলের সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হইয়া বিশ্বের সমগ্র-সকলের সৃষ্টি হয়। উপনিষদের "অগ্নি" বা অণুতম স্বয়ংতব তড়িতাণুর অরূপ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু কেবল তড়িতাণুর অরূপ বলিলেই ইহার ধর্মাব স্বরূপ বলা হইল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। তড়িতাণু কেবল শক্তি স্বরূপ; কিন্তু উপনিষদের "অগ্নি" কেবল শক্তি স্বরূপই নহে; ইহা ওদগতিক চৈতন্য-স্বরূপও বটে; অর্থাৎ উপনিষদের "অগ্নি" চৈতন্যপ্রাণীত শক্তি স্বরূপ। পরমাণুতে এইরূপ চৈতন্যের আরোপ না করিলে, পরমাণু যোগে চৈতন্য সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে না। প্রাচ্য ও পাক্তাভ্যাস পরমাণুবিদ্যার মতে ঈশ্বর জগতের সত্ত্ব চৈতন্যময়ী কর্তা ও পরমাণু সত্ত্ব জড়োপাদান রূপে স্বীকৃত হওয়া, এবং ঈশ্বর সৃষ্টি হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত থাকায়, সৃষ্টিতে চৈতন্যের ক্ষুদ্র অতীব ক্ষুদ্র রহস্যরূপেই পরিণত হয়। কিন্তু চৈতন্যময়ী বিশ্বব্রহ্মার বিকাশরূপে পরমাণুর কল্পনা করিলে, চৈতন্য সৃষ্টির সুব্যাখ্যা যেমন আমরা পাইতে পারি, জড় সৃষ্টির সুব্যাখ্যাও তেমনই আমরা পাইতে পারি। কারণ, জড় চৈতন্যেরই মূল রূপ এবং চৈতন্য, জড়েরই স্বয়ং মূলতব ধা আখ্যা। উপনিষৎ "অগ্নোহপি অগ্নিরান্" বলিয়া এই স্বয়ং মূলতব বা আখ্যাকেই নির্দেশিত করিয়াছে। অণু হইতেও অণুরূপে

বর্তমান থাকিরা, বিশ্বের এই চরম ভাব রূপে পরমাণু, পরমাণু অপেক্ষাও হৃদয়রূপে ইহার মূলস্বরূপ হইয়াছেন। এইরূপেই উপনিষৎ ও পুরাণে পরমাণুতত্ত্ব চৈতন্যভরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের অভিন্নরূপে পরিণত হইয়া এক অভিনব পরমাণু-

বাদের স্রষ্টা করিয়াছে। ইহা প্রচলিত আড়-পরমাণুবাদ নহে, পরম, চৈতন্য-পরমাণুবাদ। পান্ডিত্য বিজ্ঞানে ইহার যে হুতনামা হইয়াছে, প্রাচ্য দর্শনের শেষ মীমাংসাতেই তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

মা

[শ্রীঅমুরূপা দেবী]

(১২)

বিবাহের পর একটা বৎসর কাল মনোরমা পতিগৃহে স্থান লাভ করিয়াছিল। এক বৎসর সময় পূব দীর্ঘ নয়—তিনশত পঁচষট্টি দিন মাত্র; কিন্তু মনোরমার নিকট সেই একটা বৎসর,—কাল-সমুদ্রের সেই এতটুকু একটা বিদ্যুৎ,—ঘটনা-বৈচিত্র্যময় একটা পূর্ণ যুগেরই স্তায় সুদীর্ঘ। সেই ক্ষুদ্র বৎসরটি তাহার সৃষ্টির ভাণ্ডারে যে সব অমূল্য রত্ন সঞ্চার প্রদান করিয়াছে, সে সকলের দ্বািত্রি এমনও তো জান হইবে নাই, কখনও হইবে এমনও মনে হয় না। যেহেতু তাহার মধ্যে তো একটাও কুটা নাই। সেই বৎসরের অঙ্গাণু ছোট-বড় স্রবের আশেয়ে এতটা কাল ধরিয়াই এই অতাপ্তি মেঘেটার বৃক্কের মধ্যটা অন্ধকারের কালো কালিতে ভরিয়া উঠে নাই; বরং আশ্রয় আশ্রয় আকাশের পাকে-পাকে ছিটানো নক্ষত্র-বিন্দুগুলির মত সূঁটয়া-সূঁটয়া আলো হইয়া আছে। মনোরমা সব ছাড়িতে পারে; কেবল সেই সুখাসিক বৎসরটির স্মৃতিটি সে ইহজীবনের সার করিয়া তো রাখিবেই; যদি সম্ভব হয়, তবে হয় ত পরকালেও ইহাকেই মাথার করিয়া লইয়া যাইবে। ষাণ্ডকী সোপার ঢকে দেখিয়াছিলেন, নন্দ্যার সৌখ্য উপহার মূল হইয়া উঠিয়াছিল;—আর স্বানি-প্রেম !—তা বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীরও ভাগ্যে ষ্টিক অমনট খটগাড়ে কি না, এ বিষয়ে এই দুয়ো নারীটির মনের মধ্যে আজও বিদ্যম সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। অরবিন্দ নিজে দেখিরা, বড় সাধ করিয়া বধু ঘরে আনিয়াছিল। বধুর সঙ্গে দুপাছি হোপলা-পাকের বাসা এবং ইহারই উপযুক্ত আরও খানকরেক হাফা পুরাতন পাটারের অলুবিহীন পোষাকপা

দর্শনে মাতা কৃষ্ণা; বধুর সঙ্গে একখানি মাঝ কোম্পানি কাপড়ের উপযুক্ত রোপামুতা গৃহপ্রবিত্ত হওয়ার পিতা কই; বধুর পিতামহ হইতে দ্বিষ্টাদ্বিয়ার অগ্রদূতরায় আখীয়া-সুইখিনী, দাসদাসী, প্রতিবেশী সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া, বাহার যেমন ইচ্ছা নববধুর পিতৃমণ্ডলে ইচ্ছা-মুখে কানির আঁচড় কাটিতে থিরা করে নাই। কেবল একা অরবিন্দের চিত্তের কোন অংশে কোনও অগ্রদূতরায় ছায়াপাত পড়াত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে চারি পাশের বিপ্রদ-বিপ্রোহ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিরা কিশোরী বধুটির সহিত আলাপ-পরিচয় করিরা কেলিয়ার মত একান্ত উৎসাহের সহিত লাগিয়া গেল। হিন্দু ঘরের হিলাবে বধু নিত্যন্ত বালিকা নয়; হরিত্র পিতাকে কস্তাদার হইতে উদ্ধার করার প্রথমাবধিই মনে-মনে সে স্বাধীর প্রতি কৃতজ্ঞা; তাহার উপর চিরপরিমিতী ভগিনী শরৎশশীর সহায়তা; যেখিত্তে-যেখিত্তে বর-বধু পরম্পরের কাছাকাছি আসিরা পড়িল। ঐশ্ব্যাকপ, একজামিনের পড়া বলিরা ছেলে-বউর শরত পাকিবার ব্যাবস্থা কর্তা করিরা দিলেন। অরবিন্দ শুধু মুখে শরতের কাছে-কাছে বৃহৎ বৃহৎ করিরা বেড়াই, পান-মুপাড়ির প্রয়োজনে ঘন-ঘন বাড়ীর মধ্যে বাতায়ত করে, যাহিত্তে আহারাদির পর শরতের ঘরের বিছানায় থিরা শুইয়া পড়ে, —উহার আসিলে বলে, “আমি আমার ভারি সাধা করেছি, তোরা ওঘরে শুতে যা।” শরৎ বধুর উপর মাধ-ধরায় চিকিৎসা-ভার চাপাইয়া দিরা, মুখ টিপিরা হাসিতে-হাসিতে গরিরা যায়। কোরের বেশা কোন দিন সেই আলিরা ভাখিরা দেয়, কোন দিন বধু বা অরবিন্দ আসিরা উঠিরা পায়।

সহিত বর-বরল করে। তা এমন প্রায়-অসহ্যই ঘটিতে লাগিল। বিশেষ, এই বরম-ঐশ্বরের ব্যবহার রোগ-কি কখনও সারিতে চাবে? বরম দিনে-দিনে তুচ্ছপ্রাপ্ত হইয়া, এমন কি, সুযোগ বুজিলে—অকস্মাৎ বরম-কখন দিবা দ্বিশ্রবরেত, ইহার আক্রমণ ঘটিতে লাগিল। পিতা কোঠে চমিয়া বান, উষা মূল্য বায়, মাতা দিবাক্ষিত্রায় একটা বরে কোথায় হুগু থাকেন; আর জানিতে পারিলেও তিনি কখন এগব বিষয় চোখ দিয়া দেখেন না,—বরম মেঘের তৌকুকে মনে-মনে একটুখানি হাত করিয়া, নিজেদের এই বরলের কথাগুলি মরণ করেন। এমন দিন সকলেরই এক সময় আইসে,—তুখুই বে ইহাদেরই আদিমধ্যে তা নয়। এই বলিয়া অপরাধীদের কথা করিয়া যান। এমন করিয়া বে দিন কাটিতেছিল, সেই শ্রমালস-ভরা হুগের দিন অকস্মাৎ কি নির্ঘণ বেঘনায় আঘাতেই চুপের কাগজাঝিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

বীননাথ নিজের প্রতিক্রান্ত অলম্বনের মধ্যে ভর-মল-বারো গোণা দুষ্কায় বহুর গুণে পৌছিয়া উঠিতে পারে নাই। বিবাহের সময় বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতার আনন্দে নিজেরা খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, রূপার বান এবং বিবাহ-রাত্রির খাওয়া-পাওয়ার অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়া বেশিয়া, স্বর্ণকারটিকে এক পর্যা দিতে না পারায়, হুঁতিনখানি গহনা আসার করিতে পারেন নাই। বিবাহ-সভার সমস্ত বেনা-পাওয়া দুইইয়া দেওয়া হইল। বহুবলবায় হানী লোক, তিনি এ সকল ছোট বিষয়ের মধ্যে থাকিতে পারেন না। বাড়ীর প্রাচীন সরকার বিধুবায় মগব টাকা গনিয়া, এবং বহুর অঙ্গের অলম্বার ফর্দ সহিত মিলাইয়া দইতে। দিয়া দেখিল কণ, রতনচুড় এবং ধোপায় দিবার সোণার আটটি প্রোশাপতির অভাব ঘটিতেছে। কন্ডাকর্ডা মিনতি করিয়া জানাইলেন, উষা সেকরার এখনও দিতে পারে নাই, ফুলগায়ার সঙ্গে নিশ্চিত ঐ কন্ডটি বস্ত পৌছাইয়া দিব। বরফর্তা ছ চারিটি বিশিষ্ট বহুর সহিত সে সময়ে আশাপ করিতেছিলেন। বহু করটির মধ্যে একজন বিখ্যাত রিকরমার ছিলেন; 'বরপ' লম্বে তাঁহার মতটা বেশ হুবিবায়ত নয়। বিধুবায়ের বরফর্তা কাণে পৌড়িতেই তিনি কিছ গরম হইয়া উঠিয়া বহুর দিকে

দিকিরা করিলেন, "সে কি যে, এই না কনলায়, তুমি বিনা-পাণে ছেলের বে' মিতো?"

দুষ্কায় ভাবী বৈবাহিক এবং বিধুবায়ের উপর মনে-মনে অত্যধিক কষ্ট হইয়া, প্রকান্তে ক্রোধটাকে মনে রাখিয়াই, সভাতে উত্তর দিলেন, "দ্বিই নি কি? তা' না মিলে এই বাড়ীতে কি অরুকে নিয়ে আনয়া পা দিই?" বহুরের মধ্যে মধ্যাঙ্গাশালী সব করাই। বহুর মধ্যায়ের খাতিরে ভিন্ন এ বাড়ীতে ইহার পা দুইতেও আসেন না। একশে বাধ্য হইয়া আসিতে হওয়ার কন্ডাকর্ডার উপরে মন কাহারও বিশেষ ভাল ছিল না। ইহাদেরই একজন বহু মধ্যায়ের বাধ্য মরণ করিয়া তাই আশ্রয়ের সহিত নায় দিয়া উঠিলেন, "সে কথা আর তোমার কষ্ট করে বলতে হবে কেন কর? বায়ের-বায়ের কপালের মধ্যে দুটো চক্ষু আছে, তাই কি এটা দেখতে পাচ্ছে না? তাই সোণার চাপ ছেলে—মশটি হাজার টাকা। মগব গুণে দিয়ে মজাও-মুট গহনার খয়ের পা ঢেকে দিলেও, যে ছেলে লোকে পায় না, সেই ছেলের কি না ঐ একটা হাজার টাকাকে গণপণ বলতে হবে? আরকালের কান-খোঁড়া হোঁড়া-জলোও তো এর চেয়ে বেশী আনে!" অপর একটা কল্পলোক—ইহার একটা দৌছিকার সহিত এক সময় অরবিন্দের বিবাহের কথাবার্ত হয়;—দুষ্কায় বহুর ফর্দ মিলাইয়া আর-আর সমস্তই নিতে প্রস্তত ছিলেন, কেবল মগব পাঁচ হাজারটাকে তিন হাজারে নামাইয়া দিতে অহুরোপ করার কোঠিও কি অমিল বাহির হইয়া পড়িয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। ইনি এই প্রযোগে সেই কথাটি একটুখানি মরণ করাইয়া দিতে চাইলেন—"আমরা যে এই ছাপোষা মাহু, বেশী পারি, তবু নগমে গহনায় সাত-আট হাজারের কমেও তো মেয়ে সভায় কবুতে লম্বা বোধ করি। তবু কি আর সকল দিক থেকে অমন পাতরটি পেরেছি!" "আরে ছাঃ, এ কি আবার একটা বিয়ে! বোম্বা, পাশপাশায় মুক্তা ছড়ালে!" "তা বা বলা বা কও, মজুত দেখিয়েছে বটে! আকালকর দিনে এখন কে পারে বল যেখি? এ একটা এক্সাম্পল হলো।" "বর্ধা! বস্ত আপনি। মেরের কাছে এ মধ্যায় সবায় পৌছান উচিত। বেশী, বিতবাসী, বহুতাই আর সজীবনীতে এ সম্বন্ধে বর পাঠান উচিত।"

মুহুর্তের সময়ান্তে করিয়া উঠিলেন, “আরে হায় হায়, ওসব কর্কশ না! এতো সাধারণ কর্তব্য করছি,—এতে আর ‘মহাশূটা’ আবার এমনই কি দেখলেন!—”

“বলেন কি! মহাশু সেই!—চুপশুটা টাকার শোভাই শোকে ছাড়তে না পেয়ে গরীবের ভিটে বেচে দেয়,—মনীষের টাকা ভেঙ্গে কত লোক এই কতাবারে বেশ খেটেছে, অথবা অপমান এড়াবার জন্যে আত্মহত্যা করে হয়েছে। আর আপনি আপনার এই অগাধ টাকা,—কল্যাণের মত হুন্দর এ-এ পাশ করা ছেলে, এই দরিদ্র ঘরে বেছায় এসে বিয়ে দিচ্ছেন, এর চেয়ে আর—”

এই সময় বিকরমার বহুট আবার বসিয়া উঠিলেন—“কিন্তু ঐ যে গল্পটা হচ্ছে কি একটা কথা শুনিছিলেন না? বড়লোকের কাছে দশ হাজার ছেড়ে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ শুণে দিগে তেমন কোন ক্ষতি হয় না, বত এই ক্ষীণপ্রাণ গরীব গৃহস্থকে পেণব করার হয়।” “গরীব গরীবের মত থাকলেই পারে, তাদের উদ্ধারকাজ করে উচু চালের কল ধরতে যাবার দরকার কি?” “কায় না মাথ হয় যেসেট একটু ঘুবে থাকে? কতাপুত্রের সুশাসকালী মা-বাপকে অপরাধী মনে করতে পারিনে। বনীর মনে যদি বনাকাজ্ঞা বড়ই প্রবল পাকে, তাঁরই প্রথমাবস্থার দরিদ্রকে নিবৃত্ত করা উচিত। নতুবা সমস্ত হয়ে অভাগা লুপ্তকে আশ-বর্গে ভুণে ক্রমে-ক্রমে তার গলা টিপে ধরা—”

নতমুখ কতাবর্ত্ত গলবস্ত্রে আসিয়া কুণ্ঠিত অশ্রুভাষে জানাইলেন, “শর উপহত, অস্থির হইলে”—কথটা সমাধা হইতে না দিয়া মধ্যপথেই ভাবী বৈবাহিক মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বাধা দিলেন “বিলম্ব! অস্থিরতাই যদি না ঘেবে, তাহলে কি আমরা এখানে বন-ভোজন করতে এসেছি?”

সঙ্গে-সঙ্গেই বিবাক্ত তীরের মত আক্রোশ পরিপূর্ণ একটা তীক্ষ্ণবৃষ্টি—যে ব্যক্তি প্রাণ্ডও লভ্য কল লাভার্থ নিজের ধর্মতা সবেও উৎসাহ হইয়া উঠিয়াছে,—তাঁহারই প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। ইহার মধ্যে আর যে অর্থ নিহিত থাকে থাক, প্রীতির উৎস যে ভস্ময়া হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল না, সেটুকু বেশ বৃষ্টিতে পারা যায়। এমনি দশে-ভ্রমে পড়িয়া বন্দোবস্ত মেঘেরা বরণমালা তাহার নাগাল পাওয়ার অনেক উর্দ্ধে, বিখ্যাত বনাপুর কৃতাবর্ত্ত অরবিন্দের গলায় পৌছিয়াছিল।

তা পৌছিলে আর কি হইবে, মালা-গাথা হতাচার হয় ত বা তেমন মোর ছিল না; অথবা বৃষ্টি হতাই তাহাতে ছিল না,—বিনা হুতার মালা গলায় উঠিয়াই বসিয়া পড়িয়া গেল। শোকলজ্জারই বোধ করি অনিচ্ছুক বিরক্তিতে বহু মহাশয় বধু লইয়া ঘরে কিরিলেন; কিন্তু বাস্তবিকালে এবং ইহার পর হইতে সকল সময়েই তিনি বধু এবং তত্ত্ব দাতা পিতাকে শুনাইতে লাগিলেন যে, যে ছোট ঘর হইতে তিনি মেয়ে লইতে বাধা হইয়াছেন, সেখানে আর তাহাকে পাঠাইবেন না। মূলশকার তত্ত্ব আসিলে ঘরের বাহির হইতেই যে সকল দারবান, বেধর ও ডোমকে বাটিয়া দিয়া, কুই-বৃহের দাসী-চাকরগণকে শুধু ন চুতো ন ভবিষ্যতি গানি বকসিৎ করিয়া বিদায় বেগুয়া হইল। পাক-স্পর্শে বর্ধমানের অনেক গণমাস্ত ভ্রম ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দীক্ষিতের হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? সেই নোট পত্র ছোট-লোকটা কি তাঁহাদের মত, মেয়ের অল সোণা-হীয়ার মুদ্রা দিতে পারিযাছে? না মূলশকার তবে একশত জন দাসী-চাকর কুই-ব-বাড়ী পাঠাইয়াছিল? তা বাই দোষ, এমন করিয়া যে পংল সেই মুহুর্তের বর্ধে কনিয়া গহিল, তাহা তাঁহার কোন অপকার করিতে না পারিলেও, তাহার দুহুর্ধঃ উদারগণে ক্র-প্রাণ ব্যক্তিগণ লক্ষ্যভূত হইয়া উঠিতেছিল। পুন্ডার তত্ত্ব অবমানিত হইয়া কিরিয়া গেল। জানাইএর চাকর জানাইএর দুতী-চাবরটা কুই-বৃহের দাসীদের সাক্ষাতেই বর্ধশিখ লাভ করিল। বেদের সাড়িখানা শুধু মেদের কাছে পৌছিল। বাকী জিনিষপত্র গালির চোটে কেয় লইয়া, ধনীগৃহে ভাগরূপ পাওনার আশায় এতখানি পণ বাহিয়া আগত পাড়াপ্রতিবেশিদের এবং বাড়ীর দান-দাসীগণ বর্ধমানে কিরিয়া সিধা দুর্গাশুন্ডার উপর মনের ঝাল মিটাইয়া ছাড়িল। সকলেই একবাক্যে শূণ্য করিয়া বলিল যে, তেমন ছোটলোকের বেধম ঘরে তাহার আর একমু কখন পা দিবে না। তাহাওও চের-চের শুধু লইয়া গিয়াছে, এমন করিয়া কখন অপমানিত হয় নাই। অমুখ দায়গায় অমুখ বাবুর বাড়ী ছুটাকা করিয়া নগরের উপর আবার বহু বাড়ীর কড়া নিজে হাতে করিয়া পান খাইবার লজ পাচ টাকা বর্ধশিখ করিয়াছিলেন। অমুখ গায়ের অমুখ জমিদারের গহিণী নিজের হাতে লচি ভাজিয়া কাছে

গাড়াইয়া খাওয়াইয়াছিলেন ইত্যাদি। মনোরমার যেমন চামার-খণ্ড, গড় করি বাখা খণ্ডের পায়ে!

দুর্গাহুন্দরী কামিরা বসিলেন, “ওগো, ওরা ঘেরোটাকে আনার কতই না শাহানা করচে; তুমি বেঘন করে হহ, আঁধার মেয়ে এনে গাও।”

দীননাথ ইতঃপূর্বে কয়েকবার কড়া আনিবার চেষ্টা করিয়া সকল-প্রবর হইতে না পায়ার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পূর্বের পূর্বে বেশে আগার খবর পাইয়া বহুঃ হাফড়া গিয়া বেড়াইএর সহিত সাক্ষাৎসম্মত কথাবার্তা কহিয়া আসিয়াছেন। পহনার দানের বাকী আড়াই শতের মধ্যে দেড় শত টাকা লুপা করিয়া দিয়া মেয়েটিকে একবার বর্মান্নে গইয়া বাইবার স্তম্ভ অনেক বিনতি করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। ওকালতি কারো মক্কেলের নিকট করিয়া আদার করা বাঁধার নিত্যকার্য্য, এবং সেই সেই টাকার তেজারতিতে সুদের হ্রস্ব তাহার হ্রস্ব আদার করার বাঁধার একমাত্র আনন্দ, বিবাহের পর বছর খুঁটিতে বাট,—হ্রস্ব ও তত্ত তত্ত হ্রস্ব তো বহু দূরের কথা,—আসিলেই এখনও একশত টাকা বাকি রহিয়া গিয়াছে। তার পর এই এক বৎসরের বায়নাতে তের পার্শ্বের মধ্যে আঠারো-আনা ঋণ। মুক্কাহর বহুর মহাশয়ী কারবারে এত বড় কলঙ্ক তাঁহার শরতেও আর কখন খুঁজিয়া পাইবে না। তথাপি বহুকষ্টে প্রচণ্ড কোণোক্ষাণ্ডক দমনে রাখিয়া, অতি কষ্টে মুখে একটুখানি কঠিন হাসি টানিয়া আনিয়া, তিনি ঘণ্টে সঘনতাবেই বেড়াইকে বিদায় দিয়াছিলেন। নিজেও সেই লজ্জা-সুগা-পরিপূর্ণ ছোটখোঁকটাকে তাঁহার লোকমানে পরিপূর্ণ পূজাবাড়ীর বাহির হইয়া বাইতে বলেন নাই; আর মনে মনে অত্যন্ত কোতোদর হইতে থাকিলেও, চকচকে চাপরাস-মাগান নৃতন লাল-নীলের পোষাকপরা বারবানলকালে ডাকিয়াও বৈবাহিকের বিদায়-অভিনন্দনের জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। শুধু শাব, উদার বরে সংসার-নির্গম্ভ তাবেই এই লজ্জাবহু তিনি দিয়াছিলেন—“কি জান বেড়াই, আমি আর ওদের মধ্যে নেই। ছেলে এখন ডাঙ্গর হয়েছে, তার পছন্দেই বিয়ে দিয়েছি, বউ পাঠান তার মত নয়। আর গিরি বলেন, ছোটখের মেয়ে এনেছি, জ্বরীতি নেটেই দেখেনি—আমাদের ঘরে দেখে-তনে সব শিখে নিচ্। স্ত্রীমরা তো কবে আছি কবে নেই, এদব

ডালরকর না শিখলে কি পেবে মশের মাঝে অল্পর আদার সুখ হাসাবে! আমাদের এই বোসেদের খতা নামটা কম নয়! আর ক্রিয়াকর্মেও অল্প নেই! তা, গিরির তো এই মত। ছেলেও ঐ কথা বলে যে, ছপটাই বাহিরে থেকে দেখা যায়, শিকা-দীক্ষাটা তো আর বোঝা যায় না,—তা বাই লোক, বা হবার তাতো হয়েই গেছে, এখন একটু মাছুষ করে তো নিতে হবে।”

বেড়াই মাথা চুলকাইয়া আনতা-আনতা করিয়া লবাব দিলেন, “সেতো ঠিক কথাই বলেছেন, তাতে আর সম্বন্ধ কি? তবে যেহেতু মা একটাবার—আর তো নেই আমাদের—সেইজন্তেই—”

“ওহে, তুমি কিছুই বোঝ না। বোসেদের বাড়ীর বউ কখনও কষ্টে লাস রিম্বাট না করে টোপে ঢেঁকি। পার্শ্ব তেমন করে নিরে বেতে? আবার তেমন করে পৌছে দিয়েও বেতে হবে।” দীননাথ নগ্নকাল চূপ করিয়া থাকিয়া, গরে সুদূর করে কহিলেন “তাই হবে, কবে পাঠাবেন?”

“বলি অনেক টাকা হয়েছে যে দেখতে পাচ্ছি! তবে গরীবকে অনর্থক স্বীকৃত টাকাটা কাকি নেওয়া কেন? ঋণ শোখটা আগে করলেই ভাল হয় না?” হেটুখে

বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস অনেকক্ষণ পরে যখন বৈবাহিকের সুসজ্জিত বৈঠকবানার বাহিরে আসিয়া গাড়াইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিগাছে, কর্ণবাড়ীতে লোকজন ব্যস্তভাবে যোরাঘুরি করিতেছে; তাঁহার মত নগণ্য ব্যক্তির পানে কেব একবার কিরিয়াজ তাকাইল না। সেইক্ষণে বাড়ীর মধ্যে হইতে শাখিরা-ভাখিরা, চাবরে খুব দানী এসেদ মাখিয়া, পান চিখাইতে-চিখাইতে অরবিন্দ কোথার বেড়াইতে বাহির হইতেছিল,—খণ্ডরকে অকস্মাৎ সমুখে দেখিয়া ধমকিমা গাড়াইয়া পড়িল। সেই ঘোবনোৎসন্ন হ্রস্ব সুদের দিকে চাহিতেই দীননাথের স্তম্ভ চিত হইতে সমুদ্র কোভের জালা ছুড়াইয়া গড়ল হইয়া আসিল। যেহেতু কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন “ভাল আছে তো বাবা?” “হ্যাঁ” বলিয়া কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত গাড়াইয়া থাকিয়া, তারপর বারেক চারিদিকে চাহিয়া লইয়া, ধনীপুত্র অরবিন্দ গরীব খণ্ডরের পায়ে পোড়ার অতি সংক্ষেপে একটা প্রণাম করিয়াই, আর একবার এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে সন্ধ্যা পড়িল; যেন কি একটা অপরোক্ষক কার্য্যই করিয়া গেল, ঠিক

এমনই জাহাঙ্গানা প্রকাশ পাইল। দীননাথ একটা দুখীও নিঃশাস পরিত্যাগ করিয়া বিদায় হইলেন। কস্তুর সহিত লাক্ষ্য করিতে চাহিবার ভরসা হইল না।

একি দিবসের পর দিন দুর্গাহুজরী ঘেরে আবার ৩৩ কালাকালি শ্রুতগুণ বহুত করিয়া স্বামীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সকল বিষয়ে বুদ্ধিমতী হইলেও, এই একটা বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা সমস্তই যেন শোণ পাইতে বসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া কুটুংবের বাবশারে ও জামাতার নিঃসম্পর্কতার কস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার গুরু-ভাবনার আর আদি-অন্ত ছিল না। এই রকম কথাই বাহারা, তাহার কি গরীবের ঘেরে বলিয়া তাহারই লালন-পালনার কিছু বাকী রাখিবে? হয় ত পেট তরিকা তাহাকে বাইতেও দিবে না, অনেক স্বস্তিও বাপের বাড়ীর অপরাধে বন্ধু শুধু শুধু গালমন্দ করিয়াই নিরুত্তর হয় না, বউ কঁদিলে কিবা এতটুকু জবাব করিলে গাল টিপিয়া দেয়, গালে ঠোকা মারে, এমনি কতই খোয়ার করে তুলিতে পারেন। না জানি তাঁর মল্লটার কি অবস্থা হইয়াছে! গরীবের ঘরে জন্মিলেও চূপ কখনও তাহাকে সহিতে হয় নাই। হয় ত ভাবিয়া, কাদিয়া, না খাইয়া তাঁহার সেই সোপার প্রতিমা কালি মাড়িয়া গিয়াছে। হয় ত অকস্মাৎ একদিন শুনা গাইবে, অন্যদরে, অন্যত্র মনোরমার কটিন পড়িয়া হইয়াছে এবং তার পর হয় ত—উঃ ভগবান! এই জন্তই কি তিনি সর্বত্র খোয়াইয়া বড়ঘরে ঘেরে বিরাহিলেন? এমন কুমতি তাঁহার কেনই বা হইয়াছিল! সমাবস্থা গরীবের ঘরের ভাল একটা পার সেবিয়া ঘেরে দিলে তো আর মেয়েটী তাঁহার এমন করিয়া বড়লোকের লাখি-কাটা বাইরা মনের চূপে ঢুকাইয়া মরিয়া যায় ত না!—বাই, বাউ, এ কি করিতেছি? কি মহাপাপী মন এই অচাণী মায়ের? মল্ল-কামনাও এমন করিয়া কেন করিতে জানে না, আবার অমঙ্গল চিত্তার উদ্বিগ্ন এমন আর কোথাও হয় না।

ইতোমধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটিল, এ পর্যন্ত যা কখনও ঘটে নাই। অরবিন্দ এবার পতাকার ফেল করিয়া বলিল। মাতা: সুখানি জান করিয়া বলিলেন, “বউমার আবার আর-পর তো ভেদম ভাল সেবিবে বাহু! সেই ইচ্ছা থেকে অল্প আবার কখনো পড়ে থাকে দি।”

পিতা অসুস্থিতি করিয়া বাঁকীর মধ্যে আসিয়া গৃহীককে

উদ্দেশ্য করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন “দূর করে লাও এই হতচ্ছাকা বীহমিত্তিরের লক্ষীছাকা! মেয়েটাকে। ছোটলোকের ঘরের ঘেরে ঘেরে আনলে বড় খরচ ছোট হয়ে যায়। ও যেট বেদিন আবার ঘরে ঢুকেছে, সেইদিনই আদি-জানিতে পেরেছি, যে এ বাড়ীর আর ভরস্ব নেই। গিণেবের অমন কোরালা কেনটা মাতা হয়ে গ্যাল,—আল আবার ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সকাল পর ছাদের শিঁড়ির ঘরে পরতের দোতায় লাক্ষ্য ঘটিল মনোরমা স্বামীর জান মুখের পানে চকিত কটাকে চাহিয়াই কাঁদিয়া বেলিল। অরবিন্দের নিজের মনটা কীভাবে সর্বপ্রথম এই অকৃতকার্যতার প্রথম ধাক্কা খাইয়াছিল; কিন্তু মনোরমার গোপের জলে তাহার নিজের বাথা, লক্ষ্য মুহূর্তে বিস্মৃত হইল; তখন সে সেই বিদায়-প্রতিম খানি হস্তে বন্ধে টানিয়া শইরা, চোখদুটী মুছাইবার চেষ্টা করিয়া পাশনা বঁধা বলিল, “কীমা কেন মনো, ফেল কি কেউ হয় না? এবার না হলো, আগছে বায়ে ভাল করে চেষ্টা করো; হয়ে বাবে কি না।”

মনোরমার কার্য ইহাতে বাধা মানিল না; বরং এগ্রি-হির দুস্তাধারার দ্বার ভ্রম ও ভুল অস্বপ্নিত তাঁহার পরিপুষ্ট উজ্জল দুটি গুণ বাহিয়া করিতেই থাকিল। যোহনে জ্বলিতে-জ্বলিতে তরকটে সে বলিল, “আবার জ্বলেই এই হলো।” “তোমার জ্বলে?” অতিকটে বাড়ি বাড়ি সে জানাইল যে, ইয়া তাহার জ্বলেই বটে। অরবিন্দ যোহ বিদয়ের ভান করিয়া বলিল, “বটে, তা তো জানতাম না। তুমিই কি তা’হলে এবারকার কচেন তৈরি করেছিলে? না, পেপার একজামিন কর্তার লম্বা আবার মাথা খেয়ে অমন বিদ্য ভুল করে ফেলেছে! অথবা আবার কছে জুই লম্বাটী রূপে তার করে আবার নিয়ে ভুল আনুগার করিয়ে? কি করেই সেইটে তাকে যেনো সেবি।”

কাস্তুর মধ্যে কিছু করিয়া হাসিয়া বেলিয়া, স্বামীর সুকর মধ্যে সেই হাসি-মাথা মুখ লুকাইয়া, আঁপুটে কহিল, “বাও, তা কেন; আমি যে অপরা। যদি তুমি আমার বিয়ে না করত—”

“তাহলে আর কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে আমার লক্ষীটি লাভ হতো, না মহ, যে আমার দত্ত কেল করে মরেনি।”

হাসি এবং কান্না এ দুইই বিস্মৃত হইয়া যোহ লজ্জার

আকর্ণ-লগাট আরক্ত হইয়া উঠিয়া, অরবিন্দের এই বিপদ।
বৃষ্টি তাহারই কোলের মধ্যে অলসায় ভাবে নিম্নেক
স্টাইয়া দিয়া, চুই হাতে তাহারে চাপিয়া ধরিল। লজ্জার
ভাঙনার সবেগে তাহার মুখ নিম্না বাহির হইয়া গেল “ছি,
ছি! কি বেতুনি যা তা সব কথা বলো!” অল্প স্টাইরি
হাসি হাসিতে-হাসিতে সেই সরস-রাগ-সুন্দর প্রিয় মুখখানি
গ্রন্থাতে তুলিয়া ধরিয়া, গভীর দৃষ্টিতে সেই মুখে চাহিয়া,
লজ্জিতকে অধিকতর লজ্জা দিয়া কহিল, “তুমিই তো বল
যে আমি যদি তোমার বিয়ে না করতুম, তাহলে কি যে সব
তাল তাল ব্যাপার ঘটতো! তা আমি বিয়ে না করলেও
তো আর তুমি চিরদিনই কিছু আইবুড় হয়ে থাকতে না।
তোমার সঙ্গে আর একজনের বিয়ে তো হতোই!” এমন
অভাষ কথা শুনিতে কাহার সহ্য হয়? স্বামীর হাত হইতে
মুখখানা ছিনাইয়া লইয়া, সবলে উঠিয়া বসিয়া বহু উত্তর
করিল, “তা কি কখন হ’তে পারে? তোমার বা বিয়ে!”
“ঐ ঈশ্বরে তো আমার ফেল করে দিয়েছে। বিয়ে থাকলে
কেউ কখন ফেল হয়? তাহা কি হতে পারে না? আমি
তোমার দেখতে গিয়ে লুটে না নিলে, এখানে তোমার বর

চুটো না? এ হৃদিত্ব বসবেশে আমি ছাড়া লজ্জী আর
কি একটাও ছিল না? হ্যাঁ রে মহাশয়!” স্বামীর আদরে
পলিষ্টা পড়িয়া সেই ক্ষুর পানীর সহিত উপমিতা আহরিণীটি
হাসিতে হাসিতে তখন কত কথাই কহিয়া গেল। অরবিন্দ
ভিন্ন তাহার যে অপর কাহারও সহিত বিবাহ হওয়া সম্ভবই
ছিল না। সেই সব দার্শনিক মহাত্ম্য সে অনেক দূরে
বিস্মরণ করিয়া একালের অর্ধ নাস্তিক, পাশ্চাত্য বিদ্যার
সুপণ্ডিত স্বামীকে বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা-বহ্ন করিল।
স্বামীটি সে সব ভয়ঙ্করতার সহিত সারিষ্টে নিগূঢ় ভাব
বিশ্বাস করিলেন কি না তাহা তাহার কোতুক-হাত-মণ্ডিত
আনন্দোচ্ছল মুখখানি হইতে ঠিক আন্দাজ করিয়া উঠা
যায় না। তবে ইহঁতারা গুরুবাক্যে এবং বেদের বচনে
সুপণ্ডিত অশ্রদ্ধা দেখাইতে কৃষ্ণাধ্বা না করিলেও, হুগুদী
এবং ভরুদীসের মুখের বাণী সশ্রদ্ধ চিত্তে মাথায় করিয়া
লইয়া থাকেন, এটা জানা কথা। মনে-মনে অবিশ্বাস
মাগিলেও সে অগ্রিয় সত্তা প্রকাশে প্রিয়চিত্তে বেদনা
ধান করিতে বাধ্যত হন।

সাহিত্য *

[প্রিন্সেস প্রকৃত লাহা এম-এ]

আজ এই বস্তুরতা, বাস্তবতা, mysticism এবং art
for art's sake এর দিনে উত্তর পক্ষের ওকালতীর প্রতি
সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্যের
আলোচনা অসাধ্য না হউক, দুঃখা তা বটেই।
পদালাচনের কোলাহলে বহু-বাণীর বীণার তান ডুবিয়া
গেল, তবুও ঘন মিটল না। উদ্বেগ অসিদ্ধা লগুড় হস্তে
আনন্দের পশাড়াবন করিল, কিন্তু অসীমের মধ্যে আনন্দ
এমনই নিরুদ্দেশ-বাত্ম্য বাহির হইয়া পড়িল যে, অশ্রুত
অবেশে এখনও তাহার সন্ধান মিলিল না। কাকের
পিছনে সোঁড়াইতে রাজী আছি, কিন্তু কানের দিকে
চাইবার অবলম্ব নাই। স্বাধোচনার ‘না’ আদ্যের
আহুণ করিয়া তুলিল, কিন্তু সাহিত্যের অনবিরহিত নীরব

প্রতিবাহ আদ্যের অস্তরের কর্ণে প্রবেশপাত করিল না।
সত্তা এবং কল্পনা, ছাড়া এবং আলো, মাত্রা এবং বস্তু,
কৌশল এবং স্বভাব, বাস্তব এবং আদর্শ একের সহিত
অন্ত্রে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া গেছে যে, কোনও সাহিত্য-
রচনার ইচ্ছার একটিকে অবিশিষ্টাভাবে আজ পর্যন্ত পাওয়া
গেল না। চণ্ডীদাস জরদেব, গেটে শেলী, হুগো হাইন
হইতে বর্তমান বাঙ্গালার কবি পর্যন্ত কেহই এই নিরসের
ব্যতিক্রম-স্থল নহে।

ইংরাজীতে classicism এবং romanticism এর
বিশ্বব্যাপী যাদু আর্গণ্ডের মধ্যে নিবৃত্তিলাভ করিতে না
করিতে, realism এবং idealism এর তুণ্ড গুরু-
কোণাল পাশ্চাত্য-সাহিত্য অলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।
আজ তাহারি প্রতিধ্বনি বাঙ্গালার দালিক পদগুলি গৃহে

গৃহে প্রচার করিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের অঙ্গুদ্রণ করিয়া বাঙ্গাল্যে উদ্ভিষ্ট হইলে বলিয়াই কি এই তরু উপেক্ষণীয়? তাহা হইলে ত ভারমণি হইতে আশ্রয়ানি বলিয়া romanticism অর্থাৎ স্বভাব-ও-বিষয়বাহ ইংরাজী হইতে বহু পূর্বেই অর্ন্তস্ত্রে প্রাপ্ত হইত; এবং বাস্তববাহ করানী নভেল প্রথম অঙ্গগ্রহণ করে বলিয়া Russiaর Tolstoy এবং Norwayর Ibsen তাহাকে ‘ঠাই নাই, ঠাই নাই’—বলিয়া দ্বারদেশে হইতেই বিতাড়িত করিয়া দিত! বাস্তব ও আশ্রয়বাহের বাঙ্গালার আলোচনাকে পাশ্চাত্য তরুর প্রতিক্রিয়ায় না বলিয়া পুনর্জিহবার বলাই হয় ত সম্ভব। তাহা না হইলে নব অঙ্গ-ও-দর্শন হইতে Transcendentalism বা অস্তি-লোকবাহ আদ্রণ করিয়া ইংরাজি সাহিত্য উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া Coleridge এবং Carlyle-এর উপর অপহারকে অপবাদ দিতে হয়।

কিন্তু আমি এ কি বলিতেছি? সাহিত্যের প্রকৃতি এবং লক্ষণের কাহিনীর অবতারণা করিতে সাহিত্যের অঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেই বে বলিয়া গেলাম। কাব্য ও উপক্ৰম লইয়াই ত কেবল সাহিত্য নয়। নানা বিভাগ ও বৈচিত্র্যকে আচ্ছাদ্য করিয়া এক বিরাট বিশ্ব-সাহিত্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আর্থী এবং অনার্থী, প্রাচীন এবং নবীন, সত্য এবং বর্জিত, নারী এবং পুরুষ সকলেই এক ‘মানব’-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাগদের সমস্ত বিবেক এবং বৈবক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্টিয়া উঠে যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য, সে তাহাদের মানবতা। অতীত এবং বর্তমান, পরিণত এবং অপরিশ্রুত, স্বদেশী এবং বিদেশী, কাব্য এবং গল্প, প্রবন্ধ এবং সমালোচনা প্রকৃতি নানা রচনার ভিতর দিয়াও তেমনিই একটি বৈশিষ্ট্য, একটি একক প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই বিশেষ স্বভাবটি থাকে বলিয়াই আমরা সেই রচনা-সমষ্টিকে সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করি। গোষ্ঠীপন্থের পাটীগণিত বা অগণনীয় যাকরণকে আমরা সাহিত্যের বলে আদান দিই না; কিন্তু বহিঃকল্পের ‘পদার্থ’ বা বাহ্যিকবস্তুর ‘প্রকৃতি’কে সাহিত্যের অন্তর্গত না করিয়াও থাকিতে পারি না; কিন্তু শেষ ছইয়ানি গ্রহ যে প্রকৃত সাহিত্য, তাহাও নয়।

সাহিত্য ও ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সীমাবোধটি কোথায়, তাহা অনেক

সময় ধরা ধার না—কেন না বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস সমস্তই সাহিত্যের উপাদানীভূত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণি-পদার্থই হউক আর উদ্ভিদ-পদার্থই হউক, মানুষ যেমন সমস্ত আহার্য্য জীর্ণ করিয়া আপনার শোণিতের সঙ্গে মিশাইয়া দেহ, সাহিত্যও তেমনি সমস্ত উপাদান পরিপূর্ণ-রূপে আচ্ছাদ্য করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠে। বিজ্ঞান এবং দর্শন এবং ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব—আপনারেই বিশেষত্ব হারাইয়া সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

তাই ত সাহিত্যের উপর প্রাণবর্ধের আয়োগ করিতে হয়। ব’হুর মত অন্ধ এবং বহুর মত জীবনহীন হইলে, সাহিত্য ত কিছুকে কোনরূপে আপনার নিমগ্ন করিয়া লইতে পারিত না। কলের ভিতর ইট কেলিয়া দিলে শুঁড়া হইয়া স্তব্ধ হইয়া যায়; কিন্তু উত্তরের ভিতর গজা কেলিয়া দিলে, পাকবয় নিঃশেষে তাহাকে পরিপাক করিয়া ফেলে। ইটের শুঁড়ার মত, গজার শুঁড়া স্তব্ধ হইয়া পাকা হিহের মস্ত অঙ্গেক্ষা করে না; শরীর-বস্তুর সহিত তাহা একীভূত হইয়া বাহ। এই একীভূতের সমতার মধ্যেই প্রাণবর্ধের পরিচয়। আবার মানুষের যেমন অঙ্গ আছে, বুদ্ধি আছে, বাক্ত্য আছে—সাহিত্যও তেমনি অঙ্গ গ্রহণ করে, পরিণত হয় এবং প্রাচীন হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়া সেবিলেও সাহিত্যের উপর জীবন-বর্ধের আয়োগ করা যায়। আর একদিক দিয়া সেবিলে, সাহিত্য কেবল জীবের মত, মানুষের মত নয়, সমাজের মতও বাটে। সমাজের মত সাহিত্যও মরে না। চতুর্দিকের সূত্রার মধ্য দিয়া সাহিত্য অমর হইয়া আছে। অতএব সাহিত্যকে প্রাণবর্ধী বলিলে অগ্রাহ্য বলা হয় না।

সাহিত্য জীবনের বলে চির-চকল। কিন্তু সেই প্রাণ-শক্তির উৎস কোথায়? ঋণশস্যের স্নাকসের প্রাণ থাকিত; দক্ষিণপুরুষের ছইডুব ধানের নীচে শিশুর কৌটার ভিতর যে চির-চকল জ্বর আছে তাহারই মধ্যে। সাহিত্য-সেবতার প্রাণও তেমনি গোপনে লুকানো থাকে—মানব-দমের অন্তঃস্থলে। মানুষের কাছে, মানুষের সংস্রবেই সাহিত্য প্রাণবন্ত। লোহা চূষকের কাছেই চকল হয়; সাহিত্যের প্রাণের সাঁড়ান পাতলা যায় তেমনি মানুষের মনের কাছে; সাহিত্য ও মানবজীবনের মধ্যে এমনই একটি গভীর অচ্ছেদ্য এবং নিগূঢ় সংযোগ আছে।

বিজ্ঞান বা দর্শন একজন নিউটন, একজন ল্যাস, একজন সাধবার্চাণী, একজন বার্নার্স বা তাহারদের সহস্র অথবা লক্ষ শিষ্যের স্নোহরণ করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে আপনা হইতেই সৰ্ব সাধারণের খ্রীতি আকর্ষণ করে।

মাহুৎ সন্ধ্যক, সামাজিক জীব। একেলা সে বাচিতে পারে না। কেবল বিশ্বের চিত্তার মধ্যে জুঝিয়াও সে থাকিতে পারে না। বতই সে বার্ষণের হটক, পরকে ভাল তাহাকে বাসিতেই হইবে, পরের সংস্রবে তাহাকে আশিতেই হইবে। সে যদি বনেও চলিয়া যায়, তবুও বৃণ-বৃণারহের সঙ্কিত পূর্ণপূর্ণবের চিত্তামাশির দার-তার প্রত্যাপান করিবার সাধ্য তাহার নাই। অথচ পরকে পর বলিয়াই সে জাঝিতে হয় তাহা নয়। পরের মধ্যে সে নিজেকে প্রত্যাক করে, নিজের মধ্যে সে পরকে অস্বতব করে বলিয়াই পর তাহার চিত্তার মধ্যে আপন হইয়া যায়। অস্বতব করে বলিয়াই কবির মুখে তনিতে পাই—

“পর কৈহু আপন, আপন কৈহু পর—

বর কৈহু বাহির, বাহির কৈহু বর।”

মাহুতের সখিত মাহুতের সগাহকৃতি আছেই। এই সগাহকৃতি বতই গভীর এবং বাগব হইয়া পড়ে, মাহুতের ততই উবুচ্ছ হইয়া উঠে। এই সগাহকৃতির বিবর আনি, জুনি এবং সকলেই। অর্থাৎ মানব-জীবনেই মানবের সাধারণ অস্বত্বতির বস্ত।

যেখানে জীবনের সম্পর্ক, মাহুতের চিত্তা সেখানে দিয়াই উপস্থিত হয়। অথচ এই ভাবনা যে দুঃখের কারণ, তাহাও নয়। মানব-জীবনের আলোচনার মাহুতের একটা অকারণ আনন্দ আছে। এই অধেতুক আনন্দ হইতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।

জীবনের সম্পর্ক আছে বলিয়াই সাহিত্য আমাদের আশয়ের বস্ত। জীবন-ধর্ম-বিবৃত হইলে এধ ধর্মপাত্র হইতে পারে, দর্শন হইতে পারে, বিজ্ঞান হইতে পারে; সাহিত্য হয় না। যে এধে বতটা বিবৃত এবং বতটা গভীর জীবনের আলোচনা পাওয়া যায়, সে প্রেত ততটা পরিমাণে সাহিত্য। সিদ্ধান্তের স্কন্ধিত শম্মকে তুলিয়া লইয়া কাণের পাশে ধরিলে যেমন তাহার মধ্য হইতে সমুদ্রের অশ্রান্ত সসীত তনিতে পাওয়া যায়, সাহিত্যের মধ্য দিয়াও তেমন আদর্শ চিরদিন ধরিয়া অনন্ত জীবনের কলো

তনিতে পাই। চতীধাসের পদাবলী, কবিকঙ্কণের চতী, মধুসূদনের কাব্য, বক্রিমের উপাস্তাস, কাবীপ্রদয়ের প্রবন্ধ—সকলের মধ্যেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই জীবন-সসীত বাসিতেছে বলিয়াই ইহার সাহিত্য। ধানচালের হিসাব, পাটের দর, জমিদারীর জমাখরচ, ম্যাসেরিয়া নিবারণের উপায়, এবং মশা মাঝিবার কোলদ, হামার দ্রুতভাবে শিথিত হইলেও—কখনও সাহিত্য হইয়া উঠিবে না।

সাহিত্য গভীরা করিবার আর একটি উপায় আছে। আকাশের চাঁদকে দুইরকম করিয়া দেখিতে পারা যায়। এক বিচারের ভিতর দিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া, গভীরা করিয়া, স্কন্ধিত পূর্ববীক্ষণ লাগাইয়া; আর এক আনন্দের ভাল-লাগা মন-লাগা আনন্দের আবেগ, আনন্দের আনন্দ, আনন্দের বেদনা দিয়া। এক দিকে কার্য করিতেছে আনন্দের মস্তিষ্ক, আর একদিকে কার্য করিতেছে আনন্দের জগৎ। যেখানেই তাবাবেগ হইতে বিজিন্ন—কেবল প্রজ্ঞা মাত্রেয় আধিপত্য, সেইখানেই বিজ্ঞান; এবং আনন্দের জগতের তেও চিত্তা যেখানেই রতীত হইয়া উঠিয়াছে—সেই-খানেই সাহিত্য। অতএব এই মানব-জগত সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। সংসারের মধ্যে যেমন, সাহিত্যের মধ্যেও তেমনই আনন্দ মানব-জগতের পরিচয় পাই। কিন্তু সংসারের মধ্যে যে পরিচয়, তাহা আর্থিক পরিচয়, অসম্পূর্ণ পরিচয়, হয় ত বা ত্রাস্ত অথবা একদেশদর্শীর পরিচয়। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে যে পরিচয়, তাহা বাবসারের নয়, কর্তব্যের নয়, অশয়ের নয়, তাহা সমগ্র জগতের আনন্দপূর্ণ পরিচয়। মানব-জগতের গভীরতম প্রবেশে যে তাবদ্যাপি জগতবিশেষের রহস্যশির মত নিভাতই মননের অন্তরালে অনাবিকাল হইত বিদ্যায় করিতেছে, সাহিত্যের মধ্যে সম্ভা আদর্শ সেই নিভূত-দ্বারী অপূর্ণ তাবপুঞ্জের সাক্ষাৎ লাভ করি। ইহাই ত সাহিত্যের গৌরব!

কিন্তু এইরূপ অবজিন্ন ভাবে যেখিল ত সাহিত্যের সম্পূর্ণ তাবপর্ণ্য আদর্শ জগতরম করিতে পারি না। সাহিত্য ত আকাশ হইতেও পড়ে না, সাহেব মতও গমায় না। মাহুতের সঙ্গে-সঙ্গেই সে পৃথিবীতে জুটিত হয় নাই। সভ্যতার প্রথম আবির্ভাবে তাহার জন্ম হইয়াছে; এবং মানবের অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেও ক্রমে-ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। হয় ত বা সমস্ত কলা, সমস্ত আর্টের মত

সাহিত্যও মানুষের মূগ্ধ চেতনার ভিতর নিহিত ছিল। আত্মিক বিকাশের সুখে-সুখে সাহিত্যও ক্রমে ক্রমে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলে ত সাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলা হইল না। এই art-consciousness বিশেষ বেশ, বিশেষ জাতি, বিশেষ কাল, এবং বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইতেছে। সাহিত্য সাধারণের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং আবেগ হইতে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। কখনো কাব্য, কখনো ক্যান্টিনী, কখনো নাট্য, কখনো উপজ্ঞাসরূপে যুগে-যুগে সাহিত্য বিশেষ প্রতিভার মধ্য দিয়া বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এক দিক দিয়া মানুষ স্বার্থপর, আর এক দিক দিয়া মানুষ পরার্থপর। এক পক্ষে মানুষ নিজের কথা বলিতে চায়, আর একপক্ষে মানুষ পরের কথা ভাবিতে চায়। এক দিক দিয়া সে নিরন্তর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য উদ্বুগ্ন, আর এক দিক দিয়া সে সর্বদা অপরের অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভের জন্য উদ্বিগ্ন। অথচ এইজন্য মানুষকে স্বার্থপর অথবা পরার্থপর বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয়। মানুষ আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করে, এবং অন্তরের কথার মধ্যে আত্ম উপলব্ধি করে বলিয়াই পরের কথা শুনে। কোকিল যেমন আপনার আনন্দে গায়িতা চলে, সাহিত্য-শ্রষ্টাও তেমনি আপনার আনন্দে আপনাকে ব্যক্ত করে। কিন্তু কবির সেই আত্ম-প্রকাশ সাহিত্য হইত না, যদি না তাহার মধ্যে পাঠক আপনার মনোভাবের সাড়া পাইত। সাহিত্য কবির ভাবাবেগের ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়ব্যবধিকে উদ্ভূত করিয়া তুলে। ধরা থাকে কালিদাসের 'মেঘদূত'।

কতকগুলি ভাব আছে, তাহা মানুষের মধ্যে সাধারণ। সেই ভাবগুলি সাধারণ মানুষের মনে স্থায় ভাবেই থাকিয়াই যায়। প্রিয়ের বিরহ এমনি একটা ভাব। ইহা সকলেরই মনে ছিল এবং আছে। কিন্তু বলিদান এই স্থায় ভাবের মধ্যে আবেগ আনিয়া দিলেন। এই ভাব চকল হইয়া, জীবন্ত হইয়া কবির মন হইতে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া গেল; এবং পাঠক কবির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

তাং ভানীথাঃ পরমিত কথং জীবিতং যে ভীত্যাঃ
দুহীভূতে বরি সহচরে চক্রবাকী মিথৈকাদ্য।

গাঢ়োৎকর্ষাৎ স্তম্ভং দিবসোৎসবং সজ্জনং বাসং
মাতং মন্তে শিশির-মখিতাং পদ্মিনীং

বাসান্তপাদ্যং।

কবির হৃদয়ের এই গতি এবং তাৎ-প্রাণবন্ত যুগ্ম-যুগ্মভাব ধরিয়া পাঠকের হৃদয়ে আবেগ সঞ্চার করিয়া আসিতেছে; এবং পাঠকের আবেগের ভিতর দিয়া কবির-প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রতি বর্ণার বিরহ-বেদনার আবেগময় হইয়া উঠিতেছে।

অথবা ধরা থাকে Shelley's Epipsychidion. স্নানভ্রম এবং কলাপনভয়ের জন্য যে আতঙ্ক, তাহা আশ্বাসের মনের স্থায়ী ভাব। এই ভাব সাধারণের মনে সঞ্চিত হইয়া হৃৎক মত পড়িয়া আছে। শৈলীর আবেগ এই ভাবের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করিয়া দিল; এবং কবি হইতে পাঠকের হৃদয়ে সেই চেতনা বিজ্ঞাতের মত প্রবলিত হইয়া গেল।

পাঠকও কবির সহিত গাহিতে লাগিলেন,
Spouse ! Sister ! Angel ! Pilot of the Fate
Whose course has been so starless !

O too late

Beloved ! O too soon adored by me !
এবং মানসীর সহিত কল্পনার একত্ব অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

One hope within two wills, one will beneath
Two over-shadowing minds, one life ;
one death,

One heaven, one hell, one immortality,
And one annihilation.

আমরা যে উপহাসন দিয়াছি তাহা কাব্য হইতে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথা-সাহিত্যের অভ্যস্ত অঙ্গ সম্বন্ধে খাটিবে না, তাহা নহে।

ধরা থাকে কবির 'কপালকণ্ঠল'। ইহার মধ্যেও একটা প্রাণ ভাব আছে,—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অভ্যস্ত আত্মব্যক্তি ভাব তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। সে ভাবটি হইতেছে—প্রেম ও বৈরাগ্য, সংসার ও মৃত্যু, আতঙ্ক ও ভাবের সম্বন্ধ নির্ণয়। প্রেম, সংসার ও আতঙ্ক। দুই হইয়া উঠিয়াছে পুরুষ। সে পুরুষ নবযুগের। ত্যাপ, প্রকৃতি এবং বৈরাগ্য সৃষ্টি ধরিয়াছে নাড়াতে। সে নারী

কপালকুণ্ডলা। একটা হাত ভাব নবকুমার এবং কপাল-কুণ্ডলার সম্বন্ধের মধ্যে আশোষিত হয়েতেছে। এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই, অথচ আর একটু হইলেই যেন ইহা নির্দোষ হইয়া যায়। এই ভাবটির মধ্যে কবি যে অস্থিরতা, যে উবেগ দিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিন ধরিয়া পাঠকের হৃদয়বোণ উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিবে।

অথবা দেখা যাক Shakespeareর Hamlet. Hamletএর মধ্যে Shakespeare আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন—এই কথা বলিবার পূর্বে দেখা যাক, Shakespeare আপনায় মনের কোন্ ভাবটি জীবন্ত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। এক দিকে কর্তব্য, আর এক দিকে চিন্তা, এক দিকে নিশ্চিত, এক দিকে অনিশ্চিত, এক দিকে কার্য, আর এক দিকে আত্মসন্ধান, এক দিকে সাধনা, এক দিকে সন্দেহ, এক দিকে চেষ্টা, আর এক দিকে অসমতা,—এই বিধার মধ্য দিয়া ট্রাজিক ভাবটি কৃষ্টিয়া উঠিয়াছে—নিভা-নৃতন অথচ চির-পুরাতন কবির সেই ভাবটাই নানা অর্থ, নানা আলোচনা, এবং নানা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া সপুষ্প শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত পাঠকের হৃদয়কে ব্যয়ব্যয় আশোষিত করিয়া ফুলিতেছে। অথচ এই ভাবের গতি আজও শেষ হয় নাই। বতই দিন বাইতেছে, শুভই এই গতির বেগ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অতএব ইহাই সত্য যে, সাহিত্য কবি ও পাঠকের মধ্যে একটা জীবন্ত যোগ সাধন করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা বলিলেও, সাহিত্যে যে কবি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, এ কথা বলা হইল না। তাহা বুঝাইতে হইলে আরও কিছু বলিতে হয়।

যেখানে গিয়াছে—সাহিত্যে জীবনের স্পর্শ আছে। সে স্পর্শ কিরূপ, তাহাও কিছু বলা গিয়াছে। সাহিত্য যে মানব-জীবনের আলোচনা—এ কথা বলিলে ভুল বলা হয় না; এবং সাহিত্যেই যে জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও সত্য। অতএব এক দিক দিয়া সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি, এবং আর এক দিক দিয়া সাহিত্য জীবনের আলোচনা; এবং সাহিত্যে মানব-জীবনের আলোচনা চলে বলিয়া, সাহিত্যেই জীবন-সমস্যার মীমাংসা

পাওয়া যায়। অতএব, সাহিত্যকে জীবনের ব্যাখ্যাও বলা চলে।

কিন্তু যে-কোনও সাহিত্য-গ্রন্থ পুঁজিলেই দেখিতে পাই এই যে, জীবনকে প্রকাশ করিবার দরপত্র এক রকম নহে, এবং ইহার ব্যাখ্যাও একটা নহে। বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্ন প্রকারে জীবনের আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মীমাংসার আদিয়া পৌছিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্যে এই বিভিন্নতা, এই বিভিন্নতা কবিরের ব্যক্তির বা স্বভাবের বিশেষত্বের ফল। রূপা-কৃষ্ণের চিত্রের প্রেমদীপা—বিজ্ঞাপতিও গায়িয়াছেন, চণ্ডীদাসও গায়িয়াছেন। অথচ উভয়ের গানে কত প্রভেদ।

যে-কোনও গ্রন্থ জীবনের প্রতি রচয়িতার বিশেষ ধারণার আলোকে অন্বেষিত। প্রতিভার ধারণা সাধারণের ধারণা হইতে অন্তরতর এবং সত্যতর। এই ধারণা বতই সত্যতর হইবে, ধারণার আলোকও ততই স্পষ্টতর হইবে; আলোক বতই স্পষ্টতর হইবে, অন্বেষণ ততই প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিবে। সেট মন্ত প্রতিভাশালী সাহিত্য-রচনার মধ্যে তাহার ব্যক্তির স্পষ্টতর, প্রগাঢ়তর ভাবে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। কিন্তু কি করিয়া এইজন্য হয়?

কবির ভিতরে এক আত্মপূর্ব বিরোধ করিতেছে এবং বাহিরে এক বিধ পড়িয়া আছে। এই বাহিরের বিধ গ্রাণে ও প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন। কবির আত্মা বাহিরের মানব-জীবন এবং প্রকৃতিতে সঙ্গী করিয়া কখনো এক ভাবে, এবং কখনো বিচ্ছিন্ন করিয়া বহু ভাবে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির পাকড়ার উপর সাহিত্যের গভীরতা নির্ভর করে। যাহাই হউক, যে কথা বলিতে বাইতে-ছিলাম, তাহা এই।—কবির আত্মার সহিত বাহিরের সন্ধার মিলনে একটা হর্ষের যিহোলা পড়িয়া যায়। সেই আনন্দের মুহূর্তে সাহিত্যের জন্ম। সাহিত্য সেই আনন্দের দূর্ত প্রকাশ।

বাহির প্রতি মুহূর্তেই অন্তরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং অন্তর প্রতি মুহূর্তেই বাহিরকে গ্রহণ করিতেছে। সঙ্কলের মধ্যেই এই মিলনের আত্মল চেষ্টা অরহঃ চলিতেছে। সাধারণ মানুষ স্বপ্নের মত এই অমুভূতির সাদা পায়। কিন্তু এই উৎকর্ষা সচেতন ভাবে অমুভব করে বলিয়াই কবির অন্তর এক অমুভূতি-প্রবণ। কবির

অন্তঃশক্তি বাহিরের সবার উপর সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে আকৃতি প্রদান করে, কবির প্রকৃতির 'ছাপ' তাহার উপর অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাই একই বহির্লিঙ্গ Wordsworth, Shelley এবং Keats-এর কাব্যে বিভিন্ন 'রূপ' ধারণ করিয়াছে। তাই 'কৃতকান্তের উইল' এবং 'চোখের বালি'র সম্মাশে ঐক্য থাকিলেও, বিনোদিনীর সহিত রোহিণীর, মহেন্দ্রের সহিত গোবিন্দলালের মৌলিক প্রভেদ আছে। তাই Emerson এবং Carlyle-এর একই Napoleon-এর বিভিন্ন মূর্তি। তাই Ruskin এবং Lowell-এর একই Carlyle-কে এমন বিপরীত চক্ষে দেখিয়াছেন। সেই হেতু সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমন গুরুতর বিষয়। এই ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সাহিত্যলোচনা করিলে, কবির রচনাকে নিত্যই বিবর্ণ এবং নিষ্কীব করিয়া দেখানো হইবে। রামের চরণ-রেণুশর্পে একদা অহগ্যা যেমন জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই ব্যক্তিত্বের পূণ্য শর্পেও তেমনিই কত ভক্ত সাহিত্য জীবন্ত হইয়া, যেন দুগ্ধদ্বারতরুর নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই সাহিত্যে বর্ণ, বৈচিত্র্য, উত্তাপ এবং একমুখতা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

এই ব্যক্তিকক বরণ করিয়া লইলে কিন্তু তর্ক উঠিতে পারে। ব্যক্তিব-বিবেচনায় চর ত বলিতে পারেন, "আচ্ছা, Byron-এর কাব্যে না হয় পদে-পদে Byron-এর সাক্ষাৎ লাভ করি। কিন্তু Browning-ও নিজের কাব্যে নিজেই প্রকাশ করেন নাই; তিনি চরিত্র হুটাইয়া তুলিয়াছেন মাত্র। উত্তরমেক হইতে দক্ষিণমেক বত ঘুরে, Browning হইতে Browning-এর চরিত্রও ত ঘুরে। তাঁহার Pippa বা Filippa Lippi হইতে Browningকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে কি? তিনি নিজেই ত বলিয়াছেন, যদি Shakespeare নটিকে কি সনেটে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ত less Shakespeare he" — ইত্যাদি।

Pippa বা Filippa Lippi, My last Duchess-এর Duke বা The Statue and the Bust-এর প্রেমিক-প্রেমিকা সকলেই বিভিন্ন প্রকৃতির; কিন্তু সকলেই Browning-এর মনন-সম্মান। এই চরিত্রগুলির নিজস্ব বস্তু, এবং জীবনের উপর Browning-এর ধারণা—এই উভয়ে মিলিয়া সাহিত্যে ইহাদের উত্তম সম্ভব হইয়াছে। ব্যক্তিব-বিবর্তিত

উপাদান এবং ব্যক্তিগত শক্তি ও ধারণা এই দুই না মিলিলে কোনপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিই অসম্ভব হইত। Hamlet-ও যেমন Shakespeare, Falstaff-ও তেমনি Shakespeare, Othello-ও যেমন Shakespeare, Iago-ও তেমনি Shakespeare। তবে সেক্সপীয়ারের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র, সর্বাঙ্গ, অপরিসর নহে—তাঁহা বৃহৎ, উদার এবং মহৎ। সহস্রভূতি ইহাকে স্রবত, এবং অসংখ্য ইহাকে উচ্ছল করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী বৃহৎ এবং আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর সীমাবদ্ধা আমরা সহসা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। Shakespeare-এর নাটকও Shakespeare-এর এত বৃহৎ জাবে অবস্থান করিতেছেন যে, তাঁহার মহাত্ম সীমাবদ্ধ Shakespeare-এর অতিব আদর্শ অনেক সময় তুলিয়া যায়। এই হিসাবেই বলা যায়, সাহিত্য কবির আত্মপ্রকাশ মাত্র।

কিন্তু ইহারই সঙ্গে আর একটা কথা আসিয়া পড়ে। আরেক বিচার করিতে গেলে, তাহার মধ্যে তিনটি মূল উপাদান পাওয়া যায়। একটা জীব, একটা ভাবের প্রতিমা এবং আর একটি প্রতিমার উপর ভাবের প্রভাব। মানুষকে বিচার করিলে, মানুষের মধ্যেও আমরা এই তিনটি জিনিষ দেখি। একটি আত্মা, একটি আত্মার বিস্তারবরণ মূর্তি, এবং আর একটি দেহের ভিত্তর দিয়া আত্মার প্রকাশ বা দেহের উপর আত্মার প্রভাব। সাহিত্যের আত্মা তাহার ভাব, মূর্তি বা প্রতিমা তাহার ভাষা বা অলঙ্কার, এবং মূর্তির উপর আত্মার প্রভাব হইতেছে ভাষা ও অলঙ্কারের উপর ভাবের প্রতিচ্ছায়া। এই প্রতিচ্ছায়া বাহার মধ্যে বসেই স্পষ্ট, কবির ক্ষমতা তাহার মধ্যে ততই পরিমূর্ত।

একদিকে ত ভাবের সঙ্গে কবির নিজস্ব গুণপ্রোভ ভাবে বিমুক্ত হইয়া আছে; আর একদিকে আত্মার ভাষার উপর ভাবের প্রতিচ্ছবি বিশেষ কবি-বিশেষ ভঙ্গীতে হুটাইয়া তুলেন। এই হুটাইয়া তুলিবার কৌশলই কবির style বা রচনা-কলা। এই রচনা-কলার মধ্যে কবির নিজস্ব এত অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া যায় যে, কোনও রচনার-বাহিরের রূপটি দেখিয়া আমরা বলিয়া দিতে পারি, ইহা কোন কবির মূর্তি। অন্ততঃ ভাবটি যদি পুরাতনও হয়, তবু চক্ষু যেমন করিয়া সৌন্দর্য্যকে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সাজাইয়া লয়, তেমনি কবিয়া সেই ভাবটি

সকলের ব্যবহৃত এই ভাষাকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে বিভক্ত করিয়া, রচনাটিতে এখন একটা 'রূপ' প্রদান করিবে যে, সেই বিশেষ রূপটির মধ্যে বিশেষ কবিতাকে চিনিয়া শব্দে আশাধারের কোনই কষ্ট হইবে না।

কিন্তু কেবল লেখকের দিক দিয়া, অথবা পাঠকের দিক দিয়া, কেবল কবির দিক দিয়া অথবা ভাষার দিক দিয়া বিচার অথবা বিশ্লেষণ করিলে, সাহিত্যের অনেক রহস্য অব্যবসিক থাকিয়া যায়। সাহিত্যকে পঠন করিতে আরো অসংখ্য শক্তি কার্য করিতেছে। তাহার মধ্যে ব্রহ্ম-তিনটির উল্লেখ না করিলে, প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহিত্যের উপর জাতীয় চরিত্রের প্রভাব, এবং দেশের আকাশ-বাতাস, শাদন-তত্ত্ব, সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ দেশ-প্রভৃতির পরিবেশ-প্রভাব স্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া যায়। বঙ্গ-সাহিত্যের উপর ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও, বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরিমাণে ইংরেজীর অনুসরণে গড়িয়া উঠিলেও, বঙ্গ-সাহিত্যে ও ইংরেজী সাহিত্যে একটা জাতিগত প্রভেদ বর্তমান। ফরাসী সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে কেবল ভাষাগত ভিন্নতা নহে, জাতিগত বিভেদ রহিয়া গেছে। ফরাসী চরিত্রের সংস্কৃতি, শোভনতা, গভীরা, ফরাসী সাহিত্যে প্রাচুর্য, স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য রূপে, জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আবার ভাষা এবং জাতির প্রায় সর্বত্রই একা থাকিলেও, অণ-বায়ু শাদন-সমাজ-দেশ-দৃষ্ট English literature এবং American literature-এর মধ্যে কত যে পার্থক্য আনয়ন করিয়াছে, তাহা Carlyle ও Emerson, Robert Browning ও Walt Whitman, Lord Alfred Tennyson ও Edgar Allan Poe-এর ভুলনায় সমালোচনা সাধ্যা দিবে।

Celtic ও Teutonic-এর জাতীয় বিশেষত্ব ইংরেজী সাহিত্যকে কতকটা বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে; এবং বিভিন্ন ভাবে তাহা কোন্ কোন্ বিশেষ দিক দৃষ্টাইয়া তুলিয়াছে, তাহার উর্ক-কন্ডহে একথা ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে সাদা পড়িয়া গিয়াছিল। Teutonic জাতি কতকটা সামাদিগা, গোঁয়ার-গোবিন্দ এগাছের কাণের লোক; জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে যে সব ভণের প্রয়োজন—সেই ব্যবহার-বুদ্ধি, খিটার-বিবেচনা প্রভৃতি

তাগাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইংরেজী সাহিত্যের বস্ত-তত্ত্ব এই Teutonic বা Anglo-Saxon বিশেষত্বের দ্বারা নিগূহিত। কিন্তু Celtic জাতি মূলতঃ কল্পনা-প্রবণ। অনির্দোষিত, রহস্যচ্ছন্দা এবং অশোককল্পসত্তের অপটু আভাষ প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যের 'সাহিত্য-ভাব Celtic প্রভাবের রূপ। Pope, Dryden বেন ইংরেজের Teutonic অংশ হইতে উৎপন্ন; এবং Wordsworth, Shelley বেন তাহার Celtic অংশ হইতে জাত।

হিন্দু-সাহিত্যেরও দুইটি দিক আছে। একটা তাহার আধ্যাত্মিক বা spiritual দিক, আর একটা তাহার erotic বা কামনারাগাম্বক দিক। কে জানে কোন্ দুই বিভিন্ন মহাজাতির মিশনে বিশাল হিন্দুজাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু সকলের চেয়ে বাহার প্রভাব মর্মে-মর্মে অসুতব করিতে হয়, বাহার প্রভাব অনতিক্রমণীয়, বাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত—সে যুগধর্ম। বাহার প্রতিভা আছে এবং বাহার প্রতিভা নাই, যে পণ্ডিত এবং যে মূর্খ, যে মৌলিক এবং যে অসুকারী—তাগাদের সকলকেই যুগধর্মের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহুবত কেবল নিম্নোক্ত-দেশের মধ্যে নহে, সে তাহার কালের মধ্যেও যে বাণ করে। কোনও লেখকের রচনার যেমন তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের, তেমন তাহার যুগধর্মের পরিচয়ও পাওন! যাইবে। ভারত-ক্ষেত্রে যে বাঙ্গালার অষ্টাবদ শতাব্দীর এবং বিহারীশাল যে উনবিংশ শতাব্দীর কবি, তাহা তাগাদের অণ-বায়ুর তারিখ মিলাইয়া না দেখিলেও চলে; তাহার নিদর্শন "জরদা-মঙ্গল" এবং "সারদা-মঙ্গল"র পৃষ্ঠার-পৃষ্ঠায় বর্তমান। জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং যুগধর্মের Criticron অবলম্বন করিয়া "সাহিত্য জাতীয় জীবনের দূহর স্বরূপ", "সাহিত্যে সম-সাময়িক সমাজকে প্রতিবিম্বিত দেখি" প্রভৃতি কথা পূর্বতন সমালোচনার বগা হইত। এখন সে সব কথা পুরাতন হইয়া গেছে; তাগাদের পুনরুজ্জীবিত বাহুল্য যাত্র।

সাহিত্যের অনেক সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। জীবনের বাধ্যতার নত সাহিত্যের ব্যাখ্যাও আবাদিগকে রহস্য হইতে রহস্যাকারে লইয়া চলে। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে একথা সাহিত্য কাব্য রূপে কবির দ্বন্দ্ব-উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া পড়িল। প্রকাশ-কামনার দারুণ বাধার দ্বন্দ্ব মানব-

প্রকৃতি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কে জানে সে কোন বান্দীকি, বাহার শোক, প্রথম শোক রূপে আদিযুগের ছায়া-নিবিড়তার মধ্য হইতে, কল্পণ-কল্পিত বেদভার বাণীর মত আকাশ-বাতাসে মস্তি হইয়া উঠিল। তাহার পর বহুদিন পরে আবার একদিন, ভাবের আগুন-প্রদানের বাধ্যধাতিক ভাষা সমস্ত অপমান-অবহেলাকে তুচ্ছ করিয়া গম্ভীর রূপে সাহিত্যে আপনায় বর্ধার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সেও এক স্মরণীয় দিন। পূর্ব ও নারীর মত, দিবস ও রাত্রির মত, কাব্য ও গম্ভীর সাহিত্যকে হৃদয় এবং বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের আলোচনা, জীবনের ব্যাখ্যা এবং জীবনের অতিথিক্রিতে কাব্য এবং গম্ভীর উভয়েই পূর্ণতার, উদারতার এবং গভীরতার হইয়া উঠিতেছে।

এমনি করিয়া পুরুষের মত গুরু ভাবের গম্ভীর জীবনকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, এবং কাব্য নারীর মত বর্ণ, বিবেক, ভঙ্গী এবং শিল্পিনীতে বিভিন্ন হইয়া, জীবনকে হৃদয় হইতে হৃদয়তর করিয়া তুলিবে। সাহিত্য অন্তরের মত মানবকে বেদন দান করে; জীবন হইতে পুষ্ট হইয়া সে জীবনকে পোষণ করে। এই দুঃখ-ব্যতিক্রম-বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি হইতে অন্ত-লোকে যে লইয়া যাব—সে সাহিত্য। চতুর্দিকের এই অশ্রুত কলহ, কোলাহল, উচ্চ ভাষকে ডুবাইয়া—দুগ্ন দুগ্ন, বেশে-বেশে, মনে-মনে যেহী সন্ন্যস্তীর বীণা বাজিতে থাকুক। অন্তরের সকল কল্যাণ সেই বীণা-ধ্বনি আনিয়া দিবে।

চিঠি

[ত্রিপাচুলাল ঘোষ]

শৌভিক যেমন হ্রদার বাবলা কঁদিয়া কত লোককে অশ্রুকের অস্ত্র হাসার, কীদায়, পরিণামে দয়ায়,—নিজে কিন্তু হাসে না, কঁদে না, মজে না, আমিও তেমনি এতটা জীবন ধরিয়া চিঠি-বিলির ব্যবস্থা করিয়া কত লোককে হাসাইয়াছি, কঁদাইয়াছি, মজাইয়াছি—নিজে কিন্তু হাসি নাই, কঁদি নাই, মজি নাই! কারণ, আমি চিঠি বিলি করিবার ভার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; কাহারও চিঠি পাইবার অসুখ লইয়া আমি নাই!

মহুদ একা আলে, একা যাব—একঘাটা আমাতে যেমন খাটে, এমন বোধ হয় আর কাহারও গণ্ডে খাটে না! জানোদয়ের পছন্দা তারিখ হইতে এ নামের আমি—এক! জানোদয়ের পূর্ণে এবং পরে নিঃশব্দ হইয়া বহন অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলান, তখন যে আশ্রয় পাই নাই তাহা নহে; তবে সে আশ্রয়ের পরমায়ু-কাল এত অল্প যে, তাহা মনে করিয়া রাখিবার মত নহে। স্রোতে-ভাসা পাতা বহন অকূলের দিকে ভাসিয়া চলে, সে অনেক স্থানে আশ্রয়ের বীধনে আটকা পড়ে বটে, কিন্তু মনে রাখিবার মতন কোথাও বেধী মিন দয়া থাকে না। যেখানে সে থকা পড়ে, সেখানে সে আপনাকে হারাইয়া দেয়—সে সেই

অকূলে! আমিও অনেক আশ্রয়ের বন্ধরে বন্ধরে ঘুরিয়া যুগ্মা শেষে এই চিঠি-বিলি করার ব্যবস্থায় বাধা পড়িয়া গিয়াছি।

শৌভিকের কখনও মস্তপানে লাগলা হয় কি না জানি না; আমার মনে কিন্তু দুঃখ-ভয়ের ভীত-মধুর মধিরমর চিঠি পাইবার অস্ত্র একবার উৎকট লাগলা জাণিয়া উঠিয়াছিল। তখনই নিঃশব্দ একটা দমকা বাতাস বিতুততা ঢালিয়া বলিয়া গেল—“হাঃ, অবাধ হতভাগা, তোর এ কি আশঙ্কা! এ তোর কি বিষম আত্মবিশ্বাস! তোর জীবনের মূল নেই, ভুল নেই, তোর এ কি ভুল!”

আশঙ্কা! সেই রাত্রি এক চিঠি পাইলাম। দিশ্মিশে কল্যাণ রক্তের পুরু ধামে চিঠি আঁটা। চিঠির উপর আমার নামের প্রথম ভিনটি অক্ষর ‘জী-ব-ন’ অতি অশ্লষ্ট ভাবে পড়া হইতেছে যাই। নামের আশিতে ‘শ্রী’ নাই, অস্ত্র পদবী নাই, ঠিকানা ত নাই-ই! ডাকঘরের ছাপ বুজিগাম; যেখি,—একটা মাজ ছাপ আছে, কিন্তু তা সেই লেখাপার কালো ব্লকে এখনুকাইয়া, মিলাইয়া আছে, কিছুই বুঝিতে পারিগাম না। আগ্রহের আবেগে লেখাপা ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিলাম; কিন্তু কি অশ্রুত উপায়ে সে লেখাপা

তৈরী আনি না, কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিলাম না। তখন লেফাফার সেই সংযুক্ত স্থানটা খুলিতে চেষ্টা করিলাম; লেফাফার উপর বলের পর বল দিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই খুলিল না।—কোন্‌ও মুখে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। এ কাহার নির্বন্ধ পরিহাস? আমার প্রাণের নীরব বাদনা তো কারাকণ্ঠে জানাই নাই! কে আমার মনের কথা চুরি করিয়া আমার এমন করিয়া ঈদারাইতে চায়?

আবার চিঠিখানি তুলিয়া লইলাম। হায় রে বিকল চেষ্টা! হৃদয়ের দাক্ষিণ্য পিপাসা অমর্ত্য বাঁধিয়া পাথরের মত বিধিতে লাগিল। সহসা বেন কাহার উপর অতিমান বসাইয়া আসিল; অঘনি বরষার করিয়া খানিকটা গোথের বল লেফাফার আবদ্ধ বুকে ঝরিয়া পড়িল। সবিম্বর আনন্দে দেখিলাম, কখন অলক্ষ্যে লেফাফা আপন হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে! পড়ো লেখা:—“আবার মনে পড়ে, বন্ধু! আমি আখ্যানন্দ শ্বামী—তোমার কত দিনের বন্ধু। বহু শু ভূমি আঁধারে ভুলিয়া গিয়াছে, আমি কিন্তু ভুলি নাই। বহুঃস্বয় মার্কে বিস্তৃতির যে একটা বিচ্ছেদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই বিদূরিত করিবার মন্ত, যে দ্বারের চিত্র-পুস্তক, বন্ধু মনোম, তোমার আল এই সঙ্গীতি আখ্যান-লিপি পাঠাতেছি; প্রাপ্তি মাত্র আমার সঙ্গে দ্বিগিত হইবে। আবার আখ্যান-দ্বান যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, তবে এই পত্রের সাহায্যে পথের মস্তান পাইবে।”

২

চলিয়াছি, চলিয়াছি—ক্রমাগতই চলিয়াছি! কেবলি মনে হইতে লাগিল—এই বুকি বন্ধুর দেশে এগেছি! দিন বত ঘাইতে লাগিল, ততই লেফাফার সেই বন কালা রঙটা বেন ফিকে হইয়া আসিতেছিল। শেষে এক দেশে আসিয়া স্থগিলাম, এ বন্ধুর দেশ না হইয়া আর দার না!—চিঠির বর্ণনার সঙ্গে সেই দেশ ছবছ মিলিয়া গেল।

তখন এক পবিত্রকে বন্ধু আখ্যানন্দের আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে একটা দুর্বলতা আকাশ-অন্দী বুক নির্দেশ করিয়া বলিল—“ঐ গাছের উপরে।” বিশেষীর প্রতি এ প্রকার পরিহাসে ভারি বিরক্ত হইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ লেফাফাখানার উপর দৃষ্টি

পড়িল; দেখি, কালা রঙটা আবার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। অনেক দূরে গিয়া আর এক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে আখ্যানন্দের আবারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল “ঐ যেখানে একটা হস্তা হস্তে, ঐখানে আখ্যানন্দের বাড়ী।” মম লক্ষ্য করিয়া সেখানে গিয়া দেখি—সে একটা তড়িৎখানা!—এক পলিত বেশ ব্যক্তি এক-খানি চৌকিতে বসিয়া বত তড়িৎখোরকে তড়িৎ বিক্রম করিতেছে! তাহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে আখ্যানন্দের আশ্রম কোথা?” সে আমার পানে ডার অবাধুণের মত চোখ বেলিয়া বলিল “কে বাবা ভূমি বেরশিক? আখ্যানন্দকে চেনে না!” আর এক ব্যক্তি বলিল—“আ-হা!—চিন্তে কেনন করে...এ রসে যে ব্যক্তি বেথি—ও! চিন্তে যদি বাবা, আখ্যানন্দের তড়িৎ একটু চুষক দাও!” সেই লোক ওনার হাবভাবে আমি তুণার সে স্থান ভাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। খানিক দূরে গিয়া দেখি, এক হু-সজ্জিত বাড়ীর ভিতর হইতে বাহ্য-কর্মে সন্ন্যাসের উচ্চমূল্য হিম্মেল বহিতেছে! বিশালীর দল দাওয়া-আসা করিতেছে। অতি অস্বচ্ছতার তাহাদের একজনকে আখ্যানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ভারি আশ্চর্য হইয়া কিছুকণ আবার দিকে চাহিয়া রহিল! তার পর বলিল, “এদ না আমার সঙ্গে! শুধু আখ্যানন্দ কেন, অনেক আনন্দ এ বাড়ীতে আছেন!” আমি তাহার গুণিত পরিহাসে ব্যথিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করি, এমন সময় দেখি সেই বৃদ্ধ তড়িৎখানা বাহির হইয়া আসিল। এবার আর তার সে তড়িৎখানা স্তম্ভ নর, বেশ নটবর বেশ। আমি আবার সন্মুখের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে আর ‘এক বাড়ী পড়িল। দেখি, কয়েকটা লোক গৃহস্থানীকে বৃহৎ কর্তে গালি বর্ষণ করিতে-করিতে বাড়ির হইয়া আসিতেছে! আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ওহে বাপু! আখ্যানন্দ শ্বামীর আশ্রম কোথায় বলতে পার?” সে ব্যক্তি আখ্যানন্দের প্রতি একটা কুৎসিত গালি প্রয়োগ করিয়া বলিল, “সে স্বপ্নের বদমাইসকে আর আখ্যানন্দ বলতে নেই। ব্যাটা ঘোর কসাই মশাই, ঘোর কসাই! ব্যাটার আবার মাঘের বহর কত—আখ্যানন্দ শ্বামী!”

আমি বিম্বিত হইয়া বলিলাম, “তিনি কি কুটিলকৌরী?” সে বলিল, “ভিতরে গিয়া দেখুন বা, ঐ তার বাড়ী।” আমি

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই তাড়িওয়ালা একটা ফরাসে বসিয়া অতি নির্ভয় ভাবে ছদ্ম আশ্রয় করিতেছে। অধর্মপথের মধ্যে যে ক্ষমতা জানাইয়া দয়ার প্রার্থী হইতেছে, তাহাকে অকথা ভাবের গালি দিতেছে! দেখিবা, আমার অস্তর ঘৃণা ভরিয়া উঠিল। এই নীচাশর কখনই আমার বন্ধু আত্মানন্দ হইতেই পারে না। আমি আর সহ্যই কাল সেখানে অবস্থান করিলাম না।

এই রকম করিয়া নানা ভয়ঙ্কর ঘটনায় আত্মানন্দের উদ্দেশ করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ চলিতে লাগিলাম। আশ্রয় আর বেশে না! আশ্চর্যের বিষয়, বেখানে ঘাই, সেইখানেই সেই বুড়ো তাড়িওয়ালা হাসিম। মনে কেমন সন্দেহ হইল, এ কোন্ দ্বারাপুরে আসিলাম! পথপ্রসন্ন দেখি ক্রান্ত, হতাশাসে মন অবসর হইয়া আসিল। একবার মনে হইল, আর বন্ধুর সহিত সাক্ষাতে কাজ নাই—কিহিয়া যাই। বন্ধুর লেখা লেখাপা-দোড়া চিঠিখানার উপর নজর পড়িল; সে যেন আমার মনের কথা জানিতে পারিয়া জুড়ুটি করিয়া উঠিল! কিহিবার পথে পা যেন অবশ হইয়া আসিল; গতি নাই—আবার সম্মুখে পথেই চলিতে লাগিলাম।

৩

বন্ধুর চিঠি জীর্ণ, বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে; মনের ভিতরটাও হতাশে ছুইয়া পড়িয়াছে—অথচ চলার শেষ নাই! সহসা অদূরে এক আশ্রয় দেখা গিল। অবনি মনের ভিতরে কে যেন বলিয়া উঠিল, “ওই—ওই আশ্রমেই তোমার বন্ধুকে পাইবে।”

আশ্রয়ের সামনে এক বিশেষ দাঁড়াইয়া। সে যেন আমারি প্রতীক্ষার রহিয়াছে! আমার দেখিবা বলিল, “এত সেরী হ’ল?”

আমি সাগরে ভিজিয়া আসিলাম, “এই কি আত্মানন্দ আবার আশ্রম?”

সে বলিল “হাঁ, এখানেও তাঁর দেখা পাবেন।”
আমি বলিলাম, “উঃ কম খুঁজে আস্‌চি।”
“কেন, পথে ত অনেক বার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে।”

আমি সবিস্ময়ে তার পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে সহাস্তে বলিল “তাঁকে বুঝি চিন্‌তে পারেন নি?”

“আমি যে তাঁকে চিনি না।”

সে বলিল “চেনেন না—এক কাঁছে থেকেও?”

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম “কাঁছে থেকে? কি রকম?”

“এই ছায়া যেমন কায়ার কাছে থাকে!”

আমি আবার হতবুদ্ধি হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। সে এক অপূর্ণ বিদ্যুৎ হাসি হাসিয়া বলিল “ভিতরে আসুন।”

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বাধা দেখিলাম, তাহাতে অগণকের লজ্জা ভড়িতাহতের দ্বার দাঁড়াইয়া রহিলাম। ওই বজ্রবেদী-সদাশীন, রক্ত-চূর্ণ শাস্ত্রভিত্ত, শাস্ত্র-সৌম্য মুষ্টি বৃদ্ধ, যিনি শৌভিকালয়ে বিরাজিত হইয়া ভ্রমের অশ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছিলেন, বাঁচকে গণিকালয়ে দেখিয়া তীর ঘৃণার ভ্রম আমার ভরিয়া উঠিয়াছিল, বাঁচার গুণিত কুশীলবী-স্বলভ নির্দয় বাহ্যারে আমার অন্তরায়া বিদ্রুপ হইয়া উঠিয়াছিল—অই বৃদ্ধ—উনি আমার বন্ধু আত্মানন্দ স্বামী! শাস্ত্রের আনন্দের নেশা তখনো কাটে নাই,—বন্ধু আত্মানন্দ তাঁহার আনিবনউপস্থ বহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “এস বন্ধু—ছমরে এস।”

আমি ভাবকুণ্ড কণ্ঠে বলিলাম, “এ বহুতরী যেমন কেন বন্ধু?”

প্রসার মুষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বন্ধু আমার বলিলেন, “ইহার উত্তর সীতার পাইবে।”

সহসা বগ্ন ভাড়িয়া পেল! দেখিলাম, আমি নিম্নের কুঁড়ে-ঘরে শ্যামাশীন। সূর্য আবি, বন্ধুর কথা বুঝিলাম না। হ্যাঁ পো সীতা কি?

পাটীগণিতের অঙ্ক

[অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ]

বাতবিকই ভারতে একটা নতুন যুগের সূচনা হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই নতুন পরিবর্তনের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর হাতে প্রাথমিক শাসনকার্য্য-ভার এখন কিয়ৎ পরিমাণে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবং ক্রমে-ক্রমে আরও অর্পণ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কনভোকেশনে বক্তৃতাটী বাহাদুর বলিয়াছেন, “এ দেশে শিম-বাগিচাক্ষেত্রে কেবল ভারতীয় অর্থ খাটিলেই চলিবে না; ভারতের অধিবাসিগণ বাহ্যতে উহার অংশভাগী হইতে পারে তাহা করিতে হইবে। তাহারা যে শুধু ফুলি মজুরের স্তায় কার্য্য করিবে তাহা নহে; পরন্তু শিম-বাগিচার নৈক্য তাহাদের হাতে বাগড়া চাই।” ভারতে ছাত্রদিগের অধ্যাপনা ও পরীক্ষাশ্রম বাতৃভাষায় চলিবে কি না, এবং চলিলে কোন পরীক্ষা পদ্ধতি এবং কোন-কোন বিষয়ে বাতৃভাষায় চলিতে পারিবে, তাহাও আলমগার আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থার-কল্পে যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহারও রিপোর্ট লিখিত হইতেছে। উহাতে, আলমগারের সমরোপযোগী উচ্চশিক্ষা কি প্রকার উন্নত প্রণালীতে দেওয়া গাইতে পারে, তাহাও আলোচিত হইবে। এই সকল পরিবর্তন হইতে লক্ষণ পাইতে হইলে, আমাদের দেশের নিরাশিক্ষার বর্তমান অবস্থাও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থানে সংস্থার লক্ষন করা আবশ্যিক। দেশের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধেও ঘোষিত পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নহে, পরন্তু অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক ভবিষ্যতের আশাশুঙ্ক, তাহাদিগকে সর্বোচ্চে তথা করিতে হইবে, এবং কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহা দেশের, তথা লোকের পক্ষে অধিকতর কার্য্যকর হইবে, তাহা স্থির করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

আমি এই প্রবন্ধে শিশুদের গণিত-শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। যে পদ্ধতিতে গণিতের শিক্ষা দিলে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও, ছাত্রদিগকে ভবিষ্যতে কি শিম-বাগিচা বিষয়ে, কি অন্য কোনও কার্য্য-ক্ষেত্রে উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করা কর্তব্য। ইহাতে আমাদের অত্যন্ত পদ্ধতিগণি পরিচয় করিতে হইলেও, সূচিত হওয়া উচিত নহে।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন, পাটীগণিতের বোণ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ, ইত্যাদির পদ্ধতির পরিবর্তন কি হইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষার পাটীগণিতের প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দেখিয়া বুঝিগাছি যে, পাটীগণিতের পদ্ধতির আদ্য পুরনো পরিবর্তন দরকার। আমাদের দেশে ১০ বৎসর পূর্বে পাটীগণিত যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত, আজও সেই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আলমগার পাটীগণিতের যে সকল পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই, ১০-১০ বৎসর পূর্বে যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হইত, তাহাদের অনুরূপ। পাটীগণিত-শিক্ষার কোনও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া এই সকল পুস্তক পাঠে বৃদ্ধিতে পারা যায় না। এক স্থলে পরিবর্তন দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাকে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি বলিয়া মনে করিলে অস্তর হয় না। আমেরিকার বা ইংলণ্ডে পাটীগণিত সংক্রান্ত যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যদি কেহ কঠোর স্বীকার করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই বৃদ্ধিতে পারিবেন যে, পাটীগণিতের প্রথম চারি নিয়মও পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে। এই আবশ্যকতা লক্ষ্যন করিতে হইলে, পাটীগণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে হইবে; এবং বর্তমান প্রণালীতে ঐ উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও দেখিতে হইবে।

পাটীগণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা নিত্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয় বোধ হয় অসুগত আর নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার দ্বারা প্রত্যহই পাটীগণিতের প্রয়োগ করিতে হইবে। আনন্ডকালকার গণনা, শিক্তিই হউন আর অশিক্তিই হউন, প্রত্যেকেই পাটীগণিতের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব ব্যবহারিক জীবনে পাটীগণিতের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। এই উপকারিতাই পাটীগণিত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, ইহা দ্বারা মানসিক বৃত্তিগুলির ঔৎকর্য্য সাধিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহা দ্বারা গৌণভাবে চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক অঙ্কের সঠিক ভাবে উত্তর পাওয়ার জন্য বাহ্যিক সাধুভাবে চেষ্টা করে, তাহাদের লক্ষণবৃত্ততা বা বাধ্যবাধিত্য প্রতি অল্পবয়সে হওয়া স্বাভাবিক। অঙ্কের সমাধান অসম্ভবরূপে সাধাইয়া লেখাই বাহ্যিক। ঐরূপ শিথিলে পরিচ্ছন্নতা অসম্ভব হয়। সময় লম্বা করিবার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া শিখিতে-শিখিতে ক্রিপ্রত্যয় প্রতি আশ্রয় লয়।

আনন্ডকালে যেকোন ভাবে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে তৃতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আনন্ড পাটীগণিত যে ভাবে শিখিয়াছে, তাহাতে কার্যকালে উপকার পাওয়া যায় না। কামল, পেন্সিল না হইলে এবং যথেষ্ট সময় না পাইলে আনন্ড নামক অসুখি পর্য্যন্ত বসিতে পারি না। পাটীগণিত শিক্ষা কিরূপ কার্যকরী হইয়াছে, তাহা একবার ধান্দা, ষটি ইত্যাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত দোকানে গেলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সেখানে দান অল্পই রাখিতে হইলে, দোকানদারের হিসাব অনুসারে মূল্য দিয়া আসিতে হইবে। ঐ মূল্য ঠিক হইল কি না, তাহা অন্ন সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ করা আমাদের পাটীগণিতের বিচার ক্রমাইবে না। অনেক হয় ত বলিবেন যে, আনন্ড শুদ্ধরী শিখি নাই বলিয়াই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা ঘটয়াছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, শুদ্ধরী পাটীগণিতের কোশল বাজীত আর কিছুই নহে। বাহ্যিক বুদ্ধির সহিত পাটীগণিত শিক্ষা করেন, তাহাদের শুদ্ধরী শিখিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বাহ্যিক কেবল না বুঝি কতকগুলি নিয়ম কঠোর করিয়া অল্প কথিতে থাকেন, তাহাদের পক্ষেই শুদ্ধরীর আর্থিক-রূপে আরও কতকগুলি নিয়ম কঠোর করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অতএব যে সকল প্রণালীতে সংক্ষেপে সমাধান হইতে পারে, সেই সকল প্রণালী প্রথম হইতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ, প্রথমে কোনও এক প্রণালী অভ্যস্ত হইলে, উহা পরিভাষা করা কঠিন হইয়া উঠে; এবং বহুদিনের অভ্যাসের ফলে উহার সহিত তুলনার জন্য কোন প্রণালী, অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইলেও, কঠিন বলিয়া মনে হয়। যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিলে সময় এবং পরিচয়ের লাভ হয়, অল্পই স্পষ্টিত কল পাওয়া যায়, তাহাদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বাহ্যিক, পূর্ণকার্য বা এই জাতীয় অল্প কোনও কথাকথিতে লিপ্যন্তরিত হইতে পারে। লগন চেম্বার অব কমার্শের পত্রিকা আধুনিক নিয়মের পরিবর্তে প্রাচীন ধর্মের নিয়মে অল্প কথিতে, উহা অগ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা গ্রহণাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে পুরাতন প্রণালী পরিভাষা করিয়া নতুন-নতুন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহারিক ভাবে কার্যকরী করিবার নিমিত্ত অল্পই পত্রিকা অল্প শিখিত পাটীগণিতেও নতুন-নতুন প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশেও শিবপুর এডমিনিস্ট্রেশন কলেজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত P. W. D. Fourth grade (আনন্ড কাল Second grade) Accountantship পত্রিকা প্রশংসিত দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ পত্রিকা আধুনিক সংক্ষিপ্ত প্রণালীই চাহিয়া থাকে। পাটীগণিতের প্রশংসিত এই মর্মে টীকা থাকে। এক বঙ্গীয় লেখা ছিল যে, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। সেই বঙ্গীয় একটা প্রশ্ন এই ছিল :—“Find the L. C. M. of 18, 28, 108, 105.” (Vide Hall & Stevens' School Arithmetic, page 78.) Hall & Stevens এর পাটীগণিত দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আনন্ড যেকোন ল. স. স. বাহির করিতে শিখিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কিছু সংক্ষিপ্ত প্রণালী ঐ পাটীগণিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ-কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার বিশেষ লাভ হয় নাই। বিশেষ লাভ হইয়াছে কি না তাহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে, যোগ ও গুণনের আধুনিক প্রণালী সম্বন্ধে বাহ্যিক নিমিত্ত লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক্ষেত্রে বিশেষ লাভ না

হইলেও এক্ষণে সক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অভ্যাস করিলে অনেক সময় সুবিধা হইয়া থাকে। আরও, এই সকল স্থলেই বৃত্তিতে পারা যায় যে, শিক্ষার্থী সক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার অভ্যাস হইয়াছে কি না। লোকচরিত্র পঠীক্য করিতে হইলে সামান্য সামান্য ঘটনার প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, সামান্য-সামান্য ঘটনার বিশেষ লক্ষ্য বা কতকগুলি সঙ্গতবশত থাকে না বলিয়াই লোকে সত্যকথা অবলম্বন করে না; এবং তখন প্রকৃত চরিত্র বাহির হইয়া পড়ে। মিতব্যয়িতা বাহ্যিক সঙ্গতবশত হইয়াছে, অন্তরে অনিত্যবাহী হইতে দেখিলে তাঁহার মনে একটু চাকলা উপস্থিত হইবেই। কলিকাতা পূর্ণবয়স্কের Commercial Institute-এ আধুনিক প্রণালী অবলম্বনে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়াই অস্বাভাবিক। উপরিস্থিত তিনটা দৃষ্টান্ত হইতে বৃত্তিতে পারা যাইবে যে, বাহ্যিক আধুনিক প্রণালী জানেন, তাহার উদাহর্য পক্ষপাতী। এই পক্ষ-পাত্যের কারণ ব্যবহারিক জীবনে আধুনিক প্রণালীর অধিকতর উপকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অঙ্ক কথিবার প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্তন করা দ্বির করিবার পূর্বে, এই দুইটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলে উৎসাহ বিবিড্যালয়ের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় এবং কোমলবয়স্ক বালক-বালিকাদের উদ্যোগে অসুবিধা উপস্থিত হইবে কি না। যেটুকিউল্লম্বন পঠীক্যর পরে পাটীগণিত পড়ান হয় না। অতএব যেভাবেই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন, তাহা ভবিষ্যতের শিক্ষার বিরোধী হইতে পারে না। বরং আধুনিক প্রণালীতে পাটীগণিত শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে বিবিড্যালয়ের উচ্চ পঠীক্যবিপণনেরও অনেক সুবিধা হইবে। আদ্যকাল ধৈর্যেতে পাঠ্য দায় যে, Hydrostatics-এর অঙ্ক কথিবার সংখ্যার গুণকল নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বি. এ. ক্লাসের ছাত্রেরাও পাটীগণিতের প্রথম শিক্ষার্থীর স্তর স্তরের প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন। ছাত্রদের এইরূপ অবস্থা দূর দূর পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় শুভই ভাল।

কোমলবয়স্ক শিক্ষার্থীর পক্ষেও নূতন প্রণালী অসুবিধা-জনক হইবে না। কটকে বাগানী বালক-বালিকাদের জন্য একটা বহুবিভাগীয় প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এই বিভাগে অঙ্ক কথিবার আধুনিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। সপ্তম বর্ষের শিশুরাও গুণন ও ভাগের আধুনিক প্রণালী

শিখিয়াছে। কোনও প্রকার অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে যে বার্ষিক পরীক্ষার শুধন ও ভাগের অঙ্ক ছিল, প্রায় ছাত্রই আধুনিক প্রণালীতে শুধন ও ভাগ করিয়াছিল। যে অঙ্ক কয়েকটা ছাত্র পূর্বে বাড়ীতে পুরাতন প্রণালী অনুশাসনে ছাত্রই নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিল, কেবল তাহারাই আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করে নাই। লেখকের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদ্বয়কে পাটীগণিত শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই আধুনিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে কাহারও অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অঙ্ক কথিবার আধুনিক প্রণালী কি? আধুনিক প্রণালীতে সময় ও পরিশ্রমের লাভবের চেষ্টা হইয়াছে; এবং বাহ্যতে ছোট-ছোট গণনা মনে-মনেই সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ৮০ বৎসর পূর্বে Girdlestone তাঁহার Arithmetica শিখিয়া-ছিলেন, "Let the learner try to acquire habits of rapidity in his calculations as well as accuracy : too much time is generally wasted in counting up in addition, in using too many words in multiplication, etc., whereas these processes ought to be done instantaneously and without effort. The habit of making short calculations in the head instead of writing down every figure is as much to be commended as it is generally neglected." অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন তাহার গণনা দ্রুতপূত্র করিবার ও শ্রু-শ্রু সম্পাদন করিবার অভ্যাস অর্জন করিতে চেষ্টা করে। যোগের সময় সংখ্যা-গণনা, গুণনের সময় অত্যধিক লক্ষ্য রাখতে, ইত্যাদি নানা প্রকারে অত্যধিক সময় সাধারণতঃ নষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, এই সকল প্রক্রিয়া নিমেষ-মধ্যে ও অনায়াসে সম্পাদিত হওয়া উচিত। ছোট-ছোট গণনা না লিখিয়া মনে-মনে অভ্যাস করিতে শৈশবলাই সচরাচর লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐরূপ অভ্যাসই অতীব বাহনীয়। কিন্তু কেহ মনে করিবেন না যে, কতকগুলি নিয়ম কর্তব্য করিয়া সময় ও পরিশ্রমের সংক্ষেপ সাধন করিতে হইবে। পুরাতন পাটীগণিতেই কর্তব্য করিবার

মাত্র এক-একটা নিয়ম দিয়া ঐ নিয়মাবলীতে কবিবার মাত্র কতকগুলি অঙ্ক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আন্তর্জাতিক ঐ ব্যবস্থা আমাদের দেশে বর্তমান থাকিলেও, অত্যন্ত বেশে ব্যবহৃতব্য পরিভাষ্য হইতেছে। Sydney Jones (Headmaster of Cheltenham Grammar School) তাঁহার Modern Arithmeticএর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "An efficient teaching of Arithmetic must aim at (1) a clear conception of units of the quantities involved in calculations, (2) accuracy, (3) quickness in the manipulation of numbers, (4) cultivation of the reasoning faculties." অর্থাৎ পাটীগণিতের শিক্ষা কল্যাণপাটিকা করিতে হইলে, এই চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—(১) গণনার ব্যবহৃত রাশিদসূত্রের একক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, (২) ভ্রমশূন্যতা, (৩) সংখ্যা ব্যবহারে দ্রুততা, (৪) বিচার-শক্তি ও ঐশ্বর্য সাধন। এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রচলিত প্রণালীর সংস্কার সাধন করিলেই আধুনিক প্রণালী পাওয়া যায়। এখন এক-একটা নিয়ম ধরিয়া প্রচলিত ও আধুনিক প্রণালীর পার্থক্য দেখান যাউক।

যোগ।—মনে করুন, ২, ৩, ৫, ৭, ৬, ৮ এই কয়েকটি অঙ্ক যোগ করিতে হইবে। প্রচলিত প্রক্রিয়া এই :—
“২ আর ৩, পাঁচ; আর ৫, দশ; আর ৭, সতর; আর ৬, পঁচিশ।” আন্তর্জাতিক চক্র শিক্ষা এরূপ দেওয়া হইয়া থাকে যে, নিম্নে সংখ্যা ২, ৩, ৫ এই তিনটি অঙ্ককে চক্র সাহায্যে একত্র করিয়া যোগকল দশ এবং ৭, ৬, এই দুইটি অঙ্ক একত্র করিয়া যোগকল পনের ধরিয়া লইতে অভ্যাস হইয়া যায়। আধুনিক প্রণালীতে এইরূপে যোগ করিতে হয় “দশ, পঁচিশ।” শৈশব হইতেই এই প্রকারে যোগ করাইতে শিক্ষা দেওয়া ভাল। দুই তিনটি অঙ্ক একত্র করিয়া বিশদ্বিবার অভ্যাস হইলে, বহু এবং বৃদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সময় সংক্ষেপের উপায় নিজে উদ্ভাবন করিতে পারা যাইবে।

বিয়োগ।—আন্তর্জাতিক শিওরের মাত্র লিখিত বাহ্যিক পাটীগণিতে বিয়োগের যে প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বাস্তব নহে। উহা বাহ্যিক বিয়োগকল পাওয়া যায় বটে,

কিন্তু ঐ নিয়ম শিক্ষা করিলে একই প্রক্রিয়ার গুণন ও বিয়োগের কার্য সম্পাদন করা সুকুমার শিক্ষার্থীর পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব ভাগের আধুনিক প্রণালী (ইতালীয় প্রণালী) শিক্ষার পক্ষে ঐ নিয়ম কটকটরূপে হইয়া গাঢ়াইয়াছে। আমরা যে পুরকযোগের সাহায্যে বিয়োগ (subtraction by complementary addition) শিখিয়াছিলাম, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রণালী; উহাকে বিয়োগের Austrian method বলে। এই Austrian method সম্বন্ধে Hall and Stevens তাঁহার Modern School Arithmeticএ লিখিয়াছেন “in some subsequent rules is indispensable for rapid work.” অর্থাৎ পরবর্তী কতকগুলি নিয়মাবলীতে দ্রুত কার্যের জন্য অপরিহার্য বা একান্ত আবশ্যিক। আন্তর্জাতিক যে নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বহু সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই নিয়ম শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে ভ্রমানক অশ্রবণীয় পতিত হইতে হয়। বিয়োগে “বার করিবার” যে প্রণালী আছে, তাহাও বহু সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব; এবং এই “বার করা” প্রণালী হইতে পুরকযোগের প্রণালীতে অনায়াসেই ঘাইতে পারা যায়। অতএব বহু সাহায্যে বিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার সময় বর্তমানে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে “বার করা” নিয়মটি শিক্ষা দেওয়া বাস্তবীয় ও ফলজনক। এ বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্তৃপক্ষের, তথা গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক। Austrian method শিক্ষা করিলে একটা সংখ্যা হইতে অপর কতকগুলি সংখ্যার সমষ্টির অন্তর একই প্রক্রিয়ার বাহির করা বাইতে পারে।

গুণন।—গুণনে গুণকের তাইন দিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করিয়া পর-পর গুণকের অঙ্কগুলি দিয়া গুণ করা ই আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি। গুণকের বামদিকের অঙ্কটি হইতে গুণনের কার্য আরম্ভ করা ই আন্তর্জাতিক নিয়ম। গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা গুণনের পৌরোপরি সম্বন্ধে Hall ও Stevens তাঁহার Modern School Arithmeticএ লিখিয়াছেন, “In theory the order in which these separate multiplications is (r) performed is immaterial; but there are great advantages in

• • • beginning with the figure of the highest place-value in the multiplier." অর্থাৎ শুধু জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে কোন্টির পর কোন্টি দিয়া গুণ করিতে হইবে, তাহা দেখা না দেখা সমান; কিন্তু গুণকের সর্বোচ্চস্থানীয় মান বিশিষ্ট অঙ্কটি দ্বারা গুণন আরম্ভ করিলে অনেক সুবিধা হয়। গুণন সম্বন্ধে Dr. Workman (Senior Wrangler) দ্বারা নিবিশ্রাচ্ছেন তাহার উল্লেখ পরে করা যাইবে। সাধা পড়িবার বা উল্লেখ করিবার সময় যে কারণে ভাইন দিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ না করিয়া বাম দিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করিয়া থাকি, ঠিক সেই কারণেই গুণকের বাম দিকের অঙ্কটির দ্বারা গুণন আরম্ভ করা উচিত। 'তিন শ', 'পঁচিশ' বলিলে দ্বারা তুমার 'পঁচিশ, তিন শ' বলিতে তাহা বুঝায়। তবে তিন শ আগে বলা হয় কেন? মনে করুন, একখানা বাঁটা তৈয়ারি করাইতে কত টাকা খরচ লাগিলে বিজ্ঞাপন করায়, কেহ এইরূপে বলিতে লাগিলেন, "পঁচিশ, তিন শ, দশ হাজার, টাকা"। এখন "পঁচিশ" বলা হইল তখন খরচ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণাও জন্মিল না। "পঁচিশ, তিন শ" বলা হইলেও ধারণা প্রায় তদ্রূপই রহিয়া গেল। উত্তর সমাজ না হইলে খরচ সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারা যায় না। কিন্তু "দশ হাজার, তিন শ, পঁচিশ, টাকা" বলিলে, এখন "দশ হাজার" বলা হইল তখনই মোটামুটি বুঝিতে পারা গেল, দশ ও এগার হাজারের মধ্যে খরচ লাগিলে। এখন "দশ হাজার, তিন শ" বলা হইল, তখন বুঝা গেল যে প্রকৃত খরচ আর এক শ টাকার মধ্যেই থাকিবে। এই অঙ্কই সাধা বলিবার বা পড়িবার সময় বামদিক হইতে বা সর্বোচ্চস্থানীয় মানের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করা হইয়া থাকে। গুণনের সময়ও এই একই নীতি। যদি ৩০৪৭ দ্বারা গুণ করিতে হয়, ৭ দ্বারা গুণ করিলে যে আংশিক গুণফল পাওয়া যায়, তাহা হইতে নির্ণেয় গুণফলের মোটামুটি ধারণাও জন্মে না; তিন হাজার দ্বারা গুণ করিলে কতকটা ধারণা জন্মে। ৩, হাজারের ঘরে আছে। ৩ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল হাজারের ঘরে রাখিলেই ৩ হাজার দ্বারা গুণফল পাওয়া গেল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ গুণকের বামদিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করিয়া গুণন করিলে

প্রথম হইতেই গুণফল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মিতে থাকে। এইরূপে গুণন করিতে গেলে, গুণকের সম্বন্ধিত • দ্বারা গুণনের অনাবশ্যকতা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যথা, ৩০৪৭ দ্বারা গুণ করিতে হইলে ৩ হাজার ও ৪৭ দ্বারা গুণ করিতে হইবে বুঝা যায়। • দ্বারা গুণনের কথা মনে আণা উচিত নহে। কিন্তু মেট্রিকউলেশন পত্রীকারও গণিতের প্রারম্ভে উক্তবে গুণনের অঙ্ক • দ্বারা গুণনের ফল স্বরূপ এক দ্বারা • দৃষ্ট হইয়া থাকে। হুঃখের বিষয় এই যে আমাদের বঙ্গদেশের কোনও ইংরেজি পাটীগণিতে দেখা আছে যে, গুণকের একক স্থানে হইতে আরম্ভ করিয়া গুণন করাই সর্বোৎকৃষ্ট সুবিধানমূলক। এই সুবিধা কার্যমূলক, বাস্তবিক নহে। কারণ, ইহা বহু দিনের অভ্যাস হইতেই উৎপন্ন। আরও পরিভাষার বিষয় এই যে, ভাইন দিক হইতে গুণনের প্রণালী দেখাইতে গিয়া আমাদের বঙ্গদেশে একখানি অন্ত্যস্ত সম্ভূত ইংরেজি পাটীগণিতে আংশিক গুণফলগুলি একত্র উত্তরানীতভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, উত্তরের কোনও অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। হুঃখের যে অসাবধানতা বা চিত্তাশক্তি-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুণনের এই আধুনিক প্রণালী শিক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক পর্বেতে গুণনের প্রক্রিয়া সহজে আয়ত্ত হয়। গুণনে পটুতা না থাকিলে, পাটীগণিতের বিজ্ঞা শুভ কার্য-করী হইতে পারে না।

ভাষা—ভাষার যে প্রণালী আমাদের দেশে আজকাল প্রচলিত আছে, তাহা কোন-কোনও দেশে একেবারে পরিভ্রান্ত হইয়াছে, কোন-কোনও দেশে পরিভ্রান্ত হইতেছে। আজকাল ইতালীয় প্রণালীতে (Italian method) ভাষার পদ্ধতিই অন্ত্যস্ত দেশে পূর্ণ-প্রচলিত পদ্ধতির স্থান অধিকার করিতেছে। আমরা ভাষাকলের যখন যে অঙ্কটি বাহির করি, ভাষক ও সেই অঙ্কটির গুণ ফল আংশিক ভাষার নীচে রাখিয়া অবশিষ্ট বিয়োগের সাহায্যে দ্বিগুণ করিয়া থাকি। ইতালীয় প্রণালীতে ঐ গুণফল একেবারেই লিখিত হয় না, গুণন ও বিয়োগ একই প্রক্রিয়াতে সম্পাদিত হয়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাভ হয়, প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত হয় এক কাগজ রক্ষা হয়। ইতালীয় প্রণালী সম্বন্ধে D. E. Smith

(Professor, Columbia University, New York) তাঁহার Teaching of Elementary Mathematics নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "the introduction of the 'Italian method', which we commonly use, was a great improvement." অর্থাৎ যে ইতালীয় প্রণালী আমরা (অর্থাৎ আমেরিকাবাসিনগ) সচরাচর ব্যবহার করি, তাহার প্রচলন দ্বারা পাটীগণিতের অত্যন্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, আমেরিকার ইতালীয় প্রণালীই ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে Hall ও Stevens, এবং Dexter ও Garlick ইতালীয় প্রণালীর প্রচলনই অস্বাভাবিক করিয়াছেন। ইংলণ্ডে নৈমিত্তিক আধুনিক প্রত্যেক পাটীগণিতেই ইতালীয় প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং ইহার সুবিধা প্রত্যেক ক্রিয়ায়ই উপেক্ষিত অনেক পাটীগণিতে উভয় প্রণালী অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া পাপা-পাপি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাগের প্রক্রিয়ায় ভাগ্যের উপরে ভাগকল স্থাপন করাই অস্বাভাবিক রীতি। ইহাতে ভাগকলের প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয় মান স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের দেশে পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে ভাগ্যের ডাইনে ভাগকল রাখা হয়। ইহাতে ভাগকলের অঙ্কের স্থানীয় মান সহজে বোধগম্য হয় না। এই ভুলই দশমিক ভাগ্যের ভাগে ভাগকলের দশমিক বিন্দু বসানো স্থাপন করিতে হেট্রিকিউলেশন পদ্ধতিগুলির অনেকও ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু ভাগ্যের উপরে ভাগকল লিখিলে, প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয় মান স্পষ্ট হয় বলিয়া, ভাগকলের দশমিক বিন্দু বসাইতে ভুল হওয়াই অস্বাভাবিক। Dr. Workman লিখিয়াছেন, "It is recommended that *Partial Products* of a Multiplication should be arranged to slope from left to right and not from right to left as is sometimes done and that the *Quotient* of a Division should be placed *over*, and not to the right of the dividend." (School Arithmetic, page 10) অর্থাৎ গুণনের প্রক্রিয়ায় আংশিক গুণফলগুলি বাঁকে-মাঝে যেমন ডাইন দিক হইতে বাম দিকে বাঁকাইয়া রাখা হয় সেই রকম না রাখিয়া বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে বাঁকাইয়া রাখাই উচিত, এবং ভাগের

প্রক্রিয়ায় ভাগকল ভাগ্যের ডাইনে না রাখিয়া উপরে রাখাই উচিত; সত্বেও যেমন এই পদ্ধতিই অগ্রগণ্য করেন।

গ. সা. গু. — ভাগের ইতালীয় প্রণালী প্রচলিত হইলে গ. সা. গু. নির্বাহ করিবার প্রণালী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। ভাগের প্রক্রিয়ায় শূন্যতা লাভ করিলে, ভাগ্যকে ভাগকের দ্বারা রাখিয়াও ভাগ করা যাইতে পারে; এবং ভাগকল ভাগ্যের দ্বারা রাখিতে পারা যায়। এইরূপ করিলে গ. সা. গু. বাহির করিবার প্রক্রিয়ায় কোনও ভাগককে ভাগ্যরূপে ব্যবহার করিবার পূর্বে পুনরায় অঙ্ক স্থানে না লিখিয়াও ভাগের কার্য সমাধা করিতে পারা যায়। এই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে একটা অঙ্কের মাত্র বসাইতে কাগজ লাগে, ততটুকু কাগজে অঙ্ক হইতে অঙ্ক কমায়াসে করা যাইতে পারে। পত্রিকা ক্রিয়া দেখা গিয়াছে যে, উপরে-উক্ত কয়েকটি প্রক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত প্রণালী শিক্ষা করিতে ছোট ছোট ছেলেরদের পক্ষে, নূন বিঘর শিক্ষাগ্রনিত স্বাভাবিক অসুবিধা বাতীত, অল্প অসুবিধা হয় না।

সামান্য ভাগ্য—(ক) কতকগুলি ভাগ্যের মধ্যে ছোট-বড় ভুলনা করিয়া দেখিতে হইলে, সাধারণ হ্রস্ববিশিষ্ট করাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু অনেক স্থলে ভাগ্যগণিতিক সাধারণ লববিশিষ্ট করিলে অথবা এক করিয়া লইলে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। অবস্থা বিশেষে সাধারণ রীতির পরিবর্তন করা উচিত। না করিলে, বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়, ইহা শিক্ষাবিদগণকে বুঝিয়া দেওয়া কর্তব্য।

(খ) অল্প ভাগ্যের হয় ও লবের ভাগ্যগণিতের হয়ের গ. সা. গু. দ্বারা হয় ও লবকে গুণ করিলে উভারা অথন্ত সংখ্যায় পরিণত হয়। তাহাতে অনেক সময় প্রক্রিয়া অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়, সময় ও পরিশ্রমে লাভ হয়, এবং ভুল করিবার সম্ভাবনা কম থাকে। সত্বেও পাটীগণিতেই এই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পাঠক, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে লব লব নিয়ম অত্যন্ত বেশে অভিজ্ঞতার ফলে পরিচয় হইয়াছে, আমাদের শিশুরা আর কত কাল সেই নিয়ম শিক্ষা করিতে থাকিবে? পাটীগণিতের কয়েকটি নিয়ম শিক্ষা দেওয়াতেও কি আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিব? আমাদের ছেলে মেয়েদিগকে কি বিশেষত্ববীর্য সাধন করিয়া ভাগিতে চেষ্টা করা উচিত নহে?

দাদা-ম'শায়ের বে

[কৌতুক-চিত্র]

[শ্রীশৈলবালা বোধজায়া]

(কথার কথার দ্বন্দ্ব !)

পত কন্যা first year class'এর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। ভূপেন পরীক্ষাটা বেশ ভাল রকমই দিয়া আনিয়াছে; সুতরাং নিশ্চিত সাক্ষ্যের সম্ভাবনার তাহার মনটা খুঁই দৃষ্টি-গ্রন্থ ছিল। আর সকালে নিত্য-অধ্যয়ন ডন, কৃষ্টি প্রভৃতি ব্যায়াম সাহিত্য, ধন্যবোধান্তে পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, সেইমাত্র পাঠ্য-বইখানি খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় মালতুতো ভাই ভূষণব্রত আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূষণ আই-এল-দি পড়ে,—তাঁহার বাবিক পরীক্ষা করদিন পূর্বে শেষ হইয়া গিয়াছে। সে ভূপেনের সববয়স, — ছুই ভাইয়ে খুব ভাব। ছ-জনেই মাঝামাঝে থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে, যাতনেহ রূপানামবাব কলেজের প্রক্টোর।

ভূষণ ঘরে ঢুকিয়াই, চমকিত হইতে গৃহের ভাবৎ পদার্থের উপর সতর্ক দৃষ্টি স্থাপন—হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলিল, “এই ঘরেছে যে : ছুটির দিনে কুমারসভা ! ওহে রাধ, রাধ,—এখনি মৃগিল বেধে গায়ে।”

ভূপেন আরত-উজ্জ্বল চকু ছুটি তুলিয়া সবিনয় হাতে বলিল “ঘাউতঃ বন্ধু, হিরোতব ! কেবল একজামিনে পাস করবার জন্তে মাত, নইলে তোরা গিবি বদ্বি, ও বাপারে আমার একবিশ্বও সমগ্রভুক্তি নাই।”

“দ্রবণ, তোমার মঙ্গল হোক !” বলিয়া ধপ করিয়া ইলি-চোয়ালের উপর বসিয়া পড়িয়া, ছ'মিকের হাতের উপর ছুই পা তুলিয়া দিয়া ভূষণ সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—“আজ ছুটির দিনটা কি করে কাটান যায় ভাই ভূপেন !”

ভূপেন একটু ভাবিল; তার পর গভীর ভাবে বলিল, “কাকর মাখার গাঠি বাহুতে পাবলে বেশ মজা হয়, না ?”

ভূষণ বিজ্ঞানের ছাত্র; সুতরাং সকল বিষয়েই তাহার জ্ঞানটা একটু বিশেষবহুতক হওয়া উচিত ভাবিয়া, সে ততোধিক গভীরতার সহিত বলিল, “Certainly, but—”

ভূপেন এক মামতাদা উকীলের পুত্র; কাজেই আইনের অতি সচিব খোজ-খবর সে কিছু কিছু রাখিত; —অতএব তৎক্ষণাৎ উত্তরভাবে বলিয়া উঠিল “কথবা if যোগ করতেও পার ওখানে,—আইনে বাধে না—”

উগাশ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ভূষণ বলিল “ভাবাত, if নিরুপস্থ তৃষ্টিতে ও-আমাদের শোণীর দলটা উপভোগ করতে পারা যায়। ও কি !—”

হঠাৎ তাহারদের ছোটমামা চকলকুমার সতর্ক, নিঃশব্দ বিভ্রাল-মঞ্চ তুড়ক করিয়া ঘরের মেকের লাফাইয়া পড়িলেন ! ছোটমামা ভাগিনেয়র অপেক্ষা বয়সে তিন-চারি বছরের ছোট,—এ বছর সেকেন্ড-ক্লাসে উঠিয়াছে। নামের উপস্থিত চরিত্র, চুট। স্বভাবে মাতুল-জনাতিত গভীরতার আঁচ না থাকায়, ভাগিনেয়গণও তাহাকে উপস্থিত সম্মান, উপস্থিত মর্যাদা বেখাইতে নিতান্ত উৎসাহহীন ! ছোটমামাও অবশ্য তাহাতে বিশেষ কিছু মনঃপীড়িত নহেন।

পরম পুজনীয় মাতুল মহাপ্রসঙ্গে অমন ভাবে ঘরে ঢুকিতে যেখিয়া, ভাগিনেয়র কোতুহল-উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিতে উত্তর হইল; কিন্তু মামা পরম গভীর ভাবে উত্তরকে শুধু থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া, নিঃশব্দ-পদে পাঠগৃহের ভিতর-ঘরের দিকে সরিয়া গিয়া, ছত্রায়ের আড়ালে লুকাইয়া গাড়াইয়া উৎসুকভাবে কি যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভাগিনেয়র উৎসুকতাবে সেইদিকে চাহিল। মোলা ছত্রায় দিয়া পাশের ঘরটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে-

ছিল। উভয়ে দেখিল, ঘরের মেয়ের বলিষ্ঠা তাহাদের বড়মানার পুত্র—আট বছরের বালক মণিক ধোঁড়া খুঁড়ি আঁঠা দিয়া ছুঁড়িতেছে, আর তৎ তৎ করিয়া গান গাহিতেছে “প্রথম স্বপ্ন ছিলোম কোন ধর্ম্মে অন্যসক—” ইত্যাদি।

নিকটে বলিষ্ঠা তাহার ছোট বোন খুঁড়ি অবাক্ হইয়া বাধার “বিকৃ-কর্ম্মের” নৈশুণ্য দেখিতেছে।

প্রথম হু-হু গাহিয়া মণিক ঘোড়ের উপর আঠাটা টিপিয়া বসাইতে-বসাইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে গান বলিল :—

“বিঃসং হোল পৃথিব্যে ভক্ত্যে বাক্ষি বৃষ্টে,
এমন সময় দিলেন পিতা—”

অকস্মাৎ গিছন হইতে আসিয়া, তাহার পিঠে ভান-পা চাপাইয়া দিয়া, চকনকুমার হুহু হুহু দিলাইয়া আনুভূতি করিল,—

“.....দিলেন পিতা, পদাঘাত এক পূর্বে!”—

সব-সকল চকনের ভাগিনেরঘর পটাপটী হাততালি দিয়া উচ্চহাস্তে চীৎকার করিয়া একজন বলিল “Excellent!”

অন্যে বলিল “Bravo!”

একতঃ অপমান! তাহাতে আবার পূর্ব্বাহ্নে বড়বয়স করিয়া, ‘তুণেন-বা’ ও তুঃবাঃ-বাঃ’ মত মাননীয় বাহাগণকে লক্ষ্য রাখিয়া—এমন নির্দয় অপমান! খুঁড়ি, কাপড়, আঠার হাতা, লাঠাই, হুতা সব কেলিয়া, এক লম্বে উঠিয়া বাঁকাইয়া, বাড় বাঁকাইয়া ক্রুদ্ধমুখে মণিক বলিল “বাবা! বাবা!”

কাকা পরম দেহভরে চুনখুঁড়ি দিয়া আচমনের আবেশে চক্ষু মুদ্রিয়া উত্তর দিল “আহা! বৎস, বাছা আমার!”

ভাগিনেরঘর ততক্ষণে চৌকাঠের ব্যবধান ডিলাইয়া হাসিতে-হাসিতে রঙ্গমঞ্চে আবিস্কৃত। মণিকলাল কোন্দের উত্তেজনার মুখ রাঙা করিয়া বলিল “তুনি কিসের অন্তে আবার পিঠে লাথি মারলেন?”

চকল মাথা নাড়িয়া, প্রশান্ত ভাবে বলিল—“Should not make so far চটুং তার, যে যেহু, I have done this, only তোমার পিতার জবাবী!”

ভাগিনেরঘর এইবার পক্ষম হইতে—সোম্বা শপটে তর্কম্বর চড়াইয়া—বিপুল আনন্দে অট্টহাস্ত করিয়া উঠিল।

দাদাদের এই নির্দয় ব্যবহারে নিম্নরূপ নর্থবেদনার অবির হইয়া নিকপার মণিকলাল হুঁধাত উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া অধীরভাবে লক্ষ্য-লক্ষ্য করিয়া ক্রোধ-কপিত ওঠে বলিল, “কী! পিতার জবাবী! বাবার জবাবী! ওঃ ভারী তো পিতা! ভারী তো! উনি আমার পিতা! এঃ, বাবা—ভারী তো বাবা!”

তুণেন ও তুঃবের নিঃশব্দ কৌতুক-আনন্দ-বিচ্ছুরিত হস্তধ্বনিতে সমস্ত গৃহস্থানা মুগ্ধ হইয়া উঠিল। মণিকলাল সমস্ত মল হইতে তোলা কুণ্ডো টিংড়ির মত বহনয় তিড়ি-তিড়ি করিয়া লাকাইতে লাকাইতে, সেই এক “পিতা” লম্বকে লক্ষ্য করিয়া লুকা-আক্রোশে অল্প অর্থহীন বাঁকা বর্ণন করিতে লাগিল। চকল অচকল ভাবে উচ্চমুখে চাহিয়া, বেওলালের গারে লবমান পক্ষম অর্জের চিত্র-সম্মিলিত এ বছরের ক্যালেন্ডারখানা নিপুণ মনোযোগ সহকারে দেখিতে-দেখিতে, বিজ্ঞ ভাবে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

অনর্থক বক্তাবলিতে হ্রাস্ত হইয়া, মণিকলালের মাথার হঠাৎ এক সার্থক, সমর্থপূর্ণ হুঁহুঁহু উদ্বহ হইল। লাকাইয়া আসিয়া অন্তঃপুরের দিকে জানালায় মুখ বাড়াইয়া প্রাণপণ চীৎকারে এক নিঃশব্দে সে অভিযোগ ঘোষণা করিল—

“ওহা, বা, তনুহ,—পোন, কাকা বলছে, উনি আমার বাবা হবেন—”

এবার চকলকুমারের অচকল গাশীর্ষা টলিল। মাথা নাড়িয়া লুচ্ তৎদনার মত সে বলিল,—“আহাশব্দ বাঁধার! আমি তাই বহু! আমি বহু ‘পিতার জবাবী’ বলেছি—” মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পূলে ভাব, ও কণাটা Present perfect tense ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না, আর তুই কি না আকাট গোঁয়ারের মত ওকে ঠেসে বিশি ডাফ future tenseএর দাকার। তুই নিশ্চর মরে এবার বক্তকণা তুত হয়ে জমাখি।”

মণিক সন্তুষ্ট হইয়া গেল। এ জন্মের এই হৃদয় টুকুটেকে সৃষ্টি—বে মনোহর সৃষ্টি দেখিয়া, প্রীতিমুগ্ধ হইয়া, ঠাকুরমা আমার করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন—“মণিক-লাল,”—সে সৃষ্টি কি না, ব্যাকরণের বিধি-লম্বনের দোষে, জন্মাতরে কর্ম্ম ক্রুৎসিত দ্বক-কাটা তুতে পরিণত হইবে! সত্যই কি সে এত বড় মহাপাণ করিয়া কহিল! সন্দেহ

করিবারও পথ নাই—যেহেতু ব্যাকরণ-বিদ্য মনোপত্তিত
কাকার শ্রীমুখে ই নিদারূপ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত
হইয়াছে।

মাণিক ভাষাচ্যোকা বাইরা ভূপেনের মুখপানে
চাহিয়া শুককণ্ঠে বলিল, “হ্যা ভূপেন দা, সত্যি তাই হয়—”

মাণিকের উপর আন্তরিক স্নেহের টানটা কিছু বেশী
থাকায়, ভূপেন প্রায়ই তাহার পক্ষ লইয়া চকলের সঙ্গে
কিছু-কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে; কাহেই তৎক্ষণাৎ
বলিয়া উঠিল—“কখনো না, কখনো না! ও কথার বাধাই
নেই, তা হুণ্ড থাক্বে। মূলে ভুল! মূড়ার পর এবং
পুনরাহ্ন জয়দ্রোহণের পূর্ববর্তী অবস্থাতেই আশ্চর্য প্রেতব
বিশেষণ চম্পতে পারে,—অন্ধের পর, অর্থাৎ দৃষ্টিকাটা ভূত
হয়ে লক্ষ্যন একেবারেই অসম্ভব—একেবারেই!”

মাণিক এই পতিভী বাধ্যতার এক বর্ণও বুঝিল না;
কিছু বুঝিল, কাকার পাণ্ডিত্য এই পাণ্ডিত্যের ধাক্কায়
মূল্যনাৎ হইয়া পেল। যথোন্মাদে লক্ষাইয়া উঠিয়া, হো
হো শব্দে হাসিয়া, হাততালি দিতে-দিতে বলিল, “এইবার!
কেমন এইবার! হয়েছে তো! ইং, ভাতী কন্ডকাটা,
ভাতী কিউং টং শিখেছেন দ্বৈলে!—হঁ!—আবার ‘পিতার
লবানী’ বলতে এসেছেন! ভাতী তো!”

চকল নিঃশব্দে একটা মর্ন্তভেরী অবজার কটাক্ষ
হানিয়া ভূপেনের দিকে একবার চাহিল; তার পর নিবটস্থ
আর্ম চোয়ারখানার উপর তইয়া পড়িয়া দ্রব করিয়া গান
ধরিল—

“There is a wise awful গাধা

তিনি হচ্ছেন মাণিকের পিসুতুতো দাদা—”

মুহুর্তে ভূপেনের ঐক্যচ্যুতি ঘটিল। পুণী বাগাইয়া কষ্ট
শব্দে পে বলিল—“ভাণ্ডো চকল-বাবু, নিজের মান নিজের
কাছে। বেশী বাড়াবাড়ি কর তো আমি বাড়ির-বাড়ির
রাগ্‌বা না!—আমার মাণিক গাওনি বুন্ধে—হ্যাঁ!”

স্বপ্নমগ্নে চকল কোমর বাঁধিয়া কোমলের লজ্জা খাড়া
হইয়া গাড়াইল। মুখে-চোখে বধাসাধা উদ্ভেলনার ভাব
আনিয়া বেশ চড়া গলায় বলিল “তোমার কে বলছে
হে বাপু! তুমি কেন গারে পড়ে রগড়া করতে
আসছ?—”

উৎকণ্ঠিত ভাবে ভূপেন বলিল, “মাণিকের পিসুতুতো

দাদাটি কে, তিনি? আমি নয় তো—কে? আমার
বলনি?”

বাগা দিগা চকল বলিল—“তুমি! তুমি! তোমার
নাম করে বলছি আমি? মাণিকের পিসুতুতো দাদা আর
নাই? এই তো দামনে ভূষণ একজন আছে,—আমি
ভূষণকে বলছি, তোমার কি?”

এই প্রত্যেক প্রশ্নের উপর ব্যতিরেক ভ্রাতার তর্কটো
কেমন করিয়া চালাইতে পারা বাইবে, ক্রোধান্বিত ভূপেন তাহা
সম্ভবহিতে পারিল না, অতীত হইয়া বলিল “ভূষণকেই
বলবার তুমি কে? তোমার একুতার কি বল তো,—জানো,
এ রকম অবস্থার একজন বাহুব আর একজন বাহুবের
নামে ডিকামেশন হ্যাট আনতে পারে!”

বাক্যবরে চকল বলিল “হ্যাঁজ্ঞে—”

ঈশুপ্ত উদ্ভেলনার ভূপেন বলিল, “বাও তুমি আমাদের
পড়বার ঘর থেকে! স্বর্গদার, আর এখানে ঢুকা না, বাও
বলছি—আচ্ছা, আশ্রন আর দামদামশাই বাড়ীতে, আমি
নিচের বন্ধ, চকল-বাবু এসে আমাদের পড়ার বাগ্‌ঘাত
করেছে, লকালে আমাদের পড়তে দেয় নি। হঁ; নিজের
পড়া নাই, কিছু নাই,—খালি ছিট খুঁজে পরের সঙ্গে রগড়া
করা! আমি আর দিদিমাকে সব বলব, গাড়াও—”

উৎসাহের সজ্জিত লাগাইয়া উঠিয়া মাণিক বলিল
“আমিও বলবো”—ভজ্ঞনি বেলাইয়া পুনশ্চ বলিল “সব
বলবো, ছাদের ওপর মাঝবেল খেলার জর গাবু কটার
কথা বলবো, ফুল-মাচোর চুরির কথা বলবো, চানাচুর
ভাঙ্গার কথা বলবো—”

বাগা দিগা বাহুবরে চকল বলিল, “এবং—গোলাপ ফুলট
লও—তার ইংরেজি কি?—না ‘the rose is take’ সে
কথাও বলবো। বুন্ধল হে ভূষণ, তোমার মাতার যদি
কখনো তোমার বলেন যে, ‘গোলাপ ফুলট লও;—তার
ইংরেজি কর তো হে বাপু’—তুমি তুম্বনি বলো—the
rose is take বুন্ধল?”

বাগা বাহুব মাণিকের মাতারের কাছে মাণিক একলা
ঐ পরীক্ষা দিয়াছিল।

মাণিক রাগে লজ্জার অতীত হইয়া বলিল—“বেশ, বেশ,
—তুমি তো খুঁষ বিধান, তুমি ধাম! তাই সেদিন লামাবাবুর
কাছে—সেই—হঁ;—” কি প্রশ্নের কি উত্তর দিয়া যে

কাকা অল্পতাকার্য্য হইরাছিল, মণিকের সেটা আদৌ বোধগম্য হয় নাই; কাবেই শুধু “হুঃ!” বলিয়া সেইখানেই থাথিয়া পড়িল।

ভূপেন্ত্র ভূপেনের চেয়ে মাদ কতকের ছোট হইলেও, ভূপেনের মত অত খেলো-প্রকৃতির মানুষ ছিল না,—সহজে উত্তেজিত হইয়া কণ্ডা কাটিতে লাগিত না,—সকল বিষয়ে বেশ একটু সংযত সহিব্যক্তের পরিচয় দিত। এতকণ সে চুপ করিয়া ছিল; এবার ভূপেনকে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া কি একটা কথা বলিতে উত্তত দেখিয়া—তাহাকে বাধা দিয়া দীর ভাবে বলিল “শোন, শোন—”

টিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের রাত্তা হইতে ক্রতোচ্ছারিত কণ্ঠে হুইজম ডাকিল, “ভূপেন বাবু, ভূপেন বাবু—”

মুহূর্ত্তে সকলে সংযত হইয়া গেল। ভূপেন পড়িবার ঘরে আসিয়া বলিল, “কে সতীশ? বিনোদ? এদ, এস।”

সদে-সদে এ ঘরের সব লোক কয়টি ওঘরে সিঁধা ছাঙ্গির হইল। সতীশ ও বিনোদ নামক ভূপেনের সহাধ্যায়ী বন্ধু-দুটি ঘরে ঢুকিল। সতীশ ব্যস্ত স্বরে বলিল “এই যে মণিক, চকলমামু, হুজনেই আছে, বেশ। শোন, তোমাদের বুড়োটি আসছেন এখানে। ওহে ভূপেন, তুমি বোলো আমি এলাহাবাদ থেকে আসছি। নিঠাবান গোঁড়া হিন্দু আমি, পরম বৈষ্ণব,—আর কস্তারগ্রস্ত। নগর তিনটি হাঙ্গার ঢাকা, হুশো বিধা দেবোত্তর জদি, আর একটি বিষ্ণু বিগ্রহ এবং একমাত্র কস্তার সমর্পণ করবার জন্তে একটা নিঠাবান বৈষ্ণব পাঠ খেঁজবার জন্তে এখানে এসেছি। তার পর ভূপেন তুমি ঘটকালী কোরো।—ভূষণ, তুমি আমার পক্ষে। চকল মামু, তুমি বরকর্ত্তা হোয়ে পড়ো। মণিক, তুমি নিঃস্বয় হবে।”

মুহূর্ত্তে কল-ভাঙাবের উদ্দান উত্তেজনা প্রহসনাত্মক অভিনয়ের উৎসবে পরিণত হইল। সতীশ ও বিনোদ গা হইতে ইল্লি-করা শার্ট খুলিয়া ফেলিয়া আন্টা হইতে এক-একটা চাদর টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইয়া নিকটস্থ সোফায় বসিল। চকল মামু চকল হইয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল, “আরে না—না, সতীশ মামু, আপনি সোফায় নয়, এই কবলের আসনে বসুন।—হী, ঐ টিক, একগাছা হরিনামের মালা হলে হাতে বেশ মানাতো, নয়?”

মাণিক উৎসাহের সহিত লাফাইয়া অন্তঃপুরের দিকে

ছুটিতে উন্নত হইয়া বলিল “গাফান, গাফান হরিনামের মালাটা চেয়ে আনি।”

খণ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া থামাইয়া, সতীশ উদ্দেশ্যেই সমগ্রবে নমস্তার করিয়া বলিল,—“আরে না,—না,—মে মালা কি নিতে আছে?—হিঃ,—Give not which is holy unto dogs.”

চকল বলিল “আবার চন্দন-কাঠের মালাটা দেব? এই নিম্,—ত্রাকেটের উপর হইতে মালা পাড়িয়া সে সতীশের হাতে দিল।

টিক সেই সময়ে বাহিরের দ্বারয়ে ঢুকিতে ঢুকিতে পকব কর্কশ কণ্ঠে এক বৃদ্ধ ডাকিলেন, “কপানাম আছে হে, কপানাম,—ওহে কপীন, কপীন হে—”

ভূপেন বলিল, “আজ্ঞে এই যে, মেধ-মা-মশাই,—আহ্নন, আহ্নন,—আমরা এইমাত্র আপনায় কথাই কইছিলাম,—আহ্নন।”

(কথায় কথায় ছন্দ)

বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিলেন। তাহার পরাণ সুইয়ের খাটো কাপড় ও শালা স্থানলের পিরাণ; গায়ে খাম অন্তঃপুরের শিশু হতে-খোন, মড়ির শুকতলাবৃত্ত কাধিগের জুতা। মাথার চুলগুলি সব শাদা, দাঁতগুলি কিন্তু একটাও স্থানত্রই নয়; গায়ের চামড়া সমস্ত কুঁচকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু মোতিঃহীন—ভাল করিয়া দেখিতে পান না; কিন্তু সেইকুঁচকাধরও কাছে স্বীকার করিয়া খাটো-হইতে তিনি আদৌ রাগি ন’ন। হাতে হরিনামের জুপি।

ঘরে ঢুকিয়া চারিদিক চাহিবার চোঁটা স্বভিতে-কব্রিতে বৃদ্ধ সহজারে মালা কাঙ্ক্ষাইয়া বলিলেন “আমার খুঁজিলে? কেন বল তো হে? দেই বাঁকী খাণনার নাগিনের শমনটা বুঝি এসেছে হা?”

ভূপেন বলিল “আজ্ঞে বাঁকী খাণনার শমন কি? এ মন্ত শমন!—এই বোঝা মশাই এসেছেন আজ এলাহাবাদ থেকে। এঁরই কথা আপনার কাছে সেমিন বলছিলাম। নগদ তিন হাঙ্গার টাকা, বিষ্ণু-বিগ্রহ, হুশো বিধে দেবোত্তর—আর পরম ধর্ম্মশীলা মেয়েটি, বৃন্দেন বাদামশাই,—আহা বহুন, বহুন, এই চেহারাটায় বহুন। এ বেত্তের ছাউনি চেহারা, কিন্তু অপকিছ নয়। খোখলা মশাই, ইনিই আমার

পতিত লোক, দয়া পাইকব। আর অধুনা বাবু তো সাক্ষ্যে ভক্ত অবসর, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন।”

চকল বলিল, “বাবু—এর পর কুটুবিতে হলে কি সে আলাপ-পরিচয়ের বাকী থাকবে? এখন—”

বাধা দিয়া গঙ্গা কণ্ঠে সতীশ বলিয়া উঠিল, “আহা, তাই বল বাবা, তাই বল,—তোমার মুখে ছন্দ-চন্দন পড়ুক, এইখানেই যেন কুটুবিতে করতে পারি! এমন বৎস, এমন সংগ্ৰাহ,—আহা লক্ষণ দেখলেই বৈক্যব চেনা যায়,—স্বায়ং মশার, সাক্ষ্যে নিত্যানন্দ অবতার! এ অদ্ভুত রহস্য কি আমার রাধাভাগ্যির অন্তরে আছে বাবা—” সতীশ বিজ্ঞপ-বিতার হইয়া ফোঁস-ফোঁস করিতে-করিতে চারদিকের খুঁটে চোখে মুহিতে লাগিল।

চূপণ সতীশ ভাবে বলিল, “আজ্ঞে, তার অনেক কিছু বিধা করবেন না। সেই জন্মেই তো আপনাকে আনান হোল। আপনি নিজের চোখে দেখাই দেখে বেন। আমায় পাশে, পাশেই কি আর বল—কিন্তু এমন বৈক্যব চূড়ান্তে বুঝলেও পাবেন না।”

সতীশ হাট হাট করিয়া দস্তর দস্ত এক চোট কাঁদিয়া গিয়া বলিল, “আহা, সে কি আর বলতে, না সে সব শুনতে আমার বাকী আছে? আমি এত আরাধনা করে এসেছি কি মাঝে! এখন দয়া করে উনি যদি গঙ্গাপ্রাণে ঠাই দেন,—যদি কতাবাদে অধুমতি করেন, তবে আরই আমার সাতপুরুষ সন্যাসের বৈক্যে চলে যাবে!” সতীশ আবার মুখে কাপড় ঢেঁপিয়া উজ্জ্বল তরে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কান্না ছুড়িয়া দিল।

বুড় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মাগা কাঁকাইয়া, অনেক কণ্ঠে, নিত্যন্ত অস্বাভাবিক স্বরধ্বনির একটুখানি সলজ্জ-ধ্বনির-স্বচক কণ্ঠ-ধ্বনি হাঙ্গিয়া—কণ্ঠের একটু নরম করিয়া বলিলেন, “তা—তা, আপনারা কখন এলেন? এইখানেই কি প্রথম পদার্পণ হোল? কপালানগের সঙ্গে দেখা হয়েছে?”

চূপণ বলিল, “আজ্ঞে না, তিনি যে ভিপুটী বাবু ছেলেকে পড়তে বেরিয়েছেন, এখনো তাঁর আসতে চের দেবী, উনি তো এই বাড়ী আসছেন। এই আপনাদের কথাটি জিজ্ঞাসা করছেন, আর আপনি এলেন—”

মাণিক ইতিমধ্যে গুটি-গুটি চরণে ঘরে ঢুকি গেলেন, এবার প্রাণপণে সাহস স্বর করিয়া বলিল, “নাথ কবুতেই আপনি এলে পড়েছেন দাদামশাই, আপনি অনেক দিন বাঁচবেন—”

এই কথাটি শুনিলে, বুড় চিরদিনই বড় খুশী হন। আজ অত্যধিক খুশী হইয়া বলিলেন, “বাঁচবে, বাঁচবে—অনেক দিনই বাঁচবে—কি বল, এঁটা? তা বাঁচবে বৈ কি! হরিনামের ঘোর হে,—হরিনামের ঘোর! এই বরেন্দ্রে আমার মত কটা লোক পথ হারিয়ে পাবে বল বেবি? আর দাঁত,—এই দেখো একটাও পড়ে নি, আমার বড় বাটা ভরতের দাঁত—সে তো একটাও, একটাও অবশিষ্ট নাই; কিন্তু আমার দাঁত সবই রয়েছে!—হঁঃ! হরিনামের ঘোরে হে!”

সতীশ টুকুটুকু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “তার আর সম্বন্ধ কি বাবা! সাথে এসে ঐক্যবৎ আশ্রয় নিয়েছি। এখন দয়া করে এ অভাগার হার উদ্ধার করুন, রাধাভাগ্যিকে পারের তলার ঠাই দিয়ে তৃতীয়া করুন।”

সাগ্রহে বুড় বলিলেন, “কি? কি নাম বলেন? রাধাভাগ্যি? আহা, বাসো নাম। যে নামে জীব উদ্ধার হয়, আহা!”

চকল মাণিকের কাণে কাণে-কি বলিল। মাণিক একটু শিঙা হঠাৎ ভয়ে ভয়ে বলিল, “আজ্ঞা দাদামশাই, বিয়ের পর রাধাভাগ্যি ঠাকুরমাংসে আহার যদি রাধা-ঠাকুরমা’ বলে ডাকি, তা হলে আহারও উদ্ধার হবে তো?”

মহা উত্তেজিত হইয়া, লম্বা ছুতা ছুঁকিয়া, সন্দেশে ওজ্জ্বল আন্দোলন করিয়া বুড় বলিলেন, “আরে বাও, বাও, কাঁদিল ছোকরা সব! লক্ষণ কথার চেপেশী। উজ্জর যাবে সব! ঐ কাল্‌নিমিই তো উজ্জর দাঁতের বেং!” (অর্থাৎ হেঁচু)।

চকল ভাড়া দিয়া বলিল, “তাই বটে। এই মাণিকে, কেন বদমায়েসি করিল? ভারী বড় হেলে, পাশ—এ কি ঠাট্টার কথা?”

মাগা কাঁকুদী মিতে-মিতে, দস্তর করিয়া বুড় বলিলেন, “উজ্জর যাবে,—উজ্জর যাবে।”

দুই পক্ষ ভাড়া খাইয়া, মাণিকের মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিল—“আমি না দাদামশাই, কাঁকা আমার শিখিরে দিলে—”

তুয়েন, তুয়েন এক সঙ্গে হঠাৎ করিয়া উঠিয়া সে কথাটা নিশ্চিহ্ন রূপে চাপা দিয়া ফেলিল। বিনোদ ভক্তি-বিহীন কণ্ঠে বলিল, “আহা, তাই বল বাবা, তাই বল। তোমাদের ঠাকুরা হওয়ার দৌভাগ্যই বেশ আমাদের রাখারামের হয়!—মেরে নামের রাখারামি, কাজেও রাখারামি! মেরের বয়স তের-চৌদ্দ বছরের বেশি হবে না; কিন্তু ব্রাহ্মণ-বৈক্যে কি মিঠা, কি ভক্তি! অমূল্য রাখারামি ঠাকুরবাড়ীতে দিনান্তে কুড়ি পচিশটি বৈক্য-মুষ্টির সেবা হয়,—তা সেই রাখারামি নিজে তাদের পা ধুইয়ে দেবে, তিন প্রহর পর্যন্ত উপবাস করে থেকে তাদের সেবা-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করে দেবে, পদসেবা করবে—কি ভক্তি মেরের! দেখলে চকু জুড়ায়.....” ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনোদ বাড়ী আত্মকথা ব্যাপী, একটানা হৃদয়ে একাগ্র বক্তৃতা করিয়া গেল। গৃহস্থ সবাই শুক।

বুড় এক মনে (?) মালা ভণিতে-ভণিতে পরম মনো-যোগের সহিত বক্তৃতাটা শুনিয়া উঠিলেন, কিছু বলিলেন না। কিন্তু লগাটের দাঁত শিরার বেশ একটু চিন্তায় লক্ষ্য দেখা গিল। তুয়েন ভীত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখভাব পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, “সেখন অমূল্য বাবু, আপনাকে সোজাপ্রাণি কথা বলে দিই,—আপনি তো মেরের বাপ, আপনিই বুঝে গুন। দাদামশায়ের কি আমাদের এরই মধ্যে বিয়ে করার ব্যবস্থা গেছে, না উনি সন্তাই তেমন অবদর বুঝে গিয়ে পড়েছেন? এই তো বোটে ঠর দ্বিহান্তর বছর বয়েস, এই বয়েসে কত কুনীন ব্রাহ্মণ—কত বড়-বড় বনৌী কামর—চতুর্থ পক্ষ থেকে চতুর্থ পক্ষ পর্যন্ত পার করে দিচ্ছে,—তাদের তুলনায় উনি তো ছেলে মাছ! এই দেখুন, এখানে ঠর একটাও গাত পড়ে নি। কেমন স্বস্তির পথ হাটেন, আর কি রকম হোজ আওয়ারে কথা কইতে পারেন, সে তো আপনারা দেখছেন! আমরা অন্ত হোজের কথা কইতে গেলে বোধ হয় লাংস্ কেটে মরে যাই—আর উনি—”

তুয়েন বল করিয়া বলিল, “তুতু চোখটাই বা একদম গেছে।”

বুড় মনে করিলেন, কথাটা সুবি তুয়েনই বলিল।—তৎকালীন সংকোপে জুতা চুড়িয়া বস বিনোদে হুজুর করিয়া বলিলেন, “ওহে শা—” আমার চোখ গেছে। তোমার

হৃদয়ে গেছে, না? তোমাদের মত চন্দা-পরা বাবু না হলে চোখ থাকে না, নয়?” প্রসারিত হস্তে তর্কনি আন্দোলন করিয়া বলিলেন, “আরে বাও, বাও, তোমাদের মত ফড়কে ছোঁকরামের সঙ্গে আমি কোন কথা কইতে চাই না—আম্রন মশাই, আম্রন আপনারা আমার বাড়ীতে, সেইখানে সব কথা হবে—”

বুড় সত্য-সত্যই উঠিলেন। বিনোদও তৎকালীন উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “আরে করেন কি, করেন কি রায় মশায়, ডেসেপের কথা কি ধরুবা! কে ওদের কপার কপা দিচ্ছে! বস্তুক না ওয়া কি বস্তু?”

উপর্যুপরি বাড় নাড়িয়া রোখ-ভরে বুড় বলিলেন, “না,—না, মশাই, এখানে বসে ও সব কথা হবে না—ও সব ‘তোদরি’ ছেলে! ‘তোদরি’ ছেলে! ওদের সামনে আমার কথা কইতে আছে?—না, আমি ওদের সামনে কোন কথা কইব না, আমি চলুম!”

চকল সবিনয়ে বলিল, “বহন জ্যাঠামশাই, বহন,—একটু তামাক খেয়ে যান—”

বিনোদ সনির্বন্ধ অহুরোধের স্বরে বলিল, “আমি ব্রাহ্মণ,—অমূল্য মেরের কুল-পুত্রোচিত, বিনিদ বাড়ুঝো আমি,—বাবা, আমার কথা রাখুন,—ওদের ওপর রায় করবেন না বাবা, বহন তামাক খান—” বিনোদ হোজ করিয়া বসাইল। তুয়েন বাহিরে গিয়া চাকরকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিল।

বুড় অগ্রসর যুগে, কিংবদন্তে মালা ভণিতে লাগিলেন। চকল অতীত জোবল কণ্ঠে বলিল, “বাস্তবিক জ্যাঠামশায়, ঠিকই বলেছেন. এদর কথা এখন এখানে বসে হবে না। বিকেল বেলা জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতে গিয়ে ও-সব কথা ঠিক করাই উচিত। সে বেশ নিরীহিলা ব্যাঙ্গা—ছোপোদের সোলমাস কিছুই নাই। বৈকালে আমি শুধু সেখানে থাকুব। সে-বজা আর বাড়ুঝো মশায়, আপনারা দয়া করে সেইখানেই আজ পায়ের ধুশা সেবেন। আর সেখান, মেরেটকে শুধু বহন আপনারা সঙ্গে করে এনেছেন—তিনি এখন আপনার বহুর বাড়ীতে রয়েছেন তো (গোগনে বাপিকের দিকে আঙুল দেখাইয়া)? বৈকালে তাঁকে শুধু নিয়ে আসবেন—জ্যাঠামশায় নিজের চোখেই তাঁকে দেখে সেবেন। সেইটেই ভাল হবে, না বাড়ুঝো মশাই?”

বাড়ীয়ে মশাই উজ্জ্বল ভরে বলিলেন, “খুব ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল!” সে আর বলতে ? রায় মশায় ঘেঁষে দেখে যদি মত করেন, তবে চাই কি—কালই হৃতহিস্ক বোগে শুভ বিবাহটা প্রলম্পন করে দিয়ে তবে আমি দেশে কিরব ?”

কপালে দাশা ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে-করিতে বৃদ্ধ দৈবৎ বাগ্ৰতাড় সহিত বলিলেন, “কাল কি লয় আছে ?”

বিনোদ বলিল “খুব ভাল লয়।”

একটু আনন্দ-আনন্দ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন “তা—তা—টিফ্টি-টিফ্টি হেলানর কি হবে ?

বিনোদ বলিল “তা ! তার ভুলে চিত্তা কি ? বৈকালে আমি একজন জ্যোতিষীকে যোগাড় করে ঐ সঙ্গে নিয়ে যাব।”

চকল বলিল “হ্যাঁ, সেই ভাল কথা। যেখান, আর এক কথা,—এখন আমাদের প্রথম কিছূ করা হবে না। বিয়েটা এখন আপনাদের আশীর্বাদে নিঃশিঃে আগে চুকে যাক, তার পর প্রথমের কথা ! কেন না, বৃদ্ধতাই পারছেন,—আজ ত্রিশ বৎসর আমার জাঠাই-না মাতা গেছেন,—জাঠামশাই আর দারপরিগ্রহ করবেন না-ই স্থির করে-ছিলেন। এত দিনের পর, এ শুভ—”

তুপন বলিল “কেবল আপনাদের কস্তার উদ্ধার করবার চক্রেই—”

তুপন বলিল, “আর আমার একান্ত অমুরোদেই রামি হয়েছেন। আপনার কথা সবই ভঁকে বলেছি। মগর তিন হাজার টাকা, দু’শো বিধা জমি, বিজু-বিগ্রহ, আর অমন চমৎকার মেয়ে!”

এবার হঠাৎ সাতিশর প্রায়তা সহকারে বৃদ্ধ বলিলেন “তা সে বাই হোক। বিয়ে আমি করবই ট্রিক করলুম। এখন এ কথা আমার কোন আশীর্বাদে বলবেন না, আমার ভাইকেও না—”

চকল তৎক্ষণাৎ বলিল “না—না, বাবাকে বলবার দরকার কি ?—আর বাবা শুনেই বা করবেন কি ? আমার হয়েছি, আদর্য এখন যোগাড়-সোপাড় করে—আগে দু’হাত এক করে বিই, তার পর—”

তুপন বলিল “তার পর বৌভাতের দিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পেট ভরে খাইয়ে দিলেই হবে। তবে কাল যদি

বিয়েটা হয়, তা’হলে ‘জাত্যতিক হরণ’টা যোগ্যে একজনকে করতে হবে তো, তা চকল দাদা, তুমিই করো। আজ তাহলে ভোমার বোধ হয় নিরান্বিত খেতে হবে,—না বাড়ীয়ে মশাই ?”

বাড়ীয়ে মশাই বলিলেন “হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিরান্বিত।”

তার পর সেইখানে বসিয়াই—আগামী কাল যদি সভাই বিবাহ হয়, তবে কি-কি আয়োজন-উত্তাপ করা হইবে, সে সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিব্রাৎ প্রস্তত হইয়া গেল। তুপন বলিল “বাণিক হবে নিদ্বন্দ্ব, কি বলুন দাদা-মশাই ?—”

চিন্তিত ভাবে বৃদ্ধ বলিলেন “তা বেন হোলি যে। কিন্তু কলকেই যদি বিয়েটা সত্তি হয়, তা’হলে সদর আর কৈ ? এর মধ্যে কি সব গোছান হবে ?”

বৃদ্ধ মুশাইয়া তুপন বলিল, “কিছু ভাববেন না দাদা মশাই, আমরা সব সামলে নেব। আমি আছি, তুপন আছে,—আরো ছই-একটি বিধানী বন্ধুকে সঙ্গে নেব, বাস ! তার পর ? আমরা কি তত্ত্বলোক অহুতুল বাবুকে ‘অভ্রম’ হতে দেব, না আপনাকে কোন অনুবিধায় পড়তে দেব...” ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে কাল কুচুহুচে চেহারা হিন্দুস্থানী ভূতটি শালপাতার তোঁটা ও কলিকা হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধের কাছে আসিয়া বলিল “কি নেন্ জিঠা মুশা—আমি রামভজন চাকর—”

বৃদ্ধ চোখে ভাল দেখিতে পান না, সেইজন্য রামভজন বখনই তামাক খিতে আসিত—তখনই আগে নিজের পরিচয়ট দান করিত। কিন্তু আজ হিতে-বিপরীত ঘটিল; ভজন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন “রামভজন কি রে ব্যাটা ? রামভজন কি ? গোবিন্দ-ভজন বল !”

তুপনের চোখে ইসারার টেলিগ্রাফ পাইয়া রামভজন দয়া আগতির সহিত প্রতিবাদ করিল,—“কেনে জিঠা মুশা, গোবিন্দ-ভজন বল্ কেনে ? বাপ মারে দাদার নাম রাখিয়েসে রামভজন,—হামি রামভজনই থাক্বে ? গোবিন্দভজন হোবে কাঁহে,—”

সম্বন্ধে ভূতটি ক্রীড়া বজ্র-স্বকারে বৃদ্ধ বলিলেন “তবে রে ব্যাটা ! গোবিন্দ-ভজন হবি না, বিস্কালো আবি আমার সামনে খেচক !”

রামভঞ্জন কলিঙ্গ। দিতে-দিতে বিহিহুরে বলিল—
“ঐ! ভিঠা মুগা, ই-তো আপনাবু বড়। ছুসুখাতি! সূহৃৎ পশায়ন করিল।

হানার বাপে-মায়ে বো নাম রাবিয়েসে, গো নাম কি—”

পুনঃ ছুতা চুকিয়া বুদ্ধ বলিলেন, “আলবৎ বদল্ করনে
যোগ। রামভঞ্জন! ও তো রোজ্জ নাম।—আমাদের
ইষ্ট দেবতার নাম গোবিন্দ,—বল বাটা গোবিন্দভঞ্জন!”

মহা বিম্বে রামভঞ্জন বলিল, “তা ভিঠা-মুগা, হামি
আপনার তানাকুল দাধনেবালা নোকর, হামি আপনার
ইষ্ট দেবতা হব কেনে, হানার পাঁপ দাগবে যে।”

উৎকট পন্দনে বুদ্ধ বলিলেন, “ওবে রে বাটা!”

সহে-সহে অশ্রাব্য কটুক্তি!—চকলের ইকিতে রামভঞ্জন

অনেক সাধা-সাধনার ঠাণ্ডা হইয়া, দুই টান তানাক
টানির,—তার পর বৈকালে কন্ডাকর্তা, ধোতিবী ও কুল-
পুত্রোহিতকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে দিয়া পাকা বন্দোবস্ত
টিক করিবার জন্য বসিয়া বুদ্ধ উঠিলেন। বাইবার সময়
যেহেটকে শুদ্ধ লইয়া বাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বসিয়া
গেলেন।

(আগামীবারে সমাপ্ত)

বিবিধ প্রসঙ্গ

রসনাগর

বর্ণনাত্মক কবি কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য

[ঐপূর্ণচন্দ্র দে উড়টনাগর বি-এ]

(৩১)

শান্তিপুর-নিবাসী কোন ভক্তস্নানক একদিন রস-নাগরকে কহিলেন,
“হাশাশ! বর্ণনাত্মক জেবায়ল হেট্টেল কি হুরে কান্তবাহুর বাড়িতে
দিয়া আশ্রয় লইয়া আবার কহিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে বর্ণনা
কহিতে হইবে।” তখন রস-নাগর কহিলেন, “আমনি আমাকে এ
সময়ে একটা লম্বা বিন। তাহা হইলেই আমি এই বিষয় বর্ণনা
কহিতে পারি।” ইহা শুনিয়া উক্ত ভক্তস্নানক এই লম্বাটী পূর্ণ
কহিতে নিষেধ,—“হেট্টেল ভিনার বান্ কান্তের ভবনে।” রস-নাগর
ইহা এইরূপে পূর্ণ কহিয়াছিলেন—

লম্বা—“হেট্টেল ভিনার বান্ কান্তের ভবনে।”

হেট্টেল লিখা-ভরে হইয়াই ভীত

কান্তবাহুরাণে দিয়া হব উপনীত।

কোন হানে দিগ্গ আম লইব আশ্রয়,

হেট্টেলের মনে এই নিবাসন জন্ম।

কান্ত-পনি ছিল তাঁর পূর্ণের পরিচিত,

তাঁহারি বোকানে দিয়া হব উপহিত।

মহাশয়ের ভরে কান্ত নিঃশব্দ ভবনে

সামনেরে রেখে গের গরম যোগেন।

লিখাভের লোক তাঁর কহিল সন্ধান,

যেখিতে বা গেরে গেরে কহিল গ্রহণ।

হৃৎকশে পড়িয়া কায় করে হায় হায়,

হেট্টেল কি খেতে বিধা বান যথো দায়।

যরে ছিল পাঠ্য-ভাষা, আর চিত্ত-বাহ,

কীচা লক্ষ্য, বড়ি পোড়,—কানে কলপাধা।

কাটরা আশিস ঈশ কায় কল্যাণত,

লিখা কহিল ওহে গরম গরম ভাষা।

পেটের আলার হুহু হেট্টেল তখন

চক্ষু চুখা লেহে লেহে করেন জোড়ন।

এ রস-নাগর বলে কি হ'ল কি হ'ল,

হেট্টেল ভিনার বাড়ী হাত হারাইল।

হৃৎকশের হ'ল আশ পশ্চিম পশ্চমে,

‘হেট্টেল ভিনার বান্ কান্তের ভবনে।’

(৩২)

একদিন দুঃখানক ঐশ্বর্য কতিপয় যত্ন-সমর্থিতাধারের সত্যের বসিলা
আজ্ঞে, এমন সময় রস-নাগর দিয়া দে হানে উপহিত হইলেন।
তখন ঐশ্বর্য কহিলেন, “রস-নাগর বর্ণনা।” যেতনাম পদ্যগোবিন্দ

দিয়ে বাহাদুরের মাতৃশ্রদ্ধে কিওন সন্মানসম্বোধেই চাইতামিল, তাহা
একবই আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই
সমস্তারী পূর্ণ করিতে দিলেন,—“এক মাতৃশ্রদ্ধে কংস গোবিন্দ বেত্তমান।”
বাহাদুর-বেত্তার ঐতিহাসিক ঘটনা হুস-নাগর মহাশয়ের কণ্ঠস্থ ছিল।
এই সমস্তারী শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে সন্মানসম্বোধের মাতৃশ্রদ্ধে
বর্ণনা করিলেন :—

সমস্তা—“এক মাতৃশ্রদ্ধে কংস গোবিন্দ বেত্তমান।”

দুর্ভাগ্যবান-বেত্তা খরত বাগলাচর,

কাঁকী-নগরের নাম প্রসিদ্ধ ওদার।

ঈদগঙ্গা-গোবিন্দ সিংহে তথায় থাকিয়া

করিলেন মাতৃশ্রদ্ধে লন্যাতোষে ত্রিমা।

এই শ্রদ্ধে হুতমিল কিম্বা সন্মানসম্বোধ,

করে নাই, করিতে না, করিবে না কেহ।

যহাঃ বেত্তা-বল, বস্তু বাহুরেগেল তাঁর

শ্রদ্ধেই মস্তারী বোধে করেন বিহার।

হেবোতর ব্রাহ্মণের সিংহে তুখাখী ভাখিয়া

নিম্ন শাল পেতে বেন মহাপন করিয়া।

এই মানে দক্ষ্যনিত বেত্তা-বাহুর-পন

অভাপি শ্রদ্ধেই তথা করেন কীর্তন।

মহীশায় নাটোলের অঙ্গনে প্রবনে,

বর্জমান দিনাচুপ্ত হন ত্রণে ত্রণে।

ত্রণে বসিলেন মস্তারীপ বদোহন,

এইরূপে বসিলেন সব পর পর।

তুচ্ছস্তর মহারাজ শ্রদ্ধিত থাকায়

বিচুতে না পারিলেন লাইতে ওদার।

ঐতুচ্ছস্তরের আত্মা লইয়া তখন

শিবচন্দ্র কাঁকী-বাসে করেন পদন।

কিবা তাহা মহারাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত

সত্যই লাইয়া তাহা করেন মণ্ডিত।

লক্ষ লক্ষ ত্রিঙ্গু দিয়া পূরাইল ঘাই,

চতুর্দিক হুতে এল লক্ষ লক্ষ জাটে।

কত শত বাগা-বাড়ী নির্বিত্ত হইল,

না-বাখিল কিবা তথা শৌধিতে লাগিল।

গেটল, ডাউল, বন্দা বায় গাঢ়ি বাড়ি,

হুসদুল পড়ে গেল লক্ষসেরি বাড়ী।

ঘরি ছুত তুত ভেল রাখিবার তরে

বড় বড় খাত কেটে হাণে করে ধরে।

মিষ্টানের কত নাম কে করে লক্ষান,

এতোক বাগায় কাঁহে পূর্ণত-এলাপ।

হেন কোন কল নাখি মিল বাগাচা,

যায়া নাখি পৌষিলি বাগাচ বাগাচ।

বিবিধ আশঙ্ক-এক রকমের করে

বিরাজ করিল বিরাট প্রত্যেকের ঘরে।

ভাতিয়া তেজস্ব শেখ বাসিল বিদ্যামা,

খাট পাগলের সংখ্যা নারি বার ধরা।

লক্ষা! আ-হুকের বন্দোবস্ত হ'ল বাগা,

কোথা কুদী কুদে পূর্ণ হ'ল সব বাগা।

কোমর ব্যাঘ্র! শিবচন্দ্র বুঝায়

বেত্তানের সত্যবলে করেন বিরাজ।

চতুর্দিক বুঝায় করি' নিরীক্ষণ

বেত্তান বাহাদুরে করেন ওদন,—

“গোবি আক বা-হু!” বুঝে আপনায়

হইলছে টিক লক্ষ-লক্ষের খাণ্ডার।”

ইহা শুনি' বাহাদুর তখন হাসিয়া

শিবচন্দ্রে করিলেন বিদায় করিয়া,—

“বাঘার খাতার শ্রদ্ধে লক্ষ লক্ষ হুতে

অনেকবাংসে বড় আশি যদি বিধিযতে।

লক্ষের লক্ষতে শিব না পেলেন হান,

নোর মাতৃশ্রদ্ধে শিব নিজে মিথসন।”

শুনিয়া মস্তারী মোক বলিয়া উঠিল,

“লক্ষ তব মাতৃ-শ্রদ্ধে সত্য মায় হ'ল।

রাখিলে মাহার মান, বেত্তানে বিদায়,

আপনায় ছোট বেবে বড় বৈই হয়।”

বেত্তান দিগেরে কিবা ভাণ্ডার। বহুত

আশিবারে শিবচন্দ্রে হ'লেন প্রস্তুত।

শিবচন্দ্রে বত দিবা পাঠান বেত্তান,

তাহা তিনি ত্রিঙ্গুকেবে করেন এলাপ।

পুনঃপুনঃ বত দিবা আশিতে লাগিল,

সমস্তই শিবচন্দ্রে এলাপ করিল।

তখন বুঝেন শিবচন্দ্রে মহাপন,

দিগেরে ভাণ্ডার কত হুংবার বর।

সোণা রূপা শাল খাটে হইয়া বসিত

ব্রাহ্মণের করে বেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

না-নাখিল খাত তথা, বর আর বন

পাইয়া ত্রিঙ্গু-লক্ষ করে আদায়ন।

এ শ্রদ্ধেই কথ্য কোথা না করে সন্মান,

‘হুত মাতৃশ্রদ্ধে কংস গোবিন্দ বেত্তমান।’

(৩৩)

একবার মহারাজ নিরীশপ্তে এল করিলেন, “তাঁহা এঁইবার।”

হুস-নাগর মহারাজের ঘরের তাব সুকিতে পাঁচিয়া তৎক্ষণাৎ এই ভাসে

এবের উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—“ভাঙলো এইবার।”

একথা সুশিখাথানে নবাব নিজাক
নিম্ন পুরে সভা করি করেন বিচার।
রাজা মহারাজ মত ছিলেন যেখানে,
এক একে আসিলেন নবাব-ভবনে।
লইয়া গোপাল ভাঁড় কুচলত্র তার
উপহিত হইলেন নবাব-সভার।
সুগম সমস্তক এইবার পর
আপন আপন পুরে কিরিতে তৎপর।
তৎকালে বেগমেরা উপর হইতে
বিদ্য-বিদ্যে লোকগণে লাগিল। যে কতে।
তখন গোপাল ভাঁড় অধার হইয়া
বেগমদিগের বিদ্যে হয়ে তাকহিরা।
এই কথা শুনিয়াই নবাব তৎক্ষণে
কৌতুহলে করিলেন আন্তর-লোভে,—
“এবি গোপাল ভাঁড়! আনহ ধরিয়া
বিবিধতে শান্তি তবে বিদ্যে বিচারিয়া।”
মহল গোপাল ভাঁড় সভার আসিল,
সভায় লক্ষ লোক হাসিতে লাগিল।
একজন কহিলেন,—“রক্ষা নাই আর,
গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড় ভাঙলো এইবার।”

প্রত্যয়। কোনও কারণ-বশতঃ নবাব নিজাকউর্দোবা খাঁর রাজ-
দারী সুশিখাথানে একবার সভা করিয়া বঙ্গালা-প্রদেশের দাবতীর
রাজ' ও মহারাজবিদ্যে আস্তান করিয়াছিলেন। মহারাজ কুচল-
কেও তৎস্থানে বাটতে হইয়াছিল। গোপাল ভাঁড়ও নবাব-মাজী
বেবিয়ার মত মহারাজের সঙ্গে সুশিখাথানে গিয়াছিল। সভাসভার
পরে যখন রাজা ও মহারাজ-পন্য বাসিতে লিখিয়া আসিতেছিলেন, তখন
নবাবের বেগমেরা কৌতুহল-বশতঃ উপরে উঠিয়া আসি বিদ্যে উঠা-
বিদ্যে দেখিতেছিলেন। গোপাল রসক হাড়িয়ার লোক নহে। সে
রাজার পক্ষাৎ পক্ষাৎ আসিতেছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে, তৎকালে
বেগমদিগের প্রতি তীর কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কিংবদন্ত
পরে এই বিদ্য নবাবের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি কৌতুহলে মহারাজ
কুচলত্রের বিদ্যে লোক পাঠাইলেন। তখন মহারাজ ভীতচিত্ত হইয়া
গোপালকে ডিমালা করিলেন “এ কি তোমারই কাণ্ড?” গোপাল
নির্ভর-চিত্তে কহিল “বর্ধা-বতীর! এত বড় বড় কর্ণ আর কে
করিতে পারে? ঠাঁড়, আপনি এমন চিত্তিত হইবেন না।” এই
বলিয়া গোপাল নবাবের প্রেরিত লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বন-
বীশের রাজার লোক নবাবের বেগমদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছে
এবং প্রার্থন করিয়াছিল নিজে নবাবের লোক তাহাকে বন্দিয়া লইয়া
হইতেছে, এই ভ্রমের নগরে তৎক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর গোপাল নবাবের নিশেই বীত হইলে। তার লোকদিগের মধ্যে
হাঁহায়া গোপালকে চিনিতে, উহারা। বলিতে লাগিলেন “এইবার ভাঁড়
জাখিল!” নবাব চোখেরে ও আন্তর মনে গোপালের দিকে চাহিয়া-
মাত্র গোপালও তৎক্ষণে নবাবের বিদ্যে তীর কটাক্ষপাত করিল, এবং
তৎপরে সভায় লক্ষ লোকেরই প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিল।
নবাব তাহার তীর কটাক্ষপাত বাস্তবিক দৃষ্টিয়া দিভায়ে লজিত
হইলেন এবং ইচ্ছা হতে করিয়া তাহাকে বিচার দিলেন।

(৩৬)

একদিন শ্রীপত্র রস-মাগের মহাপ্রদে এই সমস্তাটী পূর্ণ করিতে
বিলেন, “ব্রাহ্মণের পদমূলি একবার সাহা!” এবং আদেশ করিলেন যে
“ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে এই সমস্তাটী পূর্ণ
করিতে হইবে।” রস-মাগের শ্রীপত্রের অভিপ্রায় দৃষ্টিতে পারিগা
ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া বিলেন :—

সমস্যা—“ব্রাহ্মণের পদমূলি একবার সাহা!”

মহা কুমারের পূর্ণ লুপ্ত, কল,
সাধাণিক মহাপ্রদে বিলেন দুর্লভ।
বর্ধা-বৃদ্ধির হেতু তদন্ত হইয়া,
করিলেন ত্রিধা এক আদেশে বন্দিয়া।
যেন ত্রিধা করিলেন পূর্বে তিনি আর,
যাহা করে নাই স্বত্ব কোন মহারাজ।
এক লক্ষ ব্রাহ্মণের হ'ল নিবৃত্ত,
সুদধার হ'ল বৃত্ত, — কে করে পান।
যেহে বেহে আনিলেন তাদুর-ভবনে,
কুচলত্র মহারাজ, এই হুই গণে।
একে একে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ বন্দিয়া
আহার করিলা যুগে যুগে হইয়া।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদমূলি-কণা ম'লে,
যতনে রাখেন রাজা তাদুর-আহারে।
তুহিই ব্রাহ্মণিগে শ্রীমন্ত কুমার!
“ব্রাহ্মণের পদমূলি একবার সাহা!”

(৩৭)

স্বতঃস্ফূর্ত অতি সুধার লোক বিলেন। মহারাজ, রাজা,
মহারাজ ও ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে টাকার কর্ণ দিয়া উহাদিগকে আসন
দিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। একই উহার বিদ্যেই লক্ষ লক্ষ
নত করিয়া থাকিতেন। তিনি বিদ্যার বাস্তব-কর্তৃক নিবৃত্ত হইতেন
এবং মহারাজ, রাজা ও মহারাজ-পনের বের কর যাহা বিদ্যার দ্বারা
পাঠাইয়া বিলেন ব্রাহ্মণের মহাপ্রদে নবাব-পন্য তাহার যথেষ্ট লক্ষ্য
করিতেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ও তাহার প্রতি অত্যন্ত অত্যন্ত যত্ন
করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ সিংহ-চক্র এই লক্ষ বিবর লইয়া

রস-সাগরের লহিত আশাপে করিতে করিতে সনের কটে বলিয়া
কেবলেন, “বৎসে! বৎসে! শেঠে! ক’ণে! পড়িল!” রস-সাগর এই
সমস্তটি এই ভাবে পূর্ণ করিয়া বিলেন :—

সমস্তা—“বৎসে! বৎসে! ক’ণে! পড়িল!”

সক’রাম দী নবাব বাহাদুরের পতি,
হুন্দরী নারীর প্রতি ছিল তাঁর ঐতি।
নন্দনং দী সাহেব যোগায়েব তাঁর,
হুন্দরী সঃপ্রঃ কঃ। তার ছিল তাঁর।
রূপসী হুন্দরী বৎসে! জাফিলা য়ান্ন।
এবং শেঠের এক পাত্-বো আছিল,
রূপসী বাহার বত কতু মাঝি ছিল।
সহে নারী বৎসে! হইল যেরে তার,
না বালিকা, না হুন্দরী, নাপাখাঝি সাহ।
নাত্-বো! উপহার বিহার কারণ
ভাফিলা রূপং শেঠে নবাব তখন।
ইহা তব! বৎসে! প্রমথ পণিল,
আকাশ ভাহার পিরে তাসিহা পড়িল।
একদিন সৈয়দপণ পঠাইয়া তারে
নবাব আছিল খরি! আশনার ঘরে।
কেবল তারের রূপ বর্ণন করিয়া
সন্ধ্যাকালে গৃহে তারে ফিলা পাঠাইয়া।
শেঠ-রাষ্ট্রি বেবে যদে কি হুগ হুগ,
‘বৎসে! বৎসে! ক’ণে! পড়িল!’

(৩৬)

একদিন হুগরাজ ঈশচন্দ্র রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি
কারণে পদ্মিনী লম্বাকালে স্মৃতি হইয়া যায়?” এই প্রশ্ন করিয়াই
তিনি এই সমস্তটি পূর্ণ করিতে বিলেন :—“পদ্মিনী নরন যুগে লম্বাওলে
হলে।” ইহা তবিনায়াজ রস-সাগরের রস উপস্থিত উঠিল। তিনি
তখন এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া বিলেন :—

সমস্তা—“পদ্মিনী নরন যুগে লম্বাকাল হলে।”

চন্দিয়া সেসে সূর্য্যসেব অতঃকাল,
অধিতে নারিল বত যোমাকির বদ।
কেনাক কলমাকী নরন বরিল,
পেচকসকল রহ করিতে নারিল।
হাসিতে নারিল যুগে বত কুহুদী,
ভাফিল চকর হলে বত বিরহী।
বালিকা বৎসে! নরন অতঃকাল,
হুগের অতঃকাল হার, এ সব ঘটিল!

শেঠা বিহারার দীলা বৎসে! তার,
কিহুতে না লুহ হুগ এল যাপাণ।
যেব অশকল কাও বেহিরা ভূতল
‘পদ্মিনী নরন যুগে লম্বাকাল হলে।’

(৩৭)

একদিন মহারাজ সিদীশ চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “কোন
কিছা বিহারী পুথকে বৃত্ত করিয়া করিয়া রাখে?” রস-সাগর উত্তর
বিলেন, “সর্দার!” তখন মহারাজ করিলেন, “পদম প্রথম বিহ
নরনের কোণে!” রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া
হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া বিলেন :—

সমস্তা—“পদম প্রথম বিহ নরনের কোণে!”

যেবল কহে যদে সতুর মন্ব,
তা হতে কতই বস্ত টটিল তখন,—
বিহারী সে লগতলি প্রহঃ করিয়া
যতবে নারীর যুগে বিলেন বাফিয়া।
পত্নীয়ে রাফিলেন তজ শপথয়ে,
অদুতে রাফিয়া সেন ৩য় ভাটথয়ে।
রহা পাইয়াতে পুণা নিখাস-পলনে,
‘পদম প্রথম বিহ নরনের কোণে।’

(৩৮)

একবার মহারাজ সিদীশ চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “পাঠ
পাঠ পায় না?” রস-সাগর হাসিতে হাসিতে তাহা এইভাবে পূর্ণ
করিয়া বিলেন :—

সমস্তা—“পাঠ পায় পায় না।”

চিনিতে নারিহু আদি,
আফিল লগৎ-বাবী,
মাফিল নিগার-বুধি, আর কিছু চায় না।
বর্জ্জ যেবি উপদাস, সেবে যেবি সর্দারস,
বর্জ্জ সর্দা বিহ আশ, তাই সন হার না।
নিয়া সকল সম্পদ, এ যেবি যোর বিপদ,
যাকী আয়ে এক পল, বণ সোব হার না।
কি আর জিজ্ঞাসা শিরে, বিজ্ঞাপলি! যেবদিত্ত,
অবিল ব্রজাও বিহে ‘পাঠ পায় পায় না।’

(৩৯)

একদিন রাজসভার এর উঠিল, “গ্রাণপাখী ক’কি বিয়া রাখে
পলাইয়া?” রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া বিলেন :—

সমস্তা—“গ্রাণপাখী ক’কি বিয়া রাখে পলাইয়া।”

এ যেব পিঞ্জর,—তার আয়ে নব হার,
গ্রাণপাখী তার যতঃ করিতে বিহার।

একিছু তবির করি' বুঝিছে সমাই,
পায়ে পানী খার ঢালে—এই ভর পাই।
হানি বা শিকার হতে কোনে বার নিয়া
'আপনানী' কাকী নিয়া বাধে পলাইয়া।'

(৭০)

একদিন দুবলাল শ্রীপদ্ম কঠিনর বন্ধু গাইয়া বীর সত্যার বদিয়া
আছেন, এমন সময়ে রত্ন-নাগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা
লকলেই তৎকালে বসন্ত-কালের নিরীতিবর প্রসঙ্গা করিতেছিলেন।
তখন শ্রীপদ্ম কহিলেন, "রত্ন-নাগর মহাশয়! বসন্ত কালের নিশা
করিয়া আপনাকে একটী কবিতা রচনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়া
তিনি এই সমস্তাটী পূর্ণ করিতে যিলেন, "বসন্ত-কালের পবে লক্ষ
মহতারা।" রত্ন-নাগর তখনই ইহা এইভাবে পূরণ করিলেন :—

সমস্তা—“বসন্ত-কালের পবে লক্ষ মহতারা।”

(বসন্ত-কালের প্রতি সূর্য-নাগের উক্তি)
দুহত বসন্ত! তব বস্ত্র পাওয়া তার,
কোথা বিল 'সু-খাদ' নাথায় তোমার!
বিহরী পুঙ্খ, কিবা বিহরিণী নারী
তোমার 'আপার' ঘলে ডিবিবন বরি।
বাহুক পয়ের কথা, করি বিল কথা,
তুমিলে তোমার বাস পাই বহু ব্যথা।
তুমি আশিলেই হার বত তরুণ
দুশ্বর পরব পত্র ধরে অপরন!
আমি কৃত দুঃখ-পার! কি বলিব হার,
ভাল পাগা কাটে লোক, বাধাটী দুহার!
এ রত্ন-নাগর তাই কহিতেছে নাথ,—
'বসন্ত-কালের পবে লক্ষ মহতারা।'

(৭১)

মহাশয় শ্রীশ্রীপদ্মের সময়ে রাজবাণীতে হতভূত ও দুঃখিনী
কর্তব্যটী বা ব্যাকার রাজ-নাগেরে নিরীতিবর বিদ্যুৎপ্রাণে খট্টাইল।
মহাশয়ের বসন্ত-বর্ষ তৎকালে হরখাধ, আনন্দখাদ, নিব-নিবাস
প্রভৃতি স্থানে নিয়া বসতি করিতেছিলেন। তৎকালে হরখাধে রাজা
পদোপভোগ অবস্থিত করিতেন। তিনি সম্পদে মহাশয়ের পুত্র
হিসেব এবং বাগেশের বস্ত্র বা করিমাণ্ড "বাগেশেরী" উপাধি গ্রহণ-পূর্বক
বিজ্ঞ নামের সহিত "বাগেশেরী" পদবী যোগ করিয়া লিখিতেন। একত
মহাশয় শ্রীশ্রীপদ্ম তাঁহাকে "বাগেশেরী পুত্র" বলিয়া ডাকিতেন।
তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি রাজবাণীতে
কর্ম করিতে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজবাণীর কর্ম-
কর্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি রাজ-
বাণীতে কর্ম করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ-বাণীর মহাশয় প্রা

সামগ্রীতিনি আনন্দখাদ করিয়া গ্রহণ করেন। তিনি প্রভুত-পদ
তাঁহাই করিয়াছিলেন। একদিন মহাশয় শ্রীশ্রীপদ্ম রত্ন-নাগকে
কহিলেন, "বাগেশেরী পুত্র! তখন রত্ন-নাগর উক্ত ভণ্ডার পুত্র
মহাশয়কেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্তাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সমস্তা—“বাগেশেরী পুত্র।”

বসন্ত-কালের অবিশিষ্ট বৃষ্টিভিত্তি।
কত ইন্দ্র চন্দ্র এই বসন্তের মেঘে পেছেন হৃদ।।
লক্ষ লক্ষ লেটে লেটে হৃদ-নাগে না এক ভাঁড়া,
না বিহরে ক'বাই এর না 'বাগেশেরী পুত্র।'

(৭২)

একদিন মহাশয় শ্রীশ্রীপদ্ম, বীর বৈদ্যকিক ও রত্ন-নাগকে লইয়া
নাগেশ্বরের পরিদর্শন ও মৌলিক করিতেছিলেন। কথায় কথায়
বৈদ্যকিক মহাশয় কহিলেন, "রত্ন-নাগর মহাশয়! আপনাকে একটী
সমস্তা দিব; ইহা আপনাকে এখনই পূরণ করিতে হইবে।" ইহা
বলিয়াই তিনি এই সমস্তাটী পূর্ণ করিতে যিলেন, "বাগেশেরী
পরিহারি" ব্যালকাঞ্চি বাস।" রত্ন-নাগর বৈদ্যকিক মহাশয়ের প্রভুত
অভিমাণ বুঝিতে পারিয়া নির নিমিত্ত কবিতার সমস্তাটী পূর্ণ করিয়া
যিলেন :—

সমস্তা—“বাগেশেরী পরিহারি ব্যালকাঞ্চি বাস।”

বৃষ-বন পতিহারি হরি! সুব্রাহ্মণ্য
হৃদয়ের বদলে বাসে,—লক্ষ্য নাহি তার।
সুব্রাহ্মণ্য শ্রীশ্রীপদ্মে পিণ্ডিয়ায় বন,
কি ভণ্ডে করিল ভণ্ড, হে রত্ন-নাগর!
সুব্রাহ্মণ্য বীণা আন, তুমি বীণা জ্ঞান,
বীণার বীণার দিলে, তবু ভণ্ডারন।
কিশোরী কি শরীর বাণিজ্যে বেষ না,
তার পদে সুব্রাহ্মণ্য হরি কি ভুলনা।
বীণাকার পুণ্ডিয়ায় হরি! ওক-সারী,
সুব্রাহ্মণ্যের তবুে বাণিজ্যে বরি!
বাগেশের মেঘে মেঘে হর নাথিতে অকতি,
তোমার প্রেমের ভণ্ডে লোক হ'ল ভণ্ডি!
সুব্রাহ্মণ্য বন-ভাড়া হইল তোমার,
অবশ্যই বটাইল,—সুব্রাহ্মণ্য বিচার!
বন অপর প্রেম পিণ্ডিলে কোথায়,
মেঘবাণী হারি হ'ল আন সুব্রাহ্মণ্য।
গ্যারীকে ডাকিয়া মেঘে সুব্রাহ্মণ্য প্রেম,
'বাগেশেরী পরিহারি' ব্যালকাঞ্চি-বাস।'

(৭০)

একদা কোন কার্ণাণমলক মহাশয় দ্বিতীয়া-চন্দ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাপ্রসাদিকে বিবাহের যেতায় হইতেছিল। নব্বীশ হইতে সম্বাস্ত্র একটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সত্যের বসিলা মনোপ্রসঙ্গের বাণু-বিতণ্ডা করিতেছিলেন। তিনি হৃৎপণ্ডিত হইলেও চিত্ত-চ্যাবলাত্ত বৃথা বাচা-বাচ-বোম্বে সাহায্য প্রদর্শনের বিকটেও বিচ্যেয় পরামিত হইয়া পড়িতেন। অবশেষে অধ্যক্ষ মহাপ্রসাদের প্রবৃত্তি বিবাহের সন্ততি না হইয়া মহাপ্রসাদের সন্নিবেশ দিয়া নানা প্রকারে বীর বিজ্ঞা-বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইয়া আশ্বাসন করিতে লাগিলেন। তখন মহাশয় তাঁহার দ্ব্যভিচার লক্ষ্য করিতে বা পাতিয়া রত-সাপ্রসাদের বিকে ইন্দ্রিত করিয়া এই সমস্তাই পূর্ণ করিতে গিলেন, “বেদাঙ্গের চূপ ক’রে থাকাই মঙ্গল।” রত-সাপ্রসাদের মহাপ্রসাদের প্রকৃত অভিলষ্য হইতে পাতিয়া তাঁহারভাবে এই সমস্তাই পূর্ণ করিয়া গিলেন।

সমস্তা—“বেদাঙ্গের চূপ ক’রে থাকাই মঙ্গল।”

(সমস্তার প্রতি উক্তি)

দিক্ বিদ্ পত বিদ্ তোমার সাধন !
কত কাণ্ড হ’ল তব দুকের উপর।
মক্ষ মক্ষ বেদাঙ্গের একত্র হইয়া,
সত্ত তত্ত ক’রে মিল তোমার বসিলা।
যে সব বাসন দুঃখ করে তোলে ডালো,
তাঁহাও লসন করি’ বেগ পাগে পাগে।
হুজি নাক্তা মস্ত ক’রি’ বাসন বাসনী,
সেতু বেগে রেখে মিল দুকের উপরি।
অপাখ অশার হুজি, তব নিরন্তর,
অপত্তা সত্তবে পুরে পেটের ভিতর।
তুফারি পণ্ডিত মল খাইলে তোমার,
তোমা মলে সুখখানি পুড়ে যায় তার।
সত্ত করিয়াও তুমি এত অশাসন,
এখনও প্রাণ করে আছে বিজ্ঞান।
কীংগ মর্দন তব, কীংগ তত্তর,
এই সব সইবাঁই কর কত রত।
কুখের সাপটু তব পরম প্রাণ,
‘বেদাঙ্গের চূপ ক’রে থাকাই মঙ্গল।’

(৭১)

একদিন ভূকন্যাবর্ণিণি মহাশয় দ্বিতীয়া-চন্দ্র রত-সাপ্রসাদের এই সমস্তাই পূর্ণ করিতে বিচ্যেয় গিলেন :—“ভক্তি-ভরি বাও হরি ! পার হ’রে বাই !” রত-সাপ্রসাদের তৎকালে তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া গিলেন :—

সমস্তা—“ভক্তি-ভরি বাও হরি ! পার হ’রে বাই !”

অতি ভক্তের এই সঙ্গার-সাপ্রসাদ,—
বিষয়-বাসনা-মল তথা নিরন্তর ;
বহিতেছে সর্বক্ষণ মন-পাশন,
সর্বদা উত্তরে মোহ-তত্তর তাঁপন ;
বৃহত্তী-দ্বারের পাক নিতেছে কেবল,
তানিতে ছুর পুত্র কুতীর মঙ্গল ;
মদ্যে মদ্যে বের কস্তা-হাসন মর্দন,
কীংগ মল্য-সর্গ করিতে মর্দন ;
ভক্তি-ভাড়াবারি কিবা নিতেছে উত্তাপ,
ধক্ ধক্ মলিতেছে বাণু, রে বাণু !
সত্তর তত্তর বস্ত্র ম’রেছে তত্তর,
রত-সাপ্রসাদের রত কুজি বা তত্তর ;
এ হেন সাধনে মল আছি হে সমাই,
‘ভক্তি-ভরি বাও হরি ! পার হ’রে বাই !’

বাস্তবসীরা খাণ্ড—(২)

[ডাক্তার—ঐতর্য্যমণ্ডের দ্বার, এল্-এল্-এল্]

প্রধান প্রবেশ, কতকটা বায়বায়িকরূপে, বাতাসবৎ হুগ আসোচনা করিয়াহি। এ প্রবেশ, অসামান্যভাবে, নিত্যমোহনীয় কতকগুলি বিষয়ের আসোচনা করা হইবে। আরম্ভের পক্ষ সম্বন্ধে কিংবা বড় একটা বেগা দার না :— তাহার প্রধান কারণ, বেগ হই, অনতিজ্ঞাত। এই অনতিজ্ঞাত ও তাহারীত যে তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে বেগা দার, তাহা নহে ; এখন কি বহুদূর চিকিৎসকেরাও পক্ষ সম্বন্ধে সাধবে প্রসঙ্গের সুযোগে। পাক্তাও বেগের শিখা মর্দনে প্রজ্ঞাও বেগে প্রবেশ্য নহে।

সাধেবী পাক্ত

কয়েকটি সন্তান-বংশীরা বাসনী বৃত্তান্তকে নিত্য পুরাণের সাধেবী দানা বাইতে দেখিয়াহি। তাহারা সাধনিনা মাঝের কোল-ভাঙ করিৎ বান। তাহারা পিত্র শ্রীম মঙ্গল কহুতেই তিন সন্তান সাধন, ভিক, পাটকট, মাখন ইত্যাদি তাহান করিয়া থাকেন। চক্রে বা বেগিলে, এহণ সাধেবী-বিত্তন, বিধান করিতে প্রজ্ঞা হয় না—কারণ, বেগ, কাল, পাক্ত-নির্দেশে, তত্ত্ব অনুভবীয়ার প্রেরণা, মাতৃগে যে এতটা মোহাঙ হইতে পারে, তাহা কল্পনাযুক্ত। সাধেবী ও সাধনোপনিষদের পক্ষে সাধন রূচিৎ পাক্ত হইলেও, প্রথমদুঃখ, শ্রীম-বেগবানী, চিরকাল মল-পরিবেশ্যেগোষ্ঠী-বেগবানী ইত্যাদি নিত্য-পরিবেশ্যেগোষ্ঠী জ্বলিত বাসনীর পক্ষে সে পাক্ত বিধবৎ হইয়া ইচ্ছায়। যোঁটাক্ট বসিতে গেলে, যে যাক্ত ব্রীতবত ত বেগ পরিপ্রব কহে, তত্ত্ব

কবিতা : এই প্রকার ফলে, সামাজিক বাস্তবতাব্যবস্থার অপচর নির্ধারণ করিতে
বাঁহীরা অদল; বাহু) ৭ ততোধিক অদল) জীবন অপচরিত হইয়া থাকে।

পুষ্টিকর আহার্যের অভাব

টাকাভিত্তি হিসাবের মত আহার্যটোও হিসাব-নিকাশের জিনিষ।
 বাহার যেমন প্রয়োজন, তেমনই উপার্জন করা উচিত এবং
 তৎসঙ্গে ক্রিষ্ণি দক্ষতা রাখাও ভাল। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু লক্ষ্য
 করার তৃষ্ণার জন্য অর্থোপার্জনে উদ্বৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি উগ্রাণ, সে
 ব্যাধিগ্রস্ত। আবার, যে ব্যক্তির কোনও অজ্ঞানই নাই, সংসারে
 উদারীশ, তাহার পক্ষে আত্মজ্ঞানোপযোগী অর্থের সমাধানই যেতে
 যে হাত। তাহার অর্থের, স্বপ্ন অর্থের প্রয়োজন।

আবার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। যেহেতু কণ্ঠ্য, সেহেতু কণ্ঠ্যই হ'ল আবার কণ্ঠ আবার কণ্ঠ্য প্রয়োজন। শুধুই উত্তরিকের মত আয়োজক ব্যাপণে স্থির ভাবিলে, হুহুও কণ্ঠ্য থাকা কৃষ্ণের কথা, যেহেতু তারিখা পড়ে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিমাণে যা শুধুই আন্তর্জাতিক, শরীর হুহু না থাকিবে। কণ্ঠ্য বা মৌলিক হইয়া পড়ে। এই দুই কণ্ঠ্যই সমস্তই হুহু হ'ল কণ্ঠ্য। দুই মিলানে, ব্যাপারী মৌলিকের প্রথম পদে বসন্তের পদেও বুদ্ধির কাল। তৎপরেই পদে বসন্তের (২০—২১) বিজ্ঞানের সমস্ত; এবং তৎপরে (২২) হইতে বসন্তের পদে ব্যাপারী বাধ্য হুহু হইতে থাকে। এই বিজ্ঞানও ঠিক হইল না বলিয়া অনুমান করি। সমস্ত কথা বলিতে গেলে, ব্যাপারী মৌলিকের ইতিহাস এইরূপ:—

দৈনন্দন হইতে কিশোর বয়স পর্যন্ত—বয়েসে বৃদ্ধি বর্ধমান হারে হয় না; যে কিছু স্তম্ভ বা বৃদ্ধি ঘটে, সেইসকল কাঙ্ক্ষণে হয় বা জটোর ফলে মরে। স্বতঃস্ফূর্তিক পথ সহস্র প্রতিফল ঘটনা সম্বন্ধে যেসকল ঘটনা থাকে। শিশুসম্প্রদায়ের চৈতন্য, ভাবধারার সহস্র ক্ষমতার ফলে কার্য হইয়া যায়।

কিশোর হইতে প্রৌঢ়বয়স প্রায়ঃ পর্যন্ত (১৮-৩০)—এই সময়ে যাহা কিছু বৈদিক উন্নতি ঘটয়া থাকে ।

ত্রিশ হইতে—চল্লিশ পর্যন্ত—২৫২। “ন দাধৌ ন ভহৌ” এইরূপ
অবস্থায় থাকে। তখন হইতে দেহের প্রত্যেক কণ্টকের কাঁটার উপরে
তীব্র লজ্জা ব্যথিতে আচ্ছন্ন করিতে হয়। নৃত্য শিল্পী অবসন্নতায়।

ভাষাশাস্ত্রের পর হইতেই—বাংলা ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে।

অতএব আবার যেখানেই যাবে, যেখানেই যাবে, যেখানেই যাবে
যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে
যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে
যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে, যখনই যাবে

সেহের উন্নতি কিসে হু? কতগুলি ঘটনা-নিহেরে উপর
 দৈনিক উন্নতি নির্ভর করে—কোন একটি কারণ-নিহেরে
 উপর নহে। কতগুলি কারণ আছে, সে সকলগুলির উন্নয়ন
 এখানে বিস্তারিত। এখানে শুধু খাওয়ার দিটার করিতে
 বলিমাতি, অতএব পুষ্টির খাওয়ার উন্নয়ন করিব। বামাণীর পুষ্টির

খালা—দৈশপবে,—বাড়তক্ত, খালা হইতে শরের সময়ে—বাঁধ, মাংস, ডাইল (বা তজ্জাতীর শীঘ্র, বনহট, ঘটর, হোলা ইত্যাদি) পুত, নিতাই, তিষ, গোখুম ইত্যাদি। তালিকাটি দেখিতে গুলিতে ভাল হইলেও, কাখাত: উহার ব্যবহার বড়ই কম।

বাংলাদেশের ন্যূনতম প্রথম কাজ, অবকাশ; আমরা বহুদূর
 গরিমা যে পাথো অজ্ঞান নহি, সে বাংলা প্রকৃষ্ণাৎ এগুলি কহিত
 গেলে অমিত হইবাহই সত্যবান। এই স্রুত, বাসে এবং
 উপলব্ধী বাবা হইবেত, অলস বাসালী। সপারে বিতা বাসে
 এজনক কাল চলে না। বাসে বেশি বেশি পাইবা, যদি ভয়বাহী
 বাসারিক গমিষন না কা বাসে, তবে অলস-পাইবাও অকাল-
 দয়া উপনীত হয়। বাস-বাণী, অর্থাৎ প্রকৃতিও প্রবিশিষ্ট
 বাস-বাহারি পক্ষে অপর কুল। বাসের ভাষা, ভিতর অতি
 গুণিতক বাস। কিন্তু অধিকারিণি গরিমা ভিষ কোলে অর্প,
 অর্থাৎ, বাস, প্রমাণে আমসংস্বেদ বাহির হওগা প্রকৃতি ঘটিত
 পারে। গৌরবও পরম উপকারী বাস; কিন্তু অবকাশ পক্ষে উঠা
 সময়েই অর্থাৎ ও প্রমাণে পাণ্ডুর বাসিণি হই কহিত পারে।

বাহ্যাহারের ন্যূনতার দ্বিতীয় কারণ, অভ্যাস। কোন ব্যক্তি
 পারীক্ষিক কত শুভবে ও কিভাবে পড়বে, কিভাবে পরিচয়ের অনুশাস্তি,
 কোন অধ্যায়, কোন খণ্ড কতটা ও কিভাবে পড়িতে হইবে, তাহা আত্ম
 অধ্যয়ন দ্বিঃ। আত্মনিয়োগ পাঠ্যতা শুভর্য বেবেদ-বেবেদ শিক্ষাদান
 করিগণের, আত্মতা তাহার "সহি বাস্তব কপি" কবিত্তে পারি হইবে।
 কিন্তু বিলাত ও ভারতবর্ষ, বাঙ্গালী ও মায়েষ, ভুলান্য নহে।
 কাজেই সাত্ত্বিন বিলাতি বিদ্যা এবেশ আয়বানি করিবে চলিবে
 কেন ? এবেশের চিকিৎসকমূল এ সমবে সম্পূর্ণ অভ্য ও উপাদান,
 কাজেই সন্তানি আয়ো অভ্য। স্বতকটা এই অভ্য হুইকর
 মানে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গলীয়া মানে (১৮৭২ খৃষ্ট) শিখা কবিত্তদান
 এই দর্শে আবেশন কবিত্তাবিসমঃ—কমিকতা, চাক, রাঙ্গালী
 প্রভৃতি বহু-বহু সহর কবিত্তে বহু হাত আবে (পাঠশালা হইতে এ, এ,
 হ্রাস পর্বা, তাহা মিলেগপ্রভোকেষ বাত ও বৈদিক পুস্ত্রি রীতিনত
 বাৎসরিক বা বাস্তবিক পর্বা, উপপূর্ণ পাঠ বৎসর পর্বা কত হইক।
 সেই পাঠ বৎসর কাসের পর্বা, বহু মাধ্যমে প্রচার কত হইক।
 এবে সেই বিবরণী হইতে, বাঙ্গালী ছাত্রদিগের বৎসর-বৎসর পারীক্ষিক
 পুষ্টি কি হারে হইবা কাবে, তাহা সঠিক নির্ণাত হইক। সেই নির্ণয়ের
 পক্ষে, পাঠ্যতা গতিভরগণীর সহিত এ বেশী চিকিৎসক ও কবিত্ত
 মাধ্যমে। গর্যসর্ণ করিবা ছাত্রদিগের আহারের ও ব্যায়ামের "নির্ণয়"
 গুণিবা মিল। সেই "নির্ণয়" অনুসায়ে, আপাততঃ সমস্ত সরকারী
 ছোটেসে ও বঙ্গালম্বন পর্বসেই বিভাগসমূহে আহার ও ব্যায়ামের
 বাস্তব হইক। পূর্বাণ এই প্রকার পাঠবৎসর পক্ষে তাহার দল
 কি হইবে হুইক, পাণ বাস্তবতা উচিত। একজন কার্য হইবে,
 দেশের মতো ছাত্র-বাহ্য, বাত-বিভাগ ও পারীক্ষিক পরিচয়ের
 সার্বভিত্ত সমবে বেগে একটা পাঠ্য গতিয়া পাইবে, এবা তাহার বসে,

করেন না—তাহারাই তাই বসিমা হুস্মান বা বর্ধাকৃতি বা বর্ধাক্ষ
নামের। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবারা অনেক লিঙ্কটেল আহার করিলেও
বাংলা, মাংসও ও গৃহিচ্ছতার তাহার কদম নবের। এই সমুদ্রই বস
হয় যে, তৎ আহারের পুষ্টিকারিতাই বেহের পুষ্টির সাধক নবের—সংরক্ষক
মাত্র। ইতিমধ্যে, সাময়িক রীতিমত পরিচয় ও আবহাওয়ার বস
বৈধিক পুষ্টি হয়, বাস্তব আহারের তবির করিয়া তাহার পশ্চিম হয় না।

তবে কি আমি আহার সমস্ত বৈশ্বাণমৌক দিগামিবাশি হইতে
পর্যায় নিতেছি? আমি তাহা নিতেছি না। তাহারই দ্বিতীয়প্রকৃতি-
প্রাণ, তাহারই পুষ্টি নিমিত্তই হইল। তাহারই আভ্যন্তর-তুল্য, তুল্য
ও অধিক পরিমাণে তাইল তুল্য করুন। কিন্তু যে ব্যক্তি খাটয়া
খাইবে, যে ব্যক্তি রীতিমত পরিচয় করিবে, অথচ তাহার আর্থিক
বলম্বলতা নাই, তাহার মাত্র মাংস খাইবার পুষ্টি আর্থিক আছে এবং
তাহার অস্তিত্ব বর্ধমান একাকারের মূলে তাহা খাওয়া উচিত। বলা-
বাস্থ্য তৎ আশ্রিত হয় তাহা বা গুরু হয় তাহা আশ্রিত "কলম-পেশা"কে
আমি পরিচয় বলিয়া বলা করিতেছি না। এতাই দ্বিতীয়প্রকৃতি
ব্যায়াম বা অপর কোনও রূপে সাময়িক চালনা করাতেই পরিচয়
করা বলা যায়। এও করবে, যে দক্ষ বাঙ্গালী-যুবক "কলাই-তুলি ও
গলা তুলি" এইরূপে খুটল খাটয়া করে, আমি তাহারই অপর-
বসিতার নিমিত্ত করি। আহার যে দক্ষ ব্যক্তি আহারোক্ত পরিচয়
করিয়া এতদূর তাহারই বৈধিক "অপর"রূপে সম্পন্ন করেন, অথচ তাহা
মাংসের বস পাতেন, আমি তাহারই বৈধিক দিখ্য করি। এই বসাতলি
পাঠ করিয়া কেহ বৈধিক বস না করেন যে, আমি এই বলিতেছি,—
খাটতে হইলেই মাংস খাওয়া আবশ্যিক। যদি সেই পাখাতা-
শিলাই পোষকতা করাই আহার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে প্রবর্তিত
পলোবাগিদের তৎ আহারের পুষ্টি বেহের খাওয়ার উদ্দেশ্য করার সার্বকতা
কোথায়? আমি এই বলিতে চাই যে, বর্ধমান সময়ে, বাঙ্গালীর
সাময়িক অপর-তন বৈধিকই বৈধিককে সেই অপর-তনের আর্থিক
পুষ্টিবসত, বাস্তব-মাংসের তার অপর-তন বসমূল্য ও বসমূল্যে লভ্য
খাটতে বাস্তবের প্রবর্তিত হইলেই কদম হয়। আহার যদি একই প্রা-
বর্তী একই অপর-তন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের আহার তুলনা
করি, তবে তুলনায় আভ্যন্তরীণই আহার পোষকতা করিতে হয়।
এই একই অপর-তন, একই প্রাণবর্তী মধ্যে একসঙ্গে প্রভেদ—মাংসের
বাস্তব। এই প্রাণবর্তী হিন্দু বাস্তবতিন্দুকে রক্ষা তুলিতে হইলে,
উৎকৃষ্ট পুষ্টি প্রভেদ সম্বলতা একত্র প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে জাতি
আমি সময়ে খাইবার বসে। কবেই, তৎকালে, বসত-মাংসের বসতিন্দু
অধিক প্রভেদের আবশ্যিকতা। আহার সাধারণ বসিতে এই বসিমা
যে, সৌন্দর্যকালে একসঙ্গে রীতিমত খাওয়ার আয়োজন ও সেই সময়ে-
সঙ্গে অপর-তনের লক্ষণবসন ও মাংস-তনের বসেও বসে। ভাল।
শ্রীতকালে মাংস খাওয়ার চালিবে, সৌন্দর্য তাহার বৈধিকতা বা বসিত
তুল্য খাটল একত্র প্রয়োজনীয় এবং বাস্তব-তন পক্ষে চালিবেবসন
পার হইলে মাংসের খাওয়ার কদম বসেই বাস্তব।

অনেক মাংসের ওকালতী তবির, আহার উপর বিস্তৃত হইবে।
আমি এই পথত বলিতে চাই যে, এই প্রভেদ আহার সম্বল নিম্ন
ও সাধারণ অধিকতর কদম বসে বসিমা, মাত্র তাহারই আলাদা
করিয়া। সমস্ত হিন্দু-পার পুষ্টিমা, এমন পক্ষ্য করিতেছি না।
কিন্তু বসিমা সত্যক বসিমা, তাহাতে আহার হইলি কদম মনে
সামিমায়ে। প্রথমত, হিন্দু-বর্ধের প্রতি পদবিসংকে খাওয়া ও বসিমা
মাত্র প্রতি হয়, এমন কথা হিন্দু কোথাও বসেই নাই। দ্বিতীয়ত,—
বৈধিক পুষ্টি হইতে তাহা অপর-তন সম্বল পথত, বাস্তব-বসনের বসি-
তুলি এমন প্রায় প্রভেদ। অধিকত, বসিমা, প্রাণবর্তী, প্রাণবর্তী, প্রাণবর্তী,
পুষ্টি, বাস্তব-তন প্রকৃতিতে মাংস তৎকালে বসিমা আছে এবং অপর-তন,
পুষ্টি, প্রাণবর্তী ও চতুর্থী প্রকৃতি তবির ব্যক্তি, প্রভেদই মাংস খাইবার
বসিমা পক্ষ্যকালে বেহের আছে। হিন্দু-বর্ধের চরক ও বসতে
মাংস কোথায়? প্রভেদ-বসিমা অপর-তন। বসিমা কদম বসিমা, এবং বসিমা,
বসিমা, বসিমা প্রকৃতি বসতকদম মাংসের ওকালত বেহের আছে।

আহার বিধান এই যে, বৈধিক-বর্ধের প্রাণবর্তী বসল হইতেই
এমনে মাংস খাওয়ার কদম বা হসে বসে উচিত। প্রভেদ। এবং
চতুর্থ প্রকৃতির কদম হইতে, মাংসের বিস্তৃত বসের পুষ্টি হইয়াছে।
বসিমা, হিন্দু-বর্ধের বসিমা, কদম মাংস খাওয়ার বসিমা বসিমা,
আহার বসে হয় না। (বসিমা ১০০) মাংসের প্রাণ বসিমা
"প্রাণবর্তী" "প্রাণবর্তী" তাহাতে মাংস তৎকালে প্রভেদ প্রভেদ।

বর্ধমানকালে যে রকম "বিস্তার" পক্ষ্যকালে, তাহাতে বাঙ্গালীকে
বৈশ্বাণমৌক বসিতে হইতে পারে। বাঙ্গালীকে বাস্তব হইতে
হইলে, পুষ্টি পথত-বসে সমস্ত প্রভেদ হইতে হইবে। সমস্তের
উচিত চাইলে, মাংস প্রাণবর্তী বসে সৎ বসে-বসে করিতে
হইবে—সেই প্রভেদ হইলে মাংস-বসে অপর-তন হইতে বাস্তব।
বসিমা প্রভেদ বসে, প্রাণবর্তী ও মাংসের প্রাণবর্তী মধ্যে বাস্তব-বসে
প্রভেদ হইতে বসিমা প্রাণবর্তী বসিমা মনে হয় না। এই সমস্ত,
বসিমা দ্বিতীয় প্রকৃতিতে বসিমা, সমস্ত বাঙ্গালীই বাস্তব-বসে
তৎকালে কদম বা বাস্তব হইতে বসিমা করিতে। আমি এমন বলি না যে,
বসিমা বা হসে বসিমাতে বসিমা প্রভেদ বসে বসে, বসিমা বর্ধমান
কালে দক্ষ তৎকালে প্রাণবর্তী প্রভেদ প্রভেদই মাংস—এমন কি সৌন্দর্য প্রাণ,
প্রাণবর্তী তাহা। এক্ষণে কদম-বর্ধের বসিমা-বসে বসিমা বসিমা,
অপর বিধে প্রাণবর্তী প্রভেদ সমস্ত প্রভেদ-বসিমা উদ্দেশ্য, বর্ধমান
কালে, মাংস প্রভেদের আর্থিক পক্ষ্যকালে। প্রভেদ-বসিমা প্রভেদের
সমস্ত বসিমা করিতে হইলে, তাহাতে প্রভেদ প্রভেদ প্রভেদের সমস্ত
প্রভেদ। প্রাণবর্তী বাস্তব-বসে প্রভেদ প্রভেদ প্রভেদ প্রভেদ
হইতেই মাংস প্রভেদের প্রভেদে বসিমা করিতে। তবে আমি এমন বলি
না যে, দক্ষ বাঙ্গালীই প্রাণবর্তী হইল। আমি এমন চাই না যে,
বাঙ্গালী বসিমা মাংস-বসে বসিমা এবং প্রভেদ-বসিমা প্রভেদ প্রভেদ
পুষ্টি হইতে। আমি এমন বলি না যে, মাংস বা বসিতে প্রভেদ

বাল্যসীর বিদ্যুৎ থাকে। আমি বলিতে চাই যে, যে ব্যক্তির অধঃস্থ দুইটি, তিনি যখনই পরিমাণে মাত্র বাইরা পুষ্ট লাভ করেন, বাইরা অতিক্রম হইবে তিনি মাংসেই পরিতুষ্ট হইল। কল বলা, বাস অশেষাকৃত সভা এবং পুষ্টির হিসাবে মাত্র বাসে এরাই তুল্য-তুল্য।

আমার মনে হয় যে, কোনও যৌনে অর্ধোপার্জন করিলে যাহাঁকো বিনামূল্যে ভোগ করা যায়, তেমনই পৈশবে দুইটি ভোজন করিয়া ও যৌনে দুই-টি বা ততোধিক যৌন পরিমাণে মাত্র বাইরা য় তৎপরিণতিতে উভয় ব্রহ্মই বাইরা ও যৌনপুষ্টি পরিমাণ করিয়া পরীক্ষক ভৈরব করিয়া রাখা সকলেরই উচিত। পরে, ১০ বা তদুর্ধ্ব বসে বাসে যৌন বর্ধন করিয়াও বেগকে দুই ও তদুর্ধ্ব রাখা সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। উল্লিখিত হইয়া, শুষ্ক সন্ধ্যায় পরিতুষ্ট হইয়া এবং না করিয়া বাসে বাওয়া পাগলের কার। কৃষা পাইলে বাইতে হয়—মুখো বাওয়া উচিত নহে। পরীক্ষিক ক্ষয় হইলেই কৃষার উল্লিখিত হয়—কিন্তু অসদ বাসেযোগ্যপরিণতি প্রকৃত কৃষা বা হইয়া ছুই কৃষাই বেশী-বেশী হয়। কয়েই সেরগ করিয়া বাইলে পরীক্ষার অন্তিম অবতরকারী।

কবিরাজী মতে খাড়াখাওয়ার বোধগণ্য।

ভাষ্য—(১) নূতন চটিলের ভাত—স্বাধ, পুষ্টিকর কিন্তু ভরপাক।

(২) পুরাতন চটিলের ভাত—সহনপাক কিন্তু দাবিহীন।

(৩) অত্যন্ত গরম ভাত—বলকরকারী; মনে মনে ভাত—সহনপাক। (৪) বাসি ভাত—বৃষ্টি। আধিনি—পুষ্টিকর, ক্রিদি ও পান্থযোগে হিতকর।

(৫) ভাতের খেব—কৃষা ও মুসলিম।

(৬) চিড়া—ভরপাক; কিন্তু উহার উপরে যে ভড়া থাকে সেগুলি খারক।

(৭) খৈ—সম্পূর্ণ।

দল—ইহা পুষ্টিকর, বলকারক এবং পরীক্ষার কৃষ্ণা-সাধক।

জাঁকায় ভাঙ্গা পনের সঙ্গে যে উহা পান্যবিরক কিন্তু থাকে ('গোবর') তাহা কোষ্ঠজীকারক; কিন্তু অধিক দিন সাধনারে আশাপন্ন পুষ্টিকর।

ডাইল। (১) সুপের ডাইল—সম্পূর্ণ, পুষ্টিকর।

(২) কসাই বা সাংকসাই—ভরপাক, বিহ, বলবৃদ্ধিকর, প্রসাববৃদ্ধিকর।

(৩) ময়—খারক।

(৪) হোণা—ভরপাক, পিত্তযোগে হিতকর, পুষ্করযোগ্য।

(৫) মটর—বলকরকারী।

(৬) অরুণ—ভরপাক, বলবৃদ্ধ-যোগ্য।

মুখ্যও—প্রসাব পরিষ্কার করে। উদাহ ও মুখ্যরাসী পক্ষ।
সিদি ও রকমোদন; গুরু-বৃদ্ধিকারক; পুষ্টিকর।

চালকুমারী কটী—পাকারী যৌন পক্ষ।

অপা—(লাট)—রেক; চুলকনায় পক্ষ ক্রিয়াকর।

আপু—পুষ্টিকর। গুরুপাক, গুরুবৃদ্ধিকর।

পটোল—বাত পিত্ত কষক উপকারী। কামি ও কুটে উপকারী।

ভল—অর্ধোপার্জ পক্ষ।

কচু—রেক ও আশ্রয় যৌন পক্ষ।

বানকচু—যোগ যৌন পক্ষ।

মুগা (কাটা)—অপকারী। পুরাতন ও গুট হইলে—শোথে হিতকর।

পাক। (১) কসাই—বলকর, গুরু ও গুরুবৃদ্ধিকর। (২) কটীসটে—ভরপাক। (৩) পুই—ক্রিদি, রেক। (৪) বেজো—রেক। (৫) মর্দেই—ক্রিদিবৃদ্ধিকর। (৬) হুনি—প্রসাধনক ও উদারের হিতকর। (৭) বিবি—বেগ ও আশ্রয়বৃদ্ধিকর। (৮) পালং—ভরপাকের ও উদার হিতকর। (৯) গাণ্ডাটে—অর্ধ ও ভরপাক উপকারী।

কসাই—(১) পাকা—রেক, বাবৃদ্ধিক, গুরুপাক। (২) কাটা—পুষ্টিকর, বাবৃদ্ধিক, খারক। (৩) বেজা—ক্রিদিনাপক; মুসলিমযোগে পক্ষ। (৪) মর্দেই—আশ্রয় উপকারী। কটীসি কমা—বাবৃদ্ধিক ও বলকর।

বেগা—গুরুবৃদ্ধিক। ভরপাক, বেগ, কচ, বাত ও কাসে হিতকর।

আর—ভরপাক, গুরুবৃদ্ধিকর ও বলকারক।

মাংস—চতুষ্পরিণেয় মধ্যে গ্রীষ্মাতীর ও পক্ষিদিগের মধ্যে পুষ্টিগ্রাহী মাংস উত্তম। কিন্তু হিমুর শাখ গ্রীষ্মাতীরের মাংস ভগ্ন নিষিদ্ধ। কসাই পক্ষিদিগের মাংস ঈশ, বাতগ্রাহীদিগের মাংস পিত্তবৃদ্ধিক। সমস্ত প্রকৃত বহুত প্রাণের মাংসগ্রাহ্য করা উচিত। পক্ষ, গুরু, বিহাট, পিঁড়িত, বৃদ্ধ, কৃষ ও নিত্যক কতি মাংসকে অধম মাংস করে। কচুটের মাংস—বাতনাশক।

হুমুর—বর্তককারী—গুরুবৃদ্ধিকর।

বিহুড ভোজন।

কবিরাজী মতে একপ্রকারের বাত বাইলে অল্প একপ্রকারে আহার গ্রহণ করা অসম্ভব এবং অসম্ভব—যদি একপ্রকারে মাংস ও দুগ্ধ ভোজন করা অসম্ভব। বহি আহারের বহি পুষ্টিগ্রাহী মাংসে হয়, তাহা হইলে অনেক ক্রিদিই বাইলে অল্প অনেক একপ্রকারে বিভিন্ন সেই সঙ্গে বাতগ্রাহ্য চলে না। একপ্রকার মাংসগ্রাহ্যে হাঙ্গির উড়াইয়া যেন। জাদি না সকল কসাই উপযোগযোগ্য কি না। তবে আশ্রয়-ক্রিদিগের বৃদ্ধি ও জ্ঞান এত অল্প যে, উপহার না কসাই শোভন বলিয়া প্রতীতি হয়। একপ্রকারে মাংস ও দুগ্ধ বাইতে নাই—নাহেৎ। একপ্রকারে মাংস ও দুগ্ধ বাইতে নাই। কিন্তু বর্তমানকালে বিবিধপ্রকারের মাংস গ্রহণ করবে, গুরুবৃদ্ধিকর লক্ষণ বা লক্ষণ

বাড় খাইলে ছুত সহজে পরিণাম হয় না এবং খাশে সাংঘাত্যে, খাশে ও ছুত উভয়েই ভয়পাত্ত হয়। এই ভুক্ত যে বালক বালিকাভের চুখের সঙ্গে ভয়ভাবি বা ভালা ভাণ্ড ভয়প করা অত্যন্ত আছে, তাহাখিধের সেই অজ্ঞান শিশুই ভাণ্ড ভয়ান উচিত।

যদিও ঐক্য বিরুদ্ধ ভোজন বসিরা বলা যায় না, তথাপি আহার্যের আকর্ষণ পরিবর্তন লব্ধে এই বলে উল্লেখ করা উচিত বনে করি। অতি শিশুবিদগে হুইং যো ছুত হইতে ভাণ্ডভুক্ত বা হুইং এক আহার হইতে অপর আহারে গইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। তবু বহুলগ ঐক্য জাই। এই কারণেই যো হুং প্রকার বচন ইইয়াছে—“আশুকরি খাশা”

কবিতারী মতে ছুই একটী বিরুদ্ধ ভোজনের সূত্র ভালিকা দিলাম :—

হুংর সঙ্গে বিরুদ্ধ—যন্ত্র, দুলা, লাগ, কয়েদবেল, ঠেতুল ও অপর আর, নারিকেল।

বসির লিখিত—হুংরীং খাশে, কলী, ভাল। [ত্রাহৈত শ্রীকৃত বিরহভাষণ ও প্রহাণের বসোখরি বর্ণন গ্রহে এই সকল তথা বিস্তর বর্ণনা আছে]।

নানকপত্নী—নানকশাহী

[শ্রীমাত্তোষ তরুণ্যত]

নানক ১৪৬৯ খৃঃাব্দে লাহোর জেলার অন্তর্গত ভালকশী নামক গ্রামে ক্ষেত্রীপুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০৮-৯ খৃঃাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। নানক একজন গ্রন্থিক বর্ষ-সংস্কারক। পত্নাধের আধিকাংশ আধিবাসী নানক-প্রবর্তিত বর্ষের অনুসরণকারী। নানক-কবিত, ইহর স্ত্রী, নিতা, অতিবন্দী ও অনন্য। তিনি সচা, স্ত্রীর পূর্ণের বর্তমান হিসেব, বর্তমান সময়ে বর্তমান আয়েব এবং স্ত্রী-প্রভেতে বর্তমান থাকিবেন। তিনি এক, অধিষ্ঠীত ও অকাল। নানক বোমা ও গতিত, বহবেশ ও সঙ্গাধিগকে সাংঘাত্য করিয়া কহিবেন যে, পরমেশ্বর কত গভ বসন্ত, বিষ্ণু ও শিবের আধিষ্ঠা ও গভ বর্ণন করিয়া-হেন ও কহিতেছেন। তিনি আরও কহিবেন যে, বর্ষ, ধান, সংকার্যে ধীবনোৎসর্গ ও জ্ঞান কোন কলোপাধ্যাক নহে; সেই জ্ঞানই জ্ঞান বদ্বায়া দিগে উপলভি হয়। নানকের মতে যে ব্যক্তির উপর ইহরের অনুগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তিই ভাণ্ডার বর্ণন লাভ করিতে সক্ষম হয়। নতুবা, হালাসিগের বিধাশ অধর্মে বিধাশ স্থাপন করিয়া বন্দী সংকর্ষ ছায়া অনন্ত জীবন লাভ করিবে নানক তাহাধিককে অনুশোণ করিতেছেন। সত্যভাষণ ও সংকর্ষভাষা দ্বিত্ব দাত হইতে পারে বটে, কিন্তু ভালাভেত ইংগাধুগ্ৰহের আশেপা করে। নানকের মতে, হিন্দু ও

মুসলমান এক। উপাসনার নিধিত আভিভয়ের প্রয়োজন নাই। জাতিভেদ নাই; বহুভুতাই এক।

আধিকাংশ নানক-পত্নী বসিলে শিব বুঝার। ইহাখিধের উপাধি সিংহে। ইহায়া পূর্ববর্তী জন্মপণের অনুশোখিত শিব পাসনকারী, বাহাউত্বপূত্র ও সাধাধিক বিদ্যের বহিষ্ঠুত। সাধাধিক নিয়ম ও বাহাউত্বর ভক্ত বোধিধ সিংহ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ভক্ত বোধিধ শিবের নতানুগাধিগ বৃথাপান করে; মতকের বেশ রক্ষা করিতে বাধ্য হয়ে, কিংবা চারি ‘কল্মাধিক’ দার হারে না। তাহার ‘পাশল’ (পদ প্রকাশন বল) দ্বারা দীকিত হয় না এবং ভ্রাণকপণকে সাধার বহুধের জায় বর্ণন করে না। নানক-পত্নী শিব হিন্দুধিগের জায় বহুত মুনন করিয়া বহুধলে ‘বোদী’, ‘ভোদী’ (শিবা) রক্ষা করে। অপর শিবেরা বেশ মুনন করে না। এইহেতু পূর্ণোক্ত শিবগণকে ‘বুদী’, ‘মুদী’ বা ‘বোদীওয়ান’ শিব কহে। ইহাখিধের অপর নাম ‘সাধাধাধী’। দীকাকালে নানকপত্নীগণ ভক্তর চরণান্ত পান করে; ইহাখি নাম ‘চরণ-কা-পাশল’। ভক্ত বোধিধ শিবের নতানুগাধিগ ‘ধাও-কা-পাশল’ (বক্ত-স-খোঁত মল) পান করে।

মুক্ত-প্রবেশে নানক-পিতৃগণ নানকশাহী নামে পরিচিত। ইহা-খিধের ছয় শাখা :—উদাধী, নির্বল, অকালী, মুখাধাধী ও ভাণ্ডাধি। ইহাখিধের মধ্যে কতকগুলি বধন দীকিত হয়, তৎকালে বেশ-অনু মুনন করে এবং দলত স্ত্রীর বহি ও মল দ্বারা প্রকাশন করে। অপররা একেবারেই ক্ষৌরকারকে স্পর্শ করে না; বদ্যালে বেহ খোঁত করে এবং ভক্তর চরণান্ত পান করে। তৎপরে ভক্ত কর্তৃক ‘দত্য নাম’ শিবের কার্য অনুজ্ঞ বটে উচ্চারিত হয়। একদে শিখ উন্নত যোগানে আয়োজন করিলেন, কারণ, তিনি ‘মন্তত্বধিগ বহাধাধা’ প্রাণ হইলেন। চারি বর্ষের লোক নানকশাহী বর্ষে দীকিত হইতে পারেন। দীকিত হইতে হইলে বহঃকথের কোন নিয়ম নাই।

১। উদাধিগ্ৰহের মধ্যে অনেক বেশ ত স্তম মুনন করে; অনেক আবার বেশ রক্ষা করে। ইহায়া পেল্লা রঙের ধৌপিন পরে এবং এক বস্ত্রও দ্বারা কট্টসেণ বন্ধন করে। এই কট্টসেণ বসনের দান ‘অক্ষল’। তাহার। স্ত্রীশালিগের জায় আধাবালিগের বিকট এক মল-পাতি (কণ্ডপু) রক্ষা করে। যিনি বস্ত্রের প্রধান, তিনি বোহোভ নামে অভিহিত হন। বোহোভ বহুকে লাগাবর্ষে পাগুতী (লাকা) বন্ধন করেন।

২। নির্বলগণের পরিধের উদাধিগণের জায়। ইহায়া বেশ কর্তন করেন না; তবে কণন-কণন যেত বস্ত্র পরিধান করেন।

৩। মুখাধাধী পুংহ; ইহায়া বেশ কর্তন করে না, মতকে পাগুতী ধানে এবং সাধাধি বস্ত্র ব্যাধার করে। ইহাখিগের মলমাল্য যেতঅধিগ।

৪। অকালীগণ বেশ রক্ষা করে; আধিগা পরিধান করে এবং কণন কুকর্ষ ও কণন বা যেতঅধিগ পাগুতী ব্যাধার করে।

৫। মুখাধাধী পুংহও উদাধী-বা স্ত্রীশালী। ইহায়া ছইটী কটী

বালাইয়া শুক নানক সম্বন্ধীয় গান গায়; ইহারা যেত বন্দন পরিধান করে; কিংবা মত ও ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণাঙ্গ খাণ্ড করে। এই হিন্দু পন্থা নিষিদ্ধ।

৩। ব্রাহ্মোত্তরণ নিষিদ্ধ; ইহারা চামার (চর্মকার) জ্যেষ্ঠত্বক। ইহারা শুক গোবিন্দ বিগ্রহের সন্মানবলী।

উষারী ও নির্মলগণ আপাদমস্তক জোড়নের নিষিদ্ধ আর পাক করে না। ইহারা ছয় ধারে-ধারে অন্ন সূর্যক গ্রন্থত আর ভোজন করে; লতুবা ক্ষেপে (হুয়ে) পবন সূর্যক জোজন করে। অনেকের নিষেধ আর আছে; অনেক বধী নিরুপা কৃষ্ণ প্রতিপাদিত হয়। ইহারা তিনকালে 'নাখারান' শব্দ উচ্চারণ করে। ব্রাহ্মণ, কন্নিয় ও বৈজ্ঞান্য পুণ্ড্র বান, ভাত ও রসী ভোজন্য করিতে; কিন্তু সূর্যের পুণ্ড্র কেবল গজা (পুতী, ভক্তকণী, দীর্ঘাই ইত্যাদি) ভোজন্য করে। ব্রাহ্মণ, কন্নিয়, বৈজ্ঞান্য ও পুত্ৰ গায় বর্ষের মধ্যে যে কোন বর্ষের শ্রুতি মূল পান করিতে কোন আপত্তি নাই। ইহাঙ্গিণের মধ্যে বাহায়া সন্ন্যাসী, তাহারা আমর্য অধিযাচিত থাকে; বাহায়া দুহই হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আপন জ্যেষ্ঠ পরিবার-সম্বন্ধ হইতে কড়া দখোদীত করিয়া লয়।

কেব-কেব-এলপতী ইচ্ছা করে। পুত্রসংগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রদর্শিত আছে। উষারীদ্বন্দ্ব বিবরণের মধ্যে একবার জোজন্য কচ্ছে; অপরে বিধা-মাজির মধ্যে দুইবার করিয়া করে। ইহাঙ্গের মধ্যে ভক্তিকূট, মত ও মাদল ব্যবহার নিষিদ্ধ; কিন্তু কোন-কোন উল্লীসক ব্রত গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহায়া পুণ্ড্রসংগের মাদল করে, তাহারা ব-ম মাজীর মিত্তি অনুসারে গান ও জোজন্য করিয়া থাকে। ইহাঙ্গিণের গানপা-বিশ্বাসিদের; জায়। ইহাঙ্গিণের বর্গসংগের নাম 'সম্বৎ'। তথায় ইহাঙ্গী নানকের এক অর্চনা করে। ইহাঙ্গিণের প্রধান তীর্থ অমৃতসর; কিন্তু ইহাঙ্গী অমৃতসর, ব্রহ্মকাল্য, সেতুঘর মাদল, বাহায়া অনুভূতি তীর্থসংগে গমন করিয়া থাকে; এবং বিশ্বেশ্বর-সেবীর উপাসনা করে। 'মহ শুক কি কতে' বলিয়া ইহাঙ্গী পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া থাকে। কিন্তু উষারীদ্বন্দ্ব 'বওবৎ' শব্দ উচ্চারণ করে। বর্মবাসী ও পুণ্ড্রদের শব্দ বার হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীগণের শব্দ মধী-মদে নিষিদ্ধ হয়। নানক-কন্নিয় এক ব্যতীত ইহাঙ্গিবাদে ব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বর ও শক্তিই অর্চনা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুকপন্থ এক পাঠ করেন এবং শিষ্টপন্থকে বর্ণীগণের প্রদান করেন। শিষ্ট-গ্রন্থের সমস্ত ব্রহ্মই শুক গ্রহণ করেন এবং বর্ষ সমস্ত শিষ্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন। নানকশাস্ত্রানুসারের হয় নাথার বিশেষ বিবরণ বারাক্ষরে প্রকাশিত হইবে।

বক্সাল্লের হাড়

[ঐতিহাসিকোপদেশ শুভ, এম-এ]

বক্সাল্লের হাড় লইয়া ভেদী খেলিবার উদ্দেশ্যে আপাদমস্তক লতুবে উপবিষ্ট হই নাই। কারণ আমায় সে ভয় নাই। একতর, পুণ্ড্রতর,

বা ইতিহাসের বার্তা আমি জানি না। এককালে কিং, একতরিকের সৌরবর পলাতক ইচ্ছা আমাকে একতর, প্রদর্শিত অধিবৎ সংগ্রহে প্রেরিত করিয়াছিল। এখন পুণ্ড্রতর বর্ষাবধি লতুবে, বাইরা, একতরক কন্নিয় শিলার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, সে বাহায়া লয় গিয়াছে। তবে আমার মত ইতিহাসিক-বন্দ্য-প্রাধিকার্য লাভমান করিয়া বিচার্য মাসে 'বক্সাল্ল' কথা নিবৃত্ত করিতে দায়ী হইতেছি। আপদারা বৈধা ব্রহ্মা এমন করিলে তৃতীয় হইবে।

একতরার অজ্ঞাতমানে অবস্থানকাল, তীর্থ বন্দন শক্তব্রাহ্মী বক্সাল্লের বিবদ্য করে, তখন তিনি বহুতর ভাবের নাই যে অমৃতের অধি ভবিততে পণ্ড্রমাত্র সাহিত্যসেবীর আগ্রহে গান পাইবে। আপদারা অবধি হইবে না,—অপাদে বৈজ্ঞান্য হইলে যে, এই অধিবৎ লইয়া আমায় মত লেখকদের বন্দন বাহায়া লতুবে হইবে, ইহা হইতে বক্সাল্লের পুণ্ড্রব্রহ্মণ্য ও তৎপরে বিধানমতলীকে প্রাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তৎকর ব্রহ্ম একবার অমৃতব। অধিবৎ ইতিহাস—কথা করিবে—ইতিহাস বহু, কাহিনী—আপদারের নিবৃত্ত বাক্য করিলে, আপদারা আঘাত হইবে।

১৩২২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে কর্ণওয়ালিসে বন্দন খেলিবার জিলায় তথ্যেপুত্র বক্সাল্লের জিলায়, তখন তথ্যকার জামিন্দার সূর্যের প্রাচ্যে বাহায়া এক বও গ্রন্থের এক আমায় পুত্ৰ পাঠ্য হই। অনুসন্ধানের আলিখান যে, কোন এক গ্রন্থগ্রন্থত মুদ্রণক মাদল উঠা পড়বেতর মাদল হইতে আনয়ন করিয়া বিশেষতঃ প্রোথিত করিয়া বান। ব্রহ্মণ্যবন্দন; মাদল বহাঙ্গের মাদল মাদিতে পারি নাই। একতর ভাল হইয়াছে; কারণ অধি আধিকারের সৌরবের জামি ওহাৎক করিতে হইলে যে আমায় বৈধাচ্য হইত। বাহা হটক, তববনি উক্ত গ্রন্থগ্রন্থত অধি-বান পড়বেতর বিয়া নৃতন তথ্য প্রাচ্যের বার। ইতিহাসিক অগ্ন্যে চমকিত করিবার যেমন ইচ্ছা মনে জাগরক থাকিল। বটনক্রমে, ১৩১০ অব্দে যে মাসে বক্সী পরদবার মাদলবন্দন কর্যে আমাকে আমদাগোড়া ও পড়বেতর অধিবৎ থাকিতে হয়। আমিও একতরিকের মাদাগোড়ের সেই হুব-হুবোপ পরিচায়ক করিতে পারিলাম না। এখনই বক্সী পরদবার (নিষিদ্ধ) সংগ্রহে প্রাপ্ত হইলাম। বন-প্রাচ্য আমায় তৎপূর্ণ অমতিভূত, পরদবার জামায়, মাদাগোড়-প্রদিত বক্সাল্লের বিবদ্য-ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিল। আমি আহার শিলা পরিচায়ক করিয়া একতরক অনুষ্ঠানে ব্রহ্মী হইলাম। আমদাগোড়ার খেলিবার জামিয়ারি কোম্পানির বাহায়া হাভার মাদিত বক্সাল্লবন্দন উল্লেখ্য অধি অগ্নে লইয়া, হাড়, দুর্গ, মাদ একতর বৈজ্ঞান্যিক পরীক্ষা চলিতে লাগিল। তবে, আমায় মদে পরদবার জামায় লতুবে অধি উল্লেখন করিবার পুণ্ড্র অধি। কিন্তু বক্সী পরদবার ব্রাহ্মণ্য বিবদ্য করিলে। তাহার মাদিলে যে অমৃতের হাড় মদে আমিলে পরিচায়ক নক্সিখি অধি, এমন কি বন-মোপ পণ্ড্রতর হইবে। বাহা কোম্পানীর আঘাতে বাক্সাল্ল-পুণ্ড্রের আমা জামি উল্লেখ, বন্দনকর্তার আও

সর্পের মূখ এবং শুভ্রবেশে উত্তরকণ্ঠে বন্ধ করিয়া একটা মৃতন ঝড়িতে রাখিতে হইবে। পরে সেই ঝড়ির মূখের সমা রাখিয়া তাহাতে বৃত্তিকার লেপ দিতে হইবে। পরে নির্জন স্থানে প্রাতঃকালোবধি পুণঃ প্রাতঃকাল পর্যন্ত অগ্নির আল দিতে হইবে। পরে শুভকণ্ঠে হালীদুপ পুড়িয়া সপ্তভুজ মগ্ন হইতে পারব গ্রহণ করিবে। একতোলা তাম্র উত্তাপে তপন করিতা, তাহাতে সেই পারব একত্রিত বিবাহ্যাই সেই তাম্র দ্বারা হইবে।

শেষের বহনকে সেই সময়ে ১০১১ বৎসর। সেই সময়ে পিতৃবাক্য সকল বলাবধি বিধান করিতাম। প্রথমতঃ, ঐ কর্ণে বড়ই কঠিন বলিয়া শোধ হইয়াছিল। কেউটে সাপ খরিতে হইবে ত। সেটা নিত্যন্ত সারজ নহে। বর্ষা হইত, সেই সময়েও আমি পারব লইয়া মগ্ন করা আরম্ভ করিয়াছি। এবলিন সেবিলাম, একজন সাপুড়ে সর্পের বোকা বৈক কুলাইয়া দুইটা বারাইয়া চমিকিতে। আমি তখন তাহারে ঢাকাইয়া একটা কেউটে সাপ ঢালিলাম। সে পাঁচ টাকা দুলা একটা সর্প আমাকে দিল। তাহার হস্ত দ্বারা সেই সর্পের দেহের মধ্যে বন্ধ ভরি পারব পুড়িয়া লইলাম। সর্পটাকে ধী কড়াইয়া পায়া চালিবারাইই সমস্ত পারব সর্পের বৈক প্রবীষ্ট হইল। পরে পিতৃবাক্যের ভাষা সর্পের মূখ এবং শুভ্রবেশে উপরিভাবে বন্ধন করিয়া একটা মৃতন ঝড়িতে রাখিয়া ঝড়ির মূখ সজা দিয়া ঢাকিলাম।

এই সময়ে আমি লোণা প্রস্তুত করিবার মোতে এবলিন অর্ধ হইয়াছিল। আমি যে, বিনা কারণে একটা কেউটে সাপ রাখিয়া ফেলিলুম। একটা বিবাক সাপ মালিলে আবার সাপ কি? তখন যনের এই অবস্থা। একটা নির্জন বাগানে বিগা এক পরশুট বৃদ্ধিলাম। এক হস্ত ব্যাগ-দুত এবং দুই হস্ত পতীর একটা কর্ণ করিয়া তাগা বনমুটীয়া খালা পরিশুদ্ধ করিহেঁচি, এমন সময়ে সেই নির্জন বাগানের বাতের শব্দ দিয়া একজন ত্রিখায়া বহিঃগেলিল। ত্রিখায়া আমার কর্ণে বৈকি বাগানের মধ্যে আলিয়া আমাকে নানাসকর গ্রহণ করিতে লাগিল। পায়া তত করিবার সময় সজা কখাই বলিতে হয়। হুতরাঃ সে ব্যক্তি কর্ণ, বলিল, বৈকিখায়াই হইলেক, তাহাকে সকল কখাই বলিলাম। সে বলিল, “বাগা, তুমি হুইট মগ্নাশপ করিতেছ। কেউটে সাপ গ্রাসণ, কেউটে মালিলে ব্রহ্মভায়া, এবং পায়াতে অগ্নি দিলে পুহ-শোক প্রাপ্ত হয়।” অবশ্য তখন এ কথা শুনিয়া আমি হাসিয়াছিল। পায়াতে অগ্নি দিলে বহি পুতশোক প্রাপ্ত হয়, তবে পিতৃ কেন পারব ভাষের বিধি ভাঙে নিষিদ্ধায়েন?

আমি পরশুট নিজেই অগ্নি দিয়াছিল। প্রায় ২০ বটাকাশ ঐ দ্বারা অগ্নি মধ্যে দিল। অপরাহ্নে ঐ পরশুটের বাকি মিল্লিপিত হইলে, আমি উহা উঠাইয়া লইলাম।

কেহ কেহ বলিলেন, ঐ সজা পুসিবারা এখন একটা বিবাক গ্যাদ হইয়া নির্মিত হইবে যে, তাহাতেই বৃষ্টি হইতে পারে। একে কেউটে সাপ, তার আবার সাখাৎ বনমগ্ন পায়া! বলিতে দি, আমি একটু ভীতও হইয়াছিল।

বাগাই হটক, সজা তো পুসিহেঁচি হইবে। আমি প্রাণাভাষ্যে কতকটা অভ্যাস করিয়াছিল। যেন-যেন ভাবিলাম, ঝড়ি পুসিবার সময় বিধান মগ্ন (হুতর) করিয়া পুসিব। তাহাই করিলাম। ঝড়ি পুসিবার সেবিলাম, সেই সর্পটার সময় সেই পুসিবার আবার হইয়াছে। সর্পের কাটাটি ঝিকট পুসিবার হুপ হইয়াছে। আর পারব আর সময় ঝড়ির নীচে টপ টপ করিতেছে। বীরে-বীরে সময় পারবটাই ঢালিয়া লইলাম, এবং তপন করিয়া ২০০ পাইলাম। দিকি করি আশা কর্তব্য পাইলাম না। যেন করিলাম যে, উহা উড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি সজাশে পারব উপস্থাই বাস, কিছুই থাকে না। কি কারণে সেই অগ্নিস্রোহাণি সজা করিয়াও সময় পারব থাকিল? পর দিবস প্রাতে আবার সেই সর্প-ভক্ষণালয় দেখিতে-দেখিতে পুসিতে পারিলাম যে, সর্পের কাটা পুসিবার হুপ হইয়াছিল, সেই হুপের সঙ্গে মিলিয়া অগ্ন-মগ্ন পায়া বহিয়াছে। তাহা নিত্যন্ত সাযুজ্যে। বাগা হটক, সেই কাটাভাঙিও রাখিলাম। সর্পের কাটা-সমগ্ন পারব কোনও মতেই বাহিতে পারিলাম না। অতঃপরই বাগা হুপ হইয়া বাস, এবং তপন আর চাকচিক্যও থাকে না।

পায়া তখন ত হইল না। মিছামিছা সর্পটা খরিলাম। কিছুদিন পরে একজন আত্মীয় ত্রিখায়া করিলেন, “তুমি যে সাপ পোড়াইয়া তপন করিলে, সেই তপন তাহা পলাইয়া তাহাতে বাও না। বেশ না একবার, কি হয়?”

আবার যেন দিল, পায়া তখন না হইলে ত খোলা হইবে না। তখন হয় নাই, হুতরাঃ উহা বৈকিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু আত্মীয়ের বারবার তপন করিলে তখন পলাইবার বাধ্য করিলাম। আমাদের দেশের পর্বতভায়ে। এমন অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারবদ্ধ যে, তার পলাইয়া বাও বলিলে, উহায়া কোনও মতেই রান্নি হয় না। “বিশ্বকর্মান্তি বারন আছে—সুখু তার পলাইবে না। হুতরাঃ তাম্র পলাইবার বাধ্যও আমাকেই করিতে হইল।

আমি একটা কোড় কলার উপান করিয়া তাহার উপরে একটা টিনের দুই হাত টানি দিলাম। মৃতী করিয়া তাহার পাশ রাখিয়া, হাত-পাখার মধ্যে বসাইলাম। পরে উনানের উপর টিন বসাইয়া, হাত-পাখার বাতাস ঘিটে লাগিলাম। সমগ্রই তাম্রপাত সকল গ্রহণ হইয়া নীলবর্ণাক্ত বহিঃর মল রূপ বারন করিয়া পুসিতে লাগিল।

এখনও এক বিবদ লম্বা উপস্থিত হইল। উত্তর ভাষা হাতুর উপর পারব নিখায়াই মিটকাইয়া উঠিবে, এবং পায়াতের বিবাক সাপ সেই দ্বারের বায়ু সহিত মিলিত হইবে। হুতরাঃ এই কার্যেও নিয়ম বন্ধ করা নিত্যন্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, তপন পারব এক রতি একটা ছোট সৌহবর্ণিত হাতার লইয়া তপন তাম্রপাতুর উপর ঢালিয়া দিলাম। দ্বিখায়াই উহা মিটকাইয়া উঠিল, এবং গালিত তাম্র-বাহু সেই মৃতীর মধ্যেই কঠিন ভাব ধারণ করিল। আর সেই দ্বারের মধ্যে গালাব মত একটা পদার্থ সেই ভাষে হইতে নির্গত হইল। উহা দ্বারা



হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিবার মত, এবং উহা পূর্বকার তরল কবিতার মত নূন হোতে পাশার বাতাস দিতে লক্ষ্যমান। কিন্তু এই তরল আশ কেমন্ত সতেই তরল হইল না। হুতরাং উহা নূন মনের উদ্ভাসে উঠতে ভুল ভিরা ক্ষিতল করিলাম। যেখান, তাম্র বাতুর বর্ণ ইন্দ্র পীতক হইয়াছে; কিন্তু উঠাতে হুবর্ণ বলিতে পারা যায় না; কারণ, নাইট্রিক এনিড বিলম্বিতই উহা হইতে নূন নির্ণত হয়।

এই পটীকা দ্বারা বুঝিলাম, পূর্বোক্ত বস্তুরের তরলমণে সংকৃত ভাষাতে দ্বারা নির্ণিত হইয়াছে, তাহা কোল হুইটলি কোকোর রচনা। উঠাতে একমত: কুকর্ণের হাতেই হুতুর সন্ধান; বিদ্যুত: বন-লোতে ব্রহ্মাণ্ডের পাতক; সূত্রীয়ত: একবার সর্গেরের ইন্দি বুঝিবার সম্বন্ধ, আর একবার গালিত তাম্র হযোগ পারম প্রয়োগ কালে নিঃসাদের সহিত পারমের বাস্তু মিলিত হেই একবারে পারমের বিবে পূর্ণ হইবার সন্ধান। কি না? বন-লোতে! আর, সে মত কি একবার বিশুদ্ধকৃত অমৃতমণি!

সর্বের কীট পুষ্টিয়া যে হুপ হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে একটু একটু যে পারম ছিল, তাহা একটা কীটের হিপিষ্টক নিপিতে বাঁধাছিল। সর্বের সেই কীটগুলি বাঁধিবার কারণ এই যে, তাহাতে যে কিছু নিকের পায়ট্রু বোমা বাইতেছিল, অমৃতমণে সেইগুলি কোলোয় শুষ্ক হইত। একবার মনে করিলাম, এই হুপ-সংসার পারমই বোম্ব ক্ষুদ্র-এইহা। এই হুপ-সংসার পারমই গালিত তাম্রে দিয়া বোধিবার ইচ্ছা হইল।

ইহার পর-বিবল একটা নূন প্রাকটিক নুনা করিয়া গোটাভক্ত ভবন পুরগা গলাইলাম। উত্তর রূপে তরল হইলে, সৌন্দর্য্য-চাক্চিক্য বিশিষ্ট সর্বের কীট একটা বেশিয়া বিলাস। সেই সময়ে ভাস্কর্য্যের দীপ শিখা অবিদ্য হইতে উঠিহেছিল। সর্গাধি হুপ-সংসার পারম অতি সামান্যই ছিল সম্বন্ধ নাই; কিন্তু উহা মিথামায়ে জ্বায়ে মিল শিখার পরিভর্তন হইয়া হরিবর্ণ শিখা নির্ণত হইয়াছিল। পূর্ববিবল তরল পারম প্রয়োগে তাম্র এবং পারম যে একবার হিউইয়াই উঠিয়াছিল, পর-বিবল তাহা হইল। বিশেষত: বিদ্যার বিদ্যে ভাস্কর্য্যের বর্ণ শীত হুবর্ণের মতই হইয়াছিল। গালার মত পারমের অধিক পরিমাণে নির্ণত হইয়াছিল। সত্যই কি হুবর্ণ হইল না কি? তরল বাতু একটা ইষ্টক-নির্মিত হাতে ঢালিয়া 'ক্যাথি' করিলাম। পিষ্টিকা বেশিমান, পাতক হয়। পর বিবল তাহা নানা প্রকারে পটীকা করিলাম। নাইট্রিক এনিড, তাহার উপর প্রয়োগ পড়ে কণা করে। লাবণ্য হুবর্ণবিদ্যে ১০ টাকার গোপা বলিয়া লইতে চলে। আদি তাহা বিস্তর করিলাম না; তাহা নূনা মতম রানিয়া দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে Specific Gravity সেমিয়ার একটা মোট-নুট প্রভৃৎ করিয়া সেমিয়ারিলাম যে, উহা হুবর্ণ হয় নাই। তাম্র-বাতুর বর্ণ-পরিবর্তন হইয়াছে বার।

বহু পূর্বকালে যোগ হয় এই প্রকার পরিবর্তিত তাম্র হুবর্ণ বলিয়া চলিত হইত। এখনও উহা সর্বের সঙ্গে মিশ্রিত বিস্তর করিলে, কষ্ট-প্রসূত্রে, অথবা এনিড পটীকার সম্বন্ধে বহু বড়ই হুপি।

এই বসে একটা কথা এই হইতে পারে যে, পারম তরল হয় নাই। হুতরাং পূর্বকার একটা কুকর্ণের আব্রতক। কিন্তু সেই সময়ে অপর কোলোয় লাপুড়ে এই প্রকারে সর্গ দিতে চলিল না। আবার মনে পূর্ণাপারই ইচ্ছা ছিল, এই পটীকা আবার করিব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে উহা হইতে বিস্তর হই।

অনেক দিন পূর্বের কামিয়ারে গোপাল দিও ন্যাক এক অমৃতক আনিয়াছিল। তাহাকে আমি মিথামা করিয়াছিল, তাম্রবাতু পারম তরল মনোযোগে হুবর্ণ হয় কি না। তিনি ইহার উত্তরে মিথামিষ্ট করিওটি আমাকে বলেন;—

"কহ না কেমন্তে লবি,

তাম্র কুক এক বেশি।

কুক হাম এক তর,

এই তো গনিয়াচি।

হুনিম মেঘের বর্ণে হবে হুপিয়ার ভাস্তু,

লক্ষী ভগা সীতা বোধি মনে বেশি অমৃতমণি।"

এ কবিতার অর্থ গোপাল শির যে প্রকার বুধাইয়াছিল, আমি তাহা লিখিলাম:—

গাম-লুকবর্ণ।

কুক-মীলবর্ণ।

তাম্র গালিত হইলে তাহা হইতে মীলবর্ণের বহি-শিখা নির্ণত হয়; বর্ণ গালিত হইলে, মনুসবর্ণের বহি-শিখা নির্ণত হয়। অতএব এই সম্বন্ধে তাম্র শব্দে হুবর্ণ, এবং কুক শব্দে তাম্র বাতু হুবর্ণ। হিন্দু শাস্ত্রমতে বেথোপাসনার বর্ণ-পারমের অত্যন্তে তাম্র পাত্র ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। কবিতার মূল অর্থ এই যে, বহিঃকণা গালিত তাম্রের মীল শিখা পরিবর্তিত হইয়া বহুপি হরিবর্ণ বারন করে, তবেই তাম্র এবং কুক (অর্থাৎ তাম্র হুবর্ণ হয়) এক হয়। এবং তাহাতেই লক্ষী, অর্থাৎ বন লাক হয়।

গাঢ়তা এন্-কমিউ-র লয়ানবিহু। গণ তাম্রকে 'তিবল' নামে বিখ্যেয়। তাহার কারণ এই যে, উহার সহিত কোমল একটা যেতবর্ণ বাতু মিলিত হইলেই উহা পীতবর্ণ বারন করে। উদাহরণ হলে তাহা হুপ কেমন্ত যে, তাম্র এবং হুতর মিলনে পিতল, তাম্র এবং রত্নের মিলনে কাঙ, তাম্র এবং এম্বিমনের মিলনে সোনার। (Rolled gold) ইহা থাকে। পিতল, কাঙ, অথবা সোনারা যেহেতু প্রায় হুবর্ণেই হয়। তাহাদের সহিত কোমল প্রকারে পারম মিলিত করিতে পারিলেই সেই মিলনবাতু হুবর্ণের শুণ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের সহিত পারম মিলনে, উহা হুবর্ণের মত জারি, এবং উচ্চল পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহাদের সহিত পারম মিলিত হইবার পক্ষে অনেক অমৃতমণি আছে।

যে একান্ত উত্তাপে তার তরল হয়, সেই উত্তাপে পারদ ঘাপ হইয়া উঠিয়া যায়। রস-স্রাবক রসেত্র-চিহ্নাখি, এবং রসেত্র-পায় একত্রিত হতে পারিলেই সেই বোনের মধ্যে “বলি-বোম” যেহু পারদ তরল হইয়া থাকে। এই বলি-বোমটি নিম্নাকৃত কথিতে পারিলেই, উহা অজ্ঞাত বাতু হইয়া ভায় কামিত্র প্রাপ্ত হয়। তখন উহা গটিলে পাত হইবে, এবং তারও হইতে পারে। এই একান্ত বলি-বোম নিম্নাকৃত পায় এবং মাদিন্দু বাতু প্রায় এক একবার ঘূই হয়।

মাদিন্দু, এনুদিন্দু এবং তার সহযোগে এক একবার মিল বাতু হয়; তাহা হৃৎকর্ণের সহিত মিলিত করিলে, হৃৎকর্ণের বর্ণ ও অজ্ঞাত কণের বিশেষ পরিবর্তন উপলব্ধি হয় না। মাদিন্দু একিগত তাহা ত্রয় হয় না। কল্পি-পাথকও তাহার পায় গ্রসি বলা যায় না। মিলাতী ২ কয়লাই হৃৎকর্ণের সহিত এই একান্ত বায় বেগের থাকে যদিও সেই একান্ত কন-বহর যোগের সেন্দ্র, গুণী, অসুখী, এবং অজ্ঞাত অলভ্যারূপি প্রকৃত হইয়া থাকে। এই মিলন প্রযো (৭. carat অর্থবা) ৩২৫ এই একান্ত মূল্যবান থাকে।

পারদক কোনও একবারে কটন কথিতে পারিলেই, উহা তরলের সহিত মিলিত হইবে; এবং এই মিলনবাতু সর্বা একত্রিত বসিল হৃৎকর্ণের সহিত হইবে। আসল হইতে মূলক হৃৎকর্ণের কিছুই পার্থক্য বোম হয় না। এমন কি, একবার অনেক মাদিন্দু এই বিভাজ্যভাবে “জাগ্রানি” নামে পাইয়াছেন। অজ্ঞাত মাদিন্দুস্রাবীস্রাবের সর্বা-স্রাবক অজ্ঞাত বোমের কথিয়ার তত্ত্বই তাহার এক তীর্থ হইতে অপর তীর্থে অমন করেন। পারদের তর-স্রবত কন-প্রস্রাবী বিশেষ কটন কর্তৃক বহে। তাহার উহা কথিতে পারেন, তাহারের অধিক মূল্যবান ব্যাধির খা বহুদূর কোনও পদার্থ আশ্রয়ত হয় না। সামান্য সূত্রিকা-মিলিত পারদ দি, একটা বল, এবং বহুদূর অর্থবা বাতু-বহর অধি-বাহারী তাহার কাযা নির্বাহ করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা আবশ্যক। সোণ প্রকৃত কথিতে পারে, এই একান্ত অধিক বুদ্ধাক্ত হানে-হানে ঘূরিয়া ভাসমানপ্রযো ইকায়ি থাকে। আশ্রয় এই একান্ত কথিয়ার হাতে পড়িয়া উঠিলেও এগিলত করেওই সাধারণ পদ্ধতি পারদকর্ণের সোণ করা আবশ্যক।

১। পোষার কলিকার আত্ম-নির্ভর প্রিন্সা বিয়া তাহার উপরে পীঠা সামান্য পীঠা যায়, এবং পীঠা পুড়িয়া গেলে, সেই কলিকার প্রিন্সারূপী হৃৎকর্ণ হয়।

কিঞ্চি পরিবর্তন হৃৎকর্ণের প্রিন্সা প্রকৃত করিয়া তাহার উপর তাহার নির্দিষ্ট করিয়া ইহাও স্থান মধ্যে রাখিয়া দেয়। ইহাতে এই সকল তর-স্রাবক প্রিন্সা উৎকৃত সাধিত হয়। সোণার উপর উল্লম্ব নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলে, কের হানে এই প্রিন্সাভূমি হৃৎকর্ণ বসিয়া সূত্রিতে পারে না; এ কারণেই অর্থবা চোরেও উহা লয় না (১)। যেখানে এই একান্ত একটু বুদ্ধাক্ত দেখাইলে কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে, সেখানে একটা প্রিন্সা কথিতে গোড়াইয়া তাহার নির্দিষ্ট উঠাইয়া

হৃৎকর্ণ করিয়া দেখাইলে, হৃৎকর্ণ বেশ দৃ’ এক হাজার টাকার কিম্বদন্ত হইয়া যায়।

২। পারা মদাইয়া টানি করা।—ইহাও এমন তবে দেখানো হয় যে, সহজে কেহ উহা সূত্রিতে পারেন না। প্রথমতঃ মাদিন্দু কিছু বাইতে চাহে। যদি আহার্য পাইল, তাহা হইলে প্রায়ই গিলিয়া যায়। যদি না পাইল, তবে মাদিন্দু কান-বহিরে এই একান্ত মদাইয়া দেয় যে, তাহার তর-স্রাবক এমন বিভা বিভাজিত যে, সে একটু পারা পাইলে, আন বস্তুই যথো গিলি প্রকৃত কথিতে পারে। এই কথা মিলিলে অনেকেরই “টানি করা” বেশিবার মজা মাদিন্দুকে থাকিবার হান এবং আশ্রয়ত অবস্থায় যোগাত করিয়া যেন। হৃৎকর্ণ, বিশেষতঃ রস মধ্য পারের একটু রস মদাই তাহাতে একটু তিনি মদাইয়া সেই রসটা পারার নিম্নাকৃত পারা মদাইয়া বহু, এবং বর্ণকম্বলী মূলক আশ্রয় হইয়া পড়েন, এবং এই কথা পারা মদাইলে টানি হইবে, এই কথা গুণিয়া মূলক যোগাত করিয়া যেন। মদাই উহা মদাইয়া উৎকৃষ্ট টানি হইবে।

বিশেষতঃ রসের সহিত তিনি বসিয়া যে ভড়া বেগের হইয়াছিল, তাহা বহুতঃ তিনি মদে, তাহা বাইটে ট-অ-মিলনাত্ম। পাঠ্যপাঠ্যে কর মন মাইটে ট-অ-মিলনাত্মক বেশি সূত্রিতে পারেন?—হৃৎকর্ণ টানি প্রকৃত হইয়া গেলে, পাণ্ডুর বাম চাহিযিকে ব্যাধ হয়, এবং একটু সূত্রিত-মাইটে ট-অ-কৃত করিয়া সাধু মানা একবার বিশেষ লাভবান হইয়া প্রস্থান করেন।

৩। পারা মদাইয়া পারা সোণা করা।—এই বুদ্ধাক্ত আশ্রয় উত্তমতঃ। আবার একবার এই একান্ত বুদ্ধাক্ত বেশিয়ারি। পারদ-কর্ণের মোচর্য্য তাহা আশ্রয়িত করিয়া যেন। একজন মূলকমান কর্তার এক পুত্রপুত্রিয়ার বাটে বসিয়া ছিলেন। আবার চারি-পারদমন বহুত মিলিয়া সেই বাটে মিলি তাহার সহ্যে আশ্রয় করিয়া। কর্তার সাহেব কিছু বাইতে চাহিলেন। কি বাইবেন কিজাসা করায়, তিনি প্রায় ১০/১০ টাকার অবস্থায় কথ্যকল্প করিলেন। দুইটা মূলক, একবোতল ভ্রামেন্দ্র, মলেন্দ্র, কনসলেন্দ্র, রায়কী, ভাল গুণী, ইত্যাদি কর্তৃক বেশিয়ার আশ্রয় মূলক হাদিয়া উঠিল। ইহাতে কর্তার কিছুমান সূত্রিত না হইয়া আশ্রয়ের বিবেক চাহিয়া বসিলেন, “ক-কী আশ্রয়ী এক কথা। তাহা এই পারাও এই একান্ত আশ্রয় করি।” অর্থবশে তিনি এক ভরি পারা, দুইখান মদা, এবং চারি মরলার খুঁট চাহিলেন। আশ্রয় তাহার যোগাত করিয়া মিলান। কর্তার সাহেব ঠায় বসিয়া রহিলেন। আশ্রয়ী তাহার কথাক্ত কর্তা কথিতে পারিলেন। প্রথমতঃ পারা কাপকুট হাদিয়া একবারি মদার তাহা কথিতে বসিলেন। পরে তাহার মদার বুদ্ধ-পদকট হইতে একটা কথের শিশি বাহির করিয়া হাদিয়ারের একটা ভড়া শিশি হইতে বাহির করিয়া সেই পারার সহিত মদাইয়াবার পারা মদাইয়া গেল। পরে আর একটা মদা তাহার উপর রাখা মিলি খুঁটের উপর

রাজ্যকে বলিল। রাজ্য ইহাতে আরও ঢোল হইল। মালবিকাকে
বেশিতে উৎসুক হইলেন। বিদূষক চরিত্র করিয়া পণবান ও হরহস্ত-
নামক কথাবিকা-লিপিকরের মধ্যে বিবাহ দৃষ্টি করিল। 'উত্তরের
মধ্যে কে আনিকতর হিল, এই বিচারের সোমসংসার এক উত্তরই রাজ্য-
সদুপে উপস্থিত হইলেন—বিদূষক। এই দিশাও করিয়া মিল যে
যাহার শিখা নৃত্যে আনিকতর পটুতা দেখাইবে, সেই জেট। পণবানও
বুলিল না, হরহস্তও এই রহস্ত বুলিল না। রাজ্য সমস্ত আশিরা
নৃত্য। পণিকা বিবাহর ক্ষত মালবিকা অ'হুয়া হইল। ভীত-
চকিত। মালিকা আশিরা রাজ্যের সদুপে বাড়াইল। নৃত্য আরও
হইল, অজ্ঞের এতোক সন্ধাননে বেন, তাহার এতোক বোমকূপ
হইতে কি এক বসীর সুখা বিপ্লব হইয়া অগ্নিবিদ্রোহ দৃঢ় করিল।
কান্দুক নৃগতি ইয়াবতীকে কুলিলেন, এগর পাত্তর করিবার ক্ষত
সেই বারিশি মান। হঠাৎ মালবিকাকে আরও কতদিন রাজ্যের দৃষ্টি
হইতে দূরকরা রাখিলেন। পরে উত্তরের মধ্যে দর্শবিবাহ হির
হইল, বারিশিই তাহার দৃষ্টি। বৈধরকে ইহিমধ্যে মালবিকার
একট পতিতর জ্ঞাত হয়। আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, বিবাহের
মলমলান্ন বারিশি উঠিল।

শ্রাবণীকৃতঃ—নিমিত্তিতের পাঠ করিলে মনে হয় বেন মালবিকার
নিমিত্ত কামিনীগণের মতিভ্রমের প্রদান-চন্দা। কামিনীগণের হস্ত
তখনও বেন পরিপক্ক হয় নাই। মালবিকারি চরিত্রের সঙ্গে পশুতলার
চরিত্রগুলির তুলনা করিলেই ইহা উপলব্ধ হয়। বারিশির চরিত্রও
তাই। উহা পরিপক্ক হয় নাই। উহা এক অকৃত দৃষ্টি। বারিশি বেন
অজ্ঞ-সঙ্গীতা বহনকী। সুখ সূচী। কিছু একাক করিয়া, অপর অন্যতর
মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ চণিতেরে, একটা ক্ষত বহন চণিতেরে, তাহা
বেন অসুখান করা যায়। ইয়াবতী ও মালবিকার প্রতি তাঁহার
বিবাহ ও ঐতি কতদূর আশা পরিহার কিছু বুলি না, বারিশি ভরতের
সঙ্গীত, সে গাভীও বেগিয়া সশেষ হয়, ভরত হয়। তাই অম্বেক য'লে
অসুখানেই তাঁহার চরিত্র বহন করিতে হয়। বারিশি গাভী, বয়
বারিশি ও কন্যার সৌন্দর্য বুলি। রাজ্য তাঁহারে ভর করেন ও ভক্তি
করেন। হরহস্ত ও পণবানের বিবাহকালে সঙ্গীর পরামর্শই সূত্রী
হয়—রাজ্য বাবীন ভাবে সম্মতি দিতে পারেন না। মালবিক,
রাজ্যের সমস্তমাত্রই নক হইতে অশাসিত হয়; অস্তর বশিরা
বেলেও অগ্নিবিদ্র, আর একবার নৃত্য করিবার ক্ষত মাল-
বিকাকে অসুখান করিতে সাহস করেন না। মালবিকার
সমিত রাজ্যের ক্ষত মিলনে ইয়াবতী অগ্নিবোপ করিলে, বারিশি
অগ্নিবিদ্রের বিচারকের মত পানবরও প্রণ করেন, মালবিকাকে
কাহাণীর নিকশ করেন। ইহা ব্যাঙ্গ উপাধারের রাজ্যকেই
মত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাণ-প্রতিমা মালবিকাকে কাহা-
ণার হইতে দৃষ্টি বিহার ক্ষত আশেপাশ করা মূলে পাশুক—
বারিশিকে সম্বোধন প্রার্থনা করিতেও রাজ্যের সাহস হয় না। রাজ্য
কবার কবার বিদূষককে বলেন—“বারিশিকে ভর হয়”। সঙ্গীর চক্ষুতে

যে বর্ণমোহিতঃ অগ্নিবিদ্র দৃষ্টি হয়, তাঁহার আশোকে, পাণ-কন্যার
সমত কতৃৎ, দুইতে সঙ্গীর-মতে আশলঃবরণ করিতে চায়। সতীকে
ভর না করে কে? বিবেচনঃ অগ্নিবিদ্রের ভরণ পরিপলতার আশার।
বারিশি বিবীত, ভক্তিমতী ও বেন-বল-সেবিকা (বিশ্বনাথ)। বিধিবিধে
আশনার পূর বহুবিদ্রের মরল কামনার খণ্ডপ্রাণ বহনকী সেই সমস্ত
বেশিক সেবার আশোপন করেন, উহা পাঠ করিতেও ভক্তি লাগে।
পতিতা খোদিকীর সমিত তাঁহার এতোক আচরণেই আশা বৃদ্ধিতে
পারি যে, তাঁহার ভরণ মিলন ও সম্মততার আশার। বারিশি মলমলকী।
পতিততা ও সতীত্বের সম্মত আশার। রাজ্য কৌশলিকীর সঙ্গে তাঁহারকে
বেশিয়াই বলেন,—“এবা, মলমলকৃত্যভাতি, কৌশলিকা যতিবেশা।
(বল) বিদ্রহবজ্জেন সমবদ্যান্ন বিজ্ঞাঃ” বারিশির আশত্যাগ অকৃত।
তিনি ইচ্ছা করিলেই ইয়াবতীকে ভর করিয়া দিয়া ভীত রাজ্যকে বধন
হির রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পতিপরাধা, পতিকে আশ
দিসা ভালবাসিতেন। ইহাওকে ভাবযায়েন, তাঁহার সব অত্যাচার সঙ্গ
করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি দীর্ঘব ছিলেন। তিনি সৌভাগ্যের
কান্দুক অগ্নিবিদ্রের শিখালা ব্যাঙ্গ করিবার কবিতা আর তাঁহার
নাই। ইয়াবতীর প্রেমে বাধা মিলে কান্দেই অগ্নিবিদ্রের প্রাণে
আশাত করা হইত। তাই তিনি কুহা পরিচরিত্রকে নির্বিশেষে
আপন হান রাষ্ট্রিয়া বিলেন। তৎপর বেশি আশা নৃতন অভিন্নঃ
সকল বেধে ক্ষর আছে, সকল সৌখ্যেরই হ্রাস আছে, ইয়াবতীরও
তাই হইতেছিল। ইয়াবতীর পতন নিশ্চয় আদিতেরিল। যে উভাব
রূপজাত,—তাহার পতন ক্ষীণ ও অস্বস্তকারী। বতকণ প্রাণে অগ্নিতে
থাকে, বেধে আশানকী বীতি থাকে, ততকণই অগ্নি-বহ্ন আশা-
বন্ধঃ তেব করিয়া বেধ চূষনের আশার অমলর হয়; কিন্তু বধন সে
আশোক নির্বিতা যায়, তখন উহা এত বেধে পতিত হয় যে, তাঁহারে
বাহুবন্ধঃ নির্দোষ হইয়া যায়, অতল-নিয়ের বনোহৃত তিথিতর বেন,
তাহার আশতে বিহ-ভিন্ন হইয়া যায়। বারিশি বৃদ্ধিতে পারিল, ইয়া-
বতীর বৈধরও অবলম্বন আশিরাও, কালিমা প্রেধন করিয়াছে।
এবন আশার প্রিহরণের দানবরূপের ক্ষত নৃত্য-সৌন্দর্য হই।
মালবিকা আশিল। বারিশি তাঁহারে কত বন্ধে সাহায্যী, গুণগণা
করাইয়া আশার অগ্নিবিদ্রের হস্তে মর্দণ করিলেন, আশা তাহা
বেশিয়াছি। এই আশত্যাগে বোধ থাকিলেও বারিশির চরিত্রে আশা
বর্ণপ্রবর্তা বেহিতে পাই। মালবিকার সঙ্গে পরিণর হইয়াছে।
রাজ্য আর একটা নৃতন কীদন পাশর হইয়াছে,—ইহার অবলম্বন
হইবে, আশার বৃদ্ধি কিছু নৃতনত্বের প্রয়োজন হইবে, ইহা
ভাবিয়াই বোধ হয় বারিশি বিবাহ-সভার কর্মোদ্ভে অগ্নিবিদ্রকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে জিহ, আদি আশনার আর কি মনস্ত
করিতে পারি, আশেপ কখন?”—এবন আশত্যাগঃ এবন পতি
নিমিত্ত। আদি না করমন সতী বেহায়েত পালে। রত্নশির
সঙ্গীত-বোধে কতই অমল, তাহা বনশীই মানে। অমল পতির
ঐতর্ধ্য বারিশি বিদ্রের ভোগ বিশর্ঘন দিয়া নৃতন নৃতন সঙ্গী

কিএপায় দৃঢ়তা, কটকামী পক্ষতও অতিশয় করিতে পার।
 মালবিকার চরিত্রে তাহা যেমিনাম, তাহার শব্দভাণ্ডারে উহা
 দেখি! মালবিকার জীবন খটখটানুপু ও ত্রেশ্বর। ওখার প্রত্যেক
 বৈশিষ্ট্য ঘটনা মালবিকার এক একটা মানসিক ভণের পরিচয় দেয়।
 মালবিকাকে কবি ভারতের সাম্রাজ্য করিবেন—তাই বর্ষকল্পের
 সমুখে তাহার অগ্রিমতীকা আদৃত হয়। হস্তশাসিনীকে, সমস্ত
 পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হইবে। রাজার ঘরে, পথে ধরা কল্ক হত
 হইল, তথাপি কি বৈধ? একটীবারও আত্ম-প্রকাশ করিল না!
 ভীষ্মভূষ্মাসিনী মালবিকা, জানি না কি কোনসে, কানাস্তকনর
 দলসমূহ হইতে পলায়ন করিয়া, বীরসেবের আশ্রয় লইল, অথচ
 আত্মপ্রকাশ করিল না; মালবিকা মানিত, যদি সে আত্মপ্রকাশ
 করিয়া বিদিশা সমুদে কি উদ্ভাস্ত তাহা বলিয়া দেয়, তবে কেহ তৎ-
 কথার স্বপ্নাত করিবে না এবং ইন্দ্রাসিনী আসে তাড়াতীয়া বিদে।
 বিদিশায় আসিয়াও কত কষ্ট! রাজার ঘরে—তিব্বত বালিকার মত
 পরিচরিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল! সত্যি অস্বাভাব্যে পদযাত্রা-পুণে
 সত্যীতাবি অকাল্য করিতে গাশিল; অহম্বর ভত হলে রাজার
 সমুখে আসিল, যোগানে দেখা সাধ্য পদত হইল, অথচ মালবিকা
 একটীবারও বলিল না—সে কে! মালবিকা ভানিত তাহার মধ্যে
 প্রথমসংকেত ওখাশি আছে; সে ভানিত, যাযা তাহার লক্ষ্য উহা
 ভারতের সিংহাসন! সে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী হইতে হইলে কেবল
 মৈত্রিক সৌখ্যে চলিবে না, অদ্বৈত বৈধ—অনন্ত কমা, উদারতা
 ইত্যাদি মানসিক গুণেরও প্রয়োজন। তাই সে ইচ্ছা করিয়াই কষ্টের
 মধ্যেই আপনাকে পাতিত করিয়াছিল, এবং অবিচল চিত্তে উহা
 সম করিতেছিল। সে বৈধা দেখিয়া বিম্বিত হইতে হয়! সীতার
 অদ্বৈত পরীক্ষার মত মালবিকার জীবনেও অনন্ত পরীক্ষা আদিত
 বেশিতে পাই। মালবিকা রাজার সমুখে আসিয়া সত্যীতাবিতে
 চিত্তে পটুতা দেখাইল। সেই সময় হয় ত কত বিক হইতে কত
 শত সংস্টিত দৃষ্ট হস্তশাসিনীর মর্দভবন করিয়া থাকিতেছিল, সব সম

করিল, তথাপি আশা—স্মিতভবের মনোব্রজন। রাজার ভ্রত
 মালবিকা সুখিতী লম্বন করিয়া আসিয়াছে, তদুপাতে রাজসভায়
 নুঃ। যতি তুচ্ছ কথা। ধারিত্রী, ইন্ডাবতীর অতিবেগে তাহাকে
 ধাক্কাবদ্ধ করিল, তখন মালবিকা অগ্রিমিয়ে মনোব্রজন করিয়াছে,
 ইচ্ছা করিলেই তাহার যাযা রাজ্যার্থ্য একটা প্রথম আশিয়া দিতে
 পারিত। কিন্তু সেই কার্য-ব্রজ্যও সে নীরব সমু করিল।
 ধারিত্রী তাহার গুণাকাল্পিত তাহা সে বুঝিয়াছিল। আর না হয়
 হোহাৎ একটু ব্রজ্য বিতরণে, কিন্তু তৎকাল তাহার বিস্ময়ে রাজার
 নিকট অতিবেগ করিলে রাজা হয় ত তাহার মনে কষ্ট দিলেন এই
 ভয়ে মালবিকা নীরব মিল। সত্যি মালবিকা অনন্ত বৈধাশাসিনী
 নারী। মালবিকা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। সেই বীজিতে ইন্ডাবতীর
 দাঁড়া মিলন দেখাইত, সেই দৃশ্যে কর্ণে ধারিত্রী চমকিয়াছিলেন, সেই
 হঠাৎ অকস্মিকের মাধ্যম একটা চিত্র বর্ণনে রাজা বিস্মিত হইয়া-
 ছিলেন—উহা সাধারণ সৌন্দর্য্য নহে, কবির কথার তাহার—

“কটাক্ষে অমর ভরী, বনমন্ডলে সপ্তমসুতের দ্বা

ময়ন বিদ্যে, পুসেরে শোণনে যেন অমর বসনী!”

মালবিকার প্রতিভা অনন্তবৃত্তা! মালবিকার অস্বাভাব্যে বর্ণনে আচার্য্য
 প্রণবাস বিম্বিত হইলেন। মালবিকা বুঝের বিদগ্ধ উৎপাদন করিল।
 ধারিত্রী যখন স্ববর লইলেন—প্রণবাস বলিয়া পঠাইলেন—মালবিকা
 শিরোভূষণে ও কল্যাণিতার আনাকেও অতিশয় করিয়াছে।

“ববৎ প্রঃগর বিধরে ভাবিকল্পপাতিতে ঘাভাতৈ।

তত্তবিক্রমকরণং প্রভৃগপিন্ধতীষ বে বাস।”

সহম কথা নহে! তবে আর থাকী কি! সব ত হইল! ধারিত্রী
 সুখিলেন গ্রীক হইয়াছে! মালবিকা সত্যি ভারত সম্রাজ্ঞী উপহৃত!
 তখন আনন্দে রাষ্ট্র, বালিকা “মালকে দিহেরে মানে কয়লিছেন;
 মনোভের মাল্য স্মিতভব রাজার গলে বহতে পঠাইয়া দিলেন!
 ইন্ডাবতী বিস্মিতের ভলে কুলিল।

আশ্বাস

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাল, এম-এ]

ভারতের ভবিষ্যতে রেবেছি ভরসা,
 মানবের ভবিষ্যতে রেবেছি বিশ্বাস;
 জীবনের মাদুরীতে পেয়েছি আশ্বাস;
 প্রকৃতি অগাধ প্রেমে অনন্ত-স্বরসা।
 নিরাশে মিলোহে, কাত, বাকশী বরণা,
 আকাশ নিকব-কালো দুরন্ত দুর্যোগ,
 ভীষণে হৃদয়ে একি নিবিড় সংযোগ!

ক্রন্দনী ধরিত্রী হ’ল আনন্দ সরস।
 তুলি নাই বর্জ্জান, রাখিয়াছি আশা;
 —ভাব চিরন্তন, ভুল হ’তে পারে ভাষা।
 চেয়ে দেখে উর্ধ্বপানে অমর আকাশ,
 চেয়ে দেখে যুগি-কুণ্ডে ঐ ছোট হুস।
 ভয় নাই, যে পিপাস, পেয়েছি আশ্বাস,
 —সত্য বাহা সত্য, তবু ভুল নহে ভুল।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[ত্রিঅনামাধ বহু]

তৃতীয় অধ্যায় ।

কলিকাতায় আগমনের পর শিশিরকুমারকে অন্ত-
র্ভুক্ত পত্রিকার কার্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকিতে হইয়া-
ছিল। পত্রিকার গ্রাহকগণকে জ্ঞাপন করা হয় যে,
পত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণ কলিকাতায় আসিয়াছেন; নানা
কারণে কিছুদিনের জন্য কাগজ বন্ধ থাকিবে; এবং পরে
পত্রিকাখানি নূতন ভাবে পুনঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রাহক-
গণ এই সংবাদপত্রের গৃহপোষক; পত্রিকার গ্রাহকগণ
অস্বস্তি করিয়া তাঁহাদের দেহ চালা প্রেরণ করিয়া পত্রিকার
জীবন-রক্ষার সহায়তা করিলে স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাদের
নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবেন, একথাও জ্ঞাপন করা
হইয়াছিল। অন্ত-বাহ্যের পত্রিকা দেশের যে মহত্বপূর্ণ
করিতেছিল, তাহা দ্রবণ করিয়া গ্রাহকগণ পত্রিকা বন্ধ
থাকিলেও আপনাদের দেহ চালা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ
করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার গ্রাহকগণের এই
সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞ হিতে দ্রবণ করিতেন।

কলিকাতায় আসিয়া শিশিরকুমার ভাগই করিয়া-
ছিলেন। বশোতের থাকিলে তাঁহাকে যে নিম্নরূপে কারা-
দণ্ড প্রদত্ত করিতে হইত, পাঠক নিরাসিত হইত।
হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতায় আগমনের
পর একটা মোকদ্দমার সাক্ষাৎ প্রদানের জন্য শিশিরকুমারকে
একবার বশোতের হাউতে হইয়াছিল। তৎকালীন অজ্ঞত
ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামবিহারী বহুর সহিত তাঁহার
সাক্ষাৎ হইলে, রামবিহারীবাবু বলিয়াছিলেন, “শিশির,
বহু শ্রম পায় তুমি কলিকাতার কিরিয়া বাণ।”

শিশির—“কেন?”

রাম—“এখানে অধিক দিন থাকিলে তোমাকে বিপদে
পড়িতে হইবে।”

শিশির—“কি বিপদ?”

রাম—“আমি আর জইন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন একজ
বসিয়া কথাবার্তা করিতেছিলাম। তিনি হঠাৎ আমাকে

বলিলেন,—‘তুমি তোহি শিশির ঘোষ কলিকাতা হইতে
বশোতের আসিয়াছো। এখনই তাহার নামে একখানা
পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হউক।’

শিশির—“আমার অপরাধ কি?”

রাম—“আমি তাঁহাকে সে কথা বিজ্ঞাপন করিলে তিনি
বলিলেন, আগে পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার
করা হউক, পরে যাহা হয় করা হইবে।”

শিশিরকুমার কানিয়া অবাচ্। তিনি হাত দ্রবণ
করিতে পারিলেন না। মিটার শ্রম তখন বশোতের
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তাঁহার সহযোগিতা কাণ্ড-কারখানা
বেধিয়া বিম্বিত হইয়াছিলেন। তিনি নিবেদ না করিলে,
জইন্ট সাহেব যে শিশিরকুমারকে গ্রেপ্তার করিতেন, তাহাতে
সন্দেহ নাই। মিটার শ্রম পরে বিভাগীয় কমিশনারের
পক্ষে উন্নীত হইয়াছিলেন।

মানবানির মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার
অনেকেরই নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায়
আগমনের পর, তিনি প্রুপ্রিন্স ঠাকুর-বংশের মহারাজা
সার বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজা
সার দৌরীন্দ্রমোহন এবং কামাপুত্রের রাজা দিগম্বর মিত্র
প্রভৃতির সহিত বনিষ্ঠ রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের
অবিদ্যার-সম্প্রদায়-মধ্যে তৎকালে মহারাজা বতীন্দ্রমোহন
বিভা, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য বিশেষরূপে
সন্মানিত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য
মনোনীত হইয়াছিলেন। বতীন্দ্রমোহন সাহিত্যসিঁদ্বাশি ও
গুণগ্রাহী পুংস্ব ছিলেন; বহু ছঃসাহিত্যসিঁদ্বাশি তাঁহার
নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। শিশিরকুমারের সহিত
আলাপ করিয়া মহারাজা বাহাদুর তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি
করিয়াছিলেন। উভয়ের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে
তাঁহার রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেন।
মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা দৌরীন্দ্রমোহন অসংখ্য

সদীত-শাস্ত্র ছিলেন। সদীত-শাস্ত্রে শিশিরকুমারের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি বৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা সদীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইহাদিগের দুইজনের ভ্রাতা রামা দিগম্বর মিত্রও শিশিরকুমারের গুণে এতদূর সুখ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে আপনার পরিবারভূক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

কলিকাতায় আলিয়াই শিশিরকুমার একটা নূতন গ্রেস ক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থাভাব-বশতঃ ত্রুতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাজা বতীন্দ্র-মোহন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন, রাজা দিগম্বর প্রভৃতি জমিদার-গণের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়াও, শিশির একদিনের জন্যও তাঁহাদের নিকট আপনার অভাবের কথা প্রকাশ করেন নাই। একটা নূতন গ্রেস ক্রম করিতে ছয়শত টাকা আবশ্যক। শিশিরকুমার, এই টাকাও লব্ধ হই উক্ত তিন জনের মধ্যে কাহারও বসিতেন, তাহা হইলে গ্রেস ক্রম করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু পাছে তাঁহারা মনে করেন যে, শিশির কর্তৃক প্রত্যাশার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদের নিকট টাকা-কন্নি সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। বাগ হটক, গ্রেস ক্রম করিবার টাকা অভাববীর উপায়ের শিশির-কুমারের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন। একদিন তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—“শিশির, তুমি যে আসিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।”

শিশির—“কি রূপে?”

রাজা—“তোমার পদচুম্বি শুনিয়া।”

শিশিরকুমার উপবেশন করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্তা চলিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, “শিশির, আমি প্রত্যক্ষ লেখিতে পাইতেছি যে, তুমি ভবিষ্যতে একজন মহৎ লোক হইবে।” রাজার এই কথাগুলি শুনিয়া শিশিরকুমার আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবিহীন হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, “শিশির, একটা লোকের নিকট কিছু টাকা পাইতাম; লোকটা টাকাগুলি কাল পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। এই টাকা-গুলি কি রূপে বাটান যায় বল দেখি?” শিশিরকুমার কি

উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া দীর্ঘবয়স হইলেন। রাজার সহিত নানা কথাবার্তার পর তিনি বাড়ীতে কিরিয়া আসিলেন। পর দিবস ঘটনাক্রমে তাঁহার মনেক আখ্যায় তাঁহার বাসায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন জমিদারের অধীনে কাৰ্য্য করিতেন। জমিদার মহাশয়ের কিছু টাকা কর্তব্য করা আবশ্যক; সেই জন্য তিনি উক্ত কর্তব্যরীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কথাগ্রেসদে জমিদারের কর্তব্যরীটি শিশিরকুমারের নিকট তাঁহার মনিব মহাশয়ের গুণ প্রদর্শন কথা প্রকাশ করেন। পূর্বমুখে রাজার সহিত শিশিরকুমারের যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার আখ্যায়ীকে আশা প্রদান করেন। জমিদারের কর্তব্যরীটি শিশির-কুমারের নিকট টাকা দায় করিবার চেষ্টা করেন নাই, কলিকাতায় তাঁহার বাসায় আসার লইবার জন্য আলিয়া-ছিল। শিশিরকুমার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা প্রকাশ করেন। রাজা গুণবানে সম্মত হইলেন। যথারীতি বন্সিলাদি সম্পাদিত হইলে, রাজা বাট রাজার টাকা দায় দিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় শিশিরকুমার বন্সিলাদির জমিদারের নিকট হইতে আটশত টাকা পাইলেন। এই টাকার মধ্যে ছয়শত টাকা দিয়া শিশিরকুমার একটা নূতন গ্রেস ক্রম করিলেন। তদনুসারে কাৰ্য্য করিবার ইচ্ছা শিশিরকুমারের ক্ষয় হইয়াছিল।

কলিকাতায় আগমনের কয়েক মাস পরে শিশির-কুমারের ঘরে ও চেষ্টার অন্তঃ-বাজার পত্রিকা নূতন নোটেবে পুনঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা নিমন্তল-বাট ট্রীট নিবাসী জমিদার ও হুনিপুণ চিত্র-শিল্পী বর্দীর গিরিন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় শিশিরকুমারকে পত্রিকা প্রচারে নানারূপ সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় একজন প্রেসম্যান দ্বারা নূতন প্রেসটা ট্রিক করিয়া গিয়া, শিশির তাঁহারই শিক্ষিত কম্পোজিটর প্রভৃতি অন্যান্য লোক বশোদ্ধ হইতে আনিয়াছিলেন। এই সময়ে ইন্স-ট্যুলের কথা লইয়া যেহে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। এই ট্যুল বাহাতে প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি যোর আন্দোলন করিতে-

ছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার অমৃত-বাগার পত্রিকায় পতর্নযেটের পক্ষপন্থন করিয়া, ইন্সপেক্টর হারা দেশের বিশেষ কোন কতির আশঙ্কা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগকে কোন টাক্স দিতে হয় না; ইন্সপেক্টর প্রচলিত হইলে লাট সাহেব হইতে সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীকে পর্যন্ত, এবং দেশের দলবানদিগকে তাঁহা দিতে হইবে; সুতরাং সাধারণ জন-সম্প্রদায়ের ভাষাতে কোন কতির আশঙ্কা নাই, শিশিরকুমার বীর পত্রিকায় এই যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরেজ-সম্প্রদায় প্রভাবিত টাক্সের বিক্ষেপে বোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাহাতে তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন, **কলিকাতার** এক তাঁহারা নামা কোর্স অবলম্বন করিতেন। তখন আমায়ের দেশের রাজনীতিজ্ঞগণ ক্রমে ইংরেজদিগের কথার আর্পন-আর্পন মত প্রদান করিতেন, তাহা বেখাইবার লজ শিশিরকুমার অমৃত-বাগার পত্রিকায় একটা বাক-চিহ্ন প্রকাশ করেন। ভট্টনাক গোপকান-পরিহিত বাক্যাদি বাবুর নাকে ঘড়ি দিয়া ভট্টনাক ইংরেজ টানিয়া লইয়া বাইতেছেন। এই চিত্রটি শিশির ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ১০ই এপ্রিল তারিখের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিবারছিলেন,—

Salieb—Babu, you understand politics ?

Babu—Very much, Sir.

S—You know the country well ?

B—Thoroughly, Sir. My great-grand-father came from the country, and my aunt is married to a villager of great experience.

S—Of course you have an independent opinion of your own ?

B—I am particularly strong and tenacious in that respect, Sir.

S—What is the most oppressive of all taxes ?

B—That, Sir, is a question, Sir, which Sir, I, Sir (scratches his head).

S—I dare say, you would name the Income Tax.

B—Assuredly, Sir. I was going to name

that hateful tax when you interrupted me, Sir.

S—Is not this tax very much hated in the Muffosil ?

B—They hate ! They,—Sir, language fails me to express their feelings, Sir. My aunt has heard from her husband some of the doings of the Income Tax Assessors.

S—The Assessors are not to be blamed, poor fellows. It is the unnatural, inequitable, and—

B—Beg your pardon, Sir. I was going to say the same thing. My aunt has heard that the assessors are good, 'very excellent, jolly fellows, but the tax,—the tax—what were you going to say, Sir ?

S—The inquisitorial nature of the tax makes the Assessors unpopular.

B—Yes Sir, I strongly believe—a belief which is not to be shaken—that the Assessors inspite of their jolliness are very inquisitive Sir.

S—The tax is simply detested.

B—Yes Sir, absolutely detested by those who pay it.

S—Not only by those who pay it—

B—Yes Sir, it is much more hated by those who do not pay it, Sir, than by those who pay it, Sir. I am absolutely certain of that, Sir.

S—It is demoralising in its effect.

B—Who with a pair of noses in his head can doubt that ? I am quite sure that if a proper statistics could be taken, it would undoubtedly prove that since the introduction of this demoralising tax, thefts have increased

in the land, Sir, cyclones have become more frequent, Sir, epidemic fevers universal Sir, floods more violent Sir, cattle plagues more virulent Sir, and—and—Sir,—Sir—

S—You must then cry down the Income Tax.

B—I was going to propose the same thing to you, Sir.

S—You can talk loud.

B—I am a Calcutta Babu, Sir.

S—Then we will join with you for your sake and cry down the hateful tax.

B—Many thanks, Sir. I am particularly thankful Sir, that I have been able at least to convince you, Sir, that the Income Tax Sir, is a hateful impost, Sir. I very much understand politics, Sir.

পালমোন্টে ইন্কম্ ট্যাক্সের কথা উঠিলে, তৎকালীন ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার ভায় প্রভাবশালী সংবাদপত্র এখন ট্যাক্সের সমর্থন করিয়াছেন, তখন এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি তুলিবার প্রয়োজন নাই।

অমৃতবাজার পত্রিকা নিদ্রামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের শিশিরকুমারের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। পাঠক অবশ্য জানিবেন যে, শিশির তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ কিম্বা তাহার প্রত্যাশাও করেন নাই। একদিন তিনি রাজাকে বলেন যে, তিনি যদি অল্পগ্রহণ করিয়া পত্রিকার মজুত করেক-জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—“এ আর বেশী কথা কি? আচ্ছা, আমি পত্রিকার কতগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।” যেমন কথা, তেমনই কাৰ্য। রাজা তৎক্ষণাৎ একখণ্ড কাগজ লইয়া তাহাতে টালার বাবু পরাগচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শোভাবাজারের মহারাজা কমলকান্ত বাহাদুর, হাইকোর্টের বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ জন বন্ধুর

নাম লিখিয়া প্রত্যেককে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হইবার মজুত তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত পত্রগুলি ডাক-যোগে বৎসাহানে প্রেরণ করিলেন। কেবল মহারাজা কমলকান্ত বাহাদুর ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত শিশিরকুমার স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। টালার পরাগবাবু ব্যতীত সকলেই পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইন্কম্ ট্যাক্সের প্রভাব সমর্থন করিয়াছিলেন; হুতচাঁপ তাঁহার ভায় মেশপ্রোহীর পত্রিকার গ্রাহক হওয়া পরাগবাবু সম্মত বলিয়া মনে করেন নাই। মজুত দ্বারকানাথ শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন,—“আমি আপনার পত্রিকার গ্রাহক হইলাম বটে; কিন্তু আপনার লেখার ভিত্তর এমন একটুকু তীব্র ভাব লক্ষিত হয়, যাহা হয় ত সময়ে ভারতবর্ষে সাধারণ লোকবিশিষ্টের মধ্যে অসন্তোষ ও শেষে অশান্তি উৎপাদন করিবে।” প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন,—“ভারতবাসীকে তাহাবিশিষ্টের চরবন্ধার কথা বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা যেমন লেখার প্রবৃত্তি আগাইয়া, দিবার মজুতই অমৃতবাজার পত্রিকার স্রষ্টা। ভারতবাসী মনোমোহন চরবন্ধার কথা সম্যক্ অবগত নহে বলিয়াই, আপনার উন্নতি সাধনে বড়ই উদ্যোগী। তাহাদের উদ্যোগিত্ব দূর করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে একটু উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যিক।

অমৃতবাজার পত্রিকার দিন-দিন উন্নতি হইতে লাগিল। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কলিকাতার আদিবার পরে পত্রিকার কতক অংশ ইংরেজী ও কতক অংশ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত। পত্রিকার সময় ও সমুদ্রিকপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিবার মজুত অবদানার্থে যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অল্পকোন সংবাদ-পত্র পাঠে তাহাদের পৈ আগ্রহ লক্ষিত হইত না। গভর্ণমেণ্টের কোনও কার্যের প্রতিবাদ করিতে হইলে, তাহা এক্ষণেও লিখিত হইত যে, পাঠকবর্গের সহিত গভর্ণমেণ্টও তাহা পাঠ করিয়া আশ্রয় উপভোগ করিতেন। তার মজুত কাগজে যখন বাঙ্গালার ছোট-মোট বাহাদুরের মনোমোহন প্রতীকিত হইলেন, শিশিরকুমারের অমৃতবাজার পত্রিকা সেই সময় দেশের মজুত কি করিয়াছিল, আমরা এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তার মজুত প্রকাশপত্রের প্রতি যে পরিমাণ প্রীতি ও সহায়ত্ব প্রদর্শন

করিতেন, অমিদারগণ তাহা তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন না। ছোটলাট বাহাদুরের সমাধিস্থতি পাইয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবগণ অমিদারদিগের উপর বিবেচ-
পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাবনা জেলার একবার প্রভা-
গণ অমিদারগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপাধন করিয়াছিল। এই
বিদ্রোহের ফলে ঈশানচন্দ্র রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ লক্ষ-
বিক লোক লইয়া ইংরেজাধীনে, কিন্তু অমিদারের শাসনের
বাহিরে—একটা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উত্তাপ
করিয়াছিলেন। দিল্লীর নলেন তখন পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট
ছিলেন। ছোটলাট সার জর্জ ক্যাথেল ও ম্যাজিষ্ট্রেট
নলেনের ব্যবহার সম্বন্ধে অসুতবাহার পত্রিকার বহু প্রবন্ধ
লিখিত হইয়াছিল। মতিলাল এ সম্বন্ধে একটা স্মরণ প্রবন্ধ
লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার সেই প্রবন্ধটা পাঠ করিয়া
মতিলালকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার যথেষ্ট
প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে ক্রমে বিষয়েই হউক না কেন,
শিশিরকুমার সংবাদপত্রে আন্দোলন করিবার পূর্বে তাহা
প্ৰথমে সুশ্রদ্ধা প্রাপ্যে করিয়া দেখিতেন। তিনি
কোন বিষয় লইয়া “ছদ্মগুণ” করিতে ভালবাসিতেন না।
সত্যতাপত্যতার অঙ্গসন্ধান না করিয়া তিনি কোন বিষয়েই
হস্তক্ষেপ করিতেন না। সার জর্জ ক্যাথেলের শাসন-কালে
বিহারে একবার চুক্তি হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে মহা
আন্দোলন হইয়াছিল। লর্ড নরফক তখন ভারতের
বড়লাটের পদে বিরামধান ছিলেন। চুক্তির সংবাদে
তিনি বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। অসমভাবে বাহাতে
একজন লোকও সূচ্যুত্বে পতিত না হয়, তিনি
তাহার নবোবত্ত করিবার জন্য ছোট লাট বাহা-
দুরকে আদেশ করেন। সার জর্জ সাংঘা দানের বাত্বা
করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিশিরকুমার এই চুক্তির
ব্যাপারটা পত্রিকার বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।
অঙ্গুপদুক কালে গভর্নমেন্ট প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন,
কিন্তু প্রকৃত চুক্তির সময় হয় ত অনশন-ক্রিষ্ট ব্যক্তিগণ
সাংঘ্যের অভাবে সূচ্যুত্বে পতিত হইবে, শিশিরকুমার ইহাই
আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অসুতবাহার পত্রিকার পক্ষ হইতে
শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রন হেমন্তকুমার বিহারের পন্নীতে-
পন্নীতে পত্রিকায় করিয়া, তখন অবিদ্যাপিগণের অবস্থা
ব্রহ্মক মর্দন করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিহারে প্রকৃত

হৃতিক হয় নাই; তবে মেশবাদিগণ চিরকাল যে চুক্তি ও কট
ভোগ করিয়া আসিতেছে, এবারেও তাহারা তাহার হস্ত
হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। শিশিরকুমার
ইহা তাহার পত্রিকার ব্রহ্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অসুত-
বাহার পত্রিকার পূর্বে, ভারতবাসী-পত্রিকাতে কোনও
সংবাদপত্র মকবলের প্রকৃত অবস্থার অঙ্গুদানের জন্য যে
কখন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিতে
পাওয়া যায় না। অসুতবাহার পত্রিকার কথা গভর্নমেন্টে
সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তথাকথিত চুক্তির
প্রতীকার-কালে গভর্নমেন্ট প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয়
করিয়াছিলেন; কিন্তু চুক্তি-ক্রমে এই টাকার অধি-
কাংশই ন বোয়ার ন ধর্ম্যার ব্যয় হইয়াছিল। যে সময়ে
সাংঘা না করিলে বিশেষ কোনও ক্ষতির আশঙ্কা
ছিল না, গভর্নমেন্ট সেই সময়ে কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিয়া-
ছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বন সত্য-সত্যই চুক্তি ভীষণ
দৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন সাংঘা-ভাবে কত লক্ষ
লোক যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা
নাই। দূরদর্শী শিশিরকুমারের পরামর্শ-মত কার্য করিলে,
গভর্নমেন্ট হয় ত দক্ষিণ-ভারতের লক্ষ-লক্ষ প্রকৃত হৃতিক-
প্রদীপিত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন।

সার জর্জ ক্যাথেল যে সকল বিধির প্রচলন কিবা প্রস্তাব
করিয়াছিলেন, তাহার কোন-কোনটা বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক
অগ্রাহ ও সার রিচার্ড টেম্পল কর্তৃক রহিত হইয়াছিল।
কিন্তু সার জর্জের রূঢ় সবডেপুটী ও কানলুওর পদগুলি
আর পরিবর্তিত হয় নাই। সবডেপুটী পদের সঙ্গীত ব্যাপার
লইয়া অসুতবাহার পত্রিকার “সার জর্জ ক্যাথেলের আদর্শ
ডেপুটী” শীর্ষক একটা গতি নুত্র হিঙ্গুপদক কবিতা বাহির
হইয়াছিল। অসুতবাহার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া
হিন্দু পেট্রিষ্ট ও চিত্রী প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিতাটা
এই—

“সেখানে মনস্তত্ত্ব অস্বা-বোহাগেতে।

শান্তল স্থানে চেন কম্পাশ কাণেতে।

তিন হাত সাত ইঞ্চি দুই আঙুল দু পাটা।

আমাদের হজুরের মনস্তত্ত্ব ডেপুটী।”

চিত্রী প্রকাশিত হইলে বেশবোবে একটা মহা উত্তেজনা
পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজ-সম্পাদক-সম্মে অনেককেই

উক্ত চিঠির বক্ত অমৃতবাভার পত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সার ভক্ত কাম্বৈল হিন্দুগণের প্রতিজ্ঞা করিবার ভক্ত এক অতি অসুস্থ বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন : কোন হিন্দুকে লগ্ন করিতে হইলে, গুরু লাভ ধরিতে হইবে, চোটা লাভি বাহাদুর যখন এই ব্যবস্থা করেন, তখন শিশিরকুমার অমৃতবাভার পত্রিকার একটা বিভ্রান্তকর চিত্র প্রকাশ করেন।

পাঠক! আমরা এইখানে বলিয়া রাখি, ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ২য় এপ্রিল হইতে, অমৃতবাভার পত্রিকা ২নং আনন্দের চট্টোপাধ্যায় গণি হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ৩শে এপ্রিল তারিখের অমৃতবাভার পত্রিকার রংপুরের তৎকালীন জজ হিষ্টার লেবিনের বিবৃতিতে ছইটী একিডেবিট প্রকাশিত হইয়াছিল। জজ সাহেব বাহাদুর জানিতেন না; আইনের তাঁহার জ্ঞান অতি অল্প; এতদুপাধার দেহেরদারাই মোকদ্দমার বার লিখিয়া দিতেন। জজ কোর্টের কর্তব্যকর উকিল এই সংবাদ শিশিরকুমারকে জানাইয়া তাঁহার পত্রিকার আন্দোলন করিবার ভক্ত অমৃতবাভার করেন। আমরা একটা একিডেবিট হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"We Hiralal Mitra, Matiar Rahaman, Ramkamal Roy, Koylashchandra Sen, Mahima ch. Mazumdar, Krishna ch. Sircar, Gopal ch. Chakrabutty, Shyamamohan Chakrabutty, Mahesh ch. Sircar, Pyarilal Roy, Prosanmanath Chowdhury, Kalidas Moitra, pleaders practising at the Judge, and Sub-Judge's Court at Rungpore do solemnly declare and affirm as follows :—

(I) That we know and believe that the present Judge A. Levin does not understand the current language of the Court, has no adequate knowledge of the Law and Regulations in force and is regardless of the duties of his high and responsible post.

(II) That we know that the Sherristadar of the Court Womachurn Sen sits with the

Judge in the ijlaz, takes down notes of the arguments addressed to the Court by the pleaders, dictates to the Judge in open Court the orders that have to be passed in the ordinary course of the Judge's official duties and that the said Sherristadar does write out the Judgments decreeing or dismissing cases which the Judge afterwards merely copies out and passes off as his own.

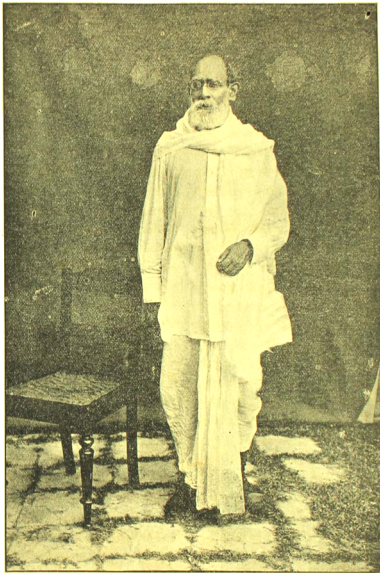
(VIII) "That we do believe that the said Sherristadar Womachurn Sen is the real Judge and the Judge is a mere puppet in his hands and that the Sherristadar takes bribes and disposes of cases in favour of the highest bidder.

Sd. Above-named 12 pleaders. Solemnly affirmed before me this 21st day of April, 1874.

O. C. Roy

Sub-Judge and Commissioner to administer oaths and affirmations.

বাহাদুর সংবাদপত্রে ইংরেজ ভাষার বিবৃতিতে শুধু অভিযোগের কথা প্রকাশিত হইলে, ইংরেজ রাজপুত্রবর্গের মধ্যে একটা বহা উত্তেজনা পরিণত হইতে লাগিল। অমৃতবাভার পত্রিকার সম্পাদক ও রংপুরের উকিলগণকে অভিযুক্ত করিবার ভক্ত তাঁহারা গভর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করিতে ভ্রষ্ট করেন নাই। শিশিরকুমারের ত্রীত্র আন্দোলনের ফলে সংবাদপত্র সত্যগত্যভার অহুদজ্ঞান করিবার ভক্ত তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি সার লুই ক্যাম্বেন রংপুরে গমন করিয়াছিলেন। অহুদজ্ঞানে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সার লুই ক্যাম্বেন জানিতে পারিলেন যে, অজ্ঞান লেবিনের বিবৃতিতে, অমৃতবাভার পত্রিকার যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহার ফলে বাহাদুর দেহেরদারকে তৎক্ষণাত্ কর্তৃত্ব করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাঁহার আদেশ-বহু কার্য করিতেন, সেই ইচ্ছাপূর্ণ



ঐনুল হুসেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসম্ভবতঃ তাঁহার সহিত কর্ণচ্যুত না করিয়া তাঁহার হইয়া কর্ম হইতে অপস্থত করিয়াছিলেন। এই সময়েই কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল। কৈফিয়ৎ দিবার জন্য দেশপূজা ঐনুল হুসেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিটার লেবিন বিদায় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহার কৈফিয়ৎ অতিশুল্ক ও এগিস্টিয়ান্ট ম্যাগিষ্ট্রেটের পক্ষ হইতে বিচ্যুত দিবার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে শেষে গভর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়াছিলেন। মিটার লেবিন সাহেব, অরেন্স বাবু বাগলো।



বন্দীত বিপ্লবের হারকামোদ মিঃ



বন্দীত রামা দিব্যর মিঃ



বন্দীত মহারাণা দার বন্দীতমোহন ঠাকুর

হুজুর বাবুর মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিখরকুমার অমৃত-
বাগার পত্রিকার বগেট আন্দোলন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে
সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। সেবিনের ও হুজুরবাবুর বিচার-
পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া শিখরকুমার বড় দুঃখে শিখিয়াছিলেন,
—“শিবিন সাহেব কর্তৃক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। পাঠক-
বর্গ জ্ঞানেন যে, শিবিন সাহেব হংগুরের জজ ছিলেন এবং
ঐহার বিরুদ্ধে সেখানকার উকিলরা হাইকোর্টে অভিযোগ
করেন। এক্ষণে অভিযোগ কোন বাঙ্গালী হাকিমের বিরুদ্ধে
হইলে ঐহার শুদ্ধ চাকরি বাইত না, তাঁহাকে নানা রূপে
অবমানিত হইতে হইত। গভর্ণমেন্ট হুজুর বাবুকে যদি
শুদ্ধ কর্তৃক হইতে অপসৃত করিতেন, তাহা হইলে ঐহার
প্রতি বিস্তর অসুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু সামাজ্য
করেদীর ভার ঐহার বিচার হইল; ঐহার মোকদ্দম
গভর্ণমেন্ট নানা রূপে দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র করিলেন এবং
ইংরেজী সংবাদপত্রেরা তাহা লইয়া নানা গালি-গালাজ
দিলেন।” শিখরকুমারের লেখনী কিন্তু হুজুর বাবুকে
রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভাবের অভিব্যক্তি



রাহিলা



আর্থনা



গোথটেপা



ଚିନ୍ତା



ହୃଦୟ



ହାତ



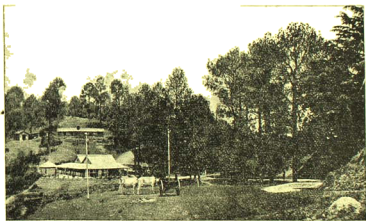
ମାୟା

রাণীক্ষেত্র-ভ্রমণ

[ত্রি প্রবেশচক্র রক্ষিত]



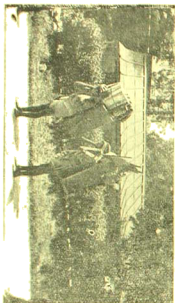
রাণীক্ষেত্রের সাধারণদৃশ্য



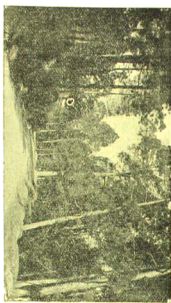
টেলন হাশপাতাল—রাণীক্ষেত্র

প্রকৃতির শীতলত্ব দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? সেই
বাসনার বশবর্তী হইয়া গত ২৫শে অক্টোবর পাঞ্জাব যেনে
কানী হইতে পাঠাড়াভিমুখে রওনা হইলাম। লক্ষ্যে অংসনে
গাড়ীতে জনতা হইয়াছিল। রাত্রি ৮টার সময় বেরিলি
অংসনে গাড়ী বদল করিলাম। তিন ঘণ্টা পরে যোহিল-
খণ্ড-কুম্বুন রেলওয়ের ছোট ট্রেণ (metre gauge train)
হাডিল। এখন শীতের প্রারম্ভ। শেঘরায়ে খুব বেশী
শীত অনুভব করিলাম ;—তারণ অহুস্কানের অস্ত্র জানালা
খুলিয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম যে, দূরে অচল
অটল পর্বতশ্রেণী অগং-পিতার কীৰ্ত্তিতত্ত্ব বরূপ

সাহাঙ্গী কলী



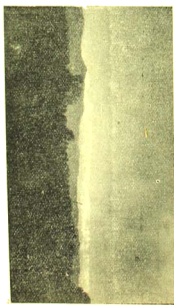
হাফিজের নিউটন শাখ



সাহাঙ্গী কলী



হাফিজ





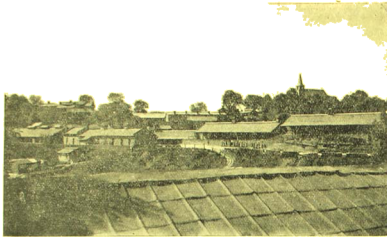
রাণীক্ষেত্র হইতে বরফের পাহাড়



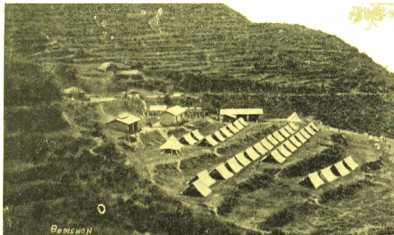
পাহাড়ীর বিবাহ

দণ্ডারমান রহিয়াছে। উদার আলোকের সহিত কাঠগোদান নামক সীমান্ত ষ্টেশনে পাহাড়ের পাদদেশে গাড়ী পৌঁছিল। কাশী হইতে কাঠগোদানের দূরত্ব ৪৯৯ মাইল। ষ্টেশনের নিকটে নৈমিত্তাল, ভাওয়াশি, রাণীক্ষেত্র, আলমোড়া, প্রভৃতি স্থানে পাহাড়-বাহী ব্রহ্মপুত্রগণের মত বিজ্ঞানাগার (Resting house) আছে। আমরা ষ্টেশনের বিজ্ঞান-

কক্ষেই (waiting room) অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এখানে ভাল খদ্দশালা আছে। শকটের গমনোপযোগী কাট রোড (cart road) দিয়া গেলে নৈমিত্তাল এই স্থান হইতে ২২ মাইল। এক, অথ, ডাঙী, টোঙ্গা অর্থাৎ টম্‌টন্ বা মোটরে যাওয়া যায়। আমরা রাণীক্ষেত্রের বাহী। এই স্থান বা আলমোড়া বাইবার তত্ত সাধারণতঃ



গৌড়াঙ্গীয়া দেশ-বিখাস



বন্দোবস্ত গোরাবিখাস

প্রত্যহ গাড়ী পাওয়া যায় না, পূর্ন হইতে বন্দোবস্ত করিতে হয় এবং ভাড়াও অত্যধিক। সেই ক্ষত এই ক্ষণে বড় একটা কেব্বল বন্দন করিতে আসেন না। ঘোঁটর, টোপা বা একাধোপে কাঁট রোড দিয়া রাণীক্ষেত্রে বাইতে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। অধগমনের রাস্তা (Bridle path) দিয়া ৩০ মাইল যাত্রা—বীরতটর এই রাস্তা দিয়া বোকা, ভাণ্ডী ও মাহুৎ যাত্রাস্থ কর। পথে

ভীমতালের মনোরম ব্রহ্মের নন্দন-লাভও হইয়া যায়। একদিন বিখ্যাত শিখ রজডেবেল কোম্পানীর টোকার অগ্রগ্রে লোকের যাত্রাযাতের সুবিধা ছিল। সংগ্ৰতি ৩০শে অক্টোবর হইতে উক্ত কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে। বেড়া-রুনে তাহাদের টোকার চড়িয়াছি; মনুড়ি পাথড়ের অস্ত্র তাহাদের ভাণ্ডী পাওয়া বাইত; তনিয়াহিলাস যে ড্যালহাউসি পাথড়ও তাহাদের ভাণ্ডীর বন্দোবস্ত ছিল। ৪০ মাইল পথ

একাংশে বাওয়া মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে। ডাক্তারী নামক ঘানে, কুলীর ফকে বা অল্পপূর্বে বাইতে ছই দিন লাগে। সাধারণতঃ ছয় ঘন কুলী ডাক্তারী বহন করে। প্রত্যেক কুলীর মজুরী ১৪০; ডাক্তারী বাতারাতের ভাড়া ৩; প্রত্যেক কুলীর কমিশন ১০ আনা হিলাবে দিতে হয়। আবার কুলীর লব্ধ কাঠগোশামের গবর্ণমেণ্টের কুলীর রিকাদারকে পূর্বাঙ্কে সংবাহ বেওয়া আবস্তক। ঘোড়ার ভাড়া ৭০ টাকা মাত্র। মালবাহী কুলীর মজুরী ১৪০ টাকা। টম্‌টম্ ভাড়া একঘনের লব্ধ হান পাওয়া গেলে ১৮ টাকা ছিল; নচেৎ পূর্ণ টম্‌টম্ ভাড়া ৩৫ টাকা দিয়াও একদিনে পৌছান হইত না; এবং পাহাড়ের বেশে রাত্রি ভ্রমণের স্বংগ সহজে অসম্ভব। এই সকল সুবিধা-অসুবিধা খতাইয়া দেখিয়া ১২৪০ টাকা ভাড়া দিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর মোটরে বাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। পূর্বে হইতে হানীর টোকা ইমপ্লিমেন্টকে পত্র বেওয়ার, সাহেব আমাকে ১২৪০ টাকার একঘনের স্থান দিয়াছিলেন; নচেৎ ৭৫ টাকা ভাড়ার সম্পূর্ণ মোটরখানি লইয়া বাওয়া খট্টা উঠিত না। কাঠগোদানে নৈনিতাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী নামে যে আর একটা মোটর কোম্পানী আছে, তাহা রাণীক্ষেত্র, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে রাজী বহন করে। রাণীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। মোটরে আমার সমভিব্যাহারী জনৈক সাহেব ৫০ টাকা ভাড়া দিয়া নৈনিতাল ফ্রান্সি (ভাটিখানা) পর্যন্ত বাইবার টিকিট লইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ ও গল্প করিতে-করিতে ১৪ মাইল পথ বেশ সুখে কাটয়া গেল। এ পর্যন্ত রাত্রা খুব ভাল; কারণ হুন্ড-প্রদেশের ছোটলট সাহেব গ্রীষ্মের সময় নৈনিতালে অবস্থান করেন। ভাটিখানার আমাদের সাহেব নামিয়া গেলেন। তিন মাইল মাত্র অশান্তোৎপে বরাবর খাড়া পথে উঠিলেই তিনি ইংরেজের সাহেব শৈশবনিবাস নৈনিতালে পৌছিবেন। অত্বে নৈনিতালের বাড়ীগুলি সুখ্য-কিরূপে উন্মাদিত হইয়া বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল। সেখানকার বিখ্যাত হ্রদ (lake) দেখিবার লব্ধ ঘন বড় চঞ্চল হইল। মোটর-চালককে বলিলাম যে “মোটর লইয়া চল, অভিরিক্ত পারিভ্রমিক দিব।” সে কহিল, “বাবুজী, ভাটিখানা হইতে নৈনিতাল পর্যন্ত মোটরে বাইবার পথ

নাই। কাঠগোদান হইতে ১০৪০ মাইল উঠিলে, অপর এক মোটরের রাস্তা আছে। তাহা হইলে অধীশ আনাবিগকে অনেক নামিয়া বাইতে হয়,” বিশেষ চাপের সহিত এমন সেখানে বাইবার প্রস্তাব পদ্রিভাগ্য করিতে গেল। হির কহিলাম যে, ক্রিয়ার পথে হ্রদ দেখিয়া যাইব। পাহাড়ে চারি স্থানে ইংরেজ সৈন্তগণের বস্তাবান (camp) আছে,— ভাটিখানার প্রথম দেখিলাম। মোটরে আদি ও চালক।



রত্নঘাট

আগম বনে স্বভাবের অনাবিল শোভা সন্দর্শন করিতে-করিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। একবার যে পথ দিয়া গাইলাম, কণেক পরে ঘুরিতে-ঘুরিতে তাহার উপরের হাতা দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। পর্তমালার প্রত্যেক স্থান অপূর্ণ সৌন্দর্য্যাপি-বিভূষিত। নানা স্থানে দ্রুতং স্বভাবল্লাভ পাইন ও দেবদারু বৃক্ষাঙ্গি উন্নত শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধরাকে শোভাদান করিতেছে। শিবলা ও দারজিনিঃ

পাহাড় রডোডেনড্রন (Rhododendron) বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে তাহা দেখিতে পাইলাম না। মাইল-ষ্টোন পাথরে যেখানে ২২ মাইল খোদিত আছে, সেখান হইতে তাওয়ারি আরম্ভ হইল। এখানে গোরাধের দ্বিতীয় বস্ত্রাবাস রহিয়াছে দেখিলাম। Mrs. Cotton's Viewforth Hotel এ হলযোগ সাহিবা লইলাম। নিকটে বস্ত্রাবাসীর বাহানিবাস। তাহারাই এই সবক্কে সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার King Edward Sanatorium, Lotni, Dt. Almora এই ঠিকানার পত্র লিখেন। দার-জিলি, দিমলা, দহরি প্রভৃতি হিমালয় বনস্থ স্থানে বাহানিবাস প্রতিষ্ঠিত না করিয়া এখানে, আলমোড়া, ধরমপুর প্রভৃতি

প্রান্তিকনি কুলু কুলু নামে বহিয়া বাইতেছে। পাহাড়ের নদীর দল বহু ও নদীটা কীণতোয়া। রতিখাট ও বদলন নামক স্থানদ্বয়ে গোরাধের বস্ত্রাবাস রহিয়াছে। তাহাতে গোরাধ সংখ্যা কম। ক্রমে রাণীক্ষেত ছাউনী (cantonment) দর-বাড়ী নহন-পথে পড়িতে লাগিল। পাইন গাছের সারি চলিয়াছে। অবশেষে ৪ ঘণ্টাকাল ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া আমরা রাণীক্ষেতে আসিয়া পৌছিলাম। এই কাট রোড ধরিয়া গেলে আলমোড়া এখনও প্রায় ৩০ মাইল। খড়িবাড়ারের প্রান্তিকাগে আমাদের গন্তব্য স্থানে বাইরা আত্মম বোধ করিতে লাগিলাম।

নৈনিতাল, আলমোড়া ও গড়বাগ এই তিনটি জেলা



হনীক্ষেত্রে কাওয়ান হ্রদ

দুর্গম স্থানে বস্ত্রাবাসীগণের বাহানিবাস স্থাপনের কার্য পাইন বৃক্ষের দলল বহিয়া মনে হইতেছে। পাইনের বাতাস তাহারদের পক্ষে প্রথম হিতকারী। Olci Pine Sylvestris নামক ঔষধ এই ভোগে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আমরা ক্রমে গরমপাদি নামক গ্রামে পৌছিলাম। এখানে মেস্ট্রিগণের বিশ্রামের স্থান আছে। চালক বলিল যে, “এখানকার সরগার দল গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত গরম বহিয়া এই স্থানের নাম গরমপাদি।” ধরেননা নামক স্থানের সেতুটি বেশ সুন্দর। আমরা এতক্ষণ কেবল উঠিতে-ছিলাম; বধো-মধ্যে যে নাশিত হয় নাই এমন নহে। এখন সমস্ত-স্থানিতে ঘোড়ার জুতগতিতে ছুটি। রতিখাটের

দ্বারা কুবাহু বিভাগ বিভক্ত। গড়বাগ জেলার বহরিনাথ ভীর্থেয় কথা অনেকই শুনিয়াছেন। উত্তর-পূর্বে তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমে গড়বাগ, দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈনিতাল, ও দক্ষিণ-পূর্বে নেপাল রাজ্য আলমোড়া জেলাকে চতুঃসীমাবদ্ধ করিয়াছে। আলমোড়া এই জেলার প্রধান নগর এবং রাণীক্ষেত দ্বিতীয় নগর। ইংরেজ সেনাগণের ছাউনী (cantonment) থাকার আলকাল এখানকার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানকার দলবাহু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে নানা দেশ হইতে অনেক সাহেব স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন। দারজিলিং, নৈনিতাল, দহরি, দিমলা প্রভৃতি হিমালয়ের বাহানিবাসগুলি অন্তর্গত বহিয়া অনেকে

এই বনোয়াম, নির্জন স্থান পছন্দ করেন। ইহা অপেক্ষাকৃত বেশীহলশূন্য, অথচ বাহার, হাসপাতাল, ক্লাব প্রভৃতি থাকায় সুবিধাজনক। বাথের সমতল-ভূমি ও অস্ত্রাস্ত্র স্থাণা থাকায়, এক সময়ে নিম্নলিখিত পাথড় হইতে রাণীক্ষেত্রে সামরিক সদর (military headquarters) স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে এখানে তিন পট্টন(battalion) গোরা সৈন্য এবং Supply Transport Corps-এর গরুর (অশ্বতর) বাহিনী ছিল। শৈতব নক্ষণ অবিকাল গোরা বেরিগী প্রভৃতি সমতল-ক্ষেত্রে মাখিয়া গিয়াছে। এখন বাহার হটতে অর্ধ নাইল দূরত্ব স্থানী-ক্ষেত্রে ছাউনীতে গোরা আছে। নিকটেই কাওরার স্থবিভূত ময়দান (parade ground)। এখানে ঘোড়-মোড় হয়। ১৮১৩ বৎসর পূর্বে ডিনারাইটের দ্বারা পাথড় ভাঙিয়া এই স্থান সমতল-ভূমি করা হইয়াছিল। প্রত্যাহ আলদা ব্যাংক হইতে ১২টার সময় তোপধ্বনি হয়।

এই প্রদেশের প্রাচীন কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বা-প্রতিপাত্তে চিরস্থায়ী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তেজিতার মতে যে পুরুষসিংহ পোরস বা পুরু বিস্ততা (Hydaspes) নদীতীরে ভুবন-বিজয়ী আলেক্সান্ডারের পথরোধ করিয়া-ছিলেন, তিনি ও কুমারবীরের রাজা ফুর (Phur) একই ব্যক্তি। ইহা সত্য হইলে এদেশবাসিন্যের সৌরবের বিবরণ সন্দেহ নাই। চন্দ্রবংশীর রাজপুত্র সোমটাব বিখ্যাত টামবংশীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আক্কাট ও তাহার বংশ-ধরণ করে শতাব্দী রাম্য করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে গুর্জাপণ আলমোড়া অধিকার করে। গুর্জাপণ গোয়থপুর ও অস্ত্রাস্ত্র বৃষ্টি অধিকৃত স্থানে লুণ্ঠন প্রভৃতি আরম্ভ করিলে, লর্ড হেলিং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল জিলিগি দেবরাহনের নিকটবর্তী কালদাহর্গ আক্রমণ করেন। এককল গুর্জা কুম্পুরে (বর্তমান রাণীক্ষেত্রে) পরিণাম হইয়া করেবদিন বাৎ বিজয়ী ইংরেজ সৈন্তের গতি-রোধ করিয়াছিল। অবশেষে কর্ণেল গার্ডিনার স্থির করিলেন যে, যদি কুম্পুর ও আলমোড়ার মধ্যস্থিত তাহিদেবী নামক পাথড় জয় করা যায়, তাহা হইলে স্থাণা হইবে। কামেও তাহা হইল। কিন্তু পরাজিত গুর্জাপণ কাণ্ডে হিয়ারদিকে বন্দী করিয়া হইয়া আলমোড়া রক্ষা করিতে

পারেন না। তৎপরে কর্ণেল নিকোলাস যুদ্ধ-যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ-গুর্জাপেনতা হস্তিনাল গুহামুখে পতিত হইল। বিজয়-লবী হুগলর হইয়া ইংরেজের গলে জয়লাভা অর্পণ করিলেন। দেশে শান্তি বিস্তার করিতে লাগিল। গার্ডিনার সাহেব কুমারবীরের কবিন্দার এবং টেল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। রামসে সাহেবের আমলে এদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুর্গম পর্বত আলমোড়াতে দেশীয়গণের দ্বন্দ্ব কলমে স্থাপন,—তাঁহার অক্ষর কাঁঠির একটি নিদর্শন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে লোক-বসতির সূত্রপাত হয়। সর্গ, কোটিলি, টানা, রাণীক্ষেত্র গ্রামগুলি লইয়া এই সহর স্থাপিত হইয়াছিল। আলমোড়া জেলার চির পাইন (chir pine) বৃক্ষ হইতে দ্রুপ বা রজন ও এক প্রকার আলুকাঁড়ার বাহির করা হয়। এই গাছ খুব উচ্চ এবং পাতাগুলি মোটা ছোট মত সরু ও খুব লম্বা। এই প্রদেশের ঘর-বাড়ী, দরজা-জালনা ইত্যাদি গন্ধবৃক্ষ, কটিন ও বীর্ষকালস্বারী কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। ইহার নিকাশ প্রভৃতি বাহির করিবার দ্বন্দ্ব গবর্ণমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত কারখানা আছে। রাণীক্ষেত্রের সেনা-নিবাসের চতুঃশীমার মধ্যে, সাধারণকে বন কাটতে দেওয়া হয় না,—আইন-তৎসকারী শাস্তি লাভ করে। সেনানিবাসের ম্যাক্সিট্রেট ও স্-ডিভিশনাল অফিসারের কাছারী হইতে মেখিবার জিনিস। শেবোক্ত কাছারীর নীচে প্রকাণ্ড মাঠে শিক্ষা-নবীণ গুর্জাপৈলগণ রূপ-বিভা শিক্ষা লাভ করিতেছে। তাহাদের বরেকটি তাঁর পড়িয়াছে। কাছারীর অপর পার্শ্বে রাজ-কোষ (Treasury); ১৯০৭ বালে আলমোড়া হইতে এখানে কোষখানা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বাহার হইতে ৪ নাইল দূরস্থিত সর্বোচ্চ পৃথক চৌতাটরা বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১৯২৫ ফিট। গত ৩-শে নভেম্বর কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টিপতনের পর ২ ইঞ্চি পরিমাণ বরফপাত হইয়াছিল, ক্রমে স্থাণ-কিরণ-সম্পাতের সহিত গলিয়া যায়। রাণীক্ষেত্রের উচ্চতা ৫২৮৩ ফিট মাত্র। এখানে অস্ত্রাস্ত্র বৎসর শীতকালে বরফ পড়ে নাই। এবার মাকে-মাকে বরফের শিল গড়িতে মেখিয়া-ছিল। পাথড়ের উচ্চতার উপর বরফপাত নির্ভর করে। বৈনিতাল ৬৪০০ ফিট এবং আলমোড়া ৪৪০০

ফিট মাত্র উচ্চ। ভৌতাত্তিকার পাণ্ডা কাটির বেশ সমতল করা হইয়াছে। শ্রীতের দক্ষ এখানকার সেনা-নিবাসে কোন গোরানাই। পাণ্ডাডের উপর হইতে তিরতুয়ায় বৃত্ত দিগন্ত বৃত্ত হিমাচলের দৃষ্ট অতি হালদা, অতি মহান। মল সরবরাহের জন্য এখানে কলের কল (Pumping station) আছে। ১০০০ ফিট নিম্নের সরণাগুলি হইতে মল টানিয়া সুবৃহৎ ট্যাক মধ্য কত্রিয়া সহরে বিতরিত হইয়া থাকে। লোকের বাড়ীতে কল নাই, বাস্তার কল হইতে কল আনিতে হয়। শুনিলাম সহরে যে একজন প্রবাসী বাসানী আছেন, তিনি কলের কলের ইঞ্জিনিয়ার। যে ৭৮ জন বাসানী দ্বারী কনসিগ্নমেন্টে কার্য করিতেন, দুভারন্তে তাহারা মেসোপটনিয়ারে প্রেরিত হইয়াছেন। পূর্বে ইন্সিনারেটর (Incenerator) যন্ত্র দ্বারা সহরের সমস্ত মল তথ্য করা হইত; সেই প্রণালীতে অকৃতকার্য হওয়ায় একশে নানাব্যবসায় পাইনের গুড়-পত্র দ্বারা ভর্তুকি করিয়া নষ্ট করা হয়। কলিকাতাতেও এক সময়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল,—কিন্তু মন পূর্বে ২২ঃ কন্ডেক্ট লেনব বন্দোবস্তে তানিটারি কমিশনার সাহেবের আদেশে এই বস্ত্র অকরণ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

রাষ্ট্রসেবকের সদর বাহার প্রসিদ্ধ,—৮.১০ মাইল দূরত্ব গ্রামবাসিগণও এখানে বাসার করিতে আসে। সব দেশের মত এখানকার বাহার অপরিহার্য ও অস্বাভাবিক। অল্প সেনে যেমন সৈন্য লোকের উত্তম দ্ব্যনে বাসভূমি মিলে, এখানে অর্ধ দিলেও তাহা পাওয়া যায় না। পাহারী সাহেবগণের স্থাপিত স্কুলে (middle vernacular school, মধ্যপ্রাচ্যে পর্যায় পাঠের বন্দোবস্ত আছে, অর্থাৎ সে ইং উচ্চশ্রেণীর স্কুলে পরিণত হইতেছে না। এখানে ধর্মশালা আছে; কিন্তু দীতনিবাসেরের মস্ত যেমন প্রায় সব গৃহেই তিন্মি আছে, ধর্মশালা সে বন্দোবস্ত নাই।

ম্যোন্টের নামে জরিলা (অর্থাৎ গভীৰ্ণ) বাসার নন্দ্যেবীর সেনা উপপক্ষে নাট-গান ও ছাগদ-মহিষ বলি হয়। পাণ্ডাডীয়াঘের ধর্মবাস ও পুন্ডা-পাচ্চি অল্পত। বিষ্ণু, শিব, কালী প্রভৃতি দেবতার পূজাতে বিশ্বাসবান হইলেও, তাহাদের মধ্যে গ্রাম্যসেবতা ও প্রেতপুন্ডা এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত। প্রেত ছই বকম, বাবা ও ভূত জাতীয়,

তাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহার অপমৃত্যু হইয়া প্রাচ্য হয় না, সে ভূত হয়। অবিবাহিত পুরুষ ভূতকে তোলা বলে। শিকার-রত মৃত ব্যক্তি আধরি হয়। শিশু মরিলে মঙ্গল বলে। যে সকল পত্নী যুবক-যুবতীকে মৃত্যু করে, তাহারা আচিরি নামে খ্যাত। তাহারা দেবতারপরে নিকট লাভি, পুরুষ-মহিষ, ছাগ, শূকর, এমন কি টিক্টিকি পর্যন্ত বলি দিতে থাকা বোধ করে না। রামপুত ব্রাহ্মণ, ছত্রি ও জোম, এই তিন প্রকার জাতি পাণ্ডাডে দেখিতে পাওয়া যায়। আধিমনিবাসী ভোমেরা গ্রামের নীচ কর্তৃক করে, কদাচ কৃষি-বর্জ্য করে বা অমিয়ার হইতে পারে। এই জেলার যত ভূটরা দেখিতে পাওয়া যায়, বৃত্ত-প্রদেশের মস্ত কোন দ্ব্যনে তত দেখা যায় না। বহু-বিবাহ কখন-কখনও দেখা গেলোও তাহা অধিক প্রচলিত নহে। বালিকাপ্রবণ ২ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায়। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কথা বহুত। গণেশ-পুণ্ডা কত্রিয়া বিবাহ-কার্য সংক্ষেপে সাধিত হয়। শাহীর মৃত্যুর পর গ্রীক ছোট জাতীয় নিকট সমর্পণ করা হয়, ছোট-জাতীয় নিকট কখনও নহে। কাঞ্চিতে কাহার প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পাণ্ডাডীয়া রমণীগণ গৃহে বাস করে, এবং লালস দেওয়া বাড়ীতে শজোপায়নের সমস্ত কাজ দেখে। ইহাদের মধ্যে পর্দা প্রথা নাই। পাণ্ডাডে কখনও মোটা লোক দেখা যায় না; পাণ্ডাডী যুব মল ও কর্ণাট। বৃত্ত-প্রদেশের অধিকাংশ দ্ব্যনে হিন্দুদ্ব্যনী গ্রী-কুলি পাওয়া যায়; কিন্তু বাবালা, বা উড়িয়াদেশে ইহা বিরল। দার্জিলিং পাণ্ডাডের মত এখানে গ্রী-কুলি প্রচুর নহে। তাহারা ২০ মণ পর্যন্ত ভারী মোট আক্কেলে বহন করিতে পারে, পুরুষগণ ততোহমিক। পাণ্ডাডের মল-বায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদিগকে অগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাভাব্যনে ধনী করিয়াছে। শরীরের সহিত মনের তৎপরতা দ্ব্যনে সমর্থ হইলে তাহারা এক শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হইবে। আমাদের পাঠকগণ মানসিক উন্নতি বিধান তৎপর, কিন্তু শরীরের প্রতি অবহেলা করিয়া তাহার কলোপ করিতেছেন। ম্যোন্টেরি-অর্জিত বস্ত্র-কুমি দ্ব্যহার পক্ষে তেমন অহঙ্কল নহে। কিন্তু তাহারা যদি লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ করিয়া বালাকাল হইতে শারীরিক তৎপরতা লাভে রত হইল, তবেই এই

অধঃপতিত বাবাশি-জাতি জীবন-সংগ্রামে মরী হইতে পারিবে।

সরকারী বাড়ীগুলি প্রস্তর-নির্মিত ; কাঠ ও কয়লাগেট ও সৌহ দ্বারা তাহাদের ছাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাচা-ডীয়াগণের গৃহের ছাদ প্রস্তর বা পাইন-কাঠ দ্বারা গঠিত হইতে দেখা যায়। আলমোড়া ও রাণীক্ষেত্র নগর ব্যতীত এই ধোলায় পুলিশের তেমন বন্দোবস্ত নাই। গ্রামের প্রধানগণ ঘোষিকে গ্রেপ্তার করিয়া পাটোয়ারীর নিকট সংবাদ দেয়, পাটোয়ারী ও থোকদারগণ বানায় পুলিশের নিকট লাশি করে। ইংরেজরাজের আগমনের পূর্বে গ্রামের শাসনতন্ত্র এমন এইরূপ ভাবে সম্পন্ন হইত।

প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যখনি তুষারমণ্ডিত হিমালয় নগর স্থানের পাহাড় হইতে দৃষ্ট হয় না। রাণীক্ষেত্রের অনেক স্থান, এমন কি আমাদের বাগা হইতে যে অনিন্দ্য রূপরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার বর্ণনা করিতে বাধ্য

হইব, ভাষা পরাণ হইবে। বহুদিনের শৈল-মালায় অধিত্যকংশে আমাদের পাচক ও ভূক্ত লছমনসিংহের বাসস্থান দাখিলি গ্রাম সন্ধ্যার পূর্বে সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে চিত্রপটে প্রতিকলিত পার্শ্ব-ভাগে সৌন্দর্য্যময়ী দৃষ্টাবলীর ভাষা ভবনহারা। অপরূপ নভশোভার ঐশ্বর্য্যে এই গ্রামের চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইতেছে ; সেই ভিত্তি বৃষ্টি এই স্থানের নাম রাণীক্ষেত্র হইয়াছে। পূর্ব্বতপ্রস্থি পরম্পর সংলগ্ন হইয়া বেন আলের ভাষা নিবন্ধ রাখিয়াছে। এই পূর্ব্ব-নিচর বেন ভরদ্বারিত—একটীর উপর আর একটা উঠিয়াছে এবং ক্রমে তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর ও তুষারমণ্ডিত হইয়া অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। বরফাশির উপর নানা স্তরে নানা স্থানে সূর্য্যরশ্মি বা ভোম্বাঙ্গার অমল-ধবল-ছটা নিপতিত হওয়ার উহাদের সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্ত পরিবর্তন-শীল। এ দৃষ্ট যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

রঙ্গমহাল

[প্রথমপর্বে রায়চৌধুরী]

(১)

প্রাণের ধ্বংস-শেষ, রূপের সমাধি অভিহান !

এই প্রেম ? এই পরিত্যগ ?

না মুরাতে বদন্তের মেলা

ভেঙ্গে গেল কবে মূল-খেলা ?

কোন্ বিদ্যাহী তুষারভাগে,

কোন্ বিরাগীর অভিযোগে

ভস্ম আল তব পঞ্চশর,

ভয় ভব কোয়েলার স্বর ?

শুভ মৌন মহলে-মহলে

গল্পের কাটো-কাটো

সাহাবার হা-হা সব কুণ্ডা শুধু উঠিছে উগাও—

যেদি মান, আও—আও, কলিমায়ে আও !

(২)

শিলা-সৌধে ছলছল সীলার মর্ম্মর-মুরতি !

হো হো প্রেম ! হায় কি নিয়তি !

সে সর্ব্বশতাব্দী বেন আলি

মায়ারীর রত্ন-দ্বারাখানী,

অভীতের নেপথ্য হইতে

দেখা দেয় ঝিলিকে চকিতে

কত রূপ-খোবন-ইতিহাস,

কত মুখা, পরল-উচ্ছ্বাস,

কত ভান, মান-অভিমান

কত দান, কত প্রত্যাখ্যান !

সাহাবার হা-হা সব আল শুধু উঠিছে উগাও—

যেদি মান, আও—আও, কলিমায়ে আও !

(৩)

অপরীষি সেওয়ানা পীরিতি কোন্ টানে নেমে আসে বেথা ?

এই গ্রেম ? এত তার বাথা ?
জোৎস্না-বাধিনীর স্রোতে ভাসি,
বুকভরা স্বপনের রাশি—
কবরের আবরণ পুঁনি'
বিশ্বতির ব্যবসিকা তুনি'
ককে-ককে এ শশনি-গুরে
ছায়া-মুষ্টি সাহায্যি ঘুরে !
হাশে, কাপে—কি বেন কুহকে !
চলে' বায় দিনের আলোকে ।

সাহারার হা-হা সম শুধু আরা, উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিঙ্গমে আও !

(৪)

কাণে আসে পর শব্দ, গ্রাণে বাজে কানের ঘূরুর !

এই গ্রেম ? এতই জুজুর ?
কিরোজা-রকের পেশোয়ার,
পাহাড়ার চুন্সকীর কাভ,
বেগী বাধা মহোর কি তার,
কালো আঁধি শোভিত সূর্য্যার,
ভুবুভু হেনার আন্তর,
কুবুভু কোয়ারার স্বর,
এজাঙ্কের সাথে গলা সাথে
গ্রেম-দ্বিত লাঞ্জে বেন বাঁধে ।—

সাহারার হা-হা সম রেশ আরা, উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিঙ্গমে আও !

(৫)

কে তোমরা শাখিত কবরে ? ঘুমাও, ঘুমাও অবিরাম !

এই গ্রেম ! এই পরিণাম !
শ্রির-বন্ধ উপাধান করি,
ঘুমা'তি না তোরা, নারী-পরী ?
অর্ধ-রাতে আসি শ্রিরতম
চিরুষ্টি ধরি, দ্বিগুন
'দিলজানি' বলিরা আধরে
গ্রেম-চিহ্ন আঁকিত অধরে ।
সে চুখন-সরল অধর
হরে আছে কাতর পাখর !—

সাহারার হা-হা সম শিশা ঘাটি উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিঙ্গমে আও ।

(৬)

কে সে জান ? কাহার কলিঙ্গা ? কোথায় সে দেওয়ানা পীরিতি ?

হো হো গ্রেম, এই তোরা রীতি !
বুক-ফটা পাবাণের মুখে
স্বপনের কুহ বাহু-বুকে
শোন পাহ কি অন্তর ভাষা,
“অমর ! অমর ! তালবালা !”
নিশ্চল সমাধি তুনি' নড়ে,
কবরে-কবরে লাড়া পড়ে,
“মরি নাই, মরি নাই, শ্রির,
গ্রেম, সে যে ধরার অমির ।”

সাহারার হা-হা সম তার সাথে উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিঙ্গমে আও ।

দু'কুড়ি সাত

[ত্রৈকেশবচস্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল]

(১)

"সহজে নাম কিন্তে গেলে যেমন বোগাতার আবস্তক, তেমনি নামটাও একটু কটুমটে রকমের হওয়া চাই।"

টেবিলের উপর ত্রিচরণ তুলিয়া চেয়ারের উপর অর্ধ-শায়িত অবস্থায় ধবরের কাগজ পাঠ করিতে-করিতে আবার অঙ্গীকার প্রাইভেট ডিটেক্টিভ সতীশচন্দ্র অলসভাবে এই কথাগুলি বলিল। অবশ্র আবার দিকে তাকায় নাই বা তর্কের অবতারণা করিবার ভ্রমত আমাকে সযোজন করিয়াও সে এ কথাগুলো উচ্চারণ করে নাই। আমি কিন্তু তর্কের সুবিধাটুকু পরিত্যাগ করিয়া কাপুকুঘোচিৎ মৌনাবলম্বন মুক্তিসিদ্ধ মনে করিলাম না। আমাদেবের গম্ভীর প্রধাত-নায়ী "লডায়ে শিসির" কলহ-প্রণালীর অমুৎকরণ করিয়া বলিলাম—"তার কি কোনও মানে আছে?"

সতীশ বলিল,—একটু আছে বই কি!

আমি বলিলাম,—অমনি থাকলেই হ'ল? গায়ের-জ্বর কথা বল কেন?

সে টেকিলের উপর হইতে পা' নামাইল। জ্বলন ত্যাগ করিয়া চেয়ারে উঠিয়া বলিল। টেবিলের উপর ধবরের কাগজখানা রাখিয়া একবার চক্ষু মুছিল। (এ সবগুলো তাহার বাক্য মুছের উদ্ভোগ-পর্ব!) আমিও কোমর বাধিলাম। সে বাস্তব হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আমাকে একটা দিল—পালোরারের। হুস্তি লজিবার পূর্বে যেমন মুক্তিকাবিনিময় করে। নিম্নের সিগারেটটা টেবিলের উপর ঠুকিয়া সে বলিল—নয় কি?

আমি বলিলাম—যেটেই না।

সে বলিল—এই কাগজ দেখ, এই ব্যারিষ্টার আর এই উকীলের নাম, এখের নাম ছটা অসাধারণ, তাই লোকে একবার শুনে তোলে না।

আমি বলিলাম—বটে! যেচারাদের কি বোগাতা নাই?

সে বলিল—নিশ্চয় আছে। কিন্তু কটুমটে নামও একটু সাধারণ করে।

আমি বিক্রপ করিয়া বলিলাম—যথা শুদ্ধদান, আত-ভোগ, কেশবচস্র, হামপ্রসাদ—

সে বলিল—এ দেখ হামপ্রসাদ! ঐশ্বরচন্দ্র একটু সাধারণ হ'লেও বিদ্যাগাগর অসাধারণ। হামচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংস বোপ হ'য়েছে ব'লে এমন কি ইংল্যান্ডের ও-নামটা তোলে না। বিবেকানন্দ, গোবিন্দ, বহিন্দ্ৰচন্দ্র, দীনবন্ধু—

আমি বলিলাম—মুরেশ্র, দেবেন্দ্র, অগনীশ, প্রহর, দিবেন্দ্র—

এবার সে পরাণ হইল। বলিল—না, তা' বলছি না;—অর্থাৎ

আমি বলিলাম—বেশী কথার কাম কি? এখন পুথি-বীতে সকলের চেয়ে ক্ষমতাবান লোক—উইলসন্। নামটা কি পেট্রোকোভিন, ব্রাডিনোইক্, হুরোপ্যাটকিন্ বা কামাদ-কাট্কার বড় চোয়াল-ভাঙ্গা? হুক বা হেপ বা হার্ডও খুব গালভরা নাম নয়।

সে বলিল—লয়েড্, হার্ড্ বিশেষত্ব আছে। আবার কথটা বুঝে না। আমি বলিলাম কি, গালভরা নাম-গুলো কষ্ট করে শিখতে হয় বটে, কিন্তু একবার কারবা করতে পারলে, স্বভিতে বেশ চেপে বসে থাকে। উইলসন্ খুব বড় লোক, কিন্তু তাকে ভুল করে লোকে উইলিয়ম্ বলতে পারবে; কিন্তু লয়েড্, হার্ড্ বিকৃত হ'বে না।

আমি বলিলাম—বামে তর্ক।

সে বলিল—এই আমাদেবের দেখ না। তুমি আমি কাম করি; কিন্তু কারবারের নাম—নরেশ সেন, প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। যদি আমাদেবের নাম হ'ত—সতীশ চাট্‌যো ডিটেক্টিভ—নামটার অন্ততঃ একটা বিশিষ্টতা থাকত না।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ! কারমটা প্রায় প্রতিদিন লাভ করেছে নামের বিশিষ্টতার জন্যে। আমাদের নাম বেরিয়েছে “বিবাহ-বিলাস” কলের জন্যে। এবং মনে করিয়ে দেওয়া বাঞ্ছা যে, সে মামলার কিনারা করেছিলেন অথচ মিস নরেন সেন।

“ভালোবাসে।” হ্যাঁ! কিন্তু তার প্রণালীতে আনন্দ তখন ক্রি তখনই নামটা দেখ না—সারলক্ষ্যে হ্যাঁ।

উত্তরে হাসিলাম। আর তর্ক হইল না। মন্তব্য আসিল। সত্যি উঠিল না।

মন্তব্য আসিল—একজন নয় দুই জন। পোষাক-পরিচ্ছন্ন দেখিয়া ব্যবসায়ের বলিয়া মনে হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—সত্যি যে কটাকে তাহাদিগকে দেখিতেছিল, তাহাতে একটু ইতস্ততঃ করিবার কথা।

একটু দ্বন্দ্ব করিবার জন্য আমি তাহাদিগকে বলিলাম—বলুন। সিগারেট খান?

তাহারা পরস্পর মুখের দিকে চাহিল। একজন অর্ধ-দুটু খুঁজে বলিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ,—না, থাক।

অপরটি বলিল—আর বাবু, কিম্বোজোটা থাকলে আর আপনাদের শরণার্থী হই? বাবু আমাদের সন্তান হ'লে গেছে।

সত্যি হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ কতকটা হ'লেই বই কি? কি ব্যাপারটা বলুন দেখি।

দুইজন পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। উত্তরে এক সঙ্গে বলিল—বল না।

গভীর গান শিখাইবার সময় ছাত্রের সহিত যখন গলা বিলাইবার চেষ্টা করিয়া গায়—“তেরে বাহারিয়া”—তখন যেমন শব্দ হয়, ইহাষের উত্তরের মিলিত কণ্ঠের সমবর্তী প্রায় সেই প্রকারের অসমান ধ্বনির সৃষ্টি করিল। যে লোকটি অধিক শিক্ষিত, তাহার “সবুনাশের” দ্বারা “জোটা” ছিল না—অতি তীক্ষ্ণ অর্থক সর্বত্রই কথা কহিতেছিল। আর অপরটির গলা বেশ মোটা এবং গভীর।

সকলার দিকে চাহিয়া সত্যি বলিল—আপনিই বলুন না।

একটু কানিয়া কর্তব্যের পরিহার করিয়া লইয়া সে বলিল—“আজ্ঞে, বেশেদার আমাদের চালের দোষ

কারবার আছে—আর্থ-আর্থি বখরা—সনাতন জিবিকম নগুই।”

আমি অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলাম—বাপসু।

লোকটি একটু বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। আমি সত্যি বলিলাম—যে কথা হ'ছিল। কিন্তু

এদিকি চুলের দ্বন্দ্ব, এমন নামটা পূর্বে তো কখন শুনি। সত্যি বলিল—না। কিন্তু এখন শুনে। একবার

কারবা করতে পারলে আর ভোগবার ভয় নেই। হ্যাঁ, কার নাম সনাতন, আর কার নাম জিবিকম?

মোটা-গলা হৃদয়-কণ্ঠকে দেখাইয়া বলিল—আজ্ঞে, ইনি সনাতন নগুই। ইনি বোধমান—বিদ্যেসিদ্ধ আছে—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ তা? শুদ্ধ তাহাতেই প্রকাশ। তা? জিবিকম বাবু—

সনাতন বলিল—আজ্ঞে ইনি বোলাগোবিন্দ বাবু— জিবিকম এর ছেলের নাম।

মনে মনে তাহাণাম, লোকটা কি পাবাণ প্রাণ! অজ্ঞান-বধনে নিজের ছেলের নাম রাখিতে পারে—জিবিকম। এমন লোকও বেশ আছে! প্রকৃত্তে বলিলাম—তা? মহাশয়ের শুভাগমনের কারণ কি?

সনাতন—শুনেছি, মহাশয় টিক্‌টিকি—এই গুর নাম কি গোয়েন্দা—অর্থাৎ পুলিস—

উৎসাহ দান করিয়া সত্যি বলিল—বেশ—

সনাতন বলিল—আজ্ঞে, আমাদের একটা চুরি হ'লে গেছে—মগর টাকা—রোক টাকা আর মোটা,—অধিক টাকা—অর্থাৎ প্রায় ত্রিশটি হাজার টাকা।

আমি বলিলাম—কত? চুরাশি হাজার টাকা!

বোলাগোবিন্দ বলিল—আজ্ঞে চলিল।

সত্যি বলিল—কিন্তু,—কিন্তু অত অধিক অর্থ চুরি হইল?

তাহারা বলিল—একটা লোহার ব্যাগ-বাক্সে টাকা স্তম্ভিকার প্রেরিত ছিল, গত রাতে কে সেই টাকার ব্যাগ চুরি করিয়া পলাইয়াছে। তাহাদের কর্মস্থল বেলাহাটা; কিন্তু তাহারা বাস করিত ভিলকলা সেনে একখানি বিতল বাটীতে। তাহারা দুইজন ব্যক্তি বাসার থাকিত একটা উৎকলবাসী পাচক ব্রাহ্মণ; আর দিবাভাগে একজন টিকা দাসী গৃহস্থালীর কর্ম করিত; রাতে সে নিজের বাসার

থাকিত। তাহাদের একটা মাত্র সরকার, সে বেশিরাহাটার গদিতে থাকিত।

সতীশ বিজ্ঞান্য করিল,—গদিতে বাস দিলু ক নাই?

সনাতন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, শোখার দিলু আছে, কাঠের কয়দবায় আছে; খাতাপত্র মাল মজুত সবই গদিতে আছে।

“তবে টাকা বাসার আনা হ’ত কেন?”

“খাজে না, আনা হ’ত না। গদির টাকা গদিতে থাকত। এ টাকা বাসার।”

আমি বলিলাম—গদিতে কত টাকা আছে?

“আজ্ঞে জা হুশ’ চার শ’ বা খাতাট্টেটিক আছে। শুধরিলে কোন দিন বাটতি-বাড়তি হয় না।

আমি বলিলাম—তবে বাড়ীতে ৪০ হাজার টাকা পুঁতে রেখেছিলেন কেন?

তাহারা পরস্পর মুখের দিকে চাহিল। সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়ের আগাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়াই সনাতন কেন্দ্র একটু অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। আমিও সাধারণ বিশ্বাসের অংশ ভোগ করিলাম। প্রথর দৃষ্টিতে সেই হসু-বুগলের দিকে চাহিলাম।

সনাতন বলিল—আর বলই না দলু, সত্যি কথাটা। বদির কাছে ব্যারাম লুকেলে লেগেবে কেন?

সতীশ বলিল—ওটা বুকেছি। কারবার বুঝি শির উঠে, তাই টাকাটা তুলে নিয়ে বাড়ীতে রেখেছিলেন?

সনাতন সতীশের পদাশ্রয় গ্রহণ করিল। বলিল—এ রকম না হ’লে আর মধ্যমের খ্যাতি এতটা দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করেছে।

আমি বলিলাম—তা হ’লে কেসটা চোরের উপর বাটপাড়ি। মশারগা বাহার বেয়ে টাকাটা গরিয়েছিলেন—খাতার রাখে জমা-খরচ করে তহবিল ঠিক রেখেছেন; কিন্তু মশারদের সেই ৪০ হাজার টাকাট চোরে নিয়ে গেছে।

মোলগোবিন্দ মস্তকে কড়াখাত করিয়া বলিল—তা যা বলেন আজ্ঞে। তবে হ্যাঁ, এ বিপদটা হবে জানলে ধর্ম-প্রদান করে লোকের ল্যাকপড়া বুঝির দিতেম হুজুর।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ তা’ নিঃসন্দেহ! তবে খাতা

গাফ করার পরিপ্রমটা বুঝাই গেল। এ বুদ্ধিটা আগে হ’লে—

সতীশ বড় বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ তোমার ওদর ঠাট্টা-বিক্রপে কাম কি? আশাদের কাছে যে দামলা এসেছে, আমরা তারই কথা বলি আশোচনা করব। যেমন করেই হ’ক ওদের ৪০ হাজার টাকা একটা দিনের বা লোহার বাসন্য করে পৌতা ছিল,—

উভয়ে আবার সেই সহ-মোটা গলায় ঐক্যতান বাঝিয়া বলিল—আজ্ঞে।

“কোথার পৌতা ছিল?”

“আজ্ঞে নীচের ঘরে, যে ঘরে বাবুন ঠাকুর গুতেন।”

সতীশ বলিল—বটে? কেন, সে ঘরে কেন?

মোলগোবিন্দ অভিমান-ভরে সনাতনের দিকে চাহিল।

বুঝিলাম, সনাতনের বুদ্ধিতেই টাকার বাস নীচের ঘরে পৌতা হইয়াছিল। সনাতন সেই অভিমানের কটাক্ষের উত্তরে বলিল—আজ্ঞে, আমাদের কু-অভিপ্রার মোটেই ছিল না। তবে বুঝলেন তো, কু-লোকে কু-কথা রটরেই থাকে—বিশেষ একটা গদি যেউলে হ’লে। ওপরে পৌতবার জায়গাও ছিল না। আর নীচে বেদামুখ করে পুঁতে ফেললে কোনও সরস্বৎও হ’বে না। এ কষ্টের উপার্জনের টাকা যে পাচক ঠাকুরের শোবার ঘরে পৌতা থাকবে এ সরস্বৎ কেউ করত না। তবে যখন বিপদ হয়—তখন তো আর কোন বুদ্ধিই হালে পানি পায় না। টাকা তুলে মেবার বুদ্ধিও অব্যবহার, আর স্থান নিম্নহটাও।

সতীশ নিস্তকে তনিত্তেছিল। সনাতন শব্দ কথাগুলি একটু গর্ক করিয়া বলিল। তাহার কৈকিরত শব্দ হইলে বলিল—বেশ কথা। বাবুন ঠাকুর কাল রাখে গুতেরিয়েন কোথা?

“আজ্ঞে সেই ঘরে।”

“নকালে কোথা?”

“আজ্ঞে নিরুদ্ধে। ঘরের কপাট খোলা, মাটির তলা থেকে বাস বার করে নিয়ে হুজুর মাটি অবধি চাপা দেবনি।

আমি বলিলাম—তবে আর এ দামলা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন কেন? পুলিশে খবর দিন, হস্তিরা করিয়ে দিন, তার বেশে লোক পাঠান, থানা পড়বে এখন।

সতীশ হতাশভাবে সুবাদপত্রের বিজ্ঞাপনসম্মত মনো-

নিবেশ করিল। সকালে খাড়ে বকিরা একটা পরস্য আসিল না—কৈবল কখনো। আমিও বড় বিরক্ত হইলাম। তাহাদিগকে উপরোক্তরূপে উপদেশ দিয়া স্থানান্তরে বাইবার ভক্ত উঠিয়া গড়াইলাম। হঠাৎ সন্ধ্যার মুখ উজ্জ্বল হইল। সে ঘেন একটু ভ্রব করিয়াছিল; অকস্মাৎ সংগোধনের অবসর বুঝি, কাগজ ফেলিয়া বলিল—হ্যা, বুকেছি। এ ব্যাপার পুলিশের হাতে যাবার নয়। তা'হলে মালটা কোথা থেকে এলো সে বিষয় খোঁজ হবে, আর ইনসপেক্টরের বহবাণ্ড হ'ব্ব হবে না।

সনাতন মহা আড়ম্বর করিয়া আর একবার তাহার পদ-খুলি গ্রহণ করিল। বিনয় সহকারে বলিল—হুজুর মনের কথা বলতে পারেন। হুজুর বাহাদুর স্ত্রীর ক্রটি। এ ব্যাপারটা কি পুলিশের হাতে দেওয়া যায়? ভীষণ ব্যাপার। অস্তান্ততা চাই।

দোলগোবিন্দ বলিল,—আরও একটু কথা আছে। হুজুর, বাহুন ঠাকুরেরও টাকাতা ভোগে হয় নি।

আমি বলিলাম—কেন?

সনাতন কিছু না বলিয়া বাহিরে গেল। তখনই একটা বিস্কুটের টিন লইয়া যবে ফিটিল। বাস্কের ভিতর হইতে অব্যাহত একটা ছিন্ন হস্ত বাহির করিল। আমরা বিস্মিত হইলাম। উত্তরে একটু শিখাইয়া পড়িলাম। কি পৈশাচিক দৃষ্ট!

আমি বলিলাম—কার হাত?

সে বলিল—আজ্ঞে বলু ঠাকুরের—আমাদের পাচকের।

সতীশ ক্রুদ্ধকিত করিয়া, বিস্ময়িত নেয়ে সেই ছিন্ন হস্তের দিকে চাহিয়া ছিল। যে সৃগালটা তাহার কতকটা অংশ উপরসাৎ করিয়াছিল সেও ঐরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহে নাই। মণিবন্ধের নির হইতে হস্তের প্রায় সমস্তটাই ছিল—কেবল কনিষ্ঠা অঙ্গুলির এক গাইট বোধ হয় কোন একটা ভক্তর অর্ঘ্যে বিয়াজ করিতেছিল। হাতটা একটু কুলিয়াছিল—রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণের ছিন্ন-হস্ত আশাদিগের সকলকে একেবারে নির্ভীক করিয়া দিয়াছিল।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম—হাতটা সনাক্ত করছেন কি করে? কার হাত?

সতীশ সেই ছিন্ন হস্তের দিকে চাহিয়া বলিল—ঐ আংটি দেখে বুঝি? আংটি কার? বলজান ঠাকুরের?

সনাতন বলিল—আজ্ঞে ঠিক বলছেন হুজুর। ও আংটি আমরাই গত বৎসরে দিরেছিলাম। সেপার আংটি—প্রিনি সেপার হুজুর।

(২)

টান্সিতে বসিয়া সতীশ বলিল—ব্যাগারটা যত সোচ্চার গিয়াছিল, ততটা সোচ্চার নয়। হাত—আংটি—চুরি—মেউলিয়া আড়তদার—

আমি বলিলাম—হ্যা, কেউ কেউ গরম্—আজ্ঞে সবই। কিন্তু খরচা বাবদ আশে শ'হুকে টাকা আদায় করে নাই। যে রকম বাগদার-মারা পাটি—একবার নদী পেরুতে পারলেই অমন কুমীরকে দেখাবে বোড়া হুজা।

সতীশ লবাব দিল না। সে গম্ভীরভাবে কেসের কথা ডাবিতেছিল। সমুখে বোট-চালকের পার্শ্বে দলুই-দুগল বসিয়া ছিল। সকালে সাতার ভিড় ছিল না। গাড়ী যেন লবেগে বেলিয়াঘাটার পুলের উপর দিয়া উঠিল। ভীষণ আন্তর্দ্বন্দ্ব কবিত্তে-কবিত্তে পুলের নিয় দিয়া বজবজের ট্রেন ছুটিতেছিল।

সতীশচন্দ্র জরুকন করিয়া মর্ক-মীলনিত নেয়ে বতই চিন্তা করুক, ব্যাগারটা আমার নিকট খুব স্পষ্ট বসিয়া বোধ হইতেছিল। বলু ঠাকুর অর্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—স্বায়ে হুগোব বুঝিয়া ব্যাগারট লইয়া পলাইতেছিলেন। ইন্সপেক্ট-বেন্ট ট্রাষ্টের অফিসে তিলমলা, গোবরা, গোরাচাঁদ রোড, চিড়িয়াঘাটা একেবারে ধাপার মাঠ অবধি কশিকাতার গেল্ডা-তলার বিশিষ্ট ভ্রমণস্থানদিগের নূতন বাসস্থান হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বলু ঠাকুরের শ্রম লাভ করিয়া বাস্তুটির গুরুত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ছিন্ন-হস্তটা আসিল কোথা হইতে? একটা পুস্ত, ডোবা বা ধাপার প্রমত্ত মরদানে লাগটার সন্ধানি হওয়া সম্ভব। কিন্তু হাতটা? নয়—রসিকতা করিবার ভক্ত—না ঠিক হইয়াছে হাত দিয়াই সে বাস্তুট ঠকা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অগ্রে হাতটাই কাটিয়াছে। শেষে হয় ত সৃগাল কুকুরে মুখে করিয়া—

যেন আমরাই মানসিক প্রেরণ উত্তর দিবার ভক্ত সতীশ বলিল—হাতটা এলো কোথা থেকে? আর কি অস্ত্রের

ঘায়াই বা কাটিলে। কস্তির কাছটা শিরাসে ধরে মাটি ক'রেছে।

আমাদের গাড়ী বেশিরখাটার বাজারের নিকটে আসিল। সনাতন পিছনে আবারের দিক মুখ তিরাইয়া বলিল—এইবার গমিতে আসছি। দেখবেন বাবু, সরকার ঘেন কোন কথা মনেহ না করে। আর হজুরদের কাছে সে কথার উপাশন করাই বারহুলা।

আমি বলিলাম—রেশ কণা।

গমিতে বিশেষ কিছু তবন্ত হইল না। একখানা আম-কাঠের তক্তপোষের উপর ম'দুর বিছাইয়া অনেকগুলি খাতাপত্র লাইয়া সরকার কাম করিতেছিলেন। এককোণে বেশ ভাল একটা লোহার সিন্দুক। আমদিগকে দেখিয়াই সরকার বনমানী বলিল—বাবু দানী এলেন, বলে ঠাকুর ঘরে চাবি দিয়ে কোথা গেছে—এখনও এসে নি।

সনাতন বলিল—বল কি? আচ্ছা দেখছি।

আমরা বাহিরে আসিলাম। বনমানী চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল—বাবুয়া কে?

মোলগোবিন্দ বলিল—উকীল।

বাহিরে আসিয়া সনাতন বলিল—বাবু, আমি ঘরটা তালি বন্ধ করে এসেছি—গম্ভীরা আপনাকে দেখাব ব'লে। আর কি বৌটা যাতে না মনেহ করে।

আমি বলিলাম—বনমানীরা বাড়ীর ঠিকানা জানি?

কেহ জানে না। পুরী বা কটক বা বালেশ্বর এই ত্রয় একটা কোন দেশ হইবে। তাহার যেশের কোন লোকের সন্ধানও ভাষায় কেহ জানে না।

ঘোঁটের বসিয়া তিফ্‌ডিয়া রোডের উপর দিয়া ভিল-কলার দিকে ছুটলাম। দামিনী-আলোক-স্পোডিত এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে ৭৭-৭৮ টাইলের শিরানের আশ্রিত গুটাইয়া এক পোরা সাহেব পা কীক করিয়া গাড়াইয়া ছিল। অগ্রসর হইয়া দামিনীকে বেসেটা মুসলিমালের কনাইয়ানা—নিত্য তথ্য অধ্যয় গো-হতা। হয়। ইহার সম্মুখে হিন্দু-মুসলমানের মাথা-কাটা-কাটি হয় না—মাথা-কাটা-কাটি হয় বখন ধর্মের নামে মুসলমান একটা গরু জবাই করে।

একটা গলির মোড়ে আসিয়া ঘোঁটের ধামিল। আমরা ঘোঁটের হইতে নাহিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাটী কুত্র। নিচে দুইখানি উপরে দুইখানি ঘর। সমুখে বায়ান্না, পিছনের বায়ান্নার এক পার্শ্বে শিঁড়ি—অপর পার্শ্বে দরমা-ঘোরা ছোট কুটুরির মধ্যে রক্ত-শালা। বাটার বাহিরে রোগিং—ঘোরা ছোট দটক। দটক হইতে বাটা অবধি প্রায় তিন চারি কাঠা জমি। একতলার বায়ান্নার নিচে দুইটি খাপ রিমা সেই জমি হইতে বাটাতে উঠিতে হয়। দটক হইতে শিঁড়ি অবধি মোটা রাস্তা প্রায় ১০ ফুট। রাস্তার দুই পার্শ্বের জমি দুই টুকরাই ফুলের বাগান;—অবশ্য কোনও সৌন্দর্য্য নাই—গাধা ফুলের গাছ—মাকেরমাখে দুই একটা চন্দ্রবলিকা। এক কোণে একটা বড় শেফালী বৃক্ষ। বায়ান্নার উঠরাই দক্ষিণ দিকের ঘরটি পাচকের, উত্তর দিকের গৃহীতর ভিতর দিয়া ভিতরের বায়ান্নার বাইবার পথ।

বাটার পিছনেও প্রায় দুই তিন কাঠা জমি পড়িয়া আছে। সেইখানে দানী বাগন মাতিতেছিল। আমা-দিগকে দেখিয়া সে গাড়াইয়া উঠিল, অবগতিতা হইল, আমাদের দিকে পিছন করিয়া তাহার ভগবান দত্ত ক্যাক-কৈকে স্বরকে ধপা-দস্তব মোলায়েম করিয়া বলিল—বাবু বাবুনের তো দেখা নেই—কি জানি কোথা গেছে—তা বাবা খাওয়া-দাওয়ার কথা আমি জানি নি।

সনাতন তাহার ভগবান দত্ত স্বরকে কোন একর নম্রতা বা উগ্রতার আবরণ না দিয়া বলিল—হ্যাঁ দেখছি। তুমি সব ধোঁয়াড় কর। আর দেখ দর্প, তুমি বাবার থেকে চারটে কমলা লেবু, আর কিছু শাক লাগু, আর দেখ যদি পেঁপে পাও তো পেঁপে আর—

আমি বলিলাম—ধাক্কা, ধাক্কা।

সজীব জুড়টি করিল। আমি সামলাইয়া গেলাম। বাতবিকই তবর্ণ ঠাকুরাণীকে বাজারে না পাঠাইতে পারিলে অবশ্য আমাদের কার্য্য চলিতে পারে না। অপর সম্বর ধর্পকে এই সামান্য হতু্য তামিল করাইতে হইলে দলুই-নাম্নকে সবিশেষ বেগ পাইতে হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে দুইটা বাহিরের লোক দেখিয়া সে কেবল নিষেধ মনেই অনেকের মুগ্ধপাত করিতে-করিতে প্রস্থান করিল। কেবল গমিতে পাওয়া গেল, বলু ঠাকুরের মুগ্ধপাতের রায়টা—“বুঝপাড়া মিন্দে। মরে না, কে র'খে-বাড়ে তার ঠিক নেই। ম' বিটুলে বামন, উড়ে মিন্দে”।

বাহিরের ঘটক অর্পণবদ্ধ করিয়া সনাতন বসু-ঠাকুরের ঘরের দরজা খুলিল। চাবি তাহারই নিচুটে ছিল। ঘরের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে একখানা কালীঘাটের পট—জটায়ু পক্ষী রাবণের রথ গিলিতেছে; আর একখানা জীর্ণ মাছের উপর দুইখানা শতগ্রন্থি কড়া। শয্যা দেখিয়া মনে হইল, বসু-ঠাকুর রায়ে অত্যন্ত কিরুৎক্ষণ শয্যার শয়ন করিয়াছিল। একখণ্ড কড়া শয্যার কার্য করিত; অপর-খানি লেপ। শয্যার হাত-দুই দূরে প্রায় এক হাত গভীর গর্ত। মাত্র একখানি টালি তুলিয়া, গর্ত খনন করিয়া, চোর বাসন্তী বাহির করিয়া লইয়াছিল। সতীশ বহু পরিশ্রম সহকারে, অতি ধৈর্যের সহিত ঘেরের টালিগুলি পরীক্ষা করিতেছিল। মাটিগুলার উপর সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল। সোলগোবিন্দ বা আমি তাহার অত যত্ন পরীক্ষার বিশেষ মোহিত হই নাই। মোহিত হইতেছিল সনাতন। কিরুৎক্ষণ পরে সতীশ আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া একেলা পকেট-বহিত নোট করিতে লাগিল। কার্য শেষ করিয়া বলিল, “এবার আপনারা গর্তটা বুজাইতে পারেন,—দাসীরা আদিবার সময় হইয়াছে।” তাহার পর সে বারান্দার দাঁড়াইয়া গঁদা-ফুলের বাগান দেখিয়া হাসিতে লাগিল। গঁদা ফুলের ভাল পুঁতিয়া কিরুৎক্ষণ বড় ফুল পাওয়া বাইতে পারে, সে সবকে বকুতা দিয়া সে দেখিতে চাহিল, ছিন্নহস্তটি কোথায় পাওয়া গিয়াছিল। সনাতন বাটার বাহিরে প্রাচীরের ধারে একটা স্থান দেখাইল। সেখানে রক্তের দাগ ছিল না, কোনও টুকরা অস্থি ছিল না। সতীশ মাঠের উপর নানা প্রকার তদন্ত করিয়া উপরে তাহারে শয্যাগৃহে আসিল। আমরা নানা প্রকার কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। সে বারান্দায় পাথরাড়ি করিতে লাগিল।

(৩)

সমস্ত দিন সনাতন মনুটিকে সঙ্গে রাখিয়া, সন্ধ্যার সময় সতীশ যখন বলিল যে, সে রায়ে ভিলজনার শয়ন করিবে, তখন তাহার উপর আমার একটু ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাহার মত বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, তাহার সকল কার্যে একটা বাড়াবাড়ি। সেটুকু আমার আদৌ ভাল লাগিত না।

আমি তাহাকে বলিলাম,—রায়ে আর এই শীতে জ্বাড়ে কেন ভাই। আমার কাল হৃদ্যির আশোর বা হর করা বাবে।

সে বলিল,—তা হ'লে সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা মারি হ'বে।

আমি বলিলাম,—আজ্ঞা উদ্বেকটা একটু বোকাও; তা' হ'লেও একটু শান্তি হ'বে।

সে বলিল,—কথাটা গুহ্যতন, সে কথাটা নিরে রাখিলাম ঔপন্যাসিক ডব্লিউওয়াস্কি, “দোব ও দণ্ড” বইখানা নিখে কেনেছে। তুমি তো জান যে, বড়-বড় পানীরা তাদের পানের স্থান দেখবার জন্যে এক-একবার আসে। যদি বললাম বেঁচে থাকে, তা' হ'লে নিশ্চয় সে একবার দেখতে আসবে, চামিশ হাজার টাকা হারিয়ে তার মনিবেয়া কি কহুছে! অবশ্য রায়েই অদ্ভুতকারেই আসবে। আর যদি কাটা হাতটা বলারামের হয়, তা হ'লে তার হজাকারী অবশ্য একবার ঘটনাক্রমে দেখতে আসবে। বিশেষ যখন সে রসিকতা করে হাতটা বাড়ীর পানের মাঠে রেখে দিয়ে গেছে। লম্বী ভাই চল।

একটা হোল্ড-অপে দুইখানা বিলাতী কবল, দুইখানা কাপড়, এক বাসর চুকট, মোমবাতি, দিরাশাশাই প্রভৃতি ভর্তি করিয়া অদ্ভুতকারে গিরা বসু-ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দোঙ্গাই-ঘর উপরে নিজেদের শয্যা শয়ন করিল। অর্দ্ধরায়ে সতীশ ঘুম ভালাইয়া বলিল,—বীরে-বীরে উপরে হাও; যদি ওরা ঘুমার তো কোন কথা নাই। যদি ধোপে থাকে তো কোন ক্রমে ঘেম বাহিরের বারান্দায় না আসে। আমি উপরে না খাওয়া পর্যন্ত তুমি ওদের সব ত্যাগ কর না।

অগত্যা তাহাই করিলাম। তাহার সারাদিনের উৎকর্ষ ও পরিশ্রমের পর একেবারে অকাতরে নিদ্রা ঘাইতেছিল। সোলগোবিন্দের নাক ডাকিতেছিল, সনাতন যত্নকে লেপ গড়াইয়া কৃত্তকর্ণের মত পড়িয়া ছিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে সতীশ উপরে আসিয়া বীরে-বীরে আমার দক্ষ স্পর্শ করিল। অদ্ভুতকারে সুখ দেখিতে পাইলাম না। নিঃশব্দে উত্তরে নানিয়া গেলাম। কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া সে বাতি জালিল। সুখে চিত্তার লক্ষ্য নাই, চোখের কোণে জর উপর, লম্বাটের রেখার

উপেগের চিহ্ন নাই। নিশ্চয়ই সে কিছু একটা আবিষ্কার করিগাছে।

আমি তাহাকে বলিলাম,—বাগার কি ?

সে বলিল,—তবস্তের গভী খুব মজী হযে এসেছে।

আমি বলিলাম, “কিসে ?”

সে বলিল,—কারণ আছে,—কান আমরা ভোরে বাড়ী গাব। বতস্বন না ওয়া এসে উঠার, ততক্ষণ মটকা ঘেরে পড়ে থাকতে হবে। বুকেহ ?

আমি সম্মত হইলাম। উপরে একটু শয়ন হইল। সতীশ বাতি নিভাইয়া শুইল। কথা কহিতে নিষেধ করিল।

(৪)

প্রথমে কবাইখানার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কোনও সংবাদ দিতে পারিল না। তাহার পর অপর একটা কারখানার গেলাম। অনেক ক্লি যান করিতেছিল। তখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোর হইতে বারোটা অবধি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের আর ক্লুংল ছিল না। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। আমি কল-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। একটা ছোট ছেলে অপর একটা ছোকরার সহিত কলহ করিতেছিল। কলহের সামগ্রী একটা পীপার বাধন, লোহার হালের চাকা। উভয়েই সেইটার দাবী করিতেছে। আমি মধ্যস্থ হইয়া বলিলাম,—কোরা দ্বন্দ্ব ?

প্রথম ছোকরা খুব সগুণে চক্কিঃ বলিল,—দেখো না বাবু, হামারা চাকা—হামকে ঐ উস্‌তরফ দিয়া।” তাহার পর অপর ছোকরাকে ও তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলকে গালি দিল।

দ্বিতীয় ছোকরা গালি দিয়া আরম্ভ করিল; বলিল, “হামারা চাকা—” আবার গালি দিল। তখন প্রথম বালক চাকা ছাড়িয়া দ্বিতীয় বালকের পলা টিপিয়া ধরিল। সেও ছাড়িবার পাত্র নয়,—উঠাকে লড়াইয়া ধরিল। উভয়ে মনমুগ্ধ হইল—ভূমিতে গড়াগড়ি। কিন্তু এমন কারখানাওয়ারের স্বভাব—দুই শত ক্লির মধ্যে কাহারও এমন উৎসাহ ছিল না যে, আসিয়া সে কলহে মধ্যস্থ হয়। প্রত্যেকটা কলে-বাড়া নীরপ ইচ্ছা

বড়ের মত। তাহারা হামাহারের চেষ্টা করিতেছিল—আবার তিনটার সময় কার্য আরম্ভ হইবে। অগত্যা ভূমি হইতে আনাকেই বালক দুইটাকে টানিয়া তুলিতে হইল। আবার দুই হস্তে দুইটা বালক টান দাড়াইতেছিল। আমি একটু কটুকান দিয়া দুইটাকে থামাইলাম। চাকাটা লইয়া গুরুতর ফেলিয়া দিলাম। বালি হইতে দুইটা আমি বাহির করিয়া দুইটার মধ্যে দিয়া, একটাকে তাড়াইয়া দিলাম, আর অপরটাকে ধরিয়া রাখিলাম।

প্রথম বালকটা দূরে চলিয়া গেল। মধুর বাল্যকাল। অত স্বগড়া, অত বেগ, অত জোহ এক মুহূর্তে অপসারিত হইল। দূরে দিয়া ডাকিল,—আরে রহিম, বিড়ি নেহি পিওগে ? সিগারেট-উগারেট।

রহিম হাসিল বলিল, “আবেইহে।”

আমি বলিলাম,—আচ্ছা ছোড়া ; ইহেতো বাতঃ—বিন্দুকা হাত কাটু দিয়া থা ও কাছা হার ?

রহিম একটু চিন্তা করিল; বলিল,—হাত কাটু দিয়া এ কন্মে ? এবে কলসু—

দ্বিতীয় বালকটা নিচটে আসিল। রহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের কলহেব কাহারও হাত কাটিয়া দিয়াছিল কি না ? কলসু বলিল, “ও, হাঁ,—হাত দাব দিয়া থা ; এ কন্মে নেহি—হাড্ডি কলহে।”

হাড্ডি-কলটা কি পদার্থ, এবং কোথার অবস্থিত—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিলাম। তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইতে স্নান করিতে হইল। অবশ্য এ সাংঘর্ষের মত আরও দুই আনা পরমা খরচ হইল।

দলুইয়ের বাগার পার্শ্বেই বলিরাছি একটা প্রাঙ্গণ। তাহার অপর দিকেই খুব বড় কারখানা। ভাগাড় বহু মৃত জীব পড়ে, কবাইখানার বহু অস্থি ভয়ে, কলিকাতার অগ্নিতে-গলিতে পটাওয়ারা, মুসলমান কবাইয়েরা বহু হাড় বিক্রয় করে,—এ কারখানার সে সব হাড় চূর্ণ হয়। চূর্ণ হয় ক্ষেত্রের উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার মন্ত্র—কিন্তু আমাদের বিশাল ক্ষেত্রগুলার মন্ত্র নয়—রাগান, অষ্টেলিয়া, প্রোভান্সারের বীপমাশার যেত ও হরিত্রাবর্ণের ক্রিমীবিব হুবিধার মন্ত্র। আর কারখানার স্থলীরা আটআনা, দশ-আনা, বারআনা বোম পাখ বটে,—কিন্তু কলের ইংরাজ ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ারের বেতন বেশ ছুটপুট এবং মেয়াদের

মুনাফাও খুব অধিক। ঘোষ আদ্যদের, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পল্লিতে আর একটা করখানা আছে; সেখান নিহত কীংবর রক্ত ভরাট বীধান হয়। সে ভরাট-রক্তের চাকরগুলাও বিদেশের কমির উন্নয়ন সম্পাদন করিতে যায়।

যাহা হউক এ কলে সংবাদ পাইলাম, কিছু দিন পূর্বে একটা কুশির হাত কলে ঢালিয়া গিয়াছিল। মনিবকের উপর হইতে সেটি কাটায়া গিয়াছে। হির হত কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার হাড়গুলা কলের কাছে লাগে নাই, এ প্রকারেরই সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেল। কলের মেথর বলিল যে, সে কাটা হাতটা মাঠে ফেলিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ সংবাদ দিয়াও সতীশের নিকট বক্তব্য পাইলাম না। সে খুব বড় একটা বক্তৃতা করিয়া বলিল—“এখনি ক্যাথেনে যাও। হাত-কাটা কুশির কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে এস, তার হাতে আংটি ছিল কি না?”

কুড়ে অর্ধেক গণৎকার। আমি বলিলাম—সিঃসন্দেহ ছিল না।

“কেন?”

“কেন? কলের কুশির হাতে আংটি থাকে না। চরের নথর, হাড়-কলের মেথর এত উদার হবে না যে, কাটা হাতটা কলে মেথর সময় পোণার আংটিটা খুলে নেবে না, এবং তিন নথর—”

সতীশ বলিল—সন্ধান আংটি সনাক্ত করেছে। তবু একবার ধেনে আসতে দেখ কি?

“অগত্যা! তবে যাও, একটা সিগারেট দাও।” যে গতিতে বাদিকা প্রথম বস্ত্র-পূর্বে যায়, বাড়ীতে সতী-পুণ্ডার দিন বালক যে গতিতে বিভ্রাণে যায়, সেই গতিতে হাসপাতালের বিকে অগ্রসর হইলাম।

(৫)

দ্বিতীয় দিন দুইবের মধ্যে কেহই আসিল না। সতীশ তাহাদের চিত্রা একবারে ছাড়িয়া দিয়া, খরগোষ ও কাঠ-বিড়ালীর মধ্যে বি-কি প্রভেদ এবং শব্দক হইতে কাঠ-বিড়ালীর অভিব্যক্তি হইয়াছে, না কাঠ-বিড়ালী হইতে শব্দকের অভিব্যক্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে খুব মনোযোগের

সহিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিল। সন্ধ্যার একটু পরে আমি বলিলাম—কি যে? ভিলম্বলার কথা যে আর আলোচনা কর না, এর কারণ কি?

সে বলিল,—ও সব ঠিক আছে।

আমি বলিলাম,—কি ঠিক?

সে বলিল,—এটা সপ্রমাণ হয়েছে যে, বলরাম মরে নাই; বসিধ বসরামের নয়; আর আংটিটা—

“আংটিটা বলরামের।”

“হ্যাঁ ঠিক বলেছ। বলরামেরই বটে,—ওরা দুজনে সনাক্ত করেছে—ওটা ভুল ধারার নয়।”

“বিশেষ ধন কুশি নিরন্তরও সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। আমি আংটি তার হাতে লাগালাম, একবারে চল্‌চল্‌ করতে লাগল। অবশ্য সে একটু রোগা হ’য়ে গেছে।”

সতীশ বলিল—তা’হলে আবারা ঘোড়ার উপর এই পেশাব, টাকাতা চুরি হ’য়েছে রায়ে—চোর বেই হ’ক, নিরন্ত কুশির কাটা হাতটার বলরামের আংটি লাগিয়ে বাড়ীর পাশে ফেলে গেছে, বলরাম অদৃষ্ট।

আমি বলিলাম—যদি বলরাম নিয়ে থাকে, তা’হলে সে কাটা হাতটার নিয়ে আংটি লাগিয়ে চলে গেছে। তখন কেবেছিল যে, তার কাটা হাত পেয়ে লোকে মনে করবে যে, চোরের তাকে কেটে বাস্তু নিয়ে গেছে; কিংবা বাস্তু নিয়ে যাবার সময় তাকে চোরেরা মেরে গেছে।

সতীশ একটু চিন্তিত হইল; বলিল—তার বিবৃদ্ধ নথ একটা ভুল আছে। যার বাথার এতখানি বুদ্ধি, সে নিশ্চয় জানবে যে, এসব ব্যাপারে হুড়া-হুড়ি হবে। তার মনিবরা কিছু পোনে নি; হুতরাং সে কথাটা বিশ্বাস করবে না। আবার বিশ্বাস যে, যখন চুরি হ’য়েছে তখন বলরাম ঘরে ছিল না। চোর চুরি করার সময়—

“আংটি।”

সে বলিল—হয় ত আংটিটা আগে থেকে সরিয়েছিল—তা’হলে হাতটা আগে পেয়ে সনাক্ত বতলবটা করেছিল। কিংবা—

আমি বলিলাম—হয় ত বলরামের, আংটিটা খুলে দিয়েছিল, চোরের সেটা নিয়ে কাটা হাতে লাগিয়ে দিয়েছে।

সে বলিল—কাটা হাত পরে পাওয়া যায় নি, আগেই পাওয়া গেছে। আর আংটি লাগাবার বহু পূর্বে কাটা হাত

মাঠে পড়ে ছিল না—তা'হলে কুহুর-শেয়াল রাখত না।

কাটা হাতটা একটু কুলেও ছিল—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ; তা' না হলে আংটিটা লাগত না—

“পরে লাগান হয়েছিল, সে কথাও প্রথম বেথে আমার বিখাপ হ'রেছিল—”

“বটে।”

হরষা পুলিল। ছুইটা লোক প্রবেশ করিল। একজন সতীশের উড়ে পোহেনা। অপর লোকটি অপরিচিত।

অপরিচিতকে সোধখন করিয়া সতীশ বলিল—
“বলরাম!”

বলরাম কাঁপিতেছিল। সে সতীশের পদ স্পর্শ করিয়া বলিল—মু নিরপরাধ হুহুর! মু নিরপরাধ!

সতীশ বলিল—তোমার আংটি কোথা?

বলরাম নিম্নের দক্ষিণ হস্তের তর্জনির দিকে চাহিল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আমার সন্দেহ রহিল না যে, সে তখন প্রথম দেখিল যে, তাহার অঙ্গুরীয়ক হারাইয়াছে। সে পৈতায় ধূমিল, পাইল না। বিম্মিত হইয়া পুত-দৃষ্টিতে চাহিল।

বাম হইতে অঙ্গুরী বাহির করিয়া সতীশ তাহাকে দেখাইল। সে বলিল—হাঁ! হুহুর এই আঙ্গুটি। এ সব-পানাই যেন যার, তোমরাবী। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান হুহুর—হ্যাঁ প্রকৃৎ অপরনাথ! হা লগাটিক লিখন!

বেহারা আমিরা লংখার বিল—সমানতন বাবু এসেছেন।

(৫)

ভাড়াভাড়ি বলরাম ও গদা পোরেম্বাকে পার্শ্বের ককে সূক্ষ্মিত রাখিয়া আমার সমানতনকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন। বোধ হয় তাহার সম্বন্ধের ভক্ত সতীশ আর একটা ভক্তিত অলোক আমিরা বিল। দুই দিনে তাহার মুখের ভাব একবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু দুইটা বগিয়া গিয়াছিল কেটরে—অথচ কেটর হইতে বাহির হইবার ভক্ত বিধিযত চোঁট করিতেছিল। মাথার চুলের কোনও পরিচর্যা হয় নাই; মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

সতীশ তাহার মুখ-ভাব লক্ষ্য করিয়া একটু মুদ হাসিয়া বলিল—কেমন আছেন?

আজ তাহার কণ্ঠের আরও হুহুর এবং বিবম কক হইয়াছিল। সে বলিল—মহার আমারের হাঁট কি? ধনে-প্রাণে মারা গেলাম—খাব কি? পরব কি? হার! হার!

সতীশ বলিল—কেমন, নতন কিছু হ'য়েছে না কি?

সে বলিল—নতন আর কি হ'বে? ন-ত-ন—হ্যাঁ।
—না—নতন আর কি? টাকার বাজ্জটা একেবারে গেছে—একেবারে।

সতীশ বলিল—হঁ, একেবারে গেছে। আগে আশা ছিল?

সে এহার কামিল—বলিল—হ্যাঁ। মোটে আশা নেই? যেহাঁই বাবু! বলুন! আশা নাই? হার, হার! চোরের ওপর বাটপারি হ'ল। কেন তখন বাজার মারতে গিয়েছিলেম!

আমি বলিলাম—আশা আছে—আশা আছে।
অমৈধ্য—

সে বলিল—বাবু, পৈধ্য বে আর থাকে না!

সতীশ বলিল—বাস্তব টিক কত টাকা ছিল?

সে বলিল—১০০ টাকা কম চারিদ্বি হাজার।

সতীশ বলিল—বলরামের একটা উপপত্নী ছিল। সে রাজে বাড়ী থাকিত না—এ কথা আপনায় অংকিয়ার দোলপোবিন বাবু জানিতেন?

সে বলিল—অজ্ঞে?

সতীশ বলিল—সত্য কথা না বললে, টাকা বার করতে পারব না।

সে বলিল—বোধ হয় না।

সতীশ বলিল—হঁ। তবুনেহন, বলরাম বেঁচে আছে?

সে বলিল—হ্যাঁ—না, হ্যাঁ, বেটা বেঁচে আছে বই কি!

বেটা নেমহারায, বেইমান—উড়ে, সেই বেটারই কাজ—বেটা আলিরাং—ভোপে হবে না, বেটার ভোগে হবে না। আমিই ধরব। বেটা বোমাসুয় সঠিরেছে।

সতীশ বলিল—কোন্ চুরিটা সে করেছে?

সমানতন একটু বিম্মিত হইয়া বলিল—কোন্ চুরিটা কেমন?

সতীশ বলিল—যর থেকে চুরি, না গাঁধাপাছের তলা থেকে?

কথাটা ভাল বুঝিয়ায় না ; কিন্তু সনাতন বুলিল।
তাহার ফ্যেকের ঝুঁটি স্থির হইল, অফতৌর কাপিতে লাগিল ;
হাত কাপিতে লাগিল। শেষে সে বসিয়া পড়িল।

সতীশ বলিল—আপনারেয় মাত্রে হুঁশো টাকা নিরেছি
—তার কাল করছি কি ?

লোকটা সতীশের পা ধরিয়া কাদিতে লাগিল। অতি
কাতরকণ্ঠে বলিল—বাঁচান্ বাবু, বাঁচান্—ধনে-প্রাণে
মারবেন না।

(৩)

সতীশ বলিল—সেখ নরেশ, আমি তোমাকে বরাবর
বলেছি যে, জাতিভেদে সর্বত্র বিস্তারিত—চোর-ভুয়াচোর
অপরাধীদের মধ্যেও। যে গাড়ি মারে, সে পকেট মারে না ;
যে পকেট মারে, সে সিঁধ কাটে না। ভুয়াচোর চোরকে হুণা
করে; চোর কোকেন-বিস্ফোতকে বলে, ছোট কাণ্ডের
কাজী। আমার প্রবণ হইতে মনে হইল—সনাতন টাকা
লুকাইয়া আত্মসাৎ করিবার অপরাধের সংস্কার লইয়া
অস্বিগাছে। যদি উহার জীবনের ইতিহাস আলোচনা
কর, দেখিবে, শৈশবে ও বাতাবর ভাতার হইতে সন্দেহ চুরি
করিয়াই ঘাইত না—অথো তাহা কোথাও লুকাইয়া
গ্ৰাথিত, পরে ভোজন করিত।”

সনাতন বলিল—হুজুর অগ্রযাত্রী। ঠিক বলেছেন।

সতীশ বলিতে লাগিল—তাহার পর কতকগুলো কথা
মনে কর—বাগার নারিবার পরম্পর সনাতনের, নিম্নের বয়ে
টাকা পুঁতিবার ব্যবস্থা ইহার—চুরিটা প্রথম ধরিল সে—
হাতটা প্রথম দেখিল সে। এই হাতের বিষয়ে ছুটা কথা
বদিয়া রাবি। দেখ, হাতটা সারায়ত মাঠে থাকিলে, ফুজুর-
পুগাল ছাড়িতে না, আর আংটি পূর্বের হইলে তাহার চারি-
দিক স্থগিত ; আংটি হুলায় মধ্যে বসিয়া থাকিত। এ
ক্ষেত্রে কিন্তু আংটিটি আমার পুঁতিতেও সক্ষম হইয়াছিল।
তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, আংটি পরে শবের হস্তে
পড়ান হইয়াছিল। বেশ কথা। করিল কে ? হয় বসু-ঠাকুর,
না হয় সনাতন। বসু-ঠাকুর টাকার সন্ধান জানিত, না সনাতন
জানিত ? কিন্তু আমার সন্দেহ দূর হইল সরমসিনে গুহারক
করিয়া। অপর যেখানে অস্ত্রের মত চলে, আমাদের সেখানে
চকু যেগিয়া ঢলা উঠিত। ভূমি লক্ষ্য করছিলে কি না

জানি না,—আমার প্রবণেই মনে খটকা লাগিয়াছিল যে,
গাধার অঙ্গলে ছুটা গাছের পাতা নিরুপু, ভাণ্ডলা
লভানো।

সনাতন বলিল—হুজুর অগ্রযাত্রী। আমি যিনের
বেলা মেখেই বুকেছিলাম। হাঃ ভগবন্ ! শেষে বলা বেটা
ঠকালে ?

সতীশ বলিল—আমার তখনই সন্ধান বহুসুল হইল।
আজকাল শিশিরের দিনে অত বড়-বড় ছুইটা গাধা ফুলের
গাছ অবনত-মস্তক হইতে পারে, তুলিয়া পুনরায় রোপণ
করিলে। নিশ্চয় ভোর রায়ে কেহ তাহাদিগকে উৎপাটন
করিয়া আবার পুনরায় রোপণ করিরাছে। কে এমন
কাল করিতে পারে ? বসু-ঠাকুর পলাইয়াছে—সে নিশ্চয়
টাকা পুঁতিয়া পলাইবে না—কাজেই প্রায়শাশ্রের মতে—
কেহ সে স্থানে টাকা পুঁতিয়াছে—হয় মোল, নয় সোণা।
দলু গাধা, সোণা চাপাক, বিশেষ উপরে যে সকল কারণ
বলিয়াছি, সেগুলো আমার মনের মধ্যে গুহম্বাইতেছিল।
আমি সিদ্ধান্ত করিলাম—সনাতন টাকার বাল্ল ঐ স্থানে
পুঁতিয়া রাখিয়াছে। কোনও একটা ধারণা দিয়া সে ব্রাহ্মণকে
সেপছাড়া করিরাছে।

সনাতন বলিল—আজ্ঞে ? হুজুর সাক্ষাৎ ঐহরি !
অগ্রযাত্রী। কিন্তু বেটা আগে থেকে দেখেছিল। ওই রায়ে
বাল্লটা ফুলে নিরে গেছে।

সতীশ বলিল—“তোমার মরণ থাকিতে পারে, সে দিন
রায়ে সনাতনকে কাছছাড়া করিলাম না। রায়ে তাহা-
দের বাড়ীতে শয়ন করিলাম। তোমাকে উপরে পাঠাইয়া
গাধার তলা পুঁতিলাম ; বাধা জাবিয়াছিলাম ওই—বাল্ল
সম্বন্ধে বিস্ময়জনক !”

সনাতন উদ্ভ্রান্ত হত লাকাইতে লাগিল। হুজুরা-
কিরিরা নাচিতে লাগিল। এক হাত কোমরে দিয়া অপর হাত
মাথার দিয়া নাচিল। মাঝে-মাঝে সতীশের পদধূলি গ্রহণ
করিল। উদ্ভ্রান্তের মত বলিল—সন্ধ্যার পর নিরিবিদি দেখে,
বাল্লটা বার করত গিরে দেখলাম, বাল্লটা নাই। ডেবে-
ছিলাম, বলা বেটা চোর ; এখন দেখছি হুজুর চোর—
অর্থাৎ—”

সতীশ বলিল—চোপ ! অর্ধ-পিশাচ, তক্ষর ! টাকার
বাল্ল পুঁতিবার হাতে ; ভূমিও পুঁতিবার হাতে বাবে।

সে আবার কাদিল। তাহার পা ধরিয়া বলিল—
দোহাই হজুরের—

সতীশ বলিল—চুপ করে বল।

সে চুই হাত নাখায় দিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিল।

সতীশ বলিল—তাহার পর বলরাম ঠাকুর ইহার ভিতর
আছে কি না, এবং হাতের রহগাটা জানিবার জন্য, তোমাকে
কল-কারখানাগুলোয় পাঠাইয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস
হইয়াছিল, হাতখানা কোন অভাগা কুলির। সনাতন,
ভূমি হাতটা কখন পেয়েছিলে ?

“অঁজে, সন্ধ্যার সময়।”

“আর আটটা ?”

“তার পর। কদিন পরেই নানা রকম কন্দি ডাক-
ছিলাম। হঠাৎ হুঁটো জিনিস পেরে কাঁদটা করে
ফেললাম।”

সতীশ বলিল—সন্ধ্যের আরও একটা বিশেষ কারণ
বলতে ভুলে যেছি। প্রথম দিন আমাদের দেখাবার সময়
মোলগোবিন্দ হাতটা স্পর্শ করে নাই; কিন্তু হিন্দু-সন্তান
অথচ ডাক্তার নহ—সনাতন বৈরাগ্য ভাবে পিশাচের মত
হাতটা ভুলিয়া আমাদের নিকট হইল, তাহাতে আমি
বিস্মিত হইয়াছিলাম। পিশাচ !

আমি বলিলাম—বলরামের সন্ধান পেলে কোথা ?

সে বলিল—বলরাম লুকাইয়া আছে, জানিলাম। স্বপ্না
শোয়েন্ডাকে দাসীর কাছে পাঠাইয়া তাহার উপপত্নীর
সন্ধান পাইয়াছিলাম। শেষে তাহাকে ভোক-বাক্য দিয়া,
অনেক লগন করিয়া স্বপ্না আনিয়াছিল। কি প্রকারে
সনাতন গুড়াইয়াছিল—

সনাতন বলিল—অঁজে, বলছি।

সতীশ বলিল—মরাধন, তোমার মুখে শুনেও চাই না।

সে ইঙ্গিত করিল। আমি বলরামকে লইয়া আসিলাম।

সনাতন একেবারে বিস্মিত হইয়া পেল।

সনাতন জানিত যে, বলরাম রাত্রি চারিটার সময় গৃহে

আসে। সে রাজে সে অপেক্ষা করিয়াছিল। বলরাম গৃহে
ফিরিবাখাত সে তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, রাজে তাহার কক্ষ
হইতে তাহাদের বহুশ্রী হইল ও অলসারাদি চুরি হইয়া
গিয়াছে। সে তাহাকে সন্বেহ করে না। কিন্তু মোগল-
গোবিন্দ পুলিশ ডাকিতে গিয়াছে। বলরাম পলাইয়া দেশে
যাক। ডামাডোলে মিটিলে আসিবে। সে মোগল গোবিন্দর
কোণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই
বলরাম পলাইয়াছিল।

টিকু এই সময় মোগলগোবিন্দ আসিয়া পৌছিল। সে
বলরামকে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সতীশ বলিল—আপনাদের মাঝলয় তদন্ত শেষ
হইয়েছে। বলরাম নির্দোষ। এই দিন টাকার বাস্তু।

সে আমাদের লোহার সিঁদুক হইতে বাহির করিয়া
কাঁদোনাখা বাস্তুটা দিল। সে সময় দলুইয়ের বৈরাগ্য
মুখের ও মনের ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা
অসুস্থান করা সহজ।

তাঁহার সতীশের কথা মত টাকা গণিয়া গেল। সনাতন
হাজার টাকা বাহির করিয়া আমাদের পুরস্কার দিল।

মোলগোবিন্দ বলিল—অঁজে, চোর ?

সতীশ বলিল—সনাতন বাস্তুক জিজ্ঞাসা করবেন।

আর সেতুন, বাজার মারবেন না। বান্।

তাঁহার চলিয়া গেলে সতীশ বলিল—এদের কাছে
টাকা আছে, এ কথাটা বাজারের লোকদের জানাতে
পারলে, এতক-বিস্তার কাজ হয়। কিন্তু আমাদের কর্তব্য
নয় লোকের কতি করা। সনাতন একটা বিখ্যাত জবাব
দেবে এখন—হয় ত বাজার মারবে না।

আমি বলিলাম—সে বিধে আমাদের বিশেষ সন্বেহ
আছে।

“হ্যাঁ, টিকুই বলেছে। আমরা অর্থের দাস। আমাদের
এ ক্ষেত্রে দু'হুড়ি সাতের খেলা ভিন্ন আর অন্য কি খেলা
ছিল ?”

[অষ্টাঙ্গিক ত্রিভঙ্গিকান্তি বন্দী এম্-এ, এফ্-সি-এস্ (লন্ডন)]

আমাদিগকে প্রথমেই স্বাক্ষর করিয়া লইতে হইবে যে, ভগবান শ্রীশোক ও পুরুষের কণ্ঠের পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন—ভগবতের বহির্জীবন পুরুষের ও অন্তর্জীবন শ্রীশোকের। ইহাও সত্য যে, আমাদের সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে শ্রীশোকেরা আত্মহমানকাল হইতে এক্রপ নিপুণতার সহিত সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহাদের পক্ষেও শিক্ষা যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু অধিক শিক্ষার অভাব সবেও তাঁহারা যে এক্রপ নিপুণতার সহিত সংসার চালাইয়া আসিতেছেন, বাহ্যতে তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা আমাদের মনে হয় না, সেটি তাঁহাদেরই কাব্যকুশলতার পরিচায়ক, আমাদের বুদ্ধ এবং চিন্তা-শক্তির পরিচায়ক নহে। কোন বিষয়ের আলোচনার পূর্বে, সে বিষয়টির ভিতর কি-কি কথা আছে, প্রথমেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, যদি আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনেক সময়ে বৃথা ভর্তু হইতে বাঁচিয়া যাঁতে পারি।

শিক্ষা শব্দের এক্ষত অর্থ কি? শিক্ষার অর্থ কি কেবল চলিত-ভাষার আদর বাহ্যকে লেখা-পড়া শিক্ষা বলি, তাহাই,—না আরও কিছু? কতকগুলি বিশেষ কারণে আমরকাল শিক্ষার অর্থ—বাহ্যকে লেখা-পড়া শিক্ষা বলে, প্রযোজন্য: তাহাই গাড়াইয়াছে; কিন্তু শিক্ষার অর্থ তাহা আপেক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত। সম্পূর্ণভাবে জীবন ব্যাপন করিতে হইলে, তাহা পুরুষেরই হটক বা শ্রীশোকেরই হটক, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের জীবন অনেক-গুলি অনেক-রকমের কর্তব্য কার্যের সমাবেশ,—ইংরাজিতে বাহ্যকে বলে harmonious combination of manifold duties। এই কর্তব্য কাজগুলির মধ্যে কতকগুলি দেশ ও সমাজ-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি পরিবার-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি নিজের সম্বন্ধীয়; এবং উহারা পরস্পর এক্রপভাবে জড়িত যে, একটী স্বকীয় অথবা ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে গড়িতে

হইলে, তাহাদের মধ্যে কোনটিকে বাধ দিলে চলিবে না। সুতরাং, এই সমস্ত কর্তব্য কালের মধ্যে বাহ্যতে তাঁহাদের কোনটির অভাব না হয়, অথবা তাহাদের কোনটির মধ্যে অসম্পূর্ণতা না আসে, সে এক্রপ প্রত্যেকটির উপর ভাল করিয়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং যদি কোনটির মধ্যে অভাব অথবা অসম্পূর্ণতা ঘটিয়া যায়, তবে তাহা তৎপরযোগী শিক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং, ছোট হটক, আড়, বড় হটক, সব বিষয়েরই বালাকাল হইতে অন্তর্বিস্তার শিক্ষার প্রয়োজন, বাহ্যতে সে সমস্ত বিষয়ে কোনরূপ অভাব অথবা অসম্পূর্ণতা না থাকিয়া যায়। তবে এটি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সব শিক্ষা এক ধরণের নহে—কতক-গুলি এক্রপ সহজভাবে আপনা-আপনি হয় যে, তাহাতে কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা হইতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি না—বাহ্যকে আমরা ইংরাজীতে spontaneous unconscious education বলিয়া থাকি; এবং কতক-গুলি অধিক সময় ও প্রয়-সাপেক্ষ। শিক্ষার স্বরূপ ও বিভাগ সম্বন্ধে বাহা বলা হইল, তাহাতে, যোধ হয়, কাহারও কোন আগন্তি হইবে না। এক্ষণে দেখা যাউক, বালিকাদিগের শিক্ষার প্রণালী নির্ণয় সম্বন্ধে ঐ তথ্যগুলি কি পরিমাণে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে প্রত্যেকের জীবন তাহার অবস্থার অধীন হওয়া উচিত; অর্থাৎ যে বালিকা দরিদ্রের ঘরে পড়িয়াছে, তাহার জীবন ঠিক রাজকীয় জীবনের বদল হইতে পারে না; তাহাকে এমন অনেকগুলি কর্তব্যের অভ্যাস রাখিতে হইবে, বাহা রাজ-রায়ের অভ্যাস না রাখিলেও চলিতে পারে। এইরূপ মহাবিশ্ব অবস্থার গৃহস্থীয় জীবনের একদিকে দরিদ্রের গৃহস্থী ও অন্তর্বিধিক পূব বড়বরের গৃহস্থী,—উভয়েরই জীবন হইতে কিয়ৎপরিমাণে পার্থক্য আছে। ওবাশি, যে অবস্থাই শ্রীশোক হউন না কেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষে এমন কতকগুলি অবশ্য কর্তব্য অংগ দেখিতে পাই, বাহা

ঔপদেশের সকলের মধ্যেই এক। চলিত ভাষায় আমরা বাহ্যিক গৃহস্থির পক্ষে সংসার বলিয়া থাকি, অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের ভিতরের ব্যবস্থা,—ভাগ্য সম্পূর্ণতার ত্রীলোকের হাতে; হৃতরাং, সংসারের সেই কর্তব্যগুলি, যাঁহার লক্ষ্য ত্রীলোকেরা সর্বপ্রধানতঃ দায়ী, এবং বাহ্যিক নগিলে কোন সংসারই হুমুখ্যায় চলিতে পারে না, সেইগুলি বাস্তবিকভাবে সকলের আগে দেখা প্রয়োজন। বাহ্যিক আমরা গৃহস্থানীর কাজ বলিয়া থাকি—অর্থাৎ সর্বতোভাবে গৃহটিকে ছাড়িয়াচোঁবে চালান—গৃহটিকে পরিচালনা রাখা, রক্ষণ, গুরুজনদিগের সেবা, সন্তান-প্রতিপালন এবং তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে পড়িয়া তুলনা। দাস-দাসীদিগকে উপযুক্তভাবে কার্যে নিযুক্ত রাখা ও বস্ত্র করা—এই শিক্ষা প্রত্যেক বাস্তবিকই সর্বপ্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু এইটাই হৃদয়ের বিষয় যে, এই শিক্ষা বেতন সর্বপ্রথমে প্রয়োজনীয় ও সদয়-ধারণক, প্রত্যেক বাস্তবিকই নিম্ন-নিম্ন পিতৃ-ভবনে ও পরে বৃত্তান্তের ইহা আন্তঃ-আন্তঃ শিখিয়া থাকে। প্রত্যেকের নিজের সংসারই এই সম্বন্ধে প্রকৃত বিভ্রান্ত। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কাহারও সহিত মতবৈধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন হইতেই মতবৈধের বস্তু সম্ভাবনা। এক পক্ষ বলিয়া থাকেন যে, উপরিউক্ত গৃহস্থানীর কার্যই ত্রীলোকের সম্পূর্ণ জীবন, ইহা অপেক্ষা তাহাদের আর কিছুই প্রয়োজনীয় নহে; হৃতরাং, তাহাদের লেখা-পড়া শিক্ষার প্রয়োজন কি? লেখা-পড়া শিখিয়া তাহাদের অপরকার ভিত্তি উপকার হয় না। অপর পক্ষ বলেন যে, উপরিউক্ত সাময়িক কার্য শিক্ষার সহিত লেখা পড়া শিক্ষা ও বৃত্ত প্রয়োজন; এবং যে বস্তু অধিক শিখিতে পারে, তাহার পক্ষে উভয় ভাল। এখন এই উভয় মতের মধ্যে সত্য কোন দিকে ও কতখানি, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করা আবশ্যিক। যে সাময়িক কার্যগুলি ত্রীলোকের প্রধান কর্তব্য বলিয়া উভয় পক্ষই মানিয়া লইয়াছেন, এক্ষণে দেখা বাটক যে, কিছু লেখা-পড়া জানা থাকিলে তাহার সাহায্য হয়, কি অহুবিধা হয়। অথবা ব্যয় না হইয়া উপযুক্ত ব্যয়ে বাহ্যিক সংসার চলে, ইহার লক্ষ্য পদে-পদে হিচাব আবশ্যিক;—কি দরে কত ভিনিষ আদি, তাহা ঠিক পরিমাণে আশিয়াছে কি না, প্রত্যাহ কি পরিমাণে খরচ হওয়া উচিত, ইত্যাদি তাহারই হিসাব, ধোঁপার হিচাব,

গৃহের চিহ্ন, দাস-দাসীর বেতনের হিচাব—এগুলি সংসারের প্রাত্যহিক ব্যাপার; অন্ততঃ এগুলি প্রত্যেক গৃহস্থির জাতিয়া রাখা উচিত। প্রথম শ্রীলোকের হস্ত ত বসিবেন যে, এই কাজগুলি গৃহকর্তার করা উচিত। কিন্তু সারা দিন অক্ষিপে অথবা অন্তরূপে খাটিয়া এইগুলি গৃহকর্তার হুচাক-রূপে করা সম্ভব কি না, তাহা সকলেরই বিবেচ্য। অবশ্য এ কথা সত্য যে, যেখানে গৃহিণী এ বিষয়ে অশিক্ষিত, সেখানে স্বামী বেচারার এই কাজগুলি না করিয়া উপায় নাই। পক্ষান্তরে, ইহাও সত্য যে, গৃহিণী এ বিষয়ে শিক্ষিত হইলে, স্বামী বেচারার এ বিষয়ে অনেক কথাটি বাচিয়া যায়; এবং তিনি তাহার বাহিরের কার্যগুলি, বাহ্যিক অর্থোপার্জন ও সংসার-যাত্রা নির্বাহের উপায়, সে দিকে অনেক অধিক মন দিতে পারেন এবং হুচাক ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। তাহার পর, গুরুজনদিগের সেবার মধ্যে তাহাদিগের হইয়া পড়াদি সেবা, বাহ্যিক যত্নসহিত ইত্যাদি পড়িয়া শুভান—ইহাও কম সেবা নহে। স্বামীর নিকট সংগ্রহ পাঠ উভয়ের উন্নতির একটা প্রকৃষ্ট উপায়; এবং ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইতে পারে যে, যাতার কিছু লেখা-পড়া জানা থাকিলে, ছেলেরদের লেখা পড়া শিখা বস্তু সহজে হয়, আর কিছুতে বেতন হয় না। হৃতরাং নিত্য সঙ্গী দাস-দাসীক হুবিধাভ্রম চণবার ভিতর দিয়া বেবিলেও, অমরা অতি সহজে বুদ্ধিতে পারি যে, যেদের লেখা-পড়া শিক্ষা সাময়িক হুবিধা ছাড়া অহুবিধার কারণ নহে।

আর একটু উচ্চ ভাবে যেখান কথাটি আরও পরিচাল্য হইবে। পুরুষের পক্ষে লেখা-পড়া শিক্ষার আবশ্যিকতা কি? না হয় স্বীকার করিলাম, প্রথমতঃ অর্থোপার্জন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহের লক্ষ্য; কিন্তু উহা অপেক্ষাও একটা উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে—মানসিক ও নৈতিক উন্নতি। এই মানসিক ও নৈতিক উন্নতি পুরুষের পক্ষে বেতন প্রয়োজন, ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ। আমাদের শাস্ত্রের মতও তাহারই,—কেন না, ত্রী প্রতি বিষয়ে স্বামীর সহধর্মিণী। অথবা অর্থাৎ পুরুষেরা উন্নতি, কিন্তু ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান অবস্থার কেলিয়া রাখিব,—ইহা নিত্য শ্রীলোকের কথা! এবং একজন অবস্থার অর্থাৎ একজন উচ্চশিক্ষিত এবং অন্তরূপ নিত্য অশিক্ষিত হইলে, উভয়ের প্রকৃত মনের মিলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলা নিশ্চয়োজন; কেননা,

অনেকেই নিজের সংসারে এ বিষয়ে ভুলভোগি আছেন। তবে এ বিষয়ে আমি আমাদের ত্রীলোকবিগকে আহ্বাণে সোণী করি না; তাহাদের মতন শত্রু, বাধা স্ত্রী-স্বাভি পৃথিবীর আর কোনও স্থানে আছে কি না জানি না; তাহাদের অজ্ঞতার দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ দারী অবস্থা,—তথু আলত বশতঃ অবস্থা এ বিষয়ে অধো চেষ্টিত হই না।

ত্রীলোকের জ্ঞানার্জন এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি আরও একটা কারণে বিশেষ প্রয়োজন,—তাহার আভাব পূর্বেই বিদ্যাহি। সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়েরই সোণ ও গুণের অংশ লইয়া ভ্রমগ্রহণ করে। সে এক বেড় বৎসর পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে মাতার হৃদয়ে বসিত হয় এবং যে বয়সে তাহার মানসিক বৃত্তির তিক্তি ক্রমে নিহিত হয়, এবং যে সময়ের কল লইয়া ভবিষ্যতে সে ভাল অথবা মন্দ গাঁড়ায়, অর্থাৎ ভ্রম হইতে ৭৮ বৎসর পর্যন্ত সেই কোমল বয়সের শিক্ষার তার মাতার উপর সম্পূর্ণ ভাবে তত্ত্ব থাকে। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে, মাতার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর মাতার প্রভাব কতদূর। এই ভ্রমই ইংরেজিতে একটা কথা আছে—“The future of a nation depends upon its mothers.” “যে কোন জাতির ভবিষ্যৎ সেই জাতির মাতৃকুলের উপর নির্ভর করে”; কেন না, মাতা যেরূপ শিখান, সন্তান সেইরূপ গাঁড়ায়। ইহা সবেও যদি আমরা মাতার জীবনের মূলভিত্তি পরূপ স্ত্রী-স্বাভিকে শুধু রক্ষণ এবং বাসন-মালার প্রধান উপায় মনে করিয়া মুখ রাখিতে চাই, তাহা হইলে একটা গল্প যেরূপ গুলিয়াছি যে একজন লোক গাছের যে ডালে বসিয়াছিল, সেই ডালই কাটিতেছিল, সেই গল্প আমার মনে পড়ে।

তবে এখন কথাটি এরূপ গাঁড়ায় যে, এই বিষয়টি যদি আমরা এত সহজে এরূপে নীমাংসা করিতে পারি, তবে প্রথম পক্ষ—গাঁহার এখন পর্যন্ত দেশের লোকের অধিকাংশ—গাঁহার ইহার এত প্রতিভুলে কেন? ইহার উত্তরও তত কঠিন নহে;—প্রকৃত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব! প্রথম পক্ষ—গাঁহার স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী বলিয়া নিজের পরিচিত করেন—গাঁহার মনে বিশ্বাস যে, এসেছে স্ত্রী-শিক্ষা পূর্বে কখনও ছিল না, ইহা ইংরেজ রাজত্বের সহিত এসেছে নূতন আমবানী হইয়াছে; এবং যখন এতদিন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও দেশ চলিয়াছে, তাহা হইলে এখনই বা

চলিবে না কেন? গাঁহারের এ বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। যখন আমাদের প্রাচীন হিন্দু জাতির সর্বাঙ্গের উন্নত অবস্থা ছিল, তখন পুরুষের শিক্ষার অপেক্ষা স্ত্রী-শিক্ষার আদর কম ছিল না,—ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গাঁহার সাংসারিক কার্যের পর মাতারই ত্রীলোকবিগকে একত্র করিয়া গাঁহারের সহিত শাস্ত্র-মালোচনা করিতেন। এমন কি, গাঁহার-মহিলারের মধ্যে কেহ-কেহ বনের ময়ও গির্জায় বিদ্যাজ্ঞান, এরূপ প্রমাণ আছে। গাঁহার, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষ মূনির ভ্রম—এই সবই আখ্যান হইতে তাহা সম্পূর্ণ এতীত হইবে।

পরে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে সময় হইতে হিন্দুদের ক্রমে পতনাবস্থা আরম্ভ হয়, তাহার কিছু পূর্বে হইতে ত্রীলোকবিগের বেমাখার ক্রমে বৃদ্ধ হয়। তথাপি শত্রুগাঁহারের সময় পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার কিছু আদর ছিল, তাহা গাঁহার উত্তর ভারতীয় সহিত বিচার হইতে বুঝা যাইবে। শত্রুগাঁহারের সর্বাঙ্গের বিচার প্রকাশের সহিত নহে, ত্রীলোকের সহিত। গণিত-শাস্ত্রে গাঁহারী নাম সকলের নিকট সুপরিচিত।

আর একটা জ্ঞান সহজ কথা হইতে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার কিছু আদর ছিল, সহজে বুঝা যাইবে। বিজ্ঞান বিনি অধিকাংশী, তিনি বেমাখা নহেন, বেমাখা—পুণ্ড্র-সহজতী। যদি প্রাচীন ভারত স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিষয়ে কোন সোণীর নাম থাকিত না, বেমাখারই নাম থাকিত। যদি আমাদের আর কোনও প্রমাণ না থাকিত, তথাপি শুধু এই প্রমাণটুকু হইতে আমরা প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার আদর বুঝিতে পারিতাম। সুতরাং, এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, স্ত্রীশিক্ষা এখনকার নূতন আমবানী নহে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছিল। মূলমানবদের ভারতবর্ষে বিস্তারের পর অনেক পুরাতন জাতি জিনিসের সহিত ইহাও চাপা পড়িয়াছিল এবং কালের ও অবস্থার পরিবর্তনের সহিত ইহার পুনরুজ্জীবনের সময় হইয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, ইংরেজ-জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের অনেক পুরাতন জিনিস পুনরায় নূতন করিয়া চিনিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। এটিও তাহাদের মধ্যে একটা। তবে আমাদের পুরাতন-জাতির সহিত

একমত হইয়া আমি এটুকু মনি যে, বালিকাদের লেখা-পড়া শিখানটা বেশী দরপেই হওয়া উচিত। ইংরেজি ভাষাতে জ্ঞান বাড়াইবার বেকর অসীম উপায় আছে, তাহাতে, নিম্নের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভের পর যদি কাহারও ইংরেজি শিখিয়া সেই জ্ঞান বাড়াইবার সময় ও সুবিধা থাকে, তিনি শিপুন; তাহা ভাল ছাড়া মন নহে। তবে সকলের আগে নিম্নের মাতৃভাষা ও সেই সাহিত্যের জ্ঞান আবশ্যক। দ্রী-শিক্ষার বিরোধীরা আর একটি আপত্তি করিয়া থাকেন যে, লেখাপড়া শেখানতে দ্রীলোকেরা সাংসারিক কার্যে অপটু হয়, তাহাদের অহঙ্কার মনে এবং গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকে না। একথাই মূল যে একেবারে কোনও ভিত্তি নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে যে স্থলে এরূপ ঘটনা থাকে, সেখানে এইটুকু বলা বাইতে পারে যে, যে শিক্ষার এরূপ ফল, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে।

বাঁহা উপর সংসারের ভার, তাঁহার পক্ষে সাংসারিক কাজ ও লেখাপড়া এই দুইটির মধ্যে আগে সাংসারিক কাজ। সাংসারিক কাজ গারিয়া সময় থাকিলে গ্রন্থপাঠের অল্প সময় যায়—এই শিক্ষা বালিকাকে অথবা গৃহিণীকে যেওরা থাকিলে, গৃহিণী সাংসারিক কাজে অবহেলা করিয়া গ্রন্থপাঠে সময় কাটাইতে পারেন না। আর একটা কথা—প্রকৃত জ্ঞান কখনও বাহুবলকে অহঙ্কারী অথবা অবিদিত করে না। কেন না তিনি বাহা জানেন, তাহার তুলনার তাঁহার অজ্ঞাত কত ভিন্নই পড়িয়া আছে, সেটী সর্বদা তাঁহার মনে আগরক থাকে। ইংরেজিতে কথা আছে যে, সর্কেটস্ সর্কাপেকা জ্ঞানী ছিলেন; কেন না, তিনি তাঁহার জ্ঞানের সীমা জানিতেন। এগিছ জ্ঞানী নিউটন বলিয়া সিদ্ধাছেন যে, শুধু জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপল-খণ্ড সংগ্রহ করিতেই তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে,—জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিবার তাঁহার আর সময় হয় নাই। কিন্তু বাহা জানের জানমাত্র অথচ প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহাই বাহুবলকে গর্জিত এবং অহঙ্কারী করে—ইহা

সর্বত্রই বিদিত। ইংরেজিতে আছে, Little learning is a dangerous thing অর্থাৎ অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সংস্কৃতে আছে—‘অগাধ জলসকালী বিকারী ন চ যোহিত, গমুখ জলনাভেণ শক্যী কক-রাগতে।’ সুতরাং অল্পবিদ্যা-জনিত অহঙ্কারের ঔষধ, বিদ্যাদান না করা অথবা বিদ্যা-লাভের অধিকার কাড়িয়া লওয়া নহে;—অধিক বিদ্যা ও শিক্ষা যারা যম বিভ্রাণকে আরও গভীর করা ও প্রকৃত জ্ঞানের বস্ত্রণ বুঝান। যে সময়ে মন কোমল থাকে, সেই সময়েই শিক্ষার ভিত্তি আরম্ভ হওয়া উচিত। তবে আমাদের যে সমস্ত সাংসারিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে বালিকা বয়সে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সাধারণতঃ অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ অ-বাহার বালিকার মন যে দীর্ঘ ও জ্ঞান যে অগভীর থাকিবে, তাহা আশ্চর্য কি? কিন্তু তাহা বলিয়া যে শিক্ষাইকু তাহার বালিকা বয়সে পায়, সেটুকুও বন্ধ করা উচিত, অথবা, যে শিক্ষাইকু সে পাইয়াছে, তাহা বস্ত্র-মাতৃভি ও স্বামীর নিকট হইতে বাড়াইয়া লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করা উচিত,—এ দুটি রাস্তার মধ্যে কোনটী প্রশস্ততর তাহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই নিম্নের মনে বুদ্ধিতে পারিবেন; সুতরাং আমার অধিক বলা নিশ্চয়জন।

বালিকাদের শিক্ষার আবশ্যকতা লোকের গর্ভের বাড়িতে স্বীকার করিলেও শেষে এই কথা বলেন :‘বে, শিক্ষা ঘরে দিলেই চলিতে পারে, তাহার অল্প মূল ইত্যাদি প্রয়োজন কি? সেটী শুধু মূর্থের কথা মাত্র; কেন না এতোক নিম্নের ঘরের অবস্থা হইতে জানেন যে, সাংসারিক কার্যের পরে বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার অল্প কিছু সময় দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দুই-তিনটি অল্পবয়স্ক সন্তানকে করে নিরবদত শিক্ষা যেওরা সাংসারিক কার্যের পর কিরূপ দুঃস্থ ও অসুখা ব্যাপার হইয়া পীড়ার, তাহা বাঁহারা এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাও জানেন।

বলাইএর কাণ্ড

[ত্রিগিরীক্ৰমান্থ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্]

(১)

হামি ২টা বাজিয়া গিয়াছে ; গ্রামখানি ক্রমশঃ নিশ্চল হইয়া আসিয়াছে । আকাশে দেখও কিছু হিম্মা কীতের কনকনে বাতাস গিতে আরম্ভ করিয়াছে ।

এমন সময় বলাইটার একটা ছোট পুটুলি সত্তর্পণে কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, বাজারের প্রান্তে শিউশরণ মাড়ওয়ারির দোকানের বহু দরজার দা দিল ।

ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা হইল, “কে ?”

বলাই এদিক-ওদিক দেখিয়া কহিল, “আমি বলাই ।”

ভিতর হইতে সোহ খুলিল ; বলাই ঢুকিতেই আবার দরজা বন্ধ হইল । কালো মুখে একরাশ সাদা গীত বাহির করিয়া শিউশরণ কহিল, “বলাই যে হঠাৎ ! নতুন শিকার কিছু আছে না কি ?”

বলাই কালের মাহুদ ;—সে তার পুটুলিটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, “শুও ।”

কিপ্রহণে শিউশরণ তাহা খুলিয়া ফেলিল । তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল একছড়া চেন সমেত সোণার ঘড়ি, একসেট সোণার বোতাম, এক মোড়া শান্তিপুতী ধূতি, এবং মল-খাইবার কীসার গ্লাস একটা ।

আবার তেমনি প্রসন্ন দৃষ্টি-পংক্তি বিকাশ করিয়া শিউশরণ কহিল, “বাহুরে বলাই ! চমৎকার শিকার ! কোথায় মারলে ?”

বলাই বলিল, “তা বেখানাই হোক্ না, কত দিচ্ছ বল-মিকিনি !”

শিউশরণ কহিল, “ওটা বলতে হবে । জানো তো, আমাদেরও সাবধান হ’তে হয় ।”

বলাই বলিল, “আগানসোল ঠেপনে ভিড়ের মধ্যে এক বাহুর কাছ থেকে । বাজিল কল্‌কাতার । নাও, কতু সেবে বসো ।”

শিউশরণ একবার ত্রিনিবওলা ফ্রেন-দৃষ্টিতে পরখ করিয়া লইয়া কহিল, “টাকা ৫০, ৫০—আর কত ?”

বলাই বলিল, “আমার দর-মন্তরের সময় নেই ; ৭৫, টাকার কমে হবে না, একা চেনটারই দাম হবে ১০০, টাকা ।”

শিউশরণ অনেক দর-কসাকসি করিল ; অনেক বুঝাইল, যে, ও-তলায় শুধু সোণাইকুই পাওয়া যাইবে । তা’ ছাড়া এর ভেতরে ভরের কথা বিস্তর । হুতরাং ৫০ টাকার এক পাই বেশী হয় না ।

অবশেষে ৩০ টাকা স্থির হইল । শিউশরণ সেকরা তাকাইয়া দেখণা শুৎকণাৎ তালিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল ।

(২)

বলাই নিঃক্রাস বদমায়েদ, এবং সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই । আছে কেবল মোক্ষদা আর তার পুর কেঠ । এই মোক্ষদা বলাইএর বন্ধু—আরও একটা সি-রাগ—বেগারমের বিধবা কত্কা । একবার বলাই যখন খুব বিশপে পড়ে, তখন তাহারক বাচাইতে গিয়া বেচায়াই নিজের প্রাণ হারায় । সেই হইতে বলাই মোক্ষদা আর তার ছেলের তার নিজের উপরই লইয়াছে । তাহা-যেই বাড়ীর পাশে নিজে একটা ঘর বাধিয়া বাস করে । যেটাকে সম্ভ্রতি গাঁয়ের ইকুলে ভর্ত্তিও করিয়া দিয়াছে ।

শিউশরণের দোকান হইতে বরাবর আসিয়া বলাই মোক্ষদার ঘরে ঢুকিল । বলিল, “কিছু আছে মোক্ষ, বড় কিসে পেয়েছে ?”

মোক্ষদা বলিল, “কেন, তোমার ভাতই ত রয়েছে—বেড়ে মিছি ।”

ভাত আসিয়া মোক্ষদা কহিল, “আজ আমার কোথায় গিয়েছিলে কাকা ?”

বলাই কাপড়ের খুঁট হইতে টাকাটা বাহির করিয়া কহিল, “এই নে ; টাকা-পাচেক আমি রেখেছি, ওতে বাকী ৫০ টাকা আছে ।”

মোক্ষদা বলিল, “আবার ঐ সব করতে গিয়েছিলে !

আর কেন কাঁকা! টাকা ত অনেক হ'য়েছে, আর কেন অর্থশ ক'রা!"

এচুর পরিমাণে একগ্রাম তাত মুখে তুলিতে-তুলিতে বলাই কহিল, "ওতে অর্থশ হয় না। আমি যদি টাকা না আনতাম ত তোরা বাচিস্ কি করে। বুকেছিন্, মাগুদের প্রাণটাই সবচেয়ে বড়,—তাকে বাঁচাবার অন্তে যে-কোন কাম করা যায়, তাতে অর্থশ হয় না। তা ছাড়া গরীবের টাকা ত' আর আমি নিই নে। বেচাধাধা বস্তু' সোণা ছুবি করলে পাশ হয় না, কেন না ওটা ত' আর দরকারী মিনিস নয়। একজন বে গোণা দিখে বারুয়ানা করবে, তাই নিয়ে যদি আমি অসহায়দের হু'দুটো খাওয়াই, ত' তাতে পাশ হয় না রে, বরং পুণি হয়। আমি ত' এই শাস্তর বুঝি!"

এক বড় প্রহল শাস্ত্রীর মুক্তি খণ্ডন করা অসম্ভব বৃত্তিরা মোক্ষবা বলিল, "তা যেন হোল, কিন্তু টাকা ত' হাতে অনেক জমেছে—আর কেন? ধরা পড়বার ভয়ও যে আছে।"

বলাই কহিল, "সে আর চারটি তাত দে।" তাত সেওরা হইলে বলাই কহিল,—"একজন গোণকার জপে বলেছে, আমি আর বেশী দিন বাঁচোবা না,—তাই-তোদের একটা উপায় ক'রে রেখে থাকি—বুঝি?"

মোক্ষবা বলিল, "হাট! ও-সব কথা আবার কি?"

বলাই হাসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কথটা উল্টাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মোক্ষ, ফেট কোথার রে, বুঝে বুঝি?"

এমন সময় বলাইএর সময় দরবার হাঁক হইল, "এ বলাই, বরেনে বা?"

বলাই ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পড়িল, "ঐ এসেছে।"

(৩)

যে আসিয়াছিল, সে কনষ্টেবল রানমোচন। বলাইএর নৈশ হাজিরি লইতে আসিয়াছিল; এবং তাহার সঙ্গে আরও বাকি কিছু মেলে। বলাই দরদা পুলিশ দিতে, সে চারি-হুণ্ড-প্রহাণ বাঁশের লাঠিটা দরদার গোড়ার রাখিয়া ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে "আ রে" কিলার টানে কহিল—
"গাধা বা?"

বলাই হাসিয়া কহিল, "আছে বৈকি!" বলিয়া কি-প্র-হাতে কলিক। রাশোচনকে দিয়া কুহিল "ধরাও।" রানমোচন প্রচণ্ড তিন টান দিয়া চক্ উল্টাইয়া দিয়া অধিলয়ে কলিকা বলাইকে দিতে-দিতে কহিল, "আজ তনলাম বড় শিকার দিলো?"

বলাই হাসিয়া কহিল, "তোমাদের আশার কি আর শিকার-টিকার মেলবার কো আছে? রাত্রির-দিন পাহারা—পাহারা! আগে কিন্তু এ সব আশা ছিল না। নাম লেখা থাকত এই মাত্র!"

রানমোচন হাতে তামাকু ডলিতে-ডলিতে কহিল, "শুশান্‌টেন্‌টেন্ বড়া বদমান্ বা। সুতরাং সে কি করিবে? বা হোক, তার পাওনা?"

বলাই ছুটো টাকা কেশিয়া দিয়া কহিল, "সময় বড় মন্দা যাচ্ছে—এ মানে আর না।"

টাকার মনোমোহন কনৎকারে রানমোচনের মুখে হাসি ছুটয়া উঠিল; কহিল, "তুমি বড়া আচ্ছা বদমান্‌ই আছে,—সেলাম, সেলাম!" বলিয়া বাঁশের লাঠি লইয়া নামিয়া পড়িল।

বলাই শমন করিতে বাইতেছিল, এমন সময় বাকী টাকা তিনটা হাতে লাগার সে উঠিয়া বলিল। মনে পড়িল, সকাল বেলায় এলোকেশী আসিয়াছিল; তাহার হাতে এক গয়লা নাই, কিছু চাহিয়াছিল। বলাই বলিয়াছিল, আমাই কিছু তাহাকে দিবে। তখন সে তাহার ছোট এক-হাতের লাঠিটা কাপড়ে লুকাইয়া টাকা তিনটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এলোকেশীর কলঙ্কের ইতিহাস বিস্তার। সম্ভ্রতি সে গ্রহ অবস্থার এই গ্রামে আসিয়া আছে—ভিক্ষা এবং বলাইএর দরদার উপর নির্ভর। গ্রামের আর একগ্রামে তাহার ঘর।

বলাই তাহার দ্বারে যা দিয়া ডাকিল, "এলোকেশী!" এলোকেশী দরদা পুলিশ দিতে, বলাই ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে টাকা তিনটা দিয়া কহিল, "আজ এই নাও।"

এলোকেশী কহিল, "এই অন্তে এত রাত্রে?"

বলাই হাসিল; কহিল, "আমার মনে থাকে না; তাই এখন মনে পড়ল, তখনই নিয়ে এলাম। নইলে ভুলে যেতাম।"

তিনটা এলোকেশীর গোথে বল আসিল। কথটা

মিথ্যা,—কেন না, বলাই দিব বলিয়া কোনও দিন ভুল করে নাই। দুখ নষ্ট করিয়া এলোকেশী কহিল, “বন্দো, তামাক সেজে দি।”

বলাই কহিল, “না,—আদি হাই, বড় দুদ পেয়েছে।”

(৪)

সকাল বেলায় বড় দারোগা-বাবুর বাসন মালিতে হয়। এটাও হাজিরার অঙ্গভূক্ত। সে দিন উঠিতে একটু বিলম্ব হওয়ার বলাই তাঁহার নিকট অনেক পালি খাইল। তিনি বলিলেন যে, কেন যদি এতদূর হয়, ত, তিনি বলাইকে চান্নান না দিয়া হাড়িবেন না।

মনটা ভাল নাই,—তাঁহার উপর আরও একটা গোলযোগ উপস্থিত। বলাই বাড়ী আসিতেই যেখিল, সমুখে ইন্সপেক্টর পণ্ডিত মশাই। ছাতিতে ব্রাহ্মণ, হুতরাং চকু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, “জাতে ছোটলোক কি না—আর কত হবে?”

প্রথম সম্ভাষণ বেশ ক্রটিরোগক না হইলেও, বলাই রাগ না করিয়া কহিল, “কি হয়েছে ঠাকুর?”

ঠাকুর কহিল, “আর হবে কি? বলে কি না আমাদের লাগা,—তোরা ঐ কেটা!”

বলাই ডাকিল, “কেটা, এমিকে আর!”

পণ্ডিত-মশায় তখনও সপ্তম্বে। তিনি কহিলেন, “নিজের ছেলে হোলো কি আর এসব বড় শিক্ষা হোতো,—পরের ছেলে কি না!”

যাহার ভবিষ্যতের জন্ত সে ধর্ম-অধর্মও মানে নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাটা বলাই এর মুখে তীরের মত বিধিল। সুদূরে রাগে জ্ঞান হারাইয়া সে কেটাকে এমন মার মারিল যে, সে সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, এবং পণ্ডিত মশাইও নিজের মান বাঁচাইতে দ্রুত হইয়া গেলেন।

কেটার কান্না শুনিয়া তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, “ছেলেটাকে ঘেরে কেনে? শরীরে কি একটু মারা-মরা নাই?”

বলাই কাঠের মূর্তির মত ঠাণ্ডাইয়া রহিল; সত্যই রাগের বশে সে এমন মার মারিয়াছে!

অন্তঃপালকের মত তাহার মনটা খুঁতখুঁত করিতে

লাগিল। অত্যন্ত সুবোধের মত খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে বখন আসিয়া খসিল, তখন বোকাবার মিষ্ট সাধনার কথা-গুলিও তাহার মনকে বাহ্যিক চকল করিয়া তুলিতে লাগিল।

এমন সময় নিতাই আসিয়া খবর দিল যে, সন্ধ্যার সময় ক্রোশ-গ্রন্থক দূরে জঙ্গলা মাঠের কাছে থাকিতে হইবে,—একটা শিকারের সম্ভাবনা।

বলাই কহিল, “আজ আমাকে মাগ কর নিতাই,—আজ মনটা ভাল নয়।”

নিতাই বলিল, “ধর্ম-ভাষ হোলো না কি? এত ভাল নয়। বাড়ীতে বসে থাকলে কি মন ভাল হবে? তাহা চেয়ে বহু চল; ভারী শিকার।”

বলাই তাহিয়া দেখিল কথাটা ঠিক! একবার ঘূরিয়া আসিতে পারিলে মনটা ভাল হইবে বোধ হয়। বলিল, “আচ্ছা ধাব।”

(৫)

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বি-মাধনে স্নাতোবর তহশীলদার বাবু আড়াই হস্ত পরিমিত এক ঘোটক-পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া চলিয়াছেন,—অর্ধ-পদ্মতে হুইলন বরকন্দাজ। কা’ল লাট দাবিল করিতে হইবে,—সঙ্গে হাজার ধানেক টাকা। রেল চড়িয়া সদরে যাইতে হইবে। আরও সকাল-সকাল বাহির হইবার কথা ছিল,—কিন্তু অসময়ে নিম্নাকর্ষণ হওয়ার বিলম্ব হইয়া গেছে। গাড়ীর দেয়ী আছে; কিন্তু এখনও তিন-মাইল পথ অন্তিম করিতে হইবে। বিশেষ এই মাঠটার ভয় আছে।

ঠিক একটা বেগের পাশে আসিতেই, না করিয়া একটা লাঠি প্রথম বরকন্দাজের পারে আসিয়া সঞ্চারে লাগিল। তৎক্ষণাৎ “মারলে রে” বলিয়া সে ভূপতিত হইল।

অবিলম্বে দ্বিতীয়েরও সেই অবস্থা হইল। তখন বেগতিক সেখান তহশীলদার বাবু ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। ঘোড়া-ভল্ল ঠালাকেও আছাড় খাইতে হইল, এবং কি-গ্রন্থিতে ব্রহ্মজন শোক আসিয়া তাঁহার হাজার টাকা’র তোড়ার তার হইতে তাঁহাকে মুক্তি দান করিল।

সন্ধ্যার পর কিরিয়া আসিয়া বলাই ডাকিল, “মোক, ও মোক!”

মোকদ্দা কহিল, “কি ?”

“কেই কোথায় রে ?”

মোকদ্দা বলিল, “তার পর থেকে তার অর এসেছে—
বজ্র অর।”

বলাইএর মুখ শুকাইয়া গেল; কহিল, “কোথায়
আছে সে ?”

যেখানে কেই গুইয়া ছিল, সেখানে তাহার নিকটে গিয়া
বলাই ডাকিল, “কেই, দাদা, অর হ’য়েছে রে ?”

কেই ছই রাঙা চোখ খুলিয়া কহিল, “হ্যাঁ দাদামশাই।”

বলাই কেইর বিছানায় বসিয়া তাহার মূখে-চোখে হাত
বুলাইতে লাগিল; কহিল, “সেবে বাবে এখন।”

(৬)

একশ দিন অর ভোগ হওয়ার পরও ভাল হইবার
কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এ কয় দিন বলাই কেইর শয্যা
এক রকম ভাগ্য করে নাই বলিলেও চলে। পরিশ্রমে
দে কোনও সিনই কাতর নয়;—কিন্তু তাহার একটা ধারণা
এই হইয়াছিল যে, কেইর রোগের কারণ-সে-ই; ইহাই
তাহাকে অসহনীয় বল দিয়াছে।

সন্ধ্যার পর রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইয়া আসিল,
এবং হিকা আরম্ভ হইল। মোকদ্দা কীদিয়া কহিল, “কাকা,
কি হবে ?”

বলাই ধানিকটা চুলচাপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ
স্মৃতির স্বরে বলিল, “মোক, মনে পড়েছে রে,—আজ্ঞা,
আমি ভাল করে বিদ্ধি।”

মোকদ্দা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি ক’রে ?”

বলাই কহিল, “সেখ, ত! একটা মস্তর শিখেছিলাম,
সেটা মনে পড়ল।” বলিয়া বিড়-বিড় করিয়া মস্ত পড়িতে
পড়িতে কেইর বিছানায় চারিদিকে সাতবার ঘুরিয়া আসিল।

তাহার পর মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, “যে—একটা
বিছানা ক’রে সে। মাখটা ভারী হ’য়ে আসছে; বস্তু
পায়ছিনে।”

মোকদ্দা বলিল, “এ আবার কি হ’ল ? তোমারও মাথা
ভারী হয় কেন ?”

বলাই ভইতে-ভইতে কহিল, “ভারী মোর এতাক্ষ হয়।
এক মিনিটে কল হয়। আমি গুড়ঠাকুরের কাছে শিখে-
ছিলাম। বেশ, তোর কেঁটা ভাল হয়ে গেল। রোগটা

আমি নিশান। আমি সহ করতে পারব। আর বিরোহিলাম
ত আমিই”—বলিয়া সে হাদিবার চেষ্টা করিল।

মোকদ্দা কেইর গায়ে হাত দিয়া কহিল, “সত্যিই ত গা
ছড়িয়ে এসেছে। আর তোমার গা ত খুব গরম হ’য়েছে।
কাকা, এ সব কি ?”

মুখে তখনও লাকণোর হাদি। বলাই কহিল, “হ’তেই
হবে। বাড়-খুঁক কি নিচ্ছে শিখেছি—না। মস্তর
শিখে হয় ?”

মোকদ্দা চিকিৎসার ভ্রষ্ট করিল না। গায়ের হাত
ভাল ডাক্তার, বৈদ্য—সকলকে দেখাইল। কিন্তু রোগ
কিছুতেই কমিল না। সকলই মাথা নাড়িয়া কহিল, “এতটা
বাড়বোড়ি হ’য়ে রোগ আরম্ভ হওয়া ত’ কখনও দেখিনি!
লক্ষণ ভাল নয়।”

সে-দিন ক্ষণে-ক্ষণে চৈতন্ত-অচৈতন্তে সমস্ত দিনটা
কাটিল। রাজ্যে অবস্থা আরও খারাপ হইল। মাড়ী বসিয়া
ঘাইতে লাগিল,—ডাক্তার, কৰ্ম্মরাম প্রভাব দিয়া গেল।

বিছানায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলাই
কহিল, “মোকদ্দা, একবার কেঁটেকে নিয়ে আর। বেশ
সেরেছে ত ?”

কেঁটেকে আনিলে, তাহার মাঝায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে
কহিল, “আঃ, বেঁচে থাক দাদা, বেঁচে থাক।”

সামান্য স্বরে মোকদ্দাকে কহিল, “কীদিস্ নি মোক !
ভাঁড়ার-ঘরে বেজের পোতা অনেক টাকা আছে, নিম্।
তোমার ভাবনা কি ? এইবার আমাকে ভাল ক’রে গুইয়ে
দে,—দোরটা খুলে দে, একবার চারিদিকে ভাল ক’রে
দেখে নি !”

বাহিরে রামলোচনের গলার আগ্রাধ পাওয়া গেল,—
“বলাই, ওয়ারিট বা।”

বলাই হাসিয়া কহিল, “ওনেছিস্ মোক, ও আনাকে
ওয়ারেটের জর দেখাতে আসছে! ডাক্ তো—
ডাক্ তো !”

রামলোচন ঘরে ঢুকিয়া সমবেদনার স্বরে কহিল,
“বলাই, এ কি।”

বলাই কিম্বদিস্ করিয়া কহিতে লাগিল, “ক’কি
দিয়েছি,—তোমার সবাইকে ক’কি দিয়েছি। এখার ঐ
ওপর থেকে ওয়ারেট এসেছে,—বলাই সেইখানে চ’মো।”

জাতি-রক্ষা

[ত্রিপূর্ণচন্দ্র আঢ্য, বি-এ]

বছর তিনেক পরে

বিশ্ব বধন ফিরে এল আপন গাঁয়ের ঘরে,
'মহু'র' স্থিতি গেল না'ক অনেক তীর্থ ঘুরে ;
অন্তর তার জুড়ে ;
তারই ছবিখানি

ছিল তাহার বুকের মাঝে, সেই যে বাথার ম্যানি
বন্ধ তাহার অন্ধকারে রেখেছিল ঢেকে,
দাখে থেকে থেকে

বিদ্যাত্তরই মন্ত সেখান, উইত বেগে অলে
কচি মুখের হাসির আশে, হাসি চোখের অলে
ভোরের আলোর বাধ বাগি, গলা জড়িয়ে ধরা,
তারই মুখে তারই নায়ের মুখটি মনে পড়া ;
সেই যে মনু বাসন্তো ভাল বুড়ি লাটাই খতো,
পুতোর লম্বা ছুটোছুটি পরে মকুন জুতো ;
এমনিতর কত

বিশ্বর মনে উইত শত শত ;
তীর্থে তাহার হারাননি ক স্থিতি
ঘরে এসে আগুন আবার অলস বধারীতি ।

দক্ষিণ আশার তাপে

পূজো-আলিক বাধা নিরেই দিনতলি তার বাপে ;
হঠাৎ সেদিন বেধে নদীর তীরে
চুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোমে তপ্ত বাসুর' পরে,
বেখার নদীর চরে
কলসী ভাঙ্গা হেঁড়া মাছের শোড়া ধানের রাশি ;
সেইখানেতে আসি
হারগা বেন পেয়ে
চিরন্তরে ঘুমিয়ে আছে গাঁয়ের টাঙাল ঘরে ;
তারই বুকের' পরে
কাবা-মাথা শিশুটি তার বেকার খেলা করে ;

মায়ের গুন নিয়ে

নিজের মুখা মিটাতে সে যাছিল গ্রাম গিয়ে ।
হঠাৎ বিশ্বর কি যে হল মনে,
বন্ধ তার কুলে নিলে ; হারান রতনে
সে বেন তার ফিরে গেলে কোলে ।

অশ্রু বেহের গোলে

সকল বাধা জুড়িয়ে গেল শিশুর পরণ পেয়ে,
শিশু-কোলে ছুটল বিশ্ব গাঁয়ের মাঝে খেয়ে ।
গাঁয়ের লোকে বললে বধন "গে কি, বাসুন বিশ্ব
মাহ করবে টাঙাল মাস্তির ? পাগল কিংবা শিশু
ওটা"—তখন বিশ্ব গিয়ে
শিশুর মায়ের মাহ করে, তাকে কোলে নিয়ে
ফিরে এল নিজের ঘরে ; নিজের বুকের'পরে
শিশুরে তার ঝাংলে চেপে ধরে ।

অনেক দিনের পরে

আজকে তাহার বুকের বহে উৎসলে বেন পড়ে,
বিশ্বরে তার ভিড়িয়ে দিলে এ যে
তারই মাঝে সে যে
হারান তার মহুরে সে কিরিয়ে পেয়ে আজ
পেরেছে যে কাল !

কোথার তাহার মুদকুমিটি, কোথার কাঠের বোড়া,
কোথার আছে লাল পশমের ছোট মোলা রোড়া,
কোথার পুড়িয়ে গরম করা কোথার জুখের বাটী,
কোথার আছে সেই ছোট গাল কাঠের লাটী ;
এমনিতর কত
ছোট ছোট সেহের কাঁজে বইল সে আজ রত ।
দীর্ঘ রাতের মাঝে
পাছে পোকের মুখটি ভাঙে তরুী তাহার বাজে ,
প্রাণীপ জেলে ঘরে
পাখা নিয়ে বসল গিয়ে কোকার নিদ্রার 'পরে ।

ঠাঙ্গিনেবে গ্রামের মাথো উইল্ল গুণগোণ
 "বিশ্বর বয়ে ঠাঙ্গাল হোঁড়া"—সে এক তীব্র হোল
 উইল্ল তীব্র তাবে
 "এমনতর অনাচারে বেশটা তেলে বাবে
 কপোতাকীর লেলে,
 গ্রামের পূর্ণাঙ্গে,
 যারনি হুধু আদ্যকে এতক্ষণও; এখন শুধু তার
 উপায় এলে কক লম্বাচার।"
 লম্বাচার হুধুও মশাই এসে—
 "পাণলাপি বা কবেছ তার হুত কিছু নিবে
 ছেলে কেসে দিয়ে
 লাতে তোমার উইলে হবে বিত্ত!"
 "কোথায় বাবে বিত্ত?"
 "ঠাঙ্গালের ছেলে
 দাও ওটাকে কেসে
 প্রাক্তনে বা আঁছে ওটার হবে—

অন্তরিক কেসে দিয়ে তটি কর নথ"।
 শান্ত হরে বললে বিত্ত, "গুহন সমার্ত-স্বামী,
 থোককে তুলেছি বৃত্ত ফেলব না'ক আমি।"
 যেনে বয়ে লম্বাচপতি "তোমার জাতি বাবে
 ঠাঙ্গাল-হোঁড়া বাবুনের হাতের জল খাবে
 এমন পাত্ত নথ ক গ্রামের লোক।"
 বলে বিত্ত "নাইক হুংগ শোক,
 মাহুণ আমি সেইটা জাতি মানি,
 মাহুণের বা ক'ক আমি সেইটা হুধু মানি;
 সেই জাতিটি হাংগে আহার হবে।
 এখন তবে
 মুক্ত কর লম্বাচ আহার তোমার বাঁধন হতে
 মহা জাতির পথে।"
 এই বলে তার বজ্রহস্ত নিজের হাতে ধুলে
 গরম ঘেঁরে :খাকার বিত্ত নিলে কোল তুলে ॥

নাম-যজ্ঞের মহাসাধক

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাসুধণ]

'শুদ্ধ বিষ্ণু-ভক্তি'র স্তিমান্বিত গ্রামে হরিদাস মূলদান-
 কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও "গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে" নিরত
 ভাসমান থাকিয়া সৌভাগ্য বৈষ্ণবপণের শিরোমণি রূপে
 আলো পুষিত হইয়া থাকেন। এইরূপ মহান্ত সাধুগণের
 জীবনের কথা জানিতে স্বা'র না প্রস্তুতি হইয়া থাকে।
 কিন্তু চুখের বিষয় হরিদাস ঠাকুরের জায় যথার্থ জীবনের
 জাতি অন্ন কথায় আশ্রয় জানিবার অধিকারী হইরাছি।
 তাঁহার পার্শ্ব-জীবনের কোন কথায় জানিবার উপায়
 নাই। ব্যাপারভার কৃপাধন দাস ঠাকুরের কৃপায় ও
 ঐশ্বর্য-কৃপাপাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দীর অহুগ্রহে
 নাম-যজ্ঞের মহাসাধক হরিদাসের চরিত-কথার যে জাতি
 নামান্ত বিবৃতি-মাত্র পাইরাছি, আশার বিধান, শুধু তাহাই
 মনোযোগ লব্ধকরে পাঠ করিলে, প্রকৃত বৈষ্ণবের
 প্রেমভক্তি লাভ করা অনায়াস হইয়া পড়ে।

উপায় বৈষ্ণব-যজ্ঞের উপায়ভার চূড়ান্ত উপায়চরণ হরি-
 দাসের প্রীতি ছোট-বড় সকল বৈষ্ণবের আন্তরিক প্রীতি।
 বৈষ্ণবগণ শুধু মুখেই বলিতেন না—

"অথম কুলতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
 তথাপি সে ই সে পূজা" লক্ষ্য শাস্ত্রে কর ॥

তাঁহার শ্রী-শ্রী আচরণ দ্বারা এই ভগবৎ-বাক্যের
 পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়া দিরাছেন। তাঁহার হরিদাসকে
 পূজাত করিরাছেনই,—তাঁহাদের পূজা অভিনন্দ্য উট্টা—
 হরিদাসকে তাঁহার মহান্ত-বাহিত 'ঠাকুর' উপাধিতে কৃত
 করিরাই ক্ষান্ত হ'ন নাই। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যিনি বড়
 বড়ই হউন না কেন, যথ মন্ত্রপ্রভৃ, ঐহিক অধৈত্যাচার্য ও
 ঐহিকভাষ্যদ্য ব্যতীত মহাপ্রভুর সময়ে কাহারেও "প্রভু"

নামে অলঙ্কৃত করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। (১) কিন্তু আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-প্রীতি! অশাস্তর্ক্য্য তাঁহাদের মহিমা! হরিদাসকে তাঁহারা এতই আপনায় করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ও 'প্রভু' বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে ছাড়েন নাই। ঐতিহ্য-ভাগবত আমাদের এ কথা বলিতে সক্ষম! ঐন্দ্রাবন দাস বলিয়াছেন—

'প্রভু হরিদাস যাহা নৃত্যে প্রবেশিলে।

সকল আদিত্য তান ঐবিগ্রহে দিলে।'

(১১৮ পৃঃ)

শুধুই গুণের আদর করে; বৈষ্ণবই বৈষ্ণবদের মায়ায়াকর্ষিত করিতে পারে। বৈষ্ণব বলেন, হরিদাস নীচ জাতি হইলেও সকলের তিনি মাথার মণি। সকলেই তাঁহার সম্বন্ধে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে।

চৈতন্যভাগবত বলেন—

"প্রজ্ঞান যে যেন দৈত্য, কপি হনুমান।

সেই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।"

কিন্তু নীচ জাতি হইলে কি হয়?

"হরিদাস স্পর্শে বাহ্য করে দেবগণ।

গঙ্গাও বাহুনে চরিদাসের মন্ডন ॥

স্পর্শে কি দাগ, দেখিলেও হরিদাস।

ছিন্তে সর্গভাবের অনাগি-কর্ণপাশ ॥

হরিদাস আশ্রয় করিব বেই জন।

তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন ॥

সকল যে বলিলেক হরিদাস নাম।

সত্য-সত্য সেহ বাইবেক কৃষ্ণ-ধাম ॥

(১) ঐতিহ্য-ভাগবত লিখিত করিয়াছেন—

"ইথে ভক্তভাব ঘরে চৈতন্য গোদাকি

ভক্ত-বরণ দ্বার নিত্যানন্দ ভাতি ॥

ভক্ত-সংবার দ্বার আচাৰ্য্য গোদাকি।

এই তিন ভাব লবে অল্প কহি গাই ॥"

ঐতিহ্যভাগবতেরও ইহাই প্রতিজ্ঞা আছে। মহাপ্রভু নিত্য-নন্দ ও অপরিত্রিত কেহই অনুপস্থিত হইতে পারেন না এবং হন নাই। তবে যে 'হরিদাস' ও 'হরিদাসকে' অল্প বলা হয়, থাকে, তাহাতে তাঁহাদের নামের 'অল্প' শব্দকে স্মৃতিত বৃত্তে ধরিতে হইবে। নরহরি ঠাকুরের 'ভক্তি রত্নাকর'ও 'অল্প হরিদাসের' যে প্রমাণ আছে, তাহাতে এই স্মৃতিত-বৃত্তি।

হরিদাস বৈষ্ণবের এক অপূর্ণ রত্ন। তাঁহার প্রেমের তুলনা নাই—প্রেমাবেশে তাঁহার নৃত্য অসুখম। সে নৃত্য এখনই যে

"হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।

ত্র্যম্বক পরিব্রজে ও-নৃত্য-সেবনে।"

হরিদাসের বালা-কণ্ঠার মধ্যে এইটুকুই জ্বলিতে পাওয়া যায় যে,

"বৃন্দ-প্রাণেতে অবতীর্ণ হরিদাস।

সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ ॥"

দশের ঘোড়ার বনগ্রাম সবভিতিসনের নিকটে বর্তমান চৈতন্যের সন্নিকটে 'বৃন্দ' প্রাণে ভগ্নগ্রহণ করিয়া হরিদাস সেই গ্রাম পবিত্র করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার বালা-জীবন এই পল্লীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কোন প্রামাণ্য প্রমাণে তাঁহার পিতা-মাতার নামের উল্লেখ নাই। সম্ভ্রান্তি করে-জন লেখক কল্লন-সাধায়ে হরিদাসের পিতা-মাতার নাম ও জাতি-কুলের অদ্ভুত তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের উর্জর-মস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া হরিদাসকে মূলতঃ হিন্দু করিয়াই জ্ঞানিয়াছেন। এ সমস্ত মত যে আদৌ গ্রাহ্য নয়, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। বস্তুতঃ হরিদাস যে মুসলমান এবং মুসলমানদের মধ্যে বড় বনিয়াদি ঘরের ছেলে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। (২)

মুসলমান-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস কি নামে অভিহিত হইতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বাহা হউক,

(২) হরিদাসকে কাকি নবাবের নিকট আনয়ন করিলে নবাব দ্বারা বলিয়াছিলেন, সেই উকি হইতেও, হরিদাস যে মুসলমান ও বড় বংশের ছেলে, তাহা জানা যায়।

ভাগবতে আছে—"আপনে রিভাগে তানে মুগ্ধের পতি।

"কেনে কহি। গোয়ার নিকপ দেখি নতি।

কত ভাগ্যে দেখি তুমি ইন্দ্রজ বন।

তবে কেনে হিন্দুর আগারে গ্নেহ মন।

আমরা হিন্দু দেখি নারি নাই ভাত।

তাহা তুমি কোড়ে হই মহাবংশধার।

না আদিকা যে কিছু করিয়া আনাগার।

সে পাণ বৃণ্ডা করি কলিঙ্গ উদার ॥" (১২০ পৃঃ)

হিন্দু-আচার্যসম্মত ও হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া বোধ হয় তাঁহার নাম হরিদাস হইয়া থাকিবে। তবে তিনি কাহার প্রেরণায় কৃতকৃত্তিকপরাণ হইরাছিলেন, বৈকব-এথে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। ৩)

হরিদাস হরি-প্রেমে বিভোর হইয়া বচন পরিত্যাগ পূর্বক নিকটবর্তী বেনাপোলের অঙ্গলমর স্থানে সাধনা-নিরত হইলেন।

“নির্জন বনে কুঠীর করি তুলসী-দেবন।

রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম সঙ্গীর্জন।

ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ভীকন।

এতাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥”

এই সময়ে সেখানে রামচন্দ্র বা নামক বৈকবদেবী পাণ্ডব সেই বেশাধার্য ছিলেন। হরিদাসের এত নাম, সমাদর, তাঁর সাধন-ভজনের একগু মহাশক্তি—রামচন্দ্র ঐর আর সহ্য হইল না। রামচন্দ্র

“তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।” কিন্তু—
“কোন প্রকারে হরিদাসের হিত্র না পাইয়া” শেষে “বেস্তাগণ আনি করে হিত্রের উপায়া ॥”

বেস্তাগণ যখন তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভক্ত হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নষ্ট করিতে পারিল না, তখন

“বেস্তাগণ মধ্যে এক হুন্দারী যুবতী।

দেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥”

হরিদাসকে সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত করিবার অন্ত রাত্রি-কালে সেই বেস্তা বেশবিক্রাস করিয়া উৎকল-দ্বয়ে হরিদাসের নির্জন কুঠীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

“তুলসী নন্দারি হরিদাসের ঘারে বাঁকা।

গোদাক্রিরে নদঘরি রাহিলা দাড়াইয়া।

অঙ্গ উভাঙিয়া দেখার বসিরা চ্যারে।

কহিতে লাগিলা কিছু অমরু বসে ॥

ঠাকুর! তুমি পত্রম হুন্দর প্রথম যৌবন।

তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন ॥

তোমার সখ লাগি লুছ যৌবর মন।

তোমা না পাইলে প্রাণ না বাঁধ খাণ ॥”

কিন্তু হরিদাসের ত কাহারও সহিত কথা বলিবার অবকাশ নষ্ট কিছু ভাবিবার অবসর নাই। নামে তিনি একেবারে বিভোর হইয়া আছেন। তিনি যে সৌন্দর্য-রসের আশ্বাসন করিতেছেন, তাহা যে “কন্দর্প-দর্প-হর”। সামান্ত হুন্দরী বেস্তা তাঁহার নিকট অকিঞ্চনতর সৌন্দর্য্য তাহার লইয়া কান উপাধন করিবে? বেস্তার কথা শুনিয়া

“হরিদাস কহে তোমার করিব অকীকার।

সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না আদার ॥

ভাবৎ তুমি বসি তন নাম-সঙ্গীর্জন।

নাম সমাপ্তি হইলে করিব যে তোমার মন ॥”

সেই রাত্রি ত বেস্তা সমস্ত রাত্রি বসিরা নাম শ্রবণ করিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গেল। পুনরায় রাত্রিকালে বেস্তা আসিল। হরিদাস তাহাকে বলিল, কাল তুমি কষ্ট পাইয়াছ, ইহাতে আদার অপরাধ লইও না। তুমি এখানে বসিরা নাম-সঙ্গীর্জন শ্রবণ কর।

“নাম পূর্ণ হইলে তোমার পূর্ণ হবে মন।”

এইরূপে সেই রাত্রি ত গেল। তার পরদিন সন্ধ্যার বেস্তা—

“তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার কর।

ঘারে বসি নাম শুনে বলে “হরি হরি” ॥

আজ সে হরিদাসের নিকট বিশেষ আশ্বাস পাইল।

কিন্তু—

“কীর্জন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল।

ঠাকুরের সনে বেস্তার মন কিরি গেল ॥”

বেস্তা হরিদাস-চরণে প্রণাম করিয়া তাহার কৃত পাণের প্রাণান্তিক্ত প্রার্থনা করিল। ঠাকুরের উপদেশে সেই বেস্তা—

“গৃহ বিজ্ঞ যোবা ছিল ব্রাহ্মণেরে মিল ॥

বাধ্যমুদ্রি এক বস্ত্রে রহিলা সে ঘরে।

রাত্রি দিবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥

ভক্তদ্বন্দ্বের বসিরায়ে—“বসনের কুলে জন্ম হইল যে তারণ ॥”

চৈতন্যচরিতামৃতের আছে—“হীনকান্তি অম্ব মোর নিম্ব। কালপর ॥”

অন্য—১১শ পরিচ্ছেদ

ভাগবতে কামির উক্তি—“যদন হইয়া করে বিন্দু বসন্তে ॥

ভাস্মতে তরে মানি করহ বিদ্যা ॥ ১১১ পুঃ

(৩) সাধকবিধের মতে তিন বা তিন বটীক দুনিব পূর ছিলেন।

তখন তাঁহার নাম “ব্রহ্ম” ছিল। তিনি শিষ্ট-শাণে হাব কুলে অম্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে এই অভ্যাশের বিবরণ আছে। এই ভক্ত কেহ-কেহ তাঁহারে “ব্রহ্ম হরিদাস” বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন।

পরে সে এমন ভক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরম মহাত্মা নামে খ্যাত হইল। তাঁহার আশ্রম তীর্থে পরিণত হইল। বড়-বড় বৈষ্ণব তাহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তাঁর পর হৃগণীর নিকটবর্তী চাঁদপুর নামক গ্রামে গিয়া তাঁহার এক রূপাপাত্র বলরাম আচার্য্যের গৃহে উঠিলেন। সেখানে তিনি তাঁহাকে বহু করিয়া সেই গ্রামে রাখিলেন। হরিদাস এক নির্জন পর্ণশাখা থাকিয়া কীৰ্ত্তননাশ করেন, আর বলরামের গৃহে ভিক্ষা নির্কাহণ করেন। এই সময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অমূল্য নিধি ঋতুনাথ নাম গোস্বামী বাসকর্য্য। তাঁহার তখন পঠদশা;—তিনি পড়েন আর নিত্য গিয়া হরিদাস তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসেন। হরিদাস সেই বাসকের দ্বারা যে ভক্তি বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে কালে এই দ্বাপন-লক্ষ্যধিপতি ক্ষতল হইলেন। তুচ্ছ করিয়া কোপীন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চরিত্রাশ্রিত বলেন—

“হরিদাস রূপ করে তাহার উপরে।

সেই রূপ কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥”

হরিদাস ও গোবর্দ্ধন তৎকালে সেই দেশের অধিপতি (মহাস্থান) ছিলেন। বলরাম আচার্য্য তাঁহাদেরই পুরো-হিত। তিনি একদিন তাঁহাদের সভায় হরিদাসকে লইয়া যান। সেই সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সজ্জন এবং হরিদাস ও গোবর্দ্ধন তাঁহার যথেষ্ট স্তুতি করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা নান-নাথ্য। তুমিরা আশ্রয় হইলেন। এইখানে গোপাল চক্রবর্তী নামে হরিনামদেবী এক ধন্যতা ব্রাহ্মণ নাম-মহাযোয় বিশেষ প্রতিবাদ করায়, তিনি ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া কুর্চ-রোগাক্রান্ত হ'ন। হরিদাস এই বিপ্লব দোষ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে তাহার কল্যাণ করিতে হইল।

“বিপ্লব হুঃখ তুমি হরিদাসের হুঃখ বৈলা।

বলাই পুরোহিতে করি শাস্ত্রপুণ্ডে আইলা ॥”

তিনি গঙ্গাতীরে আশ্রয় লুগিরায় রহিলেন। শ্রীমদ্ অষ্টোত্তমোক্তা তাঁহাকে আশ্রয়ন করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং গঙ্গাতীরে তাঁহার নির্জন ভবনের দ্বারা এক গোলা করিয়া দিলেন। হরিদাস অষ্টোত্তমোক্তার

গৃহে ভিক্ষা নির্কাহণ করিতেন, আর আচার্য্য তাঁহাকে ভাগবত ও গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইতেন। শ্রীমদ্ অষ্টোত্তমোক্তা তাঁহার সম্মান পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। হরিদাসও অষ্টোত্তমোক্তার সঙ্গে আনন্দে মাতিয়াই হইয়া-ছিলেন। বিপ্লব-স্থলে তাঁহার স্তুতি আদৌ ছিল না। ভাগবত বলেন—

“বিপ্লব স্থলেতে তিনি বিরক্তের অগ্রগণ্য।

কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীধরন বস্তু ॥”

কর্ণমাত্র ও তাঁহার গোবিন্দ-নামে বিবর্তিত ছিল না। তিনি সর্বদাই গঙ্গার তীরে-তীরে উঠে-থরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে-করিতে ভ্রমণ করিতেন। আর ভক্তি-রসে আপ্ত হইয়া কখনও আপনা-আপনি নৃত্য করিতেন, কখনও বা মত্ত শিখরের দ্বারা ধ্বনি করিতেন; আবার কোন সময়ে উঠে-থরে হোমেন অথবা মহা অট্টহাস করিতেন। অঙ্গপাত, রোমহর্ষ, সূক্ষ্মী, বর্ষ প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তি-বিকারের সমস্ত মর্দই তাঁহাতে প্রকটিত হইত। এই সময়ে তিনি নিত্য গঙ্গারান-পূর্বক সমস্ত স্থানে উদাস্তভাবে হরিনাম কীৰ্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। হরিদাস প্রত্যহ অষ্টোত্তমোক্তার অগ্র গণ করেন। ইহাতে তাঁহার একমিনি নিবন্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অষ্টোত্তমোক্তাকে বলিলেন।

“যোরে প্রত্যহ অগ্র দেহ কোন প্রার্থনন ?

মহা-মহা বিপ্র থোকা কুলীন সমাধ।

নীচে আদর কর, না বাগে লাগ ॥

অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।

সেই রূপ করিবে যাতে যোর রক্ষা হয় ॥

আচার্য্য কহেন তুমি না করিছ ভয়।

সেই আচারিবে যেই শাস্ত্রমত হয় ॥

তুমি থাকিলে হয় কোটা ব্রাহ্মণ-ভোজন।

এত বলি ব্রাহ্মপাত করায় ভোজন।

অগুণ নিজার লাগি করেন চিন্তন।

অষ্টোত্তম বগৎ কৈছে হইবে মোচন।

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা।

গঙ্গাধর তুমি লইয়া পূজিতে লাগিলা।

হরিদাস করে গোপাল নাম সর্গীর্জন।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন, এই তার মন।

হই ঘনের ভক্তো কৃষ্ণ কৈল অবতার ।

নাম প্রেম প্রচারি কৈল লগৎ নিষ্ঠার ॥”

বেনাপোলের ঘনে বেড়া যে ভাবে হরিদাস ঠাকুরকে প্রোক্ষিত করিতে আদিয়াছিল, সেই তাবের অতুষ্করণ করিয়া দ্বারসেবী স্বয়ং এক ধোয়াসামগ্রী হস্তিতে ঠাকুর হরিদাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে প্রদৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মাগণত ঠাকুরের নাম-কীর্ত্তনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ইঞ্জির-সংঘের প্রলোভিত ক্ষমতা দেখিবা কৃষ্ণ-নাম-প্রার্থিনী হইয়া একেবারে তাঁহার চরণ বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হরিদাসের নাম-সংঘের আশ্রয় অনেক অপূর্ণ দৃষ্টান্ত আছে ;—আমরা আর একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রেমের উপলংঘের করিব।

হরিদাস ত দ্বিবার সর্বদাই হরিনাম করিয়া বেড়ান। কালি দেখিলেন যে, তাহাদেরই একজন মুসলমান স্বর্ণপুত্র পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর আচার অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমান-শালনাথের মুসলমানের এ দৃষ্টান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিল। কালি দেশাদিপতিকৈ সমস্ত বিবরণ জানাইলেন ;—

“যখন হইয়া করে হিন্দুর আচার ।

ভাল-মতে তারে আনি করহ বিচার ॥”

অতঃপর হরিদাসকে ধরিয়া আনা হইল। তিনিও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে-করিতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। সুদৃকপতি তাঁহার ভক্ত্যপুত্র বনোহর কলেবর দর্শন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে লিঙ্কাস করিলেন—

“কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি।

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈছাৎ ধন ।

তবে কেনে হিন্দুর আচারে যে’ মন ॥

আমরা হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত ।

তাঁহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥

ভাতি-ধর্ম লক্ষি কর অস্ত ব্যবহার ।

পর-লোকে ভেদতে বা পাইবা নিস্তার ॥

না জানিঞা যে কিছু করিলা অন্যচার ।

সে শাপ চমুৎ করি কলিমা-উচ্চারণ ॥”

তখন হরিদাস তাঁহাকে বহু বচনে বলিতে লাগিলেন—

“ওম বাপ! সত্যতই একই ঈশ্বর ।

নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুতে ধরনে ।

পরমার্থে এক কেহ কোরাণে পূজাণে ॥

এক শুদ্ধ নিষ্ঠা বস্ত্র অখণ্ড অব্যাহ ।

পরিপূর্ণ হই বৈদে সত্যের ক্ষয় ॥

সেই প্রভু ব্যারে যেন লগরণের মন ।

সেই মত কর্ত্ত করে সকল ত্বন ॥”

হরিদাসের এইরূপ সত্য কথা শুনিয়া উপস্থিত মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কালি ইহাকে শাস্তি দিবার জন্য বহু প্রকারে বলিলেন। শেষে বাইশ বাজারে তাঁহাকে নির্দয় রূপে প্রহার করিয়া প্রাণ লইবার আদেশ লইলেন। পাইকগণে তাঁহাকে বাইশ বাজারে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিলেন।

“বাইশ বাজারে সব বেড়ি ছুঁগণে ।

মারের নিষ্ঠার করি মহাক্রোধ মনে ॥”

কিন্তু—

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” শ্রবণ করেন হরিদাস ।

নাশানবনে দেখে হুঃখ না হয় প্রকাশ ॥”

পাইকগণকে অনেকে সাধা-সাধনা করিল ;—

“কেহো দিরা ধবদগণের পারে ঘরে ।

কিছু দিব, অন্ন করি মারহ উহারে ॥”

কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মনে দ্বার উন্মোচন হইল না।

ইহাদের এইরূপ নির্দয় প্রহারেও কিন্তু কৃষ্ণনামের প্রভাবে

“কৃষ্ণের প্রসাধে হরিদাসের শরীরে ।

অন্ন চাহি নাহি আছে এতক প্রহারে ॥”

শুধু তাহাই নয়। হরিদাস পাইকদের উপর একটুও অসন্তুষ্ট হন নাই। তাহার দৃষ্টই প্রহারে করে—তিনি ততই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন। আর বলেন—

“এ সব ভীষেবে কৃষ্ণ! করহ প্রসাধ ।

মোর ভ্রোমে নহ এ-সত্য অপরাধ ॥”

বাইশ বাজারে নির্দয় প্রহার বাইরাও হরিদাস মরিলেন না। তখন,

“ধবন-সকল বোল অরে হরিদাস!

তোমা হৈতে আমা’ সত্য হইবেক নান ॥

এত প্রহারের প্রাণ না যায় তোমার ।

কালী প্রাণ লইবেক আদ্য সভাকার ॥”

ইহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া—

“হাসিয়া বোলেন হরিদাসে মহাপর ।

আমি জীলে যদি তোমা সভার মন্ম হয় ॥

তবে আমি মরি এই দেখ বিস্তমান ॥”

এই বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন । বেবিয়া তাহার মনে করিল, হরিদাসের—মৃত্যু হইয়াছে । তাহার বিদিত হইয়া তাহাকে লইয়া নবাবের ঘরে রাখিয়া দিল । নবাব শবদেহটিকে সমাধিব করিতে বলিলেন । কিন্তু কালী নবাবকে বলিলেন, এই কক্ষেব্রকে সমাধিব করা কর্তব্য নয়, ইহার শবদেহ গাঙ্গে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত । নবাবের অমেনে তাহাই করিবার ব্যবস্থা হইল । কিন্তু তাহাকে তুলিবার সময় তাহার ঘেঘে বিসম্বদ-অধিষ্ঠান হইল । যেহেতু তাহাকে মড়াইতেই পারে না । শেষে ইনি গলাগলে নিষ্কণ্ঠ হইয়া ভাসিতে-ভাসিতে কিছুদূর গেল, তাহার নিজ-ইচ্ছার বাহুজ্ঞান হইল । পরম আনন্দময় হরিদাস চৈতন্ত পাইয়া তীরে উঠিলেন এবং হরিদাস করিতে-করিতে কুলিয়া নগরে আসিলেন । সেখানে নবাবকে দর্শন দিয়া দ্রব্য হস্ত করিলেন । তখন নবাব বুঝিলেন যে হরিদাস একান্ত সাধুপুণ্ডর । তার পর তিনি তাহাকে মহা-পীর জ্ঞানে তাহার নিকট কন্য প্রার্থনা করিয়া হরিদাসকে যথেষ্ট বিচরণের আদেশ প্রদান করিলেন । অতঃপর তিনি কীর্তন করিতে-করিতে বিপ্রগণের সভায় উপস্থিত হইলেন । তাহার তাহাকে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । হরিদাসের চরিত্রে এইরূপ অদ্ভুত আখ্যানের কথা আরও আছে ; বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না ।

হরিদাস নবদীপে গমন পূর্বেক তত্ক্ষণ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইতেন । যথা: মহাপ্রভু ঐক্যচৈতন্ত ইত্যাদি একই অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাহাকে অগ্নিগন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন । ঐহৈতন্ত নীলাচলে গমন করিলে, হরিদাসও তাহার অঙ্গগমন করিয়াছিলেন । নীলাচলে তিনি তত্ক্ষণ বৈষ্ণবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মনের

আনন্দে হরিদাস কীর্তন করিয়া ভজনানন্দে কালদাপন করিতেন ।

একদিন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ হরিদাসকে মহা-প্রশাদ দিতে গিয়াছেন । তখন ঠাকুর হরিদাস শ্রম করিয়া মন্ম-মন্ম সংখ্যা-সংকীর্তন করিতেছিলেন ।

“গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন ।

হরিদাস কহে আমি করিব লভন ॥

সংখ্যা-কীর্তন নাহি পূর্বে কেমনে খাইব ।

মহাপ্রশাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥

এত বলি মহাপ্রশাদ করিল বন্দন ।

এক রক লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥”

তার পরদিন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আসিয়া তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন । হরিদাস বলিলেন—

“শরীর অস্থির নহে যোহ, অস্থির বৃদ্ধ মন ॥”

মহাপ্রভু তখন তাহার অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হরিদাস বলিলেন, সংখ্যা-সংকীর্তন পূর্ব না হওয়াই তাহার ব্যাধি । ইহার উত্তরে—

“প্রভু কহে বৃদ্ধ বৈদ্য সংখ্যা অল্প কর ।

সিদ্ধ-দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥

লোক নিষ্ঠারিতে তোমার এই অবতার ।

নাথের মহিমা লোক করিয়া প্রচার ॥”

হরিদাস অনেক দৈন্ত ও বিনয় সহকারে প্রভুকে অনেক কথাই বলিলেন ; আর বলিলেন,—

“এক বাহা হয় যোহ বহুদিন হৈতে ।

লীলা সম্বন্ধে তুমি যোহ লয় চিত্তে ॥

শেই লীলা প্রভু মোরে করু না দেখাইবা ।

আপনার আগে যোহ শরীর পাড়িবা ॥

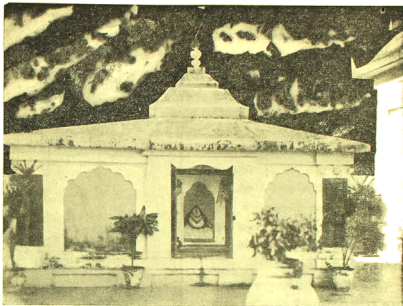
দগরে ধরিব তোমার কমল চরণ ।

নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ॥

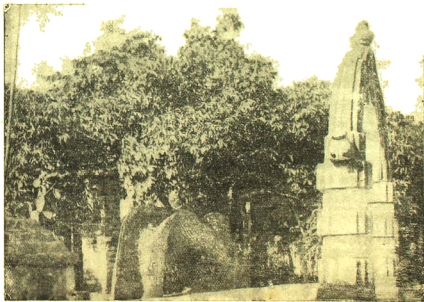
হিসাবে উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্ত নাম ।

এই মত যোহ ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥”

ঐশ্বর্যপ্রভু তত্বতরে বলিলেন, হরিদাস । এই অবতারের বাহা কিছু মন্ম-সম্পদ, তাহা ত তোমাকে লইয়াই ।



ହରିବାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନ୍ଦିର



ନିଧି ସ୍ତମ୍ଭ

জামাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার হৃদয়চুক হয় না। অন্তঃপর মহাপ্রভু হরিদাসকে আনিবন করিয়া দখ্যাক করিতে সমুদ্রে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু উক্ত-গণ সঙ্গে লইয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুকে ও বৈকুণ্ঠকে বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তখন হরিদাসের অঙ্গনে মহাসতীর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সর্বলক্ষ্যে হরিদাসের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস প্রভুকে সমুখে বসাইয়া তাঁহার সেই অপূরণ্য দূরদর্শনের মূর্তি অনিমেহ নরনে ধর্পন করিতে লাগিলেন। তাহার পর সমস্ত উক্তজনগণের পদতলে শিরোভূষণ করিয়া বারবার ঐক্যচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিলেন। মহাপ্রভুর সুখনাথুরী অংলোভন করিতে-করিতে নাম-মহাসাধক ঐক্যচৈতন্য নাম উচ্চারণপূর্বক অঙ্গার তড়-বেহ পরিত্যাগ পূর্বক অঙ্গর চিত্রর ধামে গমন করিলেন। তার পর মহাপ্রভু হরিদাসের সেই কোলে লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। নাড়িতে-নাড়িতে সমুদ্রে গমন করিলেন ও তথায় হরিদাসকে সমুদ্রকূলে স্থান করাইলেন। তার পর—

“হরিবোল হরিবোল বলে গৌর দাস।

আপনি ঐহতে বাসু দিল তাঁর গার।”

হরিদাসের সমাধি তীর্থে পরিণত হইয়া অতাপি সাগর-তটভূমির শোভা সম্বৰ্দ্ধন করিতেছে। উক্ত সাধকের উচ্চম-কুটার তাহারই পূর্বদিকে অবস্থিত থাকিয়া নাম-সাধনের কীৰ্ত্তি বিদ্যোবিত করিতেছে।



ঐক্য চৈতন্যদেব বন্যোপাধায়

ক-এম. আই. ই. এম.



শ্রী ৪ ডক্টর রাধাগোবিন্দ কল



ব্রিট ইংল্যান্ডের জেনারেল
(বিল্ডারে নামেরা সংবাদপত্রের প্রতিবিম্ব)



ব্রিট রুসেল্যান্ডের জেনারেল
(প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী) ইংল্যান্ডের জেনারেল 'অবলান্স'
এই সংখ্যা 'জারভার্ড' প্রকাশিত হইল)

ভীষণ কামান বা অগ্নিবান

[৬চুগীলাল মিত্র]

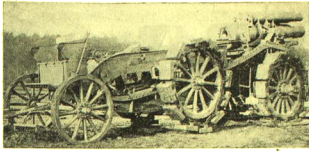
বর্তমান মহাসমরের বহু কাল পূর্বে কোন এক জাতিগণ সামরিক কর্তৃত্ব বিনিময়ছিলেন, Artillery will decide the next war; অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কোন মহাসমর হইবে, তাহার ভয়পত্রের কামানের গোলায় দ্বারা হির হইবে। এই সামরিক কর্তৃত্বের বাক্যের সার্থকতা এখন বেশ উপলব্ধ হইতেছে। বলিতে কি, এই বৃহৎ লোকবল অপেক্ষা অস্ত্রবলই দীর্ঘস্থায়ী অধিকার করিয়াছে।

সামরিক ও মহাজারতে বহিত আয়েসের সকল কবিত্ব কল্পনা বলিয়া বোধ হইত। অনেকই পাত্তপত অস্ত্র, শব্দ-ভেদী বাণ, হৃদয়ন ক্রুর, বিমান প্রভৃতির কথা আশে বিখ্যাত করিত না। কিন্তু আজ যুদ্ধোপায় মহাসমরে ব্যবহৃত অস্ত্র সকলের বর্ণনা শুনিয়া, আমাদের পৌরাণিক যুগের

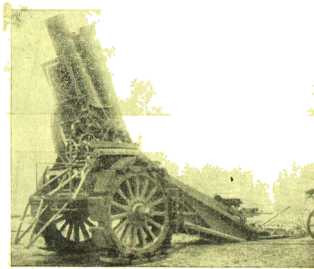
যুদ্ধাঙ্গুলির কথা আর অবিখ্যাত করিতে সাহস হইতেছে না। জাতিগণের দূর-পাল্লার কামানের কথা শুনিয়া অগৎ স্তম্ভিত। আবার জেলসিন, সি-সেল, বাইপেল, liquid fire, air gas প্রভৃতি নারকীয় বৃদ্ধ-উপাদানের কথা শুনিয়া সকলে একেবারে চমকিত।

বর্তমান যুদ্ধের প্রথমই এই বর্তমান কালের আয়েসের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। Spanish-American ও South-African যুদ্ধে এই অস্ত্রগুলি কতক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাই দুই বছরেই বর্তমান আয়েসের উন্নতির লব অনেকটা যুগম হইয়াছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞগণ (Military Strategists) এই আয়েসের আবিস্কার ও উপযোগিতার বিষয় Russo-



১১ ইকি যাপোন রক্ত-মুক্ত কৃষি-কামান
(অতিবর্ণনের উপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে)



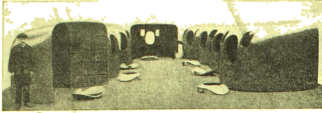
গোলাবৎসাপ্রদ যন্ত্রের কীট হাটাইবার

Japanese যুদ্ধে প্রথমে বিশেষরূপে চিত্তা করেন। যতটুকু কষ্টের করিয়া দুর্বল নির্মাণ করুক না কেন, কামানের গোলাবৎসাপ্রদ যন্ত্রের ধরিয়া যে এই আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি-করে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কে বলিতে পারে? তবে যে দিন তাহাদের সহিত রক্ত-মুক্তের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, সেই দিন তাহারা আগ্নেয়াস্ত্রের গবেষণার কল এই মহাযুদ্ধে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিল।

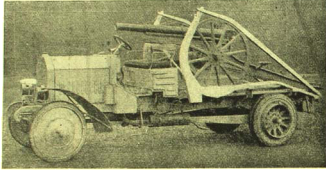
পোর্ট আর্থারের দুর্গগুলি তোপে উড়াইবার কালে জাপান কামানের ভীষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। তখন তাহারা উহার দ্বারা সঞ্চার করিয়াছিল যে, রক্ত-মুক্ত

যতটুকু কষ্টের করিয়া দুর্বল নির্মাণ করুক না কেন, কামানের গোলাবৎসাপ্রদ যন্ত্রের ধরিয়া যে এই আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি-করে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কে বলিতে পারে? তবে যে দিন তাহাদের সহিত রক্ত-মুক্তের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, সেই দিন তাহারা আগ্নেয়াস্ত্রের গবেষণার কল এই মহাযুদ্ধে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিল।

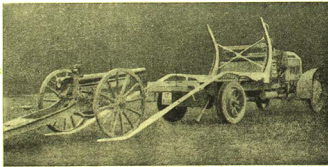
পোর্ট আর্থারের দুর্গগুলি তোপে উড়াইবার কালে জাপান কামানের ভীষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। তখন তাহারা উহার দ্বারা সঞ্চার করিয়াছিল যে, রক্ত-মুক্ত



৬ ইতি মশের দ্রুত গোলাবর্ষী কামানের ইংশার-আজোহন



৬১ সেটিমিটার মশের ডীল বেগুন কামান (গাড়ীতে)



কুল-মিশ্রিত ৬১ সেটিমিটার ডীল বেগুন কামান (ছুঁটিতে)

তাই-রূপ সৈনিকগণ ভাপানী কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হইয়া আর দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

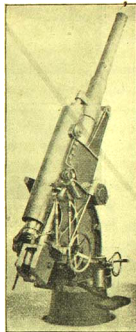
বলকান যুদ্ধেও কামানে শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার ভীষণ কমতা সপ্রমাণ হইয়াছে। তুর্কি সৈনিক যে পৃথিবীর মধ্যে দুর্জয়ের বোদ্ধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল বোদ্ধা হইয়া কি করিবে, উপযুক্ত চালক ও অস্ত্রশস্ত্রের

অভাবে তাহারা আপনায় সাধার্য প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই; আপনাদের অস্ত্রশস্ত্রের কমতা কোন মতেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। অধিক কি তাহারা শত্রুর কামানের প্রত্যগে এত বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, সেবে তাহারা একত্র হইয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

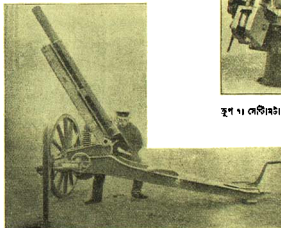
কেহ কেহ বলেন যে, এই বলকান যুদ্ধে কোন পক্ষের

অস-পরাজয় টিক মত নির্ভরিত হয় নাই। তাঁহাদের সে ধারণা ভুল; কারণ, হারাই হোক, আর জিতই হোক, ইহাতে আত্মাণগণের যুদ্ধ-শিলা বাড়াইয়া দিচ্ছে,— তাই আজ তাহারা পৃথিবীর সকল জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছে। যখন সাত্ত্বান জাতি যুলগেরিয়ানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তখন উত্তর পক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল সমানই ছিল; কিন্তু যে পক্ষের অধিক যুদ্ধলব্ধার ও গোলাঘাণ ছিল, তাহারা ই জয়লাভ করিয়াছিল।

প্রভু প্রতীষ্ঠা করিবার জন্য যত না হউক, আরেগারের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বেন এই বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুলে জুপের কামান তুর্কি দেশে বেশ প্রতীষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু জলপথে ব্রিটিশ কামান



রূপ ৭। সেটিনটার বিনদেশী কামান

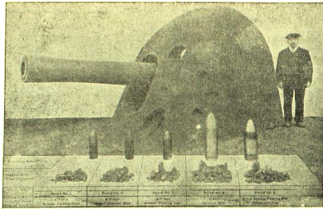


রূপ ৮। সেটিনটার বিনদেশী কামান

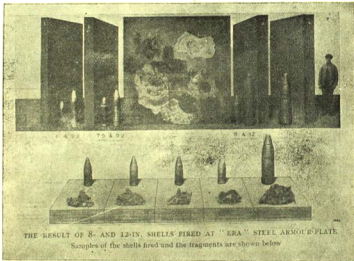
আপনার অল্প প্রতীষ্ঠা দান হইতে বের নাই। ফরাসী (School of artillerists and methods) আরেগার পরিচালকগণ এই তুর্কি পরিচালিত যুদ্ধ-বিদ্যার বিদ্যোতী ছিলেন। ফল কথা, এই দুই শক্তির armament schools-এর মধ্যে ঘোর বিরোধ আছে। তুর্কিগণ জুপপন্থী এবং বলকানগণ জেসোপন্থী। কে না জানে জেসোপন্থী আজ ফরাসী সমরাজ্যের কত উচ্চ আদম লাভ করিয়াছে? ফরাসী কামানের এই প্রাধান্যের কারণ কি? ইহার গুঢ় কারণ এই যে, ফরাসীগণ পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদ

লইয়া কামানের উন্নতির সম্বন্ধে অশ্রুণীকন করিতেছে; আর আত্মাণগণ তাহাদের জুপ কামানের অভ্যন্তরীণ বিদ্য ভাবিয়া নিশ্চিত আছে।

বর্তমান যুদ্ধ দেখে পুরাতন পদ্ধতির অঙ্গুরণ করা হইতেছে। একদিকে জুপ নির্মিত কামান, আর অপর দিকে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত কামান। প্রায় বাট বৎসর কাল আত্মাণ এই জুপকে ধরিয়া বসিয়া আছে। আত্মাণী যেখানে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সিরাজে, সেইখানেই জুপকে আশ্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ আত্মাণীর



০ ই ক তাহাদের ইঞ্জিনের আলোচন

THE RESULT OF 8- AND 12-IN. SHELLS FIRED AT "ERA" STEEL ARMOUR-PLATE.
Samples of the shells fired and the fragments are shown below

ইঞ্জিনের বর্ষ—তাহার উপর বিভিন্ন শেল গোলাঘাতের ফল

দূতগণ পৃথিবীর সকল দেশেই কুণ কাহান বিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অধিক কি, তাহারা হির করিয়াছে যে, যদি দেশের ও জাতির মঙ্গল কামনা করিতে হয়, তাহা হইলে কুণের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন তাহাদের আর অন্য পতি নাই।

বর্তমান যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে কোন এক প্রুইশদেশীয় সমরজ্ঞ পণ্ডিত (artillery technician) বলিয়াছিলেন

যে বর্তমান যুদ্ধেই আর্থাগীর ও তাহার কুণ কাহানের দর্প বর্ষ হইবে; অর্থাৎ আর্থাগীর পতনের সহিত উহার কাহানের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এই পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ বাণী অনেকটা ঠিক হইয়াছে বলিতে হইবে। আর্থাগণগণ কুণ কাহানের এসার বৃদ্ধি করিবার অস্ত্র কত রকম গল্প বে রচনা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। উহাদের এখান উদ্বেষ্ট শত্রুর মনে একটা ভয় উৎপাদন করা। আর্থাগ সৈন্যের

সহিত ১০০, ২৮ ও ৪২ centimetre কামান আছে। এই সকল কামানের বুলিট বাণ ধরিতে হইলে ৮০, ১১ ও ১৭ ইঞ্চি দূর হইবে। আর্থাগ্নী বধন নিজ, নাদুর ও আন্তোয়ার্গ দূর অধিকার করে, তখন জুপ কামানের যে চরমতায় কত গল্প রচনা করিয়াছিল, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। পরে জানা গিয়াছে যে, এই সকল দূর গুলি ধরিতে ২৮ centimetre কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল—তাঁহার উচ্চ নয়। বড়-বড় কামান পাওয়ার দূর গুলি পরিবার জন্ত যত্নত রাখা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে আশা আকাশ-মুখেরে পরিণত হইয়াছে।

আর্থাগ্নী জুপ কামান স্থানান্তরে লইয়া যাইবার বেশ ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা এ বিষয়ে অনেক মাথা খেলাইয়াছে। এ কামানের barrel-বার্ড ও mounting নাম দুইটা স্বতন্ত্র ভাবে নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেকটির একটি করিয়া স্বতন্ত্র গাড়ী আছে। তাহার খাড়া উঠার যত্নে লীড হয় ও তথার দুইটা অংশ একত্র করা হয়। পাছে যাতায়াতের সময় কিংবা কামান ছাড়িবার সময় এই গাড়ী ঘটিতে বসিয়া যায়, তাই উহার mounting টি caterpillar system এর উপর বসান হয়।

এই বস্তুর মোট ওজন প্রায় ৪০ টন অর্থাৎ ১০৮ মণ এবং উহা হইতে যে গোলা নির্গত হয়, তাহার প্রত্যেকটির ওজন অন্তর ৭৫ পাউন্ড অর্থাৎ ২০ মণ। এই কামানের Firing angle অর্থাৎ ছুঁড়িবার দিগাংশ তিরো (দূনা) হইতে গোলা ছাড়িলে এই গোলা সাড়ে ৩৫ মাইল পথ ছুটিয়া থাকে।

বর্তমান কামান যে কি ভয়ানক দায়-বস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আশ্রয় করনা করিতে পারি না। একটি গোলা ছাড়িলে উহা এক মিনিটের মধ্যে উদ্ভিট বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া উহাকে ধ্বংস করে। উহা বর্তমান মহানগরে অতি আশ্চর্যান্বক কল প্রদান করিয়াছে। যদি আশ্রয় কামানের কোন ক্রটি দেখি, তাহা উহার নিজের দোষ নয়—হয় indifferent explosive কিংবা পুরাতন detonator এর দলপ ঘটিয়া থাকিবে।

কোন-কোন স্থানে ৪২ centimetre কামান ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার একটি গোলায় ওজন ১৫০০ পাউন্ড এবং ৪২° ডিগ্রি angle হইতে গোলা ছাড়িলে উহা

৮ মাইল পথ অনায়াসে ছুটে। ইহার গতি প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ ফিটের অধিক হয় না। জুপ কামান ছাড়িবার সময় যে পক্ষাৎ-পতি উৎপন্ন হয়, উহা প্রতিরোধ-করিবার নিমিত্ত উহার সহিত brake সংযুক্ত করা হয়। এই brake এর একটি চাকের ভিতর, piston দেওয়া থাকে। তাহাতে তৈল ও গ্রিসিরিদ্দি গতিকে অনাগ্রাসে প্রশমিত করে।

যে কোন কারণেই হউক, জুপ এই প্রণালী অহুসারে কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু করানী ও ব্রিটিশ জাতি hydro-pneumatic system অর্থাৎ চলিত সাইকেল পম্পের জায় কাজ করে।

আর্থাগ্নী এই সকল বড়-বড় বস্ত্র ইম্পাত ঢালাই প্রথা অহুসারে নির্মিত হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান প্রসিদ্ধ artillerists গণের হাতে উহা অতি প্রাচীন পদ্ধতি এবং বর্তমান কালের সম্পূর্ণ অহুপকৃত। ইংরাজ ও করানী কামানে screw mechanism আছে।

আর্থাগ্নি সাংবাদপত্রে যথো-যথো যে সকল সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৪২ centimetre কামান অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কামান এত অল্প ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, উহার জীবনীশক্তি অতি অল্প। বড় কামান ষ্ট্র নষ্ট হইয়া যায়। দশটা গোলা ছাড়িলে উহার জীবনীশক্তি শতকরা ৪০ অংশ ক্ষয় হয়। ২৫টা হইতে ৩০টা গোলা ছাড়িলে উহা এক রকম অকর্ণ্য হইয়া পড়ে। ইহার কেবল যে দশটা বাতাপ হইয়া যায় তাহা নয়, সমস্ত mechanism নষ্ট হইয়া যায়। কামানের প্রতিঘাত (Strain and stresses of the recoil) এত কঠিন যে, ইহাতে সমস্ত বস্তাদি নষ্ট হইয়া যায়। মেরামত করিলেও আর তাহা কার্যকরী হয় না। ফলে উহা এত অকর্ণ্য হইয়া পড়ে যে, উহাকে পরিভ্রাণ করিয়া একটা নূতনের আশ্রয় লইতে হয়।

আইনী নদীর তীরে যে মহাবৃত্ত হয়, তাহাতে একটি কামান ফাটিয়া যায়। এই ঘটনার কারণ, অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ (overcharge) বলিয়া নির্ধারণ করা হয়; কিন্তু পরে বতবুর জানা গিয়াছে, তাহাতে কিয় হইয়াছে যে, উহার জীবনী-শক্তি শেষ হইবার পর (after its life was completed) ব্যবহার ইহাকে ব্যবহার করাতে উহার এই দূর্বতি ঘটিয়াছিল।

গোলায় দ্বারা শত্রুকে যে ক্ষতি করা হয়, তাহার অপেক্ষা এক-একটা গোলায় মূল্য অনেক বেশী। কারণ, প্রত্যেক গোলায় মাত্র অষ্টাধ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। অর্থাৎ কামানটী যখন শেষ গোলা ছাড়ে, তখন উহাতে ৩২০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ চারি লক্ষ আশী হাজার টাকা ব্যয় হয়।

ফরাসীগণ দুই রকম কামান ব্যবহার করে; যথা "Soixantequinze" ও "Canon lancer"। এই রকম কামানই আধুনিক প্রণালী অনুসারে নির্মিত এবং Crensol ও গভর্ণমেন্ট কারখানায় নির্মিত হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত কামানের মধ্যে প্রথমটী তিন ইঞ্চি; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল কামান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের কোনটার এত ক্ষমতা করিবার ক্ষমতা নাই। ইহার গোলায় ওজন ১৫ পাউণ্ড, কিন্তু ইহা Melinite ও Shrapnel এ পরিপূর্ণ। অপরটার মাপ ৫ ইঞ্চি এবং তাহার এক একটা গোলায় ওজন ৩৬ পাউণ্ড।

বর্তমান ফরাসী (artillery) গোলাবাহী যুদ্ধ-সম্প্রদায় অতি আধুনিক দৃষ্টি। এই মহাসময়ের প্রথম ভাগেই ফরাসীগণ বিখ্যাত্তি কারখানায় কাক চাপাইয়া তাহাদের আরোহীদের অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে।

বর্তমান সময়ে ভার্সাইগণ এক প্রকার দূর-পাল্লার কামান ব্যবহার করিয়াছে; তাহা হইতে গোলা ৭৫ মাইল, ৮০ মাইল, এমন কি ১০০ মাইল পর্যন্ত ছুটিয়াছে। এখন গোলা দাইতেছে যে, উহা অষ্টাদশ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-গণের পক্ষেও ধরা কল। সংবাদপত্রে উহার যে বর্ণনা পাওঁ: দিয়াছে, তাহাতে ধান্য দায়—

The Canon which bombarded Paris is an

Austrian gun of a calibre of 30 mm. The cost of firing works at about \$ 4000 a time so that as twenty four shells were thrown into Paris at the suburbs, the bombardment cost the Germans about \$ 96000 for their eight hours' amusement.

অর্থাৎ যে কামানটী দ্বারা প্যারী নদীয়া আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা অষ্ট্রিয়ানের দ্বারা নির্মিত। উহার বন্দুর ব্যাস ২০ মিলিমিটার। উহা হইতে এক-একটা গোলা দ্বাশিবার খরচ প্রত্যেক বার ১০০০ টাকা; অর্থাৎ আট ঘণ্টার ভার্সাইগণের যে চকিঘণ্টা গোলা পড়িয়াছিল, তাহার খরচ ২৪০০০ টাকা লাগিয়াছিল। কামান হইতে যে গোলা নির্গত হয়, তাহা প্রতি সেকেন্ডে ৪০০০ ফিট ছুটিয়া থাকে।

ভার্সাইগণ এই নূতন কামান হইতে গোলা ৭৫ মাইলের অধিক দূরত্ব লাগে। কামানটী অত্যন্ত দ্রুতবেগে বসিয়া একশতের অধিক গোলা বর্ষণ করিতে পারে না। গোলা-সকল আকাশদ্বারা বক্রপথে ধাবন করিবার সময় বিশ মাইল উড়ে উঠে। আশ্চর্য্যের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশ মাইলের অধিক হইবে না। গোলাগুলি এই বিশ মাইল পথ উড়ে উঠিলে, তাহার একটা নূতন বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই শক্তির বলে উহা তাহার পতন পথে অর্থাৎ ৭৫ মাইল পর্যন্ত অনায়াসে বাইতে পারে।

বর্তমান যুগে কামানের যে লীলাখেলা দেখিতেছি, তাহাতে যেন হয় যে, একদিন উহা ভারতবর্ষে বসিয়া প্রবুদ্র আমেরিকা কিংবা জাপানে গোলা ছুড়িতে পারিবে।

শাঁখারী

[ত্রিমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ]

(১)

করকটী যুদ্ধ মিলিয়া কলিকাতার ৮২ হারিসন রোডের মেগের পূর্বদিকের একটা কক্ষে বসিয়া বেলা দুইটার সময় প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি বই পড়িতেছিল। একজন পড়িতেছিল, আর সকলে শুনিতেছিল।

‘মহাদেব শাঁখারীর বেলে আসিয়া পার্শ্বতীকে শাঁখা পরাটভেদন—এই স্থানে যখন তাহার আসিল, তখন বর্ধাক্ষর বসিল, “আজ, শাঁখারী সেজে কে তোরা বোকে শাঁখা পরিয়ে আসতে পারিস?”

সহসা কেহ উত্তর দিল না।

কীরোধ বিজ্ঞানায় শুইয়া চোখ খুলিয়া ভনিতেছিল; সে অলসভাবে লিভাঙ্গা করিল, “যদি কেউ পারে, তাকে কি দেখা হবে?”

স্বর্গকুমার বলিল, “পচিশ টাকা খরচ করে তোদের এক দিন ভোগে দেখ।”

কীরোধ হাই তুলিয়া উঠিয়া বলিল, “বেশ, আমি যাব; কিন্তু ভাড়টা তোদের দিতে হবে।”

স্বর্গকুমার বলিল, “আজ্ঞা স্বামী আছি, যদি তুই শুখ শাখা পরিষেই চলে আসিস।”

কীরোধ খানিক চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল, “আজ্ঞা, ভাড়া না হয় নাই দিলে, কিন্তু ভোগটা তো নিশ্চিত।”

“জ্বর নিশ্চিত।”

“আজ্ঞা, এখানে তো তিন দিন ছুটি আছে,—আজ রায়েই ট্রেপেই তা হ’লে আমি যাব।” বলিয়া কীরোধ পুনরায় চুপ সূত্রিত করিল।

কীরোধের মনে তখন একটা দতলব জাগিতেছিল। তাহার খ্রী তখন গরায় তাহার ভালক সুখাময়ের নিকটে ছিল। সুখামব দেখানে স্বপ্নের বহু ধনী মজল পাইয়া ওকাশতি আরম্ভ করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে যখন কীরোধের বিবাহ হয়, সুখামবের আসন্ন-স্নেহা খ্রী বীণাপানি গিলাগরে ছিল; সুতরাং তাহাকে সে দেখে নাই। তার পর ২১০ বার সে স্বপ্নবাকী নৈশাটী গিয়াছিল; কিন্তু বীণাপানি তাহার সম্মুখে বাহির হয় নাই। না বাহির হইবার অবশ্র সামান্য একটা কারণ ছিল। এই বীণাপানির সহিতই কীরোধের পূর্বে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ঐকুজির কি একটা পরমিল স্বপ্নায় বিবাহ হয় নাই। তাহার পর সুখামবের সহিত বীণাপানির বিবাহ হয়। তাহার মনন চাকলতার সহিত যখন কীরোধের বিবাহ হয়, তখন এ কথা লইয়া তাহার স্বপ্নবাকীতে সামান্য একটু আলোচনাও হইয়াছিল।

কীরোধ তবু তাহার ভালককে অনেকবার বলিয়াছে—“তেন যৌদি আমার সামনে বা’র হবনে না? আইবুড় মেয়ে’ থাকলে এমন অনেকের সঙ্গেই সম্বন্ধ হয়ে থাকে; তা হ’লে কি সে কোচাধাদের একেবারে বীণাস্তরে পাঠাতে হবে? আরও—যৌদি তোমাদের ঠাকুরের সামনে

বা’র হয়, চাকরের সঙ্গে কথা ক’ন; আর আমি অবিশ্রী সামান্য রকমের একটু শিক্ষা পেয়েছি, চরিত্রও বেয়াং খাড়াপ নয়,—তেন না, তা’ হলে তোমরা আমার সঙ্গে এত বড় সম্বন্ধটা স্বীকার করলেই পারতে না—তবু কি আমি তোমার ঠাকুর-চাকরের চেয়েও অধিখাত?”

সুখামবও অনেকবার তাহার খ্রীকে এ সম্বন্ধে অনেক অহরোধ করিয়াছিল। কিন্তু বীণাপানি একটু অধিক লজ্জাশীলা ছিল বলিয়া এবং পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটায়, কিছুতেই তাহার নমাইয়ের সম্মুখে বাহির হয় নাই। এমন কি, খ্রী স্বভাব শূন্যত কোভুলসবশে সে একবার নমাইকে সুখাইয়াও দেখে নাই—পাছে কেহ তাহাকে কীরোধের সম্মুখে বাহির হইবার লজ্জা ধরিয়া বসে। কীরোধ তাহার খ্রীর নিকট বলিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক যৌদি’কে তাহার সম্মুখে বাহির করিবেই।

শাখা বেচিবার কথা উঠিযামাত্র, কীরোধের মাথায় একটা কন্দী আসিল,—“যদি শাখা লইয়া গরায় বাওরা যাব, তাহা হইলে ঠিক হয়। দেখানে স্বপ্ন-স্বাভাবীও নাই যে কোন মূল্য দিবিবে।”

(২)

অপরাত্নে কীরোধ যখন স্বর্গকুমারকে বলিল, “তা হ’লে হুবি-বা’ শাখা-টা’খা সব আনিরে দাও,—আজই রাতের ট্রেপে যাব,” তখন যেসের সকলেই লজ্জা-সত্যাই আশ্চর্যাবিহিত হইয়া গেল। উহা যে রহস্ত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে, এ কথা তাহাদের মধ্যে কেহ ভাবেও নাই। কিন্তু কীরোধের কথাব্যক্তীয় যখন তাহারো বুদ্ধি লসাই সে ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারিবে, তখন সকলে মহোন্মাদে নৃতন-বাজার হইতে বোড়া-কুড়ি শাখা কিনিয়া আনিল। ইহা গেল বহু-বাকবের খরচ। তাহার পর নিম্নের ব্যয়ে সে দুই বোড়া হস্তর কারুকার্য-খচিত চাকাই শাখা কিনিয়া লইল।

যেসে আসিয়া এক-এক বোড়া শাখা পৃথক করিয়া কাগজে মোড়ক করিয়া লইল। একটা পুরাতন ক্যাশিনের ব্যাপ তার পূর্বেই সংগ্রহ করা ছিল,—তাছাড়া বেশ করিয়া শাখাগুলি শুকাইল। একখানি দেখী কোচোন হস্ত-পাড ধুতি, একটা আড়ির পাছাবো, দিহি উড়ানি

একখানি ও একঝোড়া পশু হু বাগের ভিতর লইল। পরিল একখানি আধ-ময়লা ধান, একটা আধ-ময়লা সাট ও একখানি বিগাঠী উড়ানি; পায়ে একঝোড়া সাদা-সিঁদা ব্রাউন রংয়ের চট।

স্বাস্থ্যে কয় বছর মিলিয়া একখানি খোড়ার গাড়ী করিয়া কীর্ত্তনকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া গেল। বাইবার সময় শব্দর বলিল, “দেখো ভাই, সেখটা যেন বাহুটী সেজে ‘ভাঁহ’ কাছে গিরে আদ্যদের ধেমন্ বোকা বানিয়েছে’, এ সব বলে হাসির কোয়ারা তুলো না।”

কীর্ত্তন বলিল, “এ সামান্য কাজটাও যদি না পারি, তা হ’লে কিরে এসে, তোমাদের কাছে নিম্নের দুর্জলতা স্বীকার করে, তোমাদের টাকটা আনিই দেব। আমি সত্যি বলবো এ বিখাপ তো আছে?”

সকলে সম্বরে বলিল, “হাঁ—হাঁ, তা আছে।”
গাড়ী ছাড়িয়া গেল।

(৩)

বেলা আনান্ন বায়টার সময় ষ্টেশনখানি গয়া ষ্টেশনে ধামিতেই, নবীন শাখাটি প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িল। তাহার গায়ের কামিজটা তখন বাগের গর্তে অস্তিত্ব হইয়াছে; আধ-ময়লা উড়ানিখানি এক কাঁধে ফেলা, আর এক কাঁধে বাগ।

নবীন শাখারী কিয়ৎক্ষণ চলিয়া, একটা নির্দিষ্ট পথের মোড়ে গাঁড়াইয়া, বাগটা বেশ করিয়া কাঁধে বাগাইয়া লইল; ও “শাঁধা চাই, ভাল শাঁধা” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই পথে চলিতে লাগিল।

সেই সন্ধ্যায় বাঙালীর বসতিই বেশী। সেই দূর বিহাও প্রবেশে বাঙালীর ঘরে হইয়া শাঁধা পরিবার স্নাতক সম্বরণ করা নিত্যই প্রসাধন। অনেক বাড়ী হইতে আনান্ন আসিল। দুই-এক বাড়ীতে শাঁধা দিয়া এবং কতকগুলি বাড়ীর আনান্ন উপেক্ষা করিয়া শাখারী একটা লাল-রঙের দিল্লি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাঁড়াইল। ঘরের এক পার্শ্বে কৃষ্ণ প্রস্তর-কলকে ইয়েরীজীতে দোণার জলে লেগা ছিল ‘স্বধারয় রায়, এন্-এ, বি-এন্’। একটুখানি তাবিতা লইয়া শাখারী ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠের ঘরে হাঁকিল, “চাই ভাল কাব-করা ঢাকাই শাঁধা।”

শাখারী বেধানে গাঁড়াইয়াছিল তাহা বহিরাটী। একটু পরেই হুলাতী তদেবীয়া দানী আসিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া গেল। শাখারী অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার দ্বারের পাশেই গাঁড়াইয়া রহিল। অনতিবিলম্বে একটা গোরাগী সুনসী কিপোরা ‘কি রকম শাঁধা দেখি’ বলিয়া বস্ত্র-হিম্মলের হত দ্বারের কাছে আসিতেই, শাখারীকে দেখিয়া বিস্ময় ও হর্ষে চমকিয়া উঠিল। শাখারী ভাড়াটাকি নিম্নস্বরে বলিল, “চুপ, চুপ,—বো’দিকে যেন কিছু ব’লো না; তোমাদের শাঁধা পরাতে এসেছি।”

চাকরতা স্বামীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছে যে, কোন-না-কোন কিছুর করিয়া তিনি বউদিগকে সামনে বাহির করিবেনই। স্তম্ভতা সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। একবার মুচ-মুচ হাসিয়া যে তখনই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার বৌদিদি বীণাপাণি তখন উপরের ঘরে ছিল। চাকর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “বো’দি, শাখারীকে তা হ’লে ভিতরে ডাকি, তুমি নেমে এস, দেখবে।”

বীণাপাণি নামিয়া আসিতেই, চাকর বহিরাটীর নিকে চাহিয়া বলিল, “ওগো, শাঁধা নিয়ে এদিকে এস।”

শাখারী বিশেষ চেষ্টা করিয়া হাত দমনপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রথমেই একবার বাড়ীর চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া উঠানে বলিয়া বাগটা তুলিল।

দুটী তরুণীই তখন ঘরের বায়ান্নার গাঁড়াইয়া ছিল। বীণাপাণির সুবে দ্বৈত অবলম্বন ছিল, যদিও তাহার মধ্য হইতে তাহার হৃদয় সুখখানি দেখিতে পাইবার কোন বাধা ঘটতেছিল না।

“তা হ’লে, কি রকম শাঁধা নেবেন, যিদিমদি, একবার দেখুন” বলিয়া শাখারী বীণাপাণির নিকে চাহিল।

বীণাপাণি নিম্নস্বরে চকলতাকে বলিল, “তুমি পছন্দ করে নাও ভাই, ঠাট্টাও।”

“পূব ভাল কাব-করা শাঁধা বার কর” বলিয়া চাকরতা উঠানে নামিয়া আসিল।

বেশ সুস্থ, চাকরতা-বাচিত দুই কোড়া ঢাকাই শাঁধা বাহির করিয়া শাখারী বলিল, “আপনারা নিজেরা প’দ্বেন, না পরিচর দিতে হবে? নিজেরা প’দ্বতে গিরে যদি ভেদে কেলেম, সে কিন্তু আপনাদের বাবে।”

চাকলতা বলিল, “তা তুমিই পরিয়ে দাও।” পরে তাহার বৌদিগির পানে চাহিয়া বলিল, “নিজেরা পরলে ঠিক মানানসই হয় না, বড় ঢলঢলে হয়, না বৌদি?”

বলিয়া চাকলতা অঙ্গের হইয়া দেখানে বলিল ও শিখারীর প্রসাবিত হস্তের উপর আপনায় হৃদয় স্নেহের মল্লকগুলি এক-এক স্থাপিত করিল।

শিখা পরিবার সমস্ত চাকলতার চাকলজিত সুখখানি ও শিখারীর সুখের হাসি লুকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা যদি বীণাপানির দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা হইলে অনর্থ খচিত,—বীণাপানি কিছুতেই শিখারীর কাছে শাখা পরিতে চাহিত না। কিন্তু চাকল সুখ বীণাপানির বিপরীত দিকে ছিল ও শিখারীর সুখ চাকলতার অন্তরালে লুকান ছিল,—তাই বীণাপানি এ সব কিছুই লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি,—আমাদের অন্তঃপুরে এমন অনেক পুমান্নী আছে, বাহ্যিক নিকট আত্মীয়ের সমুখে বাহির হইতে-লজ্জা বোধ করেন; কিন্তু কিরি-ওয়ারাদের নিকট চুড়ি বা শিখা পরিতে বিশেষ কুষ্ঠা বোধ করেন না।

হৃদয় মনোরম শিখা চুগাছি পরিয়া চাক বীণাকে বলিল, “বৌদি, এইবার এস।”

বীণাপানি একবার মুহুরের বলিল, “তুমি লজ্জা করে এনে পরিয়ে দাও না তাই, আমার লজ্জা করে।”

চাক নিকটে আসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, “না বৌদি, তুমি ওরই কাছে পরে দাও। মানানসই হ’লে খালি দেখাবে ‘খন’।”

বীণাপানি আর আপত্তি না করিয়া চাকর সঙ্গে নামিয়া আসিল। চাক পাশে ঠাঁড়াইয়া রহিল,—বীণাপানি বলিয়া শিখা পরিতে লাগিল।

চাককে শিখা পরাইতে শিখারী বস ঘেরী করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অল্প সময়ে বীণাপানিকে শিখা পরাইয়া দিয়া সে মুহু হস্তের সহিত বলিল, “দিখা মানিয়েছে।”

বীণাপানি নিরতিশয় লজ্জিত ও ঈর্ষ বিরক্ত হইয়া বারান্দার উঠিয়া আসিল।

প্রণলতা চাক বিজ্ঞাসা করিল,—“আর আবাক কি?” আর একবার হাসিবার অবকাশ পাইয়া হাসিয়া লইয়া শিখারী বলিল, “আপনাকেও চমৎকার দেখাচ্ছে।”

যাম দিটারীয়া দিয়া উপরে আসিতেই, বীণাপানি একই বিরক্ত-বিরক্ত বলিল, “ছি ঠাকুরকি, ওর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা তোমার ভাল হয় নি।”

চাক একই অপ্রস্তুতের ভাব দেখাইয়া হুল করিয়া রহিল।

উঠান হইতে শিখারী বলিল, “ঠাকুর, একই খাবার জল পাব? পরনে ঘুরে-ঘুরে বড্ড তেঁটা পেয়েছে।”

বীণাপানি পূর্ন হইতেই শিখারীর উপর একটু চট্টা-ছিল; সে চাককে বলিল, “ঠাকুরকি, ওকে বাইরে গিয়ে বসতে বল; লজ্জা নিয়ে জল দিয়ে আসছে।” চাক তাহাই বলিল। শিখারী উঠিয়া বাইরে গিয়া বারান্দায় বেশ একটু আশ্রয় করিয়া বসিল।

তদুপ জল মাথাকে দিতে নাই,—তাই লজ্জা খানিকটা তিনি দিয়া শিখারীকে জল দিয়া গেল। লজ্জার সহিত বেশ একটু ভাব করিয়া শিখারী বলিল, “ঠাকুরকির বলগে সত্যার সময় চাট্টা পেলাব পেয়ে যেতে চাই। আর সফল বেশা খাওয়া হয় নাই।”

লজ্জা আসিয়া ‘বহুদা’কে সে কথা বলিল। খানিক পরে চাকলতা বীণাপানির কাছে আসিয়া বলিল, “সত্যি, বৌদি, শিখাগুলি স্নায়ব দেখাচ্ছে।”

বীণা বলিল, “তাহা’ক, মিলেটা কিন্তু ভারী বড়। পেরন্তর বৌ কিম্বের সুখের পানে চেয়ে অমন করে বেহাচার মত হাসে কেন? আকেন?”

চাক হাসিয়া বলিল, “শিখারীর চেহারাটা ভাল কি না, তাই বোধ হয় তাৎবে—হাসলে ওকে বেশী ভাল দেখাবে। চেহারাটা কিন্তু সত্যি বেশ, মর বৌদি?”

ঐরা ব্যাকহায়া ঈর্ষ-ক্রোধ তাৎবে চাকর পানে চাহিয়া, বীণাপানি কহিল, “তোমার আর হ’বেছে কি ঠাকুরকি?—শিখারী হৃদয় কি স্নায়বিত, আমাদের ত’তে দরকার কি?”

চাক একই সুর হইয়া বলিল, “হৃদয়কে হৃদয় বললে কি কোন সোম হয়, বৌদি?”

বীণাপানি তৎকথায় উত্তর করিল, “হ্যাঁ, আমাদের হয়। ঈর্ষ চোখে খানী ছাড়া কাউকে হৃদয় দেখতে নেই।”

চাক বলিল, “কি জানি তাই, খানী অহৃদয় সে কথা

বলুহিনে; কিন্তু তাই বলে একেও কুৎসিত বলতে পারিলে না।

“তুমি তাকে শুনিযেই তাই, দুবার ‘হুম্মর’ ‘হুম্মর’ বলে এস না। আমার ও-সব ভালো লাগে না।” বলিয়া বীণাপাণি বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল।

এ সময় লইয়া রহত সে ভালবাসিত না।

(৪)

রাগ করিয়া বীণাপাণি আপনার ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার পর স্বামীর অসুখ বল-
খাবার ঠিক করিয়া, পান সাজিয়া রাখিয়া, তাহার ঘনে হইল, ঠাকুরির উপর অত রাগ করিয়া ভাগ হইয়া গেল; হর ত তাহার ঘনে আসিতে পারিয়াছে।

তখন বীণাপাণি চারুকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার ঘরে গেল; কিন্তু সেই ঘরে চারুকে পাওয়া গেল না। উপরের সব ঘর-কটাই বীণাপাণি খুঁজিল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

যে অভিমতানী ঘরে,—হর ত নীচে কোথাও বসে কান্ধে ভাবিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। পাইএর নিকট আসিল চারু বাগানের দিকে গিয়াছে। বাগানটী তাহারে বাসারই সহিত সংলগ্ন।

একটু অহতপ্ত চিত্তে বীণাপাণি বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঘর অতিক্রম করিয়া বাগানের মধ্যে আসিতেই সে দেখিল, চারু ও সেই শাখারী মুখো-মুখী করিয়া একটা গাছের তলার দাঁড়াইয়া; এবং চারুর হাত দু'খানি তাহার হাতে বদ্ধ। বীণাপাণির পা হইতে মাথা পর্যন্ত কি বেন একটা বহিরা গেল;—বাধজান সুপ্রসার হইল। কতক্ষণ যে সে সেখানে হতজান অবস্থায় ছিল, তাহা তাহার মনে নাই। প্রকৃতিস্থ হইয়াই একবার ভীত কণ্ঠে ‘ঠাকুর’ বলিয়া ডাকিয়াই বীণাপাণি ক্রতবেগে উপরে আসিয়াই, তাহার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বীণাপাণির বুক কাটিয়া বাইতে লাগিল। তাহার কত মাথের ঠাণ্ডুখি, বাহ্যকে সে শ্রোণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছে, তাহার এই কাজ! ক্ষোভে, দুঃখে তাহার চোখ কাটিয়া জল আসিল।

ঘণ্টা বারেক পরে হুম্মার আদালত হইতে ফিরিয়া

নিজের কণ্ঠ-দ্বার বন্ধ-বেঁধিয়া বিস্থিত হইল। অল্প দিন সোপানের উপর-প্রান্তে বীণার কমলপাণি ছুটি তাহার কণ্ঠের প্রত্যাশার অপেক্ষা করিয়া থাকিত; আর আশা এ কি!

একবার ডাকিতেই বীণাপাণি দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার মুখ চোখ দেখিয়া, সে যে কাঁদিতেছিল, তাহা বুঝিতে হুম্মারের বিলম্ব হইল না।

হুম্মার সরসেই ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কি হয়েছে .
পাণি?”

হুম্মার ত্রীকে ‘পাণি’ বলিয়া ডাকিত। প্রথম-প্রথম এ ডাক শুনিয়া বীণাপাণি বলিয়াছিল, “বা বে, আমার তো সবাই বীণা বলেই ডাকে! তুমি আমার পাণি বল কেন?”

হুম্মার উত্তর দিয়াছিল, ‘পাণি’ মানে জল জান ত। তুমি আমার তেঁতার পাণি কি না, তাই।”

বীণাপাণি পূর্ব হাসিয়া বলিয়াছিল, “ও হরি, এই বুঝি তুমি বাধনা জান! এখানে পাণি মানে বুঝি জল, এ পাণি মানে তো হাত।”

হুম্মার বিশ্বাসের ভান করিয়া উত্তর দিয়াছিল, “ও, তাই বুঝি! তা’হলে, তুমি আমার ভান হাত কি না, তাই।” অন্ততঃ বীণাকে পাণি নামই মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া বীণাপাণি কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। একটু ভাবিয়া বলিল, “আমি একটা কথা বলবো, তুমি?”

হুম্মার হাসিয়া বলিল, “এই তো পাণির বেশ বুঝি হয়েছে যেখি,—নিবিব করিয়ে নিয়ে কথা বলতে নিখোছে।”

বীণাপাণি স্বামীর হাত বরিয়া বলিল, “না, তুমি ঠাট্টা করো না; আমার কিছু না জিজ্ঞাসা করে আমার কথা রাখবে বল?”

“খাফা, বল কি কথা।”

সবদা বীণাপাণির মনে পড়িল, স্বামীর এখনও যে হাত-মুখ খোঁজা পর্যন্ত হয় নাই। সে নিরতনর লজ্জিত হইয়া বলিল, “সে কথা এখন থাক,—তুমি আগে জলটল খাও, তার পর বলবো।” বলিয়া একে-একে স্বামীর জুতা, মোজা, জামা ইত্যাদি খুলিয়া ধোয়াহানে রাখিয়া দিল। হুম্মার তখন পাংসুব খুলিয়া কাপড় পরিতে-পরিতে বলিল, “উঁ হঁ, কথাটা না শুনে আমি কিছুতেই বাব না। পাণির

চোখে পানি যেমিয়েছে, এত বড় কথা না শুনে কি আমি স্থির হতে পারি ?”

‘পানি’ তখন বড়ই সুস্থিরে পড়িল। একটু ভাবিয়া অগত্যা সে বলিল, “ঠাকুরদিকে তুমি এবার ঠাকুরজামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও।”

স্বামীর একটু বিস্ত্রিত হইয়া বলিল, “কেন বল দেখি ?”

পানি। আমি তো বলছি, তুমি কিছু বিজ্ঞাপন করতে পাবে না।

স্বামীর। তা না শুনে, হঠাৎ কি বলে তাকে পাঠাই বল ? চাক কি যেতে চায় বলছে ?

পানি। তা আমি বল্‌বো না।

স্বামীর দৈর্ঘ্য পঙ্কীর ভাবে বলিল, “এ যে তোমার নেহাৎ ছেলোমাহুদী, পানি !”

স্বামীর সাত্ত্বিক বীণাপানি সবচেয়ে বেশী ভয় করিত। তখন সে একে-একে শাখারী সংক্রান্ত কথাগুলি বলিল; —ছদ্মনের হাতে হাত দেওয়া ছিল, এ কথাটা বাদ দিয়া গেল। শাখারী যে এখনও বাহিরের ঘরে আতিথ্যের অপেক্ষার বসিয়া আছে, তাহাও বীণাপানি বলিল।

অধিকতর পঙ্কীর হইয়া স্বামীর বলিল, “এ অসম্ভব, পানি,—নিশ্চয় তুমি ভুল দেখছ।”

পানি কঁদ-কঁদ হইয়া বলিল, “আমি ঠাকুরদিকে এত ভাসবানি, আমি বুঝি তার নামে একটা মিছে কলঙ্ক দিতে পারি। ঠাকুরি ভাল হবে বলেই তো আমি এ কথা বলছি। নইলে, সে চলে গেলে আমার বুঝি মন কেমন কর্‌বে না ?”

“আজ্ঞা, এখনি তোমাকে আমি সঠিক খবর দিচ্ছি।”

বলিয়া স্বামীর তাকাতাড়ি বর হইতে, বাহির হইয়া বরাবর নিচে নামিয়া গেল।

একটু পরেই বীণাপানির বড়ই ভয় হইতে লাগিল; এখনি হয় ত একটা কি কাণ্ড হইয়া পড়িবে। কেন সে মরিতে এ কথা বলিতে গেল।

স্বামীর হইয়া সে ঘরের বাহিরে আসিবে, এমন সময় চাকলতা সুখবানি জান করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “হামাকে বলে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ।”

এ কথা শুনিয়া বীণাপানির চম্ হইতে টপ-টপ করিয়া অল পড়িতে লাগিল। অক্ষরদ্ধ কর্তে সে বলিল, “তুমি কেন ঠাকুরি ওর সঙ্গে বেধা কর্‌লে ? আমি যে নিজে বেধা লাম তুমি তার হাতে—”

বীণাকে ধামিতে দেখিয়া চাক বলিল, “হাত দিয়েছিলাম এই তো ? তবু তো ভাই, গলা বড়িয়ে ধরি নি।”

বীণা চাকর এই প্রগল্ভতার অবাক হইয়া গেল। অন্তস্ত আহত হইয়া সে বলিল, “ছিঃ !—”

চাকলতা তখন হাসিয়া বলিল, “ও শাখারী কে,— চিন্তে পারনি বোঁধি ? ও যে তোমার নবাই—ঈশ্বর কী—বাবু।”

বীণা একবারে আকাশ হইতে পড়িল।

চাকলতা বলিল, “তুমি কিছুতেই ঠিক হুজুখে বা’র হ’তে না কি না—ভাই উনি শাখারী সেজে এসে তোমার হাত পর্যন্ত—”

এমন সময় স্বামীর ব্যাগ সমেত কীরোদকে টানিয়া আনিয়া সেই ঘরের মধ্যে হাজির করি বসিল, “এই দেখ পানি, এনেছি শাখারীকে ধরে। নাও তো সব শাখাগুলো একত্রে। আমার পরিবারকে কি না শাখা পরাতে অসা ?”

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[ঐশ্বর্যময়প্রসাদ রায়]

আটিকেবল কথা :-

বলভাবার প্রকৃত নাটক নাই বলিয়া হুঃ প্রকাশ অনেক লেখকই করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু নাটক কিসে হয়, নাটক কাহাকে বলে, এ সব কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া

বলিবার জন্য বড় বেশী কেষ্টে করিয়াছেন, এমন নয় হয় না। যে ছি চারিজন লেখক অর-বর সে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহা যে সফল হইয়াছে, এমনও মনে করি না। কেন তাহা মনে করি না, সেই কথাই এখানে

বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব। তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে মনে হয়, বাঙ্গালা নাটকের উপর বাঙ্গালী সমালোচক-গণের অধ্যা আক্রমণের কতকটা কারণ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটক জিনিষটার বিশেষত্বটুকু যে কি, তাহাও বুঝিয়া লইবার পক্ষে সকলের একটু সুবিধা হইবে। অনেক সময় দেখিয়াছি, ইহা কি, তাহা প্রথমে না বলিয়া, ইহা কি কি নহে, তাহা বলিলে জিনিষটার পরিচয় কতকটা সহজ-বোধ্য হইয়া আসে।

মনে হইতেছে, সমালোচকের আসনে বসিয়া বঙ্কিম বাবুই সর্বপ্রথম বঙ্গীয় নাটকের প্রতি উৎকট উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তিনি “নয়শো ভূপেয়া” গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১২৮০ সালের ‘বঙ্গদর্শনে’ লিখিয়াছিলেন,— “বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত নাটক একখানিও নাই। যে খণ্ড খাফাতে হামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি লগতের মধ্যে মহত্বের অশাস্ত্র কার্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে খণ্ড বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটি খণ্ডের কথা বলি। মানসিক পরিবর্তন। একজন বৃদ্ধিহীণ ব্যক্তি অপর এক বা বহুব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায়, তাহা ভাল নাটকে দৃশ্য রূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো—যে অতি অল্পকাল মধ্যে ত্রী-মাতক হইবেন; অনন্ত চিন্তাসিঁদল হামলেট যে স্বীয় স্বীকৃতির জীবন ও ফিলিয়াকে বিসর্জন করিবেন, সেই প্রণয়িনীর পিতাকে সংহত বধ করিবেন; কার্ণা-কুলল রাজ সন্ধানদারী ম্যাকবেথ যে নিস্ত্রিত গৃহগত অন্নদাতা রাজাকে খণ্ডে হত্যা করিবেন, তাহা পূর্বে জানা যায় না। কি কোশলে, কি রূপে, মানব-চিত্তের একদম পরিবর্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।”—কিন্তু নাটকের বিচার কি এইখানেই শেষ হইল? বঙ্কিম বাবু যখন উহা লিখিয়াছিলেন, তখন অল্প ‘প্রহ্লাদ’ বা ‘বিদ্যমঙ্গল’ বা ঐতর্য মানসিক পরিবর্তনের অপূর্ণ চিত্র-সংশ্লিষ্ট অল্প কোনও বাঙ্গালা নাটক একখানিও রচিত হয় নাই, এক কথা সত্য। কিন্তু নাটকের নাটকত্ব কি কেবল ঐ চিত্র-পরিবর্তনের চিত্রের উপরই নির্ভর করে? যদি তাহা করিত, তাহা হইলে কাগিরাগের অল্প কথিঁ অতিজ্ঞান শকুন্তলা কখনই নাটক নামে অভিহিত হইত না। শুধু অতিজ্ঞান শকুন্তলা কেন, তাহা

হইলে সংস্কৃত-নাট্যে নাটক বলিয়া বোধ হয় কোনও ভিনিষই থাকিত না। এমন কি, যে সেক্সপীয়ারের নাটকে আদর্শ ধরিয়া বঙ্কিম বাবু বলভাষার নাটক নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সেই সেক্সপীয়ারের ‘হার্জেট অফ-ডিনিস্’ ও ‘রোমিও জুলিয়েট’র মত অমূল্য নাটক দুইখানিও তাহা হইলে নাটকের তালিকা হইতে যায় পড়িত। ঐ সকল কোনও নাটকেই তেমন মানসিক পরিবর্তনের চিত্র নাই। “একজন বৃদ্ধিহীণ ব্যক্তি অপর এক বা বহু-ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায়, তাহা” ঐ সকল কোনও নাটকেই-চিত্রিত হয় নাই। আশাধর বিবেচনায় বঙ্কিমবাবু দ্বারা বলিয়াছেন, তাহা নাটকের প্রকৃত ও প্রধান লক্ষণ নহে;—তাহা আব্যান-কাব্যের গুণ বিশেষ। উহা না থাকিলেও নাটকের অঙ্গহানি হয় না। নাটকের প্রকৃত ও প্রধান লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহিলে, বঙ্কিম বাবু বোধ হয় লিখিতে পারিতেন না,—“বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত নাটক একখানিও নাই।”—কেন না, বঙ্গীয় নাট্য-লগতের গুণম হুগ্রভাত,—তখন ‘নীলদর্পণ’ প্রকাশিত হইয়া অভিনীত হইতেছে। ‘নীলদর্পণে’ নানা গুণগণনা না থাকিতে পারে, কিন্তু নাটক্যাংশে উহা দুর্বল নহে। কেন দুর্বল নহে, সে কথা পরে বলিতেছি।

বঙ্কিম বাবুর পর স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আবার নাটকের লক্ষণ আর একরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ১২৮৭ সালের ‘বঙ্গদর্শনে’ যখন ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’র সমালোচনা করেন, তখন তাহার একস্থানে লিখিয়াছিলেন,— “জনসং উল্লিখি যে, অখণ্যমান হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্যের দৃশ্য ব্যথিত হইয়া উল্লিখি। তিনি সত্যপ্রিয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্মপুত্রের ধর্ম-নিষ্ঠা ইতি গগনোপরি পণ্ডিত হইল। • • • কি ভয়ানক আশ্চর্য্য। যে মহাশয় কখনও প্রবক্তার কথা কহেন নাই, তিনি সত্য ব্রাহ্মের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, তিনি সত্য এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে সত্যকেই অক্ষরনিধি বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই কি না আমে চিরজ্ঞান দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্য়ের সোভে সত্য সংহার করিলেন! একেই বলে প্রকৃত আশ্চর্য্য-হত্যা,—আশ্চর্য্যতা হ্রাসের নহে যুধিষ্ঠিরের। একেই বলে বাৎস্ক্যিকর দ্বারা অহুশাসিত হওয়া—বাৎস্ক্যিকর দ্বারা নিধন-প্রাপ্তি। নাটককার এই প্রকার আশ্চর্য্যতা নিবারণ

করেন। এমন স্থলে আশ্চর্য্য না দেখাইয়া নাটককার আশ-গৌরব দেখাইয়া থাকেন; আশ্বার পরামর্শ না দেখাইয়া বিষয় দেখান।—“আশ্বার পরামর্শ ও বিষয়” কথা দুইটা ব্যবহার করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু যেন কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু ঐ কথার পোশাযোগের মধ্যে এখানে আশ্বার প্রবেশ করিব না। ‘ঐক্যের’ শোভে সুদীপ্তির সত্য সংহার করিলেন’ বলিয়াও ‘চন্দ্রনাথ বাবু সুদীপ্তির-চরিত্রের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু সে কথার আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উহার সম্বন্ধে কোনও কথা কহিব না। নাটকের নাটক্য বলিতে তিনি কি বুঝিতেন ও বুঝাইতে চাহিতেন, সেই-টুকুই এখানে আশ্বারের দ্বারা প্রয়োজন।

যতদূর বুদ্ধিগাঢ়ি, তাহাতে মনে হয়, বঙ্কিম বাবুর মতের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুর মতের কতকটা সংঘর্ষ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু যে মানসিক পরিবর্তনের চিত্রকে নাটকের সর্ব্বত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ বাবু সে চিত্রকে আদৌ আশ্রয় দেন নাই। বিশেষ পড়িয়া—প্রলোভনে পড়িয়া, ভাল লোক কেমন করিয়া ভাল থাকে, এ ছবি নাটকে যদি অস্তিত্ব হয়, তাহা হইলেই চন্দ্রনাথ বাবুর মতে ভাল ‘ভাল নাটক’। বঙ্কিম বাবু যেমন হামলেট, হ্যাকবেথ ও ওথেলো প্রভৃতি সেক্সপীরের-সহ-চরিত্রের নির্দেশ করিয়া নিজ উক্তি সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ বাবুও তেমনিই সেক্সপীরের এন্টোনিও-চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজ-মত দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এন্টো-নিয়ের এই উক্তি—

“I have heard,

Your grace hath ta'en great pains to qualify

His rigorous course; but since he stands obdurate,

And that no lawful means can carry me Out of his envy's reach, I do oppose My patience to his fury; and am arm'd To suffer with a quietness of spirit, The very tyranny and rage of his.”

উদ্ধৃত করিয়া তাহার ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ প্রবন্ধের

একস্থানে বলিয়াছেন,—“এই কি সেই ঐশ্বর্য্যশালী, অশ-শয়নাশী, প্রেমবদ্ধ-বেষ্টক, সম্ভিতসুখ প্রেমপূর্ণ এন্টোনিও? তাহার কথা শুনিয়া ত তাহাই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক আজ তিনি কি? বাস্তবিক আজ তিনি পথের ডিবালা। আর তিনি তাহার প্রেমসুখের ককণ-জ্যোতির্বিভূষিত, স্ত্রীতিপূর্ণ, হৃদয়স্থ গৃহ হইতে তড়িত হইয়া বিজ্ঞানালয়ে পাড়াইয়া মুক্তার আচ্ছাদিত করিতেছেন! তবুও তাহার এই রকম কথা! পাঠক! ইহাকেই প্রকৃত নাটক-রহস্ত বলে।—কিন্তু ‘প্রকৃত নাটক-রহস্ত’ যদি উহাই হয়, তাহা হইলে জগতের বহু বিখ্যাত নাটকেই ঐ নাটক-রহস্ত নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি, হ্যাকবেথ, হামলেটও তাহা হইলে নাটক নামের যোগ্য হয় না। আশ্বারের বিবেচনার, উহাকে ‘প্রকৃত নাটক রহস্ত’ বলে না। উহা আখ্যান-কাব্য-বিশেষের ভণের কথা হইতে পারে, কিন্তু উহাকে নাটকের নাটক্য বলা যায় না।

বঙ্কিম বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু ইংল্যান্ড কেহই সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিয়ম অঙ্গুলর করিয়া বা ইংল্যান্ডী সমালোচনার বুদ্ধি-তরু প্রয়োগ করিয়া নাটক ক্রিষ্টীয় বিচার করেন নাই। উল্লেখ্য দার্শনিক বলিয়াছেন, তাহা তাহাদের মন-গড়া কথা।—মন-গড়া কথা বলিয়া যে মেটা উপেক্ষার বিষয়, এমন কথা অবশ্য বলি না। সমালোচনা যদি সমালোচনার বিপরীত সামগ্রীর মূলতত্ত্ব অঙ্গুলর ও উপাটন করিয়া স্বাধীন ভাবে বুদ্ধির সহিত লিখিত হয়, তবে তাহা তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু বঙ্কিম বা চন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত ছই-এক-খানি ইংল্যান্ডী নাটককে আদর্শ ধরিয়া আখ্যান-কাব্যের গুণ-বিশেষকে নাটকের প্রধান লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়া-ছেন। নাটকের আশ-বস্ত কোথায়, তাহা তাহারা বুদ্ধি-র-দেখেন নাই।

ভারতীয় আলাকারিকগণও যে এ বিষয়ে তেমন কৃত-কার্ষ্য হইয়াছেন, এখনও মনে করি না। হস্ত-তত্ত্বের বিচার-বিস্তরণে বা উপমা-অলঙ্কারাদির বিভেদ-নির্ণয়ে সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে হস্ত পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বাস্তবিকই তাহার তুলনা নাই। কিন্তু সে বিচার-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় উহার ‘নাটক-পরিচ্ছেদে’ পাওয়া যায় না। নাটক সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি-নিয়ম তাহাতে আছে বটে,

কিন্তু কিসের প্রভাবে নাটকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, সে কথা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

এই সম্বন্ধে, সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও নাটক-আলোচনার সময় বড় একটা ছবিচিত্র করিতে পারেন না। নানী ও প্রভাবনাদি নাটকে না দেখিলেই তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন। পণ্ডিত ভাগ্যবন্ত ভায়রত মহাশয় 'নীলদর্পণ' নাটকে "প্রজা-দিশের উপর ভ্রামট্যাদ রামকান্ত প্রেতার, সর্বভী কেন্দ্রমণির উদরে দুষ্টাপাত, উড়ানি-পাকান হড়ীতে গোশোকস্ত্রের মৃতসেহ সোহৃদ্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরাস্রাত্যাক হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড লক্ষণ" দেখিয়া উহাকে নাটক্যাংশে দুর্লভ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'নীলদর্পণ' তো তুচ্ছ কথা,—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মাপকাটি দিয়া বিচার করিলে একমাত্র সংস্কৃত নাটক ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও নাটকেই বোধ হয় চিহ্নিত পাবে না।

আমাদের মনে হয়, 'দৃষ্টকাব্য' ও 'Drama' এই দুইটা শব্দ চই ভাগ হইতে লইয়া উহারের ব্যাখ্যা করিলে নাটক ভিনিষটার বিশেষবস্তুই যে কি, তাহা বুঝিবার পক্ষে কতকটা প্রবিধা হইতে পারে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'দৃষ্টকাব্য' শব্দের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহার মর্ম এই,— "প্রযা কাব্যের জ্ঞান নাটকেরও প্রযণ হয়, অধিকন্তু রূপ-ভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃষ্ট কাব্য।" আর, ইংরাজী 'Drama' শব্দটি দেখা যায় যে উহা Drao বাত্ব হইতে নিপন্ন। Drao কথাটা গ্রীসীর। Drao অর্থে ক্রিয়া দ্বারা। এই ক্রিয়াকে মূল ধরিয়া ইংরাজ-সমালোচকেরা নাটককে ক্রিয়ার অঙ্গকরণ-চিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখন ঐ দুইটা ব্যাখ্যায় প্রভি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উভয় ব্যাখ্যায় মধ্যে একই ভাবের কথা আছে,—যতই বলিবার ভঙ্গীটুকু বিভিন্ন রকমের। সংস্কৃত আণকায়িকগণ ইংরাজ সমালোচকের জ্ঞান 'ক্রিয়া' কথাটা কোথাও বলেন নাই বটে, কিন্তু 'অভিনয়' কথাটা তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। অভিনয় অর্থে, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 'ব্যক্তি বিশেষের অবস্থাদির অঙ্গকরণকে অভিনয়' কথা বার।"—কিন্তু সাধারণের 'অবস্থাদির অঙ্গকরণ' ব্যাপারটা ক্রিয়ার অঙ্গকরণ ছাড়া কিছুই নহে। অতএব

বুঝিতে হইবে, মানব-জীবনের ক্রিয়াশীল অংশটুকু লইয়াই নাটকের কার্যব্যয়।

মহা-জীবনের ক্রিয়াশীল অংশ কি তবে নাটক ছাড়া আর কিছুতে অঙ্কিত হয় না?—কেন হইবে না! কবি কাব্যের ভিতর দিয়া চুই রকম উপায়ে উহা মেখাইয়া থাকেন। একট উপায়—বর্ণনা। বর্ণনার সাহায্যে কবি মানবের কর্ণ-লীলা মানব-চক্ষুর সমুখে ধরিতে পারেন। কিন্তু ইহা ছাড়া মানবের কর্ণ-জীবন বেগাইবার আরও এক উপায় আছে। তাহাতে বর্ণনার অভিজ্ঞ নাই। তাহাতে কবির কথা শুনিতে হয় না। কবি নিজেকে কাব্য হইতে দূরে রাখিয়া, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লীলা এ সাংসারে যে তাবে চলে, ঠিক সেই তাবে কাব্যে তাহা প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। কাব্যে শব্দোক্ত একত্রের চিত্রণ-প্রণালী অভিনয়-উদ্দেশ্যেই কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য ঐ কাব্যের এক নাম হইয়াছে—দৃষ্ট কাব্য। রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁহার 'রত্নমল' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,— "নাটকের ভাববান্য এইরূপ হওয়া উচিত যে—আমার যদি অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় ত অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই।"— ইহা বুঝিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের উক্তি শিরোধার্য্য করিলে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্যটাকেই অস্বীকার করা হয়। উপজ্ঞানসেও ক্রিয়া-চিত্র আছে, কিন্তু আত্ম উপ-জ্ঞান লইয়া অভিনয় করা চলে না। নাটকের ক্রিয়া-চিত্র নট-চর্য্যায় উপলব্ধি করিবার সম্বই নহি। উপজ্ঞানের অভিনয় করিতে হইলে তাহা তাপিয়া আগে নাটক গড়িতে হয়।

নাটকের অণ-ইতিহাসে আমরা 'ক্রিয়ার অঙ্গকরণ' বলিয়া যে কথাটি পাইয়াছি, উহাই হইতেছে আসল কথা। কবির শিল্পেন্দ্রলাল বলেন,— "নাটক—কাব্য ও উপজ্ঞানের মাঝামাঝি।" আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমাদের মতে, উপজ্ঞান ভিনিষটাই কাব্য ও নাটকের মাঝামাঝি। উপজ্ঞান-রচয়িতা দৃষ্ট-কবি ও গীতি-কবির স্বমত পরিচালন করিতে পারেন। এবং তাহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু নাটককার ঠিক তাহা করিতে পারেন না। মানব মনোভাবের যে অংশ ক্রিয়া বা কথার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই অংশে তত্ব তাঁহাদের অধিকার। মানব

ছদ্মের যে অংশ কিংবা বাঁ কথা দ্বারা প্রকাশিত হয় না—
যাহা মনোমধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া উদ্বেলিত হয়, সে অংশের
ছবি নাটকে একটুই বেশী দিতে গেলেই নাটক-জীবনের
পক্ষে তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। অভিনয়ে সে নিম্ন
কখনও ক্ষুদ্রি পায় না। কিন্তু ঐ ছবি অধিকারই উপজ্ঞান-
সেখকের আছে। ঔপজ্ঞানিক গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে
পারেন—উপজ্ঞানের দুইটা চরিত্র সবক্কে দুইটা কথা বলিয়া
পাঠকের মনে সে চরিত্র সবক্কে একটা। ধারণা সন্মাইয়া
দিতে পারেন। যেমন ‘কৃতকান্তের উইলেন’ একদ্বানে
আছে,—গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিতেছে—“আমার বিশ্বাস
হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার
বিশ্বাস হয়?” ভ্রমর বলিল—“না।”

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় ন, আমার বল
যেথি? শোকে ও বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমার বল যেথি?

গো। তা সমস্তান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস
হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল। বলিল—“তুমি আগে।”

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার তনিতে লাথ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি-বলি করিয়া বলিতে বলিতে পারিল না।
সন্মোহনতনু হইয়া নীরবে রহিল। গোবিন্দলাল
বুঝিলেন। সে বিশ্বাসের অস্ত্র কোনই কারণ ছিল না—
কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, “সে নির্দোষী, আমার
এইরূপ বিশ্বাস।” গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।
গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন।—এ ভাবে চরিত্র-চিত্রণ

নাটকে চলে না। কাদিকাতার পেশাদারী থিয়েটারে ‘কৃত-
কান্তের উইলেন’ যে অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে এ চিত্রটিকে
একবারে নষ্ট করা হইয়াছে। তাহাতে গোবিন্দলাল
ভ্রমরকে যেমন বলিল “সত্য বল!”—অমনি ভ্রমর বলিল—
“তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস।” যে কথা ভ্রমর
বলি-বলি করিয়া বলিতে পারে নাই, সেই কথা থিয়েটারের
ভ্রমর অগত্যাে বলিয়া যায়। কিন্তু হুনিপূর্ণ নাট্যকারের
হাতে পড়িলে ভ্রমর-চরিত্রের একরূপ অশুদ্ধতা ঘটিত না।
তাহা হইলে অস্তরূপ কথা ও কালের তির্যক দিগা ভ্রমর-
মুষ্টি সজীব হইয়া উঠিত। কিংবা ও কথা বাত-প্রতি-
বাতে নাটকের যে শুণ্ড গঙ্গা অঙ্গুর হয়, তাহা নহে,—
সেই সঙ্গে নাট্যাঙ্গুরিত নর-নারীর চরিত্রগুলিও দুটো
উঠিতে থাকে। ‘নীলদর্পণ’ উহা কতকটা আছে
বলিয়াই ‘নীলদর্পণ’কে নাটক বলিতে আমরা ইতস্ততঃ
করি না।

অবাগ্নর ঘটনা ও অবাগ্নর বাক্য নাটকে বহু কম
থাকে, ততই ভাল। চরিত্র দুটাইবার দ্রষ্টব্য যে ঘটনা ও
যে বাক্যের আবৃত্তক, নাট্যকারের তাহাই অবলম্বন।
নাটকেও চরিত্রের ও ভ্রমর-গুণন দুই হয়, কিন্তু তাহা কবি-
বর্ণিত নহে। নাটকের পার-পাত্রীর জীবন-লীলার সহিত
সে দৃষ্ট প্রাণিত দেখিতে পাই। ‘রোমিও জুলিয়েট’ যে
চরিত্রের চিত্র আছে, তাহা জুলিয়েট-দ্বয় প্রতিপাত-
কারী চিত্র। শকুন্তলা নাটকে যে, ভ্রমর-গুণন আছে,
তাহাও দ্বয়-প্রতিপাতকারী। সে ভ্রমর-গুণনের সহিত
কালিদাসের সম্পর্ক নাই। সে দৃষ্ট শকুন্তলা ও দুহন্তের
দ্বয় আমরা দেখিতে পাই। এ সব দৃষ্ট দ্বয়কে দ্বারা
দিগা জীবনের ঘটনা-স্রোতকে অঙ্গুর করিয়া দিবার অস্ত্রই
মুষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অঙ্গুর-প্রাণীর উপরই নাটক-
জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে।

[**শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ**]

ভাষ্যভাষ্য কতকগুলি শব্দের হিসাব নির্ধারণের সাধারণ প্রণালী এই যে, ঐ সকল শব্দ যে পরিমাণ কৃত্রিমত উৎপন্ন হয়, তৎকৃত্রিমতের প্রত্যেক দুইবার, কি পরিমাণ সত্য উৎপন্ন হইতে পারিবে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব (estimates or forecasts) প্রস্তুত হয়; এবং সর্বপ্রথমে ঐক্য, দ্ব্যর্থ, একত্র পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়; এই হিসাব লইয়া প্রত্যেক ঐ হয় যে, যেখানে যে পরিমাণ বাবা-শব্দের প্রয়োজন, উৎপন্ন শব্দ কি পরিমাণে সেই প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিবে, উহা দেখের প্রয়োজনের আদ্যক। ক্য কি দেখে,

ধাওঁৰ পথেই পোহু অস্তমত এৰান বাধ্যপত। পোহু
এৰানত পতাব, বৃত্তাংশে, পৰিমেতৰ সীমাত এংশে, আৰম্ভীয়া
হাওঁৰাও, দিৱী, বৰাংশে ও বোৰা, বোৰাই, দিহু, বৰাংশে,
বিহাৰ ও উৰ্দ্ধিত, বৰাংশতৰ্ণ, হাওঁৰাও, হাওঁৰাও, ও বৰীয়া
এংশে উৎপন্ন হয়। তথ্যে পতাব ও বৃত্তাংশে পোহুৰাওৰ চাওঁৰ
এৰান হান। এই সবত বোৰে ১৯৩১-৩২ অংশে বেচি ১৪৫০০০০
একাৰ হাওঁতে পোহুৰাওৰ চাওঁ হইছিল। ১৯৩২-৩৩ অংশে চাওঁৰ

জমির পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ২৭১০০০০ একর বা শতকরা ৮ হিসাবে কম ছিল; অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের ৩২২০০০০ একর জমিতে গোমুয়ের চাষ হইয়াছিল। ১৯১৭-১৮ আশের উৎপন্ন গোমুয়ের পরিমাণ ছিল ২১৩০১০০০ টন। আর ১৯১৬-১৭ আশে উহা অপেক্ষা ৭২০০০ টন বেশী গোমু উৎপন্ন হইয়াছিল। বৃদ্ধ উপলক্ষে বাঘা-শ্যেয়ার অত্যধ বৈশিষ্ট্য, এইজন্য অমুহান কতিপয় সন্তকতঃ একটু ছোটো করিয়া গোমুয়ের চাষেরে জমি বাড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়াইজাত, বিখ্যাতার ইজার শস্যের পরিমাণ বাড়িল না। একশ ঘটনার কারণ, দস্যর যুবকির অত্যধ। সে বাধা হটক, বৃষ্টি হওয়া না হওয়ার উপর বহু দাপুনের কোন দাত নাই, তখন জমির পরিমাণ পূর্ণ বৎসরের সমান থাকিলে খেচ হয় গোমু খারও কম হয়িত। সুতরাং জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্যই হইয়াছিল বলিতে হইবে। অমুহান হয়, আশাযী বর্ষে বাঘাশ্যে উৎপাদনের জমির পরিমাণ—অত্যধ শস্যের চাষ করাতে হইলো—সন্তকতঃ আরও বাড়াইতে হইবে। ইহা ছাড়া, হিসাবের মধ্যে থকা হয় নাই এমন ৪৫০০০ একর জমিতে ১৭০০০০ টন গোমুই গনিয়াছিল।

জাতকবর্ষের মধ্যে বৃদ্ধাশ্রয়, বিহার ও উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, আসাম, পঞ্জাব, গুজিস্বতের সীমান্ত প্রদেশ, কোম্বাই (ও সিদ্ধিসেন), মালভাঙ্গা এবং বঙ্গদেশে ও বেহারে ইকুর চাষ হইয়া থাকে। ১৯১৭-১৮ আশে ২৫৫০০০০ একর জমিতে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অপেক্ষা শতকরা ১০ অংশ অধিক জমিতে ইকুর চাষ করা হয়। আর ১৯১৬-১৭ আশে ২৭০০০০০ টন ও ১৯১৭-১৮ আশে ৩২৫০০০০ টন, (অর্থাৎ শতকরা) প্রায় ২০ অংশ বেশী) শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উপর ২২০০০ টন ইকুর সন্তকত হানে কাট খরচ উৎপন্ন হইয়াছিল।

জা আশকাল পানীর বিদ্যাবে সর্বাধাধারণের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহাও একটা হিসাব লইতে হয়। প্রাধান্য আসাম, এবং কিংব পরিমাণে বঙ্গদেশ, ময়মনসিং, বৃদ্ধাশ্রয়, পঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ ও ত্রিখচুর মাঝে চাষের চাষ হয়। ১৯১৭ আশে ঐ সকল প্রদেশে সর্বাধাধারণে ৬৬৪০০০ একর (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অপেক্ষা শতকরা দুই অংশ বেশী) জমিতে চাষের চাষ হইয়াছিল। এবং উৎপন্ন চাষের পরিমাণ ৩৭০১৩০০০ পৌণ্ড। আর, ১৯১৬ আশে ৬৬৪৩২০০০ পৌণ্ড তা উৎপন্ন হইয়াছিল। চাষের ব্যবহারে এসেছে দিন-দিন এমন বাড়িয়া বাইতেছে যে, অমুহান হয়, অতিরিক্তভাবে চাষের জমি এবং উৎপন্ন চাষের পরিমাণ আরও না বাড়াইলে চলিবে না। কিন্তু নিত্যক পরিভাষায় বিহার এই যে, এমন একটা সন্তকতঃ এবং অপরিহার্য পণ্যের ব্যবসার বা চাষে শস্যের সোকেস অংশ খুব বেশী নয়।

স্বতন্ত্রভাবে বাসলাদেশের যে কি পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহা

কাহারও অবগিত নাই। এই স্বতন্ত্র ভূমি কতিপয় সন্তকতঃ বাসলাদেশে তুলার চাষ করিয়া ঠাটতে বহু বৎসর অল্প বেশের সোকে বেশিয়া উঠিয়াছেন বলিলেই হয়। কিন্তু সন্তকতঃ অতিক্রম করিয়া এবং মনে হয়, সন্তকতঃ বিশেষরূপেও বিবেচনা করেন যে, বঙ্গদেশের ভূমি বিস্তৃত জায়ে তুলার চাষের পক্ষে সন্তকতঃ উপযোগী নহে। আবার, অত্যধ কাছাকাছি নিঃসংসাহ করিতে চাই না; আবারের এ কথার উত্তরেও তৎপরা এই যে, অর্থাৎ করিয়া চাষ করিবার পর যদি তুলার উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে চাষের উৎপন্নও সিদ্ধ হইবেই না, অর্থাৎ অর্থ-নাশের সম্ভাবনা সন্তকতঃ হইবে। সে বাধাই হটক, বর্জন্য অমুহান, তুলার চাষে আবার কৃষকগণ হই আর না হই, তাহাতে তুলার চাষের অমুহান কিংব সে সম্ভাবনা সন্তকতঃই কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

১৯১৭-১৮ আশে সন্তকতঃের সন্তকতঃ বিবরণে দেখা যায়, দস্যর ভারতে ২৪৭৩০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। আর ১৯১৬-১৭ আশে তুলার চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২১৭৪৪০০০ একর। সে সকল জায়ে তুলার চাষ হয়, সে সকল জায়েই চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে। অমুহান হয়, তুলার ও তুলারজাত শস্যের মুখ্য বৃদ্ধি চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ। আবার, তুলার বীজ বঙ্গদেশের দস্যর তহুর্ অমুহান চাষের পূর্ব উপযোগী ছিল। কিন্তু জমির অতিরিক্ত বিবরণে মনে হয় শস্য জমি হওয়ার আশাশ্রয়ত বঙ্গদেশ উৎপন্ন হয় নাই। তবে মালভাঙ্গা, সিদ্ধি, গুজিস্বতের সীমান্ত প্রদেশ, আসামপ্রদেশ এবং বেহার ও বহীশুর মাঝে তুলার মল জমি নাই। ১৯১৭-১৮ আশে, প্রত্যেক পট ১০০ পৌণ্ড ওজননের এখন ৫০০০০০ পট তুলার সময় ভারতে উৎপন্ন হয়। উহার পূর্ব বঙ্গের উহা অপেক্ষা ৪৫০০০ পট বা শতকরা ১০ অংশ বেশী তুলার উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে উৎপন্ন তুলার কিংবং আবারের ব্যবহারে আসে, এবং কিংবং রপ্তানী হয়। গত তিন বৎসরে উৎপন্ন তুলার যে জায়ে খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব এই—

	হাজার পট		
	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৭	১৯১৭-১৮
রপ্তানী	২৪৭৩	২০৮০	১৪০৮
দেশীয় কল	}	১৭৭০	১৭৭০
ব্যবসায়			
পাণ্ডারগো	}	৭৫	৭৫
ব্যবসায়			
মোট—	৪১০৮	৪১০৮	৪১০৮
উৎপন্ন	৩৭৩৩	৪১০৮	৪১০৮

কার্গিল (—)			
বা	১০৭১	—১০২	+১৭৪
উন্নত (+)			

এই হিসাবে যেখানে-যেখানে কার্গিল অর্থাৎ, সেখানে বৃষ্টিতে হইবে যে, উৎসার তুল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বায়ু পূর্ণ-পূর্ণ বসন্তের সঞ্চিত বলে হইতে নির্বাহিত হইয়াছে। তুল্য যেমন আবারের বেশে উৎসার হয় এবং এখানে হইতে রক্তাণী হই, তেমনি যোগ হয় (ইন্টিগ্রেট, আনোমিকা প্রকৃতি) ভারতের বহির্ভাগ হইতে বীজ তুল্য কিছু কিছু আনোমিকা করিতে হয়। পৃথিবীমানের নীচাভ্যন্তরে, পটাসে, নিম্নদেশে এবং অল্প কোন-কোন স্থানে পালের জল সেচন করিয়া মিশর ও আমেরিকার এবং আফ্রিকার বীজতত তুল্যর চাষের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা কলবতী হইলে হয় ত ভারতকে আর বিদেশ হইতে বীজতত তুল্য আনোমিকা করিতে হইবে না।

তুল্যর পাঠে পাঠের কথা আদিয়া পড়িতেছে। তা আনোম আন-কাল কিছু কিছু বায়ুর করিতেছি যে, কিন্তু ভারত উৎসার চাষের আনোমিকা বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। চাষের জায় পাট ও পাটজাত প্রকাণ্ড এসেদের অন্ততন প্রধান রপ্তানী পণ্য। পাট প্রধানতঃ বঙ্গ-দেশ ও তুর্কিস্তান, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আনোম প্রদেশে উৎসার হয়। ১৯১৭ অব্দে এই কয় প্রদেশে মোট ২৭০০০০০ একর প্রদিয়ে ১০০০০০০ গতি (প্রতি গতি ৪০০ শেও) পাট উৎসার হইয়াছিল। ১৯১৮ অব্দে পাটের চাষের উন্নতি পরিমাণ ২০০২০০০ একর এবং উৎসার পাটের পরিমাণ ১০০০০০০ গতি। বলা বাহুল্য, পাটের চাষ আনোমের বেশের চাষের দ্বারা পাকিস্তান, উত্তার বাঙ্গালার খেলোয়াড় তুর্কিস্তানদেশে হাতে। তবে এখানে ইহাও বীজার করিতে হয় যে, পাট আনোমের নিজস্ব তিনি হইলেও, তুর্কিস্তানের পাটের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে উত্তার এনকার প্রায় বিপুল ভাবে চাষও হইত না, বাগিচাও হইত না। তৎপূর্বে লাক বাইবার অল্প এবং পুহের ব্যবসায় গড়ি ইত্যাদির অল্প সামান্য ছই-চারি বিঘা মাত্র পাটের চাষ হইত। তুর্কিস্তানের সর্বপ্রথমে ইহার বাগিচায়াগোবিনতা বৃদ্ধিতে পারেন; এবং প্রধানতঃ তাহারেই চেষ্টার পাটের চাষের এবং বাগিচার বর্তমান উদ্ভূতি ঘটাইয়াছে। সুতরাং পাটের বাগিচার লাভ তাহার প্রাপ্য করিয়েন না ত আর কে করিয়ে? চাষের ব্যবসায়িক সম্পূর্ণতঃ তুর্কিস্তানদেশের চেষ্টার ফল। তাহার আনোমের জমানে উত্তার আনোম করিবার পূর্বে, উত্তার কথা এসেদের কে জানিত? ভারতের বন জমানে তা ও পাটের জায় এমন কত জিনিষ অবহেলায় নষ্ট হইতেছে, কে তাহার ইচ্ছা করিয়ে? তার পর হয় ত কোন প্রাকৃতিক সম্পদ তুর্কিস্তান দেশে নষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগিচায়াগোবিনতা আনোমের পূর্বে উত্তার ব্যবসায়ের প্রচুর অর্থ লাভ করিয়েন, আর আনোম হই। করিয়া চাষিয়া থাকিবা আনোম করিয়া মরিল মার।

ভালিকা ক্রমঃ বীজ হইয়া পড়িতেছে—এখনই হয় ত পার্শ্বের বৈজ্ঞানিক বর্গীয়াছে। সুতরাং আর পুণি বাড়াইতে সক্ষম হইতেছে না। এইবার তিনি, Rape ও সিরিষ, তিল চীনাবায়ন ও বীলের চাষের মতি এবং উৎসার প্রকাণ্ড পরিমাণের একটি সফলিক ভালিকা বিয়াই এখানি কাছ হইতেছি—

১৯১৭-১৮	১৯১৭-১৮	
মস্যা	জমি—একর	মাল—টন
তিল	৩৭০০০০	৪০০০০
Rape	৩২০০০০	১১০০০০
সিরিষ		
তিল	৪০০০০০	৩০০০০০
চীনাবায়ন	১০০০০০	১০০০০০
নীল	৩০০০০০	১০০০০০

মুখ্য বাগিচায়ে; পাটের উৎসার হইতেছে। সিরিষ কথাবার্তা হির করিবার অল্প যে পাট-সংঘ পুষ্ট হইয়াছে, আনোমের সার ঈদুল সত্যোজ্ঞসার সিংহ ভারত-পর্বতের একটি নিখি বঙ্গ সেই পাট-সমিষ্টিত যোগ বিবার লজ বিলাতে পমন করিয়াছেন। সার সত্যোজ্ঞসার সিংহের বটে, কিন্তু তিনি আর কিরিয়েন না; তিনি কিরিয়েন তিনি লর্ড সিংহ। সার ঈদুল সত্যোজ্ঞসার সিংহ বিলাতী আনোম-প্রেক্ষিত হইয়াছেন, এবং কখনোই পবনী লাভ করিয়াছেন।

ভারত-সিটিং সিংহ সিংহ এবং ভারতের বকুল সিংহ চেনসকোভ ভারতবর্ষে যে বাহর-পানন ভার হিতে প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহারই নতুন বঙ্গ ভারত-পাট বহোমের সার ঈদুল সত্যোজ্ঞসার সিংহ মহাপ্রভু তাহার আবার প্রেক্ষিতাধী পদে নিখু করিয়েন। বিলাতের মন্ত্রী-সভায় মহাপ্রভু ভারতবাহীর নিগোপ এই প্রথম। ইহাতে ভারতবর্ষের আনোমের সীমা বহিল না। আর, সার সত্যোজ্ঞসার সিংহ মহাপ্রভু বাগিচা বহিল, তাহার নিগোপ বঙ্গদেশ পৌরবাহিত হইল।

এই সংখ্যা পুস্তক হইতে যা হইতে সংখ্যা আনিল, সিংহ মহাপ্রভু সীতার বা বিলাতী আনোম-প্রেক্ষিত উত্তী হইয়াছেন। এই নিগোপ যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অতিবাহীর এবং তৎপন্ন অতুপূর্ণ। সুতরাং বলা বাহুল্য, ভারতবাহীরাই এই সংখ্যা আনিল হইয়াছেন।

এই প্রদেশে কতকগুলি পুস্তক কথা আনোমের মনে পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্বে ছই চেষ্টা না হয় মহাপ্রভু ইংলিশমান কবিবাহারী করিয়াছিলেন যে, সার সত্যোজ্ঞসার সিংহ মুখ্যদেশের পাননকর্তা

উদ্ধৃত হইয়া গাইতেছে। যে টাঙ্কার একটা যোত্রেন নির্মিত হয়, সেই টাঙ্কার দ্বারা হাসপাতাল তৈয়ার হইতে পারে এবং তাহাতে অনেক লোকের জীবন রক্ষা গাইতে পারে। সহস্রাব্দে কি তাহা হইলে বলিতে চান যে, লাট বাহাদুরের শিক্ষা আশ্রয়ঃ রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অশেষ, রোগ বাহ্যিক আছে হইতে না পারে এতদ্বারা করা কি অতিক্রমের বহুলক্ষণ নয়? অমৃত, বায়ুবিজ্ঞানে সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে বড়ই শিক্ষার বিস্তার হইত না কেন, রোগ যে একেবারে হইবে না এমন কথা আমরা বলি না; রোগ বিহারের ভিত্তি বড়ই উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা হইত না কেন, রোগ হইবেই এবং তাহার চিকিৎসার ভিত্তি হাসপাতালও রাখিতে হইবে; কিন্তু বাস্তবে বেশ পূর্বোক্ত যোগ্যতা এবং স্বতন্ত্র্য প্রভৃতি আরও কয়েকটি যোগের বিস্তৃতি বেশকি অধিক, তাহাতে যেনের লোকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার-সাধ্য-পূর্বক ব্যবস্থাবিজ্ঞান-বর্জিত উপদেশ বিহার ব্যবস্থা না করিলে, হাজার হাজার হাসপাতাল নির্মাণ করিলেও বিশেষ কোন ফল জন্মিলে না। লাট সাহেবের উক্তির প্রতিবাদি করিয়া (এবং আমাদের বিজ্ঞিতও তাই) আমরা বলিতে চাই যে, বৈশ্বব্যাপী বাস্তব বিস্তৃতির সম্ভাব্য সাধন করিতে হইলে, জনসাধারণকে বায়ুবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে; এবং সেই উপদেশ তাহাতে বলবৎ হইতে পারে, উচ্চতর জনসাধারণের মধ্যে ক্রী-শিক্ষার বিস্তারের প্রাথমিক শিক্ষার বহুসাধ্য বিস্তার বড়াইতে হইবে। ভেলি নিউমের বিস্তার যেনের নষ্ট বাধ্য করিয়া আসিলে না।

আমরা পূর্বের বলিবারি, যেযেবর শিক্ষা বিহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতবোধ নাই; কেবল পাঠ্য-নির্ধারণ এবং শিক্ষাব্যবস্থা-প্রণালী সম্বন্ধেই বা-জিত মতবোধ দেখা যায়। লাট বাহাদুরও অবশেষে এমি এই কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাহার মত এই—"I have no wish to enter at any length into the vexed question as to the goal which we should set up as the end of the high school course for girls. It must be perfectly obvious, to every impartial observer, that a curriculum which includes such subjects as hygiene, nursing, needle-work, cookery and domestic work, must be of far greater practical value to an Indian girl than a curriculum designed with a single eye upon the Matriculation examination. Yet it must be equally obvious to any moderately observant person that the Matriculation certificate in Bengal has acquired so extraordinary and so fictitious a value in the eyes of the people that it is difficult to persuade them to adopt what is obviously the more rational course." অর্থাৎ বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষার বেশ লক্ষ্য

কি হইবে, এই প্রশ্নের প্রসঙ্গীত দীর্ঘ আলোচনা করিতে আমি চাই না। তবে আমার মনে হয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট হুঁত্রে পারিবে যে, ব্যাধাত্মক, সেবার্ণক, হৃদয়ক, উদয়-বিজ্ঞাত ও সূর্যক—এই বিষয়গুলি যদি ক্রীলোকদের পাঠ্যবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহা, কেবল বায়ুবিজ্ঞান পত্রিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ধারিত পাঠ্য-ভিত্তিকার অশেষ, ক্রীলোকদের সম্বন্ধে উপযোগী হইবে। তথাপি, ইচ্ছাও অনেকের যোগ্যতা হইবে যে, বায়ুবিজ্ঞান পত্রিকা বাস্তবিক যথেষ্ট এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, লোক উহার এমন অসাধারণ এবং কার্যকর বৃত্তা নির্দেশ করিয়াছে যে, তাহাবিষয়ে অশেষকৃত অধিক উপযোগী পদ্য অবলম্বন করানো কঠিন।

ইহা হইতে পাঠক-পাঠিকারা সহজেই হুঁত্রে পারিবেন যে, সাধারণতঃ হিন্দু সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ ক্রী-শিক্ষা বিষয়ে ভেদগত পোষণ করেন, লাট সাহেবের মত তাহার পক্ষে বিশেষ অসম্ভব। যদি লর্ড রোবান্সনে বাহাদুরের মতের অনুসরণ করিয়া এদেশে ক্রী-শিক্ষার প্রচাণী সংগোপিত এবং পাঠ্য বিহার নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে আমাদেরই লক্ষ্যের মাত্র করিবেন, এবং আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে যেযেদেরও স্বার্থ উপকার হইবে, লক্ষ্যের বৃদ্ধাধীনও লক্ষ্যের আশ্রয় হইয়া উঠিবে। এমি ভাবে ক্রী-শিক্ষার প্রচাণী সংগোপন প্রথমটা যদিও কঠোর হইবে, তথাপি, লাট বাহাদুরের উক্তির প্রতিবাদি করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে, "perseverance deserves to be rewarded by success," এবং "to due time wisdom must prevail." অর্থাৎ যেরূপে বিজ্ঞান দূরত পন্থার অনুসরণ করিলে উহার ফল ভাল হইবেই,—এমি সমস্ত হুঁত্রে জর হইবেই।

ক্রী-শিক্ষার কথাই আমরা আরও একটা কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কয়েকদিন হইল, যখনই ক্রী-শিক্ষার বিস্তার-কল্পে সার ঐজু প্রমুখতর সার মহাশয়ের নেতৃত্বে রায়সাহেব লাইব্রেরীতে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার মাননীয় বিচারপতি সার ঐজু আগন্তব মৌদুরী মহাশয় শিক্ষাবিধী-পক্ষে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা সমস্তকেই সেই উপদেশটি সর্বদা মরণ করিয়া রাখা করিতে অনুপ্রাণিত করি। সার আগন্তব মৌদুরী মহাশয় বলিয়াছেন, বাস্তবিক যেনে অবশেষে এমি দর্শনীয় থাকায় এখানে ক্রী-শিক্ষার দৃঢ়তা ব্যবস্থা করা যোগ্যের মত সহজ নহে। বস্তুতঃ বাস্তবিক যেনের উপযোগী তাহােই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তদ্ব্যবস্ত্রে একটি দারী-শিক্ষা-সমিতি পদনপূর্বক এখনে কলিকাতাতেই কাণ্ডারিত করিতে হইবে। সমস্ত সহস্রাব্দে কয়েকটি কেন্দ্রে বিস্তৃত করিয়া শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আম-বাগ

বে সকল পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষা হীতিবৃত্ত প্রবৃত্ত হইতেছে, সেখানে একটি সৌখিন এই ইচ্ছাইয়াছে যে, শিক্ষিতা মেয়েরা একেবারে ইংরেজী ভাষাপ্রা হইয়া পড়িতেছে—যেমনদায়েব বসিয়া বসিতেছে। লাউ মাইয়েবও ইয়া লভ্য করিয়াছেন,—তাহার আভাষ আংলা পুর্বেই বিরাহি যে, সেয়েরা হ্যাট্টুলেশন পাপ করিবার মত স্ত্রীকরা পড়িয়াছে। সার আন্তোনিও সৌখিন মহাশয় এই কথাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

হাংলীর মেয়েদের যেমনদায়েব শাসিনে চলিবে না, তাহাখিনকে বাস্তবসিই থাকিবে হইবে; হুতরাং তাহাখিনকে বাস্তবতা ভাণ্ডা, বাস্তবতা সাহিত্য অব্যয়ন করিতে হইবে এবং সপ্তমকারে বাস্তবতা ভাণ্ডাই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তবাস্তব নুণ এ কথা বুঝি শাণ্ডে; কারণ, হিমি বহা: এবং তাহার পান্ডোবর্গ বাস্তবতা ভাণ্ডা এবং বাস্তবতা সাহিত্যের পরম অসুখাণ্ডি।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অষ্টাংশ পরিচ্ছেদ

স্বদেশ গানের পাকীতে দিয়া উঠিল সভা, কিন্তু তিনি ? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে,—ভাঁহার চেহারা, তা' সে দত অস্পষ্টই হোক, সে কি একবারও তাহার চোখে পড়িত না ? আর এলাহা-বাবের পরিবারে এই কি-একটা নতুন ট্রেনসেই বা গাড়ী বদল করা হইল কিদের জন্ত ? জন্মের ছাটে তাহার শাখার চুল,, তাহার গায়ের জাফা কাপড় সমস্ত ভিন্নিগা উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বায়-বায় নুণ বাহির করিয়া একবার সসুখে একবার পচাতে অঙ্ক-কারের মধ্যে কি যে বেবিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহা সেই জানে; কিন্তু এ কথা মন তাহার কিছুতে পৌঁছায় করিতে চাহিল না যে, এ গাড়ীতে তাহার স্থান নাই,—সে একেবারে অন্ত-নির্ভর, একান্ত ও একাকী স্বদেশের গহিত কোন্ এক বিবিধীন নিরুৎসাহ-বাজার পথে বাহির হইয়াছে। এমন হইতেই পারে না। এই গাড়ীতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন !

স্বদেশ বাই হোক, এবং সে বাই করুক, একজন নিরপরাধ রথশ্রীকে তাহার সমান হইতে, দর্শ হইতে, নাতীর সমস্ত সৌভর হইতে ভুগাইয়া আনিয়া এই অনিবার্য বৃত্তার মধ্যে টেলিয়া দিবে, এতবড় উদ্ভাষ সে নয়। বিশেষতঃ, ইচ্ছাতে তাহার লাভ কি ? অতলার যে বেহটার প্রতি তাহার এত লোভ, সেই বেহটাকে একটা পণ্ডিকার বেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না.. এই লোভা কথা-টুকুও যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত, ভালবাসার কথা নুণে

আনিয়াছিল কোন্ নুণে ? না না, ইচ্ছা হইতেই পারে না ! ইচ্ছিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পার নাই !

সহসা একটা প্রবল মনের ঝাপটা তাহার চোখে নুণে আসিয়া পড়িতে যে সঙ্কটিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল, এবং এককণে নিজের প্রতি চাহিয়া দেখিল সর্বদা শুক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই ! বৃষ্টির ভলে এমন করিয়াই ভিন্নিয়াছে যে, অকল হইতে, জামার হাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল করিয়া পড়িতেছে। এই শীতের বায়ে সে না জানিরা লাহা সরিয়াছিল, আনিয়া আর পারিল না। এবং কিছু কিছু পরিবর্তন করিবার মানসে কপিত হতে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাফি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে গাড়ীর গতি মন্দ হইয়া আসিল, এবং অনভিবিলেই তাহা ট্রেনে আসিয়া ধামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ ট্রেনে জানিবার উপায় নাই; তবুও ব্যাগ খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে হার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আশ্রয় করিয়া ভিন্নিতে-ভিন্নিতে দ্রুতপদে স্বদেশের জানালার সন্মুখে আসিয়া গড়াইল।

চীৎকার করিয়া ডাকিল, স্বদেশ বাবু।

এই কাবরায় মন দুই বাসিনী ও একজন ইংরাজ ভ্রম-লোক ছিলেন। স্বদেশ একটা কোণে অড়মুণ্ড ভাবে বেগমসে ট্রেন দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। অচলায় বোধ করি ভয় ছিল, হয় ত তাহার গলা দিয়া সময়ে শব্দ

ছুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উত্তরের কর্তব্যর ঠিক বেন আহত মস্তর তীব্র আশ্রিত্যের মত শুধু মূরেশকেই নয়, উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অতিক্রান্ত মূরেশ চোখ মেলিয়া মেখিল ঘারে পাড়াইয়া অচলা। তাহার অনব্রত মূরেশ উপর একই কালে অমল্ল মলধারা এবং গাড়ীর উজ্জল আলোয় পড়িয়া এমনই একটা রূপের ইচ্ছাশাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মূগ্ধ দৃষ্টি বিষয়ে একেবারে নির্ভীক হইয়া গেছে। সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে পাড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাকে দেখিও, — কই তিনি? কোন্ গাড়ীতে তাকে ভুলে গেল?

“চল, দেখিয়ে দিচ্ছি” বলিয়া মূরেশ বৃষ্টির মধ্যেই মাখিয়া গড়িল, এবং যে দিক হইতে অচলা আসিয়াছিল, সেই দিক পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী হুঁশ্বর মুখ চাওয়া-চাওয়া করিয়া একই হাসিল, ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূ-সৃষ্ট কল্যাণটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা হীরাবাস কেলিল এবং তরু মুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলায় কান্নার সঙ্কে আসিয়া মূরেশ ধমকিয়া পাড়াইল, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তরে প্রশ্ন করিল, তোমার বাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক বৃহত্তর অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎটা মস্তরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়া লইয়াই দর কছ করিয়া দিল।

মূরেশ অস্থূল নির্দেশ করিয়া কহিল, এটা পুলে কে? অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও থাক, —তিনি কোথায় আনাকে দেখিয়ে দাও, —না হয়, শুধু বলে দাও কোন্ দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্ছি —বলিতে বলিতে সে ঘরের দিকে পা বাড়াইতেই মূরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে কেথলে পাছো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুকিল কথটা সত্য। গাড়ী চলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার হই চক্রে ভয় বেন সৃষ্টি ধরিয়া সেবা দিল। সে কিরিয়া পাড়াইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া শুধু পন্থকের জন্য মূরেশের একান্ত পাণ্ডুর ঐশ্বরীন সূচীর প্রতি চাহিল, এবং পরক্ষণেই হিরণ্মল তরুর ভ্রায় সন্ধ্যা মেকের সূটাওয়া পড়িয়া হই বাহ দিয়া মূরেশের

পা পাড়াইয়া কাদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? তাকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দিচ্ছো? রে'গা! মা'মকে খুব করে তোমার—

এত বড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাত তাহার বুক-কাটা কান্নায় বেন শতধারে কাটা পড়িয়া মূরেশকে একেবারে পাণ্ডুর করিয়া দিয়া চতুর্দিকের ইলাই মত ভয়াবহ এক উজ্জল ঘামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিশ্রী হইয়া গেল। এবং সেইখানে, সেই গদি-খাঁটা থেকে গারে হেলান দিয়া মূরেশ অমল্ল বিষয়ে শুধু শুদ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পদতলে কি যে খটতেছিল, কিছুকণ পর্যাৎ তাহা বেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেককণ পরে সে পা ছুটা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া হীরে হীরে কহিল, এ কাল আমি পারি বলে তোমার বিশ্বাস হয়?

অচলা তেমনি কাদিতে-কাদিতে জবাব দিল, তুমি সব পারো। আমার ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাকে পুড়িয়ে মা'তে চেয়েছিলে। তুমি কোথায় কি কবে, তোমার গারে পড়ি আনাকে বল। বলিয়া সে আর একবার তাহার পা ছুটা চাপিয়া ধরিয়া তাহারই পরে সম্মুখে মাথা ফুটিতে লাগিল। কিন্তু পা ছুটা বাহার সে কিন্তু একেবারে অবশ অচেতনের ভ্রায় কেবল নিঃশব্দ চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

বাহিরে মস্ত রাতি তেমনি দাশাশপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উজ্জ্বল বড়-মল তেমনি ভাবেই সবস্ত প্রকৃতি লণ্ড-লণ্ড করিয়া বিতে লাগিল, কিন্তু এই দৃষ্টি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ ক্রমহসে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সবস্ত একেবারে ভুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা অচলা তাহার ভূ-শাখা ছাড়িয়া কীরবেগে উঠিয়া পাড়াইতেই মূরেশের বেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সে চাহিয়া মেখিল পরের ট্রেনে সন্নিকটবর্তী হওয়ার গাড়ীর বেগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অচলা কেন যে এমন করিয়া উঠিয়া পাড়াইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল চেষ্টার আসনকে সযত্ন করিয়া লইয়া মূরেশ ডান হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, বোস। যদিও এ গাড়ীতে সেই।

নেই! তবে কোথায় তিনি? বলিতে-বলিতে অচলা সমুদ্রের বেকের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

হুসেন লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহার মূখের উপর হইতে রক্তের শেষ চিটুটুকু পর্ধ্যায় বিসৃষ্ট লইয়া গেছে। বোধ করি এতক্ষণের এত কান্না-কাটি, এত মাথা-কোটা-কুটীর মধ্যেও হৃদয়ে তাহার সমস্ত প্রতিভুল মৃতির বিরুদ্ধেও এক প্রকার অব্যক্ত অন্তর্নিহিত আশা ছিল, হয় ত, এ সকল আশঙ্কা সভ্য নহে, হয় ত এই প্রচণ্ড দুঃখেরে চূড়ান্ত বেদনা ঘূর্ণ তাড়ায় সম্মত সহস্রই শুধু কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসেই অবশ্যমান হইয়া গিয়া গুলকে সমস্ত চরাচর রাঙা হইয়া উঠিলে।

--এমনি কিছু একটা অচিন্তনীয় দর্শন হইত তখনও তাহার আগাগোড়া সুখশালি করিয়া দিত' বিদায় গ্রন্থ করে নাই। কেন না, এই ত তখন পর্যন্তও তাহার সংসারে খালা কিছু কামনার সবই বজায় ছিল; অথচ, একটা রাত্রিও কি পোহাইল না, আর তাহার কিছু নাই,—একবারে কিছু নাই! চক্ষের পলক কেলিতে না-কেলিতে ধীরে ধীরে এক-বারে হৃদয়গোচর শেষ সীমা ভিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল! এতবড় পরিমাণ-বিশীন বিপত্তিতে তাহার বাঁচিয়া থাকটাই বোধ করি কোন মতে বিখ্যাপ করিতে পারিতেছিল না।

উভয়েই দ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ী আসিয়া একটা অজানা ঠেগনে লাগিল এবং অল্পকাল পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

হুসেন একবার কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার উঠিয়া গাড়াইল, এবং জানালায় কাঁচ তুলিয়া দিয়া কয়েকবার পর্য্যটন করিয়া সহসা অচলার সমুদ্রে দ্বিগ্ন হইয়া গাড়াইয়া কহিল, মহিষ ভাল আছে। এতক্ষণে বোধ হয় সে এলাকা-বাসে পৌঁছেছে। একটুখানি ধামিরা বসিল, ওখান থেকে সে অল্পদূরত্বেরও বেশে পায়ে, কলকাতারও কিরে আসিতে পারে।

অচলা ধীরে ধীরে মূখ তুলিয়া নিজস্বা করিল, আশঙ্কা কোথায় থাকি?

সেই অস্ব-কলঙ্কিত মূখের উপর দুঃখ ও নিরাশার চরম প্রতিমূর্তি আর একবার হুসেনের চোখে পড়িল। তাহার মূল যে কত বড় হইয়া গেছে, এ কথা আর তাহার অগোচর ছিল না এবং ইহার জন্য আশা যে নিজেই হত্যা করিয়া

কেলিতেও পারিত। কিন্তু, হাওয়ার সমস্ত হলুদা তাহার সত্য দৃষ্টিকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া এই জ্বলের মধ্যেই বাহ্যিক অজুলি নির্দেশ করিয়াছে, সেই হলুদাধার বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে বিখ্যাপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে অচলার নিজস্বা উপরে সহসা তিক্ততার বলিয়া উঠিল, বোধ হয় আমার সমুদ্রের নরকেই থাকি। যে অধঃপথে পথ যেখানে এতদূর পর্য্যন্ত টেনে এনেচ, তার মাঝখানে ত ইচ্ছে করলেই গাড়িবার বাঁধা পাওয়া যাবে না! এখন শেষ পর্য্যন্ত যেতেই হবে।

কথা শুনিয়া অচলার আগাগ-মস্তক একবার কঁপিয়া উঠিল, তারপরে সে নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যে বিখ্যাচারী কাপুক্ষ্য পরব্রাহ্ম এমন করিয়া বিপক্ষে তুলাইয়া আনিয়াও অন্যভাবে এতবড় নির্দোষ অপবাদ মূখ দিয়া উদ্ধারিত করিতে পারে, তাহাকে বদিশার আর কাহার কি থাকে!

হুসেন আবার পর্য্যটন করিতে লাগিল। বোধ হয় এই পাবাণ-প্রতিমার হুসেনে গাড়াইয়া কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না। বলিতে লাগিল,—তুমি এমন ভাব বেখাচ্ছ যেন একা তোমারই সর্বনাশ। কিন্তু সর্বনাশ বলতে যা বোঝায় তা' আমার পক্ষে কোথায় গিয়ে গাড়িয়েছে, জানো? আমি তোমাদের মত ব্রহ্মভানী নই, আমি মাস্তিক। আমি পাণ-পুণ্যের ফাঁকা আগুয়ান করিনে, আমি নিরোঁট সত্যিকার সর্বনাশের কথাই ভাবি। তোমার রূপ আছে, চোখের জল আছে, মেহে বাহুঘের বা' কিছু অন্তরত্ব তোমার জুপে সে সব প্রয়োজনীয়ও অতিরিক্ত আছে,—তোমার কোন পথেই বাধা পড়বে না। কিন্তু আমার পরিণাম কল্পনা করতে পারো? আমি পুরুষ বাহু,—তাই আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে ভুলি করতে হবে! বলিয়া হুসেন ধমকিয়া গাড়াইয়া মুকের মাঝখানে হাত দিয়া দেখাইল।

অচলা কি একটা বলিতে উত্তর হইয়া মূখ তুলিয়াও নিঃশব্দে মূখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে কৃপা যে উপলব্ধি পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া হুসেন কোণে জলিয়া উঠিয়া কহিল, মনুষ্য-পুঞ্জ পাবাষ শুঁজে দাঁড়াক! কখনো মনুষ্য হয় না অচলা। ও চাইনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাধে না। থাকে সাধুতো

সে দুঃখ, তুমি নয়। তুমি অস্বাভাবিক। হিন্দুর ঘরের কুল-বন্ধু মও, এতটুকুতে তোমাদের ভাত বাবে না। তুমি যেখানে হুসি বেবে চলে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, মহিমকে দেখিয়ে, সে ঘরে নেবে। টাকা দিচ্ছি তোমার বাপকে দিয়ে—তার সুখ বন্ধ হবে বাবে। তোমার চিত্ত কি অচল, এ এমনিই কি বেশী অপরাধ?

সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল, একবার চাহিয়াও দেখিল না তাহার অশ্রু শূল কোথায় কি কাজ করিল। পায়চারির গোতে বক্রপদ কঁপে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে বাহা পায় তাহাই যেমন নির্ভর ধ্বংসে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেই ভাবে সুরেশ অচলকে একবারে বেন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চাহিল। হঠাৎ মাঝখানে ঝড়োয়া পড়িয়া কহিল, এ এমনি কি ভয়ানক অপরাধ? স্বামীর ঘরে গাড়ির তার ঘুরে উপর বসেছিলে একজন পর-পুরুষকে ভালবাসো,—সে কি তুণে গেছ? বে লোক ঘরে আগুন দিলে তোমার স্বামীকে গোড়াতে চোরেছিল বলে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চলে আসতে চোরেছিলে,—এবং এলেও তাই;—স্বরণ ধর? তার ঘরে, তার আশ্রয়ে বাস করে গোপনে কেঁবে তাকেই সঙ্গে আসতে সেবেছিলে,—মনে পড়ে? তার চেয়েও কি এটা বেশী অপরাধ? আরও কত কি প্রতিদিনের অসংখ্য খুঁটিনাটি! তাই আজ আমার এত সাহস! আসলে তুমি একটা পণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেছি! ভেবেছিলাম প্রথমে একটুখানি চুকু কেটে বাক! তার বেশী তোমার কাছে আশা করিনি! তোমাকে বাহবার বলে দিচ্ছি, অচল, তুমি দস্তী-সাবিত্রী নয়! সে তেম, সে স্বর্ণ তোমারে সাজে না, মানির না,—সে তোমার একান্ত অনধিকার-চর্চা। বলিয়া সুরেশ ক্রমশঃ নিশ্চীর্ণ হইয়া থাকিতেই অচল সুখ তুলিয়া ভয়কণ্ঠে চাঁৎকার করিয়া উঠিল, আপনি থাম্বেন না সুরেশবাবু, আরও বলুন, আরও বলুন। আমাকে হুই পায়ে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে লগারের বন্ধ কষ্ট কথা, বন্ধ কুৎসিৎ ব্যঙ্গ-বিদ্ভগ, বন্ধ অপমান আছে সব করুন। বলিয়া মেয়ের উপর অকস্মাৎ উদ্ভূত হইয়া পড়িয়া অবকচ্ছ রোদনের বিলীল-ধরে বলিতে লাগিল,—এই আমি চাই, এই আমার দরকার। এই আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধ!

পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাণ।

সুরেশ সেখানে ঠেস দিয়া কাঠে হইয়া চাহিয়া রহিল। অচলার সুখীর্ণ কেশজার সত্ত-বিপণ্যত হইয়া যটিতে স্টাইতে লাগিল, তাহার জলসিক্ত পায়েবান ধূলী-কাষার মলিন, কণ্ঠা হইয়া উঠিল, কিন্তু মেদিকি সুরেশ পা' বাড়াইতে পারিল না। নতুন শিকারী তাহার প্রথম ভূ-পতিত পক্ষিণীর মুক্তা-বস্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তেমনি হুই হুড চোখের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে বেন কোন্ এক বয়সাহত নারীর শেষ মুহূর্তের লক্ষ্য ঝাঁড়াইয়া রহিল।

আবার পাড়ীর পতি বন্ধ হইতে মনস্তর হইয়া ধীরে ধীরে ঠেসনে আসিয়া থাকিল। সুরেশ সোম্বা হইয়া ঝাঁড়াইয়া শান্ত সহজ গলার বলিল, লোকে তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে আশ্চর্য্য হ'রে বাবে। তুমি উঠে বোসো, আমি আমার ঘরে চললাম। সকাল হ'লে তুমি যেখানে নাহতে চাইবে আমি নাথিয়ে দেব, যেখানে যেতে চাইবে আমি পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবার চেষ্টা কোরো না, তাতে কোন ফল হবে না। এই বলিয়া সুরেশ কপট খুশিয়া নীচে নামিয়া গেল, এবং সাবগানে তাহা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া কখনকাল চুপ করিয়া ঝাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে সুখ বাড়াইয়া কহিল, তুমি আমার কথা বুঝবে না, কিন্তু এইটুকু শুনে রাখো যে, এ সমস্তার বামাংসার তার আমিই নিম্ন।—আর তোমার কোন অমঙ্গল ঘটতে দেব না,—এর সমস্ত গুণ আমি কড়ান-পত্তার পরিশোধ ক'রে বাবো। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিজের কামরার দিকে প্রস্থান করিল।

ট্রেণের টানা ও একঘেয়ে শব্দর বিরামের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই সুরেশের তত্ত্বা ভাঙিতেছিল বটে। কিন্তু চোখের পাতার তার ঠেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি আর বেন তাহাতে ছিল না। ভিদ্দা কাপড়ে তাহার অভ্যন্তরীণ ভিত্তি করিতেছিল, বস্ত্রতঃ সে যে অগ্রহে পড়িতে পারে, এবং বর্তমান অবস্থায় সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, ইহা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেও ছিল, কিন্তু ব্যাগ খুশিয়া বন্ধ-পরিবর্তনের উত্তম একটা অসাধ্য অভিজ্ঞার মতই তাহার

মনের মধ্যে অশান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। টিক এমনি সময়ে তাহার কানে গিয়া একটা স্থপরিচিত কণ্ঠের ডাক পৌছিল,—কুলি! কুলি! সে অর্ধ-সজাগভাবে চোখ মেদিয়া দেখিল গাড়ী কোন্ একটা হেঁসনে ধামিয়া আছে, এবং স্বপ্ন-অন্ধকার কাটিয়া গিয়া ক্ষান্ত-বর্ধন মূদর মেঘের মধ্যে নিখা একপ্রকারের বোলাটে আলোকে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাইল, অনেক নানিতেছে, অনেক চড়িতেছে,—এবং তাহারই মাঝখানে ঠাঁড়াইয়া একটা শোকাচ্ছন্ন রমণী-মূর্তি কিসের তরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এ অচলা। একজন কুলি বাড়ি একটা মত চামড়ার ব্যাগ লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া কাছে ঠাঁড়াইতে সে ভাঙকে কি একটা দ্বিজঙ্গা করিয়া গেটের দিকে দীয়ে দীয়ে অগ্রগর হইল।

একজন পরীক্ষিত হুয়েশ নিশ্চেষ্টভাবে শুখু চাহিয়াই ছিল। বোধ হয় তাহার চোখের দেখা ভিতরে ঢুকিবার পথ পাইতেছিল না। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার বেলের শব্দ প্লাটফর্মের বোর্ড এক প্রান্ত হইতে লম্বা ধনিয়া উঠিয়া তড়িং-স্পর্শের মত তাহার অন্তর-বাহিরকে এক মুহূর্তে এক করিয়া তাহার সমস্ত ভবিষ্য চূড়াইয়া বিল, এবং পলকের মধ্যে সে নিজের ব্যাগটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

টিকিটের কথা অচলার মনেই ছিল না। সে দ্বারের মুখে টিকিট হাবুকে দেখিয়া ধমকিয়া ঠাঁড়াইতেই হুয়েশ পিছন হইতে নিম্ন কণ্ঠে কহিল, গাড়ীয়ে না, চল। আমি টিকিট দিচ্ছি।

তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই। সুহৃৎের ক্ষত সূত্রায়, ভয়ে তাহার পা উঠিল না, কিন্তু এই সন্কেচ অপরের লক্ষ্য-বিষয়ীভূত হওয়ার পূর্বেই সে আত্মে আত্মে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া উভয়ের নিম্নসিখিত মত কথাবার্তা হইল।

হুয়েশ কহিল, আমি ভেবেছিলাম তুমি সোঝা কলকাতাতেই ফিরে বেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহ্লিতে নেবে পড়লে কেন? এখানে কি পরিচিত কেউ আছেন?

অচলা অন্তর্দিকে চাহিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়াই দ্বাব বিল, কলকাতায় আমি কার কাছে যাবো?

“কিন্তু, এখানে?”

অচলা হুপ করিয়া রহিল। হুয়েশ নিজেও কিছুকণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমার কোন কথা হয় ত আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আর সেভাবে আমার মালিশও কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কাছে শেখ সময়ে কিছু ভিক্ষে চাই।

অচলা তেমন নীরবে স্থির হইয়া ঠাঁড়াইয়া রহিল।

হুয়েশ কহিল, আমার কথা কাউকে বোকাবারও নয়, আমি বোকাতেও চাইনে। আমার তিনিশ আমার সবাই থাক। যেখানে গেলে এখানের আশ্রন আর গোড়াতে পারবে না, আমি সেই বেশের জন্তই আজ পথ ধরলুম, কিন্তু আমার শেখ সফলটুকু আমাকে হারও,—আমি হাত জোড় করে তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

তথাপি অচলার মুখ বিরা একটা কলাও বাহির হইল না। হুয়েশ কহিতে লাগিল, আমি নিজে তোমাকে অনেক কিছু কথা বলেছি, অনেক গুণে দিয়েছি; কিন্তু পরে যে ভালো-খারকর মস্ত ওপরে বসে তোমার মাথার কলঙ্কের কাগি ছিটিয়ে ভালো করে তুলবে, সে আমি মরেও সহিতে পারবো না। আমার জন্তে তোমাকে আর না চুঃপেতে হয়, বিয়ার হবার আগে আমাকে এইটুকু সুযোগ ভিক্ষে দিয়ে বাও অচলা।

তাহার কণ্ঠস্থরে কি যে ছিল তাহা অন্তর্গামীই জানেন, অকস্মাৎ তত্ত-অক্রতে অচলার দুই চক্ষু জ্বালাল। গেল কিন্তু শুণ্ড সে নিজের কণ্ঠ প্রাণপনে অবিকৃত রাখিয়া সুদূরবর্তী শুখু দ্বিজঙ্গা করিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

হুয়েশ পকেট হইতে টাইম-টেবিলখানা বাহির করিয়া সাতার সময়টা দেখিয়া লইয়া কহিল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন কোনদিকে বাবারই উপায় নেই, তখন এইটুকু কাল আর আমাকে বিশ্বাস করো না, এই শুখু আমি চাই। আশা হতে তোমার আর কোন অকলাপ হবে না একথা তোমার নাম করেই আজ আমি শপথ করছি।

প্রত্যুত্তরে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু সে যে সমস্ত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল।

চোখের মুষ্টি এবং কৌতুহল আকর্ষণ করিবার আশঙ্কায়

ষ্ট্রেনে ফিরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বিবাহের ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে হ'লনের কাহারও প্রতীতি হইল না। সন্ধান লইয়া জানা গেল বড়-সাজার উপরে সম্রাট শের-শাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ের অস্তিত্ব আদিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সহরের একপ্রান্তে তাহারই একটার উদ্দেশে হুকমে অগ্ণকালের ভ্রম নিরোধের মর্যাদিত্ব হুৎ বিদ্যুত হইয়া একখানা গরুর পাড়ী ভাঙা করিয়া যাত্রা করিল।

পথে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, কেহ কাহারও মুখের প্রতিও চাহিয়া দেখিল না। শুধু গো-শকট আসিয়া যখন সরাইয়ের প্রাঙ্গণে থামিল, তখন নানিতে গিয়া পলাকের ক্ষত্র হুরেশের মুখের প্রতি অচলায় দৃষ্টি পড়িয়া সে মনে মনে শুধু কেবল আশ্চর্য্য নয়, উদ্ভিগ্ন হইল। তাহার হই চোখ ভয়ানক রাঙা, অথচ মুখের উপর কিসে বেন কালী মাখাইয়া দিয়াছে। সংসারের অনেক বড়-কাপড়ের মধ্যেই সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার এ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখিয়াছে নহি। দরপ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ানকে তড়া দিয়া বিদায় করিয়া হুরেশ

মনি-ব্যাগটা সেইখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, এটা আপাততঃ তোমার কাছেই রইল, যদি কিছু দরকার হয় নিতে লক্ষ্য কোরো না।

অচলায় ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, এ কথার অর্থ কি? কিন্তু পারিল না। হুরেশ কহিল, এই হুশুখের ঘরটাই সম্ভবতঃ কিছু ভালো, তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর, আমি পাশের কোন একটা ঘর থেকে এই জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে আসি। কি জানি এইগুলোর মধ্যেই বোধ করি এ রকম বিস্তীর্ণ চেকুচে। বলিয়া সে অচলার হুবিধা-অহুবিধার প্রতি আর লেশমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের ব্যাগটা হাতে লইয়া গ্রীক বাতালের মত টলিয়া টলিয়া বারান্দা পার হইয়া কোনোর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এই অচিরমীম্র রাত্রি আচরণে অচলার বিশ্বাসের অবধি রহিল না। কিন্তু এমন করিয়া একাকী পথের- ধারে ধাঁড়াইয়া থাকার যার না; তাই সে অনেক কষ্টে নিজের ভাবি ব্যাগটা টানিয়া টানিয়া সমুখের ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং তাহারই উপরে তরু হইয়া বসিয়া রাত্তার উপরে লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি

অভিভাষণ*

[মাননীয় বিচারপতি সার্ব শ্রীমান্তোষ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-ল]

সভা চ মা সমিতিচাবতঃ প্রজাপতেহু'হিতয়ো সংবিদানে।

যেনা সংগচ্ছা উপ বা স শিকাজ্ঞাত বশানি পিতরঃ

সংগতেষু ॥

বিশ্ব তে গতে নাম নরিতা নাম বা অসি।

বে তে কে চ সত্যসম্বতে যে সন্ত সবাচনঃ ॥

এষামহঃ সনানীনানি বরো বিজ্ঞাননা মসে।

অস্তাঃ সর্গস্তাঃ সং সোমা মামিত্র ভগিনঃ স্পৃগ

বদ্ বো মনঃ পত্নাগতঃ বদ্ বহ্মমিহ বেধ বা।

তদ্ বা আবর্ত্তগানসি বরি বো রমতাঃ মনঃ ॥

অধর্ষবেধসংহিতা ৭:১:১১-৪

ধর্ম্মগভার ধর্ম্মোৎসবের দিনে বাহা আবাদিগের দূর হইতেও হুহুর তাহা সম্বিকট হয়; বাহা প্রচ্ছন্ন তাহা বিকশিত হয়; বাহা হুহুর তাহা ভাঙে হয়। আবাদিগের দিনে সমাদীন সভাসদবর্গের দ্বয়ের আনন্দ সকলের দ্বন্দ্বকে অধিকার করে। অল্প সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা অধিকার বাহা অধ্যাক্ত থাকে আদ্য তাহা পরিচ্ছূট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব আহার মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাংস পূর্ণক আদ্য আপনাদিগের সমুদীন হইয়াছি। সেই সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবাদিত মনে করিতে কুষ্ঠা কিংবা সঙ্কট হয় না। সমবেত সকল দ্বয়ের প্রস্তুত আনন্দ

আমার নিজের জ্বরকে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অস্ত্রকার অধিবেশনে আদিমযাওয়ার সভাপতিত্বপে সমাজের বাহা উদ্বেগ ও নিবেদন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের গুণ ইচ্ছা পাই, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ, ভক্তিতে পরিণত হয়, পরম প্রেমরূপের সাধনার সাধায়া করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদের পৈতৃক জাতীয়তার স্রষ্টা। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হিন্দু বলিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবাবিত মনে করি। বহু দিন পূর্বে এই সমাজের একজন পুণ্ড্র স্বনামধন্য আচার্য্য মহোদয় * হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সহজে একটা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই কথেকটা কথা বলেন—

“আমি দেখিতেছি আমার সমুখে মহাবল-পরাভাবিত হিন্দুজাতি ভিন্ন। হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া বীর কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং মেঘবিক্রমে উন্নতির পথে গাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-বোধ্যাবিত হইয়া পুনরায় জান ধর্ম সত্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবী হৃদয়ভিত্তি করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ষি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীর পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে।”

আমরাও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাহার উপসংহার আমার উদ্বোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা হরি নাই। হিন্দুধর্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। বাহা সত্য, সত্য-প্রতিষ্ঠা, তাহার মরণ নাই। আশা হয় আমাদের ধর্মকেস্রক জাতীয় ভাব লাগিয়া উঠিলে সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানুতঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—“আমরা ভারতবাসী যে এই হৃদয়-বারিভা, ঘর-বাহিরে উৎপাত সরে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা লগতের মত এখনও আবিস্কৃত।” আবারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি অস্ত্রের করিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহা ধর্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। যোগ্যানে আবার কোরার বহির্বে, আমার বিশ্বাস। আশা

হয় গোড়া ক্ষেত আবার অক্ষুণ্ণ হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া আমি হৃদয় কথা বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রাধান্টিত হইয়াছিল, বাহা এখনও নির্বাপিত হয় নাই, বাহা এখনও গোঁড়াইতেছে, কতদিন ধর্মাবিকার ও রাষ্ট্রধর্ম স্বতন্ত্র থাকিবে ততদিন সে আভ্যন্তরীণ নিকিবে না। ইউরোপীয় লগতে আদিকার ও স্বকর্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে কুতুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই পুত্ৰই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আভ্যন্তরীণ লগিয়াছিল, তাহাতে লগিয়া কল্লভের টুকরা মাত্র। League of Nationsই বল, Parliament of menই বল, আর Federation of the worldই বল—যে ভাবেই উল্লেখ কর না কেন, সেই League, Federation, Parliament-এর ধর্মশক্তি নাই থাকিলে নামেবাহেই থাকিবে। সে নামে মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐকিক প্রতিগতির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্মী হও, কিন্তু কালের সেবে “ব্রহ্মপূর্ণময়” বলিয়া কালের চল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই।

কর্মী কর্তব্যল চার। তুমি হইই সেই শক্তি প্রকাশন কর ততই তাহা অসংহত হইয়া পড়ে, তাহা উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তি-সাধনা আত্মিক।

নিত্শের (Nietzsche) অ্যান্টিক্রাইস্ট গ্রন্থ (Anti-Christ) পড়িতে পাই—

“তত কিসে? ক্ষমতা প্রচারে। ক্ষমতা শক্তির আকাঙ্ক্ষা বাহাতে প্রবল হয় তাহাতে। হাহুয়ের শক্তি প্রভাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা প্রচারের অন্তর্ভুক্তিতে। বাহা বিয়ের অস্তিক্রমে। ক্ষমতা অর্জনে অস্তিক্রম ও অপরিভূষিত। সর্বধর্ম বিনশের শান্তিলাভে নহে, সংগ্রামে। স্বর্গবলে, ধর্মবলে নহে।” *

* “What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contentedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but capacity.”

মার্মাণ্ডিতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আত্মহিত্য বস্তু দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি ?

মার্মাণ্ডিনি তাহার “মানবধর্ম” (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, “যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের কালে প্রেম, ক্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না।” ঐহিক প্রতিপত্তি দ্বাধানিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বৃক্ষে পা পড়িতেছে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দশাইয়া দাইতেছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে “ভাই, ভাই”, কিন্তু কারো বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাহীদিগের শিক্ষার ফল। মার্মাণ্ডিনি বলেন যে বিরোধ, স্বতন্ত্রতা, ধর্মবন্ধন না থাকিলে যটবেই যটবে। নির্জিয়োগ হইতে চাহিলে লক্ষ্য এক হওয়া,—একীকৃত হওয়া চাই;—সেই লক্ষ্য ধর্ম। ব্যক্তিগত স্বাধিকার আছে নত্যা, কিন্তু সেই স্বাধিকার রক্ষার চেষ্টাতে বর্তমানই অস্ত্র ধন বা অস্ত্র জাতি প্রতিদ্বন্দ্ব হইয়া দাঁড়াই—বর্তদিন তাহাৎ ধর্মতাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না পার। সমাজ কিংবা জাতি সংকল্পে ধর্মতাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি কয়গী দেশের Lamennais-এর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ‘স্বাধিকারসিদ্ধি ও কর্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস’। প্রাপ্তির চেষ্টাতে তাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরোধের অবদান হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধাবিধি অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পার না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নির্ভর, সে জাতির জীবন শোণিত-সিক্ত। এই চেষ্টার নিরুত্তি কিসে, সেব কোথায়? বর্তদিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্বল জাতি অগ্রে থাকিবে, ততদিন সেই স্বাধিকারের প্রসার চলিতে থাকিবে। নির্জীব জাতি দলিত হইবে। বর্তমানের কথা,—‘আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে

পড়িবে তাহাকে দমন করিব, বাহার সহিত বিরোধ তাহাকে উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। যাহা বিয় সহ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই’।

এই আত্মহিত্য ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী মানব-রাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ধর্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্মরাজ্যের সংগ্রাম থাকে, তাহাতেই ধর্ম-মানবের যুদ্ধ হয়। যে মহাসমর হইয়া গেল, তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া আত্মহিত্য বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধ আমেরিকার যোগদান সেই ধর্মভাবের উত্তেজনা। আমেরিকার নিজের হ্রদিখা কিংবা প্রতিপত্তিসাধনের কিছুই ছিল না। Crusades-এর সময় যেমন God wills it! God wills it! বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, ঐযতের আদেশপালন কর্তব্যতানের উপর—বিধাসের উপর তাহার একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেবদানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে রিপু দমন হয় না। যে শক্তিদানব যুক্তি লাভ হয়, তাহা ঐশ্বর্যশক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশ্বর্য শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মৌলিক লাভ হয়। যাহা কিছু কর্তব্য, তাহাই ব্রহ্ম অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত চরম, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধর্মসের কারণ, প্রসারের কারণ। ধর্মই কর্তব্য। প্রাপ্তিতে তাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমারই সবার্ণ। আমি করদানের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমারই। যাহা সবার্ণ, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই ‘আমি’ পরিত্যাগ আবশ্যক। সব লগতের যাহা, তাহা অনন্তের; যত্বের সেই দর্শন্যাপক ভাব ধর্মই অর্জবী। কর্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্র আত্মহিত্য শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

Mazzini বলেন—‘যদি মানব-মনের অসীমত্বরূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিত্ব আমাদের উপর অধ্যাপিত করিলে কে সেই অধ্যাপিত হইতে আমাদেরিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোন পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে জ্ঞান অজ্ঞান বিচার করিবার মাপদণ্ড কোথায় থাকে ?

অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে কাহার বলে প্রতিবাদ করিব? আশাঘের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া অনসাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থভাগ করিতে, আপনাকে বলি দিতে আত্মান করিব? বহু দিন পাঠ আমরা আমাদের বুদ্ধিগ্রস্ত মতামতের উপর ঠাড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, ততদিন কথাই মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে পাইতে পারিব না। *

৫- অর্থগী আতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধনা বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিযুক্তিত করেন। সংগ্রামোচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব সংগ্রাম-চেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা (Baron von Freytag Loringhoven) অর্থগীর এক অন সূক্ষ্মপ্রধান গৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইস্কে (Treitschke) বলেন—

“প্লেসতা” বল, বর্জর বল, উত্তরেরই পত্তবৃত্তি আছে। বাইবেলের এ কথা সত্য—মানবচরিত্রের পাপতাব, মাহুয় যে সময় সৃষ্টি হয় সেই সময় হইতেই। সত্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—বতই কেন সত্য হও না তাহা বাইবার নহে। পত্তপ্রকৃতিকে দমন করিতে মাহুয় কখনই পারিবে না।”†

কিন্তু তাহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্তন না হইলে শক্তিপুঞ্জিতে মানবের হিতসাধন হইবে না।

* “If there be not a Supreme mind reigning over all human minds who can save us from the tyranny of our fellowmen, whenever they find themselves stronger than we. If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against oppression and irregularity? How shall we demand of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect suggests to us, we shall have what we have to-day adherence in words not in deeds.”

† The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than

আত্মার সংহার যদি আবশ্যক হয়, তাহা ধর্মতাব ভিন্ন কিসে হইবে? অর্থগীরস্রাট বিতবৃত্তের পদ পাইয়াছেন তাবিতেন। তিনি প্রকান্তভাবে তাহার প্রোদ্যবর্গকে বলেন “আমি সময়ে—আমি তোমাদের রূপদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আত্মা করি, পিতা-মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগের তাহা তৎকথাং প্রতিপালন করিতে হইবে। সে কার্য ভাল কি মন্দ তোমাদের বিচার্য্যীন নহে। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজপত্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আত্মাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম।”

অর্থগীর নেতাগণ সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে তাহার সত্যতই মহিবার জন্ত প্রস্তুত থাকে।—শিক্ষা যেন, “বল, আমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিব? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিব।” তাহারের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্ত। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম শাসনতত্ত্ব (State and Church) বহু দিন হইতে ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে—রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্তব্য। রাজনীতি ধর্মের শাসনের অধীন নহে এই উদ্যোগের কথা।

কিন্তু হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্মতাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবজন্মের আনন্দ দেখা গিয়াছে। Mazzini এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—

“সমস্ত বড় বিপ্লবের তিতর যে ধর্মি ব্যক্তির হইয়াছিল, তাহাই জুগেজুগের ধর্মি—“ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।” এই ধর্মিই নিরুদ্ভাৎ কর্ণে প্রস্তুত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে ছুরেদের শিল্পীগণ মেডিচিভিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রী স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিয়া বিতবৃত্তকেই অনন্ত রাজ্যের নেতা বলিয়া অভিষেক করেন।” *

the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

* “The cry which rang out in all the great revolutions the cry of the crusade “God wills it!” “God wills it!” alone can rouse the inert into action. Remem-

ইতালীতেই স্ত্রাবনরোলা (Savanorola) ম্যাটুসিনি (Mazzini) এবং গারিবল্ডি (Garibaldi) জয়গ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা—জানকর পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জন কর, এবং তাঁহার নিয়ম, সত্যের নিয়ম জান। আর আমাদের প্রাচীন গুণবির হসিরা গিয়াছেন—

“গত্যে জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম”

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন;—

“দ্য তদ্ভিন্দু পরম প্রেমরূপা”

তাঁহাকে “প্রেমবরূপদ্ম” বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে,—

‘সিদ্ধো ভবতি’

অমৃতো ভবতি

ভূপ্তো ভবতি* বলিয়াছেন।

ভন মল্টি (Von Moltke) একটা শান্তি-সভাতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন :—

“বৃহ পুণ্যকার্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য-বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে। বৃহ মানবপ্রকৃতির মহত্ব ও উন্নতির উপায়। তাগাতেই মহত্বময়, নিঃস্বার্থপরতা*, সাহস বশান্ততা প্রকৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈবরিক ভাব হইতে মানুষকে উদ্ধার করে।”

এই কপট আধ্যাতিক ভাবের কথা পড়িলে বিমিত্র হইতে হয়। অর্থাগীতে কি ভাব দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা বুঝা যায়। যে বাহাই বসুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ধর্মসত্য উপস্থিত সকলেই

নিষ্কর বলিধেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাণ্ডকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্তব্যে ধর্ম করিয়া তুলিলে অধঃগতন নিষ্কর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, মানব-সম্প্রদায়ের বিবেক নাই—“Human communities have no conscience.” তিনি বলেন—“উদ্ভেদ সাধনে সব পন্থাই সাধু।” সেখানকার একজন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতিকক্ষেে বলপ্রয়োগ অনিবার্য। জেনারেল বার্নহার্ডি বলেন, বৃহ স্বভাবমত নৈবিক প্রয়োজন (biological necessity) ; বৃহ হইতে জীবন লাভ হয়। আশ-কালকার অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির এই ভাব। কিন্তু সেই অর্থাগীতেই ক্যান্ট জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে, “মাহুৎ স্বাধীন; স্বাবলম্বন তাঁহার প্রকৃতি। যখন সে কোন আর্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্তব্যপারায়ণ হয়, তখনই সে সত্যের পথে চলে।” তিনি বলেন যে “ঐশী প্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অবনিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মাহুৎ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মাহুৎ কর্তৃ, নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম গঠন করে। Kant’ দ্বারাও বলেন “মানব দ্বারে জ্ঞানই ব্রহ্মোদ্ভূত। বাহ্য জ্ঞান তাহাই পবিত্র। এই নীতিধর্ম রামায়ণও প্রাপ্য। তাঁহাকে তাহা হাঁটু পাতিয়া লইতে হয়।” *

কিন্তু Barnhardi বলেন—“ঈশ্বরের প্রেম সর্বোচ্চ সাধনা, এবং ঐতিবাণীকে অধ্যবসৎ দেখ, এই ছই কথা রাজ্য-ভগ্নে বাটে না। জীতিমান ধর্মনীতি নিজের জন্ত, সমাজের জন্ত, তাহা কখনই শাসনভগ্নের জন্ত হইতে পারে না। বিত্তর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে।” Barnhardi হউন, মল্টি (Moltke) হউন, কিংবা কাইজার (Kaiser) হউন, কাহারও এসব কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা হামু ভাতি; কিন্তু আমাদের দ্বারে ধর্মতাব আছে,—আমাদের অবনিহিত বিপুল ধর্মশক্তি আছে;

* He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate depths of the Divine nature. Man is then a sovereign entity, bearing within himself the law of his own will.

ber the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

(৭) “War is sacred and instituted by God; it is one of the holy bonds which rule the world; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism.”

আমাদের মনে তাঁহাদিগের এ কথা কখনও স্থান পাইবে না। আমাদের কথা,—সত্য জ্ঞান: অনন্ত ব্রহ্ম।

“ভগবৎ সাধাতাম্, ভগবৎ সাধাতাম্”

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, ‘পিতামোহসি’ তিনি পিতার ভায় আমাদের পিতৃগণের জ্ঞান দান করুন—

“পিতা নো বোবি”।

অন্তহ্যং সৌগভ্যং ভক্তো

ভক্তদিগেরই তিনি দুলভ।

নাস্তি স্তেনু জাতিবিশ্রাভপুঙ্খলখনক্রিয়ামিত্যেতৎ:

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিভ্রাভ রূপ কুল ধন ক্রিয়াদিভিন্ন ভেদ নাই।

তন্ময়া

তাঁহাতে সকলই সম্পূর্ণ

বস্তু স্বরীরা

সবই তাঁহার;

এই সহস্র শিক্ষা হিন্দুধর্মের। যিনি এই শিক্ষা অঙ্গুলরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠ লভতে, স শ্রেষ্ঠ লভতে

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হইবেন।

আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা—হিন্দুধর্মের এই বীজ-ব্রহ্মলাই আদি সমাজের বীজমন্ত্র। আদি সমাজ হিন্দু সমাজ; আদি সমাজের ধর্ম হিন্দু ধর্ম। হিন্দু সাধনাতে জাতি-বিভ্রা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াধির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে হুঁ! হয় না—সংঘর্ষে সংঘর্ষে বলিতে সাহস হয়, বলিতে পৌরষাধিত মনে হয়। সাধক সমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় সধীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূত-ভবিষ্যতের এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

জিনিস্তাভ ভক্তিরেব গজীৱনী ভক্তিরেব গজীৱনী—

স্বাধিকার অর্জন কর কিন্তু ধর্মার্জনের অহুসিলন না করিলে, ব্রহ্মে ভাষা সমর্পণ না করিলে বিদ্রোহের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। সেপ কাল পাত্রে উগর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সাবলম্বন। এই শিক্ষা নিম্নের উপর নির্ভর করে; ইহার ভর মধ্যবর্তী কোন কিছুই প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যস্থিত ‘বৎ অস্বাকং তবামি’। এই ধর্ম সনাতন-ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষা নহে।

ম্যাটুসিনি বলেন—ভগবান ক্রমাগত মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান—God manifests himself successively in humanity.

হিন্দুধর্ম ও গণতন্ত্র হিতের জন্ত—

‘সন্ততামি যুগে যুগে’

ভগবানোক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাটুসিনি ইতালি মধ্যে বলিয়াছেন—“আমাদের জাতির ভিতরে ধর্মভাব মিশ্রিত আছে—প্রাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই মূল ধর্মভাবকে প্রাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন।”

আমারও আজ সেই কথা। এই কোটি কোটি হিন্দু মধ্যে এরকম একটি দোকান জন্মে নাই, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্মভাব হইতে ধর্মোৎসবের দিনে সেই ভাব প্রাগ্রত হয়, এই আমার প্রার্থনা।

ও ব্রহ্মপূর্ণময়

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories.

ঐচ্ছিকতঃ যোগ্য বি-এ প্রণীত, মূল্য চৌদ্দ আনা

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীট-দ্বন্দ্ববিরোধ সংক্রান্ত শ্রীমুক্ত গারডেন
যেমন মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। পূর্বা এমিকল-
চারেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা
প্রকাশিত করেন; কিন্তু সে সময়েই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় বলিয়া
ইংরাজী অনভিজ্ঞ লোকের কোনই উপকারে আসিলে না। এই
মৌমাছি-পালন পুস্তকখানিও ইংরাজীতেই পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল;
সদাশয় গার্ডেন্স এক্ষণে তাহা বাহাংগে প্রকাশিত করিয়া আশা করেন
বঙ্গবাসীকাল হইয়াছেন। মৌমাছি-পালন করিয়া কেমন করিয়া
লাভবান হওয়া যায়, কিভাবে মৌমাছি-পালন করিতে হয়, তাহার
সমস্ত বিবরণ এই পুস্তকে অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। চাহুরীকীমী বাসালী এই পুস্তক পাঠ করিলে বোধহয়
পাইবেন, আশা করেন বেশ কত লাভজনক ব্যবসায়েই পথ রহিয়াছে;
তবু একই বর-চৌরীর প্রয়োজন। আশায় সকলক্ষেই এই পুস্তকখানি
পড়িলেই সস্তা অনুবোধ করিতেছি। তবু যে ব্যবসায়ীরাই পড়িবেন
তাঁহা নহে, অপরদেরও শক্ত উচিত। বইখানির দ্বারা অতি সুন্দর;
অনেকগুলি উদ্ভূত হইতে পারে। পূর্বা কৃষি কলেজে প্রকাশকের
নিষেধ বইখানি পাঠ্য বই।

নামিত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষদ্বারা প্রণীত, মূল্য ছয় টাকা

শ্রীমতী শৈলবালা বাসালী উপজাতি-পাঠকদের দিকট অপরিসীম
নমস্কে; তাহার কয়েকখানি উপজাতি-বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।
এই 'নন্দিতা' উপজাতি তাহার বংশ: স্তম্ভ করে নাই। পুস্তকখানির
আখ্যানভাগ পুং বিদ্যুত নহে; কিন্তু হৃদয়বিধা ইহাতে যতদূর
যে যিহেব করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। কর্তব্য-পারগণতা যে
কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ হয়, গায়ের অন্তি করিতে কেনে যে কেমন
করিয়া নিজেই অন্তি হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিদ্যুত
হইয়াছে। 'নন্দিতা'র চরিত্রে যে আশ্চর্য প্রতিষ্ঠিত করিবার স্তম্ভ
সেইখানি প্রত্যক্ষ লেখনী দ্বারা করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।
এই উপজাতিখানির মধ্যে আরও হইবে বহিরা আশা করেন বিদ্যায়।

সুত্র সঙ্গীত

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা

'সুত্র-সঙ্গীত' একখানি কাব্য। আত্মকালকার দিনে নৃত্য কবিতা
যা কয়েকজন তনিয়ে লোকের নব স্নাতকের সঙ্গার হয়; যিহেব
লেখক যদি অপরিসীম হয়। কিন্তু আশা নিঃশব্দভিত্তি বসিতে পারে,
সুত্র-সঙ্গীত একখানি কাব্য—উৎকৃষ্ট কাব্য। যিনি এই কাব্যখানি
পাঠ করিবেন, তিনিই লোকের কবিতাগুলির স্তম্ভী প্রকাশ না করিয়া

প্রকাশিত পারিবেন না। কি বিষয়-নির্মাণ, কি বর্ণনা, কি লক্ষ্যবোধন,
কিছুতেই এই কাব্যখানি অন্যদৃষ্টির মত। ইহা বিশালময়ের পাঠ্য-
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে যেখানি আশা করেন আনন্দিত হইয়াছি।

স্বনীতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত, মূল্য বেড় টাকা

পুস্তকখানির নাম পড়িয়া যেন ইংরাজি, ইহা হয় ত কোন ভ্রম
নাম; কিন্তু তাহা নহে। স্বনীতি পুস্তকখানি এবং একটা মাসের
মত বাস্তু। বহিঃ অনাথ বাসক নিঃসঙ্গ অবস্থায় পতিত হইয়াও
শাসনময়ের বসে কেমন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে, এই
উপজাতি তাহাই বলা হইয়াছে; এবং যেমন করিয়া বসিলে টিক বলা
হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। বইখানি আত্মকালকার উপজাতি লিখিত
হয় লিখিত নহে; পূর্বে যে কালে আখ্যাতিকা লিখিত হইত, সেই
কালেই লিখিত। লোক মহাশয় অতি কৌশলে ইহার মধ্যে মানবদেহের
স্বাধীন বুঝতে বিদ্যায়। লোকের লিপিবদ্ধতা প্রকাশের; তাহার
উপর তাহার বেশ অধিকার, সুত্র-বর্ণনা অতি সুন্দর; আখ্যানভাগেও
বৈচিত্র্য আছে।

জলদ্বি

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি জলদ্বি চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা-
সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে কতগুলি ছোট গল্প
প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলির আর সবই ইত্যংপূর্বে বাসিকপণ্ডে
পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি এতই সুন্দর, এমনই করতলে,
এমনই চিত্তাকর্ষক যে, এই পুস্তকে সেগুলি পুনঃ, বসিতে দেখে,
এক নিমেষে পড়িয়া কেঁদিত হইল। ছোট গল্পের আট যে কি,
তাঁহা বসিলে বাস্তু এই গল্পগুলি পড়িলে বেশ সুখিত পড়া যায়।
কোনী রাবিনা কোনীরা নাম করি,—সবগুলিই সুন্দর। এই
পুস্তকখানি আটআনা-সংক্রান্তের অন্তর্গত যেখানি আশা করেন আনন্দিত
হইয়াছি।

পুস্তকখানি

শ্রীকৃষ্ণস্বামী পাণ্ডা বি-এ প্রণীত, মূল্য বেড় টাকা

এখানি উপজাতি। ইহাতে বিষয়ক কোন ঘটনার সন্ধান নাই,
বহিঃ বাসালী গৃহস্থের স্তম্ভ-কালের কথাই কথিত। এই উপজাতি
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাসালী গৃহস্থের গৃহিণী একমাত্র ভবনবান
উপর নির্ভর করিয়া কিভাবে মসায়-মসায়ের জাতি হইতে পারে,
'পুস্তকখানি' নির্ভরশীল চরিত্রে তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত
হইয়াছে। মাসার হৃদয়কার সত্যবর্ণন কেমন উন্নত-চরিত্রে হইতে
পারে, এই উপজাতি তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি নিঃশব্দভিত্তি
জী, জাতি, পুস্তকখানির হতে কেবল বসিতে পারে; এবং তাহার
এই পুস্তক পাঠে হৃদয় লাভ করিতে পারিবেন।

প্রাচীন উৎকল (গঙ্গাবংশ)

[আলোচনা]

[প্রিপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল্]

বিপ্লব ১০২৫—ভাষ্কর নংগা তাম্রলিপ্যে শ্রীমত রতনচন্দ্র নাম মহাপর
কণ্ঠক লক্ষ্যিত 'উৎকল মাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে মুদ্র (শ্রীকট
১০২৫) হইতে 'প্রাচীন উৎকল' (গঙ্গাবংশ) প্রথম পৃষ্ঠীত হইয়াছে।
এই প্রবন্ধের প্রতিপাতক বিবরণের সম্বন্ধে আশ্বাসের কিছু বক্তব্য আছে।
'প্রাচীন উৎকল' প্রবন্ধের লেখক শ্রীমত রতনচন্দ্র সিংহ মহাপুত্র মহর্ষি
শাক্তব্যাধির বাহিষ্য ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদির লেখক ভাটিকে অতির
শীকার করিয়াও বলিতেছেন—“উক্তিয়ার কেওটোয়া ভক্তি নীত ভাতি
ও ইহাযের মদ অশুভ। নৌ-চালন ও-বন্তে ব্যবসায় ইহাযের প্রদান
বাসনা। হুতরাঃ পরপতিবধের সহিত ইহাযের সম্বন্ধ ভক্তি হাতাশন
কথা।” উক্তিয়ার কেওটোয়া রাজব্যাধির বাহিষ্য ভাতি নহে।
উক্তিয়ার কেওটোয়ির সহিত বাহিষ্য ভাতির কোন সম্বন্ধ নাই।
হুতরাঃ পরপতিবধের সহিত উক্ত কেওটোয়ির কোন সম্বন্ধ থাকিতে
পারে না। উক্তিয়ার কেওটোয়া মৃত্যু নৌ-কর্ণকৌরী ভৈবর্ত। উহায়া
নিবাস দিতার ভরবে আশোদনী রাতার গর্ভে প্রসবগ্রহণ করে। উহাযের
ভাতীর ব্যবসায় নৌ-কর্ণ; শৈলুক ব্যবসায় বস্ত্র-ব্যত। বধ্য

নিবাসো দার্কক হুতে দাশ্য নৌকর্ণকৌরী।

কৈবর্তমিতি যঃ প্রাজ্ঞাধ্যানবর্ত নিবাসিনঃ।

মত্, ১০-ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

অজ্ঞত নিবাসের ব্যবসায় আছে—“নিবাসিনাঃ বস্ত্রব্যাতঃ”। উক্তিয়ার
কেওটোয়ির যখন নৌকর্ণ ও মন্যাবিক্রমারি ব্যবসায় গাইতেছি, তখন
উহায়াই মৃত্যু নৌকর্ণকৌরী ভৈবর্ত। উহাযের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরা-
ণারি লিখিত কৃষ্ণকৌরী কত্রিঃ-মদন বাহিষ্যভাতির কোন সম্বন্ধ
নাই।

এখনে গঙ্গাবংশের কথা। লেখক মহর্ষিঃ তাম্রশাসনের প্রমাণে
বলেম, গঙ্গাবংশেরাজ চন্দ্রবংশলভ্যতঃ। গঙ্গাবংশীয়েয়া বাহিষ্য হইলেও
চন্দ্রবংশীঃ হুতরাঃ অনন্তব্য নহে। বাহিষ্যভাতির শিভা কত্রিঃ, বাতা
বৈভা। হুতরাঃ শিভুল্লম অরেন তাঁহারা বীর বংশ-প্রপতিতে নিকমের
চন্দ্রবংশ-সম্বন্ধ বলিয়েম, বিচিতি কি ?

এখনে দেখা থাকিবে, চন্দ্রবংশলভ্যতঃ গঙ্গাবংশীয়েয়ির অধি বাসনাম
কোথায় ? লেখক বহিভেদেব, অনন্তব্যবর্ণার রাজধানী বঙ্গাব-রেনার
অন্তর্গত গঙ্গাবাণী প্রায়ে ছিল ; এবং ইহা তাম্রশাসনের উক্তি বলিয়া
তিনি বলেন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনন্তব্যবর্ণার রাজধানী গঙ্গাবাণী হইতে
পারে। তাহাতে তাঁহারা যে পটাবেম লোক বা উক্তিরা, ইহা সম্ভব
হয় না।

গঙ্গাবংশীয়েয়িতও সমসাময়িক ইতিহাস নহে। ইহা অনন্তব্যবর্ণার
বহুকাল পরে রচিত। উহাতেও গঙ্গাবংশীর চূড়মুখমতকে ‘কৈব কৈব
'শৌভ্রাশ্রমঃ’ বলিয়া নির্দেশ করেন’ লিখিত আছে। ‘শৌভ্রাশ্রম-
বংশই পরিণামে গঙ্গাবংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।’ লেখকের উদ্ধৃত
গঙ্গাবংশীয়েয়িতও এই কথাই উল্লেখ আছে। ‘শৌভ্রাশ্রম’ বলে
কিন্তু ইহা গঙ্গাবংশের বাসালীর হ্রিত হইতেছে।

মূল বাসাল্য পত্রিকা বহুকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান
মুদ্রিত বাসাল্য-পত্রিকার হস্তলিপি অনন্তমুদ্রণে দেখা।

‘গঙ্গাবাণী’ শব্দ তখন ‘গঙ্গারাজী’তে পরিণত হইতে পারে না।
অনন্তব্যবর্ণা বা কোলাহল একাধক শতাব্দীতে উৎকলের রাজা হয়।
‘গঙ্গারাজী’ রাজ্যের উৎপন্ন আশ্রয় বৃহৎসূর্য তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাপ্ত
হই। খোঁগা লম্বাট চন্দ্রগুপ্ত বৃহৎসূর্য তৃতীয় শতাব্দীতে বিজয়
হিসেব। ঐক্য পুত্র বিদ্যাধিনির্মল মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় বিজয়
হিসেব। তিনি গঙ্গারাজি নামক এক জনপদের বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।
হুতরাঃ দেখা বাইতেছে, ‘গঙ্গারাজি’ রাজ্য ‘ই’ প্রান্তের ১০০ বৎসর
পূর্বের বিজয়ন ছিল ; এবং বিদ্যাধিনির্মল উক্ত রাজ্যের পূর্ব সীমায়
গঙ্গানদী প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎপর বৃষ্টির প্রথম
শতাব্দীতে পিহিয়াশ, বৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উলেনি, ১ম শতাব্দীতে
রোমীয় মহাকবি জাভিল ‘গঙ্গারাজি’ রাজ্যের ও গঙ্গারাজী বীরবংশের
বীরবেব বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। (শৌভ্রাশ্রমগাণা ঐক্য।) এই
গঙ্গারাজী রাজ্যের অবস্থাই অনন্তব্যবর্ণা বা কোলাহল। এক কথা প্রত-
শাসনে লিখিত আছে। (P. C. XXXVIII Wilson's Preface
to Mackenzie collections) ; হুতরাঃ পরবর্তী কালের তাম্রশাসনে
লিখিত গঙ্গাবাণী শব্দ দেখিয়া আমরা উহাকে বহুসূর্যের গঙ্গারাজী
বলিয়া অনুমেয় বল করিতে পারি না। এখনে তাম্রশাসনের ও প্রত-
শাসনের ঐক্য করিলে প্রতীত হয়, রাজ্য কোলাহলই উক্তিয়ার বিজয়তঃ।
মহুর্ষ দাকিণ্যতে। গঙ্গাব জেলা পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভূক্ত ছিল,
এবং এই জেলের গঙ্গাবাণী নামে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

গঙ্গারাজী-রাজ বাহিষ্য মুদ্রিত। ইহার সম্রাটরাজ্য উক্তিয়ার
বতাইত বা বঙ্গাবাণী এই বৈশ্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। নবকৌরী
কামেন ইত্যাদি পূর্বের উক্তিয়ার বতাইত ভাতিই শাসক ভাতি রূপে পণ্য
ছিল। এখনে যে পত্রি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। বৃষ্টির রাজা
(বৃষ্টির রাজা) ও অজ্ঞত গুহুভাত রাজা নবকৌরী বতাইত-বংশোদ্ভূত।
ইহারা ক্রমোন্নতিতে কত্রিঃপদযাত্রা হইয়াছেন। উক্তিয়ার প্রথম কাত



কবি "নিবিড়-কেশী, মুক্তা-বসনা, হস্তকমলাধরা তে"—৮বিম্বেন্দ্রনাথ
 ইন্দু। আধাহুয়া তৌরীত আলোকিত হইতে [ইপিথহুয়া তৌরীত অহুয়া
 (Engraved at the Bharatvarsha Office)



ভৈরব, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড]

ষষ্ঠ বর্ষ

[চতুর্থ সংখ্যা

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত না বিকার ?

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

বৈকল্য ও অবৈতন্যকারী উভয়েই স্বীকার করেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম জগৎের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম প্রভু; এবং যে উপাদান দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। বৈকল্য ও অবৈতন্যকারী দ্বয়ের মধ্যে এই পর্য্যন্ত সামঞ্জস্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত না বিকার, এই লইয়া মতভেদ আছে। অবৈতন্যকারী বলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। বৈকল্য-বলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিকার।

বিবর্ত ও বিকারের প্রভেদ এই তালুক নির্দেশ করা হয়—

মতান্তরেভিন্নত্বা প্রথা বিকার ইত্যাদ্যুক্তঃ।

অন্তর্যন্তোভিন্নত্বা প্রথা বিবর্ত ইত্যাদ্যুক্তঃ।

যেখানে দুইটা পদার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় এবং তাহারা বাস্তবিক ভিন্ন, সে স্থলে ঐ দুই পদার্থের মধ্যে যে পদার্থটি

অপর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে অপর পদার্থের বিকার কহে। যে স্থলে দুইটা পদার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইলেও বাস্তবিক তাহারা ভিন্ন নহে, সে স্থলে একটা পদার্থকে অপর পদার্থের বিবর্ত বলা হয়। দৃষ্টান্ত মিলে কথাকাটা আরও পরিষ্কার হইবে। দুই হইতে দশি উৎপন্ন হয়। দুই ও দশি ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এবং তাহারা বাস্তবিকই ভিন্ন। এজন্য দশিকে দুয়ের বিকার বলা হয়। কিন্তু অন্নাদ্যকারে রন্ধু দেখিয়া যখন সর্প ভ্রম হয়, তখন সৃষ্টমান বস্তুর রন্ধু হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইলেও, বাস্তবিক তাহা রন্ধু হইতে ভিন্ন নহে। এখানে কল্পিত সর্পটি রন্ধুর বিবর্ত। উল্লিখিত দৃষ্টান্তের বিকার ও বিবর্তের গ্রন্থিত পুঙ্খানুপুঙ্খ। অতএব অবৈতন্যকারী যে বলেন, এ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবিক আদ্য জগৎ বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নহে। আদ্য জগৎ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে একটা

স্বতন্ত্র পদার্থের কল্পনা করি, তাহা আমাদের মনের ভ্রম। বৈক্যব বালীক তাহা নহে; বালীকে আমরা ভগৎ বলিয়া অনুভব করি, তাহা এক নহে; ভগৎ এক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা এক হইতে ভিন্ন।

উক্ত মত আপাত বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভগৎ যে এক হইতেই উৎপন্ন, ইহা বৈক্যব ও অধৈবতবানী উভয়েই স্বীকার করেন। কিন্তু এই এক হইতে ভগতের উৎপত্তি ব্যাপারের উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। বৈক্যব বলেন, হৃদ হইতে যেমন দধি উৎপত্তি, ত্রক হইতে ভগতের উৎপত্তি সেইরূপ। অধৈবতবানী বলেন, অশ্মট দৃষ্ট রজ্জু হইতে বেক্রপ সর্পের উৎপত্তি, ত্রক হইতে ভগতের উৎপত্তি সেইরূপ। আমাদের মনে হয়, উভয় দৃষ্টান্তই কিয়ৎপাশে দার্ষ্টান্তিকের অসুস্থত, তিরস্বেণে বিভিন্ন। রজ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি এক হইতে ভগতের উৎপত্তির অসুস্থত—এই অংশে যদিও আমরা সর্প দেখিতেছি, তথাপি রজ্জু রজ্জুই হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। সেইরূপ, যদিও ভগৎ এক হইতে উৎপন্ন, তবাপি, ভগতের উৎপত্তির পরও, ত্রকের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই;—তিনি ভগতের উৎপত্তির পূর্বে যেমন ছিলেন, পরেও সেইরূপ আছেন; তিনি অবিকারী, তাহার বিকার সম্ভব নহে। কিন্তু রজ্জুতে সর্পত্রয় দৃষ্টান্তটি ত্রক চৈত্রে ভগৎ-উৎপত্তির এই অংশে অসুস্থত হইলেও, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। রজ্জুতে বহন সর্প ত্রয় হয়, তখন আমাদের মনের মধ্যে সর্পের ধারণা হয়, মনের বাহিরে সর্পের কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ভগৎ যে আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। আমাদের মনের বাহিরে যে ভগৎ বলিয়া কিছু নাই, ইহা স্বার্থ নহে। আমাদের মনের বাহিরে যে ভগৎ বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই মনের কল্পনা—ইহা বিজ্ঞানবান; ইহা বেদান্তের মত নহে। ঐতিহাসিক, শব্দপ্রচারা “নাতাব উপলব্ধেঃ” এই বোদ্ধ-সূত্রের তাৎপা এই বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।* স্মৃত্তান্ত বেদা ব্যতীতহে যে, রজ্জু হইতে সর্পজ্ঞানের উৎপত্তির

সহিত ত্রক হইতে ভগৎ-উৎপত্তির যেমন সাদৃশ্য আছে, সেই-রূপ প্রভেদও আছে।

অপর দৃষ্টান্তটিও তথাবিধ। হৃদ হইতে দধি উৎপত্তির সহিত ত্রক হইতে ভগৎ-উৎপত্তির সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত যে, দধি নামক পদার্থের একটা অস্তিত্ব আছে, উহা আমাদের মনের ভ্রম নহে। সেইরূপ ভগৎ নামক পদার্থের একটা অস্তিত্ব আছে, উহা আমাদের মনের ভ্রম নহে। কিন্তু হৃদ হইতে দধির উৎপত্তির সহিত ত্রক হইতে ভগতের উৎপত্তির প্রভেদ এই যে, দধির উৎপত্তিকালে ত্রকের বিকার ঘটিয়া থাকে। যে হৃদ হইতে দধি উৎপন্ন হইল, সে হৃদটা আর হৃদ থাকে না, একটা স্বতন্ত্র আকারে পরিণত হয়। কিন্তু ভগতের উৎপত্তিকালে ত্রকের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি ভগতের উৎপত্তির পূর্বে বেক্রপ ছিলেন, পরেও অবিকল সেইরূপ থাকেন। তিনি বিকার-বহিত; তাহার কোন রূপ পরিবর্তন সম্ভবপর নহে।

অতএব বেদা ব্যতীতহে যে, ভগতের উৎপত্তি-ব্যাপারের যে অংশে প্রথম দৃষ্টান্তের সহিত সাদৃশ্য আছে, সেই অংশে অপর দৃষ্টান্তের সহিত প্রভেদ; আবার যে অংশে প্রথম দৃষ্টান্তটির সহিত প্রভেদ, ঠিক সেই অংশে অপর দৃষ্টান্তটির সহিত সাদৃশ্য। ত্রক হইতে ভগতের উৎপত্তি এক অশৌকিক ব্যাপার। ঠিক তাহার অসুস্থত কোন শৌকিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। যে দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইবে, তাহারই সহিত কিছু সাদৃশ্য থাকিবে, আবার কিছু প্রভেদও থাকিবে। ভগতের উৎপত্তি-ব্যাপারের মধ্যে দুইটি বিশেষত্ব আছে। এক, ত্রকের কোন পরিণতি বা বিকার হয় নাপ্রতি^১ দ্বিতীয়, ভগৎটা মনের কল্পনা বা ভ্রম নহে,—মনের বাহিরে ভগৎ বলিয়া একটা কিছু আছে। বৈদান্তিকের দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্প ত্রয়, ত্রকিতে ব্রহ্ম-ত্রয়, ইন্দ্রমালিকের জীড়া, এই সকল দৃষ্টান্তই প্রথম লক্ষণ অসুস্থত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের দ্বারা দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাভার ঘটনায়ে। পরন্তু, দ্বিতীয় লক্ষণ অসুস্থত হইয়া দধি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়,—হৃদ হইতে দধির উৎপত্তি, সমস্ত হইতে উর্ধ্ব ও কেন্দ্রাঙ্গির উৎপত্তি,—তাহা হইলে দৃষ্টান্তভাগিতে প্রথম লক্ষণের ব্যাভার ঘটিবে; কারণ, হৃদের যে অংশ হইতে দধি হইতেছে, তাহা আর হৃদ থাকিতেছে না, সমস্তের যে অংশ উর্ধ্ব ও কেন্দ্র-স্থানিতে পরিণত হইতেছে, তাহার পূর্ববর্তী আকারের

* প্রবন্ধান্তরে এই প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা করিবার

পরিবর্তন হইতেছে। দূরাত্ত দ্বারা ভগবানের মহিমা সম্পূর্ণ
ভাবে বৃদ্ধাইবার চেষ্টা বার্ষ হইবেই। তিনি অবাধমনস-
গোচর, তাঁহার দূরাত্ত বা উপমা তিনি নিজেই।
পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র

• বিবর্তনের পতন করিয়া ঈশ্বরভবনের ভগবতের উৎপত্তি কিরণে
হয়, তাহা এই বলিয়া বুঝাইয়াছেন।

“মহিমা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে।”

যদি হইতে বহুত্ব পর্য্যন্ত বর্ণের উৎপত্তি হয়, অথচ মনের কোন বিকার
হয় না। এই দূরাত্ত, ভগবতের উৎপত্তি-ব্যাপারের যে দ্বিষ্ট লক্ষণ আনন্দ
নির্দেশ করিয়াছে, উক্ত লক্ষণই অসুখ বাধিয়াছে। কিন্তু এই দূরাত্তকে
সৌন্দর্য্য দ্বারা ঘাইতে পারে কি না সন্দেহ। বহুত্ব অতিশয়
বাধিতা স্বর্ণাঙ্গী প্রদান করে এবং যদি কেবল বৈদিকধর্মের বলিয়া তদনি
নাই। সুতরাং প্রথম মনের ইচ্ছা থাকিতে পারে।

পার্থক্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী ইচ্ছাতে
আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে,
জগৎ ব্রহ্ম হইতে অতিশয়। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার আপত্তির
কারণ নাই। “জগৎ ব্রহ্ম হইতে অতিশয়” — বৈদান্তবাদীর
এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছে; কারণ, বৈদান্তবাদী বলেন যে, কার্য কারণ হইতে
অতিশয়; ব্রহ্ম যখন কারণ এবং জগৎ যখন কার্য, তখন
জগৎ ব্রহ্ম হইতে অতিশয়। “তদনন্তরং আরম্ভণ শব্দাদিতাঃ”
এই শব্দের ভাষা এ কথা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।
বৈদিকবৎ যখন স্বীকার করেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতেই
উৎপন্ন, তখন এ বিষয়ে তত্ত্ববিদ্যায় উত্তরের মধ্যে কোন
মতভেদ নাই। বৈদিক ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ
বাস্তবিক হিমায়ে বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ও জগতের এই
বাস্তবিক ভেদ অদ্বৈতবাদীও স্বীকার করেন না।

মা

[ত্রিভুজরূপা দেবী

(১৩)

সূত্রাত্মক এক সংগঠিত ভেদে ওকালতি করিয়া বিপুল
অপেক্ষার্কানন্দতর ভাবানুপ্রেরণা করিয়া আসি-
লেন। সঙ্গে করিয়া আনিলেন একটা বস্তু। অবিবাহিতা
কস্তা। তিনি আনিয়াই যৌবনবন্ধ সূত্রাত্মকে পত্র লিখিলেন
যে, পূর্ণ-প্রতিকৃতি-মত তাঁহার পুত্রের সহিত কস্তা ব্রহ্ম-
স্বাধীকৃত বিবাহ দিবা এইবার তাঁহাকে নিশ্চিত করা হোক।
বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত; কেবল কস্তা-পুত্রকে আনিবার
করিয়া দিন দ্বিগুণ করা যাক। যেহেতু তিনি বিশ হাজার
টাকা নগদ এবং হাজার-পাঁচ-ছয়ের গরবা দিবে, তা তাঁর
আর বা কিছু। চিঠি পড়িয়া মায়ের হৃদয় ঠেলিয়া একটা
নিশ্বাস পড়িল; বলিলেন, “বরাতে নেই, কে ঘোবে?” পিতা
উগ্রব্রহ্মীতে প্রত্যয়ক ছোটলোক বীহ মিথিয়ার চতুর্দশ
পুত্রের পর্বত প্রবাহিত করিয়া দিবা, শেষে যোগ করিলেন
“যেমন কাল পড়েছে, যেহেতু ছেলেকে একটা নোলক-
পরা মুখ দেখলেই তার পায়ে গিয়ে গলে পড়বে। হৃদয়
আর স্নেহ সহ না। আমি বরাবর আনি.....বস
আমার ঘোরে আসবেই আসবে, সেইভাবেই না যেমনকার

৪৩ সখ্য, সব ছেড়ে দিচ্ছিলাম। ছেলে আমার মনে
করলেন, বাবা বুদ্ধি আর বিয়ে হবেই না, নিজে এসে
হৃদয় করে এক ভোমের বুদ্ধি ধরে! এখন কেমন হলো?
এই পনের-সোণ হাজার হাত-ছড়া হয়ে গেল কি না?”

কর্তার ব্যঙ্গের সময় কথা কহিবার ভরসা কেহই রাখেন
না; গৃহিণী তথাপি অসুস্থকর্তে যীরে যীরে যে বুদ্ধি দ্বারা
আত্মগাঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধিটাকে দ্বারী
ক্রোধ-নিবৃত্তির বস্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহিলেন; কহিলেন—
“তা বউমাটি আমার রূপে গুণে লক্ষী। এমন হাজারে
একটা মেলে কি না সন্দেহ।” “ওঃ! পীরি বাছা আর
কি। রেখে দাও রূপ-গুণ। বাপ বায় অজ্ঞ ভক্ত ধনুর্গুণ—
ভার মেয়ের আবার রূপ-গুণ কিসের? হস্তর
কত বড় মাংস। মনের কাছে বস্তুতে মুখ উজ্জ্বল হতো।
বল কি তুমি, এ কি কণ্ড আপোষ।”

• মনে-মনে নিজের গালে-মুখে চড়াইতে-চড়াইতে প্রকান্তে
বীহ মিথি প্রকৃতির পিতৃপুরুষগণকে উচ্চাচর করিতে করিতে
গৃহস্থানী পুত্রের বাহির হইলেন। সেদিন হইতে মনোরমার

প্রতি বিবেকের যাত্রা শতভগ্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।
অবিচ্ছিন্নকণ্ঠ অনেকখানি ভৎসনা সহ্য করিতে হইল।

এখন চঃসন্ধ্যার কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী চূর্ণাঙ্গুলীকায়
অল্প মন্ত্রণাশ্রমে বিপণিত দীর্ঘ মিত্র অনেক গ্রাণে সঙ্গমীত
অলঙ্কারের শত মুদ্রা এবং কাঠ রাস রিজার্ভের হিসাব মত
টাকাগুলি বৈবাহিকের দরবারে পৌঁছাইয়া জিহ্বারীর মত
একটা পাশে জড়-জড় হইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুখ সূঁচিয়া তথ-
বলিবার ভরসা হইল না। এই চেষ্টাই যে শেষ চেষ্টা, সে
সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে কোনই সংশয় ছিল না; পাছে পূর্ক-
পূর্ব ব্যতীর ভ্রাতৃ-এবারও প্রার্থনা নামমূল্য হইয়া যায়, সেই
ভয়ে গলা বিয়া স্বর সূঁচিতেছিল না। ব্রী যে সূচাপণ্যার
গুইয়া উৎকর্ষ-দ্রুত বাহুল্যভার হায়ের মিক চাহিয়া আছে,
নিরাশ্রয় আঘাতে হয় ত সেই নির্জালাদুখ জীবন প্রদীপ-
টুকু বহুর্ভে নিবিয়া যাইবে; সে যে তাহার একমাত্র জীবিত
সম্বন্ধকে মরণকালে শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছে,— আর
বুঝি বা শুধু সেই-আশাটুকু অবশ্যমন করিয়াই এখনও
বসিয়া আছে। নীলনাথের বুকের মধ্যে জুপিণ্ডের ক্রিয়া
অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল! চেষ্টা বহি সফল না
হয়!

একটা চট্টি করিয়া পাঁচ সাতটি মজেল-মহালনের
আগমন ঘটিল; কাগজ-পত্র দেখাইল, অগ্রিম দশ-দশ মনে
করিল। বহুমহালার কাহারও প্রদত্ত দক্ষিণা হাত পাতিয়া
লইলেন, কাহারও বা পা দিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। আবার
তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেব-ভূমি সম্পাদিত হইল।
কাগজপত্র কেবল একবার কটাক্ষেপণ হইল, কেহ বা
সমবাস্তবের আদিবার ছদ্ম্ব লইয়া ফিরিয়া গেল,—সংস-
কাকুতি-মিনতিতেও বৈষ-প্রসন্নত-লাভ ভাগে ঘটিল না।
বুড়ার বহু মন্ত নান, —অপ্রতিহত প্রভাব। মাথি
বাইয়াও বস্তার বেগে টাকা আইসে,—গালি খাইয়াও মজেল
ভাঙ্গিয়া যায় না। দ্বিতীয় নীলনাথ বিশ্ব-বিস্মিতনেত্র
চাহিয়া-চাহিয়া এই সব দেখিতেছিলেন; আর ভাবিতে-
ছিলেন শত-শত মিষ্টকাষী, শিষ্ট, শান্ত, নতন-পুণ্ডরিক নিরীহ
জিকিলের কথা।

মজেলপত্রকে বিধায় বিয়া গ্যাডোথান করিতে উদ্ভত
বহুধরের পায়ের কাছে নোটের গোচাঙলা রাখিয়া দিয়া, সপ-
সপ সন্ধ্যাে অশ্রুত হয়ে দীর্ঘ বিজ্ঞ কহিলেন, “আমি এই

টাকাটা নিতে এসেছিলাম,—আর আমি একটাবয়ের
জন্ত—”

“টাকা তো ইন্সিওরড হয়েই আসতে পারতো, অনর্থক
আবার আসা কেন?” চূর্ণাঙ্গুলীকায় মন্ত্রণাশ্রমে নীলনাথ উত্তর
দিলেন, “শোকে, আগনার বেগান ঠাকুরপের জীবনের আশা
বড়ই কম,—ভাতার-কবিরাজে একরকম জীবাবই গিয়েছে।
তাঁর বড় সাধ—একটাবার মেয়েটার মুখটি দেখে যান। যদি
অনুগ্রহ করে একটা চপ্পার মস্তেও একটাবার পাঠিয়ে দেন,
তা’হলে তাঁর শেষ মুহূর্তটা হয় ত এতটুকু সুখে হয়।”

দ্বিতীয় বৈবাহিকের অল্প আশা-রোগে বিভ্রান্ত বিনীত
ভিক্ষা সূচাপণ্যের সংস্কারভিত্তিক চিত্ত বিন্দুবাচ্চ টপাটপে সমর্থ
হয় নাই, তাহা তাঁহার গঠাধরের কঠিন অবিবাদের অবশেষ
হাতেরখাটুকুতেই প্রকাশ পাইল। তিনি মুহূর্তে হাতের
সহিত মাথা টলাইতে-টলাইতে উত্তর দিলেন, “তা এ’ একটা
বড় মজা চাপ চাপনি বেয়াই। তা মতলবটা করেছিলে
ভালই; তবে কি না,—কি জানি, এসব চাপ একমুখ পূরণে
হয় গিয়েছে। এ’তে আর এই মোজোর, বেঁটে-চুল-পাখানো
মুতানু খোসের চোখে যেন সেও যা় না। হঠকে দেখলে
ত—সকাল থেকে অমন স্বত শালা-বেটা-শালা এসে ঐ
জোচ্ছবি ঢাকবার মতলবেই এই হু’পারে অলের মতন
টাকা ঢেলে দিচ্ছে। ওলব এখানে চলবে না ভাই,—ওলব
কমি খাটবে না।”

নীলনাথের গৌরব অশ্রমানে হাতা হইয়া উঠিল।
অতি কষ্টে আত্মবলন করিয়া তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কেবলমাত্র
প্রত্যুত্তর করিলেন,—“জোচ্ছবি করা কখনও ত অজ্ঞান
ছিল না বেয়াই!” “লজা? আমি ত দেখছি, এ
অজ্ঞানটি জোন্দের চোখপুরুষে পাকাপোক্ত। এই যে ছেল-
কলে ছেলেটাকে, প্রতিবেশী বন্ধু লাগিয়ে, একটা খেতে, বিজী
মেতে যেখিরে, নিষেধের থলুরে কোলে হাত করলে,—এটা
কি জোচ্ছবি, খটপাড়ের চেয়ে কোন অংশে কম? এই
যে সিকিপরশার পয়নার দাম আবার হয়ে আসতে পুরো
একটা বছর কাল কেটে যায়, এটা কোন্ সাধুতা?
তা’পর দু’দু’ করে বিদায় দিলেও ফের এই যে জ্ঞান
মানুষকে হারিয়ে দিয়ে মেতে নিতে এলো, এর চেয়ে হাজার-
জাদুকি আর কিছু সংসারে আছে? ভূমি জোচ্ছবি নও?
জোন্দের চোখপুরুষ জোচ্ছবি।”

দীননাথ বসিয়া ছিলেন, বিবর্ণ মুখে উঠিয়া গাড়াইয়া কহিলেন,—“আমি আপনার ঘরে মেয়ে নিয়ে যে মহাপাতক করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার আপনি ছোটলোক, বোঝার, বাটপাড়—সবই বলতে পারেন; যেহেতু, আমি এখন দরিদ্র, আমি এখন মেয়ে-দাবাইকে সোপান মুড়তে পারিনি, আপনার প্রাক্তন দর-বালাই তখন আসুয়াই করিয়ে দেওয়া এখন আমার সাধ্য নয়—তখন বোঝার, বাটপাড়, ছোটলোক ছাড়া আমি কি? কিন্তু আমার বাপ-পিতামহ—হরনাথ মিত্র, ব্রহ্মনাথ মিত্র নিতাইয়ে ছোটলোক ছিলেন না, তাঁদের নাম কীর্তি এখনও বেশ হতে একেবারে গোপ পায় নি। তাঁদের আপনি এখন কর্জেন না,—তারা মহাপুরুষ ছিলেন।” “বহুপুরুষের ঔরসে মহাপাতকী—বিশাস্যাতক, বোঝার, বঝারের লম্বা হয়—এটা একটু আশ্চর্য্য না?—আমাদের মাঠাকুরের কি কোন রকম—”

দীননাথের শত্রু হুটি চোখ হইতে দৃঢ়কায়ী অরিকণা ঝিকুয়াইয়া পড়িতে চাহিল; এবং কাম্পিত গঠাধর-মধ্য হইতে লজ্জা-বুণা-অপমান-মিশ্রিত তীব্র ক্রোধ আগার সহিত অতি তীব্রবরে বাহির হইয়া আসিল—“মুখ সাবল্যও—”

মুখের উপর এতখানি অপমানিত হইয়াও উদার-চিত্ত বৈরাগিক একটুকু বিচলিত হইলেন না। যেমন ছিলেন তেমনই স্থির থাকিয়া, ঠিক তেমনই একটুখানি টোপা হাদির সহিত দীননাথের অকর্ণপূর্ণ মুখের দিকে সোজা চাহিয়া কহিলেন “বলি আপনি যাবে, না, দস্তানানদের ডাকতে হবে?” দীননাথ অর্দ্ধমুহুর্তকাল নিরন্তর থাকিয়াই, অকণপরে ক্রোধ-সহিত সৰ্ব্বকর্তে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে না,—আমি আপনাই থাকি। মনোর গর্ভদাহিণী পথ চেরে আছেন, ডাকে তা' হ'লে বল্‌বো—তার কড়া এইখানেই বাঁধুক্রতা সমাধা কর্জেন। গার—”

অত্যন্ত আশ্চর্য্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কস্তার খণ্ডর মহাশয় লক্ষ্য-লক্ষ্যেই ব্যস্তভাবে বাধা দিলেন, “বলো কি? তোমার মেয়ের এই বাড়ীতে আর তিলার্দও স্থান নেই। পাজী ডেকে আনো—না হয়, প্রবৃত্তি হয়, হাঁটুয়েও নিয়ে গেলে বেতে পারো। ও আর আমার কেউ নয়—শ্রদ্ধ-তোমার মেয়ে। তবে, এই চতুরিয়া—”

দীননাথের পাখের তলার সমস্ত মাটিটা পদতল হইতে সরিয়া চলিয়া গিয়া সেইখানে প্রাক্তন একটা খাদ বাহির

হইয়া পড়িল। এই খাদটার শেষ দেখা বারান্দা,—বোধ করি ইগার তল এলোবারে সেই রসাতলেরই সমতলে। তিনি উদ্ভাসের মত ছুটিয়া আসিয়া বৈবাহিকের পা শুড়ইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন—“মেয়ের আমার অপরাধ কি? এখানে সে আর তার বাপের বাড়ীর নাম তুলতে পারে না; এই আমি বিদায় নিয়ে চলে থাকি—” বলিত-বলিতে সতাই উঠিয়া তিনি ঘরের বাহির হইতে গেলেন। কিন্তু গমনে বাধা পড়িল; পশ্চাৎ হইতে গৃহবাহীর পত্নী, অটল স্বর তাঁহার দুই অঙ্গল কর্ণকণ্ঠে এবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতিশক্তিহীন করিয়া দিল। নতুবা এসব কাহিনী এ বাড়ীতে এগার হইবার পূর্বেই, ছুটিয়া গিয়া টেপনে পৌঁছিয়া, বৈবিকতার বেকোন একটা টেপে ঢাপিয়া বেশ ছাড়িয়া পলাইতে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল। লজ্জা, অপমান সমস্ত বিশ্বস্ত করিয়া দিয়া, প্রবল একটা আতঙ্কমাত্র একপে তাঁহার অপরাধী পিতৃ-জন্মরকে অধিদগ্ধ মূলস্রাব্যাত করিতে-করিতে ভৎসনা করিয়া বলিতেছিল—“ওরে পাণ্ডা! এই করিতেই কি তুই আসিয়াছিলি? নির্দোষ নারীর অঙ্গরালে গিয়া মেয়েটার কি সর্জন্য করিতে যিগাছিস্, তাহা কি এখনও বুঝি নাই?” কেমন করিয়া নিম্নের এই মহা অপরাধের বোকা সমস্ত নিম্নকে তিনি অকণ্ঠ্য এইখান হইতে লুপ্ত করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারেন, সেই একমাত্র মহা-চিন্তার এখন হুতুকাগোর সর্জন-শরীরে বিচ্যুতের স্বভাবা বাহিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন হইতে ডাক আসিল, “বীশু মিত্র! মেয়ে নিয়ে গেলে ভাল কর্তে; নতুবা পরে আপণোর করবে। বোদেদের ঘরে তার স্থান তুমিই মুচিরে। বহরছ; না নিয়ে যাও,—হয় সে পরের ঘরে দানীযুক্তি করে যাবে, না হয় না, ঠাকুরার কাছে যদি কোন বিশেষ শেখা থাকে, তাও করে খেতে পারে,—আমার তাকে কোন লজ্জা নেই। আমি ওকে ত্যাগ করছি।”

দীননাথ হলো দুই জাম্ব তালিয়া সেইখানে থণু করিয়া বসিয়া পড়িয়া, হতশার্ক উর্দ্ধশ্বাসে, উর্দ্ধমুখে শ্বাস ঢালিয়া উচ্চারণ করিলেন, “তবে নিজেই যাবে।”

এক বৎসরের পরে পিতৃপণ্যে প্রত্যাবর্তনে বালিকা-বধূ চিন্তে যে অনির্জনীর স্রবের তরঙ্গ উখিত হওয়া স্বাভাবিক, এক্ষণ আকস্মিক শুষ্ক, পত্নীর বিবাহে তাহার

সে-রকমটা ঠিক হইতে পারিল না। ব্যহিরে বাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কোন চাক্ষুণ-মাকী উপস্থিত না থাকায়, সব ঘটনাক্রমে ইতিহাস ঠিক-ঠিক অস্তঃপুরে আদিয়া পৌছায় নাই। চতুঃদিক চাক্ষুণ শব্দযুক্তে আদিয়া থবর দিল যে, যোমার মার কঠিন ব্যাধিরাম ; বাবা আসিয়াছেন ; ১১টার ট্রেনে যোমাকে লইয়া বাইবেন। বাবু বলিয়া দিলেন খুব ঈর্ষ জীকে তৈরি করে দিম,—বাগের বাড়ীর গহনা ভিন্ন আর কিছু যেন না দেওয়া হয়, বলিলে দিলেন।” শরৎের মুখ একটু রান দেখাইল, তথাপি সখীর আনন্দে আনন্দিত হওয়ার চেষ্টা করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এখনের গহনা দিতে ব্যয়ণ করেছেন কেন মা?”

মা যেমন মুখিয়াছিলেন তেমনি বলিলেন, “তোপের বাড়ী ; তা’ছাড়া, এই ত সাতটা বল হয়ে যাবে। দামী গহনা, তাই ব্যয়ণ করেছেন। তা দেখে তোমা, কপের ইয়ারিং ছ’চারটে ভাল-ভাল আংটি, মুক্তের জেলি, কল্লি,—আর তোমার বা ইচ্ছে হলে, তুমি নিয়ে যাও। বাপ রহেছেন সঙ্গে, তার কিসের? আচ্ছা, মা মাগি কিছুই দেখবে না? এই তো রোগ হয়েছে, যদি নাই বৈতে!”

মা বসি না বসেন! ভবিষ্যই মনোরমার ছুটি চক্ষু দিয়া জলের করকা করিতে লাগিল। হাত দিয়া সেই জল মুছিয়া শেষ করিবার অন্তর্ধক চেষ্টা করিয়া, সে ঘাড় নাড়িয়া অনিচ্ছা জানাইল; বলিল, “বাবা ব্যয়ণ করেছেন, থাক না মা। মা ভাল হলে, এর পরে আবাব বখন বাব, তখন নিয়ে যাবে।” দেহময়ী শান্তকী করিলেন, “তাই হোক বা, তাই হোক। আচ্ছা মা’টি তোমার সেরে উঠুন,—বাপ বিন্বেয় আর তো ব্যে কেউ নেই।”

গহনা ব্যহির করিবার সময় শরৎশ্রী দু’একখানা দামী গহনা, মনোরমার গুহবস্ত্র সামান্যগুলির সহিত যেন ভুল করিয়াই মিথ্যাহিল; সেগুলি কিরাইয়া দিতে গেল, সে ধমকিয়া উঠিল, “ওগো থাক থাক, ও টায়রাটি না পরিলে তোমার মুখই মানার না। কপে কি শুধু দুখানা কাপ খুগিয়ে নেমস্তম্ব খেতে যাবে? রেখে দাও সব।”

মনোরমার মনে ব্যয়েরের মত এই প্রিয়বস্ত্রগুলির প্রতি লোভ লাগিল। কিন্তু সে তখনি তাহা মনন করিয়া ফেলিল। শান্তকীর হাতে সেগুলি কিরাইয়া দিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, “এবারে থাক, বাবা যে ব্যয়ণ করেছেন।”

শরৎের মুখ তার হইয়া রহিল। শান্তকী গলিয়া গিয়া মাথার দিকে মুখ কিরাইয়া বলিলেন, “জমন সুবোধ মেয়ে কি আর আছে?”

আড়ালে আদিয়া মনোরমা জ্বর-সন্নিহী ননদাকে চুপি-চুপি বলিল, “তাক্যাতাকি একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবে, পাঠিয়ে দিবি তাই?” শরৎ অস্ত-গুহিত নভবন্ধে চাহিয়াই উত্তর দিল, “যেব না কেন!” “তুই তোজ একখানা করে চিঠি লিখবি?” “লিখব না কেন?” “আমি তাই হয় ত তোজ লিখব দিতে পারব না।” “তা আমি।” “জান ত তাই, মনের অস্থখ—তাকে দেখতে-গুহতে হবে,—তাহতে হবে হয় ত। ত কি তাই, তুই তাপ কথিস্ মুখি? না তাই, যেমন করে পারি, আমি তোজ চিঠি যোব দেখিস্।” মনোরমা শরৎের গলা জড়াইয়া ধরিল, “লক্ষিটি, দিদিটি, আমার ব্যাবার সময় চাপ করে থাকিস্ নে।” এই ‘বিদিটি আমার’ কথাটা সে বামীর নিকট লিখিয়াছিল। শরৎের চক্ষু দিয়াও এইবার জলের ধারা নামিল।

আবহাওয়ার পরিবর্তন

[অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়]

গরীব প্রতিবেশী দুই খেলা দুই মুঠা খাইতে পাইল কি না, আমরা তাহার সম্বন্ধ রাখি না। কারণ সুখসং নাই! জুলা বা পাটের দর নরম রহিল, কি গরম হইল,—তাহার থবরও আমরা পান্নেরো আনা লোকে লই নাই। কারণ এখন থবরের প্রয়োজন নাই। বিবাহে পণ লওয়ার

বিকল্পে বাহারা মুখ-খোবনা করিয়াছিলেন, তাহারো কি হালে আছেন, তাহারও খোঁজ করি না, কারণ মেয়ের বিবাহ দিয়া সারিয়াছি,—এখন ছেলের বিয়ের পালা। কিন্তু অসময়ে যদি দুই দিন মেয়ে আকাশ চাকা থাকে বা তিন দিন বাতাস বন্ধ থাকিবা। রাজিতে গুহট হয়, তবে

তারা আবাদিক এমন খোঁজা দেয় যে, ব্যাপারটাকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। তখন মনে হয়, প্রকৃতির এমন বে-নিয়মটি বুঝি কোন কালেই ঘটে নাই! ছেলে-বুড়ো, ধনী-নির্ধন, কৃষি-বৈরাগ্য—সকলেই বলিয়া উঠে, এমন অপ্রাকৃত ঘটনা দেশের দুর্লভ! আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতোকেই ইহার এক-একটা কারণ খোঁজিবার চেষ্টা করে।

সে দিন মাথ ঘাসে ঘোর বর্ষার আবির্ভাব যখন আমরা ঘরের কোণে আস্তর লইয়াছিলাম, তখন ঠিক ঐ কথাগুলিই মনে হইতেছিল। তখন একজন বন্ধু বলিতেছিলেন, সুযোগের সুচ্ছ চাবি বঙ্গের ধরিয়া যে বাসুরের ঘোঁরা উড়িয়াছে, তাহারি চাবিকি একেবারে বাপ দ্বারা হইয়া এই অকাল-বর্ষণের সূত্রপাত করিয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে আর এক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন,—পল্লিকা-বিত্রাটাই এই সব অনবের কারণ; পল্লিকার শুভি কানটাের হাত না দেওয়া-তেই আবার ঐরাব তরু দেখা দেয়; হুতরাং যাবে যে বর্ষার উৎপাত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি?

এই সকল কথাই মন সার দিল না। পৃথিবীতে বঙ্গের যত বৃষ্টি-পাত হয়, তাহার যেটাগুলি হিগাব জো জানাই আছে। বঙ্গের-বঙ্গের হিগাবের অঙ্কেও ঐরাবই দিল থাকে। তবে কেন এত ভাবনা-চিন্তা?

আমার মনে হইল, শুধুর স্থায়ী পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া দারপাটা আমাদের সম্পূর্ণ কাননিক। ইহার কারণ আবিষ্কার সমস্তের বিষয়। ত্রণের বেমনায় যখন আমরা ত্রিভিতে অনিষ্ট্রায় ছুটু-কটু করি, তখন মনে হয় ইহার চেয়ে জড় হওয়া ভাল ছিল। আবার জর হইলে মনে করি, জরের বয়সা অসহ; ইহার চেয়ে ত্রণ হইলে স্নহ পালা হইত। পূর্বে ত্রণ যে বেমনা দিয়াছিল, তাহার কথা তখন মনেই পড়ে না। শিশুতালে ছ'মিনের জড় বর্ষণ নাগিয়া যদি আত্ম-তোপেও একটু বাগা দেয়, তবে তখন ঐ রকম কারণেই আমরা ভাবি, এমন অনাস্থি ব্যাপার বৃষ্টি পৃথিবীতে আর কখনো ঘটে নাই। আমরা অতীতের আলো-বর্ণা ভুলিয়া বর্তমানের সামান্য বেমনাকেই ভুলতর মনে করি। বোধ করি, বাহুরের ইয়াই বতাব। সম্ভ্রতি একখানি বিশেষ শবদের কাগজে পড়িতেছিলাম; কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার কয়েকটি নদীতে যে ভগ্নানক বজা হইয়াছিল, তার-

হীন টেলিগ্রাফের প্রচলনই না কি তাহার কারণ। বৈজ্ঞানিক দেশের খবরের কাগজেরও সেই কল্পনা এবং সেই ভাবি! আকাশের বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের আব-হাওয়ার যে কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু তার-হীন টেলিগ্রাফের বৈদ্যুত-হিলোলই যে, দেশে প্রাকৃতিক অনর্থ টানিয়া আনিতেছে, ইহা হাতকরই মনে হয়।

প্রবন্ধের এই দীর্ঘ বৃত্তিকা দেখা পাঠক যদি মনে করেন, ত্রোত্র বৃত্তি যেন কুশালা লইয়া আব-হাওয়ার যে সকল পরিবর্তন আবাদিক পীড়া দেয়, আমরা এখানে তাহারি কার্য-কারণ সম্বন্ধ বোঝাইব, তবে তিনি মহা ভুল করিবেন। চৈত্রে আকাশের অবস্থা কি রকম থাকিবে, তাহা কোন পণ্ডিতই কল্পন মনে গণনা করিয়া বলিতে পারেন না। এমন কি ১২ই তারিখে দেশের আবহাওয়া কি রকম পড়াইবে, ১৩ই তারিখে ঠিক বলা যায় না,—থাকিটা অনুমান করা যায় মাত্র। এত শত শত প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কিত যে, সকলগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া স্বাভাবিক বা চন্দ্রগ্রহণের নিয়মের মত একটা নিয়ম খাড়া করা প্রায় অসাধ্য। বোধ করি, ইহার কাছে, নিউ-টন বা কপলারের স্তার প্রতিভাও হার মানে। পৃথিবীর সকল দেশেই বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন ধরিয়া মনে-মনে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু ইহা কোন নিয়ম নাগিয়া চলে কি না এবং চলিলে সে নিয়মটার উৎপত্তি কোথায়, তাহা এ পর্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যে সকল অবস্থার উপরে সাধারণতঃ আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা, আমরা এই প্রবন্ধে তাহার একটু পরিচয় দিব।

সুর্ঘাই সকল শক্তির কেন্দ্র, হুতরাং আবহাওয়ার উপরে যে ইহার প্রভাব নাই, এমন কথা কখনই বলা যায় না। প্রথমে সুর্ঘ্যের কথাই আগেচনা করা হউক।

প্রথমেই দেখিতে পাই, পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্তের (Equator) নিকটবর্তী কাছপায় সুর্ঘ্যের কিরণ প্রায় দ্যোক্ত্রুজি আসিয়া পড়ে; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে যেকর নিকটের কাছপায় তাহারি বাঁকিয়া আসিয়া ভূতলকে উত্তপ্ত করে। সোলা রাত্তা ধরিয়া চোখ গুণ অনেক। ইহাতে বেশি রাত্তা চলিতে হয় না; পথের দ্বায়ে বাধা-বিঘ্নও কম দেখা দেয়। কিন্তু বাঁকা রাত্তা ধরিলে পথের দ্বায়ে অনেক দমর

কাটিয়া যায়, বাবা-বিয়ও খুব বেশি আসে। নিরক্ষ-বেষে হ্রদ্যের যে সকল কিরণ সোঝা আসিয়া পড়ে, তাহা আনাদের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বেশি সময় নষ্ট করে না, কাজেই বাতাসের জলীয় বাষ্প-প্রভৃতিও তাহার তাপ আধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার ফলে, নিরক্ষ-মণ্ডলের নিকটবর্তী জায়গার স্থানের তাপ বেশ কড়া রকম হয়। আসে। উত্তর ও দক্ষিণ দেশে হ্রদ্য-কিরণ বাকিয়া পড়ে বলিয়া, পথের মাঝে তাহার অনেক তাপই কষ পাইয়া যায়। কাজেই এই সকল দেশে হ্রদ্যের তাপ খুবই মুহু ভাবে আসিয়া দেখা দেয়।

নিরক্ষ-প্রদেশ এবং দক্ষিণ নিকটবর্তী প্রদেশের হ্রদ্য-তাপের এই অসমতা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অর্ধে দুইটা বড় বড়বড়ের বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি করে। নিরক্ষ-প্রদেশের বাতাস তাপ পাইয়া আকাশের উপরে উঠিতে আরম্ভ করে, তখন এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্ত উত্তর ও দক্ষিণ বেল হইতে শীতল বায়ু ছুটিয়া আসে। এই প্রকারে পৃথিবীর দুই গোলায় উত্তর হাড়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে, দুইটি প্রবল বায়ু-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা খাড়া উত্তর-দক্ষিণ বা দক্ষিণ-উত্তর মুখে আসিতে পারে না। পৃথিবী ঘিরে নাই। বেলবল্লভের চারিদিকে উহা গতিম হইতে পূর্বমুখে নিরন্তরই সাটুর মত ঘুরিতেছে। কাজেই এই প্রবাহ দুটি নিরক্ষ-প্রদেশে সোঝা না আসিয়া, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ পর্যন্ত বাহা বলিলাম, তাহা স্থলের পাঠা পুস্তকের কথা। কিন্তু তথাপি ইহা উপেকার বিষয় নয়। বাতাসের চাপ ও তাপের ভ্রাস-বৃদ্ধিতে পৃথিবীতে আবহাওয়ার যে পরিবর্তন হয়, তাহার সোড়ার এই বায়ু-প্রবাহকেই দেখা যায়। এই জন্তই বিবরণটি উল্লেখযোগ্য।

বাতাস (জিনিসটা) স্বচ্ছ বাষ্পীয় বস্তু হইলেও, তাহার ভার আছে। সুতরাং আকাশের উপরে পকাশ বাই মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহা যে চাপ বেশ, তাহা সামান্য নয়। ভূতলের এক বর্গ-ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার সাধারণতঃ ইহার পরিমাণ প্রায় সাত দেড়ের সমান। পায়ে পাড় জিনিস রাখিলে তাহার তলার যে চাপ পড়ে, পাতলা জিনিস রাখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম চাপ পড়ে। বাতাসে ট্রিক তাহাই দেখা যায়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ সরম বাতাসের

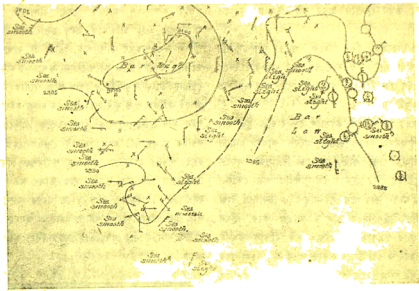
চেয়ে গাঢ়, শুষ্ক বাতাসের চাপ অনেক বেশি। চাপের এই রকম অসমতার সহিত বড়-বৃষ্টির ও আবহাওয়া-পরিবর্তনের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে।

পৃথিবীর সকল দেশেই জায়গার-জায়গার বায়ুর চাপ ও উচ্চতার পরিমাণ ক্রিয়ার বাবদ্য আছে। প্রত্যেক দিন চাপ ও তাপের যে পরিবর্তন হয়, তাহার সংহার সংগ্রহ করিয়া দেশের মানচিত্রে সেগুলি অঙ্কিত রাখার চীতি আছে। যে সকল জায়গার চাপের পরিমাণ একই থাকে, সেই সকল জায়গাকে রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়। আমাদের দেশে কখনো-কখনো এই সকল সমচাপ-রেখা (Isobars) কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়। এ দেশে কেন্দ্র-স্থানেই চাপ তন থাকে। এই প্রকার ঘটিলে বটিকা-বর্ত্তের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন সম-চাপের নিকটবর্তী জায়গার বাতাস কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমচাপ-রেখাকে ঘুরিয়া প্রবল বেগে পাক বাইতে থাকে। ইহাই বটিকা-বর্ত্ত বা Cyclone.

রেলের রাস্তা হবন পাহাড়ে দেশের উপর দিয়া চলে, তখন প্রতি মাইলে রাস্তাটা কত উঁচু হইতেছে, তাহার পরিমাণ পথের পাশে কাঠকলকে দেখা থাকে। বোধ করি, রেলের গাড়ির চালক উহা দেখিয়া গাড়ি কি প্রকারে বেগে চলাইতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া লয়। সমচাপের রেখাগুলির চাপ কেন্দ্র হইতে কি পরিমাণে পর-পর বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাও কতকটা এই রকমে আবহাওয়ার মানচিত্রে দেখানো হয়। কোনো রেখার চাপের তুলনায় তাহার খুব নিকটবর্তী অপর রেখার চাপের পরিমাণ অত্যন্ত অসম হইলে, বজ্রের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত অধিক হয়।

কি প্রকারে আকাশের বাতাস ও জলীয় বাষ্প যেটা-সুটি ভাবে চলা-ফেরা করিয়া বড়-বৃষ্টির স্রোত করে, তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এখানেই শেষ হইল না। জল ও স্থলের অবস্থান অনুসারে দেশে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহাও বিবেচ্য।

সমস্ত দেশে জল ও স্থলের পরিমাণ সমান নয়। এই জন্ত সমুদ্রের ধারে যে সকল স্থান আছে, তাহাদের আবহাওয়ার সহিত, সমুদ্র হইতে পাঠনত মাইল দূরের জায়গার আবহাওয়ার একা দেখা যায় না। এই জন্তই, আবহাওয়ার



আবহাওয়ার মানচিত্র

আন্দাজ করিতে হইলে, দেশের নিকটবর্তী সমুদ্রের অবস্থান কি রকম, তাহা লইয়া হিসাব করা প্রয়োজন।

সূর্যের তাপে জল অপেক্ষা মাটি বেশি গরম হয়। ইহার ফলে দিনের বেলায় সমুদ্র হইতে ভাটার দিকে একটি বায়ু-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। হুঁহা অস্ত গেলে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত বায়ুপ্রবাহই দেখা যায়। তাপ ভাগ্য করিয়া তখন স্থল-ভাগ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কিন্তু সে রকমে তাপ ছাড়িতে পারে না বলিয়া জল ভাটার তুলনায় বেশ গরম থাকিয়া যায়। কাজেই তখন বাতাস স্থল-ভাগ হইতে জলের দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। ইহা জল ও স্থলের উপরকার বায়ু-প্রবাহের সাধারণ কথা। দেশের উঁচু-নীচু স্থান, পাৰ্বত্য-পর্বত এবং সমতল-ভূমিতে নিম্নোক্ত আবহাওয়ার যে পরিবর্তন করে, তাহা অন্ততঃ জটিল। এই পরিবর্তনগুলিকে নির্দিষ্ট নিয়মের গতির মধ্যে দেখা যায় না। দেশের প্রকৃতি অল্পশায়ে প্রত্যেক দেশেই উহা স্বতন্ত্র।

পাৰ্বত্য-পর্বত ও সমভূমি হারা আমাদের ভারতবর্ষে

কি রকমে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়, তাহার আলোচনা করা বাউক। ইহা বুঝিলে, অস্ত দেশে সেই অবস্থান কি-প্রকারে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়, তাহা সেই দেশের মানচিত্র হইতেই বুঝিতে পারিবে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাসাগর রহিয়াছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষার দীর্ঘ দিনে যখন সমুদ্রের জলের তুলনায় স্থলভাগ বেশি গরম হয়, তখন দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে সমুদ্রের সরস বাতাস স্থলভাগের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। ইহা জলীয় বাষ্প-পূর্ণ দক্ষিণ-বায়ু। মৌসুমের মাকামান্ধি সময় হইতে আশ্বিনের কিছু দিন পর্যন্ত ইহা ভারতবর্ষে প্রবাহিত থাকে। এই বাতাস যদি পাৰ্বত্য-পর্বতে বাধা পায়, তবে তাহার জলীয় বাষ্প অমতি বিবিধ বৃষ্টির সৃষ্টি করে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই দেখা যায়, দক্ষিণ-ভারতে করাচি হইতে নর্থান নদী পর্যন্ত কোনো জায়গায় উঁচু পর্বত নাই। এইজন্য রামপুতানা ও সিন্ধু দেশের উপর দিয়া ঐ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস বৃষ্টি উৎপন্ন না করিয়া অবাধে চলিয়া যায়, এবং পরে যখন তাহা পঞ্জাব

ও যুদ্ধ-প্রবেশের সীমান্তে হিমালয় পর্বতমালায় বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেখানে প্রচুর বৃষ্টি উৎপন্ন করিতে থাকে।

দক্ষিণ-ভারতের ভিন দিকে সমুদ্র। পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ে বাধা পাইয়া ঐ দক্ষিণে-বাতাস মালাবার দেশে ভয়ানক বর্ষণ স্রব করে। এখানে বৎসরে প্রায় এক শত হুড়ি ইকি বৃষ্টি হয়।

আমাদের বঙ্গদেশে ও আসামে যে বায়ুতে বৃষ্টি হয়, তাহা বঙ্গোপসাগর, হইতে ডাঙর প্রবেশ করিয়া খাসিয়া পর্বতে প্রথমে বাধা পায়। ইহাতে চিরাপুলী অঞ্চলে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। এ প্রকার বৃষ্টি পৃথিবীর অন্ত কোনও স্থানেই হয় না। তার পরে সেই বায়ু বনম হিমালয়ে বাধা পাইয়া পশ্চিম-উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তখন বঙ্গদেশে বর্ষার হুজুপাত হয়। কিন্তু এই বাতাস কখনই হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া উত্তরে বাইতে পারে না। হিমালয়ের অপর পাশের তিব্বত প্রভৃতি দেশে এই কারণেই কমাত্তি বৃষ্টি হয়।

ইহারই বিপরীত দেখা যায় কাস্কিক ও অগ্রহারণ মাসে। তখন ভারতের স্থলভাগ স্থলীর্ণ স্বাক্ষতে তাপ তাপ করিয়া সমুদ্র-কলের চেয়ে শীতল হইয়া পড়ে। কাজেই তখন আর একটা বায়ুর প্রবাহ ভারতের উপর দিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। ইহাই উত্তরে বাতাস। ভারতের উত্তরে সমুদ্র নাই। সুতরাং এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না এবং ইহা বৃষ্টিও উৎপন্ন করে না। কেবল বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া আসিয়া এই প্রবাহের যে অংশটি ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ উপকূলের পর্বতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাই জলীয় বাষ্প বহিয়া আনিয়া করমণ্ডল প্রদেশে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করে।

হুবাই বনম সকল তাপের আধার, তখন ইহার মেঘের তাপ বাড়িলে বা কমিলে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়া হুবাই স্বাভাবিক। হর্বোর তাপ সত্যই বাড়ি এবং কমে। ইহার সহিত আবহাওয়ার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহার একটু আভাস দিব।

পাঠক বোধ হয় জানেন, মাঝে-মাঝে উচ্চল হর্বামণ্ডলে এক রকম কাল দাগ দেখা যায়। জ্যোতির্বিদ্যা ইহাকে সৌরকলঙ্ক বলেন। আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন

বায়ুমণ্ডল আছে, হর্বোর চারিদিকে সেই রকম একটা অতি গভীর বাষ্পাবরণ আছে। সেই বাষ্পরাশি সর্বদাই অস্তিত্বে এবং চারিদিকে তাপ ছড়াইতেছে। আমাদের পৃথিবীতে হর্বোর যে তাপ পাই, তাহা ঐ বাষ্পাবরণেরই তাপ। আমাদের আকাশে যেমন কখনো-কখনো ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় উঠিয়া বায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করে, হর্বোর বাষ্পাবরণেই কতিকাবর্ত ও ঘূর্ণি ঝড়। ঐ রকম চঞ্চল হইয়া পড়ে। বনম ঘূর্ণি উঠিয়া হর্বোর বাষ্পাবরণকে এদিকে-ওদিকে সরাইয়া গর্তের সৃষ্টি করে, তখনই সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি হয়। গভীরা ঝড় দেখা দিয়াছে, হর্বামণ্ডলে বনম বেশি সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, তখন তাহার তাপও অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। ইহাতে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প অধিক গন্ধে এবং তাহার কলে পৃথিবীতে সময়ে বা অসময়ে ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি মানা উপদ্রব দেখা দিয়া, একটা বিশিষ্ট কাণ্ড করিতে থাকে।



সৌর-কলঙ্ক

ইহাই সৌরকলঙ্কের একমাত্র কারণ নয়। পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, কস্পাসের কাঁটা সর্বদাই উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা হইয়া দ্বিধ থাকে। হর্বো বেশি কলঙ্ক দেখা দিলে, কস্পাসের কাঁটা আর ঐ রকমে দ্বিধ থাকিতে চায়

না,—ক্রমাগত এমিক-ওমিক ঘূরিয়া বেড়ায়। তা'ছাড়া, ঐ সময়ে পৃথিবীকে ঘেরিয়া একটা প্রবল বৈজ্ঞান-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। ইহার উৎপাতে টেলিগ্রাফের এবং টেলিফোনের ক্যাব ও বহু হইয়া আসে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে চৌম্বক-কটিকা (Magnetic Storm) বলেন। কোনো' ভিনিস খুব গরম হইলে, তাহা হইতে স্তভাবতই অনেক বিভ্রাৎ-মুক্ত অতি-পরমাণু (Electron) বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটাইয়া আসিলে করে। বস্তুতঃ এই ইহা সাধারণ ধর্ম। স্তভাব হুগের অগ্নয় বাষ্পাবরণ হইতে যে নিঃসৃত হইতে-কোট-কোট অতি-পরমাণু বাহির হয়, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরা আশঙ্কিত এই অনুমানকে অবলম্বন করিয়া চৌম্বক-কটিকার ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সময়ে সূর্যের বাষ্পাবরণে যে স্পিন সৃষ্টি হয়, রাশি রাশি বিভ্রাৎ-মুক্ত অতি-পরমাণু তাহাতে আটকাইয়া ক্রমাগত ঘূর্ণণ করায়। কাজেই সৌর্যের চারিদিকে জড়ানো তাহা বিভ্রাৎ-চালিয়াশে যেমন সৌর্য চুম্বকণ পাথ, পৃথিবী অতি-পরমাণুর দ্বারা সূর্যের বাষ্পাবরণে সেইরূপ আকর্ষণ-আকর্ষণ চুম্বকণী হইয়া পড়ে। তার পরে সেই চুম্বকণ প্রত্যাহেই পৃথিবীতে চৌম্বক-কটিকার সৃষ্টি হয়।

চৌম্বক-কটিকা অস্ত্র অগ্নিকার করিলেও, আবহাওয়ার পরিবর্তন করিয়া উপদ্রব করে না; কিন্তু সৌরকলঙ্ক দ্বারা সেই উপদ্রব দখল হয়। এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন,—সূর্যের বাষ্পাবরণে যখন কটিকা-বর্ষণ

চলে, তখন যে সকল অতি-পরমাণু বড় বেস' লক্ষ্য করিয়া পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে আসিয়া পৌঁছে, সেইগুলিই আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। জলীয় বাষ্প যখন ঘনট বীথিয়া মেঘের উৎপত্তি করিতে যায়, তখন তাহা কোনো কঠিন বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। বায়ু-মণ্ডলে গুলিকণার অস্ত্র ব' নাই। জলীয় বাষ্প সাধারণতঃ গুলিকণাকে আশ্রয় করিয়াই মেঘের উৎপত্তি করে। যেখানে গুলিকণা বা সেই রকম কোনো অবলম্বন না জোটে, সেখানকার জলীয় বাষ্প অনায়াসে মেঘে পরিণত হইতে পারে না। সূর্যের অতি-পরমাণু পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে আসিয়া পৌঁছিলে, জলীয় বাষ্পের দ্বারা আশ্রয়-বস্তুর অভাব থাকে না। তখন অতি-পরমাণুগুলিকে অবলম্বন করিয়া আকাশের জলীয় বাষ্প ঘনট বীথে এবং রাশি-রাশি মেঘের সৃষ্টি করিয়া বর্ষণ রূপ করিয়া দেয়।

এগারো বৎসর অন্তর সূর্যমণ্ডলে বেশি কলঙ্কের উৎপত্তি হয়, এবং প্রায়ই এই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে বড় বৃষ্টি প্রকৃতি উৎপাত দেখা দেয়। কিন্তু এগার বৎসরের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের সখ্য কোথাও, তাহা আশেও জানা যায় নাই। তা' ছাড়া' সৌরকলঙ্ক দ্বারা যে সত্যই পূর্ণোৎস্র প্রকারে মেঘোৎপত্তি হয়, তাহাও সপ্রমাণ হয় নাই। কাজেই সূর্যের বাষ্পমণ্ডলের প্রত্যেক পৃথিবীর আবহাওয়ার যে পরিবর্তন হয়, তাহাতে কোনো নিঃসন্দেহ বন্ধন আছে কি না, ইহাও জানা বাইতেছে না।

দাদামশায়ের বে'

[ত্রিংশতাব্দা যোজ্ঞায়া]

(পেদাঙ্ক)

(কথার কথার কালি !)

বেলা তখন দুটা বাজিয়াছে।

বুড় হার বহানায়ের নিতৃত ছোট বাজীখানির সদয়ের দ্বয়ে উড়িয়া চাকর হরেককণ ও বাজুড়ার বাঙ্গালী বায়ু উপেন্দ্র বদিশ', কলিকা হুঁকিতে হুঁকিতে ভূতপূর্ণ নবিসদের অঙ্গল স্থখাতির সর্ভিত—বলাংশি করিতেছিল, তাহাদের সত গুণবান জীবের গুণ মধ্যদায় সখ্য সমায়

পূর্ণ-নবিসরাই জানিতেন—অখ্য বর্তমান নবিস কিছুই জানেন না! এবং সেই যেতু তাহারা একত্রে গুণপ্রকাশে উৎসাহীন—ইত্যাদি।

এমন সময় সন্ধ্যাবেলা একল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বায়ু ঠাণ্ডার ব্যত হইয়া বসিল, "এই যে ছোট বুড়ামশাই আসেন। আমাদের বুড়ো বাবুটি তো আমানার

তবে হেঁপিয়ে সাঁতা হচ্ছে—আসেন আসেন, চলেন তেঁনার কাছে—”

চাকর হরেকৃষ্ণ মোক্ষা-পাসের ফেলে বিকৃত হস্তস্তর বাহির করিয়া, এক গাল হাঁসা বলিল, “হাঁ, তোপুনো বাবু—আমারো হুঁচখাবু বিধা করিবে কিড়ি—?”

সকলে মুখ-চাওয়া-চাওগি করিয়া হাসিল। ভূপেন বলিল, “হাঁ সো কিড়িমিড়ি চক্রে, তোমার বাবু বিধা করিবে কিড়ি, মোক্ষা ভূনি কার কাছে থবর গেলে?”

হরেকৃষ্ণ অনেক হাসিয়া বিপুল-সমগর্ভ-বচন-বিজ্ঞানে যে সুবীৰ্য্য কাহিনী বলিয়া গেল, তাহার সাক্ষিগুণ অর্থ এই যে,—বুড়াবাবু ক্রাম সকলে তাঁরামের বাড়ী হইতে বেড়াইয়া করিয়া অথবা অছোমার অবস্থার উপলীত হইতাহেন! প্রায় পাড়াগড় সকল মানুষের কাছেই তিনি—নগর তিন হাজার টাকা, চন্দো বিধা বেগোত্তর জমি ও কিছু বিগ্রহ সহ মুন্সেী পাত্রীটির কথা বলিরাছেন; এবং বুড়ের উপদ্রুত পুত্রপন এখন সকলেই নিজ-নিজ পরিবারবর্গ সহ বে-বার কর্তৃপক্ষে আজ্ঞা দিয়াছে, তখন বুড়ের এই শত্রু আজ্ঞার যে একটি গৃহিণী প্রতিষ্ঠা করা অত্যাশঙ্কর, সে সংকে প্রায় সকলকেই সম্বন্ধাইয়া লম্বিত মানে বাধা করিরাছেন—এখন কি চাকর হরেকৃষ্ণ হইতে বাসুদেবচন্দ্র—‘বাবা ভগ্নীকে’ পর্বাত সকলেই ধমকের ভয়ে পুঁসির সহিত লম্বিতদান করিরাছে!—তার পর একজন জ্যোতিষীকে আনাইয়া, বেলা একটা পর্বাত বসিয়া বৃদ্ধ নিজের কুট্রি দেখাইরাছেন, তবে মানান্সার করিরাছেন। এখন হরিনামের মাসা লইয়া তিনি চকলের আগমন-প্রতীক্ষার হটকট করিতেছেন—বেহেড়ু, আজ না কি এখানে কে তাঁহার ‘কুট্রিগণো’ আসিবে,—চকলই তাহারের অত্যাধনা করিবে কি না!

চকল গভীরভাবে শ্রীকার করিল, হাঁ, সে সম্ভাবিত কুট্রিগণের অত্যাধনার তরফেই আসিরাছে!—তার পর খুব সজেক্সে আর গুটিকতক জরুরী উপদেশ দান করিয়া—কুট্রিগণের আগমন-প্রতীক্ষার তাহারের বাহিরে বসিতে বলিয়া বলবল সহ চকল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

বারেবার কখন বিছাইয়া বসিয়া বৃদ্ধ মালা জপ করিতেছিলেন। হাণিক সলীসের ইমিতে কুঁতা খটখট করিয়া লামনে পিচা ডাকিল “হালাসখাই—”

অকৃষ্ণিক করিয়া, চারিদিক চাফিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “কে রে, ভূপীম?”

হাণিক বলিল “আজ্ঞে না, আমি হাণিক—আপনারে কেথ্বে এলুম”—হাণিক সসকোচে নিখটে গিয়া বলিল।

নাতিদের মুখে এই ‘দেথ্বে এলুম’ কথাটা শুনিলেই বুড়ের পিত্ত জলিয়া বাইতে!—বেহেড়ু তিনি নিশ্চয় জানিতেন, ঐ—‘দেথ্বে এলুম’ এর মূখ্য অর্থ—‘আপাণতে এলুম’ মাত্ৰ! তাহেই ভেৎগে কই হইয়া বলিলেন, “কি দেথ্বে এলে? আমি সোণা না লবর, বে, আবার দেথ্বে?”

হাণিক একটু পিছাইয়া বলিল; তার পর খুব তরে-তরে এবং অস্তান্ত বীরে বীরে বলিল “এই দেথ্বে এলুম,—আপনি মরে গেছেন, না এখনো বেঁচে আছেন!”

একে ত কর্ণধারী “দেথ্বে এলুম”—তার পর আবার এই কর্ণধারী শ্রুতোর উক্তি! ক্রোবে অধিশর্থা হইয়া, গভীর গর্জনে হুকার করিয়া বৃদ্ধ হাণিকলালের উদ্ভটতন সপ্ত-পুরুষকে ধবংছ পালাপালি দিরা,—সম্বোরে কুলি ঝাঁকুদী দিরা বলিলেন, “নিকাল বাও—তোমু হায়া! মোকামসে আবি নিকাল বাও”—রাগের চোটে তিনি সর্জবাই বংলা ভুলিয়া বাইতেন!

হাণিক এক-লক্ষে আসিয়া থামের আড়ালে লুকাইল। তাহার পাড়াপন বহু হটরাছে দেখিরা, বৃদ্ধ পালাপালি পালাইয়া আবার মালাজপ শুরু করিলেন।

রাগাধারের আড়ালে লুকাইত সলীসের নিখটে হইতে বিস্তর রকমের উৎসাহ-স্বতক নীতব ইমিতে পাইয়া, তহার্য হাণিকের বুকের ধড়কুড়ানিটা অলক্ষণেই সাহিরা গেল। আবার পা টিপিয়া-টিপিরা আসিরা সে বুড়ের লামনে বলিল। তার পর হাণিক তাহিরা-চাফিরা, বার বক্তক কাশিরা, গুণ-গুণ হয়ে কবিতা শুভ্রনে শ্রুত করিল—

“নাতি, নাতি, নাতি,—নাতি অর্গের বাড়ি!”

বলা বাহুল্য, কবিতা শুনিয়া বুড়ের অন্তরাখা নীতল হইয়া গেল! রাগ সামলাইতে না পারিয়া, সম্বোরে তর্জনি আক্ষালন সংকারে, তিনি গর্জম করিয়া বলিলেন, “নেহি মাতো!”—অর্থাৎ কি না নাতি আমি চাই না।

তবে হাণিকের বৃক চরমস্থ করিতে লাগিল,—আড়-চোখে একবার সলীসের দিক চাফিরা, কোনক্রমে কিঞ্চি লামল লকর করিয়া—তার পর পেও তেঁমনি-জায়ে তর্জনি

আশ্বিনান করিয়া ঈষৎ জোরের সহিত বলিল—“হাংনে হোগা বাভা—”

উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন “কতি সেই হাংএলা—”

অধিকতর জোরের সহিত মাণিক বলিল, “আগেবং হাংনে হোগা!—এখনি যদি আপনি মরে যান, তাহলে, কাঁধে করে নিয়ে ধাবে কে?”

বৃদ্ধ হত্যার করিয়া উঠিলেন! সঙ্গে-সঙ্গে মাণিকও এক লাঞ্চে উঠানে পড়িয়া, উর্দ্ধবালে ছুটিয়া আসিয়া, রাস্তাবয়ের মধ্যে অস্তিত্ব করিল!—চকল বাস্তবমত তাবে অগ্রসর হইয়া বলিল—“কি হয়েছে জ্যাঠামশায়, কি হয়েছে?”

সঙ্গে-সঙ্গে, থক-থক-থক শব্দে বিকট কানি কানিয়া, সতীশ শুক-বজীর মিনায়ে বলিল, “জানির্খাস রায় মশাই, জানির্খাস,—আমি জ্যোতির্কির—লক্ষ্মীপতি নন্দ!—পাজীর ঠিকুনি কোণ্টি দিয়ে, অহুকুল যোগ আমার পাঠিয়ে দিলে। আপনার কোণ্টিটা দিন—মিলিয়ে দেখি।”

গলায় মাগার হরিনামের স্তুতিটি আটকইয়া বৃদ্ধ সংকট হইয়া বলিলেন “আহুন, আহুন—”তার পর বিনা প্রয়োজনে অগ্রসর গভীর মুখে বলিলেন যে, তাঁহার ‘উচ্চর গানী’ নাতিদের উপজ্জবে তিনি বড়ই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন; এইমাত্র একজন আশিয়া তাঁহাকে বড়ই আলাতন করিয়া গেল; ইত্যাদি।

চকল বৃদ্ধের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তাঁহার চরিত্র নতিদের সহজে অনেক অস্ত্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিল; এবং জ্যোতির্কিরদেব ধন বাগদাশেপ জুড়িয়া পাণ্ডব-দলন করিয়া ফেড়াইয়াছিলেন, তখন এই কয়টা মহাপাণ্ডকে যে তিনি কেন ‘ক্যানা-যোম’র উপর দত্তরমত দলন করিতে জুলিয়া গিয়াছিলেন, সে সহজে অনেক আক্ষেপ ও অহুকুল করিল।

বৃদ্ধের কোণ্টি লইয়া, তাঁহার দিকে পিছন করিয়া বসিয়া, শাখা মনের বাড়ি-গৌর-ভূবিত লক্ষ্মীপতি নন্দ, তরকে সতীশ, নিজের লজিক বই খুলিয়া, বিড়-বিড় করিয়া পড়িতে-পড়িতে “শনি-রাহ-বৃথ—পাতকি চক্র, সাবিত্রী যোগ, লয়ে চক্রে, একাধারে সুরম্পতি” ইত্যাদি এক-একটা কথা মাঝে-মাঝে উচ্চ গলায় বলিতে গেল। বৃদ্ধ উৎকর্ষাশ্রু চিত্তে বার-বার তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সতীশ বখাশায়া অহুকুল উত্তর দিয়া চলিল। আর যেখানেই

প্রশ্ন করিল হইয়া উঠিল—সেইখানেই গুরুত্ব ভাবে বিবন, উৎকট কানি কানিয়া—নিজের বার্তাক-ভৌর জন্মজন্মক, শত বিকার দিয়া, নানা বাগদাশ-চানে বিশালাপে পরিভাষে সোলমাল করিয়া প্রশ্ন চাপা দিয়া কেলিতে গেলিল। যাহাই হউক, বড়ই ধরিয়া, বিপুল পরিভাষে নিজের কানিয়া, অনেক হিসাব-নিকাশের আঁক-ভোক লিখিয়া, নিজের লজিকের বইখানির সঙ্গে বৃদ্ধের কোণ্টি মিলাইয়া (৫), শেষে নিজ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল—“এ বিবাহ নির্জল-বাটি রান্ন-বোটক বিবাহ হইবে। পাজীর কোণ্টিতে অকটা মধবা নুতুবোগ আছে। যদিও আশ হইতে ১১ বৎসর ছমাস তের দিন পরে পাজীর সূত্রয় দিন গার্য হইয়াছে। কিন্তু বিবাহ হইলে—সেই মধবা-নুতুবোগ-বলে—রায় মশায়র ততদিন পর্যন্ত বাচিয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন,—নচেৎ তাঁহার পরিভাষ নাই।”

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ বলিলেন, “সে কি হে, চুপুত-বেলা মহানন্দ জ্যোতির্কী কুণ্টি দেখে বলে যে, এবার আমার জিপাশের বৎসর, এই চৈত্রে আমার নুতুবোগ আছে—”

চকল গলায় খেঁচাট হত্যার করিয়া সতীশ বলিল, “কে বলে! কোন্ জ্যোতির্কী বলে! কই পাজীর কুণ্টি মিলিয়ে প্রমাণ করুক দেখি!”

বৃদ্ধ ভাড়াভাড়ি বলিলেন—“হাঁ হাঁ—সেও, বলে—সেটা—সেও বলে যে, বিবাহ হলে,—যদি পাজীর গ্রহ-নক্ষত্র-যোগ তেমন বলবান হয়, তবে,—এটা খণ্ডে বেতেও পারে, বুকলে যে—এটা খণ্ডে বেতেও পারে।”

জ্যোতির্কির—এবং বাড় নাড়িয়া বলিলেন, “হাঁ, তাই বলুন!”

উঠানে দুই-গাথা মনের কন্ড কন্ড আগুগায় বাজিয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া বলিল, “ও কি?”

মহা ব্যস্ততার সহিত উর্দ্ধবালে ছুটিয়া আসিয়া জুপেন তড়-বড় করিয়া বলিল, “দামামশাই, দামামশাই—অহুকুল বাবু মেরে নিয়ে এসেছেন; সঙ্গে কি আছে, আর ঠিক বন্ধুর হই মেরে আছে।—তাঁহের সবাইকে এইখানেই আনুন?”

ব্যস্ত-সস্তস্ত বৃদ্ধ কিছু বলিবার পূর্বেই, চকল শশব্যস্তে বলিল, “হাঁ-হাঁ—এখানেই আন। গণংকায় মশাই, চমুন আমরা বাইরে গিয়ে অহুকুল বাকুকে সেইখানে কুণ্টি দেখাই

—কি বসুন দামামাশাই, ঘেরেয়া তা'হলে এইখানেই আসুন ?”

জাঠামশাই সে কথাই উত্তর দিতে-না-দিতেনই,—জাঠার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নাস্তি মশাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন—“হাঁ-হাঁ—সেই ভাল কথা ! দামামাশাই, আপনি তা'হলে ভাল করে ‘কনেটিকে’ দেখে নেবেন, বুঝলেন—” সঙ্গে-সঙ্গে চটপট দশে জুতার আওয়াজ করিয়া সকলে একতানোচ্চ হইলেন ।

হুই পা গিয়া,—কীং কিরিয়া আসিয়া—ভূপেন চুপি-চুপি বুদ্ধকে বলিল, “দামামশাই, শুহন, শুহন,—নতন কুইন এয়া আত গ্রন্থন এলেন,—কিছু জল খাওয়াই উচিত নয় ?”

নিতাই বুদ্ধ এই সব লোক নৌকিকতা, কুইন-কুইনিতার বিধি-ব্যবহার তত্ত্ব বহুদিনই তুলিয়া গিয়াছেন,—আজ এই নতন কাঁচিঃ পুত্ৰ !—অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ব্যস্ত-ভাবে বলিলেন “হাঁ-হাঁ—উচিত বৈ কি । উচিত বৈ কি !—বজ্ঞ কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে হে ! বজ্ঞ লক্ষী ছেলে তুমি,—নিতাই প্রত্যেক ভোমাদের গল্পে বলছি যে, তিনি যেন একজামিনে ভোমাদের পাশ করিয়ে যেন ।”

তজ্জিতরে প্রণাম করিয়া, বৃদ্ধের পায়ের ধূলা শইয়া,—ভূপেন কতখোঁড়ে মিনতির স্বরে বলিলেন—“দেখবেন দামামশাই,—আমাদের উজ্জয়ই যেতে বসুন, আর বাই করুন,—যেদা একজামিনে পাশ হওয়ার আশীর্বাদটা যেন অস্তরের সঙ্গেই করেন ! সে আশীর্বাদটা যেন মিথ্যা না হয় !”

হাসি-মুখে আশ্বাসের স্বরে বুদ্ধ বলিলেন “না হে, না,—তার জগ্রে কি আর আমাকে বেশী বলতে হয় ! ভোমাদের ওপর কি আমি রাগ করতে পারি যে—ভোমাদের ওপর আমি রাগ করতে পারি কি ? তা নয়, তবে ঐ মানুষকে না—’ এলে মাঝে মাঝে আমার বজ্ঞ জালাতন করে—বুঝলে যে—ঐ জগ্রেই বা—” ঘরে ঢুকিয়া, হাতকাইরা-হাত-কাইরা টাকার বস্ত্রটির ঢাতি খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া ভূপেনের হাতে দিয়া বলিলেন—“ভাবো, ওপীখো ঠাকুরকে বল, হাত-পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে গিয়ে বড়বাগারে ব্রহ্মবাসীর হোকান থেকে এক টাকার দিল্লি কিনে আনুক,—বুঝলে !”

আবহারের স্বরে ভূপেন বলিল, “তা তো বুঝলুম দামামশাই,—আজকের দিনে আমাদেরও আমি কিছু খাইয়ে যেন,—দেখুন, আপনায় জগ্রে এত খাইলী খাটুছি,—আপনি তো কখনো কিছু খেতে যেন নি,—সেহিন পঁজ-বড়া কিনে খাব যেন হুট পয়সা চাইলুম, তাও তো আপনি বিলেন না,—আজকে কিছু না খাওয়ালে কিছু আমরা জীব না—”

বিপদগ্রস্ত হইরা বুদ্ধ বলিলেন, “আজ্ঞা, আজ্ঞা তোমাদের আর একটা টাকা দিছি,—তোমরা দিল্লি কিনে খাও গে—”

হাত কচুলাইতে কচুলাইতে সনির্ভর অহুরোধের স্বরে ভূপেন বলিল, “সেট হুই না দামামশাই,—আজকের দিনে ও কথাটি বলবেন না । আজ—ঠাকুরের প্রণামই বসুন, আর ব্রহ্মবাসীর হোকানের দিল্লিই বসুন, আজ আমরা সে সব কিছু খাব না—”

এবার বুদ্ধের বৈরাগ্য লোপ হইল । হাত নাড়িয়া উগ্র-ভাবে বলিলেন “তবে কি থাকে, তাই বল যে ! আমার কুইনজ্ঞ এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার সঙ্গে জাক্কা করবার সময় নেই আমার—”

ভূপেন বলিল, “তা'তো বটেই,—কদিনের পর আজ আমাদের নতুন দিদিমা আসছেন—কি আনন্দের দিন আজ ! ঘোরাই দামামশাই, আজ আমাদের সূচি আর বাস খাইয়ে যেন !”

এতাবটা বুদ্ধের আসি তাল লাগিল না ; কিন্তু ভূপেন না-ছোড়বাখা ! অনেক তর্ক-বিতর্ক, কাকুতি-মিনতি করিয়া সে বুদ্ধের নিকট হইতে আরও ছটা টাকা আদায় করিয়া লইল । টাকা দিয়া বুদ্ধ বলিলেন, “যেখো যে, চকলকে ও-সব রকমে খাও আজ খেতে দিও না,—কাল সে আত্মত্বিক ছরায় ক'বে,—বুঝলে ?”

ভূপেন জগ্রে তা'বে জগ্রে বজ্ঞ করিয়া বলিল, “আজ্ঞে হাঁ, হাঁ,—সে আপনায় ছরায় ক'বে বৈ কি,—সে ও-সব খাবে না ।—ওই ঘেরেয়া আসছেন, আপনি ‘কনেটিকে’ ভাল করে দেখে নেবেন দামামশাই,—বেশ ভাল করে ।—দেখুন, এ গ্রন্থন-একদিনের জগ্রে নয়, এ জগ্রে-জগ্রে-সম্পর্ক ।—ঘরে গেলেও বাধন হাঁক্বে না,—এই বেলা ভাল করে দেখে নেওয়া উচিত, বুঝলেন দামামশাই,—লজ্জা করে যেন চোখ বুজে থাকিবেন না । এ হচ্ছে জগ্রে-জগ্রে-সম্পর্ক আত্ম-

শ্বিক সম্পর্ক, এর মধ্যে আবিভোক্তিকতা, আদিবৈধিকতার
নামগন্ধও তিষ্ঠিতে পারে না,—এতে লজ্জা পড়েচ কি ?”

বুদ্ধকে ব্যথিত আনিয়া বশাইয়া তুপন গ্রহান করিল।
স্বপ্নমধ্যে বৃদ্ধ-র-পাখা মলের কক্ষস্থ আওয়াজে চারিত্রিক
স্থবর হইয়া উঠিল। সাপস্বারা, মৃগজ্ঞতা ‘কনের’ হাত
ধরিয়া একটা ত্রীলোক ঘোমটা টানিয়া সামনে আনিয়া
গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া নাকি-হুয়ে পরিচয় দিল—“এইটি
হচ্ছে ‘কনে’, আমি হচ্ছি কি—আর ঘোমটা দিয়ে ঐ বে বড়
হুজান এসেছেন, ওঁরা হচ্ছেন কর্তা মশাইয়ের ‘বন্ধু কভে’।
সম্পর্কে ওঁরা ‘কনের’ দিদি।”

শূলীর সহিত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, “বটে, বটে,—‘কনের’
দিদিরা শুভ এসেছে ? বেশ, বেশ,—বলো সবাই। আচ্ছা
কি, তুমি কবেটিকে তোমার গাড়ি করিয়ে দাও দেখি—আমি
দেখি ভাল করে—”

ব্যতীত আর থাকেই থাকে যে চৌত্র আসিয়া পড়িয়াছিল,
‘কনে’কে সেইখানে গাড়ি কতান হইল। বুদ্ধ কুঁকিয়া
ঠাকর করিয়া দেখিতে-দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, “কি বেল
স্বপ্ন, নয় গা ? কিন্তু একটু যেন কাহিল-কাহিল দেখছি—
একটু খাটোও আছে ; নয় ?”

পরিচয়-পাঞ্জী বি-ভাক্সাণী পুনরায় নাকি-হুয়ে পরিচয়
দান শুরু করিলেন—“এজ্ঞে, খাটো নয়,—এই তেরো বছরের
যে—আবার শুকে পড়ে—আগার সঙ্গে বেশ সাজুক হবে।
তবে কাহিল একটু আছে যেটন, তা মেরের উপোষ-তিরেশ,
বিহু-সেবা, বোতু-সেবা, কত ‘ভক্তের’ ঘট ! এমন
যেবে দেখবে নি,—বলতো দিদি তোমার নামটি—আগে
পেরান কর—”

প্রণাম করিয়া মিহি হুয়ে ‘কনে’ বলিল “ঐমতী রাণা-
রাণী বৈক্য-বাসী।”

বৃদ্ধ বলিলেন “বেশ, বেশ, বেশ,—খাসা নাম।”

(কথার কথার হাসি !)

শিখন হইতে একজন ডাকিল “জানাই বাবু !”

চমকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন “কে হে ?”

সঙ্গে-সঙ্গে খুঁখুঁ করিয়া একাধিক কর্তার চাপা
হাসির শব্দ উঠিল !—বৃদ্ধ অতীত কষ্ট হইয়া বলিলেন, “কে
তুমি ?”

কীর্ণ কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল—“আমি কনের বড়-
দিদি, জানাই বাবু—”

বৃদ্ধ কাহারো অজ্ঞাত বরণের কঠিতে পারেন না।
তৎক্ষণাত্ উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “দাঁড়িয়ে বাবু, এখন কি
জানাই বাবু ? আগে বিয়ে চোক তা’পর জানাই বাবু—”

উত্তরে তিনি বলিলেন, “কনে বেশ পান গায়েতে পারে।
তাই বহু, একটু পান শোনাতে আপনাকে ?..”

“পান ! যেহেতু মাহুয়ের পান।”—বলিয়া বৃদ্ধ অগ্রণর
ভাবে নীরব হইলেন।

আর একজন বলিল, “আজ্ঞে, খাটী তাগবতের কথা নিয়ে
রাখাকরের নীলার বিষয় পান—গাও তো কনে, তোমার
বরকে একটু পান তুলিয়ে দাও তো—অজ্ঞের মুখে
তগবানের কথা বেশ মিষ্টি লাগবে, সেই জন্তে শুকের
মুখে পতীকিং—ইত্যাদি।”

আচম্বিতে নিকটে হার্মোনিয়াম বাজিয়া উঠিল,—কনে
পান খরিল,—“আবার পরণ বাহা চাও, তুমি তাই, তুমি
তাই গো—”

নিত্যন্ত অলসোদের সহিত বৃদ্ধ বলিলেন, “ও আবার কি
পান ! ও পান গায়েতে হবে না—”

খিলখিল করিয়া হাসিয়া আর একজন বলিল, “আজ্ঞে
জানাই বাবু,—কেলি-কথের মূলে ঐমতি সোবিনের কাছে
ঐ পান দাগর যুগে পেয়েছিলেন—” সঙ্গে-সঙ্গে খুব হাসি !

বিনি হার্মোনিয়াম বাজাইতেছিলেন, তিনি হার্মোনিয়াম
বন্ধ করিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে কিস্ কিস্ করিয়া
বলিলেন, “আগে দুই, কেলি-কথের কেন হবে,—বীর-
সমীরেই তো গোবিন্দের সঙ্গে প্রথম দেখা—”

প্রথম উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “তবে তো তুমি বড়ই
জানো, বীর-সমীরে প্রথম দেখা হয়,—না মুন-পুলিনে ?
আচ্ছা দাখানাই—” বলিয়াই পোপনে জিভ্ কাটিয়া
জন্তে কথাটা সামলাইয়া লইয়া খুব ভাড়াভাড়ি বলিলেন—
“ওর নাম কি জানাই বাবু—ও জানাই বাবু, আপনি বলুন
তো—বীর-সমীরে গোবিন্দের সঙ্গে রাধিকার প্রথম দেখা
হয়, না—কুজবনে, না নিধুবনে, না মুন-পুলিনে ?”

হতবুদ্ধি জানাই বাবু কোন কথা বলিবার পূর্বেই—
অন্ত ভ্রান্তিকা মহোদয় বাবনার চাবি টিপিয়া সবিস্ময়
হাতে বলিল—“আরে নাও, দাদার মাইল ঘুরে মুন-

পুলিনের তরু ঘেড়ে গাও—হঠাৎ এই হার মশারের লালনানেই
রাখিক। ঠাকুরণ গোবিন্দকে First দেখে side-long
glance করেছিলেন! মকর গে যাক্ দে,—এখন
ধামায়ণী, জুনি গাও তো সেই গানটি—কি কণে দেখিছ
ভ্রামে—”

মুখে কথাল গাঁগিয়া কিক্ কিক্ করিয়া হাসিয়া ‘কনে’
গান ধরিল—“সই, কি কণে দেখিছ ভ্রামে কন্যের মূলে—
সেই দিন পুড়িল কপাল আমার—”

(হস ভস !)

অকস্মাৎ বাহির হইতে উক, গভীর কণ্ঠে কে ডাকিল,
“মাণিক !”

অন্তে গান ধামায়ণী ‘কনে’ বলিল, “আজ্ঞে—পরকণ্ঠেই
হঠাৎ একলাকে হাফোনিয়ামওয়ালাকে ডিকাইয়া পানের
ঘরে ঢুকিয়া পড়িল! সঙ্গে-সঙ্গে ঘুড়-র-গীথা মল ছুইটা,
কনের পা হইতে বলিয়া কস্তুর-স্তম্ভং সঙ্গে একটা পড়িল
হাফোনিয়ামের উপর, এতটা পড়িল হাফোনিয়ামওয়ালা
পিতে!

কি ও কনের উই দিদি একসাথে ভর্যাক্ত কণ্ঠে বলিয়া
উঠিল, “সর্বস্ব! মায়াবাবু বে!—”সঙ্গে-সঙ্গে ঘোমটা
খুলিয়া, লাফাইয়া উঠানে পড়িয়া, একএক লাফে উপাটপ
হাস্যবতের পিছনের ছোট পাঁচিল ডিকাইয়া তিনজনে
ঐক্য হইল!

বিস্ময়-স্তম্ভিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, “কে হে ভূশীন না
কি? ভূশীন! তোমরা! এ্যা—সে কি হে, তোমরা—”

চকলের কাণ ধরিয়া তাহার বড়ফাড়া বিনয়বাবু দামনে
আসিয়া বসিলেন, “জ্যাঠানশাই, ছেলেগুলি সব খেল
কোথা?”

মকরুণ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, “কি জানি বাবা, আমি
কিছুই জানি না! বড়ো মাছব, নিশ্চিত হরে হরিনাম করছি,
তারও ব্যাঘাত! ঐ ভূশীন দা—কোথা থেকে এক
অস্থূল বোম আর তার মেরেকে এনে হাঙ্গির করেছে,—
বলে, নগর তিন হাজার টাকা, দুশো বিঘে জমি, আর বিহু
বিগ্রহ পাওয়া বাবে,—আমার তো বাবা বহা শীতাপ্তি
লুক করেছে! ওই বে কনের বাপ শুধু এসে এইখানেই
কোথা জিজ্ঞাসে—তাহা না বাবা, চকল তার কাছে
আছে!”

বিনয়বাবু চকলের কাণ ধরিয়া মাড়িয়া মুখ টিপিয়া-
টিপিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পিছন হইতে
অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের পরম বেহতাজন দুহুদ্ব কবিরাজ
মহাপর প্রসন্ন-কৌতুক-মিত হাতে বলিলেন “হার মশাই,
আপনার মাতিরা তো বেশ বিয়ের আনন্দ যদি
তুলেছে,—এখন আমরা এর মধ্যে দু’একখানা সূচি-মোড়;
পেতে পারি বোধ হয়?”

নিষ্কংসার-কণি কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, “কে হে, কবিরাজ?
এস এস,—আর সূচি-মোড়া! আমা সকাল থেকে
‘শাশা’ আমার উহাঙ্গ করে তুলেছে হে,—ভয়ের সঙ্গে
কক-কক আমার মাথা ঘরে গোছে, উঃ—”হরিনামের
মালাটি হাতে লইয়া বৃদ্ধ অকসর ভাবে কবলের উপর সেই-
খানেই শুইয়া পড়িলেন।

চকলের কাণ ধরিয়া বেশ জোরের সঙ্গে আর একটু
মাড়া দিয়া, দ্বালে চড় কসাইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, “জ্যাঠা
মশাই, বাবার বড় ভাই,—ভীর সঙ্গে রঙ্গ করা? এই
বিষে হচ্ছে? এ্যা?”—প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে ও-পাশে আর
এক চড়।

প্রশ্নার অস্থির হইয়া চকল ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে
চাছিল,—এক-বাজার সন্ধ্যার কাহাকেও এই সময়
আবিষ্কার করিতে পারিলে—তাহার শান্তিটা শেষ হইতে
পারে তো!—মাণিক ঘরের ভিতর হইতে সতরে উকি-
বুঁকি বাড়িতেছিল—হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই
চকল টোঁটাইয়া উঠিল—“ঐ বে—ঐ বে, মাণুক ঐ ঘরে
রয়েছে—ঐ কনে সেজেছিল—”

বিনয়বাবু ডাকিলেন—“মাণুক, এখানে আর—”

গহন-পত্র ও পার্শ্ব সাজী খুলিয়া, নাকের রসকলি
সুঁছিয়া ঘৃতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া মাণিক শুক, কুণ্ডিত মুখে
বাহিরে আসিয়া, সরোবরে বলিল, “আমি তো শুধু ‘কনে’
হয়েছিগুণ, আর তুলেন-না আর তুলোনা যে কনের দিদি
হয়েছিল, আর স্বাকা তো দাদামশাইয়ের ‘হাবাতের হুয়া’
পর্বাৎ কর্বে বসেছিল—”

সবিস্ময়ে বিনয়বাবু বলিলেন “হাবাতের হুয়া!
সে কি?”

“বৃদ্ধ বলিলেন “আত্মমণিক লাভ হে। ও সব ‘ভৈরব’
হলে কি না?—মাণুকে ‘খ’ বানিয়ে দেয় বাপ, আমা

আবার মালাজপে বড়ই ব্যাঘাত করেছে, মাথকে না—
আবার কানে পেয়ে টকা গেবে শোনার হে।”

“এই যে গাওয়াই টকা—” বলিয়া উত্তর করিল দুই জনের
কাণ ধরিয়া নড়া দিয়া। দুজনকে পাশাপাশি ধাক্কা দিয়া,
তৎসনা-বাক্যে কয়েক বিনয়বান্ধু বলিলেন “আমার জ্যাঠা
মশাই, বুড়ো মাছ, একে ঠর চোখের কোর করে গেছে,
—এখন কোণার তোমরা ঠর সেবা-গুস্তরা করবে, প্রহা-
তজ্ঞি করবে,—তা চুলায় গেল, এখন শুঁকে নিয়ে তামাসা।
ঠর শাস্তির বিয়!—ওতভাগা ছেলে সখ, যে জ্যাঠামশায়ের
সামনে নাক খৎ, মল্ হুজনে নিজের নিজের কাণ!—”

দুজনে তাইই করিল। বিনয়বান্ধু দুজনকে টানিয়া
আনিয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিলেন,
“বতকশ না জ্যাঠামশায়ের মাথা ছাড়ো, ততকশ দুজনে বসে
পা টেপ।”

তার পর বৃদ্ধের অমূল্যমতি লইয়া,—কবিরাজ মহাশয়ের
হাত ধইতে ঠাণ্ডা তৈলের শিশি লইয়া, স্বয়ং বৃদ্ধের মাথার
ও কপালে তৈল মাশিল করিয়া দিতে লাগিলেন।

কবিরাজ মহাশয় প্রসন্ন হাতে বলিলেন, “যেখুন দেখি
স্বয়ং মশাই, আপনার ছোট নাতিটি আপনার পদসেবা
করছে—এইবার আপনাকে কেমন চবৎকার দেখাচ্ছে।
বাক্, ওর ভ্রাতা এবার আপনি ওর দাণদের মোরাম্বাটা
সন্তুষ্ট-চিত্তে মাগ করুন। আর যেখুন, নাতিরা মিছামিছি
আপনাকে নিয়ে যে কৌতুক করেছে, এই ভাল,—

ধরুন সতি-সতি যদি বিয়েটা দিবে দিত, তবে সে যে বড়
ভরানক হ’ত?”

অবস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুত উজ্জ্বল হৃদয় বলিলেন,
“নিশ্চয়, নিশ্চয়,—তার আর লক্ষ্য কি! সেই কথাই
তো আমি ভাবছিলাম যে, তা ঐ কৃষ্ণ—না—যে
কিছুতেই ছাড়ো না, বলে ভাওয়া বিষ্ণু-বিষ্ণু আছে
ওদের ধাড়ীতে! উঃ না—কি ধড়িবাড় হে!—কুটুম্বের
লগ খাওয়াবে, আর নিঃস্বা সেই সঙ্গে, লুচি মাগ খাবে
বলে—আমার কাছ থেকে আর চার চাটো টাকা আদায়
করে নিয়ে গেছে হে!”

সদানন্দ কবিরাজ মহাশয় দ্বিত হাতে বলিলেন, “আহা,
বাক্ - বাক্, আপনার বিবাহের উৎসবে তারা খেতে পরিশ্রম
করেছে, তাদের কিছু খাওয়ান উচিত বৈ কি!—বাক্—
আপনার নাতিরা এখন বাজনাটা কেল রেখে গেছে, তখন
আমি এটার একটু সজ্জাবহার করি—কি বলেন?”

সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন “গাও, গাও—”

সঙ্গীতবিশারদ কবিরাজ মহাশয় হার্ষোনিধানের ঢাকি
উপরিঃ গম্ভীর কোবল কর্তে গায়িলেন—

“চলিয়াছি গৃহ পানে, খেলা-খুলা অবসান।

ডেকে লও,—ডেকে লও, স্নাত বড় মন প্রাণ।

খুশার বলিল বাস,

অঁয়ারে পেয়েছি ত্রাস—

মিটাতে প্রাণের কুয়া—বিবাদ করেছে পান!”

অক্স-সঙ্গল নরনে বৃদ্ধ বলিলেন “নারায়ণ, নারায়ণ!”

সখী

(বহুবচনের আখ্যায়িকা-বিশিষ্ট-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞাতকৃত এম্-এ]

প্রথম প্রেরণ

এইবার প্রথম প্রেরণের সখীদিগের চিত্র আলোচনা করিব।
যে চিত্রগুলি প্রথম প্রেরণের আলোচনা করিয়া গঠিত হইয়াছে, সেগুলি
আলোচনা করিয়া পরে পূর্ণায়ত্ত চিত্রগুলি আলোচনা
করিব।

(১) বিমলা ও আশ্চর্য্য

‘ছপ্পনখিনি’তে বিমলা লগ্নপতিগণকে যে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন, তারার পেশার্থে (২য় বও, ১ম পক্ষ) বিদ্যুত
আছে যে, বানসিংগের মহিলা উর্ধ্বাধিবীর আশ্চর্য্য-

নারী এক পরিচায়িকা ছিল। বিমলাও উক্ত উদ্ভিগা-
সেবীর সখী (বা 'সহচারিণী দাসী') ছিলেন। অর্থাৎ
আশ্‌মানি বিমলার পরিচায়িকা নহে, উভয়েই উদ্ভিগা-
সেবীর বৃত্তিভোগিনী, শ্রুতঃ উভয়ের সম্বন্ধ বিতীর্ণ বা
তৃতীয় শ্রেণীর নহে, প্রথমশ্রেণীভুক্ত। বিমলা লিখিয়া
ছেন:—'আশ্‌মানির সম্বন্ধ আমার বিশেষ সন্তোষিত ঘটিল;
আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে
তাঁহার অসুস্থতান কহিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া
আদিল। প্রভুরের তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া
পাঠাইলেন,...আমি আশ্‌মানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া
পাঠাইলাম, তিনিও তাঁহার প্রভুতর পাঠাইলেন। পুনঃ
পুনঃ এইরূপ ঘটতে লাগিল।' বুঝা গেল, এক্ষেত্রে আশ্-
মানি পত্রদ্বারা বা সন্দেশদ্বারা কৃতীয় কার্য করিয়াছে।
তাঁহার পর, আবার বীরেন্দ্রসিংহ আশ্‌মানির সাহায্যে ও
'সমভিযোগে' বারি-বাহক দাস সারিয়া পুত্রী মধ্যে প্রবেশ
করিয়া' নিশাকালে বিমলার শয়নকক্ষে দর্শন দিয়াছিলেন।
এক্ষেত্রে আশ্‌মানি বিমলার সমবেদনাময়ী সাহায্যকারিণী
সখী। বাহ্য হউক, বৃত্তান্তটি নিত্য সংকীর্ণ, তাহাও
আবার পথে বিবৃত, রীতিমত চিত্রিত নহে।

পরে উভয়ে বীরেন্দ্রসিংহের অশ্বঃপুরে বাস করিয়াছিল,
তখনও তাঁহাদের পূর্বের দৃঢ়তা ছিল, তবে পাছে লগৎ-
সিংহ আশ্‌মানিকে চিনিতে পারেন, এই ভয় বিমলা লগৎ-
সিংহের নিকট বাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে ল'ন নাই।
বিশ্ণুসহস্রনাম ব্যাপারে উভয়ের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।
(১ম খণ্ড, ১১ম, ১২ম, ১৩ম ও ১৪ম পরিচ্ছেদ।)

(২) লুংকউরিয়া ও মেহেরউরিয়া

'কপালকুণ্ডলা'র লুংকউরিয়া ও মেহেরউরিয়া পরস্পরের
'বাল্যসখী'। ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে মতিবিবি
(লুংকউরিয়া) বলিতেছেন:—'মেহেরউরিয়াকে আমি
কিশোর বয়ঃাবধি ভাল জানি। মেহেরউরিয়া আমার
বাল্যসখী'। আবার ঐ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে জানা যায়,
'মেহেরউরিয়ার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে
উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যভাদের ভ্রম প্রত্যাগাশিনী হইয়া-
ছিলেন।' অসুস্থমান হয় যে, এক সময়ে তাঁহারা শেক্স-
পীয়ারের হার্শিয়া-হেলেনার ভায় পরস্পরের নিবিড় প্রীতি-

বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন, পরে হার্শিয়া-হেলেনার মতই প্রেমের
প্রত্যাগাশিতার সেই নির্মল প্রীতি বিকৃত হইয়া-কলুষিত হয়।
৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, 'সেলিম যে তাঁহাকে
উপেক্ষা করিয়া মেহেরউরিয়ার ভ্রম এত ব্যস্ত হইবার
প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।'

পুণ্ডরিক একটি মাত্র পরিচ্ছেদে উভয় সখীকে একত্র
দেখা যায়। মতিবিবি (লুংকউরিয়া) রাজনীতিক বড়-
বস্ত্রের ব্যাপার সমাধা করিয়া উড়িয়া হইতে কিরিবার
পথে সেলিম (জ'হাঙ্গীর) বাবাশাহ হইয়াছেন সংবাদ
পাইয়া 'মেহেরউরিয়ার চিত্ত জাহাঙ্গীরের উপর কিরূপ'
তাঁহা জানিবার উদ্দেশ্যে 'প্রত্যাগাশিনী-গৃহে' বাইবার সত্ম
করিলেন, যেমন বাদশাহ মেহেরউরিয়াকে বিবাহ
করিলে লুংকউরিয়া প্রত্যাগাশিনীর নিকট হইতে অনিষ্ট
আপত্তা করিয়াছিলেন। (৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ)
সেহবনের সহিত মতিবিবির কথলাপে এই উদ্দেশ্য জানা
যায়।

পর-পরিচ্ছেদে (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ) উভয় সখীর
বহুকাল পরে দেখা হইল, মতিবিবি 'অত্যন্ত সমাধা'র গৃহীত
হইলেন। কিন্তু বাপাটরা শেরনে-শেরানে ফোলাকুলি।
মতিবিবির ভিতরে-ভিতরে জানিবার উদ্দেশ্যে 'মেহেরউরিয়ার
চিত্ত জাহাঙ্গীরের উপর কিরূপ', আবার মেহেরউরিয়া
ভাবিতেছিলেন 'দেখি, লুংকউরিয়া কি কিছু প্রকাশ করিবে
না?' 'মেহেরউরিয়া বাসকামনার বসিয়া তদবীর লিখিতে-
ছিলেন। মতি মেহেরউরিয়ার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্র-
লিখন দেখিতেছিলেন এবং তাঁহুল চর্চণ করিতেছিলেন।'
ইত্যাদি। এ যেন যুগাদিনী-মণিমালিনীর দুগলমানী
সকরণ। প্রথমে উভয়ের কথাবার্তার সখীমেহের পরিচয়
পাওয়া যায়। মেহেরউরিয়া বলিতেছেন, 'তুমি যে আমাকে
কাল প্রাতে ভাগ্য করিয়া বাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে
তুলিবে? আর হুই দিন থাকিরা তুমি কেনই বা চরিতার্থ
না করিবে?...আমার প্রতি ভোম্বার ও ভালবাসা আর
নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া বাইতে।' তাঁহার
পর সেলিমের প্রণয়ের কথা শুইয়া তিনি সখীকে একটু
পরিহাস করিলেন, একটু খোঁচাও দিলেন। এই ভাবে
কথাবার্তা অনেকক্ষণ চলিল। (পাঠকবর্গকে সমগ্র
পরিচ্ছেদটি পাঠ্য করিতে অনুরোধ করি।) মতিবিবি

যেহেঁ হুইই মেহেরউরিনাকে সেলিমের কথা বলিলেন, তাহার পর তিনি বন সেলিমের সিংহাসনারোহণের সংবাদ দিলেন, তখন আর মেহেরউরিনা ছদ্মের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, আবেগভরে সেলিমের প্রতি গঢ় অহুয়াস একপটে প্রকাশ করিলেন। 'মেহেরউরিনা! আর কিছু তুলিলেন না। তাঁহার সর্বত্র শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। শোচনদুঃখের অক্ষয়্যার বহিতে লাগিল। মেহেরউরিনা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করিলেন, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' বলিত মনমান সিদ্ধ হইল।' তাহার পর, মতিবিবির প্রাণে তিনি প্রকৃত মনোভাব বিশদ-ভাবে প্রকাশ করিলেন, সেলিমকে কি বলিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মতিবিবির যেন বিদ্রোহপ্রদায়কাত্মি সখী বা মনোমোহিনী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রতিযোগিনী, যুগ্মতঃ এই চিত্র আপাত-মনোরম হইলেও অকৃত্রিম সখিদের নির্দশন নহে। বিদগ্ধ সখী-প্রীতি একেবারে প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা কলুষিত বিকৃত হইয়াছে। 'মতি মনমান সিদ্ধ হইল,'—এই কথাই ইহার শেষ কথা। কোশলে মেহেরউরিনার চিত্র জানিবার লক্ষ্যই মতিবিবির এই যুগ্মতার ভান করিয়া দিলেন। ইহা সখি নহে, সখিখাত্য।

(৬) মৃণালিনী ও মথুরার রাজকন্যা

'মৃণালিনী'তে নারিকার মৃণালিনী মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন। মৃণালিনী 'পূর্ণ পরিচয়' দিতেছেন (৪র্থ খণ্ড, ১১ম পরিচ্ছেদ) :—'আমার পিতা:.....অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখ্য ছিল।' মৃণালিনী যখন ধনিকতা, তখন তিনি অসম্ভব রাজকন্যার বৃত্তিভোগিনী ছিলেন না, যুগ্মতঃ এ 'সখ্য' প্রথমশ্রেণীভুক্ত। যাহা হউক, এই 'সখ্য'ের কোনও চিত্র নাই, কেবল মথুরার রাজকন্যার সহিত অশবিধায়ের দ্বিধা মৃণালিনী নৌকাভ্রমিতে স্নানরত হইলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে উদ্ধার করিলেন এবং উদ্ধারের ফলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর অজ্ঞাতাভ্যুদয় মন্বিল, ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ (উক্ত পরিচ্ছেদে) আছে। এই ঘটনা ঘটাইবার লক্ষ্যই মথুরার রাজকন্যার সহিত অশবিধায়ের অবতারণ। যুগ্মতঃ এই 'সখ্য'ের রস এক কথাতাই শেষ করিয়া।

(৮) মৃণালিনী ও মণিমালা

মৃণালিনী যখন সৌভদ্রগরে দ্বীকেশ ব্রাহ্মণের গৃহে 'পিল্লের বিরহী' তখন তিনি দ্বীকেশ-কন্যা মণিমালাসহিত 'স্নেহ-শিকলে' অর্থাৎ সখিবহু হইয়া বহু হইয়াছিলেন; অল্প দিনের পরিচয় হইলেও এই সখি অকৃত্রিম। ১ম খণ্ডের ২৪, ৩৪ ও ৪৪ পরিচ্ছেদে এই সখিদের চিত্র আছে, বিশেষতঃ ২৪ পরিচ্ছেদে। অপরিচিত স্থানে মণিমালাসহিত সখিবহু মৃণালিনীর একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহার পর, মৃণালিনী দ্বীকেশের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে এই সখিদের আর অবসর ঘটে নাই, কেবল 'পরিশ্রমে' জানা যায় যে এই সখি দীর্ঘকাল পরস্পরের অবদর্শনেও অটুট ছিল, Out of sight out of mind হইল নাই। 'মৃণালিনী... মণিমালাসহিত আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণিমালাসহিত রাজপুরী মধ্যে মৃণালিনীর সখ্যরূপে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার সখী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।' (শেষ বাক্য হইতে বুঝা গেল, সখী মণিমালাসহিত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহেন!)

১ম খণ্ডের ২৪ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, এই 'দুইটা তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলোচ্য দিগ্বিত্তেছিলেন' ও কথোপকথন করিতোছিলেন। যত্নতঃ সাহিত্যে বহু নারিকার চিত্রবিভাগ পারদর্শিনী। বহিঃপ্রবর্ত ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ আখ্যানিক-রচনার প্রবৃত্ত হইলেও একেবারে মৃণালিনীর চিত্রবিভাগ-পটভূমির বেশার সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মৃণালিনী চিত্রবিভাগ পারদর্শিনী, মণিমালাসহিত শিক্ষানবিশ। মণিমালাসহিত আঁকিতেছিলেন উক্তের কথাবার্তা হইতে তাহা জানা যায়, কিন্তু মৃণালিনী কি আঁকিতেছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তিনি যদি বিরহাধুনা হেমচন্দ্রের প্রতিভূতি আঁকিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঠিক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য হইয়াছে, কেননা উক্ত সাহিত্যে নারিকার নারিকার বিরহকালে প্রেমাপ্পদের প্রতিভূতি-অঙ্কন 'বিনোদোপার'। (সেবদ্বিতে 'মৎস্যদুস্তঃ বিরহভূতঃ বা ভাবগম্যঃ লিখতি' সর্বথা।)

* তবে ইংরেজী সাহিত্যে অনেক স্থলে নারিকাকে চিত্রবিভাগ পারদর্শিনী দেখা যায়। উক্ত সাহিত্যে বহুতর স্থলে নারিকাকে সেদাই-কার্যে ব্যাপ্তা দেখা যায়। মৃণালিনীও হৃদিকর্মবিপুলা ছিলেন। ২৪ খণ্ড, ৩৪ পরিচ্ছেদে তাই। ('কাপড়ের উপর কল তুলিতে মানি।')

অবতরণিকার (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ: ২৬) বলিহাতি, সখীর ব্যক্তিগত মুখ-মুখের, পারিবারিক জীবনের প্রসঙ্গ কাণ-নাটকে স্থান পায় না ইহাই সাধারণ নিয়ম হইলেও কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এবং দৃষ্টান্তরূপ সখী হুতাবিধি ও সখীস্থানীয়া নন্দনা কমলমণি ও ভ্রামার উল্লেখও তথ্যের পরিচয়। এক্ষেত্রেও সখী মণিমাণিক্যের স্বামিগুণের (৪) প্রসঙ্গ এই পরিচ্ছেদের কথোপকথনে একটু-আটটু আছে, তবে মণিমাণিক্য সে কথায় বড় অঙ্গ নেন নাই। না বিয়া ভালই করিয়াছেন, কেননা নারিক। মণিমাণিক্যের পূর্ববৃত্ত বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়াই এখানে কবির উদ্দেশ্য। তিনি মুকোশলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। (‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে সীতা ও সরস্বতীর কথোপকথন দ্রষ্টব্য।) পাঠকবর্গকে সমগ্র ২য় পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা হইতে উভয় সখীর বিশ্রুপাণে তথা নন্দীশাল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের অন্তঃস্থিত মেহেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ‘এ ত মণিমাণিক্য নহে যে মেঘ-শিকলে বঁধিয়া রাখিব।’ ‘তোমাকে ভগিনীর ভ্রাতৃ ভালবাসি।’ ‘স্বামি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি।’ মণিমাণিক্যের এই সকল উক্তি এবং ‘কেবলমাত্র তুমি আমার সখী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে?’ মণিমাণিক্যের এই উক্তি উভয়ের গভীর প্রীতির প্রমাণ। মণিমাণিক্যের পূর্ববৃত্ত ভগিনী মণিমাণিক্যের অনুরোধ করিলেন, ‘তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে গুরুদেবের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?’—ইহা যেহেতু অনুরোধ, বিচারকের ভীত তিরস্কার-বাক্য নহে। মণিমাণিক্যও মণিমাণিক্যকে ভাল-বাসিতেন বলিয়া ইহাতে বাধা পাইলেন এবং ‘সেহমরী সখীর ধারণা ধারণা দূর করিবার অন্ত, তাঁহাকে অন্ত কাহারও কাছে কথটা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ও ওচ্ছন্ন শপথ করাইয়া শুদ্ধকথা (যেহেতু সখীর সহিত চৌরিকা-বিবাহের কথা) বলিলেন। † এই শপথ কর্তার ব্যাপার হইতে ও পরে মণিমাণিক্যের দ্বারা ভিখারিণীর ভক্ত ভিক্ষা আনাইবার দ্বলে তাঁহাকে গৃহভাঙনে পাঠাইয়া গিরিজাধার

নিকট হেমচন্দ্রের সাহায্য লওয়ার ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে মণিমাণিক্য সখীকে পূজাপুত্রি বিবাহ করিতে পায়েন নাই, তিনি একটু আশঙ্কিতা পাছে মাধবাচার্যের শিষ্যকর্ত্তা কর্তব্যবোধে এ সব শুণ্ড কণা আপন পিতাকে জানায়। উভয়ের পরিচয়ও ত বেশী দিনের নহে। স্তত্রায় এ অবস্থার এক্ষণ আশঙ্কা স্বাভাবিক। যদিও ইহা ‘বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী’ সখীর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলে না, কিন্তু তথাপি মণিমাণিক্যের সেহমরীঃ সখীজনন।’ মণিমাণিক্য বখন ফিহিয়া আলিয়া ভিজ্জায়া করিলেন, “নই ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?” তখন মণিমাণিক্য ছড়া কাটোয়া রসবাক্য করিয়াই সারিরা লইলেন, মণিমাণিক্যও সেই রসবাক্যে যোগ দিলেন। কথটা ঐ ভাবেই চাপা পড়িল।

বাধা হটক, উভয়ের ক্ষমতার এইটুকু বাধন থাকিলেও উভয়ের মেহপ্রীতি অকৃত্রিম। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্বীকেশ বখন মণিমাণিক্যকে দ্বন্দ্বপ্রতিজ্ঞা মনে করিয়া সেই রাত্রেই তাঁহাকে গৃহ হইতে চলিয়া বাইতে বলিলেন, তখন এমন বিপদে এত অপমানেরও মণিমাণিক্য দ্বীকেশের কত্তা ও পাণ্ডিত্যে যোম্যকেশের ভগিনী ‘সখী মণিমাণিক্যের নিকট বিদায়’ না লইয়া বাইতে পারিতেছিলেন না। দ্বীকেশ কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে, ‘এবার মণিমাণিক্যের চক্ষে জল আসিল।’ এতক্ষণ তিনি কাঁদেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, মণিমাণিক্যের প্রতি তাঁহার মেহ কত গভীর।

আবার মণিমাণিক্যের দেহও সমান গভীর। ‘প্রাঙ্গণ-ভূমে ক্রতপাখিকোণিণী মণিমাণিক্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ভিজ্জায়া করিলেন, “নই, এমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় বাইতেছ?” মণিমাণিক্য কহিলেন, “সখি, মণিমাণিক্য, তুমি ভিখারিণী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না। তোমার বাপ মাদা করেছেন।” যদি: সে কি মণিমাণিক্য! তুমি কীদ্বিতেছ কেন? সর্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন। সখি, কেহ। রোগ করিও না।” মণিমাণিক্য মণিমাণিক্যকে ক্রিষ্টাইতে পারিলেন না। তখন অতি ব্যস্তে মণিমাণিক্য

† মণিমাণিক্যের কাণে কাণে কি বলিলেন, পাঠক আপাততঃ ভাবা জানিতে পারিলেন না। ইহা আশাবাদের উক্তি বিকাশের দ্বারা অবশেষে একটু কাব্যোপলব্ধি। ‘দুর্গেশবন্দিতা’তে

ঐক অন্তঃস্থ ভৌমল আছে। মণিমাণিক্য বখন দুর্গেশবন্দীর অনুরোধে ব্যতীত ওপরিচয়ে আগতি করিলেন, তখন বিদ্যা তাঁহাকে কাণে কাণে দিলেন লক্ষ্যের কথা বলিলেন। (১ম খণ্ড, ১৭৭ পরিচ্ছেদ।)

পিতৃপরিণামে আদিলেন—এই অভ্যাসিতের প্রতিবিধানের চেষ্টায়। মুগালিনীর তৎক্ষণাৎ গিরিজার সহিত গৃহত্যাগে অবতরন চেষ্টাই পণ্ড হইয়াছিল। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, জীবকেশ পুস্তকগ্রহে অন্ধ হইয়া পুস্তকের পক্ষপাতী হইলেন ও পুস্তকের কথা বিশ্বাস করিলেন, পুস্তকের দোষ যেখানে পাইলেন না, কিন্তু মনিষ্যগণী স্নাত্ত্বগ্রে অন্ধ হইলেন না, ‘ব্রাতার চুক্তিরূপে বৃত্তিতে পরিয়া, তাহাকে ভৎসনা করিতেছিলেন।’ ইহাও তাহার গভীর সখী-প্রীতির প্রমাণ। বলতঃ এই চিত্র ক্রুর হইলেও কদম্বপ্রাণী ও উচ্ছল-মধুর।

(৫) মুগালিনী, গিরিজা ও রত্নময়ী

মুগালিনী যেমন গৌড়নগরে জীবকেশ ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাসকালে গৃহস্থানীর কল্পা মনিষ্যগণীনের সহিত অন্নদিনের পরিচয়েই সখিবৃত্তে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আবার নববয়সে পাটনীর গৃহে বাসকালে ‘পাটনীর দুবতী’ কল্পা রত্নময়ীর সহিতও অন্নদিনের পরিচয়েই সখিবৃত্তে বদ্ধ হইয়াছিলেন; তবে তখন তিনি গভীর ছায়ে বিকল-চিত্ত, গিরিজার বহু চেষ্টার উপায়ে মুখ সুটিয়া কণা কহিতে প্ররোচিত করিত, সুতরাং রত্নময়ীর সহিত মুগালিনীর সাক্ষাৎসম্বন্ধ তেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই, গিরিজার সাহচর্য্য ও সাধাযোই তাহার সখীর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। আর অভিজাত-গুণরা মুগালিনী অপেক্ষা ভিত্ত্যায়ের মেরে গিরিজার সহিতই পাটনীর কল্পা রত্নময়ীর মাধ্যমি যেই হইয়াছিল, কেননা তাহার অনেকটা সমান সামাজিক শ্রেণীর। বহা হটক, মুগালিনীর সহিত রত্নময়ীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তেমন সখিব না থাকিলেও গিরিজার সহিত উভয়ের সখিব থাকিতে ইচ্ছিত্রের প্রথম বৃত্তগিদ্ধ অংশে এই সখিব স্বীকার করিতে হইবে। রত্নময়ী যখন যেন্যত্রকে দেখিয়া নিজস্বা করিল, “আজ্ঞা, উনি তোমার কে?” মুগালিনী কহিলেন, “দেবতা জানেন।” মুগালিনী সব কথা তাহার কাছে জামিলেন না। (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। ইমিয়ারও সব কথা হাঙ্গামীর কাছে জামেন নাই—বোধ হয়, একই কারণে—সে এমন অভাববীর ঘটনার বিশ্বাস করিতে না বলিয়া। ইহার পরে রত্নময়ীর আর বাক্য পাওয়া যায় না।

তথাপি বলিব, তাহাকে একেবারে সখী-হিসাবে গ্রহণ করা চলে না, বার দেওয়া যায় না। ‘পরিণিষ্ট’ দেখা যায় :—‘রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেয়চন্দ্রের নতুন রাজ্যে দিয়া বাস করিল। ওয়ার মুগালিনীর অশু-এয়ে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌভর্য হইল। গিরিজা ও রত্নময়ী চিরকাল “সই” “সই” রহিল।’ (একেক্রেও গ্রন্থকার তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অতএব সে ‘স্বাভাব্য উপেক্ষিত’ নহে।)

একদিনে পরিচ্ছেদে (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) সখি-বের চিত্র থাকিলেও গিরিজার সহিত রত্নময়ীর সখিবৃত্তটুকু বেশ অল্পমধুর। ‘র। “সই?” গি। কি সই? র। তুমি কোথা সই? গি। বিজ্ঞানসই। র। গারে মল দিব সই। গি। মলসই? ভাল সই, ত’ও সই। র। স্বগার সই তুমি চিরমই—আর মিলাইতে পারি কই? তোমার মুখে ছাই।’... এই দ্বাতারীর ধরণের পাচালীর ‘ছাই-মুঠাও’ দিষ্ট। অতএব এ চিত্রও ক্রুরাধি ক্রুর বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

(৬) কুন্দ ও চাঁপা

অবতরনিকার বলিখাচি (ভারতবর্ষ, আবার ১৩২৪, পৃঃ ৫০-১২ নং পাদটীকা) বক্তিমন্ত্রে ‘মলভাগিনী চির-ছাখিনী’ কুন্দমনিষ্যীকে একেবারে সখীভাগ্যে বক্তিত করেন নাই। বাল্যে পিতৃবিরোধের পরেই তাহার ‘সমবহতা ও সজিনী’ চাঁপাকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়াছেন। চাঁপা তাহাকে সাজনা দিয়াছে, কুন্দও তাহাকে অসুত সমবৃত্তান্ত বলিয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—‘চাঁপা কুন্দের সম-বহতা ও সজিনী। চাঁপা আশিয়া কুন্দের সঙ্গে মনোবিশ্ব কথা কহিয়া তাহাকে সাজনা করিতে লাগিল। কিন্তু যেমিল যে কুন্দ কোন কথাই কহিতেছে না, কোন করিতেছে এবং যথো যথো প্রত্যাপ্যাপন্নং আকাশপানে

। হই সখী এই হুড়াটা ও (১ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদ) মুগালিনী ও মনিষ্যগণীর হুড়াটা “সই মনের কথা সই; মনের কথা সই...সই” কথা কোন্ কথা কব নইসে কারো নই” “হলি কিলো সই?” “তোমারই নই”—“দীনবন্ধু দিল্লের দীনাভবিত (২য় অধ্যায় ১ম ভূত) দীনাভবিত ও সারথ্যেশ্বরীর ‘সই মনের কথা তোরে কই, আমার কে আছে আর তোমার নই’—“হাঁ নই, আমি কি কেউ নই” সহ্য কহাইয়া বের।

চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কোকুৎস-স্রুত বিজ্ঞানী
কহিল, “এক শ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ ?”
কুম্ভ তাহাকে স্বমুখতার আদ্র বসিল এবং পরে নগেন্দ্র-
দত্তকে দেখিয়া চাঁপাকে দেখাইল, “এই সেই স্বপ্নট
পুরুষ।” (‘বিষয়ক’, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) স্বমুখতার উত্তর
সখীর কথা প্রদত্তে কৌশলে পাঠকবর্ণের গোচর করিবার
জন্য কবি বালাসখীর অবতারণা করেন নাই, কেননা কবি
ইহা নিজেই পূর্বে পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন। তবে
কুম্ভ যে কতকগুলি অসামান্য সরলা, স্বপ্নবৃত্তিতে সম্পূর্ণ
বিশ্বাসপারায়ণ, কবি চাঁপার সহিত কুম্ভের কথাবার্তার
এইটুকু কৌশলে বুঝাইয়াছেন। বাহা হউক, তথাপি
বলা বাইতে পারে যে কবি, ভবভূতি ও মাইকেল মধুসূদনের
দত্ত, করুণাপরবশ হইয়াই এই দারুণ শোকের সময়
বালািকা কুম্ভনন্দিনীর একজন সখীর ব্যবস্থা করিয়াছেন,
এক দণ্ড জুড়াইবার স্থান নিশাইয়াছেন। ইহার পর কুম্ভ
অন্তর্য নীতা, আর তাহার সারাভাবনে চাঁপার সহিত দেখা
হই নাই। তবে সত্তা: সত্তা: অপরিচিত স্থানে থিরা সে
কমলমণির প্রেছার পাইয়া কতকটা গ্লু ও শাখ হইয়াছিল,
ইহাও সংগে রাখিতে হইবে। (৪ম পরিচ্ছেদ।)

(৭) কুম্ভ ও কমলমণি

যৌবনকালে যখন কুম্ভ প্রণয়ের বাগ্যার কাতর, তখন
আবার কবি করুণা-পরবশ হইয়া কমলমণিকে কণেকের
তরে তাহার সমবেদনাময়ী সখীর তুলিকা গ্রহণ
করাইয়াছেন। অবতরনিকার (১২ নং পাদটীকা)
ইহারও আভাস দিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ বালািকা কুম্ভকে
কলিকাতা লইয়া গেলে কমলমণি তাহাকে ছোট বোনটির
দত্ত বর আর্জি করিলেন, ইহা অবজ্ঞা সহিতের চিহ্ন নহে।
কিন্তু কয়েক বৎসর পরে হৃৎসুখীর বাতনার সংবাদ জানিয়া
এবং তাঁহার অগ্রদ্রোষপন্ন পাইয়া কমলমণি যখন গোবিন্দ-
পুরে গেলেন ও হৃৎসুখীর ‘কণ্টক উদ্ধার’ করিবার জন্য
গঠে হইলেন, তখন তিনি যে কৌশলে কুম্ভর মনোভাব
জানিবার জন্য তাহার প্রতি (মতিবিবির দত্ত) দেহের
ভান করিলেন তাহা নহে, তিনি একান্তই কুম্ভকে ভাল-
বাসিলেন। আর কুম্ভও যে ‘লোকা মেহে’ বলিয়া,
দীর্ঘায় যৌথিক ধর-আদরের দত্ত, কমলমণির সেহের ভান

দেখিয়া তুলিয়া গেল তাহা নহে, উত্তর পক্ষেই একান্ত
ভালবাসা ঘটিল। ‘কমলের যে প্রকৃতি চির-শ্রেয়সময়ী,
তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ
করিয়াছিল। যথো কব বৎসর অদর্শনে কতক কতক
তুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে,
কুম্ভেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল। প্রণয় গাঢ় হইল।’ (১৩ম পরিচ্ছেদ।)

‘কুম্ভনন্দিনী কমলের বাগ্যার কথা শুনিয়া আপনায়
ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।.....কুম্ভের মাথা তুলিয়া, কমল
তাহার দত্তক আপনায় কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া
তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।’ তাহার পর কমলমণি
কুম্ভকে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা বাইতে বলিলেন এবং
‘সদয়ে’ তাহাকে বিজ্ঞানী করিলেন, “তুই বামাব্যুকে
বড় ভালবাসিস্—না?” ‘কুম্ভ উত্তর দিল না। কমল-
মণির জ্বরমধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।’ তাহার
পর যখন কমলমণি তাহাকে বুঝাইলেন এই ভালবাসার
কত অনিষ্ট হইতেছে, তখন ‘খুরিয়া কুম্ভের উত্তর দত্তক
আবার কমলমণির বস্ত্রের উপর পড়িল। কুম্ভনন্দিনীর
অন্তরালে কমলমণির দৃশ্য প্রাপ্ত হইল। কুম্ভনন্দিনী
অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালািকার স্মার বিবদা হইয়া
কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার
চুল তিরিয়া গেল। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার
কমল তাহা জানিত। অন্ত:করণের অন্ত:করণ মধ্যে
কুম্ভনন্দিনীর ছাঁখে ছাঁখে, মুখে মুখী হইল।’ (১৪ম
পরিচ্ছেদ।) ইহা ‘সমস্তগুণ সখীজনের’ চিহ্ন নহে কি ?
বঁধ ও কমলমণি হৃৎসুখীর সুখের জন্য সন্ত সন্তে, এবং
হৃৎসুখীর ‘কণ্টক উদ্ধারের’ জন্যই কুম্ভকে কলিকাতা
লইয়া বাইবার প্রস্তাব করিলেন, তথাপি তিনি এক্ষণে
কুম্ভর প্রতি পূর্ণ সমবেদনা দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে
হইবে।

আবার ১৭ম পরিচ্ছেদে হৃৎসুখী কুম্ভকে কর্কশ-
ভাষায় গ্লু হইতে চাওয়া বাইতে বলিলে, ‘কুম্ভের পা
কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়।
কমল তাহাকে ধরিয়া শরনগৃহে লইয়া গেলেন। শরনগৃহে
থাকিয়া আদর করিয়া সাধনা করিলেন।’ পরে তিনি

স্বর্গসুখীকে বুঝাইলেন যে কুম্ভ-সম্বন্ধে যেবেশ বস্তুর কুৎসা বিখ্যাসযোগ্য নহে এবং পলায়িতা কুম্ভর সন্ধানে সচেষ্ট হইলেন। (২০শ পরিচ্ছেদ)। ইহাও কুম্ভর প্রতি পূর্ণ সমবেদনার পরিচায়ক।

৩১শ পরিচ্ছেদে বিধবা-বিবাহ ও স্বর্গসুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রের ব্যবহারে ও স্বর্গসুখীর গৃহত্যাগে ব্যথিত-হৃদয়া কুম্ভ 'আজিকার মঞ্চপট্টা, সম্ভবতঃ দেহমণী কমল-মণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন।' সেদিন, প্রণয়ের নৈয়াস্তের সময়, কমলমণি তাঁহার হৃৎপে হুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া ঢাকের ধল ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন ঘনে করিয়া তাঁহার কাছে কাদিতে গেলেন। কমলমণি কুম্ভনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—... কুম্ভ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া কাদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে।' এ ক্ষেত্রে কমলমণির সমবেদনার উৎস তত্বইহাছে, স্বর্গসুখীর গভীর ভাবনা ও গৃহত্যাগের ক্ষত তিনি মর্মস্পীড়িতা, তাঁহার স্বর্গসুখীর প্রতি প্রীতি এখন সর্বাভিশ্যাসিনী।

কিন্তু ৪৩শ পরিচ্ছেদে আবার যখন কমলমণি গোবিন্দ-পুরে আসিলেন, তখন তিনি আবার পূর্ববৎ কুম্ভর প্রতি দেহমণী সমবেদনাময়ী। 'যে অবধি স্বর্গসুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুম্ভনন্দিনীর উপর কমল-মণির চর্চ্ছর ফোঁস; যুগ্ধ বেধিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুম্ভনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির হৃদয় দূর হইল—হৃৎ হইল। তিনি কুম্ভনন্দিনীকে প্রহৃষিত করিবার লজ্জা বর করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুম্ভর মুখে হাসি দেখিলেন।' এবার আবার তিনি সমবেদনাময়ী সখীর কাণ্ড করিলেন।

শেষে কুম্ভনন্দিনীর মৃত্যুকালে 'কমলমণি ভক্তনিঃশিষ্ট-বদনে কুম্ভের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং অভিযুক্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।' এবং তাঁহার লজ্জা 'উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।' (৪৮শ ও ৪৯শ পরিচ্ছেদ)। ইহার উল্লেখ না করিলেও চলে—কেননা তখন সপত্নী স্বর্গসুখী পর্য্যন্ত সমবেদনার পূর্ণভরসা, 'চিরপ্রেমময়ী' কমলমণির ত অখাই নাই।

কমলমণি প্রধানতঃ স্বর্গসুখীর দেহমণী নন্দনা বা সখীর

ভূমিকাপ্রবেশের লজ্জাই পরিকল্পিত। তথাপি তিনি উল্লিখিত দৃশ্যগুলিতে কুম্ভনন্দিনীরও সমভাববত্বের সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা এই শতদল কমলের পাশড়িতে পাশড়িতে সঞ্চিত প্রীতি-মধুর পরিচয়, এই 'চিরপ্রেমময়ী'র সর্বাঙ্গপ্রসারী প্রেম-মেঘের নিদর্শন। তাই 'নন্দন-ভাঙ্ক' প্রবন্ধে 'ভাব-পঞ্চদশিতে বশিষ্ঠাঙ্গি, 'কমলমণি আমার favourite, আমি চিরদিনই কমলমণির গুণপক্ষপাতী। কমল সত্যই সোণার কমল, নারীময়। তাই সে প্রসুত পতঙ্গ কমল (full-blown Rose)।' বাক্য, সখীর চিত্র-বিচারে এট উচ্ছ্বাস বর্জনীয়। এই চিত্র নিত্যন্ত ক্ষুদ্র নহে, এবং কুম্ভর ও উচ্ছ্বস, ইহা বীকার করিতেই হইবে।

(৮) হীরার গঙ্গাঙ্গল মালতী গোয়ালিনী

কুম্ভ-কমলের এই রোমাঞ্চিক চিত্রের পরে হীরার গঙ্গাঙ্গল মালতী গোয়ালিনীর (realistic) বাস্তব চিত্রের আলোচনা করিয়া আগাততঃ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনটি পরিচ্ছেদে (১৯শ, ২২শ, ৩১শ) আমরা 'গঙ্গাঙ্গলের' দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করি। ১৯শ পরিচ্ছেদে শিকল নাড়ার দশক তুলিয়াই হীরা বৃষ্ণিল ইহা বাবু বাড়ীর ঘরবানের শিকল নাড়া নহে, 'তাঁহার হাতে শিকল অধন মধুর বলে না',..... 'এ শিকল বগিতেছে' 'কিটু কিটু কিটু! 'সেবি কেমন আবার হীরেটি!' ইত্যাদি। ইহা হইতে আদর্শও বৃকিতে পাঠি, উত্তরের পশার গলায় ভাব। মালতী নিত্যন্ত বেগুয়া ব্যাপারে দৃড়ীর কাণ্ড করে। (তাঁহার ব্যবসায়ের ঠিক নাম-নির্দেশ করিয়া দেখনী 'কলঙ্কিত করিতে চাহি না। 'সই' 'বেগুন ফুল' প্রকৃতি অভিধা ছাড়িয়া 'গঙ্গাঙ্গল' অভিধার তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে গুঢ় বাঙ্গ—Irony—লক্ষণীয়।) সে হীরাকে বলিল 'তোকে দেবেশ্র বাবু ভেৎকেছে।' ইহার অর্থ হীরা বৃষ্ণিল। রতনে রতন চেনে। ছই সখী—অভিসারিকা ও দ্বীতী 'গঙ্গা মিলাইয়া' দেশকালপাত্রো-পযোগী 'শ্রীত পারিতে পারিতে চলিল।' বাহা হউক, এক্ষেত্রে যেবেশ্র বাবু উদ্বেজ অতরুণ ছিল, হীরা সোড়ার একটু ভুল ব্রীয়াছিল।

তাঁহার পর, 'হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন ঘাতাঘাত হইতে লাগিল।' (২২শ পরিচ্ছেদ।)

হীয়ার সঙ্গে তাহার গলায় গলায় ভাব থাকিলেও এই 'মাতাভাত্ত' কিন্তু সবাগ্রীতির ফল নহে। মালতী দেবেস্ত্র বাবুর কাণ্ড উদ্ধারের ভক্ত কোণে কুম্ভকে হীয়ার ধরে আবিষ্কার করিল এবং সেবেস্ত্রকে সংখ্য দিল। এতদপ চরিত্রের স্রোতের সবাগ্রীতি অপেক্ষা বাবাভাত্তাই প্রবল।

যাহা হউক, আবার ৩৬শ পরিচ্ছেদে সেবেস্ত্র 'মালতী দ্বারা ঈর্ষাকে ডাকাইলেন।' এবার মালতীর কাণ্ডটি তাহার ব্যবসায়ের হিসাবে। যাহা হউক, এই বাস্তব চিত্রের আর আলোচনা করিব না। শুধু প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার দ্বিতীয় হীয়ার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

এই প্রবন্ধে যে আটখানি চিত্রের আলোচনা করিলাম, ইহার মধ্যে শেষেরটি (realistic) বাস্তব চিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য—এইমাত্র। বাকী সাতখানির মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও নগণ্য; কিন্তু সুপাণ্ডিত্য ও বর্ণনামূল্যের সন্ধিষের চিত্র ক্ষুদ্র হইলেও উজ্জ্বল ও মনোহর, গিরিজার ও রত্নমহীর সন্ধিষের চিত্র ক্ষুদ্রানুপিত ক্ষুদ্র হইলেও হৃদয় এবং হৃদয়ের সহিত তরলমণির সন্ধিষের চিত্র নিভাত ক্ষুদ্র নহে, এবং হৃদয় ও উজ্জ্বল। ব্যাভ্যস্তরে প্রথম প্রেমীর অবশিষ্ট কয়েকখানি চিত্রের বিচার করিব; সেগুলি এতগুলি অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গতম ও জয়গ্রাহী।

ভক্তের ভগবান

[ত্রিহরনাথ বসু]

ঈশতাল। হিন্দুগণ প্রায়েই বিশ্বের পরিমাণ নাই। উপরে হিম—নীচে হিম—হিমালীর হিমবন্দা—হিমবাহ—হিমগ্রাগ—হিম আচ্ছাদিত। সে হিমে মাতুল জমট হইয়া যায়—জল জমট হইয়া যায়—পৃথিবী জমট হইয়া যায়। সমুদ্রে পক্ষান্তে দূরে অদূরে শিখরের পর শিখর বোজন ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ নাই—লতা নাই—শুধু বোজনব্যাপী অনন্ত তুফারগণি। মাতা বঙ্গমহীর অঙ্গ কে বেন তন্ত্র বসনে ঢাকিয়া দিয়াছে। হিমগিরির ঈশতাল কল্পস্পর্শে অপরাহ্ন-রবি গ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। মাতুল—পদ্ম-পক্ষী—শব্দ-গন্ধ কিছুই নাই। স্থানে স্থানে শুধু রক্ত-খবল তুফার-কীর্তিগী পূত-প্রবাহিত গোমুখী গঙ্গা। মন্যাকিনী রূপে বহিয়া কটিন গরজরাশি বন্ধে বাহন করিয়া রক্তকর্ণে বিশ্বনাথের নাম গান করিতে-করিতে মহরগতিতে চলিতেছে। প্রবাহিনীর আর সে প্রায়টের নৃত্য নাই—উৎস শব্দ নিকট—সমীপ তুফার-গণি ছড়াইয়া দিতেছে। বেধিলে আতঙ্ক হা—মনে হর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তি হিমপিণ্ডে পরিণত। সব মূল—শুধু কনু—কনু—কনু।

এই নিপাত্ত হিমে দিন-শেষে এক অশ্রুতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ক্রত পূর্ণতারোহণ করিতেছেন। সন্ন্যাসী উর্দ্ধনুগে চুটকে-

ছেন। উপলব্ধের আঘাতে কতরাগির নিপেথনে তাঁহার পদম্বল ক্ষতবিক্ষত। পরিধানে কোপীন মাত্র—আঙ্গুর আধরণ কোথায় খসিয়া দিয়াছে। কণে-কণে কুম্ভটিকা-রাশি ছুটরা আসিয়া পথিকের গতিরোধ করিতেছে। হিমবীতল সমীপ তাঁহার জীর্ণ সেধে মৃত্যুক্ষণ শর বিদ্ধ করিতেছে। সন্ন্যাসীর তৎপ্রতি ক্রোধও নাই। দুই বাহ উর্দ্ধে তুলিয়া, দেবাদিষেব বধিরানারগণের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে-করিতে ক্রত পদবিক্ষেপে তিনি সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতেছেন। বৃদ্ধ পশ্চিমদেশীয় রামাহুজ সন্ন্যাসীরূপে একজন বৈকুণ্ঠ সাধু। জীবনের প্রান্তে আসিয়া বৈকুণ্ঠের পরম স্থান বধরিকা দর্শনের জন্য ভক্তের প্রাণ লাগানিহিত। তাই আজ ধর্মপিপাসা-নিবৃত্তিকরে সেই জীর্ণসেধে অঙ্গুরের বল আসিয়াছে। কুণ্ডা নাই, তুলা নাই, ভর নাই, ক্রান্তি নাই। বৃত্তি শান্ত, সৌম্য, জ্যোতির্ধর্ম, —কল্পিতে জ্যোতির্ধর্মের ককণাধারা সঙ্কলিত প্রাবাহিত। সে বৃত্তি বেধিবার জন্য পার্শ্ব তুফারগণির মধ্য হইতে পরমানন্দে অলকানন্দা নাচিয়া উঠিল, লাহা-হা-হা-হা শিখরে-শিখরে গলিত হৃৎকণাশি ছড়াইয়া দিল,—নিমেষের জন্য লজ্জাপুত্রের চেতনা কিরিতা আসিল। ধর্মের সজ্জার অংশটি

আলোকে, হিমংসী আকাশতলে, অলকানন্দার সৈকত-
সম্বী তুষারমণ্ডিত পাশাপাশে সেই বিরাটুকূলের বিরাট
মূর্তি চিত্র-নিখিতের ভায় প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল।

আজ দীপাবিতা অমাবস্তা। ছয় মাসের পর ছয় মাসের
জন্ত আজ বহরিনাথের মণির-যত্রি রক্ত হইবে। গাভীরা
সকলেই সে স্থান হইতে নাথিয়া আসিয়াছে। ধারার
সর্বশেষে গিয়াছিল, তারারা হুমান-চি অতিমুখে
ছুটিতেছে। সন্ধ্যা অতীত হইলে সে বিপদ-সমুদ্র ভীষণ
পথে ভ্রমণ অব্যবহ। হুমান-চি বহরিকা হইতে ৩৭
মাইল দূর। কিন্তু এই পথটুকু অতি দুর্গম। সাধু
সন্ধ্যার অন্ধকারে এই পথে বাইতেছেন। কালবিলম্বের
অবসর নাই। অধিক রাত্রি হইলে তাঁহার আত্মা দেবের
দ্বার রক্ত হইবে। তারা হইলে ভক্তের বাহ্য পূর্ণ হইবে না।
সাধু প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধবাসে ছুটিতে
আরম্ভ করিলেন। যে গাভীর দল হুমান-চি অতিমুখে
নাথিতেছিল, তারারা সমুখে ঐ নগ্নপ্রায় সাধুকে দেখিয়া
স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। একজন তাঁহার হস্তধারণ-পূর্বক
বলিল,—“কীহা বাও তাই?”

ব্রহ্মচারী গুরুপতীর বয়ে উত্তর করিলেন,—“গোলা বেতা
ভগবানকী দ্বার।”

প্রভাতের অপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মণ বাইবার জন্ত
বাগ্ৰতা প্রকাশ করিলেন। বক্তা পুনরায় বলিল, “আমি
তাই, তোম কি পাগল! হুয়া? আমি ত এক পহরকা
হাতা দ্বার। বটী তরমে ত বেলকুল বরফ হো জাগি।
হাভারা সাথ চলো তাইকী,—হু-হাভিমা বাব আকে,
ভলবানীকীকো দর্শন করে, জনম সকল হো জাগি।”

উত্তর দিবার অবসর নাই। উপেক্ষার হাসি হাসিয়া
উদাসী নির্ভয়ে ছুটিলেন। অনেকে তাঁহার গতিরোধের
চেষ্টা করিল। কিন্তু, বটিকাবেগে ব্রহ্মচারী লোকের আকর্ষণ
হ্রাস করিয়া অকৃত্রিম বিম্বা দিলেন।

২

অমাবস্তার রাত্রি; কিন্তু অন্ধকারের সে বনমণ্ডা নাই।
পদম্পর্শী পর্বতের হিমবর প্রদেশসমূহ অন্ধকার রাত্রিতেও
মন্ডলআলোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে তারা
স্বাভাবিক সূর্য্য-প্রভা হয়। উত্তর মাসের উত্তর আকাশ

—(নক্সের আলোকে কি?) আদরা সহরবানী তাহা
জাগি না।

হিমালয়ের লতী উপত্যকার বহরিনাথের বহির
বেলা বাইতেছে। শীমান্ত, হৃদয়, হুলাল আকাশে অসংখ্য
মন্ডল সূর্যের মত কলমল করিতেছে। আর সেই
সূর্য্য কোমলভঙ্গীতে স্রবধুর আলোকরশ্মি মৈলে মৈলে,
নিখর-নিখর, নির্ভীকভাবে ধারার ধারার, অলকানন্দার
লহর-লহর,—সহ প্রিরিয়ারের প্রতি অশ্রু প্রতিকলিত
হইয়া অপূর্ণ শোভা প্রকটিত করিতেছে। উপরে আকাশ-
ভরা কুল—নীচে বর্ণ-বর্ণিমা তুষারাবৃত হিমালয়ে তারার
প্রতিচ্ছবি। উপরে কুল, নীচে কুল; উপরে আকাশ—
নীচে আকাশ; স্বর্গরক্তের শোভাময় সম্মিলন! এখানে
পাপের কলুষ নাই, লোকালয়ের কোলাহল নাই—
শীতের আর্দ্রতা নাই। সব নির্মল, শীতল শান্তসম্পদ!
তাই এই স্বর্গরাজ্যে অন্ধকারের মধ্যে আলোকের বেলা!
ঐশ্বর্য্যালকের ইশ্বরাল!

সূর্য্য মন্দিরমধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তি। পুরোহিত
পুণ্ডর ব্যাপ্ত। সমুখে দীপাবার তরু প্রদীপ জলিতেছে।
দর্শক নাই, বাক্যকর নাই, কলরব নাই। কথটিং
পুরোহিতের বটীর ব ও মন্ত্রধ্বনি দুঃসংত সঙ্গীতের ভায়
কৃত হইতেছে। জনহীন মন্দিরমধ্যে ব্রাহ্মণ একাকী।
আজ শেষ পূজা। ছয় মাসের উপবাসী ভোগ্যদির ব্রহ্ম-
সন্ধ্যার সূর্য্য গৃহীত পরিপূর্ণ।

পূজা সম্পাদন পূর্বক পুরোহিত দেবতার পানে চাহিয়া
আছেন, অনিমেষে শ্রীতপবানের মূর্তি দর্শন করিতেছেন।
বিগ্রহের বড় মণ্ডর বেশ, বড় শান্ত মূর্তি। ছয়মাসের জন্ত
দেবতার সমাধি হইবে, তাই আজ বেবাদিদেব যেন ধ্যানমগ্ন
হইয়াছেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর—একটা তিমিত-প্রায় দীপ হস্তে
পুরোহিত বাহিরে আসিয়া মন্দির-দ্বার রক্ত করিলেন।
সন্ধ্যা বেগমধ্যে ক্রম হইল—“ঠাকুর বাবা! দ্বার খুলিয়া
বাও, আমি বাইতেছি।” জীত ও বিম্বিতভাবে ব্রাহ্মণ
চারিদিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—“বিম্বনে কে এ?” এমন
সময়ে পুরোহিতের কোণীণবাহী বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী তথায়
উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
—“কে তুমি?”

একচারী সেখানেই উত্তর করিলেন,—“যেথিত্তেছ না—
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দেবতা-বর্ণনে আসিয়াছি। মন্দির খুলিয়া দাও
তাই, বর্ণন করিয়া জীবন সাধক করি।”

পুরোহিত। হার আর ছয় মাস খোলা হইবে না।

সাধু হতাশ হইয়া বলিয়া পড়িলেন। আবার তখনই পূণ
উত্তরে উঠিয়া বলিলেন,—“সে কি! না—না, তুমি উপহাস
করিতেছ? উপহাস কেন তাই, হার উন্মোচন কর।
একবার বর্ণন করি।”

পুরোহিত। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমার উপহাস করি
নাই। হিমে আমি কাপিতেছি—তুমিও অবসর; এখন কি
উপহাসের সময়?

সাধুর মনে একটু ক্রোধের স্ফোর হইল। অপেক্ষাকৃত
উচ্চঃস্বরে তিনি বলিলেন,—“তবে—তবে—”পুরোহিত
কহিলেন,—“হার বন্ধ করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে আর
খুলিবার নিয়ম নাই। ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।” গম্ভীর স্বরে
ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন,—“তবে কি দেবদর্শন আমার
অস্বপ্নে নাই?”

পুরোহিত। কেন থাকিবে না?—এখন কিরিয়া যাও,
ছয় মাস পরে আসিও।

বৈক্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মাঘত হইলেন। পদতলে পুতী উপ-
নল করিতে লাগিল। যে চরণ এই দীর্ঘ দুর্গম পথের সূর্য-
বাণা তুচ্ছ করিয়াছিল—সংসা তাহা অবশ হইয়া পড়িল—
মল্লক বিধ্বস্ত হইল—গুপ্ত অঙ্গ গুপ্ত প্রাবৃত করিল—
সর্বাঙ্গ ঘোর-বিশু বেণা বিগ। কিরংগণ তাঁহার বাহু-
নিশ্চিন্তির ক্রমতা রহিল না। বহুকষ্টে আশা-বষ্টি অবলম্বনে
কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাতরভাবে পুরোহিতকে
কহিলেন, “কি বলিতেছ ব্রাহ্মণ—তুমি কি উন্মাদ? যেথিত্তে
পাইতেছ না—এই পলিত-অঙ্গ, পলিত-কেশ বৃদ্ধ শীতাতপের
কত কষ্ট সহ করিয়া দেহরক্ষার জন্য দেবতার দ্বানে
আসিয়াছে? আবার এই দীর্ঘ পথ ব্যতীত—দীর্ঘ ছয়
মাস জীবন-ধারণ? অসম্ভব! তাই বলি তাই, নিয়ম
ভঙ্গ কর—দরজা খোল—আমার দেহদর্শন করিতে যাও।
নাথ্যরূপ তোমার মঙ্গল করিবেন।”

পুরোহিত অধিক বাক্যবার নিশ্চরোজনে বোধে শুধু
বলিলেন, “স্বর্জন্য কর,—ও-কার্যে আমি অক্ষম। শাস্ত্র-
বিরুদ্ধ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।”

সাধু বর্ষাষ বেদ-সম্মানবৎ গুরুপন্থীর স্বরে কহিলেন,
“সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হয়, তাহার অপেক্ষা তোমার শাস্ত্র বড়?”
পুরোহিত বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, “ওকে
অবশ্যক নাই। কিছুতেই আমি এ কাজ করিতে
পারিব না।”

সাধু। তোমার কি দয়া নাই?

পুরোহিত। হইতে পারে; এখন পথ দাও।

সাধু। দরজা খুলিবে না?

“না”—বলিয়া পুরোহিত অগ্রসর হইলেন। সাধু
সমক্ষে তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক কহিলেন, “হৃদি তোমার
দীক্ষিত করি।”

পুরোহিত। আমি তাহার প্রত্যুক্তর দিব।

উদ্বীর্ণ-ক্রোধ ব্রহ্মচারীর চক্ষু-কর্ণ দিয়া অমিতুলিল
নির্গত হইতে লাগিল।- আশ্চর্য্য হইয়া তিনি কহিলেন,
“তবে তাই হউক। তুমি দয়া, আমার মন্দিরের চাবি
চুরি করিয়াছ, শীঘ্র চাবি ফিরাইয়া দাও।”

পুরোহিত ব্রহ্মচারীর হাত ছাড়াইয়া সবেমাত্র প্রস্থান
করিলেন। বৈক্য সাধু শোক সূত্রিত হইয়া বরফময়
শিলাতলে নিপতিত হইলেন। সংসা নক্ষত্রের আলো
নিভিয়া গেল। বুঝি সেই বিবাদের দৃষ্ট যেথিত্তে না পান্দিয়া
দেববাণীগণ দেবোবাগুঠনে বদন আবৃত করিল। অনতি-
কাল মধ্যে সেই অচেতন মেহে নির্গম জ্বালামুখি কটিন
শব্দা বিস্তার করিয়া দিল। বহুকাল পরে তাঁহার চৈতন্য
হইল। তখন তিনি উঠিয়া বলিয়া মন্দির সম্মুখে করবোড়ে
উচ্চকণ্ঠে হোমন করিতে লাগিলেন। নিম্নের দুইদুইয়ের কথা
বলিতে-বলিতে এবং লম্বাক্তরীণ দুঃখিতির অশ্রুশীলন করিতে-
করিতে ব্রহ্মচারী আশ্চর্য্য হইয়া বসে কন্ডাঘাত করিতে
লাগিলেন। দেবতার কাছে কত দুঃখের কাহ্না কাদিলেন—
কত অভিমানের কথা বলিলেন—তাঁহাকে কত তিরস্কার
করিলেন—কত দম্ভের কথা শুনাইলেন। মহাপুরুষের
বন-বন দীর্ঘ-শীলে সংসা জ্বালামুখি বসে হইয়া গেল।
সমুখের প্রস্রবণ হইতে তাঁহার গুপ্ত অঙ্গ অস্বস্তি উৎপন্ন
হুটিলে লাগিল; হিমশীতল গিরিবন্ধের গ্রীষ্মের উত্তাপ
অস্বস্ত হইল।

নিশ্চয় রাত্রি এক ফকীর-বেশকারী সাধু তথায়
আসিয়া উপনীত হইলেন। কবীরের কণ্ঠে কবিতা—

অথ পঞ্চমের আরাধা—মতকে বৃকছলের আচ্ছাদন—
কণ্ঠে পলা-মধ্যক্ষটিক-তুলসী প্রকৃতির মালা। তাঁহার
সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র পার্শ্বতা অর্থ—তৎপূর্বে কিঞ্চিৎ
আরাধা, তৈজস ও কাঠাদি স্থাপিত। ফকীর বহু
দূর হইতে আসিতেছেন—অথের বৃক-নিঃসৃত ফেনাশপি,
ময়ূর গতি, ও গমনে অমিচ্ছা স্রাস্তি জ্ঞাপন করিতেছে।
ফকীরের শরীরে কিছু স্রাস্তির কোন চিহ্ন নাই। তাঁহার
বহঃকন পকাশের উর্ধ্ব হইলেও শরীরে অময়ের বল—বমনে
বালকের লাবণ্য—নয়নে অপূর্ণ মাধুরী বিকশিত। সেই
হুল্লিখিত, স্ফটিক, সর্বাঙ্গমুখ্য, সন্তেজ হোমায়িশিখার স্রাব
পূর্ণাববহ বতঃ-উৎপন্ন সূক্ষ্ম বর্ষন করিলে জীবন দার্ভিক হয়।

অষ্টমকে নিকটবর্ত্ত কোন নিরাপন্ন স্থানে রাখা করিয়া
ফকীর-বৈক্য সাধুর সযৌগবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দেহান্তকণ্ঠে
বিজ্ঞাপা করিলেন, “কেন ভাই, তুমি এই হিসে নরমেহে
বসিয়া কাটিতেছ ?”

সম্মেলনার কোমল আবাতে ব্রহ্মচরীর বাখাতরা বৃক
আরো আন্দোলিত হইতে লাগিল—শোকের নবী উছলিয়া
উঠিল। তিনি অধিকতর আবেগে অঙ্গ বিলম্বন করিতে
লাগিলেন।

ফকীর সন্ন্যাসীরা চক্ষু মুছাইয়া স্রব্য কলিতম্বরে
কহিলেন, “ছি ভাই, কাঁদিও না; সংসার-বিরাগী সাধু তুমি,
তোমার যে মৌরুগ কেন ?”

ব্রহ্মচরী ফকীরের মূন্ডর মুখের গানে চাহিয়া একটু
দ্বিগ্ন হইলেন। পরে বলিলেন, “তুমি কে ভাই, আমি না;
দেখিতেছি তোমার ফকীরের বেশ। বৈরাগী, কাকে কি
বলিতেছ ? আমি যদি সাধু হই, তবে লগতে অসামু কে ?
আমি যদি বলীয়ান হই তবে দুর্জল কোথায় ? জল বৃকছে
ফকীর, লোকালোককর্মণী মহাপুরুষ তুমি—তোমার উদার
হৃদয়, উন্নত মন ক্ষুদ্র মিনিসের কমনা করিতে পারে না।
তাই তুমি আমার আবেগা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছ।
ব্রাত্ত বিধাস পোষণ করিও না। আমি বড় দুর্জল; এ
তনুয় লগতে একগাছি ক্ষুদ্র তৃণের যে সামর্থ্য আছে, আমার
ভাও নাই। আমার জ্ঞান মহাপাতকীই বা কে আছে ? এই
বেশ, সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, সহস্র ক্রোশ দূর হইতে
সেববর্ষনে আসিয়াছিলাম; বাবা আমার দেখা দিলেন না।
কেন দিবেন—আমি যে তাঁর আবেগা সন্তান! ফকীর

বাবা, আপনাকে একটা কথা বিজ্ঞাপা করিব—টিক উত্তর
দিবেন ?”

ফকীর হস্তমুখে কহিলেন, “বল।”

সাধু। কি করিলে আশ্রয়তা করা দার, অথচ পাণ না
হয় ?

ফকীর। কেন—মরিবে কেন ?

সাধু। বাঁচিবারই বা প্রয়োজন কি ? বিনি দুর্জলের
বল, অসহায়ের সহায়—তিনি ত আমার ভাগ করিলেন !
তবে আর কার লজ্জ বাঁচিব ? অহুশোচনীয় জীব বহিতে
বিনয় হওয়া অপেক্ষা এই মহাদ্বানে অলক-নন্দার নীতল
শয্যায় শয়ন করা কি সোভাগ্যের কর্তব্য নহে ? বৈরাগী,
তুমি সাক্ষী—দেবতার পরিত্যক্ত আমি—আমার একমাত্র
ঔষধ।

ফকীর। প্রেলাপ বলিতেছ কেন ? তুমি বেবেয়
পরিত্যক্ত কিলে ?

সাধু। আমি বড় আশা করিয়া তাঁর কাছে আসিয়া-
ছিলাম। তিনি ত বেগা দিলেন না। দার হুহু হইয়া
সিরাছে।

ফকীর। আর দার হুহু হইয়াছে, কাল পুণিবে।
তখন বর্ষন পাইবে।—এই লজ্জা এত বিলম্বিত ?

ফকীরের কথায় সাধু চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ
তাঁহার ভাস্মা বৃক কে খেন সোহার বথ পরাইয়া দিল।
উদ্ভ্রষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন,—“ফকীর, কে বলিল মন্দির-
দার কাল খোলা হইবে ?”

ফকীর কহিলেন,—“আমি বলিতেছি।”

সাধু। আপনি জানেন না, পুরোহিতের সহিত আমার
দেখা হইয়াছিল—তিনি বলিলেন, “ছয়মাস পরে খোলা
হইবে।” তাঁহাকে পুণিবার লজ্জ কত কাহুতি-বিনতি
করিলাম—নিষ্ঠুর আমার কথা শুনিলাম না।

ফকীর। সে তোমার বিরূপ করিয়াছে—আমি
বলিতেছি, কাল প্রাতে মন্দির খোলা হইবে।

সাধু। সত্য কি—না আমার ভূগাইবার লজ্জ উপভোগ
রচনা করিয়াছ ?

ফকীর। বিধাস না হয়, কয়েক দণ্ড এগো দুইজনে
গান-গয়ে কাটাওয়া দিই; প্রভাত হইলেই বৃষ্টিতে পারিবে।
ব্রহ্মচরী বালকের স্রাব আক্রমণে আটপানা হইয়া

ফকীরের কণ্ঠ হইলেন। হুইটী ছয় এক হইয়া গেল।

ফকীর কহিলেন,—“দেখ, এখানে চরম শীত—এল আমার নিকটস্থ কোন গুহামধ্যে গিয়া ত্রিভিকু অভিযাহিত করি।”

তাহাই হইল। হুইটীয়ে একটা ক্ষুদ্র গুহার প্রবেশ করিলেন। ফকীর স্বীয় অশপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ কাঠ আনয়নপূর্বক, তাহা অধিগম্য করিয়া, উভয়ে তাহার উত্তাপে বসিয়া নানাকথা কহিতে লাগিলেন। ফকীর ভিজাসা করিলেন,—“ভাই, তুমি কিছু খেলা জান? সমস্তা ত কাটাইতে হইবে!”

স্বাধু। বহুকাল পূর্বে বধন গৃহস্থান্তরে ছিলাম, তখন পাশা খেলিতে আনিতাম; এখন বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

ফকীর। বেশ—বেশ; আমার খুলিতে পাশা আছে। এসো, খেলা আরম্ভ করি।

স্বাধু সম্মত হইয়া অনন্তমনে ফকীরের সহিত পাশা ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল। অংশেবে বধন বাল-পুত্রের অশ্রুত আগ্রহ-রোখা গুহাঘারে দৃষ্ট হইল, ফকীর তখন তাঁহার বন্ধুর হস্ত ধারণপূর্বক বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—“এইবার দেখদর্শনে চল। তুমি অগ্রসর হও—আমি বাইতেছি।”

ব্রহ্মচারী দেব-দর্শনে চলিলেন;—বাইবার পূর্বে তাহাে গদ-গদ হইয়া ফকীরের হাত ধরিয়া প্রাণাচ্ছন্নভাৱে কহিলেন,—“তোমারই সমায় আজ আমি ধন্ত হইলাম। বিশ্ব-প্রেমিক বৈরাগী, তুমি কে? তুমি অলম্বনের সমায়—দুর্জলের বল—নিরাশের আশা! তোমারই অব্যাহিত কল্পনার আজ আমি ভাগ্যবান। তোমার পরিচয় হাও তাই!”

ফকীর সংক্ষেপে উত্তর করিলেন,—“ভিখারীর আবার পরিচয় কি তাই! যাও—সকলোঁ যাও! বদরিনাথ তোমার আশীর্বাদ করিবার জন্য ডাকিতেছেন।” “জয় বদরী বিলাপাকী জয়” বলিয়া স্বাধু প্রস্থান করিলেন।

প্রভাত হইয়াছে। আজ হিমালয়ের নতুন সাধনজ্ঞ। কি অভিনব হর্যোদয়! এ শুধু পূর্বাকাশ লোহিত-রাগ-রঞ্জিত সন্ধ্যা; এ শুধু একখানি সোণার থালা আকাশের

কোলে পড়িয়া নাই। এক স্বর্গ লক্ষ হইয়া লক্ষ তুফার-শিখরের উপর ধক-ধক কমিতেছে। আবার সেই রবি শৈলশ্রতাসমূহের প্রীতি ভরদের সঙ্গে ডাসিয়া বাইতেছে। বদরিকার ক্ষুদ্র উপত্যকা হইতে যে দিকে দেখ, সেই দিকেই দিবাকর দিবা করে দিগ্‌ময়ল প্রাণিত করিতেছে। অনন্ত আকাশ—তাহারই মাঝে অনন্ত রবির বিকাশ—মিত-বিদিক কিছুই বুঝা যায় না। সকলই সেই আনন্দময়ের অনন্ত সৌন্দর্যের অভিযুক্তি।

উপত্যকা, নদী ও শিথিগাজের তুফারতানি সন্নিধ্য গিয়াছে। অলক্ষ্যনিদার ‘ফটিকভূষণ’ বাহিরায় নাচিতে-নাচিতে ছুটিতেছে। প্রতিপদে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিলাখণ্ড তাহারে বধা দিতেছে। কিন্তু চকলা উর্মিমালা স্বীয় তারল্যে কর্তন শিলাগাজ সিক্ত করিয়া সর্বদানে সাগরভিত্তিধনী। বল-কল ধনি করিয়া নদী বেন বলিয়া বাইতেছে,—কঠোরতা নির্ভীকতা কি কখন মেঘ-বদার কোমল প্রভাব হস্ত করিতে পারে! শত নিখরিশী প্রোতকিনীর-অঙ্গ-পুষ্ট সাধনে অবিরাম ধাবিত। উচ্চ হইতে স্বত উৎসর হইয়াই তাহার্য্য নানিতছে,—তাহারের উন্নয়ন-ধনিই বা কি মনোরম! শত-শত নিখরিশীর সমবেত শব্দ ধ হইতে স্ফূর্ত্যের ধনিত হইয়া বেন প্রকৃতির মহোন্মাদ জাগন করিতেছে।

ব্রহ্মচারী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধানপূর্বক উচ্চ-কূণ্ডে গমন করিয়া মন্দির-সমূখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আরো করেকটা ঘাটী তথায় সমবেত। পুরোহিত দ্বার উদ্যোনে করিতেছেন। ফকীরের কথাই সত্য হইল। পুরোহিতের পূর্বরাত্রির বাবহারের কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর মনে সহসা কোথের সন্ধান হইল। তিনি তাহারে একটা ক্ষুদ্র চপেটা-ঘাত করিয়া কহিলেন,—“ঠাহুর, তোমার এ কি আচরণ?”

স্বাধুর এবিধ ব্যবহারে পুরোহিত ঠাহুর বিমিত হইয়া কিরংক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে প্রহারোত্তর হইয়া বলিলেন,—“কে হে বেলিক—মিছামিছি মার কেন?” স্বাধুও উত্তরভাবে কহিলেন,—“আমি বেলিক, না, তুমি বেলিক? মিছামিছি বেরেছি। তুমি আমার গত রাত্রে মিছামিছি এত কষ্ট মিলে কেন? জান, ফকীর না এলে আমি মরিতাম!”

পুরোহিত বল্লভ কথ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া,
অর্থাৎ হইয়া তাঁহার মূখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

যাজ্ঞশ্রবণের মধ্যেও একটা ছলছল পড়িয়া গেল। ব্রহ্ম-
চারীকে কেহ বিকৃত মন্তব্য সাব্যস্ত করিল—কেহ বা
তাঁহার উর্ধ্বের মন্তব্যের সাহায্যে এই প্রহার-কাণ্ডের
একটা কারণ বাহির করিয়া মনে-মনে পুরোহিতকেই
দোষী সাব্যস্ত করিল। দুই-একজন তাঁহাদের স্বভাবগত
রূপ ও কলহপ্রিয়তা শুণের মর্ধ্যাণা বসার্ধ অশ্রু জ্বরে
অশ্রুক্ষেপে নখে-নখে ছাড়াইতে করিতে লাগিল।

পুরোহিতকে নির্দোষ দেখিয়া বৈকুণ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন,
“চূপ করিয়া রহিলে কেন ঠাকুর।”

পুরোহিত। কি উত্তর দিব। গত রাত্রির কথা কি
বলিতেছ?

সাদু। বা—বাঃ! বিদ্য তোমার স্রষ্টা-মন্তব্য! কাঁপ
আবার সে-বর্ণন করিতে নাও নাই কেন?

পুরোহিত। সে কি! কাল ত আমি এখানে ছিলাম না!

সাদু। হি ঠাকুর!—তুমি এত মিথ্যা কথা কও?

পুরোহিত। মিথ্যা কি—সত্যই আমি ছিলাম না।

ছয় মাস পরে আর আশিয়া এই প্রথম দ্বার খুলিতেছি।

সাদু। কখনই নয়—ককীকে ডাক।

পুরোহিত। কে ককী?

সাদু। তিনি এ দিকে আছেন

পুরোহিত বলিতেছেন, ছয় মাস পরে আর তিনি ওখার
উপনীত—সাদু বলিতেছেন, গতরাত্রিতে পুরোহিত তাঁহাকে
তাড়াইয়াছেন—এই লইয়া উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা।
বাপার ব্রহ্মত্বজনক। প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য সকলেই
কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

তখন ব্রহ্মচারী-বর্ণিত ককীরের খোঁজ পড়িল। পাঁচ
ম্নে তাঁহার অহলন্ধান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মন্দির দ্বার খোলা হইল। বৈকুণ্ঠ সাদু
বদ্বিনায়ায়ণ বর্ণন করিয়া বীধন চরিতার্থ করিলেন।
তাঁহার গণ বহিরা আনন্দাঙ্ক করিতে লাগিল।

ককীরকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন
একজন বাদী, কি বলিয়াছিল, বিজ্ঞাপা করিল। সাদু
সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। শেষে পুরোহিতকে
সম্মোদনপূর্ব্বক করিলেন,—“ঠাকুর আর কাহাকেও কখন
আমার মত নির্ণায়ন করিও না। অহা, সেই ককীর
গুহামধ্যে পাশা খেলাইয়া যদি আমার রাত্রিটুকু ভুগাইয়া
না রাখিতেন তাহা হইলে মনঃকষ্টে আমার প্রাণান্ত
ঘটিত।”

পুরোহিতের চকুর সমুদ্র হইতে একটা বিরাট সন্মোহের
আচ্ছাদন সরিয়া গেল। প্রকৃত অবস্থা তাঁহার উপলব্ধি
হইল। তিনি সব বুঝিতে পারিয়া সম্মানীয় পদখুঁদি
মন্তব্যে লইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“ভাগ্যবান বৈরাগী—
ককীর কে—এখনও তা চিনিতে পারিলে না? তিনি যে
ভক্তের ভগবান! এক রাত্রি নয় দেব, দীর্ঘ ছয়মাসকাল
তুমি তোমার সেই ইষ্ট দেবতার মাঝে আচ্ছন্ন হইয়াছিলে।
তাঁহাকে পাইয়াও চিনিতে পার নাই। তবুও তুমিই ধন্ত
সাদু! তোমার দেববর্ণন সার্থক হইয়াছে। ঐ দেব,
সে ভুবাররাশি সরিয়া গিয়াছে—তমসা-মুক্ত নন্তো-
মণ্ডল রবিরয়োজ্বল—বাদীসহাগমে নিস্তর উৎসাহক।
সুখরিত।”

সাদুর মিথ্যা-চক্রে প্রকৃষ্টি হইল। তিনি অশ্রু জ্বরে,—

“নমঃ ব্রহ্মণ্যে দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃকার গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥”

এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে-করিতে ধ্যানস্থ হইলেন।
সে ধ্যান আর তাঁহার ভাঙ্গিল না।

আজিও সেই মহাপুরুষের সমাধি বদ্বিনায়ায়ণের মন্দির
পার্শ্বে বিস্তৃত। আজও শত-শত বাদী এই সাধকের
সমাধি-মন্দিরের সমুখে নতমস্তক হয়;—আজিও সেই কত
কাল পূর্ব্বের ঘটনা স্রষ্টা করিয়া লোকে ভক্তিতরে বলিয়া
উঠে—

জয় বদরী বিশালাকী জয়!

শ্রেয়সী

[ত্রিশোত্তরীক্ৰমাধ ভট্টাচার্য্য]

যে শ্রেয়সি ! হে - ন্যাসি !
কবে কার প্রেম-ভপতায়
এ মর্ত্যে আসিলে নানি' ;
নরনের দৃষ্টি দিয়া—
করণার গন্ধা গলে যায় ।

ধরার খুলির মাঝে নন্দনের আলো ক'রি' হাতে,
বাড়র প্রতিমা বধে মধুয়াতে দাঁড়াইলে রাতে,
ভেসে গেল অকস্মাৎ নিবিলের বত অন্ধকার,
তোমার বদন হেরি' অন্ধরের শত হাহাকার ;—
সাত্ত্বনার শাস্ত্র-মস্ত্রে প্রতি বন্ধে গভিল নির্মাণ,
নানব-জীবন-পরে এস এস 'অমৃতের দান' ।
বত হুঃখ বত মানি মোত হ'রে গেছে আছি,
নির্মাণিত সব হাহাকার ;
তব প্রতিবিম্ব প্রেমে, আশা-সিদ্ধ-ভটে বসি,
বিশ গণ্যো পেতেছে সংসার ।

জীবন-সমুদ্র-বুকে মন্থনের মাথ হতে
উঠিরাছে হে তুমি কল্যাণি,
অবসর এ চিন্তের মুকুট মাশ ক'রি' দিতে
ত্রিশোকের মুখা দিলে নানি' ।

সে প্রেম-অমৃত পানে তুলে পেছি বিশ্ব চরাচর,
সহস্র ছায়া দিয়া বাহিরিতে চায়ে এ অন্তর,—
পূজিবীর প্রতি পুষে ঢালি' দিতে তব বেধবার ;
একা সে হৃদয়ের হর্ষ নাহি শক্তি নাহি রোধবার ।
হে শ্রেয়সি, একাধারে শক্তি আর করুণার ছবি,
মহীরনী স্তম্ভ-তলে স্তম্ভ' স্তম্ভ, গড়ে শত কবি ।

তোমার গভীনে হাতে সোণার স্বপনরাশি
ভাঙি' গড়ি' উঠে প্রতিদিন,
তুমি যারে বেছে ধরা রাজস্বাবেশের সে যে,
নহে আর নহে দীন দীন ।

তব চিত্ত-ভুলনার, তোমার বিহার পানে,
মুক্ত রাশসম্পদের ভাঙ্গা,
এ স্তম্ভের কণ্ঠে যেবি চুলানে দিবাছ অবি,
সত্য শিব হৃদয়ের বালা ।

সাধ যায় ধরদীর কোটী আঁধি দিয়া অনিবার,
মিলায়ে এ দুটী আঁধি স্তম্ভি চির হেরি গো তোমার ।
প্রতি আশা প্রতি হুক মিলাইরা মম আশা প্রাণ,
তব প্রেম-উৎসথারা করিবারে চাহি ওগো পান ।
এম হোর সর্বস্বত্বে সর্বস্বত্বে শাক্ত করি শোক,
ব্রহ্মার মানস হতে বরিরাছ মিলনের লোক ।
প্রতি কর্ম মাথে ভূমি মর্ম্ম তলে আছ যার
ভূমি যারে সঁপেছ পরাণ,
ভূমি যারে বেছে ধরা ভূমি যার শ্রিরা—সে যে,
ভুঙ্ক করে কুবেরের দান ।

নাহি চাই রাজতত্ত্ব নাহি চাহি অভিবেক,
গতিরাছি তব ভালবাসা,
শ্রেয়সী সন্নিবী যার, সংসার-আশ্রয়-তলে,
বাধা তার নন্দনের বালা ।

কণ্ঠের কঙ্কারে তব বামি' উঠে নিবিলের বীণ,
তব অগ্নিসনপানে মাসলিক বাধা নিশিদিন ।
লুকারে রেবেছ বন্ধে মানবের সর্ব প্রয়োজন,
শ্রিয়ের আনন্দ দিতে রুদ্ধ করি নিভের বেধন,
ঢেলে বেছ শান্তি মুখ নিঃশ ক'রি' আপনার দিয়া,
বিম্বিত এ রুদ্ধ কণ্ঠ, নাহি জানি পূজিব কি দিয়া ?
জীবনের প্রতি অংশে, আছ সন্নিবীর বেলে,
প্রাণের গুণ্যো পূর্ণ গান !
যে শ্রেয়সি ! হে শ্রেয়সি ! তব পূণ্য-বেদীতলে,
হবে চির আশ্রয়বিশ্রাম ।

ব্যথিতের অভিসম্পাত

[ঐচ্ছন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞাবিনোদ, বি-এ]

পৃথিবীর সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই অভিসম্পাতের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মানবের ধর্মগান্না যাদেরই অভিসম্পাতের উল্লেখ এবং দৃষ্টান্ত আছে। আবার ভারত-বাসী—অভিসম্পাতকে অতিশয় ভয় করি। আমাদের রামায়ণ মহাভারতাদিতে অভিসম্পাতের এবং তাহার বিবরণ ফলের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অধিক। রাজা দশরথ সুগ-ব্রজে সিদ্ধ হুনিতে বধ করিয়া সিদ্ধর পিতা অন্ধ কর্তৃক অভিশপ্ত হন, এবং পুত্রবিরোধে প্রাণত্যাগ ও চারি পুত্র থাকিতেও তাহাদের সকলেরই অসম্পাতে পরলোকে প্রস্থান করেন। রাজা পরীক্ষিত ধ্যানমগ্ন হুনির গলদেশে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া হুনিপুত্র নৃসিংর অভিসম্পাতে তক্ষক-দংশনে গতহু হন।

আমাদের প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদিতে ব্রহ্মশাপের কথাই অধিক। হুই এক বৃন্দে অভিসম্পাতে কিঞ্চিৎ অত্যাচারও লক্ষিত হয়। শকুন্তলা কথের আশ্রমে বসিয়া হুদয়শেষ চিন্তা করিতে-করিতে অতিথি দুর্জয়গাণ্ধীর বাক্য শুনিতে পান নাই বলিয়া হুনি তাঁহাকে শাপ দিলেন যে তুই বাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিল, সে তোকে চিনিতে পারিবে না। ইহাতে শকুন্তলাকে বিগম দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। এখানে হুনির মনঃসীড়ার অল্পপাতে পতিচিন্তারতা শকুন্তলার প্রতি অভিসম্পাতের হাতা অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যেখানে মনঃসীড়ার পরিমাণ অধিক, সেখানে অভিসম্পাতের হাত হইতে কাহারও পরিদ্রাণ নাই। আমাদের শাস্ত্রের কথা এইরূপ যে ঐরামচন্দ্র যোদ্ধাযুগে সীতা-উদ্ধারের নিমিত্ত হুদৌবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া হুদৌবাএর বানিকে বিনা অপরাধে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই শাপে ধাপের যুগে কৃষ্ণরূপে ব্যাধের দরে বিদ্ধ হইয়া সেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে হয় ত কেহ কেহ অভি-সম্পাতকে ততটা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু ব্যথিতের

অভিসম্পাত সকল যুগেই অব্যর্থ। অনেক যুগে উহার ফল এমনভাবে বলিয়া থাকে যে, ঘটনা শুনিতে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কেহ কাহারও মনে অস্বাভাব্য বা অস্বাভাব্যে অধিক পীড়া দিলে পীড়িত ব্যক্তি পীড়াদায়কের অমঙ্গল কামনা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। আর এইরূপ কামনা সর্বদাই ফলবতী হইয়া থাকে। বাঙ্গালার একটা চলিত কথা আছে যে, “হুঃখ পেয়ে চাঁড়ালে শাপে, এড়াতে পারে না বাহুণের বাপে।” এ কথাটী বড়ই সত্য। ফলতঃ, ব্যথিতের অভিসম্পাত কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। তবে কোন ঈশান যুগে উহার ফল হয় ত হাতে-হাতে না বলিয়া কিছু বলিবে ফলে; কিন্তু তাহাতেও অভিসম্পাত অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। কবিশ্রেষ্ট দাশরথী রায় কহিয়াছেন—

“যে দিনে কৃপা হোগ, সে দিনে কি হয় হোগ,

কৃপা হোগের মূল বটে।”

আমরা হুইটী প্রকৃত ঘটনার উদাহরণ দিয়া দেখাইব যে, মনঃসীড়াপ্রাপ্ত লোকের অভিসম্পাত ব্যক্তই হউক বা অব্যক্তই হউক, উহাতে পীড়াদায়কের সর্বনাশ সাধিত হয় এবং ঐরূপ সর্বনাশ সাধিত হইতেও অধিক সময় লাগে না।

বঙ্গের এক গওগ্রামে সতীনাথ বাবুর বাস। সতীনাথ উচ্চপদর রাজকর্মচারী। বিদ্যার লইয়া বাটতে আছেন। একদিন অপরাত্র প্রাণের নিকটস্থ নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সতীনাথ মেঘিলেন নদীর একটা ঘাটের পথের পাথের এক অথব যুদ্ধের নীচে এক সন্ন্যাসী ধনী আসিয়া বসিয়া আছেন। সতীনাথ উচ্চশিক্ষাগ্রাণ্ড; সন্ন্যাসীনায়েই ভক্ত, ইহাই তাঁহার বিবাস। সন্ন্যাসী যে ঘাটের পথের পাথের বসিয়া আছেন, ঐ ঘাটে অনেক কুল-লগনা হল লইতে বা দান করিতে আসিয়া থাকেন; উল্লবৎ সন্ন্যাসীকে দেখিলে তাঁহাদের লম্বাবোধ হইতে পারে, এই

ভাষিয়া সতীনাথ তাহাকে ডড়াইবার জন্য তাহার সম্মুখীন হইয়া কক্ষমত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এখানে কাহার ঘৃণ্যে আসিয়া বসিয়াছ?” সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “কাহারও ঘৃণ্য নই নাই, কালই উঠিয়া যাইব।” সতীনাথ করিলেন, “কাল নয়, আজই এখনই উঠিয়া যাইতে হইবে।” সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি এ স্থানের জমিদার?” ইহাতেই সতীনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কেন না তিনি গ্রামের জমিদার না হইলেও একজন সন্ন্যাসী অধিবাসী। তিনি সন্ন্যাসীকে অস্বাভাব্য গালি দিলেন। সন্ন্যাসী প্রতিবাদ করিলে সতীনাথের ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পাছকা খুঁটিয়া তদ্বারা সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত নির্মম ভাবে প্রহার করিলেন। সন্ন্যাসী প্রহারের স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে ‘ও’ একবার ‘হা’ বিদ্যনাথ। হা বিদ্যনাথ।” লক্ষ উচ্চারণ করিয়াই আপনায় লোটা, চিন্টা, আপন প্রভৃতি গুছাইয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিলেন।

সতীনাথ বাড়ী ফিরিলেন। অল্পকণ মধ্যেই তাঁহার সন্ন্যাসীকে প্রহার করিবার কথা গ্রামে রাষ্ট্র চাইয়া পড়িল। অনেকই বলিলেন সতীনাথ অভিশপ্ত অস্ত্রার কার্য করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতে তাঁহার ভাবী অমঙ্গল অনিবার্য। তিনি এখনও বাইরা সন্ন্যাসীকে বেথানে পান সেখানে তাহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সতীনাথ এ কথা গ্রাহ্য করিলেন না। সতীনাথের বৃদ্ধ পিতা সন্ন্যাসীর পথ অমূল্য করিয়া অনেক দূর গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার দেখা পান নাই।

সতীনাথের বিহার-কাল হুয়াইয়া আসিল, তিনি কক্ষ-স্থলে ফিরাইয়া গেলেন। ‘ও’ চারিদিন চাকরি করিবার পরই সতীনাথ কার্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, যে হস্তে সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে পাছকা প্রহার করিয়াছিলেন, সেই হস্তিণ হস্ত আর দেখা-চালনার সর্ব্ব নহে। হস্তে বিশ্ব বেধনা অমূল্য করিতে লাগিলেন। পুনরায় বিদায় লইতে হইল। কিন্তু তাঁহার সেই আর হস্ত হইল না। হাতের বাবা ক্রমশঃ বাধিতে লাগিল, এবং অঙ্গনিবেশে যথেষ্ট মহাব্যাবি কৃষ্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দশ বার বৎসর হোমের অশেষ ব্যয়্য তোগ করিয়া সতীনাথ পুঁথিই হইতে

পড়িয়াছিল, এবং সূত্বার চারি পাচ বৎসর পূর্বে হইতে তাঁহার সাজে এখন চূর্ণ হইয়াছিল যে, নিকট আত্মীয়েরাও তাঁহার ঘৃণে প্রবেশ করিতে চাহিতেন না। এই সময়ে গ্রামের সকল লোকই বলিতেন যে, অকারণে সন্ন্যাসীকে পাছকা-প্রহার করিবার ফল হাতে-হাতেই ফলিল। সতীনাথ নিজেও তখন আর ইহা অস্বীকার করিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বলিতেন, “সেই সন্ন্যাসীকে পাইল তাহার পদখলি লইয়া সর্কাদে লেপন করি। উহাই যথেষ্ট হইবে আমার যোগের একমাত্র মনোবধ।”

দ্বিতীয় ঘটনাটা আরও ভয়ানক। বঙ্গের কোন এক প্রসিদ্ধ জনপদে জগৎবাবু বাস করিতেন। কলিকাতায় বাবসার করিয়া জগৎবাবু প্রচুর অর্থের অধিকারী। তাঁহার বাসস্থান একান্ত অট্টালিকা। এই অট্টালিকার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে হুমার পুকুরিই এবং তাহার পূর্বে বিস্তৃত উদ্যান। পুকুরিয়ার উত্তর ধারে বাঁধা ঘাট এবং ঘাটের উপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৃহৎ চাতাল। এই চাতালের পশ্চিমদিকে বাটার প্রবেশ-পথ, এবং ইহার পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতে হয়। চাতালের উত্তরে নগরের এক রাস্তা পথ।

একদিন বেলা তৃতীয় প্রহার সময়ে এক ক্ষুধার্ত ভিখারী এই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে ভিক্ষালত্ব কিঞ্চিৎ তুলু আর এক কুস্তকারের নিকট ঘাট-কো করিয়া প্রাপ্ত একটা ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ছিল। ভিখারী কতকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া লোক তাহাকে পাগুলা ভিক্ষুক বলিত।

আহারার্থে চটলকটা সিদ্ধ করিবে বলিয়া ভিখারী একটু স্থান খুজিতেছিল। জগৎবাবুর পুকুরিয়ার উপরিস্থ চাতালটি দেখিয়া সে ভাবিল, স্থানটা বেশ পরিষ্কার, মলও নিকটে, এখানেই চটলকটা সিদ্ধ করিয়া লই। চাতালের যে নিকট উদ্যানমঙ্গল, ভিক্ষুক সেইদিকের এককোণে কয়েক খানি ইষ্টক মধ্যেদে একটা উত্থন করিয়া তাহাতেই হাঁড়িটা চড়াইয়া—অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। জগৎবাবুর বাড়ীর দোকে ইহা কেহ দেখিতে পার নাই। বাবু তখন নিমিত্ত। ভিখারীর তাত কয়টা হুটখা উঠিয়াছে, এমন সময়ে জগৎবাবুর এক কুতা উঠা দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ বাইরা বাবুকে জানাইল। বাবু ক্রতপদে সেখানে আসিলেন এবং

দেখিয়াই ক্রোধে অগ্নিশর্পা হইয়া উঠিলেন। ভিখারী তখন ভাত চাহিবে বলিয়া একখানি কলার পাতা আনিতে গিয়াছিল। সে পাতা হাতে করিয়া কিরিয়া আনিতেই অগংবাবু “শালা, ভাত রাঁধিবার আর বারগা পাওনি?” বলিয়া ছুতোওড়-পারে হাঁড়ির গারে এক লাথি মারিলেন। ফুৎপাতটা ভয় হইয়া ফুৎপাত ভিখারীর ফুৎপের আর সূতিকায়া নিক্ষেপ হইল। ভিক্টুর চাক দর-দর দ্বারে অক বহিল। হতবৃত্তি কদলীপত্রখানি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপথ ধরিয়া চলিয়া গেল। অগংবাবু কেবল “হা শালা, তোকে আর কিছু বলান না” বলিয়া চাতাশটীর কামিসের অংশ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ভূতাক রাজমিস্ত্রী ডাকিবার আবেশ দিয়া এবং বিনামার তলশেষ ধলে ধৌত করাইয়া তাঁহার মুখা-দণ্ড গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এ গৃহ কিন্তু আর অধিক দিন মনুষ্য কর্তৃক ব্যবহৃত হইল না। ভিখারীর মুখের আর নষ্ট হইবার পরই অগংবাবু সংসারে অবনতির সূত্রপাত হইল। বাবু নিজে বাতরোগে শয্যাগামী হইলেন। কলিকাতার বাবনামে প্রচুর ক্ষতি হওয়ার উহা তুলিয়া দিতে হইল। ভিন-চারি বৎসরের মধ্যে বহুভাগ অগংবাবুর সুরমা ভবন জনশ্রুত করিলেন। বাবু নিজে গেলেন এবং স্ত্রী পুত্র সকলেই গেল। যে কয়েকজন আত্মীয় উত্তরাধিকার-সূত্রে অগংবাবুর তাক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, তাঁহারা কেহই এ গৃহে প্রবেশ করিলেন না। লোকে তাঁহাদিগকে ভিখারীর অভিসম্পাতের ফলভোগের- ভয় দেখাইল। এমন কি বাড়ীর ইট, কাঠ, খানালা, দরজা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে চাহিলেও উহা কেহই ক্রয় করিল না।

এই নগরের এবং তরিকটবর্তী স্থানের লোকের কেমন এক বিশ্বাস যে, অগংবাবুর বাড়ীর কোন জিনিষ বাড়ীতে আনিলে বা ব্যবহার করিলেই ক্রোভা গুণেশ্বায়ীর অনিষ্ট হইবে! ইহার ফল এই হইয়াছে যে, অগংবাবুর সেই অট্টালিকা কালের প্রভাবে কোথায় বা অন্ন কোথায় বা অধিক পরিমাণে ভয় হইয়া বলিয়া গিয়া পড়িতেছে। ভয় অংশের পরিমাণ অসুসারে উহাকে এখন এত খণ্ডে বিভক্ত দেখায় যে ভিখারীর প্রস্তুত অন্নপূর্ণ সূত্র ফুৎপাতও হয় ত অগংবাবুর পদাঘাতে তত খণ্ডে বিভক্ত হয় নাই।

আর সেই চাতাল এবং পুত্রবধী? বহু দিন ধরিয়া

উহারা মনুষ্য-পরিভ্রাজ এবং শৃগাল কুল্লরের সূত্র পূরীয়ে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লোকে ভূমিগাও এই চাতালে পদার্পণ করে না কিংবা এই পুত্রবধীর মল ব্যবহার করে না।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, অগংবাবুর সংসারের এই পরিণামের সহিত ধর্ম্ম ভিখারীর প্রতি নির্দয় ব্যবহারের কোনই সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কাব্যিকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কঠিন। আর এক দিশায়ে ইহাও বলা বাইতে পারে যে, ভিখারীই অগংবাবুর দারগাহ অধিকার প্রবেশ করিয়াছিল, এবং চাতাশটী নষ্ট করিয়াছিল বলিয়া সেই দণ্ড। কিন্তু এক্ষণ তর্কে লোকের বিশ্বাস অপনোদিত হইবার নহে। এই বিশ্বাস এখনই বহুতল যে, অগংবাবুর বাসস্থান, এই জনপদের বাহ্যকে ভ্রাতাগা করা বার সেই বলিবে, এই সেই অভিসম্পাতের বাড়ী। এমন কি কুতূহল ব্রহ্মপাতের সময়েও কোন বিশদ পবিক বা পণ্ডিতবাহী এই বাড়ীতে আশ্রয় লয় না।

পান্ডিত্যমণ্ডে একটা কথা আছে যে “বশজন বাহা বলে ভগবানও তাহাই বলেন” অর্থাৎ দশজননের মতই ভগবানের মত ধরিয়া লইতে হইবে। হুতরাং দশজননের বাহা বিশ্বাস, তাহা অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া কখনই উপেক্ষা করিবার নহে। ইহাকে অভিসম্পাতের ফলই বলিতে হইবে।

হায়! মাহু্য কেন নিঃসংসারের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া অভিসম্পাতের বোকা মাথার তুলিয়া লয়, ইহা বুঝা যায় না! ঐশ্বর্য্য-মহিয়ার মন্ততা এবং তজ্জনিত ক্রোধই কি ইহার কারণ? তাহা হইলে ধনী পরিষের স্ত্রী-কর্ত্তা সর্গসক্তিমামা হৃদয়মের রাগে। এইরূপ মন্ততা এবং ক্রোধ সর্গতা পরিভ্রাজ।

যখন বৈজ্ঞানিক আদ্যাদিগকে দেখাইতেছেন যে অচেন্তন উদ্ভিদ প্রভৃতি পদার্থেরও বেদনা বোধ করিবার শক্তি আছে, তখন আত্মা বিশ্বের সর্গশ্রেষ্ঠ জীব মাহু্যয়ের মনে বিশ্বাস বাধা দিয়া তাহার অভিসম্পাত মাথার লইব, ইহা কেমন কথা? মাহু্য ইচ্ছা করিলে কি এইরূপ অভিসম্পাতের কাব্য হইতে বিরত থাকিতে পারে না? “পরশ্চিৎন মল্যপাণ” ইহা সর্গতা অন্নপাত্রি বোধ হয় মাহু্যয়ের এমন মন্তিত্রয় খণ্ডে না, এবং কেহ কাহারও প্রতি কোন অসামান্যিক ব্যবহার করে না।

টাতার কারখানা

[ত্রিগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বোম্বাই লাইনে অতি অল্প বাতালীই ঘাটারাত করেন। এই পথের ধারে,—কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে—একটী হ্রৈবা বস্ত্র ররিয়াছে, যাহা অনেক সময়ে বেশ-শোভার হইতেও অনেকে দেখিতে আসেন। এই হ্রৈবা বস্ত্র—টাতার লোহার কারখানা।

হাওড়া হইতে ১৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত ক্যানিমাটী ষ্টেশনের ধারে টাতার অনতিবৃহৎ সাক্‌টী নগর (নতুন নাম জেমসপুৰ) অবস্থিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বোধ হয় সাক্‌টী ভারতের অনেক বড়-বড় নগর অপেক্ষাও উন্নত। 'হাট ঘাট বাট মাট' সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু ময়লা, আবর্জনা বা চৰ্গক নাই; বা কোথাও বস্ত্র লতাগুহাদি তাগাধের ভূগর্ভস্থ নিভৃত আশ্রয় হইতে সগর্ভে মস্তকোত্তোলন করিয়া অধিকক্ষণ বিকরবার্তা বোষণা করিবার অবসর পাৰ না।

এখানে সমস্তই টাতার নিমগ্ন; এবং তির-তির বিভাগের ডার বিভিন্ন কর্মচারীবিদের উপর ব্রত। হাট বাজার, হাওয়া-ঘাট, পুলিশ-পাহারা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়—সমস্তই টাতার। এখানে মিউনিসিপালিটী নাই, কিন্তু কোম্পানীর 'টাইন অফিস' ও হাওয়া-বিভাগ আছে। তাগাধের হাওয়া সাধারণের কার্যে বোষণ হুচক রূপে নির্দোষিত হইয়া থাকে, অনেক বড়-বড় মিউনিসিপালিটীর হাওয়াও সেদুপ হয় না।

সাক্‌টীর পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদী ধরকারী; এক্ষিণে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ ধরকারীর উপর পুল বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে; পূর্বে দিগন্ত-বিস্তৃত অদমতল মাঠ ও পাগড় এবং উত্তরে কিছুদূরে দুগ্ধবোবা। কিন্তু বে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন, ছোট বড় 'দূর পাহাড়'—শ্রেণী চোখে পড়ে। দূরের পাহাড়গুলি মাঝা উচু করিয়া আকাশ-পারে মেঘের মত দণ্ডায়মান; এবং কাছের পাহাড়গুলি যেন দ্বির-পত্নীর প্রেমাঙ্কুর দৃষ্টি-নিষ্কপ করিয়া কালের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে। যে সাক্‌টী এখন এরূপ হৃদয় নগর, সেই সাক্‌টী কিছুদিন মাত্র পূর্বে বাগদ-সমূহ পাহাড় ও রঙ্গনগর ছিল।

সেই সব পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও স্থানে-স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছে এবং আশ্চর্যকরতায় হাওয়ার 'খোয়া' কোপাইতেছে।

আর তাহার সর্কাপেক্ষা বিশ্বকর পরিবর্তন—টাতার লোহার কারখানা (the Tata Iron and Steel Works)। একান্ত-কর্মী টাতারই মত তাহার কারখানাও দিবায়াত্রি অবিশ্রাম চলিতেছে (ইহার স্থাপনকর্তা—ঐযুক্ত জেমসপুৰী নাগেরওয়ান্‌কী টাটা)। অনর্গল ধুমহাদি ও অগ্নির লেলিহান শিখা বহুদূর হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিন নাই, রাত্রি নাই, চারিদিকে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়া সশব্দে, ভীষণ দর্শনে চারিদিক পরিপূর্ণ করিয়া চলিতেছে। কারখানার বিভিন্ন বন্দীধ্বনি ও রেলওয়ে এঞ্জিনের মুহূর্তে ভীত চীৎকার চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে যেন হয়, প্রাচ্যের এই অভিনব ও সর্কাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা যেন বিশ্বকর্মীর স্থানপূর্ণ হস্ত-নির্মিত। ইহার সঙ্গত নতুন কারখানার (Greater Extension) কার্য ক্রম অগ্রগত হইতেছে; এবং ইহা পের হইলে, টাতার কারখানা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অস্ততম বৃহৎ কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রায় ২০,০০০ লোক এখানে নানা বিভাগে কর্মে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া, জেমসপু, কোং, বার্ডা বিজ কোম্পানী প্রভৃতি কতকগুলি কোম্পানী তাগাধের নানা প্রকার কারখানা সাক্‌টীর আগে-পাশে স্থাপন করিতেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কারখানার ভিত্তি-স্থাপন ও ১৯০৭ অব্দে কারখানা বাড়ীর নির্মাণ আনতিক-ভাবে শেষ হইয়া কার্য আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে কারখানার অগ্নি আর নির্দোষিত হয় নাই। এক্ষণে আনন্দ কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিভিন্ন বিশ্ব ক্রমাধারে বিস্তৃত হইবে।

কোক ওভেনস (Cock Ovens)

করলার কারখানা;—টাতার অনেকগুলি করলার খনি আছে। তথা হইতে এবং অজান্তে নানা হান হইতে

প্রত্যয়ক কীড়া করণ। এইখানে আলীত হয় এবং পোড়াইয়া কোক্ প্রস্তুত হয়। এখানে দুই প্রকার কোক্ গুডেন্স আছে—এথা Non-recovery Coppee Ovens ও Kopper's Bye-product Ovens। প্রথমগুলি হইতে কোন প্রকার bye product পাওয়া যায় না। ইহা সাধারণতঃ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়; অবশিষ্ট বাহা কিছু থাকে, তাহা কোক্ প্রস্তুত করিবার সময় পুড়িয়া যায়। দ্বিতীয়গুলি হইতে আগাততঃ তিন প্রকার bye-product পাওয়া যায়—এথা (১) 'কোল্ প্যাস্', (২) 'আলকাত্তা' (coal tar) ও (৩) 'আমোনিয়াক্যাল লিকার' (ammoniacal liqr.)—এই শেষোক্ত পদার্থ 'সাল্ফিউরিক এসিড' সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা 'সালফেট্ অব আমোনিয়াক'তে পরিণত হয় ও বেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট 'সার' (manure) রূপে ব্যবহৃত হয়।

কোক্ গুডেন্স বাড়িতে বেথিতে অতি সুন্দর,—মেথিলে মনে হয়, যেন বায়ুতাপ বেথিতেছি। গুডেন্স (ovens) এর ভিতর কীড়া করণাগুলি যখন পুড়িয়া কোক্ হয়, তখন সমুদ্রের সৌর-বার উদ্ভূত করিয়া, পশ্চাত্ হইতে এগ্নির দাহযোগে সেগুলিকে ঠেংগা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। গুডেন্স হইতে যখন সেগুলি বাহির হইতে থাকে, তখন মনে হয়, যেন অগ্নিধর পাছড় মচন হইয়া বাহিরে আসিতেছে। পরক্ষণেই সেই পাছড়-সদৃশ অগ্নি প্রাট্টিকরনের উপর ভাসিয়া পড়ে। তখন 'হোজ্' পাইপ (hose pipe) দ্বারা সেগুলির উপর অনবরত্ চল চালা হইতে থাকে।

বয়লার (Boiler)

(Boiler);—ভিন্ন ভিন্ন কারখানার কাজ চালাইবার জন্য ১৬টা বয়লার আছে। ইহার মধ্যে ৮টা সাধারণতঃ কোক্ গুডেন্স-এর ও ব্লাস্ট ফার্নেসের (blast furnace) প্যাস্ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমস্ত বয়লার অত্যন্ত নানা কার্যের মধ্যে বিদ্যাদাগার (power house) এর কার্য পরিচালনা করিতেছে।

পাওয়ার হাউস (Power-House)

একটা বৃহৎ বিদ্যাদাগার সমস্ত কারখানাতিকে এবং শহরের সমস্ত আলো, পাখা ইত্যাদির জন্য বৈদ্যুতিক

শক্তি প্রদান করিতেছে। ইহা ভারতবর্ষের অন্ততম বৃহৎ বিদ্যাদাগার। অল্পট টায়ার Hydro-Electric Power-House ইহার চেয়ে অনেক বড় এবং পৃথিবীর মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তাহা পৃথিবীর সমস্ত পাওয়ার-হাউসের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তথ্য এক লক্ষ ভোল্টেজ-এ (100,000 Voltage) কাজ হইতেছে। এখানকার Voltage ৩,০০০ এবং K. V. O. ৫,০০০। ব্যাপারটা কিরূপ, সহজেই অসম্ভব। টামওয়ে চালাইবার পক্ষে ৪০-৪৫ ভোল্টেজ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে শব্দে কর্ণ বধির হইবার আশঙ্কা আছে। এই বৃহৎ কারখানাটা একরূপ এই বিদ্যাদাগারের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এখানে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই বৈদ্যুতিক বিভাগ সম্পূর্ণ ভাবে ভারতবাসীদের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। চীক ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একজন ব্যাসলী—জীক্স স্মিথ—নাথ যোথ, M. S. T., A. M. I. E. E. etc. etc.। ইনি ব্যাকটোর ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইহার সহকারী জীক্স স্মিথের সহকারী M. C. T. মহাপনও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমেরিকার ছাত্র জীক্স স্মিথের সহকারী পাদি, কান্ট্রী ও পাস্তারী। বিদ্যাদাগারটা ভারতবাসীদের কার্যতৎপরতার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই বিদ্যাদাগারের কার্য বেতন সুন্দর ভাবে নির্ধারিত হয়, অল্পত সচরাচর সেতুপ হ্রাসবদ্ধ হইত না। আরও ২১টা বিভাগ ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে; তাহা বখাদ্বানে বিবৃত হইবে। তবে এখানে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, কারখানার অত্যন্ত অবিকালে বিভাগই বিদেশীয়দের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

বিদ্যাদাগার বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রস্তুত করিতেছে এবং ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্য Turbo-Blower চালিত করিতেছে। Turbo-Blowerগুলি ফার্নেসে যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস (Blast) প্রেরণ করিতেছে।

ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnaces)

আগাততঃ এই কারখানায় দুইটা ব্লাস্ট ফার্নেস

আছে। প্রত্যেকটীর সহিত একসেট্ (১টা) করিয়া ষ্টোভ্ (Stove) আছে। এই ষ্টোভগুলি গ্যাস্ দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া হয়; এবং Blower হইতে যে বাতাস আসে, তাহা এখানে যথোপযুক্ত ভাবে গরম হইয়া কার্বনের অক্সিজেন প্রদেয় আবৃত্তক রত উত্তপ্ত থাকে। রাষ্ট্ কার্বনের সাধারণ লৌহ (Pig Mn.) ও ফেরো-ম্যাঙ্গানিস্ (Ferro-Manganese) প্রস্তুত হয়। সাধারণ লৌহ (Pig Iron) প্রস্তুতের ক্ষত লৌহ-প্রস্তর (Iron ore), সামান্য পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস্ (Iron), কোক্ (Coke) ও ডলোমাইট্ (dolomite) নামক এক প্রকার মরম প্রস্তর আবৃত্তক হয়। ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিম্নের এই সকল বস্তুনি পূর্ববর্তের পাঠ্য আছে। সাধারণ লৌহ এখন কার্বনস্ হইতে উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় নির্গত হয়, তখন তাহাকে অতিরিক্ত তপ্ততার বাতীত অন্য কিছু বস্তু যোগ করা হয় না। এই অবস্থায় ইহার কতক অংশ খণ্ড-খণ্ড ভাবে গুলাইয়া ফেলা হয়; এবং তাহা pig iron নামে অভিহিত হয়। অবশিষ্টাংশ ইল্পাত প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত স্টিল ওয়ার্কস্ (Steel Works) এ প্রেরিত হয়।

লৌহ-প্রস্তর (Iron Ore)

লৌহ-প্রস্তর বা Iron Ore নামা স্থানে পাওয়া যায়। আপাততঃ যাহা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ক্যালিফোর্নিয়া হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ও ম্যুরডক্স নামের অন্তর্গত পর্বতবিন্দী পার্বত্য হইতে আনীত হয়। এত অধিক লৌহ অল্প কোন প্রকারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্বত্য হইতে প্রস্তর কাটিয়া ট্রেনে বোকাই দিয়া কারখানায় আনা হইতেছে। টাটার রাষ্ট্ কার্বনস্গুলি সেরূপ অবিরত লৌহ উল্লীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ এই প্রকাণ্ড পার্বত্যটিকে ক্রমশঃ উদয়মান করিতেছে। কালে ইহার ভিত্তি দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, উক্ত স্থানের পরিবর্তে নিম্ন অসমতল ভূমি বাতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইবে না। এখানেও টাটার প্রসঙ্গে আর তিন-চার হাজার লোকের অধিক সংখ্যা হইতেছে।

লৌহ প্রস্তর, ডলোমাইট প্রভৃতি প্রাপ্তি বখা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইলেক্ট্রিক্ ইলিপ্তে চালিয়া দেওয়া হয়।

ঐ টালি আর ৮৫ কিট্ উল্ফ্ অবস্থিত রাষ্ট্ কার্বনের ফানেল (Funnel) এর মুখে ঐ সমস্ত ত্রয়া চালিয়া দেয় ও এগুলি গলিয়া লৌহ হইয়া পুনরায় বাহিরে আসে। প্রতি কার্বনে দুইখানি করিয়া টালি আছে। একখানি ফানেল্ অভিমুখে বোকাই লইয়া বাইতে থাকে ও অপর-খানি তাহার ত্রয়াপি ফানেলে চালিয়া দিয়া অবতরণ করিতে থাকে। মধ্য-পথে দুইটীর বেগা হয়। ভিন্ন-ভিন্ন নিকট হইতে একটি রেলিং-দেওয়া রেল লাইন নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ দিকের গৃহভাঙার প্রবেশ করিয়াছে— উঠাই টালি লাইন। উক্ত গৃহে ভূগর্ভে ত্রয়াপি মিশ্রিত হইয়া টালিতে বোকাই লইয়া থাকে। ঐ ঘরটির ভিতরের বন্দোবস্ত গুহ্মর। একজন মাত্র লোক এখানকার সমস্ত কাজ চালায়। ত্রয়াপি থাকে-থাকে সন্ধান থাকে। এক-খানি ইলেক্ট্রিক্ টালি একপ্রকার ত্রয়া লইয়া গিয়া অল্প একস্থানে থামে; এবং ঐ লোকটি হুইচ্ সাহায্যে এক স্থানে গাড়াইয়া, বখাপরিমাণে অল্প ত্রয়া তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, তাহাকে চালাইয়া পুনরায় অপর স্থানে থামায়; এবং ঐরূপে আর এক প্রকাণ্ড ত্রয়া লইয়া গাড়ীবানিকে চালাইয়া প্রথমোক্ত টালির নিকট আসিয়া তাহাতে সমস্ত ত্রয়াপি চালিয়া দেয়।

রাষ্ট্ কার্বনে ফেরো-ম্যাঙ্গানিস্ (Ferro-manganese) ও প্রস্তুত হয়। সম্ভ্রুতি এই পদার্থ প্রস্তুত করিবার ক্ষত Battelle Furnace নামক একটি নূতন Furnace প্রস্তুত হইতেছে।

লৌহ-প্রস্তুতকালে যে ময়লা (লৌহ-পাদ) পাওয়া যায়, তাহাকে Slag বলা হয়। এই Slag মসিমে চূর্ণ করিয়া বিক্রয় করা হয়। ইহা মায় (manure) ও সিমেন্ট রূপে ব্যবহৃত হয়। চূর্ণ করিবার ক্ষত এগুলিকে skull-cracker নামক গোলায় নিকট আনা হয়। তথায় একটি তিন টন ওজননের গোলা (২৭০ মণে এক টন) ফ্রেনের সাহায্যে উপরে উঠাইয়া ইহাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া ইহাগুলিকে চূর্ণ করা হয়। ফ্রেনের সহিত একটি mag-netic plate (চুম্বক) সংযুক্ত আছে। ঐ চুম্বক গোলাটিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে ও ফ্রেন তাহাকে উপরে লইয়া যায়। উপরে চুম্বকের শক্তি কাটিয়া দেওয়া হইলে, গোলাটা নীচে আসিয়া পড়ে। ইহার নিকটে আর একটি

skull-cracker (গোলা) আছে, তাহার ওজন ৪ টন। এটাকে অতি উচ্চে উঠাইয়া ঐক্লপভাবে নিক্ষেপ করিয়া সোরাশি চূর্ণ করা হয়। এই লৌহ-চূর্ণ বা টুকরা লৌহ (Iron or steel scrap) স্লিশ ওয়ার্কসে ব্যবহৃত হয়। এই স্থানে আসিলে 'ভরতের গোলা'র কথা মনে উদয় হয়। বার্ষিকসে ৭৭৭৭ উত্তপ্ত Slag বাহিরে চালিয়া দেওয়া হয়, তখন সমস্ত আকাশ তাহার বীজিতে উদ্ভাসিত হইয়া সম্বরটিকে কিছুকণের ভিত্ত আশোকিত করিয়া তোলে।

স্লিশ ওয়ার্কস্ (Steel Works)

এখানে ৩টা কার্ণেল আছে,—ইহাখণ্ডকে Open Hearth Steel Furnaces বলা হয়। এই সকল কার্ণেলসে, এবং অন্ত্যস্ত যে সকল স্থানে অগ্নির প্রয়োজন হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলে, গ্যাসের অগ্নি ব্যবহৃত হয়। স্লিশ ওয়ার্কস্‌র পার্শ্ববর্তী বৃহৎ গ্যাস-প্রডিউসার (Gas Producer) এ গ্যাস প্রস্তুত করিয়া সকল স্থানে সরবরাহ করা হয়।

ব্রাট কার্ণেল হইতে তরল লৌহ আনিয়া Open Hearth Steel Furnace এ চালিয়া দেওয়া হয়। এই-রূপ তরল লৌহ লইয়া আদিবার ক্ষত রেলওয়ে ওয়াগন ব্যবহৃত হয়। কারখানার ভিতরে সকল স্থানেই রেল লাইন আছে, এবং টাটার নিজের অনেকগুলি এম্বিন আছে। লাইনগুলি একস্থানে বিস্তারিত বরাবর কালিমাটী ট্রেন পর্যন্ত গিয়াছে। এক স্থান হইতে অল্প স্থানে ভারী বা উত্তপ্ত বা ক্ষত কোন প্রকার আবস্তক প্রযোজ্য লইয়া বাইবার ক্ষত রেলওয়ে ওয়াগন কিংবা ট্রাক বা ওভারহেড ইলেক্ট্রিক্যাল ক্রেনের (Overhead Electrical Crane) সাহায্য লওয়া হয়। তরল লৌহ লইয়া বাইবার গাড়ীগুলিতে বড়-বড় লৌহ-নির্মিত পাত বদান আছে। কার্ণেলের ভিতর তরল লৌহের সহিত লৌহ-প্রস্তর (Iron ore), চূর্ণ প্রস্তর (lime stone) এবং লৌহ বা ইস্পাতের টুকরা (Iron or steel scrap) মিশ্রিত করিয়া তরল ইস্পাত প্রস্তুত হয়। এই অধিবৎ

তরল ইস্পাত হাঁচে (Ingot mould) চালিয়া দেওয়া হয়; পরে তাহা কঠিন হইয়া আসিলে হাঁচ হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। এগুলিকে তখন ইন্গট (ingot) বলা হয়। একটা ইন্গটের ওজন প্রায় ১৪০০ তিন টন।

সোaking পিট্ (Soaking Pits)

ইন্গটগুলিকে 'রোল' (roll) করিয়া কড়ি, বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এগুলিকে 'রোল' করিবার উপযোগী করিবার ক্ষত স্থানীয় উত্তাপ দ্বারা অধিবৎ করিতে হয়। ভূগর্ভে চারিদিকে লৌহ-পাতে আবৃত স্থানে গ্যাস জলিতে থাকে। এইগুলিকে সোaking পিট্ (Soaking Pit) বলে। ইহাতে 'রোল' করিবার পূর্বে ইন্গট (ingot) গুলিকে আবস্তকমত উত্তপ্ত করা হয়। এই স্থানে Overhead Electrical Crane এর সাহায্য লওয়া হয়। একটা হস্তগতাকার প্রকাণ্ড লৌহ ইন্গটগুলিকে লইয়া আসিয়া সোaking পিটের তীব্র অধিবৎ প্রদত্ত করা হয়। যে ও বাক্যকালে বাহিরে আনিয়া 'ইন্গট বগি' (Ingot Bogie) নামক গাড়ীর উপর বসাইয়া দেয়। ইলেক্ট্রিক-চালিত 'ইন্গট বগি' তাৎক্ষণিক লইয়া গিয়া ব্লুমিং মিলে (Bloom ing mill) শোয়াইয়া দেয়।

ব্লুমিং মিল Bloom ing Mills)

ইন্গটগুলিকে এখানে গিটিয়া লওয়া করা হয় ও তৎপরে প্রযোজ্য প্রস্তুতের উপযোগী স্লিশ দ্বারা হাততে থাকে, এইরূপভাবে তাহাখণ্ডকে কয়েক খণ্ড করা হয়। এইরূপ প্রস্তুত খণ্ডের নাম ব্লুম (Bloom)। কতকগুলি ইন্গট "বার-মিলে" (Bar mills) প্রযোজ্য প্রস্তুত হইবার ক্ষত অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া কাটা হয়। তাহাখণ্ডকে 'বিলেট্' (billets) বলে। ব্লুমিং মিল এম্বিনটীর ক্ষতি ২০,০০০ H. P.। এই এম্বিন বস্তকণ কাট করে, ততকণ সমস্ত সম্বট কাশিতে থাকে।

রি-হিটিং ফার্নেস (Re-heating Furnaces)

প্রত্যেক ব্লক বা বিশেই 'রোল' হইবার পূর্বে পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। যেখানে এগুলি এই অবস্থায় উত্তপ্ত হয়, সেই স্থানকে রি-হিটিং ফার্নেস (Re-heating Furnaces) বলে। প্রত্যেক মিল-সংলগ্ন একটা করিয়া রি-হিটিং ফার্নেস আছে।

রোলিং মিল (Rolling or ২৪ inch-mills)

সুদৃশ্যলিকে এইখানে আনিয়া তরেকটী 'রোলারে' পিষিয়া ক্রমশঃ রেল, কড়ি, বৃহৎ বৃহৎ ত্রিকোণ (angles) চ্যানেল (channel) ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং সপেক্ষে সেগুলি ইলেকট্রিক-চালিত হইয়া (Finishing Mill) ফিনিশিং মিলে উপস্থিত হয়। বর্তমান মধ্যযুগে এই কারখানা প্রবর্তনটিকে অপূর্ণাঙ্গ রেল, মেসোপটেমিয়া, বাগদাদ, প্যালেস্টাইন্ প্রভৃতি স্থানের মত ভোগাইয়াছে। বিফল বেরুগ তাহার শিশু শাবককে সুখে করিয়া একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ এখানকার crane অগ্নিবর্ণ বৃহৎকার লৌহগুলিকে এক রোলার হইতে অপর রোলারে লইয়া বাইতেছে। বস্তুতঃ—রোলিং মিল একটা অপূর্ণ দৃষ্ট। এখানকার কাজের বিষয় বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা হইল।

ফিনিশিং মিল (Finishing mills)

এই মিল-সংলগ্ন লৌহব্রহ্মগুলিকে ইচ্ছামত আকারে কাটিবার মত হইখানি চক্রাকার বৈজ্ঞানিক কল্লা আছে। রোলিং মিল হইতে প্রযাতি প্রস্তুত হইলে সেগুলি বহুচালিত হইয়া এইখানে আসে। তখন সেগুলিকে ইচ্ছামত আকারে কাটা হয়। তাহার পর ঐ ভাবে ফিনিশিং মিলে গিয়া সোঝা ও পরিষ্কার হয়।

এখান হইতে সেগুলি বহুবার সিপিং ইয়ার্ডে (Ship-ping yard) গিয়া উপস্থিত হয়। ঠাটা অবস্থায় যে সকল প্রযাতি কাটিবার আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে এই

yard এ cold saw নামক কল্লাতে কাটা হইয়া থাকে। Hot saw অথবা cold saw যন্ত্রে লোহাগুলিকে কাটিবার সময় একরূপভাবে অগ্নিদুগ্ধ চারিদিকে ছুটিতে থাকে যে, মনে হয় সে স্থানে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

বার মিলস্ (Bar Mills)

এখানকার কাজ অনেক আগে রোলিং মিলের মত। পার্থক্য কেবল এই যে এখানে ছোট ছোট প্রযাতি প্রস্তুত হয়। ইহার নিকটে একটা গ্যাস প্রোডাক্টার (Gas Producer) আছে এবং এখানকার আবশ্যক গ্যাস এই স্থান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রি-হিটিং ফার্নেসে পুনরায় উত্তপ্ত হইলে, ছোট-ছোট নানা আকারের রোলারের সাহায্যে ক্রমশঃ লম্বা হইয়া আবশ্যকানুসারে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে গরাসে, যেটা পাত (Flat) বরগা (tees), ত্রিকোণ লৌহ (angles), ছোট কড়ি, চ্যানেল (channels), লাইট রেল (light rails) এবং ফিশ-প্লেট (Fish plates) প্রস্তুত হয়। যেখানে গরাসে প্রস্তুত হয়, সে স্থানের কার্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একজন লোক সেগুলিকে ধরন্থে এখিট করাইবার সময় সাহায্য করিতেছে; এবং অপর দল অপর পার্শ্বে গাড়াইয়া, সেগুলি যখন আরম্ভ সক্ষম হইতেছে, তখন সাবধানে নামাই-তেছে এবং পরক্ষণেই পার্শ্ববর্তী কলে স্থাপন করিতেছে। চারিদিকে অগ্নি এবং প্রমথীবিধের নির্লীক মহা ব্যস্ততা ও অবিরাগ শব্দ। মনে হয় যেন কতকগুলি লোক অগ্নি-ক্রীড়ার মত। যে সকল স্থানে এইরূপ অগ্নিক্রীড়ার ছড়াছড়ি, সেই সকল স্থান রাত্রিতে দেখিতে অতি সুন্দর। এখান হইতেও প্রযাতি সিপিং ইয়ার্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ফাউন্ড্রি (Foundries)

কারখানার ভিতর দুটা বড় বড় ফাউন্ড্রি আছে। একটার নাম জেনারেল ফাউন্ড্রি (General Foundry)—এখানে কারখানার প্রযাতি প্রস্তুতের উপযোগী নানাপ্রকার ছাঁচ প্রস্তুত হয়; এবং অপরটা—স্লিপার ফাউন্ড্রি (Sleeper

Foundry)—এখানে পেল ও স্লিপার (Pot or Plate sleeper) প্রস্তুত হয়। সেনারেল কাউন্টিতে সৌদ বা ইস্পাতের অথবা সৌদ ও ইস্পাত মিশ্রিত করিয়া ওড়ানো হাঁচ প্রস্তুত হয়।

প্যাটার্ন শপ্ (Pattern shop)

এই স্থানে নানাবিধ হাঁচ কাঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অসংখ্য টানা মিশ্র এই স্থানে কাটা করিতেছে। এই স্থানে প্রস্তুত প্যাটার্ন হইতে বাসুকা মিশ্রিত স্তম্ভিকা হাঁচ শওয়া হয় ও তাহা হইতে কাউন্টিতে আসল হাঁচ প্রস্তুত হয়।

মেশিন শপ্ (Machine shop)

কাউন্টিতে হাঁচ প্রস্তুত হইলে, সেগুলি এই বৃহৎ শপে আসা হয় ও আবশ্যিকত মেশিনের পাশি ও অঙ্গাঙ্গ যন্ত্র কার্য সমাপ্ত হইলে, তখন সেগুলি কার্যোপযোগী হয়। মিলে যে সকল 'রোল' (Roll) আবশ্যক হয়—তাহা সবগুলি এই ভাবে প্রস্তুত হয়। আগে এগুলি বাহির হইতে আনিতে হইত। এখানে কলকল্ল দোরানত প্রতীতিও হইয়া থাকে। রেলওয়ে এঞ্জিনগুলি এখানে অতি সুন্দররূপে মেরামত হয়। এতৎসংশয় দ্বিধা সপে একটি প্রকাণ্ড স্টিম হাম্মার (Steam Hammer) আছে। সেটা নিজ কার্যে রত হইলে চারিদিকে ভূমিকম্পের দৃষ্টি হয়।

বাইপ্রডাক্ট প্লান্ট (Bye-Product Plant)

এখানে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যালুমিনা প্রস্তুত হইয়া বাগানে বিক্রীত হয়। Ammonium Sulphate-এর বিধার পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন সল্ফিউরিক এসিড প্লান্ট (Sulphuric Acid Plant)এ প্রচুর পরিমাণে সল্ফিউরিক এসিড প্রস্তুত ও বিক্রীত হয়। এই পেশেখ গৃহটির উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিট।

ক্যালসাইনিক প্লান্ট (Calcinic Plant)

এই স্থানে ডোমাইট (Dolomite) ও লাইমস্টোন (lime stone) পোড়াইয়া চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

সোডা ও আইস্ প্লান্ট (Soda & Ice Plant)

কোম্পানীর আবশ্যক সকল প্রকার সোডা, শেননেড ইত্যাদি পানীয় ও বরফ এইস্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রমজীবীগণ কঠিন পরিশ্রমের সময় অনবরত জলপান করিলে অসুস্থ হইতে পারে, এবং এতদ্ব্যতীত পুনঃপুনঃ বাহিরে গাইতে হইলে কাণেরও ক্ষতি হয়—এই ফেছু তাহাদের স্বস্তি কারখানায় ভিতর সোডা-ওয়াটার সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

লেবরেটরি (Laboratories)

দ্রব্যাদির পরীক্ষার জন্য একটি ফিজিক্যাল ও একটি কেমিক্যাল লেবরেটরি (Physical & Chemical Laboratories) আছে। অনেকগুলি কেমিষ্ট এখানে কার্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান মিউনিশন্স বোর্ডের (Indian Munitions Board) অধীনে মেটালার্জিক্যাল ইন্সপেক্টরের (Metallurgical Inspector's) একটি অফিস আছে। দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, ষ্টিক হইয়াছে কি না তাহা এই অফিস কর্তৃক পরীক্ষিত হয়।

মাইনিং ও প্রস্পেক্টিং বিভাগ

(Mining & Prospecting)

কোম্পানীর কোন্ পাহাড়ে বা অঞ্চলে কিরূপ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানীর একটি মাইনিং ও প্রস্পেক্টিং (Mining & Prospecting) বিভাগ আছে; এবং এই কার্যে বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি উচ্চ শিক্ষিত যুবক এখানে নিযুক্ত আছে। ইহার সুবিধায় স্থানের সন্ধান দিলে, কোম্পানী তাহা সহজরূপে ব্যবহার করেন।

দপ্তর বা অফিস বিভাগ (Office)

কোম্পানীর অফিসগুলিতে বহু উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ সকল অফিস সাধারণ অফিসের জায়গা নহে—এখানে ‘সর্ব-শ্রুতি-বর্ধ-সম্বয়’। বাগানী, ঘোষারী, পালাবী, পেশোয়ারী, কান্দারি, কচ্ছি, গুলহাটী, মারহাটী, গানী, হাইব্রাবারী, মহাপুরী, মালাবারী, মাস্ত্রাজী—(তামিলী, তেলগু, কানাড়ী) উড়িয়া, আদিব, মধ্যপ্রদেশী কেহই বাস বাস নাই। চীনা, যুরোপীয়, আমেরিকানও অনেক—তবে মাস্ত্রাজী সংখ্যার বাঙ্গালীর ঠিক পরেই; এবং আমানীর অল্পপাতে অল্পমান হয়—শুধুই বাঙ্গালীকে পরাক্ত করিবে।

উপস্থিত কারখানায় প্রস্তুত প্রযোজ্য পরিমাণ—

কারখানা	পরিমাণ (বাসিক)
কোক ওডেন্স (করলা)	কিঞ্চিৎধিক ২৭,০০০ হাজার টন
ব্রাট-কারপেন্স (সৌহ)	প্রায় ১৫,৫০০ .
টিগ ওয়ার্কস্ (ইন্দো)	প্রায় ১১,০০০ .
য়েলিং মিল (বৃহৎ প্রযোজ্য)	প্রায় ৭,২০০ .
বর নিল (ছোট .)	প্রায় ৩,৭০০ .

বলা বাহুল্য, এতদংশ লোহার কারখানা ভারতবর্ষের অজ্ঞ কোথাও নাই।

কুলদীর বেসল আররু এণ্ড টিগ কোম্পানী (Bengal Iron & Steel Co. Ltd.) সাধারণ সৌহ (Pig Iron) পর্যায় প্রস্তুত করিয়াই থাকাস। আর এবার একটা যুরোপীয় কোম্পানী আসানসোলার নিকট ইতিহাস আররু এণ্ড টিগ কোম্পানী (The Indian Iron & Steel Co. Ltd.) পুন্নিবার অজ্ঞ বিশুল উত্তমে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

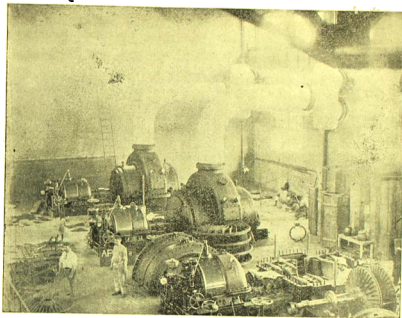
পৃথিবীর অধিকাংশ বড়-বড় সহরে টাটার ব্রাক অফিস আছে। এখানকার সৌহ এখন সর্বাস্থানেই উৎকৃষ্ট এবং আমেরিকা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা, ক্রাস ও ইটালী পর্যন্ত বিস্তৃত।

দূরদেশ হইতে যাহারা এদিকে ভ্রমণ করিতে আসেন, তাঁহারা প্রায়ই একবার টাটার কারখানা দেখিয়া যান। জাপান ও চীন হইতেও কেহ কেহ আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে বিহার-উড়িয়ার ছোটলাট বাহাদুর

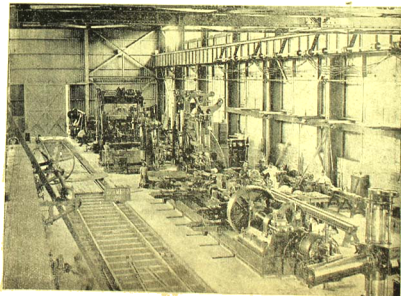
আসিয়াছিলেন। সেদিন বাংলার লর্ড লর্ড রোপাণ্ডে ও সম্রাট রান-প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড বাহাদুরও এখানে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তিনি স্যারাদিন টাটার নামে বিভাগ দেখিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। ডাইরেক্টরগণের নূতন বাংলার তাঁহার বিশ্রাম-স্থান নির্মিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সার্স টনাস্ হলাও, সার্স মর্ক্স বার্নেন্স, সার্স বোত্রাব টাটা এবং আরও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগর-ভ্রমণের পর তাঁহারা উল্লিখিত বাংলার কিরিয়া আসিলে লর্ড চেম্‌সফোর্ড বাহাদুর একটা প্রকৃত সভার করেকটা সমরোপযোগী হুন্সর কথা কহিয়া ‘সাক্চী’র নাম পরিবর্তন করতঃ উহার স্থাপন-কর্তা চেম্‌সফোর্ড টাটার নামানুসারে ‘চেম্‌সফোর্ড’ নাম ঘোষণা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটা এখানে উক্ত করিলে পাঠকগণ তাহা হইতে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইবেন—

“Gentlemen,

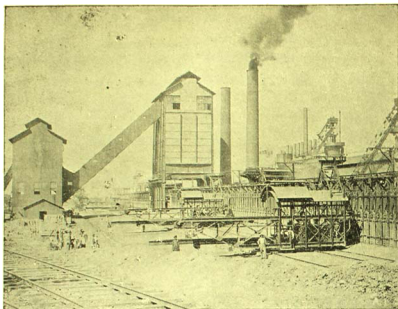
“I have come down here to-day in the first place to see this fine example of Indian Industry. As you know, it is the policy of my Government to encourage all industries in India as far as possible to do so. And I wanted to be able to see this fine example of Indian Industry which has been set up at Sakchi. In the second place, I wanted to come here to express my appreciation of the great work which has been done by the Tata Company during the past four years of this War. I can hardly imagine what we should have done during these four years of this War if the Tata Company had not been able to give us steel rails which have been provided for us not only for Mesopotamia, but for Egypt, Palestine and East Africa. And I have come to express my thanks to the Directorate of this Company for all that they have done and to Mr. Tutwiler the General Manager of this Company for the



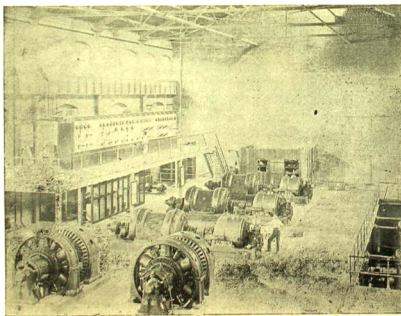
ଟାରବାଇନ୍ (୫୫୫.୫) — ପାଣିପାଗର ହାଲେ ବା ମାଟ୍ରି ଉପାରେ କାରଖାନା:



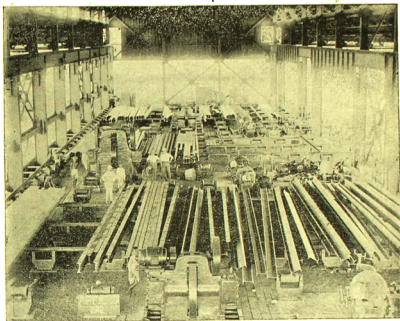
ସେମିସ ସମ୍ପ



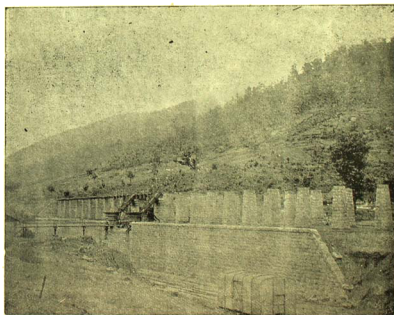
কোয়ালিটি করিয়ার উন্নয়ন



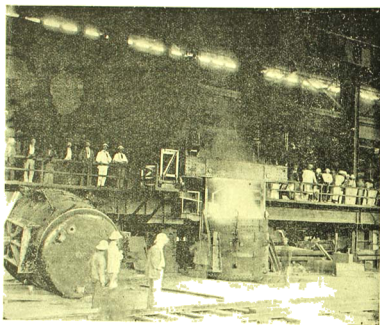
পাওয়ার হাউস—বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা



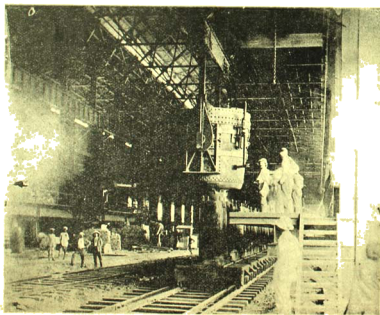
ବେଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କାରଖାନା



ସାଲ ଗାମ୍ଭାଲ ଫାଟିକ କାରଖାନା



ଫାଉଣ୍ଡେରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ



ସ୍ଟାର୍ ଡିପାର୍ଟ୍ମେଣ୍ଟ

enthusiastic work which he brought to bear in this behalf during the past four years (applause).

"It is hard to imagine that 10 years ago this place was scrub and jungle and here we have now this place set up with all its foundries and its workshops and its population of forty to fifty thousand men. This great enterprise has been due to the prescience, imagination and genius of the late Mr. Jamsetji Tata. We may well say that he has his lasting memorial in the Works that we see here all round. But you will be pleased to learn when I tell you to day that on account of the filial reverence of Sir Dorab Tata this

place will see a change in its name and will no longer be known as Sakchi but will be identified with the name of the founder, bearing down through the ages the name of Mr. Jamsetji Tata. Hereafter this place will be known by the Name of JAMSHEDPUR. (Applause). It is my privilege here to-day to have been able on this the occasion of the first visit of a Viceroy to this place to pay my tribute to the memory of that great man." (loud applause).

সাক্চী সম্বন্ধে এবার এই পর্বাঙ্ক ; সমস্তান্তরে—
নূতন নগর "জামশেদপুর" সম্বন্ধে জাদবরা বাঁটী কণার
অবতারণা করিব।

ভাবের অভিব্যক্তি



ধান



প্রহর



শৈল্যাবিতা





অভিরাম

দেশী ও বিদেশী

[ক্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল]

(১)

জ্যোতির্ষ্যের কথা

আমরা সন্ধ্যার ছেলে, আমরা সন্তা, আমরা শাংখ-বাবু বা বাবু-শাংখ; হস্তরাং আমরা যে প্রকৃতি-মাতার ভাষা-পুত্র, —এ বাটি সত্যটুকু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, প্রকৃতির কীলা-ভূনি বাসিন্দা-পাখাড়ে গিয়া। আমাদের চন্দ্র, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, বক—এই ইন্দ্রিয় পাঁচটিও প্রকৃতিগত কর্তব্য-সাধন করিতে পরাযুগ্ম হয়, যে পণ্ডিত না আমরা কতকগুলি আদর্শ-কার্যের বাহ্যিক চাক্ষুতিকো ভাষায়ে। প্রকৃতিগত কর্তব্যের “বেই” ঘরাইয়া দিই। অনেকগুলি কাপড়ের ভায়ে বগেন্দ্রিকে শীকার করিতে হইয়াছিল যে স্থানটি কখনো ঠাণ্ডা। সরল বেবদ্যের পাতাগুলির ঘূষে কর্তব্য-কর্তব্য শব্দের মুহূর্ত্তের রোল ভূমিরা লগাই প্রমথারী শীতল মল্লর আমাকে অভিযান করিত। কিন্তু তাহার শৈত্যের সত্যটুকু ঠিক বাসিন্দা লইতে পারিতাম না। কারণ সংবাদগত পুণিয়া প্রত্যহ প্রাতে বেদন কলিকাভার শীতকের স্বরূপ-দখল তাপমান

হয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ পাইতাম, শিল্পের মানবমিত্রের তাপমান হয়ের বৈনিক উঠা-নামার কোনও সংবাদ কোনও পত্রিকা চক্ষের সম্মুখে আনিয়া চায়ের পেয়ালার পাখে রাখিত না।

শিল্প শীতল। হস্তরাং অঙ্গের উত্তীর্ণ দাবী দুষ্টির ঘোটেই ছিল না। আমার লক্ষ্যেই সার্থকের পোষাক পরিচালনা-বানের পথ চিনিয়া যখন চৈতন্য বাবুর বাগানার প্রদর্শনে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন সেই অশান্তি—প্রাণ লইয়া তত নর, তত কর্ণেত্রি লইয়া। এক-বাধন হস্তের হুল—অতি মুহূর্ত্ত পৌরত; মুহূর্ত্ত সমীর্ণে রবির কর মাঝি বড় মধুর স্পন্দনে স্পন্দিত। কিন্তু তাহাদের বর্ণ ও পৌরতের গ্রিক স্বরূপ আবিষ্কার করিবার শ্রমটুকু চন্দ্র ও নাসিকা ঘোটেই থাকে লইতে চাহিল না, বতকণ না চৈতন্য বাবু বলিয়া দিলেন—এগুলি কমদম্, এগুলি ডাঙ্গিয়া, এগুলি চন্দ্রময়িক।—অর্থাৎ ক্রিসেন্ট বিন্দু, এগুলি ছুঁয়া



ডেব টেপা



বাসিনা বালিকাশ্রম

এবং এগুলো গোলাপ। তখন যেন সেই সুন্দর বাগানভর্য, রবিকর-গড়, কুম্ব-সম্পদের গোরব-বুড়ি হইল। তখন নরেল-গড়া, কবি-সীমিত মিলন-ভূষিত গ্রাণ বড় অশ্রু হইল—বাগের চাত-গড়া এই পুষ-বীথিকা, বাগের রশ্মি-লাভে বড় হইবার জন্ত এত দূর আসিয়াছি, এত গোব্যাক পরিচ্ছন্ন পরিষ্কারি, গ্রাণে এত আশা পুষ্টিরাছি—তাহাকে দেখিবার জন্ত, আমার আকস্মিক আগমনে তাহার পিতাকে যেমন বিস্মিত করিয়াছি, তাহাকে তাহার শতগুণ পুলকে পুলকিত করিবার জন্ত।

চৈতন্য বাবু বলিলেন, “তুমি পাগলা ছেলে, তুমি এসে কোথায় ঘোণাবে পরের বাগের ভেঁজে,—ছিঃ! ছিঃ!!”

আমি বলিলাম, “না, ও বাগার আমার এক বন্ধুর; তিনি ছুটিতে বাড়ী গেছেন; কাজেই ওখানে এসে উঠিছি। এখানে স্থান আছে কি না—”

“তা ত’ সংবাদ নাও নি। বাড়ীতে বড় রাগ করবে—তোমার বুদ্ধি-মা—”

আমি হুবিধা পাইয়া বলিলাম, “তিনি কোথা?”
চৈতন্য বাবু একটা গোলাপ চুল ছিড়িয়া বলিলেন, “এই নাও। তিনি গেছেন অশোককে নিয়ে মহিলা-সমিতির সভায়। এখানে আমাদের ব্রহ্মবন্ধিরে ওরা একটা সভা করেছেন, প্রতি বুধবারে বৈঠক হয়। এখানকার মহিলারা কুম্বারী মেয়েদের খুব বড় করেন, আর সব আপনা-আপনির মত—বাগানী তো বেশি নেই। ও বাবে?”

আমি তাহার সম্বন্ধিত গুণে একখানা বোকে বলিলাম।
খুড়িয়া ও অশোকের নিকট আমার আগমন-সংবাদ পৌঁছন রাখিতে বলিলাম। তিনি হাসিয়া কর্ণভুলে সেলেন।

পাহাড়গুলার সৌন্দর্য! অসুখ, —চারিধিকে সরল

সেবার্ভার বন একেবারে উপত্যকা হইতে আরম্ভের
পাহাড়ের মাথার উপর পর্যন্ত উঠিয়াছে। আর শৈল-
শৃঙ্গারও কি তেমনই নৌভয়।

অকস্মাৎ পিছন হইতে কে আমাদের চোখ টিপিয়া ধরিল।
সে ঈষৎ-কম্পিত মুহূর্ণ-স্পর্শের স্ব-আমিষ কি গোপন
করিবার উপায় আছে! আমার সর্গশরীরে নত হাদিনী
বেগিয়া ধাইতেছিল। তাহারও কোমল স্পর্শের আবেগে
বিহ্বলতার চাক্ষুষ স্পষ্ট অঙ্গুষ্ঠ হইতেছিল। চোখ-টেগার
আইন-মতে নাম বলিলেই চোখ ছাড়িয়া দিতে হয়।
কাজেই পাঁচটা দিখা নাম করিয়া অশোকার সেই চম্পক-
অঙ্গুলি পাঁচটা আগনার চক্কর উপরেই বা কতক্ষণ রাখি
সে স্পর্শ-পাকি অগরের ঘাকিতে, পাতে, এ অসম্ভাবনাটাকেই
বা প্রেমের দ্বিই কেমন করিয়া? কাজেই প্রকৃতিজাত
বাসনারাশির সরল পরামর্শকে আমলে আনিত না দিয়া
অতি মুহূর্তে, বিলম্বিত-গমে বলিলাম, “অ—শো—কা।”

অশোকা হাত ছাড়িয়া দিল। হাসির অন্ত পৌরব
পূর্বে দেখি নাই; হাসি যে প্রেত মানব-প্রকৃতির অঙ্গ,
বাহুয়ের সহজাত-সংস্কার, তাহা পূর্বে কখনও বুঝি নাই।
অবল সরল হাতে তাহার মুখের স্বর্গীয় গুণমা যে কতদূর
বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নেরও দেখে,
মনে, প্রাণে বেন মোহ-মহিয়ার আবেগ ছুটাছুটি করিতে-
ছিল। জীবনে এমন অল্পকৃতি হয় ও হই এক মুহূর্তে আসে
—বাকী জীবনটুকু সেই হই একটা মুহূর্তের শুভাগমনের
অঙ্গ সাধনা যায়।

অশোকার কথা

অবিহ্বলতার তিমির-পার্শ্বে মাথুয়ের স্ট্রী চলে—নিশ্চর
চলে। বড়-বড় ঘটনার দ্বারা তাহারের সন্মুখে পড়ে—
নিশ্চর পড়ে। আর তাহাে বধন নয়া ত্যাগ করিয়া
প্রার্থনা করিতেছিলো,—ভগবানকে বলিতেছিলো, “পিতা:
অসতে শান্তি বিরাগ করক” তখন মাথার পাহাড় উপর
বড় সলিল স্রোতের হির জ্বলে একটা ঘোষেল পান গাহিতে-
ছিল, আর কমলালেবুর পাহাড়ের বড়-বড় পাতার মধ্যে
দুকাইয়া একটা বুলবুলি সর মিলাইয়া গাহিতেছিল,
“শিক্কো—শিক্কো”। পূর্ব-স্থ কল্লপশৃঙ্গার অতি মুহূ
পদ আসিতেছিল; চ্যাম্পার সঙ্ঘের সহিত গোলাপ-পদ

মিলিতেছিল। সেই সময় জ্যোতি-বাধাকে মনে পড়িতেছিল,
—আহা! আনন্ডা এমন সৌন্দর্য্য, এমন দিকবের মধ্যে
কাল-বাণন করিতেছি—আর তিনি চৌরঙ্গীর পাড়ির বড়-
ঘড়ানী, মোটরের পো-পো, কণ্ঠ-কণ্ঠ শব্দের মাঝখানে ঘুলা
ও ঘোঁঘর বেশে কত না কঠি ভোগ করিতেছেন! আর
বাগানে কত ফুল ফুটিয়াছিল, এত ফুল এক সঙ্গে কোন
দিন ফোটে না। প্রাণের ভিতরটা হুহুহু করিতেছিল।
জ্যোতি-বাধা কতবার শিলে আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন
—কই একবারও তো আসিলেন না। শুনিলাম, তিনি
বিলাত ঘাইতেছিলেন,—তবু তো আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করিতে আসিলেন না। আগনার মনে সাক্ষ করিলাম,
পোষাক পরিলাম—আশির সন্মুখে গাড়াইয়া চুলের উপর
খুব পরিপাটীরূপে কিটা বধিলাম। আর তাহাতেইলাম
তাঁহার কথা—তাঁহার সরলতা, তাব-প্রবণ চকলতা, আর
তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার। সম্মিততে ঘাইবার সময় না চিবুক
হাত বিয়া বলিলেন, “অশোকা, আর তোমার মাঝটি বেশ
হ’য়েছে।” আমার প্রাণ হুহুহু কপিঁয়া উঠিল,—সন্মুখে
হইল, বা বুঝি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, অন্ত-মনে কাহার কথা
ভাবিতে-ভাবিতে পোষাক পরিয়াছি।

তাই, যখন সত্য ছাড়িয়া গুহে আসিয়া বৈধিলাম,
আমাদের ফুল বিয়া সাক্ষানো ঘরে বেতের বেকে জ্যোতি-
বাধা বসিয়া সন্মুখে পোপাটের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া
আছেন, তখন আনন্ডে, আবেগে, উৎসাহে ছুটিয়া
গিয়া পিছন হইতে তাঁহার চোখ টিপিয়া ধরিলাম।
চোখা কী করিবে আমার সঙ্গে? চিঠি না লিখিয়া অকস্মাৎ
শিলে আসিয়া তুমি আমাকে বিম্বিত করিবে? বটে!
চোখ টিপিয়া ধরি,—দেখি, কে বিম্বিত হয়! পাহাড়ের
উপর থাকি বলিয়া বুঝি আমাদের বুঝি নাই? আমার
অস্থান সত্য হইল। জ্যোতি-বাধা বিম্বিত হইলেন। মুখে
এক মুখ হাসিলেন বটে, কিন্তু কিছুতে বুঝিতে পারিলেন না
আমি কে! হই পার্শ্বে হইটা হাত তুলিয়া তিনি অনেকটা
ইতস্ততঃ করিয়া তবে আমার নাম বলিতে পারিলেন।
কাহারের ব্যাক্যাতা যেমন বল বাপিরা অঙ্গের হয়, সেই
রকম বাপিরা-বাপিরা প্রথমে বলিলেন, “অ—”; কোনও
আপত্তি হইল না বুঝিয়া বলিলেন, “শো—”; তাহার পর
একবারে শব্দ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “কা”।

আমি হাত ছাড়িয়া হাততালি দিলাম। তিনি পাড়াইয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাসিলেন। তাঁহার সুখে খুব লাগিয়াছিল। আমি বলিলাম, “কেমন লক্ষ, কেমন ঠিকিয়েছি।”

তাঁহার মনের মধ্যে আশ্চর্য-প্রশংসার ধ্বনি উঠিতেছিল—যেন তিনিই আমাদের প্রত্যাশিত করিয়াছেন; কিন্তু এখন আপনাদের অধঃপাতি খেলদান উপলব্ধি করিলেন, তখন বলিলেন, “ঈশ, তোমাদের বাড়ীর যে দরজাগুলো জানতেন না। তা চলুন কে কাকে ঠিকিয়েছে দেখাযাক।”

কৃশ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এমন সময় আমার জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “জ্যোতি!”

জ্যোতিমাশ হাতাকে প্রশংসা করিলেন। মা তাঁহাকে চিবুক দিয়া আদর করিলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু কঁপিল, চোখ-জুনি একটু ছল-ছল করিল। কহিব্যাহই কথা, জ্যোতি-মাতার জননী ও আমার জননী বালাসবী—এক গ্রামের মেয়ে, এক সঙ্গে খুলে পড়িয়াছেন। জ্যোতি-মাতার দশ বৎসর হইল স্বর্গে গিয়াছেন; তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া, কি মা বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন? একটু সামলাইয়া লইয়া মা বলিলেন, “অশোকা বুঝি জানিতেন?”

আমার চুলের সমুদ্র কিংবদন্তীর অতীতে আমার হাত পড়িল। আমি সলজ্জভাবে বলিলাম, “না মা, মোটেই না।”

তুলিলাম, তিনি মোথারে কোন্ বস্তুর খালি বাড়ীতে উঠিয়াছেন। আমাদের পাড়ার নাম লাখান—মোথার আর একটা পাহাড়ে, ভিন্ন পাড়া। সেখানে ইংরাজি-শিক্ষিত সৌখীন বাসিয়া বাস করে। জননী বড় বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, “তোমার এ কি পাগলামি!” আমিও খুব রাগ করিয়াছিলাম। জ্যোতিমাশ! অপ্রস্তুত হইয়া একবার আমার সুখের দিকে চাহিলেন! আমার চোখে কোনও উৎসাহ না পাইয়া তিনি মাতার দিকে চাহিলেন। বাবা চুলকাইয়া বলিলেন, “বুড়িমা, একটু মুখিলে পড়েছি। পথে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে,—তিনিও আছেন কি না।”

গৃহে ছিল না। অনেক বাদ্যযন্ত্রাদি হইয়া গেছে স্থির হইল যে, জ্যোতিমাশ মোথারের বাড়ীতে রাখে গুইবেন মাত্র, কিন্তু দিন-রাত তাহাকে আমাদের সহিত থাকিতে হইবে। আজ বৈকালে তাহাকে কোন্ কোন্ দৃশ্য দেখাইব, সব বলিলাম। আমাদের একঘেরে জীবনে অতিথির সঙ্গে কত আনন্দ আসে, তাহা প্রবাসী মাঝেই বিধিত। বিশেষতঃ অতিথি যদি আত্মীয় হন,—অতিথির শুভাশমনের সমস্ত যদি বহুদিন প্রতীক্ষা করিয়া বলিয়া থাকিতে হয়।

জ্যোতিশ্বরের কথা

কার্য-কারণের রহস্য বিশ্লেষণ করিতে পারেন ধার্মিক, তাঁহারাই প্রতিভার দাবী করিতে পারেন। কি সামান্য কারণে কি গুরুতর কল কলিতে পারে, তাহা নিতাই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অসাবধানতা বশতঃ দশরথ রাজা বেঁচার সিদ্ধ মূলিক বধ না করিতেন, তাহা হইলে গোণার লক্ষ্য দৃষ্ট হইত না, রাবণ রাজা মরিভেন না এবং রাম, লক্ষ্মণ বা সীতাদেবীর আশ্রয় চরিত্রের বিকাশ হইত না। বিঃ চম্পটীর সহিত সাম্রাজ্যের পরিচয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, লোকাতাবে। ছোট রেল-পাড়িতে দুইজন মাত্র আরোহী ছিলাম—চম্পটী ও আমি। নিম্নরক্তার জীব কঠোরতাকে উপেক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ছিল—পরস্পরের পরিচয়। পরিচয়ে মুগ্ধিতও হই নাই; কারণ, তিনি কথাবার্তা কহেন ভাল, রসবোধও কতকটা আছে। মোটোটা হইতে শিল্পে উঠিবার সময় পাহাড়ের দৃশ্যপটগুলো এখন জীবন্ত ছাত্রাভ্যাসীর মত পরিবর্তিত হইতেছিল, তখন মোটর গাড়ীতে একজন সাবী না থাকিলে পথের ধারের পাহাড়ের মতই জীবনটা কঠিন ও গুরুতর হইত। এখন পাহাড়ের উপর একটা ছোট গ্রামের ধারে মোটর আসিল, তখন চম্পটী বলিলেন, “শিল্পে তাঁহার বাসস্থানের স্থিতি নাই।” জ্ঞাপোণার হইয়া মনের মধ্যে ছুটিতে-ছুটিতে এখন যেখানায়, পথের ধারে হইটা মৃগ রোমন্থন করিতেছে, তখন চম্পটী আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল; চালককে বলিয়া গাড়ী থামাইয়া সে দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল। এই রসবোধের পরিচয় দিয়াই একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টান্তে সে আমাকে নিয়ে

দিকে টানিতেছিল। ভ্রাংপোর আরও উপরে যখন সেখিলাম, আমরাও বত বেগে উপরে উঠিতেছি—উপর হইতে ভাঙোবদিক বেগে একটা একান্ত গিরিনরী ভীষণ কল-কল কানিতে আমাদের মোটর-পথের নীচে সর্বত্র ছুটিতেছে, তখন চম্পটী আমার গলা ভড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “বাঃ! কি মধুর! কি চমৎকার! আমি জাপান, নিকাপুর, হংকং সর্বত্র ঘুরেছি,—এত সৌন্দর্য্য কোথাও দেখিনি।”

সেই সৌন্দর্য্যবোধের আবেগ আমাকে পরাঙ্কিত করিল। আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। আমি বাগার একাকী থাকিব,—সে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত বাস করিতে পারে।

কিন্তু একজ সাত দিন বাস করিয়া বুঝিয়াছিলাম, চম্পটী নানা রসের রসিক। হুঃখের বিষয়, তৃতীয় দিবসে আমি চৈতন্ত বাবুর বাটীতে লইয়া গিয়া তাহার সহিত সকলের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলাম। সে ভাল সমাজে হিশিয়ারছে, সে বিধেয়ে কোনও সম্ভেহ ছিল না। সে খুঁড়ি-মা ও অশোকার সহিত অতি সশ্রদ্ধভাবে কথা কহিত। এক দিন আমাদের সহিত সে চৈতন্ত বাবুর বাটীতে রায়ে ভোজন করিল। সৌভাগ্যে ও প্রছায় সে অশোকাকে মুগ্ধ-করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অশোকা কোনও প্রকারে তাহাকে লম্ব করিতে পারিল না।

এইটাই আমার হুঃখের কারণ হইয়া উঠিল : তাহাকে বিধি-মতে বর্জন করিলাম, তবু দুঃখেক্তর মত সে আমাদের স্নাত আকাশে মাকে-মাকে উন্নয় হইত। অশোকা বিরক্ত হইত; নানা প্রকার কৌশল করিয়া তাহার লজ এড়াইতে হইত।

দ্বিতীয় হুঃখের কারণ হইয়া উঠিল, যেদিন সেখিলাম যে সে মত্তপায়ী। আমার পিতা ব্যারিষ্টার,—আমি যে সমাজে পালিত হইতেছিলাম, সে সমাজে মত্তের ভেদন অন্যায় ছিল না। কিন্তু আমার পিতার পান-পোষ ছিল না; এবং তিনি সর্বদা আমাকে মত্তপের ভীষণ পরিণাম লক্ষ্যে বক্ষতা দিতেন। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা মত্তে বেশী তৃপ্তা ছিল চৈতন্ত বাবুর। তিনি ঘণ্টের অন্ন, অমল জীবন-বাপন করিবার ক্ষত্র ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন;—পবিত্রতা তাঁহার জীবনের ইতিহাসের প্রতি ছুরে লিখিত ছিল। সুতরাং চম্পটী যেদিন আমার অসুস্থতি লইয়া প্রথম

হুত্ৰা পান করিল, সেদিন আমি আপনাকে ঘোরতর অপরাধী মনে করিলাম। যদি চৈতন্ত বাবু জানিতে পারেন! যদি অশোকা বুঝিতে পারে!

তাহার পর বুঝিলাম, চম্পটী আরও রসিক। শিল্প-যাত্রীর প্রথম লক্ষ্য হর খাসিয়া স্রোতাক। বেশ ছুটপুট সবল রমণীর মল—একটু ধরিয়াত বেহ, রক্তাক্ত গও, চোপটা নাসিকা—দিবা-রাত্রি বোম্বাছির মত পরিভ্রম করিতেছে। তাহার আমাদের মত মূলভা নহ; তাই তাহাদের সমাজ-বন্ধনে শাসন-অনুশাসন হুঃশাসনের ধুমধাক্কা নাই। ইহার প্রকৃতির সত্ত্বতি, প্রবৃত্তিবশে কার্য্য করে। ইহাদের নীতি বা দুর্নীতি লক্ষ্যে লাহেব ও বাসানীসের ধারধার কতক আভাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, পাণ্ডু হইতে আদিনাগাও পার হইবার সময়, ব্রহ্মপুত্রের উপর স্রিমায়ে থানা থাইতে বসিয়া। তিন-চার দিনের মধ্যে সেখিলাম, চম্পটী বাগারে-বাগারে ঘুরিয়া তাহাদের ভাষাটা কথকিং খায়ত করিয়াছে। একদিন আমরা বাসানার বারান্দার বসিয়া গল্প করিতেছি, তিনটা খাসিয়া বালিকা পৃষ্ঠে বীশের চোকা বাঁধিয়া কোথায় বাইতেছিল। চম্পটী তীব্রকার করিয়া বলিল—“আলে, আলে, আলে হাজেনে।” পরে তিনটিয়াছিলাম কথাকলার স্বর—এল, এল, এখানে এল।

বালিকাজর হাসিয়া নিকটে আসিল। একজন বলিল—“খুংলে, বাবু, খুংলে।” আমি “খুংলে” জানিতাম; খুংলে মানে সেলাম।

সে বলিল—“দেই সেনো?”

বালিকা বলিল—“টুং, উং।”

চম্পটী বুঝাইয়া দিল। বলিল—উহার লল জানিতে হইতেছে।

আমি বলিলাম—“এ তাহা শিশুত্বের কেন?”

চম্পটী হাসিল। বলিল—“আমার খাসিয়া পাহাড়ে আগার উদ্ভেদটা ভুলে যাচ্ছেন। আমি জাপান থেকে মোমোছির চাষ করবার প্রোগামী শিখে এসেছি। এখানে মোচাকের ব্যবসা করব। আর বুকেছেন তো, মধু আহরণটা সর্ব্ব প্রকারেই করা চাই। কেন খাসিয়া দুইভীতলা?”

আমি বলিলাম—“রক্ষা করুন। আপনি খাসিয়া বিবাহ করুন, আমার ওদিকে কচি নাই।”

বেচিতাম, শোকাটা হাটে-বাজারে খাসিয়া যুবতীদিগের সহিত রহস্যলাপ করিত। আমাদের বাসার একটা যুবতী কাটাঁই ছিল। কাটাঁই বলে দাসীকে। কাটাঁই বেশ সুন্দরী—বাদামী রত মুখ;—নাম শেন্নাক। কাটাঁই তাহাকে চুণা করিত, অধিবাস করিত, বোধ হয় একটু ডর করিত। কাজেই সে আমাকে শ্রদ্ধা করিত; আমার কাঁধা করিতে, আমার সেবা করিতে সুখানুভব করিত। ডোর হইলেই দরজার পার্শ্ব আদিয়া বলিত “উম্ শীট বাবু,” চম্পট বসিয়াছিল, তাহার অর্থ গরম জল। হস্তাংগ শেন্নাকের অহুগ্রহে আমি ডোরের উঠিয়াই গরম জলে মুখ ধুইতাম। তাহার পর সে আনিত “সি বুই সা” এক পেয়ালা চা। এ সকল রূপাংগার পরিবর্তে আমি তাহাকে দিতাম—হুই চারি খানা পরমা আর এক একবার হাদি মুখে বলিতাম—“বুবে”। শেন্নাক তারি রম্য বোধ করিত। আমার জামা বাড়িত, জুতা বাড়িত, “শীট সা” আনিয়া দিত।

এ বিবর লইয়াও চম্পটী আমাকে পরিহাস করিত। শোকাটার উপর আমার বিকৃত। দিন-দিন বাড়িতেছিল। কিন্তু অচল টাকার দত্ত কিছুতেই তাহাকে বর্জন করিতে পারি নাই।

অশোকার কথা

যেমন নির্মল শরতের আকাশ অনাবিল, স্বর্গালোক-মণ্ডিত,—আমার মনের আকাশও তেমনি নির্মল, তেমনি সুন্দর। অনাবিলে লাবন পাহাড়টার সর্বোচ্চ শিখরের নাম শিলঙ। ওনিয়াছি, খাসিয়া-বৈলপুঞ্জ—শিলঙ শিখরই সর্বোচ্চ। সেই শিখরদেশে এক-আধ টুকরা কুয়ালা ঐশ্বর্যবানের ঘোঁসাঘেঁষের মত, সর্ব্বদাই কুলিয়া থাকিত। সে কুয়ালা এত দূরে যে, তাহাতে শিলঙবাসীর সুখের ব্যত্যয় হইত না। আবারও সুখাকাশে বহু দূরে এক টুকরা কালা মেঘ ভীত শিশুর ক্ষুধার ডয়ের মত, বিতীর্ণিকা সৃষ্টি করিত। সে চম্পটী সাহেবের উপস্থিতি। শোকাটা কথাবার্তা কয় ভাল, শিক্তি বসিয়া মনে হয়, ধূমপানের উপর ঐশাচ প্রভা; তাই মধু-মসিকার আবাস করিয়া বন্যবাতাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিতে মনস্থ—কিন্তু তালিকানা। কখন কোথায় বাহিতে বর, কাহার সঙ্গে

নিশিতে হয়, তাহা জানে না। আর আমার মনে হইত, তাহার চক্ষে একটা শ্রবণবার তাব আছে। এ কথাই ইন্দিত আমি জ্যোতি-দাদাকে একদিন দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। সে প্রত্যয়ক হউক, শাধু হউক,—তাহাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। কিন্তু সে অতিশয় বে-ভাল। বাস্তবের মত মাকে-মাকে আমাদের সন্ম লইত, কিছুতেই ভক্তভাবে তাহাকে বর্জন করিতে পারিতাম না। তাহাতে এক-একবার বিরক্তি আসিত। কারণ জ্যোতি-দাদার লহিত গল্প করিবার প্রসঙ্গ আমার অনেক। তাহার সহিত গল্প করিবার হেবে আশী-দারের চিন্তা একেবারে অসম্ভব। আর সভা কথাই বা লিখিতে যোয কি? এ ডোহেরে তো আমার নিষেধ।

সে দিন শিলঙ সন্ধ্যাবের গড়ানে জমিতে বাসের উপর বসিয়া জ্যোতি-দাদার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। চমিকের গড়ানে জমি শুষ্ক-শুষ্ক উঠিয়া গিয়াছিল। চারিদিকেই সুবৃহৎ তরুজাতির কালা ছায়া শিলঙ হ্রদের বহুদে জলে মুহু বায়ু-হিলোলে স্পন্দিত হইতেছিল। সন্ধ্যার উপর ধোঁয়েল ডাকিতেছিল—সমস্ত রূপগুণ একটা সুখের স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছিল। সেই সময় আমার সেই স্পন্দন আসিয়াছিল—বে আনন্দ, বে শান্তি বিধ-পিতার নিকটে প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া চোহিতাম—সেই আনন্দের বহরে-লহরে সারা সৃষ্টি, সারা প্রকৃতি বিস্তার হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সুখ-মদিয়ার স্বাদ পাইলাম, তাহা বলিতেছি।

হ্রদের ধারে বসিয়া ছিলাম। আমি বলিলাম—“জ্যোতি-দাদা, বিলেতে গিরে যদি আমাদের ভুলে যাও?”

পুলের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—“গা’তে না ভুলি, সেই ব্যবস্থা করবার জন্মেই তো শিলঙে এসেছি অশোকা।”

কি জানি, কি একটা অজানা সম্মেহে বৃক্টা দ্রুদ্রু করিতেছিল। চিত্ত-কম্পননের বাড়ীর মধ্যমের ইউ-ক্যালিপটাস গাছে বসিয়া একটা গুণু গুণু করণ করে ডাকিতেছিল। আমি তাহার-সুখের দিকে চাহিলাম। তিনিও যেন একটু লজ্জিত। আমার মুখ হইতে বাহির হইল—“কি বকব?”

জ্যোতি-দাদা বলিলেন—“বাবার ইচ্ছা যে বিলাত

হাইবার পূর্বে—মানে বিলাতে বাসালী দুবক্কেহ বিলাদ খুব
বেশী—তাই মানে—বাবার ইচ্ছা—”

আমি বলিলাম—“কি?”

“বিবাহ করে যাই। তাই শিলঙে পাঠিয়েছেন।”

কুকর ভিতর একেবারে আলাদা মেল ছুটিতেছিল—
হুড়ুহুড়ু হুড়ুহুড়ু মলা তুকাইতেছিল, তবু কি আমি কেন
বলিলাম—“শিলঙে কেন?”

কেন? তাঁহার সেহের চাকের মুহু ভৎসনা উত্তর দিল
—বিবাহ করিতে শিলঙে কেন? তাঁহার অভিমান-ভরা
কল্পিত কর্তব্যের জোর করিয়া কণ বলিয়া বলিয়া দিল—
তিনি কাহাকে বিবাহ করিতে শিলঙে আনিয়াছেন।
তাঁহার আশ্রয়ের মত নয় কল্পিত অসুশিক্ষিতা বলিয়া
দিল—কেন? তবু তিনি কল্পিত-ওটে অভিমান-ভরা
ভিত্তান্তের কল্পিত হয়ে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—
“অশোক!”

আমি তাঁহার সে আবেগের গভীর দৃষ্টি সহ্য করিতে
পারিলাম না তাঁহার কল্পিত হৃদয়ের উকল্শ সহ্য
করিতে পারিলাম না। আমি ছই হাতে চোখ টিপিয়া
ধরিলাম। মনের ভিতর হতদুঃখ দৃষ্টি চলে, ততদূর চাহিয়া
দেখিলাম—জন্মের পরবার-পরবার, পোষিতের স্পন্দনে-
স্পন্দনে রমণী-প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রেস্ত ভাবে মিশিয়া-
মিশিয়া এক হইয়া আছে তাঁহার মধুর স্মৃতি, তাঁহার কর্ত-
ব্য, তাঁহার উপায়তা। ও হা! আমার অন্তর্কিতে চোখের
মত তিনি কেমন করিয়া আমার প্রাণের কৈশোর সকল অস্ত,
সকল কল, সকল প্রাণের দখল করিয়া লইলেন? এতদিন
আমার নারীহীনতা লক্ষ্য কেন এ কথা বীকার করিতে
যের নাই; কিন্তু এ অনন্ত ভালবাসার ভাবীরনী তো আমার
কখনীতে বহিয়া বাইতেছিল। আজ মন স্পষ্ট করিয়া গাহিল
সেই স্তর—যে একমাত্র স্তর সে আত্মীবন সাধিয়াছে।

একবার আত্মশ্রের স্বর্গ দিয়া তাঁহার হৃদয়ের দিকে
চাহিলাম। তিনি নিম্নমেঘ শোভনে আমার দিকে চাহিয়া
ছিলেন।

“আমার গান ভাড়াইয়া তিনি বলিলেন—“চল।”

আমি উঠিলাম। উত্তরে বিহারপূর্বে উঁচু-নীচু পথের
উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে ক্লিষ্টোবেরিয়া ও
উইলো আমাদিগকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। সুরল

গাছগুলো উর্দ্ধমুখে আমাদের হৃদয়ের সমোদ বিব-শিতার
ঐচ্ছরণে নিবেদন করিল।

জ্যোতির্জয়ের কথা

যে সময়ে পালিত হইয়াছিলাম, সে সময়ে বিবাহের
বিষয়ে চক্ৰবাক্য, দুর্গলতা বলিয়া পরিগণিত হয়। যখন
পিতা শিলঙে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—
“আমি নিজে চৈতন্তকে লিখিতে পারি। কিন্তু তোমার
বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত তোমার নিজের। প্রথমে
অশোকার সম্মতি নিও। যেন আমাদের দুই পরিবারের
বন্ধুত্বের খাতিরে তুমি বা অশোকা চিরদিনের জন্য কষ্ট
পেও না।” আমি জানিতাম, এ সম্মতি পাইতে এত দূর
পণ-দ্রব্য অব্যবস্তক। কিন্তু অব্যবস্তকতাও সামাজিক
নিষেধের বশে অনেক সময়ে আমাদের পরিচয়ের দাবী করে।
শিলঙে প্রথম দিনেই ব্রিগ্যাছিলাম, সে গুণ অধিকার
করিবার জন্য তলি-বাকল যাড়ে বহিয়া আমিযাছি, সে দুর্গ-
দাবী আমি। শিলঙের হৃদয়ের ধারেও অশোকার মৌন-
সম্মতি পাইলাম। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা আসিতেছিল,
আমি চৈতন্ত বাবুর সম্মুখে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারি-
লাম না। আহা! অশোকের কি ভগ্ন-দাখুদী সে দিন
দেখিয়াছিলাম, যে দিন হৃদয়ে সত্যোত্তরতার তাগকে মনের
ভাব বিবৃত করি। এ কথা কাহাকেও বলি নাই। বলি-
বলি করিয়া ছইবার চৈতন্তবাবুকে বলিতে পারি নাই।
অশোকের সম্মতি পাইবার চই দিন পরে সাবানের পুলের
উপর গাড়াইয়া অন্ত-মনে একটা বস্ত্রের পানীর নৃত্য
যেখিতেছিলাম। সাবানের পুণ হাওড়ার পুলের মত
দীর্ঘায়তন নয়, সাবানের নদীকেও সৌন্দর্য্য প্রকাশ
করিয়া নদী বলিতে হয় মাত্র। একটা বড় স্বর্ণা
বধকিং সমস্তল তুমি পাইয়া কিয়দূর সন্তোষে
ছুটিয়াছে। নানা রকম আকারের উপলব্ধের বাধা
পাইয়া তাহার জল খুব গভীর কলরব করিয়া আপ-
নাকে স্রোতবতী বলিয়া চীৎকার করিবার অবসর
পাইয়াছে। কাজেই সেতুটি ২০ ফিটের অধিক প্রস্থ নয়।
যখন পুলের উপর গাড়াইয়া বস্ত্রের নৃত্য দেখিতেছিলাম,
দেখিলাম, চৈতন্তবাবুর সহিত চন্দ্রী আসিতেছে। আমাকে
দেখিয়া চৈতন্তবাবু বলিলেন—“কবে কলিকাতা যাবে?
সুনিচি না কি আর বেশীদিন থাকবে না?”

আমি বলিলাম—“হ্যাঁ, গেলেই হয়। তা’ আপনায় সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে—বাবা বলতে বলে দিয়েছিলেন।”

চৈতন্যবাবু বলিলেন—“আজ বিশেষ কথা শুনবারই আমার দিন। তোমার বন্ধু চম্পটী সাহেবও আজ বিশেষ কথা বলবার ভণিতা করে—”

তিনি হাসিয়া চম্পটীর দিকে চাহিলেন। চম্পটী খুব লজ্জিত ভাবে বলিলেন—“আমি নিশ্চয় সেনের সম্বন্ধে প্রশংসা করছি।”

আমার ক্ষময়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে বিষয়ের আর উল্লিখ “—কি?”

চৈতন্যবাবু খুব সরল ভাবে হাসিয়া বলিলেন—“চম্পটী মহাশয় আমার কন্ডাকে বিবাহ করিতে চান। অশোক! এখন ছোট—ওর বিবাহ কি?”

সমস্ত লাবানের পুলাটা কাঁপিতেছিল, লাবানের পাখাফটা কাঁপিতেছিল, আমার জিহ্বাটাকে অল্প-বিক্রমে কে ভিতর হইতে টান মারিতেছিল, কে বেন আমার ক্ষপিত-টাকে ভীম পরাক্রমে গোঁগা ধরিতেছিল। ইংরেজ বাঙ্গালীর হস্তে অস্ত্র ঘের নাই,—খুব বৃদ্ধির কাজ করিয়াছে। সে সময় আমার নিকট কোনও অস্ত্র থাকিলে নিশ্চয় তাহাকে খুন করিতাম। কি পক্ষা! ছোট মুখে কত বড় কথা! অজ্ঞাতকুলশীল, কুচরিত্র, মাতাল—উঃ! কাল কীট! ফুলের সঙ্গে তুমিও সাধুদের শিরে উল্লিবার দাবী রাখ!

এ সব চিত্তাকুলতা দুহুস্তের দ্বারা আমার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তখনই সামলাইয়া লইলাম। প্রকৃতিস্থ হইলাম। ইহার নাম সভ্যতা, সভ্য সমাজে ইহার নাম তত্ত্বতা। যে বস মনোভাব গোপন করিতে পারে, সম্বন্ধ-সম্বন্ধের গলা টিপিতে পারে, সে তত সভ্য, তত তত্ত্ব।

চৈতন্যবাবু আমার মনোভাব বৃত্তিতে পারিলেন কি না জানি না; আমাকে বলিলেন—“চল।”

আমি বলিলাম—“আপনাদের ওখান থেকেই আগছি,—এখন বাসায় যাব।”

চম্পটী বলিল—“আমিও মিঃ মাসের সঙ্গে যাই।”

চৈতন্যবাবু চলিয়া গেলেন। চম্পটী বলিল—“আমি আপ’ সেনিটেরিয়মে বাগা টিক্ করছি। কাল বাহ পরন্তু সেখানে উঠে যাব।”

আমি আশ্চর্য করিলাম না। সে রাতে বস্ত্রপূর পারিলাম, তাহার সন্ধ্যা ভাগ করিলাম। পরদিন প্রভাতে সে আমার কক্ষে আসিয়া বলিল—“আজ বড়বাঝারে যাবে না?”

আমি বলিলাম—“না; পরে যাব। আমার ছোট টাকার ধলোটা কোথা গেল কে জানে?”

সে বলিল—“কত টাকা ছিল?”

আমি বলিলাম—“না, টাকা বেশী ছিল না,—পাঁচ মশ টাকা।”

সে বলিল—“কাণ্টাইকে বললে খুঁজে দেবে এখন; ব’লো—জেই ইয়েরেঙ্কে।”

একটা কানকে সে কথা করটা শিখিয়া চলিয়া গেল। শিলঙে প্রতি অষ্টম দিনে একটা করিয়া খুব বড় হাট ঘose—তাহার নাম বড়বাঝার। বড়বাঝারে সমস্ত খাসিয়া পাহাড়ের লোক জমে। খাসিয়াদের সে দিন বড় উৎসবের দিন। সপ্তাহের মধ্যে সেই এক দিন তাহারা উদ্ভব বেশ-ভুজা করে। পূর্বদিন যান করিয়া আপনাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। শেতাকও সে দিন খুব খাসিয়াছিল—পরিষ্কার ঘাসরা পরিয়া, যাত্রার ধলের ঝাণাল বালকদের পীতমন্ডার ধাকে একখানি সত্তা অথও টেকুদার শাল বাধিয়া, একটা “কমুন”র (ধলিতে) পান ও মূল্যবী লইয়া সে কাজ করিতে আসিয়াছিল। আমার বাসার সম্মুখেই বড়বাঝার। সে আমার জিনিসপত্র ব্যভিভেছিল। আমি তখনও পোষাক পরি নাই—মানের ক্ল্যাসের ইয়ার পরিয়া বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ আমার মণি-ব্যাগের কথা মনে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—“হামারা মণি-ব্যাগ জানতাম? মণি-ব্যাগ—টাকা বিস্মে রাখত।”—বাকীটুকু ইচ্ছিতে বুঝাইলাম।

সে হাসিয়া বলিল—“এম্টিপ্।”

আমি বলিলাম, “এম্টিপ্ কাঁধ হার—এম্টিপ্।”

সে বলিল—“এম্টিপ্। কিজ্‌নি।”

আমি ‘কিজ্‌নি’ জানিতাম। কিজ্‌নি বাঙ্গালার ‘কি জানির’ অপভ্রংশ। এম্টিপ্ কিজ্‌নির খাসিয়া। বৃষ্টিলায়, সে আমার প্রায়ই মুখে নাই। তখন চম্পটীর স্ত্রীসঙ্গে লেখা কথাগুলো বলিলাম—“জেই ইয়েরেঙ্কে।

প্রথমে যুবতী একটু স্তম্ভিতের মত হইল। তাহার

পর তাহার গণ্ডগল ঘোরতর লাগে বর্ষ যারও কছিল—সে
জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া আমার হাঁটু ধরিয়া অপর হাতে চকু
ঢাকিল! সেই রকম চকু ঢাকিয়াছিল অশোকা। সুবতী
আমার ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল; এমন তাহা বুঝিতে
পারিলাম। কি সর্বনাশ! কি শরভানী! ক'দি বাইতে
হয় বাইব,—চম্পটাকে খুন করিব! খেঁ ইয়েই কে,—পরে
বুঝিয়াছিলাম—তাহার অর্থ “আমি তোমার ভালবাসি।”
আমি কি করিব ঠিক করিতে পারিলাম না। অন্তত্বতা
করিবারও কারণ দেখিলাম না। আমি সময়ে তাহার
শিঠে হাত দিলাম—সহসা স্নানাগার দিকে চাহিয়া দেখিলাম
—অশোকা!

অশোকা! সর্বনাশ! তাহার চক্ষের অপরূপ
কটাক দেখিলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্নানাগার দিকট
গেলাম। বাঘের ভয়ে ভীতা হইয়া কুয়দিনী যেমন
পলায়ন করে, অশোকা সেই রকম পলাইতেছিল—তবে
একটু হাত-পা বেঁকায়, একটু হাতলামির ভাব। আমি
ডাকিলাম—সে সাড়া দিল না। পোষাক পরা ছিল না—
ছুটিয়া তাহার দিকে বাইতে পারিলাম না। ঘরের ভিতর
চাহিয়া দেখিলাম, শেলাক উঠিয়া গাড়াইয়াছে—নিম্নমেঘ
নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহারও চক্ষে অপূর্ণ
বিষয়ের ভাব—বিষয়ের সহিত ভালবাসা মিশ্রিত।
আমার অবস্থা ভীষণ! মধ্যে আমি—দুই দিকে দুই জন
সুবতী;—উভয়েই আমাকে ভালবাসে—একজন দেখি,—
একজন বিদেখি।

অশোকার কথা

সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। বিশপ মলগ্রাপাতের
ধারে তাঁহাতে-আমাতে বসিয়াছিলাম। তিনি বলিতে-
ছিলেন—“অশোকা, এখন ছদ্মবেশে নীড় ধরিয়া নগর করিব,
তোমার দয়ার ধারা বেনে বর্ষিত হইয়া পাবানগুলার উপর
এই রকমে শান্তিলাভ করে। আমাদের উপার্জনের
অর্ধেক বেনে আমরা গরিবসেবার বার করিতে পারি।”
তাঁহার মুখ স্বর্গীয় বীণিতে উদ্গাদিত—তিনি যেন স্রাব্য
চিরদিনের সুরে-বাঁধা তারুণ্যের বক্তার দিলেন।

এই সুখ-স্বপ্ন ভাঙিল একটা কল্প আর্দ্রনায়ে। কাতর
পঙ্কর বর। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কদল ভাড়াইয়া বারান্দার

পেলাষ—একটা বিড়াল একটা পাখীর হানা বহিরাছিল।
আমাকে দেখিয়া পলাইল, পাখীর কুহু গ্রাণ বাহির
হইয়া গেল, তাহার কাতর আর্দ্রনাশ শুভ হইল।

সেদিন বড়বাজার। বাবার সহিত বড়বাজারে গেলাম।
অল্প দিন অন্ত চক্ষের উপর পড়ে না। আশু প্রভাতের
শোকের দৃষ্টে মনটা তিঝিয়াছিল। বাসিরাগুলো বড় বড়
শুকর সিঁচ করিয়া বিক্রয় করিতেছে,—বাঁচা তরিয়া ঘোরণ
আনিয়াছে, মৌচাক তামিরা আনিয়াছে—বেচারা মৌমাহির
কত কষ্টের মধুতে তরা ঢাক। বাবা ক্লশকপির দর করিতে-
ছিলেন, আমি তাঁহার দিকট অতৃপ্তি লইয়া তাঁহাকে
ডাকিতে গেলাম—বাজারের নীচেই তাঁহার বাসা। পথে
চম্পটীর সহিত দেখা হইল। সে খুব সৌন্দর্য দেখাইয়া
ঝোড়পথে চুপি খুলিয়া আমাকে অভিযান করিল।
আমি কি করি? অসত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—
“হ্যাঁ—মি: দাস কোথা?”

তিনি বলিলেন—“বাড়ীতে ভাল সঙ্গীর কাছে আছেন।”
তাঁহার চক্ষের কোণে বিষের ছুরি লুকান ছিল—সে
জ্বর, কুটিল ভাবটা আমার ভাল লাগিল না। তাড়াতাড়ি
তাঁহার বাসায় গেলাম। দৃষ্ট পথেই চেরে অনেক ক্রত-
গতিতে তাঁহার গবাকের ভিতর দিয়া ককে প্রবেশ করিল।
সর্বনাশ! তাঁহার পদপ্রান্তে একটা বাসিয়া সুবতী এক
হাতে জাহ্নু ধরিয়া বসিয়া আছে,—অপর হাত বক্ষে। আর
বাঁহার বেষের স্তূতিতে আমার সারা প্রকৃতি গহ্বীর অশে
জিহবের শান্তি মাখাইতেছিল—তিনি—সবেহে সেই নির্লজ্জ
পথের রমণীটার শিরে হাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে-
ছিলেন। কি মর্মভেদী প্রেমের আধ্যাতিক—কি পাশব
দৃষ্ট!

কি প্রকারে নিষ্কর ককে প্রবেশ করিয়াছি জানি না—
কিসের জলে আমার বাগিন্স তিঝিয়াছিল, তাহা অতৃপ্ত
করিলাম যাই। কতকণে স্ববয়ের, সারা ঘোবনের, নিকিত
আশা গলিয়া চোবের ভিতর দিয়া উপাধান সিক্ত করি-
য়াছে, তাহার সন্ধ্যা রাধি না। বুঝিতেছিলাম, বুকের
উপরে একটা ভীষণ গুরু ভার। পাবান-পিথর সর্ব অর্ধে
হৃদিকার পরিচ্ছন্ন গরিয়া আমার বকের উপর চাপিয়া
বসিয়াছিল। আমার তাসের বর পলাবাত করিয়া তামিরা
দিতাছিল—জ্যোতির্গর—সদা নশনে জড়। ওঃ! সামান্য

একটা পথের কাটা-ফুলের মত তিনি আমার এই নির্মল মন-কল-হৃদয়ের পুরাতন ভাগিতে পদাঘাত করিলেন।

২য় বীচিয়া থাকে প্রেম, কষ্ট সহ্য করে প্রেমের দ্বারে, তাহার কাণে বিশ্ব-প্রকৃতির এক সুর—প্রেমের সুর। আর আশি আমি যুগিতা, উপেক্ষিতা, প্রতারণিতা। এক দুহর্ষে বালিকা অশোকা মরিয়াছিল—তাহার সঙ্গে তাহার বস প্রেম, বস আশা, বস নির্মলতা, ওঃ! মাগো! এক দুহর্ষে! হা ভগবন্!

সহসা গৃহে জননী প্রবেশ করিলেন। আমি নিম্নার জ্ঞান করিলাম। তান করিলাম,—জননীকে প্রতারণা করিলাম,—এই প্রথম। আমি তো আর অশোকা নহি—আমি হান্সী, প্রেতিনী, ছায়া-বাকীর স্বন্দরী—ভিতরে প্রাণ নাই, আত্মা নাই।

‘না ডাকিলেন—“অশোকা!”

আমি চক্ষু মুছিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন—“কখন এলি? অগ্রহ করিতে?”

আমি বলিলাম—“হাঁ, মাথা ধরেছে।”

মাতা বিস্মিতা হইলেন। আমি ছায়াবাকীর ভূত—আত্মহীন দেহ। আমার আবার সত্য-মিথ্যা? মাতা কার্ধ্যাশ্রয়ে গেলেন। আমি অনেক সমালোচনা করিয়া একটা সম্বন্ধ করিলাম—চন্দ্রটিকেই বিবাহ করিব।

বাস! বাস! তারি সাধু সম্বন্ধ, বড় সমীচীন! যে মন্দির হইতে দেবতা গলাইয়াছেন—সে মন্দিরের আবার পবিত্রতা কি? যে দেহ হইতে আত্মা পলাইয়াছে—সে দেহের দাবী তো শূন্য, কুহুর, গুণের। আমার দেহটা চন্দ্রটার হাতে কেলিয়া দিব—ইহাতে আবার ভাবিবার কি আছে? আর হৃদয়ের খুব নীচে একটু দর্শনার অগ্নি,—একটা নরকের শিখা, লকলকে জিহ্বায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রতিহিংসা! হিংস! হিংস! না! কেন না?—আমার কেনন রক্তাগার ধরণ করিয়াছে, আমার কি অমল পবিত্র কুহুমরাশি পদাঘাত করিয়াছে, আমার কত সাধের গড়া, কত স্বপ্নের রচিত স্বপ্ন-সৌন্দর্য—ওঃ! ভগবন্! কেন এ শাস্তি দিলে—কেন আমার কুহুম-গড়া প্রাণটাকে পদাঘাতে পরিণত করিলে?

জ্যোতির্ময়ের কথা।

প্রাণের মধ্যে লক্ষ কথা গুমরিতেছিল; কিন্তু সেগুলি

ভীষণ পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, মনের মধ্যে কারাকন্ড হইয়া। কন্ড বাক্যের দাতনা বিধম, বিশেষতঃ যদি বাক্য-ভুলকে থাকে দিয়া সারি দিয়া মনের মধ্যে সাধাইয়া-গুহাইয়া রাখা হয়। বাংলার নিকট বুঝাইবার মত এত মানসিক উত্তেজনা, এত অবসরের অল্পসন্ধান, সে যদি ভুলিতে না চায়, অবসর দিতে একান্ত পরাধীন হয়, তখন সংগ্রামটা কত অধিক হয়, তাহা বুঝিবার অধিকার আছে শুধু কৃত্তভোক্তার। অনেক অবসর হুঁজিগাম, অনেক সাধা-সাধনা করিলাম, অশোকা কোনপ্রকারে মাতার কাছ-ছাড়া হইল না। তাহার মনে কি ছিল জানি না। সে সাক্ষাতে কাহাকেও জানিতে দিল না—আমার সম্বন্ধে তাহার কি ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু তাহার চক্ষের কাতরতা দেখিয়া তাহার কথাবার্তার দৃঢ়তা দেখিয়া—অশোকার আসল মনোভাব আমি বুঝিয়াছিলাম। নরবাতকও বিচারালয়ে আপনাব কথা বলিতে পারে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! অশোকা আমার সাক্ষাৎ পুনিল না, এ বড় বিড়ম্বনা।

এই রকমে সাত দিন কাটিল। বাড়ী কিরিত্তে পারি না—একটা ভাবাব না দিয়া; চৈতন্ত বাবুকে বিবাহের কথা বলিতে পারি না—ভয়, জানি না, এখন অশোকা আমাকে গ্রহণ করিবে কি না! অশোকা গ্রহণ করিবে কি না? ওঃ! চিত্তটোর ভিতর সহস্র গোখুরা সাপের বিব সুস্মারিত ছিল।

অষ্টম দিনে চৈতন্তবাবুর সহিত লাভানের ময়দানে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দুখ চিন্তাতারঙ্গিত। আমি তাঁহাকে অভিযান করিলাম। তিনি বলিলেন—“তুমি চন্দ্রটার বিষয় কিছু জান?”

আমি বলিলাম—“কেন?”

“একটা বড় বিপদে পড়েছি। কেনন ক’রে কি হ’ল জানি না।”

আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল। এমন কি অবলম্ব হইতে পারে? আমি বলিলাম—“কি বিপদ?”

তিনি বলিলেন—“জান, সে একবার অশোকাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিল? আজ আমার বললে, অশোকার কাছে সে প্রস্তাব করেছিল—অশোকা সম্মত হইয়াছে। অজাতকুলশীল—”

আমি আর শুনিতে পাইলাম না। একটা দেবদাক

বৃক্ষের বন্য ধারণ করিয়া আপনাকে স্থির করিলাম।
স্থির ভাব কি বৃক্ষ হইয়াছিল জানি না। চৈতন্যবান
আমার স্থখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“জ্যোতি, আমি
তোমাকে পুত্রের মত দেখে করি। আমি আমার অবস্থা
জানি—আমি দরিদ্র কেরাণী মাত্র। তোমার পিতা যেন
যায়ে আমার চেয়ে বড়। আমার দ্রো শোধ করিয়াছিলেন,
কিন্তু আমি কোনও দিন তাবি নাই—”

আমি একটু সামলাইয়া লইলাম। সত্যতা! ভ্রষ্টতা!
বলিলাম—“কি?”

তিনি বলিলেন—“আমি সত্যের অমুরাণী। আমি
কোনও দিন তাবি নাই যে, ভূমি আমারের—ওর
নাম কি?”

আমি বলিলাম—“জানাই হ’তে পারব? আমি সেই
জন্তই এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু—”

তিনি বিম্বিত হইলেন। বলিলেন—“তবে এতদিন
বলনি কেন?”

মুহুর্তের অন্ত সংগ্রাম হইল—আত্মাভিমান এবং নিম্নের
শুধ—তিনি সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্ম, তাহাকে কি শেরাকের গল্প
বলিয়া—না—না—আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম—“অশোকা
আমাকে গ্রহণ করবে না বলে।”

তিনি বলিলেন—“অশোকা তোমার গ্রহণ করবে
না?”

আমি বলিলাম—“আমি তার মনোভাব জানি। আপ-
নার পায়ে পড়ি, তাহাকে অস্বরোধ করবেন না।”

তিনি বলিলেন—“না—অস্বরোধ ক’রব না। আমি
স্বাধীন বিবাহের পক্ষপাতী। তবে চল্গী—”

আমি ক্ষিপ্তের মত তাঁর হাত বহিলাম। বোধ হয়,
আমার হাত সেই শীতপ্রধান শিলপ পার্বত্যেও অগ্নিতেছিল।
তিনি যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—
“না—সোহাই আগনার। এমন নিষ্ঠুর কাম ক’রবেন না।
তার সঙ্গে আপনার কস্তার—”

তিনি বলিলেন—“কি জান, বল ত।”

আবার ভ্রষ্টতা ও সত্যতা আসিল। পরের চরিত্রের
কথা বলিতে সমাজ নিবেদ্য করে। তবে বন্ধুর হিতের
জন্ত—না কাম নাই। অন্তরগণে কার্য হাসিল করিব।

আমি বলিলাম—“তা’ ব’লব না। কিন্তু কোনও হতে

না,—আপনার পায়ে ধরি, খুঁড়িয়ার পায়ে ধ’রে আসব—
কোনও মতে না।”

তিনি বলিলেন—“বুঝি না, কে কোথায় একটু সত্য
পোষন করছে, তাই এত হাসাধা হ’তে। চল তোমার
খুঁড়িয়ার কাছে।”

যেমন রোগ তার তেমনি ঔষধ। অশোকা ছোঁর করে,
—চল্গীকে হত্যা করিব। তাহা হইলে তো তাহার হস্ত
হইতে অশোকা রক্ষা পাইবে। আমার ক’সির পরও
কি সে বুঝিবে না যে, আমার দ্বারে একাধিক সৈনীর
আসন নাই?

অশোকার কথা।

হাঃ! হাঃ! হাঃ! বাসনা বেশে তো আপাদর
মাধরণের আগে হয় বিবাহ—তাহার পর প্রেম। কহটা
খ্রীষ্টান আর ব্রাহ্মণের মাজ পরিণয়ের স্বাধীনতা আছে।
আমার ঠাকুরনার কি হইয়াছিল? কেন হ’বে না।
বিবাহ তো হউক, পরে দেখিব। প্রেম হইবে কোথা?
মাধা নাই তার মাধা মাধা! প্রেম তো আমার গজায়,
দ্বারে পজায়। আমারান তো খাঁচাছাড়া হইয়াছেন—
দ্বার তো অমটি বিধিরা পাখর হইয়া গিয়াছেন। আচ্ছা,
তবু তো বিবাহ হ’ক। আর কি কষ্ট হবে? ওগো!
আর যে সহিতে পারি না। মতে-মতে যে ঘন-নও ভোগ
করিতেছি। কেন এত উপেক্ষা করিলে—কেন এত
প্রভারণা! মাতাও বুকাইলেন, পিতাও পষ্ট করিয়া
বুকাইলেন—আমার সংকল্প অটল, অটল। আর তো বাসিকা
নাই—এখন স্রোটা—হয় ত বিবাহ! না, না,—পরিত্যক্তা!
বাচিয়া থাকুক—অনুক, অনুক—এমনি অনুক!

হাঃ হাঃ! আবার একদিন কৈকিরত দিবার চেষ্টা
করিল। এক মিনিটের অন্ত না উঠিয়া গিয়াছিলেন—বার
দোখিয়া গড়াইল। নিশ্চয় কলিকাতার থিয়েটার দেখে!
কখন হাতযোড় করিয়া বলিল—“অশোকা, একবার
তবুবে না?”

আমিও কম ঘেঁরে নই। আমিও বলিলাম—“ওনু
কেন,—যেহেঁচি। শোনার চেয়ে দেখা বন্ধ গ্রামণ।”

কখন উত্তর! বলিল—“অশোকা, আমাকে বর্জন কর,

কতি নাই। নিজের চিত্তা সাধাইও না। চম্পটী মাতাল,
হু-চরিত্র—”

আমি বলিলাম—“তিনি আমার স্বামী হ’বেন। তাঁর
নিদ্রা, বোধ হয়, আমার কাছে নীতি-বিরুদ্ধ। চিত্তের কথা
জানি না। তবে আর দশ দিন বাসে ফুলপাখা হবে।”

তিনি চলিয়া গেলেন। আচ্ছা। একবার তুলিলে
হইত। না, না। ঠিক হইয়াছে। সুখের মত অব্যব
দিত্বিহীন। ওঃ! ভগবান, বুকের এ বাখাটা কি?

সকলকে সম্মত হইতে হইল। ঠিক দশ দিন পরে
বিবাহ। কেহ জানিবে না—কেবল না, বাবা, আর আমার,
—আর অবস্তা আচার্য্য—রেজিষ্টার। বিবাহের পরদিনই
রওনা হইবে। একেবারে ভিন্ন দেশে। হ্যাঁ পা! আর কি
বিলম্বে থাকি যাব? বেথানে এত জ্বালা! এত কষ্ট! এত
কষ্টের তা!

জ্যোতির্শস্যের কথা

আচ্ছা! সোপার কদল পাগলের মত নাচিতেছিল।
শিতা-মাতাও জ্বল। আমি তো নিজের কথা ভাবিতেছি
না। সাগর-পারে পলাইব—না—না, জীবনের পর-পারে—
কাদি যাব। কিন্তু মরিব। হঠাৎ চম্পটীর সঙ্গে লক্ষ্য
হইল। তাহাকে ধরিলাম, কিন্তুের মত ধরিলাম, বলিলাম
“চম্পটী, তুমি কি, আমি জানি।”

সে বলিল—“আমাদের পরস্পরের জ্ঞান উভয়তঃ
সমান।”

আমি বলিলাম—“মাতাল, চম্পটী, এত স্পর্ধা রাখ!
জান, কিছুতে না পারি—তোমার খুন করিয়া এ বিবাহ
বন্ধ রাখিব।”

চম্পটী হাসিয়া বলিল—“যদি তেমন মনের তাব, তো
তোমাকে তার পূর্বে পুলিসের হাতে—”

আমি খুব জোরে তাহার মূখ লক্ষ্য করিয়া খুঁসি
দারিলাম। সে অন্যরাসে আমার হাত ধরিয়া কেঁপিল।
কে অগ্রে জানিত সেওটা এত বলবান! বড় লজ্জিত
হইলাম। হি! হি! শেষে একটা কেসেল্‌য়ারি করিব।
বখন মরিব, তখন একেবারে মরিব।

সে হাসিয়া আমার মদ্যর করিল, বলিল—“পাগলামি
করো না। বাড়ী যাও। আর দেখো, বিবাহের পর আমরা
ব্যাঙ্গালোর দাব—একবার এসো।”

ক্রোধে ও তৃণার মূখ ক্রিয়ার চলিয়া গেলার।

অশোকার কথা

কাল বিবাহ! হ্যাঁ সত্য বিবাহ! ভগবান, এ কি
করিলে! এ কি আশুনে ভুগ করিলে! ওমা! কি হবে?
না—না, মন স্থির হও। “নাহিতে খেতে” অনেক জিনিস
সারে। হিঃ হিঃ! দুর্জলতা! কাল বিবাহ। বেশ,
কথা! কাহার বিবাহ? অশোকার? অশোকা ত
মহিলাছে। ছায়াসুস্তির বিবাহ। পাখানের বিবাহ! হাঃ
হাঃ! বড় মজা!

জ্যোতির্শস্যের কথা

তাও কি কখন হয় যে দৈবের রাজ্যে ভ্রমবিচার
নাই! করদিন এত ছুটাছুটির কি ফল ফলিবে না? কিন্তু
আর এক দিনের বিলম্ব হইলে—সর্বনাশ! তাবিতেও
শোণিত-প্রবাহ শুরু হইয়া যাব।

বোটর আঁকসে সেলান পাড়ী রিজার্ভ করিতে।
হায়ে বিবাহ;—যদি তাহাকে মারি, আমার পাগটা আবিষ্কার
হইবার পূর্বেই ভোরে পলাইতে পারিব। বখন মোটর-
আঁকসে, তখন বেলা প্রায় একটা। একখানা পাড়ী
আসিল, তাহার একজন যাত্রোহী আমার কলেজের সতীর্থ
মদ্যব বসাত। মদ্যব শুণ্ড-পুলিসের ইন্সপেক্টর,—একবার
প্রাপটা চমকিয়া উঠিল। তাহাকে বলিলাম, “কি বে,
তুমি!”

সে বলিল, “হ্যাঁ তাই, আমাদের চলাফেরা তো
সর্বত্রই। একটা জালের আগামী ধনুতে এসেছি।”

আমি তো পাগল,—হাড়াপদ হইবার তর রাখি না,—
মনে করিলাম, যেখি না। বলিলাম, “জাপান-কেন্দ্রত,
গৌক-বাড়ী নাই—”

সে বলিল, “হ্যাঁ, সোহারা, ইংরাজি কর, মাকে-মাকে
কাঁধ-তোলে।”

আমি বলিলাম, “নাম চম্পটী।”

সে বলিল, “না, চম্পটী নয় মিত্তির—সাক্ষীগোপাল
মিত্তির।”

আশা কখনই পরিত্যক্ত নয়। আমি বলিলাম, “ইয়
সে-ই! তুমি চিন্তে পারবে? বল না?”

সে বলিল, “চিন্তে খুব পারব। আর একবার যাও

করেছিলাম,—বাগাবাণীর বাগদার,—একটু প্রমাণ অভাবে
বৈধে গেছে । এভাবে এতকথারে পালা প্রমাণ ।”

আমি বলিলাম, “কি করেছে ?”

“হুজী ভাল করে পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করেছে ।”

তারাকে আর্ল দেখিটেরিয়মে লইয়া চলিলাম । সে
ইতিমধ্যে একখানা চাক্তি দেখাইয়া থানা হইতে চারিজন
গুপ্তা পুলিশ লইল । বলিল, “সোকটা তারি বক্তা ।”

আমি বলিলাম, “তবে সে-ই টিক্,—বলতে কুলে গিয়ে-
ছিলাম,—বা নাহে একটা বড় তিল আছে ।”

সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল । বলিল, “তবে
যেথুবে ?”

পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া সে আমার
দৃষ্টে ধরিল—হিঃ চম্পটী !

অশোকার কথা

এ বিবাহ কি দিনের আলোয় হইতে পারে ? কে
বলিতে পারে—পাষণ ভাটিয়াও তো সময়ে-সময়ে বল বাহির
হয় । বিবাহের সময় হইয়াছিল গ্রামি দশটার । আমার
মুখের ভাব যেখিয়া পিতামাতা কোনও সম্বন্ধ করেন
নাই । তাঁহারা কেবল আমার মুখের ভক্ত সমস্ত দিন
উপালনা করিয়াছিলেন । আহা ! কি অন্ধ বেহ !

তখন বেলা পাঁচটা । জনক-জননীকে ভুলাইবার ভক্ত
অনেক গোলাপ ফুল তুলিয়াছিলেন । এতোক ফুলখানে
নুতন চন্দ্রবলিকা বিয়াছিলেন । জননী বেশ পরিবর্তন
করিবার ভক্ত নিজের গুণে বড় ছিলেন—টিক্ সেই অবসরে
জ্যোতির্ধর দাস আদিয়া আবার গুণে প্রবেশ করিল ।
শোবাক গরিচ্ছর দান, বেশ রক্ত ; কিন্তু মুখের ভাব
আনন্দের । হুটীয়া আমার ঘরে ঢুকিল, আমার পায়ে
কাছে হামু পাতিয়া বলিল । আমি বলিলাম, “কি ও ?”

সে বলিল, “অশোকা, কাল তোকে চলে দাও । জীবনে
হয় ত আর দেখা হ’বে না । একটা কথা ভন অশোকা,
—এক খিনিট ।”

আমি বালু করিয়া বলিলাম, “আর তো আশা নেই,
সব টিক্-টাক্ ।”

সে বলিল, “তোমাকে পাবার আশা রাখি না । কিন্তু

নিজের একটা অংক দিয়ে রাই । অশোকা, উম্মর সাকী
ক’রে বল্দি, আমার বুভা জননীকে —”

সে বালকের মত রোদন করিল ; বলিল, “তাঁর পরিচ
নাম নিয়ে বল্দি, আমি নির্দোষ । চম্পটী আমাকে একটা
খাশিয়া ফুল শিখিয়েছিল,—বলেছিল, এর মানে আমার
ব্যাগ কোণা । কিন্তু তার আসল মানে,—‘তোমা
তালবাসি ।’ আমি সেই কথাটা বলেছিলাম,—দুহতী ফুল
করে আমার —”

আমি ভাবছিলাম চম্পটীর মরতানি,—সে-ই আমাকে
আবার সে বৃত্ত দেখাইয়াছিল । কথাটা বিবাহ হইল ; কিন্তু
আর তো আশা ছিল না—

সে বলিল, “বল, আমার কথা করিসে ?”

আমি নিজের ভাবে নিতক্ রহিলাম । সে উঠিল ; বলিল,
“কিন্তু তোমাকে চম্পটী মরতানের হাত থেকে রক্ষা
করেছি । সে পুলিশের হাতে ।”

মাথা ঘুরিতেছিল । সে উঠিল ; বলিল, “অশোকা !

বোন আমার ! দেবী আমার ! এই দেখ দেখা, কথা
কর ভাই । ভগবান্ তোমার —”

আর বলিতে পারিল না । আমার কামিল, মাতালের
মত টলিতে-টলিতে বাহিরে গেল ।

হাঃ পোড়া কণাল ! আমার আশা ! ছয় তুবে
পাষণ হয় নাই—আর নিতে নাই, ছাই-চাপা ছিল ।

হিঃ হিঃ ! তালবাশিয়া বিনিময় চাহিয়াছিলাম, ললনা
আমি—সীতা, সাবিত্রীর বেশে জাহিয়া, সেবা না করিয়া,
সেবা চাহিয়াছিলাম । সময় আছে,—নিশ্চয় আছে ! ঐ তো
দাইতেছে—মাতালের মত, পাগলের মত, কর্ণবাহীন
তরঙ্গের মত । ঐ তো কটকের পার্শে । হুটীয়া দিয়া
বহিলাম—“জ্যোতি ! জ্যোতি ! জ্যোতির্ধর, কথা কি—।”

হোঃ হোঃ দাঁড়ি পক্ষ পাইলাম । সেই খাশিয়া
দুহতীটা—শেক্সা একটা খাশিয়া বুকের সঙ্গে রহতালাপ
করিতে করিতে বাইতেছে ।

জ্যোতির্ধর দেখিল । সে স্বপ্নোন্মিতের মত বলিল,
“কোন ঘোষে ঘোষা নই অশোকা, ঐ দেখ বিদেশী ।
কথা কর অ—”

ও হা ! এ কি হল ! তিনি ভূমিতে সটাইয়া
পড়িলেন কেন ? মহামহ ! বিশ্বপিতা ! হা ! হা !

তিনি জইয়া পড়িলেন। আদিই তাঁহার এ নশা করিলাম! হান! কি পবিত্র তীর্থ! বোম্বল বাদশাহের কথা এই
 “না! না!”
 হান সম্বন্ধে প্রসূতা—

চুটিয়া না আদিশেন।

অশোক। ও জ্যোতির্ষ্ময়ের কথা

আজ আবার আমরা সেই ক্রমের ধারে। কি বন্দা এই হানে!

“আগুৎ ফারদৌশ বা রু’য়ে জমিনত।

হামিনোস্ত! হামিনোস্ত! হামিনোস্ত!।”

যদি পৃথিবীতে শরণ থাকে তাহা এই হানে, এই হানে,

বিবিধ প্রসঙ্গ

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পরিচয় (১)

[অধ্যাপক শ্রীআণ্ডতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

মুকুন্দরামের পুরা নাম মুকুন্দরাম চন্দ্রবতী; অন্ততঃ উপাধি—মিশ্র।
 “কবিকঙ্কণ” রাত্তরক সম্মানপত্রক পদবীধানে। তাঁহার পিতামহের
 নাম ভগদাশ মিশ্র ও পিতার নাম রুদ্র মিশ্র। পুত্রের নাম ছিল
 শিবরাম ও কঙ্কণ নাম বংশধার। পুত্রবৎ ও জ্যোতিষ্যতার বাবও ভণিতার
 পাওয়া যায়—চিত্রলেখা ও মহেশ।

১। মহামিশ্র ভগদাশ, রুদ্র মিশ্রের তাত,

কবিকঙ্কণ-নন্দন (১)।

তাঁহার অমুন ভাই, চতুর আদেব গাই,

বিভাগিণী শ্রীকবিকঙ্কণ।

২। উরিয়া কবির কাবে, কৃপা কর শিবরামে;

চিত্রলেখা বংশধা মহেশ।

এখনোক্ত ভণিতায় দেখা যায় যে, কবির আগ্রহের নাম কবিকঙ্কণ।
 সম্ভবতঃ এই কবিকঙ্কণ আসল নাম নহে, উপাধিধার। এই কবিকঙ্কণ
 ভণিতাহুক্ত দুইটী কবিতা পাওয়া যায়। যটন্তমার ছাপা সর্বজন-
 বিদিত “শিববোধকে” আখ্যান বৃদ্ধ-বণিতার গ্রন্থ ‘বাভাকর্ণ’ ও
 “কল্লব ভজন” নামক দুই কবিতা দেখা যায়,—উহা কবিকঙ্কণের ভণিতা-
 হুক্ত। ঐ শিওরযোগে কবিকঙ্কণ ভণিতাহুক্ত যে “গঙ্গার-বন্দনা”
 আছে, তাহা পরবর্ত্তে মুকুন্দরাম-রচিত। কবিকঙ্কণের আর কোন
 লেখার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

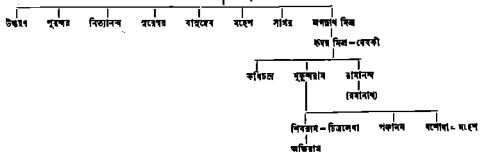
মুকুন্দরামের বংশাবলী নিয়ে প্রণীত হইল—

যাদুনাথ প্রানে রক্ষিত “চৌদঙ্গলেঃ” পুঁথিতে যে বংশ-পরিচয়
 আছে, তাহা হইতেই এই বংশ-তালিকা সম্বলিত হইয়াছে। এই

তপন ওখা (কবিত্তি গাই)

উপাধি

বংশ



(১) জৌহাটী শাখা পরিচয়ের বংশবর্ণনের চতুর্থ অধ্যবেশনে গঠিত।

(২) রুদ্রনন্দন—রুদ্রমিশ্রের সম্বন্ধ।

বাপ-পরিচয় হানুয়ার পুঁথি হাড়া অত্র কোন পুঁথিতে না থাকিলেও, ইহা কবিকল্পের উত্তরদ্ব্যন্বয়বিধের নিকট পাঠ্য হাওয়াতে, তাহা আনানিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। এই বাপ-পরিচয় অংশ লিখিত্যের উদ্ধৃত করিয়া বহুতঃ—

কুলে শীলে বিরম্বত ভ্রাম্বণ কাহর হৈত,
হানুয়ার সম্মানের স্থান।

অভিযার কণ বাক্য, হৃদয় বক্ষিপশাড়া, (৩)
হৃদয়িত হৃদয়ি লমান।

বহু বহু কলিকালে, হুয়াহু মনের (৪) কুলে,
অবতার করিলা পড়তে।

ধরি চক্রাবর্তি নাম, হাওয়া করিলা নাম,
তীর্থ ভৈল্য বৈই সে নদর।

হুয়িলা ভোবার তনু, যেটল দিল বৃন্দত,
কথো কাল তথায় বিহার।

কে হুয়ে ভোবার মায়া, হুহুহুহু তোরদিয়া,
হরমান করিলা নকায়।

হরমান হুনির্ভল, ভোবার চরণ জল (৫)
পার কৈহু শিতকাল হোয়ে।

সেই তো গুণ্যর কলে, কবি হই শিতকালে,
হুলাস ভোবার ললিত।

ধরি নখী ভায়াবানু, শিলে বিল হুই নাম,
মাখণ ওয়া ধবাধি কায়। (৬)

হানুয়ার সোক বহু, শিলের চরণ রত,
সেই পুত্রী হরের বহুত।

করুণিকুলের অরি বদোবত অধিকারী,
বহুতঃ নাম উদ্যাপতি।

অশেষ গুণ্যর কল, মাখণি, মল্লানল
সেই পুত্রী সম্মান বসতি।

কীটী বিদ্য বদ্যাবাধি, বদোব নিগম পাতি,
ইশান পতিত মহাপর।

বহু বহু পুত্রবানী, বদ্য সে বাক্যল পানী,
লোকনাথ বিল বহুতঃ।

কাছাড়ী (৭) কুলের আর, মহাবিল অলকার,
শব্ব বোধ কাণের বিধান।

করুণিকুলের ভালা, বহুতঃ তপন ওয়া,
তত্ত্ব হুত উদ্যাপতি নাম।

তনর মাখণ পর্বা, বহুতঃ প্রকৃতবর্বা,
ভার নর তনর সোহর।

উচ্চরণ, হুতলর, বিদ্যাবিল, হুতলর,
হাউলর, বদোব, মাখণ।

মর্দেবর অলুভাত, মহাবিল অলকার,
একভায়ে সেবিল পড়ত।

বিনেব গুণ্যর নাম হুতল হুতল নাম,
অভিচরণ তার মাখণর।

অহুত হুতল পর্বা, হুতলি হুতলপর্বা,
নানা পায়ে নিকর বিধান।

শিবরাম বংশলর, কৃপা কর মহেশ্বর,
হুত পুয়ে সৌত্রে মিনহর।

শেষ দুই পাণ্ডি পড়িয়া মনে হুত, “বংশলর” শিবরাম ভিন্ন কবির আর এক পুত্র ছিল। ইহা হইল নাম পতানন ছিল, বিভাবিনি মহাপর এইরূপ অনুমান করেন।

এইখানে কবির দ্বিতীয় ভ্রাতা হমানাথ বা হমানেশ্বর উল্লেখ নাই : “প্রহ্মোপতি বিনরগে” আছে, তাহা গুণ্য উদ্ধৃত হইবে।

মহেন্দ্রনাথ বিভাবিনি মহাপর বলেন, কবির ভাতার নাম ছিল দেবকী। লিখিত ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই বাক্য সমর্থন করিতে চাহেন—

চতৌর চরিত, হুতল সনৌত,
বদোব নাম তপে। (চতৌরসনার ভণিতা)

কিন্তু বদোব নামের বা ইতিহাস কোন স্মৃতিতে এই ভণিতার আভুতি এইরূপ—

চতৌর চরিত হুতল সনৌত
ঐকবিকল্প তপে।

ভ্রতরায় কবির ভাতার নামের ধীমাংসা করিতে পারিতেছি না। হুতলরায়ের ভ্রীর নাম পাঠ্য হাওয়া নাই। এক হিন্দিক সমালোচক বলিতে চাহেন যে চকবর্তী ঠাহুরে দুই ভ্রী ছিল। প্রথম—ভদ্রবর্তী যার আসিলে পর হুতলর সতীন-আলতা ও বদোবের দুই ভ্রীর কোমল বর্না। শাক্যে সংঘে এই মণ্ডলী-বাস্যর অন্ত্যক না থাকিলে, কবি এত হৃদয়গুণ বর্ণনা করিলেন কি করিয়া? অধিকতঃ, এই হিন্দিক সমালোচক মহাপর কবির নীকারোক্তি গর্ভত হারিল করিতেছেন—

(৩) বক্ষিপশাড়া—হানুয়ার বক্ষিপশাড়া।

(৪) হুয়াহু—কুলন। এখন আর ভাড়াট হইয়া গিয়াছে।

(৫) ভোবার চরণ জল—কবির বিদ্যাবিল, শিবহুয়ার কলে তিনি কবিশপকি লোক করিয়াছিলেন। “শিব-সংকীর্ণন” নামে কবি এক-ধাষি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

(৬) ধবাধি কাহণ—পাঠের কিছু বদোবল আছে—“ধরদী” লিখিত দিল হুত।

(৭) কাছাড়ী—করুণিক বহুতঃ।

খুঁজিল কোমল ধৌলে কবির কোমল ।

একমন সবিলে কোমল হয় মূর ।

বিশেষ ভাবেন চক্ৰবর্তী ঠাকুর ।

(বঙ্গবাণী সং পৃ: ১৪৩)

ইহার বিচার পাঠক করিবেন ।

বর্ধমান মেসার সেলিমাবাদ খানার অন্তর্গত বাবুজী গ্রাম কবিবরের
গৈত্রিক বাসভূমি ছিল ।—এই গ্রামে মুহুম্মদাবাদের ছয়-সাত পুরুষ বাস
করিয়াছিলেন । ই গ্রামের ভিবিহার বামুন সন্তিকের অভ্যাগারে তিনি
দর্শবাৎ হইয়া এই গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া অন্তর আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য
হইয়াছিলেন । অন্তঃপর সহ্যাবশত তিনি যেদিনাংয়ের অন্তর্গত
ব্রাহ্মণভূমি শরণ্যার আড়াল গ্রামে গিয়া তত্রতা রাজা বৈষ্ণুদাস রায়ের
আশ্রয় লাভ করেন । এই মহাত্মা তাঁহাকে নিম্ন পুত্রবিশেষের শিক্ষকতবে
নিযুক্ত করেন ও কবির পরিবার গোত্রবের ব্যবশপত্ত্ব বন্দোবস্ত
করিয়া যেন । ১)

এই আড়াল গ্রামে থাকিয়াই মুহুম্মদ চৌধুরা গ্রন্থ লেখেন ।
যে সময়ে তিনি বাবুজী পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রয়ক্ষেত্রে বহির্গত
হইয়াছিলেন, তৎসময়ে শনিমাঘে চৌধুরী তাঁহাকে স্বগামেণ করেন ।
আড়াল গ্রামে অবস্থিত হইলে পর, রাজা এই গ্রামের বিবরণ অবগত
হইয়া, তাঁহাকে কাগ্য-রচনার উৎসাহিত করেন । এই নরপুংষ বাহাদুরী
ভাষিত বঙ্গভাষা—তাঁহার উৎসাহিত ব্যতীত বঙ্গভাষার এই অমূল্যমূল্য
কাব্যের দৃষ্টি হইতে পারিত না ।

উপরিবিস্তৃত কবির জীবনী তাঁহার কাব্যের চরিত্রাঙ্গ প্রদত্ত
“এবেংগতির বিবরণ” হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে—ইহা হাজী কবির
জীবনের আর কোন ঘটনা এখন পর্য্যন্ত উপলব্ধিত হয় নাই । এই
“বিবরণ” উদ্ধৃত করিয়া প্রিতোহি—

গুন তাই সজ্ঞান,

কবিবের বিবরণ,

এই শ্রীত হৈল যেন মতে ।

উদিতা দায়ের বেশে,

কবির শিরে বেশে,

চরিতা বসিলা আচরিতে ।

দহর দিলিমাঝে,

ভাষাতে সজ্ঞান ছায়ে,

নিবসে নিরোপী বোশীদাশ ।

তাঁহার ভাগ্যে কদম্ব

বাদিতার চান চনি,

নিবাসে পুংষ ছয় সাত ।

বহু রাজা মানসিঃ,

বিহু পয়াবুদ কুস,

সৌরবর উৎকল-অবিল ।

(১) “কবিবরের বংশাবলী” গ্রন্থে বর্ধমান মেসার মোট বৈষ্ণব
কবির বাস করিতেন । বাবুজী রায়ের বংশাবলীর বর্ধমান বাস
সেবাংশিত গ্রামে । এই গ্রামে ইহারের বাড়িতে মুহুম্মদাবাদের অন্ত-
র্গত একজন চৌধুরী পুত্র এবং একজন মুস-চন্দনে পুত্রিত হইয়া
থাকে ।”

(বঙ্গভাষার লেখক)

সে বাসনিবাসে কালে,

অম্বার পাশের কলে,

ভিবিহার বামুন সন্তিক । (১)

উদিত হইলো রাজাবা

(১-২) বোশানিরে বের বোশ,

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলা অধি ।

মাসে কোণে দিয়া দড়,

পদর কাঠার কুড়া, (১১)

নাহি গুনে অম্বার মোহাতি । (১২)

সরকার হইয়া কাল, বিল ভূমি (১৩) লেখে দাস (১৪)

বিনা উপকারে যায় মুক্তি (১৫)

সোনার হইল বস,

চাকা বাড়াই খায়া কস,

পাই লতা দার (১৬) হইলি ।

ভিবিহার অবশেষে কোষ (১৭), কড়ি বিলে নাহি গোম (১৮)

বাত্ত গোত্র কেহ নাহি কেনে ।

একু শোশীদাশ নদী,

বিপাকে হইলা নদী,

যেহু কিছু নাহি পরিভ্রাণ ।

সোনার সবার কালে,

অম্বার পাশের পাশে,

দুয়ার চাপিলা বের বাসা । (১৯)

একো হইল ব্যাকুলি,

বেতে ঘরের কুড়ালি,

চাকার ত্রয় বেতে হল আনা ।

সহর শ্রীমন্ত খাঁ,

চৌধুরী দার খাঁ,

মুক্তি কৈলা সুবিধার লনে ।

বাবুজী হাজীরা খাঁ,

সকল রহমান (২০) তাই,

পাশে চৌ বিলা শরমস ।

(১) বামুন সন্তিক—ইঙ্গদী আরম্ভণার খানার সারাপুর গ্রামে এই

ভিবিহার সন্তিকের বংশীয়েরা এখনও বাস করিতেছেন ।

(১০) রাজাবা—ব্যক্তি বিশেষের নাম ।

(১১) কুড়া—বিশা ।

(১২) সোহাতি—কাভেরোতি ।

(১৩) বিল ভূমি—অস্থায়ী ভূমি ।

(১৪) দাস—উর্দুর ।

(১৫) মুক্তি—উৎকোচ ।

“মুক্তি কেহ কেহে বিল মালিনী পলায়”

ভারত । ৩ ।

(১৬) লতা—দ্রব । বিন এতি এক পরমা দ্রব দ্রব ।

(১৭) অবশেষে কোষ—পাঠ্যের বর্ণা আরম্ভ বোম—সৈনিক-

কর্মচারীর উপাধি বিশেষ ।

(১৮) গোম—সৈনিক শব্দ ।

(১৯) খায়া—পাহারা ।

(২০) রহমান—পাঠ্যের—হাফিজ ।

ভেটনার (২১) উপনীত, রূপনার (২২) নিল বিত,
বহুত্ব তিনি কৈল তকা।
বিভা আগনার ঘর, সিংহের কৈল ভর,
বিন দিগের নিল ভিগ।
বাহিরা গোড়াই (২৩) নদী, নদাই গহিরে বিধি,
ভেটটার (২৪) হইল উপনীত।
বাহিরের ভরি, গাইল পতন গহি, (২৫)
গহায়া (২৬) বড় কৈলা হিত।
নাগর পানার, (২৭) এড়াইল বাহোর, (২৮)
উপনীত হুটটা (২৯) নগরে।
ভৈল বিলা কৈলু গান, কহিলু উষ পান,
শিত (৩০) কৈলু ভৈলের ভরে।
আগর গুহুরি আড়া, (৩১) বৈবেক পানক, (৩২) গোড়া,
গুলা কৈলু হুহুরি গহায়ে।
গুলা ভর পহিলগে, নিলা বাই সেই গহায়ে,
চৌ বেগা বিলেন গহায়ে।
হাতে লইয়া পত নদী, আপনি কলমে বসি,
নানা রঙ্গে লিখেন কবির।
যেই মত নিল দীকা, সেই মত কবি শিকা,
নামের ধনি নিতা নিতা।

যেই চৌ বহায়া, বিলেন ভগ-গহা,
আজা বিলেন হুটিতে নদী।
চৌর আগর পাই, নিলাই (৩৩) বাহিরা বাই,
আড়নার হইল উপনীত।
আড়না কামল-বুধ, ভাঙ্গন বাহার বাহী
মহপতি ব্যাসের লখন।
পড়িয়া কবির বাই, সত্যধি বৃন্দাধি,
পাচ আড়া (৩৪) গাইল বিলা গান।
হুহুরি বাহুড়া ভাঙ্গ, ভাঙ্গিল সলল বাহ,
শিত পাচ কৈল নিগোজিত।
তার মত হুহুরি, ভাঙ্গণে অবহা,
ভক্ত কবি করিল পুজিত।
সহে বাহোর (৩৫) নদী, যে বাহে পদন সক্তি,
অহুধি কহিত বতন।
নিতা দেব অহুধি, হুহুরি মরপতি,
গাহনে বিলেন হুহুরি (৩৬)
বীর বাহোরের মত, ভগণে অবহুত
বীর বাহুড়া ভাঙ্গান।
তার মত হুহুরি, ভাঙ্গণে অবহা,
ঐক্যিকরণে রস গায়।

(২১) ভেটনার—পাঠান্তর তেলিয়ার গায়। এই গ্রাম বাহুর
এক কোণে গহি-পলিমে।

(২২) রূপনার—জৈক রূপান্তর গহা। পাঠান্তর বগা—রূপনার
কৈল হিত।

(২৩) গোড়াই—হুটাই বা হুটগহী নামে এক নদী আছে,
তাহাই বোঝায়।

(২৪) ভেটটার—পাঠান্তর—কেটটার। এই গ্রাম বর্তমান বাহার
অধস্তত।

(২৫) পতন গহি—পাঠান্তর—মাতুলগহী (হগলী জৈয়ার এক
পানি গ্রাম।)

(২৬) গহায়া—কবির বাহুর-গহা।

(২৭) নাগর পানার—হুটী কুর নদী অহুধি বিদ্যুত।

(২৮) বাহোর—পাঠান্তর—আহোর। "হুর্গেপনগি"তে এই
আহোরের উল্লেখ আছে। এই নদীর পাড়েই গহায়াগ্রাম অবস্থিত।

(২৯) হুটটা—পাঠান্তর—হুটটা আহুধি নাম ভেটটা।

(৩০) শিত—পুত্র পলমে (বিলাপিত) ; গৌর অভিরাম (ভগ)

(৩১) আড়া—পাচ (হুহুরি)

(৩২) পানক হুহুরি ভাটি। হুহুরি হুহুরি গুলা হুহুরি। কিত

ভিকি নামে হুটী তথা বিলাই পদা কহিতে হইয়াছিল।

এখন হুহুরিয়ার আধিষ্ঠান কাল নিরূপণ করা বাটক (৩৭) ১৮২০
খ্রিষ্টাব্দে অথবা প্রাচীনিক বটগার মূর্তি চৌমঙ্গলের শেষে সময় নিরূপণ
সুচক একটা সৌক বোঝায়। পরবর্তী বটগার মন্তকরণসিঙেও
এই সৌক বহাঘর উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রেক্ষিতী বহা—

পাক রস রস বের লগাও বিনতা।

কত বিল বিলা সীত হরের বিনতা।

পাত্রীর প্রাথমিক অঙ্কত বাহা গতি বহিরা ইহা হইতে পাঠ্য বাহ ১৪৩০
শকা বাহ-৩, বের-১, লগাও-১) অবহা ১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু
উপর উদ্ধৃত "প্রদোষগতির বিবরণ" হাজা মানসিয়ার উল্লেখ আছে
যে তিনি তৎকালে বহা, বিহার ও উৎকলের অধিপতি ছিলেন। হাজা
মানসিয়ার ১৪৩০ খ্রিঃ হইতে ১৪০০ খ্রিঃ পর্যন্ত বাহরার প্রধান

(৩৩) নিলাই—বেলিনীপুর জেলায়।

(৩৪) পাচআড়া—১০ ঘণ।

(৩৫) বাহোর—পাঠান্তর—বাহাল। এই ব্যক্তি কবির জৈক
শিত, ছিল। অপর পাঠ—সহে তাই রামাধনী। ইহা হুটিকৃত।
পূর্বে এই তাইয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে—"সহে রামাধনী (বাহাল)
তাই।"

(৩৬) হুহুরি—"কবিরগণ" এই উপাধি।

(৩৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১০৯ ভাগে অধিকাংশ ভগ
হুহুরি লিখিত কবি-কল্প এবং অবলম্বনে লিখিত।

হিসেব। অতএব এই স্রোতের বাধাধা যে ১৪০০ লক্ষ পাওয়া বাইতেন, তাহা অসম্ভব হয়। সামগ্রিক রকম করিবার ক্ষমতা না থাকিয়া যদি ২ লক্ষা বাত, তবে স্রোত নির্দিষ্ট কাল ১৪০০ লক্ষা বা ১৭৭৭ বৃত্তাক হইয়া পড়ে। ইহাও মানসিগের অনুমানী প্রতির মূল্য হইয়া পড়ে। এই অসামগ্রিক আপনোমন করিবার ক্ষমতা অনেক বসেন যে, আধুনিক প্রকৃতিবিদগণ সেও এত দেখা দেখ করিয়া পরে পুস্তকের বিজ্ঞাপন বা প্রচলন দেখেন, কথিতকথনও সেই প্রকার প্রকৃতিবিদগণ করিয়া প্রকৃতিগতির বিবরণ লিখিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যা সত্যকীর্ণ নয়। কারণ আধুনিক প্রকৃতিবিদগণের জীতি অনুসারে পুস্তকন প্রকৃতিবিদগণের কথিতে পাওয়া বিড়ম্বনা যায়।

তারপর এই স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া কবির কাল-নিরূপণ করিবার আর এক প্রধান সমস্যা থাকে। কোন মুহুর্তে শব্দগণে এই স্রোত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কোন স্থান-নির্ভর মুহুর্তেও এই স্রোত এক পদ্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কবির বংশধরগণের নিকট সঞ্চিত মুহুর্তেও এই স্রোত নাই। রত্নাবলি রায়ের বংশধর-গণের নিকট যে পুঁথি আছে, তাহাতেও এই স্রোত পাওয়া যায় না সেখানে প্রাথমিক পুঁথিগণের লেখান না থাকতে জোর করিয়া বলা যায় না যে, উহাতে এই স্রোত ছিল না। বাহা হটক, দেখা বাইতেন, যে, বটহাজার পুস্তক হাজা মজ কোন পুঁথি বা মুদ্রিত পুস্তকে নবন এই স্রোত : পাওয়া যায় না, তখন এই স্রোত মত প্রাথমিক বলিয়া না বহাই। অতএব কবির কাল-নিরূপণ করিবার উপায়ান বাহা হইল—মানসিগের উল্লেখ বা বাতুলার উল্লেখ। ইহা মুদ্রিত-অমুদ্রিত সকল পুঁথিতেই আর অবিভক্ত আত্মকিত পাওয়া যায়। বানসিহ ১৪০০ খৃঃ বাঙ্গালার আদ্যে। তাহারই নাদন সময়ে কবির জিহবারের অভ্যাসের মতরান প্রতিষ্ঠাপন করিতে বাত হইয়াছিলেন; স্তব্ধতা মানসিগের নাদন আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পরেই কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বানসিগের মত নাদমালা শাসকের সময়েও প্রকাশিত হইতে পারে, কবি এইরূপ কোড করিয়া লেখ্যত মনে হয়, স্রোতের এই অভ্যাসের মত থাকিতে থাকিতেই তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন নতুবা উল্লেখ করিবার কোন তাৎপর্য দেখা যায় না। অতএব বানসিগের আগমনের সময় কয়েক বৎসর মধ্যেই এই কাব্য প্রণীত হইয়াছিল। আশা ১৪০০ খৃঃ এই কাব্যের রচনা-কাল ধরিলে যথেষ্ট বয়স বড় জুল হইবে না।

বাতুলার রায় ও রত্নাবলি রায়ের সময় নিরূপণ করিতে পারিলে কথিতকথনের উপরিবৃত কাল সঠিক কি না তাহা জানা বাইতে পারে। সৌভাগ্য তবে এই ব্যাপার সম্বন্ধে হইয়াছে। আড়ার প্রাকলক্ষ্যের সাক্ষ্য-সাক্ষ্যের দেখা যায় যে, কথিতকথনের প্রতিপালক রাজা রত্নাবলি যথেষ্ট বয়স ১৪০০ লক্ষ (১৭৭৭ খৃঃ) হইতে ১৪২০ লক্ষ (১৭৯৭ খৃঃ) পর্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। আর রাজা রত্নাবলি রায়েরই উপরে যে কবি এই প্রকৃতিবিদগণের রচনা করিয়াছিলেন,

তারান প্রভুত প্রভাব এই কবির প্রাণ প্রত্যেক ভূমিতাতেই আছে।

অতএব আশা ১৪০০ বৃত্তাক যে এই কাব্য-রচনার কাল পরিচয়িত, তাহা এই প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে।

“বংশ পরিচয়” পড়ে আরো—

বিবরণ বংশধর,

তুলা কর মনোর,

৩৮ পৃষ্ঠে পৌরো বিনয়ন।

অতএব এই প্রকৃতিবিদগণের সময় কবির সৌভাগ্যবিশিষ্ট। “প্রকৃতি-পরি বিবরণে”ও যথেষ্ট হয় এই পৌরোহই উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন,

কবে শিত ওদানে উড়ে।

এই লিখিবার সময় কবির বয়স আশা ৪০ বর্ষ ধরিলে পৌর-সত্যকথা হয়। এই হিসাবে ১৭৪০ খৃঃ আশা কবির বয়স হইয়াছিল ধরিতে হইবে। অতএব দেখা বাইতেন, এই বাঙ্গালী কবি দেবপুত্রগণের সমধর্মিক ছিলেন।

কবি কতদিন জীবিত ছিলেন, তাহা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় ব্যাপারতঃ বর্তমানে নাই।

কথিতকথন কতদূর লেখাপড়া জানিতেন, তাহা জানিতে আশাযের মতঃই উৎসাহ করিবার কথা। যেদন্ত পতাকাতে বাঙ্গালী দেশে সেগপড়ার অর্থ সংকুল বিজ্ঞ। এই সংকুল বিজ্ঞা তাহার কতদূর ছিল, এই কাব্য হইতে তাহা বড় বেশী জানা যায় না। ভারতবর্ষের মত তিনি নিম্ন বিজ্ঞা জাতির করিবার সৌভাগ্য কোথাও করেন নাই। তবে তিনি যে সংকুল ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্তের বিজ্ঞা-শিক্ষার বর্ণনায় তিনি সংকুল কথিতব্য প্রকারে একটা লক্ষ্য বর্ণ দিয়াছেন। তিনি এই লক্ষ্য প্রকৃতিবিদগণের কখন আর না কখন, কখনও, অতঃ পড়িয়াছিলেন যথেষ্ট হয়। একদানে নির্ণিত বর-কল্পা দেখিবার মত বর্ণনায় প্রকৃতি কবি দিক্‌রই কালিদাসের এনিম্ন বর্ণনা হইতে লইয়াছেন। কখনো-কখনো বর্ণনা প্রদানে কবি কালিদাসের অকাল বর্ণনায় বর্ণনা হইতে কিছু ধার করিয়াছেন দেখা যায়। এই সব দেখিয়া মনে হয় কবি সংকুল ছিলেন। কথিতকথন আশা ৪০ বর্ষেই অনুমান করিতে পারি যে, এই কবির বিশেষভাবে সংকুলে যুগ্মতা না হইলে, রাজা বাতুলার রায় রত্নাবলিগণের শিক্ষকতা কাছাকাছ নিকট করিতেন না। তিনি যে রায় রত্নাবলিগণের স্তব-বহান করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কবির আশা পীকারোক্তি; বর্ণা,

স্বপ্ন বাতুলার রায়,

তামিল সকল বাহ,

শিত পায়ে ঠেল নিয়োজিত।

তারপর রত্নাবলি,

সামন্তে অবতার,

৩৮ করে কবির মুদিত।

এই প্রমাণ প্রমাণ ব্যতীত প্রমাণ পাওয়া বাইতেন। “প্রমাণ এইরূপ যে কবি বাঙ্গালীরা পাঠ্যশালার পাঠ্যসময় করিয়া বাতুলার স্রোত কোন পুস্তকী আশাযোড়া প্রাণে সঞ্চিতগার ব্যাকরণ, কাব্য, অন্তর্য ও সত্যিগার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহাযোড়া

সম্ভূত চরিত্রের মত লম্বিক অঙ্গিক ছিল। অর্ধশতাব্দী পূর্বে এখানে ৩০০০টা চতুষ্পাশী ছিল।" অসেক আশর করিয়া ইংরাজ কোট নম্নে বলিত।"

[সাঃ পঃ পঃ ১০৭ ভাগ পৃঃ ১২৬]

কবিকল্প চতীর উপাখ্যান-ভাগ দুইটি। প্রথম ভাগে কলকাত্তর উপাখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সমাধির উপাখ্যান। দুইটি উপাখ্যানই সমাধির; তন্মধ্যে দ্বিতীয়ের কাহিনী আশল-বুদ্ধ-বলিগা মকল বালানৌই জানে অথবা জানিত। এরূপ কল্পনামূলক কাহিনীর যিনি প্রথম বৃত্তি করিয়াছিলেন, বঙ্গ-সরস্বতী তাঁহাকে অপেক্ষে ধন্যবাদ দিবে সম্ভব নাই। কবিকল্প এই উপাখ্যান-ভাগ কোথা হইতে প্রাপ্ত করিয়াছেন, তাহার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে এই উপাখ্যান পূর্বে হইতে প্রচলিত ছিল, কবি তাহাই সুন্দর সাহায্যী নৃত্য করিয়া আশাধিপতির নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। চতীর গান পূর্বে হইতেই প্রচলিত ছিল; কবিরা তাহাই উপলব্ধি করিয়া কবিতা নৃত্য বাক্যে রচনা করিতেন। এইরূপেই বাক্যসাধিতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে "বর্ধমান" "বিজ্ঞান" ও "বদান্ত ভাসাব" বহু কবির হাতে বিলাসিত। প্রথমে কোন্ ব্যক্তি এই মকলের বৃত্তি করেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুঃসম্ভব। যৌনেশ্বর সিংহিয়াছেন, "মুন্সিং-রাসের পূর্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া বাজাচড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না।" বলিয়া কবিকল্পের চতী যেমিনীপুর একে প্রচলিত ছিল। দাদাবাচ্যের চতী ১৭৭৬ খৃঃ প্রাপ্ত হয়। এই চিত্রগুলি গোপালদাস করিয়া মুন্সিংগর নৃত্য কবি প্রথম করেন। মুন্সিংগর তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দ্বারা বঙ্গনাগরে সিংহিয়াছেন।

দ্বিতীয় ভাগে বঙ্গনাগর কবিকল্প।

ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বঙ্গনাগর কবিকল্পের চতী অবলম্বন করিয়া তিনি বীর ভাগ্য রচনা করেন। যেমিনীপুরের লোকবিশেষ সংখ্যায়, এই বঙ্গনাগর কবিকল্প মুন্সিংগর কবিকল্পের পিছাওক। (৩০)

সে যাহা বটক, গল্পী মৌলিক নহে বলিয়া মুন্সিংগরের কাব্যের অঙ্গশলা কবিবার কিছু নাই। তিনি কেমন সাহায্যিয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। ইংরাজ কবি লেগেবীর যে মকল নাটক লিখিয়া এত বন্দী হইয়াছেন, তাহার আর প্রত্যেক উপাখ্যানই তিনি পূর্বে পূর্বে দেখকরিয়া নিকট হইতে বার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৌলিকতার ঘনি নাই। তিনি যে প্রকার সাহায্যিয়াছেন, তাহাতে অসিদ্ধিময় স্থালা উল্লিখ্য। কি রচনা ভুলিতে, কি লোকবিত্তা পাতলাজীর চিত্রাভাসে কবিকল্প যে শিরচাতুর্ঘ্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতীত প্রমাণ্য—পর মৌলিক না হইলেও কতি নাই।

কবিকল্পের ভাষা অতি সরল। তাঁহার রচনাতে প্রয়োজন্যে প্রায়শঃ পরিচ্ছন্ন। পরবর্তী প্রকারে বার-বারের ভারতচন্দ্রের

কাব্যের পাণ্ডিত্য তাঁহার নাই।—এই কাব্যের পাণ্ডিত্য নাই বাসিয়াই আনন্দ মনে হয়, তাঁহার কবিতা এত সুন্দর সুন্দর। ভারতচন্দ্র বৃত্তি কবি-তাঁহার প্রকৃতকরণে আসল কবিতা হাজির। তবে মনে হয়, ভারতচন্দ্র হাজিরগড়কে দেখাইবার জন্যে তাঁহার মনতঃসম্মত ও শিরচাতুর্ঘ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ধমান মূল বিহার তিনি পূর্বেই কবিত্বের নিকট হইতে বোধ্যন প্রাপ্ত করিয়া তাঁহার চতীর নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। ভারতচন্দ্র যে প্রকৃতি, তাহা বলিতেছি না; তবে বর্তমান-কবি যাহাকে মনে, তিনি তাহা হিসেন না, এই পৌরব কবিত্বকল্পেই।

মুন্সিংগর বর্তমান-কবি বলিয়াই প্রাণের সুখ-দুঃখের কথা এত সোজা ভাষায় প্রকাশ করেন মর্শপণী কবীর ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। কবি বহিঃস্থ ছিলেন; বহিঃস্থের কাহিনী বলিতে তিনি যেমন পাণ্ডিত্য-যে, এরূপ বোধ হয় অল্প কথিই পাঠ্যেন। কালকাত্তর উপাখ্যান অল্প বিখ্যাত নিতাই হইলেও এই রচনা এত মনোহর। বহুতঃ কবি নিজে বাহা ভূসিরাছেন, তাহাই বেন অকলপে বলিয়া আশাধিপতির প্রাণ স্পর্শ করিয়াছেন। প্রত্যেকপত্রের বিবরণে তিনি যে নিঃস্বের ভঙ্গ কাহিনী লিখিত করিয়াছেন, তাহা গড়িয়া পাঠকের চকু অল্প বর্ণ করিতে যোগ্য হয়।

ভারতচন্দ্র কোন কোন হানে এইরূপ পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাহা ও বহিঃস্থ হইতে আশাধিপতির নৃত্য করিয়া কেনেন; কিন্তু সে বোধ অগণীত হইলে আমরা যেহি আশাধিপতির ভাষে কোন বাধ বধে নাই। কি কাব্যের সাহিত্যে, কি প্রকারে মাধুর্য্য, অল্প কথেন সাহায্যী কবি ভারতচন্দ্রের মনক-মহেন। কিন্তু প্রকৃত কবিতা তিনি কতই হীন! আশপণী কবিতা তিনি কত কই সিংহিয়াছেন।

কবিকল্পের কবিত্বের আর এক বিশেষ এই যে, তিনি শুক্লকলের লম্বায়ের এক নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। লোকের ভাবন ভিন্ন ভাবন বাসন করিত, কি পাইত পণ্ডিত, কি ভাবিত, চিন্তা করিত, এ সকলের পূর্ণাঙ্গুণ্ড চিত্র তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। এ মকল বিখ্যাত কবির অতিভাবের একটুকুও প্রকাশ নাই। বহু: পুঁনিষ্ঠি লইয়াই তিনি এই মকল চিত্র আঁকিয়াছেন। কেহ-কেহ মনে করেন যে, বাহুকে কি বার পাত, কি প্রকারে বাক্য, সেজ্ঞা, ইত্যাদি লম্বায় কবীর বর্ণিত আর কবিতা কি? কিন্তু লোক-চরিত্রের প্রকৃত দ্বি বিতে মনে, এই সকলের আশ্রয়তা আছে,—নতুবা কাব্যে প্রকৃত লোক-চরিত্র দ্বারা অসম্ভব। এই মকল চিত্রনিষ্ঠা হুলা আছে বলিয়াই দুর্লভা হারী নিখুঁত চরিত্রী এত স্পষ্ট। দুর্লভা ধনপতির শৃণা রচনা করিয়া যে মূল কাণ্ডটা করিল, তাহা যদি কবি না বলিতেন, তবে দুর্লভা-চরিত্র দুর্লভা কি প্রকারে?

যথা বিখ্যাত্যে হালী, বহিঃস্থে না পাঠে হালী,

বহু চারি গড়াপড়ি যায়।

(৩১) মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানি মহাপণ্ডিত এই প্রকারে উল্লেখ করিয়া

মনে যে, ইহা সত্য পথে। তিনি বলিতে চায়েন যে, বহু: মুন্সিংগরই

সকলকালেই এই উপাখ্যানের লোকবিত্তা পাতলাজীর চিত্রাভাসে কবিকল্প যে শিরচাতুর্ঘ্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতীত প্রমাণ্য—পর মৌলিক না হইলেও কতি নাই।

একতঃ চিত্রিতঃ কথং যস্য ইতি? এই একাধারে অতোহো কবিরেখেণা বাইবে যে, বনপতির ভ্রাতৃ বিহারী, লক্ষ্মী ও পুন্দরীর ভ্রাতৃ লক্ষ্মী, ভীম-বস্তের ভ্রাতৃ অবকথ (কামরুতু উপাখ্যান), দুর্জয়ার ভ্রাতৃ দ্বাদী লসারের নিখুঁত চিত্র; এবং নিপুণ কবি দুটিনাটি দ্বিগাই এই সকলের বর্ণনা আনিয়েছে বিকট উদ্ভাঙ্গ করিয়া বহিরিয়েছেন।

নিখুঁত চিত্র আঁকিতে কবিকণ্ঠ ভারতজ্যেষ্ঠের অনেক উপরে আসন পাইতে পারে। এই সম্বন্ধে রবেন্দ্রের বহু মতামত বাহা নিবিরাজেন, তাহা অতীত সত্য কথা। তিনি বলেন, “সংসার বেথিয়া দুর্ভিক্ষরাম নার-নারিকা চিত্রিতঃ করিয়াছেন।” ভারতচন্দ্র অঙ্গাধার পণ্ডিত, অঙ্গাধার চন্দ্র, বাক্যবিভাগে অঙ্গাধার অমর্যাপানী, কিং তাঁহার বাহক-নারিকাগণ কি লসারের মনসারী? হীরার ভ্রাতৃ চন্দ্র। মাদিনী, দুর্জয়ার ভ্রাতৃ বিলাসপারায়ণ বাহক, বিজার ভ্রাতৃ বিলাসিনী নারিকা লসারের সচরাত্র মনসারী নহে। দুর্ভিক্ষরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র দুঃখিং সমাধ-বিশেষের দুঃখিং ইতিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।”

উপসংহারে এই হাত বজা যে, দুর্ভিক্ষরাম বাম্বানী মহাকবিবিশেষের মধ্যে একজন প্রধান। কৃত্তিবাহু, কাঞ্চিমান বাম্বের পরেই তাঁহার আসন।

তত্ত্ব-নাম কতদিন হইয়াছে?

[ঐক্যচন্দ্র কবাপুস্তকপার্থ]

তত্ত্বশাস্ত্রের তত্ত্ব নাম কত দিন হইতে হইয়াছে, ইহা বলা মুহূর্ত্ত। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীনকালে তত্ত্বশাস্ত্র তত্ত্ব নামে কেবল পরিচিত ছিল না। পণ্ডিত কোথাও দ্বিগাই-ব্রহ্ম তত্ত্ব নামে পুনঃ-পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক-কালে তত্ত্ব পর্ধ্যারে লিখিত হইয়াছে,—

“তত্ত্বঃ সুইবকৃত্যে স্যাদিগ্ধ্যাক্ষে চৌধ্যাক্ষে।

এখানে তত্ত্ববাক্যে চ পাঠ্যভেদে পরিচ্ছেদে।”

তত্ত্বশাস্ত্র—সুইবকৃত্য, দ্বিগাই, উত্তম, উত্তম, এখানে, তত্ত্ববাক্য, পাঠ্যভেদ ও পরিচ্ছেদে আর্য বাহকত হয়। পাঠ্যভেদে আর্য যে এলিঙ্গ তত্ত্ব-পাঠ্যের বোধক, তাহাতে কোন দল্লহ নাই। প্রাচীন কৈবল্যের অপর-সিদ্ধি বহুচিত্ত অপরকৈবল্য নামক কো-এই তত্ত্ব পর্ধ্যারে লিখিয়াছেন, “তত্ত্বঃ এখানে দ্বিগাই পুত্রকণ্ঠে, পরিচ্ছেদে।” এখানে, দ্বিগাই, পুত্রকণ্ঠ ও পরিচ্ছেদে আর্য তত্ত্ব শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎপর্ধ্য-এইত পুত্রকণ্ঠ তত্ত্বশাস্ত্রের সংলগ্নত্ব হইয়াছে ও পুত্রকণ্ঠ নামে এলিঙ্গ লাত করিয়াছে। এলিঙ্গ বৈদ্যক চয়ক হয়,—তত্ত্বশাস্ত্রের নীচ-বৃহত্ত্ব হইয়াও তত্ত্বনামে সত্য সমাধে পরিচিত হইয়াছে। চয়ক তত্ত্ব নাম

“বিভায়াস্তি সোপেক্ষঃ সাক্ষিপত্যস্তি বিভায়াঃ।

সংসর্গী কৃত্যে তত্ত্বঃ পুত্রকণ্ঠ নহঃ নহঃ।

অতঃপ্রত্যয়বহিঃ চয়কপাতি দ্বিগাই।

তত্ত্বঃ বহুত্বপাঠ্যঃ =

তত্ত্বতঃ কর্তা এখানে = ইত্যাদি।

বৈদিক ও অপরকৈবল্য ব্রহ্ম আর্য যে সকল পর্ধ্যারে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল হলে উপরি-উক্ত তত্ত্ব শব্দের আর্য প্রায়শঃ দ্বিগাই বা অপরকৈবল্য ব্যবহৃত হইয়াছে। হুতরাঃ তত্ত্ব শব্দেঃ এখানে পরিবৃষ্ট হইলেই যে তাহা কেবল তত্ত্বশাস্ত্রকে বুঝাইবে তাহা নহে। বৈদিক-কালে তত্ত্ব আর্য বৈদ্যকৈবল্যে উদ্ভেদ করিয়া। প্রচলিত তত্ত্বশাস্ত্রের নামেই বৈদিক তত্ত্ব হইয়াছে, তৎপরি, অপরকৈবল্যের কো-ব্রহ্মের তত্ত্ব পর্ধ্যারে তাহার উদ্ভেদ না থাকায়, অপরকৈবল্যের উক্তি সর্গীকৈবল্য বৈদিকই মনে হইতেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে তত্ত্বশাস্ত্র বলিতে অপরকৈবল্য বুঝিয়া থাকি, প্রাচীন কালে তাহা বুঝাইত না। উক্ত অপরকৈবল্য তাহার প্রগুঠ উদ্ভাষণ। তত্ত্বশাস্ত্র বচন-পদ্যসম্বন্ধে উক্ত বাক্যের সমর্থন করিতেছে। তত্ত্বশাস্ত্রের তত্ত্বকণ্ঠ এখানে উল্লিখিত হইয়াছে,—

“সর্গক প্রতিকর্ষক তত্ত্ব নির্ণয়ক।

ইত্যাদি লক্ষণকৃত্যঃ তত্ত্ববিভায়াস্তি।”

তত্ত্বনির্ণয় পদ্যবাক্য তত্ত্বশব্দ যে তত্ত্বশাস্ত্রের নামকৈবল্য বুঝাইতেছে, তাহা অপরকৈবল্য করিতে হইবে। বহি তত্ত্বশব্দ তত্ত্বশাস্ত্রের বোধক না হয়, বা প্রাচীন কালে তত্ত্বশাস্ত্র বহি তত্ত্ব ও তত্ত্বশাস্ত্র নামে পরিচিত না থাকে, তাহা হইলে তত্ত্ব-শাস্ত্র যে বিভায়া আধুনিক তাহাতে লক্ষ্য নাই। বাস্তবিক, প্রাচীন কালে তত্ত্বশাস্ত্র বর্তমান কালের ভ্রাতৃ কেবল তত্ত্ব নামে পরিচিত ছিল না; উহা তত্ত্বনামে আদ্য, নিম্ন, ৫ বহু নামেও বৃথিখিত ছিল। তত্ত্বশাস্ত্র পর্ধ্যারের দ্বিগাই ও এখানে আর্য লইয়া সর্গীকৈবল্য তত্ত্বশাস্ত্র যে তত্ত্ব নামে বিশেষ ব্যাতি লাত করিয়াছে, তাহাতে লক্ষ্য নাই। বৃহত্ত্ব চতুর্ধন পতাকীর বিভায়া বার্ষিক পণ্ডিত সর্গীকৈবল্য-পদ্যবাক্যের বাবাবাক্য পাতকলোকে ব্রহ্মের বহু সংসারের বর্ণনা সময়ে লিখিয়াছেন,—

“তৎপদ্য অকাত্যাত্মক কর্ণে তত্ত্বশাস্ত্র ব্রহ্মনামে বোধন।”

এহলে তত্ত্বশাস্ত্র তত্ত্বশাস্ত্রের নহে। ব্রহ্মের বহু সংসার কেবল দ্বিগাই তত্ত্বশাস্ত্র নিবৃত্ত। বৃহত্ত্ব সর্গক পতাকীর এখানে কবি বাণকট্ট মহোদয় কাশবতী হয়ে তত্ত্ব নামে তত্ত্বশব্দেঃ এখানে করিয়াছেন, বহা—

“ব্রহ্মব্রহ্মে নিগুণ ব্রহ্ম সাধনকরিত বিভায়াঃ (হারিত বর্ণনা)

কোটিভ-শাস্ত্রেও তত্ত্ব নামে ব্রহ্ম শব্দ পরিবৃষ্ট হয়; বহা,—

“কোটিভ ব্রহ্মনামে চ বৈদ্যকৈবল্য বোধন।

আর্য বাস্তব বৃহত্ত্ব নামে সাধনকরিত বিভায়াঃ।”

এখানে ব্রহ্মব্রহ্ম আর্য যে তত্ত্বশব্দ অতিক্রম, তাহা বোধ হয় তাহাকেও সর্গিকৈবল্য হইতে হয়।

অমিনি-ঐষ্ট্য প্রাচীনতম জ্যোতিষ-সূত্রেও তন্ময় হয় নাম উৎকলিত
হইয়াছে; বলা,—

“ত্রিকোণে পাণবরে যন্ত্রিকা।”

ইহার সাধ্যা বকণ শরণ-বহিষ্ঠার শরণায় বসিগায়ে,—

“করিকোণে ত্রিকোণের খেটেও তারিকা তরং।

পাশে পুত্রবধের তরং তরংসকল।”

ইতিমধ্যে এখান দৃষ্ট অস্বীকৃত হয়, প্রাচীন কালে বিখ্যাত-সম্রাট তর-
শাহর মর্যাদা নবমেও পরিচিত ছিল। অমরসিংহও এতদধিকারের
দার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন; বলা,—

“বেদকলে গুণিতবাহে মরঃ।”

“আদমঃ পঞ্চমো বেদঃ” আদম অর্থাৎ তর পঞ্চম বেদ বলিয়া লতা-
সম্বন্ধে সুপরিচিত। অমরসিংহও বেদকলে অর্থ উদ্ধৃত করিয়া
তাহার সর্বপন করিতেছেন। নহা অতিবাহ মেঘিনীকোষে তরশাহের
নাম মেঘিয়া, ও অমরকোষে তাহার উল্লেখ না পাইয়া থাওয়া উক্তের
মধ্যবর্তী সময় তরশাহের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন,
অমরসিংহের কোষ হইতে প্রাথমিক পথে দেখাইব যে, সে সময়েও
তরশাহ প্রচলিত ছিল। এতাবৎ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইল, তরশাহ
প্রাচীন কালে কেবল তর নামে পরিচিত ছিল না। বর্তমান যামিন
দেশাল দ্বারা তরশাহ শরণায় নামে সর্বত্র সমাধৃত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে তরশাহের উপর প্রভা ও বিলাস বহুদিন হইতে চলিয়া
আসিতেছে। বরং তরশাহকে প্রত্যেক কলসর শাহর জামিনা ভারতীয়
প্রাচীন পণ্ডিত-সম্রাট তাহার জামিনা সকল শাহের উপর স্থাপন
করিয়াছেন, বলা—

“অজ্ঞাত শাহেরু বিলাস নামে।

ন তেহু কিকিৎ কুবি সত্যমতি।

চিকিৎসিত মোতিব তরবাহাঃ।

পরে পথে বিলাস দ্বাধ্বতিঃ।”

বৃত্তি প্রকৃতি শরণায় শরণায় কেবল তরশাহেরই বিলাস নামে হত
হইয়াছে। তাহারের মধ্যে সমসারে লতা কিছু নাই। চিকিৎসা,
জ্যোতিষ ও তরশাহ প্রত্যেক প্রমাণ দ্বারা বিলাস উৎপন্ন করে।

একালে শিবিয়াসি হইবে, এবং কলসর হইবে না বলিয়া তরশাহ
কুজোজঃ জ্যোতিষ যোগ্য করিবার আদেশ করিয়াছেন। তরশাহের
উপর তরশাহের প্রাচীন বহিষ্ঠার ও পণ্ডিতসম্রাট তাহার অমর-অমর
প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন, দেহক কোষ প্রভৃতি স্ট্রীকের প্রত্যেক
স্থাপারের উল্লেখ নাই। বহিষ্ঠা পান্ড্যতা পণ্ডিতগণ সমস্ত তর-
শাহকে আধুনিক বসিগায়ে বসিয়া মনে হয়। তরশাহের উল্লিখিত
হইয়াছে।

“জতি বৃত্তি পুত্রপানি সত্যভাগনিকা ইব।

ইহর শাহী বিদ্যা তরো মূলবাহুঃ।”

সাহায্যের দোহা; শিব-কবিত তরশাহ মূলবাহু জাহ সবসের
বিকট যোগ্যী।

তরশাহ মূলবাহু জাহ ওত, সত্য, তরশাহ প্রাচীন প্রভৃতি তর-
শাহের যে নামায়েন আছে, কলে কলে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা
হইতেছে।

পুত্রাণে তরশাহের উল্লেখ আছে কি না?

১৪০০ খৃষ্টাব্দে নবদীপ-দাব-দাবের অকলত পুত্রগণ চৈতন্যচন্দ্র
দ্বন্দ্বিত হইয়া মিলন ভক্তিচন্দ্রিকাভ্রোতে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল
অন্যপূর্ণ বহুভূমি প্রাপিত করেন। তৎপূর্ণের জ্যোতিষ সম্রাট বলা-
ম্রোণে বর্ষায়ে প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রাচ-
্যবর্তী উক্ত সিংহাসনে হইতে অতিক্রমের পর্বতের পর্যন্ত সে
সময়ে তরশাহের নামে বর্তমান হইত। শিকিত সম্রাটের বিকট
অনন্ত হওয়া দাও, সে সময় জ্যোতিষ পঞ্চম-প্রাচীন প্রতি বহু-
প্রাচীন প্রাপিত করিয়া মিলন-বহু-প্রাচীন প্রাপিত হইয়াছিল। জাম, অর্থ
ও তর জ্যোতিষ সম্রাটের শৈশবিক বিচিত্র বর্ণে নানা সময়ে সম্বিত
হইয়া বিবিধ বীজগণ তাহার অবতারণা করিয়াছিল। চৈতন্যচন্দ্রের
প্রত্যেকের জ্যোতিষ সম্রাটের শৈশবিক তামসীলীলা প্রায় সমুদ্রে
উৎপাদিত হইয়া নামায়েন পর্যন্ত হইয়াছিল। বর্তী বর্ষ-সম্রাট
অকিনৎ কলসরপানার বীজ বিকিত করিয়া অসুপূর্ণ চন্দ্র ১৪০০ খৃষ্টাব্দে
অস্বীকৃত হয়। তরশাহের বিস্তারিত করিয়া তর তাহার অকিনৎ
আবর্তিত হইয়াছিল, এক্ষণে আধুনিক শিকিত সম্রাটের প্রায় বিলাস
করেন ও এতদ্বর্তী উক্তকর্তে সর্ব সম্রাট প্রকাশিত করেন। তাহা
হইলে বর্তমান সময় হইতে প্রায় করিয়া খৃষ্ট ১৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত
প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ণে যে, তরশাহের বর্তমানতা ও বর্তন প্রায়
ছিল, তাহা সর্ববাসিন্দ্রকলে প্রমাণিত হইতেছে। পুত্রাণে
কলসর আধুনিক, বহুদায় শিরোমণি ও বহুদায় তরশাহ
মহোদয়গণ মহোদয়গণ সর্বমহোদয়, এমন কি অনেক প্রাচীন
মহোদয়গণও বলিয়া থাকেন। কলসর আধুনিক মহোদয়, চৈতন্য-
চন্দ্রের দ্বিতীয় প্রাচীরের সময়ে “তরশাহ” নামক বহুদায় তর-সম্রাট-
প্রায় প্রকাশিত করেন। মহোদয় বহুদায় তরশাহ এই সময়ে
বহুত বৃত্তি-বিষয়ে ওবিলাকোর বিলাসভ্রমণে ও দেখাবের পুত্রায়
দাওগা সাক্ষ্যমণে নানা তরশাহ উদ্ধৃত করিয়া, দীর্ঘ-বিলাস-পণ্ডিত
ও ওবিলাকোর তাৎপর্য বিচিত্র কৌশলে বিজ্ঞাপিত করেন। বর্তমান
বৈকর-সম্রাটের সর্বাঙ্গপ্রতিষ্ঠা দ্বারা চৈতন্যচন্দ্র ও বিজ্ঞান্য একুটি
মহোদয়গণ, তরশাহের বহু-প্রাচীর পদম ইবৎ বহিষ্ঠা মনে করিতেছেন।
চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চন্দ্রিকাদি প্রকৃতি প্রাচীন বৈকর-প্রায়
পুত্রাণে ইবৎপুত্রী ও কলসর-ভারতীয় বিকট বহুদায় প্রায় বহু-
দীকার বলা স্ট্রীকের শিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞান্য প্রায় সময়ে
অনিক বহিষ্ঠার প্রায়মণে নাই। অনেক প্রাচীরে প্রায় বহুদায়
জ্যোতিষ নামেও অভিহিত করেন। বৈকর সম্রাটের বিজ্ঞান্য প্রায়

বলগেয়ে অনেক স্থানের প্রকৃত অবিকারী ছিলেন। এমিলি বড়ই
জ্যেদে গুণের হাশিত্রি প্ৰিয়। এই অত্যাধি লোকচন্দনের পোষ
হইয়াছে। যিনি বলগেয়ের অসংখ্য বালিকা খাত, ধাঁধার হাশিত্রি
তত্ত্বের দৃষ্টি-বিচার কর্তব্যে প্ৰিয়পূজ্যতার নথির বর্ননাভিত
হইয়াছে, তাহার একান্ত বামাচারী সত্যিকার কথার বিলা
হাতে পাসে? ওস্তাদগণ তাঁর পোষণ সম্বন্ধে কবিত হইয়াছে,—

“अथः नाशः दक्षिः देवताः

अक्षांशः देशकालः उदयः

बानाकण बरः कोलाः

ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ।"

যহাশ্রুত তৈত্তির্য্যবেদেও মধ্যে-মধ্যে বল্লেখ্যে ভাবে বিস্তার হইয়া
‘যত্ৰ আন, যত্ৰ আন’ রূপে লগাতর জীতি উপাধান করিতেন।
সংক্ষেপে এইবার বলা যাউ, সে শব্দে তন্ত্রাত্ম্যের একল বস্তুর বস্তুত্ব
একবারে নির্দিষ্ট। নবাবী হইতে প্রবৃত্ত মিথিলা প্রদেশে সে
বস্ত্র সে প্রদেশস্থান্য করে নাই তাহা সন্দেহ। যৈথিল পণ্ডিত-গণের
উচ্চস্বভাব রূপে বিশ্ববিদ্যী পক্ষের মিল্লও যামাচাণ্ডী তান্ত্রিক হিসেবে ;
নবাবীয়ে জ্ঞানোত্তর প্রবর্তিত। কলে জট পিতোমনি মহালয়ের
সাহসার কটাক্ষাতিতে ‘হুটুগে’ পরিবর্ত হয়। ব্রহ্মান পিতোমনি
মহাপ্র পক্ষের মিল্ল মহাপ্রকট উপলব্ধ করিয়া প্রবর্তিত জ্ঞানোত্তর
জ্ঞান। মধ্যে বসিলাগের—

*ଜବାହର ମୋଡ଼ି ସମାବାଦୀ ମୋଡ଼ି:

বিনা তত্ত্ব মস্তেবিনা শব্দ চৌধাৎ।

अथर्व ऋषिर्वा अथर्व ऋषिर्वा

বিবিধিক প্রাপ্তকে অবস্থায় কবি কঃ।”

বিবিকি-বিবিকিত সংসার এগকে স্মৃতিৰ্ণ প্রবন্ধের প্রবন্ধা আবার
তুলা অস্ত কোন পণ্ডিত আছে ? কেন না আমি যতপান করি না,
মৌরী উপাসনা করি না, তত্ত্বপ্রবের পাঠ্য্য এগে করি না, ও প্রতি
শব্দকে অপব্যব করিয়ার নষ্ট লব গোষণও করি না ।

তুমিতে পাঠ্য। ষাট, শব্দধর দ্বিত্য গ্রন্থের শিরোনামি কবিতা বোধ
বা ভবে। একত আখ্যার হিসেন। শিরোনামি মহাশয় তত্ত্বাক
তত্ত্বাক্ষারী বৈকর সম্ভবাক্ষর। বর্তমান সময়ে মহাশয় একত
বৈকর সম্ভবাক্ষর অনেক মহাশয় একত তত্ত্বাক্ষর উপেক্ষার সামগ্রী
হইলেও, ঐক সম্ভবাক্ষর একত মহাশয়বোধে বৈকর-তত্ত্বাক্ষর মহিমা
অনুভব্য বসিত হয় নাই। গুল্যপাথর মহাশয় বৈকর-তত্ত্বাক্ষর
সমলে অত্যাধি তত্ত্বাক্ষর-বৈকর-বৈকর বৈকর পথ্য শিরোনামি
কবিতায়েন ও কবিতায়েন। একত বৈকর-সম্ভবাক্ষর কবিতায়েন
বা বৈকর-সম্ভবাক্ষর একত বৈকর-সম্ভবাক্ষর কবিতায়েন, এই বৈকর
বৈকর-সম্ভবাক্ষর। বর্তমান সময়ে তত্ত্বাক্ষর একত
তত্ত্বাক্ষর-সম্ভবাক্ষর-বৈকর-সম্ভবাক্ষর

ছিল, তাহা পূর্বের কবিত হইত। ইহার পূর্বের তত্ত্ব-শাস্ত্রে যে বর্ধমানতা ছিল কি না, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে, পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহের সাহায্য নিতাই আবশ্যিক। কিন্তু পাক্কা পণ্ডিতদেরের ও এতদেবীর পাক্কাই শিক্ষার শিক্ষিত যনীতিবিশ্বের বিভিন্ন বিদ্যায় প্রচা-পণ্ডিত পুরাণসমূহ অজ্ঞানি সমগ্র বঙ্গেরের উর্দ্ধনীতি, অতিশ্রম করিতে পারে নাই। পাক্কা পণ্ডিত ও তৎশি-প্রশিক্ষণের প্রচারিত পুরাণ-সমূহের চমকাকাল মুটে অবগত হওয়া বার পুরাণসমূহ অত্যন্ত আধুনিক। তাহাদের মতে অনেক পুরাণের বয়সক এক শত কি বেড়ে শত বৎসর। সর্ব্বম্বোক্ত পুরাণের বয়সক অজ্ঞানি সমগ্র বঙ্গেরের উর্দ্ধযোগ্য লক্ষন করিতে পারে নাই। স্বতঃ পাক্কা পণ্ডিত পুরাণসমূহের পৌরী-পৌরীসহস্রের আলোচনা করিলে যেখা বাইবে, তাহাদের মতে তত্ত্ব-শাস্ত্রের ইদমের আর কি না ?

यकाली, निश्च

[**ঐ**অন্তোষ তরুণার]

[illegible]



যেনকা ও উষা

[শিল্পী—ঈশ্বরদাসচরণ উকিল

(Engraved at the Bharatvaraha Office).

জীতিএব হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাধিপের সহায়তার প্রতি সহায়তা। যথেষ্ট সাহায্যে বৃদ্ধ বিধান ছিল এবং ইহাধিপের বিধি সমুদয়ে তিনি বস্তুতঃই হইয়াছিলেন। বনবৈ সিদ্ধুর পাচ-পারবতী বৃদ্ধা পঠানবধের সমুদয় ইহাধার আনতঃতা হইত, তৎকালে অকালীপন সর্বাশ্রমতী-রূপে বৃদ্ধ হইত।

অকালীপন কাল, মীল ও তেতালাত পশিদ্ধ, চুড়াতি পাপতী ও তদুপরি সৌহবল্য আনতঃ। ইহাধা কেল কর্তন করিয়ে না, কাল (মোহন-গোত পায় জালা-ভাতিয়া) পতিবে, ততা (সৌহ-বল্য) দান করিয়ে, বত্ব (মুখি) রহিয়ে ও কাল্যা (চিকিৎসা) সবে-সবে রহিয়ে, অর্থাৎ গুহ পোষিদ্দসিহের আশেব সত্ত বাতিক নিয়ম সতল অবত পালন করিয়ে। অকালীপন ইতিহাসবর্ষের পাপতী যথহায করিতে আসবানে। শিবপন কেবল বনত-পকালীতে ইতিহাস বর্ষের পাক্কী ব্যবহার করে। অন্তঃস্থতি অকালী মীল পাপতীর নিয়ে ইতিহাস বর্ষের পাপতী পরিধান করে। কলাটেট উপর মীল বর্ষের পাপতীর নিয়ে ইতিহাসবর্ষের পাপতীর অলপিয়েব বেশ সৌভে পাপতা যায়।

জাই গুহপান বলের :-

"সিহাই (কাল) সত্যের (শাখা) যুব (লাল) জুয়াই (হৃদয়ে) যে পহমে (পরিধান করে) সেই গুহ (তক) জাই।"

কাল পশিদ্ধবধারী অকালী, যেত পশিদ্ধবধারী নির্মল, লাল বা হরিজাবর্ণ পশিদ্ধবধারী উদালী প্রভৃতি শিব সমুদায়ের সমুদয়েই জাত-ভাবে আনতঃ। অকালীপন অজ্ঞাত লোকের জায় হুলাপায়ী বা আশিৎ-জোতী নহে কিং অধিক ভায়াত জাত (স্থিতি) লেবন করে।

বাল্পন-বধন আদুর্ভায়েব বিন বাইলে, অকালীপনের পূর্ণ-বৃত্তি পাপতী উঠে। যে সৈন্ত বহে সে পিছুই নহে। অজ সৈন্ত বহে—গুহর সৈন্ত। সৈন্ত বহেও সৈন্ত বৈদিয়ে। এক লম্বের কম চিত্তাই করিয়ে না। যদি পাঁচ জন অকালী উপস্থিত থাকে, তবে করিয়ে "ভোমার সমুদে পাঁচ লক্ষ বর্ষবায়।" যদি সে একতী হয়, তবে করিয়ে যে, ভোমার সমুদে ১২০০০ এক লক্ষ পঁচিশ বারবার বাল্পন আয়ে। যদি কোণ বাল্পনকে এর করা হইত, "তুনি সেসম আছ?" অমনি উত্তর সে বিত, "সৈন্তবল উত্তর আবে।" যদি কেহ সিজাঙ্গা করিত যে, সে কোণা হইতে আনিতকে? অমনি উত্তর বিত, "সৈন্তবল ভোমার হইতে অস্তর হইতেছে।"

সিহের অর্থে অগাধবনে—অনন্তর।

কেব-কেব করেন যে, "জালা" (নয়) হইতে সিহর বধের উপস্থিতি ; অথবা ইহা দক্ষত বিদ্রোহের অঙ্গপ্রাণ। অতুতসময়ের অকালজালা, আটকের শির দাখিব, পাটনাও অগোপাল বদরে সৌখিন সাহায্যে অধির ইহাধিপের সমবেত হইবার দান ; কিন্তু ইহাধিপের অধম দান হুলাপায়ীপন বোমার—কিরাংপূরে। এই দ্বায়ে হুল সাহায্যে পশিদ্ধ বধিব বর্ষবায়। বাল্পনপূর তক মোহায়া বাল্পনপূর সাধিব—

অকালীপন বড়ই সৌভায়া করিত। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে মুঘলদার বিপদের একজন পাপতী একজন বেরোদর শিব বর্ষক এই বোমার বিহত হয়। শিব কহতায় ভ্রাসের সমিত অকালীপনের সমিতঃও ভ্রাণ হইয়াছে।

সুথর শাহী (Suthra Shahi)

সুথর শাহী হিন্দু উদালীপন সমুদায়। হুহ-এসেবে ইহাধিপের সাখা অতি অল্প। গুহরমপূর জেলায় (পাঞ্জাব) বহরমপূরে সুথর শাহী নামে একজন বুয়েতোব ক্ষেত্রী ছিলেন। ইনি তক অর্দ্ধশিবের (শিব-তক) শির হ'ন। তাঁহার দত্যাবিহিত্য রক্ত গাঁহাকে সুথর (পনির) নামে অভিহিত করা হয়। সুথর শাহ হইতে 'সুথর শাহী' বা সমুদায়ের নামের উৎপত্তি। (১)

অগাধক উইলসন বলেন "গুহ তেগ বাহাছন এই সমুদায়ের প্রবর্তক।"

ডাক্তার ট্রম্পার (Dr. Trumpp) যেই এই সমুদায়ের আবিষ্কার একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম হুহ। বহাছনে ইহাধা গুহ বহোবায়িদের শির। উত্তরভেব কর্তৃক গুহ হর হার দিলীতে আনতঃ হন। কিন্তু হর হার বহা পদম বা করিয়া শির সুথর শাহকে প্রেরণ করেন। সুথর গুহবহোকা বিজী উপনীত হন এবং আশন অগাধার বুদ্ধিবল্য ও বহুতে গুহলেন্থেবে সঙ্কট করেন। বোমল সমাট পুস্তকায় বত্ব প্রত্যেক বিপদী হইতে এক এক পাশা লইতে বাজা প্রদান করেন।

বাহা হইক, এক্ষণে এই সমুদায়ভুক্ত ব্যক্তিতা তিকালাভ প্রণে জীবনধারণ করে এবং লোকোনে শিখা একপ্র অজ্ঞাত ধেম করে যে, তিকা না পাইলে কোন বহেই বোমল পরিভাণ করিয়া বাইবে না। ইহাধা তখন বাহারের বহা দিয়া পদম করে তখন ইহাধিপের আকার-প্রকার বৈদ্যাই সকলেই ইহাধিপকে 'সুথর শাহী' বলিয়া কামিতে পারে। সমাটে তুক বর্ষ তিকল, কাল পদমের ৩৬ (সেলি, সত্তকে ও সমুদয়ে বৌদ্ধ এবং হুহ পদমিত হুইটী কাট-বত্ব (ভাঙা) পরম্পরে আখ্যাত করতঃ পাঞ্জাবী ভাষার গুহ নামক বা বৌদী সীত পাঠিত বাহিতে চলিয়াছে।

ইহাধা পদ বাই করে—অধি বহাভ দিক্ষেপ করে ; বহোপদীত বা শিখা বাহা করে না। ইহাধা বাহক ব্রহ্ম সেবন করে ; অনেক বহুপান করিতেও পদ্যাপন নহে। ইহাধিপের ব্যবহার বেশ-প্রসিদ্ধ। অনেক বলেন যে, ইহাধা জুতা খোমার দ্রুতসর্গম হইয়াছে। ইহাধা অজ্ঞাত জাতি হইতে তেলা। সত্রহ করে, এবং সকলের আশের পক্ষে 'পাহ' বোধ করে। ইহাধা প্রকারণে বহু-মত সববে বাস করে। ইহাধিপের প্রধান কলকোয়াবা (গুহপায়) লাহোরে। কান্দীর নিকট নগর সোনে (Nagar Sain) ও পাতিভালার ইহাধিপ বর্ষভবন আছে। ইহাধা হুহ-এসেবে আশিঙ্গ সেবনকার অধিবাসিন্য জত হয়।

ফিলিপ্স, তখনই হঠাৎ ইহার উদ্ভাবন হয়। উক্ত নল কাচ-নির্মিত এবং দেখিতে ঐরাপ সোদাফার। বাহার ভিতর বৈজ্ঞানিক আলো আছে, সেই কাচমুখে ইহার উদ্ভাবন বস্তু বলা বাহির্ষে পারে; কিন্তু সেই কাচমুখের ভিতর যে ‘স্বচ্ছ বাতুনির্মিত তাম্রী’ আছে, তাহা অধ্যাপক বৃন্দোনের পরীক্ষা-পরেই। অধিকন্তু, দুইটি তার বিদ্যুৎ বিক হইতে তাহার ভিতর একপ্রকারে প্রতিবিম্ব, তাহাও দেখান পরাম্পরের সম্মুখীন কিন্তু পরস্পরের সম্মুখীন নহে, উহাদের মধ্যে ব্যবধান ঐরাপ ৪৫ ইঞ্চি দূর। তার দুইটির শেষভাগে দুইখানি ছোট ত্রোকার বাতুনির্মিত পাত্র সংযুক্ত আছে। তাহারা পরস্পর সমান্তরালে নাই; একখানি লম্বাভাবে সরল এবং অপরখানি বেগুন। উক্তদ্বয় বিন্দিত হইলে সন্ধ্যা-বুকে ৪০ ডিগ্রী কোণ স্রষ্ট করিবে। তার এবং ত্রোকার পাত্র দুইটী মাটির বাতুনির্মিত, হস্তাঙ্ক তাক্টিং-পরিচালনশীল; কিন্তু তাহাদের সন্ধ্যায় বাতুনির্মিত হস্তাঙ্ক তাক্টিং-এবং এক তার হইতে অল্প তাপে পৌঁছিতে পারে না। বাতমিক, বলদী সম্পূর্ণরূপে বাতুনির্মিত হইলে, তাক্টিং-পরিচালন এক্ষেত্রেই অসম্ভব হইত। যাহা ঠিক, ইহার ভিতর যে অত্যন্ত বাতু থাকিবে তার, তাহা সম্বন্ধে তাক্টিং-এবং এক তার হইতে অল্প তাপে পৌঁছিতে হইলে, একবারের গাণ অত্যন্ত অধিক হওয়া আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক আলোকের সাহায্যে উল্লিখিত ‘স্বচ্ছ তাম্রী’ প্রদর্শিত করিয়া মন্ত্র বসন্তী গাণ আবশ্যক, তাহাও ইহার তুলনায় অল্প। তাক্টিং-এবং এখন বহাতিতে অত্যন্ত বাতু ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তখন ইহা নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে; কিন্তু যে তাম্রী যেমন ত্রোকার পাত্রের শেষে হইয়াছে, তাহার বিকট নানা বা-বর্ণের আলোর দ্বারা প্রেরিত পাওয়া যায়; এবং তাহার পরেই অপরকার এইই উদ্ভাবন দ্বারা পৃথক করিয়া আছে। এই অপরকার ক্রমে নিম্ন আন্তরন বিন্দিত করিয়া দেখে সময় নদের ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৎপরে এক অল্পত বৃত্ত দৃষ্টগোচর হয়। উল্লিখিত লম্বাখান পাঞ্জীর সম্মুখীন সময় হানে একটা সমুদ্র আঁতা দৃষ্ট হয়। এই সমুদ্র আঁতা হইতেই বৃন্দোনের রহস্য উৎপত্তি।

এখন এক-প্রেক্ষিত করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা বহিরাগত পূর্ণ, বাতুনির্মিত ভিতর কিরূপে সমুদ্র আঁতার দৃষ্ট হয়, তাহা বলা আবশ্যক। যদি জানা যায় অপরকার পাত্রের সাহায্যে লম্বাখান পাঞ্জীর বিকে তাকাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, অতি সূক্ষ্ম অশ্রুদ্রাঘি ইহা হইতে অত্যন্ত বেগে নির্গত হইয়া অপর পার্শ্বের কাঠের গায়ে পড়িয়া উক্ত কাঠের পট্ট করিতেছে। এই সমস্ত অশ্রু ইংরেজীতে “ইলেক্ট্রিক্স” নামে অভিহিত, এবং ইহাওয়েই এবং তাক্টিং-এবংয়ের কারণ। অল্পত ইহারপক্ষে দেখিতে গেলে অত্যন্ত পঞ্জিশালী অপরকার পাত্রের প্রয়োজন, সম্বন্ধে মাই।

যে অশ্রুদ্রাঘির সমষ্টিতে তারের গঠন, তাহাওয়ে অলোকা “ইলেক্ট্রিক্স” নামের দ্রোণ। তাই তাহারা ধীরে-ধীরে তারের অশ্রুদ্রাঘির ধরণতী দ্বারা বিদ্যুৎ নির্গত হয়। উক্তদের ক্ষণ-ক্ষণ সংস্পর্শে যেহে তাপের সৃষ্টি হয়। বলা-ইহাওয়ে, যে তারের দ্বারা লম্বাখান পাঞ্জীর উদ্ভাবন

দ্বারা পরাম্পরের পত্তিত তত্ত অবলম্বন হইবে। একপ্রকারে তাপের আবির্ভাব যেহে তাহাওয়ে প্রদর্শিত হইয়া উঠা অসম্ভব নয়। এই লম্বাখানের উপরেই বৈজ্ঞানিক আলোকের ভিত্তি। এখন এই পরাম্পর-প্রেক্ষিত তার হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন পদ্ধতী অশ্রুদ্রাঘির বেশ যেহে এবং অপর পার্শ্বের কাঠের আকর্ষণ যেহে, ইহারপক্ষে পত্তিত বেশ অত্যন্ত অবলম্বন;—এখন কি লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ হাজার মাইল। ইহাওয়ে এখন কাঠের গায়ে আবির্ভাব প্রতিকূল হয়, তখন যে এক অল্পত বল বহির্ষে তাহাওয়ে আর বিচিত্র কি? ইহাওয়ে সমুদ্র হোমান পাঞ্জীর উপর পড়িয়া তাহাওয়ে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তোলে; এবং তাহা হইতেই বিদ্যুৎ বৃন্দোনের রহস্য বিবর্তিত হয়।

এই রহস্য উদ্ভাবনের ইতিহাস নিম্নে লিখিত হইল। একদিন অধ্যাপক বৃন্দোনের অপরকার উদ্ভাবন দেখার, একপ্রকারে আশ্চর্যের উপর তাক্টিং-পরাম্পরের কিরূপ ব্যবহার, তাহা অধ্যাপন করিবার দ্বারা, বাতুনির্মিত নল লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাহাওয়ে উদ্ভূত বাতুতে নির্গত হইবার পূর্ণ একটা পাওয়া আসা পঞ্জিশালী বাতুনির্মিত তত্ত্বগাণ পাত মাত্র। একপ্রকারে পূর্ণ অসম্ভবতার ইয়াছিল; কিন্তু বৃন্দোনের সাহায্যে বলদী কালে পঞ্জিশালী বাতুত করিয়া সম্পূর্ণ অপরকার ভিতর ইহার পরীক্ষা করিল। তাহার ক্রমে দেখিতে পান যে, পঞ্জিশালী দ্বারা সম্বন্ধে পরাম্পর, একপ্রকারে আশ্চর্যজনী পদ্ধতি পৌঁছে। তৎপরে তিনি খাঁর হস্তাঙ্ক দ্বারা প্রতিকূল করিবার চেষ্টা করেন; ক্রমে সেই আশ্চর্যজনীর উপর হস্তাঙ্ক প্রতিকূলতার পরিঘর্ষে অপরকার প্রতিকূল দেখিতে পান। বাতমিক তাহাওয়ে হাত কড়াপে পঞ্জিত হইয়া যায় নাই; উপরি দ্বারা এই রহস্যের সাহায্যে পদ্ধতি ইয়াছিল মাত্র। ইহা যে একটা অতি আশ্চর্য উদ্ভাবন তাহাওয়ে সম্বন্ধে নাই।

পরীয়ে যদি কোনও ভুলি, হত বা বাতুনির্মিত পদ্ধতি বিদ্যুৎ হয়, তাহা হইলে কোথায় বিবিধতা তাহা ইহার সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বাখান সাহায্যে এই অল্পত উদ্ভাবন তাহাওয়ে কালে লম্বাখান হাত অধিক বিদ্যুৎ করেন নাই। সত্যই ইহা বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন যুগের পট্ট করিয়াছে।

কার্পাস

[শ্রীমতীলাল সাহা]

আজকাল বস্ত্র-বস্ত্র বিদ্যে সমস্ত ইহা ঐতিহাসিক, এবং এই সমস্তের লম্বাখান করিবার নিমিত্ত নানা ধরনের নানা রকম উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক কার্পাস-চাষের আবশ্যকতা অল্পত করিয়াছেন এবং সেই কেষ বা বেশাধীন্যক কার্পাস গাণ করিতে উপবেশিত হিতেছেন। তত্ত্বক্ষেত্রে লম্বাখান পদ্ধতি আশা করি

কার্ণাল সমস্ত উক্ত ও নাস্তিকতাক সম্বন্ধেই কথিত থাকে ; কিন্তু জ্যোতিষই যে কার্ণালের প্রকৃতি এবং এই যেসেতেই যে ইহার প্রচলন সর্বপ্রথমে আরম্ভ হয়, তাহার তুল্যত্বই প্রমাণ আছে। গ্রীস-যেশ্বর প্রথম ঐতিহাসিক লেখক হেরোডোটস্ বহিঃতত্ত্বে “ভারতবর্ষে একমাত্রার বৃক্ষ আছে, তাহাতে উল বা গম্বল ফলে এবং তাহা হইতে ভারতবর্ষের লোকেরা খাদ্যাদি প্রস্তুত করে।” জার্মানিয়াও এইরূপ কার্ণালকে “বটম” বা বৃক্ষ-উল বলে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম শুধু যে বট, তাহাতেও কার্ণালের উৎপত্তি আছে। ইহা হইতেই বহুদিন হইতেই যে, ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথমে কার্ণালের প্রচলন আরম্ভ হয়।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে কার্ণাল জন্মিতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক। পূর্বকই বলিয়াছি যে, কার্ণাল উক্ত ও নাস্তিকতাক সেনারই ফল। হিন্দুযাওয়ার ১৫ উত্তর হইতে হিন্দুযাওয়ার ৩৭ দক্ষিণ মধ্যে যে বিস্তৃত ভূ-খণ্ড আছে, তাহাতেই কার্ণাল জন্মিতে পারে; অর্থাৎ আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার তিন-চতুর্থাংশ, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং আটলান্টিক ও এশিয়ার মধ্যে যে সমস্ত দীপপুঞ্জ আছে—সেইগুলিতেই কার্ণাল জন্মিতে পারে। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণাংশের দক্ষিণ অংশেও ভারতবর্ষ, মিসর ও গ্রানিসেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্ণাল উৎপন্ন হয়। থাকে।

অধিকন্তু, পশ্চিমভারতীয় দীপপুঞ্জ, পশ্চিম আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, গ্রিস, চীন ও জাপান প্রভৃতিও কিছু কিছু কার্ণাল উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই সমস্ত কার্ণাল উক্ত বেশদূরেই ব্যবহৃত হয়, বাহিরে প্রচারিত হয় না।

কার্ণালের জাতি নির্ণয়

উক্তভবদ্বিধ পণ্ডিতগণ কার্ণালের বানা জাতির নির্দেশ করিয়াছেন ; কেহ গাছ, কেহ সার, আবার কেহ বা ভূতাবিধ জাতির উৎপত্তি করিয়াছেন। যাহা হউক, নিম্নলিখিত যে কয়েকটি জাতি সকল উক্তভবদ্বিধ পণ্ডিতগণই নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাগুলির বৈজ্ঞানিক নাম দিবে প্রস্তুত হইল; যথা :—

প্রথম। বার্সোডেন্স জাতীয়।

দ্বিতীয়। হায়ব্রুইন জাতীয়।

তৃতীয়। ওখনি জাতীয়।

চতুর্থ। পোর জাতীয়।

কোমেল, মল্ল, দীর্ঘ-ভ্রমণবিধি যে সকল দুঃখান কার্ণাল বার্সোডেন্স বীণা এবং তুলিও জন্মিবার সম্ভ্রামণকূলে আছে, সেইগুলিকে বার্সোডেন্স জাতীয় কার্ণাল কহে। বার্সোডেন্স নামক দীপ হইতে এই জাতীয় কার্ণাল বার্সোডেন্স নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কার্ণালের ফল হরিদ্রা বর্ণের এবং ইহার বীজের নিম্নতলে দুই লোম আছে না।

ওখনি জাতীয় কার্ণাল বৃক্ষাংশের তুল্যকে হায়ব্রুইন জাতীয় কার্ণাল বলি। উক্তভবদ্বিধ পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই কার্ণালের কোষ বা চৌকীগুলি লোমল এবং ইহার বীজগুলিতে দুই সমুদ্র আভাবিধি লোম আনুত থাকে। দক্ষিণ কার্ণাল এই জাতীয় অন্তর্গত।

ওখনি পুত্র বৃক্ষাভাবিধি কার্ণালের গার ওখনি জাতীয়ের অন্তর্গত। এই বৃক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ৩ ফুটে ৭ ফিট মাত্র উচ্চ হয়। এই কার্ণাল বৃক্ষ অল্পমিত হইবার পর গড়ে ৮ মাস মধ্যেই ইহার চৌকীগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহারও ফল হরিদ্রাবর্ণের। ভারত-বর্ষীয় সমস্ত কার্ণালই আর এই জাতীয়।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল ও পোর যেসে যে সমস্ত কার্ণাল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পোর জাতীয় কার্ণাল কহে। এই জাতীয় কার্ণাল-বৃক্ষ ১০ হইতে ১২ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে এবং ইহার ফল লাল বর্ণের। এই জাতীয়ের একই বৃক্ষ হইতে ১০-১২ বৎসর পর্যন্ত কার্ণাল পাওয়া যায় বটে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের কার্ণালই সর্বোৎকৃষ্ট। পরে যেমন ইহা বড় হইতে থাকে, কার্ণালও তেমনি নিতুই হইতে নিতুইতর হইয়া পড়ে।

দি-আই-জাতীয়, হুজি-দি-আই-জাতীয়, লি-দি-আই-জাতীয়, টাফি-দি-আই-জাতীয়, পোর-দি-আই-জাতীয় ও ব্যাসেলী কার্ণাল—বার্সোডেন্স জাতীয়।

আপলুল্লুয়, বোবাইলী, টেলসী, অরিসী ও যেত মিসরীয় কার্ণাল—হায়ব্রুইন জাতীয়।

জাটন মিসরীয়, মিসরা, জীক, মিসরবাদী গারওয়াদী, বারোতী, থেলোর, অমবাবতী, ভামতী, মিচি, “বেসল,” ভিনিভেরী কার্ণাল ওখনি জাতীয়।

ব্রাজিলী ও পোর যেশ্বরকার্ণাল—পোর জাতীয়। অত্যন্ত বেশের কার্ণালের বিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে প্রত্যেক দীর্ঘ হইয়া পড়িবে যেন করিয়া নিজে কেবল ভারতবর্ষীয় কার্ণালের বিবরণই প্রস্তুত হইল, প্রসঙ্গক্রমে অন্তর্গত কার্ণালের কথাও বলা হইল।

ভারতবর্ষীয় কার্ণালকে তিনভাবে বিভক্ত করা হইতে পারে—যথা, ১ম, যেশ্বর বীজ হইতে উৎপন্ন; ২য়, দক্ষিণ বীজ হইতে উৎপন্ন এবং ৩য়, মিসরীয় ও দি-আই-জাতীয় বীজ হইতে উৎপন্ন। অল্প যেশ্বর কার্ণালপেক্ষা ভারতবর্ষীয় কার্ণাল নিতুই জাতীয়।

হিসনবাদী কার্ণাল

ভারতবর্ষীয় কার্ণালের মধ্যে হিসনবাদী কার্ণালই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা যথা প্রচলনপূর্ণ ও গারবা, দীপপুঞ্জ, দিবার প্রকৃতি বান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রচলনে হিসনবাদী নামক সমস্তের দীপপুঞ্জের ইহার নাম হিসনবাদী কার্ণাল হইয়াছে। ইহাতে আবর্জ্যবান থাকে বটে, কিন্তু ইহার তত বেশ মহত্ব। ইহার ২৫ মাসকা কাকসভাবিধি

হইতে ৩২ নম্বর পর্যন্ত টানা হুতা কাটা হইতে পারে; কিন্তু মার্কিন কার্পাসের সন্ধিত মিলিত হইলে ১০ নম্বর পর্যন্ত হুতা ইহা হইতে অন্তর করা হইতে পারে। ইহা ১০০ গ্রেণ ভারসহ এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চি ব্যাপক ভাগের একভাগ।

বরোচী কার্পাস

বরোচী কার্পাস ভারতবর্ষীয় কার্পাসের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। বোম্বাই প্রদেশের বরোচ, বড়োবা, পৌরাণী, রেওয়া কাটা প্রভৃতি স্থানে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার রং দীর্ঘ শিকল বর্ণ এবং ইহা যখন রন্ধনের পরিকার। এই কার্পাস অল্পপরিমাণে প্রযুক্ত হইলেও বেশ শক্ত ও স্থিতিশীল। ইহার তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস বিদ্যমান কার্পাসের সমান। ২৫ নম্বর পর্যন্ত টানা গোল্ডেন হুতা ইহাতে কাটা হইতে পারে।

খোলেয়া কার্পাস

বোম্বাই প্রদেশভূক্ত কাবিবাক, আভান্ডাবাব, কাম্ব, বড়োবা, অমরাবী, পালমপুর, বরোচ, মারিকোটা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে অল্প তন্ত ও আবর্জনাবি বসন্ত পরিমাণে থাকে। ইহার রং সাদা এবং তন্তও বসন্তে সম্মত নহে। ২৫ নম্বর পর্যন্ত গোল্ডেন হুতা সাদা ইহা হইতে অন্তর হইতে পারে। তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চি ১০০ ভাগের এক ভাগ।

মাত্রাণী কার্পাস

মাত্রাণ প্রদেশে গারি প্রকারের কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে; বহা, গন্ডিনে কোকোবনী, তিমিতলী ও কোরেনথোটেটো বা সাদেলী। নিম্নের নামের গন্ধিপাকসে গন্ডিনে কার্পাসই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোকোবনী কার্পাস হস্তাকৃত সাদা বর্ণের। ইহা ১০ হইতে ১২ নম্বরের হুতার শক্তি প্রাপ্ত। মাত্রাণ প্রদেশে যত প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে তিমিতলী কার্পাসই পরিমাণে সঙ্গোপনক। অধিক এবং ইহা ভারতবর্ষীয় কার্পাসের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। ইহা মাত্রাণ প্রদেশের গন্ধিপাকসে উৎপন্ন হয় এবং এই স্থানের সঙ্গোপন কার্পাসের গন্ধে অল্পসুন্দর হওয়ায় ইহার বিন-বিন উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার তন্ত বেশ সম্মত ও স্থিতিশীল এবং চন্দনই রন্ধনের পরিকার।

ইহার তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস ১০০ ২৫ নম্বর পর্যন্ত টানা হুতা ইহা হইতে অন্তর হয়।

খারওয়াড়ী কার্পাস

খারওয়াড়ী কার্পাস দুই প্রকারের; বহা, একপ্রকার দেশীয় বোম্বাই হইতে, আর অন্য প্রকার বিদেশীয় এবং মার্কিন বোম্বাই হইতে উৎপন্ন। বিলাপু, বাহবাড়, বেলগাঁও, মোলাপুহ ও বন্ধিন মহামাষ্ট্র বেষ্ট্র প্রকারে উৎপন্ন হয়। দেশী বোম্বাইকার কার্পাস শক্ত বটে, তবে কর্কণ এবং মাত্রাণের রন্ধনের পরিকার। ইহার তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১১

ইহার ব্যাস ১০০ এবং ২০ নম্বর পর্যন্ত টানা হুতা অন্তর করিতে ইহা বসন্তে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অমরাবতী কার্পাস

অমরাবতী কার্পাস বেহার, বামেশ, বরসি, আন্ধ্রনগর ও বিহার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বসন্ত ইহা আত্মকাল দিল্লীর পুনে তিন প্রদেশে বিতরিত হয়, বহা—অমরাবতী, বামেশী ও তিমিতলী—কিন্তু বামেশী গন্ধে ইহা বেহারী, বামেশী ও বরসীবন্দী নামে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। সর্বোৎকৃষ্ট অমরাবতী কার্পাস বেহার প্রদেশে আছে। বামেশী কার্পাসই মাদারী সেরাতে ও অল্প পরিমাণে মাসিক অক্ষলে উৎপন্ন হয়। বরসী এবং বরসী প্রদেশীয় কার্পাস বরসী এবং আন্ধ্রনগর নামক মহানগরের সান্দ্রপুসারে অতিবিত্ত হইয়াছে।

ইহার তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস ১০০ ইহাতে অপরিশুদ্ধ তন্ত অধিক থাকায় হুতা কাটিতে “গোল্ডেন” বা হুতি অনেক শক্তি। বহা হুতি ইহার হুতা বহা না হইলেও সেরাতের সমকক্ষ নহে। ইহার রং সাদা এবং ইহা হইতে ২০ নম্বরের টানা ও গোল্ডেন উত্তর প্রকারের হুতাই অন্তর হয়।

কোমতাই কার্পাস

ইহা বোম্বাই প্রদেশভূক্ত খিলাপু, বামবা, বেলগাঁও, মোলাপুহ এবং বন্ধিন মহামাষ্ট্র রাজ্যে উৎপন্ন হয়। ইহার তন্ত কোমল ও সুন্দর এবং তন্তে স্বাভাবিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহার তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস ১০০ ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জনাবি বসন্ত থাকে। ইহার রং শিশিলাত। ইহা হইতে ১০ নম্বর পর্যন্ত গোল্ডেন হুতা সাদা কাটা হইতে পারে।

“বেলস” কার্পাস

ভারতবর্ষে বর্তমানকার কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহারিগের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা নিরুৎকৃষ্ট হইলেও অত্যন্ত কার্পাস অনেক। ইহাই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং ইহা কেবলমাত্র যে ধরনেরই উৎপন্ন হয় তাহা মরে; গরত, ফুল-প্রদেশ ও অমোঘার, বহা প্রদেশে, “মাত্রাণ” নামের, প্রাক্ষণে এবং দিল্লী প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এই কার্পাস “বেলস” কার্পাস নামে অভিহিত হইলেও, বাস্তবিক গন্ধে বসন্তে ইহা অতি অল্প পরিমাণেই উৎপাদিত হয়। ইহাতে অত্যধিক আবর্জনাবি থাকে। ইহার তন্ত শক্ত হইলেও মোটা, কর্কণ এবং তাহারে যত ও মোটা। ইহা বেশ বর্ণের। ইহার তন্ত দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস ১০০ ১০ নম্বর হইতে ১০ নম্বর পর্যন্ত টানা হুতা অন্তর করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সিদ্ধি কার্পাস

দিল্লী প্রদেশে আছে বলিয়া ইহাকে সিদ্ধি কার্পাস বলে। ইহার তন্তও সুন্দর এবং বেশ বর্ণের। ইহা চন্দনই রন্ধনের সম্মত এবং পূর্ণোদ্ভিজ্জিত করকে প্রকার কার্পাস অপেক্ষা পরিকার। ইহার

তত্ত্ব সৈধ্যে ১/২ হইতে ১/৩ এবং ইহার বায় ১/১০০ ইহা হইতে উত্তম ১২ নম্বর পর্যন্ত টানা ও পোড়নের হুতা প্রস্তুত হইতে পারে।

এসম্বলিয়ার কার্পাস

এসম্বলিয়ার কার্পাস—এসম্বলিয়ার টাকীর পক্ষিপোষকুলে প্রসিদ্ধ থাকে। ইহার বর্ণ অশুদ্ধ বর্ণে এবং ইহা মধ্যমরূপ পরিভার ও নক। ইহার তত্ত্ব সৈধ্যে ১/২ হইতে ১/৩ এবং ইহার বায় ১/১০০। ২০ নম্বর পর্যন্ত পোড়নের হুতা ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

পশ্চিম ভারতীয় কার্পাস

পশ্চিম ভারতীয় কার্পাস বলিতে পশ্চিম ভারতীয় বীপপুত্রাংগের কার্পাসই বুঝায়। ইহা উক্ত বীপপুত্রের—কুলা, ভূমিনিকা, লামাইকা প্রভৃতি বীপে প্রাপ্য। ইহাতে অস্বাভাবিক আয়ুর্জনাধি থাকে ও ইহা মধ্যমরূপ নক, কিন্তু তত্ত্ব ও নক। ৩০ নম্বর পর্যন্ত টানা ও পোড়নের হুতা প্রস্তুত হইতে পারে। তত্ত্ব সৈধ্যে ১/২ হইতে ১/৩ এবং ইহার বায় ১/১০০।

আফ্রিক কার্পাস

ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত নাটালের পশ্চিম-পূর্বোপকূলে, আশার দিগির পক্ষিপোষকুলে ও লাইবেরিয়া নামক স্থানে প্রসিদ্ধ থাকে। ইহা উচ্চ, হালকা, নরম। ইহাতে অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র তত্ত্ব থাকে বটে, কিন্তু আয়ুর্জনা প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। ইহার তত্ত্ব মধ্যমরূপ নক এবং ২০ নম্বর পর্যন্ত টানা হুতা প্রস্তুত হইতে পারে। তত্ত্ব সৈধ্যে ১/২ হইতে ১/৩ এবং ইহার বায় ১/১২০।

আমেরিকার বুলভারভো আন্তঃ দুই একর বিশেষ গুণবিশিষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হয়; যথা বেগেরলু ও পিয়ারলু। ইহাদের চাষে পুষ্ণ বয় লগ্ন্য হয়। বিশিষ্ট গুণবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বলিতে বাহাই বীজ হইতে এই দুইটি কার্পাস উৎপন্ন করা হয়।

বেগেরলু কার্পাস বীজ, নক ও মিহি। পিয়ারলু কার্পাসও বীজ, নক এবং দুই: অধিকতর ইহা বেগেরলুর ত্রিগুণ, কোমল ও দুগ্ধের মত সাদা। ইহা সাধারণতঃ মধ্যম প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

মোহা, পেট্রি ইত্যাদি বুদ্ধিব্যায় লক্ষ্য যে হুতা ব্যবহৃত হয় তাহা ব্রাজিল, লোক ও ব্রাজিল মিসরীয় কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। ব্রাজিলি লোক কার্পাস হইতে অতি উৎকৃষ্ট বেষ্টবর্ণের মোহা পেট্রির হুতা হয় এবং মিসরীয় হইতে “কোমিতা” বা হালকা দেহের নবের হুতা প্রস্তুত হয়।

কার্পাসের পন্থী হুতা প্রস্তুত করিতে বেগেরলু, মোহাইনী ও মাজিনী কার্পাসের গোমেদু ব্যবহৃত হয়। মধ্যম প্রস্তুত করিতে যেত মিসরীয় কার্পাসের হুতা ব্যবহৃত হয়। পিয়ারলু ও ব্রাজিল মিসরীয় কার্পাসও ব্যবহৃত হয়।

হারবারাইসি—ব্রাজিল মিসরীয় কার্পাসই হারবারাইসি, করার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

লোক ও পেট্রি—প্রস্তুত করিতে লী-আইম্যাডী ও মিসরীয় কার্পাস ব্যবহৃত হয়।

মুখীক্যোপমোমী হুতা প্রস্তুত করিতে সর্বোৎকৃষ্ট মিসরীয় ও লী-আইম্যাডী কার্পাস ব্যতীত ব্যবহৃত হয়।

ব্রাজিলীয় বেষ্ট একর কার্পাস ব্যবহৃত হয়, তাহারূপে লী-আই-ম্যাডী কার্পাসই তদ্রূপে প্রথম হাবীর। মিসরীয় কার্পাস দ্বিতীয় হাবীর। ব্রাজিলি ও শেরবেশীয় কার্পাস তৃতীয় হাবীর। বার্কিন চতুর্থ হাবীর। এবং ভারতবর্ষীয় ৭ম হাবীর। কিন্তু বেষ্ট একর কার্পাস উৎপন্ন হয়, পরিমাণ হিসাবে তাহারূপে প্রথম বার্কিন কার্পাসই সর্বোৎকৃষ্ট অধিক। ভারতীয় কার্পাস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, মিসরীয় তৃতীয় হাবীর, ব্রাজিলি ও শেরবেশীয় চতুর্থ হাবীর এবং লী-আইম্যাডী কার্পাসই সর্বোৎকৃষ্ট অল্প উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে সকল বন্দর হইতে উপরিস্থিত কার্পাস ভিন্ন ভিন্ন দেশে আমদানি অথবা রপ্তানি করা হয়, তাহারূপে নামক এই স্থানে প্রথম হইল। যথা—

আমেরিকার—মিউইজক, মিউ অরলিনস্ ও চারলস্‌টন।

ইংলণ্ডের—মিডারলু ও ব্যাকেলি।

জর্জিয়া—ব্রীয়েন।

কালের—হাতার।

হলেন্ডের—আম্‌স্টারডাম।

মিশরের—আলেক্সান্দ্রিয়া।

ভারতবর্ষের—বোম্বাই।

কোন কোন দেশে কোন কোন ভারতীয় কার্পাস ব্যবহৃত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা:—

আমেরিকার—বার্কিন কার্পাস ব্যবহৃত হয়।

বিশাখের—বার্কিন ও মিসরীয়।

বার্কিনিতে—বার্কিন ও কিন্তু ভারতবর্ষীয়।

ক্রোম—ভারতবর্ষীয়।

হলেন্ডের— ই

ভারতবর্ষের— ই

যে সকল প্রত্যেক লক্ষণ যাহা কার্পাসের উৎকৃষ্ট নির্ণয়িত হয়, সেগুলি এই স্থানে উল্লেখ করা গাইতেছে; যথা:—

১। তত্ত্ব সৈধ্যে। ২। দুগ্ধতা। ৩। বর্ণ। ৪। নির্মলতা।

৫। মধ্য বা মধ্যমরূপ। ৬। নক। ৭। দ্বিগুণবাক্য।

৮। বাহু লম্ব।

আসুহীঅধিক লক্ষণ—

১। বাজানিক পাক। ২। তত্ত্ব বন্ধের দুগ্ধতা। ৩। মধ্যতা।

৪। মধ্য। ৫। দুগ্ধগর্ভতা ইত্যাদি।

এই বিভিন্ন গুণগুলি প্রাথমিক: বিশিষ্টভিত্তি কাপের উপর নির্ভর করে; যথা:—

- ১। বীজের প্রকৃতি। ২। মণির প্রকৃতি। ৩। জমি-প্রস্তুত-
এখানী। ৪। চাষের এখানী। ৫। বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা।
৬। কার্পাস চেন ও বীর পৃথকীকরণ।

এই রূপী বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বারম্বারে করিবার যত্ন
হইল।

জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের উপযোগী কি না ?

[অধ্যাপক ঐক্যোপেন্দ্রচন্দ্র হস্ত, এম্-এ, বি-টি]

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপান অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।
যত দিন যৎসর পরে এই সকল বিষয়ে জাপান এত উন্নতি লাভ
করিয়াছে যে, সে আজ সুবিধীর অন্তর বিজ্ঞানোন্নত জাতির সঙ্গে
একিংশিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভারতের বিশিষ্টত্রে আজ
জাপানী ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ। জাপানের এইরূপ আপাতীয় বৈশিষ্ট্য
উন্নতির দুল তাহার প্রমাণীয়ক ব্যবহারিক শিক্ষাব্যবস্থা। ভারতও
আজ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতি লাভার্থ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।
কি এখানী অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে এক সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ
করিতে সমর্থ হইবে, তাহা এখন বেশবালী জনসাধারণ ও শাসনকর্তৃপক্ষ
উক্ত বিষয়েভাবে আলোচনা করিতেছেন। অত্র বিব্র হইল ভারতীয়
শিল্প-কবিশিল্পের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শিল্প-
শিক্ষা প্রথমে ওঁহারা কতকগুলি সুচিহ্নিত, লোক-হিতকর, প্রাচীন
উপস্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর এ সময়ে জাপানের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-
ব্যবস্থার আলোচনা অসাধারণ বা অসাধারণ হইবে বা। জাপানের
এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের সঙ্গে কতটা উপযোগী, তাহা শিক্ষাজিহ্ন
ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন।

জাপানে সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে ব্রহ্মণ, বধ্য, উচ্চ, ও কলেজ—
এই চারি বিভাগ আছে, ব্যবহারিক শিক্ষা প্রথমে ও জাপানে তদ্রূপ চারিটি
বিভাগ আছে। ব্যবহারিক শিক্ষার বিভাগগুলি সাধারণ শিক্ষা-
বিভাগের সঙ্গে যেনে তাহা সমষ্টি রহিয়াছে। ব্যবহারিক শিক্ষা
বলিতে জাপানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বৌদ্ধিজ, কলাবিজ্ঞা প্রকৃতি
ধর্ম প্রভৃতি। কিন্তু এই প্রথমে শুধু কৃষি, শিল্প আলোচিত হইবে।

জাপানে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিভাগগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—
আজ বিভাগ, বধ্য বিভাগ, উচ্চ বিভাগ ও কলেজ। আজ
বিভাগগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—‘পরিপূরক’ (supple-
mentary) ব্যবহারিক বিভাগ ও ‘ব’ দ্বিতীয় ব্যবহারিক বিভাগ।

‘পরিপূরক’ ব্যবহারিক বিভাগ।

(Supplementary Technical Schools)

এ সকল বালক বিদ্যালয়-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। Ordinary Primary

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করিবার প্রচলিত
এক প্রকার বিভাগের প্রচলিত হইয়াছে। ইহাশিক্ষকে ‘পরিপূরক’
ব্যবহারিক বিভাগের বলা হয়। এই বিভাগের সাধারণতঃ দুই-তিন
বৎসর পড়িতে হয়। বিভাগের সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলায় বসে। কারণ,
ইহাদের নিজ ঘর নাই বলিয়া, ইহারা সন্ধ্যাবেলায় প্রাথমিক বিভাগের
বহুগুলিই ব্যবহার করে। এই বিভাগের শিক্ষকগণের অবকাশ-ই
দিলের বেলায় প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকতা করে। অতঃপর এই
সকল শিক্ষককে অবকাশ সময়ে ব্যবহারিক বিভাগের পাঠ করিয়া
‘পরিপূরক’ বিভাগের শিক্ষাক্রম-কার্যের উপযোগী শিক্ষা লাভ
করিতে হয়।

এই বিভাগের জাপানী ভাষা, গণিত ও নীতি প্রথমে পাঠ প্রদান
করিতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিই এখানে বিশেষ মনো-
যোগ দেওয়া হয়। বিশিষ্টত্রে বিষয়গুলি হইতে ব্যবহারিক শিক্ষার
বিষয়গুলি ইচ্ছাযত্নে ব্যক্তিগত হইতে হয়—

(১) শিল্প-বিজ্ঞা—পদার্থ-বিজ্ঞা, রসায়ন-বিজ্ঞা, চিত্রাঙ্কন, প্রকৌশল,
স্থায়ী চিত্রাঙ্কন (Mechanical Drawing), আর্কিটেকচার কাঁচের
কাঠ (Wood-modelling), বস্ত্র-প্রকৌশল (Designing),
গতিবিজ্ঞান (Dynamics), যন্ত্রপাতি প্রকৌশল।

(২) কৃষি-বিজ্ঞা—পদার্থ-বিজ্ঞা, রসায়ন, জীব-বিজ্ঞা (Natural
History), জলিমা (Soils), জলির সাহ, চাষের প্রণালী, চাষের
যন্ত্র, শস্যনিষ্কাশন কৌশল, শস্যের ব্যাধি, উদ্যান কল (Horti-
culture), পল-পালন, পরিমাপের কাঠ (Surveying)

(৩) বাণিজ্য-বিজ্ঞা—বাণিজ্য সংক্রান্ত গণিত ও চিত্রপত্র, পণ্যগ্রহণ,
জুগাণ, হিসাবপত্র (Book-keeping), বাণিজ্য-বিষয়ক আইন,
বৈদেশিক ভাষা, ইত্যাদি।

‘ব’ দ্বিতীয় ব্যবহারিক বিভাগ।

(Technical School of Class “B”)

প্রাথমিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের প্রচলিত জাপানে আর এক
প্রকার আদ্য ব্যবহারিক বিভাগের আছে। ইহাশিক্ষকে ‘ব’ দ্বিতীয়
ব্যবহারিক বিভাগের বলা হইতে পারে। এই ‘ব’ দ্বিতীয় বিভাগের
স্থানীয় প্রকৌশলীজ্ঞতা ও উপযোগিতা অনুসারে কোথাও বা কৃষি,
কোথাও বা বাণিজ্য, আর কোথাও বা শিল্প-কার্য শিক্ষা দেওয়া হয়।
এই সকল বিভাগের প্রবেশ করিতে হইলে, শিক্ষার্থীকে উচ্চ-প্রাথমিক
বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ সমাপন করিতে হয়। যখন বৎসর
বয়সের বিষয়ক বালককে এখানে লওয়া হয় না। এখানে পাঁচ বৎসর
অধ্যয়ন করিতে হয়। এই বিভাগগুলি ‘পরিপূরক’ ব্যবহারিক
বিদ্যালয় প্রাথমিক উন্নততর। ইহাদের নিম্নের বিভাগের-পূর্ব এখা
নিম্নেরই শিক্ষক আছে। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-

মধ্য ব্যবহারিক বিদ্যালয়

পূর্বেই ব্যবহারিক বিদ্যালয় অংশকা উচ্চতর আর এক প্রকার ব্যবহারিক বিদ্যালয় আছে। ইহাবিশেষে 'খ'মিত্তির ব্যবহারিক বিদ্যালয় বলা হয়। বিভিন্ন স্থানের প্রয়োজনানুসারে অঙ্গসারে এখানেও কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে চতুর্থ পর্য্যবসিত করিয়া এই স্কুল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে অধ্যয়নকাল সাধারণতঃ ৩৫ বৎসর।

উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয়।

উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী দুইতরফক সাধারণ মধ্য বিদ্যালয়ের (Middle School) পাঠ সমাপন করিতে হয়। মধ্য ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়াও তাহারো এক স্কুল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে শিক্ষার্থীর বয়স ১৭২ উপরে হওয়া আবশ্যক। এখানে সাধারণতঃ ৫ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-কাল ৬ বৎসরেরও অধিক।

কলেজ বিভাগ।

উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয় অংশকা উচ্চতর আর এক প্রকার বিদ্যালয় আছে। ইহাবিশেষে 'কলেজ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এখানে প্রবেশ করিতে হইলে, শিক্ষার্থীকে সাধারণ বিভাগে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহারো উচ্চ বিদ্যালয়ের (আনাতের প্রথম শ্রেণীর কলেজের তুল্য) পাঠ সমাপন করিতে হয়। এই প্রকার কলেজে সাধারণতঃ তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

হুত্যাং আবারও দেখিতে পাই যে, আপনেন সাধারণ শিক্ষার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে সমান্তরাল ভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষার স্থান বিস্তৃত হইয়াছে। আনাতের শেষে, বালক শিশুপ্রাথমিক বিদ্যালয় জির শিক্ষালয়ের বিচার স্থান দেখিতে পায় না। কৃষকের সন্তানই হউক, বা শিল্পীর সন্তানই হউক, বা ব্যবসায়ীর সন্তানই হউক, বা দলীতাবী মধ্যবিত্ত লোকের সন্তানই হউক, সকলকেই, শিক্ষাব্যাপ্ত করিতে হইবে, সেই উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশ্রয় লইতে হয়; তারপর মধ্য বিদ্যালয়, তারপর উচ্চ বিদ্যালয়। এইরূপে সকলকেই এক হয়ে পিঠি হইতে হয়। তাই, যে কৃষক কৃষি-ব্যাপারে তাহার সন্তানের সাহায্য পাইতে ইচ্ছুক, সে সমাজকে কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের আর উপায় নাই দেখিয়া, বাধ্য হইয়া তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসে। এইখানেই হয় ত বালকের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। অপর কোনও কৃষক হয় ত পুত্রকে উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। সেখানে পাঠ সমাপনান্তে বালক ঘরে-ঘরে উক্ত হইতে উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। এইরূপে পিতার বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া পুত্র যখন গৃহে প্রত্যাপ্ত হয়, তখন সে পিতাকে কৃষিকার্য্যে বিঘ্নের

করিয়া পিতা বেগুন হুগে-বজ্রবে কল্যাণতিপাত করে, গৃহে শিক্ষিত হইয়াও তত্ত্বমুগ অর্থোপার্জনে অক্ষম হয় এবং অদুঃখ ও অমুঃখ জীবন যাপন করে। শিক্ষা-ব্যবহার দেখেই বিন-বিন সমাজমনো এইতম অসন্তোষ ও দুঃখ-বৈয়ের সৃষ্টি হইতেছে। এই সমস্যার কৃষক-সমস্যার শিক্ষা সম্বন্ধে বেগুন প্রণোদ্য, শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সম্বন্ধেও তরুণ প্রণোদ্য।

আপনেন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্তঃস্থ। নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গারি বৎসরের বস্ত্রতামুলক পাঠ সমাপন করিয়াই, বালক সম্পূর্ণ বহু গণ উদ্বুদ্ধ দেখিতে পায়। সে দেখিতে পায়, তাহার জ্ঞান সাধারণ বিভাগে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; কৃষি-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি তাহার স্বচ্ছন্দেই মস্ত প্রস্তুত হইয়া হইয়াছে। আবার সাধারণ বিভাগের উক্ত-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, সে আর একপ্রকার শির কৃষিবাণিজ্য বিদ্যালয়ে তাহার মস্ত উদ্বুদ্ধ দেখিতে পায়। তারপর উক্ত-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গারি বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়া, সে আবার আর এক প্রকার কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পায়। তারপর মধ্য-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়াও সে উক্ত কৃষিশিল্প-বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা তারপর মধ্য-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া সে কৃষি শিল্প-বাণিজ্য কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে। এইরূপে যে কোনও শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার অন্তে শিক্ষার্থী হনোমত বিভাগ নির্বাচনে করিতে দ্বন্দ্বেন পায়; অসময়ের শেষের ভ্রান্ত মনন ছাড়ি তঁহু চাহুয়া বা বায়ের (Bar) বিকে কৃষিকর পড়ে না।

এখন আপনেন একে একে আপনেন কৃষিশিল্প-বাণিজ্য বিদ্যালয়গুলির বিধে বিবরণ প্রদান করিব।

কৃষি-বিদ্যালয় ১.

'পরিপূরক' কৃষি-বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিঘের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। সেখানে কৃষি বিঘের শিক্ষা বিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রণোদ্যে প্রদত্ত হয় কি না সম্বন্ধে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবৃত্ত পাঠের পরিপূরক (supplement) করাই এই বিদ্যালয়গুলির প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু "খ"মিত্তির কৃষি বিদ্যালয়ে (Agricultural School Class B) বিঘাগুলি সীমিত পট্টন হয়। সুতরাং এই 'খ'মিত্তির বিদ্যালয়-গুলিকেই আখ্যা কৃষি বিদ্যালয় বলা সম্ভব। 'ক'মিত্তির কৃষি-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর বিঘাগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইতে পারে। সাধারণ বিঘা ও কৃষি বিঘা। দীর্ঘ শিক্ষা, আপাদী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, এবং ভূমি সাধারণ বিঘার অন্তর্গত। ইহা ছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি (Political Economy) এবং চিন্তাশক্তি সাধারণ বিঘা-রূপে ইচ্ছানুসারে পট্টন হইতে পারে। কৃষি সম্বন্ধে বিঘার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিকা, ভূমির শাখা, কৃষিপ্রান্ত্র ভাষা, শত-বাণিক্যর কীটপতঙ্গ, পশুপালন প্রভৃতি বিঘাও জানাৰ্জন করিতে হয়।

সকল শিক্ষার্থী এই কৃষি বিদ্যালয়ে হইতে উক্ত কৃষি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাণিসকল তিন বৎসরের অন্তরিত্ব আরও কতক সময় এই বিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপ অধিকার বিদ্যালয়ের সংসদ কর্তৃক বিধা করা যাকে। সেই বিদ্যালয়-সময় হইতে প্রাপ্তন দিলে পাকস্বতী ও বাগ্‌চারি পত্র প্রাপ্ত করে। কতক পরিমাণ কৃষি গোষ্ঠীর দ্বারাও ব্যবহৃত হয়।

উক্ত কৃষি-বিদ্যালয়।

এই প্রেরিত সকল বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-কাল সমান নয়। জাপান যে চাকিটো বীণ সইয়া পট্ট, তাহাণের মধ্যে সর্কোভার বীণটিকে হকিডো (Hokkaido) বলে। এই বীণের প্রাধান্যের সোপানোতে (Sapporo) একটি প্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্যালয় আছে। সেখানে সর্বদয় ৬ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। প্রথম দুই বৎসরকে শিক্ষাবিধি কাল বলা হইতে পারে (Preparatory Course)। তদ্বি বৎসরই প্রকৃত অধ্যয়ন কাল। (Main Course)।

শাখাবিভাগের অধ্যয়নের বিধ। (Preparatory Course)

প্রথম বর্ষ—নীতি-শিক্ষা, জাপানী ভাষা, চীনের ভাষা, ইংরেজী মার্গ, ইতিহাস (বর্তমান), বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি, পদার্থ বিদ্যা, অক্সিজেন (Inorganic Chemistry), চিকিৎসা ও ছিল।

দ্বিতীয় বর্ষ—নীতি শিক্ষা, জাপানী, চীনা, ইংরেজী ও মার্গ ভাষা, সমীকরণ (Equation), বিশ্লেষণ মূলক ক্ষেত্র (Analytical Geometry) সার্কেইং, জাতিত্ব (Zoology), উদ্ভিদত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ঔষধ-সংগ্রহ (Organic Chemistry) এবং ছিল।

প্রধান বিভাগের অধ্যয়নের বিধ :-

(Main Course)

প্রথম বর্ষ—কৃষিবিদ্যার সাধারণ জ্ঞান (General outline of Agriculture), বিশ্লেষণমূলক সংগ্রহ (Analytical Chemistry), পত্রের বহুকারক খাদ্য (Nutrition of plants), বৃত্তিক (Soils), প্রসারিত, পাকস্বতী সযতী (Vegetable histology), কৃষিজাত পদার্থবিদ্যা (Agricultural physics), তুলনামূলক পশুর-প্রাণজীব-বিদ্যা (Comparative Anatomy of Animals), উদ্ভিদত্ব ও প্রাণিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক জ্ঞান (Experiments in plants and in animals)।

দ্বিতীয় বর্ষ—অর্থশাস্ত্র ও আইন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, কৃষির শাস্ত্র, কৃষির উৎপাদিকা পদ্ধতি কৃষি চৌকো, (Improvement of Soils) উদ্ভিদ-ব্যাক্তিবিজ্ঞান (Pathology), জীব-পদার্থ-বিদ্যা ও জ্ঞানত্ব (Animal Physiology and Embryology), পত্রাধি বিদ্যক (Entomology), কৃষিবিদ্যক কৃষিবিদ্যা (Agricultural

Engineering) এবং কৃষিবিদ্যক ইতিহাস। (History of Agriculture)।

দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়বিশিষ্ট বিষয়ের যে-কোন একটীর সম্বন্ধে ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষা লাভ করিতে হয়—জীবসত্ত্ব পালন ও পোষণ সযতী (Zoo-techny), কৃষিবিদ্যক ব্যবহারিক বিদ্যা (Agricultural Economics), কৃষিবিদ্যক রসায়ন (Agricultural Chemistry), উদ্ভিদ সযতী ব্যক্তি-বিজ্ঞানপত্রক বিদ্যা বোপের চাষ-আবাস (Sericulture) ইত্যাদি।

তৃতীয় বর্ষ—বিশিষ্ট প্রকৃতির পত্র (Special Crops), উদ্ভিদ-কর্ষণ (Horticulture), কৃষিবিদ্যক ব্যবহার-বিদ্যা (Agricultural Economy), জীবসত্ত্ব পালন ও পোষণ বিদ্যা (Zoo-techny), পুষ্টিগণিত পত্র সযতী পাতার-বিজ্ঞান ও পাতা-তত্ত্ব (Physiology and Hygiene of Domestic Animals), পত্র-পালন (Feeding of Animals), যেপের চাষ, অরণ্য-সংরক্ষণ-কার্যের সাধারণ জ্ঞান (Elements of Forestry), সংক পালন সযতী সাধারণ জ্ঞান (Elements of Fishery), বীজাণুতত্ত্ব (Bacteriology), এবং কার্যকরী শিক্ষা (Practical Works)।

চতুর্থ বর্ষ—জীবসত্ত্ব পালন ও পোষণ বিদ্যা (Zoo-techny), পত্র-চিকিৎসার মূল তত্ত্ব (Elements of Veterinary medicine), কৃষি-বিদ্যক পরিচালিত্ব পত্রের ব্যাখ্যা (Agricultural Technology) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত বাগ্‌চারিক শিক্ষা ও প্রবর্তন হয়, এবং অধ্যয়ন শেষে প্রত্যেক বৌদ্ধিক পদার্থ-পূর্ণ প্রবর্তন দিখিতে হয়।

বিদ্য-বিদ্যালয় পরিচালিত কৃষি কলেজ।

সামান্য বিদ্যাবিদ্যালয়গুলির সমগ্র কৃষি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিকিৎসা বিদ্যাবিদ্যালয় সমিতি এজন্য একটি কলেজ আছে। সাধারণ বিভাগের উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া শিক্ষার্থী যেখানে প্রবেশাধিকার পায়। সেই কলেজে তাহাকে তিন বৎসর পড়িতে হয়। পাদী বিষয়গুলি সেখানে (Sapporo) উক্ত কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রায় অনুরূপ। উক্ত বিষয় ব্যতীত এখানে বিজ্ঞানবিদ্যা ও কৃষিক্ষেত্রে (Farm) হাতে কলমে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

জরথুষ্ট্রের জীবনী ও ধর্ম-মত

[ঐশ্বর্যমতকুহার সরকার, বি-এ,]

পাদীবিদ্যের বর্ষ-পাঠ্যপুস্তকের নাম জরথুষ্ট্র। এই নামের মূল অর্থ—যশের ভাব ধারণা জাতি,—এক কথায় বিদ্যাযোজ্যিঃ। জীবকলা

জরথুষ্ট্রেজ Zoroaster (জোরোস্তার) বলিতে—ইংরেজরাও তাহাই বলেন।

জরথুষ্ট্রেজের জন্ম-তারিখ সন্ধ্যাে বর্ণিত নহইতে পারে। তবে খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে তাঁহার জন্ম ও ৫০০ অব্দে মৃত্যু,—এই তারিখ অনেকটা ঠিক বলিয়া বলা হইতে পারে। তাঁহা হইলে বলিতে হইবে, অমরতার দ্বারা ইতিহাসের এক নতুনধর্মের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কেন না খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ভারতে বুদ্ধ, চীনে কনফুসিয়াস ও গ্রীসে সোক্রেটিস অবতীর্ণ হন।

পারস্ত্রোশের অন্তর্গত আর্থরাইজান নামক স্থানে জরথুষ্ট্রেজের জন্ম হয় এবং তাঁহার বাল্যকাল তথায় অতিবাহিত হয়। তাঁহার নামের নাম 'ইথরাশা' ছিল। জরথুষ্ট্রেজের মাতুল-বংশ তিব্বতের বিকটবর্তী মিসিরার অন্তর্ভুক্ত 'গাই' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল 'মোস্তাশ' (দুঃ, বধ, অসুখ, অর্থ, আত্ম-বাহার অর্থাৎ বহুঅসুখসংকট)। তাঁহারের পোষিত উপাধি ছিল 'শিতা' (সংস্কার-বৈতন্য)।

জরথুষ্ট্রেজের স্ত্রীর নাম 'হোরাই'। নৃপতি বিস্তারের রাজসভায় কোন সন্মান ব্যক্তির তিনি কড়া ছিলেন। এই বংশের দুই সাতা—জরথুষ্ট্রেজ ও মাস্তাশ—জরথুষ্ট্রেজের পিতৃব্য এবং পূর্বক তাঁহাকে বর্ষশ্রমের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। জরথুষ্ট্রেজ তাঁহার বস্ত্র ছিলেন, আবার এনিকে তাবান্য তাঁহার সজ্জাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দু-বাহু, উর্বরাং নর, স্ত্রীর-শিশু নামে জরথুষ্ট্রেজের তিন পুত্র ছিল; এবং স্রেই, শ্রুতি ও পৌরুণিক নামে তিন কন্যাও ছিল।

জরথুষ্ট্রেজ বর্ষ প্রত্যয়ের অন্ত প্রান্তাইরাণে (Bactria) গমন করেন এবং অনেক বৈরাগ্য ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিস্তার নামক নগরটিকে নিজ বর্ষে বীজিত করেন। তৎপরে তিনি পূর্ব নকলদা নামক করিয়া যথেষ্ট দিন মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। বৃট-বর্ষের ইতিহাসে যোহান সরাট কনস্তানটাইনের যে স্থান—পারলীক বর্ষে নৃপতি তিস্তারোও সেই স্থান।

জরথুষ্ট্রেজের সন্ধ্যাে পরে অনেক বর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেগুলির উল্লেখ নিম্নলিখিতঃ—কথিত আছে—তিনিই একবার মানবশক্তি, যিনি মনু হরণ করিয়াছিলেন তাহা হারিয়াছিলেন।

এখন জরথুষ্ট্রেজের বর্ষের সন্ধ্যাে কিছু বলিব। তাঁহার বর্ষে অশ্বশীঘ্রের নাম অমর সম্বন্ধ। অমর মানে সঙ্কট-অপ্রঃ, অমৃত প্রাপ্য বা হারাতি ইতি—ই, The Life-giver; আর সম্বন্ধ—সং-সেবক, ইং omniscient—স্বতন্ত্রাৎ সমস্ত কথাটির মানে ঈশ্বর।

—The omniscient Life-giver, The Wise Lord। জরথুষ্ট্রেজের সময় কখনও অমর, কখনো সম্বন্ধ, কিংবা অমর সম্বন্ধ সম্বন্ধ একসাথে ব্যবহারার্থে ব্যবহৃত হইত। পরে অমর সম্বন্ধ সর্বত্রই একত্র ব্যবহৃত হইত। পারসিক লম্বাট বরাহুদ (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) অমরমণ্ডল শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

জরথুষ্ট্রেজের চিন্তা—প্রাণী অতি দুঃস্থ বস্তু। সমস্তের বিচার-মুখিই তাঁহার মতে জীবনের স্রোতের জ্ঞান। ইহুরে মনোবীর বর্ষের আরাগ্য করিয়া পুণ্ডা, কিংবা প্রাচুর্য্যক পণ্ডিতসমূহের পুণ্ডা তিনি বহিত বলিয়া মনে করিতেন। প্রাণী ইতিমধ্যে আশ্রয়ণের জ্ঞান তাঁহার চিন্তা-প্রাণী সোমোব্রি বস্তুদের ছিল। তাঁহাতে দুর্বোধ্যতা, অজ্ঞেয়তা কিংবা অসত্যতার স্থান ছিল না। সংগের হৃদয় প্রাণী অমরমণ্ডলে তাঁহার মত ছিল না। হৃ-চিন্তা, হৃ-বাক্য ও হৃ-কর্ম—এই তিনটিই জীবনের প্রধান ও প্রধান কর্ম। বৃদ্ধা যাব-বাক, পুণ্ডাভ্যন্তর কিংবা তৎপক্ষেপে তাঁহার বর্ষ সাধন হইবে না। পরিচয়ের সহিত চান-বাস কর, প্রবক্তা ও বিশ্বাসকে ক্রমবর্ধিত সহিত বৃদ্ধ। কর এবং অমর সম্বন্ধ জীবনের প্রতি বর্ষা বর্ণনা—ইহাই তাঁহার বর্ষ-কর্মের সার বর্ষ।

মিসু (সং বর্ষা বৈতন্য মিসু), অমরমণ্ড (সং অমরমণ্ড, নবী-সেবতা বিশেষ), জবশী (দুঃখাত্মা), বেরোশ (সং বৃদ্ধ ২য়), ২য় (সং সোম) প্রভৃতি বৈতন্যের পুণ্ডা জরথুষ্ট্রেজের পূর্বে এবং তৎপরে ইরাণ-বাসীর মধ্যে ফল প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু জরথুষ্ট্রেজের প্রচারিত বর্ষে এ সকলের স্থান ছিল না। এমন কি ইরান অনেক বৈতন্য নাম 'বহু' অর্থাৎ বৈতন্য বৈতন্য হইয়াছিল।

সূর্যের যেমন পত নামে অমর সম্বন্ধের সেইরূপ অনেকগুলি নাম আছে। জরথুষ্ট্রেজ অমর সম্বন্ধ ব্যক্তি আত্মা হৃদয় বৈতন্যের পরি-কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিকে তিনি বৈতন্য না বলিয়া অমর সম্বন্ধের বিভিন্ন প্রকাশস্বরূপ বস্তুসমূহ মনে করত। হৃ-শক্তি যেমন ব্রহ্ম হইতে জিহ্ন বর্ষ, পালনী-শক্তি যেমন বিহ্ন হইতে জিহ্ন বর্ষ—সেইরূপ এইগুলিও অমর সম্বন্ধ হইতে জিহ্ন বর্ষ। ইহাউপের নাম অমরমণ্ড—সং 'অমৃত পণ্ডিত'—The Immortal Holy Ones। ইহাদের অনেকের মনের মতো অমর অর্থাৎ Life-giver বিশেষগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষ সম্বন্ধ সময়ে সময়ে অমরমণ্ডের সন্ধ্যাে পরিগণিত হইয়াছেন। এই সকল বৈতন্য বর্ষাভ্যন্তর এক-একটি বিস্তারের অধিকারী। প্রবক্তার এই বর্ষ বৈতন্যের পরিচয় বৈতন্য হইবে।

সপ্তপদী গমন

(বৈদিক বয়স হইতে অনুদিত)

[ত্রিকিরণচাঁদ বরবেশ]

বয়

বিভূরূপ আমি প্রিয়ে ! গৃহে মোর বস
আহার্য-সামগ্রী আছে, সে সব নিরত
তোমার সেবার লাগি নিয়োজিত হবে ;
আমি হ'তে তুমি গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী হবে ।
প্রথম চরণ-ক্ষেপ সম গৃহপানে
কর যেবি !

বধূ

আনন্দ-ভরস বহে গ্রাণে
গ্রাণনাথ ! শুনি বধু বচন তোমার ।
ধন-ধাত্ত-ব্যাক্রমাদি দিষ্টার-সম্ভার,
তোমার বা' কিছু আছে,—সকলি আমার !

বয়

বিভূ-রূপ আমি প্রিয়ে ! বহিবারে তার
একান্ত সক্ষম আমি । সঙ্কল-অস্তরে—
দ্বিতীয় চরণ-ক্ষেপ কর যোর ঘরে ।

বধূ

চিরদিন সজ্জি-রূপে বিভাজিব আমি,—
তব বাম-পার্শ্বভাগে । যে আবার আমি !
দ্রুমে বৈরাগ্য ধরি, হয়ে ক্ষুণ্ণ-চিত্তা সুখে,
তোমার হুটুগপে নিত্য হাত্ত-সুখে
নিমন্ত করিব সেবা ।

বয়

বিভূ-রূপ আমি ।
একান্ত নির্ভয়ে তুমি হও অজ্ঞানী—
কৃত্য চরণ-পাতে । যোর বিস্ত বস,
নিয়োজিত হবে তব সেবার সতত ।

বধূ

কি আর কহিব প্রিয় ! ধন-বাত্ত দিয়া
তুমিগছ মোরে তুমি ! এ আমার হিয়া
একান্ত তোমারি হবে । প্রম-বশে কতু,
পর-পুরুষের মূখ হেদ্বি না এতু ।
কতু-সাতা শুদ্ধা শুচি হইয়া, তোমায়ে
তুমি একান্ত নাথ ! মদ্রথ-বিহারে ।

বয়

ধীরে—সতি, ধীরে !—চতুর্থ চরণ কেনে
মোর গৃহ-পানে, চল সুখে অকহেলে ।
তবালোকে সূকাইবে আবারের মাজি,
সকল সুখের মোর তুমি অধিষ্ঠাত্রী ।

বধূ

প্রতিদিন দিয়া গন্ধ করিব সেপন
মোর এই বয়-আঙ্গে,—তোমার কারণ ।
এ-দুট হুমে মাগা করিয়া রচনা,
সাজিয়া সোহিনী-গানে পূজা'ব কামনা ।
কাকন-ভূষণে নিত্য বৈধিয়া কদম্বী,
প্রতীক্ষা করিয়া র'ব দিবস-সন্ধ্যারী ।

বয়

মোর গৃহে আছে প্রিয়ে ! বস পশুপাল,
আমি হ'তে তব বাধা হবে চিরকাল ।
পো-বহিধ সেবা-রতা তুমি, হাত্তসুখে—
প্রতিদিন দ্রুত মোরে পিরাইবে সুখে ।
পঞ্চম চরণ-ক্ষেপ কর পথ চিনে,
আমি হ'তে পশুপাল তোমারি অধীনে ।

বধু

তোমার সর্ব্ব্ব যোগে করিলে প্রাণন !
কে আছে ভুবনে বধু, তোমার সমান ?
প্রিয় সখীগণ সাথে একাত্ম হতনে,
মিতা নিয়োজিত হ'ব গোষ্ঠী-আরাধনে।
সতীর চরণ-পূজি, সতীষ লভিহা,
তোমাকে অচলা ভক্তি লইব মাগিহা।

বর

ক্রোধ, বর্গ, কি শরৎ, হেমন্ত, বা শীত,
বসন্ত গহ্বর প্রিয়ে! যা কিছু সখিৎ,
আজি হ'তে তারা হবে অধীন তোমার।
বড়-বড়-অধিষ্ঠাত্রী, যে কতী আহার !
সুখে বট পদক্ষেপ, কর গৃহ-পানে।

বহু

যোগা যেন হই নিতে তোমার এ দানে।
বজ্র, ধোম, দান আমি দত অস্থান,

সর্ব্ব কাণ্ডো তব বাসে করি অধিষ্ঠান
সম্পাদিব মনের হরবে! যা' করাবে
তুমি, তব অস্থগামী আমি,—সেই তাবে—
করিব পাগল। আমি তব অর্ছাসিনী,
আমি তব দাসী!

বহু

প্রিয়তমা শো মদিনি!

এ মহা-মুহুর্তে তুমি এস সপ্ত-পদ।
তু-আমি এ সপ্ত-লোক বা' কিছু সম্পদ,
তোমার অধীন হোক। আমি বিজু-রূপ!
হে অস্থগামিনি! তুমি বৃত্তিরা বরুণ,
এস মোর গৃহনাথ, এস গৃহলক্ষ্মী!

বধু

অস্বতীকে য়েবগণ রহিলেন সাকী!
তুমি—তুমি—তুমি মম ভর্ত্তা প্রাণ-পতি!
সুখে হুখে এ জনমে আমি চির-সাকী।

সহযোগী সাহিত্য

পৃথিবীর জন্ম-কথা

[ঐবীরেন্দ্রনাথ বোষ]

'গ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব-ইণ্ডিয়া'র তরফ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের সভ্য, অধ্যাপক জে, ডবলিউ, গ্রেগরী "পৃথিবীর জন্ম-কথা" (Genesis of the Earth) সম্বন্ধে ড্যালফোর্টসী ইন্সটিটিউটে একটা বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার আধাঘণ্টা জ্ঞানবার অনেক কথা আছে।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি, এই পৃথিবীটার জন্ম কেমন করে হ'ল, তা' জ্ঞানবার জন্তে বাহুবল মনে অনেক দিন থেকে কৌতুহল আছে। আর, এর একটা বীমাংসা করবার জন্তে অনেক বড়-বড় পণ্ডিত অনেক মাথা ঘামিয়ে এক-একটা থিওরী গাড়া করেছেন। এঁদের মধ্যে

থিওরীটা গাড়া করেছিলেন, সেটার নাম nebular theory; অর্থাৎ, প্রথমে পৃথিবী বাষ্প বা চলিত-কথায় ধোঁয়া ছিল। পরে জঘাট বেঁধে বর্ত্তমান আকার ধারণ করেছে। আর, সাহ নরম্যান লকইয়ার (Sir Norman Lockyer) নামে আর একজন পণ্ডিত আর একটা থিওরী গাড়া করেন; সেটা হচ্ছে, পৃথিবী কতকগুলো উদ্ভাপিকের সমষ্টি রাজ। অধ্যাপক গ্রেগরী তাঁর বক্তৃতা'র বা' বলেছেন, তাঁর সাহ মত এই যে, লাপ্লাসের থিওরী-মতে পৃথিবী যেমন ধোঁয়াটে পদার্থ থেকে জন্মে কঠিন হয়ে পৃথিবী হয়েছে,—ঐ থিওরীটাও তেমন ধোঁয়াটে, ওর ভিতর থেকে স্পষ্ট কিছু বাকবার যো নেই;—থিওরীটা ধোঁয়ার মত,—

লাপ্লাস (Laplace) নামের একজন জ্যোতির্বিদ যে সময়ের আদর্শবাদের মতে জন্মের কথা বলে দা। আর

উজাপিত থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে, এই যে থিয়োরীটা, এটা বড় পর্যায়ের মতন স্পষ্ট এবং এটাকে বেশ ধরা-হোঁচড়া বার।

এ রকম শুক রিয়ে কেবল থিয়োরী খাড়া করাই যথেষ্ট নয়; বিনা নাস্তা-প্রমাণে এ সকল থিয়োরী পণ্ডিত-মহলে গ্রাহ্য হবার যো নেই। অধ্যাপক গ্রেগরী সেই দ্বন্দ্বের ঠার থিয়োরী সমর্থন করার জন্যে অনেক প্রমাণও হাঝির করেছেন। সেই সকল প্রমাণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যে সকল উদার লোহার ভাগ বেশী, পৃথিবী সেই সব উদার মতন; পৃথিবীটার ভিতরেও খুব বেশী রকম দাতব্য পদার্থ আছে।

প্রমাণগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগ করা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর ভায় খুব বেশী। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর শাঁসটা খুব ভারী; আর, খোসাটা তার চেয়ে হালকা; অর্থাৎ ধাতুঘর পদার্থগুলো অল্প জিনিসের চেয়ে বেশী ভারী বলে, মাধ্যাকর্ষণের টানে ভিতরের দিকে গিয়ে পড়েছে; আর, হালকা জিনিসগুলো উপরে ভেসে রয়েছে বলে সেগুলো দিয়ে পৃথিবীর আবরণটা গড়ে উঠেছে। (২) পৃথিবীর বেঁটু কিরণ বিতরণ করার শক্তি আছে, সেই কিরণ যে সকল জিনিস থেকে বেজোর, সেই সব পদার্থ পৃথিবীর ঐ পাতলা আবরণটার মধ্যেই আছে; আর যে সকল উষ্ণ নিকেল-লোহার গড়া, তা' থেকে যেমন কোনও কিরণ বেরোর না, পৃথিবীর শাঁসটা যে সকল জিনিসে গড়া, সেগুলো থেকেও তেমন কোন কিরণ বেরোর না। (৩) পৃথিবীতে মাকে-মাকে যে ভূমিকম্প হয়, তা' থেকে এই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ভিতরের দিকে ৫০ কি ৬০ মাইল ঘেলেই, তার খোসার পাথরের অংশের বদলে এমন ঘনীভূত পদার্থ দেখা যায়, যার ঘন ঠিক ধাতুর মত।

এই সকল প্রমাণের আলোচনা করে' অধ্যাপক গ্রেগরী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পৃথিবীটা একটা গোলাকার লৌহ-পিণ্ড, এখনকার কামানের গোলায় মত খুব স্বতীন; আর ঐ লৌহের সঙ্গে (৩০ ভাগে ১১ ভাগ) কিছু নিকেল মিশানো আছে। এই প্রকাণ্ড লৌহখণ্ড কামানের গোলায় উপর একটা পাতলা পাথরের আবরণ আছে; যাকে পৃথিবীর খোসা বলা যেতে পারে। পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ

তার নাম দিয়েছেন, ভূপঞ্জর। এই খোসাটার মসলা কোথা হতে এল? যদি থেকে ধাতু বার করে নিলে সেটা যেমন আর-পাটো। জিনিসের সঙ্গে বেশানো অবস্থায় থাকে,—তার পর তাকে গুলির ধাতুটা বার করে নিলে বোটা বাকী পড়ে থাকে, সেটা যে জিনিস, পৃথিবীর উপরকার কঠিন খোসাটার মসলাও প্রায় সেই রকম একটা জিনিস, পৃথিবীর গর্ভ থেকে ওইই কোন শক্তিতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

তা'হলেই দেখা যাবে, যদি অসংখ্য উষ্ণ অম্লটি বেঁধে নিয়ে এই পৃথিবী তৈরী হয়ে থাকে, তা'হলে তার যে রকম অবস্থা হওয়া উচিত, তার সঙ্গে থিয়োরীটা ঠিক-ঠিক নিলে যাবে। পৃথিবী যদি উষ্ণরই সমষ্টি হয়, তা'হলে তার উৎপত্তি এই রকম হয়েছে—চাপে এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উষ্ণতাগুলো প্রথমে খুব গরম হয়ে গলে গেল; তার পর সেগুলো একমুখে ভাল পাকিয়ে খুব উত্তপ্ত একটা প্রকাণ্ড পিণ্ডে পরিণত হল; তার পর সেই পিণ্ডের ভিতর থেকে পাথরের অংশটা ক্রমে-ক্রমে বেরিয়ে ভেসে উঠল। তাই থেকে পৃথিবীর উপরের-পাথরের পাতলা আবরণটা—যার নাম ভূপঞ্জর—সেটা গড়ে উঠল; আর ভিতরের দিকে ধাতুর অংশটা ভাগ বের করে দিয়ে ঠাণ্ডা হবার পথ না পেয়ে, পিণ্ডের আকারে গরম অবস্থায় রয়ে গেল।

আগে মনে করা হ'ত, আকাশের তাপের ধানিকটা অংশ পৃথিবীর ভিতরে আবদ্ধ হয়েছে, সেটা এখনও ঠাণ্ডা হবার সুযোগ কিংবা অবসর পায়নি। কিন্তু উদার থিয়োরী সত্য হলে, পৃথিবীর ভিতরের ভাগ যে আকাশের তাপের ধানিকটা অংশ, এখন আর তা' বলা চলে না। বর্তমান থিয়োরী-মতে পৃথিবীর গর্ভের ধাতুঘর পদার্থ তাপের পরিচালক হওয়ার, স্থানভেদে এই তাপের একটা সামঞ্জস্য থাকবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কতই ভিতরের দিকে যাওয়া যাবে, ভিতরের তাপের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের সঙ্গে ভিতরের তাপের সকল ব্যরণরই এই রকম একটা সামঞ্জস্য থেকে যাবে। স্বয়ং হিসাবে পৃথিবীর ভিতরের তাপের পরিমাণ ১৫০০ সেন্টিগ্রেড বা ৩০০০ ফারেনহাইট ঠান্ডাতে পাবে। এটা বড় কম তাপ নয়; তবু, 'আগে পৃথিবীর তাপ বতমানি হওয়া উচিত বলে' মনে করা গেল, তার চেয়ে অবশ্য অনেকটা কম। পৃথিবীর

উপরের আবহাওয়ার বিবরণের সম্বন্ধে ভূপঞ্জরখটিক যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তার সঙ্গে এই যে ভাণের হিসেব করা হ'ল, তার বেশ মিল হচ্ছে। এক সময়ে পণ্ডিতেরা মনে করতেন, এখন হ'ল বত বড় আর বত উত্তর, আগে তার চেয়ে বড়, আর বেশী গরম ছিল; ক্রমে তাপ বিকীরণ করতে-করতে এখন অনেকটা ঠাণ্ডা, একা কালেক্ট-কালেক্ট আকারে অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। আরও মনে করা হ'ত যে, সে সময়ে পৃথিবীর ভিতরের তাপ বর্তটা বাইরে বেরিয়ে আসত, এখন আর ততটা পারে না। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, এখন গ্রীষ্মকালে কলিকাতার বতখানি উত্তাপ পাওয়া যায়, সে সময়ে সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া তার চেয়ে বেশী উত্তর ছিল। এই পৃথিবীব্যাপী গরম আবহাওয়ার ধরন লোকের মনে বিশ্বাস ভাঙেছিল যে, পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'লে আসতে-আসতে ক্রমে মেরু-প্রদেশ হুটো শীত-প্রধান হয়ে পড়েছে; আর বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া আগেকার চেয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; আর এই রকম অবস্থাই গ্রীষ্মপ্রধান অংশে আর তার চেয়ে ঠাণ্ডা অংশে, সাধারণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই যে লোকের বিশ্বাস যে, পৃথিবী 'বীত-বীত'ে অনেক কাল ধরে ঠাণ্ডা হয়ে-হয়ে, শেষকালে তার স্থানে-স্থানে বরফ মনে থাকতে শুরু করেছে, এই বতটার সঙ্গে, —ভূপঞ্জর অনুসন্ধান করে 'ভার পরীক্ষা করে' যে সকল কথা জানা পিয়েছে, সেটা ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবীটার এক সময়ে একই রকম গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়া বর্তমান ছিল, এইরূপ মনে করবার একটা কারণ ছিল। অর্থাৎ এই রকম একটা সিদ্ধান্ত না করে নিলে, যে সকল গাছপালা, বনজঙ্গল থেকে এখন পাবুরে কয়লা পাওয়া থাকে, সেগুলো অস্বাভাবিক কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারা যায় না। যে সময়ে ঐ সকল অরণ্যের উৎপত্তি হয়েছিল, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে Carboniferous Period। সেই সময়টাকে আমরা বাঙ্গালার বন্য, কয়লার যুগ। এই কয়লার যুগের অর্থাৎ ঐ রকম ব্যাখ্যা করা দরকার হয়ে পড়েছিল। এই কয়লার যুগটা নিয়েই বত গোলযোগ বেধে গেছে। পরম শুভু না হলে গাছপালা জন্মাবার যো নেই বলে, এক শ্রেণীর পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করে নিলেন যে, ঐ সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল; আবার

এক শ্রেণীর পণ্ডিত নানারকম গবেষণা করে প্রমাণ করে বিশেষ যে, যে সময়টাকে কয়লার যুগ হুতরায় গ্রীষ্মপ্রধান যুগ বলা থাকে, ঠিক সেই সময়েই এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারত-বর্ষেই নাসপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে glacier বর্তমান ছিল। এই বিতীর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা যে সকল প্রমাণ হাজির করেছেন, তা' একেবারে অকাটা। কিন্তু এই যে নাস-পুরের দক্ষিণ অঞ্চলের যে দেশের কথা হচ্ছে, সেখানকার এখনকার আবহাওয়া মোটেই গুল জমে বরফ হবার উপযোগী নয়। মাসিয়ার বর্তমান থাকার যে সব প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, তা' এই রকম—সেখানকার পাহাড়-গুলার উপর-মিকটা এমন বাজাবা, যা' কেবল মাসিয়ারের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। কেবল এই একটা প্রমাণই নয়, আরও প্রমাণ আছে। মধ্য-ভারতবর্ষের অনেক-বারগাতেই নদীর গর্তে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথরের টাই পাওয়া গেছে,—বাসের গারেও এমন বাজাবাঘার দাগ আছে,—যা' থেকে মনে করা যেতে পারে, ঐ সকল দাগ মাসিয়ারের মধ্যে পাথরগুলার পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষনির ফল,—অন্ত কোন রকমে সে রকম দাগ উৎপন্ন হতে পারে না। এই সকল প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যে সময় যুগোপ-আমেরিকা ও চীনের স্থানে-স্থানে বন অরণ্য ও জঙ্গল ছিল, যা' থেকে পৃথিবীর সমস্ত কয়লার বনি উৎপন্ন হয়েছে, সেই সময়েই মধ্য-ভারতবর্ষে মাসিয়ারও ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতেও সে সময়ে মাসিয়ার থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়াতে আবার, কেবল যে এখনকার গ্রীষ্মপ্রধান অংশে তখন মাসিয়ার ছিল, তা' নয়,—সমুদ্রের পৃষ্ঠের সমান উঁচু বারগাতেই ঐ সকল মাসিয়ার ছিল বলে স্থির হয়েছে। এই সকল তথ্য থেকে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হচ্ছে যে, কয়লার যুগে পৃথিবীর বায়ুমহা-বায়ুয় আবহাওয়া এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা ছিল। তবে অবশ্য ঐ যুগে সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া এখনকার চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল, এরকম মনে করবার কারণ ঘটেনি। তখন কতকটা বারগা যেমন ঠাণ্ডা ছিল, আবার কতকটা সেই রকম গরমও ছিল। তবে গড়পড়তার দৃষ্টোভিত্তি এখনকার সমানই ছিল মনে করা যেতে পারে। কয়লার যুগের আগের যুগটাকে ভূতবর্ষি পণ্ডিতেরা Cambrian যুগ নাম দিয়েছেন; আর তারও আগের যুগের নাম

যে pre-Cambrian যুগ। পৃথিবীর ইতিহাসের এই ছই যুগে ভূপঞ্জরের অবস্থা কেমন ছিল, তা' কিছু কিছু জানতে পারা গেছে। তার আগেকার কোন যুগের বিশেষ কোন কথা এখনও অসুশুদ্ধানে ধরা পড়েনি; সেখানে কেবল অল্পমান ছাড়া অন্য কোনরূপে বস্তুস্থিট করবার যো' নেই। ঐ ছইটা যুগেও পৃথিবীর স্থানে স্থানে সমুদ্রের সমতলে মাসিয়ার থাকার কথা জানতে পারা যায়; কিন্তু এখন ঐ সব ব্যয়গার বয়স নেই। এই সব ঘটনার মধ্যে যেগুলো পণ্ডিতদের খুব মনে লেগেছে, তা' এই যে, ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে মধ্য-অট্টেলিয়ার প্রায়গ্রন্থান অংশে সমুদ্রের সমতলে যে সব ব্যয়গার মাসিয়ার ছিল, সেই সব ব্যয়গার মাসিয়ারের পরচিহ্ন, অর্থাৎ কি না, তাদের নড়াচড়ার বক্র মাটিতে যে সব গভীর গর্ত উৎপন্ন হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। আসল কথা, বতরিন ধরে ভূ-পঞ্জর গড়ে উঠেছে, ততদিন ধরেই পৃথিবীর আবহাওয়া এখনকার গড়গড়তা আবহাওয়ার প্রায় সমান-সমানই গিয়েছে—একটু উনিশ-বিশের তফাত হয়ে থাকতে পারে।

ভূপঞ্জর-ঘটিত যে সব শুষ্ক জানা গেছে, তার মধ্যে এইটেই সব চেয়ে বড় যে, ভূপঞ্জরের ষত দিনের বিবরণ সংগ্রহ করতে পারা গেছে, তার গোড়া থেকেই, যে সব শক্তি পৃথিবীর আবহাওয়ার ও জীব-জগতের উপর কাজ করে, তাদের মধ্যে ইতরবিশেষ ঘটায়, সেই সব শক্তি এখন যেমন আছে, তখনও প্রায় সেই রকমই ছিল। এখনকার হাওয়ায় হোর বতবানি, তখনকার হাওয়ায় হোরও প্রায় ততখানি ছিল। এই তথ্যটা জানা গেছে এই রকম করে যে, এখনকার যে-সব বায়ুত্যা হাওয়ার হোরে এক ব্যয়গা থেকে আর এক ব্যয়গার উড়ে যেতে পারে এক ব্যয়, তাদের আকার বত বড়,—সেই লোকালের যুগের যে-সব বায়ুত্যা ভূপঞ্জরের ভিতর বরা পড়েনি, সেগুলোও ঠিক তত বড়; স্তরায় যে হাওয়া তাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াত, তার জোরও এখনকার হাওয়ায় হোরের সমানই ছিল—এটা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হ'য়ে গেল। কোন-কোন স্থলে

এমনও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এখনকার হাওয়া যে দিক দিয়ে যেমন করে বইছে, তখনকার হাওয়াও সেই দিক দিয়ে ঠিক তেমনই কয়েই বইত। পৃথিবীর তাপও তখন যেটাবুটি সম্ভবতঃ এখনকার মতই ছিল। পৃথিবী বত দিনে বর্তমান আকারে গড়ে উঠেছে, সেই সময়টার যে অংশে পৃথিবীর নিজের ভিতরের তাপ বাইরের আবহাওয়ার তাপের কমবেশী ঘটতে পারত, সে সময়টা ভূপঞ্জরের যুগের আগেই কেটে গিয়েছিল বলে মনে হয়; অন্যতঃ, ভূপঞ্জরের বতদিনের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তার আগে ত বটেই। সেই সময়ে যে-সব পানর গড়ে উঠেছিল, এখন আর তার কোন চিহ্নই যেথতে পাওয়া যায় না,—সে সময়েই নষ্ট হয়ে গেছে। তা' বখন নেই, তখন তার বিবরণ আর জানা কেমন করে জানতে পারব? তখনকার পৃথিবীর বিবরণ জানতে হলে, অতি অস্পষ্ট ছাড়া-ছাড়া প্রমাণ-গুলো একত্র করে সানাক্ত কিছু জানা যায় মাত্র।

এইসকল বিষয় বিবেচনা করে,—এক বিষয় থেকে বিবরণের হাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রায়সঙ্গত না হলেও,—অব্যাপক মহাশয় ধোঁয়াটে ভাব ছেড়ে দিয়ে, উদ্ভাসলোকেই পৃথিবীর গঠনের উপাদান বলে যেমন নিতে বলছেন; কিরণ-বিকীরণের কথা ভুলে দিয়ে, পৃথিবীর ভায়ের কথাটা মনে রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন; আরও, ভূমিকম্প এবং আগেকার আবহাওয়ার ইঙ্গিতটা বিবেচনা করে যেথতে অনুমোদন করছেন। তিনি মেথাকার চোঁটা করেছেন যে, এই সব সাক্ষী যে সব প্রমাণ দিচ্ছে, সেগুলো পরস্পর-বিরোধী ত নয়ই, বরং তাদের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে; আর সেই সকল প্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহ স্থির করা যেতে পারে যে, পৃথিবী অগাধা ঠাণ্ডা উন্ডা দিয়ে তৈরী—ধোঁয়া দিয়ে নয়; সেই সকল উন্ডার পরস্পরের ঘর্ষণে একটা ধোঁয়ার উৎপত্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা লালুসায়ের কথিত ধোঁয়া নয়,—এ অন্য রকম জিনিস। এ জিনিসটা উন্ডাপিণ্ডগুলির পরস্পরের ঘর্ষণে উৎপন্ন, এদের একত্রিতও আলাদা, আর এই ধোঁয়া জড়-পথার্ঘের আকারে দেখা যেত।

জাতকের ইতিহাস

[অধ্যাপক ত্রিহরণকুমার রায় চৌধুরী, বি-এ]

দে কাজ কত দিনের কথা। উদীচা শৈলাঙ্কলে পূণ্যতৃণি
কণিলাবন্ত নগরীতে অব্যাহ ভোগবিলাসের মধ্যে সর্গরত্যাগী,
নিখিল-মানব-চূষণ-ভাত্তর, সমুদ্র-জবর শাক্যাদিঃ গৌতম,
রাজা শুভোদন ও সমগ্র প্রজাপুঞ্জের শত সাধ ও আশা
বুজ্বিত করিয়া যে দিন ভ্রমগ্রহণ করেন, সে দিন বিকে-
লিকে কি হব্যোচ্চাসই না ছুটিয়াছিল! কে জানিত তখন,
এই অপূর্ণ স্বর্গীয় শিশুর পূণ্য-কোটি-প্রভাব একদিন অর্ধ
পৃথিবী সমুদ্বাসিত হইবে। কে জানিত তখন, এই ধূলিনদী
ধরতীর কঠোর স্থলিণ-প্রলয়-বাধিত, তাপসিচ্ছ হতভাগা নর-
নারীকে শাস্ত্রের অমৃতভারা বিতরণের নিমিত্ত নর-নারায়ণের
আবির্ভাব হইয়াছে। কে জানিত তখন, অদূর ভবিষ্যে
জ্ঞানের বিদূষ কাশ্যাকে সার্বভৌম নরপতি ও দীন সাধারণ
একুত্তিপুঞ্জ পরস্পর বাহু-বন্ধনে সঙ্কর্ষের হৈম-বেণীগণি
দণ্ডায়মান হইয়া এক মহা ভারতের স্বর্গ-বিধান করিবে।

গৌতম বুদ্ধের তিরোধান-কাল পর্য্যন্ত তৎপ্রচারিত ধর্ম
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সর্বত্র হর নাই। সঙ্কর্ষের একনিষ্ঠ
সেবক প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বুদ্ধ-মহিমা
সমুদ্র-পর্য্যাপ্ত এবং ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে
অপ্রতিহত মহিমায হুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ-বিকৃতি সম্যক প্রচারের নিমিত্ত বোধগণ যে সকল
পন্থার অনুসরণ করেন, জাতক-কাহিনী তন্মধ্যে অঙ্গতন
বলিয়া পরিগণন্য করা যাইতে পারে। বোধ-সাহিত্যে
ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্ম-কাহিনী বৃত্তান্তের নাম
জাতক।

এই জাতকের সংখ্যা ৪৩৭। বিশ্ব-সাহিত্যে জাতক-
বলী সর্বাধিক প্রাচীন কাহিনী এবং ইহাঙ্গের সঙ্গ্রহও
সম্পূর্ণ।

বোধগণ জন্মান্তরবাণী। জন্মান্তরীয় স্মৃতিবলে
মানসিক শক্তির অভিব্যক্তি হয়। বিভিন্ন বোনিতে উদয়
ও ব্যয় ধ্বন চরিত্রের সম্যক বিকাশ সাধন করে, তখন
বোধিদায় অর্থাৎ “বুদ্ধাত্ম” বিভিন্ন মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া

অবশেষে অনাগমিষ ও পরিনির্লিপ লাভ করেন। বুদ্ধসং
প্রতি জন্ম স্মরণ-সমক। সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান সময়ে
গৌতম বৌ “অতীত আদরণ” করিয়া প্রতিপদে শিষ্যবর্গের
জ্ঞান ও ভক্তি দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-পেলব শিশু-জনয় অথবা জন্মান্তরীণ-বাসে অটুট-
বিখ্যাসী নর-নারী সকলেরই নিকট পরিচয় সর্বকালে
মনোহাতিগী ও সমাদৃত। এ নিমিত্ত বুদ্ধসেবকে ইহার
নায়ক্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবকমণ্ডলী তাঁহার প্রোক্ষণ
মহিমা পরিদৃষ্টনের প্রার্থনা হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই এই
অখণ্ড প্রায়স বিনয়, অভিদর্শ ও পিতৃকামিহৃদয় এ বিষয়েও
পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। প্রচলিত অথবা রচিত
সমস্ত কাহিনীই তাঁহারা ভগবান তপাস্বতের অপূর্ণ মহিমা-
কিরণে বিভাজিত করিয়াছিলেন।

গৌতম জন্মপাণ্ডিতে জাতকের বহু ঘটনা ঐষদ্বিত্ত
ভাষ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারত, সুপ-বেটনীতে বহু
জাতকের ঘটনাবলী চিত্রিত রহিয়াছে। সুবিখ্যাত নিগ্রোধ
মুণ জাতক তন্মধ্যে অন্ততম। চূষণ শোক নিশ্চিহ্নিত, শাস্তি-
তৃপ্তিবিহীন মানব বাহ্যতে জরা-শোক-বিগত অমিতাভের
চরণে শরণ গ্রহণ করে, এই অভিজ্ঞায়ে উক্ত চিত্রাবলী
পাষাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জাতক-কাহিনীগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহারা সম্পূর্ণ
রূপে সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধ। পরিবর্তিত এবং প্রতি দেশ ও
ধর্মের উপযোগী। আরম্ভকৃত অণু পরিমিত জীবের প্রতি
উদ্বুদ্ধ করণ, অতুল দানশীলতা, একান্ত পবিত্রতা প্রভৃতি
সমুদ্রপালীর পরিচয় আমরা জাতক গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হই
এবং বহু ভারতের একখানি নির্বৃৎ মানোন্নয় চিত্র আশাশ্রয়
মানস-চক্ষু প্রতিভাত হইয়া উঠে। জীব, সেমতই ক্ষুদ্র
বা মহৎ হটক, অথবা তর বা তম শ্রেণীভুক্ত হটক, বোধ-
গণের পক্ষে সকলেই তুলা-মূল্য। বাস্তবিক জীবের প্রতি
কাক্ষণ্য বোধ হয় আর কোন ধর্মই এতদূর প্রদায় লাভ
করে নাই। এই কারণেই মনে হয়, বুদ্ধ প্রতি জন্মে বিভিন্ন

যোনিতে প্রতিই হইয়াছিলেন এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারা ক্রমশঃ বোধিবুদ্ধ লাভ করেন।

সেই অতীত যুগে ভারতীয় বণিক পণ্য-ভার-সমৃদ্ধ মৌ-শ্রেণী লইয়া ফেনিল জলদি আতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তর পত্তন গ্রামে নিঃশব্দ দ্ব্যবেশে প্রয়াণ করিতেন। প্রতি সমুদ্র, তাহার সমীপস্থ ও বিশিষ্ট জলচরী জীব, এ সমুদ্রায় তাহার নিগত বুদ্ধমুহুর-প্রতিবিম্বিত বস্তুর ভায় স্পষ্টীকৃত ছিল। সুবীৰ্য, বিবৃত রাজমার্গগুলি সার্বভাষ ও পণ্যবাহী উষ্ট্র-অশ্বাদির দ্বারা সন্তত সুখরিত থাকিত।

জাতকের সমাজ-বন্ধন ঠিক বর্তমান সমাজের অসুত্রপ ছিল না। রাজা বিশেষজ্ঞের সহায়তায় রাজ্য-শাসন করিতেন। কুসংস্কার ও প্রেত-যোনিতে বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। তৎকালে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না এবং শ্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রভাব পরিদর্শিত হইত। বিধবার পত্যস্তর গ্রহণ ঘোষণার বিবেচিত হইত না। আমরা "উচ্চাঙ্গ জাতকে" দেখিতে পাই, রাজদ্বারে করুণা-প্রার্থিনী, রোহিত্যমায়া নারী স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষার পরিবর্তে "পথে ধাবন্তীরা পতি" বলিয়া জাতার দণ্ড-মুক্তি কামনা করিতেছে। স্বামীর জীবিতাবস্থায় অস্ত্র স্বামী এরূপের উদাহরণও বিরল নহে।

যমরাজ্য-মধ্যবর্তী কুশাবতী নগরীর (বর্তমান কুশিনার) নরপতি ওজাকের ঘোষ্ঠ পুত্র কুশ দেবরাজ শকের অর্থাৎ ইশ্বের বহু-প্রভাবে জ্ঞানসম্পন্ন ও কুংসিং-বর্শন হইয়া জন্ম লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মন্ত্রসেশভর্য্য, অপূর্ণরূপ-লাবণ্যবতী প্রভাবতীর সহিত তাহার পরিধরকিয়া সম্পাদিত হয়। রূপ-যৌবন-গর্জিত প্রভাবতী রাজপুত্রকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া ঘৃণা ও রোষভরে "অস্ত্র স্বামী গ্রহণ করিব" এই সঙ্কল্প করিয়া শিক্ত-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দেবরাজ প্রভাবতীর পুনর্বিবাহবার্ত্তা শোষণা করিয়া একাধিক্রমে লাভ্যী রাজাকে বিবাহের অস্ত্র আশ্রয় করেন।

ইন্দ্রিয়ানী নামক বৈদীর জীবনীতে দেখিতে পাই, উচ্ছাদিনী পুত্রীর প্রেজী-কন্যা ইন্দ্রিয়ানীর প্রথমতঃ এক বণিকের সহিত উদাহবন্ধন হয়। এই গৃহকর্ম্মনিপুণা, সস্ত্রী-শুদ্ধশিষ্টী রমণী অত্যন্ত স্বামী কর্তৃক পতিভক্ত। হইয়া পতির ইচ্ছায় শিক্ত-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রেজী পুনরায় অর্ধ তপ গ্রহণ করিয়া এক ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে ইন্দ্রিয়ানীকে

সম্প্রদান করেন। হস্তপ্রাণিনী বিনা ঘোষে দ্বিতীয় বারও স্বামী-দ্বয়ে বক্তিতা হয়। অবশেষে এক ধীন-ধীন সম্বন্ধে ভিক্ষুর হস্তে তাহার শিতা-মাতা তাহাকে দান করেন। নিঃশব্দে নিষ্ঠুর বিধানে এ যুগও বিনা অগ্ন্যধায়ে ইন্দ্রিয়ানীকে পতিভাগ্য করেন। সঙ্গার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া এই নারী প্রমত্ত-জীবন লাভ করেন এবং বুদ্ধ-আরাধনে পূর্ণ-ব্রত হইয়া পরিশেষে নির্জ্ঞান লাভ করেন।

এই সকল জাতক পাঠে স্বতঃই মনে হয়, গল্প বা কথ্য-সাহিত্যেই সমাজের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত এবং উদাহারি যেন জাতীয় জীবনে ক্রম-বিকাশের স্রবণ-শ্রুত।

জাতকাবলী পাণি ভাবায় রচিত। পাণি ভাবায় কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত আছে। বর্তমান প্রবন্ধ ইহার আলোচনার স্থল নহে। তবে অসংকোচে ইহা নির্দেশ করা হইতে পারে যে, গৌতমের প্রাদুর্ভাব-কালে ইহা জনসাধারণের কথিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত ছিল এবং এক বিশাল বৌদ্ধ-সম্ম-গঠনে অসুপ্রাণিত হইয়া ভগবান বুদ্ধদেব মুক্তি নব ভারতা প্রচলিত ভাষাতেই ঘোষণা করেন। সমভাষ্যভারী, মমতী জন-মণ্ডলীকে ধর্ম্মের মহিমায় বৈজয়ন্তী মূলে একীভূত করিবার ইহা একটা অনন্ত-সাধারণ ও সংজ্ঞাধা উপায়। গৌতম এই মাপকাঠি ভাষায় স্বর্ণ দান না করিলে হয় ত আজ ইহার এতাদৃশী পরিপূর্ণি সাধন হইত না, অথবা বহু প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া ধ্বংসে ও বিদেশে পরিপূর্ণিত হইত না; এমন কি অজ্ঞাত প্রাকৃত ভাষায় সহিত সংমিশ্রিত হইয়াও হইত।

অধিকাংশ জাতকীয় ঘটনা বাল্যপণী-রাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে সম্পন্ন হয়। এই ত্রুতন্ত রাজের কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অসুদান হয় না; আমাদের দেশে প্রচলিত হুয়ো ও হুয়ো রাণীর মত কল্পিত ও প্রাত্যহিক নাম বলিষ্ঠই ধারণা হয়। তখনকার দিনে বুদ্ধের সন্ত্যা-দীপালোকিত সূচীতে বা ককে শিশুর নিকট এই সকল কাহিনীর বর্ণনা করিতেন।

জাতকে রামায়ণের গল্প বিভিন্ন রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। কবি স্বীকার করা যায়, জাতক-কাহিনী রামায়ণ-পেকা পূর্ব্বানত, তাহা হইলে রামায়ণের গল্প লিপিবদ্ধ হইবার সময় কাহিনীগুলি যে পরিবর্তিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দশরথ ও রত্নপুত্র জাতক পাঠ করিলে

অতিকূল শক্তি পড়িয়া তুলে। তখন নদীর গর্জ গর্জ হয়—নদীর বোহনায় চড়া পড়ে—তরা নদী মজিয়া যায়। সেখানে ধরণীর ঢলঢল শুভল লাগিয়া দ্রান হইয়া যায়।

কিন্তু এই ক্ষতর বাসুন্ধর্যার সংহাত অস্ত্রের একঝোটে, জ্ঞানদীনের অঙ্গ-শক্তি। অশ্রুপথ ভগতেও ভেদন দীন-দীন কুলের দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতেছে,—এক স্থানের পদার্থ অত স্থানে মিলিতেছে—সমু মিলিয়া গুরু হইতেছে, গুরু ভাঙ্গিয়া বহু হইতেছে। আবার মনে হয়, বিধির বিধানে নষ্ট জীবের মধ্যে বাহ্যিক ঐ শক্তির অধিকারী, তাহারাই ঐশ-শক্তি-স্ববিত সৃষ্টিরক্ষক প্রজাপতি;—তা' হউক তাহার। গাছের পাতার সবুজ কোষ ক্রোরোফিল, আর হউক তাহার। জ্ঞানভনে মোহাচ্ছিন্ন জ্ঞানচক্রে লাক্ষা-কীট। গাছপাটার গ্রান আছে এ কথা এখন নিছ;—তবে তাহাদের জ্ঞানের দ্বারা কতটুকু, তর্ক সেই ধানে। এখন তাহার। পারীক্ষিক হৃৎস্থঃ, সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচ্য ভগবীশচক্রে বাতার শিখি। বিতেছে। সে হিসাবে গাছের নতুন কোষের গ্রান আছে,—সে বাসুন্ধর্যার মত বড় নয়,—সে জীবসেহের অঙ্গ। এই স্কোরোফিল সৃষ্টিরক্ষক প্রজাপতির প্রধান কর্মচারী—তাহার পৃথিবী-পরগণার নার্যেব, মনিব, পোষতা। স্বর্বাঙ্গলোকে ঠাড়াইয়া বাড়ীর কর্মকর্তা দুক্কির মত কার্জন বা করণার সঙ্গে ভগবানকে গুতগোত ভাবে মিলাইয়া দেয়, বড় আয়তনকে অব্যাহতি দেয়। এই স্ক্র্যাপিল ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্রোরোফিলের দ্বারা বহি hydrocarbon বা উদ্বায় নির্ধাণ করিয়া না দিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোনও প্রাণী বসবাস করিবার অধিকার পাইত না। যেহেতু এ কথাটা এখন উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃতির অন্তরীম শক্তিকে শরীর দিতে পারে এক স্কোরোফিল; আর সেই শরীরী উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ-জোড়ী জীব না থাকিলে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই জীব-পরিপোষক উদ্ভাব্য রচনার কার্য-করণ কেবল উদ্ভিদের ক্র্যার—আবাদের মধ্যে কোনও হোমরা-চোমরা পণ্ডিত এখনও সে শক্তি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আমি দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া আপনাদের বৈদ্য পত্রিকা করিতে চাহি না। আবার বক্তব্য বিষয়ে এই স্কোরোফিলের কথাটা ‘শিব-

সম্বর্তী’ নয়। গ্রান-পরিপোষক উদ্ভিদ-ভগতের ব্যবহার দ্বারা অপ্রতিরূত থাকে, তাহার কুলের রেণু তাহার কুলের বীজ-কোষের মধ্যে মিলিলে। মোহাচ্ছিন্ন-প্রমুখ কীট পতন এই মিলনে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। কিন্তু সে সাহায্য উদ্ভিদ পায় না, তাহার স্বাক্ষের মজুরি না দিলে। উদ্ভিদ কুলের চুম্বির ভিতর যমু-জমাইয়া রাখে, মোহাচ্ছিন্ন সেই স্থানের গোতে অঙ্গ কুলের রেণু মাখে, সেই রেণু অঙ্গ কুলের পক্ষ বীজ-কোষে মিলাইয়া দেয়, তখন কুল তাহার মজুরি দেয় অতি অল্প একটু মুখ। এই মুখ থাকে বটে কুলের বৃকের মাঝে; কিন্তু তাবিধের না, এই বৃকের ঘন ঘিরা কুল বড় বদান্ততার পরিচয় দেয়। মোহাচ্ছিন্নের পের হইলেও, কুলের মুখ কুলের পক্ষে অজ্ঞান। উদ্ভিদের সেহের মধ্যে রাসায়নিক কার্যবাহী আছে। সেখানে উদ্ভিদের পুষ্টির ভ্রম নানা-প্রকার পদার্থ নিম্নিত হয়। শর্করা বা চিনি সেইরূপ একটা পদার্থ। যে শর্করাটুকু তাহার সেহের বসলের ভিত্ত আবেশিত হয় না, উদ্ভিদ সেই চিনিটুকু কুলের মাঝে ফেলিয়া রাখে। প্রকৃতি আমো অশ্রুত দেখিতে পারে না। সে অজ্ঞানটুকু সে রাখিয়া দেয়; কারণ, সে জানে, বাহা উদ্ভিদের পক্ষে আবর্জনা, তাহা অনেক জীবের পক্ষে মুখ। তাহার বীজ-গঠনে সহায়তা লইয়া কুল মোহাচ্ছিন্নকে দেয় এক বিশ্ব্র তিন শতাব্দের এক অংশ মুখ! কি বদান্ততা!

এই এত অল্প দ্বারা কেন মুখদান করিয়া প্রকৃতি উদ্ভিদ-ভগতের বংশধারা অঙ্গুর রাখে, তাহারও একটা কারণ আছে। এই কার্পণ্যের মূলে প্রকৃতির সকল অমৃতানের মত যোক্তানবাবী আছে। একই কুলের রেণুর দ্বারা বীজ উৎপন্ন হইলে তেজস্ব গাছ হয়ে না। তির কুলের রেণু পাইবার ভ্রম প্রকৃতি নানা কৌশল করিয়াছে। ‘অর্জন’ই আমি সে কথা বলিয়াছি। আবার মনে হয়, এই ভিন্ন কুলের রেণু মাতের ভ্রমই কুলের দান অত তুচ্ছ—প্রকৃতি এত রূপ। একশত কুলে ঘ্রিলে তবে মোহাচ্ছিন্ন এক শেট মুখ পায়; আর তাহার ক্ষুদ্র সেহের এক শেট মুখ এক বিশ্ব্র এক-তৃতীয়া অংশ মাত্র। এক টানে এক শত কুলে পুষ্টির সমগ্র একের রেণু অঙ্গের বীজে মিলাইয়া মোহাচ্ছিন্ন তাহাদের উৎপন্ন করে। স্তব্ধতা আবার যখন নোচকের যমু দুটাবার নবর মনকে অধিষ্ঠায়া বসি যে, চোখের উপর

বাটপাড়ি করিতেছি, সে কথাটা জ্ঞানীক। আমরা বাটপাড়
নাই, কারণ মোমাছি বেচারা চোর নয়।

সময়ের গড়িরা, সন্ধ্যা রচিরা তবে কীৎ-বেহ মোমাছি
প্রকৃতির এত বড় একটা কার্য সাধিতে পারে,—আমাদের
মত রসগ্রাহী জীবকে মধুদান করিতে পারে। প্রকৃতির
একটা অবজ্ঞানকে সংগ্রহ করিরা অস্ত্র জীবের রক্ষণ
সাধিতে পারে বলিয়াই তুচ্ছ মোমাছি বরণ্য। আমরা
ভূমির হইয়াই তাহার পরিভ্রম-লভ্য মধু পান করি; মধু দিয়া
বাগ-বজ্র করি, সেবতার প্রদান পাইবার অস্ত্র; আর তাহার
ঘর তাম্রিরা যোম লই বেকতার সম্ভাবের ক্ষত্র; কারণ,
কেবল কিন্তু নয়, সুন্দরান, কাঞ্চালিক, হুহুদি সকলের
বেশার আলোকিত হয় চাক-ভাদা খাঁটি মোমের লীপের
আলোকে। নানা লোকে নানা কারণে মোমাছির কার্য-
কলাপ পর্যবেক্ষণ করে, তাহার সম্ভাবের গুণ গান করে।
আমার কিন্তু মনে হয় যে, মোমাছি মানুষের প্রিয় একটা
কারণে—সে তাহার সন্তের তত্ত্বার হইতে আমাদের মধুদান
করে বলিরা। যে যে, সেই বড়,—সেই বড়। মোমাছি
মধুদান করে, তাই সে বরণ্য। অবশ্য কথাটা নিষ্ঠুর ও
উচ্ছন্নতির পরিপন্থী বটে; কিন্তু ইহার একটা গুণ আছে যে,
ইহা শতকরা ৯৯ জনের প্রাণের স্বরের প্রতিধ্বনি। :

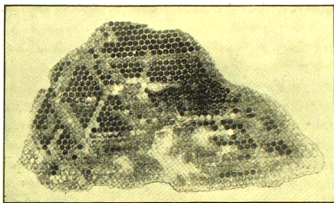
এ হেন মক্ষি-সন্ধ্যা ঘেঁষিবার, বুঝিবার—ঘেঁষিরা, বুঝিরা
তাহাতে মধিবার সানগ্রী। চলিরা, পলাশ, বাট হাম্বার
জীব একত্র বাস করে;—এক উদ্দেশ্যে, এক সাধনার
প্রাপ্যতা করে;—অস্ত্রান্ত্র ভাবে পরিভ্রম করে;—পরস্পরে
যাৱাৱাৱি-কাটাকাটি করে না, খেয়োখেরি-দলাদলি করে
না;—গুণাভিত্তি ইত্যর জীবের এ হেন কার্য-কলাপ
ঘেঁষিরা জীৱ-শ্রেষ্ঠ বহুবা অক্লেশে-সম্ভার নতশির
হইতে পারে। মক্ষি-সম্ভাবের সেনলিন কাল করিবার,
চলা-ফেরার প্রতি পদে-পদে যে সব আইন-কানুন
বিধি-নিষেধ মানিরা চলিতে হয়, সেগুলার মধ্যে বিচার-
বুদ্ধির ছায়া প্রদান আছে। যে বুদ্ধির লভ মোমাছি
স্বরা কতটুকু-প্রতির দাবী করিতে পারে, সে কুট তর্ক
পরে তুলিবা।

মোচাক মোমাছির অমৃতভূমি, কন্দুভূমি, বাসস্থান।
চাক তাহার নিজের গড়া। চাক-নির্মাণের দাপ-মদাটুকু
তাহার নিজের দেহ-নিঃসৃত বস্ত্রের সানগ্রী। তাই মানুষের

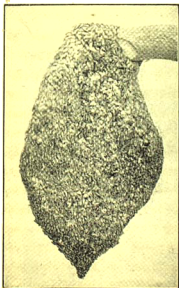
পুষ্ঠ-বিভাগের কার্যের মত ইহাদের পুষ্ঠ-বিভাগে অণুচর
নাই;—‘কোম্পানীকা মাল দরিদ্রমে ডাল’—এ নীতির
প্রচলন নাই।

মধুচক্র ঘেঁষে নাই কে? পুরাণ-বাতীরা চাকুর-দালানের
কড়ি-কাঠে, তুচ্ছ-পিতামহের পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত গুহং
অখণ্ড-বটের কোটরে; সোশালার হাঁচতলার,—যে স্থানই
একটু বড়-কাপটা, দুর্গভ হইতে নিরাপদ, মোমাছির দল সেই
স্থানেই বাসা করে। আমার নিকটে একটা শূন্য মধুচক্র
আছে, সেট বড় আশংক্যের আওতার প্রোথিত একটা
তরুণ কামিনী গাছের মোটা ডালে রচিত হইয়াছিল।
ইহার উপরের ভিত্তি ছিল কামিনী গাছে, পার্শ্বের বাধন
ছিল বাগানের কাঠের রেলিং। হানট বেন নিবিবিগি—
কড়-কাপটা হইতে অনেকটা নিরাপদ, অখণ্ড ভূমি হইতে
মাত্র ৪৫ ফুট উচ্চ। আমাদের দেশে মোমাছির চাব
নাই; তাই আমি এই প্রকৃতিভ্রাতা মধুচক্রের কথা বলিলাম।
বিলাতে মোমাছির চাব হয়, তাই বিলাতী পুস্তকের বর্ণনা
জাগ্রদের মক্ষি-শালা, bee-house, apiary বর্ণনা।
মোটের উপর উত্তর সম্ভার মোমাছির গুণগণা, ক্রতিষ,
শিল্প-কলা সমান। আমি সংক্ষেপে বিলাতী মক্ষি-শালারও
বর্ণনা দিব।

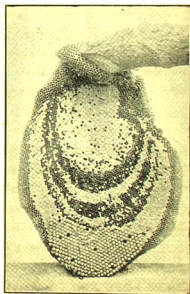
বলিরাছি মোচাক মোম-রচিত। মক্ষিকার কল্প
উপারে চাক নির্মাণ করে, সে কথা পরে বলিবা। এখন
বলিবা চাকের কথা। মক্ষিকা-রীতি মধুচক্র ঘেঁষিতে বড়
শুদ্ধ। চক্রে মক্ষিকা থাকিলে তাহার সান্ধ্যা বড় নিরাপদ
নহে এবং স্বাক-রীক মোমাছি চাকে বলিরা ত্যানত্যান
করিভেছে, নিজের মনে ছুটাছুটি করিতেছে,—আট হিসাবে
লে-চিহ্নও বড় মনোহর নহে। নীচে ভিত্তি করিরা আঁৱরা
যেহন অট্টালিকা উপরমিকে গাঁৱিরা কুঁড়ি, মোমাছি তেমন
উপরে গাছের ডালে, বা কড়িকাঠে, বিলাতী মক্ষিশালায়
স্তম্ভের উপরের কাঠে ভিত গাঁৱিরা ক্রমশঃ নীচের দিকে
ঘর বাড়াইয়া যায়। চাকের দুইদিকেই ঘর থাকে; অর্থাৎ
ঘর এক সারি ঘর দুই পূর্বদুখ, অপর সারি হইবে পশ্চিম
দুখ। এই ঘরগুলি প্রত্যেকটি ছত্র-কোণা—কিঞ্চ প্রত্যেক
ঘর সমান নয়, কতকগুলি বড় কতকগুলি ছোট। কতক-
গুলি ঠিক সোজা horizontal নয়, বোহিদের দুখটা
একটু উঁচ। ভবিষ্যতে যাহারা মক্ষি-রাণী হইয়া অস্ত্র



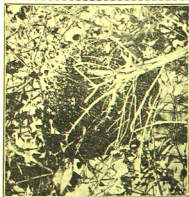
মৌচাকের বহিরাংশ
(এই মৌচাকটি পোয়াপোকা দ্বারা প্রক্রান্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে)



চাকের উপর মৌচাক



খাদ্য মৌচাক



କୋମର ଭିତର ଘୋଡ଼ା

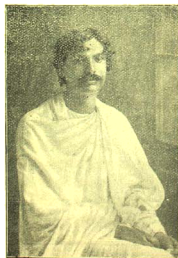


କୋମର ଘୋଡ଼ା ହସ୍ତେ

ଘୋଡ଼ାଘୋର ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖା ହେଉଛି

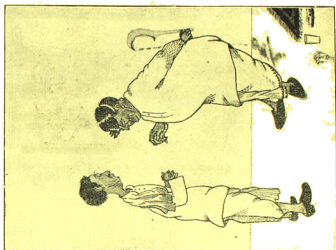
ଚାକ୍ରେ ପ୍ରାୟ-ମୂଳା କରାଯେ, ଡାହାଣ ବଡ଼ ଶ୍ରୀମତ କଳାପାର ଧାକେ । ମଧୁ ମାଝିଆ ଆସିବେ ନା ବାରିଆ ଶ୍ରୀମତ ମୂଳା ପାଲିତା ହେ । ସେ କଳାପାର ଭିତର ଦିଶେ ମୂଳା ଚାକ୍ରେ ନିର୍ମାଣେର ବାବଦ ।
ମାହାତ୍ର ମାହାତ୍ର, ମେଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗା-ମୂଳା,—ଡାହାଣ ଭିତର ମଧୁ

• ଏହି ଶ୍ରୀମତ କଳା କଳାପାର 'ମୂଳା' ଡାହାଣ ଶ୍ରୀମତ କଳାପାର 'Hec-Keeping' ମୂଳା ହେଉଛି । ଡାହାଣ ଆସା କଳାପାର ମୂଳା କଳାପାର ।

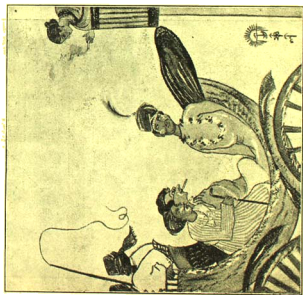


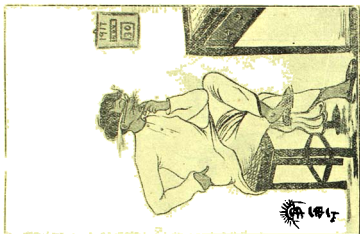
ମିନି—ଶ୍ରୀମତ କଳାପାର ଡାହାଣ

রঙ্গ-চিত্র [ত্রিচকল বন্দোপাধ্যায়]

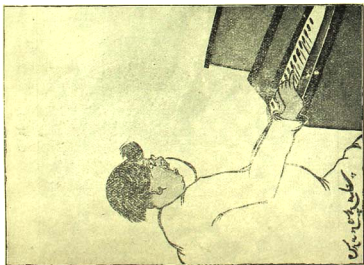


সরের বাপ





କେ.ଏ.ଏ.



କେ.ଏ.ଏ.



কোটির দল

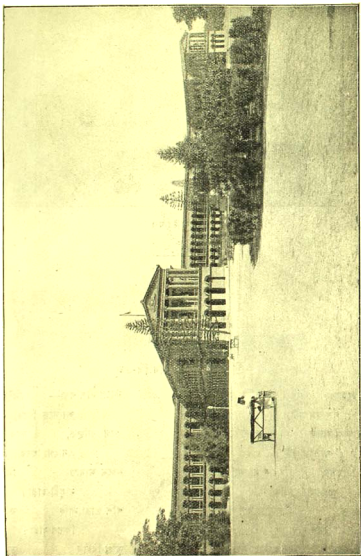
আশ্বান

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল্]

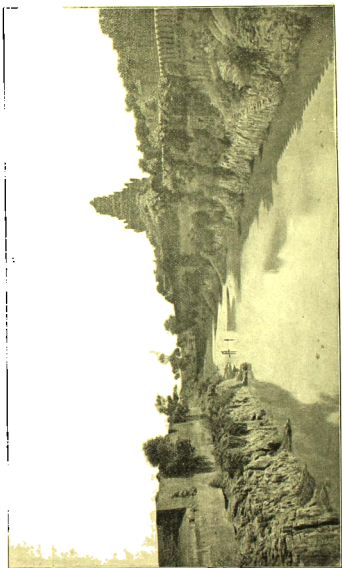
কুত্রে আমার উঠেছিল বস
কুহ্ম কুট,
একে একে আমি স্বত্বের ভূতলে
পড়িছে সূচি।
ওগো প্রিয়তম, তুমি কোথা আমি
কোথায় আমি,
শুভ্র শুবনে কেমনে কাটিবে
দিবস যাবী।
দীপখানি মোর আলিয়া বিঘন
কুটার থাকে,
পথ-পানে চাহি বসে আছি ঘারে
নীরব সঁকে।

কাপে দীপনিধা— নিদ্রিৎ আঁখার
আসিছে বিরে,
ওগো ব্যক্তি, কিরে এস তুমি,
এস গো কিরে।
নয়নে আমার নিখিল ভুবন
মাদুরী-ধারা।
শশি তারা নাহি করে বহিষণ
কিরণ-ধারা ;
তৃপ্তি-বিহীন তুমার বহিছে
জন্ম মম,
এস, কিরে এস, দেবতা আমার,
হে প্রিয়তম !

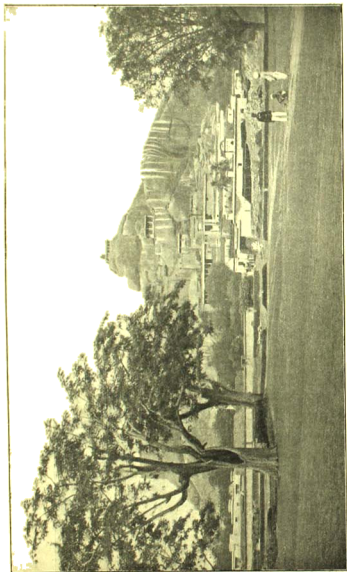
ভারত-চিত্রাবলী



সরকারী কবরستان—কুমিল্লা—বাকুলেশ্বর



ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ପାଣି-ତାଳିଆ



ବିଧିନିର୍ମାଣର ମାଡ଼

ছুটি

[ত্রিসরসীবালা বহু]

১

“হাণু! হা!” “কি বাবা?” “কাজ না, ভোমার জননীর কটোখানির বাসি মাগা এখনও বহুলে দাও নি কেন?” “এই যে এখুনি দিচ্ছি বাবা! অমূল্য এতকণ যে আমার নাকাল করছিল” বলিয়া রাগি কিপ্র-পরে অস্ত গৃহ হইতে সখর-এবিত একটি কুম্ব ফুলের মাগা লইয়া আসিয়া, ইন্দের উপর গাড়াইয়া, বসীরা জননীর কটোখানিকে বেটন করিয়া তুলাইয়া দিল। বসী মালাটি নানাইয়া লইয়া, সম্মুখের পুষ্করিতিতে ভাসাইয়া দিতে গেল,—মাতৃ-পুত্রের মূল যদি কারও পায়ে লাগে, তাহারই যে পাপ হইবে! গ্রায় বৎসরাধিক কাল হইল, হেমন্তবাবুর পত্নী-বিরোগে হইয়াছে। তাঁহার বয়স চল্লিশ; পত্নীর বেশ রুহ ও সবল; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আত্মীয়-বন্ধুর অহুরোধেও তিনি দ্বিভীষণ্যর দার-পরিগ্রহ করেন নাই; তাহার কারণ, তিনি অত্যন্ত পত্নীবৎসল ছিলেন। দিনটি পুস্তকতা রাবিয়া সাধী সতী লক্ষী, স্বামীর পায়ে দ্বলা মাথায় লইয়া, সতীশোকে গমন করিয়াছেন। তাঁর সুভা-শ্যার শেষ অহুরোধ,—“ছেলে যেরেঙলোকে এই রকমেই চিরদিন ভালোবেসো” দিনরাত্রি হেমন্তবাবুর কাণে বাজিতেছে। হায় নারি, এ কি কারণে অহুরোধে বা ধারে পড়ে ভালবাসা, যে, ভোমার অবর্তমানে পিতৃ-ভ্রমের স্বভাবই নির্মল রেধে-উৎস গুতাইয়া বাইবে? সে যে অসম্ভব! এরা যে তোমারই আত্মার স্বতি! ইহাদের অবহ! স্মরণ করিলেও যে গ্রাণ শিথিয়া উঠে!

বড় মেয়ে রাগীর বয়স বছর বার;—বেক মেয়ে ইঁহুর বয়স বছর নয়;—খোকা অমূল্যধন তিন বৎসরের শিশু মাত্র। ইহারা পিতার নয়নের মণি, ভ্রমের আনন্দ। হেমন্ত বাবু ছেলেমেয়েদের প্রতি অত্যন্ত যেরেঙল। তাঁহার স্বভাব খুব অমায়িক; বাটার দাস-দাসী, গৃহপালিত জীবজন্তু পর্য্যন্ত তাঁহার এ মেয়ের অংশে বকিত ছিল না। হেমন্তবাবুর বন্ধু-মহলেও সকলে তাঁহাকে বন্ধুবৎসল বলিয়া জানিত। কেবল চাকরমোহনবাবু বলিতেন, “হেমন্তের স্বভাব চিরকালই মোগা-

য়েম পোছের; তবে ওর স্ত্রীর স্বভাব মাথুখে ওর স্বভাব এত উদার, এত মধুর হয়ে গেছে। ওর নিছের প্রকৃতির তেমন কিছু বিশেষত্ব নেই। বহর ও একটু দুর্জলচিত্ত”। বন্ধু-বান্ধবরা এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। হেমন্তবাবুর বিন্দুী ও মধুরস্বভাবা পত্নী অনিবার রূপ-গুণের খ্যাতি বিশেষরূপে অবগত হইলেও, স্ত্রীর স্বভাবের ছায়াপাতে স্বামীর স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হয়, এ অসম্ভব কথাত্তে কেহ আমল দিতে চাধিতেন না। এ যাকৈ কথা কেই বা বিশ্বাস করে? আর কল্পনাধীরা চাকরমোহনবাবু ছাড়া কেই বা বলিতে সাহস করে? তবে এ কথা সত্য যে, চাকরমোহনবাবুর সহিত হেমন্তবাবুর কর্ণহানে আসিয়া বহুত্ব স্থাপিত হয় নাই; তাঁহার আবাণা বন্ধু,—শুণ-কলেজের সহপাঠী; স্ত্রুতহাং হেমন্তবাবুর প্রকৃত স্বভাবের কথা তাঁহার অপেক্ষা কেহই বিশেষ অবগত নহেন।

হেমন্তবাবুর সংসারে তাঁহার এক বিধবা ভ্রাতৃবধু ছাড়া আর কেহ ছিল না,—অমূল্যধনকে সে-ই যুকে করিয়া হানুহ করিয়াছিল। বোবনে পরার্ণপ করিতে না করিতেই তাঁর নারী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কালের নিষ্ঠুর আঘাতে তাগিয়া গেল। সে আঘাতের গুরুত্ব বোধ করিবার শক্তি তখনও বলিকার তরুণ জ্বরে পূর্ণভাবে উদ্বেবিত হয় নাই। কিন্তু দিনের পর দিন বতই সে ঘনিষ্ঠভাবে সংসারের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে গায়িল, তাহার জীবন একটা বিভ্রমের মাত্র,—একটা দুর্জিহব বোঝা বই আর বেন কিছু নয়। সাধ নাই, লক্ষ্য নাই, কামনা নাই, আনন্দ নাই,—এমন রসহীন, বিগুণ মলকুটির তুল্য জীবনের মিনতলি একটার পর একটি কটে কেমন করিয়া?

মোহিনী অল্পবয়সে শোখাপড়া শিখিয়াছিল, অবসর মত হ-একখানা গল্প ও উপস্ত্রালের বই পড়িত। সেই সব বইয়ের নারক-নারিকায় বিচিত্র জীবন-কাহিনী পড়িয়া তাহার মাথা বেন আরও কেমন হইয়া বাইত। সে কিছুই বুঝিত না,

কিছুই ভাবিত না,— শুধু কিসের এতটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বৃহৎ বাসনা চিন্তের মধ্যে জাড়া করিয়া ফিরিত।

অনিলা স্বামীকে একদিন ধরিয়া বলিল, “ছোট বৌ কি চিরকাল বাপের বাড়ীর গড়ে থাকবে? ঠাকুরপো গেছে বললে কি এ বাড়ীর সঙ্গে তার আর সম্পর্ক নেই? আমরা এখন রয়েছি, তখন আমাদের তো তাকে আনা উচিত।” হেমন্তবাবুর অমত করিবার কিছু ছিল না; কিন্তু মোহিনী প্রথমে স্বত্ত্ব-বাড়ী আসিতে রাজী হয় নাই। স্বামী-পুত্র স্বত্ত্ব-বাড়ী,— সে আবার কি অদ্বত চিনিস! কিন্তু মোহিনীর মাতা খুঁছমতী ছিলেন। তাঁহার দুইটা পুত্র ছিল। সম্প্রতি তিনি তাহাদের বিবাহ দিরাছিলেন। তাঁহার অন্তর্যমানে ভবিষ্যতে যদি তাহারা মোহিনীকে না দেখিতে পারে, তাহা হইলে একমুঠ ভাতের জন্ম অভ্যাগিকে কার দ্বারা পড়াইতে হইবে ঠিক নাই। তার চাইতে ভাতের ওভাতের সংসারে যদি বনাইরা চলিতে পারে, তো সম্মানের সহিত দিন কাটাইতে পারিবে; সুতরাং কল্পকে তিনি বুঝাইয়া-ভুঝাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোহিনী কিন্তু অল্প দিনেই অনিবার্য মেঘ বয়ে এমন বহুভূত হইয়া গেল যে, আর তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া হইল না। পাঁচ বছরের ছুটিকে মেঘ-বহু করিতে-করিতে শেষে যখন অনুশ্রবণ আসিয়া সংসারে দেখা দিল, বাসবিধবা তার চরনের সমস্ত দক্ষিণ মেঘমাণি একেবারে নিঃশেষে উগাড় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অতিথিকে বরণ করিয়া লইল। দিনের পর দিন, প্রাণের অন্তরেই অতিবিক্ত করিয়া বড় আদরে, বড় যত্নে মোহিনী অনুশ্রবণে মাহুঁষ করিতে লাগিল। অনিলা ইহাতে খুব খুশী হইল। অনিলা অনুশ্রবণকে মোহিনীর খোকা বলিত। শিশুও তার ছোট-নাকে এমন করিয়া চিনিল যে, রাক্ষসে যে ছোট মার কছেই ওঠিত। শিশুর ভালবাসার এর চাইতে বড় নখীর প্রনিয়ম আর কিছু নাই। মোহিনী নিজের জীবনের আশ্রমানে আর নতুন করিয়া তৃপ্ত হইল। মেঘের সোপার কাঠির স্পর্শে তার অন্তরের হৃদয় নান্দী-মহিমা এতদিনে কল্যাণময়ী সুরিতে জাগরিত হইয়া, জগতের এক অভিনব-সৌন্দর্য্য সোভার দৃষ্ট তাহাকে দেখাইয়া, তাহার অম্ব গার্ভক করিয়া দিল।

২

“কাকীয়া!” “কি না?” রাণীর পর অভিমান-ভারে ক্রোশিতছিল। “আজ মার ফটোতে মাশা দিতে গিরে

দেখলুম, ফটো দেখানে নেই। বউকে জিজ্ঞেস করতে বললে, ‘সে ফটো তোমার কাকীবার ঘরে রেখে এসেছি, সেই ঘরে মাশা দাও যে।’

হেমন্তবাবুর ছয়মাস হইল পঞ্চমী হ্রস্বতী শাক্তিলতাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছেন। মোহিনী ইহাতে সৌভাগ্যের নিশ্চয় ছাড়িয়া রাখিয়াছে। রাণী বিবাহের পর একবার-বার স্বত্ত্ব-বাড়ী গিয়াছিল। তাহার স্বামী এতদিন পড়াশুনা করিতেছিল বলিগাও বটে, বৈবাহিকের গৃহপুত্র হইয়াছে বলিগাও বটে,—রাণীর স্বত্ত্ব-বাড়ী এতদিন বধূকে লইয়া যান নাই। তিনিও আবার বিপত্নীক। তবে তাঁহার মোটা শুশুনি বালবিধবা জ্ঞানদা চিরকাল ভারের সম্মারেই আছেন, এবং গৃহস্থালী চালাইতেছেন। শেজন্ত তাঁহাকে কোন অগ্রবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ছোট মেয়ে স্বত্ত্ব-বাড়ী আসিয়া তিনসন্ধ্যা বাপের বাড়ীর জন্ম মন কেমন করিতেছে বলিয়া মাকে কঁদিবে, সে সব তিনি চুপকে দেখিতে পারেন না। তবে এতদিনে ছোটপ ওকালতী পাশ করিয়া প্রাক্টীশ শুরু করিয়াছে,—বউও এত দিনে বড়-সড় হইয়াছে,—এইবার আর না আনিলে বর চলে না; সুতরাং রাণীর আর বাপের বাড়ী থাকা হইতে পারে না। অঞ্চ রাণী চলিয়া গেলে, সুবতী বিধবা, পত্নীহীন ভাষ্যের বরকরা চাশর কি করিয়া? সেটা দেখিতে শুনিতেই বা কেমন লাগে? তার উপর পল্লীগ্রামের নহনানী সকলেরই চণ্ড ও হসনা সর্জনা সঙ্গাণ থাকিয়া কেবল নৃতন-নৃতন ছিন্ন ব্রীজিতে তৎপর;—অবদর-বাগনের এমন ক্রতিমুখবর, ব্যাপার আর কি আছে? তা, যা কালীর দ্বার বড়-ঠাকুরের এতদিনে হ্রস্বতী হওয়ার, তিনি শাক্তিকে বিবাহ করাত, মোহিনী তবু নিশ্চিন্ত হইয়া বাচিল। তাহার যে ভাবনা হইয়াছিল!

অবশ্য দিদির কথা স্মরণ করিয়া মোহিনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সবই পোড়া কপালের মোহ; নহিলে, সে তাকরাণী এই বরসে সোপার বর-সংসার ফেলিয়া, চাঁদের হাট রাখিয়া চলিয়া গেল কেন? সে অবশ্য আগিমানী, এমোরাণী—বর্ণে গিয়াছে। মোহিনীর পোড়া অদৃষ্টে তো মুচু নাই! সে মরিলেই তো; সবদিকে ভাল হইত! বিধাতার উদ্ভট বিচার বোকা দায়।

যাযা হউক, শাক্তি বেশ চালাক-চতুর মেয়ে। সেখা-

পড়া, উপ-বোনা, তাল্লা-বায়া সবচেয়েই সে বেশ নিপুণ।
শেষবয়ে বরের সঙ্গে এমন বড়-সড়-মেয়ে না হইলে
সাক্ষরই বা হইবে কেন? বউ দেখিয়া সকলেই একবারে
বেশববাবুর পত্নী-ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। সেবারের
চাইতে এবারেরটি কোন আগে নাহি নহ, — ভোর কপাল
না হইলে কি এমনটি হোটে?

তবে চাকরোহনবাবু লোকটা কিছু খুঁৎ-খুঁতে, তিনি
বহুসমায়ে বলিয়া বসিলেন, “অনিবার মত স্বভাবের মধুরতা,
—আর, নামটি শান্তিলতা হ’লেও—তখন শান্ত ভাব
কখনও এঁর হবে না।” অজ্ঞাত কথা করিলেই পাটো জবাব
গুলিতে হয়। বরপুত্র উত্তর দিলেন, “কেন হে? তুমি সে
খবর জান্নেকে কি করে? ভোমার সঙ্গে কি কণের কিছু
স্রুতিবধুর সম্পর্ক আছে?” চাকরোহনবাবু উত্তর দেন
নাই। এবারের কড়াও তিনিই দেখিতে গিয়াছিলেন;
এবং দেখিতে গিয়া, পনের বৎসর পূর্বেরকর কড়া বেধার
কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। তখন তাঁহারা কোণে ইয়ারে
পড়িতেছেন,—ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়নে মন-
প্রাণে অপূর্ণ ভাবের বেনা ঘরিয়াছে,—চোখেও সে বেনার
রস লাগিয়াছে। ছই বন্ধুত্ব একদিন ঘটকের সহিত
পরামর্শ করিয়া (অবস্ত্র অভিতাবেকের অভ্যাসে) ঠাং
কড়া দেখিতে গিয়াছিলেন। বৈশ্যবের শাস্ত্রাঙ্গল প্রভাতে
বিস্তৃত উজানে শিবপুত্রার মত ছোট-ছোট মেয়ের দল
স্বল তুলিয়া, দুর্গা খুঁটা করিতেছিল। তাহাদের কলহস্ত-
গুলিতে ও মলের রুণ্ডুপ শব্দে প্রভাত-বাবু মুখের হইয়া
উঠিতেছিল। ঠাং পাড়ার ঘটক-দাদার সহিত ছইজন
স্বকর্তি, স্বেদেশ, ওস্তাদ সুবককে দেখিয়া, বহুতা বেয়ের দল
ছুটিয়া পলাতয়া গেল। ঘটক-দাদা অনিলার নাম ধরিয়া
ডাকিতে, সে কিরিয়া পাড়াইল,—স্বল-স্বলে পতিপূর্ণ স্রুতি
হাতে লইয়া বালিকা মনুস্বের ঘটক-দাদার কথা শুনিবার
মত পাড়াইয়া রহিল। সমস্তাতার প্রসন্নকক চুলের রাশি সিঁঠ
হাইয়া পড়িয়াছে। নিরাকংগ: ওস্তাদ বেহের শোভা সাজির
মহোকার ছুট ছুটে জাহই অতি মৃদু। গাল-ছুটিতে
ত্রীড়ার হকিম আসা গোণাগের রক্তের অক্ষরুণ করিতেছে।
বেশমেন রঙের ওস্তাদের কাণড়ানির মধ্য দিয়া সর্বাঙ্গের
লাবণ্য যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ইতঃপূর্বে একদিন
ছই বড় পিতার সহিত আসিয়া, গহনার আপাদ-মগ্নক-

মোড়া, পাভা-কাটিয়া-চুল-বাগ, বড় রক্তবের টিপ-পরা
কনেটিকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। সেদিন গহনার অসুপ,
কাণড়-গোণড়ের পাতিপটি, মাধার উপরে জরি ও গোণার
চিকুই, স্নল প্রভৃতি দিয়া মাফান,—ছোট সাটকের একটা
চুবড়ী ছাড়া মাহুঘটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ তাঁরা
পান নাই। আর মুক্তকেশী, সাতলক্ষার আড়বর-পুত্র-মেহা
বালিকার স্বাত্তাবিক সৌন্দর্য দেখিরা উঠয়ে মুগ্ধ হইলেন।
ঘটক দাদা বালিকার মূখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল,
“চেয়ে দেখুন মশাই, একবারে হিমাচল-কন্তে গোঁঠী বার
মএন স্রপ। মাংনি ভোর বর এনেছি; কুইও পছন্দ করে
নে। ঐদেইই শুধু চোখ থাকবে কেন? আমার
মাংনিরও তো পছন্দ চাই।” অনিলা ‘খোং’ বলিয়া তখন
ঘটক-দাদার হস্ত এড়াইয়া ক্ষিপ্ৰপদে চলিয়া গিয়াছিল।
অদূরে পলাতক। সদিনীর দল অস্তরালে থাকিত; এ বাগার
প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অনিলাকে দেখিরা তাহারা হাততালি
দিয়া হাসিয়া উঠিল। রহস্ত করিয়া কে কি বলিল, অবস্ত্র
সেগুলা আর ইংহদের শুনিবার মোচায়া হয় নাই।

এবারের কনে দেখিতে গিয়া সকলেই পছন্দ করিলেন;
কিন্তু চাকরোহনবাবু মনে হইতেছিল, কিশোরীর নয়নে ও
অধরে সল্যম নব্রতার পরিবর্তে যেন কেমন একটা উগ্র ভাব
ছুটিয়া গরিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বাগে কথার কাণ দিবার
অবলর তখন কোথায়? পাচকনের সাধা-সাধনার যদি এক-
দিনের পর বেহস্তবাবু বিবাহ করিতে রাঙ্কী হইলেন, আর
এমন একটা স্রমত্রী, বহুতা বেয়েরও পাওয়া গেল,—তখন
ওস্তাদ শ্রীম্ম। পুত্র মাহুঘের চমিশ বছর বয়সে কি
গৃহলক্ষ্মীপুত্র হস্ত: থাকা গোবাহ, না ভাল মেথায়? কথার
বলে, ‘হস্তভাগ্যার খোঁড়া হয়ে, ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে’। আর
স্ত্রী না হইলে পুত্র মাহুঘের সময়ে বাওয়া পড়ার পদ্যাক
কত অগ্রবিধা। উপযুক্ত সেবা-বহু না পাইলে নরীর
টেকেই বা কেমন করিয়া?

বিবাহের পরই শান্তিকে সাদি-গৃহে আসিয়া গৃহিণীপদে
প্রতিষ্ঠিত হইতে হইল। রাণী কিন্তু যেহে ভাল নয়। পাড়ার
পাচকনে আসিয়া যখন বর-বধূকে বরণ করিয়া, ঘন-ঘন
শাঁখ বাঝাইয়া উলু দিতে লাগিল, তখন রাণী, “আমার মা
কোথায় সেল গো?” বলিয়া এমন কান্না ছুড়িয়া দিল যে,
পুহাতন দাস-দাসী সকলেই বুঝা গৃহকক্ষীর মত হয়ে হয়ে

করিতে লাগিল। শান্তির এসব ভাল লাগিবে কেন? রাশি আবার বড় একগুঁয়ে যেয়ে—সমবয়সী নব-বধূকে সে 'মা' বলিতে রাবী হইল না। মোটকথা তার চালচলন, বাপের কাছে আজুরে তার শান্তির চোখে মোটেই ভাল লাগিল না। গায়ে এক গা গহনা পরিয়া মেয়ে হেন যেমাকে কাটিয়া পড়িতেছে। যেয়েছেলের এসব ধরণ-ধাত্রি কি ভাল কথা? শান্তির বাপ-মার অবস্থা ভাল নয়,—এমন দাবী-দামী গহনা যে কখনও চোখেও বেধে নাই। হেমন্তবাবু ত্রীকে শ্রদ্ধাই অনেক গহনা গড়াইয়া দিলেন। শান্তি খুব শ্রদ্ধাই বহু-কন্য়ার জিনিস-পত্র বুঝিয়া লইল। শয়ন-গৃহের বড় আলমারিতে কি আছে জিজ্ঞাসা করায়, মোহিনী কহিল, “দিদির জাণা-কাপড়, গহনাপত্র সব আছে।”

“বটে? চাবী তার কাছে?”

“রাশির কাছে। ঐ মাকে-মাকে খোল, রোদ্দুরে দেয়, বেড়ে-সুড়ে রাখে।”

মনে-মনে ছ' বলিয়া শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, “ওর মার জিনিস বুড়ি ঐ নেবে?”

মোহিনী ব্যাপার বুঝিয়া কহিল “না, ও নেবে কেন? ওর স্বত্তরখা খুব বড়লোক, আর বড়বাবুও ওর বিরুদ্ধে অনেক জিনিস দিয়েছেন। অনুগ্রহন বেঁচে থাকুক, তার বউ এসে একদিন ভাগ্যমানী-দাতাড়ীর জিনিসপত্র পরবে। টুনির বিরুদ্ধে টুনিকেও কিছু বেওয়া হবে। রাশির বিরুদ্ধে দিদি নিজের হাতের মুক্তার ব্রেসলেট আর কাণের মুক্তার চুল জোড়! দিয়েছিলেন,—তখন টুনিরও কিছু পাওনা বটে।” শান্তির গা মাথা বিস্ম-বিস্ম করিতে লাগিল,—কণ ভেঁতৌ করিয়া উঠিল। এক মেরেকে কোন্ না তিন-চার হাজার টাকা র গয়নাপত্র বেওয়া হয়েচে—এখনও এক মেরের বিয়ে বাকী। এরাই যদি সব ছুরে দেয় তো আমার:পেটে বায়া জমাবে, তারা কি এসে ফ্যান্ চাইবে?

(৩)

“বাবা, মার কটো এ বর থেকে বউ সরিয়ে দিলেন কেন? তুমি বলো কি?” হেমন্তবাবু বগড়া-কাটি, বাগ্-বিতণ্ডা মোটেই পছন্দ করিতেন না। কাচাড়ী হইতে বাকী আসিয়া, সন্ধ্যের বেওয়ালে কটো না দেখিয়া শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কটোটা কি হইল?” সেখানা ছোট-দিক

বরে রেখে এসেছি।” বয়সে বড় বলিয়া মোহিনীকে শান্তি ছোট-দিকি বলিয়া ডাকিত,—সে শান্তিকে নুতন-দিকি বলিয়া সম্বোধন করিত।

শান্তির বরটা বেশ গভীর। অনিলার ঐ তৈলচিহ্ন-খানি আশ্চর্য বয়সের যাবৎ ঐখানে টাঙান ছিল। সমীপ, নির্ভীক ছই মুক্তিকে সন্ধ্যুে রাখিয়া এক সময়ে হেমন্তবাবু কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ছবির এটি অত্যধিক বর দেখিয়া অনিলা এক-এক সময় আসিয়া বলিত, “আমি মনে তোমার ছুঃখকষ্ট ঐ ছবি দেখেই ভুলিতে পারিবে।” অনিলার সে কথা বড় মিথ্যা হয় নাই,—গভীর নৃত্যর পর ছই বৎসর হেমন্তবাবু সভ্যই সেই এতিকৃতি দেখিয়া অনেকটা সাবনালাভ করিতেন। কটোতেও অনিলার মুখের সেই হাসিটুকু বেন স্মরণ বার্য বর্ণন করিতেছে। চোখের দৃষ্টি কি স্মরণ সরলজ্ঞাপূর্ণ! যাক সে কথা। গভীর জাব দেখিয়া হেমন্তবাবু মুকিলেন, কথা কহিলেই ব্যাপার অপ্রীতিকর ঠাড়াইবে; কাজেই,এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। তা'ছাড়া তিনি যখন বিজীর পত্রা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নৃত্য গভীর এটি সে সন্ধান আর দেখাইবার উপদ্রুত ন'ন। এখন কন্য়ার অস্থযোগ গুনিয়া কহিলেন, “তাতে আর যোয কি মা? সেও তো বর বটে,—সেই-খানে তুমি মালা দিও।” রাশির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে কহিল, “কিন্তু এইটেই তো আমার মায়ের বর,—এই বরেই আমার মার ছবি বরাবর ছিল।” হেমন্তবাবু উত্তর দিলেন না। কন্য়ার সহিত কথা-টাটকাটি করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিশাস ফেলিয়া ভাবিলেন, “হায় অনিলা, সভ্যই তো এ তোমারই বর; কিন্তু তুমি যে সাধ করে সব পায়ে তৈলে চলে সেহো,—আমার কি সোয?”

রাশি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “বাবা, বড় আলমারীর চাবী আমি স্বাকীমার কাছে রেখে রাখ। আমি আলমারীর সব জিনিস রদ্দুরে বিয়ে শুছিয়ে রেখে রাখি। আবার তো শিগ্গীর আসুব, তখন আলমারী খুলে খাড়া-ঝোড়া করব। এর মধ্যে ও-আলমারী খোলবার আর বরকার হবে না।”

হেমন্তবাবু কোন উত্তর দিলেন না, রাশির কথার মর্ম তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত মেহ করিতেন, কিন্তু তিনি এ কথা বেশ বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, রাণী ও শাস্তির মধ্যে যে খুঁজার মত একটা আবহাওয়া আদিয়া উঠিয়াছে, অতিরে উল্ল কাল মেঘের আকারে সমস্ত সংসার ছাইয়া ফেলিবে; এ অবস্থার রাণীর শ্বশুরবাড়ী ঘাওয়াই মঙ্গল। হায়, এ যে বেশী দিনের কথা নয়,—হেমন্তবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার রাণু মা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে, বাড়ী-ঘর অন্ধকার হয়ে পাবে, আমি কেনমন করে থাকব তখন? আমার ভাত খাবার সময় কে আমার পাতের কাছে বসে পান্যের হাওয়া কসুতে-কসুতে এটি খাও, ওটি খাও, বলে ছকুচ চালাবে?”

পিতা পুনরায় বিবাহ করিবার পর তাহারে প্রতি আর বেন তাঁহার আগেকার সে ভাব নাই, রাণী ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মাতৃ-বিরোধ-বেদনা দিগন্ত হইয়া বৃদ্ধি বাধিতেছিল। শাস্তি আশ্চর্য্যজনক আহারের সময় নিজেই উপস্থিত থাকে; স্নাতরাং, রাণী মন খুলিয়া বাপের সহিত কথা কহিতে পায় না। ক্রমে-ক্রমে সে পিতার আহারের সময় উপস্থিত থাকা বন্ধ করিয়া দিল,—শাস্তি সে স্থান পূজাঘাটার বসল করিল। হেমন্ত বাবু প্রথম-প্রথম একটু কিস্তি বোধ করিলেও, তার পর তাঁহারও অভ্যাস হইয়া গেল; এবং নববধূর হাতের পাখা নাড়িবার সময় চুড়িভঙ্গির মিঠা আওয়াজ তাঁহার কাণে ভালই লাগিতে লাগিল। খুব সন্তব তাঁহার আর সে কথাও মরণ হইল না, যখন তিনি অনিলাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি বাও, অস্ত কাল দেখে। আমার রাণু-মা থাকতে তোমার আর পাখা নাড়তে হবে না। এখন তোমার কেয়ার করে কে? কি বল রাণু?” রাণী বিষম-গর্বে হাসিয়া পিতার কথার সাথ বিদায়িল।

রাণী কতক্ষণ রান মুখে, শুদ্ধভাবে গাঁড়াইয়া রহিল। কতায় বিপর্যয় দেখিয়া হেমন্তবাবুও একটা অশ্রুতি বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এই সময়ে চকল-চরণে টুনি আদিয়া কহিল, “মিদি, শান্তিনী এ এসেছে। বোমা আস্তা পসুছে, তুই পসুবি তো শীগুণীর আয়। আমি পসুছি।” টুনি চলিয়া গেলে, রাণীও হাইতছে, এই সময় হেমন্ত বাবু কহিলেন, “রাণু মা, তুমি কেন শুধু বো না বলে, টুনির মতন বোমা বল না? এও তো তোমাদের—”

রাণী বেন চাবুক খাইয়া দিহিয়া গাঁড়াইল, দৃষ্টি কটে

কহিল, “বাবা, বউকে আমি মা কিছুতে বলতে পারবো না। মা বলতে গেলে, আমার মায়ের কথা মনে পড়ে—বুক কেটে দায়। আমার মা বেঁচে থাকলে কার সাধি এ ঘর-ঘোর আগুন বসত। মায়ের ছবি এ ঘর থেকে সরাবার কার ক্ষমতা হ’ত? আমি মা নেই বলেই না আমরা নিজের বাড়ীতে ভরে-ভরে রয়েছি।”

রাণী বরাবরই বাপ-মায়ের আদর্শিতা নিয়ে। তার অভিমান বড় বেশী, রাগিলে মুখ কোটেও বেশ।

চাকরদোহন বাবু দরজা ঠেসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। কথাগুলো তাঁহারও কাণে গিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, “ও কেপি মা, বলি রেগেছিস কেন? শোন শোন, শুনে যা বেট।” রাণী কি আর এক নও সে স্থানে গাঁড়ায়? সে থব-থব করিয়া চলিয়া গেল। হেমন্তবাবু মুখ কাল করিয়া শুশুতি ভাবে বসিয়া রহিলেন। : কথাগুলো রাণী, শাস্তি শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে আত এক পর্জ না হইয়া যায় না।

ছ-টার দিনের মধ্যেই রাণীকে শ্বশুরবাড়ী হাইতে হইল। হাইবার সময় বৃদ্ধা জননীর উদ্দেশে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া সে এমন করুণ হয়ে কাহা ছুড়িয়া দিল যে, অনুলা, টুনি, মায় আমলের ছোঁড়া চাকর ভীণ্ড পাক্ত সে কাহার যোগ দিল। মোহিনী অঙ্গ মুছিতে-মুছিতে কত প্রবোধ দিতে লাগিল,—শ্বশুরবাড়ী হাইবার সময় এ রকম কাহিলে অকলাণ হইবে, ইত্যাদি। প্যাসের ঘরে, হেমন্ত বাবুরও চক্ষু দিয়া বাধা না মানিয়া তপ্ত অঙ্গ বসিয়া পড়িল। অনবরক এই মড়া-কাহা শাস্তির হাড়-হাড়ে ছুঁচের মতন বিঁধিয়া দেহের রক্ত পর্য্যন্ত বেন বিধাইয়া তুলিল।

৩

চাকরদোহন বাবুর স্ত্রী মরলা হেমন্তবাবুর বিবাহের সময় উপস্থিত ছিল না, পিতাভায়ে প্রসব হইতে গিয়াছিল। অনিশায় সহিত তাহার সখি ছিল; স্নাতরাং হেমন্ত বাবুর বিবাহ-সংবাদে সে বোটেই খুশী হয় নাই। বরং—বৃদ্ধা বয়সে আবার ভীমরতি গ্রহিল কেন? সে মেয়ের সাধে মেয়ে, সোপার চাঁদ ছেলে, সবই বিয়ে গেছে, তবে কেন নিজের আবার বিয়ের সব চাপল? অনিলাকে যে দণ্ডে-ধণ্ডে চোখে ছাড়াই, সে সব বুঝি ভুয়া ভালবাসা..... ইত্যাদি মন্তব্যগুলি তাঁর ভাবের প্রকাশ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া সরলা হেমন্তবাবুর পরিবারে, চাকরবোহন বাবুকেই করেকটা চোখা-চোখা বাকাবাণে বিদ্ধ করিয়া নাকাল করিতে চেষ্টা করিল। তার পর উল্লেখ্যগ করিয়া অনিবার পদাতিব্রজকে দেখিতে গেল। শান্তি বাকচতুর্বা, প্রিয়ভাষিনী ছিল; সহজেই সে মিলাপাশে লোকের মন বশ করিতে পারিত। হুতরাং সরলার তাকে মন লাগিল না। ক্রমে চুইকনে একরকম বসিয়া গেল। পাশাপাশি বাড়ী; কাতোই ঘনিষ্ঠতা না হইয়া যায় কোথা? সেদিন সরলা কোলের খুঁজিতে লইয়া বেড়াইতে আসিয়া দেখিল, মোহিনী পূজা লাভ করিয়া তুলসী-মূলে প্রণাম করিতেছে। সরলা কহিল, “এ কি ছোটো বউ, এখানে তোমার বাওড়া হয় নি? বেলা যে চুটো বেগে গেছে!” মোহিনী হাসিয়া কহিল, “পেরস্ত-ঘরে কালের কি কম আছে বিদী? আল, নিরিম্বিহ রায়। দেব করে, ঠাকুরের ভোগের পায়ে ধৈর্য, সবাইকে বাইরে বাইরে তবে ক ভগ্নে বসবো।”

“কেন? তোমাদের ঠাকুর কোথায়? পেরস্তর রায়। সেই ত রাঁধে, তুমি ত কেবল ঠাকুর-ঘরের কাজ-কর্ম আর ভোগ রাঁধা নিজে থাকতে। এক অনুগার কৌৎসাহলাতেই তোমার অস্থির হতে হয়,—তা আরকাল এ আবার নতুন বিদী হ’লো কবে থেকে?”

“ঠাকুর যে বাড়ী গেছে।”

“তা নতুন বো বুঝি হৈসেলে ঢোক না? তবে যে শুদ্ধি নুহ, নতুন বোধের খুব রায়ের বশ বেরিয়েছে?” “আর সে কথা কি বলবে বিদী! বাবুয়া বুঝি বিয়ের সময় শুনে-ছিলেন, নতুন-দিবির হাতে রায়। খুব ভাল। একদিন সবাই খেতে চাইলেন। তা’ নতুন-দিবি কোণাড় করে পাঁচরকম রাঁধলে। কিন্তু সন্ধ্যার পর সে যে কিছু আরহত হ’ল। ডাক্তার এসে; বলল, যেন কিছুদিন আগুণ-ভাতের ত্রিদিবার না বেতে যেওয়া হয়। সে যে সর্ব্বনেশে হাত-পা ছোঁড়ো,—আমি ত বেধে ভরেই অস্থির।”

“তাহা” বলিয়া সরলা শান্তির ঘরে আসিল। শান্তি সরলাকে দেখিয়া কহিল, “এই যে বিদী এসেছে। আধাঘের কটো আর বাঁধিয়ে এসেছে। বেধ দেখি, কি রকম করেছে?”

শান্তি কহিল হইতে বানীকে বলিয়া-কহিয়া নিষ্কর ও

চণ্ডা সোপালী কাজ-করা ছেমে বাঁধাইয়া আনিবামা, যেখানে অনিবার কটো ছিল, সেইখানে টাঙাইয়া বিরাছে। সরলা দেখিয়া কহিল “হয়েছে বেশ; কিন্তু অনিবারেরও যে একখানা এই রকম বৃগল রূপের কটো ছিল, সেখানা বড় চমৎকার হয়েছিল। তখন হেমন্তবাবু আমান বলেন কি না।”

এই তো রক্তক হইয়া গেল। সুখ কাল করিয়া শান্তি কহিল, “সে কটো কোথায়? আমি তো কই দেখিনি!” “দেখনি? সে বেশ ছল পেলেটের ছবি—বড় আলমারীতে আছে যোগ হয়।” “আচ্ছা, আমি চাখি। ঢেরে আনিছি।”

রাষ্ট্রের বারবার নিবেদন সবেও শান্তির ছত্বে বোধিনী অমর করিতে পারিল না, চাখিবামা চাখি শান্তির হাতে গিল।

বাসু রে! আলমারী-তরা কত জিনিস, কত বিভিন্ন পাড়ের, বিভিন্ন রঙ্গের শাড়ী ও কাপা। ভাল-ভাল রেশমী শাড়ী, লরির শাড়ী, কাজকাঁচা করা শালের বোড়া,—রূপার এক সেট, হাতীর হাতের এক সেট খেলনা,—কি তার নক্সা, কি তার কাজকাঁচা! রূপার বড়-বড় বাটী, বেকারী, পানের ডিবা, মূলমান,—শান্তি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। আলমারীতে যে এত ভাল-ভাল জিনিস আছে, তাহা সে কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সরলা শান্তির বিষয়-বিষয় ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, “এ তো সব জামা কাপড়। অনিবার গায়ের পরনা বুঝি তুমি দেখ নি?” শান্তি মাথা নাড়িল মাত্র।

সরলা কহিল, “সে সব এক-একখানা পরনার ওজন কি, আর নক্সাই বা কি! সব ঢাকার গড়ন।”

একখানি পাতলা আচ্ছাদনীতে ঢাকা কটোখানি সরলা টানিয়া লইয়া কহিল, “এই সেই কটো।” কটো তুলাইবার কজিট সম্পূর্ণ নতুন। চোরের উপর হেমন্তবাবু বসিয়া আছেন; পাশে সুন্দরী অনিলা মৃগজিতা বেশে দাঁড়াইয়া। অনিবার পিঠ হাইয়া চুলের গোছা হেমন্তবাবুর কাঁবে ও হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। গলায় একছড়া মোটা মুলের গোড়ে। একছড়া সর মুলের মালা কপাল বেড়িয়া রহিয়াছে। হেমন্তবাবু একহাতে স্ত্রীর কটদেশে বেষ্টন করিয়া, আর একহাতে অনিবার একখানি হাত ধরিয়া চাখিয়াছে।

কি সোহাগ, কি আশ্রয়ের ভাব! অনিবার্য চকু ছুটিতে লজ্জা ও সন্তোষের চারা। ঠোট দুখনিতে ঈষৎ হাসির আভাস,—সমস্ত বেগে একটু মৃদুসড় ভাব। লজ্জার লালিনা যেন গাল দুটিকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। ফটোতে যে সব বর্ণ-বৈচিত্র্য ধরা না পড়িলেও ফটো দেখিবামাত্র বর্শকের এমনই মনে হয়।

শান্তির চোখ দুটা যেন স্নান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে ঠোট উন্টাইয়া কহিল, “কিন্তু কি বোঝাপনা বাপু! আমি ত সে-দিন লজ্জার ভাল করে ত্যাগেই পারছিলুম না। পরপুরুষের সাহায্যে এমন রক্তচর্চা করে গাড়িরে ফটো তোলালো,—সেই ছবি আবার পটভেদ দেখবে! কি যেনা মা!”

সরলা কহিল “পর-পুরুষ আবার কে? অনিবার্য এক বিধি বেশ ছবি তুলতে পারে। সে তার স্বামীর কাছে শিখেছিল,—তিনি একজন ফটোগ্রাফার কি না। সেই বিধিই মাঝে মাঝে বোন্দ-ব্রিগাডের ফটো তুলে দিচ্ছেলি। তা’ অনিলা এখনা বাইরে রাখেতো না। হেমন্তবাবুর আগে-আগে বেশ চুলের বাধন ছিল,—এদানী মাথার চুল উঠে গিয়ে গড়র মাঠে বেড়িয়ে পড়েছে।”

সরলার দামী যিনি আলিঙ্গা ভাঙিল, “মায়ের গল্প করতে বসলে হৃদ্য থাকে না। শ্রদ্ধা-বিধি যুগ থেকে উঠতেই যে কান্না জুড়েছে, বরকে এস বাছা।” সরলা চলিয়া গেল। শান্তি ফটো-খানা আবার হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। যেখিকে-যেখিকে তার দেখ মন আশা করিতে লাগিল। রূপ, রস, যৌবনের সব সস্তুই নিষাড়িয়া উপভোগ করিয়া, তাহার জন্ত শুধু উজ্জ্বিত পোলাটুকু বেশিয়া রাখিয়া গেছে,—সতীনগুণা এখন রাক্ষসীই বটে। সেই মাহুদ, সেই বেষ, কিন্তু সে কান্দি, সে শাবণা নাই। সেই প্রাণ, কিন্তু আত্ম রসমুক্ত, প্রয়োজ্ঞানহীন। এ কি বিড়ম্বনা। সে যেমন ঠকাইয়াছে, তাহার পোষ লইবার ত আর কোন উপায় নাই। নিজস্ব আক্রোশে শান্তির অন্তর্যাত্মা স্কন্দ হইয়া উঠিল। একবার অনিবার্য ফটোর দিকে চোরে, আর একবার নিকষের ফটোর দিকে চাহিয়া ভাবে, “ও ফটোখানাকে চোখে-মুখে হাসি-ভালবালা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে,—এতে তার নাম-গন্ধ নেই। তোলাতেই তো চার নি,—আমি হোর করে ধরে-বোঁধে তুলিয়েছি বই ত নয়। পরের জেনে ত

আর ভেতরের ভালবালা ছুটিয়ে তোলা যায় না,—সবই আমার পোড়া অন্তর।”

(৪)

কাছারী হইতে কিরিয়া হেমন্তবাবু চা খাইতে বসিলে, অনুলা ও মণি কাছে গিয়া বসিত। বাপের সঙ্গে গল্প করিত; চা, জলখাবারের অংশ হইতে প্রসাদও পাইত। ছেলেনেছোদের সঙ্গে লইয়া না; বাইলে হেমন্তবাবুর তৃপ্তি হইত না। এ অভ্যাগের জন্ত অনিবার্য কাছে তিনি অনেক সময় ভিরতুত হইতেন,—“এই ওয়া খেয়েছে, আবার খেতে মিষ্টি কেন? নিজে খাও না।”

হেমন্তবাবু বসিতেন, “তোমার নজর দেবার দরকার নেই। একটু-আধটু সুখে দিয়ে দিচ্ছি বই ত নয়। ওয়া আবার সঙ্গে খেতে ভালবাসে, জানই ত।”

শান্তি গৃহিণী-পদে অধিষ্ঠিতা হইবার পরও কিছুদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অনুসর্য ছিল। বুদ্ধিমতী বোঁধনী শান্তির বিবরণ আশঙ্ক্য করিয়া, হেমন্তবাবুর চা খাইবার সময়, টুনি ও অনুলাকে সাহায্যে আঙুলিয়া রাখিতেন। টুনি অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল, পিতার সহিত আর তাহার খাইবার বয়স নাই,—বেশেত, ছ-চারি বৎসর পরেই তাহাকেও দিমির ক্রার বশুত্বের খাইতে হইবে; যদিও সে বুঝিতে পারিল না, পিতার সহিত চা-জলখাবার খাওয়ার সহিত উহার সম্পর্ক কি? কিন্তু অনুলাও ত সে সব বোঝাই নাই। বাহা হউক, যোহিনী তাহাকেও নানা ছলে আঙুলিয়া রাখিত।

এখানে আলিঙ্গা শান্তিরও চা-পানের অভ্যাস গাঁড়াইয়া-ছিল। স্বামীর সহিত সেও বসিয়া চা খাইত; কানেই ছেলে-বেরে বটো আলিঙ্গা পড়িলে, হাসি গল্প কিছুই আর তেমন জমিত না। হস্তস্তাঃ মনটার মধ্যে ছাঁৎ-ছাঁৎ করিলেও, ইহানী হেমন্তবাবুও আর উত্তরের ডাকিতে পারিতেন না।

সেদিন উত্তরে গল্প করিতে-করিতে চারে চুপক মিডে-ছেন, অনুলা অকস্মাৎ কোথা হইতে বন্দন-মুক্ত মৃগশিক্তর ক্রায় ছুটিয়া আলিঙ্গা কহিল,—“আনি চা খাব বাবা! ছোট-মা ভারী হুঁই হয়েছে। আত্মকাল চা খেতে আসতে দেব না। বসে, তোর পেট গরম হয়েছে। সব মিথো কথা খাবো। তুমি পেটে হাত দিয়ে দেখ না, কত ঠাণ্ডা, একটুও গরম নেই।” “আর, খাবি আর” বলিয়া হেমন্তবাবু যেমন পেরালাটি

অমূল্যর মুখে দিতে গেলেন, দ্রুত বাসক তড়াতড়ি অগ্রদর হইয়া আসিতে, ঠেলা গাড়িয়া শান্তির হাত হইতে গরম চারের পেছালা টপ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। গরম চা শান্তির হাতে পড়ার “উঃ বাগ্গে, পুড়ে মলাম” বলিয়া শান্তি আর্ন্তনাস করিয়া উঠিল। অমূল্য ত হতভয়। হেমন্তবাবু দ্রুত হইয়া অশান্ত বাগকের গালে এক চড় বসাইয়া দিবামাত্র, সে বিগুণ আর্ন্তনাস করিতে-করিতে ছোটদার কাছে ছুটিল। শান্তি গিয়া বিছানার ওইয়া পড়িল। হেমন্তবাবু শান্তির মস্ত খানিকটা ডেসলীন লইয়া শান্তির হাতে লাগাইয়া দিতে গেলেন। শান্তি হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল, “আর আত্তিতে কাজ নেই, আমি ত সকলেরই আপন!” কথাটার অর্থ হেমন্তবাবু বুঝিতে পারিলেন না; তবে এইটুকু মাত্র বুঝিলেন, বাস-বিসম্বাদগুণকে যতই তিনি অগ্ৰহণ করেন, তাহারা তেমনি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার মস্ত সুযোগ খুঁজিয়া কিরিতেছে।

হেমন্তবাবু কহিলেন, “আলাটা ঠাণ্ডা হয়ে বাবে,—একটু লাগিয়ে দিই,—লস্ট্রাটি, অমন কোরো না। ইস, বড্ড ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে যে!”

শান্তি আর প্রতিবাদ করিল না। হেমন্তবাবু ডেসলীন লাগাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, “আলমারী পছন্দ হয়েছে শান্তি?”

“না হ’লে আর উপায় কি?” হেমন্তবাবু আদর করিয়া শান্তির চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “তোমার পছন্দ হয়েছে তুমি মনটা আমার কত পুখী হয় বল বেঁচি। তুমি সেদিন আলমারী চেয়ে পর্দাও আমার এ কথাটি মনে ছিল, কাল বড় সাহেব আলমারী বেছে নেনই, আমি পাঁচোকা বেশি মিয়ে গুটা কিনে ফেললাম। অনেকই কেন্দ্‌বার মস্ত কুঁকেছিল।” শান্তি স্বাধীন অস্থিরতার এতখানি প্রমাণ অগ্রাহ করিয়া, মুখ কিরাইয়া কহিল—“তুমি ত আর আমার ভালবাদ না?” এ কি কঠিন অভিযোগ! হেমন্তবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার শরীরের শিরা-উপশিরাই আত্ম আবার বোঝনের চকল শোণিতধারা সংবেগে বহিল। অভিমানিনীকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, “তুমি এত নিষ্ঠুর কেন শান্তি? কেন আমার মনে বাধা দাও? বল, আমার ভালবাসার কি প্রমাণ পেলো তুমি সঙ্কট হও?” এই বর,

আর একজন অভিমানিনীকে বুকে টানিয়া, তিনি ঠিক এই কথাগুলিই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কথাগুলি বলিয়াই তাঁহার সে অতীত স্মৃতি মনে পড়িল। এ কিন্তু কই তাঁহার মত চোখে জল, মুখে হাসি লইয়া, স্বামীর কণ্ঠ বেটন করিয়া, দুর্ভাগ্যবী প্রভাতে যেমন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসী হইয়া গ্রবি-কিরণ-প্রাণনার আকাশের দিকে তাকায়, সেই রকম করিয়া নিম্নের পুষ্পপেলব অধরখানি চুবনের আশায় বাড়াইয়া দিল না,—বরং উহার পরিবর্তে তাহার চুই গণ্ড বাহিয়া ধারা নামিল। হুমকী, দুবতী, মানিনী প্রেমসীমায় নখনে তপ্ত অশ্রুধারা বহিতেছে,—এ দৃষ্টে বড়-বড় বীর-পুরুষের হৃৎকম্প হয়,—এ ত সামান্ত হেমন্তবাবু!

ভাবুক পাঠকগণ, তাঁহার মনের অবস্থা আপনারা কল্পনা করিয়া লউন। আশ্রয় এ বিষয়ে অক্ষম। কিছুকাল পরে হেমন্তবাবু শান্তির চক্কু মুড়াইয়া দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, “শান্তি! বড় আবার সামান্য লাভ করবার জন্যে তোমার বিয়ে করেছি। তুমি আমার বড় আদরের, বড় ভালবাসার জিনিস। আমার ভালবাসার যদি কিছু ক্রটি তুমি পেয়ে থাক, আমার তা বুঝিয়ে দাও,—কিন্তু এমন করে আমার প্রাণে বাধা দিও না। আমি বড় হতভাগা শান্তি! তুমি ছেলে-মাছ, তুমি জান না,—তোমার মৃগদৃষ্টি আমার মস্তে আমি কতখানি বিরোধি, আর কত দিতে পারি।” কথাগুলো যেন বেহুয়া বাজিল। কেহ সমস্তর থাকিলে বুঝিতে পারিতেন, ইহা ত ঠিক দুবতীর প্রতি বুকের প্রেমোচ্ছাস নয়! শান্তি কিন্তু মনে-মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল—“তোমার ঘেরে বড় আলমারীর চাবী বিবাস করে আমার কাছে রেখে দাও নি; কেন, আমি কি বাড়ীর কেউ নই? আমি কি সেগুলো খেয়ে ফেলতাম? তোমার সে স্বীয় কত গরম, কত দাবী-দাবী জিনিস আছে, আমার ত এক বিন চোখে দেখতে দাও না,—কেন? আমি কি সেগুলো বাণের বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম? আমি সব কিছু বেগছি, মনে রাখছি, মুখ ফুটে কিছু বলি না তাই। অস্ত্র ঘেরে হলে ইত্যাদি ইত্যাদি—”

হৃৎকণ্ঠে সব বিপর্যয় হইয়া গেল। হেমন্তবাবু নিম্নের চমকাবেগে সংকট করিয়া বীর কণ্ঠে কহিলেন, “শান্তি, বড় আলমারীর চাবীতে তোমার আবশ্যক কি? ওতে যে-সব

যেদিকে ঘিরেছিলেন। সে বড়লোকের বাড়ীর একটানা জ্ঞানব্রহ্মের মেয়ে ছিল,—অনেক দামী জিনিস সে প্রায়ই উপহার পেতো। সেগুলোতে আমার কোন দামী গাওয়া নেই। তা ছাড়া, ভাতকে আদি বা কিছু একদিন ঘিরেছিলাম, সে সকল বস্তু ধনে আমারও আর কোন অধিকার নেই,—তার ছেলে-মেয়েরাই এখন পে-সব পাবে। জোয়ারও ত কোন জ্ঞান নেই, শান্তি! গুহনা, কাপড়, বসন বা মরকার, আমিই বিচি, বোবোও। আলমারী চাইবামাত্র এনে দিলুম। আর কি চাই বল, শুধু জোয়ার হাসিমুখ—” আর হাসিমুখ! বর্ষার ঘন কানবিনী শান্তির মুখ অন্ধকার করিয়া জুড়িয়া বসিল। শান্তি বোকা মেয়ে নয়। প্যানপ্যান করিয়া না কাঁদিয়া, সে উঠিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, “বস্তু ধনে-বসি অধিকার না থাকে, তা’হলে মনটাও ত একদিন তাকেই ঘিরেছিল,—এখন আবার চড় করে’ সেই ভালবাসা কি কোরে আমার দিতে এসেছে? ও কাঁজরা ফুটো গ্রাণ নিয়ে আমার সঙ্গে তারবার চলে না বলছি।” শান্তি সেদিন উপব্রাহ্মণ-প্রেম পড়িয়াছে, ‘গ্রাণ নিবিণে’ পাতাখানা সে প্রায় কর্তৃক করিয়া ফেলিয়াছে। কথাগুলো বেশ সরল হইলেও, তুমিহাই ত হেমন্তবাবুর মাঝার ভিতর তুমুল গোলাঘোণ বাধিয়া গেল। শান্তি ত আর বড় ভবর কথাই বলিয়া বসিয়াছে,—এটা ত নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মতন কথা নয়! কিন্তু কোন বৃত্তি ও তর্কের দ্বারা বাসিকাকে এখন বুঝান যায় যে, ‘ওগো, ঋতু ও চেতন ছুটা জিনিসের উপর স্বয়ং বা দাবী সন্ধানভাবে চলিতে পারে না; চেতন পরিবর্তনশীল, ঋতুর রূপান্তর নাই।’ তা ছাড়া, শান্তি কি বৃত্তিতে চাহিবে, যে, হেমন্তবাবু তাহারই মধ্য দিয়া সেই অনিলাকেই ভালবাসিতে চাহিতেছেন,—কাজকে হারাইয়া শান্তির মধ্যে তিনি অনিলাকে পাইতে চাহেন? (এগুলি হেমন্তর নিম্ন বৃত্তি!) বসন স্বাদি-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রেমভিমানহৃৎক স্ত্রীর অভিনয়-লীলা চলিতেছিল, সেই সময় পাশের ঘরে, পিতার চড় খাইতে অনভ্যস্ত অমূল্য ছোট্ট-মার কোলে মুখ ভাঁজিয়া, হুসিয়া-হুসিয়া এমন অভিমানের কান্না কাঁদিতেছিল যে, মোহিনীরও ছই চকু হইতে বড়-বড় কঁোটা, বাধা না মানিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

চারুকোহনবাবুর বড় ছেলে খগেন্দ্র দ্বিতীয় সময়ক। তার বছরের বোন সুধা বসন মধ্য উৎসাহের সহিত তাহাকে বলিল—“দাদা, আর তুমি কিছু বেন আত্মসের মতন খেয়ে বোবো না, আর তাইসেঁটা দোবো” খগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “সকাল না হতে-হতেই আত্মসের মতন কে খেতে বসে,—তুই, না আমি? তুই আর কি খেয়েছিলি বল ত?” সুধা সববেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “আর আমি উপস্থিত—কিছু খাই নি,—চুখ না, মুচি না, শুধু একটা ছেশপ খেয়েছি।” খগেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “খুব উপস্থিত করিছিনু ত! আমিও তোমার মতন উপস্থিত করব, কি বল?” সুধা ব্যস্তি কহিল, “না, না, যা বললে আমি যে ছেলেমাছু?” খগেন্দ্র বলিল, “অমূল্যকে নেনতর করেছিনু ত?” সুধা খেচোঁর অতশত জানা ছিল না। সে তৎক্ষণাত্ ছুটিয়া অমূল্যের বাড়ী গিয়া, অমূল্যকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে, অমূল্যের পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল,—অবস্ত্র অমূল্যকেও বাস দিল না। কিছুক্ষণ পরে হেমন্তবাবু অমূল্যর হাত ধরিয়া বন্ধুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখা দিলেন। চারুকোহনবাবু বন্ধুকে দেখিয়া চমকা খুসিয়া, কঁোচা খুঁটে ভাল করিয়া মুছিয়া আবার চোখে দিলেন। হেমন্তবাবু মুখ হাসিয়া কহিলেন, “অবাক হয়ে সেখুঁ কি? চিন্তে পারছ না?”

“চিন্তে পারছি বৈ কি। তবে মনটা বড় খুঁৎখুঁতে,—চোখকে ধক ঘিরে বলে, কি দেখতে কি দেখিছিনু,—ভাল কোরে নিরীক্ষ করে দেখ।” এ পরিহাস হেমন্তবাবুকে মিঠে-কড়া রকমের আঘাত করিল। যে চারুকোহনবাবুর সঙ্গ তিনি শৈশবে, বোবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, ছাত্রজীবনে, কর্তৃক্সে সর্বদিন সন্ধান ভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছেন,—গত কয় মাস হইতে সে একটানা গতির রোধ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর শান্তির একা থাকিতে ভয় করে বসিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া তিনি আর চারুকোহনবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহাদের প্রাত্যহিক সাক্ষা-সন্ধ্যার যোগ দিতে পারেন না। উভয়ের বাড়ী খুব কাছাকাছি হইলেও, চিরকাল চারুকোহনবাবুর বাড়ীতেই বন্ধুগণ সমবেত হন; তাল, দাখা প্রভৃতি খেলা-গুলিও চলিতে থাকে। হেমন্তবাবু পূর্বে কখনও এ সভায় অঙ্গপত্রিত হইতেন না। স্ত্রত্যন্ত তাঁহার অঙ্গপত্রিত সকলের

চমকপ্রব হইলেন, উহার কারণ বুঝিয়া কেহ আর তাঁহাকে ডাকিতে বাস্তব হন নাই। বরং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যে আলোচনাদ্রষ্টৃ সভার চলিত, তাহাতে খোদ-গম্ন প্রমিত ভাণ। কোন-কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি পরীতত্ব, প্রেমভক্তের মীমাংসার সভা মনগুল করিয়া কুণিতেন,—শ্রোতারা উপভোগ করিয়া সুখী হইত। হেমন্তবাহুক অপ্রতিভ দেখিয়া চাক্ষোহনবাবু কহিলেন, “তার পর? নতুন খবর কিছু আছে? নতুন গৃহিণীর গৃহস্থালী চলছে কেমন? শাদনটা নতুনবস্ত্র কিছু খিটে-কড়া?”

“জাব তাই,—তোমরাই পাচজন হজুক করে ধরে বেঁধে এ গ্রহ ঘটালে। এ যেন কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না। বুড়া বয়েসে কত আর একটা ছেঁটে বেয়ের ঘন যোগাব? যা সব শেখা ছিল, সে ত কোন্ দিন ভুলে যবে আছি।”

“বেশ ত, নতুন গিন্নীর পান্নার পড়ে আবার সেগুলো নতুন করে বুথব কর, তাতে আর ভাবনা কি? তোর ত দেখছি সামনের মাথার আবার চুল গম্বয়ে উঠছে। গিন্নীর হাতের শুণ আছে বলতে হবে। সে গুলুগুলায় পাক ধরেছিল, সেগুলোও প্রায় কাল হয়ে আসছে? নবীনায় সংঘর্ষে যৌবন ফিরে পাচ্ছ দেখছি। আনাসের তাই অদ্ভুত মন্ম, সামনের দিকেই পা এগিয়ে চলেছে, পিছন দিকে ফেরবার সাধা কি?” হেমন্তবাবু সলজ্জ ভাবে কহিলেন, “জাব তাই, শাস্তি বড় ছেলেমান্বী করে। আন ত, কেনন একঝিমে মেয়ে! আমারও কপালের ভোগ ছিল,—নইলে এ বয়েসে কি আর সাজপোষা পোষার?”

চাক্ষোহনবাবু উৎসাহের সহিত কহিলেন, “তা বলতে মোব কি,—এই বেরেবের জালাই ত আনাসের অকালে বাড়িকা ঘটে! একটু আন্তে-আন্তেই বলি,—ওঁদের আবার আড়িপাতা। শুণদ্রষ্টৃও আছে,—জানালায় আড়াল থেকে গুলুতে পেসে ছর ত ঈট ছুঁড়ে মাথার বাহুব,—বছর না ক্ষিত্তে-বিস্তে একটা করে ছেলে, নয় ত মেয়ে আন্দুলানী করবে। বার বছর না হতেই দাঁও সেই মেয়ের বিয়ে! তার পর চলি না পেরুতেই নাতি-নাতনীরা ঠাকুদা সাম! সেদিন তাই, তাড়াতাড়ি বেড়াতে বাজি, আলনা থেকে একটা পান্নাবী টোনে গারে দিতে, গিন্নী কোথেকে এসে চান গির কেড়ে নিয়ে বসলে “সেখতে পাচ্ছ না, এটা

চুড়িয়ার, তোমার সেই আদেশকার পান্নাবী! ছেলের সান্দনে এটা পড়বে কোন্ লজ্জার?”

তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে খগনকে ঘোঁটা দিতে আসিয়াছিল, পিতার গলার সাদা পাইরা, ছুটিয়া চাক্ষোহনবাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কাপে-কাপে কহিল, “বাবা ত এসেছে, মোঠামণি, সেই কথাটা বল এইবার।” বলিয়াই তিনি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে সে বন্ধন-তখন পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমূল্য ও রাবীর বিরুদ্ধে কত কি গোপনীয় কথা কিস্কাস করিয়া বলিত। কিন্তু আজকাল আর সে বাবার কাছে ঘেঁসে না। যেখিতে-যেখিতে জারি মাস হইল রাণী শতরবাড়ী গিন্নাছে,—তিনি ত অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সে পিতার কাছে বিধিকে আনিবার প্রস্তাব করিতে সাহস না পাইয়া, সরলা ও চাক্ষোহনবাবুক তিনমস্তা ভাগসা করিতেছে। সরলা বলিয়াছিল, “তুই ভোর বাবাকে বল না গিরে।” তিনি উত্তর দিয়াছিল, “নতুন-মা রয়েছে যে!” “তা থাক্বেই বা, তোকে কি ধরে ধরে নেবে?” “আমার লজ্জা করে।”

এর আর উত্তর নাই। লজ্জা যে কেন করে, তা সে নিজেই বুঝিতে পারে না,—তা অপরকে কি কৈফিয়ৎ দিবে? চাক্ষোহনবাবু ইনি সনির্ভর অমুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, হেমন্তবাবুর সহিত দেখা হইলেই রাণীকে আনিবার কথা বলিবেন; কিন্তু সে অমুরোধ প্রকৃত-পক্ষে তিনি রক্ষা করেন নাই। এখন তিনি পিতার সামনেই বহন আর্জি পেশ করিল, তখন আর উহা মূলভূমি রাখা চলে না। অপরন্তা তিনি কহিলেন, “ওকে, রাণীকে এইবার আন। তিনি ত আজ কদিন ধরে যে ভাগসা লাগিয়েছে,—আর সেও ত এই প্রথম গেছে, একবার আনুক। আবার দু-এক মাস রেখে পাঠিয়ে দিও। তার পিন্-খাণ্ডীটি গুলুতে পাই, সাক্ষাৎ রুত্নাবী,—যেহেঁটা কেনন আছে কে জানে! তবু শতর বড় ভালমাস্তব।”

হেমন্তবাবুর মনটা তার হইয়া উঠিল। তিনি কি এমন শুকতর অপরাধ করিয়াছেন যে, ছেলে-মেয়েগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে পর ভাবিতে শুরু করিয়াছে। মেয়ের রক্ত মল করিয়া বাহাদিগকে মাহুব করিয়াছেন, তাহাদের এই বাবহার! হায় রে সংসার! তিনি কি বাবাকে ভাগসা করিতে পারিত না? ষোঁটা কি তার এত আপনার?

আর রাণী, সেও ত কই আসিবার নাম করে না! আগে-আগে দুখানা চিঠি লিখিয়াছিল বটে। একখানার উত্তর বুঝি সেওরা হয় নাই,—অমনি ঘেঁরে অভিমান করিয়া চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। পুঙ্খার পর বিয়হার একখানি প্রশ্নানী পত্র লিখিয়াছে মাত্র। তাঁর যে কত কাজ, কত বিকের কত ভাবনা,—সে ত বোঝে না,—যেহেঁরা এমনি স্বার্থপর হয় বটে। চাকরমোহনবাবুও যে ঠাট্টাভণি করিলেন, উহার মধ্যেও তো খোঁচা রহিয়াছে। কেন বাপু, বত দোষ কি সব হেমন্তবাবুরই? সবাইই মনে ঐ এক কথা,—যদি আর ঘরের গিন্নী বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সংসারের সব্বা অস্তরূপ দেখা বাইত। আরে বাপু, সে ত ভালই হইত। সেই বা এই অগমরে, তার সাক্ষ্যে বরকরা কেলিয়া, তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া, সংসারের বিচিবিচিতে হাড়েনাড়ে জলিয়া-পুড়িয়া মতিবার জন্ত রাখিয়া নিজে পলাইয়া গেল কেন? তা হইলে এ বিপর্যয় ঘটিত কি জন্ত,—একটা বালিকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার পক্ষে প্রভিষ্ট করিতে হইবেই বা কেন? শাস্তির কি এখন সংসারের সাত-সতের হাঙ্গামা পোহাইবার বরন? সে তো প্রৌঢ়ের স্ত্রী না হইয়া সঙ্কেই মুকতিসম্পন্ন কোন শিক্ষিত যুবকের প্রেমসী হইতে পারিত! তাহার এ নব-যৌবনে কত সাধ, কত আঙ্কাদে, কত বাগনা,—সেগুলো কি অগমরে সংসারের পাঁচ কড়াটের তত্ত নিবাহে ঝগড়িয়া বাইবার জন্ত তপথান ঘটি করিয়াছেন?

হেমন্তবাবুর মনের মধ্যে অনেক কথার উদয় হইতে লাগিল। এমন কি, যে বন্ধুকে তিনি চিরজীবন অন্তরঙ্গ ও শুভামুখারী জ্ঞানে বিখ্যাত করিয়া আসিতেছেন, আজ প্রবেশ বুঝিয়া তিনিও বিব্রোহী হইয়াছেন—এই ভাবিয়া তাঁহার মন ভিত্ত হইয়া উঠিল।

চাকরমোহনবাবু বন্ধুর সুখের অগ্রগর ভাব দেখিয়া, বাপারটা কতক অস্থান করিয়া লইলেন। অন্যদের দিকের দরজার সুখ বাড়াইয়া করিলেন, “ও হিনি, তোদের গিন্নীকে বন্দু না জল-খাবার দিতে,—ভরলোক কন্দু থেকে এসে তখন থেকে বসে রয়েছে!” তার পর বন্ধুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া করিলেন, “ওলি, ষাও ভেঁজে বসে রইলে যে? কি হুকথা ঠাট্টা করলু, অমনি বুঝি রাগ হল? তুলের ছেসোমন্টীটা আজও যায়নি দেখছি। আমাকে না

বিগগেসু করে ত কোন দিন কোন কাজ কর না,— তাতেই রাণীকে এইবার আনতে বললাম। অগ্রহারণ মাসের প্রথমে তাকে আনলেই হবে। এখন চল, দুখার নেমস্তরটা খাবে।”

হেমন্তবাবুর মনের মেঘ কাটিয়া গেল। সত্যই ত, আর পৃথগ চাকরমোহনবাবুর পরামর্শ না লইয়া কোন কিছু কাজই তিনি করেন না। স্ততরাং ছেসোমোয়ও তাঁহারই বিকে একটু বেশী জুঁঝিয়া থাকে,—তাঁহাতে পোহই বা কি?

(৬)

অগ্রহারণ মাসে নব্বারের দিন সরলা হেমন্তবাবুকে সপরিবারে বাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছে।—হেমন্তবাবু চাকরমোহনবাবুর সহিত আহার করিয়া কাছারী গিয়াছেন। শান্তি রায়ারঘরের মালাদে বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে। বোহিনী বখালোয়া কালকর্মে সরলাকে সাহায্য করিতেছে। রাণীও আসিয়াছে,—সে বাহিরের ঘরে বসিয়া টুনির সহিত ঘুটিং খেলা শুরু করিয়াছে। শওরবাড়ী হইতে আসিয়াই সে প্রবেশে যখন কাকীমার কাছে আলমারীর চাবির খোঁজ করিয়া ডানিল, শান্তি উল্লা চাহিয়া লইয়াছে,—তখন ৮পু করিয়া তাহার মাথার ভিতর আঙণ জলিয়া উঠিল। কিন্তু এই কয় মাসেই তাহার স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সে নিজেকে সামণাইয়া লইল। পতদিন শান্ত ডাবে গিয়া শান্তির নিকট হইতে চাবির গোছা চাটিল; শান্তি তৎক্ষণাৎ উল্লা কেলিয়া দিল। রাণী যখন চাবিটি কুড়াইয়া লইতেছে, তখন সে শুধু বলিল, কাজ হয়ে গেলে আবার আমার কিরিয়ে দিও। রাণীর সমস্ত মন বিব্রোহী হইয়া কি একটা স্বভাবের উত্তর দিতে বাইতছিল। কিন্তু তাহার মনে গড়িল, স্বামী ক্ষিতীশ বার-বার করিয়া তাহাকে অস্থতোদ করিয়াছে, তাহাকে মোটে দুই মাসের জন্ত বাপের বাড়ী পাঠান হইতেছে,—এই অল্প সময়ের জন্ত সেখানে গিয়া সে যেন বিমাতার সহিত কোন কিছু খুঁটিনাটি লইয়া কগড়া-কাঁচা না খাওয়া। তাহা হইলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে। বাপের ঘর তাহার চিরদিনের ঘর নয়। আর হা যখন নাই, তখন বিমাতাই এখন সে গৃহের সর্বময়ী কর্তা। স্ততরাং তাহার কালকর্মে বা কথার প্রতিবাদ করিয়া সংসারে অশান্তি লম্বান কিছুতেই উচিত নয়। সে এখন এত বড়

বৃহৎ বাড়ী ও সংসারের লক্ষ্য ও গৃহিণী (বহিঃ পিসিমার সেকিও প্রতাপে স্বয়ং গৃহকর্তারও প্রভাব নিশ্চিত)। তাহার কি আর ছেলেরাহী ভাল দেখার? কিত্তীনের উপদেশ যে অনেকটা কাছে লাগিয়াছিল, তাহা হাবীকে হায়ারা ভাল রকম জানে, তাহায়া বেশ বৃত্তিতে পারিবে। কিন্তু তবু তার মনের আশ্রয় সম্পূর্ণ রূপে নিভিল না। সে কিরিয়া আনিয়া গৃহস্থালীর সকল রকম পরিবর্তন দেখিয়া অবাক্ হইল। শান্তির আধিপত্য চারিদিকে স্বন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আগেকার ঘর সামান্য হইতে পান সান্না, আহার প্রস্তুত, দাস-দাসীর কাজকর্ম, গোয়াল-ঘরের বিধিবাধ্য—সবতেই কিছু-কিছু পরিবর্তন করিয়া, যেন নূতন হাতের ছাপ দেওয়া হইয়াছে।

ঠাকুর সেই যে বাড়ী গিয়াছে, আর আসে নাই। রাত্রার তার মোহিনীর উপর। যে হুঁদুহী তির অবধাতার ভক্ত অনিলা তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছিল, সে এখন শান্তির ধাম তির পদে বাহান হইয়াছে। অমূল্য বড় হইয়াছে,— তাহার ভক্ত একটা স্বতন্ত্র চাকরের অনাবরক্ততা বৃত্তিরা, ভীষু গরু চরাইবার তার পাইয়াছে,—বৈকালে অনুলাকে লইয়া বেড়াইবে। তাঁড়ারের চাষি আর মোহিনীর হাতে নাই। শান্তি নিজেই সব জিনিস বলা সময়ে বাহির করিয়া দেয়। বৈকালে ছলখাবার, স্নেহপ, বসগোলা, নিমকি ইত্যাদি শান্তি নিজের হাতেই প্রস্তুত করে,—যে হেতু শান্তির হাতের খাবার খাইয়া যেমন বাবু অত্যন্ত প্রশংসা করেন; এবং মাঝে-মাঝে বহুদূরদেশে মিষ্ট মুখ করাইয়া সার্টিকিট পাওয়া যায়। অনুলা ও টুনির যখন-তখন ছোট-মার কাছ হইতে বাহানা করিয়া সন্দেশ আদার করার পথ একবারে বন্ধ। মোহিনী কিন্তু এজন্য রাত্রাঘরে বসিয়া এক-এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের চারিদিকে সে নিজের ভক্ত যে বাধান তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে, এখন ত আর তাহা হইতে মুক্তি পাইবার উপার নাই! আহা, প্রাপ্ততা যেন থাকে-থাকে হাঁপাইয়া উঠে।

রাণী এবার নিজের মনকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল যে, সত্যই সে আর কোন কিছুতে চোখ-কাপ দিবে না,—ছোট তাই-বোন ছটিকে কাছে পাইয়া সেহমহী কাকীয়ার মেহ-ঘরে সে এক রকম বেশ থাকিবে। যে বাড়ীতে সে দিনের পর দিন ঘরিয়া এত বড়টি হইয়াছে, যে বাড়ীতে তার স্বর্গীয়া জননীর গায়ে বাক্স, চুলের গুচ্ছ, অমৃত-মাখা

নিঃশ্বাস এখনো নিশিরা আছে,—আর সেই হুহুৎ তৈল-চিড়ে সেই যে করুণাঘরী চকু ছটির প্রশান্ত দৃষ্টি, বাহা হইতে আশীর্ষাদের পবিত্র ধারা প্রভাতের আলোকধারায়ই মতন প্রাণে নব উদ্দীপনা লাগাইয়া তোলে, সেই বাড়ীর প্রত্যেক আস্বাদবর্ণনে তাঁরই স্পর্শ লাগিয়া আছে;—হুতরাং এ সকলের মধ্যে থাকিরা সে সেই বেহমহীর সান্নিধ্য অমৃতত্ব করিয়া ভুঞ্জি পাইবে। কিন্তু তবু—তবু রাণীর মন বিরোধী হইয়া উঠিল। ঘর-সংসারের আমূল পরিবর্তন, বিশেষ করিয়া পিতার অন্ত ভাব তাহাকে বড় বেশী বাধিল। আগে পিতা ও তাহাদের মধ্যে যেন কোন কিছু ব্যবধান ছিল না। কিন্তু এখন এই যে একটা আড়াল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাকে যেন কিছুতেই সে অন্তরের সহিত স্বীকার করিতে পারিল না।

নব-বিবাহিতা রাণী যখন শব্দভাড়াতে এক সপ্তাহ কাটাঁইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন যেমত বাবু রাণীর শব্দর বাড়ীর কত খুঁচনাটি খবর জিজ্ঞাসা করিতেন,— পিসিমার গৃহস্থালীর সজ্জা আইনের কথা, প্রিয় বাবুর মাখার কতগুলি চুল পাশিয়াছে,—মাছের মুড়া চিবাঁইতে পানেন কি না—সব খবর তিনি লইতেন। এবারে ‘রাণু মা তুমি ছিলে?’ ছাড়া তার এক কথনই শব্দর বাড়ী বাগনের কাহিনী একবারও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। অথচ সেবারের প্রয়োজনে বিরক্ত হইয়া অনিলা দমক দিরাছিল,— ‘তোমাদের খবর সেও-না-ওগা আর ফুরলো না।’ অত যদি জানতে সাধ, তা হ’লে এবারে যেহের সঙ্গে তুমিও যেহের শব্দর বাড়ী যেয়ো,—যেহের পিসুখাণ্ডীর সঙ্গে আসাপ করে এসো। তবে একটা কথলর কোট পায়ে দিবে যেহো।’

এক-একবার রাণীর চোখ কাটাঁয়া হল আসিত,—তাহা-যের না ঘিঁই বা গেল, বাবা কেন তাহাদের রহিলেন না? তিনি কেন এমন করিয়া দুহের চলিয়া গেলেন? তার পর রাণী বেশী ভাগ সময় সরলার বাড়ীতেই কাটাঁইতে লাগিল। প্রথম-প্রথম মনে বড় কষ্ট হইলেও, হুঁচার দিনে কতক গা-সহা হইয়া গেল। পিতার পরিবর্তে জ্যেষ্ঠমশাই তার শব্দর-বাড়ীর সমস্ত সাংসারিক খবর লইয়া, তাহাতে রঙ মিশ্রা এমন সব গর করিতেন, যাঁহাতে সকলেই বেশ কৌতুক অমৃতত্ব করিত। টুনিও বিবাহের যোগা হইয়া উঠিতেছে; প্রস্তুত

ভাবী শতাব্দী সন্ধ্যাে তাহারও কিছু-কিছু কালনিক জ্ঞান সঞ্চার হইত।

রাশি ও টুনী যখন ব্যস্তভাবে দুই-ও খেলার নিমুক্ত, অধা বেগানে আশল না পাইয়া, টুল টানিয়া লইয়া উপর উপরে পাড়াইয়া বেঘন আলমারীর মাথা হইতে পুতুল নামাইতে যাইবে, সরলা সেখানে পাইয়া ধমক দিল,—“কাঁচের পেলাস আছে শুধানে, খবরদার, হাত দিস্‌নি—এখনি গড়ে ভেঙ্গে ছুঁ হয়ে যাবে” বলিতে-বলিতেই অগ্রহ হাত লাগিয়া তিনটি কাঁচের পেলাস ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সরলা আশিয়া থা-কতক দ্রুতগতি করিয়া অগ্রহ পিঠে চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, “গা ভর করলুম তাই! আপোদগলোর আশায় যেন আঁহির। হাড়-খাল কালি করে খেলে!” হিমি কি ছুটিয়া আশিয়া টাংকার পরায়ণা অগ্রহ হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাইবার সময় সরলার উদ্দেশে অজ্ঞান কটুকথা বর্ণন করিতে ছাড়িল না। সরলা এ সব শুনিতে অভ্যস্ত,—সে ও সব কাণে তুলিল না।

মোহিনী কহিল, “লতি দিদি, তুমি যুধাকে যে মারটা মারলে,—পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছে। মারলে কি আর কাঁচের পেলাস ফিরে পাবে?” সরলা কহিল, “ওরা আমার ঐ রকম জ্বালাতন করে। পাঁচবার মরে একবার হু না না দিয়ে গারি না।”

হিমি অগ্রহকে কোলে লইয়া তখন ঘরের মেঝের হড়ান কাঁচের টুকরাগুলি ফুড়াইতেছিল; সুখনাড়া দিয়া কহিল, “ঘরে খাতকী-নমর না থাকলে বো-বিসের হাত-মুখ হুইই খুঁ চলে। আমি বাই তাই কত মার পিঠ পেতে নেই,—নইলে এমন গাফুলী মারেসের হাতে কোন দিন বাছারা মরেই বা যেতো! যে সব অলুক্ষণে রাগ!” শান্তি বিয়ের কথার শুধ মেলিয়া অবাচ্ হইয়া গেল। কলিকাতার তাদের ট্রিকা কির সহিত ছই বেলা শুধু বাসন মাঝা, বাছার করার সম্পর্ক;—সুতরাং কিরা যে আবার হু পাঁচ বৎসর থাকিতে-থাকিতে গৃহস্থেরই একজন হইয়া গিয়া, অবশেষে গৃহিণীর উপরও এরকম কড়া-কড়া কথা কহিতে পারে, তাহা তাহার ধারণা ছিল না। সুতরাং সে অগত্যা ভাবে কহিল, “মা-বাগের ছেলে, তার শাসন করলেই পাঁচমনের এত কথা। পর হ’লে ত না আমি কি ব্যাণার ঘটতো। সে দিন অমৃণা একটা বাট

আছে সেটিয়ে দিলে বেশ” একটু ধমকচ্ছিম, তাতেই পাড়ার কে কি বলেছে,—সংসা, তাই মর নেই! হু’দী আবার আবার এসে বসলে।”

সুখনা হিমি জবাব দিল, “তোমার আই হু’দী কির পায়ে গড় করি না,—ওর কথা কণে তুলো না, বড় লাগ-লাগানী, ঘর-আলানী—কাত বাড়ী হু’ মাস টিকতে পারে না। সুখমোদের বাড়ী এক মাস কাছ কন্তে গিরে, এমন কগড়া বাখিরে দিলে যে, বাবুদা তাকে বিয়ের করে তবে বাঁচলো। বড়মা ওকে ওই মন্তেই হু করে বেচ্ছলো—তুমি তাই ওকে ঠাই দিচ্ছে!”

শান্তির আপাতমন্তক জলিয়া উঠিল। অনিলার পরিত্যক্ত জানিয়াই সে সাধ করিয়া হু’দীকে আশ্রয় দিয়াছিল। হু’দীর আর বাহাই সোব থাকুক, শান্তির মনোরঞ্জে সে বেশ পটু ছিল। তা’ ছাড়া, হিমির এত দূর স্পর্ধা যে, শান্তির মুখের উপর কথা বলে হুঁক না তাহার পক্ষাণ বহর বহন,—বাড়ীর বি ত সে! বাবুদের ছোট বেলা হইতে দেখিতেছে বলিয়াই কি তাহার মান এত কিছু বাড়িয়া গেছে? শান্তি পক্ষ কর্তে কহিল, “খবরদার বি, আমার কিকে টেনে বনবার তুমি কেউ নও। আমার থাকে খুশী রাখতে কি ছাড়াতে আমি পারি,—তুমি কথা কইবার কে? তোমার মনিব তোমার চাটো-চাটো কথা সহাবে বলে আমি সহব না। আমার হু’দীর এত ক্ষমতা নেই যে, আমার মুখের উপর সে কথা বলে। কি-চাকরদের এত বেয়াড়াপনা আমি ভালবাসি না।” সরলা হিমিকে ধমক দিয়া কহিল, “তোমার কথা বলার বক্তাব গেল না? বিদুর মাসী তার ছেলে-মেয়েকে মারবে, তা তোমার অত গায়ের জালা ধরে কেন? তোমার বিনকতক বেশে পাঠিয়ে দিছি দাঁড়াও,—যুড়ো হয়ে দিন-দিন ভীমরতি হচ্ছে।”

হিমি কগড়ার পেছাপাও হবার নয়; চাকরমোহনবাবুকেই সে ভর করে না, তা সরলা! বিশেষ, শান্তির কথার জবাব শু সরলার উপর দিয়াই চলাইতে হইবে। কাজেই সে কহিল, “আমার গায়ের জালা কি যাবে ধরে? পেট থেকে কাটা কেলেই যে তুমি খালাস! তার পর বুকের রক্ত ধল করে” এতগুলোকে মাহুৎ কহলে কে? আজ্ঞা, সব আলকালকার ঘেয়ে বাহু,—নিজের পেটের ছেলে-মেয়েদের ওপর এত রাগ! সত্য-সত্যিই হ’লে ত গলা

টিপেই যাহতে পার,—তোমাদের উদ্দেশে নমস্কার ।” হিমি
সত্য-সত্যই মাটিতে বাথা ঠেকাইল। সরলা কথার অর্থ
বুঝিয়া, হাসি চাপিয়া কহিল, “নিজের ছেলে বলেই পারে
হাত তুলি, পরের হ’লে তুলিব কেন ? এই অমূল্যের গারে
কি কোন দিন শান্তি হাত তোলে ? পেটের সন্তানের

ওপর হাপও হয়,—আবার কোলে নিলে সব হুঃখু তুলেও
যেতে হয়। তুমি বাজা মাহুস,—ও-দেবের মর্শ বৃত্তান্তে পারবে
না, চুপ ক’রে যাও ।” হিমি আর কথা কাটাকাটি করিল
না। শান্তির মুখে অঙ্গরসস্তার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

প্রবাসী

[শ্রীকুম্ভদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

বনবাস যোর শেষ হ’বে কবে
জান যদি কেহ কহরে ?
চৌদ্ধবরষ রয়েছি যে আমি
পাড়াগ্রাম ছাড়ি সহরে ।
কাননে রানের বহু স্থ ছিল
ছিল ফুল তরু লতা যে ;
বন্ধ সলিলা ছিল গোদাবরী
ভূগাতে পারিত বাথা যে ।
এখানে নাহিক বন-মর্থর
বন-বিহগের সাড়াটী,—
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি
কৌণ কল জলধারাটী ।
কোথা আমি পাছে কুল ঝাঞ্জর
কোথা বট পাছে চুলগো
কোথা অজরের সেই স্তম্ভ কুল
যেথা নুনো কুল তুলগো ।

কোথা কস্কস্বে, কাঁকুড়ের ক্ষেত
ছোলা বটরের ভূঁই গো
রাজা হব কোথা বিদ্যাতার মত
বনে পাঠাইলি তুই গো ।
যাব মিথিলার মধা সদ্যরোহে
কোথা হরধহু টুটতে,
তুই না আমারে বনে পাঠাইলি
মন্ত্রীচের পিছু ছুটতে ।
হাঁক ছাড়িবার সময় নাহি য়
পেটেতে নাহি না অন্ন,
মিশেহায়া হ’রে ছুটেছি কেবল
শূণ্য-মুগের অন্ন ।
আর কি তোমার কোমল কোলে যা
পাব না ক আমি কিহতে,
শৈশব-সুখ-স্বর্ণ আমার
সরস্বতী তীর তীরে ।

উৎকল-সাহিত্য

[**ত্রিষ্মশ্লোক** প্রাণ]

मुकुन्द-वार्त्तनिष्ठ, १७१७

“**এস্ট্রিন উৎকল**” (জগন্নাথ বসিয়ার) — লেখক — ইন্ডিয়ান সিং
উৎকলের লবই গিরকে, তথাপি লবই আছে। এস্ট্রিন উৎকলে
শিল্প, বাণিজ্য একুতি লবই লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বেথানিয়েব
জগন্নাথ অজাপি উৎকলে বিরাচিত। আল লব-লব, লবই-লবই,
লব-লব পাশী-তাপী উৎকলের বিকে বাহিত। উৎকলের সেই
পৃথিব্য। এলও কালের লবই লবই হইয়াছে? জগন্নাথ বসিয়ার
বিচিত্র নর কি? বিস্তর, ত্রিবার সত্য। হতরং জগন্নাথ, জগন্নাথ-
বসিয়ার, বসিয়ার শাসক-প্রশাসী একুতি আল আরাবের প্রথম
আলোচনার বিবরণ। বসিয়ার পত্রিকা এই বিবরণে আরাবের প্রথম
আলোচনা।

[illegible]

বিস্তৃত মহাকাব্য ইলিয়াড কোথায় বিস্তৃত বর্ণনাইদেন, তাহিতে
লাগিলেন। ঐহবশতঃ ঐকটান নামে এক বৈকব ইলিয়াডের নাম-
নভায় প্রবেশপূর্বক নীলমহাবের নামই প্রাপন করিলে, বহায়ায়
নাম-পুত্রোহিত বিখ্যাতিলে পলাবির তপাৎনভায়ে প্রেরণ করিলেন।
বিখ্যাপতি বহায়ায় পরিব্রজন করিল। বিখ্যাপন নুয়ে উজীর হইলেন ও
তাহার সহিত বিজ্ঞতা প্রাপন করিলেন। শবরকভার সহিত বিখ্য-
পতির বিবাহ হইল। শব-বিবাহিতা পত্নীর সাহায্যে নীলমহাব
দুর্ভি বর্ণন করিয়া একাধাবন পূর্বক ইলিয়াডকে সনত বৃত্তান্ত প্রদান
করিলেন।

ইস্রায়েল বেধ-বর্ণনের আগার দাওয়া করিলেন; কিন্তু পবিত্রযে
দায়কের দূত্রে নীলসাবনের অন্তর্ধান-সাংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয়
দ্বেষিত হইলেন, এবং আপনাকে বিচার বিত্তে লালিলেন। এমন সময়ে

আকাশবাণী হইল—“তুমি আর এ মূর্তি দেখিতে পাইবে না। পঞ্চ
মত বর্ষ মধ্যে দায়িত্ব অবশেষে হস্ত করিলে, আমি দ্বিতীয় ভাবে
বদলভ, অপ্রাপ্য, হৃৎকণ্ড ও হৃৎকণ্ড—চারি মূর্তিতে অবতীর্ণ
হইব।”

বহাণ। ইল্‌ছ্যার আকাশবাণী এখন করিয়া লগেনে বজা আরম্ভ করিলেন। এথিকে বাক্তরক সমুদ্রে ভাগিনে ভাগিনে বাঁকি হোহোনার গরিকটে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে হইতে বাক আনীত হইয়া ভক্তি। যথিলে নৃত্তি পঠিত হইল। ইল্‌ছ্যারের পত্নীর নাম ভক্তি। "ভক্তি-বশিষ্ঠ" ও "ভক্তি-বামা" তাঁহার নামানুসারে রচিত হইয়াছে। ইল্‌ছ্যার বশির নির্ধাণ দ্বারা আরম্ভ করিলেন। খুজি বিশাশ বশির নির্ধাণ হইলেন, এতিষ্ঠার জ্ঞান ত্রাণার নিষ্ঠা বশির করিলেন; কিন্তু ত্রাণার সহিত প্রাণদগন করিয়া বৈধিলেন, ত্রাণা পানদগন তগন বশির বৈধিকার করিয়া পূজাৰ্জনা করিলেন। পানদগনের সহিত ইল্‌ছ্যারের জ্ঞান হইল। পানদগন পরাজিত হইলেন। ত্রাণার আভাযুগারে ত্রাণাও ভবি বশির এতিষ্ঠা করিলেন। ইল্‌ছ্যার বহুতাল ভক্তিভরে পূজা করিলেন, বগদগন সহজ হইয়া বর প্রাণ করিলে উভাত হইলেন। ইল্‌ছ্যার আৰ্ণাভ করিলেন—“এতু! আমার বগে বৈ কেহ ‘এ বশির আদা’ বলিলে না বাকো!” জ্ঞানের বাহা পূর্ণি বসে। বগদগন বগাও পূর্ণি পূর্ণি বর প্রাণ করিলেন। তাঁহার কলে ইল্‌ছ্যারের বগে আন কেইই হইল না। বগদগন বৈ বগে। জ্ঞান বগদগন এক নিষ্ঠা তাঁহার বাকি লাভ করিয়া বগদগন। বশিরে এ প্রাণ আদাও পূর্ণি প্রাণে।

ইস্রায়েল বহাঃক আবেক্ষণ পূৰ্ণ করিয়া ক্রমশঃকে দমন
করিলেন। তাঁহার পরে বেঙ্গল রাজ্য হইয়া সেবা-পুৰী সম্পন্ন
করিলেন। ক্রমে কলি উপস্থিত হইল। অনেক রাজ্য ভগ্নবাসের
পুৰী করিয়া কাল অতিবাহিত করিলেন।

সামগ্রণের দ্বারা যাহা সম্ভব হইবে সেব্যের সম্পত্তি স্বতন্ত্র; সুতরাং এখানে
হইয়াছে। বিধি যাহা বিধিগোচরে আনয়ন করিয়াছেন, তিনি স্বাধীন
পূজা-পার্বণের বিধিও প্রকৃত পরিমাণে কৃপণতায় দান করিয়া
নিজাছেন। অথবা তাঁহা যেরূপ “হুগল” বা দুঃখের দ্বিগুণ—“বহুতঃ
পারতঃ” নং হইতে বহুতঃ। বর্ষান্তে সমস্তই বিক্রয় করিতে
কুণী।” ইহার সম্ভবতঃ ভ্রমের যে পরিমাণ হইয়াছিল, তাহার
সামগ্রণ হইতে সম্ভবতঃ হইবে বহু সম্পত্তি বিক্রয় হইবার
সম্ভবতা পাওয়া যায়।

২। “উড়িষ্যা ‘গাটশানী’ বা পাঠশালা”—

লেখক—শ্রীমদ্রত্ন নায়ক ।

প্রাচীন ভারতের সকল ভাষা আর বহুব্রুজ ছিল। সেইজন্য শিক্ষকগণ শিক্ষা দান বর্ধক্যেবর অদ্বার্ত হইয়া যবে করিতেন। তত্ৰ:শিষ্যে। ভাষাগ্রন্থিত পথ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যালয় বা চতুশাশ্রী এবং প্রাকৃত বিদ্যালয় বা “গাটশানী” নামে দুই প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঠশালা সস্ত্রী বহুপুর্বে অর্থাৎ বৈদিক যুগে চতুশাশ্রীর গুরু এবং বোধেশম বহিব্রুজ ভাষার শিক্ষক। আর উন্নত বৌদ্ধযুগে বা প্রাথমিক ভাষার উন্নতিযুগে এই পাঠশালাগুলি হ্রাসিত হয়। “গাটশানী” সম্বন্ধী চর্চাশালা হইতে হংসর। প্রাকৃত বা পালিতাষার চর্চাশালায় অর্থ হ্রাসশালা বা হ্রাস-গণের কার্যক্ষেত্র।

অতীত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত পাঠশালা পরিমার্জিত হইয়া উড়িষ্যা বিদ্যালয় রূপে পরিচালিত হইতেছে। মার্গট্রান্সিগের সময়ে পাঠশালায় শিক্ষা অতি দুর্ভাগ্যে চলিতেছিল এবং দুসলমান রাজ্যেরে শিক্ষার অবস্থা ভিন্নমান হইলেও যোগলগণের সময়ে কয়েকজন কবি প্রাথমিক ভাষার কবিতা রচনা করিয়া কং-ভাষা উন্নতি করিয়া-ছিলেন। সেই কবিতার বহুত অংশ পাঠশালা-শিক্ষার অদ্বার্ত হইয়াছিল। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, “রাষ্ট্রবংশ শুকা” জাতির স্তম্ভ না হইয়া থাকিলে, দুসলমান যুগে উড়িষ্যা শিক্ষার পথ লুপ্ত হইয়া গাইত। অত্যাচার মহোদয়ের ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, পদাবলম্বের

রাজবাক্যে উড়িয়ার নামাঙ্কণ উন্নতিকর কাণ্ড হইয়াছিল। পাঠশালায় উন্নতিত ভাষা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সেইজন্য অনেক যবে করেন, পদাবলম্বের সময়ে পাঠশালায় স্তম্ভ। কিন্তু ভাষা লুপ্তবশত নয়। তবে সম্মান্যেবর রাজবংশ উড়িষ্যা ভাষার সমাধার ক্রান্ত, পাঠশালাও অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে ভ্রমণগণ স্থানে-স্থানে কতিপয় ছাত্র লইয়া শিক্ষা-পঠনের সহিত নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেন। এই প্রমাণে বর্ণাঙ্কুর বলিয়া অভিহিত হইতেন। ঠাণ্ডাঘের বিদ্যালয়গুলি “গাটশানী” নামে পরি-চিতি হওয়া বিচিতি নয়। প্রাকৃত ব্রহ্মদেশে এইরূপ বর্ণাঙ্কুর ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ককালে এতি প্রাণে এ প্রকার পাঠশালা দুই ত্রিভুজী করিয়া ছিল। ভ্রমণগণ পুথের আদিমান, ব্রহ্মদেশে বা কোন সাধারণ যুগে এই কার্য সম্পন্ন করিতেন। এই যুগে সাধারণ পাঠশালা ব্যতীত উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রচলিত ছিল। স্রাবতি, কপিলবাস্ত, বৈশালী, হরপ্রস্থ, পাইনীমুদ্র প্রভৃতি বিদ্যাপুঞ্জীময় এবং বর্ধক্যেবর প্রমাণ পুঁঠানি দিল। আর নামদা, ভক্তশিল্প, ব্রহ্মপুত্রী বা পুত্রী, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ-সংগে বিদ্যার্থী অবস্থান করিতেন।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, উড়িষ্যার “গাটশানী”—ব্রহ্ম, বিদ্যার ও উড়িষ্যা এক শাসনাবলম্ব প্রাকার সময়ে—বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ-রাষ্ট্র-গণের সাহায্যে সংস্কৃত চতুশাশ্রীর প্রাণে বৌদ্ধ ভ্রমণ কর্তৃক প্রবল প্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্যাধি চলিয়া আসিতেছে।

খাঁদা

[ত্রিপ্রমাঙ্কুর আতর্থা]

অবর ও সতীশ দুজনে ছেলেবেলাকার বন্ধু। কবে থেকে তাদের এই বন্ধুত্ব আরম্ভ হয়েছে, তা’ তারা দুজনেই প্রায় ভুলে গিয়েছে। ছেলেবেলাতে তারা এক স্কুলেই পড়ত; তার পর, স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেলে, এক কলোজেই পড়ে’ তারা বি-এ অবধি পাশ করেছে। দীর্ঘকাল পরে, এই জায়গাটাতে এসে, তাদের সহবাসের স্মিথানে একটা হতি পড়ল।

ছেলেবেলায় স্কুলেও একটু উঁচু ক্লাসে উঠেই তারা মনে-মনে একটা সম্বন্ধ করেছিল যে, **কি-কি** পাশ করে’ বিলেতে বেতে হবে। সেখানে গিয়ে কি পড়তে হবে, কোথায় থাকার হবে, **পাশ-পাশ** করে বেশে ফিরে এসে কি-কি কাজ করতে

গিয়েছে,—সেই ভাবনার কত বিনিময় দুজনের মাঝি বেথুতে-বেথুতে অবসান হয়ে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই।

বিলেতে বাওয়া সবুজে অম্বরের কোনই বাধা ছিল না, বাধা ছিল একটু সতীশের। সতীশের বাধা অভ্যন্তর নিষ্ঠা-বান হিন্দু ছিলেন;—তিনি বিলেতে বাওয়া ইত্যাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই সতীশের মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, হয় ত তার বাধা তাকে বিলেতে বেতে দিতে তত্ত্বানক আপত্তি তুলবেন। তাই সময়ে-অগময়ে সে তার মাকে এই কথাটা বারবার করে জানিয়ে রাখত। প্রাথমিক পড়া-খার সে যখন বেশ ভাল করে’ পাশ করে’ বেকল, তখন সে তার মার কাছ-এ বিষয়ের একটা পাকা বক্তার নিশ্চয়

তার—এই সব জটিলতার কত সত্যতা তাদের আনন্দে কেটে

করে রেখেছিল। সতীশের মা ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা করে-
ছিলেন যে, তিনি যেমন করেই পারেন, বিশেষতঃ বাগরায়
হুতুয়া কঠোর কাছ থেকে আহার করবেন। কিন্তু মাহুয়ের
ইচ্ছাই সব সময়ের শেষ নয়; সতীশের আরও বেশ হবার
আগেই ত-পারের বাটোখাল তার মাকে টেনে নিয়ে
গেল।

দ্রীষ মূহুর সঙ্গে-সঙ্গে সতীশের বাবার ধর্মের উপর
আগন্তিক একটু বেশী হাতের বেড়ে উঠল। রাত্রি মিন ঘর-
বাগান, জিরা-কর্প—এই সব দিয়ে তিনি দ্রীষ শোকটা ঢাণা
দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সতীশকেও এই সবের মধ্যে
টেনে নেবার আকর্ষক ইচ্ছা সবেও সেটা করে পরিণত
হয়ে উঠেনি; কারণ, তার পরীক্ষা তখন সমুখে।

পরীক্ষার ফল বেরোবার পর দেখা গেল, সতীশ বেশ
ভাল করে পাশ করেছে। এতে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-
স্বজন বসন্তা আনন্দিত হোক আর না হোক, সে কিন্তু তারি
আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে-মনে ধারণা ছিল, এবার বোধ
হয় পরীক্ষকের আশুনের কীক দিয়ে গলে' বেরোন তার
পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠবে। কিন্তু তার ধারণা ঘাই
থাক না কেন, সেবার সে পাশ হয়ে গেল।

পরীক্ষা পাশের আনন্দটা ভাল করে উপভোগ করবার
আসেই, একটা বিধম উৎসর্গ এলে সতীশের মনের উপর
সওয়ার হয়ে বসল। তার কারণ, বিশেষতঃ বাগরায় কথাটা
তার মা ছাড়া বাড়ীর আর কাউকে সে ঘুণাক্ষরে জানতে
যেহ নি। সে জানত তার মায়ের কথাটা বাবার কাছে
পাড়বার অবসর পান নি; তা'হলে এতদিনে সে বাবার মুখ
থেকে একটা "হী কিংবা না" বা হোক কিছু শুনতে পেত।
অমরের সঙ্গে তার বোধ পরামর্শ চলতে লাগল, কি করে
বাবার কাছে কথাটা উত্থাপন করা যায়। মোটেই সম্ভার
সময় দুইদশ বর্ষ এই নিয়ে পরামর্শ চলত। আর নতুন-
নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা হত বটে; কিন্তু পরদিন সকালে
বাপের সেই স্বপ্ন-গুচ্ছ-মুণ্ডিত গম্ভীর মুখ দেখলেই আর
একটা কথাও সতীশের মনে থাকত না।

মাস দুয়েক এই ভাবে কাটবার পর, একদিন সম্ভার
সময় মরিয়া হয়ে সতীশ তার বাবার ঘরে ঢুক পড়ল। বৃদ্ধ
গোবিন্দচরণ তখন শীতার মধ্যে জীবন-মূহুর নির্গূঢ় গুণের
রসাব্যাসনে ব্যস্ত ছিলেন। সতীশ ঘরে ঢুকতেই তিনি চোখ

থেকে চশমাটা নামিয়ে বইয়ের উপর রেখে, তাকে নিজস্বা
করলেন—“কি বাবা, কি মনে করে?” সতীশ যে-
কথাটা শুকে বলতে এসেছিল, একবারে সেটা না পেড়ে,
অন্ত কথা আরম্ভ করল।

গোবিন্দচরণ তাকাতা করলেন, “তার পর? এম-এ
পড়বে না কি?” কথা আশুনিই অনেকটা এগিয়ে এসেছে
মনে করে, উৎসাহের সঙ্গে সতীশ বলে কলেন,—“আজ্ঞে,
এখানে আর পড়বার ইচ্ছা নেই—”

“তবে? বিশেষ বাবার মতলব আছে? আর পড়ে’
কি হবে? এবার নিজেদের কাজকর্ম দেখ। আমি আর
ক’দিন আছি,—এই বেলা ভাল করে সব সুখে-শুখে নাও।”

কথাটা ধার বেঁধে এলেই যে এতদূর চলে যাবে, তা’ সে
মনে করতেই পারে নি। কিন্তু আত্মকেই বলা চাই, আর
বেশী বোঝা নয়। তার অন্ত অমরও বাবার কোন রকম
বলোবস্ত করতে পাচ্ছে না। সে চোখ-কাণ দুইে সোমোহুতি
বিশেষ বাগরায় সংকল্পটা তার বাপের কাছে প্রকাশ করে
কলেন।

তার পরে যে পালার অভিনয় হয়েছিল, তার বেশী
বিবরণ অনাবশ্যক। রূপে উদ্ভট-প্রাণ গোবিন্দচরণ তাঁর
একমাত্র সন্তানকে জানিয়ে দিলেন যে, এই সমস্ত যদি সে
ভাগ না করে, তবে সে তাঁর সন্তানই নয়;—তিনি পোষা-
পুত্র গ্রহণ করে, তাকে বিবাহ থেকে বঞ্চিত করে যাবেন।
বৃদ্ধ ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না যে, তাঁর ছেলের
মতিগতি এক রকম হল কেন।

সতীশ একবার বন্ধুহলে টাকা ধার করবার চেষ্টা
কেনলে; কিন্তু সেখানে কোন রকম সুবিধা হয়ে উঠল না।
বিশেষতঃ গিয়ে পড়াতনা করবার মতন টাকা ধার দিতে
পাচে,—তখনতে পাওয়া যায়, এমন বন্ধ অনেকের ভাগ্যে
ছুটেছে; কিন্তু তার কপালে ছুটল না।

সতীশ ছেলেবেলা থেকে কল্লার ভবিষ্যতের অন্ত যে
নন্দন-কাননের স্বপ্ন করেছিল, বাপের এক তাকার দেখতে
গেলে, সেখানে শুদ্ধে-শুদ্ধে পরিবার ছল হুঁচোর আলোর
অন্ধকার কুহুে।

সতীশের মা বাগর, মায় অমরের বাগর—এই ঘটনাটা
সতীশকে অমরদের পরিবারের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সহানু-
ভূতির সম্পর্কে বেঁধে ফেলে। অমরের বাবা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী

ছিলেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। এক ছেলে, একমেয়ে ও স্ত্রী—এই নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলে অমরনাথ সম্রাট বি-এ পাশ করেছে,—মাধ্যমিকের ভেতরই আইন পড়তে বিলতে গায়ে। মেয়ে সুধমা এইবার প্রবেশিকা পাশ করে' বাড়ীতেই পড়ে। সত্যেশের নিত্য পীড়িত অন্তরটা এই পরিবারের সহ্যভূতি পেয়ে একটু তৃপ্তি পেলো। মাতৃহীন সত্যেশকে অমরের বা মননী-সেহে অন্ন দিনের মধ্যেই একান্ত আপনাতর করে নিলেন।

মাসখানেক পরেই, শীতের একটা ঘন ক্রান্তি-ভরা সকালে, দুই বৃষ্টি চোখের মলে পরম্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'ল। সে-দিন সমস্ত দিন সত্যেশ বাড়ী ফিরল না—সকাল থেকে আপনাতর খোঁজালো রাস্তার ঘুরে-ঘুরে, সন্ধ্যা-বেলা অবসর বেহে আপনাতর নির্জন বরাটতে এসে শুয়ে পড়ল।

এই ঘটনার পরে সত্যেশের মনটা তাঁর নিজের পরিবারের উপর অত্যন্ত নিবেদী হয়ে উঠল। তাঁর বাবা একেই গভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন; এই গোলমালের পর তিনি যেন আরো বেশী রকমের গভীর হয়ে উঠলেন। বাপে-ছেলেতে আগেই কথাবার্তা খুব কমই হোত; এখন থেকে একরকম সুখ-মেথামেবিই প্রায় বন্ধ হইল।

সত্যেশের অশান্ত মনটা একটুমান সান্ত্বনা পেত অমরের দ্বারা। এখন সে প্রত্যাহ নিরন্ন করে' তাঁদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করল। নিজেদের প্রতি নিবেদী তাঁর চোখ দুটো এই পরিবারের ধরণ-ধারণ, চাল-চলন সবই যেন হৃদয় দেখতে লাগল। নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে, তাঁর মনে হ'ত—আমাদের চেয়ে এরা কত বেশী উদার! তাঁর চোখে সব থেকে হৃদয় লাগল হরম্যার সরল ব্যবহার। তাঁর বয়সের অন্ত বয়েসের সঙ্গে তুলনা করে সে দেখত, একদিকে সে তাদের চেয়ে কত বেশী জানে, আবার অন্য দিকে কত কম তাঁর অভিজ্ঞতা! এত বেশী আর এত কম জানার এই হৃদয় সমাবেশটা তাঁর কাছে বড় মধুর ঠেকতে লাগল। এর আগে সে বরফা অবিবাহিতা বয়েসের সঙ্গে এমন স্থানীয় ভাবে কখনো মিলেনি। তাই প্রথম-প্রথম হরম্যার সঙ্গে কথাবার্তার তার কেমন যেন একটু সঙ্কটবোধ হত। কিন্তু এ বিষয়ে বেশী দিন তাকে শিকানবিনী

করতে হয় নি,—খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই সঙ্কটটুকু কেটে গেল।

এখন থেকে সে নিরন্ন করে' রোগে তাঁদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করল। হরম্যার সন্ধ্যাবেলাকার ছোট চাষের বৈঠকটার উপর ক্রমে সত্যেশের এমন মোতাক্তি জন্মে গেল যে, সন্ধ্যার সময় একবার সেখানে হাজিরা না দিলে, তাঁর মনটাই যেন বিকলে যেত।

সত্যেশের অলক্ষ্যে তাঁর মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের আয়োজন চলছিল। সেটার আভাস সবচে-অসময়ে তাকে নাড়া দিলেও, সে ভাল করে ব্যাপারটাকে ধরতে পারছিল না। হরম্যার সহজ, হৃদয় ব্যবহার, তাঁর সরল কথাবার্তা গোপনে তাঁর প্রাণের মধ্যে ধীরে-ধীরে যে নিজের আগুন বিস্তার করছিল, তাঁর সন্ধান সে পায় নি।

সত্যেশ সন্ধান না পেলেও, সেবার সন্ধান কিন্তু ব্যর্থ হোল না। যে পৃথিবীটার সঙ্গে এতদিন ধরে কিছুতেই তাঁর যিনিবাও হচ্ছিল না, হঠাৎ তারই মেথের মেলা,—জুলের পাতার সংয়ের খেলা—সত্যেশের হৃদয়ের মরচে-খরা তার-গুলোতে কিসের একটা ঝড়ার লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। কেন! এক অজান্তে বাহুরকরের সোণার কাঠির স্পর্শে সত্যেশের যেন দৃষ্টি-বিভিন্ন ঘটল,—অগতকে সে নতুন চোখে দেখতে লাগল। সে দেখলে, চারিদিক যেন উষ্মাধনের উৎসবে যেতে উঠেছে,—সমস্ত পৃথিবীটা যেন প্রাণ খুলে প্রেমের গান গাইতে আরম্ভ করেছে। হৃদ সত্যেশ সে সঙ্গীতে আত্মহারা হয়ে' চেয়ে দেখল, তাঁর হৃদয় ধারে বেশী গাড়িয়ে;—নীলবে বরণ করে' প্রাণের গোপন পুরে তাকে অভিবেক করে তুলে নিলে।

হরম্যার হাসি, তাঁর গান, তাঁর কথা শোনবার মত সমস্ত দিন তাঁর প্রাণটা ছটফট করত থাকত। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত সমস্ত দিনটা সে এই সমস্তটার মত উত্তপ্ত হয়ে বসে-বসে, পাঁচটা বাজতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। হরম্যার বাড়ী বতকণ সে থাকত,—সমস্তটা যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, তা সে বুঝতে পারত না। রাত্রে সহরের গোলমাল শুনে গেল, নির্জনে আপনাতর মনটাকে হুড়িয়ে নিয়ে সে ভাবতে বসত। মনে-মনে কখনো তাঁর মাথায় জুলের মুকুট পরিয়ে, কখনো বা তাঁর গলায় কুলের মালা দিয়ে, আপনাতর খোঁজালে শুকে সাজাত। হৃদয়ের খোঁজে সে

দেখত, আকাশ থেকে অগ্ন-সুন্দরীরা নেবে এসে, তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে সুপ-সুগন্ধের মিলনের স্নান গাইচে। আবার কখনো বা বার্ব-প্রেমিক-প্রেমিকাদের কল্পন বিরহ-পাখার উৎকণ্ঠিত তান এসে তার চমক ভাঙ্গিয়ে দিয়ে যেত। চমকে উঠে সে দেখত যে, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

এই নেশার মগ্গল হয়ে সতীশ বেশ দিনকতক কাটিয়ে গিলে। কিন্তু এই রকম এক-তরফা প্রেমে তার মনটা স্থবির হতে পারছিল না। মাকে-মাকে তার মনে হতে লাগল, সুরমার চোখ চুটে। যেন কি বলতে চাইচে—অথচ মুখ ফুটে বলতে পাচ্ছে না। হঠাৎ যেন তার ভাষা-ভাষা চোখ চুটোর কোণে একটা কটাক্ষের বিদ্যুৎ খেসে গেল,—তার সুখখানা লক্ষ্যের রাঙা হয়ে উঠল।

সতীশ ভাবত, কি সে বলতে চায়? কি যে বলতে চায়, সে কথাগুলো তার কল্পনার জালে আটকা পড়ে' তবুনি তার চোখের লামনে জল-জল করে ফুটে উঠত; আর মনে হত, ঘেরঘের প্রেত ভূরণ হচ্ছে লক্ষ্য। এই কাল্পনিক লক্ষ্যের ঢাকা অকবিত কথগুলো রাত্রি-দিন তার কাণে গুণ-গুণ হয়ে বাজতে থাকত।

সতীশ মুখে কিছু না বললেও, তার কথাবার্তা, ভাব-ভঙ্গীর ক'ক দিয়ে মাকে-মাকে তার মনের ভাবটা সুরমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে' তার প্রাণ একটা আশার উৎসীড়নে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠত; কিন্তু সুরমা তার সেই ব্যবহার-ভুলোকে পূব সম্মত ভাবে গ্রহণ করে' তাকে সংসারের আর একটা পূর্ণিণাকের মধ্যে বেলে দিত;—নিরাশা ও উৎসাহের একটা বেগনা বুক করে নিয়ে সে বাড়ী ফিরে আসত।

এই রকম ভাবে বিন কাটানো ক্রমেই সতীশের পকে অসহ হয়ে গাড়তে লাগল। সে টিক করলে, একদিন সে সুরমাকে তার প্রাণের কথাটা খুলে বলবে। কিন্তু কেমন করে কথাগুলোকে শুঁড়িয়ে বলতে হবে, সমস্ত দিন-রাত্রি ভেবেও সে তার একটা কিনারা করে উঠতে পারছিল না। সুরমার নির্জিকার সম্মত ভাবটা তার মনে একটা সন্দেহের ছাপ লাগিয়ে দিবেছিল। তার মনে হত, যদি সে প্রত্যাখ্যাত হয়। সুরমার মুখের সেই কথাটুকুর উপর তার বর্তমানের এই বার্ষ জীবনটার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তার

রোজই সে মনে-মনে সম্মত নিয়ে বেকত—আজকে যেমন করেই হোক কথাটা সুরমাকে বলতেই হবে; কিন্তু তার কাছে পেনেই তার সমস্ত উদ্যম চুপসে যেত। হাল্কার চোঁটা করে অনেক সময় কথাটা চোঁটের কাছে এনেই মিলিয়ে যেত; সে ভাবত, আজ্ঞা, আজ বাস্—কাল নিশ্চয়ই।

সতীশ ভাবত, আজ্ঞা, সুরমা যদি সত্যিই তাকে ফিরিয়ে দেয়, তবে কি তাকে পাবার আশা সে ভাগ করতে পারবে? তার সমস্ত বৃত্তিগুলো নোঁতা খেয়ে একসঙ্গে বলে উঠত, না—না। বিদ্বান্যায় গুরে-গুরে সে ভাবত, কালকে কি করে কথাটা প্যাড়া হবে? কেমন করে, কোন্ কথার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে; তাবতে-তাবতে ভবিষ্যতের একখানা ছবি বর্তমানের এই ভাবনার ভিত্তি-গুলোকে টোল-টুলে, তার মনের সামনে ফুটে উঠত। নানারকম রতিন কল্পনার আগল কথাটা কোথায় হারিয়ে যেত। অলঙ্কার শিশুর মতন সে মনের ভেতরকার সেই কথাটা খুঁজতে-খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়ত।

তার মনের ভেতর আশা ও নিরাশার বে বৃদ্ধ চলছিল, সেইটেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে গাঁড়াল। এই বিখাটা তাকে বারবার খোঁচা দিয়ে বলতে থাকত, এই তবে শেষ—এই তবে শেষ কথা। এইটে বলা হয়ে গেলেই, চোখের এই অজ্ঞান মুছে গিয়ে, আবার পৃথিবীর সেই কতালসার মুক্তিটা তার সামনে ফুটে উঠবে,—প্রাণের ভেতরকার এই অপ্রায় রাসিগীর অবিরাম স্বাকার চিরদিনের জন্য খেমে যাবে।

মনটা কিন্তু তার এই শেষ কথাটারই চারিধারে গুমরে-গুমরে বাধা পুঁড়তে লাগল।

নিঃস্বের মনকে সে আখাল দিত, হয় ত সুরমা তাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি না করে—তবে আবার সেই কণ্ঠহীন স্তম্ভ দেহ, সেই ভাবনাবানী অবলম্বন মনটার বিধম বোকা বহন করে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে! কোথায় সে বোকা নামাবে!

সুরমার সম্মত বেনশার মতন তার বৈধ-মনকে আবিষ্ট করে ফেলছিল। দিনরাত তার ভাবনা কুতের মতন তার কাঁধে চেপে তাকে যে দিকে ইচ্ছা চাশিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। এই নেশার ঘোরে কখন সে দেখত, সুরমাকে

ভার প্রাণের কথাটা বলে কেলেঙ্কি;—সরল সেই চোখ দুটো যেন আবেশে এলিয়ে গেল, গোলাপের মতন স্নেহের তার হৃৎখানা যেন বাতাসে হেলা হুলের মত ঢলে পড়ল। আবার কখনো বা দেখত, পৃথিবীর বুকেখানা কেটে গিয়ে, একটা বিরাট আঁখিটা উঠে, যেন সমস্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরিষ্কার হয়ে গেল দেখতে পেত, যেন একটা বিরাট অনন্যতম তত্ত্ব উপর উপর প্রোভের মতন সে গাঁড়িয়ে আছে।

প্রাণের মধ্যে ভাবের ঘরটা তার যেমন একদিকে ফুলে-ফুলে সেজে উঠতে লাগল, অন্যবের দ্বন্দ্ব শূন্যতার একটা হাহাকার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। চতুর্দিকে আনন্দের উৎস, পরিপূর্ণতার প্রায়ুর্ঘ্যের মধ্যে সে একা উপবাসী,—বৃককাটা তুফান তার অন্তরটা শুকিয়ে উঠেছে। সামনে ভল, কিন্তু তাকে করবার সাহস নেই। তার নিম্নের উপরই একটা বিতৃষ্ণা জন্মতে লাগল। এক-একবার মনে হ'ত, দুঃ ছাই আর ভাব না; কিন্তু কিছুক্ষণ বেতে না যেতেই, হৃদয় তার ভাবনা আবার দিগন্ত জোরে তার মনটাকে আঁকড়ে ধৃত।

এমনি করে সতীশের দিন কাটিতে লাগল।

বেথতে-বেথতে পাঁচটা বছর,—পাঁচটা বছর কেন্খান দিয়ে পার হয়ে চলে গেল,—অমরনাথ আইন পাল করে দেশে ফিরে এল। কয়েকদিন তাদের বাড়ী পাঠি, ডিনার ইত্যাদিতে একেবারে সগরম হয়ে উঠল। এই হুজ্জে অনেক নতুন পরিবারের সঙ্গে সতীশের আলাপ হ'ল। আক-এখানে, কাল সেখানে নিমন্ত্রণ। পাঠিতে হেতে-আগতে সতীশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। এই কটা বছর জীবনটা একরকম নিরিবিলা কাটানোর পর সে দেখলে, হঠাৎ যেন পৃথিবীটা ভয়ানক তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে,—নিজে হাতে সাক্ষ্যে গ্লানিসত্ত্বে যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অমরমের বাড়ী গিয়ে কোন দিন দেখত, চাইত-কমটা চেনা-অচেনা নামাকরম মুহুরিতে ভর্তি; আবার কোনদিন বা দেখত, হুম্মা বাড়ী নেই—অমর ও তার নতুন বন্ধুরা যেন গল করছে। তাদের কথায়, তাদের হাসিতে প্রাণ খুলে যোগ দিতে সতীশ যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। তার মনে হ'তে লাগল, এক দিন যবে বলে-বলে সে দাবা-খেলায় দৃষ্টিগুলো সানিয়ে রাখছিল,—হঠাৎ সেগুলো আপনার খেয়ালে চলতে-ফিরতে আরম্ভ করেছে। হুম্মাদের ছোট

সংসারটার একটানা রীতি-নীতিগুলো অমরের আগমনে এক তাড়াতাড়ি বদলে বেতে আরম্ভ করলে যে, তার সঙ্গে সমানে পা রেখে চলা সতীশের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হ'তে লাগল।

হাইকেট খুণতে, অমর বারে ভর্তি হ'বার পর, তাদের বাড়ীর গোলাপালটা একটু কমে এল। সতীশের মনে হ'ল, এতদিন বা হবার হয়ে গিয়েছে,—এইবার হুম্মার কাছে সে প্রস্তাব করবেই,—আর দেবী নয়। একদিন বিকেলে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অমরের বাড়ী পৌঁছে সে দেখলে, হুম্মা বাড়ী নেই। অমর ও তার মা দুজনে ভুত-ভ্রমে বলে আছেন। সে ঘরে ঢুকতেই অমর বলে—“তোমার গল্প বলে আছি,—একটু বাজার করবার দরকার আছে,—চল না, তোমার ত কোন কাজ নেই, একটু ঘুরে আসবে।”

অমরের মা বলেন—“সতীশ, তুমি না খেয়ে বেগ না।”

কিন্তু তার মতে এই চারের বৈঠক সতীশের কাছে এক মধুর হয়ে উঠেছিল, আজকের এই বিশেষ দিনে তার অল্পপরিচিত তার বৃক্কের ভেতরটা বেগনার টনটন করিতে লাগল। সে অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—“হুম্মা কোথায়?”

অমরের মা বলেন—“সে আর তার বাবা এক জায়গায় খেড়াকতে গেছেন।”

অমর তার মাকে বলে—“সতীশকে বলতে কতি কি মা? ও ত ঘরে ছেলে।” বলেই যেন সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেলে—“ওঁরা নগ্নেদের ওখানে গিয়েছেন।” আর এক ঢোক চা খেয়ে, সে একবার তার মার মুখের দিকে চেয়ে সতীশকে বলে,—“আমি সতীশ, নগ্নেদের সঙ্গে আমরা হুম্মার গিয়ে দিকি! অবিশি ওরা নিজেরাই নিজেদের বিবে ঠিক করেছে—” অমর আরো কি বলতে বাচ্ছিল, কিন্তু বলা হোলো না,—চা খেতে-খেতে হঠাৎ একটা মায়াকর বকনের বিষয় লেগে, পেরাশা পিঁচিট মাটিতে পড়ে ছুরমার হ'য়ে গেল।

বেরাবার মুখে অমরের মা সতীশকে বলে দিলেন—“পরন্ত হুম্মার এন্ট্রেরমেন্ট—সকালবেলা তোমার নেমস্তর হইল। সকলো বন্ধুরা বলে সকলো করেছে এসো না যেন,—একটু তাড়াতাড়ি এলো,—তোমার খাটিতে হবে কিন্তু।”

সেদিন সকাল আগেই সতীশ বাড়ী ফিরে এল।

অন্ধকার ঘরে বসে-বসে সে ভাবতে লাগল, কি করি ? তবেই দেখলে, করবার আর বিশেষ কিছুই নেই। নিজের প্রতি একটা বিতুকার আশা তার সমস্ত বৈধ-মনকে পুড়িয়ে ফেলেছিল। যে কথাটা সে এই পাঁচ বছর ধরে নিজের মনে ভেঁজে রেখেছিল,—একদিনও সুখ ঘটে বলবার সাহস হয়নি,—আজ একজন অপরিচিত এসে যে তার প্রাণ এখন করে কেড়ে নেবে, সে ধারণা সে স্বপ্নেও করতে পারে নি। তার কল্পনার সে দেহান্ত, শুধু সে আর স্মরণ। সেখানে যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হ'ত, তা হলে হয় ত এটি মধ্যে একটা বা হয় কিছু সে করে ফেলত। সে ঠিক ক'লে, নিমন্ত্রণ যাবে না। যে ছবি কল্পনাস্তে মনের সামনে এসে পড়লে, সে দূরে দূরে ফেলে দিয়েছে,—যে আবছায়াটা এতকাল দিনরাত্রি ধরে তার আশেপাশে উঁকি মারত,—এত অকস্মাৎ সেটা যে স্মৃতিমান হয়ে উঠবে, তা সে বুঝতে পারে নি। স্মরণকে না পাওয়া সে সহ করতে পারে; কিন্তু তার সামনে যে অজ্ঞ কেউ তার প্রশ্নভাগী হবে, তা সে সহ করতে পারবে না। সে ঠিক ক'লে, বেশ ছেড়ে চলে যাবে। কোথায় যাবে?—যেখানেই হোক, কিন্তু এখানে আর না—

সন্ধ্যা হবার আগেই একটা অজ্ঞাত নাক্তি সতীশকে স্মরণায়ের বাড়ীর দিকে টানতে লাগল। নিজের সঙ্গে বুদ্ধ করে' তার মনটা এত বেশী নিষ্কর্ষ হয়ে পড়েছিল যে, সে আকর্ষণের বিরুদ্ধে বেশীকণ সে দৃষ্টিতে পাকছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রান্ত হুগরে সে রাস্তার বেগিরে পড়ল।

সতীশ এখন স্মরণায়ের বাড়ী গিরে উপস্থিত হ'ল, তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সবলেই এসেছেন। ড্রাইংরুমের দ্বার, গান, আনন্দের কোয়ার্টার ছুটিছিল। স্মরণায় সঙ্গে দেখা হতেই, সে একটু অভ্যর্থনায়ের সুরে তাকে বলে, —“এই বুঝি আপনার ভাতাভাতি আসা হ'ল? বা আপনার উপর তারি রূপ ক'রিয়েছেন।” তার কথার উত্তরে সতীশ যে কি বলে, স্মরণা বুঝতে পারলে না। অমর কাছেই গাড়িয়ে ছিল, সে তাকে বলে—“কি যে, অসুখ করেছে না কি? তোমার চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।” নিজেকে একটু শামলে নিয়ে সতীশ বলে—“হ্যাঁ ভাই, শরীরটা ভাল নেই।”

যাত্রাভার একটা গদি-দেওয়া চেয়ার টেনে নিয়ে, সতীশকে সেইখানে বসিয়ে দিলে। তার গুহ হজিল, মার সঙ্গে সতীশের দেখা হ'লেই, মা হয় ত তাকে একটা কলের তার চালিয়ে যেবেন। তার চেয়ে এই অন্ধকারে একটু নিরিবিলি বসতে পেলে বোধ হয়, তার শরীরটা একটু ভাল হবে।

সতীশ ছোট ছেলের মত চুপ করে সেই চেয়ারখানাতে গিরে বসে পড়ল। নির্জন গাছপাটার বগতে গেয়ে ঘরের ভেতরকার চেয়ে অনেকটা সুখ বোধ করতে লাগল। ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজগুলো বাজের মতন তার কাশে এসে পড়তে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও সে মনটাকে শক্ত করতে পারছিল না। স্মরণায় সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আর পর্যন্ত প্রত্যেক নিমেষের কাহিনীগুলোকে গেঁথে গেঁথে সে মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল; সুতো-ছেঁড়া মাগার মতন সে স্মৃতিগুলো এলিয়ে পড়তে লাগল। প্রথম যেদিন সে এখানে এসেছিল, সে দিন তার বাধিত চিত্তকে সেই চুটো লম্বাছুটি-মাথা চোখ কেমন করে সাফনা দেবার চেষ্টা করেছিল। তার পর কতদিন কত রকম ভাবে সেই চোখ দুটোর মধ্যে কত কথা কত ভাব সে বেগুতে পরেছে। নিজের উপর তার ভ্রান্ত কল্পনা হতে লাগল। কেন সে মনের মধ্যে এই কথাটাকে এতদিন ধরে গুখে রেখেছিল? কেন তার কাছে সে প্রকাশ করে নি,—তা বলে কি যখন এর থেকে বেশী হত?

তবে থাক এ হুঃ—বা কাউকে সে বলতে পারত না, —যাতে কারো কোন লাভ কিবা ক্ষতি নেই। নিজের এই যন্ত্রণাকে সে কেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। এত দিন যে চিন্তার শব্দগাকে তার মনটা বাঁধা পড়েছিল, সেগুলোকে সে আশ্রয় করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। নিজের জীবনের অতীতের দিকে সে একবার ফিরে দেখল। সেখানে বিকলতার চক্ৰসূরির তপ্ত ধীরগতি। সমস্ত জীবন-যাপনী এই বিকলতার অশ্রুতের উপর আশ্রয় কল্পনা দিয়ে যে সিংহাসন সে সাজিয়েছিল, অসুঠের নিষ্ঠুর পরিণামে তা ধূলিমাণ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ভাবনার সে একবার ফিরে দেখল—সেখানে সাদা অন্ধকার। সে অন্ধকার ভেদ করে স্মৃতি চলে না। ঘরের ভেতর তখন গান

(৩)

আজি যোর মত হিয়া সাজিয়াছে উম্মাদিনী রাই,
তুই বেন নিষ্ঠুর কানাই !
ঘরে ঘরে হেরি বৃন্দাবন,
বাঁশী শুনি—বিহগ-কুঞ্জন !
বিগতের শব্দ নীলিমাধ
কালিন্দীর তরঙ্গ-খেলায় ।
শৈল-শৃঙ্গ-চূড়া মনোহোতা,
শত-ধাত্তে পীতধড়া-শোভা !
'সখা বলি' আদিকিতে ধাই—
সারা বিশ্ব আমারি কানাই !
কাণ্ডহার লাল হয়ে ডাকে বুকে পীঠিত-কোয়ারা,—
লুই শিরা দিল যেহি দিলকে পিয়ারা !

(৪)

কোথা হ'তে এলে বধু ?—স্থখাইলে সুখ গানে চাও,
আশা দিহে ভাষাটি সুখাও !
কোথা—কতদূরে সে বিশেষ ?
কোথায় আরম্ভ, তার শেষ ?
বল সে কি আসে, না অধার ?
অশান, না হৃতিকা-আধার ?

কেন ঘাওরা-আশা কিরে-কিহে,
যে যোয়ার, সেও যোরে কিহে ?—
ও হাসিতে এ যে তরঙ্গিত
শ্রীবনের বিহার-সঙ্গীত !

কাণ্ডহার লাল হয়ে ডাকে বুকে পীঠিত-কোয়ারা,—
লুই শিরা দিল যেহি দিলকে পিয়ারা !

(৫)

এ মোহিনী কোথা হ'তে শিখে এলে, ও বিদেশী বধু,
ঢেলে দিলে প্রাণে কেন মধু !
কোথা গেছি কৃথা অভিসারে !
ধানের দেবতা দোর ধারে !
গৌরমাসী চন্দ্রাতপ ঘরে,
মলয় চামর আঁম করি,
মধুকর দুইলী বাজায়,
বজ্র কুল বাসর সাজায়,
এস প্রাণে, পরাণের বন,
লাগে গরে' বাক্ ত্রিভুবন !
কাণ্ডহার লাল হয়ে ডাকে বুকে পীঠিত-কোয়ারা,—
লুই শিরা দিল যেহি দিলকে পিয়ারা !

দৃষ্ট-কাব্যের উৎপত্তি এবং বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে তাহার রূপ

[ঐগত্যজীবন মুখোপাধ্যায়]

দৃষ্ট-কাব্য বলিলেই, উহা কি, এবং কিরূপেই বা উৎপন্ন
হইল, তাহা জানিবার জন্য বর্তমান মনো এক কৌতূহল
জন্মে ; এবং সেই কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া মানব উহার
বাচ্যার্থ ও বাচ্যার্থের অর্থবুদ্ধি হইয়া উঠে । বঙ্গবান
প্রবন্ধে মুনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধে দৃষ্ট-কাব্যের উৎপত্তি দেখাইয়া
প্রথমেই উহার বাচ্যার্থ প্রকাশিত করিব ; পরে কিরূপে
বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার রূপ-বিকাশ হইয়াছে, তাহারই

আলোচনার প্রসঙ্গে উহার বাচ্যার্থেরও প্রতিপাদন
করিতেছি ।

মানবের জন্ম-নিহিত বৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে নাট্য-বৃত্তি ও
অনুভব-বৃত্তি নামে দুইটা বৃত্তি আছে । বৃত্তিগুলির ধর্ম
এই যে, ইহারা অজ্ঞাতদারে মানব-হৃদয়ে আপনাদিগের
আধিপত্য বিস্তার করে ; এবং মানবও যন্ত্রনুদয়ের স্তার
তাহাদিগের দাস হইয়া থাকে । নৃত্য, গীত ও বাজ, এই

জিনের সহায়কে নাট্য করে। নৃত্য দেখিবার, এবং গীত ও বাজ তুলিবার যে স্বাভাবিক অভিশাপ, তাহাই নাট্য-বৃত্তি ; এবং এই নাট্য-বৃত্তির প্রেরণায় নৃত্য, গীত ও বাজ—বাহ্য দেখা বা শুনা হইল, মানব-মস্তিষ্কে তাহাদিগের চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাই অমূলক-বৃত্তি। এই বৃত্তি কার্যকারণ-সম্বন্ধে এক বস-সম্পৃক্ত যে, বৃহৎদৃষ্টিতে অনেক সময়ে ইহাদিগকে অস্তিত্ব মনে হয় ; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাদিগের পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। কিন্তু এই বৃত্তির দৃষ্ট-কাব্যের উৎপত্তিমূলক হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতেছি।

জীব-প্রকৃতির পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৈশব হইতে বার্ত্তব্য পৰ্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই জীবকূল নাট্য-বৃত্তির সেবার তৎপর। এই বৃত্তির যোহিনী শক্তি যে কেবল মনুষ্য-জগতে পরিব্যাপ্ত তাহা নহে, মনুষ্যের প্রাণীর মধ্যেও ইহার অভিব্যক্তি দৃষ্টগোচর হয়। দেখা গিয়াছে যে, গীত ও বাজের শক্তিতে মোহিত হইয়া সর্প বা মৃগ সর্প বৈজ্ঞানিক অথবা কিতাবের কৌতুক হইয়াছে। সুতরাং নাট্যবৃত্তি যে ওতপ্রোত ভাবে জীব-জগতে পরিব্যাপ্ত, তাহার আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। পৌরুষাৰ্থ্য সৰ্ব্ব নিবন্ধন অমূলক-বৃত্তিও নাট্য-বৃত্তির অঙ্গাঙ্গী। অমূলক-বৃত্তির ধর্ম এই যে, জীবের চক্ষে বাহ্য কিছু হ্রস্ব ও আনন্দপ্রসূ, তাহার অমূলক-বৃত্তি জীব মৃত্যু-প্রণোদিত হয়, অপরের প্রোচোচনার অপেক্ষা রাখে না। অ্যারিস্টটল এই বৃত্তির সার্ব-জনীনতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “মানব-জগতের অমূলক-বৃত্তি-প্রকৃতি স্বভাবজ এবং শৈশব হইতেই পুষ্টিত। অমূলক-বৃত্তির আনন্দ সর্বত্রাতি সর্বকালে সদভাবে অমূলক করে।” • শিশু মাতৃকোক্ষে শায়িত থাকিরাই মাতার হর্ষোৎসাহ অকল্পিত-সহকারে প্রে-সম্ভাবণ, স্রাস্তা-ভগিনীর আদর-আপ্যায়ন এবং কোন উদ্দিষ্ট বস্তু নিকটবর্তী করিবার আনন্দিক কৌশলদি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিয়া, শিশু-মহা হইতেই সেই সকল প্রদর্শিত বাচনিক ও আনন্দিক অমূলক-বৃত্তি আপনায় ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর বিরাট আপনায় নয়ন ও মনের প্রীতিপ্রদ বাহ্য কিছু দেখে ও শুনে, তাহারই অমূলক-বৃত্তি প্রবৃত্ত হয়। নাট্য-বৃত্তির মত অমূলক-বৃত্তিও প্রত্যাব মনুষ্যের প্রাণীর মধ্যেও পরিচালিত হয়। পক্ষীশাবকের উজ্জ্বল-চোরা ও তাহার অশ্রু-মধুর কাকলি যে তাহার মাতাপিতার উজ্জ্বল-নিরতি ও লক্ষ্যলিপ্ততার অমূলক-বৃত্তি সংঘটিত হয়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা হইতে পারে।

মানবের এই অমূলক-বৃত্তি সময়ে-সময়ে একপ্রকার প্রবল হইয়া উঠে যে, যখন সেই মানব অপর কোন মানবের ভাব বা অবস্থার সংঘর্ষে আসিয়া তন্ময়চিত্তে তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে, তখন মনুষ্যের ভ্রম সেই পর্যবেক্ষিত ব্যক্তির ভাব বা অবস্থার অমূলক-বৃত্তি ভাবতরঙ্গী নিজের অভ্যন্তরে তাহার বৈজ্ঞানিক-মতো প্রবেশ করিয়া থাকে। কখনও বা একপ্রকার হয় যে, ভাবপ্রবণ মানব আপনায় পারি-পার্শ্বিক সমাজের কোন এক উন্নত ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া, সেই আদর্শমূল্যবাহী ভাবের অমূলক-বৃত্তি করিয়া, আপনায় মনোবাহিনী তাহার চিত্র চিত্রিত করেন; এবং সেই অমূলক-বৃত্তি মানসী প্রতিমাই ক্রিয়াশীল হইয়া জগৎ-প্রাণময়ী হইয়া উঠে। পরে এই প্রাণময়ী প্রতিমা বহুবিধ ঘটনার দ্বা-প্রতিঘাতে চরিত্রবাহিনী হইয়া উপাখ্যান-বস্তুর সৃষ্টি করে; এবং কালে সেই ঘটনাসম্বলিত উপাখ্যানভাগই বহিঃবরণ প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টকাব্য আখ্যা পাইয়া থাকে। এক্ষুণ্ণ প্রত্যাবে ইহাকেই দৃষ্টকাব্যের মনোবিজ্ঞানমূলক উৎপত্তির কারণ (Psychological origin) বলিয়া নির্দেশ করা হইতে পারে। বিধাত-বিদানে দৃষ্টকাব্যের জন্মসম্বন্ধীয় এই চিরন্তন প্রশ্নের তত্ত্বাবহ নাই। সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এ পর্য্যন্ত দৃষ্টকাব্যের তত্ত্ব এই ভাবে নিরূপিত হইতেছে। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে অবয়বের বিচিত্রতা ব্যক্তিগত পারে; কিন্তু জগৎবিশ্বের বৈশিষ্ট্য নাই। নাট্য-অবয়বের বিচিত্রতা আলোচনার ভিত্তিমূল্যমূল্যে হুচিত হয়। যে জাতির মধ্যে দৃষ্টকাব্য বস্তু বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত হয়, তাহার ইহা বস্তু সেহি বস্তু-বস্তুতার ভ্রম নানা শাখা-প্রশাখায় বিধুতি লাভ করিয়া আপনায় হুশীতল ভ্রান্ততলে ও হুশীতল-বিদ্যানে আশ্রিত পাদুর পদপ্রদ অপনোদন করিতেছে; এবং যেখানে ইহা সমাক্রমে আশোচিত হয় নাই, সেখানে উহার কেবলোৎসাহ অবয়ববহিত

• “Imitation is instinctive in man from his infancy; and no pleasure is more universal than that which is given by imitation.”

কৃষ্ণ-ভঙ্গের স্তায় কন্ডালদার হইয়া কাব্যকুমুদমুখতি-পরিঘাত সাহিত্য-কালনের শোভায় অন্তরায় হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান নট-দৃষ্টকার স্কেলে (Schlegel) সাহেব দৃষ্ট-কাব্যের উৎপত্তির অল্পসন্ধান বিষয়ে অল্পকরণ-প্রবৃত্তি হইতে আরও এক পদ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতবোয় তাৎপর্য এইরূপ—“যানবের পৃথক পৃথক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে অল্পকরণীয় অংশগুলি বিভাগ করিয়া লইয়া, সেইগুলিকে চুবকভাবে একতী ঘটনার অঙ্গীভূত করিয়া, সমাজ-চক্রে তাহাদের এককালীন পুনঃ-প্রদর্শনই দৃষ্ট-কাব্যোৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা।”*

পূর্ববর্ণিত বিশ্লেষণের মধ্যে আবার দৃষ্ট-কাব্যের ব্যাখ্যা পরিষ্কৃত দেখিয়াছি। এক্ষণে উহার আভিধানিক এবং আলঙ্কারিক ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহার ব্যাচাৰ্য্য প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালা দৃষ্ট-কাব্যের রূপ-বিকাশ প্রত্যক্ষ করিব।

কাব্যকলাপ্রমুখ সেই গ্রন্থ-বিশেষকেই দৃষ্ট-কাব্য বলে, যে গ্রন্থবলবিত্ত ক্রিয়ার পাত্র-পাত্রিগণ ক্রিয়াসমূহাবিত্ত হইয়া সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে শ্রব্য ও দৃষ্টভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—অবগোষ্ঠিত-গ্রন্থ তাহাই শ্রব্য-কাব্য; যথা—মহাকাব্য, ষষ্ঠকাব্য, কোষকাব্য ইত্যাদি। পুংগুতলে যখন লিখন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন প্রাচীন রীতাহুসারে উল্লিখিত কাব্যাদির আধারন প্রধানতঃ ক্রতি সাহায্যে নিম্নরূপ হইত। যদিও মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পরও পুর্বেক কাব্যাদির পঠন-ক্রিয়াও সম্পাদিত হইতেছে, তথাপি উহার আশ্রয় পঠ্য তাহাদের প্রাচীন শ্রব্য নামে অভিহিত আছে। কিন্তু যে কাব্যের শ্রবণ বা পঠন ব্যতীত দর্শনেরও প্রয়োজন হয়, তাহাই ব্যাচাৰ্য্যগত দৃষ্টকাব্য। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ দৃষ্টকাব্যের বিবিধ রূপ কল্পিত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু ইরানী, উর্দুভাষের অধিকাংশই অপ্রচলিত; এবং প্রবন্ধ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট না থাকায় পাদমীকার কেবল উহাদিগের

নামোদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।† অবলম্বিত ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার অল্পকূল কার্যাবলীর সম্পাদন-পদ্ধতি অল্পদূরে রূপের পার্থক্য দৃষ্টিতে হয়। আকারগত পার্থক্য বিস্তারিত থাকিলেও নাট্যার্থ গত পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ ক্রিয়াসমূহাবিত্ত বিষয়ের সম্পাদনরূপ মূল স্বত্ব এবং সাধারণতঃ সেই মূল স্বত্ব কি-কি উপায়ে এবং কি-কি পদ্ধতিতে কল্পিত হয়, তাহা সকল দৃষ্ট-কাব্যেই একরূপ।

সংস্কৃত দৃষ্ট-কাব্যের বিবিধ প্রকারভেদ ও রচনা-রীতি বাঙ্গালা দৃষ্ট-কাব্যে নাই। উপাদানের দৃষ্টত্ব প্রমুখ বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-চিকিৎসাবিশেষের সহায়কূর্তির অভাব ঐরূপ ক্রুর কারণ নহে। বরং ছইচাষিজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকের সংস্কৃত দৃষ্ট-কাব্য ব্যতীত, তৎকালীর অধিকাংশ দৃষ্ট-কাব্যই অধুনাতন উচ্চ প্রকৃতির বাঙ্গালা দৃষ্টকাব্য অপেক্ষা অনেকাংশে শোভাহীন। ঐ ক্রুর কারণ অন্তরঙ্গ; এবং তাহা শৈশব-সাহিত্যের ইতিহাসের চিত্রস্তম্ভে প্রকারে হেতু-ভূত। যদিও বাঙ্গালা দৃষ্ট-কাব্য এখন মান্য রতনস্তরে সমৃদ্ধ হইয়া যুগভঞ্জীর আবহেরে সামগ্রী হইতে চলিয়াছে,—তথাপি ইহা সর্বদা তৈশোরের দীপ্য অতিক্রম করিয়াছে। অল্প-সঙ্কটগার বশবর্তী হইয়া স্বাধীনচেতা বালক যেমন নামরূপ ঘটনা-সংঘাতে আপনার জ্ঞান সঞ্চয় করে, বাঙ্গালার দৃষ্ট-কাব্যও সেইরূপ প্রাচীন কালের সংস্কৃত নাটক এবং বর্তমান কালের ইংরাজি নাটক এতদ্ব্যতিরেকে সংঘর্ষে আসিয়া জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হইতেছে। এই অবস্থায় যদি কোন বাঙ্গালা নাট্যকার প্রাচীন আলঙ্কারিকবিশেষের সহায়কূর্তি হারাইবার আশঙ্কায় আপনার দিগন্তপ্রসারী স্বাধীন কল্পনাকে নিয়ম বেটনীর বিবর্তীভূত করেন, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার চিরন্তনে বৈভবহীন হইবে। বাংলা-কালই জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট সময়। বাণেশ্বর উগ্ৰ বীজ যৌবনে অঙ্কুরিত হইয়া প্রোঢ়ে বিশাল বনস্পতির আকার

* ‘One step more was requisite for the invention of the Drama, namely, to separate and extract the imitative elements from the separate parts of social life and to present them to itself again collectively in one mass.’

† সত্যতঃ—নাটক, প্রবন্ধ, তান, যামোশ, সমবকার, চিত্র, ইহাঙ্গ, অক্ষ, প্রহসন, বীথী, নাটক, জোটিক, গৌরী, হটক, নাট্যরাসক, প্রহসন, ইলাশ, কাব্য, প্রেম, বালক, সঙ্গোপক, ঐগিত, পিত্তক, বিশাখিকা, মুগ্ধিকা, প্রকরণী, হরিস, তানিক।

ইংরাজি—Mystery, Miracle, Morality, Interlude, Tragedy, Comedy, History, Pastoral, Melodrama, Farce,

ধারণ করে। কিন্তু বাংলা অর্জিত জ্ঞানরাশি পাছে যৌবনের উদার বৃত্তিনিচয়ের বশীভূত হইয়া বিপথগামী হয়, সেইজন্য কাব্য-শাসন সূত্র হইয়াছিল। বাংলা নাট্য-কারগণ যে কাব্য-শাসন একেবারেই মানিবেন না, তাহা নহে; তবে দৃশ্য-কাব্যের বালাবদ্বার জ্ঞানার্জনের ব্যাঘাত হইবার ভয়েই ঐ বিবরে ততটা মনোযোগী নহেন।

বাংলা দৃশ্য-কাব্যের এই শৈশবকালে, কাব্যজ্ঞের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধিত হইবার সময়ে, উৎসব প্রকারভেদে সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু, বৈদেশিক নাট্য-প্রভাব-অনিত ক্রটির পরিবর্তনও বর্তমানে কালের বাংলা দৃশ্য-কাব্যগুলিকে প্রাচীন আনন্দাত্মিকগণের অননুমোদিত পথে কণ্ঠকটা পরিচালিত করিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া যথ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আদিবরণের যে স্রোত প্রবাহিত ছিল, কাল সহকারে সেই স্রোত ক্রীণ হইতে ক্রীণতর হইয়া, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দৃশ্য-কাব্যগুলিকে ক্রমে-ক্রমে গণিত করিয়া তুলিতেছিল। গুংকালীন বৈদেশিক নাটকের নূতন-নূতন রঙ্গের অপূর্ণ প্রভাবে বিমোহিত হইয়া, তাহাদিগের রচনামীতি অবলম্বনপূর্বক, প্রাচীন অর্থাৎ-পতি প্রকার দৃশ্য-কাব্য সমুদ্র মণিত করিয়া, উৎসব

সম্মেলনস্থ উপাধানে যে নাট্য-মন্দির গঠিত হইতাহিন্দু তাহাই বাংলা দৃশ্য-কাব্যের বর্তমান রূপ। রণাধিকারের আরতমো, এবং রণাঙ্গুগম্য উপাখ্যান-বস্তুর বৈচিত্র্যে, বাংলা দৃশ্য-কাব্য নাটক, নাটিকা ও শ্রবণন এই সৃষ্টিদ্বয়ে দৃশ্য-কাব্য-মন্দিরে বিগ্রহ রূপে বিরাজ করিতেছে। অবশেষে পার্থক্য থাকিলেও মূলে পুরোক্ত সৃষ্টিদ্বয় এক।

অথবা বাংলা সাহিত্যের বাবতীর উদ্ভাবের দৃশ্যকাব্য, বাহার ভাবম্রোত মানব-জগতের স্তম্ভীতম প্রদেশে পৌছাইয়া মানবকে জাহারা বর্তমান অবস্থা ভুগাইয়া দেয়, তাহাই নাটক-পর্ধ্যায়ের অস্তিত্বক।- যে দৃশ্য-কাব্যগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু ভাব লইয়া জগৎপ্রাণ করিয়াছে, অথবা বাহার্য্য নৃত্যমীতবহুল এবং কৌশলী-বৃত্তি-সম্পন্ন, তাহাই নাটিকা-পর্ধ্যায়; এবং যেগুলির উপাখ্যান হান্ত, পরিহাস, ও হাস্য, অথবা বাহার্য্য কোন সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গুভূতি (parody) তাহাই প্রহসন-পর্ধ্যায়ভূক্ত দৃশ্য-কাব্য। কিন্তু নাটকে সর্ববিধ উৎকর্ষ অধিক পরিমাণে বিভবমান থাকায়, নাটকই দৃশ্য-কাব্য-জগতের চক্রবর্তী-সম্রাট। উপরিউক্ত সৃষ্টিই বাংলা দৃশ্য-কাব্যের বর্তমান রূপ।

ছবি

[ত্রিপ্রতিপ্রসঙ্গ ঘোষ]

পটের রঙীন ছবি ভূয়েছে কালের কোলে,
 বুকে গুত্তরে পাবে না ধরাই ;—
 প্রাণের শিখা দিলে এঁকেছি দ্বন্দ্ব যে ছবি—
 কেমনে ছুঁনি বস তার ?

পটের সে ছবিখানি হাতের অঁকা যে গুলো—
 প্রেম বিনে প্রাণহীন হায়,
 অমর প্রেমের তুলি এঁকেছে দ্বন্দ্ব যে ছবি—
 হরিতে পারে না কাল তাহ।

দুইখানি বই

মার্কিন যাত্রা

৩

America through Hindu Eyes

[ত্রিভঙ্গর সেন]

বই দুইখানির একখানি যে বাঙ্গালা ভাষায় এবং অপরখানি যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত, তাহা নামে দেখিয়াই মুকুতে পায়া যায়। দুইখানি বইই একজনের লেখা :—তিনি শ্রীকৃষ্ণ ইন্দুদ্রব্য যে সমুদ্রযাত্রা মহাপন। সেযোক বইখানি লেখক মহাপন কেন বাঙ্গালার কোনে নাই, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি যেন নাই, যেওনা যোগ হয় আশ্চর্যক বলে করেন নাই। আশ্রয় সেই কৈফিয়ৎ বিহেই। আমেরিকা মহাসম্প্রদায় করিয়া একজন হিন্দু-সন্তান উক্ত যোগ যথেষ্ট কি সম্বন্ধা প্রকাশ করেন, তাহা সেই যেনের লোকবিশ্বকোষেই সর্বদায়ে শোভান কর্তব্য; তাই তিনি সেযোক বইখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে : আমেরিকার লোকের তাহার পুস্তকখানি সকলে পড়িয়াছেন কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু তাহার ভাষা-ভাৱেরা অর্থাৎ সাংক্ষেপেরা—অন্ততঃ এ যেনের সহযোগেই অনেককেই যে পড়িয়াছেন, তাহা আশ্রয় বলিতে পারি; কারণ কলিকাতার ইংরেজ-সম্পাদক-পরিচালিত, লক্ষ্যভিত্তি সৈনিক-পত্র 'The Indian Daily News' এই ইংরেজী বইখানি আজ্ঞাত তাহাদের পক্ষে ভ্রমণঃ প্রাপ্যহিমা বিহায়েন এবং উক্ত পত্রের সম্পাদক ও অভ্যন্তর ইংরেজী পত্রের সম্পাদকসকল এই বইখানির প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লক্ষ্য ব্যতীত এতটা করিয়াছেন। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ যে সমুদ্রযাত্রা মহাপনঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তিনি 'America through Hindu Eyes' বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবর্তিত করিয়া প্রচার করিতে লোকতঃ, বর্ষতঃ বাধ্য। বিশেষতঃ তিনি যখন 'মার্কিন-যাত্রা' বাঙ্গালার লিখিতা বোধ্য-পতন করিয়াছেন, তখন বাকীটুকু বাঙ্গালার না বলিলে, আশ্রয়। বাঙ্গালান্যায়নের পক্ষ হইতে তাহাকে সহজে অব্যাহতি লাভ করিতে বিধি কেন ?

এবং বই দুইখানির কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দুদ্রব্য বাবু আধাবিলাক কথা করিবেন, আশ্রয় এই দুইখানি বই তুলনার সমানোপমা করিয়া দেখিবেন, বাঙ্গালা অংশকা ইংরেজীতেই তাহার কলম চলিয়াছে ভাল। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবারও একটা 'মার্ট' আছে : সে 'মার্ট' ইন্দুবাবুর ইংরেজী পুস্তকখানিতে খুব সুসিদ্ধায়ে। বাঙ্গালান্যায়নি আর বন্যখানি বাঙ্গালা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সবই হইয়াছে; অর্থাৎ অনেক বিবরণ আছে। তবে মার্কিন-যাত্রা বলিয়া তাহা আরওয়ের সহিত পড়িতে হইয়াছে।

কিন্তু 'America through Hindu Eyes'—সে এক আকর্ষণ বই,—একখানি সর্বসামান্য ভ্রমণ-কাহিনী !

এমন কথা কেন বলিলাম, তাহার কারণ বলিতেছি। সাধারণতঃ যেখানে পাওয়া যায় যে, বাহায়া কোন ভ্রমণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতা থাকেন, তাহায়া সেই ভ্রমণের নাক্তি-মঞ্চের পটভের বিচার লক্ষ্য বিশেষ উদ্ভূত প্রকাশ করেন। এই মার্কিন-ভ্রমণ বা America through Hindu Eyes বইখানিই বকন। সাধারণ যেন লেখক আমেরিকার কথা লিখিতে বলিলে, অথবা যে তিনি লিখিতেন আমেরিকা আবিষ্কারের বিবরণ ইতিহাস; তাহার পর লিখিতেন, আমেরিকার 'আদিম' অধিবাসীদিগের বিবরণ—তাহাদের জুহুদী, তাহাদের অন্তর্ভবনের ব্যবস্থা; তাহার পরই লিখিতেন ইংরাজ-মার্কিনদের আমেরিকার প্রভাববশতের কাহিনী এবং ও হাফের উপনিবেশের বিবৃত্ত বিবরণ; সর্বশেষে লিখিতেন আমেরিকার ভূতাত্ত্বিকের শাখীনতার হৃদয়ের ইতিহাস। এই কথাগুলি লিখিতেই একখানি সাত-আট ভাগের ইতিহাস পড়িত। লোকের বলিত, ঐ খুব ভাল বই হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার ইতিহাসের কোন তথ্যই বা পড়ে নাই। কিন্তু, তাহায়া একবাক্যেই জুলিয়া যান যে, ইতিহাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এক মিলিলে নহে : ইতিহাসে যাহা চাই, ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাহা চাই না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এমন ভাবে লিখিত হইবে যে, তাহাতে পড়ার ব্যবস্থা থাকিবে না, অতঃপর পাঠ্যতা প্রকাশ থাকিবে না, আনন্দময়ক বাস্তবতার থাকিবে না;—অতঃপর যেনের কথা বলা হইতেছে, তাহার সর্ববিষয়ের একটা সম্পূর্ণ হৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে সমুদ্র ভ্রমণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দুদ্রব্য বাবুর পুস্তকে আশ্রয় তাহাই দেখিতে পাইলাম। কোন ইতিহাস নাই, কোন পুস্তককাহিনী নাই, কোন ব্যবস্থা নাই। লেখক মহাপন করেকট প্রত্যক্ষ ব্যাপার—অতি সাধারণ কথা হাসিতে-হাসিতে সোজা ভাবে বলিয়া দিয়াছেন, আর তাহাতেই সঙ্গ বিবরণ সুসিদ্ধায়ে উঠিয়াছে :—আমেরিকা যেন এবং সেই যেনের অধিবাসীদিগকে তিনিবার, জাতিবার, সুবিধায় কিছুই বাকী থাকে নাই। ইহারই নাম বৃত্তান্তি। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, ইন্দুবাবুর বই সত্য-পত্রই অতি উপায়ের ভ্রমণ-কাহিনী হইয়াছে। উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত এই বইখানি হইতে নিতে পায়া যায়; কিন্তু তাহা বলিতে

গোলে সমগ্র বইখানিই অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। সে তার প্রবন্ধকার মহাশয়ের ঠগর স্তম্ভ করিয়া আবার দুই একটীমাত্র বুঝে দিব।

আমেরিকার বাইবার সময় চাহালের টিকিট তিনিবার সময় বাড়িসিগকে একখানি ছাপান কাগজে বিনমিখিত বহুগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়; যথা—(১) তমিক সময়, (২) সম্পূর্ণ নাম, (৩) বয়স, (৪) পুত্র কিম্বা স্ত্রী, (৫) বিবাহিত কি অবিবাহিত, (৬) জীবিকা, (৭) নিখিলে পড়িতে গিয়া কি না, (৮) বেরাতোর প্রজা, (৯) জাতি, (১০) দুকরাতোর প্রজা কি না (১১) শেখ বাসহান (১২) বস্ত্র হাব (১৩) গন্তব্য স্থানে বাইবার টিকিট আছে কি না, (১৪) কনিষ্ঠা বা দুকরাতা ব্যক্তিকে অত্র কোন দেশের বাসী কি না, (১৫) নিউ-ইয়র্কে পৌঁছানোরই পথবাস্থানে বাইব কি না, (১৬) বাসী তাহার টিকিট বিক্রয় কর্ণে তিনিয়াছে কি না, তাহা না হইলে যে ব্যক্তি ও সমিতির, ডিউনিগালিস্টার বা দ্বর্গ-মেটের কর্ণে টিকিট ক্রীত হইয়াছে, তাহার নাম, (১৭) বাসীর সঙ্গে ৪০ ডলার কর্ণা বেতু নত টাকা আছে কি না; কম থাকিলে সর্ব-শুদ্ধ কত হুয়া সঙ্গে আছে, (১৮) পূর্বে কোন দিন বৃত্ত হাজে আনিয়াছে কি না; আনিয়া থাকিলে কবে আনিয়াছিল, এবং কোথায় অনুস্থান করিয়াছিল; (১৯) কোন আত্মীয় বা বন্ধু নিকট গাভরাই কণা থাকিলে, তাহার নাম ও ঠিকানা; (২০) কখনও কারাগারে, বহিরাগোণে অথবা পাগলা গায়ে বাস করিয়া থাকিলে, কোথায় বাস করিয়াছে; অথবা অপরের হানে জীবিকা নির্বাহ করিলে তাহা লিখিতে হইবে, (২১) বহু-বিবাহের পক্ষপাতী কিম্বা বহুপত্নীক কি না, (২২) অস্বাভাবিক পক্ষপাতী কি না, (২৩) কোন কার্যে নিদ্রু হইবার প্রস্তাব আছে কি না, (২৪) গায়ে অথবা, (২৫) অস্বাভাবিক বা বহু কি না; হইলে তাহার কারণ কি। এতগুলি প্রশ্নের উত্তর সকলকেই দিতে হইবে,—ইন্দুবাংকও দিতে হইয়াছিল। শুধু ইন্দুবাং কেন, তাহার দ্বিতীয় বাবের সহোদরী কুচবিহারের শ্রীক মহারাজকুমার ভিটর নিত্যোপ নামায় বাহাদুরকেও লিখিয়া দিতে হইয়াছিল যে, তাহার তথ্যলিপি কেবলমাত্র টাকা আছে! এই সময় এসে হইতে আমেরিকা সমস্তে বাহা দ্বিভূতে গাভা বাস, মনটী দীর্ঘ পরিচ্ছেদে তাহার অধিক লিখিবার সম্ভাবনা নাই। ইন্দুবাং এই রকম কতগুলি কথা বলিয়াই আমেরিকার হৃদয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আর একটা ছোট বৃত্তান্ত নাই। আমেরিকার মহিলাদিগের কথা হইতেছে। ইন্দুবাং কেনন হৃদয় ভাবে একটা সোজা কথাতেই পৃথিবীর মহিলাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—
"In Asia, the wife follows the husband; in Europe

they go together; in America she goes ahead," অর্থাৎ—এসিয়ার স্ত্রী স্বামীর পক্ষাবর্ত্তিনী হন; যুরোপে সঙ্গে চলেন; আর আমেরিকায় অগ্রাবর্ত্তিনী হন।" সেই ভ্রত যদিও লেখক যাদু ওয়েল (Max O'rell) বলিয়াছেন—"If I had to be born again, and might choose my sex and my birth-place, I would shout to the Almighty at the top of my voice 'Oh, please make me an American Woman.'" অর্থাৎ—আমার যদি আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং সে সময় পুত্র বা স্ত্রী হইব এবং কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিব, এ সমস্তে যত বিচার অবিকার পাই, তাহা হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা চাহিবার করিয়া বলিব 'ওহ! ভগবান, আমাকে আমেরিকার স্ত্রীমণ্ডল করিয়া দিলে করিত প্রু'।

বই দুইখানির আর অধিক পরিচয় দিতে হইবে না, পাঠকগণ বাঙ্গাল বইখানি একটাকা মূল্যে এবং ইংল্যান্ডখানি নাড়োচরি টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিবেন। এখন লেখক ও সম্পাদক মহাশয়দের ভিত্তি পড়িত নাই। লেখক শ্রীকৃষ্ণ ইন্দুবাং যে মহাশয়ের মহাপ্রাণ প্রদানকার আমেরিকার দান কলিকাতার গিন্নি বিজ্ঞান সমিতির বৃত্তি পাইয়া, ত্রুণি-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য। তিনি আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রুণি বিজ্ঞানের 'কর্ণেণ বিদ্যা-বিজ্ঞান' শিক্ষালয় করেন, এবং বিশেষ সূচীয়া প্রশংসা করিয়া উক্ত উপাধিলাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় বার আমেরিকা ও জগত্ৰ উপনিবেশে গমন করেন কুচবিহারের মহারাজ-কুমার শ্রীকৃষ্ণ ভিটর নিত্যোপনামায় বাহাদুরের সহোদরী হইয়া। এই মহারাজকুমারই ইন্দু বাবু হৃদয় পুস্তকের সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ কুমার বাহাদুর হৃদু দেশ-প্রাণ করিতেই যান নাই,—অথবা তিনি অনেক করিয়াছেন। তিনি ভাব্যকের সমস্তে শিক্ষালয় ও অধ্যয়নের জন্য যান। কুচবিহার ভাব্যকের জন্য এমিড; কিন্তু কুচবিহারে ভাব্যক আমেরিকার ভাব্যক অপেক্ষা ভাল মনে এবং কলনও কম। সেই ভ্রত বঙ্গীয় মহারাজ বাহাদুর তাহার এই পুস্তকে ভাব্যকের চাব সমস্তে অভিভূত সত্ত্ব করিবার জন্য আমেরিকার প্রেরণ করেন।—সত্যি হন ত্রুণি-বিজ্ঞানশিখার ইন্দুবাং। তাহার দুইজনই ভাব্যকের সমস্তে বিশেষ অধ্যয়ন নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বিবরণ বইতে নাই এবং কুচবিহার নামে ভাব্যকের চাবের কতকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, সে সংস্করণে আশা নাই। ভাব্যকের অল্পটী বাহা হইবার হটক, আশা কিন্তু এই ভ্রতকৃত অধ্যয়নের ফলে ইন্দু বাবুর ও মহারাজ-কুমারের লিখিত রচনা-কাহিনী পাঠ করিয়াই পতিভূত হইয়াছি।



স্বরলিপি

কথা ও স্বর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী]

[স্বরলিপি—শ্রীরমেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

মিশ্র কৃত্ত—দাদরা।

আমি কি চাহি ?

সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !

আনন্দ সাগর তার খেলে পদতলে,

কোটি চন্দ্র তারা শিরোপরি স্লে,

বিশ্ব ভুবনের রূপ রত্নমণি,

তাহাতে বিরাজে সে মোর তরঙ্গি !

আমি তাহারে বাহি, আর কি চাহি !

সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !

দূরে থেকে দেখে ভাবে লোকে সবে,

ধীন হীন নেয়ে আমি এই ভবে,

ভরী বাহি কার হাসি মনে মনে,

তাহারা এ স্বপ্ন বুঝিবে কেমনে,

অগতে সবাই চুপে প্রবানী,

আমি শুধু স্তম্বে দিবানিশি ভাসি,

কালাকাল হেথা নাহি, আমি কি চাহি !

সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !

আমার মতন ধনী কেহ নাই,

অনন্ত উল্লাস বাঁধা মোর ঠাই,

রূপের তরঙ্গী প্রেমতে ঢালাই আনন্দ সঙ্গীত গাহি !

আর কি চাহি ?

সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !

মা মা মা | মা গা মা | গা গা গা | গা রা রাসা | রা রা মা | মা মা - পা |

তা ধা রা এ হু খ বু ঙি বে কে ম নে • জ গ তে স বাই •

পা পা ধা | ধা ধা ধনা | সর্গী সর্গী | সর্গী সর্গী | না না না | সর্গী ধা ধগধপ |

হু খে র এ বা নৌ • আ মি তু ধু হু খে দি বা নি শি তা নি • •

মা মা মা | -গরসা রা রগমা | গা রা - ১ | - ১ - ১ - ১ | মা মগা - রসা | রগা • মপা মা |

কা লা কাল • • • হে ধা • • না হি • • • আ মি • • কি • • চা

পা - ১ - ১ | - ১ না না | সর্গী - ১ - ১ | - ১ ধা সর্গী | নধা পধা পা | - ১ - ১ ধা |

হি • • • সে আ মাহ • • • আ মি তাহ • • • • আ

মপা - ধপা - মগরগা | মা - পা মা | পা - ১ - ১ | - ১ - ১ - ১ |

মাহ • • • • • কি • না হি • • • • •

II পা পা নধনা | সর্গী সর্গী সর্গী | সর্গী সর্গী | সর্গী সর্গী | সর্গী সর্গী | গা সর্গী সর্গী |

আ মাহ • • • মত ন ধ নৌ কে হ নাই • • আ ন ত উ নাস •

সর্গী সর্গী না | -সর্গী ধগা -পা | মা মা মা | মা মা গমপা | পা পা ধা | ধা ধা না |

বা ধা বোহ • ঠাই • রু পের ত র নী • • প্রে মে তে চা লা ই

সর্গী সর্গী সর্গী | সর্গী না নসর্গী | ধা - ধগা - ধগা | পা - ১ - ১ | মা - ১ - গরসা | রগা • মা গা |

আ ন ন স ধী ত • গা • • • • হি • • • আহ • • • • কি • • চা

রা - ১ - ১ | - ১ না না | সর্গী - ১ - ১ | নধপা ধা সর্গী | নধা - পধা - পা | - ১ - ১ ধা |

হি • • • সে আ মাহ • • • • • আ মি তাহ • • • • • আ

মপা - ধপা - মগরগা | মা পা মা | পা - ১ - ১ | - ১ - ১ - ১ |

মাহ • • • • • কি • না হি • • • • •

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেই ঘরের সমুখে ভোরের উপরে বসিয়া আশা ও আশা-
সের বস্ন দেখিয়া অচলার কোথায় দিয়া যে দৃষ্টা হই অতি-
বাহিত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছু-
ক্ষণ দূর্য্য উঠিয়াছে। শৈতবের দিনের ধূলি ধুলিত তরুশ্রেণী
কলাকার স্বচ্ছ-মলে দাত ও নির্মল হইয়া প্রভাত-দূর্য্য-
কিরণে কলমল করিতেছে। সিন্ধু হিন্দু রঙ্গপথের উপর
দিয়া বিগত-রেশ পাথু প্রুন্ন মুখে পথ চলিতে হুক করিয়াছে;
কনাচিং হই একটা একাপাড়ী ছোট ছোট বটীর শব্দে
চারিদিক মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; বারে মাকে
রাখাল-বালকেরা গো-মহিরের দল লইয়া অদ্বত ও অদগ্ধ
আখ্যেয় সখের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কোথায়
কোন্ গ্রাম-প্রান্তে যাত্রা করিয়াছে; অদূরবর্তী কোন এক
হুটার হইতে গম-ভাঙা বাতায় শব্দের সঙ্গে মিশিয়া হিন্দু-
হানী গৃহস্থ-বধূর অপ্রান্ত অপরিচিত হ্রদ ভাসিয়া আসিতেছে।
সবতত্ত্ব লইয়া এই যে একটি নুতন দিনের কর্ণ-ব্রোত
তাহার চেতনার ঘীরে ঘীরে গতি-শীল হইয়া উঠিতেছিল,
ইহারই বিভিন্ন প্রবাহে তাহার মুখ, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার
দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোথায় যেন ভাসিয়া দিগন্ত
টিক কিসের জন্ত, কেন সে এখানে এ ভাবে বসিয়া, তাহার
দরদ ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িল জন হই পল্লী-
বালকের বিস্তৃত দৃষ্টপাতে! তাহার আশ্রিত্যের একপ্রান্ত
হইতে শুধু বিস্ময়িত চক্ষে নিঃশব্দে চাহিয়া ছিল। এই
জীবী মলিন পাথশালার প্রাচীন দিনের গৌরবের ইতিহাস
ছেলে ছটার জানা ছিল না; কিন্তু তাহাদের জান হওয়ার
অবধি একদল বিশিষ্ট অস্তিত্বের সমাপন যে এ গৃহে কখনো
ঘটে নাই, তাহাদের নীরব চোখের চাহনি সে কথা স্পষ্ট
করিয়া অচলকে জানাইয়া দিল। পুর ভাঙিয়া নিত্য-
নিবনিত খেলা করিতে আসিয়া আত্ম সহসা এই আশ্চর্য্য
মাপার তাহাদের চোখে পড়িয়া গেছে।

অচলা চমকিয়া উঠিয়া পাড়াইয়া বোধ হয় কিছু প্রের
করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ছেলে ছটা নিমিষে অন্তর্ধান
হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িল, আর
দৃষ্টা হই পূর্বে সেই যে সুরেশ কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া
পানের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে আর দেখা দেয়
নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সে একাকী কি করিতেছে, জানিবার
জন্ত সে তখন ঘীরে ঘীরে অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের সমুখে
গিয়া উপস্থিত হইল। এবং অবশেষে কবালের ভিতর হইতে
কোন প্রকার সাদা-পদ্ম না পাইয়া সে মিনিট হই চুপ
করিয়া থাকিয়া তখন আত্মে আত্মে দ্বার ঠেলিয়া সাহসেই
যাত্রা দেখিতে পাইল, তাহাতে একই কালে মুক্তির তীব্র
আবেগে ও বিকট ভয়ে কণকালের নিমিত্ত তাহার সব
বেদ-মন যেন পাবাণ হইয়া গেল। বরটা অন্ধকার, শুধু
ওদিকের একটা ভাঙা জানালা দিয়া থানিকটা আলো
চুকিয়া ঘরের উপর পড়িয়াছে। সেইখানে সেই আলো-
আঁধারের মধ্যে একান্ত অপরিচ্ছিন্ন ধূলা-বাণির উপরে
সুরেশ চিং হইয়া শুইয়া আছে। তাহার গারে তখনও
সেই সব জামা-কাপড়, শুধু কেবল খোলা ব্যাগটার ভিতর
হইতে কতকগুলো ব্রিন্দ-পত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

চক্ষের পলকে তাহার শেখ কথাগুলো অচলার মনে
পড়িল। মনে পড়িল, যে ভাঙার, সে শুধু মাতৃঘের জীবনটা
ধরিয়া রাখিবার বিপ্লবই শিখিয়াছিল তাহা নয়, তাহাকে
নিঃশেষে বাহির করিয়া দিবার কৌশলও তাহার অবিদিত ছিল
না। মনে পড়িল, মিথাক্ষণ তুলের জন্ত তাহার সেই উৎকট
আত্মগোপন; মনে পড়িল, তাহার সেই বিদার চাপরা, সেই
আশ্বাস দেওয়া,—সর্বোপরি তাহার সেই বারবার প্রায়শ্চিত্ত
করার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত;—সদ্যই এক সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে
যেন ওই অবলুপ্তিত মেঘটার কেবল একটি মাত্র পরিণামের
কথাই তাহার কাণে-কাণে করিয়া দিল। সেই খানে

সেই দ্বার ধরিয়া সে ঘরের ঘরে বসিয়া পড়িল,—তাহার এমন সাহস হইল না যে আর ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু এইবার ওই অচেতন সেকটার প্রতি চাহিয়া তাহার হই চকু কাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। যে তাহারই জন্ত এতবড় দুর্নিবের বোঝা মাথায় লইয়া হতভাগ্যে এমন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরূপ তাহার বহু শুভচরিত্র ভোক, তাহাকে মার্জন্য করিতে পারে না এতবড় কঠিন দ্বার সংগরে অগ্নি আছে।

এবং আজই প্রথম তাহার কাছে তাহার নিম্নের অপরাধও হুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। মুরেশের সহিত সেই প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সেদিন পর্যন্ত বহু কিছু জামনা বাসনা, বহু ভুল-ত্রাস্তি, বহু মোহ, বহু ছন্দা, বহু আগ্রহ-আবেগ উত্তরের মধ্যে দিয়া বহিয়া গেছে, সমস্ত একে একে কিরিয়া কিরিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার নিম্নের আচরণ, তাহার পিতার আচরণ—অকস্মাৎ সর্বত্র শিররিয়া মনে হইল শুধু কেবল নিম্নের নয়, অনেকের অনেক পাতকের শুভ-তার বহন করিয়াই আজ মুরেশ যে বিচারকের পদপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সে নিশ্চয়ই মুখ বুজিয়া সমস্ত শান্তি স্বীকার করিয়া লইবে, কিংবা একটি একটি করিয়া সকল দুঃখ সকল অভিযোগ ব্যক্ত করিয়া তাহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে।

ওই লোকটির সংসার উপভোগ করিবার অনেক সাম-সরঞ্জাম, অনেক উপকরণই সঞ্চিত ছিল, তথাপি এই যে নীরবে, সেন্সাভ্য আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত পরিভোগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহার গভীর বেদনা অশোকে আজ কিরিয়া কিরিয়া বিছ করিতে লাগিল। সে যে বর্ষাধি প্রাণ দিয়া ভাসখাশিরাছিল, সে কথা আজ ওই সুতীর সম্মুখে ঠাঁড়াইয়া প্রসূ করিবার, অবিশ্বাস করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না।

আবার তাহার হই গও বাহিরা দরদার ধারে অস্ত্র বহিতে লাগিল। গড রায়ে পাড়ীর মধ্যে তাহাদের বিস্তার কঠিন-কটু কথা, বিস্তার শরৎশরৎ জায়-অভ্যয়ের বিতর্ক হইয়া গেছে। কিন্তু সে সকল যে কত বড় অর্থহীন প্রমাণ, অচলা তখন তাহার কি ভাবিত। ভালবাসার যে ভাবিত

নাই, ধর্ম নাই, বিচার-বিবেক ভাল-মন্দ বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে সে যে এই সব সমা-জের চরিত-গড়া আইন-কাহনের অনেক উপরে, এ সকল বিধি-নিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে ঠাঁড়াইয়া আজ এ কথা সে অবশ্যই করিতে বেমন করিয়া ?

অচলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, সহসা তাহার হৃৎকর ভিতরটা হাঁৎ করিয়া মনে হইল, মৃতসেধটা যে একটু-খানি নড়িয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই একটা অসুস্থ আঁতরণের দকে মুরেশ পাশ কিরিয়া গুইল। সে মরে নাই,—কীভাবে আছে;—একটা প্রচণ্ড আগ্রহ-বেগে অচলা ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে পড়িল এবং তখন-কর্তে ডাকিয়া কহিল, হুগেণ বাবু ?

আজ্ঞান গুনিয়া মুরেশ হুই আরক্ত চকু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

অচলাও আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু অম্বা বাশোক্ষাস তাহার কর্তব্যে করিয়া অস্ত্র আকারে হুই চকু দিয়া নিরস্তর করিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হুদুর্ভ পূর্বের অস্ত্রের সহিত এ অস্ত্রের কতই না প্রভেদ !

অথচ তাহার সকল চিন্তার মধ্যে যে চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সন্ধাননে ঠাঁড়া বিতেছিল, তাহা ইহার বাস্তব দিকটা। এই অজানা অপরিস্রুত স্থানে মুরেশের মৃতসেহ লইয়া সে কি উপায় করবে, তাহাকে ভাবিবে, তাহাকে বলিবে—হয় ত অনেক অস্বীকৃত্যের আশোচনা, অনেক স্নেহসিত প্রসূ উঠিবে,—সে তাহার কাহাকে কি জবাব দিবে, হয় ত পুলিশ টানাটানি করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া আনিবে,—সেই সকল অনাগত প্রকল্পতার সম্মার তাহার সমস্ত বেহ-মন যে অন্তরে অন্তরে কিরূপ শীতল, কিরূপ স্নিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সমস্তটা বোধ করি সে নিম্নেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নাই। এখন সেই বিপদের অপরিসেহ লাহনা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাইয়া তাহার কান্না বেদ আর বাধিতে চাহিল না, এবং সে যে মরে নাই, শুধু ইহাতেই তাহার প্রতি অচণার সমস্ত দ্বার কানার কানার কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু এখন এই ভাবে কাটিলে মুরেশ ঘরে ঘরে কিজালা করিল, কীদম কেন অচলা ?

অচলা ভাণ্ড-কণ্ঠে বসিয়া উঠিল, কেন তুমি এমন করে 'ভরে' রইলে? কেন গেলে না? কেন আমাকে এত ভয় দেখালে?

তাঁহার কণ্ঠস্থরে যে বেহা উঘেলিত হইয়া উঠিল, তাহা এমনই করুণ এমনই মধুর যে শুধু হৃৎকেশের নহ, অচলার নিজের মধ্যেও কেমন এক প্রকার ঘোষের সঞ্চার করিল; সে পুনরায় কহিল, তোমার যদি এতই ঘৃণা পেয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আমিও ওদিকের বড় ঘরটা পরিষ্কার করে বাথোক কিছু পেতে তোমার একটা বিছানা বৈরি করে দিতে পারতুম। ট্রেনের সময় হতে ত চের পেরি ছিল।

হৃৎকেশ কোন জবাব দিল না, শুধু বিগলিত ঘোষে স্থির হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া অচলার ডান হাতখানি তুলিয়া লইয়া নিজের উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিয়া কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ধোঁচন করিল।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, এ যে ভয়ানক গরম। তোমার কি আর হরছে না কি?

হৃৎকেশ কহিল, 'হঁ'। তা' ছাড়া এ আর সন্ধ্যা সারবে বলও আমার মনে হয় না। বোধ হয় টাই—

অচলা হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া শইল, এবং প্রত্যুত্তরে তাঁহার মুখ দিয়াও এবার কেবল একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই পড়িল। তাঁহার উঘেলিত সমস্ত প্রেহ-মমতা এক মুহূর্ত্তে মমিয়া বেন পাথর হইয়া গেল। সহ করিবার যৈখ্যে পরিবার তাঁহার যা কিছু শক্তি ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া সে স্থির হইয়া আজিকার বেলাইকু গাড়ীর দ্বার আগেকা করিয়া থাকিবে, ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু এই অচিন্তনীয় ও অত্যাশিত-পূর্ব্বক বিপদের যেহে তাঁহার আশার ক্ষীণ রন্ধি-রোখাইকু এখন নিম্নে অস্তিত হইয়া গেল, তখন দুহু ভিন্ন ভিন্ন মনে আর প্রার্থনার বস্তু; তাঁহার বিতীর রহিল না।

ইহাকে এই ভাবে এখানে একাকী ফেলিয়া যাওয়ার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিল না; কিন্তু এই বাহ্যার পীড়ার দর্শন প্রচার্য দায়িত্ব, সমস্ত স্তব্ধতার তাঁহার মাথা পড়িল, তাহাকে লইয়া এই অপরিসীম স্থানে সে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাংখ্য ভিক্ষা চাহিবে, কি

পরিচয়ে মানুষের সমুদ্রভূতি আকর্ষণ করিবে, অহমিশ কি অভিনয় করিবে,—এই সত্যল চিন্তা বিজ্ঞাষণে তাঁহার মাথার প্রবাহিত হওয়ার সে ছুটিয়া পলাইবে, না ডাক ছাড়িয়া কামিবে, না সম্মোহে মাথা কুটিয়া এই অভিশপ্ত মৌরবের পালাটা হাতে-হাতে চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহার কোনটাইই বেন কুল-কিনারা পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেমিন ট্রেনসন হইতে কিরিবার পথে কিছু কিছু জলে ভিজিয়া কোথারবাবু ৭৮ মিনি গাঁঠের বাত ও শব্দিকরে শব্দগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কস্তা-সামান্যতার কুশল সন্ধ্যার অভাবে শান্তিশর চিকিত হওয়া সবেও তিনি কলকাতার বন্ধুকে একখানা পোষ্টকার্ড লেখা ভিন্ন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার জবাব আসিয়াছে। কেহই আসে নাই, এবং তিনি কাহারও কোন খবর জানেন না এইটুকুই খবর দিগছেন। ছদ্ম করটি কোথারবাবু বার-বার পাঠ করিয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু চন্দ্রবার কাঁড়ে। ঘন-ঘন হুঁতে লাগিলেন। তাঁহারের কি হইল, কোথায় গেল, সন্ধ্যারের দ্বন্দ্ব তিনি কাহারে ডাকিবেন, কোথায় চিঠি লিখিবেন, কাহার কাছে ভিক্ষায়া করিবেন, তাঁহার কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সত্যল আশ্রয়-বিপদে যে ব্যক্তি কাহ-মন দিয়া সাহায্য করিত, সেই হৃৎকেশও নাই, সেও সঙ্গে বিরাছে!

ট্রিক এম্মিন সময় বেহারা আসিয়া আর একখানি পত্র তাঁহার হৃৎকেশে রাখিয়া দিল। কোথারবাবু কোনমতে নাকের উপর চন্দ্রা-খানা তুলিয়া দিয়া বাহু হাতে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, চিঠি তাঁহার কস্তা অচলার নামে। ঘোষলি হাতের চন্দ্রাকার স্পষ্ট লেখা। এ পত্র কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, জানিবার আরাহে পরের চিঠি খোলা-না-খোলায় প্রবণ ও তাঁহার মনে আসিল না, তাড়াতাড়ি বাসখানা ছিড়িয়া ফেলিয়া প্রথমেই লেখিকার নাম পড়িয়া দেখিলেন লেখা আছে, 'তোমার যুগল।' তাঁহার পরে এখানিও তিনি আভ্যোপান্ত বার-বার পাঠ করিয়া বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চন্দ্রা

মোছার কাজে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল তাহা অসদীশ্বর জানিলেন। বহুকণে চন্দ্রা পরিষ্কারের কাণ্ডটা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় তাহা বধাহানে স্থাপিত করিয়া আর একবার চিত্তিখানি আগাগোড়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণাল প্রীর সন্তুষ্টি, কমা, ধৈর্য প্রভৃতি সহজে তীব্র-মধুর বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছে—

সেখা তোমার সবচেঁড়ি কিছুই বলেন না সত্য, এবং জিজ্ঞাসা করিলেও ভগ্নানক সম্ভার হইয়া উঠেন বাটে, কিন্তু আমি ত বেগুনামুখ, আমি ত সব বুঝিতে পারি! আজ্ঞা সেখদি, বগড়া-বিবাদ কাহার না হয় তাই? কিন্তু তুমিই বলিয়া এত অভিমান! তোমার স্বামী তাঁহার শরীর-মনের বর্তমান অবস্থার না বুঝিয়া রাগ করিতেও পারেন, অধীর হইয়া অস্তায় করিয়া চলিয়া আসিতেও পারেন, কিন্তু তুমি ত এখনো পাগল হও নাই যে, তিনি বাই বলিতেই তুমি সন্ধ্যাবে মায় দিয়া বলিলে আজ্ঞা তাই হোক, বাও তোমার সেই বনবাসে। তাই আমি কেবলই ভাবি, সেখদি, কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমার এই মৃত-কম স্বামীটিকে এত সহজে এই মনের মধ্যে বিসর্জন দিলে, এবং দিয়া স্থির হইয়া এই সাত-আট দিন বসি কেন, সাত-আট বৎসর নিশ্চিন্ত মনে বাপের বাড়ী বসিয়া রহিলে! সত্য বলিতেছি, সেদিন যখন তিনি জিনিস-পত্র লইয়া বাড়ী চুকিলেন, আমি হঠাৎ চিনিতে পারি নাই! তোমাধের কেন বগড়া হইল, কবে হইল, কিসের জন্য পক্ষিমে বাওরার বহলে তিনি যেনে চলিয়া আসিলেন, এ সকল আমি কিছুই জানি না এবং জানিতেও চাই না। কিন্তু আমার মাথার দিবা রহিল, তুমি পত্র পাঠমাত্র চলিয়া আসিলে। জানই ত তাই, আমার খাতকীকে ছাড়িয়া কোথাও বাইবার বো নাই। তবুও হয় ত আমি নিজেই গিয়া তোমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিতাম, যদি না সেজন্য এতটা অমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। একবার এম, একবার নিঃশেষ চোখে ঠাকে দেখ, তখন বুঝিবে এই অসমস্ত মান করিয়া কতদূর অন্তায় করিয়াছে! এ বাড়ীও তোমার, আমিও তোমার, সেই ভর এ বাড়ীতে আদিত কিছুমাত্র স্থিরা করিবে না। তোমার পথ ছাড়িয়া রহিলাম। শ্রীচরণে মৃত কোটা প্রণাম। আর একটা কথা। আমার এই পত্র লেখার কথা সেজন্য এখন

চিন্তিতে না পান, আমি লুকাইয়া লিখিলাম। ইতি, তোমার মৃণাল।

পত্র শেষ করিয়া মৃণাল একটা পুনস্ত দিয়া কৈক্লিৎ দিয়াছে যে, যে ভেতু মাখার অমুগ্ধবৃত্তে তুমি একটা বেলাও হুয়েশবাহুর বাটার থাকিবে না আমি, তাই তোমার বাপের বাটার ঠিকানাতেই লিখিলাম। তবুলা করি এ পত্র তোমার হাতে পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

কোমারবাহুর হাত হইতে চিত্তিখান্না খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, তিনি আর একবার সূত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চন্দ্রা মোছার কার্যো ব্যাপ্ত হইলেন। এটুকু বুঝা গেছে মহিম কল্লপপুত্রের পরিবর্তে এখন তাহার গ্রামে রহিয়াছে, এবং অচলা তথায় নাই। সে কোমার, তাহার কি হইল, এ সকল কথা হয় মহিম জানেন না, না হয় জানিয়াও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ মনে হইল হুয়েশই বা কোমার? সে যে তাগাধের অতিথি হইবে বলিয়া সঙ্গ লইয়াছিল! সে নিশ্চয়ই বাটাতে ফিরে নাই, তাহা হইলে একবার মেধা করিতই। তাহার পরে পিতার সূত্রের মধ্যে যে আশঙ্কা অকস্মাত সূত্রের মত আসিয়া পড়িল, সে আশঙ্কাত আর তিনি সোজা থাকিতে পারিলেন না, সেই আরাম-কোমারটার হেলান দিয়া পড়িয়া হুটচুৎ সূত্রিত করিলেন।

দুঃখবোলা দাসী হুয়েশের বাটী হইতে সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাহার পিসিমা কিছুই জানেন না। কোন চিঠি-পত্র না পাইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছেন।

যায়ে নিকৃত শরন-কক্ষে কোমারবাহু প্রকৌপের আলোকে আর একবার মৃণালের পত্রখানি লইয়া বলিলেন। ইহার প্রতি অক্ষর তর-তর করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, যদি ষোড়াইবার মত কোথাও এতটুকু বায়গা পাওয়া যায়। না হইলে যে তিনি কোমার গিয়া কি করিয়া মুখ লুকাইবেন ইহা জানিতেন না। চিরদিন পুরুষাভুতকমে কলিকাতাবাসী; কলিকাতার বাহিরে কোথাও যে কোন কল্পলোক বাচিতে পারে এ কথা তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। সেই আশঙ্ক-পরিচিত স্থান, সমাজ, চিরদিনের বন্ধুগোষ্ঠ সমস্ত হইতে বিচ্যূত হইয়া কোথাও অজ্ঞাতবাসে যদি শেষ জীবনটা অতিবাহিত করিতেই হয়, তবে সেই ভ্রমস্

দুর্ভাগ্যবশত যে কি করিয়া কাটিবে, সে তাঁহার চিন্তায় অতীত। এবং কতক হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোকা তাহার রূপ, যুদ্ধ শিকার অশ্রু শিরে ফুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবে, তাহাও তাঁহার চিন্তায় অতীত।

সারা রাত্রির মধ্যে একবার তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না; এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অশ্রুর বাধাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আল বখন নিদ্রের বলিয়া

মুখ চাহিতে চিনিয়াই আর তাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নিজীবের মত শব্দাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘুণা বোধ হইল। এতবড় বেদনাকেও আল তিনি শাস্ত্রযুগে যুক লুকাইয়া অন্তরিনের মত বাহিরে আনিলেন, এবং রেলগাড়ের টেম্বেরে লজ্জা গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জানা-কাপড় শুকাইয়া লইতে বেহারাকে আদেশ করিলেন।

আলোচনা

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বোষ]

সে দিন সরকারী কর্মশিলা ইন্সটিটিউটের বার্ষিক আধিবেশনে, পুরস্কার-বিতরণ-সভার সার ঐক্য রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই মহাশয় যে কথাস্তম্ভ বলিয়াছিলেন, তাহা 'ভারতবর্ষের' পারিক-পারিকাগণের জানিয়া রাখা উচিত বলিয়া মনে করি; সেই লজ্জা এবার প্রথমেই সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতার আলোচনার প্রস্তুত হইলাম।

সুস্টার অবস্থা বেশ ভাল। ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার লজ্জা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। স্কুলটি যে খুব জনশ্রীর হইয়াছে, তাহার একটা পরিচয় এই যে, গত সেসনের আরম্ভের সময় ২০০ ছাত্র এই স্কুলে ভর্তি হইয়াছিল। কিন্তু চুঃখের বিপরীত, স্কুলের রিপোর্টেই প্রকাশ, বিশেষ বিশেষ বিধরে শিক্ষাদানের লজ্জা উপযুক্ত গুণগণের শিক্ষক ও অধ্যাপক পাওয়া বাইতেছে না। সেইজন্য বোধ হয় আশাহরুপ কল পাওয়া বাইতেছে না। সম্রাতি স্কুল-বোর্ডের পরামর্শে গবর্ণমেন্ট ভারত-সচিব মহোদয়কে এই বিদ্যালয়ের শ্রমিগণের কার্যগতদের লজ্জা ইতিমধ্যে এক্ষেপনাল সার্জিসে একটা পদ পঠন করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এইটা হইলে স্কুলের অবস্থা আরও ভাল হইতে পারে।

পুরস্কার বিতরণ করিবার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া যে হুমকি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, বাঙালীর এই স্কুলে শিক্ষা-প্রাপ্ত হেলোদের বেশ আদর আছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ছেলেরা দারিদ্র্যপূর্ণ কার্যগতের গ্রহণের বোগ্যতা তেমন বেগাইতে পারিতেছে না। সার রাজেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, লোক মনে করে যে, সাহেবেতা তাঁহাদের আপিসে কোন দারিদ্র্যপূর্ণ পদে সহজে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিতে চাহেন না। অধিকন্তু ভারতবাসী এই মত পোষণ করেন যে, বাণিজ্য-বাবসারে লিপ্ত যুরোপীয়েরা তাত্ত্বিক ব্যাপারে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়া থাকেন; সামাজিক জীবনে তাঁহারা দেশবাসীর সঙ্গে সহজে মিশিতে চান না;—সার রাজেন্দ্রনাথও এ কথা স্বীকার করেন। কিন্তু বাবসার-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাহেবেতা ততটা গোঁড়া নন, ইচ্ছাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃঢ় ধারণা। কেন না, তীক্ষ্ণ বাবসার-বুদ্ধির প্রভাবে তাঁহারা এইই বেশ বুঝেন যে, উপযুক্ত ভারত-বাসী পাওয়া গেলে, বাঙালীদের জাহাজ ভাড়া দিয়া উচ্চ বেতনে যুরোপ হইতে কর্মচারী আনা অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যুরোপ হইতে যে সকল কর্মচারী এ দেশের বেসরকারী সাহেবদের বাণিজ্যের আপিসে আদ-গানী করা হয়, তাঁহারা ১৮ বছর বয়সে স্কুলের দেখাপড়া শেষ করিয়া ইংলণ্ডেরই কোন বড় সওদাগরী আপিসে তিন-

চার বৎসর শিক্ষানবীশী করেন। তার পর তাহার ২১-২২ বৎসর বয়সে এদেশে আসিয়া বাহিষ্পূর্ণ পদের তার হইবার যোগ্য হইয়া উঠেন।

ব্যবসার-বাণিজ্য কেহে ভারতবাসীরা কেন যে তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে না, অথচ, যুগোপীয়েরা বেন লক্ষ্যগত ন্যায়ের বশে বাণিজ্য কার্যে প্রবীণ হয়ে উঠে,—এই ধরণের সমস্তর কথা আমরা অন্তর সমস্তর ভাবে আলোচনা করিয়াছি। গত পূজার পূর্বে একখানি কথা-সাহিত্য বিরহক কুমুদপুস্তকে গ্রন্থের নামকের জননী—গৌড়া হিন্দু বাসানী গ্রন্থটির মূখ্য দ্বিতীয় টিক এই ধরণের কথাগুলিই বলাইয়াছি। আজ যুগোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাগুলি তিনিসা আমরা পরম শ্রীতি লাভ করিলাম; বুদ্ধিলাভ, আমাদের ধারণা নিত্যমাত্র ভ্রান্ত ছিল না।

যুগোপীয়েদের যোগ্যতার পরিচয় দিবার পর সার হাজেন্দ্র-নাথ আমাদের অযোগ্যতার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে, আমাদের ছেলেদের অযোগ্যতার প্রধান ও প্রধান কারণ, বাংলা-বিবাহ; এবং দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষার ব্যবস্থার ভ্রষ্ট। কথাগুলি ঠিক। কিন্তু একজন আমরা ছেলেদের ততটা দোষী মনে করি না, ততটা করি তাগাদের অভিভাবকদের—তাদের বাপ, মা, খুঁদা, চোঠা, মামা প্রভৃতির। কারণ, ছেলেরা নিজেরা উপযাচক হইয়া বিবাহ করে না। আমাদের সামাজিক গঠন অনুসারে তাহা করিবার ঘো-ই নাই। বরং আজকালকার ছেলেরা বাংলা-বিবাহে রাজী নহে; অনেক স্থলেই অর্থ-গুরু পিতার ভাড়া-নায় এবং দাতার অশ্রু-ধাঁহর বাধা হইয়া তাহারা বিবাহে সম্মতি দিয়া থাকে।

যুগোপাধ্যায় মহাশয় এই দুইটা বিষয়ের একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের ছেলেদের লগা-রণ শিক্ষা শেষ করিতে তাহাদের বয়স ২১/২২ বৎসর উত্তীর্ণ হয়। তার পর সে কার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে অন্ততঃ এক বৎসরও উচ্চ বাণিজ্য-শিক্ষা লাভ করিতে গেলেও তাহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়া যায়; ততদিনে তাহার দুই একটা ছেলে মেয়ে হয় এবং সে রীতিমত স্কলারে প্রবেশ

করে। তখন আর তাহার কোন সওধাপত্তী আপিসে বিনা বেতনে বা কেবল সামান্য পকেট-খরচা লইয়া দুই বৎসর শিক্ষানবীশী করিবার অবদর থাকে না। এ দিকে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, যে যেমন যোগ্য লোক তারাকে তেমন বেতন দিতে হয়,—যোগ্যতার অন্তরিক্ত বেতন দিতে গেলে ব্যবসা চলে না। বাণিজ্যাগারে উচ্চ-শিক্ষার দৃশ্য তেমন নাই। হুতরাং উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও বাণিজ্যাগারে যেটা সাহিনার দাবী করা চলে না। বাণিজ্যক্ষেত্রে সাফলা লাভ করিতে হইলে, সেখানেও রীতিমত হাতে-খড়ি দিয়া কিছুকাল শিক্ষানবীশী করিয়া বাণিজ্য কার্য পরিচালনা শিখিতে হইবে। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত যুবকের পক্ষেও অন্ততঃ দুই বৎসরের কবে এই শিক্ষা লাভ করা যায় না। এইরূপে বাণিজ্য-বিত্তা শিথিয়া মনিবের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলে, তবে লোকে উচ্চ বেতনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবার আশা করিতে পারে।

যুগোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং চর্চিল বৎসর দ্বিতীয় বাণিজ্য-কার্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি বড় চুপ করিয়াই বলিয়াছেন, এই অধীর্ণ কালের মধ্যে তাঁতার ছোট আপিনটিতেই বহু সাংখ্যক কর্মগ্ৰাস্তী উদ্দেশ্যের যুবক চাকুরীর তত্ত্ব দরখাস্ত করিয়াছে। ইদারা সকলেই প্রায় এই একইরূপ দাবী করিয়াছে যে, তাগারা যুগে পরিবারের ভারাক্রান্ত; অন্তঃপ্র তাহাধিগকে চাকুরী দিতেই হইবে এবং বেতনটাও বেন খুব খোটা হয়; নচেৎ তাগাদের পরিবার পালন করা কঠিন চটেবে। ইহার দ্বিত, যুগোপাধ্যায় মহাশয় যুগোপীয়ে এলিট্যাক্টের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, তাগারা এক একটা বড় বাণিজ্যাগারে ৩০ বৎসর শিক্ষানবীশী করিয়া একেবারে কাযের লোক হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে ৪৫ শত টাকা বেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত চইতে পারে। পরিবার পালনের উপযুক্ত হারী আরের যোগ্যতা না করিয়া তাহারা বিবাহের কল্লাও করে না। তাগারা প্রায় ১৫ বৎসর কার্য করিবার পর মাসে ১০০০ টাকা উপার্জন করিয়া থাকে। সার হাজেন্দ্রনাথ বিবেচনা করেন, ভারত-বাসীরাও এইরূপ যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিলে, এইরূপ উপার্জনের দাবী বহুদমে করিতে পারে। এই কারণে তিনি দৃষ্টকপক্ষে কণ্ঠে অর্থ-উপার্জন করিবার দাবী

লাভের পূর্বে বিবাহ না করিতেই পরামর্শ দিয়াছেন। বালা-বিবাহই তাঁহার মতে আমাদের চির-মারিহস্ত্রের মূল কারণ। বিবাহ করিলে, ছেলেপুলে হইলে, মোটা টাকা উপার্জনের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জনের অবসরও থাকেই না; স্বয়ং পরিবার রূপ পেরোয়ার পোড়নে—বা' পাই তাতেই রাণী ভাবে—কে-কোন একটা ধেনম-ভেমন চাকুরীর যোগাড় করিয়া লইয়া জীবনটা নাট করিয়া কেলিতে হয়।

—

দুগুটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির সম্বন্ধে হুই একটা পরামর্শ দিয়া সারসভ্যেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে যে চৌকট উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল বাণিজ্যশিক্ষার্থী নহে, চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালী দৃবকমাত্রেরই পক্ষে প্রয়োগ করা বাইতে পারে, এবং সকলেরই তাহা ধাঙ্গাধা পালন করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। উপদেশগুলির মর্ম এই-রূপ:—(১) শিক্ষানবীশরূপে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিও না; এবং তোমার স্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নহে এমন লোকের অধীনতায় কাজ করিতেও সন্মত হইও না। (২) শিক্ষানবীশীর কালে নিজেই ছাত্র বলিয়া মনে করিবে; শিবিবার ভক্ত আত্মিক আগ্রহ থাকা চাই; কাজের সোজা হইবার জন্য বস্ত করিবে। আকসিরে লুপ্তা পূর্ণমাত্রায় বক্তার হাথিরা চলিবে। (৩) অভিজ্ঞান বর্জন করিতে চেষ্টা করিবে। তোমার উপরের কর্মচারী তোমার ভুল দেখিলে ধ্বি তিরস্কার করেন, তবে তাহাতে রাগ করিও না, কিম্বা তাহার প্রতিধার করিও না। (৪) গ্রিক সময় আগিসে বাইবে; বেশ-ভূষার উপর লক্ষ্য রাখিবে; সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। (৫) বহুবাহুবের সহিত আলোপ কালে বাহুদার সংক্রান্ত গুণ কথা প্রকাশ করিও না। (৬) আগিসে তোমার নিয়মদ্ব কর্মচারীদের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা করিও না; সকলে দ্বাহাতে আগিসের সুখ্যা বাহার রাখিরা চলে; তাহা করিতে তামসিগতে বাগা করিবে। (৭) কার্যে আত্মসিকতা থাকা চাই; পরিশ্রমে কাতর হইও না; খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও আগ্রহ করিও না। (৮) তোমার উচ্চতন কর্মচারীরা যখন তোমাকে কোন উপদেশ দিবে, তখন তাঁদাদের ভুল হইলেও মূখের উপর তাহার প্রতিবাদ করিও না। (৯) ক্রমাগত বেতন বৃদ্ধি তাগাদা করিয়া তোমার চিত্তবিন্দু

বিরক্ত করিও না; উপযুক্ত সময়ের ও অবসরের প্রতীক্ষা করিবে। দ্বাহিত্রা বা পরিবার পালনের গুরুভারের গুহর করিরা বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিবে না। নিম্নমিত ভাবে প্রসুখ্যলে কাজ করিরা গেলে তাহা মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিরা যায় না। (১০) সর্বদা সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিবে; ভুল হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিবে; দ্বাহিৎ এড়াইবার চেষ্টা করিবে না, কিম্বা তোমার ভুলের দোষ অপরের খাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিবে না। উপরওয়ালাকে সন্মম করিবে; বোদাবনী করিবে না। বোদাবনী না করিরাও তোমার অত্যন্ত-অভিব্যোগের কথা জ্ঞাপন করা কর্তন হইবে না। (১১) তুচ্ছ অজুহাতে কাজে কামাই করিও না। (১২) কথা কহিবার সময় বাচালতা পরিহার করিবে। অন্য কথা আসল মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিবে। (১৩) বাবহারে সত্যতা রক্ষা করিরা চলিবে; মনিবের বিশ্বাস দ্বাহাতে দ্বাহাইতে না হয়, ইহাই যেন তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়। সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, কর্মবান্টি ও উদ্ভগম্ব কর্মচারীদের প্রতি আস্থগতা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হইরা থাকে। (১৪) সর্ব শেষে—রাজনীতির সহিত বাণিজ্য মিশাইরা কেলিও না। সাং শ্রীমুক্ত রাজ্যেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালীদের মধ্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অনন্তসাধারণ সফলতা লাভ করিরাছেন। এ সফল উপদেশ তাঁদার ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা-জ্ঞানিত; হুতরাঃ এগুলি কখনই উপেক্ষণীয় নহে।

—

আমাদের বাঙ্গলা বংসরের শেখাশেখি প্রায় সরকারী বংসর শেষ হইরা থাকে। তবুহুসারে আগামী ৩১শে মার্চ একটা সরকারী বংসর শেষ হইরা ১লা এপ্রেল নূতন বংসর আরম্ভ হইবে। প্রতি বংসরের স্ত্রীর এবারও আগামী বংসরের জন্য আর বারের হিসাব ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পেশ হইরাছে। আমরা ভারতীয় ও বাঙ্গলায় বাজেটের ব্যতিক্রিৎ আলোচনা করিব।

—

ভারতীয় আর-বারের সম্বন্ধে আমাদের আলোচা বিষয় বড় বেশী নহে। পূর্বে বংসর এই সময়ে যে পদ্তা আর-বারের তালিকা প্রস্তুত হইরাছিল, বংসরের শেষে প্রস্তুত আর-বারের সহিত তাহার তুলনা করিবার সুবিধা হইরাছে।

এই তুলনায় ফলে দেখা যাউতেছে, গম্ভী হিসাবে বৎসরের শেষে আর হইতে যায় বাকি দ্বিতীয় প্রায় পোনে চারি কোটি টাকা উদ্ধৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত হিসাবে আর অপেক্ষা যায় প্রায় পোনে সাত কোটি টাকা অধিক পাড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যুদ্ধের মরুপ সমর-বিতরণে আর স্বতাবতঃই কিছু বেশী হইয়াছে; এবং জমির খাজনা বত টাকা আদায় হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, ততটা হয় নাই। তবে অনাদায়ী টাকার কিছু এবার আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সে কথা আলোচ্য গম্ভী হিসাবে অনুমানও করা হইয়াছে। তবে ঠিক করিয়া কিছু বলণও যায় না; কারণ আদায় না হইতেও পারে; কারণ, বেশ্যাবাদী প্রতিক্রমের যে হুচনা দেখা যাউতেছে, তাহাতে সরকার বাণিজ্যকে চরিত অনেক হলে খাজনা আদায় এবারও দুগুণিত রাখিতে হইবে।

১লা মার্চি যে বাজেট ভারতীয় বায়ব্য়গত সত্তার শেখ করা হইয়াছে, তাহাতে অনুমান করা হইয়াছে যে, বর্ষ শেষে বেড় কোটি টাকা উদ্ধৃত হইতে পারে। তবে এই অনুমান বর্ষ-শেষে প্রকৃত হিসাবে কারো পরিণত হওয়া সাময়িক ও স্থানীয় অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এবারকার বাজেটে একটা ছাড়া আর কোন নতুন তর হ্রাসের প্রস্তাব নাই। যুদ্ধের সুযোগে যে সকল বায়বাসী সাধারণ সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী অতিরিক্ত লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের সেই অতিরিক্ত লাভের উপর একটা অস্থায়ী কর (Excess Profits Tax) স্থাপিত হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। তবে বাহ্যিক এই কর দিবেন, তাঁহাদিগকে আর বৃত্ত আরও দিতে হইবে না। অর্থাৎ অন্ততঃ লোকের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে যেমন আরও দিতে কিছু বেশী পরিমাণে দিতে হইবে, তাঁহারা তেমন অতিরিক্ত লাভও অনেক টাকা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্রব্দের এবং আপত্তির বিশেষ কোন কারণ দেখি না।

বাজেটে এবার একটা সুবিধার কথা আছে। পূর্বে জানিতাম, বাহাদের মাসিক আর ৪২ টাকার বা বার্ষিক

৪০০ টাকার বেশী, তাঁহাদিগকে আরও দিতে হইত। তার পরে, কয়েক বৎসর হইল, ব্যবস্থা হয় যে, বাহাদের বার্ষিক আর ১০০০ টাকার বেশী, কেবল তাঁহাদিগকেই আরও দিতে হইবে। ইহাতে সামান্য আরও অনেক মধ্যবিত্ত ভরলোকের বিশেষ সুবিধা হয়। এবার ভারত গণপরিষদের মধ্যবিত্ত অবস্থার ভরলোকদিগের প্রতি আরও কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন,—বাহাদের বার্ষিক আর ২০০০ টাকা বা তদপেক্ষা অল্প তাঁহাদিগকে আরও দিতে অস্বাভাবিক দিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। লোকের ঘোবন-বাক্সা নির্ধার করা বিন-বিন বেক্সার ব্যবসায় ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে, এই ব্যবস্থার ভরলোকেরা যে অনেকটা উপকৃত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এইবার বাহাদার বাজেটের কথা করিব। বর্ষীয় গণপরিষদের অর্থগণিত মাননীয় শ্রী হুইলার মণ্ডলার আপাতী বর্ষের বাজেট বায়ব্য়গত সত্তার শেখ করিবার সময় বলিয়াছেন যে, বৃত্ত বৎসর এখনই সমর চলতি বৎসরের তুল্য যে বাজেট প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহাতে বর্ষশেষে যে টাকা উদ্ধৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, প্রকৃত হিসাবে তদপেক্ষা ২৭৭০০০০ টাকা বেশী আর হইয়াছে। বিদ্য-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে এই তথ্যটি নিকটই প্রতি-স্বত্বকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আর-বুদ্ধি খটিল, সচিব মহাশয় তাহারও আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আবহাওয়া বিভাগ হইতে খুব বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছে (We have gained heavily under the head of Excise), আর ট্যাক্স, আরও, জম, বন্দর ও 'পাইলট' এবং বিবিধ খাতে দাক্ষ্যমাত্র (to a fair extent) রকমের (অন্ততঃ অনুমানের অপেক্ষা বেশী) আর হইয়াছে। কেবল আদায় বেশী নহে, বাহ-সত্তাচের ফলেও এবারকার আর বৃদ্ধি ঘটয়াছে; অর্থাৎ এবার শিক্ষা-বিভাগে যায় খুব কম হইয়াছে (large decrease under the head of Education)। সুতরাং সরকারের তথ্যবিলে প্রচুর মজুত অর্থ দেখিয়া আমরা উল্লসিত হইব, কিংবা অশ্রু মোচন করিব, তাহা বৃত্তিতে পারিতেছি না। শিক্ষার ব্যাপারে বরং কম কেন হইল, তাহার কারণ এই দেখা যাউতেছে যে, "The savings

in that respect are also due to the non-
"utilisation of grants" অর্থাৎ যে যে বাবদে সাহায্য
মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিতে সে সাহায্য
লওয়া হয় নাই।

সরকারের আত্মতুচ্ছির যে দুইটী দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ কারণ
যেখা দৃষ্টান্তে,—আবগারী বিভাগে অধিক টাকা আদায়
এবং শিক্ষাবিভাগে ব্যয় হ্রাস—এ দুইটী আমাদের পক্ষে
আশ্চর্যের কারণ নহে। আবগারী বিভাগে আত্মতুচ্ছির
মানে এই যে, দেশের লোকে বেশী পরিমাণে মাদক দ্রব্য
সেবন করিতেছে। বৃদ্ধ উপলক্ষে অসভ্য কৃষিরা মর্কপ্রথমে
মত্তপানে বিকৃত হইল; হ্রাস, ইংলণ্ড মত্তের ব্যবহার
সংবৃত্ত করিল, ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌ আইন গড়িয়া মদ খাওয়া
এবং মদ চৈতন্যী করা বন্ধ করিল; আর এই সুযোগে
আমরা কি ব্যতীল হইয়া গড়িতেছি! দেশের কি
হুঁচকিয়া!

আর, সরকারের শিক্ষা-বিভাগে ব্যয় হ্রাস আমাদের
পক্ষে কম দুঃখসূচক কারণ নহে। সংবাদপত্রে দেখিতে
পাই, প্রায় অসুযোগ করা হয় যে, সরকার এদেশে শিক্ষা-
বিস্তারে সৃষ্টিত অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন; অথচ,
কার্যক্ষেত্রে দেখা বাইতেছে, সরকার যে সাহায্য মঞ্জুর
করিতেছেন, তাহারও সমাধার করিবার পাত্র নাই।
শিক্ষার কি আমাদের অকতি ঘুরিয়া গেল? অথবা, শিক্ষা
শাস্ত্রে আগ্রহ কি আমাদের আন্তরিক নহে?

রাজব-সচিব মহাশয় আগামী বর্ষের গেজেটে আবগারী,
ট্যাক্স ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাতে আরও আর-বৃদ্ধির আশা
করিতেছেন। তবে আগামী বর্ষে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য
ও পুষ্ঠ-বিভাগে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার কল্পনা
করিয়াছেন।

বঙ্গের স্বাস্থ্যায়ত্তিকল্পে যে ব্যয় হইবে, তন্মধ্যে বর্তমানে
একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয়
থরা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখী হইলাম। বঙ্গের
পল্লী অঞ্চলে স্বাচিক্যসংস্কারের বেরূপ অভাব, তাহাতে
মকদ্দমলের সহস্রসংখ্যে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া
চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির আবশ্যক হইতে দেখিলে, আশ্চর্য
না হইয়া থাকা যায় না।

বর্তমান বর্ষের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত হইয়াছিল,
তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যায়ত্তিকল্পে ১১৭১-০০ টাকা ব্যয়
করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হইয়াছে
২-৪০০০ টাকা। এই দুইটী অঙ্কের মধ্যে যে পার্থক্য
ঘটিতেছে, তন্মধ্যে ১২০০ ০ খাল বিভাগের হাত দিয়া,
ম্যানেজিয়ার প্রতিবেদনকালে খাল খনন পূর্বক রাসের
সংস্থানের কাজ, ব্যয় করা হইয়াছে। সুতরাং হিসাবমত
উহা স্বাস্থ্যায়ত্তিকল্পের উদ্দেশ্যেই ব্যয় হইয়াছে বলিয়া ধরিতে
হইবে। আগামী বর্ষের জন্য যে বাবদা হইয়াছে, তাহা
আরও আশাশ্রম। বাজেটে এবার রোগ-প্রতিষেধকল্পে
১৮৬৬-০০ টাকা ব্যয় করিবার কল্পনা হইয়াছে।

আগামী বর্ষের বাজেটে শিক্ষা-বিভাগে সরকারী স্কুল-
কলেজে দ্ব্যয় দত্ত বেতন হইতে ১০২২-০০ টাকা আর
হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে এবং শিক্ষা বাবদে
২৭৮৬-০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্তমান
বর্ষের বাজেটে ধরা হইয়াছিল ১০৩১-০০ টাকা। কিন্তু
এবার প্রকৃত খরচ তরপেকা অনেক কম হইয়াছে। ফলে,
আগামী বর্ষের এপ্রিলে যে ব্যয় থরা হইল, তাহা বর্তমান
বর্ষের প্রকৃত খরচের অপেক্ষা ১২৮৬-০০ টাকা বেশী
হইতেছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে বাহা খরচ হইবে, তাহা
বৎসরের শেষে জানা যাইবে। তবে আগামী বর্ষে শিক্ষা-
সংক্রান্ত অনেক নতুন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা
হইয়াছে। অন্ততঃ সব টাকাই বোধ হয় খরচ হইতে
পারে।

গদাধর

[শ্রীমতীশচন্দ্র বাগচী]

(১)

“কি খাব, যে না মা! কিষে পেরেছে বে!”

রত্নপুত্রের গদাধর মাঝি আদ্য প্রায় বাসনিকতাল অমুহু। কোন উপার্জন নাই। শীড়া সাহিরাছে বটে, কিন্তু দৌর্জলা এ পর্য্যন্ত ঘূর হয় নাই।

সূত্র খড়ো ঘর। ঘরের বেড়া ও উপরের ঢাল—উত্তরের মধ্য দিরাই বিধাতা এই দরিদ্র মন্ত্রমৌবীর সীন অবস্থা দর্শন করিয়া চন্দ্রকিরণ চালিয়া বিজ্ঞপের হাসি বর্ণন করিতেছিলেন। তাহা ঘর, বাশের মাচা, ছেঁড়া কাঁধা, অকাল-জরাগাঁও গলাঘরের অস্থিচর্খার বেহ, আর তাহাকে বেড়িয়া করেকটা বৃত্তস্থ প্রাণীর আর্ন্ত-লোলুপ দৃষ্টি—তাহার মধ্যে চন্দ্রকিরণ। ইহাকে বিধাতার বিদগ্ধ-হাসি বই আর কি বলিব?

পীড়িত শরীর মইয়াই গদাধর কয়েকদিন গালে ঘাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার শরীর অমুহু বলিয়া তাহার প্রী সঙ্ঘ এখন পর্য্যন্ত তাহাকে ঘাইতে ঘের নাই। এতদিন কোন ইকবে চলিয়াছে, আদ্য আর ঢলে না। এতদিন ধরিয়া সোদামিনী খাশীকে যে বুক দিয়া আসিয়াছে, সাত বৎসরের অবাধ শিশু আদ্য তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। বালক নিতাই অনাহারে আর থাকিতে না পারিয়া বলিল,—“কি খাব, যে না মা! কিষে পেরেছে বে!”

অতাদিনীর চোখ কাটিয়া টুটসু করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বলিল, “চুপ কর বাবা! অমন করে কালকে তো রাগা গামছা! কিসে দেব না!”

হা রে হতভাগিনী! সকালে কয়েক মুঠা মুড়ি খাওয়াইয়া এই রাত্রি পর্য্যন্ত ছবয়ের ঘনকে একখানি রাঙা গামছা! কিনিয়া দেওয়ার বিখ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া গিয়াছে। মায়ের প্রাণ—এখনও কাটিয়া যায় নাই! সোদামিনী চুই হাতে সন্ধানকে বুকে ঝড়াইয়া ধরিল। তার পর তার মাথার উপর মুখ রাখিয়া নীরবে চোখের জল ছাড়িয়া দিল।

নিতাই প্রথমে খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তার পর কুণ্ডার তাকুনা সহ্য করিতে না পারিয়া কানিয়া উঠিল। শব্দা হইতে গদাধর ত্রীকে বলিল, “কি খেতে দিবি, যে না! কিষে পেরেছে, কেন কাঁদাচ্চিস এখন!”

সোদামিনী উঠিয়া গেল। একটু পরে একখানা ভাঙ্গা পাখরের পায়ে একটু লবণ এবং খানিকটা কলৌশাক ও পদ্মের মূল-সিদ্ধ আনিয়া ছেলের সমুখে রাখিল। তার পর সেই উজ্জ্বল হস্তে বামীর পা চুইখানির মধ্যে মুখ শুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কানিতে লাগিল।

বিখিত গদাধর উঠিয়া বলিয়া মুহূর্ত মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া নইল। ত্রীর প্রতি চাহিয়া কহিল, “এই করে বুঝি এত দিন আমার সাবু-মিছরি ভোগাচ্চিস? নিজে কদিন খাস না?”

সোদামিনী আর পারিল না।—বামীর পা চুইখানি আরও ঘোরে ধরিয়া বলিল, “এগো, না খেয়ে-খেয়ে বুকের মুখ শুকিয়ে গেছে! ছশাসের যেচোটা ভোমার পাতের সাবু জল খেয়ে-খেয়ে একেবারে মরার হাস হয়েছে!”

গদাধর চাহিয়া দেখিল। তাহার পদতলে তাহার সুদীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষের সুখ-দুঃখের সন্নিবি, তাহার বড় আদমিনী সোদামিনী—অনশন-ক্লিষ্ট-দেহা, রান-বদনা—রৌদ্রবদ্ধা অনাসুতা ব্রতভীর মত পড়িয়া রহিয়াছে। পাশবত্তী মাচার ছিন্ন বাড়তের উপর তাহার বুকচেরা ধন ছর মাসের কল্যাণী নিশ্চীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে—কে জানে, আছে কি নাই! নিজে তাহার নরনের আনন্দ, বংশের প্রাণী, ভবিষ্যতের আশা শিশুপুত্র বৃত্তস্থ কুহুরের মত ব্যগ্রহস্তে গোপ্রাণে কতকগুলি অখাদ্য ভুগিয়া ঘাইতেছে।

কম্পিত পদে গদাধর উঠিয়া গাড়াইল। ত্রীকে কহিল, “নাও কি ভানবো আছে?” সোদামিনী উত্তর করিল, “না। বড় হাস্যরস মশাই আট আনা তাকুা দিয়ে পরত একবার উঠিয়ে নিয়েছিল। খাটের গারে খেজুর পাছে

বৈধে বেখেছে।" "জালখান! পেড়ে দে!" বাব্রার
সোমামিনী বলিল, "জাল দিয়ে কি কত্থে এই রাতে?"
তুই হাতে খুঁটি জড়াইয়া ধরিস, তাঁহার গায়ে মাথা রাখিয়া
গদাধর কহিল, "জাল দে বৃদ্ধি!" বাবীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া
সোমামিনীর আর বিতীয়বার প্রস্তাব করিতে সাহস হইল না;
বীরে বীরে জালখানি লাড়িয়া দিল। অশ্লিষ্ট চরণে গদাধর
ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। তার পর নৌকার উল্লিখা
নশি দিয়া তুই ভিনতি তেলা লাগাইয়া গলুরের উপর হাল
ধরিয়া বসিয়া পড়িল। বৈঠা মাঝিবার শক্তি তখন তাহার
ছিল না। অল্পকাল পরে নৌকা বীরে-বীরে চলিতে লাগিল।
এদিকে সোমামিনী ঘরের বাওরার উপড় হইয়া পড়িয়া
আব্বোর কাঁদিতে লাগিল। নিতাই তখন ভাঙ্গাপাথরের
খালখানি উত্তর হন্তে গ্রাসপণে তুলিয়া ধরিয়া বহা আক্রমে
চাটিতে আঘাত করিয়াছিল।

(২)

গ্রামের জমিদার কত্ৰকান্ত খাজুরী মহাশয় তাঁহার
কুকাকরবল্ল নামের মতই মোদিত-প্রভাশ লোক। গ্রামের
ছেলে-বুড়ো সকলেই হালফ করিয়া বলিতে পারে যে, তাঁহার
ছর বসায়ের আদরিণী কজা রাণী হাড়। আর কাহারও
সম্মুখে কেহ তাঁহাকে কখনও হালিতে বেখে নাই। কত্ৰ-
কান্ত কখনও কাহারও সহিত বিশিষ্টেন না। তাঁহার বন্ধুর
মধ্যে কেবল রাজ ছিলেন তাঁহাদিগের স্থল-পুত্রোক্তিত,
তাঁহার সমবয়সী কেদারনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়।

সকালবেলা কত্ৰকান্ত কাহারী করিতে বসিয়াছেন—
সম্মুখে বিজুত গ্রামকে পোকাভন। বেগমান রামদাস বজ্র
মহাশয় হুতা-বাধা চন্দা মাথার-জড়াইয়া একাধা লাল-
খেরের একখানি খাতা বাবুর নালিকা-বগাবর উঠাইয়া
ধরিরছেন। বাবু কুকিত-ক ও বিক্ষান্ত-নাগা হইয়া
পড়ার ভাবে গোঁকে তা দিতেছেন। চারিপাশে কালো-
দলো, রোগা-মোটা নানা জাতীয় আমলাবর্ণ অচল্যন্তন
খাতাত্প "বিচারিণ" ও "জের জদা" লিখিয়া ভরাইয়া
কেজিতেছে। বাবুর হাঁটু জড়াইয়া তাঁহার আদরিণী রাণী-
জুহরী নানাপ্রকার অদন্তনী ও ছড়া আনুজি করিতেছে।
বাহ্যাব্য একখানি তরঙ্গর টুলে অতি সন্তর্পণে উপবেশন
করিয়া কেদার ভট্টাচার্য মহাশয় কৃকের শব্দ নাম কহিতে-
ছেন। পাশের কঠরিতে যত্ৰকমার মোক্তার ব্রজলাল

নন্দী মহাশয় একটা মিথ্যা মোকদ্দমার সাক্ষী তালিম
করিতেছেন। বহা-উঠানে ছলিধ দেখ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে
অস্বীকৃত হওয়ার এক পায়ে গাঁড়াইয়া আছে, আর শিব-
মহাশয় বরকম্বাল ভূতা রাহিহোতার সফরতার তাহার
মতকের উপর একটা এক মণ-ভাটী বোকাই তুলিয়া দিও
চোঁা করিতেছে। এমন সময় বহুভাচারী একজন মাতব্বর
একাধ এক হোহিত মন্ত উঠানে রাখিয়া প্রশ্না করিয়া
বুক-করে গাঁড়াইল। মন্ত দেখিয়া কত্ৰকান্ত বলিলেন,
"বেশ, বেশ, মোড়ল! বড় খুদী হলান, বড় খুদী হলান।"
কানন্দে অধীর হইয়া মতল মহাশয় নশনশক্তি বিস্তার
করিয়া চকু মুদিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয় কৃকের শব্দনাম
তুলিয়া গেলেন। আত-আত টুল হইতে উল্লিখা মুহু-
নেমে কহিলেন, "উত্তম মন্ত। অমুনা ঘাটে একল মন্ত
সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া ঘটে না।" রাণী ইতিমধ্যে পিতার
হাঁটু হাড়িয়া মাছ টপিতে বসিয়াছিল। একটু পরে বলিল,
"বাবা, আমি কিন্তু সব ডিমটাই খাব।" বাবা বলিলেন,
"ও বাছের কি ডিম আছে মা!" বেয়ে ঠোট ফুলাইয়া
বলিল, "জামি ডিম খাব।" ক্রমে আতঙ্ক বাহির
হইল—তার পরে স্বর একেবারে সন্তোষে ঢলিল। কত্ৰকান্ত
হাঁকিলেন, "বেগমানজী! একশি বাবারে লোক পাঠিয়ে
দিন। ঘাটে খোজ করান। যে বকম করে হোক,
কই বাছের ডিম জোপাড় করা চাই।" কশ্ণিতস্থরে
বেগমানজী বলিলেন, "এটা তো ডিমেরই লম্ব। ডিম
পাওয়া তো শক্ত নয়,—তবে এখন এত বেগার বাবারে
মাছ গেলে হয়।" বক্ত গোচনে কত্ৰকান্ত গম্ভিলেন,
"যে বকম করে হোক চাই-ই!"

কাহারী ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজনরা সে দিনের মত
চলিয়া গেল। চাকর—বাকর, আমলা—পাইক, আর
বেগমানজী হৈ হৈ শব্দে বাছের ডিমের লন্ডানে বাহির
হইয়া পড়িলেন। এই গোলমালের মধ্যে মন্তলাতে
অকৃতকার্য হওয়ার আপত্তার ভট্টাচার্য মহাশয় মনে-মনে
এই চমুখানিকা, আদরিণী, বাবরী জমিদার-কতাকে পালি
দিতে-দিতে গৃহগামী হইলেন।

(৩)

আপোপানের পাঁচ-লাভখানি বাবার মুদ্রিরা আদরিয়া
হকলে হুতাখাস হইয়া বলিল, "বাবারে ডিমতলা কই বাছ

আসে নি।" সর্জনশ! দেওয়ানজীর মন্তকে যজ্ঞাঘাত হইল। দেওয়ানজী নিজে ছুটিলেন। নদীর তীরে-তীরে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, বীর-গণের ভয় করিয়া একখানা জেলে-ডিকী চাঙ্গিয়া আদিতোছে। উর্ধ্বাঙ্গে দেওয়ানজী সেইবিক ছুটিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, নৌকার পাটাতনে কয়েকের উপর মাথা রাখিয়া গদাধর বাকি শুইয়া আছে। হাকিয়া বলিলেন, "কি রে গদাই, কি মাহ ধরনি?" কৌণকর্থে গদাধর উত্তর করিল, "জাছে, ছোট বাটো এচটা কই পেয়েছিলাম।" "গেছলি কোথায়?" "জাছে, এই বাগড়ের দিকে।" "দেখি, দেখি মাহটা।"—গদাধর কুলিয়া ধরিল। দেওয়ানজী কহিলেন, "ভিন্ন আছে বোধ হচ্ছে না?" গদাধর উত্তর করিল, "জাছে ভিন্ন অম্বর আছে বই কি।" দেওয়ানজী কহিলেন, "তবে যে, চটপট করে যে! কর্তার হুকুম।" হুকুম করে গদাধর বলিল, "হুকুম হামটা?" "হামটা? বলি, হামটা কি রকম?" ইয়া যে ও গদাধরকে! বলি, হামটা কি রকম? তার এলাকার মাহ ঘের এলে? চক্কবীর বাগড় যে ওদীয়ার কুস্তকাস্ত খাতঙ্গীর মহাপ্রের এলাকার, তা কি হুকুমের জ্ঞান ছিল না? কবছরের বাধনা বাকি, তার হিসেব আছে? নাশির করে হিটেমাটি চাটী করে আনব, তা জােনো? হাজারজানা বেটা, আবার হাম?"

ত্রী-পুরু-কতার অনাহার-স্রষ্টে দুঃখচ্ছবি গদাধরের মনে বিভ্রান্তের মত খেলিয়া গেল। দুই হাতে মাহটা চাপিয়া ধরিয়া গদাধর বলিল, "হাম না পেলো মাহ ছাড়াই নে হুকুম! বাড়ীতে ছেলে-পিলে মরে"—

দিয়ের মত গর্জন করিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "রবে যে তোর কেনে-পিলে!—মাহ কাণ শীলুই?"—গদাধর দুই হাতে মাহটা জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। উল্লসের মত উচ্চ রবে দেওয়ানজী হাকিলেন, "কোই হার!"—ইনার সিং দরওয়ান এতক্ষণ একটু তফাতে ঝাঁড়াইয়া ছিল, —ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। দেওয়ানজী হুকুম দিলেন, "গদাধর! বেটার কাণ পাচ্ছক মাহটা কাড় দেও তো।" ইনার সিং বিনা বাকাবারে নৌকার উপর লাফাইয়া উঠিল। তার পর মাহটা কাড়িয়া লইয়া গদাধরের কর্ণপুলে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া নারিয়া আদিল। কীণ করে একবার "বাপো" বলিয়া গদাধর উত্তর হস্তে কপাল

ধরিয়া পড়িয়া গেল। বীরগণভরে ন-হারবান দেওয়ানজী বাড়ী কিরিলেন।

কোন রকমে বাড়ী কিরিয়া গদাধর ঘরের ঘাওয়ার উপর শুইয়া পড়িল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে গুণে পড়লে যে?" অশ্লক, স্থির নেড়ে ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকি। কিছুক্ষণ পরে গদাধর উত্তর করিল, "আজ কিছু খাম নি তো?" সৌদামিনী বলিল, "তা নাই বা যেদুম, কুশি অমন করছ কেন?" কল্পিত কণ্ঠে গদাধর কহিল, "সেত্রেছে সচ, সেত্রেছে! তোমার হস্তে মাহের দাম চেয়েছিলাম, তাই সেত্রেছে। তা ব্যাক, তাতে গুণ নেই। কিছু দাম যে দিলে না। কুই খাবি কি? নিতে খাবে কি?"—গদাধর হালকের মত হা-হা করিয়া কীমিহা উঠিল। দ্রিক সেই সময়ে দেওয়ানজী মহাপর বাবুর নিকট দ্রুজ্ঞ, ছোটলোক গদাধর মাটির স্পষ্টতার বিপর বর্ণনা পূরক তাঁহার খাটীতে মধ্যাক্ষ-তোষনের নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া আনন্দে কেশবিহীন মন্তকে দস্তাধম্বণ করিতেছিলেন।

সমস্ত দিন অনাহারে, দুশ্চিন্তায় এক রকম করিয়া কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সৌদামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো দেখ, খুচী কেমন করচে!"—স্থির ভাবে শয্যাপার্শ্বে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকি। গদাধর বুকের তিতরের ঝাঁকুনিটা মাঘলাইয়া লইল। তার পর অস্থির হস্তে ঘেরোটকে বার-কয়েক নাড়িয়া-চাড়িয়া ঘূর্ণিল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অনাহারের অত্যাচার আর সহিতে না পারিয়া অভিমানিনী ছোট মাটি তাহার চিরমিনের মত তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। একটু বসিয়া সমস্ত ব্যাপার সে নানা রূপে তলাইয়া বুঝিয়া লইল। তার পর শীর্ণ, শিশু পূরকে হুকু সম্বোধে জড়াইয়া ধরিয়া বানিক কীমিল। অনেক ক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কর্ণপ, কঠিন করতলে চক্কবীর সুখিয়া লইয়া, পথভলে পতিতা অক্সম্বী গভীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তার পরে কোন কথা না বলিয়া, হেঁড়া কাঁধের ঘেরটিকে জড়াইয়া লইয়া, নদীর জলে তাল-ইয়া দিতে বাহির হইয়া গেল। সৌদামিনী উচ্চৈঃস্বরে কীমিয়া উঠিল। জীতিতত্ত্ব পুত্রী মাঝের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকি।, শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রকান্ত তখন মাহের হুকুর খট ঝাঁড়াইবার

বন্দোবস্ত করিতে ছুফু মিতেছিলেন। আদরিষ্ট কভা কালে বসিরা, গভীর সুখে, মাছের ডিমের অংশ যে পিতাকে কিছুখানাই দিবে না, তাহা তারখের পুনঃ-পুনঃ জানাইতেছিল।

চিরহুঃখী গদাধরের সে কালরাত্রি প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু বাহার বন্ধ সে সেই অনাহার-বিধত-জীবনা শিশু কভাটাকে জন্মের মত রাখিরা আসিয়াছে, তাহার বন্ধ হইতে গদাধর আর ফিরিতে পারিতেছিল না। নদীর অতল গহরে জ্বরবৎ চিরদিনের মত ডুবাইরা রাখিরা, গদাধর উদ্ভবের মত নৌকা লইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহার যোগজীবী শরীরে তখন অস্থিরের বল আসিয়াছে। ঘুরিরা-ঘুরিরা ক্রান্ত হইয়া, অবশেষে সে নদীর তীরে, যেখানে খেজুরগাছী মলের উপর হুঁকিয়া গড়িয়া হিংস্রদ্বিতে দীর্ঘ কাল হইতে জলজোতের আনাগোনা দেখিতেছে, সেইখানে নৌকা বাঁধিল। প্রবল প্রভাত। অল্প-ক্লিমে সমস্ত আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তর-তর নবীন তরু-তরু-কিরণে অধরাভূত হইয়া বিচিত্র নীলাশ্বের বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়াই তুলিয়াছে। ঝাঁক-ঝাঁক শালিক, বাবুই প্রভৃতি বিহঙ্গম আনন্দ-কল-গুঞ্জে বোয়ামগ্ন স্খরিত করিয়া উড়িতেছে। সত্তা-স্বপ্নোপিত মলয় মাকুত যেন আবেশ-বিহ্বলতার গাহের গাহে চলিয়া পড়িতেছে। পাতার-পাতার অমনি ঝিরঝির করিয়া একটা পূলক-স্পন্দন বেশিরা উঠিতেছে। আনন্দ-মহির জ্বাল শপ্পোষী সেই খেলার বোয়দান করিতে চাহিরা নাচিরা উঠিতেছে। ঢকল নদীমগ্ন সে স্রবণে ছাড়িবে কেন? হিল্লোলের পর হিল্লোল তুলিরা নদী আগনি নাচিতেছে, গদাধরের জীবী ভবীমানিও নাচাইতেছে। সকলের চোখে বধন পৃথিবী এত হুম্বর, তখন একরাশি মলে বুক ভাসাইয়া, গদাধর তাহার ছদ্ম বৎসরের পুরাতন বন্ধ, তাহার বোর ছদ্মদের চিরদাবী নৌকাখানির বুক লুটাইয়া গড়িয়া, দিকে-দিকে একটা কল্প বেদনার আর্দ্র চীৎকার জাগাইয়া গাইয়া উঠিল,

“মন বাঁধি তোরা বৈরা নে রে!—

আমি আর বাইতি পারলাম না।

সকাল বোনা ছাড়লাম নৌকা রে,—

নদীর কুল-কিনারা পাশায় না”—

কে ভূমি অশিক্ষিত পল্লী-কবি! তবে, কোন্ দিন এমনি এক শান্তি, মৌন, কল্প প্রভাতে নিম্নের দুঃখ-স্বপ্নের চিরদাবী ক্রুদ্র ডিকীখানির উপর বসিরা, সারানিশি-কর্ণ-ক্রান্ত বেহ এলাইরা দিরা, হতাশার সীম-মুদু হুত্রে হালাকারে কাদিরা গিয়াছে! আরও দুঃখিনী বহুদাতার শত গদাধর তোমার মূলে হুয় মিলাইরা কাদিরা বাঁচিতেছে!

“গদাই, ও গদাই, আমাকে নোকার চড়াবি?” গদাধর উঠিয়া বলিল। বেখিল, মদ্যপারের আদরিষ্ট কভা এক কোড় শিউলি ফুল লইয়া, একগাল বইতি চিবাইতে-চিবাইতে, এক পায়ে ঘুরিতে-ঘুরিতে বিকৃত মুখে কহিতেছে, “গদাই, ও গদাই, আমাকে নোকার চড়াবি।” গদাই বলিল, “এত সকালে নোকার চড়লে ঠাণ্ডা লাগবে যে দিবি।” “না, লাগবে না। তুই নে না আমার ফুলে!” নাছোড়খানা মেয়ে,—না তুলিলে ছাড়িবে না। অগত্যা গদাধর দুই বাঁহী প্রদাহিত করিরা তাহাকে তুলিরা লইল। “ও পায়ে চল না!” “ওপায়ে কোথায় বাবে, দিবি!” “ঐ যে পেগায়া-বাগানের ঘায়ে। সেখানে অনেক বইতি-গাছ আছে।” “বইতি খেলে পেঠের অহং করবে।” ঠোট ফুলাইরা আদরিষ্ট বলিল, “না, কত্বে না, তুই চল।” গদাধর জানিল, এই মেয়ে যদি কাহারও কথার একটু কানে, তাহা হইলে ক্রুরকণ্ঠ সেই “কাহারও”র উদ্ভটন ও অশ্রুজন চতুর্দল পুরুষকে কাদাইরা ছাড়েন। কামে-কামেই বাধ্য হইয়া গদাধর নৌকা ছাড়িল।

গদাধর ঘোরে-ঘোরে বৈরা বাঁচিতে লাগিল; নৌকা ঘোরে-ঘোরে চলিতে লাগিল। জীবীদার-কল্পার মুখের দিকে চাহিতে-চাহিতে গদাধরের সত্তা-মুতা কভার কথা মনে পড়িল। বাঁচিরা থাকিলে সেও কালে এত বড় হইতে পারিত। তাহার ফুলও ত ওই রকমই কৌকড়ান ছিল। কালে তাহার বিবাহ দিত,—তাহার শিশু সন্তান হইরা বর তরিয়া বাইত। সে কি হুং! সে কি আনন্দ! বিবাতার বৃত্তি তাহা স্মিল না,—তাই তিনি এত হুংয়ের মাঝে বন্ধ হানিলেন। এ বন্ধ কে হানিল? কে তাহার সোপার পুতলীকে অনাহারে মারিল? জীবীদারের সেওহান! সে যদি মাছের মূল্য দিত, তাহা হইলেই ত সে-দিন তাহার শেট তরিয়া খাইতে পারিত! তাহার হুংয়ের দন ত অনাহারে জ্বালাইয়া মরিল না। কিন্তু সেজন্যই এ কার্য করিরাছে

কাহার অস্ত? অমীহারের অস্ত! তাহা হইলে অমীহারই
হায়! অমীহারের আশে কি বিশ্বাসই যাহা নাই? এই
ত তাহার কল্পা বসিয়া আছে,—আমি যদি উহাকে না
খাওয়াইয়া দাখিয়া বেশি। তাহাতে কি অমীহারের কষ্ট
হইবে না? হইবে বই কি! তবে,—তবে এই নিশ্চয়
প্রভাতে, এই নির্জন নদীতীরে এই যেহেতুকে যদি ডুবাইয়া
দিই! কে দেখিবে! উত্তম সুযোগ! প্রতিশোধ!
প্রতিশোধ! গদাধর বৃষ্টিবদ্ধ হাতে এবার বৈঠাখানি বড়
ঝোরে ফেলিল। তাহার কোটরগত, পাতুর চক্ষুর ধব
ধব্ অগ্নিরা উঠিল।

রাণী এতক্ষণ মোকার পাটাতনের উপর মূল ছড়াইতে-
ছড়াইতে “পানী সব করে রব রাতি গোহাইল” আত্মতী
করিতেছিল। হঠাৎ গদাধরের ঐক্লপ আকার-বাবহার
দেখিয়া ভীতি-কম্পিত স্বরে বলিল, “অমন করিল নি গদাই,
আমার তর করছে যে!” শিশুর মিনতিপূর্ণ কোমল,
বাণিত কষ্টস্বর! বাহুতীরে কোন্ মোহিনী মায়ায় উত্তত-
কণ আঁহিরাই নিজেই হইয়া গেল। গদাধর সন্তক অবনত
করিল।

কিছুক্ষণ পরে রাণী জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁয়ে গদাই,
তোর কাপড় ছেঁকা কেন?” এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?
এ অদৃষ্ট প্রসঙ্গ এই স্বর্গীয় ছদ্মগ বৎসর কেহ ভালকে
করে নাই! এমন কি, সে নিজেও না! ও গো রাজার

হুগাণি, এ কি প্রশ্ন! গদাধর কণা কমিল না। মানিক
পরে রাণী আবার বলিল, “গদাই, তুই অত রোগা কেন?
তোর না বৃষ্টি তাকে পেট তরে খাইয়ে দেয় না!”
আবার, আবার! সেই মাঝের কথা,—সেই অনাহারের
কথা! মূগ্ধ মৈত্রেয় আবার জাগিয়া উঠিল। চীৎকার
করিয়া গদাধর কহিল, “সে শুধু তোমের মজ্জা,—সে তোমের
কজ্জা! আজ এই পাকের মলে তার শোধ নেব!”—উত্তেজিত
গদাধরের হস্ত হইতে বৈঠা খসিয়া পড়িল। ছুই বাছ
প্রমাণিত করিয়া গদাধর মেহেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে
গেল। তবে বিষয়ে একটু পিছাইয়া যাইতেই সে মূগ্ধ
করিয়া মলে পড়িল। গদাধর ধরিয়া ফেলিল। বৃষ্টি
স্বহস্তে ডুবাইতে না পারিলে তাহার কৃপিত হইতেছে না।
গদাধর বস্ত্রমুগ্ধিতে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া,
সজোরে তাহাকে একবার ঝাঁকটায় দিল। বাহুর হস্তগা না
বৃষ্টিলেও, আগের দুহাত বিতীর্ষিকামর জিজ্ঞাসিত হস্তগাদিনী
ক্লীপকর্মে ডাকিল, “বাবা!”—গদাধর চমকিয়া উঠিল। চকিতে
মনে পড়িল, বাঁচিলে তাহার শূণ্য ও ত এত বড় হইত,
শোকে-মুখে এমনি কষ্টে তাহার নাম করিত। বড় বিপ-
দের সময় সকলের কথা ভুলিয়া তাহাকেই ডাকিত, “বাবা!”
—বহুর্ভে পাণ্য ব্রহ্মীভূত হইল। বিপুল বলে টানিয়া ভুলিয়া,
তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, গদাধর হাঠাৎকরিয়া কহিয়া ডাকিল,
“মা—মা!”—

শোক-সংবাদ

পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনী দাস

বহুবাহারের বনামধর পরলোকগতা স্রীনাথ দাস
মহাশয়ের পুত্রবধূ স্বর্গীয় বেবেজনাথ দাস মহাশয়ের বিধবা
পত্নী পবিত্রচন্দ্রা, নারীহিতৈষী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়ের
পরলোকগমন সংবাদে আশ্রয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছি।
স্বর্গীয় বেবেজনাথ দাস মহাশয় বহন বিশাৎ গমন করেন,
তখন কৃষ্ণভাবিনী তাঁহার সঙ্গে যান। যেসে আশ্রিয়া দাস
মহাশয় যে সময় কারো যোগদান করেন, তাহাতেই কৃষ্ণ-
ভাবিনী প্রকৃত সহধর্মিণীর দায় তাঁহার পার্শ্বভাবিনী

ছিলেন। বামীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণভাবিনী নারীহিতৈষীতে
সভাদতাই জীবন উৎসর্গ করেন; স্রী-মহামণ্ডলের কলিকাতা
শাখার তিনি প্রাণবহনদিনী ছিলেন; অবঃপূর্বে স্রীবিদ্যা
বিস্তারের জন্য তিনি দিনব্যস্ত ব্যটিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুপ-
ত্রবৎ-মৃত্যু ও কবিতাবলী বাঁধাইয়া পাঠ করিয়াছেন,
তাঁহায়াই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার প্রমাণ করিয়াছেন;
অনেক মানিক পক্ষে তাঁহার লিখিত মুচিস্তিত প্রবন্ধাদি
প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর অস্ত আশ্রয়
শোকপ্রকাশ করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সনিসন্দ্বজার বঙ্গোপাখ্যাত বিশাখরু এইচ এ এমবীত 'কপালকুণ্ডলা-সংঘে' বিস্তীর্ণ সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংগ্রহে প্রায় ৩০০—নামক একটা নূতন অংশ লক্ষিত হইয়াছে ও একটি বিরাট পুঁতি প্রস্তুত হইয়াছে।

আগামী শুক্লাষ্টমীতে হুগুঁতে, ১৯১৮ সালের ১ই ও ২ই বৈশাখ গাওড়ার সঙ্গের "বঙ্গীর সাহিত্য-সন্নিবেশ" স্থাপন ব্যক্তি আবিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রকৃতির প্রকৃতি বিষয়ক একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। বীরাঙ্গা সমিতিতে পাঠের ভিত্তি প্রথম দিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রগত-পুস্তক প্রদর্শন, প্রত্যেকের বিরাটী শ্রীযুক্ত বুর্জাবাস লাক্ষিতী মধ্যমক (সম্পাদক—অধ্যাপক) সমিতি। "বঙ্গীর সাহিত্য-সন্নিবেশ" গাওড়ার প্রায়গাওড়েন, এবং ১০ই জানুয়ারি মধ্যে প্রত্যেকের পাঠ্যসিদ্ধি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। বীরাঙ্গা প্রদর্শনীতে প্রস্তুত হইবে। প্রদর্শনী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ও অগ্রগত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গের তাঁহাকে জানাবেন এবং মিষ্টি সিংসের পুস্তক প্রদর্শনা সামান্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বীরাঙ্গা প্রতিমিতিকালে সমিতির মধ্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও বহু সময় সময়, প্রত্যেকের আদানাদান অন্তিমত জানাইবেন। বিদ্যুৎ মধ্যমাগণের প্রত্যেক এই সমিতিতে বহু ব্যবস্থা হইতেছে।

বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের পাণ্ডা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতন-মোহন বসু মহাশয় শিখিরায়েম, "বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের কাণ্ড-মিষ্টি হক সমিতি কর্তৃক দ্বিতীয় হইয়াছে যে, বর্তমান বর্ষের চৈত্র মাসে বাঙ্গালা সংগ্রহের পত্র-ব্যক্তি প্রত্যেকের হইবে। এই উৎসবের আয়োজনাদি করিবার ভিত্তি উক্ত কাণ্ড মিষ্টি হক সমিতি কর্তৃক এক পাণ্ডা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই পাণ্ডা-সমিতিতে এক আবেশনে দ্বিতীয় হইয়াছে যে, কলিকাতা ও বাক-বঙ্গের মধ্যে বাঙ্গালা সংগ্রহের পত্র ও অন্তর্গত সাহিত্যিক পরিষদের সাংগঠনিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে। তৎসময়ে আদানাদান বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে অগ্রগত করিতে হইবে, আদান অগ্রগতপুস্তক আদানার সম্পাদিত পত্রের

সংগঠন ইতিহাস ও আদানার বিবৃতি এবং আদানপুস্তক অন্তর্গত বাঙ্গালা সংগ্রহের পত্র ও সাংগঠনিক পত্রিকার সংগঠন ইতিহাস লিখিয়া আদানের বিবৃতি পাঠাইবেন। এই উপায় আদানার্থে লাভাযোগ বাঙ্গালা সাংগঠন পত্র ও অন্তর্গত সাংগঠনিক পত্রিকার মধ্যে একটি সমগ্র লাভাযোগিক ইতিহাস প্রস্তুত হইবে, এই পত্র-ব্যক্তি উৎসবের উদ্দেশ্যে অনেক পরিমাণে সফল হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও জানাইতে হইবে, উক্ত উৎসবে একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। সেই প্রদর্শনীতে সকল বাঙ্গালা সাংগঠনিক ও সাংগঠনিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা কিংবা সর্বপ্রথম পৃষ্ঠা প্রদর্শন হইবে। পাঠ্য পাঠাইবে তাঁহারা অন্তিম হইবে এবং তাঁহারা সমগ্র পরিষদের প্রকার ব্যবস্থা হইবে। আদান করি, আদানি আদানার্থে অগ্রগত-পুস্তক ও বিবৃতি সাহায্য করিবেন। আগামী ৩০ই জানুয়ারি মধ্যে উক্ত বিবৃতি প্রকৃতি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি হইবে।"

হলেনক শ্রীযুক্ত বেবেপ্রদায় বসু কর্তৃক অনুদিত সঙ্গতিবিশেষের 'ওয়েলো' নটিক ঠায়-বঙ্গমতে অন্তিমীত হইতেছে। নটিকখানি শ্রীযুক্ত পুস্তককারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস প্রণীত সচিত্র 'বিয়ের ক'মে' প্রকাশিত হইয়াছে; উৎসবী বীখাই, মূল্য পাঁচ পিকা।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রদায় বঙ্গোপাখ্যাত প্রণীত বিদ্যাবাসী প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৮/-

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রণীত সচিত্র দারমাখের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১১/-

শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর গুপ্ত করিগলে সঙ্গিত অধ্যবেশক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২/-

শ্রীযুক্ত নাগরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত বর্তমান প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১১/-







বৈশাখ, ১৩২৬

ସିଡ଼ିୟୁ ଏଫ୍ ୩]

व्यास दत्त

[अक्षय मर्यादा]

ভারতবর্ষে নববর্ষ

[ଅକ୍ଷୟକାନ୍ତ ବାରିକୋହୁରି]

(2)

হে ভারত, এল এ নববর্ষ নিয়ে পুরাতন তব আদর্শ।

এ-পারে, ও-পারে, স্বজাতি, বিজাতি, সকলেই তাই-ভাই।

কি গভীর ভাব, কি উদ্ভার ভাষা, বিরাট মনন, বিশাল শিখামা,

এ কল্লনা-পায়ে আপনা বিকাবে দুরাশা লুটায় তাই !

দেশহিত ছলে পরস্ব-হরণে বলের উন্মাদ ঘূর্ণবল পীড়নে

বিপ্লব-বিকাশে মানুষ-শিক্ষার পাবিবে না। যেতে কেহ !

জন্ম-ভাণ্ডব কে বিদেশী নাশে, ভারত-ভারতী অগতে বিকাশে.

মানুষ শু নয় একবার লাগি,— হৃদয় মবার গেহ !

ধর্মের দ্বানি হেরি' সত্যতবে নামিল ভারত জগৎ-সমরে,
 মোহিয়া প্রতীচী দধিচীর তেজ শত-শত প্রাণে ছালি !
 হিমাত্রি হইতে কুমারী অবধি দেশদেশান্তরে গাহিল জলধি,
 ভারত জিনিল জগতের রণ বৃকের শোণিত ঢালি' ।

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে ঘোষিল গরবে নুতন বর্ষ,
 সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ ।

(২)

স্বা-অংশ নিয়ে এ যেন অন্ধ মাতালে-মাতালে নিদ্রা ঘন,
 সকলেই কয়,—মোরে দয়াময়, দাঁও জয়-পুরস্কার !
 চূর্ণ ধর্ম-মঠ, কীর্তি-সৌধ যত কলা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ব্যাহত,
 নরবাণী যন্তে শুধু রগরগ-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ।

স্বাধীনতা দান, সভ্যতা বিলীন, ব্যাধি অনশনে নগর বিপিন,
 মানব মানব অটু হাঙ্গিয়া যুগের শাশানে নাচে !
 মানবী মানবী ! মাতৃদেব লয় ! কাঁদিল বিদেশী সাধুর কদর,
 জগতের নাশে ভারতের ভাবে মূঢ়পাশে ক্ষান্তি যাচে ।

বলে,—এ ধরণী জননী সবার, বিশ্ব-মানব এক পরিবার,
 দাস কেহ নাই, এসেছে সবাই সম-অধিকার নিয়ে ।
 হিমাত্রি হইতে কুমারী অবধি দেশদেশান্তরে গাহিল জলধি,
 ভারত জিনিল জগতের রণ দেহের অস্থি দিয়ে !

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে ঘোষিল গরবে নুতন বর্ষ,—
 সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ ।

(৩)

হেরি রক্ত-গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে কবি কৃষ্ণবর্ণ সজল নেত্রে
 শান্তি-মন্ত্রে রণ-ভয়ের আশ্রিত করিল শেষ !
 শ্বेत-জনপতি গেই হুরে গায়, বধিরের সভা তাসিয়া উড়ায়,—
 আদর্শের তরে সে যে অস্ত্র ধরে তাই ছাড়ি উপদেশ !

জলে-স্থলে বৃক্ষ, কামানে-কামানে, শূন্যে রণ জুড়ি বিমানে-বিমানে,
নিবাহিল বীর বিশ্ব-অরাতির জগৎ-জিগীষা ঘোরা !
অসি কেড়ে ধ্বনে,—মনে মন জিনে, বন্দী কে হয় প্রেম-বঁাদ বিনে !
করুণার সিন্ধু জগতের বন্ধু এ কোন্ পাগল গোরা !

জয়ীর নিষ্ঠুর ধর্ম উড়ায়ে, জিতের বিধুর মর্দ্য জুড়ায়ে,
সফল করিল গীতার স্বপন,—প্রতীচীর কথি কে এ !
হিমালয় হইতে কুমারী অবধি দেশদেশান্তরে গাহিল জনধি,—
ভারত জিনিল জগতের রণ দেহের অস্থি দিয়ে ।

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

(৪)

বরি, ডরি তোমা, হে জনসজ্জ, অনাদি অনন্ত প্রাণ-ভরস,
তুমিই সাধনা, তুমিই সাধক, জগতের কর্ণধার ।
ভ্রম-নিপাতি ও পূত-কুশির, 'কৈশর', 'জার', 'নীরো', ও 'নাধির' !
বৃক্ষ, নানক, ঈশা, মহম্মদ তোমা সেবি' অবতার !

জন-নারায়ণে করিয়া সারথী জন্মোন্মত্তি-পথে জগতের গতি,
ধরার স্বামিস্ব কারও নিজ বিস্ত এ যুগে কি হ'তে পারে ?
মাধব মাসের প্রথম দিবস শুভ বরষের ধাত্রী-কলস
অভয়ে বরিয়া বিজয়ে ভরিয়া সাঙ্গার ভারত-ধারে !

হে কৃ-স্বর্গ, ওগো দেবোপম জাতি, পাশব বলের দস্তে আঘাতি
এ প্রলয় তাঁর, খুলিতে তোমার মুক্তি-দুয়ার খালি ।
হিমালয় হইতে কুমারী অবধি দেশ-দেশান্তরে গাহিল জনধি,
ভারত জিনিল জগতের রণ বৃকের শোণিত ঢালি ।

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

পুরাতন ও নতুন বাঙ্গালা সাহিত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম.এ]

পুরাতন মত, পুরাতন বহু, পুরাতন পাদুকা—এ সব বড় আশয়ের ভিত্তি। প্রথমটির সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই। শেষোক্ত দুইটির সম্বন্ধেই বা আপনাবিগকে কি বলিব ? রসের সঙ্গে জল যেমন অনার্যাসে ঘ-ব অতিথি সোপ করিয়া মিশিয়া যায়, পুরাতন বহু-সম্বন্ধে যে তেমনি করিয়া আমরা আত্ম-সূতা হারাইয়া গেলি। আর পুরাতন পাদুকা—আমাদের অধমাদের সঙ্গে কেমন বনিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহা সহসা পরের পাদুকা-সম্পর্কেই ‘ফুটন্তর’ হইয়া উঠে।

সত্যতার লক্ষণই এই যে, পুরাতনে কিরিতা বাওরা। ইহার অর্থ এ নয় যে, কেবলই পিছাইয়া পড়া। পুরাতনের সম্পর্কে নতুন ও বর্তমান সজীব, প্রাণময় ও প্রকট হইয়া উঠে। পুরাতন আমাদের নজীর। যৌবনাগ্রে যখন ‘জ্ঞান: পলিত: বাতঃ ক্লান্তঃ’ হইয়া পড়ে, তখন কঠোর বস্ত্র-মধুর মত, অস্পাত-নীলস হরিতকী বা ইক্ষুগ্রহির মধুর রসের মত—সেই পুরাতন বাড়িকা আসন্ন-মরণের আগমন-প্রতীক্ষার মধুর, রাগোজ্বল ও মনোহারী হয়। পুরাতন গুড়, পুরাতন ঘৃত, পুরাতন চাউল, পুরাতন তৃতা, পুরাতন দূতি, পুরাতন বাস্তভিটা, পুরাতন বই, পুরাতন কাহিনী—হিন্দু-ভীষনে এ সকলের মহিমা, শক্তি, আকর্ষণ ও সূচ্যের বিধর আপনারা বিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু তথাপি কোন সাহসে ও কোন শক্তিবলে আপনাদের সম্বন্ধে আত্ম আনি গোটাচক্রে পুরাতন কথা ওনাইতে গণ্ডায়মান হইরাছি, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাদের বন্ধে মহাপ্রাণ; ঢাক মন্তী বিজা; সর্কাদে স্নর্গ-জ্যোতিঃ; আপনারা অমৃত;—আপনাদের সকলের মধ্যে প্রজীভূত সেবশক্তি আমার সহায় হউক; সমিতির সারমত সেবতা আমার সহায় হউন; আমি আশা করেকটী পুরাতন কথা যেন আপনাবিগকে ওনাইতে পারি।

আমরা প্রত্যহ ধবস্ত্রের স্নানসঙ্গে সঙ্ঘি যে, সমগ্র যুরোপে একটা প্রবল বড়া সম্রাতি ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার উত্তর রাশিয়ার কোণে বিঘন আঁকরে—সেখান

হইতে সেই জ্যোত নানা নম-মহী, সাগর-মহাশাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এমন এক ভীষণ momentum ধারণ করিয়াছে যে, তাহার ভাঙনের সমগ্র রাজশক্তি বিপর্যস্ত ও পর্যাভুল হইয়া পড়িয়াছে। এই জ্যোতের নাম Bolshevism;—ইহার গভীরত্ব রাশিয়ার জন-নেতা Lenin ও Trotsky। ইহারে আবাহন-মন্ত্র এই;—‘পুথ্যস্তন বচন বৃঢ়াইয়া দাও,—পথের ভিখারীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দাও,—আভিজাত্য-গৌরব মুছিয়া ফেল। যাহারা জমি চাষ করিয়া খায়, তাহারা কোন অংশেই সম্রাটগণের অপেক্ষা হীন নহে। সমাজ-শক্তি, রাষ্ট্র-শক্তি—কোনটাই রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে সমীচীন ও প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। জাতীয়তার সূলে নির্মাচন-প্রথা ও লোকমত-সংগ্রহ। এই নির্মাচন-প্রথা ও লোকমত-সংগ্রহে রাজ্য-প্রজ্ঞার সম্বন্ধ নিশ্চিন্দ করিয়া মুছিয়া দাও। সমগ্র পৃথিবীর লগাটে এই মহাবাপী রক্তের অক্ষরে লিখিয়া দাও—‘শিবোহং।’ নাস্ত্র: কোপে সনান-ধর্মী।’ ‘আমি শিব—আমার সনানধর্মী কেহ নাই।’

এই রাজনৈতিক মতের সঙ্গে আমার বক্তব্য বিষয়ের একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীর বড়-বড় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্যার ধারা—ঊঁরা বলেন যে, এই বলশেভিজিসের জ্যোত কাগজের সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইবে। ব্যাপারটী ঠিক পূরণ-কথিত আসন্ন প্রলয়ের মত, কিংবা বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্লাবনের মত। কিন্তু এই রাজনৈতিক মতের যে একটুও সার্থকতা নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সকল উচ্চাসের সূলেই একটা নীতি আছে;—বলশেভিজিসের নীতি জাতি-সাম্রাজ্য বা ভাবিরা-পড়া। পুরাতনের ধান, ধারণা ও সমাধির ফলে জাতীয়তা অহল্যার মত পাব্যন হইয়া পড়িয়াছে। সেনীন্ ও ট্রুটস্কা শ্রীরাষ-চন্দ্রের মত এই লজ্জাজাত জাতীয়তাকে সজীব করিয়া, পুরাতন ও নতনের মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড প্রাণালী ধনন করিতে চাহেন।

বীরে-বীরে, অলঙ্কিতে অগভের সাহিত্যে এই ভাবের প্রেরণা ছুটিয়া উঠিতেছে। সাহিত্যের কার্য্য সৃষ্টি করা, কি

আনন্দ মেহরা,—ইবসেনিজম, কি শা-ভিঅন্, বহুতাত্ত্বিক হওয়া, কি হাওগাই প্রাণাধা গড়া,—সত্য, শিব, হৃদয়ের ধর কেতরা, কি তাহার গোলক সহসা লোকাবৃত্তি করা—আমি এ সব আলোচনা করিব না। আমরা পুরাতন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, তাহাই ব্রূত। কারণ, সাহিত্য কখনও সমালোচকের আদেশে গঠিত হয় না। ইহার বৈয়াক্তিক, বাহার চালের মত। বিভিন্নস্তরকে বিভাগ্যগর মহানয়ের ভাবা-নীতির দ্বারা, বা বীজনাথকে লেখকতারের দ্বারা প্রকাশিয়া রাখা যায় না। এই পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের আধোচোনা আদর যে ধর্মবাহী নীতি দেখিতে পাইব, তাহারই নাম দিব—সাহিত্যে বস্তুভিত্তিক।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ ছিল—একটা প্রচলিত convention বা প্রথার চারিদিকে কেন্দ্র করিয়া বোঝা। ইহাতে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিমর সন্দেশই সত্যিক হইয়া গিয়াছিল। তাই সমগ্র বৈকর সাহিত্যে, এমন কি, পুরাণ-সাহিত্যেও ‘কাহু ছাড়া গীত নাই।’—সেইখানেই আমি, সেইখানেই অন্ত। বর্ষই সমাজের ও সাহিত্যের একমাত্র বন্ধন-বন্ধ ছিল। এই বিশাবে পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্যে বন্ধ বৈকি বৈকি নাই। সকল মনোমের সাহিত্যেই একটা বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহা এই যে, সাহিত্যে বর্ধন-শীল, progressive—ইহা ঠিক পৃথিবীর আকর্ষণ-পতির মত অলক্ষিতে অঙ্গের হয়। বিভাগ্যগতি, চতীয়াস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে জাতব্য ও গঠিতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে; কিন্তু ইহাতে যে আধুনিক যুগের বিয়াট প্রেরণিত ও তাহার সমাধান-চেষ্টা নাই, তাহার ক্ষমতা আক্ষেপ করিবার বড় বৈকি অবকাশ দেখি না। কারণ, সাহিত্যের গতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী রামমোহন রায়ের যুগকে আমি ‘পরিবর্তনের যুগ’—age of transition বলিব। এই যুগ দ্বিভাষিক মধুসূদনের যুগে আদিয়া গড়িয়াছে। ভারত-চন্দ্র, রামমোহন, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার, বিভাগ্যগর প্রভৃতি ক্রমে তাহা ও তাহার মধ্যে একটা প্রকাশের ক্ষমতা—power of expression—আনয়ন করিলেন। মধু-

সূদন কাব্য-জগতে League of Nations স্থাপন করিয়া প্রেসিডেন্ট উইলসনের মত দেখাইলেন যে, সাহিত্যে নবীক রূপ বজায় রাখিবারও ডিনোক্রাটিক হইতে পারে। এক্ষেত্রে নানাবিধ তাহার সহিত তাঁহার নিগূঢ় পরিচর যথেষ্ট কার্যকর হইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক তাবের অর্থাৎ আনয়ন (internationalisation) বহুতাবাক্ষে নম্র ও বরণ্য করিয়া গিল। তখন ‘বহুমনের’ উদীর-মান আলোকেরোপা-পাতে মনোর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিত্তা-পল্লি নূতন প্রাণ লাভ করিল। বিভিন্নস্তরের সময় হইতে বীজনাথের যুগই বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান যুগ।

এই যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সাহিত্যের বস্তু আর সত্যীক গভীর মধ্যে নিবদ্ধ নাই। দলীতে, তাবো, নাটকে, আখ্যানে—এমন দেই পূর্ণ-প্রচলিত ধর্মবর্তের প্রকাশই সাহিত্যের একমাত্র উপজীয়া নহে; সাহিত্যের গতি এখন বহুমুখী। বিপদ পকাশং বৎসরে আদ্যমের বঙ্গ-সাহিত্যে সর্গ বিষয়ে সমুদ্র, তরুণ ও হৃদয় হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যকে যদি একটা living organism বা প্রাণবর পদার্থ বলা যায়, তবে বলিব—আদ্যমের বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্গরূপে পৃষ্ঠ ও বহিত হইয়া যে অপরূপ, বিভিন্ন ভূমার সজ্জিত হইয়াছে, তাহা যে কোন দৈন্য পরিচ্ছন্ন, তাহা বৃষ্টির উপাধ নাই।—ইহা বর্তমানে internationalisationএর ফল। পরে কথিত এক ব্রাহ্মণ-যুবক একবার এইরূপ বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন পোষিত হইয়া উৎসব-পুহে নিমন্ত্রিত ভ্রমলোকমের অশেষ বিশ্বর উৎসাহন করিয়া-ছিল। বহন কোনও অপরিত্ত ভ্রমলোক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে বলিল, ‘মহাশয়গণ, আদ্যর নাম ইজাহিব—আমি না ইংরেজ, না ব্রাহ্মণ, না হিন্দু, না মছল-মান,—অথচ এই চারি জাতির সমাবেশেই আমি ই—ত্ৰা—হি—ম। পরে কথিত এই জন্ত যুবকটির মত, আদ্যমের বর্তমান বঙ্গ-ভাষাকে যদি আমি ‘ইজাহিব ভাব’ বলি,—আশা করি, তাহা হইলে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না। ব্যতিক্রমের ছাড়াবালির মত, গানের সুরের মত, নবীর বাঁচিবাশার মত, এই জীবন ক্রমাগতই অঙ্গের হইয়া চলিয়াছে। ইহার বতি নাই, শেষ নাই। জীবনের বর্ষই এই যে, ইহা dynamic বা গতিশীল। জীবনের এই dynamic ভাব—জীবন-যুগের সাহিত্যেও প্রতিফলিত

হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য dynamic বলিয়াই আবার তাহা 'ইন্ডিয়ান'—সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আক্ষেপের কারণ কি আছে ?

কিন্তু সস্ত্রীতি—গুণু সস্ত্রীতি কেন, ক্রমাগতই—আমাদের পিতৃপিতামহগণ আমাদেরকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন, 'বাপু বে, বিলাতী লেখাপড়া ত' শিখিলে, কিছু এমিকে ছাতি, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য—সব বে Patel's Bill এ ভাসিয়া যায় !' সদর গ্যারে আগড় দিয়া 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বলিয়া গগনবিহারী চীৎকার করিলে কি হইবে—ওদিকে যে বিড়কীর দিকে সর্দানাশ ! 'হিসকা যাকন, ভজন সাধন ত' অনেক দিন বিশ্ব-বিভাগের সমুখের পুকুরে ভাসাইয়া দিয়াছে,—এখন ছাতির কোলিত-বর্ষাধা বে ঘায় ! তার উপায় কি ?

বংশোদ্ভূত মানিয়া লইলেও, কোনও অংশে আমরা আমাদের পিতৃপিতামহগণের অপেক্ষা অধিক সত্যদর্শী, এমন কথা আপনায় কেহই মানিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের এই আক্ষেপের মূলে কিছু সত্য আছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। ছাতি, ধর্ম ও সমাজের কথা তুলিব না—কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বেবের ভাবটুকু ছয়সম করিলেই চলিবে।

বর্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা অবসাদ আদিয়া পড়িয়াছে। এটাকে 'চর্কিত-চর্কণের' যুগ বলা যায়। মাসান্তে পত্রিকাগুলি তাহাদের পরিচিত রূপ লইয়া প্রায়ই যবা-সময়ে হাজির হয়,—তাহাতে বার্থ কবিতার বড় একটা স্থান ঘেলে না। কবিতা শিখিবার ও পড়িবার সামর্থ্য ও সুবিধা আমাদের বর্তমান বৈশ্ববিন জীনে বড়ই কম। বাহা আছে, তাহা সনেট, বাস-কবিতা, ছোট গদ্য, দ্রব্য-কাহিনী ও মহালোচনা পাঠেই ব্যস্ত হয়। অধুনা প্রত্যক্ষে ও ভাষাতত্ত্বে বাঙ্গালীর মন মজিয়াছে। কিন্তু আর বাঙ্গালীকে মহালোচনার ঠেকাইতে পারা যায় না। শিশিমেই ছাপানো যায়, চোঁটা করিলে পকেটেও কিছু আসিতে পারে।—এমন অবস্থার আমাদের গুতাবিগণের আশঙ্কার ঘণ্টে কারণ আছে। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে নিরীশ্বরবাদী,—আমাদের standard বা মান নাই; আমাদের ভাবার ও জীবনের ধর্ম ইতিহাস নাই,—পুরাতনের উপর সে তর্কস্রজা, সে অহুয়ান নাই। নতাই

সাহিত্যে বহুশ্রেণীভিহের কোয়ার আদিয়াছে। আমাদের পোষাক ও ভাষা ইংরেজী, ভাব ও রং বাঙ্গালা, ধর্মবত বোধ বা ভ্রাম, আচার মূলদমানী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ ঘণ্টেই আছে।

একমল বলেন, 'সাহিত্য কি চিবকানই 'রমাকান্ত কানার' উচ্চারণ করিবে ?' জর্জন অট্টালিকার বাস করিলে জীবন-নাশের সম্ভাবনা; সুতরাং 'বাগানি জর্জনি বধা বিহার' ঐ পুরাতন আবাস ভাগ কর।' আর একমল বলেন, 'আতীরতার উদ্বেগ মাখনে যেটুকু নৃতনবের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া সব বাতিল ও নামজার। পুরানো কাঠামোর তালি দাও ও আলুকাংরা মাখাও।'

কোন মলেরই কোন সামঞ্জস্য বা অগোণ সহজে করিতে পারা যায় না। ইহার উপর বর্তমান যুগের কয়েকটা গুহতর প্রশ্ন আদিয়া সাহিত্যের ব্যাপার আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা প্রশ্ন এই যে, লিখিত ভাষাকে কবিতা ভাষা করিবে, না, শুধু বিশায়া-সাগরী বা ভিত্তী ভাষা করিবে ? তাহার লক্ষ্যতা 'এক মিনে বুচিয়ার নহে। ভাব-প্রকাশের দাবী মাহুযকে ক্রমাগতই ব্যাকরণ তুলিতে বলিতেছে। ইহারই ফলে বিশায়াগরী সমস্ত ভাষা মল্ল ও নীল হইয়া পড়িতেছে—টিক পেঁচোর পাওয়া শিশুর মত।—গদ্যর প্রবল প্রবাহে প্রায়বত তালিয়া চলিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের লক্ষণই পুরাতনে কিরিয়া যাওয়া। যে পুরাতন মানে না, যে ক্যানানের বাস, সে নাতিক। ক্যানানে বা লক্ষণ উত্তেজনার সাহিত্য পড়িয়া উঠে না। অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিলাতী আবহাওয়ার কলে ক্যানান ঢুকিয়াছে। মহা-জগরের বিশ্বজনীন ভাব-সমূহ দ্বারা অপূর্ণ হইলে সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন, তাঁরাই সাহিত্য-লগতে অবর হইয়া থাকেন। যুগধর্ম-নির্ধিন্যে, দেশাচার-নির্ধিন্যে আমাদের মনে যে ভাবদ্বারের সমান দাবী দেই ভাবদ্বারের প্রকাশেই প্রতিভা। লক্ষণ উত্তেজনার কেনিসোচ্ছন্ন হওয়ার মত যে ভাব আশ্বিত্যের কবে, মুহূর্ত অন্তে আবার তাহা বাতাসে বিশিষ্টা যায়। বর্তমান যুগের সাহিত্য অলঙ্কার ও তাবে সমৃদ্ধ হইলেও, তাহা ছাতিয়ের মহিমা ও পৌরব বিশ্বত হইতেছে। নীকার করি, শিক্কা-বিশ্বতের সঙ্গে-সঙ্গে

সাহিত্যেরও বিকৃতি অবশ্যজ্ঞা। এ হিসাবে অধুনাতন সাহিত্যের প্রভাব পূর্বকাল সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এই বিকৃতির ফলে বঙ্গ-সাহিত্যের বাহির হইতে এরূপের ক্ষমতাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এ হেন সুগে সাহিত্যে স্থলীকোশল অসম্ভব। পরের গুণাগুণ বেধিতে গেলে স্থলী করা চলে না। তাই ইহা সমালোচনার সুগুণ,—স্থলীর সুগুণ নহে।

সমাজেও যেমন আচার-রক্ষার প্রয়োজন, সাহিত্যেও তেমনি চাই—কারণ, সাহিত্যকে আনি প্রাথমিক পর্য্যাবস্থায় বা living organism বলিয়াছি। সেই আচারের নাম Standard ও জাতীয়তা বলায় রাখা। এই জাতীয়তারক্ষার সুগেই পুরাতন ও নতনের সমন্বয়-নীতি বর্তমান। এক দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের বেধন প্রচার ও সমাধর, অন্য দিকে তেমনি বিজাতীয় তাব শুণ্ড কল্পনারায় মত সাহিত্যে ও সমাজে অস্থায়্য হইতেছে। রাসা-মহাশয়, উকীল-বারিষ্টার, অধ্যাপক-সিভিলিয়ান, এমন কি, বিদেশী ইংরেজের নিকট আদ্য-কাল বাঙ্গালা ভাবের যে সমাধর দেখি, তাহাতে মনে হয়, আমরা একটা মোহময়ী বাতাসের ভিতর দিয়া বাইতেছি।

আমাদের সমাজ-সমতা, রাষ্ট্র-সমতা, জীবন-সমতা যেমন সর্বরূপে জটিল, গ্রন্থিল ও জটিল হইয়াছে,—আমাদের সাহিত্য-সমতাও তেমনি। আমরা 'সবুজ পত্র' না 'সাহিত্যের' দলে? আমরা পুরাতন সাহিত্যের কোন্ অংশটা জাতীয় জীবনে আবার ফিরিয়া পাইতে চাই? আমাদের Standard বা মান কি? সাহিত্যের নামে যে-সব ব্যক্তির মাসিকপত্র, নটকে ও উপভাসে নিত্য অভিনীত হইতেছে, সেগুলি ক্রান্তেজ্ঞারে তুলিবে, না, ত্রিগ্ধের মত গুরুবস্তার মতকে অর্পণ করিবে? আজ যে দুখা উঠিয়াছে—আমরা কোন বাণা মানিব না,—আমরা পূর্বকাল বশেগারা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইব এবং সমাজ ও সাহিত্যকে সর্বপ্রকারে নতুন আকার দান করিব,—সাহিত্যে এই কথোচ্চারণ কতদূর সম্ভব? আমরা কোন্ পনের পথিক—এ বাস্তব শেষ কোথায়? বর্তমানে আমাদের কর্তব্য কি?

জগতে নতন বেসবতার আবাহন-গান উদ্গীত হইতেছে—“পুরানো বা জিন্দ, কোল তা মূজিরে।” এই গান সাত

সবুজ তের নদীর পারে আদিয়া আমাদের কাণে পৌছিতেছে। আমাদের সাহিত্যে কি-ই বা ছিল, আর এখনই বা কথানা ভাল বই, ক'জন নামজাদা লেখক? বাঙ্গালা সাহিত্যের 'ত' পারম্পর্য্য নাই,—এটা প্রকৃতির বিকৃতি—amorphous growth—ইহার মন্ত এত মাথাব্যথা কেন? আমাদের সমাজে এখনতর indifferentist বা “ছঃখেরছঃখির-মনা: হুংবুং বিদ্যতস্পৃহঃ” এককল হুনিরও আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবান আমাদেরকে এই অস্থিরতা হুনিগদের কবল হইতে রক্ষা করুন!

বর্তমান সাহিত্য-প্রশ্ননিচয় ক্ষিপ্ত জটিল, তাহা আপনামিথকে বলিলাম। আপনাতা জাবিধেন ও চিন্তার কবিনেন। “দীর্ঘ দিবল, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস”—আমরা এই থ্রিটি-প্রশ্নসমূহ নিরন্তর প্রসীদ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে; তাই এই প্রশ্নগুলি আপনামিথকে জানাইবার মন্ত আজ আমি ছুটিয়া আসিয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এখন বিভিন্ন জীবন, গতি ও অভিব্যক্তি। তরুণ সাহিত্যের এই বৃদ্ধির সুগে শাসনের প্রয়োজন হইয়াছে। সেই শাসন-শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে, সেই বর্ণশক্তিটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বর্ণশক্তিই আমাদের চিরন্তন শক্তি। পাশ্চাত্য-জীবনের মেহে পড়িয়া আমাদের সাহিত্য-সেবতার অঙ্গে আমরা যেমন কখনও পেটেকোট ও গাউন তুলিয়া না দিই—ইহাই আমাদের সাহিত্যের বর্তমান নীতি হউক। পুরাতনের সঙ্গে এই পারম্পর্য্য, এই ধারা, এই হৃদয় রক্ষা করিতে পারিলে, সাহিত্যে আর বশশেভিজিরের তর থাকিবে না,—সিদ্ধ মধুকরণ করিবে, বাতাস মধুবরী হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আমাদের পদা শিব হইবে।

এ ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গ নীতির কথা উঠিলে বলিব, internationalisation সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইলেও, পরের দলে কোন জাতি বা কোনও সাহিত্য কখনও পুঠি হইতে পারে না। আমরা অবশেষে নিকট কৃত্য হইতে চাই না। ‘বাচ্চা: ধোখা বরষমিগুণে নাথবে লছকামা:।’ আন্তর্জাতিক প্রভাব-লভ্য তাবজালি সাহিত্য পরিপাক করিয়া লয়। ইংরেজী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গার সমস্ত আলোচনা করিলে, এই ব্যাপারটা সম্বন্ধময় হয়। নানা ভাষা ও নানা ভাবের সংমিশ্রণে এই বিশাল ইংরেজী সাহিত্য বৃষ্টির মত পতাকী

হইতে যিং শতাব্দী পর্য্যন্ত সঙ্গতোভাবে পূর্ণাবয়ব ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইংরেজ জাতি ও ইংরেজ চরিত্রের বিশেষব্যবসায়িক ভাবগুলি যুগে-যুগে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুলের গন্ধের মত অজ্ঞেয় অথচ অব্যর্থ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালার নাটক, নভেল, সমালোচনা, ধর্মন, সমাজ তত্ত্ব, সাহিত্য-তত্ত্বে যে প্রভাব পরিস্ফুট, তাহা বেশী নহে—বিশেষতঃ। কালধর্ম ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্যে জাতীয়তা-বর্জনও কোনরূপে হ্রাস নহে। সেই জন্য পুরাতন আদর্শকে আবার গৃহে বরণ করিয়া আনিতে হইবে।

সুন্দরের দ্বারা আদর্শ 'রজনী শাউন ঘন, ঘন মেঘা বরিষণ',—কিন্তু আহাদের ভয়ে অন্ধা; আমাদের কণ্টক-মুক্ত চরণ,—কিন্তু তবুও আদর্শা স্থির-মেত্র, কঠোর-ব্রত, দৃঢ়-বৃষ্টি; নৃতনের ঘোহন কৃৎকে আদর্শা পঞ্চধারা; আহাদের চারিদিকে ফুলের বাগান; দূরে পশ্চিম-সমুদ্রের

প্রবণাগমি অশ্রুত কলরোল; আহাদের কণি কণ্ঠে ছন্দবদী ধর্ম্মধেবের সেই চিরন্তন প্রসন্ন—'কঃ পদ্মঃ কা পতিঃ কা বার্তেতি'—এ দুহিন্দে সাহিত্যে, জীবনে, ধর্মে, কণ্ঠে প্রাচীর সাধন-যুগের সেই অদ্বয়-লোক আহাদের চরণ লক্ষ্য হউক,—প্রথম আগরণ-জড়িত-লক্ষ্য হিন্দু-জীবনের উপনিষদ্রুত সেই পরম জ্ঞান আহাদের ব্যঙ্গোপর অমল স্রবস্তক যদি হউক—কঠোপনিষদের সেই স্রোতী আহাদের সেই তাম্বোর বার্তা বলিয়া যের—

‘ন তত্র হৃদ্যা জাতি ন চক্সতারকম্
মেধা বিদ্রোহো ভাতি ক্রোড়াহরমধিঃ ।
তমেব ভক্তিমহুভাতি সর্গম্
তত্র ভাষা সর্গবিদং বিভাতি ॥’

• বেংলা সাংস্কৃত সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

১০

কলিকাতা স্টেডেন হিন্দু হোস্টেলের ভিতরের একটা ঘরে অরবিন্দ পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররূপে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিল; এক্ষণেও স্থিগ্ন কলেজের ল-ক্লাসে আইন অধ্যয়ন উপলক্ষে তথায় বাস করিতেছে। এ বৎসর ভেল কলার সে মনে-মনে বড় লজ্জা পাইয়াছিল। পিতার মনের মধ্যে যে এ ঘটনা তাঁহার স্মরণে পুস্ত-সৌরবে একান্তই আঘাত করিয়াছে, এবং তাহারই বলে তিনি এ সম্বন্ধে অত্যন্ত ও পরোক্ষভাবে একমাত্র অপরাধিনী বধূর প্রতিই সমধিক অঙ্গসর হইয়া উঠিয়াছেন, এ সংবাদ তাহার ভাল করিয়াই জানা আছে। এবার একসঙ্গে পিতার সম্বোধ-উৎপাদন এবং বধূর কলঙ্ক-বিসোধন—এই দুইটি সম্বন্ধে কার্য্যের ভার সাধারণ তুলিয়া

লইয়া, প্রাপণ বস্ত্রে সে বধূ-সারথের তলদেশে তলাইত চিত্রটিকে টানিয়া তুলিয়া, আইন-অধ্যয়নে নিরুচ্চ স্থাপিতে চেষ্টা হইয়াছিল। তবু সে অবাধ্য মন কি উপদেশের চোখ-রাঙানি মানিতে চায়? যখন বিদ্রোহে সোরগোল করিয়া স্বাধার নিরন্ত তপস্বীর ধ্যান-ভঙ্গের চোঁতাতেই সে বেন সরা-সর্করা লাগিয়াই থাকে। শৌর্যময়, জ্বিরের-গদি-অঁটা বাটের উপর ভিৎপাত হইয়া পড়িয়া-পড়িয়া, হৃদিত হুঁট চোখের সামনে বাড়ী নাকের মাঝখানে মোহন্য-মান তবু পুন্ড বোলকটি, সর্ব-সর্ব জোঁকা ভুরুন যদ্যুৎলে পাপুরে পোকার কালো টিপখানি, তাৎপল্যগে-পকবিষের মত আরক্ত, আবার গোলাপের পাণ্ডু-ভিখানির মতই হৃদয় হাদিমাধা অধরোষ্ঠ—এ সব বস্তু সম্বন্ধে পরৎকালের স্বচ্ছ,

নির্ণল আকাশে বিচিত্র, স্নগদ, খণ্ড-বেদের মত অনায়াস-
লঘু প্রস্রিত ভাসিয়া বেড়ায়, খোলা চোখে আইনের বইয়ের
মধ্যে নিহিত আইনের ধারাগুলি গ্রিক ভেমনটি হইতেই
পারে না। কখন-কখনও পাশের ঘরের নিকর্যা ছায়েয়া
একান্ত মনোযোগী ভাগ ঘেঁষেটির একটানা পঠন-শয়
অকস্মাৎ খানিখা বাইতে ক্রান্তিত পার; এবং একটুখানি
খুঁটখাট শব্দ হরত কখনও সোনা বার, নহ ত বারও না।
তার পর যদি কেহ একটু সন্নিহিত চিত্তে উঠিয়া আসিয়া উঁকি
দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত, হয় ত তাহার পক্ষে এমনও
সেখিতে পাওয়া সম্ভব হইলেও হৃদয়ে পারিত যে, সেই
বিশাল-বিশুশীল ল-বুখখানির সেই খোলা পাতাখানারই
উপরে টেবিলের উপরকার ক্যাবিনেট সাইজের একখানি
ফটোগ্রাফ পড়িয়া আছে; আর বিপণ কলেজের
এই ছাত্রটির মূঢ় হৃদি চোখের ভায়া সেই কার্ডে আঁটা
ছবিটুকুর ফুটুটে মুখখানির উপরে অনড় হইয়া বসিয়া
গিয়াছে। তা কখন-কখনও যে ঐ সহস্রাবার পর্যাবেক্ত
আলোকচিত্রখানির পৌরব-সিংহাসন একখানি এসেগ-পতী
রসীন চিঠির কাগজের অধিকৃত না হইয়া বাইত, এমন
কথা হলপ করিয়া স্বস্বীকার করিবারও সাহস আনাঘের
নাই;—তা সে রসীন কাগজের চিঠিখানার বতই কেন
বানান্ন ভূণ থাক, বতই কেন তার অক্ষরগুলির হাঁস কুশ্রী,
লাইন বাকা এবং কালির ছাপে অগাঠা হোক, ঐ
সবুতে অনারে এম্-এ পাশ ল-কলেজের ছাত্রটির নিকটে
ইহা বি-এ ক্লাসে পঠিত কাগিনসের বিশ্ববিখ্যাত মহা-
বিরহ-কাব্য মেঘদূতের চেয়ে একটুহুও নীচে নহ;—যেহেতু
ইহাতেও তাহার রূপনী, তরুণী প্রিয়—সেই বক্ষ-বনিতা
তরী ভ্রামা শিখরিংশনা পক্ষবিধাঘেটো,—মধ্যে কান।
চকিত হরিশ্রী প্রেক্ষণা...ইত্যাদি স্বরূপা—হর ত গ্রিক ভেমনি
করিয়াই পতি-বিরহে 'শিখরি-বনিতা পদ্বিনী' এবং মেঘাবরণ
যেহু যশিন-কান্তি হৈশ্বর স্তায় অবস্থাপনা হইয়া এককণ—
গ্রিক ভেমন—আবাড়ের প্রথম দিবসোদিত বঙ্গপ্রভাভাস
গজের স্তায় তুফায়েধের দর্শন-স্বযোগ না পাওয়ার শুধুই
এই শবের পর-উপভোগ্য স্বপন-রৌত্র-বিতাপিত নিদ্রা
নীলাকাশে প্রবলকমিতোজ্জ্বল নেত্র-ভায়াফা দ্রুত হুণীর
সংস্থাপন পূর্বক দূর্যাপদ প্রায়বনের ধ্যান করিতেছেন।
সেই ঘানদ্বাংদ্বার যদিও তাঁহার উরসোচ্চাত হইয়া স্র-

বাধা বীণ হৃদয়ের কুবি-সুপ্রতি হয় নাই; কিন্তু হয় ত শরতের
খোকার অর্ধ-প্রস্রত পর্ণধের ইপিটা কাঁটা খুঁজিয়া কোন্
সময় হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে,—পতীর অন্তরনভা প্রসুত
সেখিকে লক্ষ্য পর্যন্ত হয় নাই। চোখের মলে বীণাতন্ত্রি
আর্জ না হইলেও, গোপন-রোমনে বৃত্তাকারে তাহারে দুইটি
কালির রেখা দেখা গিয়াছে;—এবনি কত কি চিত্রাই সেই
নবীন বিহরীর তরুণ চিত্তকে রামগিরি নির্জানিত হতভাগ্য
বন্ধের মতই সদয়ে-অসময়ে বিকশিত করিতে পারিত।
তবে সুখের বিষয় এই যে, এই স্থানটা হরিশ্রী রামগিরির
নির্জন প্রদেশে নহে, জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের শত-শত
চাকমাপূর্ণ, তরুণ-বৃক-অদ্বাদিত হিন্দু গোটেল এবং নিরতি-
ভাবক, নিকর্যা বন্ধের মত এই অরবিন্দ বেণ্ডারীর নির্ভর
ও কর্ণহীন অবস্থা নহ। মাথার উপর হৃদ্যত পিঠার তীর
তৎসনার আতঙ্ক-লক্ষ্য ও রাশিকৃত আইনের বই পড়ার
ধািয়—এই দুইটা বড়-বড় দায় ঠেলিয়া ফেলিয়া সেই
'চকিত হরিশ্রী প্রেক্ষণার' চিত্রা বতটুকু করিয়া উঠিতে পারে,
সেইটুকুই তাহার বাহাদুরী। এবার বেমন করিয়া হোক,
পাশ করিয়া ফেলিয়া প্রিয়-বিরহরূপ অভিশাপ দূর করিতেই
হইবে। পাশ হইলে ত আবার এমন করিয়া এই নির্জা-
নে কিরিয়া আসিতে হইত না! দীর্ঘবাস বোচন করিয়া
অনুতাপী মনে-মনে বলিত, পাশের প্রায়শ্চিত্ত! একটু
যদি মন বিভ্রান্ত, তাকেও কারও কাছে কথা কনিত হইত
না, আর আমাকেও;—বাক্য, যা ভাগ্যে ছিল হইয়াছে—
এবার আর ঠকা হইবে না। তত্ত্বিত, কালধর্মে আধুনিক
বিহরীরে আরও একটা মহা স্বযোগ ঘটিয়াছে,—দূতের
সাধায়া ব্যতীত এখনকার বিহরী-বিরহিনীগণ অনায়াসেই
নিম্ন-নিম্ন বিরহ-বেদনা প্রিয়মনের গোত্রভূত করণে
অনায়াস-সমর্থ। এই বিরহ-লিপি ভাকযোগ্য প্রেরণ-
সাধনা থাকিলে: কি আর নির্জোঁব বক্ষ একখানা হুঁ চারি
পর্যায় টিকিট আঁটা লোকাকার তরিয়া বান-হুকার চিঠির
কাগজ সরাসরি প্রিয়ার পদহস্তের উদ্দেশে না পাঠাইয়া
মেঘের উদ্দেশে বকিয়া মরিত?

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রথম ডাকেই অরবিন্দের
নিজের হাতে শিরোনামা দেওয়া, একটু কালি-মাথা—
উৎস মোদ্দানো চিঠিখানি আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহারে
বেশনি স্নেহিত, ভেমনি বিশ্বিত করিল। মৃদু-মাইনের বেল

বেলায় আসি কি না; সেইকল্প উৎস্রেক্ষায় পূর্বেই আশা-
ভীত রূপে সে ইহাকে লাভ করিয়া আতর্ঘ্য হইয়া ভাবিল,
হুও কালই মহাশয় হুথানা চিঠি লিখেছিল,—ডাকঘরের
ওরা অত ঘেঁষেনি,—কাল একখানা ঘিরে পাচ্ছে, আশ
আবার এখানে দিলে। তা একসঙ্গে হুথানা পাওয়ার চেয়ে
এই বেশ হলো কিছু! বাসা তুলটি করেছে! আর
মনোটাও কত লম্বী! কেমন মজা করে চিঠিখানি লিখে
আবার আতর্ঘ্য করে দিলে! উঃ, ঐটুকু ঘিরে কত ভাল!
মেধি কি লিখেছে!—নিজের ঘরে পা দিয়াই খামখানার
উপর চোখ দিতে-না-দিতেই বলিয়া উঠিল—“এ যে বর্ধমানের
ছাপ! কবে এলো? ও হরি, তাই এমন সময় চিঠি
এসেছে!”

বেটি মনে করিয়াছিল, টিক সেট মনে দেখিয়া, মন
স্বয়ং ক্ষোভাত্ত্বত করিতে দাঁড়িয়েই, সহসা স্রবণে আসিল
যে, চিঠিখানা একদিনের মধ্যে দুইখানি লেখা পত্রের
একতম না হইলেও, এতকরে পূর হওনের কোন কারণ
নাই; এবং এমন কি বয়ঃ কিছু স্থানী হইলেও হওয়া যায়।
কলিকাতা হইতে বর্ধমান খুব বেশী দূর নয়—ইচ্ছা করিলেই
একদিন—একদিন আর কেন, আশই কলেজ-কেন্দ্রতা
সেখানে হইতে খুরিয়া আসা যায়। কাল রবিবারটাও
সেখানে বাটাইয়া চাই কি সোমবার তোতের কোন
পাড়ীতে চাপিয়া বসিলে, খামসময়ে সে সেদিনের কলেজ
করিতে পারে। চিত্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কর্তব্য বির করিয়া
ফেলিয়া, কৃতসময় অরবিন্দ চিঠিখানি খুলিয়া পাঠে মন
দিল। পত্র বেণী কথা কিছুই ছিল না; অতি সংক্ষেপে
কেবল এইটুকু অহুরোধ,—

“প্রিয়তম!

আমি আশ এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। কলিকাতা
তো দূর নয়—একবারটি আসিবে না কি? বার বড় অহুধ,
‘বড় ভয় করিতেছে। কেমন আছ? আমি ভাল আছি।
কবে আসিবে লিখ। তোমার—মজু।”

অরবিন্দের পরিপূর্ণ চিত্র এই ক্ষুদ্র পত্রটুকুর ক্ষুদ্র
অগ্রাধ করিয়াই তখন সহসা উদ্গিসিত হইয়া উঠিল আরম্ভ
করিয়াছে,—সে আনন্দকীর্ণ তাহার কন্ড হইল না।
ইত্যপূর্বে ইহার চতুর্দশ পত্রকেও সে ক্ষুদ্র-বোঝারোপে
অভিনানে ভাবিয়া কলেজের পড়া মাটি করিয়াছে।

লেখিকাকে এই অপরাধের সাজা স্বরূপে নানাবিধ মান-
অভিনানে পরিপূর্ণ গল্প-পত্র ভরা। পাঁচ-সাতখানা কাগজের
চারি-চারি পৃষ্ঠাখানী প্রকাণ্ড পত্র পড়াইয়া, তাহার খানখানা
বড় উত্তর লেখাইয়া তবে শান্তি পাইয়াছে। আশ কিন্তু কিছু
না। মেহাৎ সুবোধ বাসকের শান্ত হৃদিতে চিঠিখানি
খানখানো রাখিয়া সাবান পানক। হাতে সকলের পূর্বে দান
করিতে গেল। বারে-বারে সাবান ধরিয়া পরিপাটী
মানশেবে বেশ-বিভাল ও আহাির সদাধার পরও বধন
বড়িতে কলেজের বেলা ঘোষণা করিল না,—তখন অলটাই
শ্রী-শ্রী কাম চুকাইয়া নিশ্চিত মনে ওদিকের উদ্দেশ্য
করিতে বসার সাথে ইতি করিয়া, একটা চানড়ার হাত-ব্যাপে
জানা, কাপড়, সাবান, এসেল, হু’ এক মোড়া বাক্তি জুতা,
আরও সব কি—কি গুছাইয়া ফেলিয়া পোটাকয়েক টাক।
পকেটে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অরবিন্দ এখন দুই পকেট ভর্তি করিয়া এবং কমান-
খাণা কাপড়-মোড়া কতকগুলি মূল্য প্যাকেট, বই, খাতা
আরও কত কি দিয়া দুইহাত ভরি করিয়া, হাসি-ভরা
প্রমুখুখে হোটেলে ফিরিল, তখন বেলা তিনটা। তিনটা
চলিষ মিনিটের যে ট্রেনখানার সন্ধ্যাচর সে ভাগলপুরের
মজ বজনা হয়, সেইখানাতেই এবার ততদূর না গিয়া
বর্ধমানে নামিয়া পড়িবে, এই ইচ্ছা। জলখাবারের প্রয়োজন
নাই—বলিয়া দিয়া, দুইটা করিয়া শিঁড়ি টপকাইয়া, হৃদীর্ঘ
সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্বক নিজের ঘরটার ঢুকিয়া
পড়িল। পথে হু’ একটা প্রহর আসিলেও, উত্তর দিবার
আবজ্ঞকতা-বোধ ছিল না,—তাই প্রহর-করতা কার্যই হইয়া
গেল। প্রহরকর্তাদের মধ্যে হু’ একজন হাতেই মিনিসুলার
মধ্যে কি-কি, এবং কাগার মজ ইহাদের আকর্ষক এই
আগমন, এই সতল বিবরের শুভাহ্বনকার্য্য অগ্রসর হইতেই,
অরবিন্দ শেজার আভতীরীর হতে আশ্চর্যমর্গ পূর্বক
বিশেষ অহুদয়ের সহিত নিশ্চি করিয়া কহিল, “মোটো সময়
নৌই তাই,—কাল না তো পরও ফিরে এসে সব তোমাদের
বল্যো।” “ইঃ! কাল না’তো পরও,—কোথার গমন হবে,
আশ অন্ততঃ সেইটেও শুনে রাখি। ভাগলপুর নিশ্চই
নয়। গৃহীণী তো সেই কং-কাগাগারে,—নতুন কিছু
হয়েছে না কি? নিম্নে পকে সেইটুকুখানিও খবর রাখতে
চাই। আমাদের চোখের সামনে যে দিনে ডাক্তারি করবে,

সেট হাতে না।" কোন হাতে ইহারও লুপ্ত হইল করিয়া ইহারের হাত এড়াইল।

তার পরে নিজের বেশভূষা ত্যাগ করিয়া যথেষ্ট সজ্জা পরিপাট্যে সজ্জা করিয়া বেশিয়া, সেই হাত-ব্যাগটার নতুন-কেনা জিনিষ-পত্রগুলি তরিয়া লইল। এইবার একেবার বাঁকি হইতে বাহির হইয়া পলা।

স্বর্গপ্রসাদ তেওয়ারি হাত-তরি করিয়া পোষ্টকার্ড, লেফাকা ও প্যাকেট বিলি করিতেছিল। অরবিন্দ যিতলের সিঁড়ির সব-শেষ-ধাপে তাহার বর্ণন পাইয়াও, নিজের কোন চিঠি আছে কি না, খবর পাইয়া লইল না; পরন্তু, পাশ-কাটাইবার দিকেই মনো-বোপ রাখিল। উল্লিখিত পত্র আজ সকালের ভাঙে অপ্রত্যাশিত রূপেই পাইয়াছে। শিতার পত্র পত্রকলা অসিদ্ধাছিল। আর কিছু না থাকিলেও, আজ তাহার মনের একটা কোণেও কিছুমাত্রই কোঁচ জন্মিলে না। স্বর্গপ্রসাদ খানদুই লেফাকা হাতে লইয়া হাত বাড়াইল, "আপকা মো চিঠিটি আয়া।"

"আমার চিঠি?" এই কথার বিষয় প্রকাশ করিয়া অরবিন্দ পত্র লইবার অল্প হাত বাড়াইল।

"কাল মো চিঠিটি দিয়া; কিন্তু আজ বো;—অকস্মিক হুটু-খুটী কো খবর হোয়া,—বর্ণনা মিলনা চাহি।"

ডাকের দ্বায়ে ভাগলপুরের নাম ও লেফাকার উপর শিতার স্বাক্ষর দেখিতে পাইয়া, সেইখানার উপরেই প্রথমে মনোযোগী হইয়া পড়িয়া, অল্প ঈর্ষ হাতের সহিত ধরায বিল, "হী হুহু, খবর খুটীকোই হোয়া,—লোকের আভি হুহুসং কদ,—কাল তোমকো খুটী কর বেয়া।"

"ঐ আচ্ছা।"

স্বর্গপ্রসাদ চিঠি-বিলি করিতে চলিয়া গেল। অরবিন্দ পত্র খুলিয়া মনে-মনে পাঠ করিল।

ভাগলপুর—জুলাই

শতাব্দীর বিজ্ঞাপন—

অরবিন্দ, তোমার পত্নীর সহিত আমি আমার সকল সখ্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। যদি তুমি আমার পুত্র হও, তুমিও আমার আয়েশে অগ্রাবধি তাহার সহিত নিজ সখ্য সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে। অত্যাচার হইলে তুমি তোমার অনন্য পবিত্র মনে,—তোমার লক্ষ্যপত্র কোন যোগ আছে। যদি পিতৃ-আয়েশ লক্ষ্য কর, তবে একমাত্র লক্ষ্য হইলেও তুমি আমার ত্যাগ-পুত্র।

আত্মবিশ্বাস

ঐশ্বর্য্যবান হই।

অরবিন্দ হাত হইতে পত্রিত এবং অপত্রিত হইখানি পত্রই এক-সঙ্গে খলিত হইয়া বাতীতে পড়িয়া গেল। সে নিজেও এই মধ্যাহ্ন-বেশের পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেও গাঢ় অন্ধকার হইয়া পানের প্রাচীরটা তরিয়া বেশিয়া কোন মতে পত্র নিবারণ করিল।

হাটের তখন উৎসাহ-উত্তেজিত পরিপূর্ণ-চিহ্ন সংসার-পথের নবীন পথিক দুবার হল হল-বাহিরা তলেই হইতে ফিরি-ভেঁজে বা জীভাঙ্কেতে চলিয়াছে। যৌবনের দীর্ঘ-স্বর্গা লক্ষ্যেরই সুখে পূর্ণ-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জলিতেছে। অন্ধ-উৎস হইতে আনন্দের স্রবস হারা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া ইহারের চতুর্দিকও আনন্দময় করিয়া তুলিতেছিল। তাহারের পানের হুহু, হাতির তরল চারিদিকের বাতাসে লহর তুলিয়া তুলিতেছে।

অরবিন্দ কর্তে সে সবের কিছুই প্রবেশ করিল না। অন্ধকার তাহার মনে হইল, এই যে শিতার স্বাক্ষরে লেফা পত্র এইবার সে পাঠ করিল, ইহাতে তাহার নিজেরই মুক্তা-সংবাদ সে পাইয়াছে।

অমরকোট

[ত্রিাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

সিদ্ধেশ্বরের পূর্বদিকে শত-শত-কোশ বিস্তৃত মরুভূমি। এই বালুকাবথ প্রদেশের উত্তরে পকনব-শিক্ত সমতল-ভূমি, পূর্বে মালবের উর্বর উপত্যকা, দক্ষিণে গুহ্মরাত্রার বহুতর মরুসম সীমা এবং পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বর বিশাল সিদ্ধেশ্বর-শিক্ত সমতল-ভূমি। কঙ্কশ্বরের উত্তর সীমান্তে এই মরুসম প্রদেশ শেষ হইয়াছে। যেখানে হারিহীন লবণী নদী কঙ্কর উত্তরপূর্ব সীমার লবণময় ত্রুণে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে অমরকোট নগর ও দুর্গ অবস্থিত।

ভারতের মরুভূমি আফ্রিকার মরুভূমির ভায় নহে। বর্ষাকালে যেখানে বৃষ্টির জল পড়ে, সেখানে নীরস বালুকার সমুদ্রের পরিবর্তে বহুবর্ষের পুশ-শোষিত ভ্রামল ভূপৃষ্ঠতল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে তৃণক্ষেত্র ও পুশবীধি সপ্তাহের মধ্যে মরুভূমির মূলিকাণ্য পরিণত হয়। এই মরুসম বিশাল প্রান্তরের পূর্বপ্রান্ত অবলম্বন করিয়া সিদ্ধেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলে, ক্রমশঃ দূতের পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে বৃক্ষলতাহীন অনন্ত বালুকা-তরঙ্গের পরিবর্তে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবগুটা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগুটা পত্রহীন বৃক্ষ; স্থানবিশেষে ইহা অতি উচ্চ বৃক্ষ; কিন্তু মরুভূমিতে ইহা হস্তধরের অধিক উচ্চতা লাভ করে না। দেবগুটার পরে দুই-একটা বাবলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও আকারে অতি ক্ষুদ্র। সিদ্ধেশ্বরের পশ্চিম কোণের সীমার মধ্যে আসিলে, বন-কাউ ও অন্যান্য বাংলাদেশের নদীর চড়া ও দিয়াড়া জমির গাছ দেখিতে পাওয়া যায়,—যেমন, কাশ, কশাড়া ইত্যাদি। এখন সিদ্ধেশ্বর হইতে পশ্চিম কোণ দূরে গমন করিয়া জল আসা হয়। হস্তমাত্র মরুভূমির সীমান্তেই ভ্রামল ভূপৃষ্ঠতল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পূর্বে নৈসর্গিক দূত অতি দীর্ঘে পরি-বর্তিত হইত।

এককালে অমরকোট বা ওমরকোট মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত ছিল; কিন্তু এখন উহা দেখিলে, সিদ্ধেশ্বরের মূলি-

পূর্ণর একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পরিবর্তে, শুষ্কভ্রামল বহুবর্ষের পরী বলিয়া মনে হয়।

অমরকোটের পূর্বদিকে দূরত্বপূর্ণ দেবগুটা, বন-কাউ ও বাবলা-মণ্ডিত বালুকা-ভূমির পর বালুকা-ভূমি; কিন্তু পশ্চিমদিকে বিগত-বিস্তৃত ভ্রামল ক্ষেত্রসমূহ। বর্তমান সময়ে অমরকোটে মরুভূমির শেষ হইয়াছে এবং তথা হইতে সিদ্ধেশ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে অমরকোট মরুভূমির মধ্যে একটি oasis নাম ছিল। মরুভূমি হইতে ভ্রামল সিদ্ধেশ্বরে প্রবেশ করিতে হইলে যে কয়টা পথ অবলম্বন করিতে হইত, তাহার মধ্যে একটি প্রধান পথ অমরকোট দিয়া গিয়াছে। মরুভূমির সিদ্ধেশ্বরী তাহার নাম 'ধর'। ধরের পথগুলি oasis অবলম্বন করিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পথ অধিকা-বীকা। আর এখন হইতে মশ কোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে পানীই জল পাওয়া যাইবে,—কাল সেখান হইতে আট কোশ দক্ষিণ-পূর্বে গেলে আর একটি ক্ষুদ্র পাওয়া যাইবে,—এইরূপে কোন দিন পূর্ব বা কোন দিন পশ্চিম মুখে চলিয়া, মরুদেশের যাত্রী উত্তর হইতে দক্ষিণ চলিয়া থাকে। ধরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র আছে, তাহার জল অত্যন্ত বিষাক্ত,—যেপন 'তথার 'বোদা' (Brackish); তাহাও আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। জয়শালমের (Jaisalmer) বা ধোদপুর হইতে সিদ্ধেশ্বরে আসিতে হইলে, অমরকোটের পথই প্রস্তুত; কারণ, এই পথে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র আছে। এই ক্ষুদ্র প্রাচীন কালে অমরকোট একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল; এবং অতি প্রাচীন কালেই এই-খানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরের রাজারা যখন বলবান হইয়া উঠিতেন, তখন তাঁহারা, অমরকোট দুর্গ সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশের দ্বার বলিয়া, শৈল দ্বারা রক্ষা করিতেন; কিন্তু তাঁহারা দুর্বল হইয়া পড়িলে, মরুবাসী রাজপুতগণ উহা অধিকার করিত। সিদ্ধেশ্বরের দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজ-পত্নির প্রাণা কখনো অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই; সেই

রাজ অধিকাংশ সময়ই অমরকোট রাজপুত রাজাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল।

বৃত্তীয় বোতল শতাব্দীর মধ্যভাগে রাণা প্রসাদ নামক একজন রাজা অমরকোটের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ১৪৪২ খৃঃ অব্দে হিন্দুধর্মের চোগতাই বা মোঙ্গোল-বংশীয় দ্বিতীয় বাহাদুর নাসিরুদ্দীন হুমায়ুন শের খাঁ বা শের শাহ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুব্যাগের রাজা মালদেব হুমায়ুনকে শেরশাহের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রোত্থিত হইলে, তিনি সিদ্ধুবেশ পরিভ্রাম্য করিয়া বোধপুর রাজ্যে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি গুপ্তচরের দ্বারা তথ্য জানিতে পারেন যে, মালদেব তাঁহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা বন্ধী করিয়া, তাঁহার চিরশত্রু শেরশাহের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য, তাঁহাকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া হুমায়ুন তৎক্ষণাত্ বোধপুর রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যালয়ের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অরণ্যালয়ের রাজা তাও লক্ষ্যণ তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। এমন কি, বাহ্যতে হুমায়ুন অশ্রুচরবর্ণের সহিত অসত্যভাবে বিনষ্ট হন, এই উদ্দেশ্যে তিনি মোঙ্গোলদিগকে ক্রূর হইতে জল লইতে দেন নাই। অরণ্যালয়ের আশ্রয় না পাইয়া হুমায়ুন সর্বশেষে মরুভূমি পার হইয়া সিদ্ধুবেশভিষ্মক্ষে রাজ্য করেন। মরুমধ্যে হুমায়ুন ও তাঁহার অশ্রুচরবর্ণ অসত্যভাবে ও অসত্যভাবে বংশধরানিধি বহুদূর পাইয়া, অবশেষে অমরকোটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ভূতপূর্ব বাহাদুর হুমায়ুন যাহা সত্যজন অশ্রুচরের সহিত অমরকোট দ্বর্গে উপস্থিত হইলে, মোচা-বংশীয় রাজপুত রাণা প্রসাদ তাঁহাকে সারথি অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন।

আকবর-নামার মতে অমরকোটের গুণকালীন রাজার নাম প্রসাদ। যথার্থ মাস্থ-প্রণীত তারিখ-ই-সিদ্ধু অঙ্গুসারে অমরকোটের রাণার নাম বীর শাল। (১) তারিখ-ই-মাস্থী, (২) সিদ্ধুবেশের গেজেটায়ার (৩)

প্রতি গ্রহণ এই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রাণা প্রসাদ বা বীরশাহ মোচা-কাজীর রাজপুত। তিনি বাহীন রাজা ছিলেন, এবং সিদ্ধুবেশের মুসলমান অধিপতি না হোসেন আবদগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। মোচা ও জায়েদা রাজপুতগণ এখনো পর্যন্ত মরুমণ্ডলের প্রকৃত কৃষ্যমী। প্রবাদ আছে যে, মোচাগণ ১২২৬ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী হইতে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য সিদ্ধুবেশে আসিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের নামক পদমার মোচা অমরকোট ও রটকোট নামক দুর্গবহ অধিকার করিয়া রাণা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়েজ অধিকারের প্রারম্ভ পর্যন্ত মোচা রাণাগণ প্রকৃতগণক স্বাধীন ছিলেন। মোচা কুলমহিলাগণ পরমাত্মবলী,— তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের জন্য পূর্বকালে শত-শত রাজপুত আত্ম-বিসর্জন দিচ্চেন; কারণ, সিদ্ধুবেশের পরাক্রম মুসলমান অধিবাসিগণ প্রমত্তী মোচা সলমা সগরের জন্য অসহনীয় বলহীন মরুপ্রদেশ আক্রমণ করিত। বৃত্তীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বলাচ, আকগান দর্দারগণ দ্বিতীয় মোচাগণের নিকট হইতে হুমায়ী কস্তা ক্রয় করিতেন।

রাণা প্রসাদ রাজ্যহীন হুমায়ুনকে সাধবে অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহার পরিবারবর্গকে সুপ্রদ হ্রদে আশ্রয় প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই যেষ্টিত ক্ষুদ্রায়তন সুপ্রদ হ্রদে চতুর্দশবর্ষীয়া বানিকা দ্বাদশ বাহু বেগম হিন্দুধর্মের তথ্যবাহ অধীশ্বর আকবরকে প্রেম করিয়াছিলেন। মরুমণ্ডলের গীমতে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজপুত-কৃষ্যমীর ক্ষুদ্র হ্রদ অমরকোট এই ক্ষুদ্র ভাটতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পরবর্তী কালে সগাগরা ধর্মীয় অধীশ্বর হইয়া আকবর নানাহানে নানাবিধ সৌখিন্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অশ্রুত্বান কখনো তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় নাই। যেখানে বৈয়াম খাঁ চতুর্দশবর্ষীয়া অনাথ বালককে চোগতাই-বংশীয় দম্ভাট বলিয়া আত্মবাহন করিয়াছিলেন, সেই কানানু উজানে প্রেমত বধী নির্ধিত হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে নির্ধিত হুমায়ুনের সমাধি এখনো দিল্লীর প্রাচীনতম সৌন্দর্য্যগার মধ্যে অন্ততম। মরুমধ্যে আকবরের নূতন রাজধানী কতেপুর শিকড়ী এখনো ভাটতের মদনীর

(১) তারিখ-ই-সিদ্ধু—বেঙ্গল মাসেটর অগ্রবাহ, পৃঃ ১১১।

(২) তারিখ-ই-মাস্থী—History of Sindh, Vol. II, translated by Mirza Kalichbeg Faridunbeg, Karachi, 1902.

(৩) Gazetteer of the Province of Sindh, by E. H. Aitkin, Karachi, 1907, page 102.

প্রাসাদমালার 'শীর্ষস্থানীয়'; কিন্তু আকবরের জম্মস্থানে
বোম্বাই বামশাখের স্থাপিত একখানি ইষ্টক বা প্রস্তর নাই।

অমরকোটের বর্তমান নাম ওমরকোট বা উমরকোট।
ঐতিহাসিক ভিসেন্টে দ্বিধ্ব মলেন যে, উমরকোট 'সুদূর
জাতীয় উমর নামক বনৈক প্রধানের রাজধানী'; এবং
তাঁহার মতে অমরকোট নাম ভুল। কিন্তু যে সময়ের পরমার
সোচা উমর-কোট অধিকার করিয়াছিলেন, সে সময়
মরুদেশে মুসলমানের অধিকার ছিল কি না, তাহা নিশ্চিত
বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ভারতীয় মরু দক্ষিণাংশ
কখনো মুসলমানগণের অধিকারভূক্ত হয় নাই। ১৫৪২
খৃষ্টাব্দে রাণা প্রসাদ অমরকোটের অধিগতি ছিলেন।
১৫৬০ বিক্রমাব্দে (১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) ক্ষেত সিংহ নামে
একজন রাজপুত অমরকোট পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন।
এমন কি, নূর মহম্মদ, গোলাম শাহ, সরফরাজ খাঁ প্রভৃতি
কালঘোরা-বংশীর আত্মীয়গণ অমরকোটের রাণাপ্রগণকে
স্বাধীন নরপতির জ্ঞান দেখিতেন। আত্মীয় আত্মুল নবী
কালঘোরার রাজত্ব-কালে বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্রা অমরকোট
প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আকবরের
জম্মস্থানের নাম উমরকোট না হইয়া অমরকোট হওয়াই
অধিকতর সম্ভব। সিদ্ধনদীর বীণ পৃথক্কে যে সমস্ত ভূগোল-
বেত্তা আধুনিক সময়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাবিগের
মধ্যে বেঙ্কার হেগের (M. R. Haig) নাম স্থগিচিত।
বেঙ্কার হেগ, তাঁহার গ্রন্থে একখানি মানচিত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ
করিয়াছেন যে, আকবরের জম্মস্থানের নাম উমরকোট;
কিন্তু ইহার প্রাচীন নাম অমরকোট। (৪) কেহেস্তা
প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ উমরকোট না লিখিয়া
অমরকোট লিখিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভিসেন্টে
দ্বিধ্ব উমর নামক মুসলমান-প্রধানের নাম অত্মসারে
উমরকোটের নামকরণ কোথায় পাইয়াছেন, বলিতে পারা
যায় না। উমরকোট এখন আর খর ও পারকর জেলায়
প্রধান নগর নহে, উহা একটা ভাস্কর্যের প্রধান নগর
মাত্র।

বর্তমান সময়ে অমরকোটে বাইতে হইলে, বোম্বাই-
বিকানের রেলের ছোট ট্রেনে নামিয়া ছয় ক্রোশ উঠে
চড়িয়া অথবা গরুর গাড়ীতে বাইতে হয়। ছোট একটা
জুড় গ্রাম; রেল হইবার পূর্বে এখানে অধিক বসতি ছিল
বলিয়া বোধ হয় না। এখন দুই-চারিখানি দোকান
হইয়াছে এবং অমরকোটের পথ বলিয়া ডাকগাড়ী
এইখানে থাকে। ছোট হইতে অমরকোটে বাইতে
হইলে উষ্ট্রপুতে আরোহণ করাই বিধেয়; কারণ,
রাস্তা তেমন ভাল নহে। সিদ্ধনদেশে তেমন ভাল রাস্তা
নাই বলিলেই চলে। গরুর গাড়ী চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু
তাৎহাতে সড়কচর মালপত্রই চালান হইয়া থাকে। ছোট
ট্রেন হইতে যে রাস্তা অমরকোট পর্যন্ত গিয়াছে, তাহার
দুইধারে সারি-সারি বাঘা গাছ। যে সমস্ত জমি নীচু,
সিদ্ধ নদী হইতে লহর কাটিয়া জল আনিয়া তাহাতে আবাদ
হইতেছে। এখানে ধান, গম, তুলা প্রভৃতির পরিমাণে ভদ্রিয়া
থাকে। উঁচু জমি এখনো পর্যন্ত মরুভূমিই আছে; কারণ,
তাৎহাতে লহরের জল উঠে না। খর ও পারকর জেলায় বড়
গাছ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; সিদ্ধনদেশে বড়
গাছ দেখিতে হইলে সিদ্ধ নামের ধারে বাইতে হয়। এই
বিষয়ে অমরকোটের একটু বিশেষত্ব আছে। অনেক দিন
জেলার প্রধান নগর ছিল বলিয়া অমরকোটে দুই-একটা
সরকারী এবং অনেকগুলি বেসরকারী বাগান আছে।
দূর হইতে খুব-খুব বাসুকাত প-বেষ্টিত জামল বৃক্ষলতামণ্ডিত
অমরকোট নগর বড়ই সুন্দর দেখায়।

অমরকোটে একমাত্র জটীক বৃক্ষ অমরকোট গুর্গ।
সিদ্ধ দেশের খর-বাড়ীর মত সিদ্ধনদেশের গুর্গগুলিও কাঁচা
ইট দিয়া তৈয়ারী। অমরকোট গুর্গটা চতুর্কোণ, ইহার
চারিদিকের প্রাচীর এখনো বিস্তারিত আছে। গুর্গের একটী-
মাত্র প্রবেশ-দ্বার ছিল; কিন্তু এখন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
আরো দুইটী দ্বার নির্মিত হইয়াছে। প্রাচীন গুর্গদ্বারের
দুই-দিকের প্রাচীর পাথরের তৈয়ারী। এইখানে একখানি
সম্ভ্রত শিলালিপির পাঁচ-ছয়টী টুকরা বেগুনালো পাঁখা
আছে। সবত টুকরাগুলি যে একখানি শিলালিপির অংশ,
সে বিষয়ে কেহনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, শিলা-
লিপির ধারে যে সমস্ত কাক ছিল, তাহার চিহ্ন প্রত্যেক
টুকরার পার্শ্বেই আছে। এই শিলালিপির একখানি

(৪) The Indus Delta Country, by Major M. R. Haig, Kagan Paul, Trench, Turner & Co. Ltd, London, 1894, Map facing page 30.

ইকরায ঠকুর ঐ যেত সিং (ঐকের সিং), ১৮৬০
বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ ও তাঁরই অজিতনাথের
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ঠকুর ঐকের
সিংহের রাজত্বকালে অমরকোট মহাভূমির মধ্যে কোন কোন
সাপু অর্থাৎ বণিক তাঁরই অজিতনাথ সেবের একটি
সূক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দুর্গবাসীর কথা এখন মাটিতে পড়িয়া আছে। পোনা
দেল, উড়া ভেঁসন পুরাতন নহে। দুর্গবোধে একটি অতি
প্রাচীন সূক্তি ব্যতীত প্রাচীনকালের ধরবাড়ী কিছুই নাই।
সমস্ত ভাদিয়া কেলিরা কালেক্টর সাহেবের বাড়ী ও কাছারী
তৈয়ারী হইয়াছে। সূর্য্যটী অতি উচ্চ, এবং এখনো পর্য্যন্ত
ইহার কোনও অংশ ভাদিয়া পড়ে নাই। ইহার উপরে
আট-দশটী পুরাতন ভোগ মাঠান আছে। এই সমস্ত
ভোগের মধ্যে একটি বোগল বাদশাহদিগের আমলের।
ইহার উপরে পার্শ্বিতে লিখিত আছে যে, এই ভোগটী ১১২১
হিজরার খোদা ইহার খাঁ বাহাদুর কর্তৃক তাঁহার নিজের
কারণানার তৈয়ারী হইয়াছিল। এই দুর্গবোধে ১৮৪২
খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে (আকবরনামা অনুসারে
১৫ই শাবান ১২৪১ হিজরী, কিন্তু বেরেন্ডা অনুসারে ৫ই
রজব) অলাসুদীন মল্লম আকবর বাদশাহ জয়প্রাপ্ত
করিয়াছিলেন।



সম্রাট আকবর বাদশাহ

আকবর বাদশাহের অস্থান সম্বন্ধে সতর্কতা আছে।
দ্বিতীয় প্রাচীন অনুসারে, আকবর অমরকোট দুর্গের বাহিরে

দুর্গ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এক পুষ্করিশ্রীর ধারে অস্থ-
প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। এই স্থানে একখানি সাদা পাথরে
লিখিত ভাষায় দেখা আছে যে, এই স্থানে আকবর বাদশাহ
অস্থিয়াছিলেন। এখন এই পাথরটির উপরে একজন
সিদ্ধবেশীর মূলমহান ভক্তলোক একটি ছোট পাখা ঘর
তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। ধর ও পারকর জেলার
ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্টেন রাইন্স ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে এই মত সমর্থন
করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাম্রিখ-ই-মাহমী অনুসারে আকবর
অমরকোট দুর্গমধ্যে অস্থিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ভিলেট
সিদ্ধ এই মতের পোষকতা করেন। দুর্গের বাহিরে দুর্গ
হইতে এক মাইল দূরে আকবর অস্থিয়াছিলেন বলিয়া
বোধ হয় না; কারণ, হমায়ুন অমরকোটে আসিলে, রাণা
প্রসাদ বা বীরশাল তাঁহাকে অমরকোট দুর্গ ছাড়িয়া
দিয়াছিলেন; এবং গর্ভবতী হামিদা বাহু বেগম দুর্গমধ্যে
আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে সময়ে আকবরের জন্ম হয়, তখন
হমায়ুন অমরকোটে ছিলেন না; তিনি সৈন্ত-সামন্ত লইয়া
সিদ্ধবেশের মূলমহান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।
হমায়ুনের অশুপস্থিতিকালে হামিদাবাহু বেগম অস্থায়
অবস্থায় অমরকোট দুর্গের বাহিরে বাস করিতেন, ইহা
বিশ্বাস করা যায় না।

সিদ্ধবেশের পেছোয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্গ-
মধ্যে পুলিশ লাইনের নিকটে আকবরের জন্ম হইয়াছিল।
অমরকোট দুর্গমধ্যে যে পুলিশ লাইন্ ছিল তাহা কিছুদিন
পূর্বে ভাদিয়া কোলা হইয়াছে; সুতরাং কিছুদিন পরে পুলিশ
লাইন্ কোথায় ছিল, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন হইয়া
উঠিলে। এখন অমরকোট দুর্গে যুক্তিভার্য্য করার কাছারী,
কালেক্টর সাহেবের বাসলা ও প্রবৃত্ত উচ্চান ব্যতীত আর
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আকবরের জন্মস্থানে
একটি স্মৃতি-চিহ্ন নির্মাণ করা নিত্যক আবশ্যক।
আমাদের দেশে বর্দ্ধমানের মহারাজ স্ত্রীর বিজয়চাঁদ
মহতাব্ বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আকবরের সমাধির
আস্তরণ তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি এই
দিকে আকৃষ্ট হইলে স্মৃতিচিহ্ন-নির্মাণের আশা করা
হইতে পারে। সিদ্ধবেশবাসী এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
উদাসীন।

বেধিতে-বেধিতে দুই বৎসর অতীত হইয়াছে,—শান্তি এক্ষণে পুত্রের জননী; স্বতন্ত্র্য নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে এখন সম্বাদিত। শান্তির বোকা রাজেন্দ্রও এক বৎসরের জট-পুট, নগরকার, গির্য-দর্শন লভ। অমূল্য বয়স এখন সাত বৎসর। তার বয়সের বাগকেরা আর বটটা দ্রুত হয়, সে তাহা হয় নাই। ছোটবেলায় সে যেন বাধানা-আকার করিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া মোহিনীকে জাগাতন করিত, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ সবল হোহিনীর অন্তর আশঙ্কা হইত,—হাটুগীনের এ সব দ্রুতত্বনা এর পর কে সহ্য করিবে? কিন্তু অমূল্য তেমন দ্রুত হয় নাই,—শান্তি, শিষ্ট হইয়া পড়ায় মন দিয়াছে। বেলা নটার সময় বাইরা-বাইরা নিরমিত ভাবে ফুলে যায়; স্কুল হইতে ফিরিয়া জল বাইরা ভীষুর সহিত ঘুড়ি কি গুলি খেলিবার মত বাহির হয়। রাজেনকে সে বড় ভালবাসে; কিন্তু শান্তির ভয়ে রাজেনকে সে বড় একটা খটখট করে না। মোহিনী সংসারের একমাত্র বন্ধন অমূল্যটির দিকে চাহিয়া উদ্ব্যস্ত পর্বাত অস্ত্র পরিশ্রম করে। শান্তির সহিত তাহার অবনিবনাও নাই। রাজেনকেও সে বধাসাধা আদর-বয় করে। মনির সম্ভ্রতি বিবাহ হইয়াছে। তাহার দিদি-বাগুড়ী বোল বছরের নাতিটির সাথ করিয়া বিবাহ দিয়া, ছোট নাংবোটিকে কাছেই রাখিয়াছেন। রাণীও আর বাপের বাড়ী আসে নাই। তারও একটা মেয়ে হইয়াছে। পিসিমা আদরের নাংবোকে চোখের আড়াল করিতে নারাজ।

রাজেন্দ্রকে পাইয়া শান্তি যেন আকাশের চান হাতে পাইয়াছে। তাহার সঙ্গাই মনে হইত, স্বামীকে এখনো সে পূরাপুরি মনন করিতে পারিতেছে না। সে বতই চোঁটা করিত, তবু তাহার মনে হইত, তার কর্মতার যেন আর কুলাইতেছে না। হেমন্তবাবুকে এক-একদিন বড় বিব্রল দেখাইত,—যেন কিশোর হৃৎকর তিনি দ্রাব হইয়া পড়িতেন। তিনি ক্রীড় নিকট সে তার গোপন করিলেও, নারীর সতর্ক চক্ষুকে কান্ধি দেওয়া বড় কঠিন। হঠাৎ এক-এক দিন অমূল্যকে

ডাকিয়া অকারণে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া, সম্মুখে গায় হাত বুলাইয়া পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, মূলের খোঁজ-খবর লইতেন। বাগক পিতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত সময়ের যেন কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়িত; অথচ চাক্ষুসের বাবুর নিকট তাহার আকারের অস্ত ছিল না,—বাগের নিকট সে দুই বেলা পাঠাভ্যাস করিতে বাইত। শান্তি মনে-মনে ভাবিত, আমার যদি একটা ছেলে কি মেয়ে হয়, তখন তাদের টানে আমার ওপর আরও টান পড়বে। হে মা কালী, তোমার আমি সোপার নং পড়িয়ে দেবো, আমার একটা ছেলে দাও মা!

যে শান্তি হৃৎকর মাসের মত বাপের বাড়ী গিয়াছিল। পুত্রার ছুটিতে হেমন্তবাবুও সেখানে গিয়া একমাস ছিলেন। তার পর তিনি বাড়ী চলিয়া আসিলেন। শান্তি স্বামীর নিকট হইতে পত্র পাইবার মত হাঁ করিয়া থাকিত। তার পর সে যখন চিঠি পাইল, তখন তাহার যৌবনের প্রেম-পিপাসা সে পত্রের স্রবাপানে পরিভূত হইল না। বিশেষ, শান্তির বালাসবী বিনোদিনী সে চিঠি পড়িয়া যখন সখীর গারে হাসিয়া চলিয়া পড়িল, তখন শান্তির মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর স্বামী কলকাতার ছেলে। তাহার চিঠি শান্তি অনেকবার দেখিয়াছে। তাহাতে আদর সোহাগের কথা রাশিরাশি, প্রেরণী, প্রাপ্তবতী, প্রেরণতম প্রভৃতি সন্ধানের ছড়াছড়ি। আর হেমন্তবাবু শিথিয়াছেন, “কল্যাণীয়ায়, এ বাড়ির সকল মঙ্গল, ইত্যাদি ইত্যাদি; নীচে আশীর্বাদক লিখিয়া নাম দহি করিয়াছেন। বিনোদিনী সখীর গালে টোকা খাতিয়া কহিল, “মিলের না হয়, প্রথম বারে সাধ-আজ্ঞার সব মিটেছে,—তার দোহান বয়েসও গেরিয়েছে; কিন্তু তোর ভোঁ আর বুড়োবয়সও হয় নি, সাধ-আজ্ঞারও ঘটে নি। এ শুভ ঠাকুরের মতন আশীর্বাদী চিঠি লিখলে কোন্ কল্যায়। আজ্ঞা বেরদিক বটে তো? সে বটেও যোগ হয় এই রকম লিখত।”

শান্তি খেলো হইবার মেয়ে নয়; সে কহিল “আমি তাই

শাশিমে চিঠিই ভালবাদি। কে ধানে, কখন কার চোখে পড়বে। অন্তো রঙ-চঙের চিঠি লিখলে আমার লজ্জা করে। স্বামী তো শুকনম বটেই; ত্রীকে আশীর্বাদ করলে তো কি হোলে।" কিন্তু আমার মনি, শান্তি সে চিঠির উত্তরে অভিমান-ভরে হেমন্তবাহুকে চার পৃষ্ঠা ভরিয়া অনেক কথা লিখিয়াছিল। উত্তরে হেমন্তবাহু কি লিখিয়াছিলেন, সেটা অবশ্য জানিতে পারি নাই।

কার্তিক পূর্ণা করিলে ছেলে হয়, — শান্তির কার্তিক পূর্ণা করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু সে তো আর এ জন্মে হইবে না। পরজন্মের আশা ছাড়িয়া দিয়া, এ জন্মের বন্ধাঘ কেন ঠাকুরের পূজার ঘুটিতে পড়ে, এ প্রশ্ন শান্তির মনে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, একদিন সে সরলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। সরলা তো হাসিয়া পুটোপুটি। সে কহিল, "বেশ আছ বোন্, দিখি মিথ্যাকাটে আছে। খাঙ্ক-মাজ্জ, আমোদ-আল্লাদ কর, গারে বাতাস লগ্গছে,—ছেলে-মেয়ের সাথ কোরো না। না হলে এক জালা, হলে পরে শতেক জালা। তোমার ছেলের সাথে ছেলে, মেয়ের সাথে মেয়ে—কিছুই তো অভাব নেই। এক অমূল্য বৈচে থাক্, বংশ রক্ষা করক; ঐ যোতেই সাতপুরুষ জনপতি পাবে।" শান্তি বেশী কথা বলিয়া কথা-কাটাকাটি ভালবাসিত না; কিন্তু পাঁচজনেই বিচার করিয়া উচিত কথা বলুক দেখি,—অমূল্যর দ্বারা অমূল্যর পিতৃ-মাতৃকুল পরকালের আহার—পানীয় পাইতে পড়ে,—কিন্তু শান্তির বাপ-শিতানহ কি উপবাসী থাকিবে?

যাহা হউক, ভগবানের তো বিচার আছে,—তিনি শান্তির সাথ স্নিহাই পূর্ণ করিলেন,—শান্তি পুস্ত্রের দাতা হইল, তাহার রমণী-কন্য শোভাগা-পর্ষে স্নীত হইয়া উঠিল। হেমন্ত বাহুও নব শিশু পাইয়া খুব খুশী হইলেন। তাঁহার চিন্তে যে "একটা অবশ্যদের দ্বারা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল,—শান্তিও হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। সরলাও শান্তিকে খুশী মনে নুতন শিশুর গেহা-গুস্তরা শিকা দিতে লাগিল। চাকরমোহন বাবুর অবস্থা সে সময় বড় খারাপ হইতেছিল,—একটা মোকদ্দমার হারিয়া কিছু স্বপ্ন দাঁড়াইয়াছিল। শম্ভুবে শারদীয়া পূর্ণা আগত-প্রায়। ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় মোকদমে ধার করিয়া কিনিতে গরিয়াছিলেন,—সরলা কিনিতে ভায় নাই। কিন্তু হিমিকে

আঁটিয়া ওঠা ভার। সে মৃগা ও খোকার মত নুতন জামা-কাপড় কিনিয়া আনিয়াছে। সরলা বকাবকি করার, সে করার করিয়া কহিল, "জামার ভাই-বোনের বেগে আমি যদি কিছু কিনি, তোমার চোখ টাটের কেন বাছা?"

হিমির দ্বিঃসায়ে কেহ ছিল না। সে মাসে তিন টাকা করিয়া যে মাথিনা পাইত, তাহা জমাইয়া পাড়ার সঙ্গে খাটাইত,—স্বতন্ত্র্য তার হাতে দ্রুপদা ছিল। কলিকাতা হইতে কাপড়ওয়ালো এতী বৎসর বাবুদের বাড়ী-বাড়ী অনেক টাকার কাপড় বেচিয়া বাইত,—এবারেও সে আসিয়াছিল। সরলা তাহাকে মিষ্ট-বুধে বিদায় দিল। শান্তি অবশ্য অনেক জামা-কাপড়ই কিনিল,—সরলাকে জাকিয়া পছন্দ করাইয়া লইল।

চাকরমোহন বাবু ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাগুর মেয়ের মজ্জ কি রকম তামা কিনেছে দেখলে? সে আমার শিবেছে, তার মেয়েকে এই প্রথম জামা-জুতো দেওয়া হবে,—যেন সব ভাল জিনিস দেওয়া হয়। মেয়ে যে অভিমানী,—যশুর-বাড়ীর খেঁটা সহিতে পারবে না। যে তার খাণ্ডাং খাণ্ডী। তাদের কাছে বাপের বাড়ীর মান রাখবার মজ্জ তার ভাতী বাততা। এই বাতলা মেয়ের মেয়েগুলোয় জালায় আরও বাপ-মারা ডুবলো।"

কথাটা সরলার গারে বিধিল। সে কহিল, "মেয়ে-গুলোই বড় মোহ। বাপ-মাকে টেনে ছ'কথা বললে মেয়েরা সহিতে পারে না বটে,—ঐটে তাদের মত মোহ। স্বামীর বাপ তো অক্ষমও নয় যে, পুত্রোয় মাংসীকে একটা সাম-পোষাক কিনে দিতে পারবে না? অনিলা থাকলে যে জাল মাংসীর কত আদর হোতো।"

"সে তো হোতোই। যখন নেই, তখন আর কি? অবস্থা বুকে ব্যবস্থা হবে তো।"

"তা তো বটেই। স্বামী যে বড় অসুস্থ মেয়ে। সে মনে করে, তার বাপকে ভূমি বন্সেই সে কিনে বেবে। সে যে এখন অজ রকম হয়ে গেছে, তা জেনেও জানছে না। শান্তি তো একটা লুক তবু মাংসীর মজ্জ কিনেছে যেখলুম। সংসা যে মনে কোরে কিনেছে, ঐ চেয়।"

"তা বৈ কি? সতীন-বেচারীর গুণর যে রাগ, কাল, হিংসেগুলো হয়, সেগুলো, তার নাগাল না গেলে, তার বাচ্ছা-কাচ্ছায়ে গুণর দিয়ে যেটান চাই তো। বতইকু

করছে, জাতেই সবাই মনে করছে, 'আমি সংসা হে জাতো করছে, ঐ তের!' হায় নারী, খর ভাষবার গোড়াই তোমরা! কি কাণ-ভাঙ্গানি মন্ত যে কাণের কাছে পড়,— পুত্রবের সাধা কি তার প্রভাব এড়িয়ে থাকবে! সেই হেমন্ত একেবারে বশ্লে গেছে।"

চিলটি মারিলেই পাটকেলটি বাইতে হয়,— ইহা সংসারের সনাতন ব্যবস্থা; নহিলে, সরলা বেচারী পাঁচ কথা কহিবার মাহুৎ নয়। সে কবাব দিল, 'আমরাই কাণ-ভাঙ্গানী মন্ত পড়ি? তাই না হয় পড়ুমই;—হুর্ষ ঘেরেনাহুৎ, আমাদের কি জাতো হিতাহিত বুদ্ধি-গুচি আছে? তোমরা তিনটে-চারটে পাশ করে, বিধান হুয়েছ,—আগন্তে গাড়িয়ে বস্তুতা ও তর্ক কোরে, হয় কে নয়, নয় কে হয় কোরোছো,—জানেন সীমে নেই, বুদ্ধির সীমে নেই। কোনও কিছু কথার কথা বলতে গেলে, 'মেয়েনাহুৎের দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই, তাবের আবার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে' বলে হাঁকিয়ে দাও,—কথায়-কথায় বল, 'এ সব তোমরা কিছু বুঝবে না'—জবে আবার কাণ ভাঙ্গানীদের মন্তরেই বা কাণ দিতে দাও কেন? হায়! কাণ-ভাঙ্গানীদের পরামর্শ শুনে মা-বাগকে, মার পেটের ভাই-বোনকে পর করে, নিজের সন্তানের মারা তোলে, তারা মাহুৎ, না পিশাচ? তারা আবার বিদ্যো-বুদ্ধির বড়াই কোরে বেড়ায় কোন্ লজ্জায়? যত ধোবে এই মেয়ে নাহুৎগুলো! নিষেধের কি একটুই ভাল-মন্দ জান নেই?" সরলা ধর-ধর করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। চাকরমোহন বাবু এমন সুখের মতন জবাব কোনো দিন পান নাই।

বন্ধুহলে পুত্রবের মনের দুর্দলতার প্রসঙ্গ উঠিলে,— জীলোকের কুপরামর্শই যে উহার মূল, তাহারা যে ধোর মারামিনী, অবিদ্যার প্রতিমূর্তি, তাহা প্রচলিত ব্যাপারের দুইস্তরে ও শাস্ত্রোক্তিত বাসানকলের উল্লেখ করিয়া, সকলেই সে সত্যটিতে নিঃশংরে নিমগ্ন করিয়া দিয়া নিশ্চিত হ'ন। সংসারে যত কিছু অশান্তির মূলই তো ঐ নারী! নারীর মারা-ধানে যুৎ হইয়াই পুত্রবের সমৃদ্ধি বিনষ্ট হয়; নহিলে আর কি!

কিন্তু সরলার কথাগুলো আজ চাকরমোহনের চিন্তা-শক্তিবে বেশ একটু সজাগ করিয়া তুলিল। বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের মেয়েদের যদি কিছু স্বত্বাধার যোগ-

ফ্রটি ধরিতে বাওয়া যায়, উহার পোড়া তাহা হইলে পুরুষেই। বিবাহ হইবার পরই তঁহার শিলালয়বাসিনী বালিকা বধূর নিকট হইতে বিরহের হা হুতাপন্থকে পড়া পাইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান; জীকে হুশিকা দিয়া তাহার মানসিক উন্নতি সাধনের কথা তাঁহাদের মনেও আসে না। এদিকে বালিকা বধূ কাপেলে-পড়া শ্রমীর লখা-চোড়া, নানা ছন্দোবন্ধে প্রেরণাভিযুক্তিপূর্ণ পত্রখানির আদৌ রস গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া, এইটুকু মাত্র মর্শ-গ্রহণ করিতে পারে যে, তাহার স্বামী তাহার বিরহে 'অর-অর বেশ, তবু অতি কীণ'। তখন বধূর হইয়া বধূর দিদি, যৌদিদি, অতাবে ঠাকুর মা, কাকীমা, মাসিমা পর্যন্ত নানা ছন্দে ও ভাবে সে লখা চিঠির চাবাব সেন। বালিকার এইরূপে শিক্ষানবীশি চলিতে থাকে। স্বামী-বেচারী সে প্রেমপত্রখানি কালেজে ও মেনে বন্ধুহলে দেখাইয়া বাহবা লয়। (আর সে বেচারী নিত্যন্তই হুঁচুগা, বাহার শত্রুবাড়ীতে শ্রালি শ্রালাল প্রভৃতি, অন্ততঃ বধূর পক্ষে ওকালতী করে, এমন কোন সঙ্গিনী নাই।) প্রীর কাঁচা মনটি হাতে পাইয়াও, বাপ, মা, ভাই, বোনের সংসারে ঝাপ খাইবার মত না পড়িয়া, তাহাকে ইঁচেড়ে পাতিতে ও ক্ষুদ্র-বুদ্ধি হইয়া থাকিতে লখা অবসর দেওয়া হয়। তার পর যথাকালে যৌবনের বয়স চকু হইতে মুছিয়া গেলে, সংসারে যখনই নিজের কর্তব্যের ফ্রটি ধরা পড়িতে থাকে, তখনই প্রতি পদে জীকেই উহার কারণ বলিয়া, নিজের বিবেকের নিকটে, কীধনশক্তিরই ক্ষুদ্র বুদ্ধির গোলাই দিয়া, রেহাই পান,—হাঁক ছাড়িয়া বাঁচেন।

চাকরমোহন বাবু বরাবর কাল কিতা-পাড়ের 'কাপড়টাই বেশী ভাগ পছন্দ করেন ও পরিচা থাকেন। বিলম্বা-বশমীর দিন বৈকালে আলস্যের নক্ষ-পেড়ে মুক্তি মেথিয়া সরলাকে কহিলেন, "এ মুক্তি কবে আনাগে? আমি তো কালাপেড়ে মোড়াই পছন্দ করেছিলাম,—সেটা কি কেবল দিয়েছে?"

সরলা কহিল, "কেবল কেন দেবো? খপেনের ঐ মোড়া পছন্দ হয়েছে। তুমি আর খপেন এক-পেড়ে কাপড় পরা কি ভাল দেখায়? আমি তোমার সঙ্গে নক্ষ-পেড়ে

দুটি রেবেছি, ঐ বেশ হবে এখন। বুড়ো বয়সে বা হোক একথানা পড়লেই হোকো।”

চাকমোহন বাবু হাসিয়া কহিলেন, “তুমিই আমাকে বুড়ো করে তুলেছ। তোমার শক্তি হেমন্তকে মনে পর্গায় করবার ঠিক দেখ না যে, তার বয়স দিন-দিন বাড়ছে বই কমছে না। আর তুমি কেবল আমাকে সব রকমে বুড়ো করবার চেষ্টার আছ।”

সরলা কহিল, “তোমারও দেখছি ভীষণত ধরেছে, ঠাকুর-পোর মতন ছোকরা সাজবার ইচ্ছে হয়েছে। খপেন যদি মেয়ে হোতো, তোমারও যে আশ নতি হোতো! ঠাকুরপোর ভগ্নে শক্তি সে দিন কাগ-কন্ডার ধাক্কা সেওয়া চকচকে জড়ীপাড় দৃষ্টি কিন্নে। আমি মনে করেছিলুম, জামাইয়ের ভগ্নে বৃষ্টি কিন্নে,—তা নয়। আমাকে বল্গে, ‘হাঁ দিদি, উনি কি এত বুড়ো হয়েছেন যে, এ-সব কাপড় পরতে পারেন না? থান্ পরা আমি কিন্তু পছন্দ করি না।’ আমি বল্লাম, ‘এত কি আর বুড়ো হয়েছে! আমাবের গঁর চাইতে তু’ বন্ধরের ছোট বই তো নয়।’

চাকমোহন বাবু কহিলেন, “তা তোমার শক্তির হাতের গুণ আছে। হেমন্তকে বয়সের চাইতে অনেকটা ছোট দেখাচ্ছে। রোজ দাড়ি কাটার,—পাছে পাক্কা চুলগুলো পড়িয়ে বয়সটা ধরিয়ে দেয়। আমার তো সুখখানা জ্ঞান না হলে কামাখার অবসর হয় না। তোমার তো এমিকে নম্বর দেবারও কুহসং নেই।”

সরলা হাসিয়া কহিল “তা বটে। তবে কথা হচ্ছে কি না, যে, শক্তির এখন তহবিল ভরা আছে,—কাজেই ঠাকুরপোর গরতগুলো সে নিম্নের তহবিল থেকে পুরিয়ে রাখবে। আর আমার তহবিল তো তোমার ঐ সঙ্গে ভেঙ্গে চলেছে,—আমি আর কি ঘিরে পুইই বল? তবে অনিবার্য মতন যদি তোমার ছুটি ঘিরে যেতে পারি, তুমি না হয় তা হোলে একটা গুণ-তহবিলের মালিক আোগাড় করে আন।”

চাকমোহন গভীর ভাবে বলিলেন, “না সরলা, আমার গ-সব আর দরকার নেই। তুমি ঘরের লক্ষী, বাজা-কাছোলের বা ঘোরে আমার ঘর আলা কোরে বেঁচে থাক। আমাবের মনকে বিধাব নেই। দেখে-গুনেন এখন

সম্বন্ধ হয়, ছেলে-মেয়েদের প্রতি আমারে যে এই যে-ভালবাসা,—সেটা ঠিক গুণেরই টোনে, কি স্ত্রীর টোনে।”

সন্ধ্যার পর শক্তিরে ছায়ে উঠিয়া ‘বারোঘারী’ প্রতিমা দেখিবার ভক্ত সরলা উঠানের বাড়ী আসিল। চাক-চোল বাজাইয়া, ছেলে-বুড়ো, ইতর-ভয় অনেকেরই সমারোহ করিয়া প্রতিমা বিলম্বন দিতে চলিয়াছে। চাষা ও বাপ্পীরে ছেলেরা কয়েকটা মশাল ও আসিটিগিন গাল আসিয়া প্রতিমার সঙ্গে-সঙ্গে বাইতেছে। উজ্জল আলোকোন্মাদিতা দেবী-প্রতিমার রাওতার দাছ বেন বদল করিতেছে। মেয়েরা জানাশার, ছায়ে—যে যেখানে ঠাকুইয়া দেখিবার সুবিধা পাইতেছে, সেইখান হইতে প্রতিমার উদ্দেশে বোড়-হাত করিয়া এগিপাত করিতেছে। মোহিনী গলায় কাপড় দিয়া ভক্তি-ভরে এক দৃষ্টে দেবী-প্রতিমার দিকে চাহিয়া মনে-মনে বলিতেছিল, “না জগন্নাথ, তুমি জগতের ছোট-বড় সমারাই মা। তোমার পায়ে আমার গুণু এই তিন্কা মা, অনুগ্ৰহে বেন ভালগ-ভালগ বেখে আমি তোমার চরণে ঠাই পাই।”

প্রতিমা দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া গেলে, শক্তি সরলার পায়ের ধূলা লইল। সরলা শক্তির চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, “বৈতে থাক্ বোন্; রয়েন ভাগ থাক; পাক্কা চুলে সিঁদুর পর।” মোহিনীও সরলাকে প্রণাম করিল। সরলা কহিল, “থাক্—থাক্, আর পেরাম করতে হবে না। তোমার অনুগ্ৰহ তোমার কোল্ জোড়া কোরে বৈতে থাক। বিশ্বগ্ৰহে আশীর্বাদ করিবার আর কি—আছে?” সরলা কিন্তু আনিত, অনুগ্ৰহ মোহিনীর কতখানি বুক জুড়িয়া আছে। শক্তি কিন্তু দৃষ্টিতে পারিত না,—পায়ের ছেলেকে এতখানি ভালবাসা যায় কেমন করিয়া? নীচে নামিয়া আসিয়া মোহিনী সরলার ভক্ত তলপায়ের গুছাইতে গেল। সরলা আসিয়াছে আনিয়া, হেমন্তবাবু বেশখা হইতে কহিলেন, “বন্ধরের মধ্যে তোমার একটা প্রণাম পানো বৌদি! তা এই শোধ দিচ্ছি।” সরলা হেমন্তবাবুর সহিত সাহনাসাদ্ধি কথা না কহিলেও, আড়াল হইতে গুনাইয়া-গুনাইয়া বলিতে ছাড়িত না। হুভরা শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “যার বা শোধ দেবার থাক্বে, বাড়ী করে বেন ঘিরে আসে! আমি কিছু বেচে আমার নিতে আসি নি।” হেমন্তবাবু কহিলেন, “তা সত্যি,—বেখা হোলা

হোসে হাতে-হাতে শোধ দিচ্ছিল। তা থাক্, বাড়ী বয়েই দিরে আসবো।" শান্তি ঘরে স্ত্রীরের হাঁচ, নারিকেল-দুস্পন্দ, নিম্বী প্রভৃতি উত্তার করিয়াছিল। সরলাকে জল খাইতে বসাইয়া গল্প শুরু করিয়াছে, এমন সময়ে দুন্দরীর কোলে চাপিয়া, বিসম্মম দেখিয়া বোকা বাড়ী ফিরিল। তাহার হাঁকডাকে শান্তিকে উঠিয়া ঘাইতে হইল। অমূল্যও ভাসান দেখিয়া ফিরিল। সরলা অমূল্যকে কোলে টানিয়া ধাওয়াইতে লাগিল। মোহিনী কহিল, "কোঠাইনাকে একটা বিজ্ঞান্য পেশায় করলি না, খেতে বসলি?" অমূল্য অমান বদনে কহিল, "কাল কত্ব এখন,—কেনম কোঠাইনা?" সরলা কহিল, "তাই করিস্ বাবা, বাপ্-বেটা হ'লনৈই হাস্।"

হঠাৎ বেওয়ারের গায়ে অনিলায় সেই বড় ছবিখানির দিকে সরলার দৃষ্টি পড়িল,—সব গোলমাল হইয়া গেল। সরলার মনের মধ্যে একটা অশান্তির হাফাকার মাথা নাড়া দিয়া ভাগিয়া উঠিল। ঐ যে দুন্দরী সেরী-প্রতিমার মত নারীমূর্তি,—আজ কোথায়, কোন দূর-দেশে গে ভাগ্যবতী! গৃহের গৃহিণী, স্বামীর স্ত্রী, পুত্র-কঙ্কার জননী! একদিন সংসার ছাড়িয়া অন্তত গেলেন, অমনি চারিদিকে কি বিন্দুখানিই না ঘটে! আর আজ কত বৎসর হইতে কোথায় গে চলিয়া গেছে!

বড় ঘরের, বড় সাধের এই অমূল্যখন। উপবৃণির চুইটি শিত নষ্ট হইয়া অমূল্য কান্নাসে পর, বড় বেহে নাম-করণ হইয়াছিল অমূল্য। একবার ঘাটকে চোখের আড় করা হইত না, আজ তাহাকে কেলিয়া কোথায় গেছ পাখনি! একবার কি তোমার গ্রাম কাঁদিল না! সরলার চক্ষে জল আসিল। তাহার মনে পড়িল, বিজ্ঞান-উৎসবের দিন ছই সবীতে এই গৃহে গলাগলি করিয়া কত আদোষ করিয়াছে,—একজ্ঞ আহারে বসিয়া কত অদ্ভুত হাসি-তালনা চলিয়াছে! একবার সরলার মনে হইল,—এই গৃহে অনিলা বৃষি সেই রকমই গৃহলক্ষী হইয়া আছে,—শান্তির ব্যাপারটা বৃষি ব্রহ্মায়। কিন্তু হায়, তা তো হইতেই পারে না! নিঃশ্বাস কেলিয়া সরলা কহিল, "ছবিখানা দেখে মনটা বড় ধারাপ হয়ে গেল। সব যেন চোখের ওপর নাচছে,—কালকের মতন বলে মনে হচ্ছে।" অমূল্য সাঙ্গেই কহিল, "কোঠাই না, ছোট-না বলে, ঐ খানা আবার বড়-মার ছবি,

বড়-না এখন বর্গের ভাল বাড়ীতে আছে। আবার বড়-মাকে তুমি দেখেছিলে কোঠাইনা?"

হায় বাপক, তুই কি বৃষিবি—সে বড়-না তোয় কোঠাই-মার কতখানি অন্তরঙ্গ ছিলা! মাহুকের সহিত মাহুকের মৌহাঙ্গের বন্ধন চিরদিন, চিরকালই খটতে পারে; কিন্তু প্রথম বহসে যেমন করিয়া বজ্জ-বান্ধবের সহিত জ্বরের যোগ ঘটে, তেমন সচ্চোচীন প্রেম-বন্ধন বৃষি আর কখনও হয় না, হইতে পারে না।

মোহিনী সাক্ষ্য নরনে কহিল, "ও ছবি কোথায় লুকাব দিদি,—তা হ'লে যে বাড়ী অন্ধকার হয়ে বাবে। এখন বেহ-মন নিতান্ত এলিয়ে পড়ে, এখন বড় অলস্ বোধ হয়, তখনই ছবির দিকে চাইলেই মনে হয় দিদি যেন বলছেন, 'অমন ক'লে তো চলবে না বোন! আমার অমূল্যকে যে তোমার হাতেই দিরে এসছি। তাকে না মাহু ক'লে তোমার ছুটি নেই।' মোহিনী অকলে চক্ষু মুদ্রিল। সরলাও অতি কষ্টে অলস্ সতরণ করিল। শান্তি আসিয়া পড়িলে আশ্চর্যের স্তম্ভ মিনে এখন একটা অশ্রীভিক্ত ব্যাপার ঘটতে কতক্ষণ? অমূল্য হতবুদ্ধি হইয়া তত ছোট-মার কোলে মুখ লুকাইয়া কাতর কঠে কহিল, "আমার দুখ পাচ্ছে যে!"

২

প্রিয়বাবু আহারে বসিয়া, বধূকে না দেখিয়া কহিলেন, "দিদি, বৌমা কই?"

প্রিয়বাবুর চুইটি মাজ পুর। বড় কিশোর, ওকালতী গাশ করিয়া প্র্যাক্টীশ করিতেছে; ছোটটি কনিষ্ঠতার বেড়িকেল কলেজে চতুর্থ বাবিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। পুত্র-বধু ব্রাহ্মিক পাইয়া তাহার কঙ্কার সাধ মিটিতেছে। রাণী স্বভাবের অভ্যস্ত প্রিয়পাত্রী। প্রিয়বাবুর আহারের সময় সে নিরমিত ভাবে উপস্থিত থাকে। পৌরী কমলা প্রিয়বাবুর চক্ষের মণি। নাতিমীর কচি, রাতা ইকটুকে মুখ দেখিয়া বুড়ার মন নিতান্তই মজিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। সেই জন্ত সাধ করিয়া তাহার ডাক-নাম রাখিয়াছেন 'কনে'।

'কনে' জ্ঞানদার মতন কড়া-মেঝাজের লোককেও বশীভূত করিয়াছে। জ্ঞানদা হাস-বানী হইতে পাড়া-প্রতি-বানী সকলেরই নিকট পিসি-মা নামে পরিচিত। পিসিমার

ধারণা, রাশভারী না হইলে দাম-দামী হইতে বাড়ীর বউ-ঝি পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রিৎ-মত বশে রাখা যায় না। সেই কারণে সকলের বোধানবা ধনন করিবার ক্ষমতা নিম্নের যেজাজি চড়া রাখিতে-রাখিতে, কোন কাঁকে যে উঠা দাড়া ছাড়িয়া আরও উঠে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা কুন্নিবার অবশর নিজে তিনি কোনও দিন না পাইলেও, উহার উগ্রতা শ্বঃ গৃহদামী হইতে দাম-দামী, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই নিকট নিতা পরিচিত হইতে হইতে ক্রমে কতকটা সহিষ্ণু গিয়াছে।

এ হেন পিসি-মা যে কনেকে এতখানি ভালবাসিয়া সে যেহেতু বস্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন, মেথিরা সংসারের পুরাতন দামী জানকীরায় তাক্ লাগিয়া গিয়াছে।

পিসি-মাত প্রত্যহ ভাইয়ের বাইবার সময় উপস্থিত থাকেন। অবশ্য তাহার বহুদুল সঙ্গর তিনি এক গুণ নষ্ট করিয়া বে-হিসাবীর পরিচয় দেন না,—হরিনামের দামা তাহার হাতে থাকেই। প্রিয়বাবুর প্রায় তিনটি তিনি দামা বুঝাইতে-বুঝাইতে করিলেন, “কে জানে বাপু! তোমার ছিঁটকাঁদনে বোটর তো অত লাগে! তার! বাপের বাড়ী থেকে চিঠি পেলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে, —তোমার বুঝি অল্প কয়েক।”

প্রিয়বাবু বণ্কে অভ্যস্ত ঘেঁষ করিলেও, তাহার দিগ্গলর-পক্ষপাতিত্বটা পছন্দ করিতেন না। বাপের বাড়ী হইতে চিঠিপত্র আসিতে বিলম্ব হইলেই রাগি বড় বেশী উতলা হইয়া পড়ে। অথচ প্রিয়বাবুর নিকট এটা কিছু অবস্থিত নাই যে, বহুর পিতা কতর ক্ষমতা আছে! বাত নহেন।

বাহা হউক, রাগীর একটামাত্র তাই অমূল্য অমূল্য তুলিয়া কতর হইবারই কথা।

কিছুক্ষণ দামা বুঝাইয়া কুটি দামাধা ঠেকাইয়া পিসি-মা করিলেন “আমিথোতা বাপু ভাল লাগে না আর। বাপের বাড়ী তো আর কাকর নেই! তারের একটু ছর হয়েছে শুনে অম্মি কেঁদে ভাগায়ে! এত নাকে-কাঁদনও বেটোর! ছাড় বেন কালাপালা হলো।” কামাটায়া প্রিয়বাবুও পছন্দ করেন না; করিলেন, “তা কেঁদে কি হবে? এম্মি চিঠি লিখে ববর আনিবে দিছি। বা তো জানকীরা, বোমাকে ডেকে আন তো?” বটরের আদান তুলিয়া তৎক্ষণাৎ রাগি নামিয়া আসিল। প্রিয়বাবু করিলেন “কাঁদে কেন দা,

অমূল্য-বিমূল্য সব সংসারেই আছে। এই হুতা সব সংসারে চুকেছ দা,—এখনও কত দেখবে, কত সইতে হবে।”

হাঃ—হাঃ, রাগীর প্রাণের তিতর যে কি করিতেছে, তাহা কে বুঝবে? তার মাতৃহীন চাইটাকে যে সে জীবনের চাইতে ভালবাসে! তার মাথা ধরার সংসারে যে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! স্বর্গপতা জননীও গর্জিত ধন যে অমূল্য!

পিসি-মা করিলেন, “সতি-মিথো তাই বা কে জানে!” বাপ তো একখানা পত্তর লিখে উদ্ভিৎ করে না। সেই পাতানো মোঠা লিখেছে বই তো নয়।”

পিসিমার কথাগুলো আজ এতদিন হরিয়া তুলিয়া-তুলিয়াও রাগীর কিছু গা-সহ্য হইয়া যায় নাই। ক্ষীণ কত বুঝাইয়াছে,—যেহেতু বটর দিবাগাত্রি রাগীকে মিষ্টে কণার তুট করিতেছেন; কিন্তু একটুখানি লম্প-সংযোগে যেমন সম্ভার মিষ্ট জিনিষটি বিবান হইয়া যায়, তেমনি এই পিসি-মার কণার জালার রাগীর সর্কাক কলিয়া উঠিয়া মুহূর্তে এমন লুপ্তর বটরালর তাহার নিকট এসহ বোধ হইত। যুথ লাল করিয়া রাগি জ্বাবে দিল, “আমার মোঠাদামাই মিছে কথা লেখেন না বাবা। আপনার মোঠা কেমন হয় জানি না, কিন্তু এ মোঠার চাইতেও যে তাঁদের যেহ বেশী হয়, তা আবার মনে হয় না। রাজেনের দর হয়েছে, তার পর অমূল্যও দরে পড়েছে। আজকাল ওখানে বসন্ত হচ্ছে। রাজেনের গারে শুটি দেখা মিঠেছে, অমূল্যও গারে খুব বাবা। ডাকার বলেছে, শুও না বেরিয়ে যাবে না।”

প্রিয়বাবু করিলেন, “তা হোলো তো ভয়ের কথাই না, কিন্তু কি করবে বল, ভগবানের কাছে প্রাণনা ভিন্ন অমূল্যের আর হাত কি?”

এদিকে প্রাণই যেমন খটখা থাকে, পিসি-মা জোখ-মুখ বুঝাইয়া করিলেন—“হ্যাঁ দেব প্রিয়, তোমার সংসার এতদিন মাথার কোরে দিলুম,—এইবার আমার খালাস হাও। এক কথা বলতে পাঁচ কথা তুলিয়ে দিলে। আমি কোন ছোট-লোকের বৌর উত্তেজার হয়ে থাকতে পারব না। আমার এইবার কাশি পাঠিয়ে দাও।” এ প্রস্তাব কিছু নূতন নয়। অথচ রাগের বা বৌকেই মাথার এ প্রস্তাবের বস্তখানি মোর থাকে, অত সময়ে তাহার শিকি থাকিলেও হয় তো পিসি-মা সভাই এতদিনে বিবেচন-অরপূর্ণর পদপ্রান্তে স্থান পাইতেন।

প্রিয়বাবু কহিলেন, “বাৎসা হুপুর-বেলা চৌচিরে বাড়ী মাথার কর কেন দিবি ? তাই না হয় যেয়ো।”

পিসি-মা তেলে-বেগনে জলিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তা বলবে বৈ কি ! আমার বিধের করে নিশ্চিন্তি হবার কলী ! বলি, এতদিন সোহাগের বউ কোথায় ছিল ? সংসারটা এতদিন মাথার করে রাখলে কে ? বোয়ের বাপের বাড়ীর নাম কব্বার ভোট নেই ! কেন বল না, একশ-বার জোলবো। এই পুজোর সময়ে নাতনিক পের্বন একটা পোষাক দিতে পারিনি,—ছোটলোকতা যেমন ছেলে-মেয়েদের জায়া দেয়, তাই একটা কিনে দিয়েছে। বলি, মা না হয় নেই, সে না হয় সংসা, তার অতো ছেদা হবে কেন ? বাপ বিশেষ তো রয়েছে—তার কি একটু লাল-লজ্জা নেই ? একটা হাকিমের ঘরে তুই অই বকম কোরে তব-ভাপান কুড়িস, সরম লাগে না ? হি, হি ! এমন চামারের ঘরে কল করেছিলুম যে, কুইনবাড়ীর তব লোককে দেখাতে লজ্জা বোধ হয়। পুজোর তব্বর সন্দেশ পাঁচ ঘরে বিলিয়ে খেতে পাই না। কোনও সাধ মিটল না গা ! কুইনে খেয়া ধরিয়ে দিলে।”

জানকীয়া কহিল, “পিসি-মা, ছোট দাদাবাবুর এমন ঘরে দাদী দিও হান্দা যেন—”

পিসি-মা মুখ-নাড়া দিয়া কহিলেন “বা, বা,—তোদের আর সাউছুঁড়া কর্তে হবে না। এর বৌ এসেই ব্যাংরা ধরছে,—আর একজনাই ঠিট উঁচিরে আহুক ! বিয়ে আর কার আদিনি দিচ্ছি নে—নাকে থং।”

“সেই ভাল,—তা হোল পুণিশের হাতে থেক আদিত রেহাই পাই।” বলিয়া প্রিয়বাবু হাত-মুখ ধুইতে উঠিয়া পড়িলেন। দিদির এ-সব কথা তিনি আদৌ পারে বাণিতেন না। রাণী অবাক হইয়া ভাবিত, পিতা-পুত্রের এ পরিপাক-শক্তি আসিল কোথা হইতে ?

(১০)

ক্ষিতীশ কহিল, “বাবা, তা হোল আপনি কি বলছেন ?” প্রিয়বাবু ধবরের কাগজে কুঁকিয়া গড়িয়া কহিলেন, “আমার বলাবলির কি অপেক্ষা রাখছ তোররা ? বা ভাল বোধ তাই কর যে। হাজার হোক এক গাছের ছাল আর এক গাছে লাগতে পারে না। এত আদর-বড় করও বৌ-মা

আমাদের বন হোলো না,—সবই আমার অন্তঃ !” ক্ষিতীশ উত্তর দিল না। পিতার এতটুকু অলসোব বা মনোবেদনা যে তাহাকে কতখানি বাহিত, তাহা অন্তর্দামী ভিন্ন কে জানিবে ?

বাণ্যকালে মাতুলীন হইয়াও এই বেহম্বর পিতার অপার সেহ-বস্ত্রে পালিত হইয়া তাহার ছই তাই যে একদিনও বৃথিতে পারে নাই,—সংসার তাহাদিগকে প্রথম বয়সেই কি অমৃতা সম্পদে বঞ্চিত করিয়াছে ! আর পিসিমা !—তিনি অস্ত্রের পক্ষে অশ্রিভাবিণী, সুখা হইলেও, তাহার প্রাণপশী দেহধারা যে তাহাদের কীবন-ভুজর মূলে এতদিন ধরিয়া রস-নিযেক করিয়া আদিতোছে, অকৃতজ্ঞের মত তাহা হই বা সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে ?

রাণী বড় অতিমানসী। পিসিমার বাৎসা-আলা অমল হইলেও, প্রথম-প্রথম সে চুপ করিয়া থাকিত,—নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিত। কিন্তু নববধূর সন্তোচ কাটিয়া গেলে পর, সেও সময়-সময়ে হু’একটা কথাই জবাব না দিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার ফলে ব্যাপার এমন হয় যে, বাড়ীতে টেঁকা দার হইয়া উঠে।

ক্ষিতীশ রাণীকে সাধামত অনেক বাক্যে বুঝাইতে চেষ্টা করে। রাণীও যে না বুকে, তাও নয়। কিন্তু মাহুঘের মনের অবস্থা সব সময়ে সমান থাকে না। স্ততঃস্রা অনেক সময়েই অনিচ্ছাসম্বোধে সংসারে অশ্রির ব্যাপার ঘটয়া বসে।

ক্ষিতীশ এক-একবার মনে করিত, ধায়ের বাহ ! ইচ্ছা করুক,—যে কোন দিকে চোখ-কাণ দিবে না। কিন্তু সে কল্পনা কোন-দিন কাজে পরিণত হইত না। একবার পিসি-মাকে বোঝান, আবার রাণীকে সাধনা দান—এই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে সংসার ক্রমেই তাহার নিশ্চটে অনাস্থিকর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে থাকিত বৈজ্ঞান্য দান করিত ‘কমল’। ক্ষিতীশ দেহকরে তাহার ডাক-নাম দিয়াছিল ‘নানী মা’। তাহার চিরবুড়ুকু, মাতুলমহিলাস্ব জন্ম-এ ক্ষুদ্র বালিকাকে ‘মা’ বলিয়া ডাকিয়া বৃদ্ধি কৃপ হইতে চাহিত।

চাকমাহোনবাবুর পক্ষে ক্ষিতীশ আদ্য জানিয়াছিল, রাণীর বাগাটী সন্তব হইলে ভাল হইত ; যে কেতু, রাজেনকে-লইয়া সকলেই বিরত হইয়াছে। সোপের ঘরগার, আর্ন্তনাদে বালক দিনরাত চোখ বৃথিতে পারে না, অমূল্য

জরে বেহাশ,—পুতীমা তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন। রাণী শুনিয়াই ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছে,—কিচীশ কিছুতেই তাহাকে সাহায্য দিতে পারিতেছে না। পিশিয়ার তর্জ্জন-সর্ঙ্গলেনও সে আঙ্গ উঠিয়া খুঁকীকে কোলে নের নাই,—তখন পান করার নাই। পিশিমা রাগিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া ফুসিয়াছেন। রাণী উচ্চ-বাচা না করিয়া, অঙ্গ-জল তাপ করিয়া নাটতে লুটাইতেছে। শ্রিহাব্যবহৃত ইচ্ছানরবে, এই মহামারীর সময়ে বসু পিতৃ-কর্ত্তা লইয়া সেখানে যায়; অথচ রাণীকে না পাঠানও আর স্কিন্দনত নয়। কিন্তু পিতার অমতে কিচীশ তাহাকে পাঠায় কিরূপে? সকাল হইতে রাণীকে একবিন্দু জল পর্বাৎ খাওয়াইতে না পারিয়া, অবশেষে সে রাণীর পিজালায় গমনের প্রস্তাব লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইরাছে। পিতার অমতে আঙ্গ পর্বাৎ সে কোন কাজ করে নাই। কিন্তু আর বৃষ্টি সে নিঃশব্দে চলে না; যে হেতু, কিচীশ ঝানিত, ত্র্যম্বকপ্রাণা রাণী ভাইএর সীড়ার সংবাদে না বাইরা থাকিবে না, অনাহারে শুকাইয়া য়িবে; তখন বাড়ীর লোক তাহাকে পাঠাইতে বাধ্য হইবেই।

কিচীশ মনে-মনে অত্যন্ত অবশি বোধ করিতেছিল।

ভাঙ্গার মনে হইতেছিল, বিবাহ করিয়া সে অস্ত্রায় করিয়াছে। বেশ নিশ্চিত জীবন ছিল। আঙ্গকাল সকলেরই মনোহরজন করা যেন তাহার একটা বাণী হইয়াছে। হাঙ্গার কাছে একটু অহুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে, সেই ছুটা ঘরিয়া যুগ ভার করিবে। ভাল আশা পড়িতে হইয়াছে বটে। আপে জানিলে সাধ করিয়া কে বিবাহ করিত!

যদি বা বিবাহ করিতে হইল,—বাধাকে নিষেধ বলিয়া পাওয়া যেন, তার আবার বাপের বাড়ীর উপলব্ধিটা বাধাকে কেন? ও ভিনিসটা না থাকিলে তাহারেও পাছ-চাল থাকে না। তিন দিন অন্তর বাপ, ভাই, মায়ের অহুতের খবর রাণীর সংসারের প্রতি উৎসাহী হইয়া, মন উড়ু উড়ু করিয়া চোখের জলে বজ্রার সৃষ্টি করে না। কিন্তু পরক্ষণেই এ উডুট কমনার অসারত্ব মরণ করিয়া এত দুঃখের সময়েও কিচীশ মনে-মনে হাসিয়া কেলিল; সঙ্গে-সঙ্গে রাণীর প্রতি সমবেদনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হুঁপাচদিন পরের সংসারে আসিয়া হাঙ্গার উটাকে ঠিক আশনার করিয়া লইতে পারে, একরক্তের

ভিনিল তাহাদের নিকট তাহা হইলে কত প্রিয়, কত আশনার!

পাছে ইহাদের কষ্ট হয় বলিয়া রাণী আঙ্গকাল আর বাপের বাড়ী বাইবার নামটিও করিত না,—ভাইটির অহুত শুনিয়াই না এত অব্যথা হইয়াছে! এইবার সে শেষ চেষ্টা করিবার মন্ত অমুনয়ের বরে করিল, “বাবা, আমার মনে হয় ওকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। যে রকম ভাই-অন্ত্রপ্রাণ,—কাল রাতি থেকে জল-গুণ যুগে দেই নি। যদি সেখানে কোন জল-মন্ড হয়ে যায়,—চিরদিনের জন্যে একটা খোঁটা থেকে যাবে।” প্রিয়বাসু শ্রাবণ নহেন,—এ কথা জাহার প্রাণে বাজিল। তিনি কহিলেন “কিচীশ, তোমা তবে যাক; কিন্তু ‘কেন’কে আমি পাঠাতে পারবো না। তুমি যোমাকে পৌছে দিহেই চলে এগো; কিন্তু সাবধান, সেখানে জল-স্পর্শ কোরো না। সজ্ঞানক রোগকে বড় ভয়!” বাহা হউক, অবশেষে পিতা যে অহুত দিলেন, ইহাই যথেষ্ট। চুনিচ্চা হইতে পরিচাল পাইয়া কিচীশ যেন হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল।

১১

রাণী যখন কমনার কামা-ঝোড়া, যোবা, টুপী প্রভৃতি জানকীয়াকে দেখাইয়া আশায়া একটা ট্রাকে শুকাইয়া দিতেছিল, এবং কিচীশ চেয়ারে বসিয়া অস্ত্রমনত ভাবে নিঃশব্দে সে দিকে চাহিরা দেখিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ সজ্ঞার বরজা ঠেলিয়া উগ্রসৃষ্টিতে পিশিমা প্রবেশ করিয়া, বর কাঁপাইয়া কহিলেন, “বলি, মায়ের দ্বিত, ভুইও যে কটি খোকা হয়ে খুঁকীর সঙ্গে নাচতে লাগলি। বড়মাহুয়ের বেটা বাপের বাড়ী চলে,—এখানে আমার কনেকে নাই দেবে কে? বাহা যে গলা শুকিয়ে বরবে! তোদের দানীপনা-বানীপনা বড়দুর পারি করছি,—আবার ঐ মেরে সন্মার গেঁথে তি মরবে?”

কিচীশ এককণ ঘরিয়া এই রকম একটা কিছু প্রবল কড়ের আশঙ্কাই করিতেছিল। পিতার সম্মতি পাইবার সময় পিশিমার দিকের কথাটা তাহার মরণ ছিল না; পরক্ষণেই সে কথা মনে উদয় হওয়ার, সে সমস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহা হউক, তাহার আশঙ্কা সৃষ্টি গ্রহণ করিতে, সেও যেন সুবিবার বল পাইল; সহজ পলায় কহিল, “ও তো তোমার

আর জানকীরাওই খুব বেশী ভাঙটা,—মাই খাবার আছে দু'এক দিন জীয়ে বেটে,—তা না হয়, খুঁকীকেও ওর মার সঙ্গে পারিয়ে দাও,—কাল কি কল্যাণে তেবে?" পিসিমা এমন অপ্রত্যাশিত উত্তরে কষ্টের তীক্ষ্ণতর করিয়া করিলেন, "ওরে বেয়াড়া, তোর শুদ্ধ আর হোসো কি? আমার এমন কথা বলিস? বেচে মানু কেঁদে লোহাশ কাড়তে তাদের বেটা তাদের ঘরে যাচ্ছে বলে, আমার ঘরের ঘরে কেন সেখানে বেচে থাকবে? এত কি অভাগি তার?" পিসিমা এইখানে একটু খামিয়া আবার করিলেন, "রোগ-দরপের ঘরে, আমার বেটের বাচ্চাকে আমি কেন পাঠাতে যাবো? আমি তো তাদের মতন কেপনি!" তার পর পিসিমা যেমন পমডরে ভূমি কম্পমান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই তাইবেই কিরিয়া গেলেন। জানকীরাও সভয়ে অস্থির হইয়াছিল,—যে যেতু আশে-পাশের অস্থির আশ্রয়স্থান খাতিয়া খাতিয়া কাহার প্রতি বর্ষণ হইবে, তা কেই বা জানে! কিন্তু কিছুকণ যে বর্ষণ না হইয়া যায় হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

পিসিমার শেষ কথা রাণীর কাণে অভ্যস্ত কঠিন বাজিয়াছিল। তাহাকে অস্ত্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে দেখিয়া, ক্রীতশ্রম অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কৈদো না রাণি, পিসিমার মুখের কথাই অমনি,—তিরিখ দিনই শুদ্ধ ত? এখন তাড়াতাড়ি শুধিরে নাও, দু'খণ্টা মাত্র আর পাড়ীর সময় আছে।"

জানকীরা খুঁকীতে লইয়া আসিয়া কহিল, "পেট তরুকে দুখ পিনা বে বহু-না, ডাবনা চুড়ু না। খৌকী হযরে পাশ খুব থাকবে, ওকরা পাতির শোড় তু করিস না—"

জানকীরা বাহির হইয়া গেল, রাণী চুড়ু মুছিয়া খুঁকীকে ঘন পান করাইতে লাগিল। কিছুকণ পান করিয়া খুঁকী খুঁকী হইয়া যাবার কোলে উঠিয়া বসিয়া, যাবার চুড়ুগুলি নাড়িতে-নাড়িতে খেলা শুরু করিল। ক্রীতশ্রম মেহতরে ডাকিল, "মাহ, ছোটনা আমার!" খুঁকী পিতার দিকে কিরিয়া কিছু করিয়া হাসিয়া যাবার গলা জড়াইয়া ধরিল। রাণী মেহের মুখে চুমা খাইয়া বুক চাপিয়া ধরিল। ক্রীতশ্রম কহিল, "খুঁকীকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে তো রাণী! ওর ভজ্ঞে ডাবনা অবজ্ঞ নেই,—শিলীমা গুড় টিক রাখবে। তবে তোমার—" রাণী খুঁকীকে ক্রীতশ্রমের কোলে দিয়া

কহিল, "তোমরা তোমাদের খুঁকীর কথাই তাব গো, আমার ভজ্ঞে ভেবে নিচ্ছে কই পেতে হবে না!"

"কেন রাণি, তোমার দুঃখ-কষ্ট ভাববার কি আমার অধিকার নেই?"

রাণীর প্রশ্নে অভিমানপূর্ণ কষ্টেরে বাধিত হইয়া রাণী কহিল, "সেখ, খুঁকীর ভজ্ঞে আমার কষ্ট হলোও, আমার অনুশার সেবার ভজ্ঞে পেটুকা তাগ-বীকার কি আমি করতে পারবো না? না মরবার সময় তাকে আমার হাতে-হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'মা, তুমি সব চাইতে বড়, তোমার খুঁকীর হাতে অনুশাকে দিয়ে চলবু, তুমিও ছোট তাইটির সেবা-বহু কোরো।' আর বয়সেই যাকে হারিয়েছি,—কিছু যাবার সেই সেব কথাগুলি দিনগতি বৃকের মধ্যে জপ করি। অনুশার এই কঠিন ব্যারামের সময় আমি যদি না দাঁই, তা'হলে আমার মহা-পাপ হবে। সে একটু মারলেই আমি চলে আসব। খুঁকীর এখানে কোন অভাব বা কষ্ট হবে না তাও আমি জানি। কাজেই মন কেমন করলেও, তার বিবরে আমি নিশ্চিত।" লজ্জিতপ্রাণ, ভগিনীর দেহ-মনতাপূর্ণ চরণের পরিচরে ক্রীতশ্রম মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহারও যদি এমন একটা ভগিনী থাকিত! ভগিনী-দেহ কি অমৃতমাধা মিনিস! ব্রীহ পিতামহ-অনুগ্রহে তাহারও মনে যে ক্ষোভের আভাস ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল।

বাইবার সময় রাণী যখন স্বামীকে এগাম করিল, ক্রীতশ্রম ব্রীক সম্মুখে চুপন করিয়া কহিল, "সেখানে বেশ ঠাণ্ডা হোয়ে থাকবে। তোমার দুটি তাই-ই মান,—হুমনকেই দেখা-শোনা কোরো। নতুন মা হু তো কচি ছেলে নিয়ে অনুশার তহারক করতে পারছেন না; সেমজ কুহ হোয়ো না। তার পর অনুশা ভাল হলেই আমার ঘরের লক্ষী ঘরে ফিরে আসবে, কেমন?" রাণী মনে-মনে স্বামীর সহিত স্বামীর শেষ বাক্যটিকে অভিনন্দন করিল।

শান্তি বোমানার রূপ চাষে করিয়া খোকার মুখে চাপিয়া দিয়া স্বামীকে কহিল, "রাত অনেক হলো,—তুমি একটু ঘুমোও। আমি এখন মেয়ে থাকি, হু'মরীও বহুক।"

হেমন্তবাহু কহিলেন, “আমি তবে একবার অনুশ্রমকে দেখে আসি।”

শান্তি কহিল, “এই তো একবার দেখে এসে। এখন তো ও-থরে অনেকেই রয়েছে। তুমি একটু এইবেলা চোখ বুজে নাও না।”

হেমন্তবাহু সে কথাব উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। হুম্মরী যেহেতু বদমাশ ছিল; কহিল, “হিদি মাসির আবার আদিখোতা আছে বাপু। কত দরদ দেখান হয়, যেন মা না মাসী। ও-সব কি আমরা বুঝি না? কথার বলে ‘মা চরে বাধা দায়, তাহে বলে ডান্’। রানী দিদিরও আকল বেশ। কাল থেকে যে এসেছে, তা এদিকে কই উঁকি দেবার নামটি নেই। কেন, এত তো সেই ভাই বাটে, —এক বাগের সম্মান।” শান্তির মন রানীর প্রতি কোন দিন প্রসন্ন ছিল না। অনুশ্রম ও মনির প্রতি তাহার মন ভক্তদূর বিষুদ্বা না হইলেও, তাহারই সমবয়স্ক সতীন্দ্র-বিক্রেয় দেখিলেই, তাহার মনের মধ্যে একটা বিরোধের আগুন দগ্ন করিয়া অনিষ্টা উঠিত। ইহার কারণ কিন্তু সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। এবারে যেন রানীর প্রতি সে অপ্রসন্ন ভাব বাড়িয়া উঠিয়াছে। রানী আসিবার প্রথমে শান্তির সহিত বেশ কথাবার্তা করিয়াছিল। রাজেনকে দেখিয়া, অস্থির হুঁটিনাটি সংবোধ লইয়াছিল। তার পর হঠাৎ কি হইল,—আর সে এ-ঘরে আসেও নাই, বা শান্তির সহিত কথাবার্তাও বলে নাই। যদি বল, শান্তিই কি ও-ঘরে গিয়া অনুশ্রমের বোঁধ বধ করিয়াছিল? কিন্তু সে বোঁধী কেলিয়া কখন যায়? সে তো একা, অথচ উহার এক ঘরে তিন চাষিজন রহিয়াছে।

হুম্মরীর কথা শুনিয়া শান্তি কহিল, “বোধ হয় লাগা-ভাগা কথা কিছু শুনেছে। শুনে তো বয়ে গেল। কায়র আটচালার বাস করি না যে তার কোরে চলেবে।” হুম্মরী উৎসাহিত হইয়া কহিল, “খুঁজীমাকে চেনো না মা। ও মিটমিটে ডান্—কেবল অনুশ্রম, অনুশ্রম। কেন বাপু, আমাদের ছোট খোঁকা কি কেউ নয়? আমি ও-সব একচোখোখানা ঘোটে দেখতে পারি না।”

এ ধরণের নানাতরুণ কথা প্রত্যহ শান্তির কর্ণগোচর করা হুম্মরীর সৈন্যবিন কার্যেই তাগিতকাকুর ছিল। শান্তি কিছু হুঁ, হাঁ, নং করিলেও, সোজীর চনিবার বৈধে,

বক্তার বলিবার আগ্রহ কমিবার অবসর পায় নাই। অনুশ্রম যখন আর হয়, তখন প্রথমে কেহই গ্রাহ্য করে নাই। যাকেনের আর পুং বৈদী হওয়ার, তাহারই সেবা-ভ্রম্যার শিতা-মাতা উভয়েই পুং বাস্ত; যোহিনীও মনে করিয়াছিল, হুঁ একদিনে শান্তিরা বাইবে। তার পর তিন দিনের মিন আর প্রবল হইলে সে শান্তিকে বগিয়াছিল, “অনুশ্রম, আর বড় বেড়েছে দিদি! মিন-কাল ভাল নয়,—তুবি বড়-ঠাকুরকে একবার দেখতে বল।” শান্তির মন ভাল ছিল না। সম্ভবতঃ সে কথা তাহার কাণে পড়িবার নাই। বৈগতিক দেখিয়া তিখুকে দিয়া যোহিনী সরলাকে সংবোধ দিল।

আমকাল ধবর আনা, ডাক্তারকে ধবর বেওয়া প্রকৃতি কাজে তিখুরও একদম অবসর নাই। সন্ধ্যার পর সরলা যখন অনুশ্রমকে দেখিতে আসিল, সে তখন বাতনার ছটকট করিতে-করিতে কণকণে জল চাহিতেছে। রানী-ঘরে যোহিনী ছাঁক ছাঁক করিয়া গুচি ভাজিতে বাস্ত। অনুশ্রমের ডাক শুনিবার ভক্ত সে কণ বাড়ী করিয়া থাকিলেও, গুচি ভাজার শব্দে সে কণি আছান ডুবিয়া গাইতেছিল। সরলা বাস্তভাবে অনুশ্রমকে জল পান করাইয়া কহিল, “কি কই হচ্ছে অনুশ্রম?”

অনুশ্রম কহিল, “বড় বাধা করছে। মা কই? বা, বাধো।” সরলা কহিল, “মাঝে ডেকে খিছি এগুনি।” রানীঘরে গিয়া সরলা যোহিনীকে কহিল, “বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুরের জোপ সাজাও; ছেলেরা যদি জল-জল করে চৌচিরে জল না পায়,—তিব্বী বাবে যে! কড়িকে তো কাছে বসতে হয়! চাকর, বি, তিখু—কেউ এ জগাটে নেই।” যোহিনী কড়া নবোইয়া উঠিয়া গাড়াইল; কপালে কড়াবাত করিয়া কহিল, “ক’দিনে আর বাড়লো বই কদল না। আমি এখন রোগা ছেলে দেখি, না পেরস্তর সংসার চালাই! আমার পোড়া কপালে কি মরন বেই দিদি! ওয়া সবাই রাজেনকে নিয়ে বাস্ত রয়েছে,—তার গারে বসন্ত দেখা দিয়েছে,—সে ছেলেও বাতনার বেহঁসু।”

সরলা আর বড় চট্টা গিয়াছিল; কহিল, “তা কর্তা-গিরীর একবেলা ভাতে-ভাত, একবেলা ছোটো মুড়ি-চিড়ে খেলে কি চলে মা? হুঁ-ছোটো কণী যখন হবে, তখন থাবার অত ভাব্য নাই বা যোশো! জোমারও যেনন বাড়ি ভুক্ত

চেপেছে—“মোহিনী কহিল, “চুপ কর দিদি। অমূল্য ভাল থেকে হেসে-থেসে বেড়ালে আমার বুক দশ হাত হয়ে থাকে,—আমি দশটা হয়ে গভীর বাটাতে পান্নি। অমূল্য বিছানার পড়ে আমার কোমরে শাটের দা পড়েছে। ঔসেরও বড় ঘোব বিই না, ছেলে নিয়ে বাত, কি করে বল। তুমি বিধি, এককটা ব্যবস্থা কর। নতুন দিবি ছেলে-মাছব,—প্রবুৎ ঠাণ্ডা, —ছেলের অগ্রহ দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে,—কোন কথা বললে কাপ পাতছে না।” সরলা তৎক্ষণাৎ গিয়া চাকমোহনবাবুকে সকল কথা বলিল। চাকমোহনবাবু কহিলেন, “গারে বাধ্য এখন বলছ, তখন তো ভাল কথা নহ। টেম্পারেচারটা দেখা হয়েছে? অর কত?” সরলা কহিল, “সে সব কে দেখেছে? আমি তো বিকেলে জন্মুন। গিয়ে দেখি, অরে গা পুড়ে যাচ্ছে,—ছোট বৌ ভেবে অস্থির। সে হস্তান্তর ঐটুকুই তো সমল,—নইলে সে এখানে পড়ে আছে কেন? তুমি একবার যাও, দেখে এসো।” চাকমোহনবাবু অমূল্যকে দেখিতে গিয়া হেমন্তবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমূল্য কেনন আছে? অর না কি খুব বেড়েছে?” হেমন্তবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “কই? আমি তো কিছু জানি না—” বলিয়া জিজ্ঞাস্য নৈবে পত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “অমূল্য কি হু হু হয়েছে না কি?” শান্তির গুণন চমক হইল, মোহিনীর অহরোধ তাহার মনে পড়িল। চাকমোহনবাবু ঐরকম তাবে কহিলেন, “নিজেই ঘরের খোঁজ রাখ না বাড়ীর কর্তা হয়ে, তা আবার বউকে জিজ্ঞেস করছ? ও ছেলেশাহু,—নিজেই তবে আবখানা হয়ে গেছে, তোমার তো সব দিকের খবর রাখতে হয়।” কথায় ভিতরে বগেই বোঁজা ছিল, হেমন্তবাবুকে তাহা বিধিল। হুই বজুতে অমূল্যকে দেখিতে গেলেন। অমূল্য তখন অরের দাতনার হট্টকট করিতেছে। চাকমোহনবাবু ঘরের উতাপ দেখিয়া ভয় পাইলেন; উত্তীয়া দাড়াইয়া কহিলেন, “তুমি এখনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন। বেশ আবেগ তোমার! ছোটটাকে নিয়ে দ্রুতনে পড়ে আছে,—অথচ এ ছেলেটা তিন দিন থেকে অরে পড়ে আছে! আমার ঐ বহি না আসতো, আমিও তো খবর পেতুম না! হেমন্ত, আজ যদি অমূল্যের বা বেঁচে থাকত!” কথটা বলিয়াই চাকমোহনবাবু থকিয়া গেলেন;—

বজুকে এ কথা বলিতে আদৌ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সুখের বলা কথা আর কেয়ে না। যে কথাকলা বনের মধ্যে সদাসঙ্গীতা চলিয়া কিরিয়া বেড়ায়, অথচ প্রকাশ-যোগ্য নহ,—কোনও ফাঁকে বাহির হইবার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়া না পাইয়া কি থাকে? পত্নী-বিরোধের পর বজুর নিকট হইতে হেমন্তবাবু এতদূর ভীত রেববাগী আর একদিনও শোনে নাই। আজ শুনিয়া তিনি মুগ্ধতা চমকিত ও ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকর ও ভিথুকে ডাকিয়া কহিলেন “তোরা আমার বলিদু নি কেন যে অমূল্য অর হয়েছে?” কেহই জবাব দিল না। অমূল্যের অরের সংবাদ অবিলম্বে বাবুর কর্ণপোচর করা দরকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। তীব্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “ডাক্তারবাবুকে আজ সকালে বহেছিলাম।” আশুপে দ্রুত পড়িল; হেমন্তবাবু জিয়া উত্তীয়া কহিলেন, “সে কোথাকার কে? আমার না বলে বাইরের লোককে খবর দেবার তোরা কে? বড় বাড়ী সব বেড়েহিসু নহ,—আমার বলতে কি হয়েছিল?” চাকমোহনবাবু জাবিলেন, বাইরের লোক অর্থে তাঁহাকেও উদ্দেশ্য করা হইতেছে। কিন্তু আশুপে তৎক্ষণাৎ বল পড়িল। মনিবের রক্ত চক্ষুকে ভর না করিয়া তীব্র কহিল, “সকালে তো খুঁজিয়া নতুন-বাকে বরেন আপনাকে বলতে যে, দাদাবাবুর অর খুব বেড়েছে।” হেমন্তবাবু উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে চলিলেন। পথে চলিতে-চলিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঐটি তো সবারই দেখছি। তবে কি আমারও ঐটি হয় নি? যাজেন এখন আমার বউটুকু বুক জুড়ে বসেছে, আগে সেটুকু অমূল্যের ঠাই ছিল না কি? কিন্তু সে যেন কত দূরে চলে গেছে,—নাগালই পাই না। কেন গেল? হেমন্তবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। আজ বহুদিনের পর অনিশার অস্ত্রিত স্বতি তাঁহার চিত্তপটে আশিয়া উঠিল। চিরবিদার-মুহুর্তে তাঁহার পায়ের উপর হাত রাখিয়া অনিশা বলিয়াছিল, “আমি চমু, কিন্তু আমার স্বতি-চিহ্নবস্ত্র তিনটি জিনিস তোমার দিহে গেলুম। এদের বুক নিয়ে তুমি শাসনা পাবে। তোমার অমূল্যদন রইল, ভাবনা কি? অমূল্যকে বহু করে মাহুৎ কোরো, ঐ ঘোটে আবার সব পাবে।” হেমন্তবাবু চমু শাসপূর্ণ হইয়া আসিল। সুতার

সে শেখ বাণী কি তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে সমর্থ হইরাছেন ?

সেই সময়ে শাক্তির পাথের কাছে বসিয়া ব্রহ্মরী বলিতেছিল, “বেশ্লে যা, খুঁজিবার কাণ্ডখানা, বাবুকে খবর না দিয়ে পাড়ার খবর বেওয়া হয়েছে ! তাবের দরম

কি বাপের চাইতে বেশী ? তারা কই কেউই তো ডাক্তার ডাক্তারে যেতে শু পালে না। তারা কেউ টাকার কড়ি খরচ কোরে উপহার কসতে আসবে ? আমাকেও তো একবার বললে পারতো। সব খোলাসী, যা, সব খোলাসী !” (ক্রমশঃ)

সখী

(বন্ধিমচন্দ্রের আখ্যায়িকা-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারতত্ত্ব এম-এ]

(প্রথম প্রণী)

পূর্বসংস্কৃতি

(৯) রাধারাণী ও বসন্তকুমারী

রসমঞ্জরীতে দ্বিতীয় লক্ষণনির্দেশে ‘তন্ত্রাঃ সংঘটন-বিরহ-নিবেদনারীনি কন্দাপি’ এইরূপ বলা হইরাছে, কিন্তু খরিতে গেলে ‘সংঘটন’ অর্থাৎ নাটকের সহিত নারিকার মিলন ঘটাইয়া দেওয়া সখীরও একটি কার্য। রাধারাণীর সহিত বসন্তকুমারীর সখিবে এই তব ক্ষুদ্রীকৃত। (রসিক পাঠক হয় ত বলিবেন, মদনের সংঘর বসন্ত !)

রাধারাণীর দারিত্র্যের দিনে মাতা ও কস্তা পর-স্পরের ভালবাসাও সমবেদনার চিহ্ন আছে, কিন্তু তখন তাঁহার সখীর ব্যবস্থা নাই। তাহার পর কামাখ্যা বাবুর গৃহে রাধারাণীর মাতার বৃত্তা হইরাছিল ; তখন অবস্তাই কামাখ্যাবাবুর কস্তা বসন্তকুমারী (কুম্বর বেলায় চাঁপা অঙ্গেশাও) শঙ্করভার সহিত রাধারাণীকে সাধনা বিদ্যা-হিসেন, কিন্তু কবি সে প্রেমগ জোলেসে নাই। রাধারাণীর পূর্বসংস্কৃতির হৃদয়পাতেও সখীর নিকট সাধনা ও সাধনা পান নাই (চন্দ্রকুমারীর মত পৌত্যা তাঁহার ঘটে নাই), কেননা তখনও তিনি কামাখ্যাবাবুর গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই। তাহার পর, রাধারাণী যখন ‘পরম প্রমত্তী বোড়শখরীয়া কুমারী,’ তখন বালাবিধাক্ষেণী ‘নবাতন্ত্রের পোঙ্ক’ কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর সব

করিবার অন্ত উদ্বেগী হইলেন ও তাঁহার ‘মনের কথা আনিবার অন্ত আপনার কস্তা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।’ (৩য় পরিচ্ছেদ)। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির অন্তই ধ্যাসময়ে (তাঁহার একটুও পূর্বে নহে) বসন্তকুমারীর সখিদের অবতারণা। বালিকা-বয়সেই পূর্বসংস্কৃতির হৃদয়পাত হইরাছে বটে, কিন্তু তাহা এতদিন পাঠকের নিকট প্রকাশ পায় নাই, এই শিতাপুরীর স্বপোনকথন উপলক্ষে পাইল। অবস্ত পূর্বেই রাধারাণী মনের কথা প্রাপের বাধা বাধার কাণী সখীকে ধানাইরাছিলেন। কিন্তু পাঠক সে বিস্তারলাপ আড়ি পাতিয়া শুনিবার অবকাশ তখন পান নাই, এখন পাইলেন। ছোটগল্প বলিয়া গ্রন্থকার সখিদের ইতিহাস ফলাও করিয়া বর্ণনা করেন নাই। এইজন্যই কল্পিত-কুমারের সন্ধানে যখন কোন জন হইল না, তখনও নিবন্ধ-কুমারীর দ্বারা বসন্তকুমারী কি ভাবে নারিকাকে সাধনা বিলেন, চন্দ্রকুমারীর দ্বারা রাধারাণী কি ভাবে সখীর পলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন, সে সকল বাহুল্য-বর্ণনা নাই।

অন্তর্যমিকার (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃঃ ২৩) বলিয়াছি, সখীর নিম্ন স্বপ্নদৃশ্যের কথা কাহো স্থান পায় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এক্ষেত্রে বসন্ত বিবাহিতা কি

কুমারী, সর্বব্যাপী বিধবা, তাহা পণ্ডিত পাঠকের জ্ঞানান কবি আবৃত্তক বিবেচনা করেন নাই। বাক্, এক্ষণে প্রকৃত অঙ্গসংগ্রহ করি।

‘বসন্তের সহিত রাধারাণীর সখ্য। উভয়ে সখবন্ধ।
এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়।’ ‘বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ
অন্ন হাসিতে হাসিতে’ কল্পিতকুমার-খচিত বিবরণ... ‘পিতার
সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল’ এবং বলিল ‘রাধারাণী
কল্পিতকুমার ভিন্ন আর কাহারও’ বিবাহ করিবে না।
সেই রাত্রি অবধি, কল্পিতকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা
গড়িহা, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। এই পাঁচ
বৎসর রাধারাণী আবাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ
বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যেদিন রাধারাণী কল্পিত-
কুমারের কথা আবার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই।’
(৩য় পরিচ্ছেদ।) এই শেষ বাক্যটী লক্ষ্য করিয়াই বলিতে-
ছিলাম, রাধারাণী পূর্বেই ‘বিবাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচরিত্রী’
সখী বসন্তকুমারীকে মনের কথা, প্রাণের যথা ভানাইয়া-
ছিল, কিন্তু কবি তখন সে বিশ্রদ্ধালাপ পাঠকের গোচর
করা আবৃত্তক মনে করেন নাই। রাধারাণী প্রথম দর্শনেই
সাক্ষীর স্তায় (১) কল্পিতকুমারকে মনে মনে পতিবে বরণ
করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাইবার ‘সন্তাননা কিছুই নাই’
তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াও উপগতিত। এই বিরহেৎকণ্ঠিতা
অবস্থায়ই সখীর সাহচর্যের অধিক প্রয়োজন, বসন্তকুমারী
অবতারণায় সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। বাহ্যতে নারিক।
অতীত নারিককে পাইতে পারেন, তজ্জন্ত সখী বিধিত
চেষ্টার ক্রটি করিলেন না, তাহার অল্প পিতার নিকট একটু
প্রণয়লভতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এ
বিলম্বিতা যে রাধারাণীর উপকারার্থ। পিতাপুত্রীর এ
বিবর্তে এমনভাবে আলোচনা আবাদির মত পাড়াগাঁয়ের
একটু কেমন কেমন ঠেকে; কিন্তু অসুস্থান হয়, বসন্ত-
কুমারী যাকুতীনা, স্তম্ভতা এ সব কথা মাতার মারকত
পিতাকে মানাইবার উপায় ছিল না। আর কাণাখাবানু
‘নব্যভ্রমের দোক’, রবীন্দ্রনাথের ভাবায়, ‘নব্যসমাজের
খোলাগুলি মনে বীজিত’, স্তম্ভতা তিনি কল্পার সহিত এ
বিবর্তে আলোচনা করিতে বিধাবোধ করিলেন না। •

যাহা হউক, কল্পার প্রয়োচনার কাণাখাবানু সংবাদ-
পত্রে বিজ্ঞাপন সেওরা প্রকৃতির বায়ব্যা করিলেও তাঁহার
জীবনশায় কল্পিতকুমারের কোন হৃদয় মিলিল না। তবে
তিনি যে হৃদয় ধরিয়া সজ্জন আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহারই
পরিণামে ‘কাণাখাবানুর আশ্রমের পর’ বসন্ত রাধারাণী
আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন, তাহারও ‘দুই এক বৎসর
পরে’ সখা বসন্তকুমারীর নিকট পত্র লইয়া একজন ভদ্দ-
লোক (ইনিই রাধারাণীর আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত
‘কল্পিতকুমার’ ছদ্মনামধারী) রাধারাণীর হৃদয়ে হাজির
হইলেন। (৪ম পরিচ্ছেদ।) উভয় সখী এখন আর
একত্র বাস করেন না, কিন্তু ‘পার্শ্বচরিত্রী’ না হইলেও
বসন্তকুমারীর সখীপ্ৰীতির কিকিদ্দারও ভ্রাস হয় নাই, দুই
থাকিও তিনি সখীর ইষ্টপাথনে নিরত। এই চিঠি
পাঠানোর ব্যাপারে একটু রকমকের আছে। সাধারণতঃ
নারিক বা নারিকা প্রণয়লিপি লেখেন, সখী বা স্ত্রী তাহা
বহন করিয়া বধ্যস্থানে পৌছাইয়া যেন, ইহাই মামুলি
ব্যবস্থা। এখানে সখী নারিকের বহিরা চিঠি লিখিলেন,
নারিক এই সুপারিশ-চিঠির জোরে স্বয়ং যোতা গেলেন।
এই এক চিঠিতেই সব কাহা হাসিল। আসামী এই চিঠি
ঘরা ও আপন একত্রারে সেনাক্ত হইল। এবং এই চিঠির
হৃদে মামলা তহিরের সমস্ত ভার হাকিম স্বংতে লইলেন।
উকীল-যোক্তারের প্রয়োজন হইল না। অর্থাৎ এমন
সঙ্কল্পে সখী বসন্তকুমারী শলিতা-বিশাখাদি সখীর স্তায়
বা স্ত্রীস্বতীর স্তায় পার্শ্ব থাকিলে ভাল হইত। এমন
রাধারাণীর সুখ দিয়া কবি দুই একবার বলাইয়াছেন,
‘বসন্তকে যদি আনাইতাম’, কিন্তু লক্ষ্য করিলে চিরজন্মের
মত বাহ্যতকে হারাইতে হইবে বুঝিয়া নারিক। বেশ
একটু প্রণয়লভতা প্রকাশ করিয়া কাণাখানি করিলেন।
ইন্দিরাও এমন অবস্থায় আশ্বদোষ-কালনের স্তম্ভ বলিয়াছে,
‘তখন আমার কি দায়, মনে করিয়া দেখ’ (ইন্দিরা,
১২ম পরিচ্ছেদ।) ‘ইন্দিরা’ বিবাহিতার পতি-উদ্ধার,
এক্ষেণে কুমারীর অতীতবর-উদ্ধার। প্রণালীও স্বতন্ত্র।
স্বভাবগির সাহায্য ও বসন্তকুমারীর সাহায্য, হারায়
যোতা ও চিত্রায় শাঁক-বাজান, ইন্দিয়ার কীর্তি ও রাধা-
রাণীর কীর্তি, প্রকৃতির তুলনায় সমালোচনা করিলে
প্রণালীর এই প্রভেদ ধরিতে পারা যায়। শেক্সপীয়ারের

• ইংরেজী মফসে কল্পা নিম্নের প্রণয়ের কথাই অনেক সময়
পিতার নিকট বর্ণিত থাকা করেন না।

জার বহিঃপ্রবেশ ও এক ধরনের ছুটী মিসিসে ঠিক একই অংশী অবলম্বন করেন না। বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীত্ববিশিষ্ট সাধবা বসন্তকুমারীর অপেক্ষাও অনেক বেশী। বসন্তকুমারী উকীল-কজা, স্ত্রীত্ববিশিষ্ট উকীল-পত্নী, উকীলের বাড়ীতেই একদল ভবিষ্যৎবিশিষ্ট লোক, বাহার-ভাঙ্কর বাড়ী সাজে না।

বাবু, এ সব বাস্তব কথা আর কব নাহি। প্রেমিক-মুগলের মালাবল হইল, মঙ্গল-নাম্য বাজিল, 'ভক্ত লগে হৃদহিতুক বোপে' বিবাহের দিন স্থির হইল। তখন বসন্ত আসিল।' (১ম পরিচ্ছেদ)। উত্তর সবীতে নন্দালাপ হইল ('অতঃ পরিস্থিতি-প্রভৃতি কৰ্ম্মাণি'—বসন্তকুমারীর কখন বর্ত্তা)। 'বসন্ত আসিলে রাধারাসী বলিল, "তোমার কি আভেল, তাই বসন্ত?" বসন্ত বলিল, "কি আভেল, তাই রাধারাসী?" রা। বাক-ভাক তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?...বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। হৃদ শুদ্ধ ঘেনা পাতনা স্থির নাহে, অমন মহা-জনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।" রাধারাসী বলিল, "তাই আজ আমি তোমার পলায় দড়ি দিব।" এই বলিয়া রাধারাসী যে হীরককাণ্ড ইত্যাদি। সঙ্গে-সঙ্গে ঘটকীবিদায় ও বাকী রহিল না। হাতে হাতে মিলিল। 'রাধারাসী যে হীরককাণ্ড রক্ষিতকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।' এমন গুণের সখী প্রিয়তমের মত রক্ষিত বহুল্লা হারেরই উপদ্রুত। এই নন্দালাপ হইতে উত্তর সবীর ঘোষ-শ্রীতির পত্নীত্ব ও বহুল্লা দুই বার। মধুর-বিসদ-বর্ণনে গলিতা সবীর জার বসন্তকুমারীর কি আদম হইল, সবীকে স্নেহের কথা বলিয়া রাধারাসীর কি আদম হইল, তাহা অমৃতবের তার মধুর পাঠকের উপর দিয়া কবি বিদায় লইয়াছেন, আদম ও লইয়া।

(১০) 'ইন্দ্রিয়ার' অমলা-নির্মলা

অবতারণিকার 'পুনর্নিবৃত্ত ও পরিবর্তিত'—'ইন্দ্রিয়ার' সন্ধে বলিয়াছি, 'স্ত্রীত্ববিশিষ্ট সখি' এই আধারিকার উচ্ছলবর্ণ চিত্রিত। তারাই (prelude) হৃদয়-ব্রত অমলা-নির্মলা বালিকাভয়ের 'স্বপ্ন' হৃদ চিত্র (২য় পরিচ্ছেদ) গ্রন্থের প্রথম ভাগে পরিবেশিত হইয়াছে। (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৫, পৃঃ ৩২)। যেন স্ত্রীত্ববিশিষ্ট

অমলা-নির্মলা এই 'ইন্দ্রিয়ার' ঘরের বিমল সখিদের ঘরের সহিত সুরবীণা। (যেহে 'ইন্দ্রিয়ার' নির্দেশ সখিদের ইতি অমলা-নির্মলা নাম 'ইন্দ্রিয়ার' লক্ষণীয়)। 'সেইদিন সেই স্থানে 'ইন্দ্রিয়ার' ঘরে দেখাছিলো, তাহারে কখনও জুনিব না। = ঘরে 'ইন্দ্রিয়ার' বসন্ত সাত আট বসন্ত। বেগিতে বেগ, তবে পত্র মনরীও নয়। কিন্তু সখিয়ার-ছিল ভাল। কপে হুল, আর হাতে গলায় এক একখানা-গলা। হুল দিয়া খোপা বেড়িয়াছে। রত্ন, কজা, নিউনী ফুল ছোবান, 'ইন্দ্রিয়ার' কাশপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারিগাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট 'ইন্দ্রিয়ার' কলনী আছে। তাহার পাঠের রাগার নামিয়ার সময়ে ঘোড়ারের মনের একটা গান + গারিতে গারিতে নামিল। গানটী মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল তাই এখানে লিখিলাম। একজন এক এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়। তাহারে নাম তুলিলাম, অমলা আর নির্মলা।' ছোট বয়সে ছিন্নদ্বার হৃদয় ছবিখানির আঁকার পট্টায় কৃত্তি দেখাইবার মত এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ মানসনরনে, ছবিখানি প্রত্যক্ষ (Visualise) করিতে পারিয়াছেন। মল বাজানার গানটা ইন্দ্রিয়ার মিষ্ট লাগিলেও উদ্ধৃত করিব না, কেন না অনেক পাঠক হয় ত বহুল্পরীর মত বিরক্ত হইয়া বলিয়া যাবেন, 'মরণ আর কি? মল বাজানার আবার গান?' এই অবস্থাতেই ভালমত লাগার কথা আবার ইন্দ্রিয়ার আপাত-দৃষ্টিতে:দৃষ্টির ব্যবহারের নিম্নের বেলার তুলিয়াছেন। 'যদি কখন মল বাজিবে বেতে-হ, তবে সে এখন।' (১৫ম পরিচ্ছেদ)।

(১১) 'ইন্দ্রিয়ার' ও স্ত্রীত্ববিশিষ্ট

সখিদের (prelude) হৃদয়-ব্রত এই পরিচ্ছেদের ঠিক পর-পরিচ্ছেদেই ইন্দ্রিয়ার সহিত স্ত্রীত্ববিশিষ্ট সখিদের

• এই ঘরে দুই দিনায়া ইন্দ্রিয়ার লেখ কথা বলিয়াছেন, 'আমি স্ত্রীত্ববিশিষ্টে জুনিব না, ইহ কপে জুনিব না। স্ত্রীত্ববিশিষ্ট মত এ গলায় আর কিছু দেখিলাম না।' আমরাই কি জুনিব?

+ ইন্দ্রিয়ার তখন ঘোড়ারের মত ভরা যৌবন, এ ইন্দ্রিয়ার প্রাধান্য-বোধ্য। 'মল বাজানার ইতি (symbolism) ১৫ম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত।

বিনিময়-পতন। অবশ্য বড় 'ইন্দিরা'র কথা বলিতেছি, ছোট 'ইন্দিরা'র অমলা-নির্মল্যও নাই, সুভাষিনীও নাই। আমরা বহু কাব্য-নাটকে নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনে প্রেমে পড়ার (love at first sight) রোমাঞ্চিক ঘটনা দেখিয়াছি, এ ক্ষেত্রে নারীতে নারীতে প্রথম-দর্শনে সখি-সংলগ্নের ব্যাপার। প্রথম-দর্শনে প্রেমে পড়ার ব্যাপারে যেমন (প্রেমসংস্কারের আধিক্য-স্বরূপ) রূপগুণের চিত্র কবিরূপ অঙ্কিত করেন, এ ক্ষেত্রেও সেই কারণে সুভাষিনীর রূপবর্ণনার প্রয়োজন ঘটয়াছে। যাক্ একবার অমলা-নির্মল্যের রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, আর সেই স্তরে স্তরবধি সুভাষিনীর রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিব না। প্রেমের ব্যাপারে যেমন 'অমিনিয়ে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ', সখি-ব্যাপারেও সেইরূপ ইন্দিরা 'অমিনেব-গোচনে' 'সুতো'কে দেখিতে লাগিলেন, ('তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে বাহু করিয়া কেলিল') 'প্ৰবেশ' মিষ্ট কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। ('সুভাষিনী' নামের সার্থকতা লক্ষ্যীয়।) সুভাষিনীও ইন্দিরার 'আত্ম হাত' লক্ষ্য করিলেন, 'চোখে জল' ও মুখে হাসি'ও দেখিলেন, প্রাণ পুল্লিঙ্গ অপরিসীমতার সহিত আশাপ করিলেন। কর্কশ-ভাষিনী মাণী নার কথা'র আঁচ তাঁহার গারে লাগিতে দিলেন না, দৃষ্টতা ও কোমলতার প্রভাবে তাঁহাকে দানীভূতি নহে, লোক-সেবান পাটিকাভূতি গ্রহণ করিতে রাজী করিলেন, স্বাভাবিক 'বশ করিয়া লইতে' একটু বেগ পাইতে হইবে তাহাও বলিলেন। একদিন সুভাষিনী ইন্দিরার পরমোপকার করিবেন, হারানিধি মিলাইবেন, আর কেবল তাহার পুনোৎপত্তি উপস্থিত অস্থিতপক্ষ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, আপাততঃ তাঁহার একটা কিনারা করিয়া দিলেন। পাঠকবর্গ সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে বুঝিবেন, যেমন সরল-মধুর ভাবে উভয়ের সখিষের সূত্রপাত হইল।

বাটা পৌছিয়া সুভাষিনী চাকুরী বেদিয়া স্বাভাবিক বুঝাইলেন বাবুনের মেয়ে অপেক্ষা কারোন্তের মেয়ে রাধুনীই ভাল, 'সুসুদিনি' বুঝী বলিয়া স্বাভাবিক তাহাকে রাখিতে একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন হঠাৎই দ্বারা স্বামীকে ভাতাইয়া তাঁহাকে হুসুম করিলেন ইহাকে রাখাইয়া দিতে হইবে, স্বামীর একবেলা খাওয়া হইল না তাহাতে

সুভাষিনী যে কষ্ট পাইলেন, তাহা অপেক্ষা স্বামীর কোমলে এই রাধুনী রাখা হইল তাহাতে বেশী দুঃখ পাইলেন, আবার এমিকে স্বাভাবিক দুঃখকো 'সুসুদিনি' যখন মর্মে রাখা পাইয়া কামিতে লাগিল তখন তাহার সহিত তিনিও কামিলেন,—ইত্যাকি-ব্যাপারে (১ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত) বুঝা যায় ইহার মধ্যেই নব পরিস্থিতির প্রতি তাঁহার কতটা প্রাণের টান হইয়াছে। তাহার পর বুঝী বাবুনী বর্ণনা-বসন্ত: 'সুসুদিনি'কে গালি দিলে উচ্চতর সুভাষিনীর তাহাকে তিরস্কার, স্বাভাবিক পাকা চুল তোলা লইয়া রক্ত, সুভাষিনীর হেলের কল্যাণে 'সুসুদিনি'র সহিত বেহান পাতান, সুসুদিনির রাগার কাষ হাফা করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি হইতে (৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ) বুঝা যায় সুভাষিনীর স্বাভাবিক কত গভীর হইয়াছে। বিতৃষ্ণিতরে এ সবলের পুরা বিবরণ দিলাম না। নাটিকা মিলাই বর্ণনাছেন, 'একটা অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটা হিঁতবিশি সখী। দেখিতে লাগিলাম যে সুভাষিনী আমাকে আত্মিক ভাল-বাসিতে লাগিল—আপনার শুভিনীরও সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই, ব্যবহার করিত। 'এমন বহু পাইয়া আমার এ হৃৎপের মনে একই হুখ হইল।' (৯ম পরিচ্ছেদ।) যাক্, এ সবটাই গেল গোড়া-পত্তন, সখি-সম্পর্কের প্রথম ধাপ। প্রোবিতভর্তৃকা বিরোধোৎপত্তিতা 'রাই-উম্মাদিনী' স্বামি-পাগলিনী নায়িকার গতি-উদ্ধারের অস্ত্র সুভাষিনী কতটা করিলেন, তাহার বিবরণ এইবার আরম্ভ হইবে; ইহাতেই সখিষের পুরা পরিচয় পাওয়া যাইবে। পূর্বের এ সমস্ত ব্যাপার তাহারই preparation বা সূত্রপাত।

একদিন 'সুসুদিনি' দুখ কসকাইয়া 'কালান্বিতার ভাণ্ডারী' কথাটা বলিয়া কেলিয়াছিল (৯ম পরিচ্ছেদ) কিন্তু তখন কথাটা চাপা দিয়াছিল। পরে সুভাষিনী চাপিয়া ধরিল, 'সেই গল্পটা বলিতে হইবে।' (১০ম পরিচ্ছেদ।) এই কোমলে গ্রহকার নায়িকার প্রসুখাৎ ইন্দিরার জীবনের ইতিহাস সুভাষিনীর—ভিত্তিগত সখীর গোচর

• তিনিই সখি-সুসুদিনি, একটা ভাষণও আছে। সুভাষিনীর প্রথম ও শেষ অংশ ইন্দিরার—সুভাষিনীর সখিষের বর্ণনা আছে। ইন্দিরা যখন শিশুপ্রকৃতি আবাদিনী, তখন সুভাষিনীই যেও ভাবিনী-সুভাষিনী।

করিয়াছেন। সকল তুমিরা হুতাবিণী স্বামীসহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দিয়ার পতি-উদ্ধারের রীতিমত ভবির লাগাইলেন। প্রথমে পত্র লেখা হইল, জাকব্বের নাম না থাকতে কোনও ফল হইল না। হুতাবিণী স্বামী দ্বারা তাহা দাখা করাইয়া-
ছিলেন সবই ইন্দিয়াকে বলিলেন। (১৭ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর ‘আকাশে ফান পাতিয়া’ ইন্দিয়ার সোণার টাং দিয়া পড়িল,—হুতাবিণী তথা রমণবাবুর কোমলে। (১৮ পরিচ্ছেদ।) এইবার ইন্দিরা ‘অভিশারিকা’ হইবার মস্ত উদ্ভূষ হইলেন—কিন্তু এ স্বামী-বোঝবার মীমাংসা নহে, নিম্নের পত্রের নিকট অভিসার। তিনি হারায়ীর গাধা চাছিলেন, পাইলেন না, অপরূপা সখী হুতাবিণীর শরণ লাইলেন; তাহার সহিত কথা কহিতে গিয়া বুকিলেন, এ সব যোগাযোগ হুতাবিণী তথা রমণবাবুর কাণ্ডি। হুতাবিণী ইন্দিয়ার অনুরোধে রমণবাবুর মারকত উপস্থাব্যকে বাড়িটার মস্ত তথার থাকিতে বলাইলেন। এবং ইন্দিয়ার উপকারের মস্ত হারায়ীকে দূতীরাণি করিতে দিতেও রাজী হইলেন। (২২ পরিচ্ছেদ।) অস্ত্র সখী প্রয়োজন হইলে দূতীর কার্য করেন, এ ক্ষেত্রে পর্দানশীন ভদ্রমহিলাস পক্ষে তাহা অসম্ভব, হারায়ীকে ইঙ্গিত করিয়াই হিউবিশী সখী হুতাবিণীকে কান্ড থাকিতে হইল। ইংও দোষের কিনা তাহা বিবেচনা করিবার মস্ত ‘হুতাবিণী অনেকক্ষণ জাখিল।’ এইরূপে কবি এই রোম্যান্টিক ব্যাপারে হুতাবিণীর যোগদানের মস্ত আট-খট ঝগড়া কাব করিয়াছেন।* পর-পরিচ্ছেদে (১৩ পরিচ্ছেদে) বেধা দায়, হুতাবিণী কোমলে হারায়ীকে ইঙ্গিত করিলেন।

হুতাবিণী এই পর্যন্ত করিয়া কান্ড হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এই ১৩ পরিচ্ছেদে কবি ইহার উপর এমন একটা সলেন জিনিস বিদ্যায়, বাহাতে এই সখিযেত, স্ত্রীত্বব্দের নিবিড়তা গভীরতা ‘সুউতর হইয়াছে, চিত্র উজ্জলতর হইয়াছে। হুতাবিণীর ঘরে কবাট দিয়া

ইন্দিয়াকে সাজান (বালক-সজ্জা)। আপনার অলঙ্কার-রাশি উপহার বেওয়া, ইন্দিরা কিছুতেই রাজি না হইলে তাহাকে কুলের সাথে সাজান, ‘কি জানি তাই আদ বৈ তোমার সঙ্গে যদি বেধা না হয়, তবুবা তাই কখন,—তাই তোমাকে আদ এ ইয়ার-রিং পরাইব। তুমি যেখানে যখন থাক, এ পরিণে আদাকে তুমি মনে করিবে।’ এই বলিয়া ঝুড়িতে কাহিতে আসন্নসখী-বিরাহকুলা অধঃ সখীর প্রাপণতির সহিত আসন্নমিলনের সম্ভাবনার আনন্দোৎসাহ হুতাবিণীর ইন্দিয়াকে ইয়ার-রিং পরান, উত্তর সখীর আদিকে কান্ডিতে হাঙ্গিতে হাঙ্গিতে মিষ্ট ইয়ারকি, + আলিদান, মুখচূষন ইত্যাদি বধুর স্বন্দর ব্যাপারের চুখক বর্ণনা দিয়া এই অল্পমাত্র চিত্রের অন্তহানি করি না, পাঠকবর্গকে ১৩ পরিচ্ছেদের শেষার্ধ্বে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাণি একটু উদ্ধত করিবার শোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ‘সখীভাবেই কথা কহিতে লাগিল। আমি যে চলিয়া যাইব, সে কথা পড়িল। চকুতে তার একবিম্ব মল ঢক ঢক করিতে লাগিল। এক ফোটা চোখের মল আমার গালে পড়িল। ঢোক দিলিরা আমার চোখের মল চাপিয়া, আমি বলিলাম।... তখন হুতাবিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরলাম। গাফ আলিদানপূর্বক পরস্পরে মুখচূষন করিয়া গলা ধরাধরি করিয়া, দুইজনে অনেকক্ষণ কাঁদিতাম। এমন ভাবভাগা কি আর হয়? হুতাবিণীর মত আর কি কেহ ভাল বাসিতে জানে? মরিব, কিন্তু হুতাবিণীকে কুলিব না।’ ইয়ার উপর চীকা-উগ্গনী অনাবরক্ত (imper-
tinence) বেদাদবি হইবে।

+ নিম্নাইএর পাঠ্যকে স্বামীসহিত বেধা করাইবার সময় সাজানোর চেষ্টা ইয়ার কাছে হার গমনে। কবলমণিও এমন করিয়া হুতাবিণীকে সাজাইতে গর করিতে পারেন নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে বন-ভাগ লক্ষণের উপরও ভেটা দিয়াছে।

= যে লক্ষণ পাঠক ইহাতে হারায়ীকে বেধিয়া বাসিকা কৃত করিলেন, তাহারিগকে পুতকের শেষে উদ্ধৃত দেখায় কবিতা ‘Rarely, rarely, comest thou; spirit of delight’ যখন কহিতে অনুরোধ করি। সে বসে বসে আনন্দের উজ্জ্বল হই বস্তু কহিতেই অস্বাভাবিকভাবে ‘পুনর্দীপিত’ করিয়াছিলেন।

* হারায়ীর যোগদানের-এই প্রকার ‘পরিবর্তিত ও পুন-
দীপিত’ ইন্দিয়ার কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হারায়ীর
এসঙ্গে দুইয়াই। (ভারতবর্ষ, আদিন, ১৩২৬।)

ইহার পথে, ইন্দিরা স্বহস্তে তথিরের ভার লইলেও—স্বপ্নপঙ্কাও বড়, কেননা কমলমণির সখি নিজের ভায়েক হুতাবিণী একেবারে হাল ছাড়িয়া দেন নাই—রমণবাবুর উপশ্রবাবুর বাটী ঘাভাড়াই তাহার প্রমাণ। (১৭৭ ও ১২৭ পরিচ্ছেদ।) ইন্দিরার পতি-উচ্চারে হুতাবিণীর সখীর কণ্ঠা স্ফুটিল। ‘উপসংহারে’ ইন্দিরা আবার হুতাবিণীর কথা তুলিয়াছেন, হুতাবিণীর সহিত পত্র-বিমিশর ‘করিগাছেন, আর বলিগাছেন, ‘হুতাবিণীর জন্ত সর্ব্বদা আমার প্রাণ কামিত।’ আর একবার রাজ হুই সখীর দেখা হইয়াছিল—হুতাবিণীর কস্তার বিবাহ-উপলক্ষে। ইন্দিরার শেষ কথা—‘আমি হুতাবিণীকে ভুলি নাই। ইহকালে ভুলিব না। হুতাবিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।’ সহস্রর পাঠকেরও বোধ হয় এই রায়। এক দিগায়ে হুতাবিণীর সখি কমলমণির সখি

সঙ্গে, আর হুতাবিণীর সখি নিত্যক নিত্যের সঙ্গে, নব-পরিচিতার (অজাতকুলশীলা বলিলেও চলে) সঙ্গে। এই তুলনার কথা ছাড়িয়া দিলেও হুতাবিণী এখন শ্রেণীর সখীমণির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহা নিঃসন্দেহ। আখ্যানটি হামুলি আদরসের ব্যাপার হইলেও, হুতাবিণীর আচরণ ও কাব্য ঠিক বাধ্যবাধী (Conventional) প্রণালীতে নহে, সখিদের এই রমণীর আদর্শে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে।

ব্যতিক্রমে সম্পূর্ণ নুতন ধরণের সখিদের চুইট চিত্রের (প্রভুর ও দিবা-নিশি, শ্রী ও অরবী) পরিচয় দিয়া প্রথম শ্রেণীর সখীর বিবরণ শেষ করিব।

দেবী ও দানব

[ত্রৈকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল]

(১)

ধন্যপুরের সর্ব্বেশ্বর বহুর স্তম্ভরী কস্তা গৌরীরাণীকে বধন জামনগরের চৌধুরী বাবুরা মণি-মুক্তার অলঙ্কারে মুড়িয়া বধুজপে লইয়া গেলেন, তখন গ্রামের মধ্যে একটা ভীষণ আলোলনের সৃষ্টি হইল। একই ভাঙের বাশ ভিন্ন প্রকৃতির মহাবীর প্রবৃত্তির বশে নানা কর্তব্য সাধন করে—কেহ ধর্ম্মভীর হস্তে তৈলপত্র ও ধূমপত্র হইয়া সন্মানের নাথার পুণি ফাটাইয়া দেয়, আবার কেহ বা কার্তিক মাসে প্রাসাদ-শিখরে গাড়াইয়া গৃহস্থের পূর্ণপুঙ্খদের প্রেক্ষালোকের দ্বারপথ উদ্ঘাটিত করিবার জন্ত আকাশ-প্রাণীদের অবলম্বন হয়। গৌরী-রাণীর বিবাহের উৎসবের তরঙ্গগুলো তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মানব-প্রকৃতির আশ্রয়ে গিয়া বিভিন্ন চিন্তার লহর তুলিল। ঈর্ষার কাহারও বুক ফাটিয়া গেল, আনন্দে কেহ অধীর হইল, জামনগরের চৌধুরী বাবুর সহিত অবসরে আলাপ পরিচয় করিয়া লইয়া, কেহ বা আপা করিল, ভবিষ্যতে বা হোক একটা কিছু সুবিধার পথ গুলিয়া লইবে। সর্ব্বেশ্বর বহুর কনিত্র ভ্রাতা উকীল, পরমেশ্বর কেবল

প্রজাপতির শুভাগমনের হুতপাতের সময় হুইতে নাসিকা ফুকন করিগাছিলেন এবং বিজয়ের মত জোড়ের নিকট গিয়া বলিগাছিলেন—দাদা, কাণ্ডটার কি সুবিধা হবে? বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া কখন শেখেনি—ওর নামটা কি—টাকাই কি সর্ব্ব? বেঘেটার ভবিষ্যৎ সুখ-শাস্তি—দাদা বাধা দিয়া বলিগাছিলেন—বল কি ভাই? ছেলের স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।

রায়ে সর্ব্বেশ্বর-গৃহিণী বলিলেন—জানি গো জানি। হিংসে মিনিগটা বড় সর্ব্বনেশে। বেধব গুর মেয়ে—সর্ব্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিলেন—ছি, ছি—অমন কথা মুখে এনো না।

কিন্তু সেই পরমেশ্বর উকীলের আশঙ্কার ভিত্তর সেই বর-বধুর ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসের একটা শোক-প্রাণন অধ্যায়ের দৃশ্যটি ছিল তাহী প্রকাশ পাইল বিবাহের সাত বৎসর পরে। বধন নবনী-কোমল গৌরী-রাণী ইন্-কাজি লইয়া কৈশোর ও যৌবনের ঐতিহাসিক বন্দ্য বাধিয়া গেল,

যখন “চরণ চপলতা লোচন বেশ,—ইতাদি, ইতাদি” তখন যুবক অমিলকুমারের “বৌবন-নিকুঞ্জে গাছে পাখি, ইতাদি, ইতাদি।” স্তব্ধতা সে গ্রাম ভরিয়া গৌরী-রাণীকে ভালবাসিল। নিজের হাতের দ্বারা বাণ ও বনবরাহের ভীম-সেহ গৌরীর কক্ষের গবাকের নীচে রাখিয়া অমিলকুমার বিশ্বস্ত পরিচর্য্যক টঙ্করণালের দ্বারা বৌ-রাণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইত। যখন তাঁহার আরবী ঘোড়া তিলক-টান দাড় ঝাঁকায় ছুটের মত গিল্মনে চাহিয়া “শিরশা” করিত, তখন অমিলকুমার কোনও প্রকারে, অন্ধ-মহল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় এমন একটা স্থানে তাহাকে লইয়া গিয়া, টঙ্করণালের উপর উক্করপ আঁজা দ্বারি করিত। উদ্ভন্নশীল চকচকি রাহিয়া তাহার পূর্ণ আনন্দ হইত না; কারণ নদীর ধারে বাসির চরায় তো আর বৌ-রাণী আসিয়া তাহার অদ্বুত লক্ষ্য-বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইবে না। সে নিজের হাতে গোলাপ ফুল তুলিয়া গৌরীকে উপহার দিত, আর গৌরী যখন তাহার সোহাগে গলিয়া বাইত, তখন সে বড় শান্তি পাইত।

কিন্তু এ আশা তো চিরকাল চলিতে পারে না— বিশেষ যখন পিতৃ-বিরোধের পর তাহাকে ঘন-ঘন সহরে বাহিতে হইল। সহরে চৌধুরীদের বড় বাড়ী ছিল—কালেই পাঁচ জন বড় ছুটিল। অমিয়ারের পক্ষে ব্রহ্মণ হওয়া যে একেবারে বাতুলতা,—কীবনটা, বিশেষ বৌবনটা, যে অশেষ প্রকারে উপভোগ্য,—“বৌবন সারথের” ঘোষার যে পঙ্খার ঘোষারের মত নয়,—তাঁহা বাইলে আর কিংবা না—ইতাদি—ছোট-ছোট সরল সভ্যতালা কেন সে এককাল আবিষ্কার করে নাই, ইহা তাহায়া নবীন অমিয়ার আপনাকে ভিরঙ্কার করিল, একটু বিচার দিল। সহরের লক্ষ-আদালতের একজন নব্য উকীল তাহাকে বুঝাইল যে, সন্নীত-চর্চার উৎসাহ দিবার মালিক সেপের অমিয়ার-কুল। কিন্তু সত্যদিন অমিলকুমার নিজের সর্ব্বের কলা-কুশলতার ত্রিবিধ-সাধনে বস্ত্রবান হইল, সত্যদিন গৌরী-রাণীর ভাগ্য-বিসি অন্তঃসেপে পথে চলিলেও একেবারে মুখ সুকান নাই। যে দিন অমিলকুমার কলিকাতা হইতে এক থিয়েটারের নর্ত্তকী আনিয়া নিজের সহরে পৌঁছায়—করিয়া আশ-প্রদান লাভ করিল, সেদিন বিপ্রথরে গৌরী-রাণী জামনগরের অন্ধরের বাগানে হঠাৎ শিবা-কন্দল গুলিয়া মড়কে পড়ায়

উপর উঠিতে গিয়া একটা কাঁচের ফুলদান, একটা ভাপানী পেয়ালা এবং অমিলকুমারের কটোরিয়ার কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

(২)

সকল বাগারই “ভান বলত বলত বন বাই”—তা হউক সে প্রেম, আর হউক সে অসংপত্তন। প্রথম যখন একটু-একটু করিয়া অমিল ও গৌরীর দুইটি ক্ষম বিলিয়া-বিলিয়া এক হইয়া বাইতেছিল, এখন তেমনিই একটু-একটু করিয়া অমিলকুমার গড়াইতেছিল—অসংপত্তনের গড়ানে পথে। সে পথের নিম্নে বিশিষ্টতা আছে,—একটু অঙ্গের হইলে আর পঙ্খম হয় না; আরও অঙ্গের হইবার মত কষ্ট করিতে হয় না, ঝাঁকাইতে হয় না, কপালের ঘাম মুছিতে হয় না। অমিলকুমারের বোর্ডিং ও প্রতাপ; সে চিরদিন একরোখা ছেলে। পুরাতন কর্মচারীত্বম সকল কথা বুঝিতে পারিলেও সাহস করিয়া কেহ তাহাকে কিছু বলিতে পারিল না। কলিকাতার সেই অভিনেত্রীতার নাম নেকি;—সে এখন ধনীও আশ্রয়ে আসিয়া নিজের নামকরণ করিয়াছিল—অভোজাকুমারী। দুই-একজন নবীন কর্ম-চারীকেও কাপলপত্র দ্বারা কড়াইবার মত সহরে বাবুর নিকট অভোজাকুমারীর গৃহে বাইতে হইত। গৌরী জামনগর গ্রামে থাকিতে প্রথম-প্রথম বিবাহ করিত, কালেক্টর সাহেবের মনস্তত্ত্বের মত দ্বীপীকে সহরে থাকিতে হয়। কুসংবাদের স্বার্থ, সম্প্রদায় ও আশ্রয়ভাট্টার চেষ্টা,—বিশেষ যে তাহাকে চাহে না, তাহার নিকট। কুসংবাদ প্রথমে কানামুখ্য রূপে, শেষে প্রকৃত ভাবে অস্তিত্বব্রতের সুখাস পরিয়া গৌরী-রাণীর নিকট আশ্রয়-সমর্পণ করিল। গৌরী মুখিতা হইল,—মুখুড়িভের পর আপনাকে বিচার দিল—“ছিঃ ছিঃ দ্বীপী-নিম্মা গুনুতে আছে!” যে ত্রীলোকটি ভোবামোহ করিবার মত এ সংবাদ লইয়া বৌ-রাণীর নিকট পৌঁছিয়াছিল—তাহাকে সকলে ভিরঙ্কার করিল। শেষে যখন সে বুঝিল, বাবু তুলিলে তাহার ভিটার যুগু চরিত্রে, কলাগাছে হরিদ্রাল বসিবে, তখন সে কিছুদিনের মত ভিন্ন গ্রামে হুটুখ-বাড়ীতে বাস করিতে গেল। এমন চৌধুরী বাবু না! তাঁদের নামে বাবে-পুরুতে এক হাতে মল পান করে।

গৌরীর ঘন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দে হইল না। ৩

তাহার মন-কেন্দ্রটি “হ্যাঁ,” “না,” “উহু,” এবং “জা হ’বেও বা”র কুরুক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তাহাতে সে অবসর হইতে লাগিল। অথচ আশ-মর্যাদা তাহাকে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিতে লাগিল—এ কথার সত্য-মিথ্যা অপরের সহিত আলোচনা করিতে; স্বামীকে শিক্ষাসা ক্রমও অসম্ভব। যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেই তো ঐতিপন্ন হইবে যে, সে তাহার জীবন-সকলই অনিলকুমারের বিবল চরিত্রে সম্বোধন করিয়াছে।

এইরূপ সংগ্রামে বরষা কাটিল। যখন চারিদিক যন-যনোচ্ছন্ন হয়, যৌ-রাণীকে কুচিন্তা আদিয়া উৎপীড়ন করে। যখন পুকুরের উপর জল পড়ে, পুকুরের গায়ের ফোকাগুলি উৎফুল্ল হইয়া বৃষ্টির জলকে ধরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তখন তাহার মনের ব্রণগুলিও কুচিন্তাকে সামরে যত্নের মধ্যে বরণ করিয়া ভুলে। কিন্তু সপ্তাহে যখন একবার করিয়া অনিলকুমার আসিয়া তাহাকে কোবল ঘোষের ঈতল উৎসাহ দাত করে, তখন মনের মহলা দুইশা যায়, সে আপনাকে বিভ্রান্ত বের; ইচ্ছা করে মনের কথাটা অনিলকুমারের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে—কিন্তু সরসে মরমের কথা বরষেই লুকাইয়া থাকে। পূজার সময় তাহার পিজালয়ে বাইবার কথা হইল। শেব তাত্রের ভীষণ শুভাটে সহর হইতে আট ক্রোশ অস্বারোহণে আসিয়া যখন অনিলকুমার শয্যার ক্রান্ত হইয়া শয়ন করিল, তখন তাহার শ্রম অপনোদন করিবার জন্য ঘামটি মারিতে-মারিতে যৌ-রাণী বলিল—“আজ এত কষ্ট করে না এসেই হ’ত।”

অনিল অলসাল গরে বলিল—“হেঁ! ঠিক বলেছ।”

গৌরী নিঃশব্দ হইল। সে আপা করিয়াছিল যে, একটু গদগদ কর্তে অনিল বলিবে—“তোনাকে দেখবার দ্বন্দ্বের কাছে এ কি আর কষ্ট গৌরী!” কিন্তু নির্ভর তাহা বলিল না। তখন গৌরী বলিল—“তা” না এসেই পারতে।”

অনিল তাহার অভিমানের স্বরটুকু বলিল। কিন্তু সময়ের সেবকা তাহাকেও আলস করিয়াছিলেন। সে বলিল—“হ্যাঁ, সত্যি কথা।”

গৌরী একটু আশ্রয় ও স্নেহ-বিহ্বলিত হয়ে বলিল—“বিশেষ, বা’ শুদ্ধি, তা যদি—”

অনিল শয্যার উঠিয়া বলিল। তাহার চোখের উপর হির

বৃষ্টিতে ঢাছিল; গৌরীর বকু স্পন্দিত হইতেছিল, সেখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। এ কয়েক মাসের উৎপীড়ক সম্বোধনটুকু যেন একটা বীমাংসার বিকে ধাবিত হইতেছিল। অনিল দৃঢ় স্বরে বলিল, “কি তুলেছ? কার কাছে—”

তাহার নিঃশ্বাসে কি যেন একটা দুর্ব্বল, চকুটা যেন ঈষৎ নোহিত-বর্ণ। সে কথা কহিতে পারিল না। অনিলকুমার এবার অধীর হইয়া বলিল, “কথা কও না।”

বাস্তবিক আশ্বারোহণের পরিভ্রম লাগব করিবার জন্য সে প্রথমে এক বোতল বীরার পান করিয়াছিল—লাইসেনডের সহিত মিশাইয়া। শেষে যিঞার চকের নিকট আসিয়া পকেট-ভ্রাক হইতে একটু হাইকি পান করিয়াছিল—নেশার জন্ত নয়, শ্রম অপনোদনের জন্ত। ইহার পূর্বে কয়েক দিন তাহার বন্ধুস্বাক্ষর ইচ্ছিত করিয়াছিল, যে তাহার দুই একটা হু-নীল কর্মচারী তাহার বিবল এবং নির্দোষ আশ্বা-প্রমোহ সম্বন্ধে প্রবিশ্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহার বংশের বর্ষালা রক্ষা করিবার জন্ত, সেই হু-নীল বেতন-ভোগীওলাকে ধরিতে সে বন্ধ-পরিকর হইয়াছিল। আজ “রঃয়ের সুখ” এ বিষয়ের কেবল সেই দিকটাই সে লক্ষ্য করিল,—দ্রীর কথা, প্রণয়ের কথা, সন্ন্যাসিনতার কথা ভাবিল না। সংঘর্ষদ্বীপে হির থাকিতে দেখিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ কর্তে বলিল, “বল না কে বলে।”

বহুকষ্টে অক্কেবেগ সম্বরণ করিয়া গৌরী-রাণী বলিল, “কেউ না।”

“কেউ না?” এবার সে একটু গম্ভীরা বলিল, “কেউ না? বৃত্তি নি? জুনিও গুদের আফ্রায়া মিড?”

স্বামীর এ বৃত্তি গৌরীরাণী নিঃস্বের চক্রে ঘেঁষে নাই। সে বড় বিরক্ত হইল, বলিল, “আমি কাকে আফ্রায়া মিডি?”

সে বলিল, “তা হ’লে গুদের মাথার ওপর ক’টা মাথা আছে, ভনি। আমি বহিলায়, ভাননগরের চৌধুরী—আমি যদি কলকাতা থেকে একটা একট্টে এসে রাখি—”

গৌরীর বুক ফাটিতেছিল। তবে কি সত্য না কি? যে মা কান্দী! যে বাবা বিশ্বনাথ! সে শব্দান্তে বলিল, “না না, আমি ও সব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করি না। হির হও।”

ফটসেত্তর পোকেরা নাকি খুব সাহসী। তাহাদের

মেশের নির্দিষ্ট প্রথা না কি বাঙ্গালীকেও নির্ভীক করে। তখন ক্রান্তের হৃদয় বাস্পাকারে অনিলকুমারের বস্ত্রভটাকে অবিকার করিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল, “বিদ্যা কেন? তর করব না কি? কেন বাবা, কারও তো বাপ খুড়ার পরমা কর্জ নিয়ে অড়োমার ঘরে থরচ করি নি। হাঁ—রেবেছি—বেশ করেছি।”

পতীর শোকে বা জীঘ্রাঙ্গে জীঘ্রাৎ সংজ্ঞাহীন করিবার ব্যর্থতা যদি ভগবান না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা হইত না। পায়ের তৃদ্বাস্ত্র ঝাটগা রক্তশ্রাব বেশিয়া শোকে মুক্তি হয় বলিয়া তাহার হৃৎসর তাড়াভাতি স্পন্দিত হয় না; তাই সে রক্তের প্রবাহ বস্ত্র-হাসনে শুভ্র জোরে পাঠায় না,—নাহুৎ বাঁচিয়া যায়। দিনের ভরে ছুটিতে ছুটিতে ভরে সংজ্ঞাহীন হয় বলিয়া সুগের প্রাণ বাঁচিয়া যায়, কারণ নিঃসৃতসেয়ে উহর পূর্ণ করে না; সে প্রাণহীন ভাবিয়া গুণায় সুগের প্রাণদান করে। এ ক্ষেত্রে মৌর্যগণী মুক্তিলাভ হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে প্রথমতঃ, কতকগুলি কুৎসিত ভাষা শুনিতে হয় নাই এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহার অবস্থা দেখিয়া অনিলের চমক ভাঙ্গিল। তাড়াভাতি কার্জ হইতে গোলাপলল চালিয়া সংজ্ঞাহীনায় মুচ্ছাভব করিতে করিতে অনিলকুমার বুঝিল যে, শুণ্ড কথাটা ব্যাক্ত করিয়া সে বুদ্ধিমানের মত কার্য্য করে নাই।

(৩)

দারুণ শীত। বহানিয়ম পূর্বদিক স্নানাইয়া সোণার খালের মত আকার ধারণ করিয়া অরুণদেব উদিত হন, ক্রমে ক্রমে মাথার উপর উঠিয়া ভিন্নবর্ণ বর্ণ করেন, আবার গোপাল-গরে অন্তাচলে গমন করেন। কিন্তু তিনি পথ ঘাট নবীর জল ঘোটেই তাড়াইতে পারেন না। সন্নিবার ফুলে মাঠগুলি ভরিয়া সিঁচছে, ছোলায় গাছে ফল বরিষাচ্ছে, মুগ, মুরগি কলাই, মটরের চারা-গাছে ফলোৎপন্ন হইয়াছে। হিমাগরের ওপর হইতে বৈক-বৈক চকচকী, সরাল, মরাল, হাঁস আদিয়া বাঙ্গালা দেশের নবীর চলে, বিলের ধারে আগ্রহ লইয়াছে। পানী জননীর গড় প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, সলাই হাতমতী। কিন্তু চেতন পরার্থের দুর্দিন তো অভল, দ্বির; আশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত অবধি একই জায়ে চলে। কৃষকের আশ্রয় বস্ত্র নাই,

ঘরে আর নাই, বুক বল নাই, আছে পেট-জোড়া স্রোত, আর শীতের কম্পনের উপর মালেরিয়ার কাঁপনি।

উত্তরপা চিত্রা করিতে-করিতে অনিলকুমার এষ্টাংশ পাশ-করা দুহির কণীত চক্ৰবর্তী নিম্নেরে মাঠ পার হইয়া গড়গড়ি নবীর ধারে-ধারে নিজ প্রাণান্তিস্থে গমন করিতে-ছিল। তাহার পিতা চৌধুরী-সরকারে নায়েবী করিয়া জামনগরের সন্নিকটে সন্নিবাসে একখানি ছোট পাশা বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিল। কণীত অনিলের সম্বন্ধ—জামনগরের বিভাগস্বয় সত্যী। কিন্তু এখন তাহারে মরণে প্রভু ও ভ্রাতার সন্ধান;—কণীতও বালা-মিত্রতার দাবী করে না, অনিলকুমারও তাহাকে বালা-সহচরের পাণ্ডনা-গণা দিবার কথা মনে আসে না।

যখন সে গ্রামের বাহিরে আসিল, তখন কতকগুলি লত, অর্ধলত, মালেরিয়াগ্রস্ত বালক তাহাকে অভিযান করিল। গোলাপদেবের নিঃসৃত বিধবা কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল; তাহাকে দেখিয়া সন্তর করিল যে, আর কিছু চাহিয়া লইবে। সে সন্নিবাসের সন্ধানের প্রিয়, সলাই হাত-মুখ, সলাই প্রসন্ন। এক একটা প্রকৃতি আছে, যেখানে অভাব পরামিত্ত হয়, সেই অশান্তি আনিতে পারে না। কণীত সেই প্রকৃতির।

কণীতের সম্বন্ধশী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রভাতের শীতে এক-টুকরা ছিন্ন বস্ত্রের বিছানার চার গায়ে লড়াইয়া সে নিজ-হস্তে সমস্ত গৃহটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এখন কি গোলাপ-ঘরে অবধি একটু দুর্গন্ধ, একটু আবর্জনা ছিল না। কণি তাহার চিবুক বরিয়া হাসিয়া বলিল, “আজ বুঝি জর আসে নি।”

নলিনী বলিল, “তোমার ভয়ে; এই গোব মাসের কটা দিন কেটে গেলে আর জর আসবে না।”

ত্রী পাণ্ড অর্থের হাসিটুকু কণীতের হৃদয়ে শেল-সব আঘাত করিল। দারুণ শীতে একখানি শীতবস্ত্র নাই, মালেরিয়ার সহিত স্ত্রীবার উপযুক্ত ঔষধ নাই, তাহার স্বন্দর দেহ সজ্জিত করিবার ছুই-টুকরা অলঙ্কার নাই। সে বালাই সন্ধান করিয়াছিল যে, অরুণায়েব-গোমতার মত চূর্ণ করিবে না। তাহার এ চরিত্র সম্পট অনিলকুমারও জানিত, কিন্তু সে বেতনের সম্বন্ধে তাহার সহিত অপর গোমতার পার্থক্য করিত না।

কণীন্দ্র স্ত্রীকে গৃহে আদিবার কার্য বলিল। সে সহর হইয়া রাজবাড়ী বাইবে। চৌধুরীরা তাঁহাদের কতক জমির পত্তনদার। পত্তনদার হিসাব লইয়া রাজসরকারের সহিত গোল বাধিয়াছে। সে হিলাব মিলাইয়া আবার কামনগরে কিরিবে। নলিনী কণীন্দ্রকে গরম ছুত দিল, তাল নুতন গুড়ের মুড়কী দিল। তখনও খোকা-বাবুর ঘুম ভাঙে নাই। তাহার দূরে বসিয়া তাহার দুইজনে ঘুমের দিকে চাহিয়া শুশ-গুশের কথা করিতে লাগিল, আর সেই কমন-কোরকের মত সংজ্ঞাধীন ক্ষুদ্র বহন দর্শনে অপর আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

পাচ কথার পর নলিনী বলিল, “হ্যাঁ গা সত্যি? বাবু না কি খুব বাড়াবাড়ী করেছেন?”

কণি বলিল—“চুশোর বাবু। আমায়ও টাকা থাকলে আমিও করতাম।”

নলিনী মুড়কীর খালা সরাইয়া দিল। বলিল—“রাপ চাও। অমন কথা আর মুখে আনবে না বল।”

কণি বলিল—“না, আর তিছুর কল্লো ছা-ধ হয় না। ছুখে হয় বোড়াধির ভক্তে। সত্যি নালিনী, দিন-দিন তাঁর যে কি চেতনা হ’চ্ছে, কি বলব।”

নলিনী বলিল—“হ্যাঁ তাই শুনেছি। আঃ! দোপার কমন! হ্যাঁ গা কৃষি তো ছেলেবেলার ঠাণ্ড সঙ্গে বেলা করেছিলে, বলতে পার না।”

কণি বলিল—“এ তো ঘরে বসে পরবার রীথ্য নয়। বাবা! দিন-দিন যা বেজা-ধ হ’চ্ছে। যদি অত্যা একটু চাকুরী পাই—”

খোকাবাবু উঠিল। আর পরচর্চাত্তপ বিমল আনন্দ উপভোগ করা হইল না। বাবু অনিলের হুটী রসাতলে, হটক গোঁরাগাণ্ডির মজাপত্ত অর;—আহা কি নখর নদীর হাত পা—স্ত্রীমুখের কি মধুর হাসি—কি স্বর্ণের স্নেহা! পিতা চুটিয়া দিয়া তাহাকে বকে চাপিয়া বারবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। আর সেই মৃত উপভোগ করিবার সময় আনন্দে নলিনীর বুক ছুঁ ছুঁ কাঁপিতেছিল। তাঁহার সঙ্গী মেয়ে সুদীর্ঘা আসিতেছিল। অথচোই বস্ত্রের বিবৃত হইতে পারে, শুভ্রবর্ণ বিদ্যারিত হইতেছিল। আহা! কি পুলক! এই মুখেই তো সে দারিদ্র্যকে শাসন করিত, ম্যালেরিয়া-রাকসীর দীত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। শিশু ছোট-

ছোট হাত ছুঁইয়া নিতে শিটার গলা অফাইয়া বিজয়-পর্বে একটু উপেক্ষার ভাব করিয়া বাতায় দিকে চাহিতেছিল। তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার একটা অকুণ্ট আকাঙ্ক্ষাকে বহন করিয়া লম্বী ক্রকৃৎকিত করিয়া বলিল—“খোকা, বদমায়েস।”

(৪)

রাজ-কাছারিতে হিলাব মিলাইয়া সন্তুষ্ট মনে গো-শকটে সহরের পথে আসিতে আসিতে কণীন্দ্র আনন্দগুলি স্নেহের স্বপ্ন দেখিতেছিল। প্রত্যেক চিত্রের মাঝখানে বৃহৎ স্ত্রী—ক্ষুদ্র খোকাবাবু। সহরের বাহিরে একটা টোলগ্রাফ-ভবনের তারের উপর দুইটি দ্বিতীয় নখর-বেহ শিশুকে বলাইয়া জনককে ততলোক আনন্দ করিতে-ছিলেম। তাহার খোকাবাবু বড় হইলে সেও তাহাকে লইয়া এমনি রক্ত করিবে—এ আশাটুকুও বৈশাখী আকাশে চপলার মত তাহার ছায়াশাপে বেগিয়া গেল। সে এবার তিন দিন গৃহে থাকিবার অল্পমতি পাইয়াছিল। তাহার উপর একদিন বিনা অল্পমতিতে ঘরে থাকিলে সহর-নায়েব কিছু বলিবে না। সে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে ঘরন সহরে বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পাইক জানিফ সেখ সেলাম করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বলিল—“ডোয়ের বেলায় এ পত্র জামনগরের কাছারিতে আপনাদের গাঁয়ের আইনুদ্দিন এনেছিল—জকরি ব’লে নায়েব নগর আমার হাতদিয়ে পাঠায়ে দিলেন।” জানিফ পত্রের বর্ণ জানিত, কিন্তু কুসংবাদ মুখে বলিতে তাহার সংকোচ হইতেছিল। পত্র পাঠ করিয়া কণীন্দ্রের হাত পা কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু খোলা হইয়া গেল। সে বলিল—“বাবু কোথায়?”

“আজ্ঞা, বোধ হয় শু-কুটিতে।”

ভিলার্ড বিজ্ঞান না করিয়া কণি “ও-কুটিতে” ছুটিল। এখন লক্ষ্য বা সংকোচের সময় নয়। বাবু এত অর্থ বিলাস-বাসনে, পানের পথে ব্যয় করিতেছেন, আজ তাহার হৃদয়ের ঘন খোকাবাবু কলেরা রোগে আক্রান্ত,—বাবু তাহার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করিবেন না? সে না হয় পরিত্রাণ করিয়া ঐ পরিণাম করিবে। আজ তাহার সহিত সাহেব ডাক্তারকে পাঠাইতেই হইবে। যিনি এত অর্থ অশব্য

করেন, সম্বোধন করিতে ক্ষুধিত হওয়ার তাহার পক্ষে অসম্ভব।

দেবিন অনিলকুমারের সহিত ত্রীশোকটার বাচনিক কলহ হইয়াছিল;—কণ্ঠস্থ তাহার বিলাস-বর্ণে পৌছিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্বেই প্রেয়-বন্দ্য করিয়া অনিল বন্ধুগৃহে গিয়াছিল। কণ্ঠস্থকে কাগজপত্রাদি স্বাক্ষর করাইবার অন্ত অভিনেত্রীর গৃহে মধ্যে মধ্যে বাইতে হইত। সে আত্ম বাবুকে দেখিতে পাইল না। একটু ভিতর দিকে দিয়া অপর একটি কক্ষে দেখিল—অভিনেত্রী ও বাবুর উকীল বন্ধু! সর্বনাশ! বাবুর এত অর্ধ শোষণ করিয়া, এমন বিলাসের মধ্যে বাদ করিয়াও ভুলদিনী বিশ্বাসঘাতিনী! মস্তবুদ্ধের মত সে তাহাধের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল। উকীল বলিল—“বাঁটা মার ওরাপের মুখে। এসে পড়ে ব’লে।”

ত্রীশোক বলিল—“এবার এসে ঐ দরজার নাক-খত দেওয়াব, তবে ছাড়িব। আমার কাছে অমিয়াটা চলে! আমার চরিত্রে সন্দেহ!”

উকীল বলিল—“সূৰ্ণ কি না!”

বাতবিক! সূৰ্ণ কি না! উকীল গণ্ডিত! তাই বন্ধুর বক্ষে ছুরি দিতে উদ্ভত! সে বলিল—“ভাই নেতি! শোন! এবার সহি করিয়ে নেওয়াই চাই! আমার ঐ বাগানটা না হ’লে চলেবে না। হাইরি!”

সেন্টি বলিল—“তোমার মস্তে সব ক’ত্বে পারি—”

শেষটুকু কপি শুনিল না। তাহার মাথা ঘূর্ণিতছিল। বাবু নাই, অর্ধ নাই,—পুত্রের এতক্ষণ কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সে বারান্দা হইতে দরিদ্রা সিয়া বাহিরের কক্ষে প্রবেশ করিল। একটা পাথরের গোল মেলের উপর কি একটা চক্ৰকু করিতেছিল। সে অল্প-মনস্কভাবে সেটা তুলিয়া লইল—জড়োরা কাপ্টা! শোকে ও স্থগার তাহার নিকট বিখ-প্রকৃতি যেন ছায়ার মত বোধ হইতেছিল।

সে দিন-রাত ভুড়ের বেগার খাটরা মরে, বাবুর একটা পরমা বাহাতে নষ্ট না হয় ধর্ম-ভয়ে তাগা রক্ষা করে, তাহার পরিবর্তে প্রাণা দুই বেলা দুই দুই অন্ন, আর মাসিক নগদ পনের টাকা। আর এই পথের ধূলা, নরকের কীট নিলজ্জা বিশ্বাসঘাতিনীটার অন্ত বাবু পৈশিক ঘন নষ্ট

করিতেছেন—কি বিড়ম্বনা! তাহার প্রকৃমার! আচ্ছ! বাচ্ছ! কি এতক্ষণ আছে! পরমার অভাবে, চিকিৎসার অভাবে—ওঃ! যা গো! আর নলিনী, সত্যী, সান্দী, হাত-মুঠী, সীলাবহী একেলা সেই ত্রোণী লইয়া—

হঠাৎ একটা স্থগিত চিত্তের সে চমকিত হইল। বাবু যে কেবল এক মুহূর্তে প্রেয়ে পড়ে তাহা নয়, তাহার জীবনের প্রায় সকল বড় বড় ঘটনা এক মুহূর্তেই ঘটয়া থাকে। তাহার পূর্বে বানিকটা জমি তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু বাবুকের তত্বর মত হঠাৎ পরিত পুষ্পিত ক্ষুধার মহীচর্য সেই জমির উপর উল্লসিত হয়,—কোথা হইতে আসে তাহা কেহ জানে না। পৃথিবীতে শতভরা নিরানন্দইটা খুন এই রকমেই হইয়া থাকে। স্থগার, শোকে, অভাবে কণ্ঠের মনে যে জ্বলিত আবাস হইয়াছিল, অকস্মাৎ সেখানে এক গাছ লাকাইয়া উঠিল। সত্যি তো ইহাতে পাপ-পুণ্য কোথায়? ইহাতে শান্তি হইবে, তাহার পুত্রের চিকিৎসা হইবে—ইহা বিধির বিধান! সে একবার কাপ্টাটিকে উঠাইয়া-পাটাইয়া দেখিল। সেটা তাহার হস্ত ছাড়িয়া পাথরের বেহেতে নামিতে চাহিল না। একটু ভর হইল, একটু গা হুম্ হুম্ করিল, একটু হুটু গুকাইল, একবার হাত কাপিল; কিন্তু উপায় নাই। সারা জীবনের শাখা ভাসিয়া বাইতেছিল;—কি করিবে, জীবনে একবার চুরি করিলে যদি থোকা বাবু বাঁচিয়া উঠে, নলিনীর মুখে হাসি ফুটে;—নিজের পরকালের ব্যবস্থা পরে হইবে। চিরকাল খাটরা সে বাবুকে শোধ দিবে—বাবুর নিকটে মোহ স্বীকার করিবে, প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক’না চাহিবে—কিন্তু এখন? এখন প্রত্যাভর্তন অসম্ভব—থোকাকে খুন করা—শিষ্টা হইয়া!

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শোকারের নিকট অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া সে টাকা লইল। ভাতার সাহেবের সহিত মোটর গাড়িতে বসিয়া সে সবিধাবাদের দিকে ছুটিতেছিল। পাপ-পুণ্য, চুরি-চান্দারী সকল চিত্তকে ঘুরে ফেলিয়া, সে একমাত্র শিঙর কথা ভাবিতেছিল—আপনার আত্মার অন্ত পরমাখার নিকট ক্ষমা চাহিল না, প্রার্থনা করিল না; একমনে, একপ্রাণে, কেবল মহাপক্তি মহাকালীকে ডাকিতে লাগিল—মা শ্রো! বন্ম যে মা! শক্তি যে মা! সেই ক্ষুদ্র প্রাণের নিম্নিটে বীশশিখাটুকু জ্বালাইয়া রাখ মা!

(৫)

ছই-একজন বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া, সহরের মহাধনে অলস নিবিদলভাবে একটু পদচারণা করিয়া অনিলচন্দ্র বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। ক্রীষনে বিবস অবসাদ আসিয়াছিল,—একটা পাগড়ের মত বোকা ছদ্মরূপকে যেন চাপিয়া ধরিতেছিল,—কেবল অবসাদ, কেবল বিরক্তি, কেবল দুঃখ। কিন্তু অবসাদের চাপে দুঃখের ও তীব্রতা ছিল না। ছদ্মরূপ ছাড়িয়া কেবল—“দূর ছাই” ভাব। অফোয়াসুয়ারী ও উকীল বন্ধু যে তাহার সহিত বিদ্যাসংঘাতকতা করিতেছিল, তাহার অর্থে পুষ্ট হইয়া যে ক্রীলোকটা উকীল বন্ধুর প্রতি অস্বাভাবিক দেখাইতেছিল,—বুদ্ধ্যমান জমিদার তাহা এক রকম বুঝিয়াছিল। কিন্তু কি একটা চূর্ণমনোর আসক্তি তাহার সলল ভাবকে পরাক্রান্ত করিয়া, সমস্ত বিজ্ঞতা, সমস্ত হুপ্রভৃতিকে নশল করিয়া, তাহাকে সেই ক্রীলোকটার দিকে, তাহার গৃহের সেই আমোদ-প্রমোদের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। আর এই অবসাদের প্রভাবে সে টানটান যেন শিথিল হইয়াছিল,—যেন কোনও বিষয়েই তাহার আগ্রহ নাই, যেন কোনও ক্রীষণ, কোনও পরার্থের প্রাণ নাই। মাথার উপর পুণ্ডির টাণ হাদিতেছিল, মাঠের উপর বড় শোভা হইয়াছিল,—জ্যোৎস্নার আলোকে উদ্ভাসিত শল-সমুদ্রক্ষেত্র, কিন্তু বড় বড় পাছ-গুলার নীচে কালো ছায়া। তাহার অবসার ক্ষণে একটা প্রভৃতি যেন মাথা তুলিতেছিল। তাহার স্বপ্নোন্মেষ, তাহার আমে বাইবার আট ক্রোশ পথের এই রকম আশো ও ছায়া যেন তাহাকে লইয়া রঙ্গরঙ্গ করিবার সঙ্গ তাহাকে ডাকিতেছিল। একটু পূর্ণপ্রভৃতিও তাহার অবসাদের অভ্যুত্থান যেন গলা টিপিল,—অমনি আলো ও ছায়ায় কত সুখে, বাটার উপবনে বসিয়া গৌরীরাণী,—গৌরীর কথা সে ভাবিতে পারিল না। তাহার পাণ্ড অধর, শুকসেহ, শাবণা-তরা বড় বড় চোখ দুটির স্বাভাবিক তাহাকে বিচার দিল। কিন্তু চন্দ্রের প্রভাব তাহাকে একটু অস্বপ্রাণিত করিল। যাহা বাকি ছিল, তাহা সম্পাদন করিল তাহার আশ্রয়ের কুহক—তিলকচাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো ও ছায়া তিলক-চাঁদের ও আর অস্বপ্রাণিত করিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ ছুটফুট করিতেছিল। প্রত্যেক দেখিয়া আর সে দ্বির থাকিতে পারিল না। তাণ শক্ত করিয়া, নবমুখিয়ারিত করিয়া

সে হেয়ারব করিল,—অবশ্যতার শক্ত জমির উপর সসুখের পদ চুকিয়া উত্তেজক খটখট শব্দ করিতে লাগিল। হাড়ি ছিঁড়িয়া প্রত্নর নিকট আসিবার সঙ্গ অত্যন্ত অধীর হইল। অনিলকুমারের অভ্যুত্থান কাটিল। সে পোষাক পরিতে গেল। সহিল তিলকচাঁদের পূর্বে শ্রিন কথিতে লাগিল।

(৬)

পৌষ মাসের শীতে জ্যোৎস্নারাত পথের উপর দিয়া তিলক চুটিতেছিল বসিলে তাহার গতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না—সে উড়িতেছিল। অনিলবাবু খুব মোটা আগষ্টায় সর্পসর্পীর হুড়িয়া, বালাকাজা টুপিতে দুখ চাকিয়া কেবল নাসিকা ও চক্ষু ছইটী বাহির করিয়া, দুই পার্শ্বের মাঠের উপর জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতেছিল এবং উচ্চরক্তের সক্রীবনী শক্তিতে মনে ও শরীরে বল লাভ করিতেছিল। বাটাতে পৌছিবার পর বাবুর বাড়ী প্রত্যাপদন-জনিত সোরাগোলের মধ্যে সে একটু বিশ্রাম পড়িল। অন্যরে দিয়া আপনার কক্ষে শয়ন না করিলে ভৃত্যদিগের মধ্যে কথা ধরিবে। অথচ গৌরীর সসুখীন হইতেও সে ইতস্ততঃ করিতেছিল। এমন সময় টকরলাল আসিয়া বলিল—“রাণীনা সেলাম দিয়েছেন।” ইতস্ততঃ না করিয়া সপ্রতিভভাবে সে বৌ রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু গৃহে শ্রী নাই। কোনও পরার্থে যত্নের চিহ্ন নাই। স্নানদানগুলি প্রাপ্য নহে—হুল নাই। কেবল তাহার কটোর নিচে চন্দনসিক্ত কলটা শেকানী। একটা বৈদ্যান্তিক প্রবাহ অনিলের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। সে ভাঙিত-ভাঙটার অর্থ অশ্লিষ্ট—কি যেন একটা বহুমূল্য রত্ন ও কচের তুলনা। তাহার প্রাণের ভিতর হইতে একটা ধীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিল। সে আবার কটোর দিকে চাহিল। গৌরী দ্বিপ্রহন্তে স্নান-গুলি সরাইয়া লইয়াছিল। সে তাহার কৃপ পাণ্ডুর সুখের দিকে চাহিয়া বড় কাতর হইল। সন্ধ্যাে গৌরীকে বন্ধে ধরিয়া সে বলিল—“গৌরী, তোমার শরীর যেন একটু বেশী খারাপ দেখছি। এ কি, গা গরম?”

সে বলিল—“না। শীতে গুণিয়ে গেছে। এ সময় আর একটু-আধটু সবারই হয়।

অমিদার কিছু বলিল না, কিন্তু কথাটার কৃপ হইল না।

গৌরী বলিল—“একটু বোস আমি চট্ট করে ধাবারটা নিয়ে আসি।”

অনিল ছাড়িল না, সে ভোজন করিবার গৃহে আদি-রাছে। গৌরীও ছাড়িবে না। শেষে তির হইল গৌরী ঘরে বলিবার পিরিটের চুলিতে তাহাকে ঢা তৈয়ারি করিবার দিবে।

চা পান করিতে-করিতে অনিল এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার হুচনা করিল। সে বলিল—“গৌরী আমি পণ্ড—আমি পানর, আবার বরণ ভাল—”

“গৌরী তাহার সুখ চাপিয়া ধরিল। বলিল—“ছি: স্বামী-নিন্দা শুনতে নাই। জান না দক্ষের ঘরে—”

অনিল বলিল—“ওঃ, একটু একটু শান্তও পড়া হুচে। গৌরী—গৌরী-রাণী, আবাকে কি কমা করবে না?”

গৌরীর রুদ্ধ অঞ্জ বাহা মালিল না। অনিলও কঁাদিল।

তৃতীয় দিবসে বেলা দশটা অবধি মনের মধ্যে কুহেলি হুচ্চ চলিল। হুচ্ছে বিরক্ত হইয়া সে অখারোহণে সহরে যাবা করিল। অন্ধরের বায়না হইতে কল্মিতেদেহে গৌরী যেবিল—চক্ষে ধল পড়িতেছিল—বুকের মধ্যে কে একটা হুস্ত পিঠিতেছিল—ভিতর হইতে কে গলা টিপিতেছিল। অখারোহী বৃষ্টির বাহিরে গেল। গৌরী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—“মা গো! মা! বেল ছিলাম! আবার কেন এ বয়রা দিলে মা! হাঃ! হরি!”

(১)

অনিল সেসে দিগাহে তনিয়া অড়োয়া ও উকীল খুব হাসিল,—আনন্দে সামারাত হুয়া পান করিল—নানাগ্রকার বাসের তরকারী রন্ধন করিল, কিন্তু নেশার কোঁকে আহার করিবার অবসর পাইল না। প্রভাতে উঠিয়া বখন তাহার কাপ্টাটা হারাইয়াছে বহিতে পারিল, তখন দাস-দাসীর উপর অনেক কুপন করিল, কিন্তু পুলিশে সংবাদ দিতে পারিল না—অনিলের ও উকীলের মান ঘাইবার ভয়ে। হুইটার সহব সমস্ত কাছারীর কার্য মারিয়া উকীল পোকারদের ঘরে-ঘরে ঘুরিয়া বকনী পোকারের পুছে ভড়য়ের সন্ধান পাইল। কষ্টে একটা আকস্মিক অভাবের ভাবনার চুরি করিয়াছিল—সে ব্যবসারী চোরের কোনও কার্য-করণ জানিত না। তাই পোকারের বহিতে নিছের

নাহ ধাম লিখাইয়া, নিছের হুস্তে স্বাক্ষর করিয়া, কাপ্টা বন্ধ করিয়াছিল। উকীল ও অড়োয়া অত্যন্ত আশ্বাসন করিতে লাগিল। অনিল নিজে চুরি করিয়া, ভুতোর ঘারা বন্ধ দিগাহে বলিয়া নিছের করিল। আরও নিছের করিল যে, ইহার বিত্তন ধানের অলঙ্কার যদি অনিল দিতে পারে, তাহা হইলে অড়োয়া তাহার আশ্রয়ে থাকিবে, নতুবা উকীলবাবু কাঁচকলা গ্রামের জমীদারকে আনিয়া তাহার বন্ধে অড়োয়ার সমপতি করিবে।

তৃতীয় দিবসে অনিল সহরে আদিবার পর উকীল তাহার সাহস সাক্ষাৎ করিল। সে বড় বিমর্ষ। অড়োয়া তাহার আশ্রিতা, তাহার চরণের রেণু, তাহার প্রসাদের ভিখারী; তাহার উপর কি অত শক্তাশক্তি অভিমান সমীচীন। কাচকলা-মাছ টোপ গিলিয়াছে, তাহা চতুর বৃক, শিক্তি বৃক বৃকিল। সে এবার হুতা ছাড়িয়া তাহাকে বেলাইতে লাগিল। আহা! অবলা সরলা গুইদিন অল-স্পর্শ করে নাই। এমন কি কাপ্টার শোক অবধি মনে—

“কাপ্টার শোক?”

“সেই যে ওর অড়োয়া কাপ্টাটা, বোটা কপি—”

“কি বলছ?” অধীর হইয়া অনিল বলিল—“কি বলছ! হেরালী ছাড় না। ওকালতী কি সর্বত্র?”

উকীল বড় যোগায়েব। সে বলিল—“কি করব ভাই, আমার ধাবার-পরবার সংস্থান থাকলে আর—”

বাবু অধীর হইল। বলিল—“আঃ! আবার বাক্য-বার!”

উকীল কানিয়া বলিল—“গলাং সন্ধ্যাত কামঃ। বেশ ভাই, একটেলের সঙ্গ করে বেশ একটু ক’রতে নিবেছ।”

অনিল বলিল—“ঘোটে বুকতে পারছি না। কি বলছ?”

“তোমার সেই রসিকতার কথা। তুমি সেই কাপ্টাটা নিয়ে চলে গিয়েছিলে কি না।”

এবার জমিদার ক্রুদ্ধ হইল। কি স্পষ্টতার কথা! সে রসিকতা করিয়া ব্যাঘ্রমনার অলঙ্কার লইয়া চলিয়া গিয়াছে! এ নিছের একটা অপবাদ দিবার বড়বন্দ। সে বলিল—“সূর্যের মত কথা বল না।”

এবার উকীল একটু বিম্বিত হইল। তাহার মুখ বিম্বাস
হইয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করিয়া চলিয়া যাইবার
সময় অন্তিমার্তা লইয়া গিয়াছিল। অকস্মৎ অর্থের অনাটন
হওয়ার ফলি দ্বারা তাহা বন্ধ দিয়াছিল। তাই সে
তাড়াতাড়ি রাখে বেশে গিয়াছিল—অর্থ কানিবার বন্ধ।
কিন্তু তাহার ভাবে ও ভাবার উকীল বিম্বিত হইল। সে
যে অঙ্কের তুনিলা কতিনয় করিতেছে মাত্র—টিক তাহাও
বোধ হইল না। বাপারটার আরও রহস্য আছে, তাহাতে
সন্দেহ নাই।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া অনিল অধীর হইল।
বলিল—“কি, ব্যাণ্ডার কি? সমস্ত কথা ভেবেচুরেই
বল না।”

উকীল সকল কথা ধাওয়া প্রকাশ করিল। বিম্বিত-
বিম্বিত বন্ধে সে তাহার কথাগুলি বেন দিলিতেছিল।
কণীত্র চক্রবর্তী বেস্তার অন্তিমার চুরি করিয়া তাহা বন্ধ
দিয়াছে। ইহা অপেক্ষা বহুতর কথা সে কী বনে শুনে নাই।
সে উপেক্ষার হাসি হাসিল। বলিল—“এ সকল বড়বড়
যে আনার লক্ষ টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যে কোন দিন
একটা প্রকার কাণ্ডে এক পরগা পেলে তা’ সরকারে জমা
দেয়, আনার চাকর হলেও থাকে আমি মনে মনে শুদ্ধা
করি, সমান করি—তার দ্বারা চুরি হ’য়েছে? পাগলামির
কথা!”

কিন্তু পোষারের নিকট কণীত্রের চাকর দেখিয়া
তাহার মধ্যে ঘূরিতে লাগিল। উকীলের ছুই একটা স্নেহে
তাহার বৈধাত্য হইল। সে বুঝিল যে জীলোকটার দৃঢ়
ধাওয়া যে, এ রহস্যের সূলে অনিলকুমারের সম্ভব আছে।
ইহাতে তাহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথিবীর সকলের
উপর তাহার একটা ঘোর অধিকার ছিল। কিন্তু প্রধান
চিত্তা হইল আশ্রয়কার,—বাগানদার নিকট আপনায়
সমান বন্ধা করিবার। কণিকে গলা টিপিয়া ধরিয়া
আনিয়া, তাহাকে বেলে পাঠাইয়া অবলার নিকট আপনায়
নির্দেহিতার প্রমাণ দিবার বন্ধ সে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে
উকীলের অহুতোষ উপেক্ষা করিল। কণীত্রকে ধরিয়া
লইয়া একেবারে সে বাড়ার দ্বার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ করিতে
ইচ্ছা করিল।

(৮)

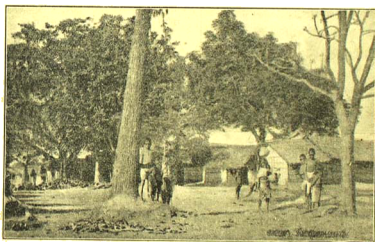
আজ লক্ষীপুত্র। দরিদ্রের ঘরের লক্ষী-পুত্র; তাহাতে
এক ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। নতন ধান দিয়া
লক্ষীর আবাসন হইয়াছিল—ঘরঘার সমস্ত পরিষ্কার
পরিষ্কার করিয়া নগ্নী প্রচাকরণে আল্পনা চিত্রিত করিয়া-
ছিল। সু-চিকিৎসার কালের কবল হইতে খোকাবাবু
রক্ষা পাইয়াছিল,—তাহার মনে পূর্ণাঙ্গি বিভাগ করিতে-
ছিল। স্বামী দিন-রাত কথ-শিত্তকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া
ছিল—তাহার সহিত কথা করিতেছিল, সে আহার করিতে
চাহিলে তাহাকে তোক-বাক্যে ভূই করিতেছিল—লগনার
পক্ষে ইহাই বর্ণে—নাই বা রহিল ঐশ্বর্যের ভোগ-বিলাস
আর নাই বা রহিল কতকগুলি বস্ত্রালঙ্কার।

কণীত্রের কিন্তু মনে শান্তি ছিল না। পুত্রের
নিরামরতাও তাহার প্রাণে স্নেহ আনিতে পারে নাই। সে
তর্ক করিয়া, সংগ্রাম করিয়া, নিরন্তর কাণ্ডকে নিশাপ
বসিয়া বহুই দিগন্ত করিতে লাগিল, ততই বেন প্রাণের
খুব গভীরতম একটা নিভৃত গুহার মধ্যে একটা অসম্ভব
বর উঠিতে লাগিল,—ক্রমে সেই কীল কষ্ট সবল হইতে
লাগিল,—সব তর্ক সব সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তি করিয়া সেই বর
আশ্রয়-প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতে লাগিল—“করিলে কি?
ইয়া! কি! কি! করিলে কি?” এই ভৎসনার
তাহার স্মৃতা বার, তুকা বার, পুত্রের নিরামর বদন-কমল
দর্শনের স্মৃতা বার, প্রাণের মধ্যে স্রীর হাসিমুখের ছায়া
স্নান হইয়া যায়। এ কথাটা কাণ্ডকেও বলিতে পারিলে,
বাবুর নিকট মোহ স্বীকার করিলে বেন প্রাণের আশ্রয়ের
লক্ষ্যকে মিথ্যাওলাে নিভিয়া যায়। কিন্তু চৌধুরী-বংশের
কুলপ্রাণী তো তাহাকে বার্কানা করিবার পাত্র নয়।
হয় তো এই প্রীত, শান্তির সংসার ছাড়িয়া তাহাকে
কাগাগারে বাস করিতে হইবে। উঃ! কি বিকল্পনা।
মুখ শিহরিয়া উঠিল। তাহার ছুই চক্ষু অলম্বারা
বহিল।

সদ্যার ছায়া নাশিয়াছে। প্রাণ-দানিরে আরতির
নম্র ব্যক্তিরা উঠিয়াছে। সতিবাসনের পৃথিবীর ঘরে-ঘরে
মঙ্গল-মঙ্গল ফুৎকারিতেছে। নগ্নী এক হাতে শীপ লইয়া,
অপর হাতে নম্র লইয়া কুলদীপনার প্রাণী দিতে বাইতেছে
—অকস্মাৎ বাহিরে খোকার সুরের শব্দ হইল। সে



মল্লিকার তীর



শ্রী-পুত্র

একটু ভক্তিত হইয়া গাঁড়াইল। একজন সুপুরুষ অধীর হইয়া তাহাদের গ্রামে আসিল—উত্তরের চক্রে চক্রে ঘিলিল, উত্তরেই সিঁড়াইল—মধ্যে ধীরে ধীরে চৌর-বাসিনী দেবী স্থিতি বেন অনিলের উত্তর ভাবগুণার ভাবব সূতকে শালন করিয়া কঙ্কর মধ্যে চলিয়া গেল। অনিলও কিরিল—সুজিতার অলিঙ্গনা বেধিল; চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—পৌষমাসের শীতল বায়ু বকে বেন শান্তি সুধান

রকিয়াছে। মন্ডার পাখীর কিলিকিলির সহিত গৃহবধের মধুরোল ঘিলিয়া একটা অক্লিনব শব্দে স্থিতি করিতেছিল; —তাহার লাঙ্গলটা, তাহার আশুস্তরিতা, তাহার অধৈর্য্যও তাহার নিকট নতশির হইল। সুতরাং সে আর বজ্র-নির্ঘাটে কণীশ্রকে ডাকিতে পারিল না; দুহুধরে ডাকিল—“কণি”। কিন্তু সেই দুহুধরই কণীশ্রের বকে সেলসল বিধিল। থোকাকে হার কোড়ে দিয়া সে তাড়াতাড়ি



চিত্র

বাহিরে আসিল। কম্পিত-করে বাবুর তক্ত ঘাওয়ার একবানা আসন্ন বিদ্বাহিয়া দিল। উভয়েই কণকাল নির্ভীক রহিল। শেষে কণীক্স কথা কহিল। বলিল—“বাবু আমার ছেলের কল্যাণ হইবে। সেবেছে, ডাক্তার সাহেব ছুঁদিন এসেছিলেন। শিশু—”

অনিল হৃদ পাইল; বলিল—“ডাক্তার সাহেব! ডাক্তারের খরচ পেলে কোথা? বাবের মুখে হাত দিয়েছ জান? এখন বেলে—”

কণীক্স বাধা দিয়া বলিল—“বাবু, বাহিরে চলুন। লক্ষ্যপূৰ্ণ। বাবু বাবের ভক্তে বেলে বাব, বাবের ভক্তে নরকে বাব, তাহা না দৃশ্য করে। বাবু, ঘোড়াই আপনার—এখানে কিছু বলবেন না—এই ভিক্ষা—”

বাবু নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন, কণীক্সও চলিল। একটা

বড় পাহুরগাছের তলায় টন্টন ছিল। উহার তাহার পার্শ্বে গাড়াইল। কণীক্স বলিল—“বাবু পেটের মাংসে আপনার এক পরমা ছুঁই নাই। বাবু ছেলের প্রাণ-রক্ষার জন্য আপনার সেই কৃত্তর মাংসের পরমা চুরি করেছি। বাবু! আমি একবানা গায়ের কাপড় আমব?”

“হাত।” অন্তরমানে বাবু আত্মা দিল; কিন্তু যেন মস্তমস্তের মত তাহার পিছু পিছু গিয়া আঁধারে গাড়াইল। কণীক্স ধোকাতে বন্ধে বহিরা বারবার তাহার মুখ-চুমন করিল। নগিনীর হৃদে হস্ত দিয়া বলিল—“ননু, বাবুর কাজে এখনি মকসল বাব। হয় ত তিন চার মাস বাবে দেখা হবে।”

নগিনী কাতর ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বামীর কথার সে তুষ্ট হইল না—তাহার কটাক্ষে সে মিথ্যা ছোকার চিহ্ন দেখিল। যেন চারিদিকে অমঙ্গল! অকল্যাণ! অথচ সে কিছু বলিল না, বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। কোশিক বাহুর অকালে সে চক্ষু হুছিল। কণীক্স সম্মুখে তাহাকে চুমন করিল। উভয়ের নমন-মল মিলিত হইয়া এক জোতে বহিতে লাগিল।

এ সমস্তই অনিল দেখিল। তাহার ঐশ্বর্য আছে, বহু আছে, স্ত্রী আছে, বারাদনা আছে, কিন্তু এ যুগ তো তাহার নাই। তাহার মন ছুটিয়া সেই কৃশা, কৃশা, গোষ্ঠীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার ফটোর সমুখের চন্দনসিক্ত শেলগি করটা তাহার স্মৃতিতে বড় উজ্জল ভাবে ভাসিতে লাগিল। তাহার নৃশংসতার তাহার স্ত্রী—সাক্ষী সতী, মায়ামহী, ভক্তিমতী গোষ্ঠী-রাগিণী দিন দিন বলিল হইতেছিল, রোগ ভোগ করিতেছিল, এ কথা তাহার স্বপ্ন হইল। সে আবার সেই ব্রাহ্মণ-দুহতীর দিকে চাহিল, বজ্রাকালে সে যুগ হুহুতেছিল। দুইটি দেবী-স্মৃতির পদাঙ্কে যেন একটা পিণ্ডাটিনীর যুগ দেখিল। এই দুইজনকে ব্রাহ্মণীটা দিলিতে বাইতেছিল। ওঃ! কি সর্বনাশ—একটা ব্রাহ্মণী দুই দেবীর বিঘল শাস্তি অপহরণ করিবার মন্ত্র অষ্ট-হস্ত করিতেছিল। সে আর এ চিত্র দেখিতে পারিল না।

কণীক্স আসিল। বলিল—“চলুন।”

অনিল দ্বির হইয়া রহিল। বলিল—“কেন নিয়েছিলে তা ত বললে। কি ক’রে নিলে?”

কণীক্স একটু ইতস্ততঃ করিল। তাবিল, তব কি?

সভা কথা বলিল। বলিল—“যখন ছেলে বাড়ি, বলতে কি! বাবু পুত্রাণে চাকরের একটা কথা শুনুন। বাবু ও মণিটাকে ভাগ্য করুন। ও কৃত্তর বিশ্বাসঘাতিনী, আর ঐ উকীলটা।”

অমিল আড়িত উঠিল। কণীন্দ্র তাহার পার্শ্বে বলিল। অমিল বলিল—“কণি তাহের সামনে বলতে পারবে?”

“কেন পারব না বাবু?”

অমিল লাগাম ধরিল। অব চোলাইল না। কি ভাবিল।

বলিল—“নাহো।”

বিদিত ব্রাহ্মণ তাহার মুখের দিকে চহিল। প্রকৃ লাগাম ছাড়িয়া তাহার হাত ধরিল। ব্রাহ্মণের বলটুকু ঘাইতেছিল, জানটুকু লোপ পাইতেছিল। সে ঠিক যেন বুঝিল না—একটু আশ্ব-বিশ্বস্ত হইল; যেন স্বপ্নের কোঁকে বলিল—“অমিল ভাই! ভাই! তোমাদের কম খেয়েছি দু’পুত্র। কিছু শেষে চুরি করিলাম তোমার জিনিস। ছেলের জন্তে। মোহাই ধর্ম—খোকার জন্তে—কিছু বড় ভূগি ভাই। বড় ভূগি। আল আমহা মনিব চাকর মই—আসামী করিহানী—ওঃ।”

অমিলও নিম্নের মনে ভাবিতেছিল—সেও আশ্বহারা। শেষের কথা করটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বলিল—“কণি, তুমি আমার শৈশবের খোশার সাবী। আজ তুমি

আমার গুরু। আর কোথাও যাব না। তোমাদের বৌ-রাণীকে নিজে তোমার মত বাসা বাঁধব। কণি, তোমার ঘরে যে দেবী দেখান আমায়ও ঘরে তেমন আছে;—কেবল আমি মানব, তাই তার পূজা করতে পারি নাই। কণি, আল আমহার চোখ মুটেছে।”

বাবু তাকে কমা করিতেছে এ কথাটা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল। শেষে আপনায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া কণীন্দ্র চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—“বাবু তরে বহিনি। কবিরাজ মশার বলছিলেন—যদি এখনো বৌ-রাণী মনে না শান্তি পান তো কিয়ই দক্ষা—”

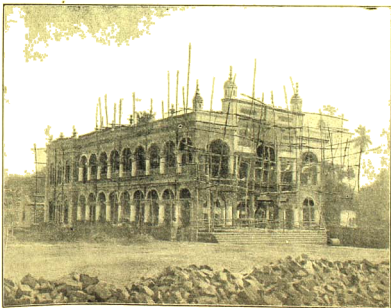
“খাঁ!”—অমিল চমকিয়া উঠিল।

কণীন্দ্র বলিল—“বাবু এখনও উপায় আছে।”

অমিল তাহাকে এক রকম গাড়ি হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। বলিল—“কণি, দামাধীর দাসের করেছি—এবার পূজা করিতে দেবীর মন্দিরে ছুটি। তুমি বাড়ী যাও।”

সে কাল-বিলম্ব করিতে সঙ্গত হইল না। সন্ধ্যার প্রসাধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। একদিন আসিয়া নদিনীর হাতের অর-বস্ত্রন খাইতে প্রতিশ্রুত হইল—কিন্তু এখন সে আর কাল-বিলম্ব করিতে পারে না। চাবুক মারিয়া সে ভোমসগরের দিকে ঘোড়া ছুটাইল।

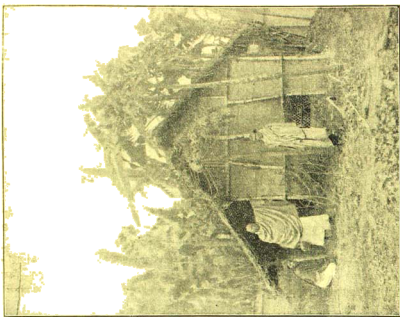
বাস্তালায় শঙ্কর-মঠ



বর্তমান মঠ (এখনও নির্মাণ শেষ হয় নাই)



କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଗୀତା-ପଠନ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା



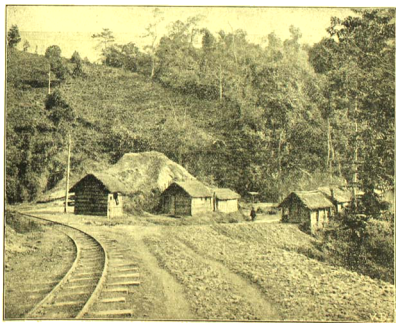
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା

হিমাচল-পথে

[শ্রীকলধর সেন]



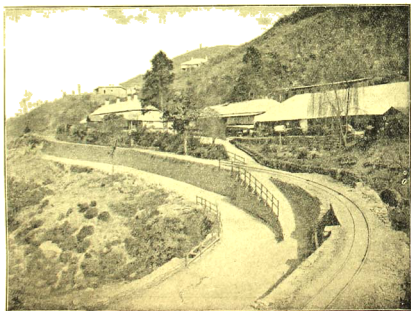
হিমাচল-পথে—মহানদী সেতু



হিমাচল-পথে—হাট ষ্টেশন



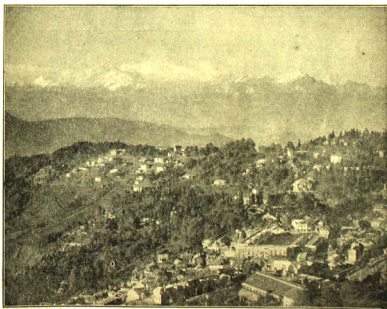
হিমাচল-পথে—হিমচরিকা স্টেশন



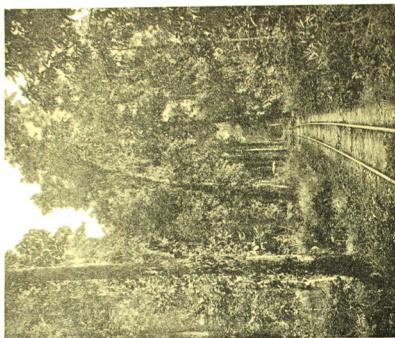
হিমাচল-পথে—কদিং স্টেশন



হিমালয়-পথে—রঞ্জিত ও তিতা নদীসঙ্গম



হিমালয়-পথে—দুধাওয়াড়



বিহারের পথে—জমাই অরেন



গায়েড়ী বন



দেওয়ানী মহিলাসভা

সারা বৎসরের মধ্যে কেবল একবার—একটিবারের জন্য কাজ-কর্মের বোকা বলাসম্ভব, মস্তক হুইতে নামাইয়া, একসঙ্গে কয়েক দিনের অবকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি; —সে আমাদের সর্বগ্রন্থান পূর্ক চুর্গোৎসবের সময়। সে সময় বাঁহারা দীর্ঘ অবকাশ পান, তাঁহারা সিন্ধী, লাহোর, বোম্বাই, সিংগে যান; আর বাঁহারা অল্প কয়েকদিনের ছুটি পান, তাঁহারা হাতের কাছে পুরী, বৈজ্ঞান্য, মধুপুর বা দারজিলিং যান। বাঁহাদের এখনও পলী-বাস আছে, এখনও বাঁহাদের পলী-অঙ্গনিকতনে দিনান্তে স্ত্রী-প্রাণীটি জলে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই,—বোধ হয় হাংগারে মশ ঘন—পুল্লার সময় দেখে যান কি না সন্দেহ।

বাঁহাদের আর সতীর্ণ, তাঁহারা সন্ধ্যা-প্রতিপালনের ভিত্তি এই দুর্ভাগ্যের দিনে গুপ্তপ্রস্ত; তাঁহাদের মনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রবাস-বাস ঘোচে না—দরিদ্রের মনোরথ জ্বরেই বিলীন হয়; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহারা প্রবাসেই অবকাশ-কাল খাপন করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, আমিও এই দলেরই একজন। স্ত্রী-পুত্র বিপন্ন পুত্রার অবকাশে যখন বহুপদের মধ্যে নানা জনে নানা স্থানে ঘাইবার সুদীর্ঘ ‘প্রোগ্রাম’ করিতে লাগিলেন, আমি তখন বাড়ী জবাব দিলাম—এবার কলিকাতা পরিভ্রমণ করিয়া ‘পাদনেকম্ ন গচ্ছামি’।

আমি ‘ন গচ্ছামি’ বলিয়া বসিয়া থাকিলে যদি তাহা

কার্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে জীবনের অনেক সময় এমন করিয়া বিফল হইত না। বিগত পুন্নার সময় আমি তাহার বেশ প্রমাণ পাইরাছিলাম। বহুগুণের মধ্যে অনেকে অনেক স্থানে চলিয়া গেলেন, আমি পঞ্চমী দিন পর্যন্ত সেই 'ন গজানি' ধরিয়াই বসিয়া আছি। পঞ্চমীর রাতি যখন এগারটা, তখন আমার প্রবাস-গৃহের সমস্তদ্বারের কড়া কে সম্বোধে নাড়া দিল এবং পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ সুরে 'বাবু, তার আরা' শব্দ আসিল।

তার! রাতি এগারটার সময় আমার মত পরিষের নামে 'তার!' আমাদের কালে-ভয়ে 'তার' আসে, আর সে তারের সংবাদ সকল বারেই অশুভ। হুতরাং 'তার' শুনিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল,—এখনই শুনিব, কে হুত মুকু-পথ্য! আমি আর 'তার' লইতে গেলান না; আমার এক পুত্র তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দেখাযোঁতি সহি দিরা 'তার' লইলেন, এবং আমার অসুস্থতার অপেক্ষা না করিয়াই কপিত-হস্তে তারের লোকা খুলিয়া পাঠ করিয়াই বসিয়া উঠিলেন, "খবর ভাল—দারজিলিংয়ের তার।"

দারজিলিংয়ের তখন বহুমানের ঐক্য নগরাস্থাধিরাধ বাহাদুর অবস্থিত কৃতিত্বছিলেন। এ 'তার' নিশ্চয়ই তিনিই করিয়াছেন বুকিতে পারিয়া আমার কাঁপনি বাহিল। পুত্র বলিলেন "মহারাজ আপনাকে সপ্তমীর দিন দারজিলিং পৌঁছিবার জন্য আরম্ভেই তার করিয়াছেন।" বাস—এ আদেশ অমান্য করিবার বো আমার ছিল না; হুতরাং আমার 'ন গজানি' সঙ্গম ধ্বংস লুপ্ত হইলেন।

পরদিন যজ্ঞ। সেই দিনই বাড়ী করিতে হইবে। প্রাতঃকালে ট্রেনে লোক পাঠাইলাম, যদি একটু স্থান রিজার্ভ করিতে পারি। তাহা হইল না; শুনিলাম, সে দিন দারজিলিং মেলে দত লোক যাইতে পারে, তাহার অনেক অধিক লোক—সবই সাবেব-বিবি, পূর্নহুই আসন রিজার্ভ করিয়াছেন; তাঁহাদেরই স্থান হইলেন না। পরনের স্থান না হয়, বসিবার, অন্ততঃ গাঁড়াইবার স্থান নিশ্চয়ই করিয়া লইতে পারিব, তাহা বাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আরোজন আবার কি করিব? একটা ছোট বাগের মধ্যে খানচায় কাপড়, শুষ্কতিনেক সাধা জামা, আর একটা গরম কোট লইলাম। ব্যাগে আর স্থান হইল না; গাভ্রবস্ত্র একখানি বালাগোব ও একটা ছোট বাগিল একখানি কুজ

বিলাতী কথলে জড়াইয়া লইলাম। ইহার অধিক আরো-জনের প্রয়োজনই বোধ হইল না। আমার এক বন্ধু কিন্তু পূর্ন সংসর দারজিলিং ভ্রমণে বাইবার সময় পাঁচশত টাকা কাপড়-চোপড় ইত্যাদিতেই ব্যয় করিয়া বসিয়াছিলেন।

দারজিলিং মেলে ছাড়িবার বন্দোবসনে পূর্নহুই ট্রেনে যাইয়া ছাড়ি! বিজ্ঞানবাদ করিয়া জানিলাম যে, উপরেই ছই শ্রেণিতে একটুও স্থান নাই; সেখানামও তাই। শিলিগুড়ি পর্যন্ত একখানি মধ্য-শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িবার প্রায় তিন কোয়ার্টার পূর্নহুই মধ্য-শ্রেণীর একটা আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। আমার পূর্নহুই অনেকে আসিয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের মধ্যে দারজিলিং বাড়ী বেশী ছিলেন না—ছই তিন জন মাত্র; অনেকেই পথে নামিয়া যাইবেন।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া একবারে ক্রান্ত হইয়া পড়িলাম; বড়ই বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু উপায় নাই। বিশেষ আসিলে মধ্য-শ্রেণিতেও স্থান পাইতাম না। গাড়ী ছাড়িবার পূর্নক্ষণ পর্যন্তও লোক আসিতে লাগিল; শেষে গাধাদের অন্তঃস্থান হইল, তাঁহাদিগকে গাঁড়াইয়াই যাইতে হইল। এক এক কমরার ব্যয় জন বসিয়াও আগন্তুক-গণের স্থান বেঁটা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ভ্রমণের আরম্ভ অনির্ভর্যমী হুৎকর হইল, তাহা আর বর্ণনা করিয়া বুঝিতে হইবে না!

গাড়ী ছাড়িল,—আমার 'হিমাচল-পথে' ভ্রমণ আরম্ভ হইল। এ ভ্রমণ-কাহিনীর নাম যদি 'দারজিলিং ভ্রমণ' লিখিতাম, তাহা হইলেই ঠিক হইত; কিন্তু দারজিলিং-ভ্রমণ সম্বন্ধে এত বই ছাপা হইয়াছে, এত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে যে এমন পোস্তাভিজ নামটা করিতে কেমন বাধ-বাধ চেকিল। তাই নামটা একটু বোলাস করিয়াছি; পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এই ইচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন। এখন ত আর কোনখানে বাওরা হয় না যে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিব। সৌভাগ্যক্রমে বহুমানের মহারাজাধিরাধ বাহাদুরের কৃপায় যদি মগাধিরাধ দর্শনের সুযোগ হইল, তখন সে ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার প্রোভোজন সংবরণ করা আমার মত কালাগের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। এ দুর্লভতা গোপন করিবারও লাভ নাই। অন্তঃপ্রব আপনারা যদি দারজিলিং-ভ্রমণ শুনিয়া ও পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও

না হয় কাউ-স্বরূপ আর একবারও পড়ুন। এই দ্বামে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি; তাহা এই যে, আমি হারজিনিয়ের দ্বন্দ্বকে একটা কথাও বলিব না,—আমার প্রবন্ধের নাম যে ‘হিমাচল-পথে’—আমি পথের কথাই বলিব।

হারজিনিয়ে মেল শিখালদহ ছাড়িয়া, পদ্মার এ-পারে যান হুইটা যানে গাড়ার; এক রাত্রাঘাটে আর পোড়ামহে; হুতরাং এ পথটার মধ্যে আর বলিবার ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রাত্রাঘাটে আমাদের গাড়ী হইতে চার পাঁচজন নামিয়া গেলেন, নতুন আর কেহ উঠিলেন না। যে কয়েক নামিলেন, তাঁহারা এই একঘণ্টা, স্থলের পাঠে অবনোদগোঁ ছায়েব মত গাঁড়াইয়াই ছিলেন; তাঁহাদের তিরোভাবে আমাদের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইল না,—আমরা যেমন বস্ত্রহেদী ছিলাম, তেমনই থাকিলাম। পোড়ামহে পাঁচ-পাতালী গাংব-বিবিকে জিনিসপত্র লইয়া দোড়াদোড়ি করিতে দেখিলাম; তাঁহাদের কি গতি হইল তাহা বলিতে পারি না। তারপরই সারা সেতু পার হইয়া একেবারে ঈশ্বরদি। এখানে সাহেবেরা ‘ডিনার’ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ডিনার করিতে নামিলেন, আর হুতরাং আমরা আসন বেরখল হইবার ভয়ে আড়ষ্টভাবে বসিয়া তাঁহাদের ভোজনের অধবা বিলম্বের কথা লইয়া নিত্যম অশ্রুতিকর সম্বাশোনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরেই গাড়ী ছাড়িল, আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; এবং একটু পরেই আবার নামিয়া দোড়াদোড়ি করিতে হইবে; সাত্তাহার যে গাড়ীতে উঠিতে হইবে, তাহাতে বসিবার স্থানটুকুও মিলিবে কি না; এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। সাত্তাহার হইতে যে ট্রেন শিলিঙডি দ্বার, তাহার গাড়ীগুলি ছোট, এ দিকে আমরাও দলে কদ নহি; এবং ইতঃপূর্বেই আর একখানি ট্রেন কলিকাতা হইতে আখিয়া সাত্তাহারে পৌঁছিয়াছে। সেই ট্রেনের আয়োজন। ‘পূর্বাংগেই গাড়ী দখল করিয়া বসিয়া আছেন; হুতরাং হুপিডা হইবারই কথা।

সাত্তাহারে আমাদের গাড়ী পৌঁছিলে অস্ত্র বাজীরা দ্বন্দ্ব ‘সুন্সী, সুন্সী’ করিয়া চাংকার করিতে লাগিলেন, আমি তখন বায়ুর মত আমার ক্ষুদ্র বাগ ও ভৌতিক ক্ষুদ্র তথ্য-কথিত বিদ্যানা নিজেই অনায়াসে বহিয়া লইয়া সকলের

আগে বাইরা একখানি মধ্য-শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। একটু পরেই আমাদের পরিত্যক্ত গাড়ীর আকোহী, তিনটা ভগ্নলোক তাঁহাদের পাঁচ-মাত-গড়া বাক্স বিছানো দ্বার হারিকেন লর্ডন লইয়া ছুটয়া আসিলেন। আমাদের গাড়ীতে তখনও বসিবার স্থান আছে দেখিয়া আমি তাঁহাদিগকে সত্বর আহ্বান করিলাম। আমাদের গাড়ীতে উপবিষ্ট একজন লোক—ভাল কাপড়-চোপড় পরা হুতরাং ভগ্নলোকই—বলিয়া উঠিলেন, “আপনি ত আজ! লোক মশাই, এ গাড়ীতে স্থান কৈ? আপনি পান না শোবার ঠাই, শতরাক ডাকেন পাশে ততে।” এ কথাই জবাব দিবার বয়ল আমার অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে; তাই কোন কথা না বলিয়া ভগ্নলোক তিনটার প্রথাদি গাড়ীর মধ্যে তুনিবার সাগসা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর কোন রকমে তাঁহাদের বসিবার স্থান হইল। তাঁহারা হারজিনিয়ে বেড়াইতে যাইতেছেন। কোন আশ্রমে না উঠিয়া বাসা করিয়া শতর থাকিবেন; তাই তাঁহাদের সঙ্গে এত লটবহর। কথাই কথার তাঁহাদের দৃষ্টি পরিচয় হইল। তাঁহাদের গাড়ী বাগবাঝারে।

ভাল কাপ করিলে যে তাহার পুষ্কার হাতে-হাতে পাওয়া যায়, আজ তাহার প্রমাণ পাইলাম। সাত্তাহার হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর ভগ্নলোক তিনটা তাঁহাদের গাটেরী খুলিয়া বাসা-প্রথা বাহির করিতে লাগিলেন। আমি সঙ্গে কিছুই আনি নাই; হাজিটা অনাচারে কাটাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। এখন দেখি, ভগ্নলোকেরা তাঁহাদের খাড-প্রবোর অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে চোপিয়া ধরিলেন। ইহারই নাম ভাল কাপের পুষ্কার! তাঁহারা বহি বিদ্রুণ হইয়া অস্ত্র গাড়ীতে বাইতেন, তাহা হইলে কি এই গাড়ীর হাজিতে শূন্য, তরকারী, ভাজা, এবং—বাপবাঝারের বিখ্যাত নবীন মরতার উৎকৃষ্ট রসগোলা আমার ভোগে লাগিত! অপর বোকে উপবিষ্ট ভগ্নলোকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া এই বহুদিগকে বিদ্রুণ করিলে কি লোকমানই হইত, বলুন দেখি! বৃত্তিলাপ, হিমাচল-মন্দিরী আজ হিমাচল-বাহী এই কাপাল সম্মানকে ভোগেন নাই। আজ কি তাহার আগমনী দীত হইতেছে; আজ কি অপরূপা বহির সম্মানকে অতুল রাখিতে পারেন। বাক্, ‘পেটে খেলে গিঠে ম’—মহানন্দে

গরুওজবে, বলিয়া-বলিয়া রাতি কাটান গেল,—একটুও কষ্ট বোধ হইল না।

এইবার শিলিগুড়ি। সন্নী বন্ধুরা—তীহাসিগকে আর 'ভরলোক' বলিয়া অভিহিত করিলেন রসগোল্লা-ভাংরা হইতে হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই বন্ধু—তাঁহারা একেবারে কলিকাতা হইতে দারজিলিংয়ের টিকিট করিয়াছিলেন। দারজিলিংয়ের রেসে ত আর বধ্য-শ্রেণী নাই, তীহাসিগকে তৃতীয় শ্রেণীতেই গাইতে হইবে। শিলিগুড়িতে টিকিট কিনিবার গোল মিটাইবার জন্যই তাঁহারা এই বাধ্যতা করিয়াছিলেন। শিলিগুড়ি নামিরা তাঁহারা তাঁহাদের লগেজাদির ব্যবস্থা করিতে গেলেন। আমি হিমচলের রেসের অবস্থা কি, তীহাই দেখিতে গেলাম। দেখি সাধেব-বিবিতে প্রাটেকরম জরিয়া দিয়াছে। একখানি দূরে থাকুক, তিনখানি হৈণেও তাঁহাদেরই কুলাইবে না—আমাদের কথা ত বহু দূর!

এমন সময় একটা বৃক্ক আসিয়া "দাদাবাবু বে!" দারজিলিং বাচ্ছেন বুঝি? বলিয়া প্রণাম করিল। বৃক্কটা আমার বড়সারার সোহিত, মেলওয়ে মেন-মার্জিশে কাজ করেন। তাঁহাতে দেখিরা আমি এই সাধেব-সম্মুখে কুল পাইলাম। তাঁহাকে বলিলাম "লাগা, আমার একখানি দারজিলিংয়ের টিকিট কিনে দাও ত।" এই বলিয়া তাঁহার হাতে একখানি দশটাকার নোট দিলাম। তিনি শুড়াতাড়ি চমিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া আসিলেন। ইত্যপেক্ষে এখন দারজিলিং দিয়া-ছিল্য, তখন সৌক্য-প্রবর আহারকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গাইতে দেখিয়াছিলেন; সেই জন্যই বোধ হয় এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। আমি তখন বলিলাম, "লাগা, টিকিট ত দ্বিতীয় শ্রেণীর করিলে, এখন চতুর্থ শ্রেণীতে একটু স্থান করিয়া দিতে পার কি না, বেশ।" তিনি আমাকে অনেক আশা-ভরসা দিয়া দারজিলিং গাড়ীর দিকে গেলেন এবং এরিক ওমিক চুটীচুট করিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাই ত দাদাবাবু, তিনখানি ট্রেন দিয়াছে, তার সবগুলিরই ফার্ট সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ, আর থার্ড ক্লাসগুলি সাধেবদের পানদার্মা আয়দানীতে ভর্তি।" আমি বলিলাম "তুমি আমার এই ব্যাগ ও বিছানার কাছে দাঁড়াও, আমি একবার দেখে আসি।" গাড়ীগুলির দিকট হাইরা একে-একে তিনখানি গাড়ী অতিনিবেশ সহকারে অহলক্ষ্য করিয়া

কোথাও স্থান পাইলাম না। শেষে দেখিলাম থার্ড ক্লাসের একখানি গাড়ীতে দুইজন পাখাড়ী পুলিশ কন্ট্রোল, একজন সবইন্সপেক্টর ও একটা বাবু বসিয়া আছেন। ছব্বদনের স্থানে চারিজন আছেন দেখিরা সেই দিকে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু গোড়ার সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না—পুলিস বে! কিন্তু আর ত উপায় নাই। কালেই অতি বিনোদ ভাবে সেই পুলিশ-হাকিমের কাছে আমার ব্যাগেরী পেশ করিলাম। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাকিমী মেজাজে বলিলেন "দখে বেশী জিনিসপত্র থাকলে স্থান হবে না।" আমি সবিনয় নিবেদন করিলাম যে, জিনিস বিশেষ কিছুই নাই। তখন তাঁহার সম্মতি পাইয়া আমি আমার ব্যাগ ও বিছানা লইয়া সেই গাড়ীতে আস্তর পাইলাম। গাড়ীতে উঠিয়া চাহিয়া দেখি, সেই গাড়ীরই অদূরবর্তী দুইখানি বেকে আমার বন্ধুরও স্থান লাভ করিয়াছেন।

সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গাড়ী আর ছাড়ি না। প্রায় একখণ্ডা লেট করিয়া দারজিলিংগামী তিনখানি মেল ট্রেন একে একে ছাড়িল; আমরা তৃতীয় গাড়ীর আরোহী। এইবার সত্যসত্যই হিমচলের পথ আরম্ভ হইল।

শিলিগুড়ি হইতে দারজিলিং গাইতে হইলে নিরলিখিত ট্রেনগুলি অতিক্রম করিতে হয়; বধ্য, শুকনা, বটো, তিন-খরিয়া, গয়াবাড়ী, মহানলী, কমদিয়া, হুং, সোপালা, ঘুম। তাহার পরই দারজিলিং। শিলিগুড়ি হইতে শুকনা পর্যন্ত সমতল-ভূমি; দেখিবার মধ্যে চা-বাগান। পর্তুত তখনও দূরে। বহুদূর-বিদূত ক্ষেত্রে ছোট ছোট চারের গাছগুলি দেখিতে বেশ। বাগনগুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিলাম কুলী-হমলী ও বালক-বালিকাগণ চারের পাভা ভুলিতেছে; কেহ বা হা করিয়া আমাদের গাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে হিমালয়-পায়ে ধোয়া মাখিয়া গাড়ীর তাবে বসিয়া আছেন।

'শুকনা' নামের ইতিহাস আছে কি না বলিতে পারি না; তবে স্থানটি যে জিজ্ঞা নাহে, একেবারে শুকনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুকনা হইতে পাড়ী ক্রমে ঢোকাই উঠিতে লাগিল; অল্প ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল; গাড়ীর এগনের সোঁদকোণনি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

যেটারী বেনে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই চড়াই উঠিতে লাগিল। রাত্তার ছই পার্শ্ব বড়-বড় গাছের দেহ হইতে লম্বানি বিবিধ বনোহর লতাগুল্ম ও অর্জিত। একেবারে প্রকৃতির ইঞ্জারা-মহল! সেখিলে চকু জুড়াইয়া যায়। আশার ত মনে হয়, বাতজিলিংয়ের এই রেলপথ, আর চান্সিকের এই নয়নাভিরাম দৃশ্যই ত্রণকারীর পক্ষে যথেষ্ট;—বাতজিলিং সহর না। সেখিলেও ইহাতেই থরচা ও পথপ্রদ পোষাইয়া যায়। গাড়ী এই সোঝা উপরের দিকে চলিতেছে—অমনি একস্থানে অতি কৌশলে এমন এক চকু ছিল যে, চাহিয়া দেখি, যে লাইন দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা একেবারে পদতলে গিয়া গড়িয়াছেন। এই চকু-গুলিকে ‘দুপ’ বলে। ইঞ্জিনিয়ার বাহাদুর-পুরুষ বটে। এমন করিয়া একটা চকু দিয়া অনেকটা রাত্তা উপরে না উঠিতে পারিলে এক দিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করিতে হইত। সমস্ত রেলপথে এই রকম চারিটা ‘দুপ’ আছে।

আমাদের গাড়ী যে দিন রংটং ঠেগনে থামিল না; কিন্তু তাহার অনতিদূরে একটা স্থানে জন লাইবার মস্ত একটু অপেক্ষা করিল। পথের মধ্যে অনেক স্থানে এই রকম জন লাইবার আড্ডা আছে। রংটংয়ের পরই তিন-ধরিয়া। রংটং হইতে গাড়ী ছাড়িয়া তিনধরিয়া পৌছিবার পূর্বে যে পথপানি অতিক্রম করিতে হয়, আশার মনে হয়, দৃষ্ট শোভার এই পথটুকুই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি কবিও নহি, চিত্রকরও নহি; সুতরাং বাক্য বা তুলিকাধারা এ দৃষ্টের মহিমা কীর্তন করিতে পারিলাম না। ঘুরে তিনটা নদী অলস দহর পর্বতে কোথায় চলিয়াছেন; পার্শ্বে অদ্যথা তরুগাঝি ধান-ময়; অগণিত জলধারা কুলকুল হলে কাহার নাম পান করিতেছে; আর যোগনিময় ভাণস-প্রবর হিমাচল মস্তক উন্নত করিয়া আপনাহারা হইয়া—কি করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। শুণ্ড গোল বাধাইতেছে এই আমাদের ইঞ্জিনের বিকট গর্জন!

তিনধরিয়া বেশ বড় ঠেগন। এখানে এই রেলের কারখানা আছে। অনেক লোকজন থাকে। সাহেবদের মস্ত থানা না হউক পিনার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; আমাদের মস্ত অফিসিও!

তিনধরিয়ার পর গলাবাড়ী। ইহার পরেই সেই

পাগলাঝোরা! এই ঝোরা বা ঝরণা দস্তানভাই পাগলা। ইহার মতিগতি ঝোরা বাহ না। কখন অবিরল ধারার বাহিরাশি ছাড়িয়া বিতেছেন; কখনও বা প্রলয় বৃষ্টি ধরিয়া একেবারে লক্ষ্যভ্রম। তখন ইহার পাগলামি দেখে কে! একেবারে পথ-ঘাট সব ভাঙ্গিয়া ছুঁড়িয়া একাকার করিয়া ফেলে। পাগলের বাহা দস্তর!

তাহার পরই মহানদী। মহানদী পার হইয়াই করসিং। একাও সহর। দারজিলিং আর করসিং বনজ-স্রোতা! ছুঁটিই বিশাস-নিষেত্তন; ছুঁটিই শোভা-সৌন্দর্য বর্ধনের মস্ত যথেষ্ট কৃত্রিম আয়োজন। এখানে গাড়ী অনেক-ক্ষণ থাকে; কারণ সাহেবলোক এখানে আহার করিয়া থাকেন, আর আমরা এখানে অনাহারে বসিয়া থাকি; আমাদের মত কোন বনোবন্তই এখানে নাই। বোম্ব হর কোম্পানী মনে করিয়াছেন, সাহেবের নিত্য একবেলা আহার ষোটে, তাহাদের মস্ত আহার কিসের ব্যবস্থা। সে বাহাই হউক, আমাদের মস্ত কিশু এখানে ব্যবস্থা ছিল। আমি যে এই সপ্তমীর দিন দারজিলিং বাইব, সে সংবাদ পূজনীয় ঐহুক রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর পাইয়া-দিলেন। তিনি তখন করসিংয়ে অবস্থিত করিতেছিলেন। ঐহুক রাজা সাহেব আমাকে নামাইয়া লাইবার মস্ত তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহানরকে ঠেগনে পাঠাইয়াছিলেন। সে ভদ্রলোক পর-পর দুইখানি ঘের ট্রেনে আমাকে না দেখিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন। তৃতীয় ট্রেনখানি বখন ঠেগনে পৌঁছিল, তখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলির মধ্যে আমাকে অবহণ করিয়াছিলেন। আমি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিয়া আছি, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। অবশেষে গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্বে বখন তিনি আমাদের গাড়ীর সমুখ দিয়া বাসায় ফিরিয়া বাইতেছিলেন, তখন আমাকে দেখিতে পাইলেন। তখন আর সময় ছিল না; কাধেই ঐহুক রাজা সাহেবকে উল্লেখে প্রণাম করিয়াই আমি শুক্লমুখে বিদায় গ্রহণ করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পাগাড়ী মেয়েছেলেরা কেহ বা কোলাহল করিতে-করিতে গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল, কেহ বা গাড়ীইরা-গাড়ীইরা দেখিতে লাগিল।

এখন আমরা একেবারে সন্দের রাত্তা উপস্থিত হই-লাম। উপস্থিত সময় দুখিয়া মেঘ আকাশ ছাইরা ফেলিল।

তার পর তুই! বাতীরা গাড়ীর পর্দা ফেলিয়া দিয়া শিত-
বস্ত্র গায়ে জড়াইয়া দি হি করিতে আরম্ভ করিলেন।
তুইর মধ্যেই হুঁ, পোনাদা পার হইয়া পেলাম। তারের
পরই ঘুম। এখানে এখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন আড়াইটা
বাতিয়া দিয়াছে—যেলের কিন্তু একটার সমর দায়জিলিয়ে
পৌঁছিবার কথা। ঘুম টেনে যেল আর ঘুমাইবার অব-
কাশ পাইলেন না; একটু গাড়াইয়াই একেবারে নিয়াতি-

খুঁচা হইলেন; ঘুম হইতে দায়জিলিং নীচে। কিছুক্ষণ
পরেই আমাদের গাড়ী দায়জিলিং পৌঁছিল। তখন প্রকৃ-
তির দেবাবগ্ভটন উদ্ঘোষিত হইয়াছে, রৌদ্র বেগা দিয়াছে।
আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলাম।
আমার 'হিমাচল-পথে'র কথা শেব হইল; আপনাতাও
বলুন, রাম বাঁচা গেল!

অভিভাষণ *

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কজুবণ]

যেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির দৌরব-মণ্ডিত
আদ্যনে উপবেশন করিবার অধিকার প্রদান করিয়া
আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান-প্রদর্শন করিয়াছেন, সেজন্য
আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ আপনাদের নিকট বিনীত
ভাবে নিবেদন করিতেছি। এই অবাচিত মহনীর সম্মান
নাচে আমি যে দৌরব অহুস্তব করিতেছি, তাহা আমার
জীবনে অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়।

বাংলা ত্রিতাপসহ চরণ-কমলে ত্তিকুপ্পাঙ্গলি দিবার
জ্ঞত আমরা এই পবিত্র মণ্ডপে অস্ত্র সমবেত হইয়াছি, সেই
মহীয়সী প্রত্যক্ষ দেখিতা—জননী বঙ্গভাষার প্রভাবে অদ্ব-
তবিত্তে বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর সমুদ্রত মানবজাতিগণের
মাঝে বহুদূর আসন লাভে সমর্থ হইবে, এই আশাই আল
প্রত্যক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ্বরে সমুদ্রান্তিত হইতেছে,—
এই আশাই আল প্রবর্তার রাম বাঙ্গালীর গন্তব্য দ্রোহ:
ও প্রয়োজ্যোজ্যে দিক্ প্রদর্শন করিতেছে। এক কথায়
বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই আশাই আল বাঙ্গালীর
বহুদিনের লক্ষ্যপ্রাপ্তি সমাজ-পন্থীরে আবার নূতন জীবনী-
শক্তির সঞ্চার করিতেছে।

আমাদের মাতৃভাষার কমনীর সঙ্গে নানাপ্রকারের
সাহিত্য-রসাকরণ বিভ্রাস্ত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া
বাংলায় অঙ্গপ্রস্থ করিয়াছিলেন, বাংলাদের পাণ্ডিত্যে ও
কৃতিত্বে বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা ধ্বংস ও পৌরবিত হইয়াছেন,
সেই কৃত্তিবাস, কান্দীদাস, বিভাগতি, চণ্ডীদাস, সুকুমারদাস,
কৃষ্ণধনদাস, সোচনদাস, কবিরাম কুম্ভদাস, গোবিন্দদাস,

ভারতচন্দ্র, রামা রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, বিভাগদাস,
অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বীনবন্ধু,
নবীনচন্দ্র, রাম-নাথায়গপ্রমুখ অনন্তকীর্তিমণ্ডিত ভারতীয়
বরপুত্রগণের পূর্ণাঙ্গী মৃত্যির উদ্দেশে অকপট ত্তিকি,
প্রীতি ও প্রভার পুষ্পাঙ্গলি উপহার দিয়া, আমি আপনাদের
নিকটে আমাদের সকলের বহুদূর মাতৃভাষার প্রকৃতি,
প্রীতি ও ভবিষ্যৎ গতি বিধের কিছু নিবেদন করিতেছি।

কিছুকাল হইতে আমাদের মধ্যে বঙ্গভাষার প্রকৃতি
সম্বন্ধে দুইটা পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের উদয় হইয়াছে। একটা
মত এই যে, বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ যতই
ঘনিষ্ঠতর হইবে, ততই ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি
পাইবে। দ্বিতীয় মতটী এই যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত
ইহার সম্বন্ধ যতই বাবহিত হইবে, ততই ইহার কার্যকারিতা
শক্তি ও মনোহাতিয়া বৃদ্ধি পাইবে। এই দুইটা মতের
সম্বন্ধক বিবৃতিগণের অবতারণিত দুর্ভেদ মুক্তি-মাসের
অবতারণা করিয়া এই সুখের সম্মিলনে আপনাদিগকে
বিব্রত করিবার অভিলাষ আমার একেবারেই নাই; কিন্তু
এই দুইটা মতের মধ্যে কিরূপভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে
পায়া যায়, আমি তাহারই সংক্ষেপে প্রতীপাদন করিতে
চেষ্টা করিব। সংস্কৃত ভাষা কি বঙ্গভাষার মাতা বা
মাতামহী, না প্রমাতামহী—সে বিষয়ে হস্ত বিচার করিবার
ভার অতিজ্ঞতর ভাষাতত্ত্ববিদ মনীষগণের উপর সমর্পণ

করাই প্রেরণ। তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ মত থাকিলেও সংস্কৃত শব্দ যে বাঙ্গলাভাষায় সুখ্য উপাদান—এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ ও সংস্কৃত নাম-বিশক্তিগুলির অবিকল প্রয়োগ বা ব্যবহার বাঙ্গলা ভাষায় কোন দিন ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না—ইহা সকলেরই স্বীকার্য। কিন্তু, সংস্কৃত অবিকল শব্দ ও বিশক্তি বাতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ অর্থাৎ প্রাতিশব্দিকগুলিকে পরিচয়্যাপন করিলে বঙ্গভাষায় অস্তিত্ব যে একেবারেই থাকে না—ইহা কে স্বীকার করিবে? সেই প্রাতিশব্দিকগুলির অবিকৃতভাবে ও বিকৃতভাবে ব্যবহার বাঙ্গলা ভাষায় যত বেশী ভাবে হইয়া থাকে, ভারতের সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠ অল্প কোন দেশের ভাষায় তত হয় না, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃত প্রাতিশব্দিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা—আর নলিণ ও খোল উভয়ই বদলাইয়া হ'কাকে সেই হ'কা বদলা পরিহার দিবার চেষ্টা যে একই প্রকারের হইবে, তাহা অতিক্রম ব্যক্তিমানই বিশেষভাবে বুঝেন।

সুতরাং যে সকল সংস্কৃত শব্দ শত-শত বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গলা ভাষায় ভিত্তিকপে পরিণত হইয়াছে, সেই ভিত্তিকে ভাঙ্গিয়া অল্প একটী নূতন ভিত্তির উপর বাঙ্গলা ভাষাকে বাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের কল্পনাকুশলতা নূতন হইলেও, তদুপায় যে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকৃতি নূতন ভাবে গঠিত হইতে পারে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

বিশাল বঙ্গভূমির ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে কথোপকথনকালে ঐ সকল সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণও বৈষম্য চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। এ হিসাবে প্রাদেশিকতা অব্যর্থনীয় হইলেও, লিখিত সাহিত্যের ভাষার উপর প্রাদেশিকতার প্রভাবকে বাঁহারা এখনও লোপাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা প্রতিভা ও শক্তিশালী হইতে পারেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রতিভা বা শক্তি—চট্টগ্রাম হইতে দানপুর, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও দ্বিপুরা পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের ভাষায় অনিবার্য গতির অগ্ন্যাজ্ঞ ও বজ্রতা যে সম্পাদন করিতে পারিবে না, ইহা প্রবলতা।

চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বীকড়া, মেদিনীপুর, যশোহর ও বরিশালের বাঙ্গলা উচ্চারণ পরস্পর প্রকৃত পার্থক্য আছে ও চিরদিনই থাকিবে। এক জেলার বাঙ্গালীর কথোপকথনজনিত রসায়নে অল্প জেলার বাঙ্গালীর অল্প বা বিস্তর অনধিকার স্বাভাবিক হইলেও, সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সাহিত্যিক ভাষার অল্পপ্রাচুর্য আও আমাদের পরস্পরের ভাব-বিনিময় অনায়াসেই সম্পাদিত হইতেছে। আপনাতঃ মুখের কথা আমার বুঝিতে ক্লেশ হইলেও, আমার মুখের কথা আপনার বোধগম্য না হইলেও,—আপনার লিখিত সাহিত্যিক ভাষা আমার অবগোচ্য নহে, বা আমার লিখিত সাহিত্যিক ভাষা আপনারও অবগোচ্য নহে,—এই ভাবে সমগ্র বাঙ্গালী ভাষিক এক করিবার জন্য যে রূপান্তরসাধনী সাহিত্যিক ভাষা, নব্যোদিত অল্পশক্তিগণ্যটোয় স্তরে বহুশক্তির ডেবনিয়াবঙ্গ প্রভাৱী জীবনে নব-নব অনুদানের আশা ও উৎসাহ লোপাইয়া দিতেছে, সেই সাহিত্যিক ভাষার জীবনী-শক্তি যে বিগত সংস্কৃত শব্দগণি হইতেই সমুদ্ভূত এবং সেই শব্দগুলির সহিত ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, ইহার জীবনী শক্তিই যে বিলুপ্তপ্রায় হইবে—এই প্রবলতার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমার এই নিবেদন। আশা করি ইহা উপেক্ষিত হইবে না।

এইবার আমাদের সাহিত্যের কথা বলিব। সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত ভাষায় নিত্যম সীমাবদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হইলেও, আমাদের নিম্নে ইহা অর্ধ-বিষয়ে আর সেইরূপ সীমাবদ্ধ নহে। বাঙ্গলার কাব্য ও অলঙ্কারই ইহার প্রতিপাদ্য নহে। আর শিক্ষিত-বাঙ্গালীর সাহিত্যের ভাষা—বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, কৃষি, শিল্প, কলা, বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাব ও বিষয়ের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সাহিত্য শব্দটা বাঙ্গলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নিজের প্রাচীন সীমাবদ্ধ শক্তি পরিহারপূর্বক অসীম পারিভাষিকী শক্তির প্রভাবে, বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের বিবর্তোদ্ভূত চিন্তাশক্তির জীভাক্রান্ত রূপে অল্প পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য এই সাহিত্যের গতির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের বিগতি ও উন্নতির উপর জাতীয় জীবনের বিগতি

ও উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে। বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও দর্শন প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল রসের পরিপুষ্টি ছাড়া কোন ভাব্যর সাহিত্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আমাদের ভাব্যর সাহিত্যের গতি কিন্তু এখনও বহুলভাবে সেই রূপ-দৃষ্টিই দিকে। উপজ্ঞান, নাটক ও কাব্য রচনার দিকেই বর্তমান সময়ে আমাদের সাহিত্যিকগণের বৌদ্ধিক অত্যধিক। বেশের অধিকাংশ লোকই এখনও উপজ্ঞান বা নাটক পড়িতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দর্শন, বিজ্ঞান, কবি, শোকনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা সাহিত্যের হাটে অতি অল্পই বিক্রীয়া থাকে। ইহা কিন্তু সত্য লক্ষণ নহে। ইহার প্রতীকার 'কল্পে' হইতে পারে, তাহাও বিশেষরূপে এখন ভাবিবার বিষয়।

সকলেই বলে বাঙ্গালী বড়ই বুদ্ধিমানী,—বাঙ্গালীর প্রতিভা বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতের জাতীয় অত্যাধিকার গতি নির্দেশ করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালীর কর্ণে ইহার অপেক্ষা তৃপ্তিকর প্রশংসা আর কিছুই হইতে পারে না—ইহা কে না বীকার করিতে? কিন্তু, এই প্রশংসা বাহ্যে চিরস্থায়িনী হয়, তাহার লক্ষ্য আমরা কি করিতেছি? কেবল উপজ্ঞান বা কাব্য লইয়া থাকিলে এই ভ্রমর জীবন-সংগ্রামের দিনে চলিবে কি করিয়া? বাঙ্গালার গ্রামগুলি মালেশিয়ার প্রভাবে বাসের অধোগ্রাস্ত হইতে চলিল,—বাঙ্গালার ক্ষেত্র সমস্ত বাঙ্গালী কৃষকেই অকর্ণপাতার বা অভাবে আর পূর্বের স্তায় শক্তসমৃদ্ধিপূর্ণ হইতেছে না,—চাকরী ছাড়া অল্প কোন জীবিতাই শতকরা নিরানব্বইটা গৃহস্থ-পরিবারের নিকট অর-সংস্থানের উপায় বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। ব্যবসায়-বাণিজ্য কেমন করিয়া চলাইতে হয়, বাঙ্গালী তাহা বুঝে না, বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। কদাচ বুঝিলেও তাহাতে উৎসাহ নাই। কাজেই দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের নিত্য-সংঘটন রোগ ও অকাল-মৃত্যু আদির নন্দন-কানন-ভূম্য বকের পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতে চলিয়াছে। তাহার উপর বেশের সর্বত্রই পরম্পর ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ ও আত্মবিমানজনিত কলহের ভীষণ লগ্নায় তীব্রবেগে সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে অবসর করিয়া দিতেছে। এই ঘোর দুর্দিনে বাঙ্গালী-জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে যে সাহিত্য রক্ষা করিতে পারে, তাহার সৃষ্টির লক্ষ্য সম্ভবত

চৌদ্দা যে একান্ত আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও ধর্ম, ইহা আর কুলিলে চলিবে না। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমুদ্রতট এই ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের লক্ষ্য বিশেষের সাহায্য গ্রহণ করিবার পূর্বে, ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তথ্য কি—তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাগ করিয়া বৃত্তিতে হইবে। সেই ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞান এখনও সংস্কৃত ভাষায়ই সম্বন্ধিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভাব্যর এখনও সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানপূর্ণ সংস্কৃতগ্রন্থনিবহের দ্বাৰা অসুখ্য অতি বিরল। দার্শনিক পরিভাষার ঐকান্তিক অভাবে, বাঙ্গালার দার্শনিক গভীর তত্ত্বগুলির আলোচনা এখনও এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রতীকারও সম্ভব আবশ্যিক।

ইংরেজি শিক্ষার প্রচারা বহুই বাড়িতেছে, ততই শিক্ষিত সমাজে পাকাতা হীতির অসুখ্যের ভাবে আদান ও প্রদানের উপর ক্রটি বাড়িয়া যাইতেছে;—প্রাচীন চতুশ্রী-প্রচলিত হীতির অসুখ্যের ভাবে আদান-প্রদানের গতি লোকে ক্রমশই অনাস্থাসম্পন্ন হইতেছে। এক্ষণ অবস্থায় চতুশ্রী অধ্যাত্মসাধনার পণ্ডিতগণের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত স্নাতকগণের তত্ত্বাবধান-হীতি-বিষয়ে ঐকমত্য ঘটয়া উঠিতেছে না। অধিকংশ লোকই পাকাতা প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাহাই ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব—ইহা বুঝাইবার লক্ষ্য নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। অপর দিকে, সংস্কৃতভাষায় চতুশ্রী অধ্যাপকগণ সংস্কৃত অধ্যাত্মসাধনের বহুতাব্য অসুখ্য করিতে প্রবর্তন হইলেও তাহাদের স্কৃত ভাষায় পাকাতা হীতি অসুখ্যের না হওয়া প্রবৃত্ত, অনাস্থারূপের কটিকর হইয়া উঠিতেছে না। এই অসামঞ্জস্যের ফলে বাঙ্গালার দার্শনিক ও ধর্মগুরুত্ব সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতেছে না। এই অসামঞ্জস্যের পরিহার করিতে হইলে, এক দিকে যেমন চতুশ্রী অধ্যাপকগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার একান্ত আবশ্যিকতা হইয়াছে, অপর দিকে পাকাতা ভাবে শিক্ষিত অধ্যাত্মসাধনাবাসী বা দার্শনিকগণের মধ্যে দ্বাধ্যতভাবে সমস্ত ভাষার সুপণ্ডিত

ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের অমূল্যলবণও তেমনই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে চতুশাখীয় অধ্যাপকগণের সহিত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাকাত্য ভাবে শিক্ষিত মনোবিদগণের মতের ও ভিত্তার সামঞ্জস্য যে পর্যন্ত না হইতেছে, সে পর্যন্ত বাঙ্গালার দার্শনিক ও ধর্মসংক্রান্ত সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। এই বিষয়টির প্রতি আমি নির্ভরসহকারে বঙ্গভাষার দার্শনিক-সাহিত্য-রচনার উন্নত ও উৎসাহপ্রব মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টিপাতের প্রার্থনা জানাইতেছি।

সাহিত্যের বিত্তহিই সামাজিক বিত্তহির মূখ্য কারণ। সাহিত্যের মধ্যে আবার উপজ্ঞান বা কাব্যভাগের বিত্তহি-সম্পাদন বর্ধমান সময়ে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মধ্যে এ সময়ে কাব্য ও উপজ্ঞানের পাঠকশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ হইতেছে ছাত্র বা কুলদলনা। উপজ্ঞান ও কাব্য পাঠে তাঁহাদের বৈরাগ্য উৎসাহ ও আনন্দ হইয়া থাকে, অল্প ঐষ পাঠে তাহাদের মতামতেরও একাংশ হয় কি না সম্ভব। এরূপ অবস্থায় কাব্য ও উপজ্ঞান-গ্রন্থগুলি এরূপ ভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধর্মপ্রবণ হয় এবং তাঁহাদের চরিত্র সুরক্ষিত হয়। রমের মধ্যে পানব বৃত্তিগুলি বাহ্যতে উত্তেজিত না হয়, প্রত্যুত প্রশমিত হয়, সেইরূপ উচ্চ আদর্শের সরল চিত্র প্রচুরভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। পবিত্র চরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কল্পিত চরিত্রের ব্যবহার চিত্রণও আবশ্যক বটে; কিন্তু, তাই বলিয়া কল্পিত চরিত্রের এরূপ অঙ্কন হওয়া কিছুতেই উচিত নহে, যাহার ফলে খেই সকল চরিত্রের উপর ভরসামতি, অপরিচিতচরিত্র বালক বা বালিকা-গণের সহানুভূতি উৎপন্ন হইতে পারে।

বিশ্ব-মানবের এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে অসহায়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজ বৈরাগ্য কঠোর পরীক্ষার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, সেই পরীক্ষার ফলের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন-পটন যে একান্ত নির্ভর করিতেছে, তাহা অস্বিগ্ন ব্যক্তিম্বারাও বিশেষরূপে মুকিতে পারিতেছেন। যে ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তির অবলম্বনে আমাদের পূর্বপুরুষগণ মৃত্যু ও শাস্তিতে জীবনমহাত্মা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, পাকাত্য শিক্ষার প্রবল আঘাতে সে ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিগত বিবেক ও স্বাভাবিক বিজ্ঞ-চেতনার বঙ্গ-পন্থীর মিনায়ে বিহ্বলতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আমরা সমস্ত-শক্তি হারায়াছি! অথচ, আবশ্যিক শিক্ষার অভাবে, বাস্তব-বিশুদ্ধ উত্তাল ভরসামান্য-সুপ্রতিষ্ঠিত অগাধ ভরসার মধ্যে ভাসমান নাবিকহীন পোতের স্তায় আমাদের জাতি এখনও ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। এই বিপদ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার একমাত্র মূখ্য-উপায় আমাদের সাহিত্য,—এ কথা প্রত্যেক সাহিত্যিককে মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। যে পথে বাইলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে, সে পথের সূচনাটার সাহিত্যের দ্বারাই সর্ব প্রথমে উন্মোচিত হইবে। সে যোগ্যতার যথুর আহ্বানজনক ডাকিবার জন্য অল্প সময় বাঙ্গালী-জাতি উৎকর্ষ হইয়া রহিয়াছে। জানি না, এ জীবনে সে আহ্বানবাণী তুমিতে পাইয়া কৃতার্থ হইব কি না। মৃত্যুর বিষয়, তাহার তনিবার আশা কিন্তু প্রকৃষ্টির যোগ্য অমানিশায় পর বেগনিমুক্ত পূর্বাকাশে সমুদ্রিত শুকভারার স্তায় আজ বাঙ্গালীর চন্দ্রাকাশে উদিত হইয়াছে। বঙ্গ-জীবনের অগাধাধর পৌরষের হেতু, সূচনায় স্তায় আওতোব সুযোগাধার সরস্বতী মহাশয় নিজের অলোক সামান্য অধ্যবসার ও কৃত্তিভের প্রজ্ঞাবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পরীক্ষার আমাদের দীনা উপেক্ষিতা মন্তব্যকে দৌরবেদ্যমান রক্ত-মিঃসংসনে উপবেশন করাইবার জন্য তাহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের কল অল্প লাভ করিয়াছেন। এ কথা বোধ হয় আপনাদের কাণেরও অবশিষ্ট নাই যে, সমুদ্র-ভ্রমর ভারত-পতঙ্গবৈঠি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গলা-ভাষার প্রবেশ-বিষয়ে অসুবিধিত প্রদান করিয়া আজ বাঙ্গালী-জাতির প্রকৃত অভ্যাসের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। এ মন্ত ভারত-পতঙ্গবৈঠি আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আর যে নিঃস্বার্থ, দেশহিতব্রত মহাপুরুষের কঠোর, তপস্কার এই অব্যবহিত সংঘটিত হইয়াছে, সেই স্নানবস্ত্র স্তায় আওতোব সুযোগাধার সরস্বতী মহাশয়কে আমরা যে কি বলিয়া আমাদের আত্মিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, তাহার ভাবা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি নিরাময়, নিরাপদ ও সুখোপভোগী হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-ভারতী-মন্ডার, তাঁহারই মনের মত ঘটক্রিংশ-উপভার ধারা পুঞ্জা করিয়া, বাঙ্গালীর অভ্যাসময়, নব জাতীয় জীবনের সুপ্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল—ইহাই ভগবৎ-পাদপরে আজ সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির আত্মিক প্রার্থনা।

রঘুনাথ শিষ্যমণি যে জাতির তর্কশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন,—ঐগৌরান্দেব যে জাতির অন্তর্নিহিত প্রেমনির্ব্বরকে বিশ্ববিদ্রোহী বচোর পরিত্যক্ত করিয়া সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের পথ নির্দেশ করিয়া সিদ্ধাছেন,—যে জাতির মধ্যে প্রথমে রাজা রামমোহন রায় প্রাণী ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের বিষ্ণু উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন,—বাঙ্গালার কালিদাস অমর কবিসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতির জীবনাবশেষে উদ্ভাবিতা,—মধুমর মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যে জাতির নবজীবনের উদ্‌বোধিতা,—আচাৰ্য্য ভাৰ লগদীপক ও ভাৰ প্রকৃষ্টর যে জাতির জড়বিজ্ঞান-মন্ত্রের উঠা, মধুর্বি,—বিশ্বমানবের উপাসনার গায়ত্রীমন্ত্র। বিশ্বকবি কবীন্দ্র ভাৰ রবীন্দ্রনাথ যে জাতির সৌন্দর্য্যের ও মাদুর্গের আদর্শ-রচয়িতা,—সে জাতির সাহিত্য যে লগতের সঙ্গীত সাহিত্য-রত্নভাণ্ডারে অসাধারণ ও অপূর্ণ ধোয়াজি: বিকীরণ করিবে, তাহা অবিশ্বাস্যিত ও অলোভ সত্য।

সেই বিশ্ব-বিমোহন সাহিত্য-সৃষ্টির উপকরণেরও অভাব নাই। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্বাধীনতা-মন্ত্রের অধীকার সাবক বিশ্ববিদ্রোহী ইংরেজজাতির বিরাট সাহিত্য-রত্নভাণ্ডারের দ্বার সৌভাগ্যবশত: আমাদের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, পুণ্যক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্যবিধাতা, প্রজাবৎসল, রাজভাষ্যের পক্ষম লক্ষ্য মহোদয়ের সুখকমল-বিনিঃসৃত আশ্বাস ও আশার ধোয়ণাবাহী এখনও প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিক ভারতবাসীর হৃদয়-ভিত্তিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া, ধ্বনিত-ধ্বনিত চিরবিপুল উৎসাহ-মন্তিকে স্তননভাবে লগপাইয়া দিতেছে। এই শুভ অবসরে প্রতীচ্য সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া, আমরা যদি নির, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য ও নীতিরগ্ন তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অভাব অপেক্ষিত পুষ্টিসাধন না করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদের অকর্ম্মগতা ও নিরুচ্ছিতার কলহে বনমাতার সুখ কালিমাতৃত হইবে, ইহা কে অধীকার করিবে? অপরদিকে ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমর ভাণ্ডার লগ্নত সাহিত্যও এখনও,—আমাদের জাতীয় জীবনের তিত্তির উপকরণ কি-তাহা অসমিদ্ধভাবে নির্দেশ করিতেছে। প্রাণী ও প্রতীচ্য সাহিত্যরগ্ন পক্ষ ও মধুমর এই মধুর সঙ্গিগনে সন্মুখ এই নবীন তীর্থে অবগাহনের দলে যে চতুর্দর্শ লগ্নত অবতর্য্যাবী, আমি বিজ্ঞাসা করি,

আর কতদিন আমাদের তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এই অপূর্ণ শ্রেয়স্বয় দিলনে যে বিত্তম সাহিত্য উন্মুক্ত হইয়া সমগ্র মানবজাতির ঐহিক ও পারাত্মিক সুখ ও শান্তির বিমর তত্ত্ব নির্মাণ করিবে, সেই সাহিত্য-সৃষ্টির ভাৰ আজ সমবেত বনমাতার লেখকগণের উপর বিধাতার কলপার অর্পিত হইয়াছে। ঐহাদের উপর এই ভাৰ অর্পিত, ঐহাদের মধ্যে এ মধুর পরম্পরা ঐহা, বিধেবলুল কলহ ও তুচ্ছ স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রতা স্বার্থে অকপালের দ্বন্দ্ব ও স্থান প্রাপ্ত না হয়, সে বিধেব প্রত্যেক সাহিত্যিকের আত্মিক সাবধানতা যে বর্ধমান সময়ে একান্ত অপেক্ষণীয়, এবং কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে, তাহাই আমি বিনীত ভাবে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিতেছি।

বাঙ্গালী সাহিত্যের উন্নতির প্রধান উপায় যে বৈদিক সাহিত্যের সম্যগহৃদীন, তাহা এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের চিন্তাপথে উদিত হইতেছে না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। বাঙ্গালী জাতির নবজীবন-প্রতিষ্ঠার এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আর্থ্য সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ কি, তাহা বিশেষ ভাবে জ্ঞানিতে হইবে। সেই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই আর্থ্য সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ইতিহাস বর্ত্তদিন পণ্ডিত ভাৰ্য্য ভাৰ করিয়া অহুদীন না করিবে, তত্তদিন সাহিত্যের সাধাণে আমাদের জাতীয় নবজীবন প্রতিষ্ঠার সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারিবে না। এই এব সভ্যতার প্রতি উপেক্ষা করা নিশ্চিত বনসক্তানের লগ্নে আর কিছুতেই শোভা পাইতেছে না।

যে প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য আমাদের লগ্নে, শুধু আমাদের লগ্নে কেন, লগ্নতের সমগ্র সভ্য মানবজাতিকে “একং সদ্ বিপ্রা বন্থা ববতি” এই মহাবাক্যে, বৈবস্বতী প্রপঞ্চ-সৃষ্টির মূল সামোর বিরাট ও সর্গসাহু্যত সভ্যতার প্রশান্ত মহিমা সর্গপ্রবেশে লগ্নদৃষ্টিরদ্বারে উপেলাগিত করিয়াছে, যে সাহিত্য অমর ভাৰ্য্য রঘুনিবহের দ্বাত-প্রতিদ্বাত-লগ্নিত বৈবস্বতের তাদৃশ্য বিদ্বিত জিতাপল্লিত মানবের উত্তম কর্ত্ত্বহরে জানন্মের অসুত-ভাৰ্য্য বর্ধণ করিতে করিতে লগ্নতের পূর্বে গাহিয়াছে—“আনন্মোভোব খদিমানি কুতানি দ্বারতে, আনন্মেন জাতানি জীবন্তি, আনন্মেন প্রয়ন্তি অজিতং-বিশতি” অর্থাৎ আনন্ম হইতেই এই জীবনিবহ উৎপন্ন, ইহা আনন্মেই প্রতিষ্ঠিত এবং

এলায়কালেও ইহার। সেই একাধার আনন্দেই বিলীন হইবে”—যে সাহিত্য সোহাগাভিমানে বিবেচ্য, বিবহাগিক্রির প্রচণ্ড কথ্যবাস্তে বিদ্যমান অস্বাভাবিক সনাতন শাস্তির সিংহাসন কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাই সোহাগিয়ার জন্ত নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়াছে—“ন কৰ্ম্মণা ন প্রজ্ঞান ন ধেনে ত্যাপেনৈকে অমৃতবদানন্তঃ” অর্থাৎ, আগন্তিমূলক কৰ্ম্মসমূহের অহুতানে দ্বার-সন্ধির জন্ত এম্বাস্ট্রির দ্বারা অপরিমিত বসনগ্রহণ বা অধিশ্রান্ত ধন-সঞ্চয়ে মানব মরণের ভীতি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, ত্যাপই মরণের তত্ত্ব হইতে নিবৃত্তির একমাত্র উপায়—অপত্যের সেই প্রধানতম সাহিত্যের প্রসিদ্ধ চারার আশ্রয় ব্যতিরেকে শাস্তিপ্রদায়ী বিশ্ব-মানবের প্রাচীর দ্বীপ-পঠন-কার্য যে কখনই স্থগাপ্য হইতে পারে না—এই অবিসংবাদিত অস্ত্রের সত্তার নির্ণয় বহুপাই বাগলা সাহিত্যের সুকূলে বিনম্রভাবে ঘাটতে প্রতিবন্ধিত হইয়া, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত দ্বীপনে সন্মুখ হির ঐক্যতার স্তায় চিরদিনের জন্ত সত্ত্বা পথ নির্দেশ করিতে সক্ষম হয়—এ বিষয়ে বোধ করি কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীরই মতবৈধ হইতে পারে না। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় যেহেতু সেই অমূল্য গ্রন্থগুলি এখনও বাঙ্গালীর নিকট সাধারণতঃ একপ্রকার অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বহুদিন পূর্বে বর্ণিত স্বরসীর-চরিত ৮৭তমস্ত্রে দত্ত মহোদয় গণ্ডেশ্বর-সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের এই বিষয়ে আগ্রহের হইবার পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপানে বদ্ধ থাকিবে। কিন্তু, তাঁহার প্রকাশিত অনুবাদ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশ স্থলে পাচাত্য প্রবৃত্তবুদ্ধি পণ্ডিতগণের মতামতসমূহে কণা হইয়াছিল বলিয়া, আন্তিক বিদ্যুৎ সময়ে ঐ অনুবাদ তেমন আশ্রয়ের সহিত গৃহীত হয় নাই।

ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার স্তম্ভরূপ বেদব্যাক্যাত্য ব্যাস ও জৈমিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণের অসীম নীতিসাধনগণের সাধনো বৈদিক সাহিত্যের বিদ্যমান ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়া বর্তমান সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বনে হয়। একদানি বৈদিক গ্রন্থের সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া

বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার জন্ত এ পর্যন্ত কোন বৈদ্য চেষ্টা হইয়াছে—এতদ্বা ব্যতীত বনে হয় না। গণ্ডেশ্বর-সংহিতার ঐক্য অনুবাদ বত শ্রী সত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, আশার আশা হয়, সে বিষয়ে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীই মতবৈধ করিবেন না। তাহার পর তৈত্তিরীয়-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, বাহুসনে-সংহিতা, শতপথ-ব্রাহ্মণ, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রহ্মসংহিতা ও বিশ্ব ব্যাখ্যাসমূহিত অনুবাদ এ পর্যন্ত বাঙ্গালী ভাষায় প্রকাশিত হইল না, ইহা আক্ষেপের বিষয়। এই গ্রন্থে অর্থবোধের সহজে দুই-একটা কথা বলিবার আছে। ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির পরিচয় যেমন অর্থবোধে পাওয়া যায়, সেজন্য অস্ত্র পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম ভারতের কৃষি, বাণিজ্য, সমুদ্রযানবিধি, সামরিক, শিল্প, বর্ণন ও অধ্যাত্মবিচার প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এই অর্থবোধের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ঐ সকল তত্ত্ববিধির উচ্চারণ সাধন করিয়া যোগ্য সাহিত্যিক-শিল্পী কত জ্যোতির্ভর রচনার পড়িয়া মাতৃভাষারূপ জননীর কন্ডনীর কণ্ঠে অর্পণ-পূর্বক জন্ম সার্থক করিতে পারেন। উৎসাহের অভাবে এই পথে কোন কৃতি সাহিত্যিক এখনও আগ্রহের হইতেছেন না—ইহাও কম দুঃখের বিষয় নহে।

বৈদিক সাহিত্য-গ্রন্থে এতদঞ্চল ধরিয়া কেবল দুঃখেরই বিষয় আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিয়াছি। কিন্তু এই সহজে দুঃখের এবং আশার সবাচীর এই যে, বৈদিক সাহিত্যের চিরমন্ডল রত্নসুট স্বরূপ উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির প্রতি বঙ্গীয় পাঠকগণের প্রজ্ঞা পড়িবার উপযুক্ত সময় আশাযের মধ্যে আশিরা উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্র ভাষ্যের সহিত ঐশ, কেন, কঠ ও মুক্তক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপনিষদের বিশদ তাৎপৰ্য্য-সম্বিত সরল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে, ভাস্করী, রত্নপ্রভা প্রভৃতি চীকাসম্বিত শাস্ত্রভাষ্যজ্ঞমত ব্রহ্মহ্মের বিশদ ও বিস্তৃত তাৎপৰ্য্য-সম্বিত সরল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া আমাদের একান্ত আশ্রয় হইয়াছে। অষ্টবর্তনসিদ্ধি, বণনবণ-বাণ্ড, তিৎসহী ও শিষ্টাংশে প্রভৃতি গ্রন্থেরও বিশদ অনুবাদ আশ্রয় হইয়াছে। এই প্রকার তাৎপৰ্য্য ও বিবরণসম্বিত সরল অনুবাদে দ্বারা আমাদের দেশে মহর্ষিগণের জন্মের

ধন ব্রাহ্মবিজ্ঞান প্রকৃত প্রচারের পক্ষে যুগান্তর সাধিত হইতেছে।

এই ব্রাহ্মবিজ্ঞান বা অশ্বৈতবিজ্ঞানই ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি। ইহা ত্যাগ ও সংখ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সভ্যতাকে প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিতে হইলে, ত্যাগ ও সংখ্যের মহাযাত্রার সাধনা করিতে হইবে—ইহা বেন সর্গনা আমাদের মনে থাকে। ত্যাগ ও সংখ্য বিরহিত সভ্যতা জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে তীব্র গতিতে অগ্রসর হইলেও, মানব-জাতির অতীর্ণিত শাস্ত্রিয়জ্ঞা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় না—এই অমুপেক্ষণীয় অকুমাৰ সভ্যসিদ্ধান্তের প্রতি আর অহেতুলা করা কিছুতেই সম্ভব নহে। তাহা বৃথাইবার মত অল্প প্রমাণ, যুক্তি বা তর্কের অবতারণা অপেক্ষিত নহে। গত বর্ষচতুর্দশবাপী যুবোপী মহাসমরই তাহার আশ্চর্যমান প্রমাণ। সমগ্র মানবজাতির অন্তরের অন্তরঙ্গ হইতে সহুভূত, সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠার বিরতি আকাক্ষার প্রতিধ্বনি আর পৃথিবীর চারিদিকেই স্রুত হইতেছে। এই স্রুত শান্তি-প্রতিষ্ঠার মঙ্গল-মুহূর্ত্তে আমাদের দাতৃত্বভার সুপ্রশস্ত উর্ধ্বর ক্ষেত্রে, বেনাতের অশ্বৈতবাদরূপ করতরুর মূল ভাতীর চিত্তার অদ্বুতপ্রবাহ সেচন অপেক্ষা সাহিত্যিকের পক্ষে গুরুতর আবশ্যকীয় অল্প কোন কার্য নাই, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

মুখী মহোদয়গণ! আমার অন্তরকার বক্তব্য আর বেশী কিছুই নাই: মেদিনীপুরের কথা মনে হইলে আমার সর্বাঙ্গে মনে পড়ে, সেই বাঙ্গালার চিরসৌভাগ্যের, চির-আনন্দের বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা। কেন যে তাহা মনে পড়ে, তাহাই বলিতেছি—

মেদিনীপুরের সহিত বংগের বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রেম-ধর্মের অবতার ঐগৌরাঙ্গ-মহাবীরের অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবনে গোষ্ঠাসিঙ্গ-বিরচিত সৌভাগ্য বৈষ্ণবমন্তের প্রবলিত বঙ্গ আনন্দন করিবার সময়, এই মেদিনীপুর অঞ্চলের নির্বিড় অরণ্যে সেই প্রথমলি অঙ্গুত হয়। এই মেদিনীপুরেরই সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রাজধানীর পরাক্রান্ত স্বাধীন বীরহাতির নরপতির সাহায্যেই আবার তাহা বৈষ্ণবভাষ্য ঐনিবাস প্রকৃত

হস্তে ভক্তিরূপে প্রতাপিত হয়। শুধু তাহাই নহে, বীর-হাতির, আচার্য্য ঐনিবাসের নিকট বৈষ্ণবধর্মের নীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিছুপুরে তাঁহাকেই দ্বারা সেই সকল অমূল্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচার-কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত গ্রহণেই আরম্ভ হইয়াছিল। স্মরণ্য বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচার-কার্য্য মেদিনীপুর ইতিহাসে বিশেষভাবে গৌরবিত। এই কারণে, মেদিনীপুরের এই স্মরণীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এই বৈষ্ণব-সাহিত্যগুলির মধ্যেই চারিত্র্য বংগের পূর্ব্বকালীন বাঙ্গালীর বর্ণাধ ভাতীর ইতিহাস অতি পরিচুতভাবে নিহিত আছে। চারিত্র্য বংগের পূর্ব্ব বাঙ্গালীর বর্ণাধীন, বাঙ্গালীর বৈশ্বনর গাহঁতা চিত্র, বাঙ্গালী সমাজের নৈতিক চরিত্র ও বাঙ্গালীর অকুমাৰ বিবলজনী প্রেম-প্রবণতার প্রকৃষ্ট ও বর্ণাধ পরিচয় পাইতে হইলে, এই বৈষ্ণব-সাহিত্যের পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যেভাবে সেই পর্যালোচনা হওয়া উচিত, তাহা এখনও হইতেছে না। এখনও বৈষ্ণব সাহিত্যের গ্রন্থ-গুলির অধিকাংশই বিলুপ্তভাবে অস্মৃতি হইয়াছে। বিলুপ্ত-ভাবে উদ্ধারের সুপ্রণ ও প্রকাশের অভাবে সাধারণের নিম্নে এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব অমূল্য রত্নরাশি, অপেক্ষিত জ্ঞানপ্রোৎসাহ-বিতরণে সমর্থ হইতেছে না—ইহার মন্ত সাধারণের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট চেষ্টা ও আয়োজন আবশ্যক। আশা করি, মেদিনীপুরের এই পবিত্র সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত উন্নয়নপ্রবণ, এই বিষয়ে সমরোপযোগী কি প্রকার আয়োজন হওয়া উচিত, তাহার নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

পরিশেষে, আমার প্রতি এই সম্মান ও আদর প্রদর্শনের মন্ত আবার আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সম্মরণের সহিত লিখিত অভিবাদনে অনেক ক্ষতি ও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে; নিবেদন এই যে, আপনারা নিম্নলিখিত তাহার সার্বজন্য করিবেন। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে কোন একটা বিষয়ও যদি আপনাদের অন্তর্মোহিত বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে আমি আমার প্রশংসা বলিয়া বোধ করিব।

পাখী-পোষা

(৩)

(যৌননির্বাচন ও পরভুৎ-রহস্ত)

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্]

(বেঙ্গল, ভাটাবেল্ হিল্লী সোসাইটি—বোম্বাই)

অনেক বয় করিয়া পাখীর বয়সকাল সাধাইয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদের মিলনের কথা আলোচনা করিতে বসিলে যে সকল সমস্ত আশিরা পড়ে তাহাদিগের সমাধান কেহই সম্বন্ধরূপে এখনও পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই মিলনকালকে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে যেখানে পাতলা থাকিবে যে, প্রথম অর্ধে—প্রাভ-মিথুন-শীতাব্দ (period of courtship)—পক্ষীটির মনোরঞ্জন করিবার জন্য পুংপক্ষীর কত ভাবভঙ্গী, কত বিভিন্নবর্ণচ্ছটা প্রচার, কত রেবাবেবি বেষাঘেবি, কত সখীতোজ্ঞান পক্ষীগৃহস্থে মর্ষিত, মিলোমিত, তরঙ্গিত হইয়া উঠে। বিশিষ্ট ও পুণ্ডিত পালক অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, পক্ষী কিসে যুগ্ম হয় ?—পৌরুষে, না সৌন্দর্যে ? প্রকৃতির অমূল্যরূপে নির্মিত ও সম্বন্ধিত নিকৃষ্টে বাহুব দেখিতেছেন যে—বেঙ্গল পক্ষী বলাইনের লজা, এই পক্ষীটিকে বলাইন পক্ষী লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আবার তিনি দেখিতে পান যে, পাখীর বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা যুগ্ম হইয়া পক্ষী পুংপক্ষীর নিকট আত্মদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। রূপের দোহে শিল্পবাহু পক্ষীকে কত চকল করিয়া তুলে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পালক কোনও কোনও বিহ্বলতাবিৎ একপ্রকার বৃহৎ বাঁচার মধ্যে পাশাপাশি তিনটি কামরার দুইটিতে এক একটি করিয়া পুংপক্ষী এবং অবশিষ্ট কামরার সেই ভাটীর একটি পক্ষীকে রাখিয়া উহাকে বয়সকাল হইবার সুযোগ দিয়া এই সমস্তরূপ চূড়াক যীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার বাঁচাটী একরূপভাবে বিভক্ত করিলেন যে, অভ্যন্তরস্থ দুইটি প্রাচীর ছাড়া পর্যন্ত না পছন্দাইয়া মধ্যস্থ দেখে হইয়া গেল। ছাদের নিম্নে সমস্ত

বাঁচাটীর মধ্যে একটি পাখীর চলাফেরার সুবিধামত অব্যাহত মুক্ত পথ থাকিরা গেল। দুই পার্শ্বের কামরা দুইটিতে একপ্রাচীর দুইটি পুংপক্ষীকে রাখা হইল। বাঁচাটে তাহার সমস্ত বাঁচার মধ্যে ইচ্ছামত উড়িতে না পারে, এবং তাহাদের কামরার প্রাচীর উল্লম্বন করিয়া কোঠার হইতে কোঠান্তরে যাতায়াত করিতে না পারে, সেইজন্য তাহাদিগের পক্ষচ্ছন্ন করা হয় ;—এক পার্শ্বের জানার কতকগুলি পত্রে ছেদন করিলেই উদ্ভেদ দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ হাকের কামরার বৃদ্ধন বিচরণশীল পক্ষী যুক্ত হয়। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তিনটি পাখীই একপ্রাচীর। পুরুষ দুইটির বর্ণের অল্পবিস্তর তার-তম্য আছে। কিংবদন্তি অবস্থানের পর প্রায়ই দেখা যায় যে, পক্ষী নিম্নের কামরা পরিভ্রমণ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক রূপবান্ পক্ষীটার সহিত মিলিত হইবার জন্য বোঝার তাহার কামরার প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই পক্ষীকে পাইবার জন্য পুংপক্ষীর মধ্যে দৃষ্টি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনও অবকাশ দেওয়া হয় নাই। এইরূপে একপ্রাচীর পক্ষিপালক ornithology য় দৃষ্টি হইতে ডারউইনের নৈসর্গিক নির্বাচন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রাপ্ত করিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু এখনকার পক্ষিবিজ্ঞানে নিঃসংস্রবণে কেহই ভোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, পুংপক্ষীর শারীরিক সৌন্দর্য ও যৌননির্বাচনের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পক্ষীটির এমন বৃহৎ সৌন্দর্যবোধ থাকিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবৈধ বহিয়াছে। (১) পক্ষীকে

> ১ "Many writers seem to find a difficulty in imagining that the female sex among birds is sufficiently endowed mentally to possess the requisite

পাইবার ক্ষত্র পুংপক্ষিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয়ের অবকাশ বেগা হইলে সাধারণতঃ কি কল পাওয়া যায় তাঁহা পূর্বে প্রবন্ধে (২) কিংকিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিজ্ঞেতার দৃষ্টি পক্ষী স্বরকলা পাতিয়া বসে। সে যে বিজ্ঞেতাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও অধিক পর্যবেক্ষণের ফলে এই biological বা জীবতত্ত্বগতীয় এবং psychological বা মনস্তত্ত্বগতীয় কৃত সম্ভার সমাক্ত সমাধান হইবে।

প্রাচীনযুগীয়া সম্রাট হইতে না হইতেই পক্ষি-দংশনীর বাসা-নিৰ্মাণের ধুম পড়িয়া যায়। পুংপক্ষী এত উগ্রম সহকারে এই কার্যে প্রতী হয় যে, অনেক সময়ে বড়কুটী সংগ্রহের আতিশয্যে নীড়টী পক্ষীর মনোমত হয় না;—পক্ষী হয় নীড়টী নষ্ট করিয়া ফেলে, না হয় অপর নীড় নির্মাণে ব্যাপৃত হয়। এমনও প্রায় দেখা যায় যে, নীড় রচনা অনেকদূর অগ্রগণ্য হইয়াছে, কিন্তু যে কোনও কারণে হটক উচ্চ পক্ষীর ভাল লাগিতেছে না; উদাহরণের বার্থ পরিভ্রমের নিদর্শনরূপে অর্ধরচিত নীড়টী অসম্পূর্ণ অস্থায়ী ফেলিয়া দিয়া বিধগমিধুন অপর স্থানে ক্ষত্র মাল-মসগার সাহায্যে আবার নূতন করিয়া বাসা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এই রহস্যময় ও কোতুলো-দীপক ব্যাপার প্রায়ই আমাদের কৃত্রিম পক্ষিগৃহ মধ্যে ঘেঁষিতে পাওয়া যায়; বনে গঙ্গলেও এই প্রকার অসম্পূর্ণ পরিত্যক্ত নীড় ইত্যদ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পক্ষিগণের নিকটে থাকিলে চলিবে না; পক্ষিপ্রকৃতির ব্রহ্মশাশ্বতের ও ক্রটিপরিহার্যের ভার বক্তকতা

aesthetic sense, and, indeed, evidence that female birds do consistently prefer the more beautiful males, or even that they are pleased by the display of the latter, is not very abundant."

—Ornithological and other Oddities,

by F. Finn, p. 7.

"We are not justified in saying positively that the *raison d'être* of these decorations is the attraction of a wife, though *a priori* reasoning certainly leads to this conclusion."—*Ibid.*, p. 12.

২। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৪।

তাঁহাকে লইতে হইবে। কৃত্রিম গৃহমধ্যে বড়কুটী খোঁগাইয়া দিয়া, বাসা-নিৰ্মাণের উপযোগী আধার পোহানো সারি-বেশিত করিয়া, এখন কি সময়ে সময়ে পক্ষিদংশনীর কুলায় নির্মাণের অশটুংঘের সংশোধন করিয়া দিয়া অর্থাৎ অনতিজ পক্ষিগণের বাসা-রচনার ক্রটি মার্জিত করিয়া তাঁহাকে সমাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে, বেনে অভ্যাবস্ত্রক উপকরণগুলির অভাবে অথবা পক্ষিদের নিবৃত্তিতা-বশতঃ উপকরণ প্রবাহির অথবা-বিভ্রাণে ভবিষ্যতে নীড় মধ্যে ভিষ সংরক্ষণের ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে, পক্ষিগৃহে যোগিত বৃক্ষগুলির শাখাতরালে পানীয় বাসা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত স্থান পায়। যে সকল পক্ষী গর্ভ মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, তাহাদিগের নিমিত্ত তরুকাটাই উপযুক্ত স্থান; ইহার অভাবে প্রাচীরগায়ে গর্ভ করিয়া দিতে হইবে অথবা গর্ভের অসুস্থতা কাটের বা নারিহুলের মালার আধার প্রাচীরগায়ে মগের মাথা আবস্তক। ভ্রামল কৃপাচ্ছাদিত বনের একপার্শ্বে কৃত্রিম কোণের মধ্যে ভূমিতে বিচরণশীল পানীয় বাসা-নিৰ্মাণে তৎপর হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির পানী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুলায় নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল; ক্রমশঃ তাহাদের নীড়-রচনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল; আমি পূর্বে পক্ষি-দংশনের নীড় রচনারূপ যে বিভিন্ন পরের উল্লেখ করিয়াছিলাম সেই পর প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল; এখন বিধগ-মিধুনগীলার তৃতীয় পরে আমরা উপনীত হইলাম। পক্ষিদংশনের এই পরটী অত্যন্ত বিচিত্র ও রহস্যময়। যথেষ্ট প্রবীকৃত করিয়া এতদিন পরে তাহাদের নীড়রচনা কার্য শেষ হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের পরিশ্রমের লাভ হয় হইতেছে মনে করিলে চলিবে না। বধাকালে ভিষগুলি প্রসঙ্গ করিয়াও পক্ষী নিবৃত্তি স্মৃত করে না; প্রসবের পর হইতেই একাধ্রমবে দিব্যরাজ সেই ভিষগুলির উপর তাহাকে সন্তর্পণে বলিয়া থাকিতে হইবে। যতদিন না ভিন্ন কুটীরা শাবক বার্তির হয়, ততদিন সে কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন মনে তা দিতে থাকিবে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া যাই, তথাপি সে অবিচলিত চিত্তে তাহার ক্রীত উদ্ভাবন না হওন পর্যন্ত একভাবে বলিয়া থাকে। এ শু মন রহস্যময়। যে পক্ষী চিরদিন অত্যন্ত চকন-প্রকৃতি বলিয়া আমাদের

নিকট পরিচিত; সাধারিন পক্ষ-বিভার করিয়া আকাপ-মার্গে উজ্জীর্ণমান হইতে ভালবাসিত; আশ কোন্ যাত্রা-কল্পনে, তাহার স্বভাবের এত পরিবর্তন সাধিত হইল? হঠাৎ সে কেমন করিয়া এমন দ্বাংসু প্রাপ্ত হইল। একে-বারে নিশ্চল হইয়া এককণ একই ভাবে তাহার বাগটির উপরে সে বসিয়া গেল! হয় ত সে হিংস্রভাব; অসহায় কীটপতংকে ও বিরাটীর্ণ পক্ষিশাবকে সে চিরদিন নিম্ন ভক্ষ্যবস্তুরে পরিণত করিয়া আপনার উদরপূষ্টি করিতে ভালবাসিত; আশ সে অত্যন্ত বেগপূরণ হইয়া তাহার সগাংকৃত আহার্য্যে যোজ্য উল্লীর্ণিত করিয়া শাবকের মুখে তুলিয়া দিতেছে। হয় ত সে ভীকৃষভাব; সাধারণতঃ আশ্রয়কার লব্ধ পত্নে বাহুরে নিকট হইতে বহুদূরে বিচরণ করে; আশ সে একেবারে নির্ভীক। তাহার আচরণ দেখিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না যে, সে স্বভাবতঃ মানবভয়-ভীতা; এখন মাহুদ তাহার কাছে আসিতেছে; তাহার গারে হাত দিতেছে, হয় ত তাহাকে তাহার বাগা হইতে উদ্ধে উত্তোলিত করিতেছে (৩); কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। পুংপক্ষী সাধারণতঃ তাহাকে চক্ষুপুটের সাহায্যে আহার যোগাইতেছে; সর্ব্বদাই গান গাহিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী রহিয়াছে। উভয়ের এই যে সাধনা, ইহাতে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহার পক্ষেতে যে নিগূঢ় শক্তি বহনকার অস্ত্ররাসে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিধগব্দগণের হাম্পত্যালীনা এইভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাকে Instinct বলিতে হয় বলুন;—হয় ত Instinct বলিয়া তাহার পরিচয় দিবার

যথেষ্ট কারণ এক্ষেত্রে বিস্তারিত রাখাচ্ছে। বোধ হয় এই Instinct-তত্ত্ব কতকটা মানিয়া লইলে পক্ষীজীবনের এই ভিষগণিত আর একটি কুট লক্ষ্যের সমাধানের কিছু সুবিধা হইতে পারে;—সেই parasitism বা পরভূত-রহস্যের কথা এইখানে স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে। পাঠকের মনঃ থাকিতে পারে যে আমি পাখীর এই তথাকথিত Instinct সম্বন্ধে পূর্বে (৩) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। নূতন করিয়া সে বিষয়ে এখন বিশেষ কিছু বলিবার পূর্বে নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে পক্ষীজীবনের এই অভিনব রহস্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া পক্ষি-তত্ত্ববিদগণ কার্য্যকারণ নির্ণয়ে প্রায় একমত হইয়াছেন, সেইগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

আলোচনার বিষয় এই যে ডিম গ্রহণের পর পক্ষীটি বিভাণক্ৰিয়াজীন কলের গুহুলের মত, ইচ্ছাশক্তিবিরহিত automaton-এর মত কাৰ্য্য করে কি না? এ সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তাহার। দৃষ্টান্তেই হয় ত পাখীর instinct গোষ্ঠী-হইতেই বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু অবস্থা-বিশেষে পাখা যে কেবলমাত্র একটা বহু-বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়া শুধু automaton-এর মত ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহা ভারতীয় সিডিল সার্কিসের হুনামাখ্যাত ডগ্লাস ডেওয়ার (Douglas Dewar) গ্রন্থে বিধগতবজ্ঞেরা ঘোষণা করিয়া প্রচার করিলেও, তাহার বিচারশক্তি অথবা Reason-এর একান্ত অভাব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ বিস্তারিত আছে। দৃষ্টান্তেই জানেন যে, কাকের বাসার কোকিল ডিম রাখিয়া যায়; কোকিলের ভিত্তি আদর্শনে এত ছোট যে তাহা কখনই কাকের ডিম বলিয়া ভ্রম প্রসূত হইতে পারে না। উভয়ের বর্ণ-বৈদ্যমণ্ড (৪) অত্যন্ত প্রেকট। কৃমিতলে

৩। আমেরিকার পক্ষিগণ মধ্যে পাখীর ডিম হইয়া এই অবস্থায়

পক্ষি একবার নড়াচড়া করা হইয়াছে। আমি নিজে লক্ষ্য করিয়াছি যে কেমেরি (Canary) পাখী যখন তাহার ডিমে তা দিতে থাকে, তখন তাহার পক্ষি স্পর্শ করিলেও সে সন্তুষ্ট হয় না; এমন কি তাহাকে হাতে করিয়া হরিয়া তুলিয়া লইবার উপক্রম করিলেও সে সেই ভিত্তি পরিভ্রমণ করিয়া পক্ষিগণের প্রেরণ করে না। এতদ্ব্যতীত তাহার আশ্রয় ভিত্তি সরাইয়া লইবার লব্ধ তাহাকে উঠাইয়া একটা বক্ষম ভিত্তি তৈয়ারি বাপিত করিয়া পাখীটাকে হারিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে সে সেই আস্র ভিত্তিকে সেখানে লক্ষ্য করিয়া হরিয়া তুলিয়া উল্লম্ববদন করতঃ তা দিতে থাকে।

৪। ভারতবর্ষ, আশ্রয় ১৩২৬।

৫। কাক এবং কোকিল উভয়েরই ডিমে পিঙ্গলবর্ণের আশ্রয় বিস্তারিত থাকিলেও দেখিতে যায় ডিমের ইন্ড বীলবর্ণ এবং কোকিলের ডিম লব্ধ বর্ণ। কাকের ডিম অগোলা কোকিলের ডিম আরম্ভে যথেষ্ট গোটা। সাধারণতঃ উভয়ের ডিমে এই বর্ণবৈদ্যমণ্ড থাকিলেও এখন এখন পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা একজন সাধারণ করিয়াছিলেন যে, যে পক্ষীর হুনামকে কোকিল আপনায় ডিম গ্রহণের উপযোগী বলে করে, সেই পক্ষীর ডিমের বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ডিম গ্রহণের কক্ষতা তাহার

অণু প্রশ্ন করিয়া সেই সত্যপ্রসূত কুণ্ড অণুটিকে চকুপুটে (৩) ঘায়ন করতঃ পক্ষীর বারমহুলায় সমীপে উপস্থিত হয়; গুণশক্তিও তাহার সাধনাবী হইয়া থাকে। উভয়েই জানে যে, কাকের বাসার কোকিলের ডিম রাখা সম্বন্ধে বায়ল-প্রবণের ঘোরতর আপত্তি আছে; কাক কখনও সম্মানে কোকিলকে তাহার নীড়ের মধ্যে ডিমটিকে রাখিতে দিবে না। কোকিল তাহার বাসার সম্মুখে আনিয়াছে দেখিলেই সে তাড়া করিয়া যায়। বন্ধা কোকিল অগ্রসর হইয়া নীড়-রক্ষক বায়লের সম্মুখীন হয়; কুড় কাক তাহার পড়াগ্ৰাঘন করে; এই অবসরে মাদী কোকিল সেই নীড়ের মধ্যে কাকের ডিমের পাশে নিম্নের ডিমটা সময়ে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যায়। আনিক পরে কাক ফিরিয়া আসিয়া নীড়স্থ সমস্ত ডিমগুলিতেই তা দিতে থাকে,—একটা ডিম যে বাড়িয়া গেল এবং সেটা যে সম্পূর্ণ ডিম জাতীয়, সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও দোঁতা লাগে না। প্রকৃতির সীলানুসারে এই যে পানীর সুকোচুরি খেলা, বংশ-রকার প্রভৃতির আগমনে কোকিল-দলপতীর কাককে কাকি দিয়া এই যে ডিমটি রাখিয়া আসা, এই প্রকাণ্ড রহস্য-ময় ব্যাপ্যটি পর্যালোচনা করিলে কি কেবলমাত্র অন্ধ instinctএর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাতীত আর কিছুই আরম্ভ উপলব্ধি করি না? শুধু অর্ধস্থপ অর্ধ-জ্ঞাত অন্ধ instinct বহুদূর ধরিয়া একটা বিহীন-জ্ঞাতিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে? অনেক গবেষণার পর instinct-পক্ষপাতী ডেওয়ারকেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যে,

আছে। এই ব্যাপ্য যে একবারে আত্ম এবং সম্পূর্ণ অনুগত, তাহা আধুনিক মূল্য বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক বিচ্যুত হইয়াছে। কোকিল পানী কাক অপেক্ষা অধিকতর ক্রিয়াবল পক্ষীর নীড়ের স্থিতিমত ডিম রাখিয়া আসে: বর্ষ বা আকার-বৈষম্যে কিছু আসে যায় না, তাহা সে বেশ জানে।

১। It is now proved up to the hilt that the female Cuckoo first lays her egg upon the ground, and carries it in her bill (not in her zygodactyle foot, as was for so long supposed) to the selected nest. * * * Cuckoos have been shot carrying their own eggs in their bills.

—W. Percival Westell's

The Young Ornithologist, p. 185.

পানীর এই সহজ-বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ; তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার বিচারশক্তি (intelligence) অনেক সময়ে কাল্প করিয়া থাকে;—there is apparently a limit to the extent to which intelligence is subservient to blind instinct (৭)।

পরত্ব-রহস্তের প্রথম ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি,—কাকি দিয়া পরের বাসার, শত্রুর বাসার ডিমটিকে রাখিয়া আসা। যাহা হোক কোকিল আসিয়া কাকের ডিম-গুলিকে নীড় হইতে ফেলিয়া দেয়, হয় ত সেইখানে আরও দুটো একটা নিম্নের ডিম রাখিয়া যায় (তাঁহার পূর্ণ রক্ষিত ডিমটিকে অশ্রুই সে স্থানচ্যুত করে না); অনেক সময়ে মাদুবেও কাকের ও কোকিলের ডিম লইয়া অদল বদল করিয়া কাকের স্বভাব-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিয়া থাকে; এমন কি ডিমের পরিবর্তে golf ball রাখিয়া আসে (৮); পানী নির্জিকার চিত্রে কোনও সন্দেহ না করিয়া সেই কল্লুর উপর উপবেশন করিয়া তা দিতে থাকে। ডগলাস ডেওয়ার এই সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া পানীর বিচার-বিস্মৃতা

৭। Birds of the Plains by Douglas Dewar, p. 116.

৮। ডিমপ্রদানের পরক্ষণ হইতে পানী বিচারশক্তির সহরে পুতুলের ভাণ্ড কাঁচা করে, এই যত্নের পোষকতার প্রমাণরূপ D. Dewar দেখায় কাকের সহিত কোকিলের খেলা খেলিয়াছিলেন। বিহীন আতির মধ্যে কাক যে অত্যন্ত বুদ্ধিশালী, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সত্যক্ৰম করিয়াছেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি কাকের বুদ্ধির মৌড় কতদূর, তাহা পরে করিমার নিমিত্ত কাকের বাসার ডিমসমূহ বাহ্য-প্রদান করিয়া তাহার পরীক্ষার বল এইরূপে নিশিচয় করিয়াছেন, "In all I have placed six Koel's eggs in four different crow's nests and.....in no single instance did the trick appear to be detected." আর একটা কটন পরীক্ষার বল তিনি এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটা বৃহৎ মুরগীর ডিম তিনি বায়লদীকে সম্মোহন করিলেন। বায়লকে সর্বদমেত এই বৃহৎ ডিমটা লইয়া ছাড়া ডিমের উপর তা দিতে হইয়াছিল। নিবির্যিগিতে বায়লপটী তা দিতে পারিল। বৃহৎ ডিম হইতে বন্দা বাছাটি বাহির হইল, তখন বায়লপতীর স্রোতের সীমা হ্রাসিত না। Dewar লিখিতেছেন, "With angry squawks, the scandalised birds attacked the unfortunate chick, and so viciously did they peck at it that it was in a dying state by the time my climber reached the nest." প্রত্যেকের তিনি একটা

সবকে হির-নিচর করিয়া বলিয়া আছেন বটে; কিন্তু তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন, যে পাখীকে যতটা সুস্থ বলিয়া মনে হয় গ্রিক সে ততটা নহে;—অনেক সময়ে সে ছুঁচুচুি ঘরিয়া ফেলে; জাশ-ডিহের উপর হয় বলিতে রাজি হয় না, নয় ত ডিম ফুটাইয়া বিলাতীর পক্ষিশাবককে সংহার করিয়া ফেলে। এই সমস্ত রহস্তের ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া গ্রিক করিয়া বলা কঠিন যে পাখীর সহজ-বুদ্ধির দোড় কতদূর; আর কোথায় এবং কখন তাহার বিচরণশক্তি জাগ্রতভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল।

বহু যুগ ধরিয়া বাশ-পরম্পরায় কোকিল এইরূপে আপনাকে বাঁচাইয়া আসিতেছে; এই অভ্যাসটা যে ইহাদের মঙ্গাগত, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াও গ্রিক করিয়া বলা কঠিন, কি অবস্থায় এই অভ্যাসের হৃদয়পাত-হইল। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এক জোড়া পাখী তরুকেটির অশ্ববা বৃক-শাখার পত্রাত্তরালে বধায়িত্তি নীড় নির্মাণ করিয়া তদ্ব্যপাে সন্তর্পনে নিরোদের সন্তঃপ্রসূত ডিমগুলি রক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে আর এক জোড়া অপর জাতীয় অধিক বলশালী পাখী আপনানিমের নীড়োপযোগী স্থানের



কাকি দিয়া গরের বাসায়—পল্লের বাসায়—ডিমটিকে রাখিয়া আসে।

কোন দূর অতীতে কোন এক অখ্যাত বিহসে বিহস-জীবনে এই পুরুষ-রহস্যের প্রথম পুচনা হইয়াছিল, প্রকৃতির রসমন্ডে সেই বিচিত্র রহস্য-বহনিকা আশ পূর্ণতা উজ্জ্বলিত হয় নাই। একটা পাখীকে বাঁচাইবার রত সীলাময়ী প্রকৃতি কেন এই বেলা খেলিলেন, এবং কবে ইহার আরম্ভ, ইহার তত্ত্ব এখনও নিহিতা শুধরাৎ। নিশ্চয়ই

golf-ball লইয়া অপর একটা নীড়ে বাসনপূর্বক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন যে বাসনজী তাহার অপর ভিষগণের সহিত golf-ballটিও তা দিতে লাগিল। কিন্তু আর এক বসে তাহার উচ্চারণ কণী পানিটা বহিয়া কেলি এবং উৎসাহে তা দিতে রাজী হইল না।

—Playing Cuckoo by D. Dewar,

(Birds of the Plains, pp. 111—115).

অন্যথানে তাহার উপস্থিত হইয়া নীড়স্থ বিহসযুগলকে ভাড়াইয়া দিয়া গড়িবে সেই নীড়টি অধিকার করিয়া ফেলে। আমার পক্ষী গৃহ মধ্যে পক্ষী জীবনের এই বিচিত্রলীলা অনেকবার দেখিয়াছি। এক জোড়া ফিন্চ (Ribbon Finch) একটা নারিকেল মাগার মধ্যে বাসা তৈয়ার করিয়া বসবাস করিতে লাগিল, যথা সময়ে ত্রী পক্ষীটি ডিম এসবও করিল। এমন সময়ে সেই পক্ষীগৃহের অভ্যন্তরস্থ একত্র সংরক্ষিত নানা পক্ষীর মধ্যে এক জোড়া লয়া রামগোড়া (Java sparrow) সহসা সেই নারিকেল মাগাটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ফিন্চ-যুগলকে নীড়-চ্যুত করিল। সেই মাগাটির মধ্যে এখন তাহারা গৃহস্থালী আরম্ভ করিয়া দিল। প্রত্যহই আমি তাহাদের জীবন-

রীতি লক্ষ্য করিতেছিলাম; যেখানায় তাহার বধাসময়ে ডিম পাড়িল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, দুটি ডিম ফুটয়া দুটি বিভিন্ন জাতীয় পক্ষিশাবক বাহির হইয়াছে,— একটি সাদা রামগোড়ার বাচ্চা, অপরটি ধূসর ফিক শাবক। নজা এই যে, খাড়ি বাবগোড়া পক্ষিটি অপত্য-নির্বিশেষে উভয়কেই মালিন করিতে লাগিল। এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। আবছাছার পক্ষিগৃহমধ্যে পিঙ্গড়ি মুনিয়া (Indian silver-bill) জাপানী মুনিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নীড় ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। নীড়মুক্ত মুনিয়ার

সেই দিন হইতে তাহার পরের উপর নির্ভর করিতে শিখিল। কালক্রমে ডিম-প্রসবের পর তাহা ফুটাইয়া তোলায় অভ্যাগতু পূর্ণাঙ্গ তাহাদের নষ্ট হইয়া গেল;— পক্ষি-জীবনের এই বিচিত্রে biologic processএর মধ্যে পরভূৎ-বহস্ত বংশ-পরম্পরায় বেশ ঘটিল হইয়া পড়াইল; বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকটে হয় ত এ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা মনে; ইহা একটা theory মাত্র; কিন্তু অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের মত এক্ষেত্রে একটা theoryর আলোর না লাইলে আপাততঃ এই ঘটিল ব্যাপারের ব্যাখ্যা সম্ভবপর



এদনি করিয়া:—“তথু অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত অন্ত instinct বহুদূর ধরিয়া একটা বিহীন জাতিকে রক্ষা করিয়া আনিতেহে?”

পরিভ্রাত ডিমগুলিকে তাহার জাপানী জাতি সম্বন্ধে ফুটাইয়া তুলে। তথু কৃত্রিম পক্ষিগৃহ মধ্যে আবছাছার যে এইরূপ ঘটনা থাকে তাহা নয়; বৃক্ষ প্রকৃতির শীতাকালে একের বাসা অন্তে কাড়িয়া লয়,—কাট্টো কুরার বাসা শালিকের অধিকারে আসে, pheasant ও তিত্তির পরম্পরের বাসা অধিকার করিয়া পরম্পরের ডিমের তা দেয়, তালচকুর বাসায় চড়াইয়ের অধিকার হয়। এই বিরোধকে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি; অতি প্রাচীন যুগ হইতে এই যক্ষ-কলহ পক্ষিমগতে চলিয়া আসিতেছে, অথচ ইহা হইতে তিত্তির মিত্র পানীকে আশ্রয় করা করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে হইয়াছে; যে শাবী সহৃদয় অবলম্বন করিতে পারে মাই, সে লুপ্ত হইয়াছে। যে দিন পক্ষিমল্লভী প্রথম দেখিল যে অপরে তাহার পরিভ্রাত ডিমটিকে সম্বন্ধে রক্ষা করে,

হয় না। একজন পক্ষিতত্ত্ববিদ লিখিতেছেন (২)—We can of course presume that parasitism may be the retained habit of some ancestral form of the species practising it at the present time, and acquired during conditions of existence of which we can have no possible conception now-a-days. We can also suggest in its explanation that the habit may have prevailed more widely during earlier epoches of avine existence. The fact that every detail and condition of the habit is so marvellously perfect seems to suggest its long-continued

duration. আর একজন লিখিতেছেন (১০) — Just as it is conceivable that in the course of ages that which was driven from its home might thrive through the fostering of its young by the invader, and thus the abandonment of domestic duties would become a direct gain to the evicted house-holder; so the bird which through inadvertence or through any other cause adopted the habit of casually dropping her eggs in a neighbour's nest, might thereby ensure a profitable inheritance for endless generations of her off-spring. এখানে বলা আবশ্যক যে, খাড়িয়া কর্তৃক পালনে পরাশ্রয় হইয়া এই পরভূৎ জাতির সৃষ্টি করিল কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন যে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রথমে বোধ হয় পক্ষিপারিকাই দ্বারা। একদিন সে অসহায়

অবস্থায় কোন গহন কামনে অথবা মক-প্রান্তরে তাহার নিহৃত্র মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সেই অসহায় অবস্থায় আর একটা ভিন্ন জাতীয় পানী দ্বারা পরবশ হইয়া তাহাকে অপত্য-নির্কাবে লালন করিতে গিয়াছিল। কিছুকাল পরে সে তাহার খাড়ীর আবাস হইতে উড়িয়া চলিয়া গেল। সে যখন আবার কালক্রমে জনক অথবা জননী হইয়া কোনও কারণে নিজ নীড়ে ডিম ফুটাইবার প্রবিধা পাইল না, তখন ছয় ত নিম্নের বৈশিষ্ট্য-কথা মরণ করিয়া যে পানীর কাছে আবার বস পইয়া অভ্যস্ত নিরুপায় অবস্থায় লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই জাতীয় পানীর কুলারে ভিখটি রাবিয়া আসিলে তাহা সম্বন্ধে রক্ষিত হইবে এই স্থির করিয়া হয় ত সে যেক্ষণে পরের বাসায় নিম্নের শাবক ফুটাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। ইহারা বলেন যে, সম্ভবতঃ parasitism-এর ইতিহাসের গোড়ার সঙ্গে বোধ হয় এমন করিয়া পানীর বৈশিষ্ট্য-বৃত্তি জড়িত হইয়া আছে। ইহাও একটা theory মাত্র। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, একটা বড় 'হয় ত' রহিয়া গেল। উপায় নাই; কারণ এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক হিসাবে শেব পাকা কথা এখনও বলা যায় না।

১০. Alfred Newton in his Dictionary of Birds, p. 634 (Nidification).

বাদ্যালীর ছেলে

[শ্রীমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

পিয়াস কোম্পানীর সাবান, কিংবা যেগুলি হুড প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে যে বিলাতী শিশুর প্রতিচ্ছবি দেওয়া হয়, সেগুলি যেখিনেই মৃত: মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং এখনো, বহু লোকের গৃহে, ঐ সকল বায়া ও সৌখ্যের প্রতিমা সম্বন্ধে দেওয়ালে রক্ষিত আছে, যেখানে গাওয়া যায়। কিন্তু “ওরিন্টাল আর্টস” ক্যান্সা ছবির কথা খাড়িয়া দিলেও, বাদ্যালীসেবের শিশুর ছবি যে কেমন রোগ-অসুখ-মাখান, কেমন যে অকাল-বার্দ্ধিকোত্তরা করিয়া অধিত হয়, তাহা যেখানে, আনন্দের সঙ্গে যুগপৎ বিবাদের ছায়া দেখা যায়। এমনটি কেন হয়? আমাদের “দোশার চান, স্তম্ভবর, নব্বের হুগলোয়া” এরূপ শাপপ্রভ হইয়া মরার কেন? যে দেশে কণবরের জন্মের মন্ত আনন্দ-উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে,

যে দেশে বংশরক্ষা করা ধর্মকর্ম মধ্যে পরিগণিত, সে দেশে শিশুর এরূপ হৃদ্বাণ কেন হইল?

আপাততঃ অসাধ্য কারণ-নিচয়

যদিও পৃথিবীর সকল মনতাপে হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি কৃত্তকর্ণের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া বলা-তথা এবং এইখানেই উহার মনজ-লাভা কালাজেরও নিত্য প্রসার ঘটতেছে। কলেরা বা বিশৃঙ্খল-ব্যাধি পৃথিবীর অপর কুজাশি এইরূপ সম্বলীর্ষ হইয়া রাম্য করিতে সাহসী হয় না। বসন্ত-ব্যাধি ভারত-বর্ষেই “মাতার-অশ্রুপ্রহ” অধিক পরিমাণে বর্ধণ করিয়া থাকে। বিভীষণের ভায়, দম্বা ও উপদংশ-ব্যাধি শনৈঃ-শনৈঃ

একেশ্বর অমরত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। চিকিৎসা-
শাস্ত্রে ম্যালেরিয়া, বিদ্যুৎচিকিৎসা, বসন্ত, বস্মা ও উপদংশ—
এই সকল ব্যাধিই অসামান্য নিবারণ হইলেও, আনাসিগের
জ্বরটুকু বশতঃ, উদাসিগকে নিবারণ করা অসম্ভব,—অন্ততঃ
এইটুকু দারুণ আঘাদিগকে বাধা হইয়া কঠিনতই হইতেছে।
আজ ইতালীতে ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়া নির্জেরেধের
কাষ বলিয়া বিবেচিত; যেমন পেন্সিল বাটিতে-কাটিতে
মিষ্ট অল্পলি কাটায়া লুণ্ডা হুণ্টনা হইলেও অসাবধানতা-
দূতক, তেমনি ইতালীতে যে কোম্পানীর অমৌ প্রযোজীরা
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়, আইনামুসারে সেই অসাবধান
কোম্পানীকে অসাবধানতার নগ্ন পতন মিষ্ট পরমা বায়
করিয়া পীড়িত প্রযোজীদিগের চিকিৎসা ও খেদান্তের
জন্ত বাধ্য করা হয়। এই ইতালীর কোম্পানী অনেক ভুলও
অনেকাংশে বাস্তবায়নের ভায়। সে দেশে ম্যালেরিয়া
হওয়া লক্ষ্যের কথা, আর মাঝবের দেশে ম্যালেরিয়া হওয়া
একটা অবজ্ঞাজনকী ব্যাপার। কার্খাপত্রাণ্ডো গো-বীজের
জীবাণুগণ বাধাতামূলক বলিয়া, পৃথিবীর মধ্যে ভাঙ্গাণ
হাটাই বসন্ত-ব্যাধি-বিদ্যুৎ; সমগ্র যুরোপের বস্মা নিবারণের
জন্ত কি উত্তরের তার চিত্তেছে! এবং তাহার ফলে আজ
বস্মা যুরোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হইলেও
অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। ভোগভূমি যুরোপে উপদংশের
বহুবিস্তৃতি সযেও উহাকে অসম্ভবীকরণ করিবার জন্ত কত
উপায়ই উদ্ভাবিত হইতেছে। আর, আর উপদংশ পাঠ
প্রণেয় ভায়, আনরা, বস্মাশেষের চিকিৎসককুল, তাহা
ওনিয়া বাইতেছি দ্বিঃ!!!

অসামান্য-সাধন

আনরাও চিকিৎসক, অপর বেশের লোকেরাও চিকিৎ-
সক; আনরাও বাহুব, তাহারাই বাহুব;—তবে কেন সুখ
আনরাই ভোগ ও জরা ভোগ করি? তাহার কারণ
অনেকগুলি। সেগুলি প্রণিধান করিবার উপযুক্ত।
(১) এ দেশের প্রাচীন বাবদ্য এই ছিল যে, চিকিৎসকগণ
দাতব্য তাহেই যোগ্য চিকিৎসা করিতেন—বনৌরা এবং
দেশের রাজাই চিকিৎসকের প্রতিপালনে অর্থদায় করিতেন।
তাদের অধ্যাপকগণও অবৈতনিক-ভাবে শিক্ষাদান করিয়া
বাইতেন;—এ কারণে, সমাজ নানাক্রমে অধ্যাপকগণকে বৃত্তি

বা সম্মান দান করিয়া অর্থ যোগাইতেন। বল কথা,
চিকিৎসা-ব্যবসায় অর্থকরী-ব্যবসায় ছিল না, এবং
চিকিৎসককুল আপামরসাধারণের উপকারে নিযুক্ত
থাকিলেও, তাহাদিগের নিত্য-অশ্রাণের বিষয় ছিলেন না।
আমাদের বর্তমান কালে, চিকিৎসা একটা ব্যবসারে পরিণত
হইয়াছে—আমনি-প্রদানের পতীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে
—কাবেই সাধারণের চক্ষে উহার মর্যাদার হানি ত
হইয়াছেই, পশ্চৎ চিকিৎসককুলের ঐশ্বর্য্য আর এখন
সাধারণের সহায়ত্বিত আকর্ষণ করে না। কাবেই,
কতকটা ব্যবসায় বলিয়া, কতকটা চিকিৎসার নিম্ন
বৈশিষ্ট্য বশতঃও বটে,—সাধারণে উহার “ভালহ-মান”,
সম্পদে-বিপদে সম্পূর্ণ হইতে চাহে না। সাধারণে উহার
বৈচিত্র্যে সন্ত না হইয়া, উহার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট না হইয়া,
বহু ঐ চুই কারণেই চিকিৎসা-ব্যবসারকে দূরে পথিয়ার
করে এবং চিকিৎসকগণকে ভীষনের নিত্য ঘটনার পতীর
মধ্যে আনিতে চাহে না। চিকিৎসকের পক্ষেও ব্যবসা-
হিসাবে ব্যারাম “মারোগ্য” করাটাই লাভজনক বলিয়া,
তাঁহার ব্যাধ্য—“নিবারণের” জন্ত আদৌ ব্যস্ত হন না।
(২) উইইত্তিরা কোম্পানীর আমলে যেমন কোম্পানীর
নিশান ভূদিয়া দিয়া যে-কোনও যুরোপীয় বিনা-গুণে
লবণের বাণিজ্য করিতেন এবং তজ্জন্ত এদেশবাসী ব্যবসায়ীরা
প্রতিযোগিতার সহিগ্রহ হইতেন, বর্তমান কালে, বে-
সরকারী-চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরাও ঠিক অমুরণ কতিগ্রস্ত
হইতেছেন। যেটা যেমন মিথ্যে সিদ্ধিসমার্জন, ও এদান
বেতনে আদিষ্টাঙ্গ-সমার্জন ও হস্পিটাল-আসিষ্টাট
রাখিয়া এবং তাহাদিগকে অবাধ্য গ্রাণকশি করিবার
স্বাধাণ বেওদায় বেশরকারী চিকিৎসককুল প্রতিযোগিতার
অনেক স্থলে সফল হইতে পারেন না। কাবেই, বাহারা
সরকারী কাষ করে, তাহাদের সময় ও সহায়ত্বিতর অভাব
বশতঃ, এবং, বাহারা বেশরকারী চিকিৎসক, তাহাদিগের
নিত্য অর্থের অভাব বশতঃ, সাধারণের উপকার হয়, এমন
কার্য্যে উভয়ের কেহই মন দিতে পারেন না। কাবেই, বাধ্য
হইয়া, স্বাধ্য-পরিদর্শক (হেল্প অফিসার ও ডানিটরি
ইন্সপেক্টর) নিযুক্ত করিয়া, অর্থদায় ও অনেক সময়ে
অসামান্য উপায়ে, স্বাধ্যাকুলবিধি প্রযুক্তি করিয়া
নইতে হয়। যদি দেশের মধ্যে বহুজনভাবে চিকিৎসা-



প্রসাধন

ঐগ্যক আয়োজনার 'চৌধুরি আশোক চিত্র মন্ডির'

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরি অধ্যাপক]

BLOCKS BY BHARATVARSA HALF-TONE WORKS

যাবার চালান সম্ভবপর হইত, যদি হাঁসপাতালগুলিতে স্থানীয় চিকিৎসকবৃন্দ মিলিয়া-মিশিয়া কাণ্ড করিবার ব্যবস্থা পাইতেন, তাহা হইলে, পত্রীগ্রামে চিকিৎসকগণের বাহুল্য ও তাঁহাদের বিস্তার ও বহুদশিতার বুদ্ধি দীর্ঘত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গরতার ফলে, দেশের বাহ্যোগতি খটত এবং বেতনকুঁচ স্বাস্থ্যপরিদর্শকের নিয়োগের আয়োজন থাকিলেও, তাঁহাদের কার্যের উপরে তাবৎ সেনাবাহিনীরই খরচুরী থাকিতে পাইত। (৩) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যমণ্ডল; সাধারণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কথা কহিতে চাহেন না। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপাঠ ধরান, সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পঠন ও ছাত্র-চিত্রালোকের সাহায্যে প্রচারকরণ, বালিকা-বিদ্যালয়ে হস্তিষ্যত তাহে স্বাস্থ্যপাঠ ধরান, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় মোটামুটি জ্ঞানের মত উপাধি স্থলিকরণ—প্রভৃতি নানা উপায়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাধারণের মধ্যে অভ্যাস “জুড়ু” ভয় তাড়াইতেই হইবে—নতুবা আনামিগের ভয়বৃত্তা নাই। বিদ্যালয় বলিতে ইংরাজী বিদ্যালয়ের (হাইস্কুলের) নিয়মের হইতে কয়েকের উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত আবার লম্বা এবং বালিকা বিদ্যালয়ে এম-এ, বি-এ, প্রভৃতি উপাধির বিদ্যমানতা রাখিয়া, থাকী-বিজ্ঞা, চক্ষুদাক্ষিণী-বিজ্ঞা, বাহ্য-বিজ্ঞা, রক্তনবিজ্ঞা, গৃহস্থানী প্রভৃতি বিভাগ সমাধার হওয়া বাহ্যনীয়। (৪) নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আনামিগের ঔদাসীন্য অস্বাচ্ছন্দ্য। আমি চাহি না যে, ঘরে-ঘরে রমণীরা বীজগণিতের কূট অঙ্ক সমাধান করুন; আমি চাহি যে, ঘরে-ঘরে পুরুষেরা রমণীগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিন। বাড়িতে মরণ বা কল রাখিয়া খাওয়া, গুরুত্ব না হইতেই চক্ষু বিবদে দান করা, আত্মকৃত বস বয়লা ও পরিভাষা জিনিস ব্যবহার করা, একই পুরুষিণীতে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করা ও তাহার স্পর্শ পানার্থ ব্যবহার করা, লবস্ত্র ময়লা কাপড় পদ্যবার ত্যাগ করিয়া গুটিয়া বসে, পাতের এঁটো খাওয়া, মাথা মুড়ি দিয়া শয়ন করা, শরদাপাতের সমস্ত রক্ত বন্ধ করা, ময়লা “জাতা” ঘরা ভোজনপাত্রগুলির মার্জনা করা, প্রভৃতি কত রকমের যে অবাস্তবিক অত্যাস-গুলি আনামিগের রমণীকুলের মঙ্গলত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অত্যাসগুলির দোষ একে একে বুঝাইয়া ইংরাজকে পুরুষেরা নিরাকৃত না করিবেন ও কে করিবেন ?

(৫) বার হাঙ্গপুতের তের হাঁড়ি—এই প্রবাদ-বচনটি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আনামিগের জাতীয় একতার অভাব আছে। এই জাতীয় একতার অভাব একটা প্রধান অভাব। আমি বর্ণপ্রভ-বর্ণের উপযোগিতা বা অস্থপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু প্রতিনিবিত্যের ত্রুটি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। তবে এটা বেশ মনে হয় যে, যদি ব্রাহ্মণধর্মের পশ্চাতে স্বাধর্ম সমানে সম্মান ও প্রবল থাকে, তবেই ব্রাহ্মণধর্মের মর্যাদা থাকে—নতুবা মলমল সেনা, ভাবহীন ভাব্যর মত জাতিবিচারের “কচকচি” লইয়াই বলাদলি করা যায় হয়। জাতি-বর্ণ-নির্ভেদে, এখন সকলে মিলিয়া একত্রে কথা কহিতে হইবে। হীন বার্ষ বা কুহ্ম আশ্বাতিমান লইয়া মলাদলি করিবার আর সময় নহে—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখনো-ওখানে করতৃত-হস্ত-পরিচালিত বাতীকরের পুস্তিকার জায় নরন-কুর্দন করিয়া, পলিটিক্যাল থিয়েটার (বা রাজনীতির বুঝা অভিনয়) করিয়া আশ্বাতিমান পুঁই বা বার্ষ এংগ্রহ করিবার সময় আর নাই। অপুতের সর্বত্রই প্রচার আগ্রহ হইয়াছে। আনামিগকেও জাগিতে হইবে। কুহ্মকর্ণের কথা ভুলিতে হইবে, বিভীষণ যে সময় সে কথাও ভুলিতে হইবে। দেশের লোক লইয়া, লোকমত প্রবল করিতে হইবে। লোকমত প্রবল হইলে, রাজ্যর পক্ষে কর্তব্য নির্ধারণ করা কঠিন হইবে না। লোকমত প্রবল হইলে, দেশমধ্যে শিক্ষা-বিত্যয়ের ও বাহ্যোগতির অভাব হইবে না। লোকমত প্রবল হইলে দেশের লোক অহমিশ দেশের প্রাণের অধিষ্কার লাভ পাইবে। তখন ছেলের যে কি চক্রে বাহ্য করিয়া ভুলিতে হয়, তাহার পরিচয় হাতে-কলমে পাইব।

যদি দেশের সকলেই বুঝিতে পারে যে, আনামিগের প্রধান অভাব দুইটা—শিক্ষার বিহীনতা ও স্বাস্থ্যলাভ,—তবে উঠিয়া পড়িয়া সকলেই সেই অভাব পূর করিবার মত প্রয়াসী হয়। ছেতের বিঘর, আনামিগের দেশের অবস্থা ঠিক উল্টা—অর্থাৎ আনামিগের দেশের লোককে আনামিগের জ্ঞান না যে, তাহাঙ্গিগের অভাব কি। আর তাহার উপরে এত বেশী করিয়া এবং এত দোষের সহিত তাহাঙ্গিগকে অনবরত গুনান হইয়াছে যে, তাহাঙ্গা অস্বচ্ছন্দ্য ও তাহাঙ্গিগের দেশে বাহ্য নাই এবং তাহাঙ্গের দেশে সেবিবার বা শুনিবার

উপভুক্তও কিছু নাই, যে তাহার। এখন সেই ভুলই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থা ও ধারণা বিপরীত হওয়ার সঙ্গে, ব্যবস্থাও বিপরীত রকমের হইতেছে। অর্থাৎ, কোথায় দেশের লোকের কথার, দেশের লোকের সাহচর্যে, দেশের লোকের দাওয়া, দেশের স্বাভাবিকতার ব্যবস্থা হইবে, তাহা না হইয়া—সুদূর সিংহলা বা দাক্ষিণি বৈশিষ্ট্য বসিয়া, স্বাধাভিত্তিকের কর্তার ইচ্ছামত, এখানে-ওখানে বাধ্যতামূলক বাহ্যবিধি প্রবর্তিত হইতেছে—আর দেশের লোকের। কতকটা অসুস্থের প্রচারের মত, কতকটা “বোকার উপরে থাকের আঁঠির” মত তাহা গারে দাখিয়া লইতেছে। এক পক্ষের দাবী করা পিতৃশ্রমের কর্তব্য-প্রবোগ, অপর পক্ষে সাংখ্যের পুরুষের ভ্রার ব্যবহার;—ইহার ফলে অর্থ-নষ্ট, মনঃকষ্ট হয় বটে, কিন্তু কল অতি সামান্যই।

সত্য বটে, ইংরাজ আমাদিগের না-বাণ হইয়া বসিয়াছেন। সত্য বটে তাঁহারা মনতামিকাবলতঃ আমাদিগকে ভিন্নদেশীয় ব্রহ্মদেশীয় শিশু করিয়া রাখিতে চাহেন; কিন্তু আমাদিগের নিজেরও ত কর্তব্য আছে—আমরা কি কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করি নাই? অঙ্গুর হইয়া, পিতামাতার কাছের লগুতা সম্পাদন করা আমাদিগের উচিত।

রাষ্ট্রশক্তি বাহ্যতে প্রকাশ হতে সম্পূর্ণই না হউক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে প্রকাশ হয়, দেশের সেই আবেশালন চলিতেছে বটে; কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দেশের শিক্ষা ও স্বাধাভিত্তিকতার সত্য-সমিতি কই? বাহার বস্তুতঃ সামর্থ্য, বাহার বস্তুতঃ অবকাশ—সে সমস্তই দেশের হিতকর নিদ্রাকরিত হইবে। আগে দেশের লোককে বাইতে ও বাচিতে দিতে হইবে, তবে ত রাষ্ট্রশক্তির উপভোগ করিবার প্রদোষ হইবে? যে চেষ্টার কংগ্রেস হইতেছে, সেই চেষ্টাকে সমস্ত বর্ষব্যাপী ও ক্রমাগতীয় করিতে পারিলে এবং তাহাতে প্রাণের সংযোগ থাকিলে, কত কাম করা বাইতে পারে। দেশের লোককে জানাইতে হইবে, মালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি নিবার্য। বাণিজ্যিক কি-কি কারণে হয়; সেই সঙ্গে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার উপায়গুলিও জানাইয়া দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের লোককে কর্ণ ও মর্মে বেশ করিয়া এই কথাগুলি বুঝিয়া দিতে হইবে যে, পুণি-

বীতে অপর কোথাও এই সকল আঁধার তামূল উপভোগ নাই, অতএব আমাদিগের দেশেও উহার। থাকিতে পাইবে না। ইহার মন্ত যদি সমস্ত দেশবাসীকে একবেলা না খাইয়াও থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া মালেরিয়াকে সংশ্লিষ্ট নিবন করিতেই হইবে। সত্য করিয়া, সমিতি করিয়া, মলগঠন করিয়া, গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব হউক, গভর্ণমেন্টের সাহচর্যে হউক, অথবা স্ব-স্বেচ্ছায় হউক, যেমন করিয়া হউক, মালেরিয়াকে বেশ হইতে বিসর্জন দিতেই হইবে। যেমন এক দারিদ্র্যমোহ গুণগণি নষ্ট করে, তেমননি একা মালেরিয়াই সমস্ত বাঙ্গালার সত্য স্বপ্ন, সকল স্বাধা, সকল উন্নতির অন্তরায়। গবর্ণমেন্ট করে দিয়া করিয়া আমাদিগের কথার কর্ণপাত করিয়া রাষ্ট্রের সুবিধা দান করিবে, কত দূর পরে আমাদিগের শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষার পরিণত হইবে, কোন সুদূর ভবিষ্যতে দেশেরই লোকে দেশের স্বাধাভিত্তিকের কর্তব্য হইবে—এই সকল আকাশকুসুমের আশার বসিয়া না থাকিয়া আজই, এই সঙ্গেই, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, বাহার যেমন সামর্থ্য ও বাহার যেমন অবসর ও সুযোগ—সে সেই তাহেই দেশের লোককে দেশের কার্যে উৎসাহিত করুক। বামী বিবেকানন্দের অঙ্গপ্রবো আশ দ্বিতীয়বারের সেবার মধ্যমা অনেক; কবে এই জরায়াবির ক্রীড়াভূমি আমাদিগের দেশে পীড়িত, নিরক্ষর ও সামান্যিক “নিরপ্রেমী” ভুক্ত নারায়ণের সেবা হয়ে-যয়ে অঙ্গুলিত হইবে? এই আশাততঃ অসাধাসাধন না করিতে পারিলে, শিশু-স্বাধা লইয়া বিচার করিয়া কি করিব?

যদি মালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে শিশুস্বাধার অন্তরতর কারণ নির্দেশ করিতে পারি। কিন্তু যে দিক দিয়াই দেখি, মালেরিয়াই ওত্তঃপ্রোক্ত তাহা শিশু-স্বাধাধারিন কারণ বলিয়া একটুট হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন মালেরিয়াকে এখন “বামাগণা” দিয়া রাখিতেই হইবে, তখন মালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া, অঙ্গুর কারণগুলি নির্দেশ করিব।

পিতামাতার অন্তরায়

শিশু ও মাতৃ দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থা—হেলেনো নহে। ইংরাজের অঙ্গুরণে আমরা পল্লীকে আর সর্বাধিক

ভাবি না, বিলাস-ভোগ-সাধনের সামগ্রী মনে করি।
 কি নিজ-নিজ জীবনে, কি সন্তান-প্রতিপালনে, সংব-
 শিকার বিকট বাড়াই না—নিজেও নিতা অভাব বৃদ্ধি
 করিয়া, নিতা সুখ-আশায় ব্রিহা মরি, ছেলেকেও
 বিলাসিতা, ভোগৈবধের পথে ঐশিষ্ঠা অগ্রসর করিয়া দিই।
 ইহা অপেক্ষা আর মূঢ়তা কি বেশী হইতে পারে? আমরা
 বাণ্যবিবাহের ঘোষ “দিই,—আমরা অমন অনেক বিলাসী
 ঘৃণা ধরিয়া, কর্তব্যহী কঠিন বাহ্যের পদক্ষেপে বাহিন হই;
 কিন্তু বাণ্যবিবাহ বলিলেই কাম-পরিতৃষ্ণির কথা মনে
 কর কেন? ছেলেকে সংব শিকা দাও নাই কেন?
 আশাদিগের প্রথম অজ্ঞতা এইখানেই। আমরা বিলাসী
 কাচ লইয়া অকালে গিরা দিবার দ্রষ্টা জড়ি উদ্ভীষ।
 আমরা সংঘর্ষশীল রমণী মনে করি, প্রেমোদা জ্ঞান
 করি, আমরা বিবাহকে “বিশিষ্টরূপে পত্নীর ভার
 বহন করা” মনে না করিয়া ভোগোৎসব মনে করি।
 আমরা নিজ-নিজ সন্তানদিগকে মনোহর ভাবী নিরস্ত্র ও
 অসংযমের কীটিল বংশধর মনে না করিয়া, কামনার
 লীলাক্ষেত্রে, ও অর্থবাহী বলপূর্ণে কল্পনা করি; এবং পুত্র
 সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান চরম আদর্শ—“বাণ্য, তুচ্ছ
 দারোগা হও”। এইখানেই আশাদিগের প্রথম অজ্ঞতা—
 সংবদের অভাব।

আশাদিগের দ্বিতীয় অজ্ঞতা—স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞানহীনতা।
 রমণীরা গৃহিণী হইতে স্পর্ধা রাখেন, সুপাটিকা হইতেও
 স্পর্ধা করিতে পারেন, কিন্তু স্বমাতা হইবার স্পর্ধা
 কোথায়? যে গৃহিণী রন্ধনশীল, তিনি রন্ধনের প্রত্যেক
 উপকরণের দোষ-গুণ বেশ করিয়া আশ্রয় করিয়া, তবে
 রন্ধনকার্যে দক্ষতা লাভ করেন। কিন্তু, কি বাইলে
 শিশু ভাল থাকে, কি পরিণে শিশু ভাল থাকে, এ
 সম্বন্ধে অতীত যুগজ্ঞান যদি তাঁহারা কেহ কেহ নিজ
 অভিজ্ঞতার বলে সংগ্রহ করিতে পারেন। মোটামুটি
 স্বাস্থ্যতত্ত্ব কি পুষ্টি, কি রমণী,—এ দেশে কেহই জানেন
 না, জানিবলৈ চেষ্টাও প্রকাশ করেন না। প্রত্যেক
 বিভাগেও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পাঠ্য পড়ান হয় না। যে
 অভিজ্ঞতার সন্তানেরা বিভাগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠ্য
 পুস্তক পড়ে, সে অভিজ্ঞতারেরা ব্রহ্মক্রেমও সেই
 সামান্য স্বাস্থ্যশিক্ষাটুকুও কষ্ট করিয়া পাঠ করেন

না। পরন্তু, এ দেশে স্বাস্থ্যশিক্ষাতে অবজ্ঞার চক্রে
 দেখা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিকৃত-মত দ্বৈতের সহিত প্রকাশ
 করাই পৌরুষজ্ঞাপক। আমাদের দেশে কাহারো
 কোন ব্যাধি হইলে, বহুব্যবস্থার সুখ হইতে—এমন কি
 হুচিকিৎসকেই সমুদ্রে—কত রকমের যে ব্যবস্থা আশ্র-
 য় প্রকাশ করে, তাহা ভুক্তভোগীরই জানা আছে। যেখা হয়
 আশাদের বেশে বহু লোক আছে ততজনই “হাসিক”
 অথচ, আশাদিগের দেশের ত্রাণ রোগের আকর অপর
 কোনও দেশ নহে। প্রজ্ঞাবান না হইলে, কখনো জ্ঞান
 লাভ হয় না। অপ্রজ্ঞাবুদ্ধি ভাগ করিয়া আশাদিগকে
 হুগ স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিতেই হইবে,—নতুবা নিজ নিজ শিশু-
 দিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আশাদিগের কর্তব্য নিষ্কারণ করা
 অসম্ভব ব্যাপার হইবে।

আশাদিগের তৃতীয় অজ্ঞতার কল—বেশকালপায়ে
 সম্বন্ধে অবিবেচনা। আমরা জুলিয়া যাই যে, শিশু যখন
 পর্ডে বাপ করে, তখন উকললে নিমজ্জিত থাকে; জন্মের
 পরে সেই শিশুর যে কত দুর্গতি আমরা করি, তাহার ইহুতা
 নাই। কখনো স্থানোলে বা পশ্চাদে আপদবস্তক দুর্ভিক্ষ
 তাহার চর্চের উগ্রতা সাধন করি, আবার কখনো তাহার
 দেহের উপর্য্যস্ত পরিচ্ছন্নাদিকা করিয়া, শরীরের নিদ্রা
 নয় রাখি। কখনো আমরা সাধন ব্যবহার করিয়া
 তাহার কোমল ঘককে কর্কশ করি, আবার কখনো ঘান
 বন্ধ রাখিয়া তাহার বায়ুগুলির উত্তেজনা বৃদ্ধি করি।
 কল কথা, এটি আশারা কেহই শ্রবণ রাখি না যে, আকৃতির
 তুলনায় শিশুর চর্ম্মবিশুদ্ধি বেশী বিধারে, অতি সামান্য
 কারণেই শিশুর ঠাণ্ডা লাগে এবং বহুসম্ভব একই উত্তাপে
 তাহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বথা উচিত। জোয়ার অধিক
 ও মনোভাষিকা বনতঃ, অকারণে শিশুকে শতভুবার
 ডারাক্রান্ত করিও না। শিশুদিগকে যে কাপড়-চোপড়
 পরান হয়, তাহাতে অধিকাংশ সময়েই তাহার বিরত
 হইয়া পড়ে,—আবার অনেক সময়ে এমন আশাভোক্তা
 পরান হয় যে, ছেলেকে বস্ত্রব্যব কোলে তোলা হয়,
 ততবারই তাহার বুকপিঠ আঘাত হইয়া পড়ে। কাপড়-
 চোপড় পরান সম্বন্ধে যতটা অবিবেচনা প্রকাশ করা হয়,
 হেলেদিগকে খাওয়ান সম্বন্ধে ততপেক্ষা অধিক অবিবেচনায়
 কাব করা হইয়া থাকে। খুব আর সংখ্যক রমণীই জ্ঞাত

আছেন যে, শিশুর হৃদয় মাস বয়ঃক্রম পর্যন্ত নিজ মাতৃদুগ্ধই
 তাহার স্বাভাবিক ও যথেষ্ট আহার্য। এ কথা
 জানা থাকিলেও, সকল জননীর মনে এত দূর আসে না
 যাহা তদীয় শিশুর পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। আবার, যে
 জননীর স্তন্য যথেষ্ট থাকে, তিনিও সমত্যাগিক। বশতঃ হয় ত
 দেহ, দুই, এমন কি তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্তও স্তন্য দিতে
 কুণ্ঠিত হন না। আদর্শকাল হেলে জন্মিলেই তাহাকে
 "বিশাভী গাঢ় দুগ্ধ" (condensed milk) অথবা একটা
 না একটা "হুড" (malted milk food)—অন্ততঃ সাগু
 বাগিও খাওয়াইতেই হইবে। এইরূপ খাওয়ানর হেতু,
 প্রথমতঃ, ঐ খাদ্য তদীয় জননীর বা অপার আত্মীয়ের
 অভিপ্রেত। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসকসকলের নির্দেশিত। বা
 অবিরোধিত। তৃতীয়তঃ, সাহেবদিগের বা সাহেবীজানি-
 ঐক্য বাঙ্গালী বাহুদিগের অসুচিকির্ষ। এই "হুড" খাওয়ান-
 গ্রন্থা সর্বথা বর্জনীয়। নিত্যন্ত ব্যায়াম সময়ে, অস্বাস্থ্যভাবে
 ব্যবহার করা ভিন্ন অত্র কোনও অবস্থায় ইহা দিলক্ষে
 ব্যবহার করা উচিত নহে; তাহার কারণ, ঐ বিশাভী
 খাদ্যগুলি বাগি; উহাতে তাইটামিন না থাকায়, উহা
 খাইয়া সেহের বাহ্যিক পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু শিশুরা
 রোগপ্রবণ ও অস্বাস্থ্যবাহীন হইয়া পড়ে; এবং উহার
 ব্যবহারে দেশের হন অনর্থক বিদেশের কবলিত হয়। খাদ্য-
 সম্বন্ধে বিচার করিতে বলিয়া আর একটা প্রধান দোষের
 উল্লেখ করিব। সেটিও অত্যন্ত অবিরোধনীয়। খুব
 অল্প জীলোকেই আনেন কতকগুলি অল্প শিশুকে খাওয়াইতে
 হয়। তাহার ফলে নিত্যন্ত এলোমেলো রকমে শিশুরা
 খাদ্য পাইয়া থাকে এবং সেই হেতু বশতঃ ব্যাভ্যমেও
 বিভিন্ন ভোগে। তাহা ছাড়া, অনেক গৃহস্থের এমন
 অভ্যাস আছে যে, কতি হেলে ভোজনের সময়ে নিকটে
 আসিলেই তাহার তাহাকে কিছু কিছু ভোজ্য দিয়া
 থাকেন। এই ভাবেও শিশুর দেহের পক্ষে অসুপযুক্ত বহু
 খাদ্য অসুপযুক্ত সময়ে তাহার পাকস্থলীতে খাইয়া শীতল
 হেতু হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় পক্ষে শিশুরা
 অতি অল্প বয়স হইতেই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ভোজনে অভ্যাস
 হয় এবং পরিচয়ের সময়ে অনেক চুপাচু, লবণ সোডানের
 ব্যবহার হইতে বাধ্য হয়।

খাদ্যবিবিকল্প কাণ

পূর্বে যে যে কথাগুলি বলিয়াছি, তাহার অধিকাংশই
 খাদ্যবিবিকল্প কাণের বিবরণ; কিন্তু খাদ্যের প্রেরণার
 হেলো এমন কতকগুলি কাণ করিতে চাহে, যাহা করিতে
 না পারিলে তাহারা অসুখী হয়। সেগুলি কাণ দুইটি।
 প্রথমতঃ, হেলো মিট খাইতে ভালবাসে ও তৎ হৃদয় পাইলে
 সুখী হয়। অর্থাৎ, সাধারণের মনে ঐ দুইটি মিনিমের বিবরণে
 নানা রকমের কুসংসার আছে। মিট খাইলে ক্রিমি বাড়ে,
 গাড়ে পোকা, জমে, এবং টক খাইলে সর্দি হয়,—এই তর
 সর্বমাই গৃহীত মনে ভাগ্যবান আছে। কিন্তু বিশ্বস্তভাবে
 সর্বত্রই শিশুদিগের ঐ দুটি মিনিম প্রিয়। তাহার কারণ,
 প্রথমতঃ, মিটের মত আত্ম-স্বভাবের খাদ্য খুব অল্পই আছে;
 এবং দ্বিতীয়তঃ, মিট ভোজনে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও
 উত্তাপ রক্ষণ অতি অল্পর রূপেই হইয়া থাকে। তাই
 প্রকৃতির প্রেরণায় শিশুদ্বয়েই মিটের অমুরাগি। টক
 খাইলে সর্দি হয়, এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্র বিবরণ। অর্থাৎ
 টক খাইলে স্রাব ও তেজঃস্থিতি হয়, বোধ হয় এই
 প্রাকৃতিক প্রেরণায় হেলোর কাঁচা ও টক কল ভালবাসে।
 আমায় মনে হয়, শিশুদিগকে এই দুইটি রূপ হইতে বঞ্চিত
 করা অস্বাভাবিক—তাহার ফলে শিশুদিগের অনিষ্ট হয়। তবে
 একথা সর্বথা সত্য যে—"সর্বদাত্ত্যং পরিহিতং।" দ্বিতীয়তঃ,
 শিশুরা নর থাকিতে ভালবাসে। আমায়ের বেশে অন্ততঃ
 আট-নালকাল গ্রীষ্ম, চারিমা মাস শীত। অর্থাৎ, অনেক
 হলে দেখা যায় যে, সকল গুরুত্বই শিশুদ্বয়ের খেদাল ও
 অস্বাস্থ্যের পরিচয় করিবার লক্ষ্য, নানা রকমের লামা-কাপড়
 শিশুদিগকে পরাইয়া দেওয়া হয়। লামা-কাপড় এমন কি দুই-
 তিন মাসের শিশুকেও লামানিবারণ কৌশল বা পা-লামা
 যাতীত সহরে দেখা যায় না। আমায় মনে হয় যে, এই
 কাপড় অন্তর। শীতে, বর্ষায় বা যে কোনও দিন ঠাণ্ডা
 থাকিলে অতি অল্প শিশুকে লামা-লোড় দিয়া আবৃত
 করা উচিত। তথায্যাত বাগেবাসে প্রত্যহই শিশুকে
 রীতিমত ভাবে তৈলমর্দন করা উচিত। তৈলমর্দন চর্ম
 মৃদু থাকে এবং শীতল হইতে শিশুকে রক্ষণ করে।
 কিন্তু অর্থাৎ শিশুকে লামা-লোড় পরাইয়া রাখা অসুচিত—
 বিশেষতঃ যে সকল পরিচয়ের বন্ধন, কিতা সেহুটি পিন
 লাগানির প্রয়োজন হয়, তাহা সর্বথা বর্জনীয়। তৃতীয়তঃ

শিশুরা বড়ই ভাল বাঁটিতে ভালবাসে এবং নয় পয়ে ধলে-
 ধলে বেড়াইতে পাইলে সুখী হয়। এই অভ্যাসটির অর্থ-
 ঠিক দৃষ্টিতে পায় নাই। এবং ছেলেরা অনবরত ভাল
 বাঁটে বা ধলে বেড়ায়, ইহার সম্বন্ধন করিতে পারিলাম না।
 পরন্তু যে সকল অবিবেকী জনক-জননী শিশুগণকে “শক”
 করিবার আশায় ঐ দিকে শিশুগণকে প্রেরণ দেন,
 তাহার। জানেন না যে, “শক” করিবার চেষ্টার ফলে,
 কত শিশু অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া বসে। আমার
 মনে হয় যে, যে সকল শিশু প্রত্যহ রীতিমত দান করিতে
 পায়, তাহারাই সর্বাধিক স্বাস্থ্যবান হয়। চতুর্থতঃ, শিশুরা
 চাঁৎকার করিতে ভালবাসে। অনেক বাটীর শোকেরা
 ইহাতে বিরক্ত হন এবং শিশুরা সাধারণ চাঁৎকার করিলেই,
 তাহাদিগকে শাসন করেন। চাঁৎকার করিলে বুকের
 কোর বাড়ে, এই বড়ই শিশুরা চাঁৎকার করে; তাহাদিগকে
 নিষেধ করিলে শিশুরা ক্রটিগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ অত্যধিক
 শাসন ও ত্রয়োদশ তৈয়ারি করিবার অত্যধিক চেষ্টার ফলে,
 আশাবাদের ছেলেরা গ্রাণ ভরিয়া হাসিতেও ভুলিয়া পড়াকে,
 এবং তাহার। পেচক-রীতি অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে।
 পঞ্চমতঃ, ছেলেরা স্বভাবতঃই ঘোড়ামোড়ি ও হুটোপাটি
 করিতে ভালবাসে। কিন্তু অপরিসর হানে বাস করা
 ও চতুর্দিকে বিলাতী মাটি বিরা বাধান হওয়ার ফলে, এবং
 কতকটা সমজাদিক্য বশতঃ, আমরা শিশুগণকে দ্বিধা হইয়া
 বলিতে থাকিতে বাধ্য করি—বাসাভিক উপায়ে তাহাদিগকে
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিতে দিই না। এক দিকে তাহা-
 দিগকে জানাঘোড়ার বাধনে বাঁধি, অপর দিকে তাহাদিগকে
 সরাসরি ভয় বানাইয়া ফেলি; কাষেই ছেলেরা দুর্ভীক্ষী,
 দুর্বল-শৈথিল্য, লজ্জিত হইয়া থাকে। ছোট পুষ্করীতে
 ভাড়া না খাইয়া যে মাছেরা বাস করে, তাহার। ক্ষুধার
 হইয়া থাকে; বড় পুষ্করীতে সর্পধাই ভাড়া খাইয়া যে
 মাছেরা বাড়ে, তাহার। বৃদ্ধাশ্রম হইয়া থাকে। নিঃশব্দ
 ঠিকই বলিয়াছেন—“You cannot have an
 As empirical with C3 population” অর্থাৎ বস্তুবাদী
 লোক সহীরা বস্তুবাদী হইয়া বাস করি না। বস্তুতঃ,
 ছেলেরা অহঙ্কর করিতে ভালবাসে এবং চাকল্যের ভিত্তি
 দিয়া মনোবৃত্তিকে হুটাইতে চেষ্টা করে। আমরা সেই
 নিষত-চকল ও নিত্য-অহঙ্করশীল শিশুকে পাঁচ বৎসর বয়স

হইতে না হইতেই, পাঠ করাইতে আরম্ভ করি,
 জোর করিয়া তাহার অসংযত অসুশিক্ষিত মন। হাঁদের
 অক্ষর লিখিতে অভ্যস্ত করাই এবং সামান্য ভুল হইলেই
 তীব্র প্রদর্শন করাই! পাঠক মহাশয়, কখনো কি দ্বিধা
 দৃষ্টিতে শিশুকে হস্তাক্ষর লিখিতে দেখিয়াছেন? কখনো
 মনোনিবেশ পূর্বক দেখিয়াছেন কি, যে, শিশু কত জোরে
 কলমটিকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং প্রত্যেক অক্ষর-পাতের
 সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোমল লম্বাটে কত কঠিন রেখাগুলি
 ফুটিয়া উঠে? আপনাদের-আমাদের পক্ষে হই ছাত্র সেখা
 কিছুই নহে, যে হেতু এতদিন উহা অভ্যাসগত হইয়া
 গিয়াছে;—কিন্তু একটা সামান্য অক্ষর লিখিতে হইলে
 শিশুকে কি প্রচণ্ড মানসিক শক্তির প্রয়োগ করিতে
 হয়, এবং সেই শক্তি সেই প্রকৃতির বেগের অধুগাতে
 কতটা, তাহা কি কখনো গ্রহণমান করিয়াছেন? তাবা-
 শিকা কর্ণের সাহায্যে বসত সহজে হয়, চক্ষুর সাহায্যে তত
 শীঘ্র ও দ্রুতী ভাবে হয় না। শিশুরা নিতাই নূতন
 জিনিষ দেখিবার কত কুতূহলী হয়, কতই তাগানের মানসিক
 বৃত্তিগুলির উদ্বেগ ঘটিয়া থাকে—কিন্তু আমরা অবলম্বিত হই
 মধ্যা ঘোর করিয়া তাহাদিগকে অকষ্টেই করিয়া, বিভার
 হাপি তাহার কঠোর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিই। এতদূর
 করার ফলে, তাহার মন সঙ্কুচিত হয় এবং মনের সঙ্গে
 তাহার তাবৎ বেগই জব্ব হইয়া পড়ে। আমরা কি কখনো
 এ সকল কথা ভাবিয়া দেখি?

অপরাধের কারণ

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমরা ব-ব কর্তব্য উপলব্ধি
 করিবার পূর্বেই জনক-জননী হইয়া বসি। এ কারণে কেহ
 যেন মনে করিবেন না যে, আমি “বাল্য”-বিবাহের প্রতি-
 কূল মত দিতেছি। “বাল্য”-বিবাহ ভাল কি মন্দ, সে
 বিচার এখানে করিব না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই
 যে, আমরা নিজ-নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ না
 পাইয়াই, প্রজ্ঞোৎপাদন করিয়া থাকি। বয়সের সূক্ষ্মতা-
 বশতঃ যে সেই কর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হই, তাহা মনে—
 “শিক্ষার” কল্যাণেই তাহা জানিতে পাই না, বিজাতীয়-
 তাবা-শিক্ষার জাঁতা-কলে পেরিত হইয়া যে তাগাও ভাল
 করিয়া শিখি না, বিশ্বের চিত্তবৃত্তির উদ্বেগও হয় না।

অন্যদিকের অগ্রদিকের মজ্জিকটাকে উচ্চ করিয়া আনয়ন করিয়া দানবিক সংঘে শিক্ষা করিবার আশা রাখি; কিন্তু চরুণ-সেবে কীভাবে প্রতিদিনই অসংখ্যের পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা বুদ্ধ-বিশ্রব্ধের ইতিহাস চর্চা করি, কিন্তু ভাবনে একদিনও নিজের প্রকৃত সমাজের ও দেশের সংবাদ পাই না। শিক্ষার নামে এইরূপ বিরাট তত্ত্বাবধি মধ্যে ভারবাহী "পাখা" হইয়া, মনুষ্য সমাজে ধারণা লব্ধ-কণের বাহ্যরই দিতে শিখি। মানুষের মনুষ্যত্বের সন্ধান পাই না, সমাজের মজ্জার সন্ধান পাই না, দেশের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি না—নিজের ঠাকুর না হইয়া পরের কুহুর হইয়া সমাজে বিচরণ করি। বেহতব, স্বাধীনতব, সমাজতব, এ সকল শিক্ষা না করার ফলে আমরা, সংসারে সকল ব্রহ্মই আরক্ত করিয়া বসি, যা কষ্ট রহে ব্রহ্ম অর-বস্ত্রের। তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা কর্তব্য কিছুই জানিতে-না-জানিতে, পিতৃবে উন্নীত হই এবং অজ্ঞানতার দ্বারা স্বরূপ অকালে কতকগুলি শিশু হারাষ্টয়া, পত্নীকে চিরস্রগা করিয়া ও স্বয়ং মৃত্যুবান অস্বাস্থ্য হইয়া সংসারে ভীকর হইয়া বেড়াই। পূর্বে "অটোমটরী" ও "বিশেষাভী" মতে আত্মপূর্ণনা করা হইত বলিয়া, মনে হয় যুগের অভ্যুত, ভারতবর্ষে সাধারণের আত্মকাশ ১৯৮ বা ১২০ বৎসর ছিল। তখন দেশের আবহাওয়াও বোধ হয় ভাল ছিল এবং লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। এখন দেশের আবহাওয়া অতি নর, বাত্রে পুরুত-প্রমাণ তেজাল, ম্যালেরিয়া সর্জিত, দৈত্য ও অভাব প্রভেদ, কাহেই লোকের আয়ুঃ পন্ন। অথচ আমরা কেহই এই আয়ুত্ব অলোচনা করি না, এবং আমাদের দেশে রমণীরা এই চরুত মানব জীবনটাকে বহু করিবার সাধনী মনে করেন না—আমরাও অল্পবয়সের তব লগ্না কর্তব্য কর্তব্য বোধ করি না। কাহেই আমাদের দেশে হইতে ভাত সন্ধান-সম্রাতি যে রোগের আকর হইবে, তাহার বিচিহ্নতা কোথায়? মাসিক পক্ষে যে উপভাসের চর্চা অববরত চলিয়াছে, তাহার একমুখাংশও যদি স্বাস্থ্য-চর্চায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেও অনেক কাহ হয়। এবং বিভ্রান্তে বিভ্রান্তে স্বাধীনতব, শারীরবিধানতব (physiology) ও মোটামুটি বেহতব (anatomy) শিক্ষার প্রচলন হওয়া চাই।

দৈত্য আমাদের চরিত্রের একটা প্রধান কারণ, তাহা

সন্দেহ নাই। বাহ্যর সংসারে নিতাই অভাব, তাহারই সংসারে না-বজির রূপা বেশী হয়। কাহেই সকল দেশের প্রতি সমান বহু করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অপরাধের দেশে বৈজ্ঞ ও পুত্রবাহীরা থাকিয়াও অগ্রবিধা নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ আমরা অলস, প্রমদমুগ্ধ ও কষ্ট-অসহিষ্ণু বলিয়া, সকল ব্রহ্ম কাহে হাতে দিতে পারি না। আমরা অভ্যস্ত সন্তানবৎসল বিধার, গৃহ ছাড়িয়া বেনী ঘুরে বাইতে চাহি না। আমরা অদৃষ্ট-বাহী ও স্বরাজ্যে বলিয়া, সকল কষ্ট মোরবে সহ্য করিয়া, বেনতেন প্রকারেণ অন্ন বেতনেই সংসার চালাইয়া দিই। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মাসিক আমরা নহি বলিয়া, আমাদের যোগ্যতার পূরণ্য কখনো পাই না এবং যে সকল কাহ আমাদের কায়ান্ত নহে; কাহেই বৈজ্ঞের বিকট মূর্তি সর্বত্রই প্রকট। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯২৪, মাঘের শেষ) প্রকাশে পালিগ্রামেন্ট মহাসভার উদ্বোধন কালে সম্রাট জর্জ যে আশাসংগী তাহার স্বমাজীবিদগকে তনাইয়া ছেন, সে আশাসংগী কবে আমরা শুনিতে পাইব? সে দেশে, প্রমদীবিদগের বেনতেন নুন নিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, ভয়ভাবাদিগকে নিরাশর করা হইবে। আমরা কবে সেই সকল আশাসংগী শুনিতে পাইব?

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা একান্ত স্বার্থপর হইয়া, একান্তবক্তিতা ও বৌদ্ধিতা জ্বলিয়া গিয়াছি; অথচ এই দুইটির উপরে ভরসা করিয়া আমরা অনেক কাহ করিতে পারিতাম। এখন মাত্র গৃহীণী-সম্বল হইয়া, তাহার উপরে বিশাশিতার কঠিন শৃঙ্খল পরিয়া, আমরা ক্রমশঃই বেহে ও মনে, অর্থে ও সামর্থ্যে, দীনতার চরম সীমার উপস্থিত হইয়াছি। আর তাই বতদিন বাড়িতে পারি, ততদিন পরিবার বাইতে পার, এবং এখন এমন তাহাকেও আশীর রাখি নাই, বাহার ভরসাও হুদিন সংসার ছাড়িয়া স্থানান্তরে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে বাইতে পারি।

উপসংহার

বাঙ্গালাদের আবহাওয়ার অস্বাস্থ্য ক্রমশঃই বহু হইতেছে। বাঙ্গালীরা নিত্যই দীন হইতে দীনতর হইতেছে;—কাহেই জর্জ ও শারীরিক সাধর্থা, উভয়ই

করিয়া বাইতেছে। সামাজিক ব্যবস্থার ফলে, বাঙ্গালীর জীবনের ক্ষেত্রও—একায়ত্ততা ও সৌত্রাতি—শিথিল হওয়ায়, বাঙ্গালীর চরিত্রের সহিত বিশালতার বস্তুসংস্পর্ক শক্তির যোগ হইয়াছে; এবং উভয়ের ফলে, শক্তি নষ্ট করিয়া দূরে থাকুক বাঙ্গালী শক্তি রক্ষা করিতেও পারিতেছে না। বিশালী ভাষা ও অনাবশ্যক কতকগুলি বিভাগ কর্তৃক করিয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়গুলি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী চিরতিমিরে বাগ করিতেছে। বাঙ্গালী ব্রহ্মদেব বতই পাশ করুন না কেন, বতই বিজ্ঞানিকা করুন না কেন, কবিতা ও নভেলেই মুগ্ধ আছেন—গৃহস্থালীর কিসে উন্নতি হয় বা শারীরতত্ত্ব কি, জানেননা। কাষেই বাঙ্গালীর ছেলেরা নিতাই চর্তুক, নিতাই ক্রম, নিতাই শ্রমায় হইয়া পড়িতেছে।

এই ঘোর অপনোদনের জন্ত আমাদের কর্তব্য কি? কর্তব্য অনেক। সেগুলির শুধু উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। (১) প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মর্মে-মর্মে সজ্ঞিত হইবে যে, ধাপে-ধাপে বাঙ্গালীর স্বাধা প্ৰাপ্য হইতেছে। (২) আমাদেরকে অধিনশই মনে রাখিতে হইবে, আমরা কতটা অজ্ঞান এবং আমাদের শিথিলতা ও জানিবার কত আদ্য। দ্রো-পুত্র-নির্ভরশেব প্রত্যেক বিভাগের ব্যর্থতা ও রীতিমত ভাবে বেহতব, স্বাধাভব, শারীর-বিধানতব শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষা কাজী-শিক্ষার পরিণত হওয়া উচিত। (৩) দেশ হইতে মালেকিয়ারে সম্মুখে উপাট্ট করিতেই হইবে। (৪) যেহ ও মন পেথকারী বর্তমানকালের শিক্ষাভিত্তি আশুল পরিবর্তন করাইতে হইবে। (৫) স্তব্ধত পত্নীজীবনকে পুনরায় জিয়াইয়া আনিতে হইবে। (৬) রীতিমত বেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত না রাখিলে কোনও বিভাগের থাকিতে বেওয়া

হইবে না, এরূপ সঠিক বিভাগেরদিকে বাধ্য করিতে হইবে। (৭) জেলায় পাত্তব্রবের বিরুদ্ধে সমাজকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। “বাদান তৈলে ভাঙ্গা খাবার”, “লগনিয়া চুড়” প্রভৃতির সম্মুখে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। খাতের বিপত্ততা সর্লখা বৃক্ষশীষ, বিস্তৃত পাত্ত একেবারে বর্জনীয়। উভয়ের মধ্যে রক্ষা করা চলিবে না। (৮) গো-চারপের শাঠি রাখিয়া, গোজাতির উন্নতি সাধন করিয়া, দেশে রুত ও গো-চুড় স্থলত করিতেই হইবে। (৯) গ্রামে-গ্রামে বিভাগের ও বেসরকারী আত্মস্বয় থাকিবে, ব্যায়াম-চর্চের স্থান, কৃষি বা শিল্পশিক্ষার স্থান থাকিবে। (১০) জনসাধারণে ব্যাংকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতব সবক্ষে অবধিত হন, সেই উদ্দেশ্যে ও ব্যাংকে চিকিৎসকগণ অবধে সমাজে নানারূপ স্বাস্থ্যবিত্তকর কার্যে সর্লদ্রই নিযুক্ত থাকেন, এরূপ করিতে হইবে। (১১) সমবার (Co-Operative) প্রথাগ্রহণে নানারকবের শিল্প, ব্যবসার ব্যাপিকোর যৌথ সমিতি স্থাপিত করিয়া, গ্রামে-গ্রামে নিয়মকে, চুঃস্থকে ও বরিত্তকে সাধায়া করিতে হইবে। এতগুলি করিলে তবে বাঙ্গালীর ছেলেরা পুনরায় স্বাধাযান্ হইবে। তাহ অনেক বশিয়া ভর পাইলে চলিবে না। সকল কাঃই আমাদের একাত চোয়ার হইবে না, এরূপ করনা করিলেও চলিবে না। আমরা আপে যেমন সাধা-সিধা চালে থাকিয়া নহৎ অস্থিমান নীরবে করিয়া বাইতাম, এখন তেমনই আড়বরবাশীষ হইয়া উঠিয়াছি। পরীকের দেশে সে চাল ভাল নহে, পুরা সাধায়া বাহুব হইয়া, আড়বর তুলিয়া গিয়া প্রত্যেককেই নিম্ন-নিম্ন মদর, অর্থ ও সামর্থ্য নিহোগ করিয়া, কাষ করিয়া বাইতে হইবে—তবেই স্বর্ল সুযোগ আসিবে, নতুবা নহে। “উন্মোদিনঃ পুরুষসিংহঃপতি সন্ন্যাসৈবৈন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।”

কৃতজ্ঞতা

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

ভক্ত কহে—“সো প্রেয়সী দ্বারা, যত মানি ও' ওহু হৃদয়, পথিকের বিশ্রামের তরে বিছারে রেখেছ অকাতর।”

কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয়কে তরুরে করিল কাঁপি' দ্বারা, সুখিই ত নিজে পুড়ি নাথ রতছে আশার এই কাণা।”

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায়নের কামসূত্র

[ঐতিহাসিক চক্রবর্তী, বি-এ]

বাংলায়ন-এইট কামসূত্র নামক পুস্তকখানি গ্রীসী ও প্রামাণিক এবং বলিয়া বিশ্ব-সম্মানে হুস্তিষ্ঠিত। গ্রীসী কাব্য-স্রষ্টার টিকা-কারণ অনেক সময়ে এই কাব্যসূত্রের প্রমাণবলী উদ্ধৃত করিয়া যতই সন্দেহ বা কাব্যনিষিদ্ধি বিবরণ স্মৃতিভূত করিয়াছেন দেখা যায়।

এরূপী কোন সময় প্রারম্ভ হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা দুঃকর। তবে সংস্কৃত-ভাষা-বিশারদ পণ্ডিতগণের অনেকের মতে বাংলায়ন খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দীর দোক। শাস্ত্রোক্ত সংস্কৃত পণ্ডিত যেকবি সাহেবের মত এইত। প্রাচ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাসুখ এম্-এ, Ph. D. মহোদয়ও এই মতেই সম্মত করেন। কাশ্মিরীয় দুই-চারিজন পণ্ডিতও ইংরেজ দ্বিতীয় শতাব্দীর দোক বলিয়াই বহু প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাহাই মানিয়া লইতে যাই। তবে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংরেজ কাল-বিবরণ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থটির অসুস্থতান বৈশিষ্ট্যবোধ করা প্রয়োজন, আমাদের বর্তমান অবস্থায় সে হযোগ ও হুনিয়া কিছুই নাই। সুতরাং যদি কেহ এ বিষয়ের অন্তরঙ্গ প্রমাণ উপস্থিত করেন, তবে সাগ্রহে তাহা জ্ঞাত হইয়া হুনি হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্যটির আলোচনা কালে যখন এই পুস্তকখানির বিষয় অবগত হই, তখন হইতেই যৎকাল পর্যন্ত পুস্তকখানি বৈশিষ্ট্যের মত বড়ই আশ্চর্য হিল। কিন্তু তাহা বুঝ করিবার হযোগ পাই নাই। কারণ, আমার পরিচিত যত্ন-বাক্যবর্ণনের মধ্যে অনেকেরই নিকটে এই পুস্তকের বিষয়ে অসুস্থতান করিয়া ঘূর্ণ-বনোয়ন হইয়াছি। তৎপরে আর এক বৎসর হইল আমরা হিন্দুস্থানী সংস্কৃত এক যত্নের নিকটে হইতে একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া সাগ্রহে তাহা পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি যারাদণী-বাহন, চৌধাণা সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত,—রাজকল-কৃত সম্পূর্ণ টিকা-সম্বিত।

যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাবিষয়ে প্রাচ্য, উপদেশ, পুস্তক-বাহনতা প্রভৃতি যোগাবলীর বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে হইলে, অনেক ভাষা বিদ্যেই আলোচনা পাঠ্যভাষেই করিতে হই, এরূপ-বিজ্ঞান অসুস্থতানবাহিগণকে জনন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে নিয়া সর্বপ্রকার অবস্থায়ই বিষয় প্রকাশ করিতে হয়; বাংলায়ন সুবি-প্রবর্ত এই পাত্রে আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিষয় সেইরূপ পুণ্যপুস্তকভাষেই বিবৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি বার্ষিক বিচার করিতেও স্মৃতি হইয়া নাই; সৌক-সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও প্রবৃত্ত নাই; আবার কামসূত্রের সাধনপ্রকার ভাব ও

অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করিতেও লক্ষ্যবশত হইয়া নাই। আমি অতি কৃত যত্নে, সংস্কৃত-জ্ঞানও আমার অতি সামান্য; কিন্তু বৎসরিক মধ্যে যাহা স্মৃতিতে পাই, তাহাতে আমার বোধ হয় যে, তিনি নিরপেক্ষ-ভাবে ইহার অধিকরণবলীর অন্তর্গত অধ্যায় ও একত্রবস্তুই মহোদয়ের লক্ষ্যে পাঠ করিয়েন, তিনিই প্রবর্তকার বিজ্ঞানতা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং ভূতপূর্বের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন। মানব-মনোভূতি-নির্দেশে নানা ভাবে নানা রূপ বিকাশের সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে পরিচিত না হইলে, এইরূপ বৃত্ত-প্রব প্রকাশ করা সম্ভব নয়, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিতে যাই হইবেন।

বলা বাহুল্য যে, বর্তমান কালের চিত্র সম্বন্ধে তাত্ত্বিক চিত্র যথেষ্ট পার্শ্ব দিল। তাত্ত্বিক প্রাচ্য আলোচনা বর্তমান কালের চিত্র অনুসারে করা কর্তব্য যাহা এবং সমালোচনার পদ্ধতিও তাহা নব্য বোধ হয়।

ইহার অনেক অধ্যায় বা একত্র বর্তমান কালের চিত্রব্রতগণের নিকট অত্যন্ত ভয়ানক বলিয়াই বোধ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা-যে নিকটও স্থানে-স্থানে কতকটা সেরূপ বোধ যে না হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা হইলেও, প্রবর্তকার মানব-মনোবিশিষ্টের প্রত্যেক স্মৃতির সম্বন্ধে একত্র পরিচয়ের প্রমাণ না করিয়া থাকি পার না।

আমরা যে পুস্তক-ভাষণকে কাম প্রবৃত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত রাখি, ইহার সমীচীনতা সম্বন্ধেও অনেক পাঠ্যতা বোধী, বৈজ্ঞানিক ও বর্গভাষণগণ পর্যন্ত সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, উপপুস্তক বর্ণনে এ বিষয়ের শিখাও অতি সামান্যে কিছু-কিছু প্রকাশ করিলে, লভ্যবর্ণনের বিশেষ বাইরা ন্যায়গত হুণ-কট ও রোগের হাতে পড়িবার আশঙ্কা কম হইতে পারে। তাহারা উপপুস্তক পাত্রে নিকট হইতে উপপুস্তক ভাবে প্রবৃত্তি লিখা না পাত্রে, অসুস্থতান বহু হইতে বিকৃত লিখা পাইয়া কট পায়। তাহাদের এই কট কোলের মত তাহাদের পিতামহাই পায়।

কাম একটা সামাজিক প্রবৃত্তি। সংসার-ব্রিতি মত ইহার প্রয়োজনীয়তা। ইহাও অন্তরে সাধারণ জীবপুস্তক বহন হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহার সেবা যে সমাজ, অর্থ, ইহা বোধই বলিতে পারেন না। বর্ষ, অর্থ, সৌক-বাহাই হউক, প্রবর্তে কাম না হইলে তাহাদের প্রয়োজনীয়তাই লুপ্ত হয়। কারণ, কাম না থাকিলে প্রাচ্য থাকিলে

না; এতাই যদি বা থাকিল, তবে খর্ব, অর্ব এবং যোজের দেখা কে করিলে? অতএব কস অবহেলায় বস্তু নহে।

উপযুক্ত ভাবে ইহার দেখা দ্বাৰাই সম্ভবের স্থিতি। হুতরাঃ ইহার উপযুক্ত দেখার উপদেশ যদি গৃহস্থধৰ্মদ্বারাখনোদ্রুতপক্ষে আসে হইতেই এতদা কহা যায়, তবে অশ্বযথাহোরে আসক্ত কহ হইবে কি। কিন্তু আমরা নিজে এ বিষয়ে উপদেশ দিবার উপযুক্ত পাত্র নহি যনে করিরাই সেজন উপদেশ দিতে আশঙ্কিত হই, পাৰে শিব পড়িতে বানর পড়িয়া ফেলি, পাৰে উপদেশ করিতে বিদ্যা সম্ভবনের বিশপ-বানরের পথই আশ্রয় সরল ও প্রস্তুত করিয়া দি।

এ আশঙ্কায় যেহু নিবৃত্তই আছে। কারণ “বরদ্বারখ্যকং পশুং সাধয়েৎ।” তবে এ বিষয়ে দীক্ষণভাবে বিবেচনা করিবার সময় যেনে আদিয়াছে। সম্ভবদ্বয়কে কি উপারে কি পদ্ধতিতে এই সব শুভ শিক্ষাও দেওয়া হইতে পারে, তাহা সমীচীনভাবে এশিধান করা দেশের সম্ভবের মত কর্তব্য বোধ করি। কারণ, দীর্ঘ-বীৰ্য্য অতিষ্ঠতার কল হইতে যোৎ হইব সকলেই স্থিতিতে পারিবেন যে, ইঞ্জিরচালনার অশ্বযথাহোরে বালক ও কিশোরবয়সের মধ্যে কতজন অন্তি হইতেছে! আমাদের দেশে বালিকাগণ যত বেশী দিন অবিবাহিতা থাকে না; হুতরাঃ তাহাদের মধ্যে একজন বালকের অঙ্গার একজন বাই বলিদেই চলে। কিন্তু পাক্যতা দেশে অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকার মত অনেক সময় সুব্যয়গণের মধ্যেও বানরগণ বোনের এগার হইয়া থাকে বহিরা পাক্যতা অনেক বিদ্যায় ব্যক্তিও আশ্রয় করিয়াছেন দেখিতে পাই। আমাদের দেশের বান্দালা সামাজিক ও বৈদিক গল্প-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন-পত্র এবং পত্রিকার বিজ্ঞাপন-পত্রগুলি ধারাদা সম্মোষণ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহারাও দেখিতে পাইবেন যে, আশ্রয়াদি ইঞ্জির-পট্টে বোপাদি এবং পত্রিকার উৎসবের কত এককের এটার হইতেছে; আর ইহাও অসুস্থভাবে আদিত পারিবেন যে, এই সবক উৎসবকালী এইকল্পের মধ্যে আর্জেকেরও বেশীই দেখিবার ও হৃৎকণ। অতঃপাি এ বিষয়ে অসুস্থভাবে বহুতর বিচারি, তাহাতে আসব ইব ব্যাধা কুই হইয়াছে।

ইহা হইতেই স্থিতিতে পাতা যায় যে, এই বিষয়েরও উপযুক্ত শিক্ষা যৌবনাবস্থাতে দেশোপায়সময়ক সাবধানে বিচার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, বোধ হয় দেশের প্রকৃত সম্ভবের একটা এতদা গণ পরিহার করা হয়।

কাম্যপুত্রের আলোচনা করিতে আদিয়া প্রথমতঃ এই সব কথার অজ্ঞাতব্য অঙ্গাঙ্গনিক মনে হইতে পারে ঘটে, কিন্তু একটু দীর্ঘ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ঐক তাহা নহে।

কাম্যপুত্রিণে যে অবস্থায় মিলিত নহে, ইহার আলোচনাব্যবহাই যে সৌকর্য্য নহে, ইহারই প্রথমে ঐ সব কথা বলিতে হইয়াছে।

প্রাচীন হুদি-বর্ণিণ কাম্যে বৈব ব্যাধার এতদাশীলীই মনে করিছেন; এ মত এ পাতের চর্চ্চা হুদীশ মনে করেনই নহে। বোধাৎও বিদ্যাল-বাসদাও পাণ্যবৃত্তঃ সৌকর্য্য মনে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃই

যোহুদ্যের পদ্ধতিই বৈদ্যনী করিতে চাহিলে, তাহাতে লক্ষ্য পাতের আশা আশ্রয়হুদ্যে পর্যাপ্তিত হয়। আর এই সৌখ্য্যার্থের সুবিধার অসাধ্য সুখ্য বস্তুও যৌবনের ভোগের প্রভই হইয়াছে। তবে সর্বদ্যতঃ পঠিত। কিন্তু অত্যধিক ভাল নহে। “সুসার্বৈ ত্রিভতে কাম্য”, এই পাতের আশ্রয়। কেশল কাম্যোপাতোলের মত ব্যাঃ-সংগ্রহ নহে, গৃহস্থ সংসার-স্থিতির প্রভই বিবাহ করিয়া আশ্রয়-পদ্ধতিগত করিবেন, ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়।

তবে বিদ্যালী কি নাই? প্রাচীনগণ ইহাও স্থিতিতে যে ভিত্তিকঠিহিস্যেকঃ। সংসারে একই প্রকৃতির সৌক লক্ষণে হইতে পারে না। পূর্ণ-সংসার-বস্তুঃ সৌকঃ প্রকৃতি ভিত্তি-স্তিঃ; বিভিন্ন মুখে অবস্থান এই প্রকৃতি প্রোত বস্তু কহা ওয়াই অসাধ্যাতিক ও অগত্য মনে করিতেন। তাই তাহাদের এই বাণী “প্রুতিয়েতা কৃতানাঃ নিবৃত্তিত হযাকলাঃ।”

এই ভদ্রই তাহারা বর্ধ-সংগতঃ যেনে কাহারও মত নিরাকার পরস্পরের উপাসনা, কাহারও মত সাধারণ, কাহারও মত শৈব, কাহারও মত শাক্ত, এমন কি বহুত্যাগীয়াঃ হুদ্যঃ প্রম পর্যন্ত তরীয়া প্রকৃতিরই উপযোগী পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইজন্য অন্ত্যস্ত দিকেও বিভিন্ন অধিকারীর মত বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাম্যপুত্র বলিতে কাম সম্বন্ধী সর্বসম্প্রদায় সৌকর্য্য সর্বস্বকার্য্য কাষ সম্বন্ধীই হুদ্যিবে হুতরাঃ তিনি কাম্যপুত্রের আলোচনা করিবেন, অথবা কাম্যপুত্র প্রায়ম করিবেন, তাহাতে কামের সর্বস্বকার্য্য বিকাশেরই পঠিত পরিচিতি হইতে হইবে এবং তাহাদের নানা ভাবেই আভাস দিতে হইবে। নির্ভূৎ বোনী হইতে আরম্ভ করিয়া পুস্ত্রঃ সৌতঃ যৌব পর্যন্ত তাহাকে আদিত হইবে এবং মানবের মধ্যে নানা প্রকৃতির সৌক ব্যাকার কারণে তাহাকেও এতদ্যেক প্রকৃতির মধ্যে কামের বিকাশ ও প্রসাধের ব্যাধা ও পঠিত লক্ষ্য করিয়া তাহার পরিচয় এতদা করিতে হইবে। কাম্যপুত্রের সনুচিত হইলে চলিবে না, সম্ভা কামিণে চলিবে না।

বাস্তবিকর্য্য হুদিঃ তিনি হিহবী, নির্ভিকার্য্যিতঃ; হুতরাঃ নির্ভিকার্য্য কামেই তিনি কটটার কুটিলঃ কটাক বিসেং হইতে আরম্ভ করিয়া একজাতিই সতীঃ ব্রত-পালনের কথা পর্যন্ত আশাধিককে ওদাইয়াছেন; নানাক্রম প্রকৃতির ব্যাকর্য্য নানাক্রম পঠিত আশাধিককে বিদ্যছেন। ইহার আলোচনার মনে ওদন্ত ব্যক্তি লোক ভিবিধার অনেক হুসোপ মতে করিতে পারিবেন।

আর, এই পুত্ৰকের আলোচনা ব্যাধা আশ্রয় তাৎকালিক ভারতীয় সমাজের অনেক প্রকার তথা অবগত হইতে পারি; সেকালের সাদার-বাস্তা-নির্ভাকের একপাদি সুখ্য ভিত্তি আশাঃ দেখিতে পাই; অনেক আভার-ব্যবস্থারের পরিচয় পাইতে পারি। পাঠিতের হিগোলেও এগুলির মূল্য কম নহে। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া আদি এই পুত্ৰক্যামির আলোচনার প্রকৃত হইয়াই।

পূর্বেই বলিরাছি যে, বৃদ্ধদান কামের কঠিন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

ইহার সকল একত্রণের বিবৃত আলোচনা দার্শনিক পত্রের পৃষ্ঠায় করা সম্ভবপর নহে; আনন্ড তাহা করিতেও চাহি না; তবে যে লম্বাখা বিজ্ঞের আলোচনা অন্যান্যসেই করা যাইতে পারে, তাহা তাহাই আমরা। তাত্কাগিক সাংখ্যিক আচার-বাবহার, নিরাম-পদ্ধতি প্রভৃতির এক একটা ছায়া পাঠক বর্ষের গোচরে আনিতে চেষ্টা করিব।

এবার উপক্রমণিকাতেই অনেক স্থান আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া আর বেদীমূলে অঙ্গুর হইতে সাংস করি না। সাংখ্যায়ন মূনিবর তাহার এই পাত্রেই মূল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বলিয়াছেন, তাহার একটা বিবরণ মাত্র বিস্তারিত।

এহলে বলিয়া রাখা ভাল যে, স্ত্রাবোনের নীচা-স্ত্রাবোনিয়নের মধ্যে যে একজন সাংখ্যায়নের নাম পাওয়া যায় তিনি, এবং আনন্দের সাংখ্যায়ন অন্ত্রি ব্যক্তি নহেন। দুইজনই বহুত্র ব্যক্তি, একথা পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছেন।

প্রথমতঃ এখানে বর্ণনা করিতে সম্ভব করিয়া ঐ উপলক্ষে ইহাযেই অজ্ঞাত প্রাণজীবির বিচার পূর্বক বলিতেছেন যে, প্রাণাশক্তি প্রাণাঙ্গকে সৃষ্টি করিয়া তাহাযেই স্থিতির ক্ষত ত্রিবর্ণ-সাধন উপদেশ-পাশ শত-সংখ্যক স্রোত বাক্ত করিয়াছিলেন। "বাহ্যভূত মনু তাহারই প্রাণাঙ্গিকারিত অংশ পৃথক করিয়া প্রচার করেন।" অর্থাৎ বিচারের অংশ বৃহৎ-শক্তি প্রচার করেন। আর শিখামূর্তির ন্যায় সৎসং অধ্যায়ে কামনু প্রচার করেন। উচ্চাঙ্গ-পুত্র স্রোতকেই আবার তাহাই পাত শত অধ্যায়ে প্রচার করেন। আর কথিত আছে যে, এই বৈদ্যকেইই স্রোতকে সাধারণ ভোগ্যভাব হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনমায়ারি বিচার-পূর্বক বিচার-বন্ধন করিয়াছেন।

ক

তার পর সাংখ্যায়নীয় সাংখ্য এই পাশ সাধারণ, সাংখ্যায়নিক কল্পা সঃপ্রভৃৎ, সাংখ্যায়নিক, পারমার্থিক, বৈদিকী, পদার্থিক, এই সঃপ্রভৃৎসমূহে সংক্ষেপ করেন।

দ্বিতীয় নাম এক ব্রাহ্মণ আবার পাঠ্যমূল্যবানবাসিনী পদার্থিকের অধ্যয়নে উদার বৈদিক নামক অধিকরণটি পৃথক করেন।

তার অন্যান্যসি চারজন সাধারণ, দুঃখপাত সাংখ্যায়নিক, যেটকমুখ কল্পা সঃপ্রভৃৎ, সাংখ্যায়নীয় সাংখ্যায়নিক, সাংখ্যায়নীয় পারমার্থিক, এবং সুখময় উপনিষদিক একজন ব্রাহ্মণের পৃথক করিয়া প্রচার করেন।

এইসমূহ নামা সাংখ্যায়নীয় হইয়া এই পাশ খণ্ডে খণ্ডে প্রকৃত হইয়া প্রায় মূনিই হইয়া বাইখা উপলব্ধ হয়।

ইহা দেখিয়া মূনিবর সাংখ্যায়ন সাংখ্য-ঐশ্বর্য এবং অতি বৃহৎ বলিয়া স্রোতের পক্ষে দুঃখপাত বিচার এবং ব্রহ্মকায়ী প্রকৃত পাশ একসঙ্গে অর্থাৎ এক একটা বিবরণে অংশবিশেষে নির্ণিত বলিয়া, তাহা হইতে কাম-পাত্রের সমস্ত জ্ঞান হওয়া সম্ভব মনে করিয়া, সমস্ত প্রায়োজ্যবীর-বিবরণী সম্বন্ধ করিয়া সাংখ্যায়ন সঃপ্রভৃৎসমূহে বহির্ভূত অধ্যায়

এবং চৌদ্দটি একত্রণ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ এই কামনু নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সাংখ্যায়ন অধিকরণে পাশ সংগ্রহ ত্রিবর্ণ প্রকৃতিশক্তি, বিজ্ঞানমুদ্রণ, সাংখ্যিককৃত, সাংখ্যিকময়ী স্রোতের বিবরণ এই পাঠ্য একত্রণ আছে।

সাংখ্যায়নিক নামক দ্বিতীয় অধিকরণে ১৭টি একত্রণ আছে। অধ্যায় দশটি।

কল্পাঙ্গপ্রভৃৎক নামক তৃতীয় অধিকরণে বহু বিবরণ, সমস্ত নির্ণয় ইত্যাদি দশটি একত্রণ আছে; অধ্যায় পাঠ্য।

সাংখ্যায়নিক নামক চতুর্থ অধিকরণে একত্রিংশি বৃহৎ-প্রাণস চর্চা, সঃপ্রভৃৎসমূহে সাংখ্যায়ন ইত্যাদি বহুটি একত্রণ এবং দুইটি অধ্যায়।

সাংখ্যায়নিক নামক পঞ্চম অধিকরণে স্রোত-পুত্র সাংখ্যায়ন, সাংখ্যায়ন কামনু প্রকৃতি দশটি একত্রণ ও দুইটি অধ্যায়।

বৈদিক নামক ষষ্ঠ অধিকরণে সাংখ্যায়ন একত্রণ এবং দুইটি অধ্যায়। উপনিষদিক নামক সঃপ্রভৃৎসমূহে বৃহৎকরণ, বৈদিকরণ, বৃহৎ-প্রাণ প্রকৃতি বহুটি একত্রণ এবং দুইটি অধ্যায়।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে নারীচরিত্র

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ]

(১)

বিশ্বমোহিনী

লক্ষিণ বিবরণ :—পুত্রবান নামক চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতিষ্ঠান নগরে রাজত্ব করিতেন। কালিদাসের কল্পা ঐশ্বর্যী তাহার প্রাণনা নহিবা ছিলেন। একদিন পুত্রবান বিদ্যামায়া রণে অঙ্গন কালে যোগেতে পাইলেন, কৌশলবান আকাশ-পথে উল্লসিত হইয়া লইয়া যাইতেছেন। তিনি শুৎকণ্ঠ্য দানবকে বন্দন করিয়া উল্লসিত হইয়া বৃত্ত করিলেন। উত্তরে চাহি চক্ষুর নিলন হইল। সেইদিন হইতে রাজা বৃত্ত হইলেন,—পুত্রবান ঐশ্বর্য পূর্ণ হইয়া উল্লসিত হইল। তাহার মনে আর দ্বিগুণ নাই, বর্ণের প্রভাৎক বৃত্তই অসংখ্যকোকে পরিবর্তে বেন-তাহার চক্রে বিকণ্ঠ্য বর্ণে করিতে পারিল। কিশোরী-কলতান, বৃক্ষকোরে সুসমাধ ও বন্দারের মালা তাহার আশ্রয় সাধন করিতে পারিল না। "দন্দীর বধব্য" অভিযে "সুখমোহন" হলে উম্মা উল্লসি অসংখ্য পুত্রবান পণ্ডিতগণ করিয়া যেনেস্তের যোগদূরী বৃত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি অভিমান দিলেন—“বর্তমানে না পুত্রবান পুত্রবান বর্ণন করবে, ততদিন সুখি পূর্ণতা হইয়া তাহার নিমিত্ত অবস্থান করিবে।” উল্লসিত পাশে বর হইল, মহানমে বেন প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হইল।

এখিকে রাজী ঐশ্বর্যী রাজার বিবরণব্যা হইতে সমস্ত অসংখ্যন করিয়া লইলেন, “প্রিয়প্রাণবান” নামক কৃত্যের ব্রত পাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, উল্লসিত প্রাণে তিনি কোনও বাধা লক্ষ্যইলেন না। উত্তরে নিলন হইল। উল্লসি ও রাজা বিদ্যায় বিচার করিতে

সময় করিলেন। একদিন পুত্রহারা একদিন স্বর্গ-নাশিকার প্রতি
স্থপতির আবে দুঃখিত করেন; তাহা যেমিতা উর্কণী স্তম্ভা কবিতার মত
পক্ষিরা উঠে, এবং অতিমান হতে 'কুমারকবে' প্রবেশ করিয়া সত্যার
পরিণত হয়। রান্না তাহার বিয়েতে উল্লাসপ্রাপ্ত হইয়া বনে-বনে বুঝা
পরিচালন করেন। বহুদিন পরে বৈকুণ্ঠে আশার উর্কণীর সঙ্গে
উল্লাস মিশ্র হয় এবং তিনি রাত্রে মস্তাপন করেন। উর্কণীর গর্ভে
পুত্রসংসার 'আত্মদায়ক পুত্র' লক্ষ্যগ্রহণ করিয়াছিল। হস্তাধিনী এইমনি
শাপমুক্তি তবে তাহাকে সত্যার দুষ্ট হইতে মুকাইয়া রাখে; কিন্তু
একদিন অকস্মাৎ পুত্র আশিরা পিতার সহিত মিলিত হয়। উর্কণী
আশার উল্লাসে নৃতন আবেশে পুত্রসংসার বৃদ্ধা পণ্ডিত তাহার সঙ্গে গ্রহণ
বাস করিতে থাকে।

ঔনবীরী :—

যে ভারতে পতির বৃত্তান্তে বন্দী নিম্নের সমস্ত স্থ-বাসিন্দা পরি-
ভোগ করিয়া তাহার পার্শ্বে ভিতর উল্লাস বসিতে পারে,—সেই
ভারতেই কবি লিখিয়াছেন। মারী-হস্তের এত বল, মারী-গিরির
এত উৎসর্গ কেবল ভারতেই সম্ভবে। পতির ঐক্যার্থ পাত্রী কতদূর
আত্মত্যাগ করিতে পারে, ইহা যেখানেই কবিগণের ঔনবীরী পট!
বাহীর মধ্যে চিত্রাবলি আশ বিলম্বিত করা বলা সহজ, তাহা উদ্ভাওতে
চলু হৃদিত করিতেই কঠোর অসাধ্য-হয়। কিন্তু হিন্দু সতী বাহীর
সত্যারের মত উহা হইতেও তাকর আত্মত্যাগ করিতে পারে।
ঔনবীরী তাহা করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে আশার উপলব্ধি করিয়া
যাকি যে, মানব-জীবনের কতকগুলি বাসনিক কষ্ট দুঃস্বপ্নের চেয়েও অধিক
কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। বৃদ্ধার অবল একদিন পুষ্টিয়া নিবাসি যাকি,
কিন্তু মনের আশ্রিত স্থানসমূহ মত আশ্রিত আসাইয়া মারে। সেই
দীর্ঘকৃত প্রবন্ধ। বড়ই তরানক! হস্তের সপ্তাধিগেহ উক প্রে-
নিম্নের মধ্যে একদিন। সপ্তাধিগেহ কত যন্ত্রপ্রাণ, কত অকৌতুক,
কত ভীষণ, তাহা হস্তাই জানে, পুত্র তাহা বুঝিতে পারে না। আশার
সৌভ, প্রাণের, সাহিত্যী ইত্যাদি সাহীর চমিক পুষ্টিয়া—নকলেই
নিম্নে অন্তঃশরীরিক কষ্ট বাকর করিয়াও বদলগণে পতির মনোভঞ্জন
করিয়াছিলেন,—কিন্তু কামগণের বাহীর চিত্ত-তর্পণের মত একদিন
বয়সকালের নিম্নের অধিকার অকাঙ্ক্ষিত হইয়া, মারী-মীরে সেই
অভ্যাচারের সহ করিতে আসেন। কামগণকে যেমিরাহি? উহা যে বড়
কষ্টকর অধ্যায়। উহার প্রকৌতুক করিতে না পারিয়া, মারী আত্ম-
হত্যা করিয়া মারে,—কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার মীরে, অকাঙ্ক্ষিত এই বাসনা
সহ করিতে পারে না। যদি কেবল পারে, তবে সে মানবী নহে, যেহী;
এবং ঔনবীরী তাহারই একমত!

ঔনবীরী বৃত্তান্তে যে, পুত্রসংসার অসংগত হইয়াছে। ঔনবীরীর
কবিতা অনুসৃত। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার উর্কণী-প্রবেশে যাকি
কুমারকে পারিবে,—কিন্তু বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি।
বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি। বৃত্তি।

ধাঁড়ায়, তবে সে পতন নিবারণ করিতে পারে। পতনপর হস্তের উল্লাস
অমিত করিতে হইবে। হস্তের সন্তোষিত হইবে না, পতন, সেই কটন
সংগেহে, উহা চূর্ণমান 'কটক-ভিত্তের মত, সংগেহে বিলুপ্ত হইয়া
পড়িবে। তাই ঔনবীরী পণ হাটিকা বঁকাইলেন। তিনি মারী,
পতিশাশ্বত্যাগী নানী। সমস্তা ওন মারী-হস্তেই ধবংস। তিনি 'ভারত
মর্যাদা' আশ্রিত। হস্তের পুত্রসংসার সব অভ্যাচারের সহ করিতে পারে,
করিয়াও থাকে। ঔনবীরী জান তাহা পুত্রসংসারে তালাবাসিনে,—
তিনি তাহার অন্তরে শেলবিত্ত করিতে পারেন না। যদি নিম্নের
চমিক উৎসাহিত করিয়া উপহার দিতে হয়, তাহাওই ঔনবীরী কতরা
নহেন। কিন্তু বাহীর মনে কষ্ট বৈকুণ্ঠ অদৃষ্ট!

ওন প্রাণবাহিনী হস্তের। নীরব উল্লাসে পতন পুষ্টিয়ার পানে
চারিয়া ছিল। যাকি নিম্নে অতীত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান নগরের সর্বত্র
পত্রের শক্তি বিলম্বিত। হস্ত-পিত্তের বিলুপ্তকর পুত্রসংসার বসিয়া
উর্কণীর চিত্তের নিম্নে। উর্কণী আশার অসংগেহা বঁকাইয়াছে। এমন
সময়ে ঔনবীরী হস্তসংসার পরিচালন করিয়া বদলগণেরে সত্যার সন্তোষে
আশিয়া বঁকাইলেন। রান্না-বসিয়াই নিম্নেরে! একি বৈশ? হস্তিলেন,
হস্তের মনে কোনও একটা উল্লাসের পরিচরিত আশিয়াছে। সেদিন
ঔনবীরী সত্যার চেয়ে বস্ত্রপত্রের ঘরে রান্নাও সাধারণ করিয়া
বসিয়াছেন।—“এখনও যদি পানের কিছিয়া লাইবে। আমি জানি,
আশার কপাল কাঁচিয়াছে; কিন্তু তাম্রক আশি হুগুণিত নহি। আশার
দুখেই আশার স্থ। কিন্তু উর্কণীর চেয়ে আশার স্থ হইবে না।—
আশার ভর হইতেছে,—আশার পরিচালন কষ্টকর! রান্না আশার
বক হইতে একটা উল্লাস বস্ত্র অধ্যয়ন করিল; তাম্রক আশি হুগুণিত
নহি। কিন্তু আশার আশ্রিত, সে এই হস্তের যথোচিত বস্ত্র করিবে না।
সে এই হস্তের অধ্যয়ন সাধন করিবে। অতঃপর 'রান্না', আশার বসি
সাধন।” সত্যার এই বৃত্তান্তের ভিত্তিতে পুত্রসংসার একটা মাত্র করিয়া-
ছিলেন; কিন্তু আশে হঠাৎ ঔনবীরী আশিয়া সত্যারত্যাগিনী তাম্র-
গারিনীর বেশে পত্রের সমস্ত আশ্রিত বদলে বঁকাইলেন; তাই রান্না
ভাঙ হইলেন। ঔনবীরী, উল্লাসে নীরব আশ্রিত, আশ্রিত চমিক, নিম্নে
পুত্র সংসার ও সন্তোষে (কিন্তু পুত্রসংসার) করিয়া বসিলেন।—এবার আশি
কিন্তু-প্রাণবাহিনী বস্ত্র করিল। আশি এতিনা করিতেছি, আশে হইতে
আশ্রিত পুত্রসংসার হস্তেরই কাশন্য কলন না কেন, আশি তাহাতে বিলুপ্তক
বাসা দিব না। আশি নীরবে সত্যার বঁকাইব! আশি তাম্রক হুগুণিত
নহি। আশি নিম্নের স্থ চাহি না; বস্ত্র নিম্নের সমস্ত স্থে লক্ষ্যপ্রাণ
নিম্ন। আশার মিত্রকরকে লক্ষ্য করিতে চাহি। ইংহাই আশার আশ্রিত
ও বস্ত্র সম্ভব।—“এবার যেওনিম্নেরে রোমিহি বস্ত্রলোহন দাকৌতুক
আশ্রিত। অসংগেহ। অতঃপর আশ্রিত। বারি প্রাণ কাশন্যে,
যাকি আশ্রিত সত্যারত্যাগিনী ওন। সহ যে অমিতমত্রে বস্ত্রিতব্য।”
...মত্রে বস্ত্র আশ্রিত: স্থাবলগণের আশ্রিত হুগুণিত।
এই বস্ত্র ঔনবীরী বঁকাইলেন। রান্না কবিতা বসিলেন, “এ কি।
এ কি করিলে রান্না!” আশ্রিত পুত্র হইয়া। এ পুত্র বসিল, আশার

টপার ঢোকার ভাঙিমা পেল। এই অচ্যুত আত্মতাপ বেঁধিমা চমকত
নেবে আকাশে কতকণ তরিত হইয়া ঠাঁইহিসেন। বর্ণের অপর
উজ্জল বর্ষা-সারী এই আত্মতাপে রণে কহিয়া গিহরিলা। নির্ঝক
বিহরে সেই গবির বরষট একবার ভাল করিয়া বেঁধিমা লইল।
বোরে-বোরে উণীষী হঠকীর অকথ্যে ঘিগিলেন। তার পর আবার
আর ভাঙকে বেঁধে গাই।

डॉ. रमेश

হুবেই ফানবা। অধিলেই যে,—মাসবের কেন,—যেকতারত অগ্নি-
পতি হুই,—তোষের পঠিবাব যে ভাণাম্ব,—মানদার মনে-মনে যে
কটার বন্ধন ঘটে,—ইহা প্রতিপালন করিবার জন্যই কবির উল্লসী-
পঙ্খী—উল্লসী বর্ণের জিনিষ। বর্ণের বিলাস, বর্ণের রূপ ও ঐশ্বর্য
ভাষার কোণমাত্র হুবেই শান্তি দিতে পারিল না। তাই বর্ণ-
বিলাসিনী ইচ্ছাকৃত ভাষার মর্ড়ে গড়ন ঘটিল। বাসনার জাহার মর্ড়ে
আত্মীয় স্বজন ঘটিল।

উর্ধ্বাণী পরমা হুম্মতী,—সে সৌন্দর্যে স্নিগ্ধবদনে বোধিত। যে
সৌন্দর্যের পানে চলে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, বহু যখন ইন্দ্রসভার
বসি। যে তপ বর্ণনে মুগ্ধ হয়, তাহা যে তত তীর্থ, তত উদ্ভল, তত
প্রবাহী তাহা অমৃতের। তাই মদ হইয়া কবি গাইয়াছেন—

“ବ୍ରହ୍ମା: ସର୍ବବିଦ୍ୟୋ ଶ୍ରୀମାମିତିହୁତଃ। ମୁକାଦ୍ବିଦ୍ୟା: ।

প্ৰসাদৈক্যকৰণঃ স্বয়ং হু মহনো বাসো হু পুণ্যকৰণঃ ।

বেদান্তসিদ্ধিঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতুহলঃ ।

निर्वातुः अतवेन् ननोहृविषः कपः पुराणो बुद्धिः ।”

ইহা বিভিন্ন কি যে, সেই আলোচ্যই ম্হনা। বার্তাগ্রন্থ গুরুত্ববাক্যে উল্লিখ করিয়া তুমিহে! কিন্তু যে সৌন্দর্য শরতে মুগ্ধ করে, তাহা আবার বিশ্বের তুষ্টিও চায়। প্রাণ-শিখা কেবল আলোক বিস্তার করিয়া তুলত মরে, মৃত মলস্তরে প্রাণ-বলিও চায়। ই কারণের অদম্য নাই, উহা সুমুগ্ধ উন্মোচিত হয়। তাই কবি বলেন—

“न वातु काम कादिनाः उपकारेण शान्तिः ।

হবিষা তৃণবর্গের ভূমি এবং তিব্বতে ।*

তাই আশ্রয়ন বর্ণ-বিলাস উপভোগ করিও উর্ধ্বশ্রী তৃপ্তি হইল না। সে আবার পুস্তকখ্যাক দেখিবা ছুঁলিল। বাসনারিহ ক্রক পুষ বধন।
অন্ধরে এদার গাভ, তখন নানব অণু হয়, বিকাকিত নুখে না,
তবিত্ত ও বর্তমান দেখিতে পার না। তাই উর্ধ্বশ্রী বর্ণের লমত ত্রাণ
ছুঁলিলা পুস্তকখ্যাকে আসি হইল। সেবসভার উদ্ভাষা হইয়া পুস্তকখ্যাক
নাম উভারণ করিবা অভিলশা হইল। সেসের শক্ত ব্যাধাধাও সে
অনুল ইচ্ছা ও বর্ণলমত পরিভাষণ করিতে পারে, তাহা উর্ধ্বশ্রী
চরিত্রেই নুতন বটে। বহািকবি ভাস কিংবা সুসকর 'বসন্তসেনা'ও
ইচ্ছাও বর্ণকে পলাপাত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মেঘ মর্দা
হইসেও নাই। উহাতে কাব হিস না—কই ছিল না। তাহা ঐসে
বসিল।

উর্দুগীর রমণী হইলেও বারনানারী। তাহার কণ্ঠস্থিত কথ্যে মাদী-
কত কোমল পৰ্য্যবহিত নৃপ হইয়াছিল। তাহারি সন্মুখে বৈদী
উনরী রান্নার পায়ে আঁচলি বিরা শ্রাবণ করিল,—ভাংহাতে সে
খিলি বটে, কিং কুখিতা হইল না। উর্দুগীর যুগে মাদা নাটকে
উনরী সখেৎ একটী মহাশুকুতির কথাও গুনি নাই। উর্দুগীর
বিত, তৎকাল হাত জালাকে চিলে,—কয়েক খিল জালাকে মাইগ
করিতে, তাই মর্জ্যে আশিগারে। মাজের কিনা মাল-পরিবারের
হাতে কি কতি-বুজি হইল, তাহাতে ক্রোধে ক্রিবারও তাহার
দেহ নাই। সে তাই, পশুত উদার রান্নার মইয়া দিখাডলে
মেল। দাবনীর লোণ পখিত জালাদারো মশুপু হইতে পারে না;
র মজ নুতন রান্না নাই। কিন্তু তাহাতে মাজের কি দুর্দশা
হইল, ওখিলে সে একটীবারও চিন্তা করিল না। মর্জ্যের মাজের মদে
মাজে গথখ কি ?

উর্দুশীর এমন আবার ইর্যাণর। উহাতে সারাজ আখাত লালিলে ই হিসা কেলিহানে জিহা বিস্তার করিয়া হলিয়া উঠে। হিবাসরে উঠী পথর-কল্পকার প্রতি রাসা। একটু টাটকে গালিলে,-ইহাতেই উর্দু বৃদ্ধা কনিদার বসে পজিয়া উঠিল: রাসাকে কত ভিতরতার দিল। এবং অবশেষে বিবহ ক্রোহে ‘হুমার বদে’ এবেল করিয়া গার পঠিত হইল। আর উশিরার। কত ক্ষেত্রে! রাসা উচরে (রক) হুজিবেল হুজিবেল কি, লাকী মর্ত্য মায়ীর নির্বল এসে ত, না হুমরা নর্থিবারে আলোশর এগর মদনায়? কথি একটী হুইই অনেক কথা হলিয়া গেলেন।

কনি মত হলে একটা উদ্ভঙ্গ বুঝাতে দেখাটাইয়েম—সাদা! আর
রসভারি ভাবের পার্শ্বা কত! যেভার আবেশ ছিল,—যখন
সব পুস্ত্রের দৃশ্য দেখিয়েম, তখনই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে।
দীর্ঘ ইহা জানিত, ত বেশ করিয়া মনে রাখিয়াছিল। পুস্ত্র 'সাহেব'
হইল, কিন্তু হতভাগিনী রাজকো এই কথা জানিতেও ছিল না।
গলে যাই গাথনের আশ্রমে লইয়া গিয়া। তৎকাল তগণিতের হাতে ঐ
পুস্ত্র রূপাশ্রমে গভীর অর্পণ করিল। কিন্তু সেইভায়ে যখন সে
প্রাণে হইয়া গিয়া। সপুত্র উপনীত হইল, তখন এক অতুত দুঃখ।
গাথন হতভাগিনী জননী বহু বয়স পরে পুস্ত্ররূপে অর্পণ করিয়া
দেখে অধীর হইয়া পুস্ত্রকে আশ্রম করিবে,—না, সে ভাষাকে
পরিচাচারই রাজকো এককোণে গিয়া ঐতাইল তথায়ে অশ্রম
হিতে জাগিল। কেন না, যেভার আবেশ—সেই বুঝতেই তাহাকে
পুস্ত্রিনী হইতে হইবে। কি আশ্চর্য! এত কাল কোপ করিয়া
গাথন যখনও ভুগি হইল না—আজও চাই। বয়সী জননী কোপ-
প্রেম এতবহু হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত পুস্ত্রের সপুত্র অশ্রম করিল। কি পুস্ত্র
কেন আশ্রমের হইয়া তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত জাগিয়া হইলেন।

আবার বলিতে হয়—কোবার উর্বশী, আর কোবার ঠোণবতী !
কোবার বর্ণের জোড়গাঁতের মামী, আর কোবার মর্দ্যের সাকী গুব-

লক্ষ্য। তোমার পঠন, তোমার বচন। উর্দূরী কোমরে বর্ণমালী হইল
তারা নহে, বড়ো আখীর বন্ধ রসিল। আর জোশ-বিস্তিতে উদীয়নী
উর্দু বদন ও মুক্তি। ইহাই সংসারের নিয়ম। হৃদয়ে ইহা বুঝে বটে,
কিন্তু চকুর সমুপে কাঁখে বেঁধিতে পার না। বলা ইহা বড়ো
কঠোর কঠোর বটে, কিন্তু সত্যই করিয়া দেখাইতে পারেন না। কিন্তু
কবি কবিরাজ গ্রন্থে শুধু মৌলিক বেন না—গ্রন্থ বেন, পতি বেন,
ভাষা বেন। তাই Shakespeare বলিয়াছেন—

The lunatic, the lover and the poet,
Are of imagination all compact :.....
The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth and
earth to heaven.

আপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের উপযোগী কি না

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশ্বর দত্ত, এম্-এ, বি-টি]

শিল্প-বিভাগ

আমরা পূর্বে এক প্রবন্ধে আপানের কৃষিক্ষেত্র বিষয়ক অবস্থা
তর্কিত। এই প্রবন্ধে শিল্প ও বাণিজ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আপানের শিল্পশিক্ষা, চুবি ও বাণিজ্য-শিক্ষার ছাত্র, চারি
শ্রেণীর বিভাগে বিভক্ত হয়—‘পরিপূরক’ শিল্প-বিভাগ, শিল্পবিদ্যার
বিভাগ (Apprentices' School), প্রকৃত শিল্প-বিভাগ, উচ্চ-
শিল্প-বিভাগ ও কলেজ।

‘পরিপূরক’ শিল্প-শিক্ষালয়

(Supplementary Technical School)

এখানে সাধারণতঃ বৎসরদ্বয়ের অধিক সময় বালক পড়িত হয়।
তাহারিগকে নিম্ন-প্রাথমিক বিভাগের পাঠ সমাপন করিয়া আসিতে
হয়। কিন্তু এই বিভাগ সকল সময়ে খোলস করা হয় না। অনেক
সময়ে পূর্ণবয়স্ক বৃদ্ধক এই বিভাগে যান পায়। এখানে অধ্যয়ন-
কাল দশমের পক্ষে বর্ধমান হয়। কেহ এক মাস পড়িয়াই চলিয়া
যায়, আবার কেহ বা এক বৎসরও পড়ে। কিন্তু যাহারা পূর্ণ এক
বৎসর থাকিয়া সমস্তপ্রবন্ধকল্পে পাঠবিষয়গুলি অধ্যয়ন করে না,
তাহারিগকে ম্যাট্রিকুলেট বোঝা হয় না। বিভাগের সাধারণতঃ
সম্ব্যাক্ষেপে বসে। প্রত্যহ এই বিভাগেই বৈশ-বিভাগের বসিলেও
চলে। এইখানে বৎসর বৎসরের উচ্চবয়স্ক বৈশক বালক বা
যুবক নিজ-নিজ সুবিধামত এক মাসে হইতে এক বৎসর কাল অধ্যয়ন
করিতে পারে। অধ্যয়নের বিষয়গুলি এই—

(১) সাধারণ শিক্ষার বিষয়—নীতিশিক্ষা, ভাষারী ভাষা ও
গণিত।

(২) বিশেষ শিক্ষার বিষয়—পার্শ্ববিকা, হস্তায়ন, ব্যবহারিক
জ্যামিতি, শুধু হাতে চিত্রাঙ্কন (Free-hand Drawing), বস্তুর
মহাযোগে চিত্রাঙ্কন (Instrumental Drawing), কাঠের কাঠের
উপস্থাপন ও বস্ত্রপাতি, গৃহনির্মাণ (Building Construction),
মাপমোকা (Measurement), বস্তু-প্রকৃত কল্প (Architec-
tural Drawing), বাতুর কাঠের উপস্থাপন ও সাধ-সংক্রান্ত
(Materials and tools for metal work), বস্ত্রপাতি নির্মাণ-
কৌশল (Machine Mechanics), গতিবিজ্ঞা (Dynamics),
যন্ত্রনির্মাণ (Machine Drawing) রঙবর্ণনা (Dyeing),
বস্তুবিজ্ঞা, ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry), শিল্প-
বিষয়ক বস্তু (Industrial Design)। উল্লিখিত বিশেষ
বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও পাঠের এক সময়ে এক মাসে পাঠ্য বিষয়
রূপে নির্ধারিত হইতে পারে। আবার এই পাঠ্য বিষয় হইতে শিক্ষার্থী
নিজের ইচ্ছামত এক বা ততোধিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে।
কিন্তু তাহাকে সমস্ত সাধারণ বিষয়গুলি পড়িতে হয়।

শিক্ষানবিশের বিভাগ

(Apprentices' School)

এই বিভাগের প্রবেশাধী বয়স ১২'৩'৪'৫'৬'৭'৮'৯'১০'১১'১২'১৩'১৪'১৫'১৬'১৭'১৮'১৯'২০'২১'২২'২৩'২৪'২৫'২৬'২৭'২৮'২৯'৩০'৩১'৩২'৩৩'৩৪'৩৫'৩৬'৩৭'৩৮'৩৯'৪০'৪১'৪২'৪৩'৪৪'৪৫'৪৬'৪৭'৪৮'৪৯'৫০'৫১'৫২'৫৩'৫৪'৫৫'৫৬'৫৭'৫৮'৫৯'৬০'৬১'৬২'৬৩'৬৪'৬৫'৬৬'৬৭'৬৮'৬৯'৭০'৭১'৭২'৭৩'৭৪'৭৫'৭৬'৭৭'৭৮'৭৯'৮০'৮১'৮২'৮৩'৮৪'৮৫'৮৬'৮৭'৮৮'৮৯'৯০'৯১'৯২'৯৩'৯৪'৯৫'৯৬'৯৭'৯৮'৯৯'১০০'১০১'১০২'১০৩'১০৪'১০৫'১০৬'১০৭'১০৮'১০৯'১১০'১১১'১১২'১১৩'১১৪'১১৫'১১৬'১১৭'১১৮'১১৯'১২০'১২১'১২২'১২৩'১২৪'১২৫'১২৬'১২৭'১২৮'১২৯'১৩০'১৩১'১৩২'১৩৩'১৩৪'১৩৫'১৩৬'১৩৭'১৩৮'১৩৯'১৪০'১৪১'১৪২'১৪৩'১৪৪'১৪৫'১৪৬'১৪৭'১৪৮'১৪৯'১৫০'১৫১'১৫২'১৫৩'১৫৪'১৫৫'১৫৬'১৫৭'১৫৮'১৫৯'১৬০'১৬১'১৬২'১৬৩'১৬৪'১৬৫'১৬৬'১৬৭'১৬৮'১৬৯'১৭০'১৭১'১৭২'১৭৩'১৭৪'১৭৫'১৭৬'১৭৭'১৭৮'১৭৯'১৮০'১৮১'১৮২'১৮৩'১৮৪'১৮৫'১৮৬'১৮৭'১৮৮'১৮৯'১৯০'১৯১'১৯২'১৯৩'১৯৪'১৯৫'১৯৬'১৯৭'১৯৮'১৯৯'২০০'২০১'২০২'২০৩'২০৪'২০৫'২০৬'২০৭'২০৮'২০৯'২১০'২১১'২১২'২১৩'২১৪'২১৫'২১৬'২১৭'২১৮'২১৯'২২০'২২১'২২২'২২৩'২২৪'২২৫'২২৬'২২৭'২২৮'২২৯'২৩০'২৩১'২৩২'২৩৩'২৩৪'২৩৫'২৩৬'২৩৭'২৩৮'২৩৯'২৪০'২৪১'২৪২'২৪৩'২৪৪'২৪৫'২৪৬'২৪৭'২৪৮'২৪৯'২৫০'২৫১'২৫২'২৫৩'২৫৪'২৫৫'২৫৬'২৫৭'২৫৮'২৫৯'২৬০'২৬১'২৬২'২৬৩'২৬৪'২৬৫'২৬৬'২৬৭'২৬৮'২৬৯'২৭০'২৭১'২৭২'২৭৩'২৭৪'২৭৫'২৭৬'২৭৭'২৭৮'২৭৯'২৮০'২৮১'২৮২'২৮৩'২৮৪'২৮৫'২৮৬'২৮৭'২৮৮'২৮৯'২৯০'২৯১'২৯২'২৯৩'২৯৪'২৯৫'২৯৬'২৯৭'২৯৮'২৯৯'৩০০'৩০১'৩০২'৩০৩'৩০৪'৩০৫'৩০৬'৩০৭'৩০৮'৩০৯'৩১০'৩১১'৩১২'৩১৩'৩১৪'৩১৫'৩১৬'৩১৭'৩১৮'৩১৯'৩২০'৩২১'৩২২'৩২৩'৩২৪'৩২৫'৩২৬'৩২৭'৩২৮'৩২৯'৩৩০'৩৩১'৩৩২'৩৩৩'৩৩৪'৩৩৫'৩৩৬'৩৩৭'৩৩৮'৩৩৯'৩৪০'৩৪১'৩৪২'৩৪৩'৩৪৪'৩৪৫'৩৪৬'৩৪৭'৩৪৮'৩৪৯'৩৫০'৩৫১'৩৫২'৩৫৩'৩৫৪'৩৫৫'৩৫৬'৩৫৭'৩৫৮'৩৫৯'৩৬০'৩৬১'৩৬২'৩৬৩'৩৬৪'৩৬৫'৩৬৬'৩৬৭'৩৬৮'৩৬৯'৩৭০'৩৭১'৩৭২'৩৭৩'৩৭৪'৩৭৫'৩৭৬'৩৭৭'৩৭৮'৩৭৯'৩৮০'৩৮১'৩৮২'৩৮৩'৩৮৪'৩৮৫'৩৮৬'৩৮৭'৩৮৮'৩৮৯'৩৯০'৩৯১'৩৯২'৩৯৩'৩৯৪'৩৯৫'৩৯৬'৩৯৭'৩৯৮'৩৯৯'৪০০'৪০১'৪০২'৪০৩'৪০৪'৪০৫'৪০৬'৪০৭'৪০৮'৪০৯'৪১০'৪১১'৪১২'৪১৩'৪১৪'৪১৫'৪১৬'৪১৭'৪১৮'৪১৯'৪২০'৪২১'৪২২'৪২৩'৪২৪'৪২৫'৪২৬'৪২৭'৪২৮'৪২৯'৪৩০'৪৩১'৪৩২'৪৩৩'৪৩৪'৪৩৫'৪৩৬'৪৩৭'৪৩৮'৪৩৯'৪৪০'৪৪১'৪৪২'৪৪৩'৪৪৪'৪৪৫'৪৪৬'৪৪৭'৪৪৮'৪৪৯'৪৫০'৪৫১'৪৫২'৪৫৩'৪৫৪'৪৫৫'৪৫৬'৪৫৭'৪৫৮'৪৫৯'৪৬০'৪৬১'৪৬২'৪৬৩'৪৬৪'৪৬৫'৪৬৬'৪৬৭'৪৬৮'৪৬৯'৪৭০'৪৭১'৪৭২'৪৭৩'৪৭৪'৪৭৫'৪৭৬'৪৭৭'৪৭৮'৪৭৯'৪৮০'৪৮১'৪৮২'৪৮৩'৪৮৪'৪৮৫'৪৮৬'৪৮৭'৪৮৮'৪৮৯'৪৯০'৪৯১'৪৯২'৪৯৩'৪৯৪'৪৯৫'৪৯৬'৪৯৭'৪৯৮'৪৯৯'৫০০'৫০১'৫০২'৫০৩'৫০৪'৫০৫'৫০৬'৫০৭'৫০৮'৫০৯'৫১০'৫১১'৫১২'৫১৩'৫১৪'৫১৫'৫১৬'৫১৭'৫১৮'৫১৯'৫২০'৫২১'৫২২'৫২৩'৫২৪'৫২৫'৫২৬'৫২৭'৫২৮'৫২৯'৫৩০'৫৩১'৫৩২'৫৩৩'৫৩৪'৫৩৫'৫৩৬'৫৩৭'৫৩৮'৫৩৯'৫৪০'৫৪১'৫৪২'৫৪৩'৫৪৪'৫৪৫'৫৪৬'৫৪৭'৫৪৮'৫৪৯'৫৫০'৫৫১'৫৫২'৫৫৩'৫৫৪'৫৫৫'৫৫৬'৫৫৭'৫৫৮'৫৫৯'৫৬০'৫৬১'৫৬২'৫৬৩'৫৬৪'৫৬৫'৫৬৬'৫৬৭'৫৬৮'৫৬৯'৫৭০'৫৭১'৫৭২'৫৭৩'৫৭৪'৫৭৫'৫৭৬'৫৭৭'৫৭৮'৫৭৯'৫৮০'৫৮১'৫৮২'৫৮৩'৫৮৪'৫৮৫'৫৮৬'৫৮৭'৫৮৮'৫৮৯'৫৯০'৫৯১'৫৯২'৫৯৩'৫৯৪'৫৯৫'৫৯৬'৫৯৭'৫৯৮'৫৯৯'৬০০'৬০১'৬০২'৬০৩'৬০৪'৬০৫'৬০৬'৬০৭'৬০৮'৬০৯'৬১০'৬১১'৬১২'৬১৩'৬১৪'৬১৫'৬১৬'৬১৭'৬১৮'৬১৯'৬২০'৬২১'৬২২'৬২৩'৬২৪'৬২৫'৬২৬'৬২৭'৬২৮'৬২৯'৬৩০'৬৩১'৬৩২'৬৩৩'৬৩৪'৬৩৫'৬৩৬'৬৩৭'৬৩৮'৬৩৯'৬৪০'৬৪১'৬৪২'৬৪৩'৬৪৪'৬৪৫'৬৪৬'৬৪৭'৬৪৮'৬৪৯'৬৫০'৬৫১'৬৫২'৬৫৩'৬৫৪'৬৫৫'৬৫৬'৬৫৭'৬৫৮'৬৫৯'৬৬০'৬৬১'৬৬২'৬৬৩'৬৬৪'৬৬৫'৬৬৬'৬৬৭'৬৬৮'৬৬৯'৬৭০'৬৭১'৬৭২'৬৭৩'৬৭৪'৬৭৫'৬৭৬'৬৭৭'৬৭৮'৬৭৯'৬৮০'৬৮১'৬৮২'৬৮৩'৬৮৪'৬৮৫'৬৮৬'৬৮৭'৬৮৮'৬৮৯'৬৯০'৬৯১'৬৯২'৬৯৩'৬৯৪'৬৯৫'৬৯৬'৬৯৭'৬৯৮'৬৯৯'৭০০'৭০১'৭০২'৭০৩'৭০৪'৭০৫'৭০৬'৭০৭'৭০৮'৭০৯'৭১০'৭১১'৭১২'৭১৩'৭১৪'৭১৫'৭১৬'৭১৭'৭১৮'৭১৯'৭২০'৭২১'৭২২'৭২৩'৭২৪'৭২৫'৭২৬'৭২৭'৭২৮'৭২৯'৭৩০'৭৩১'৭৩২'৭৩৩'৭৩৪'৭৩৫'৭৩৬'৭৩৭'৭৩৮'৭৩৯'৭৪০'৭৪১'৭৪২'৭৪৩'৭৪৪'৭৪৫'৭৪৬'৭৪৭'৭৪৮'৭৪৯'৭৫০'৭৫১'৭৫২'৭৫৩'৭৫৪'৭৫৫'৭৫৬'৭৫৭'৭৫৮'৭৫৯'৭৬০'৭৬১'৭৬২'৭৬৩'৭৬৪'৭৬৫'৭৬৬'৭৬৭'৭৬৮'৭৬৯'৭৭০'৭৭১'৭৭২'৭৭৩'৭৭৪'৭৭৫'৭৭৬'৭৭৭'৭৭৮'৭৭৯'৭৮০'৭৮১'৭৮২'৭৮৩'৭৮৪'৭৮৫'৭৮৬'৭৮৭'৭৮৮'৭৮৯'৭৯০'৭৯১'৭৯২'৭৯৩'৭৯৪'৭৯৫'৭৯৬'৭৯৭'৭৯৮'৭৯৯'৮০০'৮০১'৮০২'৮০৩'৮০৪'৮০৫'৮০৬'৮০৭'৮০৮'৮০৯'৮১০'৮১১'৮১২'৮১৩'৮১৪'৮১৫'৮১৬'৮১৭'৮১৮'৮১৯'৮২০'৮২১'৮২২'৮২৩'৮২৪'৮২৫'৮২৬'৮২৭'৮২৮'৮২৯'৮৩০'৮৩১'৮৩২'৮৩৩'৮৩৪'৮৩৫'৮৩৬'৮৩৭'৮৩৮'৮৩৯'৮৪০'৮৪১'৮৪২'৮৪৩'৮৪৪'৮৪৫'৮৪৬'৮৪৭'৮৪৮'৮৪৯'৮৫০'৮৫১'৮৫২'৮৫৩'৮৫৪'৮৫৫'৮৫৬'৮৫৭'৮৫৮'৮৫৯'৮৬০'৮৬১'৮৬২'৮৬৩'৮৬৪'৮৬৫'৮৬৬'৮৬৭'৮৬৮'৮৬৯'৮৭০'৮৭১'৮৭২'৮৭৩'৮৭৪'৮৭৫'৮৭৬'৮৭৭'৮৭৮'৮৭৯'৮৮০'৮৮১'৮৮২'৮৮৩'৮৮৪'৮৮৫'৮৮৬'৮৮৭'৮৮৮'৮৮৯'৮৯০'৮৯১'৮৯২'৮৯৩'৮৯৪'৮৯৫'৮৯৬'৮৯৭'৮৯৮'৮৯৯'৯০০'৯০১'৯০২'৯০৩'৯০৪'৯০৫'৯০৬'৯০৭'৯০৮'৯০৯'৯১০'৯১১'৯১২'৯১৩'৯১৪'৯১৫'৯১৬'৯১৭'৯১৮'৯১৯'৯২০'৯২১'৯২২'৯২৩'৯২৪'৯২৫'৯২৬'৯২৭'৯২৮'৯২৯'৯৩০'৯৩১'৯৩২'৯৩৩'৯৩৪'৯৩৫'৯৩৬'৯৩৭'৯৩৮'৯৩৯'৯৪০'৯৪১'৯৪২'৯৪৩'৯৪৪'৯৪৫'৯৪৬'৯৪৭'৯৪৮'৯৪৯'৯৫০'৯৫১'৯৫২'৯৫৩'৯৫৪'৯৫৫'৯৫৬'৯৫৭'৯৫৮'৯৫৯'৯৬০'৯৬১'৯৬২'৯৬৩'৯৬৪'৯৬৫'৯৬৬'৯৬৭'৯৬৮'৯৬৯'৯৭০'৯৭১'৯৭২'৯৭৩'৯৭৪'৯৭৫'৯৭৬'৯৭৭'৯৭৮'৯৭৯'৯৮০'৯৮১'৯৮২'৯৮৩'৯৮৪'৯৮৫'৯৮৬'৯৮৭'৯৮৮'৯৮৯'৯৯০'৯৯১'৯৯২'৯৯৩'৯৯৪'৯৯৫'৯৯৬'৯৯৭'৯৯৮'৯৯৯'১০০০'১০০১'১০০২'১০০৩'১০০৪'১০০৫'১০০৬'১০০৭'১০০৮'১০০৯'১০১০'১০১১'১০১২'১০১৩'১০১৪'১০১৫'১০১৬'১০১৭'১০১৮'১০১৯'১০২০'১০২১'১০২২'১০২৩'১০২৪'১০২৫'১০২৬'১০২৭'১০২৮'১০২৯'১০৩০'১০৩১'১০৩২'১০৩৩'১০৩৪'১০৩৫'১০৩৬'১০৩৭'১০৩৮'১০৩৯'১০৪০'১০৪১'১০৪২'১০৪৩'১০৪৪'১০৪৫'১০৪৬'১০৪৭'১০৪৮'১০৪৯'১০৫০'১০৫১'১০৫২'১০৫৩'১০৫৪'১০৫৫'১০৫৬'১০৫৭'১০৫৮'১০৫৯'১০৬০'১০৬১'১০৬২'১০৬৩'১০৬৪'১০৬৫'১০৬৬'১০৬৭'১০৬৮'১০৬৯'১০৭০'১০৭১'১০৭২'১০৭৩'১০৭৪'১০৭৫'১০৭৬'১০৭৭'১০৭৮'১০৭৯'১০৮০'১০৮১'১০৮২'১০৮৩'১০৮৪'১০৮৫'১০৮৬'১০৮৭'১০৮৮'১০৮৯'১০৯০'১০৯১'১০৯২'১০৯৩'১০৯৪'১০৯৫'১০৯৬'১০৯৭'১০৯৮'১০৯৯'১১০০'১১০১'১১০২'১১০৩'১১০৪'১১০৫'১১০৬'১১০৭'১১০৮'১১০৯'১১১০'১১১১'১১১২'১১১৩'১১১৪'১১১৫'১১১৬'১১১৭'১১১৮'১১১৯'১১২০'১১২১'১১২২'১১২৩'১১২৪'১১২৫'১১২৬'১১২৭'১১২৮'১১২৯'১১৩০'১১৩১'১১৩২'১১৩৩'১১৩৪'১১৩৫'১১৩৬'১১৩৭'১১৩৮'১১৩৯'১১৪০'১১৪১'১১৪২'১১৪৩'১১৪৪'১১৪৫'১১৪৬'১১৪৭'১১৪৮'১১৪৯'১১৫০'১১৫১'১১৫২'১১৫৩'১১৫৪'১১৫৫'১১৫৬'১১৫৭'১১৫৮'১১৫৯'১১৬০'১১৬১'১১৬২'১১৬৩'১১৬৪'১১৬৫'১১৬৬'১১৬৭'১১৬৮'১১৬৯'১১৭০'১১৭১'১১৭২'১১৭৩'১১৭৪'১১৭৫'১১৭৬'১১৭৭'১১৭৮'১১৭৯'১১৮০'১১৮১'১১৮২'১১৮৩'১১৮৪'১১৮৫'১১৮৬'১১৮৭'১১৮৮'১১৮৯'১১৯০'১১৯১'১১৯২'১১৯৩'১১৯৪'১১৯৫'১১৯৬'১১৯৭'১১৯৮'১১৯৯'১২০০'১২০১'১২০২'১২০৩'১২০৪'১২০৫'১২০৬'১২০৭'১২০৮'১২০৯'১২১০'১২১১'১২১২'১২১৩'১২১৪'১২১৫'১২১৬'১২১৭'১২১৮'১২১৯'১২২০'১২২১'১২২২'১২২৩'১২২৪'১২২৫'১২২৬'১২২৭'১২২৮'১২২৯'১২৩০'১২৩১'১২৩২'১২৩৩'১২৩৪'১২৩৫'১২৩৬'১২৩৭'১২৩৮'১২৩৯'১২৪০'১২৪১'১২৪২'১২৪৩'১২৪৪'১২৪৫'১২৪৬'১২৪৭'১২৪৮'১২৪৯'১২৫০'১২৫১'১২৫২'১২৫৩'১২৫৪'১২৫৫'১২৫৬'১২৫৭'১২৫৮'১২৫৯'১২৬০'১২৬১'১২৬২'১২৬৩'১২৬৪'১২৬৫'১২৬৬'১২৬৭'১২৬৮'১২৬৯'১২৭০'১২৭১'১২৭২'১২৭৩'১২৭৪'১২৭৫'১২৭৬'১২৭৭'১২৭৮'১২৭৯'১২৮০'১২৮১'১২৮২'১২৮৩'১২৮৪'১২৮৫'১২৮৬'১২৮৭'১২৮৮'১২৮৯'১২৯০'১২৯১'১২৯২'১২৯৩'১২৯৪'১২৯৫'১২৯৬'১২৯৭'১২৯৮'১২৯৯'১৩০০'১৩০১'১৩০২'১৩০৩'১৩০৪'১৩০৫'১৩০৬'১৩০৭'১৩০৮'১৩০৯'১৩১০'১৩১১'১৩১২'১৩১৩'১৩১৪'১৩১৫'১৩১৬'১৩১৭'১৩১৮'১৩১৯'১৩২০'১৩২১'১৩২২'১৩২৩'১৩২৪'১৩২৫'১৩২৬'১৩২৭'১৩২৮'১৩২৯'১৩৩০'১৩৩১'১৩৩২'১৩৩৩'১৩৩৪'১৩৩৫'১৩৩৬'১৩৩৭'১৩৩৮'১৩৩৯'১৩৪০'১৩৪১'১৩৪২'১৩৪৩'১৩৪৪'১৩৪৫'১৩৪৬'১৩৪৭'১৩৪৮'১৩৪৯'১৩৫০'১৩৫১'১৩৫২'১৩৫৩'১৩৫৪'১৩৫৫'১৩৫৬'১৩৫৭'১৩৫৮'১৩৫৯'১৩৬০'১৩৬১'১৩৬২'১৩৬৩'১৩৬৪'১৩৬৫'১৩৬৬'১৩৬৭'১৩৬৮'১৩৬৯'১৩৭০'১৩৭১'১৩৭২'১৩৭৩'১৩৭৪'১৩৭৫'১৩৭৬'১৩৭৭'১৩৭৮'১৩৭৯'১৩৮০'১৩৮১'১৩৮২'১৩৮৩'১৩৮৪'১৩৮৫'১৩৮৬'১৩৮৭'১৩৮৮'১৩৮৯'১৩৯০'১৩৯১'১৩৯২'১৩৯৩'১৩৯৪'১৩৯৫'১৩৯৬'১৩৯৭'১৩৯৮'১৩৯৯'১৪০০'১৪০১'১৪০২'১৪০৩'১৪০৪'১৪০৫'১৪০৬'১৪০৭'১৪০৮'১৪০৯

করণ (Architectural Drawing) প্রথম বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগ—ধাতু রচনা, (Forging), পরে প্রস্তুত করণ, সৌহার্দ্য কাজ, এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Mechanical Drawing) প্রস্তুতি পলা প্রস্তুত হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক প্রদীপ্তে দুই বিভাগের ডায়েরী একত্রে অবধান করে। সাধারণ বিদ্যালয় সন্ধ্যায় প্রস্তুত এক প্রকার—নর্ভটিকার, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি (Tools), কার্যপ্রণালী (Methods of work), চিত্রাঙ্কন ও চিত্র। প্রথম বর্ষের মধ্যে চিত্রাঙ্কন দুই বৎসরের চিত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, কার্যসময়ের শিক্ষা-নির্দেশের কাজ করে।

অসামান্য চিত্রাঙ্কনের বয়স সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৩র মধ্যে হওয়া চাই। তাহারদিককে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ বা উত্তর; পাঠ সমাপন করিয়া আপিতে হয়। শেষ পরীক্ষার উপরী হওয়ার পর চিত্রাঙ্কন একত্রিণী সার্টিফিকেট (Certificate) পায়। এই সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রম পরে শিক্ষার্থী প্রাপ্ত করিলে আরও এক বৎসর পড়িতে পারে। ইহার চিত্র সাধারণে একত্রিণী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাহা পরে কোনও কা-খানার দুই বৎসর ব্যবহারিক করণ (Practical Works) করার পর, সে দুনিপুণ কারিগর (Competent Craftsman) বলিয়া একত্রিণী প্রদানপত্র প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় শিল্প-বিদ্যালয়

(Industrial School)

পূর্বোক্ত দুই প্রকার বিদ্যালয়ের শিল্পবিষয়ক লামা শিক্ষায় প্রস্তুত হয়। হুতরাং ইহাদিগের মাসকরণ-কালে ইহাদিগকে শিল্প-বিদ্যালয় বলা হয় নাই—“পরিপূরক” বিদ্যালয় বা শিক্ষাবিশেষের বিদ্যালয় বলা হয়। শিল্পবিষয়ে যথাবিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাৎই প্রস্তুত পক্ষে শিল্পশিক্ষা বলা হইতে পারে। সেই অনুসারে এই বিদ্যালয়গুলিকে শিল্পবিদ্যালয় বলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে প্রথমদিক পূরে কার্যাব্যবহার তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের পক্ষে, Foreman or Manager, নিযুক্ত হয়।

প্রদেপাশী উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আপিতে। তাহার বয়স ১৩র উপরে হইবে। তাহারদিককে সাধারণতঃ তিন বৎসর অবধান করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ ১২ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারদিককে দুই বৎসর সাধারণ বিভাগে (Preparatory Course) অবধান করিয়া প্রথম বিভাগের উপর প্রস্তুত হইতে হইবে।

সাধারণবিভাগের শিক্ষার বিষয়—নীতিশিক্ষা, ভাষাশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাথমিক পদার্থ ও তত্ত্বাবধান-বিজ্ঞান (Elementary Physics and Chemistry), চিত্রাঙ্কন এবং চিত্র। ইহার সঙ্গে একত্রিণী বৈশেষিক কার্যকর পড়িতে পারে।

প্রথম বিভাগে শিক্ষার বিষয়—নীতিশিক্ষা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, তত্ত্বাবধানবিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, এবং চিত্র। এই সকল সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে শিল্প-প্রদেপাশী বিষয় অবধান করিতে হয়।

সেইভাবে এই—

ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering), জাহাজ-নির্মাণ (Ship-building), তড়িত-বিজ্ঞান Electricity, কাঠের কাজ (Wood work), খনিজ বিজ্ঞান (Mining), বস্ত্র-বিজ্ঞান (Weaving) এবং রঞ্জকবিজ্ঞান (Dyeing), লাকার কাজ (Lacquar work), নকশা অঙ্কন (Designing) এবং চিত্রাঙ্কন (Painting)।

(একই বিভাগে এই সকল বিষয় অবধান করিবার যোগ্য নয় নাই। হাবীরা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই বিষয়গুলি দুইতে সাধারণতঃ এক বা ততোধিক বিষয় লব্ধকে শিক্ষা প্রদত্ত হয়।)

উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়

শিল্প বিষয়ে উন্নততর শিক্ষা উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রদত্ত হয়। এই প্রদেপাশী বিদ্যালয়গুলি (Practical work) কার্যক্রমী শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা অধিকতর ব্যাপ্ত। অধর্ন করে। হুতরাং এই সকল বিভাগে প্রথম বৎসর এক বা ততোধিক বিদ্যালয় গণিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির যন্ত্রপাতি নানা প্রকার বয়োভিত্তিক হয়ে পরিপোষিত থাকে, এবং পুস্তকপাঠের নব-প্রকাশিত ব্যবহার প্রস্তুত হয়।

প্রদেপাশী যুগকে সাধারণ বিভাগের যথাবিভাগের পাঠ অবধা যথানির্ণয়বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আপিতে হয়। এখানে প্রথম বিভাগে তিন বৎসর পড়িতে হয়। বিদ্যালয়গুলি লামাদের তিনটি প্রথম শিল্পক্ষেত্রে স্থাপিত। হাবীরা অবধা হুতরাং ও উপযোগিতাহুতরাং বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে পার্থক্য বৃদ্ধি হয়। ওসাকার (Osaka) যে উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয় আছে, তাহার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—বস্ত্র প্রস্তুত করণের প্রণালী (Brewing); জাহাজ-নির্মাণ (Shipbuilding), সামুদ্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Marine Engineering)। এই সকল বিষয় সেই হাবীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

তৌকিত নগরে যে বিদ্যালয় আছে, তাহাতে পশমের কাপড় বুনন ও রং করণ বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হয় (Weaving and Dyeing of Wool)। কীওটো (Kyoto) বিদ্যালয়ে রেশম লাকার শিল্প পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথম হাবি অবধা প্রদত্ত।

তৌকিত উচ্চ শিল্পবিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের বিশেষ বিষয় বিশেষ প্রদত্ত হইল।—

এই বিদ্যালয়টি সাত বিভাগে বিভক্ত।—

(১) বস্ত্র ও রঞ্জক বিভাগ (Weaving and Dyeing),

কোন-কোন বিষয়টির ভূমিকা বর্ণনা পঠিতো আরও এত বঙ্গসং
অতিরিক্ত শিক্ষা প্রদান হয়। এই অতিরিক্ত প্রদান বিদ্যালয়ের বিষয়-
গুলি পঠিত হয়—অর্থনীতি (Political Economy), ইতিহাস (History),
(Statics), বাণিজ্য-সংক্রান্ত বৈদেশিক ইতিহাস (Foreign
practice and Commercial usages), ইংরেজি, তিথি।

ଡେକ୍ଟ ସାମିତ୍ୟା-ବିଜ୍ଞାନୀ ।

(Higher Commercial School.)

বিয়ে জাপানের একটা আদর্শ উচ্চ বানিজ্য-বিদ্যালয়ের বিবরণ
এরকম ছিল। ইহা হইতে জাপানের উচ্চ বানিজ্য-বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-
কালেও অধ্যয়নের বিধে সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইবে। এই
বিদ্যালয়টি টোকিও নগরে স্থাপিত। ইহা পঞ্চদশেই কর্তৃক পরিচালিত
হইতেন।

এই বিদ্যালয়ে দুইটি বিভাগ আছে। শাখা বিভাগে (Preparatory Course) এক বৎসর কাল পাঠ্য করিতে হয়। আর প্রধান বিভাগের (Main Course) অধ্যয়ন-কাল তিন বৎসর। শাখা-বিভাগের প্রধানবিভাগের পথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই উক্ত শাখা-বিভাগে (Preparatory Course) প্রবেশ করিতে হয়। আর, উক্ত বিভাগের পথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই শাখা-বিভাগে পাঠ্য করিতে হয়।

এই দুই বিভাগ হাড়া আরও একটা বিভাগ আছে। (Post graduate or professional course) সেখানে বাহাযী উচ্চ গবেষণা। Consular service) তাহানিকগে আরও দুই বৎসর কতকগুলি অভিজ্ঞ বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়।

সাধাবিভাগের অধ্যাপক-বিভাগ—বাণিজ্য-নীতি, নগরপ্রবন্ধিনী, জাপানী
ভাষার সংগ্রহ-রচনা (Japanese composition) শবিত ও যৌগশবিত,
বিসাধনত, ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry), ব্যবহারিক
পদার্থ-বিজ্ঞান (Applied Physics) ব্যবহার-বিজ্ঞান (Jurisprudence),
ইংরেজি, অপর একটি ব্যবহারিক ভাষা ও ভিল।

अध्यापन विभाग—(Main Course)

প্রথম বর্ষ—বাণিজ্য সন্যাস নীতি (Commercial Morality),
 বাণিজ্যিক্য চট্রপত্র, বাণিজ্য সন্যাস পণিত ক কুপোল, হিসাব পত্র
 (Book-keeping), যন্ত্রবিদ্যা (Mechanical Engineering),
 পণ্যস্রা (Commercial products), অর্থনীতি (Political
 Economy), সেন্তানী বিবি (Civil law), ইয়েত্রী, অপর একত্রী
 বৈশেষিক ভাষা, বাণিজ্য বিজ্ঞান (Science of Commerce),
 ভিঙ্গ।

ষষ্ঠোঃ বর্ষ—বাণিজ্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র, বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিক ও
কুশোণ, হিসাবপত্র, পণ্যের নাম, অর্থপত্র, সেতুগামী বিধি, ইত্যোজি, কোম্পানী
একটী বৈদেশিক ভাষা, বাণিজ্য বিজ্ঞান এবং ছিল।

তৃতীয় বর্ষ—বাণিজ্য সংক্রান্ত ইতিহাস, হিসাবশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আর্থিক সংক্রান্ত শিক্ষা (Finance), স্থিতিবিজ্ঞান (Statics), বেৎসহাধী বিধি, বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, আন্তর্জাতিক আইন (International law), ইংরেজি, অপর একটি বৈশেষিক ভাষা এবং তি ল।

আপাদের কৃষি-শিক্ষা-বার্ণিশা-শিক্ষা-বাধ্যতা হইতে ভাঙিত অনেক কথা শিখিতে পারে। ভাণ্যানে ভাণ্য ভাঙিত কৃষিগ্ৰন্থন বেশ, এবং ভাণ্যভেদে অধিকাংশ লোক কৃষিকাৰ্য্য করিয়া জীবন-ধারণ করে। সুতরাং এদেশে কৃষিশিক্ষার একটা হৃদযোজন্য হওয়া উচিত। আশা যের বেশে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ লগাপন করিয়া থাকিতে কৃষক-লগাপন কৃষি-বিষয়ক সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারে শিকিতে সাধাৰ্য্য করিতে পারে, তদ্বৎসেই, ভাণ্যানে ভাণ্য ভাণ্য-এনে বহু শিক্ষালাভে পাইবে কৃষিকৃষিকাৰ্য্য সাধনে প্রয়োজনীয়তা আশিয়া উপস্থিত হইবে। আশা বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা গ্রহণের উপলক্ষ্য একমূল শিক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং বহু কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পূৰ্বেই এইরূপ শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। শুধু শিক্ষক প্রস্তুত করাই বহু কৃষি-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে না। বাহ্যতে বহু কৃষি-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যুবকগণ প্রস্তুত প্রাণাণিত, আবেগিকার ভাণ্য দেশের ভাণ্য-হানে কৃষি ব্যৱসায় বৃদ্ধি জীবিকাৰ্জ্জনের এক নতুন পথ লাভ করিতে পারে, তাহাও চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষিকলেজে, লগাপা বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীৰ্ণ ছাত্রগণকে সেই কলেজে অধ্যয়নের অধিকার দিতে হইবে। এই লক্ষ্য কলেজের লগাপা বৃদ্ধি না করিলে, বহু কৃষি বিদ্যালয়ের পরিচালনা অল্প উপলক্ষ্য কোষের লগাপন হইতে পারে না। আশার বহু বিদ্যালয় স্থাপিত না হইলে আশ্য কৃষি-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে পারে না। সুতরাং

সর্বপ্রথমে যেখানে উচ্চ কৃষিক্ষিকা বিস্তারের পথ হ্রাস ও প্রলম্ব করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, জায়ে-বিজ্ঞানের আভিযান লক্ষ্য, উচ্চ শিক্ষার একমিষ্ট সেবক, অসংক-কর্ত্তী সার আভ্যন্তর্য্য যুগোপযোগ্য হস্তীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৃত্তিক স্থাপন (Convocation) উপলক্ষে টীকই বিশদভাবে, উচ্চ-শিক্ষাক্ষেত্র জোড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলে যেখানে বিদ্যাপিকা। আলো-আগনি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আর উচ্চ-শিক্ষাবিস্তার না করিয়া শুধু বিদ্যাপিকা বিস্তারের চেষ্টা করিলে, তাহা বিফল হইবে, এ কথা কৃষিবিদ্যাক্ষেত্র শিক্ষা লক্ষ্যেই বলা যায়। সুতরাং কৃষিক্ষিকা বিস্তারের প্রস্তুত তাহার,—যেখানে প্রথমতঃ উপগ্রহ সংখ্যক কৃষি-কলসের উচ্চ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, এবং অসংখ্যের দ্বি-ত্রি-বীজের কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করা।

ମିଶ୍ର ମିଳା ଦିଆଯେଉଁ ଉପର ଭାଗରେ କବିତା ଓ ଉଚିତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ-ମାତ୍ରି
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ । କେବଳ ସମୟ କେବଳ ସେ, ଭାବରେ
 ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଇହା ଅବିଚାର ଶ୍ରୋତାମଣି ।
 ସଂସାର, ଭାବରାଶିର ସଂସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ-ସଂସାର । ଏକ ସମୟ ହିଁ ପଢ଼ିବାରେ,
 ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ-ସଂସାର ବିଦ୍ୟା-ବିଦ୍ୟା ଏକ କ୍ରମେ ହିଁ ପଢ଼ିବାରେ ସେ, ଉଚିତ

শিক্ষিত সোকাবের মধ্যে একটা অন্তর্ভোষের লক্ষণ একটুট হইতেছে। এই অন্তর্ভোষের কারণ বৃত্তীভূত ন। হইলে, কি বাহ্যৈকিক হিমাণে, কি ঋষিভৈকিক হিমাণে, কি শিক্ষার হিমাণে, যে কোন বিজ্ঞ বিদ্যা বেশি না কেন, শির-শিক্ষা ভারতে সমুচিতভাবে আদৃত না ব্যক্তিগত বাহ্যতে তাহাশে বিতৃত আকারে ব্যাণ করে, সমসাময়ে তাহার চোটা করিতে হয়শে। ভারতীয় শির-শিক্ষণও যেরূপেই শির-শিক্ষা বিস্তারের জন্য কতকগুলি প্রয়াস উদ্যোগ করিয়াছেন।

(১) স্কটল্যান্ডের উন্নতি সাধনার্থে যে-এক প্রকার শিক্ষা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেখানে বিভিন্ন বানোয়াটপেশী সম্প্রদায় শিক্ষা বিদ্যা বিভাগীকুলের দ্বারাও তাহা জীবিতকালেই পথ উদ্ঘাটন করিতে হইবে। এইরূপে স্কটল্যান্ডের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।

(২) স্ব-পরিচালিত কারাগারসমূহের সংখ্যা এসমিল-বিভাগের
হুগিম করিগা, সম্মতিবিধানের মধ্যে শিল্প-শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে।
কারাগার্যে তাহার শিল্প-বিষয়ক কার্যক্রমী শিখা লাভ করিবে এবং
কারাগার্য-সমূহ বিভাগের শিল্প বিষয়ক উপবেশ গ্রাপ্ত হইবে। এইরূপ
বেশে বীরে-বীরে একতল বিগুণ শিখা পুষ্টি হইবে।

(৩) যেখানে উপযুক্ত কলকারখানা নাই, সেখানে প্রদর্শিত বিখ্যাতের সংসদে বিখ্যাতের নব্বুগকে একটি কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। প্রদর্শিতগণকে কার্যকরী শিক্ষা গ্রহণ করাই এই কারখানার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে।

(২) কতকগুলি নিম্ন মাছ, বাছা কাঁচখানার হাতে-কলমে বা পিঁথিতে, বিছায়ে পড়িগাই পিকা কড়া বায়,—বা, চিনি প্রভৃতি করণ শাদাণী, অথবাগ্ন প্রস্তুত করণ প্রাণী, ইহাদের বা চটিলের কল পড়িডালন-প্রাণী। এই সকল নিম্নগত উপায় কাঁচখানাবিহীন পিঁথি বিছায়েও প্রস্তুত হইতে পারে, যদি বিছাল-সঙ্গ বিজ্ঞানকে (Laboratory) উচ্চ শির স্ফটিক তত্ত্বের পদাধীনত্ব জানিয়া কনিষ্ঠা বংশের হতে।

এইক্ষেপে শির-শিক্ষাকে কারতর শিরশবিনয় চারি প্রধান ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়—(১) কুটীর-শিরশিক্ষা, (২) কল্যায়নাব্যায় কার্যপাঠ-প্রাঙ্গণী প্রযুক্ত্যবী শিক্ষা, (৩) আশ্রমবিশুদ্ধের কর্তব্যে তত্ত্বাবধানের উপদেশী শিক্ষা, এবং (৪) ইতিহাস্যবোধ শিক্ষা। এই ভাবে যেহেতু মেলে, শিরশবিনয় প্রকাশ্যভাবে কাপালেকার, বৈশেষ্যে আচার-শির-বিদ্যালয়, বধ্য-শির-বিদ্যালয়, উক্ত-শির-বিদ্যালয় ও শির-কলেস প্রতিষ্ঠার পঞ্চমাদী বিনিয়োগ মনে হয়। অতঃ এ কথা লক্ষ্য যে, জ্ঞাপানের শিরশিক্ষা ব্যবস্থা এই প্রাচীন চিন্তার মূলে এদেশে অবিস্মরণ নকল করিবার চেষ্টা করা বাস্তবতা বাক। কিন্তু জ্ঞাপানের শির-শিক্ষা প্রবাদের মূল নীতি-গুণি (Main principles) যে দেশে কুটীর হইতে পাঠে, এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ দেখে নাই।

५३

[श्रीशिवभक्त्युत्थोपाशासत्र]

আমাদের এই দুঃসময়ের ভিতর যে গুরুশরীর থাকে, দুঃসময়ই হবে আমাদের জীবন। সেই গুরুশরীর রাখণ করতঃ পরলোক লাভ করা যায় কঠোর থাকে। এই গুরুশরীরী জীবনদ্ব্যপেক্ষ মধ্যে কের-কের কর্তব্যে কৃত-কৃত হয় : এবং কৃত-কৃতের ন্যসে জন-সাধারণের আশে কেনব একটা আশ্রয় উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশে সত্য অসত্য
সকল ভাষ্টির লোকই কৃত বিবাহ করিয়া আসিয়াছে।

আমাদের যেনে তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক যুগে লোক কৃত্ত বিদ্যান
করিত; তথ্যে এবং পুথ্যাবলি গ্রন্থে কৃৎসনোনি স্রাণ্ড হওয়ার কারণ,
তাৎপার্যের আকৃতি, প্রকৃতি ও অন্ত নান্দ্রাকার বিহরণ হেথিকে
পাওয়া যায়।

যাওয়ার সর্ব্বথা শাপ কারো তত থাকিও উঠালোক চইতে থিরা
 এখা করে—উৎসব, বিধবাস, শত্রুবিদ্বেষ আখ্যানে, লুণ্ঠাশপেক হইতে,
 ব্রহ্মাঘাতে, সর্বাঘাতে এবং অনন্তত অবস্থার বহায়েন বৃত্ত। এই—
 তাহার ক্ষেত্রেবিশিষ্ট জ্ঞান হইয়া শাস্ত্রকৃত জ্ঞানিষ্ট কর্তব্যঃ বেদমন্ত্রাজেৎ।
 অর্থাৎ আপন কর্তব্যহারাে বাহুবল-বেদ-জ্ঞান ও জ্ঞানীভ হইয়া থাকে।
 (গুরুপুণ্ডরীক ১১১)

এবেশ যখন ভূতের রেঙা আছে, তিক্তেত ও তুঃচেন নামে এক প্রেইঃ লোক আছে, তাহারা পিপাচনিছ—এতদর্শের সহিত তাহাদের বিবরণ লব্ধ আছে যবে করিয়া সোকে তাহাদের। অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে।

সুন্দর্যমহাও আয়ার স্বাধীন বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের হস্তে বর্গ ও মরক আছে এবং বেহেত কর্তৃকল কোশ করিবার কথা তাহাদের শাস্ত্রও উল্লিখিত আছে।

পূর্বকালে মুসলিম সনক জাতিই ভূত বিধান করিত; এবং কায়রও উপর ভূতের আবির্ভাব হইলে উপভুক্ত লোকের দ্বারা ভূত তাক্ষিত। রোমক ও গ্রীক সমাজভুক্ত বৃত্তী হারকলিসের মধ্যে ভূত ভাঙ্গন গ্রন্থ অভ্যাসি প্রদত্ত আছে। তাহাদের সমাজে এখনও যোক্তা দেখা যায়,—এই সকল যোক্তা রোমক বর্ণাভাষার নিকট (এন্টি) সময়ে নির্দিষ্ট (বিশি) অনুসারে বর্ণিত হইয়া ব-ব বর্ণ সমাজের একজন পবন কর্তব্যী বসিয়া পণ্য হইয়া থাকেন।

বৃহৎ প্রবর্তিত হওয়ায় বহু পূর্ব হইতে বৃহৎ পরিমাপকত বক্তৃতিপত্র সমাজের ৯৯ উপাসনারি করিত এবং পরলোকবাসিনের সহিত সঙ্গীলোকবাসিনের যে সময়ে সময়ে দেখা লাগিত ও কথাবার্তা হয়, ইহাও বিধান করিত।

বাইবেল প্রকৃতি বর্ণনাবলি যে সকল আলৌকিক ঘটনা পাঠ করা যায়, তাহা তখন বসিয়া উড়াইয়া না দিলে, অথবা তাহার কোন আধাঙ্গিক ব্যাখ্যা না করিলে, অতি প্রাচীনকালে খ্রীঃ বর্ষসমীপনের ভৌতিক তত্ত্ব কি রকম বিধান ছিল, তাহা এই সহ-এ ঘটনা হইতে স্পষ্ট হইতে পারে।

পৃথিবীর আদিত অবস্থায় লোক যখন পর্জন্ত-ভায়া বা ঘাটের তলার বর্গ বন্দন করিয়া উল্লস অবস্থায় স্থান করিত, যখন গাছের ফল বা গাছের শাখার দ্বারা অথবা আচ্ছাদন পূরক বস্তু নিয়ন্ত্রণ করিত, সেই সময় হইতে লোকে ভূত-প্রেরণারি অন্তরে বিধান করিয়া আনিতেছে। প্রাচীন কালে অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কাগরও বৃত্তি হইলে, তাহাদের দৃষ্টিতে কতই কঠোর সময়, তাহাদের প্রেরণা পরলোকে বাইরা পত শিকার করিবে বলিয়া, ভয় মধ্যে অস-স্বাভি দেওয়া হইত। গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যে পিতৃলোকের ভূত-সংবল ভক্ত নাস্তিক্যের দ্বিগ-পদ্ধতি প্রদত্ত ছিল। চীনেও পিতৃলোকের পূজা করিত এবং তাহারা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, এমন সে দেশের লোক সকল ভীত ও সশঙ্কিত হইয়া থাকিত; কিন্তু আল পশ্চিম পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রাচ-কর্তৃপরি করিতেছে। এই সকল বিবরণ প্যামোচনা করিলে বুঝা যায়, প্রাচীন কাল হইতে মজা-অসভ্য সকল জাতির লোকেই প্রেরণা বিধান করিয়া আনিতেছে।

ভূতের আর এক নাম অসমবলতা। কর্তৃপদে যে সকল জীবিতা ভূতবানি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের বনি অসমবলতা বলা যায়, তাহা হইলে, লক্ষ্যবর্তিত জীবিতালাপকে বেদতা জ্ঞান করা ও বেদতা-জ্ঞানে

তাহাদের পূজা করা কিছুই অজ্ঞার হয় না; বাস্তবিক তাহারা সকল দেশেই বেদতা-জ্ঞানে পূজা পাইয়াছেন।

অপসমবলতাদের আধার ও তাহাদের পূজা করিবার রীতি-প্রথা আচারের বেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আনিতেছে। বেবিলনে (Babylon) খ্রীঃপূর্ব ৬০০ বৎসর পূর্বের যে সকল প্রত্নতত্ত্বক পণ্ডিতা গিয়াছে, তাহাতে সেই অতি প্রাচীনকালে সে দেশের লোক যে ভূত বিধান করিত এবং (Ghost-God) ভূত-অসমবলতার পূজা করিত, তাহার উল্লেখ আছে।

Universal Spiritualism p. 297.

গ্রীসের আবিপ্লবকণ বৃত্তি প্রদেয় হর পত বন্দর পূর্ণে বসিয়া গিয়াছেন, এই পৃথিবী ভূত-প্রেরণে পরিপূর্ণ হইয়া আছে; বর্ত্তমানের বাহাই কিছু ভাবুক বা কলক, ভূত-প্রেরণা অসমবলতা তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকে, এবং অসমবলতাকে বর্ত্তমানের পক্ষে বসিয়া থাকে।

The master minds of Greece, such as Thales, who lived some six hundred years B. C., thought that the universe was replete with demons, who were the spiritual guides of human beings and the invisible witnesses of all their thoughts and actions.

—Universal Spiritualism, pp. 299.

সোলনের (Solon) সমাজমুখি এপিমিনিাইডিস্ (Epimenides) অপরীক্ষিত পূর্বকণের নিকট হইতে বর্গীয় প্রেরণা পাইতেন; এবং (Zeno) ভূত বসিতে, কোন-কোন অসমবলতার আত্মিক প্রেরণা তাহ ও কথার তাহাকে জাননা করিতেন।

সক্রেটিসের একটা প্রেরণা সহায় ছিল; উক্ত প্রেরণা সর্ব্বদা লক্ষ্যবর্তিত লোকের দ্বারা তাহাকে যে উপদেশ দিত বা-অপেক্ষ করিত, সক্রেটিস তাহা লক্ষ্য করিতেন। সক্রেটিসের সহিত প্রেরণার কথা হইত।

রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত Apuleius (এপুলিয়া) বসিয়া গিয়াছেন, যেখানে সহস্রাব্দান্তর প্রেরণালাপন ব্যক্তিগণের, পরিবারবিশেষের এবং মরগণেরের রক্তা কাণ্ডা করিয়া থাকেন।

সিসিরো (Cicero), পিথাগোরাস (Pythagoras), প্লেটো (Plato) প্রকৃতি আদিত পূর্বের বদান্যতায় বসিয়া ভূত-প্রেরণা বসিতে এবং বর্ত্তমানের সহিত তাহাদের দেখা-লাগে হর ও কথাবার্তা হয়, ইহাও বিধান করিতেন। প্লেটো বসিতে, Each human being has a particular spirit with him to be his guiding genius during his mortal life-time; and when the physical life is ended, the spirit receives and accompanies the enfranchised one to its future destiny. ব্যক্তি যাহারই সঙ্গে তাহার চালক-বলপ একজন প্রেরণা থাকে;

আমরা উক্ মেত সবে সবে ব্যক্তিগত বৈশেষ্যে তাহাকে তাহার পত্ন্য্য হানে নইয়া দিয়া থাকে।

উপস্থিত বসীমপন প্রদর্শন করার বহু পূর্বে (Pagan) পেশাবের মধ্যে কাহাকেও দৃষ্ট্য হইলে, তিনি ভিত্তিমধ্যে বসে দিবার হইয়াছেন, ইহা তাহার মনে করিত না। তৌতিক তৎপ তাহাদের এত অশাণ্ড বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যে সর্বদা সহ্যই তাহাদের নিকট আছে, ইহা তাহারা তাহাদের প্রতি তরিক ভাবাবলী দেখাইতে কখন পরাধীন হইত না।

প্রোত্মাধারণের সহিত বৈশাখ-সাক্ষ্য হওয়ার কথা আমাদের মহাভাগতে আছে। কুরায়েত মুক্ত বাহাঃ প্রাপ্তত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের আত্মার বহননো অত্যন্ত শোক-সত্ত্ব হইলে, তাহাদের শোক অপনোদন করিবার মন্ত্র ব্যাসসেব সেই মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার সহিত আত্মার বহননের বৈশাখ-সাক্ষ্য করাইয়া দিত্ত্বিধেন।

হোমার তাহার ইতিমত্ত কাণের ত্রয়োবিংশতি মধ্যমের (Achilles) একমিলনের সহিত পেটুকনের প্রেতাত্মার দেখা করাইয়াছেন। মাদ্রু ইজা করিলে প্রোত্মাধারণকে পরলোক হইতে এই বর্তমানকে তরিকা আনিতে পারে, এ বিধের গ্রীক দেশের অস্ত্রি প্রাচীনবাসের কবি (Hesiod) ইতিমত্ত তাহার কাণের অতি মন্দ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

মাদ্রু বহিরা ভূত হই এবং ভূতের সহিত আবারের বৈশাখ-সাক্ষ্য হয়, এ কথা অনেকই বীকার ও বিশ্বাস করেন না; তাহার বসেন, মাদ্রু বহিলে আবার থাকে কি? কিছুই না। মাদ্রু, বহি ভূতের অতিশয় শক্তিত, তাহা হইলে জনসাধারণে কেন তাহাদের দেখিতে পারে না?

জনসাধারণে বাহা দেখিতে পারে না, তাহার অতিশয় মাই, এ কথা কখনও বলা যায় না। আকাশে কত এই নক্ষত্র আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না; আবারো কতকাল কত কীটাদি মাক হইতেছে, তাহা আমাদের দৃশ্যপোচের হয় না; কিন্তু ব্রহ্মবীক্ষণ ও অহবীক্ষণ তাহাদের অতিশয় সন্ধান করিতেছে।

প্রোত্মাধারণের সহিত প্রোমার কখন বৈশাখ-সাক্ষ্য না হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অতীতের বর্ণন-মুক্তি-সম্মত লোকের সহিত সর্বদাই তাহাদের বৈশাখ-সাক্ষ্য হইতেছে; এতদ্বিধ জনসাধারণের মধ্যে অনেকই ভূত-প্রেত দেখিবারে, এবং তাহাদের সহিত কথাবার্তা হইয়াছে।

বিয়ে আবার কয়েকটি ঐতিহাসিক তৌতিক ঘটনার কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

(১) ক্রাণের রাজা চতুর্থ বেনেরী বাসকের হস্তে প্রাপ্তত্যাগ করেন। এই ঘটনাকাল সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বে কোন প্রেতাত্মা একদিন তাহার সমুখে উপস্থিত হইয়া, তাহার দৃষ্ট্য দিম যে অতি দিকট, তৎ-বিষয়ে তাহাকে জানাইয়া বিদ্যায়িল।

(২) স্টলনের রাজা চতুর্থ বেন্দেফ কোন প্রেতাত্মা ইংসতে দৃষ্ট-

যাঃ করিতে বাসবার বিশেষ করিয়াছিল। রাজা তাহার বিশেষ না মানিয়া দৃষ্ট-যাঃ করেন। ফলে আর তাহাকে বেশে ফিরিয়া আনিতে হয় নাই,—তাঁহার দৃষ্ট্য হইয়াছিল।

(৩) ইংলন্ডের রাজা প্রথম চার্লস বেন্টিম মুক্তের পর বহন বিভ্রাণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ট্রাক্টের প্রেতাত্মা তাহার সহিত সাক্ষ্য করিয়া বর্তমানে পার্লামেন্টের সৈন্যবলের সম্বন্ধ দিখিত হইতে বিশেষ করেন; কিন্তু রাজকুমার হ্রিৎপোর্ডের কথা-বত রাজা সে আবেশ অবশেষে করিয়া দৃষ্ট-যাঃ করিলে, পশ্চিমবংই তাহাকে পরামিত হইতে হইয়াছিল।

(৪) জোয়ান অব আর্কের সহিত বার্ষিক আত্মিক-বলের সন্ধান-সাক্ষ্য দেখা হইত।

(৫) বেনোপিরন বহন সেট বেলেনার, সেই সময়ে কোন প্রেতাত্মার সহিত তাহার বৈশাখ-সাক্ষ্য এবং কথা-বার্তা হয়। প্রেত বেনোপিরনকে তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা বলিয়া যায়।

(৬) লর্ড ট্রিস্টাম (Sir Tristram) পত্নী সেটি বেরেসফোর্ড (Lady Beresford) এবং লর্ড টাইরোন (Lord Tyrone) দুজনে পরস্পর অসীকার করেন যে, তাহাদের মধ্যে ঐত্যাগ আছে দৃষ্ট্য হইবে, তিনি আদিয়া অপনের সহিত দেখা করিলেন। ১৬২০ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে লর্ড টাইরোন তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন; তাহার প্রেতাত্মা আদিয়া সেটি বেরেসফোর্ডের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তিনি ৪০ বৎসর বয়সে পরাবর্ণ করিলেন, সেই দিন তাহার মৃত্যু হইবে। সেটি বেরেসফোর্ড এ কথা মনেই জাগিয়া রাখিলেন, কাহাঃও নিকট একাশ করিলেন না।

সেটি বেরেসফোর্ড সত্ত্ব মজীর এবং দৃষ্ট হইলে তাহার ৪০ বৎসরের প্রাপ্তত্যাগ-পূর্বা দেখ করিয়া বসকে কাকি নিরয়েন জাতিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসিত পরে আবার বিবাহ করিয়া জীবনের এক-খানি নুতন পাঠ্য গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার দুই মাসের পরে সেটি বেরেসফোর্ড তাঁহার আর এক লক্ষ বিয়ে হুঃ আনিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার বয়সের যে বিশদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভুল হইয়াছে; সেইদিন তিনি ৪০ বৎসর বয়সে পরাবর্ণ করিলেন।

অতীত পূর্বা উপলক্ষে আশ্ব-উৎসব হইতেছিল, এবং সময়ে সেটি বেরেসফোর্ডের জীবাত্মা তাহার নথর দেখ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল; এবং তাঁহার দৃষ্ট্য লক্ষ্যে লর্ড টাইরোনের প্রেতাত্মা যে কথা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা সত্য হইল।

—Real Short stories; Chapter—Historical Ghosts.

(৭) “তের সেল ও-পোথ”

Rev. Charles M^r Kay নামক কোন রোমান-ক্যাথলিক বর্ণ-পাত্রক ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে কোন কার্য্যালয়ে Perth নগরে আদিয়া উপস্থিত হইলে এনি শিদ্দেব নারী একটা প্রোত্মাক

তাঁহার নিকট আসিয়া বলে যে, প্রতি রাত্রে এক ঘ্রোতিনী আসিয়া প্রত্যেক বড় বিদ্যুৎ কবিরেতে; তাই লগ্নাহ কাল ধরিয়া সে একজন পুরোহিতের সঙ্গার করিয়া বেড়াইতেছে।

বর্ষব্যয়ক ভিজাঙ্গা বলিলেন, “তুমি কি রোমান-ক্যাথলিক?”
ক্রীলোক ভীত হইল, “না—আমি প্রেসবিটেরিয়ান।”

বর্ষব্যয়ক। তবে আমার নিকট কেন আসিয়াছ? আমি ক্যাথলিক।

ক্রীলোক। সে মঙ্গল কথা আমি কিছু জানি না, সুখিও না; ঘ্রোতিনী আমাকে একজন পুরোহিতের নিকট বাইতে বসায়, তাই আপনাদের নিকট আসিয়াছি।

বর্ষব্যয়ক। কেন যে তোমাকে পুরোহিতের নিকট বাইতে বলে, তাহার কোন কারণ ভিজাঙ্গা পরিচয়?

ক্রীলোক। ঘ্রোতিনী প্রতি রাতেই আসিয়া বলে, তাঁহার কিছু বণ আছে, একজন সে বড় অশান্তি ভোগ করিতেছে। পুরোহিত বলা করিয়া তাহার সেই বণ পোষ করিয়া বণি তাহাকে উদ্ধার করেন—

বর্ষব্যয়ক। তাঁহার কত টাকা বণ আছে, তাহা সে কিছু বলিয়াছে?

ক্রীলোক। টাকা নয়, তের পেন্স মাত্র।

বর্ষব্যয়ক। তাহার নিকট সে এই বণ করিয়া বিক্রয়?

ক্রীলোক। তাহা বলিতে পারিব না; আমার নিকট তাহার হস্তান্তরের নাম করে নাই।

বর্ষব্যয়ক। তুমি বণ বেধ নাই তো?

ক্রীলোক। হে ভগবন! আমি হইলে আমি কি বুসাইতে পারি, যে বণ বেধিব? এই প্রভাতীকাল অত্যন্তেই আমি অস্থির হইয়াছি। সে প্রতি রাতেই আসিয়া এই বণ পোষ করায় ক্ষত আমাকে বিরক্ত করিতেছে। কিন্তু আমি বড় পরোহ, তার এই বণ আমি কোথা হইতে পোষ করিব?

বর্ষব্যয়ক। যে ঘ্রোতিনী হইয়াছে, জীবিত থাকিতে কি তাহার গহিত তোমার পরিচয় ছিল?

ক্রীলোক। হ্যা—হ্রিন না তো কি? সে বেঁচে থাকিতে আমার দ্বারে গাথিয়া প্রতিদিনই বাতায়ত করিত। তাহার নাম মসি। আমার সহিত তাহার কত কথা হইত।

এই ঘটনার পর বর্ষব্যয়ক অস্থলস্থানে জীবিত পরিচয়রিলেন, নিকটবর্তী ব্যাঙ্গকে মসি নামী একজন গোপানী সৈন্যদের কাপড় গোলাই করিত,—সংস্রতি তাহার দৃষ্ট হইয়াছে। একজন কোকন-বারের কোকন হইতে সে বাহির জিনিস বহিষ্কৃত করিত। উক্ত কোকন-বারকে ভিজাঙ্গা করিলে, সে বাহ্যে খুলিয়া বলে, তাহার নিকট মসির ১০ পেন্স বেশ আছে। কোকনবার তখন পর্যন্ত জীবিত পাবে নাই যে মসির দৃষ্ট হইয়াছে।

বর্ষব্যয়ক যে কানবারের সেনা পোষ করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে বর্ষব্যয়কের সহিত সেই প্রেসবিটেরিয়ান বর্ষব্যয়কিনী

ক্রীলোকের বণা হইলে সে বলিয়াছিল, ঘ্রোতিনীর সহিত আর তাহার যোগ-সাক্ষাৎ হয় নাই।

"Anatomy of Sleep" by Edward Binns M. D, p. 463

(৮) "অপভ্রত ধন প্রত্যাপন"

মায়ামনি সেপের অন্তর্গত—মগের একটি অব্যব-আজ্ঞা ছিল। উক্ত আজ্ঞার অধ্যক্ষতার তার ধারার উপর সম্মতি ছিল, যেকোনো প্রকারে পরম বার্ষিক বৎসরপত্রকারী বলিয়া জানিত। অধ্যক্ষ মগের বিশুল সম্পত্তি ও নিম্নের চরিত্র সম্বন্ধে হৃদয় ও হৃদয়ান্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিল।

অধ্যক্ষ জীবিত থাকিতে তাঁহার একজন বৃদ্ধ পরিচালিকাকে বড় ভালবাসিতেন ও বিবাহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উক্ত পরিচালিকার প্রাসাদস্থানের হৃদয়বান্ড করিয়া বিধা তাহাকে নিম্নের সংসারে রাখিয়া ছিলেন।

অধ্যক্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীত্যাগ আসিয়া এই পরিচালিকার সহিত যোগ করিতে লাগিলেন। পরিচালিকা এই বিষয় তাঁহার পুত্রকে জানাইল; কিন্তু তিনি তাহা বিবাহ করিলেন না,—তাঁহার কথা মানিয়া উঠাইল।

উপস্থাপিত কয়েক সাত্রে প্রোভাসার সহিত পরিচালিকার যোগ-সাক্ষাৎ হওয়ার পর, পরিচালিকা ভগবানের নাম করিয়া নিজস্বা করিল, "কি উদ্ভোত জগতি আমার এই বর্ষ্যসম্বন্ধে আসিয়া বৃষ্টিা বেড়াইতেছেন?"

যেহেতু ইচ্ছিত করিয়া তাহাকে ভাবিলেন। পরিচালিকা কি করবে হিত করিতে না পারিয়া, আপসে ভয়ে-ভয়ে তাঁহার অনুগতন করিল।

যেহেতু পরিচালিকাকে কোন একটি নিবৃত্ত কয়েক নইয়া গেল; এখা সেখানে একটি থাকিল, সেই থাকুনি তাহাকে খুলিতে বলিল। কিন্তু থাকুনি গাথিত বাক্য পরিচালিকা তাহা খুলিতে না পারিয়া বলিল, "বাক্য গাথি কোথায় তাহা তো আমি জানি না, কি করিয়া খুলিব?"

বাক্য গাথি সেখানে ছিল, যেহেতু তাহা বলিয়া গিলে, পরিচালিকা গাথি আসিয়া বাকু খুলিল।

যাহার ভিতর একটি পাসের ছিল। সেই পাসের নীচে উক্ত অব্যব-আজ্ঞার বর্ষ্যকাল অধ্যক্ষকে যেতগার হস্ত যেহেতু তাহার পরিচালিকাকে অনুভব করিয়া বলিল, পরলোকে আসিয়া তাঁহার অনুভব ও অশান্তি নীচা নাই—বড় কষ্টে তাহাকে কাল যাপন করিতে হইতেছে। এই পাসের নীচে অব্যব-আজ্ঞার অধ্যক্ষকে গিলে, এবং উক্ত পাসের ভিতর রাখা আছে, তাহা আজ্ঞার বীণ-বীণপূর্ণের দ্বিগুণ দিগোপ করিলে, যদি তাহার দৃষ্ট হয়; তব্ধি তাহার উদ্ধারের কোন আশা নাই; এই বলিয়া যেহেতু অনুভব হইয়া গেল।

পরিচয়িতা এই সকল বিষয় তাহার বর্ণনায় সহিষ্ণুকে জানাইলে তিনি ক্ষেত্রের আবেশ পানন করিতে বলিলেন। তৎপূর্ব্বাবধি পরিচয়িতা প্যারেসী দ্বারা আক্রান্তাবধি দিকট পৌঁছাইয়া গিল।

পরিচয়িতা নাব-বান লিবিয়া তাহারে কিয়ৎ করিয়া বেওয়ার পদ, আক্রান্তাবধি প্যারেসী পুষ্টিয়া বহা দেবিলেন, তাহারে তিনি এবং আক্রান্তে অত্যন্ত কর্তৃপক্ষপন সকলেই একতালে অধিক হইয়া যেনে। প্রোভা প্যারিস কলেজের পরিচয়িতা করায় পূর্ব্ব, এই 'অবাক-আক্রান্তে' অবাকের পদে নিবৃত্ত হাকার সময়ে উক্ত আক্রান্তে বন-ভাওয়ার হইতে ক্রমে ক্রমে ত্রিণ হাকার ত্রিণ (Morion) হুবি করিয়া আক্রান্তে করিয়াছেন বীভার পূর্ব্বক উক্ত টাফা অবাক আক্রান্তে কর্তৃপক্ষপদে একতালি করায় রক্ত তাহার পুস্ত্রের প্রতি আবেশ করিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষপন পুস্ত্রকে এই আবেশ-পদে বোঝাই তাহার দিকট টাফা কোর চাহিলে, তিনি টাফা বিতে অধীকার করেন এবং তৎপূর্ব্ব তাহারে যানে মালিন হয়।

বিচার-কলে, পরিচয়িতা যে অবস্থায় এই আবেশ-পদে গাও হইয়াছিল, তাহা একাশ করিল। কিন্তু যুতে তাহারে তাবিয়া দ্বারা পিমা প্যারেসী বোঝাইয়া বিচারে, একথা প্রতিপন্ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে পুস্ত্রের পক্ষ হইতে তাহার পিতার ব্রহ্মা নব নব করিয়া ব্রহ্মজিনদিত্তে এক রূপে আবেশ-পদে একতালি করা হইয়াছে বর্ণিতা পরিচয়িতার বিচারে অতিশয় পক্ষ হইল। উক্ত পক্ষ হইতে বাক-বিত্ততা চাহিতে, এই সময় পুস্ত্রের পুত্র ওয় করিয়া একটা কিল পড়িল। কিল পড়ায় নব সকলেই গুলিতে পাইল এবং লোক-লোক পুস্ত্রের পিতা বাক হইয়া যেন, তাহারে সকলেই বেগিতে পাইল। কিন্তু কে কোথা হইতে কিল মারিল? কাহারে যুৎ বলা নাই। পুত্র পিতা হাত বুলাইতে, আর চাহিবিক চাহিয়া বেগিতে,—ইতিমধ্যে পরিচয়িতা বসিয়া উঠিল, "এ যে সেই প্রোভা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" পরিচয়িতার চাহনি লক্ষ্য করিয়া সকলেই সেই দিকে চাহিল; পুত্র বেগিল, তাহার পিতা একতাই ক্ষেত্র-পদীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পুস্ত্র ত পরিচয়িতা কিরূপে ক্ষেত্র-বৃষ্টি আর কাহারে বৃষ্টিপেচের হইল না। কিন্তু এই সময়ে উপস্থিত সকলেই গুলিতে পাইল, কে বেন আবেশ পুস্ত্রের নাব বর্ণিতা ডাকিয়া বলিল—"বাক—আদি একতাই এই টাফা অবস্থায় করিয়া। তৎপূর্ব্ব আদি অবস্থায় বর্ণিতা কোর করিতে; তুমি টাফাওলি কোর বিনা আক্রান্তে উভায় কর।"

পুস্ত্রের যুৎ আর কথা মিলিল না। টাফাওলি তিনি কোর যেনে, এবং এই ব্যাপার বহাতে একাশ না হয় তৎপূর্ব্ব অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহ লোকের সমস্ত বিচারকালে যে বস্তু একাশ হইয়াছিল, তাহা আর চাক্য আছিল না। "Night side of Nature." pp. 281—283.

(২) দৌঃ উদন

Count de Falkesheim তাহার ত্তর দিকট হইতে বর্ণ-উদগেল প্রাণ করায় কালে ত্তর একাশ যেনে যে, আভার অতিব এবং পরলোক লম্বকে তিনি কোর মতনত জানাইবেন না; ত্তর করায় তাইট কোরুলগাকার হইয়া ওকে কাগ্ন মিলাভ্য কাল। ওর প্রথমতঃ এ বিধে কোর বাক্য বলিতে সীতৃত হন নাই; অবশেষে তাইট অত্যন্ত আভর একাশ করায় ত্তর যেনে:—

প্রথম যানে তিনি বর্ণাভার হইবেন এই উদ্দেশ্যে শিকা এবং বীক্য প্রাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণন-পাত্র অগ্নায় করিয়া আভার অতিব তাহার সম্বন্ধে যেনে; এই সময় তাহিয়ার রাক্য প্রথম লেখকিক উদগিলেব অবশেষে তিনি কোর দিক্কার অধ্যাক অর্থাৎ প্রথম পাত্রিয়ার পদে নিবৃত্ত হইয়া যান।

দিক্কার দিকটেই পাত্রিয়ার বাস। ওর প্রথম যে দিন তাহার কর্তৃ-বানে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন তাহার বাসার শরম করিয়া আবেশ, —এমন সময় পের হাতে তাহার যুৎ কাটিয়া গেল। বিহানার শরম করিয়া তিনি কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহি মতাত হওয়ার যত্নে যথো আলোক প্রবেশ করিল। এমন সময় তিনি বেগিতে পাইলেন, কাটনশর পাত্রিযেখণ্ডারী একজন অপবিত্রিত পুত্র যের একটা কোরের লম্বকে হুইয়াইয়া একবাণি পুস্ত্রকর পাতা উলুটাইতে। তাহার দুই পায়ে হুইয়া বাসক হুইয়াইয়া আছে। আবেশক যথো-যথো সেই বাসক হুইয়ার বুকে দিকে চাহিতেও ত্তর বাক্যইয়াস পরিচয়িতা ক'রতে—তাহার যুৎ বেন শরম একটা বিহানের দ্বারা পড়িয়া।

পাত্রি-ওর যুৎ বিহান করিলেন, না কিন্তু তাহার যের দ্বারা লক্ষ্য বাক্য অবস্থায় এই আবেশক যেনে হুইয়া ত্তর করিয়া কোন্ পদে কি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাও ক'র তাহার শরীর কটকিত হইয়া উঠিল। আগন্তককে কোর বাক্য মিলাভ্য করিতেও তাহার সাধন হইল না।

আগন্তক অনেককাল পর্য্যন্ত চেয়েই লম্বকে বীজাইয়া থাকিয়া অবশেষে পুস্ত্রকরানি বন করিয়া যেনে হুইয়া হাত বরিয়া চাহিয়া যেনে; এবং যের এক পায়ে সীতকালে আভন আদিয়ার দ্বারা যে একটা দৌঃ-বিশ্রিত উদন ছিল, সেই উদনের পায়ে বাক্য হুইয়া বাক্য অবস্থ হইয়া যেন।

তাহারে অবস্থ হইতে বেগিয়া ত্তর একবারে আভরহা হইয়া পড়িলেন; এবং আর সে করে অবশ্যক না করিয়া, ত্তরতাকি বাহিরে আসিয়া, একবারে উদ্ভাসে দিক্কার বাক্য উপস্থিত হইলেন।

পাত্রি-ওর দিক্কার যথো এক-যের সে-যের পুষ্টিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেবে একটা যের আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে যের পাত্রি-পাত্রি অনেকগুলি চিনি টাফাশ ছিল। পূর্ব্বক বাক্য এই দিক্কার পাত্রিয়ার পদে অতিবিক হইলেন, এ সকল তাহারে বাক্য। পাত্রি-ওর এক-এক বাক্য বেগিতে লাগিলেন, এবং কে কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত পাত্রি-

পরে নিবৃত্ত হইলেন, তাহা পাঠ করিতে লগিলেন; তিনি যে বিতীর্ণিকা
বেঁধিয়া ভাষাইয়াছিলেন, তাহা কথেকের লজ্জা কুলিয়া যেনেন। তিনি
বেঁধিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অসময়ে শেষ ভবির নিকট আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছেন। আবার তাহার পতীর শিরহিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ
পূর্বে তাহার শব্দ-কণক যে তৌতিকা দ্বারা বর্ণন করিয়াছিলেন, এ যে
সেই মুক্তি,—সেই বসন্ত-পাতা, সেই তেঁতুল! ...

এই সময়ে নির্জাতি একজন অতি প্রাচীন কণ্ঠস্বর এগিয়া সেই
ঘরে প্রবেশ করিলেন। পান্ডিত্য-ভর তাহারে পূর্ণ-পূর্ণ অধ্যক্ষের
সম্মতে হই-এক কথা হিজাঙ্গা করিয়া, অসময়ে শেষ বসন্ত, বীরা
পরে তিনি নিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার কথা পান্ডিলেন, এবং
কথার-কথার জ্ঞানিতে পারিলেন, তিনি এই নির্জাতি পান্ডি-পথে নিবৃত্ত
কালিলেন তাহার চরিত্র ভাল ছিল না; পান্ডির কোন একটা দুইটী
অন্তঃসলিলের সন্ধিতে তিনি অসময়ে প্রথম-পাশে আনন্দ হইয়াছিলেন;
এবং তাহার ভাষে এই দুইটির পরে দুইটি পুত্র পুত্রান লজ্জা
করিয়াছিল। সম্মান দুইটি ৩০ বৎসরের হইলে কলঙ্কের ভয়ে
তাঁহাদের পুনঃস্মরণ করা হয়। সম্মান দুইটি কোথায়, তাহা আল
পাঠ্য কেহ জানে না। কিন্তু ইহাতে তাহার কলঙ্ক আরও বৃদ্ধি
পাইল—তাঁহাদের হঠাৎ করা হইয়াছে বলিয়া নানা জনে নানা কথা
বলাবলি করিতে লাগিল; এবং লোকের নিকট পান্ডির দৃষ্ট দেখান ভার
হইল। উঠিল:—এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই, যে ঘরে আগনি
কাল হাতে পড়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে পান্ডির মৃত-বেহ পাণ্ড্য
লেন। পান্ডি কলঙ্কের ভয়ে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন।

পান্ডি-ভর বধন এই নির্জাতি অধ্যক্ষের পথে নিবৃত্ত হইয়া আসেন,
তখন ঐক্যকাল। একজন বরের মধ্যে যে কৌশল নির্জিত ইদন ছিল, এবং
যে উদন-পথে তৌতিকা বৃদ্ধির অঙ্গুষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা আলিয়ার
প্রবেশান পরে নাই। দ্বিতকালে আসিলে উক্ত উদন লেনে জ্ঞানিতে
কালিয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ভাল ফলে না; উপরন্তু অতঃপর একটা
দুর্ভাগ্য বাহির হওয়ায়, সে ঘরে বাল করা হুসোয়া হয়। উদনটির কল
সই হইয়াছে ভাবিয়া, পান্ডির কানার ভক্তিকা আসা হয়। কানার
উদনের কল কুলিয়া দেখে, তদার প্রোট-প্রোট কানকের দুই কানার খুলি
এবং হাড় পড়িয়া আসে।

আলিয়ার বিন্দু দ্বারা অগম্য হইলে প্রেরণোনি প্রাপ্ত হওয়ায়
কথা বেলিতে পাণ্ডল যায়—কথার। নিত্যক নিত্যক নয়। পান্ডি বালক
দুইটিকে হত্যা করিয়া উদনের ওলার ফেলিয়া বিরা লিখে আয়ত্যা
করা, তাহার। তিন জনেই মৃত হইল এই ঘরে বাল করিতেছিল।

পান্ডি-ভর আলিয়ার অতিথি খাঁচার করিতেল না; কিন্তু এই ঘটনার
পর তাহার বিদান অল্প ব্রহ্ম হইয়াছিল।

Footfall on the Boundaries of another World. page

(১০) পাণ্ডা আদ্য

বিখ্যাত লর্ড গ্র্যান্সেলোর আর্লস্কিন (Erskine) সাহেবের বৌদ্ধ-
বয়স একবার বীর্ষকাল বয়স। তিনি কলঙ্ক হইতে অল্পপথিত
কথার পর বেঁধেন এবং এতিমসমূহ। সহরে ক্রিয়া আসেন, সেই দিন
প্রাতঃকালে কোন পুত্রকের বোকাবের লগুণে তাঁহাদের (butler)
তাঁহাদের সন্ধিতে হঠাৎ তাঁহারা দেখা হয়। তাঁহাদের বৈধি-কর্তাল-
সার হইয়াছে; তাঁহারা তেঁহারা বেঁধেন বেদ ভর হয়। আর্লস্কিন সাহেব
জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এখানে?”

তাঁহারা উত্তর করিল, “আমি হুসুয়ের সন্ধিতে লাক্ষ্য করিতে
আসিয়াছি। আদ্য কিছু টাকা পাণ্ডা আদ্য (steward)
বেওয়ারীরা সহরে অজ্ঞার করিয়া আদ্যকে টাকা বিলেন না। কৃত্তকে
বলিয়া, আমি টাকা কর্তী বাহাতে পাই, তাঁহারা বাহা আপনাকে
করিয়া দিতে হইবে।”

তাঁহাদের তেঁহারা ও তাঁহারা ভাবতদি বেঁধা আর্লস্কিন সাহেব
বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে বলিয়া সম্মুখ বোকাবের প্রবেশ
করিবেন, এমন সময়ে পক্ষাৎ ক্রিয়া বেঁধেন তাঁহারা নাই, অল্প
হইয়াছে।

সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রী একবার বোকাবের ছিল। আর্লস্কিন
সাহেব লুকান লুকান সেই বোকাবের বাঁহা জ্ঞানিতে পারিলেন,
কলঙ্ক হান হইল তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহাদের স্ত্রী অত্যন্ত কথার পর বলিল, তাঁহারা বাহা মৃত্যুভাষে
বলিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা কিছু টাকা বাহিরা পাণ্ডা আদ্য,—
আপনি বাহা বাহিরা তাঁহারা টাকা কলঙ্ক কাটা বাহিত না।

তাঁহারা যে কিছু টাকা পাণ্ডা। বাক্যে, তাঁহা তিনি পাঠাইয়া দিবেন
বলিয়া আর্লস্কিন বিদায় হইলেন; এবং বাহা আদ্য টাকা পাঠাইয়া
দিলেন।

আর্লস্কিন বধন (Lord Chancellor) লর্ড গ্র্যান্সেলোর হইয়া-
ছিলেন, তখনও তাঁহারা এই ঘটনার কথা জ্ঞান হয় নাই।

Life's Borderland and Beyond. p. 302.

(১১) অমৃত্যু-ব্রহ্ম

ইংল্যান্ডের রাজা এবং প্রিন্সের পান্ডব অত্যাচার ও উপস্থিত
রাজার বাবতীর এলা বিদ্যোদী হইয়াছিল। রাজার প্রধান মন্ত্রী
ছিলেন Duke of Buckingham; ডিউকেস রত্নপার রাজা এলা
বিদ্যোদন করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহারা উপর এলাবের ভরতর পান্ডোপ
লগিয়াছিল।

আদ্য যে লম্বের কথা বসিতেছি, তখন উক্ত ডিউকেস পিতা
(George Villiers) লর্ড ডিগিলার্ড-পারলোকে; তাঁহারা বেতায়া
আদ্য একদিন তাঁহারা কোঁস বাস্য লম্বের সন্ধিতে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন “আদ্যকে চিনিতে পার কি?”

আমি বিদায়ের সময় লম্বের মধ্যে হঠাৎ এই প্রেরণা করি

উপহিত হইতে দেখিয়া, ভয়ে বন্ধুর গ্রন্থ ছড়সড় হইয়া গিয়াছিল।
 তাঁহার দুখ দিয়া কথা সরিল না।

শ্রেষ্ঠ আহার বলিল “আমাকে কখনও কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া
 তোমার মনে হয় না কি?”

শ্রেষ্ঠের আশ্রিত দেখিয়া বন্ধু ভয়ে ভয়ে উত্তর করিলেন “আপনি
 কি লক্ষ্য ভিসিয়ার?”

শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ আমি তোমার সেই বাসা বন্ধু ভিসিয়ার।” তোমাকে
 আমি একটা অল্পবোধ করিতে আনিয়াছি। আবার অসুখোঁধ তোমাকে
 রক্ষা করিতে হইবে।

বন্ধু। আমাকে কি করিতে হইবে বন্ধু।

শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার পুত্র ভিটকের নিকট যাও। তাঁহাকে আমার
 বাস করিয়া বল, যদি তিনি এমার উপর অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত না
 হন এবং আমাকে বিরক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কীদন কখনই
 রক্ষা পাইবে না।

এই কথা বলিয়া শ্রেষ্ঠ অদূত হইল।

আমরা যে বন্ধুর কথা বলিতেছি, তাঁহার বয়স তখন ৪০ বৎসর।
 তিনিও রাজসরকারে চাকরি করিতেন; এবং হির, বীর ও জ্ঞানবান
 বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হুখ্যতি ছিল।

শ্রেষ্ঠ অদূত হওয়ার পর, তিনি এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে-করিতে
 দুঃখীরা পড়িলেন।

পরদিন শ্রেষ্ঠকেলেন দুখ ভাবিয়া গেল, পূর্ন রাত্রে যটনার কথা
 তাঁহার মনে বলিয়া মনে হইল; এবং এ সম্বন্ধে তিনি আর কোন চিন্তা
 করিলেন না।

কয়েক দিন পরে শ্রেষ্ঠ আদিয়া আবার তাঁহার সহিত বোকা করিল,
 এবং রাস্তায় নিজাঙ্গা করিল, “বাগা বলিয়া গিয়াছিলো, তালা করিয়াছে
 কি?” শ্রেষ্ঠ জানিত তাঁহার কথাসব কথাই সত্য হয় নাই; এবং
 এই বিরোধ একুত্তির সামকর্ণগারীকে শ্রেষ্ঠ বাধ্যতায় ভিত্তিকার ও
 ভৎসনা করিয়া বলিয়া গেল, যদি তাঁহার অসুখোঁধ রক্ষা করা না হয়,
 তাহা হইলে সে এই শ্রেষ্ঠত্বের সর্বকণ তাঁহার শিল্পে লাগিয়া
 থাকিলে ও তাঁহার কীদনের দুঃখ-পাতি নষ্ট করিয়া দিবে।

সামকর্ণগারী বিজয়বার বাগা দেখিলেন ও ওদিলেন, তাহা আর
 তিনি বয় বলিয়া মন হইতে দুঃখ করিতে পারিলেন না। কিন্তু কোথায়
 কি করিয়া ভিটকের সাফাং পাইবেন এবং তাহার কথায় কি করিয়াই
 বা ভিটকের এতদ্যর অস্বাধীনে, এই চিন্তায় তাঁহার মনের পর দিন
 কাটিয়া গেল। একদা সময়ে শ্রেষ্ঠ আদিয়া আবার তাঁহার সহিত অতি
 ভাষার মুহুর্তে বোকা করিয়া তাঁহাকে ভিত্তিকার করিতে উত্তর হইল।
 সামকর্ণগারী অতি দিনের সহিত বলিলেন, “আপনার আশেপাশে পালন
 করিতে আমার কোন আগ্রহ নাই; কিন্তু আমি একজন অতি সত্যত
 ব্যক্তি। কি করিয়া ভিটকের সহিত বোকা করিব এবং যে কথা তাঁহাকে
 জানাইবার লজ্জা আপনি আমাকে আশেপাশে করিয়াছেন, সে কথা আমি
 তাঁহার কি করিয়া এতদ্যর চম্বাইব? আমার কথা তিনি কখনই

বিশ্বাস করিবেন না। হয় আমাকে তিনি পালন বলিয়া তাকুইয়া দিবেন,
 না হয় আমি কোন চুই অতিচারে তাহার নিকট এই কথা বলিতে
 উপহিত হইয়াছি ভাবিয়া, আমার প্রতি কঠোর শাস্তি-বিধান করিবেন
 —এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট অসন্ন হইতে আমি সাহস করি নাই।”

শ্রেষ্ঠ উত্তর করিল, “ভিটকের সহিত সাফাং করা তোমার পক্ষে
 বিশেষ কষ্টকর হইবে না এবং তোমার কথায় তাঁহার বাহাতে এতদ্যর
 সম্বন্ধে যে লজ্জা তোমাকে আদ্য করেকটা অতি গোপনীয় কথা বলিয়া
 দাইতেছি। ভিটক তিন্ন আমার কাহারও নিকট যদি তুমি এই কথা
 প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমিও তোমার সর্বনাশ হইবে। ভিটককে
 তুমি এই কথা কহটা জানাইবে; এবং যে অস্বাধী তুমি আমার নিকট
 এই কথা জানিতে পারিয়াছ, তাহা প্রকাশ করিলে, আমায় সহিত
 তোমার বোকা সাফাং হইয়া ও আমি তোমাকে যে বিপর্যাসকে
 জানাইবার লজ্জা আমাকে করিয়াছি, তাহা আর তিনি অবিশ্বাস করিতে
 পারিবেন না।”

এই ঘটনার পর উক্ত কর্ণগারী ভিটকের সহিত সাফাং করিয়া
 তাঁহাকে তাঁহার পিতার আশেপাশে ও অতিচারে জানাইলে, তিনি সে সকল
 কথাই কিছুই বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ তাঁহার এতদ্যর সম্বাইবার
 লজ্জা যে কয়েকটা গোপনীয় কথা বলিয়া গিয়াছিল, সেই কথা কহটা
 প্রকাশ করিলে, ভিটকের দুঃখ অস্বাধী হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,
 এই সকল অতি গুরু কথা—সেই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার মাতা এবং তিনি তিন্ন
 আর কেহই জানে না।

ভিটক তাঁহার মাতাকে বন্ধু ভাবিয়াসন্তেন ও ভক্তি করিতেন।
 তাঁহার মাতা কণ্ঠক এই সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে ভাবিয়া, সেই
 দিন তিনি তাঁহার সহিত বোকা করিলেন, এবং দুইবে অনেকক্ষণ খরিয়া
 বসড়া-বিষায় করিলেন। তাহারের মাতা কি কথা হইয়াছিল তাহা
 আদ্য বলিতে পারিব না, তবে শ্রেষ্ঠের কথাসব এমার উপর
 অত্যাচার করিতে নিষেধ দিবার হইলেন না, সামকর্ণক ক্ষান্ত করিলেন
 না মনে Lieutenant Felton এই ঘটনা অবশিষ্টকাল মধ্যে অতি
 দুঃখের ভাবে ভিটককে হত্যা করিয়াছিল।

শঙ্করত্ব ৬

[ঐহিরহর শাস্ত্রী]

গাণ্ডিক বিবিধ ব্যবহারে শাস্ত্রের বহু উপযোগিতা, অল্প কোনও
 পর্যায়েই বোধ হয় এত উপযোগিতা নাই। শবোচ্চারণ ব্যতীত আমরা
 কোন্ কার্য সুস্থখ্যায় গঠিত সম্পন্ন করিতে পারি? শিত শিপাঙ্গার

• মহাশয়োগাধ্যায় ঐহিক ব্যবহারের গুরুত্ব মহাশয়ের লভ্যপত্তি
 “ব্যাগাণী শাখা সাহিত্য-পরিষদে”র সাধারণ অধিবেশনে গঠিত।

এদিকে গদ্য করিয়া শব্দের সঠিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। কাব্য, আকাশ অদৃষ্ট অর্থাৎ অবজ্ঞিতপরিমাণবহিত। বাহার অবজ্ঞিত পরিমাণ নাই, সে নিষ্কির; বস্তু ভ্রাণি। যদি বল, ত্রিভাঙ্গ কাব্য লগ্নোৎপ-বিভাগ গদ্য আকাশে আছে, তখন আকাশে ত্রিভা হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, লগ্নোৎপ-বিভাগ থাকিলেই ত্রিভা উৎপন্ন হয় না,—আকাশতে লগ্নোৎপ-বিভাগ থাকিলেও আকাশে নিষ্কির। দ্বতঃঃ হইতে হইবে, ত্রিভাঃ প্রতি পদ্যলগ্নোৎপরিমাণ প্রতিসম্বন্ধ। আকাশে পদ্যলগ্নোৎপরিমাণ আছে বলিয়াই তাহাতে ত্রিভা হইতে পারে না। কাজে কাজেই আকাশরূপ জ্যোতি, লক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া যে বিবর্তসম্বন্ধ হইবে, ইহা সম্বন্ধপন্ন নহে। তাহা গদ্য বলি 'পুত্ৰত্ব জ্ঞানঃ'—ভায়ে জ্যোতিঃ ত্রিভা নীচায় কভা কভা, তাহা হইলে লক্ষ্যপুত্ৰত্ব বাহুল্যেও শব্দের অগ্রভাষের আশ্রিত হয়। কেন না, লক্ষ্যোৎপত্তি-জ্যোতি হইতে যে বাহু আসিবে, তাহা পদ্যলক্ষ্য জ্যোতিঃ প্রতিভূততা করিবে। বাহু লক্ষ্যপুত্ৰত্ব হইলে অবতীর্ণবৃত্তা লক্ষ্যও তদা কভা কভা; আর বাহু প্রতিভূততা হইলে নিষ্কটবৃত্তা লক্ষ্যও তদা কভা কভা। কিন্তু জ্যোতিঃ প্রতি নীচায় করিলে, ইহার বিশ্রীত হওয়া উচিত। অংকটট শিখিরায়ে,—

“বাত্তো শব্দানুকূলে চ ন স্তম্ভ জীবৎ সত্যং ।

गङ्गायाः अतिक्रान्ता हि श्वेःअवृत्तेः स माहृतः ॥”

—(आत्मसंकीर्ति, २१६ पृ:) ।

যার বাস্তবিক গণকে শ্বেতাংশগতি গ্রহণে প্রোত্বেয় গমনই অসম্ভব।
কেবল আকাশই শুষ্ক হোয় নহে—কর্ণকুণ্ডলাবজির আকাশের নাইই
হোয়। শ্বেতাংশগতিগ্রহণে কর্ণকুণ্ডলা যে বার না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।
কাজেই কেবল আকাশ ঘনি শ্বেতাংশগতি গ্রহণে যাত্রা, তাহা হইলে
হোত্বেয় গমন সিদ্ধ হইতে পারে না। কর্ণবিহারাণবজির আকাশের
সহিত সম্বন্ধ হইলেও ঘনি শ্বেতাংশগতি গ্রহণে বীকার কহ, তাহা হইলে
কক্ষিকতার কোলাহল বাতালনীতে ব্যাকি প্রথা বার না কেন?।
সে কোলাহলের সহিতও শুষ্ক আকাশের সম্বন্ধ আছে। হুতাশ
অন্যাত্ম্য বীতস্তরম-ভাবে কর্ণকুণ্ডলা শ্বেতাংশগতি বীকার করিতে হইবে।
‘ভাবি ত্বোঁর দশ তপিশাশ’ এ হলো তেওঁরীশ্বের সমভাওর শ্বেতাংশ
তাপগতি।

শ্রেনী বার্ষিকিকেরা বলেন যে, 'হৃদ-হৃদ' পঞ্চপুত্রসমূহ হইতে দাবরণ পঞ্চ উপর হার (৩), এবং তাহা নিম্নের উপস্থিতি হইতে নিষ্কাশ্য হইয়া কর্তব্যে প্রবেশ করে। এই শ্রেনীবৃত্ত বর্ণনাব্যবহার-ইতিহাসিক ভাষ্যকৃত 'ভাষ্যকৃত'তে বলিষ্ঠায়েন যে, 'পুত্রব-

(৩) "অন্যভাবে: জীবনমতঃবিদ্যমানঃপশ্চিমঃ পূর্বঃপশ্চিমঃ
বিজ্ঞানবিদ্যে, ৩৩ নব্যবিদ্যা ইত্যাদিঃ।"

—*আমেরিকা* কলকাতা, ১২১ পৃ: ।

“গৌরবসিক্তঃ পথ অহবাসি এতান্বয়হেতুভয়ে চ নতি ক্রিয়-
বদ্যাদ্ বাপাসিহং ।”—আবেগকবচমার্ভিত, ১০০ পৃঃ ।

সমূহ বর্ণের অধর্য, তাহা হইতে আখ্যায় অপর্যী বর্ণিত উৎপন্ন হয়, ইহা এক কৌতুক বটে। আত্মা এই সারক বর্ণ করিতে দ্বিধায় সমর পবিত্রতা বাধ্যতায় বিক্ষিপ্ত হয় না কেন, বৃদ্ধান্তে প্রতিহত হইয়া তাহার অসততত বা কেন না হয়? আর পঞ্চ বৈশাখী হাইবার সীমাই বা কত সুখ? তাহ পণ সেই শাশবৎ পশু, একজনের কর্ণ-বিবরে পশব কর্তৃক হৃত, তখন আত্ম সোকে যেমন কতিয়া সেই পঞ্চ ভদ্রিতে পায়? যদি বল, একজনের কর্ণ হইতে শিক্তায় হইয়া সেই পঞ্চ আশ্রয় কর্ণে যেনেব করে, তাহা হইলে একই সঙ্গীত ভিত্তে দুগুণ সহস্র-সত্তর সোকেত প্রতীপাতার হয়? শোভার স্যাম্যাম্যম্যে নানা বর্ণ উৎপন্ন হয়, একগুণ কল্পনা কল্পিত সঙ্গত বহে। শোভা অধিক বাহুক, আর অধিক বাহুক, বহু। তুল্য। অথহই পঞ্চ উচ্চারণ কতিয়া পায় (৩)।

বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষিতা বসেন যে, শব্দের সহিত কর্মপ্রিয়ের সম্বন্ধ না
হইলেও, ইচ্ছার সক্তি বলতঃই শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। এই দৃষ্ট একেবারেই
বিচারসহ নহে। শব্দের সহিত কর্মপ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলেও বহি
শব্দ প্রত্যক্ষ হয়, তবে পূর্ববৎ বা ব্যবহৃত শব্দ প্ৰসিদ্ধি পাওয়া যায় না
কেন ?

অস্ত্রাভি বর্ষণকিরণের এই লক্ষ্য হতে পর্যালোচনা ভিত্তি যেখানে
 মুক্তিভেদে পড়া যায় যে, বৈরাগিকেরা যীতীতরঙ্গ-ভায়ে যে লক্ষ্য পূর্ণি
 করিয়াছেন, তাহাই মুক্তিসমত । কিন্তু এই বৈরাগিক হতে যোগোদ্-
 ভাবন করিবার ক্ষমতা বিজ্ঞানবাহীরা লক্ষ্য করিয়া থাকেন,—

‘नमः नमस्तुतः श्रुते इति तावन्मौनिकम् ।

कार्यकारणत्वात् न च पुनरेव दुर्द्धिभ्यः ।

অন্তঃস্থানান্তরে বেলে শীঘ্রঃ বসবাস্যন্ত তে :

तिथीगुह्यमवच्छेति केचन यः साधनान्तरम्

শব্দান্তঃ। পি কুর্কটঃ স্বপদ বিরহতি তে ।

ন হি বেগুদ্যক্বেদ্যাঃ মরুতানি বহু স্তে ।

কুড়ামি ব্যবধানে ৫ লক্ষেরও বেশি কণা।

যোঃ; সৰ্বপেত্তদ্বাৰ্জি কুডামৰো বাৰিহিতিঃ ।

(୧) "ବର୍ଣ୍ଣଜାୟରଥାଃ ହସ୍ତାଃ ସନ୍ତି କେଚନ ମୁଦ୍‌ଗଳାଃ ।

தெய்வீகவேதவியை வாய் வந்ததென நன்கு கையாளுக.

কুলন্ত গ্রাহনং ন কথং ন বিকিপোন্ত যাত্রটৈঃ ।

ହଳନୋ ବା ନ ଉଦ୍ଭୋଠ ବ୍ୟବହାରିତ: କଥମ ।

ଆହାଙ୍କାବନି: କଳ୍ପ ବାସନାଃ ୧୩ ଚମବିନ: ।

একজোড় অধিষ্ঠো বা স জাতিসংগঠিতঃ কথ্যঃ ।

विष्णुः कर्मात्मकः । अतः सर्वः ।

बहीषोऽ कथं कुरु वपुषश्च वरुणिः अग्निः ।

কোডিক্স-আনুসারে ন নানাবর্ণিতঃ :

“यस्य कृताः श्रवणविशेषाः विद्वद्भिरुच्यन्ते ॥”

^१भाष्यभाषी, २३७ पृ.।

তুম্বাহরকে ত তীক্ষ্ণ দন্দ্যত লবন্। কন্।
 এঘতে চাচিকায় তীঃ শব্দো দন্দ্যত লুতঃ ।
 বীটীসম্ভাবনুদ্যব্যাগি পদেহু হর্ষতঃ ।
 মুর্তিবাক্সিযোগে বেগবিহরিভাবঃ ।”

—ভাষ্যভট্টী, ২১০ পৃঃ ।

“দন্দ্য হইতে যে আবার শব্দান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা এক অসৌক্যিক ভবন। জান্নতাব্বের মতম শব্দসম্ভাবনের কাব্যকারিতব্য পীকার করা অদৃষ্ট-বিষয়। এক শব্দ হইতে দুইবতী বর্ণ দিলে তৎপদাতীত শব্দান্তর অধঃপ্রণ করে, এ মতকে লজ্জা করিতে ইচ্ছা হয় না। আচ্ছা, যদি শব্দ হইতেই শব্দান্তর ভবে, তবে তাহার বিদ্যায় হয় কেন?—কন্দঃই শব্দ হইতে পড়ুক। বাহুর মতম শব্দের ত আয় বেগবন্ধ করিয়া করিতে গিয়া না। তেহায়ের মতে শব্দের সম্ভাবী কারণ আকাশ; সেই সর্বগোপী আকাশ ত ঐরাবের সম্ভবলোকে আছে; কিন্তু ঐরাবীয়ায় বায়বান থাকিলে শব্দের সহিত ইঞ্জিরের সম্বন্ধ হয় না কেন? তুল্য ভাবে শব্দের কারণ হইলো, তীঃ শব্দ হইতে অতীত শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়? বিকট থাকিলে তীঃভাবে ত বীটী থাকিলে অক্ষুটভাবে শব্দ তদা বাহু, ইহার কারণ কি? আর বীটীতরঙ্গ-প্রাণে শব্দ-সম্ভাবনোৎপত্তির যে দুটায় বেগাইয়া, তাতাক অসম্ভব। শব্দের ত আর মনের ভাব অবস্থির পরিমাণ, ক্রিয়া ও বেগবিহ নাই।”

তাকিকেরা এই আপত্তার দ্বারা সমাধান করিরাছেন। তাহার্য্য মনেন, কণের মধ্যে কেবল জানাই যে জান্নতাব্বের কারণ, তাহা নহে। ৩পাদি ভণ হইতেও তৎপদাতীত শব্দান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটাদি অবস্থার ভিত্তি-র প্রতি রূপাদি অবস্থার রূপ হেতু। প্রত্যয়ঃ শব্দ হইতে যে শব্দান্তর উৎপন্ন হইবে, ইহাতে বিশ্লেষণের কোন কারণ নাই। তার পর যে বলিয়াছে, শব্দ হইতে যদি শব্দান্তর ভবে, তবে তাহার বিদ্যায় হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, ৩৩তাম্বাহির সংযোগ হইতে কোট-বাহুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই সক্রিয় বাহু শব্দের প্রতি নির্বির কারণ। কোষের সত্য পটভ এই বাহু প্রকাশ করিতে থাকে। কোনও কারণবশতঃ এই বাহুর প্রতিরোধ হইলে, বা তাহার বিদ্যায় হইলে, নির্বির কারণের অভাবে শব্দান্তরের উৎপত্তি হইতে পারে না। কাজেই শব্দ-সম্ভাবনের বিদ্যায় হয়। শ্রীমদাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“ন জানবদ্য বাহুবুধঃ নির্বিরকারণতঃ কৌট্যবাহুঃপটভতে ভাববুধঃ শব্দ-সম্ভাবনুত্বিতঃ। অতএব প্রতিবাতঃ শব্দাংশুপদঃ কৌট্যবাহুঃ প্রতীক্যতঃ।”—ভাষ্যভট্টী, ২১০ পৃঃ ।

কৌট্যোদ্ভূত বাহু, শব্দের নির্বির কারণ বলিয়াই, প্রতিবাতঃ প্রবল বাহু প্রবাহিত হইলে শব্দের উৎপত্তি হয় না। কেন না, এই বাহু কৌট্যোদ্ভূত বাহুকে প্রতিবত করে। “ভাষ্যভট্টীতে আরম্ভট উ

“কণাধরহণো” শব্দবিদ্যায় শব্দ-সম্ভাবনের বিদ্যায় গদ্যে পুর্বেক ভণই হুক্তি দেখাইয়াছেন (৪)।

প্রাচীরাবি বায়বান থাকিলে শব্দ যে তদা বাহু না, তাহার্য্য যেহেতু কোট-বাহুর পটভরোধঃ। সম্ভাবনী কারণের ভাবতয়া এতুই শব্দের ভাবতয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সাধুত্ব আছে বলিয়াই বীটী-তরঙ্গের দুটায় বেগনি হইরাছে। নতুবা মনের ভাব শব্দের যে বেগবিহ নাই, ইহা আর কে না জানে?

“বীটীসম্ভাবনুত্বিতঃ ক্রিয়াদ্যবাহুত্বাভ্যুতঃ।

ন তু বেগবিহ সম্ভাব্য শব্দাংশুপদাংশুপদবিহঃ”

এই ভাবে তাকিকেরা শিপকের উদ্ধাখিত সমস্ত আপত্তাই সমাধান করিরাছেন।

‘শব্দ শব্দ’, ‘মহান শব্দ’ ইত্যাদির বায়বান হইয়া বলিয়া কেহ কেহ শব্দকে ত্রয়্য বলেন। কিন্তু তাকিক-মতে শব্দ আকাশের বিশেষ ভণঃ—“আকাশত তু বিশেষঃ শব্দো বৈশেষিকো ভণঃ।” তাই বৈশেষিক প্রের শব্দের ত্রয়্যর পত্তি হইরাছে। শব্দ ত্রয়্য,—

“মোহিতহণো যোঃশঃ শ শব্দঃ।”—(২১২১২)

“এক ত্রয়্যর ত্রয়্যঃ”—(২১২১৩)

শব্দ একতম ত্রয়্য আকাশে থাকে, দ্বিতমঃ তাহা ত্রয়্য হইতে পারে না। এখন কোনও ত্রয়্য নাই, বাহ্য একতম ত্রয়্য থাকে। এখন শব্দ হইতে পারে, শব্দ যদি একতম ত্রয়্য আকাশে থাকে, তবেই “একত্রয়্যর ত্রয়্য” বলিয়া শব্দকে ত্রয়্যর পদন করা যায়; কিন্তু শব্দ যে আকাশে থাকে, তাহার্য্য প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে আরম্ভট বলিয়াছেন,—শব্দ অবগোষ্ঠিতমাত্র, এই আরম্ভট তাহা যে আকাশগত, ইহা দিষ্ট হয়। কারণ, কণিবিদ্যাব্যতির আকাশই অবগোষ্ঠিত, ইহা প্রতিশর করা হইরাছে। এখন ইঞ্জিরগতই প্রাপ্যকর্তা; অর্থাৎ ইঞ্জিরের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ না হইলে এতাক হয় না। দ্বিতমঃ শব্দ আকাশে না থাকিলে, শব্দের সহিত আকাশের সন্ধিকর হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে শব্দের একাক অসম্ভব—এই আরম্ভট শব্দ যে আকাশগত, ইহা প্রমাণিত হয় (৫)। তার

(৫) “শব্দ-সম্ভাবনবিরতিপিত ভণতি অদ্বৈতবিশেষলসর্গাপ্যে সহকারিগণনবহাণঃ।” ভাষ্যভট্টী, ২১০ পৃঃ।

“কটতাম্বাহুত্বিতঃকমিতকর্ণগ্যে বায়োঃ শব্দবিশিষ্টকর্ণাভা-
 দ্যাপত্তঃ বাহুবুধসমিতকটীতবানত ভণতি পত্তিকটিকতঃ ভণতি
 বিনাশ্যৎ বা শব্দান্তরাত্তংপত্তেঃ শব্দশব্দান্ধাবিনাশ্যৎ।”

—কণাধরহণ, ১৪০ পৃঃ।

(৬) প্রোক্তমাত্রত্বাৎ শব্দতাকাশগতত্বঃ কথ্যতে। ০ ০ ০
 আকাশগতত্বোপা বি প্রোক্তমিত্রি এপ্রতিবতত্বঃ। প্রাপ্যকটিকটিক-
 প্রিগাণঃ বধ্যতে। ন চাকাশগতত্বিত্বঃ শব্দতঃ প্রোক্তঃ প্রতি-
 ভণতি ন চাপ্রাপ্তত্বঃ প্রণিবিতি তত্রাশ্রিতত্বঃ কথ্যতে।”

—ভাষ্যভট্টী, ২১০ পৃঃ।

গয়, শব্দ যে তপ, এ শব্দে অস্বাভাব্য প্রমাণ। "ভারতীয়াসমী"তে বসন্তাচাৰ্য্য বিলম্বাচেন,—শাখাভাগে, জাতিস্বৰ্গে সতি অস্বাভাব্য বাক্য। চান্দ্রাভ্যাক্ষাণ্য পঞ্চমং" (২০ পৃ.; বোধাই নঃ)—শব্দ তপ, যে হেতু তাহা জাতিবান্ধু এবং আশাশিখর চান্দ্র প্ৰত্যক্ষের বিষয় না হইলও বহিঃপ্রিয়ভক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। বাক্যে। বৃত্তান্ত শব্দ। এমন শব্দ হইতে পারে, শব্দ যদি তপ হয়, তবে—"তথ্য তপ্ত" মহাভাষ্যোপোষিত শব্দ ভাষ্য ইতি কাণ্ডাঃ। অতি বি প্রতীতিবাহ্য শব্দ ইতি।" (ভাষ্যভক্ত, ২০ পৃ.;)—কেনন কথিত। তাহাতে বহাভাব্য তপ থাকে? কারণ, তপে তপ থাকে না, ইহাই কথন-কথনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'বহা' শব্দ এইজন্য প্রতীতি সন্দেহনীয়। এই শব্দায় উক্তের প্রত্যক্ষ বসন্তাচাৰ্য্য বিলম্বাচেন,—"শব্দায় জাতিয় ভাষ্যভাগে: তপ কথনবচনমিতি ন বোধঃ।"—তপে যে তপ থাকে না, তাহার অর্থ, সমাজীয় তপে সমাজীয় তপ থাকে না; তপে তপ থাকে না, শব্দে শব্দ থাকে না, ইহাই 'মিষ্ট' শব্দ।—এই কাণ্ডায় সিদ্ধান্তের সন্দেহ। প্রত্যক্ষ শব্দে বহাভাব্য তপ থাকিবার কোনও বাধা নাই। কেন না, সহস্র পরিমাণ, শব্দে সমাজীয় তপ নহে।

ভাষ্যভাগেবিক্রমিত শব্দ অনিত্য—ভাষায় উৎপত্তি ও বিকাশ আছে। বহিঃপ্রিয়ভক্ত কথিত।

"আশিষ্যভাষ্যভক্তকথন্য তপ্তকথন্যভাষ্যভক্ত"।—(২১২১)

ভাষ্যভক্তকথন্য উক্তভক্ত, 'আশি' শব্দের অর্থ বহিঃপ্রিয়ভক্ত, 'কথন্য'—"আশিষ্যভাষ্যভক্ত: যোনি: কাশন্যমিতি।" শব্দের বচন ভেদী-বচনভাষ্যভোগ বা ভক্তভাষ্যভোগে প্রকৃতি কাশন্য আছে, তখন উহা অনিত্য। যে বহা কারণ থাকে; তাহা বহাশি নিত্য হইতে পারে না, কেবল বহাশি। দ্বিতীয়: শব্দ: অনিত্য: সকারকথন্য বহাশি—এই অনুশাসন প্রমাণে শব্দের অনিত্যের সিদ্ধ হইবে। যদি বস, শব্দের কারণ নাই—কর্তাভাষ্যভোগে প্রকৃতি শব্দের ব্যক্তকথন্য, কথনই 'সকারকথন্য' হেতু শব্দে না থাকায়, তাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হইবে না। তাই বহাশি বিজ্ঞান হেতু অর্থন কথন্যভোগ—'প্রতিষেধক'। 'প্রতিষেধক' অর্থ—'জাতিস্বৰ্গে সতি বহিঃপ্রিয়ভক্ত মৌলিক প্রত্যক্ষবিষয়'। বহা জাতিবান্ধু হইয়া বহিঃপ্রিয়ভক্ত মৌলিক প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা অনিত্য; বৃত্তান্ত বহাশি। শব্দের উৎপত্তি শব্দ, তপ প্রকৃতি জাতি আছে, এবং প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রিয়ভক্তের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয়, দ্বিতীয়: শব্দ অনিত্য। 'জাতিস্বৰ্গে সতি' না বলিলে হেতু ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। কেন না, কেবল বহিঃপ্রিয়ভক্ত মৌলিক প্রত্যক্ষবিষয়, শব্দে থাকে, শব্দের অন্ত্যভাষ্যভোগে আছে, আরও অনেক নিত্য বস্তুতে আছে, তাহাতে শব্দ অনিত্য থাকে না। এইজন্য 'জাতি-স্বৰ্গে সতি' বিশেষ্য ব্রহ্ম হইয়াছে। শব্দ বা শব্দের অন্ত্যভাষ্যভোগে জাতি নাই—"শাখাভাগেবিক্রমিত শব্দ কাণ্ডাভাগে বসন্তা:।" বালক-প্রত্যক্ষবিষয় ও জাতিস্বৰ্গে উভয়ই আদ্যন্ত আছে, কিন্তু তাহাতে শব্দ অনিত্য নাই; এই মত 'বহিঃপ্রিয়' শব্দ দেখা হইয়াছে। আশা

বহিঃপ্রিয় মৌলিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। যোনিয়া আশাশি শব্দার্থে চান্দ্রাভ্যাক্ষাণ্য বহিঃপ্রিয়ভক্তের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, দ্বিতীয়: 'বহিঃপ্রিয়' বিশেষ্য বা ভক্তার কারণ হয় না, তাই 'মৌলিক' বলা হইয়াছে। যোনিস্বৰ্গে উক্ত প্রত্যক্ষ, অমৌলিক। অনিত্যের সিদ্ধি দ্বিতীয়: শব্দভোগের দ্বারা বৃত্তান্ত হেতু করা হইয়াছে—"কর্তব্যবহুগণ্যভোগ"। [শব্দে আছে, "বহাশি শব্দভোগমিতি:"। বহা হেতু প্রমাণ করিয়া বচন অর্থ্যে অস্বাভাব্য প্রমাণিত হয়।] 'কর্তব্যবহু' অর্থ্যে কার্য্য বহাশিতে বহাশি উৎপত্তি অর্থ্যে জ্ঞান হইয়া থাকে, শব্দেও বহাশি হয়, দ্বিতীয়: শব্দ অনিত্য। অনুশাসন আকার এই—"শব্দ অনিত্য কার্য্য প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ বিষয়ভোগ, 'বহাশি'। 'উৎপত্তি শব্দভোগ'—এইভাবে কার্য্যভোগে শব্দের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বহাশি কথন্য শব্দের অনিত্যের প্রমাণও তপ্ত পূত্র কথন্যভোগ,—

"অনিত্যভোগ: কাশন্যভোগ:"—(২১২২)

শব্দের বচন কারণ আছে, তখন তাহা অনিত্য।

যোনিয়াভোগে বসন্ত, শব্দ নিত্য—ভাষায় উৎপত্তি বিকাশ নাই। শব্দ নিত্য হইলে সর্বদা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? প্রত্যক্ষের নিত্য; এমন শব্দও যদি নিত্য হয়, তবে সর্বদা উক্ত বিষয়েপ্রিয়ের শব্দ বর্তমান থাকে। ইহার উত্তরে শব্দের নিত্য-বহাশি বসন্ত, অস্বাভাব্যের দ্বারা উক্ত থাকিলে তাহা বহা শব্দ কেন? সেখানেও বহাশি সতি চান্দ্র: শব্দভোগ আছে। দ্বিতীয়: বসন্ত হইবে, প্রতীতিবি ভক্ত: শব্দার্থে বহাশি ব্যক্ত অর্থ্যে বহাশিভাষ্যভোগ হেতু। সেইজন্য নিত্য শব্দ সর্বদা সর্বদা থাকিলেও ব্যক্তের অন্ত্য বিষয়ভোগ তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। বিলম্বিত বাহ্যভোগাশি শব্দের ব্যক্তকথন্য শব্দের নিত্যভোগে অনুশাসন প্রমাণ। অনুশাসনের আকার এই,—"শব্দা নিত্য: আকাশকথন্যভোগ, তপ্তকথন্য পদমহাশিগণ্যভোগ, অস্বাভাব্যভোগে প্রমাণ, শব্দভোগ" ইত্যাদি।

ভাষ্যভোগের দ্বারা প্রমাণ এই সিদ্ধান্ত বর্তিত হইয়াছে। এই বসন্ত-প্রতীতি মৌলিক শব্দ এই যে, শব্দকে নিত্য বহাশি বাহ্য শব্দভোগাশি বহাশি তাহার অভিব্যক্তকথন্য বাহ্য, তবে বচন ভক্তের অভিব্যক্তি হয়, তখন বহাশি বাহ্যভোগে অভিব্যক্তিগণ্য হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষ বহাশি ভিত্তি ভিত্তি ব্যক্তকথন্য অর্থ্যে বহাশি বাহ্য। বাহ্যায় সমন্বিত, অর্থ্যে কেহ কাহাকেও অগেহ। অর্থ্যে বা অর্থ্যে বহাশি থাকে না, এবং একই ইতিরের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহাশি ব্যক্তকথন্য হইতে পারে না—ভাষায় শব্দসেই একব্যক্তকথন্য। প্রতীতিগণ্য ব্যক্তকথন্য সমন্বিত হইলে বহাশি শব্দভোগ, পরিমাণ প্রকৃতি চান্দ্র হই শব্দভোগেই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহা কেহই স্বীকার করে না যে, প্রতীতি বহাশি শব্দভোগেই ব্যক্তকথন্য, কিন্তু তাহার পরিমাণে ব্যক্তকথন্য। সবত শব্দই একবার আকাশে থাকে, দ্বিতীয়: তাহায়া শব্দভোগ, এবং এক প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহাশি প্রত্যক্ষ হয়। কথনই তাহাশি প্রত্যক্ষের ব্যক্তকথন্য যে ভিত্তি ভিত্তি হইবে, ইহা সিদ্ধান্তেই বহাশি বাহ্য। শব্দকে শব্দভোগ না বলিয়া তাহায়া

গণৎকার

[ত্রিকুম্ভবরজ্ঞন মলিক বি-এ]

(১)

“ও গণক ! চা’ল দিব দেখে বাও আমাদের হাত !”
জাকিল গোলাপ-বধু, বায়ে পাঁড়াইয়া স্বামী-সাথ ।
চেন না ওদিকে তুমি ? ও পাড়ার উঠানের ঘর ;
ওই দেখ, দেখা বার তরলতা ঢালের উপর ।
উঠানেরি আছে সেই পোষ মানা কোকিলটা থালা,—
ছোট পাঁচা, খোলা খাঁর, তবু রয়—এ কি ভালবাসা !
ওহেরি কুকুর ‘ভরো’ ও-পাখীকে আগলায় তাই,—
বিচাল কুকুর কারও সাধা নাই ও-বাড়ীতে ঘাই ।
ওই কোকিলারে বধু খেতে দেয় নিজে গ্রন-ভাত,
কুকুর পাঁছারা বেধ,—কোকিলটা ডাকে দিন রাত । •
চল ঘাই ছইতেনে একবার আমি গিরে গুনে,
গণক কি বলে বার উঠানের হাত দেখে শুনে ।

(২)

গণক বধুর হাত একদৃষ্টে নিরখি আবার,
জাকিল বারেক কাছে কর্ণ-রত স্বামীরে তাহার ।
হাতখানি লয়ে তার পানী-পানে পড়িল নরন ;
কুকুর ধুকিছে কাছে, খাঁচা-তলে করিয়া শয়ন ।
গণক বিষয় হয়ে বহুক্ষণ পরে বলে তবে,—
“মা লক্ষী, আন্টিকে থাক্ বলিতে অনেক ঘের্ হবে ।”
বিপদ-সঙ্কিতা বধু প্রান মুখে আগ্রহে স্থান
“হাঁপা বাপু বল, বল, হবে না ত তাঁর অকল্যাণ ?
খান্নুক হাতের গোহা, হে ঠাকুর, কর-বর দান—
অসমান করিব না, এনে দিই ঢালু গুয়া পান ।”
গণক ঈষৎ হাসি বলে, “মা, নারিক কোনও ভয় ;
শিঁদুর উজ্জল তোহ, শাঁখা তোর হইবে অক্ষয় ।

• উল্লানিতে ওই গোরালার বাড়ীতে এসেই সে কোকিল ও কুকুরটা আছে ।

(৩)

“গুন মন দিয়া, আমি গুত-মুদ-কথা বলি আন্ট ;—
তুমি ছিলে রাজ্যস্বামী, ওই গোপ ছিল মহাধর্ম ।
রূপ-বৈভবের মোহে বুক ভরি ছিল অকৃত্যর ;
যোকনি দ্বীনের যথা, ব্যপিতের বেদনা অপার ।
শ্রিয় সে গারিকা তব পিঙ্করের নাকে ধের ওই,—
বিনুচ্চ প্রণবী তার ও কুকুর, সে বিলাস তই ।
আমি সে ভিখারী অন্ধ, কুৎসিত,—পাতিহু ছটা কর ;
বেশীর ভাঁড়ারে দিল তোমাদের দারুণ কিস্তর ।
গারিকা পুণার তরে হাসিয়া দারিল ছল ছুড়ি—
বোবে, অভিমানে আমি অভিশাপ দিহু কর ছুড়ি !
ছুদি হতে পড়ে গেল কেমনে যে ভিখা-লব্ধ চাল,
কাঁদিলাম বিকারিয়া, দিক্ বিধি, দিক এ কপাল !

(৪)

“তার পর এই ক্ষম,—সহিবারে সৈন্তের পীড়ন,
ধরিত্রের গৃহে অগ্নি পল্লীপ্রানে অগ্নেহ চূষন ।
ভুলিতে পারো নি মায়া,—গারিকা এসেছে হয়ে শিক্ ;
অবোধ প্রণবী তার এই সেই শূরনের ঠিক ।
আমি দিয়া অভিশাপ হারালেম সব পুণ্য-ফল ;
গণক হইয়া কিরি ভিকারবৃত্তি করিয়া লল ।
হারা চা’লু নিতে হায় কর্ণকলে ঘুরিতেছি বেশ ;
আন্ট হেঁতা দেখা হলো, একত্র সবার সদাবেশ ।
মাও না চাউল লাও, হও মুক্ত, কর মা উদ্ধার—
বার-বার বরা মাঝে আদিত হই না যেন আর ।”
কথা শুনি চা’ল দিয়া ফেলে বালা নয়নের শোর ।
আমরা ভাবিহু হাসি, এ গণক পাকা কুয়াচোর ।

বউ-মা

[ব্রীজপেশনাথ রায়চৌধুরী]

একমাত্র পিতৃহীন পুত্র—মাতৃভক্ত বেহের বিপিনের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিবার আশায় মহামারা এমন কোন খেতাব বা কী রাখেন নাই, বাহার উদ্দেশ্যে তিনি দিনে সপ্তসবার প্রণাম না করিয়াছেন। কারণ আর বিশেষ কিছু নহে—বিপিন কাপ-খোড়া ত নগ্নই, ভা'ভাড়া তাহাকে দেখিতেও যে নেহাত কুৎসিৎ এমন কথাও বলা যায় না। তবে, বিপিন কার্যেই ছিল, কিন্তু একটীও পাশ করিতে পারেন নাই; ইহা ভিন্ন বিবাহের তেমন সঙ্গতিও নাই,—কাজেই যোগ্যে পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে মুখী করিয়া বাইতে পারেন, বাহাতে তাঁহার হৃদয় পর বিপিন ভাবিয়া না যায়, এই সকল কারণেই তিনি পুত্রের ঈশ-ঈশ বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রাত্তা দিয়া কোন বর বাইতে দেখিলেই, তিনি নিঃশ্বাস কেঁদিয়া ডাকিয়াছেন—আহা! ত'ল'ব মায়ের সেহিন কি আনন্দ! এমন দিন তাঁহার কবে আসিবে!

‘দিন’ আসিল, আর, না; আসিবেই বা কেন? সংসারে কেবল যে তিনিই গরিব, তাঁহার বিপিনই যে মুখ, তাহা ত নহে! তা’ ভিন্ন, তিনি ত আর কোন রাক্ষসকে ঘরে আনিবার আশ করেন নাই! প্রত্যয়ে ‘দিন’ আসিল,—শুভদিনে শুভকালে বিবাহও হইয়া গেল। যিনি বিপিনের স্বপ্ন হইলেন, তিনি ছ’গোড়া গৃহস্থ হইলেও এই বিবাহে তিনি সাধামত ‘দান’ বিস্তৃত করিলেন না। মহামারাও নিজের ভাড়া আনন্দ ভাবিয়া সাধের বোমার ছ’-এক-খানি গরমা গড়াইয়া দিলেন। এ বিবাহে উভয় পক্ষই আনন্দিত হইয়াছিলেন।—বিপিন বাওসার দিন-দিন উন্নতি করিতেছিলেন বলিয়া স্বপ্নের মতামত বুঝি আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঘেরেকেও গৃহস্থের স্বভাব ‘কপের ডানি’ বণিলেই হয়; প্রত্যয়ে, মহামারারও বঁধু পাইয়া যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা মুখে বলিয়া বুকান কঠিন। তাঁহার আরও আনন্দের কারণ এই যে, তিনি দেখিয়াছিলেন,

বো-মা যে পরিমাণে ‘রূপ’ লইয়া আসিয়াছিল, সেই পরিমাণে স্তম্ভ আসিয়াছিল।

(২)

মহামারার বাড়ীখানি ছোট হইলে কি হয়, সেখানি বেশ পরিষ্কার, স্বচ্ছ, একতলা বাড়ী। ছাতে কাপড়-জামা হোস্ত্রে দিবারও সুবিধা। বো-মা প্রতিদিন দুপুরবেলা স্বাস্ত্যকীর গঙ্গা-নাওয়া কাপড় ভলে কাচিয়া লইয়া ছাতে হোস্ত্রে দিয়া আসিত। এই সময় পাশের বাড়ীর একটি তাঁহার সহবরতা বো শান্তও ছাতে আসিত। কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের ছাত্তরের বেশ আলাপ হইয়া, ক্রমে সেই আলাপ ভালবাসার পরিণত হয়। তার পর, ও এর বাড়ী, এ ওর বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে শুরু করিয়া যায়।

বো-মা আর দুপুরবেলা এ-বাড়ী বেড়াইতে আসিল। ইহার পূর্বে সে শান্তর বাড়ী আর ছই দিন মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিয়া বাড়ীতে পা দিবারাত্র শান্তর স্বাস্ত্যকী বলিলেন—“এস মা এস, বস!” বো-মা তাহাই করিল, তাঁহার আদেশ মত তাঁহার পাশে গিয়া বসিয়া মুখখানি ছোট করিয়া রাখিল। শান্তর স্বাস্ত্যকী বিনোদিনী বোমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—“আহা, তোমার মুখখানি এত শুকিয়ে গেছে কেন পা? কোন অম্ল-বিম্ব ক’রেছে না কি?”

বো-মা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—“ঠিক, কিছু হয়নি তা।”

এই কথার বিনোদিনী বলিলেন—“হয়নি কি গো—এমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—তোমার মুখখানি এতটুকু হয়ে গেছে,—আর বলত কিছু হয়নি। তা’ আমাদের কাছে হুকিয়ে আর কি করবে বাছা,—কি হায়েছে তা’ বুঝতে কি আর আমার থাকি আছে? তোমার স্বাস্ত্যকীর স্তম্ভ ত আর

আমাদের কাছে চাপা নেই। তা' বেশ যে তুমি বাকী—
এত খাবার-পয়বার কষ্ট দেয়, তবুও বোধ করি বিপিনকে
কেমন কথা বল না, না?"

এই ভাবে আরও কত কথা বলিয়া যাইতেছিলেন,
কিন্তু যে মা আর চুপ করিয়া যেমনসী খণ্ডকীর নিশ্বাস
তুলিয়া যাইতে পারিল না। তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—
“ও কি বলছেন আপনি? হাত আঘাত কত ভালবাসেন
—লোকের নিজের হাত বোধ করি এত ভালবাসতে পারে
না—ও আপনি ভুল বলছেন।”

বিনোদিনী অল্প তাচ্ছিল্য ভাবে কাঠ হালি হালিয়া
বলিলেন—“হু পাখী! সেই কথার বলে না—‘মা’র চেয়ে
বে ভালবাসে, তা’রে বলে তা’ন—ঐ মুখে আসি ক’রে-
ক’রেই ত তোমার মাথা খাচ্ছে—তুমি ওকে এখনও ঠিক
বুঝতে পার নি মা, তবে বলি শোন’ তোমার খাতকীর
কাণ্ডওনা—” এই বলিয়া তাহার খাতকীর এক স্তম্ভ
কামনিক কাণ্ড গুনাইবার লজ্জা প্রস্তুত হইয়া, উপর দিকে
হুই হাত তুলিয়া, হাই তুলিতে-তুলিতে আলস্ত ভাবিয়া
গইতে লাগিলেন। এই অবসরে যৌ মা বলিয়া উঠিল—
“আচ্ছা, আল আর তা’ হ’লে শোন হ’বে না—কাল
তনুবা। আল আঘাত এতদিন যেতে হ’বে, বাড়ীতে কাজ
আছে—”

সেই দিন হইতে বিনোদিনী যৌ-মার উপর জ্বলন্ত্রোষ
হইলেন; তাহাকে জ্বল করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।
ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহার হুই চারিঘন সহযোগিনীও আসিয়া
জুটিল।

(৩)

তিন চার মাস কাটিয়া গেল। এই সময়ের ভিতর
বিনোদিনী এবং আরও হুই চারিঘন জীলোক মহামায়াকে
বৌমা’র নামে কত কি বলিয়াছেন, তথাপি তিনি বৌমা’র
প্রতি কিছুমাত্র অনুরক্ত হন নাই; বরং যৌ-মা ভাল
বলিয়াই যে পাড়ার পাঁচজন বেংসা করিয়া তাহার নামে
ঐ ভাবে মোহাচোপ করে, ইহাতে তাঁহার কোনই সম্বন্ধ
নাই। স্ত্রুকাং, তাঁহার তাঁহাকে বতই বলেন, তিনি
তাঁহাদের দুব্বের উপর বিশেষ কিছু না বলিলেও, মনে-মনে
বৌমা’কে ততই অধিক ভালবাসেন।

কিন্তু বৌমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ বলিয়া, তাহার ভাগ্যে

এ মন্দ বেনী দিন হুয়াই হইল না। এখানে একটা কথা
বলিয়া রাখি। মহামায়া এদিকে যেমন মাহুই হইল,
তাঁহার কিন্তু একটা মনঃস্বপ্ন এট ভিল যে, তিনি প্রাণান্তেও
বৌমা’কে বাপের বাড়ী পাঠাইতেন না। তাঁহার পিতা
তাঁহাকে লইতে আসিলে তিনি বলেন—“না, একে পাঠিয়ে
আমি একদণ্ডও চিন্তিত পাব না।” আর নিজে বাবাও ভুলে
এত ভাড়াভাড়ি কেন?—ছ’চাব বছর যাক না, ভোগেপালে
গোক, তখন ছেলে বেগাতে বাবে,” ইত্যাদি তিনি আর
কিছু বলিতে পারেন না;—“আচ্ছা, আপনার যা বিবেচনা
হয় তাই করুন” বলিয়া খুদ্ব মনে করিয়া যান। বলা
বাছ্যা যে, বুদ্ধা খাতকীকে একা রাখিয়া যাইতে বৌমা’রও
মন সরে না। কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার ভাগ্য যে
নিতান্তই মন্দ। তাই তাহার ভাগ্যে খাতকীর এমন দেহও
বেনী দিন ভোগ হইল না।

যে বিপিন শস্তর-বাড়ী বাইবার নামে যুধ বেকাইত,
সেই বিপিন আল একমাসেক ভিতর প্রায় ৩৪ বার শস্তর-
বাড়ী ব্রিগা আসিয়াছে। মহামায়া যৌমা’কে পাঠাইতে
না চাহিলেও, বিপিনকে কিন্তু মাঝে-মাঝে শস্তর-বাড়ী
পাঠাইয়া, কে কেমন আছে জানিয়া আসিতে বলিতেন।
তাই প্রথমবার মহামায়া তাহাকে কত সাধা-সাধনা
করিয়া শস্তর-বাড়ী পাঠান; কিন্তু দ্বিতীয়বারে তাহাকে
একটাও কথা বলিতে হয় নাই—সে-নিজের ইচ্ছা
গিয়াছিল। তাহার পর হইতেই সে যেন কি রকম হইয়া
গিয়াছিল। তার পর আবার গেল; এবার আরও যেন
কেমন হইয়া গেল। তার পর পাঁচদিন না যাইতে-যাইতেই
একদিন সে যখন শস্তর-বাড়ী বাইবার লজ্জা বেশ-প্রতিবর্তন
করিতেছে, তখন মহামায়া বলিলেন—“বিপিন, এত বন-
ঘন শস্তর-বাড়ী যাওয়া কি ভাল বাবা! হিঃ! যান থাকুবে
কেন?” এই কথার উত্তরে তিনি বাধা তুলিলেন,
তাঁহাতেই তাঁহার মন হুয়াই গেল। বুঝিলেন, বিপিন
এখন আর সে বিপিন নাই;—অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে
যাধা বটে, ছেলের বিবাহ দিয়া তাঁহার ভাগ্যও তাঁহাই
যটিয়াছে—ছেলে পর হইয়াছে। শস্তর-বাড়ীর পাঁচজনের
পাঁচ কথা তুলিয়া-তুলিয়া এখন সেবাদিকার টিকটিকি
পৃথক তাহার প্রায় হইয়াছে।—আর না? যে মা আপনার
আপ চাশিয়া, আমীর দুকুর পর তাঁহাকে বুকে করিয়া

মাহু করিলেন, সেই মা-ই এখন মরিলে বোধ করি তাহার ভাল হয়। হায়! কেন তিনি ছেলের বিবাহ দিয়া-ছিলেন!

কি জানি বিগিনের কি দুর্ভাগ্য হইল! আজকাল সে প্রায়ই এটা-ওটা লইয়া কখন বা 'দুঃচার দিনের সন্তে' পাঠানে কতি কি? ইত্যাদি বলিয়া মাহের সঙ্গে কণ্ডা করিতে লাগিল। ইহার ফলে, দুগণ্ড মহামায়ার মনে অশান্তি, যৌ-মার মনে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা এবং শত্রুদের মনে এক অপূর্ণ আনন্দের উদ্বল হইতে লাগিল।

এক দিন মহামায়া আহারান্তে সেই পূর্বোক্ত বাসন-বাড়ী আসিয়া, বিমর্ষ ভাবে একখানি শিঙাও না পাতিয়া মাহের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। একজন তাঁহার অশান্তি-কাতর মুগ্ধানে চাহিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল—“আহা, দিদির মুখ দেখিলে আর দিগিকে চেনা যায় না গো! তা হ'বে না? ঐ ছেলেকে কি কন কঠে মাহু ক'রেছে গো—আমরা ত সবই জানি।—সেই ছেলে এখন কি না দিন পেয়ে এন্নি ক'রে! তুমি মা-ই বল দিদি, তোমার ঐ সোহাগের যৌ-মাতা হ'তেই এই কাণ্ড ঘটল কিন্তু। মেয়ে দেখেই শাস্ত্র মা এখন সেই কথা বলেছিল, তখন আমরা সকলে তার উপর রেগে গিয়া ছুঁতাম,—কিন্তু এখন দেখি তার কথা একটা-একটা ক'রে মিলে যাচ্ছে।” আর একজন বলিল—“মিলবে না! বলে কাণ-ভাষানিতে যেবতারা শুধু বন ব'য়ে যায়,—ত বিপিন ত কোন ছা!”

“তা' হোক বাবু—বললে দিদি রাগ করবে, এমন যৌ-বোটা—”

মহামায়া আর নিজেই সাদ্দালাইতে পারিলেন না। তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—“ওগো, এমন কথা বল না গো—ওরা আমার পর হোক আর মা-ই হোক, তবু বেঁচে থাক, সুখে থাক—আমি আর কখন দিদি—” বলিতে বলিতে হাট-হাট করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বাড়ীওড় প্রায় সকলেরই বস্ত্র ছাড় পড়িল বেচারী যৌ-মার উপর! একজন অদিয়া উঠিয়া বলিল—“চল ত্র একবার দেখি, কেমন ঘরের মেয়ে সে—তার বাবার ঘরে দেখিয়ে ছাড়ব না!” এইরূপে আরও কত কথা বলিতে-বলিতে তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন—

“তোমাদের এখানে এসেও যদি একটু মন না হই, তা হ'লে আমি আর ঘাই কোথা যা?”

যৌ-মার উপর এখনও তাঁহার অচল বিশ্বাস দেখিয়া, হ'—একজন মাত্র মনে-মনে বুড়ীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল; আর বাকী সকলেই তাঁহার উপর হাড়ে-হাড়ে অসিয়া গিয়া বলিল—“ঐ আন্তিতেই ত ম'রেছে তুমি!”

(৪)

কে জানিত সত্য-সত্যই মহামায়া যৌ-মার প্রতি একই নির্দয় হইবেন? যে যৌ-মার চোখে মল না থাকিলে, মহামায়া পিপাসা নিষিদ্ধ না,—কে জানিত, সেই যৌ-মার চোখা মলও আর তিনি লক্ষ্য করিবেন না—সে মল দিয়া কাজ করা ত দূরের কথা!

তাঁহার এইরূপ ভাবান্তরের কারণটি বুঝিতে যৌ-মার কিছুমাত্র থাকি ছিল না। সে নিজের মনে বেশ ব্যথিতা-ছিল যে, তাহার স্বামী যদি ঐরূপ না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার স্বাতন্ত্র্যকে তাহার প্রতি এত কঠোর করিয়া তুলিতে পারিত না; কেন না, এতদিনও ত তাহার এই সর্বনাশ ঘটাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পারিষ্কার কি? বাধা হইক, এখন আর সে কি করিতে পারে? ঈশ্বর মুখ তুলিয়া না চাহিলে, তাহার ত কোনই উপায় নাই! কেন, এক কাজ করিলে হয় না? স্বামীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া, তাহার পা ছুটি ভড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে পূর্বের মত ভাল হইতে বলিলে হয় না? না—না, তাহা হইতেই পারে না। প্রথমতঃ, তাহাতে কোন ফল হইবে কি না, ঠিক করিয়া বলা যায় না; তা ছাড়া, এ কথা সে-ই বা স্বামীকে বলিলে কেমন করিয়া? হায়, হায়! সে এখন কি করিবে? কি করিলে স্বাতন্ত্র্যের নিকট সে আবার পূর্বের মত বিশ্বাসী হইতে পারিবে,—তাঁহার ভালবাসা পাইবে? হায়! কে তাহাকে বলিয়া দিবে, সে এখন কি করিবে?

এইরূপ ভাবিরা-চিন্তিয়া যৌ-মাও আর কিছু না বলিয়া, ভায়ালাগে দ্বন্দ্ব লইয়া বোনভাবে দিন কাটাইতে লাগিল।

মহামায়ের উপর মহামায়ার দুগা অসিয়া গেল। তিনি এখন,—কি দেখিয়া জানি না—বেশ বুঝিতে পারিলেন যে,

তিনি সংসারে থাকিলে, শোক-সজ্জার ভয়ে কিছু বলিতে না পারিলেও, বিপিন মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইতেছে। তাহার মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই, তখন এ সংসারে থাকিয়া তাঁহার কল কি? কোন ভীষণে বাটরা ভিক্ষা করিয়া খাইয়াও অবশিষ্ট জীবনটুকু কাটিয়া দেওয়া ত ইহা অপেক্ষা খুবই ভাল। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহারই করিতে মনস্থ করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বেশ দুখোপও কুটিরা গেল।

তিনি লেন, পূর্ষ হইতেই ও-পাড়ার পাঁচ-ছয়জন বৃদ্ধ একত্র হইয়া বৃন্দাবন বাইবার গুপ্ত প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, “আমিও যাব” গো।” (অবশ্য তাহার আশঙ্কিত না যে, তিনিও বাইতে চাহিবেন।) মহামায়া তাহাদের নিকট বাইব বলিয়া কথা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত মনোভাব কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না;—কি জানি, যদি কোন বাগা পান।

সন্ধ্যার পর কিছু টাকার গুপ্ত প্রস্তুত করিলেন, “বাবা বিপিন, ওরা সব বিন্দাবন যাচ্ছে,—আমি বলিচি, আমিও যাব; তা আমার কাছে ত কিছু নেই; বা” ছিল সবই ত ডোকে করিবার করবার জন্যে যার ক’রে বিধিচি—এখন কিছু টাকা সে না আমাকে—তোর পুণিা হ’বে।”

বিপিন বলিল, “তোমার পাঁচ টাকা—আমারি বলে মাথার ঘারে কুহুর পাগল—ক’মাস ধরে একটা পরসার খুঁষ খেতে পাচ্ছিলে। আমার বিন্দাবন বাবার সাথে কেন?”

বৃদ্ধা সর্ধারত হইয়া বলিলেন, “তা’ আর পারবি কেন বাবা!”

কিছুদিন হইল, বিপিন খ্রীঃ গুপ্ত একঝোড়া ‘অনন্ত গড়াইতে গিয়াছিল। এখনও তাহার ‘বানি’ বেওয়া হয় নাই, ‘বানি’র টাকা গতেই আছে। এখন মায়ের ঐ উক্তরে সে মনে করিল, না বৃষ্টি সেই টাকার কথা ভাবিয়াই ঐ ভাবে টিটুকারি দিলেন। রাগে অগ্নিরা উঠিয়া সে বলিল, “হ্যাঁ,—হ্যাঁ, না থাকলে কি তোমার সঙ্গে ছুরি কর্তে যাব না কি?”

মহামায়া বুঝিলেন, ইহার উপর আর একটা কথা করিলেই, মহামায়া কাণ্ড বাধিয়া দাইবে। কাজেই সেব সদর আর স্বপড়া বাড়িয়া কোনই ফল নাই ভাবিয়া

মহামায়া চুপ করিলেন। তার পর তাঁহার বে ‘হা’র তোলা ছিল, সেই ‘হা’র গোপনে বিক্রয় করিয়া সেই টাকা লইয়াই এ সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু আর দিন নাই—কাল-ই তাহার রওনা হইবে। শেষে তাবিলেন—যেখা বাউক কতদূর কি করিতে পারেন। আর বাউক ত আগে কাটিয়া বাউক; তার পর কাল বা’ হয় হইবে।

আজ আর মহামায়ার চক্ষে নিস্তা আসিল না। আজ তাঁহার মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কাল তাহাদের সহিতই তাঁহাকে দাইতে হইবে। তাহা না হইলে, পরে তিনি একা বাইতে চাহিলে, পুজই বা ছাড়িবে কেন? আর ছাড়িলেও তিনি বাইবেন কেমন করিয়া? কি করিয়া কি যে করিতে হয়, তিনি ত কিছুই জানেন না। সুতরাং যেমন করিয়াই হউক, কাল তাঁহাকে তাহাদের সহিত দাইতেই হইবে। বাহা হউক, টাকার চিন্তা ত বা হয় একরূপ হইয়াছে; এখন যাতে আর কি কি সঙ্গে লইতে হইবে, তাহার ত কিছুই ঠিক হইল না। বিশেষ কিছু লইবার আবশ্যক না হইলেও, হ’একখানি কাপড় ত সঙ্গে করিয়া লইতেই হইবে।

এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে সংসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, একখানি কাপড় রান্না-ঘরে তুকাইতেছে। সত্যলো এ সব যাকে কাণ্ড করিবার সময় পাইবেন না ভাবিয়া, এখুনি এগুলি গুছাইয়া লইবার ইচ্ছা করিলেন। রাত্রিও অনেক হইয়াছে,—বিপিন, বৌ-মা নিশ্চয়ই নিদ্রিত; সুতরাং এ সব যাকে কাণ্ড করিয়া লইবার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত অবসর। তা ছাড়া, ‘হা’রটাও ত বাহির করিয়া রাখিতে হইবে; তাহাও করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর ভাল সময় কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। জ্যোৎস্নালোকে ক্ষুদ্র বাড়ীখানি বর্ণ-বর্ণ করিতেছিল। তার পর তিনি বখন রান্নাঘরের দরজার দাম্বে আসিলেন, তখন—এ কি! স্পষ্ট স্তনিত হইলেন, বৌ-মা কুছতাবে বসিতেছে—“* * * সুখোব না। তোমার জন্যেই ত এই সর্বনাশ বাড়ে। সমস্ত দিন বখন কেঁদে-কেঁদে মরি, তখন ত কৈ খেতে আস না?”

ইহার পর কি কথা হয় স্তনিবার গুপ্ত তিনি স্পষ্ট

ছুরে আপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর সুখে ঐ কথা তুলিয়াই বিপিন উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, “কেন—কেন, বুঝি এটি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে—তোমাকে গলাগাল দেয়?”

বৌমা জবাব দিয়া উঠিয়া বলিল, “না’র সঙ্গে তুমি এমনি করে-ক’রেই ত আমার সর্জনগণ করেছ। এতদিন তোমার কিছু বলিনি, কিন্তু আর ত চুপ করে থাকতে চলে না!”

বিপিন বোধ করি এখনও ভাঙার মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্তিতে পারিল না। বলিল, “কেন, আমার সঙ্গে ঝগড়া হয় ব’লে, তোমাকে বকে বুঝি?”

বৌমা বলিল, স্বামীর চোখে আঙুল মিহা না বলিলে, সে বুঝবে না। বলিল, “আজ আদি রক্ত-গঙ্গা হ’রে মন্মথো—তুমি উক্টো বুড় কেন? আগে না আমার মনে-মনে কত ভালবাস্তেন,—আজকাল তোমার অন্তরেই ত আর আমার সঙ্গে ভাল ক’রে কথাও কন না।”

বৌমা জানিত, স্বামী মনে-মনে না’র প্রতি বড়ই ক্রুদ্ধ হইক না কেন, কিন্তু গোক-লজ্জার ভয়ে সে বড়-একটা কিছু নিজের ইচ্ছায় করিত না। তাই বলিল, “আমিই ত মা’কে বলিছি, বাপের বাড়ী যাব না,—তাই ত মা আমার পঠান না! তা’র জন্যে তুমি কেন মার সঙ্গে ঝগড়া কর? এত যদি তাঁমার পাঠাবার দরকার হয়, ত তুমি নিজের ইচ্ছায় কেন পাঠাও না? আজকাল যাবের চেহারা কি রকম হ’য়ে গেছে দেখতে পাও না? এমনি ক’রে চুপ করে-ক’রে আর কিছুমাত্র থাকলেই মা যে মারা পড়বে। তুমি এমন করে যাবের সঙ্গে আজকাল ঝগড়া কর কেন বল ত? আগে ত এমন ছিলে না! আমার পিঙ্গী বুঝি তোমাকে এই সব ক’রতে ব’লেছে? আমাকে অবিশ্বাস করার যাবের ত কোনই দোষ নেই,—তুমি এমনি কর ব’লেই ত উনি মনে ক’রেচেন, আমি তোমার এই সব ক’রতে বলিছি—উনি ত আর জানেন না, তুমি পিস-খাতকীর কথায় এমনি ক’রছ?” বলিতে-বলিতে সে কোঁস-কোঁস করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এতক্ষণে বিপিনের তুল ভাঙিল। যে স্ত্রীর সুখে এতদিন সে এ তাবের একটা কথাও শুনে নাই, আজ সেই স্ত্রীর সুখে সহসা এতগুলি কথা তুলিয়া, সে অতিশয় বিস্মিত

হইয়া বলিল, “বেশ, তার অন্তে এতদিন ত কিছু বলনি, আজ হঠাৎ এত ক’রে বলছ—তার কারণ কি?”

“কারণ কি! আজ মা কিছু টাকা চাইতে, তুমি এমন ক’রে উঠলে কেন? টাকা নেই তোমার? কাল ভোরবেলা যদি মাকে টাকা না দাও ত দেখবে কেমন সেই ছাইরের অনন্ত আমার পরাণে পার। ঘরে কেলেও অনন্ত আর ছাইরনেও ছোঁব না।”

বিপিন মহাঘৃণে পড়িল। সত্য-সত্যই ‘বানির’ টাকা ভিন্ন আর তাহার হাতে টাকা নাই। হ’একদিনের মধ্যেই অনন্ত লইয়া সেত্বা আসিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, “না—না, সত্য বলছি, আমার কাছে টাকা নেই,—আমার কথা বিশ্বাস কর না।—”

স্বামীর এই কথার বোধ করি তাহার চক্ষে জল আসিল। বলিল, “ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আর তুমি না’র সঙ্গে এমন বাতাল ক’রো না—আমি তা হ’লে মরে যাব। বেশ, টাকা নেই বলছ ত, এক কাজ কর মা!”

“কি কাজ?”

“আমার বাস্তব যে বিয়ের ‘কাপ’ তোলা আছে, তাই বাধা রেখে কাল মাকে টাকা দাও না—মা কিছুই জানে পারবেন না।”

“না—না, তা কি হয়—আজ্ঞা সে কাল বা’ হয় হ’বে এখন। তুমি সুন্দাও, অনেক রাত হ’য়েচে—আমার হঠাৎ ঘুমটা না ভেঙ্গে গেলো, তুমি যোধ হয় সমস্ত রাতটাই অমনি ক’রে ব’সে ব’সে কাঁদতে?”

ইহার পর আর কিছু শোন গেল না। মহামায়ার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়া পড়িল। আর রাত্রা-খং না চুকিয়া আঁতে-আঁতে নিজের ঘরে আসিয়া বিশেষে দরজা বন্ধ করিলেন।

• • • • •

পর দিন ভোরবেলা বিপিন কোণা হইতে কিছু টাকা আনিয়া যাবের হাতে দিল। মা সে টাকা লইতে কিছুমাত্র অস্বীকার করিলেন না। তার পর বেলা হইলে প্রায় পাণ্ড জন বৃদ্ধা বৃন্দাবন হাইবার অন্তে প্রস্থত হইয়া এ বাড়ী আসিল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই বলিল, “কি গো বিপিনের মা, যাবে যে, না কি খালি হুবেই—”

কাল রাত হইতেই স্বাভাবিক বাইবার বাসনা তিনি মন হইতে একবারেই ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন কি করিবেন? বাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও, এখন কথা শিলাছেন, তখন তাঁহাকে বাইতেই হইবে। তাই বলিলেন, “হ্যাঁ তাই, বাব বৈ কি—একটু বাড়াও।” তার পর বৌ-মাকে ডাকিয়া বলিলেন, “তবে এখন আসি না—সব রৈল, দেখো গুনো; শক্ত মূখে ছাই দিয়ে তুমি ত নেহাত ছেলেমানুষটা নয়। তবে আমি—দেখো আমার বিপনের ঘেন কোন কষ্ট না হয়।”

বৌ-মার চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল। কি জানি কেন, তাহার মন হু হু করিয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে উঠেল অঙ্গ গোপন করিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া বলিল, “কবে আসবেন না?”

মহামায়া জানিতেন না, কবে আসা হইবে। তাই তাহাদের মৃগণে চাহিলেন। তাহারা বলিল, “কদিন আর—খুব জোর দিন পনের।”

তার পর তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়, বৌ-মা এখন হেঁট হইয়া স্বাক্ষরী পাথের ধূলা মাথার দিতে গেল, তখন হুই ফোঁটা তপ্ত-অঙ্গ মহামায়া পায়ে পড়িল। তিনি বলিলেন, “কীট কেন মা—হিঃ! আমি ত আবার আস্বে।” এই বলিতে-বলিতে চুপা নামে মৃগণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। হাঃ! বাইবার সময়—মহামায়া বৌ-মাকে পূর্বাগে আবারও যে কত অধিক পরিমাণে ভালবাসিয়াছিলেন, আপনায় অপেক্ষা তাহাকে অধিক বিশাল করিয়াছেন—এ কথা তাহাকে বলিয়া বাইবারও সময় পাইলেন না।

(৫)

স্বাভাবিক আসিয়া ছয় সাত দিন মহামায়া যে কি করিয়া কাটাইলেন, তাহা আর কি বলিব। বৌ-মা সদাশরুণাই তাঁহার চোখে-চোখে ফিরিতেছে। কেন তিনি আদিবার সময় তাহাকে কিছু বলিয়া আসিলেন না? তাহা হইলে হয় ত এখানে আসিবার সময় মন এক ব্যাপক হইত না। হায়! এত দিন তাহার প্রতি তিনি কতই না নির্ভর রাখার করিয়াছেন। সেই একদিন, যে দিন বৌ-মা তাঁহার পা দুইয়া দিতে আসিলে, তিনি এখন বলেন, “না না, অত কষ্ট ক’রে কাজ নেই—আমার পা দুয়ে দিতে হ’বে না।”

তখন সে তাহা করিবার মত কতই কাকুতি-মিনতি করিয়াও এখন কোন বল হইল না, তখন সে কামিতে-কামিতে বলিল, “আমার এমন সর্বনাশ কে করলে না?” হায়, তাহার মূখ এমন কথা শুনিয়াও কি করিয়া তিনি মৈত্রী ধরিয়া ছিলেন।

এইরূপ ভাবিমা-ভাবিমা তিনি কতাইয়া বাইতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার “এ কান্নাবাদ” অসহ বোধ হইতে লাগিল।

আট দিনের দিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন বাড়ী আসিয়াছেন। বৌ-মা যেন ছল-ছল মেয়ে বলিল—“এত বেগী ক’রে এলেন কেন মা—আমার যে বড় ভাবনা হ’ছিল।” বৌ-মা’র কথা শুনিয়া তিনি যেন মনেহে তাহার ঠান মূখে চুষন করিয়া, তিনি যে তাহাকে আবার ভালবাসিয়াছেন তাহাই একটা-একটা করিয়া বলিলেন। তারপর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—“এত দিন যা ক’রেছিলুম, তার ভুলে মনে কিছু তরিসেন মা।” তাঁহার কথায় সে চক্ষুগুলে বুক ভাসাইয়া তাঁহার কোলে বুক লুকাইয়া কামিতে লাগিল। তিনি তাহাকে মাখনা দিতে বাইবেন, এমন সময় তাঁহার মিত্রা ভদ্র হইয়া গেল। আর মিত্রা আসিল না। সমস্ত রাত ছট-কট করিতে লাগিলেন।

সকালে উঠিয়া কোন মতেই এই শ্রীধর বৃন্দাবনে আর একমুণ্ডও থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। তাঁহার চোখে সমস্তই যেন শব্দানের স্রাব বাঁ বাঁ করিতে লাগিল। সন্ধীয়েই কত করিয়া বাড়ী ফিরিবার মত বলিলেন। প্রথমটা সকলেই—“ভাল দোতকে সঙ্গে ক’রে এনেছিলুম বাবু” বলিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে হুই অন তাঁহার সহিত বাড়ী ফিরিতে রাজী হইল।

ষ্টেশনে নামিয়া অপর দুই অন পায়ে হাঁটাই বাড়ী বাইতে চাহিল। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, বাহাতে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়াটা মহামায়া একাই বহন করেন। তাহাই হইল। মহামায়া বলিলেন—“না বাবু, আমি গাড়ী কভি—আমি বাড়ী পৌঁছতে পারো বাঁচি।” গাড়ী করা হইল। হু হু শব্দে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর গলির মোড়ে থামিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া কাপড়ের খুটী হইতে বার আনা পরস্পর পাড়োয়ায় ন্যূনকি দিয়া মহামায়া অতি ক্রতগতিতে বাতীর দিকে আসিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার বাতীর দুইখণ্ড ছয় সাত জন পুরুষ জনা হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তাঁহার বুক ছাঁপে কহিয়া উঠিল। অবশিষ্ট রাজা-ইহু আরও অধিক ক্রতগতিতে আসিয়া বাতীর মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিলেন, বোমা চক্ষু বুলিয়া ভইয়া আছে, আর বিপিন তাহার মাথার কাছে বিধ্বংসন করিয়া আসছে;—একটা ডাক্তার বোমার পাশে বসিয়া তাহার বেহু পদীক করিতেছেন। মা'কে দেখিবার্থ বিপিন—“মা গো, তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে না, আর একটু আগে এলে বোধ করি তোমার সম্মানে বেহুতে পেতো” বলিয়া হুকরিয়া কাদিতে লাগিল। তবে কি এখন শেব সমর, এই ভাবিয়া মহামায়া—“বোমা গো, আমি যে ছুটে ছুটে আসছি—” বলিয়া ছুট করিয়া আহুড়াইয়া পড়িয়া বোধ করি দুর্দ্ধা গেলেন।

ডাক্তার বাবু এই পাড়ার অনেকদিনের চেনা ডাক্তার। তিনি বিপিনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“তোমার কি ছেলে-মাহুদী গেল না এখনও? বুড়া মাহুদকে কি এম্বি ক'রে বলে?—আর এতে গরের কারণ কি আছে? এখন ওঠ, ওঠ দুখে-চোখে চল দাও।” বিপিনকে আর উত্তিতে হইল না। “মহামায়া কাদিতে-কাদিতে বলিয়া উঠিলেন—“মা গো, আর বেশ আমাকে উত্তে না হয়”—বলিয়া উঠে-থরে কাদিয়া উঠিলেন। ডাক্তারবাবু তাঁহাকে সাহায্য দিয়া বলিলেন—“না কোন ভর নেই—আমি যোগ ধরে পেতে, আর দিনের মধ্যেই ভাল ক'রে যাব।”

শিশুপুত্র হারাইয়া বাইবার দশ দিন পরে, সে ছেলে আঁতকে অবস্থায় রহিয়াছে—কোন লোক এই সংবাদ লইয়া আসিলে তখনই খেবর আরম্ভ হয়, ডাক্তারের এই কথার মহানগাও তেমনি আরম্ভ হইয়া করুণ ভাবে তাঁহার নুণ পানে চাহিয়া বলিলেন,—“বোমা আমার বাঁচবে তা?” এই সমর বোমা পাশে করিয়া চক্ষু বেলিয়া আপন মনে বলিল—“মা গো—” মহামায়া উদ্ভাবিনীর স্তায় তাহার নুণের উপর খুঁকিয়া পড়িয়া—“এই যে মা, আমি এসি—” বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন। অমূল্য বাড়িবার তর বেবাইয়া ডাক্তার বাবু তাঁহাকে কাদিতে নিষেধ করিলেন। মহা-

মায়ী চুপ করিলেন। তারপর ডাক্তার বাবা বলিয়া গেলেন তাহার সার মর্ম এইরূপ;—

ভয়ের কোনই কারণ নাই—অমূল্য অল্প কিছু নয়, চিন্তিতার মনে মনে পুড়িয়া পুড়িয়া অনেকটা দিগ্গিরিয়ার মত হইয়াছে। হুঁচকার মিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিবে—সন্দেহ নাই। এখন তাহাকে বেশী বকান কিবা তাহার দুখে কাঁধা কোন মতেই উচিত নয়। এখন একশ তিন ডিগ্রী অম—এই অরের সঙ্গে-সঙ্গে সব অমূল্য ভাল হইয়া যাইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

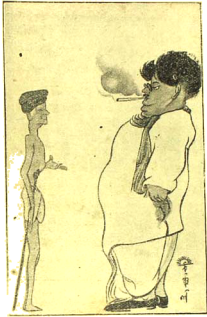
* * * *

ডাক্তার বাবু বোধ করি মিথ্যা বলিয়াছিলেন। কেন না, বোমার সারিয়া উঠিতে ১০:১৬ মিন সময় লাগিল। এই সময়ের মধ্যে বোমাকে এ বাজা বাঁচাইয়া দিবার জন্য কালী-ঘাটের “মা কালীকে” জোড়া পাঠ দিবার মানসিক করা হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তব মাতীর চিন্তিটিকে পর্য্যন্ত গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন—“ঠাকুর, বোমাকে আমার বাঁচাও ঠাকুর—আমি ত জানি হয়ে অবশি কোন পাপ করি নি, তবে কেন আমার ভাগে এখন হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—



আজ মহামায়া মনে আনন্দ ধরে না। আজ বোমা পথা পাইবে। অনেক দিনের পর আজ তিনি মহা উৎসাহে হাঁথিতে বসিয়াছেন। ইতিপূর্বেই তিনি বোমাকে লকল কথা পুন্নিয়া বলিয়াছিলেন। বেলা দশটার মধ্যেই তাঁহার রাজ্য শেষ হইয়া গেল। বোমা খাইতে বলিল। হুঁচকার ঝাপ দুখে তুলিয়াই বোমা শাওকীর নুণপানে করুণ ভাবে চাহিয়া বলিল—“এই বার আমি বাপের বাড়ী যাব মা।” বোমা কেন যে এক কথা বলিল, তিনি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন—“হঁ” মা, সে কথা আর আমার বলে দিতে হবে না, আর হুঁচকারিন বাক্য, পাঠিয়ে যোব, তাতে আমি মরি আর বাঁচি—ঐ গোড়ারমুখো বিপিন যদি তেমন না হ'ত তা হ'লে কি সে সময় আমার তেমন মতিজ্ঞ হ'ত মা। পাণ্ডেনের কথার আমি তোমার ওপর অবন হ'বে পড়তুম—লোকের কি বল মা—পরের সর্জনশ বেহুতেই গোকে ভালবাসে।” বলিতে-বলিতে তাঁহার কোঠরপত চক্ষু হইতে টপ-টপ করিয়া অঙ্গ পড়িতে লাগিল।

রঙ্গ-চিত্র [ঐকল বন্দ্যোপাধ্যায়]



অধিবাস



পিতা ও পুত্র



টাইপ-মেশিন

ভাবের অভিব্যক্তি



বিরাগ



জানক



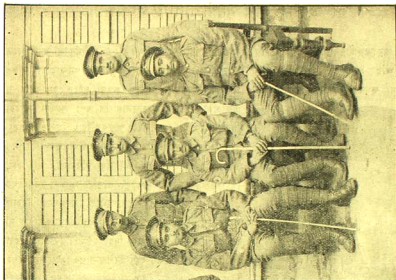
সিরাশা



কেন্দ্রীয় প্রাথমিক স্কুল, সত্যাবাস, সত্যাবাস, বার্ষিক উৎসবের

सङ्गान्तरि—

महामहर्षिनाथाय श्रीगुरुभ्यो नमः॥७॥ उर्ध्वद्वयम्



বাহ্যিকী চাহিদাগুলি কোবের সেন্সিগ।

এই সমস্ত নৈতিক কু-খণ্ড-আধারিতে বেনামে চলিত টাউনশিপের সঙ্গে তুর্কীর হাতে বলা বাহুল্য।

দুই-বিংশতি উপলক্ষে মুক্তিলাভ করিয়া বেশে'কিরি। আশিষাছেন ।

শিমুলের লাঠিতে, বামদিক হাইডে—আইজট পি, ডি, পো, আইজট এম. পি, সর্কাইকাহো,
আইজট এম, এম, পো, ইমি মুক্তে আরও ইম্মিলকন ;

ଆଞ୍ଚିକେତି ଏସ, ଏମ, ଏମ୍, ଇମି ପୁଣ୍ୟ ସାଗର ସୈବାଦିଜନ :

সম্পূর্ণ, বাণিজ্যিক হাতে—আইডেট ডোলা মুখার্জি, আইডেট শরীফ বোম্, আইডেট মে, সি, বিল ।

৬ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

‘বহুমতী’র স্বাধিকারী, অক্লান্তকর্মী, বহুবংশল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলগতে নাই; পকাশ বংশের অধিক কাল ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কার্য উদ্‌ঘাপন



• উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করিয়া বহুবংশ উপেন্দ্রনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ‘বহুমতী’ পত্রিকা প্রকাশের অব্যবহিত পর

হইতে আমরা উপেন্দ্রনাথের সহিত সুদীর্ঘকাল কার্যক্ষেত্রে সংস্পর্শে ছিলাম; তাঁহার স্নেহ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত ছিলাম। নামান্ত্র অবস্থা হইতে অধাবসার ও একাগ্রতা প্রভাবে উপেন্দ্রনাথ যে বশ: অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অমূল্যবস্তু। মূলত: সাহিত্য-প্রচারে তিনি ‘বহুবাসী’র যোগেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে বন্ধিনন্দ্র, মহীকেশ, দীপনন্দ্র, রত্নলাল, দীনবন্ধু, প্রভৃতি সাহিত্য-রত্নবিগের প্রচারণা বাঙ্গালার পল্লিতে-পল্লিতে ঘরে-ঘরে বিস্তার করিতেছে। তাঁহার ‘স্বাভাষা’র প্রতিষ্ঠার কথা কে না জানেন? তিনি বুকের বক্তৃতা দিয়া ‘বহুমতী’র সেবা করিয়া গিয়াছেন। কত ঝড়-ঝড়া উপেন্দ্রনাথের মন্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু উপেন্দ্রনাথের অটল একাগ্রতা সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহার কার্যক্ষেত্রে জড়যুক্ত করিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বড়ই বহুবংশল ছিলেন; পত্রের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি বিহ্বল থাকিতে পারিতেন না; তিনি প্রাণ-পণে লোকের উপকার করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমরা একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছি। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান সত্যীশচন্দ্র দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পিতার পবিত্র অস্থান-প্রতিষ্ঠান উন্নত করুন, ইচ্ছাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি; তাঁহার শোক আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সঞ্চয়

[ত্রিহেমেন্ত্রকুমার রায়]

সাহিত্য

হাভেলস্ ইলিস্।—এখনকার ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাণীবেন না, তাঁহার। নিজেরাই সকল-রকমে ঠিকিয়া যাইবেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে হাভেলস্ ইলিস্ The New Spirit নামে একখানি সাহিত্য-সম্পর্কীয় পুস্তক প্রকাশ করেন।

তখন তাঁহার বয়স ছিল একত্রিশ বৎসর। এখন তিনি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। এই বীর্ষকালের মধ্যে তাঁহার অশ্রমে লেখনী নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ করিয়াছে,—কিন্তু তাঁহার লেখার ছাঁদ একরকম বদলায় নাই বলিলেও চলে,—তিনি সধন ভাবে সধন ভোরে সধন ভালে বচাবত একটানা সধন কলহ চোলাইয়া আসিতেছেন। A Dialogue in Utopia, A Study of British Genius, The Soul of Spain, The World of



পাখাচর মতে লড়াই
(ডেনিস্ ভাষায় Adolf Ferichan)

লেখা পড়িয়া তাঁহাদের মনের আশা অবশ্রু মিটিতে পারে না; কারণ হাভেলস্ ইলিসের রচনার মিষ্ট রস বা কাব্যের গন্ধ বড়-একটা নাই। কিন্তু আর-আর নানান দিক দিয়া হাভেলস্ ইলিসের রচনাও এত-বেশী সার্থকতা দেখা যায় যে, বাঁহারা তাঁহার লেখার সঙ্গে পরিচয়



বীরবাহা জোরান অব্ জার্ভ
(ফরাসী ভাষায় Henri Chapue)

Dreams, The Task of Social Hygiene, The Criminal ও Impressions and Comments নামে পুস্তকগুলি, ইংরেজী সাহিত্যে হাভেলস্ ইলিস্কে একজন শক্তিশালী লেখকরূপে পরিচিতি করিয়াছে। ১৮৮৭ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি Mermaid Seriesএ প্রকাশিত

নাটকগুলিও সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল এই সকল পুস্তক রচনা ও সম্পাদন করিয়াই তিনি বিখ্যাত নন;—Studies in the Psychology of Sex নামক বিরাট গ্রন্থটির লেখকই তাঁহার নাম অধুনা ইংলেণ্ডে নর-পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়া পড়িয়াছে। মিশ্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে এত-বড় প্রামাণিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক আর-কোন ভাষার

ধাইতেছে, এই অদ্ভুত গ্রন্থে তাঁহার অগুণি উদাহরণ পাওয়া যায়! মাহুষের ভিতরের-ভিতরে যে কতটা পণ্ডিত, তাঁহার কাম-শিপাসা যে কতটা লম্বা, হাতেলক্ষ ইনিস সফলের চোখে আতুল দিয়া সেটা দেখাইয়া দিয়াছেন। অধুনা উদাহরণ দেখাইয়াই তিনি চূর্ণ করেন নাই, এমন বিস্তৃত কাম-প্রবৃত্তির কারণ এবং কামুকতার মনোবিজ্ঞান লইয়াও



মায়ার মাসে চুমু

(দুইভিত্তিক মাসের Madrassi)

আর কোন লেখক আর-পর্যন্ত লিখিতে পারেন নাই। এই অপূর্ণ পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহার পক্ষে-পক্ষে ছত্র-ছত্রে লেখকের কি দলীর গবেষণা, কি অতুল ক্ষমতা, কি অগাধত্ব পাণ্ডিত্যের আশ্রয় প্রকাশ আছে! প্রাচ্য ও প্রত্নতত্ত্বের সত্য ও অসত্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য জাতির মধ্যে কামোদ্ভব ক্রী-পুরুষের কত গোপন ও কুৎসিত অনাগারে অভ্যস্ত হইয়া অধঃপাতে



যোড়ঙ্গ

(দুইভিত্তিক মাসের Axel Ebbø)

তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, কেবল মানব-সমাজে নয়,—পশু-জগতেও ঐ একই প্রবৃত্তির একই ধারা ক্রমবর্তনে বহিয়া চলিয়াছে, সেটাও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির আড়ালে যায় নাই! হাতেলক্ষ ইনিসের গ্রন্থ যে-বিষয়ের লক্ষ সর্বত্র সমাপ্ত, সে-বিষয় লইয়া কোন বিশেষজ্ঞ বাঙালী বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সংস্কৃত ভাষার লিখিত বাংস্তানয়ন বা

কৌটিল্যের রচনাই এ-বিভাগে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ।
বাঙ্গলা ভাষার ভাষার অনুবাদ আছে।

ছাভেলস্ ইলিস প্রথমে কিছুদিন দিককের কাজ এবং
চিকিৎসা-স্বাস্থ্যের অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার
সহধর্ম্মিণীও বিধবা মহিলা। Man and Woman নামক
প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা কালে তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে কলম

দেখন আসা-যাওয়া করেন, তেমনি ভাবে কখনো স্ত্রীর
বাড়ীতে গিয়া স্বামী দেখা করিয়া আনিতে স্ত্রীর সঙ্গে,
আবার কখনো-বা স্বামীর বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রী দেখা করিয়া
বাইতেন স্বামীর সঙ্গে! পাছে দিন-রাতের মেলা-বেশার
ও বেশী ঘনিষ্ঠতার বিবাহিত জীবন হইতে রোমান্সের মাত্রা
কমিয়া যায়, সেই ভয়েই তাঁহার একসঙ্গে এক-বাড়ীতে



ননী পাহেলওয়া

(ইতালীর ভাস্কর Grazio Andreoni)



১৮ বর্ষকী কান্দোটিয়ার ভাস্করকৃতঃ



মহাশয়ের আবিষ্কার হাট

ধরিয়াছিলেন। এই পুস্তকে Sex-problemগুলির একটা
বিজ্ঞান-সম্মত বিশদ আলোচনা আছে। তাঁহার স্ত্রী
উপভোগ ও নাটক শিখিবার নাম কিনিয়াছেন।

ছাভেলস্ ইলিস সেদিন-পর্যন্তও স্ত্রীর সঙ্গে এক-
বাড়ীতে বাস করিতেন না! স্বামী থাকিতেন এক ভাড়াবাড়ি,
আর স্ত্রী থাকিতেন আর-এক ভাড়াবাড়ি। বন্ধুবান্ধবরা

বাস করিতেন না!—কথাটা কাণে শুনিতে যতই কষ্ট
ঠেক্—কিন্তু পুরাণে প্রেমকে নিতাই-নব করিয়া জিয়াইয়া
রাখিবার এ যে একটা সেরা উপায়, তাতে আর এতটুকু
সন্দেহ নাই!

তথ্যসূত্রের সংগ্রহ-পত্র।—বিল্ডারের Daily Chro-

nicleএর সম্পাদক মিঃ রবার্ট ডোনাল্ড, ভবিষ্যতের সংবাদ-পত্র সবক্ষে একটী আলোচনা করিয়াছেন। Standardএ প্রকাশিত তাঁহার ঐ আলোচনার সার-অংশ ও সম্পাদকের মন্তব্য হইতে আমরা কিছু-কিছু জুনিয়া দিলাম।

“কাগজ বিলি করিবার অল্প মূল্য পথ তৈয়ারি করিয়া বৈজ্ঞানিক ট্রেন চালানো হইবে। দূরদেশের অল্প বায়ু-

একটী করিয়া হয় থাকিবে। খাশি এইটুকু নয়,—আরো কিছুদিন পরে, লোকে আর কাগজ পড়িতেও চাহিবে না! কাগজের খবর তখন গ্রামোফোনের রেকর্ডের মধ্যে পুরিয়া বাড়ীতে-বাড়ীতে পাঠানো হইবে এবং রেকর্ডের গান যেমন করিয়া শোনা হইয়া থাকে, রেকর্ডের খবরও শোনা হইবে ঠিক তেমনি করিয়াই!... ..কিন্তু ভবিষ্যতের এই



দর্পকী কিলিস যক্ষমাধ



পত্রর হাতে বলিনী

(M. Fokin ও Mlle Fokinএর লগীর দুজ নৃত্য)

পোত ব্যবহৃত হইবে। সাক্ষ্য বা প্রত্যক্ষের সংকল্প বলিয়া কোন-কিছু থাকিবে না—দিন-রাতের চকিল খন্টার কাগজের প্রায় চল্লিশখানি করিয়া সংকল্প বাড়ির হইবে। খবর লোপাড় করা হইবে ভারতীয় টেলিফোনের দ্বারা, এবং প্রত্যেক রিপোর্টারের পকেটে ভারতীয় টেলিফোনের

কনোগ্রাফ-সংবাদও যে সকল শ্রেণীর পাঠকই ভুট্ট হইবেন, তা বলা যায় না। জন-সাধারণের মধ্যে তখনও এমন লোক যথেষ্ট থাকিবেন, বাঁহারা এখনকার খবরের কাগজকে সেকেন্দে বলিয়া দেখিয়া না-দিয়া বহু বৈশি আদর করিয়াই পড়িবেন।”

ললিত কলা

ভাঙ্করের কথা।—চিত্রকলা যেমন জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে, ভাঙ্কর্য-কলার তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। ভাঙ্কর্যের আদর ছিল সেকালে,—একালে তাকে কেউ বড়-একটা আমোল দেয় না। ভাঙ্কর্য বলিতে সাধারণত আমাদের মনে হয়, ধনীরা বাগান-সাজানো ভাবধীন ও কুৎসিত পুতুলগুলোর কথা;—বাড়ীর ছোট-ছোট ঘেরেরা যেমন আন্দুয়ারিতে খেলনা সাজাইয়া রাখে, ঐ পুতুলগুলোর সার্বকথাও ঠিক তেমনিগারাই। ভাঙ্কর্যের সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্যই যে বাগানের প্রয়োজন এবং বাগান সাজাইবার জন্যই যে ভাঙ্কর্য নয়—এ-কথা বোঝে খুব কম-লোকেরই।

ভাঙ্কর্যের এই অনাসরের দিনে, একটি শিল্পরসিক বৃদ্ধ ভ্রমলোক বিশাভের এক রাত্তা দিয়া বাইতেছিলেন। সেই রাত্তার তখন একটি নূতন প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভ্রমলোকটি দেখিলেন, দুটি বালক সেই প্রতিমূর্তির দিকে প্ৰবাহ হইয়া চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া তিনি ভারি খুসি হইলেন—“ম্যাঃ! আটের এই প্রদর্শনে, ছেলে-ছটির এই-বয়সেই ভাঙ্কর্যের উপরে এতটা তত্ত্বি!” এই আশ্চর্য্য শিল্প-অনুপ্রাণ দেখিয়া ভ্রমলোকটি বালক-ছটিকে বাহবা দিয়া উৎসাহিত করিবার জন্য ভাড়াভাড়ি তাহাদের কাছে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ছেলেদুটি বলিয়া উঠিল, “বশাই, আপনায় পকেটে ছুরি থাকে ত বহা করে” একবার দিন না।” ভ্রমলোকটি তখন বুঝিলেন, ছেলেদুটি মোটেই শিল্পরসিক নয়—প্রতিমূর্তির অমল ধবল বর্ণের দেখিয়া তাহার উপরে এদের নাম-বোম্বাই করিতে সাধ হইয়াছে—কি সর্বনাশ! ভ্রমলোকটি তখন হতান হইয়া ভাড়াভাড়ি পলায়ন করিলেন।

শিল্পীর পাথরের উপরে নাম-বোম্বাই করিবারও যেইহু আশ্রয়, একালের সাড়-পনেরো আনা লোকের মনে কিছু সেইহু আশ্রয়ও নাই,—তাঁহারা পাথরের মূর্তির দিকে কিরিয়াও ভাঙ্কর্য না, তাঁহারা ভাঙ্কর্যকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়।

ভাঙ্কর্যের মধ্যে যে কালোপায়ী গভীর সত্য নিহিত আছে, একালের অধিকাংশ শিল্পীও তাহা অস্বত্ত্ব করিতে

পারেন নাই। সে সত্য অস্বত্ত্ব করিয়াছিলেন, অতীতের সেই মহা-প্রতিভার অধিকারী ভাঙ্কর্যগণ, তাঁহাদের অস্বত্ত্ব সত্য পার্থক্যের ভিত্তিতে-ভিত্তিতে সত্য-সত্য মূর্তির মধ্যে দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। একালের ভাঙ্কর্যগণ সত্যের সেই প্রকাশ দেখিয়া অভিভূত হন বটে, কিন্তু তেমন করিয়া সত্যের আধার-পক্ষে আর গড়িতে পারেন না। তাঁহাদের কাহ্ন, তাঁহারা নিজেদের মস্ত নূতন পথ বাড়িয়া না-লাইয়া, প্রতি পথেই অতীতের শিল্পগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলেন; কলে সত্যের কোন নূতন বিকাশ-বৈচিত্র্যও দেখানো হয় না এবং সত্য-নকলে আদর্শও ব্যাটা হইয়া যায়।

অথচ, একালের অন্য যে-কয়েকজন ভাঙ্কর আপনাদের স্বাধীনতাকে শিলা-পটের রেখায়-রেখায় ফুটাইয়া ফুলিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যে ভাবের এবং সত্যের কি অপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখা যায়! কেবল রূপ-রসের সাধনার নয়,—তাঁহারা সাধারনের সাগ্রে বৃষ্টি আকষণেও সক্ষম হইয়াছেন। ফরাসী ভাঙ্কর গুগু-বোদা ও গ্যাত ভাঙ্কর মেট্রোভিকের নাম ঘাটে-মটে-পথে সকল শ্রেণীর সকল লোকের মূহুই শোনা যায়—তাঁহাদের সন্ধানের সর্বত্র, সর্বসাধারণের মধ্যে। হস্তরায় এক-কথাও বোকা সক্ষম নয় যে, একালে সবাই যে ভাঙ্করকে আদর করে না, তাঁহার মস্ত বেশী দারী প্রধানত ভাঙ্করগণই। তাঁহারা ভাঙ্কর্যের মধ্যে নবুগের নূতন বাণী, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা, নূতন ভাবের চর্চা দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বাধা করিতেছেন, সেটা অতীতের ভাব-কাটা বৈ অস্ব-কিছু নয়। কাজেই জন-সাধারণও তাঁহাদের প্রতি বিরূপ।

আমরা এখানে একালের পাঁচজন বিখ্যাত ও প্রতিভাবান ভাঙ্করের গঠিত মূর্তির এক-একটি নমুনা দিলাম।

রসালয়

ভাষ্কর্য নৃত্য।—বিলাতের বিখ্যাত নৃত্য-কুশলী মিস্ ফিলিস্ মক্কায়া, নৃত্য-কলার গুপ্ত ইন্দিজ সখেই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, “নৃত্য হচ্ছে আটের একটি উচ্চ জ্ঞান। এবং যে অস্ব-নর্বাচক নয়, সে কখনো উচ্চের আর্টিষ্ট হইতে পারে না। অবশ্য, নাচিতে হইলে প্রথমেই

যথেষ্ট সাধনা এবং শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু যতই শিক্ষা লাও, কি আর-বাধাই কর, যে লোক বাটী ভাবুক নয়—নৃত্যকলায় সে কখনো প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিতে পারে না। ‘অনুক ভাবে হাত নাড়িলে এবং অনুক ভাবে চোখ পাকাইলে রাসের ভাব দেখানো যায়’ বলিয়া তুমি হয় ত কাহারকেও শিক্ষা দিলে। সে হয় ত ঠিক তোমার শিক্ষা মতই কায় করিগা গেল। কিন্তু তবু রাসের আসল ভাবটি ফুটাইতে পারিল না। কারণ, সে প্রাণের তিতরে ক্রোধের আবেগ অনুভব করে নাই—সে বাহ্য করিতেছে, তাহা তোমারই অবিকল নকল মাত্র।

নাচের ভাবের তিতরে নাচিরেকে মৃগুণ হইয়া থাকিতে হইবে। হর, আমার নাচের বিষয় হইতেছে, ‘একটি তিথারীর মেঘে ফুল ফুড়াইতেছে’। এখানে আমাকেও মনে করিতে হইবে, সত্যমতাই আমি তিথারীর মেঘে, ফুধা ও হর্ভাগের তাড়নার আমি ভিতরে-বাহিরে অস্থির, আমার যেহ আর বাতনার তার বহিতে পারিতেছে না, পা আর চলিতে চাহিতেছে না! তারপর, কলনার আমাকে দেখিতে হইবে, আমি যেন নিভৃত পল্লীর বন-সত্যার শ্রমলতার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছি;—নাথার উপরে উদার আকাশ, চারিদিকে মধুর বাতাস, পদতলে নরম দুর্জায়াস। বসন্তের আলোনে তিথারিণী আমি,—‘আমারও শ্রান্ত প্রাণ অনানে বিস্তার হইয়া উঠিল, সান্নে ঐ ফুলের বাগান,—বরষীর উপরে হাটো-হাটো ফুলগুলি হাসির মত ছড়াইয়া রহিয়াছে! হর্ভাগের তাড়না ও ফুধার বাতনা ছুঁগিয়া নাচিতে-নাচিতে আমি ফুল ফুড়াইতে ছুটিলাম। এমনি ভাবে অভিবৃত্ত হইতে না-পারিলে নাচে কখনো ভাব বা আবেগ ফোটানো যায় না।

নর্তকী তার সেহ দিয়া ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। কেমর-করিয়া সে তা করে, নর্তকী তা বলিতে পারে না। চিত্রকর কি-করিয়া ছবি আঁকেন, কবি কি-করিয়া কবিতা লেখেন, সে কথা কি তাঁহারা বুঝাইয়া বলিতে পারেন? চিত্রকরকে পোকার খালি পিথিতে হর চুম্বিএর কারদা, কবিকেও পিথিতে হর দেখার প্রাথমিক পোষ্টাকতক পদ্ধতি; তারপর তাঁহাদের হাথা কর্তব্য, সেটা শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে তাঁহাদের

শক্তি, প্রতিভা ও কলমের উপরে। নৃত্যকলা-সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে।”

আমাদের দেশে রঙ্গালয়ে যে নাচ হয়, তাহার তিতর হইতে ভাবের ও আবেগের নিকটো একরকম চলিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। কিন্তু যুরোপের সকল যেমতই নৃত্য-কলার ভাবাবেগের রূপ ক্রমেই বৈশি-করিয়া আগিয়া উঠিতেছে। সেখানে এখন কেবল হাত-পা ছোঁড়াইতেই নাচ বলে না; প্রতি নৃত্যে যিনি এক-একটি বিশেষ ভাবের ইঙ্গিত দিতে পারেন, সমস্তবাহের আগরে এখন তাঁহারাষ্ট আসর হর অধিক। হাত-পা অঙ্গতন্ত্রির ছন্দে, মুখ-চোখের বিচিত্র ভাবে নর্তকীরা সেখানে কখনো চুঃখের ও কখনো সুখের ছবি আঁগাইয়া তুলেন এবং নাচের সঙ্গে অভিনয়ের যে কতটা বনিষ্ট সম্পর্ক, দর্শককে সেটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন।

আমাদের দেশেও বাটী-বৈশি ভাবাব্যক নৃত্য আছে, কিন্তু তেমন নাচ দেখা যায় খুব কম। বাহ্লা দেশে সেটা একরকম নাই বলিলেও চলে; কেবল দ্বাদ্ধিপাতো এবং ভারতের অন্তরত দু-একটি দ্বারপার ভাবাব্যক নৃত্য এখনো সম্পূর্ণরূপে সূচ হইয়া যায় নাই।

বিবিধ

আলোক ও দৃষ্টি।—কি-রকম আলোকে হর আলোকিত করা উচিত এবং দৃষ্টির পক্ষে কি-রকম আলোক উপকারী, তাহা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। সংগ্ৰতি ইংগাই হির হইয়াছে যে, মাধবের দৃষ্টি যে-ঐশ্বর্য কালে খাটানো হয়, সেই-ঐশ্বর্য কালের উপরেই আলোকের বিভিন্নতা নির্ভর করে। যেখানে কোন জিনিষ চোখের কাছে রাখিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি দেখার দরকার, সেখানকার আলোকও উজ্জ্বল হওয়া চাই। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানিয়া রাখা ভালো যে, উজ্জ্বল আলোক দ্রাবিকর। দৃষ্টিকে যেখানে একটানা অনেককণ পর্যন্ত কর্ণে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে, আলোকের উজ্জ্বলতা সেখানে সচরাচর বড়টা দরকার মনে হয়, তার চেয়েও কমাইয়া বেশা উচিত।

এইসঙ্গে এখানে আর-একটি কথা জানা দরকার। চোখকে ঝাড়া উজ্জ্বল ও পরিষ্কার রাখিতে চান, দৃষ্টিকে তাঁরা যেন মিছামিছি হর্যাপ না-করেন। যিটুমিটে আলোকে

লেখাপড়া করার মনে হচ্ছে চোখের মাথা খাওয়া। পড়াওনা করিবার সময় এমনভাবে বসিতে হইবে, আলো বাহ্যতে শিখন হইতে বইয়ের উপরে আলিয়া পড়। খুব প্রথমে আলো, আর রোমের দিকে সামান্যত না-চাওয়াই উচিত। অনেকেরই চোখের প্রথমেই কঠ পান এবং বিনা চিকিৎসার অনর্থক সে কঠ দহিয়া থাকিয়া তাঁরা চোখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন। এ অবস্থার দশ গ্রেন বোরাক্স (borax) এক আউন্স ক্যাম্ফর তরবারে (Spirits of camphor নয়) দিশাইবা, চোখকে দুইরা কেশা তালো। মাঝে-মাঝে চোখে জলের তাপটা দেওয়া সকলের পক্ষেই প্রকার। তাঁরা ও পাতলা চারের মল স্নান ও চর্চল চক্ষু দুইবার পক্ষে যেমন উপকারী, তেমনি নির্দোষ।

* * *

দৈনিক মানসিক ব্যায়াম।—কুঁড়ের বেহ মানস যোগের বাস। আশকাল অনেকেরই তাই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করেন। কিন্তু বেহের ব্যায়াম দইরা ধীরে ধীরে আধাঘণ্টা হইতে একঘণ্টা পর্যন্ত বাড়িয়া থাকেন, মনের ব্যায়ামের মত দিনে পাঁচ-দশ মিনিট সময় খরচ করিতেও তাঁরা মন নেহাৎ ব্যায়াম। দেহ ও মন, কাকেরই অংশেলা করা ঠিক নয়,—অংশেলা করিলেই মাঝে পাইতে হইবে। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন বেহের দিকে না-চাইয়া শুধু মনের চর্চায় বাড়িয়া অকাল-বুড়ো হইয়াছেন বা পরবাহু থাকিতে মরিয়াছেন, অনেক ব্যায়াম-করিয়া মোহালা লোকও তেমনি মনকে অকল্যাণে রাখিয়া বসে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধিতে বাসক হইয়া থাকিয়াছেন। বড় বড় পালায়ান এর সাক্ষী। পালায়ানরা এরাই পণ্ডিত হয় না কেন?—মানসিক ব্যায়ামের অভাবে। বিশেষতঃ 'ভেলি মেল' Mr. Archibald Marshall তাই বলিতেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য প্রতিদিন অন্তত ক্বিকিঞ্চি মানসিক ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকা। মারজাল সাহেব নিজে একতঃ মানসিক ব্যায়াম করেন। তার কলে "Odes of Horace" এর চার অংশই তাঁহার সুখ। এই চার অংশে সাইন আছে তিন হাজার বাপটি। তিনি বলেন, "এটা কিছুই সস্ত নয়। যে-সবটায় আমি Horace কর্তৃক করেছি, সে-সবটা আমি আর-কোন-

রকমেই কাটাতে পারতুম না। আমি সুখ করেছি দিনে-দিনে, দাঁড়ী কামাতে-কামাতে বা পোষাক পরতে-পরতে বা ঘান কর্তে-কর্তে, প্রতিদিন দশ বা দুই লাইন করে। আর এই সুখ-করার কাজটা অল্প সময়ের চেয়ে সত্যসেই হয় বেশী সস্তা। সর্বপ্রথমে আমি ওয়র থৈথমের কবায়ত কর্তৃক করি। এতে আমার সময় পেগেছিল একমাস। ওয়ার্ডলওয়ার্থের "Ode on the Intimations of Immortality in Early Childhood" নামে কবিতাটি একসপ্তাহের মধ্যেই আমার কর্তৃক হয়ে যায়। ধীরে ধীরে পড়তে ভালো লাগে, তাঁর পক্ষে সেই লেখাই সুখই করা সস্ত ও প্রস্তুত।" মারজাল সাহেবের দৃষ্টান্ত সকলেই অনুসরণ করিতে পারেন। ধাঁহারা মনকে পশু রাখিয়া মেহকে বশিত করিতে ব্যতিব্যস্ত হন, তাঁহারা যদি এদিকে একটু দৃষ্টি দেন, তবে মনের চর্চা ত হইবেই, বেশীর ভাগ ব্যাধি সময় খরচাও বাঁচিয়া যাইবে।

* * *

সমুজ্ঞান বিবন্ধ।—এমন চের পাখী আছে, রাতে বাহাঘের বেহ চক্‌চক্ করে বা জলিতে থাকে,—একখাটা আদিকালের কথা এবং অনেক স্থলেই বাড়ানো কথা বা মিছে কথা। রোমের প্রিনি ও ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে কনরাত পেন্সার এবং আরো নানাময়ের নানা লোক সমুজ্ঞান বিবন্ধের কথা বুঝিয়াছেন। আশকাল অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, সমুজ্ঞান বিবন্ধের কাহিনী একেবারে গাভীখুরি নয়। Knowledge নামে ইংরেজী সাময়িক পত্রে এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বহির হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "১২০৭ খৃষ্টাব্দে কেদ্রিজে সমুজ্ঞান বিবন্ধ দেখা গিয়াছিল। তার ডিম্বি শিশুটি সেদিকে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানেই আগেও আর একবার 'চেন্স আলো' দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যাপারটাকে তখন গণ্যো লোকের আশঙ্ক্যি কল্পনা বশিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবার এ বিষয় দইরা গীতিমত খোঁজবর হুক হয়। কলে জানা যায়, কুপের Vosges ও Pyrenees-এও মন্বি সমুজ্ঞান বিবন্ধ দেখা গিয়াছে। কেদ্রিজে একব্যক্তি তলি করিয়া একটি সমুজ্ঞান বিবন্ধ মরিয়াছিল। তাহার মুখে একাশ, পাখীটি প্যাচ

বৈ আর-কিছু নয়।”—তার পরে অমূল্যদান ও আলোচনার প্রকাশ পাইরাছে, শুধু পাঁচটা নয়, আরো অনেক পাখী—এমন-কি শোণা পারবারা পঞ্চায়ত নাকের নাক এমনি সমুজ্জল হইয়া ওঠে। এই আলোর অংশটা থাকে পাখীদের নুকের দিকে। এবং বখন তারা উড়িতে থাকে আলোর

উজ্জলতা তখনই বেশী হয়। এখন স্থির হইয়াছে যে, ফস্ফোরাসের মত কোন একটা পদার্থ, পাখীদের নুকের অপরিস্রুত পালকের মধ্যে জন্মার বসিয়াই সময়ে-সময়ে তাঁহারা সমুজ্জল হইবার সুবিধা পায়।

সহযোগী-সাহিত্য

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

মাসুদের জন্মকথা

কয়েক দিন হইল, বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন হ’য়ে গেছে। এই সভার সভাপতির আসনে বসে’ ডাক্তার এইচ, এইচ, হেডেন মাসুদের জন্মকথা বলেছিলেন। আনবার পাঠক-পাঠিকাগণকে তার মন্তব্য শুনিতে রাখতে চাই।

সম্রাট চুগজের কাল সম্বন্ধে কতকগুলি গবেষণা-মূলক অমূল্যদান হ’য়ে গেছে; এই সন্ধ্যা মাসুদের জন্ম-কথারও আলোচনা হয়েছিল। তারই উপর নির্ভর করে’ ডাক্তার হেডেন বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলেন,—

পঞ্চাশ বছর আগে লামো অমূল্যদান করেছিলেন, পৃথিবীর বয়স ২৫০০০০০ বছর। অত্র ক্রকট-কেউ হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর বয়স ১০০০০০০ কি ১২০০০০০ বছরের বেশী হবে না। এই শেষের পণ্ডিত্য স্বর্গ্যের বর্তমান তাপ থেকে তার বয়সের হিসাব করে’ তাই থেকে বৃষ্টি-ভর্তু ধরে’ পৃথিবীর বয়স অমূল্যদান করেছেন। আবার উনিশ শতাব্দীর শেষার্শ্বে মর্ড কেগল্ডিন হিসেব করেছিলেন যে, পৃথিবীর বয়স ৫০০০০০০ বছর হতে পারে। অনেক লর্ড কেসলিনের মত অনেকটা ঠিক বলে মনে নিয়েছেন। আবার কেউ-কেউ আর এক রকমে পৃথিবীর বয়স স্থির করবার চেষ্টা করেছেন। এখনকার বড়-বড় নদীতে জলের স্রোতের সঙ্গে যে সব মল্যামাটী, কাঁদা, বালি ভেসে আসে, সেগুলি ক্রমে বিস্তারে গিয়ে নদীর গর্ভে পলি পড়ে। সেই পলি ক্রমে-ক্রমে জমে-জমে ভাঙ্গা গড়ে ওঠে। কোন্ নদী দিয়ে কত সময়ে কি পরিমাণে মাটি-কাঁদা ভেসে এসে, কত

দিনের পলি জমে’ কতখানি ভাঙ্গা গড়ে ওঠে, সে সমস্ত হিসেব করে দেখা হয়েছে। এই হিসেব ধরে’ অত্র ব্যয়গার ডাক্তার পরীক্ষা করে’ অধ্যাপক সোলোম স্থির করেছেন, পৃথিবীর বয়স ৮০০০০০০ বছর হতে পারে। ঐ সব বিস্তারিত পড়া পলিবাটী জমতে-জমতে তাবের উপর চাপের উপর চাপ গড়ে’ সেগুলো এখন পাথর হয়ে গেছে। যে সব ব্যয়গার এই ভাবে পৃথিবীর ভাঙ্গা গড়ে উঠেছে, অধ্যাপক সোলোম সেই সব ভাঙ্গা বেগে দেখেছেন, ৩৩৬০০০ ফিট হয়েছে। তার পর তিনি হিসেব করে দেখেছেন, ঐ ৩৩৬০০০ ফিট পাত্তরে ভাঙ্গা গড়ে উঠতে পৃথিবীর ৮০০০০০০ বছর লেগেছে। অধ্যাপক জলি আবার আর এক দিক থেকে এই সমস্তার মীমাংসা করলেন। তিনি দেখলেন, আগের পর্ব্বন্তের গারে যে সোডিয়াম খাত্ত জমে’ আছে, তা’ বৃষ্টির জলে ধুয়ে-ধুয়ে নদীপথে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই রকমে, যে সব নদী দিয়ে সোডিয়াম সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, অধ্যাপক জলি তার এক বছরের হিসেব নিয়ে কতটা সোডিয়াম এক-এক বছরে সমুদ্রে গিয়ে পড়া সম্ভব, তা’ স্থির করলেন। তার পর সমস্ত সমুদ্র-স্তরের সঞ্চিত লবণের পরিমাণ স্থির করে, বত বছরে ঐ পরিমাণ লবণের সমুদ্রে গিয়ে পড়া সম্ভব তার একটা আনখাজী হিসেব খাড়া করলেন। তাতে পৃথিবীর বয়স পাঁড়াল ৯৬০০০০০ বছর। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত (physicists) এ সব হিসেব আমলে আনতে চান না, একেবারে উড়িয়ে দিতে চান। তাঁরা বলেন, পৃথিবীর বয়স

এত হতে পারে না; এই সব হিসেবে পৃথিবীর বয়স প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক বেশী পাড়াচ্ছে। তাঁদের মতে, ভূ-পঞ্জরের দিক থেকে যে হিসেব করা হয়েছে, সেটাও নির্ভুল হয় নি; আর সূর্য ও পৃথিবীর তাপ ক্রমশ: কমে আসছে, এই তথ্যের উপর নির্ভর করে আবহাওয়ার দিক থেকে যে হিসেব হয়েছে, তাও ঠিক হয়নি। এই শেষের হিসেবটার গোড়ায় গল্‌ফ্বট্টে গেছে। কারণ, radio-activity বলে যে নতুন একটা ভিনিসের খোঁজ পাওয়া গেছে, তা' থেকেও কিছু তাপ পাওয়া যায়; সূর্য ও পৃথিবীর তাপের ক্রম-বেশীর উপর নির্ভর করে' পৃথিবীর বয়স স্থির করার সময় এই radio-activity'র তাপটা ধরা হয়নি। এই সব কথা বিবেচনা করে' physiscists পৃথিবীর যে কোটি তৈরী করলেন, তাতে, তাঁদের মতে পৃথিবীর বয়স ১০০০০০০০ ও ২০০০০০০০ বছরের মাঝানারি কোথাও ধরলে খুব বেশী ভুল হবে না। এদিকে radio-activity সম্বন্ধে বতাই নতুন-নতুন পরীক্ষা হতে লাগল, ততই দেখা গেল যে, ভূ-পঞ্জরের উপাদান-বস্তুর পাথর-স্তম্ভের বয়স স্থির করার মত নতুন-নতুন কোটি পাওয়া যাচ্ছে। এখন এই physiscists দলের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, এইবার তাঁরা নির্ভূত ভাবে পৃথিবীর বয়স ঠিক করতে পারবেন;—এমন কি শুধু মোটামুটি ছই-এক শে' কোটি বছরের প্রথম দিক দিয়েই তাঁরা কাজ করেন না,—কোনো শুভ দিনে কোনো শুভ মুহূর্তে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, সেই দিনকণ, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড পর্যন্ত নির্ভুল করে গণনা করার তরঙ্গা তাঁরা করছেন। ইউরেনিয়াম নামক একপ্রকার নতুন আবিষ্কৃত মূল পদার্থের এমন একটা ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে, যাতে করে এটা সম্ভব হতে পেরেছে। সেই ধর্মটা এই যে, ইউরেনিয়াম কোষে-তেলে হেলিয়াম ও রাডিয়াম নামক কয়েকটি মূল পদার্থে পরিণত হয়। এই শ্রেণীর পদার্থগুলির ভিতর সীসাই বোধ হয় সর্বশেষ পদার্থ। ইউরেনিয়াম যে সকল বস্তু পদার্থ থেকে উৎপন্ন হতে পারে, তাদের মধ্যে হেলিয়াম, রাডিয়াম ও সীসা প্রকৃতি যে সব পদার্থ পাওয়া যায়, তাঁর পরিমাণ ত ঠিক করা যায়ই; তার উপর প্রধান মূল-পদার্থ 'এক তা' থেকে উৎপন্ন অন্ত-অন্ত মূল-পদার্থ কি পরিমাণে কম হয়ে যায়, তাও ঠিক করা অসম্ভব নয়। এই সব উপকরণ

থেকে, যে সময়ে কম-কম আদিত্য হয়েছে, অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-উৎপাদক বস্তু তৈরী হতে বতটা সময় পেলে, তারও হিসেব করা যায়। এই রকম উপায়ে ভূ-পঞ্জরের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে যে সব radio-active বস্তু পদার্থ পাওয়া গেছে,—বত কম সময়ের মধ্যে তারা উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে, তা একরকম স্থির হয়ে গেছে। তার ফলে এই জানা গেছে যে, ভিত্তিস্তম্ভ পর্যন্ত থেকে যে সকল তরল বস্তু পদার্থ বেয়ে এসেছে, সে-স্তম্ভের বয়স এক লক্ষ বৎসর হতে পারে; আর পৃথিবীর খোসার মধ্যে সব-চেয়ে পুরোনো যে পাথর—সেই কানাডার আর্জিয়ান পাহাড় থেকে পাওয়া, ঐ ধরনের বস্তু পদার্থগুলির বয়স ১৪০০০০০০ বছরের কম নয়। এই রকম হিসেব করে স্থির হয়েছে যে, 'সেকেনে' ডিঙী ও কীকড়া-শ্রেণীর জীব ৪০০০০০০ থেকে ৭০০০০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল। প্রথম মাছের বয়স এত দিনে ৩৫০০০০০ থেকে ৪০০০০০০ বছরের মধ্যে থাকবার কথা। আর পক্ষীজাতির বয়স বেশী নয়,—মোট ১৫০০০০০ বছর। কোন কোন স্তম্ভপায়ী জীব (mammals) পানীনের সঙ্গে সঙ্গে কিবা তার কিছুদিন (অর্থাৎ হ্রদশ লক্ষ বৎসর) আগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভাবে স্তম্ভপায়ী জীবের শ্রেণীর (mammalia) পূর্ণ পরিপাতি হটেছিল জীব-স্থিতির তৃতীয় স্তরে (Tertiary epoch); আর একটু নির্ভূত ভাবে বলতে গেলে বলা যায়—Miocene ও Pliocene period; কিন্তু সে বেশী দিখের কথা নয়,—মাত্র ৪০ লক্ষ কি এক কোটি বছর। এই স্তম্ভপায়ী জীব-শ্রেণীর মধ্যে বাঘের আকার খুব বড় ছিল, তাদের কতাল এখনও হিমালয়ের শিখারিক পাহাড়ে ও পঞ্জাবে পাওয়া যায়।

এই সব স্মৃতি ও নির্ভূত গণনা থেকে, পাঠকেরা পৃথিবীর বয়স, আর কয়েক-শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা নিশ্চয়ই করে নিতে পেরেছেন। এইবার খোঁজ মাছের কথা আসছে। মাছ হলে স্তম্ভপায়ী জীব-শ্রেণীর মধ্যে সর্বশেষের পর্যায়ভুক্ত; অর্থাৎ মাছ-বেড়েই এই শ্রেণীর জীবের চরম পরিণতি হটেছে। এই মাছের প্রথম স্থিতি থেকে আর পর্যন্ত কত বছর

কেটে গেছে, তা' জানতে মানুষের মনে নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল জন্মতে পারে। অতএব এই বৌদ্ধটা এইবার নেওয়া যাক।

সু-পথের ভেতরে অস্ত্রাস্ত্র ভীষ যেমন তাদের একটা চিহ্ন কি ইতিহাস লিখে রেখেছে, মানুষেরও সেই রকম একটা ইতিহাস সেখানে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র ভীষের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের চেয়ে তফাৎ দেখা যায়। কারণ, কোন একটা বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর ভীষ যে বর্তমান ছিল, তা' কেবল তাদের দেহের কঙ্কাল বা ধ্বংসাবশেষে দেখেই জানতে পারা যায়; কিংবা কোন বারগাছ বড়-ছোট তাদের স্বাভাবিক পদচিহ্ন মুছে না গিয়ে থেকে গেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় তা নয়। মানুষের কঙ্কাল ভেত থাক আর নাই থাক, তার হাতের কারিগরি অনেক বারগাছেই দেখতে পাওয়া গেছে। বরং বেশীর ভাগ স্থলেই মানুষের হাতের কারিগরি থেকেই সেখানে তার অস্তিত্ব জানা গেছে। এই সব কারিগরির মধ্যে খুব সাধারণ হচ্ছে, তাদের নানা রকম বস্ত্র-পাতি। সকলের আগে তারা যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করেছিল, সেগুলো পাথর দিয়ে তৈরী। তার পরের বস্ত্র-গুলো হাতের; এবং সব শেষেরগুলো কাঁসা ও লোহার। প্রাচীন মানবের হাতের তৈরী এই সব বস্ত্রের ইতিহাস,— বৈজ্ঞানিক ভাষায় বার নাম "artifacts,"—তিমটী করে ভাগ করা যায়। এই তিন প্রকারের নাম—stone age বা পাথরের যুগ; Bronze age বা কাঁসার যুগ, আর Iron age বা লোহার যুগ। সুতরাং সর্বপ্রথম যুগ—পাথরের যুগের কাল-নির্ণয় করতে পারলেই, মানুষেরও বয়স স্থির করতে পারা গেল।

প্রস্তরযুগ পত্তিভেদ্য বিবেচনা করেন যে, বহুদিনের মানুষ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তারও আগে মানুষের দশটা অস্থানীয়দের অবস্থা কেটে গেছে। এই দশটা অবস্থার প্রত্যেকটাই মানুষের হাতের কাষের এক-এক রকম বস্ত্র, স্পষ্ট ও বিশেষ নিৰ্ণয়ের দ্বারা বিশিষ্টতা পেয়েছে। আবার এদের মধ্যে অনেকগুলো অবস্থাতে মানুষের কঙ্কালও পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আবার সকলের পেরে অস্থানীয়দের অবস্থা বহুদিন ধরে চলেছিল, সেই সময়টা-বরাবরই নরকঙ্কাল বেনী পরিমাণে দেখা যায়। তবে

পাথরের যুগ ধরে বতই এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই নর-কঙ্কালের পরিমাণ কমে আসে; এমন কি স্থল-বিশেষে হুই-একটাই বেনী পাওয়া যায় না।

বেনী হিসের কথা নয়,—মানুষের সবচেয়ে পুরাতন জাতি Neanderthal নামে পরিচিত ছিল। (Neanderthal বোধ হয় একটা বারগাছ পুরাতন নাম; কারণ) প্রথমে এইখানে, পরে অস্ত্র বারগাছেও Mousterian বলে কোন সাক্ষ্য পথেরই ভেতরে এই জাতের মানুষের অনেক-গুলো কঙ্কাল পাওয়া গেল। যে জাতের মানুষ এখন পৃথিবীতে বাস করছে, তার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে sapiens। যে জাতের মানুষের কথা এইবার বলা হল, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম H. neanderthalensis। এরা বর্তমান জাতের মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাত; এই ছোট্ট জাতের প্রত্যেক খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেছে। Neanderthal জাতের মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার হবার কিছু কাল পরে Heidelberg নামক একটা বারগাছ একটা মানুষের চোয়াল পাওয়া যায়; এই চোয়াল যে জাতের মানুষের, সে জাতিটা আবার আরো আপেক্ষিক মানুষ। ইংলণ্ডের সাসেক্সের মেদার পিটভাউন নামক একটা বারগাছ একটা মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে; সেটার গড়ন পুরীক্ষা করেও স্থির হয়েছে, এই মাথার খুলি যে জাতের মানুষের, তারও Neanderthal জাতের মানুষের আপেক্ষিক শোক।

চোয়ালটা যে জাতের মানুষের, তাকে একটা আলাদা জাত বলে ধরে নিয়ে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে H. heidelbergensis; আর খুলির আধিকারী মানুষটা Eoanthropus নাম পেয়ে একটা নতুন জাত বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু সাসেক্সের Eoanthropus বলা হচ্ছে, তারা একটা স্বতন্ত্র জাত কি না, এ বিষয়ে ভাবলিট, কে, গ্রেনবী নামক একজন পণ্ডিত সম্বন্ধে প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯১৬ অব্দের American Museum of Natural Historyর Bulletinএ একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। তাতে তিনি প্রাচীন কালের মানুষদের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস তত্ত-তত্ত করে আলোচনা করে' এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, Pithecanthropus নামক মাথার খুলি যে জাতের মানুষের, সেই Eoanthropus dowsoniদের Homo কোটা'র কেনা

উচিত, এমন কি, Heidenberg জাতের মানুষের অন্তর্গত বলেও তাদের বরা যেতে পারে।

আগে যে দশটা অংশীদারের অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তারই একটা ধাপের নাম দেওয়া হয়েছে Mousterian stage। Neanderthal মানুষ এই স্টেজেরই লোক। এই স্টেজের যে মানুষের অস্থি, কঙ্কাল আর খুলি পাওয়া গেছে, এর আবেশকার কোন ধাপের মানুষের কোন রকম ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। এই ধাপটা যে সময়কার বলে মনে করা হচ্ছে, সেই সময়-বন্ধাবস্থাই পৃথিবীতে তৃতীয় glacial period বা বরফের যুগ চলছিল। তার আগেকার যুগ, যেটা পূর্বনাম দ্বিতীয় এবং তার নাম inter-glacial epoch, সেই যুগে মানুষের দ্বিষ্টা অবস্থা কেটে গেছে। তাদের একটার নাম Chellean stage, আর অপরটার নাম Achealian stage। ঐ সময় ভূপৃষ্ঠের যে অংশ গড়ে উঠেছিল, তার ভেতরে মানুষের হাতের তৈরী কিছু-কিছু বস্তু-স্ত্র পাওয়া গেছে; কিন্তু এ সময়কার মানুষের দেহের কোন অংশই এখনও মিলে নাই। আবার হীডেলবার্গ ও পিউডাউনে মানুষের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাদের অধিকারীরা যে সময়ে বর্তমান ছিল, সে সময়ের সীমা এখনও স্থির হয় নি; এই দ্বিষ্টা অবস্থার এক-একটা কোন্ সময়ের আরম্ভ হয়ে কোন্ সময়ের শেষ হয়েছিল, সে সবকিছু পণ্ডিতেরা নানা মত প্রকাশ করছেন,—সকলে একমত হতে পারছেন না। কেউ-কেউ বলেন, ভূপৃষ্ঠের যে স্তরের ভেতর ঐ দেহাবশেষগুলো পাওয়া গেছে, ঐ স্তর যদি প্রথম interglacial epoch গড়ে উঠে থাকে, তা'হলে সেগুলার অধিকারী মানুষেরা যে Neanderthal-এর Mousterian stage-এর মানুষের চেয়ে প্রাচীন, তা' স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যায়। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সময় Pleistocene যুগ আরম্ভ হয়েছিল, সেই সময় থেকেই মানুষেরও সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ-কেউ আবার বলেন, Tertiary যুগেও মানুষ বর্তমান ছিল, কিন্তু এখনও তার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বীরা এই কথা বলেন, তাদের যুক্তি এই যে, ঐ Tertiary যুগের মানুষের হাতে গড়া বস্তু-স্ত্র, (eoliths) এমন কি, ঠিক মানুষের মত, অন্ততঃ মানুষের সঙ্গে খুব দাঁতু আছে এমন জীবের কঙ্কাল পর্যন্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সময়ই অস্থান শাউ, এর

একটাও খাঁটি নিখুঁত প্রমাণ নয়। Eoliths নামে যে বস্তু-স্ত্রের কথা হচ্ছে, সেগুলো যে মানুষের হাতের তৈরী হয়, এ কথা অনেক বিখ্যাত করছেন না। আর, ঐ যে মানুষের, কি মানুষের মতন জীবের অস্থি, কঙ্কাল পাওয়া থাকে, সেগুলো আর কিছুই নয়,—আতা বৌশে Dubois-এর আবিষ্কৃত Pithecanthropus erectus নামক জীবের কঙ্কাল—Upper Tertiary যুগের স্তরের ভিতর পাওয়া গিলে; আর ভারতবর্ষে শিবালিকের পাথরের মধ্যে পাওয়া Sivapithecus indicus নামক জীবের কঙ্কাল; এগুলো মানুষের, কি মানুষের মতন কোন জীবের নয়। W. K. Gregory নামক একজন পণ্ডিত অস্থান করেন যে, প্রথম হাড়গুলো যেমন মানুষের হতে পারে, তেমনই এক খাতীর বানরেরও (anthropoid apes) হতে পারে। প্রজাতি শিবালিক পাহাড়ের মির দিকের স্তরের ভিতর যে কতকগুলো খাঁত আর নিচু-দিককার চোয়ালের খানিকটা পাওয়া গেছে, ডাক্তার পিলগ্রিম (Dr. Pilgrim) সেই Sivapithecus indicus নামক হাড়গুলোকেই মানুষের বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ডবলিউ, কে, গ্রেগরী বলেন, গুলো মানুষের হাড় নয়, অস্ত্র কিছু। এই মতভেদের এখনও কোন মীমাংসা হয় নি। সুতরাং Miocene যুগের যে মানুষ ছিল, এটা এখনও প্রমাণ হ'ল না। আতাত্তে পাওয়া Pliocene যুগের Pithecanthropus হাড়গুলো বানর আর মানুষের মাত্রাধারকার কোন জীবের হাড় হলেও হতে পারে বটে, কিন্তু সেগুলোও আসল খাঁটি মানুষের হাড় নয়। এ থেকে স্থির হচ্ছে যে, আপাততঃ Pleistocene যুগেই প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। এ সবকিছু কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ নেই,—এ নিয়ে কোন মতভেদও ঘটছে না। জে, ব্যারেল (J. Barrell) নামক একজন পণ্ডিত ভূপৃষ্ঠের ভিতর থেকে পাওয়া প্রমাণগুলো বিশ্লেষণ করে স্থির করেছেন, Pleistocene যুগের গোড়া থেকে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষ কি ১৫ লক্ষ বছর কেটে গেছে। তা' হলে আমরা মনে করতে পারি, Neanderthal মানুষের বয়স এখন ৫ লক্ষ কি ৭৫০০০ বছর হবে।

এ কথাটা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, বর্তমান যুগের মানুষ সরাসরি Neanderthal জাতের মানুষের বংশধর

নয়; তবে এরা Neanderthal জাতের সমগামরিক
অন্ত কোন জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। W. K.
Gregory বিবেচনা করেন যে, Neanderthal জাত যে
রূপে উৎপন্ন হয়েছে, বর্তমান যুগের (H. Sapiens)
সেই Heidelberg জাত থেকে উৎপন্ন। কিন্তু
এই H. heidelbergensis জাতের সম্বন্ধে এত অল্পই
জানা গিয়াছে যে, তা থেকে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর-
বার যো নেই। তার পর যদি আরও এগিয়ে বাওয়া যায়,—
জাতাধীপে পাওয়া Pithecanthropus হাড়টাকে মানুষের
মনে করে, Pliocene যুগে তারা বর্তমান ছিল বলে ধরে
নেওয়া যায়, তা'হলে তারাও মূল মানবজাতির একটা শাখার
শাখা হতে পারে মাত্র,—তারাও মূল মানব-পরিবার নয়।
এখন সকলে মনে করতেন যে, anthropoid apes

আর মানুষের পূর্বপুরুষ একই; তবে, মানুষ শাখাটা
(Hominidae) বানর ও মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ
simian থেকে Tertiary যুগে অর্থাৎ Miocene যুগের
মাঝে-মাঝি কিংবা বংসরের গণনার এখন থেকে ১০০০০০০
কি ১৬০০০০০ বংসর পূর্বে, শাখা রূপে পৃথক হয়ে
পড়েছে। যেটা কথা, মানুষের বংসরের এখন থেকে
৭৫০০০ বছরের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। তবে, কেউ-কেউ
তা' বলেছেন, Pittdownএর খুঁটিটা যে তারে পাওয়া
গেছে, সেটা যদি সত্য-সত্যই Pleistocene যুগে গড়া
হয়ে থাকে, তা'হলে মানুষের বংসর আরও ৫০০০০ বছর
বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা' হলেও, আদি মানুষের,—
আমাদের আদি পূর্বপুরুষের বংসর ঠিক করতে এখনও
অনেকটা বাকী রয়ে গেল।

বর্ষ-আহ্বান

[কথা ও হৃদ—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী]

ভৈরো—ব্রহ্মলীলা

নমস্তে মতে তে সনাতন নৃতন,
অরূপ কাল-রূপ হে, অশ্রিয়ান মহীরান্।
হেরি ভিন্ন মূর্তি তব পল' পল' কণ' কণ'
কভু প্রেম-জ্যোতি কভু রক্ত ভিদির ঘন;
এস ধরণী পর ধরণীঘর আজি হে
কৃপা-বারি করি দান,—
মিলিত প্রাণে শরণ গানে করি আহ্বান।
বিতর মঙ্গল হে বিতর কল্যাণ।
আজি হে মহাকাল, নিখিল বিশ্বভূপ;
দুঃখমাহনে পাবন, ধর শান্তিরূপ;
শোক শাপ নাশি, মরণ-মারকে আন প্রাণ;
বিতর মঙ্গল হে, বিতর কল্যাণ।

খেয়া

[ত্রিনিশিকান্ত সেন]

আর না-হলেও তিরিশ বছর আমি এই তুলসীঘাটার বেয়া বাই। কেবল এপার আর ওপার। এপারের এই অশ্বপাছ, আর ওপারের ঐ বাঁশের কাড়—আমার গদুই দিয়ে বেঁচে বাবু, এইটুকু আমার পিণ্ডিহী। আমার নায়ে ঘরা ওঠে, তারা মোটে আধ-ঘড়ীর চড়নবার,—ওঠে শুধু এই গাছ পেছিয়ে বাবার দ্বারে। যদি সঁকো থাকত, নিসেন এখানকার মলটা এমন অগাধ, আর গাঙ্গের বুকটা এমন চাটাল না-হত। আমি গাঙ্গের মল ছুঁয়ে দিলেঙ্গা করে বলতে পারি বাবু, এই ছিদাম পাটনীর নায়ে কোনো গোসাঞরই পায়ের খুলা পড়ত না।

গর হয়,—ঘরা পায় বাবার দ্বারে নায়ে ওঠে, তারা বারো গাঙ্গের তেরো গর সঙ্গে নিতে আসে,—সে যে কত রকমের, বলে শেষ করতে পারিনে। কিন্তু জন্মার উঠতে না উঠতেই খতন্—আমার কথা ফুরলো, নটেগাছটি দুফলো। আমার না' কেড়ে যাটে, আর তাদের গর ডোবে মথিগাঙ্গে। চড়নবাররা সবাই সুপুষ্কপু নেমে পড়ে।

আপনি বেজার হুবে না তো বাবু? এই গরিব খেজার নারীর হুংখু যোখে, কি কাণ দিয়ে তার হুতো হুংখের কথা শোনে, এমন বান্দা কেউ নেই। আম্রকের এ কেপে খালি একলা তুমি; যদি বেজার না গয়ে, বানিকটা বক-বক করে বঁকে বুকুর বোকা হাতি করতে চাই। বেশি গেরি হবে না বাবু, খোয়া ওপারে লাগবার আগেই আমার কথা আমি শেষ করে ফালল।

আচ্ছা বাবু, আমার নাও-খানা সেন না-ই, কিন্তু আমার পেরতালীটা তো আর পার-বাটার নাও নয়। সেখানে এসে যে উঠল, তার কেন এমন তাড়াহুড়ি চলে দাবার গা হল? তার যে চলে দাবার অত সরত, সে কিন্তু তার ভাব বেখে কোনো মতেই বুকে উঠবার ছো ছিল না। আমি তার বেশ দিবা-নিশিভিত্তি ভাবই দেখেছিলাম, বাবু; থেকে-থেকে চোরা-খালি হাসত, মুখের দিকে চাইত,

আর ছাগতে পেরতালী গোছাত। বেখে মনে হয়েছিল, এতো বেশ খালা—বেশ মজার মানুষ খা-হোক।

এই ছিদাম পাটনীর সঙ্গে ছিদাম পাটনীর নায়ের কি ভাব, সে আপনি জান না বাবু? কেমন করে জানবে? —আপনি হলে বিশেষ লোক; কিন্তু এখানকার ঘরা বাসেন্দা, তাদের তা অজানা নেই। খালি একটা কথা আপনাকে বলি,—পারঘাটার এসে, কাকেও কখনো হা-পিত্তেলে বসে থাকতে হয়েছে, এমন কথা কানুর বলবার ছো ছিল না। যদিও বে এগেছে, দেখেছে, বান্দা বৈঠা-হাতে নারে হাঙ্গির।—“বলি ও ছিদাম, তোর কি নাও-খাওয়াও নেই!”

“না বাবু,”—হেসে বলতাম, “পাকা হরতুকী খেয়েছি।”

কিন্তু বিয়ের পর, শুনে তুমি আশ্চর্যি হয়েন বাবু, এক নাগাড়ে একটা বছর, পাঠশালা-পালানো পড়বার মতো ধর-কট করে ধরে না আনলে, আমাকে কেউ নারে এমন হাঙ্গির করতে পারে নি। পারে দাবার লোকেরা যখন বাস্ত হয়ে উঠানে এসে, হীকাইকি করে গলা ডান্দছে, ছিদাম হয় তো তখন তার হান্নাখরের কোণটিতে বসে, চেউএর তাল আর নৌকোর নাচ ফুলে, পাটনী-বোরের বাঁটনা-বাটা আর তার মেহের পোলন বেখেছে, নয় তো চেলের হাঁড়িতে কাঠি বেবার দ্বারা বাস্ত হয়ে, তার হাত থেকে কাঠীটা কেড়ে নেবার দ্বারা নিজে চোটা করছে। তার কি তখন বাইরের লোকেরের চীংকার শোনবার ফুরলং ছিল? আপনি হয় তো শুনে ভাবছ বাবু, যে, ছিদামটা কি পাগল! তা আপনায় যোব সেই নে, বাহুবে অগ্নি-পাহাও ভাবে। কিন্তু আমার তো মনে হয়, জীবনে নিসেন একটিবারও যে এমন পাগল না হল, তার এ ছিদার হাটে আসা—কেবল সিঁছে আসা।

হুংখের কথা বলব কি বাবু।—আপনাদের সেই পাটনী-বোরের ছাগর ফুলে ছিদাম যখন তার বড় সাংঘের পারঘাটা,

নাও, আর বৈঠাখানার বিয়ের নজরে দেখছে, ঠিক সেই তখন একদিন বলা নেই কওয়া নেই, ঘুণ করে সে আমার মনোর থেকে নেমে পড়ল। অতিনার হয়েছিল, বাবু!

পারে ঘাবার লোকেরা, তবু মনে হয়, নারে উঠে কিছুক্ষণ বসে, গরও যা-হয় খানিকক্ষণ ধরে করে; কিন্তু এ কি করলে তাই বলুন তো? বিয়ের পরের একটি বছর কি আবহভাবের মতও লগা? আমার তো মনে হয়, তার চাইতে ঢের ছোট; চোখ বুলায় আর বগুন দেখায়, —সে কতক্ষণ? কিন্তু আশ্চর্য, সে আবহভাবের বগুন আর আমি এ জীবনে কুন্তে পারালাম না— বেন চোখের উপর বাসা বেঁধে রয়ে গেল।

নারের পেছনদিকে ঢেয়ে দেখো, ঐ যে ঘাটের কিছু দূরে, পাতা-নেই একটা মত বড় বাগান-গাছ, তার শুকনো ডালপালা নিয়ে হাড়গোড়-বাঁ-করা জুতোর মত ঠার বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়ে,—ওর তখন অমন হাসি ছিল না; ওরি তলার আমি তাকে নিম্নের হাতে পুড়িয়ে ছাই করে কেল-ছিলাম। তার সেই চিতার আঁকনের ভাতে বোধ করি, আমার এই কলমেটাও বেশ-একটু কলসে এসেছিল! তা নইলে গাছ তো শুকায় নি বাবু—অলও দেখছি, অলের ধরও দেখছি, কিন্তু অলের সে ছিঁচি, সে নাচ, সে গান কোথায় গেল?

আচ্ছা বাবু, তোমরা তো ঢের ঢের নেকাপড়া শিকেছ। শুনেছি নেকাপড়া শিকলে ওপরের ঐ আশমান আর অলের তলের এই পাতালের খবর ঠিক-ঠিক বলতে পারা যায়। বলতে পারো, হালুহ মূল কি হয়? পারো না! —কেউ পারে না বলছ! কিন্তু কেন পারে না বাবু? তা হলে আশমানের খবর, আর পাতালের বাজা কেনে লাভ?

সে চলে গেল; আর আমি রইলাম। রইলাম,—ছুত হয়ে এই গাছের খেঁচা পায়পার করত। কিন্তু দেখো, হালুহ কি পাগল! যে গাছের অল নেই, আছে কেবল ভালনা খোলায় বালি, হালুহ সেই গাছের অলও আঁকলা করে খেতে চায়, তারি অলে দাঁটার কেটে নাইতে চায়। চোখের ওপর মূল, নিজের হাতে পুড়িয়ে খোঁচা করে আশমানে উড়িয়ে দিলাম। তবু কি তার আশা ছাড়তে পেরেছি? খেঁচা বেয়েছি, আর বাগান-তলার

দিকে চেয়েছি। এ যদি পাগলামী না হয়, আর পাগলামী কাকে বলে, আপনি বলতে পারো বাবু? কিন্তু এমন পাগল কি আর কেউ নেই? আমার তো মনে হয়, ঢের-ঢের আছে; তবে কেউ বলল করে, কেউ করে না।

যখন ঘাটে পায়পারের লোক মা-খাচ্ছিল, মরা বাগান-গাছের ওপরকার ক্রিমের-কাতর ডিলের ডাঁক, আর অনেক ঘিনের ঘর-ছাড়া নারের মাতীর ভেটেল হরের গান, কাপে এসে ক্যাপা মনটাকে আমার আরো বেশি করে তুলত। তখন বৈঠা-হাতে নারের ওপর চোখ বুজে বসে-বসে ভাবতাম—কি যে ভাবতাম মাথা-বুণ্ড, তার ঠিক নেই। মনে হত, বেন এক সরাসী-ঠাকুর,—তার মাথার ভটা ছেড়ে দিলে, ছুঁয়ের ওপর ভিড় পাকিয়ে পড়ে, গারের জোনাক কালো কাহুরের ভেতরের আলোর মত অল অল করে ফুটে বেরত,—এই গাছের ধার দিয়ে কোথায় কোন্ পাহাড়ের বেশে চলে যেতে-যেতে, হঠাৎ ঐ চিতার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার পর তার কমগুণের অল খানিকটা হাতে চেলে নিয়ে, বিড়-বিড় করে মস্তর পড়ে চিতার ওপর ছড়িয়ে দিতেই, বেন সে নাট থেকে টাপা-হলের মত ফুটে উঠল।

আরো কি মনে হত কোনো বাবু?—জীহবে উঠে ঐ যে বাগানগাছ, হয় ত ওরি আড়াল, নয় ত ওর পাশে যে আশাওড়া কোণ, ওরি মধ্যে সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। হাতে আমি উতলা হয়ে তাকে খুঁজে বাঁ-করি, তাইহলে সে বেন, একবার উকি মেয়ে, অমনি আমার পা-চাকা বেবে। মন আমার উতলা হয়ে উঠত; নারের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, ঐ গাছ, আর ঐ কোণের দিকে চাইতাম।—কোথায়, কোথায় সে? হুছ করে বাতাস বইত, কোণের পাছগুলো মাথা নেড়ে-নেড়ে বলত, নেই—নেই,—সে নেই। নেড়া বাগানগাছের হামার আঁসুল, মাথার ওপরকার কঁকা আকাশ দেখিয়ে দিয়ে বলত,—যদি থাকে ত এখানে।

বাবু শু কি। তুমি যে চোখ বুজছ! কথা শুনে বুঝি তোমার চোখে অল এসেছে? তোমার প্রাণটা খুব নরম—কড় হরদের শরীর তোমার,—না বাবু? কিন্তু দেখো এ হু-খু—হু-খু সেটা হু-খু হলেও, ছিঁচাখ, বুকের পুরানো দরদের মতো, চোখ বুজে বহনাত করতে পারত। না

করে চাড়া কি বাবু? হাছের বড় সাধের ধানী খিনিস হারালে, কি নষ্ট হলে সে কি করে? কাঁধে-কাঁটে, তার পর চুপ করে তার অকথ্যের দুঃখ বহ। কিন্তু বহি দেখে, তার সেই সাধের খিনিস আর কেউ পেয়েছে, মনের সুখে ব্যবহার করছে, তা হলে তার কি হয়—তার কলমেটার মধি কেমন করে, একটু সম্ভবে দেখো ত বাবু!

বড় বেশি দিনের কথা নয়,—সে দিনও আমকের মতোই ঘাটে পাড়ে বাবার লোক ছিল না। এতকণ আমরা বতখানি পেরিয়ে এলাম—গাঙ্গের প্রায় আট-দশটা হবে না বাবু? আমার পষ্ট মনে পড়ে, আশম্বানের মোছানা, দামনের পাড়ের গাছপাশান্তসো, আর গাঙ্গের এই বাকি কাথখানার রূপালী ধরিয়ে, আমাদের পেরিয়ে দিকে, আস্তে আস্তে এগিয়েছে। আমি নারের উপর চুপটি করে বসে, মোছানার দিকে চেয়ে-চেয়ে, গেল রাত্তিরের একটা ভাঙ্গা-চোরা স্বপন মোড়াভাড়া দিয়ে রেখবার চেষ্টা করছি। নাও-বানা ঘাটেই বাঁধা, আচম্কা নড়ে উঠতেই, দুখ কিরিয়ে চেয়ে দেখি, কে একজন নারে উঠছে।—“কে গো, কে?”—হেঁকে বললাম। অব্যব নেই। বুঝলাম, চোঁকে কড়ি নেই, অমনি পার হবার চেষ্টা, সুখে তাই বোলু কুঠছে না। কিন্তু—উই, সেটি হতে থিঙ্কিনে কোনো মতেই। দয়া? আমাকে কে দয়া করে বল? মনিব—যার জলার আমি থেরা বাই, সে দয়া করে, কোনো কিত্তি আমার খামনা রেহাই করেছে বলতে পারো? তার পর তোমরা যাকে দয়াল বল, কাঠালের ঠাকুর বল, সেই বড় গাঙ্গের বড় পাটনী—পেটে বার কিসে নেই, বার উপরে মনিব নেই, সে আমার বিনি পরসার তার গান্ধী পার করে যেবে কি?—কখনো না। ঐ বে গানে আছে,—

“গো, কড়ি নেই বার

তুমি তারে কর বে পার”

ও মিছে কথা। আমি চীৎকার করে বললাম, “নামো, আমার না’ থেকে, নামো বলছি।” হিঙ্গাম চেয়-চেয় লোককে দয়া করে ঠেকেছে; বাহ নাম দয়া, তার নাম ঠকা, সে ঠকা হিঙ্গাম আর ঠকেছে না। কিন্তু লোকটা নড়েও না, কথাও কয় না। হঠাৎ আরো উঁচু, আরো কড়া করে বললাম, “ঈগুরি—ঈগুরি করে নামো বলছি, ভাল-

ভালই যদি না নামো, ভাল হবে না কিন্তু।” গাঙ্গকে বলি না পাথরকে বলি!—ভালও বলে না, রোখিমও বলে না, একেবারে চুপ! বড় রাগ হল।—“হোসো, তা হলে তোমাকে বেশ ভাল করেই পার করাছি”—বলে এক লাফে তার ঘাড়ের উপর পড়ব; এমন সদয় সে যেন কি বলে উঠল। আমি চমকে উঠলাম—হঠাৎ যেন চেনা-চেনা। কিন্তু চিনি-চিনি করেও কিছুতেই চিনে উঠতে পারিলাম না। কাছাকাছি এগিয়ে বেলাম। মোছানা যেটুকু ছিল, তাতে হাছব চেনা না পেলেও আমার চেনা বার। ঠাউরে দেখে বুঝলাম, পুরুষ নয়—এ বেরে-হাছব!

“হাঁগা কে! কে তুমি?”

“আমি।”

“আমি!” নাম বলে না, নামও বলে না, বলে কি না—“আমি!” খুব মজার লোক ত বা-লোক! দেশলাইয়ের কাঠিগুলোও আমার ভেমনি!—ঠকু-ঠকু, ঠকাঠকু কেবল ঠকেই বাছি। কোনোটা বা কসু, কোনোটা বা হুসু, কোনোটা বা মছ!—সিকি-বজাটাকু ঠোকাঠুকির পর, স্বপন বাস্ত প্রায় কাবার, তখন কি ভাগিসা, একটা কাঠি কসু করে অশে উঠল। সাবধানে তার পর লম্পটা জ্বলে নিয়ে, তার সুগের গোড়ার ধরে দেখি, বল্লে পেন্ডর বাবে না বাবু,—সেই, আর কেউ নয়—সেই। বাকে ঐ বাহাম-তলার পুড়িয়ে ছাই করে বেগেছিলাম—সেই!

আর কেউ হলে নিশ্চই তার পেয়ে আঁৎকে উঠত; মনে কবুত, সে কুত হয়ে বাড়ি মটিকাত এসেছে! কিন্তু আমি,—আমি যে তার দেখা পাবার জন্তে পারল। আমার কি ভর-ভর কিছু ছিল? কতদিন নিভুতি রেতে একলা আমি নাও নিয়ে ঐ বাহামতলার পেছি, যদি দেখা পাই—যদি কুত হয়েও সে একবার আমার দেখা দেয়। কিন্তু দেখা ত পাই নি! এককাল পরে যদি সে আমার ঘেঁচে দেখা দিতে এল,—বে বেসেই আশ্রুক, আমি ভয় পাব? খুশী হয়ে, আত্মবি হয়ে, আমি বলে উঠলাম, “তুমি!—এ্যা তুমি!”

প্রথমটা সে যেন কেমন জড়জড় হয়ে পড়ছিল; তার পর আমাকে একটুখানি ঠাহর করে দেখে, বল্লে, “আমার তুমি চেন?”

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলা!—ও কি আর ভুল হবার আশা আছে? বল্লাম, “তোমার আর চিনিবে। তুমি যে আমার—” সে তার ভগ্ন-ভঙ্গর চোখ দুটো বন্ধুর সাধি টান করে মেলে, আমার মুখখানি দেখতে-দেখতে বল্লে, “মিছে কথা, তুমি নিশ্চর ঠাট্টা করছ আমাকে। তুমি ত পাটনী, এখানকার খেয়া বাও, আর আমার হালাস পরলা।”

পরলা! না ভেবে-চিন্তে ওখুঁই আমি বলে উঠলাম, “কথনো না, তুমি পাটনী।”

বেলে কেললে,—সেই হাসি, যে হাসি দেখে হিম্মত পাটনী একদিন তার পাটনীপিরি ভুলেছিল। কিন্তু একটু পরেই মুখখানা আঁধার করে বল্লে, “ঠাট্টার সময় নয়, আমার সোরাযীর বক্ত অমুখ। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি আমার পার করে দাও।”

সোরাযীর অমুখ! বলে কি ও! আমার বুকের ভেতরে যেন একটা মস্তবড় লগ্নীর বা পড়ল। মনের ধাঁধাও অমনি আমার চুট করে কেটে গেল। আমি বুঝলাম, এ ভূতও নয়, সরাসরী-ঠাকুরের বরে হাড়ে-মাসে জীয়ে উঠেও আমার দেখা দিতে আসে নি,—এ সত্যি-সত্যিই পরলানী, কোন্ এক পরলার ঘরে ওর বেয়েছে। এবারে পরলানী, কিন্তু আর যথেষ্ট পাটনী-তৌ হয়ে এই যে আমার ঘরে এসেছিল, তার আর ভুল নেই।

বাবু, আপনি হাস্‌ছ!—আমার কথা বোধ হয় তোমার শেতর হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না বাবু? সেই মুখ, সেই চোখ—সেই সব, শুধু সে নয়? আচ্ছা চোখটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কথা? কথা, গলায় স্তব্ধকে তো আর বাইরের মিলিস বলে আপনি উড়িয়ে দিতে পারবে না,—সে তো ভেতরেরই। তবে?

লম্প নিবে গেল,—বাঙাল ছিল না; পিরমিহী আশ্রয়ান, পাড়ের গাছপালা, পাড়ের জল সবই যেন অবাক হয়ে, মম বদ্ধ করে গাড়িয়ে, কি ভাবছিল,—কিন্তু আমার হাতের লম্প নিবুল, বোধ করি আমার কল্লের ভেতরে যে তুকান উঠে গিয়েছিল, তারই বাগটা খেয়ে। আমি তার সামনেই ভূতের মতো থক্‌কে গাড়িয়ে ছিলাম; কিন্তু আমার অবস্থা তার বুঝার উপায় ছিল না। সে বাত

হয়ে উঠে আমার বল্লে, “সোহাই তোমার মাকী, আমার পার করে দাও, সোমাক তোমার ভাল করবে।”

মনে-মনে বল্লাম, ভাল বা করবার, তা সোমাকে ভাল মতেই করেছেন, আর তার আমার কাজ নেই। সে বাই হোক, কিন্তু তোমাকে আমি পার করে দেব পরলানী। বৈঠা দরলাম। পাড়ের গাছপালা ছাড়িয়ে চাঁদ উঠেছে। আঁধারের শোষণখান আর কোথাও কিছু নেই। মনটাকে বলে-করে অনেকটা ঠাণ্ডা করে, তার পর আমার তার সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম, “আচ্ছা, জগো পরলানি, তোমার ঘর কোথায়, বাপের নাম কি? তোমার দেখছি, খুব কাঁচা বয়েল, কাকেও সঙ্গে দেখছি না যে!”

পরলানী দুহাতে তার আঁচলের খোঁট পাকতে পাকতে বল্লে, “সঙ্গে আর কে থাকবে! আমি যে পালিয়ে যাছি!”

“পালিয়ে! কেন গা, কিসের ভয়ে?”

“কিসের ভয়ে আর? বলেছি ত আমার সোরাযীর অমুখ। বাপের বাড়ী আসবার পর, সোরাযীর সঙ্গে আমার বাপ-ভাইদের বগড়া হয়। তার পরেই তার অমুখ,—অমুখ শুনেছি, খুবই বাড়াবাড়ি। আমাকে নিয়ে বাবার ভয়ে সেখান থেকে লোক এসেছিল, এরা পাঠায় নি। আমাকে ছেড়ে দেবে না, এই এদের ইচ্ছে।”

পালিয়ে বাবার কারণ বুঝলাম, কিন্তু সোরাযীর সঙ্গে এর বাপ-ভাইদের বিবাদের কারণ বুঝলাম না। তা বুঝবার আমার পরকায়ও ছিল না। কিন্তু এর পরিচয়টা? থাকে এত ভলবাস্ত্রাম, এত ভালবাসি; বার বোরাপোঁচা চিতার দিকেও নিম্নে একবার না চাইলে আমার মিন কাটে না, সে আমার দেখা দিয়ে অমনি চলে যাবে?—তার পরিচয়টা নেব না? ভালবাসা না পাই, ভালবাসা দেখার, এমন কি চোখের দেখা দেখে আসবার পথটুকুও কি খোঁসলো রাখব না? জিজ্ঞেস করলাম, “হাঁগা, তোমার ঘর কোথায়?”

মুখ ঝুঁক করে কি ভাবতে লাগল, আমার কথায় অবাক দিল না। হয় ত আর কি ভাবছে, আমার কথা শুনেই পার নি, এই ভেবে কথাটা আমার আমি পালটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

খুব নরম হুয়ে, দুখটি না তুলেই সে বললে, “সে কথা জেনে ?—সে কথা শুনে কি হবে তোমার ?”

পরলানী যদি তার হাতের নো গাছটি দিয়ে খুব ঘোরে আমার কপালে একটা বা মার্ভ, বোম্ব করি, কিছুই করে উঠতে পারত না। কিন্তু তার নরম কথার চোটে খেয়ে চৌকি বেঁধা মাছের মতো আমার পরলানী বেন খালি ছটফট করতে লাগল।

পরলানীর নরম কথার ভাব কি জানো বাবু ? ভাব এই যে, সে গেরস্তর বো। পালিয়ে পায়ে হেঁটে সোরাযীর কাছে চলেছে। পরিচয় দিলে, গুর, গুর বাগের, আর গুর সোরাযীর সকলেই মাথা আমার কাছে হেঁটে হয়। তাই আমাকে বলা হল, “সে কথা শুনে কি হবে তোমার ?” এতক্ষণ বে ভিজ্ঞেল করে-করেও পরিচয় পাই নি, তাতেই গুর মনের গতি আমার বুকে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন বেন কেমন বোকা বনে গিয়ে-ছিলাম।

চুপ করে বৈঠা বাইতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে বুকের কাংরাগিটা একটু ক্ম হয়ে এসে, আমার মনে হল, কিন্তু গুর বোম্ব কি ?—আমিই না হব ওকে পাটনী-বো বলে চিন্তে পেরেছি, ও ত আর আমাকে আপন বলে, সোরাযী বলে চিন্তে পারে নি। জেনও আমার কাছে ঘরের পরিচয় দিতে বসবে ? আলোপ কন্নার ইচ্ছে আমার একটু-একটু করে গানের ঘোরাবের মত আমার বুক ছাপিয়ে কুণে উঠতে লাগল। চলে ত বাবেই—পরিচয়টা না দিয়েই হয় ত চলে বাবে ; কতক্ষণই বা, ছুটো কথা করে, ছুটো কথা শুনে মনটাকে আমার একটু হাল্কা করে নেব না ? কথা কইতে বুক কন্নার, “তোমার সোরাযীর অম্বুখের কথা যে সত্যি, তা তোমার কে বললে ? তোমাকে বাগের বাড়ী থেকে নিয়ে বাবার মতো এ তো মিথো ছলও হতে পারে।”

তোবেছিলাম, আমার কথায় সে কতকটা সোরাগতি পাবে—মনটা তার আমার দিকে একটু হুইয়ে আসবে। কিন্তু সে আমার ভুল। পরলানী বেন চুপাতে আমার কথাটিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললে, “না—না, মিথো ছল কন্নাও না,—মিথো ছল বলে কখনো তার মতো আমার মন এমন উতলা হয়ে ওঠে ? তার বড় অম্বুখ ;—কে জানে

সে কেমন আছে।” বলেই থামে গেল। পলা তারি ঘরে উঠেছিল, বুখাম চোখে মল এসেছে।

দেখলে বাবু, টান ! তার সোরাযীর অম্বুখ হয় ত মিথ্যাই, কিন্তু সে তা মিথো বলে মানতে পারছে কি ?—তারি জন্যে বাড়ীরা হয়ে ছুটে চলেছে ! এই কাটা বরসে ঘর থেকে একলা বেয়েবার বাগাই কি ক্ম ! কিন্তু সে কথা বেন তার মনেই বোই। সোরাযীর জন্যে ডব-জয়ের মাথা ঘেয়ে বাড়ীরা হয়ে ছুটে চলা—কথাটা অবস্ত ভাল, খুঁই ভাল মল নেই ; কিন্তু আমার পক্ষে কেমন ভাল, সে কথাটা আপনি একটু ভাব্ছ কি বাবু ? এই যে টান, এই যে চোখের মল নিয়ে সে আর একম্বনের জন্যে ছুটে চলেছে,—সে কে ? ছুধিন আগে পাটনী-বো হয়ে বখন সে আমার ঘরে এসেছিল, তখন আমিই কি ছিলাম না তার সব ? মাননা একটু মাথা ঘূলে, গাটা একটু গরম হলে আমারি জন্যে সে অরি-ধারা তেবে-তেবে সারা হত !

বাক্ সে কথা। তার পর বা বলছিলাম, তাই শোনো। গানের একম্বিকে মুখ করে সে বসেছিল। কুটকুটে জোড়না তার মস্ত গায়। মাথাটার পেছন দিক আঁচল দিয়ে মল একটু ঢাকা, মুখের একটা দিক—নরম কোমল ভরাওগি গালটি, কায়ের পাশ, বুকের নীচের চোখের ঝাঁক, খুঁতীর গোল ধাঁজটি আমি বেন পষ্ট দেখতে পাছি। পা ছুটি ছড়িয়ে হাঁটুর উপরে হাঁটুটি দিয়ে, বা হাতে দেহের ভরটি রেখে, একটুখানি কাঁত হয়ে ঘরের মেজের বসে পাটনী-বো বেনন করে আমার সঙ্গে গল্প কন্না, একেবারে অবস্থ সেই ভাবটি। এ যে আর কেউ নয়—সেই—আমারই সেই, তাতে আর একটুও ভুল বোই। দেখতে-দেখতে আমার বেন কেমন বিবভুল হয়ে গেল ; আমি ব্যাগুগাতা করে বিজ্ঞেল কন্নার, “হ্যাঁ গা, সত্যিই তুমি আমার চেনো না, সত্যি ?”

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে মুখ কিরিয়ে চেয়ে রইল। পাটনী-বোয়ের সেই সাদা চোখের কালো ভাসা-ভাসা ছুটো চোখের তারি আমিও অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। বনে হল, বেন সে আমার চিন্ছে, এগনি হয় তো আমারই মতো বলে উঠবে—হ্যাঁ গা, হ্যাঁ, চিনেছি, ওগো চিনেছি, তোমার আর চিন্ না।—তুমি যে আমারই। কিন্তু সে আমার দিছে আপা, সে তা বললে না ; বললে,—“তোমাকে আমি কেমন করে চিন্ ? আমি ত আর

কখনো পারে হেঁটে আসিনি, তোমার নামে উঠেও পার
হইনি।”—বাস্!

বে সোক পারের শাড়া পেলেই বলতে পারত, আমি,
কি, আমি কি না, সেই সোক আমারই সামনে বসে,
আমারই হৃদয়ের দিকে চেয়ে বলছে—তোমার চিনিমে,
তুমি পাটনী, আর আমি পরলা। যদি আর কিছু না-
বলে এও বলত যে, তোমাকে যেন চিনি-চিনি বলেই
ঠেকেছে, কিন্তু কিছুতেই চিনি উঠতে পারছি না, তা হলেও
যে কতক ভরসার কথা ছিল। বলে কি-না, কেমন করে
চিন্বে। হারে, যদি চিন্তেই না পারবি, তা হ'লে এক
দিন তুমি কেন আমাকে গোপের আঁড় হতে দিতিস নে,
কেন তুমি আমাকে অন্ত ভালবেলে মাঝার করে রেখেছিলি?
তার পর, কখন চোখ বুজে ঘুমাশি, বুধ থেকে রেগে
উঠেই বলছিস, তোমার আমি চিনিমে—তুমি কোথাকার
কে, এক নায়ের মাতী!

যেথ, আমি পাপলের মতো কি আবেগ-ভাবোন্মত্ত বচ্ছি!
তার কি শেষ, যে তাকে আমি এত দুঃখি? সে ত আর
ইচ্ছে করে আমাকে ভোলেনি, আর ইচ্ছে করেও আর
একজনের ঘরে যায় নি। কোন্ এক খাম-খোলা
বাঁকীর তাকে নিয়ে এই জ্বরগ্রস্তি ভোগবাঁকীর খেলা
খেলেছে। শেষ যদি কারো থাকে ত সে তারই, না বাবু?
আজ্ঞা, যে পাখাণে-পড়া বাঁকীর আড়ালে বসে-বসে তার

এই সমের খেলাটা খেলেছে, তাকে একবার চোখে দেখা
যায় না? বেখলে কি কতভান? কি আর কতভান,
আমার হাতের এই বৈঠাটা দিয়ে তার মাথা খুব ক'লে
হনের মত একটা বা মেরে বেখ্ভান মাথাটা তার কত
শক্ত।

পরলানীর কথাই আমি কি জবাব দেব? চূপ করে
আমার বা কান তাই আমি করতে লাগলাম—বৈঠা বেয়ে
চললাম। কিছুক্ষণ পরে সে আমার বললে, “তুমি যে
এত ব্যাগ্গতা করে জিজ্ঞেস করছ, আমার চেন কি-না,
চেন কি-না—কেন বল দেখি?”

কেন! আমার বলে, কেন! বলি, এতদিন আমি
সংসার পেতে ঘর করিনি কেন? বাসায়-ভলার ঐ
শশানের দিকে চেনে-চেনে আমার সমস্ত সংসারকে আমি
শশানঘট করে তুলেছি কেন? এরও যে জবাব, ওরও সেই
জবাব।

কিন্তু এক্ষণে আমার না-খানা ঘাটে দিয়ে দেগেছিল।
আমার জবাব শোনার জন্য তার আর এতটুকুও তার
সইল না, টপ করে আমার না থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু
খালি নামতেই সেখান, তার পর কোন্ পথ ধরে কোন্
দিক দিয়ে যে কোথায় গেল, সে যেন আমি বেখ্ভেই
পেলায় না।

কবি নবীনচন্দ্র*

[মানবীয় বিচারপতি শ্রীতার আন্ততঃ্য চৌধুরী কে-টি]

কবি নবীনচন্দ্রে বিশিষ্টাচ্ছেন যে, আমরা এই অনন্ত
অভিন্ন-ক্ষেত্রে, অনন্ত অভিন্নের এক-একজন অনন্ত
অভিনেতা। যখন তাঁহার সেই কথা মনে হইত, তখন
তাঁহার হৃদয় আত্ম-পরিমা-পূর্ণ হইত। নবীনচন্দ্র তাঁহার
কবি-জীবনের মধ্য ও শেষ ভাগে সেই অনন্তের অন্ধান তাহা
হৃদয়ের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চারি-
দিকের নিতা নৃতনের মধ্যে চিরস্থায়ী পুরাতন বাহা,
অনন্তের বাহা, বাহা অনন্ত—তাহাই কবি আমাদের নগ্নপে
উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সব বড় কবিই

আধুনিক হইলেও বহু পুরাতন। ইতিহাসে জীবনের এক-
একটা কণামাত্র থাকে। কাব্য জীবনের সবটার মঙ্গলত
প্রাপ্ত। তাহা বহু প্রাচীন। প্রকৃতির দ্বারা চিত্র-ছন্দোময়।
সেই বহু বেদের তাহা ছন্দোময়। কবি কাণ পাতিয়া
যখন সেই ছন্দ শুনিতে পান, তখন তাঁহার ভাব ও ভাষা
ছন্দস্বরূপ হয়। বৈবচক, কুরুক্ষেত্র, প্রোক্ত ভগবানের আদি
মধ্য ও অন্তিম গীতার চিত্র। কবি যখন দেখিলেন যে,

* কবিকর্তা পরিচয়-পরিচয় কবির নবীনচন্দ্র সেবার দ্বন্দ্ব-
বৃত্তি এতটা উপলক্ষে সভাপতির অভিধাণ।

ঊর সান্নাধ্য ক্ষুদ্র ঘরবতী, ক্ষুদ্র কুশাবন নর, তখন কবি
প্রচারক ভাবে আমাদের এই শিক্ষা দিলেন—

ঊর রাজা নীলাধর মনবি-রসর
ঊর রাজা বিখ্যাত, তিনি নারায়ণ,
ঊর রাজা বন্দরাজা, কহিতে প্রাবিত
নাহি সাধা সমুদ্রের। স্বপ্ন পায়াবার
চুখিয়া চরণতট হবে প্রবাহিত
সইয়া চরণ-ধেণু মন্তকে তাহার।

তিনি আশাপূর্ণ রসের গাহিয়াছিলেন :—

উন্নতির পথ চারাপথের মতন
প্রীতিময় স্নেহময় পবিত্রতাময়,
বহিয়াছে প্রসারিত, সেই পথে প্রভো
মাতীর জীবন-তরী লব ভাসাইয়া।

এবং তিনিই ভবিষ্যৎ-বক্তার মত এই কথা বলিয়া
গিয়াছেন—

কিছু দিন পরে হবে কি শাস্তি স্থাপিত
ধর্ম-রাজ্য-ছায়া-তলে! আলোকিক জগৎ
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অস্বর
শাস্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!
শির বাণিজ্যের কুঞ্জে শিক মধুকর
সাহিত্যের সঙ্গীতের, উঠিবে গাহিয়া।
আর্য্য অনাধর্মের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সান্নাধ্য মহান
কহিবে স্মরন পার্থ! যুগ যুগান্তর।
ভারতের মরুস্থান হবে রাজস্থান।

কবিই আনাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন

“এক জাতি মানব সকল
এক বেদ মধা বিশ্ব অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার মানব রসর
একনায় মহাবল স্বধর্ম-সাধন।”

কিন্তু আমাদের ক্ষম কি ভাবে এখন চকল, কি আশার
আমরা উত্তেজিত, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে
নব বিশ্ব আর বলিবার উপযুক্ত দিন নহে। আমার
একেবারেই মনে হয় না যে, কবিবরের স্বষ্টি-সন্মানার্থ
সভার উপযুক্ত সভাপতি আমি। তবে বাল্যকালে তাঁহাকে
সেখিয়াছি,—তিনি আমাকে ছোট তাইসের মত যেহ

করিতেন। তিনি আমার পিতাঠাকুরকে বড়ই শ্রদ্ধা
করিতেন; এমন কি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে তাঁহার ও অন্ত
কোন বন্ধুর বিষয়ে তিনি এই কথাটি লিখিয়াছেন—“ইংরাজ
হুজনেই নয়দেব। ইংলিশের চরণারবিন্দ-সমীপস্থ হইবার
যোগ্য লোকও আর আমি দেখি নাই।” আমার বিষয়ও
একদম্বে “আ” ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি
আমার ঘরী জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসিত করিতে
হইতেছে জানিলে, বোধ হয় আর সে প্রার্থনা করিতেন না।
আমি তাঁহাকে চিনিতাম, তিনি আমাকে যেহ করিতেন,—
সেই সাহসে আপনাদের আজ্ঞা আজ্ঞা পালন করিতে উপ-
স্থিত হইয়াছি। তাঁহার জীবনের চুই-এক কথা আমি জানি;
তাহা তাঁহার আত্ম-জীবনীতে নাই। আমার মনে পড়ে, যখন
তিনি ‘অবকাশরঞ্জিনী’ লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন মধ্যে-
মধ্যে আমাকে তাহা পড়াইয়া শুনাইতেন। যশোহরে তখন
উমাচরণ দাস মহাশয় হেডমাষ্টার। লগবন্ধু ভট্ট (চুচুন্দরী-
বধ কাব্য লেখক), শ্রীশঙ্কর বিদ্যারত্ন, শিশিরকুমার বোম্ব,
বীনবন্ধু মিত্র মহাশয়দিগকে—আমার মনে পড়ে। সে আসরে
অনেকেই স্থান পাইতেন না। কিন্তু তাহাতে কবি নবীন-
চন্দ্রের স্থান ছিল। তিনি স্কুট (flute) বাজাইতেন; ছোট-
ছোট কবিতা লিখিতেন, ও পড়িয়া শুনাইতেন। উমাচরণ
বাবুও Captain Richardsonএর ছাত্র। আমার
পিতা Shakespeare recite করিতেন, এবং নবীন বাবু
মধ্যে-মধ্যে Byron আওড়াইতেন। পলাশির যুদ্ধও সেই
সময় লেখা আরম্ভ হয়। Shakespeare ও
Millon-সেবকদিগের নিকট Byron স্থান পাইত না।
তখন আমার মরণ-শক্তি বড়ই প্রবল ছিল। কবিতা
শুনিলে ভুলিতাম না। সেইজন্য আমাকে মধ্যে-মধ্যে ইংরাজি
কবিতা আওড়াইবার জন্য তগব হইত। আমি একদিন
Scottএর Lady of the Lake হইতে কিছু আওড়াই।
তাঁহাদিগের সকলের কাছে তাহা বড়ই নূতন লাগিল।
Scottএর উপক্ৰান্ত তাঁহারা পাঠ করিতেন; কিন্তু তাঁহার
কবিতা যে পাঠ্য, তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না। সেই
দিন হইতে নবীন বাবু ইংরাজি কবিতা পাঠে আমার সহপাঠী
হন। Scottএর ছন্দ তাঁহার কাছে বড়ই ভাল লাগিত;
এবং মধ্যে-মধ্যে তিনি বালাশার তাহার অক্ষরগণের চেষ্টা
করিতেন। কিন্তু তিনি তুল্যক্রমেও কখনও ইংরাজিতে কবিতা

ইমানদার

(উপভাস)

[খ্রীষ্টলব্ধালা ঘোষণা]

মাস মাসের প্রথম। বৈকালে এক পশলা স্ত্রী হইয়া
দিরাছে। ঈতের ঠাণ্ডা হাওয়া অধিকতর ঠাণ্ডা হইয়া। তীব্র
বেগে বহিতেছে। ঘরের বাহিরে বাওয়া মানুষের অসাধা
হইয়া উঠিয়াছে। মন-প্রতিষ্ঠিত বাকুড়া-মাসেদার শাহিনের
অন্তর্জাতী স্ত্রী—স্টেনটা মতাকার তেপান্তর মাঠের মধ্যেই
অবস্থিত বটে। চারিদিকে আড়াই মাইলের মধ্যে জন-
মানবের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সত্য-ধান-কাটা,
লাঙ্গল-চষা, শুল্ক-স্বপ্নের মাঠগুলি খ্রীষ্টান স্ত্রীতে পড়িয়া আছে।
দূর জগলে শূণ্যলের দৃষ্টি-ছয়া, আর পেটের কৰ্কশ
কণ্ঠের ছাড়া কোন শব্দ নাই। রাত্রি সাড়ে বারটার শেষ
ট্রেণখানির প্রতীকার রেল কোম্পানীর বেতনভোগী চাকর-
করতী ট্রেনের ঘরে জাগিয়া বসিয়া ছিল। থানামরে ট্রেন
জাগিয়া ট্রেনে দাঁড়াইল। গুটি-চুট বাতী নামিল। তার
পর ট্রেন শব্দে বাতী বাজিয়াই পশ্চিমাত্মস্থে ছুটিয়া গেল।
ট্রেন পান করাইয়া ট্রেন-মাষ্টার, রেল কোম্পানীর নামের
জাপ-মাত্রা শিতলের বোতাম-আঁটা, বোটা কাল রঙের
কোট গায়ে, লঠন হাতে করিয়া, মনিরামত চরণে টলিতে-
টলিতে বাতী হটির নিকটে আসিলেন। জড়িত কর্তে বলি-
লেন, টিকেট। বাতী ছুঁলেন তখন আগনাগের মধ্যে কি কথা
কহিতেছিল। তাহাঘের একজনের আকৃতির সৌন্দর্য ও
পরিচ্ছদের মহাখাঁতা দেখিলেই, শব্দে গৃহের সন্তান বলিয়া
বুঝিতে পারা যায়। অল্প বাক্তির ভূতাত্তর পরিচ্ছদ ও হাতে
ঘারবানের মাদুলী মোটা শাট্ট দেখিয়া ভূত বলিয়া চিনিতে
বিলম্ব হয় না। প্রকৃত তরুণ, বয়স বছর আঠার-উনিশের
বেশী নয়, চেহারা চুট-পুট, রঙট ধবধবে স্বন্দর, মুখখানি
প্রসন্ন হাস্যময়। অল্প বাক্তি বৈকিক গঠনে ও বয়সে তাহার
অপেক্ষা বছর পাঁচ-ছয়ের বড়। তাহার গায়ের রঙ
অপেক্ষাকৃত হলিন,—সাধারণতঃ বাক্যকে যোমে-পোড়া রং
বলে তাহাই। চকু দুইটি বিশাল, আয়ত, সুখী দৃশ্যের।
দৃষ্টিতে পবিত্রতা, এবং শিশুর স্নেহতার সহিত, সদানন্দ-
প্রসূতা চিত্রবিজ্ঞানমান।

টিকেট-মাষ্টার টিকেট চাহিতেই, ভদ্র-পরিচ্ছদখারী
তরুণ বাক্তি তাহার দিকে তিরিয়া দাঁড়াইল,—বুকপকেট
হাতড়াইয়া, মনিরামত, রুমাল, চিঠির পোছা টানিয়া বাহির
করিয়া, অবশেষে টিকেট দুইখানির উদ্ধার সাধন করিল।
ট্রেন-মাষ্টার গরফে টিকেট-মাষ্টার লঠন তুলিয়া টিকেট দুখানা
পরীক্ষা করিলেন। তারপর ভদ্রলোকের হাত হইতে সে
দুখানা লইয়া, লঠনের আলোটা বুঝাইয়া তাহার মুখখানা
দেখিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার চেষ্টা সফল হইল কি না,
তিনিই জানেন। সধবা অদূরে লুপকপির স্ত্রীটির উপর
দৃষ্টি পড়িতেই, একটু সচেতন হইয়া নুরু-চকল স্ত্রীতে
এদিক-ওদিক চাহিয়া, খুব মোলায়েম সুরে বলিলেন,
“কলকতা থেকে আসা হচ্ছে,—লুপ-কপি—স্ত্রী-ভরা
খাসা কপি কিনেছেন মশায়,—বোকা লগেজটা ভারী হয়ে
হয়ে—”

স্ববক্তার সম্ভাব্যতায়া ভূতটি এককণ নিম্ন হইয়া
ট্রেন-মাষ্টারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল,—এইবার সে
ভ্রূত কৃত্তি করিয়া বলিল, “কী ই, কতর মাগ কখন,—বোকা
আমাদেরও ইটার ক্লাসের টিকেট ছিল, ভাল করে দেখুন।”
লোকটার এই অনাবস্তক মধ্যস্থতায়া ট্রেন-মাষ্টারের
অন্তঃকরণ ভরফর চটল গেল। একটু কষ্ট তাহে তাহার
দিকে একবার কটাক্ষ-কোণ করিয়া তাহার প্রভুর দিকে
চাহিয়া বলিলেন, “এটি কি মশাইয়ের ‘বিনোদ্যার’?”
নিরপরাধ অল্পবয়স প্রভুটি এই ভিত্তে একটু বেন বিস্ত
হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বিশেষ কিছু উত্তর দিতে পারিলেন
না, বিশপ তাহে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভূত প্রভুর
অবস্থা বুঝিয়া, এক মুহূর্তে অগ্রসর হইয়া লবিনয়ে বলিল—
“আজ্ঞে না, আমি ওর ম্যানোদ্যার নই, ম্যানোদ্যারের
উপবহার। ওর ম্যানোদ্যার সেই তিনি,—সেই গেল খালে
থার কাছ থেকে মোর করে তিনসের বিজুপরের তামাক
কেড়ে নিজেছিলেন,—আপনার ঘরে আছে বোধ হয়,—
সেই বছর লোকটিই ওর ম্যানোদ্যার।” ট্রেন-মাষ্টারের

নেশা ছুটিয়া গেল। হতবুদ্ধির মত নির্দাক হইয়া সেই অন্ধৃত পল্লভঙ্গি, চুঃসাহসী লোকটার মূখপানে চাহিয়া বহিলেন।—“কড়িত কর্তে বলিলেন “তুমি, তুমি তার কে হও—”

অসম্বোধে প্রাণোৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া অগ্নান বসনে ভূতা বলিল, “কার? সেই বীর ভাষাক কেড়ে নিয়েছিলেন? ওঃ—তিনি আমার বাবার গুণরত্না!—আজ্ঞা মাঠার বাবু, ট্রেসনে গরু পাড়ী ও পাব না, কুণিও কি হুঁ—একটা বিলাবে না?”

খিয়োগত নাটকের, দ্বন্দ্ব-প্রস্তমকাত্তি খোকাবহ অভিনয়ের মাঝে, অকস্মাৎ রসতরু করিয়া কোন হুচকুর বিদ্যুৎ নিষ্করণ ভাবে বিদ্রূপ-রহস্তের অবতারণা করিলে, উৎকণ্ঠিত মণকের মনটা খেনন বিক্ষিপ্ত, বিচলিত হইয়া পড়ে, ট্রেসন-মাঠার মহাশয়ের অবস্থাও বোধ হয় তরুণ হইয়া গাঁড়াইল। অগ্ৰকাল অবাচ্ হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, ক্রম-সন্তানটির বীর-বীরে সংজ্ঞা করিল। কি-একটু ভাবিয়া হঠাৎ তিনি জীবন গম্ভীর হইয়া উঠিলেন; অবজ্ঞাভরে মুখ বাঁকাইয়া প্রবানোভত হইয়া, প্রচণ্ড তাক্‌লোয়ার স্বরে বলিলেন, “হানি না,—বেশে নাও পে।”

ট্রেসন-মাঠার মহাশয় বল-দর্পিত পদক্ষেপে তাঁহার টিনের ছাউনি-দেয়া আরাম-নিকেতনের দিকে অঙ্গের হইলেন। পিছনের সোকা দুইট হাঁ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অগ্ৰকাল পরে প্রুত মুখ দিয়াইরা ভুতোর দিকে চাহিয়া একটু অর্ধহৃৎক হাত করিয়া বলিলেন “তুমি সব কাঁচালে কৈজু! একটা কপির দ্বারা ছাড়লে, ক্রমশোক্তের কাছে অনেকটা উপকার পাওয়া যেত!”

কৈজু হুর্জের মজ একটু মাথা চুলকাইয়া ইতস্ততঃ করিল; তার পর হিতহায়ে মুখ তুলিয়া উত্তর দিল, “নির্দিষ্টমির বরাতি কপি, বাবু—সবই যদি রাজ্যের খরচা করে গাই, তা’লে চলবে কেন? আর, ভা হাফা, নিরপার ভিক্ষুক বলে, না-বহ খুদী হয়ে একটা-দুটো মান করতু; কিন্তু ওই দাঙ্গাবাজ রেলের চাকরগুলাকে—না বাবু, না,—ওদের ভক্তি করে আখ্যানা খিনিস দিতেও আমার মন একব্দ নায়াজ হয়ে যায়!” সহস্রে প্রুত স্থনীলভক উত্তর দিল, “হাই-ওম্,—না, হয়

অতজি করেই এতটা দিতে!—পরজ বড় বালিই যে!” প্রুত পরিহাস করিয়া কথাটা বলিলেন বটে; ভুতা কিন্তু সেটা ঠিক সে ভাবে গ্রহণ করিল না। লাঠি-পাছতার-উপর ভর দিয়া সে হুর্জের মজ ভন্ হইয়া কি ভাবিল; তার পর মহা মৌনতা-ভঙ্গ করিয়া, তাক্‌লা-বাক্ক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল, “চুশোর বাচ্ বাবু, অমন পরজ মাথার থাক। এই বয়েসে কৈজু মিঞা গোদার মেহেরবাগিতে অমন বহুৎ পরজের—”পরক্শনে কথাটা সামলাইয়া লইয়া, ঈহৎ হাসিয়া বলিল, “বোদা, ঐ বাবুটি বখন আমার সতি্য কথা শুনে একবার চটেছেন, তখন তদ্বর লোক চটেই গাহুন,—আমি কিন্তু সরমের তেলার নিরে কথা বলে ওঁর পায়ে তেল মালিশ করতে আর বাচ্চিনে!”

ইহরগতের মধ্যে-সুপ্রুত অত্যাব-অস্থবিধাপূর্ণ হীনতম অবস্থার মাল করিতে বাধা হইলেও—এই সামান্য মাহুগতি বে নিমের একান্ত-নিম্মম ঐহিক গরজগুলির মজ ইহরগতের মাহুগতির কাছে কথার-কথার থেয়েবাগি তিকা করাটা নিতান্ত ঔষাসীস্তের চক্রে দেখে,—এমন কি হানবিশনে, দ্বগার চক্রে দেখিতেও স্তম্ভিত হয় না, সেটা স্থনীল ভাল করিয়াই জানিত। সেই মজ কৈজুকে সে শুধু তাহাযের “পরদার গোলাব” বলিয়া মনে করিতে পারিত না,—তথপেক্ষা উত্তর আরও কিছু মনে করিত। কৈজুর কথার উত্তরে আখ্যানিও প্রতিবাদহৃৎক বাকা উচ্চারণ না করিয়া, স্থনীল টেসনের বাড়িরে যেটো পথের দিক চাহিয়া, কি খেন ভাবিতে-ভাবিতে চুপ্তিতা-গম্ভীর-মুখে শুধু বলিল “এই খমতম নিততি রাত কৈজু, কি কস্বে বল মেথি?” কৈজু ক্র-কৃত্তিক করিয়া, সেই দিকে চাহিয়া, ভীক্স দৃষ্টিতে কি মেথিতে-মেথিতে বলিল, “আকাশে বেশ আছে, বিদ্যৎও চমকাজে বটে, কিন্তু বল এখন হবে না—কেন না দ্বোর হাওয়া বইছে।” একটু থামিয়া, কি খেন ভাবিয়া, মহা হাসিমুখে অত্যন্ত উৎসাহের বরে বলিল, “চলুন, চলুন,—চলনইে কুইক্ মার্ক করা যাক। আমার লাঠিগাছটা আপনি হাতে নেন,—আমি এই কপির হুড়ি আর আপনার ব্যাগটা কাঁধে করে নিছি।” বিস্ময়িত দৃষ্টিতে চাহিয়া স্থনীল বলিল, “পাগল কৈজু!—এই বিশমণি তার কাঁধে নিরে তুমি অন্ধকার রাখে ঐ পিছল পথে চলবে।” কৈজু কপির

কুড়ির মাঝে কি একটা কিনিয়া আবেশন করিতে-করিতে হেঁট হইয়া উত্তর দিল, “চলতেই হবে! না হলে এই খোলা ট্রেনের মাঝে, এমন হিমের রাতে আপনাকে রাখবে কোথা বাবু?” কণির কুড়ির তিতর হইতে, কাগজের বাস্ত-নোতা, সত্ত্ব কেনা ভিট্রল লঠনটা বাহির করিয়া, সন্তোষে ভাঙানি দিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিয়া, উৎফুল্ল মুখে বলিল, “চলবে, খুব চলবে; হাতাটুকু পার হওয়া নিজে কাশ, এই তেলেই বন্ধ হইবে!” হুণীল সবিস্ময়ে বলিল, “কিনেই ওতে তেল দিবেছ; বাহা রে কৈছ! তবে আর ভাবনা কি?”—“কৈছ শাখা নাড়িয়া বলিল, “বাহা রে কৈছ নয় বাবু, এখানে গাথা কৈছ বলুন—ঠিক হবে!—সুটো-টুটো আছে কি না দেখবার জন্যে এটার বখন এক পরসার তেল পুরে নিসুধ, তখন আর একটা পরলা খরচ করও যে উচিত ছিল, সেটা বুদ্ধিতে আসে নি কেন!—বাবু, এখন যাচ বাস্তটা বার করুন।”

পকেট হাতড়াইয়া দেখলাই বাহির করিয়া হুণীল বলিল, “ওহে, আমার এতে কীটা যে আছেই আছে,—সেখো দেখেই খরচ-পত্তর কোর না।” “না।”—বলিয়া দেখলাই ও লঠন হাতে লইয়া কৈছ নিকটস্থ টিকিট ঘরের আড়ালে, হাওয়ার পালা এড়াইয়া লঠন আনিবার লক্ষ্য দেখ। কন্ কহিয়া দেখলাই আলিয়া বাতি ধরাইয়া ক্রিষ্ণ-হস্তে চিমনি পড়াইয়া লঠন ঠিক করিয়া গেল। শব্দ পাইয়া খট করিয়া ঘরের ওয়ার গুলিয়া খুল বাড়াইয়া পূর্কোক্ত টিকিট-বাবু বলিলেন “কে?”—“কৈছ সহজ ভাবেই উত্তর দিল “আজ্ঞে আমি”—টিকিট-বাবু কঠোর ক্রুদ্ধন সহকারে রক্ত দৃষ্টিতে একবার তারার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলেন—তার পর বিনা বাক্যে, অকস্মাৎ অত্যন্ত ধোরের সহিত, সপকে ওয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। কৈছ হাসিমুখে কিরিয়া চলিল। হুণীল অপুরে গাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল। কৈছ নিকটে আসিতেই, স্তম্ভ হয়ে বলিল, “ওহে, ভয়লোক তবু পেরেছেন,—নিশ্চয় ভোগার দের্শন ঠাটেরছেন।” প্রদর, উজ্জ্বল বদনে, রক্ত কণ্ঠে কৈছ উত্তর দিল, “কাবটার হাত পাকাতে পারলে বড় প্রথমে হোত বাবু—তবে খামকা বার-তার সঙ্গে অশ্লিষ্ট পরিচয় করতে যেতুম না,—শ্রেয় মাথা বেছে, সোকা লাগি গাশিবে হাওয়াই আমার কাশ হোত।”

কৈছ কণির কুড়িটা মাথাখ তুলিয়া, ব্যাপটা লাতে ফুলাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই, হুণীল খোর করিয়া সেটা কাড়িয়া লইল। কৈছ অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু হুণীল গুলিল না। অগত্যা ক্ষুর চিত্তে লঠনটা হাতে তুলিয়া কৈছ ব্যগ্রভাবে বলিল “শালটা মাথাখ জড়িয়ে নেন বাবু, দেখবেন,—ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাশ বেন অল্পেই পড়বেন না,—তা হলে বাবা আমার মাথা নেবে!” হাসিমুখে মাথাখ শাল জড়াইতে জড়াইতে হুণীল বলিল, “বাগকে ছুদি খুব ভয় কর, না কৈছ?” “ভয়!” কৈছ দুহুর্কের লজ চুপ করিয়া রহিল; তার পর ঈর্ষা বিচলিত হয়ে বলিল, “না বাবু, না,—কৈছ দিচ্ছে কপাট বলতে পারবে না। সত্যিই বলছি, তবু তো বাগকে করিই না, তবে,—তার অনেক কথা যে রাখতে পারি না, সেজন্তে আমার সময়-সময় বড় হুত্ব হয়!—আমার বাগ তো কলেই,—আর আমি নিজেও বলছি,—আমার মত কুপুস হুনিয়ার কোন বাগের বেন কখনো না হয়!”—তারার কণ্ঠধরে একটা তীব্র বেদনার আভাস হৃৎপিণ্ডে দৃষ্টিয়া উঠিল। সাধারণ রক্তচাপক প্রদেব উত্তরে কৈছ যে এমন সরল ভাবে অকস্মাৎ তারার প্রদর অহতুর্ঘ্ন মনটির আবরণ উন্মোচন করিয়া দিবে,—সেটা হুণীল ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই কৈছর উত্তর শুনিয়া সে দূর-লক্ষিত অন্তরে একেবারেই নিরন্তর হইয়া গেল, আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণে তারার প্রবৃত্তি হইল না। উত্তরে নিঃশব্দে ট্রেন পার হইয়া মাঠের আল-পথ ধরিয়া বাড়ী আস্ত করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভিন মাইল পথ হাঁটিয়া, গ্রামি প্রার ছইটার সময়, উত্তরে জগৎপুর গ্রামের হুপ্রাচীন অমিয়ার-বাড়ীর সময়-খেউড়ীর সামনে আসিয়া পৌঁছিল। খেউড়ীর কড়া নাড়িয়া, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কৈছ ডাকিল “রানটেল, রান টেল,—এ ছবে, এই ভ্রামলচীল, কপাট-টা খোল রে—”

বাগপ শ্রীতে আট-বাট বন্ধ করিয়া, পরম বিহ্বানার মধ্যে সকলেই নিদ্রার অচেতন। কৈছর চীৎকার ও হুণীলের বিস্তর ডাকাডাকিতেও কাহারও ঘুম ভাঙিল না। এতটা পথ ঠাণ্ডায় খোলা মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া, শ্রীত-কান্তর হুণীল শ্রান্ত অবসর দেখে আর গাঁড়াইয়া থাকিতে

পারিল না, বলিয়া পড়িল। কৈঙ্ক অবৈধ। তবে সুপু করিয়া কপির কুড়িটা চুয়াবের পাশে নামাইয়া কেশিয়া, এক লক্ষে পাঁচিলে উঠিয়া, ধপু করিয়া ভিতরে লাকাইয়া পড়িল। স্থানীয় ব্যক্ত হইয়া বলিল, “পাখান কৈঙ্ক, শার্ণ না খেন—” “কিছু না বাবু” বলিয়া, আখান দিয়া কৈঙ্ক উঠান পার হইয়া উচ্চখানে ছুটিয়া গিয়া চাকরদের বারোভার উঠিল। যাকের ঘরের চুয়াবের লাখি বারিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, “রামটেল, এ রামটেল, ওঠ—ওঠ, ছোটবাবু বাহিরে গাড়িরে রয়েছেন। শীঘ্রী ওঠ, মেউড়ার চাবি বার কর—”

সত্তা-সুগোবিত রামটেল দ্বারবান ভিতর হইতে লাড়া দিয়া, ‘ভারিখো’ আওয়ানে কৈঙ্কর পরিচর ভিত্তায়া করিল। অগতি কৈঙ্ক ব্যক্ত ভাবে তড়া দিয়া বলিল, “অম্বি ওঠ বেহু, ঘরের ভেতর বিন্দি দিয়ে বসে ছ’দিয়াতীর মোড় দেখাতে হবে না আর, খুব হয়েছে, নে।—”

রামটেলের ক্ষমর বুলিল। এত রায়ে ডাকাডাকি কনিয়া হজাবনিছ অভ্যাগ-নাহাখো আসেই ডাকাতের ভরটা তাহার মনে উত্তর হইয়াছিল। কিন্তু এমন ধোর গলার বদক বেওয়া বে পুরানো বন্ধু কৈঙ্ক ছাড়া আর কাহারও কর্ম নয়, এবার তাহা নিশ্চর বুলিল। এক দুহুর্ন্তে চাবি লইয়া, চুয়াব বুলিয়া বাহিরে আসিয়া, এক গাল হাসিয়া বলিল, “হায়া যে রে—”

কৈঙ্ক তাহার দুট টপিয়া, মিঠেকড়া সোছের একটু বাকনি দিয়া বলিল, “হায়া তোমার গিতি চটকাচ্ছে কাল, হাড়াও বেয়াব—তোমার খুব বে বোয়ের ঠাকুরদার সাতার পুরুষ উচুতে! এঁ। তোরা হসি কি রে। ডাকতি হাঁক হাঁক্ছি, তবু খুব ভালে ন।? মাধ্যামে বা উল্লুক!” অগ্রসর রামটেল মাথা চুগকাইয়া বলিল, “তা খাচ্ছি জাই, আর গলা-হাটা দিস্ নি, ছোটবাবু কই?”

“মেউড়ার বাহিরে—চল অম্বি—” রামটেলকে টানিয়া বাহিরে মেউড়ার কাছে আদিয়া চাবি খোলাইয়া কৈঙ্ক বাহিরে আসিল। রামটেল প্রকৃক অভিযান করিয়া, ডাকাডাকি ব্যাগটা লইতে গেল।—কিন্তু, কৈঙ্কর মাথার এখন চুটানীর বোঁক চাপিগাছে,—সে কি তাহাকে এত সহজে আঁক দিক্তি দিতে পারে? ব্যাগটা তাহার হাত হইতে টানিয়া গইয়া, বিনা বাকো মূলকপির কুড়িটা তাহার মাথার উপর চড়াইয়া দিয়া গভীরভাবে বলিল, “চল তো

বোত!” মাথ-রায়ে গভীর নিদ্রার মারে অকস্মাৎ খুব ভাঙ্গিয়া বাওবার একই রামটেলের মাথাটা উল্ টল করিতেছিল,—তার উপর শীতে মড়-মড় হইয়া বাহিরে আসিতে, গভীরের অন্তরাখা। অভ্যন্তর রেশ-কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। তত্পরি এই ভাৱী কপির কুড়িটার অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সে একেবারেই কাবু হইয়া চোকাইয়া উঠিল, “আরে বাপ! কোর অব্যু!”

কৈঙ্ক বিজ্ঞপের সুরে বলিল, “হু, বোক চান!—নবাবের মত খবে পড়ে-নড়ে খুব বেওয়া হচ্ছিল, হুশো ডাক লাড়া নেই! এখন কেমন আরে?—চল বাড়ীর মধ্যে, ভাল-মাছবের মত এগিয়ে পড়, আমি একে আর নামাচ্ছি নে।”

বাগ শু মঠন লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া, কটকে বগাৱাতি চাবি লাগাইয়া, তিনমজনে ভিতর-মহলের দিকে চলিল। সকাতির রামটেলের বিপর অবস্থা দেখিয়া স্থানীয় খুব টপিয়া শিশবে হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই আলত-প্রিয় ভূত্যাটিকে কৈঙ্ক ছাড়া আর কেহই বে ভয় করিয়া সংশোধনের পথে আসিতে পারে না, সেটাও মনে পড়িল। হস্তরাং তাহার হৃৎখে বিশেষ কিছু সহ্যহুতি প্রকাশ না করিয়া, স্থানীয় একটু উপাশীনে ভাবে পাশ কাটাইয়া চলিল।

ভিতর-মহলের লোতলার স্থানলের বিধবা বৃদ্ধী শিশিয়া, বিধবা দিদি হুহুতি দেখী ও কি বুঝাইতেছিল। ডাকাডাকি কনিয়া দিদির খুব শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। কিকে উঠাইয়া ডাকাডাকি তিনি নিষেই চুয়াব খুঁগিয়া দিয়ায় মস্ত নীচে আসিলেন। ইত্যবসরে, কপির ভাৱ-ক্লি রামটেল মকরুণ কণ্ঠে বলিল, “উ: কি অবর ভাৱী রে কৈঙ্ক—টলন্ খেকে কে এটা আন্সে ভাই?”

কৈঙ্ক নির্দর-কোঁক-হাস্ত-বিকশিত দৃষ্টিতে একবার রামটেলের মুখভঙ্গিখটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তার পর স্থানলের দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল, “বেয়াদবি হাফু ককন ছোটবাবু, আপনি গাড়িরে আছেন, কি কবু, —আমার কিন্তু একবার বসতে হয়েই! আক, পোস্ত আমার বেয়াব ধবে পড়েছে, আমি ঝাঁকিয়ে বসে একটু রত দেখি!”—কৈঙ্ক সত্য-মতাই চুয়াবের চোকাঠের পাশে পা ছড়াইয়া বলিয়া পড়িল। রামটেলের দিকে চাহিয়া বলিল, “হ্যা, তার পর,—কি বলছিলি,—কপির কুড়িটা কে আন্সে? অ।—তোর কি মানুষ হয় বল দেখি?”

বিশরাম হাটের কোন দিক হইতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণের কোন সুযোগ না পাইয়া,—অন্যতঃ দুই হাতে কাঁকানি দিয়া কপির হুড়িটাকে ভাল করিয়া চাপিয়া, মাথায় বলাইল। কৈজ্জু সেইহু লক্ষ্য করিয়া, সফলহুড়ি-আত্ম, মুকামল ঘণ্টে বলিল, “ভাটটা তেমন কিছু হয় নি, কি বল ? তা, এই ব্যাগটাও গর গর চাপিয়ে দেওয়া চলে, যেব তাই ?”—“না” বলিয়া সত্যত ভাবে শিছু হট্টা, হাটের চলিত কোণ দিককারে বলিল, “এখানে বনে-বনে কি করছিস হতভাগা,—বেরো, দুধ হ’, বাড়ী যা !” পরক্ষণেই কি একটা কথা মনে পড়তে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “তনছিন্, বাড়ী শা, বাড়ী যা,—বেশেগ যা, কে এসেছে !” কৈজ্জু সন্ধিত দৃষ্টিতে একবার হাটের দূর পানে চাহিল। তার পর ভাড়াভাড়ি কথাটা বুঝিয়া লইবার লজ্জা বলিল, “হ’, তুমি খাম তো,—কপির হুড়িটা ক’ মন হবে বল দেখি ?”

হামটেল হাসতঃ স্বরে বলিল, “কপির হুড়ি হ’ মণ্ডই হোক, তুই বাড়ী যা, তোরা বিবি এসেছে”—এবার কৈজ্জু মাথা নীচু করিয়া চুপ ! হুণীল দখিরে বলিল, “তাই না কি, কৈজ্জুর বিবি সতি এসেছে ? ও ! ভাল আছে বেশ !”

হামটেল বন্ধ কটাকে কৈজ্জুর দিকে চাহিয়া গভীর ভাবে বলিল, “হা হুজুর,—খুব ভাল আছে। সর্দার নিজে বলে, হাকিমরা বলে ঘিরেছে, আর বোমারের তর নাই, এবার গরুর বাড়ী গিয়ে থাক !” সরিষা আদিয়া, কৈজ্জুর কাঁধে মুক্ত-মুগ্ধ বেগে হাঁটুর ভঁটা দিয়া, কড়া আগুয়ালে বলিল, “তনতে খাছিন না, নয় ? কালা হয়ে গেলি না কি ?” “না” বলিয়া হাসি-মুখে গা-কাড়া দিয়া, ভড়াক্ করিয়া কৈজ্জু উঠিয়া পাড়াইল। হামটেল চক্কর নিয়ে যে সতরে পিছাইয়া গেল। কিন্তু এক অর আত্ম বেনী দুই অঙ্গুর হইতে পাইল না ; কারণ তখনই উয়ার পুলিঙ্গা, দালীর সঙ্গে হুমতি দেখী সামনে দেখা দিলেন।

কৈজ্জু লগত হইয়া লগনে দুই হইতে অভিযান করিল। হুণীল আগাইয়া গিয়া দিগির গায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রশ্ন করিল। হুমতিদেবী সম্মুখে দ্রাবার মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া, উল্লসের শাণ্ডীক স্থূল প্রশ্ন বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া বরাবর দিকলে

উঠিলেন। হামটেল ও কৈজ্জু সঙ্গে-সঙ্গে গেল। কপির হুড়ি এবার বিনা বাঁকোই কৈজ্জুর সাহায্যে হামটেলের মাথা হইতে নামিল। “আঃ !” বলিয়া হামটেল মাথা তুলিয়া, বুক চিড়াইয়া, সোজা হইয়া পাড়াইল। তার পর কৈজ্জুর দিকে চাহিয়া, একটু কোর গলায়—এম দুব্বর সকলে ভাল করিয়া শুনিতে পার, এমনি ভাবে বলিল, “তুই আর এখানে পাড়িয়ে থেকে কি করবি কৈজ্জু, বাড়ী যা—”

কিছু হামটেলের দুর্ভাগ্য। কথাটা ধারাবের কাণে পৌছাইবার লজ্জা সে অত কোর গলায় চোলাইল, তাঁহারে কেহই তখন কথাটাও কান দিলেন না। বুড়ী পিসিমা বিজ্ঞান ছাড়া উঠিয়া আসিয়া, লজ্জা-সহ হইয়া চোকাঠের পাশে বসিয়া, ত্রিমিত নিশ্চয় নৃষ্টি মেসিয়া হুণীলকে তখন খুব বকিতে শুরু করিয়াছেন। এই বন্ধুত্বে নিষ্ঠুর রাত,—গারে ডাকাত পড়িলে কোন চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায় না এমন সময় তেপাক্তর মাঠ পার হইয়া, এই হুঃপাহসী ছেলে দুইটা আসিল কেনন করিয়া ? ইহারা এমনি করিয়া কোন্ দিন কি সর্বনেশে কাণ্ড ঘটাইয়া বিদ্যে—সঙ্গে সঙ্গে সিঁদি অর্থাৎ হুমতিদেবীও তৎসনা আরম্ভ করিলেন, এত রাতে নাই-বা আশা আলা হইত ! আর তাই যদি আসিল,—কোন্ পূর্বাঙ্কে সংবাদ দিয়া রাখিল যে, হামটেল গরুর গাড়ী শইয়া থাকিত ?

পিসিমা চোখ বগড়াইয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, “আর বলিস নি বাছা,—এখনকার ছেলেরাই সব ওরি এক ধরণের হয়েছেন,—ওরা কি কাকুর কথা মানে !” উপযুক্তির তির্যক্য, তৎসনার বিরত হইয়া হুণীল বলিল, “ভাণে পিসিমা, আমার বাপু তোমারা বোকা না,—যা বলতে-কইতে হয়, বল ওই তোমার আত্মে তাইপো কৈজ্জুকে। ওরই যোগে ত আশ চারটের ঠেঁপ ফেল্ হোলো! নইলে আসতুম সন্ধ্যা সাড়ে ছটার ! কর্তা আশ আর একটু হলে হাতকড়ি পরে মেলে গিয়ে হাজির হতেন, জানো ? উনি আশকাল এরি কোর ভালো পরহিতবিদ্যা বুজিতে যেতে উঠেছেন, যে, আশ-হিতবিদ্যা বুজির মাথার যে বন্ধর ভেঙ্গে পড়ছে, সে খোঁজই রাখেন না।”

পিসিমা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “জেনে কি রে, এঁা, জেনে কি ?”

হুমতি ঠোঙা আদিয়া চায়ে লগ চড়াইয়া দিতে-দিতে

কিরিয়া চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “সে আবার কি, হ্যাঁ ফেঙ্ক, সত্যি কিছু করেছ ?”

ফেঙ্ক হুড়ির উপর হইতে কপিঙলা নামাইয়া একে-একে ঘেঁষের উপর রাখিতে-রাখিতে, বাড়ী নীচু করিয়া লম্বা দ্বিতীয় স্তরে সবিনয়ে বলিল, “না—না দিদিমনি, শোনেম কেন ছোট বাবুর কথা !” হুশীল বাধা দিয়া বলিল, “ছোট বাবুর কথা শোনেম কেন ? বলব তব ? ভাখো দিদি, তোমার কপি কেনবার জন্তে নতুনবাঝারে গিয়ে, কর্তা এক স্তম্ভকে ধরে এমন রকম দিয়েছেন সে যেচারা কিছু-দিনের মত এখন বাবসা ফেঁড়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হবে।” হুমতি দেবী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “কি করেছিল সে, হ্যাঁ ফেঙ্ক ?”

ফেঙ্ক সে গ্রন্থের উত্তর দিতে একাত্তই অসিদ্ধ !
বাড়ী চুলকাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সংক্ষেপে বলিল, “আবার কিছু করে নি। থাক সে, বামে কথা থাক,—আপনার কপিঙলো ভাল করে বেখে নিম দিদিমনি”—দিদিমনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “থাক,—থাক, তোমার কেনা জিনিস—ও আর দেখতে হবে না,—তোমার ছোটবাবুর কেনা জিনিস হলে কথা ছিল বটে। থাক, এখন স্তম্ভটা ক্রি করেছিল শুনি না ?”

ফেঙ্ক চুপ !

ফেঙ্ককে অগ্রজত্বে ফেলিয়া কোতুক দেখা হুশীলের চিরদিনের অত্যন্ত আদ্যোপ। ফেঙ্ক এখন তিন বৎসরের বালক, তখন তাহার পিতা ওয়াক্ষেব সর্দার এই বাড়ীতে চাকরী করিতে চুকিরাছেন,—তখন হইতে ফেঙ্ক এই বাড়ীর নিত্যক আপনাদি জন “ঘরের ছেলে” বলিয়াই সকলের কাছে পরিচিত। কেহই তাহাকে ‘পর’ বলিয়া সজোচ করে না। হুশীল ও একেবারেই না ! বরং ফেঙ্কুর পিতা—পুহানো আমলের বুড়া লোক বলিয়া এবং স্বর্ণগত পিক্সেবের প্রিয়তম বিশ্বাসী কৃত্য বলিয়া, হুশীল ও হুমতি তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলে। এমন কি গোখতা ও ন্যায়ের মহাপ্রাণ পর্য্যন্ত বুড়া সর্দারকে অবহেলা করিয়া চলিতে পারেন না। কিন্তু ফেঙ্ক

সবচেঁ সে বালাই কাহারো নাই। ফেঙ্ক সকলের কাছেই, ঘোহাঙ্গ ‘ঘরের ছেলেট’—বুড়ী পিসিমা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ফেঙ্কুরও অবশ্য সে গুণে ঘাট নাই। ওনা দায়, ছেলেবেলায় পিসিমার জন্ত কলমী শাক ভুজিতে গিয়া ফেঙ্ক তিনবার পুহুরে ভূবিরাছিল। আজও হুশীল সেই কথা উল্লেখ করিয়া পিসিমাকে রাগাইয়া দেয়, এবং ফেঙ্ককে বিদ্রোহ করে। প্রত্যয় দিদির উৎসুক গ্রন্থের উত্তরে ফেঙ্ককে ইতস্ততঃপর্য্যন্ত দেখিয়া হুশীল যো পাইয়া বলিল !
জুতা, মোজা, জামা প্রভৃতি খুসিয়া, চায়ের ঠোঁটের পাশে বলিয়া গরম আঁচে হাত তাতাইতে-তাতাইতে হুশীল ফেঙ্কুর দিকে যাক দৃষ্টি হানিয়া বলিল, “বল না ফেঙ্ক, তোমার স্তম্ভা মশাই কি করেছিল !” রামটেল ইকুটুকু করিয়া বাড়ী নাড়িয়া, অত্যন্ত স্বকোমল ভাবে একটু বোলায়েন হাসি হাসিয়া বিহিস্ময়ে বলিল, “বল না ফেঙ্ক, তাতে আর লজ্জা কি ? জুই ও ঘেরে ঘেরে এখন ঘরের ছেলে ঘরে এসে ঢুকছিল,—তোমার আর ভয় তাবনা কিসের ? বল না কি হয়েছিল, কথাটা শুনে যাই—” কশির তখির রাখিয়া, ফেঙ্ক কাড়া-হুড়ি দিয়া উঠিয়া গাড়াইয়া, রামটেলের কাঁধ ধরিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “শোনাজি তোমার, থাম ; চল দেখি, আগে ছোটবাবুর বিছানাটা ঠিক করে বেখে চল,—অনেকটা রাত্রি হয়েছে, একবার ঘুমান্তে হবে তো—” অর্ধব্যাকুল বিদ্রোহের দৃষ্টিতে চাহিয়া রামটেল বাড়-খুব নাড়িয়া কি একটা পরিহাস করিতে যাইতেছিল ; ফেঙ্ক তাহার বাড়ী ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া থামাইল। তার পর পশবাতে একটা আলো ও ঝাঁটা সংগ্রহ করিয়া রামটেলকে টানিয়া লইয়া হুশীলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

পিছন হইতে হুশীল সমস্ত মুখে বলিল, “শালাজি কেন, পরটা বিধিকে বলে যাও ফেঙ্ক ;” ফেঙ্ক চৌকাঠের অন্তরাল হইতে বলিল, “বড় কিংবে পেয়েছে দিদিমনি,—যার চিৎফে-মুড়ি কিছু থাকে ও বার কখন,—আমি এসে থাকি। ছোট বাবুকে চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেবেন না,—ওকে হাওড়া ট্রেনে অনেক জিনিষ খাইয়ে এনেছি !” (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

এবার বকীর সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন শুভ-সুবিধের অবকাশ সময়ে (৩ই ও ৭ই বৈশাখ) হাবড়ায় হইবে। এখানে মাননীয় ঐশ্বর্য সার্ব আন্তোভাষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয় প্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন; এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইবেন রায় ঐশ্বর্য রায়চন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী বাগোদর; ইতিহাস-শাখার সভাপতি হইবেন ঐশ্বর্য উত্তর প্রবন্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বনবাসী কলেজের অধ্যাপক ঐশ্বর্য গিরিশ-চন্দ্র বসু মহাশয়, এবং দর্শন-শাখার সভাপতি হইবেন ঐশ্বর্য রায় বহুলাক্ষ মহম্মদার বেদান্ত-বাস্তবতা বাগোদর মহাশয়। সন্ধ্যায় উপস্থিত ব্যক্তিগণই সভাপতি পদে বৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অসার্বনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন মাননীয় ঐশ্বর্য মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়; ইনি হাবড়া ইউনিভার্সিটিতে চোয়ারম্যান। হাবড়ার বর্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাগোদর সম্মিলনের উদ্বোধন করিবেন। সম্পাদক হইয়াছেন আমাদের বন্ধুর অরাস্তুরকর্ণ ঐশ্বর্য পূর্ণদাস নারিকী মহাশয়। উক্তোপ-আয়োজন যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এবারের সম্মিলন যে খুব ভাল হইবে, তাহা আমরা আগে থাকিতেই অনুমান করিতে পারি।

এই সম্মিলনে পাঠ করিবার লজ্ঞ এবারও সকলের নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা বরাবরই এইরূপ বিরোধী; এমন ভাবে নারকের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিও করা কিছুতেই কর্তব্য নহে। আমরা পূর্ণেরও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এ ভাবে কর্তব্যের কার্য-পরিচালন করিয়া কোনই লাভ নাই। বস্তু লেখককে প্রবন্ধের লজ্ঞ অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই অবজ্ঞা লিখিবেন না; কিন্তু তাহারা লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম হইবে না। তাহার পর এত বড় একটা সম্মিলনে পাঠ করিবার লজ্ঞ বা 'তা' লিখিলেও হয় না, এবং যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেও চলে না; সুতরাং লেখকগণ বক্তব্য বিবরণ লক্ষ্যে

লিখিতে পারেন না। মনে করুন, চারিটা শাখায় প্রত্যেকটীতে পাঠ করিবার লজ্ঞ যদি বহুটা করিয়া প্রবন্ধ আসে, তাহা হইলে সম্মিলন কি করিবেন? তাহাদের লব্ধ কৈ? সুতরাং তাহারা কতকগুলি প্রবন্ধ ভাল হইলেও বর্জন করিবেন, কতকগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল বলিবেন। আর বড় জোর পাঁচ-সাতটা প্রবন্ধকে কবন্ধ করিয়া পাঠ করিবার আবেশ করিবেন। তাহারা প্রবন্ধ পাঠ করিবার অধিকার লাভ করিবেন, তাহাদের কাহাকেও হয় ত মণ মিনিট, কাহাকেও বা পনয় মিনিট সময় দেওয়া হইবে; এ দিকে তাহাদের প্রবন্ধ অন্ততঃ তিন কোয়ার্টারের মধ্যে পড়াই হইতে পারে না। প্রতি বৎসরই আমরা এই কর্তব্যভোগ দেখিয়া আসিতেছি।

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হই কি তিনজন লেখককে প্রবন্ধ লিখিবার ভার দেওয়া হউক। তাহারা যে যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার ভার লইবেন, তাহা সংখ্যা-পক্ষে বিজ্ঞাপিত করা হউক। ইহাতে এই লাভ হইবে যে, সভাপতি মহাশয়গণ ও প্রতিনিধিগণ সেই-সেই বিষয়ের আলোচনা করিবার লজ্ঞ পূর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিবেন; এবং প্রবন্ধ পাঠের পর তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিবে। ইহাতে প্রবন্ধ পাঠের সার্বজনীনতা এবং সম্মিলনেরও সার্বজনীনতা। নতুবা, এখন যেমন হইতেছে, তাহাতে প্রবন্ধ পাঠে কোন ফলই হয় না। তাহার পর, একই সময়ে চারিটানে চারিটি শাখার অধিবেশন হয়; ইহাতেও বড়ই অসুবিধা হয়। যিনি সাহিত্য-শাখার আগ্রহ লইয়াছেন, তাহার কি ইতিহাস বা দর্শন-শাখার প্রবন্ধ শুনিবার ইচ্ছা হইতে পারে না? কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। ফল এই হয় যে, নানা শাখার বিতরণ করিতে গিয়া প্রতিনিধি মহাশয়গণের কোন দিকই রক্ষা হয় না। ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন শাখার অধিবেশন করা কি সম্ভবপর নহে?

বিগত শিবরাত্রির সময় বেদিবীপুর সাহিত্য-সভার গণন বার্ষিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হুজুতিত, শ্রদ্ধার অতিভাষণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। অত্যাধনা-সমিতির সভাপতি ঐযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অতিভাষণও অতি শ্রদ্ধার হইয়াছিল। সভার সম্পাদক লুকাবি ঐযুক্ত কীৰ্ত্তীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতি সাহিত্যিকগণের অত্যাধনা করিয়া যে শ্রদ্ধাভিত্তিক কবিতা পাঠ করেন, স্থানান্তরে বর্ণিত। আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বেদিবীপুরের সচিব সাম্মিষ্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন উপলক্ষে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলেন এবং সভার কার্যে বিশেষ সহায়ত্ব প্রকাশ করেন।

এবার সাময়িকীতে সভার কথাই বেশী বলিতে হইতেছে। দুইটা সভার কথা বলিলাম; এখনও তিনটির কথা বলা বাকী। নবীরা জেলায় রাণাঘাট সখতিভিনয়ের অন্তর্গত হুগিরা গ্রাম মহাকবি কৃষ্ণবাসের জন্মভূমি। এই হুগিরার কৃষ্ণবাসের ভিত্তি বহুকাল অগত্যা পরিপূর্ণ ছিল। বহুদিন পূর্বে কবিবর নবীনচন্দ্র বেন ধ্বন রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি কৃষ্ণবাসের স্মৃতি-রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু সে চেষ্টা কার্যে পরিণত হয় না। তাহার পর অনেক দিন চলিয়া গেলে, কবিবর ঐযুক্ত রমণীবোদন বোদন ধ্বন নবীহার পোষ্ট আফিসের সুপারিন্টেনডেন্ট হন, সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি এতদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন নবীহার ঐযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (Mr. S. C. Mukherjee, I. C. S.) মহাশয় নবীহার ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেটর। ঐযুক্ত রমণীবোদন ও রাণাঘাটের উৎসাহী উকীল ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ও রাণাঘাটের সেই সময়ের ডেপুটী ঐযুক্ত অভুলকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের উৎসাহে ঐযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণবাসের স্মৃতি-রক্ষার জন্য অগ্রসর হন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে তিন বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবাসের ভিত্তি উপর একটি বাঙালি বিজ্ঞান প্রভিষ্ট হই, একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় এবং একটি ব্রহ্মারতন স্থাপন হইল। এই স্মৃতি-স্মারিকা প্রভিষ্ট

উপলক্ষে কলিকাতা ও মানাহান হইতে অনেক স্মারিকা-সেবী কৃষ্ণবাসের ভিত্তি উপস্থিত হন; মানাহার বিচার-পতি ঐযুক্ত সাহু আওতাধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা-কার্য শেষ করেন। মহা-সমারোহে উৎসব-কার্য শেষ হয়। তাঁহার বিবরণ আমরা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত করি।

তাঁর পর এই তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন উৎসবেরই আয়োজন হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ঐযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবীহারে থাকিলে বোধ হয় এমন হইত না; কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ার কৃষ্ণবাস-উৎসব বন্ধ থাকে। এবার সৌভাগ্যক্রমে এসিষ্ট সাহিত্যিক ঐযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় কৃষ্ণনগরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন বোদন বিভাগার বাহাদুরের মুখোপাধ্যায় ঐযুক্ত সারদাপ্রসন্ন বোদন মহাশয় রাণাঘাটের ডিপুটী। এই দুইজন সাহিত্যিকের উৎসাহে উকীল নগেন্দ্রবাবু আবার উৎসাহিত হইয়া উঠেন; এবং অস্বাভাবিক ঐযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উৎসব সম্পাদনের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তাই বিগত ২৭শে মার্চ তারিখে কৃষ্ণবাস অগত্যা উৎসবের আয়োজন হয়। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক জল্পালোকের সমাগম হয়। এই উপলক্ষে যে সভার আয়োজন হয়, তাহাতে অবসর-প্রাপ্ত সিবিলা সার্জন, বিখ্যাত সাহিত্যিক ঐযুক্ত রায় দীননাথ সাক্ষাৎ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমরাও এই সভায় উপস্থিত ছিলাম।

এবার ত কৃষ্ণবাস-স্মৃতি-উৎসব হইয়া গেল। কিন্তু এভাবে সভা করিয়া উৎসব করা আমাদের আর ভাল বোধ হয় না। আমরা গতাব্দেই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, প্রতি বৎসর মাস মাসের কোন এক দিনে সভা হয় হউক, তাহাতে আগন্তি নাই; কিন্তু উৎসবের স্থায়ি-বিধান করিতে হইলে, এই স্থানে বর্ষে-বর্ষে একটি মেলা করা কর্তব্য। প্রথম দুই-তিন বৎসর বেলা বসাইতে কিছু-কিছু ব্যয় হইবে; তাহার পর আর কিছুই করিতে হইবে না,—নির্দিষ্ট দিনে বিনা বিভাগে, বিনা নিয়ন্ত্রণেই বেলা বসিবে। মহাকবি কৃষ্ণবাসের স্মৃতি এই ভাবেই রক্ষিত হওয়া শোভন বলিয়া

আমরা মনে করি। সুখের বিষয় এই যে, সকলেই এ প্রয়াসে এগণ করিয়াছেন। আগামী বৎসরে বেলায় আরোজন হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। রাণাঘাটের নগেন্দ্র-সুরেন্দ্র-প্রমুখ মহোদয়গণ চেষ্টা করিলেই এ কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

এত দিন পরে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ-ভবনে কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ধর-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সে দিন এই প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্রের আওতোব চৌধুরী মহোদয় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিতাষণ পাঠ করেন, তাহা হানাত্তরে প্রকাশিত হইল। আমরা অনেকের মূর্তি-রক্ষার জন্য সভা সমিতি করিয়া থাকি, কার্য-নির্বাহক কমিটীও গঠিত হয়; প্রথম ছই-চারি দিন একটু চেষ্টা-চরিত্রও হয়, কিছু অর্থও সংগৃহীত হয়। তাহার পর আমাদের যেমন দস্তর, আর কোন সাড়া-শব্দ বড়-একটা পাওয়া যায় না। নবীনচন্দ্রের মূর্তি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আমাদের সেই আশঙ্কাই হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় কবিবরের মর্ধর-মূর্তি সে দিন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এখনও আরও কয়েকটা প্রতিজ্ঞিত কার্যে পরিশ্রম করিতে বাকী আছে। তাহার মধ্যে রমেশচন্দ্র-মূর্তি-মন্দির ও বঙ্কিম-চন্দ্রের মর্ধর-মূর্তি-প্রতিষ্ঠাই প্রধান। এ বিষয়ে সকলকে চেষ্টা করিবার জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। গিরিশ-চন্দ্রের মর্ধর-মূর্তি নির্মাণের জন্য ভারতকে আগায় ঢাকা যেওয়া হইয়াছে, এ কথা লগ্ন্যত আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু অনেক দিন চলিয়া গেল, আরও কোন সাড়া-শব্দ নাই।

আর একটা সংবাদ দিলেই সভার কথা শেষ হয়। পরশোক-গমনের কর্তব্য বৎসর পূর্বে আমাদের কবি বিশেষজ্ঞাল এক বোল-পুর্নিমার তাহার ভবনে পুর্নিমা-সম্মিলন করেন। তাহার পর কিছুদিন প্রতি পুর্নিমার নানা স্থানে, নানা সাহিত্যিকের ভবনে পুর্নিমা-সম্মিলন হয়; কলিকাতার সাহিত্যিকগণ প্রত্যেক পুর্নিমা-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া আমোদ-আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু বীয়ে-বীয়ে কি জন্য বলিতে পারি না, পুর্নিমা-সম্মিলন

উঠিয়া গেল। একা তধু অমর নাট্যরথী গীনবন্ধু মিত্র মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দলিতচন্দ্র মিত্র মহোদয় বৎসরান্তে এক পুর্নিমার তাহার জনকের মূর্তি-উৎসর্গে সম্মিলনের আরোজন করেন। আর কোন পুর্নিমার বিশেষজ্ঞালের প্রতিষ্ঠিত সেই উৎসবের আরোজন হয় না। আমরা বড়ই আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা হইতে যে অহুষ্ঠান অবস্থিত হইয়া গিয়াছে, সম্ভার অপর-পারমিত শালিখার উৎসাহী যুবকবৃন্দ তাহারে জরাজীর্ণ বিশেষজ্ঞালের কীর্তি রক্ষার জন্য বিগত বোল-পুর্নিমার দিন শালিখার সেই পুর্নিমা-সম্মিলনের আরোজন করিয়াছিলেন; এবং অতঃপর প্রতি পুর্নিমাতেই তাহার সম্মিলিত হইবেন স্থির করিয়াছেন। শালিখার উৎসাহী যুবকগণের এই চেষ্টা সফল হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা। শালিখার যুবকগণ এই উপলক্ষে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, গান-বাঁজনা এবং ভগবানের প্রচুর আরোজন করিয়া-ছিলেন এবং বোল-পুর্নিমার জন্য আত্মত্যাগ হুড়া-ছড়ি হইয়াছিল। এই পুর্নিমা-সম্মিলন যেখান বিশেষজ্ঞালের গৃহে বোল-পুর্নিমার প্রথম উৎসবের কথাই আমাদের মনে হইয়াছিল, এবং সর্বশেষে যখন একজন স্নায়ক বিশেষজ্ঞালের সেই অমর গীতি 'মহাসিন্ধুর ও-পার হতে' মধুর স্বরে গান করিলেন, তখন বিশেষজ্ঞালের আবির্ভাব যেন সকলেই অহুস্তব করিতে লাগিলেন।

গত ১লা মার্চ তারিখে "ওরিয়েন্টাল সেমিনারী"র পুরস্কার-বিভাগ-সভার সভাপতির আসনে বসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের অল্পতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার জন উডরক কতকগুলি বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি আমাদের আগামের অতীত কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, এবং সেগুলি মনে রাখিতে বলিয়াছেন। তাহার উক্তির সার মর্ম এই যে, "They (স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা) come out of their schools and colleges without knowing anything of their past" (তাঁহারা তাঁহাদের অতীত কালের কোন কথা না জানিয়াই, না শিখিয়াই স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হয়); যাঁহারা সংস্কৃত পড়ে না, তাঁহারা ভারতের সাহিত্যের কোন খবর রাখে না; মুসলমানদের

ভারতে আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। “পাইওনীয়ারের” কথা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় ছাত্রেরা দাব্যপ্রণত: তাহাদের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া বি-এ উপাধি লাভ করিতে পারে না—সে যথোগই তাহাদের নাই। ভারতবর্ষ যুগ্ম অতীতে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল, আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে তাহার একটা স্থান থাকে, বলা মহোদয় ইহাই দেখিতে চান।

—

অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্থলের কর্তৃপক্ষকে স্থল-বাঁচীর দেওয়ানগুণিতে বালি ধরাইয়া তাহার উপর ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা ভারতের অতীত ইতিহাস হইতে পার্থিব ও বর্ষ-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর দৃষ্টগুলি চিত্রিত করা ইয়া হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তার পর তিনি বলিতেছেন, “Your students will then both live in the atmosphere of beauty, that is, beauty in a form which will be a constant suggestion to themselves of their Indian past and a stimulus to faith in their Indian future.” অর্থাৎ আপনাদের ছাত্রেরা তখন এমন একটা সৌন্দর্য্যময় আব-হাওয়ার মধ্যে বাস করিবে যাহা তাহাদিগকে সর্বদা তাহাদের অতীত কথা স্মরণ করাইয়া দিখা ভারতের তথ্যাদি গঠনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবে।

—

সর্বশেষে তিনি বলিয়াছেন, “There is much more in such things than some imagine. Suggestion occupies a great part in education. Up to now, the suggestion which has been almost uniformly made to your young is, that they belong to a people who have done nothing in the past, or at any rate nothing to compare with the magnificent achievement of Western nations—that their civilisation is an inferior one and so forth. This has been so dinned into their ears that many have come in time to believe in it. Such think that

their only hope of salvation is to give up an inheritance which is worthless, and to sit at the foot of some Western Guru or other, and to receive from them the Mantra of his civilisation. Well, if suggestion can be made, it is possible to make a counter suggestion. Show to your youth what their forefathers have done, and you will give them faith in themselves; for, you put before them a warrant for such faith. What has been done, it is within the bounds of possibility to do. They will then themselves be in a position to break the spell which has been cast upon them. For this purpose Art is perhaps a more valuable ally than any others.” অর্থাৎ, ঐক্লপ বিবরণের (পূর্বোক্ত জিয়ারতীর) প্রভাব খুব বেশী; এত বেশী যে অনেকের কল্পনায়ও অতীত। শিক্ষার ব্যাপারে এইরূপ ইঙ্গিত (suggestion) খুব বেশী কাজ করিয়া থাকে। এ পর্যন্ত তোমাদের যুবকগণকে ক্রমাগত একইভাবে এইরূপ ভাবের ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, তাহারা যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতি অতীত কালে কিছুই করিয়া গাইতে পারে নাই; অন্ততঃ এমন কিছুই করে নাই,—পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কৃত গৌরবময় কাণ্ডের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে। তাহাদের সভ্যতা অতি নীচসরের; এবং এই রকম সব ইঙ্গিত। তাহাদের কাণের কাছে এই ধারণার কথা এতবার ঢাক বাজাইয়া বলা হইয়াছে, যে, এখন অনেকেরই সে সব কথা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা মনে করে যে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-স্বত্ব বাহা পাইয়াছে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর; তাহা ত্যাগ করিয়া কোন পাশ্চাত্য গুরুর কথা অপর কাহারও শব্দে বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে সভ্যতার স্বয়ং গ্রহণ ছাড়া তাহাদের মুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। আচ্ছা, যদি ইঙ্গিত করা চলে, তা’ হইলে তা পাশ্চাত্য রকমেরও একটা ইঙ্গিত করা যায়! তোমাদের যুবকদের দেখাইয়া দাও, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা কি

করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে তোমরা তাহাদের ক্ষমতা তাহাদের নিজস্বের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে; কেন না, এক্ষণে বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী উপাদান তোমরা তাহাদের সামনে ধরিয়া দিতেছ। পূর্বে বাহা করা হইয়াছে এখনও তাহা করা অসম্ভব নয়। তখন, তাহারা যে মন-শক্তি যোগে অভিলুত হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাহারা নিজেরাই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে অত্র সকল বিষয়ের অপেক্ষা (Art) কলা-শিল্পই সমধিক উপযোগী।

— — —

অনুদ। হুয়াশে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে এবং ভারতবর্ষে আমাদের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে self-determinationএর ধূম উঠিয়াছে, ইহা কি তাহাই? জানি না। কিন্তু সে তাহাই হউক, এই পূর্ব পূর্বের পৌরষের অঙ্গভূতি যে সকল দেশে সকল সমাজের

লোককে আত্ম-প্রতিষ্ঠার উৎসাহিত করে, ইহা যোগ্য হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে "এব" নামক অধুনা-মুগ্ধ একখানি ছেলেরের মাসিক পত্রের শিশু পাঠক-পাঠিকাগণকে গল্পছলে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 'কিশোর' নামক পুস্তকে সে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আরও অনেক স্থলে অনেক এক্ষণে চেষ্টা করিয়াছেন—আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় বৃত্তি জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে কোন ফল হইতেছে, এমন কোন লক্ষণও দেখিতে পাইতেছি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার যোগে আমরা এখনও এমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি যে, আমরা কোন কালে যে আমাদের নিজস্বের বৃত্তিতে পারিব, এক্ষণে আশা পর্যন্ত করিতে সাহস হয় না। সার জন উত্তরক মহাপুত্রের এই উপদেশে কোন ফল ফলিবে কি না, তাহা ভবিষ্যতাই বলিতে পারেন।

পুস্তক-পরিচয়

ঠাকুরের কথা

শ্রীযুগোষ্ঠী যোগদ্বিনোব মহারাজের শ্রীমুক্তকর্ম-বিঃবত,

বিদ্যা মূল্য বিবর্তিত।

নামেই একজন, এখানি গল্পবহন শ্রীশ্রীমতক দেবের কথা। তাঁহার অনুভবী বাণী বত অধিক প্রচারিত হয়, তাঁহার পক্ষে ততই বহন। দিমুসতলার শ্রীযোগদ্বিনোব পাণ্ডব হইতে এই বৃত্ত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কলিকাতা আশীর্বাদী-সোনার শ্রীমুক্ত মহেশনাথ বর মহাপ্রাণ যোগজীবন এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণ করিবার সক্ষম করিয়াছেন। তত্ত্বের উপলব্ধি কাজই হইয়াছে। অত্র সময়ের মধ্যে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়া দিয়াছে। ঠাকুরের কথা সকলেরই পাঠ করা উচিত। আর ঠাকুরের যে সকল ভক্ত দিমুসতলার বিহার-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন এবং বিনামূল্যে এমন বাণী বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই বিহার-প্রতিষ্ঠার ভক্ত সকলেরই বঙ্গাঙ্গ্য সাহায্য করা কর্তব্য। পুস্তকের প্রাতিষ্ঠান দিমুসতলার আশ্রম, ই, আই, শাখা।

কৃষ্ণাবতার-রহস্য

শ্রীকৃষ্ণদেবের মিত্র কৃত, মূল্য আট আনা।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম ঐতিহাসিক করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ মিত্র মহাপ্রাণ বরদর্শী প্রবীণ লেখক। আশ্রম হংকাল হইতে তাঁহার সেবা পাঠ করিয়া আসিতেছি। বর্তমান পুস্তকে তিনি কৃষ্ণাবতার রহস্যের আলোচনা করিয়াছেন। মহাপ্রাণের স্বভাব ও মহাপ্রাণের প্রকৃতির লোকবিশেষের মধ্যে পূর্ব-প্রচলিত এবং বর্তমানের প্রচলিত বৈদিক ও পার্শ্বিক বর্ষকর্ত্তের পরিবর্তে অধুনা কৃষ্ণের নামে যে সকল সহস্রাব্দ উপলব্ধি ও সাধন প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহার যথার্থ ক্রিতে দিয়া সমগ্র উজ্জ্বলতা, অমিত ও পাশের স্রোত অথবা প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়, তাহার প্রতিফলন বা প্রকাশের ভিত্তি মিত্র মহাপ্রাণ নানা শাস্ত্রসংগ্ৰহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রহস্য নির্ণয় করিয়াছেন। লেখক মহাপ্রাণের দর্শনমুখ্য, অনুপ্রাণিত ও বিহার-প্রণালী দর্শন্য প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবতারাব্যবস্থার সমস্ত সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশিত হইবে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ওথেলো

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু-অনুবৃত্ত, দুলা এক টাকা।

যদ্যপি সেক্সপীয়ারের ব্যাকবিশ নাটক বহু পূর্ণে নটরাজ পরিণত হইয়াছে, তথাপি পরিচয়হীন এবং যত্ন সহকারে অবতীর্ণ হইয়া তাহার অভিনয় করিয়াছিলেন। সে অনুবাদ পাঠ করিয়া সোঁতে বস-বস করিয়াছিল; এমন পুস্তক অনুবাদ তাহারই পক্ষে সম্ভবপর হইতামি। তাহার পর এতদিন আর কেহ সেক্সপীয়ারের কোন নাটকের অনুবাদ করিতে এয়াস করেন নাই। এবার শ্রীমহেন্দ্রনাথের উপস্থল সহযোগী, বস-নাটক-কেন্দ্রে অধিষ্ঠানপাঃ প্রবীণ সেনক শ্রীকৃষ্ণ সেনের বাহু 'ওথেলো' নাটকের অনুবাদ করিলেন। তাঁর সহকারে এই নাটকখানি অভিনীতও হইতেছে। আবার নাটকখানির আভাস পাঠ করিয়াছি,—অনেক স্থল স্থল এতদেব লিখিত দিয়াইয়াও পাঠ করিয়াছি। আবার অসংখ্যে বসিতে পারি, অনুবাদ বলাদ্বারা হইয়াছে; এবং গ্রীক গ্রীক অনুবাদ করিয়াও বুকের পৌরুষ অক্ষর রাখি। প্রবীণ সেনক মহাশয় যে ভূতবিশ্বের পণ্ডিত এয়াস করিয়াছেন, তাহা অনন্তপাণাধার। পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকসমূহের নিকট যে বসন্তে আশ্রয় লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেনের বাহুর চৌর্য, বস ও অর্ঘ্যের সার্থক হইয়াছে।

পটুং-বিপণ্ডে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিং-আই ই এম্বিট, দুলা আট আনা।

এখানি তরুণাস চট্টোপাধ্যায় এত লগ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ হইয়াগার বহুবিধ প্রঃ হুয়নিত লেখক ও বহাংবস্ত শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় লক্ষ্যবস্ত-পরিচিতি; তাহার শিল্পকলায় এতিয়া যেমন লক্ষ্যবাসী, তাহার সাহিত্য-লিপি-কুশলতাও তেমনই বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে আদৃত। হুতারাং এই 'পটুং-বিপণ্ডে' যে ভাসি হইয়াছে, হুৎ ভাসি নদে, বাঙ্গালী গর-সাহিত্যে) এখানি অমূল্য রত্ন, তাহা আর বসিতে হইবে না। সবভলি গল্পই বহোবস্ত, সবভলিই একেবারে নূতন দৌর্যে ভূষিত। এমন বর্ণনা-কৌশল, এমন রহস্য-গঢ়তা, আর এমন লুক্কায়িত কবিতা যেখানে পাওয়া যায়। কোনটী রাখিলা; কোনটীর বান করি—সবভলিই উৎকৃষ্ট।

জীবনের পথে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঠাকুর এম-এ, বি-এল এম্বিট, দুলা তেড় টাকা।

এখানি উপভাস। সেনক শ্রীকৃষ্ণ সেনবাহু এতদেব নূতন নয়েন; তাহার উপভাস লক্ষিত 'ওথেলো' প্রকৃতি উপভাস তাহারে সাহিত্য-কেন্দ্রে পরিচিতি করিয়াছে। 'জীবনের পথে' উপভাসখানির আধাংবস্ত যেমন বহোবস্ত, সেনবাহুর রচনা-প্রণালীও তেমনই প্রণাল্য। তিনি কোথায় অব্যবস্ত কথার অবতারণা করেন নাই। সেই মতই এই উপভাসখানি পণ্ডিত আবল্য বোধ হয়। চরিত্র-চিত্রণও বেশ হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন।

মনাক্ষা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঠাকুর এম্বিট, দুলা পাঁচ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ সেনবাহু 'জীবন' মহাশয় সেনবাহু; তাহার পুস্তকখানী বহুটা পাঠক-সমাজে বসন্তে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই 'মনাক্ষা' তাহার অন্য গর-পুস্তক; তাই আবার বিশেষ আশ্রয়ের লক্ষিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। আবার বসিতে পারি, এই উপভাসখানি সাধারণ উপভাসপ্রণালী হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। উপভাসের ঘটনা-সংবাদ লক্ষ্য; চরিত্র-বিভরণও বেশ হইয়াছে; তাহা স্বরভাসে, কোন একটা আভাস নাই। পুস্তকখানির ছাপা, কাসের ও বাঁধাইও উৎকৃষ্ট। উপভাস-পাঠকগণ এই 'মনাক্ষা'র সহাধার করিয়া ভূতদাস্য করিবেন।

শিবচন্দ্র দেব ও তৎ-সহধর্ম্মিণীর জাদর্শ জীবনালেখ্য

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঠাকুর এম-এ, বি-এল এম্বিট; দুলা আড়াই টাকা।

মহাশয় শিবচন্দ্র দেবের নাম শিখিত বাঙ্গালীর; পরিচিত। তিনি স্বাধারার্থে যেমন লক্ষ্য হইয়াছিলেন, তেমনই কার্যেও জেদন একটা চিত্রে আশ্রয়-লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কেবল যে স্বাধারার্থেই উত্তমিকল্পে তিনি তাহার সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাহার লক্ষ্যমান কোমলতার সমস্ত সম্ভাটন, সমস্ত উত্তমির মূলেই তিনি ছিলেন। তাহার একাভাস, তাহার অধ্যবসায় তাহার বর্ণনাপালা অসুকার্য। এমন মহাভারত ও তাহার সহধর্ম্মিণীর জীবন কথা পাঠ করিলে উপভাস হওয়া যায়।

সাহিত্য-সংবাদ

অগাধ শ্রীকৃষ্ণ সনিতহবার বন্দোপাখ্যায় বিভাজন এম-এর শ্রীকৃষ্ণ "কৃষ্ণ ও পর" নামক শ্রীকৃষ্ণ পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল ; মূল্য ৪৪ আনা ।

শ্রীকৃষ্ণ কীরণচন্দ্র বরবেশ শ্রীকৃষ্ণ "সানন্দগা গাথা" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৮৪ আনা ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ "বাহিবাহিনী" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৬৬ টাকা ।

শ্রীকৃষ্ণ নিবন্ধনাথ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-ঐতিহাসিক চন্দ্রনাথ "চন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৬৬ আনা ।

শ্রীকৃষ্ণ পদপতি সত্যকামের "ব্যাখ্যান ও বোধতত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৬৬ টাকা ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন দাস শ্রীকৃষ্ণ "বাগের আশীর্বাদ" বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইবে ।

মহিমার সম্পাদিত "বহুত পিয়ামিত গিরিজের" বই ও সপ্তম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে : উহার নাম বহুতক্রমে "বহুতক্রমে" ও "একপত্র" ; মূল্য প্রতি গ্রন্থ দ্বিগুণ বৈধি ১।০ ও ৩।০০ মাত্র ।

শ্রীকৃষ্ণ নির্মলসিধি বন্দোপাধ্যায় বিরচিত ঠাকুর আত্মবীত "স্বপ্ন" মত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৪৪ আনা ।

শ্রীকৃষ্ণ কালীদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ "ভিগ্নাশ্রিত পৈল" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৪৪ আনা ।

শ্রীকৃষ্ণ এগোপানন্দ সনিতহবার শ্রীকৃষ্ণ "শ্রীকৃষ্ণ সত্যক" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৪৮ আনা ।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রনাথ সেন শ্রীকৃষ্ণ "বড় বাতী"র তৃতীয় সংস্করণ, "পথিকের" তৃতীয় সংস্করণ ও "হিমালয়ে"র বই সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।

ভাকুর শ্রীকৃষ্ণ দীপকর সত্যকাম বহাণর এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিজ্ঞানমন্ডলের আইন স্কোলাসের পক্ষে নিবন্ধ হইয়াছেন । বঙ্গা বঙ্গো, এই বঙ্গোকারী নিবন্ধে বঙ্গোয়ার সর্বসাধারণ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন ।

আর একজন আনন্দের সংবাদ এই যে, ভাকুর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের মনীষার বিশ্ব-বিজ্ঞানমন্ডলের আইন স্কোলাসের পক্ষে নিবন্ধ হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে ; এবং বঙ্গোয়ার হইতে এই মন্ডলের একজন সংস্করণ কলিকাতায় আসিয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ "বিরাজ বৌ" এবং "বিশ্বনাথ"র দ্বিতীয় সংস্করণ সত্যকাম চট্টোপাধ্যায় এত দল কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইবে ।

চিত্র-পরিচয় ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন দাস কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ পটে 'প্রথম' শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন চিত্রিত হইয়াছে ; ঐ চিত্র এবার 'চিত্রদর্শন' নামে প্রকাশিত হইল । সুনিপুণা বিশাখা নিজে মদনমোহন রূপ আঁকিয়া কৌতুহল-পরায়ণা রাধাকে দেখাইতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ চাক চুলিকার মুখা রাধার দ্বিগুণে নেড়ে এগরের প্রথম উচ্ছ্বাস অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে । রাধা সাক্ষিগা চণ্ডিগা গারিয়াছিলেন—
হাস্যে সে অখলা স্বপ্নের অক্ষর

ভালমত নাহি আনি,
বিরলে বসিধা পটেতে লিখিয়া
বিশাখা বেথাল আনি ।"

Publisher—Sudbanshukhar Chatterjee,
of Messrs. Gurusdas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.



Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chandra's 2nd Lane, CALCUTTA.



অর্থ।

[শিল্পী—ঐক্যবদ্ধ সারা]

(Engraved at the Bharatvarsha Office).



জৈষ্ঠ, ১৩২৬

[বিভীয়া খণ্ড]

ষষ্ঠ বর্ষ

[ষষ্ঠ সংখ্যা]

বেদমাতা

[শ্রীবিজয়াস দত্ত এম-এ]

বেদমাতা সত্যানের নিকটে হুঁচির আশা করেন।

দাশ, যাকের বাক্যের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার গবেষণার উপযোগে বসিওয়েন, “বিজ্ঞানই ব্রাহ্মণ্যমগ্নান, গোপায় না শেখিয়েই বসি”—বিজ্ঞান বা বেদ ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল—“আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার পক্ষে অমূল্য রত্নস্বরূপ।” ব্রাহ্মণগণ বেদমাতার প্রতি কিরণ হুঁচির করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু সৎকারে বেদমাতার রক্ষা-সাধন করিয়াছিলেন,—শেষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বেদের সোপাই তাহার প্রাধান্য। আজ এই বিশেষ শতাব্দীতেও বেদমাতা কি তাঁহার সত্যানবিশেষের নিকটে হুঁচির আশা করিতে পারেন না? পারেন। তবে একটু অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে। সে কি? তাহাই একটু বিস্তারিত করিয়া বর্ণন করিতেছি।

পুণ্ডিতন ক্রমবিকাশবাদ (Darwinism) মতের অতীত সত্বে, জ্ঞানবিস্তারের পূর্ববস্থা সত্বে, এক প্রকার অত্যন্ত উপস্থিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ উনিয়াছিল যে, দারউইন (Darwin) একদিন পথে বেড়াইতেছিলেন; তখন কার্লাইলও (Carlyle) আর একজন বন্ধুর সঙ্গে সেই পথে বেড়াইতেছিলেন। কার্লাইলের সঙ্গে দারউইনের কোন পরিচয় ছিল না। কার্লাইলের বন্ধু দুই হইতে অসুখী সত্বে দারউইনকে বেধাইয়া কার্লাইলকে বলিলেন, ‘ঐ লোকটা দারউইন, তিনি বলেন বানর পিতা হইতে আদিম মানুষের জন্ম।’ ঐ কথা শুনিবামাত্র কার্লাইল আর বৈধি রাখিতে পারিলেন না; তিনি যোড়িয়া দারউইনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি না কি বলিয়া থাকেন, বানর

হইতে মানুষ জন্মিয়াছে? দারউইন বলিলেন “হাঁ।” কারণশীল অমনি বিরক্তহৃৎক জুটুটু করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রাকৃতিক মনোনিয়ম এবং শিক্ষার প্রভাবে (Natural selection and training) বানর পিতা হইতে মানুষ জন্মিতে পারে, কারণশীলের মত মনোবীণ এ কল্পনা মনে স্থান দিতে পারেন নাই। কিন্তু পান্ডাভা গগণ তখন দারউইনের ঘোষে পড়িয়াছিল। বস্তার সুখে ভিকি নোকার ভ্রাতা কারণশীলের মত মনোবীণপেরেও মত ভাগিয়া গিয়াছিল।

অজ্ঞাতপারে হটক, অথবা জ্ঞাতপারে হটক, দারউইনের ক্রমবিকাশবাদ এই বিশ শতাব্দীতেও আমাদের বেনবাতার পক্ষে তাঁহার সম্মানদিশের নিকটে স্থিতির লাভের কিরূপ অন্তর্য হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও চন্দ্র ব্যথিত হয়।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতীত হইল, মোক্ষমূল্যের সম্বন্ধে দারউইনের একই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আমরা কলেজের ছাত্র। সেই সংঘর্ষের নিবর্ণন মোক্ষমূল্যের গ্রন্থেই আমরা পাইয়াছিলাম। যেসব মার্জিত সুললিত ভাষায় প্রীতি, এবং বৈদিক ধর্মিদিশের চরিত্রোদ্ভাষকী ওষুজানোদীপক কবিত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ধাতু (পাণিনির মতে প্রায় ছয় হাজার) হইতে অর্থাৎ লাতীনের পূর্ববীমর-বাগ্ন ভাষা সকলের লগ্ন্যশির উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, মোক্ষমূল্য স্বীকার করিতে পারিলেন না, বানর হইতে প্রাকৃতিক মনোনিয়ম দ্বারা (Natural Selection) বাহু অবস্থা (Environments) এবং শিক্ষার প্রভাবে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রবল বস্তার সুখে মোক্ষমূল্যের “স্বাপত্তি” অতি অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি, আমরা নিম্নোক্ত বিচার অভিযানে সীত হইয়া দারউইন প্রকাশিত ধ্রুতালোকে তখন ভাবিতাম যে, বৈদিক সময়ের লোক যখন আমাদের ভুলনার বানরদের বহু সংখ্যক বংশের অধিক নিকটবর্তী, তখন তাঁহারা আমাদের মত প্রতিভাশালী অথবা তথ্যদী ক্রমে হইবেন? তাঁহাদের রচিত বেদের, আমাদের মত গুণধরদিগের নিকটে, কি মূল্য হইতে পারে! এই

হেতুবাধের উপরে দাঁড়াইয়া আমরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বৈদিক ধর্মিগণ তত্ত্বজ্ঞান অথবা হস্তজ্ঞান লাভের অনধিকারী ছিলেন। আমরাও তখন মনে-মনে মোক্ষমূল্যের বিরুদ্ধে দারউইনের পক্ষে মত দিয়াছিলাম। এইরূপে বেশ সম্বন্ধ আমাদের রক্তে সর্পভ্রম হইয়াছিল। এখন ভ্রম বুঝিয়াছি। কিন্তু এখনও কি সে পূর্বের মেনা ছুটিয়াছে, পূর্বের সর্পভ্রম দূর হইয়াছে? আমাদের মেনা ছুটিয়া ধাতুক আর নাই ধাতুক, এখন আর পূর্বের মত আতঙ্কের কোন প্রকৃত কারণ নাই।

মেণ্ডেল (Mendel), ডিভাইজ (Devries), বার্বঙ্ক (Berbank) প্রভৃতি মনোবিগণ তাঁহাদের বীজ-বিজ্ঞান (Embryology) অধ্যয়ন দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আতঙ্কের আর কোন প্রকৃত কারণ নাই। মানুষ আর আপনাকে বানর পিতার সম্মান কখনো মনে করিতে পারিবে না,—প্রাকৃতিক মনোনিয়ম দ্বারা বানর-সম্মান মানব-সম্মান হইতে পারে, এরূপ আর কখনো মনে করিতে পারিবে না। বৈদিক ধর্মিগণ বীজের বিকাশে “ওটা”র অথবা “অয়ির” মীনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন,—“ওটারূপানিহি প্রভুঃ পতঙ্গং বিশ্বাণ্ সমানরে” (১-১৮৮-১); রূপনির্ণায়কর্তা ওটা রূপের প্রভু। তিনিই বীজের ভিতরে বসিয়া সকল প্রাণীর রূপ ব্যক্ত করেন। “অং গর্ভো বীজস্যং জন্তুবে-ত্তিঃ” (২-১-১৪)—হে গগন-প্রকাশক অধি, তুমি তুতি বা রূপরহিত, আবার তুমিই লভ্যতির গর্ভস্থানীয় হইয়া জন্মগ্রহণ কর। “ওটারূপানি পিলন্তু” (১০-১৮৪-১); রূপনির্ণায়কর্তা ওটা বীজের ভিতরে বসিয়া রূপাবয়ব সকল বিকাশ করুন। মেণ্ডেল প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণও সৃষ্টি-বিকাশের ভিতরে (Germ plasm) বীজের মাহাত্ম্য (১) দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন।

(১) “It is a universal tendency in all living protoplasm to exhibit variations. The germ-plasm is spontaneously variable. No parent ever produces a germ cell.”

“The individual is practically the trustee of the germ cells but not the maker.” Adaptation (i.e., Evolution) depends almost exclusively on sponta-

প্রাকৃতিক সনোময়ন-বলে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বাহ্যিকতার আত্মকুলো বানর মাতা-পিতা হইতে মানবের পিতৃপুত্রবৎ উৎপত্তি হইয়াছিল, এই ত্রাত সংস্কার আধুনিক বীজবিজ্ঞান (Embryology) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাধারণের মন হইতে এই ত্রাত সংস্কারের মূল এবং পুণ্যতন আত্মক এখনও সম্যকরূপে দূর হয় নাই। এই ত্রাত সংস্কার একবার বাহ্যিক মনকে অধিকার করিয়াছে, এ কথাও তাহার মনে সঞ্জেই স্থান পাইবে যে, অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্বের বৈদিক কবি—যিনি আবারের অপেক্ষা বানর স্ত্রীবনের এক অধিক নিষ্ঠাবর্তী,—তিনি জ্ঞান বিষয়ে কখনও বিংশ শতাব্দীর গোড়ের সমান হইতে পারেন না,—শিক্ষা এবং বাহ্যিকস্থাননিত (Training and environment) পরম্পরাগত (Cumulative) উত্তির সম্বন্ধে নিশ্চয়ই নয়, স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা এবং আত্মশ্রুতাসিদ্ধ “সাক্ষাৎ-পর্যাক্ষাৎ” (Immediate or Intuitive) জ্ঞান লাভেও বৈদিক কবিগণ বিংশ শতাব্দীর সত্যাত্মবাদী নয়মূল্য-মিগের বিশেষ স্রষ্টা-ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না। আধুনিক সভা করণ এই ত্রাত এবং অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া, আত্মক বৈদিক কবিগণকে তাঁহাদের জ্ঞাততঃ প্রাপ্য স্রষ্টা ও সম্মান প্রদান করিতে পারিতেছেন না। তাহারই একটা দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

পৌরাণিক ‘অদ্বিতি’ একজন স্ত্রীলোক,—বস্ত্রপের দুই স্ত্রী এক স্ত্রী। হয় ত কল্পের অদ্বিতি নামে একজন স্ত্রী ছিল। কিন্তু বৈদিক অদ্বিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—অনন্ত অনির্জাতাচর্যম্ব উপরের নাম—পিতা এবং মাতা উভয় নামে অভিহিত। হুবহুের প্রথম মতলসেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, কবি সৌম্য বলিতেছেন, “অদ্বিত্যোঁরদ্বিত্যরত্ন-রীক্ষদ্বিত্যমিতা স পিতা মপুত্রঃ বিবে বেবা অদ্বিত্যঃ, পক্ষজনঃ অদ্বিত্যাত্মদ্বিত্যনিবঃ।” (১-৮২-১০)

“অদ্বিতি স্রষ্টাশব্দ, অদ্বিতিই অন্তরীক্ষশব্দ, অদ্বিতিই মাতা বা নির্ধাপকর্তা, অদ্বিতিই পিতা বা পালনকর্তা,

অদ্বিতিই পুত্র বা স্বাক্ষকর্তা, অদ্বিতিই বিশ্ববেবগণ, অদ্বিতিই পক্ষপ্রবেশের সন্ধর্ভাধি পক্ষজনগণ, বাহা কিছু জগদ্রাজ্য করিয়াছে, তাহা অদ্বিতি এবং জগদ-ব্যাপারও অদ্বিতি। আবার হুবহুের অষ্টম মতলে কবি ত্রিতআপ্য (বাহ্যার নাম কেমাবেভ্যন্তেও পাওয়া যায়) বলিতেছেন,— “অদ্বিত্যিওঁরত্বদ্বিত্যিঃ স্বর্ধর্মজ্ঞত্বঃ। মাতামিত্রত্বঃ বেবতো-র্ধয়ো বকপ্ত চানেনংগো ব উত্তর ম উত্তরো ব উত্তরঃ।” (৮-৮২)—অনন্ত অনির্জাতা অদ্বিতি আমাদিগকে স্বাক্ষা করুন, অদ্বিতি আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। তিনি আমাদিগের অধিষ্ঠাতা, যিহের নির্ধাপকর্তা—তিনি কল্যাণের আকর, অর্থাৎ নির্ধাপকর্তা, তিনি অন্ধকারের অধিষ্ঠাতা, বকপেরও নির্ধাপকর্তা। শুধা হইতে তোমরা পাপরহিত স্বাক্ষা মূল প্রাপ্ত হও! তোমাদের স্বাক্ষা মূল হুম্বর হউক, তোমাদের স্বাক্ষা মূলই হউক! ইহা কি এতস্ববাবদের পরাক্রা নর? বাহ মতে অদ্বিতি স্বাক্ষা মূল হইতে, মায় মতে মো হাক্ষ হইতে; পাপিনি বলেন, ‘বীওঁ’—করে, এবং ‘মো’ অব্যবত্তনে। বাহ বলেন:—

“অদ্বিতিঃ সক্ষা প্রাপ্ত ধার নেবলীনা ন বিদ্যতে।”— সক্ষা প্রাপ্ত ধার করিয়াও অদ্বিতি বির হইতেছেন না। —তিনি আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন যে, বেবের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে ‘ন সংসারমাত্রিবেত অর্থোনিভাঃ-পরীক্ষেতঃ’, শুধু পূর্ব-সংসারের উপর নির্ভর করিবে না, নিভা অর্থ পরীক্ষা করিবে। ‘মো’ হাক্ষ হইতে মায় অর্থ করিতেছেন, “অবত্তনৌ” বা অপরিচ্ছেদ বা অনন্ত। বোক্ষম্ভার তাহার স্বাক্ষের অহুযায়ে (P. II, 242 to 245) এই অদ্বিতি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, “অদ্বিতি (২) মগতে অনন্ত এবং অনির্জাতোঁর (The Infinite and “The

(*) Aditi is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of the long process of abstract reasoning. But the visible Infinite visible as it were to the naked eye beyond the clouds, beyond the sky, one might almost say but for fear of misunderstanding the Absolute. For it is derived from Diti bond, and the negative particle, and meant therefore originally what

neous variations. No embryo and no individual ever made germ cells. The latter existed first. The individual inherits nothing from his parents. It is impossible to alter germ plasma.”

— Dr. Leighton's Embryology.

Absolute") প্রথম নামকরণ। এ সাক্ষ্য অতি সূচ্যবান। তাঁহার মত একজন খৃষ্টানীর পক্ষে এইরূপ সাক্ষ্যদান বেদ-মাতার পক্ষে সামান্য গোঁড়বের কথা নয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, সেই সাক্ষ্যের সঙ্গে-সঙ্গেই পণ্ডিতবর একটু চুপকণ্ঠের অথবা ভয়েরও পরিচয় দিয়াছেন। "Nor fear of misunderstanding!" কি ছানি পাছে লোকে ভুল বুকে এই ভয়ে! এই কথা বলিতে আমা-দিগকে হুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মোক্ষ-সুখেরও বেন বেদমাতার স্তায়তঃ প্রাপ্য স্থান দিতে সাহসী হইতেছেন না! কেন সাহসী হইতেছেন ন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলিতেছেন, "এই 'অদ্বিতি' নাম এবং অনন্ত, অনির্কীর্ণতার এই ধারণা একেবারে আধুনিক (decidedly modern) মনে হয়। তিনি বলিতেছেন, বেদ সেই অখণ্ডস্বতন্ত্র অদ্বিতিকে বেগপণের মত রূপে উল্লেখ করিতেছে যেহেতু, অত্যন্ত বিশ্রিত হইতে হয়। (৩)

এ উল্লেখ জ্ঞানের অথবা বিশ্বাসের কি কারণ হইতে পারে? এত আদিম কালের লোক আমাদের তুলনার বানরবের এত অধিক নিষ্ঠুরতা লোক,—এত আধুনিক সভ্য লাভ করিতে পারে, মোক্ষসুখেরও ইহা বিশ্বাস করিতে সক্ষম! ইহা কি দাক্ষিণ্যের বিবরণ মূল নয়? এমন কি, মোক্ষসুখের কথাতেই মনে হয় যে, তিনি বেদমাতাকে একেশ্বরবাদী বলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু লোক-ভয়ে তাহা করিতে সাহসী হইতেছেন না (৪)। বিশ্বেই হউক, অথবা ভয়েই হউক, দ্বাদশতমের তিনি বেদে অর্ধ-একেশ্বরবাদের (Henotheism) কলঙ্ক আরোপ করিয়া বেদমাতার

প্রতি অবিচার করিয়াছেন। হাব, মোক্ষসুখের মত উদারচেতা তত্ত্ববর্নী মনীষীর নিকটেও বেদমাতা তাঁহার স্তায়তঃ প্রাপ্য মর্যাদা পাইলেন না! সে বাহ্য হউক, তিনি যে এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক 'অদ্বিতি'ই অগ্রেত অনন্তের (Infinite) বুদ্ধি-মনের অগোচরের (Absolute),—কোরাপ বাল্যকে বলে "আরা", হোসমন্—প্রথম নামকরণ, এবং তিনি যে এ কথাও স্বীকার করিতেছেন যে, যে গোতম স্ববির অন্তরে এই 'অদ্বিতি' নামের মহিমা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনিই অগ্রেত প্রথম একেশ্বরবাদী, এতদন্ত আমরা প্রাণের সহিত তাঁহাকে হতভম্বতা অর্পণ করিতেছি।

অনন্ত এবং অনির্কীর্ণতার (The Infinite and the Absolute) ধারণা সম্বন্ধেই বেদমাতা অগ্রেত ধর্মশাস্ত্র, তদু এ কথা স্বীকার করিয়াও মোক্ষসুখের নিরন্তর হন নাই। অতীন্দ্র শক্তি (Force বা Energy) এবং শক্তিমানে ধারণা সম্বন্ধেও মোক্ষসুখের বেদমাতাকে অগ্রেত আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন,—

"অনন্ত সত্ত পরমে ধোময় দক্ষ্য অন্তরিত্তিরূপেহ।"

৪ ১০-৪-৭

বেদমাতা বলিয়াছেন,—"সদসাম্যক এই অগ্রেত পরম বা সর্বোত্তম চিদাকশে অবস্থিত, যেখানে অনন্ত স্বরূপ অদ্বিতির ক্রোড়ে দক্ষ বা বলের (Creative energy) জন্ম। দক্ষ অর্থে বাহ বলিতেছেন—"বলং"—"দক্ষ ইতি মকারন্তঃ বল নাম।" পানিনি বলিতেছেন—"দক্ষ বুভৌ ঈজার্থেচ।"

এই 'দক্ষ' বা অব্যক্ত শক্তি বা অতীন্দ্র শক্তিমানে সম্বন্ধে মোক্ষসুখের বলিতেছেন—"বৈদিক ধর্মগণ 'অদ্বিতি' নামে অনন্তের ধারণা করিয়াও দেখিলেন, তাঁহারও পরে আরও কিছু রহিয়াছে, এবং তাহাকে তাঁহার 'দক্ষ' নাম প্রদান করিলেন, বাহার অর্থ শক্তি বা শক্তিমৎ। এ সকল এত আধুনিক বোধ হয় যে, তাহা বিশ্রিত হইতে হয়। •

is free from bonds of any kind, whether of space or time, free from physical weakness, free from moral guilt.

(৩) To us such a name and such a conception seem decidedly modern, and to find in the Veda Aditi, the Infinite as the mother of the principal gods, is certainly, at first sight startling.

(৪) We may not be justified in saying that there ever was a period in the history of the religious thought of India, a period preceding the worship of

the Adityas, when Aditi, the Infinite, was worshipped, though to the sage who first coined the name, it expressed, no doubt, for a time the principal, if not the only object of his faith and worship.

• • শব্দ এবং অসত্তের ধারণা হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন সম্বন্ধ হইতেই সুপরিচিত, এবং তাহা তাহাদের নির্বিশেষের চিন্তার বিকাশের কল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব শক্তি (Power or Potentia) অর্থে এই শব্দের ধারণাও তাহাদিগের নির্বিকারের চিন্তার বিকাশের কল হওয়াই সম্ভব (৪) ইত্যাদি। 'শব্দ' এবং 'অসত্তের' ভেদবুদ্ধি 'পূরন বোম' বা বিখ্যাত চিদাক্রান্তের ধারণা, অনন্ত, অনির্লীচ্যের ধারণা, এবং পরিশেষে 'শব্দ' বা বলের (Potential Energy) ধারণা, এ সকলই বেদব্রাহ্মণের সুপরিচিত। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর একেশ্বরবাদ কি হইতে পারে? পাক্কাতা সংশ্লিষ্টাদিগের, হৈতুকদিগের (Deist) অথবা কুবেরের উপাসকদিগের (Mammon-worshippers) একেশ্বরবাদ ইহার তুলনার সম্মত।

(৫) "There was something beyond that Infinite which the Vedic poets called Daksha, literally power or the powerful. All this, no doubt, sounds strikingly modern.....The ideas of being and not-being are familiar to the Hindus from a very early time in their intellectual growth and they can only have been the result of abstract speculation. Therefore *daksha*, too, in the sense of Power or Potentia, may have been a metaphysical conception. But it may also have been suggested by mere accident of language, a never-failing source of ancient thoughts."

—M. M. Vedic Hymns, ১-২৩৬ to ২৪৭.

গুপ্ত ব্যাখা

[ঐ প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল,]

(কবির রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ অনুসরণে)

বখন আসিলে কচ 'ফিরি' দেবলোকে
মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা কহি' অধারন,
স্বর্গ-মোক্ষার্থ হ'ল তোমারি আলোকে,
তবু তুহি অক্ষমলে ভরিলে নয়ন;
দেবরাজ সমাদরে বসাইলা পাশে,
উর্ধ্বশী-উন্নত-আশি' পরাইল মালা,
সকলে সম্রাটেরে তোমারে সম্ভায়ে;

বেলা মাজে, মানস-পৌত্তলিকতামাত্র, প্রকৃত একেশ্বরবাদের ছায়াবাত।

"তথ্যিকোঃ পরমঃ পরঃ সৰ্বা পত্ততি স্বরঃ।" (১-২২-২০)

বৈদিক ঋষিদিগের এই শাস্ত্রাৎ অপরোক্ষ বর্ণন-ভবিত একেশ্বরবাদের তুলনার পাক্কাতাদিগের সম্মত। একেশ্বরবাদ অর্ধ-একেশ্বরবাদ (Henotheism) অথবা পাইবারও অযোগ্য। কিন্তু বোদ্ধশূন্যের দ্বিচ্ছিন্নতা হার বিপত্তী! তিনি অসলকে নকল, সাক্ষকে কুটা এবং নকলকে আদল, কুটাকে সাক্ষা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বৈদিক ঋষিদিগের অপরোক্ষাত্মকৃত্যমূলক একেশ্বরবাদের উপরেই অর্ধ-একেশ্বরবাদের কলঙ্ক আত্মপন করিয়াছেন। আদ্যরা প্রকৃত অসত্ত। সাধারণের সম্বন্ধে, মগতের সকল ধর্মাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে উপস্থিত করিয়া, বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, যে, তাঁহার মূলমন্ত্র হউন, বৃষ্টান হউন, অথবা বৌদ্ধ হউন, অন্ততঃ বোদ্ধশূন্যের সাক্ষার উপরে নির্ভর করিয়া, যেন বিনা বিচারে কেহ বেদব্রাহ্মণের উপরে বহু-ঈশ্বরবাদের অথবা অর্ধ-একেশ্বরবাদের কলঙ্ক আত্মপন না করেন। যদি বোদ্ধশূন্যের কথায় সত্য হয়, অদ্বিতীয় যদি সত্য-সত্যই জগতে অসত্ত এবং অনির্লীচ্যের (The Infinite and the Absolute) প্রথম নামকরণ হয়, এবং বৈদিক 'শব্দ'ই যদি নির্বিশেষ বা অস্বাক্ষর শক্তির (Force) প্রথম নামকরণ হয়, তবে খৃষ্টান, মূলমন্ত্র অথবা বৌদ্ধ, কেহই যেন আদ্যদের সঙ্গে একগ্রাম হইয়া, "বেদোহথিলো ধর্মঃ শূন্যঃ হি" বলিতে লজ্জা বোধ না করেন।

তবু না নিবিল তব চরণের জালা,
এ মহা আনন্দ দিনে রহিলে নীরব,
হাসি-বাশি-গান কিছু শিশিলা না আগে,
স্বর্গ বসি' মনে হ'ল সকল উৎসব,
চিন্তে তব আগে হৃদু এ কথা কে জানে
পূরে বেদব্রাহ্মণী ভীয়ে সে কুটীরখানি
মান মুখে বসি' থকা আছে দেবখানি।

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষলয়া ।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামটলকে ঘরের মধ্যে পাঠাইয়া, কৈজু মিছে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া—কেমন করিয়া চাষের প্রভৃতি বন্যাইয়া খাটের বিছানা বাড়িয়া-তুড়িয়া ঠিক করিয়া দিতে হইবে, সে সব দেখাইয়া দিতে লাগিল। রামটল এ সব বিবায় তেমন পট্ট নয়;—তবে ছোটবাবু বাড়ীতে থাকিলে, তাহাকেই এ সব কাণ করিতে হয়। কিন্তু, হইলে কি হইবে,—সতর্কতা ও মনোযোগের অভাবে তাহার কাণ কোনকালেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইত না। তাই কৈজু তাহার ভুল সংশোধন করিতে লাগিল।

বিছানা শুছাইতে রামটল অনেক গলদ খটাইল। গদী ও তোবক সোজা করিয়া পাতা হইল, ত—চামরখানা বাঁধিয়া ঝুঁকাইয়া রক্তা গেল। কৈজু বক্রা-বক্রিয়া অনেক কষ্টে সেটাও সোজা করাইল। তার পর কৈজুর নির্দেশ-মত বাগিন সাধাইয়া দিয়া, সে হাঁপ ছাড়িয়া বর খাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

কৈজু নিশ্চিন্ত চট্টরা পিছন দিকে একবার চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কি না;—তার পর নিরন্তরে ডাকিল, “রামটলে!”

রামটল খাঁট দিতে-দিতে, সুখ তুলিয়া বলিল,—“কি রে?”

কৈজু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—“গতি এসেছে?”

দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া রামটল বলিল, “গদা-মাই কিরিয়া—হামি মিছে বল্বে কেন?—আজ পাঁচ-সাত রোজ হোল তোর বিবি এসেছে,—তোর বগুর বি এসেছিল, আবার চলে গেল। তাই তো তোর বাপ পোষিতাবাহকে বলে বে, ছোটবাবুর সাং কৈজুকে জরু আসে লিখ দাও—বুজ্জি!—জরু!” রামটল আবার হাসিয়া উঠিল।

সলজ্জ হাতে একটু তাকি দিয়া কৈজু বলিল, “নে—নে,

মিলগাণী রাখ,—খাঁট দিয়ে নে। একটু চটপট্, নে,—তুই বড়া হুস্ত আদমী তেল?”

বস্ত-বিকাশ করিয়া বিজ্রপের স্বরে রামটল বলিল, “হে! হামি হুস্ত কোবে বৈ কি, তুহার আজ জরুরী তলব্কা দিন আছে, না? জিনো বরহ্—”

সহাত অধর-প্রান্ত দীতে চাপিয়া, কৈজু একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, “তোমার মরণ বাড় হয়েছে—না? এবার হুপ্—নয় তো মজা দেখাব?”—সঙ্গে-সঙ্গে খুদী দেখাইল।

সতরে পিছু ছট্টয়া বসিয়া রামটল বলিল, “না ভাই, না, তাখালা জব্ব না, থাম্। কিন্তু সাতা বলছি কৈজু, তুই যেমন কপাল চুকে বেড়িয়েছিলি, তেহি তখুনাথনী তোর মুখ রেখেছেন,—যেচারা খুব আশান হয়ে গেছে।”

পিছনের অন্ধকারের পানে চাহিয়া, একটু রানি হাসি হাসিয়া কৈজু বলিল, “হঁ, কপাল চুকেই বাটে,—মোখা তোর লেগে কপালটা জব্ব হয়ে গেছেও বড় জব্ব রে!”

রামটল খাঁটা রাখিয়া, কৈজুর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, “তোর বাপজীর গোসার কথা বল্ছিন্? আরে রাখ,—ও বুড়ো হুনীয়ার বাপারে তো গোয়া ছাড়া আর কিছুই শেখেনি! মিঞের আওগাতের বোমার, তারি দাওদাই, হাকিমের খরচ ঘোটাখার জন্তে তুই মিরাট হাস, বড়া হাস্, আর কাবুল হাস্, তাতে তোর বাপজীর অত গোলা কেন? এই তো, ভাগো হু বহরের জন্তে চাকরী করতে গিয়েছিলি, তাই তো—”

অনহিহু তাবে ক কুকিত করিয়া কৈজু বলিল, “থাম্, থাম্, রামটল, ওখানে আমাদের কোন কথা কইবার নাই, হুপ কর।”

রামটল হুপ করিল, কিন্তু একেবারে নয়। একটু থামিয়া বলিল, “তোর বাপ এখন তোর উপর ততটা নারাজ, নাই, এখন অনেকটা দিখে হয়ে গেছে, বুজ্জি—”

নিঃশব্দে একটা বাথিভ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৈজু বলিল, “হঁ বুঝছি।” তার পর একটু শুক হাসি হাসিয়া বলিল, “তুই যেহিঁরে আর।”

ক’টি সমাপ্ত করিয়া, ক’টা লইয়া রামটহল বাহির হইল। কৈজু আলো লইয়া আগে-আগে চলিল।

বারেবার আসিয়া দেখিল, হুশীল তখন চা লইয়া বসিয়াছে। কৈজুকে দেখিয়া কোকু-স্মিত মুখে হুশীল বলিল, “নাও, শুভার বাড়ি ভেঙে খুব বারষ করে নিরৈচ্ছ, এবার ফলায়ে বস।”

হুমতি পিছন করিয়া বসিয়া চিঁড়ে বুইতেছিলেন; হুশীলের কথা শুনিয়া কৈজুর দিকে চাহিয়া সেহমর শুৎগনার স্বরে বলিলেন, “দীর্ঘ তো নয়, আকাট গোয়ার্হী! আচ্ছা কৈজু, তোমার ঐ মারামারি-পেটাপেটি ক’বার বোকা কত দিনে যাবে বল দেখি?”—

কৈজু চোখ নীচু করিয়া অগ্রসৃত ভাবে একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। হুশীল এক চৌক চাশিলিয়া কাপটা নামাইয়া বলিল, “কৈজু তো ও ক’বার সোম-প্রাণি অথবা দিতে পারবে না, আমি বিচ্ছি শোন, কৈজু বলেছে যে—”

ব্যস্ত হইয়া কৈজু বলিল, “হ্যাঁ, কৈজু বলেছে যে,— সেখান ছোটখাট, বোহাই আপনাত, অমন করে কু-তা বলে আমার ঘাড়ে বন্দোমের বোকাটি চাপাবেন না।”

বিস্ময়িত চক্রে চাহিয়া হুশীল বলিল,—“ঐ: এইটে বন্দোমের বোকা! তুমি সে দিন বলে না বাপু আমার, যে যদি ফকীর-মহিনী হয়ে সংসার ছাড়তে পারি, তাহলে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হব; আর না হইল, যে দিন কবরের নীচে যাব, সেই দিন সংসারের বাহুঘের অধরদত্তির অভ্যাসকে চোখ মেলে দেখা, আর হাত তুলে বাধা বেওয়া ছেড়ে দেব? তুমি বলেছ কি না বল?”

কৈজু যেন সে কথা ভিনিতেই পাইল না এমনি ভাবে পিছন ঘিরায়া অকস্মাৎ স্বগতীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল, “ঐ, দিবি আপনি বসে-বসে ক’চ্ছেন কি? আরে বাস, অত চিঁড়ের ওপর অত মূড়ি! তুলুন, তুলুন,— সমস্ত মূড়ি গঠিয়ে নেন, ঐ চিঁড়েতেই ঢের হবে, ঐ আমার ভিন দিনের ধোয়ারক। এই টহল, চিঁড়েটা নীচে নিয়ে আর।” বলিয়াই চোকাঠ ডিসাইয়া তড়-তড় করিয়া

সিঁড়ি তাড়িয়া সটান নীচে চলিল,—পিছনের ব্যস্ত আঙ্গানে কাণ দিল না।

একটু পরে রামটহল আলো ও পামাদানদী লইয়া নীচে বারেবার আসিয়া দেখিল, কৈজু অন্ধকারে চুপ করিয়া গড়াইয়া আছে। রামটহল একটু রাগত ভাবে বলিল, “আবার আবার দিয়েই ধাবার বরে আনালি? আবার না কই যিলে ভোর ঘুম হয় না, না?”

কৈজু হাসি-হাসি মুখে বাড়ি মাড়িয়া বলিল, “না—” তার পর সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, “যে, খেয়ে নিই!”

রামটহল বলিল, “আর এখানে বসে খেয়ে কি হবে? বাও,—বাড়ী গিয়ে একেবারে খেয়ে-সেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে ঘুমোও পে!”

কৈজু একটু হাসিয়া বলিল, “দাঁড়া, আগে খাওয়া তো হোক; তারপর—” পামাদানদী লইয়া কৈজু ক্ষিপ্ত-হস্তে খাওয়া শুরু করিল।

অগত্যা রামটহলও এক ছিলিম তামাকুল্ সানিতে বসিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে এয়ারের ছোট-খাটো অনেক খবর একটানা ছবে উল্লেখ করিয়া চলিল। কোন নবাগত মানুষকে পাইলেই রামটহল আগে গায়ের খবর পাড়িত।

যথাসম্ভব শীঘ্র খাওয়া শেষ করিয়া কাঁচাইয়া আসিয়া, কৈজু জামার পকেট হইতে দুই কুঁচি মুলারী বাহির করিয়া মুখে দিয়া, রামটহলের দিকে চাহিয়া বলিল, “এখন তুই কি সারাসার বসে-বসে তামাকই খুঁকুবি না কি?”

রামটহল একটু পরিহাসের সহরে উত্তর দিল, “তা আর কি করব বল,—আমার তো আর কোমলও অকরী তলব নেই যে, শাট খাড়ে নিয়ে ছুটেতে হবে—ক’চ্ছেই—”

কৈজু বলিল, “বেশ, বসে-বসে রাত-ভোর তামাক টানো, আমি তওক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই—” বলিয়াই রাণ-টহলের বিছানার অর্ধেকটুকু দখল করিয়া, নিজের পায়ের কাপড়খানি খুলিয়া আপায়-মতক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

রামটহল খুব টপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “ওতে আমার কোনই দোকমান নেই মিঞা সাহেব,—কিন্তু নিজের হিঁসাব বুঝে—”

কৈজু কোন উত্তর দিল না। মিনিট মশেক পরে

রামটেল হাঁকা নামাইয়া রাখিয়া আসিয়া বলিল, “ওঠ! তোকে বিবেক করে কটকে ঢাবি দিবে আমি।”

কৈজ্ঞ গায়ের কাপড়ের ভিতর হইতেই উত্তর দিল, “তুই তরে পড়, আমার ভারী ঘুম গেরেছে—এখন আর বাড়ী যেতে পারি না।”

রামটেল একটু ধবক দিয়া বলিল, “৫ঠ—৬ঠ, বাড়ী যা,—ভারী ঘুম শিখেছে ছোকা! যা, বাপের সঙ্গে দেখা করবে—” সে কৈজ্ঞকে উঠাইবার জন্য টানটানি ছুড়িয়া দিল।

মুখের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া, কৈজ্ঞ একটু হাসিয়া বলিল—“কেন নিচ্ছে হাসান? করছিলাম! এই তিন পরে রাতে বাড়ী গিয়ে বাড়ীতক ঘুমন্ত মানুষগুলোকে হাসিয়ে একটা হৈ চৈ করা—সে আমার ব্যাধি হবে না। তুই তরে পড়—সত্বা আমি বাব না।”

রামটেল সবিস্ময়ে বলিল, “সত্বা বাবি না? ঘাঘ কৈজ্ঞ, তোর বাপ রাগ করবে কিন্তু—”

“সে কাল শুনব তখন—” বলিয়া কৈজ্ঞ পাশ ফিরিয়া ঘুমের উত্তোপ করিল। রামটেল আরও কিছুক্ষণ চোঁচা করিয়া, পরন্তু হইয়া শেষে নিজেও নিদ্রা-চেষ্টিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টিক তখন চট্টা বাড়ির কাছে। কৈজ্ঞ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, রামটেলকে টানিয়া তুলিল। কৈজ্ঞর ভয়ে রামটেল দৈত্যের মত কোন আপত্তি করিতে সাহসী হইল না,—‘আহা উহ’ শব্দে কিছু-কিছু কাতরোক্তি করিয়া, বিছানা গুটাইয়া, ঘর ভাঁট দিয়া, পূর্বাংশগৃহীত নিম-কাঠির দাঁতন বাহির করিয়া কৈজ্ঞকে একটা দিল, নিজে একটা গইল। তার পর দুজনে দাঁত নাড়িতে-নাড়িতে বাহিরে চলিল।

কটক পুঁজিয়া রাস্তার বাহিরে হইতেই কৈজ্ঞ দেখিল, লাঠি-বাড়ে, পাগড়ী-বাধার, ভাঙার বৃদ্ধ পিতা গায়ে কয়ল জকাইয়া, হুপুণ নাপরা গায়ে খট-খট করিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধের বয়স পকাশের উপর, কিন্তু সতীরের বাঁধন খুব শক্ত, হৃদয়। বৃদ্ধের সে দৃঢ়তার কাছে অনেক বাগ্মন-মুখদী বুকের বিনীততাও পরাস্তব মানো। হং হুং ইচ্ছন গোর,—কৈজ্ঞর অপেক্ষা কর্ণ। মুখশ্রীতে পিতা-পুত্রের ঘর্ষেট সামুশা দেখা যায়। তবে বৃদ্ধের হৃদয় ত, খরোজ্জল

বৃত্তি এবং দৃঢ়বদ্ধ গুণাধরে বেশ একটা অজ্ঞান-অসহিষ্ণু, কঠোর দৃষ্টিভার ভাব পরিব্যক্ত। মুখে ধবংস শালা চাপ-দাড়ি,—যাখার পাগড়ীর নীচে বিশাল টাক। বৃদ্ধের মুখে-চোখে যদিও একটা তরু নিষ্ঠুরতার ভাব নিঃশব্দ-পাঞ্জীকো বিরাজমান বটে, কিন্তু তবুও তাঁহার চাল-চলনে বেশ মৃদুর, সরল, শিষ্টতা-সম্মতপূর্ণ—সেই পুরাতন যুগের আদর্শ-কাহনা-দৃশ্য ব্যবহারের পরিচয় প্রকাশ পাইল।

পুত্রকে দেখিয়া, অভিমান্যর বিশিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ রেং-কোমল কর্ণে বলিয়া উঠিলেন,—“বাগ্‌জান বে! কখন এলি রে?”

কৈজ্ঞ সসম্মত মত হইয়া পিতাকে বঞ্চিত অভিমান করিয়া বলিল, “কাল রাত হুটোর সময় এখানে এসে পৌঁছেছি—ছোটখাবুও এসেছেন, উপরে ঘুমেছেন।”

বৃদ্ধ বলিলেন “ভবিষ্যত ভাল আছে বাবুর?”

কৈজ্ঞ বলিল “হঁ—”

বৃদ্ধ বলিলেন, “তা, তোমার বাড়ী পৌঁছাতে এত রাত হোল কেন? গাড়ী ধরতে পারিলি কি? বৃষ্টি? হু—টা—র এসে বাড়ী পৌঁছালি। উঃ! রাতে তুই বাড়ী গেলি না কেন?” প্রশ্নটার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ ত কৃত্তিক করিয়া পুত্রের দুখপানে চাহিলেন।

কৈজ্ঞ একটু ক্লান্ত হইয়া বলিল, “খাওয়া-দাওয়া করুতে রাত গিনটে বেছে গেল! তার পর তত রাতে—”

ভাড়াভাড়ি সুখ হইতে দাঁতন সরাইয়া রামটেল উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, “পকাশবার বলেছি সন্দাঁরকী, পকাশবার বলেছি, বগব, তোমার ছেলে—” বিস্তর বৃষ্টি-তরু বরফ করিয়া, মুখে-মুখেই একটা হর্দ প্রস্তত করিয়া রামটেল বিজ্ঞতার সহিত প্রায়শংসহ মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, কৈজ্ঞর মত এমন অবাধা পুত্র, কখন কালে কোন পিতার কখনও হয় নাই—হইতেও রামটেল শুনে নাই! এই প্রশ্ন সে দেখিল ও শুনিল!

কৈজ্ঞ নতমুখে নীরবে হাসিল।—রামটেলের কথাটা যে নিদ্রক পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা বৃত্তিতে অবশ্য বৃদ্ধের হাতী রহিল না। কিন্তু তবুও তাঁহার অগ্রসর, গভীর মুখের ভাবটা দেখিয়া শব্দই বোকা গেল, পুত্রের ঐ আচরণটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। অপরূপ ভণ্ড হইয়া কি তাহারা—হঠাৎ বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিয়া

বলিলেন, “তোমার পুরোনো মনোব আশা সাধেব এখন কলকাতার আছেন না কি ?”

প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার কৈফিয়ত বেশ একটু ঝড়ো দিল। বিপর্যয়ে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, “না, এখন তিনি জলদ্বারে গেছেন।”

বৃদ্ধ আর একটু বেশীমাত্রায় ঙ্গে সুকিত করিয়া বলিলেন, “তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতার ?”

কৈফিয়তের দ্বারা একটু বিচলিত হইল; তার পর আশ্চর্যের করিয়া বলিল,—“হঁ। হয়েছিল,—সড়ের দাঠে। ছোটখাটো তখন সেখানে বেড়াতে গেছেন।”

অলক্ষিতে একটু ঙ্গে সুকিত করিয়া, ঈশ্বর তীর ঘরে বৃদ্ধ বলিলেন, “মনোব কি ঘরে ? কের চাকরী নেবার ক্ষেত্রে ?”

এবার বেশ বীর ভাবেই কৈফিয়ত উত্তর দিল, “হঁ। বলেন; কিন্তু আমি জবাব দিলাম যে, আমার বাগদীর মত নাই,—মাগ করবেন।”

“বহুৎ আচ্ছা” বলিয়াই বৃদ্ধ সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “গোমস্তা বাবুজী তো কেউই এখনো আসেন নি দেখছি। আজ ককৌরপুরে বাঙা খাননা আদারে যেতে হবে,—ছোট গোমস্তা বাবু শুভ সঙ্গে যাবেন বলে যোগেছেন। হাই, তাঁর বাড়ীতে একটা হাঁক দিয়ে হাই,—আর অধি বলে হাই, মা’কৌকে তোমার দ্বারা চলে নিতে।”

বৃদ্ধ যে পথে আগিতেছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন। বৃদ্ধ দৃষ্টি-পরাভীত হইলে, রামটল একটু বিহ্বল হইল—“হ্যাঁ। কৈফিয়ত, তা দৃষ্টি ভাতের দ্বারা তুই কেন আর আচ্ছ কত করে বাড়ী যাবি,—আমিই না হয় দৃষ্টি ভাত দেব,—তুই আমার কাছেই থাক। রাক্ষী ?”

চলিতে-চলিতেই রামটলের ঘাড়ে এক বুঢ়াঘাত বসাইয়া হানিপুরে কৈফিয়ত বলিল, “বহুৎ বুঝ—সেখানে হোক একবুঢ়া দানা ছুটলেই হোল—আমি খুব—খুব রাক্ষী।”

সকলক খুবে ঘাড়ে হাত বুগাইয়া কপট কোপে রাম টল বলিল, “উঃ! কোম কড়া মান বাপ! তুই আবাবায়ে যা।”

হানিয়া কৈফিয়ত বলিল, “খাসা মায়গা! তবে তোমার মত এমন দুঃখাত্মক, আশে-ইঁড়ে, সুস্থিগাং বহুটিকে ছেড়ে একলা তো যেতে পারবে না,—তোকে শুভ নিয়ে দাব দেও।”

রামটল কি একটা উচিত-মত সহুস্তর দিতে গাইতে-ছিল, এমন সময় সামনেই তারোঘের ছোট গোমস্তা মশাই—ছিপ্ছিপে লগা হুচিৎক-কান্তি বুঝক রমণী মণ্ডলকে আসিতে দেখিয়া বামিল। রমণী মণ্ডল কৈফিয়ত দেখিয়া উৎকল্লু বুঝে বলিল, “আরে, আরে,—এ কি দেখি! তাই সাধেব আবার, পথ ভুলে এ কোথায় এসে পড়েছেন, এঁয়া!”

রমণী মণ্ডল পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা মাইনার খুলের কয় ক্রাশ পর্যন্ত কৈফিয়ত সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিল। যৌবনেও সব করিয়া কতদিন তাহার সহিত লাঠি খেলিয়াছে। এখন সে এই এষ্টেটের ছোট গোমস্তা—কৈফিয়ত শিতার উচ্চতম স্থানীয় কর্মচারী। কৈফিয়ত তাহারকে সন্যাস করিয়া চলিতে চাহ, কিন্তু মণ্ডল মশাই সেই বাংলা সাধের ছেরটা এখনও মিটতে সেন নাই। কানেই দুজনের মধ্যে বেশ একটু অন্তরঙ্গতা ছিল।

বহুত কথা শুনিয়া কৈফিয়তের উত্তর দিল—“তাই তো বটে! আবাবো তাই সন্দেহ হচ্ছে। পথটা ভুল করে ফেলেছি, না মোড়ল মশাই?—হাক, বাড়ীর খবর বল, সব ভাল তো?”

“ভাল—বলিয়া একটু অর্থহীন হাত করিয়া মণ্ডল মশাই বলিল, “এখন ভূমি মহাপুত্র, কি মনে করে গায়ে এসে বল দেখি?”

কৈফিয়ত তৎক্ষণাত উত্তর দিল, “তোমার খোকা হয়েছে জনলম বে, তাই মিঠাই খেতে এলুম—নিরে এল মিঠি।”

মণ্ডল হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা শরভান বটে! জবাবটি ট্রাটের গোড়ার যোগানেই মাছে ঠিক! আচ্ছা, বাগদার মিঠি,—এখন চল দেখি, ককৌরপুরের সামন্ত গোষ্ঠির সঙ্গে একবার মূল্যপাত করে আসি! ওরা বড়ই বিক্কাবিরি ঘরিয়ে দিয়েছে তাই,—চল তো আর দুজনে গিয়ে একটা মোকা-বিলা করে আসি।”

কৈফিয়ত উৎসাহের সহিত বলিল, “চল—চল, আমি তৈরীই আছি,—ভূমি চটপট চেক-মাখিলা, হিসেবগার বার কর,—আমি এখনই বাট থেকে ফিরে আসছি।”

আরও ছোট একটা কথার পর, প্রভু মুনীশকরের সহায় নিজাগা করিয়া মণ্ডল চলিয়া গেল। রামটল একটু বিম্বিত হইয়া বলিল, “তোমার বাপ যে ককৌরপুরে যাবে বলে সোম-শুভে বেরিয়েছে রে,—আবার তুই চমি ?”

হাত মাঝিতে-মাঝিতে কৈজু বলিল, “বাবা বুড়ো মানুষ, কোথায় কষ্ট করে বাবে,—তুই বলিস, কৈজু গেছে গোমস্তা মশাইয়ের সঙ্গে,—তোমার আর বেতে হবে না।”

রামটেল কপকের মস্ত নীরব রহিল; তার পর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তোমার বাপ এখানকার নন্দীপিরি না ছাড়লে, তুই তো এখানে গোমস্তাপিরি করবি না। কিন্তু তোমার বাপ যে বেঁচে থাকতে পুরোনো মনীষের চাকরী ছাড়বে না বললে কোট করে বলে আছে, এও তো বড় সুখিল! তোমার বাপের উচিত এবার কাষ ছেড়ে সেওয়া—ছায়াবর কোষ বাটা এখন লায়ক হয়েছে, কেন আর—”

কৈজু একটু অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়া বলিল, “চুপ—চুপ রামটেল, তুই সব বেবস্তার বৈবিসিয়াতে রোঁকক বিয়ে বেড়াস নি ভাই, ধাম!—নিমকহালাল চাকরই, পুরোনো মনীষের চাকরীর মান রাখে ধরে, নিমকহালাসে রাখে না!—আমার বাবার কাষের উচিত-অসুচিত বাধা বুঝবে, আমি তার হিসাব খতাবার কে ভাই?”

রামটেল অপ্রস্তুত ভাবে নীরব রহিল। এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর-বাচ্য হইল না।

অদক্ষ পড়েই পুকুর-ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া, লাঠি-পাশপড়ীতে সজ্জা হইয়া কৈজু মণ্ডল মশাইয়ের সহিত ককীপুত্র লাক্সা করিল। তাহার পিতা তখনও কিরিয়া আসেন নাই। কৈজু রামটেলকে বলিয়া গেল, কেন ছোট বাবুকে ও তাহার পিতাকে তাহাদের ককীরপুত্র লাক্সার কথা বলা হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ককীরপুত্র হইতে কিরিতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। মণ্ডল মশাই কতকগুলো বাকী-খারবার নালিশের আর্জীর নকল শিখিয়ার মস্ত কৈজুকে হাশিক্ত কামল পছন্দিয়া দিয়া পথ হইতেই বিদায় করিলেন; এবং নিজে কাছারী-বাড়ীতে বক্তৃৎপোষিত হারধন বিজ্ঞের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। কৈজু কাপড়ের তাড়া বগলে লইয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে চলিল। জমিদারী-সেহেরতার কাষ চলনসই রকম কৈজু আনিত, বাঙ্গালা হস্তাক্ষরও তাহার পরিষ্কার ছিল, বাড়ীতে থাকিলে মামলা-মোকদ্দমার দলিল

দস্তাবেজের অধিকাংশ সেবা নকলের ভারটা গৌমস্তা বাবুদের অস্থগ্রেহে তাহার হাতে পড়িত। ইহার মস্ত তাহার নির্দিষ্ট পাওনাও অবশ্য একটা ছিল।

উচু-পাটিল-ঘোড়া বাড়ীর দ্বারের সামনে আসিয়া কৈজু দ্বারের দাক্তা হিতে গেল; কিন্তু ভিতরে অর্ধল ছিল না, দ্বার তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল।—বাড়ীর ভিতরে পা দিগাই কৈজু দেখিল, পাশেই উঠানের কুয়া হইতে বড়ি টানিয়া একজন তরুণী মল তুলিতেছে। দ্বারের খোলায় নব্বু পাইয়া সে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল। আগন্তুকের সহিত চোখোচাখি হইতেই সে জ্ঞপ্তে মাথার কাপড় টানিয়া, আরক্ত মুখে, সজ্জা ভাবে দৃষ্টি ফিরাইল! অজ্ঞাতে একটু দ্বিষ্ট-কোমল হাসির রেখা আগন্তুকের অধর-প্রান্তে নিশ্চেষ্টে ফুটিয়া উঠিল। নিশ্চেষ্টে দ্বারের মেঝাইয়া দিয়া, কাপড়ের তাড়াটা নিকটস্থ ঘোষকের উপর নামাইয়া রাখিয়া, বিনাবাক্যে কুয়ার পাশে আসিয়া তরুণীর হাতের হড়িটা ধরিয়া সে বলিল, “তুমি সর,—আমি মল তুলে দিচ্ছি।”

প্রাপণে চোখ চটিকে নীচু করিয়া, মাথা নড়িয়া, অন্বুট ঘরে গুন্সী বলিল, “না, আমি তুলতে পারি।”

হাসি-মুখেই সিধবরে কৈজু বলিল, “সে আমিও বেথতে পেরেছি। এখন সর দেখি, আমি তুলে নিই।”

আর কেহ হইলে কি হইত বলা যায় না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে, এ সময়, ঐ মাহুঘটির এই অলসত অমুরোধের উত্তরে বেশী কিছু বাধাহুয়া করিবার মত অধিকলিত বৈধা বেচাটী তরুণীর ছিল না। কায়েই বিপর হইয়া এবার সে বিনাবাক্যেই হড়ি ছাড়িয়া, আর একটু ঘোবটা টানিয়া নিশ্চেষ্টে প্রস্থানোন্মত হইল। কৈজু চকিত-নেত্রে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া, নিরবধরে বলিল, “কেনন আছ এখন চিরা?”

অত্যন্ত লক্ষ্য-কুপিত হইয়া, তাড়াতাড়ি আরও একটু বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া, অলিত চরণে দিয়া সে রায়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল,—কৈজুর কথার কোন উত্তর দিল না।

বগিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র সফালন-কোশলে তাড়াতাড়ি বালুতী-কতক মল তুলিয়া বড় টব-ভিনটা তুলি করিয়া, বালুতী ছাড়িয়া কৈজু এক লাফে ঘোষাকে উঠিয়া, কাপড়ের তাড়াটা বগলে তুলিয়া, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল “বলিকা—”

কেহ উত্তর দিল না। কৈজু আবার ডাকিল, তবুও উত্তর পাওরা গেল না। এবার সে আপন মনেই অসুস্থ কণ্ঠে বলিল, “বাড়ীতে নাই বহিঃ?”

যহে চুকিয়া কপালের ডাকটা বাটের উপর ফেলিয়া, ঘোষাকের উপর হইতে মাথিয়া সে রাস্তাঘরে গেল। বাড়ীর ছায়ার দিকে একবার চাহিয়া, রাস্তাঘরে চুকিয়া বলিল, “বলিধা গেল কোথায়?”

তরুণী হাঁটুর তিতর মাথা ভাঁজিয়া চুপ করিয়া বলিয়া ছিল,—সেই অবস্থাতেই সে দুহুয়ের উত্তর দিল, “নানীর বাড়ী।”

কৈজু তাহার দিকে চাহিয়া কপালের অন্ত তরুণীকে বলিল, “তোমার শরীর খারাপ হয়েছে না কি?”

সে তেমনি ভাবেই উত্তর দিল, “না।”

কৈজু বলিল, “মন করে বসে আছে কেন?”

এবার বেশ একটু জোরের সঙ্গেই উত্তর হইল, “বুদী!”

কৈজু পরাভব মানিয়া হাসিল। বিড় কণ্ঠে বলিল, “বধর ভাল! এখন আমার মাথবার জন্তে একটু তেল দেবে?”

দুহুয়ের উত্তর হইল, “বিচ্ছিন্ন।”

“নির্বেশে তব—” বলিয়া কৈজু আনা খুঁটিতে-খুঁটিতে ঘোষাক পার হইয়া বাহেগার দিয়া বলিল।

একটু পরে ছোট একটা বাড়িতে তেল লইয়া দিয়া তরুণী বাহেগার চুকিল। কৈজুর দিকে না চাহিয়াই, তাহার পায়ের কাছে হেঁট হইয়া ভেলের বাটি মাঝিয়া দিয়া, নিঃশব্দেই সে পুনরায় প্রাণমোহিত হইল। কৈজু বগ্ন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু টান দিয়া, প্রায়শ্চন্দ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া স্থিত-হাস্তে বলিল—“কথাটার লবাব দিলে না? বসে না তুমি কেনম আছে?”

টান সাধলাইতে না পারিয়া তরুণী বলিয়া পড়িল। ঘোষালের শিঠে ঠেস্ দিয়া, দুহুয়ের অন্ত নীরব থাকিয়া, —অকস্মাৎ কিশোর-ভালগোর লাববা-শ্রী মাখন, প্রায়শ্চন্দ্র হৃদয় মুখখানি তুলিয়া, প্রায়শ্চন্দ্র মুখের উপর অভিমান-সমস্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, একটু বেগের সহিত উত্তর দিল, “খুব ভাল।”

কৈজু হাসি হাসি মুখে তরুণীর পানে চাহিয়া নীরবে

ধোঁকে তা বিতে হুক করিল,—আর কোন কথা বলিল না। যেন তাহার প্রেমের পাশা এইখানেই সমাপ্ত হইয়া গেল।

যন শান্তিত বৃত্তে, শ্রুগভীর তব্দমা-পঙ্খিত যবে তরুণী পুনশ্চ বলিল, “কি এমন মস্তক মস্তক অহুগুণা আবার হেরেছিল তুমি, আর জন্তে এত কাণ্ড, এত কার-খানা! কই, মরে তো ঘাই নি!”

কৈজু তেমনি হাসি-হাসি মুখেই সংঘত যবে উত্তর দিল “তার জন্তে দারী আমার কিসকৎ, আর হাকিম সাহেবদের চেষ্টা—”

একটু উত্তেজনার সহিত তরুণী বলিল, “মুখে-আঙুল হাকিম সাহেবদের চেষ্টার! তোমার যেমন পেয়েছিল ভাল মাহুণ, তেরি বাড় ভেঙ্গে কতকগুলো টাকার স্রাঙ্ক করে নিয়েছে!—না হয়, মরে যেতুম, যেতুমই! তার জন্তে তোমার অন্ত দূরে বাবার কি নরকার ছিল?” একটু খামিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল “যদি সত্যি মরেই যেতুম, তাহলে তো তোমার সঙ্গে আর দেখাই হোত না!” কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার চোখ আবার উজ্জ্বলিত অক্ষতে তরিয় গেল।

এবার কৈজুর হাসি বন্ধ হইল। ঈর্ষৎ বিস্মিত ভাবে ক্রীক কাছে টানিয়া লইয়া, নিম্নের পেন্টিপুট স্থবিশ্রুত অনাবৃত পৌর বৃকর উপর ক্রীর মাথাটি টানিয়া ধরিয়া, সঙ্গেহে তাহার কপালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে শান্ত-কোমল কণ্ঠে বলিল, “আঃ, কি মিছে রাগারগি করছ, —তুমি আগলে তোমার রোগটা কি, তাই বৃত্তে ভুল করেছ; যারা তোমার রোগটাকে চিনেছিল, তারা আমার কি বলেছিল জানো?”

মাথা দিয়া তরুণী বলিল “আমি সে সব কিছু জানিতে চাই না।”

কৈজু আবার হাসিল, বলিল, “অথচ চোখ বুজে রোগ করবে আমারই ওপর। আর রোগের কালটুকুও কাড়বে আমারই যাড়ে! স্বকোবন্ত মম নয়!”

সহসা সহোরে মাথা টানিয়া লইয়া, শ্রুগভীর অভিমান-তরা দৃষ্টি তুলিয়া স্বাকীর মুখ পানে টানিয়া, বেদনা-বখিত কণ্ঠে তরুণী বলিল, “তবে কার ওপর রোগ করবে? তোমার ওপরও নয়? তবে?” তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। চোখ-দ্রুত জলে করিয়া উঠিল।

কৈজু নিরস্তর। এমন প্রকোমল, অথচ এত-বড় মর্ম-

শ্রী তীর তিরতীর সে বোধ হয় জীবনে কখনো শোনে নাই ! কণকাল নির্জাক থাকিয়া সে বীরে-বীরে আশ-সমরণ করিয়া লইল। কথটা উন্টাইয়া দিবার জন্য পরিচাস-কোমল হয়ে বলিল “আচ্ছা নাও, লোকের অতাব হয়ে থাকে, আমি না হয় ওটা চোখ বুজে সাথে বেতে রাখি হুন্মু। কিন্তু তোমার কি উচিত নয়, আমার ওপর ভাগ করবার আগে আমি সত্যিই দেখি কি না, সেটা বিবেচনা করে দেখা ?”

তরুণী প্রতিবাদের হয়ে বলিল, “হ্যাঁ, করবে বিবেচনা ! তোমার কাণ্ড-কারখানার আমার যে বুদ্ধি-মুখি সব লোণ হয়ে গেছে।”

কৈজু হাসি মুখে বলিল, “তবে আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য থান, বুড়িটা খিত্তিরে ট্রিক ঠাণ্ডা হোক, তার পর ভেবে-চিন্তে পাগলামী কোরো।”

তরুণী এবার একটু অশ্রুত হইল। আশ-গোপনের জন্য মুখ হেঁট করিয়া, আঁচলটা তুলিয়া চোখের মল মুছিতে-মুছিতে সলজ্জ হাতে বলিল, “হ্যাঁ, পাগলামীই বটে ! এততেও আমি যে সত্যি পাগল হয়ে বাইনি এখনো, এইটাই আশ্চর্য ! তোমার কি বল না, বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াও—কিছুতে তো কাণ দাও না। আর এদিকে আমার যে, তোমার সহকে হরেক-রকম গুজব শুন্তে-শুন্তে কাণ কালাপালা হয়ে গেল—” বলিয়াই ত্রুতে চোক দিলিয়া কথটা সামলাইয়া লইয়া, নিমিত্তপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, “নাও, অনেক বেলা হয়েছে, আগে নাওয়া-খাওয়া গেয়ে নাও। বাড়ীতেই দান কর না।”

“না, আমি পুছুরে যাব।” বলিয়া হাতে তেল ঢালিয়া কৈজু কোঁহুগী ঘূষিতে জীর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, “আমার সম্বন্ধে তুমি কি গুজব শুনেছ, বল তো টিয়া।”

টিয়া—শুরকে মতিয়া এবার একটু বিশেষ রকম বাড়িবার হইয়া বলিল, “সে গুলিখোরী গুজব খোনবার সময় এখন নয়, ওটা আগে।”

কৈজু বলিল, “আঃ ! এত ভাড়াভাড়ি কিসের ? কি এমন বেশী বেলা হয়েছে ? ওঃ ! তার মধ্যে, তুমি দান করবে, নয় ? আচ্ছা, আমি বেরিরে যাছি।”

ট্রিক সেই মুহূর্তে বাহিরের ছয়ার টৈসিয়া বাড়ী ঢুকিয়া এক মহাবহতা নারী পরিচাসপত্রিত কণ্ঠে ইচ্ছিলেন, “কই

ধো, বাড়ীর মানুষ সব কোথায় ? কাকর যে সাড়া পাচ্ছিনে !”

টিয়া ত্রুতে মাথায় কাণড় টানিয়া, নিশেপে উঠিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে অদৃষ্ট হইল। কৈজু তেলের বাটি ধাতে লইয়া, বাহিরে বোরাফে আসিয়া, হাসি মুখে বলিল, “আখাব, —বাইরের মানুষ মহাশয়ের খেদাফ সন্নিধ ?”

রমণী, কৈজুর বিবগা ভ্রাতৃগায়া রহিমা বিবি। রহিমা জ্ঞান বরসেই একটু পুস্ত লইয়া বিবগা হইয়াছিল। ছেলোট বাঁচিয়া থাকিলে আশ পনের বছরের বালক হইত ; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আট বছরে পড়িয়াই সে মারা গিয়াছে। ভাগ্যহীনা রহিমা, সংসারের সর্বস্বার্থা ক্রতির বিবগ-শোক বুকে বহিয়া, —আজ ভাগ্য-বৈরাগ্যের মধ্যে উদাস-আনন্দময় ক্রুর লইয়া বাস করিতেছে। এই দুর্ভাগিনী পুস্তবধূ উপর শব্দের সেধ-বস্ত্রের সীমা ছিল না। “বাকী” বলিয়া ডাকিতে তিনি অজ্ঞান হইতেন ! শৈশবে মাকুলার দেবর কৈজুর উপর রহিমা একাধারে জননী ও মৌটা ভগিনীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ভ্রাতৃভায়ায় মত এখন যেহেতু নির্ভর আলস্য সংসারে কৈজুর আর কোথাও ছিল না। কৈজু পিতাকে চিরদিনই একটু বেশী মাঝাফ সম্বোধন করিয়া গলিত ; কিন্তু ভ্রাতৃভায়ায় কাছে তাহার আশ্রয় উৎপাতের সীমা ছিল না। ছেলেশোয়া কৈজুর উপস্থানে রহিমা অষ্ট প্রহর বাড়িবার হইয়া থাকিত। এখন বড় হইয়া কৈজু সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃভায়ায় এখন সে মনে-মনে বেশ একটু সন্তানের মতই সম্মান করিয়া চলে। উপস্থব তো একেবারেই বন্ধ !

কৈজু রহস্তভরে আশাব জ্ঞাপন করিতেই, রহিমা কণ্ঠ বিম্বরে ক্র কুক্ষিত করিয়া তিরতীরের হয়ে বলিল, “কে তুমি, বল দেখি ? বলা নাই, কওয়া নাই—নিশের ইচ্ছের বাড়ী ঢুকে বসে কার হুকুম ? কতি বৌটিকে আমি একলা বাড়ীতে রেখে গেছি,—তোমার সাহস তো খুব ! শরীরে কি একটুও আতলের গন্ধ নাই ?”

কৈজু সলজ্জ হাতে নিজের গায়ে তেল মগড়াইতে মনোযোগী হইল,—রহিমার কথার কোন উত্তর দিল না।

কৃত্যতলা হইতে পা দুইখা আসিয়া, রহিমা হাতের পুনী-বিনানোর রেশমের গুটী কুপুজিতে রাখিয়া কৈজুর মাখনে আসিয়া ঝাঁপাইল। তার পর সত্য-সত্যই সেহেত

তৎপন্নায় নবর বলিল,—“বাড়ীর কথা তো একেবারেই
জুলে গেছে। তা বেশ করেছ! আর কিই বা মনে করবে!
বাড়ীতে থাকবার মধ্যে আছে এক হস্ততান্ত্রী বুদ্ধি,—তা সে
কবরে গেল, আর হইল,—তার আর কি বোঝা দেবে? তা
বেশ! কিন্তু তা হলেও, মানুষের মধ্য-ধর্ম বলে একটা কথা
আছে! কাল রাত্রে যে গাঁয়ে এলে, তা একবার কি ছাই
বাড়ীতে এসে দেখাটা করে যেতে নেই? তাই একজন
সুখতি দিহির কাছে বলে বলে, কেঁসে মরছিলুম, যে
কৈজ্জকে আমি গেটের ছেলের চেয়ে ভালবাসি দিদি, কিন্তু
আমার নসীবের ভগ্নে কৈজ্জ এমি হয়ে পাড়িয়েছে যে বলবার
কথা নয়! এ শুধু আমার ভাগ্যের দোষ কৈজ্জ, তোমাদের
নয়! বলিতে-বলিতে রহিমা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিল।”

কৈজ্জ বেশ পৈতৃ-সংকট নিকরকার চিত্তেই দমত
অনুযোগটা ভুলিল। তার পর একটু হাসিয়া বলিল, “এর
মধ্যেই দিহির কাছে শুধু নাগিল কজ্জ হয়ে গেছে? বেশ!
—দিদি কি বলেন?”

রহিমা রাগ করিয়া বলিল, “কি আর বলবেন? তোমার
জন্মে রসগোয়ার স্তম্ভাস্নান বিলেন!”

কৈজ্জ তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ হাতে বলিল, “বহুৎ আচ্ছা!
তোমার আগে তার ভাগ দিয়ে দাও! আচ্ছা বলিফা,
বাবা কোথায়?”

কৈজ্জ ছেলেবেলার রহিমাকে আদর করিয়া “বলিকু”
বলিয়া ডাকিত। সেইরকম আদরও তাহার সেই সখোদন
বহাল আছে।

কৈজ্জর কথা শুনিয়া রহিমা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া
বলিল, “তুমিও ককীরপুর চলে গেছ,—আর সঙ্গে-সঙ্গে

সমুদ্রপূর থেকে দোক এল,—দিহির ভাঙ্গুর না দেওর কে
হন, সেই সেধবার আছেন একজন,—তিনি বাকী-খাল্লা
ফেলে রেখে, দিহির মহল নীলমে চড়িয়ে দেবার বোনাড়
করেছেন বুদ্ধি! তাই কি-দব ছাড়াই হয়েছে। সেই নিয়ে
গোল বেখেছে, তখনই বড় পোমত্তা বাবু বাপজীকে নিয়ে
সমুদ্রপূরে চুটে গেলেন। আর আর তাঁরা কিরবেন না।”

কৈজ্জ তেল মাথা বড় রাবরিয়া, উৎকণ্ঠিত দিহিরে নিঃশব্দ
হইয়া রহিয়ার কথাগুলো সব শুনি। তার পর ত্রুটি
করিয়া বলিল, “বাঃ! এর মধ্যে এত কাত হয়ে গেছে?
আমি তো ককীরপুর নিয়ে ভাল করি নি! বাপজী
সেখানে একা গেল?”

কৈজ্জর উৎকণ্ঠা দেখিয়া রহিমাও ভিতরে-ভিতরে বেশ
একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শুধু মুখে বলিল, “হ্যাঁ! দিদিও
তাই ব্যর্থ করে দিলেন যে, রাত্রে বেন সমুদ্রপূরে বাবুয়ের
বাড়ীতে থেক না—অন্ত জায়গার খোঁজা।”

বুকের উপর হুই বাছ ছাঁদিয়া, সটান সোঝা হইয়া
পাঁচাইয়া, কৈজ্জ কয়েক দুর্ভেদ নীরবে কি ভাবিল। তার পর
বলিল, “আচ্ছা, আমি ছোট বাবুর কাছে বসব নিয়ে তবে
পুছুরে যাব। তোমরা আমার ভাত বেড়ে রেখে যেতে
বোসো।”

রহিমা ব্যগ্র ভাবে বলিল, “না—না, তুমি একটু শৌকী
এস। তুমি এসে তবে আমার বাথো।”

কৈজ্জ গামছা লইয়া ভ্রতপনে বাহির হইয়া গেল। রহিমা
গিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, “শৌকী কিরো, আমি ভাত
বাড়বো তুমি এসে।” (ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সমালোচনা*

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম.এ]

(১)

প্রার্থের রহস্ত স্বর্গীয় অঙ্ককারে সুকলি আছে; কোথা
হইতে যেমন করিয়া যে ইধা আসিল, মানুষ তাহা বৃত্তিতে
পারে না। আত্মাদের মনে হয়, “রূপকথা”র স্বাক্ষরকার যত
জড়ের মধ্যে চৈতন্ত হুণ্ড ছিল; কবে কোন শুভ মুহূর্তে

হঠাৎ কে বেন পোশার কাঠি ছোঁরাইয়া দিল; অথনি যুগ
ডাকিয়া চৈতন্যর আগরণ। সেই আগরণ হইতেই কল্প-
লগনের স্বর্গ এবং জ্ঞানের প্রথম উদগম। তাহার পর
লক্ষ ও চৈতন্তের দ্যুত-প্রতিধাত্তে স্বর্গের বে বিভিন্ন নীলা
প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অগ্নিদ্বায়ই মৃদু-ভাবের অদিশা।

নাব বিস্মৃত হয়। কিন্তু সাহিত্যের সত্য চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে; কারণ, ইহার সহিত প্রাণের ধোঁব আছে। বিজ্ঞানের সমাপ্তি কথ্যে, সাহিত্যের পরিণতি ধর্ম্যে। বিজ্ঞান যে জ্ঞানের আলো আশিষ দেয়, তাহাতে কথ্যের অটলতা বৃদ্ধি পায়; সাহিত্য চিত্তকে প্রসাদ-ভাবে বিভূষিত করিয়া ধর্ম্যের পথে লইয়া যায়। দৌকিক ধর্ম্য ভগ্ন হইতে বিস্মৃত হইতে পারে; কিন্তু বতদিন সাহিত্য-চর্চা থাকিবে, ততদিন ধর্ম্যের মূল ভাবগুলি বহুদূর দূর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ হইবে। বিজ্ঞানের যে সমস্ত সত্য আনন্দবিগ্নকে বিধ্বংস করে ও আনন্দে প্রসঙ্গিত করে,—ভক্তিতে জগৎ নমিয়া পড়ে,—সেগুলি সাহিত্যে স্থানলাভ করিবেই। এইরূপ করিয়া সাহিত্য বিজ্ঞানকে ধর্ম্যের পথে সঙ্গীত করে।

বাস্তবিক সাহিত্যে যেমন সৃষ্টি বৈচিত্র্য রক্ষা পায়, বিজ্ঞানে তেমন পায় না; কারণ, বিজ্ঞান জ্ঞানের মানদণ্ডে তুলিয়া সমস্ত যাপিরা এক করিতে চায়। বৈজ্ঞানিকের এমন আশ্ব-সংঘম আছে, তাহাতে তিনি নিজেই কেন্দ্র করিয়া সংসারের পতি নিরুপিত করিতে পারেন, আশ্ব হইয়া প্রত্যেক তথা এবং সত্যের স্বরূপ পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি বিশেষণের দিকে,—সাহিত্যের চেষ্টা সৃষ্টির দিকে। সাহিত্যিক বাহিরের তথ্য অথবা সত্যের সংযোগে মানসিক সৃষ্টি পড়িয়া তুলেন। একই সত্য সাহিত্যে কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে বলা যায় না। মানব-প্রকৃতির বিভিন্নতা সত্যে প্রতিকলিত হইয়া তাহাকে নব-নব অঙ্গুরাগে রঞ্জিত করিয়া তুলে। সাহিত্যিকের আশ্বা বিষের তথ্য এবং সত্যের সহিত মিশনের জন্ত উদ্ভূত হইয়া অভিসারিকার বেশে সর্বদাই সান্নিধ্য বসিয়া আছে। এই মিশন সত্ত্ববশ করিতে হইলে, বিষয়ের মধ্যে অঙ্গপ্রতিষ্ঠা হইতে হইবে, বৈতরিক অঙ্গিত করিতে হইবে। কবি যিনি, তিনি তাঁহার বিষয়ের সহিত এই একপ্রাণতা বত অঙ্গতব করেন, আর কেহই তত করেন না; সেই জন্ত কবি সাহিত্যের চরম প্রকাশ। মটির মধ্যে বীজ রোপিত হইলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বেগ হয়,— সে নিজেকে প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে। তেমনই কবির মনের মধ্যে সত্যের বীজ নীত হইলে, তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার হয়; এবং সে আপনিই নিজের স্বরূপ সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুট করে। এই জন্ত কবির প্রাণ বিষয়ের সঙ্গে এমনই নিপু

হইয়া যায় যে, তাহাকে আর পৃথক করিয়া দেখা যায় না,—কবি তাঁহার মানসিক সত্তা বিষয়ের মধ্যে হারাইয়া ফেলেন।

সাহিত্যিক নৃতন তথা অথবা সত্যের অবতারণার জন্ত ব্যস্ত নহেন। পরিচিতির সহিত নৃতন পরিচয়, বসিতের স্বরূপ স্থাপন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্যে আনন্দের জগৎকে সত্ত্ব করে, অঙ্গুরীর চিত্ত-ভূমিকে সত্ত্ব-প্রাণনা করিয়া দেয়; এবং জ্ঞানের কাগ্নিত আনন্দে পরিণত করিয়া, জীবন কমনীয় করিয়া তুলে। জ্ঞানের পরিধি বহুদূর, সাহিত্যের ব্যাপ্তিও ততদূর; এবং জগৎের গভীরতাও তারতম্য অনুসারে সাহিত্যের গভীরতা। কিন্তু যে জ্ঞান সাংকেতিক চিত্তমাত্র, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—অথবা তাহা কর্তব্যগতের সত্যার্থতাও অদৃশ্য অবেদ্য, তাহার ভিতর দিয়া আদর্শের কোটি: ক্ষুণ্ণিত হইতে পারে না,—সে জ্ঞান সাহিত্যের বিষয়ীভূত নহে।

কারো-কারোই সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে, তিন দিক হইতে দেখিতে হইবে; ১ম, সত্য অথবা তথ্য; ২য়, সাহিত্যিকের একপ্রাণতা; ৩য়, এই দুইয়ের সংযোগে অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কিন্তু শেষ দুইটা এত গুরুপ্রায় ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, তাহাদিগকে বিদ্বিষ্ট না করিয়া আদি একত্র দেখিবার চেষ্টা করিব। ১ম, সত্য অথবা তথ্য। এ সংক্ষেপে আদি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বস্তুতঃ জীবনের প্রকাশ না হয়, তাহা দিয়া আমরা আমাদের সত্যকে চারিদিকে ছড়াইয়া বিতে না পারি, তাহা আমাদের স্থায়ী আনন্দ দান করিতে পারে না। মানুষের প্রাণ যেন কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার অন্তরতম তল হইতে উদ্বেগিত হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই তাহাকে থামিয়া রাখা যায় না। আচার, নীতি, অঙ্গুষ্ঠানের অনুশাসন দিয়া ঐদৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিলে, সে প্রতিবুদ্ধিতেই নিজেকে প্রতিবৃত্ত মনে করে; এবং তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, সে সমস্ত বন্ধন ছিড়িয়া পাতল বেগের সহিত মুক্ত হয়। চাই জীবনের ব্যাপ্তি,—যে ব্যাপ্তির দ্বারা জ্ঞান আনন্দ আমরা পাইতে পারি;—যাহার দ্বারা জীবনের ক্ষুদ্র সত্যের ভিতর অসীমের কীর্ণ স্পন্দন অঙ্গুভূত হয়,—তুচ্ছ ধূলি-মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত সৌর-জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করি।

যে সাহিত্যে আমাদের সত্য এই ব্যাপ্তির দিকে

লইয়া যায়, তাহার সার্থকতা তত বেশী। একাল ও সেকালের মধ্যে মত প্রভেদ এই যে, সেকালে প্রত্যেক দেশ ও সমাজ সমীচীন গভীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল,—যুগে মানব-মনের সাড়া স্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে পারে নাই। বেশের সহিত বেশের ব্যবধান এখন কমিয়া আসিতেছে,—পরস্পরের সহিত ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান সম্ভবপর হইয়াছে। একদল দূরে বসি কোনও সাহিত্য অতীতের পুনরাবৃত্তিতে বাস্তব থাকে, অথবা ভগ্নতের চকল ভাব-পতি, আধুনিক চিন্তা-প্রোত ও অনুভূত সভ্যতালির প্রতি লক্ষ্য না করে, তবে সে সাহিত্য বর্তমান কালের উপযোগী হইতে পারে না। আমরা যাহাকে উচ্চ সাহিত্য বলি, তাহা শুধু তাবের প্রকাশ নহে,—তাহা জীবের সহিত সভ্যতার সংমিশ্রণ; এবং যে সভ্য সাধারণের সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সাহিত্য তাহার নিম্নে পড়িয়া গেলে, নিজেকে বার্ষক করে। বৈজ্ঞানিক-ঐগতে দেশ ও কালের তেজোভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, সভ্য-চর্চাই বিজ্ঞানের মূল। সৌন্দর্যের স্বরূপ জাতীয় প্রকৃতি-ভেদে ভিন্ন হইলেও, যে সভ্যতার আশ্রয়ে সৌন্দর্যের স্বকৃতি, তাহা জাতিগত অথবা ব্যক্তিগত নহে; এবং যে সাহিত্যের সভ্যতার সহিত বস্তু নিষ্টতার সম্বন্ধ, তাহা তত পার্শ্বজনীন হইয়া যায়। ইহা না হইলে, এক জাতির সাহিত্য অল্প জাতিতে তুলি প্রদান করিতে পারিত না; এবং তাহা ও তাবের ব্যবধান নব্বো, সাহিত্যের উচ্চ-উচ্চ স্তরে দেশ ও কালের ভেদ অস্পষ্ট।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, মানুষ জাতীয় ভাব ও চিন্তা বিসর্জন দিয়া অজাত বিশ্ব-সভ্যতার সন্ধানে নিবৃত্ত থাকিবে; কারণ, সভ্যতার রূপ জাতীয় বিশিষ্টতার দ্বারা দিয়াই পরিপূর্ণ হয়। আমরা যাহাকে বিশ্ব-সভ্য বলি, তাহা অনেক সময়েই কোন দেশের সভ্যতাই নহে। তাহা সৃষ্টিবিহীন প্রজ্ঞা, যাহা অধিগম্য,—তাৎ-পাশ্চ্যে তাহার স্থান নাই। বখনই ইহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তখনই এ সভ্য স্রষ্টার পূণ্য-চন্দনে চর্চিত হইয়া বিশেষ সৃষ্টি পরিগ্রহ করে; এবং তাহা না করিলে জাতীয় জীবনে এ বিগ্রহের স্থাপনা হইতে পারে না। কিন্তু যুগে মানব-প্রকৃতি ত ভিন্ন নহে। যে বিশ্ব-শক্তি সমস্ত বৈচিত্র্যে প্রকাশিত, তাহা বিচিত্র হইলেও এক। আমার এই বিভিন্নতাই সম্ভাব্য করে যে, ইহা এক হইলেও ভিন্ন।

প্রত্যেক জিনিসের সম্ভার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা এক হইতে অল্পকে পৃথক করে, বিশিষ্টতা দেয়। মানব-সভ্যতার মূল প্রসারণ এক হইতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা ও গতি ভিন্ন। সেই মূলের দিকে না তাকাইয়া এখন এই বিশিষ্টতার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তখনই সাম্প্রদায়িক অথবা জাতীয় ভাব দারিত্যে এত প্রাধান্য লাভ করে যে, বিশ্ব-মানব-মনের সহিত তাহার যোগ সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় না।

প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর এক দিকে যেমন কতকগুলি সভ্যতার আভাষ পাওয়া যায়,—যাহা সনাতন, যাহাদের দ্বিতীয় দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে না; আর এক দিকে তেমনি কতকগুলি সভ্যতা আছে, যাহা বিশেষ ভাবে তাহাদের নিজস্ব। সর্বসময়ের সাহিত্যের প্রকৃতিই এই যে, সে এই “নিজস্বের” ভিতর দিয়া যাহা সনাতন তাহার দিকে ঘাইতে চেষ্টা করে;—কোথাও বা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহার গতির দ্বার হইয়া যায়, কোথাও বা সমস্ত জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক ভাব ভেদ করিয়া সে নিত্য সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যে পৌছিতে পারে। মহাকবি দ্বারা কাব্যলিঙ্গ স্রষ্টার সম্প্রদায়ের কবি; কাব্যলিঙ্গ ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার কাব্যে যেমন ফুটিয়াছে, আর কোথাও তেমন নহে। কিন্তু আর তাঁহার কাব্যের উৎকর্ষ এই সাম্প্রদায়িক ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে না। কাব্যলিঙ্গ ধর্ম মানব-মনের যে অধ্যাত্ম-সম্পদ সূত্রায়িত আছে, তাঁহার কবিতা তাহারই মহান প্রকাশ; এবং ইহা নিত্য, ইহার স্বরূপ বদলাইতে পারে না। সাহিত্যে যাহা স্থায়ী, তাহা নিত্য সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত; বিশেষ ভাবে কোনও জাতীয়, হইলেও, তাহা সমস্ত মানবের; এবং বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত হইয়াও তাহা সমস্ত জাতির। সেই লজ্জ সাহিত্য-ক্ষেত্রে, বর্ষ, রাষ্ট্র ও সমাজের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ মানুষের সহিত সমভাবে মিলিত হইতে পারে। সর্বসময়ের সর্ব-কালের সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে যে, যে সাহিত্য এই সৃষ্টির স্বাদ বস্তু দিতে পারে, তাহার দ্বারিণ তত বেশী। সাম্প্রদায়িক হইলেই যে সাহিত্য অনিত্য হইবে, তাহার কোনও মানে নাই; কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া নিত্য-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং সেদিক দ্বারা বিচরণ করা ঘাইতে পারে; কিন্তু এই

অতীত শূন্যে আরোহণ করিলে, জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক
বিশিষ্টতা গুণের অনিত্যাকার নদী, বন, প্রান্তরের ভ্রাণ এক
মহা সাধারণ মধ্যে লয় পায়,—তাৎপরের পার্থক্য ক্রমশঃ বাধিত
না করিয়া অঞ্চল সৌন্দর্যের উপাদান স্বরূপ প্রতীয়মান হয়।

সত্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের এই গতি
দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে; এবং তাহার সাম্প্রদায়িক ভাব ও
আবেশিকত্ব খুঁচিয়া বাইতেছে। সাধারণ মানুষের মনের
সহিত উক্ত সাহিত্যের যোগ ক্রীণ হইয়া আসিতেছে।
এক দিকে যেমন সাধারণ তত্ত্ব সাধারণতঃ পার্শ্বের সংরক্ষণে
নিয়োজিত, মানুষের সহিত মানুষের পার্থক্য-লোপে বাধ্য,
আর এক দিকে তেমনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে আভিমানের সৃষ্টি,
যাহা মস্তার সন্ধানে বেশ ও কালের বন্ধনের বাহিরে
চলিয়া বাইতেছে! এইরূপ করিয়া প্রত্যেক জাতির
সাহিত্যের ভিতর দিয়া এক মহামিলনের পথ উন্মুক্ত
হইতেছে। যে সাহিত্যিক এখন পর্য্যন্ত ইহা দেখিতে পান
নাই, তিনি “কলুর চোখ ঢাকা বলের মত” অন্ধ ভাবে
দুরিয়া মরিভেছেন। এখন যদি আমরা অচল্যন্তনের
প্রকার দিয়া আমাদের সাহিত্যকে খেঁদন করিয়া রাখিতে
চাই, তাহা হইলে আমাদের চোটা ত সকল হইবেই না;
পরন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে, কালের অঘোষ নিম্নে
জীবনের সলল ধারা হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া
পড়িয়াছি।

শিশু যেমন ভূমিট হইলেও সত্যের সহিত তাহার
নাড়ীর যোগ থাকে, তেমনি প্রত্যেক সাহিত্যের তৎসাময়িক
মনোবসন্তের সঙ্গে প্রাণের যোগ আছে; সমাজ ইত্যন্তঃ
বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যেন মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া আয়িয়াছে; এবং
এইজন্যই ইতিহাসের যুগ-চক্র সাহিত্যে ধরা পড়ে। যে
অঞ্চল গতিতে মানব-সত্যতা ক্রমশঃ পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে,
সেই গতির স্রোত-খণ্ড, অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের
বিভিন্ন যুগের সাহিত্য। এই গতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া
যুগ-সাহিত্যের বিচার করা, আর শব্দ-ব্যবচ্ছেদন করিয়া
প্রাণের রহস্য উন্মোচন করিবার চেষ্টা করা একই প্রকার।

তথু সাহিত্য কেন, মানব-স্রষ্টা যে কোন ব্যবস্থা,—হৃদয়
হটক, সন্দেহ হটক, আর রাষ্ট্র হটক—সমস্তই মানব-
প্রকৃতির বাহ্য-প্রকাশ। মানবের অন্তরাত্মা যখন নৃতন
ভাবে সজ্জা পাইয়া আপিয়া উঠে, তখন সে স্পন্দন

আবাদের দমস্ত সঞ্চয়ের কথা দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করে।
যদি সমাজ, রাষ্ট্র অথবা ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে এই স্পন্দন
অগ্রভূত না হয়, তাহা হইলে বৃত্তিতে হটবে যে, তৎসাময়িক
সাহিত্য বিকৃতমান,—ইহা মানব মনের স্পষ্টপ্রকৃত ভাব
সইয়া বাস্তব, কিংবা সমাজে সংঘত সত্যগুলিরই প্রকাশ।
সেই হিসাবে এ সাহিত্য মোকো,—ইহা বাঁটির সহিত এক
পংক্তিতে বলিতে পারি না। আদর্শের প্রেরণা ইহাতে
নাই। চিত্তের প্রণয় এইরূপ সাহিত্যে হয় না; এবং ইহা
জীবন সঙ্গী করিয়া বেহ। কারণ, কর্মজীবন ভাবেরই
অনুসরণ করে। যদি আমরা দেখিতে পাই, কোনও
জাতির সাহিত্যের মূদ্রণ জাতীয় অথবা সামাজিক ব্যবস্থার
কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহা হইলে মনে করিব যে,
হয় নৃতন ভাব বা চিন্তা সে সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে
নাই; কিংবা অল্প কোনও কারণে সে সাহিত্য সাধারণ্যে
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

বাস্তবিক, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সাহিত্য
বিপ্লববাদী। যাহা সনাতন, যাহা মানব-মনের নিত্য
সাময়ী, যে আচার, নীতি, ব্যবস্থা নইয়া মানুষ স্রষ্টা ও
শাস্ত থাকে,—সাহিত্য অনবরতই তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
করে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সমালোচনা করিলে
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিপ্লবের সমসাময়িক কিংবা তৎ-
পূর্ববর্তী যুগেই সাহিত্যের সমধিক দৃষ্টি হয়। বাস্তবের
সহিত আদর্শের সংঘর্ষে যখন শক্তি চূর্ণ করিয়া অসন্তোষের
সৃষ্টি করে, তখন বিপ্লব অগ্রসর। ভাবের উদ্বাহনায়
মানুষের প্রকৃতিগত ক্ষুধা যখন লোপ পায়, তখনই তাহার
চলিবার ইচ্ছার প্রকাশ। নির্জন গিবি-পঙ্করে দমাধি
স্বাভাবিক; কারণ, সেখানে চৈতন্যের উদ্ভূত করিবার
কোনও প্রেরণা নাই। সমাজ এইরূপ সমাধি-অবস্থা
প্রাপ্ত হইলে, বাহিরের আলোক আসিলে তবে তাহার
যোগ-মিত্রা তত্ত্ব হয়; নতুবা সে নিজেই নিজে
জাগাইতে পারে না। চৈতন্যের যখন তাহার প্রেম ও
ভক্তিতে এক নৃতন ভাবের বস্তা এদেশে আনিয়াছিলেন,
তাহারই বিবৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্যে। আবার পান্ড্যতা
সত্যতার আলোকে রামা রামমোহন রায় যে নৃতন ধর্ম ও
সমাজ-ব্যবস্থার আভাস পাইয়াছিলেন, বর্তমান বাঙ্গালা-
সাহিত্যের সেই বিপ্লবেই অঙ্গ।

নূতন ভাব ও চিন্তা বাহির হইতে সাহিত্যে ছই একান্তে আঁসিতে পারে। কখন দেখা যায়, নূতন ভাষার বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া ক্ষুদ্র বেশের সাহিত্যে স্থান লাভ করে। প্রায়শই এরূপ সত্য সার্জনময়; তাহার ঠিক কোনও বেশ ও কালে আবদ্ধ নহে—বিশেষী হইলেও স্বদেশী। আর অনেক সময়ে নূতনের সংস্পর্শে পুরাতন নূতন বেশ ধারণ করে। তখন মাহুকের যোগ হয়, যেন পুরাতনেরই পুনঃ স্থাপন হইতেছে; কিন্তু তাহা সনাতন নহে,—স্বদেশী হইলেও বিশেষী। এইরূপ ক'ররা বাহ্যিক সনাতনপরী, তাহার্য্য ও নিঃশেষের অভ্যন্তরে নূতনেরই উদ্বোধন করিতেছেন; কারণ, অতীত মৃত, কালপ্রবাহে নিমজ্জিত,—বর্তমানের আদর্শ দিয়াই তাহার প্রাণধান সম্ভব। এই ছই একান্তেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে আমরা তাবের উদ্দেশ্য দেখিতে পাই। উত্তর দলেই মূল প্রেরণা বিশেষী, স্বদেশী নহে; এবং ইহার তত্ত্ব লক্ষিত হইবারও আশি কোন কারণ দেখি না। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নূতন ভাবের উদ্ভাবনা অনেক দলেই বিশেষ হইতে আইসে। তাহা বলিয়া তাহাকে বিশেষী ভাবের নকল বলা যায় না এবং ভাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতাও ইহাতে নষ্ট হয় না। প্রাণ দিয়া সত্য প্রকাশ করিতে পারিলে, তাহা স্বদেশী হইয়া যায়; আর বাহ্যের প্রাণের সহিত যোগ নাই, বাক্য আচার-অনুষ্ঠানের লক্ষ্যের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিশেষী। যুরোপে নূতন জ্ঞানের যুগে প্রাচীন গ্রীস ও রোমীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা আসিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে যুরোপের বর্তমান সাহিত্যের অভ্যুদয়। বহু শতাব্দী রহিয়া যুরোপ ঐ সাহিত্যের চর্চা করিয়াছে; কিন্তু তাহার ভাতীয় বিশিষ্টতা নষ্ট হয় নাই; বরং পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণের গভীরতা থাকিলে, বিশেষী সত্যের সম্বন্ধে তাহা নষ্ট হয় না,—গভীরতর হইয়া যায়। বাস্তবিক, যাহাকে আমরা বিপ্লব বলি, তাহা পুরাতনের সংহার নহে, অনেক দলেই তাহার নূতন প্রকাশ।

আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সাহিত্যে শাস্তির প্রয়োগ। পরম্পর বিরোধী সত্য মানসিক বিক্ষিপ্ততা উপস্থিত করিয়া যখন অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে, তখন সাহিত্য তাহাদের সম্বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে ঐক্যের দিকে লইয়া যায়; বিরোধের মধ্যে সাম্য স্থাপন করে; কর্তৃত্ববাদের চকল, স্বদিক প্রকাশের মধ্যে নিত্য-অচকল সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়;—বাস্তবের জটতা ভাবে মণ্ডিত করিয়া এমন রাঁধো আদর্শদিক লইয়া যায়, যেখানে হারিয়ার দ্বন্দ্ব নাই, লালমার অপমান নাই, পরাধীনতার কোথ নাই, পাপের শাস্তি নাই, এবং মৃত্যুর শোক নাই। জীবনের অসামঞ্জস্যে জ্বর পীড়িত ও ব্যথিত হইলে তাহার সমাধান পাই সাহিত্যে। যে সত্য ও সৌন্দর্য্যে জ্বর ভরিয়া উঠে, তাহা স্বর্ণ হইতে উজ্জ্বলিত; স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও স্বর্গের ইহাতে নাই। তাই সাহিত্যে আনন্দরূপ—সত্য ও মঙ্গলের নির্মল প্রকাশ। জ্বরের অভ্যন্তরে যে সৃষ্টির আনন্দ স্বতঃ প্রবাহিত, সাহিত্য তাহারই ধারা বহন করে। বতদিন মানসিক জটতা থাকে, ততদিন সাহিত্যে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না; এই জটতা কাটিয়া গেলে, সাহিত্যে অপূর্ণ বৈচিত্র্যে শোভিত হইয়া উঠে। যে জাতি সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছে, সে সে জাতি ঘের নহে, অবজ্ঞের নহে, সে জাতি পরাধীন হইতে পারে না,—সৃষ্টির লীলাই তাহার অনেক স্বাধীন করিয়া দিয়াছে,—তাহার প্রাণের জ্যোতিঃ পরাধীনতার স্নানভার কখনই নির্মোহিত হইবে না। ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার দৃষ্টান্ত অসংখ্য স্মৃতি বহিয়াছে;—এক ইতিহাস ত মিথ্যা কহে না। কিন্তু সাহিত্যে চাই সত্যের প্রতিষ্ঠা,—যে সত্য দেশ ও কালের অপেক্ষা করে না,—সাধারণের অম্বোদয় ও প্রাণসার ধার ধারে না,—নিঃস্বার্থ পায়ের উপর নিঃস্বার্থে গাঁড়িহা সমস্ত কষ্টকে নিকটে আদ্বান করিয়া লয়।

ছুটা

[শ্রীমদগীতালাবন]

(১৩)

সেই ঘটনার পরদিন পতীর রাত্রিতে ঘোহিনী আসিয়া
হঠাৎ বধন শাস্তির ঘরের শিকলটা নাড়া দিল, তখন তাহার
ঠনঠন শব্দে নিদ্রিত রায়েন চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।
আসের দিন হইতে সন্ধ্যা দিন, সন্ধ্যা রাত্রি যাতনায় শিও
ঘুমানিতে পারে নাই,—শিতা-মাতাও চক্কে-পাতায় কহিবার
অবসর পায় নাই। মাতা কিছুক্ষণ পূর্বে হঠাৎ রায়েনের
কান্না কহিয়া আসিল; সে শব্দভাবে ঘুমানো পড়িল।
খোঁকায়ে ঘুমানিতে যেিয়া স্নানঘরে শান্তি ও হেমন্তবাবুও
বিছানায় শুইয়া পড়িলেন; এবং শুইবামাত্র পতীর নিদ্রায়
মগ হইলেন। এমন সময় শিকল-নাড়ার শব্দে সন্ধ্যারই
ঘুম ভাঙিয়া গেল। শান্তি সচকিতে বাহিরে আসিয়া
দেখিল, ঘোহিনী গাড়াইয়া আছে। ঘোহিনী শাস্তিকে
দেখিয়া কহিল, “নতুন দি’, অনুলা বড় বেন কেমন করছে,
—আমার গুণ হছে।” রায়েন তখন-আগিয়া উঠিয়া পুনরায়
আর্দ্রবরে কীদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শান্তি বিরক্ত
হইয়া কহিল, “বে কোরে তুমি শেকল নেড়েছ,—আমি
মনে করলুম, বুঝি কি বেন ব্যাপার হয়েছে!—বাড়ীতে
আগুনই লেগেছে, কি ডাকাডাকি পড়েছে! হুটু-হুটু করলে
তার আর অনুব কি? খোঁকা যে ক’দিন ক’রাত চক্কে-
পাতায় করে দি,—আজ কি তাগো হবে মাদা চোখটি
বুজেছিল,—আর তুমি এগে তুলে দিলে!”

শান্তি ঘরে আসিয়া খোঁকায়ে কোলে লইয়া সাধনা
বিহার চোঁকা করিতে লাগিল। হেমন্তবাবু চট পায়ে দিয়া
বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, শান্তি বলিয়া
ফেলিল, “সে বুঝায় নি তো একেও বুঝতে দেখা হবে না।
পজ্ঞা করে বাদ সাধা আর কি! আমি কি ও-সব কিছু
বুঝতে পারি না?” শান্তি অনিচ্ছা-সঙ্গেও এতখানি বিশ্ব
উপরোপ করিয়া ফেলিল, বাহার আলা ঘোহিনীর সর্পাকে
বেন তীব্র বাধের সৃষ্টি করিল। শান্তি ঠাক-ঠোরে বাহাই
একাক্ষ কহক, যুথ ছুটিয়া এতখানি কটু কথা সে কোনও

দিন বলে নাই। ঘোহিনী সন্তুষ্ট হইয়া তাহিতে লাগিল,
কেই বা তাহার শব্দ, আর শব্দটাই বা সে কি করিল!
বেচারী বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, একটুখানি শিকল
নাড়ার এতখানি উকী উৎপত্তি হইয়া গাড়াইবে! মোট
কথা, স্নান রমণীর নীরবতার মধ্যে হঠাৎ একটুখানি তীক্ষ্ণ
শব্দই যে অত্যন্ত কর্কশ ও ভয়ানক শোনাও, সে কথা কেহই
তাবিয়া না দেখিয়া, উভয়ে উভয়ের ত্রুটি ধরিয়া মনে মনে
অশান্তি অহুত্ব করিতে লাগিল। ঘোহিনী প্রতিজ্ঞা করিল,
এবার হইতে সে যুথ সাবধানে চলিবে,—পারত-পক্ষে আর
কখনও শাস্তিকে বিরক্ত করিবে না। কিন্তু হায় হায়,
অনুলায় অত সে আজ করে কি? অনুলাকে সে ছোট-বেলা
হইতে বুকে করিয়া মাহুণ করিতেছে,—এমন কঠিন সীড়া
তার কখনও সে দেখে নাই। তাহার গুরুত্ব জ্ঞান নবীন
বরদেই গুরুতর আঘাত-সমন্বীল হইলেও, সংসারের
আবিধায়া প্রকৃতির উৎপীড়নের অতিক্রম্য এখনও
পাকিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। দ্রুতগত গোপীর
যাতনাজনিত চীৎকারে তাহার আগ্রহ ও অনশন-ক্লিষ্ট
মনে এমন আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছিল, বাহাতে সে
এক। আর থাকিতে না পারিয়া গুরু-বিজ্ঞান চিন্তে
শাস্তিকে খবর দিতে গিয়াছিল।

ঘোহিনী কিরিয়া আসিয়া অনুলায় মাথার কাছে
বসিতেই হেমন্তবাবুও আসিয়া অনুলায় ঘেঁহের উত্তাপ
পতীকা করিলেন। অনুলা তখন প্রলাপ বক্তিতে
হুক করিয়াছে। হেমন্তবাবু অনুলায় মাথার জলপটি
দিতে-দিতে কহিলেন, “গুণ নেই; রায়েনেরও ত্রিক্
এদনি হয়েছিল এখন বাড়বার যুথ কি না। হুটো-হুটো
ছেলে এক সবে গুণতে লাগুনো,—এমনও বিপদে পড়লাম!
চাকরটাও আজ শোয়ানি, বাড়ী গেছে। তীখুকে একবার
ডাকি,—সেই বা হেলেমাহুণ কত আর রাগ লাগবে!”

এই সময় শান্তি আসিয়া পড়িল;—ঘরে ঢুকিয়াই

ভীত-কণ্ঠে কহিল, “বলি, হ্যাগো, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? ভাত-বোএর ছায়া মাড়তে নেই,—আর এক বিছানার তোরঙ্গ দু’তনে বসেছ! দাঁসরও তো আড়ল বেশ! হিঁদুর ঘেরে হয়ে এটা জান না?”

হেমন্তবাবু উঠিয়া পাড়াইয়া কহিলেন, “বিপদে-আপদে অত বাহ-বিচার চলে না। এতে কিছু মহাভারত অণুছ হয়ে থাকে না।”

“তা হৈ কি! ছেলের অস্থব বলে পাণ-পুণি বজায় রেখে চলতে হবে তো! ও-সব বাহানা আমার ভাল লাগে না।”

“চল—বল, —কি বকুছ পাগলের মতন! ছেলের অস্থব তোমারও মাথা খাণায় হয়ে গেছে দেখছি! হোগা ছেলেকে একলা ফেলে এখানে কি কর্ত্তে এলে?” বলিয়া হেমন্ত-বাবু শাস্তিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মোহিনী মুখের মোটা সরাইয়া আঁচলে ঢকু মুছিল। সত্যই সে আজ অস্তায় করিয়াছে! ভান্নর আদিয়া বিছানার বসিলে, সে অনুশায় মাথার কাছ হইতে উঠিয়া দায় নাই। তগবানের চক্ষে এ ক্ষুদ্র ব্যাপার মার্জনারী হইলেও, শাস্তির চক্ষে এ একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য, স্তম্ভক্য অমর্যক্ষণীয়। তার পর লেখ কল্যাণিতে শাস্তি কি ইঙ্গিত করিয়াছে? মোহিনী মনে-মনে শিরিগা উঠিয়া কহিল, ‘হে ঠাকুর, আর অশ্রু কত পাণ করছিলুম,—তার কি মাপ আর হবে না কোন দিন? হি,—হি। এত অপমান সবে এইখানে পড়ে থাক্‌বো! না, আর নয়,—অনুশায় ভাল-ভালার সেরে উঠুক, তাকে রেখে—’ অনুশায় মাথার উপরে অনিবার সেই ছবি,—মোহিনীর দৃষ্টি সে দিকে পড়িবামাত্র, মোহিনীর হুই চক মতধারা বহিল। সে মনে মনে কহিল, ‘দ্বিদি, একি বীধনে আমার বেঁচে! আবার তেঁা বীধন কেটে পালাবার পথ রাখনি! তোমার পঙ্কিত ধন কার কাছে রেখে যাব আমি? এ যথের ধন যে! আমার বুক দিয়ে আগলে রেখে নাহুব কর্ত্তে হবে। বত খোয়ার, বত সাহনা—সব পাখর হয়ে সইতে হবে। যদি কখন যাত্রা করে তুলতে পারি, তখনি ছুটা পাব। অনুশায় এই সময় উরুকাঁটে কহিল, “জলে গেল মা, জলে গেল,—জলে মলুন, ঠাণ্ডা কোরে যে মা, তোমার পাবে পড়ি, ঠাণ্ডা করে সে।”

অজাগিনী নারী যেমনা-ব্রিই বালকের লগাটে চুষন

করিয়া কহিল, “সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাপু, ভয় কি? তোমার মুখ দেখে যেমন আমার বুকের ওত জলুণী জুড়িয়ে জল হয়ে থাক্‌বে, তেমনি মা দেহতার দয়ার তোরও সব জানা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

পরদিন সন্ধ্যা অনুশাকে দেখিতে আসিলে, মোহিনী কাঁদিতো-কাঁদিতো সকলই বলিয়া কহিল। সন্ধ্যা কহিল, “বলবার ত কিছু নেই থোন্, যে বল্‌বো। শুণু চোখ মেলে দেখেও, আর কণ পেতে শুন্‌বো। এমন যে হবে, সে ত জানা কথা। শাস্তির কোন বোধ দিই না,—সে ছেলেমানুষ, তার অত বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। বোধ যে কার, তাও জানি না। সবই আমাদের অসুত্রেই যোব। যিনি আজ বেঁচে তোমার কাছে থাক্‌বে এখন,—তবু অনেকটা সাহস পাবে। কাজ ফেলে আসবার জো নেই,—নইলে আমিও থাক্‌তে পারতুম। রাশিকে তো লিখেছি,—সে যে এসে পড়্‌লে হয়! ছেলেটা তো আরও বেঁকে কেবল যিনি-যিনি কর্‌ছে!”

পরদিনই রাশি আসিয়া পৌছিল। গুড়ীমার নিকটে কিছু না শুনিলেও, হিমির নিকটে সবিতারে এ-সব কথা শুনিয়া, তাহার মন এমন তিক্ত হইয়া উঠিল যে, সে তার মাতুলমা, অপার যেষ্মশাণী, চির-মুখিনী শ্রুতীমার প্রতি বিমাতার এ রূঢ় আচরণকে কিছুতেই মার্জনার চক্ষে দেখিতে পারিল না। বাহা হউক, সকলের ঐকান্তিক যত্ন ও দেবতার আশীর্ষ্যে অনুশা ও রাজেন এ-যাত্রা রক্ষা পাইল; তবে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে প্রায় দুই মাস লাগিল। এ দিকে সকল বিষয়ের খুঁটি-নাটি ব্যাপার লইয়া মেরেদের মনের মধ্যে এমন একটা অশান্তির ধূম পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বাহার কাল ছায়া মংসাের সকল স্থব-বাজ্জেশোর উপর একটা আশঙ্কার ছায়াপাত করিয়া বাইতে লাগিল।

(১৪)

পৌষ মাসের প্রথমে কনুনে শীত পড়িয়াছে। গত-রাতিতে এক-পলগা বৃষ্টি হওয়ার শিতের নাজা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। হুপুৰবেলা ফুলের চিকিনের ছুটির সময় ছেলের হল সামনের খোলা মাঠে ছড়াছড়ি বাধাইরাছে,—কল-যোগের পরিবর্তে পোণযোগের পুইই বাড়িয়াছে। ফুলের পাশেই ছোট-ছোট ছেলেদের অল্প গুরুমহাশয়ের খোঁড়া পাঠশালা। গুরুমহাশয় চলার বদমা তামাক খাইতে-খাইতে,

স্বথকর রোহি-শর্শে নিম্নাধর্য বহুদায়, ছেলেশের বইগুলি
একত্র করিয়া উপাধান করিয়া মাথায় দিয়াছেন, এবং
আরামে নিম্নাধর্য উপভোগ করিতেছেন। পড়ুয়ার মল
শোভানে মাঠে গিয়া গুলিভাণ্ডা খেলা শুরু করিয়াছে। কেহ-
কেহ তালশ বালকদিগের সহিত ভাব জমাইয়া, কড়াই-
তটির ক্ষেত হইতে কড়াইগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির
সম্ভাবনার করিতে নিযুক্ত। এমন সময় সে গ্রামের আবাগ-
বুজ-বণিকার পরিচিতা দিগ্-বোইমী সেই পথ দিয়া ঘরে
কিরিতেছিল,—চেলের মল ভাষাকে পাকড়াও করিয়া
গানের ক্রমাস করিল।

বোইমী আগন্তু করিল। সকাল হইতে সারা গায়ে
ভিক্ষা সাধিয়া একক্ষেণে সে বাড়ী কিরিতেছে—বেলা এক
গ্রামের বাড়িয়া গিয়াছে,—এখন সে গান করিয়া সারা
চড়াইবে,—তবে ছুটি কিছু মুখে দিতে পাইবে। আজ
থাকুক, আর একদিন সে তখন ভাল ভাল নৃতন-বাঁধা
গান শুনাইয়া দাইবে।

ছেলের মল নাছোড়বান্দা। একজন দিয়া দিগ্-
একতারাটি কাড়িয়া লইল। বোইমী ঘাপরে পড়িয়া কহিল,
“বাছা, তোমরা ত এখন-তখনই গান শোন,—আমার
খেতে ত কিছু দাও না। পাওনা আবার ক্রমেই বেড়ে
যাচ্ছে,—এবারে তোমরা সবাই মিলে আমার একখানা
নীতের গায়ের কাপড় কিনে দাও। মুছের মত্রে কাপড়
বে মাগুই হয়েছে! আমার ত কেন্‌বার সামর্থ্য নেই,—
তোমরা কিনে দাও।”

অমূল্যর বহন এখন বহর দায়; সে খুলে কিপ্-
পড়ে। রাজেনও হাতে-খড়ি দিয়া পাঠশালার প্রবন্ধভাগ
আরম্ভ করিয়াছে। অমূল্য কহিল, “আজ্ঞা, তুমি আমাদের
একটা গান শোনাও আগে,—ভাল গান, নতুন গান।”
বোইমী আশ্চর্যচিত্রের আশা নাই দেখিয়া, একতারা
বা মারিয়া গান আরম্ভ করিল।

কার্ণাণি আর ইয়েরেতে লড়াই বেঁচেছে,

মরণ-বাঁচন পথে ঘুরে পান্না দিয়েছে।

হা দেখ ঐ মরন বেলে,

মারব, বোরের ঝাঁচল ফেলে,

বাদল! দেশের ছেলেরা সব সেপাই সেজেছে,—

প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে মুখে চলেছে।

এ দিকে এক বিঘন দায়,
কাপড় বিনে কি হার হার!

বস্ত্র বিনে কতই জনা পরাণ ভোজেছে,
কাপড়ওলা মহাজনের কপাল কিরেছে।

দেশের শোকের রক্ত তথৈ

ভূঁড়ির বহর বাড়ছে যে সে,

আঙুল ধামে কাপড় বেচে কোলা ঘেরেছে,—

মা লক্ষ্মীর হুঁড়ো এরা মুটে নিরেছে।

কাল হোলো পৌষ মাস,

কাঁচ হার সর্জনশ,

বিহিত বিধান কে কার করে, কি কাল পড়েছে,—

হার রে হার কি কাল পড়েছে।

মুদন বলে মাঙ্গল চুল ভাই গুতো এগেছে,

কত ঘুরে ঠেসেবে কারে কেই বা তেনেছে।

লড়ায়ের নতুন গান শুনিয়া ছেলেরা আনন্দে হাততালি
দিয়া উঠিল, গানের মধ্যে বস্ত্রাভাবের মত্রে যে হাণ্ডাকার
ছিল, তাহারা অন্ত তলাইয়া বুলিল না। কয়েকজন চাবী
চপুয় রোহে একটু বিশ্রাম করিবার মত্রে একদিকে বসিয়া
তানাকু খাইতেছিল, “তাহারা গান শুনিয়া হার হার করিয়া
বস্ত্রাভাবের মত্রে নিজ নিজ সাংসারিক কষ্টের কথা উল্লেখ
করিতে লাগিল। রাজেন আপনাদা দায়ের গায়ে হাড়াইয়া
গান শুনিতেছিল; সে কহিল “দাদা সেই গুরুদশায়ের
গানটা গাহিতে বল না।” দিগ্ কহিল, “আজ থাক বাবা,
আবার এক দিন শুনে।” ইত্যাদি লোকাইতে-লোকাইতে,
হাণ্ডাইতে-হাণ্ডাইতে তিনটি ছেলে সেইখানে আনন্দে উপস্থিত
হইল। একজন কহিল, “ওরে ভবা, ওরে অমূল্য, আজ ভারী
মজা হচ্ছে। গাথা বে সতি-সতাই গাথা, আজ তার
প্রমাণ পেরেছি।”

গাথার গর্দভবুদ্ধি অবিচ্ছিন্ন কভার কথা শুনিয়া প্রোত-
বর্ণ অধীর আগ্রহে চারিদিক হইতে “কি—কি, কি-রকম
তাই” প্রশ্ন করিয়া উঠিল। বক্তা উদ্ভাষের সহিত কহিল,
“মূল-গাছের চারা রোজন-রোজন খেয়ে বার বলে, কাল
ইমুলের মাকী গাথাটাকে বেঁধে রেখেছিল। রাত্তিরে সাধা-
রাত টুপটা বৃষ্টি পড়েছিল। এই ঠাণ্ডা বাতাস,—জনকনে
শীত। গাথাটা চালায় বাঁধা ছিল,—তার পেছন-দিকটা
চালায় বাইরে ছিল। গর-বাছুর-ছাপলগুলো দেখেছিল, ত,

—গারে একটু বৃষ্টির ছাঁটি লাগলে কেমন সুস্বাদু-মত সরে
দাঁড়ায়, তা' গাখাটা এমন নির্মূল্য, —সে একটুও সরে
দাঁড়ায় নি। তার পেছন দিকটার সমস্ত রাত্তির জল
পড়েছে, —দাঁতে কেঁপেছে, —তবু সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল।
ভান্তেই বলে গাখার বৃষ্টি। এমন না হোলে গাখা! মালী
আমাদের ডেকে বলছিল।”

ছেলেদের হাসা-ধোহাে আনন্দধ্বনিতে সমস্ত মঠ প্রতি-
ধ্বনিত হইয়া উঠিল। উহাদের অন্তরুনক দেখিয়া বোষ্টমি
সহিয়া গতিতেছিল;—অনুশা গিয়া আবার পাকড়াও করিয়া
কহিল, “বেই না, আর একটা গান গেয়ে দাও।”
বোষ্টমী অগত্যা ছেলেদের অতি প্রিয় সেই গানটি গাহিতে
লাগিল।

ওজনশাই তোমার ঘুরে করি দণ্ডবৎ,
দূর থেকে এই সাত হাত বেগে দিছি নাকে ধ্বং।

বিশে থাকছে পিকের তোলা,

গিথের যোগাড় আতপ কলা,

অটপ্রহর তাবাক বলা, পাঠশালায় এই সতবৎ।

না পারলেই তৈয়ার বাড়ী দেখাও হাতের কদরৎ।

ঘরের ছেলে ঘরের খেয়ে”

কাল কি বনের মোষ ভাড়িয়ে,

শিখা দমন, সাক্ষাৎ শমন কাল কি তোমার মহবৎ!

ভালর ভালর বিষের হই গো, দূর থেকে এই দণ্ডবৎ।

বোষ্টমীর দিটা হ্র খোলা মাঠে অনেক ঘুঘু পর্য্যন্ত
ছড়াইয়া গড়িল। রাখাল-বাগেচরা গল্প কেলিয়া, কড়ি খেলা
ছাড়িয়া পাঁচনী হাতে গান গানিতে আদিয়া দাঁড়াইল।
পাঠশালায় ছোট-ছোট ছেলের দল পরম কৌতূহলের সহিত
গানটি উপভোগ করিতে লাগিল। এ গানটি তাদের ভাতী
গ্রন্থ। গ্রাম্য-কবি সরল ভাষায় ভাষ্যবোধই গ্রন্থের কথা
দিয়া বেন গানটি বাঁধিয়াছে। রাজেন ত এ গানটির একজন
সমর্থকার শ্রোতা। সে তখন হইয়া গানের প্রত্যেক শব্দ বেন
হী করিয়া দিলিতেছিল। বোষ্টমী গান শেষ করিয়া রাজেনের
দিকে চাহিয়া কহিল, “খোকাবাব, কি দিচ্ছ, দাও,—বাড়ী
হাই।” রাজেন অনুশার দিকে চাহিতেই, অনুশা কহিল, “হা,
দৌড়ে গিয়ে ভোর মায়ের কাছ থেকে পরসা নিয়ে আর।
আমার নাম বেন করিস্ মি, খবরদার! তা হোলে বেতের হাড়
ভাঁড়ো কোরবো। খাখার-টাখারের নাম কোরে চাস্,

বৃষ্টি।” রাজেন তৎক্ষণাত্ সোড় দিবা বাড়ী পৌছিল। গিয়া
বেশিল, মা আবারে ঘুঘাইতেছে। টেবিলের উপর একটা
টাকা ও ছটা আখুদি পড়িয়া রহিয়াছে। রাজেন বজ্রবে
একটি আখুদি লইয়া আদিয়া বোষ্টমীর হাতে দিল।
অনুশা জানিত, রাজেন বাহাদুর করিলে শান্তি তাহাকে
কিছু না দিয়া পারিবে না। তাই রাজেনকে আখুদি
আনিতে দেখিয়া সে মনে করিল, রাজেনের মা তাহাকে
ঐ আখুদি দিয়াছে। সে তাই কোন প্রশ্ন করিল না।
বোষ্টমী খুবী হইয়া রাজেনকে রাখ-পাশে অভিব্যক্ত
করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে গানের শব্দ ও
ছেলেগুলার গোলামালাে ঘুঘু ভাড়িয়া গিয়া রক্ত-চক্ষু
পণ্ডিতদশাই উত্তিয়া বসিলেন। বোষ্টমীকে দেখিয়া তাঁহার
পিত্ত জ্বলিয়া গেল; কহিলেন, “বেহারা মাপি, আবার এই
দিকে এসেছিস! আবার সেই হতজ্ঞাড়া গান গেয়ে ছেলে-
গুলার মাথা খাচ্ছিস্। তোর নামে এইবার সাহেবের কাছে
ধরখান্ন দিছি, দাড়া। ফের ঐ সব গান গাইবিত্ত মাথা
ভেঙে যোব। গোটা গা, হাল গা,—তা নয়, কে-সব পাসে
ছেলেদের মন বিগড়ে দার, সেই সব গান পাওয়া হচ্ছে।”
বোষ্টমীও ছাড়িবার পাণ্ডী নয়,—সে-ও উত্তরে কর্ণ-স্বত্বকর
অমৃত-বাণী বর্ষণ করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

(১৪)

একটা বোকদম্বার হু' পরসা বেশ পাণ্ডার সজাবনা
ছিল। হু'কর টান দিতে-দিতে কাছারা-প্রতাপত হেমন্তবাবু
গ্রন্থর মনে সেই বোকদম্বার বিষর চিন্তা করিতেছিলেন।
শান্তি আগে-আগে বখন-তখন এটা চাই, শুটা চাই বলিয়া
ফরমান করিত। সম্ভ্রতি কেলে আর একটা খুকী হইয়া
পর্য্যন্ত সে রাজেন ও খুকীর জন্তই বাহা কিছু ফরমান করে।
হেমন্তবাবু ভাবিতেছিলেন, এযাত্রেয় টাখাটায় শান্তির
অজ্ঞাতসারে একটা কিছু দানী শৌখিন জিনিষ কিনিয়া
তাহাকে হঠাৎ খুকী করিয়া দিতে হইবে। ঠিক এই সময়ে
কড়ের মত বেগে শান্তি ঘরের মধ্যে আদিয়া কহিল, “হু
আমায় বিষের দাও, নয় তো একটা কিছু বিনি-স্বত্বা কর।
চোখের ওপোর ছেলে বে ক্রমে চোর হয়ে চুরি করিতে
শিখে, এর পর পাকা ডাকাত হয়ে দাঁড়াব,—সে আদি
“সইতে পারবে না।” হেমন্তবাবু থ হইয়া গেলেন। এমন

সমর রাজেন আদিয়া করিল, “বাবা, তুমি আমার আট আনা পরগা দাও। আমার আট আনা পরগা নিয়ে একটা বোটে নৌকে দিয়েছি বলে বা কত পাল দিয়েছে।” “তবে রে পাগল, হতভাগা ছুটো।” বলিয়া শান্তি দুমবাম করিয়া রাজেনের পিঠে ঠাকতক বগাইয়া দিল। হেমন্তবাবু ছেলেরের মার-মের ঘোটেই পছন্দ করিতেন না,—হঁকা ফেলিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছেলেকে টানিয়া কোলে ধইলেন। রাজেন করুণ হয়ে চাঁৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় পালের বাড়ীর একটা ছোট ছেলে আসিয়া নালিশ করু করু, “বেখুন, আপনাদের অনুশা সেদিন আমার বাট নিয়ে এসেছে, বিচ্ছেদ,—আর সকালে ছুটো শুনি নিচ্ছে, তাও বিতে চায় না।”

শান্তি কহিল, “আজ্ঞাসে গোপাল হুকে দিন-দিন,—কাঁখে চেপে মাচুবে এর পর। একটু বাবু নেই, শাপন নেই,—তা’ ছেলে বিগড়ুবে না? থোকা ত চুই কর্তে জানত না, ও-ই আজ শিনিয়ে দিয়েছে,—তাতাই ও আশুলি চুই কোরে নিয়ে গেছলো। ও-নব আজ্ঞাসে বেলা আমার ভাল লগে না। যে অম্বপাতে মার বাবু,—সক-থোবে আমার ছেলেকে বিগড়ুতে আমি পোবো না। আমার পরের ছেলেরও বিনিস নিয়েছে।” সেই সময়ে,—“থোকা কু খেলতে বাবি তো আর” বলিতে-বলিতে অনুশা আদিয়া ঘরে ঢুকিল। আর মার কোথা! হেমন্তবাবু পাখাখানা তুলিয়া লইয়া অনুশার পিঠে ও বাহুতে যে দিকে পাইলেন, খুব কোরে হুঁচার বা বগাইয়া দিলেন। অতর্কিত আক্রমণে অনুশা একবার আঁর্টনার করিয়াই হুপ হইয়া গেল। নখ তুলিয়া মোহিনী বাস্তভাবে ছুটিয়া আদিলা। হেমন্তবাবু পাখা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, “হুহ হয়ে বা আমার হুহুথ বেকে, সুলারার কোথাকার! আমি তোমার মুখ বেখতেও চাই না। নিজেও গোমায় পেছ, আবার থোকাকুও চুই করুতে পেছাচ্ছ!”

অনুশা পিতার বেধ-ধরে বকিত হইলেও, এভাবে তিরত্বত বা প্রদত্ত কখনও হয় নাই। শান্তিকে পছন্দ না করিলেও, রাজেনকে সে পুই ভালবাসিত। রাজেনও মাতার নিবেগ সখের সর্বদা অনুশার সঙ্গ লইত। আজকাল সে ময়সের সঙ্গে বাল-সুগত নানা প্রকার ছুটাই দতই শিখিতেছিল, শান্তি অনুশাকেই উদ্যম মূল ভাবিয়া পুত্রের তবিত্য সবচে ডিতিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মুখ ছুটিয়া

হেমন্তবাবুর কাছে অনুশার বিরুদ্ধেও কিছু বলিতে পারিত না। আর খুব হইতে উঠিয়া টেবিলের উপর আশুলি না দেখিয়া, থোকা মূল হইতে আশিলে তাহাকে ভিজালা করা, সে বন্ধনে উঠা বীকার করিল। শান্তি ধনক দিয়া কহিল, “অনুশা শিনিয়ে দিয়েছিল, নয়?” রাজেন সবলে বাড় নাড়ল বটে; কিন্তু শান্তি আর হুঁচারবার হাঁকাহাঁকি করায় বলিয়া ফেলিল যে, অনুশাই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল। তখন শান্তির মনের কোণে সজিত ধুমপুত্র অকস্মাৎ বাস্তব পাইয়া একেবারে মপ করিয়া জলিয়া উঠিল।

অনুশা নির্দয়ভাবে প্রদত্ত হইয়াও চোঁচাইতে পারিল না। সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মোহিনী ছুটিয়া আসিয়া, ব্যাপার দেখিয়া, শাশ-সজ্জার মাথা বাইয়া করুণ কর্তে বলিয়া উঠিল, “ওখো, তোমাদের পারে পড়ি,—ওকে ছেড়ে দাও, আর বেয়ো না।”

অনুশাকে মারিতে দেখিয়া তবে থোকা আরও চাঁৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোহিনী কাঁদিত-কাঁদিত অনুশাকে টানিয়া ধরার বাহিরে আনিবাসাত, সে থাকা দিয়া মোহিনীকে এক পাশে টেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। মোহিনী “অ মাণিক, তঁবে, বা, গোপাল আমার, ধন আমার, কোথাও বাসু না বাসু” বলিতে-বলিতে পিছনে ছুটিল। তার পর অনুশাকে সোঁবা চাকরবোঁহন বাবুর বাড়ী চুকিতে দেখিয়া, সে তখন রাস্তাঘরে মনের কান্নে গেল। অনুশার মুখ দেখিয়া সরলা বলিয়া উঠিলেন “কি হয়েছে রে অনুশা? তোমার মুখ এমন কেন?” অনুশা আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। “মোঠাইয়া গো, বাবা আজ আমার বেয়ে কেনেছে গো।” বলিয়া বড়াম করিয়া সরলার পারের কাছে আছাড়িয়া পড়িল। সরলা শব্দবাতে অনুশাকে কোলে টানিয়া লইয়াই চাঁৎকার করিয়া উঠিল, “ওমা, এ কি ব্যাপার! পিঠে যে হুড়া-হুড়া লাগ পড়ে গেছে,—রক্ত হুটে বেরিয়েছে! এ কি গোরাতুই! ও বিকুর মালী, ঈশ্বরী মল আন গো।” অনুশার চোখে-মুখে মল দিয়া মুছাইয়া, তার পর পিঠে ভিমে স্কাঁকড়া বাঁধিয়া, সরলা অনুশাকে তুলিয়া বগাইল। অনুশা অনেককণ কোঁপাইয়া-কোঁপাইয়া কাঁদিবার পর কিছু শান্ত হইল। তখন সরলা ছুটিয়া-ছুটিয়া ভিজালা করিয়া ব্যাপারটি অবগত হইল। অনুশাকে সামলা দিবার মজ কহিল, “কৈসো না বাসু, উনি

ত তোমার কখনো মারেন না ; কি রকম রাগ হয়ে গেছে, তাই সাম্প্রদায়িক মারেন নি।” অমূল্য কহিল, “না কোঠাইবা, বাবা আমার একটুও ভালবাসে না, খোঁচাকেই শুধু ভালবাসে।” সরলা কি বলিবে তাইবা পাইল না। ঘটনাক্রমে পূরুণ পিতৃস্নেহে অবিরাম হইয়া পাড়াইতেছে। অমূল্য কি তাইবা আবার কহিল, “কোঠাইবা, বাবা আমার তাড়িরে দিয়েছে;—আর আমি ওদের বাড়ী বেতেও চাই না। তোমরা আমার থাকতে দেবে না ? আমি বড় ধরে চাকুরী করে টাকা এনে তোমাদের খোঁচো।” সরলা হাসিয়া ফেলিল; কহিল, “তুই কি পাগল হইলি অমূল্য! ওদের সমর বাপ-মা যে অমন বলে। আমি যে হুগাক, খোঁচাকে কত সমর মেতে বাড়ী থেকে তাড়িরে দিই,—তা তারা কি আর বাড়ীতে আসে না ?”

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল; তাহার মন কোঠাইবার একবার সার দিতে পারিল না। এখন তাহারও বৃদ্ধি হইয়াছে। সে এখন বৃদ্ধিতে পারিয়াছে, ছোট-মা তার নিজের মা নয়। হুগা-খোঁচার মতন মারের হাতে দিনে পাঁচবার মার খাইতেও সে প্রস্তুত আছে। হুগা খোঁচা বাড়ীতে শু কত উপদ্রব করে; সে কিন্তু একটু কিছু করিলেই ছোট-মা কত রকমে বুকাইতে থাকেন—এ রকম করিতে নাই; ইত্যাদি। অথচ রাগনের বেলায় সে সব নিষেধ খাটে না। অমূল্য যেন ভয়ে-ভয়ে গরের ঘরে বাস করিতেছে। হুগা-খোঁচাকে শু কই অমন সগছোতে থাকিতে হয় না! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমূল্য কহিল, “কোঠাইবা, আমি দিবার কাছে বাব, বিদি হাঙ্গুলী একবার আমাকে বেথতেও আসে না।” “তাই বাস এখন। ওদিকে ছোটমা তোকে তিন দুই পুকে বেড়াবে। আর বেশি কিছু খাটয়ে দিই।” বলিয়া অমূল্যকে লইয়া সরলা রাসা ঘরে গেল। এদিকে বোহিনী বাঁটনা বাঁটতে বসিয়া কেমন করিয়া সন্ধ্যার হাত চোখে লাগাইয়া বলিল যে, অবশেষে শান্তিতে রাসাঘরে আসিতে হইল। বোহিনী নিজের ঘরে আসিয়া মেঝের উপর হইয়া পড়িয়া চক্ষু রপড়াইতে লাগিল।

কাক্সনের মিঠা হাতায়, পরজীৱ অশ্বখ, ঝট, নিম ও আদের ছোট-বড় গাছগুলার সারো হোমাক বসিয়া যেন রাস্তারান্তি বন্ধরিত, পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে; গৃধ্রের আধিনার ও মাতীর টবের বেল-ফুল গাছগুলিতে ফুটি

ধরিয়াছে। কোকিলগুলি অববরত হু-হু করিয়া ডাকডাকি আরম্ভ করিয়াছে। ছেলের বগল উঠানের অঙ্গুরণ করিয়া আনোণ অল্পভব করিতেছে।

অমূল্য পুহুর-পাড়ে বসিয়া মাঠের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়াছিল। সমুখের মাঠে আখ কাটা হইতেছে। রাকোর ছেলেরা আখের মোতে দেখানে গিয়া লম্বা হইয়াছে। কেহ-কেহ চাহিয়া-চাহিয়া এক-আধখানা আখার করিতেছে, কেহ বা তুলিয়া লইয়াই গম্পট দিতেছে।

পুহুরে এক পাল হাঁদ প্যাক-প্যাক লম্বা হাঙ্গুরের কাণে বেন বোঁতা দিতেছে। পাড়ে পাড়াইয়া একটা ছোলে ক্রমাগত ঢিল দাখিয়া নিজেদের হাঁদগুলিকে লম্বা হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহারা তীব্র কর্তে তাহারই প্রতিবাদ করিতেছে,—এখন আনাদের হাঁদেই ইচ্ছা নাই, মিছামিছি বিরক্ত করিও না।

চট্টা রাগেনে আসিয়া অমূল্যর পলা পাড়াইয়া কহিল, “শাবা, তোমার বেগুনের পাছে ফুঁড়ি ধরেছে, দেখবে চল।” অমূল্য সাধ করিয়া একটা বেলফুলের চায়া গুঁড়িয়াছিল। প্রত্যাহ লল সেনে করিয়া সেটিকে বড় করিয়াছে। তীব্রক বধন-তখন হুহুম করে, “গাছটার গোড়ায় গাটী ভাল মাটি এনে যে।—সেখিন শ্রীপ্তীর ফুল ছুটেবে।” অমূল্যর সাখের গাছটির কথা সকলেই অবগত। মার চিঠিতে এ শুভ সংবাদ রাণী-দিবির কাছেও পৌঁছিয়াছে। এখন কি অমূল্য প্রতিশ্রুত হইয়াছে, উঠাতে ফুল ফুটিবে বিধিকে ধামের মধ্যে সে একটা উঠার বস্ত্র পাঠাইয়া দিবে, হুস্তরা রাগনের এত বড় শুভ-সংবাদে তাহার খুবই খুশী হইবার কথা। কিন্তু অমূল্যর আশ্রম মন ভাল নাই। সে উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল, “খোঁচা, তুই বাড়ী যা,—আমি এখন কোঠাইবাদের বাড়ী গাছি। তুই আমার সঙ্গে গেলে তোমার মা তোকে মারবে, আমিও রকুনী বাব।” রাগেন এত বড় হুস্তরটা উৎসাহের সহিতই দিতে আসিয়াছিল, এবং আশা করিয়াছিল, মাদা এখনি তাহার সহিত গিয়া ফুলের ফুঁড়ী দেখিবে। কিন্তু তাহা হইল না। অমূল্যর সঙ্গ তাহার খুব প্রিয় হইলেও, সে তাহার সঙ্গে হাঁদে লাহস করিল না। যা যে তাহাকে মারিবে, সে ভয়কে সে গ্রহণ করে না। কিন্তু অমূল্য পাছে বকুনী খায়, এ তার তাহার বগল ছিল, এবং অমূল্যকে সে অত্যন্ত

তালবাসিত। স্তম্ভরাজ ভাণ্ডার বকুণী খণ্ডেরা সে পছন্দ করিত না। অথচ ক্রমবশত ভাণ্ডারকে বাড়ী দিহিতে হইল।

রাণী আদ্য পনের দিন হইতে প্রবল অরে শয্যাগত। ক্রীড়ণ অমূল্যকে চিঠি লিখিয়াছে যে, রাণী কেবলই ভাণ্ডারকে দেখিতে চাহিতেছে। রাণীকেও সে একবার দেখিতে চায়। কিন্তু বাবা যদিই না আসিতে পারেন, অমূল্যকে পাঠাইতে যেন আপত্তি না করেন; কেন না, ভাণ্ডার বলিতেছেন, আজ দুইদিনমাত্র; ত্রাণীর মনে যেন এমনকি কোন উৎসাহ উৎকর্ষা না হয়; তা'হলেই আশঙ্কা বেশী।

অমূল্য তো এখনই হাইতে হাড়ী। কিন্তু বাবাকে সে বলিতে পারে নাই, তাই কোঠার শরণাপন্ন হইরাছে। সে এখন বড়ট হইরাছে, দেহশরায়ণা দিমিকে সে এখন চিনিতে পারিয়াছে। অমূল্যকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট হইলেও, যোহিনীরও খুব ইচ্ছা যে, অমূল্য দিদির অঙ্গুষ্ঠে দিদির কাছে যায়। রাণী ভাণ্ডারকে কাছে পাইলে কত সুখী হইবে।

দিদির অঙ্গুষ্ঠ বাগতে ভাল হয়, অমূল্য সে মস্ত প্রত্যাহ বিদ্যনা হইতে উঠিয়াই খোড় হাতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে। এ দু'দিন খোলা-খুলা কিছুই ভাণ্ডার ভাল লাগিতেছে না।

চাকরমোহনবাবু রল খাইতে বলিয়াছেন। সরলা তরকারী কুটিতেছিল। অমূল্য আসিয়া কহিল, “বাবাকে বলছে কোঠামশাই?”

চাকরমোহনবাবু কহিলেন, “সে তো বাবা, এই রসগোল্লা খাবার মত সহজ কাজ নয়। একে তো তোর বাপ আজ-কাল আবার ওপর বড় সন্দেহ নয়; মনে করে, তাঁর ছেলেকেই সব কথাতেই আমি বুঝি পারে পড়ে ওফাসতী করিতে বাই। তার বেলায় বুঝে বলব এখন।”

অমূল্যর মুখ শুকাইয়া গেল। সে আজ বাইতে পাইলে কাল চায় না,—তার দিদি এতক্ষণ যে তাইটির পথ চাহিয়া আছে! সরলা অমূল্যর গুড় মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কহিলেন, “ভয় কি অমূল্য, ভাবিস্ না,—দিদি তোর সেয়ে উঠবে। অল্পবয়সে কত গোকার হয়।”

অমূল্য কহিল, “কোঠামশাই, তুমি আজ একবার বলুন চলে। আসাইবাবুর চিঠিখানা দেখাবে চল না।

তা'হলেই তো হবে। আর আমার কিছু বেগানা আর আঙুর কিনে দিতে বল,—আমি নিয়ে যাব দিদির সঙ্গে।”

চাকরমোহনবাবু কহিলেন, “আচ্ছা, তুমি বাড়ী যা,—আমি থাকি। তা'হলে সকালের পাড়োতেই তোকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করিতে হবে।” অমূল্য আশ্চর্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সরলা কহিল, “আহা, মায়ের পেটের ভাই,—দিদির অঙ্গুষ্ঠ মনে ছেলে যেন মনে পড়ে গেছে। কিন্তু সহস্র কোরে বাগের কাছে বলতে এতদূর না। তা বেশ, আমরা তো সবচেয়েই মন হাঙ্কি,—তুমি একবার ঠাকুরপোর কাছে বিয়ের কথাটা পড়ে দেখ; এমন সহজ হাত-ছাড়া করা ঠিক না।”

চাকরমোহনবাবু কহিলেন, “তোমরা যেহেতুপুত্র, বিয়ের নাম শুনেই নেচে উঠো। তা' গা থেকে আঁতুড়ের গন্ধ না বেরুলেও, সে ছেলেমেয়েও বিয়ে দিতে হাড়ী আছে। এই হুঁপের ছেলে অমূল্য, তার আবার বিয়ে!”

সরলা মাথা নাড়িয়া কহিল, “এ তো আর বর-সংসার করবার বিয়ে নয়। অত বড় ভ্রমীবারের ছুটি মেয়ের সঙ্গে ছুটি ছোট ছেলে খুঁজছে,—যবে রাখবে, মাহুব করবে, লেখা-পড়া শেখাবে। তাগাই এর পর ভাগ্যক-মূল্যের মাদিক হবে। সে মন্দই বা কি? অমূল্যর একটা অদম বিয়েও তো হবে! ভবিষ্যতের ভাবনা কিছু থাকবে না, পুত্রের পায়ের রানধিও কর্ত্তে পাববে।”

চাকরমোহনবাবু কহিলেন, “ধন্য স্ত্রী-জাতি,—টাকটাই খুব চিনেছে,—টাকার সঙ্গে ছেলেকে পর করে দিতে চায়। অমূল্যর বাগের কিসের অত্যা? সে কেন ঘরমশাই হ'তে যাবে?”

সরলা ফোঁস করিয়া উঠিল, “তাতে মোটেই বা কি? অমূল্যর বাবার এ পক্ষেরও ছুটি সন্তান যোগে, অতঃপাটত হবে। এখন এই বিবর সাত তাগ হলে, আর কি থাকবে? তা হাজা, এই অমূল্যকে নিয়ে এখন থেকেই খুঁটুই থেবেই আছে,—এর পর তন্দুরে গড়াবে, তা কে বলতে পারে? তার চাইতে অত বড়লোকেরা যখন এমন এতটা ছেলে ঘরমশাই করবার সঙ্গে খুঁজছে, সেই বা কি মন্দ? আমরাও টাকটাই চিনি,—টাকার সঙ্গে ছেলেকে পর কর্ত্তে চাই! তোমরা খুব সাধু। স্ত্রীর সঙ্গে সন্তানের

মারা কাটতেও তোমাদের দেখী লাগে না,—অবস্তা দ্বিতীয় কি তৃতীয় পক্ষের ত্রুটির জন্তে।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ,—বড় ঠিক কথা বলেছ। সে যে হারানিনিগে, তার কদর তো বাড়বেই;—পাছে আবার কাকি বিয়ে পাগার। সেই যে গানটি আছে ‘সন্ধ্যা মনে হাওয়াই হাওয়াই, কি আছে কপালে ভাবি তাই’।” চাক্ষুসেনবাবু গানটিতে সুর বেগ করিলেন। সরলা ছুই হাতে কাণ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “চুপ কর গো, এখুনি পাকার ছেলেনেয়ের দল, কোন ভিখারী গান গাইতে এসেছে মনে কোরে, সোড়ে এসেবে। আর তা ছাড়া, পাঁচু ধোবার বাড়ীও বেশী দূরে নয়।”

চাক্ষুসেনবাবু কৃত্রিম কোণের সহিত কহিলেন, “তুমি আমার অপমান করুছ? না, আর চলে না—তোমার কাছে ক্রমেই আমার খেলা হয়ে যেতে হচ্ছে। গাঁড়ও দুদিন, ছেলোটোর বিয়ে দিতে হবে। তার পর নান্দীদের কাছে আমার আদর বাড়ি কি না দেখো। তখন আর তুমি আমল পাছ না—শাদিরে রাখছি তা।” জনক-জননীর নিকট পুত্রের বিবাহ, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী পরিপূর্ণ সংসারের কল্পনা বড়ই মনোহর। সরলা ধর্মসিঁরা কহিল, “তাই হোক, ভগবানের দয়ার সেই দিনই হোক, আমাদের আদর নাতিদের কাছে বাড়ি কি না, তাও দেখে নিও।”

(১৭)

একমাস কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া রাণী কাল পথা গাইয়াছে। অমূল্য আল কয়েক দিন হইতে বিধির কাছে আসিয়া রহিয়াছে। রাণী বড় আশা করিয়াছিল, তাহার কঠিন বাধির কথা শুনিয়া পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, নিজেও আসিবেন। অমূল্য আদিলে পর রাণী কীপকণ্ঠে বিভ্রাণা করিয়াছিল, “বাবা এসেছেন, অমূল্য।”

“না বিধি, তাঁর কাছের ভিড় পড়েছে, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ছোটমার আসবার ভারী ইচ্ছে,—তা তোমার খণ্ড-বাড়ীতে তাকে তো আসতে নেই।”

অমূল্য বিধির শিরে বসিয়া বিধির গুণ দলিতে হাত দিল। রাণী শীর্ণ হাত তুলিয়া তাইয়ের হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। বাবাকে তাহার এ সময়ে যেখানে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। যে সেবায় পিতার সমে

শেষ, বাবা, কৈশোর জীবন পাকে-পাকে ঘড়াইয়া ছিল, তাহার ঘেঁষ, বহু, অবশ, সোহাগে যিনের পর যিন, বৎসরের পর বৎসর তাহার ঘেঁষ-মন পড়িয়া উঠিহাছে, আল হঠাৎ সেই পিতাও তাহার মধ্যে এতখানি বাধ্যমান আসিল কেন? ভোগ-শয্যার পড়িয়া রাণীর বায়বার মনে হইতেছিল, বুঝি সবই তাহার জট,—ছুরত্ব অভিমানের বশে বাসিকা সেহর পিতাকে বাধা দিয়া বুঝি তাঁরাকে কঠিন হইতে বাধা করিয়াছে। কিন্তু সন্তানের শত সোখ-জটও ত পিতামাতার চক্ষে মার্জ্জনীয়। জনক-পিতার প্রতিভূ ঋণ, তাঁরদের করুণা-মমতার কি অন্ত আছে? রাণীর মনে হইত, বাই হোক, পিতার পারে ধরিয়া সে নিম্নের অজ্ঞাত সোখ-জটের মন্ত কমা চাহিবে। কিন্তু পিতা ত আসিলেন না। যদি সে নাই থাকে,—তাঁহা হইলে ত বড় আক্ষেপই থাকিবা বাইবে। রাণীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। মায়ের ভোগ-শয্যার কথাগুলি তার মনে পড়িত। তিনি যখন বলিয়াছিলেন, “আমার দিন ছুরিয়েছে যা, তোমার ফেলে চলে,” রাণী তখন কাঁদিয়া কহিয়াছিল, “আমাদের কার কাছে রেখে চলে যা?” তিনি কতবার বাধায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, “কিসের দুঃখ যা, তোমাদের বাবার মতন বাবা কখনের হয়? তিনি তোমাদের কত ভালবাসেন, তোমাদের কোন দুঃখ-কষ্ট হবে না। তুমিও বড়টি হয়েছ, তাঁর সেবা-ধর কোরে।”

যদি আল সত্যি রাণীকে পরপারে বাঁধা করিতে হয়, তাহা হইলে, মাতার সম্মুখীন হইয়া সে নিম্নের কর্তব্য-জটের কি হিমা-নিকাশ দিবে? পিতার সব উপেক্ষা-অন্যায়ের কথা তুলিয়া দিয়া, শুধু নিম্নের জটগুলিকে মনের মধ্যে বড় করিয়া দেখিয়া, অভিমানিনী কত্না ব্যাধির শীতলে আল সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া বড় আশার পিতার আসিবার পথ চাহিয়া ছিল। পিতা আসিলেন না। কারের কল্যাণে মরণ্যাপর কল্যাণকে দেখিতে আসিতে পারিলেন না,—এ সংবাদে রাণীর বুক বেন ভাঙিয়া বাইবার উপক্রম হইল। তাহার মস্তকের অন্তরতম প্রবেশ হইতে একটা আকুল নিশ্বাস বেন হার, হার করিয়া উঠিল। যে প্রহ্ন আল শীর্ণকাল ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে সম্বন্ধ-সোলায় দ্রুতিতেছিল, আল তাহার শেখ সীমাংসা হইয়া গেল। রাণী মানদ-নয়নে দেখিতে পাইল, তাহার

পিতা ও তাহারে বাঁধাধানে বেন একখানি উঁচু বেওয়ার্স গাধা হইয়া গিয়াছে। যেটাকে তুমি একটা আঁড়াল বা ছায়া বলিয়াই বনে হইত, আজ সে বৃষ্টিতে পারিল, উহা সত্যই লক্ষ, কঠিন, পাব্যপের তৃণ। ধাক্কা, একটা মিথ্যা সাধনা, মিথ্যা হলনাপূর্ণ আশা ও আশ্বাসের অপেক্ষা সত্যের এ নিষ্করণ, স্কোত্রতম আশাও প্রায়ঃ। এ কথা রাণী সেদিন বাধা পাইবার মুহূর্তে না বৃষ্টিতে পারিলেও, বীরে-বীরে এখন বৃষ্টিতে পারিতেছে। তাই সে নিজের মনকে প্রবেশ দিবার চেষ্টা করিতেছে,—কেন মিথ্যা ও-সফল কথা তাহিয়া কষ্ট পাওয়া? অমূল্য বাঁচিয়া থাকুক, তাহাই যথেষ্ট!

অমূল্যকে কাছে পাইয়া রাণী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। অমূল্য দিদির কাছে সেখানকার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতে ভালো নাই। হুতরাং রাজেনকে চুরি শোনার অভিযোগে পিতার ত্যাগনার কথাও রাণীর তনিত্তে থাকি ছিল না। তারপর, সরলা, অমূল্যার সহিত যে ধনী ভ্রাতার মহাশয়ের কস্তার সবন্ধ আসিয়াছে, সে কথাটি পরের দ্বারা রাণীকে জানাইয়া, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, অমূল্যার এ বিবাহ সেগরায়ী বৃষ্টিপঙ্ক এই কথা মিথিয়াছে। অমূল্যও ইহা তনিয়াছে। বিবাহের তাৎপর্য এখনও সে না বুঝিলেও, নতুনঘের যাব পাইবার লোভ তাহারও বেশ প্রবল। ঘরের ভাইটি গরের হইয়া বাইবে—রাণী এটা কিছুতেই গছন করিতেছিল না। কিন্তু সরলার চিঠি-খানির কথা ভাবিয়া সে ইহাও বুঝিতে পারিতেছিল, মকই বা কি? অমূল্য এতে ভালই থাকবে। কোতুহল-বশতঃ রাণী অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁয়ে অমূল্য, তোর যে বিয়ে হবে,—তা তোকো তারা বউমাহুয়ের মতন সেইখানেই রেখে দেবে,—সে ভুই থাকতে পারবে?”

অমূল্য সমপ্রতিভ ভাবে কহিল,—“তারা খুব বড় লোক দিদি! তাদের দুটো বড়-বড় হাতী আছে,—একটা বাক্সা হাতী আছে,—হাতীতে চড়তে তারা মজা!”

অমূল্যার কথার তাৎপে রাণী হাসিয়া ফেলিল; কহিল, “তাই। হাতী চড়বার লোভে গরের বাড়ী গিয়ে থাকতে তোর ভাল লাগবে, নয়?”

অমূল্য সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, “দিদি, আমার দিকে একদৃষ্টে তুমি চাও দেখি।” রাণী চাহিয়া দেখিল, কিছুক্ষণ পরে কহিল, ‘হাঁ কোরে আমার চোখের দিকে

কি দেখছিস রে?” অমূল্য হাতগুলি দিয়া কহিল, “ভাঙ্গী মজা দিদি,—তুমিও দেখতে পাবে,—আমার চোখের ভেতর চেয়ে দেখ না। নিজেও তুমি কতটুকু দেখতে পারছ? বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা সব বেন কতটুকু। আমাকে চোখের ভেতরটা দেখতে তারা মজা লাগে। আমার-উপভোগের গভীর রাজ্য, মায়াপুরী, কি ঐ রকম বেন একটা কিছু বলে মনে হয়।”

রাণী হাসিয়া কহিল, “তোর শরীরবাড়ীটাও বৃষ্টি ঐ রকম একটা আশাধীনের মায়াপুরীর মতনই মনে করছিস, না রে?”

অমূল্য হাসিতে লাগিল। মোট কথা, অরোদশ বৎসরের বালক এখন ভবিষ্যতের ভাবনা জানে না, বর্তমানের আনন্দই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। খুব বড়লোকের বাড়ী বিবাহ হইবে,—কত বাবল, কত আতসবাজী হইবে; কলিকাতা হইতে বারফোপ আসিবে,—খাওয়ান-মাওয়ান, ২১৫৫, ২১৫৫ ব্যাপার! খুশের ছেলেরা অখাচ্ছ হইয়া বাহবা দিবে। হাতীতে চড়িয়া সে বিবাহ করিতে বাইবে, এ সব শুনিয়া ও ভাবিয়া অমূল্য বিবাহের নামে বেশ আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করিতেছিল। রাণী আবার কহিল, “সত্যি অমূল্য, তারা যে তোকে ঘরদ্বারাই রাখবে, ভুই তো বাড়ীতে আসতে পারি না।”

অমূল্য স্বচ্ছন্দে কহিল, “মাই বা পেলুম। নতুন-মাকে যে ভয় কোরে থাকতে হয়।” রাণী স্নাতার ধনদীনতার ব্যক্তি হইল। জননীর পূণ্য-স্নেহ-মণ্ডিত, পবিত্র স্মৃতি পূর্ণ আবাস-ভবনখানি যে সন্মানের নিকট কত আদরের ধন, জীর্বেই তার পূণ্য-ভূমি, অবেশ বালক তাহা কি বুঝিবে? রাণী কহিল, “আর ছোট-মা যে তোার সঙ্গে কেঁদে-কেঁদে মরবে,—তোার কি একটুও মায়-দয়া নেই রে?”

অমূল্য অপ্রতিভ হইল; মুখ স্নান করিয়া কহিল, “তা কহবে দিদি,—খোকার সঙ্গেও বস্ত্র বন কেনম কহবে। ছোট-মাকে আমি নিয়ে যাব। কিন্তু নতুন-মা খোকাকে তো আমার কাছে বেতে দেবে না।”

রাণী হাসিয়া কহিল, “পাগল আর কি! ছোট-মার কি অভাগি যে তোার শরীরবাড়ী থাকতে যাবে। বাবার যে ভাতে মুখ টেঁট হবে, তা বুঝিস না?”

“দিদি, আমারই বাবু এলো,—বাইসিকলের শব্দ হচ্ছে।

আমি বাইসিকেল চড়তে শিখি” বলিয়া কিপ্রসঙ্গে অনুশা চলিয়া গেল। পিসিমা সেই সম্বর খুঁজাৎ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া করিলেন, “তাইকে নিয়ে তো খুব সোহাগ করা হচ্ছে—কারিণ শরীরে তাতে কিছু হয় না। যেহেতু যে আচ্ছ কদিন মা-ছাড়া হয়ে আছে,—তাকে তো একবার কোলে-কাছে নিতে হয়! কি সব পাখাশী মেয়ে গো!” খুঁজাৎকে নামাইয়া দিয়া পিসিমা মন্থর গমনে চলিয়া গেলেন,—খুঁজাৎ ঘর বৃকে বঁাপাইয়া পড়িল।

(১৮)

অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক ভাবনা, অনেক ভবিষ্যৎ-চিন্তা ও কল্পনা-জল্পনার পর সত্য-সত্যই মাহুড়ার জমীদার হরিভারণ বাবুর অষ্টম বয়ীরা কস্তার সহিত মহা ধুম-ধামে অনুশার বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের পুত্রবতীরা অনুশার রাজার জামাই হইবার সৌভাগ্যকে বারবার প্রশংসা করিয়া, একথাও প্রচারবার মনের মধ্যে আলোচনা না করিয়া পাতিল না যে, যেসে এত সোণার চাঁদ ছেলে থাকিতে মা-মরা অনুশাকেই বা জমীদার মশায়ের চোখে লাগিল কেন?

হেমন্তবাবু বঙ্গোপকণ্ঠের সহিত হুটুবিভা করিবার গোতে বালক পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেও, অনুশাকে বর-জামাই থাকিতে বিবাহ প্রস্তাবে প্রথমেই স্বাক্ষর নাহি; যে হেতু তিনি মনে করিয়াছিলেন, এর পর পাঁচবৎসে আবার এই কথাই বলগণি করিবে, যে, মা নাহি বলিয়া ছেলেটাকে পর্যন্ত বিহার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন।

কিন্তু চাকরমোহনবাবু বুলাইয়া বলিলেন, এরূপ উচ্চ-বয়সের সম্বন্ধ কখনও হাতছাড়া করা উচিত নয়।—জমীদার বাবু বিজ্ঞ লোক; তিনি ছোট ছেলে হয়ে আনিয়া, এখন হইতে লেখাপড়া শিখাইয়া,—উপযুক্ত করিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে যে গ্রামের মালিক হইতে হইবে, উহাতে বাস করিলেই আপনা হইতে গ্রাম্যদের প্রতি একটা আন্তরিক মনোভা বসিয়া যাইবে। গ্রাম্যরাও ভবিষ্যৎ প্রকৃষ্টকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়া-গুলিয়া উহার প্রতি অমূল্য হইবার সুযোগ পাইবে। সুতরাং এ বৃত্তি-সম্বন্ধ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করা কখনই স্রেয়ঃ নয়।

হেমন্তবাবু করিলেন, “এখন তো এই কথা বলহু। কিন্তু তোমাদের পরামর্শ মত কাল করত যে তির্যাকের ভাগী হব না, এ তরসাতাকে ত মনে ঠাই দিতে পারছি না।” কথাটির ভিতর প্রবন্ধ স্নেহটুকু চাকরমোহনবাবু বৃত্তিতে পারিলেন; যেহেতু প্রথমা জীবন স্মৃতির পর বিতীর্থ দায়-পরিগ্রহে হেমন্তবাবু বিতৃষ্ণা দেখাইলে, যে-যে বন্ধ হেমন্ত-বাবুর পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অহুতোষ করিয়া-ছিলেন, চাকরমোহন বাবুও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; অথচ বিবাহের কালে অপ্রস্তুতবী যাপারগুলিকে যে তিনি নিতান্ত ক্রপার চক্ষে দেখেন, এ কথাও হেমন্তবাবুর অবদিত নহে।

চাকরমোহনবাবু আদ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া কেলিলেন, “গাড়ী ঠিক কোরে ধরতে পারলে, চুবিকের পাঞ্জাই সবান থাকে; তা নইলে ওজনের তুল-ক্রটি লোকে ধরবে বই কি! তবে আমি—” হেমন্তবাবু বাধা দিয়া করিলেন, “বাহুয়ে দংসারের ঢাল-ঢাল ওজনের তুল-গাড়ী খুব নিচু ল করেই ধরতে পারে; কিন্তু চুবিকের তুল-গাড়ী নিয়ে সে ওজন চলে না তাই! এক দিকে বৌক বেশী যাচ্ছে জানতে পেরেও, লাম্বে উঠতে পারা যায় না। এ তো শোনা কথা নিয়ে তর্ক নয়,—নিজের জীবন দিয়ে যে বুঝতে পারছি। ঘটনার ঘাইরে গাড়ীয়ে সেটার গতিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত নিরূপিত করতে পারি,—কিন্তু তার মধ্যে গাড়ীয়ে, তখন তার গতিকেই আমাদের চলতে বাধা গোতে হয়,—এটা খুব খাঁটা সত্য।” চাকরমোহনবাবু ইহার উত্তর না দেওয়াই বৃত্তি-সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া নিরুত্তর রহিলেন। বাহা হউক, অবশেষে অনুশার বিবাহ দেওয়াই হির হইল! সরলা যখন শান্তিকে বিজ্ঞাসা করিল, “তোমারই তো ছেলে বোন,—তোমার কি মত?” শান্তি বলিল, “আমার মত নিয়ে কি হবে দিদি? আমি মোদের ভাগী, মোর করতেই আছি। সাত-পাঁচে আমার থাকবার দরকার কি?”

শান্তির স্বভাব সরলার আরাতেই ছিল। সরলা বলিল, “সে কি কথা বোন! যে-সে কাল নয়, যিরের ব্যাপার। তোমার বোটা, তোমার বউ,—তুমি যিরের গিন্নী,—ব্যাটা-বউ বরণ কোরে যিরে তুলবে, কল্যাণ করবে; নইলে যে কিছু হবে না।” শান্তি খুশী হইয়া বলিল, “তা তুলনো বই কি! তোমাদের আশীর্বাদে যদি যিরে ধরই, তা হলে বরণ কোরে তুলনো।”

মোট কথা, অমূল্যর যখন এ বিবাহে ভাল হইবারই সম্ভাবনা, অথচ শান্তিযেরও কিছু লোকসান নাই, বরং লাভের আশাটাই বেশী—তখন তাহারই বা আশক্তি হইবে কেন?

এইবার সব শেষে বোধিনীর পালা। তাহাকে ধর্মিক এ পর্যন্ত কোন গভীরত্ব করিবার ক্ষমতা হয় ভাবে নাই, সে কিন্তু নিজের মনে অনেক বোকাগড় করিয়া দিয়া করিয়াছিল, অমূল্যর যখন ভাল হবে, তাহাকে বর-আজি করবার লোক হবে, তখন আর কি। সে যুগে রান্নার হালে থাক্বে, তার চাইতে আর কি চাই?

সরলা বোধিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি বলছ ছোট-বৌ? ভোমার এ কাজে কি মত?"

বোধিনীর হাসি আসিল। তাহার মতামতের অপেক্ষার কে বসিয়া আছে? সে বলিল, "আবার আর আশা করা মত কি আছে বিধি? তোমাদের পাঁচজননের মতই আমার মত। তবে অমূল্য এখন থেকে আমার ছেড়ে কি থাকতে পারবে? সে যে রাতিয়ে এখনও আমার গলাটি ধোরে শুয়ে থাকে!" সরলা বলিল, "হুঁচোরদিন কই লেগেও, তার পর অভ্যাস হবে যাবে। তবে তোমারই বড় কষ্ট হবে। তা কি করবে বল। অমূল্যর যাতে ভাল হয় সেই ভাল, কি বল যেন।"

"একল বার,—সে কথা কি আর বলতে বিধি?" কিন্তু তবু বোধিনী বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, অমূল্য তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে।

বিবাহের সময় রাণী খুত্তরবাড়ী হইতে আসিয়াছিল। শান্তি হাসি-মুখে গৃহিণীর কর্তব্য স্বভাবোক্তি সম্পন্ন করিতে ক্রটি করে নাই। ঘরেরদের সহিত সম্ভাবনার করিয়া, তাহার মনে কোন কিছু ক্রটিতে বাধা পাইবার ভাঁক রাখে নাই। অথবা রাণীই বৃষ্টি এই দিনে সমস্ত মান-অভিমান লসারলি দিয়া কোন কিছুতে জুড় হইবার অবকাশ বিলম্বিত বিধা বসিয়াছে।

যদি কুটুম্বের বাড়ী হইতে ভায়ে-ভায়ে যে সকল জিনিস-পত্র আসিল, অমূল্য বিবাহ করিয়া আসিলে পরে মূলসজ্জার সহিত নবস্ত্রাঙ্গী কাপড়-চোপড় যে সকল আসিল,—তাহার মধ্যে বরের মাতার যথোপযুক্ত সম্মান রাখিয়া শান্তিকে যে রেশমের সূলাকান সাদী দেওয়া হইয়াছিল, শান্তি তাহাতে খুব খুশী হইল। অমূল্যের খুত্তরবাড়ী উত্তরায়ই

লোক কটে,—লোকের মান-সম্মান রাখিতে জানে,—এ কথা সে বারবার স্বীকার করিল। নিতবর রাগজনের ক্ষমতা যে যখনসের, ছোট্ট দিগাছিল, ইহাতেও তাহারে ঘৃণিত প্রশংসা করিল। কিন্তু বড়লোক কুটুম্বের মান রাখিয়া পান্না দিয়া তত্ত্ব-তাবাস করিতে গিয়া হেমন্তবাবু যেন বাড়ীবাড়ি রক্ষণ খরচের করিয়া না বলেন, এ কথা হেমন্তবাবুকে বারবার বলিয়া শান্তি দাবধান করিয়া দিল।

বিবাহ-উৎসব শেষে যখন নিমন্ত্রিত কুটুম্বের দল একে-একে চলিয়া গেল, বর-কস্তাও মোড়ে বিদায় হইল, তখন বাড়ী যেন ধাঁধা করিতে লাগিল। সকলের নিকটই সে শ্রুততার উপলব্ধি হইল। কহদিন বাহন্যার ও কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ ছিল, এখন সব থামিয়া গিয়াছে;—হুতরা এ শ্রুততা তো খাটাবিক। কিন্তু বোধিনীর যেন মনে হইতে লাগিল, তাহার যুবর পণ্ডিত শ্রুত হইয়া গিয়াছে। বিজয়া দশমীর পর প্রাতিমা-হীন মণ্ডপের মতম তাহার অন্তর শ্রীহীন, নিভাওই কাঁকা-কাঁকা ঠেকিতেছে। অমূল্যর বিবাহ বলিয়া কহদিন সে অল্পত পরিভ্রমে হাসি-মুখে দিব্যায়নি সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছিল; কিন্তু এইবার তাহার দেহ-মন যেন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল! এ কি শুধু সেই শুক পরিভ্রমেই অবসন্ন, না আরও কিছু?

বোধিনী মনকে বুকাইতে চেষ্টা করিল, এইবার তাহার ছুটি হইয়াছে,—আর তাহার কোনো বন্ধন নাই,—সে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু মনে সে সংবাদে খুশী হইল কই? মনত বুক জুড়িয়া এ কিসের একটা জু-হা লব উত্তীর্ণ-ডেছে? সংসারের সব কাজ দিনের পর দিন বোধিনীর কাছে নিত্যন্ত নীরল ও নিরর্থক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিছানা হইতে উঠিয়া, অমূল্যকে পড়িতে পাঠাইয়া, তাহার ফুলের ভাগ্যনার ভাত রান্নিবার ব্যস্ততা নাই। অমূল্য পাছে তেল না মাখিরাই রক্ষ মান করিতে পলাইয়া যায়, সে দিকেও আর চোখ রাখিতে হয় না। রান্না করিতে-করিতে পাঁচটার অমূল্যর পড়িবার ঘরে উকি দিয়া,—সে পড়া করিতেছে, না বুড়ি-মাটির বা ভগিনী-খোলা লইয়া ব্যস্ত আছে, সে খোঁজও রাখিতে হয় না।

বৈকালে আর মূল-প্রত্যাপত অমূল্যর পথ চাহিয়া জানাণার কি দরকার পাশে পাঁজীয়া থাকিতে হয় না। কোম দিন নির্দিষ্ট সময়ে না আসিলে, পাঁচটার উত্তর

হইয়া ঘর-বাহির করা, কি তিখুকে একটু আপাইয়া দেবার জন্য কাছাড়-বিনতির পালাও চুকিয়া গেছে। স্ততরা এখন মোহিনীর ছুটি, পূজা ছুটি। কিন্তু পোড়া মন সে কথা মানে কই ?

এক-একদিন রাধেন আসিয়া মোহিনীর কোলে ক'পাইয়া পড়িয়া মিজাদা করিত, “দাদা আবার কবে আসবে ছোট না ? একলা খুঁলে যেতে আমার ভাল লাগে না—” মোহিনীর চক্ষে জল আসিত। সে করিত, “আবার আসবে,—ঈশ্বরই আসবে।” নিম্নের মনকেও বুঝি সে এই বলিয়াই প্রবোধ দিত। বালক রাধেন্সও মোহিনীর মতন অনুপায় অব্যত অসুস্থত করিত। দাদার মূলগাছটি পাছে শুকাইয়া যায়, সেজন্য নিম্নের হাতে তাহাতে জল দিত। তাহার চটানী ও একওঁহেদী এখন খুব বাড়িয়া গিয়াছিল,—অথচ অনুপা এখানে নাই; শান্তি সে জন্ত আশ্রয় বোধ করিত। সে শিশু-দ্বয়ের রহস্ত বুদ্ধিতে পারিত না। পাছে দাদাকে বকুনী বাইতে হয়, সেই জন্তই তখন অনেক রকম চটানী ইচ্ছা গড়েও করিতে পারিত না। এখন ত আর দাদা নাই, স্ততরা সে বেশরোয়া।

সরলা মোহিনীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কহিল, “ছোট বউ, আত্মস্বতাল এখনকার মাটি আঁকড়েই পড়ে রইলে,—অন্যথাক ছেড়ে এক পা নড়বারও ঝো ছিল না। বাপের বাড়ীর কর্তনও নাম-উদ্দেশ্যও কর না; এখন একবার দিন-কতক সেখানে বাও। তোমার মা নেই,—ভাই-ভাৰতো বুয়েছে,—তারা কতবার নিয়ে যেতেও চেষ্টাছে,—তুমিই সে বিক মাড়ও না। এখন কিছুদিন বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এস,—মনটাও ভাল হবে। শরীর যে শুকিয়ে পাত্ হয়ে গেল।”

মোহিনীর মনে এ কথা লাগিল। সে ভাইকে চিঠি লিখিল। মোহিনীর দাদা রামবাবু ভগিনীর চিঠি পাইয়াই লইতে আসিলেন। মাতার স্মৃতির পর হুঁতিনবার ভগিনীকে লইতে আসিয়া কিরির গিয়াছিলেন,—এবারে ভগিনী নিজে হইতে বাইতে চাছিলেন। রেমন্তবাবু আপত্তি করিলেন না; কিন্তু শান্তির ঈশ্বরই সন্তান হইবার সম্ভাবনা,—স্ততরা মোহিনীর এ সময়ে বেরাভিনী বাপের বাড়ী যাওয়ার সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। হুমকী টিপিয়া-টিপিয়া কাণের কাছে কহিল, “অনুলার ঘরসেই দবার প্রীতি দরদ ছিল,—এখন

তোমরা বেন কোথাকার কে! কোথাবাবু কষ্ট হলে কি খুড়ীমার পারে লাগে ?”

মোহিনী কথাগুলো শুনিয়াও গারে মাখিল না। সে ত ইহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু লোকে ত বুঝিবে না যে, অনুপা-পূজা ঘরবাড়ী আত্ম তাহার কাছে কি ভীষণ রিক্ততার ভরিয়া উঠিয়াছে। এাণের এ পুতৃতার লৈত কোথাও গেলে যদি একটুখু নাথব হয়, সে তাহা করিবে বৈ কি।

১০

মোহিনী কানী আসিয়াছে। ভগিনীর মনটা বড় খারাপ; তা ছাড়া, এত দিনের পর ভাইয়ের নিমক আসিয়াছে;—সেজন্য রামবাবু পনের দিনের ছুটি লইয়া স্ত্রী ও ভগিনীকে লইয়া ভীর্ণ-দর্শনে বাহির হইয়াছেন। রেলো চাকুরী করিলেও, স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেও তিনি কখনও কানী-বৃন্দাবনে বাইতে পারেন নাই, ঠাকুরকির কল্যাণে এ ভীর্ণ-দর্শন ঘটিল বলিয়া ব্রাহ্মণ নন্দিনীর উপর খুব খুলী। রামবাবুর বগুরবাড়ীর সম্পর্কীয় ভিন-চারিজন ব্রাহ্মণকে ভীর্ণে বাহিরার সৰী পাইয়া তাহার সঙ্গে কানী আসিয়াছে। কানীতে রমণীগণ প্রত্যহ প্রত্যতে উঠিয়া গলাহান করিয়া, গলাতীরে আঙ্কি-পূজা সাধিয়া বিশ্বনাথ অরুণা দর্শনে বাহির হয়,—যদি-যদি-যদি দেব-দর্শন করিয়া, পূজা দিয়া মনে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু মোহিনীর এ কি হইল। পূজা-আত্মা কিছুতেই তাহার স্থখ নাই, তৃপ্তি নাই। ঘরে যদিও কোসাকুনী নাড়িয়া ইষ্টদেবতার পূজা শেষ করিয়া, তুল্লিত হইয়া, সে দেবতার উদ্দেশে তক্তিতরে যে প্রণামটি করিত, তাহাতে তাহার বেশ তৃপ্তি হইত, এবং মনে হইত, সে পূজা, সে প্রণাম দেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আত্ম এই পূজা-ভূমি কানীধানে আসিয়া, বাবা বিশ্বনাথের পূজার তাহার আগক্তি কই ? বুকের মধ্যে শুধু বা বা করিতেছে,—কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মোহিনীর নিম্নের উপরে হাস ‘হইল,—ছি, ছি। সামান্য মারামোহে সে এখন আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে, পরকাল পর্যন্ত থোরাইতে বলিয়াছে। কিবা গত-জন্মে এমন কোনও পাপ করিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্ত বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে ঠাই দিতে স্বীকৃত নহেন। নতুবা পূজা-পাঠে তাহার মন বলিতেছে না কেন ?

মণিকর্ণিকার ঘাটে বধন প্রাতঃকালে একসঙ্গে মত কান্দর, ঘটা; শব্দ বাজিয়া উঠিয়া সকল নরনারীকে মহান বিষ-সেবতার চরণে প্রণত হইবার জন্য আহ্বান করে, বধন "হর মহাদেব, শিব শরর" ধ্বনিতে প্রভাতের নিভর আকাশ যুধর হইয়া পানী-ভাঙ্গির চিত্তকেও ভক্তিরসে দিল্প করিয়া তুলে, তখন মোহিনীর সহযোগী নারীরা ঘাটে আগিয়া বলাবলি করেন, এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না; বাবার চরণে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। মোহিনীর উদার চরণে তখন কিন্তু সেই কুত্র প্রাণের কুত্র বরণানির কথা মনে পড়ে, যেখানে নিমিত্ত অনুলাকে সাবধানে মণারি কেনিয়া রাখিয়া, সে এই প্রত্যয়ে উঠিয়া গৃহকর্মে নিযুক্ত হইত। এমন ব্যাপারীয়া মাঝেমাঝে তাহার পাশ মন জুগিল না,—কি বুঝার কথা! মোহিনীর আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। সামান্য বর-সংসার ছাড়িয়া, স্বামী-পুত্র কেনিয়া কত নারী এ দেবস্থানে বাস করিবার কাদনা করে; আর সে কি না এ ঠেলিত ঘন হাতে পাইয়াও তাহার মধ্যমা রাখিতে অসমর্থ? হা পানীয়া!

আখোখা, কানী ও প্রমাণ হইয়া রানবাবু বুঝাবনে আসিলেন। বুঝাবনে নানা কারুকার্য-খচিত, অগণ্য মন্দির, অনেক ফুলবন। রমণীরা পাণ্ডার নিকট বধন তুলিল যে, ছুঁচোর যিনে বুঝাবন-স্রমণ হইতে পারে না, বধন তীর্থস্থানে আসা হইয়াছে তখন সমস্ত ভাল রকম না দেখিয়া-তুলিয়া ফিরিয়া গাওয়া কখনই উচিত নয়,—তখন মোহিনী বাতীত লকলয়েই বন থাকিবার মত সুকিয়া পড়িল। রানবাবু চুটি ফুটাইয়াছে,—তীর্থকে ত ফিরিতেই হইবে। ত্রীকোণ অবস্ত রাখিয়া বাইবেন না (যদিও, ঠাকুরারি যদি থাকিয়া যার, সেও থাকিতে রাণী)।

তদ্বিনীকে তিনি থাকিতে বলিলেন,—তীর্থে বেড়াইয়া পূণ্য-সকরও হইবে, মনও ভাল থাকিবে। কিন্তু অস্বাধ মোহিনী থাকিতে চাহিল না। মনের বোকা-ই বধন নাহিল না, তখন কেন সে মিথ্যা থাকিয়া পূণ্যস্থানের অবমাননা করিবে! পাণ্ডার সহিত রমণীরা যে দিন বুঝাবন প্রবেশ করিতে গেলেন, পাণ্ডা বুঝাবন হইতে মথুরা বাইবার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি দেখাইয়া দিয়া কহিল, এইপথে অকুরের রথে বনোদ্যানমন মথুরা গিয়েছিলেন, এই পূণ্য বুঝাবনের সকল সোণ-সোপ্তি;

মা-বশোনা, তাই কিশোরী—সবাই গড়াগড়ি দিতে 'হা কুত্র, হা কুত্র' বলে কেঁদেছিলেন। এখানকার পূণ্য বড় পবিত্র। সকলেই ভক্তিরসে রক্ত: লইয়া মাগার ও গায়ে মাখিল ও খাঁচলে বাঁধিল; কিন্তু মোহিনীর চিত্ত অপূর্ণরূপে বিগলিত হইল, তাহার অক্ষপাতা চুটিল। পাণ্ডা এই ভক্তিমতী নারীর ভাবাবিকাশ মর্শনে শ্রীত হইয়া কহিল, "মনের নমন যে বর: ভগবান ছিলেন মা, তাঁর মনে না কেঁদে কি কেউ থাকতে পারে?"

মোহিনীর কাণে বৃষ্টি সে কথা পৌঁছিল না। সে বশোনার মাতৃ-স্নেহের বেসনার শুকনকে নিজের চরণে প্রত্যাকরণে অসুতব করিয়া সগহবৃত্তি বোধ করিতেছিল।

বুঝাবনে প্রত্যেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব, বালা ও কৈশোরের খেলাধূলায় মত-মত চিত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। সমস্ত গুলি দেখিয়া দেখিয়া বেন তাহার আগাগোড়া জীবনটির প্রত্যেক ঘটনাই মনের মধ্যে সুন্দররূপে আগিয়া উঠে। তাই বৃষ্টি মথুরা এক নিকট হইলেও, মা বশোমতী, প্রাণাধিক পুত্রের সঙ্গ স্বতি-বিষড়িত বুঝাবন ভাগ করিয়া বাইতে পারেন নাই; দ্বারানিধিকে তাহার পরিভ্রম স্বতি-চিহ্নগুলি মধ্যেই অনুভব করিয়া, এং সেই স্বতির আনন্দকেই কুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া সারাজীবন কাটাতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোহিনীর মন উদ্ভাস হইয়া উঠিল। পাণ্ডা মহারাজ তাহাকে দেবস্থানে বাস করিয়া সুকিগান্তের সঙ্গ পুষা নির্দেশ করিয়া গিলেও সে উঠা এং করিতে পাবিল না, সুতরাং সংসারের গুরুতি-ভোগ এখনও তাক্সা অকুটে মাষ্টে আছে, একথাও পাণ্ডা মহারাজ উল্লেখ করিতে ছাড়িল না। বনুর স্থান করিতে দিয়া মোহিনী বিমিত হইয়া দেখিত কত মেশের কত বিভিন্ন পরিচ্ছদের নর-নারীর বেলা। কত বিভিন্ন তাহার সকলে কথা কহিতেছে। মোহিনী ইতিপূর্বে নিজেদের ছুপ গ্রামস্থানি ছাড়িয়া কখনও বাহির হই নাই, সুতরাং তীর্থ-স্রমণে বাহির হইয়া নানা দেশ ঘুরিয়া, নর-নারীর বিরাট বেলা দেখিয়া, সকলেই মগো বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া সে অবাক হইয়া বাইত। এতবড় পৃথিবীর এতখানি উন্মুক্ত স্থান, এতখানি উদার আকাশ, এতখানি খোলা বাতাসে তাহার বুক বেন আরও হায় হায় করিয়া উঠিত। পিঙ্গরের বিলম্বিত বৃষ্টি কানন-ভূমিতে ছাড়া পাইয়াও তাহার বড় পিঙ্গরে করিবার মত এখন করিয়া

আকুল হয়। হায় চর্যাসিনী নারী, সংসার ব্যাধকে
প্রতিপদে সকল জিনিষ হইতেই বঞ্চনা করিয়া চলিতেছে,
বেবদানে পুণ্য-সঙ্কটের পথেও বৃষ্টি সে এমনি করিয়া বঞ্চনা
করিতে চায়।

(২০)

সন্ধ্যার বাতাস, আধেকটা দিউলী ফুলের সুগন্ধে
মগ্ন হইয়া বহিতেছে; ধরে-ধরে ঘেরিয়া সন্ধ্যাধি
আগিয়া নব্ব বাছাইয়া সন্ধ্যা-সম্বন্ধনা করিতেছে; ছোট-ছোট
ছেলে-মেয়েদের ধল আকাশ-প্রাণীপটী আলিবার মস্ত
বাত-সমস্ত ভাবে কোলাহল করিতেছে; কোলাহল
পূর্ণিবার পূর্ণিমা আকাশে উঠিয়া মধুর জ্যোৎস্নার চারিদিক
পুনরিত করিয়াছে; মধুর চাঁদের হাসি, মধুর দিউলী ফুলের
গন্ধ হাসির সহিত মিলিয়া এক অপূর্ণ ভাবের সমাবেশে
ছোট-বড় সকলেরই হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়াছে; যোহিনী
সরলাদের আগ্নিনার বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া অনুশার
সেই শৈশব-কাহিনী ভাবিতেছিল। সে এখন চাঁদ ভাঙিতে
শিবিয়াছিল, তখন মোহিনীর কোলে উঠিয়া এবং হাতে
মোহিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, আর একখানি ছোট হাত
নাড়িয়া-নাড়িয়া আর চাঁদ, আর চাঁদ করিয়া ভাঙিত; চাঁদের
আলোর সে শিশুর চাঁদমুখ আরও হৃদয় বেধাইত, এবং
মোহিনী মৃদনরনে অনুশার সুখে চুপা খাইয়া ভাবিত
আকাশের চাঁদের তুলনায় তার কোলের চাঁদ কত গুণে
হৃদয়! মোহিনীর মনে হইতেছিল, কেন অনুশা চিরদিন
ঐহার কোল-জোড়া করিয়া তেমনই লিপুটি হইয়া রহিল
না। আকাশের চাঁদ আজ যুগান্তর পরে তেমনি তরঙ্গ
রহিয়াছে, এক তিল কোথাও তাহার কিছু পরিবর্তন হয়
নাই; আর তাহার অনুশা কি না এরই মধ্যে কত বড় হইয়া
উঠিল,—তাহার বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গেল!

ফুলগীমূলে প্রাণী মিতে আগিয়া সরলা কহিল “ছোটবউ,
এখনো বসে আছে খোঁ-সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল, তুমি ধরে যাও,
শান্তি আবার বসাবতি করবে হয় তো। আর তোমার বে
শরীর, ভাঙিত মাসের হিম লেগে অস্থিরও হতে কতকণ?”
মোহিনী কহিল, “তুমিও যেমন হিদি, আমার আবার রোগ
খালাই আছে। তবে মৃদন-বিধি বন্ধে বটে, তা আর
আমার সে সব বন্ধুর ভয় নেই, কে জানে সে সব ভয়
কি কোরে এমন ভেঙ্গে পেল।” সরলা সেখানী জননী,

হঠাৎ যোহিনীর হৃদয়ের মেঘের বেদনাকে সে অন্তরের
সহিত অনুভব করিত; কিন্তু বাহার চাড়া নাই, তাহার ক্ষত
কেন আর প্রাণপাত? তবে মাহুকের মন বড় অস্থির।
সরলা নিদ্রাকর্মে কহিল, “এতদিনের পর তাই-তালের কাছে
গেলে, তারা মাথার কোরে রেখেও ছিল, তা কেন থাকতে
পারলে না? এখানে মরতে এলে? এখন তীর্থ-ধর্ম কল্লতে
গেলে; কিছুদিন কুশাবনে থাকলে সে তো ভালই হতো,
কত গুণে সোকের ওপর ঠেঁরে বাওয়া বটে; তুমি তা হাতে
পেরে ছেড়ে এলে। অনুশাকে নিয়ে এতকাল এখানে
কাটাতে পেরেছিলে, এখন কি আর এই শূন্য ঘরে তুমি
মন পেতে থাকতে পারবে বোন? তা যে মনোনে ছনালে
তাকে বেধতে পাখে, সে আশাও নেই, তারা অনুশাকে
পাঠাবে না, তারা আবার বাপ-মার চেয়ে এর মধ্যে
অনুশার বেশী দরদী হোয়েছে। তবে অনুশা বেগানে থাক
ভাগ থাক, আমাদের ভনেই শ্রুহ।”

মোহিনী নিঃশ্বাস ফেলিল, কোনো উত্তর দিল না,
অনুশাকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইবার আশা যে তাহার
মনে হয় নাই, তাহা নহ, কিন্তু সে আশা হ্রাশা হইলেও
অনুশার স্মৃতিচূত বাড়ীখানিই যে তার হৃদয় হৃদয়ের
চন্দন-প্রলেপ। অতঃপর নারী পৃথিবীতে আর কোথায়
গিয়া শান্তি পাইবে!

সরলা আবার কহিল, “ছোটবউ, তোমার চেহারা বড়
খারাপ দেখাকে; তেতরে-তেতরে কোন কিছু অস্থির
করেনি তো? এখানে তুমি বউ মাহুয়, চিকিৎসা-পত্রের
তেমন সুবিধাও হবে না। তবে এখন এসেছ, দিনকতক
থেকে যাও, এখানে যে মন টিকবে তা মনে হয় না। শান্তি
বল্ছিল, তাই-তাল কি ব্যর্থমান ভাত ঘের? তাতেই
চলে এসেছে। আমি বললুম তা নহ, রাখাব্য বোনকে খুব
ভালবাসে, তার স্রীও সেই রকম। যেটি কথা, মোহিনী
কিছুটা আসতে শান্তি মনে মনে খুশী হইয়াছিল।
মোহিনী সন্ধ্যার সকল কালে এতদিন মাথার করিয়া
খাটার, ইহার সন্ত-সন্তের হামানার আশা কোনো দিন
শান্তিকে পোহাইতে হয় নাই। বাবুস রাখাও তাহার
শিখনে বক্তিত-বক্তিতে হারান হইতে হইত, সন্ধ্যার
কোনো না কোনো কালে খিটখিটনা খিটতেই থাকিত।
হেস্তবাসুও অন্তর অস্থির হোয় করিতেন। হইবাস পরে

হঠাৎ মোহিনী কিরিয়। আবার সকলেই বেন হাঁক ছাড়িয়া
বাঁচিল। কিন্তু মোহিনীর বেন অত্যন্ত পরিবর্তন হইয়া
দিগ্ধ। সময়ে কোন কাল করিবার মন নাই। ঠাহরের
কাছে গিয়া রান্না-বাগ্না দেখাইয়া বেম নং, নিজেও বড়
একটা রাঁধিয়া খায় না। একদুটা শুকন বড়ি খাইয়া দিন
কাটাঁইয়া দেয়। প্রথম-প্রথম শান্তি চুল করিয়া থাকিলেও,
সেবে বাধা হইয়া তাহারে মূখ খুলিতে হইল। কিন্তু কি
আপন, মোহিনীর তাতেও বড় প্রায় নাই। তবে ত না
আদিলেই হইত। এই কারণেই বাঁ ভাই-ভাল ভাত দিতে
পারে নাই। শান্তি মনে করিল, এ আপন তবে থাকার
চাইতে বিহার হওয়াই ভাল। কিন্তু মোহিনীর সে গতিকও
নহ; সে এমন নিবিষ্ট ও উদাসীন ভাবে সংসারে রহিয়া
গেল, যে, সরলার পর্যন্ত অঙ্গ বোধ হইতে লাগিল। সে কি
পাথরের মানুষ যে, কিছুতেই তার চেতনা হয় না?

হঠাৎ মোহিনীর অর হইল। কয়দিন উপবাস করিবার
পর বমন-অর উপশব, হইল না, শুখন কবিরাজ ডাকার
প্রস্তাব হইল। কিন্তু মোহিনী আপত্তি করিল। সরলা
সেখানে আসিল, শান্তি উঁচু গলায় কহিল, "তোমরা সব দেখ
যিদি, শুদ্ধ-পতর কিছু করবে না। শেষে না অংলার রান্না
ঘণ্ডের পোয়াবা এসে বসে বসে 'আমাদের জামাই বাবুর
মাংসে তোমরা যিনি চিকিৎসাতে যেরে ফেলছে?' তখন সে
বিষম ভাটা।"

মোহিনী কীপকণ্ঠে অব্যব দিল "সেজ্ঞে তোমাদের
হাতে হাতকড়ি পড়বে না যিদি। হাঁছর ঘরের বিধবা দুচার
দিনের অরে উপোস করে মরে না। তবে যদিই মরে, সে
গোষ তোমাদেরই বা কেন? কার, তা ভগ্নবান জানেন।"
মোহিনীর বাঙ্পটুভার সরলা পর্যন্ত অবাক হইয়া গেল।
এই কি সেই পরজাতি, কোমল ও ভীকৃত্যবান মোহিনী?
শান্তি অগিয়া উঠিয়া কহিল, "চাটাই-চাটাই কবা ত খুব
বেফেছে। পদ্মলা, অমলা, অমলা! অমলা ত মূখে
লাগি মেরে চলে গেছে। আমরা কি আর কিছু বুরি না।

তাতেই আর কোন কাজে গা লাগতো না। আচ্ছা
হিংস্রটে স্বভাব! এক গাছের ছাল কি আর এক গাছে
লাগে? রান্ধনও সে, অমলাও সে,—তবে এত বাধাবাদি
কিদের? সেখব এর পর কি চর?" শান্তির কণ্ঠার
ভেতরকার ক্রন্দ যে মোহিনীর চরণে এতটুকুও মাপ
বলাইতে পারিল না, তাহা মোহিনীর নির্মিত্যর মুখের
ভাবেই সরলা বুকিতে পারিল, এবং পরিণামে তাহার কি
গীড়াইবে তাহা তাহার দেহপরায়ণ চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া
উঠিল। এই সময় পটুয়া আশিয়া ডাকিল, "পট সেখবের বা
ঠাকরুণা, ভাল ভাল পট আছে।" মোহিনী সরলার দিকে
চাহিয়া কহিল, "সেখ না যিনি! আমিও শুনে-শুনে শুনি।"
সরলা পটুয়াকে পট দেখাইতে বলিল। পটুয়া আশিনার
পট খুলিতে-খুলিতে কহিল, "কি সেখবের মা-ঠাকরুণা,
রান রান্না, না বন্যাস, কি কংস বণ, না দক্ষপুত্র?" এক-
একজনে এক-একরকম কহমাণ করিয়া বলিল। মোহিনী
জানালা দিয়া সরলাকে কহিল, "কংসবধই সেখ না যিনি।"

অজ্ঞর বদন ঐক্যকণ্ঠে কন্যাবন হইতে আনিতে
গিয়াছিল, সেই দৃষ্ট পুত্রিয়া পটুয়া মোটা গলায় এ্যানা ভাবায়
হুয় করিয়া ভালা পলার হুন্সে বিহার বর্ণনা করিতে আরম্ভ
করিল। অজ্ঞরের হথ হইতে হুঁকিয়া গড়িয়া ঐক্য ক্রন্দন-
শীলা বশোমতীকে সান্ধনা দিতেছেন। বশোমতী মূগ্ধে
আছাড়িয়া পড়িয়া "হা গোপাল হা গোপাল" বলিয়া আকুল
বরে আর্ন্তনায় করিতেছেন। ব্রজনাথীপণ হুঁহাত তুলিয়া
অজ্ঞরকে একবার রথ রাবিবার মত্ৰ মিনতি করিতেছে।
সে কক্ষ তাহিনী ভনিত-ভনিত সেই মোটা তুলির মোটা
আঁকা পটের ছবি দেখিতে-দেখিতে সকলেই বেন ওম্ময়
হইয়া গেল। রমণীগণের চকু বাপপূর্ণ হইয়া আসিল।
মোহিনী যোগ-মহার গুইয়া ভিত্তিত নেড়ে চাহিয়া, কল্পনা
নয়নে সে বাস্তব দৃষ্টটিকে দেখিতে-দেখিতে স্পন্দন
হইয়া গেল,—এতকাল পরে তাহার ছুটা হইল।

বাঙ্গালীর মেয়ে

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস]

পুত্র ও কঙ্কার পার্থক্য করি কেন ?

অবগুণ্ঠনবতী, অসুখ্যাম্পনা, অন্তঃপুরচারিণী বঙ্গললনার কথা প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করিতে চাহি, তজ্জন্ত পাঠক-পাঠিকাগণের ক্ষমা ভিক্ষা করি। যে সময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই নারীজাতি স্ব-স্ব অধিকার আদায় করিবার জন্য সচেষ্ট, যে সময়ে রমণীরা সমাজে পুরুষদিগের কাৰ্য্য অব্যাহে চালাইতেছেন, সে সময়ে কোমলাকী বঙ্গললনার কথা আনুপূর্ব্বিক বিচার করিবার যেখান বাসনা নিতান্ত অকারণ নহে।

আমার পূর্ব্বের তিনটি প্রবন্ধে * যে-যে কথার আলোচনা করিয়াছি, তাহার সামান্য-সামান্য পুনরুক্তি বোঝাও আবশ্যক হইলে করিব, নতুবা যে সকল কথা সেই প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচিত হইরাছে, তাহাদিগের আর পুনরায় আবৃত্তি করিব না।

বৈশেষ, বাঙ্গালীর ছেলে ও মেয়ে প্রায় একই ভাবে পালিত হয়; মাতা দুই-এক ঘরে উভয়ের লালন-পালনের মধ্যে ভারতম্বা বৃষ্ট হয়। যেখানে সেদ্রব্য পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়, সেখানে আহারে, পরিচ্ছদে, বৈবাহাতে, শাসনে, ঘেহ-ঘিহতরঙ্গে—সকল বিষয়েই পার্থক্য রাখা হয়। বালকেবরা বেশী করিয়া গৃহ পায়, বালিকারা ততটা গৃহ পায় না; বালকেবরা নানাপ্রকার বেলনভূষণ মণ্ডিত হয়, বালিকারা মোটাটুটি পরিচ্ছদ পাইয়া থাকে; বালকদিগের বিনোদ্য থাকিলেও অনেক বুলে বালিকাদিগের বিনোদ্য থাকেই না; কোপাও বেড়াইতে বাইবার সময়ে, বালকেবরাই বাহ্যিকার ঘাইতে পার, বালিকারা তাহা পার না; বালকেবরা বাটার বাহিরে পাঠদানের সঙ্গে উঠে-বসে; কিন্তু বালিকারা অন্ধারে বসিয়া মাতার বা গুণিনীর নিকটে খেলা করে, নতুবা সামান্য তাবোও গৃহস্থালীর কাৰ্যে সহায়তা করে। এই

ঘর্ভাণ্ডা-বন্দেপে, পিতামাতার অভিসম্পাত শিরে ধরিয়া বালিকারা তুমিই হয় এবং অনাবি প্রতিনিয়তই জনক-জননী ও অপর আত্মীয়-স্বজনের দীর্ঘ-শ্বাসের উত্তাপে, মেঘ বা স্পষ্ট হর্ষাক্রোর ডাঙনার এবং একটা অম্পষ্ট চর্ভাগোর ছায়ায় বর্ধিত হইতে থাকে। সে বৃত্তি যে কিরূপ হৃৎক, তাহা বুঝাইবার শৃঙ্খলা আমার নাই।

কেন এতদূর হয়? বাঙ্গালী মাঝেই জাত আছেন যে, একটা বালককে মানুষ করিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, একটা কস্তাকে সংপাদিত করিতে প্রায় তাহাই অথবা কিং অধিক পড়ে। তবে প্রভেদ এই যে, পুত্রের বেলায় সামান্য-সামান্য করিয়া ব্যয় করিতে হয় এবং পুত্র মানুষ হইয়া পিতাকে অর্থ-সাহায্য করিতে পারে; কঙ্কার বেলায়, এক-কালীন প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কস্তা কখনো সে অর্থের প্রতিদান করে না, বরং কঙ্কার জন্য মধ্যে-মধ্যে আয়ো ব্যয় করিয়া ঘাইতে হয়। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা ঘাইতেছে যে, যাহা কিছু গোলযোগ, এক অর্থ ব্যয় লইয়াই। নতুবা কস্তা কোনও বিপদ লইয়া অন্তর না এবং পুত্র কিছু সম্পদ লইয়া আসে না। মাঝে হইতে পিতামাতাই গোল বাধান।

আমরা নিম্ন-নিম্ন সনাতন আদর্শ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, সভ্যতাই উৎপাতের অধিকৃতের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমরা হিন্দু; আমাদের পক্ষে শুধু ইহজীবনই সর্ব্বক নহে, আমাদের অগ্ন-অগ্নান্তর আছে। কোন্ সত্য কি শ্রুত ধরিয়া, আমাদেরকে জনক-জননীরূপে আশ্রয় করিয়া, আমাদের কোন্ কর্তব্য-কর করিতে আসে, তাহা আমরা না জানিলেও, মূল কথা বিস্তৃত হই কেন? সত্য, পুত্রই হউক আর কস্তাই হউক, নিম্ন কর্তব্য করিতে ত আসেই, পরন্তু সেই সঙ্গ পিতৃমাতৃ-কর্তব্যেরও সুযোগ দেয়। তবে কেন আমরা সে কথা বিস্তৃত হইয়া, একের জাবী ঐহিক সুখের

* ভারতবর্ষে, ১৯২০ সনের মাঘ মাসে “বাঙ্গালীর পিকা”, মাঘ ও কঙ্কমে “বাঙ্গালী বাঘ” এবং ১৯২১ সনের বৈশাখে “বাঙ্গালীর মেয়ে।”

আমার ভাষণে সমর্থন করি, এবং অগ্নির তথাকথিত ভাবী অর্থ-সোহন-নীতি গ্রহণ করি। ভাষণে বাক্যবাহু বিদ্ধ করি। বাস্তবিক কল্প ত অর্থ-সোহন করে না; অর্থ-সোহন অগ্নি গ্রহণ পক্ষ করে—অবশ্য বালিকা ভাষণে অনিচ্ছাকৃত হেতু চাই, চূর্ণার্থ রূপে পরিচিত হয়। বহুকে ব্যক্তিগত অর্থ বালিকা আমরা বিবেচ্য প্রচার করি— কিং ত কোন অর্থগ্রহণ নাই। এই নীতি অপূর্ণবোধিত ও অসিদ্ধ নীতি। আমাদিগের দ্বিতীয় ভ্রম, আমরা কল্পকে “সম্প্রদান” কল্পিত অর্থগ্রহণ করি। যদি আমরা (কল্প-পক্ষ ও বহুপক্ষ) গ্রহণ রাধি যে, যে ভাষিত-ভূমিতে আমরা শুভাঙ্গীত গ্রহণ করি। তাহা কর্তৃত্ব, ভোগ-ভূমি নহে, এবং হিন্দু মাঝেই সংসারে থাকিয়া কর্তৃত্ব করিতে পারে, তবে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিব যে, বর্তমান কালে, অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই কল্পকে নিঃস্বয় হইয়া সম্প্রদান করি। বাকেন এবং অল্প বহু-পক্ষেরা সেই দানকে সমর্থন গ্রহণ করেন। কল্পের পিতা বৈষ্ণবের যোহিনীমূর্ত্তির আচরণে দানের কপট লীলার অভিনয় করি। বাকেন মাত্র এবং বহুপক্ষেরা দানব সূত্রেতে সেই কপট বহুপক্ষকে অপবিত্র করেন। সূত্রের পরে সমস্ত কীৰ্ত্তনের উপলব্ধি দান দান করার পূণ্য বা বহু প্রকাশ পায় না। কিন্তু কীৰ্ত্তনকার বিশ্বজনীন প্রেম মুক্ত হইয়া, নিজ কীৰ্ত্তনের সমগ্র উপলব্ধি দান দান করার পূণ্যও আছে, মহত্বও আছে। সর্বশাস্ত্রী সম্যাসী হওয়া কঠিন কার্য হইলেও, সম্যাসী হইয়া, বাদ্য বৎসর দেখে পালিত কল্পকে বন্ধ হইতে উপলব্ধি করি। নিঃস্বয় হইয়া দান করা বহু সম্যাস-সাপেক্ষ, অধিকতর পূণ্য ও মহত্ব-জ্ঞাপক। হিন্দুসম্প্রদায় হইয়া পড়িয়া আল আমরা সে দান-এত আর উৎসাহন করি না, আল আমরা বেন নিরতিত কঠিন কথাব্যাক্ত-প্রত্যেক একটা অপ্রীতিকর কার্যের অহুতান করি। বর্তমান আমরা জাত-হিন্দু হইয়াও হিন্দু-ভাব্যগর না হইব, ততদিন নিরীহ বন্ধ-বালিকাগর অসুখে এই দুঃখ-ভোগ্য হুনিবাধ্য। বাস্তবিকই “বধ্যম পলিমে আমরা ভুবিয়া বরি।” অদ্যাবধি বিশ্বিয়ার প্রেরণার আল সমগ্র ভূগোপ ভাবে বাইতে বসিয়াছে, অহুত-প্রতিভা তাদ্ভ্যর যে অসংখ্য অর্থ, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রাণের আহতি দিরাছে, যদি প্রেমের বস্ত্র তাহার অর্ধেক অর্থ, ও অর্ধেক প্রাণ দান করিত, তবে আল

পৃথিবী হইতে হুঃ, বৈদ্য, অধ্যাপক ও অবিদ্যা সোপ পাইত। কিন্তু আল ভূগোপ বেন ও জনে দান হইয়া পড়িলেও মাঝে-মাঝে হুঃের ঐশ্বর্যের বস্ত্র দেখিতে পাইতেছে;—কৈ, আল আমরা বহুপক্ষের হুঃের ঐশ্বর্যের অধিকাংশ দেনবাসী হইয়াও ত যে ঐশ্বর্যের সন্ধানও লইতেছি না? তাই বৃথি আল আমাদিগের হুঃপার আরো বাকী আছে? সত্যের অর্থগ্রহণ আমরা নিষ্কার লীলা করিতেছি।

আমাদিগের তৃতীয় ভ্রম—কালকে যদি জ্ঞান করা। সমস্তেরই ইচ্ছা যে কল্পকে সংপায়ে দান করা হয়। সংপায়ে কে? যে বহু, অস্বনির্ভরশীল, চরিত্রবান, সেই সংপায়ে। তাহার যদি কিছু অর্থ থাকে এবং সে যদি প্রকৃতই বিদ্বান ও সংকুলোভ হই, তবে আরো ভাল। বর্তমান কালে, পাত্রের সত্যতার দিকে আমরা দৃকপাত করি না; পাত্রের সামান্যিক ও তাৎকালিক মুখা নিরূপণ করিয়া তবে তাহার হস্তে আমরা কল্পকে সমর্পণ করি। আমরা সর্বপ্রথমেই সন্ধান লই—পাত্রের আছে কি? অর্থং পাত্র মগ্ন কত টাকার অধিকাংশ হইতে পারিবেন, সেইটাই আমাদিগের প্রধান অহুতানের বিষয়। পাত্র নিজে কত উপার্জন করিবার ক্ষমতা রাখেন, অর্থং তাহার হস্তগরি থাকিরাও আছে কি না, সে ভাবনা আমাদিগের হয় না—অবশ্য প্রত্যেকেরই নহেই। কয়েক পিতৃদেব বনী পাত্রকে পাইতে হইলে, তৎকৃত নিরূপিত ধনের মূল্যকে মাথা পাতিয়া লইতে হয়। ধনের নিয়ে আমরা পাত্রের “চরণসের” সন্ধান লই—অর্থং তিনি কতটা পাগ করিরাছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করি। সেই পাগের মূল্যই বা কি, এবং সমাজে ও চাকুরির বাজারেই বা তাহার মূল্য কত, সে কথাও ভুবিয়া বাই,—ওমু পাগের যোগে মুক্ত হইয়া আমরা পরিচালিত হই। অস্ত্রাথ খেয়াল বা আশ্বার ধরিলেই তাহার মস্ত বৈদ্য মস্ত দিতে হয়, সে কথা মনে রাধি না। কল্পপক্ষের যেমন এই ভ্রমগুলি আছে, পাত্রপক্ষও তেমন পরধনে বনী হইবার অস্ত্রাথ সোভিতও গ্রহণ। কয়েক, উভয়তঃ জনের বশবর্তী হইয়া অস্ত্রাথ হেয়ের মাথার আপনাদের সর্বদান করিতেছি।

মোহ করেন পিতৃদাতা উভয় পক্ষই—কিন্তু দোষের

যোদ্ধা অবশ্য সহসা বালিকাকে আক্রমণ বহন করিতে হয়। তাই সে শাপমধ্য অংগার জার সর্বদাই শিলাখণ্ড রূপে ধরাভুলে পড়িয়া থাকে;—সংসারের হত সুখই পরিবর্তিত হউক না কেন, তাহাদের গাথাগোছার হয় না, ঘাঘত দগার অবতার রাঘবস্ত্রের পানপার্শ্ব সুখ না পড়ে।

কিন্তু এই ভাবে, সংসারের মধ্যে, শৈশব হইতে, পার্বক। সৃষ্টির ফল কখনো ভাল হইতে পারে না। যে কস্তার। শৈশব হইতে অর্ধের দোহিনী মুক্তি দেখিতে অভ্যাগ কতে, তাহার। পরে গৃহিণী হইয়া অর্ধেরই অজুগাতে একাধবতী পরিবারকে শতধা বিভক্ত করিতে সূক্ষ্মতা হয় না। তাহার। পরে অলঙ্কার ও বেশভূষা সংস্কারের দস্ত লালিত্য হয়, এবং ঐতিক্রমণেই অর্ধের হিসাবে সকল বিনিসেরই মূল্য নির্ধারণ করিতে শিক্ষা করে। তাঁহার। পরে পুত্রের জননী হইয়া, কস্তাপক্ষ হইতে অদ্যাপ্তিক অর্ধের দাবী করিতে লজ্জা বা বিধা বোধ করেন না; এবং ইচ্ছাকৃতরূপে অর্ধ না পাইলে, বালিকা বধুর উপরে নির্ঘাতন করিতেও বিরত হন না। তাঁহার। পৌর কস্তার প্রতি এক প্রকার ব্যবহার করেন এবং বধুমাতার প্রতি অস্ত্র প্রকারের করেন। সংসারে তাই নিতাই অশান্তি, নিতাই দুঃখ। অর্ধই আর সর্বক্ষেপে। আদরের সামগ্রী, আর তাই অনর্থ চতুর্দিকে।

এত ভেবনোতি, ঐত অশান্তি, এত গোলযোগের মধ্যে বাস করিয়া, মেয়ের। কখনো হৃদয়েই হইতে পারে না। পুরুষদিগের জীবনে ছুটি কঠিন সময় উপস্থিত হয়, বহন তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও জীবন লইয়া টানটানি পড়ে; সে ছুটি, দস্তোলমের কাল ও যৌবনোদগমনের কাল। ত্রীলোকদিগের জীবনে যৌবনোদগমনের কাল বিশিষ্টরূপে কঠিন সময় এবং শুধাতীত প্রৌঢ়ের শোষণ ও অপর কঠিন সময়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, কোন্ কালে আদ্যদিগের মেশের ত্রীলোকের। কি ভাবে জীবন বাগদ করেন, এবং তাহার ফল কি।

বালিকার শৈশব

সমস্ত শৈশবকাল ঘরিলে, অর্থাৎ অদ্যাপ্তি দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত, এসেলে, দুগ্ধদৈব, বালক ও বালিকা প্রায় একই ভাবে লালিত ও পালিত হইয়া থাকে। শৈশবের

লালন-পালন সম্বন্ধে “বাগাশীরা ছেলে” প্রবন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। সামান্য দান্তরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল বুদ্ধকেই স্বাধীনভাবে ফলবান করিতে হইলে, বতটা কৃষি সম্বন্ধীর জ্ঞান, বতটা পরিচর্য ও ঘর কথ। আবশ্যক হয়, ছেলে মানুষ করিবার অস্ত্র তাহার একতল ও জ্ঞান, বাহ্যাবহিক বস্ত্র ও ঐকান্তিক পরিচর্য করা হয় না। কাজেই, ছেলের। আশ্রয়-আশ্রয়ই বড় হয় মাঝে; মহুয়াবের পথে কতটা অগ্রগতি হয় তাহা বিবেচ্য। সংক্ষেপতঃ, সমতা বশতঃ আদ্য। শিশুদিগকে খাওয়াই-পরাই, কিন্তু কত বয়সে কত খাদ্য ভাণ্ডা, কি পরিমাণে উপযুক্ত, এ সকল কথা জানি না। পরিচর্য পরিচর্য রাখার মূল্য কত, তাহা নিম্নোক্ত ও উপলব্ধি করি না; কাজেই, শৈশব হইতে শিশুদিগের সে অভ্যাগ করাই না। শিখাইবার মধ্যে, শিশুদিগকে রাতদিন ভূমু-ভর দেখিতে শিখাই, কথার কথার শাসন করিয়া কাপুরুষ হইতে শিখাই, সার্ববিন অপরিচর্য অবস্থার বাকিয়া সন্ধ্যায় একবার ক্রিটফট হইতে শিখাই, আর শিখাই অসংখ্য—বাক্য, কার্য, প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে। নিত্য অবিবেচনা করিয়া কখনো তাহাদিগকে নির্ভরভাবে ত্যাগ করা, অথবা কখনো অস্ত্রায় আদর দিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করি। তাহার। কি ষায়, কি পরে—সকল সময়ে তাহার সংবাদ লই না, এবং রোগাই হউক, আর কই হউক, শাশাশী না হইলে তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অহুসন্ধানও করি না। পাছে বেহে আঘাত লাগে, এই ভয়ে সকল সময়েই তাহাদিগকে শালন করি। এবং ঢাকর-বাকরদিগের সঙ্গে অথবা পাড়ার বাহার-তাহার সংসর্গে ছেলদিগকে খেলিতে ও বেড়াইতে ছাড়িয়া দিই। ছেলের সঙ্গে ছেলে সান্নিধ্য, তাহাদিগের সঙ্গে নিম্নোক্ত তেমন অন্তরঙ্গ ভাবে কখনো মেলানো করি না। বোল আনা অস্ত্রতার উপরে বির্যটপুরুষ হইয়া বলিয়া, বক্রিণ আনা বেয়াসের বশবর্তী হইয়া আদ্য। আদ্যদিগের ভাবী বংশধরগণের বেহ ও মন গঠন করিষ্ণু থাকি।

যেহ ঘটনের মূল ভিত্তি পাঁচটি। পুষ্টিকর অথচ সহজ-পাচ্য আহার্য, বশাসম্ভব শাশারিক পরিচালনা, উত্তম বাহু-সেবন, সর্বদাই পরিচর্য থাকা এবং মানসিক ক্ষুদ্রি—এই পাঁচটির সমন্বয়ে যেহ মূপ্তি হয়। (১) আদ্য। সেবিয়াছি যে, শিশুর। যে ষায় ষায়, অধিকাংশ সময়েই তাহা তাহাদিগের পক্ষে অহুগম্য। হাতুস্ত্র—কোন-কোন শিশু

তিন-চার বৎসর পর্যন্ত পায়, আবার কেহ-কেহ ছয় বাস কালও উহা ধরেই পায় না। বয়সেই দুধা ও সবলকায়ার জননীরা শিশুর অত্যাচার; তাহার উপরে, এসবের পরে ছয়বাস কাল পর্যন্ত হাতুস্তন্য ভাল থাকে; পরে ঐ দুধে শিশুর বধ্যবৎ পুষ্টি হয় না। পাকো-মিশ্রিত, বাসী, সিদ্ধ-করা, যথিহৃতমিশ্রিত বা “ছুকা” প্রাথমিক নিশ্চয়িত অগ্ন্যবহণ পাকীর দুধ—গৃহস্থের হাতে মল, বাসি, বা শিশু মিশ্রিত হইয়া তবে শিশুর উপরস্থ হয়। সে দুধে নবমীত নাই। সে দুধে; তাইটানী নাই, সে দুধে আছে দুধের নাম ও জননীরা মনের কুপ্তি। কয়েদি, ক্রমাধি, তিন দশতেই শিশুর পুষ্টির অভাব লক্ষিত হইবে—প্রথমে ক্রমা জননীরা তত্ত সেবনে, পরে তথাকথিত গো দুধ পানো এবং শেষে অরুণবৎ কালীন। দুধ ছাড়িয়া যখন শিশুরা ভাত খাইতে ধরে, তখন পুরাতন সিদ্ধকরা চাইগকে পুনরায় সিদ্ধ ও কেন বর্জিত করিয়া, তৎসঙ্গে সামান্য সিদ্ধ ডাইলের উপরিস্থ মল ও মৎস্তের কণা দিয়া শিশু ভাত খাইতে শিখে। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে, অনেক শিশু তিনবার ভাতই খায়, দুধ খাওয়া সকলের অন্তর্গত জুটে না। কিন্তু দুধ না জুটিলেও অন্ততঃ সহরে, একটু চা ও দোকানের মিষ্টান্নের অভাব কোনও কালে হয় না। শিশুর ভোজ্য কমাইয়া,—পরিমাণে না হইলেও শুধে “নিরোগ” করিয়া—তাহার বেশ-ভূষার বটী বাড়ান হয় বৈ কমান হয় না। দুধ, বি, মৎস্ত, ডিম, মাংস, ডাল প্রভৃতি, এগুলির ন্যায্য কি, তাহা গৃহস্থ জানেন না, এবং ইহাদিগের বধ্যবৎ ব্যবহারের বিধকে আদৌ দৃষ্টি গ্রহণেন না। কয়েদি পুষ্টির খাবারের বিশেষ অভাব ঘটে, একথা নিঃসন্দেহ। যেমন হারে পুষ্টির অভাব ঘটে, সেই হারেই বালক-বালিকারা ক্রম, বা রোগপ্রবল বা ক্রম হইয়া থাকে। (২) উপযুক্ত খাদ্যের পরেই অঙ্গচালনার স্থান। যে শিশু চলিতে শিখে নাই, এমন শিশুর পক্ষে এককাল-ভোজন পরিবর্তন, রাতদিন উঠা-পড়া—ইহাধি ধরেই ব্যায়াম। যে শিশু হাঁটতে শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে, আবাদিগের চক্ষে অনবরক, কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে সার্থক, চাকলাই ব্যায়ামের প্রতিনিধি। বোঁড়ামোড়ি, ছোটোপাঠ, চীৎকার করা, পড়া, উঠা—যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। উক্ত ভাষা ব্যায়াম হইতে বঞ্চিত করিয়া, শতবন্ধন-যুক্ত বাসামোড়ি দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত রাখা, এবং

তদুপর হুই দক্ষ্য কুঁচো হইয়া, দ্বিরাগনে পাঠাভ্যাস করান বা শিশু-শিশন অভ্যাস করান যে তাহাদিগের দেহের পক্ষে স্বতন্ত্র অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। অল্পবয়স হইতে, অল্প-পরিমার স্থানে বসাইয়া, অম্লানোক্তের সাগায়ে, দুই সন্ধ্যা সূত্রাক্ষরে-বৃত্তিত অমল-বল পাঠা-পুস্তক হইতে পাঠাভ্যাস করানর ফল—বাহ্যের হানি, দৃষ্টিকৌণিক, মেধার হ্রাস, শরীর প্রতিভার সঙ্কোচ। চক্ষু, কর্ণ, বক্ষু সঙ্গাণ হইতে না হইতেই, সন্ধ্যায় তাহাদিগকে আদর্য প্রতিভূত করি—আবাসের ছেলেরা তাই চক্ষু থাকিতে পর্যবেক্ষণ করিতে শিখে না, কর্ণ থাকিতে শব্দভেদের সন্ধানে বহির হয় এবং হস্তপদাদি থাকিতেও শুধু সন্ধ্যাভ্যাস-সাধ্য কার্যই করিতে পারে। (বেরদের তুলনায়, ছেলেরা বেশী বয়স পর্যন্ত পাঠাভ্যাস করে বলিয়াই বোধ হয় আবাসের বেশের ছেলেরা বেরদিগের অপেক্ষা কম দীর্ঘজীবী-সম্পন্ন। বর্তমান কালের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে স্বাক্ষর বোকা, প্রজ্ঞা, দীর্ঘ সমস্তই নিশ্চয় হইয়া পড়ে—কাজেই পণ্ডিত-মুখের সংখ্যা এত বেশী।) মোড়াইয়া মন বাড়ান, সত্বর-পটুতা-সাধ্যায়ে মনে হয় হইবার আশঙ্কা হ্রাস করা, বেশা-ধূলায় সাধ্যায়ে ও রীতিমত তৈলাভ্যাস দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌভব সাধন করা—এসকল একরকম বেশ হইতে উঠিয়া থাকিতেছে। তৎপরিবর্তে অঙ্গ সূতা, কাপড়, প্রভৃতি জীড়ার বহুপ্রসাং ঘটিতেছে। শৈশব হইতে মাংস-পেশীগুলিকে এই ভাবে অঙ্গ করিয়া, আদর্য যে কি অনিষ্ট করিতেছি তাহা এই সামান্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। (৩) উন্মুক্ত বায়ু সেবন কাহারো বলে, তাহা এই উন্মুক্ত-বায়ু-বহল মেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—আমরা এতই মুঢ়! ভগবান কৃপা করিয়া এই বালালা দেশে যে বড়বড় দ্বিরাছেন, এই শত-জামলা বয়সে যে বহুদল মলয় প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর অপর কর্তি দেশে তাহা হইয়া থাকে? এখানে ফুয়েলিকা বিতল, এখানে অমর বা দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষা নাই, এখানে শীতও প্রবল নহে। তবে কেন বাঙ্গালী ভগবানের মুক্ত-দান, জীবের জীবন, পবনসেবকে দেবতাব্যাপ্য দ্বিরাও নিজ ঘরঘর হইতে দূরে রাখে? শয়নাগারের বহুদল-মানিলায় পর্দা টাঙাইয়া, বাবাগার পর্দা লাগাইয়া, মাথা মুড়িয়া দ্বিরা ওইয়া, সন্ধ্যার প্রাকাল হইতে গৃহের মধ্যে আবৃত হইয়া

—বাঙ্গালী কি প্রভার করে! বধন থাক। বাড়ীর বাহ্যে ছিল না, তখন পাশাপাড়ীতে ও মুক্তিকামিণী গৃহে—সত্য-সত্যই গণক নাম সার্থককারী জানালাই ছিল। ইদানীং বড় বড় জানালা বহুভাষী স্ত্রীর সঙ্গে, নানাবর্ণের কার্টেন (পর্দা) ও সাদির অভিবাহুলা দেখা বাইতেছে। ফল কথা, যে দিক দিগাই দেখি, বাঙ্গালীর গন্ধে বিভূত বায়ু সেবন এক রকম হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যদিও গুরুতর। কার্ণা-বাগদেশে বা অপর কারণে কিছু কিছু বিভূত বায়ু সেবন করিবার অবসর পান, রমণীরা সে প্রথমে যত্নিত। অথচ কলিকাতার পর্দা স্ত্রীলোকদিগের উজ্জান হইয়াছে বলিয়া কত সোকে কত কথাই বলেন! একে ত রাত-দিন আঁত্রে ধরে, আঁত্রে জমিতে বাগ, তাহার উপরে অধিকাংশ সময়েই অন্তরহরণে থাকার কালে মেয়েদের স্বাস্থ্য প্রভাবাবিধি ক্ষুণ্ণ। পুতুল খেলা, বা কুটনা কেটার অভিনয়, ইত্যাদিতে বসতি। ব্যায়াম হয় সেটা বখেই নহে। বস্ত্রের ভাবী বংশধরগণের ভাবী জননীদিগের স্বাস্থ্য এতদংশ হইলে চলিবে না। অম্মাযদি বালক বালিকাদিগের মনে উদ্ভূত বায়ু-দেবনের উপকারিতার সংস্কার জাগাইতে হইবে। কিন্তু কে জাগাইবে? বয়োলোভার্টার এ চতুর্দিক বন্ধ করিবার হোক গম্যপত্তি। (৪) সদা-সর্বদা পরিষ্কার থাকার উপকারিতা সকলেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু পরিষ্কার থাক। কাহাকে বলে, সেই সম্বন্ধে ধোর অজ্ঞতা এ দেশে দেখা যায়। আমাঘের বেশে, প্রায় প্রত্যেক ঘরেই দেখা যায় যে, নিম্ন-নিম্ন গৃহগুলিকে পরিষ্কার রাখাই কর্তব্য মনে হয়, আর গৃহের চতুর্দিশে আবর্জনা কেনার ঘোঁষ হয় না; দিনের মধ্যে দশবার বস্ত্রের পরিগ্রহ করাই শুচিতাব-জ্ঞাপক,--হটক না পরিহিত বস্ত্র মলিন। যে পুরুষদিগের জলে দানাদি মণ্ডায়িত হয়, সেই পুরুষদিগের জলই পান্যের ব্যবহৃত হয়। এক থালা অন্ন ভূমিতে রাখিলেই সেই ভূমি কলুষিত হয়; কিন্তু মলিকাকুল-স্পষ্ট, কুকার্ণিত পলুষিত অন্ন ভোজনে গৃহস্থের বাধা নাই। ভোজন-পাত্র সতবার মার্জিত হইলেও, পুষ্টিগুরুতর মলক (ভাতা) কর্তৃক শেষে যে মার্জিত হয়, তাহাতে গৃহস্থের আপত্তি নাই। ভোজন প্রচারে আধারে নিত্যই আরম্ভনা, ইন্দুর প্রভৃতি থাকিলে সোম হয় না। শুদ্ধ থাকে না এমন আনোহার নাই;—অথচ সেই শুদ্ধ ভোজনে দিবা

নাই; কিন্তু হাড়ের সাহায্যে পতিভূত করা চিনি ভোজনে প্রভাবার আছে। কাপড়ে, গামছায়, খেণ্ডাঙ্গে, মেয়েতে সদি (কফ) মুহুরিতে আছে, কিন্তু শৌচ-প্রভাব করিলেই বস্ত্রতাগ করিতে হয়। এইরূপে কত সমস্ত প্রকারের বে অভ্যাস আমাদিগের মজ্জাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না,—কাজেই আমরা দেগুলির ঘোষ দেখিতে পাই না। এখন হইতে জনক জননীকে দেগুলি বুঝিতে হইবে এবং পৈশব হইতেই বাগক বালিকাগণের বাহ্যতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস হইয়া যার, তাহা করিতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, বালক-বালিকারা সারাদিন ময়লা থাকার ঘোষ হয় না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, অনেক ছেলে-মেয়েদের তেমন বস্ত্র করেন না; কেবল ঘর ত ঘর বৈকাল-বেলায়, ছেলেদিগকে একবার বাহ্যিক পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দেন। বালক মাছেরি মল জালবাসে এবং ধূলা-কালা ঘটিতে ভালবাসে। অনবরত ধূলাকালা ঘাঁটার ফলে নথের নিচে কত ময়লা যে জমিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। আর নথের নিচের ঐ ময়লা উদ্বার হইয়া কিম্বি ও উদ্বারবহের সৃষ্টি করে। সাদ্যাদিন জামাজোড়ার বাহুলা না করিয়া, সব-মত নথ কাটা ও চুল কাটা; প্রত্যহ তৈলাভ্যাস করিয়া গান করান; একটু অপরিস্কার হইলেই তখন পরিষ্কার করিয়া দেওয়া—ইত্যাদি উপায়ে শিশুদিগের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতেই হইবে যে, যে ময়লা থাক। সুবর্ণীয়। লতুকা, স্কল সময়েই ময়লার বিরুদ্ধে না; গাড়াইলে—খেণ্ডালের মনে কখনো-কখনো পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলে মুকলের আশা খুব কম। (৫) মনের ক্ষুধা—শরীরের উত্তরিত উত্তরসাধক। ইচ্ছাপ্রসূত মনের ক্ষমতা 'বে কত বেশী, তাহার ঠিক ধারণা আমরা চিকিৎসকেরাও সকল সময়ে করিতে পারি না। এমন কি, আমাদিগের এতদূর দূরদৃষ্ট যে, এতদেবীর কোনও চিকিৎসায় মেয়ের উপরে মনের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও তথ্য সিধান হয় না বলিয়া, অধিকাংশ চিকিৎসক ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু অপর সাধারণ এই বিষয়ে অবহিত বাহুল্য আর নাই বাহুল্য, চিকিৎসক ও শিক্ষক, বিচারক ও শাসক—এই সমস্তব্যয়ের লোকের পুখুপুখুপ্রাণে ঐ তথ্য অবগত হওয়া উচিত। দিত্যাবিত্য

যদি মনস্তত্ত্ব সংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সমাজের মানসিক-বৃত্তি স্বাভাবিক ভাবে কখনো ক্ষুণ্ণ হইতে পারিতে পারে না। নিত্যের অজ্ঞানতাবশতঃই, পিতৃমাতা কল্প-নৃত্যনৈকে অবজ্ঞার চক্রে বেধেন, যখন-তখন অজ্ঞান শাসন করেন এবং রাতদিন ভুতের ও প্রেতারের ভয় দেখাষ্টিয়া তাহাদিগের মানসিক হীনতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। গৃহে পিতৃমাতার অজ্ঞানকৃত হীন ব্যবহার, বিভ্রাণের শিক্ষকগণের অজ্ঞানকৃত দুর্ব্যবহার এবং সমাজে অজ্ঞানকৃত দুর্ব্যবহার;—একরূপ অবস্থার আবাদিগণের বালিকাগণের মানসিক ক্ষুণ্ণ হওয়া ঘূরের কথা, তাহার সফোটেই হইয়া থাকে। তাই আমাদের বালিকারা সর্বদাই ভীতি-বিষণা, নিত্যই অশ্রুভর, চিরকালই যেন শত-অপরাধিনী, সকল কথার ও কায়ে সন্নিধান, সকল চেষ্টাতে উৎসাহহীন—অথচ প্রগাঢ় ভক্তিমতী, তীক্ষ্ণ, বিস্ত্র অজ্ঞানাজ্ঞা। বয়স বয়সে আমাদের বালিকারা যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও হ্রস্ববেচনার পরিচয় দেয়, তাহা যেনিহে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ তাহারা বিভ্রাণ ধরা মার্জিত, সহ্যশূন্যতার দ্বারা পরিপূর্ণ, বাহ্যে দৃঢ় ও উন্নত দেখে ও মন-সম্পাদা কল্পিত কালে হইতে পারে নাই।

কল কথ, বয়সে বয়সে বালিকারা হৃদয় অধরে এবং অশ্রুজাল পালিত-পালিত হয়, তত অধর ও অশ্রুজাল কথ কখনো উচিত নহে। আমরা বুঝিতেছি না যে, আমরা কি নিমিত্তকে অধর করিতেছি। আমাদের সমাজের ভাবী জননী, আমাদের ভাতি ও গোপীরা তাহী প্রণবিতা ধোয়া হইবেন, আমরা ভুজ্ঞ অর্ধের মধ্যেই তাঁহাদিগের হাওয়া দেহ ও মনকে সুর করিতেছি। কাহেই আমাদের বয়সেরে আকর্ষণিত করি, বাহ্যে সুর, মনে কাপুরুষ ও রমণীমোহিত, আকর্ষণিত করি হইয়া আমাদের সঙ্গেরে তার বহুত্ব হইয়া পড়িতেছে। আমরা জ্ঞানী বয়স করিব না, আমরা জ্ঞানীতে সারিব না, অথচ পুষ্কর উত্তর কলবান বৃক্ষ আশা করিব, এ কেমন কথা?

বালিকার বিবাহিত জীবনের প্রথমদিকে—আমাদের বয়স বয়সে বয়সে—অল্প ঠাকুরাণীর বস্তুধোনে কাটে। এই সময় রমণী-জীবনে যুগান্তকাল। একদিকে পিতৃভূমির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, অপর দিকে স্বর্জনসে নিত্য নৃতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিবার স্তর আত্মবিক প্রায়স এবং তত্ত্বপরিপ্রায়ের বিকাশ—এই তিনটির একত্র সমাবেশের ফলে

কিছুমানসিক প্রলম্ব উপস্থিত হয়, তাহা বীর চিকিৎসক বাতীত অপরের দায়গার অতীত। শ্রীচন্দ্রবামনকে কোটি-কোটি বার প্রণাম করি যে, তিনি বয়স রমণীকে এই প্রথম প্রলম্বের মধ্য দিয়া কিছুমানসিক নিরাপত্তা পড়িচালিত করেন। এই কথাগুলির একই বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

বিবাহিত জীবনের প্রথমদিকে পিতৃভূমি-বিস্তৃত হইয়া সম্পূর্ণ নৃতনের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, বালিকার মনের ভাব কিছুমাত্র হয়, তাহা প্রণিধান করিবার বিষয়। সে যে তত্ত্ব নৃতন বয়সের, নৃতন আকাশ-বাতাস, নৃতন বায়ু-সের মধ্যে আসে তাহা নহে—সে কত নৃতন কথা শুনে, নৃতন আচার, নৃতন ব্যবহার দেখে। নিত্য নৃতনের মধ্যে সে আপনাকে হারায়েই ফেলে; পিতৃ-গৃহে তাহার মানসিক যে অংশটুকু উদ্বেষিত হইয়াছিল, স্বপ্নালয়ে অকস্মাৎ তাহা রহিত হইয়া মানসিক অপ্রাণত সমানে উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ করে। এই আকস্মিক অবস্থ-বিপর্যায় একান্তই কষ্টকর—আপাততঃ ভীতি-বিক্ষোভকর। এই নিত্য পরিবর্তন, নিত্য বিক্ষোভ-চাক্ষুণ্য সংঘ-সাধক নহে। বালো পুত্র-কল্পার মধ্যে যে পার্থক্য-ভাব অলক্ষ্যে মজ্জাপত হইয়াছে, স্বপ্নালয়ের ভ্রমবস্তিতা ও ব্যবহার-বৈত সেই ভাবকেই গোপন করে। আমি এমন বলি না যে, সকলেই স্বপ্নালয়ে মন্য ব্যবহার করে। যে ভাগ্যবতী বালিকা সেই চর্চা ভোগ করে না, তাহার পূর্বজন্মের চক্রটি অত্যন্ত বেশী বণিত হইবে। কিন্তু, এই কাকন-কোলিক্তের ফলে, এই বয়সবস্তিতা ও স্বাধ-পূজার দিনে, এই ভোগ-বিবরণ সমাজে নবোদার মনের মত স্বর্জন ঠাকুরাণী নিত্যক বিরল। বাক্যবান, অবমাননা, আহারে কষ্ট দেওয়া, ব্যবহারে রক্ততা প্রকাশ করা—এগুলি নিত্যক শিক্ষিত এবং তথাকথিত ভদ্র-বংশেও বিরল নহে। এবং কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ স্বর্জন ঠাকুরাণী কল্পিত নিম্ন বয়সের পরিচায় এত বিবেকহীন হন যে, তিনি আশা করেন যে, নবোদার বয়সে একনিমিত্তে সমস্ত শৈশবের বৃত্তি ও অধ্যায় স্মৃতি, রাতারাতি স্বর্জন ঠাকুরাণীর জ্ঞানপঙ্কজ লাভ করিয়া, আচার আদর্শ মনের ভালে জল দ্বিবার উপবৃত্ত হইয়া বসিবে। আবার যে বালিকা নবমোদনে স্বর্জন ঠাকুরাণী কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তিনিই গৃহীত রূপে বীর পুত্রবধূকে নিমিত্তক করিতে

কৃত্য বোধ করেন না ! কলতঃ, নূতন সংসারে প্রকৃতি হইয়া, "কল্যাণ"রূপে পালিত হওয়ার সৌভাগ্য সকল বালিকার তাদো ঘটে না বলিয়া, অল্পকালকার বালিকারা সকল বিষয়েই অসংকট হইতে শিক্ষা করে।

বিবাহের দ্ব্যর্থনি সময়, বালিকার ত্রী-বর্ষ আরম্ভ হয়। অজ্ঞাতবশতঃ অনেক বালিকা উচ্চতর ভীত হইয়া পড়ে। কেহই তাহাদিগকে শিক্ষাইয়া দেন না যে, বার-চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ১৫-১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত মাসিক আর্ন্তবস্রাব হওয়া প্রকৃতির ধর্ম। আর তদপেক্ষা আরো আবশ্যকীয় একথাও কেহ শিক্ষান না যে, ঐ মাসিক ত্রী-বর্ষকে অগ্রাহ্য করার মত বাহ্যমাসিকের অতি অল্প কাহই আছে। বৃথা শাস্তা করিয়া, অথবা ততোহধিক বাধ্যতায় করিয়া, আর্ন্তবকালে হেদায়-প্রচায় চলিয়া বাহিতে দেওয়ার ফলে, আনাদিদের রমণীরা ভয়বাহা, চিরদুঃখ ও অস্বাস্থ্যঃ সন্তানের জননী হইয়া থাকেন। যদি শুধু কিঞ্চিৎ জ্ঞানের ও চারটি দিনেরই মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা নিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সকল পোলই হিটিত। কিন্তু-শাস্ত্র-মতে আর্ন্তবত্বকাল রমণীকে কোন ভিনিসি স্পর্শ করিতে নাই। অথচ মনকে চোখ ঠাঙ্গিয়া, আনাদের সেবের বধূয়া সকল কাহই করেন, এবং চতুর্ধ দিবসে যেমন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, স্নান করিয়া মনকে শুদ্ধ করিতে বিধা বোধ করেন না। হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, বধূঘাতা ঐক্লপ শারীরিক অবস্থাপন্ন হইলে, সকল কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া, শারীরিক ও মানসিক বিজ্ঞানে কাল কাটাইবেন, যেহেতু ঐ কয়েক দিন ত্রীমাসকের মেহের পক্ষে বহু প্রলম্বের কাল। ঐ সময়ে শরীর ও মন—কোনটিই প্রকৃতিস্থ থাকে না, এবং ঐ সময়ে ঠাণ্ডা লাগান বা পরিভ্রম করা বাহ্যের পক্ষে আশৌ অস্বকুল নহে। যে রমণী আর্ন্তিক কালকে গোবনে অগ্রাহ্য করিয়া জলেন, তিনি বেশী বয়সে সময়ে-সময়ে উন্মাদপ্রাপ্তা পর্য্যন্ত হইয়া থাকেন।

বিবাহিত জীবনের যথাকাল—সাধারণতঃ স্বাধীন ভাবেই কাটে। অর্থাৎ, প্রায় ঐ সময়-বরাবর স্বক্ৰীয়াস্বাধীন্য পরলোকগতা হওয়ার, বধূয়া স্বয়ং গৃহিণী হইয়া উঠেন। নিম্ন সংসারে গৃহিণী হইলে পরে, বিহার যেমন আর্থিক অবস্থা, তাঁহাকে সংসারে তত্ত্বয় ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। দান, দানী ও পাচক রাখিবার সামর্থ্য থাকিলে, অনেকটা

অল্পম ভাবেই জীবন বাগন করা চলে; ওদিকে, সংসারের সকল কাহেই গৃহিণীকে "কৃতগত" পরিশ্রম করিতে হয়। আর ঠিক এই সময়েই বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসূত হইতে থাকে। কাহেই, এই সময়েই আসক্ত বা অতিরিক্ত শ্রমবশতঃ, এবং অপর বিকে বহু প্রসবের ফলে শরীর ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করে;—কুড়ি পার হইতে না হইতেই রমণীরা কুড়ী হইয়া পড়েন। দরিদ্রের সংসারে, নিত্য-অজ্ঞাৎ প্রবৃত্তি, গৃহিণীর আহারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায়, এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল সংসারে চা, মোকানের মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং বৃথা বাসনে শরীর খারাপ হইতে থাকে। পুরুষেরা তাঁহাকে ষাণ্ডাটাকে বোধ মনে করেন না বলিয়া, ত্রীলোকেরাও তামাক পাভা (বোক্তা, পুষ্টি, দরদা) তৎকণ করাটাকে অস্তায় মনে করেন না। অতিরিক্ত ত্যাগ-চর্য, অতিমাত্রায় তামাক পাভা খাওয়া আনকাল যেখানে সেখানে প্রচলিত; এমন কি অল্পবয়স্ক বালিকা নিম্ন দাতার নিষ্কট হইতেই অগ্নানবদনে তামাক পাভা চাখিয়া গেলেন!

গোবনের শোষণ—মুখ-দুঃখ, শ্রম-বিজ্ঞান,—এইক্লপ একটা সংশ্লিষ্ট অবস্থা। এই সময়-বরাবর পুত্র উপার্জন-সক্ষম হইতে আরম্ভ করে এবং কল্যাণদেবের বিবাহ দিতে হয়। এই সময়ে কাহারো স্বামীর যেমন বৃত্তি হয়, কেহ বা কার্য, এমন কি সংসার হইতেও অবসর গ্রহণ করেন। মোট কথা এই যে, সাধারণিক অবস্থায় অস্বকুল-প্রতিকূল অবস্থায় অস্বপাতে এই সময়ে গৃহিণী দিন বাগন করেন। তবে বোধ হয় এটা অনায়াসে বলা যায় যে, যেইর জাপ স্থলে, গৃহিণীরা ভয়বাহা হইয়া পড়েন; কিন্তু সংসারের সকল বিষয়েই ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে অহুশিগ হইয়া থাকেন। এই বয়সেই সপ, সাধ, বাসনা কামনা তরল না থাকিয়া দান্য বাধিয়া উঠে—এই সময়েই পুত্রের বিবাহে অর্ধা-পার্কনের হুযোগ, এই সময়েই পুত্রবধূ উপরে শাসন, এই সময়েই গৃহ-বিচ্ছেদের সমস, এই সময়েই লেবা-গ্রহণ-পুণ্য, মুখভোগের আকঙ্ক্ষা।

বার্দ্ধক্য।

সকলের ভাগে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় না,—হইলেও বৈধবা বা অতিমাত্রায় দুঃখ ভোগের হুযোগ ব্যতীত এই অবস্থায় বলিবার কিছু থাকে না।

উপসংহার ।

বাংলা অভিভাষণের সঙ্গে জ্ঞানপ্রদর্শন করিয়া, শৈশবে
শৈতব্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া, কৈশোরে সর্ববিধ
নৃতনবের আবেশে পড়িয়া, যৌবনের যথার্থ্যে সম্পূর্ণ
স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া, এই অর্ধ-সর্বত্র সুখে,
এই অবাচ্যের কালে, অসংখ্যের কোড়ে লালিত-পালিত
বর্তমান কালের রমণীর প্রীতিনের কি উদ্বেগ থাকে এবং
তাহার সাক্ষ্য করতঃ হয় ? যে জাতি সেবার দাসী,
কর্ণে মন্ত্রদাসী, কথার ধরিত্রীমুগ্ধা, গুহ্যের মাতা ; —
বাঁহারা আভ্যন্তরীণ পুরা প্রকৃতির অংশ ; —বাঁহারা আত্ম-
বিশেষ বংশধরের সর্বভাগিনী, দেশের ও দেশের পালিনী,
সে রমণী আত্ম কোথায় ? আত্ম অক্ষতক্ষিত, ভয়চকিত,
মুগ্ধ, সহ্যই অপ্রস্তুত কামিনী অনেক ; —আত্ম চপলা, সুখর,
আত্মপরিত্র, ভোগবিলাসিনী জামিনী বহু ; —আত্ম বহুতপ-
ধারিত্রী, বহু দীপ্যমানী, বহু জামিনী রমণী বলাবৎ ।

আত্ম বাঙ্গালীর বেয়ের মাকুষ্যের গুরুত্ব জান নাই,
আত্ম তাঁহাদের সে যোগ্যতাও বুঝি নাই । আত্ম সমাজ
বহিঃস্থ ; মায়েরা তাই প্রাণহীন, শক্তিহীন, দাসী । আত্ম
সমাজ ব্রাহ্মণ শক্তিদ্বারা, তাই আত্ম মায়েরা বেদী ছাড়িয়া
মাটিতে বিচরণ করিতেছেন ।

এক পক্ষে ভর করিয়া কোন বিহবই উড়িতে সমর্থ হয়
না—সুগাংভার রামচন্দ্রকেও সর্বপীতা প্রস্তুত করাইয়া
যজ করিতে হইয়াছিল । আর আত্ম আত্মা রমণীর অকল-
প্যক হইয়াও, রমণীর উত্তরিত দিকে মন দিই না ।
ঔষধিগণকে বিনা বেতনের দাসী করিয়া, সুখভোগের সাধন
ও উপকরণ হলে করিয়া, আত্মা শুধু সেই ভাবেই চলিতেছি ।
—চলিতেছি কোন্ পথে ? রাসতলে !

আত্মবিশেষের এখনিই কিহিতে হইবে,—এখনিই জাগিতে
হইবে—নতুবা আত্মা শোণ পাইবে । আত্মবিশেষের কর্তব্য
কি ? কর্তব্য এই :—

(১) পুত্র ও কন্যা—কাহারো সহিত ব্যবহারের
পার্বক্য রাখিতে পারিব না । বৃথাতা ও কন্যা এতদ্ব্যতির
যথোৎ কোন ব্যবহারের যৈতব্য রাখিব না । উত্তর
ক্ষেত্রেই সমান বর, সমান ভাদবাসা, সমান ঐকান্তিকতা

বেখাইতেই হইবে । বতদিন তাহা না পারিব, ততদিন সে
মারিব প্রথম করিব না ।

(২) আত্মবিশেষ সংখ্যের কঠোর ত্রুত আপনাতঃ
সহিব, পুত্র-কন্যা-নির্জিনেবে সকল সম্মানকেই সংখ্যের দৃঢ়
পথে অগ্রসর করাইয়া দিব । ভোগে হ্রাস, ভোগে
হ্রাস ।

(৩) অজ্ঞান, অবিজ্ঞা,—দেশ হইতে দূর করিয়া
হিতে হইবে । দেশাচার ও লোকচাচার নামে যে শিক্ষা
সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাশিক্ষিত হইতে হইবে । প্রকৃত
সত্যের সম্মান করিতে হইবে এবং সম্মান হিতে হইবে ।
এক সঙ্গে, ত্রুত-পুরুষ উত্তরকেই স্থানিক্ত করিতে হইবে—
পুঁথির বিজ্ঞা ভাগ করিয়া কার্যকরী বিজ্ঞা শিক্ষা করিতেই
হইবে । গ্রামে-গ্রামে বাসিকা-বিভাগের স্থাপিত করিতে
হইবে এবং তৎসঙ্গে পাঠা-ভালিকার পরিবর্তন সংঘটন
করাইতে হইবে । জ্ঞানই আলোক, অজ্ঞানই অন্ধকার ।
সেই সত্য জ্ঞানের বিকাশ ধরে-ধরে করিতে হইবে ।
পুরুষবিশেষের পক্ষে শুধু আপন সহীতা থাকিলে চলিবে না,
রমণীবিশেষও শুধু গৃহস্থানীর কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে
না । উত্তরকেই উত্তর্যুক শিক্ষাদান করিতে হইবে ।
শিক্ষা বর্তমান কালের একটি প্রধান অঙ্গ ।

(৪) বাহ্যকে সর্বপ্রকারে উন্নত করিতে হইবে ।
গৃহকার্যে যেটুকু পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা ত করিতেই
হইবে ; পরন্তু ঘরোয়া দাসদাসী-পরিহৃত্য তাঁহাশিক্ষিত
রীতিমত ব্যায়ামও করিতে হইবে । ব্যায়ামে অসুখোন্ম
বৃদ্ধি পাইবে বৈ কহিবে না । ব্যায়াম করিতে নিষেধ করিয়া
ও দূর বাধু হইতে বঞ্চিত করিয়া ভগবান রমণীকে দৃষ্টি
করেন নাই । যিনি জাতির মাতা হইবেন, যিনি দেশের
তবিত্ব আশা-ভরসার স্থলগণের জননী হইবেন, তাঁহার
স্বাধা সর্বপ্রকারে উন্নত করা প্রয়োজন । অস্ত্রের লক্ষ্য, অস্ত্রের
আত্ম-বিনয় অথবা অস্ত্রের করিয়া ভগবৎকর্তৃ নিষ্কেষে বেহকে
ভুক্ত জ্ঞান করিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এই চন্দ্র দানব
বেহকে অগ্রহ করার চার মধ্যপাতক আর নাই । নিজ
বেহকে অগ্রহ করা, আর আত্মহত্যা করা একই কথা ।
খাতি লক্ষ্যে অবহিত হইতে হইবে, ক্রীতগবানের মন্দির
এই বেহকে সূত্র ও স্বহ রাখিতে হইবে ।

বাড়ঘরের এক কোণ

[শ্রী দরবেশ দত্ত রায়]

ছুটির দিন বিশ্রামের সময় আর কিছুতেই কাটিতেছিল না।
ঠাণ্ডা খেয়াল হইল, বাড়ঘর দেখিয়া আসি।

ঘুরিতে-ঘুরিতে নীচের তলায় তিনটি প্রস্তর-পুস্তকিকা
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে তিনটির সম্মুখে বহুক্ষণ
চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিম্নলিখিত প্রস্তরময়ী তিন-
ছোড়া নয়নে কি অস্বাভাবিক পরসন্ধান করিয়া আমার মূঢ়
করিয়াছিল জানি না; কিন্তু সেই তিনটি ছোট রূপসী
আমার চক্ষুর সম্মুখে নিরন্তর ঘুরিতে লাগিল। আহারে-
বিহারে, শয়নে-স্বপনে ওই তিনটি সুবতী ছুই দিন ধরিয়া
আমার অগতে সঙ্গময়ী হইয়া রহিল। ঘরে ঢোক দাও!
সেবে কি ঔপচাসিক-কথিত প্রথম দর্শনেই—তাও আবার
প্রশ্ন—! হায় রে কপাল!

দুই দিন পরে আবার বাড়ঘরে চলিলাম। কোন দিকে
না চাহিয়া, সর্বপেক্ষা নীরব সেই অংশে, সেই পুস্তকিকা
তিনটির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। যৌদ্ধ হইল যেন সে তিনটি
একসঙ্গে আমার দিকে চাহিল। ছায়াই নয়নে বড় দৃষ্টি, বড়
মধুর, সুবতী-সুভাবসিদ্ধ বিদ্যায় হানিয়া পরম্পরের পানে
চাহিল। ওঠপুটে স্বপ্নের সেই আনন্দের শোভা, হাসি বিক-
শিত হইল। ওই হাসি, ওই চাহনি আমার বলিল, “তুমি যে
আমি আসিয়ে তাহা জানিতাম।”

সন্ধ্যার সময় ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি আসিল। বর্ষণের
এখন দাৰ্দ্ধী সামলাইয়া ঝুপড়প শব্দে বড় মধুর বৃষ্টি হইতে
লাগিল। আমার কক্ষ-সঙ্গী আর তিনজন বাকীতে;—
কানেই, একা আমার সুবিধা। এক পেরাশা পরম চা
পানোতে, ঠাকুর-চাকরকে আবার ডাকিতে বারণ করিয়া,
হায় বড় করিয়া অককার ঘরে শুইয়া পড়িলাম। প্রত্যেক
শব্দে চরণ-বাকীরের মধুর ধ্বনি, কক্ষনের দিঠা আগায়া
বলিয়া আমার তুল হইতেছিল। প্রতিম্বণেই মনে হইতে-
ছিল, তিনটি তরুণী এ উৎসাহে জড়াইয়া, ব্রীড়া-সমুচিত,
ভয়ঙ্কর-চরণে আমার বহুদারে আসিয়া ফিরিয়া-ফিরিয়া
বাইতেছে। ওগো, দুহায় কি খুলিয়া দিব?

মুহূর্ত্ত পরেই বাড়ঘরের সেই কোণটি আমার চক্ষুর
সম্মুখে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই তিনটি সুবতী—
এখন কিন্তু প্রস্তরের নহে—অপূর্ণ রূপ-বিকার স্থানটি উজ্জ্বল
করিয়া বলিল। তরুণীদের ঘোষের অকুণ্ঠিত মধুর স্বর
তুলিতেছিল; পেশব তরুর উপর লাগণের মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে
নব-নব বিকাশ আমার মূঢ় করিতেছিল। তাহাদের শীলাঙ্গ-
নয়নে মলয়শরীরসোপিত করলের সঙ্গীলতা হাসিতেছিল।
চমক ভাঙ্গিলে দ্বিজ্ঞান করিলাম, “তোমরা কে? কি
চাও? কেন তোমরা আমার—?” ইচ্ছাতির পুণ্ড্র সমীরণের
স্পর্শে এখানে যেনন করিয়া গছটুকু নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয়,
যেন নিবিষ্ট মাধুরী শব্দ করিয়া তাহারা তেমনি করিয়া
হাসিল। তেমনি দ্বিরে, তীরে, অঙ্গ নিশাইয়া। বহুক্ষণ পরে
আবার দ্বিজ্ঞান করিলাম, “তোমরা কি চাও? কে
তোমরা?” “কে আমরা আসিতে চাও?” তাহাদের মধ্যে
একজন মৈত্রিক শোভার উপস্থিত বয় ও ভঙ্গীতে দ্বিজ্ঞান
করিল। আমি বলিলাম “হাঁ চাই; বল দেখি তুমি।”

আমার এই অস্বাভাবিক এক নূতন সৌন্দর্য্য প্রকটিত করা-
ইল,—প্রত্যেক প্রত্যেককে অস্বাভাবিক করিতে লাগিল, “তুমি
বল।” ওই মধুর দৃষ্ট কিছুক্ষণ অতিনয় করিয়া একজন
কহিল “আমাদের আর একজন এখানে নাই,—কে তাহার
অংশটুকু বলিবে? যদিও আমরা সকলে এক সমগ্র
জীবনেরই ইতিহাস, তবুও আমরা সব জানি; নিম্নের-
নিম্নের অংশটুকুই আমি। আমরা এক পূর্ণের এক-এক
অংশ। তার চেয়েও তোমার দিঠা চক্ষু নিশায়; তোমার
চক্ষুর সম্মুখে আমাদের ইতিহাস অতিনীত হইবে; তুমি
সেখানে পাইবে।” আমি বলিলাম “সন্ধ্যার মত,
তবাব্দ।” বলিলাম—

নগরের পথে প্রচুরিত হইতেছে, বিপুল ঘনের ও সেই
নগরের অধিপতি বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ চন্দনবাসের একমাত্র তরুণী
কল্পা সুবতী-শ্রেষ্ঠা সন্ধ্যার, কলা সঙ্গী-পূর্ণিয়ার গোপ্ণি-
লয়ে সিঁদোনীতে অবগাহন করিবেন,—নদীতীরবর্তী পুণ্ড্র

কাননে নদীগগন-পরিবৃত্তা হইয়া জীড়া করিবেন; অপরাস্থের পর আর যেন কেহ দেখানো না যায়। এই আদেশ আত্মসাৎ করিলে ভীষণ শাস্তি।

নগরের উপকণ্ঠে, নির্জন পল্লীতে, নদীতটবর্তী ঘোট একখানি হুটাইয়া নবীন ভাস্কর প্রায়ঃ সেই কথা তুলিল। বাসনা হইল, লুকাইয়া সে এই রূপ-স্বপ্ন গান করিবে।

অনেক দিন হইতেই সে তাহার দ্বারে এক নারীকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল; কত ভাবে তাহারই রূপ প্রত্যয়ের উপর হুটাইয়া ভুলিতে সম্যক কৃতকার্য হইতেছিল না। আর সেই কল্পনাময়ীকে প্রধাত্যনামা এই বাহুব সৌন্দর্যের সন্নিহিত মিলাইবে, যদি কোন নবীন উদীপনা পায়। সেই কল্পনাময়ীর প্রেমে সে এত মুগ্ধ ছিল যে, কোন বক্তব্য-সংকল্প-বাধিতর পানে সে চাহিয়াও দেখিত না। শত-শত অভিসারিণী তাহার কাছে প্রাত্যাহিক চাইয়াছিল। তাই সে পাগল বলিয়াই নগরে বিদিত ছিল। আর হঠাৎ এই পাগল বুদ্ধবলীর বাসনার আদ্র হইয়া ঐ রূপনীরে দেখিতে চলিল, কাহাটা পণ্ডিত কি, অগণিত হইবে তাহা বিবেচনা করিল না।

সিপ্রাকুলে বৃহৎ উপবনদ্বারে শ্রেষ্ঠ-কর্তা তাহারই উপবৃত্তা রূপবতী, চকলা, তক্ষণী নদীগগনে পরিব্রজিতা হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন। উপবন রূপে উল্লিয়া উঠিল। চকলা ললনাসের হস্ত-পরিচীনে কানন-প্রতিধ্বনিত হইল। বেল, মল্লিকা, বৃক্ষিক। হাসিয়া-হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। শেকাণিকা আনন্দে লাল বর্ণন করিল; সরোবরে কুবু, কল্লার হলিয়া উঠিল, কমলজীব আন্দোলিয়া নাচিতে লাগিল। জীড়াসক্তা বুধভীষের ভরে পক্ষীকুল কুলনে কানন-প্রতিধ্বনিত করিয়া উড়িয়া-উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে পূর্ণিমার নদী ধীরে-ধীরে গগনে দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ, ধবধী, নদী লকলের উপর সোণা নীল পথিত তরুণানির নখ কান্দি হুটাইয়া এলাইয়া হুটাইয়া পড়িল। সেই শোভার লগৎ মৃত।

মল্লিকা কহিল, “চল নদী, জলজীড়া করিগে।” অভি-মানে মল্লিকার বক হইতে কাঁচলী খলিয়া পড়িল, গুড়না কাঁদিতে-কাঁদিতে স্তম্ভিত হইতে লাগিল, মিচোল বৃষি জ্ঞান হারাইল। নুপুর, মেঘলা, সৌন্দর্য-হাস, কেশব, কখন চিরকাল জিবিব্রুত হইয়া একস্থানে জড়াজড়ি হইয়া বৃষি

অক্ষললে তাসিতে লাগিল। শ্বেতবহর কটিতে জড়াইয়া মল্লিকা সিপ্রায় নামিল। সিপ্রা আনন্দভরে তাহার দেহ-পানি দূর আলিঙ্গনে বহু করিল। লাকাইতে-লাকাইতে মিচোল অঙ্গ ডিগাইয়া দুই বাহুর নীচে দিয়া পীযর বন্ধে আচ্ছাদিয়া পড়িল, উচু হইয়া অধর-স্বপ্ন গান করিতে চলিল। বাহুব-পরাঙ্কিত হইয়া চলিয়া গেল, শুণ্ড হাসির শেষ নাই; তখনো বৃষি আশা কর্তে করিতেছিল, ‘বাসনা চরিতার্থ হইবে।’

বহুক্ষণ জলজীড়া হইল। এক-একে সকল রূপনীর চলিয়া গেল; জলে রহিল কেবল মল্লিকা ও তাহার প্রধাতা নদী মনিকা। আর-আর নদীরা অবগাহনাসে মল্লিকালোপ করিতে লাগিল। সেই অবসরসীতে, নদীয়ার মধুর স্বভাবে সব গুহ হইল। মনিকা কহিল, “চল মণি, উঠি।” “না নদী, দেখত, কি দৃশ্যের সোণা,—সিপ্রায়ই বা কি শোভা! সে তার—যে-উপনা আর পূর্ণায় কোন কবি যেন নাই সেই উপনায়—বোড়ানী-নন্দ-স্বপ্ন বাহিরায়ি লইয়া ছুটাইছে। দূরে নীলিমার আর পর্তের তরুণতার কি দৃশ্যের মিলন! মোহন এই উপবন, বুধভীর বর্তন:সহ মধুর গুহ গুহ, আর এখানে—জন্মে দুই দৃশ্য-প্রোষ্ঠ—বৃষি অষ্ট-দশী, আনি বোড়ানীর মধু সৌন্দর্য! শুধু আনন্দ; গুণ এই, সৌন্দর্য্যভিখারী কোন পূর্ণবের কবিত্বমাণা পূর্ণ নরন নাই!” “ওগো মণি, তা নয় গো, তা নয়। সবই তোমার ঠিক হল বটে, কিন্তু দুই দৃশ্য-প্রোষ্ঠ এই কথাটি—” “কেন?” “মান না কি তাই? কতবার বলেছি যে!” “ও,—সেই তোমার প্রিয়তম, নবীন ভাস্কর প্রায়ঃ—তারই কথা; আচ্ছা, তার বাড়ী না বলেছিলে এই ‘সিপ্রায়ই কুলে?’” “হঁ, আর একটু উল্লেখে।” “আবার কিন্তু তাই সেই পাগলকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করে; দেখতে চাই যে, সে কেমন পাগল। বল না ভাই, এখানে গাড়িয়ে, তোমার সেই কাহিনীটা।” “সেই আবার? তা শোন।”

“আর বহুর এমন একদিন কুল সোণাঘাষ তার সেই হুটায় গিয়েছিল। সেই গুহের নির্জন নিশাথে কেউ কোথাও ছিল না। শুধু অভিসারিণী আনি, আর আবার সম্মুখে সে। তাহার কটি দুই বাহুতে বেড়িয়া বলিলাম, ‘ওগো প্রিয়তম, ওগো স্পষ্ট, আমার রূপ-যৌবন সার্থক কর;—ওগো একবার, শুধু একবার।’ সে বলিল, ‘না গো না,

ওগো ভগবতী, তুমি কিংবদন্তি—আর কাজকে জীবন উৎসর্গ করগে। তুমি আমার স্মৃতি দেওতে পার্কে না, পাতি দিতে পার্কে না। তোমার রূপে শুধু লাগসা আছে,—আর কিছুই নেই। আমি ও ত চাই না।’ আমি বলিলাম, ‘আর একবার চেয়ে দেখ,—ওগো, তুমি আর একবার।’ আমার হৃৎ হাত তার স্ত্রীর ভিতর নিয়ে, সে কান্না কান্না আকাশের দিকে চেয়ে রহিল; তার পর বীরে-বীরে নামিয়ে, এক হাত লগাটে দিবে, আর এক হাত চিবুকে দিবে, মুখ তুলিয়া ধরিল, নয়নে নয়ন মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। তার উচ্চ নিঃশ্বাস আমার মূখে পড়িল। রহিতে পারিলাম না, অকস্মৎ তার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিলাম। সে এই মোর হুই বকে হাত দিয়া আমার বাধা দিল। কহিল, ‘ওগো মনসী—’ আমি কহিলাম, ‘না গো না, আমি তনিব না। তুমি কনিকের জন্ত আমার বকে চাপিয়া ধর, আমার—, তুমি রহিতেও আমি বীত্বত;’ সে কহিল ‘কেন তুমি রূপ-যৌবনকে লক্ষ্য দেওরাইবে। আমি অমন করিয়া নিখিল ধরার রূপ-যৌবনকে অপমান করিতে পারিব না। প্রেমের উপাসক হইয়া তাহারই মাথা নত করাইব? তুমি চলিয়া যাও।’

মহরিকা কহিল, ‘সখি মনসিকা, সে কি বড়ই রূপবান পুরুষ?’ ‘তবে কি অসুখবের জন্ত স্বপ্ন হুইয়া শ্রেষ্ঠা,— মনসী-শ্রেষ্ঠা মহরিকার প্রিয়তমা সখী বীর রূপ-যৌবন বিকাইতে গিয়াছিল?’ ‘ওঠ সখি, আর নয়; চল হাউ।’

বীরে-বীরে হুই সখী হাত ধরা-ধরি করিয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধি ঐমনি করিয়া বহিত, হৃদয়বানী সস্তু শান্ত করিয়া উল্লসী বলবিতল হইতে উঠিয়াছিলেন। যোপানের উপর বিবদনা হুই বৃথাতী গড়াইল। আলুগণিত কুতল হইতে বলধারা করিয়া পড়িতেছিল। ক্রী-অল হইতে বলধারা করিতে লাগিল। জোৎস্না চুনট লাগাইল। সার্বক তাহার সাধনা, সার্বক তাহার অম্ম। সমস্ত ধরনী শুষ্ক হইল, সকল অসুখর ভয়ে পলাইল। কটকট বসন হুই সখী বীর অঙ্গে অড়াইতে লাগিল।

অকস্মৎ মহরিকা মলে লাফাইয়া পড়িল। সত্যের মনসিকা বলিল, ‘সখি, কি?’ সন্দেহের তীরস্থিতবহুল-বৃক্ষট সে নীরবে দেখাইল? পরিহিতবাসা মনসিকা অঙ্গপর হইয়া চাহিল। কিরিয়া কহিল, ‘সখি, আর

কেহ নয়;—তুমি তোমার কামনা সিদ্ধ করিতে নবীন ভাবের প্রচার আসিয়াছে।’ প্রচার নাহি আসিল। বলতে গড়াইয়া, মনসিকার সন্দেহে মহরিকাকে কহিল ‘ওগো ভগবতী, ওগো মোর মানসদামি, প্রেমের জন্ত সব সধিতে পারি; আল তুমি তোমার কাছে নিবেদন করি, আমার সাধনা সার্বক কর, আমার অম্ম সফল কর, ওগো মহরিকা ওগো মনসী, ওগো মম্, ওগো মম্।’

মনসিকার মধ্যস্থতার বিফলা সন্ধান হইল। মহরিকা কহিল, ‘এখন হইতে চারি বৎসরের ভিতর এমনি প্রতি লক্ষ্য-পূর্ণতার দিনে একটা-একটা সাধনার নিদর্শন হিতে হইবে,—যদি তাহাতে তাহার হৃদয় অম্ম করিতে পারে;— অস্ত উপায় নাই; অস্তবার রামবত।’ প্রচার বীত্বত হইয়া চলিয়া গেল। চতুর্বাৎসর আর কেহ আসিল না। মনসিকাকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরানন্দে সকলে গৃহে ফিরিল। ০ ০ ০ ০

এক বৎসর কাটায়া গিয়াছে। আমার সেই মনসী-পূর্ণিমা আসিয়াছে। প্রত্যয়েই নগরাদিগণিত চন্দনধানের সত্যগৃহ পূর্ণ। প্রতিবারী সত্য প্রচারের আগমন-বার্তা আসাইল। অসংশয়ী বীর কৃত্তিক কেন বায়ুতের চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেছে, চন্দন-চর্চিত বেহ হইতে একটি দিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতেছে,—যেত উত্তরীয় বাতাসে উড়িতেছে; এক হৃৎস্পন্দীণ, অপর হৃৎ বজ্রাত্ত কি একটা জিনিষ—তাহার সত্যগৃহে প্রবেশ করিল।

উত্তরী-বস্ত্রের কহিলেন, ‘প্রচার, আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন?’ নিরন্তরে বজ্রাত্ত জিনিষটি শ্রেষ্ঠের পদতলে রাখিয়া প্রচার বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করিল। অমূল্য-পূর্ণিমা বজ্রারের পর বজ্রার, সূর্য্যার পর সূর্য্যার, বীরের পর বীর বীণার প্রতি পর্দা হইতে বর্ণিতা উঠিল— বড় কল্প, বড় দিগ্ধ, বড় মনসপার্শ্ব সেই হুই। সমস্ত নীরব। হঠাৎ বানকের স্বর কাণিতে-কর্ণাগিতে পকবে দ্বির হইল। সে গাহিল ‘ওগো মেবী, তোমারই কুটী-সাধনার্থ আমার এ আয়োজন। সেই কি শুভ সময়ের গোমুখি, যেদিন তোমার নরনের, তোমার রূপের যৌবনী প্রভাবে এ বীরের জীবনধারা উন্টাইয়া গেল? সেই দিনটি আমার এসেছে— নতন কিছু পাব না কি? পূজারীর এ নৈবেদ্য কি তোমার অনোমত হইবে না?’ ‘সাদু, সাদু,’—উল্লাসে সত্য বলিত

হইল। বীণা রাখিয়া প্রহর অপর জিনিসটির আবরণ দ্রুত করিল,—খোদিত ক্রী-মুদ্রি!

চন্দনবাস কহিলেন, “ভাঙ্গর, এ কি পুষ্প-লগ্নায় নবোদার প্রবেশ? তাই লালমস্তা, অশাধ-মুদ্রি-কেশণা, হর্ষমধুরা?” “হাঁ যেব, বিষয় ঐ বটে; কিন্তু এখানে প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দুইয়ের সমুদ্রে শকুন্তলার প্রবেশ খোদিত হইয়াছে। আননের ঐ ভাঙটি কি মিলনানন্দে লঙ্ঘিত, বাহ্যের অঙ্গ নাচার শক্তিত তাব প্রকাশ করে না?” বিদ্যারবার সভা ভগ্নোজ্জ্বলে প্রতিধ্বনিত হইল। বহুমুখা ধীরক-হার শির হইতে বুলিয়া চন্দনবাস কহিলেন, “কবি, ভাঙ্গর, প্রহর, আর কি চাও তুমি?” আশায়, উৎকর্ষায় যে অস্ত্র-পুর-চাষিদের পর্দার দিকে চাহিল। নিরাশার বীণার স্তম্ভীতে পুনরায় আঘাত করিল। হাত কাঁপিয়া গেল, রাসিকি উঠিল না। তন্ত্রে প্রহর সভার বাহিরে চলিয়া গেল। বিশ্রিত প্রেরণা সমুদ্রে কতকী নিবেদন করিল, “যেব, কুমারী মন্ত্রিকা পুস্তকিকাটি চাখিয়াছেন।”

এইবার বুঝীত্বের ভিতর প্রথমা কহিল, এই—“এই সলৌটি আদ্যের বহুচাত। এখন আমাদের মুখ হইতে শুনিত পায়।” আমি কহিলাম “না, এইরূপেই আমি দেখিতে চাই।” “খাচ্ছ।”

বিদ্যার বৎসর তেমন পূরীকেশের সভার সেইদিন প্রহর প্রবেশ করিল। চন্দনবাস জিজ্ঞাসী করিলেন, “উদ্যার! এটি কি প্রথমলিপি-লিখনরতা মারিকার বৃত্তি খোদিয়াছ?” “হাঁ যেব, দুইয়ের প্রথম লিপির উভয়ে, শকুন্তলা সেই লিপির উভয়দিকে, লেখনী ও কালি অভাবে লালকায়সে গাছের কাঁটা দিয়া লিখিয়াছেন। পূর্ণ-প্রহর মরণে আনন হাজোচ্ছল, কে কোথার দেখিতে পাইবে তাই সন্ন-কুকিত—এই ভাবটি কি ছুটিয়া উঠে নাই?” এটিও সাধারণের প্রশংসালাত করিল; কিন্তু তাহার মানসরাশির ক্ষয় লয় করিতে পারিল কৈ? প্রহর বীণা তুলিয়া গান ধরিল; কহিল “সেবী, এত—” কথা ছুটিল না, বিশ্রিত সকলের সমুদ্র দিয়া সে ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

নির্জনে মন্ত্রিকা নিম্নের কক্ষে পুস্তকটি বন্ধের উপর চাপিয়া ধরিল—অল্প চুপন বধিল। কহিল, “ওগো দেবতা, দেখে বাও, অপমানিত তুমি নও; অন্যতর দ্রুত টানিয়া তোমারই স্পর্শকে চুপন করিতেছি। ওগো দেব, যে প্রেম

বিষ-বিজয়িনী, তা’ ত ছুটাইতে পার নাই; চুটিতেই লালনার ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছ; তাই ইচ্ছা আমাকে সংবিত-হারা করাতে পারিল না। এখনো যে আমার ভয় হয়, আরো এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে,—তুমি যে অধঃপতনের পথে চলেছ।”

কৃত্যর বৎসর পড়িয়াছে। লম্বী-পূর্ণিমার আর পনের দিন থাকি। পতীর নিকীপে অর্ধ-সমাপ্ত পুস্তকটি সমুদ্রে করিয়া ভাঙ্গর মোৎসাবিধিতে সিংহর দিকে চাখিয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ চাখিয়া দেখিল, তাহার সমুদ্রে এক পরমাংশুরী বুঝী সন্ন্যাসিনী তাহার দিকে নিম্পলক নেড়ে চাখিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তন্ত্রে প্রহর উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি? কি চাও?” “চাই বা তা তোমার অমের। আমি বা কবি, তা শোন। মরণের কোন থবর রাখ কি?” “না।” “মরণপতির বিষয়ভাজন হওয়ার চন্দনবাস নিহত। কত্রা মন্ত্রিকা নৃপতির অস্ত্র-পুরে বসিনী। এই পূর্ণিমার তোমার রাজধানী উজ্জয়িনীতে বাইতে হইবে।” বিহ্বল প্রহরের সমুদ্র হইতে সন্ন্যাসিনী সরিয়া গেল।

উজ্জয়িনীর রাজসভায় অপর্যচিত কেহ প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসি জিজ্ঞাসা করিলেন “কে এ?” মন্ত্রী কহিল “যেব, ইনি ইন্দ্রাণী মণ্ডরীর প্রথিতমামা উদীরদান ভাঙ্গর প্রহর।” ভাঙ্গর বীণার বজ্রার তুলিল। মনোহর মর্মস্পর্শী রাগিণী কাষিতে-কাষিতে বাতাসে মিলাইল; পক্ষমে গাথিয়া উঠিল, “ওগো দেবী, একে নৃতন স্থানে নবীন ভাবে তোমার উপাসনা করিতে হইবে। এতকাল এ অধম কত সোকেব প্রশংসা স্ফুটাইল; কিন্তু মনোহর পুরিল কৈ? দৈবিত নিমিল কৈ? ওগো দেবী, আর কতদূরে নিয়ে বাবে? কতদিনে আশা পূরিবে? পূর্ণাতীর সাধনা কেবল সফল হবে?” সমস্ত সভা মন্ত্রদ্রব্য নিতক।

মরণতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওগো কবি, এই পুস্তক কোন হাতবাক-কুশলা চট্টল ধানাবিনী বুঝীর? তোমার প্রহর কি?” “না যেব, এ অচ্ছাদ-সন্ন্যাসের মানাবিনী মহাশেতা।” বীণাবাদিনী মহাশেতা। গীত সমাপনান্তে অবগাহন করিয়া গল হইতে উঠিতেছেন। দেহের অপূর্ণ মাধুরী যেন বর্ষাসাত, মেঘান্তরালে অন্ত-রহিতরপোচ্ছল ভ্রামরী সুখরীর অকণিকা। বিবদনা যোবিনীর অনন্ত লালিমা

বিশেষরূপে প্রকটিত। হুই হয়ে নীচিচূড় প্রথমন অঙ্গে
কড়াইবার গ্রাস। আনন হইতে তখনো সনাত-নীতের
লাংগারেবা লুপ্ত হয় নাই,—সেই শ্রীতে প্রোচ্ছল। দূরে
পুণ্ডরীক দর্শনে আনন বেন বীরে-বীরে স্ত্রী মণ্ডিত হইতেছে।
অনুগম শোভা ক্রমে-ক্রমে পলাইতেছে। ক্র-কৃত্তি, অধর
দংশিত।

সত্যগুহ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভ্রম্যমাণে কণ্ঠিত হইল। প্রহ্মার
চরভালে রাশিকৃত উপলোক উপকৃত হইল। সভাসদের
বাহার বাহা ছিল, শুপাকার হইয়া সভাতল পূর্ণ করিল।
উগ্রীব হইয়া ভাবের অন্তরের দিক চাহিয়া রহিল। কৈ,
মহু-মহু-বীরের শিখন ত ভাবের প্রাণে নবীরে আবাহন
গাহিল না? কৈ 'স্তনভারান্-অঙ্গল সমন'র কোমল
চরণের নুপুর-ধ্বনি ভাবের সমুখে নীরব হইল না? উদ্ব্রান্ত
প্রহ্ম পুনরায় বীণা তুলিয়া লইল। গাহিল, "জানি আমি,
জানি প্রিয়া, তোমার সঙ্গে ত আমার মিলন হবে না।
তবে কেন অমন করে আশা মিরেছিলে। সেব চোটা
ছাড়িব না। চিরজীবন কি ঐদিয়াই কাটাতে হইবে?
ডিরকাল—" আর কথ্য হুটিল না; সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।
প্রতিশ্রুতি নিবেদন করিল, "সেব, ইচ্ছাশীল নগরীর মেল্লি-নন্দিনী
পুতলিকাটি চাহিলেন।" নিম্নের ককে লইয়া গিয়া মরিককা
পুতলটিকে হস্ত বদ্বায়ত করিয়া কনকহার পরাইয়া দিল।

চতুর্থ বৎসরে প্রহ্মারের নীরবের সেই তত পৃথ্যাহ
আবার আসিয়াছে। দ্বন্দ্বের অনন্ত আশা লইয়া শঙ্কিত পথে
সভাতলে ভাবের প্রবেশ করিল। তখনো নকীব কুসরাইয়া
পরম ভট্টারকের আগমন-বার্তা জানান্য নাই—সভাসনে কক
তখনো সম্পূর্ণ ভরে নাই।

নরপতি কহিলেন, "ভাবর, এত প্রকৃষেই যে!"
নিঃশব্দে প্রহ্মার বীণা তুলিয়া লইল। অনুদীর স্পর্শে বীণা
ঐদিয়া উঠিল। হঃখমাধা নাম। মধুর রাগিণী লহর-লহর
গুহ পূর্ণ করিল। সে গাহিল "আজ সেব। ওগো দেবী, আজ
হয় ত শেষবার আমার বীণা তোমার আবাহন গাহিছে।
ওগো প্রিয়া, নবীন ভাবের উদ্বোধন আজও কি অমর-
পর্যন্ত? ওগো মোর মামলরাণী, কৃত্তি চিত্ত কি শান্ত
করাবে না? যে সৌন্দর্যের একাংশ লইয়া ক্রমেলিকার
নীতের নিশীথিনী এত গভীর পরতের লম্বী পূর্ণিবার পথিয়া
কিশোরীরূপে যে সৌন্দর্যের একাংশ প্রকটিত করে, যে

সৌন্দর্যের একাংশ লইয়া বসন্তের সুবতী দোল-পূর্ণিমা এত
মধুরী, যে সৌন্দর্যের একাংশে বিরহিণী বর্ণাশ্রয়ী বহনানন্দী
যে সৌন্দর্যের এক-এক অংশ মাতার আননে, সুবতীর মর
বসনে বিকশিত হয়, তা সবই একাধারে সুহৃদের লজ
তোমাতে দেখেছিলাম, ওগো আমার সৌন্দর্যধার! কিন্তু
আর হঃখ নেই, ওগো প্রিয়া, সেই চকিত দামিনী-সুন্দরের
প্রেরণায়ই আমি নীরবের পথে অগ্রসর হইব। তখাচ বাতনা
এই যে, হস্ত বিকশিত আনন বেশি নাই; সুহৃৎ, ওগো
প্রিয়া, নিবিষমাত্র—মিলন যদি দূরশাই হয়—তবু দেখিয়া
চলিয়া যাইব। ওগো, সকলকাম কি হইব না?"

গায়ক নীরব হইল। সভাসদেরা স্থাপুং নিশ্চল। হৃৎ
নৃপতির সমুখে আবরণ মুক্ত হইয়া বাস্তবস্তির আবির্ভাব
হইল। সচকিতে সন্নতি কহিলেন, "কবি ভাবর, তোমার হুই
পুতুলের মুখাবরণ একই ধরণের। আদর্শ তোমার,—সে
কোন্ সৌভাগ্যবতী? তোমার প্রিয়া কি?"

আনন্দময়ী নবসুবতী শান্তিসুখাধার, ইংৎ বেসিয়া
পুত্রকে আদর করিতেছে—ভাবর তাই খোদিয়াছে।
তরুণীর আনন অর্ধপ্রকৃষ্ট গোলাপ-কোরকবৎ। পুত্র-
গর্ভবিশি মে মেন এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; হৃৎ
সংসারের হৃৎ-হঃখের রেখা নাই; ভূমানন্দে পূর্ণ, চির-
শান্তিময়। পুত্রসেবে তন্ময়জিতা। মহাপ্রলয় হইলেও নৃকি
জান হইবে না; সমাধিময়া;—সেই সমাধি, যে সমাধিতে
নিমজ্জিত হইয়া বিরহবিধুরা, হৃৎর চিত্তাপত্তাপ্রাণা শহুতলা
হুর্সানার "অহমঃ তোঃ" আহ্বান তনিত পান নাই।
শ্রীতিময়ী সেই বসনে বাস্তবের পর্ক, মেহ, মৌলঙ্গা, উল্লতা
নীচতা—যা কিছু সবই মুস্পষ্ট প্রতীয়মান। যে দেখে তার
আনন্দ, যে বোকে তার শান্তি। সমস্ত সভা নীরব নিভন্ত।
সকলে বেন বেগ-নিমগ্ন।

আগেবিত্তে সেই নীরবতাকে সঙ্গা করিয়া নুপুর-শিখন
ধরিয়া উঠিল। অলকারের শিল্পিতে কক পূর্ণ হইল।
বিশ্বয়ে সকলে চাহিয়া দেখিল, অপূর্ণ এক মনোমোহিনী
সুবতী ছুটিয়া আসিয়া হুই গভীরমান প্রহ্মারের আদিতনে
ধরা দিল। ভাবর কহিল "এলে, এলে প্রিয়া, মরিককা,
মহরী, মহু, মহু। এতদিন পরে কি তোমার সময় চল।"
বলিয়া হুই বাহ মরিককার বাহুহুলের নীচে দিয়া কদিক
সেই হৃৎসর আনন তুলিয়া ধরিল। সুহৃদের লজ চারি চত্বর

বিলন হইল। তার পর চিরপ্রার্থিত সেই বেশবৃত্তীর
সেখানে বকের উপর হৃৎ আশ্রয়নে বসে করিল।

নরপতি কহিলেন, “কে এ রমণী?” কক্ষী কহিল,
“ইন্দ্রাণী নগরীর শ্রেষ্ঠ চন্দনমাসের কস্তা মল্লিকার। সমর
চাণ্ডাল আপনাকে ধাওঁ পূর্ণিবার রাঁহার সহিত বিবাহ হইবার
কথা ছিল।” কুহু নরপতি কহিলেন, “কি! এতরো, বন্দী
কর। তার পর হুজুর উচিত শাস্তি বিবেচনা করা
হাইবে।” এমন সময় এক মহাসিনী জিন্দা হতে পাড়াইল;

কহিল “সাবধান! কেহ এদের স্পর্শ করিও না।” ০০০০
প্রথমা বৃত্তী কহিল “তুলিতে ত?” আমি কহিলাম,
“হাঁ! কিন্তু বাও কোথায়? শোন।” “না—না, আর রহিতে
পারিব না।” “শোন, শোন।” দ্বারে দ্বারের শেষে ঘুম
ভাঙিল। বেগের এক অধিবাসী বাহির হইতে বলিল, “কি
মশর, ডাহেন কেন? আমি তাব হিলাম আপনি এখানে
ঘুমাচ্ছেন।”

“কুহু”

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

এই ধরতির শ্রম-ভূমে রক্ত এসে আশ্রয়,
ভস্ম করে নবীন জীবন দাও যে হুজুরাণ! ;
তাঁওব ঐ নৃত্যে তব প্রেমের আনন্দ ভবে,
ঘুম হতে আশ্রয় উঠুক ভোগে বিশ্বধারী সবে ;
দাহন করে শ্রমের গুহু কর চিত্ত,
ব্যথার আশ্রয় সহিতে প্রভু পক্ষি মিও নিত্য ;
দুঃখ-শোকের আঁধার ঘরে দীপ্তি কর দান,
নবীন করে জীবন আবার দাও যে ভগবান !

কলঙ্কিত সমাধ-বৃক্ষে বসে তোমার হানো,—
নির্দলতার হুজুরী বিধে পুনঃ আনো ;
লক্ষ সূর্যের কলঙ্ক-ভার সঞ্চিত এসে ভাল,
বক্ষা শুধু চলেছে দ্বীপের রক্ত-শোষণ কালে ;
আশ্রয় বিশ্বের চালাচ্ছে কেবল তপ্ত হলাহল,
সে বিশ্ব-ধারার নীল হল হার বিশ্ব-অবিস্তার।
এই সমাধের বক্ষে প্রভু বস্তু কর দান
ভস্ম হ’তে নবীন জীবন দাও যে ভগবান !
পক্ষি-পূজার নাই পুরোহিত—নৃত্য পূজাসন,
স্পন্দনহীন শবের মতন হুগু জিহ্বন।
চার দিকেতে দিন-মহুরের দীপ দ্বাধাকার,
চার না শুধু চোখ তুলে কেউ—কারা শুধু গার।

সুখা হল নির্দাসিত—পাপ সে লভে অশ্রু,
ধর্মহারা হয়ে ধরার দীপা হল অশ্রু।
পক্ষিরূপে সর্ব পাপের কর অবদান,
এ দুহ্মিনে দুঃখীয়েনে রক্ত ভগবান !

চিত্তবিহীন ধর্মীর তনয় অহম্বারে হারা,
শাস্তি-সদন বিধি যুগে আনুচ্ছে পাপধারা ;
সে বিশ্ব-ধারার কবুচ্ছে যে হার জীবন বিসর্জন,
সাঁঝের আগেই কদল-কলির দুহুচ্ছে দমনন।
যোহের ঘোরে সোণার শ্রমণ বনুচ্ছে অবিহত,—
আনুচ্ছে অর্য্য দুঃখভরা—দুহুা-দুহুতের মত।
দ্বিগু কর রক্ষণ শ্রমণ—সংহর সব মান,
নবীন করে জীবন আবার দাও যে ভগবান !

ভস্ম করে’ আবার বাষ্পের নৃতন করে গড়া,
অহম্বারের মিথ্যা বোকা কর্তৃ হতে হারা ;
স্বার্থ-ভাগের যজ্ঞে মোদের সমিধু কর প্রভু,
ভাগের দ্বাৰেও অপেশ আছে না ঘাই তুলে কবু ;—
জ্ঞানের প্রদীপ দাও আলিয়ে চিত্ত-তপোবনে,
তৈরি কর প্রেম নদীয়া আবার জিহ্বনে ;
চূর্ণ কর শক্ত-সরম, মিথ্যা অস্তিত্ব,
দাহন করে দাও যে মোদের দ্বন্দ্ব ভগবান !

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, প্রভুতত্ত্ববাণীশ]

খুব ধুমধামে হাওড়ার অল্পান্তকর্ণা সাহিত্য-সেবকগণের পরিচালনে দ্বাদশ সাহিত্য-সম্মিলন সমাধা হইল। হওশ-নির্মাণে, সন্দেশ-রসগোলায় অনেক অর্থব্যয় হইল। দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর লজ্জা ভাঙার স্থাপিতও হইল। আমরা এই অবসরে সম্মিলনের একটী খুব ছোটখাটো বিবরণ ও সন্দেশে বক্তৃতা সম্বন্ধে, এ যাবৎ ঘাওয়ার সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে এবং ঘাওয়ার সভাপতিরূপে সম্মিলনকে পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত ও পাঠকবর্গের সমুখে উপস্থিত করিলাম।

প্রায় ষোল বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইল। ১০০৯ সালে দুর্নিশাবায় হইতে তৎকালে প্রকাশিত 'স্বপ্ন' পত্রিকার পরিচালক, বর্তমানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দ্বিধাধরেন্দ্র নিম্ন-মন্তব্যের মহাশয় ৮৮তম বঙ্গ-ভারতীয় সাহায্যে সম্মিলনের হুণের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সে প্রেরণা কার্যে পরিণত হয় নাই। ১০১০-সালে ময়মনসিংহে বধন প্রাদেশিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলিত অধিবেশন হয়, তখন সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনেরও বাবদ্য হয়, কিন্তু নানাকারণে সে বাবদ্য পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর দুই বৎসর সাহিত্য-সম্মিলন সযত্নে আর কোন কথা হয় নাই। তার পর, ১০১২ সালের চৈত্র মাসে বধন বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের আয়োজন হয়, তখন কবি-সমিতির শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনেরও আয়োজন করেন; কিন্তু একটীর সঙ্গে অঙ্গীভূতও পণ্ড হয়। ১০১৩ সালে বঙ্গ-সাহিত্যের বিক্রমাদিত্য, সকল সংকল্পের অহুতা, বরণ্য কান্দী-বাগায়তিপতি নিজ আসানে সম্মিলনের আয়োজন করেন; কিন্তু সম্মিলনের প্রাপ্তবস্ত্র মহাশয়কুমার মহিমচন্দ্রের অকস্মৎ পরলোকগমনে সে বৎসর সম্মিলন স্থগিত থাকে। কিন্তু শোকসন্তপ্ত মহাশয় ১০১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক নিজ শোক বিস্তৃত হইয়া জননী-বাগীর দেবার্য সম্মিলনকে আহ্বান করেন। সেই বৎসর সম্মিলনের প্রাপ্ত-প্রতিষ্ঠা হইল। মণিকাকন্দবোণ হইল—মহাশয় হইলেন

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, আর সভাপতি হইয়াছিলেন তার রত্নোজনাথ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সুবোধাধার হইয়াছিলেন সম্পাদক।

পর বৎসরে, ১০১৫ সালের ১৮ই ও ১৯শে মাঘ রাজ-সাহীতে সম্মিলন হয়। বিজ্ঞানচর্চা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সার প্রহরেন্দ্র রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বরেন্দ্র-অহমদান-সমিতির প্রাণ, লক্ষী ও ময়মতীর বরণ্যে কুমার শরৎকুমার সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সম্পাদকতা করিয়াছিলেন হুশেখর স্ত্রী শ্রীযুক্ত শশধর রায়।

তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল ভাগলপুরে—১লা, ২রা, ৩রা ফাল্গুন (১০১৬) তিনদিন অধিবেশন হইয়াছিল। পরলোকগত সারবাচরেন্দ্র মিত্র মহোদয় হইয়াছিলেন সভাপতি এবং ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অল্পতম প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত চাক্রে বহু মহাশয় এই সম্মিলনের সম্পাদক ছিলেন।

চতুর্থ অধিবেশন হয় ময়মনসিংহে। সভাপতি হন শ্রীযুক্ত সার অগণীশচন্দ্রে বহু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন মহাশয় কুমুদচন্দ্রে সিংহ বাগোদর।

চুচুড়ায় পঞ্চম অধিবেশনে সম্মিলনের প্রাক্কলিত কান্দীমহাশয়রাধিপতি সভাপতি, সাধারণের 'সাধারণী'র ৮৭কক্ষস্থে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, আর উকীল-সরকার রায় মহেন্দ্রচন্দ্রে মিত্র বাগোদর সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী বিজ্ঞান-সাধারণ হুণপাত হয় এই স্থানে। কারণ, এই অধিবেশনে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পৃথকভাবে পঠিত ও আলোচিত হয়।

চৈত্রমাসে ২ই ও ১০ই চৈত্র সম্মিলন হয়। পঞ্চম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অক্ষরেন্দ্রে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত প্রহরেন্দ্রকুমার রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। বিজ্ঞান-সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন আচাৰ্য্য তার প্রহরেন্দ্র।

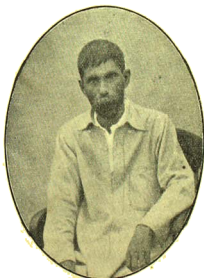
কলিকাতায় সপ্তম অধিবেশনে সম্মিলন চারিশাখার



শ্রীযুক্ত গিরি ভাটনার স্বরীজনাথ ঠাকুর
(১০১৪ সালে, কলিকাতায় প্রথম অধিবেশন)



স্বামী সাহসভাটনা
(১০১৩ সালে, তাম্রলিপুত্রে তৃতীয় অধিবেশন)



শ্রীযুক্ত গিরি ভাটনার অমৃতেন্দ্র গিরি
(: ১০১৫ সালে, বালুসাহীতে দ্বিতীয় অধিবেশন)



শ্রীযুক্ত গিরি ভাটনার স্বামীশঙ্কর বসু
(১০১৭ সালে, বরেন্দ্রনাথে চতুর্থ অধিবেশন) .৬



ଦୀନନାଥ ବହାଦୁର ଶିବୁକ ନାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ
(୧୯୧୮ ମାସେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ)



ଶିବୁକ ବିଦ୍ୟାଧର ଶାସ୍ତ୍ରୀ
(୧୯୧୮ ମାସେ, ବାଲିକାତାଳ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ)



ବୀରୀଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ
(୧୯୧୯ ମାସେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ)



ସହାନୁଷ୍ଠାନାତ ଶିବୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ
(୧୯୧୯ ମାସେ, ବାଲିକାତାଳ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ)



মহামোপাধ্যায় ঈশ্বর শত্ৰুগত বিদ্যাভূষণ
(১০২২ সালে, বশোহতে বহম্ম অধিবেশন)



ঈশ্বর শত্ৰুগত বিদ্যাভূষণ
(১০২২ সালে, বশোহতে বহম্ম অধিবেশন)



ঈশ্বর শত্ৰুগত বিদ্যাভূষণ মহামোপাধ্যায়



ই. চন্দ্র চন্দ্রসেন মহাশয়
(কংগ্রেস, ডি.সি. অধিবেশন)



মামবীর শাহ মহারাজাধিরাজ বাকাম্বর মহাশয়
(বর্ডমান, অষ্টক অধিবেশন)



কর্মী মহারাজা শ্রীমন্ত সিং মহাশয়
(মহানন্দনিক, চতুর্থ অধিবেশন)



মামবীর শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত মহাশয়
(বর্ডমান, অষ্টক অধিবেশন)



শ্রী কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়
(ইতিহাস, ১৩২০)



শ্রী কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়
(বিজ্ঞান, ১৩২০)



শ্রী কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়
(বর্ণন, ১৩২০)



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়
(সাহিত্য, ১৩২০)



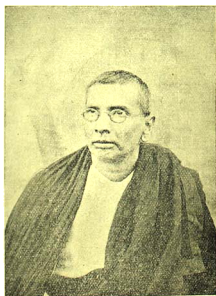
অধ্যাপক শ্রীমুক্ত বহুনাথ সরকার
(ইতিহাস, ১০২১)



শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু জ্যোতিষাচার্য
(ইতিহাস, ১০২২)



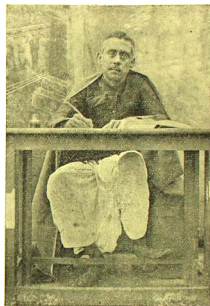
অধ্যাপক শ্রীমুক্ত যোগেন্দ্র বিহারি রায়চাঁদুর
(বিজ্ঞান, ১০২১)



মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
(দর্শন, ১০২২)



ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ
(ବିଜ୍ଞାନ, ୧୯୨୨)



ଶ୍ରୀମତୀ ମନମୋହନ ରାୟ
• (ବିଜ୍ଞାନ, ୧୯୨୦)



ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ
(ସାହିତ୍ୟ, ୧୯୨୦)



ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନ
(ସାହିତ୍ୟ, ୧୯୨୦)



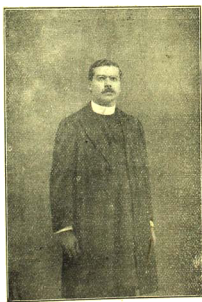
ঐযুক্ত রাজ দত্তীন্দ্রনাথ চৌধুরী
(মর্মান, ১০২০)



ঐযুক্ত রাজ বরুনাথ স্ত্রীন্দ্রনাথ বাহাদুর বেঙ্গালবাসিন্দ
(মর্মান, ১০২০)



ঐযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
(বিজ্ঞান, ১০২০)



ডাক্তার এম্বলনাথ বাম্বোয়াখার
(ইতিহাস, ১০২০)

বিভক্ত হয়। ২৭, ২৮, ২৯শে চৈত্র, ১৩২০ সালে এই সম্মিলন হয়। সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন দার্শনিকশ্রবণ ঐয়্যুত দ্বিবেশ্রনাথ ঠাকুর, — ইতিহাস-সাধারণ আচার্য্য ঐয়্যুত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, দর্শনে ডাক্তার পি. কে. রায়, বিজ্ঞানে আচার্য্য রামেশ্বরম্বর ও সাহিত্যে সভাপতি হইয়াছিলেন কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ঐয়্যুত দ্বাবেশ্বর। অত্যাধুনায়-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় ঐয়্যুত দ্বরশ্রনাথ। ঐয়্যুত ডাঃ দেবেশ্রনাথ সর্বাধিকারী, রায় রামেশ্বরনাথ শাস্ত্রী বাহাদুর ও রায় বীজনাথ চৌধুরী এই তিনজন হইয়াছিলেন সম্পাদক।

বর্ধমানের বিরাট ব্যাপারে, অষ্টম অধিবেশনে মহা-সম্মিলন হইয়াছিলেন অত্যাধুনায় সমিতির সভাপতি। মূল ও সাহিত্যের সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় ঐয়্যুত দ্বরশ্রনাথ, ইতিহাসে ঐয়্যুত বহুনাথ সরকার মহাশয়, দর্শনে ঐয়্যুত দ্বিবেশ্রনাথ, বিজ্ঞানে বিজ্ঞান-বৈজ্ঞানিক যোগেশ্বরনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্পাদক ছিলেন ঐয়্যুত দেবেশ্র-নাথ মিত্র ও ঐয়্যুত দেবেশ্রনাথ সরকার।

পর বৎসর সম্মিলনের নবম অধিবেশন হয় বম্বাইয়ে। রায় বাহাদুর ঐয়্যুত বহুনাথ মজুমদার হইয়াছিলেন অত্যাধুনায়-সমিতির সভাপতি, সাধারণ সভাপতি ছিলেন মহামহো-পাধ্যায় সত্যনাথ, বিজ্ঞানের নগেশ্বরনাথ ইতিহাসে, দর্শনে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ, বিজ্ঞানে ঐয়্যুত পি. এন. বসু মহাশয় হইয়াছিলেন সভাপতি। সম্পাদক ছিলেন ঐয়্যুত রামেশ্বরনাথ বিজ্ঞানেশ্বর।

বম্বাইর বাহিরে ব্যক্তিগত সম্মিলনের দশম অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর পূর্ণেশ্বরনাথরায়, তার আন্তরিক যুগোপাধ্যায়, ঐয়্যুত চিত্তরঞ্জন দাস, ঐয়্যুত শশধর রায় ও ঐয়্যুত বিজ্ঞানেশ্বর মজুমদার, ঐয়্যুত রায় বীজনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ স্বাক্ষরে অত্যাধুনায় সমিতির সভাপতি, সাধারণ সভাপতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আমাকেই সম্পাদকতা করিতে হইয়াছিল।

একাদশ অধিবেশন হয় ঢাকায়। ঐয়্যুত চিত্তরঞ্জন দাস, ঐয়্যুত গিরিশচন্দ্র সান্যাল-বেদান্তরত্ন, ঐয়্যুত রামেশ্বরনাথ, ঐয়্যুত শশকমোহন দেন, ঐয়্যুত দেবেশ্রনাথ মল্লিক মহাশয়গণ অত্যাধুনায়, সাধারণ, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞানসাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐয়্যুত অধ্যাপক সত্যনাথ তত্ত্ব সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

এবার বাম্প অধিবেশনও নিরুপিত শেষ হইয়া গেল। সভাপতি হইয়াছিলেন তার আন্তরিক যুগোপাধ্যায়; সাহিত্যে সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় সত্যনাথ বিজ্ঞানেশ্বর। দর্শনে রায় বহুনাথ মজুমদার বাহাদুর, বিজ্ঞানে ঐয়্যুত গিরিশচন্দ্র বসু, ইতিহাসে ঐয়্যুত ডাক্তার প্রমথনাথ বম্বোপাধ্যায়।

তার বীজনাথ বলিয়াছেন, “শিক্ষার্থীরা সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। ইহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক ফলপ্রসূ লাভ করে। এই নির্দ্বন্দ্বিতা কার্য্যই সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কর্তব্যকর্ম।”

কুলবধু

[প্রিয়বোধ—]

বরশন-সীমা চরণ-নবর পানে,
হাসির সীমানা অধর-পল্লব;
বসন-সীমানা সখী গলে কানে-কানে,
প্রবণের সীমা শিশু-মুখ কলরব।
জ্ঞান-সীমা নীতি চরিত শূন্য হুল,
স্পর্শ-সীমানা স্বামী-চরণ-তুল;
গমনের সীমা গৃহ-বাতাস-মূল,
অভিমান-সীমা কেবল নয়ন-মূল।

কণ্ঠক্ষেত্র অঁকা রক্ত-শালা,
স্বপ্ন-সীমা প্রিয়-পাড়াবশের বাহা;
দর্শকের আঙণে তুলসী-স্তলা,
জ্ঞেয়-সীমা তার মৌন হইয়া বহা।
বিশ্বাসের সীমা পিতৃ-কামল সাজে,
বাসনার সীমা সবারে তৃপ্তি দিয়া,
হৃদয়, তোমার সকল সীমার মাঝে,
অসীম কেবল প্রেম-যত্নিত দিয়া।

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আধ্যাত্মিকাবলি-অবলম্বনে)

(প্রথম প্রণী—পূর্বানুসৃতি)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানরত্ন এম-এ]

১২। প্রকৃত এবং দিবা ও নিশি

এ পর্যন্ত যে সকল সখীর কার্যকলাপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই নারিকাকে বিরহকালে সাধনা দিয়াছেন, মিলনের ভ্রত সাধনা করিয়াছেন, ইত্যাদি ভাবে ধর্মাত্মিক সখীর কর্তব্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এবারে যে দুইখানি আধ্যাত্মিক প্রণয় তুলিব, সে দুইখানিতে সখীগণ এইভাবে বাধা-ধরা নিরসে সখীর কার্য সাধন করা ছাড়াও, নারিকার আধ্যাত্ম-জীবন-পটন, প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করিয়াছেন। সেই ভ্রতই সখীমিপের প্রণী-বিভাগ-কালে বলিয়াছি যে, 'দেবী-চৌধুরাণী'তে নিশি ও দিবা এবং 'সীতারামে' ভ্রতের উক্ত অঙ্কে সখী।'

প্রকৃত পিতৃগণের বাসকালে মাতার দেহ-মমতার ও শ্রদ্ধাভাষে একরাত্রি বাসের স্মৃতিধার ব্যাপারে সোণার দতীন সাগরের সমবেদনা ও সহায়তা পাইয়াছিল। মাতার বৃত্তার পর সে ফুলমণি নাপিতানীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ফুলমণি 'দুর্গাচরিত্র'ের অবলার মত ত নহে, 'বিবরুজ্ঞের' বাগতী গোয়ালিনীর অপেক্ষাও মধুর-প্রকৃতি, প্রকৃত সর্পনা-দায়নের ভেঁটের সহায়তা করিয়াছিল। ভ্রতের ইহা একেবারে সখিদের দিক্ দিয়াই যায় না।

তবানীঠাকুর যখন প্রকৃতের নবজীবন-পটনের ভ্রত তাহাকে শিকা দিবেন দ্বিঃ করিলেন, তখন তিনি তাহার বরতা, সগোত্রিণী অথচ শিকড়িঙ্গী-বিনাশে নিজ শিক্তা নিশিক তাহার কাছে রাখিলেন; বরসে প্রকৃতের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইলেও, সে বরতার মতই বড় করিয়া আশ-পরিচয় দিল। তাহার পর সে তবানী-ঠাকুরের শিকামত প্রকৃতকে লেফটার দিতে আন্তর্য করিল; কিন্তু সখরই বুঝা গেল যে, সে শুধু শুভ জানের

ব্যাপারী নহে, ধরদের ধরবীও বটে। যখন প্রকৃত আবেগের সহিত সখীর উল্লেখ করিল এবং তাহার 'চক্ দিয়া বস্ বস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল', তখন 'নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক চুঃখ পাইয়াছ।" তখন নিশি, "প্রকৃতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল।" (১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।) প্রথম-পরিচ্ছেদেই নিশি প্রকৃতের সমবেদনাময়ী সখীর স্থান আধিকার করিয়া বসিল। ('বোন্' সম্বোধনে ভ্রততার পরিচয় পরিদৃষ্ট।)

এই খণ্ডের ১৪শ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রকৃতের প্রথম-শিকা নিশি ঠাকুরাণীর হাতে হইল, তার পর 'পাঠক-ঠাকুর' সে ভার লইলেন, নিশি দাস্তাৎ ও পরোক্ষ-ভাবে সেই শিকার সহায়তা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃত দেবী-চৌধুরাণী হইয়াছে। সাগরের মানচন্দ্রের ভ্রত ব্রজেশ্বরকে প্রেরণ করার পর যখন পক্ষীর আড়াল হইতে ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেবীচৌধুরাণীর গলাটা ধরা-ধরা হইল, তখন 'নিশি ঠাকুরাণী' দেবীচৌধুরাণীর কাছে আসিয়া বসিল। নিশি একটা সমবেদনার কথা কহিলেই 'দেবীর চক্ষে জল আর থাকিল না।'—দেবী তখন সখীকে ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহার ভার দিলেন। বুঝা গেল, নিশি দেবীর সমবেদনাময়ী সাহায্যকারিণী সখীর কার্য করিল। "তুই কথা ক। সব জানিস্ ত।" দেবীর এই কথার বুঝা গেল, নিশি 'বিবাস-বিশ্রাম-কারিণী।' (২য় খণ্ড, ৪ম পরিচ্ছেদ।) ৭ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, নিশি দেবীর ইচ্ছিতে ব্রজেশ্বর-সাগর-দত্ত ব্যাপারে লিপ্ত। আবার যে কার্য-সমাধার পর নিশি ব্রজেশ্বরকে রাণী

সেখাইবার লত 'আর এক কামরার লইয়া গেল।' অর্থাৎ সখী দামুদী প্রথার নায়ক-নারিকার মিলন-সংঘটন করিল। ৮ম পরিচ্ছেদে 'ব্রহ্মেশ্বরকে পৌছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল।' পিরিয়ারাও এইরূপ বর্ণনাদিনীকে যেমনস্বরের নিকট পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ব্রহ্মেশ্বরকে বিদায় দিয়া 'সেই নৌকার তক্তার উপর সূটাইয়া পড়িয়া কাঁথিতেছে।' নিশি আদিয়া এই ককণ বৃত্ত দেখিয়া 'তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—হৃদয় করিল,—উপদেশ ও সাধনা দিল। (২২-খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)। আবার সে সমবেদনাময়ী সাক্ষ্যদায়িনী সখী।

নিশির কথা শুনিয়া দরিদ্রা বলিয়ায়। এইবার দিবার কথাও তুলিতে হইবে। ১ম খণ্ডের ১৩ম পরিচ্ছেদে নিশি একবার তাহার নাম করিয়াছে, প্রকৃষ্ণের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিবে বলিয়াছে, কিন্তু তখনকার মত আর তাহার এসব কথা বার না। ২য় খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে দেবী 'একজন মাত্র প্রীতলাক' দিবাতে সঙ্গে লইয়া বহরা হইতে নামিয়া তীরে তীরে দিয়া একটা জলসে প্রবেশ করিল। কিন্তু দেবী 'একটা পাছের তলার পৌছিয়া পরিচয়বাক্যে বলিল,—'দিবা, তুই এইখানে বস'। আমি আসিতেছি।' বুঝা গেল, দিবা 'পরিচয়বাক্য'; নিশি অপেক্ষা কিছুটা পদবীর, সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্রীও নহে, নিশির মত তাহার সহিত দেবীর অন্তরঙ্গ সঙ্গ নহে। প্রকৃষ্ণের এই ভাবে দিবার পরিচয় দিয়া ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে নিশি ও দিবা উভয়কে একত্র দেবীর পাশে বসাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, 'দিবা অশিক্ষিতা', তাহার প্রেরণ ও উত্তরের ভক্তিতেও ইহা সঙ্গ্রাসন হয়। প্রকৃষ্ণের 'নিশি প্রকৃষ্ণের একপ্রকার সহায়দায়িনী ছিল,' আবার শিক্ষিতীও ছিল। নিশি ও দিবার মধ্যে একদম প্রভেদ থাকিলেও উভয়েরই দেবীর প্রতি গভীর শ্রীতি-বোধ ছিল। এই পরিচ্ছেদেই দেখা যায়, যখন দেবী 'স্বামি-বর্ণনের আকাঙ্ক্ষার ও শব্দের অপকার-নিবারণের উদ্দেশ্যে নিম্নের বিপদ ভাষিয়া লইল, ইংরেজের কাছে ধরা দিতে সক্ষম করিল, তখন নিশি ও দিবা উভয়েই সমান আকৃষ্ণের সহিত তাঁহাকে এই সক্ষম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল (২য় পরিচ্ছেদ) এবং তাহার পর

নিশি পুনরায় দেবীকে বুঝাইল। (৩য় পরিচ্ছেদ)। উভয়েই দেবী সাক্ষিরা সাহেবের চোখে ধূলা ফেওয়ার চেষ্টা করিল ও গোহেম্বাকে আনিতে বলিল (৪র্থ ও ১ম পরিচ্ছেদ)। দেবী তাহাদিগকে কর্তব্য উপদেশ দিল, তাহারা 'স্বামিরে আসিয়া পাড়ী মাতিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল' (৫ম পরিচ্ছেদ)। প্রকৃষ্ণ নিম্নের বিপদ আঙ্কন করিয়া সখীদ্বয়কে বাঁচাইবার জন্য ব্রহ্মেশ্বরকে অহরোধ করিল ('আমার চুইটা সখী এই নৌকার আছে। তারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকার তাহাদের লইয়া বাইও') ইহা হইতে দেবীর ঘেহের গভীরতাও বুঝা যায়। গোহেনা (৬ষ্ঠ) আসিলে সে তাঁহাদের অন্তর্ধানের জ্ঞার সখীদ্বয়ের উপর দিল। বুদ্ধিমতী নিশি কিছুদূর হরবল্লভকে ভয় দেখাইয়া প্রকৃষ্ণের কার্য উদ্ধার করিল তাহার সরস বর্ণনা ৮ম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। ইহা লইয়া নিশি দেবীর সহিত একটু রক্ত করিতেও ছাড়িল না ('পরিহাস' সখীর অন্ততম লক্ষণ)।

১২ ও ১১ম পরিচ্ছেদে উভয় দ্বীতে আসন্ন-বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া গাঢ় রোহিণী-সমবেদনায় সহিত তাহার সহিত আলাপ করিল। প্রকৃষ্ণও শ্রীতিপূর্ণ ধর্মের তাহাদিগকে দেহ-উপহার দিলেন। সখীদ্বয়ের-বিদায়-দৃষ্ট বড়ই ককণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। 'দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। প্রকৃষ্ণ দিবা ও নিশিকে সব (বহুমূল্য আসবাব ও অলঙ্কার) দিলেন। নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নাত্মক প্রকৃষ্ণকে পান্নাইতে লাগিল।...দেবীকে স্মিতাভরণ দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তার পর আর কোন কাণ নাই, কাজেই ভিন্নভাবে কাঁথিতে বলিল। নিশি যখন পরাইবার সময়ই হর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পৌ দরিলেন। তার পর পৌ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রকৃষ্ণও কাঁথিল—না কাঁথিবার কথা কি? ভিন্নভাবে আত্মিক ভালবাসা ছিল; কিন্তু প্রকৃষ্ণের মন আঙ্কনে ভরা, কাজেই প্রকৃষ্ণ অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রকৃষ্ণের মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, † কামার সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে বাহার যে ক্রটি হইল, দিবা

। অবতারবিহার উদ্ধৃত সখী। লক্ষণ মর্মস্পর্শ।—

নিশি দখী-সুখে সুখী হইলে মনে কেন?—গোবিন্দবাস।

শ্রীকর্তার হৃদয়ে সুখী হইলে সে সুখী।—ভক্তবাস।

ঠাকুরাণী তাহা দাখিয়া লইলেন।' [নিশি ও বিহার এই চরিত্রের প্রত্যেক প্রসিদ্ধানবোধ।] বিরা ও নিশির পারের ধূলা লইয়া, প্রচুর তাহাদিগের কাছে বিহার লইল। তাহারা কথিতে কথিতে কিরিয়া গেল। (১১ খণ্ড পরিচ্ছেদ।)

গাংগা-তীরে আবার সোণার সতীন সাগর প্রফুল্লের সমবেদনাময়ী সখী হইবে, স্তম্ভরাং মধ্যাজীবনের সখীঘরের আর প্রয়োজন নাই।

১৩। ঐ ও জয়ন্তী

মাতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই ত্রাতা বিধম বিপদগ্রস্ত হইলে ঐ অশ্রুতা (পাচকড়ির মার সাহায্যে) স্বামী সীতারামের শরণ লইয়াছিল; সীতারামের সহায়তার ত্রাতার বিপদ কাটিল; কিন্তু ঐ সীতারামের নিকট জ্যোতিষীর সপনার বৃত্তান্ত শুনিয়া 'প্রিয়প্রাণতন্ত্রী' হইবার আশঙ্কায় স্বামি-সহায্যের আশায় লগ্নাঙ্গল দিল এবং ত্রাতা ও পতি উভয়েরই আশ্রয় ছাড়িয়া অকূলে কাঁপ দিল। এই সঙ্গম-স্থিতিরূপে সে শ্রাবণধনের উপর নির্ভরনিলা। পরে ভরতীর সঙ্কট কথোপকথন হইতে জানা যায় (১ম খণ্ড ১১ খণ্ড পরিচ্ছেদ) যে ঐ ঐক্যের পথে পাতার অত্যাচারের ভয়ে স্বামী লগ্নাঙ্গল এতাকিনী নিঃশেষায়, আত্মহত্যার প্রস্তুত, এই অসঙ্গার অবস্থায় তাহার পার্শ্বচারিণী সখী মিলিল—সন্ন্যাসিনী অরুণী বৃটিল। (পূর্বে স্বামীর দলে থাকিতে ঐ অরুণীর সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তখন ঐ সন্ন্যাসিনী প্রয়োজন হয় নাই, স্তম্ভরাং তখন উভয়ের মিলন ঘটে নাই।)

ঐর মন টলিল। ঐ দেখিতেছিল, তিকা এবং সূতা, এই দুই চিত্র উপায়াস্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যেন উপায়াস্তর হইতে পারে বোধ হইল।' (১ম খণ্ড ১১ খণ্ড পরিচ্ছেদ।) স্তম্ভরাং সন্ন্যাসিনী এখন তাহাকে সন্ন্যাসী হইতে অহরোধ করিল তখন ঐ একটু ভর্তুকি পর সম্মত হইল। 'সন্ন্যাসিনী বিরাগিনী প্রেরজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার প্রকৃৎ নাই; আত্ম একজন সমবয়সী প্রেরজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্র একটু প্রফুল্ল হইল।' (১ম খণ্ড ১২ খণ্ড পরিচ্ছেদ।)

প্রথমে উভয়ে উভরকেই হৃৎসংযোজন করিল, কিন্তু দুই দিনের পরিতরে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে তাহার 'বহিন্' বনিয়া

গেল + 'সেহলসংযোজনে ঐর প্রাণ একটু ছুড়াইল। দুইদিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, ঐ তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুইদিন মা! বাহা! বনিয়া কথা হইতেছিল,—কেননা সন্ন্যাসিনী ঐর পুত্রনীর। সন্ন্যাসিনী সে সখ্যোজন ছাড়িয়া বহিন্ সখ্যোজন করার ঐ বৃটিল, যে সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।' (১ম খণ্ড ১৪ খণ্ড পরিচ্ছেদ।)

উভয়ে সমবয়সী, প্রথম আলাপেই উভয়ের মনে সখ্য-প্রীতির সঞ্চার হইল, অরুণী প্রথম হইতে সমবেদনার সহিত কথা কহিল, ঐকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিল, একটু মর্দলাপের স্তরে ঐর মনের কথা জানিয়া লইল, ও তাহাকে সংপূর্ণরূপে মিল ও তাহার সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসী হইল। (১ম খণ্ড ১১ খণ্ড পরিচ্ছেদ।) পর পরিচ্ছেদে ঐর হাত বেধার প্রত্যয়ে অরুণী তাহাকে (১ম খণ্ড ১৩ খণ্ড পরিচ্ছেদ) জ্যোতিষী গম্ভীর স্বামীর নিকট লইয়া গেল; সূতা গেল, অরুণী সর্বাভঃকরণে ঐকে সাহায্য করিতেছে। পর-পরিচ্ছেদে দেখা যায়, উভয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঐর সমগ্র ইতিহাস অরুণী এখন জানিল, এবং তাহার মনোজীবন-পটনের চোঁটায় অরুণী (নিশিও মত) ঐকে লোকচান হিতে আরম্ভ করিল। (অত্যাচার-জীবনের পথে নিশি অপেক্ষা অরুণী বোধ হয় অধিক অগ্রসর।) এখন হইতে ঐ অরুণীর শিক্ষা, অথচ অরুণী আবার ঐর বয়সী সখী। 'ঐ প্রাণ ধুলিয়া আবেগ-ভরে তাহাকে পতীর স্বামি-প্রেমের কথা বলিল, ঐ আর কথা কহিতে পারিল না। সুখে অকল চাপিয়া প্রাণ তরিয়া কাঁদিল। অরুণীরও চক্ষু ছল ছল করিল।' (১ম খণ্ড ১৪ খণ্ড পরিচ্ছেদ।) সূতা গেল, ঐ অরুণীকে আগনার জন্য অন্তরঙ্গ সখী বনিয়া জানিয়াছে, তাই তাহাকে সকল কথা জানাইয়া মনের তার লগ্ন করিতেছে।

'জানিলে আপন জনে মনের বাতনা।

বাণিত জুগল পাথ অনেক সাধনা।'

আবার অরুণীও নিশির মত ('বেবী চৌদুরাণী', ১ম খণ্ড ১৩ খণ্ড পরিচ্ছেদ) সমবেদনাময়ী সখী। এইখানে প্রথম

১. নিশিও প্রফুল্লের কখন কখন মাতুলসংযোজন করিয়াছে, কেননা প্রচুর বেবী-চৌদুরাণী অর্থায় রাণী মা। ('বেবীচৌদুরাণী' ২য় খণ্ড ১৪ খণ্ড পরিচ্ছেদ ও ৩য় খণ্ড ১১ খণ্ড পরিচ্ছেদ।)

খণ্ডের শেষ। বেধা পেল, প্রথম খণ্ডের শেষেই উত্তরে সখি-বন্ধন নির্মিত হইয়াছে।

গদ্যের সখীর পূর্ণ-আবেশ মত জরতী এক বৎসর পরে (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ) আবার শ্রীকে সঙ্গে করিয়া মহাপুরুষের নিকট আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ শ্রীর অশ্রুচাক্তে জরতীকে জানাইলেন যে শ্রীর পতি-সম্বন্ধনের সময় আসিয়াছে ও জরতীকে তাহার সঙ্গে বাইতে হইবে। জরতী শ্রীকে সেই অমূল্য জানাইল, তাহার সহিত 'সখী'র প্রথম উপাধন করিল, উভয়ে অনেক জ্ঞানের কথা হইল, শ্রী মনের কথা জরতীকে বুঝিয়া বলিল, সে এখন পূর্ণাধিকার জরতীর শিষ্য। (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)।

উত্তরে ভৈরবী-বেশে সীতারামের রাজধানীতে আসিল, জরতী সীতারামের রাজ্যরক্ষার প্রভূত সাহায্য করিল (সে সব এই প্রণমে অবাস্তব কথা), এবং সীতারামের আশা মিটিবে তাহাকে এই আশ্বাস দিল (২য় খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ)। এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে (১১ম) জরতী শ্রীকে বলিল 'একশ্রেণী সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।' কিন্তু শ্রী সাধন করিল না। হা হা হটক, বুঝা পেল এক্ষেত্রেও জরতী শ্রীর শুভাশুখারিনি সংস্কারমণ্ডারিনি সখী, শ্রীও তাহার কাছে কোন কথা সূচার না।

তৃতীয় খণ্ডে জরতী শ্রীকে হুখী করিবার ভ্রম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গদ্যায়মকে মুক্ত করিল এবং শ্রীর সহিত সীতারামের বিদল ঘটাইয়া দিল। (৪র্থ পরিচ্ছেদ)। এত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মধ্যেও জরতী সখীর কর্তব্য ভুলে নাই। তাহার পর শ্রী অনেক দিন 'চিত্ত-বিস্রামে' বাস করার পর জরতী শ্রীকে আসর-বিপদ হইতে উদ্ধার করিল ও তাহার ভ্রম নিজেকে বিপর্যয় করিল (১৬ম পরিচ্ছেদ)। জরতী সখীর ধরনে একটু পরিচাল করিল, তাহার পর তব-উপদেশ দিল এবং শ্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করিল। এখানেও সে 'বিদ্যাস-বিস্রামকারিণী' শুভাশুখারিনি সংস্কারমণ্ডারিনি নারিকাসহায়িনী। জরতীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। এই উদ্ধার-কার্যের ফলে শ্রীর ভ্রম জরতী সীতারামের হস্তে নিবারণ অসম্ভবন সহ্য করিল (১৮ম পরিচ্ছেদ), ইহা তাহার সখী-শ্রীর উজ্জলতম নিদর্শন। (সে বীতংস ব্যাপারের আর বর্ণনা করিব না।)

এই পাঠ্যভাগেও জরতী শ্রীর সুখ চাহিয়া অত্যাচারী

সীতারামের উদ্ধারকামা হইয়া শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, শ্রীর কাছে সমস্ত সত্যের সবিশেষ বলিল, আবার তত্বকে স্বামিসেবা করিতে প্রস্তুতি দিল, শ্রীও সম্মত হইল (২০ম পরিচ্ছেদ)। উত্তরে একান্তিহি হইয়া সীতারামের রাজধানীতে আসিল (২১ম পরিচ্ছেদ) এবং সীতারামের সর্গ-নাশের সময় তাহার (পার্বিষ নহে) পারমার্থিক উপকার সাধন করিল (২৩ম পরিচ্ছেদ)। বলা বাহুল্য, জরতী শ্রীর সুখ চাহিয়াই সীতারামের বঙ্গল সাধন করিল।

জরতী শ্রীর সুখ চাহিয়া (গোলন্দাক-বেধী) গদ্যায়মকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল, সীতারাম তাহার মাথা কাটিয়া কেঁপেলেন (২৩ম পরিচ্ছেদ)। তাহার পর 'গোলন্দাক কে?' ইহা লইয়া শ্রী ও জরতীতে কথা হইল, সম্বন্ধে মিটাইবার ভ্রম উভয়ে বর্ণনাক্ষেত্রে পেল, শ্রী অনেকক্ষণ পরে চিনিল—'গদ্যায়ম বটে।' 'শ্রীর চক্ষু মিলা অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জরতী বলিল, "বহিন্—বহি এ শোক কাজের হইবে, তবে কেন সন্ত্রাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল? বাই হটক উহার ভ্রম বুঝা যোজন না করিয়া উহার হাতু কড়া হাক আইস," তখন চইখানে ধরাধরি করিয়া গদ্যায়মের সব উপদ্রুত স্থানে লইয়া গিয়া হাক করিল।" (২৩ম পরিচ্ছেদ)। ভ্রাতৃ-শোকাতুয়া শ্রীর সহিত সমবেশন-প্রকাশ ও তাগকে সাহায্য-দান জরতীর সবিশেষ শেষ কাণ্ড। ইহার পরে উভয়ে একত্র লোকালয় ভ্রাম্য করিল। এক্ষণে কবি সখীষয়ের সম্পূর্ণ একাত্মতা বিধান করিলেন। প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিল, স্তব্ধতা শিক্ষা-কীর্তনের সন্ধীনী-ধরনের সহিত তাহার ছাড়াছাড়ি হইল। পক্ষান্তরে শ্রী সর্গভাগিনী হইয়া সন্মার ছাড়িল, স্তব্ধতা জরতীর সহিত তাহার সখি-বন্ধন দৃঢ়তর হইল। প্রকৃত ও শ্রীর চিত্ত-গত পার্থক্যের ভ্রমই সখীদ্বন্দ্বকে এই প্রভেদ।

শেষ কথা।

এই হুখীর্ণ আলোচনা হইতে বুঝা পেল, বহিষক্রেতায় কায়ের বাহুল্য প্রচার বহুল্যে—'নারিকাসহায়িনী' সখীর অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহার অনেকগুলি ফলে সবিশেষ উজ্জল ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। নারিকাসহায়িনী, গিরিজায়া, কুন্দম, নির্বলহুমারী, বদন্তহুমারী, হুভাদিকী,

নিশি, অথবা এই অষ্ট সখীর উজ্জল চিত্রের পুনরুৎপাদন। কোনও কোনও স্থলে কবি মাসুলি প্রাধিকার অমূল্য করিয়াও যথেষ্ট ঘোষিতা দেখাইয়াছেন, কোনও কোনও স্থলে নূতন আদর্শে সখীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তত্ববলে তাহাও বুঝাইয়াছি। উপসংহার-কালে পুনরাবৃত্তি

নিশ্চয়োজন। আবার কতকগুলি স্থলে যেমনহী তদিনি, মনসা বা যগহী সখীহানীয়া, অবতরনিকার তাহাও দেখাইয়াছি। আশা করি, এই আলোচনা হইতে পাঠকবর্গ বিভিন্নস্তরের ঐতিহ্যের বিভিন্ন দীপার আর্থিক পরিচয় পাইয়া প্রীত হইবেন।

বোঝাপড়া

[শ্রীমত্রেস্ত্র দেব]

দীর্ঘ যেদিন খ্রীঃ প্রদোচনার ভোজের ব্যর্থতার নিবেদন সবেও রানার বিনামূল্যেতেই পৃথক্ হইয়া গেল, সেখান হইতে বৃদ্ধ রাণানারের অচ্যব-কর্তৃত্ব বুকখানা সেদিন সেই কঠিন আঘাতে চূড়ম্বর হইয়া গেল। যেহেতু খানিকটা হঠাৎ কোথাও শক্তা লাগিয়া প্রবল ধ্বংস চিরিয়া গেল, তীব্র বস্ত্রপার সহিত তাহা হইতে যেমন ক'ব-ক'ব করিয়া রক্ত পড়ে, রাণানারের চক্ষের জল সেদিন তেমনই হাতনার সহিত করিয়া পড়িতে লাগিল।

রাণানারের স্ত্রী ক্যান্ডননি আপন বস্ত্রাকলে বান্দীর চক্ষের জল বুকাইয়া মিটা, একটা ঘোঁষনিঃবাস কেলিয়া বলিল, “চুপ কর, কেঁবে আর কি হবে; যেটাছেলে যদি মেয়ের বস হয়, তবে কি তার আর বুদ্ধিভি ভাল থাকে গো? রাঙা-বৌ আনুবা প্রিতিজে করে বসেছিলে,—অন্ততঃ টাকা মাহুজনের কাছে হাঙলাত করে পল দিয়ে সেব কোন এক চা'বরের মেয়ের কটা চামড়া দেখে বৌ করে নিবে এসে,—হোটেনেকের মেয়ে সেজান্না হয়ে তোমার হাতে-পড়া সংসারটা ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল! বেশ হয়েছে,—তুমি যেমন অল্প মাহুজ, তেমন তোমার কল করে গেল এই একটা চা'বর মেয়ে এসে। সেই বিয়ের সময়েই তখন এই মাণ্ডের মা মণ্ডার ক'রে বলেছিল, হ্যাঁগা—টাকা-পয়সা হাতে নেই, ধার-কর্জ করে এত সব করা কেন? তা সে কথা তখন কবেই নিলে না—!” খ্রীঃ কথার এই আঘাতের বেধনার মধ্যেও রাণানারের হাসি আশিল; রাণানার বলিতে লাগিল, “মাণ্ডের মা! সেদিন তুই কোথায় ছিলি রে? সেই তিনদিন বছর আগে যেদিন হুর্দ, বাপ আমার তাঁর মরণশিরে ডেকে সাতবছরের

দীর্ঘকে আমার হাতে নগে দিয়ে বলে যান, ‘বেশি বাবা! আমার দীর্ঘ যেন না কষ্ট পায়, যেটারী জ্ঞানাবধি মা-হারা, তাইটিকে তোমার লাগামত বন্ধ করিস্ মা’—তখন আমার বয়স কত জানিস্, মাণ্ডের মা! তবে ১৭১৭ বছর! ঐ কামারদের ‘নেসো’র মতন অটুটু গ্যাড়গেড়েটা গান্না ছিলুম। তুই এসে দীর্ঘকে বতবড়টা খেঁচিছিলি—তার চেয়ে বছরটাক বড় আর কি,—দেই বয়সে কি করে যে মোতজ্বা বাঁচিয়ে, ক্ষেতখামার চালিয়ে অন্যে তাইটিকে মাহুজ করিছিলুম, তা তুই কি ক'রে জানুবি? ধার করেছিলুম কি সাথে রে! তাইকে যে আমার তামুক করে গড়েছিলুম! সে মনে করে বিশ দিনে আমার বিশ বছরের হেনা মিটিয়ে দিতে পারতো! কিন্তু বার অষ্টে মূখ নেই, তার কি কখন ভাল হয় রে? তার শাকী মেণ্‌না, এমন লম্পন ভাই আমার ত্যাগ করে চলে গেল।”

রাণানারের স্ত্রী ক্যান্ডননি গুরুক মাণ্ডের মা নিমেষও এবার কাঁদিয়া কেলিল; চোখ বুদ্ধিতে-বুদ্ধিতে বলিতে লাগিল, “অবাক্‌ হয়েছি গো! সেই ঠাকুরপো—বে দাদা বলতে, বৌঠান বলতে অজান হ'ত—তার যে একদিন এমন মতিগতি হবে, এ স্বপ্নও তাইনি! বৌ-ভুঁড়ি যে তার কানে কি বিশ্বাস দিলে! তুমি একপলা সোনার ডুবে এক-কাল হয়ে যে তাইকে রান্না করে গড়লে, সে কি না তোমার বয়সকালে তোমার তাদিরে দিয়ে গেল! হি—হি। একটা অর্থকি সইবে—” বাবা বিয়া রাণানার গর্জিয়া উঠিল, “বর্দার মাণ্ডের মা! তাইকে আমার গাল-মণ্ড করিস্কে!”

(২)

তাঁহার পর দুই বৎসর কাটয়া গিয়াছে। অনিদ্দা

নইয়া ছোট ভাই দীহর সহিত মাৎলা-মর্দমা করিতে রাখানাথ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাদী, আত্মীয়-বন্ধু সকলের কথাই সে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার নিজের অনেক ভ্রাতা প্রাণাণ, দীহর আদিয়া ধাবী করিবামাত্রই বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। গাঁয়ের লোকের পরামর্শে মাৎকের মা ভবতার রোগায়াগি, কান্দাঘাটি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, রাখানাথ তাহাকে বুঝাইয়াছে, “ভগবানকে ডাক যে বটে! ‘মাৎকে’ রইল, ‘মতি’ রইল—আর তোর ভাবনা কিসের? হুঁদশ বিধে জমি নিয়ে কি ধুয়ে থাকি? আমি ত’ আর শয়ের হাতে’ তুলে বিই নি রে—দীহর থাকলেও বা, আমার থাকলেও তা, তবে আর হুঃখটা কি? দীহু কি আমাদের পর রে?”

দীহু পৃথক্ হইবার পর হইতে ক্রমান্বয়ে দুইবৎসর ধরিয়া, এই যেরোছ লোকটিকে কনিষ্ঠপুত্রের হালচাল ও ভগ্নহৃদয় বৈষয়িক বৃদ্ধির উপদেশ করিতে বারবার অপরাগ হইয়া, মাৎকের মা সম্পত্তি বিচাইবার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল বটে; কিন্তু বামীর শাস্ত্রিক হৃৎকায়ের জন্য শীঘ্রই তাহাকে চিন্তিত হইয়া উঠিতে হইল। আশৈশব বহু অভ্যাশটা মাথার বহিয়া অকুতোভয়ে এই লোকটি আশ পক্ষাশের কোটায় আসিয়া গা’ দিয়াছিল বটে, কিন্তু যে খুঁটির উপর ভর রাখিয়া সে তাহার পরিপ্রান্ত জীবন-সন্কার স্রাতি দ্ব করিতে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সেসা হৃদ্যাত্তের পূর্বে চাওয়া যেছিল, তাহার সেই একান্ত নির্ভরত্ব অস্ত্রে আসিয়া ধূল করিয়া গিয়াছে। একে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সে অপরিমেয় শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর সেসা দীহর এই অশ্রুত্যাগিত অকৃত আচরণ বহন কর্তার বজ্রাঘাতের মত তাহার বুকের ভিতর আসিয়া বাসিল, গুরু পরিভ্রমে নষ্ট-বাহ্য বৃদ্ধ তাহা বহু চেষ্টাতেও মালাদাইতে পারিল না,—অচিরে শয্যা আশ্রয় করিল।

ভবৎ-পণ্য ও চিকিৎসা প্রকৃতিতে স্মান্তমনি তাহার সমস্ত পুষ্টিপাটা ও অঙ্গের অলঙ্কার ব্যা করিয়া, ও বিক্রয় করিয়া এমন কি অঙ্গের তার আরও বৃদ্ধি করিয়াও দর্শনাত্মক বাণীকে বিচাইতে পারিল না। রাখানাথ শেষ সময়ে দীহুকে একবার সেখান ঘাইবার মত ব্যাহুল হইয়া উঠিল। স্মান্তমনি সেবরকে ডাকিয়া আনিবার মত ঘোড়পুত্র মাশিকশালকে পাঠাইয়া দিল। মাশিকশাল

কিন্তু বৃদ্ধিবার নিকট সাহিত হইয়া একা কামিতে-কামিতে দিবিয়া আসিল। স্মান্তমনি অস্ত্র দুইখা স্বাণীকে আনাইল, “ঠাকুরগো গ্রামে নাই, জমীদারী কাজে মফসলে গিয়াছে—কিহিতে বিলম্ব হইবে।” বাহা হউক, রাখানাথকে আর সে অনির্দিষ্ট বিলম্ব পর্য্যন্ত বৃত্তিতে হইল না। তাহার দুর্ঘট-প্রাণ শেষ পর্য্যন্ত তাইয়ের প্রতীকার থাকিয়া-থাকিয়া শেষে হাঙ্গকার করিয়া মরিল।

মাশিক তখন আটবৎসরের বালকশ্রী এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতি পাঁচ বৎসরের শিশু।

সম্ম-নিহতীল বালকশ্রীর অশৌচাত্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের সর্গবাস্তব হইয়া গেল। কেবলমাত্র শ্রীমন্ত সর্দারের চেষ্টায় তাহাদের কুঁড়েটুকু রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু আর সমস্তই গণের দ্বারে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাণাঘাটা চলিতে-চলিতে ক্রমশঃ গ্রামবহু রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, দীহু সাহিত তাহার অধিকাংশই বেনানীতে খরিদ করিয়াছে। নিরুপায় মাৎকের মা তখন গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ধান ভাড়িয়া, চাল ভাড়িয়া এবং অবসরমত হুতা কাড়িয়া অতি কষ্টে নাবালক ছেলের ছুটিকে রাহু করিতে লাগিল। এই উপায়ে অনাথা সান্ন্যাস বাহা অর্জন করিত, তাহাতে তিনটি প্রাণীর দুই-বেলা পেট ভরিয়া আগাতের সচ্ছন্দ হইত না। কাজেই স্মান্তমণিকে মাসের মধ্যে দুইটা একদিনী ছাড়া অন্তরিক্ত আরও অনেকগুলি একাদশী করিতে হইত।

৮ ইচ্ছার অঙ্গগিনের মধ্যেই মাৎকের মার উপবাসের দিনগুলি সংক্ষেপ হইয়া আসিল। শ্রীমন্ত সর্দারের সুপারিশে মাশিকের জমীদার-বাটতে একটা চাকরী কুটিল। কিন্তু নিত্যের ছোঁকা বসিয়া উবার জমীদার মহাপ্রসন্ন তাহাকে বেতন দিতে সম্মত হইলেন না। কেবল-মাত্র পেটভাতের বন্দোবস্তে তাহাকে আপনায় পাখাটানা কাজে নিযুক্ত করিলেন।

রাখানাথের প্রাণাত্য বয়ে দীহু বাংলা লেখাপড়া বেশ ভাল রকমই শিখিয়াছিল, এবং দাদারই চেষ্টায় সে জমীদারী-সেবতার আমলায় পদ পাইয়াছিল। সেই-খানেই আশ তাহার স্নাতুশ্রুকে এই ভূতালমোচিত নীচ কার্যে নিযুক্ত হইতে সোঁপরা দীহর বেন বাধা কাটা গেল। এই ব্যাপারটা তার পক্ষে এতই মানহানিকর বলিয়া বোধ

হইল, যে, সেই দিনই অপরাহ্নে কাছারীর কেবল—যে দীহু পৃথক্ হইবার পরদিন হইতে আশ পলাত এই দুইবৎসরের উপর হইল এগাবৎ একবারও সেমিক মাড়ার নাই, এমন কি দাদার ভোগে, স্নাত্যকালে, অন্তোচ্যন্তেও উকিটি মারে নাই—সে আশ তার নিম্নের মানের দ্বারে একেবারে সন্মিলন সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীর-প্রাচণে হাজির হইয়া ডাক দিল, “বৌঠাকরুন।”

প্রাচণের সমুখস্থ দাওয়ার উপর বসিয়া ক্যান্ডননি তখন তাহার একখানি শতছিন্ন বস্ত্রের সংস্কার করিতেছিল। স্বামীর পরম সোশালিসের এই চিরপরিচিত অচল বহুদিনের অশ্রুত ও অপ্রত্যাশিত কর্তব্যের সম্মান আশ তাহারই অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইবামাত্র মাপিকের মার কম্পিত হইতে দেখাইয়ের ছুঁচটা সম্মুখে বিধিয়া গেল। কিন্তু সেমিকে তাহার ক্রক্ষেপ নাই—কল্প-স্বাধার স্বামীর সেই আশার বাণী নিতাই তাহার মনে পড়ে “দীহু কি আদামের পর রে।” ছুঁচ, হতা ও কাশড় রাখিয়া ক্যান্ডননি তড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; এবং ঘরের ভিতর হইতে একখানি পিড়ি আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। কাছারীর কেবল আনিয়াছে সেখিয়া হাত-মুখ দুইবার ধুইবার জন্য এক ঘটি মল আনিয়া উপস্থিত করিল; এবং দীহু কিছু বলিবার পূর্বেই পিড়ির সমুখে একটা ছোট ঘামী করিয়া চাবুটি হুঁকি, একটু ভিড় ও পরিষ্কার ঠাণ্ডা মল আনিয়া রাখিল। দীহু ব্যস্ত হইয়া বলিল, “থাক! থাক! বৌঠাকরুন! ওদূর কেন? আমি এখনি যাব, একটা বিশেষ কাজে এসেছি, বৈশিষ্ট্য ত বস্তুতে পার্জ না।” মাংকের মা ওতকণে পানের সজ্জা বাহির করিয়া গান সাধিতে শুরু করিয়াছে; সুস্থ হাসিয়া বলিল, “সে কি হয় ঠাকুরপো! আশ কদিন পরে ঘর যাত্রা করে এসেছে, একটু বসে বেতে হবে বই কি। বাড়ীর সব বসর কি বল? ছোট-বো কেমন আছে? নারায়ণ কেমন আছে? পুতীকে অনেকদিন দেখিনি, সে কত বড়ট হ’ল?” ইত্যাদি প্রশ্ন-প্রশ্নে দীহুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পিড়ির উপর বসিয়া দীহু বলিল, “তোমার আশীর্বাদে খবর আর সবই ভালো, কেবল এই ক’দিন স্ত্রী-বাল্যের ছোট-বোয়ের হাণানী কাশীটা একটু বেড়েছে।” এইরূপ সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সারিয়া দীহু মাহিতি অবাক

হইয়া তাহাতে লাগিল, তাই ত এ কি ব্যাপার! কোথায় সে মনে কল্পিতাঙ্গিল বৌঠাকরুন না আনি তাহাকে কত ভিতরকারি করিবে, ধরত বা অপমান করিতেও ছাড়িবে না। এই ভয়েই ত এতদিন সে এখানে মুখ দেখাইতে পারে নাই! কিন্তু একি!—এ কি অকল্পিত সাধর অভ্যর্থনা! বৌঠাকরুন যে সুস্বস্তম্য বিধা না করিয়া সহজে, প্রচুর মুখে নির্মিত্যর চিত্তে তাহার সেই স্বেচ্ছার পরিত্যক্ত দেহাকল-খানি সগোষে বিছাইয়া দিবে, এ ত দীহু স্বপ্নেও আশা করিতে পারে নাই!

দাওয়ার এক পাশে একখানি জীর্ণ, মলিন মাড়রের উপর কোমরে একটা সুন্দরী-বাধা দিনব্যর মতিলাল তখনও ঘুমাইতেছিল। ক্যান্ডননি তাহাকে চোঁলিয়া তুলিল, “মতি! ওঠ, ওঠ—চোরে দেখ, কে এসেছে?” মতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ বগড়াইতে-বগড়াইতে, নিম্নাভ্যস্তিত কর্তে নিজামা করিল “হা মা! বাবা কিরে এসেছে বুঝি?” পরিহিত বসন-প্রান্তে পুস্তকের লগাট ও গ্রীবাশেণ হইতে সখ্যে স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া মা বলিলেন “দুখ বোকা ছেলে! চোরে দেখ না কে এসেছে—হা, গোমান করে পায়ের মূলো নিয়ে আর।” মতি এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া—যেন চিনিতে পারিল। অমনি ছুটয়া কাকার কোলের উপর গিয়া বসিল। ক্যান্ডননি নিজামা করিল, “কে বল দেখি, মতি?” মতি কাকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল “হা, আমি বুঝি জানিনি,—এ ত আমার কাকা।” তার পর চুই মতি তাহার কাকার কোল হইতে কাঁধের উপর উঠিয়া বসিল; এবং চুই হাতে কাকার চিবুক ধরিয়া নিজামা করিতে লাগিল,—“কাকা, তুমি এসেছ? বাবাও আসবে। তুমি কোথায় চলে গেছলে? তুমি চলে গেলে, বাবা চলে গেল, সবাই চলে গেল—আর আমি বোঁড়া-বোঁড়া খেলতে পাইনি। মা ভাল বোঁড়া হতে পারে না—কাকা, আর তোমাকে পালাতে যিচ্ছিনি কিং—লজ্জাটা কাকা, আর আমি তোমাকে চাবুক মার্ক না কেনন?”—দীহুর চক্ষের পাতা অশ্রুশিক্ত হইয়া উঠিল। মতিতে কাঁধ হইতে যুক্ টানিয়া লইয়া, তাহার গায়ে মাখার সয়েছে হাত মুলাইতে-মুলাইতে দীহু বলিল “ছেলেগুলো বড় রোগা হয়ে গিয়েছে বৌঠান!” কাক-মনি উদাসভাবে বলিল, “কি কর্ক তাই, সমস্ত দিন যে

ছই পনা করে,—মাথার উপর শালন কর্জার ত আর কেউ নেই। তবু তুমি মাণ্ডুতটাকে এখনও সেবনি ঠাকুরপো! সেটার একেবারে অধি-চর্চ-সার হয়েছে। তাকে দেখলে তুমি হর ত আশাকে বাঁটা-পেটা কর্কে!”

মাণ্ডুকের বিবরণ বলিবার জন্তই দীর্ঘ নাইতি আশ্রয় এখানে আশ্রয়ছিল; কিন্তু হেঁচকের অন্তর্য্যায়ের এককণ তারা ভুলিয়াছিল। হঠাৎ মাণ্ডুকের মাথ গুলিয়াই তাহা মনে পড়িয়া গেল। দীর্ঘ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—“হ্যাঁ, ভাল কথা বোঁঠান, মাণ্ডুকেক তুমি ও কাজে দিবেছ কেন? ওখানে ত ওকে রাখা হবে না।” কান্তমণি বেশ সহজ ভাবেই বলিল, “বেশ ত, তুমি বা ভাল বোঝ, কর না,—এ সব তো তোমারই বৈখ্যার কথা,—আমি যেয়েমাহুয়, আমি কি তাই অত-শত বুঝি?” দীর্ঘ এক গাল মুচী মুখে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, “না—তা, বোঁঠান; হেঁচ, আর কোন আপত্তি ছিল না আমার—তবে কি জান—‘কাজটা বড় খাটো কাজ’—‘কান্তমণি এবার একটু বেন বিরক্ত হইয়া বলিল—‘বলি হ্যাঁগা ঠাকুরপো—লে ছোঁড়ার কি এই কাম কর্জার বরস? এমন বরসে যে তোমরা ছিলে পাঠশালায় পোড়ে।—‘দীর্ঘ একটু অপ্রতিভ হইয়া সমস্ত শুকুটু মুখের ভিতর পুরিয়া বলিল—‘আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম, বোঁঠান,—ওকে আমার পাঠশালাতেই দাও। আর দিনকতক পড়াওনা করুক,—ক্রমে শুকুটীটা সোরস্ত হয়ে পেসে, তাই কি এর পর সেহেঁজার একটা কর্ণ-কাম কিছু ছুটে বেতে পাবে, বুৎপে?” কান্তমণি বহিও হাসিতে-হাসিতে বলিল, “সবই বুঝি ঠাকুরপো,—কিন্তু কথা হচ্ছে—কি জান, মণীদার-বাড়ী ও হুংগা দুটো খেয়ে বাঁচেছে—পাঠশালে দিলে যে ওকে না খেয়ে পড়তে বেতে হবে! খালি পেটে কি শুকুটীটা ভাল দোরস্ত করতে পার্বে—বাণ্ডকে হারিয়ে তুমি যেমন সোবর-পেপন দায়া পেয়েছিলে, ওর তো তাই তেমন দায়া কেউ নেই!”—কিন্তু দীর্ঘর পিঠে এই কথা শুলেই বেন সম্বোধে চাবুক মারিল,—শৈশবের সমস্ত ইতিহাসটা এক নিমেষে বেন তাহার চক্ষের সম্মুখে চিত্রের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অপরাধীর মত নতমুখে সে বলিতে লাগিল, “আমার মাগ কত, বোঁঠান, আমি তোমাদের লগে বড়ই অশ্রম করছি! মাদিককে বোঁলো, কাল থেকে ছুবেলা আমার ওখানে

যেবে পড়তে বাবে। আর শুকমশাইকে আমি বলে দেবো এখন,—ওর পাঠশালায় খরচ আমার কাছে চেয়ে নেবে।” মাদিকের মা শুধু বলিল, “বেশ, কাল থেকে তার সেই ব্যবস্থাই হবে; তবে তুমি নিজে কাল সকালে একবার এসে ছোঁড়াটাকে লগে করে নিয়ে যেও;—নইলে হয় ত হতভাগা বেতে চাইবে না।” “আচ্ছা, তাই আসবো” বলিয়া দীর্ঘ উঠিয়া পড়িল। কান্তমণি তাহাকে উঠিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল, “ও কি, এর মধ্যেই উঠে পড়লে যে ঠাকুরপো। ওই কটা মুড়ি, তাও যে সব পড়ে হইল—না—না, তা হবে না,—ও কটা দানা গালে কেলে দাও—‘দীর্ঘ হাত মোড় করিয়া বলিল, “বোঁঠাই বোঁঠান, আর পার্জ না,—মণীদার বাড়ী আস অনেকগুলো আর খেয়েছি—পেটটা বোঁঠাই হয়ে রয়েছে—” আয়ের কথা শুনিয়াই মতি দিয়া কাকার হাত ধরিয়া আদ্যার করিল, “আমি আঁখ ধাব কাকা!—আমাকে আঁখ এনে দাও,—দীর্ঘ তখন ছাড়াটি বগলে করিয়া চটি ছুটাটি পায়ে দিয়াছে। কিন্তু মতি ছাড়ে না কিছুতেই,—আম সে এংনি খাইবেই—অগত্য। কান্তমণি তাহাকে শালন করিতে উত্তর হইল। দীর্ঘ তখন ট্যাং হইতে একটা চুকেক সিকি বাহির করিয়া মতির হাতে দিয়া বলিল, “এই দাও বাবা, কাল হাট দার আছে, আঁখ আমিই খেও।” মতি সিকি পাইয়াই চম্পট দিল। কান্তমণি পুত্রের এই কাণ্ডের মত আগেরে অপ্রতিভ হইয়া দেবকে বলিল, “অলবুদ্ধে ছোঁড়াটা মত বড় হচ্ছে, তত ব্যাকুল হচ্ছে—মণি-মণি-গুলো গিয়ে পর্য্যন্ত আঁখ-কাঁঠাল ত বড় একটা খেতে পাচ্ছে না কি না—‘দীর্ঘ আর ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে তাহার এই অসৌম্য মতিহীন বোঁঠাকুরের পদপ্রান্তে ধর্বার ভক্তির সহিত মাথাটি আশ্রয় এই দর্শনপ্রথম অকপট প্রছার অবনত করিয়া গুহে করিল। প্রাঙ্গণ দার হইতে-হইতে চলিতে লাগিল দেহময়ীর হৃদয় আশ্রয়—“বেঁচে থাক—সুখে থাক তাই, দায়া হও,—অখণ্ড প্রমাই হুক—”

রাজিতে আদ্যারদ্বার পর দীর্ঘ তক্তাপোষের উপর বলিয়া ভাষ্যক বাইতেছে,—দীর্ঘর স্ত্রী মাতঙ্গিনী হেঁচের বলিয়া বুক-পিঠে পরম তেজ মাশিল করিতেছে। দীর্ঘ বার-কয়েক তার ডায়া হুঁকাটার দ্বারা টান মারিয়া, মাক-মুখ দিয়া অনেকটা বোঁলো বাহির করিয়া, কানিতে কানিতে বলিল,

“তবে হিম্মত ধো, মাগ্গেটা জমীদার-বাড়ী পাখাটোনা
কাজে চুকছে ? হি—হি, লক্ষ্মীর আবার মাথা কাটা গেছে !
আমি ঈশ্বর সেরেস্তার একটা বড় চাকরে—একটা মাস্তগণ্য
আত্মা,—আর আমায়ই ভাইপো দেখানে একটা পাখাটোনা
বেধারায় হয়ে রইল ! তাও আবার মিনি-মাইনের পেট-
ভাতে ।—কতদূর অশমানে’র কথাটা বল দিকি !”
মাতঙ্গিনী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল “ওমা কি বোমা !
বড়কীর আত্মদণ্ডে বসিহারী বাই ! কায়দাখাদ্য মাগী
তোমার দুখ হেঁট করাতই বজ্রাতি করে ওখানে হেলে
পাঠিয়েছে বোধ হয় ! গতরবারের বেতীর পেটে-পেটে
পরতানী বুড়ি !” দীহু একই স্তুতিত হইয়া বলিল, “দুঃ ! তা
কেন ! বেঠানের আদি ভক্ত গোব মিইনি—হেঁড়াটাকে
নিরে গেছে ঐ শালা ঈশ্বর সর্কার !” “বটে !—জমীদারের
সর্কার পেয়ালা হয়ে বাটা ধরাকে সরা যেখেছে বুড়ি !
ডাক্তার আশুদত্ত ক’ম নয় ! বাটা মরতো এতদিন
হলে গড়ে,—ওই বড়কীর বাপ শত্রুহাই ত বাদ সাধলে !”
বলিতে-বলিতে মাতঙ্গিনীর হাঁপ আরও এংল হইয়া
উঠিল। দীহু বলিল, “সেই মন্তই ত বাটা আঙও ওদের
গোলাম হয়ে আছে ।” মাতঙ্গিনী মুখধীনা তোলো হাঁড়ীর
মত করিয়া বলিল, “এখন উপায় ! শত্রুরেয়া যে তোমার
দুখ দেখান দায় করে তুললে !” দীহু এবার তামকের
সমস্ত খোঁজাটুকু হ’ক’ব খোল হইতে যেন নিঃশেষে টানিয়া
লইয়া সপর্ক বলিল, “সে উপায় কি না করেই বাড়ী
চুকি রে ? শাস্ত্রে আছে ‘ধাক্ গ্রাণ, ধাক্ মান’
আজ কাছারীর ফেরত সটান ওবাড়ী গিয়ে বাহির হয়ে-
ছিলুম । বড় বৌকে অনেক বকিয়ে-জুড়িয়ে হেঁড়াটাকে
চাকরী ছাড়িয়ে বেবার ব্যবস্থা করে এসেছি ।” এই পৰ্য্যন্ত
তিনিহরি মাতঙ্গিনীর মুখখানা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল,
এবং হাঁপানীর টানও একটু কম পড়িয়াছিল ; কিন্তু পরক্ষণেই
দীহু হেই বলিল—“কাল থেকে মাগ্গে হুবেলা আবার
এখানে বেয়ে ওই ঠৈকুঠ পত্তনের পাঠশালে শটকে গড়তে
যাবে”—মাতঙ্গিনীর মুখ আবার অন্ধকার হইয়া উঠিল—
এক সঙ্গে-সঙ্গে হাঁপানির বটটুকু টান কম পড়িয়াছিল,
তাহা আবার হুবে-আগলে বিগুন বেগে আত্মপ্রকাশ
করিল । তথাপি চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া, দক্ষিণ হস্তের
তর্জনিটি গুণ্ডয়েন স্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী সপক্ষে বলিয়া

উঠিল “ও সর্কানাশ !—করছে কি ? তোমার কি আত্মদ-
বুড়ি একরজি নেই ? বাবু এ কথা শুনে যে এখন
তোমার অব্যব দেখেন ! তাঁর মিনি-মাইনের পাখাটোনা
বেধারায়টকে ভুঁমি ভাঙচি দিয়ে নিরে এসেছে,—এ কথা তিনি
শুনলে কি আর রক্ষে রাখবেন ?” এবার দীহুও চোখ-দুটা
কপালে উঠিয়া গেল এবং তোমার পক্ষীর মতাই এতটা বৃদ্ধি-
বিবেচনা আছে দেখিয়া, বেচারী বিশ্বাসে নির্জ্ঞান হইয়া
ভাবিতে লাগিল—‘তাই ত’ ! এত ঠিক বলিয়াছে ! তাঁর
হৃদয় ভূষণ জমীদার প্রভৃ ত এ কথা শুনে রক্ষে রাখবে
না ! এটা ত দীহুর মাথার একবারও আসেনি— ! হতশ
ভাবে দীহু তখন হাতের সেই প্রাচীর-নির্জ্ঞাপিত ধূস-লেশহীন
হঁকাটার বারকরক নিখল টান দিয়া, আত্ম-আত্মে
সেটাকে ঘরের কোণে নাখাইয়া রাখিয়া মাতঙ্গিনীকে বলিল,
“তবে উপায় ! আমি যে বড় বৌকে বলে এসেছি কাল
ভোরে গিয়ে মাগ্গেটকে নিরে আগবো !” মাতঙ্গিনী একটা
ঝড়ার দিয়া বলিয়া উঠিল, “ওঃ ! বলে এসেছ ত’ একেবারে-
চোরদারে ঘরা পড়েছ না কি ? না গেলে কি গলাটা
কেটে নেবে ?—এত কিলের তাঁর ঘরাধরি !—এখন
কিছুদিন আর ওদিক মাড়িও না—আর কালই হেঁড়াটাকে
কেন হুবেগে জমীদার-বাড়ী থেকে তড়াও !” দীহু
আশ্চর্য হইয়া বলিল, “আমি তড়াব কি রে ? সে কি
আমাদের সেরেস্তার কাজ করে ? সে যে একেবারে বাঘুর
খাসে চুকছে !” মাতঙ্গিনী তখন মাসিশের তেলের
তড়াটা তক্তপোষের নিকট ঠেলিয়া রাখিয়া—‘তৈল-নিক’
হাতটা মাথার চুলে বসিয়া লইয়া, শয্যার উপর উঠিয়া
বসিল ; এবং কঁঠুর একটু মুহু করিয়া একেবারে দীহুর
কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “সেখ, এক কাজ
করলে হয় না ?—দাও না হেঁড়াটাকে চা-বাগানের কুণি-
ডিপোর চালান দিয়ে !” দীহুর সর্কাল শিরদাঁড়া উঠিল !
এতখানি ক্রিম-বাহির করিয়া দীহু বলিল, “হিঃ ! এমন
কথা মুখে আনি সুনি ! তুই না হেলের মা ?”—মাতঙ্গিনী
ইহার কোনও সত্ত্বক দিতে পারিল না,—মুখখানা আবার
কাল মেঘের মত করিয়া শিখন কিরিয়া বসিল। দীহু
বলিতে লাগিল, “অজ কোনও একটা গোলা মংলব ঠাওরা
দেখি,—যাতে মনিবও না চটে, চাকরীটাও বজায় থাকে, অথচ
কাজ হাঁসিল হয় । ভোর মগলটা খুব সাধ,—খালা বুড়ি

বার করিল কিম্বা—” বাবীর নিকট আশ্ব-বুদ্ধির এই অবাচিত উক্ত প্রশংসা লাভ করিয়া, হাতদিনী বস্ত্রের প্রকৃতি হইয়া উঠিল; এবং তাহার উর্দ্ধের মস্তিষ্কে সেই সুহৃৎসেই আর একটা বেসামান্য বস্তু আসিয়া বস-বস জিন্দা হুঁকিতেছিল, তাহাই ব্যক্ত করিয়া বেশিল্প সেটা হইতেছে এই যে, কোন একবারে মানিককে চোর প্রতিপন্ন করিয়া জমিদার-গৃহ হইতে বিতাড়িত করা। দীহ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, এ কার্যটা অপেক্ষাকৃত সহজ সাব্যস্ত করিয়া, এই উপায়ই অবলম্বন করিবে স্থির করিল।

(৩)

পরদিন সকালে দীহ মানিককে লইতে আসিল না সেখানকার মনিচি চিত্তিত হইয়া উঠিল। তবে কি দীহের অশ্রু-বিশ্ব করিল না কি? না বাতা-রাতি আবার বসন্ত করিয়া গিয়াছে? অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, সেযোক ব্যাপারটাই হওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই ছোট বোয়ের পরামর্শে ঠাকুরপোর মতি-গতি আবার বদল হইয়াছে। এমন সময় শ্রীমন্ত সর্দার আসিয়া হাঁকিল, “বিদিতাকরণ! বাপুকে, মতি কোথা গো? তাহার দ্বন্দ্ব আম এনেছি যে!” বলিতে-বলিতে সে গামছা খুলিয়া প্রায় ২৩ কুড়ি ছোট-বড় আত্ম বাওয়ার উপর ঢালিয়া দিল।

মতি তখন হৈসে-খর চুকিয়া চুপি-চুপি তেল চুরি করিয়া মাথিতেছিল। আমের নাম শুনিয়াই সে তাহার বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞাসা পেল; এবং মাথার এক-খামুতা ও পেটে এক-খামুতা তেল শুদ্ধ ছুটয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর কাহারও অসুস্থতির অপেক্ষা না করিয়াই, ছই হাতে ছইটি আঁখি জুলিয়া লইয়া, চক্ষের নিম্নে অশ্রু হইয়া পেল। মানিক তখন তাহার পুরাতন শিতাবোথ ও জীর্ণ ধাতুপাত-খানি কাড়িয়া-মুছিয়া, বস্ত্রের বাঁধিয়া, মাসীর বোহাতের শুকনো কাপড়ের জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া, তুম্বানী কোণ-ভাঙ্গা ছোট স্টেটখানি অতি যত্নের সহিত কাঠ-কয়লার সাহায্যে খসিয়া-মালিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। শ্রীমন্তর গলা পাইয়া সে স্টেট হাতে ছুটয়া আসিয়া বলিল, “শ্রীমন্ত-দা! আত্ম আর আমি জমিদার-বাড়ী ধাব না,—কাকা এসে আমাদের পাঠশালা নে ধাবে বলাহে।” শ্রীমন্ত চক্রে বিশ্বদ্বন্দ্ব হুটয়া উঠিল। সে মানিকের দ্বার দিকে চাহিতেই কাকতমনি

বলিল, “শ্রীমন্ত-দা! তুমি এসে পড়েছ, তাহাই হয়েছে। ছোঁড়াটাকে জমিদার-বাড়ী টেনে নিয়ে যাও, আর এই দিকটা ঠাকুরপোর হাতে কিরিয়ে দিও।” বলিয়া আঁচল হইতে দিকটি খুলিয়া শ্রীমন্তর হাতে দিল; এবং দিকটির সম্পূর্ণ ইতিবাস ও তৎপ্রসঙ্গে দীহর আকস্মিক আবির্ভাব হইতে মানিকের সম্বন্ধে নূতন ব্যবহার প্রভাব পর্যন্ত সমস্ত কথাই তাহাকে জানাইয়া অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, “ও সমস্তই বাহ্যে কথা শ্রীমন্ত-দা! নইলে দেখ না কেন,—এত-খানি বেশা হ’ল তবুও ত কই নিতে এল না! আজ্ঞা, ৮ না কখন, ঠাকুরপোর হঠাৎ কোন অশ্রু-বিশ্ব হয় নি ত?” শ্রীমন্ত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, “হে গো দিদিঠাকুরপ, রাখ না ও কথা তুলে—বলি অশ্রু ক’র বটে গো? সে তেড়ের-তেড়ের যে এখনি হাতে দেখে এশ্রু গো! সে নিম্নাশ্রুয়ের একটা কথাও বিশ্বাস যে ও না দিদিমনি—তা’ তোমার বলে দিছি। এ বাড়ীর হাঙ্গাল কি জানতে, এ নিশ্চয় সেই ভাল-লাকের ঘরে তেনাকে পাঠিয়েছালা! কিছু কৃমণবে আছে মনে হয়। হাই হ’ক, আমি এর একটা বোকা-পড়া করে লেব’খন,” বলিয়া শ্রীমন্ত-সর্দার দিকটা ট্যাংকু শুদ্ধি মানিককে লইয়া জমিদার-বাড়ী চলিয়া গেল। সেই অবধি কি আমি কেন মানিকের দ্বার প্রাণটা কেন উত্তাপ হইয়া রহিল।

অপরকে নিশ্চয়-ভয়ের পর জমিদার-বাড়ী গাভোখান করিয়া, সমস্ত দেখিবার দ্বন্দ্ব মানিকের নীচে বসন তাঁর সোপার ট্যাংকু-বড়িট খুলিয়া পাইলেন না, তখন বিম্বিত ভাবে এক-বার শব্দার এ কোণ, একবার ও-কোণ চার-কোণ অঙ্গুলান করিয়া, পার্শ্ব টুলের উপর উপবিষ্ট মানিকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ছোঁড়ার তন্ত্রাভিকৃত শিবিল হস্ত হইতে কালর-বেওয়া হস্তে পাখাখানি খসিয়া, মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে; আর ছোঁড়ার ছোট মাথাটি ঘুরে চলিয়া অসম্ভব ব্রহ্ম হস্ত দিকে খুকিয়া পড়িয়াছে। প্রচণ্ড ক্রোধে জমিদার-বাড়ী তখন একটা দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব উঠিলেন।

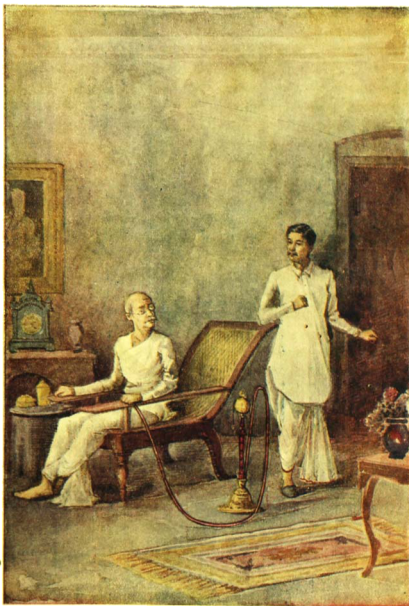
শ্রীমন্ত জমিদার-বাড়ীর বিবৃত অট্টালিকার সমস্ত ও অঙ্গর মহলে একটা হনুদুল পড়িয়া পেল। কে-কে সে-দিন মধ্যাহ্নে বাতুর ঘরে আসিয়াছিল, তদারক করিয়া জানা গেল যে, দীহ দুইটা বাতীর আর কেহই সে-দিন বাতুর কাছে আসে নাই। দীহ দুইটা হনুদুল করিয়া বলিল, সে

একখানি অস্বস্তী চিঠি সহি করাইবার জন্য বাবুকে কাছে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে নাই; দ্বার হইতেই বাবুকে নিমিত্ত বোধিয়া কিরিয়া গিয়াছে, তবে মাণিককে সেই সময়ে বাবু মাথার বালিশের নিকট হইতে যেন হঠাৎ চোরের মত সরিয়া আসিতে দেখিয়াছিল, ইত্যাদি। কিন্তু মাণিক বলে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘড়ির বিবর কিছুই জানে না। তথাপি মাণিককে একবার উলঙ্গ করিয়া তাহার কাপড় কাড়া লওয়া হইল; এবং এ উপায়েও যখন ঘড়ির একটা কাঁটাও তাহার নিকট পাওয়া গেল না, তখন শ্রম উঠিল যে, মাণিক একবারও ঘরের বাহির হইয়াছিল কি না। অনেকেই সাক্ষ্য দিল যে, হ্যা তাহারা একবার মাণিককে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছে বটে। মাণিকও তাহা অস্বীকার করিল না,— সে যে প্রমাণ করিতে একবার বাহিরে আসিয়াছিল, তাহা নির্ভয়ে কবুল করিল; এবং ইহাও বলিল যে, অমীয়ার-বাবু তখনও জাগিয়া ছিলেন,—তিনি চোখ বুঁজিয়া ফরদীর নলের মুখ হইতে ধোঁয়া টানিয়া ছাড়িতেছিলেন; এবং তাহার আলোবালাও তখনও পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যে জলিতেছিল। কিন্তু বিচারক ও তদন্তকারিণি কেহই আলোবালা ও ফরদীর নলের সাক্ষ্যই সাক্ষ্য গ্রহণ করিল না। তাহাদের চক্ষে মাণিকের দোষ সপ্রমাণ হইয়া গেল; এবং আর অধিক কিছু অঙ্গসন্ধানেরও কিছুমাত্র আবশ্যকতা রহিল না। তখন সকলে মিলিয়া, মাণিক ঘড়ীটা চুরি করিয়া ধরার লুকাইয়া রাখিয়াছে, তথা হইতে শ্রম উঠা বাহির করিয়া দিবার জন্য, বাগানের উপর মহা পঁড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাণিক কিছুই জানে না—ইহা অলংঘ্য বার বলিয়াও যখন রেহাই পাইল না, তখন ভীত হইয়া উঠিল, এবং তাহার চোখ ছুঁই ছল-ছল করিতে লাগিল। তখন বাবুজীর আর বৈধা রহিল না। তিনি হতভম্ব দিলেন,—“মায়ের চোটে ছোঁড়ার কাছ থেকে যদি আমার কর।” তিন-চারজন অনুভব তৎক্ষণাৎ মনিবের আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইল। মাণিক এবার পরিগ্রহি চাঁৎকার করিয়া উঠিল। তখন শ্রীমন্ত-সর্দার বাবুর মত লাফাইয়া পড়িয়া, মাণিককে অভ্যাচারের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল; গর্জন করিয়া বলিল,—“খবর্দার, কচি ছেলের পায়ে হাত তুলো না।”

তার পর অমীয়ার-বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—“হুজুর! এ হুদের বাছাটাকে আর মার-ধোর কর্জেন না। আপনারা রান্না-উত্তর মালুম, একটা ফড়িং মেরে আর হাত রান্নায়েন কেন—তার চেয়ে একে লবাব দিন।” দীহু দুহুরী তখনও সেখানে পাড়াইয়া ছিল। সে তাড়া-তাড়ি বলিয়া উঠিল,—“দেই ভাল বাবু, ছোঁড়াটাকে বাড়ী থেকে বার করে দিন।” অমীয়ার মহাশয় হুজুর দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“চোপরাও! আমি কার কথা শুনতে চাই নি,—আমি যদি চাই।” সম্মুখে না বের, আমি ও বিজু ছোঁড়াকে পুলিশে দোবো।” শ্রীমন্ত-সর্দার যেন কতকটা ভাঙ্কিশোর ভাবে বলিল,—“এখুনি মিন হুজুর, সে ত ভাল কথা। তবে তারা এসে ত শুধু এ বাছাকে নে যাবে না—আপনার ওই দীহু দুহুরীটারও হাতে হাত-কড়ি পরাবে।” দীহু দুখানা তখন তার অন্তরের বিকীৰ্ণকার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—কঠিনাশু তব, শ্রীমন্ত বন্ধের ভিতর রক্তের ভাল যেন প্রেমে তুলানে অতি ক্রম ওঠা-নামা করিতেছে।

শ্রীমন্তের এতদূর স্পর্শে অমীয়ার মহাশয়ের অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“তুই এখনি আমার অমীয়ারী থেকে দূর হয়ে যা! তোকে আর ঐ ছোঁড়াটাকে—তোদের দুমনকেই আমি আদম থেকে বরখাস্ত করলুম।” শ্রীমন্ত “বে অয়ে” বলিয়া তাগার গোটা বৎসরের বাকী মাঝিনা-পত্র খিপাব করিয়া চুকাইয়া দিতে বলিল। অমীয়ার-শ্রম হুজুর দিয়া বলিলেন,—“এক পরশাও পাবিনে; তুই ঐ ছোঁড়ার জামিন হয়েছিলি, তাই ত ওকে আমি বেঁধেছিলাম। তোর সমস্ত পাওনা টাকা-কড়ি রপ্তরে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। যা, অখনি শুধু হাতে দূর হয়ে যা।” শ্রীমন্ত আর একটা কথাও কহিল না,—নিশ্চয়ে মনিবকে একটা গণ্ডবৎ করিয়া মাণিকের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে বাইতে-বাইতে মাণিক বলিল, “শ্রীমন্ত-দা আমি ত ঘড়ী নিই নি।” শ্রীমন্ত সম্মুখে তাহার গিটে হাত দৃশাইয়া বলিল, “সে আমি জানি ভাই, তোমার কিছু বলতে হবে না।” মাণিক বলিল, “তবে কেন তুমি তোমার মাইনের টাকা-কড়ি ওদের দিয়ে এসে।” শ্রীমন্ত এবার টিক্ সম্বন্ধে বন্ধুর মত মাণিকের কানের উপর



কৃষ্ণকান্ত ও হরলাল

“হরলাল। আমি বাসিকালে স্বরসহানদের গৌণ পুড়াইয়াছিলাম ; এখনে উইলও সেইরূপ পুড়াইব।
শিষ্টী—কিভাবেকিভাবে লাগে। [পরিবর্তে—কৃষ্ণকান্তের উইল

(Engraved at the Bharatvareha Office.)

একটা হাত রাবিয়া বলিল, “ওদর ছোটসোকদের পরদা কি ছুঁতে আছে মাথকে ? ও হ’ল পরী-হুঃবীর রক্ত-শোষা কড়ি—নিশে মহাপাতক হুঃ!” মানিক এ কথা-শুনো ছয়দশন করিতে পারিল না; হুঃবীর হুঃ করিয়া রহিল।

বেদিন ভোরের ট্রেণে শ্রীমন্ত মানিককে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল, সেদিন বাবার সমস্ত চোখের জল মুছিতে মুছিতে ক্যাকমনি মানিকের কোচায় বুঁটে দশটা পরদা বাঁধিয়া দিল; এবং শ্রীমন্তর হাতে মানিককে কলিকাতায় লইয়া বাইবার পাকী-ভাড়া হিসাবে বার আনা পরদা দিতে গেল। শ্রীমন্ত বলিল, “আনার কাছে ত টাকা-পরদা রয়েছে বিম্বিষ্ঠাকরণ!” ক্যাকমনি বলিল, “তা হ’ক, বিশেষ-বিহু’রে যাক, সঙ্গে কিছু বেশী থাকাই ভাল।” শ্রীমন্ত কিন্তু কিছুতেই গইতে চাহে না। তখন ক্যাকমনি ভাষাকে মাথার দিবা দিয়া গড়াইয়া দিল। শ্রীমন্ত এবার আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না বটে, কিন্তু যদি সে বুশাকরেও জানিতে পারিত যে, কি করিয়া এই কর্দমশূন্য অন্যথা বিধবা আত এই ৬০/১০ সাড়ে চৌদ আনা পরদা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত মাথার দিবা সেওটা সঙ্গেও কিছুতেই সে উঠা হাতে করিতে পারিত না। রূপ দ্বারী চিকিৎসার মত ক্যাকমনি একে-একে সংসারের সমস্ত তৈজসপত্রই বিক্রয় করিয়াছিল; কেবল রাখানথ সাঁরিয়া উঠিলে পথা করিবে বলিয়া একখানিমান্য কীসার থালা অতি কষ্টে বাচাইয়া রাখিয়াছিল। গুস্তর ব্যবশ-গমন উপলক্ষে তাহাই আত সকলে কীসারীঘের নিকট বন্ধক রাখিয়া সে এই ৬০/১০ সাড়ে চৌদ আনা পরদা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

মানিক এখন তাহাকে পড় হইয়া প্রণাম করিয়া, তাহার দুই পায়ে ধুলা লইয়া গারে-মাথায় বুলাইয়া, শ্রীমন্তর সঙ্গে হাসিমুখে চলিয়া গেল, তখন দ্বারের দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতে-দেখিতে, ক্যাকমনির হুঃচোখ দিয়া যেন অসুস্থ অস্ত্রজল নিঃশব্দে করিয়া পড়িতে লাগিল। মতি এতক্ষণ দ্বারের অকল বহিয়া বারনা করিতেছিল, “ওহা! আমিও কলকাতা গাব,—আমাকেও পরদা যে না—” কিন্তু হঠাৎ দ্বারের ঢাক সেই অবিরল বলদ্বারা বেঁধিয়া, সে বালকও তৎক্ষণাৎ একেবারে নিম্ন হইয়া গেল।

(৪)

মন্ত একটা কাঠের সিমুকের মধ্যে শালুনোড়া কড়ি-বাঁধা একটা ডানর সিঁদুর চুপড়ির ভিতর সোণার বড়ি, বড়ির ডেনটা লুকাইয়া রাখিতে-রাখিতে মহাশয় বসে মাতঙ্গিনী বলিল, “বেশু’সে ত—আমার বুদ্ধি তুনে চললে সব বিকে ভাল হুঃ! কেমন নিখরচায় একটা সোণার বড়ি-বড়ির-ডেন হ’ল—ওদিকে শব্দও বিধেয় হ’ল। একডিলে হুঃপাখী ম’ল। শ্রীমন্ত মুখগোড়ার যে অর উঠেছে, এতে আমি খুব খুশী! এতদিনে মা-কলী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। ডাক্তার বিশেষ বড় বড় বাড়িয়েছিল,—তেমনি হ’ল; হাতে-হাতে তার শাখি ফলেছে। আর হবে নাই বা কেন? মাথার ওপর এখনও ভদবান রয়েছে,—আজও শাঁক-সকালে চন্দ্র-খণি উদয় হচ্ছেন; গাশের ফল ফলবে না?” বলিতে-বলিতে সিমুকের ডালা বন্ধ করিয়া, শিকল খাটিয়া, তবল ভালা-চাবি লাগাইয়া, খাঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা মাতঙ্গিনী বেশ প্রকুর চিত্তে কাঁধের উপর বসান করিয়া গিঁঠের দিকে বুলাইয়া দিল। এই সময়ে বেশ মোরে আর এক পশলা বৃষ্টি নামিল। মাতঙ্গিনী তাহার ‘ছোট বরের ছোট-ছোট ঝানসা-ছুটা বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিত প্রেমের সতিতে আদিকার হুসিছ কার্ণের পুরাতর বস্ত্র তাহার আভাষাধী দাহুঘটীর চিবুক ধরিয়া একটু সোহাগ করিবার জন্য কাছে আসিয়া, সহসা উত্তর হাতখানি নামাইয়া লইল। দীর্ঘ তখন দুই হাতে তাহার মাথার দুইটা রূপ টিপিয়া ধরিয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত বুখানা লাগ হইয়া উঠিয়াছে,—সর্ব শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে; মাতঙ্গিনী ব্যগ্র উৎকর্ষায় সহিত বিজ্ঞাসা করিল, “হাঃগা, অমন করে রয়েছে কেন? কি হয়েছে? এত কাঁপুনি ধরেছে কিদের? অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি ত?”

দীর্ঘ কাঁপিতে-কাঁপিতে অতি কষ্টে বলিল, “শুঁগুস্তির একটা লেপ-কাঁধা কিছু এনে আমার চোপা দিয়ে বেশ করে টিপে ধর ছোট বে,—আমার বন্ধ কাঁপুনি ধরেছে—তজানক জব আসছে!” বরের মইতার উপর চোলের বাতার সহিত দড়ী দিয়া বাঁধা লেপ-কাঁধা বুলাতেছিল,—মাতঙ্গিনী আর দিক্‌জি না করিয়া ছুটিয়া গিয়া উঠান হইতে মইখানা টানিয়া আসিয়া মট্‌কার লাগাইল; এবং কাঁধা পাড়িতে

তাত্কাভি তাহাতে উঠিতে লাগিল। চূর্তাপ্রাক্রমে আর বধন ভঙ্গার নিকট পৌছিয়াছে, তখন তাহার অতিমাত্র ব্যস্ততার বর্ষার জনসিক্ত বাণের মিষ্টিটা তাহাকে শুভ্র নইয়া সশব্দে পানের বেকের উপর হড়কাইয়া পড়িল। দীর্ঘ হঠাৎ সেই শব্দে চড়কাইয়া চাফিয়া দেখিল, সর্বনাশ হইয়াছে! মট শুভ্র মাতঙ্গিনী মেঘের উপর আছাড় খাইয়া ধূসরা হারাইয়াছে। সে প্রাণ অস্তরের উপর ও মাতালের মত টলিতে-টলিতে উঠিয়া আশিয়া, মাতঙ্গিনীকে ভূশিতে গিয়া দেখিল, তাহার মাথার এক কারবার অনেকখানি কাটিয়া গিয়া ভীষণ রক্ত ছুটিতেছে।

হই-সিঁড়ির সহিত মাতঙ্গিনীর পতনের শব্দে নারায়ণ ও পুঁটির ঘুম ভাঙিয়া গেল। পুঁটি ভর পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নারায়ণ উঠিয়া খুঁজি হাত ধরিয়া বাপের নিকট আশিয়া গড়াইল। দীর্ঘ তখন মাতঙ্গিনীর মাথার বেগনটা কাটিয়া গিয়া রক্ত ছুটিতেছিল, সেখানটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া ছিল। নারায়ণকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, “নারায়ণ উঠিছিস্? ঐশ্বরীর বা বাবা,—একবার দামা-ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আর। বলিস্, বা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে,—আপনি এখনি আসলস্, বড় বিপদ!” নারায়ণ তৎক্ষণাত্ বরফা খুঁদিয়া বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। দীর্ঘ তাহাকে কহিতে দেখিয়া ভিজ্জাঙ্গা কহিল, “কি হ’লরে, সেদিনে?” নারায়ণ এতটুকু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “বাইরে যে ২৬০ অঙ্ককার বাবা!” বালক অঙ্ককারে একা বাইতে ভব পাইতেছে দেখিয়া দীর্ঘ বলিল, “এক কাল কর;—খুকীকে সঙ্গে করে নিয়ে দু’ঘনো বা, ভয় নেই। ছুটে বাবি, ছুটে আসবি—সেই কহিস্নি বেন।” অগত্যা নারায়ণ পুঁটির হাত ধরিয়া তৎক্ষণাত্ আছড় গারেই বাহির হইয়া গেল।

সভ-বর্ণণ-কাল আকাশে তখনও নিবিড়, ঘন-ক্লম ঘেঘ পুরীভূত হইয়া রহিয়াছে। আবাফের ঘন-বঁটার কণ-কণে বিছাৎ হাসিতেছে। দামাঠাকুরের আটচালা দীর্ঘর ঘরের খুব নিকটেই,—রায়েদের পুকুরের এগার কার ওপার। নারায়ণ পুঁটির হাত ধরিয়া একপ্রকার ছুটিয়াই বাইতেছিল। বাণিকের অপেক্ষা সে এক বৎসরের ছোট; আর পুঁটি আর মতির সমবয়সী। নারায়ণ ও পুঁটি গিয়া বধন দামা-ঠাকুরের বিড়কীতে বা’ গিল, তখন চড়হড় করিয়া আবার একপল্লা বুলী মামিল। অনেককণ ডাকাডাকির পর

দামাঠাকুর বধন লঠন-হাতে, শাটের ঠক্কড় শব্দ করিতে-করিতে টোকা মাথার দিগা আশিয়া দরজা খুলিলেন, ছেলে-মেয়ে দুটাই তখন বুলীতে একেবারে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছে।

(৫)

কলিকাতার বাণিক এক কেরানিবাসুর বাড়ী মাসিক দেড়-টাকা বাহিনার একটি চাকরা পাইয়াছিল; আর ঐমত সর্দার এক সওয়াগরী আফিসের হালগুদামে আট আনা রোজে গাড়ী বোতাই ও থালাসের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল।

চূর্তাপ্রাক্রমে বাণিকের মনিব কেরানিবাসুটি একটি ক্ষুদ্র নবাব বিনোব। তাহার ঘড়ি ধরিয়া দুই বেলা চা খাওয়া, ঘন-ঘন ডামাক খাওয়া, কাপড় কোচান, আনা কাঁড়া, জুতার কালি লাগান, বৈঠকখানা পরিষ্কার রাখা—এ সমস্তই কাজে ঢুকিবার পরদিনই বাণিকের কাঁধে চাপিয়াছিল। তার পর ক্রমশঃ প্রানের পূর্বে বাবুকে তৈল বর্দন করা, আফিস বাইবার সময় জুতার কড়া বাঁধিয়া দেওয়া, আফিস হইতে আসিলে জুতা বোঁধা খুলিয়া দেওয়া, গা-হাত-পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত ছোট বড় করমাইন খাটাও সূক্ষ্ম হইল। ডাকিবামাত্র ঘুমে ঘুমে হাজির হওয়া চাই, শুকুম হাজির হইবামাত্র তামিল হওয়া চাই, কোন দিন ইহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই বাণিকের পৃষ্ঠদেশে প্রভুর চটি-জুতার চিহ্ন কিছুদিনের মত মুদ্রিত হইয়া থাকিত। এই বেড়-টাকা বাহিনার ছোঁকরা চাকরাটি পাইবার আগে বাবু নিজেই স্বহস্তে সমস্ত কাঁধ করিতেন; কারণ, তাহার বেতন ছিল, সেই কেরানিবাসুর সমান্তর ৩০০ টাকা মাত্র, এবং পৈত্রিক সঞ্চয় ছিল একখানি ক্ষুদ্র ভিতল বাটা মাত্র। তাহার পত্নী সরমাকেও রাঁধুনী ও বিয়ের কাল সমস্তই একা করিতে হইত। পাঁচ বৎসর পরে এবার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ার, তিনি এই কৃত্যটি নিবৃত্ত করিয়া বেজালাটা হঠাৎ খুব উচ্চ পর্দার বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। বাটাতে কেহ আসিলেই, তিনি অকারণ উচ্চঃস্বরে বাণিককে আহ্বান করিয়া, একটা বা হ’ক কিছু করমাস্ করিতেন; এবং এই উপায়ে, তিনি যে অল্পদা মস্তর-মত একজন কৃত্যের মনিব, তাহা সববেগে ঘোষণা করিতে ভুলিতেন না।

বাবু কাছে মার খাইয়া বাণিক বধন কাঁদিতে বসিত,

তখন সরমা আদিয়া তাহাকে দেখাবোকা জুলাইত। পরমা দিয়া। খাণ্ড দিয়া, সে বাপকেয় বেধনা ঘূর করিতে সাগমন্ত চেষ্টা করিত। এই উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষে প্রায়ই বসে হইয়া রাইত। সরমা বলিত, 'সেখ, তুমি কথার-কথার লোক-অনের গায়ে হাত তুলো না। তোমার না পোষার অথাৎ দিলেই পার,—যার খোর কুখার কি মরকার?' বাবু বলিতেন, 'আলবাৎ মার্ক, বেটার-হিলে কুঁড়ের সর্দার—বসে-বসে আবার মাইনে খাবে? মার্ক না? না নাহলে কি লোকজন চিট্টি হয়? তুমি কিছু জান না। কুঁড়কে নাই দিলে মাথায় উঠে! অত আদর দিয়ে তুমি আর চাকরটার মাথা ধরো, না।'

সরমা বলিত, 'ও, তারি চাকর রেখেছেন বাবু! সেফ টাকা মাইনে দিয়ে একটা ছুখের ছেলেকে এনে, তার কাছে মশ-টাকা মাইনের—একটা মদর মত কাজ নিতে গাও না কি? ওই কচি বাচ্চা,—ও কি তোমার এত কাজ পারে?' বাবু বলিতেন, 'তবে এসেছে কেন মঠে চাকরী কর্তে? থাক না,—থবে পির মারের কোশে গুণে তুলোয় করে ছুখ বাক্ না গিয়ে। এখানে এসে মৌলো কেন?' সরমা বলিয়া উঠিত 'হাট্ট! হাট্ট! পরের বাচ্চা হুংখের খাখার চাকরী করতে এসেছে,—তাকে অমন কোরে হাত-দিন 'মব্' 'মব্' বোলো না; ও-সব অকথা-কুখা মুখে আনতে নেই।' বাবু বলিতেন, 'তবে কি চাকরকে লুবেলা 'আপনি' 'আজ্ঞে' করতে হবে না কি? বেটার-ছেলেদের জুতোর তলার রাখলে তথ্যে সিধে থাকবে।' রোগে সরমার চোক-মুখ বাড়া হইয়া উঠিত; সে বলিত, 'ছি:—ছি: ওগব হ'ল লসীছাড়া মুক্তি,—চাকর-বাকর কি লোকজনের মনে কষ্ট দিলে, লসীছী থাকে না। চাকরী করতে এসেছে বলে কি ওয়া মাছুব নয়? তোমরাও ত আকিসে চাকরী কর। তোমরাও ত সায়েবদের চাকর। তারা যদি হাত-দিন তোমাদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে, তা'হলে তোমাদের মনের অবস্থাটা কি হয় বল দেখি?' এ কথায় ওরানক হাঙ্গিয়া উঠিয়া বাবু বলিতেন, 'চাকর কি রকম? আমরা সব লেখা-পড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে,—আকিসে দিলে-কেতাবেয় কাজ করি,—সায়েবরা আমাদের সঙ্গে বাবু বলে কথা কর,—আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর্তে ব্যাটারে সাধন কি? বেধিন অপরমান

করে, সেদিন আমাদের কাছেও অপরমান হবে না! গালা-গালি অর্জন দিলেই হ'ল! বেটাকে রুল-পেটা করে' তখন চাকরীতে ইন্তকা নিয়ে চলে আসব না।' সরমা তীর স্বরের সহিত হাসিয়া বলিত, 'হ্যা—হ্যা, রেখে দাও না বাবু; তোমার বা বীরত্ব আনি জানি। তাই আকিস থেকে এসে, হোম বাড়ীতে বলে ছোট-সারেবের মতুপাত কর,—আর এই বাগবাজারে বলে গাল দিলে সাহেব কিছু চৌরকী থেকে গুনতে পাবে না জেনে, বেশ নিরাপত্তে মনের সাধ মিটিয়ে তাকে থাক্কেতাই গালমন্দ দাও! কই একদিনও ত তার সাম্না সাম্নি মুখের উপর একটা কড়া অথাৎ ঘিরে চাকরী ছেড়ে চলে আসতে পার না?' তখন বাবু আর সহ্য করিতে পারিতেন না,—ভদ্রতার গীরা অতিক্রম করিয়া বলিয়া উঠিতেন, 'চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলে, আর আমার পিঠি চট্টকে গিলবে কোথেকে তখন? বাপের বাড়ী থেকে কি নামদারা বানাদ করে এসেছ? তর্ক বধন এইরূপে ক্রমশ: ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হইত, এবং স্ত্রীর পিতৃ-গৃহের সৈন্তের উল্লেখ করিয়া, মুকুঁত বধন পত্নীকে ইন্তের মত কটু কথা বলিয়া, অপরমানের অসহ্য কথাবাতে অজ্ঞরিত করিতে একটুও বিধি ব্রুথ করিত না, নিকপায়া সরমা তখন নীরবে মতমুখে অঙ্গপাত করিত।

(৬)

সেই স্বাভিভে দাশাচাকর আ'সরা'মাতঙ্গিনীর মণি হইতে রক্তপড়া এক-করিয়া দিয়া গিরাছিনেন বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান কিরাইতে পারেন নাই। সকালে কৈবর্তের সেরে নেতার মা আসিয়া দেখিল, গীহ্ হাইতির ঘরে সারি-সারি তিনটি বিছানা পড়িয়াছে। একটীতে গীহ্ নিজে অর্ধ-বিকারে শয্যাশায়ী, আর একটীতে তাহার আতত পত্নী মাতঙ্গিনী এখনও অজ্ঞান, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে; অপর একটীতে নারায়ণ ও পুটি সেদিন রাতে আরক্ত-গায়ে লসে ভিজিয়া আসিয়া অবধি অরে পড়িয়াছে। কে কাকে দেখে, কে কার মুখে বল দেয়। অমন যে পাড়া-কুঁহকী নেতার-মা,—সেও আজ মনিবের কাজে আসিয়া বধন এখানের এই অবস্থা দেখিল, তখন তাহারও মুখ দিয়া একটা আত্মরিক সঙ্কটভূতমত 'আহ' বাহির হইয়া গেল।

নিজের বার-মাগ হাঁপানী কান্দির ব্যাঘ্রাবের অজ্ঞাতে মাতঙ্গিনী পরের কাজ-কর্মে হুবিধার অত

অন্ন যেমন এই 'নেতার-মাক' নিম্ন করিয়াছিল।
কথিত আছে যে, ইহার নিম্নরূপ বাক্যাবলি
মর্দ্যাক্ত হইয়া ইহার একমাত্র বিধবা কন্যা, নৃত্যমণি
না কি কাঁচা বরষে অধিকেন্দ্র-সংঘনে প্রাপ্তভাগ
করিয়াছিল। সে যাহা হউক, তাহার "পাড়া-কুঁড়লী" নামটা
কিন্তু সে বর্ষে-বর্ষে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষার্থই
'নেতার-মা' লোকের বাড়ী বহিরা দিয়া বগড়া বাগাইয়া
আসিত; এবং এখনও তাহার সে অভ্যাগনটা পূর্ণমাত্রায় আছে।
মাতঙ্গিনী ভিন্ন গ্রামের মহা আর কেষ্ট ইহাকে ছ'চকে
সেখিতে পারিত না। সেই নেতার-মা ওরফে মল্লা দাসীর
মুখ দিয়া এখন 'জাহা' বাহির হইয়া-এল, তখন বীহু
মাইতির ঘরের বে খুব ভয়-বিমারক শোচনীয় অথবা, সে
বিষয়ে আর কোনও সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। উকি
মারিয়া-মারিয়া বার-কয়েক সে সকলকেই দেখিয়া আসিল;
তার পর কে জানে কোন্ অলঙ্কিত লক্ষ্যে সমস্ত সকলগটা
গালি দিতে-দিতে সে বীহুর ঘরের সমস্ত কাছগুলি সারিল।
পাই গ্রহীতা গ্রন্থ আল দিয়া সজান কণী কয়টিকে বাগাইল;
কিন্তু মাতঙ্গিনীকে কিছুতেই এক লগা গ্রন্থও
খাওয়াইতে না পারিয়া, বিবম জুড় হইয়া তাহার রোগের
চৌদ্রসুখকৃত করিতে-করিতে, গায়ের জ্বালা-বাবু
পারিবায়িক চিকিৎসক কবিগায় ঐতিহ্যমণি কবিভূষণ
ধনুতরী ভৈরব-রত্নাকর মহাশয়ের কৃত্যে দিয়া দেখা দিল।

"বলি হাণা কোব্রের মশাই! কুমি যেমন ভাল-
দায়ের ছেলে গা? তোমার একটু আন্তরিক-বিবেচনা
রই? বলি, সমস্ত লাল-লজ্জার মাথা কি ওই ওরুণের
থলে বেড়ে পানের রসে শুলে খেয়েছ' বাছা? বীহুর
বাড়ীটা যে কাল রাত থেকে একটা হাসপাতাল হয়ে
রয়েছে, তা কি একবার উকি বেয়েও দেখে আসতে
পারনি,—একটা খবরও নিতে পারনি! না হয় হলেই বা
কুমি জ্বালা-বাবু হাইনে বসে লোক গো,—তা' বলে কি
গল্পবাদের ব্যামো হলে আর দেখবে না? এ আবার কি
চ,—এতো আবার বাপের ভয়েও কখন শুনিমি। আর
এই যদি কর্ণে, তবে কার প্রাক্ত কর্তে মরতে আবার মাথা
মুহু এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখে-ওই ছাই-পানের বড়ি-
পাটনগুলো দুটো দুটো টাক। নিয়ে স্ত্রীর লোককে দিয়ে
কেঁচাও গুনি?" বলিতে-বলিতে নৃত্য-মা একবারে

কবিগায় মহাশয়ের বিদ্যার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।
কবিগায় এই নৃত্য-মাতিকে বেশ চিনিতেম; তৎকাল
চান্দখানা কাঁধে ফেলিয়া, জুতাটা পায়ে দিতে দিতে
বলিলেন, "এই চল বাছা বাই,—আমিও বেকজি আর
তুমিও এসেছ। তা ভালই হয়েছে, চল। এই একটু আগে
দামাটীকর নিতাপুঞ্জ সারতে এসে, আমাকে খবর দিয়ে
গেলেন,—চল বাই, এখন গে দেখে আসি।" সারাটা
পথ বকিতে-বকিতে নেতার-মা কবিগায় মহাশয়কে
সঙ্গে লইয়া চলিল।

মাতঙ্গিনীর 'ভান আর ফিরিল না। সমস্ত আত্মর্ক-
নাগর মন করিয়াও, কবিগায় ঐতিহ্যমণি কবিভূষণ
ধনুতরী ভৈরব-রত্নাকর সেদিন এমন কোনও ঔষধাসুত
আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, বাহাতে বীহুর এই দ্রুত-
চৈতন্য গল্পীটা পুনঃপল্লবিত হইতে পারে। তবে তিনি তাঁর
অধ্যায়ন বাড়ীজান হইতে এতটুকু বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন
যে, সম্ভবতঃ এই অভ্যাগিনীর পরমাণু প্রায় নিশ্চেষ্ট
হইয়াছে; এবং এ কথা যদিও তিনি কাহাকেও প্রকাশ
করিয়া বলেন নাই, তথাপি কি-মানি কোন এক অল্প-
উপরে শেখা সকলোই জানিতে পারিয়াছিল যে, কবিগায়
মহাশয় বয়স্কর্ষেই এরূপ যে হইবে, তাহা আশঙ্কা করিয়া-
ছিলেন। দ্রুতগাং সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বে মাতঙ্গিনীর
নিঃসঙ্গ প্রাণবায়ু বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জ্বালা-বাবুর
এই দ্রুতরী ভৈরব-রত্নাকরীর অভ্যাগন বাড়ীজানের
প্রাণ-স্বাং সমস্ত প্রাণবায়ু সুখরিত হইয়া উঠিল।

নির্দর্য্য হতভাগা ছোঁড়ার দল গামছা-কাঁধে কোমর
বাঁধিয়া আদিয়া দাঁড়াইয়াছে,—মাতঙ্গিনীকে অপানে লইয়া
হাইবে। গ্রামের যে সকল ছোঁড়ার সহিত তৎকালকিত
বিশিষ্ট সম্মানগণ তাহাদের মৈনমিন সাধারণ জীবনে
বাক্যালাপ করিতেনও অপমান বোধ করেন, একমাত্র
তাহারাই দেখিতে পাই—সেশবাসীর এমনই দুর্দিনে
প্রসারিত-করে গ্রামের বিপর হঃসংগণের দ্বারে বুকতরা
সহস্রভূতি ও সমবেদনা লইয়া অবাচিতভাবে আসিয়া
দাঁড়ায়। কিন্তু বড়ই আকর্ষণ ও দৃষ্টির বিষয় যে, সেই
তৎকালকিত বিশিষ্ট সম্মানগণের অধিকাংশেরই চুলের
টিকিটিও সে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। উৎসবের দিনেও
তাহারাই আদিয়া না কোমর বাঁধিলে, অতিথি-অভ্যাগতদের

অন্যভাবে কিরিয়া বাইতে হয়। তাই তাহার নিবেদনের
প্রাসের মান সত্ত্ব, নিবেদনের প্রাসের মান্য বজায় রাখিতে
অনেক সময় অনিচ্ছিতও আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং
খাট্টা-পুট্টা প্রাপ্য পাত্র পরিশ্রমে স্নানস্বাধ্যায় সঠিত ত্যাগ
সম্বাদা করিয়া দিয়া, একটা দ্বন্দ্ববাদেরও অপ্রত্যাশিত না
করিয়া চলিয়া যায়। আদিও বীজের এই মহাবিপদে
তাহারাই সর্বপ্রায়ে ছুটরা আসিবারে,—কাধকেও ডাকিয়া
আনিতে হয় নাই।

বীজের অন্তর প্রেক্ষণ তখন অনেকটা প্রেমসিত
হইয়াছে যেটে, কিন্তু উত্তাপের একবারে উপশম হয় নাই।
প্রাণে প্রেম উদ্ভিগ্নে, 'পরের সুখটি করিবে কে?' এ
কথা তাহার মনে পৌছিতেই, একটা প্রেম চেষ্টার সে
পথ। ছাড়িয়া, টলিতে-টলিতে প্রাণে বাহির হইয়া আসিল।
যতক্ষণিক প্রথম প্রাণের বাটে শোমান হইয়াছে; এবং
দামাঠাহুর বখালায় অপমৃত্যু মৃত্যুর প্রাশঙ্কিত-বাবু
কহিতেছেন। গায়ের সত্ত্ব সিঁদুর ও আলু আলু হামীর
অগ্রগামিনী এই দোকাপাঘড়ী আয়তী নারীর মাথার ও
পায়ে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছে। সহসা বীজকে বাহিরে
আনিতে বেরিয়া সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। দুই-একজন
গিয়া সমস্ত তাহাকে ধরিয়া কেলিল। কেহ বলিল, "তুমি
কেন উঠে এসে বীজ খুঁড়া—বাও, শোও গে বাও।" কেহ
বলিল, "ও কি বীজ-বা! আবার ঘরন এয়েছি, তখন সব
বাবু করে বোঝা,—তোমার বাত হবার কোন দরকার
নেই। বাও তাই, বয়ের ভেতর বাও,—হেসে-বেরে দুটোকে
আলুগাও গে।" রক্তমবার মত হুটো রাতা চোখ দিয়া
বীজ তখন অনঙ্গ অঙ্গহারা ছুটিতেছিল। বুককাটা
কল্ল রোমনের সঙ্গে পাগলের মত ধাঁধ বলিতে লাগিল,
"নারায়ণ অহুং করোহে, পুটিও অহুং,—ওরে তাদের
কাউকে তোরা বাটে নিয়ে যাসনে,—তা'রলে তারা আর
বাটবে না, মরে যাবে। ওরে, আমি বাব তোমার সঙ্গে, চল
তোরা—আধাকেও নিয়ে চল; আমি বাব, আমি আকুন
বোঝা, আমি শোড়াব, আমি আলু, আধাকেও জালিয়ে
দিবি চ'।" এইরূপে শোকের আঘাতে ও রোগের
প্রেক্ষণে বীজের কণাগুলো এখন নিম্ন প্রাণে গাঁড়াইতে-
ছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে এক চিরপরিচিত মেহ-কোমল
মিহ-সবল, বেনাফুর কঠোর আবেগ-ভরা ডাক আসিল,

"ঠাহুরপো! হিঃ তাই, তুমি না খাটাচ্ছেসে! তোমার
কি এসময় অমন কাতর হ'লে চলে?" লজকিতে বীজ
কিরিয়া বেদিল, মতির হাত ধরিয়া সমস্ত-মহী বোঁঠাহুবাণী
যেন সুপ্রবর্তী অহুংকার মত আসিয়া গাঁড়াইয়াছেন। এই
আগমনের অনটিকে লাইরা বীজ এবার বালকের মত ডাক
ছাড়িয়া কানিয়া উঠিল, "আবার লগনাং রেছে বোঁঠান!"
স্বাভাবিক জননী মত অশ্রু মেরে দেবরের চোখ দুটি
হুড়াইয়া দিয়া আগমনের চক্ষু মার্কনা করিলেন। কত না
প্রবেশ বচনে ভুগাইয়া, ধীরে-ধীরে বীজকে হাত ধরিয়া
বয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া, শবার উপর শোড়াইয়া দিলেন।
লগনাং-বাঁজের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা বাছা
মতিকে নিয়ে বাটে বাও,—ওকে দিয়েই কোন রকমে
কাছটা সেজে,—এ অবস্থার এদের কাউকে আমি যেতে
কেন্দ্রে পাঠাতে পারি না।"

হরিবোণ দিতে-দিতে শ্রম-বাঁজীরা সব বেহ তুলিয়া
লইয়া বাহির হইয়া গেল; এবং 'নেতাব-না' বহুজনের
চতুর্দশ পুত্রের নরকের বাবু করিতে-করিতে চারিদিকে
গোবর-মল ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

(৭)

দিন-দুই পরে একদিন জমিদার-বাবুর নাকী টিপিতে-
টিপিতে কবিরাজ ঐতিহাসিক কবিত্ববল বসিতেছিলেন,
"উত্তম! নাকীর গতি অতি ভাবাত্মিক! বাহু শিশু কক-
ভিনটিই বেশ দরল। শরীরে বাহির কোনও লক্ষণই নাই।
ইহর ইচ্ছা আগমনের বাহা অটুট থাকুক,—আপনি নিশ্চয়ই
দীর্ঘকালী হইবেন।" লগ্নাৎ প্রহসনরূপে জমিদার-বাবু
বসিলেন, "সে আগমনাই দ্বন্দ্ব-বাবুর অহুংরে!"
তার পর কবিরাজ মহাশয় আরও একটু অধিকতর
তোষাষাষের মূরে বসিতে লাগিলেন, "আগমনের ঐচরণে
আবার একটা নিবেদন আছে, যদি অন্তর পাই জ্ঞান
করি, নচেৎ—" একগাল হাসিতে-হাসিতে জমিদার-বাবু
বসিলেন, "সে কি কবিরাজ দণ্ডাই, আগমনের অহুংরে আমি
জ্ঞানো না, এ কি কথা হল? আগমনের দ্বন্দ্ব বে বেঁচে
আছি।" দুই হাত মোড় করিয়া বাহুর কপালে ঠেকাইয়া,
কবিরাজ মহাশয় বসিতে লাগিলেন, "সবতাই নারায়ণের
ইচ্ছা! আমি কে? তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। আধাকে

আপনারে চিত্তাহরণত দানোহুমান বলেই জান্বেন। কিন্তু সে বা হ'ক, এখন আমার বক্তব্যটুকু তত্ত্বের কাছে নিবেদন করিতে পারি কি না, অপ্রা কখন!" জমীদার-বাবু শশখান্ডে বসিয়া উঠিলেন, "অবস্ত্র পাতেন! অবস্ত্র পাতেন! এখনি আজ্ঞা করুন কি কর্তব্য হবে,—আমি সাধ্যমত আপনার অহুরোধ রক্ষা কর্তব্য চেষ্টা করি জান্বেন।" "আহা-হা, সে আর আপনাকে বলতে হবে না—বলতে হবে না। আপনি এ অধ্যক্ষকে কতখানি স্নেহ করেন, তা বিলম্ব জানি। আর তা জানি বলতে, সেই সাহসেই আমি আপনার কাছে এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আগ্রহের হয়েছি।" বলিতে-বলিতে কবিরাজ মহাশয় ধীরে-ধীরে একটা সোণার ঘড়ি ঘড়ায়-চেন বাহির করিয়া প্রস্তর সমূহে রাখিলেন। জমীদার-বাবু তাঁহার অশ্রুত ঘড়ী ও চেন চিনিতে পারিয়া বিস্মিত-দৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। মুহূ-মুহু হাত করিতে-করিতে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "অবস্ত্র, এ কার্য যে আমার হারা হয় নাই, সে কথা বোধ হয় আপনার নিকট আমাকে আর শপথ করে বলতে হবে না, তবে ঘটনাটা হয়েছিল এইরূপ—" যদিও কবিরাজ মহাশয় একে-একে ধীরে মুখ হইতে বিকারের ঝোঁক ঘড়ী-চেনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া ও মাণ্ডেকর-মার সাহায্যে ধীরে মৃত-শরীর সিদ্ধ হইতে তাহার উদ্ধার ও মাণ্ডেকর-মার সম্বন্ধ ও পরামর্শ এবং অহুরোধ মত উহা গোপনে জমীদার মহাশয়কে প্রস্তোত্ব, ধীরে এই অনিচ্ছাকৃত অপরায় দার্দ্র্যনা করিবার জন্য মাণ্ডেকর মার ও তাহার বিশ্বাস সাহায্য প্রার্থনা—প্রভৃতি সমস্ত সবিস্তারে তাহার গোচর করিয়া তিনি প্রভুর মুখের একটা অন্তর বচন তিকা করিলেন।

জমিদার মহাশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি শ্রীমন্ত চিত্তামণি ঠৈবধ্য-ব্রাহ্মকরকে আরও অনেক শিক্ষাসাবাদ করিয়া—বহুবিধ প্রশ্ন ও জোরের পর বধন পরিহার্য বৃত্তিতে পারিলেন যে, কেবল বেহাতিবির উগর ও অল্পমতি হ্রীর প্রোচোমার জাতি-শ্রদ্ধতা সাধন করিবার মহমুদেপেই ধীরে মত একজন প্রাচীন ও বিশ্বস্ত মুহুরী বসিত এইরূপ গর্হিত কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল মটে, কিন্তু সে কখনও গোচর বশবর্তী হইয়া অথবা সোণার একটা ঘড়ী-ঘড়ায়-

চেন পাইবার আশা, কিংবা একমাত্র সিদ্ধক চুরীর উদ্দেশ্যেই হঠাৎ একপ অসাধু কাণ্ডারী করে নাই,—তখন তিনি কবিরাজ মহাশয়কে অন্তর দিগা সমস্ত আইন-আদালতের খাড়া অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘ মাইতির অপরায় সর্বস্বান্তকরণে দার্দ্র্যনা করিলেন; এবং তাহাকে চাকুরী হইতে বরণ্যত করা দূরে থাক, বরং এই বুদ্ধিমান আশাশীল অতঃপর আরও কিছু বেশতন বুদ্ধি করিয়া দিলেন। তবে ধীরে এই ব্যাপারে দায়বান হইতে অসমর্থ শ্রীমন্ত সর্দারের মত একটা উপযুক্ত লোক যে জমিদারী সেরেতার হাতছাড়া হইয়া গেল, এমত বেন একটু বিশেষ জায়েই তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্য প্রভুর কবিরাজ মহাশয় ঈশ্বরে শ্রীমন্ত সর্দারকে অতি অবস্ত্র চিত্তাইয়া আনিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া জমিদার প্রভুর পুনঃ-পুনঃ দীর্ঘ জীবন বোধনা করিতে-করিতে হাসিমুখে বিহার প্রবণ করিলেন।

(৮)

কবিরাজ শ্রীচিত্তামণি কবিত্বগুণ ধনতরী তৈবধ্য-ব্রাহ্মকরের আত্মিক বহু ও হুচিকিৎসার এবং স্মৃতিমণির দিব্যত্মিক অস্ত্রাও পরিচয়ে ধীরে বৈদ্যন নীত্রেপ হইয়া প্রথম পধ্য করিল, কাস্তামণি অসামুদ্র, মা মঙ্গলচরী ও গায়ের সিদ্ধেশ্বরী তলার পূজা পাঠাইয়া দিল; এবং বৈকালে নেতায়-মাকে ডাকিয়া বর-সংসার বৃত্তাইয়া দিয়া, পুটীকে কোলে করিয়া, নারায়ণকে চুম খাইয়া, মতির হাত ধরিয়া গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিল। তখন নারায়ণ ও পুটী কাদ-কাদ হইয়া বলিতে লাগিল, "প্রাণাইয়া, আমরাত বাব তোমার সঙ্গে—আমাদেরও নিয়ে চল।" ধীরে বয়ের ভিতর হইতে নেতায়-মাকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে মঙ্গল,—তুই এক কাজ কর—'যোমোকে বল বড় পাণ্ডীখানার বলস মোড়টাতে মোয়াল দিচ্—আজ দিনটাও তাল আছে—আমরা সবাই নিলে যাই পুরানো বাড়ীতে।" তার পর আত্ম-আত্মে বাহিরে আসিয়া—গমনোদ্যম বৌঠাকুরাণির পা দুইটা একেবারে লড়াইয়া গিয়া, সে একান্ত নিরুপায়ের মত অস্বকরে কাঁপিতে লাগিল। পূর্ণকৃত অপরাধের অহুতাপে এতদিন তাহার অন্তর মদ হইতেছিল; আর চক্ষের অশ্রু বৌঠাকুরাণির পা দুটা ভিআইয়া সে বেন কতকটা পাণ্ডি পাইল—কখন দিমতি-পূর্ণ কর্তে অপরাধীয়

মত কাকুতি করিয়া বলিতে লাগিল, “মোহি, আমার মাশ কর, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—এমন করে আর আমার কষ্টের শাস্তি কোরে। না,—আমাকে পাণের প্রায়শ্চিত্ত কর্তে দাও।” অসীম মমতামयी ক্যান্ডবনি পুষ্পাধিক এই বৈষ্ণবের—আপনার স্বর্ণদত্ত স্বামীর বড় স্নেহ আশ্রয়ের এই ভাইটির আশ্র এই বীনতা, এই আত্মলজা দেখিয়া—আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাকাতাড়ি পাণের কাছ হইতে দীক্ষকে হাত ধরিয়া তুলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিবার সময় বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্বামীর সেই প্রসোষক বাণ্য—“ভরে মাংসের মা! দীক্ষ কি আমাদের পর রে?”

পর্যন্ত একই বল পাইযামাঝ দীক্ষ নিজে পিয়া কলি-

কাতা হইতে মানিক ও শ্রীমন্ত সর্দারকে সঙ্গে করিয়া যেনে ফিরাইয়া আনিয়া। মানিকের মনিব কেরাণিবাবুটা সন্তোষিত আঙ্গিসের সাহেবের বিকট অপমানিত, লাজিত ও কর্কশ্যুত হইয়া বাড়ীতে বেকার বসিয়াছিলেন; স্ত্রতঃ মানিককে কাল ছাড়িয়া আসিতে আর অধিক বেগ পাইতে হব নাই। সম্বা চক্কের মল হুঁহিতে-হুঁহিতে তাহার পাওনা-পত্তা হিসাব করিয়া স্বামীর নিবেদ সম্বও গোপনে মানিকের হাতে বুঝাইয়া দিয়াছিল। মানিক আসিয়া স্বখন মায়ের পাণের কাছে ছুই মাসের মাহিনা নগদ তিনটাকা ও একমোড়া নূতন কাপড় রাখিয়া প্রণাম করিল, তখন ক্যান্ডবনির ছুই চোখ বাহিয়া আবার একবার শ্রাবণের গারা করিতে লাগিল।

অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী

[শ্রীস্বাধুল করিম সাহিত্য-বিশারদ]

প্রাচীন কালে চট্টগ্রামে সঙ্গীতের বড়ই আদর ও চর্চা ছিল। তাহার ফলে এদেশে তখন বহু সঙ্গীত-গ্রন্থের রচনা ও অনেক সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সঙ্গীত-গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ ‘রাগমালা’ নামে পরিচিত। তাহাতে সঙ্গীত-শাস্ত্রের উৎপত্তি রহস্য ও রাগ-রাগিণীর বিবরণ নিশিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান ও বালালার তাহার অন্বয়াদ (পঙ্ক) আছে এবং প্রত্যেক রাগের নীচে সেই রাগে গের এক বা ততোধিক গান প্রদত্ত হইয়াছে। সেই গানগুলি প্রায়ই বৈষ্ণব-পদাবলী এবং বিভিন্ন কবিগণের রচিত। এখন অনেকগুলি ‘রাগমালা’ আমার বিকট সংস্কৃতি আছে। এই সব ‘রাগমালা’র কল্যাণে অনেক প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কবির পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন, সে সকল পদ আদি বহুদিন হইতে বঙ্গের নানা মানিক পক্ষে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। ‘অন্ত হিন্দু কবিগণের রচিত কতকগুলি নূতন বৈষ্ণব পদ ‘ভারতবর্ষের’ পাঠকস্বত্বের গোচর করিলাম। এই পদগুলির মধ্যে অনেকটা আমার বহু ‘রাগমালা’র মধ্যে একখানি ‘রাগমালা’ হইতে সংকলিত হইল। উহার রচনা-

কাল ১০৮২ খ্রী সন (১৬৪০ শকাব্দ) বা ১২১ বঙ্গাব্দ পূর্ববর্তী। স্ত্রতঃ বঙ্গ বাহ্য্য যে, এই পদগুলি তাহার পূর্বের রচিত হইয়াছিল।

অন্তকার পদগুলির রচয়িতৃগণের নাম এই :-

১। নরচন্দ্র দাস। ২। গোবিন্দ বল্লভ। ৩। দ্বিজ পার্শ্বতী। ৪। দয়াদাস। ৫। প্রতাপামিতা। ৬। মকট বল্লভ। ৭। রাধাবল্লভ। ৮। দ্বিজ কৃষ্ণ। ৯। কৃষ্ণদেব দাস। ১০। সুকান্তাম সেন। ১১। নট ভূঞা (ভূঞা)। ১২। কান্ত দাস। ১৩। দ্বিজ ‘জানকী’। ১৪। মোহন দাস। ১৫। শ্রীমন্তের ভ্র।

এ সব কবির মধ্যে একমাত্র সুকান্তাম সেনের ভিন্ন আর তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুকান্তাম সেন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি ‘সারদা বঙ্গল’ নামক চণ্ডী কাব্যের রচয়িতা(১)। তাহার যে দুইটি পদ এখানে প্রকাশিত হইল, তাহা তাহার রচিত উক্ত গ্রন্থে ‘ধূমা’ বঙ্গ পদাবলিতে দেখা

(১) আর দ্বিজ হইল, আমার সম্পাদকতার এই ‘সারদা বঙ্গল’ বঙ্গ সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার দুইজন কবির জীবনী প্রদত্ত।

যায়। 'শ্রীহরের কি' নামে একজন গ্রী-কবির অতিবাহাভ্য
সুচিত হইতেছে বাটে, কিন্তু তাঁহার নামটি কি ছিল, তাহা
জানিবার উপায় নাই। অস্ত্রান্ত কবিগণের কোন পরিচয়
পাওয়া না গেলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেকই সম্ভবতঃ
চৈত্র্যমাসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার
নানা কারণ আছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে বৈষ্ণব-কবিতাসমূহ এক অপূর্ণ সাধগ্রী।
উৎসাহের সৌন্দর্য্য, উৎসাহের মাধুর্য্য, উৎসাহের মনোহারিত্ব
ভাব্য পরিধাক্ষ কল্পা যায় না। উৎসাহের উপভোগ যেমন
সম্ভব, তদ্ব্যতীত তখন তেমন সম্ভব নহে। তিনিই বালা গুণ,
কুহুমের যে সৌন্দর্য্য, তাহা কে কবে কাহাকে বুঝাইতে
পারিয়াছে? কগতের আর কোন ভাব্য কবিতা-সুন্দরী
এমন মনোহারিত্বী নৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছেন
কি না,—আর কোন ভাব্য কবিতার তিতর দিগা প্রেয
এমন সুস্থিমান হইয়া আশ্ব-প্রকাশ করিয়াছে কি না, জানি
না। ক্রমেই সেই বাশরী, সেই বৃন্দাবন, সেই বৃন্দা-
পুদিন, সেই পূর্ণরাগ, মান-অভিমান, বিরহ-বিগলন—বাধা
বৈষ্ণব-কবিতা প্রাপ্তের ভাব্য চরমের শোণিত দিগা দিখিয়া
গিয়াছেন, তাহার অপরাধের অধুনা-প্রত্যয়ে তাঁহার্য্য যে
ভাবের, প্রেয়ের ও সৌন্দর্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,
তাহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও মিলে না।
গঠকগণ এই সকল কবিতার মধ্যে অনেকটিকেই তাঁহার
সুন্দর অতিবাহিত্য দেখিতে পাইবেন। নিয়ে আমরা
কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

• তাল—জাড় খেদটা।

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে ভাবি আমি।
কে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।
তুমি তো আমার যে বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমার দিতে কি হবে আমার।
নরকে হাসে কহে হুন জনপদ।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি। >।

আলোরারী।

আখির গোতরী করি দুই বছরে রাখিমু।
শোকে আশাভানি হৈলে পলকে (পলক) চাকিমু। >।

বায়ে বায়ে বন্ধু কোরে ছাও যে ভাড়াইরা (২)।
বিরলে পাইলে বন্ধু না নিম্ন ছাড়িয়া।
মেঘের বরণ বন্ধু কালকের রেখা।
নব মেঘের আঁড়ে কেন চান্দ্রে দিল দেখা।
গোবিন্দবরতে বলে তেজিমু জীবন।
দিন মধ্যে একবার দেও বরণন। >।

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়াএ (৩)।

তুয়া পথ নিরক্ষিতে হরিয়াছে প্রাণনাথ
রাধা বোলি দুহুড়ি রাধাএ।
নপুর কিকিনী কেশুর কুণ্ডলমণি
পরিহারি কর শো গমন।
প্রিয় সখীর করে বরি নীল নীচোপল পরি
সেখ গিরা ও চান্দ বদন।
তুয়া রূপ হেরি হেরি আকুল স্মারি
হেরিতে হরল পেধান (৪)।
কহে ছিন্ন পার্শ্বতী শুন শুন পুণ্যবতি
অলক্ষিতে নিম্ন পদান (৫)। >।

বসন্ত।

সেঁখেরে নহান ভরি বোলে নারায়ণ।
সেখিলে ওহার (৬) সুখ ভরএ সমন।
দুই পাশে মরকতে বরিয়া বিদানে।
যেত চানবর বাও (৭) করে সখীগণে।
সুখাবনে সারি সারি পতাকা উড়ে বাএ (৮)।
নয় কোকিল সবে পকব গাএ।
রাধারে করিয়া বাসে বোলে ক্রমবরা।
গোপিনী হেলান দিয়া দুহুড়ি বাধাএ।

(২)। ভাড়াইরা—ভাড়াইরা; বন্ধু করিয়া।

(৩)। জুয়াএ—দুঃখ হয়।

(৪)। পেদান—জান।

(৫)। পদান—প্রাণ।

(৬)। ওহার—ওহার।

(৭)। বাও—স্বাঃ; বাতাস।

(৮)। বাএ—বাতে।

কেহ দেখি (১) স্ত্ৰেণে (কাণ্ড ৭) রেণু কেহ দেখি গছ ।
হরি স্তন পাশে গোপী হইয়া আনন্দ ॥
কহে দেখে নদ্যাহনে বড় আশা মনে ।
তঙ্ক লতা হৈহু গিরা ক্রান তৃণাবনে ॥ ৪ ।

কুলবতী নারী সব বৈষ্ণৱী (১০) গৃহবাস ।
না জানি কালার বাসী করে কোন আশ ॥
মৰ্কটবল্লভে কহে মরমের কথা ।
মন বোর হরি বৈষ্ণ বাসী বাজে অধা ॥ ৬ ।

রাগ—মট ।

বন্ধুর গারি কোন সেলে আইহু ।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাইহু ॥ ৬ ॥
ভোষণে ভাত নহি বাসু পিরাগে ন বাসু পানি (১০) ।
অলিয়া অলিয়া উঠে হৃদয়ের আগুনি ॥
হৃতিগে (১১) ন আইসে নিস্তা বসিলে গোড়ো হিয়া ।
বিষ খাই মরি বাইহু কালার বদাই লৈয়া ॥
প্রতাপ আধিত্য কহে বিড়ম্বন আছে ।
নিছা নিছা ভুলি বৈষ্ণল এ ভাব মগ্না রসে ॥ ৪ ।

তুরি বসন্ত ।

থেনে ত (থেনত ৭) শ্রীকৃষ্ণাবনে নব বন সান ।
রসের রসিনী লগে থেনে অভিমান ॥ ৬ ॥
এক কাহু বহুগ গোপী করিয়া মণ্ডরি (মণ্ডলী) ।
যাকে থাকি মটবয়ে বালাএ মুচরি (মুচলী) ॥
খেনে কুলের মালা কার কার হাতে ।
কেহুহ (৭) কুসিত অক্ষ শিখিপুঙ্ক মাথে ॥
রহিয়া মণ্ডলি করে কুলবতী লম্বা ॥
বসন ভূসন মণি মকুতা বিরাম ॥
পিঠে চাহর লোণে বিচিত্র বিটনি (১১) ।
কহে রাধাবল্লভে হৃদয়ে (১০) কামিনী ॥ ৭ ॥

রাগ—মারহাটী ।

আগো রাই কালার বাসী নিষেধ কর গিয়া ।
কুলবতী নারী বৈষ্ণৱী না জানি ঠেকিগুহ গিয়া
মুই না জানু কালার বাসী এখন সন্ধানিয়া ॥
খাইতে মারে (১২) গুইতে মারে বৈষ্ণৱ নারি ঘরে ।
নিহবদি ডাকে বাঁগী আর কদম তলে ॥

প্রাচীন সাহিত্যে বেঙ্গল বানান প্রচলিত আছে, তাহা
উল্টাটরা মিটে গেলে তাহার প্রাচীন একবারে মট
হইয়া যায় এবং সাহিত্যোক্তির অলোচনার পথ কষ্ট হয় ।
এজন্য প্রবীণ প্রাচীন বানানে হস্তক্ষেপ করিতে একান্ত
নাগ্রহ । পাঠকগণ হেমিহেম, নিত্যন্ত সংকুত শব্দগুলিতে
ভিন্ন অন্তত আঘাতও বড়-একটা হস্তক্ষেপ করি নাই ।

এই মূল পদের ভাষা প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা । তৎ
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিয়া অকারণ প্রবন্ধ-কল্পের বর্জিত
কর্তব্য এবং আর প্রয়োজন দেখি না ।

(১০) দেখি—বের ।

(১১) কোথ—স্থান ।

পিরালে—পিপাসায় ।

বাস—বাই ।

(১২) হৃতিগে—গুইলে ।

(১৩) মারে—মারেছে মারে; বা পারি ।

(১০) বৈষ্ণৱী—বৈষ্ণৱী; থাকি ।

(১১) পিঠে—পুটে। মিটানি—বানান ।

(১২) হৃদয়ে—হৃদয়ে ।

বা বেগুন বা আম-অমৃতচূড়িত মাংস। কিন্তু একতর লোক একটী পরিষেক আভ্যাস পুঙ্খ কঠি নিষেধে দেখিলে, আশ্বাসের কই অনুভূত হয়; কিন্তু সে ঘটনা কোমলপে শিরা স্পর্শ করে না বা শিরার কম্পদ উপাদান করে না। ক্লোরিন উপারে ক্লোরোফরম (chloroform) খাওয়া যে নিরূপা আত্মন অবস্থা হইত, তখন স্পর্শ-পক্তি না থাকিলেও, জ্ঞানের সম্পূর্ণ সোপা হয় না। একটী পীত বন্দনের বাগকের পুটে একটী কোড়া মল্ল কভার মত তাহাকে প্রোথাক্ষ করা হয়। কোড়া কাটা হইয়া গেলে, ভাঙাযোরা কে কি করিল, সে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিল। ঐকপে বস্ত্র উড়াইবার মত অজ্ঞান করিলে, যেমতী অম্পটী চৌক্যার করিয়া হস্তের বিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দেয়। অনেক বলেন, বীরাধা কাব্যাবি দেখেন, ওঁহারা প্রাচীই বধ বর্ণন করেন; কিন্তু বৃহৎ বন্য লোকেরা এ কথা শীকার করেন না। তবে ওঁহারা সম্পূর্ণ প্রাচীনকালের কল্পনা-রাজ্যে মগ্ন করেন ইহা সত্য হইলেও, খবরের সহিত তাহার মত অতি সামান্য। আবার বীরাধা অধিকেন্দ্রশেষী, ওঁহারা অনেক সময় অর্ধ-মাত্রত অর্ধ-নিমিত্ত অবস্থার থাকেন, এবং পূর্ববাই বধ বর্ণন করেন। নিমিত্ত অবস্থার সোঁকের দুই চাপার (night-mare) ঘটে; কারণ, চিত্র হইয়া শয়ন বা অতিরিক্ত পাথ জোড়ন হইলে, নিমিত্ত ব্যক্তি অম্পটী খোঁ-খোঁ শব্দ করে; এবং তাহার ঘোষ হয় যে, কোন শির বা ব্যাঘ্র তাহাকে আত্মন করিতে আনিবে;—কিন্তু তাহার শরীর এক পক্ষি-শির যে, সে উট্টায়। পদাঙ্কিত বা খোঁড়িতে পারিতেছে না।

মিলটন এক সময় বয় দেখেন যে, ওঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী ওঁহার বিকট উপহিত হইয়া ওঁহাকে আনিমস করিতে বাহিতেছেন, এমন সময় কবির দুই ভাবিয়া বেশ এবং তিনি বুঝিলেন যে, তিনি অম্পটী—ওঁহায় পক্ষে বিব চিত্র-চিত্রায় আচ্ছন্ন। কোম্পাশে শিখির আছে যে, একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ সর্বস্ব বর্ণে বাইরা ভবায় নামা বেশ বর্ণন করেন। সেই সময় বেশের ইতিহাস শ্রুত্বে ঘণ্টার মৃতকণের সহিত ওঁহার নানাতপ কথ্যবার্তার পর, তিনি শিখিয়া আনিয়া দেখিলেন যে, যে বন্দা হইতে তিনি উট্টায়। বর্ণে বান, তাহা তখন পর্যন্ত পরম আছে। তিনি হাইবার কালে, ওঁহার পায়ে বাহিয়া একটী মল্লগার উলটাইয়া পড়ে; কিন্তু ঐ পাতের মল্ল গুরুব পর্যন্ত সনত বিশেষে হইয়া পড়িয়া যায় নাই। আবার এই উপলক্ষে অ্যাডিসন্ বলেন যে, শিবরবেশীর জৈনক ব্রহ্মভান ওঁহার বর্ণোপদেশক করেন যে, এই আখ্যান লতা হাঁতে পারে না। ওঁহার বর্ণোপদেশক এই কথা উল্লেখ করেন যে, তিনি মূলভানকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই বয়সী অসম্ভব নয়। বর্ণোপদেশক রাজ্যকে একটী বড় বাসতিপুঙ্খ ব্রহ্ম আনাহীতে বলিলেন। তাহা আনিত হইলে তিনি মূলভানকে ঐ জনের মধ্যে যাহা বুঝাইয়া তৎকথায় উট্টাইতে বলিলেন। রাজা বাসতির মনে যাহা বুঝাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটী সমুদ্রে বুলিহিত একটী বৃহৎ পক্ষীর পায়দে উপহিত হইয়াছেন। রাজার মনে সবে হইলে যে, বর্ণোপদেশক ওঁহাকে বাহ

করিয়াছেন এবং একজন মল্লক বিলাসপাশতকার মল্ল বর্ণোপদেশককে নামা প্রকারে গুলি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে সময় বাইতে লাগিল এবং মূলভানের স্মৃতি যোগ হওয়ার ভিত্তি আশ্বাসের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কতকগুলি ব্রহ্ম কভার পর জনককে কুঁড়িয়ায় এক বনে গাছ কটিলে দেখিয়া, তাহাযের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কুঁড়িয়ায় নিমিত্তেরা বহু-বহু বাল করিল। তাহারা রাজ্যকে দেখানে লইয়া গেল। সবার পরিচয়ের দ্বারা রাজা কিছু ঢাকা জমায়েল এবং একটী বন্দী স্ত্রীলোকের পার্শ্ব-ব্রহ্ম করিলেন। বিবাহের পর স্ত্রী লইয়া ঘরকরা করিতে লাগিলেন এবং রাজার ঐ স্ত্রীর মর্মে তখন চৌক্য শয়ন করিল। কিছুদিন পরে রাজার স্ত্রীর বৃদ্ধা হইল ক রাজার বন-সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। এবার তিনি সোঁকের কাঠ বহিয়া জীবিকার আর্জন করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা সমুদ্রে গারে বেড়াইতেছিলেন। প্রাণি করিবার ইচ্ছা হওয়ার তিনি ভ্রমে বাসিলেন। এক ডুব দিয়া যাহা ভুলিয়া দেখিলেন যে, তিনি ওঁহার বহিঃবর্ণের মধ্যে বীড়াইয়া আছেন। বিশেষ যোগে ওঁহার 'বহ' নামক পুস্তিকার একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন বিখ্যাত ভাঙাযের দুইটী হাত উড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। অজ্ঞান অবস্থার দ্বারা কালে কি বটে, তাহা তিনি বিশেষ ভাবে মগ্ন রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্যালের মগ্ন মগ্নের পর তিনি ওঁহার প্রতিভা ভুলিয়া যেসেন। ওঁহার মনে হইল যে, তিনি পাতিল মিত্রা হইতে উট্টায়। মিলান-সত্য হক্টা করিলেন; এবং ওঁহা আশ্বা-আশ্বা-ভগ্ন বাহির করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ইংলন্ডের ব্রহ্মান সোমাইটস সমুদ্রে বহুতা করার কালে একটী লোক বলিল যে মগ্ন মগ্ন হইয়াছে। তিনি এ কথার অর্থ কি জাদিবার মত দুই ভাবিয়া, একটী লোক বলিল দুইটীই বাহির হইয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি বহু-ভিখি-সকর তোরায় বহিয়া আসেন এবং চরিত্র সেককের মধ্যে ঐ সময় বয় দেখিরাছেন। একজন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন যে, একদিন তিনি ওঁহার স্ত্রীর সহিত এক বিভ্রান্ত ভাড়া বয় দেখিলেন যে, একটী নির্জন বলির মধ্যে এক ব্যাঘ্র ওঁহাকে ভাঙা করিতেছে। ওঁহার এক ভাড়া হইতে যে, ওঁহার চৌক্যের করিবার বহুতা নাই; কিন্তু ওঁহাের ভয়ে কেন বীড়াইতেছেন। তিনি একটা শিখির বিকট পড়িয়া গেলেন এবং ব্যাঘ্র ওঁহার উল্লসে কান্ডাইয়া দিল। তিনি চৌক্যার করিয়া জাদিয়া উঠিলেন ও প্রসিদ্ধেন যে, ওঁহার মাতা ওঁহার উল্লসে চিত্তি ভিরাছিলেন। আর একজন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন যে, এক ব্যক্তি বহুতর আভ্যাসে প্রাচীন হওয়ার পূর্বে বয় দেখে যে, সে সোঁক হইয়া পদাতক হইয়াছে এবং ওঁহাের মনে কই সফ কভার পর বৃত্ত হওয়ার ভায়েক গুলি করিয়া রাজার আশেপা হইয়াছে। এইজন অনেক উদাহরণ আছে। অনেক সময় বয় চরিত্র বন্দা পুড়িত হয়। একদিন এক ভ্রমসোক বয় দেখিলেন যে, ওঁহার নিমিত্ত দুই নিমিত্তের মধ্যে বাহ্যার উপর পড়িয়া আছে। মগ্নন তিনি মগ্নন পাইলেন যে, ওঁহাের ঐ বয় দেখার

সময়ে তাঁহার সুখের দুখ হইল। এইরূপ অনেক সময়ে ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহাও যথেষ্ট বোঝা যায়। ভবিষ্যতে কি বিপদ হইবে তা প্রিয়ান্বয়ের চক্ষু হইবে, তাহাও অনেক সময় যথেষ্ট বোঝা যায়। আবার অনেক সময় ষা একগু রোগাঘোষা হয় যে, তাহার কোন অর্থ হয় না। তবে এ কথা বোঝা হয় সারস করিয়া যায়। বাইতে পাঠে হয়, অভ্যাসে হয় অবশ্যই ও উৎসাহিত হয়।

বৃত্তাঙ্ক উপবিষ্টক বৃত্তাঙ্কগুলি যথা। এই দিকান্ত হইবে, যে যক্ষিক-
বিশেষের পতীরের ও যানের শক্তির উপর ও পাতারিক ও মানসিক
অবস্থার উপর নির্ভর করে। বীরাহা, সর্লগা বর্ণগোচনা করেন, তাহারা
যেয়ে বেবতার আবেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া এথা ধার। আবার বীরাহা
পারিত্যিক বা লেখক, তাহারা। তাহাদের রচিত পুস্তক বা যে রচন
করিলে তৎসম্বন্ধে যে দেখেন। শ্রীলোকেয় মধ্যে বীরাহের সন্তান
হয় নাই বা বীরাহ। সন্তানের ঞ্চি তাহারা পুত্র বা সন্তান সম্বন্ধে যে
বর্ণন করেন। কোন পুত্রকিশেব মনোবোধের সহিত পণ্ডিত-পণ্ডিত
দুহাইতা পণ্ডিত, সেই সম্বন্ধে যে লেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে,
আমরা যে সময়ে শরত কক্ষ, আশ্বিনের মনের তৎকালীন অবস্থার উপর
অনেক সময়ে ভিত্তি জামি নির্ভর করে। সেই ভিত্তি শরনের সমর
ধায়েত সমর ভিত্তি আমায়েই যেন হাম বা পার, তৎপক্ষে চেট্র করিলে
হৃদয় পুঁই করা যটে। তবে যে বখল সাধারণ চিত্তা-শক্তির অতর্পত,
তখন ইঙ্গাণক্তির অবস্থার উপর বরও নির্ভর করে। ইঙ্গাণক্তি মনের
পাদন দও; চিত্তা কালে ইঙ্গা মনকে সংযুক্ত করিয়া রাখে, মন
সেহকে সংহত করে। হুতহা বহুতকে প্রাণিক বা মিত্রিত অবস্থার চিত্তা
করিতে হইলে, লালনের উপর তাহার চিত্তা নির্ভর করে। চিত্তে বত
প্রকার কাম আদিয়ে উপরিত হয়, ততই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। আবার
কল আমায়ে পতীর দুর্লভ হইয়া পড়ে, তাবপ্রোত তত বল প্রাপ্ত
হয়। শ্রীপ্রোত যক্ষিক বত দুর্লভ হয়, ততই তাহার চিত্তা লসবত
হইয়া পড়ে। ইঙ্গাণক্তি দুর্লভ হইলে যেমন মানসিক শক্তি কোন
কার্যে লাসে না, সেইরূপ নিভাণহার ইঙ্গাণক্তি লুপ্ত হইলে, লনা
প্রকার ভাবেই লনা বেলো চিত্তকে উন্মাদ করিয়া তুলে। সেই ভিত্তি
আমরা বেখিত পাই যে, এল ইঙ্গাণক্তিগুণের অতীত সাধারণ দুর্লভ
ইঙ্গাণক্তিগুণের যক্ষিক আদিয়ে, সে এল ইঙ্গাণক্তিগুণের যক্ষিক
ইঙ্গা অসুদার কক্ষি করিতে বাধ্য হয়।

আর একটা কথা এখানে বলা বাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তিকে
মেসমেরাইজ (mesmerise) করিলেও অস্তর জ্বার অবস্থা ঘটে; কিন্তু
সে ব্যাধি দেখে, তাহা অবশ্যই ইল্যান্ডিক্স উপর নির্ভর করে। তবে
নারীক ইষ্ট্রিজমি পুত্র অবস্থার ব্যক্তিগত, সে অবস্থা স্ত্রীয়া
অবস্থা মধ্যে, যা অস্বাভাবিক বা উচ্চ মস্তক বসবসযোগ্য মধ্যে। মস্তক
যেহা ব্যক্তিগত যে, বসে লজা বিচার প্রভা বা; ভবিষ্যৎ বিচার প্রভা
বা; ব্যাধিভুক্ত ঘটবে, তাহা ঘটিলেই যথিগা প্রভা বা; যথিগা
ভবিষ্যৎ ঘটবে প্রভা বা ঘটবে বা, তাহা ঘটবে যথিগা প্রভা বা;
যেহাও প্রভা বা লজা-তা প্রভা বা; যথিগা-যথিগা প্রভা বা

মুঠি বনে কি জলনে থাকিলে তারা। বার্ষিক লোক যবে কবিত্তে পাম।
ইহার অনেক পুস্তাক আছে। আখার অনেক সময়ে বদ বিখ্যাত হয়,
অর্থহীন হয়। হুতরাং এ লম্বকে এই বলা ঘাইতে পারে যে, বদ সম্বন্ধ
বা অলম্ব হটক, তারা প্রব মতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, বা
তাহা বিখ্য। বাস্তাব্য বলিয়াও উচ্চাভিপ্রায়ে যেতারা চলে না।

যথেষ্ট কেহ ভেঁসিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী বা পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে; পরে জানিয়া যখন সে স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জীবিত আছে অস্বস্ত্য করা কি লুপ্ত? আবার অস্বস্ত্য যৎ এত জীভিতর যে, যথেষ্ট নিশ্চিত ব্যক্তি হয়ে তীক্ষ্ণকর করিয়া উঠে। অদেখ সুস্থ ব্যক্তির নিকট লেখক অবস্থার হইয়াছেন যে, তাঁহার। সাধারণতঃ যৎ বেবেব না; তবে যত্বাকাল বাহ্যবশত কখন এক-একটা বস বেবেব। কিন্তু তাহারও পর তিনি ভাব্যঃকাল অদেখ সময় স্থায় থাকে না। তত্ত্ব সাধারণতঃ এই নান্ন ভাষা হইতে পারে যে, আত্মা ব্যক্তি শরীরের উপর স্ত্রী বা স্ত্রী, উপশ্রুত জন শারীরিক পরিগ্রহ না করি, বা বাহ্যক ত্রাণ বাহ্যকর করি, অতিরিজি আহার করি, বাহ্যিক পরিগ্রহ সর্বত্র করি ত শারীরিক পরিগ্রহে বিদ্বৎ হই, তাহা হইলে তাহার কলে আত্মাবের ত্রাণ নষ্ট হইবে এবং মনে-মনে এই সমস্ত জীভিত্রয় বীভৎস মন ধর্ম বহিবে। একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হইল, তাহা ব্যক্তি ইহা এই জীভিত্রয় হয় যে, শরীরের বাজ্যবিক অবস্থার কলে একর বিকার হইলেই যৎ ধর্ম মূলত হয়। অতিরিজি পানঃকোষ না বাহ্যক ত্রাণ এত ব্যক্তি আত্মাবের ইচ্ছাশক্তি (বৌদ্ধিক) ভিত্তি যৎ অবস্থিত হয়। আত্মাবের যৎ সর্বত্রই যথা একর চিন্তা উপর হইতেছে; যত্ন এক মনে দুই একর চিন্তায় এক মনে উভয় হইতেছে। কিন্তু আত্মাবের ইচ্ছাশক্তি এই সমস্ত চিন্তাকে সীমান্ত রাখার ক্ষমতা অবস্থার আত্মাবের জ্ঞানের বৈলক্ষ্য ঘটবে না। জ্ঞানবাহ্য ইচ্ছাশক্তি একেবারে পত্নহীন না হইলেও, সুস্থ অবস্থার থাকে। তাহার পর যদি নিশ্চিত পান, জ্ঞান বা পরিগ্রহ ব্যক্তি শারীরিক বাজ্যবিক অবস্থার বা নিশ্চিত অজ্ঞানতত্ত্বের ব্যতিক্রম ঘটবে, তাহা হইলে চিন্তাগুলি অতিভাববাহীন বা মালতীন হইয়া পড়ে, এবং পানে-পানে, কলে-কলে সমস্ত চিন্তা এক মনে বাহির হইতে থাকে। পাঠ্যপাঠ্য স্ত্রী হইলে যোগী-স্বভাবজিন্দার। বাহ্যকবশত তাহা তাহার। মনুষ্য হইলেও পাইলে তাহাকে পদবিস্তি করিয়া কেহ বিজ্ঞানে কেহ উপদেশ বেবে, কেহ বাহ্যকবশত মায়িত-মায়িত, পাইতে-পাইতে বাহির হয়। পোষ হয় অদেখ যৎ মনের মৃত্যু হইলো তাহা পানে সম্পূর্ণ অদেখ কি না জ্ঞানবাহ্য ভজ, পানে চিন্তা ব্যক্তি মৌক্ত্যবেদ এবং তৎকালে যৎ ভজ হইয়া জাগ্রিত হইলে কলে শরীর বেবেদু হইয়া একর করিয়াছেন। যৎ এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, তৎকালে মনের উপর উপশ্রুত কর্তব্য থাকে না; তৎকালে এইজন চিন্তার যৎ বিকার ব্যাভত করে। আত্ম শরীর জাগ্রিত করিয়া যোগ এবং যৎ মূলতঃ জাগ্রিত পড়িয়া থাকে বাহ্যিক বৌদ্ধিক চিন্তা মনের জাগ্রিত হইলে যে আত্মাব যে মনে বা মন কলে হইয়া

তাড়া হইলোই বিবাহ শেষ বিবাহিত হইল (মানসি পাণী)। ইহাঙ্গের চিত্রকী বা কোঠা থাকে না।

পূজা কত্তা এতদ্ব্যতীত হইলে বিবাহের দিন বাধ্য হয়। কত্তা-কর্তা লোক পাঠাইয়া নির্দিষ্ট দিন বরকর্তাকে আশ্বাস করে। বরকর্তা আপন সম্ভ্রাতার আত্মীয়-বন্ধুগণকে অস্ত্রাঘাৎ করিয়া তাহাদিগকে কহে যে, অম্বুকের কত্তার সহিত, অম্বুকে মিলে তাহার পুত্রের বিবাহ হইবে। কত্তাগণ হইতে আস্তর যাক্তিগণকে ভোজন করাইয়া একটী পাণ্ডী ও একখানি চামর পুরস্কার প্রদান করে। এই সময় হইতে মঙ্গল-স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ হইতে থাকে। বিবাহের দিন মধ্যাহ্নে কত্তা-কর্তা ভাতীর ভোজ প্রদান করে। সাধ্যম্বে বর, বরকর্তা ও বহুগণস্বয়ং কত্তার খামরে আশ্বাস করে। ভগ্নার সকলে একখানি হরিণ্ডত চামরের উপর উপস্থিত হয়। সমুদ্রবিশিষ্ট আসনে বর ও কত্তা উপবেশন করে। তৎপরে বর-কত্তার বরপ্রাপ্ত লইয়া এতী এবং বর ও কত্তা চারিবার আসন প্রদক্ষিণ করে। এই সময় কতকগুলি যাক্তি মালিন্য কথিত। আত্মিক করিতে থাকে। তৎপরে বর বধূ সহিত প-পুণ্ডে আশ্বাসন করে। বধু ক্রিয়বিশিষ্ট বস্ত্রাভাষে যাক্তি ভাতীর সহিত শিশু-পুণ্ডে প্রত্যাপন করে। পরে পূর্ববার যাক্তি পুণ্ডে আশ্বাস দান করে। ইহাঙ্গের 'পঁওনা' (বিদ্রোহন) এনা নাই।

যে অঙ্গরাজ কহিলে মাতৃত্বাভ হইবার সম্ভাবনা। রমণী এইরূপ কোন কোনে দ্বিতী হইলে, ইহাঙ্গা ত্রী ভ্রাতৃগণ করিতে বাধ্য হয়। ত্রী ভ্রাতৃগণ করিবার সময় একবার শাস্ত্রাচারিক যাক্তিবর্ণকে জানাইতে হয়। ইহাঙ্গিগণের সমস্ত বিবাহের ধীমাঙ্গা সমাজীয়গণ সভা আদান করিয়া সম্পন্ন করে। ওজ্ঞাত প্রাইই আদানভের আদান গ্রহণ করিতে হয় না।

ধর্ম

সাধারণ একেশ্বরবাদী; একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে। ঈশ্বর মনস্তত্ত্বের স্রষ্টা। ইহাঙ্গা ঈশ্বরের 'সংস্কৃত' বা 'সংবাদ' নামে অভিহিত করে। ইহাঙ্গিগণের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর-চিত্তা ও সংস্কর্তের অমৃত্যুতন যাহা ইহাঙ্গা ঈশ্বরে মর প্রাপ্ত হইবে। ইহাঙ্গিগণের নাম এই শিলা যে যে, বরপ্রাপ্তি বা সৎকরে প্রেরা হইতে সন্তত নিষ্কর্ত থাকিলে।

উপদেশ

১। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা কর। তিনিই সকলের স্রষ্টা এবং তাহার পক্ষায় করিবার কথতা আছে। বহুভাষ্যের অনর্থক প্রস্তর, বায়ু, কঠি বা মুক কিংবা অস্ত্রাত্র খই পদার্থের উপাসনা করা বিবাহ নহে। সন্তত সন্ধান ও সন্তত প্রণয় ইহাঙ্গাই প্রমুখ। ঈশ্বরই সৎকর, ঈশ্বরই ইহাঙ্গ শব্দ। যে যাক্তি তাহার নিষ্কর্ত কোন পদার্থের নিষ্কর্ত (ঈশ্বর গভীর) সেই জন ও পাশে গভিত হয়। যে পাশ করে, সেই নরকে যায়।

২। সন্তত ধীর ও সৎ-প্রকৃতি হইবে, শাস্ত্রাচারিক কোন পদার্থ যেন তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারে। সম্পূর্ণরূপে ধীর কর্মের নিয়মাবলি পালন করিবে। তোমার কর্ম-বিরুদ্ধ কোন কর্ম করিও না।

৩। কথাত বিশ্বাস কত্তা করিবে না। এবং পুণিবী, জল, বৃক্ষ কিংবা পশুপক্ষীকে অভিপ্রাণ দিও না। তোমার রসনাকে কেবল ঈশ্বর-ভোজি নিষ্কর্ত কর এবং কখনও কোন যাক্তির জ্বলি, সন্ততি ও পশু বস্তুপূর্বক গ্রহণ করিবে না। কাহারও অজ্ঞাতমারে কোন ত্রয়া লইবে না। কাহারওকও বিপন্ন করিও না, কিংবা কাহারওকও তাহার প্রাণা অধিকার হইতে বঞ্চিত করিও না। যাহা কিছু তোমার আছে, তাহারেই সন্তত থাক। মন বিবাহে চিত্তা করিও না। লজ্জাহীন বা নিরুদ-বহির্ভূত সূতা বা সীতা (প্রী বা পুরুষ হটক) কথাত পুষ্টি নিষ্করণ করিও না।

৪। মন বিবাহ চিত্তা করিও না। আপনাকে ঈশ্বর স্তবে ও বস-সৌন্দর্যে নিষ্কর্ত কর। পর, কানিনী, পান ও বাতে আশ্বাস যোগ করিও না। ঈশ্বরের স্তব পাঠে আশ্বাস উপভোগ কর।

৫। কোন প্রণয় প্রক্তি অভিপ্রাণ সন্তত করিও না—বনাই হটক অথবা সৌন্দর্যই হটক। অপরের অধিকৃত ত্রয়া গ্রহণ করিও না। ঈশ্বরই সকল ভ্রমের দাতা। জ্বলি ইহাঙ্গে বেদগণ বিশেষ স্থাপন করিবে, তত্ক্ষণ জ্বলি প্রাপ্ত হইবে।

৬। ধর্ম তোমাকে কেহ মিথ্যাগা করে, "তুমি কে?" তুমি উত্তর দিবে "আমি সাধু" (সাধু)। ভাতীর উত্তরগণ করিও না এবং বাগদাহ্যনে প্রবৃত্ত হইও না। আপন ধর্মের বৃত্তরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর। কথাত মনস্তত্ত্বের নিষ্কর্ত হইতে কোন আশা করিও না এবং মনস্তত্ত্বের নিষ্কর্ত আশ্বাসপ্রদা প্রদান করিও না।

৭। যেত বর পরিধান করিবে; রসজ্ঞান-কিংবা বেনা যাবহার করিবে না। বের বা মলাটে কোন জাতীর চিক (চিক) রাখন করিবে না। মাল্য, উপবীত বা কোন রত্নাবলি ধারণ করিবে না।

৮। নিরাশ্রিত ভোজন করিবে—মৎস্য বা হাঁস বাহার করিবে না। পান খাইবে না। সৌন্দর্য ভ্রমের আশ্রয় নহিবে না। ধূমপান করিবে না ও অগ্নিবৈশেষ্য করিবে না। কোন মূর্তি বা মনুষ্যক প্রদান করিবার মন্ত হস্ত উঠাইবে না বা সঁদরী সন্ত করিবে না।

৯। দীপ-ভজা করিও না; কাহারও উপর দণ্ডপ্রদাতারী হইও না। লম্পণ গ্রহণ করিয়া শাক্য প্রদান করিও না। বস্তুপূর্বক কোন ত্রয়া গ্রহণ করিও না।

১০। এতোক পুরুষের একমাত্র প্রী ও এতোক প্রীরা একমাত্র যাক্তি। বিবাহিত পুরুষ প্রীরা যাক্তিবশেষে ভোজন করিবে না; কিন্তু প্রী যাক্তির বৃত্তবিশিষ্ট অবস্কারে ভক্ষণ করিবে। প্রী যাক্তির অমৃত্যুতন হইবে।

১১। কহিলের বেশে ধারণ করিয়া ভিক্ষা মাগিও না। দান গ্রহণ করিও না; আশ্রয় বিবাহ মেথিয়া ভীত হইও না; প্রণয় বিশেষরূপে গভীরা করিয়া ওয়ে কোন বিবাহে বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

সংলোকেই সমাধা-স্থল তোমার ভীষণ। তোমাকে সজাঘন করিবার পূর্বে সংলোকে চিনিয়া গেল।

১৩। সবেবিশের কোব পূর্বদিন নাই। আপন পরের জ্ঞান পত পক্ষীর ডাকে বিরক্ত হইত না। ঈশ্বর-বাক্যের অবশেষ কর এবং তাহাতেই সহস্র থাক।

বিবাহ-সঙ্গীত।

১। "বরষন বে ডক পদম সদেহি।

"তুন্ বিনা হুগ পাওয়ে ঘেরি ঘেরি।

"নিদ্ না আওয়ে অনু না ভাওয়াই।

"বাহ বাহ ঘোহিন্ বিবাহ সাতগোয়াই।

"বর অভিন ঘোহিন্ কছু না হাই।

"করায় কই পু বিবাহ ন হাই--

"নৈনান্ চুটাই সগহাস বাহা।

"নিদ্ বিন পক মিহাঙ্ক তুঘহায়া।

"বৈলে ইন্ মাই। বহু বীরা,

"ঈদি তুন্ বিনা হুঘত শরীরা।"

যে পদম শ্রিতম গুপ, বর্ণন দাঁও। তোমা বিনা আবার হুগ হুগ পাইতেক। নিতা আসে না। অত ঘোরে না। বহু বাহ তোমার বিবাহ অনুভব করি। বর-অনন কিছুই ভাল লাগে না। প্রত্যন্ত হলেও তোমার বিরহ ব্যথ না। মরবে সন্ত বাহা হুটে, রাতি-দিন তোমার পথ চাফিয়া থাকি। যেমন বীর বিনা নংক মতে, ঐকণ তোমা বিনা আশিও মরণাগর হইয়াছি।

২। "হুগত তুন্ বিনা গোটক হুয়ায়ে।

পদম বরষন বিবিয়ে।

"বিন্ভি কল"ঘেরে সানিয়া বসি দাঁও,

বিলম্ব না কিলিয়ে।

"বিবিন্ বিবিন্ কং ভায়া" ব্যাচুল বিনা

বেথে চিং না হাই।

"লটকণ অপরাধী বাহা কিয়ামার অটকণ কছু

বিচারিও।

"পতিত পাওন্ রাধ পতি অন্ পল বিন না

বিসারিও।

"বহা কিলো বসন্ বিনো অন্ কি বদিকো

প্রোক্তিও।

কন্, কন্ নয়ন নিরুধি যোগোন্ নিম

সমেহ না তোরিও।"

তোমা বিনা হুগ পাইতেকি—তোমার হুয়ায়ে কীকিতেহি—প্রভট হুগে বর্ণন দাঁও। আদ্যের শ্রিতম। বিন্ভি করি, বিলম্ব করি না।

নবো প্রকারে ব্যাকুল হয়েছি, না দেখিলে তিত হরিষ হর না। শরীরে তপ্ত হালো উঠে, আমার কটন হুগ কে লক করে? আমি পানী, অপরাধী,—পানী বলে হুগা করিত না। পতিত-পাখন! বহা কন্, এক পল তুলিও না। বহা কন্, বর্ণন বিও, আমার অপরাধ কহা কন্। আমার উপর পূর্ব দৃষ্টি রেখো, তোমার প্রেম হইতে আমাকে পৃথক রেখো না।

মৃত্যু-সঙ্গীত।

"হুগে বিনান্ কিয়। পতি কু আপনা নিধের।

"বিবাহ তাল বাহুর রে মন বাওরা, হুতারিমা বেড়।

"পদ হক হাড়ে, হক শিহাড়ে, মদকওয়ালা করে।

হুতা বাহি মদকওয়ালা, মন বাওয়ে। কন্ সাধু কি টের।

"কোয়া হো মদী মদকওয়ালা পক মনে দেব।

"ওক জাণ বড় প মদকওয়ালা, বাওয়ে। বহু

কই না রেহ।

"তোরা জীবন ছিল পল এক, মদুগে কিয়না

আইলি করে।

"তোর পদ, ভাখাম মদুগে, মন বাওয়ে। বিন্

সকাই করে।

"পতি মদাকির রাহাকে পদ বাড়ে কোমর কবে।

"লেনা হোয় লো কিলিয়ে, বিতি বাতে জায়েব।

"কন্ মদকওয়ালা মদকওয়ালা, হাড়ে মদ হাঙ্গেল।

"তিয়ে জাণ বিলম্ব মদুগে, মন

বাওয়ে। মন বাওয়ে, মদকওয়ালা কোয়।"

তোকে বিনয় করি, তুই আপন বিপদে। উপায় কন্। (বিপদ আগত প্রায়)। যে তোমা মন। বিবাহ তাল বাহিতেক, মদুগকে জাগাইয়া কি কন্। পদের হক হাড়ে, হক হাড়ে। হুগ মনের বিপদ। তোমার জাখাম মদুগে পড়ে আছে তোমার মন। সাধুর ইচ্ছিত পোন্। কায় মদরীতে পাঁচ সিংহ আছে মদকওয়ালা বড় প মদকওয়ালা বে, তোমার মন। মদের জিহাঙ্গা করিবার অধিকার থাকিবে না। তোমার জীবন এক পল দাঁও, অপগত আশিবার আসতে হবে। তোমার জাখাম মদুগে পড়ে, তোমার মন। এখন থেকে সতর্ক না হালে কিভাবে পদ পায়ে দাঁবে? মদুগেই দাঁবে, কোমর বেধে পাঁড়িয়ে আছে। বা মদকওয়ালা বে, মদকওয়ালা বাড়ে। মদুগকে মদকওয়ালা কন্, মদকওয়ালা মদুগে, তোমার মন। মদুগের পদে মদকওয়ালা হুগে মদকওয়ালা কন্।

এবং খচন্দ্রোদয়ের রচয়িতা এবং তাঁহার

আশ্রয়ভাষ্য

[ঐনির্গলক্ষে শায়াগ]

আম পর্ষদ এনিহা আদিত্তি যে, কালজন্ম-রাজ কীর্তি বর্ষার সেনাপতি
মোপাল তেজিহাও বর্ণকে পাত্ত করা কালজন্ম রাজ্যে যে উৎসব
অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বৎসবক কুকমিহ নামক উক্ত গোপালের আদিত্ত
কালজন্মবালী জনক কবি এখোখচন্দ্রোদয়ের নাটক রচনা করেন।
এই যতের সঙ্গীতকর্তা যে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে এই
সত এখন সর্ববাসিন্দগত। কিন্তু নাটকবাসিন্দে কালজন্মে পড়িতে
যদিয়া উহার মধ্যে এই যতের অনশ্বতের তথ্যই প্রমাণ (Internal
Evidence) পাইয়াছি। সাধারণের অবগতিয় রক্ত তৎসমুদায় নীচে
সিদ্ধান্ত করিয়া। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশকে দেখা যায়,
আহুয়া পৌড় রাজ্যের অধ্যাপকী রাজ্যপুত্রী কবিবালী বলিয়া বিজ্ঞের
পরিচয় দিতেছেন। কথা :- “পৌড়রাজ্যপুত্রনঃ নিম্পণা তন্মাসি
রাজ্যপুত্রী। কুটুম্বোহয় নাম বাম পতমঃ প্রসোতমো নঃ পিতার।”
ইতিমি ইত্যাদি। [পঞ্চমতঃ কবির লগ্নঃ রাজ্যপুত্রী পতিত-বহল হান
হিস ও ততঃ পতিতবিপের মনে পতিতের প্রজ্ঞ অন্তিমহ বর্ণ (যাহা
অধিকাংশ পতিতের ভিতরেই ঘুট হয়) ছিল। এই যোগে কবি
রূপকর যাহা তাঁহারই বর্ণনা করিয়াছেন।] তৎপরে চতুর্থ অঙ্কের
বিষয়ক প্রকার উক্ত হইতে জানা যায়, লগ্ন পুত্রী মহাধোলের
অধিকৃত। হস্তান্তরে রাজ্যবর্ণের অন্তর্গতী চতুর্থী বিবেক আলয়
লইয়াছিলেন; কথা :- “যেথা এত যেবহুদু” অর্থাৎ রাজ্যবিধানো
জনন। ততঃ ভাস্করী পরিশ্রমলভ্যকৃত উক্তার্থে—
বিবেক উপনিষদব্যায়া সমস্যাঃ তদ্বৎসবকীতি (পঞ্চমতঃ ইহার
ভিতরেও রূপক আছে।) যোগ হয় চতুর্থী কবির লগ্নঃ আধুনিক
নবগণ বুঝাবন প্রকৃতির মত সঙ্গীত-বিবেক বৈকল্য-বহল হান ছিল,
পূর্বোক্ত হস্তান্তর কবি তাহারই ইচ্ছিতে জানাইয়াছেন। তদ্বৎসব
বুঝা যায়, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশকের এবং চতুর্থ অঙ্কের প্রবেশকের ঘটনা-
হল কান্দি, পঞ্চম অঙ্কের প্রবেশকের ঘটনাস্থল প্রাচীন চতুর্থী ও
যত্বের ঘটনাস্থল লগ্ন। (যা লগ্নার) বৈকল্য বহুবর্ণের (১) অধি-
নামিহা। ইহাও লগ্নে যাহা রাজ্যপুত্রী অধ্যাপকী কুটুম্বা পাওয়া যায়
নাই; চতুর্থী লগ্নতঃ ওতমিয়া পৈলঃ কান্দির পরিচয় দিবার
প্রয়োজন নাই; লগ্ন (যা লগ্নার) পর্ষদ ভগ্নলগ্নর হোমার
অবস্থিত এবং যদুবেদের মস্তি তথ্যর অধ্যাপকী বিদ্যমান (২)।
এই লগ্ন হানই কবির লগ্নে বৌদ্ধগারাগোর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংক্ষেপতঃ এই কথা বলা হইতে পারে যে, নাটকীয় প্রবেশনাবস্থায়
যে লগ্ন হল কেনও হানের নাম উল্লেখ করিতে হইতামে, তাহার
অধিকাংশ হল কুকমিহ পৌড়গারাগোর অন্তর্গতী হানেরই নাম উল্লেখ
করিয়াছেন।

সত্বেতার দেখা যায় যে, উক্ত লগ্ন হল কুকমিহ—বিশেষতঃ লোকলোকে
কুকমিহ—যে লগ্নে অবস্থিত হানেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।
কুকমিহও কি তাহা করিতে পারিতেন না? রাজ্যপুত্রী এবং চতু-
র্থীর মত হান কালজন্ম না থাকুক, লগ্ন লগ্নবর্ণের ভিতরেও কি
ছিল না? আর, সে লগ্ন কখনো কান্দিতেও লগ্ন পর্ষদের ঘটনা
হইতামে, সে লগ্ন ঘটনা কি প্রাচীন ও কালজন্ম লগ্নে ঘটনাইতে
পার্য হইত না? কেন তবে কুকমিহ লগ্নের নিয়মের ব্যতিক্রম
করিলেন? কি কুক কালজন্মবালী হইয়া তিনি হানের নাম লগ্ন করিতে
পৌড় আদিলেন? কিন্তু কুকমিহকে কালজন্মবালী বলিয়া বীকর
করিয়া লইলে, পূর্বোক্ত লগ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পার্য যায় না।
এই লগ্ন উহা আনন্ড বীকর করিতে চাই না। আনন্ডের মনে হয়,
লগ্ন উহার মধ্যে উক্ত পৌড়ীর নামেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ঘুট হয়, তখন
তিনি বৌদ্ধেই লোক ছিলেন। বিশেষতঃ লগ্নে লগ্নে, এইরূপ
প্রবেশের বহু প্রকারে মহাভারতবালী বলিয়া লগ্ন কর্য হইয়াছে।

এই প্রকারে যোগ হয় ইহাও বলা অস্বস্তি হইবে না যে, কুকমিহের
রচনার পৌড়ীর ভিতর প্রাচ্য লগ্নিত হয়। লগ্ন উহা তাঁহার
পৌড়ীর লগ্নবর্ণ করিবার পক্ষে সাহায্য করে না।

যাহাই হউক, অন্তঃসর কুকমিহের আশ্রয়ভাষ্য (সংস্কৃত-প্রবেশের
প্রবেশনা ভগ্নে পিতা বলিয়া কবিত) গোপালের লগ্নবর্ণে কলি-
বক্তব্য আছে। ইহাও যে কোন্ প্রবেশেই লগ্নে কীর্তিবর্ষার সেনাপতি
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতামে, তাহা জানি না। অন্ততঃ প্রবেশ-
প্রবেশের কোথাও সে রকম কিছু নাই; এবং গোপাল নামে
কীর্তিবর্ষার কেনও সেনাপতি ছিলেন কি না, তাহাও অস্বাভি-
কথা নয়। এমন আশঙ্কা ঐ সিদ্ধান্ত রাখিয়া গইতে অনিচ্ছুক।
পতিত শ্রীকৃষ্ণ হস্তান্তর পাত্রী লগ্নবর্ণের মতে অগ্রহণ ১০০০ অব্দে
উক্ত গোপালের যাহা কর্য পর্ষদ হইল। পৌড়রাজ্য কুটুম্ব গোপালও
আর এই লগ্নবর্ণই লোক। তদ্বৎসব কুকমিহ উক্ত গোপালকে লগ্ন
বর্ণিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, লগ্নবর্ণের লগ্নার মধ্যে কুটুম্ব
গোপালকে “লগ্নরাজ্যপাল” (লগ্নের লগ্নবর্ণের লগ্ন হইয়া) লগ্নে হাইতে
যেখা তাহাও লগ্নে লগ্নবর্ণ বর্ণিত বলিয়াই মনে হয়। এমন আশঙ্কা
অন্তরূপ লগ্নবর্ণের লগ্নকে লগ্নবর্ণের লগ্ন না পাত্য পর্ষদ উক্ত
গোপালকে পৌড়ের কুটুম্ব গোপালের সঙ্গে এক বলিয়াই মনে করি।
এখানে হয় ত এর উত্তরে পারে যে, পালগারগণ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী
ছিলেন—কুকমিহের মত বৌদ্ধবিশেষী বৈশাখিক বৈকল্যে তাহাদের
মধ্যে কেহ যে লগ্নে লগ্নে, ইহা কি লগ্নে লগ্ন? তদ্বৎসব লগ্ন
এই যে, পালগারগণের কেহই লগ্নে পৌড় বৌদ্ধ ছিলেন না;
বিশেষতঃ লগ্ন বিকলার অনেকেই লগ্নে বৌদ্ধ হইলেও লগ্নবর্ণিতঃ

(১) ইহার পক্ষে লক্ষ্যপুত্রের উপমা বিরাই হয় ত লগ্নবর্ণের লগ্নী
তাঁহাকে “লগ্নবর্ণার লগ্নবর্ণ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) Statistical Account of Bengal. Vol XIV

ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হুয়া যায়। নানারূপ পাল
নিব-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কৃত্তীর বিগ্রহ পাল "স্বর্গলিপোঃ
পুণ্ড্রাযুক্ত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; রামপাল ব্যক্তি "ব্যাসা পদ্য
চৈবিকঃ" পদ্যরসে আশ্রয়ণ করেন। স্বাক্ষর নক্সা মদনপালকে
"চৌ-চরৎ-সোভা-প্রদান-পদ্য-বিগ্রহ-ঈকঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,
এবং মদন পালের শিল্পের হইতেও জানা যায় যে, তিনি তাহার
সকলকে যজ্ঞভারত ও নাইবার মত একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান
করিয়াছিলেন। অতএব কৃত্তীর যোগ্যদেরও বৈক্য হওয়া এবং
কুকনিম্নকে আশ্রয়ণে অসমর্থ নহে। কবি বিক্রম কর্তৃক
"কালকর বিবিশিতিবিবর্ধন" আখ্যা রিয়াছেন। তাহার এই উক্তি
সঙ্গে প্রোবোচেন্দ্রাবতার বর্ণনা মিশাইয়া যেখানে অসুস্থান হয়, কর্ণের
যাত্রা পরাবৃত্ত হইয়া কীর্ত্তির্ধর্ম (বোধ হয়, বিগ্রহপালের সমস্ত কর্তৃক
পত্রায়ত করিয়া সৌভাগ্য বাহিনী যে বৎ লাভ করিয়াছিল তাহা মনে
হওয়াতে) যোগ্যদের নিকটে সাহায্য আর্শন করেন এবং তাহারই
সাহায্য কর্তৃক উৎকট বিক্রমপালপা ধর্মায়িত হয়। ইহাকেই
পাল বিক্রমবত্তির শেষ স্মৃতি বলা হইতে পারে। যাহাই
হউক, অতঃপর মৌর্যবস্ত্রীতে সর্বস্বতঃ উৎসবের অসুস্থান হয়, এবং
তত্ত্বসমলক যোগ্যদের যাত্রা নিবন্ধিত হইয়া কীর্ত্তির্ধর্ম সর্বাংশে
লোভে আসেন। এই সবাই প্রোবোচেন্দ্রাবতার ন্যায় বিচিত্রিত হইয়া
হয়ে কীর মতি-মতে উত্তর রাজ্যের নৃপে অভিযুক্ত হয়।

মঙ্গলকোট উজানীর বিক্রমকেশরীর শিবমূর্ত্তি

(শ্রীযোগেশ্বর দাস)

সন ১০২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক
দ্বিবি "উজানী" নামক যে প্রান্তর প্রকাশিত হইয়াছে তৎ ১০২২ সালের
নাথিকা-পরিষৎ পত্রিকা, চিত্র ভাগ কৃত্তীর সংযোগে ঈদৃশপ্রমাণ
যহ, বি, এ, ঈদৃশরাস পালিত ও ঈদৃশপালপা বসোপাখ্যাত, এবং, এ,
মহোদয়ল "উত্তর ভাগ প্রথম" নামে যে প্রান্তর লিখিয়াছেন,
অতীত আশ্রয়ণ বিবরণ যে, তাহাতে তাহার উজানীর সৌর্য-রবি
পর্যায়ের বিক্রমকেশরীর দ্বিতীয় শিবমূর্ত্তির বিবরণ প্রদেয় করেন নাই।
সেই মত ভ্রমবশতঃ যাহা কিছু না হইতে পারে। বিচারে, তাহা প্রকাশিত
হইল। মঙ্গলকোট উজানী অরণ্য নদের তীরে। কলিকাতা হইতে
বাইতে হইলে প্রথমে ধর্ম্মা হইতে বর্ধমান, বর্ধমান হইতে বি, কে,
য়েলগবে মদন চৈবনে নামিকা পশ্চিমে তিন সাইল বাইতে হয়।
বর্তমান মূল উজানি কোষের দ্বা দ্বার্য করিয়াছে। কলিকাতার
চৌতে উজানীর, উজানীর ও উজানী এই তিনটি নামই দ্বিতীয় আছে।

এবং উক্ত উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর দ্বিতীয় শিবমূর্ত্তি "নাটেশ্বর
শিব" নামে মঙ্গলকোটের অন্তর্গত বর্ধমান "বাৎসনাতিব পত্রাশ্রম" নামক

প্রান্তে ব্রাহ্মণ বাড়িতে আছেন। (বাৎসনাতিব বাড়িতে হইলে মদন
চৈবনে নামিকা পশ্চিমে দুই কোণ পদ্য গো-বাড়িতে বাইতে হয়)।

উক্ত শিবমূর্ত্তি কত দিন পূর্বে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেবল নির্দিষ্ট
করিয়া বর্ণিত পারেন না; তবে প্রাপ্তি লক্ষণে যে প্রাচীন চলিয়া
আসিতেছে তাহা এই। (১) "নাটেশ্বর শিব মঙ্গলকোটের
বিহঙ্গম্যবতারের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। মঙ্গলকোটের দক্ষিণে ঠাকুর নামক
পুষ্করীতে শিবমূর্ত্তি বাৎসনাতিবের অনেক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
(ব্রাহ্মণের দ্বা পাওয়া যায় না তবে অনুমানের দ্বারা যায় যে,
বর্তমান শিবমূর্ত্তি মঙ্গলকোটের পূর্বে পুষ্কর)। কথিত আছে তিনি পর
নিষ্ঠাবান, বার্ষিক ১৩ দিন তত্ত্ব ছিলেন। তিনি যখনবাৎসে বৈবাহার
মন্ত্র কামিদান বাইবার ইচ্ছায় মঙ্গলকোটের নিকট অরণ্য নদের
অন্তিমূখে বাইতেছিলেন। তৎকালে কামি, কি কোণ পুষ্কর প্রদেশে
বাইতে হইলে, উজানী প্রদেশের লোকেরা যে, অরণ্য নদে বৌদ্ধ
আরাধনায় বাইতে, তাহা মূচ্ছরামের কলিকাতার চৌ পাঠে বিবরণ
অবগত হওয়া যায়। বাৎসনাতিব হইতে মঙ্গলকোট আসিতে হইলে
ঠাকুর পুষ্করীর তীর দিয়া আসিতে হয়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর পুষ্করীর
পাছাড়ে উপর দিয়া বাইতেছিলেন, এমন সময়ে "ও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ"
এই শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাহাকেও দেখিতে না পাইয়া,
আশান মনে চলিতে লাগিলেন। পুনরায় সেই প্রদেশ লক্ষ্য তুলিতে
পাইয়া, ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হইলেন, এবং যখন তিনি পুষ্করীর
বাড়ের নিকট আসিলেন, তখন তাহার বোধ হইল যে, অনুগ্রহ
হইতে তাহাকে কে ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ অতিশয় আশ্চর্যবোধিত
হইয়া বিজ্ঞান করিলেন, "কে আশনি?" বল মধ্য হইতে উত্তর হইল,
"আশি বিক্রম্যবতারের শিবমূর্ত্তি, তুমি আশাকে তুলিয়া বাসি লইয়া
চল, আশি তোমার বাসি বাসি"। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এহু আশনি
রাজার শিব, আশি গরীব ব্রাহ্মণ, কেননা আশি আপনার দেয়া চানাইব"
আবার বল মধ্য হইতে উত্তর হইল, "তোকে অস্ত্র কিছু দিতে হইবে
না, কেবল লিবার মধ্য বলিয়া বিবরণে পুণ্ড্রা করিবি। আর এক
বেলা আতপ দ-শোনা, দুই বৎসারিয়া ও হিটর বৎসারিয়া দিয়া তোম
বিবি। তাহাতেই আশি লভ্য হইব। আর আশার সুদান মিলিল
আশি মিথ্যেই বোঝাও করিয়া লই"। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এহু,
আপনার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে"। এই কথা বলিবার সময়
অন্তর্যময় শিবের শিবমূর্ত্তি বাটে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ
বল মধ্য সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ পরম আশ্চর্যবোধিত হইলেন।
তাহার পর ব্রাহ্মণ সেই পুষ্করীর তীরে শিবের পুণ্ড্রা ও কোণ দিয়া
বাসি লইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর জানীর লোকের মূখে এই প্রবাদ
অন্তর্যময় তুলিতে পাওয়া যায়। (২) মঙ্গলকোটের নদীতে সুই
নামে একটা ক্ষুদ্র নদী আছে। বর্ধমান পর নদীর তীরে ব্রহ্মিকা
তামিরা পড়তে উক্ত মূর্ত্তি বহিরা হয়। তাহা দেখিয়া প্রবন্ধের
বলিয়াছিল যে, আশার লইয়া চৌকির গড় প্রস্তর করিয়া, এবং রত্নচক্র
বলে আশার ভাঙ্গা করিবে। নতুনই প্রবাদে পাণ্ডব বলিয়া

নিবেদনা করিয়াছিল, কার্য সূত্রি উনু ইয়া পঠিতা ছিল। বাবজাতিহি
নিবাসী ব্রাহ্মণ হইয়া যোজিতা লিখা হার ও মুখা প্রকাশ করে। এখন
নাটকের শিবের বাহারা যৈব উবন খান, কিবা বাহর করেন, তাঁহারা
স্বত্বেরে ডিঙা, কিবা স্বত্বেরে খোঁচ কাপড় সুনসার মলে খোঁচ না
করিয়া ব্যবহার করেন না। তাহা যদি না করেন, তাহা হইলে যৈব
উপরে কল হর না। একথা বাবজাতিহি অমেশ্বর লোকেরা বিশেষ
রূপে অবগত আছেন।

সূত্রি যেখানে ৪৮ কি ৭৫ বর্ষ বালকের তার সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তাহার
চরণের দুই পার্শ্বে নখী ও কুখীর সূত্র আছে। নখী ও কুখীর পার্শ্বে
ইহী উলঙ্গ খোঁচ শিবসূত্র আছে। কোমরের উত্তর পার্শ্বে ছইটী
হাতী ও শিখ সূত্র আছে। বাম কর্ণ ও দক্ষিণ কর্ণের নিকট ইহী
উলঙ্গ শিবসূত্র আছে। চরণের নোচে গদ্য, তাহার নোচ সূত্রের সূত্র
আছে; সূত্রের উত্তর পার্শ্বে কয়েকটী বৈবসূত্র খোঁচিত আছে।

সূত্রি যেখানেই অস্থান হয় যে, সূত্রি বৌদ্ধধর্মের পরে প্রভুত;
কার্য সম্বন্ধ হইতে খোঁচিত করিয়া প্রভুত। গদ্য সূত্রগুলি একখানি
প্রস্তর হইতে খোঁচিত। প্রৈন তাঁহাদের শাস্ত্রধর্মের সূত্রি বাহা মঙ্গল-
কোটেয় মঙ্গল বসের পরে পাঠ্যের প্রিয়তম, এই সূত্র কতক অংশ গ্রীক
একরূপ। (উক্ত শাস্ত্রধর্মের সূত্রি সাহিত্য: পরিব্রাজক জ্ঞানকান্তার
আখ্যাত হইয়াছে)।

যখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা মঙ্গল-মঙ্গল লাভ ও শৈব ধর্মের উন্নতি
হয়, সেই সময়ে এই সূত্রি বিখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।
পূ: বিজ্ঞান সভাখীতে কনিষ্ঠের মঙ্গল নাস্তার্দ্রন নামক একজন বৌদ্ধ
আচার্য্য বহাবান মত প্রচার করেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও বঙ্গের অধিবাসি-
গণ তাহা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ সূত্রবাদের উত্তির উদয় তিনি হিন্দু-
শাস্ত্রের যোগ ও তত্ত্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা
প্রবর্তিত করেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতেই হিন্দু তান্ত্রিকতা বহুদূর
পুষ্টি লাভ করে; এবং 'মঙ্গল তান্ত্রিকতার স্রোতে দ্রাবিত হয়।
(বাল্যসার পুস্তক, পরম বন্দোয়া পৃ: ২৪২)।

পূ: ২৪ সভাখীর শেষে পুস্তকিত অমেষ বঙ্গ করিয়া পৌরাণিক
হিন্দু-ধর্মের প্রবর্তন করেন। পূ: পক্ষ সভাখীতে শুভাঙ্গকরণের
সময়ে সন্তোষ ভাষার চরণ উন্নতি হয় ও মঙ্গল-মঙ্গল হিন্দু-ধর্মের প্রবর্তনা
বৌদ্ধ-ধর্মের অববর্তি হয়। (V. Smith, p. ২৪৭-৪৪.)

পূ: ২৫ সভাখীর শেষভাগে শুভাঙ্গকরণের অনুব্রহ্ম ও তেজোভৈ
বসন্তে পুস্তকিত পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের অনুব্রহ্ম হয়। এই সময়ে
বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা হিন্দু-ধর্ম প্রবেশ লাভ করে। শুভদুর্ভাগ এই
তান্ত্রিক-ধর্ম অনুব্রহ্ম প্রকাশ করার বসন্তে তান্ত্রিকতাই প্রবর্তন
হইয়া উঠে। তবে এই তান্ত্রিক-ধর্ম ভারতবর্ষে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়;
বসন্তে এই সময়ে তান্ত্রিকগণ কর্তৃক কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর
সূত্রি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুভাঙ্গকরণের মধ্যে অনেক শৈব ছিলেন।
তাঁহাদের সময়ে বসন্তেই অশ্বমেধ যৈব-যৈবী প্রতিষ্ঠিত হয়, কালিকাট,
বসন্তের ইত্যাদি। (যা: পূ: ২৪০ পৃ:)

পূ: ২৬ সভাখীতে যখন হিন্দু-ধর্মের চরণ অনুব্রহ্ম হয়, তখন বসন্ত-
কোটে যেত নামে এক রাস্তা ছিলেন। তিনি বসন্তের-বাহারা প্রচার
করেন; এবং তিনি প্রতিদিন বসন্তের বাহারা শিবের আরাধনা করিয়া
আগিতেন। তিনি পক্ষ শিবকর্তা ছিলেন। তাহা বসন্তের-বাহারা
হইতে অবগত হওয়া যায়। (বসন্তের বাহারা যেতগোপাখান
২৫ বাহারা)।

উক্ত প্রব প্রকাশ্য না হইলেও তাহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে
তিনি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং শিব পূজার ক্ষমতা বসন্তের বাহীতেন।
কিন্তু বসন্তকোটে কোন শিবসূত্র নির্বাণের বিবরণ জানা যায় না। যেত-
রাহারা পক্ষ বিক্রম কেশবীর মৌল প্রকাশ। তিনি পূ: ৪৮ সভাখীর
শেষ ও ৭৫ সভাখীর প্রবেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান
হয়। তিনি ঠাকুরপালের সময়ে রাজা। বর্ষীয় অধিকাংশের প্রব-
চরী বহাবান ৮৫ সভাখী বিক্রমকেশবীর রাজত্বকাল বলিয়া বিব-
করিয়াছেন। কবিকল্পন প্রভৃতি চর্চাতে বিক্রমকেশবীর বিবরণ অবগত
হওয়া যায়:—

উলানী মঙ্গল, অতি মঙ্গলোহ, বিক্রমকেশবী রাজা,
করে শিবপূজা, উলানীর রাজা, তপা ১০৮ বসন্তকাল
যেন রত্ন রাজা, যেন পালে প্রভা, কর্ণের দমন দাতা।

উলানীর কথা, পদ চারি ভিতা, চৌদ্দক বেড়ক পাল,
রাজার সাধন নাহি গায় বস্ত, যদি তবে এক মাস।

ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অতি প্রবল প্রতাপশালী ও
শৈব ধর্মাবলম্বী রাজা ছিলেন।

একদিন বিক্রমকেশবীর রাজত্বকাল পুস্তক-পাঠ হইতেছিল; সেই
উপলক্ষে কবিকল্পন লিখিয়াছেন:—

পাঠকে পুস্তক করে শ্রোতের বহিরা,

শ্রোতের চন্দন বান বস্ত্রের মৌল।

সেই মন চন্দনেতে করয়ে শিবপূজা।

সমস্তক অববর্তনগলে হয় রাজা।

শিবের সম্মিলে বৈদ্য করে শঙ্খসঙ্গি।

অতিশয় সূত্রি তার শিব হয় বধী।—

* * * * * মঙ্গল চন্দনের তলে ভাতারী ইয়া।

পুস্তক-পাঠকের মূখে বিক্রমকেশবী উক্ত বিবরণ শুনিয়া ভাতারীকে
জাতিয়া চন্দন ও শঙ্খ সঙ্গিতে বসিলেন। চন্দন মঙ্গল দেখিয়া বিক্রম-
কেশবী বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বসন্ত হস্তকে নিঃশব্দে বারিষ্যার্থ
পাঠাইলেন। ইহার দ্বারা জানা হওয়া যায় যে, তিনি পক্ষ শৈব ছিলেন
এবং কেবল শিবপূজার অনুব্রহ্ম তত্ত্ব শিবপূজার ক্ষমতা বসন্তের
বাহারকে দিগন্তে পাঠাইলেন। বসন্তকোটে তাহার তুল্য প্রতাপ-
শালী শৈব রাজা আর কেহ ছিল না। যদি কোন শিবসূত্র নির্বাণ
মঙ্গল হয়, তবে সে বিক্রমকেশবীর সময়েই। অতএব ইহাই অনুমান

হয় যে নাট্যের শিখরশ্রী বিক্রমকেশরীর নির্মিত। এবার অল্পদূরে যেখানে যেখানে এই শিখরে উপনীত হইতে হয়; তাহা বিক্রম-কেশরী ও বিশ্বনাথিও একই ব্যক্তি। পূঃ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠাখোঁজে বসেবনের সিংহল, বহুদীপ, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত যাবতীয় ছিল; তাহা কালক্রমে বিবরণে পাওয়া যায় এবং বিক্রমকেশরীর সময়েও বনগতি বৃত্ত ও ভবীর পুরী শ্রীমন্ত সাধারণ সিংহলে লিপিত করিতে গান। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠাখোঁজে ত্রাণাধির যিনিবর্ত (রা) বা। ব্রহ্ম হইতে এবং ক্রম-ক্রমে কল্পি বাহ্যার হইতে; তাহাও যে বিক্রমকেশরীর সময়ে হইত, তাহা কবিকল্পের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা দেখিতে হওয়া যায়।

বহুদীপে নানা বন এনেছি সিংহলে।

যে বিশেষ যে বনগ পাবে তম কুতুংসে

অনন্ত বনলে তুচ্ছ বিবে, নাহিকেল বনলে লক্ষ্য। ইত্যাদি—

চুপলা বাহারে ঘাস, পাহা বন গুণি আর

কামর পড়ান গলে কল্পি।

চতুর সাধু বানী,

আট কাহনেতে খানী

তৈল দেব বরে বন কল্পি।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে পুরো এই অনুবাদ করিতে পারা যায় যে, বিক্রমকেশরী ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠাখোঁজে পূঃ ৭ম পৃষ্ঠাখোঁজে প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা ত্রাণাধির মরণের নভে বাইতে পারিলাম না। যদিও বহু-বার পরে পৈব চিত্রনে বটে, কিন্তু তিনি শিবদ্বার জন্ত বিতা বস্ত্রের বাইতে, ত্রাণাধির নির্মিত মূর্তি থাকিলে নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে কোনও উল্লেখ থাকিত। তাহার সময়ে কেবল পৈববর্ষের উন্নতি আরম্ভ হয়, কিন্তু বিক্রমকেশরীর সময় (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠাখোঁজে পূঃ ৭ম পৃষ্ঠাখোঁজে প্রথম) বাঙ্গালার রাজস্বপক্ষে পৈববর্ষ প্রচলিত হয় ও নানা স্থানে শিবলিঙ্গ, শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মঙ্গলকোটে মরণোত্তী মূর্তি নির্মিত হয়। (বাঙ্গলা পুণ্যবৃত্ত ১০৮ পৃঃ)। এই সময় বিহার বাংলাচনা করিয়া জামা নাট্যের শিখরশ্রী বিক্রমকেশরী বা। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠাখোঁজে মধ্যে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

মঙ্গলকোটে চন্দ্রসেন নামক আর একজন রাজার নাম পাওয়া যায়; কিন্তু অল্প কোনও বিষয় এখনও পাওয়া যায় নাই।

পূঃ ৬৭৭ আছে হর্ষবর্ধনের বৃত্ত হইলে তির্যক্তখানী এবং বেগাল-খানী। যিহা বন প্রভৃতি আক্রমণ করে, এবং প্রভেদ সহস্র জান ও নগর লুণ্ঠন করে। পূঃ নবম পৃষ্ঠাখোঁজে নবদীপখানীতেও উল্লেখ্য এবং বন প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া হর্ষবর্ধনের অর্থাৎ মূর্ধন্যবান, বীজুদ ও বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে খোর অগ্নিচারণ করে। এই সকল কারণে প্রাচীন কীর্তিসূত্র লক্ষ্যপথে পতিত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিচারণ প্রত্যয়ে মঙ্গলকোটে শিখরশ্রী বৃত্তিকা-চাপা পড়িয়াছিল, ইহাই আমাদের অনুমান। বর্ধমান প্রদেশের অনেক স্থলে পুণ্ড্রিশ্বর পট-উদ্যোগের সময় অনেক প্রকার লৌহমুদ্রার গর নির্মিত প্রস্তর মূর্তি পাওয়া যায়। ১০৭১ সালে বর্ধমান জেলার বিদ্যন গ্রামের

পশ্চিমপাড়ার বাগ্ন মাধব পুণ্ড্রিশ্বরে একটি মাহারাম মূর্তি এবং একটি মৃণালমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা উক্ত গ্রামের লিখিতবস্তুর দ্বারাও সত্যিত আছে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বেশ বুঝা যায় যে, বর্ধমান অঞ্চলে খ্রিস্টাব্দ ৭ম শতাব্দীর প্রথম অর্ভাগের ক্রিয়াশীলতা। তাহার কলে প্রাণমূর্তিগুলি নষ্ট হইয়াছে, এবং বর্তক মূর্তিকা-চাপা পড়িয়াছে। অবশিষ্ট বাহা কিছু ছিল, তাহাও মূলমামান আমলে লক্ষ্য প্রাপ্ত হয় এবং হিন্দুদের দ্বারাও প্রস্তর লইয়া মঙ্গলকোটে মঙ্গলি নির্মাণ হয়; তাহার চিত্র মঙ্গলি যিশুদ হয় নাই। (১)

এখন বাহালাতিহি গ্রামে নাট্যের মূর্তি আছে। শিখরশ্রীর সময় প্রকৃত বোলা হয়। তাহাতে বহু লোকের লক্ষ্যপন্ন হয়।

অবেস্তার সম্পদ দেবতা

[শ্রীমন্তকুমার সরকার বি-এ]

এই সপ্ত-বর্ষের সর্ব-প্রথম এক-একটি বিভাগের অবস্থান। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্তের নাম বহুদীপ এবং বোহমান। অব-সংক্রান্ত, ক্রমে-ইং Righteousness, এবং বোহমান-নাঃ-বহুদ-ইং Good Mind বা Good thought। এই দুই বোহমান বহুদীর সহিত বিশেষ ভাবে মিলিত। উক্ত নামই ত্রাণাধির-বাক্য। বোহমান প্রথম পত্রের বাক্যে বোহমান। পারসীক বর্ণে সমাধির বহু পুণ্যকার্যের মধ্যে পরিগণিত। স্তত্রায় প্রথম পত্রের বাক্যে বোহমান মন যে 'বু' হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই কারণেই বোহমান তাহাদের বাক্যে বোহমান হইয়াছেন।

তৃতীয় বোহমান নাম 'কর' বই হোয়া, নাঃ করম্ বর্ধম্, ইং The Sovereignty desired। এই বোহমান বহুদীর সহিত সংক্রান্ত। পারসী-দ্বিগের বিশেষ যে পদিত লৌহের বহুদীর অবশেষে পুণ্ড্রি পবিত্র হইবে। ইহাতে সত্য পাপ দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু বাক্যের দিকট হইয়া ইহাও সত্য হইবে সত্য করম্ করম্ বোহমান হইবে।

চতুর্থ বোহমান অরমাইতি, নাঃ অরমতি, The Earth Goddess. শেষ অর্থাৎ পবিত্র এই বিশেষণটি এই ত্রি বোহমান নামের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। চূপ করিয়া যদিও বর্ণাচরণ এই পবিত্রতা লাভ হয় না, অপরন্তে উপকার সাধন না করিলে ইহা সত্য হইবে না। 'কর' বই হোয়া' ভগবানের নামে, আর 'অরমাইতি' সেই

(১) Many indeed of the old Mahamadan mosque were built up with materials plundered from still more ancient Hindu temples (In, Arch. Sur. 1902—3, page 21)।

অন্য প্রাণী ভগবানের প্রতি মানবের ভক্তি-ভাব—এইরূপ কথাও কেবল-কেবল বলেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেদভাষ্যের নাম সর্বত্র এক সঙ্গেই দেখা যায়। ইহাযের নাম—ইতিবৃত্তাৎ ও অংবোক্তাৎ—সং, বহুতা এবং অমৃততা Health and Immortality; হাবি এবং বৃক্ষাদি এই ক্রী-বেদভাষ্যের নাম। Free of Life এবং Fountain of youth এই হুলাতীন পবিত্রজ্ঞানধর্মের (idea) সহিত ইহাযিসের তুলনা করা গাইতে পারে।

এই সপ্ত বেদভা পবিত্র, কেন না যে নবীন পবিত্র বাগ্ম্যের বিদ্যে মন্তব্যের পটী ভ্রমণ অরুণের হইতেছে, সেই পবিত্রতা বুদ্ধি করণে এই নবীন বেদভা প্রধান লহার। ইহাযের বেদভা নাম হইতে কেহ যেন মনে না করেন, তাহাযের কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধি আছে। বুদ্ধির হাস্যমুগ্ধতার ঘর্ষে নাই। তাঁহার ভগবানকে এমন কি বৃন্দর ও প্রেমধর্ম বলিয়াও ভাবিতে পারা যায় না—ইহা এমনই অমূল্য বৃত্ত ভাবের উপর অবস্থিত। এই বৃত্ত্য একমুখে অমূল্যত্বকে যেমন একরস পতীর চিত্তাঙ্গীলি স্বাধীনিক বর্ণ-প্রবর্তক করিয়াছে; অস্ত্র বিদ্যে তেমনি তাঁহার ঘর্ষকে ভগবানধর্মের বা বাগ্ম্যের ঘর্ষণে পৃথক হইতে বিশেষ বাগ প্রকাশ করিয়াছে।

অথহ মন্তব্যের ভাষা—‘হু’ এবং ‘হু’—এই হ্রস্বের দ্বন্দ্ব লহরহ চণিতাছে। অবস্ত ‘হু’ একমিন ‘হু’এর দ্বারা লক্ষ্যভ্রম পরাধিত

হইবেই। এমন কি এমনও ‘হু’ই অধিকতর অর্থাত্মাঙ্গী। বহুদিন না ‘হু’ লক্ষ্যে উপাধিত হয়—ততদিন ভগ্নত এই দ্বন্দ্ব চণিতে থাকিবে। এই দ্বন্দ্ব মানব সাক্ষী মাত্র নয়—তাহাযেরও পবিত্রতা, ভক্তি, সত্যবিদ্যা এবং কষ্টের পবিত্রত্বের সহিত কার্যবোধাক্ষেপ এই ‘হু’এর ভাষা-লক্ষ্যে ত্রুটি হইতে হইলে। এই ‘হু’এর পানী নাম ভ্রম, (পং-ভ্রমঃ) ইং Lie, Injury। এই পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট নাম “অঃ মইয়া”—The Hostile Spirit, বাংলাকে পুটিনেরা লভনত এবং যৌদ্ধধর্ম মার বহিরা থাকেন। মন্তব্যের মানব ও বহু ভগ্নতের দ্বন্দ্ব এবং সাধাযাকারী, আর অঃ মইয়া তাহাযের পদ্য লক্ষ্য। বাহারা সংশয়ে না চলে, তাহারা সকলেই এই পাশ্চাত্যের অমূল্যের। অবেদ্যের আদর্শ কতকগুলি ভাষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম এই বেদভাযুক্তরূপের মধ্যে দেখিতে পাই।

ভিগ্নতা পেরেহু—The Bridge of the Separator। এই সেতু পার হইয়া ‘গমে সেমানে’, সাং গিমে। বহু, ইং The House of song নামক ভগ্নবিশিষ্ট হানে গাইতে হয়। সং ব্যক্তির পক্ষে এই সেতু ভ্রমণ, ভিত্তি অলভের পক্ষে ইহা ক্রুরের ভ্রম ভিক্রম—সেতু ইহা হইতে অলং ব্যক্তি নীচে পড়িয়া যায়। অমূল্যত্বের ঘর্ষে পতীও নাই, সত্যিও নাই; সে পদ্য একমাত্র তাহাযের চক্ষুই, বাহারা কেবল সত্যপথে মৌনবাণম করিয়াছেন।

অগ্রদানীর ছেলে

[শ্রীকুমারজ্ঞান মল্লিক বি-এ]

হুণ-বাগি ছাড়া, কতাল-সার
লক্ষ্য-লতরা বাড়ী,
বন অলশে বেগা চামিধার,
দেখিলে চিনিতে নারি।
সতত তাহার রক্ত দুইদল,
কেহ নাহি মনে হয়;
দিনে দুইটুকু, রাতে আলো কীণ
বসতির পরিচয়।
শিত ছেলে লয়ে হোতা থাকে এক
রূপ অগ্রদানী,
হৃদয় আপে পতী তাহার
ধরা ভাষিয়াছে জানি।

এমনি পাখাণ, বধন-ভখন
নিম্ন কাছের দ্বার চলে
বিভিন্ন পুরীতে একাকী ফেলিয়া
দশ বছরের ছেলে।
চাঁদপানা দুখ ছেলেটা তাহার
করুণা মমতা মাথা,
যেন সৌধের স্তম্ভের পাথ
কনক কুহুধ অঁকা।
তনয় এমনি দিটার বাগা,
বাবে না বাহিরে আর,
রঙে জীৱন্ত মণি-মরকত
রুবি ভাঙার-দ্বার।

পিতা চলে গেলে একাকী বালক
 বেখে আন-মনে বসি,
 গাছে খলো-খলো কলিয়াছে আম,
 পড়িবারে চায় খসি ।
 দেখে গাছ-তরে' কলিরা রয়েছে
 ক্রাম নাটিকেল-কাঁদি,
 মেঘের সলিল রাখিয়াছে যেন
 অপরের লাসি বাঁধি ।
 অশখের গাছে নব কিসলয়
 অরুণাত কচি পাতা,
 হবে ছায়া দান করিতে পারিবে
 তারি যেন ব্যাকুলতা ।
 মেঘিরা-মেঘিরা তরে' উঠে আঁচা
 ছোট বালকের বুক !
 ভাবে মনে-মনে অজ্ঞাতে যেন
 দানের অতুল গুণ ।
 সন্ধ্যার পিতা ডাকে নাম ধরে
 যেমন চুপারে আলি,
 সোহাগে বালক সব ভুলি দায়,
 সুখেতে ধরে না হাসি ।
 পরদিন গৃহে রাখি তনয়েরে
 পিতা চলে যায় প্রাতে ;
 বৎসর বার হুধে স্মৃতি রাখি
 পুরাণো পান্থির পাতে ।
 বিকালে বালক চেয়ে-চেয়ে বেখে
 উষার আকাশধান,
 বেখে সে কেবল হুহু'র বি
 করে হিরণ্য দান ।
 সন্ধ্যার বেখে ধনী শশধর
 রজতে ডুবায় ধরা,
 বেখে নীরদের দান-সাগরেতে
 কত যে বিনয় ভরা ।
 মেঘিরা-মেঘিরা কি এক বাথার
 তরে' উঠে তার বুক,
 ভাবে মনে-মনে লগ্না চেরে হায়
 সেওয়ার অনেক হুখ ।

বছরিন পর কুপণ জনক
 মরণ আগত 'মন্দি'
 ডাকিয়া তনয়ে শিখরে আপন
 বলিল সোহাগ করি ।
 "সত্যই বাছা! দানে বহু হুখ,
 তাই তব করে আমি,
 দিয়ে গেছ আমি তাহার ভরি
 অতুল রত্নরাশি ;
 এত কুপণতা এত যে কষ্ট
 লকলি ললল লাগে,
 তব চামরুখ হবে না ক জান
 কতু নাটিকা-দাশে" ।
 পিতার বিরোগে বিপুল অর্থ
 আসিল বুঝার করে,
 নিয়জনে তারে পড়েছে প্রকৃতি
 ঘন অশ্রুস্রাব তরে ।
 সে বছর হল আর অতাব
 এ সাতা বালালা জুড়ি',
 আহার অতাবে পথে-পথে মরে
 ছেলে-মেরে বুড়া-বুড়ী ।
 অনাহার-রান তনয়ের হুখ
 চাহিয়া মরিল মাতা,
 বড়-বড় সব জমিদারগৃহে
 ছুঁবেলা পড়ে না পাতা ।
 তখন দয়ালু স্বভাব-চলান
 অগ্রদানীর ছেলে,
 হুঁহাতে তাহার তাণ্ডার বিল
 পরিবের তরে চলে ।
 খুলি' বিল নত অন্নসত্র,
 প্রচুর পাখশালা ;
 আপনি খাইত হুঁহাদের সনে
 এক-সনে পাতি খালা ।
 কষ্টার্জিত পৈত্রিক ধন
 দীন-দীনে দিল বাট,
 চতুর বাহারা, বলিল "এ যেটা
 একেবারে হ'ল দাট !"

তুমিরা কান্না নদীয়ায় রাখা
কুকুরে রাখ,
চাহিলেন ডাকি উপাধি-ভূষণে
তুহিত করিতে তার।
দিনের দুখ নিবেদন করিয়া
বলিল ছুটিয়া পানি,
“পরের দানেতে আমার পালিত
পতিত অগ্রহানী।
আমি! নিশান পরব হারারে
সমাজের দান আগে,
সার্বক গ্রাণ আমি যদি তাহা
পরিবের কাজে লাগে”।

আগুন ধইতে নামিয়া তখন
কোলাহুলি করি রাখা,
বলেন “আমার জীবন দত্ত,
সার্বক তুমি গ্রহা।
চৌদ পুরুষ আগে দান লয়ে:
পতিত যদিই হলে,
ব্রাহ্মণ চেয়ে ব্রাহ্মণ তুমি
আমি এ দানের বলে।
আজ হতে তুমি দানীর অগ্র
নহ কে অগ্রহানী,
কপিলের দাপ বুটাইলে তুমি,
গেহের গঙ্গা আমি”।

আমার চুপার দর্শন

[ত্রিবেঙ্গকুমার বহু]

একদিন কান্না হইতে বেলা ৩টার সময় আমি, আমার এক বন্ধু ত্রিবেঙ্গকুমার বহুকে সঙ্গে নিয়ে একটা গাড়ীতে চুপার দর্শনার্থে হইয়া কান্না ট্রেনভাতিস্থানে বাইতে আসিলাম। ট্রেনটিতে অনেক কক্ষে ট্রেনে পৌঁছিয়া। ট্রেনখানি যখন-তখন টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিয়া। গাড়ীখানি প্যাসেঞ্জার হুতরাং সবার-পক্ষের তাহার আইনগত অধিকার। কিছুক্ষণ পরে তিনি যোগদানবাইতে পৌঁছিলেন। সেখানকার ট্রেনে অপেক্ষা করিলাম; ইতিমধ্যে এক পেয়লা চা পান করিয়া কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। পরে আমাদের আশ্রিত বাসীরা রথ ধুম উল্লীষণ করিতে-করিতে ছাড়িয়া হইলেন। তখন নিম্নে লইয়া ট্রেনে উঠিয়া। কিঞ্চিৎ দলবোধ করিয়া, এক পানি-পাউর সাঁচাবো কুমার পানি ফটক লগ্নে তৃষ্ণা নিবারণিত হইল।

আমাদের বাসীরা নকট ২৪টা ট্রেন অতিক্রম করিয়া আবার নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা আগন্তকার। Over-bridge না থাকতে, লাইন পার হইয়া ট্রেনের পলতাং দিয়া এপারে আসিলাম। ফটক বন্ধ থাকায়, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিবার

পর বন্ধ-বাবু আসিয়া ফটক খুলিবার হুকুম দিলেন। বাহির হইয়া তিন আনা দিয়া একখানি একটা ডাড়া করিলাম। একাওয়ালকে বলিলাম যে, “তোমারা একায়ে বাতি বাডো”। সে বলিল, “হিঁরা বাতি যেনেকো জকরি নেহি।” এই স্থানে মিউনিসিপালিটি বা পুলিশের কোন সন্থ নাই। আমরা ট্রিষ্টাক হইয়া বলিলাম; কারণ পাড় অন্ধকার রজনী, রাত্তা জনহীন, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছ। সেই অন্ধকার ভেদে করিয়া ধারে-বীয়ে একটা-গাড়ী চলিল। কিছুক্ষণ পরে নরেনবাবুর বাসলাতে পৌঁছিয়া। বাসলাটি অতি সুন্দর। সাধুনে একটা কুয়া, তাতে সুন্দর ফটক হল। চাট্রিপাশে শাক-সবজির ক্ষেত।

নরেনবাবু আমাদের অভিযাত্রী করিয়া একটা ঘরে বসিতে দিলেন। আমরা বিছানার সহে চাট্রিয়া দিয়া স্নান করিলাম। পরে আহার করিয়া নিম্না-বেদীর সরপাশে হওয়া গেল।

যদিও প্রায় প্রত্যন্ত হইয়াছে; তখনও অন্ধকার আছে; নীলাকাশে নক্ষত্রগণ হীনজ্যোতিঃ হইতেছিল; গঙ্গাবন্ধ হইতে উষা-সন্ধ্যা বহিতেছিল। আমি ও কুমার

দামা চুই জনে গ্রাণ বুলিমা গনি পাতিতে দাসিলাম; সব গানই আবারে পুণ্যপাপ স্বর্গীর বিচেষ্টলাল রাগের রচিত। একটু পরেই দুখ প্রকাশন করিয়া নিত্য অভ্যাসের চা সেবন পূর্বক বেড়াইতে বহির্গত হইলাম।

বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে রামচন্দ্রের পদ-চিহ্ন দেখিতে গেলাম। চূর্ণারে শুক চওালের বাটী। রামচন্দ্র বখন বনে বান, একরাত্রি শুকের বাটীতে ছিলেন। তাহার পর-চিহ্ন, একখানি পাথরের উপর রহিয়াছে,—গ্রায় দেড় হাত লম্বা,—পদবর্ণাদা নিত্য ক্রম নহে! হাঁ পাথর চিহ্ন, গোড়ালি ও বুড়া আঙ্গুলের চিহ্ন আছে। তাহার পর বরাবর পদত্রে “দুর্গা-কুমা” দেখিতে গেলাম। রাত্তা অসমান বা ধূলিপূর্ণ। রাত্তা অতিক্রম করিয়া আমরা এক পাথরের পদপ্রান্তে আসিয়া পৌছিলাম। ক্রমে উপরে উঠিয়া দুর্গা-কুমারে গেলাম। বেখিলাম সেখানে সিংহবাধিনী মূর্তি। প্রবাদ এই, গোসাই কুল পুহীর উপর স্বপ্নে আদেশ হইয়াছিল, “আমাকে উঠাইয়া লইয়া প্রতিষ্ঠা কর।” তিনি তদনুসারে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্গা-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্বেই তাঁহার সমাধি-স্থান। একটু নিরে কঙ্গা বা দুর্গা-কুণ্ড ২ মল আছে, তবে পাথড় হইতে এখন আর মল আসে না।

সেখান হইতে বাহির হইয়া রামবাগে গেলাম। পাথড়ের নিরে এক সমতল ভূমিতে একটা বাগান; গোলাপ আমলকী ইত্যাদি গাছে পূর্ণ। বাগানের মধ্যে একখানি সাধাশিখে বাঙ্গলা; পার্শ্বেই স্বপ্না, প্রবেশপথে বেতি গাছের এতিনিউ ও পরিচার রাত্রা। সেখান হইতে বরাবর টেননাভিমুখে আসিলাম। পথে আসিতে-আসিতে আমার ক্রক-দাশা গ্রায় ৩০০৭০০ কুল সমত কুল গাছের এক শাখা কাটিয়া লইয়া চলিলেন। টেনন হইতে একখানি একা লইয়া পীরের দরবার গেলাম। কথার পাথরের অতি স্থল কাণ-করা মন্দির। সেখান হইতে মহাবীরের মন্দিরে গেলাম। রাজিতে অমরুট হইবে বলিয়া মন্দিরটি খুব লাক্ষাইয়াছে। পরে “আচার্য-কুপ” দেখিতে গেলাম। প্রবাদ এই, বল্লভ আচার্যের পিতা তাহার দ্রাক্ষে সঙ্গে লইয়া তাঁর বাইবার সময় এইখানে তাঁহার দ্রাক্ষ প্রদব-বেশনা কর, এবং এইখানেই এক সন্তান প্রদব করেন। স্বামী বলেন, “কুনি এখানে থাক, তোমার ছেলে হইয়াছে, আমি বুঝিয়া আসি।” দ্রী তখন

বলেন, “আমিও বাইব।” এই বলিয়া ছেলেকে কুপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর সহিত তাঁর পমন করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ছেলে কুপের মধ্যে থেলা করিতেছে। সেই অবধি লোকেরা কুপ খুব লাক্ষাইয়া রাখিয়াছে। এই কুপের পার্শ্বে বল্লভ আচার্যের পথ আছে। আমরা কুপের দিকে বাইতেছিলাম, একজন বলিল, “উধার মং বাও।” ক্রক-দাশা বলিল, “কঁাধে, হামলোক মলি খাতা, উলকো আছে নেহি আনে বেওগে।” উধারা বলিল, “নেহি, আপলোক আসনান্ কহকে নেহি আরা, উসি আছে।” আমাদের অমৃষ্ট মন্দির, তাই কুপ দেখিতে পাইলাম না।

সেখান হইতে বাহির হইয়া একা করিয়া বরাবর কেজার নিকট গেলাম। কিছু দূরে একা রাখিমা, ফটকের নিকট বাইতেই একজন সিপাহি বলিল, “কঁাধে বাওগে।” আমরা বলিলাম, “মন্দিরবাসু Jailor আছেন, তাঁহার নিকট বাইব।” খুব সন্মানের সহিত সে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল। কিন্তু মন্দিরবাসুর সহিত পরিচয় ত দূরের কথা, ইহ জীবনে তাঁহার চোখাও দেখি নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বাটীতে বাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম ও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অহুরোধ করিলাম, যাগাতে এখনকার সব দেখিতে পাই। তাঁহার সহকারীকে তিনি একখানি চিঠি দিলেন। দেখিলাম কেজা ত্রিকোণাকার। তিন ধারে বেড়াইবার বাঁধান রাত্তা আছে। অদূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী গুহ-তর করিয়া বহিয়া চলিতেছে। গ্রামে ছোট-ছোট বিগনি, বহুদূরে বিদ্যা-পিরি। দেখিতে দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম। আলকাল কেজাটা একটা Reformatory হইয়াছে। কেজা হইতে বাহির হইয়া শুকের বাটী দেখিতে গেলাম। সেখানে একটা গর্ত আছে। তুলিলাম যদি কেহ বলে, আমি তেল দিব, ত তখন ৭৮ মং দিলেও শেষ হয় না, আর কেহ যদি বলে আমি দিতে পারিব না; তাহা হইলে কয়েক ফোটা দিলেই ভরিয়া যায়। আমরা এ আলকালি ব্যাপার পরীক্ষা করিবার সময় পাইলাম না,—তজ্জাতাফি সব দেখিতে হইবে কি না। সেখান হইতে মোকান-পশরা দেখিতে গেলাম। ৩৪ খানা পানের মোকান, ২১টা মন্দির মোকান, ২১ খানা পানারের মোকান, ২৪ খানা

চুপারের বিখ্যাত বাড়ির খেলনার বোতান। আমরা কিছু খরিশ করিলাম। যখন বাগার কিয়লাশ, তখন বেলা প্রায় ১টা। তাড়াতাড়ি জিনিষগুলি রাখিয়া পবিত্র গঙ্গা-জলে অবগাহন করিয়া সমস্ত পাণ দৌত করিয়া নির্মল চিত্তে ফিরিলাম। বাওয়া-বাওয়া শেষ করিয়া আমি জিনিষগুলি জছাইতে লাগিলাম। তাহার পর একাধি আরোহণ করিয়া

টোপনে আসিলাম। তাহার পর আর কি? গাড়ীতে উঠিয়া থানসময়ে কালিধানে পৌছিয়া প্রাতি দূর করিলাম। আমার কয়েক বটায়—বলিতে গেলে এক নিঃশ্বাস—চুপার ধর্শন শেষ হইল এবং পাঠকসমূহকে তাহার একটা সন্নিপাত জানিকামাত্র বিদ্রাই আমি উপসংহার করিলাম। বৃত্তান্ত নাই হউক—অথন বটে ত!

চিনির কথা

[ঐশ্বর্যস্রোতঃ ঘোষ]

ভারতমাতা চিনি বিশেষ হইতে আসবাবী চিনির সহিত এক-বোঝিতা করিতে পারিতেছে না যেহেতু, বৃহৎ-প্রমানে শুদ্ধ ও চিনি প্রস্তুত করিবার বৈদ্যিক প্রণালীর উন্নতি সাধনের স্তর কয়েক বৎসর পূর্বা গৌরী চমিত্তেছিল। বৃহৎ পূর্ণ বৎসর পর্যন্ত বৈদেশিক চিনির আমদানী খর্ব-খর্ব বাড়িয়া বাইতেছিল; তাহাতে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিনি-প্রস্তুত-প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া, চিনি উৎপাদনের পদ্ধতি, কুসাইল, উষা প্রভৃতে বিবেচী চিনির অলপক। যবে সত্তা হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। এই চৌর্য বল পূর্বা প্রকিলাসলয়াল বিলাক ইনট্রিট্ট হইতে একখানি সূত্র পুস্তিকাভায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত পর্যবেষ্টের Sugar Engineer Expert Mr. William Hulme ও Nawabganj Experimental Factoryর Sugar Chemist Mr. R. P. Sanghi উভয়ে বিদ্যা এই পুস্তিকাখানির রচনা করিয়াছেন। সেই পুস্তিকা অবসরন করিয়াই বখানব প্রবর্তিত লস্কিত হইল। ইহার সহিত যে চিমন্তলি প্রবর্ত হইতেছে, তাহাতে ঐ পুস্তিকা হইতে পুঁঠিত হইয়াছে।

বৃহৎ প্রমানে যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এই ইক্ষু-শত হইতে যে শুদ্ধ ও চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার কিয়দংশ স্ত্রাব ও ভারতের অভ্যন্তর মধ্যে প্রেরিত হয়। শুদ্ধ ও চিনির লম্বে পত্রকার হইতে গাধা কিছু অসুস্থতান হইয়াছে, তাহা প্রমানে বৈদ্যিকী প্রমাণে আরত হয়। এই উৎপাদ ১৯১০-১১ অব্দে তথায় একটা সূত্র Experimental Factory স্থাপিত হয়। বৈদ্যিকী ও পিলিত্তের বহুদলে যাব-পত্রের পরগারী farm এই উৎপাদে নির্মাণিত হয়।

এই কৃষিক্ষেত্রে প্রমানে ইক্ষু চাষ সংক্ষেপে পটীক, আরত করা হয়। প্রমানে যে-এর বাড়ী ইক্ষু উৎপাদিত হয়, তাহায়েব রাগারাগিক বিশেষণ করা হয় এবং কাট্টীতে কয়েক সাহায়ে কোন বাড়ী ইক্ষু হইতে কি পরিমাণে শুদ্ধ বা চিনি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা হয়। এই পটীকা হইতে, কোন বাড়ী

ইক্ষু হাদী। চুমি এবং প্রম-বাহুর পক্ষে লম্বা উৎপাদী, তাহা নির্ণয় করাই এই পটীকার উদ্দেশ্য ছিল।

ইক্ষুও কখন চিনির প্রকৃতি, সার, কতু এবং চাষের প্রণালীর উপর দূর বেশী পরিমাণে নির্ভর করে; এই স্তর, কোন বাড়ী ইক্ষু প্রণালীর হাদী প্রবর্তার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা প্রবর্তে বিদিত-প্রম নির্ভরিত করিতে পারা যায় নাই। চিনির কারখানার পক্ষে দুই বাড়ীর ইক্ষু সর্বোৎকৃষ্ট উপযোগী:—সর্বোৎকৃষ্ট বাহা সর্বোৎকৃষ্ট প্রম এবং বাহা সর্বোৎকৃষ্ট প্রম; পটীকার দ্বিতীয় হইয়াছে যে, সারথবা (Sarethia) বাড়ীর ইক্ষু কিছু ক্ষীণ বনন করা হইলে, নববর্তার সারের তৃতীয় প্রমাণে কলে বাড়িয়ার উপযোগী হয়; তবে তখনও তাহায়েব পূর্ণ পরিণতি বটে না। চীন বাড়ীর ইক্ষু প্রমণে দূর ক্ষীণ হয়। এই ক্ষেত্রে যে সকল বাড়ীর ইক্ষু চাষ হইয়াছিল, তথ্যে বোধ হয় F-33 বাড়ীর ইক্ষুই সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এই বাড়ীর আশ কেরারী প্রমণে পাঠে। গট্ট (Dhour, Kagi) কাগলী প্রকৃতি বাড়ীর ইক্ষু প্রমণে পাঠে। উষা (Usha) ও আগল (Agoul) বাড়ীর ইক্ষুও উৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহাতে প্রমণ ও আশ্রয় প্রমাণ দূর বেশী পরিমাণে প্রাকার ইহায়েব সারি কারবার প্রমাণে কট্টন। এ বৎসর এই দুই বাড়ীর ইক্ষু প্রমণে বড় দূরিতে গড়িতে হইয়াছে,—নিরবিত সময় কট্টিতে না কাট্টিতেই ফিল্টারওচি বৃত্তি। বাইতে-ছিল। প্রম প্রমাণে প্রবর্তার বহু বিদ্যাই। গড়িতেও দূর বেশী সময় লাগিয়াছিল।

দুতন যে কলকতা বসাবো হইয়াছে, তাহায়েব কার করিবার কলকতা কতনু, ১৯১০-১১ অব্দে তাহা পটীকা করিবার কলকতা হইয়াছিল। কিন্তু কলকতা কল বৈদ্যিকী আশিরা পড়ার, এবং বসন্ত পরিমাণে ইক্ষুও আমদানী না হওয়ার, একটা বৎসর দাঙ্গা হইয়া যায়। তবে, প্রমণে আশ পাঠবা বাইতেছিল, তখনই কারখানার আশ প্রমাণে হইতেছিল। এইপ্রম ঐ বৎসরে ৩০ দিন কাজ চলে। ইহার মধ্যে কয়েকদিন পূর্ণ ২৪ বটী এবং কয়েক দিন দুই-গারি বটী

বৃত্ত কাল হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ অক্লান্ত কাল করিবার অনেক কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আখন্দা কলগতি যখন ৪৫ বোলায় লইয়া কাল করিয়াছিল, এবং যখন বাক্সের ঘন্টা ও এয়ারট বোলায় লইয়া কাল করিয়াছিল, তখন ইহাদের কালের ত্রুটি ইতর-বিশেষ হইয়াছিল, তাহা বিহ কাল হয়। রস পরিহার করার সম্বন্ধে অনেকগুলি পত্রিকা হইয়াছিল। আধুনিক বহু-বহু তিনি কারখানাগুলিতে অল্প সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রস বিশোধিত হইয়া থাকে; কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির যেরূপদূর যুগ মূল প্রণালীতে কাল করিবার নতুন কাল, তাহা বিদ্যমান কিন্তু অধুনা পরিচিত হইয়াছিল। মোজাহুজি দুই বিদ্যা রস পরিহার করিবার প্রণালীতে বটে; কিন্তু যে প্রক্রিয়া আর পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে নানা ত্রুটি উপস্থিত হয় নাই। এই কারণে রস পরিহার করিবার 'সালফাইটেড' প্রণালী প্রচলিত হয়। সালফাইটেড এন্ডের দ্বারা কেবল এন্ডের বহুভাগই তিনি দখল হইতে পারে। প্রত্যেক পক্ষে কে-কোল এন্ডই রসের বহু-ভাগের বটাইতে পারে। তবে এন্ডের ব্যবহারের অধুনা এই যে, হারিকিয়ার সময় বিশুদ্ধ ক্রিডা ল্যাবরেটরিতে, রস শুদ্ধীকরণের সময় উহা খুব বেশী হয়। আর যদি ক্যালসিয়াম সালফাইটেড উপস্থিত হয়, তবে তাহা রসের সমস্ত রস অবশ্যই দখল, শুদ্ধীকরণের সময় বিতাহী পড়ে। এখানে phenolphthalein ব্যবহারের তিনি ইচ্ছা লাগে হইলেও, এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ক্রিয়ার অবকাশ কম থাকে। আর ক্যালসিয়াম সালফাইটেডের অংশ অল্প ব্যবহার সমস্ত দখল সহ তদার বিতাহীলাগে। কিন্তু এই পেনোজিট এন্ডের পূর্ণ পলিমা দখলভাবে হইতে পারে নাই। সালফাইটেড প্রণালীতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে double sulphitation method ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে তাপাবিকারের এই প্রণালীতে নাই। রস হারিকিয়ার ও রস করিবার অনেক রকম প্রণালী পত্রিকা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, কারখানায় এতই-আমি পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। রক্তকাল Canal Foundryতে পত্রিকা কলকৃত্য বসানো হইতেছে।

১৯০৩-০৪ আর বেরিগী বোলায় ও শিল্পিত বোলায় আখের চাষ ভাল হয় নাই; অতি-বৃষ্টি বহু বহু আখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও বিকৃত ছিল। আখের অভাবে কারখানার কাজও হুতরাং ভাল চলিতে পারে নাই। বেরিগী বোলায় ইন্দুর অবস্থার এই। তবে পত্রিকার পেনোজিট বোলায় আখ বহু হয় না। সেই রকম পেনোজিটের সীমান্ত প্রাচীরের পর্বত, তাহার তিনি কারখানা স্থাপন করা সম্ভব কি না, তাহা বিবেচনা করিতেপ্রায়। পেনোজিটের আখ ভাল বটে, কিন্তু বহুভাগই মারিট বোলায় আখ পেনোজিটের চাইতেও ভাল বহুভাগ বোঝে হয়।

বেরিগীর কারখানার প্রায় তিনি ও শুদ্ধ প্রকৃত করা হইয়াছে। এবং তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ-সম্পন্ন পত্রিকা কল শিল্পিত করা হইয়াছে। কিন্তু বহু পরিমাণে ইন্দুর অভাবে, কারখানার কল-

কলার কাল করিবার পত্রিকা কলগতি, তাহা এখনও বিহ হয় নাই। হুতরাং কারখানার কেহ ইহার সাধনা কলকৃত হইতে পারে, তাহা এখনও অনিশ্চিত।

দেশীয় প্রণালী।

মূল-প্রণেয় উপর ইন্দুর অবিকারিত হোট-হোট দেশীয় আখন্দা কলে বেরিগী, তাহা হইতে বিকাল বিকালিত হয়। দুই কি ত্রিভুজ বোলায়ের বহু বিদ্যা আখের চালাইয়া গিয়া রস বহির্বিদ্যা লগা হয়। এক-একটি বোলায়ের বালি আট ইঞ্চি। এই কলগতি দেশীয় কারিগরের দ্বারা তৈয়ারী, ইহাদের দ্বারা দুই কম। কিন্তু ইহাতে রস অনেকটা নষ্ট হয় বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কারখানার ইহা একেবারে অচল। এই বস্ত্রে বোলায়তিনি আড়া-আড়া ভাবে বাধা, বিকালিত রস নীচে পড়িবার সময় তাহার বহুভাগ শিষ্ট ইন্দুরের দ্বারা পোষিত হইয়া যায়— তাহার আর পুনরুদ্ধার করা হয় না। পত্র দ্বারা এই বস্ত্রে চালিত হইয়া থাকে। এইরূপে উত্তম ইন্দু হইতে লতকরা ৫০ ভাগ রস পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এই ইন্দু হইতেই আরও লতকরা ২০ ভাগ রস পাওয়া হইতে পারে। এই সেক্ষেত্রে বহু কম নয়। কিন্তু কৃষক বিশেষ বিজ্ঞান। অবশ্যই পত্রিকায় সে দ্বারাও ভাল কম কিসেতে পারে না। কয়েই তাহাকে বাধ্য হইয়া সেক্ষেত্রে সত্ব করিবার এই-অল্পসময় কল লইয়া সত্ব থাকিতে হয়। এ পক্ষে দেশীয় তিনি-প্রকৃতকারিও তাহার বহু হইয়া উঠে। আ-পাড়া হইয়া গেলে যে ইন্দুর অবশিষ্ট থাকে, তাহা শুদ্ধীকরণ, রস আখ বিদ্যা শুদ্ধ প্রকৃত করিবার সময়, ইন্দুর রস ব্যবহৃত হয়। ইন্দুর হইতে বিশেষে রস বহির্বিদ্যা করিয়া গিয়া। উহা হইতে তাপ কম হয়, হুতরাং বেশী ইন্দুর লাগে। সেইরকম, ইন্দু হইতে পূর্ণ রস বহির্বিদ্যা করিয়া লগা হয়, ইহা তাহার প্রথম করে না—ইহাতে তাহার বার্ষিকি বটে।

এই ব্যবস্থা, আখদের মনে হয়, পত্রী কলকর্তার প্রতি নিত্য প্রকৃত প্রণালী। ইহার প্রতিবিধান প্রকৃত প্রকৃত কর্তব্য। আখদা পত্রীপ্রণেয় পত্রের রস হইতে শুদ্ধ প্রকৃত করার প্রণালী বেরিগী। আখের রস হইতে শুদ্ধ প্রকৃত করিবার সময়, শিষ্ট ইন্দুর হইতে ইন্দুর বহুভাগ যে সাহায্য পাওয়া যায়, সেখানে শুদ্ধ প্রকৃত করিবার সময় মূল্য হ্রাস কিছুই পাওয়া যায় না। অপর প্রকৃত শুদ্ধ প্রকৃত করিবার ক্ষেত্রে ইন্দুর প্রকৃত বহুভাগ অর্থাৎ বহুভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ প্রকৃত বেশী পড়িয়া যায়। পত্রিকা তাহা করে না। তাহা শুদ্ধ প্রকৃত, শুদ্ধ-ভাগ প্রকৃত পোড়াইয়া তাপ উপস্থাপন করিয়া চালাইয়া যায়। ইন্দু রস আখ বিদ্যা সমস্ত কেব এই প্রণালীতে কাজ হইবে না, তাহা বহুভাগে পারি না। চাষের বহু ভাগিরা সমস্ত শুদ্ধ ইন্দুর পাওয়া যায় বহির্বিদ্যা কি তাহাদের উপর

উপরি-উপরি রাখা হয়। সকলের উপরিই খলিয়ার উপর ঝাঁড়াইয়া 'একজন লোক একটা ঘর হাতে ধরিয়া' খোল খাওয়ার ভরীতে অস্ত-পড়াং দিলের বেহকে সকালন করিতে থাকে। ইহার ফলে মাংস শুষ্ক হয়। খলিয়ার ভিতর কেবল চিনি থাকে। তৎপরে তাহাকে শেলগার সাহায্যে সাঝা কঠিয়া খুঁকিঁতে উপায় পায়ে খলিয়ার ভাঁড়া রাখা হয়।

এই দুইটি বৈদ্য গ্রন্থালীতে ১০০ মণ ইলু হইতে তিন মণ বাহি চিনি পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থালীতে ১০০ মণ ইলু হইতে অন্ততঃ ১০ মণ পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়। আর একটা গ্রন্থালীতে যাহা শুদ্ধ হইবে আরও বাহিৰকা চিনি বাহিৰ করিয়া লওয়া হয়। তাহাতে শতকরা আর একমণ করিয়া চিনি পাওয়া যায়। তাহা হইলেও পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বিবেচনৈ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থালীতে উৎপন্ন চিনির সহিত বৈদ্য গ্রন্থালীতে উৎপন্ন চিনির বৰ্জমান দ্বৰাৰ প্রকোষাদিতা কথিয়ার কথিাে কোন অংশ আছে হই তা। প্রকোষাদিতা সাধা সাচ কথিাে কথিাে হইলে, চাষের অংশ হইতে কাঠায়ায় কথিাে হইবে। বাহাৰ কলন অধিক এবং বাহােতে চিনির তাপ বেধী, এমন উৎকৃষ্ট ঝাঠীর ইলু নির্মাণন করিয়া, উপযুক্ত সাহ-প্রকোষ করিয়া, এক ক্ষেত্রে ঝল পেচন ও তথা হইতে অন্তরিত্ত ঝল নিগাশেরে বন্দোবস্ত করিয়া প্রথমে চাষের উন্নতির বাহায্য কথিাে হইবে। তার পর দ্বিতীয় কথাকক কথাননের হাত হইতে তথা কথিাে হইবে; কো-অপারেটীভ ফ্রেডিট সোসাইটীর সাহায্যে সে বাহােতে উৎপন্ন কলন হইতে বর্জ্যোপেকা অধিক পরিমাণে রপ নিগাশন কথিাে পারে, তাহােয় বাহায্য কথিাে হইবে—বস্ত্র-স্ত্র সংগ্রহ করিয়া থিা। তাহােয় সাহায্য কথিাে হইবে। স্থানী চিনির কারখানা স্থাপন ঝরজনায্যে স্থাপন। তাহােয় কথাকক কথাননের বহে এবং কথানায়ির লগায়ার হইলেও, তাহােয় প্রতুধির অত্যা। অন্তর্ভে চিনি উৎপাদনের হাত নিগাশন কথিাে হইবে।

বুদ্ধদেবের দুই-একজন বন্ধী কৃষক আত্মজাতি কল চালাইবার
কাজ আরম্ভ ইচ্ছিন ব্যাধার করিতেছে। কিন্তু অভাবের প্রথম-লেশম
থিয়েলো করবে, আরম্ভ ইচ্ছিন যে তৈল ব্যবহৃত হয়, গুণার
যায় বরিয়া। তিনি উৎসাহের পদ্ধতি দেখি এই কল পড়িয়ে বা,
(কিছু আর্থ ভাল রকম দেখাই হয় বা বহিরা যে হল সোকসান হা,
কিছু নিয়ম করিলে—বেশী হয় বাহির করিয়া লইতে পারিলে কি
তৈলের বহিরা সোয়াইতে পারে না ?) বেশী আর্থজাতি কল তৈরি
করিয়া বোলায় থাকে, বিশেষ বৈজ্ঞানিক কলে ১৪টি হইতে ২-টি
পড়ায় বোলায় থাকে। তাহাতে হল বিকটই বেশী পাওয়া যায়।
একজন কল ব্যাধাৎ এবং এগুলি চালাইতে লভ্যত: আরম্ভ ইচ্ছিন বা
একজন কোন পড়ির প্রথমে আর্থজাতি। এ বিষয়ে রীতিমত পরীক্ষা
হওয়া উচিত।

বৃহৎ প্রবেশের স্থান এবং আবহাওয়া ইকুর চাষ এবং শুষ্ক ও চিনি উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত প্রযোজ্য। এই কারণে এখানকার

তিনি কোন কালে বে বহুধাণের চিনি। সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিলে, এমন আশা করিতে সাহস হয় না। বহুধাণের অগ্গেতা বৈরিনী যেসার উৎপাদন ইচ্ছা থাকায়ের দূর, পরিণামে কম এবং গুণগত দিককয় চিনির অংশও খুব কম। নিয়মিতভাৱে তালিকা হইতে বাত্যা ও দূর অংশের অবস্থার ভারতকয় কিছু বুঝা হইবে—

অতি একাধারে

বন্যায়ণে উৎসব ইত্য

বেট্রিসী হেলসার

প্রতি একারে চিনির পরিমাণ

दशमी

১১০ অর্থ

যেহিলী জেলা (দেশীয় প্রচার)

910

ସମସ୍ତେ ୧୦୦ ଏକାରେ ଜାତ ହୁଏ ହେତେ ଉତ୍ପାଦ ଗିନି ୦.୦ ଟନ

३-४ टन

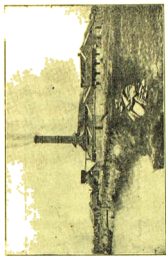
ବେଗିନୀତେ ଓ ୧୨ ଟଙ୍କା

५१ ईश्वर

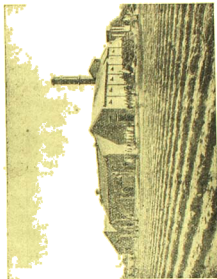
এই বিষয় পার্শ্বক) হইতে সহজেই বুঝা যাইবে, বেরিলী-খাত

তিনি কোন ক্রমে হাজার সহিত প্রতিবেশিতা করিতে পারেন না। তবে বৈজ্ঞানিক প্রাণীতে উক্ত ধরণে চাপ করিয়া যদি একবার-গিল্লু-ইকুর কলসের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়, এবং ইহু-বিস্তার-কোণে যদি তাহাতে বন রস মজাইতে পারা যায় এবং; আবার অংশ কবাইতা চিনির অংশ বাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে কেবল স্থানীয় বাজার বেরিলীয় চিনি বাজার চিনির সহিত প্রতিবেশিতা করিতে পারিলে : কারণ, বাজার চিনি কবিকাতা পর্য্যন্ত মত্তা হইলেও, যেশের দুহু অম্লত্বের চাপান দ্বিতে যেলভাড়া প্রকৃতি বাসনে যায় এক বেশী পড়ে যে, যুক্ত অংশের সহযোগিতা হাজার চিনির অংশেক। কল ঘরে যুক্ত অংশের চিনি বিকাইতে পারে। গ্রাহের উন্নতি করিলে বেরিলী জেলাতেই প্রতি একারে ১০০ বহু ইহু উৎপন্ন করা যায়। সেখানকার সহকারী কৃষিকোষে ইহা পত্রীয়া করিয়া থোকা হইয়াছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিনি তৈয়ার করিলে প্রতি একারে উৎপন্ন ইহু হইতে ৩০ বহু পর্য্যন্ত চিনি পাওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক দেশীয় প্রকার কোথায় ৭৫ বহু, আর, এ প্রকার কোথায় ৩০ বহু। কিন্তু আশাপা পাতাল প্রবেশ। এরূপ অবস্থার চিনির ব্যবহার আর বেশী। সুকুমার বংশদ্বয়ের দ্বায়ে থাকিলে অন্য কতায় আর না—যদি না চিনির সম্ভাব্য বেশী হলেও এই ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করেন।

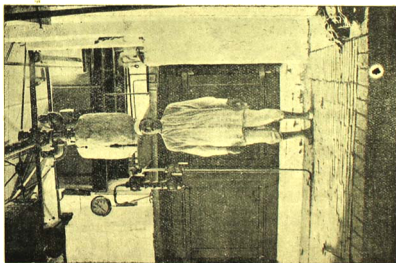
দুঃকালেরের স্বপ্নবিষ্ট চিনি-উপাখ্য-প্রাণীর উন্নতি লাগবে।
 মত বহনম বরিয়া চোঁ কবিত্তেজেন। আহা! অনেক দিন পুণেই
 তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছিলাম। বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক
 এ সম্বন্ধে যাহা কবিত্তেজেন, এই প্রবন্ধের সন্নিহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি
 হইতে তাহা কিছু-কিছু বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, এই কারণবশত
 অতি দুঃকালে, পরীক্ষার স্বরূপ, এবং যখন সৌন্দর্য্য নীতি
 এই বাসনের প্রবৃত্তি উৎসাহিত করায় মত হানিট হইয়াছে
 বৈশিষ্ট্য এই প্রকাশিত প্রকাশিত ১৯১৩-১৪ অব্দে পঠিত



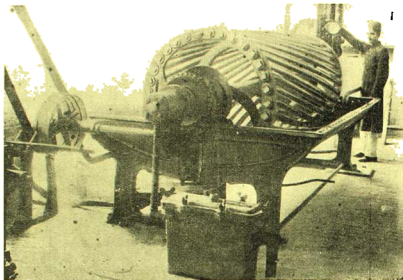
ପେଟିଗୋର ଇନ୍ଦ୍ରାଜିତକଲ୍ୟାଣ କାନ୍ଥ



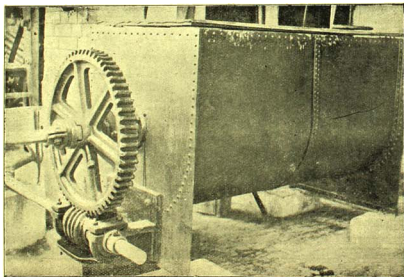
ଇନ୍ଦ୍ରାଜିତକଲ୍ୟାଣ କାନ୍ଥ



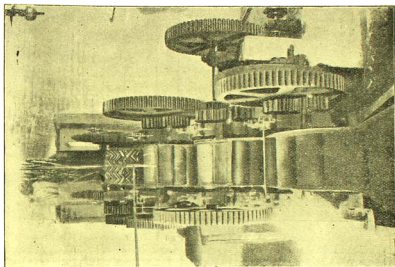
ଆବଦ୍ଧା କଲ୍ୟାଣ



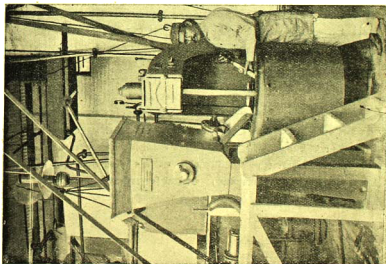
ଫିଲ୍ମ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର (Film Evaporator)



କ୍ରିସ୍ଟାଲାଇଜର ଯନ୍ତ୍ର (Crystallizer)



আবগাড়া কল



A, পদ্ম মিল; B, আইসিং টাট; C, পেরু ইউরান মেলিন

৩রায রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর

আমাদের পূর্ব প্রচলিত শাস্ত্রী-মহাশয় আর ইংরাজিতে আত্মীয় সম্পাদক ছিলেন—প্রাণবন্ত ছিলেন। অবসর নাই। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গ্রন্থের আর কয়েক দিনের পরেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ আর বেশিদিন বিশ্রাম-স্থল ভোগ করিতে পাইলেন না; হইল। বিগত দশীর সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-পাঠ্যের লগ্নজ্ঞানী তাঁহার কর্তৃত্বের সম্মানকে ক্রোড়ে টানিয়া সমাপতি পদে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু



৩রায রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর

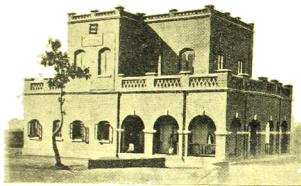
নইলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের অগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়াই যে সকলে তাঁহাকে প্রজ্ঞা ভক্তি করিত, তাঁহা নহে; তাঁহার মহৎ চরিত্রই সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তম্ভী ছিলেন, বাকালী গবর্ণমেন্টের প্রধান অধ্যাপকের কার্য তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কলিকাতার সাহিত্য-সভায় তিনি

তৎপূর্বেই তাঁহার দেহাবগান হয়। তাঁহার সহিত বাংলাভার পরিচয় ছিল, তাঁহারাই বলিষেন, এমন লোক আর হইবে না; এমন নিষ্ঠাবান ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, এমন কর্তব্যপরায়ণ-সাহিত্য-সেবক, এমন মহাশয় লোক অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়গণের এই পতীর শোক আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

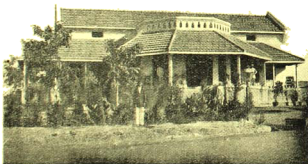
জেমসেদপুর *

[ত্রিগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)



মিসেস পেরিম ঘোষারিঙ্গেল হুস—জেমসেদপুর

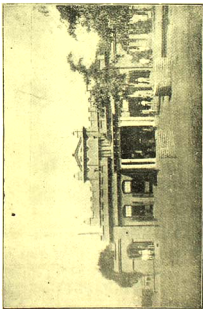


জেনারেল ম্যাকেনজের বাসভা—জেমসেদপুর

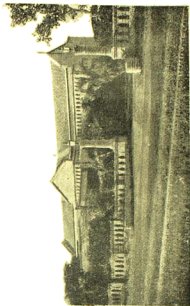
রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেন্সফোর্ড বাগদত্তের ঘোষণার পর 'সাদুটী'-প্রতিষ্ঠাতা ঐযুক্ত জেমসেদপুরী টাটার নামাঙ্কনপারে নগরটির নাম 'জেমসেদপুর' হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্তী স্থান 'কালিমাতী'—প্রতিষ্ঠাতার বংশের নামাঙ্কনপারে 'টাটানগর'

হইয়াছে। তেলওরে টৈলন 'কালিমাতী'কে—'টাটানগর' নামে অতিহিত কবিত্বার উত্তোপ আয়োজন চলিতেছে; এবং অদূর-

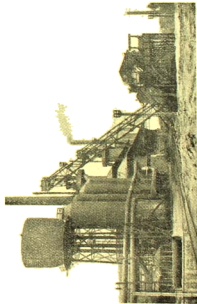
২২ জৈঃ সঃখ্যা 'স্মারতবার্ষিক'; প্রকাশিত 'টাটার কারখানা' নীধক প্রবন্ধের অপর্যাপ্ত।



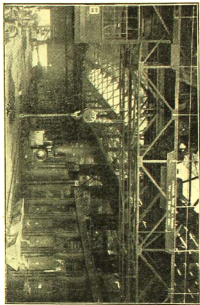
ଡାକ୍ତରୀ ବିଭାଗ - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା



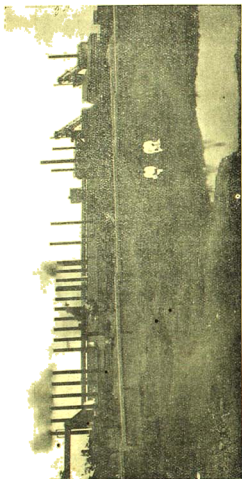
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାତୀବିହାରୀଙ୍କର ଆବାସ - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା



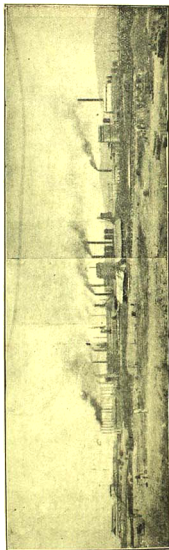
ହାତୀ ବିଭାଗ - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା



ହାତୀ ବିଭାଗ - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା



সিউর হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা, ব্রুজ
(ইংল্যান্ডের লিভারপুলের নিকট)



ব্রুজ হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা, ব্রুজ
(ইংল্যান্ডের লিভারপুলের নিকট)

অবস্থিতে 'সেঙ্গাপুর' নামে আর একটি বৃহৎ রেল-ট্রেন
খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

নূতন যে কারখানা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা বর্তমান
কারখানার বিস্তৃত; এবং অসুখ্যমান চয়, আর তিন বৎসর পরে
প্রথাপি প্রস্তুত; হইবে। ইহা ছাড়া, অপর, কয়েকটি
কোম্পানীর আরও কতকগুলি সম্মিলিত কারখানা (Subsi-

diaries) প্রস্তুত হইতেছে। নূতন কারখানার—বর্তমান
কারখানার প্রস্তুত প্রবাসি বাতীত, ছোট-বড় লোহার পাত
(sheets & plates) ও ঢালাই প্রবাসি (cast iron
articles); এবং সমগ্র কারখানাগুলিতে ক্রোমোটেড লৌহ
(G. C. sheets), লৌহের উপর কলাই করা (Ena-
melling), কল-কল্যা সংক্রান্ত নূন ঢালাই (fine

castings; finishing etc.) ইত্যাদি কাজ হইবে। জমসেদপুরের বর্তমান লোকসংখ্যার বিধর পূর্ক-প্রবন্ধে বলা হইয়াছে; নূতন কারখানা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেতনক শোভের বাসের উপযোগী বন্দোবস্ত চলিতেছে।

(২)

কয়েকটা মাত্র বিভাগ এখানে ভারতবাসিগণের তত্তাবধানে চলিতেছে,—বাঁকী সকলগুলি বিশেষীকরণের হস্তে। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ টাটোরেলার ভারতবাসিগণের কার্যের পক্ষপাতী; ইহা তাঁহার "ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের" দাফা হইতে বেশ ব্যক্তি পায়। আর। কিছুদিন পূর্বে মুরেশী ও আমেরিকানের সংখ্যা এখানে অনেক ছিল;—অতুনা প্রায় আড়াই হাত। বিজ্ঞানবিভাগ ও তত্তাবকার প্রধান এক্সিকিউটিভ অফিসারের নাম (Mr. S. Ghosh A. M. S. T. (Manchester), A. M. I. E. E. etc.—Chief Elec. Engr.) মহাশয়ের বিধর পূর্বে বলা হইয়াছে। বাই-প্রডাক্ট বিভাগ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট অফিসারের অধীনস্থ [Mr. D. C. Gupta, S. B., (Harvard), Supdt, Bye-Product plant], এবং বিক্রয় বিভাগ (Sales Dept.)—অফিসার ডি. এম. মাদান (Mr. D. M. Madan, M. A. L. B.—Sales Manager) মহাশয়ের তত্তাবধানে চলিতেছে। লুব্রিকেশন (Lubrication) বিভাগের তত্তাবধারক অফিসারের নাম (Mr. N. N. Sen. B. Sc. (Purdue) Efficiency Engineer]।

কারখানার বাহিরে, চিকিৎসা বিভাগের ভার সুযোগ্য প্রধান চিকিৎসক ডায়. সাহেব চাক্তার অফিসার অধীনস্থ (Rai Saheb Dr. S. Chakravarti—Chief Medical Officer) মহাশয়ের উপর স্থিত। এই বিভাগে বর্তমানে ১২ জন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন—সকলেই বাঙ্গালী। সমগ্র বিভাগটা এখানকার বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের পরিচালক ও প্রত্যেক সংস্কারী অঙ্গী; এবং প্রধান চিকিৎসক মহাশয়ের সমগ্র দেশীয় সম্প্রদায়ের নেতা বলিতেও অত্যাধিক হয় না। কোম্পানীর—গুরুমহিবাসী, পানপোষ ও রাসায়নিক চিকিৎসা বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন এখানকার চিকিৎসা-বিভাগের অধীন। চিকিৎসাধারে সমস্ত যোগ্য

বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার দুখবান্ ঔষধে চিকিৎসার সর্বদাই পরিপূর্ণ; এবং নানাপ্রকার আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালীর এখানে সুব্যবস্থা আছে। কার্যের অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু আর একটা প্রকৃত চিকিৎসার স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

চিকিৎসা-বিভাগের পর শাখা-বিভাগ ডাঃ অফিসারের অধীনস্থ সুযোগ্য প্রধান মহাশয় (Dr. P. C. Mukerjee, L. M. S.), ও টাউন অফিসার বা মহর-বিভাগের ভার নগরপ্রাধিক অফিসার ডাঃ, এম. পাতাল (Mr. K. S. Pandallai, Town Supdt.) মহাশয়ের উপর স্থিতি। এখানকার বাঁকী-বহ, রাস্তা-বাট, হাট-বাগার, জমি-জমা ইত্যাদি সমস্তই কোম্পানীর, এবং এই অফিস হইতে তাহা-বের বিধি-বন্দোবস্ত হয়।

ইহার পর রস-বিভাগ (Grain Depot.)—অফিসার এ. ভি. ঠাকুর (M. A. V. Thakker, L. C. E.,—Supdt.) মহাশয় এখানকার অধ্যক্ষ। ইনি অফিসারের অধীনস্থ "সারভ্যান্টস অব ইন্ডিয়া" (Servants of India Society) সমিতির একজন প্রধান সভ্য। এই স্থানে একটা উপস্থিত কর্তব্য দেখিয়া, সমিতি হইতে ইনি এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। এই কয়েকটা মাত্র বিভাগ ভারতবাসীদের তত্তাবধানে চলিতেছে। শিশুগণ এক্সিকিউটিভ কলেজের অনেকগুলি ছাত্র এখানে নানা বিভাগে কর্মে নিযুক্ত। বিশেষতঃ নূতন কারখানার (greater extensions) অবিকারে কাজ অনেকাংশে তাঁহাদের তত্তাবধানে চলিতেছে। ইহা বাঙ্গালীদের পক্ষে বিশেষ প্রাধিকার বিধর। আর প্রেসিডেন্সী কলেজের Research Scholar একজন বাঙ্গালী ছাত্র এখানকার prospecting বিভাগে অতীব যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন। ইহার নাম অফিসার বলাইব সেন, এম্-এসসি।

(৩)

দূর হইতে জমসেদপুর দেখিতে অতি সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে অসংখ্য ছোট-বড় নানাপ্রকার বাংলা সামান্য স্থিতি। রাস্তাতে সমস্ত লহরী তাক্তিকালোকে আলোকিত হয়; তখন ট্রেন হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন ইমপার্ভার্ড আলিপুর হইতে কলিকাতার আলিতেছে।

বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হইয়া পাহাড়গুলি নূতন সৌন্দর্য ধারণ করে এবং বসন্তকালে রাত্রিতে বখন পাহাড়ে-পাহাড়ে আশ্রয় লাগে, তখন তাহাদের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ষ্টেশন হইতে সহরটী কিঞ্চিদধিক দূরী মাইল। এতি ট্রেনের সময় পাখী, পাখী, টকা ও কোম্পানীর ঘটরবাস (motor bus) পাওয়া যায়। রেলওয়ে ষ্টেশনে, সহরের ভিতরে কয়েক স্থানে, ও সমগ্র কারখানাতে টেলিফোঁর ব্যবস্থা আছে।

সহরটী প্রধানতঃ চাষি অংশে বিভক্ত। উত্তরাংশে (northern town) সাধারণতঃ সাহেবরা ও ২৪ জন উচ্চপদস্থ অথবা সৌধিন দেশীয় ভূস্বলোক বাস করেন। এধিকের প্রত্যেক গৃহে বৈদ্যাতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা আছে। প্রায় প্রত্যেক বাংলা-মংশর একটী করিয়া মন্দির বাগান আছে। রাত্তা-বাট অতি পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন। এ পল্লীর সমস্তই বেধিবার উপযুক্ত।—বিশেষতঃ নূতন “জাইরেটর বাংলা” ও “টাটা ইন্সটিটিউট”।

দক্ষিণাংশ (বা southern town) দূরী ভাগে বিভক্ত ; প্রধান “জি, টাউন” (G. Town) ও বিট্টীর “এচ্. টাউন” (H. Town)। এ দিকে সাধারণতঃ ভারতবাসিগণ বাস করেন। এ দিকেও “জি-টাউনে”র পার্শ্ব মাইনে অনেক মন্দির-মন্দির বাগান আছে ; রাত্তা-বাট বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পূর্বাংশ বা “এল, টাউন” (Eastern Town বা L. Town) কিছু দিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে। পশ্চিমে থরকারী নদী ও “গ্রামদাস-ভাটা” নামক সহরতলী। “জি” ও “এচ্. টাউনের” পার্শ্ব আর একটী ক্ষুদ্র গম্বী আছে,— তাহাকে “কুলি-টাউন” (Coolie Town) বলা হয়। সাধারণ প্রমজীবন এই স্থানে বাস করে। তির তির গম্বীতে বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রথাযুগ্মীয় গৃহগুলি প্রস্তুত হওয়ার সহরের সঞ্চল অংশেই তাহাদের বেশ সৌগাণ্ড্য বজায় রহিয়াছে।

সমস্ত সহরটীতে কলের মলের ব্যবস্থা আছে। এই মল ব্যবস্থার হইতে বৈদ্যাতিক পান্স সাধারণ কারখানায় আনিতেছে এবং তথায় হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া চাষিদিকে সরবরাহ হইতেছে। পান্সিং ষ্টেশন (Pumping Station) একটী বেধিবার স্থান। জ্বলবৈদ্যার পরপায়ে বিপুলকার্য পত্তীর বৃত্তি “বন্দা” পাহাড়। নদী প্রকাণ্ড

উচ্চ নৌর প্রাচীরে আবদ্ধ। প্রাচীরের এক দিকে অগ্নি-মল ও অল্প দিকে প্রায় শুষ্ক বায়ুসামগ্রী পত্তীর ধান্দ। সেই উচ্চ প্রাচীর ছাপাইয়া যে মল নীচে আনিয়া পড়ে, তাহাই মলী ভাবে বহিরা গিয়া, ঐয় কালে নদীর অতিথি সঙ্গ্রহণ করে। মলপ্রপাতের নদী স্থানে-স্থানে প্রাচীর ছাপাইয়া নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। এক দিকে অগ্নি-মল, আর এক দিকে শুষ্ক বায়ুকার্য ধান্দ—যথো যাবধান কেবল একটী পৌর-প্রাচীর,—বেন জীবনের এদিক-ওদিক—অনুষ্ঠের ঘোর পরিহাস। কারখানার অষ্টগ্রহের মল আবদ্ধক। এই মল তথা হইতে গিয়া, এক স্থানে জহিয়া, একটী প্রকাণ্ড মলীর বৃত্তি করিয়াছে। তাহার নাম “কুলিং ট্যাঙ্ক” (Cooling Tank)। পান্সিং ষ্টেশন কারখানা হইতে প্রায় দূরী মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রত্যেক বাড়ীতে নদর আছে। রাত্তাগুলির নাম-করণ একটু তির প্রকারের, যথা এ, রোড, বি, রোড, ডায়োনাল রোড, হিল্ড-ভিট গোড, ফার্ট এ্যাডেনিউ, লেকড এ্যাডেনিউ, ইত্যাদি। দূরী দিকে সমান দূরে নানা ভাষীর মূল্যবান বৃক্ষরাজি রোপিত হইয়াছে ; এবং প্রত্যেকের গারে কাঠকলকে তাহাদের নিজ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। বড়-বড় রাত্তাগুলিতে বৈদ্যাতিক আলোকের ব্যবস্থা আছে এবং সমস্ত সহরটীতে ঐদ্রব আলোকের ব্যবস্থা হইতেছে।

(৪)

বর্তমানে কোম্পানীর চাষিটী বিভাগর আছে,—বিবা ও বৈন বিভাগর (1. Day, and 2. Night School) ; শিল্প বিভাগর (3. Technical School) (৪) বালিকা-বিভাগর। বৈন বিভাগরে বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ; এবং কয়েক শ্রেণীর প্রমজীবনের মধ্যে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রথমটী উচ্চ ইংরাজী ও চতুর্থটী মধ্য-ইংরাজী বিভাগর। ইহা ছাড়া, আর একটী ইংরাজী বিভাগর ও দূরটী বিনা-ব্যয়ে শিক্ষা বিহার মল প্রাথমিক বিভাগর স্থাপিত হইতেছে ; এবং একটী উচ্চকের টেকনোলজিক্যাল (Technological) বিভাগর স্থিতিবার ব্যবস্থা চলিতেছে।

মেষসেদ্যুর সিংকুম মেলায় অবস্থিত। সিংকুমের

শব্দ—টাইবালা। যেখানে জনসংখ্যা এত অধিক, সামান্য মোকদ্দমা সেখানে অপরিসীম। এতদুপলক্ষে সর্বদা টাইবালার ব্যতীত করা সুবিধাজনক নহে। একত্র এখানে একটি বেঞ্চ কোর্ট (Bench Court) আছে। কোম্পানীর কয়েকজন উত্তমবর্ষ কর্মচারী বিচারকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। কোম্পানীর দুইটা নাহুর বা ইনস্টিটিউট (Institutes) আছে; তন্মধ্যে একটি অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত। কোম্পানীর যে কোন কর্মচারী নিয়মিত দক্ষিণা দিয়া এখানকার সভা হইতে পারেন। এগুলির সহিত একটি করিয়া পুস্তকাগার ও খেলা-ঘা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া, বাঙ্গালীদের নিজস্ব “জেমসেদপুর ড্রামাটিক ক্লাব” (Jamshedpur Dramatic Club) ও সারস্বত-দক্ষিণ নামক একটি রঙ্গালয় ও একটি পুস্তকাগার আছে। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রধান চিকিৎসক মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও বিশেষ উন্নয়ন-যোগ্য। মাত্রাঙ্গীর্ণের “অদ্রা ড্রামাটিক ক্লাব” (Aadhira Dramatic Club) ও মহারাজীন্দ্রশরণের ব্রহ্মাষ্ট্র-সমিতি নামক আর দুইটা দক্ষিণী আছে। (২)

এখানকার দৈনিক বাজার ছাড়া, বৃহস্পতিবার ও রবিবারে হাট হয়। রবিবারের হাট এক বৃহৎ বাগান। নান্দ্র প্রকার ব্রহ্মাঙ্গি, পণ্ড পক্ষী, ছাগ-কেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে আনিয়া থাকে। সে দিন কারখানার অধিকাংশ বিভাগ অপরাহ্নে বন্ধ থাকে। হাটে কোল, পাঁচ-

তাল, হো প্রভৃতি এ দেশের অসংখ্য আদিম অধিবাসীদের সমাগম হয়। খ্রী-পুরুষ সকলেই হাটে আসে। হাটে আসিয়া প্রত্যেকেরই যথা আনন্দ। তাৎকালিক খ্রী-পুরুষ সখ্যবৃত্ত: পুত্র বশিষ্ঠ ও দ্বৈপুষ্টি। তাহাদের ভাবা চুর্ব্বোদা।

বিনিদ্রপত্র এখানে অগ্নি-মূল্য—বোধ হয় কলিকাতার অপেক্ষা ৩ গুণ; আগার অনেক সময় মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না; তাহার কারণ আবহবৃত্তকর্ত ব্রহ্মাঙ্গির আনন্দানী হয় না।

কোম্পানীর অতিথিগণের, বাহসারী বা অজ্ঞাত ভ্রম-লোকদিগের দ্বন্দ্র একটি অতিথিশালা (Guest House) ও তাহার সংলগ্ন অতি সুন্দর একটি হোটেল আছে। এখানকার বাহা হোটেলের উপর ভাল নয়। ইহার সন্নিকট-বর্তী ঘাটশিলা ও ক্রেশ্বরপুর আলকাল প্রাক্তানিভাবে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখানে শীত চুহর ও গ্রীষ্ম প্রচণ্ড। ব্যারোমিটারের উত্তাপে ১২২° (f) পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। একটি বোতলোড়ের মাঠ ও নিম্নস্থিত বোতলোড়ের বন্দোবস্তও এখানে আছে।

জেমসেদপুর সম্বন্ধে কেবল বর্ণনামাত্র সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। “দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন” আরও কিছু দিন পরে রচিত হইলোঁ ভাল হইত। তাঁহার ‘জামশেদপুরের রেল-কারখানা’ দেখিয়া অবাক হইয়া-ছিলেন,—টাটার এই বিশ্ব-বিক্রম কারখানা দেখিলে যে অধিকতর বিস্মিত হইতেন, তাহাও লক্ষ্যে নাই। ফলতঃ, সকল বিষয়েই জেমসেদপুর একটি দেখিবার স্থান। ইহা ভারতের একটি গৌরব-কেন্দ্র এবং ভবিষ্যতে ইহার গৌরব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

(২) “টাটার কারখানা” শীর্ষক গ্রন্থে এখানকার বাহা প্রদেশ-বাসীর সম্বন্ধে বেঙ্গল উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া, অনেকগুলি বেশী, ভূটানী, তিব্বতী এবং কোচীষালীও এখানে কর্মে নিযুক্ত।

ভ্রাতা-ভগিনী

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল]

(১)

বে বরষে শতকরা নব্বইজন বাঙালীর ছেলে আপনাকে
জগৎ দিহ, ওদমান প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রেমিকবিশেষ
সমকক্ষ মনে করে, ঠিক সেই বরষ প্যার হইয়াই আমি
আইডিকে প্রথম দেখি। তখন আমার বয়স ২৩ বৎসর,
তখনও সেব-ডাক্তারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই নাই। আমার
পিসতুতো ভাইয়ের স্ত্রীলক সুড়িগ্রাম হইতে শাখা-টুপির
জন্ত এক শিশি কুইক্‌ রোয়াইট চাহিয়াছিলেন, তাই আমি
হয় সাহেবের বাজারে গিয়াছিলাম। কেক্-চকলেটের
মোকানগুলার নিকট ম্যাক্‌ফারলন্ সাহেব আমার সঙ্গে
হয় রাখিয়া “হালো” বলিয়া সম্বোধন করিল। তাহার
শব্দেব প্রাণ হইতে আমার দৃষ্টি তদার তাহার বাহ-লয়
হৃদয়ীর মুখে সতৃপ্তভাবে সরিবেশিত হইল। আমার
সমস্ত মন কিন্তু আমার দৃষ্টিকে আবৃত্তি ম্যাক্‌ফারলন্‌র
গুচ্ছ-প্রধান মুখের উপর ফুঁলিল। আমার কণ্ঠে তখনকে
বলিতাম, “ওঁকে ম্যাক্‌ফারলন্” সে সেই হৃদয়ীটির দিকে
চাহিয়া বলিল, “সাহায্য আব্রু, আমার কজা দিস্‌ আইডি
বিলিঙ্ক।”

হাসপাতালে মিলিটারী ছাত্র ও নার্সদের সংস্পর্শে
আমিয়া শিখিয়াছিলাম যে, প্রথম পরিচয়ে লোকের সহিত
কর-মর্দন করিতে হয়, এবং “কেমন আছ” জিজ্ঞাসা
করিতে হয়। আমাকে এ বিষয়ে নির্দোষ দেখিয়া ওঁকে
সাহেব প্রীত হইয়া আইডিকে বলিল, “মিঃ সাহায্য আপাকে
বড় বর করেচে, উনি না বর করলে আমি বোধ হয়
এ দ্বারা বাঁচতাম না।”

স্বখ্যাতি-শ্রবণের সনাতন রীতি অল্পাধারে আমি মনে-
মনে বড় কুণ্ডিল লাভ করিতেছিলাম, বিশেষ সেই হৃদয়ীটির
নিকট তাহার পিতৃবল্ল স্বখ্যাতিতে। অথচ বিনয় সহকারে
সাহেবকে বলিলাম, “আঃ, আপনি কি বলছেন? কর্তব্য
কাজ করছি যাক।”

আইডির ক্ষুদ্র বক্তৃতা এত বুদ্ধি ছিল, জানিতাম না।

সে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলিল, “বাবা! এল, সাহায্যকে
নষ্ট (spoil) কর না। মিঃ সাহায্য চক্‌লেট খায়েন।”

এরূপ আশ্চর্যকরতার আমরা তিন জনেই প্রসন্ন হইলাম।
তিন জনেই হাসিলাম। ওঁকে ম্যাক্‌ফারলন্, তাহার
ভাষার বলিতে গেলে, সাহেব মত বস্ত্র পান করে। সুতরাং
তাহার বনট বড় সাদাসিধা সরল। তাহার কজাকে আমার
সহিত অত শীঘ্র বহুত্ব করিতে দেখিয়া সে বড় প্রীত হইল।
আমি বলিলাম, “শস্ত্রবাদ, দিস্‌ ম্যাক্‌ফারলন্”—ওঁকে সাহেব
তদ্বাদিয়া বলিল, “দিস্‌ বিলিঙ্ক।” আমি একটু ধন্তমত
বাধিলাম। মিঃ ম্যাক্‌ফারলন্‌র কজা বিলিঙ্ক! সাদাসিধা
লইলাম। সতাই তো! বিধবা বিবাহের অল্পগ্রহে! বাবু,
আমি ভাড়াভুক্তি বলিলাম, “কমা ক’বেন?” আইডি
বলিল, “মিঃ সাহায্য, আমার ভাইয়ের নাম জান? দিস্‌
বিলিঙ্ক। বেশ মজার, না? অনেকটা চীনা-মানুষের মত।”

আবার তিন জনে হাসিলাম। এমিকে পাঁচ-লাতজন
কেক্-ওলালা “এখানে বাবা” “তাল কেব বাবা” “তাল্লা
চকলেট বাবা” প্রভৃতি মুগ্ধ লালদাহরী ভাষায়
আমাদিসকে সাহেব আহ্বান করিতে লাগিল। আইডির
চক্‌লজ্ঞা নাই, অথবা বিনয় নাই, শক্তা নাই, জড়তা মোটেই
নাই। সে একটা মোকানে প্রবেশ করিয়া বড় টিনের
বাক্স হইতে চকলেট লইয়া চাখিতে লাগিল, আনাকে
চাখাইল, “পিতা” পিতাকে চাখাইল। এইরূপ কার্যে
বতম্বন সে ব্যাপৃত ছিল, ততক্ষণ বক্তিতছিল—বব্-বব্
বব্। “মিঃ সাহায্য, বাবামের চকলেট তাল।” “এ
মোকটার সংগ্রহ যক্ষ নয়?” “সিমলাতে কল্লদিবের
মোকানের মিটার খুব ভাল।” “ওঃ, সিমলায় আমরা খুব
মজা করি।” ইত্যাদি-ইত্যাদি। তাহার হাব-ভাব, কথা-বার্তা
চল-চলন কিছুই মধ্যে আড়ষ্ট ভাব নাই, জড়তা নাই।
নির্ণল জলের উৎসের মত তাহার অনাবিল, নির্ভীক মনের
ভিতর হইতে বহু ভাব উছলিয়া পড়িতেছিল। বাবারের

বাহিরে আসিয়া গাফীতে চড়িবার সময় মাস্কারসন্ বসিল, “বাবু, আমাদের বাড়ীতে একবার এস না। বিশেষ মাস্কারসন্ বড় সুখী হবেন।” মিস্ বিলিও বসিল, “হ্যাঁ এম। আমরা খুব সুখী হব।”

তাহারা গাড়ীতে উঠিল। আমি বাতাসের তলায় ধাঁড়িহা দেখিলাম। তাহার পর ফুইক্ লোমাইটের লজনে গেলাম।

(২)

সে দিন গৃহে আসিয়া ঔষধের গুণ ও মাত্রা বুঝ করিতে-করিতে অনেকবার আইডিক্ মনে পড়িল। আমাদের হাতের আর্শ ও শিকার আর্শে লাঠালাঠি হর, সংস্কার ও শিকার ঠোকাঠুকির জড়ই। আমাদের বংশ-পরিচয়গত-জাতীয় আর্শ যে রমণী-রয়ের ছবি আঁকিয়া দেয়, আমাদের নিভা-পাঠা ইংরাজি নাটক, নভেল, সাহিত্য, উপভাসে সে ছবির স্থান নাই। অথচ সেই নাটক, নভেল, সাহিত্য, উপভাসের প্রভাবটাই সর্বদা আমাদের উপর বিরাজমান, আর সে চিত্রে চাকচিক্যটোও খুব বেশী; বিশেষ, আমি আমার জীবনের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, জীবনের সে অধ্যায়ঃ। মজাগত শৈল্পিক আর্শ বড়ই প্রাণশা করে শক্ত, শিষ্ট, ধীর, স্থির, অলসাবী, ময়াল-মদনার,—আমাদের ইংরাজি শিকার আর্শ রমণী-মুগ্ধি দেখি, চালাক, চতুর, চটপটে, বাবু-প্রাণলতা। স্থিতিশীলতা ও সংস্কার, পাশ্চাত্য আর্শের অহোমনন করে না, কিন্তু সন্ধ্যা বাহুব আমরা, সন্ধ্যাভাত্যাকে উপেক্ষাও করিতে পারি না। তাই মিস্-সদাশের অন্তরালে থাকিবার ও আমরা শক্ত, শিষ্ট, আর্শা লসলসকে একটু দৃষ্ট, একটু চালাক-চতুর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাহিরে সে টুকু জাতিতে থিই না, তর্কের সময় এ আকস্মিকতাকে সাময়িক স্থিতিশীলতার সুখান পরাইতে বরখান হই।

এ সন্ধ্যা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, যেভিকেল-কলমে জড়ি হইয়া। ডাকার ও ছাত্রদের ভিতর ইংরাজ ও ফিরিসি রমণী-বংশ-চলা-কোরা, হাব-ভাবের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন স্রোতঃ তাব বেশ আচ্ছন্নভাবে স্রুতি উঠিত। তাহাদের সন্ধ্যাবতা, তাহাদের আশা-ময়-সুখলতার স্রীত হইত সন্ধ্যাই—কিন্তু আমাদের সন্ধ্যাবতার স্রোত তখন। কতিপয় সময় পোত এক-
আমাদের সন্ধ্যাবতার স্রোত তখন। কতিপয় সময় পোত এক-
আমাদের সন্ধ্যাবতার স্রোত তখন। কতিপয় সময় পোত এক-

বাক্য সন্ধ্যাই তাহাদের সুখপাত করিত। সে দুই-এক-জন সত্যের অহুতোধে মনের ভাবটুকু ধরিয়া একান্তভাবে তাহাদের হাব-ভাবের প্রাণশা করিত, আমরা এককোটে তাহাদের আত্মপ্রাণ করিতাম, তাহাদের চাইফার, ইংরাজের ‘হাম-ধরা’ প্রকৃতি বলিয়া ভিন্নতার করিতাম এবং যেময়ের দুর্নীতির গর আবিষ্কার করিহা তাহাদিগকে বিস্ময় করিতাম।

আমি এতটা কৈফিয়ৎ দিতেছি নিজের জ্বরের দুর্বলতা গোপন করিবার জন্য নয়। সে দিন হৃৎ সারথের বাজারে অসম্মান বিলুপ্তি আইডি বিশিষ্টের সন্ধ্যা চাকলাটুকু আমার নিফট হইতে সুপ্রাতি আদার করে নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তাহার ভিতর যে একটা প্রাণ ছিল, সে প্রাণটা যে নৃতন এবং নবীন, সে প্রাণটুকু আশ-প্রতিষ্ঠার জন্য কলরত করিতেছে, কেবল এই ধারণাটুকুই আমাকে উৎসাহ করিতেছিল। আমরা শায়ী-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান পড়িতাম, বোধ হয় তাই আমরা আশা ছাড়িয়া প্রাণ ও দেহকে ভালবাসিতাম। আমাদের চাক শ্রেষ্ঠ আর্ট নির্ভরময়। সে হিসাবেও মাস্কারসনের ‘সত্য’ যের আইডিভর পড়িতে স্রোত কলা সুখলতার আভাষ মিলে না।

দুই তিন দিন পরে আমার জ্বর ভিত্তি হিঁড়িয়া গেল। ঠিক এক ছোড়া জ্বরের লেশের জন্য সুপিশাল্ মার্কেটে হাইবার শিকাতাকে মন বধন সমীচীন বলিলাম, তখন আমার বিষম-সম্পত্তি পুখারপুখারপে পড়িয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বাস্তবিক তো এতকাল দেখি নাই—হিঃ হিঃ! এমন অস্বাভাবিক বুদ্ধি যে এতাব্যবসায় ক্রমে খুব খুইতেছি। একখানি চিকিৎসা গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, দস্তের উপর মাংসের পরিপাক-শক্তি নির্ভর করে এবং পরিপাক-শক্তিই আসল জীবনী-শক্তি। সত্যই তো, আমরা দাত থাকিতে দাঁতের আদর করি না। তাহা বুদ্ধিবাদী চান দিয়া বাহিরে কেনিয়া দিলাম, পড়িবার-পরিচ্ছন্ন হইয়া একেবারে নিউ মার্কেটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু হৃদয়বাক্যঃ শুকো মাস্কারসনের দাঁতের বুদ্ধি বা বুকের লেশ হিঁড়ি নাই, হৃদয়ী বিশিষ্টেরও চক্লেট-লালুগত স্তম্ভন বলবতী হয় নাই। তাই বাহিরের অলিট-পলিট স্রুতিও

(৪)

গ্রেমের নদী বজ্রক্ষে বহে না—ইংরাজি প্রথম ! ছিঃ, ছিঃ ! কি বলিতেছি ! গ্রেমের নদী অর্থাৎ যে কাছটা করিতে চাহি সেই কাছটার ধারা ! অর্থাৎ যে কাছটা করিবার ক্ষমতা মনটা চকল হয়, “যাব কি যাব না”—সম্মত-নাগর-মোশার মনটা ঘোর-পাক ধায়—সে কাণ করিতে গেলে প্রায়ই বাধা লাগে। আমার কয়েকদিন ধরিয়া ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ভক্ততা ও সৌন্দর্যের খাতিরে ম্যাক-কারলন সাহেবের বাটা বাইতে। কারণ ভক্তসোক অমন আন্তরিকতার সহিত আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহার কত্না মত যোগায়েয ভাবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, আমি তাহাদের বাটা বাইলে সে আমন্বিত হইবে। গ্রীলোকের স্রষ্টা স্রাবিবার বাগনা যখন বলবতী হইল, তখন বীরে-বীরে ওয়েটন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম।

এক বাড়ীতে তিন-চারটি কিরিগি-পরিবার বাস করিত। আমি ম্যাককারলনের অঙ্গে পেলাম। বাহিরে যেহা ব্যাঙ্গার হইলান : কাঠের টুলে বসিয়া দুইটা বালক পিরাণ পান করিতেছিল। খুব সজ্জব তাহার “চোয়াই মাল” লইয়া আনন্স করিতেছিল—নয়মণ, গারে কেট নাই, সাটেট আন্তান শুটান, একজনের পিঠে একটা বগানের টুপি, অপর বালকটি নয় শির। টুপি মাথায বালকটি মাসের দরবত পান করিতেছিল—খালি-মাথা বোতল হাতে শোভ-লোলুপ ভূষিত দৃষ্টিতে জুড়িয়ারের সুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়াই প্রথমে তাহার একটু তস্তিত হইল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া, উভয়ে খুব প্রাণ ভরিয়া হাসিল। শেষে খালি-মাথা ছোট পেণ্টুলের দুই পকেটে দুই হাতে পুরিয়া বুক ফুলাইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল—“কি চাও বাবু !” “কিঃ ম্যাককারলন আছেন !” “বাহিরে পেরেন !” “মিসেল—

বলিতে চাইল না,—মিসেল ম্যাককারলন বাহিরে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া আবৃত-মস্তক শিশু আমার পাশ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। একথানা টুলের উপর বোতলটা গড়িয়া ছিল—অপর টুলের উপর কাচের গ্লাস। মেয়ের দৃষ্টি প্রথমে সেই পদার্থ দুইটার দিকে পেল ; সে কঠোরভাবে বলিল—“বিলু !”

পলায়ন করে। তাহার মাতা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আমাকে দেখিয়া সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—“ভাকার বাবু !”

আমি অভিযান করিলাম। বিশেষ মুক্ত বাহু ধরিয়া বলিলাম—“এটি বিলু !”

“হ্যাঁ ! তরফর চুই। আর এই অর্পনদের ছেলোটায় লোভা নেই, বত সু-বুড়ি। কাল দরবত কিনে এনেছি—”

ধাতে ধাতে শিলিয়া সেম তাহাকে একটা বটুক মাঠিল। আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বলিলাম—“ছেলেয়া অমন ক’রেই থাকে !”

আমি প্রশ্নর ভাবে বিশেষ দিকে চাহিলাম। তাহার চক্ষে কৃতজ্ঞতা ; সে আমার দিকে সন্নিহি আসিল। আশ্চর্য শিতবুড়ি। বোধ হয় সকল জাতির শিতর মন এক প্রকার। আমার ঘেহটুকু তাহার মাতার ভাল লাগিল। সে বলিল—“হাও, খেলগে ! বাবুকে বিরক্ত কর না !”

আমি বিলু বিশিষ্টকে একটু আদর করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, সে ছুটিয়া উইলগনদের কক্ষের দিকে পলাইল। সেম সাহেবের আঙ্গানে আমি সন্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এই গৃহ-সম্মা বিষয়েও আমাদের সঙ্গে কিরিগিদের একটা পার্থক্য আছে। ম্যাককারলন সওগারি আকিসে কর্তব্য করিয়া মায় তিন শত টাকা বেতন পাইত। অবশ্য তাহাকে বিধবা গিসি বা উপাধানে অক্ষম কনিষ্ঠকে প্রতিপালন করিতে হইত না। তবুও তাহাকে সেম ম্যাককারলনের দুই পক্ষের সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করিতে হয়। তাহার উপর আনন্দের অপেক্ষা গোলাব-পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে উৎসাহের ব্যয় অধিক। উপরন্তু ম্যাককারলন সাহেবের মনের খরচ আছে। কিন্তু এ সকল সবেও তাহাদের গৃহের সাধ-সম্মা খুব উচ্চবয়ের—মেয়েতে মোটা কার্পেট বিছান, কিংবাণের কোট চৌকা, মেওহালে চারিখানি বড়-বড় হাতে-আঁকা ছবি, আর অনেকগুলি উজম ফ্রেমে কটোয়িত্তি বাহার করিয়া কটেক পিরানোর উপর সন্মিত। কোণের মার্বেল টেবিলের উপর গ্রোনোকো।

আমার হারণা ছিল, ইতোহাও কিরিগিরা বাবালীদেব চুপা

স্বতঃ। যেমের আত্মিক অভ্যর্থনায় বিশেষ আকর্ষণীয় হইল।। গল্পে গল্পে যেম তাহার ভাবনের সমস্ত ইতিহাস বলিয়া কেলিল। তাহার শিতামহ ঐক। বোল বৎসর পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল বলিঙের সহিত— বলিঙও ইউরোপীয়। প্রথমে গোষ্ঠা ছিল; শেষে পট্টন ছাড়িয়া শিমলা গাথাড়ে ডিউনিসিপাল কমিটিতে কার্য করিত। বলিঙের কস্তা আইডি—বয়স ১২ বৎসর; আর পুত্র বিল, বয়স ১১ বৎসর। বিলের অন্তরে পরেই বলিঙের যুত্ব হয়—ছোট শিমলায় তাহার সমাধি আছে—মরণ প্রার্থের সমাধি; তাহাতে লেখা আছে—“যুত নর, নিমিত্ত।” আইডি শিমলায় কনুতেটে পড়ে, তাহার বেতন লাগে না। বিল পড়ে সামান্টিনিয়ারে—সেও এবার শিমলায় বিশপ কটনে যাইবে। তাহার এ পক্ষেই দুই কস্তা আইরিম ও আইরিশ। দেহ “আই” অক্ষর ভাগবাসে, কারণ তাহার মাতার নাম আইডি ছিল।

এইরূপে যেম গল্প করিয়া গাইতেছিল। আশায় কিন্তু প্রতীক্ষা-চকল মন “আইডি”র পদবধি ধরিবার অস্ত কর্ণকে সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমি হাস্যপাতনে তাহার বাণীকে বহু করিয়াছিলাম বলিয়া সে আমাকে প্রশংসা করিল। আমি পাপ করিয়া বাহির হইলেই এলো ইতিহাস পঠিতে সে আমার পশার করিয়া দিতে প্রস্তুত হইল।

আমি কথার কথার আইডি’র প্রেম উত্থাপন করিলাম।

যেম বলিল—আইডি ঠিক আমার মার মত। আমার মা অমনি ছিলেন, সবাই হাতমতী। তবে ভাতি একরোখা! আৰা! বেচারা আর সাত দিন বাসে খুসে চলে যাবে।

আমি এবার নিজের উপর বিরক্ত হইলাম। এ সংবাদে আমার দুর্লভ ছদ্ম একটু তন্ত্রিত হইল কেন? আমি তো তাহারেই ঐতিহাসিক অধ্যয়ন করিবার অস্ত আশিয়াছিলাম—তুমারী শিমলা গাইবে এ সংবাদে আমার চিত্ত চাকলা! হিং—হিং!

ঠিক সেই সময় অনেকগুলি বাড়িল বগলে করিয়া আইডি আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং তাহার শুভাগমনের সন্তে-সন্তে একটা ভীষণ কোণাল আসিল। বিসময় ব্যাক-করনের দুই পক্ষের চারিটি শিশু একত্র হইল—ছোট ভিনটিও বত হাঙ্গ, চাঁৎকার করে, বত হাততালি দেয়, বত নাচে, বক্টিও কতোখিক হাঙ্গ তত চাঁৎকার করে, তত

হাততালি দেয়, তত নাচে। তাহার কেহই আমাকে লক্ষ্য করে নাই। আইডি তাহার সুগঠিত বাহুলতার মাতাকে আশ্বর্য করিয়া তাহার মুখচুখন করিল। “বলিল—“মা, বুড়া ছেলে বড় শ্রম। বাবা (ডাডী) আমায়ের কত জিনিস দিয়েছে।”

অবশ্য তাহার কথাগুলি ধাব্যে বাঙ্গালীর অদ্বিতীয় হইয়া বহুটা নিরীক্ষণ মনে হইতেছে, ইংরাজি ব্যক্তি-ধারা ও সামাজিক জীবিত—বিশেষ, যেরূপ মধুর ভাবে কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা তাবিলে মনে হইবে যে, কথাগুলো নির্দোষ। আইডি অকস্মাৎ আমাকে লক্ষ্য করিল, তাহার কপোল পত্ৰ বিবক্ষণের বর্ণ ধারণ করিল, ইংরাজি ব্যক্তি-ধারার বলিলে বলিতে হয়,—তাহার আনন্দে কে যেন তিমা কাপড় ছড়াইয়া দিল। আমি তাকাতাড়ি উঠিয়া যেমের নিকট বিদায় চাহিলাম। সেও থাকিতে বলিল না—তাহারের সে পবিত্র পারিবারিক উৎসবের মধ্যে তাহার। বাহিরের লোক চাবে না। যেম কত-মর্দন করিল। আইডি খুব বহু ভাবে আমার হাত ধরিয়া জোরে নাড়িয়া দিল;—আবার আসিতে বলিল। বিল প্যাণ্টের পকেটে হাত তুলিয়া আমার কত-মর্দন করিল। মনে কিন্তু আকাজ্জা রহিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা অভাব, দুঃখই তাব লইয়া তাহারের গৃহ ছাড়িলাম।

(৫)

এ ঘটনার পর এক বৎসর হইয়া গিয়াছে—আমি পাপ করিয়া কলেজটীতে একটা ঔষধালয়ের বন্দি। লোকে কিনা বাসে আমার নিকট ব্যবস্থা লইয়া যায়। আমার বিবাহ হইয়াছে—আইডি’র সঙ্গে নয়। বাঙ্গালীর মেরে অবলা সরলা ঘাঘন বঁধীরা একটা শিশুর সহিত। মনে মনে বুকি বটে, কনক অপসার, অপোগণ্ড অভ-প্রকৃতি, ভবিষ্যতে যে মাধবী-লতা আমার মত সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া আনতে আশ্বস্বর্গণ করিবে, এ সে সত্যিকার চারা মাত্র। তবু সেই বিবাহ-রজনীর সাত-পাকের জোরে তাহার কথা শুনিতে ভাল লাগে, গুণেরবাড়ি নিমন্ত্রণ হইলে, এসেলা মাঝি—থাক সে কথা। এ আধ্যাতিক আইডি’র। সে সকল কথা অস্ত ইতিবৃত্তের বিষয়ীভূত।

আইডি’র সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল বড়দিনের দুটিতে। সকালে ঔষধালয়ের কার্য শেষ করিয়া গৃহে কিরিবার বন্দোবস্ত

করিতেছি, এমন সময় একখানা ভাড়াটিয়া ফিটনে চড়িয়া ম্যাক্সারসনের মেম. আইভি ও বিল আদিরা উপস্থিত হইল। সিংহার সীতের হাওয়ার আইভির অপরোষ্ঠ ও কপোল দুইটি গাছ-পাকা সেবের বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। পূর্ণবোবন ও স্বাস্থ্য তাহার সর্বদে এক অপূর্ণ কমনীয়তার প্রলেপ লেপিতা দিয়াছিল। তাহার পিতার বাশের খেত বর্ণ, তাহার মাতার কোন্ পূর্ণ-পুরুষের রক্ত আধিক্যতা ও কালো চুলের রাশি তাহার সঙ্গে-সঙ্গে বড়ই হৃশোভন হইয়াছিল। এ অল্প দিনের শৈলবাস মিঃ উইলিয়ম বিলিগের পক্ষেও বড় স্বাস্থ্যকর হইয়াছিল—সে প্রায় ঘুম-সাত ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল। আমি সামরে তাহাবিগকে অভ্যর্থনা করিলাম। তাহাদের কাহিনী শুনিলাম—আইরিনের বিবন অর হইয়াছে—বোধ হয় চাইকরেড।

তখনই তাহাদের সহিত ওয়েস্টন স্ট্রীটে গেলাম। আইরিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া এক গোছা ছুল আনিয়া আমার হাতে দিল—সমস্ত শিকটা আইভির। আমি আইরিনের ঐষ, পথাপথা ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যখন গাড়ীতে উঠিতেছি, তখন আইভি দুইটি টাকা লইয়া আমার হাতে দিল। আমি ইতস্ততঃ করিতে ছিলাম। তাহার দত্ত মুদ্রাঘর লইব কি না। সে বলিল, “ভাঃ সারাগল, আমি জানি, তোমার পক্ষে এ দর্শনী যথেষ্ট নয়। তবে পুরান বন্ধুত্বের খাতির।” তাহার পর সে একটু হাসিল, কৃৎসিনীর হাসি। আমি যন্ত্রণাঘের হত টাকা ছুইটি লইলাম। মুক্ত মস্তকের ভিতর দিয়া বলিলাম,—“বন্দবাহ।”

দিনে দুইবার ঘাট, বর করিয়া রোগী দেখি, রোগীর দর্শ আইভির সঙ্গে সন্ন করি। হাতে রোগী ছিল অনেকগুলি; কিন্তু তাহাদের গৃহে ঘাইবার সময় যেমন অগ্রহ হয়, এমন আগ্রহ ধনি-গৃহে রোগী দেখিতে গেলে হয় না। ছয় দিনের দিন দেখিলাম—আইভি বড় বিদূষ। তাহার হাসিমাখা মুখ প্রথম দেখিলাম গভীর। আমি তাহাকে বলিলাম, “মিস্ বিলিঙ, তোমার তবী সারছে। তুমি হুঃখিত কেন?”

সে একটু ইতস্ততঃ করিল। আমি বলিলাম—“মিস্ বিলিঙ, আমি তোমার পরিবারের বন্ধু—সত্য কথা বল, বিদূষ কেন?”

সে আমার চক্রে বোধ হয় সর্বাহুত্বিত দেখিল।

গাছের বেল যখন পাকে, তখন কাকে নাড়া দিলেও তাহা ঝড়িয়া পড়ে। তাহার মনের মধ্যে কথাগুলো শুভ্রাইতে ছিল। তাহার সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিলেও সে বলিয়া ফেলিল,—“ডাক্তার সারাগল, সত্য কথা এই যে, আমার মাতা হুখী নয়। তুমি আমাদের পরিবারের বন্ধু—তাই তোমাকে একথা বলছি। জ্যাডি (পিতা) পণ্ড, সব টাকা মনে নষ্ট করে।”

আমি তাহার বন্ধুত্ব গর্জিত হইতেছিলাম। সে কঠ-বর নামাইয়া বলিল—“তবেছি, মাতাপ হুয়ে সে মাতাকে প্রহার করে। পণ্ড! আশা করি, সে আমার দাম্বে লাক্স করবে।”

শেষ কথা করাট উচ্চারণ করিবার সময় সে খুব দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িল, তাহার ক্র হুজিত করিল, বাম চক্ষু হুজিত করিল, আর তাহার লগাটে দেখিলাম—একটি রেখা। বুধিলাম, বুধী বিভাগবে কেবল হাড়ি ভিসাইয়া, কানামাছি খেলিয়া কাল কাটায় নাই। সে মননীর কথা ভাবিয়াছে—আমাদের সমাজের মাতৃহীন বাসক-বালিকা যেমন বিমাতার চুষ্ট ব্যবহারে শুভ্রায়, সেও তেমন বি-পিতার নিষ্ঠুরতাকে শাসন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

আইরিনের অর সাত দিনেই ছাড়িয়া গেল। কিন্তু এই সাত দিনে চতুর্দশ বার তাহাদের বাড়ী গিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সেই নৃত্যশীলা, ক্রীড়াশীলা, হাতময়ী মুবতীর ভিতর নারী-প্রকৃতি খুব প্রবল ভাবে প্রবহমান। আমি অত ধনবতী নারী কলমে পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটিও দেখি নাই। রোগিগোষায় সে আনন্দ পাইত—খুব ক্ষুধার সহিত ‘বৈ-পিতা’ ভগিনীর দেবা-ভক্তব্য করিত। অপর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আইভির রূপ তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। সে জামিত যে সে রূপশী, এবং রূপশী বলিয়া কতকটা পুষা পাইবার দাবী তাহার আছে। সম্ভার সময় প্রায়ই দুই চারিটা এঙ্গেল-ইণ্ডিয়ান যুবক বর্ণধূপে সর্ট ও কলার পরিয়া চটকবার রঙীন বেকটাই বাঁধিয়া তাহারেরে ড্রিব করবে বলিয়া তাহার মন হরণ করিবার অভ্যাসে বার ছাড়িত। সেওলা আমার চক্ষুঃপূর্ণ। কলিকাতার সেই গর্জিত গুটীর যুবক উচ্চত, অর্ধশিক্ষিত,—বোধ হয়, কাটম ও মেজারার ডিপার্টমেন্টের শিকানবীল। শেষ

দিন সেইরূপ গোষ্ঠাভিনেয় ছোকরা চলিয়া বাইবার পর আমি বিজ্ঞান করিলাম, “এ ভয়ংকর গুলি কে?”

ম্যাক্‌কান্সন বলিয়া ছিল,—“সে বলিল, “উহারা হুজুর পথের ঘাতী।”

সে আইভির দিকে চাহিয়া হুটকী হাসিল। আইভি পাথরের বেগ হইতে এমোকে। নামাইয়া তাহার উপর খেলার বৃত্ত তৈয়ারি করিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—“এখন উহারা প্রেমের পথের পথিক—ইউই প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুজুর-পথের পথিক হবে। হ্যাঃ! কলকাতার ঐ ছোকরা-গুলো আমাদের সমাজের অভিশম্পাত।”

ওঁকো একটু হাসিয়া বলিল,—“আইভি সিমলার একজন বড় সাহেবকে বিবাহ করিবে।”

আইভি একটু স্পর্ধায় সহিত অর্ধ একটু বিক্রমের সহিত বলিল,—“সঁতাই তো! আমার পিতা ছিল ইংরাজ। আমি শিক্ষা পাই। আমি কলকাতার একজন মাতাল, অমিতব্যয়ী এংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিবাহ করবার পূর্বে নেটিক বানশালা বিবাহ করব।” পিতা হাসিয়া বলিল,—“ভিক্টোরিয়া ক্রসের পাত্রের নারিকার মত।”

(৪)

তখন আইভি কলকাতার ছিল না। উইলিয়মও সিমলার। সারদিনব্যাপ্তি বরষার বারিধায়া, বিশেষ সর্কমিক-বাপ্তি কালো মেঘ, আনন্দের বা হুজুর-চিত্তার পরিণয়ী। কাগ-কর্ণের তিক্তও দম্ব ছিল না। চিকিৎসাশাস্ত্রের বসিয়া প্রায় দশজন জরুর রোগী দেখিয়া-ছিলাম। সন্ধ্যার পর আইভি-জননী আসিয়া উপস্থিত হইল—ওষ্ট কাপিতেছে, চক্ষু সজল, অজীত ক্রন্দন সূচনা করিতেছে, বেশভূষা তেমন পারিগাটী নাই। সে বলিল—“জাকার, তোমার কোনও উকীল বন্ধু আছে—পুলিশকোর্টের?”

অবশ্য আছে—মিঃ এ, টি, শীল। আমি বলিলাম, “কেন? পুলিশকোর্ট কেন? মিসেস ম্যাক্‌কান্সন, তোমাকে অস্থির দেখছি যে।”

এইটুকু সেন্সের কথাতেই যে কাঁদিয়া ফেলিল—কহাৎলো চক্ষু হুহিতে-হুহিতে বসিতে লাগিল—“শরতান। পণ্ড।

মাতাল! শূকর!” অবশ্য আমাদের নহ,—তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর উদ্দেশে! সে দত্তপান করিয়া তাহাকে-প্রহার করিয়াছিল। গৃহে একটিও পয়সা নাই—বাক্সারে দেনা,—লাল বাক্সারে পোঙ্গারের নিকট তাহার অলঙ্কার বন্ধক। গিহানো বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ সকল বয়ের কথা সে আমার নিকট প্রকাশ করিতেছে—কারণ, আমি তাহার পরিবারের বন্ধু—আমার নিকট তাহার কৃতজ্ঞ বলিয়া। সে অনেক দিন সহিধাছে, আর পারে না। আইভি ও বিল গুলিলে চালি ম্যাক্‌কান্সনকে খুন করিবে। বিল এখন বালক নহ—প্রায় ১৫১৪ বৎসরের যুগ। সে নিশ্চয় নাশিল করিবে, চার্নিকে জেলে পাঠাইবে, খোয়াকী আমার করিবে। সে—কোম্পানীকে লিখিয়া স্বামীর চাকুরী নষ্ট করিবে, তাহাকে আমুস্‌ হাউসে পাঠাইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম,—মাতাল ম্যাক্‌কান্সন তো আর আসিল ম্যাক্‌কান্সন নহ! বাবশাহের হস্তী-ক্রেতার গরু বলিলাম। আমাদের এক বাবশা হাতী চড়িয়া দ্বিতীয় রামগণ দিয়া বাইতেছিলেন। একটা মাতাল গলি হইতে বাহির হুইয়া বলিল—“এই হাতীওয়ালা! হাতী যেচোগে?” পরদিন পন্ডাট তাহাকে রাসলভার ডাকহায়া বিজ্ঞান করিলেন—“কিহে বাপু, হাতী কিন্বে?” তখন তাহার বোনা ছিল না। সে ভ্রুস্কিত হইয়া কহনোড়ে বলিল—“বাহাশনা যে হাতী কিন্বে চেয়েছিল, সে বরিদ্যার এখন চলে গেছে!”

কিছুকাল পরেই ম্যাক্‌কান্সন আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া বেন আমার বাস-কামরার দ্বিতীয় চলিয়া গিয়াছিল। সে ভাড়াভাড়া বিজ্ঞান করিল—“ডাঃ সার্যাল মিসেস এন্ড এঙ্গেলিনেস?”

আমি তাহাকে বসিতে বলিয়া, পুথ ভণ্ডিতা করিয়া বলিলাম—“একটা কেসেছাত্রী কি ভাল?”

হাতীর বরিদ্যার চলিয়া গিয়াছিল। সে বড় দর্পহন্ত, বড় অহুতপ্ত। সে বলিল—“আমি পণ্ডর মত ব্যবহার করিয়াছি। তুমি আমাদের একজন। এ ব্যাভার তাব করিয়ে হাও! আমি বড় অহুতপ্ত,—আমি আর মদ স্পর্শ করব না।”

সেব কথা করটা বিখাল করিলাম না। সে ব্যাভার পাতি-স্থাপন করিতে সর্ধ হইয়াছিল।

(৭)

ইতোমধ্যে নিম্নের ভীষনের কতকটা পরিবর্তন হইয়াছিল। সাত পাঁকের পাঁচ কথিয়া বসিতেছিল। থাক সে কথা। সে কাহিনী এ আখ্যায়িকার বিষয়ীকৃত নয়। এ আইত্তির গল্প। আখ্যায়িকার গল্পবাহী নয়।

আইত্তি কলিকাতায় আসিয়াছিল। আইত্তির পায়ের একটা ফোড়া হইয়াছিল। অস্ত্র করিয়া আইত্তি গাড়িতে উঠিয়াছিল। বড় স্তম্ভের সাথের সান্ধ্যা, বুকে গোলাপ ফুল শুঁঝিয়া, আইত্তি আমার গাড়ীর নিকট আসিল। কেমন একটু বাননার প্রেরণার বটায় বসিয়া ফেলিল, “আজ আমার আর কাজ নেই,—একটু মাঠে বেড়াব। তুমি একটু টাটকা হাওয়া—”

“চল।” সে উঠিয়া গাড়িতে আসিয়া পার্শ্ব বসিল। তাহার বেশী পোষাকের কোমল স্পর্শ আমার পশমী পোষাকের তিতর দিয়াও বেন অস্থিত হইতেছিল। আইত্তি কি বলি ব্রিক করিতে পারিলেন না। এ বিবরে, ব্রীলোক হইলেও, সে আমি অপেক্ষা সম্পূর্ণাধীন। সে বলিল—“ডাক্তার, তুমি,—আমি দুই ছাড়া কি?”

আমি সাধু করিয়া বলিলাম—“বিবাহের আশায়?”

সে বলিল—“হ্যাঁ! বিবাহের আশায়। ডাঃ মায়ালা, বিবাহ করবার মত লোক তো একটাও দেখি না।”

আমি একটু উৎসাহিত হয়ে বলিলাম—“কেন, টম, ডিক্, হারী—যে বৃকঙলকে তোমার পায়ের-পায়ে ঘুঁতে দেখি!”

সে হাসিয়া একটু কটাক করিয়া বলিল—“হ্যাঁ, পায়ের-পায়ে ঘোঁড়ার-ই উপযুক্ত। ভীষনের ভাগ্যবান হ’বার উপযুক্ত নয়। আচ্ছা ডাক্তার, তোমাদের তো শুনেছি খুব বালাকালে বিবাহ হয়। তুমি বিবাহিত? তোমার একটি পিতৃ পত্নী আছে? হে?”

সে আমার পার্শ্ব খুব সুস্থ একটু কহুইয়ের অঘাত করিল। আমি বলিলাম “না।” আমি মনকে আঁখি ঠাঠিয়া বলিলাম যে “না”; বলিলাম,—শেষ প্রশ্ন—আমার পিতৃ-পত্নী আছে কি? না—সে কথার উত্তরে। আইত্তি কিছু অস্ত্ররূপ গ্রহণ। আমি ব্যঙ্গভাবে বলিলাম—“আইত্তি, তুমি নেটভ বিবাহ করিতে সক্ষম আছ?”

তাঁহার প্রত্যুত্তরমতঃ অসম্মত। সে বলিল—“দেখ ডাক্তার, ইউরোপীয় কিংবা নেটভের মধ্যে আমার উপযুক্ত

আমি পাওয়া বাইতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা উপযুক্ত, তারা এখানে-ইতিমধ্যে বিবাহ করবে না। আর আমাদের সমাজে এমন লোক নাই, যাকে বিয়ে করতে পারি—উঃ! কি ভীষণ পানমোহ!”

আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। গাড়ি ইতেন উঠানে আসিয়া থামিল। তাহার হাত ধরিয়া নামাইলাম। কেহা হইতে একমুগ গোরা আসিয়া ব্যাঙ বাড়াইতেছিল। তখনে খুব লোকের ভিড়। দুগলে-দুগলে অনেক সায়েব-দেহ ঘুরিতেছে। অনেকের আঁখির দিকে চাহিল। প্রায় সকলেই আমাকে কিরিসি মনে করিল। যাক্কা বালালী বলিয়া সম্মেহ করিল, তাহার একটা বিশ্বাসের চক্রে আমাদের উত্তরের ঘরের দিকে চাহিল। সোকাশের ছাড়িয়া আমরা লম্বের ঘরের একখানা। বেকে গিয়া বসিলাম। আমি বলিলাম—“তোমার ও ধারণাটা তুল-তাল-ময় সব সমাজেই আছে। কত দেবচরিত্র ইউরোপীয়ান আছে। তুমি পিতার উপর অতিমান ক’রে এ কথা বলছ।

সে হাসিল বলিল—“থাক সে কথা। আমি একটা চাহুতির চেষ্টা করছি। একটা চাহুতি পেলেই যাকে ঐ পত্তটার হাত থেকে বাঁচাতে পারি। তুমি আর কি উপকার করেছ তুমি। আমরা তোমার নিকট গুণী।”

(৮)

ছয় মাল তাহার ঘরে গোপন হয় নাই—দুতরাং তাহার দের কাছাকাছি দেখি নাই। একদিন অপর এক মুক্তাঙ্গীর রোগীর বাটাতে মিলে ময়াকফারসনের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে আমার গাড়িতে বাটা আসিতে চাহিল। পরে তিনিলাম, ময়াকফারসন পানের মাত্রা বাড়াইয়াছে, আইত্তির সহিত তাহার মিতা কলহ হয়—তাঁহাতে মনের মনে শান্তি নাই। হাজার হক চাচি তো তাহার পিতা। সে এখন মনের উপর একটু-আধটু জুলুম করে, তখন আইত্তি মিথ্যাবিহি মাতার পক্ষ লইয়া গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করে। লক্ষ্য অবস্থায় ময়াক আইত্তিকে বধেই সম্মান করে। আইত্তি গৃহ ছাড়িতে চায়, কোনও কাজ-কর্মের জোগাড় করিতে পারে নাই। শেষে আন্দ নামক একটি বৃককে বোধ হয় বিবাহ করিবে; কারণ, সর্বদা তাহার সহিত বৃক।

বোম্ব! এখনও তাহাকে দেখি নাই, তাহার নামও

তুমি নাই; আমার জাতি নয়, হুটুই নয়, পক্ষ নয়, তবু
তাঁহার বাড়ীটা মটকাইরা দিবার একটা অদম্য বাসনা
আমার প্রাণকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। জেন্স
য়েলের কর্তৃচরিত্র, তিনশত টাকা বেতন পায়, মাত্র পঁচিশ
বৎসর বয়স। “বেশা করে?” মেম জুনিয়া বলিল—
“তুমিও তাই-সে আইন্ডির মন জান। না, বেশা করে না;
বয়ঃ ওয়াই, এম, শিখেতে বেশা করার বিকল্পে বক্তৃতা দেয়।
মার্জিনিকের ছেলে—কেমব্রিজ সিনিয়র পায়।”

পরদিন সন্ধ্যার সময় কান্না ছিল না। আন্তে-আন্তে

• য়াডেন সাহেবের বারোতোপে গেলাম। একটাকার আসনে
বসিবে বলিয়া মুক্তি-চায়র পরিয়া গেলাম। সবে ছিল একটি
বন্ধু যোগীশা। বারোতোপের কটকের কাছেই দেখিলাম
একটি পৌষখণ্ড ইউরেসিয়ানের বাহু-লগ্ন আইভি। আমাকে
দেখিয়া সে ভাড়াতগড়ি করধর্ম করিল। “কি তাহার সখী
জেন্স খুব গর্লিও ও বিরক্ত হইয়া একটু সন্নিহা গেল।
আইভি তাহা লক্ষ্য করিল—আমিও করিলাম। সে
আমাকে অভিবাধন করিয়া জেন্সের নিকে চলিয়া গেল।

আমাদের এ ব্যাপারটি যোগীশা দেখিল। সে আমার
মুখে ম্যাক্‌ক্যারন-পরিবারের কথা শুনিলে উপহাস করিত।
আইভিকে সে আমার ঔষধালায়ে দেখিয়াছিল। তাহাকে
চলিয়া হাইতে দেখিয়া বলিল, “কাকের কৈ কাক বিধিয়ে
গেল, বাস! তোমার আশার গাড়ি উন্মাদ হ’ল। বাবা!
গরীবের কথা যান না। ও শরভানের ঝাড়।”

“আমি বলিলাম,—“কি দরকার? যেতে দাও না ও-
কথা, যোগী-দা!”

সে বলিল,—“যেতে দাও না! কেমন অপমানটা
ক’লে! মুক্তি পরা না ধাক্কা দেবে হয় অতটা অপমান
করত না। হাহু মেখতে আমার বাকী নাই। যে কত
কালে সে গুত পায়।”

- বন্ধু ছোট আদালতের উকীল, বাণ্ডবিক ফিরিদি
দেখিয়াছিল অনেক। আমার কষ্ট হইল আইন্ডির ব্যব-
হারে। তাহাদের সমস্ত পরিবার আমার নিকট উপকৃত।
জেন্স আমাকে অপমান করিল। সে তাহাতে একপ্রকার
যোষদান করিল। আসনে সিঁধা বলিলাম। সে দিন ভিড়
ছিল। আশে-পাশে অত লক্ষ্য করি নাই। চট্টাৎ কানে
আইন্ডির সুর গ্রবেণ করিল। তাহার ষ্টিক আমার

সম্মুখেই বসিয়াছিল। আইভি বলিল,—“সিঁধি, ভাক্‌কার
বাসু নিচ্চ হুংখিত হ’বেন।”

“ও! হুংখিত হ’বেন! আমি ইচ্ছা করি না আমার
ব্রী নেটভদের সঙ্গে বেলা-বেলা করবে।”

“নেটভ! জুদি জান না। তারি শিক্ষিত লোক—
জেন্স বলিল, “থাম—থাম! শিক্ষিত লোক! যেথ
আইভি, হু’ টাকা হাইনে বাড়্যাবার জন্তে বাবুতা আমার বুটের
ফিতে বেঁধে দেয়। আমার ব্রী বেন নেটভদের সঙ্গে—”

আইন্ডির সুখ সিন্দূর বর্ণ হইল। সে ত্র কৃত্ত করিয়া
বলিল,—“এখনও তোমার ব্রী হই নাই। আমি দরককে
গুণা করি।”

সে বলিল,—“আমিও অব্যথা ব্রীকে গুণা করি।”

আইভি মাত্র একটি কথা বলিল,—“বাস্তবিক?”

ছায়াবাণি আরম্ভ হইল। সকলে নিঃশব্দে দেখিয়া বাড়ী
কিরিলাম। যোগী-দাও তেবল মাকে-মারে আমার দিকে
চাহিয়া হাসিতেছিল। সে আইভি, জেন্সকে আসলে
দেখে নাই বা তাহাদের কথা শুনে নাই।

• • (৬)

পরদিন প্রত্যবে ম্যাকের পক্ষ আসিল—“আইন্ডির
শ্রীভিত্তা, অহুগ্রহ করিয়া আসিবেন।” বয়ন তাহাদের গৃহে
গেলাম, তখন বেলা দশটা। সাহেব আকিল গিয়াছিল।
আইন্ডিরের ব্যবস্থা করিলাম। আইভি আমাকে টানিয়া
ডুয়িক্সে বসাইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—
“ভাক্‌কার, আমি বোধ হয় পাগল হ’ব।”

আমি হাসিলাম। ভাবিলাম হাতে পাইরাছি—ছাড়ি
কেন? আমি বলিলাম—“কি, জেন্সের প্রেমে? হিন্স
বিসিও, আমি সুখী হ’লাম,—এতদিন পরে তোমার
বজাতি-বিষেব—”

সে বাধা দিয়া বলিল, “ষ্টিক্‌ সেই কথা বলিবার
জন্তই তোমাকে ডেকেছি। ভাক্‌কার মায়াম, পাগল হ’ব
তিনটে ভাবের চাপে—বজাতি-বিষেব, পিতার উপর গুণা,
আর মার হুংখ।”

তাঁহার মুখে সহজ হাসিটুকু ছিল না। তাহার চক্ষের
সাধারণ হর্ষের স্রোতিঃও রান হইয়াছিল। আমি বলিলাম,
—“পাপলামির কারণ এখন বুঝতে পেরেছ, তখন আর পাগল

হবার ভয় নেই। ম্যাকফারসনকে ভালবাসিতে আরম্ভ কর, মাকে হুঁশিয়ারি মনে কর না, আর আশা করি, বজ্রাতি জেন্সনের প্রেমে কিরিশি-বিষেব কেটে থাকবে।”

সে বলিল,—“শেষ থেকে আরম্ভ করি। আমাদের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও বিলাসী ছই রকম রক্ত আছে। আমার ভিতর বিলাসী রক্ত, বিশিষ্ট, রক্ত বেশী। তাই আমি নীচ নই। মোনু নেশা করে না, তাই তাকে বিবাহ করতে সম্মত হইয়াছিলাম—কিন্তু লোকটা বড় নীচ। ওর গর্ভে অসহনীয়। ওর ভিতর দুশ্চিন্তা রক্তের প্রাবল্য। ও বিবাহের পর আমাকে নিম্নের পরমায় পূর্ববে। পশু! পরতান!”

বিশ্বস্তির্বরা হুবতী এত বিস্ময় প্রকাশ করিতে শিখিল কোথা হইতে? সে যেমন ভাব-প্রবণ, তেমন চিন্তানীল। তাহার প্রেম ও দুঃখ সমান মাত্রের পতীর। পিতা মাতা এবং ভ্রাতার উপর তাহার ভালবাসা অপরিসর। বিশিষ্ট উপর চুপাও তেমন প্রবল। গৃহে কিরিশার পূর্বে ব্রুকলান, জেন্সনের সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ তদ্বিধা গিয়াছে; আর যোগ বৎসরের বালক বিশ সিংলার বাট টাকার চাকুরী পাইয়াছে। ইহাও ইউরেশীয় গ্রন্থ করে যে, ইংরাজ তাহার “দাবী” গ্রাহ করে না।

এই “দাবী” সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিন অবশ্য একটু “টানিয়া” ম্যাক-সায়েব আমার নিকট বলিয়াছিল যে, তাহার অফিসের “ইংরাজ পণ্ডলা” তাহাকে মাহুৎ বলিয়া জান করে না। ইউরেশীয়দের কর্তব্য কংগ্রেসে যোগ দান করা। তাহার বর্ষ পৌর, মাতার দিকে একটু ক্রুদ্ধ ঘোষ ছিগ বটে, কিন্তু তাহার পিতামহ স্বচ ছিল। তবু তাহার তাহার সহিত একত্রে পান-ভোজন করে না, সমাজে বিশেষ না ইত্যাদি। ম্যাক সে কথা, কারণ এ আধ্যাতিক আইভির।

(১০)

সে দিন রবিবার, বর্ষা কাল। শুক্রবার রাত্রি হইতে বর্ষন হইতেছিল। বেলা প্রায় চারটা বাজিয়াছে। মিসেস ম্যাকফারসনের অর হইয়াছিল। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার সম্মান-বয়ের বারান্দার বলিয়া একটি শিশু বৃক তাড়িত-পাখা মেঝেতে করিতেছিল। বায়লার

ম্যাকফারসন কাটা ইবার দ্বন্দ্ব ম্যাকফারসন সাহেব শনিবার রাত্রি হইতে সূত্র-সাধনা করিতেছিল। মিসেস একখানি কৌচে শুইয়া ছিল। আমি আইভির সহিত গল্প করিতেছিলাম। পাঞ্জাবী কারিকরের দিকে চাহিয়া আইভি বলিল,—“লোকটার চেহারা বেশ ভাকার! যেমন ছোট-পুট তেমন লম্বা। এ সব লোক নীচ হ’তে পারে না।”

আমি বলিলাম,—“হাতের ও মুখের রঙ যোগে মলিন হলেও, গায়ের রঙ বেশ পরিষ্কার।”

লোকটা বুঝিয়াছিল যে, আমরা পরচর্চা করিয়া বিদল আনন্দ উপভোগ করিতেছি; এবং “পর” যে কে, তাহাও বেন সে বুঝিয়াছিল। সে মাঝে-মাঝে আমাদের দিকে চাহিতেছিল। আর বিনয়ে ও লজ্জার সম্বন্ধে বোধ করিতেছিল। সিমথার দৃষ্টি আইভির বড় মনোরম, তাহার সিমথার ঐক্য অনেক পাঞ্জাবী আছে। আমরা তাহার সহিত আলাপ করিবার দ্বন্দ্ব বাহিরে গেলাম। বেচারার আরও লজ্জাবনত হইল। আমরা তাহার বৃক, বেচারার প্রভুতির সংবাদ লইয়া তাহার সাধি হইয়াছে কি না এ প্রশ্নের “নেহি নী” উত্তর পাইয়াছি,—অননি মেধ-ম্যাকফারসনকে অতি কাতর কর্তে বলিতে শুনিলাম—“চালি, বিরক্ত কর না, দয়া কর, আমি অসহ্য। আমাকে তো হত্যা করছ, একটু শান্তি পেতে দাও।”

চালির গৌরবের ভিতর হ’তে উত্তর আসিল,—“হুপ, হুহুহী।

ক্রোধে আইভি কাঁপিতেছিল। রক্তদ্রবী হুবতী বলিল,—“মি: ম্যাক, খবরদার, ও-রকম কথা আমার মাকে বল না।”

“তোমার মা! হুহুহী! আমার টাকা কোথা!”

আইভি আরও উচ্চ কর্তে বলিল,—“মি: ম্যাক। পশু।” এ অধিসংযোগে কি বাস্তবের বজ্রা প্রজ্জ্বলিত না হইয়া থাকিতে পারে। সে বলিল,—“তোমার বিশিষ্ট হুহুহের ঘেরেকে বায়ন কর—না হয় চাকুর মাহুৎ।”

আইভি বলিল,—“বিশিষ্ট, বেঁচে থাকলে তোমার ঘোড়ার চাকুর মাহুৎ! কাপুরুষ! মাতাল, পশু, মদ্যমী, লোক (ডাট লো সোয়াইন!)”

মিসেস ম্যাকফারসন উত্তীর্ণ বারান্দার আসিয়া, ক্রুদ্ধ হইতে ক্রুদ্ধ মুখ টিপিয়া ধরিল। ঠিক পশুর মত অঙ্গ-ভঙ্গি

করিয়া সন্ত ম্যাক্কারগন অকথা ইংরাজি ও হিন্দুস্থানীতে তাহাদের গাশি মিটেছিল। আমি কোন কথা কহা মুক্তি-দুস্ত হনন করি নাই। শিখ্ দুবক উঠিয়া গাড়াইয়াছিল—
তাহারও সহায়কৃতি স্রীলোক দুইটির প্রতি।

মেঘ বলিল,—“হায় চানি! ঈশ্বরের বাতির বির হও।”

“হির হ'ব! মথলা কুকুরী! এই নাও!” বেঘের উপর একখানা বড় মাংস-কাটা ছুটি পড়িয়া ছিল। নিযেবের মধ্যে পণ্ড বোতাকে স্রীর বিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। রমণীর ভয়ে আত্মরক্ষা করিয়া উঠিল। আমার কৃপণিত তখন হইল; কিন্তু শিখ্ দুবক অমর সিংহ অবলীলা-ক্রমে সেই ভীষণ ছুরিকা ধরিয়া ফেলিল। স্রী লোক দুইটা বাঁচিয়া গেল; কিন্তু অমর সিংহের হস্ত হইতে রক্তস্রোত বহিতেছিল। আইভি “পুলিস পুলিস” করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার জননী তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল; বলিল—“হিঃ—হিঃ! আইভি! কেশেচরী হ'বে,—বেচার্য্য বিশেষ সমস্ত জীবনটা নষ্ট হইয়া যাবে।”

মেঘিলায়, ফিরিসিগের অকৃত কোঁতুল হৃদয়ের সীকা। কক্ষের বাহিরের পরিব্রাজনা এত গোলমালেও কেহ আসিল না। আইভি ছুটিয়া দিয়া অমর সিংহের হাত টিপিয়া ধরিল। নিম্নের কদম দিয়া তাহার স্তম্ভল ধরিল। আর আমি বাগানী ডাক্তার হস্তল হইয়া গাড়াইয়া রহিলাম। অমর সিংহ হাসিতেছিল, মাঠালটা বিড়-বিড় করিয়া বকিতে-বকিতে শব্দা-গৃহে প্রবেশ করিল। অমর সিংহের স্তম্ভল বাওজ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। আইভির স্রা-বিবেধ ও বলাতি-বিবেধের প্রাণশো করিলাম, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম। তাহার জননীর অবস্থা উপলব্ধি করিলাম! হায়! হায়! এই বিধবা বিবাহ সবাকে চালাইবার ক্ষমতা আমার আমার! বাস্তব! বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আমার মন্তটা বহলাইতে বাধ্য হইলাম। অন্ততঃ সে দিন।

(১১)

অতিরিক্ত ম্যাক্কারগন এবং প্রায় উপর অত চাপ সহিতে না পারিয়া ম্যাক্কারগন বেচারায়, আর হইল, মাথার শির ছিঁড়িল, পরদিন বেলা দশটার সময় সে-ইহলীল সন্ধ্যা করিল। আমার কর্তব্যবীনে সারা রাত্রি আইভি

তাহার সেবা করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল কল নাই। বেলা সাতটার সময় একবার তাহার জ্ঞান হইয়াছিল। সে আইভির নিকে চাহিয়া “কমা” কথাটা বলিয়াছিল। আইভি তখন তাহাতে গলিয়া গিয়াছিল, তাহার শব্দা ধরিয়া তাহার মুখ চুষন করিয়াছিল।

সমাধি হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস তাহাদের গৃহে গেলো। সাধান ঘরে কার্ণেট নাই, কিংবাণ বোড়া কোট নাই, গ্রামোফোন নাই, রেওয়েল চিত্র নাই। ঘরে বিলসির প্রতীপ ছিল, কিন্তু কক্ষের পাড় অন্ধকারের সহিত সুলিতে-ছিল একটি হ্যাটবক্স ল্যাম্প। কালো পোষাক পরিয়া একখানি বেস্তের মোড়ার বিধবা বসিয়া ছিল, একখানা ভয় কদারায় আইভি। তাহার নিঃশব্দে আমার অভিযান করিল। যেমের দেহ পরীক্ষা করিলাম। সে অন্ন-অন্ন কাদিতেছিল। বাহা সম্বন্ধে করিয়াছিলো, আত্ম তাহার স্পষ্ট প্রাণ পাইলাম। অতিরিক্ত মানসিক সংগ্রামে তাহার বস্তু হইয়াছে।

সে বলিল, “ডাক্তার, আমার আর নিরুতি নাই। এত দিন এক রকম সংগ্রাম করছিলাম,—এবার পারিছোয় সঙ্গে বিদ্যন হুদ। বহুত তো গেল, তার সঙ্গে গৃহের সাক্ষ-সাক্ষ। ওঃ! ঈশ্বর!”

চক্ষু কদম দিয়া সে কাদিতে লাগিল। আইভি হির হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার চাকলাও ছিল না, স্বাভাবিক সজীবতাটুকুও লোপ পাইয়াছিল। সে দুই হস্তে মাথা ধরিয়া বসিয়া ছিল।

মনের প্রকৃতি সর্বজ্ঞ মান। সে অতীতেবু নিষ্ঠুরতার ভিতর ভবিষ্যতের কঠোরতার দ্বারা বর্ণন করে, অন্ধ মনের মধ্যে আশা পুষ্টি রাখে।

মেঘ উঠিয়া গাড়াইল। আমার কাঁধে হস্ত রাখিয়া বলিল, “ডাক্তার, আমি বড় হস্তভাগিনী, বড় দুঃখিনী। আমি নিজের জাতির নিকট এত দয়া পাইনি, বত তোমার কাছে পেয়েছি। আশা সিদ্ধা যাব, যাব হয় আর দেখা হবে না।” সে কাদিতেছিল, আমার প্রাণটা গলিয়া গেল। তাহার ক্লম মুখের মধ্যে মাতৃ-মুষ্টি ছুটিয়া উঠিয়াছিল। এখন সে সাগ্রহে আমার বলিল, “বাবা আসবে? ভগবান তোমার ভাল করবেন—” আমি বাধা দিয়া বলিলাম, “মিসেস্ ম্যাক্কারগন—আশা করুন।” সে কান্নার মূহে

বলিল, “এক আশা আছে সাহায্য, আমার স্বামীর কবরে যেহ লগতে। বিলিঙের প্রতীক্ষা বহুদিন ক’রে রয়েছি, চানিকে বিবাহ করেছিলাম, শিশু চ’টার মৃত, ভালবেসে নহ। তাহাকে মই করেছিল মদ। মন্থর অংগুর ধাস।” সে কানিত নাগিল। আমি তাহাকে কোঁচে শুইতে বলিলাম। আইতি ইঙ্গিত করিল। আমি বাহিরে গেলোম। সে বলিল, “ডাক্তার, সত্য কথা বলবে। ম’র অবস্থা—”

আত সে হাতমহী, লীলামহী, শক্তিরীর হাত নাই, লীলা নাই। শক্তি নাই। মুক্তা-বিক্ষিত গৃহটা যেন ভীম অইহাস্ত করিতেছিল। তাহার সত্যই শক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। সে এক হাতে আবার দ্বন্ধে ভর দিয়া, অপর হস্তে আবার ধম্বন হস্ত ধরিয়া বলিল, “ম’র অবস্থা সত্য কি? ডাক্তার, তোমার আমি স্নাতার মত শ্রদ্ধা করি, প্রভাষণ ক’র না।” আমি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম, “আইতি, তোমার মার বন্ধ হ’য়েছে। এ বাক্স বন্ধা নাই। তবে সিমলার বিলের কাছে গেলে, কি হয় বলা যায় না।”

শোক তাহার সর্বশরীরে কাণিতছিল। পাছে বাতা তনিত পায়, তাই ক্রন্দনোৎসব রোধ করিতে গিয়া আরও কাণিতছিল। আমি তাহার দ্বন্ধে হাত দিয়া বলিলাম, “আইতি! আইতি!” সে বলিল, “না আমার! ওঃ! বা আমার। ভগবান! না ম’র মুক্তা দেখিব না। কখনই না। কখনই না।”

আমায় দ্বন্ধে ভর দিয়া সে কাণিতেছিল। কি গভীর আত্মবিক্রান্ত! সে সাদনাইয়া বলিল, “ডাক্তার, তুমি আমার ভাই। তোমার নিকট আমার ঐক্য। যদি দেখা না হয়!” আমি বলিলাম, “জি, আইতি!” সে বলিল, “না, দেখা হবে না।”

আমি কি যেন প্রকৃতির বসে তাহার চলক-অনুলি করটা মুখে তুলিলাম। খুব সেহে তাহার দ্বন্ধে হাত দিলাম। সে প্রকৃতির হইল। আমার গলা ধরিয়া আমার মুখচুম্বন করিল। বলিল, “না ভাই, আর দেখা হবে না।”

(১২)

দেখা হইয়াছিল, নিরতি-চক্রের পোর-পাক—“যেবা: না মানন্তি কৃতো: মহত্বাঃ।” তিন মাস পরে আমার

যোগী, অমিয়ার গোপীবাবু রোগমুক্ত হইয়া বাহু-পরিবর্তন করিতে চাহিলেন। আমি সঙ্গে না গেলে তিনি ঘাইবেন না। আমি বলিলাম, “সিন্দুলা পাগড় অপেক্ষা উত্তম স্থান নাই। শরতের হিমালয় বেগমুক্ত, হাসিমাখা। অবশ্য হাসি পাবাণের মুখে দেখিবার চরমাপা করি নাই, আবিহাছিলাম হাসি দেখিব তাহার মুখে, আমার পাতন ভগিনীর মুখে। আঃ! কি কষ্টই না পাইয়াছে!

প্রথমে হিমালয়ে গিয়া মি: উইলিয়াম বিলিঙের সন্ধান পাইলাম না। নিরতি-চক্রের খেলা আপনই একদিন বিলের সঙ্গে লক্ষ্যে করাইয়া দিল। খুব ভোরের বেলায় পোর্ট আকসি চিঠি কেলিয়া ছোট সিন্দুলার দিকে ঘাইতে-ছিলাম। হিমালয়ের শীতল বায়ু, মুক্ত আকাশ, সরল দেবদারু, কাঁচা ধূনা রজনীর গন্ধ—একটা মুখের লহর প্রাণের মধ্যে খেলিয়া বাইতেছিল। ঐঠাৎ দেখিলাম, কালো শেখাক পরিধান করিয়া বিলু চলিয়াছে, তাহার তরুণ মুখে বিবাদের ছায়া। হাতে এক গোছা লাঠা পোলাপ। আমি বলিলাম “জ্বালো!” বিলু আশ্চর্য হইয়া গেল। বলিল, “ডাক্তার! ওঃ! ঈশ্বর! ডাক্তার আমার মাকে হারিয়েছি। সাত দিন পূর্বে।” আমি বিবর হইলাম, বলিলাম, “তোমার যোনেয়া!” সে বলিল, “তুমি জান না? আইতি তো নিকদেপ!” “নিকদেপ!” “যে দিন তোমার সঙ্গে গুয়ের শেষ দেখা হয়, তার পরদিন থেকে। মার অম্বুখ বাড়ে, তাই জোয়ার ধবর দিতে পারেন নি। আমিও গিগি নাই।”

নিকদেপ! কি মন্ততা! বলিয়াছিল, মাতার মুক্তা দেখিবে না। নিকর কলিকাতার কোথাও কার্য্য করিতেছে। তবে কি সেদিন বলিল সে আমার সঙ্গে চলিয়া ঘাইত? আনিত, আমি অবিবাহিত। বিলু বলিল, “ডাক্তার বাবে? দিয়েই?” চলিলাম,—পাহাড়ের নীচু রাস্তা দিয়া কাঃ ও ওক পাঁচের কবুখ শব্দ শুনিতে-শুনিত চলিলাম। সমাধি ক্ষেত্রের বটকেই দেখিলাম, অমর সিংহ! অমর সিংহ! এখানে! হাঃ নিরতি-চক্র! “হিঁরা?” “ঈ বাবুজি। ডাক্তার সাহেব!”

সে সেলাম করিল। বিলের সহিত চলিলাম। তাহার সহিত কথাবার্তা হইল না। চুই মারি সমাধি; প্রত্যেকটিই প্রাণ বর্ধকের,—কাহারও উপর পরীর সৃষ্টি; শব্দের উপর

বীণার ক্রন্দন। কোণাও ঘুলা নাই, মরলা নাই। অনেক-
ভগিনী সমাধিতে পুলা। ঘুরে বিলু ইঙ্গিত করিল, তারার
জনক-জননীর সমাধি। সে বড় ভক্তিরূপে অগ্রসর
হইতেছিল, অত তত্বি অত প্রভা লইয়া। অতি অন্ন হিন্দু
বিশেষের বন্ধিরে প্রবেশ করে। একি! সমাধির নিকট
নতমাত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছে কে? পাঞ্জাবী রমণী,
কড়ীর নাগরা জুতা, সাধা ভ্রান্দের চুড়ীয়ার পারমাণা,
সাধা সার্জের পাঞ্জাবী পিহিহান, ধোত্রোখা সাধা শালে
অবগুপ্তিত। বিশ্বের বিলু পেই সূত্রির দিকে চাহিতেছিল।
চারিদিকে পাথর বেন বড়-বড় টেঙলা জমাট বাঁধিয়া
নিখুঁতে সে সূত্র বেধিতেছিল। বেন কবরে কোনও স্বেদ-
বাসা আশীস লইয়া আসিয়াছিল। ধানমরা যেত-বদনা
লগনা। বিলু বলিল,—“এ কি?”

আমরা ভাড়াই নিকটস্থ হইলাম, রমণীর ধ্যান তাহে
না। ‘বিলু নীচু হইয়া তারার সূত্রের দিবে চাহিল—উভয়ে
এক সঙ্গে বিশ্বের বলিয়া উঠিল—“বিলু! আইতি!”

আইতি উঠিয়া গাড়িল। ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পরের
সূত্রের দিকে চাহিল। ভগিনী তারাকে বহিতে সেল।
ভ্রাতা সরিয়া সেল, বলিল,—“এ কি! সমাধিক্ষেত্রে এই
সম্মে। ক্যান্সি পোষাকে!”

আইতি বলিল,—“তাবহ, চাপালি—বলে দিয়াছিলাম,
সেই পোষাকে সমাধি অগ্নিবজ্র করতে এসেছি!”

বুড় হয়ে ভ্রাতা বলিল—“নিচর!”

সে বলিল,—“না বিলু! তাই আমার, আমার ও
শোকের পোষাক সাধা!”

বিলু বলিল,—“হু? থেরেহ?”

সে বলিল,—“ও! জান না! বলছি শুন! ঐ ঘরের

জন্তেই ব্রহ্মতিকে ঘুগা করি! ঐ ঘরের জন্তেই এক দিন
যাতা হত্যা হ’জিলেন। আমার স্বামী বাণেন,”

“তোমার স্বামী! অমর দিগ!”

সে এককণ আমাকে লক্ষ্য করে নাই। আমার কঠ-
বর ভগিনী সে আমায় দিকে চাহিল। যেমীর ভাষায়
সেলাম করিয়া বলিল,—“ভক্তার, হুগ্ৰভাত! ইয়া অমর
আমার স্বামী। বলেছিলাম, মাতার মৃত্যু যেখন না,
কিরিষিরের সঙ্গে মিশব না। তাই! শুধু তাই না,
তা’র বীরবে আমি গ্রেস-উন্মাদিনী হয়েছিলাম। বিবাহের
পর হুগ্ৰভাত হইনি! আঃ! কি ব্রত করে! কি বেহ
করে! কত উভ তাবে! কত সাহন! কত মদুচর।
হুগ্ৰভাত বিলু, হুগ্ৰভাত ভক্তার!”

সে জনক-জননীর সমাধিতে প্রণাম করিয়া ফটকের
দিকে চলিল। আমরা ব্রহ্মসুত্রে মত তারার দিকে চাহিয়া
রহিলাম। হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বিলু বলিল,—“ফেয়াও!”
আমি ডাকিলাম,—“আইতি!”

আইতি করিল। সম্মে ফেরা অসম্ভব। আচ্ছা
দিল্পাতেই সূত্রিক হইয়া থাকুক, তবু মাঝে-মাঝে বেণা
হবে। বিলের ঐক্সবে সে সম্মত হইল না। বলিল,
“বিলু, স্বামীর পরেই ভোকে-জালবাশি। আমি এখানে
থাকলে তোর উন্নতি হবে না। যদি জানা জানি হব!
বিলু, আমি বেণানেই থাকি, তুই আমার প্রাণের ভেতর
থাকবি তাই!”

ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে
উভয়ের মুখচুষন করিল। তারার পর উভয়ে নতমাত্র হইয়া
বুটান-ব্রীতি-অহগারে প্রার্থনা করিল। আমি পড়িলাম,
সমাধির উপর লেখা—‘মৃত নহে নিখিত।’

প্রার্থনা

[ত্রিগিরিকাকুমার বন্দু]

কোয়ো কোরে নীচগামী বরষাধ ধরা সব—
করিয়া ঈতল, ফলে শতে তরিতে বহুধা;
চাছিনা উঠিতে উর্ধ্বে সূর পতকের মত
হইতে নিঃশেষ, মিটাইয়া বিহগের কুখা;

আমারে করিও ত্রান নিদাঘের হারা সব
আর্দ্র পথিকেরে, মিষ্ট স্পর্শ করিবারে দান,
করিওনা সম্মুখ শিশির-বিন্দুর প্রায়—
বধে যদি তাহা, নদিনীর কোমল পূরণ।

সত্ৰাট্ আক্‌বরের জন্মস্থল

আলোচনা

[ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিস্তৃত সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' বহুবীর শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় আক্‌বরের জন্মস্থল অমরকোট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আশ্চর্য্য হই চারিটা কথা নিবেদন করিবার আছে।

অমরকোট দুর্গমধ্যে, কি দুর্গের বাহিরে অনতিদূরে, আক্‌বরের জন্ম হইয়াছিল, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আক্‌বরের জন্মস্থল বর্তমান অমরকোট-দুর্গের প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া আদিগণ লোকেরা নির্দেশ করিয়া থাকে। স্থানীয় জনপ্রবাহে প্রকাশ, আক্‌বর দুর্গের বহির্ভাগে প্রায় এক মাইল দূরে এক মাঠে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গমধ্যে তাঁহার জন্ম না হইবার কারণ স্বল্প বয়সে যার যে, অমরকোট দুর্গাধিপ প্রলাদ হিন্দু ছিলেন; তাঁহার পক্ষে কোন মুসলমান মহিলাকে স্বীয় স্ত্রীপুত্র হান দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। হুমায়ূনের বাস-অস্থির হোহরও তাঁহার স্মৃতি-কথার একস্থলে লিখিয়াছেন,—‘হুমায়ূন অমরকোটে এক নির্দিষ্ট অস্থান করিতেন।’ (p. 63) উহা হইতেও দুর্গের বাহিরে হুমায়ূনের অবস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

Vincent Smith তাঁহার ‘Akbar’ (p. 14 n) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বর্তমানে যে স্থলে ‘আক্‌বর স্মৃতিচিহ্ন’ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা আক্‌বরের প্রকৃত জন্মস্থল নহে; অধিকন্তু ইহাতে আক্‌বরের সিংহাসনারোহণের তারিখ ভ্রম-প্রচলিত জন্মতারিখরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

আক্‌বর যে অমরকোট দুর্গের বাহিরে জন্মগ্রহণ করেন নাই,—দুর্গমধ্যেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এ কথা একপ্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে।

‘আক্‌বর-নামা’ রচয়িতা আবুল-ফজল আক্‌বরের জন্মস্থল প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—‘The place was the auspicious city and fortunate fort Amarkot’

(A. N. i 55). অতঃপরে,—“They proceeded towards the ‘bounty-encompassed fort’ (Hisar-i-faizinhisan) of Amarkot,” (A. N. i, 375). শুশ্রূষনও এ বিষয়ে একমত; তিনি স্বীয় গ্রন্থ ‘হুমায়ূন-নামা’ লিখিয়াছেন,—‘The Rana gave the Emperor an honourable reception, and took him into the fort and assigned him excellent quarters.’ (H. N. p. 157) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অমরকোট দুর্গমধ্যেই আক্‌বরের জন্ম হইয়াছিল।

স্থানীয় জনপ্রবাহ মতে, বেহেতু দুর্গাধিপতি প্রলাদ হিন্দু, তাঁহার পক্ষে কোন মুসলমানীকে স্বীয় স্ত্রীপুত্র হান দেওয়া অসম্ভব, কথটা কতদূর সত্য বলা যায় না। Tarkhan Nama গ্রন্থে (Elliot, i, 318) প্রকাশ, অমরকোটের অসীয়ার (ইনি এই গ্রন্থে ‘সীয়ার শাল’ নামে অভিহিত) অমরকোট দুর্গ হইতে স্বীয় লোকজন হানান্তরিত করিয়া, উহা হুমায়ূনকে ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। Beg Lar Nama (Elliot, i, 290) গ্রন্থানুসারে আসীয়ার শাহ কাশির নামে জনৈক মুসলমান, শাহ্‌ হুসেনের শালিন-কালে কিছুপ্রসঙ্গে আসিয়া, অমরকোট-রাণীর এক আসীয়ারকে বিবাহ করেন। হুতরাং রাণা যে একজন গোড়া রাজপুত ছিলেন না, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে; কাজেই তাঁহার পক্ষে হুমায়ূন-পত্নী হামীমাকে দুর্গদেয়ায় স্ত্রীপুত্র হান দেওয়া বিচিত্র নহে।

তাহা হইলে, বর্তমান অমরকোট দুর্গেই কি আক্‌বরের জন্ম হইয়াছিল? আমাদের মনে হয়, বর্তমান আক্‌বর-স্মৃতিচিহ্নল আক্‌বরের প্রকৃত জন্মস্থল হওয়াও বিচিত্র নহে। শ্রীযুক্ত ভি-এন্-মন্ডলিক (V. N. Mandlik), ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ, Bombay Branch of the Asiatic Societyতে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই

একদিন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মণ্ডলিক্ মহোদয়ের গ্রন্থে (Writings and Speeches, Bombay, 1896, p. 199) হান পাইয়াছে; ইহাতে প্রকাশ, পুরাতন অধরকোট দুর্গের ধ্বংস-সাধন করা হয়, এবং ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দুই যুগ্মক কাল-ঘোরা কর্তৃক একটা নতুন দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। (See also Calcutta Review, January, 1900).

এই কারণে মনে হয়, আকবরের অসম্মল আটান অধরকোট-দুর্গ হয় ত পূর্বে বর্তমান আকবর-স্মৃতিচিহ্ন-রূপেই নির্মিত হইয়াছিল। যিনি এক সময়ে সদাগর্য্য ধরমীর অধীশ্বর ছিলেন, সেই যোগল-কুলচন্দ্র আকবর শাহ'র অসম্মল লইয়াও মতভেদ!

জীবন-সমস্যা

[৩ —]

অগণিত কেন এ জগৎ সৃষ্টি করলে? যদি করলে, ত এত পাপপরাশিতে-পূর্ণ করলে কেন? ঘণ্টের গুত্র পখিল জ্যোতিঃ পৃথিবী উদ্ভাসিত করে না কেন?—কেবল অজাগর, ব্যক্তিগর। কেন মানবকে সুখ-দুঃখের জাগী করলে? কেন তাদের দুঃখের পুষ্টিসঙ্গমর পঙ্কিল জগৎপরে পড়িয়ে মারলে না? আবার কেন বা তাঁদের সুখের মনন-কাননে বসতি করলে দিলে না? কেন হৃকোমল পারিজাতের নিভা নুতন বিধ পখিল গন্ধ তাদের মন প্রাণ আনন্দ-রসে প্রাণিত করলে না? তা'রা ত তোমারই সৃষ্ট ধীব; তা'দের কি কোন পৃথক লক্ষ্য আছে? কেন বাঁশ, কোথ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসর্বা প্রকৃতি ত্রিপুরের স্বজন করলে? বাহুবলকে কষ্ট বিবার লজ্জা কি?—না না তা কি হ'তে পারে? উহার তুমি, মদ্যং প্রাণ তোমার, তুমি করুণা-নিধান। তুমি অচিন্ত্য, তুমি অবিনশ্বর; তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে! জানি তোমার মহিমা উপলব্ধি করা আমাদের দত নরকীটের পক্ষে অসম্ভব; জানি তোমার অক্ষুদ্রারতা, উচ্চপ্রাণতা অস্বত্ব করা আমাদের পক্ষে বাদনের চালে হাত; তথাপি বহুি, তথাপি প্রাণের কথা ধ্যানাছি।

কেন সংসার দয়ার সৃষ্টি করলে? কেন শিশুর চাপলা, ব্রীলোকের কটাক? কেন বাহুবলের দস্ত এ ধরাতলে প্রেরণ করলে? জগতের সবাইকে কেন তাই বলে ডাকতে নিধালে না? কেন আদার নিম্নের তাইএর সঙ্গে স্বগড়া ক'রে নিম্নের পায়ে হুড়ুল মারিছি? বসতে পার, যে

লোক মহা-দারের দারখানে পড়েছে, পথ হারিয়েছে, সেও কেন সুস্থির আশা করে? বসতে পার, জীবনে যার সব সুখে কালী পড়েছে, যার আপনার বলতে কেউ নাই, সে কেন ক'রে জীবন-তরঙ্গীর কর্ণ ধরে বাবে? বসতে পার, কেন ক'রে সে তোমাকে পাবে? সংসার-মোহের নিবিড় সৃষ্টিভেদ অন্ধকারের মধ্যে ভক্তির উজ্জল আলোক প্রকাশ করবে? তোমাকে সেবতে পাবে? বসতে পার, কেন ক'রে পৃথিবীর সব আশা ত্যাগ করে শুধু, তোমার আশা কীণ হলেও, আজন্মকাল চলতে থাকবে? বসতে পার, কেন ক'রে সংসারের এই পগমানির মধ্যে আপনাকে শুধু রাখতে পারবে?

সং পথ বড়ই বিয়-বহল। যতিল্পে মানব কেন সে পথে বাবে? সে চায় শুধু সুখ! ইন্ড্রিয়-পরিভূতি তার জীবনের মুখা উদ্ভেজ; কিন্তু সে জানে না যে, একত্ব সুখ কি, পার্থিব সুখ কত দিনের, কতইকু সময় দায়ী। অপারিবি সুখের যে শেষ নাই, সে যে লকল সুখের উপরে; সে সুখ অস্বত্ব করিবার শক্তি বহু জানের? ভগবৎ প্রেমে কি সুখ, কেহ তাহা বুঝে না কেন? তা হ'লে তা'দের লকল জাগা হাইত; পাণাতি-প্রীড়িত, জন্তু-বিধ্বস্ত, কাম-ক্লেধাশি-পীড়িত সংসারে, স্বপ্নকেষর তরে সুখ আসিত। এমন দিন কবে আসিবে?—যদি ঘরিত্রের অস্বপ্নায়া, পিতৃহীনতার আর্ন্তনাদ, বার্থ প্রণয়ের হতাশাস, মুখা-পীড়িতের আর্ন্তনাদ, পুত্রহীনতার দাহাকার এ জগতে না থাকিত, তবে ইহা কত সুখের হইত। হায়, যদি

স্বাভাবিক প্রণয়, চোঁটকারের বাক্য, সত্যের অঙ্গলাপ, প্রতিহিংসার জ্বালা, অর্ধের উদ্ভাষিতা সংসারে না থাকিত, তবে ইহা স্বর্ণোপম হইত। কিন্তু তা' হয় না কেন ?

মানব কি ভগবানের খেলার সামগ্রী? যদি হয় তাহালাই, তাঁর করুণাস্রোতের স্রবণ হইবে। তাঁর করুণা স্বর্ণের মন্থাকিনীর মত, মর্তের গম্বীর মত শতবারার উজ্জ্বলিত হ'য়ে মানবের উপর পড়ে; বিতরণে কার্পণ্য একশ স্বরে না, ততোত্তম মানব না। তাঁর করুণা ব্যতিরেকে এই ক্ষুৎ-ব্যাধি-উৎপীড়িত পৃথিবীতে মানুষ এক বৃহত্তর ভিত্তিতে পারিত না, সকলেই এক অনিবার্যের দাবানলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিত!

ক'দিনের তরে জীবন, ক'দিনের তরে সংসার; কাল ত এগিরে আসছে। কেন মোহিত তোমের চক্ষু খুলছে না? শমন বে তোমের হাতের কড়াবাঁত করছে, হরণ আছে কি! ভোগ-সুখে কাল কাটাচ্ছে; ভাবছ হতদিন পারি সুখে থাকি, তার পর যা হয় হবে। সূচ! পরের চিন্তা কর। অদূরদর্শী, একবার ভবিষ্যতের দিকে তাকাও; দেখ, সে জ্বালাবর, নরকের কালামি কি যন্ত্রণাদারক! সমর থাকতে দেখ। এখনও বড় উন্নীতে যেহী আছে বলে 'হাল' ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না। কড়ের নেথ উঠছে, দেখেছ কি! এখনই কোথার তোমার তরী উড়িয়ে নিয়ে যাবে, জানতেও পারবে না। উঠ, কর্তব্যের সংসারে কর্তব্য কর। ঈশ্বর আমাদের বিবেক দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, আমরা তাঁর ব্যবহার করি না কেন? কেন আমরা পাপের আপাত-মধুর সুখে ভুলে কোঁচি অনিচ্ছিত পথের পথিক হই!—তাঁর শেষ কোথায়? সে খবর কে রাখে? কর্ত্তের হল মান কি? মানব কর্ত্ত অসুদারের কল ভোগ করে, আমরা কর্ত্ত-কলসের হাস।

কে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখেছ;—এ দেখ, চিনতে পারছ? গতি বল ত তাঁকে দেখবার ইচ্ছা করে? তাঁকে দেখলে আর ভুলতে পারবে না; তাঁর প্রেমে পড়লে আর একান্তে পারবে না। সে দিন কবে আসবে? হাঙ্ সে কথা। হুশধ বড় কঠিন; নয়? হুশধের শেষ কোথায় দেখেছ। সে যে স্বর্ণ!—সেখানে যে সুখের শেষ নাই, অতৃপ্ত বাসনার হতাশাস নাই, ভোগের ভীততা নাই, স্বার্থের আশ্রিততা নাই। সেখানে শুধু মেহ ভালবাসা। সেখানে

রোগের ভয় নাই, বিপ্লবের প্রবেশ নাই, কামের জ্বালা নাই, ক্ষোভের উদ্ভাষিতা নাই, সোক্তের অন্তর্দাহ নাই, মোহের অন্ধকার নাই, মনের মাদকতা নাই, বাৎসর্যের সংকীর্ণতা নাই; সেখানে মারা নাই, তথাপি সকলে সকলকে ভালবাসে। এমন বেশে যেতে কি ইচ্ছা হয় না? সুখ চাও? কেন এত সুখ কি ঘটেই নয়? দেখ, বেন ভয় পেও না, স্বাক্ষরানে গিয়ে ফিরে এল না। আর তা যদি না পার, তবে ওরে বৃণিত! ওরে ইন্ড্রিয়াকুল! ওই দেখ তোমের মস্ত সোঁধা পথ খোঁজা রয়েছে। ওই পথ দিয়ে যা', দেখে সেখানে কি সুখ! ওরে পতঙ্গ, দেখ আঙুলে প'ড়ে কি সুখ! ওরে পথিক! মরীচিকা অহুসরণ করে দেখ, কি সুখ! ওরে লাস্ত! দেখ আলোয়ার শেষ কোথায়!—

আর আসতে কাল কাটিল না। “আমিদের” বহন ছাড়। তুমি কে একবার ভেবেছ কি? জাই, আত্মীয়, বন্ধু এরা তোমার কে? কেউ না। তোমার, তোমার বস্তুতে একমাত্র আছেন শ্রিত্তি। তাঁকে বেদিন তোমার করতে পারবে, সেদিন তোমার জীবন সার্থক। এখন সব মাত্র মধ্যাহ্ন; সন্ধ্যা হ'তে যেহী আছে। এখনও এল, সংসারের মায়া কাটাতে পারবে। না পার, বেশ, তবে সংসারের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁকেও এক জন ক'রে নাও; দেখবে অনেক জাগা যাবে, বৎ প্রাণ শীতল হবে।

আর একটা কথা, সংসারে কেন প্লেছ, এ কথা কখনও ভেবেছ কি? তোমাদের এখানে কে পাঠালে?—কি বললে, নিজেই এসেছ। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে এগেছ!—নাশুক! ছুপ কর, এত বড় একটা সৌর-অগ্নি এমন হুশখলার লহিত চলছে জান ত? এর কি কেউ জ্ঞান নাই?—ভেবেছ কি, কে পুণ্য এমন সৌন্দর্য্য দিয়েছিল, চাঁদে এমন শ্রদ্ধা দিয়েছিল, শিশুর অধরে হাসি দিয়েছিল। ভেবেছ কি, কে সতীর ছদয়ে বল দিয়েছিল, ভক্তের ছদয়ে ভক্তি দিয়েছিল, বাতায় ছদয়ে বেহ দিয়েছিল?—এর উত্তর এক ভগবান। আর ভগবানে অধিবাস ক'রে নিজের পাপের বোকা বাড়াইও না। দেখ, বৈতরণীর বাটে কে বেধা দিচ্ছে? তার কাছে তাঁকি বেধার উপায় নাই।

...টিক বলেছ; অনেক দিনের কথা বাটে, কিন্তু টিক বলেছ। সংসারে দু-ই সার বাটে। বৃলা-মারী নিয়ে খেলা ক'রছ; ছদিন পরে জেলে যাবে। এত সাধের বর, এত সাধের খেলা, সব যাবে; কেউ রাখতে পারবে না; কেউ মছে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে উঠ, আসল জিনিস নিয়ে খেলা আরম্ভ কর;—যে খেলা ভাসবার নয়, যে খেলা ছেলে-বেলা নয়, সেই খেলা খেল।



স্বরলিপি

তৃপালি—ঔপতাল

ভিক্ষাং দেহি জননি গো, ভরিয়ে যে খুলি ;

আর কিছু চাহি না ত শুধু পদধূলি—

তোমার পায়ের ধূলি—ধূলি—ধূলি ।

শুধু মাগো চাই বর, এই আশীর্বাদ কর,

তোর সেবা-ব্রতে প্রাণ পুণ্য করে তুলি—

পুণ্য করে তুলি—তুলি—তুলি ।

মনে রাখি যেন তোরে সকল কাজে,

তোর দ্ব্যংগ নিশিদিন প্রাণে যেন বাজে ;

বাজে—বাজে ।

তব মুখ সব আগে, নিত্য যেন মনে জাগে,

তোমার চিন্তায় যেন সব চিন্তা তুলি—

সব চিন্তা তুলি—তুলি—তুলি ।

কথা ও হুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী]

[স্বরলিপি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গুলী

গা পা | গা - রা | মগা রা | সা ১ ধা | পা ধা | সা - রা | সা রা | গা - রা |

ভি ক্ষাং দে • হি জন • নি গো ভ রি য়ে • যে খু • লি • •

পা • ধা | সর্গা সর্গা - রা | ধা পা - রা | পা ধা | পা পা - রা | গা - রা | সা - রা - রা |

আহ • কি ছুই • চা হি না ত • শু ধু প দ • ধু • লি • •

সা সা | সা ধা - রা | সা - রা | গগা - ধর্গা | ধা - পা | গগা - সগা - রা | পা - রা | গা - রা - রা |

তো দাং পা বেহু • ধু • লি • • ধু • লি • • • ধু • লি • •

II পা গা | পা পা-ধা | সর্গা | সর্গা-না | সর্গা | পা-না | সর্গা | পা-না |
ত ধু যা পো • চা ই বহু • এ ই আ • দী র্জা ম কহু •

I সর্গা-রর্গা | রর্গা-না | সর্গা-না | গর্গা-না | রর্গা-না | ধা-না | গা-না | সা-না |
ভোর • সে বা • র তে আশু • পু যা ক • রে তু • লি •

I সা-রা | গা-না | ধা-না | সর্গা-না | ধা-না | গা-না | গা-না | সা-না |
পু যা ক • রে তু • লি • তু • লি • তু • লি •

II সা-ধা | সা-না | গা-না | গা-না | গা-না | গা-না | সা-না |
ম নে রা • বি বে ন তো রে • স ক ল • কা ছে • • • •

I সা-রা | সরা-গা-না | রা-না | ধা-না | গা-না | গা-না | গা-না | সা-না |
তো র হু • খ নি দি নি • আ গে বে • ন বা • • •

I সা-রা | গপা-ধর্গা-ধপা | গা-না | সা-না | পা-না | পা-না | সর্গা-না | সর্গা-না |
বা • ছে • • • • বা • ছে • • • • ত ব হু • ব স ব আ গে •

I সর্গা-না | পা-না | সা-না | পা-না | সর্গা-না | রর্গা-না | সর্গা-না | গর্গা-না |
নিষ্ঠা বে • ন ম নে ছা • গে তো মা • র • চি আ ধ বে ন •

I রর্গা-না | ধা-না | গা-না | সা-না | সর্গা-না | গা-না | ধা-না | সর্গা-না |
স ব চি • আ • তু • লি • • • স ব চি • আ • তু • লি •

I ধা-না | গা-না | গা-না | সা-না | II II
তু • লি • • • তু • লি • •

চার দিন

[শ্রীম্যোতির্পরী দেবী এম-এ]

বনের মধ্যে ঘন পাতার ভিতর দিয়ে কখন গোলা-গুলি-গুলো আশ্রমের পথ কেটে নিছিল, তখন ডাল-পাতা সব ভেঙ্গে কেমন করে আমাদের পায়ে পড়ছিল, আর আমরা কি রকম বে ঘোঁড়া তখন ঘিরেছিলাম, তা আরও আবার মনে আছে। ঘন কাঁটা-ঝোপ তেলে আমরা যখন এগোছিলাম, তখন শব্দরা যে বেশ গরম রকমেই গোলা বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল, আর বনের প্রান্তের ঝোপ-গুলো যে চারিদিক থেকে লাগ-হরে-মলে-ভটা! আগুনের শিখাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তাও বেশ মনে আছে। ১ নম্বর কোম্পানীর সৌভাগ্যক (আজ্ঞা সে লোকটা) আমায়ের ফার্মিং লাইনে কি করে এল ? যখন হঠাৎ বসে পড়ল, আর একটাও কথা না বলে, বড়-বড় চোখ তুলে আমার মুখের পানে চেয়ে বৈল, আর তার মুখ থেকে ঘোঁড়া একটা রক্তের ধারা বয়ে পড়তে লাগল, তখনকার কথাও মনে পড়ে। হুঁ, আমার কিন্তু সে কথাটা বেশ ভাল করেই মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে যে, যেই আমরা বনের পথে এসে উপস্থিত হলাম, তখনই ঘন ঝোপের মধ্যে আমি সেই তাকেই দেখেছিলাম—লম্বা-চওড়া, মোহনা-মোহনা তুফান সে,—কিন্তু এই যোগা-যোগ্য বৈটে-খাটে আমি মাহুখটাই তার দিকে সোজা ছুটে গিয়েছিলাম। কাপে-তালা-ঘিরে-বেওয়ার এক জীবন্ত শব্দ হল; আর আমার পাশ দিয়ে, কাশ ছুটোকে বন্ধনিয়ে প্রকাণ্ড কি একটা ছুটে গেল। আমি ভাবলাম, যে, লোকটা আমার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। আমার এখনও মনে পড়ে,—কি রকম ভীত হয়ে টীংকার করে সে একটা কাঁটা ঝোপ তেলে গিছিয়ে গিয়েছিল; সে বেশ ভাল রকমেই সেটা ঘুরে পার হয়ে যেতে পারত; কিন্তু তারে বিশেষত্ব হবে, সে ঐ কাঁটা ঝোপ তেলেই মাথা কম্বতে গিয়েছিল।

এক আঘাতেই আমি তাকে নিরস্ত করে, আমার সান্দীনা দিয়ে তাকে ছুঁতে বেরায়। একটা ভিতরে-টানা,

চাপা কান্নার শব্দ, আর একটা মর্মরতরী করণ আর্ন্তনাদ! তার পর আমি ছুটে এগিয়ে গেলাম। আমরা যখন এগিয়ে ছুঁছিলাম, তখন আমরা হঠাৎ করেই চলছিলাম; কেউ বা বাড়িলাম পড়ে, কেউ বা মাহুখিলাম গুলি। আমি ত করবার বন্দু ছুঁড়েছি—আমার বেশ মনে আছে। আমরা বন ছেড়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমাদের হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড গভীর গর্জনে পরিণত হয়ে গেল; আর, আমরা সকলে সামনের দিকে দৌড় দিলাম। অর্থাৎ, আমাদের মনের লোক দৌড় দিল, আমি শুধু গিছিয়ে বৈলাম। একটা কি বেন অদ্ভুত কি হল; তার পর, আরও আশ্চর্য ব্যাপার,—সমস্তই বেন কোথায় পালাল,—ঠোটা-মেচি, বন্দুকের শব্দ, সব মিলিয়ে গেল। আমি আর কিছু ভুলতে গেলাম না, কেবল চোখের সামনে বানিকটা নীল কি দেখলাম—নিশ্চয় আকাশ। তার পর তাও মিলিয়ে গেল।

আমি এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় আর কখনো পড়ি নি। পেটের উপর উপড় হয়ে শুয়ে পড়েছি; আর, আমরা সামনে একটা মটির ঢেল, কয়েকটা বাড়া-খাড়া দাল, তাই আমার একটার উপরে নীচু বিকে মাথা তুলে একটা পিপড়ে চড়ছে, আর কতকগুলো ধূশার টিবি, পুরোনো বজ্রের মত দাল, এই ত দেখতে পাচ্ছি। এই ত আমার বিষমসার;—আবার তাও একটা চোখ দিয়ে দেখছি; কারণ, আর একটা চোখে কে একটা শব্দ কি জ্বিলি জ্বিলি যেনে মনেছে। আমার মাথাটা যে ডালটার উপর পড়ে আছে, সেটারই এই কাজ। আমার ভরফর অগ্রবিধা বোধ হচ্ছে; আর, আমি ঐটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, যখন আমি নড়তে চাচ্ছি, তখন কেন নড়তে পারছি না। সমস্ত এমনি করেই কাটিছে—আমি কিঁকির ডাক আর

মোদাছির গুণ-গুণ শব্দ শুনতে পাছি, আর কিছু না। অনেকক্ষণ পরে, খুব চোঁটা করে, নিজের শরীরের তলা থেকে ত ডান হাতখানেক উদ্ধার করলাম। তার পর, ছই হাত দিয়ে মটীর উপর ভর করে, হাঁটু পেড়ে বসতে চোঁটা করছি। হাঁটু থেকে খাতাল একটা কি পা বেয়ে মুকের নিকৈ বিদ্রাং-শক্তিতে উঠে গেল; আবার সেখান থেকে মাথার উঠল; আমি ত আবার পড়ে গেলাম,—আবার অঙ্ককার,—আবার শূন্য।

আমার ঘুম ভেঙেছে,—কিন্তু বুলগেরিয়া দেশের কালোটে নীল রাতের গায়ে গাড়াগুলো ক'মক'ম করছে, দেখতে পাচ্ছি কেন? তাঁবুতে শুয়ে আছি, না? তবে তার থেকে আর হয়েছি কেন? একটু নড়লাম, আর গায়ে কি ভীষণ ব্যথা! এবার আমি বুঝছি; আমি আহত। বিপদের আশঙ্কা কিছু আছে? গায়ে যেখানে ব্যথা, সেখানটা ধরলাম। বা আমার ডান ছটো প-ই ঘামট রক্তে ভরা। এখন গায়ে হাত দি তখন ব্যথা আরো বাড়ে! ঠিক যেন দাঁতের বাধা; তেমনি ধরাই বৃণুপে পা-পাক-নিধে-ওঠা ব্যথা। কানের মধ্যে বাঁকি করছে, আর মাথায় যেন সোঁসে পোয়া। কি রকম অস্পষ্ট তাবে বুঝি যে, আমার দুটো গায়ে আঘাত লেগেছে। কিন্তু ওরা আনার তুল নেই-নি কেন? তুর্কীরা কিছু আর আমাদের হারিয়ে দেয় নি। কি যে ঘটছে, তা মনে করতে চোঁটা করছি। প্রথমে গোলমলে তাবে, পরে চোর পরি-কার করেই সব মনে এল; আর এই ভেবে ঠিক বসুখ যে, আমরা কান মতেই হারি নি। তার কারণ হচ্ছে, পাঠাঙ্কের উপর যে বাঁঠ, আমি তাতেই পড়ে গিয়েছিলাম। (এইখানে বলে রাখা ভাল যে, আমার পড়ে যাওয়ার কথা আমার মনে নেই; শুধু মনে আছে যে, আর সকলে ছুটে এসিয়ে গিয়েছিল, আমি তা পারি নি,—আর, শুধু নীল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই নি।) আর, সেই বাঁঠটা দেখিয়েই তো আমাদের ছোট-খাট অফিসার সাহেব বলেছিলেন, “জরে, আমাদের ওখানটার পৌছোতে হবে।” কানেই, এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, আমরা হারি নি। কিন্তু, তাই যদি হল, তবে ওরা আমার তুসে না কেন? এই হাঠে, খোলা বায়পায় নিশ্চরই সবই দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া,

এ হতেই পারে না যে, আমি এখা এখানে শুয়ে আছি। তার পক্ষে ওরা খুব ভয়ানক রকমই গুলি চাণিয়েছিল। আমার মাথা বুয়ে একবার সব দেখে নিতে হচ্ছে। এখন আমি তা অনেক সহজেই করতে পারব; কারণ এখন আমার প্রথম জ্ঞান হয়েছিল, আর, আমি কেবল সেই ঘাস আর নীচু নিকৈ-মাথা-করে-বান-চড়তে-তৎপর সেই পিপুড়োটাতেই শেখিলাম, তখন আমি উঠতে চোঁটা করেছিলাম, আর পড়ে গিয়েছিলাম। তবে সেই যেমন ভাবে আগে পড়েছিলাম, তেমনি ভাবে নয়; অর্থাৎ চিংপাত হয়ে পড়েছিলাম। তাইতেই ত গাড়াগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমি উঠে বসতে চোঁটা করছি। এখন দুটো পা-ই ভেদ করে গুলি চলে যায়, তখন একাকটা বেশ কঠিন টেকে। করেকবার তো নিরাশ হয়ে চোঁটা করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম; কিন্তু এতক্ষণে ভয়ানক ব্যথা সহ করে, হুঁ চোখে মল ভরে একাকটা পেরেছি।

মাথার উপরে এক-টুকরো কালোটে নীল আকাশের গায়ে একটা বড় আর কয়েকটা ছোট গাড়া অলছে। আমার চারদিকে কালো লগা কি সব?—কোপ? আমি কোপের ভিতর আছি। তাই তারা আমার দেখতে পায় নি। এটা এখন বুঝতে পারলাম, তখন আমার মাথায় চুল সব ঝাড়া হয়ে ঠাঁড়িয়ে উঠল। কিন্তু আমার ত ওরা খোলা মাঠে গুলি মেরেছিল; তবে কোপের ভিতর এলুম কি করে! আহত হয়ে আমি নিশ্চরই হাধাওড়ি দিয়ে এখানে এসেছিলাম,—ব্যপায় কিছু টের পাই নি। মজাটা এই যে, এখন আমি নড়তে পারছি না—কিন্তু তখন আমি এই কোপগুলোর মধ্যে নিজেই টেনে এনেছিলাম। তবে হাত পায়ে, তখন আমি একটা গুলি খেয়েছিলাম,—দ্বিতীয় গুলিটা আমার এখানে এসে পরেছে। আমার চারদিকে কিকে লালচে রংএর দাগ রয়েছে...

বড় তারাতা ম্লান হয়ে এসেছে, আর ছোটগুলো নিগিয়ে গেছে। চাঁদ উঠছে তাই। বাড়ীতে এখন রাতটা কি চমৎকারই না হয়েছে।

কে যেন গৌড়াচ্ছে, এ রকম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হুঁ, এ ঠিক গৌড়ানি। আমারই মত সকলের-ভুলে-বাওয়া কেউ হুঁপারে কিবা পেটের-ভিতর-গুলি-দাগা কাছে পড়ে না কি? না, তা ত নয়! গৌড়ানিটা খুবই কায়ে,—অথচ

কেউ আমাদের অত কাছে নেই—এ হতে পারে না? হুঁ; কিন্তু তাই, এই আমিই ঐ রকম করে গোঁড়াছি, আর আর্টনাথ কছি। এক বেদী বয়না নিশ্চয় হচ্ছে না? হাঁ, বৈ কি, কিন্তু আমি বৃত্তে পারছি না, আমার এত বয়না কেন হচ্ছে। তার কারণ যে, মাথাটা আমার সীমের মত ভারী হয়ে গেছে, আর সবশেষে বাপ-স্বাশুড় লাগছে। ভাল-ভাল গুণে পড়ি, আর ঘুমোই; ঘুমোই.. কিন্তু আগার আগ-ত? হাক্ গিরে, তাকে কিছু আসে-যায় না।

বেই শুতে যাব, অমনি চাঁপ থেকে চণ্ডা, ক্যাঁকালে একটা আলো এসে, আমি দেখানো আছি। সে বায়গাটকে আলো করে ফেলে; আর, আমি দেখতে পেলাম, আমার থেকে পাঁচ হাত দূরে কালো মন্ত কি একটা বাটার উপর পড়ে আছে। চাঁদের আলোতে তার উপরে কি একটা মিলিস চক্ চক্ করছে। বোতাম না আর কিছু?—মড়া, না, আরও কেউ?

কি হবে ভেবে? আমি শুয়ে পড়ি। না, এ হতেই পারে না। আমাদের সোকেরা সব চলে যেতেই পারে না। তারা এখানেই আছে। তারা ভূকীনের তড়িৎ দিয়েছে; আর এই ছিনিয়ে-বেগা বায়গাটার তীব্র পেড়ে বসেছে। তবে শব্দ শুতে পাচ্ছি না কেন? তীব্র চারিদিকে—আলা আলাদা কঠ-কাটার শব্দও নাই কেন? যোগ হয়, আমি খুব হর্ষল হয়ে পড়েছি, তাই শুতে পাচ্ছি না। তাদের এখানে থাকতেই হবে।

“কে আহিন্ কোথায়? বাঁচা! বাঁচা! বাঁচা!” কে বেন বোর করে আমার মুখ থেকে পাগলের মত এই চীৎকার ছিনিয়ে বার করল; কিন্তু কোনও উত্তর নাই। রাতের বাতাসে সে শব্দ ধোঁয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু আর সব শুপ-চাপ। ঝিক্ ঝিকো কেবল তাদের ঝিক্ ঝিক শব্দ তুলে ধরে আছে। চাঁদটা আমার নিকে করণায় গলে ভাঙিয়ে রয়েছে।

ও সোকেটা যদি আহত হত, তবে আমার চীৎকারে ও বেগে উঠত। ওটা মড়া। আমাদের কেউ, না ভূকী? বেই হোক না কেন, আমার কাছে একই কথা মর কি? আমার চোখের পাতার উপর ঘুম নেমে আসছে।

শুয়ে আছি। আমি চোখ বুজে চাই না; কারণ, আমার এই বোঝা চোখের পাতার উপর বোঝাটা বেশ টের পাচ্ছি; পুঁসি যদি, ত হুঁয়ার তেজে চোখ-মুটাই বাবে পুড়ে। তা ছাড়া, না নড়াই ভাল.....কাল (কালই হবে যোগ হয়) ওরা আমার ঘেরছিল—একটা দিন আর একটা রাত কেটে গেছে; অ্যুরও কত যাবে,—আর আমি মরে যাব। একই কথা। না নড়াই ভাল। যদি মনটাকে ধামিরে রাখতে পারতাম! কিন্তু সেটাকে কিছুতেই থামান যাবে না। পুরোপুরি কথা আর নতুন—কত রকমের ভাবনা-চিন্তা—সব বলে-বলে মাথায় এসে চুকছে। হাক্ গিরে, এ সব শু বেদীকণের মত মর,—শেষ শূঁগিরি হয়ে যাবে। থবরের কাগজে কয়েকজন লেখা বেরিয়ে যে, আমাদের হতাশের সংখ্যা খুবই কম :—

আহত এত; হত.....একজন প্রাইভেট—আই-ড্যানক;—না, সোকেটার নাম শু দেওয়া হয় না,—ওরা কেবল লেখে হত—একজন। একজন প্রাইভেট, সে বেন একটা কুকুর।

একটা ঘটনা, যা অনেকদিন আগে ঘটেছিল,—তার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সব হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এতেই মনে হল—আমার জীবনটা বেন কত আগের ঘটনা, কত অতীতের কিছু বলে মনে হচ্ছে,—সে জীবনটা পারে শুলি লেগে এখানে শুয়ে পড়ে থাকার আগে ছিল।

রাতা দিয়ে বাড়িলাম, হঠাৎ একটা বায়গার তড়িৎ হওয়ার স্বরণ থেমে যেতে হয়েছিল; রাতার উপর রক্তমাখা সাদা একটা মিলিস, করণ স্থরে কেঁউ-কেউ;—তাকে দিয়ে এবং তারি দিকে ছুপ করে চেয়ে থেকে, ঐ ভিড়টা গড় হয়েছিল। সেটা একটা কুকুর, বার উপর দিয়ে টানখাড়ী চলে গিয়েছে। আমার এখন যে রকম মরবার দশা হয়েছে, কুকুরটারও সেই রকম হয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা জোন এসে কুকুরটার খুঁটি ধরে তুলে নিয়ে গেল, ভিড়ও মিলিয়ে গেল। কেউ এসে কি আমার নিয়ে যাবে? না—না.....তোমার এখানেই শুয়ে-শুয়ে মরতে হবে। জীবনটা কি স্বন্দর! আমি সে দিন কি সুখী না ছিলাম! আনন্দে মত্ত হয়ে সে দিন রাতা দিয়ে চলছিলাম। গত জীবনের পুরোনো স্মৃতি! আমাদের আর বয়না মিও না। এখনকার এই অসহ্য স্বপ্নায়

আমার অনবস্থান ঘুম ভেঙ্গে গেছে; তবুও চোখ বুজেই

মধ্যে আমার একা ফেলে রেখে দাও—তা'হলে অন্ততঃ আমাকে আর এই অনিচ্ছার তুলনা করতে হবে না।
আমি: এই যে বাড়ী কিরে বাবার গভীর বাগান—এ যে এই বাবের চেয়েও বহুশাখারক!

বাক্য, ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসছে। রোদে পুড়ে যাচ্ছে; চোখ খুলে সেই ঝোপ, সেই আকাশই দেখছি, শুধু এটা দিনের বেশা—এই যে আমার সখীটি। হাঁ, ও ত ভূতী, আর মরেও গেছে। কি প্রকাণ্ড ঘেঁহুখানা! তার ও ত সেই লোকটা, চিন্তে পেরেছি,—বাক্যে আমি...

আমার সামনে পড়ে আছে এমন একটা লোক, বাক্যে আমি মেরে ফেলছি। তাকে আমি মারলাম কেন? রক্তমাখা হয়ে সে মরে পড়ে আছে—অদৃষ্ট তাকে এখানে আনল কেন? সে কেই বা? হয় ত বা তাত্ত্ব... আমারই মত... বুঝী যা আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সে হয় ত একা-একা অনেকক্ষণ ধরে তার বিস্তীর্ণ হুঁড়ে ঘরটার সামনে বসে, উত্তরের দিকে চেয়ে-চেয়ে, তার আদরের পুতলী ছেলেরা, তার বন্ধক, তার অগ্রযাত্রার ভয়ে প্রতীক্ষা করছে। আর আমি? আমিও—হায় রে, যদি আমি ওর মত হয়ে যেতে পারিতাম! ও ত হুঁহী! কিছু তন্তু পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না; কাটা-ছেঁকা ঘরগার কোনও বস্তুই নাই,—গা পাক দিয়ে ঘুরে উঠছে না,—শিশিলায় বুক ফেটে যাচ্ছে না..... সখীসখী ত মোজারহীন বুক হুঁড়ে চলে গেছে। ওর গোবাকটার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত হয়ে আছে, আর তার চারি দিকে রক্ত। আমি,—আমি ঐ কাছটা করেছি।

আমি কিছু করতে চাই নি। আমি বধন বুড়ে ইচ্ছে করেই বোপ দিবেছিলাম, তখন কারো অন্তি করল, এ মতলব করি নি। আরাকে যে মানুষ মারতে হবে একথা আমার বুঝতে তখন চোকে নি। আমার নিজের বুকটা কি রক্তন করে গোলাগুলির সামনে পেতে যাবে, সেই কথাটাই শুণু আমার মনে জেগেছিল। তাই আমি এগেছিলাম..... আর এখন.....ওরে পণ্ডুর্ধ, বোকারাম।

আর এই হতভাগা লোকটা (জিভিন্টের লোক এ—গোবাক দেখেই বোকা যাচ্ছে)—এর ও আমার চেয়েও কম বোকা। প্রথমতঃ, সূড়ীতে-ঠাঙ্গা বোকারা নাহের মত

কোরে সীমার চক্কেতে একে এর মত আরো অনেক-জনের সঙ্গে কনট্রাষ্টিনোগলে আনি হয়েছিল। ও কখনো কখনো কিংবা বুলগেরিয়ার নামও শোনে নি। উপরিওয়ালা ওকে হুকুম দিল "দাও।" আর ও এল। যদি ও না আসতুতে চাইতো, তবে বোধ হয়, ওরা ওকে লাঠোয়ানি দিত, নইলে কোনো পাশা-মশাই ওর গা হুঁড়ে হয় ত ভালি ঢালিয়ে দিতেন। তা'হল থেকে রাসচক্রা পর্যন্ত অনেক ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়ে মার্ক করতে-করতে ও এসেছিল। আমরা ওকে তেড়ে এসেছিলাম, ও নিজেবে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু ও বধন দেখলে, আমরা তরফর লোকেরা ওর ইংরেজী বন্ধুকে একটুও ডরায় না,—বরং লাক্ষিয়ে-লাক্ষিয়ে এগিয়ে আসছি,—ও তখন ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে গেল; আর, ও বধন পালাতে গেল, তখন কোথেকে একজন ছোটখাট লোক—বাক্যে ওর কালো হাতের এক বিশাল দু'শীতেই ও সাবাড় করে দিতে পারত, —লাক্ষিয়ে এসে সরাসরি ওর বুকের মধ্যে তার সখীসখী হুঁড়ে দিল। ওর কি পোষ?

আমারই বা কি পোষ—আমি ওকে মেরেছি যদিও? কেন আমার পোষই বা হবে?...আজ্ঞা, কেন আমার এত ভেটা পাচ্ছে? ভেটা! কে জানে এই মানে কি। আমরা বধন এই জীবন গরবের মধ্যে কমানিয়ার লাভ মাইল করে বাধা হয়ে চলছিলাম, তখনও এমন কষ্ট পাই নি! ও...দু'খি কেউ এখন আসে!

ভগবান! হাঁ.....ওর ঐ প্রকাণ্ড গলের বোতলটার মধ্যে নিশ্চয় বানিফটা জল আছে। কিন্তু আমার ত সেটা জানতে হবে। আমার কি খুব কষ্ট হবে? বোকা গিরে, তবু আমি ওখানে থাক।

পা টেনে-টেনে ভাঁড়ি মেরে ত চলছি। হাতছটো এমনি চরুল হয়ে গেছে যে, কোন কাজেই বেন আসছে না। কয়েক পা মাত্র যেতে হবে.....কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে বেন কতদূর.....বেন কত কোণই যেতে হবে। বাই দোকান, আমার ওখানে পৌছোতে হবেই। আমার গলা জলে যাচ্ছে—আঙুলের মত জলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, জল না পেলে জুনি তাত্ত্বাতি মরবে দন্দেই নাই, কিন্তু তবু হয় ত...

আমি ত চলছি। পা ছটো বেন মারির সঙ্গে শিকল

দিয়ে বাঁধা, নড়তে গেলে কি ভয়ানক অসহ্য যন্ত্রণা। আমি চোঁচোছি, চোঁচোছি আর এগোছি। এসে পৌঁছেছি বাঁধা। হাঁ, বোতলটার মল আছে দেখছি,—ওস্ কত মল। অর্ধেকের চেয়ে বেশী ভরা। আমার অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজ হবে... এই বতকণ না যদি!

আমার হাতে মরা কুমি,—আমার গ্রাণ বাঁচালে। আমি একটা হাতের উপর শুয় দিয়ে, বোতলটার মুখ খুলতে গিয়ে, হঠাৎ বেসামাল হবে মুখ খুঁড়ে, আমার গ্রাণ-বাঁচানো মড়াটার উপর গিয়ে পড়লাম। মড়াটার গায়ে এর মধ্যে লজ্জা হয়েছে।

আমি মল খেয়েছি। মলটা গরম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু নষ্ট হয় নি। তা ছাড়া, অনেকটা মল আছে। আমি আরো কয়েকদিন বাঁচব। আমি একটা বইয়ে বেন পড়েছিলাম যে, মানুষে যদি মল খেতে পায়, তা হলে এক সপ্তাহেরও বেশী না খেতে পেলোও বেঁচে থাকে। আর, ঐ বইটাতাই পড়েছিলাম, একটা পোক না খেয়ে মরে গঠিক করেছিল; কিন্তু তার মরাটা অনেকদিন পর্যন্ত শিঁহিয়ে গিয়েছিল, শুধু সে মল খেতে বলে।

কিন্তু আমি যদি আরো ৭৬ দিন বাঁচি, তাহেই বা কি? কি বা লাভ হবে? আমারের শোকেরা ত সব চলে গেছে। বুলবেরিয়ানরাও চলে গেছে। তাহে কোন রাজ্যও নাই। আমাকে মৃত্যুই হবে,—মৃত্যুর থেকে তিন দিনের বরণার বায়গার এক সপ্তাহের বরণা বাঁড়াল। এখন যদি শেষ হয়ে যায়, তা' হলে তাল হয় না? আমার সপীড়র পাশে তার বসুটো পড়ে আছে। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে—একটা আলো আর ঈষৎ—বাস্, সব শেষ হয়ে যায়। টোটাও এখানে পড়ে আছে,—ওর সে সব কোন কাজেই আসে নি। তবে শেষ করে ফেলব কি? না, দেখব, কি হয়? কি কর্জ, মজি? না, মরণ? আমার এই বোঁড়া পা থেকে ভুঁকীরা এসে চামড়া ছিঁড়ে ফেলবে বলে আপেকা কর্জ কি? তার চেয়ে নিজেই নিজেকে শেষ শেষ করে ফেলি না কেন? না, নিরাশ হবার কারণ বেই; আমি শেষ পর্যন্ত বাঁচবার চেষ্টা কর্জ। যদি আমাকে ওরা খুঁজে বার করে, তা হলেই ত বেঁচে পেলাম। হয় ত আমার হাড়ে মোটেই লাগে নি—ওরা আমার সারিয়ে

তুলবে। আমি বাড়ী বাব—মাকে দেখব—মাকাকে দেখব—...ও তপস্বান, মরার ঠাসুর! তারা বেন মনে করে, আমি গোলার দা খেয়েই মরছিলাম। ওরা যদি টের পায় যে, আমি হু, তিন, কি তার চেয়ে বেশী দিন কষ্ট পেয়ে মরেছি!

মাথা তনব্বু করে দূবে। সপীড়র কাছে আসতে আমার সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর, এই ভয়ানক গন্ধ। সোকাটা কি কালো হয়ে গেছে! কালকে কি পরণ্ড ও কি রকম দেখতে হয়ে যাবে? আমার নিজেকে টেনে নিয়ে দাবার শক্তি নেই বলেই ত এখানে গুয়ে আছি। একটু ক্ষণ বিশ্রাম করে আমার আগেকাও যায়গার কিরে যাব। বাতাসটা সেই দিক থেকেই বইছে,—গন্ধটা তখন উটো দিকে চলে যাবে।

ভয়ানক স্নাত হয়ে পড়েছি। রোমে মুখ হাত পুড়ে যাচ্ছে। একটু ছায়াও কোথাও নাই। যদি রাতটা (বিতার রাতটা মজি) একটু শীগগির করে আসে।

আমার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—আর আমি বেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি।

আমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিলাম; কারণ, ভেগে দেখলাম, রাত হয়ে গেছে। আগের মতই সব;—আমার বাগুলো তেমনি টনটন করছে,—সে পোকটাও তেমনি গুয়ে আছে—তেমনি বড়, তেমনি নিখর, নতুন কিছু নেই।

ওর কথা আমার তাব্তেই হচ্ছে। এই পোকটা আর বেঁচে থাকবে না,—তধু এই মরেই কি আমি আমার সব ভাগ্য করে এনেছি—আমি না খেয়ে মরেছি, নীতে জমে গেলি, গরমে পুড়েছি, আর সব শেষে এই এখানে এই ভয়ানক যন্ত্রণা সহ করছি। শুধু কি ওকে মারব বলে? এই খুন করা ছাড়া দেশের আর কোনও উপকারে কি আমি এনেছি?

খুন! খুনী! কে?—আমি। আমি এখন ফুড়ে যাব বলে পাগল হয়ে উঠেছিলাম, মা আর মাথা খুব কেঁদেছিল; কিন্তু ব্যর্থ করে নি। ফুড়ের নেশার অন্ধ হয়ে আমি সে চব্বের মনের দিকে তাকাই নি। আমি শুখন বুকতে পারি নি (কিন্তু এখন পারছি) যে আমার

প্রিয় বাবা, তাদের কি কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু এখন ভেবে আর কি হবে? তাহলে পরে ত আর সে দিন কিরে আসবে না। আমার এই আশার ব্যাপারটা আমার বন্ধুদের চোখেও কি রকম অদ্ভুত ঠেকেছিল—“কি রে পাগল! না জেনে-জেনে সন্ধ্যা কবুতে বাজিন্?” অচ্ছা, তাদের যৌবন, তাদের দেশভক্তি, এ সবের আশ্রয়ের সঙ্গে তাদের কথা কি করে বাপ বাইরেছিল তারা? তাদের চোখে আমি অন্তঃঃ যৌবন, দেশভক্তি এ সবই ছিলাম—তবুও আমি পাগল, দম্ভরহীন রাক্ষস।

আমি এই সব জেনেও ভিসিনেকএ গিয়েছিলুম। তারা আমার একটা কণ্ঠস্বর বাপ, আর হৃদয়ের বা কিছু সরল্যাম তা দিয়েছিল। আমার সঙ্গে আরও হাজার-হাজার লোক ছিল; তাদের মধ্যে কিছু অন্তঃঃ আমার মত, য-ইচ্ছা এসেছিল। বাকীরা যদি অসুখিত পেত, ত, বাড়ীতেই থাকত, বুককে বেত না। কিন্তু তারাও আমাদের মত হাজার-হাজার মাইল পার হয়ে এসে মুখ করছে, আর হয় তো আরো ভাল করেই করছে। তারা তাদের কর্তব্য বা, তা করছে; কিন্তু তবু যদি তাদের হুটী দেওয়া যায়, ত, তারা এতদিন এসব ছেড়ে-ছুড়ে বাকী চলে যায়।

ভোরের বেলায় গিয়ে-ভরা বাতাস বইছে; কোপগুলো চলেছে; আর একটা পৃথিবী আধ-ঘুমের ঘোরে ডানা নাড়ছে; তারাগুলো সব মিলিয়ে গেছে। কালোটে-নীল আকাশটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর মরম পালকের মত মেঘে ছেয়ে গেছে। “মাতী থেকে টাটকা কুরাসা উঠছে। আমার—কিসের বলব?—দীর্ঘবনের, না বরণার?—তৃতীয় দিন আরম্ভ হ’ল। তৃতীয় দিন.....আর ক’টা বাকী ঠেগ?—বাকু বেশী দিন আর নেই। আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, সন্ধ্যার কাছ থেকে দু’রে সরে যেতে পারছি না। বেশী দিন আর নেই,—আমিও গরি মত হয়ে যাব; তখন আর পরস্পর কেউ কারো অধিবাধনক হবে না।

আমার বেবুঁই একবার মল খেতেই হবে। আমি মিলে তিনবার করে মল খাব,—ভোরের বেলা একবার, দুপুরে একবার, আর সন্ধ্যার বাপ একবার।

সূর্য উঠেছে। তার একান্ত রক্তের মত লাল, গোল মেঘটা ভাল-পালার আক্ষরী ভিতর দিয়ে চৌপাশী ডোরা-

কাটার মত বেধাচ্ছে। এখন থেকেই বোকা বাঁধে যে, আর খুব গরম হবে। ভগ্নো আবার সন্ধ্যা! আমার দিনটা কেটে গেলে তুমি কেমন বেখুঁত হবে? এখন ত তুমি ভীষণাকার ধারণ করছে! হী, সন্ধ্যা, গরম চোখা! বেবুঁই ভরই করে। গরম চুল সব ত খসে যাচ্ছে। গরম চামড়ার রং বেঁচে থাকতে কোনো ছিল, এখন কেমন ফ্যাকাসে হলুবে হয়েছে। গরম কোলা মুখটা এতদূর ফুলেছে যে, চামড়ার টান পড়ে একটা কাণের পিছনের চামড়াটা কেটে গেছে। গরম পা এতদূর ফুলেছে যে, কোলা পায়ের পট্টার বোতামগুলো ফাঁক করে ঠেলে, ফুলে। সূটার মত বড়-বড় ফোকা বার হয়েছে। আর, ওকে বেখুঁত লাগছে বেন একটা পর্জতবিশেষ। আমার কে রোগ লেগে ও কি হবে? এত কাছে তুমি থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যেমন করেই হোক না কেন, এখন থেকে আমার সন্তে হচ্ছে। কিন্তু পার্জ কি? আমি এখনও হাতটা তুলে, মলের বোতলের মুখ ধুলে, মল খেতে পারি; কিন্তু আমার এই পাণ্ডের মত ভারী, অকর্ণণা দেহটা নাড়তে পারি কি? তবুও আমি সন্ত,—সে বড়টুকুই মরি কেন। মনে কর, বাকীর এক পা,—তবুও সন্তে হচ্ছে।

আমি সারা সকালটা সরবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। বরণাটা ভরফর রকমেই হয়েছিল; কিন্তু তাকে কি আসে যায়? ভাল থাকা, হুঁহু থাকা যে কি রকম মিলিস, তা আমি ভাল দেখি,—কল্পনাও করতে পারি না। আমি এখন বরণার হাল হয়ে গেছি। আমি সারা সকালের চেষ্টার ফলে, আমি আমার পুরোনো বাহগায় ফিরে এসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ আমার পরিচায় বাতাস পেতে হয় নি—পা গরমে এমন একটা মজার পাঁচ হাত দূরে যদি পরিচায় বাতাস পাওয়া যায় ত পেরেছি। বাতাসের মুখ দূরে গেছে। এর ভিতর আরো ভীষণ, আর বিলী এই যে,—আমার ভরানক যদি আসে। বালি পেটটা যখন পাক দিয়ে উঠে, তখন আমার নতুন রক্তের বরণা হচ্ছে;—মনে হচ্ছে, আমার ভিতরের সব বরণাগুলো বেন বৈক চুতে, পাক খেয়ে গেছে। আর এই ভরফর বিধাক বাতাস এসে বাহগায় গায়ে মুখে লাগছে। আমি নিভাত অসহায় আর নিরাশ হয়ে কাঁদা শুরু করে দিলাম।

তরানক স্রাব হয়ে আমি আধ-সরাই হত পড়েছি।
হঠাৎ—বিভক্ত মস্তিষ্কের দল না কি? মনে যেন হচ্ছে……

না……হা, তাই ত……মাহুঘরের গলায় বর; ঘোড়ার
পায়ের লম্ব, আর মাহুঘরের কথা। আমি চোঁচাতে
বাঁকিলাম, কিন্তু চুপ করে গেলাম,—বহি ওরা তুর্কী হয়?
তা হলেই বা কি? তা হলে আমার এখন বা বরণা হচ্ছে,
তার উপর আরো বরণা বাড়বে; বরণের কাপড়ে যে সব
তরানক বরণাদায়ক অস্তাচীরের কথা পড়ে চুপ থাকা হয়ে
উঠে, শোম পাঁড়িরে যেত, সেই রকম অস্তাচীর সব আমার
উপর হবে। ওরা আমার জীবনে ছাপ তুলে ফেলবে,
কাটা পা কদুলাবে। এর চেয়ে বেশী কিছু না করে ত
আমার তাগি,—এদের বরণা যেবার কখনো যে আলীম এবং
বিভিন্ন। এখানে মধ্যের চেয়ে তাদের হাতে মরা কি
সভা বেশী ভাল? কিছু ওরা যদি আমাদেরি লোক হয়?
—এই সন্দেহে কোপগুলো! তোরা আমার পাঁজীরে

মত আড়াল দিয়ে দিয়ে রেখেছি? কেন? এ-গুলোর
ভিতর দিয়ে কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। একটা ঘায়সায়
গুধু ছোট আমোলায় মত একটা কঁক আছে,—তাই দিয়ে
মাঠের বানিকটা দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে সেই ছোট
নলীতা, আর থেকে সে-দিন আমরা দুজনের আগে বল
খেয়ে-
ছিলাম। আর ঐ যে নদীর বুকে সেই বেলে পাথরের
চিহ্নটা, যেটা সঁকোর মত নদীর তীর দুটোকে বেঁধে
দিয়েছে। ওরা এটে বেয়ে নিশ্চয়ই আসবে। গলায় দুখ
দিয়েছে বাছে, তারা কি ভাবার কথা বলছিলো বুঝতে
পারি নি, আমার কাণও খারাপ হবে পেছে। হে ভগবান!
বহি তারা আমাদের লোক হয়—আমি টেঁচিয়ে ভাঁকি।
ওখন থেকে তারা আমার চাঁৎকার শুনেতে পাবে—তাদের
পাওয়া উচিত। অলতা বর্করদের হাতে পড়ার চেয়ে ত
এ ভাল হবে! ওদের আসতে এত বেরী হচ্ছে কেন?
আশা করে থাকার বেরনার আমি বাতাসের দুর্গন্ধের কথা
তুলেই থাকি—বহিও দুর্গন্ধ কোন বকসেই কবে যায় নি।

কতকগুলো কলা-চোখের সাপে এসে উপস্থিত
হল,—তারা নদী পার হচ্ছে। তাদের নীল গোলাক, লাল
ভোরা-কাটা পা-জামা, বর্শা, বরম সবই দেখতে পাচ্ছি।
গোটা-পটিশ দাড়,—স্রার তাদের আগে-আগে একটা
চৎৎকার তব্বীরান ঘোড়া চড়ে, কালো বন বাড়ি-আলা

এক অগ্নিগায়। তারা নদী পার হতে-হতেই, সে দিনের
উপর ঘুরে বসে ছুঁছুঁ দিল, “কবে চা-লু।

“আরে, পাম, পাম। গোবাই তোদের! বাঁচ। আমার
বাঁচ—ভাইয়া হো!” বলে কত চোঁচলাম,—কিন্তু ঘোড়ার
খটমটি, তলোয়ারের কনকনি, আর তাদের নিজেদের চোঁচ-
মেটির মধ্যে আমার ভাল গলায় বেহুতো মোটা আঁওমাঝ
জুবে গেল—তারা শুনেতে গেল না।

ওদের ভাল হোক। অবগত হয়ে আমি দুখ বুঝে
পড়ে গেলাম, আর দুঁগিরে-দুঁগিরে কীভাবে লাগলাম।
আমার মুক্তির উপায়,—মরণের হাত থেকে পরিত্রাণের
উপায় যে লম্বাইকু, তাও বোতল থেকে গড়িয়ে পড়েছে,—
বোতলটা আমিই পড়ে বাবার মধ্য উপটুর্বে ফেলেছি।
অল বখন দেখেই আধ পৌষানেক আছে, তখন শুকনো,
কাটা-কাটা মাটিতে বল শুবে বাছে দেখে, আমার হাঁস
হোলো যে, বোতলটা উলটুয়ে গেছে,—আগে টের পাই নি।

কসাকরা চলে বাবার হুহুর্কে যে ভয়ঙ্কর নিরাশা, যে
জমে-বাওয়ার তাব আমার মনে এগেছিল, তা কি কখনো
তুলবে? আমি চোখ দুটো আধ-বোঁধা করে মড়ার মত
পড়ে রইলাম। বাতাসটা ঘুরে-ঘুরে বইতে লাগল,—
একবার পরিষ্কার, একবার দুর্গন্ধতরা—আর আমার গ্রাণ
যেন বেরিয়ে যেতে লাগল। আমার সবটাই অকথ্য
রকমের বীভৎস চেহারা হয়েছে। আমি একবার চোখ
যেলে তার মিকে চুরি করে তাকাতো গিয়ে তব বেয়ে
দিয়েছি। তার দুখ বলে পরাধটা ভেঁই;—পেটা হাড়
থেকে বসে গিয়েছে। সেই বাঁচ-বে-করা, সুনতুনই
হাসছে—যেন কতগুলো আমার বেব-মনকে বিহ্বালী করে
তুলছে। আমি (বখন ভাতারী পড়তাম তখন) ঐ রকম
অনেক মড়া বেঁটেছি কটে, কিন্তু তবুও এই চক্চকে-বোতান-
খাঁটা, দুহুহর-পোষাক-পরা এই মড়াটা দেখে যেন আমার
গা শিউরে উঠেছে। আমি তাৎপাশ “এরি না বহু
এই মড়াটা তারি আলস চেহারা।”

হুঁহা মশাই প্রতিদিনের মত আমার তাড়িয়ে (পুড়িয়ে)
কট-সঁকা করে তুলছেন। আমার হাতদুট আর দুখট
ত ফোড়ার পরিণত হয়ে গেছেন—কিন্তু আর নাই। যেটুকু
অলও বা দিল, তাও খেয়ে রেখেছি। পাগল-কবে-সেওয়া
ভেঁই পেয়েছিল, তাই মনে কবেছিলুম, এক চুপক মাজ

ধাব,—কিন্তু এক চোঁকেই, বা বাকী ছিল, সবটুকুই খেয়ে ফেলেছি। উঃ! কশাকগুলো এখন কাছে এসেছিল, তখন কেন চোঁচাই'ন? ওরা যদি তুর্কী হত, তা হলেও ত এর চেয়ে ভাল হত! তারা আমার দুর্গট, কি বড়-বোঁর ভিত ঘটা কই দিত; কিন্তু এখন, জানিনে ত কতক্ষণ ধরে এখানে বসুণার হুটকট কর্তে হবে। মাগো, আমার মননী! তুমি যদি জানতে আমার কি দশা হবে, তা হলে এই বুকো বরষে তুমি তোমার চুল ছিঁড়তে, মাথা খুঁড়তে, আমার অমূল্যকণ কোন হতেই শুভ বলতে না.....আর যে বাহুবাক বসুণা দেবার মত্রে এই দুই জিনিসটার মধ্য দিয়েছে, তাকে তুমি শাপাত কর্তে। বা আমার দেহময়ি! আমার আর বিদায় দাও! মাশা, শ্রিয়তমে, আমার বড় আদরের ধন তুমি,—তুমিও আমার বিদায় দাও! ওঃ, কি ভয়ানক কই!

আবার সেই কুহুরটাকে দেখতে পাচ্ছি। সেই ডোমটার তার উপর একটুও মায়া হয় নি; বরং উন্নিরে সে তার মাথাটা একটা দেয়ালের উপর ঝোঁরে ঝুঁকে, তাকে (বেঁচে থাকতে থাকতেই) একটা বাড়ীর সামনের আঁতা-কুড়ের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কুহুরটা তার ভিতর একদিন বেঁচে ছিল। কিন্তু আমি.....আমি সেটার চেয়েও হতভাগা,—আমি যে এর মধ্যে তিনদিন কই পেয়েছি। কালকে চার দিন হবে—তার পর পাঁচ, তার পর ছয়...

যহ, তুমি কোথায়? এস! আমার নেও। ডাকছি.....কিন্তু বসও আসে না, আমার নেও না। আর, আমি এই ভীষণ-রোমে পড়ে আছি—এক কোঁটা মলও নেই যে, মলে-পুড়ে-বাওয়া ছাতিটাকে ঠাণ্ডা করি। তার উপর একটা মড়ার দুর্গন্ধে শরীর বিবিধে উঠছে। মড়াটা ত একেবারে পচে উঠেছে,—বলা, গলা একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া ও আর কিছুই নাই। এখন শুধু হাড় কথানি আর পোষাকটা হয়ে বাবে, তখন আমার পাশা আসবে। আমিও ঐ রকমটা হব।

দিনটা কেটে গেল, রাতও কেটে গেছে। নতুন কিছুই ঘটে নি,—সেই একই রকম চলেছে। আবার সেই একই রকম করে নতুন দিন ভোর হচ্ছে—কেটেও বাবে তেমন কিছুই।

তোমার বাতাসে ঝল-হবে তঁরা বোঁপগুলো বেন

শব্দ শব্দ করে, কিস্কিন্স করে বুলছে “তুই ময়ি! তুই ময়ি! তুই ময়ি!” গমিস্কার বোঁপগুলো বেন উত্তর দিচ্ছে, “তুই দেখতে পাবি না! তুই দেখতে পাবি না! তুই দেখতে পাবি না!” আমার কাণের কাছে কে বেন চেঁচিয়ে বলে “আ, তোরা আর ওদের দেখতে পাবি না!” আমি চমকিয়ে উঠে একেবারে টুন্টনে রক্তমের সচেতন হলাম। কোণের ভিতর দিয়ে আমাদের নায়ক বাকোফের শাব নীল চোখের দৃষ্টি আমার উপর এসে পড়ল।

সে চেঁচিয়ে বলে, “ওরে, কোবাল নিয়ে আর; এখানে তুর্কীদের আরো ছুটা পড়ে আছে।”

আমার মত্রে কোবালেশের বরকার নেই, আমার কবর দিতে হবে না; আমি বেঁচেই আছি। আমি চোঁতে গেলাম; কিন্তু একটা অশ্রুট কাতরানি ছাড়া আর কিছু আমার তেঁটের-গুকিয়ে-কেটে-বাওয়া মুখ থেকে বেরলো না।

“মায়ে রানো! এটা যে বেঁচে! ওরে, এটা যে আমাদেরি আইভ্যানক! আরে, বেঁচেই আছে! আর, তাই সব, আর! আমাদের বাবু-সাহেব বেঁচে আছেন, ডাক্তার ডাকা থাক!” তার পরেই তারা ত্রাতি, মল আরো কি সব নিয়ে আমার মুখ ধুয়ে দিল। তার পর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার দ্বারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা এমন আন্তে-আন্তে, তালে-তালে পা কেলছিল যে, আমার খুব আত্মীয় বোধ হচ্ছিল, আর খুব পাচ্ছিল। আমি একবার করে আগছিশাম, আমার ঘুঁচ্ছিলাম। আমার বা বাঁধা হয়ে গেছে, তাই আর বসুণা দিচ্ছে না। আর আমার সবত শরীরে যে কি রকম একটা আত্মীয় বোধ হচ্ছে, তা বলা যায় না।

“ধা আ—আম্; ধা আ—মা!” নতুন একবল এসে আমার দোলনাটা তুলে নিলে।

আমার নিয়ে যাবার রেলের সদায় হ'ল পিটার আইভ্যানোভিচ—আমাদেরি রেলের আর একজন নায়ক, লম্বা, হিপ্পিমে চেহারা তার, কিন্তু মায়াসিবে ভয়ে-মায়াব। ও এত লম্বা যে, যদিও আমি প্রায় কাঁধে চড়েই চলছিলাম, তবুও উপর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে থেকে, তবে আমি এখনও ওর কাঁধ, তার পর মাথা, তার পর লম্বা, খোঁচা দাড়ী সমেত ওর মুখটা দেখতে পেলাম।

আমি নরম হয়ে আস্তে আস্তে বললাম, "পিটার আই-
ভ্যানোভিচ?"

গে নীচু হয়ে বলে, "কি রে তাই?"

"ডাক্তার কি হয়ে তোকে? আমি কি শিশুপির মর্জ?"

"কি বস্তু! তুই. আইভ্যানোভ? তুই বহুবি কেন?"

তোর সে রকম কিছু হয় নি ত! তুই মর্জি না। তোয়
আজ্ঞা কপাল-মোর ঘা'রো'ক কিন্তু। একটা হাড় তাকে
নি, কি পির হেঁড়ে নি। কিন্তু তুই কি ক'রে এই সাত্বে
তিন দিন কাটা'দি? কি খেলি?"

"কিছু না।"

"কলও না?"

"তুর্কীটার জলের বোতলটা নিয়ে নিজেছিপস! আর
কথা বলতে এখন পাবছি না পিটার আইভ্যানোভিচ—সে
সব শরে বসু।"

"আজ্ঞা, তাই, আজ্ঞা! পরেই বলিস। তুই এখন
ঘুমো একটু।"

আবার ঘুম—আর সব ভুলে যাওয়া!

বখন ঘুম তারল, দেখি, আমাদের হাসপাতালের তাঁবুতে
ওয়ে আছি। আমাদের চারিদিকে ডাক্তার আর নার্স
আমার ঘিরে ঠাঁড়িরে আছে—তাদের মধ্যে সেন্টপিটার-
বার্গের নামজাদা আমাদের এক ডাক্তার অধ্যাপককে
সেধতে পেলাম। তিনি আমার উপর উণ্ডু হঠে কি
করছেন—হাত তাঁর রক্তে তরে গেছে। আমার পা
সেধতে বেস্টিকশন সময় তিনি মিলেন না। আমার দিকে
ফিরে বলেন, "তগবানু তোমার পূর্ব দগা করেছেন বাপু,—
তুমি এ খাড়া বেঁচে গেছে। আমরা তোমার একটা পা শুধু
বায় করে নিয়েছি, নিতে হ'ল তাই—তা সে রকম কিছু
না ও! এখন কথা বলতে পার?"

হা পারি বৈ কি। শুধু বসুতে পারি, তা নয়—
এই একগুলো কথা,—এই সাহা ইতিহাসটাই ত
বলছি।

সাময়িকী

এবার এই শুদ্ধ-সুইডের ছুটিতে আমাদের বেশে চারিটা
কনকারেন্স বা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে
তিনটা ধাম বাঙ্গালা দেশে,—আর একটা উড়িষ্যা দেশে
হইলেও তাহাকে বাঙ্গালার খোদাই ধরিয়া লইতে হইবে;
কারণ সেটা উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্মিলন। অপর
তিনটার মধ্যে একটা হাওড়ার সাহিত্য-সম্মিলন; দ্বিতীয়টা
ময়মনসিংহের প্রাথমিক সম্মিলন; তৃতীয়টা বাশোহর
নড়াইলের বকীর কারব-সম্মিলন। ময়মনসিংহের সম্মিলন
রাজনীতিক; তাহাতে রাজনীতির আলোচনা হইয়াছিল;
তাহার বিশেষ বিবরণের লত সংবাদ-পত্রের উপর বহুত
দিয়াই আশ্রয় কাঁচা দেখ করিতে পারি। নড়াইলের
বকীর কারব-সম্মিলন সবচেয়ে এইটুকু বলিতে পারি যে,
সেখানে অনেক কারবের শুভাগমন হইয়াছিল। নড়াইলের
বাদালা-বিখ্যাত লম্বিয়ার রায়-বংশ বনিহানী মহ; আদহ-
অভ্যর্থনার ক্ষেত্র সেখানে হওয়া সম্ভবপর নহে। সভার
কারব-মাত্রি উন্নতিমূলক বক্তৃতা ও সিদ্ধান্তও হইয়াছিল।

বরণের কথাও উল্লেখিলাম। প্রায় এক শত জন অস্থায়ীত
কারব-সভান উপযীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার
প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সম্মিলনে রাজনীতিক কথার
আলোচনা হইয়াছিল; তবে তাহার সঙ্গে মডারেট ও
একটু মিষ্টের সন্ধক নাই। উড়িষ্যা একেবারে পাটনা-দাখিল
হওয়ার অবস্থি আলোচনা হইয়াছিল,—উড়িষ্যা ও প্রবাসী
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সত্তা-বুদ্ধির আলোচনা হইয়াছিল,
শিক্ষা-বিজ্ঞানের কথা হইয়াছিল।

তিনটা সম্মিলনের কথা ত দুই কথাতই সারিলাম;
কিন্তু বকীর সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ দুই কথায় সারিবার
উপায় নাই। যে সম্মিলনের সভাপতি ঐশ্বক সার আন্ত-
তোষ মুখোপাধ্যায় লরবতী মহোদয়, যে সম্মিলনে অনেক
সাহিত্য-রতীর সভায় হইয়াছিল, যে সম্মিলনে বিভিন্ন
শাখার সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান সবচেয়ে প্রবন্ধ পাঠ
ও গবেষণা হইয়াছিল, যে সম্মিলনে দুই সাহিত্য-সেবীদিগের

এর সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে সন্নিহনের রক্ত ছব-সাত-লাভার টাকা, এই মহাব্যতির দিনেও ব্যয় হইয়াছে,—সে সন্নিহনের বিবরণ চুই কথার বলিলে বড়ই অজ্ঞান—ইংরাজীতে ব্যয়কে বলে injustice—করা হয়। কিন্তু নানা কারণে সফল কথা বলা যায় না। আমরা দশাধি, বিবাস-বিশ্ববাসকে বড়ই ভয় করি। এবার সন্নিহন উপলক্ষে ঐ সফলের বড়ই প্রাচুর্য্য হইয়াছিল; প্রত্যয় বিশেষ বিবরণে কাজ নাই। সন্নিহন যে হইয়া গেল, ইহাতেই আমরা আনন্দিত। তবে, বাহ্যিকের চেটা, বস্ত্র ও অধ্যাপনারমলে কার্য্য হইয়া গেল, তাঁহাদিগকে হরণ করাইয়া দিই—“সেহাংসি বহু বিদ্যাশি।”

সন্নিহনের প্রধান সভাপতি ঐহুক সার আভাতোব সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ তাঁহার ভ্রাতৃ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরই উপহৃষ্ট হইয়াছিল; যেমন ভাবা, তেমনি ভাব, তেমনি বিষয়-নির্বাচন। শাখা-সভাপতিগণ সকলেই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তাঁহাদের অভিভাষণও অতি সুন্দর হইয়াছিল। বিভিন্ন বিভাগে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ কম আসে নাই;—কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য, কোন প্রবন্ধই আগাগোড়া পড়া হইবার সময় ছিল না; এক নিঃশ্বাসে সাতকণ্ড ভাষার পাঠ হইয়া বাইতে লাগিল। প্রবন্ধের অদ্ভুত বাগাই হটক, প্রবন্ধ-পাঠকগণের সুখে বিরক্তির হুস্পট বিভ্রাৎ দেখিয়া আমাদের সভা-সভাই বড় ভট্ট বোধ হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়গণকে শু শুদ্ধি সময়ের মধ্যে ‘কাইল স্লিয়ার’ করিতে হইবে;—তাঁহারাও বা কি করেন!

ইতিহাস-বিভাগে দুইটা গ্রন্থ লইয়া বেশ আলোচনা হইয়াছিল। দ্বিতীয়—মহাকবি কালিদাস কোন্ দেশের লোক?—এই কথা লইয়া আলোচনা। দ্বিতীয়টী—যেখানে সন্নিহনের অধিবেশন হইল, সে স্থানের নাম হাবড়া কি হাওড়া? পণ্ডিতবর ঐহুক মহাশয় কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক কৃতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চান এবং সভার উপস্থিত স্নবিদ্যাকে তর্ক-সমরে আস্তান করেন। অনেকেই এই বাঙ্গালীবাদে যোগদান করেন। কিন্তু সময়-যোখ্যার পূর্বে পর্য্যন্তও এখন প্রতিপন্ন প্রকৃত ছিলেন না, তখন বাঙ্গালীবাদ

বহাবৎ হয় নাই এবং হইতেও পারে না। আমরা সেই অল্প ঐহুক কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতাগুলির সার মর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি; প্রতিপক্ষের এই সফল বক্তৃতির বিরুদ্ধে কি বক্তব্য আছে, তাহা সংবাদপত্রের মারফত প্রকাশ করিলে, কাব্যতীর্থ মহাশয় বা তাঁহার পক্ষীয় পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিতে পারেন। আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে তাঁহাকে একটা কথা বলিতে চাই। তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা বোখাইয়াছেন, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি হইতে তদনুসৃত শ্লোক বা কথা (chapter and verse) উদ্ধৃত করিয়া দিলে সাধারণ লোকের কথাগুলি ও বক্তৃতা বৃদ্ধিবার সুবিধা হয়। এক্ষণে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতাগুলি নিবেদন করিতেছি।

১। কালিদাস এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। সিংহলের পুস্তকালয়বাসী তাঁহার নিবাস “কালিকাপুরীতে” ছিল। কালিকাপুরী ৮কালিঘাটের নামান্তর।

২। তাঁহার রচনায় ভাব, ভাষা, রূপ ও বৌদ্ধিক শব্দ, চলিত কথা এবং ছেগো কথা প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষা হইতে অনুবাদিত। তিনি গ্রীষ্মকাল হইতে বর্ষাদি এবং সৌর মাস গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্মে বসন্তকালে বর্ষাদি এবং চাত্রমাস প্রচলিত।

৩। তিনি রত্নরূপ বিগ্‌বিহার “রাড়” বেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আসামে সমাপ্তি করিয়াছেন; অব্যাহার উল্লেখ করেন নাই। কালিদাস ও রত্ন “শাদি” ধানের ভাত ও গাটালি শুদ্ধ খাইতেন; ছাত্ত, ছুটা বা মকাই খাইতেন না।

৪। কালিদাসের প্রচারিত বাঙ্গালা বর্ণমালা বা “মাতৃকা ধর্ম্মাবলী” বিকৃত হইয়া এক্ষণে যেমনাগর ধর্ম্মমালা হইয়াছে। তাঁহার লক্ষ্যভ্রমিতে গোপজাতি অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহার গ্রন্থে বিষ্ণুও গোপ-বেশ পরিগ্রহেছেন। বিষ্ণুর গোপ-বেশ বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত।

৫। আবার গ্রন্থের মাহত্বের আলোচ-ব্যবহার, চরিত্র, মনোবৃত্তি ও কৃত্তিকর ত্র্যাদি সমস্তই বাঙ্গালীরই মত। বাঙ্গালীর গ্রন্থে ছড়ার ও উপকণার তাঁহার নামের আধিক্য পাওয়া যায়।

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল, সম্মিলন-স্থানের নাম হাবড়া, না হাওড়া? একজন ভক্তলোক হাওড়ার ইতিহাস আলোচনা করিলেন, কিন্তু নামতত্ত্ব সত্বে কিছুই বলিলেন না। প্রশ্ন উপাধিত হইলে কেহ বলিলেন, হাবড়া নামই ত বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্থানের নাম সইয়া অগ্রসরত ভাবে তখন-তখনই আলোচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, —বিশেষ অল্পমন্ডানের প্রয়োজন। হুর্দাধাক্রমে আমরা তখন সভামধ্যে উপস্থিত ছিলাম। সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই নামতত্ত্ব সত্বে অভিব্যক্ত প্রকাশ করিতে সহসা অনুরোধ করিয়া বলিলেন। ঐহায়া সমাজিক, তাঁহার্য হর ত ছুই-চারি কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু নামতত্ত্ব, বিশেষতঃ হাওড়ার নাম-তত্ত্ব ত আমার এককবারে অজ্ঞাত সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অমান্য করাও যায় না। তখন উপস্থিত-মত বাহা মনে আসিল, তাহাই নিবেশন করিয়া কোন প্রকারে অব্যাহতি লাভ করিলাম। আমার বক্তব্য এই যে, হাওড়া ট্রেন হইতে রেলগাড়ী ছাড়িবামাত্র পথের দুই পার্শ্বে অনেক ধূস পর্বত জল-কামাণ্ডু স্থান দেখিতে পাওয়া যায়,—চলুতি কথায় এই প্রকার ভূমিকে ‘হাওড়’ বলে। আমার মনে হয়, পূর্বে এই সমস্ত স্থানই ‘হাওড়’ ছিল এবং তাহা হইতেই এ স্থানের নাম ‘হাওড়া’ হইয়াছে, হাবড়া নহে। সৌভাগ্যের বিষয়, স্থানীয় দুই-একজন ভক্তলোক এই কথার সমর্থন করিলেন। আমি হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং তবিত্যৎ গুরুতর বিপদের আশঙ্কায় সভাপন হইতে অভিব্যক্ত হওয়াই সুবোধের কার্য মনে করিলাম।

শেষ দিনের অধিবেশনে অনেক বিষয়ের আলোচনা ও বামাংগাদ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব সাহিত্য-সেবক-পথের স্তম্ভ ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠাই সর্বোৎকর্ষ উল্লেখযোগ্য। হাওড়া-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক বঙ্গবর শ্রীযুক্ত হুর্দাধাক্রম সাহিত্য মহাশয় অনেক দিন হইতে এই ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার স্তম্ভ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পূর্ববর্তী কয়েকটা সাহিত্য-সম্মিলনে এ সত্বে প্রস্তাবও উপস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্যে কিছুই হয় নাই। এবারের সাহিত্য-সম্মিলনে এই ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠা হইল; এবং অক্লান্তকর্মী শ্রীযুক্ত সার আভুতোব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন এই ভাণ্ডারের সভা-

পতির পর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ইহা যে স্বেচ্ছা সাধনী প্রস্তাবেই পর্যাবসিত হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা হইতে পারে। ঐহায়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের স্তম্ভ বহু চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারের সত্বেই আমার সর্বাত্মকরণে ধন্যবাদ করিতেছি।

সেমিন একটা সভার বক্তৃতা করিতে-করিতে শ্রীযুক্ত সার প্রমথচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, “আমাকে যদি চক্ৰিণ বড়ার স্তম্ভ এ দেশের রাজ্যতায় দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমার প্রথম কাজ এই হয় যে, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষাটা দশ বৎসরের স্তম্ভ বন্ধ করিয়া দিই এবং আইন কলেজের অট্টালিকা সম্বন্ধি করিয়া বেশি।” উকিলের সংখ্যা যে প্রকার বাড়িয়া দিয়াছে, এবং আইন-কলেজে যে প্রকার ছাত্রাধিকা হইয়াছে, তাহাতে কথাটা নিতান্তই অসঙ্গত নহে। ঐহায়া আইন-আদালতের ধবর রাখেন, তাহার্য জানেন যে, বার-বাইরেই উকিলের স্থান সংকলন হয় না। উপার্জননের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে বলিতে পারি, অনেক উকিলের কাঁছারীতে বাতায়তের গাড়ীত্যা পর্বত বহু হইতে দিতে হয়। এ অবস্থা জানিয়া-গনিয়াও মনে-মলে ছাত্রগণ আইন-কলেজে প্রবিষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহার্য আট বিভাগে পড়ে, তাহার্য বি-এ এন্ড-এ পাশ করিবার পর দেখে যে, তাহার্য এককাল যে কৃত্তর ব্যাপার গিয়াছে, তাহাতে তাহার্যমিপকে কোন বিবরণে লায়েক করিতে পারে নাই; সংসার-সংগ্রামের স্তম্ভ কোন বিভাগে তাহার্যের শিক্ষা হয় নাই; এক আইন কলেজ ব্যতীত তাহার্যের আর কোন পথ নাই। কাজেই তাহার্য আইন-কলেজে প্রবিষ্ট হয়। এমিকে বাহার্য বি-এসসি, বা এন্ড-এসসি হয়, তাহার্যের মধ্যে বাহার্যের সঙ্গতি আছে, মুক্করীর জোর আছে, তাহার্য কেহ বা বিবর্তকর্ম আরম্ভ করে, কেহ বা ভাল চাকুরী ঘোঁচাইয়া নয়; আর সকলে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া অবশেষে আইন-কলেজে যায়। তাহার্যের স্তম্ভ ত কোন পথই খোলা নেই! মহাবিশ্ব অবস্থায় ছেলের্য ব্যবসায়-বাণিজ্য বা বিজ্ঞান-আলোচনায় যে আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধাই পায় না। অধম-তারণ আইন বিভাগের ব্যতীত তাহার্য কোথায় বাইবে? তাহার পর বা থাকে কপালে! শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন না হইলে এবং মূলধন দিবার লোকের সস্তাব না হইলে, আইন-কলেজের অট্টালিকা সম্বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষতাল্লা এইত "আড়াই চান" কবিতা এখন লভ্যে
একালিত হইবে মূল্য ১০ টাকা।

শ্রীমুক্ত নারায়ণ চন্দ্র শুক্লোপাধ্যায় এইত "আকাশের দ্য" একালিত
হইয়াছে; মূল্য বাতোর আনা।

শ্রীমুক্ত অরবিন্দনাথ বর্দন-মাসিক এইত "মধু-চন্দ্র" একালিত হইয়াছে।
মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমুক্ত সত্যনাথায়ণ ঘোষণাধার এইত নূতন নাটক "হাওল বিদ্যব"
একালিত হইয়াছে; মূল্য বাতোর আনা।

বর্দন 'রমেশচন্দ্র' বস্তের "বাংলী কথোপকথন" নূতন সংস্করণ
একালিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমুক্ত হংসেন্দ্রনাথ রায় গৌহাটী এইত নূতন কবিতাপুস্তক
'অনবদিতা' একালিত হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা।

আর্ট আনা সংস্করণের ২য় সংখ্যক এই শ্রীমুক্ত মনমথ বেন এইত
"বিশিষ্ট কাকাতী" একালিত হইয়াছে।

একং তৎপদমতী সংখ্যক এই শ্রীমুক্ত কানীশনাথ দাসগুপ্ত এইত
"কেন্দ্র গণ" বহুত।

"কর্ণকোষ" এগেত। শ্রীমুক্ত লক্ষ্মীচরণ বেন এইত নূতন উপজ্ঞান
"কন্যাশ্রী" একালিত হইয়াছে। মূল্য দেড়টাকা।

অনন্দ-এগে তেপুটী ম্যাগাজিনে শ্রীমুক্ত চন্দ্রশেখর বর দি-এ কবিতা
বিস্তারিত "সেতাল-একাল" নামক কবিতা পুস্তকখানির এতি আখ্যায়
পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইয়া একেলে লভ্য হলে
বিস্তারিত হইয়া আশনার সেকালক প্রকাশ করিতেছে; অথচ একালের
সমস্ততার উহা পূর্ণ। কবিতাটি-এখন "পুণিমা" পত্রে একালিত হই;
একং সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।
দামত খুব সাধ্যাক্ত, যাম চারি আনা।

নিশেষ প্রস্তাব

এই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ'র ষষ্ঠ বৎসর শেষ হইল; আষাঢ়
হইতে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইবে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে যে সকল
পুরাতন গ্রাহক মূল্য প্রেরণ না করিবেন বা পত্রিকা প্রেরণের
নিবেদন না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আষাঢ় সংখ্যা ৬৯০ ছয়
টাকা দুই আনায় ভি, পি করা হইবে।

Publisher—Sudhansu Sekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurnadas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.



Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.